মৃত্যু-প্রতীক্ষায়

B. H. P. Works.

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

দ্বাদশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—পৌষ—১৩৩১—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচি

পৌষ—১৩৩১

বহুবর্ণ চিত্রসূচি

মাঘ—১৩৩১

বহুবর্ণ চিত্রসূচি

ফাল্গুন—১৩৩১

বহুবর্ণ চিত্রসূচি

চৈত্র—১৩৩১

বহুবর্ণ চিত্রসূচি

বৈশাখ—১৩৩২

বহুবর্ণ চিত্রসূচি

জৈ্যষ্ঠ—১৩৩২

বহুবর্ণ চিত্র

ভারতবর্ষ

পৌষ, ১৩৩১

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাদশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

বেদের কথা

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

বেদে সত্যসত্যই কি খাঁটি Physics আছে? যদি থাকে, তবে তাহার কাছে ঘাড় নোয়াইতে বিজ্ঞানসেবী সভ্য-জগতের কোনই দ্বিধা থাকিবে না, পাদ্রি সাহেবেরা অথবা ব্যাকরণের পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন না কেন। ফল কথা, দুর্ভাগ্য ইহাই যে, পশ্চিমের যে সমস্ত পণ্ডিত বেদের আলোচনা গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারা শব্দাম্বুধি যতই অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করিতে পারুন না কেন, নিউটনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রকৃতি-রহস্য-পারাবারের কূলে দুই চারিখানা শামুক-ঝিনুকও কস্মিন্‌কালে কুড়াইতে যান না। মাথায় আবার হয় ত কতকগুলি Metaphysical dogmas বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। এই সব Divinityর ডাক্তার ও Literatureএর ডাক্তারেরা বেদ লইয়া খাটিয়াছেন বিস্তর; ফলে বেদের পুঁথি কয়খানা সুগ্রাহ্য হইয়াছে; কিন্তু বেদের দুর্ব্বোধ্যতা ব্যাধির তাঁহারা যে চিকিৎসা করিয়াছেন, তাহাতে গোবদ্যির চিকিৎসার কথাই মনে পড়ে। একে আনাড়ীর চিকিৎসা, তার উপরে আবার চিকিৎসা-বিভ্রাট। সুতরাং পুরাতনী বেদবিদ্যার নাকালের আর সীমা পরিসীমা নাই। বড় বড় বৈজ্ঞানিকের মনীষা ও পরীক্ষা প্রবৃত্তি, এবং বড় বড় দার্শনিকের বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ-সামর্থ্য লইয়া তবে বেদের গায়ে হাত দিতে হয়। তোমার শব্দশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের চোখা চোখা বাণগুলা বেদের মর্ম্মস্থলে না বিঁধিয়া ঠিক্‌রাইয়া আসিবে, যেমন কিরাতরূপী মহাদেবের অঙ্গে ঠেকিয়া অর্জ্জুনের বাণগুলা ঠিক্‌রাইয়া আসিয়াছিল। যাস্ক ও সায়ণের শব্দশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য কম ছিল না; অনেক পূর্ব্বতন বেদ-ব্যাখ্যাতাদের উপদেশও তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছিলেন; তাঁহারা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা একরূপ অসাধ্য সাধন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু মানের গোলমাল অনেক যায়গাতেই মিটে নাই; যেখানে বা কোন রকমে মিটিয়াছেও, সেখানেও মানে শুনিয়া

মনে ঠিক তৃপ্তি হয় না—মনে হয়, কি যেন কি একটা ভিতরের রহস্য তাঁহারা ভাঙ্গিলেন না; আমরা মন্দাধিকারী বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা মুড়িমুড়কি দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন; অন্দরমহলের অমৃত ভোজে তাঁহারা আমাদিগকে পাতা পাতিতে দিলেন না। নব্যবিজ্ঞান অগ্রদূত হইয়া আমাদিগকে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িবার একটা ফন্দি করিয়া দিতেছেন; এইজন্যই নব্যবিজ্ঞানের একটু আধটু খাতির করিতে বলিতেছি। আমার মনে হয়, সায়ণ প্রভৃতি সাধ করিয়াই ভিতরের রহস্য সব যায়গাতে ভাঙ্গেন নাই। বৈজ্ঞানিক রহস্যের কথা বলিতেছি না, আধ্যাত্মিক রহস্যের কথা বলিতেছি। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি ব্রাহ্মণেই দেখিতে পাই যে, শিষ্টেরা যজ্ঞ, সাম, উদ্গীথ প্রভৃতিকে লইয়া কত রকমে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ভাঙ্গিয়া তলাইয়া দেখিতেন। উপনিষদ্গুলি পড়িয়া দেখুন, বৈদিক কর্ম্ম-কলাপ ও অনুষ্ঠান রাশির মর্ম্ম টানিয়া বাহির করিতে তাঁহারা কতই না তৎপর! এক উদ্গীথ বা প্রণব, তাহাকে কত ভাবেই না ভাবিতে হইবে! পুরাণ প্রভৃতি পড়িয়াও মনে হয়, যে মুনিরা ও ভাবুকেরা বেদের মোটা মোটা কথার ভিতর হইতে চরম অভিপ্রায়টি টানিয়া বাহির করিতে যত্নশীল ছিলেন। এই সব কারণে মনে হয়, গোড়া হইতেই বেদব্যাখ্যার সদর অন্দর দুইই ছিল। অথবা বেদবিদ্যা যেন সাতমহল একটা পুরী—দেউড়ির পর দেউড়ি পার হইয়া তবে ঠিক মাঝখানে গিয়া হাজির হওয়া যায়। যিনি বলেন, এ সব সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম ব্যাখ্যান আগন্তুক, অর্থাৎ ঋষিদের অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না, ক্রমশঃ পরবর্ত্তীকালে বেদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তিনি সেই অতি-চালাক গুলিখোরের মত বেদের আড্ডায় হামেশা যাতায়াত করিলেও বেদের আগা মাথার কোনই খবর রাখেন না। গুলিখোর সওয়াল-জবাবে বলিল- হাঁ, সে আড্ডায় আস্ত, বস্ত, গুলিটা আসটা খেত; কিন্তু তার মাথা ছিল কি না দেখি নাই। সেই রকম বেদমন্ত্রে নানাস্থানে অগ্নিকে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাধার, সর্ব্বপ্রকার বস্তুরূপে শুনিতেছি, অথচ সেই সব কথার সঙ্গতি ও নিগূঢ় তাৎপর্য্য উড়াইয়া দিয়া বলিব—ও অগ্নি আগুন ছাড়া আর কি, যাহাতে মন্তর আওড়াইয়া অকারণ ঘি ঢালা হইত! সোমরসের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন শুনিয়া মনে হয়, ইনি নিশ্চয়ই কেও-কেটা নহেন, জগতের মর্ম্মস্থানের কোনও চির-অধিবাসী, কিন্তু তবুও বুলি কপ্চাইতেছি, 'সোম লতার রস বই আর কিছুই নহে। দৃষ্টান্ত আর দিব কত—তোমার সরল ও মোটা ব্যাখ্যার মোহমুদ্গর স্বয়ং বেদই যে স্বহস্তে নানা যায়গাতে ব্যবহার করিয়াছেন! আমি বৈদ্যুতিক ব্যাখ্যা ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়া বেদার্থযন্ত্রকে বিপথে লইব কি, বেদার্থ-প্রকাশিকার চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিব কি, স্বয়ং বেদ যে নানা ছন্দে নানা ভঙ্গীতে বিদ্যুতের ছটা খেলাইতেছেন এবং অদিতি ও আত্মার রহস্য জল-অগ্নি প্রভৃতির ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া আমাদের বুদ্ধির দ্বারে তুলিয়া ধরিতেছেন। ইহাকে অস্বীকার করার কোনই উপায় দেখিতেছি না। যাহা হউক, আমার মুখের কথায় চিঁড়া ভিজিবে না, আমাকে ক্রমশঃ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আমার কেস্‌টাকে খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেবগণের মাতা অদিতি ঠাক্‌রুণের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিয়াছি। পরিচয় স্থাপন করিতে যাইয়া বেদের হেঁয়ালি নামক জিনিষটাকে আমরা জানিতে পারিলাম। বেদের শুধু দুটা চারিটা ঋক্ নহে, অনেক আদত সূক্তই ঐ রকম হেঁয়ালির ভাষায় লেখা দেখিতে পাই। বাইবেল, জেন্দ-অবস্তা প্রভৃতি অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্রেও এই হেঁয়ালির নিয়মটা অনুসরণ করা হইয়াছে। বাইবেলে এই গুলিকে প্যারাবল্ বলে। প্রাচীনেরা এই সব সটহ্যাণ্ডে লিখিতেন এবং সম্প্রদায়ক্রমে তাঁহাদের দপ্তর চালাইয়া দিতেন। এই সব হেঁয়ালি শুনিলে সতর্ক ও সাবধান হইতে হয়, অসহিষ্ণু ও উপহাস-রসিক হইলে চলিবে না। অদিতি ও দক্ষকে লইয়া যে হেঁয়ালি, তাহার সমাধান করিতে যাইয়া আজ বিজ্ঞানের বড় একটা সহায়তা পাই নাই। ইহা একেবারে গোড়ার রহস্য কি না। আবার অনেক হেঁয়ালির সমাধানে বিজ্ঞানই আমাদের কাজে লাগিবে। আপাততঃ গোড়ায় গিয়া হাত দিতে পারিলেন না বলিয়া বিজ্ঞানের মনস্তাপের কোনই কারণ নাই। ভালর জন্যই হউক আর মন্দর জন্যই হউক, বিজ্ঞান এখনও পরদা দিয়া ঘেরিয়া জগতের হিসাব লইতেছেন, রিহার্স্যাল শুনিতেছেন; এ কথা হেন্‌রি বার্গসোঁ কেন, ম্যাক্ পোয়াকারে প্রভৃতি অন্তর্দৃষ্টি-

সম্পন্ন বিজ্ঞানাচার্য্যগণও স্বীকার করিয়া যাইতেছেন। দেশ লইয়া, কাল লইয়া, ঈথার লইয়া এবং শক্তি লইয়া বিজ্ঞান কারবার জুড়িয়া দিলেন এবং ময়দানবের মত একটা মায়াপুরী গড়িয়া তুলিলেন, কিন্তু একটিবার জিজ্ঞাসা করিলেন না যে, দেশ, কাল, ঈথার—এ সব সত্যসত্যই কি? বেদ বিশ্বকর্ম্মার ভুবন নির্ম্মাণ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—কিসের উপর দাঁড়াইয়া বিশ্বকর্ম্মা এই ভুবন ধারণ করিয়াছেন? তেমনি বিজ্ঞানেরও জিজ্ঞাসা করা উচিত হইতেছে—কিসের উপর দাঁড়াইয়া দেশ, কাল ও গতি তাঁহার মায়াপুরী গড়িয়া দিল? সকলের গোড়াটি কি? ইহাই অদিতি সম্পর্কীয় প্রশ্ন, এবং বিজ্ঞান এখনও এ প্রশ্ন তুলিতে সাহস না পাইলেও, বেদ ইহা তুলিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে ভাবিয়াছেন। বিজ্ঞানেরও বোধ হয় অচিরাৎ সে ভাবনা ভাবিতে হইবে। ইউক্লিডের জ্যামিতিখানাকে পত্তন করিয়া বিজ্ঞান সব গড়িয়া আসিতেছিল, কিন্তু সে বনিয়াদ বড়ই ঝুঁকিতেছে। বাহিরের দেশ, কাল, ঈথার বুঝি সব সুড়্ সুড়্ করিয়া ভিতরে আসিয়াই স্থির হয়! অর্থাৎ যেগুলাকে এত দিন বস্তু ভাবিয়া বিজ্ঞান নিশ্চিন্ত ছিল, সেগুলা সব Concept (ধারণা) মাত্র হইবার দাখিল হইয়াছে। তাহা হইলেই চিদ্রূপিনী মাকে আর ভুলিয়া থাকা চলিবে না। যে অনুভব বা Experienceই গোড়ায়, তাহার তল্প-তাল্লাস বিজ্ঞানকে লইতে হইবে। মায়ের কোলে উঠিতে পারিলেই বিজ্ঞানের বেদত্ব, আর বেদ ও রহস্যের গুহ্য অথবা শিব জটাকলাপ হইতে নামিয়া আসিয়া জাহ্নবী-ধারার মত আমাদের সাধারণ প্রত্যক্ষ-অনুমান, জ্ঞান-বিশ্বাস-গুলিকে নির্ম্মল করিতে পারিলেই, তাঁহারও বিজ্ঞানত্ব। আমরা এখন তাঁহার হেঁয়ালির মর্ম্ম বুঝিতেছি না, বুঝিলে বেদই বিজ্ঞান হইবেন। থাক্—তার ত এখনও দেরি দেখিতেছি।

এবার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না বলিয়া তাহাই পাড়িয়া আপনাদিগকে গলদ্‌ঘর্ম্ম করিয়া তুলিয়াছি। আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধগুলার উদ্দেশ্য কিন্তু অন্যরূপ। আধিভৌতিক দৃষ্টিতেই আমরা প্রধানতঃ পথ দেখিয়া চলিব। তবে কোন্ মহাতীর্থ এ পথের অবসানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির-চূড়ার মত আমাদের সংশয়ক্লিষ্ট ধূলি-ধূসরিত মুখের পানে আশ্বাস ও অভয়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহাই একটিবার দেখিয়া লইবার জন্য পথের মাঝখানেই মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম। নহিলে যে "পথের ধূলায় অন্ধ" হইয়া আমাদিগকে অপরা-বিদ্যার খানাতেই পড়িয়া থাকিতে হইবে। অদিতির মহামন্দির আমাদের পথ দেখাইলেন। দেখিলাম, ব্রহ্মে বা আত্মাতে গিয়াই নিখিল শ্রুতিরহস্যের পর্য্যবসান। আগামী বারে অগ্নি-পরীক্ষা। অদিতির ডাক শুনিয়াছি, সুতরাং বিজ্ঞানের দিক্ হইতে অগ্নিপরীক্ষা করিতে যাইয়া বোধ হয় লঙ্কাকাণ্ড করিয়া ফেলার আর ভয় রহিল না।

নবান্ন

শ্রীরামেন্দু দত্ত

হেম শস্যের আঁটি-বাঁধা শীর্ষে হেমন্ত, হেম-অর্ঘ্য বয়,
পদ্মালয়ার সলিল সদ্ম চলিছে রচিয়া পদ্মচয়!
চন্দনা আজি নান্দী পঠিয়া বন্দিল কা'র চরণ তল!
ফুল-সুগন্ধে নন্দিতে অই নয়ন মেলিল চম্পাদল।
ধন-ধান্যের আশীষে ধন্য, সন্তান আজি হাস্য-মুখ,
গৃহে গৃহে তাই লাগে উৎসব জাগে প্রাণে প্রাণে প্রসাদ সুখ!
মর্ত্ত্যে আজিকে মূর্ত্তি ধরিয়া ত্রিলোক-পালিনী বর্ত্তমান,
চারি করে অই—ধৃত পঙ্কজ, শোভে অঙ্কুশ, অভয়, দান!
কুটীরে কুটীরে লুটায়ে আজিকে কমলার পদ-আলিম্পন,
কেমনে যে পায় মণি-কাঞ্চন জননী কৃপায় অকিঞ্চন!
সুনীল আকাশে আলোক-মালায় ঐ খেলে যায় মধুর হাসি,
জ্যোৎস্না সুধার উৎস খুলিয়া উৎসবে ঝরে অমিয়া রাশি!
নিঃস্ব যে আজি, দু'মুঠা শস্য উঠিছে কেমনে তাহার-ও ঘরে!
অতরু মরুর ঊষর বক্ষে লক্ষ্মীমায়ের চরণ পড়ে!
কোথা নিরন্ন, আছ বিষণ্ণ, এস এস আজ আঙিনা তলে,
অন্নদা মা'র অন্নের কুটে অবিরত পরিবেষণ চলে!
জলে গৃহে গৃহে দীপমালা আজি মঙ্গল-শাঁখ বাজিয়া উঠে,
তরুলতা যত ভোগ-লোভাতুর মেলিছে আপন পর্ণ-পুটে!
মাথায় লেগেছে ধান্যের কুটি সারা গায়ে মাখা মাঠের ধূলি,
বসেছে বাঁশের বাঁশীটি লইয়া, কৃষক, ধরার ভাবনা ভুলি'।
আজি নবান্নে নূতন ধান্যে পরমান্নের পূর্ণ থালা
বিতরিয়া দেন অন্নপূর্ণা সাজি' বদান্য পল্লী-বালা॥

দানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২৫)

সত্যই সকালের ট্রেণে মনীশ ও মৃন্ময় ও ঊষা আসিয়া পৌঁছিল। ঊষা পিতাকে জীবিত ভাবিয়াই আসিয়াছিল,—পিতা নাই শুনিয়া সে হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিবাহের পর চার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে সে পিতাকে আর দেখিতে পায় নাই।

মনীশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; মৃন্ময় বাহিরের বারাণ্ডায় একখানা চেয়ারে নীরবে বসিয়া রহিল। উমা খানিক আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর ঊষার হাত ধরিয়া উঠাইয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "কাঁদিস নে ঊষা, বাবা গিয়েছেন ভালই হয়েছে। আমি একটুও কাঁদি নি দেখছিস।"

ঊষা কাঁদিয়া বলিল, "তুমি কাঁদবে কি দিদি, তুমি তো বাবার কাছেই ছিলে, বাবার সব কাজই তুমি করতে পেয়েছ, আমি যে কিছুই করতে পারলুম না, একবার যে শেষ দেখাটাও দেখতে পেলুম না।"

উমা তাহাকে টানিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাহার এক বৎসরের ছেলেটীকে কোলে লইয়া মনীশের কাছে আসিল, "ঘরে চল মনীশ-দা, উঠোনেই দাঁড়িয়ে রইলে যে।" তাহার পর একটু হাসিয়া বলিল, "তোমরা দৃঢ়চিত্ত পুরুষ বলে অহঙ্কার কর, কিন্তু আমি দেখছি এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে গর্ব্ব করা। তোমরা যদি সত্যিই তাই হও—তবে দৃঢ়তা আনো তেমনি, সব উড়িয়ে দাও। তোমরা এমন করলে আমরা যাই কোথা?"

মনীশ বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে চাহিল, কোনও কথা কহিতে পারিল না।

উমা বলিল "মৃন্ময় কোথা মনীশ-দা?"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনীশ বলিল "বোধ হয় বাইরে।"

উমা বলিল, "তাকে দেখা শোনা করা তোমার কাজ মনীশদা,—আমি কিছু ঠিক করতে পারছি নে, কি করতে হবে এখন আমায়। আমার মাথারই মোটে ঠিক নেই। এর ওপরে ঠাকুরমার জন্যে ভারি ভাবনা হয়েছে। কাল হতে তিনি কেবলই অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন। তাঁকে এত বুঝাবার চেষ্টা করছি, কিছুতেই বুঝাতে পারছি নে। আমি আবার তাঁর কাছে চললুম মনীশদা, তুমি এ দিককার সব দেখ।"

উমাকে মনীশ যতই দেখিতেছিল, ততই যেন আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছিল। পিতার শ্রাদ্ধের দিন যতই কাছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার পূর্ব্ব দৃঢ়তা ফিরিয়া আসিতে লাগিল, সে দিনরাত খাটিতে লাগিল।

মৃন্ময় মনীশকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল, "উইলের কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলে মনীশ ?"

মনীশ বিরক্ত ভাবে মাথা নাড়িল "না।"

মুহূর্ত্তে কঠিন হইয়া গিয়া মৃন্ময় বলিল, "কিন্তু মনে করে দেখ মনীশ, আমি আসতে চাই নি, তুমিই আমায় নিয়ে এলে।"

মনীশ বলিল "বেশ মনে আছে মৃন্ময়, সে কথা আমি ভুলি নি। আমি ভেবেছিলুম, কাকা বেঁচে আছেন,—শেষ সময়টায় তাঁর মেয়ে জামাই সকলকে দেখানোর উদ্দেশ্যেই আমি তোমায় জোর করে নিয়ে এসেছি। উইলের কথা আমি বলব উমাকে, কিন্তু মাপ কর ভাই, শ্রাদ্ধটা আগে শেষ হতে দাও, তার পরে।"

মৃন্ময় বলিল, "শ্রাদ্ধ শেষ হলে তার পরে তুমি কথা তুলবে? আশ্চর্য্য কথা। যদি কথা তুলতে হয় তবে এখনই তোলা উচিত। বিধবা মেয়ে সম্পত্তির অধিকারিণী হতে পারে না; মাসে মাসে কিছু সাহায্য পেতে পারে, এইমাত্র তার দাবী। দৌহিত্র যখন রয়েছে, তখন আইনতঃ সেই বিষয়ের যথার্থ উত্তরাধিকারী, তা তো জানো ?"

মনীশের মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। সে একটু থামিয়া বলিল, "তা আমি জানি, কিন্তু মৃত উইল করে গ্যাছেন—"

বাধা দিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মৃন্ময় বলিল, "সে উইল ন্যায়সঙ্গত নয়। তুমি আমায় কি বুঝাতে চাও মনীশ,—আমি ও-সব জানি। আমি বেশী দিন থাকতে পারছি নে, আজই কাজটা মিটে যায় যদি, আমি আজই চলে যাব। আমার হাতে অনেকগুলো রোগী আছে তা জানো।"

মনীশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমায় তুমি শাসাচ্ছ কি মৃন্ময়? আমি তার বাপের বন্ধুর ছেলে, এই মাত্র সম্পর্ক। এ নিয়ে তুমি আমায় কোনও কথা বলতে পার না। তোমার আত্মীয়া,—বরং তোমার জোর আছে,—আমার কথা বলবার অধিকার নেই। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি নিজেই বলতে পার। আমায় বলতে বলছ, আমি একবার কথাটা তাকে শুনিয়ে দেব এই মাত্র,—এর বেশী আর কিছু সাহায্য তুমি আমার কাছ হতে পাবার আশা কোরো না।"

সে সরিয়া গেল। মৃন্ময় আপনার মনে শুধু গর্জ্জন করিতে লাগিল। মনীশকে আর কোনও কথা বলার সাহস তাহার হইল না।

খোকাকে কোলে লইয়া উমা তখন আদর করিতেছিল, ঊষা নিকটে বসিয়া ছিল। স্বামীর নিকট হইতে বারম্বার সে খোঁচা খাইতেছিল, যেন উইলের কথাটা উমার কাছে তোলা হয়। ঊষার মনেও একটা বিরুদ্ধ মত জাগিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সাহস করিয়া সে কথা পাড়িতে পারে নাই।

আজ কথাটা বলিবার জন্য তাহার অন্তরটা ছটফট করিতেছিল; তাই সে একেবারেই বলিয়া বসিল, "কিন্তু ভাই দিদি, সব্বাই বলছে কাজটা মোটেই ভাল হচ্ছে না।"

উমা কথাটা বুঝিতে পারিল না, বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া বলিল, "কি কথা ঊষা ?"

ঊষা নতমুখে বলিল, "এই বিষয় সম্পত্তি—"

"ওঃ, কথাটা যখন তুললে ঊষা, ভালই হল। বলি সব শোন তবে।" উমা খোকাকে ঊষার কোলে দিয়া বসিয়া পড়িল, "বিষয় সম্পত্তি বাবা সব আমার নামে উইল করে দিয়ে গ্যাছেন, তাতে অনেক সাক্ষী আছে, তিনি—"

বাধা দিয়া সকল সঙ্কোচ দূর করিয়া ঊষা বলিল, "কিন্তু সব্বাই বলছে, এ কখনই আইনসঙ্গত নয়। বিধবা মেয়ে না কি সম্পত্তি পেতে পারে না, বিশেষ উত্তরাধিকারী দৌহিত্র যখন রয়েছে।"

উমা স্থির দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিল। ঊষা সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

উমা বলিল, "সব্বাইয়ের দোহাই দিয়ে তুই কি নিজের কথাটাও বলছিস নে ঊষা? তোর মনেও জাগছে—আমি তোর ছেলের ন্যায্য বিষয় বড্ড ফাঁকি দিয়ে নিয়েছি। অবশ্য এর মধ্যে প্রবঞ্চনা আছে বই কি—যেহেতু বাবা কোর্টে আমায় বিবাহিতা বলেছেন, বিধবা বলেন নি। যারা স্বাক্ষর করেছে, তারাও জেনে শুনে এই মিথ্যার স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছে। এটুকু মিথ্যার জন্যে বাবাকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ, বাবা শুধু আমার দিকে তাকিয়েই এ কাজ করেন নি। তিনি দৃষ্টি রেখেছিলেন তাঁর প্রজাদের দিকে, তাঁর গৃহ-দেবতার দিকে। আশ্রিতের জন্যে মিথ্যার আশ্রয় নিলে বিশেষ দোষ হয় না ভেবেই,

তিনি এই মিথ্যাটুকুর আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিষয়টা যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে তোমাদেরই, তা আমি অস্বীকার করছি নে। অনেক ভেবে চিন্তেই বাবা আমায় দিয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন, এতে ভাল ফল উৎপন্ন হবে; কারণ, আমার নিজের কিছুই খরচ নেই। আমি বিধবা, আমার একবেলা দুটো হবিষ্যান্ন, পরণে দুখানা কাপড়, এই হলেই মিটে গেল। তিনি আমায় তাঁর অর্থ ভোগের জন্যে ব্যয় করতে বা সঞ্চয় করে রাখতে বলে যান নি, বলেছেন এর যথার্থ সদ্ব্যবহার করতে।"

উষা একটু উষ্ণ হইয়া বলিল, "এইটে যে তোমার বড় অন্যায় কথা হয়ে গেল দিদি। আমরা যদি পেতুম সব, —তুমি কি বলতে চাও সবগুলো আমাদের ভোগ বিলাসেই ব্যয় হত, অথবা আমরা সঞ্চয় করেই রাখতুম?"

আহতা উমা উষার মুখপানে চাহিল। হায়, সে উষা কোথায় গেল, যাহাকে সে এই কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে, নিজে না খাইয়া যাহাকে খাওয়াইয়াছে। চার বৎসর আগে যে উষা এ বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছিল, এ তো সে উষা নয়। হায় সংসার, হায় মানুষ, এত শীঘ্রই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায় তোমার?

উমার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ত্বরিতে সে চোখের জল শুখাইয়া লইল। তাহার পর ফিরিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "না হয় করতিস না। কিন্তু ঠাকুরসেবা তো হত না উষা। মৃন্ময় ঘোর নাস্তিক, সে ঠাকুর সেবার অর্থ কিছুই বোঝে না। আমাদের পিতৃ পিতামহের আমলের ঠাকুর কি শেষে পথের ধারে গড়াগড়ি যাবে উষা?"

তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। আত্মসম্বরণে অসমর্থ হইয়া উমা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

গোপনে পিতার কক্ষে গিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া সে আজ এই প্রথম হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া ডাকিল— "বাবা—বাবা গো।"

সংসার কি যথার্থই এমনি? এখানে যথার্থই কেহ কাহারও নয়। বাবা—স্নেহময় বাবা আমার, আমার মাথায় এ কি দায়িত্ব দিয়া গেলে গো,—আমি যে আর পারি না, আমার বুক যে ফাটিয়া যায়। এ কি পৈশাচিক ভাব এ জগতে? বাবা, তোমার উমাকে তোমার কাছে ডাকিয়া লও; সংসারের নিষ্ঠুরতা সে আর সহিতে পারিতেছে না।

মনীশ কি কাজে বারাণ্ডা দিয়া যাইতেছিল। গৃহমধ্যে অস্ফুট রোদনের স্বর শুনিতে পাইয়া সে দরজা খুলিল। উমাকে গৃহতলে লুণ্ঠিতা দেখিয়া সে প্রথমটা কিছুই বলিতে পারিল না। সে যে সংসারের নিদারুণ নিষ্ঠুরতা দেখিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সান্ত্বনার আশায় কাঁদিবার জন্য পিতার এই শয়নকক্ষে ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না; সে ভাবিল, পিতার জন্য কাঁদিতেই সে আসিয়াছে।

তাহার আর্ত্ত কণ্ঠ মনীশের বুকের মধ্যে কাটিয়া কাটিয়া বসিতে লাগিল। তাহার দুইটী চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে ডাকিল "উমা—"

"মনীশ দা,"

উমা মুখ তুলিয়া চাহিল—দুই হাতের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া সে আরও কাঁদিতে লাগিল।

"কেঁদে কি করবে উমা,—যিনি গেছেন, তিনি তো আর ফিরবেন না। মৃতের জন্যে কান্না ভাল নয় তো, তা তুমি জানো উমা। এ ত তাঁর পরলোকগত আত্মাকে আবার মায়া-মোহপূর্ণ জগতে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস মাত্র। না উমা, তাঁকে শান্তি পেতে দাও, কেঁদ না।"

রুদ্ধ কণ্ঠে উমা বলিল, "আমি তো তার জন্যে কাঁদছিনে মনীশ দা। বাবা গ্যাছেন,—আমি এতদিন কাঁদিনি তো এমন করে। আমি তা জানি। আমি বাবাকে আর আকর্ষণ করব না। মনীশ দা, আমার বুকখানা আজ যে ভেঙ্গে গ্যাছে। আমি যে সংসারের কথা ভেবে, এর লোকদের নিষ্ঠুরতা দেখে কোন ক্রমে চো'খের জল রাখতে পারছিনে মনীশ দা।"

উমা আবার হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল— "আমার বুক একেবারে ভেঙ্গে গেল মনীশ দা,—আমি একেবারে ভেঙ্গে পড়লুম যে আজ। আমার কি হল, মনীশ দা, আমার যে আর বাঁচতে ইচ্ছা করছে না। আজ উষা, আমার সেই উষা—দেখেছ তো তুমিও, সে আমার কি জিনিস,—সেও কি না আজ টাকার দাবা করছে,—সেও স্পষ্ট আজ আমায় জানিয়ে দিলে—অর্থের কাছে আর কেউ নয়। মনীশ দা, আমার বুক ভেঙ্গে গ্যাছে, আমি চুরমার হয়ে গেছি যে।"

মনীশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, "না, ভেঙ্গে গেলে তো চলবে না উমা। তুমি সংসারের মানুষ নও বলেই সংসার কি, তা জানতে পার নি। এখানে সব আছে উমা, এখানেই সব তুমি দেখতে পাবে। বনে হিংস্র জন্তু বাস করে; কিন্তু সংসারে তার চেয়ে বেশী হিংস্র মানুষ বাস করে। এখানে তুমি যাকে যত স্নেহ করবে, জেনো, সেই তোমায় দেবে শুধু বেদনা। যাকে ভালবাসবে—সে দেবে কঠিন উপেক্ষা—যাতে তোমায় একেবারেই চূরমার করে দিতে চাইবে। কিন্তু তাই বলে কি ভেঙ্গে চূরমারই হতে হবে? দেখতে হবে, আরও কতদূর যায়। একটু আঘাতেই যদি ভেঙ্গে পড়লে উমা, তবে তুমি শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হয়েছ কেন, এত জ্ঞানই বা পেয়েছ কেন?"

উমা উঠিয়া বসিল। বিশৃঙ্খল এলায়িত চুলগুলা চারিদিক হইতে গুটাইয়া বাঁধিল। নিতান্ত অসহায়ভাবে সে বলিল, "আমি কি করব মনীশ দা! তুমি আমার গুরুস্থানীয়, তোমার কাছ হতে আমি অনেক উপদেশ পেয়েছি। আজও উপদেশ দাও মনীশ দা, আমি তোমার পায়ের কাছে বসি, সেই ছোট বেলার মতই তোমার ওপরে আবার নির্ভর করি। বল—আমি এখন কি করব?"

মনীশ বলিল, "কি করবে? ওরা যাই বলুক, তুমি কাণ দিয়ো না। তোমার স্বর্গীয় পিতার কথা মনে কর, বুকে বল নিয়ে এস। তিনি সব ভেবে যা ঠিক করে দিয়ে গ্যাছেন, তা কখনই মিথ্যা হতে পারে না। নিজের দৃঢ়তার ওপরে নিজে নির্ভর করে দাঁড়াও। শুধু উষাই এ কথা বলে নি উমা, মৃন্ময়ও আমায় বলেছে তোমায় এ কথা বলবার জন্যে। আমি তাকে জবাব দিয়ে এসেছি, আমি পারব না। সম্ভব সেও তোমায় এ কথা বলবে। আমি আজ মহলে যাচ্ছি সকলকে খবর দেবার জন্যে যে, কাকা মারা গ্যাছেন। কাল বোধ হয় ফিরব। এর মধ্যে যদি মৃন্ময় তোমায় কোনও কথা বলে, তা শুনো না। এখন তোমার ওপরেই সব নির্ভর করছে, এটা জেনে রেখো। উইল কখনই বার করে ওদের দেখিয়ো না। সকলে শ্রাদ্ধের দিনে আসবে; তখন আমি উইল বার করে সবাইকে দেখাব।"

উমা নীরবে তাহার পায়ের কাছে মাথা নোয়াইল, নীরবে তাহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

মনীশ তাড়াতাড়ি করিয়া মহলে চলিয়া গেল। আর তিন দিন পরেই শ্রাদ্ধ। ইহার মধ্যে প্রজাদের খবর দেওয়া দেওয়া চাই—তাহাদের দেবতার মত জমীদার আর নাই।

মনীশ চলিয়া গেলে মৃন্ময় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে বাস্তবিকই তাহাকে একটু ভয় করিয়া চলিত। কারণ, সে জানিত, মনীশ যাহাই হউক না, সে ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াইবে,—আর ইহাদের সে আপনার বলিয়াই জানে। উমার কাছে কোনও কথা বলিতে তাহার ভয় লাগিত না যদি সে একা থাকিত। মনীশ তাহার স্বপক্ষে দাঁড়াইতে, মৃন্ময় কিছু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

"শুনুন, আমি একটা কথা বলতে চাই—"

উমা তখন সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য পূজার গৃহে যাইতেছিল, মৃন্ময়ের কথা শুনিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। কি সে কথা—তাহা তাহার বেদনাপূর্ণ হৃদয়খানা শীঘ্রই বুঝিয়া লইল। তাহার চোখে-মুখে হৃদয়ের আর্ত্ত ভাবটা বেশ ফুটিয়া উঠিল। অন্তর হইতে কে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ও গো, না, আর আমায় কোনও কথা শুনাইয়ো না, আমি যথেষ্ট শুনিয়াছি। সংসারের এই সব আঘাত আমি যে আর সহ্য করিতে পারি না।"

কিন্তু অন্তরের দেবতা আর্ত্তনাদ করিলে কি হইবে? উমার বহিঃপ্রকৃতি যে মনুষ্য আবরণের মধ্যে, সেই হিসাবে তাহাকে এ কথা শুনিতেই হইবে যে। তাই সে যথাসাধ্য শান্তভাবে বলিল "কি কথা।"

মৃন্ময় জোর করিয়া বলিল "এই উইলখানার কথা। আপনি বুদ্ধিমতী,—জানছেন, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা দিয়েই তৈরি হয়েছে, সত্য এর ভিত্তি নয়। কাজেই এ টলমল করছে, দাঁড়াতে পারছে না। আপনি যদি সত্যের ওপরেই নির্ভর করতে না পারলেন, তবে আপনিই যে মিথ্যা হয়ে গেলেন। যথার্থ অধিকারীকে ফাঁকি দেওয়া—এ হৃদয়হীন বর্ব্বরেরই সাজে, আপনাতে সাজে না বলেই আপনাকে বলছি। এখনও সময় আছে, এখনও আপনি যা নিয়েছেন ফিরিয়ে দিতে পারেন।"

"উঃ!" উমার কণ্ঠ চিরিয়া এই একটা কথা মাত্র বাহির হইয়া পড়িল। না, আর তো সহ্য হয় না, এ ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে উমা যে অক্ষম। পিতা, উমা

তোমার কথা রাখিতে সমর্থ হইল না, ন্যায্য যাহার জিনিস তাহাকেই সে ফিরাইয়া দিবে।

হাতের ফুল বেলপাতা পড়িয়া গেল, উমা দ্রুতপদে নিজের গৃহে চলিয়া গেল। অকম্পিত হস্তে বাক্স খুলিয়া পিতার আয়রণ-চেষ্ট খুলিয়া সেই সযত্ন-রক্ষিত উইলখানা বাহির করিয়া লইল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মৃন্ময় তখনও দাঁড়াইয়া আছে।

গর্ব্বপূর্ণ কণ্ঠে উমা বলিল, "এই নাও, আমার সকল দাবী আমি ছেড়ে দিচ্ছি। বাবা আমায় যা দিয়ে গেছলেন, আমি তা তোমাদেরই দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সত্য মিথ্যার কথা তুমি কি বলছ মৃন্ময়? আমার বাপের সঙ্গে তুমি ব্যবহার করনি, নইলে জানতে পারতে, তিনি নিজেই জীবন্ত সত্য ছিলেন। আমি আজ সেই সত্যের অমর্য্যাদা করলুম, মিথ্যার আশ্রয় নিলুম,—এ আমার কর্ম্মফল ভিন্ন আর কিছুই নয়। তোমাদের বাধা আমি আমারই হাত দিয়ে সরিয়ে দিলুম, এর জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ—তা আমি ঘৃণাজনক বলেই মনে করি।"

উইলখানা শতখণ্ডে পরিণত করিয়া সে তাহা মৃন্ময়ের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া, ধীরপদে পূজার গৃহে চলিয়া গেল। মৃন্ময় হাঁ করিয়া সেই গঠিত মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

সভ্যতা ও আর্থিক অবস্থা

সফিয়া খাতুন বি-এ

আজকাল যুবকদিগকে হিসাবী (Economic) কথার একটা অদ্ভুত কু-অর্থ করতে দেখি। যদি কাউকে কেউ বলে যে লোকটী বড় হিসাবী, তাহলে যুবকরা তার অর্থ করে নেন যে, লোকটা হিসাবী অর্থাৎ কৃপণ। অনেক সময় আমরা বলে থাকি "লোকটী খরচের বেলায় কিন্তু বড় হিসেব করে খরচ করে।" এ কথার অর্থ এই নয় যে, লোকটী টাকা পয়সা খরচ করতে চায় না। তার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ঠিক তার উল্টা; তবে বাজে কাজে খরচ করে না। অনেক অর্থ-নৈতিকরা অর্থ-নীতিকে দুটা ভাগ করতে চেয়েছেন। তাঁদের কেহ কেহ বলছেন যে, একটা নিষ্কলঙ্ক অর্থনীতি (Pure-economy) আর একটী কলঙ্কিত অর্থনীতি (Vulgar)।

এই যে লোকটী বাজে কাজে টাকার শ্রাদ্ধ করে না, তাকে তাঁরা বলেন "পিওর ইকনমিক"। আর "সাইলকের" মত যারা শুধু টাকা জমিয়ে রাখে, খরচ করতে জানে না, এবং নিজেও খেতে জানে না, শুধু লোহার সিন্দুক টাকা দিয়া পূরছে—তাকে তাঁরা "ভাল্গার ইকনমিক" বলতে চান।

মানলাম, পণ্ডিতদের কথাই ঠিক। কিন্তু যে লোকটা টাকাকে জলের মত মনে করে ব্যয় করে,—নিজের ভোগ বিলাসের জন্য যেমন খরচ করে, পরের জন্যও তেমনি করে থাকে—তার অর্থনীতিকে আমি কি উপাধি দেব?

সংসারে ত এই তিন রকমেরই লোক সচরাচর দেখতে পাই। একজন খুবই টাকা উপার্জ্জন করছে, কিন্তু সে খরচ করতে জানে না, বা নিজেও খেতে জানে না। আর এক রকম লোক যেমনি উপার্জ্জন করতে জানে, তেমনি ব্যয়ও করে থাকে। কিন্তু তার খরচ করার কোন সংযম নেই। আর এক রকম লোক আছে, সে বেশ খরচ করতে জানে; কিন্তু সেটা খুব স্থির ধীর ও চঞ্চলতাশূন্য।

তাই মনে হয়, দুনিয়ায় "পিওর ইকনমি" বলে কোন একটা জিনিষ নেই। ওটা বুড়দের মনের এক বায়ু তাঁরা আর্টের বেলায়ও ঠিক তেমনি "পিওর আর্ট" বলে চেঁচিয়ে থাকেন।

সোজা কথায় "ইকনমিক" অর্থ এই—ইকনমিক লোকটি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে মানুষের হালে, আর দশজন লোক যেমনি চলে থাকে ঠিক তেমনি ভাবে, চলে থাকে। মানুষ সংসারে যে সব সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করতে আসে, অর্থাৎ বিশ্বপ্রভু আমাদের জন্য যে সব সুখ-সুবিধা উপভোগ করবার জন্য সৃষ্টি করেছেন, তা যথাযথ ভাবে উপভোগ করে থাকে।

বিষয়টী আর একটু পরিষ্কার করেই বলিলে যেন ভাল হয়। অনেকে হয় ত প্রশ্ন করতে পারেন যে, মানুষের হালে থাকার কথা যে লেখিকা বলছেন, সেই হালের standardটা কি? আর একজন হয় ত তার উত্তর দিবেন যে, যখনকার যে সভ্যতা দেশে এসে দেখা দেয়, ঠিক তার সঙ্গে মিশ খেয়ে চলার জন্য যা দরকার, সেটাই হচ্ছে তার Standard.

আবার একদল লোক হয়ত বলবেন, "যখন যে সভ্যতা আসবে, তাকেই যে বরণ করে নিতে হবে, তার মানে কি? সভ্যতার একটা মাপ কাটি থাকা দরকার।"

আমিও বলি তাই। হাঁ, সভ্যতার একটা মাপকাটি থাকা চাই বই কি। আমাদের মাপকাটি ঠিক নেই বলেই ত দেশের এত দুর্দ্দশা। মাপকাটি বলতে এই বলছি না যে, মান্ধাতার আমল হতে যে প্রথা চলে আসছে, তাই রক্ষা করতে হবে। আমি মাপকাটির কথা আর্থিক দিক হতে বলছি।

দেশের সভ্যতা যেন দেশের আর্থিক অবস্থা ডিঙ্গিয়ে না যায়। যে দেশের সভ্যতার সঙ্গে তার আর্থিক অবস্থার স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ আছে, সেখানে দুর্ভিক্ষ অনাটন প্রভৃতি খুব কমই দেখা যায়।

ঠাকুমাদের মুখে শুনেছি, তাদের বুড়রা না কি আট টাকা মাসিক বেতনে রাজ-সরকারে কাজ করেছেন। তাতে তাদের বেশ চলে যেত। তার মানে এই যে, তখনকার দিনে এই আটটা টাকা ছিল আটশত টাকার সমান। তখনকার দিনে ঐ আট টাকাই আটশত টাকার কাজ দিত। অনেকে হয় ত বলবেন তা হয় কি করে? এর উত্তরে আমি বলব, ঐ যে গোড়ায় ছিল সভ্যতা। তখনকার আট টাকা মূল্যের সভ্যতা আজ আমরা ৮০ শত টাকা দিয়ে কিনছি, আর এক দিন হয় ত তাই-ই ৮ হাজার দিয়ে কিনব!

তার মানে সভ্যতা জিনিষটা জলের মত—যখন যে ভাবে রাখ সে ভাবেই থাকবে। ঘটিতে রাখ ঠিক ঘটিই হয়ে থাকবে, আর একটা চৌবাচ্চায় রাখ, দেখবে, ঠিক চৌবাচ্চাই হয়ে গেছে। কিন্তু তার দ্রব্যগুণের কোন পরিবর্ত্তন হবে না।

সে রকম সভ্যতাকে তুমি মণি মাণিক্য ইত্যাদি দ্বারা সাজিয়ে রাখ, বা শুধু শাঁকা সিন্দুরই দেও, তাতে তার সত্যটুকুর কোন পরিবর্ত্তন হবেনা—মেয়ে যা তাই থেকে যাবে। সে নিত্য নূতন ও নিত্য পুরাতন। তার (সভ্যতার) বাহ্যিক রূপটাই হচ্ছে দেশের আর্থিক অবস্থা এবং তার মাল মসলা হলেন দেশের Industry ও Science.

সোণারূপা মণি মাণিক্য না হলে যেমন নারীর রূপের ঝঙ্কার দেখাবার সুযোগ হয় না, সেরূপ দেশের সভ্যতাকে সাজিয়ে তুলতে হলে শ্রমশিল্প ও বিজ্ঞান না হলে চলে না।

তাই বলি ইণ্ডাষ্ট্রী ও সায়েন্সের যত প্রসার হবে, সভ্যতার মাপকাটিও তেমনি প্রসার করতে পারবে, তা নৈলে নয়। শুধু সভ্যতা নিয়ে ইংলণ্ড, আমেরিকা কি জাপান হওয়া যায় না। তা হতে পারবে সেদিন, যেদিন হতে ঘরে ঘরে জাপানী বা আমেরিকান ইণ্ডাষ্ট্রী দেখতে পাবে। এক ইণ্ডাষ্ট্রী দ্বারা দেশের অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। প্রথমতঃ বেকার সমস্যা। যে লোকগুলি বেকার বসে আছে, তাদের সমস্তই খরচের ঘরে ধরা হয়। ধরুন এই পৃথিবীটা একটা মহাজনের খাতা। তার মূল তহবিল হল সমস্ত মানব জাতিটা। ভগবান ঠাকুর এই মূল ধন নিয়ে ব্যবসা করতে বসেছেন। ইণ্ডাষ্ট্রী ও সায়েন্স হচ্ছে মাল পত্র (Goods)।

ভাবুন এখন, এই মানব জাতির শতকরা ৫০টী লোক যদি অচল টাকা হয়ে যায়, তাহলে ব্যবসাটা চলবে কি রকম করে শুনি?

জগৎটাকে আমরা এ রকমের একটী মহাজনের তহবিল বলে ভাবতে পারি না বলেই আমাদের জাতির ভেতর কোন একটা কর্ম্মের সাড়া নেই! কারণ, আমরা যে অদৃষ্টবাদী। "কপালে যা আছে তাই হবে" ভেবে যে আরাম কেদারায় শুয়ে থাকি। তাই হাজার হাজার লোক বেকার দেখেও আমাদের মনে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। মহাজনের ব্যবসাটা যে গোল্লায় যাবে, সে চিন্তা আমরা মোটেই করি না। আমরা ভাবি, ভগবান যখন জন্ম দিয়েছেন, তখন কি আর মেরে ফেলবেন। আরে বাপু সবটাই যে নিজেকে করে নিতে হয়। ভগবান আর তোমার মুখে তুলে দিবেন না। তিনি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, তোমাকেই সব করে নিতে হবে।

দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য। আমাদের দেশে আমদানি আছে, রপ্তানি আছে কি? আর যাও আছে, তা বিদেশীদের হাতে। আমাদের দেশ হতে চা, কাপি, তুলা, মসলা, পাট ও চামড়া—এই ত কয়টি জিনিষ রপ্তানি হয়ে থাকে। কিন্তু এর প্রত্যেকটিই সাহেবদের হাতে। তাই এসব নিয়ে তারা সুন্দর পুতুল খেলে থাকে। কাজেই সেটাও খরচের ঘরে। আমাদের দেশ হতে যে তূলা চার আনা সের দরে কিনে নিয়ে থাকে, আবার সেই তূলাই আমাদের কাছে ৬।০ টাকা সের দরে বিক্রি করে থাকে। তারা যে শুধু ৬।০ সোয়া ছয় টাকা লাভ নিয়েই ছেড়ে দেয়, তা নয়। মালের সঙ্গে তার দেশের বহু সহস্র শ্রমজীবীর অন্ন জলের সংস্থানও করে তোমার জিনিষ তোমাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছে। সুচতুর জাপান এক পয়সার জিনিষ এক টাকা দরে বিক্রী করে আজ জগতের সঙ্গে পাল্লা দিতে লেগে গিয়েছে। এই যে এক পয়সার জিনিষ এক টাকায় বিক্রী করবার ক্ষমতা, এটাই হচ্ছে শিল্প-চাতুর্য্যের চরম উন্নতি। পাঁচ টাকার কাজ যদি পাঁচ পয়সা দিয়ে করা যায়, তাহলে আমি পাঁচ টাকা খরচ করতে যাব কেন? আমাদের দেশে কত শত রকমের হস্ত-শিল্প গৃহ-শিল্প ছিল, তা সবই আমাদের অবহেলার জন্য লোপ পেয়েছে। আজ আমরা জাপানী স্ক্রীন দরজায় টাঙ্গিয়ে জাপানী পাখায় হাওয়া খেয়ে বিবিয়ানা জাহির করি। এতে আমাদের একটুও লজ্জা হয় না আমাদের অধঃপতনের এই-ই প্রধান কারণ। আমরা আমাদের দেশীয় শিল্পের উন্নতি করা ত দূরের কথা, তাকে যে বাঁচিয়ে রাখব, বা যে চেষ্টা করছে তাকে উৎসাহ দেব, তাও করি না। কিন্তু দেখ গিয়ে স্বাধীন দেশে—সেখানকার লোকেরা নিজের দেশী জিনিষ থাকতে প্রাণান্তেও বিদেশী জিনিষ কিনবে না। আর এই কলকাতাই দেখুন না কেন—সাহেবরা কোন দিনই বিলাতী জিনিষ ছাড়া অন্য কোন জিনিষ ক্রয় করে না। আমি ব্যাঙ্গোরায় দেখেছি, সেখানকার প্রবাসী ইংরেজরা, একটা তুর্কী দোকানে যে জিনিষটি আছে, সেই জিনিষই হয় ত দু' মাইল দূরের পথ হেঁটে, যেখানে লণ্ডনের তৈরী জিনিষ পাবে, সেখান হতে সেটা কিনে থাকে। তুর্কীরাও ঠিক তেমনি কাজ করে থাকে। বাজারে একটা নূতন জিনিষ বেরুলে, তা হাজার বেশী দর হলেও যদি জানে যে সেটি নিজ দেশের তৈরী তাহলে বেশী মূল্য দিয়েও তা কিনে। আর ঠিক সেই জিনিষটিই যদি অতি অল্প মূল্যে বিদেশের তৈরী দেখতে পায় তা কিনে না। আর আমাদের দেশের অবস্থা কি? এই অসহযোগ আন্দোলনে খদ্দর কাপড় প্রচলনে কিছুদিন দেখা গেল, বিলাতী কাপড়ের দর একেবারে পড়ে গেছে। সাহেবরাও ছয় টাকা যোড়ার কাপড় তিন টাকা মূল্য করে দিল। আর যায় কোথা। বাঙ্গালী বাবুরা বিলাতী সস্তা দেখে আবার বিলাতী কাপড় কিনতে আরম্ভ করে দিলেন। একটু চিন্তাও করলেন না যে, যেদিন ইচ্ছা সেদিনই সাহেবরা আবার দর বাড়িয়ে দিতে পারে। লাভের মধ্যে এই হল যে দেশের একটা অতি প্রয়োজনীয় শিল্প চিরতরে লোপ পেতে লাগল। এরকম করে দেশের কত শিল্প যে আমরা নষ্ট করেছি, তা আর কত বলব। হয় ত অনেক শিল্পের নামও ভুলে গেছি। শিল্পগুলি বজায় রাখতে পারলে, শুধু যে কতকগুলি শ্রমজীবীর অন্নের ব্যবস্থা হয় তা নয়—দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারও বেড়ে থাকে। পূর্ব্বেই ত বলেছি যে আমাদের দেশে আমদানি হয়—রপ্তানি হয় না। ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের এক দিন ভেনিসের বণিকরা বড় সমাদর করত। এ সমস্ত শিল্প যদি আমরা বাঁচিয়ে রাখতাম, তাহলে আজ আমরা রপ্তানিও যথেষ্ট করতে পারতাম। আজ আমরাও ঠুনকো জিনিষ দিয়ে সাচ্চা মাল নিয়ে আসতে পারিতাম।

অনেকে হয়ত এই কথাকে ভাল মনে করবেন না। কিন্তু জানেন কি, অর্থনৈতিকেরা সব সময় "সত্যের" খুব কমই ধার ধারেন? অর্থ-নীতি সত্যকে যত না ভয় করে, সভ্যতাকে ভয় করে তার শত গুণে বেশী। কারণ সত্য জিনিষটা দৈব, আর সভ্যতা হচ্ছে মানবীয়। সত্যের সঙ্গে অর্থের কোন সম্বন্ধ নেই—পয়সার সম্বন্ধ এই সভ্যতার সঙ্গে। সত্যের কাছে মেকী মালের কোন মূল্য নেই। কিন্তু সভ্যতার কাছে তার যথেষ্ট সমাদর আছে।

ধরা যাক, আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার অবস্থা কি? এখন আমরা সভ্যতার যে স্তরে এসে পা দিয়েছি—সেখানে চাই শুধু টাকা আর টাকা। যার ধন আছে, তার গৌরবও আছে। যে যত দামি পোষাক লাগাতে পারবে, সেই তত বড় ভদ্র। কাজেই, তুমি গরীব, তোমাকে যদি ভদ্র হতে

হয়, তাহলে তোমার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে সে ভাবে যদি সাজাতে পার, তবে ত ভদ্র হবে। কিন্তু টাকা পাবে কোথায় শুনি। অথচ এদিকে বাহ্যিক জাঁক জমক না দেখালেও চলে না। এখন উপায়? দেশের সবাই ত আর রাজা নয় যে মণিমাণিক্য ব্যবহার করতে পারে। কাজেই, যারা ইকনমিষ্ট, তারা অমনি চিন্তা করতে বসে যাবে—"আচ্ছা, কম পয়সায় মণি মুক্তার মত কি কোন জিনিস তৈরী করা যায় না? নিশ্চয়ই যাবে। দেখি, রাসায়নিক ভায়ারা কি বলেন।"

সেদিন এক ইকনমিক জুয়েলারীর বিজ্ঞাপনে দেখতে পেলাম যে, তারা এক রকম সোণার চুড়ী তৈরী করেছেন। তাতে তামার উপর সোনার পাত বসান। সত্যিকার সোণার চুড়ী বলেই মনে হয়। পরীক্ষা করবার জন্য এক যোড়া কিনলাম। হাতে দিয়ে খুব হাসতে লাগলাম। হাসি পেল এই জন্য যে, জুয়েলার মশাই সভ্যতার গালে বেশ জুতা মারতে শিখেছেন। এই ত চাই। কম পয়সায় দশ টাকার বাবুগিরী করা যায়, এদিকে সভ্যতাও বুঝে নিলে যে, তা বাবার উপরেও টাগ আছে।

[illegible] নীলের ব্যবসা [illegible] "দাঁড়াও, [illegible]"

কিছুদিন [illegible] কি এক কৃত্রিম উপায়ে ভারতীয় নীলের চাইতেও ভাল নীল তৈরী করে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের মুখেও চুণকালি পড়ল। ভারতে নীলের চাষও বন্ধ হয়ে গেল! তাই বলছিলাম, সত্যের সঙ্গে অর্থ-নীতির কোন সম্বন্ধ নেই। ইকনমিষ্টদের সর্ব্বদাই লক্ষ্য থাকে, এক টাকা দিয়ে দশ টাকার কাজ কি করে করা যায়; এবং সেটা এমন বাহাদুরী নিয়ে করা চাই, যাতে কেহ কোন খুঁৎ ধরতে না পারে। এই চালাকী যে জাতির ভেতর বেশী, সে জাতি আজ অর্থে ধনকুবের। এবং এই পন্থাকেই বলে শিল্প চাতুর্য্য। এই শিল্প-চাতুর্য্য দিয়ে সভ্যতাকে কেনা গোলাম করা যায়।

সভ্যতা জিনিষটা এমন কিছু নয়। ওটাকে আমরা ইচ্ছা করলেই হাতের মুটয় আনতে পারি এবং এ[illegible] ন্যাংটী-ছাড়া করে ছেড়েও দিতে পারি। যতদিন সভ্যতা আমাদের হাতের মুটোয় ছিল—তত দিন দেশের লোক টাকা পয়সার জন্য বড় চিন্তা করে নাই। যেদিন হতে হাত-ছাড়া হয়েছে সেই দিন হতেই দেশবাসী হা অন্ন! হা টাকা! করছে। আমি আর এক জায়গায় বলেছিলাম যে, আমরা সাহেব সাজতে চাই—কিন্তু সাহেব সাজবার মত মাল মসলা আমাদের নেই।

তার মানে আমাদের সভ্যতা আমাদের হাত ছাড়া। তার একটা মাপ-কাটি নেই। সে দিন দিনই মাপকাটি ডিঙ্গিয়ে চলছে। এদিকে আর্থিক অবস্থা কিন্তু মাপকাটি পর্য্যন্তও পৌছাতে পারে নাই। এর পরিণাম ভাল নয়—এবং কোন দিনই ভাল হতে পারে না। গত মহা-যুদ্ধের সময় বিলাতে আইন করে দেশের লোকের বাবুগিরী [illegible] তার অর্থ এই যে, তখন [illegible] তারা আর্থিক অবস্থার মাপ কাটি ডিঙ্গিয়ে চলছিল।

আমরা চাই ভারত আমেরিকা হউক, জাপান হউক ইংলণ্ড হউক—কিন্তু সেটা যেন শুধু থিয়েটার বায়স্কোপ ও মটর হাঁকানির দিকে না হয়। সে যেন তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্যে মূর্ত্তিময়ী হয়ে ফুটে উঠে। তবে দেশের কল্যাণ ও দশের কল্যাণ।

দ্বন্দ্ব

শ্রীমতী সরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

১

মিসেস রায় তখনো তাঁর লেখাপড়ার কাজের মধ্যে মগ্ন হইয়া ছিলেন। লীলা স্নান সারিয়া এবার কতকটা শান্ত ভাবে তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। একটা বোলতা শরতের হাওয়ায় উৎফুল্ল হইয়া হয় ত একটা নূতন স্থান আবিষ্কারের আশায় ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার সন্ধান শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে বাহিরে আসিবার পথ হারাইয়া পর্দ্দার আশে পাশে বৃথাই ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিতেছিল। লীলা তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া সদয় চিত্তে পর্দ্দা তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে বন্দিত্ব-মুক্ত করিল।

মিসেস্ রায় কাগজপত্র হইতে মুখ তুলিয়া লীলার দিকে চাহিলেন। তাহার পর কথঞ্চিৎ প্রসন্ন ভাবে বলিলেন, "এই যে! স্নান সেরে এলে? যা হোক— এখন তবু তোমার দিকে কতকটা চাওয়া যাচ্ছে। ঐ চৌকিখানা টেনে নিয়ে বোসো—অনেক কথা আছে। এখন তুমি বড় হয়েছ—পরিবারের সমস্ত সুখ-দুঃখের ভাগ এখন আর সকলের মত তোমারও নেওয়া উচিত। আমরা সকলেই সেটা তোমার কাছে আশা করি।"

সচরাচর মিসেস রায় এ রকম নরম সুরে কথা বলিতেন না। আজ মায়ের কথার স্বরে একটা কি অজ্ঞাত আশঙ্কার আভাষে লীলার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে শঙ্কিত মুখে একটা চৌকী টানিয়া লইয়া বসিয়া, নিঃশব্দে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া, কথাটা শুনিবার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মিসেস রায় কলমটার কালি ঝাড়িয়া লইয়া কলম-দানির উপর তুলিয়া রাখিলেন। তার পর লীলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আজ সকালে চা খাবার পরে বীণা অরুণের একটা চিঠি পেলে। তাতে বম্বের হাসপাতাল থেকে অরুণ লিখছে—ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে একটা কামান ফেটে গিয়ে, সেই শক লেগে তার দুটি চক্ষু অন্ধ হয়ে গেছে!"

"অরুণ অন্ধ? উঃ! মা!" অতর্কিত দুঃসংবাদে লীলা প্রথমটা চমকিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। তার পর দেখিতে দেখিতে তাহার বড়-বড় কালো চোখ ছাপাইয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল।

মিসেস রায় কিছুক্ষণ বিষণ্ণ মুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চিরদিনের ধারণা ছিল, লীলা অত্যন্ত হৃদয়হীনা, কঠিন-প্রকৃতি—রমণীজনসুলভ মায়া-দয়া বা স্নেহ তাহার মধ্যে লেশমাত্র নাই। আজ অরুণের দুঃখে তাহাকে বুক ফাটিয়া কাঁদিতে দেখিয়া, তাঁহার মন লীলার প্রতি অনেকটা কোমল হইয়া আসিল। তিনি নিজেও রুমালে চোখ মুছিয়া বলিলেন, এখন বুঝতে পারছো—এ আঘাতটা বীণার কি রকম সাংঘাতিক লেগেছে! সে তার পর থেকে আর ঘর থেকে বেরোয় নি। আমার ত সকাল থেকে কেবলি চোখে জল আসছে। আমার এত দিনের এত সাধ, এত আশা— সবই এই দুর্ঘটনায় একবারে নষ্ট হয়ে গেল।

লীলা কোন দিন অরুণকে দেখে নাই। বীণার ঘরে তাহার প্রিয়দর্শন চিত্র দেখিয়াই সে তাহাকে বন্ধুর মত ভালবাসিয়াছিল। সুরূপ কান্ত মূর্ত্তি! শুধু রূপ নয়, তাহার মনের ঐশ্বর্য্যও মনোহর! যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অরুণ বীণাকে যে সব পত্র লিখিত, তাহার মধ্য দিয়া লীলা তার সরল উন্নত ও মার্জ্জিত হৃদয়ের পরিচয় পাইত! সেই দারুণ মৃত্যু-বিভীষিকাময় স্থানে অহরহ সংহারের তাণ্ডব লীলার মধ্যে বাস করিয়াও সে মুহূর্ত্তের জন্য স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ হারায় নাই। কি প্রাণের প্রাচুর্য্যে ও প্রতিভায় পূর্ণ তাহার হৃদয়! বীণার প্রতিই বা কি তার অনন্ত ভালবাসা! তাহার পত্রে কখনো কোন উচ্ছ্বাসের লেশমাত্র থাকিত না; তবু সেই সব পত্রের ছত্রে-ছত্রে তাহার সংযত হৃদয়ের কি অকৃত্রিম অনুরাগ ফুটিয়া উঠিত! সেই অরুণ! একাধারে সৈনিক, সাহিত্যিক, কবি,—আজ তাহার সব শেষ,— আজ তাহার নবীন চির-সুন্দর নয়নের উপর চির-অন্ধকারের গাঢ় যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে।

জীবনের সমস্ত আশা, আনন্দ উৎসাহ—সব ব্যর্থ, সব বিফল! লীলা কোন কথা বলিতে পারিল না,—অরুণের এই ভীষণ পরিণামের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া শুধু উচ্ছ্বসিত ব্যথিত হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

মিসেস রায়ও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, আজ কেবল আমার সেই তিন মাসের আগেকার কথাই মনে হচ্ছে। কিরণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে,—যখন এখানে কিরণের কাছে বেড়াতে এলো,—সারা সহরটায় যেন একটা বিষম সাড়া পড়ে গেল। যেমন চমৎকার রূপ তার, তেমনি শিক্ষা, তেমনি ভদ্র নম্র প্রকৃতি! অত বড় লক্ষপতির ঘরের ছেলে—তা তার কি অমায়িক স্বভাব! খেলায়, গানে, বাজনায়, শিকারে সমস্ত সহরটা যেন মাতিয়ে রেখেছিল! তুমি ত দেখ নি তাকে? বুঝতে পারবে না, সে কি ছেলেই ছিল! কত লোকে তাকে পাবার কত চেষ্টাই করলে। সে কিন্তু যে দিন থেকে বীণাকে দেখলে, তার পর থেকে আর কারো দিকে ফিরে চাইলে না। আহা! বাছা কি ভালই বেসেছিল বীণাকে! যখন তারা দুজনে পাশাপাশি বসে থাকতো, দেখে দেখে বুক আমার আনন্দে তৃপ্তিতে ভরে উঠ্‌তো, মনে হতো,—যেমন ঘর আলো করা মেয়ে, তেমনি সুন্দর জামাই হয়েছে! কুক্ষণে এই যুদ্ধ বাধলো, কুক্ষণে ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালি সৈন্য দল পাঠালে। আমার ভাগ্যে তাতেই সব শেষ হয়ে গেল!

কথা শেষ করিয়া মিসেস রায় আর্দ্র চক্ষু দুটি রুমালে মুছিলেন। "তাই তোমায় সকাল থেকে খুঁজ্‌ছিলুম। এখন বীণাকে একটু শান্ত করা দরকার। আর এখন আমার চেয়ে তোমারি তার কাছে থাকা, তাকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত। কি আঘাতটাই যে পেয়েছে সে! এখন কি করে যে সে সামলে সুস্থ হয়ে উঠবে, আমি শুধু তাই ভাবছি সকাল থেকে!" লীলা তখনি চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আমি এখনি তার কাছে যাচ্ছি মা!

সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই, মিসেস্ রায় একটু ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, একটু দাঁড়াও! একটা কথা তোমাকে বলে দিই! বীণাকে বোলো, তাড়াতাড়ি অরুণের চিঠির উত্তর দেবার কোন দরকার নেই। দু'এক দিন পরে, ভাল করে ভেবে, বুঝে দেখে উত্তর দিলেই চলবে। আমার কথাটা বুঝেছ ত? অর্থাৎ আমি চাই না যে, বীণা অরুণকে এমন কোন কথা লেখে, যাতে সে কোন আশা রাখতে পারে। কারণ, এ ঘটনার পর আর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ হতে পারে না।

চলিতে চলিতে লীলা এ কথা শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ পরে সমস্ত ব্যাপারটা তাহার একরূপ বোধগম্য হইল। মা অরুণের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখিতে চান না,—বীণাকে নিজে সে কথাটা বলিতে কুণ্ঠা বোধ হওয়ায়, তাহাকে দিয়া কথাটা বলাতে চান।

লীলা কথাটা বুঝিয়া মনে মনে অত্যন্ত বেদনা বোধ করিল। যে হতভাগ্য ভাগ্য কর্ত্তৃক এমন নিপীড়িত হইতেছে, মানুষেও তাহাকে এমনি করিয়া বিড়ম্বিত করিবে? এত বড় দুঃখের দিনে প্রিয়জনের নিকট হইতে সে কি এতটুকু স্নেহের স্পর্শ, দুটো সান্ত্বনার কথা শুনিতে পাইবে না?

তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পরদুঃখকাতর হৃদয় কিছুতে এ মীমাংসা মানিয়া লইতে পারিল না। সে অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে মিনতির স্বরে বলিল, সেটা কি ভাল কাজ হবে মা? আজ তার বড় দুঃখের, বড় হতাশার দিন—আজ একমাত্র তোমাদের কাছ ছাড়া সে কোথাও একটু শান্তি পাবে না। তারও মা তুমি,—এত দিন তাকে এত স্নেহ করেছ, এত ভালবেসেছ—আজ তাকে তুমি ফেলে দেবে কি করে? বীণাই বা কি করে এ কথা তাকে জানাবে? এ কাজটা যে বড় অন্যায় হবে মা! মিসেস রায় এ কথায় বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। তিনি উদাসীন ভাবে বলিলেন, সে এখন আর হয় না লীলা! আজ যদি বীণা মনের আবেগে এ রকম একটা জীবনব্যাপী ত্যাগ করতে রাজি হয়, তাহলে সে সেটা বিষম ভুল করবে, আর সত্যিই সে কোন দিন জীবনে সুখী হতে পারবে না। আর অরুণের এ দুর্ঘটনায় আমি যে কত আঘাত পেয়েছি—সে অন্তর্যামী যদি কেউ থাকেন, ত তিনিই বুঝবেন। কিন্তু তা হলেও আমি মা—আমাকে নিজের সন্তানের ভাল-মন্দ ত আগে দেখতে হবে? সাধ করে একটা দুর্দ্দৈব কে ডেকে আনতে চায়? আমি খুব জানি—এ বিবাহ হলে বীণার সারা জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

এ কথায় লীলার মন শান্ত হইল না। সত্যকার মা যে, সে কি কেবল নিজের সন্তানের ভালমন্দই দেখিবে?

আর কাহারও দিকে দেখিবার তাহার অবসর নাই? অরুণও ত এক দিন মা বলিয়া স্নেহের দাবী জানাইয়া, কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল? আর বীণার সম্বন্ধেই বা এত ভাবনা কেন? মানুষের জীবনে স্নেহ, ভালবাসা, কর্ত্তব্য-জ্ঞান কিছুরি কি দরকার নাই? শুধু নিজের সুখই সব চেয়ে বড়? দুদিন আগে যখন তাহার স্বাস্থ্য, রূপ, শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন ত বীণা তাহাকে ভালবাসিয়াছিল!

সে বলিল, কিন্তু ধর, যদি ওদের বিয়ের পর এ ব্যাপারটা ঘটতো, তখন তোমরা কি করতে? তখন তো তাকে এমন অসঙ্কোচে তফাৎ করে দিতে পারতে না?

মিসেস রায়ের মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। মেয়েটার কি সকল সময় সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার! সহজ দিকটা ও কিছুতেই বুঝিবে না বলিয়া যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া আছে! নিজের বোনটার কথা ভাবিয়া দেখ—তা না,—যাহাকে কস্মিনকালে চোখেও দেখে নাই, তাহার জন্য যত রাজ্যের দরদ উথলিয়া উঠিল! কি বিপদেই যে তিনি পড়িয়াছেন।

প্রকাশ্যে তিনি অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন—না! তা পারতুম না! তখন যত বড়ই দুঃখ হোক, বীণার মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকত না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে রকম কিছুই হয় নি—একটা মুখের কথা হয়েছিল মাত্র। সে রকম কথা কত লোকের সঙ্গে হয়, কত লোকের সঙ্গে ভেঙ্গে যায়—কাজেই সেটাকে বড় করে তোলবার কোন দরকার নেই। বিশেষ এ প্রস্তাব আমি নিজে করি নি, অরুণই বীণাকে এ কথা জানিয়েছে। তার বড় উদার মহৎ প্রকৃতি। সে কি কখনো এ অবস্থায় আর একটা তরুণ জীবনকে এই রকম নিরানন্দ দাসত্বের জীবনে টেনে আনতে পারে? সে তার নিজের দিক থেকেই এ বিবাহ ভঙ্গের প্রস্তাব করেছে।

—"তাকে ত এ কথা বলতেই হবে। সে জানে, এ ঘটনার পর আর আগের মত সে বীণাকে নিতে পারে না। তাই সে এ ক্ষেত্রে যা বলা উচিত—তাই বলেছে। সেটা তার মহত্ব। কিন্তু সে বলেছে বলেই কি তার সম্বন্ধে তোমাদের সব কর্ত্তব্য ফুরিয়ে গেল? এখন বীণার উচিত বলা—যে, সে কখনো তাকে ত্যাগ করতে পারে না। যদি বীণা সত্যই তাকে ভালবেসে থাকে, তা হলে এ ছাড়া আর সে কি বলতে পারে, আমি ত তা বুঝতে পারি না। এখন শুধু বীণাই তার মনের অগাধ ভালবাসা দিয়ে তাকে শান্তি ও সুখ দিতে পারে, তার সমস্ত হতাশা ও বেদনা মুছিয়ে দিতে পারে। এ তো আর কারু কাজ নয়!"

মিসেস রায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ভাবে বলিলেন, তুমি এ বিষয়টা শুধু একটা সেন্টিমেন্টের দিক দিয়ে দেখছো, বিচার করে দেখছো না। জীবনটা অত্যন্ত বাস্তব পদার্থ. ভাবের আবেগ দু দশ দিন চলতে পারে। তার পর যখন সে ভাব ফুরিয়ে যাবে, তখন জীবনকে ঠেকাবে কি দিয়ে? তোমরা ছেলেমানুষ, সংসার সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই তোমাদের, শুধু কতকগুলো পুঁথিগত কথা আওড়াতে খুব শিখেছ! তলিয়ে কোন কথা বুঝলে কি এ প্রস্তাব করতে পারতে? এ বিবাহ হলে বীণাকে যাবজ্জীবনের মত ধাত্রী ও বন্দিনী হয়ে থাকতে হবে। অরুণ এখন সম্পূর্ণ অসহায়, সব সময়ই স্ত্রীর উপর নির্ভর করে থাকা ছাড়া তার আর উপায় নেই। এখন বোঝ—এই সারা জীবন বন্দিত্ব স্বীকার করে নেওয়া কি সহজ কথা? বিশেষ বীণার মত মেয়ে, যে জীবনে কোন দিন কোন দুঃখ কষ্টের লেশমাত্র জানে না, কোন কিছু সহ্য করতে যে মোটেই অভ্যস্ত নয়, চিরদিন আদর ও আমোদ প্রমোদের মধ্যে যে মানুষ হয়েছে, তার কি ওই রকম জীবন কোন দিন সহ্য হবে? এ ভাবে থাকতে হলে মরে যাবে যে সে।

মিসেস রায় চৌকি হইতে উঠিয়া চঞ্চল ভাবে ঘরের ভিতর পায়চারী করিতে লাগিলেন। লীলাও আর কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

দুই একবার ঘুরিয়া আসিয়া মিসেস রায় বলিলেন, আর কেনই বা সে ইচ্ছে করে এই দুঃখের জীবন মাথায় তুলে নেবে! তার মত মেয়ে—যে রূপে গুণে অতুলনীয়, সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন সে, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তার সামনে খোলা রয়েছে,—সে স্বচ্ছন্দে যে কোন যোগ্য পাত্রকে বিবাহ করে সুখী হতে পারে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুইই তার অনুকূল! সে কোন্ দুঃখে সাধ করে এ রকম জন্মব্যাপী দুঃখকে বরণ করে নিতে যাবে? তুমি যাও তার কাছে, তার কাছে-কাছে একটু থেকো—আর আমি

যে কথাগুলো বললুম—সে গুলো দরকার হলে বুঝিয়ে বোলো তাকে। তোমাদের এ-সব ভাবুকতা দূরে ফেলে তার সমস্ত অবস্থা বুঝে দেখা উচিত, ও অরুণের চিঠির সেই মত উত্তরও দেওয়া উচিত। বিশেষ এ প্রস্তাব অরুণের কাছ থেকেই আসছে, এতে আমাদের পক্ষে সঙ্কোচ করবার কোন কারণ নেই।

লীলা বুঝিল, মাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা বৃথা, তিনি কিছুতেই তাঁহার সঙ্কল্প ছাড়িবেন না। আর কোন তর্ক করিলে কেবল একটা মনান্তরের সৃষ্টি হইবে মাত্র।

সে আর কোন কথা না বলিয়া শুষ্ক হৃদয়ে বীণার সন্ধানে চলিয়া গেল।

৪

মিঃ রায়ের দুই কন্যা সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ গুণ ও প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছিল। বীণার রূপ মার মত অতুল, সে নিতান্ত চপল লঘু প্রকৃতি। লীলার চেহারায় এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল না, মোটের উপর সে সুশ্রী। সে পিতার উন্নত চিন্তাশীল হৃদয় ও জ্ঞানের অধিকারিণী হইয়াছিল।

কিশোর বয়স হইতেই বীণা সমাজের একটি উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। সমাজের সমস্ত আদবকায়দা, চলাফেরা, হাসিগল্প, কোথায় কতটা এবং কাহার সঙ্গেই কি কি পরিমাণ চালাইতে হইবে, এ সবে সে বিশেষ অভ্যস্ত। তাহার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ, সংযত শোভন ভদ্রতা, কণ্ঠস্বরের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও কৃত্রিম হাবভাবে বিমুগ্ধ তরুণের দল অন্ধ উপাসকের ন্যায় সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুগত জনের মত ফিরিত। সেও নিজের মোহিনী শক্তির প্রভাব তাহাদের উপর বিস্তার করিয়া সর্ব্বক্ষণ তাহাদিগকে নিজের চারি পাশে পতঙ্গের মত আকৃষ্ট করিয়া রাখিত। সে কাহাকেও ভালবাসিত না, জয়ের আনন্দেই সে বিভোর।

বীণার উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় রূপের আভায় সকলেরই দৃষ্টি ঝলসিত। কাজেই বেচারা লীলা দিদির আওতায় একেবারে মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। তাহার দিকে সহজে কাহারও দৃষ্টি পড়িত না, সেও প্রাণপণে এই সব অকিঞ্চিৎকর সঙ্গ ও নির্লজ্জ চাটুবাদ এড়াইয়া চলিত। বীণার কৃত্রিম হাব ভাব, সর্ব্বদা পরুষের মনো-রঞ্জনের সযত্ন প্রয়াস দেখিয়া বিষম বিতৃষ্ণায় তাহার হৃদয় বিমুখ হইয়া গিয়াছিল। মিসেস রায় বীণার মত কন্যার গর্ব্বে আত্মহারা। লীলাকেও তিনি নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এখানে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। যত দিন যাইতে লাগিল, লীলার হৃদয়ের জ্ঞানস্পৃহা ততই বাড়িতে লাগিল। কলেজের পাঠ্য বিষয়ের সীমার মধ্যে সে আর নিজেকে বদ্ধ রাখিতে পারিত না। জগতে যাহা কিছু জানিবার আছে, সে সবই সে জানিতে চায়। সে তাহার সমস্ত অবসর বিবিধ বিষয়ের শিক্ষা ও পাঠের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিল। তাহার মত তরুণীর এইরূপ অদম্য জ্ঞান লাভের চেষ্টা ও পাঠানুরাগ দেখিয়া কলেজের জ্ঞানবৃদ্ধ প্রফেসরগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন।

সুদীর্ঘ আট বৎসরের সাধনার ফলে সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিত হৃদয় লইয়া লণ্ডন হইতে বাড়ী ফিরিয়া লীলা দেখিল, সংসারে মা ও বীণার সঙ্গে তাহার কোনখানে যোগ নাই, সে মার কথামত কোনরূপে চলিতে পারে না। যে সব অসার বিষয়ের আলোচনায় তাঁহাদের সময় কাটে, যে সব তুচ্ছ আমোদ প্রমোদে তাঁহাদের চিত্ত বিনোদন হয়, লীলা কিছুতে সে সব সংস্পর্শে আসিতে পারে না। অথচ তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে মা বিরক্ত হন, অনেক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও মার সঙ্গে তাহার তর্কাতর্কি বাধিয়া যায়। লীলা ক্ষুব্ধ হইল, বেদনা পাইল, কিন্তু প্রতীকারের কোন উপায় দেখিল না।

পক্ষান্তরে মিসেস রায়ও দীর্ঘকাল পরে তাহাকে ফিরিয়া পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। সর্ব্বক্ষণ যেন সে তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য পণ করিয়া বসিয়া আছে! তাহার স্বাধীন মত, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, সংস্কারশূন্য উন্নত মনের পরিচয় তিনি পাইলেন না, এবং তাহার গুণ গ্রহণ করিবার মত শক্তিও তাঁহার ছিল না। তিনি বুঝিলেন, সে অত্যন্ত অবাধ্য ও একগুঁয়ে এবং জেদী। প্রতি পদে, প্রতি কথায়, সকল কার্য্যেই তাহার সহিত তাঁহার মতভেদ আরম্ভ হইল। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই সে তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল।

মিঃ রায় জানিতেন, তাঁহার এই তেজস্বিনী দুর্ব্বোধ

মেয়েটিকে কেহ বুঝিবে না। তিনি তাঁহার হৃদয়ের অগাধ স্নেহে ও আদরে অনাদৃতা বালিকাকে বুকে টানিয়া লইলেন। পিতার স্নেহের আশ্রয়ে লীলা আপনার ক্ষুব্ধ হৃদয়ের সমস্ত বেদনা ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিয়া কেবল একটিমাত্র সংবাদে লীলা সুখী হইয়াছিল। সেটি বীণার সঙ্গে অরুণের বিবাহ সংবাদ। সে সংবাদপত্রে এই তরুণ যুবকের কত সাহস, কত বীরত্বের কাহিনী পড়িয়াছিল। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ, বা পরিচয়ের আগেই সে তাহাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত ভালবাসিয়াছিল।

অনেক সময় সে অরুণের কথা মনে মনে ভাবিত। বীণা কি তাহাকে সম্পূর্ণ সুখী করিতে পারিবে? সে যেরূপ চঞ্চল ও লঘুপ্রকৃতি, অরুণের মত উন্নতচিত্ত যুবকের রুচি ও মন বুঝিয়া চলিতে পারিবে ত? আজ অরুণ তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছে, কিন্তু শুধু রূপের মোহ কত দিন স্থায়ী হইবে, যদি তাহার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ না থাকে?

এই ভাবে দিন কাটিতেছিল। লীলার বাড়ী ফিরিবার তিন মাস পরে এক দিন অতর্কিত বজ্রাঘাতের ন্যায় অরুণের দুর্ভাগ্যের সংবাদ এই পরিবারের সকলকে মুহ্যমান ও স্তব্ধ করিয়া দিল।

ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে লেফ্‌টেন্যাণ্ট ঘোষাল সাহসের সহিত নিজ সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সহসা নিকটে একটি কামান ফাটিয়া যাওয়ায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। হাসপাতালে চিকিৎসা হইবার সময়ও অরুণের মনের বলের লাঘব হয় নাই। তখনো তাঁর বিশ্বাস ছিল, তিনি আবার সুস্থ হইয়া উঠিবেন। কিন্তু প্রায় একমাস চিকিৎসার ফলে ডাক্তারদের সমবেত পরামর্শে স্থির হইল, মাথার "ওপটিক নার্ভ" আক্রান্ত হইয়াছে, লেফ্‌টেন্যাণ্ট জীবনে আর দৃষ্টি ফিরিয়া পাইবেন না। (ক্রমশঃ)

স্বপন

শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা

(আমার) খোকার গায়ের গন্ধ কেন শিয়রে আজ পাই?
নয়ন জুড়ে ঘুমের ঘোরে এসেছিল খোকন ওরে?—
আমি কারে রে শুধাই?

অলস আঁখির দুটি পাতে ধরিয়ে ছিল কোমল হাতে
তার গন্ধ মাখা তাই,

বিছানাতে চরণ আঁকা বালিসে তার হাঁটুর চাপা,
ওগো তার চিহ্ন আমায়
লুকাতে পারে নাই।

খোকন কিরে আমায় ছেড়ে রইতে পারে অনেক দূরে
দুষ্ট ছেলে ঘুমে পেলে
আমার বুকে আসে তাই।

ভোরের শীতল বায়ুর সম খোকার গায়ের পরশ মম
সে পরশ যে মর্ম্মে মর্ম্মে
জানতে আমি পাই।

খোকন তাই স্বপন হ'য়ে চোখে মুখে চুমা খেয়ে
শিয়রে তার গন্ধ রেখে আমার জানিয়ে গেছে
ওগো আমি দূরে নাই।

নির্য্যাতিতার কাহিনী

শ্রীরাধারাণী দত্ত

স্বামি ! প্রিয়তম ! ..নারীর দেবতা !...আমার হৃদয়-রাজ !
উঃ, বড় জ্বালা ! ভীষণ আগুণ জ্বলিছে বুকের মাঝ !
তুঁষের আগুণ এ অনল চেয়ে ঢের সুশীতল মানি ;
বড় যন্ত্রণা ! যায় বুঝি প্রাণ !:..সারা দেহ দহে গ্লানি !
ওগো তুমি এস—একবার কাছে—জীবনের দুখ-হারী,
তোমার অভয়-কর-পরশনে এ জ্বালা জুড়াতে পারি !
ওই মুখ আর ওরি ছাঁচে গড়া কচি মুখ দুইখানি,
বৈতরণীর তীর হ'তে মোরে ফিরায়ে এনেছে টানি।
ওগো প্রাণ-প্রিয়, জীবনারাধ্য একবার এস কাছে,
বুকের মাণিক খোকা খুকী মোর নিয়ে এস কোথা আছে ?
এ শরীর যেন প্রাণহীন জড় শব সম মনে হয়,
ঘৃণাকুঞ্চিত অন্তর মোর, সারা দেহ পূতিময় ;
মর্ম্মকোষে যে শতেক নাগিনী দংশিছে ক্রূরফণা,
শান্তি-ওষধি-প্রলেপ তোমারি চরণ-ধূলির কণা !
মণি আর টুনু দুটি যাদু মোর, ঘুমিয়ে কি তারা আছে ?
মা বলিয়া ছুটে কেন গো এখনও ঝাঁপায়ে এল না কাছে ?
মণিরে আমার এনে দাও ওগো, চুমা দিই তার মুখে,—
টুনুরাণী কোথা—দাও এনে দাও একবার নিই বুকে।
মরে যাই যাট্ ! বাছারা আমার কত না পেয়েছে দুখ,
মায়ের অভাবে কত না কেঁদেছে, বিসাদ-মলিন মুখ।

এস, কাছে এস, দূরে কেন অত ? কেন গো আনত শিরে ?
এখনও কেন গো বিবর্ণ মুখ ? পেয়েছ' তো মোরে ফিরে !
আমার বিরহ-বেদনা তুমি যে সহিতে পার না কভু ;
মৃত্যুর ক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়ে তাই মরিতে পারিনি প্রভু !
মরণের কালো যবনিকা-আড়ে চলে গেলে যে গো জানি
মণি ও টুনুরে পাব না কো আর, পাব না ও পা দু'খানি
সপ্ত-স্বরগ-শ্রেষ্ঠ আমার ও দুটি চরণ-তল
ছেলে দু'টি ফেলে গোলোকেও গেলে শান্তি পাব না পল !
এই ত আমার প্রথম প্রভাত, এই ত জীবন সুরু,
কল্পনা তুলি কত সাধ আশা আঁকিতেছে লঘু গুরু !
...উঃ ! বড় তৃষা এক ফোঁটা জল দাও গো, শুষ্ক তালু,
বুকের মাঝারে মরু-দহনের জ্বলিছে তপ্ত বালু।

ও কি কথা? ওগো, ও কি কথা কও—কোথায় যাইব আমি?
করিতেছ মোরে পরীক্ষা এ কি? মার্জ্জনা কর স্বামী!
ভগ্ন চূর্ণ বুকের পাঁজর সহন ক্ষমতা নাই,
বড় দুর্ব্বল, বড় অসহায়, তব আশ্রয় চাই।
আমি যে কী তাহা জান না কি তুমি? জীবন আছ' যে ছেয়ে,
তুমি চিরদিন জানো বেশী ভালো আমারে আমার চেয়ে।
স্বেচ্ছায় আমি যাইনি বিপথে, মনে প্রাণে আমি সতী,
তব বাহু-পাশ ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, সে তো সবই জানো পতি!
অন্তর-গভীর ক্ষত-মুখে আর হেনো না তীক্ষ্ণ বাণ,
ব্যথা অপমান যাতনা সরমে ভাঙিয়া পড়িছে প্রাণ।
—সমাজ-ত্যক্তা পতিতা হয়েছি? ওগো স্বামী, বলো তবে,
পত্নী তোমার কোন্ আশ্রয়ে কার কাছে আজি রবে?
কুল গেছে মোর? নহি কুলবধূ? অকূলে ভাসিতে হবে?
পতিতা পরশে জাতি-নাশ—তাই গৃহে আর নাহি লবে?
সংসারে মোর দেনা-পাওনার চুকে গেছে সব দাবী?
পথে নেমে আজ খুঁজে নিতে হবে হারানো ঘরের চাবি?
হিন্দু গৃহের বধূ যে গো আমি, রক্ষক তুমি তার;
দেব ব্রাহ্মণ অগ্নি সমীপে ভর্ত্তা হ'য়েছো যার।
অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী এই বলে নিলে যারে,
মৃত্যুও যেই মিলন-গ্রন্থি টুটিবারে নাহি পারে;
আজি সে তোমার কেহ নয়? ওগো, সম্ভব এর এ কি?
মোর আঁখি পরে আঁখি মিলাইয়া একবার চাহ দেখি!
তব পুত্রের জননী যে আমি, মণি ও টুনুর মা—
গৃহের একটি কোণেও কি আজ ঠাঁই মোর মিলিবে না?

* * * * *

এত অনুনয়, এত ক্রন্দনে, গলিল না তবু প্রাণ?
না না থাক্! মোর ঘুচিয়াছে ভ্রম, চাহি না করুণাদান।
পুরুষের দয়া কৃপা যে ঘৃণ্য আজিকে আমার কাছে—
দিলেও লব না তোমাদের দান, ওতে মহা পাপ আছে!
দুর্ব্বলা এক অসহায়া নারী ধর্ষিতা আজি হায়,
পুরুষ পশুর পাশব পীড়নে জীবন্মৃতেরই প্রায়,
তারে কি না আজ পঙ্গু সমাজ শাস্তি দিবার তরে
নির্ব্বাসনের দণ্ড তুলেছে উদ্যত দুই করে!
অনলে কি নাই দাহিকা শক্তি, মেঘে কি বজ্র নাই,
ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায়-অন্যায়, পুড়ে কি হয়েছে ছাই?
বিনা অপরাধে আমারেই আজ দিতেছ দণ্ড সবে!
দণ্ড ন্যায়তঃ প্রাপ্য কাদের?—সে কথা কে আজি কবে?
পশুর কবল হইতে নিজের ধর্ম্মপত্নী যেই
পুরুষ হইয়া রক্ষিতে নারে, ধিক্কার তারে দেই!
ধর্ম্ম সমাজ লোক সমক্ষে রক্ষণ ভার নিয়া
রক্ষিতে নারে পত্নী যাহারা নিজ হাতে আগুলিয়া;
তাহারা কি নহে অপরাধী বেশী? তাদের কি সাজা নাই?
আমিই কেবল ঘৃণ্য সবার! আমাকেই দূর ছাই?
জাতি ও সমাজ-চ্যুতা করিতেছ, গৃহে আর নাহি লবে!
মোর অপরাধ তাহাদের চেয়ে গুরুতর কি গো তবে?
স্বেচ্ছায় আমি বিপথে যাই নি লালসা-বৃত্তি নিয়া,
স্বেচ্ছায় আমি আসি নি এ দেহ পশুর কবলে দিয়া,
স্বেচ্ছায় আমি স্বামী-পুত্রের করি নি ত' হেঁট মুখ
পুরুষেই মোরে জোর ক'রে আজ দিয়েছে চরম দুখ!
শত অবৈধ পাপেও পুরুষ নহে পাপী অনাচারী!
হায়, তাহাদেরই খোস্-খেয়ালের খেলনা কি শুধু নারী?
শুধু আমাদেরই সমুখে রুদ্ধ হিন্দু-সমাজ-দ্বার?
মৃত্যু অথবা নরক ব্যতীত পাবো না কি পথ আর?

নারী-জীবনের বিশেষত্ব

ডাক্তার শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়

স্থির-চিত্তে নারীদেহ পরীক্ষা করিলে বুঝা যায় যে, অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে গর্ভ-ধারণ, সন্তান-প্রসব ও সন্তান-পালনই নারীজীবনের বিশেষ ধর্ম্ম। সন্তানের রক্ষার্থই ভগবান একাধারে নারীহৃদয়ে—বুকভরা স্নেহ, প্রাণভরা ভালবাসা ও অপার্থিব আত্মত্যাগ—পূর্ণভাবে ঢালিয়া রাখিয়াছেন। সন্তানের সুখেই মায়ের সুখ, সন্তানের দুঃখেই মায়ের দুঃখ, একমাত্র সন্তানের মঙ্গল-কামনাতেই মা নিজের নিজত্বটুকু পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলেন। ছেলেই ধ্যান, ছেলেই জ্ঞান, ছেলেই যাঁর সর্ব্বস্ব—যে ছেলের কল্যাণের জন্য তিনি অম্লানবদনে প্রাণ দিতেও কাতর হন না,—হায়, কাল বশে সেই ছেলে এমন মাকেও অনাদর করে! ইহার অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? চিত্তের মলিনতার জন্য আমরা ভুলিয়া যাই—মাতৃঋণ পরিশোধ হবার নয়।
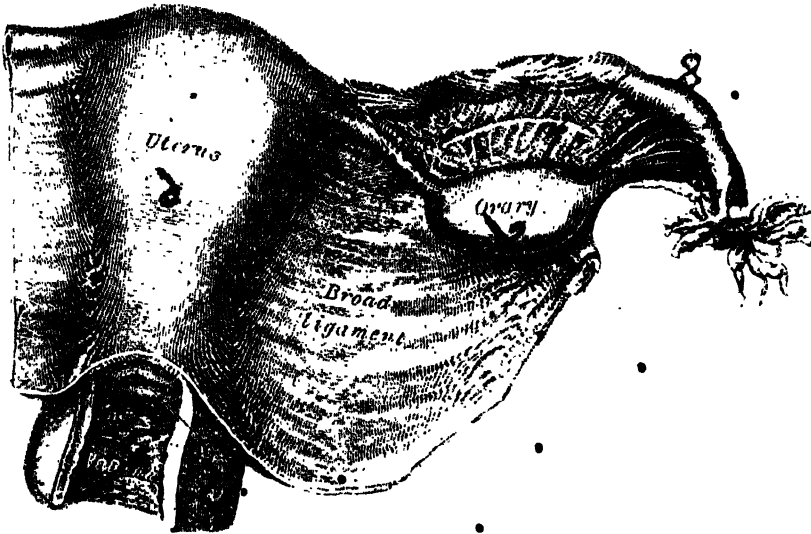
১। জরায়ু 'নাড়ী'। ২। জরায়ুর মুখ। ৩। ডিম্বকোষ—ওভারী।
৪। ডিম্ববাহী নল—টিউব। ৫। প্রস্রাব-পথ।

জননেন্দ্রিয়

স্ত্রীলোকের সন্তান উৎপাদনের প্রধান যন্ত্র,—জরায়ু ও ডিম্বকোষ। এই সকল যন্ত্র উদরের নিম্নদেশে অবস্থিত; তন্মধ্যে জরায়ু (Uterus) মধ্যস্থলে এবং ডিম্বকোষ (Ovary) দুইটী জরায়ুর দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে আছে। প্রত্যেক ডিম্বকোষ হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত একটী সরু নল থাকে, তাহাকে ডিম্ববাহী নল (Fallopian tube) বলে।

জরায়ুর সম্মুখে মূত্রাশয় (Bladder) এবং পশ্চাতে মলনালী (Rectum) অবস্থিত। এ জন্য জরায়ু পশ্চাৎভাগে বাঁকিয়ে গেলে মলনালীর উপর চাপ পড়িয়া কোমরে ব্যথা হয় এবং মল ত্যাগের কষ্ট হয়। জরায়ু সম্মুখদিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িলে মূত্রাশয়ের উপর চাপ পড়ে এবং ঘন ঘন প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা হয়।

প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই ডিম্বকোষে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্ব থাকে। যেমন কোন কোন গাছের ফল পাকিলে ফাটিয়া যায়, তেমনি যখন যে ডিম্বটী পরিপুষ্ট (পক্ব) হয়, তাহার আবরণ আপনা হইতেই ফাটিয়া যায় এবং পক্ব ডিম্বটী নলের ভিতর দিয়া জরায়ুতে আসে। তথায় পুরুষের বীজের (শুক্রের কণার) সহিত সাক্ষাৎ হইলে, উভয়ে মিলিত হইয়া সন্তানের অঙ্কুর সৃষ্টি হয়। এই অঙ্কুরের আকার একটী সরিষা প্রমাণ। প্রথম অবস্থাতে ইহাতে হাত, পা, মুখ, চোখের কোন চিহ্নই থাকে না। ক্রমে ক্রমে যেমন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যায়, ঐ সরিষা-প্রমাণ অঙ্কুর হইতে সন্তানের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলি গঠিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। সন্তান যেমন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, জরায়ুর আকারও সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হয়। পোয়াতি অবস্থায় প্রথমে তিন মাস পর্য্যন্ত জরায়ু কোমরের হাড়ের (pelvis) ভিতর থাকে। চতুর্থ মাস হইতে তলপেটে নাড়ীর নীচে ক্রমশঃ উঠিতে থাকে ও পেট

বড় হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ণ গর্ভাবস্থায় জরায়ু বক্ষস্থলের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত পহুঁছে।

সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের ১২ বৎসর বয়স হইতে ৪০।৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত—এই সময়ের মধ্যে জননেন্দ্রিয়ে (জরায়ু, ডিম্বকোষ ইত্যাদি) প্রতি মাসে ৩।৪ দিন অত্যধিক রক্তের সঞ্চার হয়; এবং ঐ সময় জরায়ুর মধ্য হইতে রক্ত নিঃসরণ হইয়া সেই রক্ত বাহিরে আসে। ইহাকেই মাসিক ঋতু বা Mens কহে।

স্বাভাবিক ঋতু

আমাদের দেশে সাধারণতঃ ১২ বৎসর বয়সে প্রথম ঋতু আরম্ভ হয়। শারীরিক স্বাস্থ্য ভাল হইলে ১২ বৎসরের পূর্ব্বে এবং খারাপ হইলে ইহার পরেও ঋতু আরম্ভ হইতে দেখা যায়। এই মাসিক রক্তস্রাব ৩ দিন হইতে ৫ দিন পর্য্যন্ত থাকে। ইহাই স্বাভাবিক ঋতু। ইহার কম বেশী হইলেই অস্বাভাবিক বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহার রঙ কতকটা স্বাভাবিক রক্তের ন্যায়। ইহাতে কোনরূপ দুর্গন্ধ বা রক্তের চাপ থাকে না; এবং পরিমাণ সকল স্ত্রীলোকের পক্ষে সমান নহে। যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩।৪ বারের বেশী বা দুই বারের কম কপ্নি (diaper) বদলাইতে হয়, তাহা হইলে স্রাব অস্বাভাবিক পরিমাণে হইতেছে বলিয়া জানিতে হইবে। এই সময় পেটে বিশেষ কোনরূপ যন্ত্রণা থাকে না। তবে অনেক স্ত্রীলোকই তলপেট ও কোমরে আড়ষ্টভাব অনুভব করেন। জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্রে রক্তাধিক্য হওয়ার জন্যই এই আড়ষ্ট ভাব বা ভার-ভার ভাব অনুভূত হয়। অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই ২৮ বা ৩০ দিন অন্তর ঋতু হয়; কিন্তু কখন কখন ২১ বা ৩৫ দিন অন্তরও ঋতু হইতে দেখা যায়। গর্ভাবস্থায় স্বভাবতঃই ঋতু বন্ধ থাকে। এই অবস্থা, এবং যত দিন শিশু মাতৃস্তন্য খায় সেই সময় ভিন্ন অন্য সময়ে ঋতু বন্ধ থাকিলে, তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া বুঝিতে হইবে। এ দেশে ৪৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের মধ্যেই প্রায় সকল স্ত্রীলোকের ঋতু একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। যদি ৪৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ঋতু বন্ধ হয়, কিম্বা ৫০ বৎসর বয়সের পরেও ঋতু বন্ধ না হয়—তাহা হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে। কারণ, কয়েকটী রোগের জন্য এইরূপ ঘটা সম্ভব; এবং সে সকল রোগের অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন।

অস্বাভাবিক ঋতু

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলির মধ্যে যে কোনটী দেখা দিলেই ঋতু অস্বাভাবিক বলিয়া জানিতে হইবে, এবং প্রতিবিধানের জন্য যত সত্বর সম্ভব চিকিৎসকের সাহায্য লইতে হইবে; কারণ, বিলম্বে কঠিন রোগ জন্মিতে পারে—
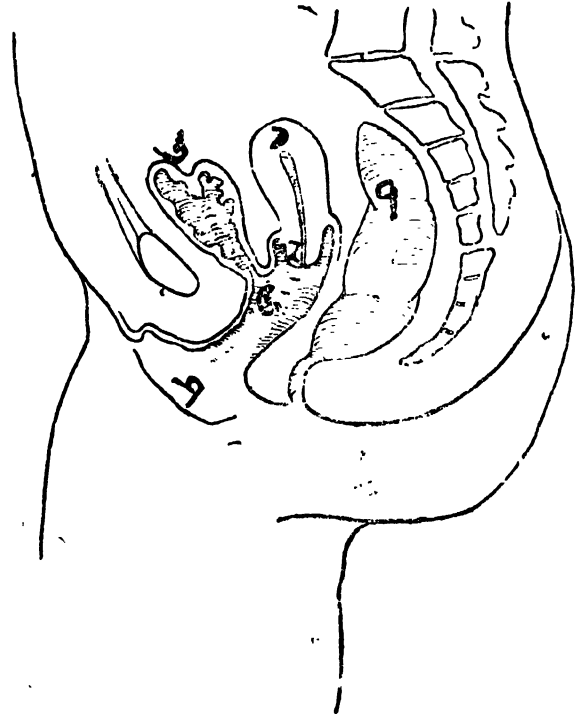
১। জরায়ু, ২। জরায়ুর মুখ, ৫। প্রসব-পথ। ৬। মুত্রস্থলী, ৭। মলনালী, ৮। প্রসবদ্বার।

১। অত্যধিক বা অত্যল্প রক্তস্রাব।
২। সাত দিনের বেশী রক্ত থাকা।
৩। জমাট রক্ত (চাপ) নিঃসরণ।
৪। দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব।
৫। তলপেট বা কোমরে যন্ত্রণা।
৬। জ্বর।
৭। মাসে একাধিকবার ঋতু হওয়া।

অর্থাৎ এক ঋতু শেষ হইয়া ১০।১৫ দিনের মধ্যে পুনরায় ঋতুস্রাব। কিন্তু যদি মাসের ১লা তারিখে ঋতু হইয়া পুনরায় সেই মাসের সংক্রান্তির দিন আবার ঋতু হয়, তাহা হইলে সেটী অস্বাভাবিক বলিয়া ধরা হইবে না।

ঋতুকালীন নিয়ম পালন।—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঋতুকালে জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্রে অত্যধিক রক্তসঞ্চার হয়। এই সময় প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই নিয়ম অবহেলা করায়, অনেক স্ত্রীলোককেই যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে দেখিয়াছি।—

১। কোনরূপ পরিশ্রমের কাজ করিবে না।

অধিক লোকের জন্য রন্ধন করা, নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে পরিবেশন করা, জলের কলসী বা বাল্‌তী, বিছানা ও ট্রাঙ্ক ইত্যাদি ভারি জিনিষ তোলা বা তুলিবার চেষ্টা করা একান্ত নিষিদ্ধ। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তলপেট ও কোমরে যন্ত্রণা হইয়া অত্যধিক রক্তস্রাব হইতে পারে; এবং সময়ে বন্ধ না হইয়া রক্ত অনেক দিন থাকিতে পারে।

২। তলপেটে ঠাণ্ডা লাগাইবে না। গরম কাপড় ব্যবহার করিবে। ফ্লানেল কিম্বা উলের কাপড় দিয়া পেট সর্ব্বদা জড়াইয়া রাখিলেই ভাল হয়। স্নান করা বা সাবান মাখা নিষেধ। ঋতুকালে ভিজা কাপড়ে থাকিলে কিম্বা অন্য কোন কারণে পেটে ঠাণ্ডা লাগাইলে হঠাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া তলপেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে পারে; এবং জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্র ফুলিয়া (Inflammation) জ্বর হইতে পারে। এই নিয়ম অগ্রাহ্য করায় অনেক স্ত্রীলোকই তলপেটে ব্যথা, কষ্টরজঃ শ্বেতস্রাব (Leucorrhœa, লিউকোরিয়া) প্রভৃতি রোগ ভোগ করেন।

৩। স্থানান্তরে গমন করিবে না। রেলপথে কিম্বা গাড়ী চড়িয়া আত্মীয়ের বাড়ী যাওয়া, ঠাকুর দর্শন বা যাত্রা থিয়েটার দেখিতে যাওয়া নিষেধ। এই নিয়ম অবহেলা করিলে জরায়ু স্থানচ্যুত হইতে পারে এবং প্রথম নিয়ম লঙ্ঘনের যে সকল কুফল লিখিত হইল, সেই সকলও ঘটিতে পারে।

৪। যে কয়দিন রক্তস্রাব বন্ধ না হয়, পৃথক শয্যায় শয়ন করিবে। স্বামী-সঙ্গ নিষেধ।

৫। স্রাবের জন্য ময়লা ন্যাক্‌ড়া ব্যবহার করিবে না। বোরিক তুলা (Boric cotton) ব্যবহার করাই যুক্তি-সঙ্গত। অভাবে, ধোয়া পরিষ্কার ন্যাকড়া ব্যবহার করিবে। কোন কোন স্ত্রীলোক স্পঞ্জ (Sponge) ব্যবহার করেন। একই স্পঞ্জ এক বারের বেশী ব্যবহার করা উচিত নয়; স্পঞ্জের ভিতর যে রক্ত প্রবেশ করে, তাহা পরিষ্কার করা কঠিন। সেই রক্ত পচিয়া স্পঞ্জ বিষাক্ত হইয়া যায়। সেই বিষাক্ত স্পঞ্জ ব্যবহার করিলে নানারূপ রোগ জন্মিতে পারে।

তুলা বা ন্যাকড়া প্রসবদ্বারের ভিতর রাখিবে না। কারণ, দেখিয়াছি, কোন কোন সময় ঐ সকল জিনিষ বাহির করিতে না পারায় ভিতরেই থাকিয়া যায়, এবং তথায় পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া নানারূপ রোগ জন্মায়। প্রসবের পর যেরূপভাবে 'কপ্‌নি' ব্যবহার করা হয়, ঋতু-স্রাবের জন্যও সেইরূপ কপ্‌নী ব্যবহার করিবে।

৬। রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত 'ঋতুস্নান' করিবে না। কারণ, জরায়ুর রক্তাধিক্য না কমিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয় না। এমন অবস্থায় স্নান করিয়া পেটে ঠাণ্ডা লাগাইলে কি ঘটিতে পারে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দেখিয়াছি, অনেক স্ত্রীলোকই স্রাব বন্ধ হোক বা নাই হোক, ঋতুর চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া থাকেন। ইহা সম্পূর্ণ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

আয়ুর্ব্বেদের 'ভাবপ্রকাশ' গ্রন্থে রজঃস্বলা স্ত্রীর জন্য এই নিয়ম লেখা আছে;—"রজঃস্বলা স্ত্রী রজঃনিঃসরণ দিবস হইতে ৩ দিন হিংসা করিবে না, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে; কুশাসনে শয়ন করিবে; পতিকেও দর্শন করিবে না। হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। অশ্রুপাত, নখচ্ছেদ, অভ্যঙ্গ, অনুলেপন, নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন, স্নান, দিবানিদ্রা, প্রধাবন, হাস্য, বহুভাষণ, পরিশ্রম, অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণ, ভূমিখনন ও প্রবল বাত সেবন—এইগুলি পরিবর্জ্জন করিবে।"

এই ঋষিবাক্য অমান্য করিলে সঙ্গে সঙ্গেই হোক বা কিছু দিন পরেই হোক বিষময় ফল ভুগিতেই হইবে,—ইহা স্থির নিশ্চয়।

ঋতুকালীন অস্বাভাবিক লক্ষণ ও তৎপ্রতিকার

১। তলপেট বা কোমরে যন্ত্রণা।—সর্ব্বদা শুইয়া থাকিবে; এমন কি যন্ত্রণা অধিক হইলে মলমূত্র ত্যাগও বিছানায় শুইয়া করা কর্ত্তব্য। বোতল কিম্বা রবারের ব্যাগে গরমজল পুরিয়া পেটে সেঁক দিবে। যদি রক্তস্রাব অধিক হয় বা জ্বর থাকে, তাহা হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইবে। চিকিৎসক পাওয়া না গেলে যন্ত্রণা নিবারণের জন্য—একটী ট্যাবলেট্‌ 'নানালা' ((Tablet Nanala)

য়্যাসপিরিণ (Aspirin) কিম্বা য়্যাণ্টিক্যামনিয়া (Anti-kamnia) সেবন করিবে। ইহাতে যন্ত্রণার আশু লাঘব হইতে পারে। এই ঔষধ খাওয়ার পর ২ ঘণ্টার মধ্যে যদি যন্ত্রণা কিছুই না কমে, তাহা হইলে পুনরায় আর একটা খাইবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩।৪ বারের অধিক এই সকল ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ। 'য়্যাস্পিরিন নামক ঔষধ বিশ্বস্ত কোম্পানীর তৈয়ারি না হইলে ব্যবহার করিবে না। 'বাজে মার্কা' ঔষধ খাইলে অত্যন্ত ঘাম ও বুক ধড়ফড়ানি হইতে দেখা যায়। অধিক মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহার করিলে হৃদযন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং কোন কোন সময়ে মৃত্যু ঘটে। 'বারোজ্ ওয়েল্‌কাম' (Barroughs Welcome), পার্ক ডেভিস্ (Parke Davis) কিম্বা মার্ক (Merck) প্রভৃতি কোম্পানীর ঔষধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

২। পেট ব্যথার সহিত জ্বর বা খুব অল্প স্রাব। তলপেটে তিষির কিম্বা গমের ভূষির পুলটীস্ দিবে। অথবা য়্যাণ্টিথার্ম্মিন (Anti-thermin) য়্যাণ্টিফ্লোজিষটিন্ (Anti-phlogistine) কিম্বা থার্ম্মোফিউজ্ (Thermo-fuse) নামক মলম তলপেটে লাগাইয়া তুলা কিম্বা ফ্লানেল দিয়া পেট বাঁধিয়া রাখিবে। ২৪ ঘণ্টার পর ঐ মলম তুলিয়া তলপেট গরমজলে ধুইয়া পুনরায় মলম বাঁধিবে।

৩। অধিক রক্তস্রাব। বিছানা হইতে মোটেই উঠিবে না। চায়ের চামচের এক চামচ (১ ড্রাম) চুণের জল কিম্বা ক্যালসিয়াম ল্যাক্‌টেট্ ট্যাবলয়েড (Calcium Lactate Tabloid) দুইটী করিয়া দিবসে ৩বার খাইবে। তাহাতেও যদি রক্ত বন্ধ না হয় এবং ডাক্তারের সাহায্য একান্তই পাওয়া না যায়—বোরিক তুলা বা গজ (Boric cotton or Gauze) ফুটন্ত জলে ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া লইবে এবং তাহা প্রসব-পথের ভিতর ঠাসিয়া দিতে হইবে। নিজে ইহা পারিবে না; ধাত্রী কিম্বা অন্য কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা করাইয়া লইবে। হাত উত্তম রূপে ধুইয়া প্রসব-দ্বারের ভিতর যতদূর আঙ্গুল যাইবে, বাম হাতের তর্জ্জনী ও মধ্যমা ততদূর প্রবেশ করাইয়া ডানহাতের তর্জ্জনীর দ্বারা সাহস পূর্ব্বক ততদূর ঐ তুলা বা গজ উত্তম রূপে ঠাসিয়া দিতে হইবে; আলগা ভাবে দিলে রক্ত বন্ধ হইবে না। ২৪ ঘণ্টা পরে ঐ তুলা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। যদি তখনও রক্তস্রাব বেশী থাকে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার নূতন তুলা সেই ভাবে ব্যবহার করিবে। তুলায় সূতা বাঁধিয়া রাখিলে বাহির করার সুবিধা হয়। গজ পাওয়া না গেলে সূতা বাঁধিয়া কতকগুলি তুলার বল (প্ল্যাগ, plug) তৈয়ার করিয়া লইবে। প্রত্যেক প্ল্যাগের সহিত ৫।৬ আঙ্গুল পরিমাণ সূতা থাকিবে। যখন এই বল ভিতরে দেওয়া হইবে, সূতাগুলি বাহিরে ঝুলিবে। যে কয়টী বল ভিতরে দেওয়া হইল, তাহার হিসাব রাখিবে। তাহা হইলে ভুল-ক্রমে কোন তুলা ভিতরে থাকিয়া যাইবে না। বাহিরের সূতা ধরিয়া টানিলে তুলা সহজে বাহির করা যায়।

অস্বাভাবিক স্রাব

১।—ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময় রক্তস্রাব হইলেই তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া জানিতে হইবে। সে স্রাব যতই অল্প বা অধিক হোক না কেন, তাহা কখনই গোপন রাখা উচিত নয়। যত শীঘ্র সম্ভব উপযুক্ত স্ত্রীরোগ-চিকিৎসক দ্বারা জরায়ু পরীক্ষা করাইয়া রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। বিলম্বে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। জরায়ুর ক্যান্‌সার (cancer) নামক যে উৎকট ব্যাধি আছে, তাহার প্রথম লক্ষণ—মলমূত্রত্যাগ কালে বেগ দিলে বা সঙ্গমের সময় অল্প রক্তস্রাব। এই রোগের আরম্ভকালে অল্প অল্প রক্তস্রাব কিম্বা জলস্রাব ভিন্ন অন্য কোন উপসর্গ বা জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না। এই জন্য প্রথম অবস্থাতে এই রোগ উপেক্ষিত হয়। স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃই হো'ক বা রোগের পরিণাম না জানার জন্যই হো'ক—বা ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করাবার ভয়েই হো'ক—অধিকাংশ স্ত্রীলোকই এই লক্ষণ অন্যের নিকট, এমন কি নিজ স্বামীর নিকট পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন না। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া যখন রোগ চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া পড়ে, তখন পেটে, কোমরে বা উরুতে যন্ত্রণা আরম্ভ হয়; রক্তস্রাব বাড়িতে থাকে, স্রাবে দুর্গন্ধ হয়। এমন কি যে-ঘরে সেই রোগী থাকে, দুর্গন্ধের জন্য কখন কখন অন্যে সে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না। জীবন্তেই রোগীর নরক-ভোগ হয়। এই সকল লক্ষণ ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি পায় যে, অতি লজ্জাশীলা স্ত্রীলোকও তখন পুরুষ-ডাক্তার দ্বার পরীক্ষা করাইতে কোন প্রকার আপত্তি করেন না; এম

কি অস্ত্র-চিকিৎসার দ্বারাও যদি সম্ভব হয়, আরোগ্য লাভ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয়, এইরূপ অবস্থায় রোগীর সকরুণ কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও সুনিপুণ চিকিৎসক রোগ আরোগ্য করিবার কোন উপায় করিতে পারেন না। অধুনা 'রেডিয়াম' (radium) নামক ধাতু-প্রয়োগে ক্যান্সার রোগের যে চিকিৎসা করা হয়, তাহাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফলবতী হয় না। যন্ত্রণায় ও রক্তক্ষয়ে রোগী ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই রোগের আরম্ভকালই চিকিৎসার উপযুক্ত সময়। সময়ে সুচিকিৎসা হইলে রোগ নিঃসন্দেহ আরোগ্য হইয়া যায়। কিছুদূর অগ্রসর হইলে আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব প্রত্যেক স্ত্রীলোকের নিকট সানুনয় নিবেদন এই—ভগবান না করুন, যদি কখনও কাহারও উপরিলিখিত লক্ষণ (অসময়ে রক্তস্রাব) দেখা দেয়, তাহা যতই সামান্য হউক না কেন, কালবিলম্ব না করিয়া সুবিজ্ঞ স্ত্রীরোগ-চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইবেন। ইহাতে লজ্জা করিবার কোন কারণ নাই—কোন পাপও নাই। বরং সময়ে চিকিৎসা না করাইয়া দেহ নষ্ট করিলে পাপ হইবে। যদি কেহ বলেন—"বিনা চিকিৎসায় প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইব না," তাহার উত্তর এই —ভগবানের দেওয়া দেহ স্বেচ্ছায় নষ্ট করিবার কাহারও অধিকার নাই। যোগ্য চিকিৎসক রোগীকে মাতৃজ্ঞান করে।

সাধারণতঃ ২৫ বৎসর বয়সের পর এবং ৫০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ক্যান্সার রোগ বেশীর ভাগ হইতে দেখা যায়; কিন্তু কখন কখন ইহার পরে কিম্বা পূর্ব্বেও এই রোগ আরম্ভ হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এদেশে ৪৫ বৎসর বয়স হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত—এই সময়ের মধ্যে ঋতু একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। যদি কোন স্ত্রীলোকের এইরূপ ঋতু বন্ধ হওয়ার পরও প্রসবপথ হইতে পুনরায় রক্ত বা অন্য কোন প্রকার স্রাব হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে উপযুক্ত ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হইবে। প্রায়ই দেখা যায়, এরূপ ক্ষেত্রে ক্যান্সার রোগ জন্মিতেছে।

শ্বেতস্রাব বা শ্বেতপ্রদর।

(লিউকোরিয়া—Leucorrhœa)

কোন কোন স্ত্রীলোকের জরায়ু বা প্রসব-পথ হইতে চূণের মত সাদা, কিম্বা পুঁয ও শ্লেষ্মা, বা জলের ন্যায় স্রাব হইতে দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় এরূপ স্রাব হওয়া উচিত নয়। এই স্রাবের কারণ :—

(১) মেহ (গণোরিয়া, Gonorrhœa)

(২) ঋতুকালে তলপেটে ঠাণ্ডা লাগান বা অন্য কোন কারণে জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ (Inflammation)

(৩) গর্ভস্রাব বা প্রসবের পর জরায়ু দূষিত হওয়া।

(৪) জরায়ু, জরায়ুর মুখ বা প্রসব-পথে ক্যান্সার, গরমীর ঘা, 'আব' (টিউমার, tumour) বা অন্য কোন রোগ হওয়া।

(৫) পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, কালাজ্বর, অজীর্ণ, আমাশয় ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়া।

শ্বেতপ্রদরের চিকিৎসা

(১) উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া কারণ স্থির করিতে হইবে, নচেৎ আন্দাজে চিকিৎসা করান উচিত নয়। কারণ, যদি কোন কঠিন রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সময়ে ধরা না পড়িলে শেষে পস্তাইতে হইবে। রোগ স্থির করিয়া চিকিৎসক যে ব্যবস্থা করিবেন সেইমত চলিবে।

(২) প্রসব-পথ ডুস দ্বারা ধৌত করিয়া পরিষ্কার রাখিতে হইবে। ডুসের জলের সহিত নিম্নলিখিত ঔষধগুলির যে কোন একটী ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(ক) ½ সের গরম জলে চায়ের চামচের ৪ চামচ (৪ ড্রাম) ফিটকারি (alum) বা জিঙ্ক-সালফেট (zinc-sulphate) বা সোডা বাইকার্ব্ব (Soda Bicarb)।

(খ) পটাস্ পারমাঙ্গানস্ (Pot. Permanganas)

(৩) সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার জন্য টনিক ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে—যথা, ইলিক্সির ভাইটো-গ্লিসিরোফস্ (Elixir Vito-gylcerophos), হিমাটো সারসা-প্যারিলা উইথ্ গোল্ড (Hæmato sarsa-parilla with gold), ফেলোজ সিরাপ (Fellow's Syrup) ইত্যাদি। এই সকল ঔষধ ছোট চামচের এক চামচ (এক ড্রাম) এক ছটাক জলের সহিত মিশাইয়া আহারান্তে দিবসে দুইবার খাইতে হয়। (ক্রমশঃ)

পতিতার কথা

শ্রীহরিপদ মহলানবীশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সমাজের ছোট খাট অত্যাচারের ফলেও যে কখন কখন মেয়েরা পাপের স্রোতে ভাসিয়া পড়ে, তাহার দৃষ্টান্তও দুর্লভ নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম, পশ্চিম বঙ্গের কোন এক জেলাবাসী রাঢ়ী শ্রেণীর এক বৃদ্ধ দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণ সঙ্গতি অভাবে কিছুতেই কন্যা দুইটির বিবাহ দিতে না পারিয়া ভগ্ন হৃদয়ে দেহত্যাগ করেন। অতঃপর সেই দুই কুলীন কুমারী কলিকাতায় আসিয়া হিন্দুত্বের ধ্বজা তথা কৌলিন্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছিল। সপ্ততিপর বৃদ্ধ কিশোরী পত্নীর পাণিপীড়ন করিয়া নূতন সংসার পাতাইতে না পাতাইতে, বৃদ্ধের নয়নমণি, বৃদ্ধকে উদ্বৃত্ত জীবনকালটুকু শোকে, দুঃখে ও অপমানে কাটাইবার অবাধ অবসর করিয়া দিয়া, প্রতিবেশী ইয়ারবাজ ছোকরাটির সহিত অন্তর্ধান করিয়াছে, এরূপ দৃশ্যও নিতান্তই বিরল নহে। কিন্তু আমাদের সনাতন সমাজ হুঁকা বন্ধ, নাপিত বন্ধ প্রভৃতি গুরুতর সামাজিক তথ্যের গবেষণায় এত নিবিষ্ট আছেন যে, এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার মত সময় তাঁহাদের ঘটিয়া উঠে না।

গণিকাবৃত্তি সম্প্রসারণের মূলে সমাজের দায়িত্ব নিতান্ত লঘু না হইলেও, আরও এমন অনেক কারণে নারীরা এই ঘৃণিত পাপে লিপ্ত হয়, যাহার প্রতিকার সমাজের সাধ্যায়ত্ত নহে। পতিতা-সমস্যা লইয়া যাঁহারা বিন্দুমাত্রও মাথা ঘামাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন, বড় বড় সহরে অনেক নীচাশয় পুরুষ ও নারী লাঞ্ছিত নারীত্বের দোকানদারি করিয়া থাকে। ইহারা ছলে বলে কলে কৌশলে কতকগুলি রমণীকে করতলগত করে, এবং তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া, তাহাদিগেরই স্বাস্থ্য ও মনুষ্যত্ব বিক্রয়লব্ধ অর্থে আত্মোদর পূরণ করে। শরীরে সামর্থ্য থাকুক না থাকুক, ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, মনিবের অলঙ্ঘনীয় আদেশে ক্রীতদাসীদিগকে লম্পটের কামানলে নিজেদের আহুতি দিতে অনুক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে হয়। ফলে দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অচিরেই তাহারা যৌবনশ্রী হারাইয়া ফেলে, এবং পরিত্যক্ত হইয়া অর্দ্ধমৃতবৎ জীবন যাপন করে। সাধারণতঃ ব্যবসায়ে নূতন ব্রতিনী কুলত্যাগিনীরাই আশ্রয়াস্তরাভাবে এই হিংস্র জন্তুর কবলে পতিত হয়। এই সকল শৌণ্ডিক ব্যবসায়িদিগের অনুচরেরা শিকারের অন্বেষণে ঝি চাকরের ছদ্মবেশে অবাধে সমাজের বুকে বিচরণ করিয়া থাকে। কত শত শিশু ও বালিকা যে ইহাদের পাপ হস্তের খেলনায় ভুলিয়া, মাতৃ-অঙ্ক শূন্য করিয়া শৌণ্ডিকালয়ে স্থানলাভ করিয়াছে, শ্বশুর গৃহে অনাদৃতা লাঞ্ছিতা কত সরলা কিশোরী যে ইহাদের প্ররোচনায়, হীরা জহরৎ, গাড়ী ঘোড়া ও অনন্ত প্রেম-সুধার লালসায় গৃহত্যাগ করিয়া নরককুণ্ডে আশ্রয় লইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সত্য কি মিথ্যা নির্ণয় করিবার উপায় নাই, কিন্তু এমনও শুনা গিয়াছে যে, বদ্‌মায়েস গাড়োয়ান আরোহিনীকে গন্তব্য স্থানে না পৌছাইয়া, সোজাসুজি গণিকা-পল্লীতে লইয়া গিয়া রাক্ষস রাক্ষসীর হাতে তুলিয়া দিয়াছে।

বড় বড় সহরে কল কারখানা বিস্তারের ফলে যে সকল অবশ্যম্ভাবী অনর্থ সমাজে প্রসার লাভ করে, ব্যভিচার তাহার কোনটার অপেক্ষা কম আশঙ্কাজনক নহে। সাধারণতঃ যে শ্রেণীর লোক কলকারখানায় মজুরি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদের নিকট উচ্চ ভাব, উচ্চ চিন্তা, আশা করা দুরাশা বই আর কিছু নহে। তাহার উপর অধিক সংখ্যক পুরুষ ও অল্প সংখ্যক নারী, অনর্গল অশ্লীল অশ্রাব্য গালাগালির সহিত, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া, সন্ধ্যাকালে তাড়ির দোকানে হল্লা করিয়া, নীতিশাস্ত্রটা অমনি নেহাৎ হাল্কা করিয়া

ফেলে। তার পর বিভোর হইয়া টলিতে টলিতে কবুতরের খোপের মত কুঠুরীতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা যে ঘোর দুর্নীতির স্রোত বহাইয়া থাকে, তাহা স্মরণ করিলে বিশ্ব-বিশ্রুত অজজাতিরও গণ্ডদেশ বোধ হয় লজ্জা-রাগ-রক্তিম হইয়া উঠে। শুনিয়াছি, কুলী সদ্দারণীকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া কোন কোন তথাকথিত ভদ্র কেরাণী বা অন্য উপরওয়ালারাও সময় সময় প্রিয়দর্শনা নারী-মজুরের সদ্ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করেন না! কলকারখানার অনেক শ্রমিকারাই যে নিশাকালে বারবণিতা, তাহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ধনিক বা মালিকদিগের এই সব অকিঞ্চিৎকর বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হয় না; কারণ, শ্রমিকদিগের নৈতিক অবস্থার সহিত তাঁহাদের ষাণ্মাসিক ডিভিডেণ্ডের কোনই সম্বন্ধ নাই।

মানব-হৃদয়ের অন্তর্নিহিত পাশববৃত্তিও যে সময় সময় নারীর অধোগতির কারণ হয়, তাহাও খুবই সত্য। চৌর্য্যাপরাধে যত লোক দণ্ডিত হয়, তাহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকিতে পারে এবং আছে, যাহারা কেবল উপায়ান্তর না পাইয়া জঠরজ্বালা নিবৃত্তির জন্য চুরি করে। কিন্তু এমন লোকও ত যথেষ্ট আছে, যাহারা সৎপথে থাকিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারিলেও, কেবল চুরির খাতিরেই পরস্বাপহরণ করে। গণিকাবৃত্তি যাহারা অবলম্বন করে, তাহাদের অনেকেই দশচক্রে ভগবান ভূত হইলেও, এমন কতক পাপীয়সীও আছে, যাহারা কেবল পশুভাব-প্রণোদিত হইয়াই কুলের বাহির হয়। এমন দৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছে যে, দেবপ্রতিম পতি, সোণার চাঁদ সন্তান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সংসার পরিত্যাগ করিয়া কলঙ্কিনী কলঙ্ক-সায়রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে এতই কম যে, ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। এইরূপ স্থলে প্রতীকারের ক্ষমতা মানুষের নাই; সুতরাং ঐ সকল কুলটাদিগের উদ্দেশে আফ্‌শোষ করা, এবং পরজন্মে যেন তাহাদের সুমতি হয় তাহাই প্রার্থনা করা ব্যতীত আমাদের আর কিছু করিবার থাকে না।

পতিতার উদ্ধারকল্পে আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন প্রযত্ন করা হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। কিন্তু ব্যাপারটা যতই চক্ষুলজ্জার (delicate) হউক না কেন, আমাদের প্রসুপ্ত সমাজের এ বিষয়ে অচিরে চৈতন্যোন্মেষ হওয়া আবশ্যক। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নৈতিক শৈথিল্যের বাস্তব বা কাল্পনিক ইতিহাস অতিরঞ্জিত করিয়া, আমাদের বিশুদ্ধ চরিত্রের বড়াই করিলে চলিবে না। বাংলা দেশের বড় সহর কলিকাতা, ঢাকা, এবং জিলাগুলির সদর ষ্টেশনের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম; গণ্ডগ্রামের হাট বাজারের অনেক-গুলিতে পর্য্যন্ত পতিতা-পল্লী দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাংলা দেশের অর্দ্ধাধিক অধিবাসী অহিন্দু হইলেও, পতিতাদিগের প্রায় সকলেই হিন্দু-নামধারিণী, এবং হিন্দুর আচার ব্যবহার পুরাপুরি না হইলেও আংশিক ভাবে পালন করিয়া থাকে। সুতরাং উহারা যে হিন্দু-সমাজেরই পিঞ্জরমুক্ত পোষাপাখী, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন গুরুতর হেতু নাই। হিন্দুর এই ঘোর কলঙ্ক হিন্দুকেই দূর করিতে হইবে। গণিকাবৃত্তির ফলে আমাদের সমাজের সুনামই যদি কেবল কলঙ্কিত হইত, এই দুর্নীতি যদি সমাজের জীবনীশক্তির হানিকর না হইত, তবে না হয়, যে দুর্ভাগ্য আত্মীয়স্বজনের মুখে চুণকালি দিয়া হতভাগিনীরা গৃহত্যাগ করে, নিশ্চিন্ত মনে তাহাদের কুৎসাচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া তামসিক আনন্দে কাল কাটাইতাম। কিন্তু সমাজ হইতে যত দূরেই পড়িয়া থাকুক না কেন, উহারা যে সমাজের বায়ু বিষাক্ত করিতেছে, এই অতিবড় সত্যটী, যাহারা জাগিয়া না ঘুমায়, তাহাদেরই দৃষ্টিগোচর হইবে। পনর আনা সতী-সাধ্বী পতিপ্রাণা গৃহস্থ বধূর ক্ষুধার অন্ন মিলে না, লজ্জা নিবারণের বসন জোটে না; কিন্তু কুহক-বিদ্যায় পটিয়সী হইলে, নৃত্য ও সঙ্গীতে একটু দখল থাকিলে, বা দৈহিক লাবণ্যের কণামাত্র আভা থাকিলে, পতিতার প্রাসাদোপম গৃহ, রাজনন্দিনীর ঐশ্বর্য্যস্পর্দ্ধী বসন ভূষণ এবং তদনুযায়ী যান বাহনের অভাব হয় না, যদিও গৃহত্যাগ করিবার সময় এক বস্ত্র সম্বল করিয়াই ইহাদিগকে আসিতে হয়। কোন্ আশ্চর্য্য প্রদীপের ভৌতিক ক্ষমতা-বলে ইহাদের অতুল বৈভব দেখিতে দেখিতে গজাইয়া উঠে? এ সবই ত আমাদের অমানুষ ভালমানুষেরা সরবরাহ করিয়া থাকেন। প্রকাশ্যে বারবিলাসিনী সেবা করিয়া যাহারা মার্কা-মারা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা কত? অথচ সংখ্যাতীত নিষ্কর্ম্মা মক্ষিরাণীই ত উৎকট

বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিতেছে। বাস্তবিক সমাজের একটা বিরাট অংশ চোরাগোপ্তা ভাবে নৈতিক হিসাবে কতদূর যে অধঃপতিত, তাহা ভাবিতেও লজ্জায় লাল হইতে হয়—আতঙ্কে শিহরিতে হয়। স্কুলের কিশোর ও কলেজের নবীন যুবা হইতে আরম্ভ করিয়া ধবলকেশ ষষ্টিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত তাবৎ বয়সের শিক্ষিত ও নিরক্ষর, নিঃস্ব ও সঙ্গতিসম্পন্ন কত পুরুষই না কুহকিনীর কুহক-জালে আবদ্ধ হইতেছে। অধিক দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই কপর্দ্দকশূন্য হইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে বৃশ্চিকদংশন যাতনায় অধীর হইতেছে বা ব্যভিচারের অপরিহার্য্য ফল উপদংশাদি অশ্লীল মারাত্মক ব্যাধি স্বকীয় দেহে আহ্বান করিয়া প্রথমে পত্নী এবং পরে ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের মধ্যে সংক্রামিত করিতেছে। সমাজের এই করুণ ও অশ্লীল দৃশ্য আর বর্ণনা না করিলেও চলিবে।

সমগ্র বঙ্গদেশে যে বহু সহস্র বারবণিতা আছে, তাহাদিগকে সমাজবৃক্ষের জীবন-রসশোষক পরগাছা ব্যতীত আর কি নামে অভিহিত করিব? ইহাদের দ্বারা সমাজের সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে; কিন্তু এই সর্ব্বনাশও সমাজকে কত উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিতে হইতেছে! আমাদের দেশে পেশাদারি ভিক্ষুকের সংখ্যা অবশ্যই কম নহে, কিন্তু বারবিলাসিনীদিগের পাছে সমাজের যে অপব্যয় হয়, তাহার তুলনায় ভিক্ষোপযোগী কুপোষ্য পালনে সমাজের অতি অল্পই অপচয় হইয়া থাকে। আমাদের মত দরিদ্র সমাজের এতগুলি অর্থ বিষবৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালিতে ব্যয়িত হওয়া বড় আশার কথা নহে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, মনুষ্যত্বহীন বারনারী-পদলেহীর অপটু দেহ ও পাপিষ্ঠ মন হইতে দেশ কতটুকু সেবার আশা করিতে পারে? সভ্যতার বহির্ভূত যাহারা, মানুষের আকারে পশুর প্রকৃতি যাহাদের, তাহাদের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। বাকী বেশ্যাবিলাসী, রোদনবল, বিহ্বলচিত্ত, নারীভাবাপন্ন, লক্ষ্মীছাড়া পুরুষগুলিই বা কি? উহারা তবলা বাজাইতে পারে, টপ্পা গাইতে পারে, বাইজীর নৃত্যের নির্লজ্জ অনুকরণ করিতে পারে, চেষ্টা করিলে কেহ কেহ বা দুই এক কলি কবিতাও লিখিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু দেশ আজ যে ভীমকর্ম্মা নরশার্দ্দূলকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছে, ইহারা কদাচ সেই আহ্বানে উত্তর দিবে না। এমন কি নিরীহ ভালমানুষটির মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতাও ইহাদের নাই। তাহারা অপদার্থ নির্লজ্জ জীবন যাপন করিবে, এবং তাহাদেরই মত এক দল কিম্ভূতাকার জীবের সৃষ্টি করিয়া সংসারের ভার বাড়াইবে।

অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, শিক্ষার অভাবে নারী-জাতি পাপের ব্যবসা অবলম্বন করে; সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার হইলে দেশে বারবণিতার সংখ্যাও হ্রাস পাইবে। কিন্তু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ব্যভিচার যে অন্যায়, গণিকাবৃত্তি যে পাপ, এই সহজ সরল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিতে কি কোন কিতাবী শিক্ষার প্রয়োজন হয়? নিরক্ষর রমণীরাও কি ব্যভিচার গর্হিত বলিয়া মনে করে না? দেশের নারী-জাতির মধ্যে শিক্ষার একান্ত অভাব বলিয়া, যে সকল বিপথগামিনী নারী পাপ পথ অবলম্বন করে, তাহাদের মধ্যে হয় ত নিরক্ষরের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু লেখাপড়া জানা পুরুষের মধ্যে যেমন অসচ্চরিত্রের অভাব হয় না, তেমনি অসৎপথে যাইবার নিমিত্ত লেখাপড়া জানা নারীরও অভাব হয় না। যে উচ্চাঙ্গের গরীয়সী শিক্ষার আলোকে নর নারীর মনের সমস্ত কালিমা দূর হইয়া যায়, তাহা লাভ করা কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গণিকাবৃত্তিধারিণী যে জননী ও তনয়া একটি অসহায়া সধবা যুবতীকে অপহরণ করিয়া তাহাদেরই অনুগ্রহভাজন কোন গুণ্ডা কর্ত্তৃক তাহার প্রতি পাশবিক উৎপীড়ন করাইবার অপরাধে অভিযুক্তা ও দণ্ডিতা হইয়াছিল, খবরের কাগজ পড়িয়াছিলাম, তাহারা জনৈক খ্যাত-নামা স্বর্গগত সাহিত্যিকের পত্নী ও কন্যা, এবং তাহারা নিজেরাও নাকি উচ্চশিক্ষিতা। এই দুইটি রমণীরত্নই যে উহাদের জাতীয়া শিক্ষিতা বারনারীর একমাত্র উদাহরণ তাহা নহে; অমন শিক্ষিতা বারবণিতার এ দেশে অভাব নাই। আমাদের দেশে সঙ্গীত ও নৃত্যকলা কেবল বারবণিতারাই জিয়াইয়া রাখিয়াছে। লিখন-পঠনক্ষম না হইলে,—কোন কোন স্থলে লিখন-পঠনে দস্তুর মত অভিজ্ঞ না হইলে, এই দুইটি সুকুমার কলায় পারদর্শিতা লাভ করা যায়, এমন নহে। হইতে পারে কুলের বাহির হইয়া আসিবার পরে উহাদের অনেকে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া থাকে, হইতে পারে উহাদের কেহ কেহ বারনারীরই গর্ভজাত, মায়েরা

গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া উহাদিগকে লেখাপড়া শিখায়। কিন্তু সকলের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না।

এই সৃষ্টিছাড়া সমাজের বিচিত্র নিয়ম কানুনের এমনই দুর্জ্ঞেয় রহস্য যে, কখন্ কোন্ বিচার-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া, কোন্ মামলার কিরূপ নিষ্পত্তি করে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র। কোন্ মনোবৃত্তির প্রভাবে সমাজ-পতিরা বিভ্রান্তা স্খলিত-চরণা রমণীদিগকে উদ্দাম পাপ-জীবনে পাঠাইয়া দেন, তাহা না হয় বুঝিলাম। কিন্তু সেই পাপীয়সী পতিতার সহ-দুষ্কর্ম্মীরা—বেশ্যাগমন করিয়া কেন সমাজে পতিত হয় না, তাহার যুক্তিসঙ্গত উত্তর কে দিবে? এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কন্যার পাণি-গ্রহণ করিলে পতিত হন, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ যে কোন জাতীয়া এমন কি মুসলমানী বারবণিতার সংসর্গ করিলেও তাঁহার জাতি-চ্যুতি হয় না কেন? অর্থলোভী গোস্বামী মহাশয়েরা মন্ত্রদানোপলক্ষে পাতকীর সংস্রবে আসিলেও সমাজে তাঁহাদের সম্ভ্রমহানি হয় না কেন, ইহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন কে করিবে? কোন্ ত্রিকালদর্শী মহাঋষিরচিত শাস্ত্রের অনুমোদনে ঢাকা অঞ্চলে ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে এবং বঙ্গ-দেশের সর্ব্বত্র দুর্গাপূজা প্রভৃতি ধর্ম্মোৎসবে, বিবাহ, অন্নারম্ভ প্রভৃতি সামাজিক উৎসবে যুবাবৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে পুরুষেরা, বিভিন্ন বয়সের পুরমহিলারা এবং উপাধিধারী টোলের পণ্ডিতেরা ভদ্র লোকের গৃহে সুরাবিলাসিনী বাইজীর অঙ্গভঙ্গিমোল্লাসিত নৃত্যগীতে পরম তৃপ্তির সহিত চিত্ত বিনোদন করেন, অথবা কবিওয়ালী ঢপওয়ালীর গান শুনিয়া বাহবা দিয়া থাকেন, তাহা বুঝিতে পারে, কাহার সাধ্য? যখন কোন নারী বয়সের দোষে ভুল করিয়া বসিল বা অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে আততায়ীর হস্তে লাঞ্ছিতা হইল, তখন যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিয়া তাহাকে ধ্বংসের পথে পাঠান হইল। তার পর শয়তানি কারসাজিতে যখন সে পুরাপুরি ওস্তাদ বনিল, তখন সমাজ তাহাকে অর্থ ও উৎসাহ দিয়া দুর্নীতি প্রচারে তাহার আনুকূল্য করিতে থাকিল। ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত বিচার-মাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠাই ঘটে। আত্মহত্যার এক অদ্ভুত সংস্করণ।

আমাদের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া যদিও হতভাগিনীরা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে, তাই বলিয়া, সঙ্গে সঙ্গে যে তাহারা দয়া মায়া স্নেহ প্রভৃতি নারীসুলভ চিরন্তন কোমল হৃদয়বৃত্তিগুলিও বিসর্জ্জন দেয় তাহা নহে। শরৎ বাবুর কল্পিতা পিয়ারী বাইজীর ক্ষুধিত মাতৃত্ব যে অফুরন্ত বাৎসল্যে সপত্নী-পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল, তাহা নিছক ঔপন্যাসিকের কল্পনা না-ও হইতে পারে। 'বাবু'র বিপত্তিকালে কোন কোন বারবণিতা যে ছার অর্থালঙ্কার ত দূরের কথা নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাও অনেকের জানা থাকিতে পারে। রাজ-নৈতিক আন্দোলনের সময় দেখিয়াছি, দেশের সম্বন্ধে, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলেও, এটা যে আমাদের দেশের ভালর জন্যই একটা কিছু, তাহাই বুঝিয়া লইয়া, গণিকারাও কোথাও কোথাও হুজুকে মাতিয়াছিল। তাহাদের হুজুকটা নির্জ্জলা হুজুক ছাড়া আর কিছু না-ও হইতে পারে; কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনা হইতেও তাহাদের চরিত্রের একটা দিক বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। গণিকাদিগের কেহ কেহ সারা জীবনের পাপের ধন মৃত্যুকালে লোক-সেবায় দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, তাহাও শুনিয়াছি। ছবিতে দেখিয়াছি জনৈক বর্ষীয়সী পতিতা রমণী কি গভীর ভক্তিভরেই না হরিনামের মালা জপিতেছেন। গলিত-খর-নখর-দন্ত বিড়াল-তপস্বী বলিয়া যাহার খুসী ইঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে পারে, ইঁহার ভক্তি-প্রীতি-দীপ্তি-ময়ী মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া আমার কিন্তু যে কোন উপাসনারতা পিতমহীর কথাই মনে পড়ে। শুনিয়াছি গৃহস্থ-ঘরের পিসীমা দিদিমার মত গণিকারাও তীর্থ-ধর্ম্ম করিয়া থাকে। মানিলাম, সকলে হয় ত অকৃত্রিম ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সহিত না-ও করিতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ ত করে। সুযোগ পাইলে, অধিকার থাকিলেও এই শ্রেণীর গণিকাদের অন্ততঃ কেহ কেহ যে সমাজে প্রত্যাগমন করিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? গোপন অন্তরে আমরা যতই স্তূপীকৃত পাপরাশি বহন করিয়া বেড়াই না কেন, আমরা নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ; কারণ আমাদের অন্তরটা পরখ্ করিয়া দেখিবার মত এক্স-রে (X-ray) আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ওদের নিস্তার নাই। আজকাল আর যিশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন না, সুতরাং মেরী মাগ্‌ডালিনীর উদ্ধার সাধন হয় না; সন্ন্যাসী উপগুপ্তও আর নাই, সুতরাং মথুরার সেই বারনারীরও পরিত্রাতা কেউ নাই। আমরা

কিন্তু ভুল-ভ্রান্তির অপরাধে স্ত্রী পুরুষের নিমিত্ত চিরকালই এইরূপ বিচার-বৈষম্যের ব্যবস্থা করি নাই। প্রাচীন ভারতের যে পাঁচটি রমণীর নাম প্রাতঃকালে স্মরণ করিলে মহাপাতক নাশ হয় বলিয়া আমাদের পণ্ডিতেরা ফতোয়া দিয়াছেন, আধুনিক ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য তাঁদের হইলে, কেহ আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া সমাজের বাহিরে কলুষ-পল্লীতে অবস্থান করিতেন, কেহ বা আমরণ ধোপা-নাপিত-বন্ধ হইয়া একঘরে হইয়া থাকিতেন। মৃত্যুর পর পাতিত্যের ভয়ে কেহ তাঁহাদের শবও স্পর্শ করিত না। প্রাতঃকালে তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করা ত দূরের কথা, দৈবাৎ শ্রুতি-গোচর হওয়া মাত্র "রাম রাম" করিয়া আমরা তর্জ্জনীর সাহায্যে কর্ণরন্ধ্র রুদ্ধ করিতাম!

আগত রোগের প্রশমন চেষ্টা অপেক্ষা অনাগত ব্যাধির আক্রমণ সম্ভাবনাটা দূর করাই অধিক বুদ্ধিমত্তার কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক ব্যাপারের ন্যায় পতিতা-সমস্যার মত দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াও আমরা এই সত্যটা ভুলিয়া যাই। সুতরাং দেখিতে পাই, কোন কোন অতিরিক্ত উৎসাহী সমাজ-শোধক, পতিতা বিদ্বেষে অসহিষ্ণু হইয়া, সমাজের এই আবিলতা দূরীকরণ মানসে, পতিতার বিরুদ্ধে কঠোর রাজবিধি প্রণয়নের পক্ষপাতী। প্রতিহিংসা-মূলক আইনে যদি পতিতা ও পাতিত্য-সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত, তাহা হইলে ভাবনার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আইন করিয়া কি কোন দিন দুষ্কৃতি-স্রোতের গতি রোধ করা যায়? জাল জুয়াচুরি, নরহত্যা প্রভৃতি পাপের বিরুদ্ধে কত না কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া দুষ্কৃতেরা কি অন্যায় অনুষ্ঠানে বিরত হয়? এক দিকে সমাজদণ্ড এবং অপর দিকে রাজদণ্ড, দুইদিক হইতে এই দুইটির প্রচণ্ড দণ্ডাঘাতে বারবণিতাদিগের মাথার খুলি চূর্ণ করিয়া দিতে চাহিলে, পরোক্ষভাবে, জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত তাহাদিগকে গোপনে আরও অধিক অন্যায়াচরণে উৎসাহ দিয়া, সমাজের প্রভূত অকল্যাণই সাধন করা হইবে। সুতরাং গণিকাদিগের বিরুদ্ধে কঠোর আইন বিধিবদ্ধ করিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে, সৎপথে প্রত্যাগমনেচ্ছু বারবণিতাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত সমাজ বা সরকার হইতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করাও আবশ্যক। দুর্নীতির উচ্ছেদ কল্পে কঠোর রাজবিধি শক্তি সামর্থ্য অনুসারে যাহাই করুক না কেন, উহা কেবল গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিবার মতই হইবে। কারণ, পতিতার সৃষ্টি-স্থায়িত্ব এবং সংখ্যা-বৃদ্ধি অনেকটা সমাজেরই হাত। যত দিন না সমাজ এ বিষয়ে অবহিত হইবে, যত দিন না সমাজ বুঝিবে, ঘুণে ধরা জীর্ণ রীতি-নীতি গুলিকেও মরণ কামড়ে কামড়াইয়া ধরা এক্ষেত্রে অন্ততঃ আত্মহত্যারই সামিল, তত দিন এই অনর্থ উৎপাটিত হইবে না। দুর্নীতি উচ্ছেদের মহান্ সঙ্কল্প লইয়া, বর্ত্তমান পতিতাদিগকে পীড়ন করিবার প্রয়োজন যতটা, ভবিষ্যতে আর কেহ যাহাতে এই ঘৃণিত পাপের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে না পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা, তদপেক্ষা অনেক বেশী আবশ্যক। তাহা করিতে হইলেই সবার আগে ডাক পড়িবে সমাজের,—পুলিশ বিভাগের নহে।

পরিশেষে ষ্টেড্ সাহেবের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলিতেছি—'যত দিন মানুষের মনে অবৈধ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার স্পৃহা জাগরুক থাকিবে, যত দিন মানুষ পরদারগমনও অগম্যাগমনের মতই মহাপাতক বলিয়া জ্ঞান না করিবে, তত দিন সমাজ-দেহের এই পচ্যমান ক্ষত একেবারে নিরাময় হইবে না। কিন্তু সমাজ একটু উদার মত অবলম্বন করিলে পতিতা-সমস্যা বহু পরিমাণে সরল হইতে পারে। সমাজ যখন ততটুকু উদারতা, ততটুকু মনুষ্যত্ব দেখাইতে কার্পণ্য করিতেছেন, তখন পাপ-স্রোতও খরবেগে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। প্রতীকারের উপায় হাতের কাছে থাকিতেও তাহা ব্যবহার না করিলে কাহার প্রতি দোষারোপ করিব?*

* এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর, লাটসাহেবের সভাপতিত্বে Calcutta Vigilance Associationএর তরফ হইতে যে সভা আহূত হইয়াছিল, সেই সংবাদ পাইয়াছি। এই Associationএর উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।—লেখক

যশোদা-জাবন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মহম্মদ আবদার রহমান চঘ্‌তাই

B. H. P. Works.

রাজগী !

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

(১৩)

সত্য সত্যই নরকে ডুবিলাম। কেহই আমাকে ঠেকাইতে পারিল না। মা সাবিত্রীকে লইয়া আসিলেন। মা কান্নাকাটি করিলেন, সাবিত্রী শাসন করিল, ধর্ম্মের ভয় দেখাইল, সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা দেখাইল, আমাকে দেশে লইয়া যাইতে চাহিল, আমি অটল অচল হইয়া রহিলাম।

মায়ের কাছে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস হইল না; কেবল মুখ বুজিয়া মাথা নীচু করিয়া সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব অসহযোগের জোরে তাঁহার সব চেষ্টা ব্যর্থ করিলাম।

সাবিত্রী যখন বেশীরকম উৎপাত আরম্ভ করিল, তখন আমি তাহাকে বলিলাম, "থাম, থাম। সার দিয়ে বীজ বুনে' গাছ দেখে মূর্চ্ছা গেলে চলবে কেন? তোমরা যে কোমর বেঁধে আমার ভাল ক'রতে লেগেছিলে, এই তো বেশ দিব্যি ভাল ক'রেছ। আনন্দ কর! রাগারাগি কেন? নরেন বাবু আমায় মানুষ ক'রে তুলেছিলেন প্রায়, সে তোমাদের সইলো না। আমার ভালর জন্য তাঁর হাত থেকে আমায় বের করে নিলে, দরখাস্ত করে আমার নাবালগী বাড়িয়ে নিলে, আমার ভাল ক'রবে বলে'। এখনো কি মনে হ'চ্ছে না যে খুব ভাল ক'রেছ? এখন আমায় রেহাই দেও পেত্নী ঠাকরুণ, আর ভালোর কাজ নেই, এখন আমার কাঁধ থেকে নামো।"

সে গর্জ্জিয়া উঠিল, আমাকে তীব্রভাষায় গালাগালি করিতে লাগিল। গলা ছাড়িয়া সে পাড়ার লোক জানাইয়া আমাকে গাল দিতে লাগিল। আমার মাথায় খুন চাপিয়া গেল। আমি বলিলাম, "বেরোও এখান থেকে, বেরোও বলছি।"

"ঈস! ভারি তেজ দেখছি! সাবিত্রী বামনী সে মেয়ে নয় যে, তোমার চোখ রাঙানিতে ডরাবে। উঠছো যে বড়! চুপ করে' বসে আমার কথা শোন, নইলে ভাল হ'বে না বলছি। আজ তোমার কোথাও বেরোন হ'বে না, আজ রাত্রেই বাড়ী যেতে হ'বে।"

"বটে? তোমার হুকুম না কি?"

"আমার হুকুম। জান আমি তোমার সহধর্ম্মিণী— তোমার ধর্ম্মাধর্ম্মের জন্য আমি দায়ী।"

"ঢের ঢের ধর্ম্ম দেখেছি, তুমি এখন বেরোও।"

গর্জ্জিয়া সাবিত্রী বলিল, "ফের! আমাকে কি তোমার ঝি পেয়েছ না বিধু পেয়েছ যে বেরোও বেরোও করছো। মুখ সামলে কথা কয়ো' বলছি।"

আমি এই তিরস্কারে ক্রোধে অন্ধ হইলাম। ধাঁ করিয়া উঠিয়া প্রবল মুষ্টিতে এক হাতে সাবিত্রীর হাত ও আর এক হাতে তার গলা ধরিয়া, তাহাকে হিড় হিড় করিয়া ঠেলিয়া ঘর হইতে বাহিরে লইয়া, খুব জোরে একটা ধাক্কা দিলাম। ধাক্কার চোট সামলাইতে না পারিয়া সে সামনে সিঁড়ির উপর গিয়া পড়িল ও সিঁড়ি দিয়া গড়াইতে গড়াইতে অনেকটা দূর পড়িয়া গেল। তার নাক দিয়া রক্ত ছুটিল। চারিদিক হইতে সবাই আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইল।

আমি ঘরে ফিরিয়া দুয়ার বন্ধ করিলাম। আমার মনটা ভারি অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। সাবিত্রীর উপর এতটা বল প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না; আর তাহাকে কোনও রকম আঘাত করা আমার অভিপ্রায় ছিল না। রাগের মাথায় আমি যাহা করিয়া ফেলিলাম, রাগের ঝোঁক থাকিতে থাকিতেই বুঝিলাম যে, সেটা ভয়ানক অপকর্ম্ম। শক্তিমান পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলা যে কতটা নীচতা ও কাপুরুষতার কাজ, সে কথা নরেন বাবুর শিক্ষায় আমার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। কাজেই তীব্র অনুশোচনায় আমার প্রাণ জর্জ্জরিত হইল।

আমি আমার দুয়ারে খিল দিয়া দুই হাতের ভিতর মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিলাম।

আমি ভাবিলাম, কোথা হইতে কোথায় নামিয়া আসিয়াছি আমি। দুই বৎসর আগে নরেন্দ্র বাবু আমাকে

তাঁহার সমাদরের যোগ্য মনে করিয়াছিলেন, তাঁর কাছে আমি গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করিবার উৎসাহ পাইয়াছিলাম। আর আজ এই দুই বৎসরের মধ্যে আমি পানাসক্ত হীনাচারী লম্পট হইয়া পড়িয়াছি। বিধুকে পাপে ও বিলাসে ডুবাইয়া তাহাকে একরকম নিরাশ্রয় রাখিয়া আমার ঔরসজাত পুত্রের সহিত পরিত্যাগ করিয়াছি; পাপাচারের সীমা রাখি নাই। আর আজ আমি স্ত্রীকে মারিয়াছি। বস্, আর কোন পদ বাকী রহিল। সাবিত্রীকে লিখিয়াছিলাম, দ্রুতপদে নরকে যাত্রা করিয়াছি—সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

আমার প্রত্যেকটি অপকার্য্য বিষমাখা ছুঁচের মত বুকের ভিতর অবিরত ঘা দিতে লাগিল। বুকটা ফাটিয়া যাইতে চাহিল। অনেকক্ষণ থাকিয়া থাকিয়া শেষে আমি বালিসে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে মাথা ঝাড়িয়া উঠিলাম। দেয়ালের গা আলমারী খুলিলাম। যেখানে আমার হুইস্কীর বোতল থাকিত, সেখানে তাহা নাই। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, সাবিত্রী কোনও ফাঁকে সেটা সরাইয়াছে। আমি মদের জন্য একটা প্রচণ্ড তৃষ্ণা অনুভব করিতেছিলাম। সামনে হুইস্কির বোতল না পাইয়া একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলাম!

কোনও রকম হৈ চৈ না করিয়া আমি কাপড় চোপড় বদলাইয়া বাহির হইয়া গেলাম। সদর দরজার কাছেই দেখা হইল দেওয়ানজীর সঙ্গে। আমি বলিলাম, "দেওয়ানজী, আমার সঙ্গে একটু বেড়াতে যাবেন চলুন।"

বৃদ্ধকে লইয়া আমি রাস্তায় একখানা গাড়ী ডাকিয়া চড়িলাম। গাড়ীর ভিতর বসিয়া তাহাকে বুঝাইলাম যে, আমার নাবালকী প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এখন আর আমাকে খুন না করিয়া কোনও মতেই সম্পত্তির দখল ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমাকে খুন করিবার কোনও প্রকার মতলব তাঁদের আছে কি না।

দেওয়ানজী ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, এ কি রকম কথা ব'লছেন।"

দেওয়ানজী এবার আমাকে "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমার সম্পত্তি পাইতে আর কয়েকমাস মাত্র দেরী আছে। তার পর তাঁর চাকরী থাকা না থাকা আমার হাত। কিন্তু আমার দেশে গিয়া রাজগী করিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। আমি স্থির করিয়াছি, কলিকাতায়ই বাস করিব। দেওয়ানজী যদি এখন আমার কথা শোনেন, তবে ভবিষ্যতেও ঠিক এখনকার মতই কর্ত্তৃত্বভার পাইয়া থাকিবেন।

দেওয়ানজী এ সব কথা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; এবং স্বীকার করিলেন যে, মনোহর সার কাছে সব দেনা তিনি শোধ করিয়া দিবেন; এবং আমি যখন যে টাকা চাহিব, কোনও সোর গোল না করিয়া তাহা দিবেন।

বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আমি দেওয়ানজীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া গাড়ী ছুটাইয়া চলিলাম। আমার মনের ভিতর প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছিল। দারুণ বেদনায় আমার হৃদয় অবসন্ন ও পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। এই কথা ভাবিয়া আমার মনটা একদম ভাঙ্গিয়া পড়িল যে, আমি একেবারে অধঃপাতে গিয়াছি। কি ছিলাম আমি, নরেন বাবুর কাছে কি সব উচ্চ আদর্শ লাভ করিয়াছিলাম, কত মহৎ কামনা আমার হৃদয় মাতাইয়া তুলিয়াছিল। আজ কোথায় সে সব? সব ভাসিয়া গিয়াছে।

এখনকার জীবনের কথা ভাবিতে আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। কি করি আমি? সকাল বেলায় দশটার সময় ঘুম হইতে উঠি। তার পর চা খাইয়া পড়িয়া থাকি। উঠিয়া স্নান করিয়া দুটি খাই। তার পর আবার ঘুম। বৈকালে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া খাই দাই। তার পর বাহির হইয়া যাই। রাত্রে কখন কি অবস্থায় বাড়ী ফিরি, কোনও দিনই তা' জানিতে পারি না। কি ক্লান্তিকর আলস্য! ভাবিতে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল। এমনি করিয়াই কি দীর্ঘ জীবন কাটাইব? জীবন লইয়া কি এর চেয়ে বেশী ভাল কিছুই করিব না কোনও দিন?

এ কথা আগে ভাবিলে হয় ত আমার ফিরিবার পথ ছিল, হয় তো আমি তাহা হইলে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া নূতন করিয়া জীবন গড়িতে পারিতাম। কিন্তু এখন আমার মনে হইল সেটা অসম্ভব। আমার নিজের উপর আমার কোনও শক্তি নাই, কোনও রূপে আমি আপনাকে এই জীবন হইতে টানিয়া তুলিতে পারি না। এখন এ সব

কথা ধ্যান করা কেবল অনুশোচনায় ডুবিয়া যাওয়া বই অন্য ফল প্রসব করিতে পারে না। এই তো এত অনুতাপ আমার হইতেছে; তবু আমি চলিয়াছি ঠিক সেই নরকেরই দিকে, যাহা আমাকে এত নীচে নামাইয়া আনিয়াছে। আমার সমস্ত শরীর তীব্র ভাবে সুরার কামনা করিয়া আমাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। আমার আর আশা নাই। কাজেই মদে ডুবিয়া থাকা ছাড়া আমার আর অন্য গতি নাই। এ পৃথিবীতে কত লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন যেমন বৃথাই বহিয়া যাইতেছে, আমারও জীবন সেই ব্যর্থ জীবন-স্তূপের ভিতর মিলাইয়া যাইবে, কেহ তাহা খুঁজিয়া পাইবে না।

আমি গাড়োয়ানকে জোরে চালাইতে বলিলাম। বিলম্বে আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। বুকের ভিতরের এ বৃশ্চিক জ্বালা নিবারণের জন্য আমি ক্ষেপিয়া উঠিলাম।

গন্তব্য স্থানে আসিয়া আমি গাড়ী বিদায় দিলাম। এ বাড়ী আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমি এক যায়গায় বেশী দিন আটকাইয়া থাকিতে পারি না। প্রথম পরিচয়ের ঝোঁক কাটিয়া গেলেই আমার মন ভয়ানক হাঁপাইয়া উঠে। তাই আমি চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই। এই অপরিচিত গৃহেই আজ ঢুকিয়া পড়িলাম।

(১৪)

পরের দিন সকালে আমার যে ঘরে নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে অতি জঘন্য একটা ঘর। এ ঘরে আমি রাত্রে আসি নাই, তাহা মনে হইল। একটা অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে একতালার ঘর, তার রাস্তার দিকে একটা ছোট্ট জানালা আছে। সেই জানালার পাশে একখানা খাট পাতা। বিছানাপত্র ভাল নয়, তবু ঘরের যা কিছু সম্পদ সেই বিছানায়। আর সমস্তই দারুণ দৈন্যে ভরা।

আমার শিয়রের কাছে যে বসিয়া বাতাস করিতেছিল তাহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। দীন শীর্ণকায় মলিন সে—কিন্তু আমার দেখিয়া চিনিতে একটুকুও দেরী হইল না—সে বিধু।

বিধুর চেহারা ভয়ানক খারাপ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে তার হাড় গিজ্‌গিজ্ করিতেছে, গায়ের রং ময়লা হইয়া গিয়াছে, শরীরে ব্যাধির লক্ষণ স্পষ্ট। সে শিয়রে বসিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

আমি লাফাইয়া উঠিয়া বলিলাম, "বিধু!"

বিধু পাখা ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ভয়ানক কাঁদিল, কিছুই বলিতে পারিল না। আমি আড়ষ্ট, স্তব্ধ, অবাক্ হইয়া গেলাম। সেই সুন্দর বিধুর এই মূর্ত্তি দেখিয়া আমি এতটা বিমূঢ় হইয়া গেলাম যে, তার প্রেতাত্মা দেখিলে এর চেয়ে বেশী বিস্মিত হইতাম না।

অনেকক্ষণ পরে বিধু বলিল, "এখন শরীর ভাল বোধ ক'রছো কি? গাড়ী একখানা ডেকে আনবো! বাড়ী যাবে?"

আমি বলিলাম "র'স্, যাব। কিন্তু আগে একটু বুঝে নেই ব্যাপারখানা। আমি কি তোর এখানেই এসেছিলাম রাত্রে?"

"পোড়া কপাল আমার! এখানে কেন আসতে যাবে? গিয়েছিলে দোতলায়। সেখানে অনেকগুলো মদ খেয়ে কি একটা হল্লা ক'রেছিলে, কতকগুলো মিলে মিলে তোমায় মার ধর করে সিঁড়ির উপর ফেলে দিয়ে গেল। সোরগোল শুনে ওপরে গিয়ে দেখি, তুমি সিঁড়ির ওপর মদে বিভোর হ'য়ে পড়ে আছ। আমি তোমায় নিয়ে এলাম এই ঘরে।"

আমি গম্ভীর হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। কোনও কথা বলিতে পারিলাম না। কেবল মনের ভিতর আকাশ পাতাল তোলপাড় করিতে লাগিলাম।

খানিক পরে বিধু আমার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুমুখে বলিল, "রাজাবাবু, তোমার পায় ধরি, তুমি ভাল হও। তুমি বড়লোক, রাজা, দেশের মধ্যে তুমি মান্যি গণ্যি, তোমার কি ভাল দেখায় এমনি মেয়ে-মানষের বাড়ীতে মাতাল হ'য়ে পড়ে ছোটলোকের হাতে মার খাওয়া। তোমার দশা দেখলে আমার বুক ফেটে যায়। আমার ইচ্ছা করে আগুনে পুড়ে মরতে। আমিই তো তোমাকে অধর্ম্মে টেনে এনেছিলাম। আমাকে দয়া কর রাজাবাবু, তুমি ভাল হও। তোমার এ দশা দেখলে আমার বাঁচতে ইচ্ছা হয় না।"

আমি একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলাম। এই বুদ্ধিহীনা নারীর প্রগাঢ় ভালবাসার কথা ভাবিয়া আমার

চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। একটি দিনের তরেও সে আমার হিত ভিন্ন অহিত চিন্তা করে নাই, আমায় সদুপদেশ ছাড়া কুপরামর্শ দেয় নাই, আমিই তাকে পাপের পথে প্রথম দীক্ষা দিয়াছি, অথচ সে সব দোষ অনায়াসে নিজের ঘাড়ে টানিয়া লইয়া, এখনো আমারমঙ্গল ধ্যান করিতেছে। তার যে অবস্থা, তাতে তার জীবনের আর কোনও আশা নাই। আমারই জন্য তার এ দশা; কিন্তু সে জন্য তার অভিযোগ অনুযোগ কিছুই নাই। সে সুধু আমার পায় ধরিয়া সাধিতেছে, "তুমি ভাল হও।"

একটা অনির্ব্বচনীয় আলোকে আমার হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠিল। বিধুর এ কাতর ক্রন্দনে অন্তর বিচলিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, এখনো আমার আশা আছে। আমার সম্পদ আছে, পদ-মর্য্যাদা আছে, বিদ্যাও আছে, বয়সও আছে! সমস্ত জীবন আমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, আমি আমার পদ ও সম্মানের যোগ্য কেন না হইতে পারিব?

আমি উঠিলাম। নূতন উৎসাহ, নূতন প্রতিজ্ঞা লইয়া উঠিয়া বলিলাম, "আচ্ছা বিধু, তোর কথাই রাখবো। আমি ভাল হ'ব। এখন আসি।"

দুয়ারের কাছে যাইতেই আমার অন্তরাত্মা যেন হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া আমাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, আমি দারুণ হৃদয়-হীন স্বার্থপর! বিধুর উপর অত্যাচার ও অবিচার করিয়া তার বিনিময়ে পাইয়াছি স্নেহ ও সেবা,—আর, তার চেয়েও বেশী, পাইলাম নবজীবন। কিন্তু একটিবার তার কথাটা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করিলাম না।

ফিরিলাম। বিধুর কাছে তার সব কথা খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম যে, আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবার অল্প দিন পরেই বিপিন উধাও হইয়া যায়। তখন বিধুকে বাধ্য হইয়া রীতিমত বেশ্যাবৃত্তি করিতে হইল। তা' ছাড়া তো পেট চলে না। তার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল,—কি লজ্জা! কি ঘেন্না! তবু পোড়া প্রাণ তো রাখিতে হইবে!

বেশ্যাবৃত্তিতে তার বেশী সুবিধা হইল না। তার রূপ-যৌবন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সে না জানে সাজিতে, না জানে গান গাহিতে, না জানে নাচিতে, না জানে দুটো কথা কহিতে। সে মদও খাইতে পারে না। কাজেই সৌখীন লোকে তার কাছে বড় ভিড়িত না। ফলে তার অবস্থা বড় সুবিধা হইল না। অল্প দিনের মধ্যেই সে ব্যারামে পড়িল, এখন সবে একটু সারিয়াছে। এখন সে এক মেসে ঝিগিরি করে; তা ছাড়া বেশ্যাবৃত্তিও করে। কিন্তু বড় কষ্টে তার দিন যাইতেছে।

খুব সঙ্কোচের সহিত আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোর ছেলে?"

বিধু বলিল, "সে গেছে।" বলিয়া চুপ করিল। আস্তে আস্তে তার চোখ হইতে বড় বড় অশ্রু বিন্দু গড়াইয়া পড়িল। তার পর চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে বলিল, "আমার যখন বেশী ব্যারাম তখনই সে গেছে। এক ফোঁটা ওষুধ, একটু পথ্যি তাকে দিতে পারি নি। সে বিনা চিকিৎসায় তিন দিনের জ্বরে মারা গেছে।"

বিধুর সমস্ত বর্ণনার মধ্যে এক ফোঁটা আড়ম্বর, একটু অনাবশ্যক ভাষার ছটা ছিল না। কিন্তু সেই সরল অলঙ্কার-হীন কথার মত করুণ কাহিনী কোনও দিন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। তার সে কথা শুনিয়া আমার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল, তাই আমি কেবল নীরবে আগাগোড়া শুনিয়া গেলাম; কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া শুনিলাম। কিন্তু যখন সে তার শিশুর—আমার-রক্ত-মাংসে-গড়া শিশুর—মৃত্যুর কথা বলিল, তখন আমার অশ্রু আর বাধা মানিল না। আমি বিধুর সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিলাম।

অনেকক্ষণ পরে আমি কথা বলিলাম। কত কথা আমার মনে উঠিতেছিল, কিছুই বলিতে পারিলাম না। কথাগুলি বুকের ভিতর ঠেকিয়া রহিল; আমি কেবল বলিলাম, "বিধু, তবে আমি আসি।"

"এসো" বলিয়া বিধু সঙ্গে সঙ্গে উঠিল।

আমি একবার বুকের পকেটে হাত দিয়া দেখিলাম, আমার টাকার ব্যাগ সেখানে নাই। গত রাত্রে যারা আমাকে মারধোর করিয়াছিল, তাহারা আমার টাকাকড়িও হস্তগত করিতে ভুলে নাই, তাহা বুঝিলাম। কাজেই বিধুকে কিছু দেওয়া হইল না, দিবার কথা কিছু বলিতে লজ্জা-বোধ হইল।

রাস্তায় বাহির হইয়া আসিয়া মনে হইল যে, এখন

বিধুকে দু' দশ টাকা দিতে যাওয়া তাকে অপমান করা। সে আমার জন্য যাহা সহিয়াছে, তার জন্য সে আমাকে গঞ্জনা দেয় না, নিন্দা করে তার অদৃষ্টের! আমার যে সেবা সে করিয়াছে, যে স্নেহ সে আমাকে দিয়াছে, তার প্রতিদানের আশা সে করে না। তাকে আমার টাকা দিতে যাওয়া অপমান। কিন্তু সঙ্কল্প করিলাম যে, তাহাকে আমি এ জীবন হইতে স্থায়ী ভাবে উদ্ধার করিব।

ভগবানের চরণে অসংখ্য প্রণিপাত যে এই সংকল্প রক্ষা করিবার সুমতি আমার হইয়াছিল।

আমি তখনই সোজা নরেন্দ্রবাবুর বাসায় গেলাম। তাঁর কাছে অকপট চিত্তে আমার সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি আমাকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "এ কি সর্ব্বনাশ ক'রেছ ভাই! এত ছোট আমাদের জীবন, ভগবানের দয়ার দান,—এর দুটো দুটো বছর এমনি করে অপচয় ক'রেছ!"

এ অনুযোগের কথা নয়; তিরস্কার নয়; এ স্নেহের কথা, করুণার কথা! আমার যেন মনে হইল, ভগবান স্বয়ং আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে কোল বাড়াইয়া দিয়াছেন।

নরেন্দ্রবাবু বিধুর ভার লইলেন। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। ইহার পর কয়েক বৎসর বিধু বাঁচিয়া ছিল। সে অভাবে কষ্ট পায় নাই, কিন্তু আবশ্যকের অতিরিক্ত সম্পদও পায় নাই। তার বাড়ী ঘর ছিল, এক বৃদ্ধা সঙ্গিনী ছিল। সে বাড়ীতে তরী-তরকারী বুনিত, অবসর কালে চরকায় সূতা কাটিত, লেস বুনিত; ক্রমে তাহাতেই তার গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইত। আমি কিছু কিছু সাহায্য করিতাম। নরেন্দ্রবাবু তার দেখা শুনা করিতেন। (ক্রমশঃ)

লোটা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

আমি লোটা আমি যোগীর কাম্য, আমি রে পরম সম্বল,
ভাগ্যবন্ত হতে বাকি শুধু ছোট একখানা কম্বল।
সব ছাড়ে যারা, হায়, তারাও আমারে চায়,
জয় গায় মোর ইরাবতী রেবা গঙ্গা গোমতী চম্বল।

আমি চলিয়াছি হিংলাজ হতে সটান পরশুকুণ্ড,
কাথিয়ার হতে মালাবার আর পুরী হতে 'কাট্‌মুণ্ড'।
বাধা নাই চলি দেদার, দ্বারকা বদরী কেদার;
সমাদর করে পাণ্ডা পূজারী দীন দাতা সাধু ভণ্ড।

গেছি দুস্কর পুষ্করে আমি প্রয়াগে নেয়েছি কুম্ভে,
অমরনাথের পথের খবর আমার নিকটে শুন্‌বে।
মেখেছি ব্রজের রজ হে, কি মহাভাগ্য বোঝ হে,
গঙ্গোত্তরী উতারি এসেছি গোমুখীর ধারা চুম্বে।

গোদাবরী নীর বহে নিয়ে যাই অযোধ্যা হতে গান্ধার,
রামেশ্বরের শিরেতে চড়াই সলিল অলকানন্দার।
সে মানসসর কোথা রে, বার করি আমি হাতাড়ে?
চোর বাটপাড় করিনেক ডর, ঘেঁসে না'ক কাছে বান্দার।

আমি লোটা, আমি সুধার ভাণ্ড, আমি অমৃতের পুত্র;
মন্দালয়ের পেগোডায় রই নহিক নেহাৎ ক্ষুদ্র।
আছি নালন্দা কক্ষে, আছি অজন্তা বক্ষে,
কম্‌লিওলার সত্রেতে আছি,—বলো নাই আমি কুত্র?

নাজেহাল আর পেশেমান হই পড়িয়া গৃহীর হস্তে,
ধ্যানের সময় তিলেক পাইনে নিরজনে একা বস্‌তে।
মনে পড়ে মোর নিতি গো, কাশী কাঞ্চীর স্মৃতি গো,
কোথা শৃঙ্গেরি, কোথা যোশীমঠ, অনুতাপে মরি পস্তে।

লয়ে যায় কেহ ঝুলাইয়া ঘাড়ে গামছায় করি বন্ধন,
কখনো জোগাই পিয়াসার বারি, কখনো বা করি রন্ধন।
সময় সময় ভাইরে, আরো হীন কাজে যাইরে;
আমি কারো পদে পাদ্য জোগাই, কেউ মোরে করে বন্দন।

সব মায়াময় স্বপ্নের খেলা দেখে দেখে করি হাস্য;
আমি লোটা, আমি বেদান্ত গোটা, খাঁটী শাঙ্কর-ভাষ্য।
সুধা ধরে রাখি স্বর্গে, নিপুণ ন্যায়ের তর্কে—
আমি রসময় রসের আধার মধুর সখ্য দাস্য।

কীর্ত্তন :—দাদ্‌রা—ঠুংরি। (তালফের)

কথা ও সুর—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন **স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়**

কতকাল রবে নিজ যশ বিভব অন্বেষণে?
দুদিনের ধনের লাগি ভুলিলে পরম ধনে!
ঘরেতে ধন কর পুঁজি, সঙ্গে নেবে ভাব বুঝি,
দীনের দৈন্য কর হে মোচন, দীনের অভাব নাই এ দেশে—
দীনের দৈন্য কর হে মোচন, দীনের ধনেই তোমরা ধনী—
দীনের দৈন্য কর হে মোচন, দীনবন্ধু হবেন সুখী—
দীনের দৈন্য কর হে মোচন, পুণ্য হবে ধন অরজনে।

দুটি ঘরে জ্ঞানের আলো, কোটি ঘরে আঁধার কালো,
এ আঁধার ঘুচাতে হবে, নইলে এ দেশ এমনি রবে—
এ আঁধার ঘুচাতে হবে, দানেই জ্ঞান দ্বিগুণ হবে—
এ আঁধার ঘুচাতে হবে, এরাও তোমারি মায়ের ছেলে—
এ আঁধার ঘুচাতে হবে, যতনে অতি যতনে।

পুরাণো সে ত্যাগের কথা, হৃদয়ে কি দেয় না ব্যথা!
সেই দেশের মানুষ তোমরা যেথা রাজার ছেলে হ'ত ফকির
সেই দেশের মানুষ তোমরা যেথা পরের তরে ঝরত আঁখি
সেই দেশের মানুষ তোমরা যেথা ধন হ'তে প্রেম ছিল বড়
সেই দেশের মানুষ তোমরা সে কথা কি গেছ ভুলে?
কেন এলে তবে মানবের ভবে রবে যদি নিজ কাজে (তবে কেন বা এলে)!

সবাকার মান হোক্ তব মান অপমান পর-লাজে (সেদিন কবে বা হবে ?)।
জাতি-কুল-অভিমান, দ্বেষ-হিংসা-ভেদজ্ঞান ভারতে আনিল মরণ (ভাই হে)
করে হবে সে সুমতি সবার উন্নতি হইবে সবারি সাধন।
হেন সাধন আর নাই হে হইবে সবারি সাধন।
এ হেন সাধনে জীবনে মরণে পূজিব হে প্রেমসিন্ধু!

(মোরা) পূজিব তোমায়, সেবার কুসুম কুড়াইয়া—
(মোরা) পূজিব তোমায়, নিজের পূজা ঘুচাইয়া—
(মোরা) পূজিব তোমায়, ভারতের আশা পুরাইয়া—
(মোরা) পূজিব তোমায় পরের দুঃখ ঘুচাইয়া—

তব পদে ঠাঁই যেন সবে পাই দয়া কর দীনবন্ধু!
নমো দীনবন্ধু! তুমি দীনজনের লও প্রণতি! নমো দীনবন্ধু!

\+ ○ II+ ○

{ সা | সা রা গা | মা পা পা | রা রা রমা | মা মা -া | মা মপধা পা |
ক ত কা ল র - বে - নি জ য শ - বি ভ ব

মপা -া | মা | গা রা গরা | গা সা } সা | সা রা গা | মা পা পা | -া -া -া | II
অ - ন্বে ষ ণে - - - ক ত কা ল র - বে - - -

া া পা | ধা ধা ধা | ধা -া ণা | ধা র্সনা ধপা | পা প্না -া | পা -া ধা |
- - দু দি নের ধ নে - র লা গি - ভু লি - লে - প

মপা ধপা মা | গা রা -া | গরা গা সা | সা রা গা | মা পা পা | -া -া -া |
র - ম ধ নে - - - ক ত কা ল র - বে - -

-া -া পা | পা ধা না | র্সা র্রা র্গর্রা | র্সনা র্রর্সা -া | -া -া র্সা |
- - ঘ রে তে ধন ক র - পুঁ জি - - - স
- - দু টি ঘ রে জ্ঞা নে র আ লো - - - কো
- - পু রা ণো সে ত্যা গে র ক থা - - - হৃ

র্সা র্সা নর্সা | ধা ধা র্সা | না না র্সা | ধনা ধনর্সা | না ধা পা া
ঙ্গে নে বে ভা ব - বু ঝি - - - - - - - -
টি ঘ রে আঁ ধা র কা লো - - - - - - - -
দ য়ে কি দে য় না ব্য থা - - - - - - - -

পা পা -া | পা -া পা | পা পা ধা | র্সনা ধা -া | র্সা র্সা -া | র্সা র্সা না | ধা র্সা র্সা | না ধা না |
দী নে র দৈ - ন্য ক র হে মো চ ন দী নে র অ ভা ব না ই এ দে শে -
এ - আঁ ধা র ঘু চা - তে হ বে - ন ই লে এ দে শ এ ম্ নি র বে -
সে ই দে শে র মা নু ষ তো ম রা যেথা রা জা র ছে লে - হ - ত ফ কি র

পা পা -া | পা -া পা | পা পা ধা | র্সনা ধা -া | র্সা র্সা র্রা | র্রা র্রা র্গর্রা | র্সা র্রা র্সা | না ধা না
দী নে র দৈ - ন্য ক র হে মো চ ন দী নে র ধ নে ই তো ম রা ধ নী -
এ - আঁ ধা র ঘু চা - তে হ বে - দা নে - ই জ্ঞা ন দ্বি গু ণ হ বে -
সে ই দে শে র মা নু ষ তো ম রা যেথা প রে র ত রে - ঝ র ত আঁ খি -

পা পা -া | পা -া পা | পা পা ধা | র্সনা ধা -া | র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সনা | ধনা না র্সা | না ধা না
দী নে র দৈ - ন্য ক র হে মো চ ন দী ন - ব - ন্ধু হ বে ন সু খী -
এ - আঁ ধা র ঘু চা - তে হ বে - এ বা ও তো মা র মা য়ে র ছে লে -
সে ই দে শে র মা নু ষ তো ম রা যেথা ধ ন হ তে প্রে ম ছি ল - ব ড় -

ধপা পা -া | পা -া পা | পা পা ধা | র্সনা ধা -া | ধা ধা -া | ধা -া ধা | ধা ধা ণা | ধা র্সণা ধপা |
দী নে র দৈ - ন্য ক র হে মো চ ন দী নে র দৈ - ন্য ক র হে মো চ ন
এ - আঁ ধা র ঘু চা - তে হ বে - এ - আঁ ধা র ঘু চা - তে হ বে -
সে ই দে শে র মা নু ষ তো ম রা - সে ই দে শে র মা নু ষ তো ম রা -

পা -া পা | পা পা ধা | মপা ধপা মা | গা রা গরা | গা সা সা | সা রা গা | মা পা পা | II II
পু - ণ্য হ বে ধ ন - অ র জ নে - - - ক ত কা ল র - বে
য ত নে - অ তি - য ত নে - - - ক ত কা ল র - বে
সে - ক থা - কি আ - ছে ম নে - - - ক ত কা ল র - বে

(অল্প ঠায়ে)

{ রা গা পা | মা গা মা | রা গা গা | গা মা গা | রা গা রা | সা ধসা সরা | রা রা -া | -া
কে ন এ লে ত বে মা ন বে র ভ বে র বে য দি নি জ কা জে - -

(রা রা | রা গা পমা | গা রসা নৃসা |) } -া -া | পা ধা সনা | ধা ধা -া | পা সা না | ধা পধনা ধপা
ত বে কে ন বা এ লে - - - স বা কা র মা ন হো ক ত ব মা ন

| পা ধা পক্ষা | গরা গা মা | গা রা -া | -া (রা রা | গা পা পা | ধা র্সনা ধপা |) | া া
অ প মা ন প র লা জে - সে দিন ক বে বা হ বে - - -

(ঠুংরি)

া ররা মগা রা | রা রা রা -া | া সমা মা মগা | রগা রগা রসা -া | { া রমা মা মা |
- জাতি কু ল অ ভি মা ন - দ্বেষ হিং সা ভে দ জ্ঞা ন - ভা র তে

মা পা পা ধা | পক্ষা পা -া -া | (মা গমা রগা সা) | } া া া া | া পধা র্সনা ধা |
আ নি ল ম র ণ - - ভা ই - হে - - - - - ক বে হ বে

[রা মা মা]

ধা ধা ধা ধা | পর্সা সা সা না | ধা না ধা পা | { । মা গা রগা | মা পা ধা পা | দ্মা পা -া -া |
এ সু ম তি স বা - র উ - ন্ন তি - হ ই বে স বা রি সা ধ ন - -

(মা গা রা সা) | } । । পা পা | পা ধা -া ধা | ধা ণা ধণা ধপা | ।রা মা মা | মা পা পা ধা |
বি ধি হে - - - হে ন সা ধ ন আর না ই হে - - হ ই বে স বা রি সা

পদ্মা পা -া -া | । । । । |
ধ ন

দাদারাতে প্রত্যাবর্ত্তন

মা পা পা | মা ধা পা | মা পধা পা | মা গা গমা | পনা না ধনা | ধা পা ধপদ্মা |
এ হে ন সা ধ নে জী ব নে ম র ণে পূ জি ব হে প্রে ম

পা ধা পধনর্সা | ধনা পা পা |
সি ন্ ধু - মো রা

পা ধা ধা | ধা পধা নর্সা | ধনা -া -া | । । । | পর্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা |
পূ জি ব তো মা - য় - - - - - সে বা র কু সু ম

না র্সা না | ধনা না ধা |
কু ড়া ই য়া মো রা

পা ধপা ধা | ধা পধা নর্সা | ধনা -া -া | । । । | র্সা র্রা -া | র্সর্রা র্গা র্রা | র্সা র্রা র্সা | না ধনা ধান |
পূ জি ব তো মা - য় - - - - - নি জে র পূ - জা ঘু চা ই য়া মো রা

পা ধপা ধা | ধা পধা নর্সা | ধনা -া -া | । । । | পা র্সা র্সা | -া র্সা র্রর্সা |
পূ জি ব তো মা - য় - - - - - ভা র তে র আ শা

না র্সা না | ধনা ধনা ধা |
পূ রা ই য়া মো রা

{ পা ধপা ধা | ধা পধা নর্সা | ধনা -া -া | । । । | (র্সা র্রা -া | র্সর্রা র্গা র্রা |
পূ জি ব তো মা - য় - - - - - প রে র দুঃ - খ

র্সা র্রা র্সা | না ধনা ধন |) }
ঘু চা ই য়া মো রা

পা ধা র্সা | র্সা র্সা -া | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সর্রা র্সনা | না র্সা না | ধনা ধনা ধপা |
ত ব প দে ঠাঁ ই যে ন স বে পা ই দ য়া ক র দী ন

পা ধা পধা | নর্সা ধনা -া | । । সা | সা রা গা | মা পা পা | রা রা রমা
ব ন্ ধু - - - - - ন মো দী ন ব ন্ ধু - তু মি

মা দ্মা । | মা গমা পধা | পা -া মা | গা রগা রগা | । । সা | সা রা গা | মা পা পা | -া -া -া
দী নে - জ নে র ও প্র ণ তি - - - ন মো দী ন ব ন্ ধু - - -

পীঠস্থান

অধ্যাপক শ্রীআনন্দকিশোর দাশ এম-এ

আমাদের পাড়ায় একটা নূতন রকমের স্কুল ছিল। পাড়াটা সহর থেকে অনেক দূরে। ছোট ছেলেদের হেঁটে স্কুলে যেতে বড্ড কষ্ট হত। তাই আমাদের অভিভাবক-গণ নিজেরাই আমাদের ভার নেবেন ঠিক করেছিলেন। সবাই মস্ত মস্ত পণ্ডিত; বেলি, রমেশ ও আমার বাবা কলেজে পড়াতেন, টুলু আর রাণুর বাবা স্কুলের মাষ্টার ছিলেন। বস্তুতঃ পাড়াটাকে অধ্যাপক-পাড়া বল্লেও চল্‌ত।

ছেলেমেয়ে সকলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। সবে ১২।১৪টী মাত্র ছাত্র। তাতে আবার এক পাড়ায় থাকি বলে, খেলাধূলা সব এক সঙ্গেই হত। কাজেই কোন রকম বাধ বাধ ঠেক্‌ত না।

পাঠশালার আলাদা কোন ঘর ছিল না। কে কখন কি পড়াবেন, আমাদের জানা ছিল; আমরা সে বাসায় গিয়া পড়তাম। পাশে পাশেই বাসা, কোন কষ্ট হত না। ক্লাস সকালে আর সন্ধ্যায় হত।

দুপুরে আবার একটা ক্লাস হ'ত, সেটা আরও অদ্ভুত। তখন মাষ্টার হতেন আমাদের মা, মাসীমা, কাকীমারা—অর্থাৎ পাড়ার গিন্নিরা। কেউ গান বাজনা শেখাতেন, কেউ সেলাই শেখাতেন, কেউ বা ছবি আঁকাতেন।

এই ক্লাসটাকে আমি বড্ড ভয় কর্‌তাম। কোন মতেই মন্‌টা বসাতে পারতাম না। কর্ত্তারা সব স্কুলে, কলেজে—কোথায় এখন একটু সর্দ্দারী কর্ব্ব, গাছে চড়্‌ব, ঘুড়ি উড়াব—তা নয়, সা, রে, গা, মা, বাজাও, ড্রইং কর; গাছের কত রকম পাতা আছে বসে বসে রং দিয়ে আঁক। এগুলি আমার কেমন আস্‌ত না। আমার ছবি সব বিট্‌কেল চেহারার হ'ত, দেখে সবাই হাস্‌ত। বেলুটাই বেশী ঠাট্টা কর্ত্ত। সে একটু ভাল ছবি আঁকৃত কি না, তাই। আমার কিন্তু ভারী রাগ হত।

সেদিন আমাদের বাসায় ক্লাস হচ্ছে, ড্রইংএর ক্লাস। নানা রংএর পেন্সিল নিয়ে বসে আছি; সামনে ফুলবাগান। মা একটা ফুল আঁকৃতে দিলেন। পাতা যখন আঁকৃতে বলে, তখন পাতার চেহারা কোন মতেই হয় না। আজ ফুল আঁকৃতে দিয়েছে কি না, কেবল পাতার মতনই চেহারা হচ্ছে। সবার আঁকা হয়ে গিয়েছে—মা একটী একটী করে দেখ্‌ছেন। আমার খাতা দেখে বেলুকে বল্লেন,—"দেখ্‌, বেলু, অনুর ফুলটা দেখ্‌ এসে—"। দেখে বেলু ত হেসে গড়াগড়ি। স্কুলে কোন বাঁধা নিয়ম ছিল না, মাষ্টারের ভয় আমাদের হ'ত না। মা, মাসীকে ত আর সত্যি মাষ্টার ভাব্‌তে পার্ত্তাম না। কাজেই ক্লাসে হাসি-ঠাট্টা বেশ চল্‌ত।

বেলুর হাসি দেখে সবাই এসে জড় হয়েছে, আর তামাসা চল্‌ছে। "অনুজদা, এটা কি এঁকেছ? ফুল? কি ফুল?" আবার হাসি। আর সহ্য হল না। বেলুটাকে মার্ল্লাম এক চড়। "কেন? ওই'ত হেসে হেসে সব জড় করেছে। ভারী ত একটু ছবি আঁকৃতে পারেন, তাই কত দেমাক্। দেখে নেব আঁকের ক্লাসে। তখন যে আকাশের তারা গুন্‌তে থাক, তার কি?"

মা কিন্তু ভারি চটে গেলেন।

"কি অন্যায় কথা, তুই আমার সাম্‌নে বেলুকে এম্‌নি ধারা মার্‌লি। তুই আজ আর বিকালে ঘর থেকে বের হ'তে পার্ব্বি না, তোর আজ খেলা বন্ধ।"

খেলা বন্ধটা যে আমার কত বড় শাস্তি, মা তা বেশ জান্‌তেন।

পড়্‌বার ঘরে মুখ ভার করে বসে আছি। মনে মনে ফন্দি আট্‌ছি, আজ বিকালে খাবার খাব না। বাবা কলেজ থেকে এলে তাঁর সঙ্গে খাবার খাই। আমায় না দেখ্‌লেই বাবা খুঁজবেন। তখন মজাটা দেখে নেব; মার নামে খুব করে লাগাব।

বাবা বাড়ী ফিরে হাত-মুখ ধুয়েছেন,—মা রেক'বীতে করে জলখাবার সাজিয়ে টেবিলে রেখেছেন।

অনু কোথায়, ওকে দেখ্‌ছি না যে। কোন অসুখ-বিসুখ করেছে না কি ?

এ সময়ে আমি কখনই গরহাজির থাকি না, বাবা সেটা বিলক্ষণ জান্‌তেন। আমি কাছে না থাক্‌লে তাঁরও খাওয়া জম্‌ত না।

—ষাট্‌, অসুখ কর্ব্বে কেন ? বেলুকে মেরেছিল, তাই খেল্‌তে মানা করেছি। তাই রাগ হয়েছে, বল্‌ছেন আজ খাবেনও না।

—ও কোথায় ?

ঐ দেখ না, জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মার্‌ছেন।

—কি হয়েছে রে ? এদিকে আয় দেখি ?

—না, আমি খাব না, কিচ্ছুই খাব না। অভিমান-ক্ষুণ্ণ স্বরে বল্লাম।

—নাই বা খেলি, তা, এ দিকে আয় না, কি হয়েছিল ? বেলুকে মার্ত্তে গেলি কেন ?

—মার্ব্বো না, সে হাস্‌লে কেন ? বলেই খানিকটা এগুলাম।

—বেশ, কেউ হাস্‌লেই তাকে মার্ত্তে হয় না কি ?

"—আমি ড্রইং আঁক্‌তে পারি না বলে সব্বাই আমাকে ঠাট্টা"—আর বল্‌তে পার্‌লাম না—কান্নায় আমার বাক্‌রোধ হয়ে গেল। মাকে কেন জানি না বড্ড ভয় কর্ত্তাম, তাই যত সব আবদার বাবার কাছেই হ'ত।

"—ও, তাই"—বলে আমাকে কোলের কাছে টেনে নিলেন। মাকে বল্লেন—"তোমরা বড্ড বোকা, এমনি কর্লে ছেলেদের যে উৎসাহ ভেঙ্গে যায়।" মা বল্লেন, "মাষ্টারী ত আর আমাদের ব্যবসা নয়।"

বাবা মুচ্‌কে হাস্‌লেন, আমাকে সঙ্গে করে খেতে লাগ্‌লেন।

খাওয়া শেষ হয়েছে; ওদিকে দেখি, বেলুটা মার আশে পাশে ঘুর্‌ছে। আমাকে না হলে ত খেলা চল্‌বে না। আমি হলাম পাড়ার সর্দ্দার।

ভাব্‌লাম, বাবা নিশ্চয়ই আমাকে ছুটী দেবেন খেল্‌তে। বাগানের ওপাশে সবাই খেল্‌ছে, তাদের হল্লা শুন্‌তে পাচ্ছি। বল্লাম "বাবা, খেল্‌তে যাই।"

—তা কি হয়, তোমার মা যে মানা করেছেন। চল, আমরা বসে গল্প করি।

ভাব্‌লাম, বাবাও মাকে ভয় করেন দেখ্‌ছি। মার কথা কাটিয়ে আমায় খেল্‌তে দিলে কত বড় অন্যায় হ'ত, ছেলের বাবা হয়ে আজ তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি।

বেলুটাও ধীরে ধীরে আমাদের কাছে এসে জুটেছে। ওর জন্যই যত গোলমাল; রাগে আমি ওর দিকে তাকালাম না। ওর সঙ্গে আজ আড়ি।

—'অনুদা, এস। আমি তোমার সঙ্গে খেল্‌ব।' বড্ড কাঁদ কাঁদ ভাব।

—না, তোর সঙ্গে খেল্‌ব না, বাবার সঙ্গে খেল্‌ব। কেন, এখন হাস্‌ না গিয়ে !

কি নিষ্ঠুর ছিলাম আমি—!

বেলু কেঁদে ফেল্লে—"আর হাস্‌ব না, আমার ঘাট হয়েছে।" বাবা বেলুকে কোলে টেনে নিলেন, তার সুন্দর কোঁক্‌ড়ান চুলগুলিতে হাত বুলাতে লাগ্‌লেন।

তার পর আমাদের দুজনাকে দুপাশে নিয়ে গল্প জুড়ে দিলেন।

(২)

বছর দুই হ'ল আমি এখানে এসেছি। এম-এ পাশ করে আইন পড়্‌ছিলাম, এমন সময় গৌহাটীতে একটা চাকুরী জুটে গেল। শ্বশুর মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, আইনটা পাশ করি; বাবা বল্লেন চাকুরীটা যখন হয়েছে, চলে যাক্‌।' আমারও তাই মত। সংসারে বড় টানাটানি, বাবা একলা পেরে উঠ্‌ছিলেন না। কয় বৎসর হ'ল, বাবা পেন্‌সন নিয়েছেন।

যাবার সময় মনটা কেমন কর্ত্তে লাগ্‌ল। কোথায় কুমিল্লা আর কোথায় গৌহাটী। তাতে আবার শুন্‌লাম, গৌহাটী না কি ৺কামাখ্যার নিকটে। বৌদি বল্লেন, 'সাবধান ঠাকুরপো, কামরূপ কামাখ্যা কিন্তু ডাকিনীর দেশ! সেখানে গেলে না কি ভেড়া হয়!' ভাব্‌লাম, 'দূর ছাই, এই দূর দেশে একলাই যাব'। মা তাতে বাদ সাধলেন,—বৌকে সঙ্গে নিতেই হবে। বোধ হয় বৌদির কথাটা কাণে গিয়ে থাক্‌বে; তাই রক্ষাকবচ সঙ্গে দিলেন।

মা চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে শিরশ্চুম্বন করে দুর্গা দুর্গা বলে বিদায় দিলেন। ট্রেণে উঠে রাত্রিটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এক রকম কেটে গেল। ঘুম থেকে উঠে

দেখি, বেশ রোদ উঠেছে। শিউলিও ততক্ষণে উঠে বসেছে। ট্রেণ তখন পাহাড়ে রাস্তায় ঢুকেছে। পাহাড়ের পর পাহাড়—মাঝে লোকালয়ের চিহ্ন নাই—কদাচিৎ দুই একটা চা-বাগিচার কুলির ঘর দেখা যাচ্ছে। এত পাহাড়! একমনে পাহাড়ের শোভা দেখছি—হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল। এ কি? শিউলি ত চেঁচিয়ে উঠ্‌লো। আমিও কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। একটু পরেই দেখি, আবার আলো,—হাসি পেল। পূর্ব্বে ত আর দেখি নি, তাই বুঝ্‌তে পারি নি যে, ট্রেণ Tunnelএ ঢুকেছিল! শিউলি বল্লে,—"বাবা, কি ভয়ই পেয়েছিলাম! তুমি আগে বল্লে না কেন, এমন ধারা সুড়ঙ্গ আছে?"

—"বলা উচিত ছিল বটে, তবে বড় অন্যমনস্ক ছিলাম, তাই বলা হয় নাই।"

এই রকম বহু পাহাড়, বহু Tunnel ডিঙ্গিয়ে ক্রমে ট্রেণ এসে গৌহাটীতে দাঁড়াল। বাবা, কি পাহাড়ের দেশ! রেল কোম্পানীর বাহাদুরী, এই বিস্তীর্ণ দুর্ভেদ্য গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে এমন সুন্দর রাস্তা কেটে বের করেছে।

একে ভেড়া হওয়ার ভয়, তাতে আবার এই পর্ব্বত-শ্রেণী দ্বারা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। অজানা দেশ, অজানা সমাজ—মনটা যেন কেমন দমে গেল। যা হোক, একখানা গাড়ী করে বাসায় পৌছান গেল। বাড়ীখানা ঠিক নদীর উপরে।

এই গৌহাটী! আহা, কি মনোভিরাম দৃশ্য! এখানে এলে লোক আট্‌কে পড়বে, আশ্চর্য্য কি? এ যে এক অপূর্ব্ব মায়াপুরী! অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলাম।—সম্মুখে বিস্তীর্ণ ব্রহ্মপুত্র, হুঙ্কার করে ছুটেছে। মধ্যে উমানন্দ ভৈরব তার গর্ব্বিত স্পর্দ্ধাকে যেন উপহাস করে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রুদ্ধ নদ আহত ফণীর ন্যায় উন্মত্ত হয়ে বিপুল বেগে হুঙ্কার করে তাকে আঘাতের পর আঘাত কচ্ছে। অদূরে কামাখ্যা পাহাড়—শীর্ষদেশে ভুবনেশ্বরী মন্দিরের শুভ্র চূড়া দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের পর পাহাড়—অনন্ত বিস্তার। পাহাড়ে নদীতে মিলিয়ে এমন দৃশ্য বুঝি ভূভারতে কোথাও নাই। শিউলি যোড় করে উদ্দেশে মা কামাখ্যাকে প্রণাম কল্লে।

পর দিনই ৺কামাখ্যা মন্দিরে গেলাম। গৌহাটী পৌছিয়াই কামাখ্যা মায়ের পূজা দিতে হবে," মা মাথার দিব্বি দিয়ে পুনঃ পুনঃ বলে দিয়েছিলেন।

সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে শিউলি জিজ্ঞাসা কল্লে—

—"আচ্ছা, কামাখ্যা এতবড় তীর্থস্থান কেন?"

বল্লাম, "পীঠস্থান কি না।" ভাবলাম, সবই বলা হল!

—'পীঠস্থান কি?'

মাটী! বিদ্যা-বুদ্ধি এবার ফেঁসে যায়! পাণ্ডাঠাকুর রক্ষা কল্লে। কেমন করে দক্ষযজ্ঞে স্বামীর অবমাননা সহ্য কর্ত্তে না পেরে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন, শোকে উন্মত্ত মহেশ্বর সেই প্রাণহীন পুণ্যময় দেহ স্কন্ধে করে কেমন করে পৃথিবীময় ঘুরেছিলেন, সেই বিশ্বগ্রাসী শোকের তাপে কেমন করে সৃষ্টিনাশ হয়ে প্রলয়ের সূচনা হয়েছিল,' ভগবান বিষ্ণু ভোলানাথের অজ্ঞাতসারে কেমন করে সেই পবিত্র সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটেছিলেন, সেই স্বর্গীয় প্রেমের চিত্তোন্মাদন কাহিনী বল্লে।

শুনতে শুনতে মনে যেন কেমন একটা অভূতপূর্ব্ব পুলক সঞ্চার হল। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ পুণ্যময় আবেষ্টনের মধ্যে অতিবড় পাপিষ্ঠের চিত্তেও বুঝি সরসতা আনয়ন করে।

শিউলির দিকে তাকিয়ে দেখি,—আঁচল দিয়ে বার বার চোখ মুছ্‌ছে। তার বেদনা-কাতর, অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ দিয়ে যেন কেমন একটা পুণ্যজ্যোতিঃ বের হচ্ছে; স্বভাবসুন্দর মুখখানিকে যেন এই প্রেমের, এই ত্যাগের মাহাত্ম্যে আচ্ছন্ন করে ফেলেছি।

ততক্ষণে আমরা মন্দিরের সোপানে এসে পৌছেছি। যাত্রিগণ 'কামাখ্যা মাই কি জয়' বলে পাণ্ডার পেছনে পেছনে মন্দিরে ঢুকছে। কি উন্মাদনা এদের হৃদয়ে! এত ভিড়, এত ধাক্কাধাক্কি,—ভ্রূক্ষেপ নাই। মন্দির-দ্বারে প্রেমপিয়াসী ভক্তগণ কেহ বা উদাত্ত স্বরে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ কচ্ছেন, কেহ বা ভক্তিভাবে ষোড়শোপচারে কুমারীপূজা কচ্ছেন। সবারই মুখে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ,—সবারই এক লক্ষ্য।

ক্রমে আমরাও মন্দিরে ঢুকলাম। পীঠস্থানে উভয়ে পাশাপাশি বসলাম,—পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করালে। ভূমি প্রণত হয়ে গদগদ চিত্তে মন্ত্রোচ্চারণ করলাম। পবিত্র পীঠস্থান দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ করলাম,—সমস্ত দেহে যেন

তড়িৎ খেলে গেল। তখনো কাণে সেই প্রেমে পাগল ভোলানাথের প্রেমের কাহিনীর মূর্চ্ছনাই চল্‌ছিল।

"মাগো, আশীর্ব্বাদ করো, যেন স্বামিপদে মতি থাকে, যেন স্বামি-সোহাগিনী হই।" শিউলির অস্ফুট, কাতর প্রার্থনা কাণে গেল। পুরোহিত আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য ও সিন্দুর সিঁথিতে কপালে লেপিয়া দিল।

ভগবান তোমার অনন্ত প্রেমের জয় হউক!

৩

আরও ৩।৪ বৎসর কেটে গেছে। হঠাৎ এক দিন একখানা চিঠি পেলাম বেলুর কাছ থেকে। লিখেছে, "অনুদা, বৌদিকে বল, তার এক অজানা অতিথি আস্‌ছে; ২।৪ দিন তাকে ভোগাবে।"

ব্যাপারখানা কি বুঝ্‌তে পারলাম না। হঠাৎ বেলু গৌহাটী আস্‌ছে কেন? তীর্থ কর্ত্তে নয়, এটা ঠিক্! তারা একটু ব্রাহ্মভাবাপন্ন। তবে কি?

ঠিক মনে নাই কেন, সেদিন আপিস বন্ধ ছিল। ভাবলাম, যাই, 'পাণ্ডু' থেকে বেড়িয়ে আসি।—বেলু-টাকেও এগিয়ে নিয়ে আসা যাবে। না জানি, বেলু কত বড় হয়েছে। উঃ, কতকাল দেখা হয় নি। ছেলে-বেলাকার কত কথা মনে হচ্ছিল। কত দুষ্টুমি, কত মারামারি করেছি দুজনায়। তার পর তার বাবা বদলী হয়ে গেলেন, আর দেখা শুনা হয় নাই। তবে শুনেছিলাম বটে, বেলু B. A. পাশ করে ঢাকায় মেয়েস্কুলে মাষ্টারী কচ্ছে।

'পাণ্ডু' flatএ দাঁড়িয়ে আছি। ওপার থেকে ষ্টীমার ছেড়েছে। মনে মনে কেমন একটা আশঙ্কা হচ্ছে কি জানি, বেলুকে যদি চিন্‌তে না পারি! কতকাল দেখা হয় নি। হঠাৎ দেখি, ষ্টীমারের উপর থেকে কে একখানা রুমাল উড়ুচ্ছে। তাকিয়ে দেখি, বেলু। এই সেই বেলু! এত বড় হয়েছে! আমি ভাব্‌ছিলাম, বেলু বুঝি এখনো এতটুকুই রয়েছে!

ষ্টীমার থেকে নেমে এসেই জিজ্ঞাসা কল্লে, "অনুদা, কেমন আছ?" উত্তর দেবার প্রতীক্ষা না করেই, "এই লীলু, এই তার বাবা" বলে তাদের Party'র সাথে পরিচিত করিয়ে দিলে। লীলা বেলুর কলেজের বন্ধু, ঢাকায় একত্র কাজ করে।

"যাও, এবার তোমার অনুদাকে ত পেয়েছ? কি বল্‌ব অনুজ বাবু, সমস্তটা রাস্তা কেবল অনুদা, অনুদা।"

তার পর গলা একটু ছোট করে বল্লে "আপনি married, তা না হলে মনে কত্তাম বুঝি—"

—"নে, নে, আর বখামি কত্তে হবে না," বলে বেলু লীলার কথা ওখানে থামিয়ে দিলে।

লীলার বাবা বল্লেন—"motorএ আমাদের Seatগুলি booked আছে কি না, খবরটা নিয়ে দেবেন অনুজবাবু!"

—"আপনারা এখান থেকেই চলে যাবেন না কি? আমাদের ওখানে এক দিন বিশ্রাম করে যাবেন না?"

—"না, এবার আর না; ফের্‌বার পথে হয়ে যাব এখন।" ততক্ষণে আমরা Platformএ এসে পৌছেছি। এক পাশে আসাম লাইনের গাড়ী দাঁড়িয়ে; অপর পাশে সার দিয়ে শিলংএর মোটরগুলি। লীলাদের Seatএর বন্দোবস্ত করে তাদের বসিয়ে দিলাম। ট্রেণ ছাড়তে এখনো ঘণ্টা খানেক দেরী। এতক্ষণ কে বসে থাকে? আমরাও একখানা Taxiতে উঠে পড়্‌লাম।

"আমরা তবে আসি, ফিরে যাবার সময় অনুগ্রহ করে হয়ে যাবেন কিন্তু" বলে লীলা ও তার বাবার কাছে বিদায় নিলাম। Car ছেড়ে দিল। বেলু আর লীলা রুমাল উড়িয়ে পরস্পর বিদায় সম্ভাষণ জানালে। রুমালের সুবাস motorএর হাওয়া বিভোর করে দিলে।

"বৌদি ভাল আছেন ত? তোমার না কি একটী খোকা হয়েছে? কত বড় হয়েছে? কি বলে ডাক তাকে?" ইত্যাদি প্রশ্ন করে বেলু অস্থির করে তুল্লে।

দেখ্‌লাম, বেলু এখনো ছেলেবেলাকার মতন চঞ্চলই আছে।

—"এই কামাখ্যা?" তখন Carখানা ৺কামাখ্যা পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

—"একবার কামাখ্যা দেখ্‌তে হবে।" একটু থেমে বল্লে—"ভেড়া কর্ব্বে না ত?"

—তোদের ভেড়া করে কার সাধ্য? ভেড়া হব ত আমরা!

—তোমার কি ভেড়া হওয়ার এখনো বাকী আছে না কি?

—কেরে সেই ডাকিনী যোগিনী?

—কেন বৌদি। বাবা, বিয়ের পর আর একখানা চিঠি লিখ্‌লে না!

—তাই বল্‌! আমি ভাবছিলাম, না জানি কে?

বেলু কথাটা নেহাৎ অন্যায় বলে নি। বাস্তবিক, বহুকাল তাদের কোন খবরাখবর নেওয়া হয় নাই। তাই তাড়াতাড়ি কথাটা ফিরিয়ে দিলাম।

"হঠাৎ গৌহাটী কি মনে করে? তীর্থ কত্তে না কি? চিঠিতে ত একটী কথাও লিখিস্‌ নি।"

—ভাব্‌লাম, তোমাদের একটু Surprise কর্ব্ব। পূজোর ছুটী, লীলুরা শিলং যাচ্ছে, বল্লে—চল্‌ না। বাবাকে জিজ্ঞাসা কত্তে, বল্লেন, বেশ ত। অনুরা গৌহাটী আছে, ওদেরও দেখে যেও। বারে! এতবড় কথাটাই খেয়াল হয় নি! বাস্তবিক, শিলং যেতে যে গৌহাটী হয়ে যেতে হয়, এত কথা কে জান্‌ত বাপু!

Carখানা এবার গেটের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে। Carএর শব্দে শিউলি এগিয়ে এল। "শিউলি, এই বেলু, তোমার সঙ্গে ত দেখা নাই।"

মুখ ফিরিয়ে বেলুকে বল্লাম, "এই তোর—"

—"বৌদি" নিজেই কথাটা কেড়ে নিলে। তার পর শিউলির গলায় ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো, যেন কত কালের ভাব!

৪

কটা দিন যে কি ভাবে কাট্‌ল, বুঝ্‌তেই পার্লাম না। রোজই একটা কিছু আছে। আজ 'বশিষ্ঠাশ্রমে', কাল "নবগ্রহ," পরশ্ব "উমানন্দ," "অশ্বাক্রান্ত" এম্‌নি করে যেন হাওয়ার মতন দিনগুলি কেটে গেল। বেলু একটা কিছু নিয়ে আছেই। তবে খোকার উপরই তার দৌরাত্ম্যটা বেশী। আদর করে, চুমু খেয়ে, কোলে করে, কাঁধে করে ওকে একেবারে অস্থির করে তুলেছে।

"আহা, তোমার কাপড়-চোপড় সব নোংরা করে দেবে যে!"

"তোমার কাপড় নোংরা করে না বৌদি?"

"কি খাসা উত্তরই দিলে! আমি ছেলের মা,—আমায় তোমায় বুঝি এক কথা হ'ল!"

"আমি বুঝি তবে ওর কেও নই?"

অভিমান-ক্ষুণ্ণ অশ্রুভারাক্রান্ত আয়ত নয়নযুগল শিউলির মুখের উপর রেখে বেলু প্রশ্ন কল্লে।

"তোর সঙ্গে আর কথায় পারিনে বাপু!"

এমনি করে দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। এদিকে শিলং থেকে তাগিদ এসেছে—"ছুটীটা কি গৌহাটীতেই কাটিয়ে দিবি না কি? তবে শিলংএর নাম করে বেরিয়েছিলি কেন?"

"চল অনুদা, কাল কামাখ্যাটা সেরে আসি। পরশু বেরিয়ে পড়া যাবে।"

মনটা কেবন ছ্যাঁৎ করে উঠ্‌ল।

—"এত শিগ্‌গির?"

"শিগ্‌গির আর কৈ? ৬।৭ দিন ত হয়ে গেল। লীলুটাও বড্ড তাড়া দিচ্ছে। এম্নি না জানি কত ঠাট্টা কর্ব্বে!" বলে মুচ কে হাস্‌তে লাগল।

এদিকে রোজ ছুটাছুটীতে শিউলীর শরীরটা বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একটু ঠাণ্ডা লেগেছে, একটু জ্বর-জ্বর ভাব। তাই বল্লাম, "তোর বৌদির শরীরটা যে ভাল নয়।"

শিউলি পাশেই বসে ছিল, বল্লে—"তাতে কি? আমি ত অনেকবার কামাখ্যা গিয়েছি। তোমরাই বেড়িয়ে এস।"

"তা কি হয়, তাহলে ত অর্দ্ধেক স্ফূর্ত্তিই মাটী।" বেলু বল্লে।

—"না, তা কেন। এসগে তোমরা। বেশী পাহাড় চড়তে ডাক্তাররা আমায় মানা করেছে।"

বুকে একটা যন্ত্রণা আছে বলে ডাক্তার শ্রম-জনক কিছু কর্ত্তে নিষেধ করেছিল বটে। তাতে আবার এই কয়দিন একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে। তাই আমি আর বেশী পীড়াপীড়ি কর্ত্তে দিলাম না।

পর দিন ভোরেই একখানা ট্যাক্সি করে আমর বেরুচ্ছি। শিউলি বল্লে—"জুতোটা ছেড়ে যাও বেলু তীর্থে যাচ্ছ, জুতো কেন?"

"আহা, পিছু ডাক্‌লে বৌদি, আজ একটা acciden না হয়ে যায় না" বলে বেলু হাস্‌তে লাগল।

"ঐ তোদের 'হিল্‌' উঁচু জুতো নিয়ে পাহাড় চড়তে পার্ব্বি না" বলে প্রকারান্তরে আমিও শিউলির কথা সমর্থ কর্লাম।

—"এবেলা নাব্‌তে বেলুর কষ্ট হবে, একেবারে ছা পড়লে ও-বেলাই নেবো। সঙ্গে চায়ের জিনিষ সব দিলাম বলে 'গেট' পর্য্যন্ত শিউলি আমাদিগকে এগিয়ে দিল।

গাড়ীখানা নদীর ধার দিয়ে মন্থর গতিতে যাচ্ছে। ডান দিকে বিরাট ব্রহ্মপুত্র নদ—প্রশান্ত, গম্ভীর। তর তর করে আপন মনে চলে যাচ্ছে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। যেন কোন যোগীবর মানব-হিতের জন্য সর্ব্বত্র প্রেমের ধারা বিলাইয়া তার চির-বাঞ্ছিতের উদ্দেশে যাচ্ছে। প্রভাতী বায়ু স্থানে স্থানে একটু একটু বীচি-বিক্ষেপ তুলেছে। এ-পারের কুয়াসা কেটে গেছে। Ferry Steamer ভোঁ ভোঁ করে যাত্রী ডাক্‌ছে।

বেলুর আজ পোষাকের বিশেষ পারিপাট্য নাই। একখানা বুটীদার খদ্দরের শাড়ি ও তদনুরূপ একটী ব্লাউজ। এতেই তাকে বেশ মানিয়েছে। ভোরের মৃদুমন্দ হাওয়া গায়ে লাগ্‌ছে; একটু একটু শীত কচ্ছে। বেলু তার ভাঁজ-করা শালখানা গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে। পাহাড়ে জলাভাব ব'লে ঘরেই স্নান সেরে এসেছে। সিক্ত কবরী উন্মুক্ত, হাওয়ায় ঈষৎ দুল্‌ছে; দুই একগাছা চুল মুখে চখে এসে পড়েছে। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।

৫

কেমন একটু আন্‌মনা হয়ে ছিলাম: হঠাৎ গাড়ী থামার শব্দে চৈতন্য হ'ল। দেখি, গাড়ী পাহাড়ের নীচে এসে দাঁড়িয়েছে।

বেলুকে গাড়ী থেকে নামালাম।

"পাহাড়ে উঠ্‌তে এম্নি হাঁপিয়ে পড়বি।" বলে তার শালখানা নিজে নিলাম।

"সন্ধ্যার ঠিক আগে গাড়ী চাই" 'শফার'কে বলে পাহাড়ের দিকে চল্লাম। ক্রুরর ক্রুর্ করে carখানা বেরিয়ে গেল।

সাম্‌নে একটা 'গেট্'। সেটা পার হয়ে সিঁড়ি চড়্‌তে আরম্ভ করেছি। প্রথম ধাপটা পার হয়েছি—ছোট ধাপ, পাথরে বাঁধান।

"এমন ধারা আর কয়টা ধাপ ?"

"এটা ত ফাও। এই সবে সত্যিকার সিঁড়ি আরম্ভ হ'ল।" ততক্ষণে আমরা আসল সিঁড়িতে এসে পৌছেছি। ক্রমে উঠ্‌ছি। ডানদিকে উচু পাহাড়, বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন; বামে উৎরাই। মাঝে পাথরের রাস্তা—বেশ প্রশস্ত।

"জয় হউক বাবা, সিদ্ধিদাতা তোমার বাসনা সিদ্ধ করুন্।" রাস্তার ধারে এক প্রকাণ্ড পাথর, যাত্রীদের দেখ্‌বার জন্য যেন উঁকি মেরে রয়েছে। তাতে সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্ত্তি,—সর্ব্বাঙ্গ সিন্দুর দিয়ে লেপা; পাশে ছোট একখানা মাটীর কুঁড়ে। সাধু বাবা বসে বসে গঞ্জিকা সেবন কচ্ছেন, আর যাত্রীদের কাছ থেকে কিছু কিছু আদায় কচ্ছেন।

"বাবা, কত বড় পাথর! এত সব পাথর এল কোত্থেকে ? কে এ রাস্তা বাঁধিয়ে দিলে ?"

"নরকাসুর।"

"সে আবার কে ?" হাসিমুখে বেলু জিজ্ঞাসা কল্লে।—

"ভগদত্তের বাবা" গম্ভীর ভাবে বল্লাম।

"হিং টিং ছট, এক্কেবারে জলের মতন তরল !"

"ভগদত্তকে চেনেন না, এসেছেন কামাখ্যা তীর্থ কর্ত্তে। বেহ্ম কোথাকার। বাক্যবিনোদ মশায় শুন্‌লে তোর কাণ মলে দিতেন !"

"ওঃ, ভগদত্ত, তাই বল; তাকে আর চিনি না ? ঐ যে দত্ত পাড়ায় বাড়ী ?" চোখে কৌতুকের হাসি, মুখ আমাপেক্ষাও গম্ভীর।

এবার আর না হেসে পার্লাম না; তার চোখ মুখের ভাব দেখে বিষম হাসি পেল।—

অগত্যা পাণ্ডাদের মুখে যা শুনেছিলাম, দুই এক কথায় বল্লাম। নরকাসুর আসামের রাজা; ভগদত্ত তাঁহার পুত্র, মস্ত বড় যোদ্ধা।—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরু পক্ষ নিয়ে অর্জ্জুনের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ করেছিলেন। এক দিন নরকাসুর কামাখ্যা বেড়াতে এসে মায়ের রূপ দেখে মোহিত হয়ে যায়—ইচ্ছা, মাকে বিয়ে কর্ব্বে।

"মাকে বিয়ে কর্ব্বে ? তা না হলে আর নরক-অসুর নাম কেন ! সার্থকনামা যা হোক !"

"তার মাকে ত আর নয়, আমাদের মাকে,—কামাখ্যা মাকে।" তার পর মার সঙ্গে চুক্তি হ'ল, মন্দিরে উঠবার রাস্তা করে দিতে হবে—এক রাত্তিরে, কুক্কুট ডাকবার আগে। নরকাসুর তাতেই রাজি—তার যত সব সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে হুড়মুড় করে পাথর দিয়ে রাস্তা বাঁধ্‌তে লেগে গেল।—মা দেখ্‌লেন, বিপদ, রাস্তা যে শেষ হয় ! এদিকে এখনো ভোর হতে ঢের দেরী। অমনি এক অনুচর পাঠিয়ে পাশের পাহাড়ে এক কুক্কুটের গলায় চেপে ধরালেন।—কুক্কুট ধ্বনি প্রভাতের সূচনা কল্লে।—

"নরকাসুর, ভোর যে হয়ে গেল !"

ক্রোধে অমুর খানিকটা রাস্তা অসমাপ্ত রেখেই চলে গেল।

"তবে আর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দোষ কি? ভাল নজীর ছিল।"

"এখান থেকে মার্ল্লাম তীর,

তীর পড়্ল কলা'গাছে।

হাটু বেয়ে রক্ত পড়ে। ইত্যাদি"

হাসি চেপে গম্ভীর ভাবে আওড়ালাম।

"তোমার বুদ্ধি দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছে অনুদা! বল্‌ছিলাম কি, তোমরা হল্লা কচ্ছ, গবর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে স্বরাজ দেয় না যুদ্ধের সময় কত খাটিয়ে মার্ল্লে, কত লোভ দেখালে; যুদ্ধ মিটে গেছে, এখন সব ফোঁসফাঁস! তাই বল্‌ছিলাম, কামাখ্যা মাই ত নজীর রেখেছেন।"

তার পর বল্লে—"চল, একটু বসি, বড্ড পায়ে ব্যথা হয়েছে।"

আমরা প্রায় দুই ধাপ উঠেছি। মুখোমুখি হয়ে দুজনায় দুখানা পাথরে বস্‌লাম। রাস্তার দুই পাশে গুলঞ্চ ফুলের গাছ সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; অসংখ্য ফুল ফুটে আছে; সাদা সাদা ফুলগুলি—রাস্তা আলো করে আছে। গাছগুলি যেন ডালা ভরে ফুল নিয়ে মায়ের মন্দিরে অঞ্জলি দেবার অপেক্ষা কচ্ছে। চারি ধারে কত ফুল পড়ে আছে। এদের মৃদুমন্দ সৌরভে চারিদিক আমোদিত কচ্ছে। হাওয়ায় দুচারিটী ফুল আমাদের গায়ে, আশে পাশে পড়্‌ছে। বেলু কটা ফুল হাতে তুলে নিলে, নাকের কাছে নিয়ে একটু শুঁক্‌লে। হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আপন মনে গুন্ গুন্ করে গান ধর্‌লে—

"ছিন্ন করে লও হে মোরে, আর বিলম্ব নয়।

ধূলায় পাছে ঝরে পড়ি, এই লাগে মোর ভয়। ইত্যাদি"

শ্রমকাতর সুকুমার দেহ, কপোলে মুক্তার মতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বেদবিন্দু, গণ্ডে একটু গোলাপী আভা, ঈষদুন্নত বক্ষ দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসে আন্দোলিত, অনভ্যস্ত শূন্য পদযুগল রক্তিমাভ—কে যেন তাতে আল্‌তা পরিয়ে দিয়েছে। উরুর উপর বাম কনুই, তদুপরি বাম গণ্ড স্থাপিত; ঈষৎ আরক্ত মুখে গুন্ গুন্ ধ্বনি; ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ বিভক্ত; চোখ দুইটি স্থির, অপলক—যেন কোন দূর ভবিষ্যতে নিবদ্ধ; দক্ষিণ হস্তের চম্পকাঙ্গুলিতে একটী শুভ্র প্রস্ফুটিত গুলঞ্চ। ঠিক যেন চিত্রকরের সাধনার বিষয়।

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি; হঠাৎ চৈতন্য হ'ল।—ছি ছি!!

(৭)

"খুব ধীরে ধীরে উঠিস্; এবারের ধাপটা বড় উঁচু।"

আমরা আবার চল্‌তে আরম্ভ করেছি। ওরা বরাবর planesএ থাকে; কাজেই পাহাড়ে চড়া ততটা অভ্যাস নাই। তাতে এতটা উঠে শরীরও একটু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। তাই খুব ধীরে ধীরে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম।

"আপনাদের পাণ্ডা কে?" জনৈক পাণ্ডা জিজ্ঞাসা কর্ল্লে।

"চিন্‌তে পাচ্ছ না, ইনি যে গৌহাটীর অমুজ বাবু" তার সঙ্গী বল্লে। তখন তারা আবার আপন মনে কথা বল্‌তে বল্‌তে নেমে গেল।

"বড্ড খাড়াই; আর যে উঠ্‌তে পাচ্ছি না, অনুদা," একখানা প্রকাণ্ড পাথর দুই হাতে ভর করে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্লে। "আর কত দূর?"

"যত দূর হক ত্বরা চল সেই দেশ

বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে

এ যাত্রা হবে না শেষ!"

"রেখে দাও তোমার কবিতা, প্রাণ যে ওষ্ঠাগত!"

"নে, এক কাজ কর; আমার হাত ধরে ধরে উঠ।"

বলে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলাম। ক্রমে একটু একটু করে উঠতে লাগ্‌ল। একে নিজেই হয়রান্, তাতে আবার বেলুর ভার; হাতে ভর দিয়ে রেখেছে। পাছে ছিট্‌কে পড়ে, তাই হাতখানা খুব এঁটে ধরেছি; ফুলের মতন সুকুমার তার হাত; আমার কঠিন হাতের চাপে একেবারে রাঙ্গিয়ে উঠেছে।

—আর একটু, আর একটু, এবার শেষ! ওঃ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। প্রকাণ্ড একটা অশ্বত্থ গাছ, বেশ ছায়া হয়েছে,—তার শিকড়ের উপর ধপ্ করে দুজনেই বসে পড়্‌লাম। দুজনেই এবার বড় শ্রান্ত। মুখে কথা নাই, চুপ করে বসে আছি। এমনি কতক্ষণ গেল। ক্রমে পাহাড়ের শীতল হাওয়ায় ক্লান্তি কতকটা দূর হ'ল।

"এখানে পাথর নাই কেন? ও বুঝেছি! এখানে

এসেই বুঝি ব্যর্থ প্রেমিকের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছল।" মাটীর রাস্তা দেখে বেলু বল্লে।

আবার বেলুর সহজ চঞ্চল ভাব জেগে উঠেছে।

"তা হবে।"

আমার কণ্ঠস্বরে বোধ হয় কিছু ছিল; হঠাৎ বেলু তাকালে।

"ওঃ, বড্ড হয়রাণ করেছি তোমায় অনুদা।" চোখে মুখে কি কাতরতা!

"দূর্, আমরা ত বরাবরই উঠি।"

"চল, না হয় আর একটু বসি।" আমার কাঁধে হাত চেপে বল্লে। বড় স্নেহমাখা কাতর করুণ কণ্ঠ।

"না, চল্, একেবারে মন্দিরের সাম্নে গিয়ে বস্ব।" বলেই আবার চল্তে লাগলাম।

"এই কামাখ্যা মন্দির!" তোরণদ্বার ডিঙ্গিয়েই একটী মন্দির দেখে বল্লে।

"কামাখ্যা মন্দির আর একটু উপরে, দেখ্‌লেই চিন্‌তে পার্ব্বি। দশমহাবিদ্যার প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা মন্দির এখানে আছে কি না, এ সব সেই মন্দির।"

ক্রমে মন্দিরের সামনে এসে পড়েছি! একটী নারকেল গাছ, নীচে বেশ ছায়া। মন্দিরের দিকে মুখ করে সেখানে বসে পড়্‌লাম।

এমন সময় মালাকর এসে হাজির। জিজ্ঞাসা কল্লে—"পাণ্ডার ওখানে যাবেন না?"

"আপাটাকে নিয়ে যাও; আমরা দর্শন সেরে তবে যাব; ওবেলা নাবব। পাণ্ডাঠাকুরকে বোলো।"

"আচ্ছা" বলে আপাকে নিয়ে মালাকর চলে গেল। একটু পরেই পাণ্ডাঠাকুর এলেন। শুভ্র গৌর দেহ সদ্যস্নাত, পরিধানে রক্তাম্বর।

—"বাঃ, তোমাদের পাণ্ডাটী ত বেশ।"

"হাঁ, এখানের পাণ্ডারা সবাই বেশ; তাদের ব্যবহারও বেশ ভদ্র।"

বল্‌তে বল্‌তে আমরা মন্দিরে ঢুকলাম।

"ও বাবা, কি অন্ধকার!"

"আমার হাত ধরে ধরে চলিস্; দেয়ালের গায়ে হাত রাখ্‌বি; সিঁড়ি আছে, এক পা এক পা করে নাবিস্। খুব সাবধান!"

সেদিন বড্ড ভিড়। পাণ্ডাঠাকুর সাম্‌নে থেকে টান্‌ছে। বেলু কতকটা ভয়ে, কতকটা ভিড়ের চাপে একেবারে আমার গায়ে গায়ে মিশে গেছে। তার 'শিরিষ-পেলব' সুকুমার দেহের স্পর্শ, তার মৃদুমন্দ নিশ্বাস-প্রশ্বাস বেশ অনুভব কচ্ছি। এবার পীঠস্থানে এসে পৌছেছি।

"বসুন"—বলে পীঠস্থানের পুরোহিত বেলুকে বসালে।

"আপনি ওপাশে বসুন" কি মনে করে বল্লে পুরোহিতই জানে। ভিড়ের চাপে দাঁড়াতে পাচ্ছি না—অগত্যা বসে পড়লাম।

যাহোক কোন মতে মন্দিরের কাজ সেরে বেরিয়ে পড়া গেল।

"এমন অন্ধকার কেন?"

"বোধ হয় মন্দিরের গাম্ভীর্য্য বাড়াবার জন্য।"

"আমার ত বাপু ভয়ই বাড়ছিল।"

পাণ্ডার বাড়ী এসেছি; দোতালার উপর একখানা ঘর আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। সুন্দর, পরিষ্কার ঘর। চারিধারে দেয়ালের গায়ে দশমহাবিদ্যা ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙ্গান; দু পাশে দুখানা তক্তপোষ, দুইটী বিছানা পাতা। মাঝে একখানা চেয়ার; সাম্‌নে খোলা বারান্দা।

খাওয়া দাওয়ার পর বেলুকে বল্লুম, "এবার একটু বিশ্রাম করে নে দেখি। ওবেলা আবার ভুবনেশ্বরে উঠতে হবে।"

"আরও উঠা বাকী আছে না কি?" ভয়কম্পিত স্বরে বেলু জিজ্ঞাসা কল্লে।

"দেখবি, কেমন খাসা যায়গা ভুবনেশ্বর।"

"ওঃ, তাই না কি"—বলে বেলু শুয়ে পড়্‌লো।

"বাঃ, বারান্দায় কি সুন্দর হাওয়া," বলে একখানা পাটী টেনে আমিও বারান্দায় শুয়ে পড়লাম।

৭

"এই বেলা চল্, তা না হ'লে নাব্‌তে নাব্‌তে রাত হয়ে যাবে।" এখন আর ৺কামাখ্যা মন্দিরের ধারে ভোরের সে ভিড়, সে চাঞ্চল্য নাই। মন্দিরে প্রণাম ক'রে উভয়ে ভুবনেশ্বরে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম।

"বাঃ, কি সুন্দর হাওয়া।"

ততক্ষণে আমরা পাণ্ডাদের বাড়ী পার হয়েছি।

চারি ধারে একেবারে খোলা। দূরে ভুটানের ও খাসিয়া পাহাড়ের পর্ব্বতমালা দেখা যাচ্ছে।

—"ঐ বাঙ্গলাখানা কোন্ পাণ্ডার? খাসা বাঙ্গলাখানা ত!"

"পাণ্ডার নয়, দ্বারভাঙ্গার মহারাজার বাঙ্গলা ওখানা।"

"মহারাজা বুঝি খুব ধার্ম্মিক? ওঃ"! হঠাৎ একখানা পাথরে হোঁচট খেয়ে বেলু আর্ত্তনাদ করে উঠ্লো।

"কিরে, বড্ড লেগেছে না কি?"

"দেখ ত" কাতর কণ্ঠে বলেই পায়ের আঙ্গুলটা চেপে ধর্‌লে। আহাহা! চেয়ে দেখি, নখটা ফেটে গেছে; ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে। চাঁপাফুলের মতন রং, চাঁপার কলির মতন ছোট্ট ছোট্ট আঙ্গুলগুলি—লালে লাল হয়ে গেছে।

"বৌদি পিছু ডেকেছিল; তখনি বুঝেছি, একটা কিছু ঘট্‌বে। তুমিও ত আবার বৌদির কথায় সায় দিলে। এখন দেখ ত! ওঃ, আঙ্গুলটা একেবারে গেছে!"

খালি পায়ে উঠতেই কতটা বেগ পেতে হয়েছে, সে কথাটা বলে আর তার ব্যথাটা বাড়ান আবশ্যক মনে কর্ল্লাম না। কুঁজোতে চায়ের জল ছিল। আপাটার কাছ থেকে একটু চেয়ে নিয়ে রুমালটা ভিজিয়ে নিলাম। একটা ধার ছিঁড়ে ফেলে আঙ্গুলটা বাঁধবার মতন করে নিলাম।

"আহা, রুমালটা ছিঁড়ে ফেল্লে!"

"তুই আর একটা বানিয়ে দিস্ এখন। এ জন্যই শাস্ত্রে বলে, 'পথে নারী বিবর্জ্জিতা।' তোরা একটা না একটা গোল বাধাবিই।" আঙ্গুলটা বাঁধতে বাঁধতে গম্ভীর ভাবে বল্লাম।

"কোন্ শাস্ত্রে এ ব্যবস্থা আছে? আমরা সাত বছরে বিধবা হলে নির্জ্জলা উপবাসের বিধান যে শাস্ত্রে, তাতে বোধ হয়।"

"বখামি করিস্ নে! দুপাত ইংরাজী পড়ে ধরাকে সরা ভাবতে শিখেছিস।"

"তা এত চোট্‌পাট কেন বাপু! বর্জ্জন করে গেলেই ত পার। এই পুণ্যতীর্থে শাস্ত্রের শাসন লঙ্ঘন কল্লে আরও কোন্ বিপদ ঘটে, কে জানে।"

"আচ্ছা, তা দেখা যাবে তখন। এবার ওঠ।"

"বল্লে ত ওঠ, কিন্তু উঠতে পাচ্ছি কৈ?"

বাস্তবিক, তাদের ত আর আমাদের মতন 'লোহাপেটা' শরীর নয়? আঙ্গুলটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফুলে উঠেছে। ধীরে ধীরে হাত ধরে তুল্লাম।

"একটা লাঠি টাঠি দিতে পার? হাঁট্‌তে পাচ্ছি না।"

"এখানে লাঠি পাব কোথায়? নেঃ, এক কাজ কর। আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল্। মন্দির ত ঐ দেখা যাচ্ছে।"

আপাটাকে বল্লাম, এগিয়ে গিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দিতে। আমরা ধীরে ধীরে উঠ্‌ছি। হঠাৎ বেলু বল্লে "অনুদা, তুমি কপালকুণ্ডলা পড়েছ নিশ্চয়।" কি মনে করে বলেছে, মনে হতেই আমি হেসে উঠ্‌লাম। বেলু কিন্তু দেখ্‌লাম, কেন জানি না, সে হাসিতে যোগ দিল না। সে কেমন যেন একটু গম্ভীর, একটু অন্যমনস্ক। ক্রমে উঠ্‌ছি। স্কন্ধে হাতের চাপ যেন ক্রমেই একটু বাড়ছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন ক্রমেই একটু দ্রুত। পা-টা বোধ হয় বড্ড কন্‌কন্ কচ্ছে! তাই ধীরে, আরও ধীরে, একপা একপা করে এগুচ্ছি।

নীরব নির্জ্জন এস্থান, চারিদিক গুল্মলতায় সমাচ্ছন্ন; মধ্যে সঙ্কীর্ণ রাস্তা। সূর্য্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। এমন সময়ে কে এ তরুণী, উদ্ভিন্ন-যৌবনা, অপরূপ-রূপলাবণ্যময়ী—এই যুবকের স্কন্ধে ভর দিয়ে একান্ত নির্ভয়ে ধীর পাদক্ষেপে চলেছে? বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত রূপ রস গন্ধ নিঙড়িয়ে যেন তার সুকুমার দেহলতাকে পরিপূর্ণ সুষমায় মণ্ডিত করে তুলেছে!—এ কি বেলু?

ক্রমে ভুবনেশ্বরে এসে পৌছলাম। চায়ের জল ফুট্‌ছিল। বেলু নিপুণ হস্তে চা তৈয়ার করে ফেল্লে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একখানা প্রকাণ্ড পাথর, পাথরের পূর্ব্বে নদী। নদীর দিকে মুখ করে পাথরে ঠেস্ দিয়ে বসে আমরা চা খেলাম।

"চায়ের বাসনগুলি নিয়ে নেবে যা। নীচে জল পাবি, ধুয়ে রাখিস্। মটর দাঁড়াতে বলিস্" বলে আপাটাকে বিদায় দিলাম।

আমি তেমনি বসে আছি। বেলু উঠে ঠিক আমার মাথার উপরের পাথরে বসলে—আধশোয়া, আধবসা গোছের। প্রস্ফুটিত কমলের মতন সুকুমার মুখখানা হাতের উপর স্থাপিত, একটু কাত হয়ে নদীর দিকে মুখ করে আছে; মাথা আমার মাথার ঠিক উপরে।

সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, তার শেষ কিরণরেখা পাহাড়ের গায়ে বিদায়ের চুম্বনের মতন লেগে আছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা সমীরণ বইছে, মৃদু মধুর সুশীতল হাওয়ায় সমস্ত গ্লানি, সমস্ত অবসাদ কেটে গেছে। গুলঞ্চ ফুলের সুবাস হাওয়ার সাথে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। বেলুর অঞ্চল সে হাওয়ায় দুল্‌ছে, উন্মুক্ত কবরী সে হাওয়ায় নড়্‌ছে, দুই একটী শিথিল গুচ্ছ সে হাওয়ায় উড়ছে, তার কপোলে, গণ্ডে, আমার স্কন্ধে পড়ছে। কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই।

ক্রমে গোধূলির আলো নিবে আস্‌ছে, সর্ব্বত্র কেমন একটু আবছায়ার মতন। নীচে বিস্তীর্ণ ব্রহ্মপুত্র নদ নীরব নিস্তব্ধ—বৃহদাকার হ্রদের মতন দেখাচ্ছে। যে ব্রহ্মপুত্র মা কামাখ্যার পাদপীঠ ধৌত করে কুলুকুলু নাদে তাঁর পুণ্যময় কীর্ত্তিগাথা গেয়ে দেশ দেশান্তরে চলে যাচ্ছিল, কাহার হস্তের ইঙ্গিতে যেন অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারিদিকে কেমন যেন একটা বিরাট নিস্তব্ধতা; সবাই যেন উন্মুখ হয়ে বসে আছে কি এক অঘটনের প্রতীক্ষায়। যেন মাতা বসুমতী তাঁর মুমূর্ষু সন্তানকে বক্ষে করে বসে আছেন,—উদ্বেগ-কাতর, অপলক নয়নে, তার বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখপানে চেয়ে। পৃথিবীর যা কিছু চাঞ্চল্য, যা কিছু ব্যাকুলতা, সব যেন লোপ পেয়ে গেছে।

এম্‌নি ধারা বসে আছি—কি ভাব্‌ছি ঠিক বল্‌তে পারি না। কিন্তু কেমন একটা নূতন, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অনুভূতি হৃদয়ে জাগ্‌ছে—যার কাছে এই মন্দির, এই পুণ্যতীর্থ, নদনদী পাহাড় পর্ব্বত—প্রকৃতির যত সব অতুলনীয় সম্পদ—সব যেন নিতান্ত তুচ্ছ, নিতান্ত অসম্ভব মনে হচ্ছে। আমি যে কি তাই যে ঠিক উপলব্ধি কর্ত্তে পাচ্ছি না। আমার যে আরও একটা সত্ত্বা আছে—একটী পবিত্র লতা যে আমাকে একান্ত বিশ্বাসে জড়িয়ে আছে, তার ফুল ফল দিয়ে সার্থক কর্ব্বার জন্য উন্মুখ হয়ে আমার পানে চেয়ে আছে—আমার সঙ্গে সঙ্গে যে তার সরল সুন্দর পুণ্যময় অস্তিত্ব একেবারে লয় পাবে—এসব কিছুই মনে হচ্ছে না। কি এ অনুভূতি—যার কাছে জীবন মরণ, পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, ইহকাল পরকাল সব ভেসে যাচ্ছে। কি এ অনুভূতি, যার কাছে সম্মুখের তরঙ্গায়িত অনন্তবিস্তার পর্ব্বতমালা, দূরের, অতি দূরের ক্ষীণ চক্রবালরেখা, উপরের বিস্তৃত, অনন্ত প্রসারিত, উন্মুক্ত আকাশ—উহারাও যেন নিতান্ত সান্ত মনে হচ্ছে—এদের ভিতরেও যেন স্থানাভাবে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠ্‌ছে। আরও দূর—আরও দূর—আরও অনন্ত—এ বিশ্বে কোন আবরণ, এ অনন্ত পথের মাঝে কোন বাধা সহিতে যেন মন একেবারেই প্রস্তুত নহে!

কি এক অপূর্ব্ব আবেগে দেহ মন বিভোর হয়ে উঠ্‌ছে—মনে হচ্ছে এ জগতে আর কিছু নাই—কেবল দুইটী নরনারী। ঐ যে ক্ষুদ্র নৌকা—নদীর মাঝখানে ধীর নিশ্চল—ওতে কে আরোহী? সুধু দুইটী নরনারী! ঐ যে পর্ব্বতমালা, অনন্ত প্রসারিত—ওতে কারা বাস করে—সুধু দুইটী নরনারী! ঐ যে, অনন্ত আকাশ, ঐ যে অফুরন্ত বাতাস—ওতে কে আছে? আর কেহ নয়—সুধু দুইটী নরনারী! এম্‌নি বিভোর হয়ে ভাব্‌ছি, হঠাৎ কেমন করে অতর্কিতে উদ্বেলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল—

—"বেলু"—

—"অনু"—

কি মধুর প্রাণোন্মাদকারী সে স্বর—যেন দূরাগত সঙ্গীতের মতন কর্ণে এসে পৌঁছল! যেন ব্রজের বাঁশরীর মতন কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মস্থানে আঘাত কর্ল্ল—শরীরের প্রতি লোমকূপ, প্রতি অণুপরমাণুতে যেন কি এক মাদকতা ঢালিয়া দিল!

আবার—আবার ডাকলাম—"বেলু!"

আবার—আবার শুনলাম—"অনু!"

কতকাল, কত যুগ ধরে যেন দুইজন ঐ কথাই বল্‌ছি, ভাষায় যেন আর কোন কথা নাই, অভিধানে যেন আর কোন শব্দ নাই—এক মাত্র এই দুইটী শব্দ—উহাতেই মানবের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত সাধনা গ্রথিত, পুঞ্জীভূত।

উভয়ে ঠিক তেমনি ধারা বসে—নীরব, নিথর। কতক্ষণ? কে বলিবে কতক্ষণ? ঘড়ি ধরে বুঝি সে সময়ের গণনা হয় না! কেবল এই অনুভূতির তীব্রতা দ্বারাই বুঝি ইহার পরিমাণ সম্ভব।

হঠাৎ স্কন্ধে যেন কিসের শীতল স্পর্শ অনুভব কর্‌লাম। দেখি, বেলুর মুখ আমার স্কন্ধের উপর। ডান হাত দিয়ে ধীরে, অতি ধীরে তাহার সমস্ত মস্তক স্পর্শ কর্‌লাম,—গায়ক যেম্‌নি করে তার সাধের বীণাকে স্পর্শ করে, চিত্রকর যেম্‌নি করে তার অতি সাধের চিত্রকে স্পর্শ করে, সাধক যেম্‌নি করে তাহার একমাত্র আরাধ্যকে স্পর্শ করে—তেম্‌নি করে

স্পর্শ করলাম। কি তড়িৎ-প্রবাহ যেন দেহের উপর দিয়ে বয়ে গেল—কি এক অপূর্ব্ব পুলকে যেন দেহ, মন, হৃদয়ের অন্তস্তল শিউরে উঠ্‌ল।

আবার ডাকলাম—বেলু! জবাব পেলাম্ না। তাকিয়ে দেখি, বেলু কাঁদ্‌ছে; উঃ, সে কি কান্না! কাঁধের উপর মুখ রেখে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে বেলু কাঁদছে—যেন এক প্রবল ভূমিকম্প দেহের ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, দেহ-মন ভীষণ ভাবে আলোড়িত করে দিচ্ছে! বক্ষঃ বিদীর্ণ করে যেন ধূম্র, কর্দ্দম, বাষ্প, সমস্ত আবর্জ্জনারাশি নিঃশেষে বের হয়ে যাচ্ছে। সে কান্নার আর বিরাম নাই, সে অশ্রুর আর শেষ নাই—এ যেন গোমুখীর অনন্ত নিঃস্রাব—এ যেন পূত মন্দাকিনীধারা, যাতে ধৌত করে দেয় পৃথিবীর সমস্ত পাপতাপ—সমস্ত কলঙ্ক-কালিমা।

বল্‌তে পার্ব্ব না কেমন করে হল, বুঝাতে পার্ব্ব না, কিন্তু ধীরে ধীরে সেই বাল্যের স্মৃতি হৃদয়ে জেগে উঠ্‌ল—সেই আমাদের পল্লী, সেই স্কুল, সেই মা, বাবা, সেই মান, অভিমান—সেই ছোট্ট বেলু—সেই সহজ সরল স্নেহ-ভালবাসা।

ডাক্‌লাম—"বেলু, দিদি, বোন্।"

—"অনুদা!"

ততক্ষণে গোধূলি অতীত, শুভ্র মেঘাচ্ছাদিত অষ্টমীর চাঁদের ম্লান আলো ফোটফোট। কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে এদের ভিতর পবিত্র সন্ধি হয়ে গেছে বুঝ্‌তে পারি নাই।

"চল্ বোন, বড্ড দেরী হয়ে গেল।"

"চল অনুদা, বৌদি না জানি কত ভাব্‌ছে।"

একখণ্ড মেঘ চাঁদকে হঠাৎ ঢেকে ফেল্লে।

—"ঝড়টড় আসবে না ত?"

—"আস্‌ছিল—কেটে গেছে।"

(৮)

'মোটর' এসে বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়াল। শিউলিকে বারান্দায় দেখলাম না। কোথায় সে? মনটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠ্‌ল।

"মার বড্ড অসুখ করেছে বাবু" ঝি-টা বল্লে।

"কি অসুখ রে? কখন হল?" বল্‌তে বল্‌তে দুজনা ছুটে শোবার ঘরে ঢুক্‌লাম। দেখি, শিউলি বিছানায় শুয়ে। মাথায় হাত দিলাম—উঃ, কি গরম!

"কখন জ্বর এল?"

"তোমরা যাওয়ার পর থেকেই গা-টা কেমন কচ্ছিল। দুপুর থেকে জ্বরটা জোরে এসেছে।"

একটু থেমে বল্লে "তোমাদের জন্য বড্ড ভাবনা হচ্ছিল, দেরী দেখে।"

রাত্রিতে ভাল করে ঘুম হ'ল না। কেমন যেন একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা প্রাণে জাগ্‌তে লাগ্‌ল। মনকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম, কারো কি জ্বর হয় না? সেরে যাবে এখন। কিন্তু কোথায়? ও কথায় যেন মন প্রবোধ পেলে না।

আরও দুই দিন গেল। জ্বরের বিরাম নাই, একটু একটু কাসি আছে। ডাক্তার বুক পরীক্ষা করে বল্লেন—নিউমনিয়া হয়েছে।

"—কি হবে ডাক্তার বাবু?" আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম।

"এত অস্থির হচ্ছেন কেন? এখনো তেমন কিছু হয় নি। একটু সাবধান থাক্‌লেই আর বাড়তে পার্ব্বে না।"

—আরও দুই দিন গেল। কৈ? তবু ত উপশম হয় না। ডাক্তারের মুখ কাল।

হায় হায়! কি হবে আমার! আমার শিউলি, আমার প্রাণের শিউলি। ওগো ভগবান, এ কি তোমার বিধান? ভগবানকে ডাক্‌তে লাগ্‌লাম। কিন্তু এ কি! ডাক্‌তে যে পারি না—মন যে বসাতে পারি না। ও কার কথা, কার চেহারা মনে আস্‌ছে। "মা কামাখ্যা, দয়া কর মা" করযোড়ে কাতর কণ্ঠে ডাক্‌ছি। মায়ের স্বরূপ হৃদয়ে উপলব্ধি কর্ব্বার জন্য চক্ষু মুদিত কর্চ্ছি। আহা হা—ঐ যে মা আমার—কি সুন্দর মায়ের মুখ, কি স্নেহমাখা তাঁর চাহনি—কিন্তু এ কি?—এ যে উদ্ভিন্ন-যৌবনা, ঈষৎ আলুলায়িতকুন্তলা কে এক নারী! এই কি মা? প্রস্তরখণ্ডে যেন বসে আছে, হস্তে প্রস্ফুটিত গুলঞ্চপুষ্প, গুন্ গুন্ স্বরে গান কচ্ছে!—এ কি শাস্তি ভগবান!

শিউলির পাশে যাই—অনভ্যস্ত হস্তে শুশ্রূষা কর্ত্তে চেষ্টা করি—সব গোলমাল হয়ে যায়। চুপ্ করে বসে থাক্‌তে চাই—পারি না, কে যেন অনবরত কশাঘাত কচ্ছে। ইতস্ততঃ হাঁটছি, ছট্‌ফট্ কচ্ছি, নিজের চুল নিজে ছিঁড়ছি।

আমি কি কর্ব্ব? কোথায় যাব? আবার বসি, আবার ভাব্‌তে চেষ্টা করি।

"ত্বম্ আদি দেব পুরুষ-পুরাণ
ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বং অনন্ত রূপ।

হৃদয় মন সংযত করে আভূমি প্রণিপাত কচ্ছি আমার মায়ের সে রাজিব চরণে। কি সুন্দর আরক্ত পদযুগল, কি সুন্দর চম্পকাঙ্গুলি—ক্রমে দেখ্‌ছি উহারা যেন লাল হয়ে উঠ্‌ছে! চম্‌কে উঠ্‌লাম—হায়, হায় এ কি?

৺কামাখ্যা পীঠস্থান। কত লোক দেশ-দেশান্তর থেকে এখানে আস্‌ছে, মানত করে, পূজো দিতে। আমি মন্দির-দ্বারে বাস করি—এত বড় সৌভাগ্য আমার। সে দ্বার আজ আমার পক্ষে অবরুদ্ধ। এ কি দারুণ অভিশাপ!

—মা, তোর নাম নিতে পার্ব্ব না, তোকে ডাকতে পার্ব্ব না? তবে আর কার কাছে যাব মা? কার দিকে তাকাব দয়াময়ী? আমার শিউলির জন্য কার কাছে হাত পাতব, কার আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা কর্ব্ব? ওঃ, বুক যে ফেটে যায়। করুণা কর্ মা, করুণা কর্। তোর এ অভিশাপ ক্ষণকালের জন্য সরিয়ে নে মা। একবার আমায় প্রাণ খুলে ডাক্‌তে দে। শিউলি ত যাবেই—মনের শান্তির জন্য একবার তোর স্বরূপ হৃদয়ে অনুভব কর্ত্তে দে। এ শান্তি দে মা, যে শিউলির জন্য তোকে একবার একাগ্র মনে ডাক্‌তে পেরেছিলাম। তার পর আমার সমস্ত জীবন অভিশপ্ত করে দে—মাথা পেতে নেব তোর শাসন।

আর ভাবতে পাচ্ছি না, ক্রমে যেন সংজ্ঞা লোপ হল। আধ-ঘুম, আধ-জাগা—এমন সময় যেন শুন্‌তে পাচ্ছি কে বল্‌ছে—

"বুকটা ত অনেকটা পরিষ্কার বোধ হচ্ছে; জরটাও ত বেশ নেবেছে।"

ধড়ফড় করে উঠ্‌লাম—তবে কি মা তোর দয়া হল? সাত দিন পরে জ্বর ত্যাগ হল।

"বেলু, আর জন্মে তুই আমার মায়ের পেটের বোন ছিলি নিশ্চয়"—শিউলি বল্লে।

উঃ, কি সেবাটাই করেছে বেলু! মূর্ত্তিমতী সেবার ন্যায় বসে থাক্‌ত শিউলির পাশে। দিবারাত্রি জ্ঞান নাই; আহার-নিদ্রা নাই। ধীর, স্থির। কোথায় ছিল তার স্বাভাবিক চঞ্চলতা! সে কি সেবা! মানুষে বুঝি তেমন পারে না।

শিউলি বল্লে—"অনুদা পাগল হয়ে যেত তোমার কিছু হলে। যা হোক, ভগবান বাঁচিয়েছেন।"

শিউলির রোগক্লান্ত পাণ্ডুর মুখখানা একটু রাঙ্গিয়ে উঠল। সলজ্জ মৃদু হাস্য করে আমার দিকে একটু তাকালে।

কাল বেলু চলে যাবে। তা যাবেই ত। তার সমস্ত জীবন সম্মুখে। নিশ্চয় জানি, এ জীবন ব্যর্থ হবে না। ভগবান তার জীবনকে সার্থক কর্ব্বেন।

সন্ধ্যায় খোলা বারান্দায় বসে আছি। শিউলি এক-খানা আরাম-কেদারায় বসে—আমরা দু'জন তার দুপাশে। কৃষ্ণ-দ্বিতীয়ার চাঁদ একখানা রৌপ্য-থালার মতন পাহাড়ের গা দিয়ে ভেসে উঠ্‌ছে। বেলু গাইছে—

আমারেও কর মার্জ্জনা
আমারেও দেহ নাম অমৃতের কণা—ইত্যাদি।"

কি মধুর তার কণ্ঠস্বর। নয়ন বেয়ে ধারা বইছিল। এ কি আত্ম-নিবেদন তার বিধাতার কাছে!

হাস্‌নাহানার মৃদু সৌরভ বারান্দার হাওয়া আমোদিত করে তুল্‌ছে; গৃহ, আকাশ, বাতাস সর্ব্বত্র যেন আন্দোলিত হচ্ছে সে সঙ্গীতের তরঙ্গ, সে গানের মূর্চ্ছনা—কেবলি যেন শুন্‌তে পাচ্ছি—

"আমারেও কর মার্জ্জনা"—

বিবিধ-প্রসঙ্গ

প্রাচীন-ভারতে কাম্বোজ জাতি

ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি

প্রাচীন সংস্কৃত ও বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে কাম্বোজদের নাম বহু স্থানে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সুতরাং এই জাতিটি খ্যাতি প্রতিপত্তি ও শক্তিতে প্রাচীন-ভারতে যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ কাম্বোজেরা প্রাচীন বৈদিক জাতিগুলিরই অন্তর্ভুক্ত একটি জাতি ছিল। সাম-বেদের বংশ ব্রাহ্মণে বৈদিক ঋষিদের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেই সর্ব্বপ্রথমে কাম্বোজদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই তালিকায় একজন ঋষির নাম—কাম্বোজ ঔপমন্যব অর্থাৎ উপমন্যুর পুত্র কাম্বোজ (পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীর সম্পাদিত বংশ ব্রাহ্মণ)। ঋষি আনন্দজ শরকরাক্ষের পুত্র সাম্ব এবং উপমন্যুর পুত্র কাম্বোজের নিকট হইতে বেদ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আনন্দজ দুই জন গুরুর নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এ কথা বলার তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝা কঠিন। কারণ এক গুরুর নিকট হইতে শিক্ষালাভ করাই তখনকার কালের প্রথা ছিল। অবশ্য কোনো বিশেষ অবস্থায় এ প্রথার পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নয়। তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায়, আনন্দজের প্রথম গুরু ছিলেন সাম্ব, তাহার পর তিনি কাম্বোজের নিকট অধ্যয়নের জন্য উপস্থিত হন। কাম্বোজের বেদ-সম্বন্ধে বিশেষ এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যই সম্ভবতঃ আনন্দজের ভিন্ন গুরু গ্রহণের কারণ। ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের ভিতর কাহারো কাহারো মতে কাম্বোজেরা ছিল ইরাণিয়ান জাতির লোক; কিন্তু এ মত যে সত্য নহে, প্রাচীন বৈদিক যুগে তাহারা যে ভারতীয় বৈদিক জাতিগুলিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, পূর্ব্বোক্ত ঘটনা তাহার প্রমাণ। বৈদিক ঋষিদের এই তালিকাতেই পাওয়া যায় যে, আনন্দজের উভয় শিক্ষকই একই ঋষির নিকট হইতে বেদ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন—সাম্ব শরকরাক্ষ এবং কাম্বোজ ঔপমন্যব—এই উভয়েরই বেদ পাঠের গুরু ছিলেন—মদ্রগার সৌঙ্গায়ণি। মদ্র সৌঙ্গায়ণি ছিলেন মদ্র-বংশোদ্ভব। (Vedic Index, I. p. 138) মদ্র এবং কাম্বোজের সঙ্গে এই যে যোগাযোগ, ইহা খুবই স্বাভাবিক। কারণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে এই দুইটি জাতি একরূপ গায়ে গায়ে মিশিয়াই বাস করিত।

ঋগ্বেদে কাম্বোজদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঋগ্বেদের যুগেও যে তাহারা বৈদিক আর্য্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহার প্রত্যক্ষ না হউক পরোক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। লুডউইগ দেখাইয়াছেন, ঋগ্বেদের স্তোত্রেও ঋষি উপমন্যুর নামের উল্লেখ আছে (ঋগ্বেদ ১,১০২,৯); এবং এই উপমন্যুই যে বংশ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত কাম্বোজ গুরুর পিতা ছিলেন, এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এই রকমের একটা সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জিমার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (Altindisches Leben, p. 102) এই সব অনুমান এবং সিদ্ধান্তের মূল্য যাহাই হোক্ না কেন, এ-সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহ নাই যে, কাম্বোজের একজন লোক সেই সব ঋষিদের তালিকার ভিতরে স্থান লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা সেই প্রাচীন যুগে বেদের আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহার বিস্তারে সাহায্য করিয়াছেন। বৈদিক-যুগে কাম্বোজেরা যে ভারতীয় বৈদিক-জাতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় ছিল, তাহাতেও সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

তাহার পর কাম্বোজদের উল্লেখ পাওয়া যায় যাস্কের নিরুক্তে। এই গ্রন্থের একটি স্থানে আছে যে কাম্বোজেরা বৈদিক ভাষাই ব্যবহার করিত। তবে সে ভাষা যাস্কের সময় মধ্য-দেশে যে ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ছিল। যাস্ক দেখাইয়াছেন যে, কাম্বোজেরা 'শবতি' ক্রিয়া পদটি তাহার আদিম অর্থ 'যাওয়া' বুঝাইতে ব্যবহার করিতেন। কিন্তু মধ্যদেশের ব্যবহারে এ অর্থ লোপ পাইয়া গিয়াছিল। তখনকার প্রচলিত ভাষায় ইহা রূপান্তরিত হইয়া 'শব' এই শব্দরূপে ব্যবহৃত হইত এবং ইহার ক্রিয়া-বাচক পদটির ব্যবহারও দেখা যাইত না। অনেকে এই ব্যাপার হইতেই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কাম্বোজেরা ভারতীয় জাতি ছিল না, তাহারা আইরেনিয়ান ছিল। এ যুক্তি মোটেই সারবান বলিয়া মনে হয় না। যাস্কের মতানুসারে বরং মনে হয় যে, কাম্বোজেরা বৈদিক জাতিই ছিল; এবং তাহাদের দ্বারা প্রাচীন ক্রিয়াপদগুলির আদিম অর্থ কোনও রূপে বিকৃত হয় নাই; কিন্তু বৈদিক জাতির অন্যান্য অংশ, যাহারা ভৌগোলিক ব্যবধানের দ্বারা বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা এই সব ক্রিয়াপদের আদিম অর্থ বজায় রাখিয়া চলিতে পারে নাই।

সার জর্জ্জ গ্রিয়ারসন বলেন, "শব এবং শবথি" এই দুইটি শব্দের ধাতুগত উৎপত্তির যোগাযোগের সত্যাসত্য লইয়া আলোচনা না করিলেও, ইহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, যাস্কের মতে কাম্বোজেরা আর্য্য ছিল না। তাহারা সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহার করিত বটে, কিন্তু তাহাদের সে ভাষার সহিত মূল ভাষার পার্থক্যও ছিল বিস্তর। শবতি শব্দ সংস্কৃত ভাষার কোথাও পাওয়া যায় না। উহা আইরেনিয়ান শব্দ।" মোটের উপর সার জর্জ্জের মতে কাম্বোজেরা ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি অসভ্য জাতি; তাহাদের ভাষা ছিল হয় আইরেনিয়ান শব্দবহুল সংস্কৃত ভাষা না হয় এমন একটি ভাষা যাহার কতকগুলি শব্দ ছিল ভারতীয় আর্য্যদের ভাষা হইতে উদ্ভূত, এবং কতক শব্দ ছিল আইরেনিয়ানদের প্রথা হইতে উদ্ভূত। (১)

(১) J. R. A. S. 1911, pp. 801-802.

যাস্ক কাম্বোজ নামটিতেও একটি ধাতু-গত অর্থ আরোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টাও সম্যক সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি বলিয়াছেন, কম্বল ভোজ হইতেই কাম্বোজ নামের উৎপত্তি। তাহারা উক্ত পশ্চিম-ভারতের মালভূমিতে বাস করিত এবং এই অঞ্চলের নিদারুণ শীত হইতে আত্ম-রক্ষার জন্যই কম্বলের ব্যবহার তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। কম্বোজ 'কম' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'কমনীয় ভোজ' অর্থ সুখকর দ্রব্য উপভোগ করিত বলিয়াই তাহাদের নাম কাম্বোজ। কম্বল যে ভারতের এই শীতপ্রধান অঞ্চলটাতে খুবই আরামপ্রদ জিনিষ ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি পণ্ডিতেরা যাস্কের এই ভাবে কম ও কম্বলের সহিত ভাষাগত সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা এবং এই দুইটি শব্দের সহিত কাম্বোজের সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইতে রাজী নহেন। কাম্বোজের যে কম্বলের কারবার করিত, তাহার উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় কাম্বোজ-রাজ যুধিষ্ঠিরকে "অনেক উৎকৃষ্ট চর্ম্ম, পশমের কম্বল, মাটির গহ্বরে বাস করে এমনি সব পশু এবং বিড়ালের লোমের দ্বারা তৈয়ারী সোনার সূতার কাজ করা কম্বলও উপহার দিয়াছিলেন।" (২) মহাভারতের আরও এক স্থানে এই কম্বল দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে আছে, কাম্বোজ-রাজের নিকট হইতে যুধিষ্ঠির কালো, গাঢ় এবং লাল রঙের 'কদলি' নামক হরিণের হাজার হাজার চামড়া, এবং উৎকৃষ্ট জমিনের কম্বলও উপহার পাইয়াছিলেন। (৩)

ইহার পর কাম্বোজের উল্লেখ পাওয়া যায় পাণিনিতে। পাণিনির একটি সূত্রে কম্বোজল শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ডাঃ ডি, আর ভাণ্ডারকর বলেন, কম্বোজ শব্দটি কেবল মাত্র কম্বোজ দেশ এবং কম্বোজ জাতি বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইত না, ইহার দ্বারা কম্বোজের রাজাকেও বুঝাইত। কিন্তু এই কম্বোজের অনুরূপ আরো কতকগুলি শব্দ আছে, যাহার ব্যবহার পাণিনির ভিতর পাওয়া যায় না। সেই জন্যই কাত্যায়ন পাণিনির পূর্ব্বোক্ত সূত্রটি একটু রূপান্তরিত করিয়া লিখিয়াছেন—কম্বোজাদিভ্যো=লুগ—বচনম্ চোড়াদ্যর্থম্। অর্থাৎ কম্বোজ শব্দটির মত চোড়, কদের, কেরল প্রভৃতি শব্দ কেবলমাত্র দেশ বা জাতিকে বুঝায় না—তাহাদের রাজাকেও বুঝায়। (৪)

টি. ডব্লিউ. রিজ ডেভিড্‌সের মতে কম্বোজ দেশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত ছিল এবং দ্বারকা ছিল উহার রাজধানী। (৫) কাম্বোজদের রাজধানী সম্বন্ধে এস, কে, আয়াঙ্গার টি, ডব্লিউ রিজ ডেভিড্‌সের সঙ্গে একমত। বর্ত্তমান সিন্ধুপ্রদেশ ও গুজরাটকেই তিনি কম্বোজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। (৬) ডাঃ পি এন ব্যানার্জ্জিও তাঁহার Public Administration in Ancient India নামক গ্রন্থে মানিয়া লইয়াছেন যে, বর্ত্তমান সিন্ধু-প্রদেশের নিকটেই কাম্বোজ অবস্থিত ছিল এবং তাহার রাজধানীর নাম ছিল দ্বারকা। (৭ ধর্ম্মপালের প্রেতবস্তুর টীকায় কাম্বোজের সঙ্গে-সঙ্গেই দ্বারকার উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু দ্বারকা যে কাম্বোজেরই রাজধানী ছিল, এ কথার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ তাহার ভিতর পাওয়া যায় না। (৮) ভি, এ, স্মিথ মনে করেন, কাম্বোজ হয় তিব্বত, না হয় হিন্দুকুশের পর্ব্বতমালার ভিতর কোনও এক স্থানে অবস্থিত ছিল। (৯) এবং তাহাদের ভাষা ছিল আইরেনিয়ান। ম্যাকক্রিণ্ডেলের মতে কাম্বোজ ছিল আফগানিস্থানেরই নাম; এবং হিউয়েন সংএর কাফ্রী (কম্বু) ছিল কাম্বোজ। (Me. Crindle, Alexander's Invasion, p. 38) মিঃ আর, ডি, ব্যানার্জ্জির মতে কম্বোজ বা কম্বোডিয়া সুমাত্রার পূর্ব্ব-প্রান্তে অবস্থিত ছিল। (১০) কিন্তু তাঁহার এই কাম্বোজ গান্ধারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমাদের মহাজনপদ কাম্বোজ নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ডাঃ ডি, আর, ভাণ্ডারকর বলেন, "কাম্বোজ যে কোথায় ছিল তাহা নির্দ্দেশ করা ভারি কঠিন। কাহারও কাহারও মতে কাম্বোজেরা উত্তর হিমালয়ের একটি জাতি ছিল, আবার কাহারও কাহারও মতে তাহারা ছিল তিব্বতীয় জাতি। কিন্তু আমাদের মতে তাহারা সম্ভবতঃ সিন্ধুনদের উত্তর পশ্চিমে বাস করিত এবং পারস্য শিলালিপিতে যে কাম্বোজিয় নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহারাই সম্ভবতঃ কাম্বোজ। কিন্তু কোথায় যে তাহাদের রাজধানী ছিল তাহা জানা যায় না।" (১১) বৈদিক সূচিপত্রেও (Index) ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতেরই সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেও আমরা দেখিতে পাই যে কাম্বোজেরা সিন্ধুনদের উত্তর পশ্চিম তীরেই বাস করিত এবং প্রাচীন পারসীক শিলালিপিতে যে কম্বুজিয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহারাই কাম্বোজ। স্যার চার্লস ইলিয়টের মতে, কাম্বোজেরা ছিল সম্ভবতঃ তিব্বতীয় জাতি। (১২) তাঁহার Hinduism & Buddhism নামক গ্রন্থের আর একটা খণ্ডে তিনি বলিয়াছেন, কাম্বোজেরা কোন্ জাতি ছিল তাহা নিশ্চয়

(২) মহাভারত—অধ্যায় ৫১.৩।

(৩) Ibid, Chap. 48, 19.

(৪) Dr. D. R. Bhandarkar, Carmichael Lectures 1918, pp. 6-7.

(৫) Buddhist India, p, 28.

(৬) S. K Aiyangar, Ancient India, p. 7.

(৭) p. 56.

(৮) Paramattha dipani on the Petavatthu, P.T.S. p, 113. Vide also my the Buddist Conception of spirits, p. 81, foll.

(৯) Early History of India p. 184.

(১০) Vangalar Ithasa, Vol. 1. p. 95

(১১) D. R. Bhandarkar, Carmichael Lectures 1918, pp. 54-55.

(১২) Hinduism & Buddhism, Vol. 1, p. 268.

করিয়া বলা কঠিন। তবে তাহারা সম্ভবতঃ তিব্বত অথবা উহার সীমান্ত প্রদেশেরই অধিবাসী ছিল। মিঃ ফুসের তাঁহার Iconographic Bauddhique নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, নেপালের ইতিহাসে কাম্বোজ দেশ তিব্বতকে বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়াছে। (১৩) স্যার হেন্‌রি য়িয়ারসনের মতে, কাম্বোজেরা উত্তর পশ্চিম ভারতের একটি জাতি ছিল এবং তাহাদের নামের উল্লেখ সংস্কৃত সাহিত্যের বহুস্থানে পাওয়া যায়. (১৪) ক্যিসি এবং সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী কম্বোজ—ইহারা উভয়েই একজাতি এরূপ মনে করা সম্ভবতঃ সঙ্গত হইবে না। (১৫) ডাঃ রায় চৌধুরী মহাভারত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে. রাজপুর নামক একটি স্থান কাম্বোজদের বাসভূমি ছিল। (১৬) কাম্বোজের সহিত গান্ধারের যোগাযোগ এবং সম্পর্কের দিক দিয়া আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে, এই রাজপুর এবং হিউয়েন সং এর রাজপুর একই স্থান (Watters, Yuan Chwang, Vol. 1, p. 284) এবং উহা পানচ্ এর দক্ষিণে অথবা দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। (Political History of India from the accession of Parikshit to the coronation of Bimbisara, p. 77.) রাজপুর এবং কাম্বোজ জনপদের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে আমরা ডাঃ রায় চৌধুরীর সহিত সম্পূর্ণ একমত। পাণিনি ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোক। সুতরাং কাম্বোজদের রীতিনীতি এবং পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁহার যে জ্ঞান, তাহা নির্ভুল বলিয়াই মনে হয়। পাণিনির মতে কাম্বোজেরা তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করিত। কাম্বোজেরা যে মাথা মুড়াইতে অভ্যস্ত ছিল তাহা রঘুনন্দনও হরিবংশ হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এই পদটির উল্লেখ অধ্যাপক মোক্ষ মূলারের গ্রন্থের ভিতরেও পাওয়া যায়। শকেরা (Scythians) তাহাদের মাথার অর্দ্ধেক মুণ্ডন করিত, যবনেরা (Greeks) এবং কাম্বোজেরা সমস্তটা মাথাই কামাইয়া ফেলিত। (১৭)

পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে, বুদ্ধের আবির্ভাবের সময়ে যে ১৬টি মহাজনপদ ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠত্বের খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, কাম্বোজ তাহাদেরই একটি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুত্ত পিটকের অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে দেখা যায় ১৬টি মহাজনপদের একটি জনপদ। নিকায়ের মতে বুদ্ধের আটটি উপদেশ প্রতিপালনের দ্বারা একজন লোক যে পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারে, তাহা তুলনায় এই সকল মহাজনপদের যে কোনো একটির উপর রাজত্ব করা অপেক্ষা অন্ততঃ ১৬ গুণ বেশী বাঞ্ছনীয়। (১৮)

হরিবংশে আমরা দেখিতে পাই যে, কাম্বোজেরা প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল, সগর তাহাদিগকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করে (Harivamsa, 14.)। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৪৩ এবং ৪৪ শ্লোকেও আছে যে, কাম্বোজ, শক, যবন প্রভৃতি জাতি প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণকে অগ্রাহ্য করিয়া পবিত্র রীতি নীতি উল্লঙ্ঘন করিয়া চলার অপরাধে তাহারা ধীরে ধীরে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় যে, কাম্বোজ ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের ক্ষত্রিয়েরা কৃষি, বাণিজ্য এবং শস্ত্র চালনার দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কাম্বোজেরা ক্ষত্রিয় ছিল। (১৯)

কাম্বোজের বীরেরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সব সময় বীরত্বের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সুমঙ্গল বিলাসিনীতে কাম্বোজ বীরদের জন্মভূমিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (২০) মহাভারত কাম্বোজ বীরদের বীরত্বের উদাহরণে পরিপূর্ণ। সভা পর্ব্বে আছে কাম্বোজ রাজ যুধিষ্ঠিরকে তিনশত অশ্ব উপহার প্রদান করিয়াছিলেন—এই সব অশ্বের দেহের বর্ণ ছিল বিচিত্র, তাহারা নানারূপ রেখাধারা পরিশোভিত ছিল, এবং তাহাদের নাসিকা ছিল শুক পক্ষীর নাসিকার ন্যায় সুন্দর। (২১) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কাম্বোজদের ক্ষিপ্রগতি এবং শক্তিশালী অশ্বগুলি বিশেষ কাজে আসিয়াছিল। পঞ্চম দিনের যুদ্ধের যে বিবরণ মহাভারতে আছে, তাহাতে পাওয়া যায়, অর্জ্জুন যখন কৌরব সৈন্যকে অত্যন্ত উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং সৈন্যেরা যখন ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন কাম্বোজ দেশাগত দ্রুতগামী অশ্বগুলি কৌরবদের বিশেষ উপকারে আসিয়াছিল। (২২) অষ্টম দিনের যুদ্ধে যে বিপুল হয়সাদী লইয়া অর্জ্জুন পুত্র নাগবীর ইরাবণ কৌরব সৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সৈন্য কম্বোজ দেশের অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। (২৩) দ্রোণ পর্ব্বে আছে, নকুল যে অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা কম্বোজ দেশীয় অশ্বের বংশ হইতে উদ্ভূত। এই অশ্বের আকৃতি ছিল অত্যন্ত মনোহর এবং উহা শুক পক্ষীর পালকের দ্বারা পরিশোভিত ছিল। (২৪) চেদীরাজ ধৃষ্টকেতুর অশ্বও ছিল এই কম্বোজ দেশীয় এবং তাহার গাত্রের বর্ণও ছিল বিচিত্র। (২৫) যুদ্ধ ক্ষেত্রের আরও

(১৩) p 134

(১৪) J. R. A. S. 1911, p. 801.

(১৫) The Cambridge History of India, Ancient India, p 334, f n.

(১৬) Mahabharata, vii, 4-5.

(১৭) A History of Sanskrit Literature by Max Muller (Published by Panini office) p. 28,

(১৮) Anguthara Nikaya, Val. 1, p. 213, Ibid, Vol. iv, pp. 252-256 etc.

(১৯) Arthasastra, Translated by Shama Shastri, p. 455.

(২০) Vol I, p. 124.

(২১) Mahabharata, Sabhaparva, chap, 51, 13.

(২২) Mahabharata, Bhismaparva, chap 71. 13.

(২৩) Ibid, chap, 90, 3.

(২৪) Ibid, Dronaparva, chap. 22, 7.

(২৫) Ibid, chap 22, 22-23

ওমর খৈয়াম্

অনেক রাজপুত্র এই কম্বোজ দেশীয় অশ্বেরই আরোহী ছিলেন। (২৬) সৌপ্তিক পর্ব্বে আছে যে শ্রীকৃষ্ণ যে রথে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহার ঘোড়া কাম্বোজের উৎকৃষ্ট অশ্ববংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং তাহার গলদেশে সুবর্ণমাল্য লম্বিত ছিল। (২৭)

জৈন উত্তরাধ্যয়নসূত্রে আছে যে, সুশিক্ষিত কাম্বোজীয় অশ্বের তুল্য উৎকৃষ্ট অশ্ব আর কোথাও পাওয়া যায় না, কোনো রকমের শব্দে তাহারা ভীত হয় না। (২৮) চম্পেয় জাতকে পাওয়া যায়, নাগরাজ কাশীর রাজাকে নাগভবনে গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজা সুশিক্ষিত কাম্বোজ অশ্বকে রথে সংযোজিত করিবার জন্য আদেশ দেন। (২৯) হয়সলা গৌরবের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুবর্দ্ধন যিনি পরবর্ত্তীকালে মহীশূরের রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহারও কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব ছিল এবং তাঁহার এই অশ্বের পদ-প্রহারে পৃথিবী কম্পিত হইত। (৩০) মুঙ্গেরের নিকট দেবপাল-দেবের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার বিজয় প্রসঙ্গে কাম্বোজ দেশীয় অশ্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (৩১) মহাবস্তু মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের একখানি গ্রন্থ। এই গ্রন্থের এক স্থানে পাওয়া যায় যে, রাজা নাগদের বাসস্থান পরিদর্শনের জন্য তাঁহার মন্ত্রীদিগকে সুসজ্জিত রাজ-পথে কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব সংযোগ করিতে আদেশ প্রদান করিতেছেন। (৩২) প্রাচীন সাহিত্যের এই উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে এ কথা বেশ স্পষ্ট রূপেই বুঝা যায় যে, কাম্বোজ দেশী অশ্ব অতি উৎকৃষ্ট এবং অত্যন্ত দ্রুতগামী ছিল। সকলে তাহাদিগকে অতি মাত্রায় পছন্দও করিত। তাহা ছাড়া কোনও রকমের শব্দেই তাহারা ভীত হইত না বলিয়া ইতিপূর্ব্বে যে কথাটা বলা হইয়াছে তাহার ভিতর অত্যুক্তি নাই। কুনাল জাতকের অর্থকথায় কাম্বোজদের বন্য অশ্ব ধরার চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়। কাম্বোজেরা প্রথমে খানিকটা স্থান বেড়ার দ্বারা ঘিরিয়া একটি খোয়াড়ের মত প্রস্তুত করিত। এই ঘেরা স্থানটিতে যাতায়াতের দ্বার থাকিত কেবলমাত্র একটি। তাহার পর জলীয় উদ্ভিজ্জে তাহারা মধু মাখাইয়া রাখিত। অশ্বেরা জলের অন্বেষণে আসিয়া মধুর গন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এই সব ঘাস ভোজন করিতে করিতে ঘেরা স্থানটির ভিতর প্রবেশ করিত। তাহার পর ঘাস-ভোজনরত সেই সব বন্য অশ্বকেই ধরিয়া কাম্বোজেরা পোষ মানাইয়া লইত। (Jtaka, vol. V, p. 446)

(২৬) Ibid, chap. 22, 42.
(২৭) Ibid, Sauptikaparva chap. 13, 1-2.
(২৮) Jaina Sutra, S. B, E. pt. ii, p. 47.
(২৯) Jataka, (Fausboll) Vol. iv, p. 464.
(৩০) S. K. Acyangar, Ancient India, p. 236.
(৩১) R. D. Banerjee, Vangalar Itihasa, pp. 179—180.
(৩২) p. 185.

কালিদাসের রঘুবংশে আছে, রঘু বংশু বা অক্ষাম নদীর তীরে হূনদিগকে পরাজিত করিয়া কাম্বোজদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কাম্বোজরা রঘুর বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার সম্মুখে তেমনি ভাবে নত হইয়াছিল, যেমন প্লাবে তাহাদের আখরোট বৃক্ষগুলি রঘুর হস্তী সমূহের পরাক্রমে নত হইয়াছিল। এই বৃক্ষগুলিতে রঘু তাঁহার হস্তী সমূহ বন্ধন করিয়াছিলেন। কাম্বোজেরা অপরিমিত অর্থ এবং উৎকৃষ্ট অশ্ব রঘুকে কর-স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন।' কিন্তু তাহাতেও কোশল রাজের মনের ভিতর গর্ব্বের উদ্রেক হয় নাই। (৩৩) কালিদাস লিখিয়াছেন, কাম্বোজদিগকে পরাজিত করিয়া রঘু হিমালয়ে আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যখন হূনদিগকে অক্ষাম নদীর তীরে পরাজিত করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে-ছিলেন তখনই এই কাম্বোজদের জয় করেন।

মহাভারতে ক্ষত্রিয় জাতিদের ভিতর কাম্বোজদের স্থান বেশ উচ্চেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভৌগোলিক নির্দ্দেশ অনুসারে কাম্বোজেরা উত্তর ভারতের অধিবাসী (Mahabharata, Bhismaparva, chap. 9) ; কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে তাহারা দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের সাহস, বিশেষতঃ তাহাদের রাজা সুদক্ষিণের রণনৈপুণ্য এই যুদ্ধে কুরুপক্ষের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের মহারথীদের ভিতর সুদক্ষিণও ছিলেন একজন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কাম্বোজ এবং পশ্চিম সীমান্তের অন্যান্য জাতির সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণের জন্য দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন (৩৪) কিন্তু পাণ্ডবেরা তাহাদের সাহায্য লাভে সমর্থ হন নাই, তাহারা দুর্য্যোধনের সঙ্গেই যোগদান করিয়া-ছিল। ইহার কারণ সম্ভবতঃ গান্ধারের প্রভাব ও প্রতিপত্তি। গান্ধাররাজ দুর্য্যোধনের মাতামহ ছিলেন এবং গান্ধার যুবরাজ শকুনী ছিলেন কুরু-পাণ্ডব বিবাদের একজন প্রধান অভিনেতা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে দুর্য্যোধন উলুকের মুখে পাণ্ডবদের কাছে যে গর্ব্বোদ্ধত বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এই কথাই বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, কাম্বোজ প্রভৃতি উত্তর অঞ্চলের মহা-রথীরা এবং অন্যান্য যোদ্ধারা তাঁহার পক্ষে সমবেত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সাহস পাণ্ডবদের আছে কি না তাহা জানিতে চান। (৩৫) এই বার্ত্তার উপসংহারে দুর্য্যোধন মহা মহারথীদের সহিত কাম্বোজের নাম উল্লেখ করিয়া কাম্বোজদের একটি বিশেষ উচ্চ স্থানেই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহার অপরিমিত সৈন্য একটা বিরাট সমুদ্রবৎ—"ভীষণ ইহার দুর্লঙ্ঘ্য স্রোত, দ্রোণ মহাপরাক্রান্ত কুম্ভীর, কর্ণ শল্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য মৎস্য এবং কাম্বোজ ইহার অগ্নিগত মুখ। (৩৬)

(৩৩) Raghuvamsa, hap IV, Verses 69-70
(৩৪) Mahabharata, Udyogaparva, 18.
(৩৫) Mahabharata, Udyogaparva hap 160, 21
(৩৬) Ibid, chap, 160, 40.

কৌরব পক্ষের রথী মহারথীদের নামোল্লেখের সময় ভীষ্ম কাম্বোজ রাজ সুদক্ষিণের বীরত্বের প্রচুর প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার মতে কাম্বোজ রাজ সুদক্ষিণ একজন রথীর তুল্য। তিনি তোমার জয় কামনা করিয়া যুদ্ধ করিবেন। হে নৃপ-শ্রেষ্ঠ, রথীদের ভিতর এই সিংহের পরাক্রম যুদ্ধকালে যখন তোমার সাহায্যে প্রযুক্ত হইবে তখন তিনি যুদ্ধ-নিরত কৌরবদের কাছে ইন্দ্র তুল্য বলিয়া প্রতিভাত হইবেন। তাঁহার অধীনস্থ যোদ্ধারা অমিত বলে তীর নিক্ষেপ করিতে পারে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ, কাম্বোজেরা যুদ্ধক্ষেত্র পঙ্গপালের মত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে।' (৩৭)

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সংস্থাপনার সময় কাম্বোজেরা পৌরবদের নিজেদের সৈন্যের সহিত ব্যূহ-মুখ রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাভারতে আছে "পৌরব, কলিঙ্গ" কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, ক্ষেমধন্বা এবং শল্য দুর্য্যোধনের সম্মুখ ভাগ রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৩৮)

ভীষ্মের চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ যখন ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ তখন সেই যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়াইয়া পাণ্ডবদের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সঞ্জয় সেই যুদ্ধের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন—"হে নৃপশ্রেষ্ঠ, শ্রুতকর্ম্ম কাম্বোজরাজ মহারথী সুদক্ষিণকে আক্রমণ করিলেন। হে রাজেন্দ্র, সুদক্ষিণ সহদেব পুত্র সেই মহারথীকে আহত করিলেও তাঁহাকে টলাইতে পারিলেন না, তিনি মৈনাক পাহাড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর শ্রুতকর্ম্ম মহা ক্রুদ্ধ হইয়া অজস্র শরের দ্বারা মহারথী কাম্বোজরাজের দেহ বহু স্থানে বিদ্ধ করিলেন।" (৩৯) যুদ্ধের তৃতীয় দিনে ভীষ্ম যখন গরুড় ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিতে-ছিলেন, কাম্বোজেরা ব্যূহের পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল। ষষ্ঠদিনের যুদ্ধে ভীষ্ম-রচিত মকর ব্যূহতে তাহারা ভার পাইয়াছিল ব্যূহের মস্তক রক্ষার। সপ্তমদিনের যুদ্ধে সহস্র সহস্র কাম্বোজ সেনা ত্রিগর্ত্তের পার্শ্বে স্থান লাভ করিয়াছিল। (৪০)

ভীষ্মের পর দ্রোণ যখন কৌরব সৈন্য চালনার ভার গ্রহণ করিলেন, তখন কাম্বোজেরা সুদক্ষিণের নেতৃত্বে দ্রোণের পার্শ্বে উপস্থিত ছিল। (৪১)

যখন দ্রোণ গরুড় ব্যূহ-রচনা করিয়া সেনা সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, তখন কাম্বোজেরা ব্যূহের গ্রীবাদেশ রক্ষার ভার প্রাপ্ত হয়। (৪২) পুত্রের মৃত্যুর পর জয়দ্রথকেই তাহার মৃত্যুর প্রধান কারণ মনে করিয়া অর্জ্জুন যখন জয়দ্রথ নিধনে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তখন কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ সসৈন্যে তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এই স্থানে সুদক্ষিণ যদিও অর্জ্জুনের শরে নিহত হন, তথাপি তাঁহার বাণাঘাতে একবার অর্জ্জুনকে হত-চৈতন্য হইতে হইয়াছিল। যে কয়েকটি শ্লোকে মহাভারতে সুদক্ষিণের নিধন ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে, সে শ্লোক কয়েকটি ভারি চমৎকার। শ্লোক কয়েকটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—"তখন কাম্বোজ-রাজের পুত্র মহাবীর সুদক্ষিণ মহাবেগশালী অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া অরি নিসূদন অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর পার্থ সুদক্ষিণকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার উপর সাত বান নিক্ষেপ করিলে শর সকল বর্ম্মভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল। মহাবীর সুদক্ষিণ গাণ্ডীব প্রেরিত তীক্ষ্ণ শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া ক্রোধ ভরে প্রথমতঃ অর্জ্জুনকে কঙ্ক পাখীর পালক শোভিত দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন, এবং পরে তিন শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি পুনরায় পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সুদক্ষিণের ধনু ও রথ ধ্বজ ছেদন পুর্ব্বক তাঁহাকে দুই সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সুদক্ষিণ অর্জ্জুনের ভল্লাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এক অতি ভয়ানক ঘণ্টাযুক্ত লৌহময় শক্তি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সুদক্ষিণ নিক্ষিপ্ত মহাশক্তি প্রজ্বলিত মহাউল্কার ন্যায় মহারথ অর্জ্জুনের উপর নিপতিত হইয়া তাঁহার কলেবর বিদারণ পুর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। মহাতেজা অর্জ্জুন শক্তির আঘাতে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ব্বক সৃক্কনীলেহন করতঃ কঙ্কপত্রালঙ্কৃত নারাচ দ্বারা সুদক্ষিণকে এবং তাহার অশ্ব, ধ্বজ, ধনু ও সারথীকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপর ভূরি ভূরি অস্ত্র নিক্ষেপ পুর্ব্বক তাঁহার বক্ষ খণ্ড খণ্ড করিয়া সুতীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধনঞ্জয়ের বিশ্রম শরপ্রভাবে কাম্বোজ-রাজ তনয় সুদক্ষিণের বর্ম্ম ছিন্ন, গাত্র শিথিল, এবং মুকুটও অঙ্গদ পরিভ্রষ্ট হইল। তিনি যন্ত্রমুক্ত ধ্বজের ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিলেন। বসন্তাগমে পর্ব্বত-শিখর-জাত সুন্দর শাখাবৃত কর্ণিকার বৃক্ষ যেমন বায়ুবেগে ভগ্ন হইয়া নিপতিত হয়, সেইরূপ কম্বোজ রাজতনয়, মহার্ঘ শয্যায় শয়ন করিতে অভ্যস্ত থাকিলেও প্রাণশূন্য হইয়া ভূমিতলে নিপাতিত হইলেন। সেই মহামূল্য ভূষণে বিভূষিত, সুবর্ণ মাল্যাকৃত, সুন্দর-দর্শন লোহিতাক্ষ সুদক্ষিণ পার্থশরে গতাসু হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিলে বোধ হইল যেন যামুমান পর্ব্বত রণস্থলে সমবস্থিত রহিয়াছে। হে মহারাজ, এইরূপে মহাবীর শ্রুতায়ুধ এবং কাম্বোজ-রাজ-তনয় নিহত হইলে আপনার পুত্রের সমস্ত সৈন্য নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।" (৪৩)

সেই দিবসের মহাসমরেই যুধিষ্ঠিরের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া সাত্যকি

(৩৭) Udyogaparvam, chap. 165, 1-3.

(৩৮) Mahabharata, Bhismaparua, chap. 17, 26-7

(৩৯) Mahabharata Bhismaparva chap, 45, 66-68.

(৪০) Ibid, chap. 87, 10.

(৪১) Mahabharata, Dronaparva, chap. 7. 14.

(৪২) Dronaparva—19. 7

(৪৩) Mahabharata Dronaparva, Chap xcii, Verses 61-75.

যখন অর্জ্জুনের অনুসরণে উদ্যত হইয়াছিলেন তখন এই কাম্বোজেরাই তাঁহার পথ অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহাভারতে আছে, "যুযুধানে ভোজরাজের সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে কাম্বোজের সৈন্যদলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। সেখানে বহুবীর রথী তাঁহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। ফলে অমিতবলশালী সাত্যকি সম্মুখের দিকে আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিলেন না।" (৪৪) ইহার পর মহাভারতকার লিখিয়াছেন; "সাত্যকি হাজার হাজার কাম্বোজকে নিধন করিয়া অজেয় কাম্বোজদের ভিতর একটি বিরাট ভয়ের সৃষ্টি করিলেন।" (৪৫) অতঃপর তিনি কাম্বোজদের সৈন্য-সমুদ্রের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন। (৪৬)

তাহার পর কর্ণ যখন কুরুসৈন্যের অধ্যক্ষের পদে বৃত হইয়াছিলেন, তখনও কাম্বোজেরা তাঁহার চারিপাশে সমবেত হইয়া প্রচুর সাহস এবং বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। (৪৭) সুদক্ষিণের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাম্বোজ সৈন্যদের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। (৪৮) এই বীরের মৃত্যুর পরও কাম্বোজেরা অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে বিরত হয় নাই। (৪৯)

অবশেষে শল্য যখন ধ্বংসাবশিষ্ট কুরুসৈন্যের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন কাম্বোজেরা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি তাহাদের বিরাট সৈন্যের সমস্তই একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ তখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শল্য যে ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করিবার ভার কাম্বোজদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াই অশ্বত্থামা গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৫০)

এতদ্ব্যতীত মহাভারতের আদিপর্ব্বেও চন্দ্রবর্ম্মা নামক একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি কাম্বোজ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। (৫১)

সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, কুরুক্ষেত্রে কাম্বোজেরা বিরাট বাহিনী লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং তাহারা মহাসাহসী ক্ষত্রিয় বীরের ন্যায়ই যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। মহাভারতের পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে অর্থাৎ শান্তিপর্ব্ব, আনুশাসনিক পর্ব্ব প্রভৃতি অধ্যায়ে কাম্বোজদের রাজ্য বর্ব্বরদের দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। এইরূপে এই প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতিটি নবাগত বর্ব্বরদের দ্বারা পরাজিত হইয়া তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল।

মহাভারতের একটি অধ্যায়ে তাহাদের নাম উত্তর পথের অসভ্য জাতিদের সহিত সন্নিবিষ্ট হইতে দেখা যায়। (৫২) অনুশাসন পর্ব্বে আছে, কাম্বোজ-ব্রাহ্মণ না থাকায় কাম্বোজেরা শূদ্র জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। (৫৩) এই সব শ্লোক হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, পরবর্ত্তী কালে কাম্বোজেরা অসভ্য জাতিদের সংমিশ্রণে আর্য্য এবং ব্রাহ্মণ সভ্যতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল এবং যে সময় উপরিউক্ত পর্ব্ব দুইটি মহাভারতের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন তাহারা আর্য্য-সামাজিক পরিবেষ্টনীর বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

রামায়ণের আদিকাণ্ডের ৫৮ পর্ব্বে দেখা যায়, কাম্বোজেরা বশিষ্ঠের অনুরোধে গো-মাতা সবলা দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল। কিষ্কিন্ধ্যা ৪৩ পর্ব্বে দেখা যায়, সুগ্রীব শতদল নামক একজন বানরকে সীতার অন্বেষণে উত্তর-ভারতের কাম্বোজ ও অন্যান্য দেশে প্রেরণ করিতেছে।

বায়ু পুরাণে আছে রাজা সগর হৈহয়দিগকে নির্ধন করিয়া কাম্বোজ শক, যবন, পল্লব প্রভৃতির ধ্বংস সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সগরের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তাহারা বশিষ্ঠের আশ্রয় ভিক্ষা করে এবং রাজা সগর তাঁহার কুলগুরু বশিষ্ঠের আদেশ অনুসারে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে মস্তক মুণ্ডনের দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন। (বঙ্গবাসী সংস্করণ ৮৮ অধ্যায়) হরিবংশে দেখা যায়, ইক্ষ্বাকু-রাজ বাহু কাম্বোজ ও অন্যান্য সকলের দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হইয়া ছিলেন।

জাতকে পাওয়া যায় যে, কাম্বোজেরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ছিল এবং তাহারা আর্য্য-রীতিনীতি পরিত্যাগ করিয়া অসভ্যদের পংক্তিভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। (৫৪) ভূরিজাতকে আছে, অনার্য্য কাম্বোজদের অনেকেরই বিশ্বাস ছিল, পতঙ্গ, মক্ষিকা, সাপ, ভেক, মধুমক্ষি প্রভৃতি বধের দ্বারা মানুষ পাপমুক্ত হয় এবং ইহা যে ভ্রান্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাস তাহাতে সন্দেহ নাই। (৫৫) শাসন-বংশে দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ২৩৫ বৎসর পর মহারক্ষিত থের জনক প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন এবং কাম্বোজ ও অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধ-শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। (৫৬) এই গ্রন্থে উত্তর জীব থেরের সিংহল গমনের কথাও পাওয়া যায়। তিনি ৮ পদ নামে একজন সামণেরকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ৮ পদ সেখানে ত্রিপিটক পাঠ করেন, এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের শ্রেষ্ঠতম পদবীতে অধিষ্ঠিত হন। সেখান হইতে তিনি জম্বুদ্বীপে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, "জম্বুদ্বীপে আমি যদি ভিক্ষুকদের সহিত বিনয়-কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করি, তবে তাহা আমার পক্ষে মহা অসুখের কারণ হইবে।

---

(৪৪) Mahabharata, chap iii. 59-60
(৪৫) Mahabharata, Dronaparva, 110, 51
(৪৬) Ibid, Chap 118, 9.
(৪৭) Mahabharata, Karna Parva. Chap, 46, 15,
(৪৮) Ibid, Chap, 56.
(৪৯) Ibid, Chap, 88.
(৫০) Mahabharata, Salya Parva, Chap, 8, 25,
(৫১) Adipara, Chap 67.

(৫২) Ibid, Chap. 207, 43-44.
(৫৩) Ibid, Anusasanik-Parva. Chap. 337, 21.
(৫৪) Jataka, (Cowell) VI p. 110, fn.
(৫৫) Fausboll, Jataka Vol. VI, pp. 208 & 210.
(৫৬) Sasanavamsa (P.T.S.) p. 49.

সুতরাং ত্রিপিটক যাঁহারা বেশ ভাল ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, এমন চারিজন ভিক্ষুককে আমার সঙ্গে লইতে হইবে।" তিনি জম্বুদ্বীপে গমন করিবার সময় এইজন্য চারিজন ভিক্ষুক সঙ্গে লইয়াছিলেন। এই ভিক্ষুকের ভিতর কাম্বোজ-রাজের পুত্র তামলিন্দ থেরও ছিলেন একজন। শ্রীহংস কাম্বোজ হইতে আসিয়া রতনপুর নগর জয় করিয়াছিলেন। তিনি একদা মনে-মনে চিন্তা করিলেন, "ভিক্ষুদের স্ত্রী-পুত্র নাই, তাহারা শিশুদিগকেই লেখাপড়া শিখাইয়া প্রতিপালন করে। এইরূপেই তাহাদের পরিবার বাড়িয়া উঠে। যদি তাহারা পার্থিব বিষয় কখনও মনোযোগ দেয়, তবে তাহারা সাম্রাজ্যও জয় করিতে সক্ষম হইবে। সুতরাং আমি সমস্ত ভিক্ষুকেই নির্ধন করিব।" অতঃপর তিনি তং-ভী-লু নামক বনের মাঠে বহু মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া জ্যেয়পুর, বিজয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলের মহাথের এবং তাঁহাদের শিষ্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা সমবেত হইলে তিনি হস্তী, অশ্ব, সৈন্য প্রভৃতির দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। প্রায় তিন হাজার ভিক্ষু এই ব্যাপারে নিহত হয়। তাহা ছাড়া তিনি বহু পুস্তক ভস্মাবশেষ এবং বহু মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছিলেন। (৫৭)

সম্রাট অশোকের ১৩ সংখ্যক শিলালিপিতে দেখা যায় যে, প্রকৃত জয় অর্থাৎ ন্যায়, দয়া এবং কর্ত্তব্যের জয় ধর্ম্মাশোকের দ্বারা তাঁহার নিজের রাজ্য কাম্বোজ, গ্রীক প্রভৃতির ভিতরেই সুরু হইয়াছিল। (৫৮) প্রত্যন্ত প্রদেশে কাম্বোজ, যবন প্রভৃতির মধ্যে অশোক ধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা তাহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রচারকও প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৫৯) অশোকের ৫ম সংখ্যক শিলালিপিতে আছে যে, তিনি তাঁহার রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে কাম্বোজ, গন্ধার প্রভৃতির ভিতর নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতিষ্ঠা এবং সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। (৬০) ভি এ স্মিথ বলেন, ন্যায়, দয়া, কর্ত্তব্যানুরাগের দ্বারা যে জয় তাহাই প্রকৃত জয়। অশোক তাঁহার সাম্রাজ্যে কাম্বোজ এবং অন্যান্য জাতির ভিতর এই জয়ই লাভ করিয়াছিলেন। (৬১)

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বাংলার পাল বংশকে রাজা দেব পাল কাম্বোজদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। (৬২) কিন্তু দশম শতকের শেষ ভাগে অবস্থা একেবারে উল্টাইয়া যায়। কাম্বোজেরাই পাল রাজাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহাদের নিজেদের একজনকে বাংলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। (৬৩) দিনাজপুরে বানগড় নামে একটি স্থান আছে। এইখানে কাম্বোজ বংশের একজন রাজার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি গৌড়ের রাজা ছিলেন। সম্ভবতঃ দেবপালের রাজত্ব কালেই কাম্বোজেরা প্রথমে গৌড় জয় করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে সময় তাহারা পরাজিত হয়। (৬৪) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের মতে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগেও হিমালয় প্রদেশের কাম্বোজেরা আর একবার উত্তর বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিল এবং উত্তর বঙ্গের বর্ত্তমান অধিবাসী কোচ, মেচ, পলিয়া প্রভৃতি তাহাদেরই বংশধর। পাল বংশের নবম রাজা মহীপাল এই কাম্বোজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। পাল রাজারা ১০২৬ শতকে বাংলায় রাজত্ব করিতেন। তাহার পর সম্ভবতঃ তাঁহারা রাজ্য ভ্রষ্ট হন। ৯৭৮ বা ৯৮০ খৃষ্টাব্দে আবার কাম্বোজদিগকে পরাজিত করিয়া এই মহীপালই পিতৃ সিংহাসন উদ্ধার করিয়াছিলেন। (৬৫)

(৫৭) Sasanavamsa, (P, T. S) p, 40,

(৫৮) V. A. Smith, Asoka, p 186.

(৫৯) Ibid, p 100

(৬০) V. A. Smith, Asoka, p. 168.

(৬১) V. A. Smith, Ancient & Hindu India, p. 96.

(৬২) R. D. Banerjee, Vngalar Itihasa, p. 182.

(৬৩) V. A. Smith, Early History of India p, 399.

(৬৪) R. D. Banerjee, Vangalar Itihasa, p 184.

(৬৫) V. A. Smith, Early History of India p 399.

ভারতের সহিত আফ্রিকা ও ঈজিপ্টের প্রাচীনকালে ঘনিষ্ঠ সংশ্রবের বিশেষ ঐতিহাসিক প্রমাণ

অধ্যাপক শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ

ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার পরস্পর সান্নিধ্য হইতে উভয় দেশের মধ্যে যে স্মরণাতীত কালেই ঘনিষ্ঠ সংশ্রব সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে এই অনুমান আরও দৃঢ়তা সাধন করে। আমরা এস্থলে সেই পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানই পাঠকবর্গের গোচর করিব।

আবিসিনিয়া আফ্রিকার বিশেষ উন্নত দেশ। এই দেশে যে প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, বৌদ্ধশিল্পের সহিত তাহার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্যেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আবিসিনীয়গণ ৩৩০ খৃষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তৎপূর্ব্বে তথায় যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল, উল্লিখিত প্রাচীন শিল্প-নিদর্শনের দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে এই সংস্রবের দ্বারা পরস্পরের উপর প্রভাব প্রখ্যাপনের মূল্যবান্ ঐতিহাসিক প্রমাণই পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতের উজ্জয়িনী ও ভারুকচ্ছ এবং আফ্রিকার অক্সাম (অক্সামু) ও আলেকজেণ্ড্রিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগই বর্ত্তমান

ছিল। জলপথেই যে ভারতের প্রভাব আফ্রিকায় বিস্তারিত হয়, তাহা বিশেষ সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম :—

"The Abyssinians were converted to Christianity about 330 A. D. Before that time their strongest outside influence may have been Buddhism. James Fergusson (History of Architecture, 1, 142-43) notes that the great monolith at Axum is of Indian inspiration, "the idea Egyptian, but the details Indian. An Indian-nine storied pagoda, translated in Egyptian in the first century of the Christian era !" He notes its likeness to such Indian temples as Bodh- Gaya, and says, it represents "that curious marriage of India with Egyptian art, which we expect to find in the spot where the two people came in contact, and enlisted architecture to symbolise their commercial union. Such an alliance was to the advantage of the Hindu traders * * * * * * Ujjeni and Bharukacha, Axum and Alexandria were in close connection during the first and second centuries, and the observer of the early relations between Buddhism and Chriatianity may find along this frequented route greater evidence of mutual influence than along the relatively obstructed overland routes through Parthia to Antioch and Ephesus." "The Periplus of the Erythrean Sea" translated and edited by Wilfred H. Schoff, A. M, pp 64-65.

আবিসিনিয়াতে ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের আরও স্পষ্টতর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তথায় ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞসূত্রের অনুকরণে দীক্ষিত খ্রীষ্টানগণ গলায় নীল রেশম-সূত্র ধারণ করিয়া থাকে। উপরি উদ্ধৃত পুস্তকেই এ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

"Another survival of Hindu influence seems to be the mateb or blue silk neck cord, the badge of baptism in modern Abyssinian Christianity, which suggests, more than any Arab-custom the Zenner or sacred cord of the Brahman priest, (See references in I-G Frazer's Pansanias and Goldha Bongh, Porphyry de Ant Nymph, p 268 ; Asiatic researches, 348, Maurice, India Antiquities)" Ibid p 139.

দেশ আবিষ্কারের উদ্যম ও সাহসের জন্য পাশ্চাত্যগণ বর্ত্তমান যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা, টেঙ্গেনিকা ও নাইসা প্রভৃতি হ্রদের আবিষ্কার তাঁহাদের কৃতিত্বের প্রধান পরিচায়ক। আবিসিনিয়ায় উপনিবিষ্ট হিন্দুগণের দ্বারাই সুদূর অনৈতিহাসিক কালের অশেষ সঙ্কটের মধ্যেও এই সমস্ত হ্রদের আবিষ্কার আশ্চর্য্য কৃতিত্বের সহিত সাধিত হইয়াছিল। এই কৃতিত্বের বিষয় পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের বর্ণনায়ই স্বীকৃত হইয়াছে :—

"The Hindu traders had a firm basis to stand upon, from their intercourse with the Abyssinians through whom they must have heard of the county of Amara, which they applied to the Nyanza and with the Wanyamuezi or men of the moon, from whom they heard of the Janganiyika and Karague mountains." Ibid p 88.

হিন্দুগণ কেবল যে দেশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা নহে, বর্ত্তমান ভ্রমণকারীদের ন্যায়, তৎসম্বন্ধে বিবরণও যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানেই প্রকাশ পাইয়াছে :—

"Nothing was ever written concerning their country of the moon, as far as we know, until the Hindus, who traded with the east coast of Africa, opened commercial dealings with its people in slaves and ivory, possibly sometime prior to the birth of our Saviour, who associated with their name, men of the moon, sprang into existence the mountains of the moon." Ibid p 88.

The antiquity of Hindu trade in East Africa is asserted by Speke (Discovery of the source of the Nile, chaps I, V, X,). The Puranas described the mountains of the moon and the Nayanga lakes, and mentioned as the source of the Nile, "the country of Amara", which is the native name of the district north of Virtoria Nyanza. A map based on this description drawn by Lieut. Wilfred was printed in the Asiatic Researches Vol, III 1801. Ibid pp 87-88.

হিন্দুগণ অপরের কথার উপর নির্ভর করিয়া আবিষ্কার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। তাঁহারা স্বয়ং আবিষ্কার করিয়াই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা নীল-নদের উৎপত্তিস্থলও আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই প্রথম এই বার্ত্তা ইজিপ্টের পুরোহিত-দিগের নিকট প্রচার করেন। পুরোহিতেরা কিন্তু আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিজেরাই গ্রহণ করিয়া বৃথা আস্ফালন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। নীল-নদের আবিষ্কর্ত্তা স্পিক (Speke) সাহেব ইজিপ্টের পুরোহিত-দিগের এই বৃথা গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া দিয়া, হিন্দুদিগকেই নীল-নদের আবিষ্কারকের প্রাপ্য ন্যায্য প্রশংসা প্রদান করিয়াছেন :—

"All our previous information," says Speke, "concerning the hydrography of these regions originated with the ancient Hindus, who told it to the priests of the Nile; and all those busy Egyptian Geographers who disseminated their knowledge with a view to be famous for their longsightedness in solving the mystery which enshrouded the source of their holy river, were so many hypothetical humbugs. The Hindu traders had a firm basis to stand upon through their intercourse with the Abyssinians "Periplus of the Erythrean Sea," Translated and Edited by Wilfred H. Schoff, A M. p 230.

"নীল" নামটী সংস্কৃত ভাষারই শব্দ, সুতরাং নীল-নদের নাম পর্য্যন্ত যে হিন্দুদিগেরই প্রদত্ত, তাহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। পেরিপ্লাসের টীকাকারের মন্তব্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নীল-নদের উৎপত্তি-স্থান ও নাম প্রভৃতি সম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণের সাহায্য লইয়া তবেই পাশ্চাত্য আবিষ্কারক স্পিক্ সাহেব আপনার আবিষ্কার কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। পুরাণে নীল নদ "কৃষ্ণ" নামে অভিহিত হইয়াছে এবং ইহার উৎপত্তি স্থানের প্রদেশ "চন্দ্রিস্থান" অর্থাৎ চন্দ্রের দেশ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এস্থলে টীকাকারের মন্তব্য উদ্ধৃত হইল :—

"Significant also is the fact that Lieutenant Speke, when planning his discovery of the source of the Nile, secured his best information from a map reconstructed out of the Puranas (Journal pp 27, 77, 216, Wilfred, in Asiatic Researches, III). It traced the course of the river, the "Great Krishna" through Kusha-dvipa, from a great lake in Chandristhan," "Country of the moon," which it gave the correct position in relation to the Zanzibar island." Ibid p 230.

ভারতের সহিত আফ্রিকার ঘনিষ্ঠ যোগের ইহাও অন্যতর বিশিষ্ট প্রমাণ যে, মধ্যযুগের পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ পূর্ব্ব-আফ্রিকাকে "ইণ্ডিজের" অন্তর বিভাগরূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মার্কো পোলো (Marco Polo), আবিবসিনিয়াকে ভারতেরই মধ্যভাগে স্থাপন করিয়াছেন :—

"European geographers in mediaeval times Classified East Africa as one of the Indies and Marco Polo located Abyssinia in "middle India." Ibid p 92.

আফ্রিকার পূর্ব্বদিকের প্রধান দ্বীপ সকলের নামের মূল লক্ষ্য করিলেও ভারতের দ্বারা ইহাদিগের নামকরণেরই আভাস পাওয়া যায়। "শকোট্রা" আফ্রিকার একটী প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা "সুখাধার" নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া, পাশ্চাত্যদিগের দ্বারা বিবেচিত হইয়াছে। এই নামের প্রাচীনত্ব ইঁহারা স্পষ্টরূপেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই দ্বীপটী ভারত ও আরবের মধ্যে সমুদ্র-যাত্রায় বিশ্রামস্থল রূপে ব্যবহৃত হইত। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের মন্তব্য এখানে দেওয়া গেল :—

"Both forms (Diokorida, Socotra) are corruption of the Sanskrit Dipa Sukhadara, meaning "Island abode of Bliss," a stopping place for the voyagers between India and Arabia. How ancient the Hindu name may be is unknown, the sense possibly antedates the language in which it is expressed." Ibid p 133.

"মাডাগাস্কার" দ্বীপের প্রাচীন নামের অর্থ পাশ্চাত্য ভৌগোলিকদিগের বিবরণে "চন্দ্রের দ্বীপ" (Island of the moon *) বলিয়া প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহাতেও আমরা ভারতীয় প্রাচীন নামের আভাসই যেন প্রাপ্ত হই। ভারতবর্ষের নয়টী উপদ্বীপের উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায়। যথা :—

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যা গান্ধর্ব্বস্তথ বারুণঃ॥"

বিশ্বকোষধৃত "বিষ্ণুপুরাণ"।

দেখা যায়, এই সমস্তের মধ্যে একটীর নাম "সৌম্য"। সৌম্য সোম শব্দ হইতে উৎপন্ন। সোম অর্থে চন্দ্র বুঝায়। "সৌম্যদ্বীপ" সুতরাং সোম বা চন্দ্র সম্বন্ধীয় দ্বীপ অর্থাৎ ইংরেজী Island of the moon অর্থই প্রকাশ করে। "মাডাগাস্কারকেই", তাহা হইলে, আমরা পুরাণের "সৌম্যদ্বীপ" বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রাগুক্ত নবদ্বীপের মধ্যে "তাম্রবর্ণ" বর্ত্তমান সিংহলেরই নাম। "নাগদ্বীপ" সিংহলের উত্তরাংশেরই প্রাচীন নাম। (বিশ্বকোষ, প্রাচীন দাক্ষিণাত্যের মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। ভারত সাগরের দ্বীপের মধ্যে প্রাগুক্ত দ্বীপদ্বয় ব্যতীত লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ ছাড়া ভারতাধিকার-ভুক্ত দ্বীপ আর দৃষ্ট হয় না। অথচ আফ্রিকার পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী দ্বীপ সকল ভারতসাগরান্তর্গত বলিয়াই যখন ভূগোলে নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তখন আফ্রিকার প্রধান দ্বীপ সকলের মধ্যে কোন কোন দ্বীপ যে পুরাণোক্ত নবদ্বীপের দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। মাডাগাস্কার দ্বীপটীকে পুরাণোক্ত "সৌম্যদ্বীপ" বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে, পূর্ব্ব-আফ্রিকার আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান সম্বন্ধেই আমরা সুব্যাখ্যা পাইতে পারি। সোমালিল্যাণ্ড (Somali-land) নামটীর

* See "The story of Geographical Discovery" (Library of useful stories) by Joseph Jacob's p 99. "He then turned to Sofala and obtained news of the Island of the moon, now known as Madagascar."

সহিত এই সৌম্য দ্বীপেরই সম্বন্ধ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। "সোমালি" নামটীর মূলে 'সোম' নামেরই রূপ ও অর্থ বর্ত্তমান ছিল বলিয়া আমরা মনে করি। ইহা হইতে নীল-নদের উৎপত্তি-প্রদেশের "চন্দ্রিস্থান", তথাকার লোকের "চন্দ্রের লোক" (men of the moon) বলিয়া যে উল্লেখ আমরা পাইয়াছি, এবং চন্দ্রের পর্ব্বত (mountain of the Moon) বলিয়া পর্ব্বত-শ্রেণীর উল্লেখ পাইয়াছি, তাহারও সুব্যাখ্যা পাওয়া যাইতে পারে। "সৌম্যদ্বীপ" সম্ভবতঃ ভারতের চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগেরই আবিষ্কৃত এবং তাঁহাদের দ্বারাই উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। তাহাতেই তাঁহাদের বংশ-প্রবর্ত্তক চন্দ্রের নামে ইহার নামকরণ হইয়াছিল। এই দ্বীপ হইতেই তাঁহারা সম্ভবতঃ ক্রমে ক্রমে আফ্রিকার উপকূল-প্রদেশে ও অভ্যন্তর ভাগেও যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং চন্দ্র নামের দ্বারাই ঐ সমস্ত স্থানের নামকরণ করেন। দক্ষিণ-ভারতের পাণ্ড্যরাজ্যের সহিত চন্দ্রবংশীয় পাণ্ড্যসন্তানদিগের যোগ বিশেষ রূপেই স্পষ্টীকৃত। ইহাঁদের দ্বারা এই সমস্ত উপনিবেশ স্থাপন অসম্ভাবিত বোধ হয় না।

পক্ষান্তরে ঈজিপ্টের সহিত সূর্য্যবংশীয়দিগের যোগও অসম্ভাবিত নহে। ঈজিপ্টের রাজাদিগের "রামেসেস্" নামে যেমন সূর্য্যবংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা রামচন্দ্রেরই রূপান্তর লক্ষিত হয়, তেমনই ঈজিপ্টের সংলগ্ন নিউবিয়া দেশের প্রথম রাজ-নামেও রাম-তনয় কুশ নামের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট রূপেই লক্ষিত হয়। নিউবিয়া রাজ্য-সম্বন্ধে একটী প্রামাণিক ইংরাজী গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে :—

"Under the Pharaohs the country was known as the kingdom of Cush," (Beeton's Dictionary of universal Information,), শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা বিজয়ের পর আর্য্যেরা আরও দূরতর দেশ বিজয়ে সমুৎসাহিত হইয়াছিলেন, ইহা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। লঙ্কার পশ্চাতে দূরতর দেশ আফ্রিকাই হয়। সুতরাং রামচন্দ্রের বংশধরেরা বিজয়াভিযান লইয়া ঈজিপ্টে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাতে অসম্ভাব্য কিছুই দেখা যায় না। ইহা হইতে রামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়েই যে আফ্রিকার সহিত সংস্রবের প্রকৃত সূত্র পাওয়া যায়, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণই দেখা যাইতেছে।

ধর্ম্মের বিকৃতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় এম-এ

সেদিন দিল্লীতে যে দাঙ্গা হইয়া গেল, তাহাতে কেবল যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা সাময়িক বিরোধ প্রকাশ পাইল তাহা নহে। উভয় জাতির মধ্যে মনে-মনে যে একটা দাঙ্গা সর্ব্বদাই চলিতেছে, দিল্লীর দাঙ্গা তাহারই একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বাংলাদেশে এ প্রকার দাঙ্গা দেখা যায় না সত্য, কিন্তু এ দাঙ্গার অভাবের কারণ পরস্পরের মধ্যে একান্ত ভ্রাতৃভাব নহে, ইহার কারণ উভয়ের শক্তি ও সাহসের অভাব, শারীরিক কষ্টের ভয় এবং যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তির অভাব। যদি দুই জাতির মধ্যে বাংলায় নিতান্ত ভ্রাতৃভাব থাকিত, তাহা হইলে চাকরীর ভাগের জন্য ব্যবস্থাপক-সভায় এত প্রশ্ন এবং খবরের কাগজে এত চিঠি বাহির হইত না এবং প্যাক্টের প্রয়োজন বাংলায়ই প্রথম হইত না। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পরস্পর বিরোধের গোড়ায় তাহাদের বিভিন্ন ধর্ম্ম।

গোঁড়া-খৃষ্টানরা মনে করেন, যাঁহারা খৃষ্টান নন, তাঁহারা চিরদিন নরকে বাস করিবেন। তাই তাঁহারা অখৃষ্টান জাতিদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ব্যস্ত। প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মের লোকের ধারণাই এইরূপ এবং সেই জন্যই প্রত্যেক ধর্ম্মের মিশনারীরা—যাঁহারা ধর্ম্মের রক্ষয়িতা বলিয়া নিজদিগকে মনে করেন তাঁহারা সকলেই পর-ধর্ম্মের লোককে নিজের ধর্ম্মে আনিতে চান। মিশনারীরা এই প্রকারে স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রচার করেন এবং প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে অন্য সমস্ত ধর্ম্মকে কুধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত করেন। হিন্দুধর্ম্মে মিশনারী নাই, কিন্তু হিন্দু পুরোহিত বা পণ্ডিতেরা এই প্রকার কথাই বিশেষ করিয়া প্রচার করেন। ভারতে অধুনা যে সব সমাজ হইয়াছে, তাহারাও প্রাচীন সমাজেরই অনুকরণ করিয়া নিজ নিজ মহিমা প্রচারে ব্যস্ত।

কোন ধর্ম্ম বড়, কোন ধর্ম্ম ছোট, তাহা বলা সহজ নয়। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্; আমরা তাহার কি বুঝিব? কিন্তু এ কথা সহজেই বুঝিতে পারি যে, সাধারণ কাজে অন্যের উপরে নিজের প্রাধান্য দেখাইতে গেলে যেমন একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, ধর্ম্মের বেলায়ও তেমনই। নিজ নিজ জিনিষের প্রাধান্য প্রমাণ করিতে যাইয়া যেমন দোকানদারদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও শেষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়, ধর্ম্মসমূহের মধ্যেও তেমনি।

ধর্ম্মের প্রচার অর্থাৎ প্রাধান্য-প্রচার যে মানব-সমাজের পক্ষে কত অহিতকর, তাহা দুই এক কথায় বলা অসম্ভব। এই প্রচার হইতেই হিন্দু শেখে, মুসলমান যবন, অস্পৃশ্য। মুসলমান শেখে হিন্দু অপবিত্র, কাফের; খৃষ্টান ভাবে সে ধর্ম্মের অমৃত পান করিতেছে এবং আর সকলেই শয়তানদত্ত ক্লেদ-ভোজী। এই প্রচার হইতেই ব্রাহ্ম-সমাজ ও আর্য্য-সমাজ ভাবিতে শেখেন, তাঁহারা ভারতের পাপী-তাপী-দিগের উদ্ধারের জন্য একটা মিশন লইয়া ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহারা অনেকেই কেবল আত্মার মঙ্গলের জন্যই ব্যস্ত; দেহ যদি আহার অভাবে লয় পাইবারও উপক্রম হয়, তথাপি ইহারা তাহার দিকে মনোযোগ না দিয়া কেবল আত্মার উদ্ধারের জন্যই কর্ম্মরত থাকেন।

এই উদ্ধার করিবার ক্ষমতার অহঙ্কারই সব ধর্ম্মের সার শুকাইয়া দেয়। প্রচারকদিগের অহঙ্কার সমাজস্থ অন্য লোকে সংক্রমিত হয়। পরিণামে ধর্ম্ম হয় অহঙ্কারের ধর্ম্ম, সমাজ হয় গর্ব্বিত লোকের সমাজ। সমাজের এই দুরবস্থা দূর করিবার জন্য মোল্লা, মুন্সী, মিশনারী, প্রচারক, পুরোহিত, পণ্ডিতদিগের কার্য্যকলাপ বন্ধ করিয়া দেওয়াই আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় মনে হয়। কিন্তু তাহা

সম্ভব নয় বলিয়া তাহাদের মতিগতি বদলাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা সঙ্গত। ইঁহারা আত্মার উদ্ধারের স্পর্দ্ধা করিতে যাইয়া, মানুষকে বিগড়াইয়া দেন। রাম যে রহিমকে, ও রহিম যে রামকে ভালবাসিতে পারে না, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা উভয়েই এই শিক্ষা পাইয়াছে যে, পরের ধর্ম্ম মাত্রই কু-ধর্ম্ম। এই ধারণার জন্য পরিশেষে তথাকথিত ধর্ম্ম-সংরক্ষয়িতারা দায়ী নন কি?

সমাজ-বিশেষের উপর ধর্ম্ম যে কুফল প্রসব করিয়াছে, তাহা দেখান হইল। এখন ব্যক্তি বিশেষের উপর ধর্ম্মের অনিষ্টের কথা বলিব।

ব্যক্তি-বিশেষের উপর ধর্ম্ম যে অনিষ্ট করে, তাহা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর। (১) অহঙ্কারের সৃষ্টি। (২) সঙ্কীর্ণতার সৃষ্টি। উভয়েরই ফল পরের প্রতি ঘৃণা।

(১) অনেক হিন্দু যখন বাড়ীতে খুব আড়ম্বর করিয়া পূজা-পার্ব্বণ করেন বা দ্বারকা, কেদারনাথ, সেতুবন্ধ, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহাদের কতটুকু ধর্ম্ম হয় সে কথা বলা শক্ত, কিন্তু তাঁহাদের যে বিশ্বাস হয় যে ধর্ম্ম কিছু নিশ্চয়ই উপার্জ্জিত হইয়াছে, সে কথা বলা শক্ত নয়; তাঁহাদের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলিয়াই তাহা প্রতীত হয়। এই বিশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে যাহারা এই সকল তীর্থ ভ্রমণ করে নাই, তাহারা যে নিতান্ত 'গরীব-বেচারা' এ জ্ঞানটাও বেশ হয়। মুসলমানের মক্কা-ভ্রমণ সম্বন্ধেও তাই। তাঁহার আবার নিয়ম এই যে, তিনি মক্কা-ভ্রমণ করিলে একটা উপাধিও পান, তিনি হন হাজী। যাঁহারা সমাজে বা গীর্জ্জায় যাতায়াত করেন, তাঁহাদের মধ্যেও যে এই অহঙ্কারটা কম তাহা নহে। তাঁহাদের এই গুণের জন্য তাঁহারা সম্মান প্রত্যাশা করেন, এবং না পাইলে প্রচারও করেন।

এই প্রকারে লক্ষপতি যেমন তাঁহার লক্ষের দাবীতে সমাজে recognition চান ও অহঙ্কার করেন, ধার্ম্মিকও তেমনি তাঁহার ধর্ম্ম-ধনের জোরে সাধারণ মানুষ হইতে উচ্চ আসন চান। ধর্ম্ম এই প্রকারে ভগবানকে ছাড়িয়া ভগবানের দোহাই-এ পরিণত হইয়াছে, আর ধার্ম্মিক মধ্যযুগের রোমের পোপের মত ভগবানের কাছারীর চাপরাশধারী বেয়াদব পেয়াদা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ধর্ম্ম বাহিরের খোসায় পরিণত হইয়া সবাইকে জ্বালাতন করিতেছে, ভিতরের রসের খোঁজ কেউ পাইতেছে না, কেউ তার স্বাদের আনন্দ পাইতেছে না।

(২) সঙ্কীর্ণতার সৃষ্টি এই ধরণের ধর্ম্ম-চর্চ্চার দ্বিতীয় কুফল। প্রথমতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তি, বিশেষতঃ প্রচারক, মিশনারী প্রভৃতি, বুঝিতেই পারেন না যে তাঁহার ধর্ম্ম সাধন ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম্ম-সাধনে জীবন উন্নত হইতে পারে। তাহা বুঝিতে পারিলে, তিনি নিজের দলের জন্য লোক খুঁজিয়া না বেড়াইয়া সকলকে নিজ-নিজ ধর্ম্ম সাধন করিতে বলিতেন। বর্ত্তমান সভ্য-সমাজের বিভিন্ন ধর্ম্মের নৃশংস ভাব প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে, নরবলি এখন আর চলিত নাই, জীববলির অন্যায্যতা সম্বন্ধেও লোকে ভাবিতে শিখিয়াছে। এখন প্রায় সব ধর্ম্মই সুমার্জ্জিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তরে টানাটানি করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। যাহা হউক, নিজ-ধর্ম্মের সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ ধারণা ভিন্ন তাঁহাদের আরও একটা সঙ্কীর্ণতার কারণ তাঁহাদের নীতি-জ্ঞান। ধার্ম্মিকরা ধর্ম্মের সঙ্গে নীতিকে বেশ করিয়া জড়াইয়া লইয়া ভাবেন, তাঁহাদের নীতিই জগতে শ্রেষ্ঠ নীতি, আর সেই নীতি যে অনুসরণ করে না সেই কুনীতি-পরায়ণ। কেবল নীতি-বিষয়েই বা কেন? দৈনন্দিন আচার ব্যবহার বিষয়েও তাঁহারা চান যে সমস্ত দুনিয়ার লোক তাঁহাদের মত আচার-ব্যবহার করুক। যে তেমন আচার-ব্যবহার করিবে না, সেই অসদাচারী। যে ধার্ম্মিক ব্যক্তি সুপারী খান, তিনি হয়ত পান-খোরকে পাপী বলিয়া স্থির করেন, আর যিনি গরীব স্ত্রী-লোক, দাসী বা চাকরাণীর উপর গালাগালি বর্ষণ করিতে ইতস্ততঃ করেন না, তিনি হয়ত ভদ্র-স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কিছু অল্পতা দেখিলেই বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রকার ধার্ম্মিক লোকেরাই সমাজে বেশ সম্মান পাইয়া আসিতেছেন। সাধারণ লোকের সমাজে যেমন তিলক নামধারী বৈরাগী গৃহস্থ হইলেও বেশ ভিক্ষা ও ভক্তি পায়, ভদ্র-লোকের সমাজেও তথা-কথিত ধর্ম্মরত নীতিজ্ঞান-পরায়ণ ব্যক্তির প্রতিই লোকে মস্তক অবনত করে। আজ কাল যেমন বিনা-মূলধনেও মহাজন হওয়া চলে, বেশ ব্যবসায় চালান যায়, তেমনি তোমার যদি কোন সদ্গুণ নাও থাকে তবু দুই-চারিটী Negative Virtueকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে দশজনের সেলাম পাইবেই পাইবে।

ধর্ম্ম এখন হইয়াছে বাহিরের জিনিষ। আজকাল যাঁহারা বেশী কোষা-কুষী নাড়াচাড়া করিতে পারেন বা মন্দির, মস্‌জীদ বা গীর্জ্জায় বেশী-বেশী যাতায়াত করিতে পারেন, তাঁহারাই নিজেদের কাছে ও পরের কাছে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এদের ধর্ম্ম-হীনতা ধরা পড়ে সামান্য-সামান্য ব্যাপারে। গৃহ-স্বামীর কোষা-কুষী যদি ঠিক সময়ে সাজান না হয় তবেই তিনি চেঁচামেচি করিয়া বাড়ী মাথায় করেন। ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া মন্দির বা গীর্জ্জায় যাইতে যদি নিজের দোষে দেরী হয়, তবুও ঘোড়াই শাস্তি পায়,—ধার্ম্মিক হুকুম করেন, "কোচম্যান, জোরে হাঁকাও, চাবুক মার।" যাঁহারা দেব পূজায় পশু বধের নিন্দা করিতে করিতে দুই চক্ষে জল আনেন, তাঁহারাই দেবপূজার পথে ঘোড়াকে মারিতে মারিতে লইয়া চলেন। জাতিভেদ যে অমানুষিক এ কথা যাঁহারা বলেন, নিম্নশ্রেণীর প্রতি উচ্চ বর্ণের ব্যবহারকে যাঁহারা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া উঠাইয়া দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন, এরকম লোককেও দেখা যায়, তাঁহারা ভীষণ বৃষ্টিপাতের মধ্যে গাড়ীর ভিতরে সুরক্ষিত হইয়া যাইতেছেন, আর তাঁহার চাপরাশী কোচম্যানের পাশে বসিয়া ভিজিতে ভিজিতে যাইতেছে। অথচ গাড়ীতে আরও তিন জনের বসিবার মত স্থান রহিয়াছে।

তাই বলিতেছি, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম একটা accomplishment বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম্ম হৃদয়ের অংশ স্বরূপ হইয়া সমস্ত আচার

ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত না করিয়া বাহিরের মতবাদ ও routine work হইয়াছে। ধর্ম্ম যদি মনের রংকে তাহার নিজের রংএ পরিণত না করিল, যদি তাহার একটা atmosphere তৈরী করিয়া না লইল, তবে সে ধর্ম্ম বৃথা জিনিষ। মাতৃভাষার মত এ ধর্ম্ম নিজের জিনিষ নয়; এ ধর্ম্ম আরবী, পার্শী, গ্রীক বা হিব্রু ভাষার মত। দরকার হইলে ইহা শিখিয়া কথাবার্ত্তা বলা চলে, কিন্তু জীবনের প্রতিক্ষণের কাজ-কর্ম্মে, চিন্তায়, কল্পনায় বা স্বপ্নে ইহার ব্যবহার নাই। যে ধর্ম্ম তোমার নিজের হইয়া গিয়াছে, তাহার স্ফূর্ত্তি হইবে তোমার প্রতি কার্য্যে, প্রতি ভাবনায়, প্রতি আচার ব্যবহারে—প্রতি মুহূর্ত্তে; সে মাতৃভাষার মত; তোমার অজ্ঞাতে, অনিচ্ছায়—সর্ব্বক্ষণ সে তাহার নিজের রূপ লইয়া বাহির হইয়া পড়িবে।

আজকাল ধর্ম্মের নামে সাধারণতঃ যাহা চলিতেছে তাহার হাত হইতে সমাজ তথা ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে হইলে ধর্ম্মকে বাহির হইতে সরাইয়া লইয়া অন্তরে বসাইতে হইবে। সেজন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া দরকার—তাহার যে ভাবে ইচ্ছা সে ভাবে সে তাহার ধর্ম্মকে গড়িয়া তুলিবে ও আচরণ করিবে। ধর্ম্ম বিষয়ে কাহারও প্রতি জোরজবরদস্তি করা যেমন অসঙ্গত, নিজের ব্যক্তিত্বের গুরুভারও অন্যের উপর চাপাইয়া দেওয়া সেইরূপ অন্যায়। ইহাতে মানুষের নিজের ব্যক্তিত্ব অঙ্কুরেই বিনাশ হয়, মানুষ সারহীন, মেরুদণ্ডবিহীন হইয়া যায়। এ প্রকার ক্ষতি কাহারও করা উচিত নয়। এই স্বাধীনতা দান বিষয়ে হিন্দু সমাজ সর্ব্বাপেক্ষা উদার। নব্য হিন্দু সমাজের লোকেরা আজ যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে চিন্তা করিতে পারিতেছেন, যেমন ইচ্ছা তেমন অনুষ্ঠান করিতে পারিতেছেন। তাঁহারা একেশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন, অথচ প্রতিমাপূজা দেখিলে পাপ হয় এমন কুসংস্কারও তাঁহাদের নাই, কাশী বৃন্দাবনের তীর্থ দেখিলেও তাহাদের জাত মারা যায় না। এ সব ব্যাপারে তাঁহাদের জনমতের অত্যাচারও (Tyranny of public opinion) সহ্য করিতে হয় না। মতামতের জন্য তাঁহাদের কোন বাঁধা ফরম নাই, যাহার নির্দ্দেশের বাহিরে যাইবার অধিকার থাকে না। আজকাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোকেরাও যেমন ইচ্ছা হইলে কমিউনিষ্টিক ভাবে চিন্তা করিবার অধিকার চান, তেমনি বিভিন্ন সমাজের লোকদিগকেও ইচ্ছা হইলে নাস্তিকভাবে বা সন্দেহবাদীভাবে চিন্তা করিবার অধিকার দেওয়া উচিত।

ভবিষ্যতের ধর্ম্ম কেমন হওয়া উচিত তাহা মনে হইলে, এই কথাই সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যে, আমাদিগকে খাঁটী হিন্দু, খাঁটী ব্রাহ্ম, খাঁটী মুসলমান বা খাঁটী খৃষ্টান হইবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া খাঁটী মানুষ হইবার ইচ্ছা করাই উচিত। তুমি যে সমাজেই থাক না কেন, তোমার গায় যে Trade mark ই থাকুক না কেন, তোমার লক্ষ্য করা দরকার তুমি খাঁটী মাল কিনা। জীবনে সত্যের সাধন ও প্রেমের সাধনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যাঁর জীবনে এই দুইটী সাধিত হয় নাই, তাঁহার সব সাধনই বৃথা। জলজীবের জীবন ধারণ পক্ষে যেমন জলের প্রয়োজন, মানব সমাজে সুখ শান্তির জন্য তেমনি সত্য এবং ভালবাসার দরকার। ভবিষ্যতের মিশনারী বা প্রচারকের কর্ম্ম হইবে মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে প্রীতির প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন ধর্ম্মের মিলনভূমি নির্দ্দেশ। ভবিষ্যতের ধার্ম্মিক কেবল লোককে উপদেশ দিবেন না, কেবল নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী মন্ত্র লইয়া জপ করিতে থাকিবেন না। তিনি সবাইকে ভালবাসিবেন, সবাইকে ভালবাসায় অনুপ্রাণিত করিবেন। তিনি যে পথে বিচরণ করিবেন সে পথের সবাই উপকৃত হইবে, তিনি ভ্রমণ করিবেন "বসন্ত বল্লোকহিতং চরন্তম্"—বসন্তের বায়ুর মত তিনি সকলের আনন্দ বিধান করিবেন। ভবিষ্যতের ধর্ম্মে লোকের ভগবান বিষয়ে যে ধারণাই থাকুক না কেন, তাহাদের জীবনে যত প্রকার বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষাই থাকুক না কেন, একটা সাধারণ জিনিষ তাহাদের থাকিবে—সেটা পরস্পরের প্রতি প্রেম ও তাহার সাধন।

দুঃখ

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

এই যে ঘিরিয়া মোরে নাচে ঢেউগুলি
গরজি গভীর হাহাকারে,
আঁকড়ি রাখিতে চাহে ধরণীর ধূলি
কিনারে আছাড়ি বারে বারে—
তুমি যে অন্তরে মোরে রয়েছ আগুলি
ওরা কি তা' পারে জানিবারে ?

এ মোরে করালে খেলা এই সারারাত
সাগরের সাথ,
এ পারে যে দিয়েছ প্রভাত !

চিঠির মাশুল

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সর্ব্বেশ্বর ভোল ছিল পঞ্চাশ টাকা বেতনের সাব্‌পোষ্ট-মাষ্টার। বেশ সুস্থ সবলকায়, বয়স মাত্র আটত্রিশ। ডাকঘরের অন্যান্য পোষ্টমাষ্টারদের জীবন যেমন একঘেয়ে, সর্ব্বেশ্বরের তাহা ছিল না। সে প্রত্যহ সন্ধ্যায় সেতার বাজাইত, ছেলে-মেয়েদের হার্ম্মোনিয়ম সংযোগে গান শিখাইত, স্থানীয় ভদ্রলোকদের বাড়ী বেড়াইতে যাইত, গল্প করিত, হাসিত এবং এমন কি সুযোগ পাইলে থিয়েটারের রিহার্সল পর্য্যন্ত দিত। এই সব কারণে, যেখানেই সে থাকিত, সেইখানেই অতি অল্প দিনের মধ্যেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজন-পরিচিত হইয়া পড়িত। সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

হঠাৎ সর্ব্বেশ্বরের এক দিন একটু জ্বর হয়; এক দিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন গেল, জ্বর ছাড়িল না। জ্বর লইয়াই আফিসের কার্য্য করে, কার্য্য শেষে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়ে। যেখানে এই পোষ্ট আফিস, সে একটা মহকুমা। সরকারী ডাক্তার আছে। ডাক্তার বাবু সংবাদ পাইবামাত্র আসিলেন। চিকিৎসা আরম্ভ হইল। সাত দিন কাটিল। জ্বর ছাড়া দূরে থাকুক্, আরও অন্যান্য অনেক উপসর্গ আসিয়া জুটিল। সর্ব্বেশ্বরের স্ত্রী দামিনী বড় ব্যস্ত ও চিন্তিত হইয়া পড়িল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, ছুটির দরখাস্ত করুন। দরখাস্ত হইল। ৩।৪ দিনে নিউমোনিয়া স্পষ্ট রূপে যখন আত্ম-প্রকাশ করিল, তখন টেলিগ্রাফ্ করা হইল, ক্রমে ডাকঘরের কাষ বন্ধ হইল—কারণ এ আফিসে সর্ব্বেশ্বরই সর্ব্বেশ্বর ছিল; আর তাহার অধীনে তিনটি পিয়ন ও দুইটি ডাক-হরকরা ছিল। প্রায় রোজই একখানি করিয়া টেলিগ্রাম হইতে লাগিল, কিন্তু ডাকঘরের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নীরব। এগার দিনে সর্ব্বেশ্বর জন্মের মত চক্ষু বুজিল, সংসারের সব বাঁধন কাটাইল, কিন্তু ডাকঘরের বাঁধনটি আর কাটিল না। তিনটি ছোট ছোট মেয়ে, কোলে একটি শিশু পুত্র ও ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র গোকুলচন্দ্রকে লইয়া দামিনী চক্ষে অন্ধকার দেখিল। একে অর্থাভাব, তার উপর এই মহাবিপদ, আর এই বিদেশ,—কি যে করিবে ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। আপনার বলিতে সর্ব্বেশ্বরের কেহই ছিল না। দেশে বর্দ্ধমান্ জেলার কাটোয়া মহকুমার সুদূর পল্লীতে এক-খানি কাঁচা মাটীর বাড়ী আছে মাত্র—তাহাও বোধ হয় এত দিনে পড়িয়া গিয়াছে! কারণ বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে সর্ব্বেশ্বর দেশেও যায় নাই, বাড়ীখানির মেরামতও হয় নাই।

স্থানীয় ভদ্রলোকেরা সকলেই এই দুর্দ্দিনে এই বজ্রাহত পরিবারটিকে সান্ত্বনা দিতে আসিলেন। অনেক বাড়ীর মেয়েরাও আসিলেন। নানা কথায় সকলেই প্রবোধ দিতে লাগিলেন; প্রবোধ দেওয়া যত সহজ, প্রবোধ পাওয়া ততোধিক শক্ত। কিন্তু তবুও মানুষ বন্ধু বান্ধবকে চিরদিনই দিয়া থাকে। দশজনের সহানুভূতিতে অশ্রু-জলে ও সমবেদনায়—বুকের ভার কতকটা হাল্কা হয় বৈ কি!

"বল হরি, হরিবোল্"! গোকুল পিতার শেষ কার্য্য সমাধা করিয়া গৃহে ফিরিল। আবার দ্বিগুণ বেগে শোক বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। এমন সময়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের তার আসিল—"send medical certificate" (অসুস্থতার জন্য ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাও।) গোকুল টেলিগ্রাম-খানি পড়িয়া, বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। পিয়ন দুইজন বুঝাইতে লাগিল। তখন বেলা প্রায় চারিটা। অগ্রহায়ণ মাস। শীতের আমেজ পড়িয়াছে।

চতুর্থ দিনে নূতন পোষ্টমাষ্টার আসিল। চার্জ্জ লইয়া বলিল ৪৩২৸৶৯ পাই তহবিলে কম। বিপদের উপর

বিপদ। হাতে নগদ মোটে সতেরটি টাকা আছে। সাতখানি পাশ বইয়ে সর্ব্বসাকুল্যে ৬১৮/১০ ও এই উনিশ দিনের বেতন মাত্র সম্বল। পিয়ন বলিল যে পাশ বইয়ের টাকা ও এই কয় দিনের বেতন পাইতে এখনও বহু দেরী; কারণ, এ সবের তদন্ত ইত্যাদি করিতে অন্ততঃ তিন মাস সময় তো লাগিবেই। এসব ইনেস্‌পেক্টার বাবুর দয়া!

সরকারী তহবিলে টাকা কি করিয়া কম হইল, কি দিয়া এ পূরণ হইবে—শোক অপেক্ষা এই চিন্তাই দামিনীর বুকে চাপিয়া বসিল। এই তো সর্ব্বনাশ হইয়া গেল! ভগবান কি আবার নূতন সর্ব্বনাশের বীজ বপন করিলেন? কে জানে!

নূতন পোষ্টমাষ্টার বাবু বেহারী। তিনিও "ফ্যামিলি"—অর্থাৎ তিনি বিপত্নীক তাঁর এক কাহারিন্ অবিস্থা—লইয়া আসিয়াছেন। কোয়ার্টার তাঁর চাইই। দামিনী স্বামীর সঙ্গে বহু দিন হইতে ঘুরিতেছে,—সে জানে যে, এ ঘর-দুয়ারে তাহার আর অধিকার নাই। কিন্তু কোথায় যায়? এই সব ছেলেপুলে লইয়া কোথায় গিয়া দাঁড়ায়? নূতন বাবু আসিয়া প্রথম দিন হইতেই কোয়ার্টার খালি করিয়া দিতে বলিতেছেন, অথচ আজ দুই দিন হইয়া গেল।

গোপেন্দ্র মিত্র বড় উকীল, মস্ত বাড়ী—গোকুল মাতার নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার কাছে গিয়া একটু আশ্রয় ভিক্ষা করিল। তিনি দয়া করিলেন। এই হতভাগ্য পরিবার স্থান পাইয়া যত না খুঁসী হইল, পোষ্ট আফিসের ঘর ছাড়ায় তার চেয়ে অনেক বেশী সোয়াস্তি অনুভব করিল; কারণ, নবাগতা গৃহাধিকারিণীটি এই দুই দিনেই ইহাদিগকে বড়ই উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

গোপেন্দ্রবাবু বার লাইব্রেরীতে গিয়া অন্যান্য উকিলদের নিকট হইতে কিছু কিছু চাঁদা তুলিয়া দিলেন—কোনও রকমে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধা হইল। ওদিকে গ্রামে যাঁহারা সর্ব্বেশ্বরের জামিন ছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বেশ্বরের পৈত্রিক ভিটাটি বিক্রয় করাইয়া সরকারী তহবিলের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিয়াছেন—সংবাদ আসিল। শেষ যে একটু আশ্রয় ছিল, তাহাও গেল। এখন উপায়?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোকুলের স্কন্ধে এখন বিধবা মাতা, পাঁচ, সাত ও নয় বৎসরের তিনটি ভগিনী ও দেড় বৎসরের একটি ভাই। তাহার বয়স মাত্র তের, সে হাই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিল। বাড়ী নাই, ঘর নাই, দেশ নাই, অর্থ নাই—একেবারে নিরাশ্রয়। গোপেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে বাস করিতেছে, তিনিই খাইতেও দিতেছেন; কিন্তু এ যেন তাহাদের উপবাসের যন্ত্রণা হইতেও অধিক যাতনাদায়ক মনে হইতে লাগিল। কিন্তু এ যাতনার হাত এড়াইবারও উপায় নাই। পেটের জ্বালা যে পৃথিবীর সকল জ্বালার চেয়ে বড়।

দামিনী গোপেন্দ্র বাবুর পত্নীর নিকট প্রস্তাব করিল—"মা, তিনটে ঝি আর কি জন্যে? একটা ছাড়িয়ে দাও। ওর কায আমিই করব।"

গৃহিণী খুব হিসাবী; প্রকৃত পক্ষে এই সংসারের, এবং গোপেন্দ্র বাবুরও, তিনিই একমাত্র কর্ণধার। তিনি যদি একমুহূর্ত্ত অন্যমনস্ক থাকেন, তবে গোপেন্দ্র বাবুর মত কিস্তিও বান্‌চাল্ হয়ে যায়। বলিলেন—"না না, তা'ও কি কখনো হয়? তোমরা আর কদ্দিনাই বা আছ, আর কদ্দিনই বা থাকবে এখানে?" কথা কয়টি তিনি খুব উদাসীন ভাবেই বলিলেন।

দামিনী বলিল—"না মা, যখন আপনারা ছিচরণে ঠাঁই দিয়েচেন, তখন আর ঠেল্‌বেন্ না। আপনাদের বাড়ীর এঁটো মাজ্‌লে আর আমাদের তো জাত যাবে না। আপনাদের পাতের চোতের দুটো ভাত কুড়িয়ে খেয়ে গোকুলের একটা হিল্লে লাগুক্। অবিশ্যি আপনারা রাজা মানুষ—আপনাদের নর্দ্দামায় যে ভাত পড়ে থাকে, তাই খেয়ে আমাদের মতন একটা গেরস্ত মানুষ হয়ে যেতে পারে।" দামিনীর বুক ফাটিয়া কান্না আসিল।

প্রথম কথা কয়টি শুনিয়া গৃহিণীর মনটা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা কি তবে আর উঠিবে না না কি? কিন্তু শেষের মিষ্ট কথাগুলি শুনিয়া মনটা নরম হইয়া পড়িল। মনে মনে বলিলেন—"থাক্ গে না হয়। আহা, বাড়ীও বিকিয়ে গেল, যায়ই বা কোথা?" তোষামোদ না পারে, এমন কার্য্য সংসারে কি আছে? ভগবানই যখন চাটুবাক্যে গলিয়া বর দিয়ে ফেলেন, তখন মানুষের মন ভিজিবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

দামিনী তৃতীয় দাসীর স্থানে নিযুক্ত হইল। গোকুলকে

হেডমাষ্টার ছাড়িলেন না—বিনা বেতনে স্কুলে নাম লিখিয়া লইলেন। নিজের বাসায় তাহাকে রাখিয়া দিলেন।

গোকুল সচ্চরিত্র ঠাণ্ডা ও খুব মেধাবী বালক ছিল। শিক্ষকেরা সকলেই তাহাকে ভালবাসিতেন—এবং সম্প্রতি তাহার পিতৃ-বিয়োগের পর একেবারে নিরাশ্রয় হওয়ায় সকলেই তাহাকে অনুকম্পার চক্ষে দেখিত।

গোকুল কিন্তু সর্ব্বদাই অত্যন্ত বিমর্ষ থাকিত। মুখখানা অস্বাভাবিক রকমে ভার করিয়া কি চিন্তা করিত, কথা-বার্ত্তা নিতান্ত যাহা না বলিলে নয় তাহাই বলিত, এবং সর্ব্বদাই কেমন বড় অন্যমনস্ক থাকিত। এই শহরে যখন তাহার পিতা পোষ্টমাষ্টার ছিল, তখন তাহার কতই না সম্মান ছিল। আজ সেইখানেই তাহার জননী দাসী ও সে অন্য একজনের অন্নদাস গলগ্রহ ও বিনা বেতনের ছাত্র। সকলেই তাহাকে যে অযাচিত ভাবে দয়া করিতে আসে, তাহাতেই গোকুল বড় মর্ম্মাহত হয় ও লজ্জা অনুভব করে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া তো বলিতে পারে না যে, ওগো তোমরা আমায় দয়া করে অনুকম্পা করো না। যে কথা মুখ ফুটিয়া বলা যায় না, তাহার ব্যথা বড় নিদারুণ। গোকুল তাই এই লজ্জা, এই দুঃখ ও এই সব অপমান নীরবে সহ্য করে। আশা, যদি কখনও সে অবস্থার উন্নতি করিতে পারে, যদি কখনও তাহার নিরাশ্রয়া স্নেহময়ী জননীর ব্যথা-ম্লান সতত অশ্রুনিষিক্ত মুখে আবার হাসি ফুটাইতে পারে। ভগবান সেদিন কি কখনও দিবেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তিন বৎসর কাটিয়া গেল। গোকুলচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইল। এইবার একটা চাকরী চাই।

দামিনী এখনও গোপেন্দ্র বাবুর বাড়ীতেই কন্যা তিনটি ও শিশু পুত্রটি সহ দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত। দামিনী ছেলে মেয়েগুলি লইয়া গোয়ালঘরের পাশে ছোট একটা চালায় বাস করে ও দিবারাত্রি সংসারের কায করে। মেয়েগুলিও এই সংসারের ফাই ফর্মাশ খাটে। গোকুল রোজ সন্ধ্যায় আসে, ছুটির দিন দুপুর বেলায় আসিয়া মায়ের চালায় বসে; ভগিনীদের সঙ্গে দুই চারিটি কথা বলে, মাতার কোলে মাথা রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে শয়ন করে; তার পর আস্তে আস্তে নীরবে উঠিয়া চলিয়া যায়। কথা খুব কম বলে, হাসি তামাসা তো সে যেন জানেই না। এই অকাল ও অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য জন্য সহপাঠী মহলে গোকুল একেবারে একঘরে। সকলেই বলে, "ভাল ছেলে বলে' ওর গরবে আর মাটিতে পা পড়ে না।" গোকুল শুনিত তবু কিছুই বলিত না। সে বরং একাকী থাকিয়া সুখীই হইত।

পাশের খবর আসিল। গোকুলের মুখ ভাব একটুও পরিবর্ত্তিত হইল না। হেড্‌মাষ্টার যতীন বাবু ও তাঁহার পত্নী কত আনন্দ প্রকাশ করিলেন, কত আশীর্ব্বাদ করিলেন—গোকুলের মুখ হইতে কোনও কথা নিঃসৃত হইল না, কেবল তাহার নিষ্প্রভ নয়ন যুগল হইতে দরদর ধারে কয়েক ফোঁটা বড় বড় তপ্ত অশ্রুবিন্দু ভূপতিত হইল মাত্র।

দামিনী শুনিল; শুনিয়া কুটীর মধ্যে আসিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিল। আজ কোথায় সে, যাহার পুত্র আজ পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে? সে যে শুধু দুঃখের বোঝাই চিরদিন বহিয়া গিয়াছে, এ সুখের দিনে কোথায় সে—কোথায় সে? ওগো—

দামিনীর ডাক পড়িল উপরে গিন্নির ঘরে। তাড়াতাড়ি সে চোখ মুছিয়া চলিয়া গেল। গরীবের শোকেরও যে সময় নাই। এ আনন্দ নয়, এ শোক! এ তরঙ্গিনীর নয়ন-সুভগ উর্ম্মিবিলাস নয়, এ যে জলোচ্ছ্বাসের পূর্ব্বরাগ! এ চন্দনগিরির দক্ষিণানিল নহে, এ যে প্রলয়ের প্রারম্ভের ঝঞ্ঝাদূত! গোকুল পাশ হইয়াছে, কিন্তু শোকসিন্ধু বহুদিন পরে আবার উথলিয়া উঠিল। এ গূঢ় রহস্য দুঃখী ছাড়া কে বুঝিবে?

গিন্নী আনন্দ প্রকাশ করিলেন, দামিনী কাঁদিয়া ফেলিল। গিন্নী গোকুলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—দামিনীর অশ্রুভারনত ছল ছল চক্ষু দুইটি কৃতজ্ঞতায় জ্বলিয়া উঠিল। দাদার পাশের খবরে মায়ের এত কান্না কিসের, বড় মেয়ে তুলসী কিছুতেই অনেক চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে না পারিয়া, যেন কেমন হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল।

গোকুল আসিলে কর্ত্তা গিন্নি হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর অন্যান্য চাকর-বাকরেরা পর্য্যন্ত গোকুলের পাশের খবরে আনন্দ প্রকাশ করিল, আশীর্ব্বাদ করিল ও অবিলম্বে শুভদিনের প্রত্যাগমন কামনা করিল—কিন্তু গোকুলের দৈন্য-ম্লান সঙ্কুচিত মুখখানিতে কোন রকম বৈচিত্র্য

পরিলক্ষিত হইল না। সে তাড়াতাড়ি মায়ের ঘরে ঢুকিয়া যেন আত্মগোপন করিয়া বাঁচিল। শতছিন্ন অতি মলিন একখানি কাঁথার উপর আসিয়া ধপ করিয়া শুইয়া পড়িল, যেন কতই ক্লান্ত।

হর্ষে, বিষাদে, উত্তেজনায় ও ক্ষীণ ভরসার পুলকে দামিনীর আর সেদিন আহারে রুচি রহিল না—সে তাড়াতাড়ি আপনার ঘরে ঢুকিয়াই শত চুম্বনে ও নীরব অকারণ অশ্রুনিষেকে গোকুলকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে, মাতা পুত্রে অনেক পরামর্শ হইল। স্থির হইল যে যাহা হয় একটা চাকরী পাইলেই এই হীন দাস্য-বৃত্তি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়! চাকরী একটা চাই-ই।

গোকুল চাকরীর চেষ্টায় লাগিয়া গেল। সকাল হইতে দুপুর, আর বিকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুরিয়াও কোনও সুরাহা করিতে পারিল না। সকলে বলিল—কলিকাতায় যাও, সেখানে বহুৎ কায। বাইরে এ সব মফঃস্বলে, তাতে এই উড়ে ও মেড়োর দেশে, কি বাঙালীর ছেলের চাকরী হয় হে বাপু?

গোকুল গোপেন্দ্র বাবুকে বলিল। তিনি গাড়ীভাড়া দিলেন ও কলিকাতায় তাঁহার নিজ বাড়ীতে থাকিবার আদেশ দিয়া পত্র লিখিয়া দিলেন।

মাতার অশ্রুসিক্ত আশীর্ব্বাদ ও কম্পিত চরণের ধূলি লইয়া গোকুল শুভদিনে কলিকাতায় যাত্রা করিল। দামিনীর আহার নিদ্রা ছুটিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঠিক হেদোর ধারেই গোপেন্দ্র বাবুর বাড়ী। বড়লোক—চাকর দারোয়ান বেয়ারা মোটর সবই আছে। কলিকাতার বাসায় খবর পৌঁছিয়াছে যে, দামিনী ঝির ছেলে গোকুল চাকরীর চেষ্টায় কলিকাতায় আসিতেছে। বাঙালী ঝি চাকর মহলে ফিস্ ফিস্ চলিতে সুরু হইল।

গোকুল আসিয়া পৌঁছিল। গোবিন্দ খান্‌সামা, প্রথম নজরেই ভাবিল—এ একটা কি উৎপাত জুটল এসে? এ-ও হুকুম করবে না কি?

ভরত চাকর ঠিক করিল—সে ইহাকে "আপনি" বলিবে না; "তুমি"ই বলিবে।

ঝি অনুচ্চ কণ্ঠে কলতলায় বাসন মাজিতে মাজিতে এক নজর দেখিয়া লইয়া বলিল—"আমর, খেঁদীর বেটা পদ্মলোচন! মা খায় ভাড়া ভেনে—বেটা খায় এলাচ কিনে।"

গোকুল সপ্রতিভ। দুঃখেই সে মানুষ। জীবনের কৈশোর হইতে সে নিরাশ্রয়, জননী তাহার দাসী, ভগিনীরা তাহার পরান্নপালিতা, তাহাদের দুঃখ তাহাকে ঘুচাইতে হইবে—হইবেই। অনেক দুঃখ অনেক লাঞ্ছনা সে সহ্য করিয়াছে, এখনও তাহার মা ও ভগিনী করিতেছে—সে কি দমিতে পারে। প্রথম দিনেই গোকুল বাড়ীর সকলেরই মনোভাব বুঝিয়া লইল। সে যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিত, খুব সাবধানে চলিত।

ঝি-চাকরেরাও তাহার নম্র ও সপ্রতিভ ব্যবহারে অবাক্ হইয়া গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার সহিত কোন্দল বাধাইতে সক্ষম হইল না।

দাসী-পুত্র যে পাশ করিয়াছে এবং বাবু হইয়া কলিকাতায় চাকরী করিতে আসিয়াছে, এই চিন্তাটাকে কিছুতেই তাহারা হজম করিতে পারিতেছিল না। কাযেই তাহাকে খোঁচা মারিয়া উত্যক্ত করিয়া বিব্রত করিয়া তুলিতে সকলেই আশ্চর্য্য রকমে একমত হইয়া উঠিল।

উপেন্দ্র বাবু বাড়ীর কর্ত্তা। তিনি গোপেন্দ্র বাবুর মামা; চিরকুমার, সদাচারী ও পরোপকারী—বয়স প্রায় ষাট বৎসর। তিনি এই ছোক্‌রাকে বড় সুনজরে দেখিলেন। গরীবের ছেলে লেখা পড়া শিখিয়াছে—ভদ্র ব্যবহার, অমায়িক স্বভাব, নম্র ধীর—তাঁহার বড় পছন্দ হইয়াছিল। এই জন্য চাকর বাকর প্রচণ্ড ইচ্ছা সত্ত্বেও গোকুলকে ইচ্ছানুরূপ আঘাত করিতে পারিতেছিল না।

গোকুল দশটায় আহারাদি করিয়া বাহির হয়, রাত্রি নয়টা দশটায় বাড়ী ফিরে। এ আফিস ও আফিস যায়, বড় বাবু, ছোট বাবু, মেজ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে—কোনও সুফল তো ফলেই না বরং কিছু অপমান ও গলা ধাক্কা প্রত্যহই সঞ্চয় করিয়া হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরে।

এক মাস কাটিয়া গেল, কোনও কিছুই হইল না। গোকুল হাল ছাড়িল না। দামিনীকে লেখে এখনও কিছু হয় নাই, তবে শীঘ্রই একটা কিছু হইবে আশা করিতেছে। মাকে আশ্বস্ত করিতে হইবে তো?

আশার আলোক দেখা গেল। তখন যুদ্ধ চলিতেছে। মেসোপোটেমিয়ার জন্য লোক সংগ্রহ হইতেছে!

গোকুল রিক্রুটিং আফিসে আসিয়া হাজির। তৎক্ষণাৎ তাহাকে মাসিক এক শত টাকা বেতনের চাকরীতে নিয়োগ করা হইল।

গোকুল পথে আসিয়া মাকে পত্র দিল, বোম্বায়ের নিকট এক স্থানে মাসিক এক শত টাকা বেতনের এক চাকরী ঠিক হইয়াছে, এক সপ্তাহ মধ্যেই সেখানে যাইতে হইবে। মেসোপোটেমিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যে যাইতে হইবে, এ কথাটি জননীকে গোকুল গোপন করিল।

এদিকের সমস্ত ঠিক করিয়া, এক দিনের মত গিয়া সে মাকে দেখিয়া আসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, গোকুল মেসোপোটেমিয়ায় কার্য্য করিতেছে। এখন তাহার বেতন হইয়াছে দুই শত টাকা। বেতনের সমস্ত টাকা তাহার মাতার নিকট যায়, সে শুধু সরকারী খোরাক পোষাকে কার্য্য করিতেছে।

গোকুলের এখন মুখে হাসি ফুটিয়াছে। দিবারাত্রি সে অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করে, অবসর পাইলেই সেই সুদূর ভারত সাগরের পরপারে বাঙ্গালী বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজবে চিত্ত বিনোদন করে। কেবল তাহার দুঃখিনী মায়ের কথা মনে পড়িলেই, তাহার চিত্ত অকারণ বিষণ্ণ হইয়া পড়ে এবং মাকে দেখিবার জন্য তাহার সর্ব্বশরীর সেই মুহূর্ত্তে অদৃষ্টপূর্ব্ব গৃহের প্রাঙ্গণে ছুটিয়া যাইতে চায়।

প্রতি ডাকে সে তাহার মাতার, ভগিনীর ও সাত বৎসরের ছোট ভাইয়ের বড় বড় লেখা পত্র পায়, হাজার-বার করিয়া পড়ে, পড়িয়া আপনার খাকী উর্দ্দির পকেটে রাখিয়া দেয়, অবকাশ পাইলে আবার পড়ে। যত দিন না পুনরায় পত্র পায়, তত দিন শেষ পত্রগুলি এইভাবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে পকেটে পকেটেই থাকে।

মাতার পত্রে সে অবগত হইয়াছে যে, সুদ সমেত টাকা মিটাইয়া দিয়া, দামিনী তাহার স্বামীর ভিটাটি পুনরায় হস্তগত করিয়াছে—বড় কন্যা তুলসীর বিবাহ দিয়াছে, জামাই রেলে ছোটবাবু। আবার তুলসী সন্তান-সম্ভবা—শীঘ্রই সে মাতার কাছে আসিবে। মধ্যমা সরসীর বিবাহ হইয়াছে, জামাই জামশেদপুরে টাটা কোম্পানিতে ৪৫৲ টাকা বেতনে কায করে; ছোট ছেলে বৃন্দাবন গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িতেছে, বড় দুষ্ট হইয়াছে।

শেষ পত্রে আর একটি খবর আছে। দীর্ঘ দুই বৎসর অদর্শন জন্য জননী বড়ই চিন্তিত ও একবার পুত্রের চন্দ্রবদন দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার বড় সাধ, যেন গোকুল একবার অন্ততঃ এক মাসেরও ছুটি লইয়া বাড়ী আসে! আর তিনি গ্রাম সন্নিকটস্থ আদিত্যপুর গ্রামের শ্রীহরিবাবুর কন্যার সঙ্গে গোকুলের বিবাহ সম্বন্ধ পাকাপাকি করিয়া রাখিয়াছেন। মেয়েটি বড় লক্ষ্মী ও টুকটুকে, যেন সরস্বতী ঠাকুরাণী!

শেষের কথা কয়টি গোকুলের প্রাণে এক অশ্রুতপূর্ব্ব মধুময় সঙ্গীতের সমারোহ রচনা করিয়া দিয়াছিল। প্রথম যৌবনের দৃপ্ত বাসনার বহ্নি মুখে এ এক নবীন ইন্ধন-সম্ভার। গোকুলের মনটা অকস্মাৎ অকারণ একটা পুলকের শিহরণে মুহুর্মুহু কম্পিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

এ উত্তেজনা ক্ষণিক। মাতার ব্যাকুলতায় গোকুলের চিত্তও অধীর হইয়া উঠিল। সে আবার তাহার মাকে দেখিবে, আবার মাতার ক্রোড়ে শিশুর মত লুটাইয়া পড়িবে, দুঃখিনী জননীর শেষ দৃষ্ট ম্লান মুখে তৃপ্তি শান্তি ও সুখের হাসি দেখিবে। নিজের বাড়ী যাইবে, নিজের ঘরে বাস করিবে, নিজের অর্জ্জিত অর্থের অন্নজল গ্রহণ করিবে—এ কি সাধারণ সুখ? তাহার নিজের বাড়ী, তাহার মাতা সেই গৃহের কর্ত্রী! স্নেহময়ী জননীর কর্ত্তৃত্বাধীনে সে বাস করিবে। ভগিনীরা তাহাকে মুক্ত-হৃদয়ে আদর করিবে। জ্ঞান হইয়া অবধি এ সুখসৌভাগ্য গোকুলের কৈ হইয়াছে? গোকুল বাড়ী যাইবার জন্য, মাকে দেখিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিল। এতটুকু বিলম্ব আর তাহার সহিতেছে না।

সে ছুটির দরখাস্ত করিল। ছুটি মঞ্জুরও হইল। মাকে পত্র দিল যে, তাহার ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে, শীঘ্রই বাড়ী পৌছিবে।

হঠাৎ আরবদিগের সঙ্গে গোলমাল বাধিয়া উঠিল। ছুটি কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখা হইল, বাড়ী যাওয়া হইল না। অথচ গোকুল তাহার মাকে লিখিয়াছে যে, সে মাঘ মাসের ৭।৮ই নিশ্চয় বাড়ী পৌছিবে।

দামিনী হাতে স্বর্গ পাইল। বাড়ীতে বিহাহের উদ্যোগ আরম্ভ হইল!

* * * *

আজ তিন দিন হইতে শত্রুপক্ষ বড়ই উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। দিবারাত্রি সমস্ত শিবির শত্রুভয়ে সন্ত্রস্ত। দিনেও কেহ তাম্বুর বাহির হইতে পারিতেছে না। সৈন্য ও শস্ত্র সংখ্যা হঠাৎ কম পড়িয়া যাওয়ায়, শত্রুপক্ষের খুবই সুবিধা হইয়াছিল। এদিকে বেস্ আফিসে তার করা হইয়াছে, এখনও সৈন্য ও শস্ত্রাদি আসিয়া পৌঁছায় নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই সকলে আশা করিতেছে—এই এল, এই এল। (O.C) সেনাপতি সাহেব ম্লানমুখে তারঘরে বসিয়া অনবরত তার পাঠাইতেছেন। হঠাৎ বিদ্যুৎ জ্বলিয়া ঘর আলো হইয়া উঠিল। শত্রুরা টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিল। টেলিগ্রাফের দফা রফা!

সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনিও আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যে ভরসায় ডাকঘরে বসিয়া ছিলেন, সে ভরসাও বিনষ্ট হইল।

অপরাহ্ন। মাঘমাস। দারুণ শীত। সাহেব নিজ তাম্বুতে গিয়াই হুকুম দিলেন যে, পুনরায় হুকুম না দেওয়া পর্য্যন্ত বেলা ছয়টার পর শিবিরের কোনও স্থানে যেন কেহ কোনও প্রকার আগুন না জ্বালে। সমস্ত শিবির অন্ধকার। রান্না-খাওয়া অতএব সব ছয়টার পূর্ব্বেই শেষ করিতে হইবে। ঠিক ছয়টার সময় বিগল্ বাজিবে। অমনি সমস্ত আগুন, সমস্ত আলো এক সঙ্গে নিভিয়া যাইবে।

ছয়টা বাজিল, সঙ্গে সঙ্গে বিগল্ ধ্বনিয়া উঠিল। সমস্ত আলো নিভিয়া গেল। বিপুল শিবির আশঙ্কায় ও অন্ধকারে ভয়াল হইয়া উঠিল? একটু শব্দ পর্য্যন্ত হইবার হুকুম নাই। সকলেই আপন আপন তাম্বুতে নীরবে অন্ধকারে মৃত্যুবিভীষিকা দেখিতে লাগিল। কেবল রক্ষী সৈন্যগুলি কালো পোষাক পরিয়া অন্ধকারে এখানে ওখানে শিবির রক্ষায় নিযুক্ত রহিল। বিরাট বিস্তৃত মরু প্রান্তর—বাহিরে জনমানব নাই। সৈন্যগণ সশস্ত্র অবস্থায় শিবির মধ্যে আদেশের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া আছে। দেশ্‌লাই জ্বালিয়া একটি সিগারেট খাইবার হুকুম পর্য্যন্ত নাই।

মধ্যে মধ্যে হঠাৎ লুক্কায়িত শত্রুদিগের গুলি আসিয়া তাম্বুতে, প্রাচীরে, ও লৌহস্তম্ভে ঠং ঠং করিয়া লাগিতেছে। আর কোনও শব্দ নাই। এ মরু মধ্যে ঝিল্লি নাই, নৈশ বিহঙ্গের ভীত চীৎকার নাই, বৃক্ষপত্রের শন শন শব্দ নাই। এমন শব্দহীন গাঢ় অন্ধকারে নিদারুণ শীতে প্রতিমুহূর্ত্ত মৃত্যুর আশঙ্কায় প্রায় দশ সহস্র মানব-নন্দন জীবন্মৃত অবস্থায় বসিয়া আছে।

সেনাপতি সাহেব শিবির পরিদর্শনে বাহির হইয়াছেন। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তিনি ফিরিতেছেন—দেখিতেছেন যে সৈন্যগণ ঠিক প্রস্তুত হইয়া আছে কি না, রক্ষী পাহারা সব যথাযথ আছে কি না, শিবির মধ্যে কেহ কোনও সামরিক বিধান বহির্ভূত কার্য্যে লিপ্ত আছে কি না!

হঠাৎ গোকুলের শিবির দুয়ারে আসিতেই দেখিলেন একটু আলোকচ্ছটা তাহার দুয়ার পর্দ্দার ফাঁক দিয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে। সাহেব দাঁড়াইলেন। কাণ পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলেন—ভিতরে কোনও শব্দ নাই। দুয়ারে মৃদু শব্দ করিবামাত্র গোকুল পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়াই দেখিল—O.C. (সেনাপতি সাহেব)!

গোকুলের বুকের রক্ত জমিয়া হিম বরফ হইয়া গেল। মাথা ঘুরিয়া উঠিল। হঠাৎ বাক্যনিঃসরণ হইল না।

সাহেব পর্দ্দা ঠেলিয়া তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটি মোমবাতী জ্বালাইয়া গোকুল পত্র লিখিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলেন,

—"কি করিতেছিলে?"

গোকুলের কণ্ঠ তালু বক্ষ পর্য্যন্ত শুখাইয়া পদতলস্থ মরু-বালুকার মত হইয়া উঠিয়াছিল। অতি কষ্টে উত্তর দিল—"আগামী কল্য প্রত্যূষে ভারতের ডাক যাইবে, তাই আমার দুঃখিনী মাকে একখানা পত্র দিতেছি। সারা দিন আমি ডিউটিতে ছিলাম, সময় পাই নাই। গত মেলেও আমার ডিউটি ছিল, পত্র দিতে পারি নাই। এবারেও যদি পত্র না দিই, তবে আমার মা হয় ত আশঙ্কায় মারাই যাইবেন। তাই—"

সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন—"আজকের হুকুম কি?"

গোকুল কাঁপিতে লাগিল। কহিল—"ছয়টার পর কোনও আলো জ্বলিবে না। আমার—"

সাহেব বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন—"এ হুকুমের অর্থ কি জান?"

গোকুলের মাথা ঘুরিতেছিল—কহিল—"অর্থ এই যে শত্রুপক্ষ না জানিতে পারে, কোথায় শিবির। জানিলে উড়োজাহাজে বোমা ফেলিয়া শিবির ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতে পারে।"

সাহেব বলিলেন—"ঠিক তাই। কত দিন তুমি এখানে আছ?"

গোকুল উত্তর দিল—"দুই বৎসরের উপর।"

সাহেব বলিলেন—"আচ্ছা, চিঠি শেষ করিয়া ফেল, আমি দাঁড়াইতেছি।"

গোকুল কহিল—"শেষ হইয়াছে। কেবল ঠিকানাটা বাকী।"

সাহেব কহিলেন—"শীঘ্র লিখিয়া আমায় দাও।"

গোকুল কি বুঝিল জানে না. মন্ত্রচালিতের ন্যায় ঠিকানাটী লিখিয়া পত্রখানি হাতে করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সাহেব গোকুলের হাত হইতে খপ্ করিয়া পত্রখানি লইয়া বলিলেন—"দাও, আমি ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিব। এ চিঠিতে তো মাশুল লাগিবে না। আজ তোমার জন্য এই দশহাজার লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইত, তাহা বুঝিতে পারিতেছ কি?"

গোকুল সাহেবের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাতর স্বরে বলিল- "সাহেব, আমার অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইয়াছে, এইবারকার মত আমায় মার্জ্জনা কর।"

সাহেব বলিলেন—"বাতি নিভাও। দাঁড়াও, এইপত্রে বরং লিখিয়া দাও যে, এই তোমার শেষ পত্র এবং আগামী কল্য প্রাতে তোমায় (Court Martial) সামরিক বিচারে গুলি করা হইবে।"

গোকুল ফুৎকারে বাতি নিভাইয়াই অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। সাহেব চিঠিখানি লইয়াই বাহিরে গেলেন।

* * * *

ভোর পাঁচটায় বিগ্‌ল বাজিল। সমস্ত সৈন্যগণ নিমেষে আসিয়া ময়দানে সারি দিয়া দাঁড়াইল। সেনাপতি সাহেব গত রাত্রের গোকুলের কাণ্ড বুঝাইয়া দিলেন, সামরিক হুকুম অমান্যের শাস্তিও যে কি, তাহাও জানাইয়া দিলেন।

সৈন্যগণের মুখে একটা চাঞ্চল্য ফুটিয়া উঠিল।

প্রহরী-বেষ্টিত গোকুল তথায় নীত হইল। বিগ্‌ল বাজিল। এগারজন সৈনিক গুলিভরা বন্দুক হস্তে গোকুলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাঁশী বাজিল, যুগপৎ এগারটি বন্দুকের শব্দ হইল। যাহারা গুলি করিল এবং যাহারা দেখিবার জন্য আনীত হইয়াছিল—তাহারা কেহই দেখিল না, কি হইল! কেবল বন্দুকের শব্দ শুনিল মাত্র!

শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হুকুম—"Right about turn, Quick march। (দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া, দ্রুত চলিয়া যাও।)

চন্দননগরের বাঙ্গালী সৈনিক

শ্রীহরিহর শেঠ

সুবর্ণপুরী ভারতে বৃটিশ অভ্যুদয়ের প্রথম সোপান এই চন্দননগর। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে অর্লেয়াঁ দুর্গের পাদমূলে এই ভূমিতেই ইংরাজের তথা বাঙ্গলার ভাগ্য নির্ণীত হইয়াছিল। আর কে জানে, ইংরাজি ১৯১৬ সালের ৬ই এপ্রেলের চিরস্মরণীয় শুভ দিনে কুড়ি জন বাঙ্গলার স্বেচ্ছা-সৈনিক সন্তান মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইয়া চন্দননগর হইতে ফ্রান্সে যাইয়া যে ব্রতের উদ্বোধন পূর্ব্বক ভার্দ্দুনের সমর-প্রাঙ্গণে বল পরীক্ষার পর জয়মাল্য লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহারা ভবিষ্য বাঙ্গালীর জন্য কোন্ সোণার পুরীর রুদ্ধ অর্গল খুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন! ইয়োরোপের মহাসাগর রূপ মহাসমরে জলবুদ্বুদসম এখানকার কয়জন বাঙ্গালী যুবকের যোগদানে ফরাসীদের কতটুকু বল বৃদ্ধি হইয়াছিল, জানি না। কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গলার ও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে একটি মহিমময় পরিচ্ছেদের যোজনা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইয়োরোপে সমরানল প্রজ্বলিত হইবার পর বৎসর ৩০শে ডিসেম্বর ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সভাপতি প্রথম তাঁহাদের ফরাসী ভারতের অধিবাসীদের 'যুদ্ধাধিকার প্রদান করেন। তৎপরে ১৯১৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী

ফরাসী - ভারতের তৎকালীন গভর্ণর মসিয়ে মার্তিনো (M. A. Martineau) দ্বারা উহা এখানে প্রচারিত ও বিধিবদ্ধ হয়; এবং ই ফেব্রুয়ারি সহরের বহু স্থানে সুদীর্ঘ বিজ্ঞাপন দ্বারা ফ্রান্সের সহায়তার জন্য যুদ্ধার্থী নাগরিক-দিগকে আহ্বান করা হয়।
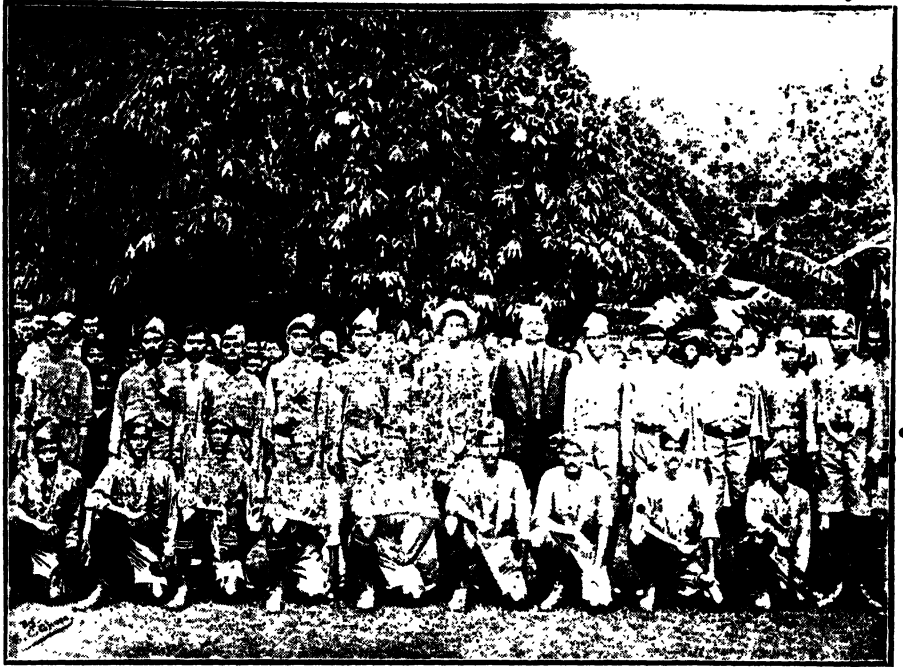
স্বেচ্ছা সৈনিক প্রথম দল—যাত্রার পূর্ব্বে

প্রথমে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫ জন যুবক
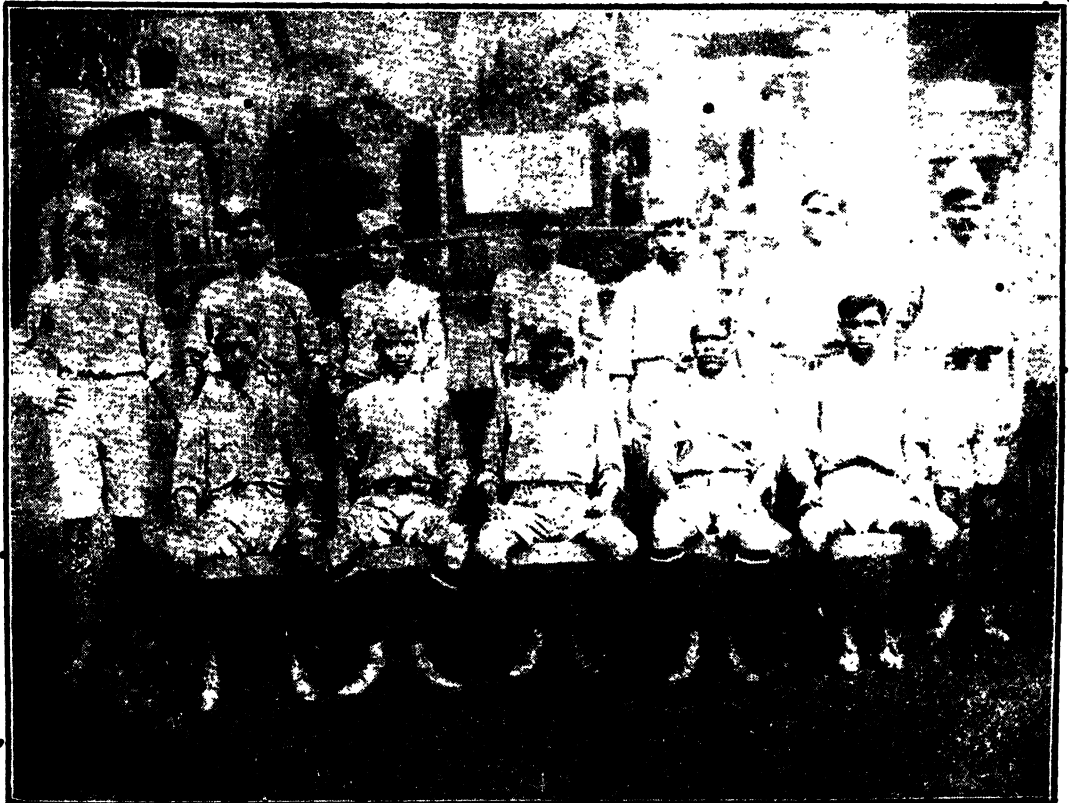
স্বেচ্ছা-সৈনিক হইবার জন্য আবেদন করেন। তন্মধ্যে ১২ জন আবেদন প্রত্যাহার করেন। ৪৩ জন ডাক্তারি পরীক্ষায় অনুপস্থিত এবং অনুত্তীর্ণ হন। শেষে অবশিষ্ট কুড়ি জন প্রথম দলভুক্ত হইয়া পণ্ডিচারীতে প্রেরিত হন। সেদিন ইং ১৯১৬ সালের ১৬ই এপ্রেলের অপরাহ্ণ। সে একটি স্মরণীয়

স্বেচ্ছা সৈনিক প্রথম দল পণ্ডিচারীতে

দিন; চন্দননগরের পক্ষে ত: বটেই, সারা বাঙ্গলার পক্ষেও তাহা চিরস্মরণীয়। সেই মাল্য-চন্দন-বিভূষিত, জনসাধারণের উল্লাস ও পুরমহিলাগণের শঙ্খধ্বনি-মুখরিত, বিপুল জনসংঘের পুরোভাগে বিংশতি সংখ্যক বাঙ্গালী যুবকের ফরাসী ত্রিবর্ণ পতাকা হস্তে ফ্রান্সের উদ্দেশে রেল ষ্টেশনে যাত্রা যিনি দেখিয়াছেন তিনি কখন ভুলিতে পারিবেন না। সে দিন সহরের চাঞ্চল্য ও উল্লাস এবং সহস্র সহস্র নরনারীদের দ্বারা সৈন্যগণের সংবর্দ্ধনা, এবং সহরের ও দূরাগত সম্ভ্রান্ত জনগণের বিপুল সমাবেশ বর্ণনার অতীত। এই দলে ছিলেন,—

ফণীন্দ্রনাথ বসু, তারাপদ গুপ্ত, রমাপ্রসাদ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সরকার, বিপিনবিহারী ঘোষ, হারাধন বক্সী, সিদ্ধেশ্বর মল্লিক (ঘোষাল) করুণাময় মুখার্জ্জি, জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ, অমিতাভ ঘোষ, বলাইচন্দ্র নাথ, মনোরঞ্জন দাস, রাধাকিশোর সিংহ, সন্তোষচন্দ্র সরকার, রবীন্দ্রনাথ রায়, অনীলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, আশুতোষ ঘোষ, পাঁচকড়ি দাস, ব্রহ্মমোহন দত্ত ও হাবুলচন্দ্র দাস।

স্বর্গীয় মনোরঞ্জন দাস (ইনি বিজার (Bizerte) নগরে মারা যান)

প্রথম দল চলিয়া যাইবার দুই মাস পরে যতীন্দ্রনাথ দে, সতীশচন্দ্র শেঠ, অজয়প্রসাদ বসু, কানাইলাল ভট্টাচার্য্য, অনিলচন্দ্র চাটার্জ্জি, ললিতমোহন দে,

পরেশনাথ চাটার্জ্জি ও গোবর্দ্ধনচন্দ্র দাস নামক আর আট জন যুবক যাত্রা করেন। এই উভয় দল পণ্ডিচারী

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক

শ্রীযুক্ত হারাধন বক্সী

পৌঁছিবার পর তথায় সকলের পুনরায় ডাক্তারি পরীক্ষা হয়। ইহাতে অনুত্তীর্ণ হওয়ায় আশুতোষ ঘোষ ও পাঁচকড়ি দত্ত বর্জ্জিত হন। বাকি ২৬ জন ঐ মাসের শেষেই ফ্রান্সে যাত্রা করেন। এই সকল যুবকই ভদ্র-বংশীয়। তাঁহাদের বয়স ১৬ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে। ইহাদের মধ্যে বলাইচন্দ্র নাথ ও গোবর্দ্ধন দাস অন্য সকলের অপেক্ষা ছোট। বলাইয়ের বয়স তখন ১৫ বৎসর মাত্র। নরেন্দ্রনাথ সরকারের বয়স সকলের অপেক্ষা অধিক ছিল।

পণ্ডিচারীতে যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ

শ্রীযুক্ত অমিতাভ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ

করিবার পর তাঁহারা ফ্রান্সে প্রেরিত হন। তথায় কিছু দিবস ফরাসী সামরিক বিদ্যালয়ে সমর কৌশল শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহারা একেবারে রণক্ষেত্রে প্রেরিত হন। এই সময় তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়, এবং তুল, বিজার্ত্ত, ট্রিপলিটন্, আরগন্, এলসেস্ ভার্দ্দুণ, সেণ্ট্ মিহিয়েল্ প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হন। ইঁহাদের মধ্যে অনেককে গোলন্দাজের কার্য্যেও নিযুক্ত

করা হইয়াছিল। তাঁহাদের কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ফরাসীদের বিখ্যাত ৭৫ মিলিমিটার কামান পরিচালনা করিয়া জার্ম্মাণ ব্যূহভেদ কার্য্যের দায়িত্ব-ভার পর্য্যন্ত ইঁহাদের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পণ্ডিচারী হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের সকল স্থানে সর্ব্ব ক্ষেত্রেই সাহসিকতা, উদ্যম ও ত্যাগশীলতা দেখাইয়া বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

দর্শিতা ও নির্ভীকতার কথা ভাবিলে বাঙ্গালী হৃদয়ে যে আত্মপ্রসাদ জন্মে, তাহা কেবল অনুভবযোগ্য—তাহার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তাঁহারা চন্দননগরের তথা সমগ্র বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। যাঁহারা আপন হৃদয়ের রক্তে জাতির কলঙ্ক-কালিমা বিধৌত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম স্বেচ্ছায় অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাছে বাঙ্গালী জাতির ঋণ শোধ হইবার নহে। বাঙ্গালী তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

বীর যুবকদিগের কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ সকলকেই 'Victory, 'Interallie' ও 'Volunteer' নামক তিনটি করিয়া পদক দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত তারাপদ গুপ্ত

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন দত্ত

পণ্ডিচারীতে শিক্ষাকালে লেফ্‌টনাণ্ট জিলে মহোদয় ইঁহাদিগকে সকল সেনাদলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাদল বলিয়াছিলেন। ফ্রান্সে ইঁহাদের যে সুখ্যাতি লাভ হইয়াছিল, তাহা তৎকালীন সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র নাথ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ক্রশ দে গুয়ার্ (Croix de Geurre) নামক বিশেষ পদক দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিক ও শ্রীযুক্ত হারাধন বক্সী উভয়ে যথাক্রমে সমর বিদ্যালয়ের উচ্চ ও নিম্ন গ্রেডের পরীক্ষায় এবং অফিসারস্ প্লাটুন্ পরীক্ষায়

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি

প্রস্তাব হইয়াছিল, কেবল স্থান ও রেজিমেণ্ট বদল হওয়ার জন্য তাহা হয় নাই। তাঁহারা যে সকল সৈন্য দলভুক্ত হইয়া কাজ করিয়াছিলেন তাহার নাম,—

11 em Regiment d' Infenterie colonial 25 em Compain

7 em Groupe d' artillerie a Bizerte 8 em.

10 em Regiment d' artillerie Toulon

6 em Regiment d' artillerie 6em. Batterie

9 em. Regiment d' Infenterie colonial Dap-Co. Hue' (Annam) Indo-chine.

4 em Infenterie colonial.

154 em artillerie a´ pied.

6 em artillerie d Afrique.

6 em artillerie a´ pied.

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার

শ্রীযুক্ত কানাইলাল ভট্টাচার্য্য

গোলন্দাজ ছিলেন এবং অস্থায়ী ব্রিগেডিয়ারের পদ লাভ

তাঁহারা মোট প্রায় তিন বৎসর ফ্রান্সে ছিলেন। মাঝে একবার মাত্র দেশে আসিবার অনুমতি পাইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। শেষে আরমিষ্টিসের পর একেবারে ফিরিয়া আইসেন। দ্বিতীয় বার কয়েকজনকে এখান হইতে ইণ্ডোচীনে পাঠান হইয়াছিল। সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, করুণাময় মুখার্জ্জি এবং হাবুলচন্দ্র সরকার যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত বরাবরই ফ্রান্সে ছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, যুবকগণ ফিরিয়া আসিলে, যখন তাঁহাদের দেশবাসী তাঁহাদিগকে অতি আদরে, অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে লইয়া আসিলেন, তখন দলের মধ্যে যুবক মনোরঞ্জনকে তাঁহারা আর ফিরিয়া পাইলেন না। মনোরঞ্জন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া বিজারে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই স্থানেই তাঁহার দেহাবশেষ ফরাসী সৈনিকদের পার্শ্বে গোর দেওয়া হয়।

ভলেণ্টিয়ারদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সহায়তার জন্য এডমিনি-ষ্ট্রেটরের সভাপতিত্বে যে ভলেণ্টিয়ার কমিটি গঠিত

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দে

একটি ৭৫ c. m. কামান লইয়া পরীক্ষা হইতেছে (মধ্যে জ্যোতিষ)

কতিপয় ভদ্রলোকও সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের উদ্যোগ ও প্রাথমিক চেষ্টায় এই কমিটি গঠিত হয়। স্বর্গীয় তিনকড়িনাথ বসু মহাশয়ও ইহার পুষ্টি সাধনে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এই স্বেচ্ছা-সৈনিক সংগ্রহ, দল গঠন ও প্রেরণ এবং বিদায় অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা ব্যাপারে শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের চেষ্টা সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। সিদ্ধেশ্বর মল্লিক, হারাধন বক্সী ও নরেন্দ্রনাথ সরকারের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি এ কার্য্যে অগ্রসর হন। প্রথম ও শেষোক্ত যুবকই স্বেচ্ছা-

হইয়াছিল, তাহার তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে মনোরঞ্জনের নামে ডুপ্লে কলেজে, যেখানে মনোরঞ্জন বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেইখানে একটি দেওয়ালে একখানি প্রস্তর-ফলক রাখা হইয়াছে। এবং প্রতি বৎসর উক্ত বিদ্যালয়ের দুইটি যোগ্য ছাত্রকে একটা মাসিক বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কার্য্যের ব্যবস্থা ও ছাত্র দিগকে বৃত্তি দিবার জন্য স্থানীয় নৃত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরের ট্রাষ্টীদিগের হস্তে টাকা দিয়া তাঁহাদের উপর ভারাপিত হইয়াছে। উল্লিখিত কমিটির ভাণ্ডারে চন্দননগর ভিন্ন বাহিরের

বাঙ্গালী ও ফরাসী সৈনিকেরা একত্র বিশ্রাম করিতেছেন

সৈনিক হইবার জন্য প্রথম আবেদন করিয়াছিলেন। উক্ত ব্যাপারে স্বর্গীয় তিনকড়িনাথ বসু, মনীন্দ্রনাথ নায়েক, রূপলাল নন্দী, হরিহর শেঠ প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

প্রথম ভলেণ্টিয়ারবৃন্দের বিদায় উপলক্ষে মাননীয় এড্‌মিনিষ্ট্রেটর মসিয়ে ভ্যাঁসা ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয় যে উদ্দীপনাপূর্ণ সময়োপযোগী সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা শুনিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের এখনও মনে আছে। সৈনিকদিগের বিদায় ও সম্বর্দ্ধনা ব্যাপারে বাহিরের যে সকল বিখ্যাতনামা নেতা ও সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্যার (এক্ষণে

বাঙ্গালী ও ফরাসী সৈনিকেরা একত্র বিশ্রাম করিতেছেন

লর্ড) শ্রীযুক্ত এস্, পি, সিংহ, শ্রীযুক্ত বি, চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার শ্রীযুক্ত এস্, কে, মল্লিক, স্বর্গীয় পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত জে, চৌধুরী, রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী, কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত বি, কে, লাহিড়ী প্রভৃতিও ছিলেন। প্রথম দল ছুটিতে আসিলে, দ্বিতীয় বার তাঁহাদের বিদায় দিবার কালে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক বিদায়-সম্বর্দ্ধনা-সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন দেশে এমন সংবাদপত্র কমই ছিল বা ছিল না, যাহাতে এই সকল

সৈনিকদিগের মধ্যাহ্ন-ভোজন

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটের বেশে স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সেন

পথ-প্রদর্শক বীর যুবকদের সাহস ও বীরত্বের কাহিনী না ঘোষিত হইয়াছিল। *

বিশেষ সংক্ষেপেই এখানকার প্রথম পথ-প্রদর্শক বাঙ্গালী স্বেচ্ছা-সৈনিক-দিগের কথা বলা হইল। কিন্তু আর একটি বাঙ্গালী বীরের কথা না বলিলে এ গৌরব-কথা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। ইঁহার বিষয় শেষে ব্যক্ত হইলেও সাহসিকতা, শৌর্য্য, কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতিতে ইনি কোন অংশে কম নহেন, বরং অধিক বলিতে পারা যায়। কারণ, যখন ফরাসী প্রজাতন্ত্রের পক্ষ হইতে যুদ্ধে যাইবার জন্য কোন ডাক আইসে নাই, যখন বাঙ্গালীর ছেলে যুদ্ধে যাইতে পারে, এ কথা কাহারও কল্পনায়ও আইসে নাই, ইনি তখন একাকী স্বেচ্ছায় নীরবে সৈন্যদলে যোগদান করেন। এই

* এই স্বেচ্ছা-সৈনিকদিগের কথা লিখিতে ভলেণ্টিয়ার শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মল্লিকের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। সে জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। —লেখক।

যোগীন্দ্রনাথের মেডেল

সৈনিক অবস্থায় স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ সেন

([illegible])
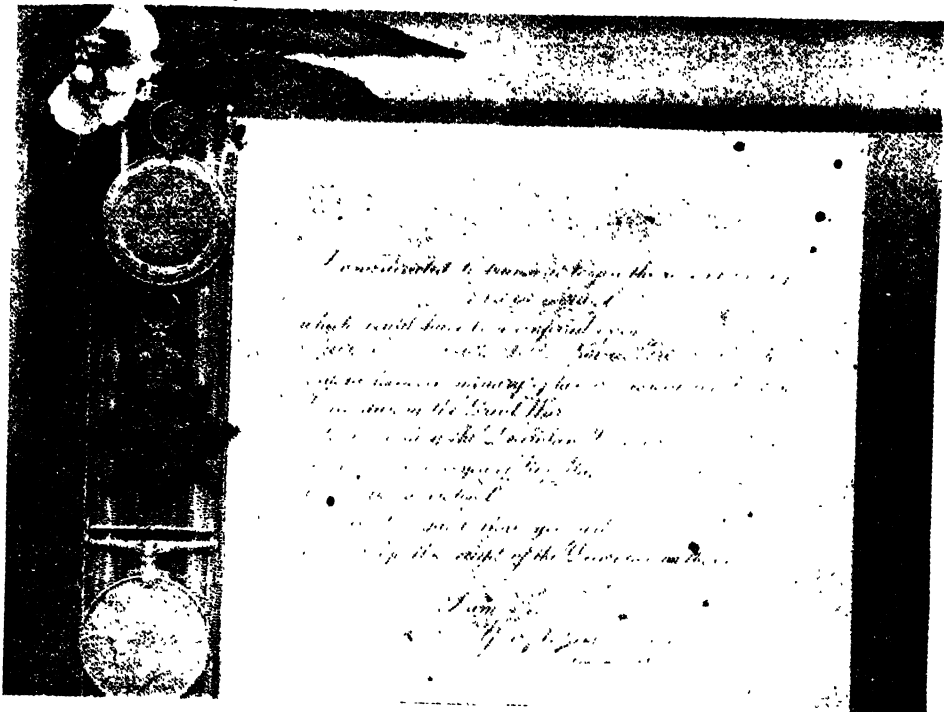
বীর যুবকের নাম যোগীন্দ্রনাথ সেন। ইনি শিবপুর কলেজে পড়িতে পড়িতে, উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বিলাত যান। তথায় লিড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসর শিক্ষার পর বি-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এঞ্জিনিয়ার হন। তৎপরে তথায় পূর্ত্ত বিভাগে সহকারী এঞ্জিনীয়ারের পদে একটি কার্য্য গ্রহণ করেন।

এই কাজ করিতে করিতে যখন মহাসমর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন যোগীন্দ্রনাথ সমর-বিভাগে অফিসারের কার্য্যের জন্য আবেদন করেন। ভারতবাসী বলিয়া প্রথম সে আবেদন অগ্রাহ্য হয়। তৎপরে তিনি যখন বুঝিলেন, তাঁহার সে আশা পূর্ণ হওয়া সহজ নয়, তখন আর কাল-বিলম্ব না করিয়া সামান্য সৈনিকের পদপ্রার্থী হইয়া পুনরায় আবেদন করেন। এই আবেদন মঞ্জুর হইল; তিনি পলস্ ব্যাটেলিয়ন্ (Pals' battalion) নামক সৈন্যদলে স্থান পাইলেন। এই ব্যাটেলিয়ন্ পরে ওয়েষ্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেণ্টের (West Yorkshire Regiment) অঙ্গীভূত হইয়া যায়। এই স্থানে নয় মাস কাল শিক্ষার পর কিছু দিনের জন্য তিনি মিশরে প্রেরিত হন, এবং তৎপরে তথা হইতে তাঁহাকে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়।

এই স্থানে তাঁহাকে প্রকৃত যুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যোগীন্দ্রনাথ সৈনিকের যে পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার নাম প্রাইভেট্। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা এবং ন্যায়পরায়ণতার জন্য, তথাকার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তিনি বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিনটি পদক পুরস্কার দিয়াছিলেন। তাঁহার গৌরবে দেশবাসীর গৌরব বাড়িয়াছে; কিন্তু সে গৌরব বুকে ধরিয়া তিনি আর স্বদেশে ফিরিতে পারিলেন না। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২২ শে মে রাত্রে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে বীর যোগীন্দ্রনাথ ফ্রান্সের সমরক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর অস্ত্রে প্রাণ বলি দিলেন। মৃত্যুর পর তথায় ইনি

আহারের পর সংবাদ-পত্র পাঠ

সামরিক সম্মান পাইয়াছিলেন। ফ্ল্যাণ্ডারসের এলবার্ট নগরে এই বাঙ্গালী যুবকের নাম ও রেজিমেণ্টের নাম লিখিত ক্রুশ্ চিহ্নিত একটি সামান্য কবরে এই বাঙ্গালী যুবকের দেহাবশেষ প্রোথিত আছে।

যোগীন্দ্রনাথের যুদ্ধে যাইবার জন্য নাম লিখানর সংবাদ পাইয়া যখন তাঁহার বৃদ্ধ পিতার পক্ষ হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে নিবৃত্ত হইবার জন্য পত্র লেখেন, তখন তিনি অগ্রজকে লিখিয়াছিলেন,—"আমি ফিরিয়া গিয়া বাঙ্গালীর মুখে চুণ কালি দিতে পারিব না।" এই যুবকের মৃত্যুতে সম্রাটের সহানুভূতি প্রকাশের কথা, লর্ড্ কিচনার তদীয় অগ্রজ ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে জানাইয়াছেন। তাঁহার ব্যবহৃত ঘড়ি চশমা প্রভৃতি দ্রব্যাদি যত্ন সহকারে পাঠাইয়া দিয়াছেন। যোগীন্দ্রনাথের বহু গুণ-কীর্ত্তনসহ তাঁহার রেজিমেণ্টের অফিসার ও তাঁহার অধ্যাপকগণের কতিপয় পত্রও যতীন বাবু পাইয়াছিলেন।

যতদূর জানা গিয়াছে, ইনিই বিগত মহাযুদ্ধে হত বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম। এত বড় যুদ্ধে প্রথম বাঙ্গালী সন্তান যিনি বুকের রক্তে ইয়োরোপের রণাঙ্গন রঞ্জিত করিয়াছেন, তিনি চন্দননগরের অধিবাসী। চন্দননগরের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, আমরা এখনও তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য চেষ্টিত হই নাই। তাঁহার একখানি সামান্য ভাবের প্রতিকৃতি মাত্র স্থানীয় নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত আছি। আর সেই গৌরবের আধার বীর যুবকের প্রাণহীন নশ্বর দেহাবশেষ আত্মীয়-বন্ধুহীন দেশের জনশূন্য প্রান্তরের মৃত্তিকাতলে পড়িয়া কালের প্রভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। একজন সাধারণ সৈনিকের প্রাপ্য যাহা কিছু সম্মান তাহা দিতে ইংরাজরাজ একটুও কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। আর তাঁহার দেশবাসী আমরা এই নয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার যোগ্য স্মৃতি-রক্ষাকল্পে, তাঁহার মৃৎসমাধি পাকা করিবার জন্য বা সহরের কোন প্রকাশ্য স্থানে তাঁহার একটি প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপন, অথবা একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য কিছুই করিলাম না। কোন মহাপুরুষের স্মৃতির পূজা করিলে তৃপ্তি আমাদের, মুখোজ্জ্বলও আমাদেরই। নচেৎ মহাপুরুষদের কি আসিয়া যায়। চন্দননগরের স্বেচ্ছা-সৈনিকগণের উক্ত স্মৃতিমন্দিরে দুইখানি প্রতিকৃতি রক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু এ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। যে যুবকদের কার্য্যে বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক-কালিমা প্রক্ষালিত হইয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল হইয়াছে বলিয়া তৎকালে বহু সংবাদপত্র ও নেতৃবর্গ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, যদি তাঁহাদের যোগ্য সম্মান প্রদর্শন বা স্মৃতি রক্ষায় আমরা পরাঙ্মুখ হই, তবে আমাদের গর্ব্ব বৃথা, আমরা মনুষ্যত্ববর্জ্জিত।

কালোর আলো

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ

১

গরীব কেরাণীর সংসারটা অচল হয়ে উঠ্‌ত অনেক সময়ে। ছোট্ট বাড়ীখানি ঘিরে অর্থের অভাব একটা দারুণ অশান্তি নিয়ে এই কেরাণী পরিবারের শান্তিটা হরণ করে ফেল্‌তে চাইত। চালের অভাব, তেলের অভাব, পরিবারের সাড়ীর অভাব, খুকীর জামা-কাপড়ের অভাব, এমনি একটা না একটা অভাব গরীব তপনের মনটাকে অস্থির করে তুল্‌ত দিনের পর দিন। ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে সন্ধ্যার সময় খোলা ছাতটুকুতে শুয়ে-শুয়ে সে তার ক্লান্ত, দীর্ঘ জীবনের ইতিহাসটা আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে দেখ্‌ত। একটা বিফলতার দৈন্য সে ইতিহাসটার পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে।

তার চোখ দুটো জলে ভরে চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করে উঠ্‌ত। তার জন্মানটাই বৃথা হয়ে গিয়েছে। উচ্চ শিক্ষিত সে উচ্চ বংশের ছেলে; আজ একটা দীন কেরাণী হয়ে তার মূল্যবান জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। কত আশা, কত সুখের কল্পনা তার নবীন জীবনে উল্লাসের সঞ্চার করত; ভবিষ্যৎ সাফল্যের উজ্জ্বল চিত্র তার হৃদয় মন সঞ্জীবিত করত। কিন্তু কার্য্য-ক্ষেত্রে সে সকলই মরীচিকার মত অন্তর্হিত হ'ল। সামান্য কেরাণীগিরিই তার সম্বল হ'ল।

এই নিত্য অভাবের সংসারটায় শুধু একটুখানি হাসিভরা শান্তি আন্‌ত ললিতা। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে এই মেয়েটী তার গরীব সংসারে যতটা সাধ্য স্বাচ্ছন্দ্য আন্‌বার চেষ্টা কর্‌ত। ছেঁড়া জামায় তালি দিয়ে, ময়লা কাপড় সাবান দিয়ে কেচে পরিষ্কার করে' সমস্ত যায়গায় সে একটী লক্ষ্মীর হাতের ছাপ লাগিয়ে রাখত। সারা দিন কঠিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় ললিতার সাহচর্য্যটুকু তপনের সমস্ত গ্লানিতে, সমস্ত ব্যথায় নিপুণ হাতের প্রলেপ লাগিয়ে দিত। তার কেরাণী-জীবনের দুঃসহ ক্লেশ এই লক্ষ্মী স্বরূপিনীর কোমল স্পর্শ যেন শীতল করে দিত। ক্ষণেকের জন্য সে তার দারিদ্র্য-দুঃখ ভুলে যেত।

গৃহে এই শান্তিটুকু না থাক্‌লে, এই মৃত-সঞ্জীবনী সুধা না থাক্‌লে তপন বোধ হয় এত দিনে পাগল হয়ে উঠ্‌ত......

২

ন'টার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তপন তখন আফিসে যাবার জন্য তৈরী হয়ে উঠেছে; ললিতা পান দুটো দিতে দিতে বল্‌লে,—"পার ত খুকীর জন্যে কিছু বিস্কুট কিনে এনো ওবেলা। জ্বরটা নেই, ক্ষিদে ক্ষিদে কর্‌ছে—"

—"হবে খ'ন"—বলে তপন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। দরিদ্র কেরাণীর মেয়ের আবার বিস্কুট কেনরে বাপ্! টপ্ টপ্ করে দু' ফোঁটা অশ্রুজল ছেঁড়া সার্টটার উপর ঝরে পড়্‌ল। আহা, রুগ্ন মেয়েটা সামান্য দুইখানি বিস্কুট চায়! কত সঙ্কোচেই তার মা সে কথাগুলো জানিয়ে দিলে! কিন্তু, তার যে অতি কষ্টে দিন-অন্নের সংস্থান হয়। মেয়েটার রুগ্ন মুখের দিকে চেয়ে তপনের বুক ফেটে যেতে লাগল। হায় হতভাগিনি, পৃথিবীতে এত স্থান থাকতে এই হতভাগ্যের গৃহে কেন এসেছিস্ মা!

পায়ের জুতোটার তলা উঠে যাচ্ছে; থাক্, ওটা ওমাসে সারালেই চল্‌বে। ছাতার কাপড়টাও দেখ্‌ছি এমাসে বদ্‌লান হয় না। সব পড়ে থাক্; যেমন করে হোক খুকীর বিস্কুটটা কিন্তু কিন্‌তেই হবে আজ!...

একটা মোটর ভ্যাঁক্ ভ্যাঁক্ শব্দ করে তার ধোয়া কাপড়খানায় একরাশ কাদা ছিটিয়ে দিয়ে চলে গেল। সেটার দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি ফেলে, একটা ছোট্ট নিশ্বাস চেপে রেখে তপন একেবারে ফুটপাথের একপাশ দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। রাস্তার একটা পেশাদার ভিখারী তার দিকে চেয়ে বল্‌লে,—"রাজাবাবু, একটা পয়সা।" কথাটা তার প্রাণে একটা ব্যঙ্গের মত ব্যথা দিলে। সমস্ত জগৎটাই তার পেছনে লেগেছে তার বিফল জীবনটাকে উপহাস করবার জন্য।

৩

সূর্য্য একেবারে ডুবে গিয়েছিল। ঘর্ম্মাক্ত তপন তাড়াতাড়ি করে বাড়ী ফিরছে। রুগ্ন মেয়েটা বিস্কুটের

জন্য পথ চেয়ে বসে আছে যে। সোনা-দানা নয়, হীরে মাণিক নয়—সামান্য দুখানি বিস্কুট! হায় হতভাগ্য জনক!

গলির মোড় ফিরতেই তপন দেখ্‌লে, তার বাড়ীর পাশের তেতলা বাড়ীটার সামনে একটা যুড়ী দাঁড়িয়ে। কদিনই এ বাড়ীতে জিনিসপত্র আস্‌ছিল—আজ বুঝি গৃহস্বামী এলেন। ঠিক তার দরিদ্র বাড়ীটার গায়েই ধনীর বিলাস লীলা চল্‌বে, এইটে ভেবেই তার মনটা যেন বিরক্ত ও সঙ্কুচিত হয়ে উঠ্‌ছিল।

তাড়াতাড়ি পাশ কাটাতেই কে একজন ডাক্‌লে,—"আরে কেও, তপন না কি?"

তপন ফিরে দেখলে, একটা মোটাসোটা ভদ্রলোক, খুব মিহি চুড়িদার পাঞ্জাবী গায়ে, পাশের কয়েকজনকে কি যেন উপদেশ দিচ্ছেন। তপন ভাল করে চেয়ে দেখ্‌লে, তারই বাল্যবন্ধু যোগেশ। স্কুলে একসঙ্গে পড়ত; বার-কয়েক মাট্রিকুলেশন ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল।

তারই হঠাৎ এত ঐশ্বর্য্য দেখে তপন একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে,—"কি খবর যোগেশ, হঠাৎ রাতারাতি বড়লোক হয়ে পড়্‌লি যে?"

একটু হেসে যোগেশ বল্লে,—"আর ভাই, এক অগাধ পয়সাওয়ালা বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে কপাল ফিরে গেছে। এই বাড়ীখানা পেয়েছি। এত দিন ভাড়াটে ছিল, তাই আসা হয়নি। তুমি পাশেই থাক না কি? বেশ বেশ, পড়শী হওয়া গেল। ভাবছ কি দাদা? বরাৎ, বরাৎ, সবই বরাতে করে—" বলে লোকটি একেবারে উচ্চহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল।

—"হ্যাঁ, তা ত ঠিকই"—বলে তপন একরকম ছুটেই বাড়ীর ভিতর গিয়ে পড়্‌ল।

ললিতা জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ গা, বিস্কুট এনেছ?"

তীব্র কর্কশকণ্ঠে তপন বলে উঠ্‌ল,—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ। এমন অদৃষ্ট করে এসেছিলাম যে একটা পয়সা পেলুম না শ্বশুরের। আর কত লোক শ্বশুরের বিষয় পেয়ে বরাৎ ফিরিয়ে ফেল্‌ছে।"—বলে সে বিস্কুটের বাক্সটা ললিতার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

কথাগুলো ললিতাকে বড় জোরেই বাজল। তার দরিদ্র পিতামাতার কথা মনে পড়ল: কি করবেন তাঁরা—তাঁদের যে কিছু নেই! রুগ্ন মেয়েটাকে বুকে চেপে ধরে সে স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার রান্নাঘরটায় নীরবে বসে রইল। রুদ্ধ অশ্রু চোখ ফেটে বেরিয়ে আস্‌তে চেয়েছিল কি না কে জানে?

৪

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তপনের আজ আর কিছুই ভাল লাগছিল না। ছেঁড়া মাদুরটা পেতে সে ছাতে শুয়ে রইল। পাশের বাড়ীতে সব ঘরগুলো বিজলীর আলোতে ঝলসে যাচ্ছে। তার মনে যোগেশের উৎফুল্ল কণ্ঠটা থেকে থেকে জেগে উঠ্‌ছিল—"বরাৎ, দাদা, বরাৎ।"

পাশের বাড়ীতে যোগেশের হাঁক-ডাকটা কমে এসেছিল। তপন ভাব্‌ছিল, কি সুখী ও। যদি সে আজ একটা ওর মত ধনীর মেয়ে বিয়ে করত! জীবনটা তার নতুন করে তেতো হয়ে উঠ্‌ল।

পাশের বাড়ীর উপরের ঘর থেকে একটী নারী-কণ্ঠ তখন তীক্ষ্ণস্বরে চাৎকার করে বল্‌ছে আর কাকে উদ্দেশ করে—"যাও, আমি ওসব কিছু দেখ্‌তে পারব না বলে দিচ্ছি। যাও, সব গুছিয়ে রাখগে। একটা গরীবের মেয়ে বিয়ে করতে পারনি, সে তাহলে তোমার দাসীর কাজ করত। আমি তোমার দাসীগিরি করতে আসিনি। আমি কিছু করতে পারব না।"......

ললিতা এসে ডাক্‌ল,—"ওগো, খাবে এস, ভাত দিয়েছি।" একটা স্নিগ্ধ আনন্দে তপনের মনটা তখন ভরে গিয়েছিল। তার মনে হোলো কার ঐশ্বর্য্য দেখে সে হিংসায় পুড়ে মরছিল। যোগেশের চাইতে সে শতগুণে অধিক সুখী—তার গৃহে যে ললিতা একাধারে তার গৃহলক্ষ্মী, তার অন্নলক্ষ্মী, তার প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী! চাই না ধনীর ঐশ্বর্য্য;—আমার ললিতা! সে আবেগভরে ললিতার হাত দুটী চেপে ধরে বল্‌লে, "লতা! রাগ কোরো না। না বুঝে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি। আমার শ্বশুর আমাকে যে ধন দিয়েছেন, কুবেরের ভাণ্ডারেও তা নেই।" বলে ললিতাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে।

ললিতার দুফোঁটা চোখের জল আনন্দ হয়ে ঝরে পড়্‌ল তপনের হাতের উপর।

জীবের উৎপত্তি

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, ভাষাতত্ত্বরত্ন, এম-এ

আমাদের পাঁচটী ইন্দ্রিয় আছে। ইহাদের দ্বারাই আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতিই সকল জ্ঞানের আধার। কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতি দ্বারা বস্তু সকলের যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান জন্মে না। কোনো বস্তুকে আমরা দেখি; এই দর্শনক্রিয়া চক্ষুর সাহায্যে হয়। যদি চক্ষু না থাকিত, তাহা হইলে ঐ বস্তুর সত্তার জ্ঞান জন্মিত না। দেখিবার কারণ, বস্তু; এবং দেখা, কার্য্য। আমরা কার্য্যের উপলব্ধি করি; কিন্তু বস্তু, যেটী কারণ, তাহার যথার্থ জ্ঞান আমাদের জন্মে না। সেটী অজ্ঞাত। এই উক্তি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে না যে বস্তুর, অর্থাৎ কারণের, যথার্থ সত্তা নাই। বস্তুর যথার্থ সত্তা কি? বস্তুর যথার্থতার জ্ঞানও এক প্রকারের অনুভূতি। যে বস্তুর জ্ঞান অনুভূতিতে স্থায়ী হয়, তাহাই যথার্থ। সন্ধ্যাকালের অস্পষ্ট আলোকে আপনি কোন পরিচিত লোককে কোন স্থানে দেখিলেন। কিন্তু আপনার সন্দেহ হইল, তিনিই কি না। অতএব আপনি তাঁহাকে আর একবার দেখিলেন। এবারও তিনি বলিয়া বোধ হইল। আবার সন্দেহ হইল। তৃতীয়বার দেখিয়া নিশ্চয় হইল যে, তিনিই। বারম্বার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবার পর সকল অবস্থাতেই যাহার স্থিতি আছে তাহাই যথার্থ বা বাস্তব।

চিন্তা সম্বন্ধ-মূলক। সাদৃশ্য ও ভিন্নতার জ্ঞান হইতে সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মে। দুই প্রকারের সম্বন্ধ পাওয়া যায়। সূর্য্যোদয়ের পর মধ্যাহ্ন আসে, পরে সূর্য্যাস্ত হয়। ইহাতে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা হওয়া, অর্থাৎ পারম্পর্য্য পাওয়া যায়। পারম্পর্য্য এক প্রকারের সম্বন্ধ। ইহাকে কালিক সম্বন্ধ বলে। আর এক প্রকারের সম্বন্ধ আছে, যাহাতে বস্তু সকলের একত্র থাকার সম্বন্ধ পাওয়া যায়। ইহা স্থানমূলক সম্বন্ধ। ইহাকে দৈশিক সম্বন্ধ বলে।

দ্রব্য কি? দ্রব্যে স্থানের লক্ষণ পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত রোধকতাও পাওয়া যায়। রোধকতাই দ্রব্যের বিশেষ লক্ষণ। আপনি হাত বাড়াইতে বাড়াইতে দেওয়াল পর্য্যন্ত পৌছিলেন। আপনি আর অধিক দূর যাইতে পারিবেন না, কারণ দেওয়ালে আপনার রোধ হইবে। ইহাই দেওয়ালের রোধকতা। দ্রব্যের রোধকতা ছাড়িয়া

দিন; ইহা কেবল স্থান-বোধক হইয়া যাইবে। এখন, এই রোধকতা কি? ইহাতে বলের উপলব্ধি হয়। দ্রব্য আমাদের পেশিসমূহের বলের রোধ করে। অতএব বল-জ্ঞানের আকারে দ্রব্য-জ্ঞান অনুভূতিতে উপস্থিত হয়। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে বলসমূহের বিশেষ বিশেষ পারস্পরিক সম্বন্ধ হইতে দ্রব্যের জ্ঞান জন্মে। যদিও দ্রব্যজ্ঞানে সম্বন্ধ সূচিত হয়, তথাপি দ্রব্যের স্বাধীন সত্তা আছে। যাহা হউক পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিচারে বস্তুসকলকে স্থান-ব্যাপক এবং রোধক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এখন, গতি কাহাকে বলে তাহা জানা আবশ্যক। গতির অনুভূতিতে তিনটী উপাদান পাওয়া যায়—দেশ, কাল ও দ্রব্যের অনুভূতি। সম্বন্ধযুক্ত কতকগুলি অবস্থার পারম্পর্য্যের অনুভূতিকে গতি বলে। গতির অনুভূতি বলসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধের অনুভূতির আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবদেহের অংশসমূহের পরস্পরের সম্বন্ধ হইতে যে সকল গতি উৎপন্ন হয়, তাহাদেরই অনুভূতি জীবে প্রথমে উৎপন্ন হয়। এই সকল পৈশিক অনুভূতি দেশ ও কালের অনুভূতির সহিত পুষ্ট হইয়া একটী সামান্য অনুভূতিতে পরিণত হয়।

কতকগুলি বিষয় এত পরিচিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। দ্রব্যের অনশ্বরতা তাহাদের মধ্যে একটী। দ্রব্য সদ্‌বস্তু। "নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" অতএব দ্রব্যের ধ্বংস হইতে পারে না। সাধারণতঃ যাহাকে আমরা ধ্বংস বলিয়া থাকি, উহা যথার্থ ধ্বংস নয়, তাহা দ্রব্যের রূপান্তর মাত্র। মোমবাতী জ্বলিয়া গেলে তাহার আকারের লোপ হয়, কিন্তু উহাতে যে যে দ্রব্য ছিল, তাহাদের বিনাশ হয় না, তাহারা কেবল অন্য আকারে অবস্থান করে।

গতিরও ধ্বংস হয় না। গতি কেবল রূপান্তরিত হইতে পারে,—এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে সঞ্চালিত হয়, অথবা এক আকার হইতে অন্য আকারে পরিবর্ত্তিত হয়। দস্তা ও গন্ধক-দ্রাবকের সংযোগে রাসায়নিক ক্রিয়া হয়। ইহা গতির একটী উদাহরণ। অবস্থা ভেদে ইহা হইতে তড়িৎ উৎপন্ন হইতে পারে। তড়িৎও এক প্রকারের গতি। তড়িৎ হইতে আলোক ও উত্তাপ উৎপন্ন হয়। আলোক ও উত্তাপ দুই প্রকারের গতি। তড়িতের গতি এঞ্জিন ও ট্রামগাড়ির গতিতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। নিউটন গতির তিনটী নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে প্রথমটী এই—যে বস্তু অচল সে চিরকাল অচলই থাকিবে, এবং যে বস্তু কোনো দিকে সচল সে চিরকাল সেই দিকেই সচল থাকিবে, যদি তাহার উপর অন্য কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ না হয়। গতি কখনো কখনো সঞ্চিত বা অব্যক্ত থাকে।

এই বিশ্বে আমরা সর্ব্বত্র কেবল দ্রব্য ও গতির খেলা দেখিতে পাই। আমরা যে সকল বস্তু বা যে সকল ক্রিয়া দেখিতে পাই, তাহাদের উৎপত্তি, দ্রব্য ও গতির কোনো না কোনো প্রকারের সংযোগ হইতে, অথবা এক প্রকারের সংযোগের অন্য প্রকারের সংযোগে পরিবর্ত্তন হইতে, হইয়া থাকে। নানা বিজ্ঞানে যে সকল বস্তুর আলোচনা হইয়াছে, তাহাদের পূর্ব্বের অবস্থার বিচার করিলে দেখা যায় যে, সকল বস্তুর উপাদানই প্রথমে বিস্তারের অবস্থায় ছিল এবং পরে ঘনীভূত হইয়াছে। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিবার কারণ আভ্যন্তরিক গতি। অতএব বস্তুসকলের প্রাথমিক অবস্থায় তাহাদের আভ্যন্তরিক গতি অধিক থাকে। যেমন যেমন এই গতি কমিতে থাকে, তেমনি তেমনি তাহারা ঘন হইতে থাকে। তাহাদের মধ্যে গতি ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া অব্যক্ত হইয়া যায়, কিম্বা আকাশে বিকীর্ণ হইয়া যায়। আবার, ঘন বস্তু কোনো আভ্যন্তরিক গতির বৃদ্ধি হেতু বিস্তার ভাব প্রাপ্ত হইয়া বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পরিণত হয়। এই নিয়ম সর্ব্বব্যাপী। বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি, পরিবর্ত্তন, গতি, লয় ইত্যাদি সব বিষয়েই এই নিয়ম পাওয়া যায়। বিশ্বের সর্ব্বত্র, হয় সৃষ্টি না হয় লয় হইতেছে। মধ্যবর্ত্তী স্থিতিশীল অবস্থা থাকা অসম্ভব। সৃষ্টির অর্থ, বিস্তারের অবস্থা হইতে ঘনীভূত হইয়া অবয়ব ধারণ করা, এবং লয়ের অর্থ, বিশিষ্ট ঘনীভূত অবস্থা হইতে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া যাওয়া।

প্রায়ই দেখা যায়, একই বস্তুতে এক প্রকারের গতির হ্রাস এবং অন্য প্রকারের গতির বৃদ্ধি উভয়ই একসঙ্গে চলিতেছে। উত্তাপ এক প্রকারের গতি। এই গতি উত্তপ্ত বস্তুর অণুসমূহের মধ্যে উৎপন্ন হয়। বালির একটী কণা হইতে বড় বড় গ্রহ উপগ্রহ পর্য্যন্ত সকল বস্তুই অন্য

বস্তু হইতে উত্তাপ গ্রহণ করে এবং নিজের উত্তাপ বিকীর্ণও করে। উত্তাপ গ্রহণ করার ফলে পাতলা, এবং বিকীর্ণ করার ফলে ঘন হইয়া যায়। ইহার এক উদাহরণ মেঘ। মেঘে বাহির হইতে কোনো দ্রব্য প্রবেশ করে না। কিন্তু সজীব দেহের সঙ্কোচন প্রসারণে বাহিরের দ্রব্য অর্থাৎ খাদ্য প্রবিষ্ট হইয়া দেহ গঠিত করে। যদি ক্ষয় অপেক্ষা নির্ম্মাণ ক্রিয়া অধিক হয়, তাহা হইলে সজীবতা থাকে। কিন্তু যদি নির্ম্মাণ অপেক্ষা ক্ষয় অধিক হয় তাহা হইলে ক্রমশঃ মৃত্যু হয়।

এই বিশ্বের সৃষ্টিতেও দ্রব্য এবং গতির সংযোগের উদাহরণ পাওয়া যায়। পণ্ডিতদিগের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, দ্রব্য ঘনীভূত হইয়া এবং গতি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এই সৌর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। বাষ্পময় নীহারিকা হইতে প্রত্যেক নক্ষত্রের জন্ম হইয়াছে। বাষ্পময় নীহারিকা ঘন হইয়া নক্ষত্রে পরিণত হয়। আমাদের সূর্য্যও একটী নক্ষত্র। ইহার জন্মও বাষ্পময় নীহারিকা হইতে হইয়াছে। ইহা প্রথমে অর্থাৎ বাষ্পময় অবস্থায় অতি বিস্তৃত ছিল। ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া গ্রহ-উপগ্রহ বিশিষ্ট একটী জগতে পরিণত হইয়াছে।

এই বাষ্পরাশির মধ্যেও গতি ছিল। তাপের বিকীরণ এবং দ্রব্যের সঙ্কোচন বশতঃ ইহা যেমন যেমন ঘন হইতে লাগিল, তেমনি তেমনি আলোড়িতও হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ইহা এমন একটী গতিবিশিষ্ট হইল যে ইহা নিজের ভারকেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। প্রদক্ষিণ করিবার গতি পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে। বাষ্পরাশির আয়তনের হ্রাস হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার আবর্ত্তনের বেগ বাড়িতে লাগিল। যে পরিমাণে ইহার বেগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কেন্দ্রাপসরণ বেগও সেই পরিমাণে বাড়িতে লাগিল। এই কারণে নিরক্ষ-দেশ ঠেলিয়া উঠিল এবং মেরুপ্রদেশ চাপিয়া গেল। কেন্দ্রাপসরণ বলের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিবশতঃ স্ফীত নিরক্ষের তরল পিণ্ডের বাহিরের অংশ পৃথক্ হইয়া অবিচ্ছিন্নাবস্থার বেগে মধ্যস্থ পিণ্ডকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতে থাকিল। স্বল্পায়তন হওয়াতে অভ্যন্তরের তরল পিণ্ডের বেগ বাড়িয়া গেল। বিচ্ছিন্ন বহিস্থ চক্র অপেক্ষাকৃত অল্প বেগে ঘুরিতেছিল। তাহার কোনো স্থান দুর্ব্বল হইয়া সেই স্থানে চক্রটী কাটিয়া গেল। কাটিবামাত্র তাহার সমস্ত দ্রব্য এক স্থানে জমিয়া গিয়া পিণ্ডাকার ধারণ করিল এবং মধ্যস্থ বড় পিণ্ডকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিল। ইতিমধ্যে ছোট পিণ্ডটীতে আর একটী গতি উৎপন্ন হইয়া পড়িল। এই গতি প্রাপ্ত হইয়া সে নিজ মেরুদণ্ডকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। এই প্রকারে গ্রহ ও উপগ্রহগণের উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের পৃথিবী সূর্য্যের একটী গ্রহ, এবং চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। অতএব আমাদের এই পৃথিবী একটী বৃহৎ পিণ্ডাকার পদার্থ। ইহার বাষ্পময় অবয়ব ঘন হইয়া প্রথমে তরল হইয়াছিল। পরে ঐ তরল ও উষ্ণ দ্রব্যের তাপের বিকীরণে উহার উপর একটী ছাল পড়িয়াছিল। এই ছালের নীচে উত্তপ্ত তরল পদার্থ রহিয়া গেল। তাহার তাপ বিকীর্ণ হইতে হইতে ছালটী পুরু হইতে লাগিল। ছালের উপর যে বাষ্পরাশি থাকিয়া গিয়াছিল, তাহা ঘন হইয়া জলরাশিতে পরিণত হইল। এই জল কঠিন আবরণের উপর সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল। আভ্যন্তরীণ তাপের বিকীরণ বশতঃ পৃথিবীর দেহের সঙ্কোচ হইতে লাগিল। এই সঙ্কোচ বশতঃ আবরণটী কোথাও উঁচু হইয়া গেল ও কোথাও বসিয়া গেল। জলরাশি উচ্চ স্থানগুলি হইতে সরিয়া গিয়া নিম্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। যে সকল স্থানে জল একত্র হইল সেই সকল স্থান সমুদ্র, এবং উচ্চ ও শুষ্ক স্থানগুলি স্থল।

বায়বীয়, তরল এবং কঠিন এই তিনের কোনো না কোনো আকারে যাবতীয় পদার্থ বিদ্যমান। যে সকল পদার্থের অণুসমূহ অধিক গতি বিশিষ্ট তাহারা বায়বীয়; আণবিক গতি কিছু কমিয়া গেলে তাহাদের তরল অবস্থা হয়, অধিক কমিলে কঠিন অবস্থা হয়। আণবিক গতি কমিয়া গেলে অণুসকল পরস্পরের নিকটস্থ হইয়া ঘন হয় এবং অধিক হইলে অণুসকল পরস্পর দূরবর্ত্তী হইয়া পাতলা হইয়া যায়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। অণুসকলের পুনর্গঠন দুই প্রকারের—মুখ্য এবং গৌণ। মুখ্য পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে গৌণ পুনর্বিন্যাসও চলিতে পারে। পদার্থের অণু-সমষ্টির পুনর্বিন্যাসকে মুখ্য পুনর্বিন্যাস বলে, এবং অণুমধ্যস্থ পরমাণুসকলের পুনর্বিন্যাসকে গৌণ পুনর্বিন্যাস বলে। যখন উভয় পুনর্বিন্যাসই এক সময়ে হইতে থাকে, তখন সেই পুনর্বিন্যাসকে যৌগিক নবিন্যাস বলে।

সজীব দেহে যৌগিক পুনর্বিন্যাস হয়। জীব দুই প্রকারের—উদ্‌ভিদ্ ও প্রাণী। ইহাদের মুখ্য উপাদান—কার্ব্বন, হাইড্রোজেন, অক্‌সিজেন, নাইট্রোজেন ও গন্ধক। কিন্তু কোনো কোনো জীবে অতি অল্প পরিমাণে ফস্‌ফরাস্, ক্লোরীন্, পোটেসিয়ম্, সোডিয়ম্ ক্যাল্‌সিয়ম্ ও ম্যাগনীসিয়ম্ পাওয়া যায়। কার্ব্বন, হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেনের যোগে শ্বেতসার, চিনি, সেলিউলোস্ ইত্যাদি কার্ব্বো-হাইড্রেটের অণু নির্ম্মিত হয়। কার্ব্বন ও হাইড্রোজেনের যোগে তেল, ঘি, চর্ব্বি ইত্যাদি স্নেহময় পদার্থের অণু নির্ম্মিত হয়। এবং কার্ব্বন, হাইড্রোজেন, অক্‌সিজেন ও নাইট্রোজেনের যোগে ডাল, মাংস ইত্যাদি প্রোটীনের অণু নির্ম্মিত হয়। প্রোটীন প্রাণীদিগের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

উপরি লিখিত মূল পদার্থগুলির পরমাণুসমূহের অসংখ্য প্রকারের সংযোগ হইতে জীব-দেহের অণু নির্ম্মিত হয়। সজীব দেহের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে সর্ব্বদা মুখ্য এবং গৌণ উভয় পুনর্বিন্যাসই হইতে থাকে। এই সকল পুনর্বিন্যাস হইতে তাহাদের দ্রব্যের এবং গতির পরিবর্ত্তন হয়। এই পরিবর্ত্তনকে মেটাবলিজ্‌ম্ বলে। প্রত্যেক প্রাণী কার্ব্বন-ডাইঅক্‌সাইড্ এবং শরীরের মল বাহির করিয়া দেয়। এঞ্জিনের খাদ্য কয়লা। কয়লা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। এই অগ্নির উত্তাপ দ্বারা জল হইতে বাষ্প উৎপন্ন হয়, এবং এই বাষ্পের গতি হইতে এঞ্জিনে গতি উৎপন্ন হয়। কিন্তু সজীব দেহে খাদ্য হইতে শক্তি উৎপন্ন হওয়া ব্যতীত দেহের পোষণোপযোগী পদার্থও উৎপন্ন হয়। এইজন্য খাদ্য ও শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজন হয়। খাদ্যে প্রধানতঃ স্নেহ পদার্থ, কার্ব্বো-হাইড্রেট ও প্রোটীন থাকে। খাদ্য যৌগিক পদার্থ। তাহাদের নির্ম্মাণের সময় উহাদের উপাদানে গতি সঞ্চিত হইয়াছিল। যখন খাদ্য জীবদেহে শরীরের পোষণোপযোগী সরল সংযুক্ত পদার্থ সমূহে বিশ্লিষ্ট হয়, তখন উহার সঞ্চিত গতি বা শক্তি হইতে কতকটা শরীরের নির্ম্মাণের নিমিত্ত আবশ্যক হয়, কতকটা তাপের আকারে উন্মুক্ত হয় এবং কতকটা জীব-দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গতি উৎপাদন করিবার জন্য সঞ্চিত হয়। প্রাণীদিগের খাদ্য হয় উদ্‌ভিদ্, না হয় অন্য প্রাণী, না হয় উদ্‌ভিজ্জ বা প্রাণিজ। মাংসভোজী প্রাণীর আহার উদ্‌ভিজ্জভোজী প্রাণী। সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত শক্তির সহায়তায় উদ্‌ভিদের খাদ্য সংগৃহীত হয়। এই গতি বা শক্তি উদ্‌ভিদে সঞ্চিত হইয়া যায়। অতএব পৃথিবীতে যত জীব আছে, তাহারা এক প্রকারে সূর্য্যের সন্তান। "সূর্য্য আত্মা জগত স্তস্থুষশ্চ"। জীব-দেহে দ্রব্য ও গতির কেবল আকারের পরিবর্ত্তন হয়, নূতন দ্রব্য বা গতির সৃষ্টি হয় না। জীব-দেহে সর্ব্বদা দ্রব্য এবং গতির যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহাকে মেটাবলিজ্‌ম্ বলে। মেটাবলিজ্‌ম্ না হইলে জীবন সম্ভব নয়, এবং জীবন না থাকিলেও মেটাবলিজম্ হইতে পারে না। যে মেটাবলিজ্‌ম্ দ্বারা দেহে উচ্চ শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ নির্ম্মিত হইয়া গতি বা শক্তি সঞ্চিত হয় তাহাকে এনাবলিজম্ বলে, এবং যাহা দ্বারা উচ্চশ্রেণীর যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া সরল যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং শরীরের মলে পরিণত হইয়া তাপ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, তাহাকে কেটাবলিজ্‌ম্ বলে। অতএব জীব-দেহে দুই প্রকারের যৌগিক পদার্থ থাকে। এক শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ শেষে উচ্চশ্রেণীর পদার্থ হইয়া শরীরে বল-সঞ্চয় করে, এবং অপর প্রকারের যৌগিক পদার্থ শেষে দেহের অনিষ্ট-কারী পদার্থে পরিণত হয়, যাহা হইতে বল পাওয়া যায় না।

যে পদার্থে এই উভয় প্রবাহের মিশ্রণ থাকে এবং সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, তাহা প্রোটোপ্লাজম্ বা প্রোটোপ্লাজমের সমূহ।

প্রোটোপ্লাজম্ আকারে বর্ণহীন অর্দ্ধতরল পদার্থ। অণুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে ইহা এক প্রকারের ঘন পদার্থ দ্বারা বেষ্টিত তরল পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। ইহাই সকল জীব-দেহের আধার এবং ইহাই সকল চঞ্চলতার কেন্দ্র। জীবনাভাবে প্রোটোপ্লাজম্ থাকিতে পারে না, এবং প্রোটাপ্লাজমের অভাবে জীবন থাকিতে পারে না।

প্রোটোপ্লাজম্ কোষের আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। কোষগুলি খুব ছোট, এবং প্রত্যেক কোষমধ্যস্থ দ্রব্যের একটী করিয়া কেন্দ্র (nucleus) থাকে। কোনো কোনো জীব একটী কোষ দ্বারা এবং কোনো কোনো জীব একাধিক কোষ দ্বারা নির্ম্মিত। বড় বড় বৃক্ষে এবং জীবে প্রোটোপ্লাজমের অসংখ্য কোষ থাকে। মেটাবলিজমের ক্রিয়া প্রোটোপ্লাজমের মধ্যেই হইয়া থাকে। এই ক্রিয়া দ্বারা

মুক্তির ডাক

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র

B. H. P. Works.

যখন কোষের অধিক বৃদ্ধি হয়, তখন তাহা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। কোষের কেন্দ্রও দুই খণ্ডে বিভক্ত হয় এবং অংশের মধ্যস্থলে একটী পর্দ্দা পড়িয়া যায়। এই পর্দ্দা কোষের দেওয়ালের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়, এবং তখন একটীর স্থলে দুইটী কোষ হইয়া যায়। প্রত্যেক নূতন কোষেও পুরাতন কোষের ন্যায় প্রোটোপ্লাজমের কেন্দ্র ও অন্যান্য দ্রব্য বর্ত্তমান থাকে। এই প্রকারে জীব-শরীরের বৃদ্ধি হয়।

উদ্ভিদ্ নির্জীব বস্তু হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া নিজ দেহের পুষ্টিসাধন করিতে পারে। উহা বায়ু এবং মাটী হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু প্রাণিগণের এ শক্তি নাই। ইহাকে সজীব পদার্থ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয়। প্রাণীদের দেহের নিমিত্ত প্রোটীনের প্রয়োজন। খাদ্যে প্রোটীন না থাকিলে প্রাণিগণের প্রোটোপ্লাজম্ নূতন প্রোটোপ্লাজম্ উৎপন্ন করিতে পারে না। কার্ব্বো-হাইড্রেট ও স্নেহময় পদার্থ হইতে কেবল কার্য্যকরী শক্তি সঞ্চিত হয়, দেহ বলবান্ হয় না।

সজীব পদার্থের তিনটী বিশেষ লক্ষণ—(১) উত্তেজনা দ্বারা চঞ্চলতা প্রাপ্ত হওয়া, (২) বৃদ্ধি হওয়া, এবং (৩) উৎপাদনের শক্তি থাকা। মেটাবলিজমই এই তিনের কারণ। যদি এনাবলিজমের ক্রিয়া কেটাবলিজমের ক্রিয়া অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে প্রোটোপ্লাজমের বৃদ্ধি হয়, শরীরের পুষ্টি হয় এবং উৎপাদনের শক্তি থাকে। যদি কেটাবলিজমের ক্রিয়া এনাবলিজমের ক্রিয়া অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে ক্ষয় হয় এবং শেষে মৃত্যু হয়। মেটাবলিজমের নিমিত্ত যথেষ্ট খাদ্য, জল, উন্মুক্ত অক্‌সিজেন এবং উপযুক্ত উত্তাপ আবশ্যক। ক্ষয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য দ্রব্যকে দ্রব করিবার জন্য জলের আবশ্যকতা। খাদ্যকে দগ্ধ করিবার জন্য উন্মুক্ত অক্‌সিজেনের প্রয়োজন। মেটাবলিজমের জন্য সীমাবদ্ধ উত্তাপও, অর্থাৎ যতটুকু প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অধিকও নয় কমও নয় এরূপ উত্তাপ, আবশ্যক। মেটাবলিজম্ ক্রিয়ার জন্য কতকগুলি বিশেষ প্রকারের প্রোটীন আবশ্যক, যাহাদের সাহায্যে রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে পারে। ইহারা বীজস্বরূপ এবং ইহাদের পরিবর্ত্তন হয় না। অতএব জীবন এমন একটী অবিশ্রান্ত ধারা, যাহাতে উচ্চ শ্রেণীর যৌগিক পদার্থ নির্ম্মিত হইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে, যাহার সঞ্চিত শক্তি হইতে নির্জীব দ্রব্য সজীবে পরিণত হইতেছে, এবং পুনরায় নির্জীব হইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে প্রোটোপ্লাজমের ক্রিয়ার নিমিত্ত শক্তি রাখিয়া যাইতেছে।

প্রোটোপ্লাজমের দ্রব্যে সদা পরিবর্ত্তন হয়। অতএব ইহা অস্থায়ী অবস্থায় থাকে। সেইজন্য সামান্য উত্তেজনাতেই ইহার দ্রব্য চঞ্চল হইয়া পড়ে। উত্তেজনা বাহির হইতেও আসিতে পারে এবং ভিতর হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে। উত্তেজনা হইতে নূতন নূতন পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। উত্তেজনা হইতেই নিকটস্থ দ্রব্যের সহিত প্রোটোপ্লাজমের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, এ যুগে আমরা যে সকল জীব দেখিতে পাই, তাহারা কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে? ইহার পশ্চাতে একটী দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এখানকার জীবে এবং প্রাথমিক যুগের জীবে অনেক প্রভেদ। প্রোটোপ্লাজমের ক্রমিক বিবর্ত্তনে জীব-জগৎ আধুনিক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রথমের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। জীবগণের উপাদান এবং পরিবর্ত্তনের ধারার পর্য্যবেক্ষণ করিলে এরূপ অনুমান হয় যে, সুদূর অতীতে যখন পৃথিবীর অবস্থা সুবিধা-জনক ছিল, এবং এখনকার অবস্থা হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন ছিল, তখন সজীব প্রোটোপ্লাজমের উৎপত্তি হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সে অবস্থা আর ফিরিয়া আসিবে না। সে সময়ে তাপ, চাপ, আর্দ্রতা এবং অন্যান্য অবস্থা এরূপ ছিল যে, আপনা হইতেই নানা প্রকারের উচ্চশ্রেণীর যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব ছিল। যে যে যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি অস্থায়ী ছিল,—যেমনি যেমনি উৎপন্ন হইতেছিল তেমনি তেমনি বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতেছিল। কতকগুলি ভাঙ্গিতেছিল, আবার গড়িতেছিল। এই অবস্থায় কতকগুলি স্থায়ী হইয়া গেল। যখন একবার স্থায়ী হইয়া গেল, তখন উহাদের মধ্যে যাহাদের টি'কিয়া থাকিবার শক্তি অধিক ছিল, তাহারা চিরকালের জন্য স্থায়ী হইয়া গেল। নিকটের সরল যৌগিক পদার্থ হইতে তাহাদের পোষণ হইতে লাগিল। ইহারাই প্রোটোপ্লাজমে পরিণত হইল। অতএব সম্ভব যে সর্ব্বাগ্রে

সমুদ্রে জীবের উৎপত্তি হইয়াছিল, কারণ প্রোটোপ্লাজমে যে যে উপাদান যে যে অনুপাতে পাওয়া যায়, সমুদ্র জলে সেই সেই উপাদান সেই সেই অনুপাতে বিদ্যমান। ইহার পর প্রোটোপ্লাজম কোষের আকার ধারণ করিল।

পূর্ব্বে যে বিবরণ দেওয়া হইল, তাহাতে এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের মতের অনুসরণ করা হইয়াছে। অন্য শ্রেণীর বিদ্বানেরা বলেন যে "না সতো বিদ্যতে ভাবঃ।" তাহারা বলেন অজীব হইতে সজীব উৎপন্ন হইতে পারে না। জীব হইতে জীবের উৎপত্তি হয়। জীব অনন্ত কাল হইতে বিদ্যমান। এখনকার জীবগণ পূর্ব্বের জীবগণের বিবর্ত্তনের ফল।

মনের প্রতিঘাত ও কর্ম্মফল

ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার

হিন্দুশাস্ত্রে কর্ম্মফল মানিয়া লওয়া হয়। হিন্দু-শাস্ত্রকারদের মতে, যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সে এ-জন্মেই হউক বা পর-জন্মেই হউক, তাহার ফলভোগ করিবে। মনের ক্রিয়াও নিগূঢ় ভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সময়ে সংসারে যে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ঘটিয়া থাকে, তাহা অনেকটা স্বখাত সলিলে ডুবে মরার মত অবস্থা। পূর্ব্বকৃত অন্যায় কার্য্য অনেক সময়ে পরবর্ত্তী কার্য্যে এমন এক ভঙ্গী দেয়, যাহা পূর্ব্বকৃত অন্যায় কার্য্যের শাস্তি যেন অনেক স্থলে অনিবার্য্য ভাবে আনয়ন করে। সুবিখ্যাত দার্শনিক লেখক এমার্সন তাঁহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দ্বারা এ-বিষয়ে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—

"মানবাত্মার মধ্যে এমন ন্যায়-বিচারের বীজ নিহিত আছে, যাহার ফল সদ্য-সদ্য এবং অমোঘ ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে কোনও সৎকাজ করে, সে সেই কার্য্যের দ্বারাই মহত্ব প্রাপ্ত হয়। কেহ কোনও নীচ কাজ করিলে, সেই কার্য্যের দ্বারাই সে হীন ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। যে অপবিত্রতা পরিহার করে, পবিত্র ভাব তাহাকে স্বতঃই অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে। অন্তরের সাধুতা হইতেই ঈশ্বরের তুল্যতা লাভ হয়। পরমাত্মার ভিতর যে ন্যায়-বিচারের বীজ নিহিত আছে, তাহা হইতেই সে পরমেশ্বরের বিহিত নিরাপদতা, অমরত্ব ও মহিমার অধিকারী। শঠ ব্যক্তি নিজেকেই প্রতারিত করিয়া থাকে এবং ক্রমশঃ সে নিজের সত্বার সহিতও অপরিচিত হইয়া উঠে। চরিত্র কখনও অজ্ঞাত থাকে না। চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা কেহ ধনী হইতে পারে না, ভিক্ষাদানের দ্বারা কেহ দরিদ্র হয় না। হত্যাকাণ্ড অতি সংগোপনে সংসাধিত হইলেও তাহা প্রস্তরের প্রাচীর ভেদ করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিবে।"

মনস্তত্বের ঘটনা কথায় বর্ণনা করা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলে অনেক সময় বিশদ ভাবে বুঝা যায়। পূর্ব্বের দুই একটি প্রবন্ধে যেরূপ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা হইয়াছে, এই প্রবন্ধেও সেই প্রথা অবলম্বন করা যাইবে; অর্থাৎ প্রথমে বিদেশী পুস্তক হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া—তৎপরে নিজের অভিজ্ঞতা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়াস পাইব। ডাক্তার ফ্রয়েডের (Freud) Psychopathology of Every-day life হইতে দুইটি গল্প নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

(১) ঘোড়ার গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া এক যুবতী স্ত্রীলোকের জানুর নীচে পা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং ইহার ফলে তাহাকে কয়েক সপ্তাহ শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু উল্লেখ-যোগ্য কথা এই যে, ইহাতে সেই স্ত্রীলোকটি কোনও রূপ যন্ত্রণা প্রকাশ করে নাই—সে তাহার দুর্ভাগ্য ধীর ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল।

এই দুর্ঘটনার পর হইতে তাহার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য-জনিত গুরুতর পীড়া হয়। অবশেষে মানসিক চিকিৎসায় সে আরোগ্য লাভ করে। চিকিৎসার সময় ঐ দুর্ঘটনাকে ঘিরিয়া যে সমুদায় ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি আবিষ্কার করি; এবং ইহার পূর্ব্বে এই রমণীর অন্তরে কিরূপ ভাবে রেখাপাত হইয়াছিল, তাহাও অনুধাবন করিবার চেষ্টা করি। এই স্ত্রীলোকটি তাহার ঈর্ষা-পরায়ণ স্বামীর সহিত তাহার এক বিবাহিতা ভগিনীর গৃহে অপরাপর ভ্রাতা-ভগিনী

ও তাহাদের পত্নী ও স্বামীর সহিত কিছু দিন যাপন করে। এক দিন রাত্রে এই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সমক্ষে সে তাহার নৃত্যকলা প্রদর্শন করে। তাহার সুনিপুণ 'Cancan' নামক নৃত্য দেখিয়া আত্মীয়-স্বজনগণ প্রীত হইল বটে, কিন্তু তাহার স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে পত্নীকে চুপি-চুপি কহিল,—"আবার তুমি গণিকার ন্যায় আচরণ করিতেছ।" এ কথার ফলও ফলিল। সে রাত্রে যুবতীটি নিদ্রাতেও সুস্থির হইতে পারিল না। পর দিন বৈকালে সে অশ্বযানে বেড়াইতে বাহির হইবে মনস্থ করিল। সে নিজেই পছন্দ করিয়া গাড়ীর ঘোড়া ঠিক করিয়া দিল। তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী, তাহার শিশু ও শিশুর ধাত্রীকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলে, সে গুরুতর ভাবে তাহার অসম্মতি জানাইল। গাড়ীতেও তাহার মানসিক চাঞ্চল্য দেখা গেল। সে শকট-চালককে বলিল,—ঘোড়া ক্রমশঃই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে; এবং ঘোড়া দুইটি সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ একটু অসংযমের ভাব দেখাইতেই, সে ভীত হইয়া গাড়ী হইতে লাফ দিয়া পড়িল, এবং ইহার ফলে তাহার পা ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু গাড়ীর ভিতরে যাহারা ছিল, তাহাদের কিছুই হইল না। এই ঘটনার বিবরণগুলি জানিবার পর ইহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায় যে, এই দুর্ঘটনাটি প্রকৃত পক্ষে স্বকৃত; এবং অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি-গ্রহণের ধরণটি দেখিয়াও বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। কারণ, ইহার পর অনেক দিন তাহার পক্ষে 'Cancan' নৃত্য করা অসম্ভব হইয়াছিল।

(২) কোনও মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এক কন্যার যথাসময়ে বিবাহ হয় এবং যথাক্রমে তিনটি পুত্র-কন্যা জন্মে। এই যুবতী স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য-জনিত পীড়ায় অল্প-অল্প ভুগিতেছিল, কিন্তু সে ইহার জন্য কোনও চিকিৎসাদি করায় নাই—কেন না, ইহাতে তাহার জীবন-যাত্রায় বিশেষ কিছু ব্যাঘাত ঘটিত না। এক দিন এই স্ত্রীলোকটি এক অসংস্কৃত রাস্তার উপর হোঁচট খাইয়া পড়ে, এবং পাশের বাড়ীর দেওয়ালে ধাক্কা খাইয়া তাহার মুখে আঘাত লাগে। তাহার মুখখানি ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, এবং চোখের পাতা নীলবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে। চোখের দৃষ্টির যদি কোনও ব্যাঘাত ঘটে, এই ভয়ে সে ডাক্তার ডাকে এবং আমি চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হই।

স্ত্রীলোকটি প্রকৃতিস্থ হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি—"কেন আপনি এই ভাবে পড়িয়া গেলেন?"

স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল—এই দুর্ঘটনার কিছু পূর্ব্বে সে তাহার স্বামীকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, যেন সে সতর্ক হইয়া রাস্তা চলে; কেন না, তাহার স্বামী তখন পায়ের গাঁটের বেদনায় ভুগিতেছিল। সে ইহাও বলিল, প্রায়ই সে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে, যে বিষয়ে সে অপরকে সাবধান করিয়া দেয়, ঠিক তাহাই তাহার নিজের পক্ষেই প্রায় ঘটিয়া থাকে।

আমি তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহা ছাড়া তাহার আর কিছু বলিবার আছে কি না।

এই স্ত্রীলোকটি বলিল—এই দুর্ঘটনার ঠিক পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে সে একটি দোকানে একখানি সুন্দর চিত্র দেখিতে পায়। ইহা দ্বারা তাহার শিশু-সন্তানের ঘর সাজাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ ছবিখানি কিনিবার তাহার ইচ্ছা হয়। সে তখন রাস্তার দিকে লক্ষ্য না করিয়া সেই দোকানটির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং এক পাথরের স্তূপে হোঁচট খাইয়া দেওয়ালের উপর পড়িয়া তাহার মুখে আঘাত প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে হাত দিয়া আত্মরক্ষা করিবার একটুও চেষ্টা করে নাই। আঘাত প্রাপ্ত হইয়াই তাহার ছবি কিনিবার ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ দূর হয় এবং সে বাড়ী ফিরিয়া আসে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন আপনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন না?"

সে উত্তর করিল—"বোধ হয় ইহা সেই ঘটনার শাস্তি, যাহা আমি আপনার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম।"

"সে ঘটনার কথা কি এখনও আপনাকে ক্লেশ দেয়?"

"হ্যাঁ। পরে আমি ইহার জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হই, এবং নিজেকে অপরাধী ও দুর্নীতি-পরায়ণ বলিয়া মনে করি।"

এই রমণী যে ঘটনার কথা আমার নিকট উল্লেখ করে, তাহা তাহার গর্ভপাতের বিষয়। ইহা তাহার স্বামীর অনুমতি অনুসারেই করা হয়। কারণ, তাহারা দুইজনেই, আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য আর যাহাতে সন্তান না জন্মিতে পারে, সেই ইচ্ছা করিয়া, এরূপ পাপ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল।

স্ত্রীলোকটি বলিল,—"আমি প্রায়ই নিজেকে এই বলিয়া তিরস্কার করিতাম যে, তুই নিজের সন্তানকে হত্যা করিয়াছিস্। আমার সর্ব্বদা এই ভয় হইত যে, এমন গুরুতর পাপের শাস্তিও আমাকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। আপনি বলিতেছেন, আমার চোখে কোনও গুরুতর আঘাত লাগে নাই। এখন আমি এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি যে, আমার পাপের উপযুক্ত শাস্তিই আমার লাভ হইয়াছে।"

এই দুর্ঘটনা এক পক্ষে তাহার পাপের প্রতিফলস্বরূপ হইতে পারে; এবং অপর পক্ষে যে গুরুতর শাস্তির প্রত্যাশায় এই রমণী ভীত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা দ্বারা সে তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া গেল, এরূপও হইতে পারে। যে মুহূর্ত্তে সে ছবি কিনিবার জন্য দোকানের দিকে দৌড়িয়া গিয়াছিল তখন তাহার পূর্ব্বকৃত অপরাধের স্মৃতি তাহার মনের ভিতর উদিত হইয়া হয় ত এই কথাই বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল—"তোমার নিজের শিশুর ঘর সাজাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইতে লজ্জা করে না? তুমি না নিজের সন্তানকে হত্যা করিয়াছ? তুমি হত্যাকারী—তোমার পাপের শাস্তির আর দেরী নাই।" এই চিন্তা অবশ্য তাহার জ্ঞাতসারে উদিত হয় নাই; এবং এই জন্যই সে পতনের সময় হাত দিয়া আত্মরক্ষা করিবারও চেষ্টা করে নাই।

এইবার যে দেশী ঘটনাগুলির উল্লেখ করিতেছি, তাহা কয়েকজন ডাক্তারের সম্বন্ধে।

(৩) মফস্বলের কোনও সহরে এক ডাক্তার থাকিতেন। তাঁহার স্ত্রী অতি সুন্দরী, শান্তস্বভাবা ও সুশীলা ছিলেন। কিন্তু ডাক্তারটির চরিত্র কলুষিত ছিল। তিনি প্রায়ই রাত্রে বাড়ী থাকিতেন না; অসৎসঙ্গে রাত্রি যাপন করিতেন। এক দিন তাঁহার পত্নী মনের দুঃখে Strychnia (কুঁচিলা বিষ) সেবন করিলেন। যখন সেই বিষের লক্ষণ প্রকাশ পাইল—তখন সেই ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার ডাক্তারের স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে লইয়া আসিতে বেশ্যাপল্লীতে ছুটিল। কিন্তু, ডাক্তার তখন বোধ হয় সহজ অবস্থায় ছিলেন না। অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও তিনি সে রাত্রে বাড়ী ফিরিলেন না। ফলে তাঁহার স্ত্রীর সেই রাত্রেই মৃত্যু হইল। ডাক্তার বাবুর ইহার পরও কোনও মানসিক বিকার বা চরিত্র সংশোধিত হইতে দেখা গেল না। যাহা হউক, কিছু দিন পরে তিনি পুনরায় বিবাহ করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী প্রথমা স্ত্রীর ন্যায় সুন্দরী ও শান্তস্বভাবা ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা ও তেজ ছিল। কারণ, তাঁহার আমলে ডাক্তার বাবুর রাত্রে বহির্বাসের অভ্যাস ত্যাগ করিতে হয়। এরূপও শোনা যায় যে, প্রয়োজন বোধ করিলে এই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ডাক্তার বাবুকে দুই এক ঘা প্রহার দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

এই উপলক্ষে প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইয়াছে, তাহার একটি কথা মনে পড়িতেছে। বঙ্গ-সাহিত্য আলোচনা করিলে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যকলাবিদ্ ভিন্ন অপর সাহিত্যিকগণের পুস্তকে প্রেমের এক রকম আলোচনাই দেখিতে পাওয়া যায়। নারীজাতি অতিশয় নম্র, পতিভক্তি-পরায়ণা—তাঁহাদের পতিসেবার আদর্শই অনেক স্থলে এই যে, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত কামুক পতিরও মনোরঞ্জনার্থ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বেশ্যালয়ে লইয়া যাইতে দ্বিধা করিলে চলিবে না। স্বামী দেবতাকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতে হইবে; এমন কি, ঈশ্বরাপেক্ষাও অধিক মান্য করিতে হইবে। তাহার সমস্ত লাঞ্ছনা, অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিতে হইবে। মোট কথা এই যে, নারীজাতির অন্যায় সহ্য করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট থাকিবে; অথচ অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা নীতি-বিরুদ্ধ বিবেচিত হইবে।

কিন্তু বাস্তবতন্ত্রী বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন যে, সংসারে প্রেমের আর একটি বিভিন্ন প্রকার আছে। স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে এইরূপ বশ্যতার ভাব প্রকাশে অনেক পুরুষের প্রেমের সম্বর্দ্ধনা হয় না। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'মৃণালিনীতে' গিরিজায়া ও দিগ্বিজয়ের প্রেম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, দিগ্বিজয় যে দিন গিরিজায়ার নিকট সম্মার্জ্জনীর আঘাত প্রাপ্ত হইত না, সে দিন তাহার মনে হইত, বোধ হয় গিরিজায়ার ভালবাসা লোপ পাইতেছে। এই আলেখ্যের মধ্যে বাস্তবিক সত্যের চিত্র আছে। অনেক পুরুষেরই স্বভাব এইরূপ যে, ভক্তি, মিনতি, স্তব-স্তুতি অপেক্ষা সম্মার্জ্জনার প্রহার বা তাহার প্রতীক কিছু তাহাদের অন্তরে শান্তি বা তৃপ্তি প্রদান করে, এবং ইহাতেই

তাহাদের যথার্থ প্রেমের বিকাশ হয়। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত অভিজ্ঞতা হইতে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এক ধনী বিধবা এক পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার এক মাত্র পুত্রের বিবাহ দেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রের মতিগতি অন্য দিকে যাইতেছে দেখিয়া, সেই বিধবাটি শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া তাঁহার পুত্রবধূকে নৃত্যগীতবাদ্যাদি অতি সুন্দর রূপে শিক্ষা দেন। তাহার পর পুত্রকে বলেন যে, বধূমাতাই যখন গীত, বাদ্য, নৃত্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছে, তখন আমোদ-প্রমোদের জন্য তাহার আর বাহিরে যাইবার প্রয়োজন কি? তাহাতে তাঁহার গুণধর পুত্রটি উত্তর করিল—তাহার স্ত্রী নৃত্যগীতাদিতে সুশিক্ষিতা হইয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি সে যে জাতীয় স্ত্রীলোকদের সহিত মেশে, তাহাদের মত বাপ-মা তুলিয়া অকথ্য গালিগালাজ করিতে তো আর পারিবে না। শ্বাশুড়ীটি যদি পুত্রবধূকে শিক্ষিতা করিবার বৃথা প্রয়াস না করিয়া, স্বামীকে শায়েস্তা করিবার জন্য সম্মার্জ্জনীর ব্যবহার শিক্ষা দিতেন—তাহা হইলে বোধ করি তাঁহার পুত্রের চৈতন্যোদয় হইলেও হইতে পারিত।

ফ্রান্স দেশে অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকেরা এক প্রকার রবারের চাবুক রাখে—প্রয়োজন মত তাহারা এই চাবুক ব্যবহার করে, এবং ইহার ফলে তাহাদের অনেক প্রণয়ীর তাহাদের প্রতি আকর্ষণও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

নীতি এবং ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও, অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া বা অন্যায় সহ্য করা যে যথার্থ পতিভক্তির নিদর্শন হইতে পারে—তাহা ভগবানের ন্যায়ধর্ম্মসঙ্গত বিধান বলিয়া মনে করা যায় না। এই ন্যায়ধর্ম্মের আদর্শ আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রচলনের অভাবই স্ত্রীলোকদের আত্মহত্যার বাহুল্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে যে কেরোশিনে কাপড় ভিজাইয়া পুড়িয়া মরা স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রচলিত হইতেছে—ইহার সহিত পূর্ব্বকালের সতীদাহের ভাব-সঙ্গতি (Association) আছে এইরূপ মনে হয়। কিন্তু পূর্ব্বকালের সতীরা যে পতির চিতায় আত্মদান করিতেন, এবং রাজপুত রমণীরা অগ্নিতে যেরূপ সতীত্বরক্ষার্থ আত্মাহুতি দিতেন, তাহাতে এক মহৎ আদর্শের প্রেরণা থাকিত। কিন্তু এখনকার আত্মহত্যা অধিকাংশ স্থলে পতি বা সংসারের উপর ক্রোধ বশতঃ ঘটিয়া থাকে। পতিভক্তির এই আদর্শের বিচার—যাহার জন্য স্ত্রীলোকেরা আজকাল আত্মহত্যাজনিত পাপ গ্রহণ করে—তাহার জন্য যে শাস্ত্রকার ও সাহিত্যিকগণ দায়ী নহেন, এ কথা অনেক স্থলেই বলা যায় না। যদি স্ত্রীলোকেরা আত্মহত্যা না করিয়া অন্য কোনও উপায়ে অন্যায় কার্য্যের প্রতিশোধ গ্রহণ বা ঘৃণাজনিত মনের ঝাল মিটাইতে পারিতেন—তাহা হইলে সমাজের, নিজেদের ও দুর্ভাগা পতিদের পক্ষেও মঙ্গলের কারণ হইত। আমরা উপরে যে ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছি, তাহাতে দুইটি বিভিন্ন প্রকার স্ত্রীলোকের স্বভাব তাহাদের পতির চরিত্রে কিরূপ পার্থক্য উৎপন্ন করে, তাহা বুঝা যায়।

যাহা হউক, দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার পর এই ডাক্তার বাবুর মতিগতির অনেকটা পরিবর্ত্তন হওয়ায়, তিনি ভদ্রলোকের মত বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্রকন্যাদিও হইল। ক্রমশঃ তিনি প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে অশান্তির ভাব উদিত হইত। তিনি বলিতেন, Strychnia ঔষধের সম্বন্ধে তাঁহার ভয়ের মাত্রা বেশী হয়। একাকী ঘরে শুইয়া থাকিতে তাঁহার অস্বস্তি বোধ হইত। এক দিন দেখা গেল, তিনি Strychnia খাইয়া মরিয়াছেন। যাহারা তাঁহার পূর্ব্ব-ইতিহাস জানিত, তাহারা ইহার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ কিছু বুঝিতে পারিল; কিন্তু সাধারণ লোক বুঝিল, ডাক্তার বাবুর মাথা খারাপ হওয়াতে, ভুল করিয়া ঘুমের ঔষধের পরিবর্ত্তে Strychnia খাইয়া মারা গিয়াছেন।

কাউণ্ট টলষ্টয়, মেরি করেলি প্রভৃতি বিলাতের ঔপন্যাসিকদের গল্পেও অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। কাউণ্ট টলষ্টয়ের একটি গল্পে আছে—একজন যুবক রেলগাড়িতে আসিবার সময় সেই রেলগাড়িতে একটি লোককে কাটা পড়িয়া মারা যাইতে দেখিতে পায়। যুবকটি তাহার দয়া-পরবশতা অন্য এক বিবাহিতা যুবতীকে দেখাইবার জন্য ঐ মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করে। তাহার কপট মহাপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া সেই যুবতী এই যুবকের সহিত পরিচিত হয়। অবশেষে তাহাদের পরিচয় অবৈধ প্রণয়ে পর্য্যবসিত হইলে, যুবকটি যুবতীকে তাহার স্বামীর নিকট হইতে ভুলাইয়া লইয়া যায়। ইহার পর কোনও এক

দিন এই যুবতীটি তাহার প্রণয়ী যুবককে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে ষ্টেশনে আসিয়া—যে ট্রেণে সেই যুবকটী আসিতেছিল, সেই ট্রেণেই ইচ্ছা করিয়া কাটা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।

মেরি করেলির একটি গল্পে আছে যে, এক দরিদ্রা বালিকা এক রাজাকে ভালবাসিত; কিন্তু প্রত্যাখ্যাতা হইয়া সে জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করে। পরিণামে দেখা যায়, ঐ রাজাও যে স্ত্রীলোকের সহিত শেষকালে যথার্থ প্রণয়ে পড়িয়াছিলেন, তাহার মৃতদেহ লইয়া ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্রের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেলেন—আর তাঁহার কোন সন্ধান মিলিল না।

(৪) কোনও ষ্টেশনে এক ডাক্তার থাকিতেন। সেই ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টারের পুত্রের এক জটিল দীর্ঘকালস্থায়ী রোগ হয়। ডাক্তার বাবু এই ছেলেটিকে প্রত্যহ দেখিতেন। ডাক্তার বাবুর সহিত ষ্টেশনমাষ্টারের এই বন্দোবস্ত হয় যে, দরিদ্র বলিয়া তিনি প্রত্যহ ডাক্তার বাবুকে ভিজিটের টাকা দিতে পারিবেন না, তবে পুত্র আরোগ্য লাভ করিলে একবারে যাহা হয় কিছু দিবেন। ডাক্তার বাবুও ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। চিকিৎসার জন্য ডাক্তার বাবুর অনেক মূল্যবান ঔষধও খরচ হয়। অনেক দিন চিকিৎসার পর রোগীর অবস্থা একবার ভাল ও আর একবার মন্দ হইতে লাগিল। অবশেষে কিছু দিন বিনা ঔষধে থাকিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে।

পুত্রের আরোগ্য লাভের পর ষ্টেশনমাষ্টারের সহিত এক দিন ষ্টেশনে ডাক্তার বাবুর দেখা হয়। ষ্টেশনমাষ্টার ডাক্তারবাবুকে বলিলেন,—"আপনি তো ভারী চিকিৎসাই করলেন। রোগী আপনাআপনিই ভাল হইয়া গেল দেখিতেছি।" ইহার পর আর ডাক্তারবাবু তাঁহার প্রাপ্য টাকার কথার উল্লেখ না করিয়া কিছু বিরক্তি ও ঘৃণার সহিত ষ্টেশনমাষ্টারের নিকট হইতে চলিয়া আসেন।

ষ্টেশনমাষ্টার যে ষ্টেশনে ছিলেন, সেটী বেশ বড় ষ্টেশন। তাঁহার মাহিনা অল্প হইলেও, ঘুস ইত্যাদি উপরি পাওনায় তাঁহার বিস্তর লাভ হইত। যাঁহাদের ঘুস ইত্যাদি লইবার অভ্যাস আছে—তাঁহাদের মেজাজ সাধারণতঃ কিছু ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। এই ষ্টেশনমাষ্টারের এই গুণটী ছিল। কিন্তু ফি না দেওয়া উপলক্ষ করিয়া ডাক্তার বাবুর সঙ্গে তাঁহার যে দিন রূঢ় ভাবে কথা হয়, তাহার কিছু দিনের মধ্যেই একজন গার্ডের সঙ্গে ষ্টেশনমাষ্টারের বচসা হয় এবং গার্ড তাঁহার নামে রিপোর্ট করিবে বলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ষ্টেশন-মাষ্টার নরম হন নাই। যাহা হউক, পরে গার্ড রিপোর্ট করে এবং তাহার ফলে ষ্টেশন-মাষ্টার একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে বদলি হন। ঐ ষ্টেশনে কোনও উপরি-প্রাপ্তির উপায় ছিল না। ডাক্তার বাবুও কিছু দিন পরে নিকটস্থ কোনও বড় ষ্টেশনে বদলি হন। তিনি এক দিন, ষ্টেশন-মাষ্টার যে ষ্টেশনে ছিলেন, সেই ষ্টেশন দিয়া ট্রেণে কোনও স্থানে যাইতেছিলেন। ষ্টেশন-মাষ্টারের Medical Certificate লইয়া সেই ষ্টেশন হইতে অন্য একটী ষ্টেশনে বদলি হইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ডাক্তারবাবু এমন গম্ভীর ও ঘৃণার ভাব দেখান যে, ষ্টেশন-মাষ্টার মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলিতে পারিলেন না। এই জন্যে মনে-মনে তিনি রীতিমত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

ষ্টেশনমাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোথায় যাইতেছেন?" তাহাতে ডাক্তারবাবু জানান যে, তিনি কার্য্যস্থল হইতে অল্প দিনের ছুটি লইয়া যাইতেছেন, আবার কয়েক দিন পরে ফিরিয়া আসিবেন। ইহা শুনিয়া ষ্টেশনমাষ্টার বলেন যে, তাঁহার কথা মিথ্যা; কেন না, তিনি যখন এত জিনিষ-পত্র লইয়া যাইতেছেন, তখন আর ফিরিবেন না। দিন-দশেক পর যখন ডাক্তারবাবু ফিরিয়া আসেন, তখন ষ্টেশন-মাষ্টার ষ্টেশনে ছিলেন না। ডাক্তারবাবু যে মিথ্যা কথা বলেন নাই, তাহা প্রমাণিত করিতে একখানি কার্ড ষ্টেশনমাষ্টারকে দিবার জন্য ষ্টেশনের কোনও কর্ম্মচারীর নিকট দিয়া যান। পরে তিনি জানিতে পারিলেন, ষ্টেশনমাষ্টারের অসুখ হইয়াছিল, এবং সেই অসুখেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

এই ঘটনায় প্রথমতঃ দেখা যায় যে, ডাক্তারবাবুর প্রাপ্য টাকা ফাঁকি দিবার মতলবে যে দিন ষ্টেশনমাষ্টার ডাক্তারবাবুর প্রতি অযথা দোষারোপ করেন, তাহার কিছু দিন পরেই গার্ডের সহিত তাঁহার গোলযোগ হয়—যাহার ফলে তিনি দুর্গম স্থানে বদলি হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এখন গার্ডের সঙ্গে ষ্টেশনমাষ্টারের যে কলহ হয়, তাহার একটি কারণ এই হইতে পারে যে, ষ্টেশনমাষ্টার ডাক্তার-

বাবুর সহিত ঝগড়া করিয়া যে অন্যায় ভাবে ফাঁকি দিতে যাইতেছিলেন, তাহার ফলে তাঁহার মনের ভিতর অযথা ঝাঁঝ জমিয়া গিয়াছিল। কুকর্ম্ম করিবার সময় অনেকেই মনের ভিতর এইরূপ ঝাঁঝের ভাব জমাইয়া লন, এবং একবার ঝাঁঝ জমিয়া গেলে, আত্মসংবরণ করাও কঠিন হইয়া উঠে। এদিকে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যখন ষ্টেশন-মাষ্টার ঝগড়া করিতে গেলেন, তখন ডাক্তারবাবু কোনও তর্ক-বিতর্ক করিলেন না, ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। ডাক্তারবাবু যদি ঝগড়া করিতেন, তাহা হইলে কতকটা এই ঝাঁঝ খরচ হইয়া যাইত। হয় ত ইহার একটা মীমাংসাও হইতে পারিত। ডাক্তারবাবুকে কিছু অল্পস্বল্প দিয়া একটা রফা হইলে, এই ঝাঁঝের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হয় তো থাকিত না। কিন্তু তাহা হইল না—মনের ভিতর ঐ ঝাঁঝটি পূর্ণভাবে রহিয়া গেল। তাহার পর ট্রেণের গার্ড আসিয়া তাঁহার সহিত ঝগড়া করিল, তখন তাহারই উপর ঐ ঝাঁঝ পুরাপুরি বর্ষিত হইল। ডাক্তারবাবু অতি সহজে ছাড়িয়া দেওয়াতে ষ্টেশনমাষ্টারের এই ভুল ধারণা হইয়াছিল যে, গার্ডও তাহাকে ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু সকলের নিকট হইতে সমান ভাবেই উদ্ধার পাওয়া কঠিন। তাহার পর যখন পুনরায় ডাক্তারবাবুর সহিত দেখা হয়, তখনও যদি ষ্টেশনমাষ্টার নিজের অন্যায় বুঝিতেন, তাহা হইলে মনের ঝাঁঝের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা লোপ পাইয়া যাইত, পুনরায় নূতন রকমের ঝাল গড়িবার চেষ্টা করিতেন না। অন্ততঃ মরণাপন্ন অসুখের সময় তাঁহার সাহায্যও পাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার অন্যায় কর্ম্মফল তাঁহাকে ক্রমশঃ মৃত্যুর পথে লইয়া গেল।

(৫) মফস্বলের কোনও এক গভর্ণমেণ্টের ডাক্তার গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক (circular) সার্কুলার পত্র পান যে, সরকারি হাসপাতাল অনেক সময় ভিক্ষুক শ্রেণীর লোক দ্বারা পূর্ণ করা হয়; এ প্রথা গভর্ণমেণ্ট সমর্থন করেন না। সরকারি হাসপাতাল পীড়িতদের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে, এ কথা মনে রাখিতে হইবে। যাহারা খাইতে পায় না—তাহাদের খাইতে দিবার জন্য হাসপাতাল স্থাপন করা হয় নাই। রোগীরা যত পরিমাণে নিজের খাদ্য নিজ ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া হাসপাতালে থাকিতে হইবে, সে হাসপাতালের পরিচালনা ততই ভাল হইতেছে—সরকার বাহাদুর তাহাই মনে করিবেন। ডাক্তারবাবুর যতদূর স্মরণ হয়, সার্কুলারটি এইরূপ ছিল।

ঐ সার্কুলার যে দিন সেই ডাক্তারটির হস্তগত হয়, তাহার দুই এক দিন পরেই একটি পশ্চিমদেশীয় যুবক সেই ডাক্তারখানায় উপস্থিত হয়। সে ডাক্তারবাবুকে বলে যে, সে দেশ হইতে চাকুরীর চেষ্টায় এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু চাকুরী পাওয়া দূরে থাকুক, তাহার দুই দিন আহার পর্য্যন্ত জোটে নাই। তাহাতে সেই ডাক্তারবাবু গভর্ণমেণ্ট সার্কুলারের কথা মনে করিয়া বলেন যে, এরূপ লোককে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয় না। তখন সেই লোকটি খাইবার জন্য কিছু ভিক্ষা চায়। ডাক্তারবাবু তাহাকে জানান যে, Subdivisional officerএর নিকট poor fundএর টাকা আছে, সে সেখানে গেলে খাইবার জন্য ভিক্ষা পাইতে পারে। নিজে তিনি কিছু দিয়াছিলেন কি না, তাঁহার মনে নাই। মনস্তত্ত্বের নিয়মানুসারে এরূপ অসন্তোষকর স্মৃতি মনের ভিতর থাকে না—আপনা আপনি বিলুপ্ত হইয়া যায়; এবং সম্ভবতঃ ডাক্তারবাবু উপদেশ ছাড়া পয়সা দিয়া ঐ বুভুক্ষিত লোকটির কোনও উপকার করেন নাই। পর দিন পুলিস একটি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ দ্বারা পরীক্ষা করিবার জন্য ডাক্তারবাবুর নিকট প্রেরণ করে। সেই লাসটি রেলওয়ে লাইনে কাটা কোনও এক ব্যক্তির। লাসটি পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারবাবু স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, এই লোকটি ট্রেণ আসিবার সময় রেলওয়ে লাইনের উপর গলা রাখিয়া কাটিয়া মরিয়াছে। শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া ইহাও বুঝা গেল যে, সে লোকটির দুই এক দিন অন্নও জোটে নাই। মৃত ব্যক্তির মুখ দেখিয়া ডাক্তারবাবু বুঝিলেন যে, যে লোকটি পূর্ব্বের দিন অন্ন জোটে নাই বলিয়া হাসপাতালে ভর্ত্তি হইতে আসিয়াছিল, এ লোকটি সেই। ডাক্তারবাবু তাঁহার কার্য্য অর্থাৎ শব-ব্যবচ্ছেদ, রিপোর্ট লেখা প্রভৃতি শেষ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মনের ভিতর যে দুঃখ ও অনুতাপ হইতেছিল, তাহা মুছিয়া ফেলিবার জন্য এই ঘটনার কথা চাপা দিবার চেষ্টা করিলেন। নিজেকে বুঝাইলেন, ইহাতে তাঁহার আর বিশেষ দোষ কি?

অন্নসংস্থান হইতে পারে, সে বিষয়েও উপদেশ দিয়াছেন। সে লোকটি যদি নির্ব্বোধ হয়, তাহা হইলে সে জন্য তিনি দায়ী নহেন। নানা কাজের মধ্যে তিনি এ ঘটনার কথা মন হইতে অন্তর্হিত করিলেন। কিন্তু বোধ হয় তাঁহার ভিতরের মন হইতে সে কথা একেবারে লুপ্ত হইল না। কারণ, যখন তিনি রেলওয়ে ষ্টেশনে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেন এবং ট্রেণ যখন শব্দ করিয়া আসিত—তখন তিনি একপ্রকার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ভাব (nervousness) বোধ করিতেন—ট্রেণের খুব নিকটে গিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন না। তাঁহার মনে হইত, যেন ট্রেণ তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চাকার তলে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি মধ্যে মধ্যে হত্যার স্বপ্ন দেখিতেন। নিম্নে একটি স্বপ্নের বিবরণ দেওয়া গেল।

তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, যেন তাঁহার ভগিনী একটি নদীতে স্নান করিতেছে। তিনি ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছেন। বাড়ী হইতে নদীর ঘাটে আসিবার জন্য যেন একটি বাঁশের সেতু আছে। এই সেতু দিয়া যেন একটি সাহেব ডাকাত তাঁহার ভগিনীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা দেখিয়া ডাক্তারবাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার ভগিনীকে রক্ষা করিবার জন্য বাঁশের সেতুর উপর উঠিয়া এই সাহেব ডাকাতের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিলেন। ডাক্তারবাবু দেখিলেন, তাঁহার হাতে একটি ডাক্তারি ছুরি আছে। সেই ছুরি তিনি সাহেব ডাকাতের বুকে বসাইয়া দিলেন। সাহেব ডাকাতটি আহত হইয়া সেতু হইতে মাটিতে পড়িয়া মরিয়া গেল। ডাক্তারবাবু তখন বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এই ভাবিয়া যে, এখন এই মৃতদেহটী লইয়া কি করিবেন। তাঁহার উপর তো খুনের দায় চাপিল। এই মৃতদেহ সমেত ধরা পড়িলে তাঁহাকে ফাঁসি যাইতে হইবে। তিনি স্বপ্নে হত্যাকারীর যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। ইহার পরই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিবার পরও তাঁহার মনে উত্তেজনার কষ্ট রহিল—তিনি দেখিতে পাইলেন, এই দুঃস্বপ্নের জন্য তিনি ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়াছেন।

উপরি উক্ত স্বপ্নটী সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করিবার এখানে প্রয়োজন নাই; তবে কিছু কিছু বিশ্লেষণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ বাঁশের সাঁকো। ইহা হইতে এই ঘটনার কথা মনে হয়—ডাক্তারবাবু একবার নৌকা করিয়া মফস্বলে গিয়াছিলেন। মফস্বল হইতে ফিরিবার সময় নৌকার মাঝিরা বলিল যে, এখান হইতে নৌকায় বাড়ী যাইতে হইলে দেড় দিন লাগিবে; কিন্তু হাঁটিয়া যাইতে ৪।৫ ঘণ্টার বেশী লাগিবে না। সেদিন জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল। জিনিষ-পত্র লইয়া মাঝিদের জল-পথে রওনা হইতে বলিয়া ডাক্তারবাবু হাঁটিয়া বাড়ী যাইবার জন্য নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। অর্দ্ধেক রাস্তায় আসিয়া দেখিলেন—নদী পার হইবার জন্য যে কাঠের সেতু ছিল, তাহা মেরামত করিবার জন্য কাঠগুলি তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এবং লোকজনের পারাপারের জন্য একটি অস্থায়ী বাঁশের সেতু করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদিও সেই সেতুর উপর দিয়া সাধারণ লোক নগ্ন পদে অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু অনভ্যস্ত লোকদিগের পক্ষে, বিশেষতঃ জুতা পায় দিয়া, সেই বাঁশের সেতুর উপর দিয়া পার হওয়া বড়ই বিপদসঙ্কুল। নীচে বেগবতী ভীষণ নদী—তাহার ভিতর একবার পড়িলে মৃত্যু নিশ্চয়। কিন্তু তখন আর কোনও উপায় ছিল না। নৌকাও ঘাট হইতে রওনা হইয়া গিয়াছে। এই সেতু না পার হইলে রাত্রে বাড়ী পৌছিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। অগত্যা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যে লোক ছিল—তাহার সাহায্যে সেতু পার হইলেন। কিন্তু এই নদী পার হইবার সময় তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, বাড়ীতে এত তাড়াতাড়ি আসিবার কি প্রয়োজন ছিল। রাত্রের মধ্যে বাড়ী না পৌছিয়া পরের দিন পৌছিলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত। স্বপ্নদৃষ্ট সেতুর সঙ্গেও এই ভাব জড়িত ছিল।

সাহেব ডাকাতের ঘটনায় ডাক্তারবাবুর আরও অনেক ঘটনা মনে পড়িল। তবে বিশেষ ভাবে যে ঘটনাটি মনে পড়িল তাহা এই। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া একবার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম্ দেখিতে গিয়াছিলেন। জীবতত্ত্ববিভাগে তাঁহার স্ত্রীকে তন্ময়ভাবে জীব-বিজ্ঞানের বিষয় বুঝাইতেছিলেন—এমন সময় সম্মুখে নজর পড়ায় দেখিলেন যে, একটি ফিরিঙ্গি সাহেব নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্ত্রীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে। ইহা তাঁহার নিকট বিশেষ কুৎসিত বলিয়া বোধ হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকাতে

তিনি সেই সাহেবকে কিছু বলিতে পারিলেন না—মনের রাগ মনেই চাপিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। স্বপ্নে সাহেব হত্যা করিয়া বোধ হয় এই রাগের ঝাল মিটাইতে চাহিতেছিলেন। বোধ হয় সাহেবের ব্যবস্থার জন্যই সেই পশ্চিমদেশীয় লোকটির মৃত্যু ঘটিয়াছিল—তিনি নিজের মনকে এই কথা বুঝাইয়াছিলেন—স্বপ্নের এই চিত্রে তাহারই ইঙ্গিত ছিল।

তাঁহার হাতে যে ডাক্তারি ছুরি ছিল, তাহাতে, প্রায় সকল ডাক্তারের ভাগ্যে যাহা ঘটে, অর্থাৎ operation was successful but the patient died এইরূপ স্মৃতি জড়িত ছিল। এইরূপ স্বপ্নের প্রায় সব কয়টি ঘটনাই জীবনের অপ্রীতিকর ঘটনার দ্যোতক এবং এই স্বপ্নদর্শনকারীর ভিতরের মনে যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল—তাহাই সূচিত করিতেছিল।

ইহার পরে ঐ সরকারি ডাক্তারটি অল্প দিনের জন্য মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালের কোনও কাজে বদ্‌লি হন। এই সময় মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে ট্রামের রাস্তার উপর ট্রাম চালাইবার জন্য যে বৈদ্যুতিক তার আছে, সেইটি ছিঁড়িয়া পড়ে। এই ঘটনা দেখিবার জন্য সেই ডাক্তার অন্য একটি ডাক্তারের সহিত রাস্তায় উপস্থিত হন। সেই সময় ঐ রাস্তায় একটি জুড়িগাড়ী বেগে দৌড়িয়া আসিতেছিল—ইহার গতিরোধ করিবার কোন উপায় ছিল না। জুড়িগাড়ী তারের নিকট পৌছিলে, ঐ গাড়ীর একটি ঘোড়ার পা যেমন বৈদ্যুতিক তারে স্পৃষ্ট হয়, ঘোড়াটি তৎক্ষণাৎ বৈদ্যুতিক আঘাত লাগিয়া পড়িয়া যায়। জুড়িগাড়ীও উল্টাইয়া পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া যায়। গাড়ীর পাশে একটী লোক আসিতেছিল, সেও চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া যায়। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার বাবু বড়ই nervous হইয়া পড়িলেন। হয় ত রেলগাড়ীতে কাটিয়া যে লোকটী মরিয়াছিল, তাহার স্মৃতির খোঁচা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। তাঁহার অজ্ঞাতসারে বোধ হয় এইরূপ ভাব হইল যে, তাঁহারই দোষে একটী লোক রেলে কাটা পড়িয়া মরিয়াছে। এখন যাহাতে আর কেহ না মরে, এরূপ কাজ করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যায় কি না? এসব কথা হয় তো তাঁহার জ্ঞানের চিন্তার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয় নাই। তিনি তাঁহার সঙ্গী ডাক্তারটীকে বলিলেন যে, কম্বল non-conductor, একটী কম্বল পাইলে তারটী ধরিয়া সরাইয়া দেওয়া যাইত। এই কথাগুলি যে তিনি পরোপকার কিংবা অসীম সাহস প্রদর্শনের জন্য বলিয়াছিলেন—তাহা মনে হয় না। তাহার মনের ভিতর যে একটা খোঁচা ছিল, তাহা হইতে অন্তরে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, সেই দ্বন্দ্বের ফলে যেন কতকটা অজ্ঞাতসারেই কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল।

হয় তো তাঁহার সঙ্গী ডাক্তারটি তাঁহার কথার এই প্রত্যুত্তর দিতেন যে, দেখুন, অমন পাগলামিতে কাজ নাই। সম্মুখে অতবড় ঘোড়া এই তারের সংস্পর্শে ঐরূপ আহত হইয়া পড়িয়া গেল—আর আপনি তাহা সরাইবার ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু সে ডাক্তারটি বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই গল্পটি যে কাল্পনিক নয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য এই ডাক্তারটির নাম প্রকাশ করা যাইতে পারে যে, তিনি আজকাল কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বিলাত-ফেরত ডাক্তার—বিধানচন্দ্র রায়।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এই বয়োজ্যেষ্ঠ ডাক্তারটির কথা শুনিয়া হাসপাতাল হইতে একটি কম্বল লইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং ঐ ডাক্তার বাবুর হাতে দিলেন। ডাক্তার বাবু ঐ কম্বল দিয়া তারটি জড়াইয়া উহা সরাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বেশী ছিল বলিয়া তাঁহার তার সরাইবার চেষ্টা সফল হইল না। তখন তিনি নিজেই কম্বলটি লইয়া বেশ শৃঙ্খলার সহিত তারটি ধরিয়া রাস্তার এক পাশে সরাইয়া আনিলেন এবং মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র আনিয়া তার পাহারা দিবার জন্য ডিউটিতে বসাইয়া দিলেন। যাহা হউক, সেই ডাক্তারবাবুর মনের ভিতর যে খোঁচা ছিল, তাহা এই তার সরাইবার উপলক্ষে দূরীভূত হইল। এই কাজ করিবার জন্য তাঁহার মনে যে এক অপূর্ব্ব আনন্দ উদ্ভূত হইল, তাহাতে পূর্ব্ব জীবনের কষ্টের সমুদায় স্মৃতি মুছিয়া গেল।

বিজলী-বিকাশ*

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ এ-এম-এস-ডি (ম্যানচেষ্টার)

বিশ্বের বিপুলতার কথা ভাব্‌তে গেলেই বিস্মিত হ'তে হয়; আর ততোধিক বিস্মিত হ'তে হয়, সেই বিশ্বের বিস্ময়কর যা কিছু তাদের সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌তে গেলে। তন্মধ্যে আজ আলোচনা কর্‌ব একটী মাত্র বিষয়ের একটী মাত্র পর্য্যায়—সে বিষয়টী "বিজলী বিকাশ"।

বাস্তবিক বিজলী সুন্দরীর বিকাশের বাহাদুরী যে কি,

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (প্রবন্ধ-লেখক)

তাহা একটী মাত্র প্রবন্ধের দ্বারা আলোচনা করা একেবারেই অসম্ভব। যে বিজলী "চকিত-চমকে চাহিয়া ক্ষণেকে ভেসে যায়" তাঁর কার্য্যক্ষমতা যে কি অসাধারণ, চকিতে যে কি অসম্ভব কাজ তিনি সম্ভব করতে পারেন, তা যাঁরা জানেন, তাঁরা ব'লবেন, কোথায় বা লাগে তার কাছে যাদুকরের ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড, অথবা আরব্য-উপন্যাসের অদ্ভুত সেই আলাদীনের প্রদীপ। সেই পলকে-প্রলয় হাসি-লাস্যের ভীমা-মধুর ক্রীড়ার অধিষ্ঠাত্রী—ভামিনী-দামিনী-চঞ্চলা-চপলা বিজলী সুন্দরীর দাসানুদাস আমি। আজ তাঁর ক্রীড়া সম্বন্ধে ২।৪টী মাত্র কথা বলতে চাই। এবং প্রকৃষ্ট উদাহরণ সমেত ব্যাপারটী আপনাদের কর্ণ-রোচক বা দৃষ্টি-রোচক করবার জন্য টাটার বিশ্ব-বিখ্যাত লৌহ-কারখানার সহিত তাঁহার অভিন্ন সম্বন্ধ বর্ণনা করতে চাই। বিজলী সুন্দরীর সঙ্গে আমার সখ্যতা বা পরিচয় অনেক
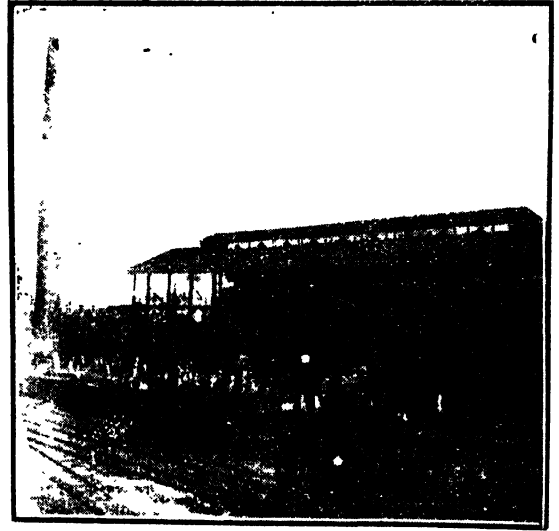
কোপার ওভেন্স (Kopper Ovens)

দিনের এবং সেই দিন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার সেব্যা-সেবক সম্বন্ধ। নানা স্থানে, নানা ভাবে তাঁকে দেখ্‌বার সুযোগ আমার হ'য়েছে, কিন্তু লৌহ-কারখানার কোক্‌-ওভেন্স্‌ (কয়লা প্রস্তুতের উনুন বা কারখানায়) এ যে কিরূপ অদ্ভুত কাজ তিনি সম্পন্ন করছেন, এখন তারই একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি।

লৌহ ও কোক

ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিশেষতঃ লৌহ শিল্পে আমেরিকা অতি দ্রুত অগ্রসর হ'চ্ছে। লোহার অগাধ ভাণ্ডার

* জেমসেদপুর সাহিত্য-সভার কার্ত্তিকী অধিবেশনে ছায়াচিত্র সহকারে পঠিত।

সেদেশে নানা কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। আমেরিকার বড় বড় লোহার কারখানা, শুধু বড় বড় কেন—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কারখানাগুলি, নানা দ্রব্যাদি প্রস্তুত ক'রে জগৎকে চমৎকৃত ক'র্‌ছে। কিন্তু সে দেশেও ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাই-

উইলপুট্টি ওভেনস্ (Willputte Ovens)

প্রডাক্ট ওভেনগুলিতে ধাতব-কার্য্যে অথবা ব্লাষ্ট-ফারনেসে ব্যবহারোপযোগী উৎকৃষ্ট কোক প্রস্তুত হয় নাই।

১৯০৬ খৃঃ ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ ষ্টীল্ করপোরেশন লৌহ-শিল্পাভিজ্ঞ বড় বড় এঞ্জিনীয়রগণের এক কমিটীর নিয়োগ করেন এবং সেই সূত্রেই সে প্রসঙ্গের সন্তোষজনক সমাধান হয়।

যে কোন লৌহ-কারখানায় কোক্‌ওভেন্‌স্ (কয়লা প্রস্তুতের কারখানা) সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কোক যত উচ্চাঙ্গের হইবে, লৌহের ঔৎকর্ষ ও পরিমাণও ততই বাড়িতে থাকিবে। পূর্ব্বে যে ধরণের কোকপ্লাণ্ট চালানো হইত, সেগুলিকে বি-হাইভ্ (Bee-hive) টাইপ বলা হইত। এখনকার বাই-প্রডাক্ট ওভেনগুলি তদপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। ইহাতে উচ্চাঙ্গের কোক পাওয়া যায়। এই সব কয়লা অধিক উত্তাপদায়ক; ওভেন্স হইতে বাহিরে আনা সহজসাধ্য ও অধিক গ্যাস্ ও নানাপ্রকার বাই-প্রডাক্ট প্রদায়ক। পুরাতন প্রথায় এক ক্ষেপ কয়লা প্রস্তুত করিতে ৪৮ হইতে ৭২ ঘণ্টা লাগিত, কিন্তু এই হয়। এই কারখানা গৃহের ছাদ সংলগ্ন যে "গড়" দেখা যাইতেছে, ঐখানে প্রথমতঃ কাঁচা কয়লাগুলিকে খুব ছোট করিয়া ভাঙ্গা হয়। তথা হইতে ক্রমনিম্ন নানা পথে সেগুলিকে চূর্ণ করিবার জন্য অপর এক স্থানে আনা হয়। সে স্থানের নাম হামার-মিল (Hammer Mill)। সেখানে সেগুলি এমন ভাবে গুঁড়া করা হয় যে, ⅛ ছাঁকনি জালের সেগুলি সম্পূর্ণ উপযোগী হয়। এই গুঁড়া কয়লাগুলিকে অতঃপর ওভেন্‌সের উপর জমা করা হয় ও পরে বৈদ্যুতিক-যান (Electric lorry) সাহায্যে প্রত্যেক ওভেনের ভিতর ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই সব ওভেন্স এক-একটী আগ্নেয়-গিরি, এবং যখন তাহার ভিতর হইতে প্রস্তুত কয়লা কল সাহায্যে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তখন মনে হয় যেন সেই সব আগ্নেয়গিরি সচল হইয়া বাহিরে আসিতেছে। এই ভাবে এগুলি প্রস্তুত হইত ১৬ হইতে ৩০ ঘণ্টা সময় ও ৯০০° হইতে ১০০০° (সেন্টিগ্রেড) উত্তাপ আবশ্যক হয়। পূর্ব্বে যেমন এই সকল অগ্নিস্তূপ বাহিরে
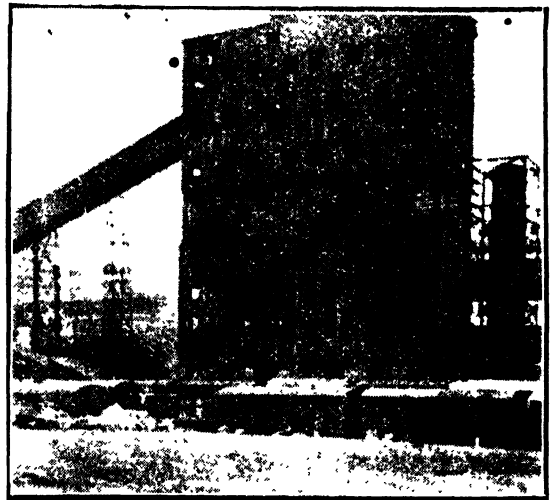
উইলপুট্টি নিষ্পেষণ-যন্ত্র

আসিয়া প্লাটফরমের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িত, এক্ষেত্রে ঠিক সেরূপ না হইয়া সেই অগ্নিস্তূপ ঠাণ্ডি গাড়ী বা Quenching Car সাহায্যে Quenching Stationএ অর্থাৎ শীতল করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনা হয়। সেখানে

উপর বারি-সেচন করিয়া ঠাণ্ডা করা হয়। এখন হইতে নানা প্রক্রিয়া সাহায্যে সেই কয়লা ব্লাষ্ট-ফারনেসে নীত হয়। কুচো কয়লা বা প্রায় গুঁড়া যাহা কিছু থাকিয়া যায়, তাহা অন্য গাড়ীতে বোঝাই হইয়া থাকে। যেখানে আগুনের এইরূপ ছড়াছড়ি ব্যাপার,—অগ্নিময় পাহাড়, সবল মানুষের পক্ষে সে-সব স্থানে হাতে কাজ করা অসম্ভবেরই নামান্তর। বিজলী সে সব স্থানে তাঁর অসীম লীলাশক্তি প্রকাশ করিতেছেন। তাঁরই ক্রীড়ায় উক্ত কলকব্জা স্ব-স্ব কাজ যথানিয়মে করিয়া যাইতেছে।

কয়লা পুড়িবার সময় তাহা হইতে যে গ্যাস উৎপন্ন হয়, তা গ্যাস-পাইপ সাহায্যে বরাবর Primary coolerএ গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে তাহা আল্‌কাতরায় পরিণত হয়, এবং বাকী অংশ হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় গন্ধক-লবণ (ammonium sulphate) প্রস্তুত হয়। কিরূপে, তাহা পরে বলিতেছি। ইহা খুব ভাল সার (manure)। ইহার পরও যে গ্যাস থাকিয়া যায়,
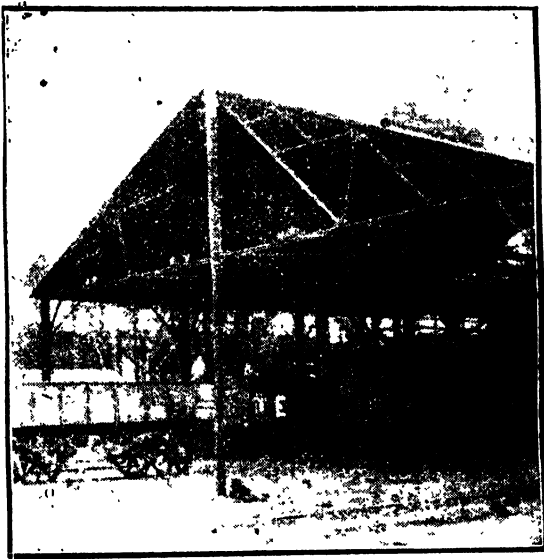
কয়লা আমদানীর ষ্টেসন

তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া কোক্ প্রস্তুতে এবং অবশিষ্টাংশ বয়লার, সোকিং পিট ও লোহার কারখানার নানা স্থানে ইন্ধনরূপে ব্যবহার করা হয়।

জেমসেদপুর কোক ও বাই-প্রডাক্ট কারখানা

জেমসেদপুর লৌহ কারখানায় মোট ৩৮০টী কোক- (Non-recovery Coke ovens). (২), ৫০টী বাই-প্রডাক্ট (Bye Product ovens) এবং (৩) প্রতিস্তরে

চার্জ্জ লরি

৫০টী হিসাবে তিনটী স্তরে ১৫০টী Willputte Bye Product ovens। ৪২০০ টন কাঁচা কয়লা এই ওভেন-গুলিতে রোজ খরচ হয় ও ২৩৭৫ টন কোক তাহা হইতে প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত ৫৫ টন আল্‌কাতরা এবং ২৫ টন গন্ধক-লবণ ও (ammonium sulphate) প্রত্যহ প্রস্তুত হয়। ইহাই Coke plant ও Bye-Product কারখানার একটা মোটামুটি আভাস। কিন্তু এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা কিছু কাজের কথা বলা হইল, তাহা সমস্তই সম্পাদিত হয় অতি অক্লেশে এবং প্রায় হস্ত-শ্রম ব্যতিরেকে, কেবলমাত্র বিজলী-সুন্দরীর লীলাখেলায়। কিরূপে, এখন তাহাই বলিতেছি। তবে এটুকু আপনাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহা কিছু কলকব্জা বা মোটরের কথা বলা হইবে, সে সমস্তই বিজলী বা বিদ্যুচ্চালিত।

খনি হইতে কাঁচা কয়লা গাড়ী বোঝাই হইয়া আসিয়া কারখানার একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রকাণ্ড এক আধারের মধ্যে জমা হয়। তথা হইতে বিদ্যুচ্চালিত কয়লাগুলি ১৫ অশ্বশক্তি ৪৪০ ভোল্ট, ৭৫০ আবর্ত্তন (R. P. M.) ইন্‌ডাকশান্ মোটর (Induction Motor) কর্ত্তৃক চালিত এক গাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত

অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ইনডাক্শান্ মোটর-চালিত আর একখানি গাড়ীতে আসে। এই গাড়ীখানি কয়লাগুলিকে প্রায় ১০০ ফুট উচ্চে যথাস্থানে চূর্ণিত হইবার জন্য লইয়া যায়।

দ্বার নিষ্কাষণ যন্ত্র

তথায় চূর্ণীকৃত হইলে চুম্বক-শক্তি দ্বারা, তাহার মধ্যে কোনরূপ লৌহ থাকিলে তাহা পৃথক করা হয়। এই যে কয়লা চূর্ণ করিবার যন্ত্রাদি, এগুলি ৭৫ অশ্বশক্তি ৪৪০

পুরাতন কোক পুসার

ভোল্ট ৩০০ আবর্ত্তনশীল স্লিপ্‌রিং ইনডাক্শান্ মোটর অশ্বশক্তির ঐরূপ একটী মোটর চালিত মিক্সিং কনভেয়ার (Mixing Conveyor) মারফত হ্যামার মিলে (Hammer Mill) উপস্থিত হয়। এই মিলটী

কোক পুসার

৩০০ অশ্বশক্তি ৩০০০ ভোল্ট ৭৫০ আবর্ত্তনশীল স্লিপ্‌রিং মোটর কর্ত্তৃক চালিত হয়।

হ্যামার মিল হইতে এই সব কয়লা আর একটী

শীতল করিবার ষ্টেসন
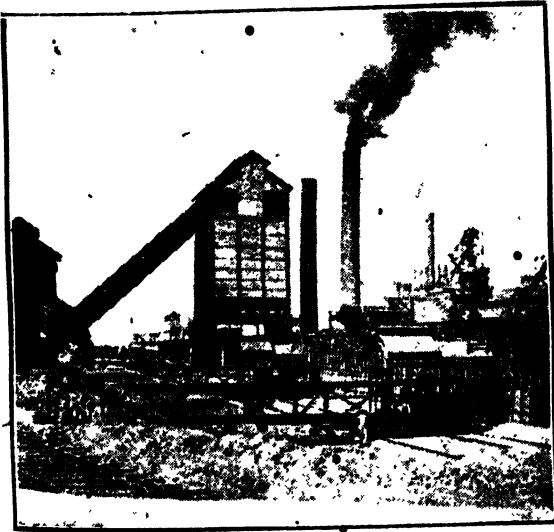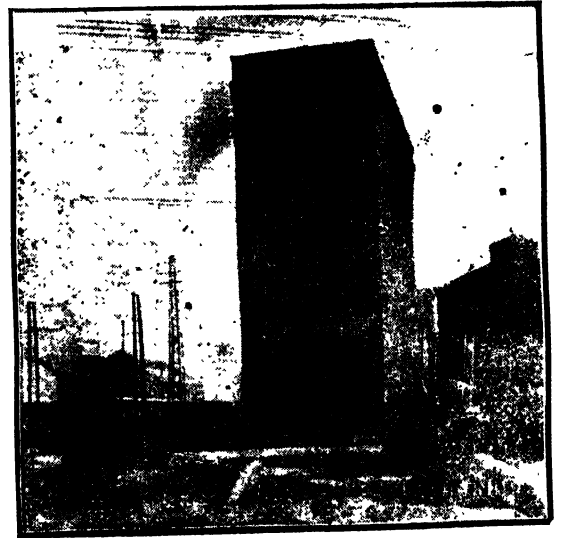
Conveyorএ উপস্থিত হয়। এই কন্‌ভেয়ার ৭৫ অশ্বশক্তি

কর্ত্তৃক চালিত। এটী আবার আর একটী কনভেয়ারএ সমস্ত জিনিষগুলি পৌছাইয়া দেয়। এই শেষোক্ত কন্‌ভেয়ার চালিত হয় এক ৫০ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট মোটর দ্বারা। অবশেষে এই কনভেয়ার তাহার সমস্ত দ্রব্যাদি

কোকের স্থান

আর দুইটী কনভেয়ারএ গিয়া নিঃশেষ করে এবং এ দুইটীও বিদ্যুচ্চালিত হইয়া ওভেনগুলির উপরিভাগে রক্ষিত ২৫০০ টনের একটী আধার মধ্যে সমস্ত দ্রব্যাদি পৌছাইয়া দেয়। এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কলকব্জার কথা বলা হইল, যদি কোন ক্রমে তাহাদের কোন একটী একটুও খারাপ হইয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ এক স্থানে দাঁড়াইয়া বোতাম টিপিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সবগুলি নিশ্চল করা যাইতে পারে।

কয়লাগুলি সেই প্রকাণ্ড আধার হইতে ৩০ অশ্বশক্তি ২২০ ভোল্ট ৬২৫ আবর্ত্তনশীল মোটর-চালিত একখানি গাড়ীতে বোঝাই হইয়া ওভেনের উপর দিয়া চলিতে থাকে। এজন্য রেলপথ পাতা আছে। গাড়ীখানি চারি অংশে বিভক্ত। প্রতি অংশ এক একখানি কয়লাবাহী হপার গাড়ী। প্রতি অংশের তলদেশে এমন ভাবে বড় বড় ছিদ্র করা আছে যে, ইচ্ছামত তাহাদের মুখ খোলা বা বন্ধ করা যায়। আবার সে ছিদ্রগুলি এমনি সমদূরবর্ত্তী যে গাড়ীগুলি দাঁড়াইলে ছিদ্রগুলি ওভেনের ঠিক মুখের উপর থাকে। ফলে, ওভেনের মুখ খুলিয়া সমস্ত কয়লা অক্লেশেই ঢালা যাইতে পারে। কয়লাগুলি এই ভাবে ওভেন পূর্ণ করিয়া ঢালা হইলে, কল সাহায্যে তাহাদের অভ্যন্তর ভাগের কয়লা সমান করিয়া দেওয়া হয়। ওভেনগুলির মুখ বন্ধ করা হয়। ভিতরে কয়লাগুলি পুড়িয়া যখন কোকে পরিণত হয়, তখন তিনটী মোটর কর্ত্তৃক চালিত কল-সাহায্যে ওভেনের পশ্চাৎবর্ত্তী দরজা গুলি খোলা হয়। এই কলের নাম Door Extracting machine. অন্য এক কল-সাহায্যে সম্মুখবর্ত্তী দরজাও উন্মুক্ত হয়। তৎপর একটী প্রকাণ্ড লৌহশলাকা (Ram) কল দ্বারা চালিত হইয়া পশ্চাৎভাগ হইতে ঠেলিয়া সমুদায় কোক সম্মুখভাগে বাহির করিয়া দেয়। এই জ্বলন্ত কোক তখন সচল আগ্নেয়গিরির মত তথায় রক্ষিত ঠাণ্ডি গাড়ীতে (Quenching Car) আসিয়া পড়ে। সেই গাড়ী এঞ্জিন কর্ত্তৃক পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়ে কোয়েঞ্চিং ষ্টেশনে (Quenching Station) নীত হয়।

ওভেনগুলির মোটামুটী আকার—লম্বা ৩৯´-৫´´, উচ্চতা ১১´ ও পাশে ১৯´ হইতে ঠেলিবার লৌহশলাকার

স্ক্রিনিং যন্ত্র

দিকে সরু হইয়া আসিয়া ক্রমশঃ ১৬½´´ তে দাঁড়াইয়াছে। ওভেনগুলি ৫৩৪ ঘনফুট পরিমাণ কয়লা লইতে সমর্থ অর্থাৎ সোজা কথায় প্রত্যেক ওভেনে পৌণে ১৭ টন কয়লা ধরে।

এই সব কাজ নির্ব্বাহ হয় ৬টী মোটর যন্ত্রের দ্বারা।

সেগুলি ২২০ ভোল্ট ৪ হইতে ৭৫ অশ্বশক্তি ও ৪৯০ হইতে ৯০০ আবর্ত্তনশীল। তন্মধ্যে লৌহশলাকা (Ram) দ্বারা কোক ঠেলিয়া বাহির করিবার জন্য যে মোটরটী ব্যবহৃত
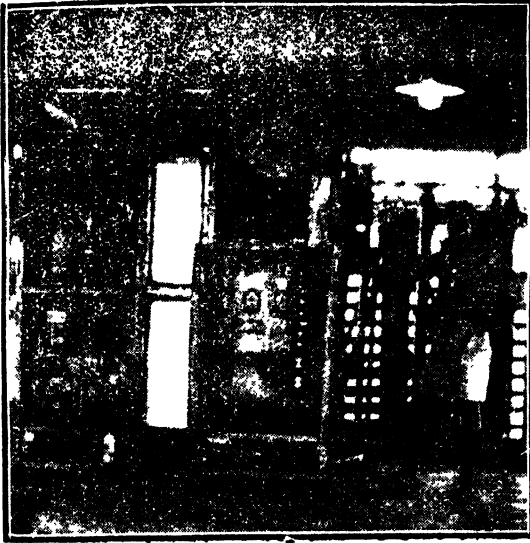
ঘড়ির কল

হয় (Ram Motor) সেইটীই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ করে।

পুনরায় কাজের কথায় আসা যাক। আগুনের

তাপের যন্ত্র

পাহাড়ের মত সেই সব কোক Quenching Stationএ সাহায্যে তাহা ঠাণ্ডা করা হয়। ঠাণ্ডা হইলে, ঠাণ্ডি গাড়ী কয়লাগুলিকে একটী ক্রমনিম্ন মঞ্চের উপর ঢালিয়া দেয়। তথা হইতে ৪৪০ ভোল্ট ৫ অশ্বশক্তি এ, সি (A.C.) মোটর চালিত কল দ্বারা কনভেয়ার নামক যন্ত্রে আনীত হয়। এখান হইতে কোকগুলিকে স্ক্রিনিং ষ্টেশনে (Screening Station) আনিয়া লৌহছাঁকনিতে পরিষ্কার করিয়া আর একটি ক্রমনিম্ন নালিপথে ঢালিয়া দেওয়া হয়। সেখান হইতে সেগুলি মালগাড়ীতে আসিয়া পড়ে ও যথাসময়ে ব্লাষ্ট ফারনেসে (লৌহ প্রস্তুত স্থানে) নীত হয়।

আলকাতরা ও গন্ধক-লবণ

(ammonium sulphate)

ওভেন মধ্যে কোক প্রস্তুতকালীন যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহার উত্তাপ৩০০০সেন্টিগ্রেড। সেই গ্যাস হইতে আলকাতরা ও গন্ধকলবণ বাহির করিয়া লইবার জন্য তাহাকে কয়েক স্থানে ঠাণ্ডা জলের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। যখন গ্যাসের উত্তাপ কমিতে কমিতে ৩৫° সেন্টিগ্রেডে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহা হইতে সঙ্কোচন প্রথায় (Condensation) কতকাংশ আলকাতরা পাওয়া যায়। সেই গ্যাস বাষ্পীয় নিষ্কাশন যন্ত্র (Steam Driven Extracter) সাহায্যে নিষ্কাশিত হইয়া বৈদ্যুতিক নিষ্কাশন যন্ত্রাভিমুখে

বুষ্টার ষ্টেসন

(Motor Driven Tar Extracter) প্রেরিত হয়।

নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। এই গ্যাস পুনরায় ৮০ সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া পরিশোধন যন্ত্রে (Saturator) গন্ধক-দ্রাবক মিশ্রিত জলে বুদ্বুদ করিলে পর গন্ধক-লবণ (ammonium sulphate) পাওয়া যায়।

গ্যাস

ইহার পরও যে গ্যাস অবশিষ্ট থাকে, তাহার কতকাংশ ওভেনসকে উত্তাপ দিবার জন্য ফিরাইয়া আনা হয় এবং অপরাংশ বৈদ্যুতিক বুষ্টার ষ্টেশনে প্রেরিত হয়। এই বৈদ্যুতিক বুষ্টার ষ্টেশন হইতে ঐ গ্যাস প্লেট মিলের রিং হিটিং ফারনেস্ (Re heating furnace) এ, এবং ব্লুমিং মিলের সোকিং পিট (Soaking Pit) এ ইন্ধন-রূপে ব্যবহার করা হয়। Booster station 3000 volts, 300 H P. 700 R. P. M. মোটর দ্বারা চালিত হয়।
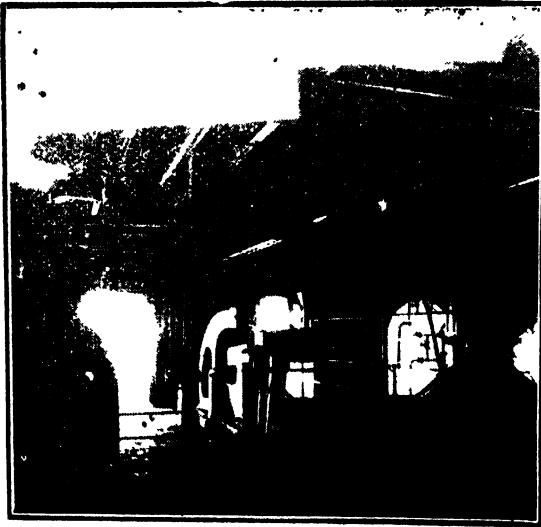
সেণ্ট্রিফিউগ্যাল ড্রাইয়ার

Bye Product coke ovensএ কি ভাবে কাজ হয়, তাহার মোটামুটি বিবরণ ইহাই।

আমাদের coke ovensএ 3000 volts H. T. বিজলী ২ নম্বর Power House হতে দেওয়া হয়। 220 volts D. C. Plate mill substation হতে পাওয়া যায়। আর 440 volts A. C. coke oven switch houseএ অবস্থিত 500 K. V. A. Transformer হতে লওয়া হয়। এই Coke

সুইচ্ হাউস্

Plantএ মোট ১০৭টী মোটর চলিতেছে; ইহাদের মোট H. P. 3690।

Coke Plant এ বিজলীকে কি ভাবে কাজে লাগান সুবিধাজনক তাহা স্থান হিসাবে বিচার্য্য। D. C. series motor এবং Three Phase Induction motor—এই দুই প্রকার মোটরই সাধারণতঃ Coke Plantএ ব্যবহৃত হয়। এখন দেখিতে হইবে, কোন্ প্রকার মোটর কোন্ কাজের উপযুক্ত। D. C. series motor চলিবা-মাত্রই পুরাদমে চলিতে পারে, আর গতির বেগ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই কম current খরচ করে। D. C. series motorএর গতি-বেগ currentএর অপব্যয় না করে' ইচ্ছামত বাড়ান কমান যাইতে পারে। Three Phase Induction motorএর গতি-বেগ প্রায় সমান ভাবেই থাকে, খুব সামান্যই কম-বেশী করিতে পারা যায়। আর যদি করা হয়, তবে যথেষ্ট current অপব্যয় হয়। A. C. motor, D. C. series motorএর মত তাড়াতাড়ি গতি-বেগ বৃদ্ধি, বা বন্ধ করা অথবা উল্টা দিকে চালান যায় না। এই কারণে আমার মতে যে সব machine ঘন ঘন চালান, বন্ধ করা, অথবা উল্টা দিকে চালাইবার দরকার হয়, যেমন charging crane, Ram machine, Door extracting machine এবং crane

ইত্যাদি. সেই জায়গাতে D. C. series motor ব্যবহার করা সঙ্গত। যে সব machine একদিকেই সমান গতি-বেগে দিনরাত চলে—যেমন Line shaft, conveyor, Hammer mill motor সেই সব machine এ A. C. induction motorই ব্যবহার করা উচিত।

আমাদের কারখানায় এই দুই প্রকার মোটরই ব্যবহার করা হয়।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, বিজলী-চালিত যন্ত্রাদি যেরূপ প্রসার লাভ করিতেছে, এবং যেরূপ সহজসাধ্য হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, শীঘ্রই লোহার কারখানায় এ রকম coke plant সম্ভবপর হইতে পারে, যাহাতে কারখানায় কাঁচা কয়লা ব্যবহারের পরিবর্ত্তে সমস্ত কয়লা coke এ পরিণত করিয়া ব্যবহার করা যাইবে। এই Coke Blast furnace এ, Coke Breeze Boilerএ গ্যাস ও coal Tar, open Hearth Furnaceএ এবং Blast Furnaceএর গ্যাস gas engineএ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা সম্ভবপর হইলে steel এর দামও খুব সস্তা হইবে আশা করা যাইতে পারে।

আমাদের এই নূতন সহরের প্রকৃত অধিষ্ঠাত্রী বিজলী। এখানকার যা কিছু সবই তাঁর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। তিনি একটু বাঁকিয়া বসিলেই চারিদিক অন্ধকার ও সঙ্গে সঙ্গে সব গোলযোগ ও হাহাকার! এখানকার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম, শিল্পকলা, বিভিন্ন কারখানা সমস্তই "তৎপ্রসাদাৎ"। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আজ বক্তব্যের পালা শেষ করি। বিজলী-সুন্দরীর সহিত আমার সেব্যা-সেবক সম্বন্ধ বহু দিনের। এ বক্তব্য তাঁহার বিকাশের সামান্য মাত্র পরিচয়। তাই বিজলী-সুন্দরীর অন্যান্য বড় বড় বিষয় পরে আপনাদের সকাশে নিবেদন করিবার ইচ্ছা রহিল। *

* বর্ত্তমান প্রবন্ধের রচনায় শ্রীযুক্ত গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট নানাপ্রকারে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, এ জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

শাহজাদী বা-দা-বুম্ এর অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী *

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আমার তখন যৌবনের ভরা উদ্যম। সুতরাং যা খুসী কর্‌বার ও যা-তা ভাব্‌বার পূর্ণ অধিকার তখন আমার। হঠাৎ খেয়াল হল—একটা ভয়ানক আশ্চর্য্য রকমের গল্প লিখ্‌তে হবে। গল্পের মোট কথাটাও মাথায় জুটে গেল। তবে এখন স্বীকার কর্‌তে রাজী আছি যে, 'প্লট'টা আমার একান্ত নিজস্ব নয়।

এক দিন রাস্তায় যেতে যেতে একখানা ছেঁড়া বই কুড়িয়ে পেলাম। দেখি, সেটা আরবীতে ছাপা, আর অতি পুরাতন। অমনি প্রেরণা হল—এর অর্থ উদ্ধার কর্‌তে হবে।

প্রথমে ইচ্ছা গেল, আরবী ভাষাটা শিখি। কিন্তু দেখতে বিলম্ব হল না যে, তাতে বাধা রয়েছে বিস্তর। গোড়াতেই এক বন্ধু বল্‌লেন যে, আরবীভাষায় মোটেই স্বরবর্ণ নাই। আর এক বন্ধু তেমনি নিঃসন্দেহে খবর দিলেন যে, আরবীতে স্বরবর্ণ ই শুধু আছে; ব্যঞ্জনবর্ণগুলি লেখা হয় না। তৃতীয় একজন উপদেশ দিলেন, মাষ্টার রেখে রীতি-মত পড়্‌তে। এই শেষ কথা শুনেই আমার ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির হয়ে গেল। বইখানির অর্থোদ্ধার করার একটা সহজ পন্থা আমি আবিষ্কার করে ফেললাম। আমার সৌভাগ্য-বশতঃ বইখানার পূর্ব্বাধিকারী সেখানা ভাল করে পড়েছেন দেখলাম। প্রমাণ, আশে পাশে বাঙ্‌লায় যথেষ্ট টীকা টিপ্পনী তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সুতরাং এই-গুলিই পড়তে সুরু করে দিলাম।

পড়তে পড়্‌তে যা আমি আবিষ্কার করতে লাগলাম, সে এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য ব্যাপার।

একেবারে আরম্ভ থেকেই গল্পটা বড় অপূর্ব্ব বোধ হল। অবশ্য গল্পের সবটাই টীকা টিপ্পনীতে ছিল না; কিন্তু যে সব নির্দ্দেশ ছিল, তার ফাঁকে ফাঁকে আমার কল্পনা এমন সহজেই রঙ্ ফলিয়ে ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, যে, যতই পড়ে যেতে লাগলাম, ততই কাহিনীটা অদ্ভুত হতে অদ্ভুত হয়ে চললো।

গল্পটার গোড়ায় আছে, এক স্থবিরা বাদশাজাদীর কথা,—নাম তার বা-দা-বুম্। কয়েক পাতা পরে দেখা গেল, বাদশাজাদী বিবাহ করলেন বোগদাদের এক ধনী বণিককে। আর বইখানির শেষে পেলাম যে, নায়িকার বয়স তখন সাড়ে পাঁচ বছর।

সুতরাং মোট কথা দাঁড়াল এই যে, কোন পরী বা জিনের যাদুবিদ্যার দৌলতে আমাদের বাদশাজাদী প্রাকৃতিক ধারার ঠিক উল্টো পথ ধরে ধরে ক্রমেই নব যৌবন

পেয়ে চলেছিলেন। ছোট হতে হতে শেষে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনলীলা—বইএর পাতা ও গল্পের বহর থেকে তা সুদীর্ঘই মনে হলো—তিনি সাঙ্গ করলেন গিয়ে তাঁর জন্মকালে।

মূল গ্রন্থে এই কাহিনীটি কবি যে কি ভঙ্গীতে বিধৃত করে থাকবেন, তা আরব্যোপন্যাস যাঁদের পড়া আছে, তাঁদের অনুমান করে নিতে কোন কষ্টই হবে না। এই রূপকের মর্ম্ম বুধমণ্ডলীর বুদ্ধিতে সহজেই ধরা পড়বে।

বাদশাজাদী বা-দা-বুম্‌এর আত্মা পৃথিবীতে অবির্ভূত হওয়ার আগে খোদাতালার কাছে নিশ্চয়ই এই ভাবের প্রার্থনা করেছিলেন—

"হে আল্লা! তোমার হুকুমে দুনিয়ায় গিয়ে আমায় যখন দীর্ঘজীবন ধরে একটি স্ত্রীলোকের দেহ অনুপ্রাণিত করে রাখতে হবে, তখন তোমায় মিনতি করি—এই প্রার্থনা আমার মঞ্জুর কর, যেন তোমার সৃষ্ট জীবেরা তাদের জীবনকাল যে ভাবে কাটিয়ে চলে, আমি তার বিপরীত দিকে চলতে পারি! বুড়ী করেই আমায় জন্ম দাও, আর জীবনের শেষ পর্য্যন্ত যেন আমি ক্রমেই বয়সে ছোট হয়ে হয়ে চলি।"

আর উত্তরে আল্লাও নিশ্চয় বলেছিলেন—

"এ বড় আজব খেয়াল। তোমার আরজি মঞ্জুর। কিন্তু এক কথা, হে আত্মা! শেষে কিন্তু অনুতাপ করতে পারবে না। এখন তবে যাও, জন্ম নাও গিয়ে।"

এই আজগুবী মৎলবটিকে আরব মহা-কবি যে কি ভাবে ফুটিয়ে ফলিয়ে ফুলিয়ে ধরেছিলেন—আমি আবার বলি—তা হৃদয়ঙ্গম করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়।

বাদশাজাদী বা-দা-বুম প্রথমেই হলেন অতি বুড়ী—কেউ তাঁর দিকে নজরও দিত না, তিনি থাকতেন নির্জ্জনে একলা একলা। বৃদ্ধ বয়সে অতীতের কথা স্মরণে যে আনন্দ, যে তৃপ্তি, তাও তাঁর ছিল না; কারণ, বুড়ী হ'লেও তাঁর অতীত বলে কিছু ছিল না। তাঁর জবুথবু অবস্থা দেখে আশপাশের লোকেরা তাঁকে অবহেলাই করে আসত। তার পর ক্রমে যখন তিনি যুবতী হয়ে চললেন, তখন তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে কত লোকেই না তাঁর পাণিপ্রার্থী হয়ে পড়ল। শেষে আল্লার মর্জ্জিমতে তাঁকে বিয়ে করল ইস্পাহান থেকে আগত জহর-ব্যবসায়ী মহাধনী আলি তোরব।

কিন্তু যৌবন পার হয়ে তিনি যখন বালিকা হতে চললেন, তখন তিনি বড়ই বিপদে পড়ে গেলেন,—তাঁর বিষম অনুতাপ উপস্থিত হল। হারেমের মধ্যে বসে, বাঁদীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, তিনি রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নিশ্চয়ই মুখে অনেক সব অঙ্গরাগ ঘষাঘষি করতেন—একটু-খানি বেশী বয়সের হবার জন্যে।

হায়, বৃথা যত্ন! শৈশব যে আসবেই। তাঁর শরীরের আয়তনও দিন দিন ছোট হয়েই চললো। দারুণ ভীতি তাঁকে পেয়ে বসল। তিনি স্পষ্ট দেখলেন যে, তাঁর জন্মের অর্থাৎ মৃত্যুর কাল উপস্থিত-প্রায়।

তাঁর স্বামী, স্বামীর বন্ধুরা সকলে তাঁকে দোষ দিতে আরম্ভ করলো যে, তিনি এখন ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েকে তাঁর অসৎসঙ্গের সঙ্গী করে নিতে চাচ্ছেন। আর সহ্য করতে না পেরে, স্বামী তাঁকে পরিত্যাগ করলে। অভাগী বা-দা-বুম ক্রমে শিশু হয়ে পড়ল। অবশেষে এক দিন যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মাতৃজঠরে গিয়ে প্রবেশ করলো—অস্তিমে, শূন্যে মিশে গেল।

এই অদ্ভুত অপূর্ব্ব কল্পনা আমার মস্তিষ্ককে এমন ভাবে আলোড়িত করে তুলল যে, শেষটা আর থাকতে না পেরে একজন বুড়ো মৌলবীকে ধরে পড়লাম—বইখানার আদ্যোপান্ত অনুবাদের জন্য। অবশ্য আমার ধারণার কথাও সব তাঁকে আগেই খুলে বললাম।

বইখানা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে মৌলবী সাহেব আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—

"আপনি প্রত্নতাত্ত্বিক—আরব সভ্যতার-গবেষণায় নিযুক্ত?"

আমি নাকচোখ বুজে খুব জোর করে বলে ফেললাম,—"আজ্ঞে হাঁ"।

শুনে বুড়ো অসভ্যের মত কি বললে জানেন? বললে—"মশাই, আমি ত মনে করি আপনি একটা অজ্ঞ।"

আমি হাঁ করে রইলাম। বুড়ো একটু থেমে বলে চললো—"এটা একটা অতি পুরাতন গল্প। শাহজাদী বা-দা-বুম'এর কথা সকলেই জানে—আপনি ছাড়া। "জিরাফা জিরাফ" বংশের যে দ্বিতীয় শাখা আজর্‌-বেন-করক্‌-মিতাল বংশ, তার যে তৃতীয় উপশাখা (আমার মুণ্ডপাত করবার জন্য এই রকম কত যে দুষ্পাচ্য নাম বুড়ো উচ্চারণ করে গেল তার ঠিক ঠিকানা নেই) তাঁর প্রপৌত্রী হচ্ছে বা-দা-বুম্‌। আর সকল মানুষে যেমন জীবন যাপন করে, ইনিও ঠিক তেমনি করেছিলেন (কথা কয়টি মৌলবী সাহেব অসম্ভব রকম বিশ্রী রাগের সঙ্গে মোটা হরফে বললেন)। গল্পটা নেহাৎ বাজে—কোন বিশেষত্ব এর মধ্যে নাই। একটা কথা শুধু এই, আরবীর প্রত্নতাত্ত্বিক বলে যিনি আপনাকে জাহির করতে চান, তাঁর অন্ততঃ এইটুকু জানা উচিত যে, আরবী কেতাব উল্টাভাবে পড়তে হয়। আমাদের বইএ যেটা শেষ পাতা, আরবীতে হচ্ছে সেইটেই প্রথম পাতা, আরবীতে ডাইনে থেকে বাঁয়ে নয়, বাঁয়ে থেকে ডাইনে পাতা উল্টিয়ে যেতে হয়। বুঝলেন এখন আপনার গল্পের রহস্য?"

এর পর থেকে আমি সঙ্কল্প করেছি, আরবী ভাষা আর কখন শিখব না। আমার স্থির সিদ্ধান্ত এখন যে, যতক্ষণ গল্প বোধগম্য নয়, ততক্ষণই চমৎকার। বোধগম্য হ'লেই গল্পের চমৎকারিত্ব মাটি হয়ে যায়।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল্

BERTRAND RUSSEL

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সুইটজরলণ্ডে লুগানো সহরটিতে ইতালীয়ানদের বসবাস। দৃশ্য-সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব। Women's League of Peace and Freedomএ আমাকে রোলাঁ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিতে যেতে হয়েছিল। আমরা শতাধিক নিমন্ত্রিত ছিলাম। তার মধ্যে মহিলাবর্গ বেশি।

এরূপ স্থলে বিদেশে এসে সকলেই একটা স্ব-স্ব দেশের এটিকেটের জগদ্দলন পাথরের চাপ হ'তে মুক্ত বোধ করেছিলেন। কাজেই এখানে আমাদের মধ্যে অবাধে মেলামেশাটা ভারি উপভোগ্য ছিল। সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার দরুণ নিয়মকানুন-আনুগত্য ও কায়দা-দুরস্ত হওয়ার সমীচীনতা সম্বন্ধে বিজ্ঞজন অনেক সুযুক্তিই প্রয়োগ কর্ত্তে পারেন। তবে যেহেতু আমি অন্ততঃ এখনও অবধি নিজে এ শেষোক্ত সম্প্রদায়ের অন্যতম বলে গণ্য হই নি, সেহেতু আমার এ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ কথা বলা নিরর্থক শোনাবার সম্ভাবনাই পনর আনা। তাই আমি শুধু এ প্রসঙ্গে বলতে চাই এই কথাটি মাত্র, যে পনর দিন ব্যাপী এ অবাধ মেলামেশার ফলে আমার এক ডেনিশ বন্ধু এক সুইস তরুণীর প্রেমে পড়ে মাস কয়েকের মধ্যে তার পাণিগ্রহণ করেন। এ ছাড়া এ সমিতির অবাধ মেলামেশার আর কোনও কুফল (?) অন্ততঃ আমার গোচরে ত আসে নি।

সান্ধ্যভোজনে বসেছি। হট্টগোলটা বেশ ভারত-সুলভই লাগ্‌ছিল। এমন সময়ে আমাদের টেবিলের এক ফরাসী মহিলা আমাকে বললেন যে রাসেল এসেছেন। যাঁর বই তখন খুবই পড়তাম; যাঁর চিন্তাধারা তখন আমাদের মনে প্রথম এক নূতন আলোর খবর এনে দিয়েছিল; যাঁর নাম য়ুরোপের চিন্তাজগতে প্রখ্যাত; যাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমার এ সমিতিতে আসার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল;—তাঁর আগমন সংবাদে যে আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠবে এ কথা বোধ হয় বলাই বেশি। আমি চারিধারে তাকাতে লাগলাম।

একটী টেবিলে এক ঘনশ্বেতকেশ গুম্ফশ্মশ্রুমুণ্ডিত, প্রৌঢ়ত্ব ও বৃদ্ধত্বের মাঝামাঝি এক ভদ্রলোককে দেখ্‌লাম। তীক্ষ্ণ নাসিকা। ততোধিক তীক্ষ্ণ চক্ষু। মাথাটী আয়তনে প্রকাণ্ড। ক্ষীণ কলেবর। হীন বেশ, এমন কি ময়লা কলার—যা য়ুরোপে সভ্য-সমাজে অতি দূষণীয় বলে গণ্য। ইনিই বার্টরাণ্ড রাসেল! নাঃ, চেহারাটি প্রথমে যে আমাকে চমক লাগিয়ে দেয় নি সে কথা অস্বীকার কর্লে সত্যের অপলাপ হবে।

আহারের পরই তাড়াতাড়ি রাসেলের কাছে গিয়ে তাঁকে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধার কথা বললাম। রাসেলের মুখখানি আন্তরিক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি অত্যন্ত সহৃদয় ও সরলভাবে বললেন "Oh it is very kind of you indeed to say so!" তাঁর এ কথার মধ্যে যে য়ুরোপ-সুলভ কপটশীলতা বা অত্যুক্তি ছিল না তা বুঝতে বেশি অন্তর্দৃষ্টির দরকার হয় নি। তাঁর হাসিটী তাঁর দৃশ্যতঃ শুষ্ক চেহারার মধ্যে সব প্রথম আমার ভাল লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আর একবার যেন নূতন করে উপলব্ধি করলাম, মহৎ লোকও আন্তরিক তারিফ পেলে কতটা খুসি হ'ন—যদিও মহত্ত্ব যে এ তারিফের অপেক্ষা

রাখে না এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে সত্যকার মহত্ব শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পেলে যে আনন্দিত হয় দেখা যায়, সে আনন্দের মূল কারণ বোধ হয় অভিমান নয়। মানুষের হৃদয় সহানুভূতির মধ্য দিয়ে এই দৃশ্যতঃ অনৈক্যের মধ্যেও একটা ঐক্যের পরশ পেয়ে থাকে। এ ঐক্যের অনুভূতির মূল্য আমাদের কাছে খুব বেশি বলে উপলব্ধিটিরও আমরা বেশি দাম না দিয়েই পারি না।

দুঃখের বিষয় রাসেল আমাদের সমিতিতে তিন দিনের বেশি থাকতে পারেন নি। সুতরাং তাঁর সঙ্গে আশ মিটিয়ে আলাপ করার সুযোগও ঘটে নি। তবে আমার সাধ্যমত আমি নানান্ সময়ে নানান্ বিষয়ে এঁর সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ খুঁজে নিতাম। কেননা আমার বিশ্বাস যে এ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে একটু নিকট-সংস্পর্শের দাম আমাদের জীবনে খুব স্থায়ী হয়ে থাকে। কারণ মহত্ব—তা সে যে দিকেই হোক্ না কেন—আমাদের মনের উপর একটা গভীর ছাপ অঙ্কিত না করেই পারে না, যদি এ মহত্ব বোঝবার একটু ক্ষমতা অর্জ্জন করা যায়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে রাসেল সম্বন্ধে দু'চারটে কথা লিখবার ও সেই সূত্রে তাঁর Philosophy of Life সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবার অভিপ্রায় নিয়ে কলম ধরা গেছে। তবে তাঁর Philosophy of Life সম্বন্ধে এত কথাই বলা যেতে পারে যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সব কথার কোনও সন্তোষজনক আলোচনা হওয়াই সম্ভব নয়। তবে তা সত্ত্বেও যে আজ রাসেলকে নিয়ে সাধ্যমত একটু আলোচনা কর্ত্তে প্রবৃত্ত হয়েছি সেটা কেবল এই কথা ভেবে যে আমাদের দেশবাসীর তাঁর মতন লোকের সম্বন্ধে খবর রাখা নানান্ কারণে বাঞ্ছনীয়।

রাসেলের প্রতিভা বহুমুখী। তিনি একজন অনন্যসাধারণ গণিতবিৎ। তাঁর Principia Mathematica নাকি খুবই গভীর মৌলিকতার পরিচায়ক। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বিশেষ করে য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহের একজন উৎকৃষ্ট সমালোচক। তিনি একজন মনোহারী বক্তা। সরস আলাপী। উচ্চদরের রসিক। চমৎকার অর্থশাস্ত্রবিৎ ও শেষতঃ একজন প্রথমশ্রেণীর Political Philosopher.

রাসেলের লেখার মধ্যে আমি তাঁর অনেক গুণেরই অনুরাগী। যথা, তাঁর গভীরতা, পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ যুক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতা, প্রাঞ্জল ভাষা, সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদি। কিন্তু বোধ হয় সব চেয়ে ভালবেসেছিলাম—জগতের দুঃখ-কষ্টে তাঁর ব্যথা বোধ করার ক্ষমতাকে।

বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি গুণ সাধারণ না হ'লেও অনেকের মধ্যেই দেখ্তে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে পরদুঃখ-কাতরতার যোগাযোগ বড় দেখা যায় না। রাসেল তাঁর এই গুণের জন্যই অন্ততঃ আমার কাছে এত উচ্চদরের মানুষ বলে গণ্য হয়েছিলেন। কারণ বুদ্ধির বিকাশ কর্ত্তে গিয়ে হৃদয়কে উপবাসী রেখে চলার দৃষ্টান্ত সংসারে বোধ হয় একটু বেশি দেখ্তে পাওয়া যায়। হয়ত বা বুদ্ধি ও হৃদয় এ দুয়ের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ সম্পর্ক আছে, যাতে করে' একের বিকাশে অপরের একটু খর্ব্বতা সাধন না হয়েই পারে না। তবে সে যাই হোক্, এটা কিন্তু ঠিক যে এ দুই গুণের মিলনে মানুষের যে মনোজ্ঞ বিকাশটা হ'য়ে থাকে তার মূল্য সত্যসত্যই খুব বেশি।

রাসেলের মহত্বের পরিমাপ সম্বন্ধে একটা কথা প্রথমেই ব'লে রাখা মন্দ নয়। যদি অনুরাগী বা ভক্তের সংখ্যা দিয়ে মানুষের মহত্বের মূল্য ধার্য্য কর্ত্তে হয় তা'হলে প্রিন্স ক্রপটকিন রাসেল বাকুনিন প্রমুখ মহাজনকে বড়লোক বলা চলে না। কারণ এরা তাঁদের উদারতা ও পরদুঃখকাতরতার জন্যই স্বদেশে উৎপীড়িত ও বিদেশে অবজ্ঞাত হ'য়ে থাকেন,—এক সমমতাবলম্বী দু'চারজনের কাছে ছাড়া। তার কারণ জগতের সাধারণ মানুষ অন্ততঃ আজ অবধি উচ্চতম চিন্তাশীলতা বা মহত্বের দাম দিতে শেখেনি যদি সমাজ বিশেষ করে' তাদের সে দাম দিতে না বলে। এ বিষয়ে মানুষ বড়ই সমাজ-মুখাপেক্ষী। কারণ গতানুগতিকতাই হচ্ছে শতকরা নব্বই জনের ধর্ম্ম। তাই যেহেতু রাসেল ক্রপটকিন্ প্রভৃতি মহাপ্রাণ লোক স্বদেশে লোকপ্রিয় নন, সেহেতু স্ব স্ব দেশবাসীদের অধিকাংশের কাছেই এরা হয় ভ্রান্ত না হয় গোঁড়া, না হয় অন্ধ ও না হয় দুষ্ট লোক বলে গণ্য হ'য়ে থাকেন; সুতরাং রাসেল যে ইংলণ্ডে লোকপ্রিয় নন এ সংবাদে ভেবে দেখ্লে বিশেষ আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

রাসেলকে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম ইংলণ্ডে তাঁর সম্বন্ধে লোকমত কি রকম; রাসেল একটু সবিদ্রূপ হেসে বলেছিলেন, "৩৫ বৎসরের নীচে যারা, তারা আমার পক্ষে; তবে ৩৫ বৎসরের বেশি যাঁদের বয়স তাঁরা এ অধীনের প্রতি মোটেই সদয় নন।" কারণটা দুর্ব্বোধ্য নয়। রাসেল পুরাতন-পন্থী নন। তার ওপর তিনি একজন Socialist (খুব বাড়াবাড়ি রকমের Socialist না হ'লেও Capitalism এর বিরুদ্ধ খড়্গহস্ত)। কাজেই প্রবীণরা যাঁরা সংসারে একটা গতানুগতিকতার খাঁজে চলায় অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন তাঁরা) রাসেলকে দেখ্তে পারেন না। তবে নবীনেরাই চিরকাল নূতনের পতাকা নিয়ে জীবন-পথে চলে থাকেন। তাই রাসেলকে এই নবীন-সম্প্রদায় যেমন শ্রদ্ধা করে, তেমন শ্রদ্ধা বোধ হয় আর কেউ ক'রে'না বা কর্ত্তে পারেও না।

রাসেল মস্ত ঘরের ছেলে। তাঁর পিতামহ দুবার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। রাসেল অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হন। আমাকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, "তারপর আমি আমার পিতামহের ঘরেই মানুষ হই।.....২২ বৎসর বয়সে আমি একটা আমেরিকান মেয়েকে বিবাহ করি।" এ বিবাহ অসুখী হয়েছিল ও এমন কি বিবাহ ভঙ্গও হয়। তারপর রাসেল কেম্ব্রিজের গার্টন কলেজের একটী ছাত্রীকে বিবাহ করেন।

রাসেল যুদ্ধের সময় যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখার জন্য কয়েক মাস জেলে আবদ্ধ ছিলেন। যুদ্ধের শেষে ইংলণ্ডে তাঁর প্রতি সাধারণের বিরাগ এতই বেড়ে উঠেছিল যে তিনি একবার একটা ভাড়াবাড়ী হ'তে

তাঁর মতামতের জন্য তাড়িত হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে যদি আজ ইংলণ্ডের সব বাড়ী Stateএর হাতে থাকৃত তাহলে ইংলণ্ডে আমার বাস অসম্ভব হ'ত। (Prospects of Industrial Civilization)

নিজের স্বাধীন মতামতের জন্য অনেকবারই তাঁকে এরূপ ছোট বড় নির্য্যাতন সইতে হ'য়েছে। বোধ হয় এই জন্যই তিনি State বা কোন সম্প্রদায়ের হাতেই বেশি ক্ষমতা অর্পণের বিরোধী। কারণ রাসেল বলেন যে বেশি ক্ষমতা একজন মানুষের হাতে ন্যস্ত হ'লে তার অপব্যবহার হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেড়ে যাবেই যাবে।

রাসেল শান্তির একজন মস্ত পুরোহিত। যুদ্ধ বিগ্রহ যে শুধু হৃদয়হীনতা নয় মানুষের বুদ্ধিহীনতার ও অজ্ঞানতার ফল, এ কথা ইনি তাঁর প্রায় সব পুস্তকেই বলেছেন ও বার বার প্রমাণ কর্ব্বার চেষ্টা পেয়েছেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে লেখার জন্য একে কেম্ব্রিজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সে সম্বন্ধে রাসেল লিখেছেন:—"যদি কেম্ব্রিজের চাকরির উপরই আমার ভরণপোষণ নির্ভর করত তাহলে এ সময়ে আমি অন্নচিন্তা চমৎকারায় বুদ্ধিহারা হতাম নিশ্চয়।" (Free Thought and Official Propaganda)

কেম্ব্রিজ থেকে বিতাড়িত হ'য়ে ইনি বৎসরখানেকের জন্য পিকিনে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়ে গিয়েছিলেন। চীনদেশ ও চৈনদের এঁর এত ভাল লেগেছিল যে রাসেল আমাকে বলেছিলেন যে চীনদেশের জল হাওয়া তাঁর সহ্য হ'লে তিনি কখনই আর য়ুরোপে ফিরে আসতেন না। চীনকে রাসেল সত্যিই ভালবেসেছিলেন। এ কথা যিনিই তাঁর চীনসমস্যার উপর বইখানি পড়েছেন তিনিই জানেন। চৈনদের শান্তিপ্রিয়তা, সৈনিকজাতির প্রতি অবজ্ঞা, সাহিত্যানুরাগ, কলাপ্রিয়তা প্রভৃতি রাসেলের বড় ভাল লেগেছিল। এ সূত্রে তাঁর জাতীয়ত্ব-অভিমানরাহিত্যের বড় সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। চীনদেশ হতে ফিরে অবধি রাসেল নানাস্থানে বক্তৃতাদি দেওয়া এবং দর্শন ও গণিতের চর্চ্চাতেই কালাতিপাত কর্ত্তে মনস্থ করেছেন। আমাকে লিখেছিলেন যে, "বিশুদ্ধ বুদ্ধির চর্চ্চাই তাঁর কাছে সব চেয়ে বড় জিনিষ হ'লেও তিনি অর্দ্ধেক সময় রাজনীতি ও সমাজধর্ম্ম প্রভৃতির চর্চ্চায় নিয়োজিত করবেন স্থির করেছেন।" তাঁর কারণ—তাঁর মানুষের দুঃখে গভীর সহানুভূতি। দর্শন, গণিত প্রভৃতির চর্চ্চার সময়েও যে তিনি ব্যবহারিক জগতে মানুষের অসীম দুঃখকষ্টের কথা ভেবে কি তীব্র ব্যথা বোধ কর্ত্তেন সে পরিচয় তার Mysticism and Logic বইখানিতে পাওয়া যায়। কি শিল্পী, কি বৈজ্ঞানিক, কি সাহিত্যিক এরা সকলেই প্রায়শঃ স্বীয় শিল্পকলা বা বিজ্ঞানের চর্চ্চার আনন্দেই বিভোর থাকেন ও অনেক সময়ে এত বিভোর থাকেন যে মানুষ বা তার সুখ দুঃখের সমস্যা তাঁদের চিন্তা-জগতে বড় একটা প্রবেশাধিকার পায় না। শিল্পী বা বৈজ্ঞানিকের মধ্যেও মানুষের দুঃখ-দৈন্যের চিরন্তন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানর দৃষ্টান্ত বড় বেশি দেখা যায় না। এরা হয়ত মনে করেন এ মাথাঘামান উদ্দেশ্যহীন, নিরর্থক; কিন্তু জগতের চিরন্তন সমস্যাগুলি যাঁদের আদর্শবাদ বা কর্ম্মজগতের উপর কোন প্রভাবই বিস্তার কর্ত্তে পারে না, তাঁরা অন্যদিকে হাজারই মহত্ত্বের শিখরে উঠুন না কেন, স্বীয় চরিত্রের একটা মনোজ্ঞ সম্পূর্ণতা সাধন কর্ত্তে পারেন না বলেই আমার মনে হয়। তাই অরবিন্দ বড় সুন্দর বলেছেন "All problems of existence are problems of harmony" (Life Divine) তিনি আরও দেখিয়েছেন যে সংসারকে খারিজ ক'রে যে harmonyতে পৌঁছান যায় সেটা কত দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ। রাসেল, রোলাঁ, ক্রপটকিন, প্রভৃতির চরিত্রের গভীরতর ও তৃপ্তিদায়ক সম্পূর্ণতা দেখলে এ কথার যথার্থতা যেন আরও বেশি ক'রে উপলব্ধি করা যায়।

এ সূত্রে আমার এক ইংরাজ বন্ধু আমাকে ইংলণ্ডে বলেছিলেন যে যাঁরা জগতে বড়লোক বলে গণ্য হয়ে থাকেন তাঁরা স্ব স্ব বিষয় ছাড়া বড় একটা আর কোন বিষয়েই বিশেষ কোনও interest নেন না। তাঁর মতে এ রকম হওয়াটা মোটের উপর বাঞ্ছনীয়। অনেক বিষয়ে interest নিলে নিজের বিষয়ে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। আমার কিন্তু মনে হয় যে এ কথা সাধারণ মানুষের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সত্য হলেও মহৎ মানুষের পক্ষেও সত্য হবেই হবে বলে মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। কেন না মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে এ রকম সান্ত ক'রে দেখা সমীচীন বলে আমি মনে কর্ত্তে পারি না। স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন যে যেমন আমরা সচরাচর একটা লাইন পড়তে তার প্রত্যেক অক্ষর আলাদা আলাদা ক'রে পড়ি না, একযোগেই তার ভাবার্থ গ্রহণ কর্ত্তে শিখি, সেই রকম এক একটা paragraphএর প্রত্যেক লাইন আলাদা না পড়েও তিনি সমস্ত paraটির ভাবার্থ বুঝে নিতে পারতেন। এ রকম ভাবে মানুষের মনের ধারণাশক্তি বোধ হয় এখনও অন্ততঃ বহুকাল ধ'রে বাড়ান যেতে পারে। ক্রপটকিন, রাসেল প্রমুখ সুধীজনের বিরাট মানসিক শক্তির কথা ভাল করে একটু ভাবতে গেলে দেখা যায় যে মানুষ চেষ্টা করলে কতখানি সম্পূর্ণতা লাভ কর্ত্তে পারে।

রাসেল বস্তুতঃ ঠিক নাস্তিক নন agnostic—অর্থাৎ ঈশ্বরকে নিয়ে মাথা ঘামানোটা তিনি নিরর্থক পরিশ্রম মনে করেন। শাস্ত্রেও তাঁর আস্থা নেই। কাজেই তিনি বলছেন "আমি কোনও জানিত ধর্ম্মেই বিশ্বাস করি না, এবং আমার আশা আছে যে সকল প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাস এক দিন লোপ পাবে। আমি বিশ্বাস করি না যে ধর্ম্ম মোটের উপর মানুষের মঙ্গল সাধন করেছে।" অপিচ "Although I am prepared to admit that in certain times and places it (i. e. religion) has some good effects, I regard it as belonging to the infancy of human reason, and to a stage of development which we are now outgrowing." (Free Thought ard Official Propagnda)

তবে তিনি কিসে বিশ্বাস করেন এ প্রশ্ন মনে স্বতঃই উদয় হয়। রাসেল স্বীকার করেন যে শেষটায় প্রত্যেকেরই এমন গোটাকতক

বিশ্বাস থাকবে যার ভিত্তির উপর সে তার অন্যান্য সব বিশ্বাস ও যুক্তি প্রতিষ্ঠা কর্ব্বে। তাঁর নিজের ক্ষেত্রে এ বিশ্বাস হচ্ছে এই যে মানুষের এ জগৎকেই ভালবাসা, চিন্তা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, জীবনে-সহজ-আনন্দ ও সমাজের হিতসাধন-প্রচেষ্টা দ্বারা সুন্দর করে নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। রাসেল তজ্জন্য মানুষের অজ্ঞানতা দূর করা, মহৎ আদর্শ তাদের সামনে ধরা, স্বাধীন ভাবে ভাবতে শেখা ও সমাজের অবিচার দূর করা একমাত্র উপায় মনে করেন।

রাসেল বিজ্ঞানের পূজারী। তবে বিজ্ঞান বল্‌তে তিনি এর ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সুবিধা বর্দ্ধনের জন্য যে সব আবিষ্কার হয়েছে তাদের বোঝেন না। তিনি বলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানাটাই হচ্ছে একটা মস্ত জিনিস এবং এ জ্ঞানের উপাসকরা প্রায় দেবতুল্য লোকের কাজ (Godlike thing men do) কচ্ছেন বল্‌লেও তাঁর মতে অত্যুক্তি দোষ ঘটে না।

সঙ্গে সঙ্গে রাসেল আর একটি কথা খুব জোরের সঙ্গে বলেন। সেটা হচ্ছে এই যে বিজ্ঞান বল্‌তে আমরা প্রধানতঃ বুঝি—protoplasms, electron, polarisation, radio-activity প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক কথা অজস্র ব্যবহার করার ক্ষমতা। কিন্তু বিজ্ঞানের রাজ্যে এ সব কথার সদর্থ জানার চেয়ে ঢের বড় জিনিস হচ্ছে—Scientific outlook অর্জ্জন করা। Scientific outlook বল্‌তে রাসেল বোঝেন—মানুষের স্বীয় ভাল-মন্দ নিরপেক্ষ হয়ে সত্যান্বেষণ করার সাহস ও ক্ষমতার বিকাশ। কারণ রাসেল বলেন আমরা কোন্ যুক্তিবলে ধরে নিই যে এ জগৎ মানুষের বিকাশের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে, অথবা মানবের চৈতন্য বা জ্ঞানানুসন্ধিৎসার ফলে আমাদের অমঙ্গল না হয়ে মঙ্গলই হবে? তাই তিনি বলেন আসল কথা হচ্ছে এই যে সত্যই আমাদের উদ্দেশ্য, তাতে আমরা মরি আর বাঁচি।

কথাটি বেশ সুন্দর শুনতে বটে। কিন্তু আমার মনে হয় যে যতক্ষণ আমরা মনে করি জগতে মানুষের পরিণতি বিকাশের দিকে হতেও পারে নাও পারে, কেবল ততক্ষণই এ নিরপেক্ষ জ্ঞান-চর্চায় আমাদের মন সাড়া দেয়, যেহেতু এর মধ্যে একটা মস্ত বীরত্ব ও গরিমা আছে। কিন্তু ধরুন একজন বৈজ্ঞানিকের কাছে আজ এটা অকাট্যভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে মৃত্যুও যেমন নিশ্চিত, দশ মিনিট বাদে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের শূন্যে লীন হয়ে যাওয়াও ততখানি নিশ্চিত। এ কথা যদি তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করেন তাহলে তাঁর জীবনের শেষ দশ মিনিটও কি তিনি তথাকথিত সত্যানুসন্ধানে নিরত থাকবেন? অর্থাৎ তখন কি এ কাজ তাঁর কাছে নিরর্থক মনে হবে না? অবশ্য এটা হ'তে পারে যে অভ্যাসবশে তিনি শেষ দশ মিনিট সময়ও স্বকার্য করে যাবেন—কিন্তু সেটা যে একটা Godlike কাজ তা কি তিনি তখন সত্য সত্যই মনে প্রাণে বিশ্বাস কর্ত্তে পারবেন? তাই আমার মনে হয় যে, মুখে আমরা যতই কেন না সংশয় জানিয়ে আমাদের সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দেই, আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বোধ হয় একটা নিশ্চিত বাসনা বা বিশ্বাস না থেকেই পারে না যে, এ দৃশ্যতঃ দুঃখময় জগতের একটা না একটা মহনীয় পরিণতি আছেই আছে।

যাই হোক্ রাসেল বলেন যে মানব জীবনের বিকাশে Scientific outlook এর মূল্য অসীম। (Theory and Practice of Bolshevism এর ভূমিকা) সে জন্য রাসেল বলেন দরকার হচ্ছে—প্রধানতঃ কোন বিষয়েই দৃঢ়-নিশ্চিত না হওয়া। কারণ আমাদের কোনও বিশ্বাসই সম্পূর্ণ সত্য নয়। নিরপেক্ষ বিচার, সত্যানুসন্ধিৎসা, বিপক্ষ মতের আলোচনার প্রয়াস—এ সব উপায়ে আমরা মাত্র আমাদের মতামতের সত্যতার সম্ভাবনা বাড়াতে পারি। (Free Thought & Official Propaganda) তাই বৈজ্ঞানিকের কর্ত্তব্য—বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সত্য খুঁজতে না যাওয়া। তাঁর উচিত—অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে চলা। এবম্বিধ outlookএর সার হচ্ছে "the refusal to regard our own desires, tastes and interests as affording a key to the world." (১)

রাসেল দর্শন শাস্ত্রেরও একজন মস্ত ভক্ত, তবে আমার মনে হয় যে তাঁর দার্শনিক মতামত অনেক সময়ে নিছক্ বিজ্ঞান দ্বারা অনুসৃত হওয়ার দরুণ একটু যেন অগভীর হয়ে পড়েছে। কেন না রাসেল intuitionএ বিশ্বাস কর্ত্তে চান না, সব গভীর সত্যেরই এক রকম প্রত্যক্ষ প্রমাণ চেয়ে বসেন। রাসেলের মতন যাঁরা যুক্তিতর্ক বা reasonকে একেবারে দেবতা ক'রে বসেন তাঁদের বিরুদ্ধে অরবিন্দই বোধ হয় চরম কথা বলেছেন:—"Reason is only a messenger, a representative or a shadow of a greater consciousness beyond itself which does not need to reason because it is all and knows all that is" (Life Divine) রাসেলের পরিহাস যে, "Reason is the province of man, intuition—that of beasts, birds and Bergson"—একটু সস্তা ও অগভীর মনে হয়।

রাসেল দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চার মূল্য সম্বন্ধে কিন্তু বেশ চমৎকার বলেছেন: "The true philosophic contemplation, on the contrary, finds its satisfaction in every enlargement of the not-Self, in everything that contemplates the objects contemplated and therefore the subject contemplating" (২) তবে দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চায় তিনি objectivismএর দিকে বেশি ঝোঁক দিয়ে যাবার দরুণ মানুষের চৈতন্যকেও অনেকটা Jamesএর মতন অস্বীকার করার দিকেই যেন প্রবণতা দেখিয়েছেন। এ attitude অন্ততঃ, আমাদের ভারতীয় মনের কাছে প্রশস্ত মনে হয় না।

---

(১) Place of Science in a Liberal Education—MYSTICISM AND LOGIC.

(২) The Essay on Value of Philosophy......THE PROBLEMS OF PHILOSOPHY.

তবে রাসেলের এরূপ ভ্রমে পড়ার প্রধান কারণ আমার মনে হয়—তাঁর mysticismকে গোড়া থেকেই একটু অবিশ্বাসের চোখে দেখা। মানুষের জীবনের গভীর রহস্য যিনি উপলব্ধি করেন তিনি জগতে সব ঘটনা বা চিন্তাস্রোতেরই জলের মত কারণ নির্দ্দেশ করে দিতে সাহসিক হন না। রাসেল যে জীবনের এ রহস্য স্বীকার করেন না তা নয়; তিনি তাঁর নানা বইয়ে নানা স্থলে মানুষের জীবনের এ অজানা, অচেনার পরশের অমৃত-রসসঞ্চারের কথার আভাষ দিয়েছেন। (৩) তবে রাসেল বলেন যে mysticism এর রাশ একটু টেনে রাখা উচিত; নৈলে তা যে আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে তা কে জানে? এ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে সব মহৎ প্রবণতারই অপচার সম্ভব। তবে তাই বলে তাদের জীবন থেকে ছেঁটে দেওয়াই কখনও পন্থা হতে পারে না। পন্থা হচ্ছে—এ সব প্রবণতাকে সুপরিচালিত ক'রে তার দ্বারা জীবনের একটা গভীরতর সামঞ্জস্য পাবার চেষ্টা করা।

রাসেলের একটা অভ্রভেদী গুণ হচ্ছে তাঁর মধ্যে কপটতার একান্ত অভাব। সব গুণের ন্যায় Sincerity বা আন্তরিকতা গুণটিরও কম বেশি আছে। তবে এ গুণটীর প্রাধান্য যে মহত্বের একটা প্রধান মাপকাটি সে বিষয়ে বোধ হয় বেশি মতভেদ হবে না। তাই রাসেলের মহত্বকে একটু বড় করে বোধ হয় দেখা যেতে পারে, কেননা রাসেল তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক মন ও কঠোর আত্মবিশ্লেষণের অভ্যাসের সাহায্যে এ sincerity গুণটিকে যতটা লাভ কর্ত্তে কৃতকার্য্য হয়েছেন, এদিকে ততটা কৃতকার্য্য হওয়া বোধ হয় মহৎ লোকের মধ্যেও দুর্লভ। এঁর প্রতি বইয়েই কপটতা, আত্মপ্রবঞ্চনা ও ভান-করার-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যে কশাঘাত বিদ্যমান তার পরিচয় তাঁর কোন অনুরাগীর কাছেই অগোচর থাকতে পারে না। তাই আমি বর্ত্তমানে তাঁর কথাবার্ত্তায় ও প্রতি ভঙ্গীতে কপটতার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গোক্তি কি ভাবে ফুটে উঠত সে সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত দিয়েই এ প্রসঙ্গের শেষ করব। এক দিন আহারের সময় আমরা কয়জন এক টেবিলে বসেছিলাম। গল্প হচ্ছিল চীন দেশের সম্বন্ধে। কথায় কথায় চীন দেশের নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কথা উঠল। রাসেল বল্লেন যে চৈনরা এ বিষয়ে বেশ অকপট। তারা মেয়ে পুরুষ বেশ খোলাখুলি ভাবেই মেলামেশা করে ও আমরা যেরূপ আচরণকে দুর্নীতিমূলক বলে থাকি, তারা সেরূপ আচরণকে দূষণীয় বলে মনে কর্ত্তেই পারে না। আমি জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম, "কিন্তু যারা স্ত্রীপুরুষের এরূপ অবাধ মেলামেশায় কোনও হানি আছে মনে করে না, তাদের সম্বন্ধে কি এ কথা বলা চলে না যে তাদের মধ্যে sense of moralityর তেমন বিকাশ হয় নি।" রাসেল তৎক্ষণাৎ একটু ব্যঙ্গ হাস্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন:—"If want of hypocrisy means want of moral development then the Chinese are certainly not so morally-developed as we are to-day."

এরূপ রসিকতা যে রাসেলের কতদূর স্বভাবসিদ্ধ তা যে-কেউ তাঁর লেখার সঙ্গে সামান্যও পরিচিত আছেন তিনিই জানেন। এরূপ তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, সূক্ষ্ম রসিকতা এরূপ দার্শনিক ও মানব-প্রেমিকের মধ্যে বিকাশ পাওয়াটা একটু অভাবনীয়। যেমন, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের যে কি ভাবে অপব্যবহার হওয়া সম্ভব তা ভেবে রাসেল সব্যঙ্গহাস্যে লিখ্ছেন:—"Broadcasting is a new method (of propaganda) likely to achieve great potency as soon as people are satisfied it is not a method of propaganda." (Icarus on the future of Science) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেদিন রাসেলের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ বল্লেন "রাসেলের মতন witty আলাপী আমি কখনও দেখি নি।" আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় আমি রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিধ্বনি কর্চ্ছি।

আমাদের মধ্যে যে একটা আত্মপূজা ও আত্মপ্রবঞ্চনার প্রবৃত্তি আছে সেটা রাসেলের চক্ষুশূল। লুগানোতে চৈনদের প্রশংসা করার সময় য়ুরোপীয়দের এ সব প্রবৃত্তিকে রাসেল যখন ব্যঙ্গ করতেন তখন অনেক সময়েই দু'চারজন য়ুরোপীয় মহিলা তা'তে আহত বোধ কর্ত্তেন, লক্ষ্য করেছিলাম। কারণ এরূপ অপক্ষপাতিত্ব পরিপাক করারও একটা বিশেষ ক্ষমতা অর্জ্জন করা দরকার। য়ুরোপীয়েরা প্রায় সকলেই এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়ে থাকেন যে, প্রাচ্য জাতিরা পাশ্চাত্যের চেয়ে হীন ও তাই white man's burden হচ্ছে—তাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার স্নেহাশীষ দান করা। রাসেল তাঁর "চীন সমস্যা" পুস্তকে ঠিক উল্টো কথাটা বলেছেন বলে গাত্রদাহে ইংলণ্ডের অনেক তথাকথিত লিবারেলও তাঁর বইখানিকে অবজ্ঞেয় বলে রায় প্রকাশ ক'রে থাকেন। কারণ অপ্রিয় সত্যকেও তারিফ করা সাধারণ মানুষের কাছে সহজ নয়। ধরুন, এ কথা শুনে কোন্ সভ্য শ্বেত মানব না চটে থাকতে পারে যে, চৈনদের আশঙ্কার কথা হচ্ছে "that they may become completely westernized, retaining nothing of what has hitherto distinguished them, adding merely one more to the restless, intelligent, industrial and militaristic nations which

(৩) যেমন তাঁর Principles of Social Reconstruction পুস্তকে যেখানে তিনি বল্ছেন যে বালক বালিকার প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত কাজ, কে বল্তে পারে যে আমরা আমাদের রূঢ় ব্যবহারে অনেক সময়ে তাদের একটা মহনীয় অভূতপূর্ব্ব পরিণতির সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করি না? বা যেখানে তিনি বল্ছেন:—Marriage should be a spontaneous meeting of mutual instinct, filled with happiness not unmixed with a feeling akin to awe. (Roads to Freedom) এই awe কথাটিতে কতখানি ভাব নিহিত! কত শ্রদ্ধা! কত বিস্ময়! কত নম্রতা!

now afflict this unfortunate planet." মানব চরিত্রের অসারতাকে শ্রেয় বলে দেখাবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এরকম ভাবে নানা প্রসঙ্গে স্বীয় দৃঢ়ভিত্তি আদর্শবাদ প্রচার করা বাস্তবিকই একটা মস্ত জিনিষ।

আন্তরিকতা রাসেলের প্রতি কথায় ফুটে উঠ্‌ত। কোনও ভদ্রমহিলা এক দিন চৈনদের তথাকথিত নৈতিক দোষের কথা উত্থাপন করাতে রাসেল বলেছিলেন: "আপনিই সুখী, যে হেতু আপনি সমাজে নীতির একটা সংজ্ঞা (definition) নির্দ্ধারণে সফলতা লাভ করেছেন। আমি কিন্তু আজ অবধি এ সংজ্ঞা নির্ণয় কর্ত্তে পেরে উঠ্‌লাম না। আমার ত মনে হয়, যা'কে আমরা sense of morality বলে থাকি, ত'' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকমতের ভয় বা অন্য কোনও ভয়। তাই কাউকে অসচ্চরিত্র বল্‌তে আমি সহজে মনকে রাজী কর্‌তে পারি না।'

রাসেল বল্‌শেভিজমের বিপক্ষে। তার সব কারণ এখানে বিবৃত করা সম্ভব নয়। সে জন্য তাঁর Theory and Practice of Bolshevism নামে পুস্তকটি দ্রষ্টব্য। তবে তার প্রধান কারণ তিনি বলেন—Bolshevismএর ব্যক্তিগত স্বাধীন মতামতকে উড়িয়ে দেওয়া বা দাবিয়ে রাখার চেষ্টা। সভ্যতার একটা চরম ফল—মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্মান কর্ত্তে শেখা। এই জন্য ইনি Bolshevismকে "a splendid attempt without which ultimate success would have been very improbable"(৪) বলে লিখ্‌লেও কার্য্যতঃ তার সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন নি। রাসেল আমাদের এক দিন লুগানোতে বলেছিলেন যে, রুষ দেশে তিনি যে কয়দিন ছিলেন, সে কয়দিন এমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য তাঁকে ছেয়ে রাখ্‌ত যে, সেটা ঠিক বর্ণনা ক'রে বোঝান মুস্কিল। 'কেন' জিজ্ঞাসা করাতে রাসেল বলেছিলেন—"ধর তুমি এমন একটা দেশে এসে পড়েছ, যেখানে প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমার জীবন-সংশয় হ'তে পারে। এরকম স্থলে তোমার মনের অবস্থাটা যে বিশেষ রঙীন হ'য়ে উঠ্‌বে না, সে কথা বোধ হয় বেশি ক'রে বলার দরকার নেই।"

রুষ দেশে কোন্ লোকের ব্যক্তিত্ব রাসেলের সব চেয়ে বিরাট মনে হ'য়েছিল জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন—"O! Lenin of course. He is undoubtedly the greatest man." কি জন্য greatest জিজ্ঞাসা করাতে রাসেল বলেছিলেন—"তাঁর দুর্দ্দম্য ইচ্ছাশক্তির জন্য।" তবে লেনিনের বুদ্ধিমত্তায় রাসেল চমৎকৃত হন নি। আমরা এ কথায় আশ্চর্য্য হ'তে রাসেল বলেছিলেন—"কথাটা কিন্তু সত্য। আমার ত মনে হ'য়েছিল আমাদের অমুক (বর্ত্তমান ইংলণ্ডের ও পাশ্চাত্যের একজন নামজাদা রাজনীতিক) লেনিনের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান্।" একজন সঙ্কীর্ণচিত্ত ইংরাজকে লেনিনের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান্ বলাতে আমরা অল্প নিরাশ হওয়াতে রাসেল সেটা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে বলে উঠলেন—"আমাকে ভুল বুঝবেন না, যেন; অমুক একজন পাষণ্ড (রাসেল villain কথাটি ব্যবহার করেছিলেন) কিন্তু বুদ্ধিমান্।" শুনে আমরা সকলেই হৃষ্ট হয়েছিলাম। তার প্রধান কারণ এই যে রাসেলের মতন চিন্তাশীল লোকের এরূপ মতামত প্রকাশ করার ও কোনও সাধারণ লোকের অনুরূপ মতামত প্রকাশ করার মধ্যে একটু তফাৎ আছে। সেটা এই যে রাসেলের মতন লোকের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞান সাধারণের চেয়ে ঢের বেশি থাকে। তাই রাসেল যখন লেখেন "The present holders of power are evil men." তখন সেটা ভাববার কথা হয়ে দাঁড়ায়—যদিও ঠিক এ কথা যদি রাম-শ্যাম লিখিত তা হলে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর হয় ত বিশেষ দরকার হ'ত না।

রাসেল জীবনে বিশ্বাসবান্। তিনি মানুষের দ্বারা জগতের অশেষ দুঃখ-কষ্টের নিরাকরণ হ'তে পারে, এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। তবে তাঁর গভীর দুঃখ এই যে, মানুষ—অন্ততঃ পাশ্চাত্য জাতি—আত্মহত্যা কর্ত্তে কৃতসঙ্কল্প। এইরূপ হওয়াটা তিনি জাগতিক নিয়মে এক মহান্ 'ট্রাজিডি' বলে বার বার তাঁর নানা পুস্তকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তা'র দরুণ তিনি বুদ্ধ বা শঙ্করের দর্শনের অনুমোদন করেন না। তিনি এ জগতে বিশ্বাস করাটা বড় জিনিষ বলে মনে করেন। জীবনে আনন্দ—Joie de vivre—তিনি একটা মস্ত কাম্য জিনিষ বলে মনে করেন। অরবিন্দও জীবনে অবিশ্বাস করাটা অনুচিত মনে করেন। বোধ হয় সমস্ত স্বাস্থ্যবান্ মনই জীবনকে অবিশ্বাসের চোখে দেখার বিরোধী। রোলাঁও ঠিক এই কথাই লিখছেন;—"না,—আমরা জীবনকে যথেষ্ট ভালবাসি না। আমাদের কেউ তাকে ভালবাস্‌তে শেখায় না! আমরা যা'তে জীবনে বীতশ্রদ্ধ হই সে চেষ্টার কিন্তু ত্রুটি নেই। আমাদের শৈশব থেকে আমরা গান শুনি কিসের?—না, মৃত্যুর মহিমার ও মৃতের গৌরবের। ইতিহাস প্রশ্নোত্তরের ধারা প্রভৃতি সবই আমাদের শেখায় কি?—না, দেশের জন্য মরতে। ন্যায়, সুবিচার, স্বাধীনতা—এ সবের জন্য যদি মরতে চাও, বেশ ভাল কথা। কিন্তু যদি বাঁচতে চাও, তবেই গোলযোগ।" (৫)

যুদ্ধবিগ্রহের ঘোর বিরোধী হ'লেও তার আশু নির্ব্বাসন যে অসম্ভব এ কথা রাসেল স্বীকার করেন ও সেটা একটা গভীর ব্যথার

(৪) Theory & Practice of Bolshevism......মুখবন্ধ।

(৫) Non; on ne l'aime pas assez—la vie! On n'apprend pas à l'aimer. On fait tout oe qu'on peut pour vous en dégouter. Depuis qu'on est petit on nous chante la mort, la beaute de la mort ou bien ceux qui sont morts. L'histoire, le catéchisme "Mourir pour la patrie"......Droit, Justice, Liberté............on peut mourir pour ea. Mourir, on ne refuse jamais. mais, vivre, c'est autre chose. —Clerambault.

সঙ্গে। এ ব্যথা তাঁর ব্যঙ্গের মধ্যে প্রায়ই প্রকাশ পায়। যথা তিনি একবার লিখছেন—এটা অসম্ভব নয় যে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ একদিন সমগ্র মানবজাতির বিনাশ সাধনে কৃতকার্য্য হবে। হয়ত এই উপায়ে যুদ্ধবিগ্রহের শেষ হওয়াই সবচেয়ে আশাপ্রদ পদ্ধতি। (Theory and Practice of Bolshevism)

যখন মানুষ ইচ্ছে কর্লেই যুদ্ধবিগ্রহের নিবারণ কর্ত্তে পারে তখন তাকে অন্ধভাবে এর দ্বারাই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হ'তে দেখাটা যে রাসেলের ন্যায় আদর্শপন্থীর কাছে কতটা দুঃখজনক তা বোধ হয় সহজেই অনুমেয়। রাসেল জীবনে অমঙ্গল, দুঃখ প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন, ও প্রকৃতির দৃশ্যতঃ অপচয়কে optimistic বিশ্বাসের দ্বারা উড়িয়ে দিতে নারাজ। কাজেই তিনি তাঁর একটি বইয়ে এক স্থলে লিখেছেন যে জানছি, বুঝছি, দেখছি যে আমরা ব্যাদিতব্যাদান অতল ধ্বংসের গহ্বরে চলেছি অথচ তার প্রতিকার কর্ত্তে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম; এ চিন্তাটা যে কত বড় ট্র্যাজিডি তা যিনিই আদর্শবাদ দ্বারা জগৎকে সুখময় কর্ত্তে প্রয়াসী তিনিই বুঝবেন। পারিসে একটি চিন্তাশীলা সুইস তরুণী আমাকে একবার ঠিক এই কথাই বলেছিল যে গত যুদ্ধের বিরাট ও অর্থহীন অপচয় ও ধ্বংসের দৃশ্য যিনিই দেখেছেন তিনিই জানেন মানুষের জীবনে এ একটা কত বড় পরিহাস ও সেটা কি হৃদয়হীন। য়ুরোপে গত যুদ্ধের দৃশ্য যে শুধু সেখানকার চিন্তাশীল লেখকদের ভাবিয়ে দিয়েছে তাই নয়, তা য়ুরোপের প্রায় সব চিন্তাশীল নরনারীকেই একটা প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে দিয়েছে।

ফলে রাসেল জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) নিষ্ফলতা সম্বন্ধেও প্রায় কৃত-নিশ্চিন্ত হ'য়ে পড়েছেন। এক দিন তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন:—"জাতিসঙ্ঘের দ্বারা যে বিশেষ কাজ হবে এ ভরসা আমার নেই। যুদ্ধবিগ্রহ অন্য কোনও উপায়েও যে শীঘ্র নিবারিত হবে তারও ত কোনও সম্ভাবনা দেখছি না। ক্যাপিটালিস্‌মের আশু পতনের কোনও আশা ত নেই। তাই আমি ত বুঝতে পারছি না মানুষ এ যাত্রা আবার কি উপায়ে নবজন্ম লাভ কর্ব্বে।" বিষণ্ণভাবে রাসেল আমাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন মনে আছে। কিন্তু তার পরই রাসেল চিন্তিতভাবে বলেছিলেন:—"কিন্তু—কে জানে—হয়ত—একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। হয়ত কোনও অজ্ঞাত উপায়ে জগতের একটা গভীর পরিবর্ত্তন হবে। এ আশা যে আমি মনে একেবারে স্থান দিই না তা নয়।" সেদিন রাসেলের এ mystic কথাগুলি আমার মনের উপর একটা ছাপ অঙ্কিত করেছিল ও সেটা এই জন্য যে, রাসেল মানুষের ভবিষ্যৎ ও সুখদুঃখ নিয়ে কতটা মাথা ঘামান, এ কথাগুলি আমাকে তার একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়েছিল। আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেই নিজের ক্ষুদ্র দৈনন্দিন সুখ দুঃখের গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরেকে নিয়ে মাথা ঘামাতে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠেন। এবং যে অল্প কয়জন এ চেষ্টা করেন তাঁদের মধ্যেও খুব কম লোকেই মানুষের সুখ দুঃখ সত্য সত্য অনুভব করেন, যেহেতু অনেক তথাকথিত শিক্ষিত লোক এ সব নিয়ে আলোচনা করেন—ফ্যাশানের খাতিরে। মানুষের মনের ও কল্পনা-শক্তির খুব মহনীয় পরিণতি না হলে বিশ্বের মানুষের সুখ দুঃখ আমাদের মনে সত্যকার অনুরাগ তুল্‌তে পারে না।

ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে এক দিন রাসেলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। রাসেল বল্‌লেন:—'আমার মনে হয়, আর বৎসর কুড়ির মধ্যেই তোমরা স্বাধীনতা পাবে।'—'কেমন ক'রে?' 'আমার বোধ হয় ইংলণ্ড শীঘ্রই আর একটা ভীষণ যুদ্ধে নাম্‌বে, তখন তোমরা বোধ হয় আমাদের সহজেই তাড়িয়ে দিতে পার্‌বে।' এতটা উদারতায় আমি একটু চমৎকৃত হয়েছিলাম মনে আছে। কারণ, স্বজাতির দ্বারা উৎপীড়িত জাতির একজন লোকের কাছে স্বীয় আধিপত্যের বিনাশ কামনা প্রকাশ করার মধ্যে একটা sincerity ও ঔদার্য্য আছে, এ কথা বোধ হয় বেশি করে' বল্‌তে হবে না। যা' হোক্ আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম: 'কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ ক'রে যদি আমাদের এ স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হয়, তা' হ'লে আমরাও তার প্রতিক্রিয়ার দরুণ অত্যাচারী হ'য়ে উঠতে পারি, এ সম্ভাবনা আছে বলে আপনার মনে হয় কি?' রাসেল বল্‌লেন: 'তা' খুবই সম্ভব।'—'কিন্তু অনেক দিন ধরে শান্তিভোগ করার দরুণ ও য়ুরোপের এই কুরুক্ষেত্র শ্মশানের দৃশ্যে কি আমাদের চৈতন্য হবে না?' রাসেল একটু করুণ হাসি হেসে বল্‌লেন:—'দেখ, মানুষের স্বভাবই এই যে অপরের মধ্যে যে দোষ ত্রুটি দেখলে সে শিউরে ওঠে, সুবিধে পেলে নিজে কিন্তু সে পাপ হ'তে নিবৃত্ত হয় না।'

রাসেলের লেখার সঙ্গে যার পরিচয় আছে, তিনি বোধ হয় তাঁর লিখন-ভঙ্গীতে (style) বিশেষ ক'রে আকৃষ্ট না হ'য়েই পারেন না। আমার মনে হয় যে, এরকম প্রাঞ্জলতা শুধু নিছক্ প্রাঞ্জলতার জন্যই ইংরাজী লেখার একটা আদর্শ হিসেবে গণ্য হ'তে পারে। আমি অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়ে কোনও লেখকের লিখন-ভঙ্গীর চেয়ে রাসেলের লেখার ঢংকে নীচে স্থান দিতে পারি না। রাসেলের লেখায় কোথাও জড়তা নেই, অস্পষ্টতার ছায়াপাত নেই, আত্ম-প্রবঞ্চনার ইঙ্গিত নেই। নিজের অসাধারণ পড়াশুনা ও জ্ঞানকে তিনি জাহির কর্ব্বার কখনও চেষ্টা করেন না।—তাঁর যেটুকু জ্ঞান বা সংগৃহীত তথ্য লোকের সামনে ধরার দরকার বোঝেন, সেটুকু আহরণ ক'রে তার পাঠক পাঠিকার সামনে ধরেন মাত্র। তাঁর লেখা ছুরির মতই শাণিত, প্রস্রবণ ধারার মতই উজ্জ্বল, স্ফটিকের মতই স্বচ্ছ। সরল ভাষায় যে কত গভীর ভাব প্রকাশ করা যায়, রাসেলের লেখা তা'র জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ। রসিকতা হ'তে গাম্ভীর্য্যে ও গাম্ভীর্য্য হ'তে রসিকতায় স্বতঃস্ফূর্ত্তি রাসেলের লেখার একটা মস্ত সম্পদ। যেমন যেখানে তিনি লিখ্‌ছেন;

Now-a-days many men love their wives in the way they love mutton, as something to devour and destroy. But in the love that goes with reverence, there is a joy of quite another order, than any to be found in mastery, a joy which satisfies the spirit and not

only the instincts.' (Roads to Freedom) অথবা যেখানে তিনি স্বজাতির সম্বন্ধে বলছেন যে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি যে—'kindliness and tolerance are worth all the creeds in the world—a view which, it is true we do not apply to other nations or subject races.' (Theory & Practice of Bolshevism).

আমার রাসেল-রোঁলা প্রমুখ দু'চার জন য়ুরোপের চিন্তাবীরের সঙ্গে আলাপ করবার পর মনে হচ্ছিল যে, শুধু এঁদের লেখা থেকে এঁদের চরিত্রের গরিমার বা বহুধা পরিণতির সম্বন্ধে জ্ঞানটা অনেকটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ জ্ঞান বা ধারণার সম্পূর্ণতা অনেক বেড়ে যায় যদি এঁদের মত লোকের সঙ্গে একটু নিকট সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়। কারণ খুব বড় শিল্পী বা শিক্ষকও তাঁর শিল্পে বা লেখায় অনেক সময়েই এমন অনেক জিনিষ প্রকাশ করতে পারেন না, যা' তাঁদের ব্যক্তিত্বের সৌরভ আমাদের এক মুহূর্ত্তেই এনে দিয়ে থাকে। অথচ এ কথা ঠিক যে, কোন উপায়েই মানুষ তা'র সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে বাইরের লোকচক্ষুর কাছে পূর্ণভাবে মূর্ত্ত করে ধরতে পারে না ; সৃষ্টির এইখানেই একটা মহৎ গরিমা ও রহস্য বিদ্যমান যে, আসল মানুষটি চিরকালই তার সব জড়িয়ে অভিব্যক্তিরও অতিরিক্ত থেকে যায়। অথচ হয়ত যেটুকু সে প্রকাশ করতে পারে তার চেয়ে তার রহস্যময় অস্ফুট রূপটা ঢের বেশি আসল। তবে এ প্রকাশ সম্বন্ধেও একটা কথা আছে। একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের আত্মপ্রকাশও ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রকম ঠেকে ও ঠেক্‌তে বাধ্য। কারণ আমরা বস্তুতঃ অপরের এমন কোনও মহত্ত্ব বা পরিণতি ধরতে ছুঁতে পারি না, যার বীজ আমাদের স্বীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে খানিকটাও অঙ্কুরিত হয়নি। উদাহরণতঃ বলা যেতে পারে যে, কোনও কবির বা শিল্পীর বা দার্শনিকের সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ দিক্ বিভিন্ন লোককে বিশেষ বিশেষ রসের খোরাক যোগায়। কিন্তু আসল কবি বা শিল্পী বা মানুষটি তা'র এ বিভিন্ন রূপ বা বিকাশের সমষ্টিরও অতিরিক্ত নয় কি ? রাসেল প্রমুখ গভীরাত্মা মানুষের সংস্পর্শে এলে এ কথার যাথার্থ্য বোধ হয়, বেশি ক'রে উপলব্ধি করা যায়। যেমন, যে কোনও বড় লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হ'লে তাঁর লেখার দাম আমাদের কাছে যথেষ্ট বেড়ে গিয়ে থাকে দেখা যায়। তখন তাঁর প্রতি পত্রের মধ্যেই আমরা একটা নূতন অর্থ, নূতন গন্ধ, নূতন ব্যঞ্জনা আবিষ্কার না করেই পারি না। এজন্য এরূপ মহাজনের নিকট সংস্পর্শের মূল্য আমি একটু বেশি করেই ধার্য্য করার পক্ষপাতী। তাই আমি এটা আমাদের একটা পরম লোকসান মনে না করেই পারি না যে কালিদাস, সেক্সপীয়র, ডষ্টয়েভস্কি, টলষ্টয় প্রভৃতি মহাত্মাদের সঙ্গে আমরা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হ'বার সুযোগ পাইনি।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অভিজ্ঞ লোকের পক্ষে মানুষে বিশ্বাস রাখা অনেক সময়ে অসম্ভব হয়ে উঠে দেখা যায়। কারণ অভিজ্ঞতার আলোয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি জিনিষটা কল্পনা ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতা'র সাহায্যে মানুষের মধ্যে এমন অনেক অসারতা, নৃশংসতা ও অদূরদর্শিতার সন্ধান পেয়ে থাকে যা সাধারণ অনভিজ্ঞ বুদ্ধির চোখ সহজেই এড়িয়ে যায়। য়ুরোপে বর্ত্তমান সময়ে বুদ্ধি ও জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা শিক্ষিতদের মধ্যে আগেকার চেয়ে ঢের বেশি চারিয়ে গেছে। তাই সেখানে বিজ্ঞ লোকদের মধ্যে অনেকেই মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হ'য়ে পড়েছেন—বিশেষতঃ গত মহাযুদ্ধের পর থেকে। একটা উদাহরণ দেব।—আমি তখন প্রাগে আমার এক বান্ধবীর গৃহে অতিথি। সেখানে একদিন এক চেক্(Czech) ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। তিনি ছিলেন একজন লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক ও বাস্তবিকই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। তিনি বলছিলেন : 'মনুষ্যত্ব, millennium প্রভৃতি বড় বড় কথায় আমি বিশ্বাস করি না। আমি যা' চোখে দেখেছি, তাতেই আমার মন সাড়া দেয়। মনুষ্যত্ব আমি কখনও দেখিনি। দেখেছি—মানুষ। এখন, মানুষের মধ্যে ত চিরকালই দেখ্‌তে পাই মূঢ়তা জ্ঞানের চেয়ে বেশি, ক্ষুদ্রতা উদারতার চেয়ে প্রবল, অসারতা সারবত্তার চেয়ে বিস্তীর্ণ।' আমার ফরাসী বান্ধবী এ কথায় আপত্তি করার উপক্রম করতে না করতে তিনি বলে' উঠলেন : 'উঁহুঃ! বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বাড়লে লম্বা লম্বা কথা ও বড় বড় নীতিসূত্রে বিশ্বাস বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। কারণ, বিশ্বাস নির্ভর করে—নানান্ সত্য না-জানার উপর ও তা' থেকে যথাযথ সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতার অভাবের উপর। দেখুন না কেন, এত দেশ থাকতে ফরাসী দেশেই সর্ব্ব প্রথম অবিশ্বাসের বন্যা এসেছিল। এর কারণ আর কিছুই নয়, এর কারণ ফরাসী বর্ত্তমান জগতে সব চেয়ে বুদ্ধিমান জাতি।' বর্ত্তমান য়ুরোপে সর্ব্বপ্রকার 'নাস্তিবাদ' (nihilism) যে গত যুদ্ধের পর থেকে বুদ্ধিমান্ লোকের মনকে অলক্ষিতে কতটা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে, তা'র এমন উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যেতে পারে। তবে তা নিষ্প্রয়োজন ব'লে এ প্রসঙ্গে কেবল এই কথা বলেই ক্ষান্ত হ'ব যে এরূপ অবিশ্বাসের হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেতে হ'লে সাধারণ আটপৌরে যুক্তির একটু উপরে যেতে হয়। কারণ, টাকা-আনা-পাইয়ের সঙ্কীর্ণ যুক্তির বলে সে দূরদর্শিতা অর্জ্জন করা সম্ভব নয় যার সাহায্যে মানুষ আপাতদৃষ্টির সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হতে মুক্তি লাভ করতে পারে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার অসংখ্য নৃশংসতা, পাশবিকতা, অসারতা ও মূঢ়তা সত্ত্বেও মানুষ যে কোন্ উজ্জ্বল শক্তিবলে মানুষের ভবিষ্যতে বিশ্বাস রাখতে পারে তা'র দৃষ্টান্ত পেতে হ'লে রাসেল, রোলাঁ, ক্রপটকিন, অরবিন্দ প্রমুখ চিন্তাবীরের কাছে যেতে হবে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার হৃদয়হীনতায় রাসেল যে একটু নিরাশ হ'য়ে পড়েছেন, এ কথার উল্লেখ ইতিপূর্ব্বেই করেছি। তবে ঐ নৈরাশ্য যে তাঁর সাময়িক মাত্র এ কথা মনে করার কারণগুলি আমি আমার 'চীন সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে নির্দ্দেশ করবার চেষ্টা পেয়েছি। (৬)

(৬) আমি সে প্রবন্ধে রাসেলের যুদ্ধের আগেকার optimism ও যুদ্ধের পরেরকার pessimism নিয়ে আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা

তাই সে প্রসঙ্গের আর আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করছি। তবে এ প্রবন্ধটি শেষ করার আগে রাসেলের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কিরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগে, প্রকৃতির অবিচার সত্ত্বেও তাঁর মনে কিরূপ আদর্শবাদ বদ্ধমূল, বর্ত্তমান জগতের হাহাকার সত্ত্বেও মানুষের ভবিষ্যতে তাঁর মনে কিরূপ বিশ্বাস বিরাজমান, সে সম্বন্ধে একটি হৃদয়স্পর্শী বাণী উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।—

"The world we must seek is a world in which the creative spirit is alive, in which life is an adventure full of joy and hope, based rather upon the impulse to construct that upon the desire to retain what we possess or to seize what is possessed by others. It must be a world in which affection has free play, in which love is purged of the instinct for domination, in which cruelty and envy have been dispelled by happiness and unfettered developement of all the instincts that build up life and fill it with mental delights. Such a world is possible; it waits only for men to wish to create it.

Meantime the world in which we exist has other aims. But it will pass away, burnt up in the fire of its own hot passions; and from its ashes will spring a new and younger world, full of fresh hope, with the light of morning in its eyes."

(Roads to Freedom, শেষ অধ্যায়)

পেয়েছি যে বিগত যুদ্ধে তাঁকে প্রথমটায় কতটা হতাশ করে ফেলেছিল। তবে তাঁর সবল হৃদয় এর মধ্যেই যে সে হতাশার কারণ হ'তে অনেকটা মুক্তি লাভ করেছে, সেটা তাঁর যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরের লেখায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। তাঁর Free Thought & Official Propaganda, Prospects of Industrial Civilization, Icarus on the future of Science দ্রষ্টব্য।

প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কার

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়
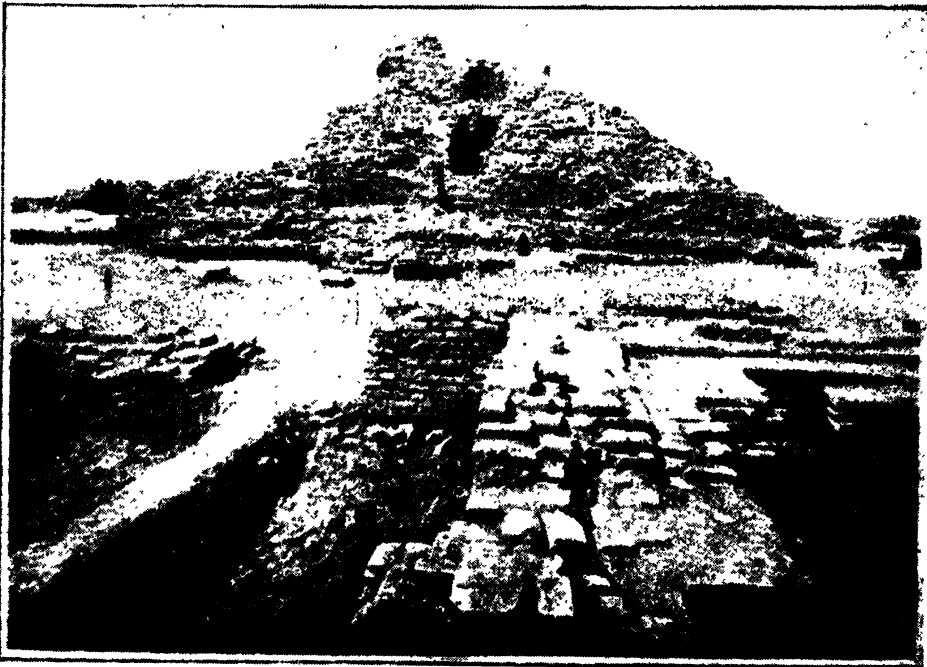
মাহেঞ্জোদারো স্তূপ

ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসের গোড়ার কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। কেহ তাহার প্রাচীনত্বকে খৃষ্ট-পূর্ব দুই চারি শতাব্দী টানিয়াই শেষ করিয়াছেন ; আবার কেহ বা তাহাকে টানিয়া বাড়াইয়া খৃষ্ট-পূর্ব্ব দুই চারি হাজার বৎসরে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত প্রত্ন-তাত্ত্বিকদের দ্বারা প্রাচীন ভারতের যে সমস্ত মাল মশলা

আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা প্রস্তর এবং তাম্র-যুগের অল্প-বিস্তর অস্ত্র-শস্ত্র, দক্ষিণ-ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কয়েকটি কবর এবং বিহারের রাজগৃহের ভগ্ন দেয়ালের ভিতরেই একরূপ সীমাবদ্ধ। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের মত একটা দেশের আদিম যুগের ইতিহাস গড়িয়া তুলিবার পক্ষে এ মূলধন মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। এই স্বল্প মূলধনের সাহায্যে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসের একটা ভিত্তি মোটামুটি ভাবে খাড়া করা সম্ভবপর হইলেও, আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি হঠাৎ এমন দুইটি স্থানের

হরপ্পা স্তূপ

আবিষ্কারের খবর আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যেখানে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের বহু শত বৎসর পূর্ব্বের ধ্বংসাবশেষও গচ্ছিত আছে বলিয়া মনে হয়।

এই নবাবিষ্কৃত স্থান দুইটির একটি হইতেছে পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলার হরপ্পা, আর একটি সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার মোহেঞ্জদরো। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কেবল মাত্র পরীক্ষা হিসাবেই এই দুইটি স্থানে খননের কাজে হাত দিয়াছিলেন। খুব বেশী জিনিষ এখনও তাঁহাদের হস্তগত হয় নাই। কিন্তু যতটুকু তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গড়িয়া তোলার সম্পর্কে তাহার দামই ঢের। সুতরাং তাঁহারা মনে করিতেছেন—ভারতবর্ষের এই অঞ্চলটা ভালো করিয়া খুঁড়িতে পারিলে, ইতিহাস গড়িয়া তোলার উপাদান এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই মিলিবে,—মেসোপটেমিয়া এবং নীল নদের উপত্যকার মত সিন্ধু-নদের উপত্যকাটিও প্রাচীন সভ্যতার নিশানায় পরিপূর্ণ।

মোহেঞ্জদরো এবং হরপ্পা খননকালে দেখা গিয়াছে যে, এই উভয় স্থানের মৃত্তিকাভ্যন্তরই কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। এবং নিম্নতর স্তরগুলিতেই অধিকতর প্রাচীন কালের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। মোহেঞ্জদরোর প্রথম স্তরে যে সমস্ত জিনিষ পাওয়া গিয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর কুশান রাজাদের সমসাময়িক। পুরাতন সহরের প্রধান রাস্তাটি এখনও রাস্তা বলিয়া চেনা যায়। এই রাস্তাটি নদীর দক্ষিণ তীর দিয়া বরাবর দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। উহার উভয় পার্শ্বেই যে লোকের বাস গৃহ ছিল তাহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানেই মোহেঞ্জদরোর খননের কাজ সুরু হইয়াছিল। তিনি বলেন,—রাস্তাটি নদীগর্ভে যেখানে হারাইয়া গিয়াছে, সেইখানেই সম্ভবতঃ এই লুপ্ত রাজ্যটির রাজপ্রাসাদ ছিল, এবং ঠিক ইহার বিপরীত দিকেই অধুনা-শুষ্ক নদীগর্ভে ছিল কয়েকটি দ্বীপ। এই দ্বীপগুলির ভিতর সহরের প্রধান প্রধান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটি সুবৃহৎ বৌদ্ধ-স্তূপ আয়ত ক্ষেত্রের একটি মঞ্চের উপর এখনও দাঁড়াইয়া আছে। বড় বড় মন্দিরগুলির চারিধারে ছোট ছোট মন্দির এবং সন্ন্যাসীদের থাকিবার মঠের চিহ্নও পাওয়া গিয়াছে।

এই প্রথম স্তরের আবিষ্কারটি অবশ্য খুব প্রাচীন নয়। তাহার পূর্ব্বের, এমন কি, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দেরও অনেক

রহস্যই ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও উক্ত সময়ের পর হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের যে যে অধ্যায়গুলি এখনও রহস্যের যবনিকার অন্তরালে ঢাকা আছে—এই কুশানদের রাজত্ব-কাল তাহাদেরই অন্যতম। সুতরাং এই নূতন আবিষ্কার ইতিহাসের এই অন্ধকার অংশটাতেও যথেষ্ট আলোকের রেখাপাত করিতে সমর্থ হইবে। মৃতদেহের ভস্মাবশেষ রক্ষা করিবার আধার, ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী অক্ষরে লেখা চিত্রবহুল ফ্রেসকো, নূতন ধরণের মুদ্রা প্রভৃতি যে সব জিনিষ সেখানে পাওয়া গিয়াছে, সে সমস্তই সেই যুগের ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ।

হরপ্পায় প্রাপ্ত বলয়

কিন্তু প্রথম স্তরের এই উপাদানগুলি যতই মূল্যবান হোক্ না কেন, তাহা অপেক্ষাও ঢের বেশী মূল্যবান তাহার পরের স্তরের উপাদানগুলি। হরপ্পার খনন কার্য্যের নেতৃত্ব রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহানি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর সাহানি ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দ্বয়ের চেষ্টাতেই এই বিস্ময়কর আবিষ্কার হইয়াছে; এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।
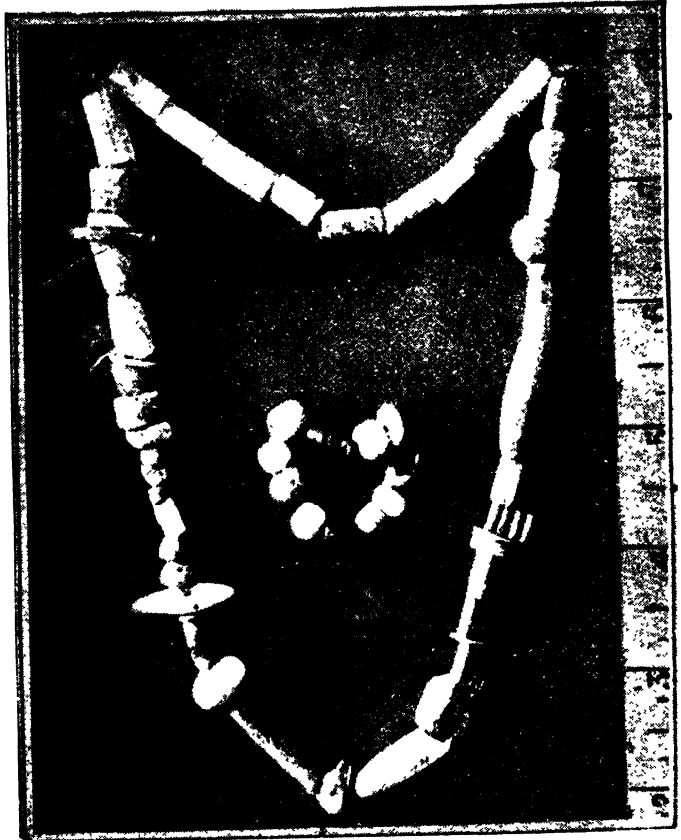
বৌদ্ধ-যুগের এই ধ্বংসগুলির বহু নিম্নে আরো দুইটি স্তর এই খননের ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং

সন্ধান মিলিয়াছে। সে যুগ যে কত প্রাচীন, তাহা অনুমান করিয়া লওয়া ছাড়া, নিশ্চয় করিয়া বলা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। এই স্তর দালান, কুঠুরী, প্রবেশ-দ্বার প্রভৃতির ধ্বংসস্তূপে পরিপূর্ণ। এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা ধ্বংসাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, যাহার দেওয়াল চওড়ায় প্রায় সাত আট ফিট হইবে। এই সব দেয়ালের গায়ে অনেকগুলি পয়ঃ-প্রণালীর মত ছিদ্র আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলিতেছেন, এ দেয়াল দেব মন্দিরের। পয়ঃ-প্রণালীগুলি দেবতাকে স্নান করানোর পর জলনির্গমের পথরূপে ব্যবহৃত হইত।

মাহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত কণ্ঠহার

পাওয়া গিয়াছে। এগুলিতেও পূর্ব্বের ন্যায় পয়ঃপ্রণালীর চিহ্ন বিদ্যমান।

হরপ্পা খননেও অন্ততঃ সাত আটটি স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৃতীয় খৃষ্টাব্দের বহু শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে যে এখানে সমৃদ্ধিশালী নগরের গোড়া-পত্তন হইয়াছিল, এই আবিষ্কারের পর সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহেরই আর অবকাশ নাই। বাসের জন্য যে সকল গৃহ ব্যবহৃত হইত, তাহার গাথনিও ছিল পাকা, পোড়ানো এবং ভাল মশলার তৈরী ইটের! হরপ্পাতে রেলওয়ে কোম্পানীর অনুগ্রহে ধ্বংস স্তূপের অবস্থা মোহেঞ্জদরো অপেক্ষাও শোচনীয়। আবিষ্কৃত জিনিষের অধিকাংশই টুক্‌রো টুক্‌রো অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ছোটখাট জিনিষগুলির চেহারা উভয় স্থানেই প্রায় এক রকমের।

মাহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত মৎপাত্র

মাহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত সিলমোহর

কতকগুলি মাটির পাত্র এই সব ধ্বংস স্তূপের ভিতর পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের গড়নও সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। তাহাদের ভিতর হাতে তৈরী এবং চাকে তৈরী, চিত্রিত এবং অচিত্রিত সব রকমের পাত্রই আছে। তাহা ছাড়া মাটির মূর্ত্তি, খেল্‌না, নীলকাচের বালা, নূতন ধরণের মুদ্রা, ছুরি, পাশা, দাবার ঘুঁটি, এক নূতন ধাঁচের পাথরের আংটি, খোদাই-করা সিল-মোহর—এ সমস্ত জিনিষও অনেক পাওয়া গিয়াছে। উপরের স্তর ছাড়া নীচের স্তরে লোহার জিনিষ এখনও কিছুই পাওয়া যায় নাই।

এই সব আবিষ্কারের ভিতর সিল-মোহরটাই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। চিত্রাক্ষরে ইহার গায়ে যে সব মূর্ত্তি খোদাই করা আছে, তাহার পরিচয় এখন পর্য্যন্তও জানা যায় নাই। তাহা ছাড়া খোদাই করিবার ধরণ এবং খোদিত মূর্ত্তিও সম্পূর্ণ নূতন রকমের,—ভারতীয় শিল্প কলায় এ ধরণের নমুনা আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। মোহরগুলি কতক বা পাথরের, কতক বা হাতীর দাঁতের এবং কতক প্লাস্ পেটের তৈরী—অধিকাংশের আকৃতিই চতুষ্কোণ। অঙ্কিত পশুগুলির চেহারা কোনটিতে ষাঁড়ের মত, কোনটিতে বা ইউনিকর্ণের মত। উন্নত ককুদযুক্ত ভারতীয় ষাঁড় বা জলহস্তীর চেহারা কোথাও নাই।

যে সব ছবি দ্বারা অক্ষরের কাজ করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে তিনটি জিনিষ বিশেষ ভাবে

লক্ষ্য করিয়া দেখার উপযুক্ত। প্রথমতঃ অধিকাংশ ছবির রেখাই বেশ উন্নতিশীল যুগের ছবির রেখার মত। দ্বিতীয়তঃ, মোহেঞ্জদরোর কতকগুলি লিপি হরপ্পা অপেক্ষা অক্ষর-মালার উদ্বর্ত্তনের পথে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগের জিনিষ। তৃতীয়তঃ, আমাদের জানা প্রাচীন ভারতের কোন অক্ষরমালার সঙ্গেই তাহার সাদৃশ্য নাই। পক্ষান্তরে তাহাদের চেহারা মাইকেনিয় যুগের চিত্রাক্ষরের চেহারার সঙ্গে অনেকটা মেলে।

উক্ত স্থানদ্বয়ে প্রাপ্ত চিত্রাঙ্কিত সিলমোহর

এই সব চিত্রাক্ষর যে কেবল মোহরের উপরই পাওয়া গিয়াছে তাহা নহে,—তাহা ছাড়া অনেকগুলি তামার পাতের উপরেও পাওয়া গিয়াছে। এই তামার টুক্‌রাগুলি খুব সম্ভব মুদ্রা রূপেই ব্যবহৃত হইত, যদিও ওজনে ইহাদের সহিত প্রাচীন ভারতের কোন মুদ্রারই কোনরূপ সাদৃশ্য নাই। এ অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে এই মুদ্রা-গুলিই সম্ভবতঃ জগতের আদিমতম মুদ্রা বলিয়া গণ্য হইবে। কারণ, এ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রাচীন মুদ্রার নমুনা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের ভিতর প্রাচীনত্ব হিসাবে লীডিয় মুদ্রার দাবীই সকলের উপরে এবং এই লীডিয় মুদ্রাগুলিও খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতকের জিনিষ। মোহেঞ্জদরোর এই তাম্র-খণ্ডগুলি যে সপ্তম শতকের অনেক আগের জিনিষ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মোহেঞ্জদরোর আবিষ্কারে আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় ধরা পড়িয়াছে—সেটি প্রাচীন ভারতের মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থা। অতি প্রাচীন যুগে মৃতদেহকে বক্র ভাবে শোয়াইয়া সাধারণতঃ চতুষ্কোণ ইষ্টকাধারের ভিতর সমাহিত করিবার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্ত্তী যুগের যে ব্যবস্থার পরিচয় এখানে পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পরবর্ত্তীকালে মৃতদেহকে পোড়াইয়া তাহার ভস্মাবশেষ একটি ছোট পাত্রে রাখিয়া এইরূপ একাধিক পাত্র একটি গোলাকার পাত্রের ভিতর সমাহিত করা হইত। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য পোষাক প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ আর দুই চারিটি অতি ক্ষুদ্র পাত্র দেওয়ার প্রথাও ছিল।

এই আবিষ্কারের পর সাধারণতঃ দুইটি প্রশ্ন প্রত্ন-তাত্ত্বিকদের জিজ্ঞাসু মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।—প্রথম এই সব জিনিষ কোন যুগের, অর্থাৎ খৃষ্টের কত শত বৎসর পূর্ব্বে এগুলি তৈরী হইয়াছিল? দ্বিতীয়, যাহারা এই সব জিনিষ গড়িয়াছিল, তাহারা কোন জাতীয়, অর্থাৎ কোন্ সভ্যতার স্তরে তাহাদের জন্ম?

এই দুইটি প্রশ্নের কোনটিরই উত্তর বর্ত্তমানে নির্ভুল ভাবে প্রদান করা সম্ভবপর নহে। আরও নূতন নূতন আবিষ্কারের উপর এ দুটি প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করিতেছে। তবে প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে এই উত্তর দেওয়া যায় যে, সিন্ধু নদের উপত্যকায় আজ যে সভ্যতার নমুনাগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দুই একশত বৎসরের ফল নহে। বহু শত বৎসর ধরিয়া তাহা প্রসার লাভ করিয়াছিল, এবং খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয়শতকে মৌর্য্যদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই তাহার যবনিকা পড়িয়া গিয়াছিল। গৃহগুলির

চেহারা দেখিয়া এ সত্য যেমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, তাম্র নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রের প্রাদুর্ভাব এবং লৌহের সম্পূর্ণ অসদ্ভাব প্রভৃতি ব্যাপারও সেই সত্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করে। ইট বা দুই একটি পুতুল ছাড়া, মৌর্য্য বা তাহার সমসাময়িক যুগের অন্য কোন জিনিষের সঙ্গে এখানকার আবিষ্কৃত জিনিষগুলির কোনোরূপ সাদৃশ্য নাই। মৌর্য্যদের সময় পর্য্যন্ত যদি এ সভ্যতা বাঁচিয়া থাকিত, তবে এরূপ অদ্ভুত সাদৃশ্যহীনতা কখনও সম্ভবপর হইত না। তাহা ছাড়া, ইহাদের চিত্রাক্ষরও রাজা অশোকের ব্রাহ্মী অক্ষর বা তাঁহার ব্যবহৃত উত্তরপশ্চিম সীমান্তের খরোষ্ঠি অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

এই সব প্রমাণের উপর নির্ভব করিয়া এ কথা স্বচ্ছন্দেই বলা যায় যে, এই নবাবিষ্কৃত জিনিষগুলি মৌর্য্য অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বের জিনিষ। বহু শত বৎসর ধরিয়া যে এ সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোন উপায় নাই। কারণ এই জিনিষগুলির নির্ম্মাণের ভিতর এমন নৈপুণ্য, পারিপাট্য এবং শিল্পজ্ঞানের পরিচয় আছে যে, দুই চারি শত বৎসরের সাধনায় তাহা লাভ করা যায় না।

হরপ্পায় প্রাপ্ত মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মূর্ত্তি

মিঃ সি, জে গ্যাড এবং মিঃ সিড্‌নি স্মিথ ইজিপ্ট ও আসেরিয়ার প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলিয়া অসামান্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত একটি প্রবন্ধ গত ৪ঠা অক্টোবরের Illustrated London News পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত প্রাচীন শিল্পাবশেষের পাশাপাশি ব্যাবিলনের শিল্পাবশেষের ছবিগুলিও ছাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উভয় শিল্পাদর্শের ভিতরকার সাদৃশ্য অদ্ভুত। হরপ্পাতে যে সব মোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে, আকৃতিতে তাহারা অবিকল মুসা ও ব্যাবিলনের আবিষ্কৃত চতুষ্কোণ মোহরের অনুরূপ। সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত বৃষের চেহারা ও ব্যাবিলনের আবিষ্কৃত বৃষের চেহারার ভিতরেও বিশেষ প্রভেদ নাই। অন্ততঃ তাহার শিং, স্কন্ধ, ককুদ্—এগুলি একেবারেই অভিন্ন। হরপ্পা মোহরে লেখার পরিবর্ত্তে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহারও অনেকগুলির সহিত সুমেরিয়ান চিত্রাক্ষরের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সংখ্যাবাচক অক্ষরগুলির ভিতরেও এই সাদৃশ্য নিতান্ত অল্প নহে। ব্যাবিলন এবং মুসার এই সব মোহর খৃষ্টের জন্মের ৩০০০—২৮০০ বৎসর পূর্ব্বে তৈরী হইয়াছিল বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং সিন্ধু উপত্যকার এই সভ্যতা ব্যাবিলনের এই সভ্যতা হইতে প্রাচীনতর কি না সে সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা না গেলেও, খৃষ্টজন্মের ৩০০০—২৮০০ বৎসর পূর্ব্বে যাহারা সুমেরীয় সভ্যতাকে পুষ্ট করিয়াছিল, তাহাদের সহিত, সিন্ধু উপত্যকায় যাহাদের মোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের যে ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।
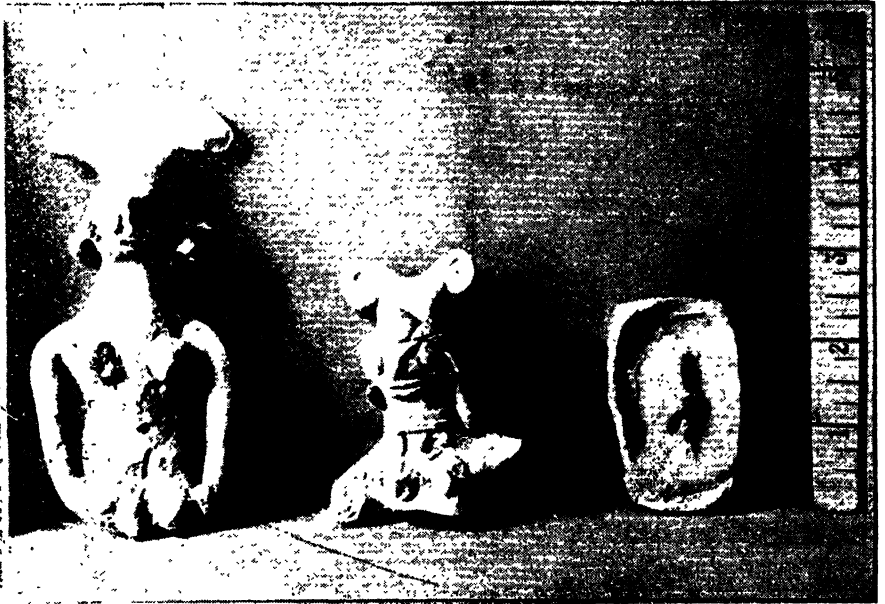
মোহর ছাড়াও আরো অনেক জিনিষের ভিতর দিয়া

এই দুইটি জাতির পরস্পরের পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। মোহেঞ্জদরোতে যে স্তম্ভাকার 'হেমাটাইট্‌' আবিষ্কৃত হইয়াছে, ব্যাবিলনে খৃষ্ট জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেও তাহা ব্যবহৃত হইত,—ছোট ছোট জিনিষের ওজন রূপে। পাথরের যে জিনিষটা ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অগ্নি মন্দিরের দণ্ড বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা ব্যাবিলনের Mace Headএর অনুরূপ। ভারতে যেমন ইহাদের আকার এবং ওজনের কোনও স্থিরতা নাই, ব্যাবিলনেও তেমনি ইহার আকার এবং ওজনের ভিতর যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মন্দির-চত্বালে এগুলি সম্ভবতঃ উপাসনার সময় ব্যবহৃত হইত। সুতরাং উভয় সভ্যতার ভিতর যে একটা যোগাযোগ ছিল, এই অগ্নি মন্দিরের সম্পর্কেও তাহার একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। নক্সা-কাটা ও সাদা-

মাহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত বৃষমূর্ত্তি-অঙ্কিত সিলমোহর

সিধে শঙ্খ ব্যাবিলন সভ্যতার একটি অঙ্গ ছিল, এই ধরণের শঙ্খ সিন্ধু উপত্যকাতেও পাওয়া গিয়াছে। মোহেঞ্জদরোর একটি মোরগের প্রতিকৃতি ব্যাবিলনের সীমান্ত প্রদেশে আবিষ্কৃত একটি পাখীর অবিকল অনুরূপ। ব্যাবিলনের এই পক্ষীটির চিত্র খৃষ্টের অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের আঁকা। এই উভয় স্থানের অট্টালিকা, পয়ঃপ্রণালীর ধরণ, পালিশ-করা ইটের নক্সা—এগুলির ভিতরেও সাদৃশ্য কম নহে। এ সমস্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এই দুইটি প্রাচীন জাতির পরস্পরের পরিচয় সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার বিশেষ কোন কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি কতকগুলি নূতন আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় আর্য্যদের সহিত অতি প্রাচীন যুগেও মেসোপটেমিয়ার ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল—এ ধরণের একটা ধারণা প্রত্নতাত্ত্বিকদের মনে বদ্ধমূল হইবার সুযোগ পাইয়াছে। খৃষ্টের জন্মের ১৪০০—১২০০ বৎসর পূর্ব্বে মেসোপটেমিয়ায় যে ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহার ভিতর হইতে অশ্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহারা কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের সন্ধান পাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, ঠিক এই সময়েই মেসোপটেমিয়াতেও ইন্দ্র, বরুণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যে পূজা হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং মেসোপটেমিয়ার সহিত ভারতীয় আর্য্যদের যে একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা একরূপ বিনা বাদ-প্রতিবাদেই মানিয়া লওয়া যায়। তবে খৃষ্ট জন্মের ৩০০০—২৮০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যাহারা সুমেরিয়ানদের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল, তাহারই এই মেসোপটোমিয়ার পরিচিত আর্য্য কি না, বর্ত্তমান আবিষ্কারের উপর নির্ভর করিয়া তাহা বলা যায় না। সেজন্য আরও নূতন আবিষ্কারের ও নূতন প্রমাণের প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, মোহেঞ্জদরো এবং হরপ্পাতে যাহারা সভ্যতার নিদর্শনসমূহ পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তাহারা কোন্ সভ্যতার স্তরে বাড়িয়া উঠিয়াছিল? এ প্রশ্নের উত্তরেও কোনো কথা আজও জোর করিয়া বলা চলে না। কেহ কেহ মনে করিতেছেন, এই সভ্যতা বাহিরের আমদানী; আবার অনেকের মতে, সিন্ধু নদের উপত্যকাতেই এই সভ্যতা জন্মগ্রহণ করিয়া পুষ্টি-লাভ করিয়াছিল। এই মত-বৈষম্যের মীমাংসা করা আজ সম্ভবপর না হইলেও, শেষোক্ত মতই অপেক্ষাকৃত সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ, দুনিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের পাতাগুলি উল্টাইলেই দেখা যায় যে, বড় বড়

নদীর উপত্যকাতেই এক একটি নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। ডানিউব, নীলনদ, ইউফ্রেটিস্, টাইগ্রীস্—ইহাদের প্রত্যেকের কাছেই সভ্যতার গোড়া-পত্তনের জন্য মানুষের ঋণের পরিমাণ আজ প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিক্তিতে ধরা পড়িয়াছে। কেবল মাত্র সিন্ধু নদ এবং গঙ্গা নদীর কাছে তাহাদের ঋণের পরিমাণ আজিও অজ্ঞাত। হরপ্পা এবং মোহেঞ্জদরোতে যে সভ্যতার নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, বাহিরের আনাগোনা হয় তো সে সভ্যতাকে খানিকটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু সিন্ধুর উপত্যকাতেই যে তাহার জন্ম, তাহা একেবারে অসম্ভব না-ও হইতে পারে। বরং যে সমস্ত কারণের উপর নির্ভর করিয়া কোন দেশের সভ্যতার ভিত্তি গড়িয়া উঠে, সেগুলির দিকে নজর দিলে, সিন্ধুর উপত্যকাই ইহার জন্ম-কেন্দ্র বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ সম্বন্ধে এই স্বল্প আবিষ্কারের জোরে কোন কথাই আজ জোর করিয়া বলা যায় না।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রবন্ধের উপকরণ ও চিত্রাদি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সার জন মার্শাল সাহেবের লিখিত প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইল।

আলো

শ্রীঊর্ম্মিলা দেবী

কঠিন বচন শাসন করিছে,
ভাল মোর সেই ভালো।
ভব-কারাগারে মোহ অন্ধকারে,
আলো মোর সেই আলো।
আমার যে কেহ ছিল আত্মপর,
সকলে মিলিয়া দিল অবসর,
অদৃষ্টের পরে করিয়া নির্ভর
তরণী আমার ভাসিল।
তীরের বাঁধন কাটিল এবার
ভাল মোর সেই ভালো,
মায়া-কারাগারে মোহের আঁধারে,
আলো মোর সেই আলো।
আদান প্রদান সাঙ্গ হইল কি ?
হিসেব পত্তরে কিছু নেই বাকী ?
মোর দান যত আগাগোড়া ফাঁকী
পেয়েছে যে, সে কহিল ?
ঋণী রহিলাম সকলের কাছে,
ভাল মোর সেই ভালো,
মোহ কারাগারে ভবের আঁধারে
আলো মোর সেই আলো।
আর বাধা কোন নাই এ ভুবনে,
অশ্রুজল কারো ঝরেনা নয়নে,
আমারও তরণী মধুর পবনে,
অজানার পথে চলিল।
তীর হ'তে কেহ ডাকিবেনা ফিরে
ভাল মোর সেই ভালো।
মায়া-কারাগারে মোহের আঁধারে
আলো মোর সেই আলো।
চিনিয়াছি পথ গহন তিমিরে,
চলিয়াছি তাই শ্রান্তি ভরে ধীরে,
আজি এ সন্ধ্যার মৃদুল সমীরে,
জীবন আমার জুড়াল।
অকূলের মাঝে দিল যে ভাসায়ে,
ভাল মোর সেই ভালো।
ভব-কারাগারে মোহের আঁধারে
আলো মোর সেই আলো।
হে জগৎবাসি! তোমরা যে কেহ,
দেখাইয়া দিলে কোথা মোর গেহ,
সার্থক করেছ মোর এই দেহ,
আমারও আশা পূরিল!
সংসার যখন ত্যজিল আমারে,
ভালো মোর সেই ভালো।
মায়া-কারাগারে মোহের আঁধারে
আলো মোর সেই আলো।
কোথা আছ তুমি ওগো বিশ্বরাজ!
সমাপন করি সংসারের কাজ,
শ্রান্ত পথিক আসিয়াছে আজ
দেখাও তোমার আলো।
চির অন্ধকার ঘুচিল এবার,
ভালো মোর সেই ভালো,
ভব কারাগারে মোহের বিকারে
আলো মোর সেই আলো।

উৎসবে সমবেত মহারাজা ও তাঁর অনুচরবর্গ

ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত হিমালয়ের উপত্যকার মধ্যে যতগুলি দেশ আছে, প্রাকৃতিক সৌষ্ঠবে তাহার কোনটিই ভুটানের সমকক্ষ নহে।

ভুটানের সম্ভ্রান্ত পরিবার

ভুটানের উচ্চশৃঙ্গ পর্ব্বত-মালাকে যে গম্ভীর ও অবসর্পি গিরিবর্ত্ম গুলি বেষ্টন ক'রে আছে, সে যেন "দুয়ার্সের" সমতট থেকে তিব্বতের অধিত্যকার উপর যাবার জন্য প্রকৃতির স্বহস্ত-রচিত অধিরোহণীর মতো! এই সমুদায় পার্ব্বত্য-ভূভাগ একেবারে শিখরদেশ পর্য্যন্ত শ্যামল বন-শোভায় সমাচ্ছাদিত। ঝাউ ও দেবদারুর নিবিড় অরণ্য একেবারে পর্ব্বতের তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আট নয় হাজার ফুট উপরেও পুষ্পিত ওকবৃক্ষ ও নানা বিচিত্র বর্ণের কুসুমতরুরাজি দেখিতে পাওয়া যায়। একাধিক খরস্রোতা গিরি-নির্ঝরিণী তাদের পাষাণ-অবরোধ ভেদ ক'রে উদ্দাম উচ্ছ্বসিত বেগে ছুটে এসে ব্রহ্মপুত্রের প্রসারিত বিশাল বক্ষের উপর লুটিয়ে পড়েছে। এই সব নদীতটের নিম্ন-ভূমিতে সুদৃশ্য সুন্দর ঘন বেণুবন ছাড়াও যেসব বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি অয়নান্ত-বৃত্তমধ্যস্থ-প্রদেশেরই বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ, তাহাও এখানে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভূত হয়। এবং এই সব পার্ব্বত্য-নিকুঞ্জ ও নদীতট-বনের শোভা শতগুণে বৃদ্ধি ক'রে রেখেছে, এদেশের অপূর্ব্ব প্রজাপতির বিচিত্র বরণোজ্জ্বল সদা-চঞ্চল পক্ষপুট! অসীম অনন্ত বিচিত্র প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য্যে ভূটান যেন কোন সুরলোকের অমরাবতীর তুল্য নয়নাভিরাম !

হিমালয়ের উর্দ্ধতম প্রদেশে যতদূর দৃষ্টি যায়, তার প্রত্যেক স্তরটি যেন ভূটানের ভৌগোলিক বিশেষত্বের নিদর্শন ধারণ ক'রে দাঁড়িয়ে র'য়েছে বলে মনে হয় ; তার পরই চ'খে পড়ে তিব্বতের শুভ্র সমুজ্জ্বল তুষার কিরীট ! ভূটানের পার্ব্বত্য-উপত্যকার মাঝামাঝি উঠে দাঁড়িয়ে দেখলে, একসঙ্গে এই দুই বিপরীত দৃশ্য দৃষ্টি-গোচর হয়,—উপরে অভ্রভেদী তুষারমৌলিগিরিশৃঙ্গ, নিম্নে বিচিত্র শ্যামল বনভূমি !

কিন্তু ভূটানের পথ-ঘাটগুলি বেশ নিরাপদ ও সুগম নহে। পথিককে সহসা আক্রমণ করে হুল ফোটাবার জন্য বা দংশন করবার জন্য অনেক রকমের কীট-পতঙ্গ পথের আশে-পাশে ঝোপে-ঝাড়ে ওত পেতে বসে থাকে। বিশেষ ভূটানে জোঁকের উৎপাত এত বেশী যে মানুষ বা পশু কেউ তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা ক'রে চলতে পারে না।

ভারত-সরকারের কাছে, ভূটানের একটা রাজ-নৈতিক

মন্ত্রিসভা

বৌদ্ধ দেবরাজ অবতার থালিঙ ও তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ

রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ

রক্ষি-পরিবেষ্টিত মহারাজ

ভূটানের মুখোস পরা নাট্যসম্প্রদায়

বিশেষত্ব আছে, কারণ এইটি ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতে যাবার একটি প্রধান প্রবেশদ্বার। বিশেষতঃ পশ্চিমে বুক্‌শার পথ ও পূর্ব্বদিকের দ্বারবান গিরিপথ এ-দুটি একেবারে হিমালয় থেকে সোজা পুণাক্ষ পর্য্যন্ত চলে এইটিকেই রাজধানী বলা যেতে পারে, কেন না শাসন-বিভাগে আস্তানা এই সহরেই প্রতিষ্ঠিত।

তিব্বতের সঙ্গে আসামের যেটুকু কারবার চলে, এই পুণাক্ষ সহরের মারফতেই সুসম্পন্ন হয়। ভূটানে স্থানীয় ব্যবসা-বিশেষ কিছুই নাই বলিলেও চলে। মে

সপারিষদ রাজা

ফেরীজোঙ দুর্গ
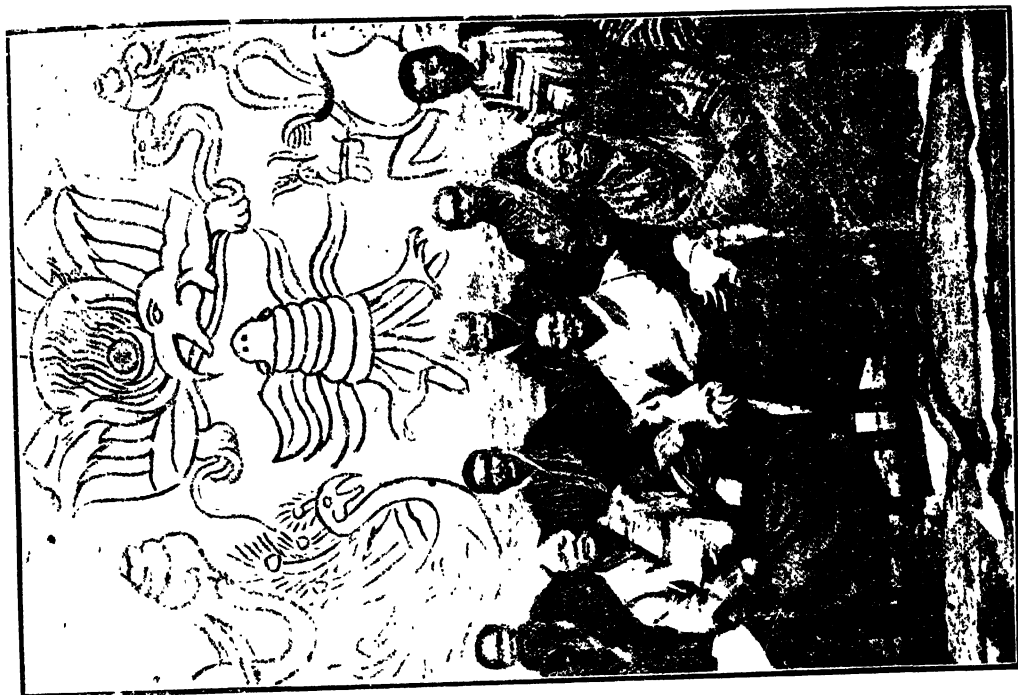
রাজপ্রাসাদের বাদক সম্প্রদায়

লামাদের নৃত্য-গীত ও বাদ্য

কম্বল, সুতির কাপড়, চামড়া আর লোহার জিনিস ছাড়া অন্য কিছু বড় একটা সেখানে উৎপন্ন হয় না, এবং এসবও যে পরিমাণে উৎপন্ন হয় তা দেশের প্রয়োজনের পক্ষেই যথেষ্ট না হওয়ায় রপ্তানী বা চালান যাবার জন্য কিছুই থাকে না।

দ্বারবান গিরিপথ আজকাল বড় একটা ব্যবহৃত হয়

না ; কারণ এ পথের উপস্থিত কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই ; তবে ভবিষ্যতে হয়ত' কোনও দিন এই পথই একটা প্রধান রাজপথ হ'য়ে উঠ্‌তে পারে ; যদি একে 'মানস' নদীর গতি অনুসারিণী করে দেওয়া যায়, তাহ'লে এই পথটাই হবে তখন তিব্বতে যাবার,—তিব্বতে কেন,

দেবরাজ (ভূটানের অধ্যাত্ম-জগতের প্রধান প্রতিনিধি)

একেবারে 'লাশা' যাবার সব চেয়ে সিধে রাস্তা ! 'মানস' হ'চ্ছে ভূটানের প্রধান নদী ; তিব্বতের বৃহত্তম হ্রদ 'ষমোদ-কোৎস' থেকে মানসের উৎপত্তি।

ভূটানী বা ভুটিয়ারা তিব্বতীদেরই জাত-ভাই। মাত্র দু'শতাব্দী আগেও পশ্চিম ভূটানের সমস্ত প্রদেশটা 'তেফু' ব'লে এক-জাতীয় লোকের অধিকারে ছিল। তেফুরা খুব সম্ভবতঃ কুচবিহারের একদল বর্ব্বর পার্ব্বত্য অধিবাসীদের শাখা-প্রশাখা ছিল ; কিন্তু তিব্বতের সৈন্যদল তাদের বিতাড়িত করে সমস্ত পশ্চিমাঞ্চলটা দখল ক'রে নিয়েছিল। এবং সেই থেকে ওদিকটা তাদেরই অধিকারে র'য়ে গেছে।

উচ্চশ্রেণীর ভুটিয়ারা সকলেই যেন আকৃতি-প্রকৃতি, স্বভাব চরিত্র ও আচার ব্যবহারে একেবারে হুবহু তিব্বতীদের মতো ! তাদের ঘর-বাড়ী, দেবমন্দির, আশ্রম সবই অতি সুন্দর কারুকার্য্যে খচিত। কাঠের কাজ তারা ভারি সুচারুরূপে করতে পারে। তাদের কাঠের বাড়ীর সামনের খোদাইয়ের কাজ এত চমৎকার যে, দেখলে অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়। শুধু তাই নয়, পাহাড়ের এমন সব অসম্ভব জায়গাতেও তারা বাড়ী তৈরী করতে পারে, যে তাদের বুদ্ধির ও দক্ষতার প্রশংসা না করে থাকা যায় না। তারা বিদেশীদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করে না, এবং অতিথি-সৎকারে কোনও দিনই বিমুখ হয় না, যদি ঠিক বন্ধুভাবে তাদের কাছে পৌছানো যায়।

ভূটানীরা চাষ-বাস ক'রতেও বেশ পটু। তারা নানা রকম উৎকৃষ্ট শাক-সব্জী উৎপাদন ক'রে, বিশেষতঃ—শালগম, গাজর প্রভৃতি সব্জী তাদের দেশের মতো আর কোথাও জন্মায় না।

ভূটানীদের দেশের শাসন প্রথাও অনেকটা তিব্বতীদেরই অনুরূপ। তাদের দু'জন রাজা আছে, একজন "দেবরাজ", অর্থাৎ যিনি দেশের আধ্যাত্মিক ব্যাপারের সর্ব্বময় কর্ত্তা ; আর একজন "ধর্ম্মরাজ" অর্থাৎ

রাজ-বন্দনাকারিগণ

সাধারণ পোষাকে ভুটানের মহারাজা (সপরিবারে)

দেশের রাজকীয় ব্যাপরের সর্ব্বেশ্বর। কিন্তু এই যুগল রাজাকেই প্রকৃতপক্ষে কিছুই করতে হয় না। দেশের প্রধান পুরোহিত বা ধর্ম্ম-যাজকেরা যাঁকে 'দেবরাজ' রূপে নির্ব্বাচিত করেন, তিনিই এই পদের অধিকারী হন। ভুটানীরা সকলেই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। ধর্ম্মরাজও দেশের প্রধান মন্ত্রীগণই নির্ব্বাচিত করেন। মন্ত্রীদের ভুটানীরা বলে "লেনেহেন"। পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভুটানের শাসন-ভার সম্পূর্ণ রূপে এই মন্ত্রীদের হস্তেই ন্যস্ত আছে। গত শতাব্দীর শেষ ভাগেও ভুটানে প্রকৃতপক্ষে কোনও রকমেরই শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল না, সে সময় অনেকটা 'জোর যার মুল্লুক তার' এই ব্যবস্থাই ছিল। কিন্তু ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ইডেন সাহেবের অধীনে ইংরাজেরা ভুটানে যে একদল প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন, তারা ধর্ম্ম-প্রচারকের ছদ্মবেশে গেলেও, তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটা রাজ-নৈতিক সমস্যার

[illegible]

ভুটান রাজ-প্রাসাদের প্রবেশ-দ্বার

তালাও মঠের তাঙ্গোলামা

রাজ-প্রাসাদের পরিচারিকাগণ

তাঁর পদের আখ্যা হচ্ছে "টঙ্‌শা পেন্‌লপ্‌"।

সিকিমের ইংরাজ-প্রতিনিধি মিঃ ক্লডে হোয়াইট (Claude White) ১৯০৩।৪ সালে যখন ব্রিটিশ মিশনের পরিচালক হয়ে তিব্বতে অভিযান করেন, তখন ভূটানের তদানীন্তন টঙ্‌শা পেন্‌লপ্‌ 'লাশা' পর্য্যন্ত তাঁদের সঙ্গে গেছলেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে, টঙ্‌শা পেন্‌লপ্‌ সেই সময় যে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন, তারই প্রতিদান-স্বরূপ ইংরাজ সরকার তাঁকে 'নাইট্‌' উপাধিতে ভূষিত করে-ছিলেন, এবং ভূটানের সঙ্গে সন্ধি করে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হ'য়েছিলেন।

১৮৬৩ সালের আগে ভূটানের ইতি-হাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, যদিও ১৭৭৩ সাল থেকেই ভূটানের সঙ্গে ইংরাজের সংঘর্ষ সুরু হয়েছিল। এই সময় কুচবিহার থেকে ভূটানীদের বিতাড়িত করে দিয়ে ইংরাজ এই প্রদেশ দখল

সুসজ্জিতা রাজপুরবাসিনীরা

সীমান্তে এসে প্রায়ই যে লুটপাট ও অত্যাচার ক'রে যেতো, তারই প্রতিবিধান করাই ছিল তাদের প্রধান চেষ্টা। ইডেন মিশনের পশ্চাতে ইংরাজের সৈন্য-বাহিনী ভূটানে প্রবেশ ক'রে বক্‌শা ও দ্বারবান গিরি দখল করবার পর থেকে ক্রমশঃ সেখানে একটা বিধিবদ্ধ শাসন-প্রণালী গড়ে উঠেছে। এখন সেখানে নামমাত্র ইংরাজের অধীন হয়ে ভূটানের প্রতিভূ স্বরূপ যিনি রাজ্য শাসন করছেন,

করেছিল। তখন ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ছিলেন ভারতের শাসনকর্ত্তা। তিনি জর্জ্জ বোগ্‌লে নামে একজন সিভিলিয়ানকে ভুটান ও তিব্বতের রাজধানীতে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। বোগ্‌লের দৌত্যকার্য্য যে অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করেছিল, ভারতবর্ষ তার মর্য্যাদা রক্ষা করেনি বলেই, ১৭৮৪ খৃঃঅব্দে টার্ণার সাহেবের

রাজবেশে ভুটানেশ্বর

অধীনে যে দল তাদের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিল, তারা অকৃতকার্য্য হয়ে ফিরে এসেছিল। তার পর প্রায় এক শতাব্দী পরে ১৮৬৪ সালে ইংরাজের বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'য়েছিল। এই সময় 'ড্যুয়ার্স' বা ভুটানের নিম্নপ্রদেশ ইংরাজের অধিকারভুক্ত হয় এবং ইহাদের তত্ত্বাবধানে ক্রমশঃ ড্যুয়াসের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, ভুটানের প্রধান নদী হ'চ্ছে মানস। কিন্তু মানস ছাড়াও সেখানে আরও অসংখ্য নদী আছে। প্রত্যেক নদীটিই প্রখর বেগবতী এবং সবগুলিই ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বক্ষে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তিস্তা ও চাঁঞ্চু নামে পশ্চিম ভুটানের দুটী নদী ভুটান থেকে লাসায় যাবার পথের প্রধান সংযোজক বলে, অনেকেরই সঙ্গে এদের পরিচয় আছে। পাণ্ড নামে চাঁঞ্চুরই একটী শাখা তিব্বত ও ভুটানের সীমারেখার স্বরূপ বহে যাচ্ছে। ভুটানের যে গিরিপথ সোজা তিব্বতের দিকে চলে গেছে, সেই পথের প্রথম জনপদ হচ্ছে ফেরী জোঙ্। বোগ্‌লে এই স্থানের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে গেছেন, এখানটায় যেন একটা বিপুল ফাঁকা,

ভুটানী লেপচা

একটা অসীম নির্জ্জনতা, একটা বিরাট ঔদাসীন্য এবং একটা অনন্ত নিষ্ফলতা বিরাজ ক'রছে বলে মনে হয়। ১৯০৪ সালে সেনাপতি ইয়ংহজব্যাণ্ড যখন তিব্বতে অভিযান করেন, তখন ব্রিটীশ সৈন্যদল ভুটান পার হয়ে এসে এইখানেই প্রথম বিশ্রাম গ্রহণ করেছিল। সেদিন মাউণ্ট এভারেষ্ট বা গৌরীশৃঙ্গ অভিযানে যাঁরা যাত্রা ক'রেছিলেন, 'ফেরী জোঙ্' তাঁদেরও বিশ্রাম-স্থল ও একটা প্রধান আড্ডা হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, লাশা যেতে হ'লে যে পথ দিয়ে যাওয়া হোক না কেন, ফেরী জোঙ্এ এসে বিশ্রাম নিতেই

হবে। সুতরাং এ স্থানটার ভৌগোলিক মর্য্যাদা যাই থাকুনা, এর একটা যে বিশেষত্ব দাঁড়িয়ে গেছে, সেটাকে আর নিতান্ত তুচ্ছ করা যায় না।

ফেরী জোঙ্ প্রায় ১৪২০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এইখান থেকে তাঙ্লা গিরিবর্ত্ম আরম্ভ হয়েছে। এই গিরিবর্ত্ম একেবারে হিমালয়ের মেরুদণ্ডের উপর গিয়ে পৌঁছবার পথ নির্দ্দেশ করে দেয়। হিমালয়ের বিরাট 'চুমলহারী' শিখরের ছায়াতলে যেখানে এই পথ এসে মিশেছে সেস্থানের উচ্চতা প্রায় ষোল হাজার ফুট হবে।

ভুটিয়াদের শরীর খুব হৃষ্টপুষ্ট। তারা সকলেই বেশ সবল সুস্থ ও কর্ম্মঠ পুরুষ। কিন্তু তিব্বতীদেরই মতো তারা অত্যন্ত নোংরা। পুরুষেরা একটা মোটা পশমী কাপড়ের হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা ঢিলে জামা গায়ে দেয়। কোমরেও একখানা মোটা কাপড়ের কোমরবন্ধ বাঁধে। মেয়েদের পোষাকও অনেকটা ওই রকমেরই; কেবল

টঙ্শা মঠের লামারা

ভুটানের মানচিত্র

পা পর্য্যন্ত লম্বা এবং জামার হাতা দুটো খুব ঝল্‌ঝলে। ভুটানীরা বেশ প্রফুল্ল জাত, খুব আমোদপ্রিয়। জীবন যাত্রার জন্য তাদের যে কঠোর পরিশ্রম ক'রতে হয়, যে চাষবাস ক'রতে হয়, তার তুলনায় তাদের এই আনন্দ-প্রিয়তা মোটেই দূষনীয় বলা চলে না।

ভুটানীরা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বটে, কিন্তু সে নিতান্ত অধঃপতিত বৌদ্ধধর্ম্ম, যা এখন কেবলমাত্র তন্ত্র-মন্ত্র, ও ভূত-প্রেতের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় পর্য্যবসিত হ'য়েছে। ভুটানীরা সকলেই যে একেবারে তিব্বতীদের বংশ, এ কথা বলা চলে না; কারণ, নৃতত্ত্ববিদেরা অনুসন্ধান ও গবেষণা করে স্থির করেছেন যে, পূর্ব্ব ভুটান-বাসীরা পশ্চিম ভুটানবাসীদের সমবংশীয় নয়। তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে দেখতে পাওয়া যায়। তারা তিব্বতী অপেক্ষা বরং আসাম সীমান্তবাসী মিস্‌মী ও আবরদেরই নিকটতম জ্ঞাতি। ভৌগোলিক হিসাবের দিক দিয়েও এরা শেষোক্ত দলেরই সঙ্গী ও প্রতিবাসী

বাদ-প্রতিবাদ

গঙ্গাতীরের প্রতিবাদের উত্তর।

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী

গত আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত পুরঞ্জয় রায় বন্দোপাধ্যায় মহাশয় "গঙ্গাতীরের" যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, বাঁড়ুয্যেদিগের ডাকাতি সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, উহা জনশ্রুতি অবলম্বনে লিখিত। ঐ জনশ্রুতি সকল বাঁড়ুয্যে-দিগের প্রতি প্রযোজ্য নহে; পরন্তু পুরাকালে বাঁড়ুয্যে উপাধিধারী যদি কেহ দস্যুতায় লিপ্ত হইয়া থাকে, তবে তাহার বা তাহাদিগের প্রতি উহা প্রযোজ্য! ডাকাত বিশ্বনাথ বাঁড়ুয্যে যে ডুমুরদহের বর্ত্তমান বাঁড়ুয্যে বংশের কেহ ছিল, তাহাও আমার প্রবন্ধে নাই। ডুমুরদহের বর্ত্তমান বাঁড়ুয্যেদিগের ইতিহাস আমি অবগত ছিলাম না; কারণ, উহা জানা আবশ্যক হয় নাই। পুরঞ্জয় বাবু ডুমুরদহের বর্ত্তমান রায় বন্দোপাধ্যায়দিগের যে ইতিহাস দিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি নিজেই দেখাইয়াছেন যে, আমার প্রবন্ধোক্ত ডাকাইতি অপবাদ বর্ত্তমান বাঁড়ুয্যেদিগের প্রতি প্রযোজ্য নহে ও ডাকাত বিশ্বনাথ বাবু এ বংশের কেহ ছিল না। আমার সামান্য ভ্রমণ কাহিনী কাহাকেও ব্যথা দিবার উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই। ইহার জন্য যে পুরঞ্জয় বাবুকে কষ্ট করিয়া প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে, তজ্জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। "প্রাচীন ও পবিত্র" ডুমুরদহ গ্রামের উপর একমাত্র আমিই সর্ব্ব প্রথম "অযথা কলঙ্কারোপ" করি নাই। আমার বহু পূর্ব্বে একাধিক লেখকের লেখনী ইহাকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের ডুমুরদহের বিবরণের জন্য আমাকে কতক পরিমাণে নিম্নলিখিত পুস্তকাদির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে:—

(ক) "দেবগণের মর্ত্তে আগমনে" উল্লিখিত আছে—"বাম দিকে দেখা যাইতেছে ডাকাইত-প্রধান স্থান ডুমুরদহ। এক সময় ঐ স্থানের বালক বৃদ্ধ সকলেই ডাকাইত ছিল। ঐ গ্রামের লোকেরা বাটীতে অতিথিদিগকে বাসা দিয়া রজনীতে প্রাণ সংহার করিত। দিবসে মৎস্যজীবীরা মৎস্য ধরিত এবং রজনীতে নৌকায় বোম্বেটেগিরি করিত! ফলতঃ সে সময় কি জল পথ কি স্থল পথ, কোন পথেই ডুমুরদহের নিকট দিয়া টাকা কড়ি সহ কেহ যাইলে নিস্তার থাকিত না। প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হইল, বিখ্যাত ডাকাত বিশ্বনাথ বাবু এই স্থানে বাস করিতেন। ইহার অধীন ডাকাইতেরা নৌকা যোগে যশোর পর্য্যন্ত ডাকাইতি করিয়া বেড়াইত। পরে মত্ত অবস্থায় বিশ্বনাথ বাবু কতিপয় সঙ্গীর সহিত ধৃত হন ও তাঁহার ফাঁসি হয়। যে বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন উহা গঙ্গাতীরের সন্নিকটস্থ একটি দোতালা কোঠা। ঐ বাড়ীর ছাদ হইতে গঙ্গার বহু দূর পর্য্যন্ত কোথায় কে আছে দেখিতে পাওয়া যাইত।" ইত্যাদি! তৎপরে বাবু ডাকাত বিশ্বনাথ পাল্কী আরোহণে ডাকাইতি করিতে যাইত তাহার কথা আছে।

বীর আশানন্দ ঢেঁকী (মুখোপাধ্যায়) কিরূপে ডুমুরদহের দুইজন ডাকাইত দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উহাদিগকে কক্ষদেশে ধারণ করিয়া তাঁহার শ্বশুরালয় গুপ্তিপাড়ায় লইয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা আছে।

(খ) শান্তিপুরবাসীগণের নিকট একটি প্রবাদ শুনা যায় যে, শান্তিপুরবাসী উক্ত আশানন্দ ঢেঁকী একবার কোন বৃদ্ধ দম্পতি সহ ডুমুরদহের কোন ভদ্রলোকের গৃহে রাত্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন। রাত্রে গৃহস্বামী দলবল সহ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে আশানন্দ অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

(গ) Bholanath Chunder's "Travels of a Hindoo to various parts of Bengal and Upper India" 1869, নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে:—"Four miles north of Triveni is Doomurdah an extremely poor village noted very much for its robbers and dacoits. To this day people fear to pass this place after sunset, and no boats are moored in its ghauts even in broad daylight. The famous robber chief Bishonath Babu lived here about 60 years ago. It was his custom to give shelter to wayworn and benighted travellers and then to kill them at night in their sleep. He was caught to end his days on the scaffold. The house in which he lived still stands, it is a two-storied house just overlooking the river.

(ঘ) "বিশ্বকোষে" উল্লিখিত আছে:—"পূর্ব্বে এই স্থান ডাকাইতির জন্য বিখ্যাত ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোক এই স্থান দিয়া যাইতে ভয় করিত।" ইত্যাদি। অতঃপর ডাকাইত বিশ্বনাথ বাবুর বর্ণনা আছে।

(ঙ) "সুরধুনী কাব্যে" লিখিত আছে:—"ডাকাতে ডুমুরদহ এবে ভয় নাই। খালের উপরে সেতু নবীন সরাই।"

এই স্থানের ডাকাইতির বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গের নানা স্থানে গল্প ও ছড়ার প্রচলন আছে। এতদ্ব্যতীত "Long's Seletions, 1748-1767"

নামক গ্রন্থে, ১৮৫৩ সালের "সংবাদ প্রভাকরে", "Bishop Heber's Journal" নামক গ্রন্থে এতদঞ্চলের ডাকাতির বিষয় জানিতে পারা যায়। আর কোথায় কি প্রমাণ আছে, তাহা ক্রমে হয়ত জানিতে পারিব।

আমার "গঙ্গাতীরে" প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কয়টি ভ্রম রহিয়া গিয়াছে; উহা সংশোধন করা আবশ্যক :—

সুখড়িয়া বর্ণনা স্থলে,অনন্তরাম ও শ্রীপুরের বর্ণনা স্থলে রঘুনন্দন মুস্তৌফী "১১২৫ সালে উলা ত্যাগ করিয়া শ্রীপুরে গমন করেন" লিখিত হইয়াছে। "১১২৫ সাল" না হইয়া "অনুমান ১১১৪।১৫" সাল বা শকাব্দা ১৬৩০ হইবে। সুখড়িয়ার নিস্তারিণীর মন্দির "১১৫৪ সালে ৺কাশীপতি মুস্তৌফী প্রস্তুত করেন" ইহা ভ্রমক্রমে উল্লেখ করা হয় নাই। এবং ৺আনন্দময়ীর পূজা "কায়ক্লেশে হয়" স্থলে "পূজার ভাল ব্যবস্থা আছে এবং তজ্জন্য ৺রাধাজীবন মুস্তৌফীর দৌহিত্রগণ প্রশংসার্হ" হইবে।

আনাতোল ফ্রাঁস

শ্রীভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য

অগ্রহায়ণের "ভারতবর্ষে" শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় "আনাতোল ফ্রান্স" নামে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে কয়েকটা ভুল আছে। আনাতোল ফ্রাঁসের মত বিশ্ববিদিত সাহিত্যিকের বিষয়ে কোথাও কিছুমাত্র ভুল থাকা উচিত নয়—সেজন্য তাহার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করি।

'ভারতবর্ষে'র ১৩৫ পৃষ্ঠা, ২য় কলমে তিনি আনাতোল ফ্রাঁসের Thais নামক পুস্তকের বিষয়ে লিখিয়াছেন, "থেঈস পুরাকালের খৃষ্টধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসী। আলেকজান্দ্রিয়ার জনৈক অভিনেত্রীর...... চরিত্র সংশোধনের ভার গ্রহণ করেন এই সন্ন্যাসী" ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই অভিনেত্রীরই নাম Thais; সন্ন্যাসীর নাম Paphuntius। এই অভিনেত্রীর নাম অনুসারে বইখানির নাম Thais হইয়াছে

"তদ্দেশীয় পুরোহিত Paphuntius তাহার অনুরাগী ভক্ত ছিল।" কিন্তু সেই সন্ন্যাসী ছাড়া Paphuntius নামের আর কাহাকেও তো আমরা বইখানির মধ্যে খুঁজিয়া পাই না। অভিনেত্রী থেঈস্ (থেঈ ?) সন্ন্যাসী Paphuntius ও আর একজন স্বকপোলকল্পিত পুরোহিতের নাম লইয়া লেখক সমস্ত গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন।

"থেঈসের শোচনীয় মৃত্যুর ও Paphuntius এর খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষার চিত্র মনোরম।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে থেঈসের মোটেই শোচনীয় মৃত্যু হয় নাই। তাহার মত সুখের মৃত্যু কে না চায়?

এখানে বইখানির আখ্যায়িকা ভাগের একটু বিবৃতি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বোধ হয়। আনাতোল ফ্রাঁস্ প্রথমেই বইখানিতে ঈজিপ্টের ধু ধু মরুভূর মধ্যে দৃঢ়ব্রতী, ধ্যানমৌন সন্ন্যাসীদের ছবি আঁকিয়াছেন। এই সন্ন্যাসীদের মধ্যে Paphuntius একজন। এক দিন সে আলেকজান্দ্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধা সুন্দরী অভিনেত্রী Thaisএর কথা শুনিতে পাইল। শুনিয়া তাহার মনে হইল যে, সৌন্দর্য্য—ভগবানের শ্রেষ্ঠ দানগুলির একটি বড় দান সৌন্দর্য্য—নির্ম্মল, শুভ্র ফুলটির মত পবিত্র—তেমনি অমলিন তেমনি গন্ধ-ভরা হওয়া উচিত। তাহাকে পথের ধূলায় হাজার পথিকের পায়ের তলায় লুটাইয়া দেওয়া ভগবানের সৃষ্টির বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া আর কিছু নয়। তার পর এক দিন সে Thaisকে ধর্ম্মের পথে ফিরাইয়া আনিবার দৃঢ় সংকল্প বুকে লইয়া মরুভূর বালুকা-গহ্বর হইতে, তাহার সাধনা-মন্দির হইতে, বাহির হইয়া পড়িল। আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছিয়া এক রঙ্গালয়ে সে প্রথম থেঈসকে দেখিল; তাহার পর থেঈসের গৃহে গিয়া তাহার সহিত পরিচয়ের বন্ধন দৃঢ় করিয়া লইল।

ধর্ম্মের মহিমা থেঈসের নিকট প্রভাতের সদ্যফোটা কমলটির মত পাপড়ি মেলিয়া জাগিয়া উঠিল। এখানে আমরা দেখিতে পাই যে, থেঈসের মনে জন্ম-অপরাধীর ভাব—criminality র ভাব ছিল না। বাল্যাবস্থায় আত্মীয়-স্বজন হারাইয়া এত বড় জগতে একা থেঈসকে দিক্‌ভ্রষ্ট হইতে হইয়াছিল; সে পাপের সোজা পথটাই বাছিয়া লইয়াছিল। কিন্তু এক দিন যখন এক অপূর্ব্ব শঙ্খধ্বনি তাহার কাণের কাছে বাজিয়া উঠিল, সন্ন্যাসী Paphuntius যখন তাহার তরুণ বুক নূতন আলোয় ভরিয়া দিলেন, তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার বাহ্য আবরণটা খসিয়া পড়িল। তাহার অন্তরের সুপ্ত নারীপ্রকৃতি—ধ্যানরতা মহিমময়ী নারী—এতদিন পরে বাহির হইয়া আসিল। অগাধ ধনরত্ন, অসীম প্রভাবের প্রলোভন এক কথায় আগুনে বিসর্জ্জন দিয়া সে ভিখারিণীর মত সন্ন্যাসীর সহিত অজ্ঞাত, দুর্গম পথে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু এবার সন্ন্যাসীর মনের বাঁধ ভাঙিয়া গেল; থেঈসকে দেখার পর হইতেই তাহার মনে বিপর্য্যয়ের ঝড় উঠিয়াছিল—যাহাকে সে শত চেষ্টাতেও পিষিয়া মারিতে পারে নাই,—এবার সেই ঝড় তাহার মনে প্রলয়ের ডমরু বাজাইতে লাগিল। হতভাগ্য সন্ন্যাসী থেঈসকে এক সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে রাখিয়া মনের দৃঢ়তা ফিরাইয়া আনিতে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া গেল। অনেক দিন সাধনায় কাটিল। এখানে আনাতোল ফ্রাঁস্ সন্ন্যাসীর মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া, এবং ক্ষুব্ধ বিচলিত মনের অপূর্ব্ব সংগ্রামের ছবি আঁকিয়া, আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

এদিকে থেঈস দিন দিন সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া চলিল। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! গর্ব্বিতা অভিনেত্রী এক দিন খৃষ্ট-মঠের সন্ন্যাসিনী!!

সন্ন্যাসী আর পারিল না। মনের যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, পরাজয় স্বীকার করিয়া এক দিন সে বুক-ভরা আগুন লইয়া থেঈসের কাছে ফিরিয়া আসিল। থেঈস তখন সুখের মৃত্যু-শয্যায়। এখানে আনাতোলের আঁকা আর একটি মন-মাতানো ছবি।

Thaisএর এক জায়গায় আনাতোল বলিয়াছেন, "Man is a beautiful hymn of God."—মানুষ ভগবানের গীতাস্তবের একটি সুন্দর গান। এই ভাব্ থেঈসের মধ্যে বড় সুন্দর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আরো দু একটা কথা—লেখক আনাতোল ফ্রাঁসের Crainquille নামের কোনও পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। ও নামের কোনও পুস্তকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। বোধ হয় লেখক Crainquebille কে ভুল করিয়া Crainquille লিখিয়া থাকিবেন।

লেখক আনাতোলের অনেক বইয়ের নাম লিখিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার একখানি খুব ভাল বই একেবারে বাদ দিয়াছেন। তাহার ইংরাজি নাম—"The Revolt of the Angels." ইহাতে লেখক আশ্চর্য্য satire ও কল্পনার গভীরতার পরিচয় দিয়াছেন। তবে অনেকে হয় তো উহার মধ্যে metaphysics দেখিতে পাইবেন।

নানা কথা

সাইকেলে কাশী যাত্রা

নর্দ্দার্ন ফ্রেণ্ডস্ ক্লাবের সভ্যগণ, যথা :—শ্রীমদনমোহন দে, শ্রীরাম লাল দত্ত, শ্রীনিবারণচন্দ্র ধর, শ্রীগোরাচাঁদ মল্লিক, শ্রীবৈদ্যনাথ বড়াল, শ্রীমহাদেব বড়াল ও শ্রীতারকনাথ বড়াল ৪০ নং রতন সরকার গার্ডেন্ ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক বি-এল্, মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে গত ২রা কার্ত্তিক রবিবার প্রাতে ৪টা ১৫ মিনিট সময়ে যোড়াসাঁকো কালীমাতার মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মধ্য দিয়া বিগত ৯ই কার্ত্তিক রবিবার সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিট সময়ে নিরাপদে প্রায় ২২৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান পুণ্যময় বারাণসী ধামে উপনীত হন। শ্রীযুক্ত বিজনচন্দ্র বসু বর্দ্ধমান হইতে আসানসোল পর্য্যন্ত সাইকেলে আরোহণ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তারকনাথ পাণ্ডুয়া হইতে বাষ্পীয় যানের সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই দলটী সর্ব্বসমেত ৪৯ ঘণ্টা ২৭ মিনিট সাইকেল চালাইয়াছিলেন; গড়ে প্রতি ঘণ্টায় ৯১ মাইল হিসাবে দৈনিক ৫৬.২৫ মাইল পথ অতিক্রম করিতেন। তাহারা দৈনিক গড়ে ৬ ঘণ্টা ১০ মিনিট ৫২½ সেকেণ্ডে সাইকেল চালাইতেন।

তাঁহারা পথিমধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় দিবস যথাক্রমে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু এম্-এল্-সি মহাশয়ের বর্দ্ধমান ও আসানসোলস্থ বসু-ভিলা নামক ভবনদ্বয়ে ভূরিভোজনান্তে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। তৃতীয় দিবস গোমো ষ্টেসনের বিশ্রামকক্ষে রাত্রি বাস হইয়াছিল। এ বিষয়ে ষ্টেশন মাষ্টার ইহাঁদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। গোমো ষ্টেশন হইতে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দূরত্ব ৩॥০ ক্রোশ; অধিকন্তু পথ অত্যন্ত দুর্গম। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবস যথাক্রমে (হাজারিবাগ) বাগোদর, (কোদার্ম্মা) বরহি ও (গয়া) সারঘাটি ডাক বাঙ্গলোয় রাত্রিবাস হইয়াছিল; এই তিনটী ডাক বাঙ্গলোর মধ্যে বরেহি ডাক বাঙ্গলোটী উত্তম। আহারাদি সমাপনান্তে সপ্তম রাত্রি কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ মল্লিক বি-এল্ মহাশয়ের ডেরি-অন্-শোনস্থ 'রিট্রিট্' নামক আবাসে অতিবাহিত হইয়াছিল ও অষ্টম দিবসে বারাণসী ধামে অবস্থিতি। তাঁহারা প্রায় প্রত্যহ প্রাতে সাইকেল আরোহণ করিতেন ও সায়াহ্নে নির্দ্ধারিত স্থানে উপনীত হইতেন; পথিমধ্যে তাঁহারা ভোজন ও বিশ্রামাদি করিতেন। বাগোদর হইতে সারঘাটি পর্য্যন্ত অরণ্যাবৃত স্থান বলিয়া বাগোদর হইতে বরহি যাইবার সময় তাঁহারা বেলা ১০টা ৪৫ মিনিটে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাগোদর, বরহি ও সারঘাটিতে মধ্যাহ্নের পর উপনীত হইয়াছিলেন।

আসানসোল হইতে তোপচাচি পর্য্যন্ত পথ অত্যন্ত উচ্চ-নীচ ও হাজারিবাগের অন্তর্গত 'দামুয়া ভালুয়ার' নিকটবর্ত্তী ৬ ক্রোশ পথ গভীর অরণ্যাবৃত। এই জঙ্গলের দূরত্ব কলিকাতা হইতে ১৩১ ক্রোশ। এই স্থানে শিকারীগণ মধ্যে মধ্যে শিকার করিবার মানসে উপস্থিত হয়েন। এই স্থানে টিকারীর মহারাজের শিকার করিবার জন্য একটী বাঙ্গলো আছে। কাশীর নিকটবর্ত্তী পথ মন্দ; অধিকন্তু ধূলি-ধূসরিত। বরাকর পুল, পরেশনাথ পাহাড় ও বরহির নিকটবর্ত্তী সূর্য্যপুকুর পাহাড়ের রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে পথিকের ক্লান্তির অপনোদন হয়। দুইজন সাইকেল আরোহী পরেশনাথ পাহাড়ের নিকট দুইবার নেক্ড়ে বাঘের গর্জ্জন শুনিতে পাইয়াছিলেন ও হাজারিবাগের জঙ্গলের নিকটস্থ নদীতে একটী সর্প একজন সাইকেল আরোহীকে তাড়া করিয়াছিল। তাঁহারা পথিমধ্যে একটী মৃত সর্পও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সাইকেল আরোহীগণ পদব্রজে শোন নদীর পুল অতিক্রম করিতে সবিশেষ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিপাত হইলেও ঐ সময় পশ্চিমাঞ্চলে সাইকেল আরোহণ করিবার পক্ষে বেশ সুবিধাজনক। এই দলটী কোন প্রতিযোগিতা না করিয়া আনন্দ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুর, ব্যাণ্ডেল গীর্জ্জা ও ধানবাদের নিকটবর্ত্তী বরাকর পুলের নিকট পথ গোলমাল হইবার সম্ভাবনা। এই স্থানে সকলকে বিশেষ সাবধানে যাইতে হয়। শেষ দিবসে এই দলটী ৪২ ক্রোশ পথ প্রায় ৯ ঘণ্টায় অতিক্রম করেন; দুর্গাপুরের ২ ক্রোশ ব্যাপী জঙ্গল ৫ মিনিট ৩৮ সেকেণ্ডে অতিক্রম করেন ও হাজারিবাগের ৪॥০ ক্রোশ গভীর অরণ্যপথ অতিক্রম করিতে তাঁহাদের ৩৫ মিনিট অতিবাহিত হইয়াছিল। এই স্থানের পথ ঢালু থাকায় সাইকেল আরোহীগণকে পদ দ্বারা চাকা ঘুরাইতে হয় নাই। যাঁহারা এই বিষয়ে ঐ দলটীকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা অশেষ ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

খাদি প্রতিষ্ঠান

এখনই তুলার চাষের সময়—কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বপন উপযোগী বীজ খাদি প্রতিষ্ঠানে আমদানী করা হইয়াছে। যে পরিমাণ বিক্রয়ের আশা করা গিয়াছিল তাহা হয় নাই। ফলে কয়েক মণ বীজ মজুদ থাকিয়া নষ্ট হইতে পারে। এই সময় বীজ বপন

করিলে জ্যৈষ্ঠ মাসে ফসল পাওয়া যাইবে। নীচু জমিতে যেখানে বর্ষার জল উঠে, সেই সকল স্থানে এই জাতের কার্পাসের চাষ করা যায়। আমরা প্রত্যেক জিলার কর্ম্মীদিগকে এই কার্পাসের চাষের জন্য বীজ লইতে অনুরোধ করিতেছি।

বপন প্রথা—জমীতে চাষ দিয়া একহাত অন্তর অন্তর লাইন করিতে হইবে। ঐ লাইনে একহাত অন্তর অন্তর দুইটী করিয়া বীজ বপন করিতে হইবে। চারা উঠিলে একটি মাত্র চারা রাখিয়া অপরটী ফেলিয়া দিতে হইবে। বীজ এক ইঞ্চ হইতে দেড় ইঞ্চ মাটীর নীচে পড়া চাই; বেশী নীচে পড়িলে চারা গজাইবে না। একবার নিড়ান দরকার। সেই সময়ে অতিরিক্ত চারা তুলিয়া ফেলিতে হইবে। জল সেচনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। এক বিঘা জমিতে তিন সের বীজ লাগিবে। মূল্য প্রতি সের ।/• আনা। এক বিঘায় দেড় মণ কার্পাস ও আধমণ তুলা হইবে।

অক্টোবর মাসে দেয় সুতা—অক্টোবর মাসের সুতা প্রতিষ্ঠান হইতে একটী পার্শ্বেলে করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পার্শ্বেলটিতে ৫৫১ জন সভ্যের সুতা প্রেরণ করা হইয়াছে। মোট ১০,০৬,২৭২ গজ সুতা পাঠান হইয়াছে। একজন ৪৫০০০ গজ দিয়াছেন। আচার্য্য রায় ৯ নম্বরের ২২০০ গজ সুতা দিয়াছেন। আর একজন ভগ্নী ২২০০০ গজ দিয়াছেন।

সভ্যগণকে প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে তাঁহাদের দেয় সুতা প্রেরণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে। যাঁহারা সুতা পাঠাইবেন তাঁহারা যেন ২০০০ গজের কম না পাঠান।

সুতা বিলম্বে পাঠান হয় বলিয়া খাদি বোর্ড হইতে অনুযোগ করা হইয়াছে। নিবেদন এই যে যাহাতে ১লা তারিখেই সুতা প্রেরণের ব্যবস্থা হয় তাহা করিবেন। গণিতে, লিষ্ট করিতে সময় লাগে। ৭ই তারিখে কলিকাতায় পঁহুছিলে তবে সময়মত সবরমতী পাঠান সম্ভব। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে:—

(১) এক ফুট ব্যাসের অর্থাৎ তিন ফুট বেড়ের লাটাই কাটুনীগণ ব্যবহার করিবেন, প্রতিষ্ঠান হইতে বাঙ্গালা দেশের জন্য এই মাপের লাটাই নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। (২) চরকা হইতে লাটাইয়ে সুতা তুলিবার সময় প্রত্যেক ১০০ গজ পরে একটী করিয়া "জো" তুলিয়া দিতে হইবে। ৫০০ গজ সুতা উঠাইয়া একটী করিয়া ফেটী করিতে হইবে। প্রত্যেক ফেটীর উপর সুতার নম্বর ও ওজন একখানি টুকরা কাগজে তুলিয়া লাগাইয়া দিতে হইবে। সুতার নম্বর নির্দ্ধারণ করিবার উপযোগী ছোট দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা প্রতিষ্ঠান হইতে বিক্রয় করা হয়। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র। এক তোলা সুতায় যত গজ তাহাকে ২১ দ্বারা ভাগ করিলেই সুতার নম্বর পাওয়া যায়।

(৩) লাটাই হইতে সুতা তুলিয়া লইবার সময় উহা জলে ভিজাইয়া বাতাসে শুকাইয়া লইতে হইবে।

প্রতিষ্ঠান হইতে সুদক্ষ কাটুনী পাঠাইয়া এবং সমস্ত আবশ্যক জিনিষ পত্রাদি নগদ মূল্যে কিম্বা কোন স্থানে বিনামূল্যে সরবরাহ করিয়া চরকা ক্লাব প্রতিষ্ঠা কার্য্যে সহায়তা করা হয়। যাঁহারা এই প্রকার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠানের সহিত পত্র ব্যবহার করুন।

সম্পাদক, খাদি প্রতিষ্ঠান
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গালা প্রস্তুত পদ্ধতির উন্নতি সাধন

[বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের শিল্পবিভাগ হইতে গালা প্রস্তুত প্রণালীর উন্নতি সাধন সম্বন্ধে ডাঃ আর, এল, দত্ত ডি, এস্ টি, ইনডাষ্ট্রিয়াল কেমিষ্ট মহাশয় লিখিত যে পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে এই বিবরণ উদ্ধৃত হইল]

বাঙ্গালার কয়েকটী গালা প্রস্তুত করিবার কারখানায় যে সকল পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহার ফল এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করা করা হইল। এই সকল কারখানায় অল্প পরিমাণে কুটীর-শিল্পের উপযোগী গালা প্রস্তুতের যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তাহা অত্যন্ত অসন্তোষকর—তাহাতে নিতান্ত অপকৃষ্ট শ্রেণীর গালা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই পদ্ধতির যে উন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ লাক্ষা বাটিবার, গুঁড়াইবার ও ধৌত করিবার প্রণালীতেই আবদ্ধ, সেই জন্য প্রচলিত যে প্রক্রিয়ায় গালা গলান হয়, তাহার বিবরণ এই প্রসঙ্গ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ঐ সকল কারখানায় এক্ষণে কুটীর-শিল্পের উপযোগী অল্প পরিমাণে প্রস্তুতের যে পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা হইল।

স্বাভাবিক বা অসংশোধিত লাক্ষা (crude lac) যাহা ক্রয় করা হয়, তাহা নানা আকারের ভাঙ্গা ভাঙ্গা টুকরার সমষ্টি, তাহাতে বহু পরিমাণে বালি, মাটি, ধূলা ও কাঠিকুটা মিশ্রিত থাকে। উহা সেই অবস্থাতেই শিল-নোড়ায় বাটিয়া অথবা অপেক্ষাকৃত বড় বড় কারখানায় হস্তচালিত কলের জাঁতাকলে পিষিয়া লওয়া হয়। সেই বাটা বা পেষা মাল ছয়-ঘরা চালনীতে (six mesh sieve) ছাঁকিয়া বড় বড় দানাগুলি, যাহা ঐ চালনীর ছিদ্রে গলে না তাহা, পুনরায় গুঁড়াইয়া লওয়া হয়—যে পর্য্যন্ত না সমস্ত মাল ছয়-ঘরা চালনীর ভিতর দিয়া গলিয়া ছাঁকা হইয়া যায়। তৎপরে উহা ধৌত করা হয়। কোনও কোনও কারখানায় কাচা বা স্বাভাবিক লাক্ষাকেই প্রথমে ছয়-ঘরা চালনীতে ছাঁকিয়া ছোট ছোট লাক্ষার কণিকাগুলি বাহির করিয়া লইয়া, বড় বড় দানাগুলি, যাহা চালনীর ছিদ্রে গলে না, তাহা বাটিয়া গুঁড়াইয়া, যাহাতে সমস্ত মাল ছয়-ঘরা চালনীর ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া বাহির হয় এরূপ করিয়া লওয়া হয়। উক্ত দুই দফার মালই শেষে মিশ্রিত করিয়া ধৌত করা হয়। এই উপায়ে লাক্ষার যে সকল চূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থাতেই ছয়-ঘরা চালনীর ভিতর দিয়া গলিয়া যায়, সেগুলিকে পুনরায় গুঁড়াইবার শ্রম লাঘব করা হয়।

উক্ত প্রস্তুত-প্রণালীতে বহুবিধ দোষ থাকায় উহা দ্বারা উৎপন্ন বস্তুও অত্যন্ত অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা দেখা গিয়াছে যে, উৎপন্ন গালার ভাল মন্দ গুণ নিম্নলিখিত তত্ত্ব বা মূলসূত্রগুলির প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। এই সকল নিয়ম বা মূলতত্ত্ব যথাযথভাবে পালন করিলে অত্যুৎকৃষ্ট (superfine). উৎকৃষ্ট (fine) এবং নির্দ্দিষ্ট আদর্শের (standard) গালা সকলেই সকল সময়ে প্রস্তুত করিতে পারিবে। কাঁচা মাল (raw materials) বা স্বাভাবিক উপকরণ যেরূপই হউক না কেন, বীজ-লাক্ষার (seed lac) গুণানুযায়ী প্রস্তুত গালা অত্যুৎকৃষ্ট বা নিম্নশ্রেণীর হইবে। কাঁচা মাল সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর হইলে প্রস্তুত দ্রব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট হয়, মধ্যম শ্রেণীর হইলে আংশিক অত্যুৎকৃষ্ট এবং আংশিক উৎকৃষ্ট হয় এবং যারপর নাই নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁচা মাল হইতেও উৎকৃষ্ট এবং নির্দ্দিষ্ট আদর্শের গালা উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর এবং T. N. শ্রেণীর গালা প্রস্তুত করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; কারণ, উচ্চতর স্তরের সহিত তুলনায় উহা অত্যন্ত অল্প মূল্যে বিক্রীত হয়।

গালা প্রস্তুত করিবার প্রণালী নিম্নলিখিত তত্ত্ব বা মূলসূত্রগুলির উপর নির্ভর করে :—

(১) ইহা দেখা যায় যে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত বা অসংশোধিত লাক্ষা ছয়-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া যাইতে পারে, কেবলমাত্র এই ভাবে চূর্ণ করিয়া লইলে, সেই লাক্ষাচূর্ণের মধ্যে অনেক লাক্ষারস (lac dye) আবদ্ধ হইয়া থাকে। লাক্ষা ধৌত করিলেও সেই লাক্ষারস ভিতরে অধৌত থাকিয়া যায় এবং শেষে গলাইবার সময় প্রস্তুত গালাকে দূষিত করে। যদি ঐ লাক্ষাখণ্ডগুলিকে দশ-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া যাইবার মত গুঁড়ান হয়, তাহা হইলে সমস্ত লাক্ষারস সম্পূর্ণভাবে ধৌত করিয়া দিতে পারা যায় ; ঐ ক্ষুদ্র কণাগুলির মধ্যে উহা একটুও থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না ;

(২) লাক্ষার বড় বড় দানাগুলিকে চালনীতে ছাঁকিয়া পৃথক করিয়া লইয়া স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে ;

(৩) যে সকল দানা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং ধূলিমিশ্রিত, সেগুলিকেও পৃথক ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং ধূলা, মাটি ও অন্যান্য অপরিচ্ছন্নতা বাদ দিয়া তবে গুঁড়া করিতে হইবে ;

(৪) ধূলা ও বাজে জিনিসের গুঁড়া বাদ দেওয়া বাছা লাক্ষা, চূর্ণ করিবার পরে কুলায় ঝাড়িতে নাই, কারণ তাহাতে অপচয় হইবার কথা। বিশুদ্ধ লাক্ষার গুঁড়াগুলি, যাহার সহিত কোনও বাজে জিনিস মিশ্রিত নাই, সেগুলি নষ্ট হইয়া যায়। সেই সকল নির্ম্মল লাক্ষার কণিকাগুলিকে আর কুলায় না ঝাড়িয়া একেবারে ধুইয়া গলাইয়া লইলেই হয় ;

(৫) ধৌত করিবার পূর্ব্বে সমস্ত ধূলা মাটি বাদ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন ; কারণ, ধূলা মাটি ভিজা অবস্থায় লাক্ষাতে দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া থাকিতে চায়, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকার কণাগুলিও লাক্ষার গাত্রে লাগিয়া থাকিবার খুব সম্ভাবনা। শেষে গলাইবার সময় সেগুলি ময়লার দাগের বা কলঙ্কের মত থাকিয়া গিয়া গালার উৎকর্ষতা বহু পরিমাণে হ্রাস করিয়া দেয় ;

(৬) যদি মলামাটি, যাহা শুষ্ক অবস্থাতেই বাদ দেওয়া যায়, তাহা বিদূরিত করিয়া তাহার পরে কাঁচা বা অবিশুদ্ধ লাক্ষাকে ধৌত করা হয়, তাহা হইলে ধৌত করিবার প্রক্রিয়া অধিকতর সন্তোষজনক হইতে পারে এবং মলিনতার চিহ্নও নিঃশেষে বিলুপ্ত করিতে পারা যায় ;

(৭) ধৌত করিবার প্রক্রিয়া অতি অল্প সময়েই এবং যথা মাত্রা সচরাচর যত করিতে হয় তাহার অনেক কমেই তাহা নিষ্পন্ন হইতে পারে, যদি ধৌতকার্য্য করিবার পূর্ব্বে লাক্ষাকণাগুলিকে দশ-ঘরা চালনীর ছিদ্রে গলিবার যোগ্য করিয়া গুঁড়াইয়া লওয়া হয় এবং তাহা হইতে সমস্ত মলামাটি ও বাজে জিনিস বাদ দেওয়া হয়।

যে পদ্ধতি কার্য্যকালে অবলম্বন করিতে হইবে তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা হইল :

স্বাভাবিক বা অবিশুদ্ধ (crude) লাক্ষা প্রথমে ছয়-ঘরা চালনীতে চালিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। যাহা চালনীর ছিদ্রে না লাগিয়া তাহার উপরে জড় হইবে তাহাকে (ক) চিহ্নিত বলা হইবে, এবং যাহা ছিদ্রের ভিতর দিয়া গলিয়া তলায় পড়িবে তাহাকে (খ) চিহ্নিত বলা হইবে। এই দুই দফায় মালগুলিকে শেষ প্রক্রিয়া— গলান পর্য্যন্ত পৃথকভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে। (ক) চিহ্নিত দফা, যাহা ছয়-ঘরা চালনীর উপরে জড় হয়, তাহা অবশ্যই একেবারে পরিষ্কার ধূলা ও বাজে জঞ্জাল বিবর্জ্জিত। উহা গুঁড়াইয়া ও দশ-ঘরা চালনীতে চালিয়া বড় বড় দানাগুলিকে পুনরায় গুঁড়াইয়া ও চালনীতে ছাঁকিয়া লইতে হয়, যে পর্য্যন্ত না সমস্ত মাল দশ-ঘরা চালনীর জালের ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া বাহির হয়। ইহা দেখা গিয়াছে যে, দশ-ঘরা চালনীর ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া বাহির হওয়া দানাগুলির অভ্যন্তরে লাক্ষারস (lac dye) আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সেই সমস্ত মালই কুলায় না ঝাড়িয়া, একেবারে ধৌত করিবার বিভাগে লইয়া যাওয়া হয়।

(খ) চিহ্নিত দফাটী তৎপরে দশ-ঘরা চালনীতে ছাঁকিয়া, বড় বড় দানাগুলিকে গুঁড়াইয়া লইতে হয়, যে পর্য্যন্ত না সমস্ত মাল দশ-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া বাহির হয়। উহা আলাদা রাখা হয়। যে দানাগুলি দশ-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া গলিয়া বাহির হয়, সেগুলিকে আর গুঁড়াইতে নাই। সেগুলিকে কেবল ৩০ হইতে ৪০ ঘরা চালনীতে ছাঁকিয়া বালি ও কাঁকর বাদ দিতে হয়। হাল্কা গুঁড়াগুলি হস্ত দ্বারা কুলায় ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়।

উক্ত দুইভাগের মাল অর্থাৎ (১) যাহা দশ-ঘরা চালনীর জালের উপর হইতে জড় করিয়া গুঁড়াইয়া লওয়া হইয়াছিল, এবং (২) যাহা দশ-ঘরা চালনীর জালের ভিতর দিয়া গলিয়া পড়িয়াছিল ও যাহা হইতে ধূলা কুটা বাদ দেওয়া হইয়াছিল, একত্র মিশাইয়া (খ) চিহ্নিত দফা প্রস্তুত হয়। উহা তৎপরে ধৌত করিবার বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়।

যে দানাগুলি ৩০ হইতে ৪০ ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া গলিয়া পড়ে, সে গুলিকে ১০০ ঘরা চালনীতে চালিয়া লওয়া হয়; তাহাতে অধিকাংশ বালি ও কাঁকর বা ভারি ধূলিকণা বাদ পড়িয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার ফলে যাহা পাওয়া যায়, তাহা কাঁচা বা অপরিশোধিত লাক্ষার শতকরা দশভাগ হইবে। উহা শ্রমিকদিগের হস্ত দ্বারা কুলার বাতাসে ঝাড়িয়া একটী স্বতন্ত্র বখরা করা হয়, উহাকে (গ) চিহ্নিত দফা বলা যাইতে পারে।

(ক) ও (খ) চিহ্নিত দফায় ধূলা বা বাজে জিনিসের গুঁড়া একেবারে থাকে না বলিয়া, উহাদের ধৌতকার্য্য খুব সহজে সুচারুরূপে সাধিত হইয়া থাকে। ঐ চূর্ণগুলি অতি ক্ষুদ্র, এবং দশ-ঘরা চালনীর ছিদ্রের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া বাহির হওয়াতে, উহাদের মধ্যে লাক্ষারস (lac dye) আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পাবে না।

সাধারণতঃ লাক্ষা ১২ হইতে ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখা আবশ্যক। সেই সময়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত লাক্ষারস গলিয়া যায়। তৎপরে উহা হস্ত বা পদ দ্বারা ঘষিয়া, একখানি বস্ত্রের ভিতর দিয়া গাঢ় রক্তবর্ণ ধোয়া জল ছাঁকিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়; ও যে সকল লাক্ষাচূর্ণ ভাসিয়া উঠে, সেগুলিকে ঐ বস্ত্রে আট্‌কাইয়া পুনরায় গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়বার ধুইয়া ঘষিয়া লইলেই সচরাচর (ক) চিহ্নিত দফার প্রস্তুত কার্য্য সম্পূর্ণ হয়; এবং (খ) চিহ্নিত দফার শেষ ধৌত করা মাল পাইতে হইলে তিন বার ধুইয়া ঘষিয়া লইলেই যথেষ্ট হয়।

অবশেষে গালা প্রচলিত প্রথামত শুষ্ক করা হয়; এবং ধৌত করিবার পূর্ব্বেই সমস্ত ধূলা ও বাজে জিনিস বাদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, আর কুলায় না ঝাড়িয়া, একেবারে গলাইয়া লইবার ব্যবস্থা করা হয়। গলাইবার প্রক্রিয়া সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপই হয়।

কখনও কখনও কাঁচা লাক্ষা (crude lac) চাপ্‌ড়া বাঁধিয়া বড় বড় শক্ত তালে পরিণত হয়। লাক্ষা কতকটা পুরাতন হইলে এবং কিছুকাল থলিয়ায় পুরিয়া সঙ্কীর্ণ স্থানে ফেলিয়া রাখিলে ঐরূপ হয়। ঐ রকম মাল প্রাপ্ত হইলে উহাকে দশ-ঘরা চালনীর ছিদ্রে গলিবার উপযোগী করিয়া গুঁড়াইয়া লইয়া ৩০ হইতে ৪০ ঘরা চালনীতে ছাঁকিয়া ধূলিকণা বাদ দিতে হয়। তৎপরে উহা ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। এরূপ স্থলে শুষ্ক করিয়া লইবার পরে সমস্ত তৈয়ারী মাল কুলায় ঝাড়িয়া সূক্ষ্ম চালনীতে চালিয়া, ধৌত করিবার সময় যে সমস্ত বালি ও বাজে জিনিসের গুঁড়া গালা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে, সে গুলি বিদূরিত করিতে হয়। যে দানাগুলি ৩০ কি ৪০ ঘরা চালনীর ছিদ্রে গলিয়া যায়, তাহা কুলায় ঝাড়িয়া, যে সকল গালার গুঁড়া তাহাতে মিশ্রিত থাকে, তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়।

ইহা দেখা গিয়াছে যে, উক্ত প্রস্তুত-প্রণালী অবলম্বন করিলে (ক) গালা, এবং (ক) চিহ্নিত অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁচা লাক্ষা হইতে যে গালা পাওয়া যায় তাহা অত্যুৎকৃষ্টের কাছাকাছি উৎকৃষ্ট (fine) হইতে নিকৃষ্টতর নহে। (খ) চিহ্নিত উত্তম শ্রেণীর লাক্ষা হইতে উৎকৃষ্ট (fine) এবং অত্যুৎকৃষ্ট (superfine) এবং (খ) চিহ্নিত যে কোনও নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁচা বা অসংশোধিত লাক্ষা হইতে ১নং উচ্চ আদর্শের (high standard No. 1) এবং উৎকৃষ্ট (fine) শ্রেণীর গালা পাওয়া যায়। (গ) চিহ্নিত দফায়, সমস্ত সূক্ষ্মতম কণাগুলি থাকে; তাহা হইতে মলামাটি একেবারে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। উহা সমস্ত মালের শতকরা দশভাগের অধিক হইবে না। উহা হইতে কেবল T. N. অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্তরের গালা পাওয়া যায়। যে লাক্ষা তাল পাকাইয়া গিয়াছে এবং যাহা হইতে ইতঃপূর্ব্বে T. N. অর্থাৎ নিকৃষ্টতম ব্যতীত অপর কোনও উচ্চতর গুণবিশিষ্ট গালা পাওয়া যাইত না, তাহা হইতেও উপরে বর্ণিত প্রণালীতে ১নং আদর্শের (standard No. 1) অথবা উৎকৃষ্ট (fine) শ্রেণীর গালা পাওয়া যায়।

খাত্রা গালার কারখানায় (Khatra Shellac Factory) একটী আদর্শ পরীক্ষার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার ফল নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

৬০ সের কাঁচা (crude) লাক্ষা লওয়া হয়। উহা ছয়-ঘরা চালনীতে চালিয়া অপেক্ষাকৃত বড় বড় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাগুলি, যাহাতে কোনও বাজে জিনিস মিশ্রিত নাই, তাহা সংগ্রহ করা হইল। ছয়-ঘরা চালনীর ছিদ্রে গলে না এরূপ মালের ওজন হইল ৩০ সের। উহাকে কুলার বাতাসে ঝাড়িয়া এবং গুঁড়াইয়া দশ-ঘরা চালনীতে ছাঁকিবার উপযোগী করিয়া লওয়া হইল। উহাই ১ম দফা মাল ধৌত করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ছয়-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া যাহা ছাঁকিয়া নীচে পড়িয়াছিল, তাহা কুলার বাতাসে হস্ত দ্বারা ধূলা ঝাড়িয়া নিম্নলিখিত বস্তু পাওয়া গেল :—

	সের	ছটাক।
ছয়-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া গলিয়া পড়া মাল।	২২	১২
লঘু বাদ দেওয়া জিনিস যাহাতে লাক্ষা নাই।	১	০
ধূলা ও অন্যান্য বাদ দেওয়া বাজে জিনিস (যাহা হইতে লাক্ষা সংগ্রহ করিতে হইবে)।	৪	৪
লঘু পরিত্যক্ত জিনিস হইতে সংগৃহীত লাক্ষা যাহা পরবর্ত্তী দফায় ব্যবহার করিতে হইবে।	১	০

ছয়-ঘরা চালনীর ছিদ্রের ভিতর দিয়া গলিয়া পড়া গুঁড়াগুলিকে পরে দশ-ঘরা চালনীতে ছাঁকিয়া, যে গুঁড়াগুলি যথেষ্ট সূক্ষ্ম, সে-গুলিকে আবার গুঁড়াইবার ব্যয় ও অযথা ধূলি বৃদ্ধি করিবার সম্ভাবনা যতদূর সম্ভব লাঘব করিবার জন্য, তাহা আলাদা করিয়া রাখিতে হয়। দশ-ঘরা চালনীর উপরে জড় করা অপরিষ্কৃত মাল জাতায়

দিয়া ছাঁকিয়া বাহির হয়। ঐ গুলি ধৌত করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত দ্বিতীয় দফার মাল হইল।

ধুলা ও বাদ দেওয়া মাল (যাহা হইতে লাক্ষা সংগ্রহ করিতে হইবে) ধৌত করিবার জন্য পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। প্রথম দফার লাক্ষার গায়ে যে সামান্য ধুলা লাগিয়া থাকে এবং তাহার মধ্যে যে লাক্ষারস বা রং মিশ্রিত থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূরীকরণের জন্য ঐ লাক্ষা দুইবার মাত্র ধৌত করিয়া ও মাজিয়া ঘষিয়া লওয়া দরকার। দ্বিতীয় দফার লাক্ষা তিন বার মাত্র ঐরূপ ধুইয়া ঘষিয়া লইলেই শেষে ধৌত করা তৈয়ারী মাল পাওয়া যায়। ধুলা ও বাদ দেওয়া ৪ সের ৪ ছটাক মাল তৎপরে ধৌত করা হয়। অধিকাংশ বালুকাই সহজে পৃথক হইয়া যায়, কারণ সেগুলি ভারি বলিয়া তলায় গিয়া জমা হয়। শেষের তৈয়ারী মাল পাইবার জন্য চার পাঁচ বার ধুইয়া লওয়া দরকার।

কাঁচা (crude) লাক্ষা বাটিবার ও ধুইবার পূর্ব্বে কুলার বাতাসে ধুলা ঝাড়িয়া লওয়া হয় বলিয়া, ধৌত করিবার পরে আর তাহা ঝাড়িয়া ধুলা বাহির করিয়া লইবার দরকার হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় দফা মালের ওজন যথাক্রমে ২৩।০ সের ও ১৭৮০ সের এবং উহাই প্রধানতঃ সমস্ত লাক্ষার সমষ্টি। ধুলা ও বাদ দেওয়া মাল ছাঁকিয়া ও ঝাড়িয়া মোট ২ সের ১১ ছটাক লাক্ষা গলাইবার জন্য প্রস্তুত ভাবে পাওয়া যায়। ধৌত করা লাক্ষার পরিমাণ—

	সের	ছটাক।
১ম দফা	২৩	৮
২য় দফা	১৭	১২
ধুলা ও বাদ দেওয়া বা "ঝাড়তি" মাল	২	১১
ধুলা বাদ দেওয়া জঞ্জাল হইতে সংগৃহীত লাক্ষা যাহা পরবর্ত্তী দফায় ব্যবহারের জন্য রক্ষিত	১	০
মোট	৪৪	১৫

উক্ত তৈয়ারী মাল ঐ কারখানা। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাবে কাজ করিয়া সুফলের যে উচ্চতম পরিমাণ লিপিবদ্ধ আছে তাহার সমকক্ষ। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে প্রস্তুত মালের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য উহার গুণের উৎকর্ষের ক্ষতি করা হয় নাই। ঐ কারখানায় সচরাচর উৎপন্ন মালের পরিমাণ উহা হইতে অনেক কম।

ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে, এই নূতন পদ্ধতিতে কোনও অতিরিক্ত শ্রমের প্রয়োজন হয় নাই, কারণ ঝাড়িবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা ধৌত করিবার পরে করা হইত, তাহা না হইয়া ধৌত করিবার পূর্ব্বে করা হইয়াছে। যদিও দশ-ঘরা চালনীতে গলিবার উপযোগী করিয়া গুঁড়াইবার জন্য কিছু বেশী শ্রমের দরকার হইয়াছে, তেমনি ধুলা ও সূক্ষ্ম চূর্ণগুলিকে গুড়াইতে না দিয়া অনেক শ্রমের লাঘব করা হইয়াছে।

সন্তরণ-প্রতিযোগিতা

ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটীর চেষ্টায় চন্দননগর চৌধুরী ঘাট হইতে কলিকাতার আহীরীটোলা ঘাট পর্য্যন্ত ২২ মাইল দীর্ঘ একটী সন্তরণ-প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। প্রতি বৎসরই এই প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে—এবার তৃতীয় বৎসর। ১৯২২ সালে এই সন্তরণ-প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয়। সেবার মাত্র ৭ জন প্রতিযোগী গন্তব্য স্থলে পৌঁছিয়াছিলেন। সেবার বাগবাজার সুইমিং ক্লাবের শ্রীমান বীরেন্দ্রকুমার বসু চন্দননগর চৌধুরী ঘাট হইতে আহীরীটোলা ঘাট পর্য্যন্ত ২২ মাইল পথ ৪ ঘণ্টা ২৪ মিনিটে অতিক্রম করিয়া প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ইহার তিন মিনিট পরে গন্তব্য স্থলে পৌঁছিয়া শ্রীমান আশুতোষ দত্ত দ্বিতীয় স্থান অধিকার

শ্রীমান জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

করেন। তৎপর বৎসরের প্রতিযোগিতায় শ্রীমান আশুতোষ দত্তই প্রথম হন। দ্বিতীয় বৎসর মোট ১৩ জন প্রতিযোগী আহীরীটোলা ঘাটে উপস্থিত হন।

বর্ত্তমান বৎসরে মোট ২৩ জন প্রতিযোগী সন্তরণে প্রস্তুত হন। তন্মধ্যে দুইজন শেষ বরাবর সন্তরণে যোগ দেন নাই। অপর একজন মধ্যপথে সন্তরণে ক্ষান্ত হন। অবশিষ্ট সকলে আহীরীটোলার ঘাটে

গন্তব্য স্থলে পৌঁছিয়া প্রথম বলিয়া গণ্য হন। শ্রীমান গোপীনাথ রায় ও শ্রীমান রাধাবল্লভ সাধুখাঁ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। শ্রীমান জ্ঞানচন্দ্রের বয়স ১৮ বৎসর। অপর দুইজনই ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক।

সন্তরণ-প্রতিযোগিতা'র সময় কর্তৃপক্ষ খুব সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রবিবার প্রতিযোগিতা হয়,—শনিবার রাত্রে লাইফ সেভিং সোসাইটীর কর্তৃপক্ষ ৫৬খানি ষ্টীমার ও বহু সংখ্যক নৌকা চন্দননগর চৌধুরী ঘাটে পাঠাইয়া দেন। নৌকায় ও ষ্টীমারে বাদ্যের বন্দোবস্ত ছিল। এবার সন্তরণ প্রতিযোগিতা দেখিবার জন্য গঙ্গার উভয় তীরে ঘাটে অন্যূন বহু সংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিলেন। অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও দর্শক শ্রেণীর মধ্যে ছিলেন। নৌকায় ও ষ্টীমারেও বহু দর্শক ছিলেন।

প্রতিযোগিতার শেষে একটী সভা হয়। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতি রূপে পুরস্কার বিতরণ করেন। ১৯২৩ ও ১৯২৪ সালের পুরস্কার একই সঙ্গে প্রদত্ত হয়।

১৯২৪ সালের প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন শ্রীমান জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এন, সি, চ্যাটার্জ্জি মেমোরিয়েল শীল্ড, সোণার মেডেল, রূপার মেডেল, ও রূপার ট্রে পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পুরস্কার—সোণার রিষ্ট ওয়াচ, সোণার মেডেল শ্রীমান গোপীনাথ রায় প্রাপ্ত হন। পুরস্কার প্রদানের পর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় একটী হৃদয়-স্পর্শী বক্তৃতা করেন। তৎপরে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীমান সত্যরঞ্জন দাসগুপ্ত

ইনি ১৯১৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের M. Sc. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন; তৎপরে প্রথমে মৈমনসিং কলেজে ও পরে হুগলী কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হন।

এদেশে অনেক স্বভাবজাত দ্রব্য,—যাহা হইতে অতি প্রয়োজনীয় নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে—ও তদ্দ্বারা দেশের অর্থ-সমস্যা ও অভাবের প্রতিবিধান হইতে পারে—কেবল উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে নষ্ট হইতেছে অনুভব করিয়া—M. Sc. পাশ করিবার পর হইতেই তিনি নানা উপায়ে ঐ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে-cial Library'র ঐ সম্বন্ধীয় সমস্ত পুস্তক সম্যক রূপে অধ্যয়নের অবসর করিয়া লইয়াছিলেন।

ইনি Bangaloreএ—'Biochemical Process of Leather Tannery সম্বন্ধে research করিতেছিলেন। তার পর Calcutta Research Tanneryতেও কিছুকাল research করেন। তিনি ১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতা হইতে Morvada জাহাজে জার্ম্মাণী যাত্রা করেন। Darmstadtএ দুই বৎসর কাল মাত্র কার্য্য (research) করিয়া তিনি Doctor of Chemical Enngeering

শ্রীমান সত্যরঞ্জন দাসগুপ্ত

উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন। এইরূপে প্রভূত অধ্যবসায় ও কঠিন পরিশ্রমে তিনি ৬ বৎসরের course মাত্র দুই বৎসরে শেষ করিয়াছেন। ইহা বোধ হয় কেবল মাত্র বাঙ্গালী যুবক সত্যরঞ্জনেই সম্ভব।

এই ত গেল লেখা পড়ার কথা। ইহা ছাড়া, খেলা ধূলাতেও তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। তিনি একজন ভাল athlete ছিলেন। Cricket ও Tennisএ তাঁহার সমকক্ষ খেলোয়াড় হুগলীতে তাঁহার সময় খুব কমই ছিল। সর্ব্বোপরি তাঁহার ছাত্রদের প্রতি ভালবাসা ও ব্যবহার তাহাদের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অটুট করিয়া

বিদেশে বাঙ্গালী খেলোয়াড় দল

১। যাভা-বিজয়ী বাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড় দল (পরিচয়ঃ—বাম হইতে দক্ষিণে—সকলের পিছন দিকে, (১) গাঙ্গুলী, পূর্ণদাস সামাদ; দণ্ডায়মান—ফণী মিত্র; পাঁচু চ্যাটার্জ্জি, হেমাঙ্গ বসু, রহমান, বলাই চ্যাটার্জ্জি, প্রফুল্ল চ্যাটার্জ্জি, মনা দত্ত। চেয়ারে উপবিষ্ট,—হাইদার, মণি দাস, রসার, পি, গুপ্ত, সুধীর দাস। ভূমিতে উপবিষ্ট—মণীন্দ্র দত্তরায়, দীনেশ গুপ্ত।

একটী বাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড়ের দল সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ ও যবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া ফুটবল খেলায় জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশে যত ফুটবল খেলোয়াড়ের দল আছে, তাহার মধ্যে বাছাই করিয়া এ, বি, রসার সাহেব একটী মিশ্র দল গঠন করেন, এবং সেই দল রেঙ্গুন, শিঙ্গাপুর ও যবদ্বীবে ভ্রমণ করিয়া স্থানীয় সকল ফুটবল খেলোয়াড় দলকে খেলায় পরাজিত করেন।

বাঙ্গালী আগন্তুক খেলোয়াড় দলের সঙ্গে ফুটবল খেলিবার জন্য সকল যায়গাতেই বাছা বাছা স্থানীয়

বলাই চ্যাটার্জ্জি হেড করে' হেমাঙ্গ বোসকে বল 'পাশ' করে দিচ্ছেন

খেলোয়াড়দের দল গড়া হইয়াছিল তা'ছাড়া সে সব যায়গায় সবচেয়ে ভাল খেলোয়াড় দলের সঙ্গেও বাঙ্গালীদের খেলা হইয়াছিল। রেঙ্গুনের বাছা দলের সঙ্গে খেলায় বাঙ্গালীরা এক গোলে জিতিয়াছেন। শিঙ্গাপুরের বাছা
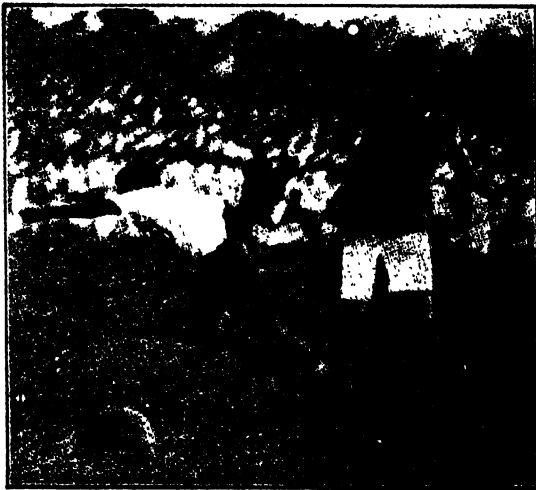
হারকিউলিস দলের সঙ্গে খেলায় রবি গাঙ্গুলী 'সুট' করে 'গোল' দিচ্ছেন।

দলের সঙ্গে তাঁরা ৪ গোলে জিতিয়াছেন। শিঙ্গাপুরের চীনাদের দলকে তাঁরা এক গোল খাওয়াইয়া আসিয়াছেন। যাভার হারকিউলিস দলকে তাঁরা ২ গোল দিয়াছেন। [illegible]

এক গোল দিয়া আসিয়াছেন। এই সব খেলাতেই প্রতিপক্ষ দল বাঙ্গালী দলকে একটাও গোল দিতে পারেন নাই। এদের মধ্যে হারকিউলিস দল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ—তাঁরা গত ১২ বছরের মধ্যে একটাও ম্যাচে হারেন নাই। এমন কি তাঁরা অষ্ট্রেলিয়াতে গিয়ে অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় দলকেও হারাইয়া দিয়া আসিয়াছিলেন।

যাত্রা বিজয়ী বাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড় দল। পরিচয়:—বাম হইতে দক্ষিণে (১) এইচ, বসু; (২) বি, ডি, চ্যাটার্জ্জি; (৩) রহমান; (৪) এম, দাস; (ক্যাপ্টেন); (৫) পি, দাস; (৬) পি, চ্যাটার্জ্জি; (৭) এফ, মিত্র; (৮) এম, দত্ত; (৯) ডি, গুপ্ত; (১০) আর, গাঙ্গুলী ও (১১) সামাদ।

যাজপুর

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

বালেশ্বর হইতে যাজপুর যাইতেছিলাম। সকাল বেলা ট্রেণ ছাড়িবার কথা। তাড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু ট্রেণ আসিল সন্ধ্যার পর। কারণ খিলুখার ধর্ম্মঘটকারিগণ ভোগপুরের নিকট রেলের লাইন খুলিয়া রাখিয়াছিল, গাড়ী উলটিয়া গিয়াছিল। সারাদিন ষ্টেশনে বসিয়া থাকিতে হইল। যাজপুর রোড ষ্টেশনে পৌঁছিলাম রাত্রি ১০টার সময়। ষ্টেশনের নিকট ডাকবাঙ্গলাতে রাত্রি কাটাইলাম। সকালে উঠিয়া যাজপুর রওনা হইলাম। ৮ ক্রোশ পথ। পূর্ব্ব হইতে গরুর গাড়ী বা পাল্কীর বন্দোবস্ত করিতে হয়। আমার সঙ্গে পাল্কী ছিল। তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া পাল্কীতে উঠিলাম। বেহারারা নানাবিধ দুর্ব্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে পাল্কী লইয়া চলিল। পথে একটি বৃহৎ খাল পার হইলাম। ইহা High Level Canal নামে পরিচিত। যাইতে যাইতে পথ হইতে অনতিদূরে কয়েকটি প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। এগুলি অনাবৃত স্থানে পড়িয়া আছে। রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত না হইলে কালক্রমে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কিছুক্ষণ পরে পথ বৈতরণীর তীরে তীরে চলিল।

পথের দুই ধারে লোকালয়। তাল খেজুর নারিকেল আম প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষপুঞ্জ শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। একটি সুন্দর মন্দির দেখিলাম। মন্দিরটি আধুনিক। একজন সাহু (মহাজন) ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মন্দিরের মেঝে মর্ম্মরমণ্ডিত। অনেক চিত্র ও মুর্ত্তির দ্বারা মন্দিরটি সুশোভিত। কিছু দুর গিয়া বৈতরণী পার হইলাম। বেলা ১১টার সময় যাজপুর পৌছিলাম। ৮ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে ৪॥০ ঘণ্টা লাগিল।

যাজপুর অতি প্রাচীন স্থান। মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। যাজপুর যজ্ঞপুর শব্দের অপভ্রংশ। প্রবাদ এই যে, ব্রহ্মা এখানে যজ্ঞ করিয়াছেন।

এতে কলিঙ্গা কৌন্তেয় যত্র বৈতারণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাচ্ছরণমেত্য বৈ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতং।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং গিরিসেবিতং॥

মহাভারত, বনপর্ব।

পুরাকালে এই পুণ্যভূমিতে ঋষিগণ বাস করিতেন। এখনও এখানে বহু ব্রাহ্মণের বাস। বহু ব্রাহ্মণের বাস বলিয়া পূর্বে ইহা দ্বিজভূমি বা ব্রাহ্মণ-নগর নামে পরিচিত ছিল। যাজপুর এক সময়ে উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। যাজপুরের অসংখ্য হিন্দু দেবালয় ইহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে। পরে রাজধানী এথান হইতে কটকে উঠিয়া গিয়াছিল। ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবকে যাজপুরের নিকটেই পরাভূত ও নিহত করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে উড়িষ্যায় হিন্দু রাজত্বের লোপ হয়।

যাজপুরে প্রধান মন্দির দুইটি—বিরজাদেবীর মন্দির (বা ঠাকুরাণীর মন্দির) এবং বরাহনাথের মন্দির। বিরজাদেবীর মাহাত্ম্যে এই স্থানের নাম বিরজাক্ষেত্র এবং ইহা ৫১ পীঠের মধ্যে অন্যতম। বিরজাদেবীর মন্দির বৈতরণী হইতে দুই মাইল দুরে। মন্দিরটি প্রাচীন। চারিদিকে পাথরের দেওয়াল দিয়া ঘেরা। এই দেওয়াল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি একজন সাধুর চেষ্টায় জীর্ণ-সংস্কার হইয়াছে। শুনিলাম, সাধুটি প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে একটি হাঁড়ি রাখিয়া অনুরোধ করেন, যেন প্রত্যহ এক মুষ্টি করিয়া চাউল এই মন্দিরে দেওয়া হয়। এই সহজ উপায়ে তিনি এই বৃহৎ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার পূর্ব্বদিকে। প্রবেশ-মার্গের দুই পার্শ্বে দুইটি সিংহ। উপরে একটি মন্দির আছে। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া একটি মন্দিরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ দেখিলাম। যাত্রিগণকে এখানে প্রণাম করিতে হয়। মূল মন্দিরের সংলগ্ন আর একটি মন্দির আছে। ইহা জগমোহন নামে পরিচিত। বিরজাদেবীর মূর্ত্তি কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্মিত, পর্য্যাপ্ত পরিচ্ছদে ভূষিত, নানাবিধ অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত,—বক্ষ পর্য্যন্ত রৌপ্যের অলঙ্কার, তদূর্দ্ধে স্বর্ণালঙ্কার। মূল বিগ্রহের পার্শ্বে একটি পিতলের ভোগ-মূর্ত্তি—উৎসবের সময় এই মূর্ত্তি বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। মন্দিরের বাহিরে আমরা একটি বৃহৎ রথ দেখিয়াছিলাম। শুনিলাম বিরজাদেবীর রথযাত্রা হয়।

মন্দিরের নিকট কয়েকটি শিবালয় আছে। একটি মন্দিরের মধ্যে একটী কূপ আছে, ইহাকে নাভিগয়া বলে। প্রবাদ এই যে, গয়াসুরের মস্তক গয়াতে পড়িয়াছিল, নাভি এইখানে পড়িয়াছিল, এবং পদদ্বয় রাজামাহেন্দ্রীতে (গোদাবরীতে) পড়িয়াছিল। অপর প্রবাদ অনুসারে সতীর নাভি এই স্থানে পড়িয়াছিল। যাত্রিগণ এখানে তর্পণ করিয়া কূপমধ্যে পিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া থাকে। বিরজাদেবীর মন্দিরের নিকটে একটী প্রাচীন প্রস্তরাবদ্ধ সরোবর আছে। ইহার নাম ব্রহ্মকুণ্ড।

বরাহনাথের মন্দির বৈতরণীর মধ্যে একটী দ্বীপের উপর অবস্থিত। মন্দিরের উত্তর দিকে নদীর ধারাতে সর্ব্দা জল থাকে; দক্ষিণের ধারাতে জল প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। আমরা প্রথমে বৈতরণীতে স্নান করিতে চলিলাম। মন্দিরের পাশেই বহু সংখ্যক পাণ্ডাদের বাড়ী। পাণ্ডাদের অবস্থা আজকাল বড় খারাপ—বাড়ীগুলি তাহার পরিচয় দিতেছে। সাধারণতঃ দরজার পাশে দেওয়ালের উপর আলপনা দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। অধিকাংশ বাড়ীর সম্মুখে উচ্চ তুলসীমঞ্চ। ইহা উৎকলের বিশেষত্ব। একটী তুলসীমঞ্চের তলে একটী প্রস্তরের সুগঠিত রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। সম্ভবতঃ ইহা মন্দিরের কোন অংশ হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

বৈতরণীতে স্নান সারিয়া আমরা মন্দির দেখিতে গেলাম। এখানে প্রধান বিগ্রহ বরাহ অবতার; নিম্নভাগ মনুষ্যাকৃতি—মুখ বরাহের ন্যায়। ইহার এক পার্শ্বে

শ্বেতবরাহ—যাঁহার কল্প এক্ষণে প্রচলিত; অপর পার্শ্বে গজলক্ষ্মী। মন্দিরের বাহিরেও একটি বেদীর উপর বরাহ-দেবের মূর্ত্তি রহিয়াছে। বাম ভুজ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত—তাহার উপর একটি ক্ষুদ্র আকারের লক্ষ্মীমূর্ত্তি। মন্দিরের পার্শ্বে দশাশ্বমেধ ঘাট। প্রবাদ এই যে, ব্রহ্মা এখানে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বৈতরণীর প্রবাহ এক্ষণে ঘাট হইতে সরিয়া গিয়াছে। ঘাটের সম্মুখে অল্পপরিমাণে স্রোতহীন জল পড়িয়া রহিয়াছে। মন্দিরের দেওয়ালে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রাকৃতি প্রস্তর-মূর্ত্তি রহিয়াছে।

এখান হইতে জগন্নাথদেবের মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। এই মন্দির বৈতরণীর দক্ষিণ তীরে নদীর বর্ত্তমান প্রবাহ হইতে কিছু দূরে। এই মন্দিরটিও প্রাচীন; চারিদিকে প্রস্তরের উচ্চ দেওয়াল—প্রাঙ্গণে নারিকেল প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ। মন্দিরমধ্যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি—পুরীর মন্দিরের ন্যায়। জগন্নাথদেবের মন্দিরের বাহিরে গণেশের মন্দির। তাহার পার্শ্বে অষ্টমাতৃকার মন্দির। এই মন্দির মধ্যে সারি সারি কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি—বারাহী, চামুণ্ডা, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী ও নারসিংহী। মূর্ত্তিগুলি নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত। কাহারও মুখে প্রসন্ন ভাব, কাহারও মুখে রুদ্র ভাব,- নানাবিধ ভাব সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিয়া শিল্পীর শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় দিতেছে।

এতদ্ব্যতীত যাজপুরে একটী প্রাচীন স্তম্ভ আছে, ইহার নাম শুভস্তম্ভ। বিরজাদেবীর মন্দিরে যাইবার পথ হইতে অল্প দূরে এই স্তম্ভ অবস্থিত। স্তম্ভটি কৃষ্ণপ্রস্তরের, উৎকৃষ্ট ভাবে পালিশ করা। ইহা তিনটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর অবস্থিত। ইহা একটী প্রস্তরখণ্ড হইতে নির্ম্মিত (Monolith)—দৈর্ঘ্যে ২২।২৩ ফুট। ইহার উপর ১০ফুট আন্দাজ অপর একটী প্রস্তর! তাহার গায়ে সিংহের মুখ এবং নির্ম্মাল্য উৎকীর্ণ হইয়াছে। উপরে গরুড় মূর্ত্তি ছিল, এখন তাহা একটি মন্দির মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। এই স্তম্ভের নিকটে কোন মন্দিরের চিহ্ন নাই। কালাপাহাড় এই স্তম্ভটি সরাইবার জন্য ইহার গায়ে ছিদ্র করিয়া দড়ি গলাইয়া হাতী দিয়া টানিয়াছিল, বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, এই স্তম্ভমধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মণিমুক্তাদি ছিল, তাহা এক সন্ন্যাসী বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই স্তম্ভটি কোন রাজা কর্ত্তৃক কখন নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা স্থির হয় নাই। ইহা কীর্ত্তিস্তম্ভ, গরুড়স্তম্ভ বা সভাস্তম্ভ নামে পরিচিত।

বিরজাদেবীর মন্দিরে যাইবার পথে একটী সেতু আছে। ইহা তেঁতুলিমাল বা এগারনালা নামে পরিচিত। ইহার গঠন প্রণালী পুরীর বিখ্যাত আঠারনালা সেতুর অনুরূপ,—খিলান ব্যবহৃত হয় নাই। সেতুটি খুব প্রাচীন। স্থানে স্থানে পাথরের উপর বিবিধ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে।

যাজপুরের সবডিভিসনাল অফিসারের আফিসের নিকটেই চারিটি অতিশয় বৃহৎ আকারের প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে,—মূর্ত্তিগুলি বারাহী, চামুণ্ডা, ইন্দ্রাণী, ও শান্ত মাধবের। প্রথম তিনটি মূর্ত্তি সার্দ্ধপঞ্চহস্ত পরিমিত। বরাহী দেবী মহিষাসনা, নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা, তাঁহার ক্রোড়ে শিশু। চামুণ্ডামূর্ত্তি অতি ভয়ানক,—শুষ্কদেহ মুণ্ডমালাবিভূষিত। ইন্দ্রাণী গজারূঢ়া, সৌম্যমূর্ত্তি—ইঁহারও ক্রোড়ে শিশু। শান্ত মাধবের মূর্ত্তি অতি বৃহৎ —১৬।১৭ ফুট দীর্ঘ। মূর্ত্তিটি স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে। এক্ষণে ভূমির উপর পড়িয়া আছে।

যাজপুরের নানা স্থানে বহুসংখ্যক শিবালয় আছে। মন্দিরগুলির আকার ক্ষুদ্র। অনেক মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মুসলমানগণ বিশেষতঃ কালাপাহাড় অনেক মন্দির এবং দেবদেবীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

উৎকলের অন্য তীর্থের ন্যায় যাজপুর শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। যাজপুরে চৈতন্যদেবের লীলার বিস্তারিত বিবরণ ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের "উৎকলে শ্রীচৈতন্য" গ্রন্থে লিখিত আছে। শ্রীচৈতন্যদেব দশাশ্বমেধ-ঘাটে স্নান করিয়া বরাহদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। পরে বিরজাদেবীর মন্দিরে গিয়া ভক্তিভরে দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। সেখানে নাভিগয়াতে পিতৃকৃত্য সমাপন করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন। অতঃপর চৈতন্যদেব নিজ শিষ্যগণের নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়া একাকী যাজপুরের অসংখ্য মন্দির এবং দেবদেবী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। যাজপুরে কত মন্দির ও দেবালয় ছিল, সে সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—

লক্ষ বৎসরেও নারি লৈতে সব নাম।
যাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান॥

দেবালয় নাহি হেন নাহি তথা স্থান।
কেবল দেবের বাস যাজপুর গ্রাম॥

যাজপুরের সে গৌরব-দিবস আজ নাই। বিশেষতঃ রেলওয়ে হইবার পর হইতে যাজপুরের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। পূর্ব্বে যাত্রিগণ যখন পদব্রজে যাইত, তখন সকল জগন্নাথযাত্রী যাজপুর দিয়া যাইত; এখানে মন্দির ও তীর্থ সকল দর্শন করিত। এক্ষণে রেলওয়ে লাইন এখান হইতে ৮ ক্রোশ দূর দিয়া গিয়াছে। অতি অল্প সংখ্যক যাত্রী এক্ষণে কষ্ট করিয়া যাজপুরে আসে। যাজপুরের ব্রাহ্মণগণের এক্ষণে অতিশয় দুরবস্থা।

যাজপুর হইতে আমি যাজপুর রোড ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। এই ষ্টেশনের নাম পূর্ব্বে ব্যাসসরোবর ছিল। ষ্টেশন হইতে মাইল খানেক দূরে বনের মধ্যে একটি দেবালয় আছে। এখানে বৎসরে একবার করিয়া মেলা বসে। আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন স্থানটি জনহীন। দেবালয়ের চারিদিক খোলা,—কয়েকটি স্তম্ভের উপর ছাদ রহিয়াছে। মধ্যস্থলে একটি সমাধি। তাহার পার্শ্বে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত জটাজুট-মণ্ডিত, অক্ষমালা-সমন্বিত একটী মূর্ত্তি—বোধ হয় ইহাই ব্যাসদেবের মূর্ত্তি।

পুস্তক-পরিচয়

গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী। শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ বসু প্রণীত, মূল্য দুই টাকা।—নাম দেখিয়াই বলিতে পারা যায়, এই পুস্তকখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। ইংরাজী ১৯১১ অব্দের অক্টোবর মাসে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৈলেন্দ্রবাবু, তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র নগেন্দ্রবাবু ও শ্রীযুক্ত কানাইলাল দে মহাশয় কয়েকজন অনুচর সহ গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী ভ্রমণে যান। সেই ভ্রমণ-কাহিনী দ্বিজেন্দ্রবাবু অতি সুললিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ প্রদেশের কথা ইতঃপূর্ব্বে আরও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এখানি, বলিতে গেলে, আর এক রকমের; ইহাতে বর্ণন-কৌশল নাই, উচ্ছ্বাস নাই, আড়ম্বর নাই; অতি সোজা কথায় অথচ মনোরম ভাবে, এই কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পড়িয়া কি তৃপ্তি যে অনুভব করিয়াছি, তাহা বলিবার নহে; বিশেষতঃ বহুদিনের বিস্মৃত-প্রায় দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে উপস্থাপিত হওয়ায়, আমরা অনেক স্থানে তন্ময় হইয়া গিয়াছি। যিনি বইখানি পড়িবেন, তিনিই আনন্দ তৃপ্তি লাভ করিবেন।

পুজনীয় গুরুদাস। শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য তিন টাকা।—প্রাতঃস্মরণীয় পরলোকগত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হওয়া যে প্রয়োজন, এ কথা বঙ্গালী মাত্রেই স্বীকার করিবেন; আমরাও এতদিন এই মহাত্মার জীবন-চরিত দেখিবার আগ্রহে ছিলাম; শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী মহাশয় আমাদের সে আগ্রহ পূর্ণ করিয়াছেন; তিনি সার গুরুদাসের জীবনের অবশ্য-জ্ঞাতব্য অনেক কথারই অবতারণা করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে সার গুরুদাসের বাল্যজীবন, কার্য্য-কুশলতার পরিচয়, গার্হস্থ্য-জীবন ও প্রকৃতির পরিচয় অবগত হইতে পারা যায়। জীবনী তাঁহার মতের বিশ্লেষণ প্রভৃতি করেন নাই; তাহা হইলেই এই জীবন কথা একেবারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। তাহা হইলেও, ভবিষ্যৎ জীবন চরিতকার এই পুস্তক হইতে যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

অশ্রুময়। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। এই উপন্যাসখানি বাঙ্গলা মায়ের শান্ত, স্নিগ্ধ, শীতল, কল্যাণে সুপবিত্র সুমধুর পল্লীচিত্র। পল্লীবধূগণের সদ্ভাব, পল্লীজননীগণের বাৎসল্য ভাব, পল্লীবালকবালিকাগণের উগ্র কোমল, অম্লমধুর বিচিত্র ভাব, পল্লীপ্রবীণগণের উৎকট শাসক ভাব ও অনুগ্র মৈত্রীভাবে বইখানির আগাগোড়া অনুরঞ্জিত। সার্থক ও ব্যর্থ দাম্পত্য প্রেম—অনূঢ়া তরুণী ও বাল-বিধবার ফোটে ফোটে-ফোটে না প্রেম, শিক্ষিতা যুবতীর সুমার্জ্জিত নিক্তিতে ওজন-করা প্রেম—মানব হৃদয়ের সদসৎ বৃত্তিনিচয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ—বহু চরিত্রের বিবিধ ঘটনা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। পাষাণে-গড়া স্বামী মূর্ত্তি, সেবাপরায়ণা নারী মূর্ত্তি, বিশ্বাস নির্ভরশীলা কিশোরী মূর্ত্তি, বিষাদ ভরা পত্নী মূর্ত্তি বাৎসল্য-মমতায়-গড়া জননী-মূর্ত্তিতে "অশ্রুময়" পাঠক-পাঠিকাকে না কাঁদাইয়া ছাড়িবে না।

মধ্যযুগে বাঙ্গলা। শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য তিন টাকা।—প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় কাহারও নিকট দিতে হইবে না। তিনি অনেক দিন পরে এই 'মধ্যযুগের বাঙ্গলা' লিখিয়াছেন। 'মধ্যযুগ' শব্দ তিনি মুসলমান অধিকারের আরম্ভ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার এ ইতিহাস মুসলমান অধিকারের আরম্ভ হইতে পরবর্ত্তী মোগল শাসনের কতক দিনের বিবরণ। এখানি ধারাবাহিক ইতিহাস নহে, তাঁহার কল্পিত মধ্যযুগে রাজ্য শাসন প্রণালী, দেশের ও দশের অবস্থা,

লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বইখানি পাঠ করিলে সে সময়ের সকল ব্যাপারের সুস্পষ্ট চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবীণ ঐতিহাসিককে আমরা সসম্ভ্রম অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

ভগবৎ-প্রসঙ্গ।—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা।—এখানি 'ভারতবর্ষ' 'উদ্বোধন' 'সাহিত্য' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত লেখক মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ-সংগ্রহ। প্রবন্ধগুলি যখন নানা পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন সকলেই ইহা সাগ্রহে পাঠ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত হইলাম। লেখক যে শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি যে নিজে স্বধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি, তাহা এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

সোক্রাটীস।—শ্রীরজনীকান্ত গুহ এম-এ প্রণীত, মূল্য পাঁচ টাকা। শ্রীযুক্ত গুহ মহাশয় গ্রীক্ ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি বহু পরিশ্রমে এই 'সোক্রাটীস' পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু এখানিতে সোক্রাটীসের জীবন কথা আরম্ভ করিতেই পারেন নাই। সোক্রাটীসের জীবন-কথা বলিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে গ্রীক জাতি ও গ্রীক সভ্যতার ইতিহাস বলিতে হয়, নতুবা সোক্রাটীসের জীবন-কথা বোধগম্য হয় না। সেই জন্য এই খণ্ডে সুপণ্ডিত রজনীবাবু গ্রীক সভ্যতার ইতিহাসই বিবৃত করিয়াছেন, পরবর্ত্তী খণ্ডে জীবনকথা বলিবেন। গ্রীক্ সভ্যতা সম্বন্ধে কোন ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বহুদিন পূর্ব্বে প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'গ্রীক ও হিন্দু' নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; তাহা অসম্পূর্ণ। অধ্যাপক রজনীবাবু গ্রীক জাতি ও গ্রীক সভ্যতার ইতিহাসের যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহার রচনাভঙ্গী অতি সুন্দর, বর্ণনা অতি সরল, আড়ম্বরশূন্য, ভাষা অননুকরণীয়। এমন সুন্দর পুস্তকের আদর অবশ্যম্ভাবী।

ঘরের কথা।—শ্রীহরিহর শেঠ প্রণীত, মূল্য আট আনা। এখানি সংগ্রহ পুস্তক; ইহার অধিকাংশই 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রবন্ধগুলি নিবদ্ধ না রাখিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া গ্রন্থকার ভালই করিয়াছেন। গ্রন্থকার সুলেখক, চিন্তাশীল ব্যক্তি, প্রবন্ধগুলিতে তাঁহার চিন্তাশীলতা সুপরিস্ফুট।

অরবিন্দ-প্রসঙ্গ।—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত, মূল্য দশ আনা। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় যখন বরোদায় ছিলেন, সেই সময় সুলেখক দীনেন্দ্রবাবু তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন। দীনেন্দ্রবাবু তাঁহার অনন্যসাধারণ সুমধুর ভাষায় সেই সময়ের অরবিন্দ-প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন। এই বইখানির যে যথেষ্ট আদর হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

হীরের টুকরো।—শ্রীনিশিকান্ত সেন প্রণীত, মূল্য এক টাকা। শিশু-সাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বাবু পুস্তকের নামকরণেই ইহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—বইখানি সত্যসত্যই হীরের টুকরো; গল্পগুলি হীরকের মতই ঝল ঝল করিতেছে; শিশুরা ত গল্প পড়িয়া মুগ্ধ হইবেই, শিশুদের অভিভাবকেরাও প্রশংসা করিবেন।

সোণার হরিণ।—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু প্রণীত, মূল্য এক টাকা ন' আনা। এখানি গল্প সংগ্রহ। ইহাতে পাঁচটী ছোট গল্প আছে। এগুলি যখন ভারতবর্ষ ও অন্যান্য মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন সকলেই ভাল বলিয়াছিলেন; এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় সকলেই এক এক খণ্ড ঘরে রাখিতে পারিবেন। মণীন্দ্রবাবু উপন্যাস ক্ষেত্রে যে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, ছোট গল্প রচনাতেও সে যশঃ অক্ষুন্ন আছে।

নাট-মন্দির।—শ্রীসুবোধ রায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা। এই পুস্তকখানিতে তিনটী কথা-নাট্য প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সকলেই বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীমান সুবোধের এই নাট-মন্দির প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

শতবর্ষের বাংলা।—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত; মূল্য বার আনা। পূজার সংখ্যা 'প্রবর্ত্তকে' এই শত বর্ষের বাংলা প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সংখ্যা প্রবর্ত্তক আর বাজারে মেলে না; তাই শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় প্রস্তাবটী পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি যত সংখ্যাই এই সংস্করণে ছাপিয়া থাকুন, তাহা অনতিবিলম্বে ফুরাইয়া যাইবে, আবার সংস্করণের প্রয়োজন হইবে, এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। শতবর্ষের বাংলার কথা এমন সুন্দর ভাবে আর কেহ এত দিন বলেন নাই।

আর্য্য নিত্যকৃত্যম্।—শ্রীসারদাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ প্রণীত, মূল্য ১৸০ টাকা। নিত্যকর্ম্মের পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়; কিন্তু নিত্যকর্ম্ম সর্ব্বথা শাস্ত্রবিহিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই পুস্তকখানি শাস্ত্রবিহিত; সুতরাং যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রে আস্থাবান ও নিত্যকৃত্যের অনুরাগী, তাঁহারা এই পুস্তকখানিকে বহু মূল্য জ্ঞান করিবেন।

আধীন গরীব।—শ্রীজহরলাল দে প্রণীত মূল্য আট আনা। এখানি গার্হস্থ্য নাটক; তিন অঙ্কে পরিসমাপ্ত। আধুনিক সমাজের কতকগুলি অযথা উৎপীড়নের মর্ম্মভেদী দৃশ্য এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। নাট্যকারের উদ্দেশ্য সাধু; তাঁহার চেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

রসাঙ্কুর।—শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ৷৵০ আনা। এখানি কবিতা পুস্তক। সাধারণতঃ কবিতা পুস্তকে যে সকল মামুলী কবিতা থাকে, এখানিতে তাহা নাই; কবিতাগুলির অধিকাংশই উপভোগ্য, কোথাও কষ্ট-কল্পনা নাই।

বঙ্গে দুর্গোৎসব।—শ্রীমনোমোহন গুহ প্রণীত, মূল্য ৷৵০ আনা। এই পুস্তকখানিতে দুর্গোৎসবের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখক মহাশয় সরল ভাষায় দুর্গা পূজার কথা বলিয়াছেন। যে সনাতন

আদর্শের উপর এই উৎসব প্রতিষ্ঠিত, সেই আদর্শ প্রচার করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

সমবায়-বিজ্ঞান।—শ্রীললিতকুমার সেন বি-এ প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। এক্ষণে আমাদের দেশে নানা স্থানে যৌথ-ঋণদান-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং তাহার দ্বারা সত্যসত্যই অনেক কাজ হইতেছে। এ সময়ে এই সমবায়-বিজ্ঞান প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার জনসাধারণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। সমবায় সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রঙ্গিণী।—শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বিরচিত, মূল্য এক টাকা। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমরা এত দিন উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক বলিয়াই জানিতাম। তিনি প্রবীণ বয়সে নাটক লিখিয়াছেন; সে নাটকও আবার সামাজিক; পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। সুতরাং নাটকখানি পড়িবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। এ নাটকে দার্শনিক তত্ত্ব নাই, গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনের কথাই নাটকাকারে গ্রথিত হইয়াছে।

কবি সেখ সাদী।—শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী প্রণীত; মূল্য পাঁচ সিকা। বঙ্গভাষায় পারস্যের অমর কবি সেখ সাদীর জীবনী পূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই; শ্রীযুক্ত সুরেশ বাবুই এই অমূল্য রত্ন প্রথম বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিলেন। শেখ সাদীর গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ আমরা পড়িয়াছি; কিন্তু তাঁহার বিস্তৃত জীবন কথা অনেকেই জানেন না। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে যে এই অমর কবির জীবন কাহিনীই জানিতে পারা যাইবে তাহা নহে, শেখ সাদীর অমৃতোপম কবিতারও রসাস্বাদন করিতে পারা যাইবে। শ্রীযুক্ত সুরেশ বাবু এই গ্রন্থে পারস্য ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত অধিকাংশ প্রামাণ্য গ্রন্থেরই আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাফল্য এবং এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

দমকা হাওয়া।—শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য এক টাকা। এখানি যে উপন্যাস, তাহা নাম দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। গ্রন্থকার এই উপন্যাসে সরসী মিত্র বা ভেকোর যে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বেশ হইয়াছে। বইখানি পড়িয়া অনেকেই সন্তোষ লাভ করিবেন।

বাংলার পাখী।—শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় সুললিত ও সহজবোধ্য ভাষায় বিজ্ঞানের নানা কথা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার এই 'বাংলার পাখী' পুস্তকখানি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তিনি পক্ষীতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বাংলা-দেশের পাখী সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা জানিতে পারিলাম। এই শ্রেণীর পুস্তক লিখিয়া শ্রীযুক্ত জগদানন্দ বাবু বাঙ্গলা-সাহিত্যের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি করিতেছেন।

ধ্রুবা।—শ্রীমতী লীলা দেবী প্রণীত। মূল্য দুই টাকা।—এ উপন্যাসখানির একটু বিশেষত্ব আছে। গ্রন্থকর্ত্রী পাঠকদের সম্মুখে একটী উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন,—শুধু মামুলি প্রেমের কথায় পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলি ভরিয়া দেন নাই। বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশে নিরাশ্রয়া বিধবার অবস্থা একটা সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে; পূর্ব্বতন আদর্শ এখন লুপ্ত এবং পাশ্চাত্য আদর্শও আমরা ঠিক আপনার করিয়া লইতে পারি নাই—লওয়া উচিত কি না, সে বিষয়েও মতদ্বৈধ আছে। এই সময়ে ধ্রুবার আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সেবাধর্ম্মের ন্যায় আদর্শ শুধু আমাদের দেশে কেন—যে কোনও দেশে উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য—এবং তাহা হইয়াছেও। আমাদের দেশে অধুনাতন যুগে স্বামী বিবেকানন্দ এই আদর্শ পুনঃপ্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। নরনারী-নির্ব্বিশেষে ইহা মুক্তির সোপান। বিশেষতঃ নারীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ আর কি হইতে পারে? ধ্রুবা ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রও বেশ ফুটিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রীর ভাষা বিশুদ্ধ। একটু সংস্কৃত-গন্ধী হইলেও কোথাও আড়ষ্ট হয় নাই; বরং কবিত্ব ও মিষ্টত্বে পাঠককে তৃপ্তি দান করে। পুস্তকখানি গ্রন্থকর্ত্রীর প্রথম উদ্যম এবং সে হিসাবে ইহা খুব ভালই হইয়াছে। বইখানির ছাপা, বাঁধাই সুন্দর।

শোক-সংবাদ

৺শরৎকুমার মল্লিক

প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও স্বদেশ-হিতকামী ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু তিনি চিকিৎসা কার্য্য অপেক্ষা দেশহিতকর কার্য্যেই তাঁহার জীবনের অধিক সময় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথম বেঙ্গল রেজিমেণ্টের বাঙ্গালী পল্টন গঠন এবং বেঙ্গল টেরিটোরিয়েল ফোর্স সম্বন্ধে তিনি যে কাজ করিয়াছিলেন, তাহা কেহই ভুলিবে না। এই টেরিটোরিয়েল ফোর্স কমিটি সম্পর্কে তিনি দিল্লী গিয়াছিলেন; সেখানেই তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন। তাহার অব্যবহিত পরেই কলিকাতায় আসিয়া হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়গণের গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺গৌরহরি সেন

কলিকাতা চৈতন্য-লাইব্রেরীর প্রাণস্বরূপ, আমাদের পরম-বন্ধু গৌরহরি সেন মহাশয় আর ইহ-জগতে নাই; গত ১লা নভেম্বর তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইয়াছে। গৌরহরি বাবু কিছু দিন হইতে বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন।

৺গৌরহরি সেন

অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়াছিল যে, তিনি বাড়ীর বাহির হইতে পারিতেন না। এই অবস্থাতেও, আমরা দেখিয়াছি, তিনি তাঁহার দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া রাস্তার অপর পার্শ্বে অবস্থিত চৈতন্য-লাইব্রেরীর কার্য্য পরিচালন করিতেন। তাঁহার জীবনই চৈতন্য-লাইব্রেরীময় ছিল; উহারই উন্নতির জন্য তিনি ৩৫ বৎসর কাল অনন্যমনা, অনন্যকর্ম্মা হইয়া খাটিয়াছেন। চিরকুমার গৌরহরি বাবু সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যিকগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। দেশের সমস্ত সভাসমিতি, সদনুষ্ঠানের সহিতই তাঁহার প্রাণের যোগ ছিল। চিরজীবন তিনি সাহিত্য-সাধনাতেই অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধা জননী এখনও বাঁচিয়া আছেন। একমাত্র পুত্রের বিয়োগ-বেদনা তাঁহাকে যে কতদূর অভিভূত করিয়াছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাঁহার এ শোক সহানুভূতির অতীত। যত দিন চৈতন্য-লাইব্রেরীর অস্তিত্ব থাকিবে, তত দিন দেশের লোক গৌরহরি বাবুকে ভুলিয়া যাইতে পারিবে না।

মিঃ মণ্টেগু

ভারতের বর্ত্তমান শাসন-সংস্কারের প্রবর্ত্তক, ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট-সেক্রেটারী রাইট অনারেবল এডুইন সামুয়েল মণ্টেগু মহোদয় পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। ১৯১০ সালে ৩১ বৎসর বয়সে মণ্টেগু ভারতের অণ্ডার-সেক্রেটারী হন, ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যেই নিযুক্ত থাকেন। বিগত মহা যুদ্ধের সময় তিনি সদর বিভাগের মন্ত্রী হন। তাহার পর ১৯১৭ সালে তিনি ভারতের ষ্টেট-সেক্রেটারী হন। এই সময়, ভারতের শাসন-সংস্কার কি ভাবে হইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং এ দেশের নানা স্থানে নানা লোকের অভিমত সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি পার্লামেণ্টে পেশ করেন; বৃটীশ পার্লামেণ্ট সেই ব্যবস্থাই পাশ করেন। তাহার কিছু দিন পরেই মণ্টেগু মহোদয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন।

সজীব নায়ক

চিত্র

শ্রীসত্যেশ চন্দ্র গুপ্ত এম্‌-এ

এক

মাঠে ঘাটে ঘুরি ফিরি ; সেটা পেশা, করি পেটের দায়ে। মাসিকে গল্প টল্প লিখি ; সেটা নেশা, করি খেয়ালের খাতিরে।

নেশায় বিপত্তি, খেয়ালের বেচালে একবার ঘটেছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা। শ্রাবণের শেষ ; জমকালো বাদল। ঘরে আরামে বসে, কল্পনার অরণ্যে মনটাকে হারানোর সুখভোগ কপালে লেখা ছিল না। গোলামীর গুঁতোয় বনজঙ্গল ভেঙ্গে, বৃষ্টিতে কাদায়, যেতে হয়েছিল সুদূর এক পল্লীগ্রামে। সারারাত ধরে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়েছিল যে রাতে আমি ফিরলুম। গোশ্রকটে যাত্রা ; বাঁশের চাটাই ঘেরা ছৈ-এর উপরে তেরপল্‌ ঢেকে বৃষ্টি নিবারণের চেষ্টা অনেকটা সফল হয়েছিল। ভিতরে পুরু করে খড় বিছিয়ে কম্বল পেতে লম্বা শুয়ে পড়েছিলুম। আর একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে তার ওপর বর্ষাতি-টা ঢাকা দিয়েছিলুম। পশুক্লেশ নিবারণী সভার পেয়াদার ভয় না থাকলেও, বলদ্‌ দুটার গায়ে ছালা ঢাকা দেওয়া হয়েছিল। শকট-চালক বসেছিলেন একটা ছাল মুড়ি দিয়ে, আর মাথায় ধরে-ছিলেন একটা বাঁশের ছাতা। আমার পায়ের দিকে, গাড়ীর ভিতর বসে বসে ঢুল্‌ছিলেন আর দুল্‌ছিলেন, আমার সঙ্গের লোকটি, যার নাম রহমৎ। গাড়ীর নীচে ঝুলছিল একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন, যার আলোতে, বাইরের অন্ধকার দূর না হলেও, কাচের চিমনির ভিতরের কালো জমাটবাঁধা ঝুলটা বেশ পরিস্ফুট হয়েছিল।

রাস্তাটা নিতান্ত খারাপ ছিল না। লোক্যালবোর্ডের কাঁচা রাস্তা ; তাতে বর্ষাকাল। মাটিটা একটু বেশী নরম ছিল। গাড়ীর চাকা ফুট খানেক বসে যাচ্ছিল। তবে দিনের বেলায় অনেক গাড়ীর চলাচল হয়েছে, আমার গাড়োয়ান তারই লিস্‌ ধরে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গরু দুটার শ্রম কিছু লাঘব হচ্ছিল বটে, তবে তাদের গতি শামুকের গতিকে হার মানিয়েছিল।

গরুগুলো হলো বিদেশ-মুখো। আরোহী ঘর-মুখো হলেও গরুর গাড়ীর গতিবেগ কিছুমাত্র বাড়ে না, এ জ্ঞানটা আমার ছিল। কাজেই, সকাল সাতটায় বিনপুর ষ্টেশনে না পৌছে দিলে ভাড়া পাবে না, এই ধারণাটা গাড়োয়ানের মনে দৃঢ় করে দিয়ে নিদ্রাদেবীর শরণ নিলুম।

অভ্যাস থাক্‌লে গরুর গাড়ীতে এমন অবস্থায় বেশ আরামে নিদ্রা দেওয়া যায়। সে রাতে কিন্তু ব্যাঘাতের হেতু ছিল। রহমতের দোদুল্যমান মাথাটা মাঝে মাঝে জোরে এসে আমার কোমরে ধাক্কা দিচ্ছিল ; আর নিদ্রাতুর গাড়োয়ানের বাঁশের ছাতাটা প্রায়ই আমার কপালে এসে ঠেক্‌ছিল। নিরুপায় আমি কিন্তু নির্ব্বিকারেই শুয়ে ছিলুম।

দুই

ভোর চারটেয় আকাশ যেন একটু পরিষ্কার হয়েছিল। বৃষ্টিও থেমে গিয়েছিল। রহমৎ বেচারী গাড়ী থেকে নেমে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লো। বাদ্‌লা বলেই সে গাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। সারারাত ধ'রে এই আশ্রয় তাকে যে রকম আড়ষ্ট করে রেখেছিল, তাতে সে নিরাশ্রয়ের দরকারটাই বেশী স্পষ্ট করে বুঝেছিল। রহমৎ নেমে যেতেই আমি পা ছড়িয়ে, ভাল করে শুলুম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। ঘুম যখন ভাঙ্গলো, তখন বি, এন, আর লাইনের বিনপুর ষ্টেশন দেখা যাচ্ছিল। ৬টা বেজেছে। বৃষ্টি নেই, তবে আকাশ ঘোরালো কালো মেঘে ঢাকা।

বিনপুর ষ্টেশনটি ছোট্ট। মাষ্টার বাবু ও তাঁর সহকারী একাধারে, ষ্টেশন মাষ্টার, বুকিং-ক্লার্ক, সিগনেলার ও মালবাবু। পানিপাঁড়ে ও পয়েণ্টস্‌ম্যান একই ব্যক্তি।

ছোট্ট একটি ঘর—তার তিন দিকে জানালা। একদিকের জানালায় মাষ্টার মশায় টিকিট বাঁটেন, আর একদিকের জানালায় মাল বুক করেন, আর তৃতীয় জানালার ধারে বসে রেজিষ্টার ও ফরম পূরণ করেন। ছ'ফুট চওড়া বারান্দার এক কোণে গার্ড সাহেবদের খাবার জলের বাঁশের একটা ফিল্টার। তাতে মাটীর কলসী মাত্র দুটি; নীচের থাকটা ফাঁক। মাঝের কলসীতে উপরের কলসী থেকে জল চুঁয়ে পড়বার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না; কারণ, ওটীর মুখটি এনামেলের বহু পুরাতন মগ দিয়ে ঢাকা। দরজার পাশে একখানা বেঞ্চ পাতা আছে। তার হেলান দেবার কাঠটি, 'চুণ, খয়ের আর আলকাত্‌রায় সুচিত্রিত। বসবার জায়গাটা ধুলো আর তেলে ধূসর রং ধারণ করেছে।

টিকিটের জানালার সামনেই আর একটা খোলা বারান্দা আছে—একসঙ্গে মালগুদাম আর যাত্রীদের বিশ্রামাগার। তার এক পাশে রেল ষ্টেশনের চিরসঙ্গী পানবিড়িওয়ালা বিরাজমান। তার কাছে পান, বিড়ি, দেশলাই ছাড়া হাতিমার্কা সিগারেটও থাকে। উপরন্তু অজানা কালের তৈরী, প্রাচীন কয়েকটা মোণ্ডাও ছিল।

তিন

ষ্টেশনের কাছে গাড়ী এসে দাঁড়াল। রহমৎ ইতিমধ্যে মাথায় পাগড়ী এঁটেছে, কাঁধে চাপরাশ ঝুলিয়েছে। নেমে বল্‌লুম তাড়াতাড়ি চায়ের বন্দোবস্ত করতে।

আমার লেখায় ও কথায় যদিও স্বদেশী ভাবটা ছিল খুব ঝাঁঝালো, পোষাক পরিচ্ছদে কিন্তু ফিরিঙ্গিয়ানা ছিল খুব জাঁকালো।

বিনপুরের মতো ছোট ষ্টেশনে, হ্যাট-কোট-টুপীধারী জীবের আবির্ভাব খুব কমই হ'ত। তাতে চাপ্‌রাশধারী অনুচর! সুতরাং আমার ষ্টেশন প্রবেশটা ছোটবড় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। মাষ্টার মশায় তখনও আসেন নি। সহকারী রাত ডিউটি করে বড়বাবুর অপেক্ষায় বসেছিল। আমাকে দেখে মনে মনে বোধ হয় ভাব্‌লে, এ আবার একটা আপদ এসে জুটলো কোত্থেকে!

জিজ্ঞাসা করে জানলুম, গাড়ী আসতে তখনও ঘণ্টাখানেক দেরী। ওয়েটিং-রুমের কথা জিজ্ঞাসা করতেই, ছোটবাবু মুচ্‌কি হেঁসে বল্‌লেন, 'আজ্ঞে, এটা ছোট্ট ষ্টেশন, আজ্ঞে এখানে—'

সারারাত ঘুম না হওয়ায় আমার সাধারণ ফেরঙ্গ মেজাজ্‌টা একটু চড়ায় বাঁধা ছিল। ছোটবাবুর কথা শেষ না হতেই আমি একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌লুম 'Damn, Shame! মশায়, ভদ্রলোককে বস্‌তে দেবার একটা জায়গা রাখেন নি?' ছোটবাবু বল্‌লেন 'মশায়, কোম্পানী রেখেছে ঐ বেঞ্চি—তাও দেখ্‌বেন ভাঙ্গা ও পুরানো। তবে আপনাদের মত লোক যদি complain করেন, তাহলে একটা নতুন বেঞ্চ পেতে পারি। আমি বললুম, 'সে ত পরের কথা—এখন আপনাদের আফিস্‌ থেকে একটা চেয়ারটেয়ার দিতে পারেন না?—আমি একজন সেকেণ্ড ক্লাস প্যাসেঞ্জার, বুঝ্‌ছেন না?'

ছোট বাবু কি বুঝ্‌লেন জানি না। ভিতরে গিয়ে একখানা উঁচু টুল এনে বসতে দিলেন। আমি তাতেই বসে সিগারেট ধরালুম। রহমৎ যোগাড়ে লোক। এরই ভিতর সে জল গরম করে চা তৈরী করতে লেগে গেছে। আমার সঙ্গের কাঠের তোরঙ্গটার উপর চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে রেখে, সে দুধের সন্ধান চাইলে ছোটবাবুর কাছে। ছোটবাবু বল্‌লেন, 'আরে, এ কি শহর বাজার পেয়েছ যে সকাল বেলাতেই দুধ পাবে? আমরা এই জঙ্গলে আছি কেবল হাওয়া খেয়ে; তবে নিকটেই ঐ দেখ কয়েকটা ঘর। কল্‌কাতার বাবুরা আসেন-হাওয়া খেতে—কিন্তু চা টার বদলে নয়। তাঁদের এত ভোরেও দুধের বরাদ্দ আছে। চাইলে পেতে পারো।'

রহমৎ দুধের সন্ধানে রওয়ানা হল। আমি ছোট ব্যাগটা খুলে, একখানা ইংরাজী মাসিক বার করে, পাতা ওল্‌টাতে লাগলুম।

রহমতের পরিচয়টা দেওয়া হয় নি। সে আমার সবে ধন নীলমণি,—সে আমার একাধারে চাপরাশী, বেয়ারা, খানসামা, বট্‌লার, বয়। মফঃস্বলে সেইই আমার একমাত্র কর্ত্তা ও পালয়িতা। সমস্ত বিপদ-জাল ছিন্ন ক'রে, অসাধ্য-সাধনে পটু—তার মত লোক আর দ্বিতীয় দেখি নি। দুর্দ্দিনের কাণ্ডারী রহমৎকে সঙ্গে না নিয়ে আমি এক পাও অগ্রসর হই না। সে আমার সহায়, সম্পদ, বল। সে না থাকলে আমার দিন চলে না। ফিরিঙ্গিয়ানা বিফল হয়ে যায়।

সুতরাং বিনপুরেও যে আমার চা পানের ব্যাঘাত ঘটবে না তা নিশ্চিত জেনে, আর একটা সিগারেট মুখে দিলুম।

১০ মিনিটের মধ্যেই রহমৎ চা প্রস্তুত করে দিল। আমি বিস্কুটে মাখন মেখে, টোষ্টের অভাব মিটিয়ে নিলুম। পেয়ালায় চা ঢেলে আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছি—আর সেই মাসিকটার পাতা উল্টাচ্ছি।

চার

এক পেয়ালা চা নিঃশেষে পান করে দ্বিতীয় পেয়ালায় মুখ দিয়েছি—এমন সময় হঠাৎ কাণে গেল এক বজ্রগম্ভীর ধ্বনি। আমি মুখ তুলে চাইলুম না—কাণ খাড়া রইল। প্রশ্ন শুনতে পেলুম,

'মশায়—আপনার নাম কি বিমল মুখুজ্যে?'

মুখ না তুলেই জবাব দিলুম 'আজ্ঞে হাঁ—মশায়—'

'আপনি কি গল্প-টল্প লেখেন?'

'আজ্ঞে হাঁ মাঝে মাঝে লিখি বটে—তাতে আপনার প্রয়োজন?'

'সে কথা পরে হচ্ছে—আচ্ছা বলুন দেখি, আষাঢ়ের নবজীবনে 'পত্নীহারা' 'গল্পটা কি আপনার লেখা'

মক্কেল নাছোড়বান্দা ভেবে এবার মুখ তুলে চাইলুম। দেখলুম, সুমুখে এক বিরাট বপু। রংটা তার সেদিনকার মেঘের মতই ঘোরালো কালো; দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায়ই সমান, ৪ ফুট হবে। পেট্টা বেশী ফুলো, কি, পিটটা, তা, না মাপ্‌লে ঠিক করা যায় না। কপালটা বেজায় ছোট—তা অনুধাবনযোগ্য। উরু দুটো গদার মত, না, পা দুটো গোদা, তা পরিমাপ-সাপেক্ষ। হাঁটু বা কনুই বলে কোন অঙ্গ আছে কি না, হঠাৎ তাঁকে দেখ্‌লে ঠাওর হয় না। হাতের আঙুলগুলো ফুলে কলাগাছ না হলেও, পাকা কলার মত হয়েছে। হাতের পিঠ পাশটা, কালো না হলে, বাতাবী লেবুর আধখানা বলে ভ্রম হওয়া খুব সম্ভব ছিল। গাল দুটো ঝুলেছে—যেন একটা কান্দিতে দুটো তাল ঝুলছে। কাণ দুটো এমন ভাবে পেছন দিকে শোয়ান যে, কেবল কর্ণরন্ধ্রই নয়নগোচর হয়। নাকটা এমন চেপ্টে গেছে যে সিঁড়ি না লাগালে কপালের নাগাল পাওয়া যায় না। নাকের নীচে থেকে গোঁফের গোছা দুদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, যেন দু আঁটি খড় ঝুলছে।

রূপ যাই হোক, বাবুটির সখ আছে। পরনে তাঁর লালপেড়ে শান্তিপুরে ধুতি। গায়ে ডবলব্রেষ্ট সার্ট; হাতে গলায় সোণার বোতাম; তার ওপর আলপাকার কোট। কোটের ওপর মুর্শিদাবাদের রেশমী চাদর। হাতে এক গাছা লাঠি, হাতলটা তার রূপায় বাঁধান। আর এক হাতে ছাতি—একটু বড়, ছত্র বল্‌লেই মানায় ভাল।

আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলুম—সাধের চা, পেয়ালায় ঠাণ্ডা হতে লাগলো।

পাঁচ

কতক্ষণ এ ভাবে চেয়ে ছিলুম জানি না। পলকহীন দৃষ্টিতে আমি যখন ঐ রূপ-সুধা পান করছিলুম—জলদগম্ভীর স্বর আবার কাণে বেজে উঠ্‌লো। আবার সেই প্রশ্ন—

'বলুন না মশায়, 'পত্নীহারা' গল্পটা কি আপনার লেখা?'

এবার আমার চমক ভাঙ্গলো। এমন একজন সুদর্শন নায়ককে পেয়ে একটু রসিকতা করবার লোভ মনে উদয় হলো।

আমি বল্‌লুম, 'বসুন না মশায় এই বেঞ্চিটাতে। আলাপটা নেহাৎ একপেশে হয়ে যাচ্ছে না কি? মশায়ের পরিচয়টা পেলে কৃতার্থ হব।'

'সব জানতে পারবেন এখনি—আগে বলুন, 'পত্নীহারা' গল্পটা আপনার লেখা কি না?'

ব্যাপার সঙ্গীন মনে হ'ল। কৌতুক চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—'কই, কোন্ গল্পটা, দেখি?'

'আবার ন্যাকা সাজা হচ্ছে!—এই দেখুন, আষাঢ়ের নবজীবন, আর এই দেখুন এই গল্পটা—লেখক শ্রীবিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—দেখ্‌তে পাচ্ছেন? আপনিই কি এই বিমল মুখুজ্যে?'

'আজ্ঞে হেঁ'—অধরকোণে আমার হাসির রেখা ফুটে উঠলো। 'কেন কি হয়েছে মশায়?'

'তা এখুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আপনি জানেন যে, নদে জেলায় পুরন্দরপুর বলে একখানা গ্রাম আছে?'

'তা থাকতে পারে।'

'আর আপনি জানেন, নবগৌরাঙ্গ পাল ঐ গ্রামের জমিদার?'

'নব গৌরাঙ্গই বটে—তা কি হয়েছে কি?'—

'আর আপনি জানেন, তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আজ দুবছর হলো মারা গেছেন?'

'আজ্ঞে সেটা আমার জানবার সুযোগ হয়নি—'

'রসিকতা রাখুন মশায়! চালাকি চলবে না! ভদ্রলোকের পারিবারিক ঘটনা নিয়ে গল্প লিখে, তা আবার ছাপান হয়েছে। আবার রসিকতা করা হচ্ছে! জানেন্ আমিই সেই পুরন্দরপুরের নবগৌরাঙ্গ বাবু—"

'ও হো—হো—হো—হো—হো—তাই না কি? তাই না কি? আরে মশায় এতক্ষণ বল্‌তে হয়! আচ্ছা গৌরাঙ্গ বাবু, তবে গল্পটা মিলে যাচ্ছে না কি?—শেষটাও মিল্‌ছে না কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে নবগৌরাঙ্গ বাবু আমার দিকে দুই পা এগিয়ে এলেন। তাঁর নেত্রদ্বয় আরক্ত, তনু কম্পিত, হস্তধৃত যষ্টি ঈষৎ উত্তোলিত, গুম্ফযুগল বিস্ফারিত।—

আমি বললুম—'মশায় এত বিচলিত হচ্ছেন কেন? আপনি ত আর আমার গল্পের নায়কের মত নিশাচর হয়ে পড়েন নি! আর হলেই বা ক্ষতি কি? গল্প ত আর সত্যি হয় না! গল্প—গল্প'—

'আর বাহাদুরি করতে হবে না—আমার সম্বন্ধে যে সমস্ত কুৎসিত ব্যাপার আপনি লিখেছেন—সত্যি হলেও তা ছাপিয়ে প্রচার করবার আপনার কি অধিকার আছে? হ'ত পুরন্দরপুর—তাহলে দেখিয়ে দিতুম গ্রামের জমিদারের নামে অপবাদ দেওয়ার কি শাস্তি'—বাধা দিয়ে আমি বল্‌লাম—'মশায়, মিছে রাগ করেন কেন? আপনার পরিচয়ের সৌভাগ্য পূর্ব্বে হয়নি। হলে প্লটটা বদ্‌লে দিতুম।—'

'আবার ন্যাকামি? জানেন, আপনাকে মানহানির দায়ে জেলে দিতে পারি—জানেন, আপনার নামে ড্যামেজ সুট্ আনতে পারি—জানেন, এখুনি পুলিশ ডেকে আপনাকে হাতকড়ি লাগিয়ে গারদে পুরতে পারি—জানেন—'

শেষের কথাটা আমার কাণে পৌছল না। ট্রেন কখন এসেছিল, খেয়াল হয় নি। রহমৎ দৌড়ে এসে বল্‌লে—'গাড়ী ছোড়তা হ্যায়।' আমি তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠলুম।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব

হিসাবের কল (এই কলের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ, কি ভাগ সবই করা যায়)

হিসাবের কল

খুব বড় বড় যোগ বিয়োগ, গুণ কি ভাগ ক'রতে অনেক সময় অনেক লোকে ভুল ক'রে থাকে। এই ভুলের জন্য অনেক ক্ষতিও হয়। এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য একজন গণিত শাস্ত্রবিদ্ একটি সুন্দর যন্ত্র তৈরী করেছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে সকল রকম হিসাব সহজে ও সঠিকভাবে করা যায়।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা

সন্তরণ প্রতিযোগিতায় মিস্ জেট্টা (Miss jetta) একজন সর্ব্ববিজয়িনী নারী। খুব কম সময়ের মধ্যে ইংলিস্ চেনেল (English Channel) অতিক্রম করার ব্যাপার নিয়ে অনেকেই হতাশ হয়েছেন ; কিন্তু মিস্ জেট্টা বলেন যে তিনি একটি নূতন রকমের রবারের পোষাক

সাঁতারের বেশ (মিস্ জেট্টা তাঁর নবোদ্ভাবিত সাঁতারের বেশ পরিধান ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন)

তৈরী ক'রবেন আর তাই গায়ে দিয়ে ভীষণ মাঘ মাসেও স্বচ্ছন্দে সাঁতার দিয়ে ইংলিস্ চেনেল্ অতিক্রম করবেন। তাঁর পোষাক এরূপ ভাবে তৈরী হবে যে, তাতে একটিও ভোড় থাকবে না। কিন্তু জোড় না থাক্‌লেও যে সাঁতার কাটবার সময় তাঁর হস্তপদ সঞ্চালনে কিছুমাত্র অসুবিধা হবে তাও নয়।

নূতন চশমা

আজকাল রাস্তায় বাহির হলেই নানা রকমের হাল ফ্যাসানের চশমা লোকের চোখে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি জার্ম্মাণীতে এক রকম নূতন ধরণের চশমা ব্যবহৃত হচ্ছে, যা আজ পর্য্যন্ত এখানকার বাজারে দেখ্‌তে পাওয়া যায় নি। চশমার কাঁচগুলি চৌকা ধরণের। জার্ম্মাণ ডাক্তারগণ বলেন যে, এরূপ ধরণের চশমা ব্যবহার

নূতন চশমা (একজন লোক নূতন চশমা চোখে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে)

করা উচিত ; কারণ, এরূপ ধরণের চশমা ব্যবহার ক'রলে শীঘ্রই চোখ খারাপ হ'বার সম্ভাবনা নেই।

দা ভিঞ্চির কল্পিত বিমান

লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি (Leonardo De Vinci) ইতালী দেশের মধ্যযুগের একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর উদ্ভাবনী-শক্তিও যে অসাধারণ ছিল, এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। তিনি অনেক নূতন জিনিষ আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু সেগুলি কালের
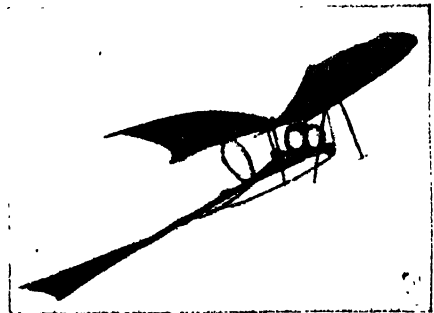
দাভিঞ্চির কল্পিত বিমান

আবর্ত্তে পড়ে লোকচক্ষুর গোচরে আসে নি। সম্প্রতি একটি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমঠের ভিতরকার জিনিষপত্র পরিষ্কার হ'তে হ'তে এক রাশ আবর্জ্জনার মধ্য থেকে পার্চমেণ্ট কাগজের ওপর তাঁর হাতে আঁকা একটি বিমানের ছবি পাওয়া

গেছে। বিমানটি যা'তে পাখীর মতো ডানার সাহায্যে উড়্‌তে পারে, সেইরূপ দু'টি ডানা সংলগ্ন ক'রে তিনি সেটিকে উড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তারহীন বেতার

বায়বীয় ও পৃথিবী সংশ্লিষ্ট (aerial and ground wire) দুইটি তার ব্যতীত বেতারে কোনও কথা বলা বা শোনা অসম্ভব। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকার বোষ্টন (Boston) সহরের একজন প্রসিদ্ধ বেতারবিদ্ উক্ত দু'রকমের তার ব্যতীত বেতারে কথা বলবার ও শোনবার ব্যবস্থা ক'রেছেন। তাঁর যন্ত্রপাতির মধ্যে হচ্ছে ফটো তোলবার ক্যামেরার একটি খালি বাক্স, আর তার ভিতর রাখবার উপযোগী কতকগুলি ছোট ছোট যন্ত্রপাতি। তাঁর যন্ত্রপাতি ছোট ছোট হলেও তাদের কার্য্যকরী শক্তি খুব বেশী।

পাতালে বেতার (১২০ ফুট খনির নীচে বসে বৈজ্ঞানিক বেতারে কথা শুন্‌ছেন)

মাটীর নীচের বেতার

ফাঁকা অর্থাৎ খোলা জায়গা ব্যতীত বেতারে কথা বলা বা শোনা যায় না. অনেক বৈজ্ঞানিকের এত দিন এই ধারণাই ছিল। কিন্তু সম্প্রতি মার্কিন দেশের ওহিও (Ohio) সহরের একজন বৈজ্ঞানিক একটি গহ্বরের মধ্যে সুড়ঙ্গ কেটে আরও প্রায় ১২০ ফুট নীচেয় গিয়ে, সুড়ঙ্গর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে বেতারে কথা শুনেছিলেন ও বলেছিলেন। তিনি বলেন যে ফাঁকা জায়গায় বেতারে আমরা যে রকম শুন্‌তে পাই, মাটীর নীচে থেকেও ঠিক সেই রকমই শুন্‌তে পাই।

তারহীন বেতার(বৈজ্ঞানিক তাঁর গাড়ী থেকে বেতারে কথা শুন্‌ছেন)

যমজ গ্রহ

COMPARED IN SIZE TO OUR SUN THE PLASKETT TWIN STAR

ডাক্তার জে, এস্ প্লাসকেট্ (Dr. J. S. Plaskett) তাঁর পরীক্ষাগারে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে একটি যমজগ্রহ আবিষ্কার ক'রেছেন। এরা সূর্য্যের চেয়ে বারো হাজার গুণ তেজস্কর এবং পরিধিতে দু'হাজার গুণ বড়। এদের গতি প্রতি মিনিটে ১৫৩ মাইল ক'রে। এরা পৃথিবীর চেয়ে আশী কোটি গুণ বড়; পৃথিবী থেকে এরা পঞ্চাশ হাজার কোটি মাইল তফাতে অবস্থিত। প্লাসকেট্ সাহেব বলেন যে, এই যমজ গ্রহের গতি ও
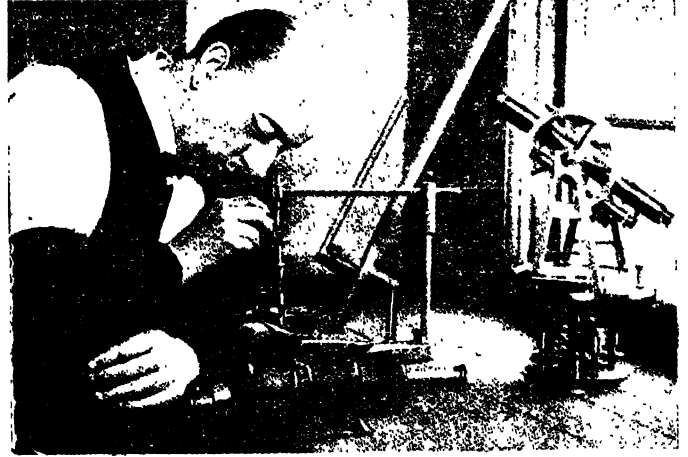
মাকড়সার জাল (বৈজ্ঞানিক দূরবীণের সাহায্যে মাকড়সার তন্তু পরীক্ষা ক'রে তাকে ব্যবহারের উপযোগী করে তুল্‌ছেন)

অবস্থা দেখ্‌লে মনে হয় যে, তারা কয়েক বৎসরের মধ্যেই ধূমকেতুতে রূপান্তরিত হ'য়ে জগতের লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে পারে।

গ্রহনির্দ্দেশক-দূরবীণ (এই নবনির্ম্মিত দূরবীণের সাহায্যে প্লাসকেট্ সাহেব তারা দুটির আকার ও অবস্থা নির্ণয় ক'রেছেন)

মাকড়সার জালের সদ্ব্যবহার

মাকড়সার জালকে আমরা আবর্জ্জনাই মনে করি। কিন্তু ওহিও (Ohio) সহরের জর্জ্জ হ্যান্‌স্ (George Hannes) নামক একজন বৈজ্ঞানিক সযত্নে মাকড়সার জাল সংগ্রহ ক'রে তা' থেকে নানা সূক্ষ্ম শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করেন। তিনি বলেন যে, মাকড়সার জালের তন্তুগুলি এত শক্ত যে, তদুপযোগী মাকু বা তাঁত পেলে তাতে কাপড়ও বোনা যায়।

বৈদ্যুতিক ক্ষুর

একজন বৈজ্ঞানিক একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কার ক'রেছেন, যাতে ক্ষুরের ফলা লাগিয়ে দিলে বিদ্যুৎ-প্রবাহেই সেটা আপ্‌নি চল্‌তে থাকে। সেই ক্ষুর দাড়ির সংস্পর্শে এলে আপনিই ক্ষৌর-কার্য্য হ'য়ে যায়। এই ক্ষুর ব্যবহারে কিছুমাত্র অসুবিধা বোধ হয় না।

অল্প ব্যয়ে বেতার

অল্প ব্যয়ে বেতারে দেশের এক স্থান থেকে স্থানান্তর কথা বলা বা শোনা এত দিন পর্য্যন্ত ঘটে ওঠেনি। সম্প্রতি গ্রাণ্ট্ হেকটর (Grant Hector) নামে একজন বেতার-বিদ্ একটি নূতন রকমের যন্ত্র তৈরী করেছেন, যদ্দ্বারা বহু শত ক্রোশ পর্য্যন্ত কথা বলা যায় ও বহু শত ক্রোশ দূর থেকে কথা শোনা যায়। তাঁর যন্ত্রের সর্ব্বশুদ্ধ দাম ৪৫৲।
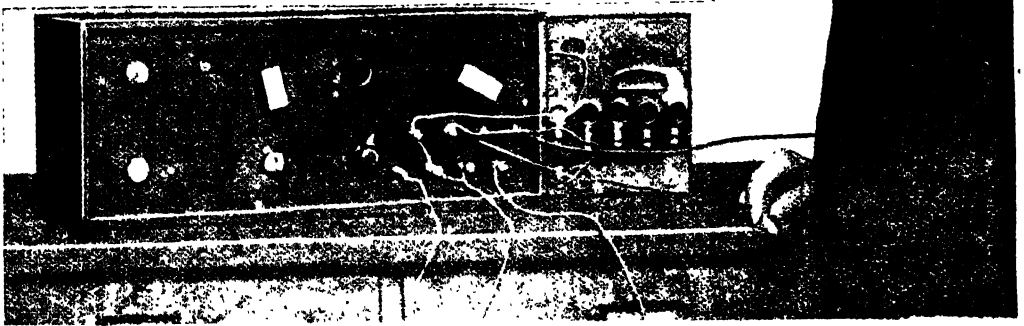
বেতার যন্ত্র (বৈজ্ঞানিক তাঁর নবোদ্ভাবিত যন্ত্র পরীক্ষা ক'রছেন)

Rear view of the set, showing the layout of instruments
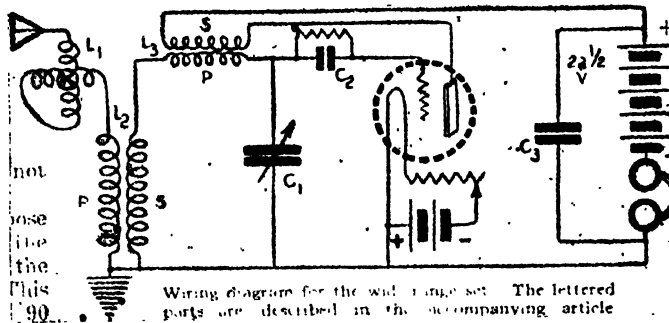
বেতার যন্ত্র　　　　বেতার যন্ত্রের পার্শ্বদিক

বেতার যন্ত্রের তারগুলি কিরূপ ভাবে পরস্পরে সঙ্গে সংযোগ আছে—এই ছবিতে তা' দেখান হয়েছে।

সাময়িকী

এবার 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদ পটে যে মহাত্মার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তিনি বাঙ্গালা দেশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষের পরিচিত, বরণীয়, দেশনায়ক পরম বৈষ্ণব শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়। মহাত্মা শিশিরকুমার বাঙ্গালা দেশের সংবাদপত্রের সেবকগণের অগ্রণীগণের অন্যতম। তাঁহার অমৃতবাজার পত্রিকা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের দেশে জাতীয়তার পতাকা যাঁহারা বহন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, শিশিরকুমার তাঁহাদেরই একজন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার 'অমিয় নিমাই চরিত' অতুলনীয়। ১৩১৭ অব্দের এই পৌষ মাসেই তিনি দেহরক্ষা করিয়াছিলেন; আমরা আজ তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

এখনকার প্রধান কথা গবর্ণমেণ্টের তিন নম্বর রেগুলেশন ও নবপ্রচারিত অর্ডিনান্স। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ববারে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। সংবাদপত্রাদিতে ও দেশময় সভাসমিতিতে এই বে-আইনি আইন (lawless law) সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে, এবং এখনও তাহার জের চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট পক্ষও নীরব নহেন। বাঙ্গলার লাট লর্ড লিটন বাহাদুর একবার দুইবার নহে, তিন তিনবারে এই ব্যাপার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; প্রথমে মালদহে, তাহার পর দিনাজপুরে, তাহার পর উপাধি বিতরণের জন্য লাটপ্রাসাদে যে দরবার হয় সেখানে। এই তিনবারে তিনি গবর্ণমেণ্ট পক্ষের সমস্ত কথা বলিয়াছেন।

লর্ড লিটন বাহাদুর এই তিনটী বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, তিন নম্বর রেগুলেশন ও অর্ডিনান্স অনুসারে যাঁহাদিগকে আটক করা হইয়াছে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন। কেবল পুলিশের কথার উপরই তাঁহারা নির্ভর করেন নাই, পরস্পর অপরিচিত নিরপেক্ষ ক্ষেত্র হইতে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। সে সকল প্রমাণ তাঁহারা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছেন। তাহার পর সেই সকল প্রমাণ ব্যবহারাজীবদিগের শ্রেষ্ঠস্থানীয় ভারতের রাজপ্রতিনিধির নিকট দাখিল করিয়াছেন। তিনিও সেই সকল প্রমাণ আলোচনা করিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাহার পর গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বিপ্লবপন্থীরা যে প্রকার ভীষণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের মতে এই আইন প্রচলন করা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পূর্ব্বেও এই আইন প্রচলনের দ্বারা বিপ্লব-প্রচেষ্টা প্রশমিত হইয়াছিল, এবারও হইবে।

গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ্য আদালতে উপস্থিত করিতে পারেন না। লাট সাহেব বলিয়াছেন যে, প্রকাশ্য আদালতে বা অন্য ভাবে জন-সাধারণের সম্মুখে সে সমস্ত প্রমাণ উপস্থাপিত করিলে, যাহারা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছে, যাহারা সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহাদের জীবন বিপন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ সমস্ত কথা গোপন রাখিতে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াই গবর্ণমেণ্ট এই বিপ্লববাদে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহারা এ সমস্ত প্রমাণ সাধারণ্যে উপস্থাপিত করিতে পারেন না।

এই উপলক্ষে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, প্রকাশ্য আদালতে না হউক দেশের তিনজন গণ্যমান্য নিরপেক্ষ সুবিবেচক ব্যক্তিকে সমস্ত কাগজ-পত্র দেখানো হউক; তাঁহাদের মন্তব্য সকলেই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবেন। লাট সাহেব তাহারও উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রথমতঃ এমন লোক মিলিবে না। গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদিগকে নিরপেক্ষ সুবিচারক মনে করিবেন, প্রতিপক্ষ তাঁহাদিগকে সে ভাবে গ্রহণ করিবেন না। আবার প্রতিপক্ষ যাঁহাদিগের নাম করিবেন, গবর্ণমেণ্ট হয় ত তাঁহাদিগকে সে ভাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবেন না। দ্বিতীয়তঃ, এ প্রকার সালিস নিযুক্ত করায় গবর্ণমেণ্টের প্রেষ্টিজের হানি হইবে।

গবর্ণমেণ্ট হইতেছেন এ সম্বন্ধে প্রভুশক্তি। সেই শক্তির উপর সন্দেহ প্রকাশ করিলে তাঁহাদের কার্য্য-শক্তিকে পঙ্গু করা হয়; তাঁহাদের শাসন-প্রণালীকে অমর্য্যাদা করা হয়। সুতরাং লাট সাহেবের শেষ কথা এই যে, গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন, তাহা ঠিক কাজ করিয়াছেন; তাহাতে কোন ভুল হয় নাই। অতএব, এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ, বক্তৃতা, সভাসমিতি করা সমস্তই বৃথা, সমস্তই পণ্ডশ্রম!

ততঃ কিম্? তাহার পর কি কর্ত্তব্য? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও অন্যান্য দেশনায়কগণ বলিতেছেন যে, এ সকল লইয়া বাদ-প্রতিবাদে আর কাজ নাই। এস, আমরা দেশের কাজে মন দিই; আমরা পল্লী-সংস্কারে ব্রতী হই। দেশের যাহারা মেরুদণ্ড, সেই পল্লীবাসীদিগকে সবল, সুস্থ ও স্বস্থ করি। তাহা হইলেই গবর্ণমেণ্টের এই ধর্ষণ-নীতির জবাব দেওয়া হইবে, স্বরাজ লাভ হইবে। এই সম্বন্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার 'দেশের ডাকে' বলিতেছেন—

"এই সংঘর্ষে বিজয়লাভ করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে চাই একতা,—কর্ত্তব্যনিষ্ঠা,—সর্ব্বোপরি চাই স্বাবলম্বন। যদি সমস্ত গ্রামগুলিতে গ্রাম্য-সমিতি স্থাপন করিয়া স্কুল, চতুষ্পাঠী, মোক্তব, নৈশ বিদ্যালয়, সালিশী পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করতঃ, সেই সেই গ্রামের চাষ, আবাদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা, ঘাট ও পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিবাদ বিসম্বাদ, দলাদলি মিটাইয়া দেওয়া, উৎপন্ন শস্য রক্ষা ও উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত, প্রতিগৃহে তুলার গাছ লাগাইয়া তদ্দ্বারা প্রস্তুত সূত্রে কাপড় তৈয়ারী করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, উচ্চ নীচের ব্যবধান ভুলিয়া হিন্দু মুসলমান পরস্পরের ভ্রাতৃত্বের দৃঢ়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া গ্রামগুলিকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারে তবে সমস্ত স্বাবলম্বী গ্রামগুলির সমবায়ে একটি বিরাট স্বাবলম্বী দেশ তৈয়ারী হইয়া অতি সহজে এই অসহনীয় পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হইতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার জন্য কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যালটি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি আমলাতন্ত্র সরকারের সাধারণের উপর প্রভাব বিস্তারের কেন্দ্রগুলিকে দখল করিয়া দেশের কাজে লাগাইয়া জাতিকে গড়িয়া তুলিবার সহায়তা করিতে হইবে। এই বিরাট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিজেদের জাতীয় জীবন দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করতঃ আমলাতন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইলে যথেষ্ট একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও অর্থের আবশ্যক। সমস্ত বাংলাদেশের গ্রামের সংখ্যা একলক্ষ পঞ্চাশ হাজারের কম হইবে না। প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ পাঁচ হাজার গ্রাম। কিন্তু প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ এক-শতখানা গ্রামে কার্য্য আরম্ভ করিতেই হইবে। চার পাঁচ-খানি গ্রাম লইয়া এক-একটি কেন্দ্র করিয়া এই গ্রামগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। এই ভাবে কার্য্য করিতে হইলে প্রত্যেক জেলায় প্রথমতঃ অন্ততঃ পক্ষে ২০ জন কর্ম্মীর দরকার। প্রত্যেক কর্ম্মীকে অন্ততঃপক্ষে কুড়ি টাকা করিয়া না দিলে, তাহার পক্ষে সকল প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়াও জীবন ধারণ করা অসম্ভব। সমস্ত বাংলাদেশে এইরূপ ভাবে ছয় শত কর্ম্মী নিযুক্ত করিতে হইবে। ইহাদের জন্য প্রতি মাসে ১২০০০ টাকা দরকার। কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় প্রথমতঃ প্রত্যেক কেন্দ্রেই কিছু কিছু টাকা দিতে হইবে। খুব কম করিয়া ধরিলেও প্রত্যেক জেলার কেন্দ্রসমূহের জন্য অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা সঙ্ঘবদ্ধ কেন্দ্রবাসী স্বেচ্ছায় তুলিয়া দিবে। এই বিরাট কার্য্যের আরম্ভের জন্য এখনই অন্ততঃ দেড়লক্ষ টাকা চাই। এতদ্ব্যতীত আরোও অনেক খরচ আছে। সমস্ত খরচের তালিকা এখানে এখন দেওয়া অসম্ভব। মোট কথা, এই মরণোন্মুখ জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, এককালীন তিন লক্ষ টাকা ও মাসিক বিশ হাজার টাকা তুলিতে হইবে। উপরিউক্ত ভাবে পল্লী সংগঠন নূতন আইনে ধৃত দেশের সুসন্তানগণের অভাবক্লিষ্ট পরিজনের ভরণ-পোষণ, প্রয়োজন হইলে এই বে-আইনি আইনে ধৃত ব্যক্তিগণের আদালতে পক্ষ সমর্থন এবং কাউন্সিল, মিউ-নিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকার করিতে প্রচুর অর্থের আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত জাতীয় জীবন গঠনের অনুকূল স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা, দুঃস্থ অসহায় বিধবাগণের জন্য আশ্রম, নির্য্যাতিতা ও ধর্ষিতা নারীগণের জন্য আবাসস্থল নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যেও বহু অর্থের প্রয়োজন। এই সমস্ত কার্য্য করাই আমার জীবনের ব্রত।"

আমরাও এতদিন এই কথাই বলিয়া আসিতেছিলাম। দেশের অধিকাংশ লোক, বলিতে গেলে যাহারা দেশের মেরুদণ্ড, তাহারা অনাহার ক্লিষ্ট, রোগে জীর্ণ, তাহাদের পরিধানে বস্ত্র নাই, ভাল পানীয় জলের অভাবে তাহারা হাহাকার করিতেছে, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া চিকিৎসার অভাবে, পথ্যের অভাবে দলে দলে মরিতেছে, তাহাদের উন্নতি সাধন, তাহাদিগকে ধ্বংসের কবল হইতে উদ্ধার-সাধন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আমাদের দেশনায়কেরা সে দিকে যথেষ্ট দৃষ্টিপাত করেন নাই। বাঙ্গালার গ্রাম ও পল্লীগুলি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে; নিরন্ন দরিদ্রের মুখে ক্ষুধার গ্রাস তুলিয়া ধরিতে হইবে, তাহাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে, রোগের জালায় কাতর হইয়া যাহাতে তাহারা বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিন্তু, করিতে হইবে বলিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না। গ্রাম ও পল্লীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। বড় বড় সহরে যাঁহারা এখন বাস করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই পল্লীগ্রাম হইতে সহরে আসিয়াছেন; তাহাদের পল্লীগৃহ এখন কোথাও ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে, কোথাও বা জঙ্গলের মধ্যে আত্ম গোপন করিয়া আছে। সহরের বিলাস-ব্যসনের মায়া ত্যাগ করিয়া পল্লী-গৃহে সকলকে গমন করিতে হইবে। দেশে যাতায়াত করিলেই দেশের উপর মায়া জন্মিবে। তখন পল্লীর উন্নতি সাধনের জন্য আগ্রহ জন্মিবে। নতুবা কালে ভদ্রে কোন গ্রামে যাইয়া দুইটা বক্তৃতা করিলে কোন ফলই হইবে না; দূর দেশ হইতে প্রেরিত স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রাণপাত চেষ্টাতেও কিছু হইবে না। যাঁহারা গ্রামে বাস করেন, তাঁহারা ঘোর অভাবগ্রস্ত; নিতান্ত নিরুপায় বলিয়াই তাঁহারা গ্রামে থাকেন। তাঁহাদের এমন অর্থ সামর্থ্য নাই যে, গ্রামের হিতকর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। কাজ তাঁহাদের দ্বারাই করাইতে হইবে। তাঁহাদের গ্রামের অভাব মোচনের জন্য তাঁহাকেই নিযুক্ত করিতে হইবে, এবং গ্রামের যে সকল সম্পন্ন অধিবাসী প্রবাসেই জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁহাদের এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই প্রকৃতপক্ষে গ্রামসকল সমৃদ্ধ হইবে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যদি এই দিকে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষের কোনই সম্ভাবনা নাই; ইহাতে দলাদলিরও স্থান নাই; নরম গরম সকলেই একবাক্যে এক প্রাণে পল্লীর উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন; হিন্দু মুসলমান একযোগে এই কার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন।

ভারত-রাজপ্রতিনিধি প্রতি বৎসরই শীতের সময় সফরে বাহির হইয়া থাকেন, ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, নানা রূপে অভিনন্দিত হইয়া রাজধানীতে বা শৈলাবাসে ফিরিয়া যান। সেই চিরাগত প্রথা অনুসারে ভারত-রাজপ্রতিনিধি লর্ড রেডিং বাহাদুর এবারও সফরে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু এবার বোম্বাই ও কলিকাতায় তাঁহার আগমন উপলক্ষে বড়ই একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার হইয়া গেল। শ্রীযুক্ত প্যাটেল মহোদয় বোম্বাই মিউনিসি-পালিটীর প্রেসিডেণ্ট। তিনি স্বরাজ-দলভুক্ত। বড়লাট সাহেব বোম্বাই যাইতেছেন শুনিয়া তিনি প্রকাশ করেন যে, লাট সাহেবের অভ্যর্থনায় বা তাঁহার অভিনন্দনে তিনি যোগদান করিবেন না। তিনি বোম্বাই মিউনিসি-পালিটীর কর্ত্তা, অথচ তিনি লাট-অভ্যর্থনায় যোগ দিবেন না, সে কেমন কথা? বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর সভার অধিবেশন হইল। তাহাতে অধিকাংশের মতে স্থির হইল যে, মিউনিসিপালিটীর প্রেসিডেণ্টকে অভ্যর্থনায় যোগ দিতে হইবে। শ্রীযুক্ত প্যাটেল মহোদয় এ আদেশ অমান্য করিলেন; তিনি লাট-অভ্যর্থনায় যোগ দিলেন না, এবং মিউনিসিপালিটীর প্রেসিডেণ্টের পদে ইস্তাফা দিলেন।

এই ত গেল বোম্বাইয়ের কথা। কলিকাতাতেও ঐ দৃশ্যেরই পুনরভিনয় হইল, তবে একটু রূপান্তরিত ভাবে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর যিনি কর্ত্তা, তাঁহাকে মেয়র বলে। বর্ত্তমানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলিকাতা মিউনিসি-পালিটীর মেয়র। প্রচলিত প্রথা অনুসারে তাঁহাকে হাবড়া ষ্টেশনে বড়লাট বাহাদুরের সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য উপস্থিতির নিমন্ত্রণ লাটসাহেবের সেক্রেটারী করিলেন।

নিমন্ত্রণ দেশবন্ধুকে ব্যক্তিগত ভাবে নহে, কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর মেয়র ভাবেই। চিত্তরঞ্জন নিজে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না; তিনি মিউনিসিপাল করপোরেশনের সদস্যদিগের উপর সিদ্ধান্তের ভার দিলেন। সভার অধিবেশন হইল; অধিকাংশ সদস্যের মতে স্থির হইল যে মেয়র মহোদয় হাবড়া ষ্টেসনে বড়লাটের সংবর্দ্ধনায় উপস্থিত হইবেন না। সুতরাং দেশবন্ধু লাট-অভ্যর্থনায় যোগদান করেন নাই। এমন ব্যাপার কিন্তু পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

লাহোরের ৭ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পঞ্জাব কনফারেন্সের কার্য্য শেষ করিবার পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী সভাপতিরূপে কয়েকটি মন্তব্য করেন। তিনি পূর্ব্ব দিন রাত্রে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, পুনরায় সেই সব কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া হিন্দু-মুসলমানের একতা, চরকার প্রচলন এবং অস্পৃশ্যতা পরিহারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি পুনরায় বিপ্লববাদিগণের হিংসামূলক কার্য্যপদ্ধতিকে বিশেষভাবে নিন্দা করিয়া বলেন যে, বিপ্লববাদিগণ দেশের শত্রু, কারণ তাহারা তাহাদের ভ্রান্ত পন্থার অনুসরণ দ্বারা প্রতিনিয়তই স্বরাজ লাভে বিলম্ব ঘটাইতেছেন। তিনি গম্ভীরভাবে একটী নূতন পন্থার বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন এবং তাহাতে তিনি স্বরাজলাভ অথবা প্রাণ বিসর্জ্জন এই দুইটীর একটী করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিবেন। কারাবরণ অথবা জেলে যাওয়ারূপ কোন মধ্যপন্থার কথা তাহাতে থাকিবে না। এই নূতন কর্ম্মপন্থার কল্পনা সুপরিণত হইলে তিনি তাহা যত সত্বর হয় দেশবাসীর নিকট ঘোষণা করিবেন। সর্ব্বশেষ মহাত্মাজী বলেন যে, তিনি দেশবাসীর কণ্ঠে "মহাত্মা গান্ধী কি জয়" এই ধ্বনি মোটেই পছন্দ করেন না। তিনি সকলকে তাঁহার নীতি ও কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিতে বলেন। যাঁহারা তাঁহার উপদেশের অনুসরণ করেন না, তাঁহাদের মুখে তাঁহার নামোচ্চারণে তিনি গর্ব্ব অনুভব করেন না।

ভারতবর্ষে যে সকল বিলাতী সিবিলিয়ান চাকুরী করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর পক্ষপাতী নহেন, এ কথা সকলেই জানেন। তাঁহাদের সান্ত্বনার জন্য বিলাতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মহোদয় বলিয়াছিলেন যে, বিলাতী সিবিলিয়ানেরাই ভারত-শাসনের মেরুদণ্ড; তাঁহারাই এই প্রকাণ্ড শাসন-সৌধের ইস্পাতের কাঠামো (Steel frame); কিন্তু কথায় মন ভিজিতে পারে, চিঁড়ে ভেজে না। বিলাতী সিবিলিয়ানেরা বলেন যে, এই দুর্ম্মূল্যের দিনে তাঁহাদের এই সামান্য (?) বেতনে এ দেশে বাস করা পোষাইতেছে না; তাহার পর নূতন যে শাসন-ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের উন্নতিরও তেমন আশা নাই। এই কারণে অনেকে পদত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া যাইবেন, এ রকম কথাও শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। ওদিকে বিলাতে যে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাহাতে নাকি শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ যুবকগণ প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হন না, কারণ ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিসে এমন কোন উন্নতির আশা নাই, যাহাতে তাঁহারা প্রলুব্ধ হইতে পারেন; বেতন যোগ্যতানুরূপ নহে, ভাতার ব্যবস্থাও তেমন নাই, তাহার পর শাসন ক্ষমতাও অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছে। এ অবস্থায় তাঁহারা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিবেন কেন? এদিকে কর্ত্তারা বেশ বুঝিয়াছেন যে, এই ইস্পাতের কাঠামো (Steel frame) না হইলে ভারত শাসন একেবারে অচল হইয়া উঠিবে। সুতরাং যাহাতে অধিক সংখ্যক বিলাতী সিবিলিয়ান এদেশে আসেন, তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে, তাহাদিগকে এ দেশে চাকুরী গ্রহণে প্রলুব্ধ করিতেই হইবে। সেই জন্য এক কমিসন বসিয়াছিল। শ্রীযুক্ত লি সাহেব সেই কমিসনের সভাপতি ছিলেন বলিয়া ঐ কমিসনের নাম লি কমিসন। কমিসনের সদস্যগণ যে মন্তব্য বিলাতে দাখিল করিয়াছিলেন, তাহার অতি সামান্য রদ-বদল হইয়া পাশ হইয়া গিয়াছে। এই কমিসনের মন্তব্য অনুসারে এ দেশের শাসন-কার্য্যে অধিক সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ আমদানী করিতে হইবে; সেজন্য বিলাতী সিবিলিয়ানদিগের বেতন, ভাতা, ছুটী প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহাতে কোন বিষয়ে তাঁহারা কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ না করেন, তাহার বন্দোবস্তে হইয়াছে। এই বন্দোবস্ত তাঁহাদের জন্য ব্যয় প্রায় দুই কোটী টাকা বাড়িবে—আমাদের দেশের লোক ব্যয়ভার বহন করিবেন

দুই চারি কোটী টাকা ব্যয় বাড়িবে, তাহাতে আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই, আমরা খোস মেজাজে, বহাল তবিয়তে সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিতে রহিব। ও সকল আমাদের গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আসল কথা হইতেছে, আমাদের জন্য যে শাসন ব্যবস্থা এত সমারোহে, এত বিপুল ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, চারি বৎসর যাইতে না যাইতে তাহার সপিণ্ডকরণ হইতে চলিল; অথচ আইন যখন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বলা হইয়াছিল যে, দশবৎসর কাল এই ব্যবস্থাই চলিবে; তাহার পর ইহার সাফল্য অসাফল্য বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করা যাইবে। তবে, আইনে এ কথাও ছিল যে, এই আইন মত কার্য্য করিতে কোথাও কিছু সামান্য পরিবর্ত্তন যদি আবশ্যক হয়, তাহা সকৌন্সিল বড়লাট বাহাদুর করিতে পারিবেন; কিন্তু সে রিপুকর্ম্ম মাত্র, মূল নীতির পরিবর্ত্তন বিলাতের মহাসভা করিবেন এবং স্বয়ং ভারত-সম্রাট তাহাতে সম্মতি দান করিবেন। এখন দেখা গেল, দশ বৎসরের অপেক্ষাও সহিল না। আইনে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, দেশীয় উপযুক্ত লোকদিগকে অধিক সংখ্যায় উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে, এবং ক্রমে ক্রমে ভারতের শাসন ব্যবস্থা একেবারে ভারতীয় (Indianize) করা হইবে। কিন্তু কার্য্যকালে তাহা হইল না, ইস্পাতের কাঠামো অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ান আমদানী করিতেই হইবে, নতুবা শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষা হয় না। সুতরাং যে শাসন-ব্যবস্থা মহাসমারোহে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যাহার কল্যাণে দেশের লোক ক্রমে ক্রমে স্বরাজ লাভ করিবে বলিয়া সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তাহার মূলই নড়িয়া গেল। বোধ হয় অতি সত্বরই একখানি সংশোধিত আইন প্রকাশিত হইবে। তথাস্তু!

সাহিত্য-সংবাদ

‘শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস অমলা’ প্রকাশিত হইল; মূল্য ২৲।

শ্রীমৎ অধরচাঁদ গোস্বামী প্রণীত ‘ভ্রান্তি-যুক্ত-রহস্য’ প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত প্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম-এ, বি-এল প্রণীত নূতন নাটক ‘বিদ্রোহ’ প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৸০।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু প্রণীত নূতন গল্প পুস্তক ‘সোণার হরিণ’ ও ‘রক্তকমল’ প্রকাশিত হইল; মূল্য প্রত্যেকখানি ১৷৴০।

শ্রীমতী লীলা দেবীর এলবম্ ‘কিশলয়’ প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৩৲।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন প্রহসন ‘জোরবরাত’ প্রকাশিত হইল; মূল্য ।৷০।

শ্রীযুক্ত জে চৌধুরী এম-এ প্রণীত ‘আশুস্মৃতি’ মূল্য ০ আনা, ‘তপ্তশ্বাস’ ১৲ ও মণিচোর ৷৵০ বাহির হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার সম্পাদিত এক সহস্র শ্রীমদ্ভগবত গীতা বিতরণ করিতেছেন। যাঁহারা বেদান্তদর্শনের দিক দিয়া গীতার প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্ব অবগত হইতে চাহেন, এবং নিত্য গীতা পাঠ করেন তাঁহারা কলিকাতা ২৮।৩ ঝামাপুকুর লেনে রাজেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে একখানি করিয়া গীতা বিনামূল্যে পাইবেন।

অধ্যাপক শ্রীমান্ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের সম্পাদনে “স্বর্ণময়ী সিরিজ” নামে নূতন এক শ্রেণীর গ্রন্থাবলী বাহির হইতেছে। ইহার প্রথম গ্রন্থ ‘দেশভক্তি বা আত্মোৎসর্গ’ যন্ত্রস্থ হইয়াছে এবং সরস্বতী পূজার দিবস প্রকাশিত হইবে। অধ্যাপক সমাদ্দার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে এই পুস্তকাবলীও যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুখ্যাতি লাভ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য।

আগামী ২৯শে জানুয়ারী ১৯২৫ বাসন্তী পঞ্চমী দিবসে কবিসম্রাট মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মরণার্থ খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরীর উদ্যোগে দশম বার্ষিক “মধু-মিলন” উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখককে একটী রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইবে। বিষয়:—“মধু-স্মৃতি”। কবিতা একশত ছত্রের অধিক হইবে না ও আগামী ১০ই জানুয়ারী ১৯২৫ উক্ত পাঠাগারের সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.

ভারতী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

[Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

ভারতবর্ষ

মাঘ, ১৩৩১

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাদশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

বিদ্যার গৌরব

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

(আধুনিক ও প্রাচীন)

বিদ্যালাভ জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। ইহা উপায় মাত্র। যিনি অর্থ সঞ্চয় করিতে চাহেন, তিনি অর্থনীতি-শাস্ত্র পাঠ করিয়া জানিতে পারেন, কি উপায়ে প্রভূত অর্থাগম হইতে পারে। যিনি পুণ্য সঞ্চয় করিতে চাহেন, তিনি বেদের কর্মকাণ্ড হইতে জানিতে পারিবেন, কি ভাবে যজ্ঞাদি করিলে পুণ্য সঞ্চয় হইবে। এই ভাবে সকল বিদ্যাই কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের সহায়ক বলিয়াই প্রয়োজনীয়।

উপায়ের গৌরব উদ্দেশ্যের গৌরব অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। এজন্য কোন বিদ্যার গৌরব, সেই বিদ্যা যাহার সাধন, তাহার গৌরব অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। যেমন অর্থনীতিবিদ্যার গৌরব অর্থগৌরব অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। আবার সকল বিদ্যার গৌরব সমান নহে। যে বিদ্যার উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ, তাহা স্বভাবতঃই, যে বিদ্যার উদ্দেশ্য অর্থলাভ, তদপেক্ষা অধিক গৌরবের বিষয়। এই ভাবে উদ্দেশ্যের প্রভেদ অনুসারে বিদ্যার গৌরবের তারতম্য হইবে।

কথাগুলি সহজ। কিন্তু এ সকল কথা অনেক সময় সকলের মনে থাকে না। আজকাল বিদ্যার গৌরবের কথা প্রায়ই শোনা যায়,—যেন বিদ্যা মাত্রই আদরণীয়, যেন বিদ্যালাভই জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে—সকল বিদ্যার সমান আদর হওয়া উচিত নহে,—কোন বিদ্যার আদর বেশী হইবে, কোন বিদ্যার আদর কম হইবে। আবার অবস্থা বিশেষে কোন বিদ্যার আদর না করিয়া অনাদর করা উচিত। বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, কোন বিদ্যা লাভ করিয়া কিরূপ ফল হওয়া সম্ভব,

এবং কিরূপ ফল হইতেছে। বিদ্যা চর্চ্চা করিলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞানমাত্রই যে বাঞ্ছনীয় নহে, একটা দৃষ্টান্ত হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। যে ব্যক্তির আত্মসংযম নাই, তাহার পক্ষে সুরা প্রস্তুত করিবার প্রণালীর জ্ঞান বাঞ্ছনীয় নহে। আবার একটি জ্ঞান এক ব্যক্তির পক্ষে অশুভজনক হইলেও, অপর ব্যক্তির পক্ষে শুভজনক হইতে পারে। যিনি চিকিৎসক,—অল্প মাত্রায় সুরা প্রয়োগ করিয়া ব্যাধি নিবারণ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে সুরা প্রস্তুত করিবার জ্ঞান বা বিদ্যা শুভজনক হইবে। ইহাই বিদ্যার অধিকার-ভেদ। একই বিদ্যা অধিকার ভেদে কাহারও পক্ষে শুভ, কাহারও পক্ষে অশুভ হইতে পারে। অধিকারী বিশেষে শুভাশুভ বিদ্যার দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। যেমন, চোরের পক্ষে, কোন্ গৃহস্থের ঘরে কত অর্থ সঞ্চিত আছে, কিরূপে এমন যন্ত্র নির্ম্মাণ করা যায় যাহার দ্বারা দরজায় বা দেয়ালে নিঃশব্দে বৃহৎ ছিদ্র করা যায়, কিংবা লৌহ সিন্দুক ভাঙ্গিতে পারা যায়—এ সকল বিদ্যা অশুভজনক। বিলাসী এবং শক্তিশালী "সভ্য" জাতির পক্ষে, কোথায় কোন দুর্ব্বল জাতি আছে, তাহাদের কি দোষ আছে যাহার ছল ধরিয়া তাহাদের দেশ অধিকার করা যায় এবং বাণিজ্য বিস্তার করিবার সুবিধা পাওয়া যায়,—এই সব বিদ্যা অশুভজনক। চক্রান্তী জমিদারের পক্ষে আইনের জ্ঞান অশুভজনক, যদি সেই আইন-জ্ঞানের সাহায্যে তিনি প্রজার স্বত্ব অন্যায় ভাবে দখল করেন।

মনে হইতে পারে যে, অশুভ বিদ্যার অশুভত্ব অতি সুস্পষ্ট,—দুষ্ট লোক ব্যতীত কেহ অশুভ বিদ্যার চর্চ্চা করিবে না; অতএব এ বিষয়ে সাবধান করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু স্থির ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সকল অশুভ বিদ্যার অশুভত্ব সুস্পষ্ট নহে। স্বার্থপরতা, দীর্ঘকালের সংস্কার বা বিদ্যার আপাতরমণীয় নামের প্রভাবে অনেক সময় আমাদের বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়, তাহার ফলে অনেক সময় অশুভ বস্তুকে অশুভ বলিয়া বোধ হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আজকাল পাশ্চাত্য দেশসমূহে Patriotism বা স্বজাতিপ্রীতি অত্যন্ত আদরণীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু এই স্বজাতিপ্রীতি অনেক সময় পরজাতি বিদ্বেষে পরিণত এবং সেইরূপে অভিব্যক্ত হয়। Patriotism এই আপাতরমণীয় নামের প্রভাবে অনেকে ভুলিয়া যান যে, ইহা সংঘবদ্ধ স্বার্থপরতা মাত্র।(১) দল বদ্ধ স্বার্থপরতার একটা বিপদ আছে, যে বিপদ ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার মধ্যে নাই। কোন ব্যক্তি একা কোন স্বার্থপরতামূলক কার্য্যে লিপ্ত হইলে, সাধারণতঃ তাঁহার এরূপ ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে না যে, তিনি অতি মহৎ কার্য্য করিতেছেন। কারণ, তাঁহার প্রতিবেশীগণ তাঁহার সম্বন্ধে যে মত পোষণ করিবে, তাহার দ্বারা, তাঁহার নিজের এরূপ ভ্রম হইলে, তাহা সংশোধিত হইবে। কিন্তু দেশের সকলে মিলিয়া যদি একটা স্বার্থপরতামূলক কার্য্যে রত হয়, তাহা হইলে সকলেই মনে করিতে পারে যে, তাহারা অতি মহৎ কার্য্য করিতেছে। এক্ষেত্রে কাহারও দ্বারা তাহাদের ভ্রম-সংশোধনের অবকাশ থাকে না। এই ভাবে সকলের পক্ষে আত্ম-প্রবঞ্চনা সম্ভবপর। তখন স্বজাতির স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং অন্য জাতির অনিষ্টসাধনের জন্য বিজ্ঞান (science), ভূগোল (geography), অর্থনীতি (political economy) এই সকল বিদ্যার অপব্যবহার হইতে পারে। তথাকথিত সভ্য জাতিরা দুর্ব্বল জাতির মধ্যে আজকাল যে ভাবে বাণিজ্য বিস্তার করেন, তাহাতে এই সকল বিদ্যার অপব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কলকারখানা, রেল, ষ্টীমার, মোটর প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। Banking, Exchange, Large scale production প্রভৃতির বিষয়ে অর্থনীতির বহু সিদ্ধান্ত এই বাণিজ্য-বিস্তার-ব্যাপারে আবশ্যক হয়। কিন্তু ইহার ফল কি হয়? দুর্ব্বল জাতি প্রাচীন উপায়ে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছিল, সভ্য জাতি

(১) টলষ্টয় বলিয়াছেন—I have several times expressed the thought that in our day the feeling of patriotism is an unnatural, irrational and harmful feeling and a cause of the great part of the ills from which mankind is suffering.

"আমি বহুবার বলিয়াছি যে আজকাল স্বজাতি-প্রীতি সম্বন্ধে সাধারণের মনোভাব অস্বাভাবিক, যুক্তিবিরুদ্ধ এবং অনিষ্ট-জনক। মনুষ্যজাতির অনেক দুঃখকষ্টের কারণ এই স্বজাতিপ্রীতি।"

তদপেক্ষা বহু সুলভে সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করেন। এ কারণে দুর্বল জাতির শিল্পিগণ যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করে, তাহা বিক্রীত হয় না,—জীবিকার অভাবে তাহারা নিরতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত হয়। অনেক স্থলে সভ্য জাতি তাহাদের পণ্য যে দরে বিক্রয় করে, তাহাতে নিজেদেরও লাভ থাকে না। তাহাদের উদ্দেশ্য থাকে যে, কিছু দিন যদি ক্ষতি সহ্য করিয়াও দুর্বল জাতির শিল্প নষ্ট করিতে পারা যায়, তাহা হইলে পরে বিদেশী দ্রব্য না হইলে যখন তাহাদের চলিবে না, তখন মূল্য বাড়াইয়া প্রচুর লাভ করিতে পারা যাইবে। ফলতঃ এইরূপে সভ্য জাতির বাণিজ্য বিস্তারে দুর্বল জাতির সমূহ ক্ষতি হয়। ইহাতে যে বিজ্ঞান এবং অর্থনীতি বিদ্যার প্রয়োগ হয়, তাহা অশুভজনক। সভ্য জাতির যে সকল ব্যক্তি এই সকল বিদ্যার চর্চ্চা করেন, তাঁহারা একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন যে, তাঁহারা জ্ঞানরাজ্যের সীমা বিস্তার করিতেছেন। দেশের লোকেও তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতে পারে, কিন্তু এই বিদ্যা চর্চ্চার ফলে জগতে অশান্তি এবং অসুখের মাত্রাই বেশী হয়।

আজকাল বিদ্যাবলে মানুষ রেল, ষ্টীমার, মোটর, এয়ারোপ্লেন তৈয়ার করিয়াছে, ফটোগ্রাফ, বায়স্কোপ, গ্রামোফোঁ প্রভৃতি কত নূতন কল প্রস্তুত হইতেছে। সত্য। কিন্তু ইহাতে মানুষের হৃদয়ের উন্নতি হইয়াছে কতটুকু? উন্নতি বোধ হয় কিছুই হয় নাই; বরং অবনতি হইয়াছে। একটা বড় কুফল হইয়াছে—আজকাল সভ্যসমাজে লোকে টাকাকে খুব বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে। কারণ, টাকা না হইলে এ সকল কিছুই হয় না; আর এ সকল না হইলে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না। অতএব টাকা চাই। ব্যয়বহুল বিলাসিতা সভ্যজীবনে এত বেশী পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে যে, ইহাতে যে কিছু অন্যায় থাকিতে পারে, অনেকের তাহা মনেই হয় না। মোট কথা আজকাল বিজ্ঞানের যেরূপ চর্চ্চা হইতেছে, তাহাতে সমাজে ভোগ-বিলাসের প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। আমার বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, আধুনিক বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলে মানবসমাজের কোন উপকার হয় নাই। কিন্তু মোটের উপর উপকার অপেক্ষা অপকারই যেন বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ডাক্তারকে রোগীর নিকট লইয়া যাইতে যতগুলি মোটরের ব্যবহার হয়, তদপেক্ষা অনেক বেশী মোটরের ব্যবহার হয় জুয়াড়ীদিগকে ঘোড়-দৌড়ের মাঠে লইয়া যাইতে, থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখিতে, অথবা শুদ্ধ বাবুগিরি করিয়া বেড়াইবার জন্য। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট স্থানে শস্য যোগাইয়া রেলগাড়ী সমাজের যে উপকার করে, তাহার চেয়ে অনেক বেশী অপকার করে কলের তৈয়ারি সস্তা কাপড় গ্রামে গ্রামে বিলাইয়া দরিদ্রের জীবিকা স্বরূপ চরকা এবং তাঁত বন্ধ করিয়া, এবং অনশনক্লিষ্ট দেশ হইতে খাদ্য শস্য রপ্তানি করিবার সুবিধা করিয়া দিয়া। এমন কি, কলের ছাপাখানাতেও যে অপকার অপেক্ষা উপকার বেশী হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ছাপাখানায় যে সকল পুস্তক ছাপা হয়, তাহার মধ্যে কতগুলিতে ধর্ম্ম এবং মানবহৃদয়ের উন্নতিবিধায়ক বিষয় আলোচিত হয়, এবং কতগুলিতে মানবের পশুবৃত্তির উত্তেজক বিষয় থাকে, তাহার সংখ্যা লইলে এ বিষয়ে সত্যনির্ণয় করা যাইবে। (২) বিজ্ঞানের সাহায্যে নানা বিলাসের উপকরণ প্রচলিত হইবার ফলে জমিদারগণ নিজ গ্রাম ছাড়িয়া বড় সহরে আসিয়া বাস করেন, এবং নানাবিধ বিলাসের জন্য প্রজার শোণিততুল্য অর্থ অজস্র পরিমাণে ব্যয় করেন। এদিকে কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতির অভাবে গ্রামবাসিগণ পরিষ্কার জল পান করিতে পারে না। জলের অভাবে কৃষিকার্য্যের ক্ষতি হয় এবং গ্রামে নানাবিধ কঠিন পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়। আধুনিক বিজ্ঞান যেন ধনীর বন্ধু, দরিদ্রের শত্রু। ধনীর বন্ধু এইজন্য যে বিজ্ঞান নানাবিধ কলকারখানার সৃষ্টি করিয়া ধনীর প্রভূত অর্থাগমের বহু নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছে, নানাবিধ বিলাসের সরঞ্জাম যোগাইতেছে; ব্যাধি প্রতিকারের অনেক

(২) মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন :—Formerly the fewest men wrote books that were most valuable. Now any body writes and prints anything he likes and poisons people's minds. (Indian Home Rule)

"পূর্ব্বে অতি অল্প সংখ্যক লোক গ্রন্থরচনা করিতেন এবং সে সকল গ্রন্থ অতি মূল্যবান হইত। আজকাল যে কেহ যাহা ইচ্ছা লিখিয়া ছাপায় এবং লোকের মন বিষাক্ত করে।"

এ বিষয়ে বিখ্যাত লেখক Frederick Harrison এর On the Choice of Books প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। তিনি বলিয়াছেন যে, আজকাল বাজে পুস্তকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। কোন্ পুস্তক পাঠ করিতে হইবে তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিয়া পশ্চাৎ পাঠ করা উচিত। নির্বিচারে যে কোন পুস্তক পাঠ করা অতি কু-অভ্যাস।

বহুমূল্য চিকিৎসার প্রবর্ত্তন করিতেছে; সে সকল চিকিৎসা এত ব্যয়সাধ্য যে দরিদ্রের আয়ত্তের বহির্ভূত। অপর পক্ষে কলের প্রচলন হওয়াতে দরিদ্রের জীবিকার উপায় বন্ধ হইয়াছে, কিম্বা জীবিকার জন্য তাহাকে সম্পূর্ণভাবে ধনীর দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে—ধনীর কলে কাজ না করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের উপায়ান্তর নাই। আধুনিক বিজ্ঞান যুদ্ধ-বিগ্রহের যে সকল মারাত্মক সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার ফলে কেবল যে ভীষণ লোকক্ষয় হইতেছে তাহা নহে, তাহার ফলে ধনী জাতি কর্ত্তৃক দরিদ্র জাতির উপর অত্যাচার করিবার অধিকতর সুযোগও হইয়াছে। এই সকল কারণে বোধ হয় যে, আধুনিক বিজ্ঞান মানব সমাজের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হয় নাই; এবং যাঁহারা বিজ্ঞান-চর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারা যদি মনে করেন যে, তাঁহারা কোন মহৎ কার্য্য করিতেছেন তাহা হইলে তাহা তাঁহাদের বুঝিবার ভ্রম। প্রকৃত কথা বোধ হয় তাহার বিপরীত।

আবার কতকগুলি বিদ্যা আছে, যেগুলিকে নিষ্ফলা বিদ্যা বলা যায়। আজকাল অনেক নিষ্ফলা বিদ্যারও যথেষ্ট আদর দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি, আজকাল বিদ্যার ফলাফল বিচার করা হয় না। বিদ্যা হইলেই তাহার আদর হয়, সে বিদ্যাটি পরাবিদ্যা, অবিদ্যা বা কুবিদ্যা তাহা কেহ দেখে না। একটি নিষ্ফলা বিদ্যার উদাহরণ Pure Mathematics (বিশুদ্ধ গণিত)। অনেক পণ্ডিত সারা জীবন ধরিয়া কেবল অঙ্কই কসিতেছেন। সে অঙ্কে কাহারও কোন উপকার নাই, তাহাতে কাহারও প্রকৃত জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হয় না। Science for science's sake, knowledge for knowledge's sake (বিদ্যার জন্যই বিদ্যা চর্চ্চা) এইরূপ নিষ্ফলা বিদ্যার উদাহরণ। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি জীবনের কি উদ্দেশ্য তাহা ভুলিয়া গিয়া মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে উপায়কে উদ্দেশ্য বলিয়া ভ্রম করেন, পন্থাকেই গন্তব্যস্থান বলিয়া মনে করেন। এইরূপ নিষ্ফলা বিদ্যাকে লক্ষ্য করিয়া টলষ্টয় বলিয়াছেন :—

It (Science) triumphantly tells him: how many million miles it is from the earth to the sun; at what rate light travels through space; how many million vibrations of ether per second are caused by light and how many vibrations of air by sound; etc.

"বিজ্ঞান বহু আড়ম্বরের সহিত প্রচার করে, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব কত লক্ষ ক্রোশ, আলোক আকাশের মধ্যে কিরূপ বেগে ধাবিত হয়, আলোক আকাশে যে তরঙ্গ উৎপাদন করে তাহা প্রতি সেকেণ্ডে কয় লক্ষ বার কম্পন করে, শব্দ বাতাসে যে তরঙ্গ তুলে তাহাই বা কতবার কম্পন করে ইত্যাদি।"

পাশ্চাত্য দেশে যে চিরকাল ফলাফল বিচার না করিয়া বিদ্যামাত্রেরই প্রশংসা করা হইত তাহা নহে। খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রন্থে আছে যে, আদি মানব জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া স্বর্গ-ভ্রষ্ট হইয়াছিল। মনে হইতে পারে, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইলে আদি মানবকে কেন স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হইবে? কিন্তু সকল জ্ঞান ত শুভজনক নহে। যে জ্ঞান শুভজনক, এখানে তাহাকে লক্ষ্য করা হয় নাই। যে জ্ঞান অশুভজনক, এখানে সেরূপ জ্ঞানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য ইতিহাসে যাহা মধ্যযুগ (Mediaeval age) নামে পরিচিত, সে সময় পণ্ডিতগণ ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনাতেই সময় অতিবাহিত করিতেন। এই সময়কার Imitation of Christ নামক উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে যে, উচ্চ ধর্ম্মজীবন যাপনের জন্য যে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া আবশ্যক তাহা নহে, বরং বিবিধ বিদ্যার অত্যধিক চর্চ্চাতে চিত্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পারে,—তাহা আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে বাধাজনক। পাশ্চাত্য দেশে আধুনিক যুগে বিদ্যামাত্রেরই নির্বিচারে প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। টলষ্টয়-প্রমুখ দূরদর্শী মহাত্মগণ ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বুদ্ধিমান পাশ্চাত্য সমালোচকগণ টলষ্টয়কে এক প্রকার প্রতিভা-শালী উন্মাদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে বিবিধ বিদ্যার চর্চ্চা হইয়াছে সত্য। কিন্তু কখনও যে নির্বিচারে বিদ্যা-মাত্রেরই আদর করা হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। প্রাচীন ভারতে সকল বিদ্যার মধ্যে চিরকাল ব্রহ্মবিদ্যাকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং

অর্থাৎ, সকল বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ এবং তাহাতেই ভগবানের প্রকাশ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,

বিদ্যাহিকা? ব্রহ্মগতিপ্রদা যা

যে বিদ্যার ফলে ব্রহ্মলাভ হয়, তাহাই বিদ্যা নামের যোগ্য। অন্য বিদ্যা বিদ্যা নামের যোগ্যই নহে।

এ বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রসিদ্ধ—

তৎকর্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম বিদ্যান্যা শিল্প নৈপুণং॥

তাহাকেই কর্ম বলা যায় যাহা কর্ম্মফলরূপ বন্ধন সৃষ্টি করে না; তাহাকেই বিদ্যা বলা যায় যাহা মুক্তি বা মোক্ষলাভের কারণ। অপর কর্ম কেবলমাত্র ক্লেশই উৎপন্ন করে। অপর বিদ্যা শিল্পনৈপুণ্য ব্যতীত আর কিছু নহে। শিল্প কার্য্যে যেরূপ বুদ্ধি ও কৌশলের প্রয়োগ আছে—এই সকল বিদ্যাচর্চ্চাতে সেইরূপ কেবলমাত্র বুদ্ধি ও কৌশলের ক্রীড়া আছে। তাহারা যখন মানব-মনকে ঈশ্বরাভিমুখে লইয়া যায় না, তখন সে বুদ্ধি ও কৌশল ব্যর্থ বলিতে হইবে।

বিদ্যা শুভ ও অশুভ দুই রকমই আছে, সেই কথাই এতক্ষণ হইল। কিন্তু শুভ বিদ্যারও ঠিকমত চর্চ্চা না করিলে, তাহাতে শুভ ফল না হইয়া অশুভ ফল হইতে পারে। কারণ, বিদ্যাচর্চ্চা এক প্রকার কর্ম। ভাল কর্মও খারাপ করিয়া করিলে তাহাতে মন্দ ফল উৎপন্ন হয়। আসক্তিপূর্বক, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কোন বিদ্যার চর্চ্চা করিলে, তাহার ফলে একটা মোহ উৎপন্ন হইবে। তাহাতে মনের উন্নতি না হইয়া অবনতি হইতে পারে। যদি মনে অহঙ্কার উৎপন্ন হয় বা মন বিলাসোন্মুখ হয়, যদি পরের দুঃখ দেখিয়া হৃদয় বিগলিত না হয়,—তাহা হইলে মনের অবনতি হইয়াছে বলিতে হইবে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, কোন ব্যক্তি বিদ্বান বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উক্তরূপ পরিবর্তন হইয়াছে। এমন হইতে পারে যে, ঠিক ভাবে বিদ্যাচর্চ্চা হয় নাই বলিয়া এই সব কুফল হইয়াছে। কারণ ঠিকভাবে বিদ্যা চর্চ্চা করিলে বিনয়, উদারতা, সহানুভূতি এ সকল সদ্‌গুণাবলি অবশ্য বিকশিত হইবে। আমাদের প্রাচীন কালে, যাহাতে বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া দম্ভ অহঙ্কার প্রভৃতি কুফল উৎপন্ন না হয় এ বিষয়ে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা হইত। এজন্য হিন্দু শাস্ত্রে বিদ্যালাভ বিষয়ে অনেকগুলি বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, যেমন তেমন করিয়া কতকগুলি তথ্যলাভ করিলেই হইবে না। দেখিতে হইবে যে, বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও প্রকৃত উন্নতি লাভ হয়। শান্ত সংযত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে গুরুর নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। চিত্ত হইতে অহঙ্কার সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করিতে হইবে—বোধ হয় এজন্যই ব্রহ্মচারীকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হইত। গুরুকে নিরতিশয় ভক্তি করিতে হইবে। বিলাস ত্যাগ করিতে হইবে। শরীরকে কষ্টসহ করিতে হইবে। এ বিষয়ে মনুসংহিতার নিম্ন লিখিত শ্লোকগুলি প্রণিধানযোগ্য—

ব্রহ্মারম্ভেহবসানে চ পাদৌ গ্রাহ্যৌ গুরোঃ সদা।
সংহত্যহ স্তাবধ্যেয়ং সহি ব্রহ্মাঞ্জলিঃ স্মৃতঃ॥ মনু ২ ৭১

বেদ পাঠের আরম্ভে এবং শেষে গুরুর পাদ বন্দন করিবে। উভয় কর একত্র করিয়া পাঠ করিবে। ইহাকে ব্রহ্মাঞ্জলি কহে।

অগ্নীন্ধনং ভৈক্ষচর্য্যাং অধঃ শয্যাং গুরোহিতং।
আ সমাবর্ত্তনাৎ কুর্য্যাৎ কৃতোপনয়নো দ্বিজঃ॥ ২।১০৮

ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইলে গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন পর্য্যন্ত প্রভাতে ও সায়ংকালে হোম করিবে, ভিক্ষা করিবে, খাটের উপর শুইবে না এবং গুরুর সেবা করিবে।

লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব চ।
আদদীত যতো জ্ঞানং তং পূর্বমভিবাদয়েৎ॥ ২।১১৭

যাহার নিকট লৌকিক, বৈদিক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিবে, তাঁহাকে প্রথমে অভিবাদন করিবে।

সাবিত্রীমাত্র সারোহপি বরং বিপ্রঃ সুযন্ত্রিতঃ।
না যন্ত্রিতস্ত্রি বেদোহপি সর্বাশী সর্বাশী সর্ববিক্রয়ী॥ ২।১১৮

যে ব্রাহ্মণের আচরণ শাস্ত্রানুযায়ী, তিনি যদি কেবলমাত্র গায়ত্রী মন্ত্র জানেন তাহাও ভাল, কিন্তু সকল বেদ পাঠ করিয়াও তিনি যদি নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন বা বিক্রয় করেন, তাহা হইলে ভাল নহে।

বর্জয়েন্মধু মাংসং চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্বাণি প্রাণিনাং চৈব হিংসনং॥ ২।১৭৭

মদ্য, মাংস, গন্ধ, মাল্য, স্ত্রী—এই সকল ভোগ করিবে না।

মিষ্ট দ্রব্য টক হইয়া গেলে আহার করিবে না ; প্রাণিহিংসা করিবে না।

অভ্যঙ্গ সঞ্জনং চাক্ষোরুপানচ্ছত্রধারণং।
কামং ক্রোধং চ লোভং চ নর্ত্তনং গীতবাদনং॥ ২।১৭৮

তৈল মর্দন করিবে না, চক্ষুতে কজ্জলাদি দিবে না, পাদুকা এবং ছাতা ব্যবহার করিবে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, এবং নৃত্য-গীত-বাদ্য বর্জন করিবে।

"একঃ শরীত সর্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎকচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনাস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥ ১৮০

সর্বত্র একাকী শয়ন করিবে, কোথাও শুক্র ফেলিবে না। ইচ্ছাপূর্বক শুক্রপাত করিলে ব্রত ভঙ্গ হয়।

উদকুম্ভং সুমনসো গোলকৃন্মৃত্তিকাকুশান্।
আহরেত্বাবদর্থানি ভৈক্ষ্যং চাহরহশ্চরেৎ॥ ১৮২

গুরুর প্রয়োজন অনুসারে কলসে করিয়া জল আনিবে, এবং পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা এবং কুশ আহরণ করিবে। প্রত্যহ ভিক্ষা করিবে।

শরীরং চৈব বাচং চ বুদ্ধীন্দ্রিয় মনাংসি চ।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেৎ বীক্ষমাণো গুরোর্মুখং॥ ১৯২

দেহ, বাক্য মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এই সকল নিয়মিত করিয়া গুরুর মুখের দিকে চাহিয়া করযোড় করিয়া বসিয়া থাকিবে।

হীনান্নবস্ত্রবেশঃ স্যাৎসর্বদা গুরু সন্নিষ্ঠে।
উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমংচাস্য চরমং চৈব সংবিসেৎ॥ ২।১৯৪

গুরু সমীপে সর্বদা গুরু অপেক্ষা হীন অন্ন বস্ত্র এবং বেশ গ্রহণ করিবে। গুরুর পূর্বে উত্থান করিবে, পরে উপবেশন করিবে।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যা মাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥ ২।২৩৮

শূদ্রের নিকট হইতেও শ্রদ্ধাপূর্বক শুভবিদ্যা গ্রহণ করিবে; চণ্ডালের নিকট হইতেও মোক্ষ লাভের উপায় শিক্ষা করিবে, নিকৃষ্ট কুল হইতেও উত্তম স্ত্রী গ্রহণ করিবে।

এ বিষয়ে মনুসংহিতাতে আরও অনেক শ্লোক আছে। তাহাতে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে সুসংযত ভাবে বিলাস ত্যাগ করিয়া বিনীত চিত্তে অধ্যয়ন করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সকল প্রাচীন আদর্শ আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় না। ছাত্রদের মধ্যে বিলাস এবং স্বেচ্ছাচার ভয়ানক বাড়িয়া গিয়াছে। বোধ হয় আজকাল শিক্ষার বিষয় এবং শিক্ষার প্রণালী উভয়েরই অবনতি হইয়াছে। এজন্য "উচ্চ" শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যেও ঔদ্ধত্য, অসংযম এবং স্বেচ্ছাচার অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্বেষণ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ, বি-এল্

কোথায় পাব, কোথায় যাব, কোন পৃথিবীর শেষে গো,
কোন বিদেশীর দেশে ?
আমি খুঁজে মরি তাই ;
দিবস হল রাত্রি আমার, কোথা-ও যে নাই ও,
কোথা-ও যে নাই।

পুঞ্জ আলোর মধ্যখানে হল আত্মহারা যে,
অন্ধকারের তারা,
যেতে পথ হয়ে যায় ভুল।
ফুটতে গিয়ে হঠাৎ কেন ফুটলো না মুকুল রে,
মল্লিকা-মুকুল ?

দিনের পরে দিন আসে যায়, করে আসি আসি গো,
বাজে বাজে বাঁশী,
তার ফুরালো না সুর।
দিনের শেষে এসে দেখি, দূর হল সুদূর হায়,
দূর হল সুদূর।

যতই বয়ে চলি ব্যথা, বোঝা যে হয় ভারী এ,
বইতে কি আর পারি ?
তবু রইতে নারি, হায় !
পাতার ফাঁকে হয় ত ডাকে ঈষৎ ইসাবার সে,
আকুল ইসারায়।

কোথায় যাব, কোথায় পাব, কোন জনমের শেষে গো
কোন জীবনের দেশে ?
আমি পথের পানে চাই,
কাছেই আছে ? কেই বা জানে ? হয় ত দূরেও নাই গো,
হয় ত কোথাও নাই।

রাজগী !

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল

নরেন্দ্রবাবুর কাছে উপদেশ লইয়া আমি আবার পড়াশুনা আরম্ভ করিলাম। আর কলেজে ভর্ত্তি হইলাম না। কেবল বই কিনিয়া বাড়ীতে পড়িতাম; মাঝে মাঝে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে যাইতাম, আর রোজ একবার নরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে গিয়া আলাপ করিতাম।

আমার জীবনের একটা নূতন পরিচ্ছেদ খুলিয়া গেল। আমার পূর্ব্বের জ্ঞান পিপাসা আবার ফিরিয়া আসিল। জীবনে খুঁজিবার মত এত বড় একটা জিনিসের সন্ধান পাইলাম যে, মনে হইল যে, ইহার অনুসন্ধানেই জীবন শেষ করিয়া দিব। আমার জ্ঞান ও বিদ্যা খুব দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিল।

প্রথমে মনে ভাবিয়াছিলাম, বুঝি আমার মুক্তি হইয়া গেল, বুঝি আমি আমার জীবন সত্য-সত্যই সার্থক করিয়া তুলিব জীবনব্যাপী জ্ঞানের সাধনার দ্বারা। কিন্তু যে বিষবৃক্ষ আমি নিজ হাতে বুকের ভিতর রোপণ করিয়াছিলাম, তাহা এত সহজে মরিবার নহে। মাঝে মাঝে তার শুকনো ডালপালার ভিতর নূতন জীবনের সঞ্চার দেখা যাইত। হঠাৎ মাঝে মাঝে সে বিষ আমার রক্তের ভিতর বিষম নেশা লাগাইয়া দিত।

আমি ঠিক যেন দুইটি স্বতন্ত্র মানুষ হইয়া গেলাম। এক আমি দিনের পর দিন রাতের পর রাত একাগ্র নিষ্ঠার সহিত বইয়ের পর বই পড়িয়া যাইতাম, গবেষণার নেশায় আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইতাম। আবার এক দিন হয় তো হঠাৎ সমস্ত বই বিস্বাদ হইয়া উঠিত, আমি উন্মনা হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতাম—তখন হয় তো মাসাবধিকাল মদ ও বেশ্যায় মগ্ন হইয়া কাটাইয়া দিতাম।

এমনি করিয়া আলো-ছায়ার ভিতর দিয়া আমার জীবনের দিনগুলি কাটিতে লাগিল। নিজের ভিতর এই যে দারুণ বিরোধ, ইহার সমন্বয় করিতে আমি পারিলাম না,—আমার আত্মাকে আমার দেহের অধিপতি করিতে পারিলাম না।

নরেন্দ্রবাবুর কাছে আমি সব কথা খুলিয়া না বলিলেও, তিনি বোধ হয় আমার গোপন গতিবিধির কথা টের পাইতেন। মাঝে মাঝে আমার গবেষণা মধ্যপথে ফেলিয়া রাখিয়া আমি যে কোথায় উধাও হইতাম, তাহা তিনি যে একেবারে আন্দাজ না করিতেন তাহা নয়।

এক দিন তিনি বলিলেন, "দ্বিজেশ, I envy you your opportunities."

আমি একটু ভাবিয়া বলিলাম, "হাঁ, opportunity for good and evil! দাদা, আপনি আমার কি নিয়ে হিংসা ক'রবেন, আমার কি আছে। আমি পেতাম যদি আপনার আত্মা, তবে আমার সব সম্পদ বিলিয়ে দিতাম।"

"বেশ, তবে দাও না তাই।" দিব্য শান্ত ভাবে কথাটা বলিয়া তিনি মৃদু হাসিয়া আমার দিকে চাহিলেন।

কথাটা মোটেই ঠাট্টা করিয়া তিনি বলেন নাই, ওই কৌতুকের হাসির তলায় অনেকখানি দৃঢ়তা ছিল, ঐ দৃষ্টির ভিতর অনেকখানি আশা ছিল।

এত বড় একটা কথার আলোচনা করিতেও আমার ভয় করিতে লাগিল। কথাটায় আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। দাদার মুখের সব কথা যেন আমার কাছে বেদ-বাক্যের মত লাগিত; তাই আমি ভয় খাইয়া গেলাম। কিছু বলিলাম না।

দাদা বলিলেন, "আমার মনটা চাও, আমার আত্মা চাও, সে তোমার আছে। আমার চেয়ে বড় জিনিস তোমার ভিতর আছে। তোমার আত্মা কেবল পাষাণী অহল্যার মত আত্মবিস্মৃত হ'য়ে আছে। একে জাগিয়ে জিইয়ে তুলতে হ'লে, কেবল একটা প্রকাণ্ড moral explosion দরকার। তুমি যদি তোমার সমস্ত সম্পত্তি দেশকে বিলিয়ে দিয়ে আপনাকে ফকীর করে দিতে পার তবেই তোমার আত্মার রুদ্ধ স্রোতস্বতী প্রচণ্ড বেগে ছুটে বেরুবে, আর কিছুতেই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ছেলেবেলা থেকে তুমি ভোগের ভিতর মানুষ হ'য়েছ, ত্যাগ কাকে বলে জান না; চিরদিন সেবা পেয়ে এসেছ, সেবা ক'রতে কোনও দিন শেখনি; তাই তোমার আত্মার একদিককার জানালা একদম বন্ধ হ'য়ে র'যেছে, সে জানালা খুলতে হ'লে চাই একটা মস্ত বড় ত্যাগ।"

আমার সমস্ত চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল দাদার এই কথায়। আমার ভিতর কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিল—আমার সমস্ত অন্তর আলোকে উজ্জ্বল হইয়া গেল, কিন্তু যেন পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। আমার মনে হইল, আমি সত্যই বুঝি মহান, বৃহৎ আত্মা। মন আমাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল সেই বিরাট ত্যাগ করিতে, যাহাতে আমার সকল সত্তা সার্থক হইয়া পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিবে! আমার মনটা আবেগে এত ভরিয়া উঠিল যে, আমি কথা বলিতে পারিলাম না।

কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম, "আপনি কি ব'লছেন দাদা? সম্পত্তি বিলিয়ে দেব কেমন করে? সম্পত্তিতে আমার কতটুকু অধিকার? আমার পিতৃ-পিতামহেরা সম্পত্তি করে' রেখে গেছেন, তাঁদের বংশের চিরদিনকার সংস্থানের জন্য। নৈতিক হিসাবে আমি সে সম্পত্তির সাময়িক ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বই তো নয়? সমস্ত পরিবার, সমস্ত ভবিষ্যদ্বংশ এর উপর নির্ভর ক'রছে; আমি এটা দান ক'রলে কেবল তো আমার নিজের সম্পদ দেওয়া হবে না, সব বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কুটুম্বের সর্ব্বনাশ করা হবে।"

বাসুদেব শাস্ত্রী আমাকে সংস্কৃত পড়াইতেন। তিনি পাশেই বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, "ঠিক কথা, এই তো হিন্দুর ছেলের কথা! নরেন্দ্র বাবু, আপনাদের ইংরাজী আইন ব'লছে যে, দায়ভাগ মতে হিন্দু পৈতৃক সম্পত্তির যথেচ্ছ বিনিয়োগ করিতে পারে। হ'তে পারে এই এখন 'আইন, কিন্তু এ তো ধর্ম্ম নয়। আমাদের আইন ও ধর্ম্ম তো আলাদা নয়! আমাদের শাস্ত্রে বলে গেছে—

"যে জাতা যেঽপ্যজাতা যে চ গর্ভে ব্যবস্থিতা
বৃত্তিং তে অভিকাঙ্ক্ষন্তি ন দানং ন চ বিক্রয়ঃ॥

জীমূতবাহন কুত্রাপি বলেন নি যে, ধনী তার পৈতৃক ধন যথেচ্ছ বিনিয়োগ করে কুটুম্বের বৃত্তি ধ্বংস ক'রতে পারে।"

নরেশ বাবু বলিলেন, "ঠিক এমনি তত্ত্বকথা লোকে বলতো feudal timesএ। মধ্য যুগে ইয়োরোপের সর্ব্বত্র এই বিশ্বাস অল্প-বিস্তর বদ্ধমূল ছিল; তাই ভূসম্পত্তির দান-বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এটা অতি পুরাতন হেত্বাভাষ, শাস্ত্রী ম'শায়। সমাজতত্ব এখন ঠিক সেই পুরাতনের গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আপনি শুনলে হয় তো অবাক হ'য়ে যাবেন যে, আপনি যে ভূসম্পত্তির ধর্ম্মের উপদেশ গাঁথছেন, সেই ভূসম্পত্তি জিনিসটাকেই লোকে এখন একটা প্রকাণ্ড অন্যায় ব'লে মনে করে। Proudhon ব'লেছেন, সম্পত্তি মাত্রই দস্যুতা। যা আমার আছে তার থেকে অপরে বঞ্চিত হ'বে, এই ধারণাটাই property, আর এটা সম্পূর্ণ অবৈধ ধারণা, এ কথা Proudhon বলেন।' আমি সে কথা স্বীকার করি না, এখনকার অনেক পণ্ডিতও সে কথা স্বীকার করেন না। কিন্তু এ বিষয়ে আজকালকার উন্নতিশীল সমাজতত্ত্ববিৎ অনেকেই স্বীকার করেন যে, ভূসম্পত্তি জিনিসটা সমাজের

হিতবিরুদ্ধ। বাতাসে, সূর্য্যালোকে, গঙ্গার জলে যদি আপনার আমার স্বতন্ত্র property না থাকে, তবে মাটিতেই বা থাকবে কেন ?”

শাস্ত্রী মহাশয় একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি ভীষণ তর্ক জুড়িয়া দিলেন। আমার এসব মতামত অনেকটা জানা ছিল, তাই আমি অবাকও হইলাম না, খুব বেশী তর্কও করিলাম না। কিন্তু কথাটা স্বীকারও করিলাম না।

পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে তর্ক হইতে নিবৃত্ত হইয়া নরেন বাবু আমাকে বলিলেন, “দেখতে পাচ্ছ না ভাই তুমি, যে, তোমার ভূসম্পত্তিটা কত বড় প্রকাণ্ড অন্যায় অত্যাচার। মাটি আছে, তা’ তুমি তৈয়ার করনি, সে দিয়েছেন ভগবান। চাষা তাকে চাষ করে সোণার ফসল তুলছে। তোমার ভূসম্পত্তির মানে হ’চ্ছে এই যে, তুমি সেই দাবী নিয়ে চাষার কষ্টের ধনে ভাগ বসাতে যাবে। কেন? কি তুমি ক’রেছ তার? State সবার কাছে আয়ের একটা অংশ দাবী ক’রতে পারে, কেন না, গভর্ণমেণ্ট সে অর্থ সাধারণের হিতার্থ ব্যয় করবে,—শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ক’রে সেই ব্যবস্থা ক’রবে যাতে করে’ প্রত্যেকে নিজ নিজ শ্রমের ফল ভোগ ক’রতে পারে। কিন্তু তুমি জমীদার, তোমার কিসের দাবী? তুমি তো কিছু কর না।”

অনেকক্ষণ তর্ক করিয়া আমি স্বীকার করিলাম যে, একটা অবস্থানিরপেক্ষ abstract সত্য হিসাবে এ কথা মানিতে হয়। সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িবার ভার যদি আমাদের থাকিত, তাহা হইলে হয় তো আমরা ভূমিকে সাধারণ সম্পত্তি করিয়া তাহার ভিত্তির উপর সমাজ গঠন করিতাম। কিন্তু আমি বলিলাম, “সমাজ তো প্লাষ্টিসিনের পুতুল নয় দাদা, যে, যখন-তখন ভেঙ্গে চুরে যেমন ক’রে ইচ্ছা তেমনি গড়ে ফেলতে পারি। আপনিই তো ব’লেছেন যে, ইতিহাস হ’চ্ছে সমাজের জীবন। সে ইতিহাস অস্বীকার করে, সমাজ ভাঙ্গতে গড়তে চেষ্টা করা পাগলামি। এই যে আমাদের land systemএর উপর আমাদের সমস্ত সমাজ গড়ে উঠেছে, ভয়ানক জটিল সব বন্ধন তৈরী হ’য়েছে,—একে এখন হঠাৎ অস্বীকার ক’রলে সমস্ত সমাজ যে চুরমার হ’য়ে প’ড়বে। এই ধরুন না কেন, আমাদের সমস্ত ভদ্রলোক, যাঁরা আমাদের intelligentia, যাঁদের অস্তিত্বের উপর সমাজের সব উন্নতি নির্ভর ক’রছে, তাঁদের পোনেরো আনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নির্ভর ক’রছে এই ভূসম্পত্তির উপর। ভূসম্পত্তির বৃত্তি দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিপালিত হ’চ্ছে।”

দাদা বলিলেন, “এর চেয়ে tragic আর কিছু ভাবতে পার কি দ্বিজেশ? এই যে লক্ষ লক্ষ ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা এঁরা দিনের পর দিন কেবল vegetate ক’রে দিন কাটাচ্ছেন, জৈব ক্রিয়া সম্পাদন ছাড়া সমাজের আর কিছু হিত সাধন ক’রছেন না। অথচ চাষা বারো মাস মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই জমীদার, মহাজন, ব্যবসায়ী প্রভৃতির পেট ভরাবার জন্য আবাদ ক’রছে! আট দশ হাত জলের তলায় সারাদিন ডুব মেরে মেরে পাট কাটছে! এত বড় একটা প্রচণ্ড অন্যায়ের উপর আমাদের সমাজ চলছে!”

আমি বলিলাম, “হ’ক tragedy, হ’ক অন্যায়, কিন্তু আমাদের এই অন্যায়ের উপর বহু কাল থেকে সমাজ এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যে, একে যদি ভাঙ্গতে চান তবে সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে প’ড়বে সমস্ত ভদ্রলোক-সমাজ, যারা সমাজের intellectuals, যারা থাকাতে সমাজের ক্রমোন্নতি হ’বে। প্রজারই কি তা’তে সুখ বৃদ্ধি হ’বে? রাজশক্তি ও প্রজার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে এই ভদ্রলোক-সমাজ। এটা ভেঙ্গে পড়লে রাজশক্তির সমস্ত প্রকোপ ও বন্ধন প্রজাকে পীড়িত নিস্পেষিত ক’রবার সম্ভাবনা খুব বেশী নেই কি?”

“তোমার কথা ষোল আনা স্বীকার না ক’রলেও মোটামুটি আমি মানি। যত বড়ই অন্যায় হ’ক, যত প্রকাণ্ড tragedy হউক, এই ব্যাপারটা সত্য, এর পিছনে একটা লম্বা ইতিহাস আছে। এটা যদি আজ হঠাৎ ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া যায়, তবে সমস্ত সমাজে এমন একটা ওলট-পালট হ’য়ে যাবে, এত বড় একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব ঘটে যাবে, যার ফল ভাল হ’বে কি মন্দ হবে বলা কঠিন। ভাল যে না হ’তে পারে তা’ নয়, তবে মন্দও খুব হ’তে পারে। Revolution মাত্রই অল্প বিস্তর জুয়া খেলা। সমাজের সব ব্যাধিরই প্রায় এই দশা—অর্থাৎ কি না যেগুলো সমাজের ভিতর শিকড় গেড়ে বসে’ গেছে। ধর না জাতিভেদ। আমার রসুয়ে বামুন যে

ভূপেন বোসের মাথায় পা তুলে দেবার যোগ্য নয়, এ কথা কে না স্বীকার ক'রবে। যদি জাতিভেদ মানে সুধু এইটুকু হ'ত তবে তাকে ভেঙ্গে চুরমার ক'রতে কিছুই ঠেকতো না। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, এই ভেদটা আমাদের সমাজের সমস্ত জীবনকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরে র'য়েছে যে, হঠাৎ এটা ভাঙ্গতে গেলে সমাজ চুরমার হ'য়ে গিয়ে আবার তার নূতন করে গড়ে উঠতে হবে। জাতিভেদ মানবো না অথচ হিন্দু থাকবো, এ প্রায় হওয়াই অসম্ভব। আর কোথাও যদি না ঠেকি, তো বিয়ের বেলায় গিয়ে ঠেকতে হবে।

"তেমনি মহাজনি। মহাজনেরা সুদের উপলক্ষ করে' যে গরীবের সর্ব্বনাশ রোজ ক'রছে তা তো চক্ষের উপর দেখতে পাচ্ছি। তারা যে সমাজের একটা দুষ্ট ক্ষত, সে বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে যদি তাদের হঠাৎ আইন করে উঠিয়ে দেওয়া যায়, কিম্বা যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যাতে করে' হয় তো মহাজন আর সুদে টাকা লাগান লাভজনক মনে ক'রবে না, তবে কি সর্ব্বনাশ হ'বে ভেবে দেখ দেখি। যতই মন্দ ও অনিষ্টকর হোক না, এই মহাজনেরাই আমাদের দেশের সমাজে একমাত্র credit গড়ে রেখেছে। মহাজনের নিপাত মানে creditএর নিপাত। তাতে করে' সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি শিল্প সব ওলট পালট হ'য়ে যাবে। সমাজের ব্যাধি নির্ণয় করা সোজা, তার প্রতিকার করা ঠিক তত সোজা নয়।"

"আমিও তো তাই বলছিলাম। তা' ছাড়া আমাদের land systemকে আমি একটা নিছক ব্যাধি ব'লে স্বীকার ক'রতেও রাজী নই। সমাজের পক্ষে একটা স্বাধীন বুদ্ধিমান intellectual শ্রেণীর যদি প্রয়োজন থাকে, তবে যে ব্যবস্থার দ্বারা তাদের কষ্টসাধ্য পরিশ্রম থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের সমাজের অভিভাবক বা guardian স্বরূপ কাজ ক'রা সম্ভব হ'বে, সেটা নিশ্চয়ই দরকার। আমি আমাদের land systemকে সেই রকম intellectualদের একটা বৃত্তি স্বরূপ মনে করি।"

নরেনবাবু। বৃত্তিই যদি দিতে হয়, তবে সে বৃত্তিরূপে দেওয়াই ভাল। এ ব্যবস্থায় কেবল intellectualরাই বৃত্তি পায় না, কেবল সমাজের guardianরা পুষ্ট হয় না। যাদের পোষণ করবার দরকার আছে, তাদের এক-এক জনের সঙ্গে নিরানব্বইজন সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য অপদার্থ পরিপুষ্ট হয়। তা' ছাড়া, আমি এ কথা স্বীকার করি না যে, সমাজের হিতার্থ intellectual নামক একটা অকর্ম্মণ্য বংশ পুষতেই হ'বে। কোদাল দিয়ে মাটি কোপালে বা মাকু ঠেলে কাপড় বুনলে intellectuality নষ্ট হ'বে, আর grip dumb bell দিয়ে exercise ক'রলে তা' পুষ্ট হ'বে, এ আমার বিশ্বাস নয়। সমাজের আদর্শ ব্যবস্থায় intellectual ব'লে একটা স্বতন্ত্র জাতের কোনও প্রয়োজন আছে বলে স্বীকার করি না। তবে এখন বর্ত্তমান অবস্থায় আছে মানি।"

তার পর যেন অনেকটা আবিষ্ট ভাবে নরেনবাবু বলিয়া গেলেন, "এইটাই দেখি সমাজের কোনও সংস্কারের পক্ষে একটা মস্ত বালাই। কোনও একটা কিছু ধরতে গেলেই দেখতে পাই, সেটা আলাদা কিছু নয়,—সমস্ত সমাজের জীবন তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সেটাকে নাড়া দিতে গেলে, এতগুলো জিনিস নাড়া দিতে হ'বে, এত সব বিধি-ব্যবস্থা গড়তে হ'বে যে, তা' ভেবে ওঠা যায় না। এ একটা জটিল গোলকধাঁধা,—এর কোথায় যে আরম্ভ ক'রতে হ'বে, আর কোথায় গিয়ে শেষ ক'রতে হবে, তা' ঠিক করা একটা ভারি কঠিন সমস্যা। তাই এক এক সময় মনে হয় যে, সমাজের সংস্কার সেই দিনই হবে, যেদিন আলেকজাণ্ডারের মত কোনও বীর এসে এ জটিল গ্রন্থি কেটে সাফ করে দেবেন। সমস্ত ভেঙ্গে চুরে একেবারে নূতন করে না গড়তে পারলে বুঝি এর কোনও উপায় হ'বে না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তবু ত' আপনি, আমাদের সমাজের ভিত্তি-স্বরূপ যে ভূমির স্বত্ব, সেটা ভেঙ্গে দিতে চান।"

"কই না, আমি তো তা' তোমায় ভাঙ্গতে বলি নি। আমি তা' ভাঙ্গতে চাই, কিন্তু আস্তে আস্তে। এমন কোনও একটা প্রণালী চাই, যাতে ক'রে ভূম্যধিকারবাদ ক্রমশঃ উঠে যাবে,—যে ভূমির ব্যবহার ক'রবে, তারই তাতে অধিকার হ'বে। সেটা হওয়া দরকার এত আস্তে যে, সমাজের কেউ যেন সেটায় গুরুতর আঘাত না পায়। কিন্তু আমি তো তোমাকে সে system ভাঙ্গতে বলি নি;

আমি ব'লেছি, তোমাকে ব্যক্তিগত ভাবে ত্যাগ ক'রতে। তোমার সম্পত্তি তুমি এমন ভাবে ব্যবস্থা করে' দেও, যাতে যে কৃষক তারই ভূমিতে সম্পূর্ণ অধিকার জন্মায়। সে অধিকার তোমার আছে, সে ত্যাগ তুমি ক'রতে পার। আর যদি তুমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে কর যে, এই systemটা খারাপ, শেষ পর্য্যন্ত এটা ধ্বংস হওয়া দরকার, তবে তুমি সে ধ্বংসের চেষ্টা না ক'রলেও, ব্যক্তিগত ভাবে এই অনিষ্টকারী পাপ ব্যবস্থার সুযোগ না নিয়েও তো থাকতে পার। এখানে আর কোনও প্রশ্ন নেই,—প্রশ্ন এই যে, তুমি একটা প্রকাণ্ড স্বার্থত্যাগ করে কেবল নিজের পরিশ্রমের উপর নিজের জীবিকার জন্য নির্ভর ক'রবে কি না ?"

আমি। "না দাদা, কথাটা অত সোজা নয়। আমার একার কথা যদি হ'ত, তবে কোনও কথা ছিল না। কিন্তু আমার পোষ্য শ' খানেক লোক, তারা প্রত্যক্ষ ভাবে আমার সম্পত্তির দ্বারা পুষ্ট হ'চ্ছে। তা' ছাড়া, পরোক্ষ ভাবে অনেক লোক পুষ্ট হ'চ্ছে। তা ছাড়া, আমার সম্পত্তির আয় হ'তে সাত-আটটা স্কুল চলছে, একটা হাসপাতাল ও পাচটা ছোট ছোট ডিস্পেন্সারী চলে। লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা-পূজা হয়, তাতে বৎসরে ছয়টা মহোৎসব হয়। সমস্ত দেশের দুঃখী কাঙ্গালী আমার কাছে ভিক্ষা পায়, বহু ব্রাহ্মণ বৃত্তি পায়। নবাবগঞ্জের রাজবাড়ী কেবল আমি নই দাদা, এর সঙ্গে ও অঞ্চলের সমস্ত জড়িত র'য়েছে। আজ যদি আমার রাজগী উড়ে যায়, তার ধাক্কা হাজার হাজার লোকের গায়ে লাগবে।"

নরেনবাবু মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "এ সব যুক্তি তোমার Brainএর। কিন্তু এর তলায় এ সবের আসল ভিত্তি যদি খোঁজ, সে হ'চ্ছে তোমার স্বার্থ! তুমি তোমার সুবিধা সুযোগ ছাড়তে রাজী নও। নইলে সম্পত্তির এমন ব্যবস্থা করা কিছু অসম্ভব নয়, যাতে লোক-হিতকর অনুষ্ঠানগুলি সব বজায় থাকতে পারে। অথচ তুমি একটা প্রকাণ্ড ত্যাগ করে' কেবল যে সমস্ত দেশের সম্মান লাভ ক'রতে পার তা নয়,—এক দিকে তোমার নিজের, আর এক দিকে তোমার দেশের একটা প্রকাণ্ড উপকার ক'রতে পার। তোমার নিজের উপকার হ'বে, কেন না, এই প্রকাণ্ড ত্যাগে তোমার আত্মার উপর জমাটবাঁধা সাড়াশূন্যতার বাধা ভেঙ্গে গিয়ে, তোমার স্বাধীন সত্তা দুই কুল ছাপিয়ে বের হ'বে; তাতে তুমি এত বড়, এত মহান্ হ'য়ে যাবে যে, তখন আর তোমার এ ত্যাগকে ত্যাগ বলে মনে হবে না। দেশের তুমি একটা মস্ত উপকার করবে, কেন না, তোমার প্রকাণ্ড জমীদারীর ব্যবস্থায় একটা প্রকাণ্ড সামাজিক পরীক্ষা হ'য়ে যাবে। সে পরীক্ষায় আমাদের সব থিওরী কার্য্যকরী বলে প্রমাণ হ'য়ে যাবে। আর তার পর দেশের সমস্ত লোক আগ্রহের সঙ্গে এই পরিবর্ত্তন কামনা ক'রবে। যে সমস্যার সমাধান এখন অসম্ভব মনে হ'চ্ছে, তা' তখন সম্ভব হ'বে। তাই ব'লছিলাম, তোমার যে মস্ত সুযোগ আছে একটা প্রকাণ্ড কাজ ক'রবার, তার জন্য তোমাকে হিংসা ক'রতে ইচ্ছা করে।"

আমার মন টলমল করিয়া উঠিল। নরেনবাবুর কথা আমার উপর চিরদিনই একটা অলৌকিক শক্তি বিস্তার করে,—আজ যেন তাঁর এ স্বপ্ন আমাকে মুগ্ধ করিতে চাহিল। আমার মনের এমন অবস্থা হইল—যেন আমি একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের ধারে আসিয়া পড়িয়াছি, আর এক ধাক্কায় নীচে অতলস্পর্শ সাগরে পড়িয়া যাইব,—অথচ মনটা মন্ত্রের মত সেই দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছে। আমার বড় ভয় হইল। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

নরেনবাবুও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের কথাবার্ত্তার মধ্য পথে গোটা দুই হাই তুলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। আমরা দুইজনে নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলাম।

অনেকক্ষণ পরে নরেনবাবু বলিলেন, "তোমাকে দোষ দিতে পারি না দ্বিজেশ। আমি বলছিলাম, তোমার স্বার্থ তোমায় ঠেকিয়ে রাখছে। সেটা ভুল ব'লেছি, ঠিক স্বার্থ নয়, এ একটা ভাবগ্রন্থি—একটা complex; একে মনের নিশ্চলতা—mental inertia বলা যেতে পারে। ভেবে দেখতে গেলে, জিনিসটা মোটেই খারাপ নয়। এটা আছে ব'লেই মানুষ টি'কে আছে। মনের এই স্থিতিস্থাপকতা না থাকলে, আমি হয় তো আজ প্রফেসারী না করে' সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে প'ড়তাম। তাতে ভাল যে হ'তই, তা' জোর করে ব'লতে পারি না।"

নরেনবাবুর এ কথাটা ঠিক তাঁর যোগ্য। তাঁর মনটা এমন পরিষ্কার, সমস্ত সমস্যার সম্বন্ধে তিনি এমন আশ্চর্য্য ক্ষমতার সহিত আলোচনা করেন, তার সমস্ত দিক এমন তন্নতন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে ও দেখাইতে পারেন যে, এ বিষয়ে তাঁর তুল্য লোক আর নাই। কিন্তু তাঁর বুদ্ধি এত পরিষ্কার বলিয়াই তিনি কর্ম্মী কোনও দিন হইতে পারিলেন না। তাঁর চেয়ে যারা ঢের কম বোঝে, সৎকার্য্যে উৎসাহ তাঁর চেয়ে যাদের অনেক কম, এমন বহু বহু লোক কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া অনেক কাজ করিয়া গিয়াছে, দেশের সেবকবৃন্দের মধ্যে আপনাদের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখাইয়া গিয়াছে। তাদের চেয়ে নরেনবাবুর অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি অনেক বেশী ছিল, সব কাজের ভালর সঙ্গে মন্দটা এত বেশী স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইতেন বলিয়াই, তিনি তাদের মত একাগ্র চিত্তে কাজে নামিতে পারিতেন না, পদে পদে সন্দেহ আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিত। তাই বর্ত্তমান যুগের ভাবুক হইয়াও নরেন্দ্র বাবু কর্ম্মী হইতে পারিলেন না।

(১৬)

নরেনবাবু উঠিয়া গেলেন—তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ঝড়ের মুখে নৌকার মত আমার মনটা ভীষণ দোল খাইতে লাগিল ; আমি মাতালের মত অস্থির চিত্তে ভাবিতে লাগিলাম।

কি প্রকাণ্ড এ আদর্শ! কত মহৎ এ কাজ! এত বড় একটা কাজ করিতে ভয়ানক লোভ হইল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে একটা একটা করিয়া বাধা চিন্তার দুয়ারে আসিয়া ভয়ানক গোলযোগ বাধাইতে লাগিল। তাই দোল খাইতে লাগিল আমার চিত্ত। আবার মনে হইল সাবিত্রীর কথা, রাণীমার কথা। মনটা ক্ষেপিয়া উঠিল—কেন করিব না ত্যাগ? এদের জন্য? এদের পথে বসাইবার ভয়? এরা আমার জন্য কবে কি করিয়াছে? কবে কি ভাবিয়াছে? বরং এরাই তো আমার জীবনটাকে মরুভূমি করিয়া ফেলিয়াছে!

হাঁ, আমার জীবন মরুভূমি—তার জন্য সাবিত্রী দায়ী, রাণীমা দায়ী, নবাবগঞ্জের রাজবাড়ী দায়ী,—সবাই দায়ী। যদি আমি রাজপুত্র না হইতাম,—গরীবের ছেলে হইলে আমার এত অধঃপতন হইতে পারিত না। আমি হয় তো মানুষ হইতে পারিতাম। গরীব হইলে হয় তো স্ত্রী স্নেহময়ী হইত—বিধুর মত।

বিধুর কথায় চিন্তার ধারা আর এক দিকে গেল। তন্নতন্ন করিয়া আমার অতীত জীবন আমি সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম। আমার জীবনের প্রত্যেকটি অপরাধ জ্বালাময় অক্ষরে আমার অন্তরে ফুটিয়া উঠিল—কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, কত লোককে নষ্ট করিয়াছি, সতী নারীর ধর্ম্মনাশ করিয়াছি, দুর্ব্বল চিত্তকে কলঙ্কের পথে টানিয়া নামাইয়াছি—আমার অন্ধকারময় অতীতের সব কথা মনে হইল। বিধুর প্রতি কি নৃশংস কৃতঘ্নতা করিয়াছি, আমার নিজের পুত্রকে অনশনে বিনা চিকিৎসায় মরিতে দিয়াছি—ওঃ, আমার পাপের যে অন্ত নাই!

মাথার ভিতর আগুন জ্বলিতে লাগিল, দম—ফাটিবার মত হইল। আমি বেয়ারাকে পেগ দিতে বলিলাম। সে পেগ ঢালিয়া দিয়া হুইস্কীর বোতলটা হাতের গোড়ায় রাখিয়া গেল। আমি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে পেগের পর পেগ নিঃশেষ করিতে লাগিলাম,—বেয়ারা সোডা ঢালিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে আমার এক পুরাতন মোসাহেব ও দালাল আসিয়া জুটিল। তার নাম অমৃত। সেও সঙ্গে সঙ্গে মদ খাইতে লাগিল। তখন আমার নেশাটা বেশ চাপিয়া আসিয়াছে,—আমি সম্পূর্ণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি। সে সংবাদ দিল, "সে বেটীকে হাত ক'রেছি।"

অনেক দিন হইল একটি ভদ্র ঘরের বধূর উপর আমার নজর পড়িয়াছিল। এই পাপিষ্ঠের কাছে এক দিন সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিয়াছিলাম। হতভাগ্য তার পর হইতে তাহার পিছনে লাগিয়া তাহাকে হস্তগত করিয়াছে।

আমি নাচিয়া উঠিলাম, বলিলাম, "কোথায় সে?"

"বোটে।"

"চল বোটে" বলিয়া আমি উঠিলাম। তার পর অমৃতের সঙ্গে ভাসিয়া পড়িলাম। এক মাসের মধ্যে আর বাড়ী-মুখো হইলাম না।

এক মাস পরে এক দিন হঠাৎ আমার নেশা কাটিয়া গেল। আমি বাড়ী আসিলাম, আসিবার সময় অমৃতকে গোপনে বলিয়া আসিলাম, "একে বিদায় কর।"

সে নারীর কোনও দোষ ছিল না। আমি তার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম; কেন না, হঠাৎ আমার আবার এই ঘৃণ্য জীবনের উপর বৈরাগ্য ধরিয়া গিয়াছিল।

পরে অমৃত আসিয়া খবর দিল, মেয়েটা ভয়ানক কান্নাকাটি করিতেছে, সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়, মাথা খুঁড়িয়া ঘা করিয়াছে; কিছুতেই সে বোট হইতে নড়িবে না। টাকাকড়িতে কিছু হইবে মনে হয় না। আমি ভারি বিরক্ত হইলাম। মনে ভাবিলাম যে, বোটে গিয়া মাগীকে দু'কথা শুনাইয়া দিয়া আসি।

অমৃত একটা উপায় বলিল। সধবা নারী লইয়া এ সব কারবারে ফৌজদারীর হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা। এ স্থলে যদি স্ত্রীটিকে স্বামীর কাছে ফিরাইয়া দেওয়া যায়, তবে হাজার পাঁচ সাত, বড় জোর দশ হাজার টাকা হইলে, হয় তো মিন্সেকে মানাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তা' করিলে কোনও গোল থাকে না। তা' ছাড়া, এ মেয়েকে সোণাগাছিতে লওয়া যাইবে না। লইতে গেলে পথে এমন একটা হাঙ্গামা বাধাইবে যে, তাহা হইতে ছাড়ান পাওয়া দায় হইবে।

আমি অমৃতের নামে একখানা সাদা চেক লিখিয়া দিয়া, সে যাহা ভাল বুঝে, তাহাকে তাই করিতে বলিলাম। সে চলিয়া গেল। দিন দুই পরে ব্যাঙ্ক হইতে পাশ বই আসিলে দেখিলাম, সে চেক বাবদ দশ হাজার টাকা ভাঙ্গান হইয়া গিয়াছে। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম।

কিন্তু সাত দিন বাদে আমার বাড়ী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ইনস্পেক্টার, কনষ্টেবলে ভরিয়া গেল। সেই মেয়েটার স্বামী আমার নামে ফৌজদারীতে নানা রকম অভিযোগ করিয়া নালিশ করিয়াছে, যার বারো আনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তার অনিচ্ছায় আমি জোর করিয়া তাহাকে লইয়া, এক মাস কাল অবৈধ ভাবে আটক করিয়া রাখিয়া, তার লজ্জাশীলতার হানি করিয়াছি; এবং আরও গুরুতর অপরাধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারিয়া উঠি নাই—এই রকম তার আরজীতে লেখা ছিল। শুনিলাম সে মেয়েটা সেই মর্ম্মে সাক্ষ্য দিয়াছে।

আমি অবাক হইয়া গেলাম। হাজার টাকার জামিন লইয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমাকে ছাড়িয়া গেলেন; আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। মাথার ভিতর ঘূর্ণাবর্ত্তের মত নানা কথা আমার চিত্তকে নির্ম্মম ভাবে কাটিয়া ছিঁড়িয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল।

বৈকাল বেলায় নরেন্দ্র বাবু আসিলেন। তাঁকে দূর হইতে দেখিয়া আমি পলাইলাম। চাকর বলিল, আমি বাড়ী নাই। তিনি চলিয়া গেলেন। আমার বন্ধুবান্ধবের অন্ত নাই; অনেকে দেখা করিতে আসিল, আমি লুকাইয়া রহিলাম। শেষে স্থির করিলাম, সত্য-সত্য বাড়ী না ছাড়িলে, এদের সঙ্গে দেখা-শুনা এড়াইতে পারিব না।

তাই বাড়ী ছাড়িয়া গেলাম—কোথায় আর যাইব? নিভৃত বেশ্যাপল্লীতে আশ্রয় লইলাম।

আমার টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে, দেওয়ানকে টেলিগ্রাম করিলাম। তিনি উত্তরে লিখিলেন, এখন আর টাকা পাঠাইতে পারিবেন না। আমি মনোহর সার গদী হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া আসিতে বলিলাম। দেওয়ানজী মোকদ্দমা মামলার তদ্বিরে দক্ষ বলিয়া তাঁহাকে আসিতে বলিলাম।

অমৃত আসিয়া সেই বেশ্যাবাড়ীতে সংবাদ দিল যে, আপোষে মামলা মিটাইবার বন্দোবস্ত সে করিয়াছে। তারা কলিকাতায় একখানা বাড়ী চায়। আমি ধমক দিয়া তাহাকে তাড়াইলাম। কিন্তু বড় ভয় হইল। পরের দিন তাহাকে আবার ডাকাইলাম। অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম যে, যদি আর হাজার দশেক টাকায় মেটে, তবে চেষ্টা দেখিতে পারি। সে চলিয়া গেল, আমি সুরা ও নারীর হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া মনের জ্বালা ও আতঙ্ক নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

দেওয়ানজী পরের দিন টেলিগ্রাফ যোগে আমাকে বিশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন, এবং পরের দিন বাকী টাকা লইয়া রওনা হইবেন লিখিলেন। টাকা হাতে আসিবার পরই অমৃত আসিয়া বলিল, পোনেরো হাজার টাকার কম কিছুতেই মানে না।

আমি বলিলাম, "এ টাকা কিন্তু আর নষ্ট করা চলবে না। তুমি আমার উকীলের কাছে নিয়ে যাও। তাঁর হাত দিয়ে, যাতে মোকদ্দমা উঠিয়ে নেয় তার বন্দোবস্ত পাকা করে, তবে টাকা দেবে।"

অমৃত সম্মত হইল। আমি উকীলের নামে একখানা চিঠি দিয়া, অমৃতের হাতে পনেরো হাজার টাকা দিয়া

দিলাম। তাহার পর হইতে অমৃতকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

দুই দিন পরে দেওয়ানজী আসিলেন। তিনি সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া লইয়া, মোকদ্দমার তদ্বির ও সঙ্গে সঙ্গে আপোষের কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। আমার পক্ষে বিচক্ষণ উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইলেন।

আপোষ হইল। বাদী ভদ্রলোকটি দেখিলাম, বিলক্ষণ ব্যবসায়ী। প্রকাশ হইল যে, অমৃত যে পঁচিশ হাজার টাকা আমার নিকট হইতে লইয়াছিল, তার এক পয়সাও তাঁর হাতে পৌঁছায় নাই। বাদী বলিলেন যে, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঘরে লইতে পারেন না। সুতরাং তাঁর স্ত্রীর ভার আমায় লইতে হইবে। তাহা ছাড়া তাঁহাকে যে পঁচিশ হাজার টাকা আমি দিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা দিতে হইবে। অনেক দর-কষাকষির পর পনেরো হাজার টাকায় রফা হইল। তাঁর স্ত্রী তাঁর ঘরেই রহিল। পরে তার কি হইল, সে খবর জানি না।

মোকদ্দমার দায় হইতে উদ্ধার পাইলাম বটে, কিন্তু আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাইবার পথ রহিল না। এ মোকদ্দমাটা লইয়া সহরে এত সোরগোল হইয়া পড়িল যে, আমার আর কারও সম্মুখে দাঁড়াইবার সাহস রহিল না। আমি কেবল পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন অনেক বড়লোককে আমি জানি, যাঁরা এমন দুই-চারটা অপকার্য্য করিয়াও দিব্য নিঃসঙ্কোচে সমাজে মিশিয়া যান। আমি অনেক অপকর্ম্ম করিয়াছি, কিন্তু এমন দু-কাণ কাটা এখনো হইতে পারি নাই।

তাই ভদ্রসমাজ হইতে আমি সম্পূর্ণ ডুব মারিলাম। উঠিলাম গিয়া সহরের নিভৃত কোণে সেই সমাজে, যেখানে এসব ব্যাপারে কারো কোনও লজ্জা নাই। সেখানে আমার অনেক সঙ্গী জুটিল। মোসাহেব দালাল প্রভৃতি ছাড়া জুটিল কতকগুলি আমারই মত বড়লোকের ছেলে। তাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া নেশায় ও হল্লা করিয়া কোনও মতে দিনটা কাটাইয়া দিতাম।

কিন্তু কি মদ, কি বেশ্যা, কোনও কিছুতেই আর আমার সুখ ছিল না। আর এই আমার নূতন সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ ও ফুর্ত্তি করা, ইহার ভিতর আমার অন্তরাত্মা যেন হাহাকার করিয়া উঠিত। আমার শিক্ষা ছিল উচ্চ অঙ্গের, আমার অভ্যাস দাঁড়াইয়াছিল নরেন্দ্র বাবু ও তাঁর পণ্ডিত বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায়। তার পাশে এই সব লোকদের সারশূন্য ইতর ভাষার ভিতর দিয়া প্রবাহিত অত্যন্ত হাল্কা ও নীচ ব্যবহারে আমার প্রাণ কোনও তৃপ্তি-লাভ করিত না। যে ভদ্রসমাজ আমার পক্ষে এমন একেবারে বন্ধ, তার আবহাওয়ার জন্য প্রাণ ছটফট্ করিত।

রমণীর কটাক্ষ আমাকে মুগ্ধ করিতে পারিত না, তার বিলাস-লাস্যে আমি প্রায় সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমার প্রাণের জ্বালায় এসব রস নিঃশেষে শুকাইয়া গিয়াছিল।

সুখশূন্য, আশাশূন্য হৃদয়ে আমি কেবল বিস্মৃতির সাধনা করিতাম। দিনরাত মদ খাইতে আরম্ভ করিলাম, হল্লার পর হল্লা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম,—কোনও হট্টগোলের মাঝখানে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিবার আশায়।

রাজ্যশ্রী

(বাণভট্ট-রচিত 'হর্ষচরিত' হইতে)

অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম-এ

তের শত বৎসর আগেকার কথা। রাজা প্রভাকর-বর্দ্ধন স্থাণ্বীশ্বরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অশ্বিনীকুমারদ্বয় সদৃশ তাঁহার দুই পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন, ও হর্ষবর্দ্ধন এবং লক্ষ্মী-স্বরূপিণী কন্যা রাজ্যশ্রী।

অসামান্য রূপবতী নানা-শিল্প-কলাকুশলা রাজ্যশ্রীকে যৌবনসন্ধিগতা দেখিয়া বৃদ্ধ রাজা তাহার বিবাহ চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। এক দিন রাণী যশোবতীকে আহ্বান করিয়া তিনি বলিলেন, রাণি, আমাদের মেয়ে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে! কন্যা বয়স্থা হইলেই পিতামাতার চিন্তার কারণ হয়। বিবাহ দিয়া তাহাকে এইবার

পরের হাতে সঁপিয়া দিতে হইবে। বিচ্ছেদের এই বেদনার জন্যই লোকে কন্যা কামনা করে না। যাহাকে এত দিন এত আদরে এত যত্নে লালনপালন করিলাম, হায়, তাহাকে এই রূপে বিদায় দেওয়াই বিধাতার নিয়ম, এবং গৃহী-মাত্রকেই ইহা পালন করিতে হয়। এখন সদ্বংশজাত সৎপাত্রে কন্যা সমর্পণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

রাণী ইহা শুনিয়া বলিলেন, রাজন্, কন্যার মাতা ত তাহার ধাত্রীমাত্র; কিন্তু তাহা হইলেও পুত্রাপেক্ষা কন্যাই মাতার স্নেহ অধিক আকর্ষণ করিয়া থাকে। যোগ্য বরে আপনি কন্যা দান করিবেন, ইহাতে আমি আর কি বলিব?

পূর্ব্ব হইতেই অনেক রাজা ও রাজকুমার রাজ্যশ্রীর রূপগুণের কথা শুনিয়া বিবাহ-মানসে থানেশ্বরে দূত প্রেরণ করিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে মুখরবংশপ্রদীপ, শৈব-ধর্ম্মাবলম্বী কান্যকুব্জরাজ অবন্তীবর্ম্মার পুত্র গ্রহবর্ম্মাকেই রাজা স্বীয় কন্যার উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করিয়া, তাঁহাদের দূতকে সেই বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। দূত সেই আনন্দ-সংবাদ পাইয়া কান্যকুব্জাভিমুখে গমন করিল।

ইতিমধ্যে স্থান্বীশ্বরে রাজকন্যার বিবাহোৎসবের বিপুল আয়োজন আরব্ধ হইল। অসংখ্য হস্তীর বৃংহনে ও অশ্বের হ্রেষায় প্রাসাদপ্রাঙ্গণ নিরন্তর ধ্বনিত হইতে লাগিল। এগুলি কন্যার যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র এবং আম্র ও অশোকের পল্লবে সজ্জিত হইয়া রাজপ্রাসাদ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। নানা দেশ হইতে রাজন্যবর্গ-প্রেরিত বহুমূল্য উপঢৌকন-সম্ভার আসিতে লাগিল। অনেক রাজা নিজেরাই এক একটি কাজের ভার লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের সধবা পুরন্ধ্রীগণও দলে দলে আসিয়া নিজেদের নানা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই সকল সুবেশা, সুন্দরী, রাজান্তঃপুরিকাগণ সীমন্তে সিন্দুর ও পদদ্বয়ে অলক্ত ধারণ করিয়া তাঁহাদের রূপের ও সঙ্গীতের হিল্লোল তুলিয়া মূর্ত্তিমতী উৎসব-শোভা রূপে বিরাজ করিতেছিলেন। জ্যোতিষিগণ গণনা দ্বারা শুভলগ্ন নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রাসাদের বাহিরে, নগর মধ্যেও উৎসব আয়োজনের অন্ত ছিল না। এক দিকে জাফ্রানরঞ্জিত জলস্রোতে নগর-বাসী সকলে পীতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছিল; অপর দিকে কুম্ভীরমুখাকৃতি নল-মুখ হইতে সুরভিত জল-প্রবাহ নির্গত হইয়া উপবনসমূহের পুষ্করিণীগুলি পূর্ণ করিতে-ছিল। গীতবাদ্যে রাজপথসমূহ সর্ব্বদা মুখরিত হইতেছিল।

ক্রমে বিবাহ-দিন সমাগত হইল। প্রাতে বরপক্ষ-প্রেরিত পারিজাতক নামক তাম্বুলবাহক আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজার নিকট তাহাকে লইয়া যাওয়া হইলে, তিনি ভাবী জামাতা গ্রহবর্ম্মার কুশল প্রশ্ন করিলেন। সে রাজাকে দেখিয়া দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া আভূমি প্রণত হইল। তার পরে উঠিয়া বলিল, 'মহারাজ, তিনি ভাল আছেন এবং মহারাজের নিকট শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন প্রেরণ করিয়াছেন।' অতঃপর তাহার যথোচিত সৎকারের ব্যবস্থা হইল।

দিবা অবসান হইল। পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বরের আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হইল। অসংখ্য গজবাজিসমন্বিত এক বিরাট শোভাযাত্রা প্রাসাদাভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটি সুসজ্জিত মুক্তাশোভিতশীর্ষ হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বর আসিতেছিলেন। তাঁহার চারিদিকে নৃত্য-গীত-বাদ্য হইতেছিল। সুগন্ধি তৈলের দীপমালা উজ্জ্বল আলোকে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছিল।

স্বজন-বন্ধু-পরিবৃত হইয়া বর ক্রমে প্রাসাদ-দ্বার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহার পুত্রদ্বয় ও বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। বর হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন, এবং রাজাও তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। অতঃপর তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া রাজা তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন, এবং স্বীয় সিংহাসন-তুল্য এক স্বর্ণখচিত আসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন।

অবিলম্বে গম্ভীর নামক জনৈক রাজানুরক্ত ব্রাহ্মণ গ্রহবর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলেন। সেই সময়ে জ্যোতিষিগণ আসিয়া রাজাকে কহিল, 'মহারাজ, লগ্নকাল উপস্থিত, বরকে ভিতরে আসিতে অনুমতি করুন।' রাজা অনুমতি প্রদান করিলে, গ্রহবর্ম্মা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে শত শত রমণীর ফুল্লোৎপলসদৃশ নয়ন হইতে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইতে লাগিল।

বিবাহ স্থলে নীত হইয়া তিনি বিবাহবেশে সজ্জিতা,

সখীজনপরিবৃতা, চন্দনচর্চ্চিতা, লজ্জারুণরাগরঞ্জিতা রাজ্যশ্রীকে দেখিতে পাইলেন। মৃদু মৃদু দীর্ঘশ্বাসে তাঁহার বক্ষ ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল, ভয়ে ও লজ্জায় তাঁহার দেহযষ্টি অল্প কাঁপিতেছিল। পুষ্প গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছিল; মনে হইতেছিল যেন কুসুমভূষণা বসন্তরাণী আসিয়া সেখানে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

স্ত্রী-আচার আরম্ভ হইল। রমণীগণ যাহা বলিতেছিলেন, বরকে তাহাই করিতে হইতেছিল। এই সময়ে তাঁহার বদনমণ্ডলে এক কৌতুকমিশ্রিত মৃদু হাস্যের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছিল। তার পরে তিনি কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া অভ্যাগত রাজন্যবর্গবেষ্টিত, শ্বেতপুষ্পাস্তৃত বিবাহবেদিকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার চারিদিকে অনেকগুলি মৃন্ময় মূর্ত্তি বিবিধ মাঙ্গলিক ফল ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল; একটির হস্তে পঞ্চপাত্র ছিল।

ব্রাহ্মণেরা হোমাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিলেন। তৎসন্নিকটে কুশ, মৃগচর্ম্ম, ঘৃত, মাল্য ও সমিধ্ সজ্জিত ছিল, এবং অপর এক পার্শ্বে একটি ডালায় শমীপত্র মিশ্রিত আচার-লাজ রক্ষিত ছিল। বর কন্যা সহ অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই সময়ে অগ্নিতে লাজাঞ্জলি প্রদত্ত হইল। অগ্নি যেন কন্যার অনিন্দ্য মুখ দেখিবার আগ্রহে দক্ষিণাবর্ত্ত হইল। কন্যার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। পুরস্ত্রীগণও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

বিবাহ শেষ হইল। বরকন্যা গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

(২)

ইহার পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, রাণী যশোবতীও সরস্বতী তীরে স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন তখন দূরে হূণদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত। এই নিদারুণ সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পিতৃমাতৃ-বিয়োগে তাঁহার শোকাবেগ এত বেশী প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধনের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া নিজে সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কাহারও অনুনয় বিনয় তাঁহাকে এই সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। রাজপুরী মধ্যে আবার নূতন করিয়া বিষাদের ছায়া পতিত হইল। কিন্তু ঠিক এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না।

যেদিন তিনি গৈরিক ধারণ করিয়া পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেন, সেই দিন সম্বাদক নামে রাজকুমারী রাজ্যশ্রীর এক পুরাতন ভৃত্য উন্মত্তবৎ অবস্থায় রোদন করিতে করিতে প্রাসাদ মধ্যে, যেখানে রাজ্যবর্দ্ধন পরিজনপরিবৃত হইয়া বেশ পরিবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য সকলে অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সে তখন বলিল যে, মহারাজের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, পাপিষ্ঠ মালবরাজ রাজজামাতা গ্রহবর্ম্মাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিয়াছে, এবং রাজ্যশ্রীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কান্যকুব্জের কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর সে না কি থানেশ্বর আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

এই নূতন আকস্মিক বিপদের প্রথম আঘাত সকলকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ভ্রাতৃদ্বয় অদম্য দুঃখে ও ক্রোধে যুগপৎ অধীর হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজ্যবর্দ্ধন ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিতে লাগিলেন,—'নরাধম মালবের রাজ্য ছারখার করিয়া তার এই অত্যাচারের শাস্তি দেওয়াই আমার এখন প্রকৃত সন্ন্যাস গ্রহণ হইবে। কি! হরিণ হইয়া সিংহের সঙ্গে বিবাদ, ভেক হইয়া সর্পকে আঘাত, গো-বৎসের ব্যাঘ্রকে বন্দী করিতে সাহস, নির্ব্বিষ জলসর্পের কি না গরুড়ের কণ্ঠরোধে মানস! পিতার জন্য সকল শোক এখন আমার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়াছে। প্রতিহিংসার প্রবল বহ্নি আমার হৃদয়ে জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছে। কোন সামন্ত-রাজকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে না। একটিও হস্তী আমি চাই না। কেবল ভণ্ডী দশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা লইয়া আমার সহগামী হইবে।' এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিলেন। তাঁহার মাতুলপুত্র এবং অন্যতম সেনাপতি ভণ্ডী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। হর্ষবর্দ্ধনও অগ্রজের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার সাথী হইতে প্রার্থনা করিলে,

রাজ্যবর্দ্ধন বলিলেন, 'এই ক্ষুদ্র শত্রুকে শাস্তি দিতে যদি তুমিও আমার সঙ্গে যোগ দাও, তাহা হইলে তাহাকে বড় বাড়াইয়া তোলা হইবে। মৃগবধের জন্য কি একটি সিংহই যথেষ্ট নহে? তুমি থাক। যখন সময় হইবে, তখন তুমি একাই দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, সকল রাজাকে জয় করিতে পারিবে।'

রাজ্যবর্দ্ধন সসৈন্যে চলিয়া গেলেন। কনিষ্ঠ হর্ষ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক দিকে যেমন দুঃখের গুরুভার তাঁর হৃদয়কে পীড়িত করিতে লাগিল, অপর দিকে তেমনই আবার প্রতি দিন নানা অশুভ লক্ষণ দেখিয়া তিনি নূতন অমঙ্গলাশঙ্কায় কাতর হইয়া পড়িলেন। রাত্রে তিনি দুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, অহর্নিশি তাঁর বামচক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল, সপ্তর্ষিমণ্ডলী হইতে ধূমরাশি নির্গত হইয়া নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল, প্রতি রজনীতে উল্কাবৃষ্টি হইতে লাগিল। হর্ষের মন হইতে সমস্ত শান্তি তিরোহিত হইয়া গেল!

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে, এক দিন হর্ষ যখন সভামধ্যে বসিয়া আছেন, তখন কুন্তল নামক রাজ্যবর্দ্ধনের জনৈক সেনাপতি কয়েকজন মাত্র অনুচর সহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেহ ধূলি-ধূসরিত, বদন বিমর্ষ, চক্ষু ভূমিসনবদ্ধ। তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় আসিতে দেখিয়া হর্ষ ভীত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সেনাপতি কুন্তল যে সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা এই—রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজকে অতি সহজে পরাভূত করিয়া, যখন ভগিনীর উদ্ধারসাধনে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন গৌড়পতি বন্ধুত্বের ছল করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক নিরস্ত্র অবস্থায় তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। (১)

এই ভীষণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া হর্ষের অবস্থা অতি-ভয়ঙ্কর হইল। দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গকারী শিবের ন্যায় তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন; জনমেজয়ের ন্যায় অরাতি-সর্পকুল ভস্ম করিবার জন্য অস্থির হইলেন, বৃকোদরের ন্যায় শত্রু-শোণিত পান করিবার জন্য তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'পাষণ্ড গৌড়রাজ ব্যতীত এইরূপ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড আর কাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে! কিন্তু সে কি মনে করিয়াছে যে, সে নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে কালাতিপাত করিবে? সে কি জানে না, ইহার জন্য তাহাকে কিরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে? কে আমার সঙ্গে এই পাপিষ্ঠকে শাস্তি দিবার জন্য যাইতে প্রস্তুত আছে?'

তখন সিংহনাদ নামক প্রবীণ যুদ্ধবিশারদ সেনাপতি তাঁহাকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন। হর্ষ তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি নির্দ্দিষ্ট দিবসের মধ্যে গৌড়রাজকে শমন সদনে প্রেরণ ও তাহার পক্ষাবলম্বী রাজগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজদেহ বিসর্জ্জন দিবেন। অতঃপর তিনি অবন্তী নামক যুদ্ধ-সচিবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'এই রাজাজ্ঞা ঘোষিত হউক যে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে যত মিত্র রাজা আছেন, তাঁহারা যেন আমার এই অভিযানে যোগদান করিতে তৎপর হন।'

সভাভঙ্গ করিয়া তিনি শয়নগৃহে গমন করিলেন, এবং একাকী শয্যায় শয়ন করিয়া শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। এতক্ষণ ক্রোধে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, এখন ভ্রাতার জন্য অবিরলধারে অশ্রুরাশি তাঁহার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিতে লাগিল। কোনরূপে রজনী অতিবাহিত করিয়া তিনি ভোর হইতে না হইতেই হস্তিসেনানায়ক স্কন্দগুপ্তকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। এই ইন্দ্রতুল্য, মহাভুজ বীরপুরুষ অবিলম্বে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলে, হর্ষ তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনি ত আমার অগ্রজের হত্যা ও আমার প্রতিজ্ঞার কথা সমস্তই অবগত আছেন। সুতরাং হস্তিযূথসমূহ শীঘ্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করুন।' স্কন্দগুপ্ত সসম্ভ্রমে বলিলেন, 'রাজন্, সমস্তই আপনার আদেশ মত হইবে। আপনি যেভাবে শত্রুর দণ্ডবিধানে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা আপনার বংশেরই উপযুক্ত। আমি শুধু আপনাকে বলিতে চাই, আপনার অগ্রজের শোচনীয় পরিণাম হইতে এই শিক্ষা

(১) ইতিহাসে এই ব্যাপারটা ভিন্ন রূপ দেখিতে পাই। রাজ্যবর্দ্ধন যখন মালবরাজকে পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন মালবেশ্বরের মিত্র গৌড়াধিপ শশাঙ্ক বিপুল সৈন্য লইয়া তাঁহার গতিরোধ করেন। রাজ্যবর্দ্ধন তাঁহার হস্তে পরাস্ত ও বন্দী হইলেন। শশাঙ্ক তখন তাঁহাকে হত্যা করেন। ('গৌড়রাজমালা' দ্রষ্টব্য)। মতান্তরে, গৌড়রাজ একদা রাত্রিকালে অতর্কিত-ভাবে রাজ্যবর্দ্ধনের শিবিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন।

আপনি অবশ্যই লাভ করিয়াছেন যে, সকল বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক, নহিলে ঘোর অনর্থ উপস্থিত হয়।' এই বলিয়া তিনি ইতিহাস হইতে আরও অনেক উদাহরণ দিয়া তাঁহার উক্তির সত্যতা প্রতিপাদন করিলেন। তার পর তিনি রাজাদেশ পালন করিতে চলিয়া গেলেন।

অতঃপর জ্যোতিষিগণ-নির্দ্ধারিত শুভ দিনে রাজা হর্ষবর্দ্ধন স্নাত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিলেন, এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে ইন্ধন দিয়া আরাধনা করিলেন। অগ্নি দক্ষিণাবর্ত্ত হইয়া শুভ সূচনা করিল। ব্রাহ্মণদিগকে শত সহস্র স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র এবং অসংখ্য স্বর্ণভূষিত-শৃঙ্গ গাভী দান করিয়া তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত, শিরোদেশ শ্বেতপুষ্প-শোভিত, পরিধানে পট্টবস্ত্র এবং পট্টবস্ত্রেরই উত্তরীয় তাঁহার অঙ্গে শোভা পাইতেছিল। রাজপুরোহিত আসিয়া তাঁহার মস্তকে মাঙ্গলিক বারি সেচন করিলে, তাঁহার সহগামী রাজন্যবর্গকে নানা মণিমুক্তাদি অলঙ্কার বিতরণ করিয়া, এবং কারাবদ্ধ বন্দীদিগকে মুক্তি দিয়া তিনি প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। তখন এক বিপুল জয়ধ্বনি আকাশ মার্গে উত্থিত হইল। সৈন্য সামন্তগণ পূর্ব্বেই অগ্রসর হইয়াছিল।

(৩)

রাজধানীর অনতিদূরে, সরস্বতীনদীর সন্নিকটে, একটি সুবৃহৎ শিবমন্দির ছিল। সেই মন্দির সম্মুখে বহু যোজন স্থান ব্যাপিয়া শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেইখানে আসিয়া সকলে সমবেত হইল। সেই স্থান হইতে অভিযান শ্রেণী-বদ্ধ ভাবে অগ্রসর হইবে, স্থির হইয়াছিল। রাজা দিবাভাগ সেই স্থলে যাপন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে শত গ্রাম দান করিলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে তিনি যাত্রার আদেশ দিলেন। অমনি তূরী ভেরী পটহ নিনাদিত হইয়া উঠিল। লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ত্তিকা সেই স্থান দিনের ন্যায় আলোকিত করিয়া তুলিল। নিদ্রোত্থিত সেনানী ও সৈন্যগণ সুসজ্জিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে সমাসীন হইতে লাগিল। অতঃপর হস্ত্যশ্বউষ্ট্রসমন্বিত সেই বিশাল বাহিনী যাত্রা আরম্ভ করিল। ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল। কত গ্রাম, কত শস্যক্ষেত্র বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে লাগিল।

যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া তিনি শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। সেখানে অবস্থান কালে তিনি এক দিন শুনিলেন যে, তাঁহার অগ্রজের সহগামী ভণ্ডী অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং শীঘ্রই আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার ভ্রাতৃশোক আবার নূতন করিয়া উথলিয়া উঠিল। তার পরে যখন ভণ্ডী অতি দীনবেশে কয়েকজন মাত্র অনুচর সহিত তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন। শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে অশ্রু মুছিয়া রাজা ভণ্ডীকে ভ্রাতার মৃত্যুঘটিত ব্যাপার সবিশেষ বর্ণনা করিতে বলিলেন। ভণ্ডী আনু-পূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে হর্ষবর্দ্ধন ভগিনী রাজ্যশ্রীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভণ্ডী কহিলেন, 'মহারাজ, আমি লোক-পরম্পরায় শ্রবণ করিলাম যে, মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনের স্বর্গারোহণের পর যখন কান্যকুব্জ গুপ্ত নামক কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, তখন রাণী রাজ্যশ্রী কারাগার হইতে কোন রূপে নিজেকে মুক্ত করিয়া সানুচর বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান হইতেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই।'

ইহা শুনিয়া হর্ষ কহিলেন, 'আমি নিজেই আমার ভগিনীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইব। এখন ইহাই আমার প্রথম কর্ত্তব্য। আপনি সৈন্য সামন্ত লইয়া গৌড়রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হউন।'

পরদিনই রাজা তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যগণ সহিত বিন্ধ্যাটবী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং অল্প দিনেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অনুচরবর্গ চারিদিকে ছুটিল। বহুদিন ধরিয়া অন্বেষণ হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি ভগিনীর কোন সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে একজন ব্যাধের পরামর্শে তিনি দিবাকর মিত্র নামক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আশ্রমে আসিয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। যখন তিনি এই সন্ন্যাসীর নিকট রাজ্যশ্রীর নিরুদ্দেশ-কাহিনী বিবৃত করিতেছিলেন, তখন দিবাকর মিত্রের জনৈক শিষ্য ব্যস্তসমস্ত ভাবে সেইখানে আসিয়া কহিলেন, 'আপনারা শীঘ্র একবার এদিকে আসুন। একজন রমণী অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন

দিতে যাইতেছেন। আপনারা তাঁহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করুন। তিনি উচ্চ-কুলসম্ভূতা বলিয়া মনে হইতেছে। নানারূপ বিপৎপাতে তিনি শোকে-দুঃখে জ্ঞানশূন্যা হইয়া মৃত্যু বরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার সখীগণ তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদেরই মধ্যে একজন আসিয়া আমাকে তাঁহাদের সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। আমি একা কিছু করিতে পারিব না মনে করিয়া আপনার কাছে আসিয়াছি।'

হর্ষবর্দ্ধন বুঝিতে পারিলেন, এই নারী তাঁহার ভগিনী ব্যতীত আর কেহই নহে। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া সন্ন্যাসীদ্বয়ের সহিত যথাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুদূর হইতেই তাঁহারা রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত বিলাপোক্তি শুনিতে পাইলেন। নিকটবর্ত্তী হইয়া হর্ষবর্দ্ধন অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভগিনীকে সম্বোধন করিলেন। রাজ্যশ্রী তখন সখীকুটুম্বিনী-পরিবৃতা হইয়া প্রজ্বলিত চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন, আর সকলে মিলিয়া বিলাপ করিতেছিলেন। ভ্রাতার আহ্বান তিনি শুনিতে পাইলেন না। তখন হর্ষবর্দ্ধন ভগিনীর হস্ত ধারণ করিয়া অগ্নির সান্নিধ্য হইতে তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া গেলেন। তাঁহারা দুইজনে তখন এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সন্ন্যাসিদ্বয়ও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী দিবাকর মিত্র এক অপূর্ব্ব মুক্তামালা রাজাকে উপহার দিলেন। তারার বিরহে কাতর হইয়া চন্দ্র যে সকল অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাই সাগরে পতিত হইয়া শুক্তি মধ্যে প্রবেশ করে এবং নাগরাজ বাসুকী সেই সকল মুক্তা সংগ্রহ করিয়া এই মুক্তামালা প্রস্তুত করেন। কালক্রমে নাগার্জ্জুন নামক সন্ন্যাসী কোন কারণে নাগগণ কর্ত্তৃক পাতালে নীত হন এবং বাসুকীর নিকট হইতে এই মুক্তামালাটি চাহিয়া লইয়া আসেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার বন্ধু সাতবাহনকে ইহা দান করেন। ক্রমে হস্তান্তরিত হইয়া ইহা দিবাকর মিত্রের নিকট আসিয়াছিল। ইহার গুণ এই যে, যে ইহা ধারণ করিবে, সে সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যাইবে। অতঃপর তিনি, মানব-জীবন যে কত দুঃখময়, তাহা তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহাদের এই দুঃখে সান্ত্বনার শান্তিবারি নিঃক্ষেপ করিলেন।

কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া রাজ্যশ্রী কহিলেন, 'স্বামী ও পুত্রই নারীর অবলম্বন। আমার স্বামীও নাই, পুত্রও নাই, আমার জীবন ধারণ করা কেবল দুঃখের অনলে অহর্নিশি দগ্ধ হওয়া মাত্র। অতএব আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অনুমতি দিন।' রাজা কহিলেন, 'আর কিছু দিন অপেক্ষা কর, আমরা দু'জনেই একসঙ্গে এই মহাজ্ঞানী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছি, তাহা আমাকে পালন করিতে হইবে। গৌড়রাজকে পরাজিত করিয়া তাহার যথোচিত শাস্তি-বিধান করিতে হইবে। যত দিন না আমি এই কার্য্য সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসি, তত দিন তুমি ইঁহার আশ্রমে অবস্থান কর।'

এই প্রস্তাবে সকলেই স্বীকৃত হইলে, তাঁহারা দিবাকর মিত্রের আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সূর্য্যদেব তখন অস্তাচলে গমন করিতেছিলেন।

* * * * * *

'হর্ষ চরিত' এইখানেই শেষ হইয়াছে। হর্ষবর্দ্ধনের চরিতাখ্যান হিসাবে ইহা অসম্পূর্ণ। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা এক অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ। বাণভট্টের অপর পুস্তক কাদম্বরীর ন্যায় ইহা কাল্পনিক আখ্যায়িকা মাত্র নয়। ইহা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। শুধু তাহাই নয়। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা এই পুস্তক হইতে অতি সুন্দর রূপে জানিতে পারা যায়। সত্য বটে চীন পরিব্রাজক হুয়েন্ সাঙ্ও এই সময়ে ভারতে আসিয়াছিলেন এবং তিনি এই সময়কার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাহা বিদেশীর প্রদত্ত বিবরণ। বাণভট্ট হর্ষবর্দ্ধনের সভাসদ্ ও বন্ধু ছিলেন; সুতরাং তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। তাঁহার বর্ণনা হইতে আমরা তদানীন্তন ভারতের যথাযথ চিত্র চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাই। উপরে সঙ্কলিত রাজ্যশ্রীর বিবাহ-বর্ণনা ইহার উদাহরণ-স্থল।

দানের মর্য্যাদা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

সকাল বেলাই মনীশ ফিরিয়া আসিল। বেলা তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীর সকলকেই সে দেখিতে পাইল; দেখিল না কেবল উমাকে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সে তখনও বিছানায় শুইয়া আছে।

উমা বগলাদেবীর গৃহে শয়ন করিত,—তাহার গৃহটা সে অন্য লোককে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বগলাদেবী তখন মুহ্যমান ভাবে বারাণ্ডায় বসিয়া ছিলেন, কথাবার্ত্তা বলা তিনি প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। মনীশ তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, "উমা কি এখনও শুয়ে আছে ঠাকুর মা?"

বগলাদেবী শুধু ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিলেন, উত্তর দিলেন না। তাঁহাকে কথা বলা নিষ্ফল জানিয়া, মনীশ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "উমা"—

"এস মনীশ-দা, দরজা ভেজানো আছে।"

দরজা ঠেলিয়া মনীশ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, উমা বিছানায় পড়িয়া আছে, ছিন্ন লতাটীর মতই সে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

মনীশ বলিল "এখনও ওঠনি যে উমা?"

উমা বলিল, "উঠতে পারলুম না মনীশদা, মাথা এত ভার হয়েছে যে তুলতে পারছিনে মোটে। বোধ হচ্ছে জ্বর হয়েছে, গাটাও তেমনি ব্যথা হয়েছে।"

মনীশ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, উমার সুগৌর মুখখানা খুব লাল হইয়া উঠিয়াছে; তাহার চোখ দুইটাও যেন বড় ক্লান্তি ভরে মুদিয়া আসিতেছে। মনীশ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তা, তোমার জ্বর হওয়াটা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা নয় তো উমা। শরীরকে তুমি বড় অবহেলা কর। এ শুধু আজ বলে নয়, বরাবর এমনি। এত দিন কাকা ছিলেন, তিনি নিজে তোমার ওপর দৃষ্টি রাখতেন, ঠাকুর মা আছেন, বটে, কিন্তু তিনি তো আর মানুষই নন, কি রকম হয়ে গেছেন, ডাকলেও আর সাড়া দেন না। তোমায় আর কে কি বলবে উমা?"

উমা শ্রান্ত চক্ষে চাহিয়া বলিল, "বলতে তুমি তো আছ মনীশদা।"

ব্যথার হাসি হাসিয়া মনীশ বলিল "আমি? আমি তোমায় কি বলছি উমা? আমি বাইরের তালে রয়েছি,—তোমার খাওয়া দাওয়ার কথাটা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে পারি নি আমি।"

উমা বলিল, "এবারে তো তোমার কাছেই যাব মনীশদা! আমায় তোমার কাছে গিয়েই থাকতে হবে। শ্রাদ্ধটা মিটে গেলেই আমি ভারি নিশ্চিন্ত হয়ে বেরুব। দেখো, তখন ঠিকমত শরীরটাকে যত্ন করতে পারি কি না। তখন তো দিনরাত তোমার চোখের ওপরেই থাকব,—দেখতে পাবে সব।"

বিস্মিত মনীশ বলিল, "আমার কাছে? কলকাতায় থাকতে যাবে তুমি উমা? কেন এখানে তুমি থাকবে না?"

যেন অশ্রু অতি কষ্টে সামলাইয়া উমা বলিল, "এখানে থাকবার অধিকার আমার আর কি আছে মনীশদা?"

মনীশ অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "নেই কি রকম? কাকা রীতিমত উইল করে তোমাকেই তো সব দিয়ে গেছেন, কাল পর্য্যন্ত তা শুনে গেছি, আজ আবার এ কি কথা বলছ উমা?"

উমা হাসিমুখে বলিল, "সত্যি কথা বলছি মনীশদা। আমি উষাদের সব দিয়ে দিলুম। আমি আজ ভিখারিণী, পরের দয়ার প্রত্যাশী। তবু—ওদের দেওয়া দানে আমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইনে মনীশদা। আমি তোমার কাছে জোর করে তবু চাইতে পারি; কারণ, তোমার আমার মধ্যে আর কেউ এসে দাঁড়াতে পারে নি। আমরা যেমন ভাই-বোন, তেমনি ভাই-বোনই আছি। ছোটবেলায় আমরা যেমন ছিলুম—এখনও তেমনি আছি, বোধ হয় আজীবন কাল তেমনি থাকবও। কিন্তু উষা—মনীশদা, সেই কেবল আমার একেবারে পর হয়ে গেল। সে চিনলে কেবল অর্থকে,—তার দিদিকে সে চিনতে পারলে না।"

প্রবল দুঃখাবেগে উমার কণ্ঠ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গেল। মনীশ সন্দেহাকুল ভাবে বলিল, "তুমি কি করেছ উমা, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

উমা বলিল, "আমি উইল ছিঁড়ে ফেলেছি মনীশদা, মৃন্ময়ের সামনেই তা দূর করেছি।"

"ছিঁড়ে ফেলেছ উমা! করলে কি! এমন করেও নিজের সর্ব্বনাশ করলে?" মনীশ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উমার পানে চাহিল।

উমা শান্ত কণ্ঠে বলিল, "সর্ব্বনাশ কিসের মনীশদা? যার সর্ব্বস্ব গেল, তার আর বেশী কি সর্ব্বনাশ হতে পারে? যেদিন বাবা গেলেন—আমি জেনেছি, সেই দিনই আমার সব ফুরিয়ে গেল। আমার আর কিছুই তো নেই, মিথ্যে আমায় কেন জড়াতে চাচ্ছ মনীশদা? আমি আর কিছু চাই নে, আমায় আর তোমরা জড়িয়ো না, আমায় মুক্তি দাও, আমায় তোমার কাছে নিয়ে চল, এখানে—এদের দয়ার ওপরে আমায় ফেলে রেখে যেয়ো না।'

উমার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনীশ বলিল "না উমা, তোমায় ফেলে যাব না। আমি যা পাব, তার অর্দ্ধেক তুমিও পাবে। যতক্ষণ আমি বেঁচে থাকব, ততক্ষণ তোমায় আমি কারও দয়ার ওপরে নির্ভর করতে দেব না। ভগবান যা ব্যবস্থা করেছেন, তা খণ্ডাতে কারুরই ক্ষমতা নেই, তা বেশ বুঝছি। একটা কথা আছে—মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙ্গে,—সেটা এখানে ঠিকই খেটে গেছে। এ বেশই হয়েছে উমা; তুমি সংসারে চির-অনাসক্তা, সংসারের ভাবনা তোমার মাথায় চাপানো ভগবানের অভিপ্রেত নয় বলেই, তিনি তোমার হাত হতে নিলেন। আমি তোমায় নিয়ে যাব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

মৃন্ময়ের মুখখানা আজ বড় উজ্জ্বল, বড় দীপ্ত। মনীশ তাহার সেই আনন্দদীপ্ত মুখখানার পানে চাহিতেছিল, আর হৃদয়ের মধ্যে প্রবল জ্বালা অনুভব করিতেছিল।

এক সময়ে নির্জ্জনে পাইয়া সে মৃন্ময়কে ধরিল,—কথাটা বলিবার লোভ সম্বরণ করা তাহার পক্ষে বড় দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

"আচ্ছা মৃন্ময়, কাজটা তোমার ভাল হয়েছে বলে তুমি বিবেচনা করছ? এটা তোমার উচিত হয়েছে?"

চশমার মধ্য হইতে চক্ষু দুইটা কুঞ্চিত করিয়া, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মনীশের মুখের উপর ফেলিয়া মৃন্ময় বলিল, "কিসের কথা বলছ?"

মনীশ বলিল "মৃতের সম্মানটা যে তোমরা রাখলে না, এতে আমি বাস্তবিকই অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছি মৃন্ময়। জীবিতের কথা ঠেলা যায়, কিন্তু মৃতের কথা অগ্রাহ্য করা যায় না বলেই আমার বিশ্বাস ছিল,—অন্ততঃ কোনও হৃদয়বান লোক সেটা অগ্রাহ্য করতে পারে না। তুমি শিক্ষিত, সদ্বংশজাত,—কেমন করে সেটা অগ্রাহ্য করলে, তা আমি ভেবে পাচ্ছিনে। সংসারে স্বার্থটাই যে সবচেয়ে বেশী, তা আমি বেশ জানতে পেরেছি, নইলে কেউ এমন করে না।"

উদ্বেলিত ক্রোধ চাপিয়া মৃন্ময় বলিল, "অন্যায় আমি কিছু করি নি মনীশ, আমার যা ন্যায্য তাই আমি চেয়েছি। তোমার বোন যা করতেন, আমিও তাই কর্ব্ব, তবে এতে না ছেড়ে দেবার মানে কি? তিনি এখানে থাকুন, আমি রীতিমত তাঁর সব ভার নেব।"

বিদ্রূপের সুরে মনীশ বলিল, "তুমি, তোমার স্ত্রী কলকাতায় থাকবে, আর উমা এখানে থাকবে দাসীর মত,—শুধু সে খেটে যাবে এই মাত্র। নিজের সংসারে নিজেই সে চোর হয়ে থাকবে,—একটা কাজ তোমাদের বিনানুমতিতে করতে পারবে না, একটা কথা পর্য্যন্ত বলতে পারবে না। এ রকম পরাধীনতার জীবন সংসারে কেউ যে প্রার্থনা করে না, তা তুমিও বেশ জানো মৃন্ময়।"

মৃন্ময় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সত্য কথা বলছি আমি, শোন। উমা যুবতী, সুন্দরী, বিধবা,—হাতে থাকবে তার প্রচুর সম্পত্তি। সুতরাং তাকে বিপথগামিনী করবার লোকের অভাব হবে না। এত দিন বাপ ছিলেন, সে সদুপদেশই পেয়েছে। এখন সে সদুপদেশ পাবে না। চির দিন মানুষের মন কিছু পবিত্র থাকতে পারে না—বিশেষ এ রকম অবস্থায়। মাথার উপর একজন শক্ত অভিভাবক থাকবার দরকার, যে তাকে সম্পূর্ণ বশে রাখতে পারবে। উমার যা আছে—আর যা তার হাতে পড়ছিল—এর একটাও মানুষের চিত্ত স্থির রাখতে পারে না,—বিপথগামী করে ফেলে। আমি শুদ্ধ তাকে রক্ষা করবার জন্যে, তার প্রবল শত্রুকে নিজের কাছে রাখলুম।"

মনীশ তীব্র হাসিয়া বলিল, "ধন্যবাদ তোমায়! তোমার নিজের মনটাই কলুষিত; তাই তুমি এত সহজেই উমার পরিণামটা দেখতে পেয়েছ,—তাই নিজের হাতে তার পথটা

পরিষ্কার করে, তাকে সোজা পথে যাবার সাহায্য করলে। এটা বোধ হয় তোমার মনে নেই—শিশুকালেই মানুষের প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। সে ছোটবেলায় যে শিক্ষার ভিত্তি গড়ে তোলে, তার উপরে ভর দিয়েই তার সারাজীবনটা দাঁড়িয়ে থাকে। উমার শিক্ষা যে কি, তা তোমার মত বধির অন্ধের কাছে বলা নিষ্প্রয়োজন। উমার শুধু রূপই দেখে গেছ তুমি,—সে যে কি রূপ, তা তুমি যথার্থই অনুভব করতে পারবে না; কারণ বিশ্বজননীর মূর্ত্তি কখনও তুমি সরল চোখে দেখতে পাও নি। যদি সেই যথার্থ মাকে দেখতে, সে রূপ তোমার হৃদয়ে থাকত, তবেই তুমি, উমার রূপ যে কি, তা অনুভব করতে পারতে। তুমি অন্ধ—নইলে দেখতে পেলে না কেন? তোমার অন্তর জড়, নইলে তুমি ধারণা করতে পারলে না কেন? তুমি পশু, তাই তাকে স্বর্গীয় ভাবে দেখতে পাও নি, দেখেছ পার্থিব চোখে। যাই হোক, ধন্যবাদ তোমায, তোমার দয়াকেও সহস্র ধন্যবাদ! যেহেতু, তার ভার তুমি নিতে চাচ্ছ। কিন্তু কে বলবে, তোমার এই দয়ার মূলে কোনও গোপনীয় উদ্দেশ্য জেগে নেই—তুমি তাকে নির্য্যাতন করতে পার না? আমি তোমার এ দয়া তোমাকেই ফিরিয়ে নিতে বলছি,—আমার আশ্রয় উমার জন্যে চির-উন্মুক্ত আছে,—আমার শ্রমলব্ধ উপার্জ্জনেই আমাদের বেশ চলে যাবে!"

মৃন্ময় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সাহস করিয়া মনীশকে সে আর বিরক্ত করিতে পারিল না। মনীশের চেয়ে সে মনীশের কথাকে বড় ভয় করিত।

শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেল, মনীশ উমা ও বগলাদেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

সজল-নয়না ঊষা আসিয়া উমার পায়ে প্রণতা হইয়া বলিল, "আমার ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছ দিদি,—আর কখনও এখানে আসবে না?"

উমা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল "না ভাই, আর এখানে আসা হবে না। আর কি করতেই বা আসব ঊষা,—এ বাড়ী যে আমার কাছে শূন্য হয়ে গেছে। বাবা থাকতেন—তাই মনে হত, বাড়ী পূর্ণ হয়ে আছে। যেদিকে তাকাতুম—মনে হত সব সুন্দর, সব ভাল। আমার সবই স্বপ্ন হয়ে গেল ঊষা, এ স্বপ্নের দেশে এসে আর আমার কি হবে?"

আবেগে তাহার কণ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। উমার ছেলেকে কোলে টানিয়া লইয়া, তাহার ললাটে, গণ্ডে চুম্বন দিয়া উমা বলিল, "তোর ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি ঊষা—যেন যথার্থ এ মানুষ হতে পারে, যেন আমাদের ঠাকুর-বাড়ীতে আবার তেমনি জাঁকজমকের সঙ্গে পূজা হতে পারে। যদি তত দিন বেঁচে থাকি, আমার কাণে সে কথা গিয়ে পৌঁছাবামাত্র আসব, একবার এসে দেখে যাব, নইলে এই শেষ।"

ঠাকুরবাড়ী গিয়া সে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিল। দেবতা—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। এ যে তোমারই ইচ্ছা দয়াময়! তুমি করাইতেছ তবে তো আমরা করিতেছি; তোমার শক্তি না পাইলে আমরা কি করিয়া করিতাম? তুমি সামনে পথ দেখাইয়া চলিতেছ, আমরা চলিতেছি; নহিলে পথ যে দেখিতে পাই না। এখনও দীর্ঘ জীবন সম্মুখে পড়িয়া—পথ দেখাইয়ো ভগবান, —দেখিয়ো, যেন বিপথে না যাই।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া উমা উঠিল।

সেই দিন সে বগলাদেবী ও মনীশের সহিত প্রসাদপুর ত্যাগ করিল।

(২৭)

গ্রীষ্মের ছুটিতে সতী বাড়ী আসিয়া ভাইয়ের কাছে সব কথাই শুনিতে পাইল। মৃন্ময় গর্ব্ব ভরে বলিল, "বুঝেছিস সতী, আমি বলে তাই আদায় করতে পেরেছি সব, অন্য কেউ হলে পারত না, সে কথা আমি খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি। মেয়েটার এত তেজ—সে আর কি বলব! কিছুতেই জমিদারী ছাড়ল না, বলে—আমার বাবা বলে গেছেন ঠাকুর-সেবা হবে না, তাঁর জমিদারীর উন্নতি হবে না। আঃ, কি জমিদারীর উন্নতি, আর কি ঠাকুর-সেবা! কতকগুলো ছোটলোক, ভদ্রলোক—এই তো প্রজা। এদের উন্নতি এরা নিজেরাই করুক; তাদের জন্যে টাকা ঢালতে যাই আমি! আর একটা মাটীর পুতুল—তার পূজোর জন্যে মাসে একশ হতে দুশো টাকা বন্দোবস্ত,—আবার তা ছাড়া বেশীও দিতে হয়। এই এতগুলো করে টাকা অনর্থক নষ্ট—সে আমার দ্বারা হবে না। আমি ও সব কিছু করব না। ঠাকুর অমনি থাকবে, সেই একটা পুতুল পূজোতে আমি অনর্থক এত টাকা নষ্ট করতে পারব না। আর প্রজার সঙ্গে জমিদারের সম্পর্ক খাজনা নিয়ে,—

দেখা শোনা করা যাবে সেই সময়ে, অন্য সময়ে আমি কারও নই।"

আগাগোড়া সব কথা শুনিয়া সতী হৃদয়ে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা পাইল—সংসারে এ কি উৎপীড়ন! পরস্পর পরস্পরকে জয় করিবার জন্য কেন বৃথা প্রয়াস করিতেছে? স্থায়ী যাহা নহে—তাহা পাইবার জন্য মানুষ কেন হাহাকার করিয়া মরে?

সতী উষার কাছে উমার কথা জিজ্ঞাসা করিল। উষা দারুণ অভিমানে বলিল, "দিদি এই এখানে মনীশদার বাড়ী এসে আছে। এই এক বছর হয়ে গেল,—একটী দিন আমাদের একটী খবর দেয় নি। মনীশদা আগে রোজই আসতেন, এই একটা বছর তিনিও আমাদের বাড়ী আসেন নি।"

আহা—উমা!

উমার মূর্ত্তিখানা সতীর চোখে স্পষ্ট রূপেই ফুটিয়া উঠিল। আহা, সে একসঙ্গেই সব হারাইল। সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াছিল, স্বেচ্ছায় তাহা বিসর্জ্জন দিল। সংসারে তাহার কিছু ছিল না, তবু সবই তাহার ছিল। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সব ঘুচিয়া গেল, সে নিজে আজ পরের দুয়ারে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়াছে!

সতী মনে মনে তাহাকে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারিল না। সে তাহার হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ভগিনীপতি কিম্বা ভগিনীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায় নাই,—সে মনীশের শরণাপন্ন হইয়াছে,—মনীশ তাহাকে আদরে নিজের গৃহে স্থান দিয়াছে। ধন্য মনীশ—সে যথার্থ মানুষের মতই কাজ করিয়াছে।

বাড়ীতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সতী সে দিন সন্ধ্যার সময় গোপনে একেবারে মনীশের বাড়ী গিয়া উঠিল।

নীচে বাহিরের ঘরে মনীশ একখানা চেয়ারে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। সতী ইতস্ততঃ না করিয়া সোজা সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

বিস্ময়ে কাগজ ফেলিয়া মনীশ বলিল, "এ কি, সতী?"

সতী তাহার পায়ের কাছে মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল, "হ্যাঁ, আমিই।"

মনীশ বিস্ময় প্রশমিত করিয়া বলিল, "আমি তো তোমায় ডাকি নি।"

সতী বলিল, "তুমি ডাক নি, কিন্তু আমি না ডাকতেই এসেছি; কারণ, এতে তোমার একারই কর্ত্তব্য নেই, আমারও কর্ত্তব্য আছে। দাদা যা করেছেন, তা আমি শুনেছি,—শুনে আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি একা ভার বইতে পারবে না, আমায় তার অংশ দাও।"

মনীশ নির্ব্বাক-প্রায় কণ্ঠে বলিল, "তুমি কি অংশ নেবে সতী?"

সতী নির্ভীক কণ্ঠে বলিল, "আমি উমাকে চাই, দেবে না কি?"

"তুমি উমাকে চাও?" মনীশ তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

সতী দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, আমি উমাকে চাই। দাদা তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে পথের ভিখারিণী করেছে, আমি আমাকে দিয়ে তার সে অভাবটা পূর্ণ করব।"

মনিশ বলিল, "কিন্তু সতী—"

সে থামিয়া গেল। সতী বলিল, "থামলে কেন? আমায় সেই মৃন্ময়ের বোন বলে তুমি আমায় অবিশ্বাস করতে পার, কিন্তু তোমার বলে তুমি তো অবিশ্বাস করতে পার না। আমার এই বাহ্যিক দেহটা তাদের হতে পারে, কিন্তু অন্তরটা তো তোমারি। বাহ্যিক দেহ কারও অনিষ্ট করতে পারে না, যদি তার অন্তরটা না যোগ দেয়। অন্তরে তুমি রয়েছ,—তোমার যে প্রিয়, তার অনিষ্ট আমি করতে পারি, এই কি তুমি বিশ্বাস কর?"

মনীশ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না সতী, আমি অবিশ্বাস করছিনে। আমি বলছি, উমা তাদের দান নেবে না বলেই প্রতিজ্ঞা করেছে,—তোমায় সে গ্রহণ করবে কি? তোমাকেও সে তো তাদের জিনিস বলেই জানে,—আমার বলে তো জানে না।"

সতীর চোখ সজল হইয়া উঠিল, বলিল, "তুমি তা বলবে না?"

মনীশ বলিল, "কি করে বলব সতী,—আমার স্বর যে বন্ধ হয়ে যাবে!"

সতী তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, "না, তোমার তা বলতেই হবে,—না বললে কোন মতে চলবে না। আমার প্রকৃত পরিচয় তোমাকেই দিতে হবে। তাকে আমার চাই-ই, নইলে হবে না, আমি তোমার কাছে হতে

কখনই ফিরে যাব না। বল—বলবে তুমি, আমায় তাকে দেবে?"

মনীশ একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়াই চোখ নামাইল. "দেব, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। তুমি তোমার ত্যাগ দিয়ে আমায় জয় করেছ,—আমি তোমার কাছে অনেক দিন আগেই পরাজয় স্বীকার করেছি। উমাকে কোথাও রেখে আমার শান্তি নেই। আমার কাছে যে সে আছে, এতেও আমি শান্তি পাচ্ছি নে, দুর্ভাবনা আমায় শুষে রক্ত খাচ্ছে। কি জানি, যদিই সে সত্য কোনও ক্রমে বেরিয়ে পড়ে! তার সে আঘাতে উমা যে বিবর্ণ হয়ে যাবে,—সে ফুল শুকিয়ে ঝরে যাবে। যে উমা আমার এত প্রিয় ছিল, তাকেই আমি এখন সর্পের চেয়েও বেশী ভয় করি, তার সামনে যেতে আমার বুক কেঁপে ওঠে,—যদি প্রকাশ পায়,—যদি আমারই আঘাতে সে ঝরে যায়! আমি কোথাও তাকে নামাবার মত জায়গা পাচ্ছিনে,—যেখানে রেখে আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।"

সতী গাঢ় স্বরে বলিল, "তাই তো আমিও এসেছি। তোমাকে আমি চিনি, তোমার কিছুই আমার কাছে গোপন নেই। পাছে তোমারই আঘাতে সে ঝরে যায়, তাই আমি এসেছি। তাকে আমি নিয়ে যাব, তোমায় রক্ষা করব, সংসারের আর একটা ভীষণ আঘাত হতে তাকেও রক্ষা করব। সে সংসারের সকলকেই চিনেছে, চেনেনি কেবল তোমায়। যদি তোমার বুকের এ গোপন কথা সে জানতে পারে,—সে ধরায় লুটিয়ে পড়বে, আর তাকে তোলা যাবে না।"

মনীশের মাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া রাজি করিয়া, সে উমাকে রাজি করিতে গেল।

কিন্তু উমা প্রবল বেগে মাথা নাড়িল, একটু হাসিয়া বলিল, "আর আমায় ও-সব ফেঁসাদে টেন না ভাই। লোকের মনের পরিচয় যত না পাওয়া যায় ততই ভাল। আমি মানুষ চিনবার প্রার্থনা করি নে, সংসার আমি যা দেখেছি, তাই আমার পক্ষে চরম দেখা হয়েছে। এখানে আমি বেশ শান্তিতে আছি, আমায় আর ও-সব ঝঞ্ঝাটে নিয়ে যেয়ো না। এ ভাই আমার আপনার লোক, তুমি তো ভাই—"

সে থামিয়া গেল, সতী হাসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "পর—কেমন? পর—কেন না আমি উধার ননদ, মৃন্ময়ের বোন। উমা, বাহির নিয়ে বিচার করতে যেয়ো না,—অন্তর নিয়ে বিচার করলে দেখতে পাবে, আমিও তোমার বড় আপনার। যেমন তোমার মনীশদা, আমিও তাই। মনীশদার কাছে থাকতে পার, আমার কাছে থাকতে পারবে না কেন? তাঁর অর্দ্ধেক শক্তি আমি পেয়েছি, তাঁর সেই শক্তির ওপরে নির্ভর করে আমি তোমায় রাখতে পারব,—সেই সাহসেই আমি এসেছি।"

অদূরে দণ্ডায়মান মনীশের পানে চাহিয়া সে হাসি-মুখে বলিল, "এস না তুমি, তুমি সাক্ষ্য না দিলে তোমার বোন যে মোটে বিশ্বাসই করতে চায় না আমাকে।"

বিস্ময়ে মনীশের পানে চোখ তুলিয়া চাহিয়া উমা বলিল, "মনীশদা—"

বিষণ্ণ কণ্ঠে মনীশ বলিল, "সত্য উমা।"

উমা মাথা নত করিল। যখন সে মাথা তুলিল, তখন তাহার মুখখানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সতীর গলা ধরিয়া সে বলিল, "আমি সব বুঝেছি সতী, আমায় আর কিছু বুঝাতে হবে না। আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি, কারণ, বাস্তবিকই তুমি মনীশদার শক্তি লাভ করেছ। আমি তোমার ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি; কারণ, তুমি তাদের নও, তুমি আমাদের। আমার আর কোন বাঁধন নেই, ঠাকুরমা ছিলেন, তিনিও চলে গেছেন। এখন আমায় যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেখানেই যাব।"

* * *

মনীশ ষ্টেশনে গিয়াছিল সতী ও উমাকে ট্রেণে উঠাইয়া দিতে। উমা তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর মনীশদা, আবার যখন ফিরব, তখন যেন তোমাদের এমনই দেখি।"

মনীশ হাসিল, আশীর্ব্বাদ করিল।

উমাকে উঠাইয়া দিয়া মনীশ সতীকে ডাকিল।

"জানে সতী, আমি আজ কি দিলুম তোমায়?"

তাহার কণ্ঠ তখন কম্পিত হইতেছিল।

সতী বলিল "জানি, আমায় এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার দানের মর্য্যাদা রাখতে পারি, হেলায় যেন এ রত্ন হারিয়ে ফেলি নে। আমার সর্ব্বস্ব তুমি, তোমার ধ্রুবতারা

উমা, সেই উমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। তুমিও জানতে পারছ না—সে আমার কে? সে আমার উপাস্যের উপাস্য, আমার লক্ষ্যের লক্ষ্য, আমার মহাসাধনার ধন। তুমি জানবে কি—আমি তাকে কতটা ভালবাসি, কতটা ভক্তি করি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি তাকে তোমার চেয়েও বেশী আদরে রাখব। তোমার গুপ্ত কথা প্রকাশের ভয় ছিল এখানে, আমার কাছে তা নেই। দাদার সঙ্গেও উমাকে নিয়ে কাল ঝগড়া হয়ে গেছে। দাদা আর এক দিন আমায় রেখে আমার প্রাপ্য এখানকার দুখানা বাড়ী আর তিন লাখ টাকা বুঝে নিতে বলেছিলেন,—আমি বলে এসেছি, আমি তাঁর এক পয়সাও চাই নে। আমার নিজের উপার্জ্জিত যা—আমি তাইতেই খুব খুসী হয়ে থাকব। আমি এই যাচ্ছি—কত কালে ফিরব, তার ঠিক নেই। যদি আমার বিশেষ দরকার পড়ে, তোমায় ডাকব, তুমি যাবে তো?"

রুদ্ধকণ্ঠে মনীশ বলিল, "যাব বৈকি সতী।"

"তবে যাই আমি।"

মনীশের পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া সতী উঠিয়া দাঁড়াইল, ধীরপদে গিয়া ট্রেণে উঠিল।

ধীরে ধীরে ট্রেণ চলিল। যতদূর দেখা যায়, সতী গবাক্ষ-পথে মুখ বাড়াইয়া ছিল,—তাহার পর আর দেখা গেল না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনীশ ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত পদে বাড়ীর দিকে ফিরিল। তখন পথের ধারে একটা বাড়ীতে কে গাহিতেছিল—

চলিয়াছি গৃহপানে খেলাধূলা অবসান,
ডেকে লও, ডেকে লও, অতি শ্রান্ত মন প্রাণ॥

সমাপ্ত

দক্ষিণ জার্ম্মাণি

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ

(১)

ভারতকে পল্লীপ্রধান ও কৃষিপ্রধান দেশ বলা হইয়া থাকে। ভারতীয় পল্লীগুলা গুণ্‌তিতে সাত লাখ বিশ হাজার। ইয়োরোপের সকল দেশের পল্লী একত্র করিলে সংখ্যা সাত লাখ বিশ হাজারের কম হইবে কি না সন্দেহ।

জার্ম্মাণি বাংলা বিহারের চেয়ে কোনো মতেই কম পল্লী-প্রধান এবং কম কৃষি-প্রধান নয়। ব্যাহ্বেরিয়া প্রদেশের লোক-সংখ্যা ষাট লাখ। এই জনপদের বড় শহর মিউনিকে মাত্র লাখ পাঁচেক লোক বাস করে,—আর লাণ্ড্‌সহুটের মতন শহরে পঁচিশ হাজারের বেশী নয়। ফ্রাইজিঙ্‌ শহরের লোক সংখ্যা হাজার দশেক মাত্র। এই সকল শহরকে বড় গোছের পল্লী বলা চলে,—বর্ত্তমান-জগৎসুলভ শহরে মাপকাঠি অনুসারে।

লাণ্ড্‌সহুটের আশে-পাশে যে সকল পল্লী দেখিতেছি, তাহার কোনটায় একশ, কোনটায় দেড়শ বাসিন্দা। হাজার নরনারীর পল্লী, গঞ্জ, "মার্কট্" বা বাজার আঙুলে গুণা সম্ভব। অবশ্য ষ্টাটিষ্টিক্‌স্ করিয়া কথা বলিতেছি না। হাঁটিয়া চোখে দেখিয়া লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করিয়া এইরূপই বুঝিতেছি।

প্রত্যেক পল্লীতেই আর কিছু থাক বা না থাক, একটা করিয়া গির্জ্জা আছেই আছে। আর পাঠশালাও কম-সে-কম একটা দেখিতে পাই। পাকা রাস্তা প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। তবে রোদে ধূলা আর জলে কাদা অনিবার্য্য। বস্তুতঃ বার্লিন, মিউনিক ইত্যাদি মহা-শহরগুলা ছাড়া অন্যত্র জার্ম্মাণরাও ধূলা কাদার সঙ্গে বসবাস করিতে অভ্যস্ত। লাণ্ড্‌সহুটে এই দুইয়ের উপদ্রব অত্যধিক।

(২)

ডোনডোর্ফ পল্লীর "বুর্গারমাইষ্টার" (নগর-শাসক বা পল্লী-শাসক) অনেক পরিমাণ জমিজমার মালিক। টিপি সদৃশ পাহাড়ের পিঠে বেড়াইতে বেড়াইতে ইঁহার ক্ষেতগুলা দেখিতেছি। ছেলেমেয়েরা সঙ্গে আছে।

কৃষাণ মহাশয় বলিতেছেন:—"আমি নেহাৎ আহাম্মুক। দেখিতেছেন এই পল্লীর প্রত্যেক কিষাণের ঘরই নয়া তাজা চকচকে। একমাত্র আমার ঘরবাড়ী যন্ত্রপাতি সবই পুরানা ও সেকেলে। ইহারা বিগত মার্ক-পতনের যুগে

মিউনিকের এক দৃশ্য

টাকাগুলা এই সব নতুন বাস্তুভিটায় ও আসবাব সরঞ্জামে খরচ করিয়া বাঁচিয়াছে। আমি বেকুবের মতন নগদ টাকা জমাইয়া 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' হইয়াছি। টাকা-গুলা ত সবই পচিয়া গিয়াছে। বাড়ীঘরও আমার অতি কদর্য্য।"

এই পরিবারের সম্পত্তির পরিমাণ হইবে প্রায় ছয়শ' বিঘা। ইহার প্রায় এক চতুর্থ অংশ পড়ো। এখানে না চলে চাষ, না গোচারণ। অন্যান্য সমস্ত জমি চাষ করা হয় সপরিবারে, দশজনে মিলিয়া। দরকার হইলে কখনো কখনো একজন বা দুইজন মজুর নিয়োগ করা হয়। বৎসরে না কি প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা আয় হয়। তাহার ভিতর সকল প্রকার খাজনা বাবদ লাগে প্রায় চার শ' টাকা।

(৩)

পঁচাত্তর আশী জন মাত্রের পল্লী। পুরুত ঠাকুর বলিলেন:—"স্বাস্থ্যের হিড়িকে পড়িয়া আমি পল্লীবাসী হইয়াছি। পূর্ব্বে আমার তাঁবে বড় বড় পল্লী বা মাঝারি গোছের শহরের গির্জ্জা শাসিত হইয়াছে।"

পুরুতঠাকুর মাত্রেই জার্ম্মাণিতে সরকারী চাকর। গবর্মেণ্টের দপ্তরখানা হইতে ইঁহাদের বেতন আসে। ডোনডোর্ফের পুরুত মহাশয় বলিলেন:—"আমার মন্দিরের দেবোত্তর আছে আঠার বিঘা জমি। এই জমির আয় আমার বেতনের এক অংশ।"

দেবোত্তরের জমিদারি জার্ম্মাণির কোথাও কোথাও এখনো কিছু কিছু আছে। তবে এই সবের প্রভাব আজকাল বড় একটা নাই। ১৭৯৯ সালের আইনে "সেকুলারিজাট্‌সিয়োন" ঘটিয়াছে। অর্থাৎ মোহন্তদের জমিজমা সরকারে বাজেআপ্ত হইয়াছে। তখন চলিতে-ছিল ইয়োরোপে ফরাসী-বিপ্লবের বোলশেভিক তাণ্ডব।

পুরুতগিরি করা জার্ম্মাণিতে মুখের কথা নয়। কোনো মতে দু'একটা লাটিন মন্তর আওড়াইতে পারিলেই এই নকরি জুটে না। প্রথমতঃ প্রত্যেককে সাধারণ "গিমনাসিয়ুম" নয় বৎসর পড়িয়া "বি-এ" পাশ করিতে হয়। আঠার উনিশ-বিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কেহ এই পরীক্ষায় পাশ হইতে পারে না। তাহার পর পাঁচ বৎসর ধরিয়া ধর্ম্ম-বিদ্যালয়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্ম-বিভাগে মামুলি ছাত্র-ছাত্রীদের মতন লেখাপড়া চালাইতে হয়। পঞ্চম বর্ষের শেষে পরীক্ষায় পাশ হইলে পুরুতগিরির কাজে "শাগ্‌রেতি" করিবার আইনতঃ অনুমতি জুটে। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস প্রধান ভাবে আলোচ্য বিষয় থাকে। প্রাচীন গ্রীস হইতে আধুনিক ইয়োরোপ পর্য্যন্ত কোনো দেশ এবং কোনো যুগই বাদ যায় না। তাহার পর তিন বৎসর খৃষ্টানদের ধর্ম্মসাহিত্য, ধর্ম্ম-শিল্প, দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্ম্মের ইতিহাস, ধর্ম্ম ঘটিত আইন, সমাজ-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়।"

জার্ম্মাণদের এই "পুরোহিত-সর্ব্বস্ব" সম্বন্ধে ভারতীয় পুরুতঠাকুরেরা কি বলিবেন? খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ক দর্শন বলিলে রোমাণ ক্যাথলিকরা টোমাস আকিনাসের মতামত বুঝিয়া থাকে। টোমাস দ্বাদশ শতাব্দীর ইতালিয়ান সাধু।
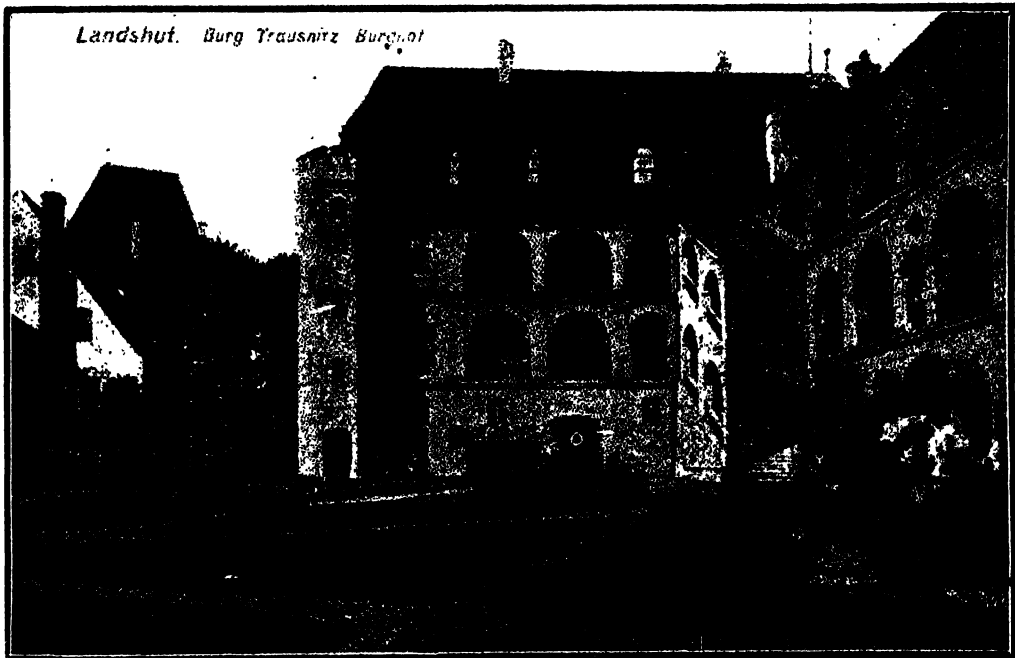
ট্রাউস্‌নিট্‌স দুর্গ (ল্যাণ্ড্‌সহুট)

কিন্তু কোনো গির্জ্জায় পুরাদস্তর পুরুতগিরি করা তাহার পরেও অনেক "সবুর-করা"র এবং ধৈর্য্য ধরার ফল।

ধর্ম্ম-বিদ্যালয়ে কি কি বিষয় পড়িতে হয়? পুরুত ঠাকুর বলিলেন:—"আমি ফ্রাইজিঙের গির্জ্জা বিদ্যালয়ে যেসব শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছি তাহার তালিকা দিতেছি। প্রথম বৎসর ধর্ম্ম সাহিত্যের গন্ধ মাত্র থাকে না। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, আকরতত্ত্ব, জলবায়ুতত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, জন্তু-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি সকল প্রকার প্রকৃতিবিদ্যা লইয়া এক বৎসর ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হয়। তাহার পরের বৎসর স্মার্ত্ত শঙ্করাচার্য্যের নাম উচ্চারিত হইলে বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে যে ধারণা জন্মে, রোমাণ ক্যাথলিক সমাজে টোমাসের প্রভাব সেইরূপ। কবিবর দান্তের সাহিত্যে টোমাসের ধর্ম্মব্যাখ্যা বড় ঠাঁই পাইয়াছিল।

(৪)

আয়ুর্ব্বেদ এবং য়ুনানি মতের চিকিৎসকেরা জার্ম্মাণিতে, অষ্ট্রীয়ায় এবং সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে নিজ নিজ জুড়িদার অনেক পাইবেন। এসকল দেশে ঐ ধরণের চিকিৎসাকে "প্রাকৃতিক চিকিৎসা"—"নাটুর হাইল"

বলে। কবিরাজ, বৈদ্য বা হাকিম মহাশয়েরা "নাটুর হাইল চুণ্ডিগার" অর্থাৎ প্রকৃতি-চিকিৎসাবিৎ নামে পরিচিত।

নয়মার্কট শহরে বা পল্লীতে চার্মাক নামে একজন কবিরাজের পসার খুব বেশী। প্রকাণ্ড দুর্গ সদৃশ নবাবী প্রাসাদে ইহাঁর বসবাস। বৈঠকখানায় লোকের ভিড় যৎপরোনাস্তি। চার্মাক বলিতেছেন :—"যেষামন্যা গতি-র্নাস্তি তারা আসে আমার নিকট। অর্থাৎ নামজাদা পাশ-করা ডাক্তার এবং অস্ত্রচিকিৎসকেরা যখন জবাব দেন তখন রোগীরা শরণাপন্ন হয় আমার। যমের দুয়ার

নয় মার্ক্ট্ পল্লী

হইতে রোগীদিগকে জীবনে ফিরাইয়া আনা আমার ব্যবসা।"

"ঝাড়া, ফুঁকা," "তুক-মুক" ইত্যাদি কিছু দেখিতেছি না। নাড়ী টেপাটিপিও নাই। চোখের রং দেখিয়া ইনি বলিয়া দেন, কবে কোথায় কোন্ হাড়-মাসে কিরূপ দরদ হইয়াছিল। ইহাঁর দ্বিতীয় কৌশল মূত্র পরীক্ষা। ব্যস্। তাহার পরেই অমুক শিকড়, অমুক পাতা, অমুক ফুল ইত্যাদির "টে", কাৎ, বা চা। এক কথায় পাচন।

পাশ-করা ডাক্তারেরা পায় ত চার্মাককে গিলিয়া খায়। তাহাদের ভাত মারা যাইতেছে যে!

(৫)

দারিদ্র্য কাহাকে বলে, জার্ম্মাণ সমাজে কেহ জানে না। এ দেশের "ফোল্‌ক্‌সশুলে" অর্থাৎ অবৈতনিক প্রাথমিক পাঠশালার শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীদের মাসিক বেতন কম-সে-কম ২৪০ মার্ক (১৮০৲)! এই সকল পাঠশালায় জার্ম্মাণির প্রত্যেক শিশু লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য। এই ইস্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ হইলে আমাদের ম্যাট্রি-কুলেশ্যনের সমান পরীক্ষা দেওয়া হয়। বাংলাদেশের ম্যাট্রিকুলেশ্যান ইস্কুলের মাষ্টারদের ভিতর কয়জনে মাস মাস ১৮০৲ পাইয়া থাকেন? জর্ম্মাণির শিক্ষাবিভাগে ইহাই নিম্নতম মাহিয়ানা।

এই সকল ইস্কুলের মাষ্টার হয় কাহারা? "ম্যাট্রি-কুলেশ্যান" পাশ করার পর তিন বৎসর এক নিম্নস্তরের শিক্ষক-বিদ্যালয়ে পড়িতে হয়। তাহার পর আর তিন বৎসর পড়িতে হয় উচ্চতর শিক্ষক-বিদ্যালয়ে। এই ছয় বৎসরের বিদ্যা শেষ হইলে,—অর্থাৎ মোটের উপর আমাদের এম-এ, এম-এস্‌সি বিদ্যার অধিকারী হইলে,

লোকেরা প্রাথমিক বিদ্যাপীঠে মাষ্টারি করিবার সুযোগ পায়। এক কথায় বুঝিতে হইবে,—জার্ম্মাণির প্রত্যেক এন্ট্র্যান্স ইস্কুলের প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী অন্ততঃ পক্ষে এম-এ, এম-এস্‌সি পাশ। আর ইহাদের কেহই ১৮০৲এর কম দরমাহা পায় না।

ইস্কুলমাষ্টারিই হউক অথবা পুরুতগিরিই হউক কিম্বা রেলওয়েতে কেরাণীগিরিই হউক,—প্রত্যেক চাকরি জার্ম্মাণিতে বেতন হিসাবে সমান। বেতনের সিঁড়ি বার বা তের ধাপে বিভক্ত। ২৪০ মার্ক বা ১৮০৲এর ধাপটা সপ্তম ধাপ। কর্ম্মচারীরা, মাষ্টাররা, কেরাণীরা সকলেই

(৬)

রেল আফিসের এক বাবু গিমনাজিয়ুমে বি-এ পাশ করিয়া চাকরিতে ঢুকিয়াছিলেন। বি-এ পাশ করিলেই চাকরি জুটে, এরূপ বিশ্বাস করা ভুল। প্রত্যেক চাকরির জন্য উমেদারকে স্বতন্ত্র ভাবে নতুন বিদ্যা শিখিতে হয়। রেল, তার, ডাক, খাজনা, তথ্যতালিকা, আদালত ইত্যাদি প্রত্যেক কর্ম্মকেন্দ্রের জন্যই "টেক্‌নিক্যাল" বা "কত ধানে কত চাল" বিদ্যা আয়ত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বি-এ পাশের জোরে জার্ম্মাণিতে কেরাণী-গিরি জুটে না। যেদেশে রামাশ্যামা সকলেই

হোফব্রয় হাউস বা বিয়ার ভবন (মিউনিক)

নিজ নিজ বিদ্যা অনুসারে যথানির্দ্দিষ্ট ধাপে ঠাঁই পায়। তাহার পর অভিজ্ঞতা এবং কর্ম্মদক্ষতা মাফিক ধাপের পর ধাপ উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে বেতন বৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। অষ্টম ধাপের বেতন ৪০০ মার্ক বা ৩০০৲। নবম ধাপের বেতন ৪৫০ মার্ক বা ৩৩৬৲ ইত্যাদি।

একদম সর্ব্বনিম্ন বা প্রথম ধাপের বেতন ১০০ মার্ক বা ৭৫৲ অর্থাৎ মাসে পঁচাত্তোর টাকার কমে জার্ম্মাণিতে কেহই নকরি করে না। তবে এত কম মাহিয়ানার লোক জার্ম্মাণ সমাজে আছে কি না সন্দেহ, বোধ হয় ঝাড়ুদার ইত্যাদির বেতন এইরূপ।

বি-এ, বি-এসসি সে দেশে এই সকল পাশের কিম্মৎ কিছুই না।

কেরাণী মহাশয় বলিলেন :—"আঠার উনিশ বৎসর বয়সে বি-এ পাশ করি। তাহার পর এক বৎসর মিউনিকের সরকারী কেরাণী বিদ্যালয়ে চোপর দিনরাত গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া আফিস-বিজ্ঞান শিখি। এই সময়ে খোরপোষের জন্য ৭০।৮০ মার্ক করিয়া পাইতাম। তাহার পর পাঁচ বৎসর প্রাক্‌টিকাণ্ট অর্থাৎ অ্যাপ্রেন্টিস রূপে কাজ। এই পাঁচ বৎসর আমাকে সপ্তমধাপের লোক বিবেচনা করা হইত। কিন্তু বেতন দেওয়া হইত

সপ্তম ধাপের ন্যায্য বেতনের বার আনা মাত্র। অর্থাৎ ২৪০ মার্কের ঠাঁইয়ে আমার জুটিত মাস ১৮০ মার্ক বা ১৩৫৲। শেষ পর্য্যন্ত পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর বয়সে পাকা চাকরি জুটিয়াছে। তখন আমার ধাপ ছিল অষ্টম,—৪০০ মার্ক বা ৩০০৲ মাহিয়ানা।"

দেখা যাইতেছে পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর বয়সের যুবা কাজে "পুরাদস্তুর" বাহাল হইবা মাত্র ৩০০৲ বেতন পায়। কাজেই দারিদ্র্য কাহাকে বলে জার্ম্মাণরা জানিবে কোথা হইতে?

ফ্রাওয়েন কির্চ্চে মন্দির (মিউনিক)

রেল-বাবু বলিতেছেন:—"প্রত্যেক ধাপে প্রায় দশ বৎসর করিয়া কাটিয়াছে। আজ দশম ধাপে রহিয়াছি,—বয়স প্রায় বায়ান্ন,—বেতন ৫০০ মার্ক বা ৩৭৫৲। পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে পেন্‌শন পাইব। তখন বেতন হইবে ৫৫০ মার্ক বা ৪২০৲।"

প্রুশিয়ায় লোকেরা পেন্‌শন পায় ষাট বৎসর বয়সে। ব্যাভেরিয়ায় পেন্‌শনের বয়স পঁয়ষট্টি।

চাকরি সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা দরকার। প্রত্যেক কর্ম্মচারী বিবাহিত হইবামাত্র স্ত্রীর জন্য আলগা মাসিক ১২ মার্ক বা ৯৲ পায়। সন্তান জন্মিবামাত্র প্রত্যেকের বাবদ জুটে আলগা মাসিক ১৫ মার্ক বা ১২৲। সন্তানদের একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীরা এই সন্তান-বৃত্তি ভোগ করিয়া থাকে।

(৭)

এণ্ট্রান্স বা ম্যাট্রিকুলেশ্যনের পর ছয় বৎসর শিক্ষক-বিদ্যালয়ে লেখা পড়া করিয়া প্রাথমিক পাঠশালায় মাষ্টারি করিতে গেলে বেতন জুটে কম-সে-কম ১৮০৲। বি এ, বি-এস্‌সি ডিগ্রী লইয়া বৎসর ছয়েক কেরাণীগিরিতে শাগ্রেদি করিবার পর পাকা নকরি পাইলে ৩০০৲ মাসিক দরমাহা জুটে।

এইবার দেখা যাক,—বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম পরীক্ষায় পাশ হইলে,—অর্থাৎ পিএইচ ডি বা ডক্‌টর উপাধি থাকিলে বেতন জুটে কত? আমার গৃহস্বামী, পোষ্ট ইন্‌স্পেকটর বাবু না ভাবিয়া চিন্তিয়া সোজা বলিলেন:—"দশম ধাপ—৫০০ মার্ক বা ৩৭৫৲।"

মাসিক ৩৭৫৲ পায় জার্ম্মাণিতে কিরূপ লোক? এদেশের "গিমনাজিয়ুম" এবং "রেআল শুলে" নামক দুই শ্রেণীর মধ্যবিদ্যালয়ের প্রত্যেক মাষ্টারই ডক্‌টর অর্থাৎ দশমধাপের কর্ম্মচারী। এই দুই স্কুল হইতে আঠার উনিশ বৎসর বয়সে বি এ, বি-এসসি বাহির হয়।

স্ত্রী-বৃত্তি এবং সন্তান-বৃত্তি বেতনের প্রত্যেক ধাপেই জাতি-বিদ্যা-বয়স নির্ব্বিশেষে জুড়িয়া দিতে হইবে বলা বাহুল্য। ইহার নাম জার্ম্মাণসমাজ। এই সমাজের সঙ্গে টক্কর দেওয়া সোজা কথা নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা কত করিয়া পায়? ইহারা দ্বাদশ ধাপের কর্ম্মচারী। দরমাহা ৭০০ মার্ক বা ৫২৫৲। ইহার কম কোনো অধ্যাপক পায় না। এইখানে আর একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। জার্ম্মাণিতে ছাত্রদত্ত বেতন সমূহ প্রায় সবই অধ্যাপকদের প্রাপ্য। এই প্রাপ্যটা "উপরি" অর্থাৎ সরকারী ৫২৫৲ টাকার অতিরিক্ত। যাহার ক্লাশে যত বেশী ছাত্র, তাহার কপালে টাকা তত বেশী। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, দর্শন, ধনবিজ্ঞান, সাহিত্য, ইত্যাদি বিদ্যা শিখিবার ছাত্রছাত্রী অগণিত। কাজেই এই সকল বিদ্যার অধ্যাপকদের "পায়া" খুব ভারি।

বাংশিল্পী হিল্ডেব্রাণ্ডের গড়া ফোয়ারা (মিউনিক)

ইঁহারা "লক্ষপতি"। আবার এমন অনেক বিদ্যা আছে, যার জন্য ছাত্রছাত্রী জুটেই না। এই সব বিদ্যার অধ্যাপকরা বাঁধা ৫২৫৲ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য।

"গিমনাজিয়ুম," ও "রে আল শুলে" ইস্কুলগুলার প্রিন্সিপাল বা হেড মাষ্টারদের পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সমান। মাসিক ৫২৫৲ বেতন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ্-ডি পাশের পর আর একটা পরীক্ষা দিলে "প্রিফাট ডোৎসেণ্ট" বা সহকারী-অধ্যাপক হওয়া যায়। এই পদের ধাপ একাদশ,—বেতন ৪২০৲।

(৮)

জার্ম্মাণ নরনারীর আর্থিক অবস্থার আলোচনা করিতে গিয়া একটা মস্ত তথ্য নজরে আসিয়াছে। এদেশে ত্রয়োদশ ধাপই বেতনের সর্ব্বোচ্চ ধাপ। সেই ধাপে উঠিলে কর্ম্মচারী, কেরাণী, মাষ্টার, পুরুতঠাকুর সকলেই মাত্র ৮০০ মার্ক বা ৬০০৲ মাসিক পায়। অর্থাৎ ৬০০ টাকার বেশী বেতন জার্ম্মাণ সমাজে জানা নাই। এ এক অপূর্ব্ব আইন।

পোষ্ট ইন্‌স্পেক্টারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম:—"তাহা হইলে যে সব লোক সমর-সচিব, পররাষ্ট্র-সচিব ইত্যাদির পদে মন্ত্রীগিরি করে তাহাদের বেতন কত?"

জবাব:—"মন্ত্রীদের পদ বেতনের সিঁড়ির অন্তর্গত নয়। কেন না তাহাদের সংখ্যা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়। মন্ত্রীরা মাসে হাজার দুই মার্ক অর্থাৎ ১৫০০৲ বেতন পায়। তবে ইহাদিগকে ঠাট বজায় রাখিবার জন্য ঘরবাড়ী, আসবাব, সরঞ্জাম ইত্যাদি সরকার হইতে দেওয়া হয়। বস্তুতঃ সরকারী ইমারতগুলা সবই যথারীতি ফিট ফাট সাজানো থাকে। যেই কোন ব্যক্তি কোন দপ্তরের সচিব বাহাল হয়, তখন সে যথানির্দ্দিষ্ট ইমারতের বাসিন্দা হইতে অধিকারী। কিন্তু মাসিক দরমাহা তাহার ১৫০০৲।"

অতএব জার্ম্মাণ সমাজের প্রথম আর্থিক কথা,—প্রাথমিক পাঠশালার মাষ্টারেরা পায় ১৮০৲ মাস। দ্বিতীয় কথা ৬০০৲এর বেশী বেতন পায় না চরমতম শিক্ষিত লোকেরাও। আর তৃতীয় কথা,—এ দেশে যাহারা রাজ্য চালায়, পল্টন চালায়, আইন চালায় তাহাদের মাহিয়ানা ১৫০০৲এর বেশী নয়।

লক্ষপতি, ক্রোড়পতি হইবার জন্য হাজার হাজার পথ এদেশে খোলা আছে। তেজারতির লাইনে, কৃষিকর্ম্মে, ব্যাঙ্কে, ফ্যাক্টরিতে পুঁজিপতি হইতেছে। লেখক হিসাবে, অভিনেতা হিসাবে, চিত্রকর হিসাবে, গায়ক হিসাবে, এই ধরণের অন্যান্য অসংখ্য হিসাবেও লোকেরা অজস্র টাকা উপার্জ্জন করে।

এই সকল কথা মনে রাখিয়াও সরকারী বেতনের সিঁড়িটা সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে রাখা আবশ্যক। এই সিঁড়ি মাফিকই জার্ম্মাণির মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আর এই সিঁড়ির মূলমন্ত্র এই যে,—নিম্নতম মূর্খতম নেহাৎ আনাড়ি লোকও যেন খানিকটা সুখে স্বচ্ছন্দে শরীরটা বাঁচাইয়া সংসারে চলাফেরা করিতে পারে। জার্ম্মাণ আদর্শ জগতে ছড়াইয়া পড়িলে মানবজাতির দুর্গতি অনেক পরিমাণে ঘুচিবে।

রাইটার পত্নী বলিতেছেন:—"স্বামী আমাদের ব্যবসার মালিক বটে। কিন্তু হিসাব পত্র চলে সবই আমার নজরে। স্বামীর উপর অঙ্কের ভার দিলে এত দিনে কারখানাটা কারখানা-লীলা সম্বরণ করিত।"

"টোন" মাটির বাসন তৈয়ারি করা রাইটারদের কারবার। টোনকে পোর্সলেন বা চীনামাটির মাসতুত ভাই বলা চলে,—মাটিটা কিছু নিকৃষ্ট। ইয়োরামেরিকায় ঘরে বাইরে যে সব থালা বাটি পেয়ালা ডেক্‌চি গামলা দেখিতে পাই, সে সবকে সহজে আমরা পোর্সলেন বলিয়া থাকি। বস্তুতঃ সে সবের শতকরা নিরানব্বুইটা "টোন"। পোর্সলেন দুনিয়ায় একমাত্র পয়সাওয়ালাদের, এবং মধ্যবিত্তদের পোষাকী,—আসবাব।

রাইটার অতি উঁচুদরের সুকুমার শিল্পী। দেশ-বিদেশের লোকেরা ইঁহার হাতের গড়া বাসন কোসন চিমনী চুল্লা লইয়া যায়। "রূপ দক্ষতায়" রাইটারকে প্রথম শ্রেণীর কারিগর বলিতেই হইবে। মিউনিকের শিল্প-বাজারে রাইটারের "হাফ্‌নারাই" বা টোন কারখানার নাম আছে।

রাইটার বলিতেছেন:—"লাণ্ড্‌স্‌হুটের এই বাড়ীটা

'টোন'—শিল্পী রাইটার পরিবার

আমাদের অনেক দিনের বাস্তুভিটা। এই যে ভাটিটা দেখিতেছেন, ইহাতেই আমার পিতামহ প্রপিতামহ সকলেই টোন পুড়াইয়া গিয়াছে। এই ধরণের মান্ধাতার আমলের ভাটি জার্ম্মাণিতে আর একটাও আছে কি না সন্দেহ। আমি ইহাকে পুরানা কায়দায়ই রাখিয়া দিয়াছি। কাঠ পুড়াইয়া আগুন তৈয়ারি করি। নবীনতম ভাটির পরিচালকেরা আমার এই সে-কেলে ভাটির কেরদানি দেখিয়া বিস্মিত হয়। আমার পিতার তৈয়ারি চিম্‌ণী ট্রাউসনিট্‌স ছুর্গের এক ঘরে দেখিতে পাইবেন।"

ছেলেও কারবারে বাহাল আছে। গোটা কারখানায় মাত্র পাঁচটা ছোটখাটো যন্ত্র। একটা মোটরের সাহায্যে যন্ত্রগুলা চালানো হয়। আট জন মাত্র মজুর কাজ করে। খাঁটি পারিবারিক শিল্প হিসাবে রাইটারের কারখানাটায় অনেক কিছু শিখিবার আছে।

রাইটারের মাল ভাটি হইতে পড়িতে পায় না। গরম গরম সবই বিক্রী হইয়া যায়। ইহাঁরা "চোপর দিন রাত"ই খাটিতেছেন। রাইটার বলিলেন:—"মজুরদের বেলায় আইন আছে আট ঘণ্টার রোজ। আমি খাটি প্রায় আঠার ঘণ্টা!" স্ত্রী বলিলেন:—"ইহাই আমার স্বামীর একমাত্র ব্যাধি।"

(১০)

দিনরাত বৃষ্টি পড়িতেছে। সবুজ ইজার ফুলিয়া উঠিয়াছে। জল কিনারা ছাপাইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে "খাল বিল পুকুর পূরিল।" চারিদিকে হাহাকার,—বিষম বন্যা। এই অবস্থা একমাত্র লাণ্ডসহুটেই গণ্ডীবদ্ধ নয়। মিউনিকও ইজারের উপর,—তাহার ছুরবস্থাও এইরূপ। গোটা ইজারতাল জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

লাণ্ডসহুটের সড়কগুলা নদীতে পরিণত হইল। মাঠ ঘাট সবই জলের নীচে। বসতবাড়ীর "কেলার" বা আস্তর্ভৌম প্রকোষ্ঠগুলায় এক হাঁটু বা এক বুক জল। কাজে ভিড়িয়া গেলাম। কয়লা, কাঠ, বাক্স, হাঁড়ীকুঁড়ি সবই "কেলার" হইতে উপরের তলায় তুলিয়া আনিতে লাগিয়া যাওয়া গেল।

হাজার হাজার কিষাণের "পাকা ধানে" সর্ব্বনাশ। মিট্টেনহ্বান্ড অঞ্চলে কোনো কোনো কিষাণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। লাণ্ডসহুট অঞ্চলে রাশি রাশি শস্যের আঁটি ভাসিয়া যাইতেছে। গরু ছাগলের দুর্দ্দশাও যৎপরোনাস্তি।
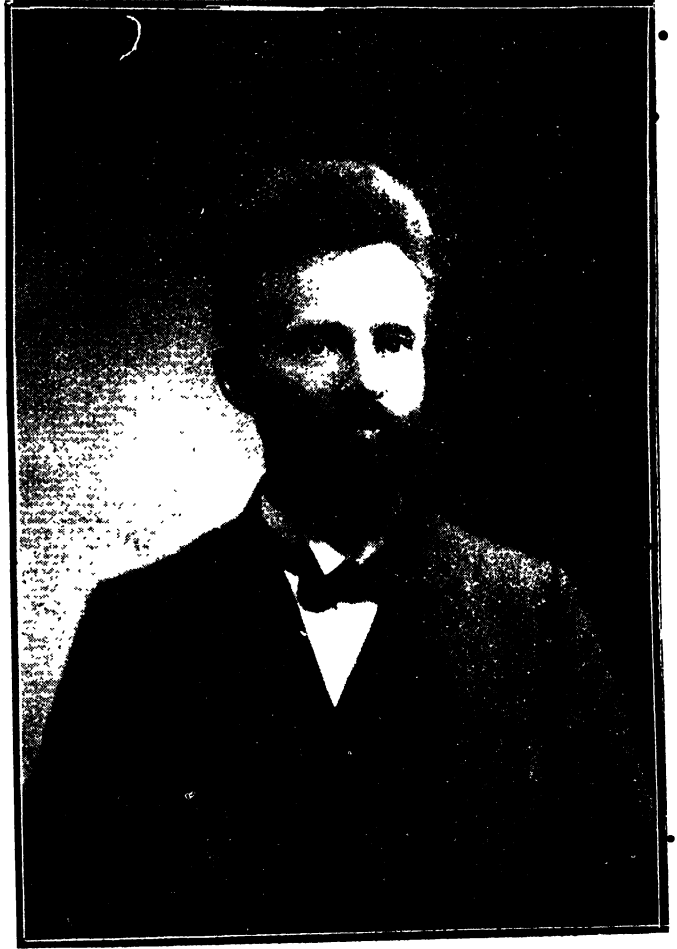
প্রাকৃতিক চিকিৎসক চার্ম্মাক

যাহা হউক,—দৃশ্যটা চমৎকার। ট্রাউসনিট্‌স দুর্গের ছাদে যাইয়া আবেষ্টনটা দেখিতেছি। গোটা জনপদ সাগরে পরিণত হইয়াছে। পল্লীভবনগুলা দূরে দূরে কতকগুলা দ্বীপের মতন দেখাইতেছে। মাঠে মাঠে চলিতেছে নৌকা। মেয়ে পুরুষেরা হাঁটিতেছে জুতা মাথায়

বা ঘাড়ে করিয়া। বন্যার দৌরাত্ম্যে ভারতে এবং চীনেও এইরূপ দৃশ্যই দেখা যায়।

দুই তিন দিনের ভিতরই দুর্দ্দৈব কাটিয়া গেল। দশবিশ বৎসরের ভিতর না কি এমনটি আর লাণ্ডসহুটে ঘটেনাই।

শিক্ষাগুরু কের্শেন ষ্টাইনার
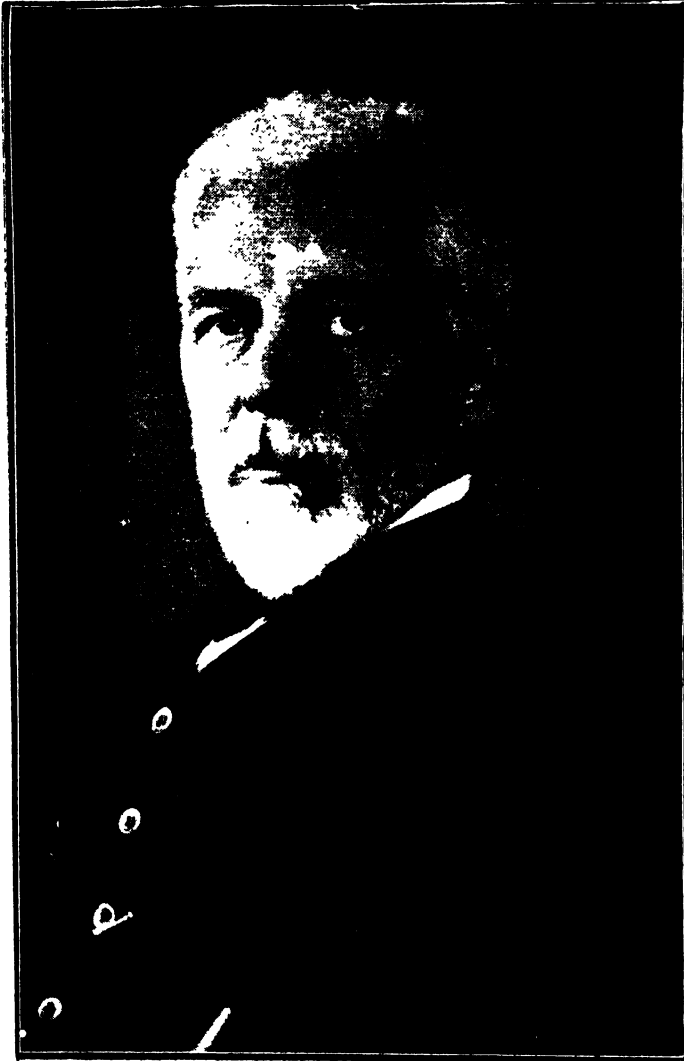
তবে জার্ম্মাণিতে চাষীদের মা বাপ গবর্মেণ্ট। জমিদার নামক অত্যাচারী জীব এদেশে নাই। কোনো নির্দ্দিষ্ট হারে বৎসর বৎসর খাজনা দিতে হয় না। প্রত্যেক বৎসর গবর্মেণ্ট চাষ আবাদের আয় দেখিয়া খাজনার পরিমাণ ঠিক করিয়া দেয়। সেই পরিমাণ ঠিক করিবার সময় প্রত্যেক কিষাণের মাসিক খরচ এবং বার্ষিক আয় লোকসান ইত্যাদি সবই খুঁটিনাটির সহিত আলোচিত হয়। কিষাণ গবর্মেণ্টের নির্দ্ধারিত খাজনার পরিমাণ যুক্তি দেখাইয়া কমাইতে অধিকারী।

(১১)

ব্যাহেবরিয়ায় কিষাণরা কত হারে খাজনা দেয় সেই বিষয়ে কয়েক ঘণ্টা করিয়া খাজাঞ্চিখানায় বড় বাবুদের সঙ্গে বচসা হইল। বুঝিয়া উঠা কঠিন। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করিয়া ত্রৈরাশিকের অঙ্ক কষিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলাম। রামার দলিলপত্র, শ্যামার দেনাপাওনার হিসাব ইত্যাদি অনেক নথি নাড়াচাড়ি করিলাম। প্রায় এক ডজন খাজনার নাম শুনা গেল। প্রত্যেক কিষাণকেই এই সব দিতে হয়।

ধরা যাউক যেন কোনো লোকের ১৫০ বিঘা জমিতে চাষ চলে। তাহার সঙ্গে কাজ করে স্ত্রী এবং চার পুত্রকন্যা আর দুই মজুর। তাহা হইলে সকল প্রকার শস্য এবং জানোয়ার বেচিয়া,—খরচ পত্র বাদে—তাহার মজুত থাকে আজকালকার বাজার দর হিসাবে প্রায় ১,৫০০৲। এই দেড় হাজার টাকার উপর জমি-কর, ঘর-কর, গির্জ্জা-কর, পল্লী-কর, জেলা কর, ব্যবসা-কর, আয়-কর ইত্যাদি সকল প্রকার করের সমবেত পরিমাণ প্রায় ১৫০৲। বাকি থাকে ১৩৫০৲। এই টাকায় কিষাণের বার্ষিক ভরণ-পোষণ হয়।

কম-সে-কম দেড়শ বিঘা জমি যে কিষাণের নাই, তাহার পক্ষে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করা এদেশে সম্ভবপর নয়। অন্ততঃ ছয়শ বিঘা জমি যার তাহাকে জার্ম্মাণরা "গুট্‌স্ বেসিট্‌সার" অর্থাৎ ইতালিয় বা ভারতীয় জমিদার জাতীয় লোক বলে। কিন্তু জার্ম্মাণ জমিদার কোনো রাইয়তের বা প্রজার মালিক বিশেষ নয়। সেও এক কিষাণ,—বড় গোছের

কিষাণ। নিজ হাতে জমি চষা তাহার কোষ্ঠিতে অবশ্য লেখে না। কিন্তু সে লোক লাগাইয়া চাষ আবাদ, পশুপালন, তদবির করিয়া অন্নসংস্থান করিতে বাধ্য। যদি সে দুর্ভাগ্য ক্রমে কুঁড়ে অথবা মুখ্খু হইয়া জন্মে, তাহা হইলে একমাত্র জমির মালিক হওয়ার দরুণ তাহার পেট ভরিবার সম্ভাবনা নাই। শিল্পপতি, ব্যাঙ্কপতি, ব্যবসায়ী ইত্যাদির মতন "গুট্স বেসিট্সার" বা জার্ম্মাণ জমিদারকে মাথা খাটাইয়া "আট দশ ঘণ্টার রোজ" চালাইয়া হাজারপতি বা লক্ষপতি হইতে হয়। বাঁধা খাজনা [ভোগ করা জার্ম্মাণিতে জমিজমার মালিকদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য নয়।

ম্যালেরিয়ায় ভোগা দক্ষিণ জার্ম্মাণিতে অজানা সামগ্রী। এই কারণেই ব্যাহ্বেরিয়ার চাষী-সমাজে বোল্শেহ্বিকীর দন্তস্ফুট অসম্ভব।

(১২)

ফ্রানৎস্ কাউপ মিউনিকের এক যুবা চিত্রশিল্পী। লাণ্ড্সহুটের লোরেটো মন্দিরের অভ্যন্তর চিত্রিত করিবার কাজে ইনি মোতায়েন আছেন। ইঁহার সহকর্ম্মী আর একন যুবা চিত্রকর।

ফ্রান্সিস-পন্থী পুরোহিতদের সঙ্গে মন্দির পরিদর্শন করা যাইতেছে। মই ভাঙিয়া মাচাঙের উপর উঠিলাম। কাউপ বলিলেন:—"দেখিতেই পাইতেছেন দেওয়ালটার
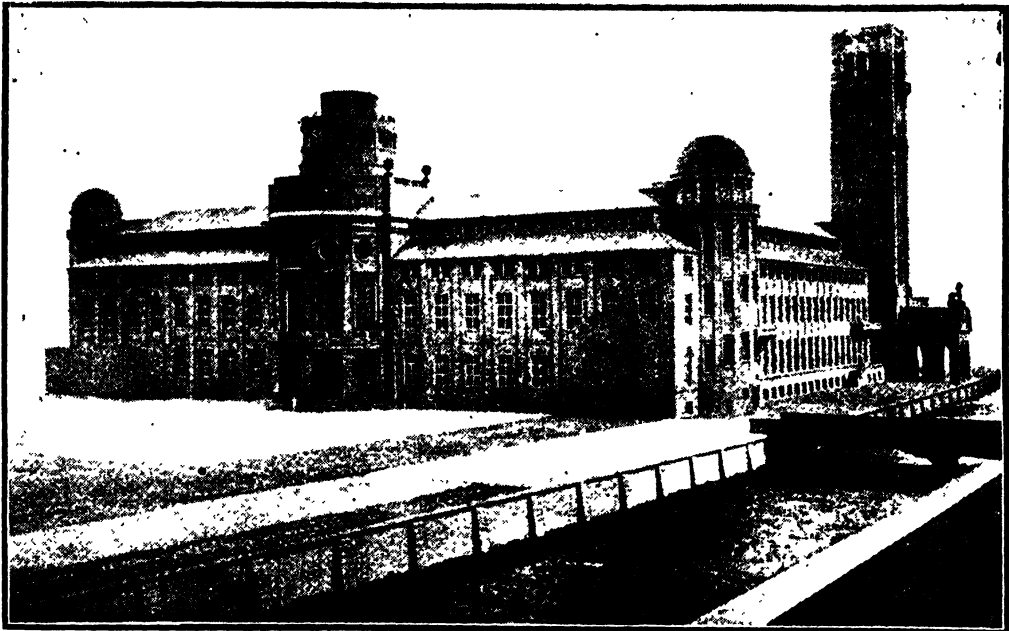
ডায়চেস মুজেয়ুম (মিউনিক)

একশ দেড়শ বিঘার কম জমি যাহাদের তাহারা নিজ চাষ আবাদ সারিয়া অন্যান্য ভূমিপতিদের নক্রি করিতে লাগিয়া যায়। কিষাণদের ক্ষেতে যে সকল মজুর দেখিয়াছি, তাহারা সাধারণতঃ ত্রিশ পঞ্চাশ বিঘা জমির মালিক। কিন্তু ত্রিশ পঞ্চাশ বিঘার মালিকেরা আর্থিক হিসাবে স্বরাজী নয়। এই জন্যই পরের কাজে গতর না খাটাইলে তাঁহাদের চলে না।

ব্যাহ্বেরিয়ায় স্বচ্ছল স্বরাজী কিষাণদের সংখ্যা অনেক। কর্জ্জে ডুবিয়া যাওয়া, অনাহারে মৃতপ্রায় হওয়া অথবা

উপর লেপা পুছা এক প্রকার শেষ হইয়াই আসিয়াছে। ছাদের কাজ কিছু কিছু বাকি আছে। কাজে হাত দিবার পূর্ব্বে প্রথমে একটা নক্সা তৈয়ারি করিয়াছিলাম।" সেই নক্সাটা ভিন্ন ভিন্ন কাগজে দেখা গেল।

নক্সা মাসিক ছবি আঁকা হইয়াছিল পরে,—দেওয়াল ও ছাদের আকার প্রকার সদৃশ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাগজে। সেই সকল কাগজ দেখাইয়া কাউপ বলিতেছেন,— "দেওয়াল ও ছাদের উপর কাগজ রাখিয়া ছবির রেখায় রেখায় দাগ টানিতে হয়। সেই দাগগুলা দেওয়াল আর

ছাদের উপর চিত্রের জমিন তৈয়ারি করে। তাহার পর রংয়ের খেলা।"

আঁকা হইতেছে ধর্ম্মের কাহিনী—বলাই বাহুল্য। একটা দেওয়াল আরও আধখানা ছাদ লেপিতে লাগিতেছে মাস তিনেক। যুগারা মোলায়েম বর্ণসমাবেশে সুপটু। মূর্ত্তিগুলা সাজাইয়াছেও অতি সুচারুরূপে। সমগ্র রূপাবলীর ভিতর একটা সামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কাউপের বন্ধু বলিলেন,—"আমরা ইহার পূর্ব্বে আরও দুই চারটা মন্দিরে কাজ পাইয়াছি। আগামী সেপ্টেম্বার মাসে (১৯২৪) আমরা আমেরিকায় যাইতেছি। সেখানে সেইন্ট লুই সহরের এক গির্জ্জায় আমাদের ডাক পড়িয়াছে।"

(১৩)

অনেক দিন মফঃস্বলে কাটাইবার সময় মাঝে মাঝে সহরে আসিলে লাগে মন্দ নয়। লাণ্ডসহুটে মাত্র হাজার ত্রিশেক লোক। ইহাকে আজকালকার নজরে পল্লীর সামিলই বিবেচনা করিতেছি। কিন্তু মিউনিককে আর মফঃস্বল বলা চলে না। সবই এখানে বিপুল। লাখ দশেক নরনারীর কোলাহল।

ব্যাহ্বেরিয়ার স্বদেশী নাম বায়ার্ণ্। মিউনিককে প্রশিয়ানরা বলে মিন্‌খেন। ব্যাহ্বেরিয়ানদের উচ্চারণে মিন্‌চেন।

গোটা জার্ম্মাণির লোকসংখ্যা আজকাল ছয় কোটি। তার দশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ যাট লাখ লোক বাস করে ব্যাহ্বেরিয়ায় বা দক্ষিণ জার্ম্মাণিতে। ব্যাহ্বেরিয়া এই হিসাবে অষ্ট্রিয়ার সমান,—সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের দেড়া,—আমাদের ভারতীয় চার পাঁচটা জেলার অনুরূপ। এক মিউনিক সহরেই ব্যাহ্বেরিয়াণ-জার্ম্মাণদের ছয় ভাগের এক ভাগ জীবন ধারণ করে। মিউনিক জার্ম্মাণ জীবনের এক মস্ত আড্ডা।

দোকানপাটগুলা নয় হাউজার আর কাউফিঙার ষ্ট্রাসেতে যারপরনাই জাঁকজমকপূর্ণ। শ্বোআবিঙ্ মহাল্লার বাস্তুগুলা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপনের প্রতিমূর্ত্তি। ইজার দরিয়ার দুই কিনারায় সবুজ বাগানের পাশে পাশে সড়কসমূহ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সাজাইয়া রাখিয়াছে। "রেসিডেন্‌ৎস" বা রাজবাড়ী, "রাটহাউস" ইত্যাদি সরকারী বাড়ী, এবং অন্যান্য বসত বাড়ী, সবই নিরেট সৌকুমার্য্যময় ইমারত।

যে পাড়ায়ই যাই,—মনে হইতেছে যেন হ্বিয়েনায় বা প্যারিশে রহিয়াছি। একটা ছোট খাটো প্রদেশ মাত্রের বড় শহর বোধ হইতেছে না। মিউনিক যদি গোটা জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের রাজধানী হইত, তাহা হইলেও জার্ম্মাণ জাতির ইজ্জত নষ্ট হইত না। যাঁহারা বার্লিন দেখিবার পূর্ব্বে মিউনিকে পদার্পণ করিবেন, তাঁহারা ভুলিয়া এই শহরকে ছয় কোটি নরনারীর রাষ্ট্রকেন্দ্র বিবেচনা করিলে দোষ হইবে না।

জ্ঞানমণ্ডলের প্রতিষ্ঠানসমূহ মিউনিকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত। মিউজিয়ামে মিউজিয়ামে "ধুল পরিমাণ"! লুড্‌হ্বিগষ্ট্রাসেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাড়া বলা চলিতে পারে। শহরের আর একটা পাড়া জুড়িয়া চিকিৎসাবিভাগের ল্যাবরেটরি, হাসপাতাল ইত্যাদি অবস্থিত। মিউনিকের টেক্‌নিশে হোখশুলে জার্ম্মাণিতে অতি প্রসিদ্ধ।

স্যাক্‌সন নগর ড্রেসডেন যেমন রেণাসাঁস গড়নে ভরপুর, ব্যাহ্বেরিয়ান নগর মিউনিকও সেইরূপ। বাস্তু রীতির তরফ হইতে প্যারিস, হ্বিয়েনা ও মিলান যে শ্রেণীর অন্তর্গত, মিউনিকও সেই শ্রেণীর শহর। কোনো কোনো ইমারত ঠিক যেন হ্বেনিস হইতে সশরীরে উপড়াইয়া আনা হইয়াছে। বার্লিনের রীতি অথবা জার্ম্মাণি-প্রসিদ্ধ "গথিক" ঢঙ মিউনিকে অতি বিরল। কিছু বিস্মিত হইতেছি।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দুনিয়ায় যে সকল নতুন শহর গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটায়ই রেণে-সাঁসের প্রভাব পড়িয়াছে। প্যারিস, হ্বিয়েনা, মিউনিক ইত্যাদির ত কথাই নাই,—ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম প্রত্যেক জনপদেই ইতালিয়ান রেণেসাঁস কোনো না কোনো আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

মিউনিকের যা কিছু বাস্তুগৌরব, সবই উনবিংশ শতাব্দীর চিহ্ন। ব্যাহ্বেরিয়ার "বিক্রমাদিত্য" লুড্‌হ্বিগ (১৮২৫—৪৮) নামজাদা বাস্তুশিল্পী স্থপতি ও চিত্রকর বাহাল করিয়া নগরের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার আমল হইতে প্রিনজরেগেণ্ট লুইটপোল্ড (১৮৮৬-১৯১২) পর্য্যন্ত মিউনিকের দরবারে "নবরত্নের সভা" লাগিয়াই ছিল।

উদাসী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

হে উদাসি !
তুমি বল হাসি
"এ ধরার
"ঐশ্বর্য্য সম্ভার
"সবই না ত্যজিলে কভু
"জীবনে বাঞ্ছিত বর নাহি দেন প্রভু"।
বুঝিব কি তবে,
বিসর্জ্জিতে হবে
যাহা কিছু কাম্য, যাহা কিছু প্রিয় ভবে ?
এই যদি সত্য হয়, তবে
বল কেন রত্নাকর
ধরে রত্ন থরে থর !—
প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার যদি সবই মিছে মায়া,
কেন তবে এ সৌরভ, গীতি, আলো, ছায়া ?
মুঞ্জরিত সুষমার রাশি,
কেন বা প্রকৃতি হাসে আলো করা হাসি ?
দুহাতে বিলোনো তাঁর অফুরন্ত সম্পদ্ ভাণ্ডার !
বর্ণে, গন্ধে,
গানে, ছন্দে,
ফলফুলে সবুজের প্রান্তর, কান্তার,
অরণ্যানী নানা রঙে রাঙিয়া বিরাজে—
যেন দেবী তৃপ্ত নন নানারূপ মাঝে
আপনারে বিলাইয়া নিতি নব সাজে
রূপে ঢল ঢল
সৌন্দর্য্য-বিহ্বল
নারী সম নিত্য কেন প্রসাধন তাঁর
যদি সবই মিছে ইহা, যদি বৃথা এ জীবন-ভার !
যদি এ জগৎ মাঝে সাধনার, সত্যের মিলন
হয় অঘটন,
তবে কেন প্রকৃতির এ বিরাট অপচয় করে মুগ্ধ মন ?

কেন তবে যুগ যুগ ধরি এই দুঃখ-তাপ ভার
রোগ শোক নিরাশার
গুরুভারও স'য়ে শ্লথ চরণবিক্ষেপে চলে ক্লান্ত দেহী আর ?
যদি এ জগৎ মায়া, কেন তবে আজিও সে হাসে ?
কেন ঢালে সুধারাশি কুসুম সুবাসে,
মলয় বাতাসে,
সদাই অবোধ মন হয় আত্মহারা !
কেন তবে আসা এ জগতে ! যদি শুধু পথহারা
চলে লক্ষ লক্ষ হিয়া অন্তরের নিভৃত কামনা
অপূর্ণ বাসনা
শত শত
দীর্ঘশ্বাসি চাপি অবিরত
তবুও বিদ্রোহী প্রাণ তার
কেন বল জপে বার বার :—
"আছে আশা ; সত্য—শুভ ; দুঃখ কভু নহেক চরম,
"যাহা কিছু দৃশ্যমান তার অন্তরালে আছে মঙ্গল পরম।
"করুণানিধান কোনও কর্ণধার
"করিবেন পার
"জীবনের দিশেহারা এ পাথারে
"অন্বেষু সবারে।
"যদিও না বুঝি আজ
"মহারাজ,
"তোমার এ রচনার অন্তর্গূঢ় সুর,
"যেন তবু তার রেশ,
"নিখিলেশ,
"স্বপ্ন সম
"চিত্তে মম
"ভেসে আসে মাঝে মাঝে মঙ্গল মধুর
"সে উদাত্ত তানে
"ছন্দে শিল্পে গানে

"বীণার ঝঙ্কারে আর স্নেহ, প্রেমে প্রাণে
"নানা স্রোতে আনে
"ভাসায়ে যখন
"চির পুরাতন
"কোনও দূর অতীতের চরম মধুর স্মৃতি,
"এক অসমাপ্ত গীতি ;
"হারায়েছি যদি শেষে
"আজি সে সুরের রেশে
"সে কেবল আমি আজ বিগত বৈভব
"বিহীন-সৌরভ
"হৃতধন
"এ কারণ"
—এই কথা বলে খিন্ন মন।

সে বিস্মৃত সুর
উজ্জ্বল মধুর
আর কি গো না বর্ষিবে শান্তি বারি
হতাশারই
মাঝে মম দিশেহারা অন্তরেতে আজ,
কহ মহারাজ !
এই কি গো সৃষ্টির মহান্
গরীয়ান্
নিগূঢ় চরম অর্থ ? অবোধ পরাণ
তবে কেন মানিতে না চাহে
বলে 'নহে নহে' অন্তর্দাহে ?
কেন বা সে কাণে মম বলে বার বার :—
"জগতের মাঝে সাধনার
"আছে পথ, আছে আছে শুধু আবিষ্কার
"করিবার অপেক্ষায় মাত্র আছে ব'সে
"আছে মোর মানসী প্রতিমা আছে চেয়ে অনিমেষে
"মোর পানে যুগ যুগ ধরি
"আমারেই বরি
"নির্ম্মাল্য চন্দনে স্নাত সস্মিত আননে
"আছে যেন শুধু মোর চিনিবার প্রতীক্ষায়, যবে অন্য মনে
"আমি খুঁজিতেছি এই অকূল পাথারে
"সে ধ্রুব তারারে,
"যার মধু স্পর্শে মোর মন-প্রাণ সমগ্র অন্তর
"উঠিবে গো উছসিয়া যবে দেবে বর
"তাহার কল্যাণ কর ;
"রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেইদিন এ চাওয়ার হবে সমাধান
"মুহূর্ত্তেক মাঝে" – বলে প্রাণ।

কিন্তু মোর বৃথা বৃথা আশা এ সকল,
আকাশ-কুসুম সম
নির্মম
সকলই বিফল ?
কে বলিবে ? কে বলিবে
চাহিলে মিলিবে ?
সৃষ্টির আদিম কাল হ'তে
এ জগতে
বহু উচ্চ প্রাণ হয়ে গেছে নিষ্পেষিত
নিয়তির অবোধ্য নিহিত
নিষ্ঠুর ও কৃপা-হিম ব্যঙ্গ হাস্যে আর
পদে পদে মানুষের শত ভাঙাগড়া সবই করি একাকার।
হে নিয়তি ! নিরদয় !
এ বিরাট্ অপচয়
সত্যই কি অর্থহীন,
সবই শূন্যে হবে লীন !
সত্যই কি বৃথা হবে অন্তর্গূঢ় আশা
যাহারে যতনে পালি
হৃদয়ের রক্ত ঢালি
আসিয়াছি এতদিন, শুধুই হতাশা
পরিণাম সব আশা ভরসার ?
সবই কি গো হাহাকার ?
এ জগৎ মরীচিকা
অথবা এ প্রহেলিকা
নিদাঘের তপ্ত বক্ষে বর্ষিবে না কভু কি গো সুস্নিগ্ধ আসার ?

তুমি কহ হাসি
হে উদাসি :—

"সমাধান চাও যদি ত্যজ এ সংসার
"দুঃখের আধার,
"শোন তবে মূঢ় নর বাণী এ আমার।
"মায়াময় সহস্র বন্ধন আর আকুল কামনা
"নিহিত বাসনা
"বাধা দেয় শান্তিলাভে তব ; তাই বৃথা এ কল্পনা
"পরিণামে হবে সবই ব্যর্থ এ জল্পনা
"বৃথা আশা তাই ; তবে নূতন আলোক
"চাহ যদি ত্যজ এই অসার নির্ম্মোক।
"পরম তত্ত্বের অন্বেষণ
"দুর্লভ সে ধন,
"মেলে এক নিরালায়
"অরণ্যানী স্নিগ্ধচ্ছায়
"যেথায় বিরাজে
"নিবিড় আঁধার মাঝে
"সেই প্রাণারাম
"নিত্য অভিরাম
"শাশ্বত সুন্দর
"চির মনোহর
"মানবের হৃদয়ের মানসী প্রতিমা,
"যাঁহার মহিমা
"যুগে যুগে গেয়েছেন ত্যাগী ঋষি কবি,
"যে নির্ম্মল ছবি
"উদাসিয়া আসিয়াছে যুগে যুগে প্রেমিক মানবে
"যাঁহারা লভিয়াছেন বিধাতার কৃপা এই ভবে।
"না সম্ভবে
"এই স্বার্থমগ্ন ঈর্ষা-কোলাহল রবে
"মহিয়সী কল্পনার রাজ্যে বসে ; তবে
"কেন মিছে সে প্রয়াস
"কেন সদা দীর্ঘশ্বাস
"আশা-ভঙ্গে ঈপ্সিত-বিয়োগে
"রোগ শোক ভোগে ?
"বৃথা হেথা অন্বেষণ মানসী প্রতিমা
"যখন এ সীমা
"সান্তের রাজ্যেতে তারে পাওয়া শুধু আকাশ-কুসুম,
"বৃথা খোঁজ এ সংসারে তাহা'র মিলন সব ভ্রম ভ্রম ভ্রম।"

সত্যই কি এই সমাধান
হৃদয়ের চিরন্তন প্রশ্নের মহান্ ?
কেমনে বা কহি, হে উদাসি,
ভ্রান্ত তুমি, আলেয়া অন্বেষু! যবে দেখি দুঃখরাশি
তোমারে স্পর্শিতে নাহি পারে,
এ সংসারে
যা কিছু ঈপ্সিত তাহা তুমি ঠেল পায়
নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে অবজ্ঞায়
যাহা রাজেন্দ্রেরও কাম্য, তারে তুমি তৃণসম দলি
যবে যাও চলি
প্রশান্ত আননে—যবে দাও তুমি বলি
জীবনে যা কিছু প্রিয় আদর্শের পায়,
নিন্দাস্তুতি সমজ্ঞান, না ভ্রূক্ষেপি তায়,
তখন কেমনে কহি তুমি শুধু মরীচিকা পানে
বিকল পরাণে
ধাবমান ভাঙাহাল
ছিন্নপাল
তরীখানি প্রায়,
সত্যের পরশ বিনা কভু কি গো সবই ছাড়া যায় ?
নহিলে এ অন্তরের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা কি কভু
রোধ করা যায় সদা ?—নহে নহে প্রভু !

তবু কি গো তব মনে সংশয়ের ছায়া
পড়ে নাকো কভু এসে ?—যদি সবই মায়া,
তবে তব মনে কি গো সন্দেহ না জাগে—
তোমার সাধনা হ'ত সম্ভব কি আগে
শত শত ব্যথাতুর
বিয়োগ-বিধুর
ক্লান্তিভারে অবনত অশ্রুপ্লুত নরনারী যদি
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে সংসারেরে নিত্য নিরবধি
যতনে না পালিত গো সবে ;
যদি এই ভবে
জননী সন্তান-স্নেহ দিত বিসর্জ্জন
দুহিতা কলত্র পুত্র হয়ে আনমন
করিত বৈরাগ্য-চর্চ্চা ; তবে কি গো তুমি

তব চির-আকাঙ্ক্ষিত মানসী-প্রতিমা তরে এই মর্ত্ত্যভূমি
এই সাধনার স্থানে লভিতে জনম
পাইতে সে মোক্ষ, যাহা বল তুমি জীবনে চরম
বহু সাধনার ধন
শৈশবে কখন
হয় না যে ধন লাভ আসি এই ভবে
বহু যত্নে তবে
এ জীবন-সঙ্কিপথে
সত্যের দরশ হয় সম্ভব জগতে।
তাই ভাবি আমি
হে সৌম্য নিষ্কামি!
তব মনে
জেগেছে কি না জেগেছে বারেকও জীবনে
উৎকণ্ঠা সংসারী তরে
যারা সদা মোহ ভরে
অন্ধ; যারা কহে সবে—'সামান্য মানব'
কিন্তু তবু যাহাদের
স্নেহ কোল প্রসাদের
দান বিনা জীবন সাধনা তব
হ'ত না সম্ভব
এ চিন্তা কি প্রভু
মনে তব সংশয়ের রেখাপাতও করে নি'ক কভু?

না না কভু নহে,
বিধি যদি রহে
যদি মানবের
হৃদয়ে স্নেহের
প্রীতির নির্ঝর
কলকণ্ঠস্বর
রঙীন আশার
মায়া মমতার
শত বিয়োগের মাঝে প্রণয়ের পুরে
সান্ত্বনার সুরে
নিভৃত অন্তরে
লহরে লহরে
শান্তি উৎস নিরন্তর করে গো বিরাজ
যদি জীবনের হাটে শত কর্ম্মকাজ
দেয় ব্যথা—দেয় না কি সার্থকতা তবু?
অনন্ত বেদনামাঝে অশ্রুধারা কভু
নাহি আনে
কি গো প্রাণে
তৃপ্তির পরম সুর
প্রেমের নূপুর-
ধ্বনি সুমধুর—
নহে কি গো উদাত্ত গম্ভীর তার বাণী?
যার স্পর্শ আনি
বাজায় এ হৃদে নিত্য প্রশান্ত রাগিণী?
যাহার সজল সুর
বিয়োগ-বিধুর
জীর্ণ প্রাণে তপ্ত ভালে বুলায় সে কোমল পরশ
যাহার আভাষে
প্রাণে আসে
শত ব্যথা মাঝে সুখ বিষাদের মাঝেও হরষ
রুদ্র বৈশাখের মাঝে আশীষে যেমতি
জলদের নির্ম্মল বরষ

বিবিধ-প্রসঙ্গ

প্রেততত্ত্ব (Spiritualism)

শ্রীচণ্ডীদাস মজুমদার বি-এ, বিদ্যারত্ন, সাহিত্য-ভূষ.

অধুনা ইয়োরোপে ও আমেরিকায় প্রেততত্ত্বের বিশেষ চর্চ্চা হইতেছে। পরলোকতত্ত্ব বা প্রেততত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা ভারতবর্ষের পক্ষে নূতন জিনিস নহে। পুরাকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উক্ত বিষয়ে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন—হিন্দুশাস্ত্র তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সম্প্রতি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সাধারণ হিন্দুর আধ্যাত্মিক বিষয়ে ঔদাসীন্য বা অনাস্থা জন্মিয়াছে; এমন কি, অনেক হিন্দু পরলোকে বা প্রেতযোনির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু, পাশ্চাত্য জগতের মনীষিগণ আজ হিন্দুর নিজস্ব সম্পত্তির অধিকারী হইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতেছেন; এবং আমরা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহা অবলোকন করিতেছি।

বিগত মহাযুদ্ধ পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিকতা জাগাইয়া দিয়াছে; এবং তাহারই ফলে আজ ইংলণ্ডে Conan Doyle, Sir Oliver Lodge, W. T. Stead, প্রভৃতি মনীষিগণ প্রেততত্ত্বের আলোচনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, পরলোক আছে—আত্মা অমর, এবং মৃত ও জীবিতের মধ্যে কথোপকথন (Communication) সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, অচিরেই পরপারের যবনিকার উত্তোলন সম্ভবপর হইবে এবং মানব-নেত্রের সমক্ষে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব, অন্তহীন জগৎ প্রকটিত হইবে।

প্রেততত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, প্রধানতঃ দুইটি উপায়ে জীবিত ও মৃতের মধ্যে কথোপকথন সম্ভব হইতে পারে—(১) সম্মোহন বিদ্যার (Hypnotism ও Mesmerism) সাহায্যে ও (২) Automatic writing বা অনিচ্ছা-প্রসূত লিখনের সাহায্যে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি দ্বিতীয় উপায় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

আমি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম automatic writing সাধনায় প্রবৃত্ত হই। নির্জ্জনে বসিয়া কোনও মৃত আত্মীয়ের বিষয় ১৫।২০ মিনিট কাল গভীর ভাবে চিন্তা করিতাম। ৫।৭ মিনিট পরে দক্ষিণ হস্তের নিম্নাংশ যেন খুব ভারী বোধ হইত এবং উক্ত হস্তস্থিত পেন্সিল আস্তে আস্তে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইত। আহূত প্রেতাত্মাকে কোনও প্রশ্ন করিলে, তাহার একটা উত্তর কাগজের উপর লিখিত হইত—কিন্তু তাহা এত অস্পষ্ট যে, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পড়া যাইত না। প্রায় ২ মাস কাল অভ্যাসের পর দেখা গেল যে ৪।৫ মিনিটের মধ্যেই পেন্সিল সঞ্চালিত হইতেছে, ও লেখা একটু চেষ্টা করিলেই পড়া যাইতেছে। তখন আমি আমার সঙ্গে ২।৩টি আত্মীয়কে লইয়া spiritual circle বা আধ্যাত্মিক চক্রে বসিতে আরম্ভ করিলাম। ৩।৪ জনে চক্রাকারে উপবেশন করিতাম; আমার হাতে পেনসিল থাকিত, উহা দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলীর সাহায্যে খুব আলগা করিয়া ধরিতাম। [illegible] চক্ষু মুদিত করিয়া প্রেতাত্মার চিন্তা করিতাম—আমার সঙ্গীগণও ঐরূপ করিতেন। ৩।৫ মিনিটের মধ্যেই প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইত এবং পেন্সিলটি সবেগে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইত। প্রেতাত্মা [illegible] নাম লিখিবার পর তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইত। প্রথমে আত্মীয়গণের আত্মা—পরে বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি দেশের মহাপুরুষগণের আত্মাকে আহ্বান করা হইত। একটা বিষয় আমরা [illegible] [illegible] করিতাম যে, উত্তরগুলি আহূত আত্মার শিক্ষা, দীক্ষা ও চরিত্রের সম্পূর্ণ উপযোগী হইত—অনেক সময়ে ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গীর সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতাম। ক্রমশঃ আমাদের মনে একটা সন্দেহ হইল যে, হয় তো মিডিয়মের পূর্ব্বচিন্তা বা অর্জিত জ্ঞান তাঁহার অজ্ঞাতসারে হস্ত হইতে কোনও রূপে নিঃসৃত হইতেছে, এবং প্রশ্নগুলির উত্তর মিডিয়মের আন্দাজ-মত হইতেছে। আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন যে মিডিয়মের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত [illegible] [illegible] ব্যক্তি সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নের ঠিক উত্তর পাইলে, অনেকটা [illegible] হয়। কিছু দিন পূর্ব্বোক্ত রূপ প্রশ্ন করা হইল, কিন্তু [illegible] [illegible] পাওয়া গেল না। এক দিন রাত্রি কালে আমার এক [illegible] বলিলেন যে, কোনও মৃত জ্যোতিষী বা [illegible] [illegible] [illegible] আহ্বান করিয়া আমাদের ভাগ্য গণনা করা হউক; [illegible] [illegible] ভবিষ্যতের কথা মিলিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে [illegible], ব্যাপারটার মধ্যে কিছু সত্য আছে। এই প্রস্তাব অনুসারে এক দিন আমাদের বংশের জনৈক কৃতবিদ্য আত্মীয়ের আত্মাকে আহ্বান করিয়া প্রশ্ন করা হইল—"আপনি পাশ্চাত্য জগতের তিনজন প্রধান মৃত জ্যোতিষীর নাম করুন, আমরা তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে চাই।"

উত্তর হইল—(১) John Murray of Scotland, (২) Lineas Lacheses of Belgium (৩) Von [illegible] of Germany। আমরা তৎক্ষণাৎ John Murray-কে [illegible] আহ্বান করিলাম। তিনি আসিয়া বলিলেন—"আমি একজন Palmist, এই কথা শুনিবামাত্র আমাদের মধ্যে একজন হাত পাতিয়া বসিলেন; মিডিয়ম চক্ষু মুদিত করিয়া পেন্সিল ধরিলেন—অন্যান্য সকলে প্রেতাত্মার নাম চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রেতাত্মা ইংরাজীতে লিখিতে লাগিলেন প্রশ্নকর্ত্তার চরিত্রের বিশেষত্ব, সাংসারিক উন্নতি, ও অতীত ও ভাবী পীড়া সম্বন্ধে ৫।৬ মিনিটের মধ্যে প্রায় ১৫।১৬ লাইন লেখা হইয়া গেল। চরিত্র ও পীড়া সম্বন্ধে

প্রেতাত্মার উক্তি সন্তোষজনক বোধ হইল। তাহার পর তলে তলে আমরা সকলেই এক একটা ছোট খাটো কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া লইলাম—এবং ভবিষ্যদ্বাণীগুলির সফলতার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তাহার পর মিডিয়মের সম্পূর্ণ অপরিচিত ২১৪ জন ব্যক্তির হাত দেখান হইল—সকলে সন্তুষ্ট হইলেন না—কিন্তু একজন খুবই সন্তুষ্ট হইলেন। এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক—ঘটনার ১ মাস পরে একখানি পুরাতন Biographical Dictionaryতে John Murrayর নাম পাওয়া গেল। তিনি চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, ইহাও জানা গেল—কিন্তু উক্ত অভিধানে তিনি যে Palmist ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না। বলা বাহুল্য, মিডিয়ম John Murrayর নাম একেবারেই জানিতেন না। আমাদের কৌতূহল বাড়িয়া গেল—প্রতি বৎসর পূজাবকাশে ভবানীপুরের বাসায় Seance চলিতে লাগিল। এক দিন বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মাকে আনয়ন করিয়া বলা হইল—"আপনি একটি বাঙ্গালা রচনা লিখিয়া দিন।" তিনি প্রথমে একটু আপত্তি করিয়া শেষে "মানুষ কি চায়?" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। প্রবন্ধটি তিন রাত্রে সম্পূর্ণ হইল। আমরা রচনার ভাব ও ভাষায় স্বর্গীয় বঙ্কিমের অতি সুন্দর পরিচয় পাইলাম। রচনাটি—"বাণী" নামক একখানি ত্রৈমাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ছাপার অক্ষরে প্রায় তিন পৃষ্ঠা হইয়াছিল।

আমার ২১০ জন আত্মীয়ের সম্বন্ধে John Murray ১৯২০।২১ সালে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য রূপে সফল হইয়াছে।

এক দিন গভীর রাত্রে কোনও প্রেতাত্মাকে শব্দ করিয়া তাঁহার আগমনের প্রমাণ দিতে বলায়, ছাদের উপর তিনবার সজোরে পদধ্বনি হইয়াছিল। উহা আমরা আট-দশ জন খুব স্পষ্টরূপে অনুভব করিয়াছিলাম।

এইরূপে ৫।৬ বৎসরব্যাপী সাধনার ফলে আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, Automatic writing জিনিষটা একেবারে মিথ্যা নয়। তবে ইহার সাফল্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে—(১) মিডিয়মের স্বাভাবিক ও অর্জ্জিত শক্তি; (২) গভীর নিস্তব্ধতা; (৩) চক্রে উপবিষ্ট জনবৃন্দের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও মনঃসংযোগ (Concentration) (৪) তাঁহাদের সাত্ত্বিকভাব ও পবিত্রতা। Automatic writing ক্রমাগত ৩।৪ ঘণ্টা চালান অসম্ভব নয়। তবে ইহার ফলে সময়ে সময়ে medium খুব পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু আমার মনে হয়—এই পরিশ্রম নিরর্থক নহে। স্বর্গীয় আত্মার সহিত কথোপকথনে কত শোকার্ত্ত ব্যক্তি শান্তি লাভ করে! কত নিরাশ প্রাণ আশান্বিত হয়, কত নাস্তিকের মনে ঈশ্বর-ভক্তি আসে এবং জনসাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাস দৃঢ়তর ও স্থায়ী হয়!

বারান্তরে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রেরপূর্ব্বোক্ত "মানুষ কি চায়?" প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"তাই বলিতেছিলাম, স্বর্গ ও নরক এই খানেই আছে—এইখানেই বৃন্দাবন, আবার এইখানেই কুরুক্ষেত্র, এইখানেই দেবীর মধুর হাস্য, আবার এইখানেই দানবীর বিকট অট্টহাস্য—এইখানেই বরষার ধারাপাত, আবার এইখানেই মার্ত্তণ্ডের অখণ্ড অগ্নিবর্ষণ, এইখানেই শ্যামের বাঁশরী—আবার এইখানেই মহেশের প্রলয়বিষাণ। এই দুয়ের সামঞ্জস্য কোথায়? এই যে আলো-অন্ধকার, এই যে হাসি-কান্না, এই যে অমাবস্যা-পূর্ণিমা, এই যে কুলিশ ও শিরীষ কুসুম, এই যে হরি-হর, এই যে শ্যাম-শ্যামা—এদের সামঞ্জস্য কিসে?"

বৈজ্ঞানিক আহার-বিচার

(আমিষ ও নিরামিষ)

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়, বি-এস্‌সি

আমিষ ও নিরামিষ আহারের প্রকৃষ্টতা ও বৈজ্ঞানিক তর্ক-বিচার বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ব্যক্তিগত বিচারের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানের কথাই আলোচনা করিব। কারণ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ভালো-লাগা মন্দ-লাগার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার খুসী, আমি যদি নিরমিষাশী হই, তবে কোন বৈজ্ঞানিক আমায় তাহা হইতে নিরস্ত করিতে পারেন না। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিজ্ঞানের রাজ্যে আদপেই আমল পায় না; কারণ, বিজ্ঞান জিনিসটা হইতেছে কার্য্য-কারণের সম্বন্ধে আবদ্ধ; সুতরাং আমিষ বা নিরামিষাশীর কেহ যেন আমার এই প্রবন্ধে ভীত হইয়া ভাবিয়া না বসেন যে, আমি এই দুইটি মতের একটাকে হয় ত প্রচার করিতে বসিয়াছি। আমিষ বা নিরামিষ ভোজনের ওকালতি করা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। পরন্তু, উভয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ধরিয়া কিঞ্চিৎ আলোচনাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমিষ ও নিরামিষ আহারের বৈজ্ঞানিক আলোচনার পূর্ব্বে, আমরা শরীরতত্ত্বের পাক-ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ আভাষ দিতে চাই; নচেৎ বিষয়টি বুঝা যাইবে না। খাদ্য হজম হইবার সময় শরীরে যে সকল জিনিসের দরকার হয়, তাহা ভগবান জন্ম হইতেই মানব-শরীরে প্রদান করিয়াছেন। মুখের লালা, পাকাশয়ের জারকরস, পিত্তথলী হইতে পিত্তরস ও প্যানক্রিয়াস্ হইতে নিঃসৃত নানা রস ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পাকাশয়ে ভুক্ত দ্রব্য দলিত ও বিমর্দ্দিত হইবার পর, এই সকল জারকরস পাকযন্ত্রের নানা স্থানে ধীরে ধীরে ক্ষরিত হইয়া, তাহাকে জটিল পরিপাক ক্রিয়ার মধ্যে আনিয়া ফেলে। পরিশেষে হজম হইয়া খাদ্যমাত্রেই কাইল্ (chyle) নামক পদার্থে পরিণত হয় ও রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। এই তো গেল হজম্ হইবার সময় শরীরের ভগবান্-দত্ত নানা জারকরসের স্বতঃ নিঃসরণ। এ ছাড়াও খাদ্য পরিপাক হইবার কালে এমন কতকগুলি তরল ও কঠিন এবং বায়বীয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে, যাহাদের নাম শরীরযন্ত্রের কোন

স্থানেই পাওয়া যায় না। তাহারা হইতেছে, পরিপাক-যন্ত্রের উপরি পাওনার জঞ্জাল। এই সব জঞ্জালের মধ্যে কতকগুলি শরীরের মিত্র হইয়া দেখা দেয় এবং কতকগুলি আবার পরম শত্রুর আকারে বিষসদৃশ হইয়া উঠে। এই শেষোক্ত শত্রু-সম্প্রদায়কে 'শরীর মহাশয়' তাড়াতাড়ি নানা উপায়ে বাহিরে পরিত্যাগ করিয়া তবেই হাঁফ্ ছাড়েন। মিত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া শরীরের উপকার করিয়া থাকে। এই উপরি পাওনার জঞ্জালের মধ্যে আমোনিয়ার (Ammonia) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমোনিয়া একটি বাষ্পজাতীয় জিনিস ও খুব ঝাঁঝালো। এই আমোনিয়ার প্রধান উৎপত্তির কারণ হইতেছে, নিরামিষ-আহার। যাঁহারা খুব নিরামিষ আহার ভালবাসেন, তাঁহাদের শরীরে এই আমোনিয়ার ভাগও বেশী হইয়া দেখা দেয়। ইহা একপ্রকার ক্ষারজাতীয় বায়বীয় পদার্থ। অম্ল-পদার্থের বিপরীতধর্ম্মী বলিয়া ইহা অম্লের অম্লতা বিনাশ করিতে পারে। শরীরে অম্ল এবং ক্ষারপদার্থের পরিমাণ বড় কম নয়। কখনো বা অম্লের পরিমাণ অধিক হইয়া শরীরের রক্ত দূষিত করিয়া ফেলে, কখনো আবার ক্ষারের পরিমাণ বেশী হইয়া রক্তের নানা দোষের কারণ হয়। এই উভয়ের মধ্যে অম্লটাই হইতেছে শরীর ও রক্তের পক্ষে বিশেষ হানিকর। তা' ছাড়া, ব্যাধির নানা বীজাণুরা সাধারণতঃ অম্লজাতীয় পদার্থের গুণ ও ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে বলিয়া, অম্লজাতীয় পদার্থটাকে চিরকালই 'শরীর মহাশয়' এবং ডাক্তার মহাশয়েরা ভয় করিয়া চলেন। ক্ষার হইতেছে একেবারে ঠিক্ অম্লের বিপরীতধর্ম্মী ও বিপরীত-গুণগ্রাহী। সুতরাং ক্ষার জিনিসটাকে শরীর বড় সহজে ছাড়ে না। তাহাকে দিয়া ঐ অম্লের বিষকে বিনষ্ট না করাইয়া, শরীর কখনো ক্ষারকে রেহাই দেয় না। সুতরাং ক্ষার হইতেছে, দেহ-মিত্র এবং অম্ল হইতেছে, দেহ-শত্রু। এই শত্রু-মিত্রকে পাশাপাশি রাখিয়া শরীর-যন্ত্র কত যে মারামারি-কাটাকাটির সৃষ্টি করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শত্রুর সংখ্যা দলে ভারি হইলে, অমনি মিত্রের খোঁজে শরীরের নানা স্থান হইতে নানা পদার্থ প্রবল তাড়নায় বাহির হইতে থাকে। মিত্রের দল পরিপুষ্ট হইলে শরীর বেশ আরামেই থাকে, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমোনিয়া হইতেছে শরীরের এই গুপ্ত মিত্রের অন্যতম। ডাক্ পড়িলেই ইহা আসিতে বাধ্য হয়। তা' ছাড়া, ইহার কিয়দংশ শরীরে স্বভাবতই রক্ষিত হইয়া থাকে। চোর ডাকাতের ভয়ে সরকার যেমন রাস্তার রাস্তায় প্রহরী নিয়োগ করিয়া থাকেন, স্বভাবতই শরীরে যে আমোনিয়া থাকে তাহাও সেইপ্রকার। আবার ডাকাতি ও মারামারি হইলে যেমন রিজার্ভ ফোর্স (Reserve force) ছুটিয়া আসে, আমোনিয়ার অতিরিক্ত সৃজনও কতকটা সেই রকমের। বলা বাহুল্য, এই স্থলে দেহ শত্রু হইতেছে অম্ল-পদার্থ।

অম্ল-পদার্থের বিপরীতধর্ম্মী ক্ষার জিনিসটা আমরা সাধারণতঃ ভোজ্যের শাক্সব্জি জাতীয় অংশ হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকি। রক্তে অম্লজাতীয় যে বিশেষ অংশটা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে আমরা খাদ্য হইতে প্রাপ্ত হইলেও, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শরীরের পাক প্রক্রিয়ার মাঝরাস্তায় উপরি-পাওনা রূপেও ইহা সংগৃহীত হইয়া থাকে। রক্তে যখন এই অম্লের ভাগ খুব বেশী হইয়া উঠে, তখনই আমোনিয়া-ক্ষারের রিসার্ভ ফোর্সে টান্ পড়ে। শরীর তখন আমোনিয়া আনিয়া তাড়াতাড়ি অম্লবিষকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। এই রিসার্ভ (Reserve) বা অতিরিক্ত আমোনিয়ার ভাগটা আমরা সাধারণতঃ শাক্ শব্জী হইতেই সংগ্রহ করিয়া থাকি। সাধারণতঃ যকৃৎ বা Liverই হইতেছে আমোনিয়ার এই অতিরিক্ত বা Reserve অংশের প্রধান আড্ডা।

আমোনিয়া শরীরে অনবরত সৃষ্টি হইতেছে এবং পরিবর্ত্তিত আকারে মূত্রনালী দ্বারা বাহির হইয়া যাইতেছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই পরিবর্ত্তিত আমোনিয়া যাহা শরীর হইতে মূত্রের সহিত বাহির হইয়া যায়, তাহার সংজ্ঞা কি? ইহাকে ইউরিয়া (Urea) বলা হইয়া থাকে। আমোনিয়া ইউরিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইবার সময় দুইটি পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যায়। রক্তস্থ কার্ব্বনিক এসিড্ (Carbonic Acid) বাষ্পের সহিত মিশিয়া ইহা প্রথমে স্মেলিং সল্টসের সেই ঝাঁকালো পদার্থ এ্যামোন্ কার্ব্ব (Ammon carb) পরিবর্ত্তিত হয়; তাহার পর এক কণা (Molecule) জলকে ঐ এ্যামোন্ কার্ব্ব হইতে নিষ্কাষিত করিলে, আমোন্ কার্ব্বোনেট্ এবং তাহা হইতে আবার আর এক কণা জল নিষ্কাষিত করিলে, আমরা অ্যামোন্ কার্ব্বোনাইড্ বা "ইউরিয়া" পাইয়া থাকি।

কিরূপে আমোনিয়া ইউরিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। "H_2O"জলের সঙ্কেতিক চিহ্ন। এক পরমাণু অক্সিজেন ও দুই পরমাণু হাইড্রোজেন্ লইয়া এক কণা বা এক Molecule জলের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

O=C(O. NH₃. H₂ / O | NH₂. | H) —— O=C(O. NH₃. H₂ / NH₂.)

$$O{=}C\begin{cases} O.\,NH_3.\,H_2 \\ \boxed{O}\ NH_2.\ \boxed{H} \end{cases} \quad \text{———} \quad O{=}C\begin{cases} O.\,NH_3.\,H_2 \\ NH_2. \end{cases}$$

আমোন্ কার্ব্ব। আমোন্ কার্ব্বনেট্।

আমোন কার্ব্বনেট্। ইউরিয়া।
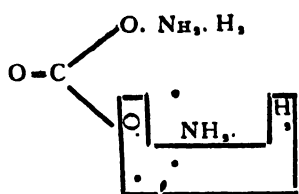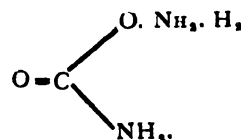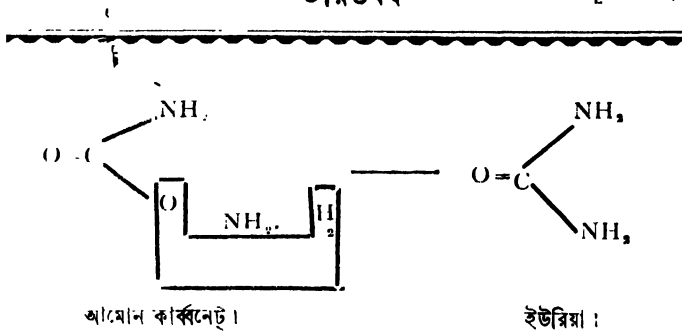
[illegible] ইউরিয়াকে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে হুলার (Wohler.) সাহেব কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করেন। অতঃপর ইহার এই কৃত্রিম প্রস্তুত প্রণালী [illegible] চলিয়া আসিতেছে। ইহা লবণাস্বাদযুক্ত এবং লম্বা লম্বা দানাদার। [illegible] অনলোৎগীষ পদার্থ দুইটির কোনোটারই স্বরূপ [illegible]। সদ্য-সংগৃহীত ইউরিয়ার দানা জল ও সুরাসারে [illegible]। শরীরের যকৃৎ (Liver) হইতেছে, ইউরিয়া উৎপাদনের প্রধান আড্ডা। বহু কাল পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ [illegible] জাতীয় জীবজন্তুদের দেহ হইতে একেবারে যকৃৎ-[illegible] দেখিয়াছেন যে, তৎসঙ্গে সঙ্গে ইউরিয়া উৎপাদনও একেবারে [illegible]। [illegible] ছাড়া, যকৃৎ বা লিভারের দোষে ইউরিয়ার পরিমাণও কম দেখা যায়। এই সকল অসুখে আমোনিয়া আর [illegible] হইতে পারে না। সুতরাং তাহা খাঁটি আমোনিয়া [illegible] শরীর হইতে নিষ্কাশিত হইয়া যায়। রক্তের সহিত আমোন [illegible] মিশ্রিত করিয়া লিভারে পাঠাইলে, কিছুক্ষণ পরে তাহা [illegible] মিশ্রিত হইয়া বাহির হইয়া আসে। সুতরাং লিভারই [illegible] শরীরের একমাত্র ইউরিয়া তৈয়ারির যন্ত্র। এখন কথা [illegible] আমোনিয়া শরীরের কোন স্থানে সৃষ্ট হইয়া থাকে? [illegible] ক্রমে খাদ্য হজম হইবার সময়, [illegible]। তাহার পর যে পরিবর্ত্তন ধারার [illegible] পরিবর্ত্তিত হইয়া ইউরিয়ায় পরিণত হয়, সে কথার [illegible] করিয়াছি। তবে একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, [illegible] আমোনিয়া হইতে ইউরিয়া পাওয়া যায়, ঠিক তাহার বিপরীত [illegible] হইতে আমোনিয়া সংগ্রহ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই [illegible] বলিয়াছি যে, [illegible] কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্পের সহিত আমোনিয়া [illegible] তৈয়ারী করে, পর্য্যায়ক্রমে তাহা হইতে দুই কণা (Molecule) পরিমাণ জল নিষ্কাশিত করিলে, আমরা ইউরিয়া নামক [illegible] পাইয়া থাকি। [illegible] ইহার উল্টা অর্থে, ইউরিয়াতে [illegible] পরিমাণ (Molecule) জল সংযোগ করিলে [illegible] সেই ঝাঁঝালো পদার্থ [illegible] আসিয়া দাঁড়ায়। আমোন কার্ব্ব হইতেছে, আমোনিয়া ও কার্ব্বনিক্ এসিডের সংযোগে সংগঠিত। সুতরাং আমোনিয়া হইতে [illegible] ইউরিয়া পাওয়া যায়, ঠিক উল্টা অর্থে ইউরিয়া হইতে তদ্রূপ আমোনিয়া গ্যাস্ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। রসায়নের এই পরস্পর-বিরোধী পরিবর্ত্তন-ধারা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক।

এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, মানব-শরীরে যে সব ব্যাধি-বীজাণু ও বিষাক্ত পদার্থ দেখা যায়, তাহারা সাধারণতঃ অম্লজাতীয়। এই সব অম্লজাতীয় ব্যাধি-বীজ ও বিষাক্ত পদার্থকে একমাত্র ক্ষারই বিনষ্ট করিয়া শরীরকে নিরাপদ করিতে পারে। যাঁহারা নিরামিষাশী তাঁহাদের শরীরে ক্ষারের অংশই বেশী দেখা যায়। পরন্তু আমিষাশীদের শরীরে অম্লের ভাগ অধিক বলিয়া, শরীরের অম্ল ও ক্ষার উভয়ের সংমিশ্রণে পরস্পর ক্ষয় সাধন ব্যাপার অধিকতর মাত্রায় সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমিষাশীগণ অম্ল ও ক্ষারের পরস্পর বিনাশসাধনে যেমন অভ্যস্ত হইয়া পড়েন, নিরামিষাশীরা তুল্য রূপে এই অম্লের বিনাশ সাধনে অভ্যস্ত হইতে পারেন না। সুতরাং নিরামিষাশীর শরীর— ব্যাধি-বীজাণু ও অম্ল-পদার্থের সহিত ক্ষারের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে যেমন সহজেই অভ্যস্ত, আমিষাশীর শরীর কদাপি তদ্রূপ অভ্যস্ত হইতে পারে না। সুতরাং নিরামিষ আহার মানবের শরীরের পক্ষে বৈজ্ঞানিক কারণে তেমন নিরাপদ নহে। অপর দিকে আমিষ আহার মানবের শরীরের পক্ষে হিতকারী এবং ব্যাধি-বীজাণু ধ্বংসকারী। লোকমত এবং ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছা যাহাই হৌক্, বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া বিচার করিলে, আমিষ আহারকেই নিরামিষ আহার হইতে উচ্চতর স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। জগতে সকল জাতির খাদ্য তালিকা সমান নহে, এবং সকল জাতির রুচিও এক নহে। তবে মানবমাত্রেই স্বভাবতই তাহার শরীর-রক্ষার উপযোগী খাদ্যসমূহ গ্রহণ করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। যে কোন দেশের খাদ্য তালিকা দৃষ্টে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কোন জাতি দেখা যায় না, যাহারা কেবল মাত্র আমিষ বা কেবল মাত্র নিরামিষ আহারের উপরই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। পরন্তু এই উভয় শ্রেণীর খাদ্যের সংমিশ্রণে তাহারা নিজেদের খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া লয়। আমাদের বাঙালীদের খাদ্যও এই মিশ্র খাদ্য এবং তাহাদের নির্ব্বাচনও যে অনেকটা বৈজ্ঞানিক কারণসম্ভূত, সে কথা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন।

নীলাম্বরী

ও কা'র মিলিয়ে গেল নীলাম্বরী সুনীল আকাশে

শ্যামল বনে সঘন সাজে মেঘের কাজলে।—সত্যেন দত্ত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার B. H. P. Works.

পরলোক-প্রসঙ্গে ইস্‌লাম্

মুহম্মদ্ অব্‌দুল্লাহ্

গত আষাঢ় সংখ্যার "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "হিন্দুর পরলোকতত্ত্ব" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইস্‌লাম্ ধর্ম্মে নরকের অনপ্তত্ব কল্পনা করা হয়, তাঁহার ধারণা সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধ হইতে এইরূপ আভাষ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনি এই বিষয়টীকে ভাল্‌রূপে অধ্যয়ন করেন নাই। প্রচলিত লৌকিক বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ ভ্রান্তি ও সঙ্কীর্ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, উদার শাস্ত্রের মত তাহা নহে। ইস্‌লামে পরলোকতত্ত্বের বিষয়ে পবিত্র কুর্‌আনে কিরূপ মত পোষণ করা হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থূল ভাবে ও সংক্ষেপে তাহাই আলোচিত হইবে। আশা করা যায়, ইহা হইতে বহু মুস্‌লিম্ ও অমুস্‌লিম্ এ সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, পরলোক সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থা অপেক্ষা ইস্‌লামী শাস্ত্রের ব্যবস্থা কোনরূপে কম সন্তোষজনক নহে। যাহারা শিক্ষার অভাবে বা সঙ্গদোষে বা সাময়িক দুর্ব্বলতার কারণে পাপ করিয়া ফেলে, তাহারাও পাপ করে এবং অপরাধী সাব্যস্ত হয়। জ্ঞানকৃত অপরাধই পাপ, কাজেই তাহার ফলে নরকভোগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পরে দেখা যাইবে যে, তাহা ভাবিয়া কাহারও শিহরিয়া উঠিবার কোন কারণ নাই। হিন্দুর ন্যায় ইস্‌লামে জন্মান্তরবাদ স্বীকার করা না হইলেও, পরলোক সম্বন্ধে এই উদার ধর্ম্মের মত অন্য কোন ধর্ম্ম অপেক্ষা কম যুক্তিপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ নহে।

পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইস্‌লাম্ সম্বন্ধে দুই-একটি দরকারী কথা বলিতে চাই। আরবী ইস্‌লাম্ শব্দের অর্থ, শান্তির মধ্যে প্রবেশ। ইহার অন্য অর্থ, অল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ইস্‌লাম্ মুস্‌লিমের (১) ধর্ম্ম। মুস্‌লিম্ শব্দের অর্থ, যে অল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ রূপে আত্ম সমর্পণ করে, অর্থাৎ শান্তির মধ্যে প্রবেশ করে। অল্লাহ্ মুস্‌লিম্‌কে এই আখ্যা দিয়াছেন (পবিত্র কুর্‌আন্ ২২:৭৮)। সুতরাং যে কোন ব্যক্তি স্রষ্টা ও সৃষ্টের মধ্যে এই সম্বন্ধে বিশ্বাস করিবে এবং নিজের বিশ্বাস মত কাজ করিবে, সেই মুস্‌লিম্। আর একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শুদ্ধাত্মা প্রেরিত মহাপুরুষ মুহম্মদ্—তাঁহার উপর অল্লাহ্‌র শান্তি ও আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক—বলিয়াছেন, উদ্দেশ্য দেখিয়া সকল কার্য্যের বিচার করিবে।

এই প্রবন্ধে পবিত্র কুর্‌আনের মতই প্রকাশ করা হইয়াছে; তবে কয়েকটী ক্ষেত্রে প্রেরিত মহাপুরুষেরও প্রবচন উদ্ধৃত হইয়াছে। সংখ্যার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলি সমস্তই মৌলবী মুহম্মদ্ অলীর (লাহোর) পবিত্র কুর্‌আনের ইংরাজী অনুবাদের মধ্যে পাওয়া যাইবে। বিসর্গের ন্যায় চিহ্নের (colon) উভয় পার্শ্বস্থিত সংখ্যাগুলির বাম দিকের অংশ অধ্যায়ের এবং দক্ষিণ দিকের অংশ শ্লোকের সংখ্যা; যেমন, ১৭:১৫ ইহার মধ্যে অধ্যায়ের সংখ্যা ১৭ এবং শ্লোকের সংখ্যা ১৫। আর যেখানে এরূপ না হইয়া শুধু একটী সংখ্যাই লিখিত হইয়াছে, তাহা উক্ত গ্রন্থের পাদটীকার সংখ্যা।

পরলোক সম্বন্ধে ইস্‌লামের ধারণা সুস্পষ্ট। আত্মার অবস্থিতির জন্য এবং তাহার ক্রিয়াকলাপের জন্য দুইটী ক্ষেত্র আছে,—ইহলোক এবং পরলোক। ইহলোকের নির্দ্দিষ্ট সময় কাটিলে পরলোকবাসের সময় আসে। প্রথমটী হইতে দ্বিতীয়টীতে যাইবার জন্য মধ্যে যে দ্বার অতিক্রম করিতে হয়, তাহাই মৃত্যু। সুতরাং মৃত্যু শুধু স্থান ভেদে আত্মার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায়। ইস্‌লামের মতে ইহজীবন ও পরজীবন দুইটি পৃথক্ জীবন নহে, বরং একটী অপরটীর অনুক্রম মাত্র। পবিত্র কুর্‌আনের মতে পরলোকে মানবাত্মার পুনরুত্থানের (Resurrection) পর যে মহাবিচার (Judgment) হইবে, তাহা ইহলোকেরই কৃত কর্ম্মের বিচার। ইহা হইতে আত্মার ঐহিক ও পারত্রিক অবস্থার ধারাবাহিকতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

পবিত্র মহাগ্রন্থ কুর্‌আনে আছে, অল্লাহ্ বলিতেছেন, "আমি জিন্নকে ও মানবকে সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে তাহারা শুধু আমার উপাসনা করে (৫১:৫৬)। ইহা হইতে এইরূপ অর্থ করিবার কোন কারণ নাই যে, মানব শুধু উপাসনা, যোগযাগ, ধ্যান ইত্যাদি লইয়াই জীবন অতিবাহিত করিবে, এবং কোন সাংসারিক ক্রিয়ায় বা চিন্তায় কোন রূপে ব্যাপৃত থাকিবে না। ইস্‌লামে সাংসারিক ও পারমার্থিক দুইটি দিক্ কল্পনা করা হয় না, উভয়েরই এক উদ্দেশ্য এবং একই জীবন বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণ সংসারের সমস্ত উৎকৃষ্ট এবং প্রয়োজনীয় বিধান মানিয়া চলা স্রষ্টার ইচ্ছা ও আদেশ এবং তাহাই স্বাভাবিক। শুধু ঐহিক ব্যাপারকে অথবা পারত্রিক ব্যাপারকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লইলে চলিবে না, উভয়কে না ধরিয়া শুধু যে কোন একটিকে সার বলিয়া অবলম্বন করিলেই আত্মার উপর অত্যাচার করা হয়। যাহারা এইরূপে আত্মার উপর অত্যাচার করে, পরলোকে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইহাই পবিত্র কুর্‌আনের মত। অল্লাহ্‌র উপাসনা করা এবং তাহার ফলে পরলোকে কল্যাণ লাভ করাই মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু এই প্রকৃষ্ট ফললাভ করিতে হইলে প্রত্যেক মানব সৃষ্টি-রক্ষা ও তাহার উন্নতির জন্য নিজের শক্তি ও পরিমাণ অনুসারে কর্ত্তব্য পালন করিতে বাধ্য; এবং সেই কারণেই তাহাকে, যে কোন বৈধ উপায়ে জীবিকার্জ্জন প্রভৃতি কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। মানবকে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে সে শরীরী জীব।

প্রেরিত মহাপুরুষ মুহম্মদ্—তাঁহার উপর অল্লাহ্‌র শান্তি ও আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক—বলিয়াছেন, ইহজীবন কৃষিক্ষেত্র, পরজীবনে ইহার ফললাভ ঘটিবে। ইহা হইতেও বেশ স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে,

(১) মুস্‌লিম্ শব্দের পরিবর্ত্তে মুসল্‌মান্ শব্দটাই সমধিক প্রচলিত। মুসল্‌মান্ শব্দটী সম্ভবতঃ আরবী মুস্‌লিম্ শব্দের পারসী বহুবচন মুস্‌লিমান্ শব্দের অপভ্রংশ। সুতরাং মুসল্‌মান্ শব্দটী ঠিক শিষ্ট প্রয়োগ নহে।

এই উভয় লোকের মধ্যে একটী মাত্র অবিচ্ছিন্ন জীবন বর্ত্তমান—মৃত্যুর উভয় পার্শ্বে সেই একই জীবনের রূপান্তর হয় মাত্র। আমার বক্তব্য, উভয় লোকেই একটিই জীবন থাকে,—কেবল লোক-ভেদে তাহার রূপ বা অবস্থার ভেদ হয়, আর মৃত্যুর দ্বারাই সেই ভেদ সংঘটিত হয়।

ইহলোকের দেহ আধিভৌতিক, পরলোকের দেহ আধ্যাত্মিক। ইহলোকেও আধ্যাত্মিক দেহ থাকে এবং তাহার অভাবে আধিভৌতিক দেহের কোন ক্ষমতাই থাকে না; কিন্তু সেই আধ্যাত্মিক দেহ এই নশ্বর (২) দেহের চক্ষুর গোচর হয় না। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, কোন অবস্থাতেই এই আধ্যাত্মিক দেহ মানব-জ্ঞানের গোচর হয় না; যে সকল সৎক্রিয়াবান্ সাধু পুরুষ ও সাধ্বী স্ত্রী প্রকৃষ্ট জ্ঞানের সাহায্যে নৈতিক ও আত্মিক জগতে উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাঁহারাই মানবজীবনের এই পরম কাম্য বস্তু লাভ করিয়া কৃতার্থ হন; কিন্তু তাহাও আধ্যাত্মিক চক্ষুর সাহায্যে সাধিত হয়, জড় চক্ষুর সে বিষয়ে কোনই ক্ষমতা নাই। "এবং তাহাদিগকে উদ্যানে প্রবেশ করাও যাহা তিনি (অল্লাহ্) তাহাদিগকে (ইহজীবনেই) জানাইয়া দিয়াছেন" (৪৭:৬)।

ইহকালের কৃত কর্ম্মে শুভ বা অশুভ ফল পরলোকে লাভ করা যায়, এবং কোন কোন অবস্থায় ইহলোকেও তাহার আস্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, ব্রতাচারী পুণ্যাত্মারাও নানারূপ দুঃখ, কষ্ট ও বিপদে পতিত হইয়াছেন। এ সকল পরীক্ষা রূপেই তাঁহাদের নিকট আসিয়া থাকে (২:১৫৫)।

এইবার স্বর্গ ও নরকের কথা। পবিত্র ধর্ম্ম ইস্লামের উদার মতানুসারে নরককে অবাধ্য ও পাপী লোকদিগের চরিত্র-সংশোধনের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ১২১০; ৫৭:১৫, ২৪৫১)। নরকের শাস্তি অতি কঠোর এবং প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দাহন ন্যায়ানুমোদিত হইলেও যথার্থই ভয়ঙ্কর, কিন্তু পাপীর জন্য এই শাস্তিরই প্রয়োজন। প্রত্যেক মানবকেই নানা রূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আত্মার উন্নতি করিবার জন্য বহুবিধ প্রলোভনের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। যাহারা এই সমস্ত তুচ্ছ প্রলোভনের মায়ায় পড়িয়া মূঢ়ের ন্যায় আত্মসংযমের কথা ভুলিয়া যায়, তাহাদের আত্মা উচ্ছৃঙ্খলতার বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমশঃ মলিন হইয়া পড়ে। ভেজাল সোণাকে খাদ বাহির করিয়া বিশুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নরক-বহ্নিতে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা আছে (২৫২১)। এই নরক-বাসের ফলে মানবাত্মার বিশোধনের পর সে ক্রমে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে (২৭৯০)।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে সকল অনুন্নত সমাজ অজ্ঞতার মধ্যে নিমগ্ন থাকে, অথবা যে সমাজের মধ্যে কোন তত্ত্ববাহক সুসংবাদ ও সাবধান-বাণী লইয়া আসেন নাই, সেই সকল লোককে মৃত্যুর পর পাপী বলিয়া গণ্য করা হইবে না। কোন সমাজে সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পর যাহারা সেই ধর্ম্মের বিধান অমান্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারাই পাপী এবং তাহারাই শাস্তি পাইবে (১৭:১৫, ১৪১১)।

নরকবাসিগণ অনেক ক্ষেত্রে নরকের শাস্তি কিছু পরিমাণে এই জগতেই ভোগ করিবে। উচ্ছৃঙ্খলতার বশে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিয়াও যখন তাহারা বিফলমনোরথ হইবে, তখন হৃদয়ের মধ্যে যে তীব্র যাতনা অনুভব করিবে, তাহাই নরক-যন্ত্রণা। আলঙ্কারিক অর্থে পবিত্র কুর্‌আনে এই কথাটি বর্ণিত হইয়াছে:—"অতঃপর তাহাকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর, তৎপরে তাহাকে সত্তর হস্ত দীর্ঘ শিকলের মধ্যে ফেলিয়া দাও" (৬৯:৩১, ৩২; ২৫৫১)। কিন্তু অনেক সময় এই শাস্তি এই জীবনে পরিস্ফুট না হইয়া পরজীবনেই সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিবে। "এবং তাহারা (ইহজীবনে) যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিল, (পরজীবনে) তাহার অপকৃষ্ট ফল তাহাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া পড়িবে, এবং যে বস্তুর প্রতি তাহারা পরিহাস করিত, ঠিক তাহাই তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে" (৩৯:৪৮, ২১৬৬ খ)। তবে যদিও নরকের শাস্তি সকল সময় ইহলোকে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে না, অথবা যদিও পাপী সকল সময় ইহজীবনে নরকের শাস্তি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না, তথাপি তাহা প্রকৃতপক্ষে এই লোকেই আরব্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞানময় অল্লাহ্ মানবের আত্মার জন্য যে সকল স্বভাবসিদ্ধ বিধান পবিত্র কুর্‌আনে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার যে সমস্ত নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল বিধান ও নিদর্শন যাহারা ক্ষমতা থাকিতেও দেখে না বা দেখিয়াও মান্য করে না, তাহারাই অন্ধের ন্যায় বিপথে চলিতে থাকে। এইরূপ অন্ধকেই তাহার অন্ধত্ব মোচন করিয়া প্রকৃত আলোক দর্শনের শক্তি ও যোগ্যতা দিবার জন্য নরকবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। নরকের মধ্যে কেহই প্রকৃত আলোক দেখিতে পাইবে না, অথবা যাহার আলোক দর্শনের মত অবস্থা হইবে তাহাকে নরকে বাস করিতে হইবে না; কেবল আলোক দর্শনের পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও বিশোধনের জন্যই নরকে থাকিতে হইবে। সুতরাং নরকে যাহারা থাকিবে তাহারাও আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব হইতে মুক্ত থাকিবে না। "এবং যে কেহ ইহাতে (অর্থাৎ ইহলোকে) অন্ধ থাকিবে, পরলোকেও (অর্থাৎ নরকেও) সে অন্ধ থাকিবে" (১৭:৭২, ১৪৫২)। ইহার অর্থ আধ্যাত্মিক অন্ধতাই নরক।

এইবার নরক কাহাকে বলে, এবং সেই সম্বন্ধে পবিত্র কুর্‌আনের কি মত, তাহার উল্লেখ করিব। নরককে সাধারণতঃ প্রচণ্ড ও প্রজ্বলিত অগ্নির আকারেই চিত্রিত করা হয়। আবার অনেক সময় অগ্নি ব্যতীত অন্য ভাবেও ইহার বহুবিধ বিভীষিকাময় রূপের কল্পনা করা হয়। সরলমতি হইলে মানুষ এই সমস্ত কল্পনা হইতেই আতঙ্কে অস্থির হইয়া পড়ে এবং তাহা হইতে দূরে থাকিবার প্রয়াস পায়। শুধু মুস্লিম্ সম্প্রদায় নহে, পরলোক ও স্বর্গ-নরকে বিশ্বাসী সকল সম্প্রদায়েরই

(২) স্থূল অর্থে এই দেহকে নশ্বর বলিলাম। সূক্ষ্ম ভাবে দেখিলে এই দেহেরও বিনাশ হয় না, শুধু রূপান্তর হয় মাত্র।

মধ্যে বোধ হয় এই ভাবটী আছে, এবং ধর্ম্ম ও সমাজের দিক্ দিয়া ইহা যে মঙ্গলকর, তাহা বলাই বাহুল্য। পবিত্র কুর্‌আনে এই নরকাগ্নিকে "গভীর পরিতাপ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। "এইরূপে অল্লা'হ্‌ তাহাদিগের নিকট গভীর পরিতাপের আকারে তাহাদিগের কর্ম্মসমূহ তাহাদিগকে দেখাইবেন, এবং তাহারা সে অগ্নি হইতে বাহির হইতে পারিবে না" (২:১৬৭, ২০৬)। অন্যত্র অভিসম্পাতের সহিত নরকের তুলনা করা হইয়াছে। তাহাদের পুরস্কার এই যে, অল্লা'হ্‌র, (স্বর্গীয়) দূতগণের এবং মানবগণের সকলেরই অভিসম্পাত তাহাদের উপর হইবে, তাহারা ইহার মধ্যে বাস করিবে (৩:৮৬, ৮৭ ; ৪৬২)। এই অভিসম্পাতের ফলে তাহারা নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবে, এ ক্ষেত্রে ইহাই বক্তব্য। নরকের সহিত অন্য একটী বস্তুর তুলনা করা হইয়াছে, তাহা তীব্র যন্ত্রণা। ইহলোকে এই যন্ত্রণাই মানবের মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট, অর্থাৎ এই জীবনে ইহা অসহ্য, কিন্তু নরকে পাপীকে অতি তীব্র হইলেও এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, মৃত্যুর শীতল আশ্রয় তাহাকে দেওয়া হইবে না। কারণ নরক শাস্তিরই আবাস এবং মৃত্যুর কোমল স্পর্শ মানব জীবনের জন্য আশীর্ব্বাদ লইয়াই উপনীত হয়।

(১৩০৪)। আর একটী স্থলে অপমানের সহিত নরকের তুলনা করা হইয়াছে। "নিশ্চিতই আজ অবিশ্বাসিগণের উপর অপমান ও অনিষ্ট রহিয়াছে" (১৬:২৭, ১৩৬১)। মানবাত্মার জন্য নরক যে কিরূপ জঘন্য আবাস এবং তাহার শাস্তি যে কিরূপ হীন ও কঠোর, তাহা পবিত্র কুর্‌আনে অতি সুন্দররূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে উক্ত হইয়াছে, "নিশ্চিতই তাহারা সেদিন তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইবে" (৮৩:১৫, ২৬১৪)। ইহা পরলোকের শাস্তি, সুতরাং ইহা নরকেরই শাস্তি।

নরকের মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে। এই সকল স্তরের সংখ্যা সাত (১৫:৪৪) এবং প্রত্যেক স্তরের জন্য এক একটী দ্বার আছে। পবিত্র কুর্‌আনের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে নরকের মোট সাতটী নামের উল্লেখ আছে। যথা:—(১) জহন্নম্, নরক; (২) লযা, জ্বলন্ত বহ্নি; (৩) হুতমা, নিদারুণ বিপত্তি; (৪) স'ঈর্, প্রজ্বলিত হুতাশন; (৫) সকর্, যন্ত্রণাদায়ক অগ্নি; (৬) জহীম্, প্রচণ্ড অগ্নি; (৭) হাবিয়া, অতলস্পর্শ নরক; (১৩৪১)।

শুধু অধার্ম্মিকেরাই নরকে যাইবে, প্রকৃত ধার্ম্মিকগণকে কোনও সময়েই কোন ক্রমে নরকে যাইতে হইবে না (১৫৫৮)। হিন্দু মতে পাপ ও পুণ্যের মধ্যে যাহা সমধিক অনুরাগের সহিত আচরিত হইবে তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প অনুরাগের সহিত আচরিত বিপরীত ফলকে বাধা দিবে, এরূপ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইস্‌লামে সেরূপ মত পোষণ করা হয় নাই, বরং তাহার বিপরীত মতই ব্যক্ত হইয়াছে। ইস্‌লামের মতে নরকে নানারূপ শাস্তির ব্যবস্থা আছে, এই সকল বিভিন্নতা পাপের প্রকৃতি অনুসারেই হইয়া থাকে। যে যে পরিমাণে পাপ করিবে, তাহার শাস্তিও সেই পরিমাণেই হইবে, কোনরূপে তাহার অধিক হইতে পারিবে না (৬:১৬১ ; ৮৪৯)। যিনি পাপপুণ্যের বিচার ও ফলাফল নির্দ্দেশ করিবেন, তিনি কি সকল বিচারকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নহেন? (৯৫:৮) নারকীদের জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে, তাহা তাহার কৃত পাপের অনুরূপই হইবে (৭৮:২৬, ২৬৫৬)। নরকবাসীরা প্রকৃত জীবনও ভোগ করিতে পাইবে না, আর তাহাদের মৃত্যুও হইবে না, কারণ প্রকৃত জীবন কেবল পুণ্যবান্ লোকদিগেরই জন্য এবং মৃত্যু হইলে তাহারা শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া শান্তি উপভোগ করিবে; কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা উদ্দেশ্য নহে (৮৭:১২, ১৩ ; ২৭১৯। ২০:৭৪ ; ১৫২৬)। সুকৃতি হউক বা দুষ্কৃতি হউক, যে যে কাজ করিবে সে তাহারই ফল লাভ করিবে (৯৯:৭. ৮ ; ২৭৮৬ক)।

পরকালে নূতন করিয়া নরকের সৃষ্টি হইবে না, ইহা পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান আছে; তবে এক্ষণে ইহা মানবচক্ষুর গোচরীভূত নহে এবং পুনরুত্থানের দিবসে ইহাকে স্পষ্ট করিয়া দেখান হইবে। (২৬:৯১ ; ১৮১৮)।

মানব সমাজে প্রায়ই দেখা যায়, নরক সম্বন্ধে সাধারণতঃ অস্পষ্ট ও ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু ইস্‌লাম্ ধর্ম্ম সুস্পষ্ট ভাষায় এই ভ্রান্তি দূর করিয়া প্রকৃত সত্যের আবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়াছে। সচরাচর লোকে যখন নরকের বিষয়ে আলোচনা করে, তাহারা তখন শাস্ত্রোক্ত আলঙ্কারিক বাক্যগুলি'ক প্রকৃত সত্য বলিয়া ধরিয়া লয়; তখন তাহারা ভাবিতে পারে না যে, নরক বিশেষ করিয়া পরলোকের ব্যাপারেই অবস্থিত এবং পরলোকের সকল ব্যাপারই আধ্যাত্মিক। তবে আলঙ্কারিক বাক্যগুলির প্রয়োগ কেবল এই জন্যই করা হইয়াছে যে, তাহাতে লোকে জড়জগৎ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ হইতে কল্পনার সাহায্যে শাস্তির প্রচণ্ডতা কতক পরিমাণে ধারণা করিতে পারিবে। পবিত্র কুর্‌আনে উক্ত হইয়াছে, "ইহা (নরক) অল্লাহ্‌ কর্ত্তৃক প্রজ্বালিত অগ্নি, যাহা হৃদয়সমূহের উপর দিয়া উত্থিত হয়" (১০৪ ; ৬, ৭)। ইহা হইতে বুঝা যায়, মানবের হৃদয়ের মধ্যেই নরক অবস্থিত, ইহার কোন পৃথক্ আবাসস্থান নাই। ইহলোকে ইহার অবস্থা এইরূপ, কিন্তু পরলোকে ইহা আরও সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিবে। (২৭২৮)।

নরকের সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিতে বাকী আছে। সাধারণতঃ অমুস্‌লিমের এবং বহু মুস্‌লিমেরও ধারণা আছে যে, পবিত্র কুর্‌আনের মতে পাপী অনন্তকালের জন্য নরক ভোগ করিবে। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। পাপের গুরুত্ব হিসাবে নরকবাসের স্থায়িত্ব নির্দ্দেশ করা হয়। যে সকল স্থানে নরকবাস অনন্তকালের জন্য বলিয়া অর্থ করা হয়, তাহার অর্থ আরবী কোষকারগণ দীর্ঘকাল বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এই সকল স্থলের ঠিক পরবর্ত্তী একটু অংশ পাঠ করিলে, ঐ সকল শব্দের অর্থ যে অনন্তকাল না হইয়া দীর্ঘকাল হইবে, তাহা স্থির করা সুসাধ্য হইয়া যায়, এবং এই অর্থ প্রয়োগ করাই সঙ্গত ও কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। পবিত্র মহাগ্রন্থের এই উক্তির প্রতিপোষণের

জন্য প্রেরিত মহাপুরুষ মুহম্মদের—তাঁহার উপর অল্লাহ্‌র শান্তি ও আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক—কয়েকটী অতি বিশ্বস্ত প্রবচন উদ্ধৃত করিলাম। তিনি বলিয়াছেন:—(১) অতঃপর অল্লাহ্‌ বলিবেন, (স্বর্গীয়) দূতগণ ও তত্ত্ববাহক এবং বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ সকলেই পাপীদিগের জন্য মধ্যস্থতা করিয়াছে, এবং এক্ষণে সকল দয়াশীলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়াশীল (অর্থাৎ অল্লাহ্‌) ছাড়া তাহাদের জন্য মধ্যস্থতা করিতে আর কেহ বাকী নাই। এই বলিয়া তিনি অগ্নি (অর্থাৎ নরক) হইতে এমন একদল লোকের কতগুলিকে বাহির করিবেন, যাহারা কখনও কোনও সৎকার্য্য করে নাই। (২) নিশ্চিতই নরকের উপর এমন এক দিন আসিবে যখন তাহা একটী শস্যক্ষেত্রের ন্যায় দেখাইবে, যাহা অল্পকাল শ্রীসম্পন্ন থাকিবার পর শুকাইয়া গিয়াছে। (৩) নিশ্চিতই নরকের উপর এমন এক দিন আসিবে যখন তাহার মধ্যে একটীমাত্রও মানব থাকিবে না। (৪) যদি নরকের অধিবাসিগণ মরুভূমির বালুকণার ন্যায় অসংখ্যও হয়, তথাপি এমন এক দিন আসিবে যখন তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনা হইবে (১২০১)।

এইবার স্বর্গের কথা। প্রথমেই জ্ঞাতব্য বিষয় হইতেছে, স্বর্গ কি এবং কোথায়? স্বর্গ একটী বিশাল রাজ্য, পরম সুখের স্থান ইত্যাদি,—ইহাই স্বর্গ সম্বন্ধে লৌকিক ধারণা। এই ধারণা অবশ্যই সম্পূর্ণ রূপে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ইহাকেই যথার্থ মত বলা যায় না। শাস্ত্রে যে সকল কথার উল্লেখ আছে, সাধারণ লোকে তাহার শব্দগত অর্থই ব্যবহার করে, কিন্তু তাহা যে রূপক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তাহার অর্থ যে প্রচলিত অর্থ অপেক্ষা অনেক বেশী গভীর, তাহা অনেকে বুঝিতে পারে। স্বর্গ সম্বন্ধে পবিত্র কুর্‌আনে বলা হইয়াছে যে, ইহা আত্মার উন্নত অবস্থামাত্র; কোনও স্থানের নাম নহে। স্বর্গ ও নরককে দুইটী অবস্থা বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (২৪৫৫ক)। স্বর্গ, আকাশ সকল (৩) ও পৃথিবীতে ব্যাপ্ত (৩:১৩২; ২৪৫৫ক)। রূপক অর্থে স্বর্গকে সুখের স্থান, উদ্যান ইত্যাদি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (১২৮৭, ২২৯৮)। স্বর্গে পুণ্যবান্ লোকদিগকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ও কল্যাণকর অবস্থায় আনা হইবে, তাহা এ জগতে সাধারণ মানবের জ্ঞানগোচর নহে। এ বিষয়ে পবিত্র কুর্‌আন্ বলিতেছেন, "কোন আত্মা জানে না, তাহার নয়নকে তৃপ্ত করিবার জন্য কি সঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে; সে যাহা করিয়াছে (ইহা) তাহারই পুরস্কার" (৩২:১৭)। ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রেরিত মহাপুরুষ মুহম্মদ—তাঁহার উপর অল্লাহ্‌র শান্তি ও আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক—বলিয়াছেন, "অল্লাহ্‌ বলিয়াছেন, আমি আমার পুণ্যবান্ সেবকদিগের জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, কোন চক্ষু তাহা দেখিতে পায় নাই, কোন কর্ণ তাহা শুনিতে পায় নাই, এবং কোন মানবহৃদয় তাহার ধারণা করিতে পারে নাই"। (এক্ষেত্রে অবশ্য জড় দেহের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে; এবং ইহা হইতেও সপ্রমাণ হইতেছে যে, স্বর্গের সম্বন্ধে যে সকল পার্থিব বস্তুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা রূপক অর্থেই ব্যবহৃত)। কিন্তু সাধারণ লোকের জ্ঞানগোচর না হইলেও যাঁহারা নিয়মিতভাবে ও নিষ্ঠার সহিত অল্লাহ্‌র আদেশ ও বিধানসমূহ মানিয়া চলেন, অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহারা এই জগতেই স্বর্গের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারেন। পবিত্র কুর্‌আনে আছে, "এবং তাহাদিগকে উদ্যানে প্রবেশ করাও যাহা তিনি (অল্লাহ্‌) তাহাদিগকে জানাইয়াছেন" (৪৭:৬)। ইহা ছাড়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ জগতে স্বর্গসুখ ভোগ করিবারও সৌভাগ্য লাভ করেন। এ সৌভাগ্য কোন কোন বিশিষ্ট কার্য্যে সাফল্য লাভ করিলে ভোগ করা যায়, এবং পরলোকে যাহা ভোগ করা যায় তাহা পূর্ব্বকৃত সুকৃতির পুরস্কার (২১০৯, ২২৯৬)।

পবিত্র কুর্‌আনে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে যে স্বর্গে পরিপূর্ণ শান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই বিরাজ করিবে না। তথায় যে সকল কথা শুনা যাইবে তাহাতে শুধু শান্তিই সূচিত হইবে। এ বিষয়ে পবিত্র মহাগ্রন্থের উক্তি, "তাহারা তথায় কেবল "শান্তি' ব্যতীত অন্য কোন অনর্থক কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইবে না" (১৬৩২)। স্বর্গোদ্যানকে পরিপূর্ণ শান্তি বলিয়াও আখ্যাত করা হইয়াছে (১৩৫৫)।

মুস্‌লিমের স্বর্গ সকলপ্রকার শোকদুঃখ ও শ্রান্তিক্লান্তির অতীত। মহা শান্তি ও কল্যাণেরই আবাস। এ সম্বন্ধে পবিত্র কুর্‌আনে সুস্পষ্ট ভাষায় উক্ত হইয়াছে, "নিশ্চিতই যাহারা (অনিষ্টের কবল হইতে) আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছে, তাহারা উদ্যানসকল ও ঝরণাসকলের মধ্যে থাকিবে; শান্তিতে, নিরাপদে সেগুলিতে প্রবেশ কর। এবং আমরা তাহাদের বক্ষঃস্থল হইতে বিদ্বেষের যাহা কিছু (থাকিবে) তাহার উচ্ছেদ করিব,—(তাহারা) ভ্রাতৃগণের ন্যায় (হইবে)...। শ্রান্তি তাহাদিগকে ক্লেশ দিবে না, কিংবা তাহারা তাহা হইতে কখনও দূরীভূত হইবে না" (১৫:৪৫—৪৮)। সুতরাং স্বর্গবাসিগণ সকল দুঃখকষ্ট ও হীনভাব হইতে সদা মুক্ত থাকিবেন এবং তাঁহাদের স্বর্গবাস অনন্তকালের জন্য হইবে। ইহা দ্বারা অস্থায়ী স্বর্গবাস সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের যে মত আছে, তাহার বিরোধিতা করা হইয়াছে (১৩৪২)। এই বিষয়ে পবিত্র কুর্‌আনে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, "এবং তাহারা বলিবে: (সকল) স্তুতিবাদ অল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদিগের হইতে দুঃখকে দূরীভূত করিয়াছেন...; তথায় শ্রান্তি আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না, অথবা ক্লান্তি আমাদিগকে তথায় ক্লেশ দিবে না" (৩৫:৩৪,৩৫)। স্বর্গে শান্তির ভাব যে কিরূপ প্রবল ও উন্নত, তাহা এই সকল শ্লোকে স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত হইয়াছে।

অজ্ঞ লোকদের মধ্যে একটী মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, উদার ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীজাতির স্বর্গে প্রবেশ নিষেধ। পবিত্র কুর্‌আনে সে বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হইয়াছে (৪২,২৩৫৬)। ইন্দ্রিয় পরতার উল্লেখ করিয়া মুস্‌লিমের স্বর্গের নামে যে অপবাদ

---

(৩) সকল গ্রহেরই একটী করিয়া আকাশ আছে বলিয়া আকাশ শব্দটী বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে (২৫১৬)।

প্রচার করা হয়, তাহারও মূলে কোন সত্য নাই। যাঁহারা ভ্রান্ত ভাবে এই মত পোষণ করেন, তাঁহারা "হুরে'র উল্লেখ করিয়া নিজেদের মতের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু "হুর্"—সম্বন্ধে তাঁহারা ঠিক ভাবে অর্থগ্রহ করিতে পারেন না। "হুর্" শব্দের প্রকৃত অর্থ পুণ্যাত্মা সঙ্গিগণ বা সঙ্গিনীগণ। পবিত্র কুর্আনে ইহা মঙ্গল বা আশীর্ব্বাদের অর্থেই আলঙ্কারিক ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে (২৩৫৬)।

ফলতঃ, স্বর্গ আধ্যাত্মিক অবস্থাবিশেষ, এবং আধ্যাত্মিক সুখভোগই স্বর্গভোগ, স্বর্গের সহিত আধিভৌতিকতার সম্পর্ক নাই (২১০৯ ক)। স্বর্গে হীন ইন্দ্রিয়পরতার লেশমাত্র নাই। যে সকল পুণ্যাত্মা সাধু পুরুষ ও স্ত্রী নানারূপ পার্থিব প্রলোভন ও মোহ অতিক্রম করিয়া, সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহুবিধ কঠোর সাধনার ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া স্বর্গবাসের অধিকারী হইবেন, তাঁহারা যে তথায় ইন্দ্রিয়-পরতার প্রশ্রয় দিবেন, এরূপ চিন্তা করাও বাতুলতা। স্বর্গ নিরবচ্ছিন্ন শান্তিরই আবাস; "অল্লাহ্ শান্তির আবাসের প্রতি আহ্বান করিতে-ছেন" (১০:২৫, ১১২৩)। সর্ব্ববিধ স্বর্গসুখকে একমাত্র "শান্তি" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে (৩৬:৫৮, ২০৯১)। অল্লাহ্র মহিমাকীর্ত্তন ও শান্তিবাণীর সম্বন্ধে অন্যত্র সুস্পষ্ট ভাষায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে:—"ইহার মধ্যে তাহাদের প্রার্থনা হইবে: তোমার মহিমা, হে অল্লাহ্! এবং ইহার মধ্যে তাহাদের অভিবাদন হইবে: শান্তি; এবং তাহাদের অন্তিম প্রার্থনা হইবে: স্তুতিবাদ অল্লাহ্র, যিনি জগৎ সকলের প্রভু (১০:১০)।" "তাহারা তাহার মধ্যে শান্তি, শান্তি শব্দ ব্যতীত কোন অনর্থক বা পাপময় কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইবে না" (৫৬:২৫, ২৬)।

স্বর্গের বৈশিষ্ট্য পরব্রহ্মের দর্শনে, এবং ইহাই স্বর্গবাসীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। পরমাত্মার দর্শনই আত্মার পরম কাম্য; উৎকৃষ্ট আত্মার জন্য ইহাই ব্যবস্থা, যেমন এই দর্শন হইতে বিমুখতাই উচ্ছৃঙ্খল আত্মার নরক। অল্লাহ্র দর্শনলাভই স্বর্গবাসীর শ্রেষ্ঠ আনন্দ (২৩৪০)। এই দর্শনলাভের আনন্দ স্বর্গবাসিগণ অনন্ত কাল ধরিয়া ভোগ করিতে থাকিবেন। "যাহাদিগকে সুখী করা হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে, তাহারা উদ্যানে থাকিবে, যতকাল আকাশসকল ও পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে ততকাল তাহাতে বাস করিবে...; (ইহা) একটী দান যাহা কখনও কর্ত্তিত হইবে না" (১০:১০৮, ১২০২)। কিন্তু ইহলোকের সুকৃতির ফলে পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগ করাই স্বর্গবাসিগণের চরম সার্থকতা নহে, সেখানেও তাঁহারা আত্মার অধিকতর উন্নতির জন্য নিরত থাকিবেন। যিনি উন্নতির যে স্তরে থাকিবেন, তিনি সেই স্তর অতিক্রম করিয়া পরবর্ত্তী উন্নততর স্তরে উপনীত হইবার জন্য চেষ্টা করিবেন। "কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে যাহারা তাঁহাদের প্রভুর প্রতি (কর্ত্তব্যের বিষয়ে) অবহিত থাকে. তাহারা উন্নত স্থান সকল লাভ করিবে, তাহাদের উপর উন্নততর স্থান সকল থাকিবে" (৩৯:২০, ২১৫৯)। তথায় ক্রমোন্নতির পথে তাঁহারা প্রার্থনা করিবেন, "আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য আমাদের জ্যোতিঃ সম্পূর্ণ কর, এবং আমাদিগকে পরিত্রাণ দাও" (৬৬:৮)। এইরূপে তাঁহারা অনন্তকাল ধরিয়া একটির পর আর একটি স্তরে উন্নতিলাভ করিতে থাকিবেন, সে উন্নতির কোন সীমা নাই। পরবর্ত্তী স্তরকে শেষের স্তর মনে করিয়া সাধনা-নিরত আত্মা যখন তাহাতে উন্নীত হইবেন, তখন আবার তিনি তাহার পরের স্তর দেখিয়া তাহাতে যাইবার জন্য সচেষ্ট হইবেন। এই ভাবেই অনন্তকাল ধরিয়া সকল আত্মাই অনন্ত সাধনায় ব্যাপৃত থাকিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এক সময়ে নরকে একটী আত্মাকেও থাকিতে হইবে না। সকল মলিনতা হইতে মুক্ত হইলে নরকবাসী আত্মাও স্বর্গলাভ করিয়া অপর সকলের মত এই মহাসাধনায় নিরত হইবেন এবং ক্রমশঃ অনন্ত যাত্রার পথে অগ্রসর হইতে থাকিবেন (২৫২১)।

আত্মা যখন উচ্ছৃঙ্খলতা, অবাধ্যতা ও অসংযম অথবা আত্মসংযমে অসামর্থ্যের কারণে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সে নিজের অবস্থা সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে পারে। কিন্তু অল্লাহ্র পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা হইতে সে সেই অবস্থায় নিজের ইচ্ছানুসারে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। তাহার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তাহাকে সকল ব্যাধি ও মলিনতা হইতে মুক্ত করিয়া প্রকৃত জ্যোতির্দর্শনের যোগ্য করিবার জন্য সেই কঠোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ইহা পরলোকের ব্যবস্থা। কিন্তু যাঁহারা এই জগতেই পুণ্যময় জীবন যাপন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেও প্রথমে সমাজের অত্যাচার, প্রবৃত্তির তাড়না, আত্মসংযমের কঠোর সাধনা ইত্যাদি যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তবে উন্নত অবস্থা লাভ করিতে হয়। ইহলোক বা পরলোক উভয়ত্রই যিনি এই অবস্থায় আসিয়া থাকেন, তাঁহাকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির উৎকৃষ্ট স্তরে উন্নীত করা হয়। তখন তিনি উপাসনা প্রভৃতি কার্য্যকে কঠোর বোধ করেন না, বরং তাহা আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া থাকেন,— ইহাই এখন তাঁহার আত্মার খাদ্যে পরিণত হয় (২৭৩২)। এই অবস্থার বিষয়ে পবিত্র কুর্আনের বাণী এইরূপ:—"হে শান্তিস্থিত আত্মা! তোমার প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন কর; এক্ষণে আমার সেবকদিগের মধ্যে প্রবেশ কর, এবং আমার উদ্যানে প্রবেশ কর" (৮৯:২৭-৩০)।

এক্ষণে স্বর্গ ও নরকের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ:—স্বর্গ ও নরক কোন স্থান বিশেষের নাম নহে, আত্মার দুইটি পৃথক্ অবস্থার নাম; রূপক অর্থে এইগুলিকে স্থান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বর্গ ও নরকের সকল বস্তুই আধ্যাত্মিক, তবে সাধারণ লোককে বুঝাইবার জন্য রূপক অর্থে সেগুলিকে পার্থিব বস্তুর ন্যায় উল্লেখ করা হইয়াছে। নরকভোগ অনন্ত নহে, কিন্তু স্বর্গবাস অনন্ত। মলিনাত্মা ব্যক্তিদিগকে তাহাদের আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত পাপের গুরুত্ব বিচার করিয়া নির্দিষ্ট কালের জন্য নরকে নিক্ষেপ করা হইবে, যাহাতে তাহারা অনুতাপ প্রভৃতির দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন করিয়া স্বর্গবাসের যোগ্যতা লাভ পারে।

অকাল-মৃত্যু ও বাল্য-বিবাহ

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দে

গত কয়েক মাসের 'ভারতবর্ষে' উপরিউক্ত বিষয়ে নানা জনে আলোচনা করেছেন। বিষয়টি গুরুতর, সুতরাং আবশ্যকের চেয়ে বেশী যে আলোচনা হয়েছে এমন বলা যায় না। এ বিষয়ে নানা জনে নানা দিক থেকে আলোচনা করে নূতন কথা ও নূতন যুক্তি দেখালে সমাজের উপকার হবার সম্ভাবনা। আমি 'ভারতবর্ষে'—পূর্ব্ব-পূর্ব্ব আলোচনা-কারীরা বলেন নি, এমন নূতন যুক্তি ও নূতন কথার অবতারণা করে, নূতন ধরণে আলোচনা করার চেষ্টা করব। ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে যা আলোচনা হয়ে গিয়েছে, নীচে তার সার সংগ্রহ করে দিয়ে, পরে নিজের মন্তব্য সংক্ষেপ প্রকাশ করব।

গত বর্ষের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের কাগজে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী এ বিষয়ে প্রথমে আলোচনা করেন। তাঁর মত সংক্ষেপে এই :—

(১) বাল্য বিবাহ অকাল মৃত্যুর কারণ নয়

কারণ, দেখা যায় যে, আমাদের পিতা, পিতামহ, ও প্রপিতামহ ও তাঁহাদের সমসাময়িক অনেক অনেকের জানা লোক বাল্য-বিবাহের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘজীবী ছিলেন।

(২) অকাল-মৃত্যুর আসল কারণ—

অসার ও ভেজাল খাদ্য, বিরুদ্ধ-ভোজন, দূষিত, বদ্ধ বায়ু ও ধুম সেবন, দায়িত্বহীন, আচারশূন্য, নিয়মানু-বর্ত্তিতাশূন্য, প্রাচীন হিন্দু ও আধুনিক ইয়োরোপীয় উভয় আচার-ভ্রষ্ট খিচুড়ী নবীন পন্থা, পরীক্ষার চাপ, জীবিকা অর্জ্জনের জন্য আবাল্য পণ্ডশ্রম, দুশ্চিন্তা ও নৈরাশ্য।

(৩) উপায়—

সমস্ত বালক বালিকার প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা, অর্থাৎ হিতাহিত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা, সংযম শিক্ষা, চরিত্র গঠন।

(৪) বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধ মত—

দাসমনোভাব বশতঃ বিজেতা ইংরাজদের অন্ধ অনুকরণ ইচ্ছা সঞ্জাত। বিপক্ষদের ভাবখানা এই—ইংরাজরা দীর্ঘজীবী, আমরা নই; আমাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ আছে, তাদের মধ্যে নেই; তারা বলে বাল্যবিবাহই অকাল-মৃত্যুর কারণ; তাই ঠিক।

(৫) কিন্তু ইয়োরোপীয় ও আমাদের সমাজের প্রভেদ—

১। তাদের অপেক্ষা আমাদের যৌবন শীঘ্র আসে ও যায়।

২। গড় পরমায়ু আমাদের ২৩ বৎসর, ইংলণ্ডের ৪৬, জাপানের ৪৪।

(৬) ইয়োরোপীয়দের দীর্ঘায়ু হওয়ার আসল কারণ—

ভাল আহার, বাস, ব্যায়াম, আমোদ,—এ সকলে

নিয়মানুগামিতা, বিশেষতঃ বিদ্যাশিক্ষায় অসাধারণ পরিশ্রমের অভাব এবং দুশ্চিন্তা ও নৈরাশ্যের অভাব।

(৭) বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন

সেকালে বাল্য বিবাহ হলেই সকলে ছেলের মা হতেন না। স্বামীর সঙ্গে দেখা শুনা হলেও স্বতন্ত্র গৃহে বাস করতেন।

(৮) বাল্য বিবাহের গুণ—

১। বালিকা বধূ শাশুড়ী, দেবর, ননদ প্রভৃতির সঙ্গে ঝগড়া করলেও তাঁদের ভাতে মারতে পারবে না—ঘর-ভাঙ্গানী হবে না।

২। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সহজে ভালবাসা হয়।

(৯) যৌবন-বিবাহের দোষ—

১। বড় মেয়ে ভিন্ন-আচার-অভ্যাস-সম্পন্ন শ্বশুরবাড়ীর নূতন চাল-চলন শিখতে চায় না ও পারে না।

২। ফলে পারিবারিক সুখ-শান্তির ব্যাঘাত হয় ও একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গে।

৩। দেশবাসীর গড় আয়ু যখন ২৩, তখন পুরুষের ২৭-৩০, ও মেয়ের ১৭-২০ বয়সে বিবাহ হলে :—

(১) প্রজাবৃদ্ধি হবে না।

(২) পিতা বয়স্ক পুত্র কন্যা রেখে যেতে পারবেন না। বিধবা অপোগণ্ড শিশু সন্তান নিয়ে বিব্রত হবে।

(১০) বিবাহের প্রকৃত বয়স

১১।১২ বৎসর বয়সে যখন এদেশে নারীত্ব দেখা যায়, তখন তাই ঠিক বিবাহের বয়স।

(১১) স্ত্রী-শিক্ষা।

১। বর্ত্তমান স্কুল কলেজের শিক্ষা হিন্দু স্ত্রী শিক্ষার উপযোগী নয়।

২। গ্রাজুয়েট স্ত্রীলোক অত পরিশ্রমে যা শেখেন, তার অধিকাংশ জীবন-পথে চলার কোন কাজে লাগে না।

৩। শ্বশুর-ঘরই বালিকাদের প্রকৃত শিক্ষাস্থল হওয়া উচিত।

(১২) বিবাহে পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচন-প্রণালী

স্বয়ং নির্ব্বাচনের দোষ—

১। আমাদের অসুন্দরের দেশে অধিকাংশ মেয়ের বর জুটবে না।

২। মেয়েদের বর শিকারের সময়ে সুন্দর যুবা পুরুষকে হাব ভাব কটাক্ষাদির দ্বারা বশ করার চেষ্টার অভ্যাস পর-জীবনেও রয়ে যায়।

৩। যুবক-যুবতীর ইন্দ্রিয়-বৃত্তি প্রবলা, ও কল্পনা তেজস্বিনী হওয়ায় তাঁরা রূপ-মোহ দ্বারাই নির্ব্বাচন করেন,—ধীর ভাবে সমস্ত গুণাগুণ পরীক্ষার ক্ষমতা থাকে না।

পৌষ ১৩৩০এর কাগজে অধ্যাপক শ্রীসত্যশরণ সিংহের প্রবন্ধের সার মর্ম্ম এই :—

(১) যৌবন বিবাহের দোষ ও বাল্যবিবাহের গুণ।

উপরে লেখা শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর মতের সার নং (৯) ১ ও ২ এবং (৮) ২ সংখ্যক যুক্তি স্বীকার করেন।

(২) যৌবন বিবাহের পক্ষে যুক্তি—

১। ১৬ বৎসরের মেয়ের বিবাহ হলে শীঘ্র জননী হওয়ার সম্ভাবনা। বিধবা হলেও তাঁর দায়িত্ব ও স্নেহের ধন বর্ত্তমান থাকে।

২। ভারতের প্রকৃত গৌরবের যুগে—অর্থাৎ বেদ, মহাকাব্য, ও দর্শন প্রণয়নের যুগে ও বৌদ্ধ যুগে—যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল।

৩। যৌবন বিবাহে প্রজাবৃদ্ধির বাধা হয় না (শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর মতের সার (৯) ৩ (১) ও (২) সংখ্যক যুক্তির উত্তর)। মেয়ের ১৮ বৎসরে বিবাহ দিলে, তিন বৎসর অন্তর একটি সন্তান জন্মালে, ৪৫ বৎসর পর্য্যন্ত (৪৫—১৮=২৭, ২৭÷৩=) ৯টি সন্তান হতে পারে।

(৩) বাল্য বিবাহের কুফল —

১। বাল্য-বিবাহের ফল অকাল-মৃত্যু—(অনুরূপা দেবীর মতের সার (·) এর উত্তর)—

(ক) পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ বাল্যবিবাহের সন্তান হয়েও দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন, অনেকে নয়।

(খ) অল্প বয়সে সন্তান প্রসবে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের মতে—

(১) অল্পজীবী ও অসুস্থ সন্তান জন্মে।

(২) মাতার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

লেখকের মতে—

(৩) প্রসূতির বিশেষ কষ্ট হয়, ও মৃত্যু সম্ভাবনা বেশী।

(গ) দরিদ্র দেশে বাল্য বিবাহের ফলে বহু সন্তান

লাভ হয়। সুতরাং ছেলেরা খারাপ খাওয়া, পরা ও বাড়ীর দোষে অল্পায়ু হয়।

২। পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ হলে লেখাপড়ার ব্যাঘাত হয়।

৩। ছাত্রাবস্থায় বাপ হয়ে পড়লে পড়া ছেড়ে যেমন তেমন চাকরী খুঁজতে ও নিতে হয়।

৪। বিবাহিতা বালিকার নারীত্ব শীঘ্র (অকালে) আসে।

৫। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের মতে নারীত্ব দেখা দিলেই সন্তান প্রসবের উপযুক্ততা জন্মে না।

৬। বালবিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

৭। অনেক বালবিধবা ভ্রষ্টা হয়।

(৪) মেয়েদের বিবাহের বয়স—

১৬ বছরের কমে নয়।

অগ্রহায়ণ ১৩৩০এর ভারতবর্ষে শ্রীপদ্মনাভ দেবশর্ম্মা এ বিষয়ে এইরূপ মত প্রকাশ করেছেন—

(১) বাল্যবিবাহের সমর্থক যুক্তি খণ্ডন।

১। মেয়ের ১১।১২ বৎসর বয়সে বিবাহ দিয়ে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত স্বামী সহবাস নিবারণ করা খুব শক্ত। দৃষ্টান্ত প্রভাত বাবুর "নিষিদ্ধ ফল" গল্প। (শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর মতের সার সংগ্রহের (৭) ও (১০) সংখ্যক যুক্তির উত্তর।)

২। পল্লীগ্রামনিবাসী শিক্ষিত পাত্রের সঙ্গে যুবতী ধনী-কন্যার বিবাহ হলে অসুবিধা বা অশান্তি হবে না; কারণ—

(ক) বধূ শীঘ্রই পল্লীগ্রাম ত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে তাঁর কর্ম্মস্থানে যায়।

(খ) পল্লীগ্রামে থাকা হলেও ধনীর কন্যা ও উপযুক্ত পুত্রের বধূর দোষ-ত্রুটি গুরুজন সহজে ক্ষমা করেন। (শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর (৯) ১ ও ২ সংখ্যক যুক্তির উত্তর।)

(২) স্ত্রী শিক্ষার জায়গা

বাপের বাড়ীই মেয়েদের শিক্ষার ঠিক জায়গা, (শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর নং (১১) ৩এর উত্তর)

(৩) যৌবন বিবাহের দোষ খণ্ডন

বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সকল ঘরের আবহাওয়া প্রায় একই রকম। মেয়ের বাপ পাত্রের জাত কুল দেখবার সময়, তাদের বাড়ীর আচার ও অভ্যাস কি রকম সে খোঁজ নিয়ে কাজ করলে কোন গোল হয় না। (শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর (৯) ১ ও ২ এর উত্তর।)

(৪) যৌবন বিবাহ ও ইয়োরোপীয় সমাজ।

বিদেশী সমাজের বিশৃঙ্খলার কারণ যৌবন-বিবাহ ও স্ত্রী-স্বাধীনতা নয়,—সমাজ ও বিবাহের আদর্শ।

মাঘ ১৩৩০এর ভারতবর্ষে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী তাঁর সমালোচকদের উত্তর দিতে গিয়ে তাঁর পূর্ব্বে লেখা কোন কোন কথা আবার বলেছেন। তাঁর লেখা নূতন কথা সংক্ষেপে এই—

(১) বাল্য বিবাহের দোষ খণ্ডন

অকাল-মৃত্যুর কারণ বাল্য-বিবাহ নয়; কারণ, বাল্য-বিবাহ হিন্দু সমাজে সুদূর অতীত কাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু অকাল মৃত্যু নূতন আমদানী। (সিংহ মহাশয়ের নং (৩) ১ (ক) ও (খ) এর উত্তর।)

(২) বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধ যুক্তি

বাল্য বিবাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুচিত, যেহেতু বাল্য-বিবাহের পর ব্রহ্মচর্য্য পালন অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্ভব। (পদ্মনাভ বাবুর নং (১) ১এর সমর্থন)

(৩) বাল্য বিবাহ ও যৌবন-বিবাহের সমন্বয়।

যিনি নিজের ছেলেকে ব্রহ্মচর্য্য পালনোপযোগী শিক্ষা দিতে সমর্থ, ও যাঁর পুত্রবধূকে মনের মত গড়বার সাধ ও সামর্থ্য আছে, তিনি ১২ বছরের মেয়ে আনবেন; যাঁরা ঐ পরিশ্রমে কাতর, তাঁরা বড় মেয়ে আনবেন।

(৪) স্বয়ং নির্ব্বাচনের দোষ

বড় মেয়ের সহজে কোন পুরুষকে নিজের যোগ্য বর বলে মনে ধরে না, সুতরাং বিবাহে বিলম্ব হয়, এমন কি বিবাহ হয় না।

(৫) অবরোধ প্রথা, নারীর স্বাতন্ত্র্য ও পুরুষের সহিত সর্ব্বত্র সমান অধিকার

প্রথমটির পক্ষপাতিনী নন, কিন্তু শেষের দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু মনে করেন ও তাদের পক্ষপাতিনী নন।

মাঘ ১৩৩০এর ভারতবর্ষে শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন যে, তিনি অধিকাংশ বিষয়েই শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর সঙ্গে একমত। তিনি শাস্ত্র উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন

যে, অকাল-মৃত্যুর কারণ বাল্য-বিবাহ নয়, পরন্তু বেদাদি শাস্ত্রের অনধ্যয়ন, সদাচারের বর্জ্জন, অলসতা, ও দূষিত আহার্য্য গ্রহণ।

ফাল্গুন ১৩৩০ এর ভারতবর্ষে পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত সত্যশরণ সিংহ মহাশয়ের প্রবন্ধের উত্তরে নিম্নলিখিত মত যুক্তি দেখিয়েছেন—

(১) বাল্য বিবাহের গুণ—

বালক বালিকা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে স্বভাব জন্য ভালবাসা স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠে, সেটা দৃঢ়মূল ও মধুর হয়।

(২) বাল্য-বিবাহের দোষ খণ্ডন—

১—সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রভৃতি অধিকাংশই বাল্য-বিবাহ করতেন; কিন্তু অনেকেই দীর্ঘজীবী হতেন। (সিংহ মহাশয়ের (৩) ১ (ক) ও খ ১) এর উত্তর।)

২—কাশীধামে অনেক বৃদ্ধা আছেন, যাঁরা অল্প বয়সে প্রসব করেছেন, কিন্তু এখনও বেশ পরিশ্রম করেন। (সিংহ মহাশয়ের (৩) ১ (খ) (২) এর উত্তর।)

৩ (ক)—পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়ে শুধু বালবিধবা নয় যুবতী-বিধবাও ভ্রষ্টা হয়। (খ) স্ত্রীলোকের কাম পুরুষের চেয়ে অনেক কম। যে বাল-বিধবার ইন্দ্রিয়-সুখের আস্বাদ লাভ হয় নি, তার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে, খুব সহজ। (সিংহ মহাশয়ের (৩ ৭ এর উত্তর।)

৪—এ কথা ঠিক যে দরিদ্র দেশে প্রজা বৃদ্ধি হওয়া অধিক কষ্টের ও অবনতির কারণ। এই জন্যই ঋষিরা বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। (সিংহ মহাশয়ের (৩) ১ (গ) এর উত্তর।)

৫—অপর প্রদেশের মত বঙ্গদেশে দ্বিরাগমন প্রথার প্রচলন করলে বাল্যবিবাহের ফলে অকাল-নারীত্ব ও অকাল-মাতৃত্ব নিবারণ হয়। (সিংহ মহাশয়ের (৩) ১ (খ) (১) (২) ও (৩), (৩) ১ (গ), (৩) ৪ ও ৫ সংখ্যক যুক্তির উত্তর।)

৬—পাঠ্যাবস্থায় বিবাহে পড়ার ব্যাঘাত হয় বলে বিবাহ স্থগিত রাখা যায় না; কারণ—

পড়া শেষ হতে অনেক দিন লাগে—এম-এর পর ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারী, পি-আর-এস, রিসার্চ্চ প্রভৃতি আছে; কিন্তু অবিবাহিত অবস্থায় কলিকাতার মত প্রলোভনপূর্ণ স্থানে থাকায় চরিত্রহানির বিশেষ সম্ভাবনা। (সিংহ মহাশয়ের (৩) ২ এর উত্তর।)

৭—মনুসংহিতা ও মহাভারত কন্যার বাল্য-বিবাহের আজ্ঞা দিয়েছেন। রাম ও সীতার বাল্য বিবাহ হয়েছিল। (সিংহ মহাশয়ের (২) ২ এর উত্তর।)

(৩) যৌবন বিবাহের দোষ

১—যৌবন-বিবাহ প্রবর্ত্তন করতে হলে, গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলন অবশ্যম্ভাবী। মনুর মতে গান্ধর্ব্ব বিবাহের সন্তান কুচরিত্র হয়।

২—একজনকে রূপ গুণ দেখে ভালবেসে বিবাহ করলে, পরে তার চেয়ে বেশী রূপ-গুণ-সম্পন্ন কাউকে দেখলে, তাকেই ভালবাসবে ও পেতে চাইবে।

৩—যৌবন-বিবাহ কামজ,—এতে ভোগস্পৃহা ও স্বার্থপরতা বাড়ায়।

বৈশাখ ১৩৩১ এর ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত পদ্মনাভ দেবশর্ম্মা মহাশয় এই বিষয়ে দ্বিতীয় বার লিখে পণ্ডিত মহাশয়ের কোন কোন যুক্তির উত্তর নিম্নলিখিত ভাবে দেবার চেষ্টা করেছেন—

(১) যৌবন-বিবাহের দোষখণ্ডন

১—গান্ধর্ব্ব বিবাহের সন্তান সর্ব্বদা কুচরিত্র হয় না। দৃষ্টান্ত—কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির। (পণ্ডিত মহাশয়ের (৩) ১ এর উত্তর।)

২—যৌবনে গান্ধর্ব্ব বিবাহকারিণী সর্ব্বদা ব্যভিচারিণী হয় না। দৃষ্টান্ত—দময়ন্তী, সাবিত্রী, শকুন্তলা, সুভদ্রা প্রভৃতি। (পণ্ডিত মহাশয়ের (৩) ২এর উত্তর।)

(২) বাল্য-বিবাহের গুণ খণ্ডন

বাল্য বিবাহে সর্ব্বদা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মে না; তার প্রমাণ, বাল্য-বিবাহকারী পুরুষদেরও দলে দলে কুস্থানে গমন, ও বালিকা বয়সে বিবাহিতা স্ত্রীদের ঘরের বাহির হওয়া, ও আত্মহত্যা করা। (পণ্ডিত মহাশয়ের (১) ১ এর উত্তর।)

(৩) বাল্য বিবাহের দোষ

অল্প বয়সে সন্তানের পিতা হওয়াতে যুবকেরা অন্ন-চিন্তায় বিব্রত হয়ে সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, সাধনা, সাহস, জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চ্চা, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, দেশ-সেবা

প্রভৃতি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। আর মেয়েরা হেসে খেলে বেড়াবার ও বিদ্যা, জ্ঞান ও শক্তি অর্জ্জনের বয়সে নিরক্ষরা, কুসংস্কারাচ্ছন্না, দুর্ব্বলা বধূরূপে স্বামীর গলগ্রহ হয়।

পাঠকদের পূর্ব্ব-আলোচনাকারীদের যুক্তিগুলি মনে করিয়ে দেবার জন্য, আর নিজে তাদের উপর মন্তব্য প্রকাশ, ও নূতন যুক্তি দেবার সুবিধার জন্য, এই সার সংকলন করে দিলাম।

লেখকগণ যে ক্রমে লিখে গেছেন, ঠিক সেই ক্রমে, তাঁদের প্যারার পর প্যারার সার মর্ম্ম না লিখে, তাঁরা আগে যুক্তির একটা খসড়া করে নিয়ে পরে তাদের ক্রম ঠিক করে নিয়ে লিখলে, সম্ভবতঃ যে ক্রমে যুক্তি সাজাতেন, সেই ক্রমে আমি লিখতে চেষ্টা করেছি। কোথাও কোথাও তাঁদের ভাবকে স্পষ্টতর করে সংক্ষেপে লিখতে হয়েছে। আমার কাজ ভাল হয়েছে কি না, তার বিচার পাঠকদের ও মাননীয় লেখকদের উপর। যদি লেখকদের মত যথাযথ প্রকাশে আমার ভুল-চুক, ছাড়-বাদ হয়ে থাকে, তাঁরা অনুগ্রহ করে মার্জ্জনা করবেন ও দেখিয়ে দেবেন। লেখক-সাধারণের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই যে, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম বাবুর মত, যদি তাঁরা গুরু বিষয়ে লিখিত চিন্তা ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধের শেষে নিজেদের যুক্তি ও তথ্যের সার সংকলন করে দেন, তবে যে শুধু আমাদের (পাঠকদের) তাঁদের কথা বুঝবার ও মনে রাখবার সুবিধা হয় তা নয়, তাঁরা নিজেই নিজের প্রবন্ধের দোষ-ত্রুটি ও যথার্থ মূল্য বুঝতে পারবেন। অপরের প্রবন্ধের উত্তর দেবার পূর্ব্বে তার সার সংকলন করে, পরে নিজের উত্তরে তার প্রত্যেক যুক্তির উপর নিজের মন্তব্য ও উত্তরের সংক্ষিপ্ত নোট আগে লিখে নিয়ে, তার ক্রম সাজিয়ে নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে বসলে খুব ভাল হয়।

এইবার পূর্ব্ব-আলোচনাকারীদের যুক্তিগুলির সম্বন্ধ নির্ণয় করে, তাঁদের সমালোচনা ও তর্কের বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমার মতামত লিখছি।

আলোচ্য প্রবন্ধগুলির শিরোনাম থেকে বোঝা যায় যে, প্রধান আলোচ্য বিষয়—আমাদের দেশে অকাল-মৃত্যুর কারণ বাল্য-বিবাহ কি না। কিন্তু শ্রীমতী অনুরূপা দেবী আনুষঙ্গিক ভাবে বাল্য-বিবাহ ভাল কি যৌবন বিবাহ ভাল, স্ত্রী-শিক্ষার প্রকৃত স্থান শ্বশুর বাড়ী কি বাপের বাড়ী, পাত্র-পাত্রী-নির্ব্বাচন নিজে করা ভাল, কি গুরুজনদের হাতে থাকা ভাল, প্রভৃতি অপরাপর নিকট ও দূর সম্পর্কিত বিষয়সমূহের অবতারণা করায়, আলোচনা অন্যান্য পথে চলে গিয়েছে। যখন ঐ সব বিষয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর হয়ে গিয়েছে, তখন আমাকেও বাধ্য হয়ে ঐ সব বিষয়েও সংক্ষেপে তাঁদের যুক্তির মূল্য নির্দ্ধারণ ও নিজের মতামত প্রকাশ করতে হবে।

১—বাল্য-বিবাহ অকাল-মৃত্যুর কারণ কি না?

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ও পণ্ডিত মহাশয়ের উত্তর—"না"।

তাঁদের যুক্তি এই যে, সেকালে (অর্থাৎ বহুপূর্ব্ব কালে হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন থেকে গত ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) প্রায় সকলেই বাল্যবিবাহ করতেন, কিন্তু অনেকেই দীর্ঘায়ু হতেন। তেমন অনেক দেখা লোকের কথা মনে আছে। (দেবীর) প্রথম বারের যুক্তির (আমার কৃত) সংক্ষিপ্ত সারের নং (১), দ্বিতীয় বারেরও নং (১), ও পণ্ডিত মহাশয়ের নং (২) ১৩২ দেখুন।)

আমার উত্তর—(১) সেকালের লোকের জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা হাতে না পেলে, এখনকার চেয়ে তাঁদের মৃত্যুর হার কম ছিল, অথবা তাঁরা এখনকার লোকের চেয়ে দীর্ঘায়ু ছিলেন, এ কথা জোর করে বলা চলে না। গুটিকতক নিজের মতের পোষক দৃষ্টান্ত দিলে, অথবা আন্দাজী কথা বললে, কিছুই প্রমাণ হয় না।

(২) শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর প্রথম বারের (২) সংখ্যক যুক্তিতে আধুনিক কালে অকাল-মৃত্যুর যে কারণগুলি দেখান হয়েছে, সেগুলি সবই ঠিক। শুধু ম্যালেরিয়া বাদ পড়েছে। কিন্তু তা থেকে প্রমাণ হয় না যে, বাল্য-বিবাহ অকাল-মৃত্যুর কারণ নয়। সেকালে এখনকার চেয়ে অকাল-মৃত্যু কম হ'ত ধরে নিয়েও বলা যেতে পারে যে, বর্ত্তমান কালে অকাল-মৃত্যুর নানাবিধ কারণের মধ্যে সেকালে অনেকগুলি ছিল না,—কতকগুলি ছিল, তাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ একটি। যদি সেকালে বাল্য-বিবাহ না থাকত,—স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে বর্ত্তমান

ইয়োরোপীয়দের মত জ্ঞান থাকত, তাহলে অকালমৃত্যু আরও কম, ও দীর্ঘ-জীবন আরও বেশী হত।

উপরের (১) ও (২) থেকে দেখা গেল যে, বাল্য-বিবাহ যে অকাল-মৃত্যুর কারণ নয়, এ কথা বলা বলে না। এবার দেখাব যে ওটা তার কারণ সমূহের মধ্যে একটি।

(৩) যাবতীয় জীব ও উদ্ভিদ রাজ্য পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, প্রথম যৌবন সঞ্চারে যে স্ত্রী-পুরুষের মিলন হয়, তাতে আদৌ ফল হয় না। আর যদি বা হয়, জন্মাবা-মাত্র মরে যায়, নচেৎ বেঁচে থাকলে দুর্ব্বল রুগ্ন ও অল্পায়ু হয়। দৃষ্টান্ত—কাঁচা বেগুনের বীজ পুতলে, গাছ বড় হলে কুঁকড়ে যায়, তাতে ফল ধরে না। নারকোল, তাল, খেজুর কুল, প্রভৃতি গাছের প্রথম বছরের ফুলে ফল ধরে না। গরু, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতির প্রথম বিয়ানের ছানাগুলি হয় মরে যায়, নতুবা চিররুগ্ন অবস্থায় বেঁচে থাকে। সিংহ মহাশয়ের (৩) খ (১) (২) ও (৩) সংখ্যক যুক্তি ঠিক বলে মনে হয়। সুতরাং মনে হয় যে, বাল্য-বিবাহ অকাল-মৃত্যুর অন্যতম কারণ। সেকালেও এই কারণে অকাল-মৃত্যু হত, কিন্তু তখন একালের মত অকাল-মৃত্যুর আরও অনেকগুলি নূতন কারণ বর্ত্তমান না থাকায়, খুব সম্ভব এখনকার চেয়ে অকাল-মৃত্যু কম হত।

২ বাল্য-বিবাহের দোষ

সিংহ মহাশয় ও দেবশর্ম্মা মহাশয় বাল্য-বিবাহের যে দোষগুলি দেখিয়েছেন, আমি সেগুলি স্বীকার করি। সেগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি দোষ দেখাচ্ছি।

(১) বালিকা বধূ লেখাপড়া, বুদ্ধির মার্জ্জন, গৃহকর্ম্ম, সংসার পরিচালন, নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা, সন্তানপালন প্রভৃতিতে কাঁচা ও অনভিজ্ঞ থেকে যাওয়ার জন্য সুগৃহিণী ও সুমাতা হতে পারে না, এ কারণেও শিশু মৃত্যুর আধিক্য হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারে অপর প্রাচীনা আত্মীয়াদের সঙ্গে থাকা হলে, এই দোষ কতকাংশে দূর হয়; কিন্তু আজকাল অনেক বধূকেই বিবাহের অল্পকাল পরেই স্বামীর সঙ্গে তাঁর কর্ম্মস্থানে গিয়ে স্বাধীনা গৃহিণী হতে হয়।

(২) অল্প বয়সে শ্বশুরবাড়ীতে বাপের বাড়ীর মত খেলা ধূলো, হাসি গল্প, লেখাপড়া করতে না পাওয়ায় ক্রমাগত নিষেধ, সমালোচনা, নিন্দা, বিদ্রূপ, ও ভয়ের মধ্যে, চাপের মধ্যে অল্প আলো ও বাতাসওয়ালা ঘরে, অবরোধের ভেতর, ঘোমটার ভেতর, থাকার জন্য, বালিকা বধূর শরীর ও মনের যথাযথ বিকাশ, উন্নতি ও স্ফুর্ত্তির ব্যাঘাত হয়।

(৩) অবিবেচক অসংযমী লোকেরা, (যাঁদের সংখ্যা পৃথিবীতে শতকরা ৯৯) নারীত্ব বিকাশের পূর্ব্বেই স্বামীর সঙ্গে বালিকা বধূর এক শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা করেন। অথবা বাড়ীর অপরে ব্যবস্থা করেছে দেখেও আপত্তি ও প্রতীকার করেন না। আর স্বামীরাও তাকে পশুবৃত্তি চরিতার্থ করবার যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করে অসহ্য যন্ত্রণা দেয়।

দৃষ্টান্ত—লায়ন ও ওয়াডেল সাহেব প্রণীত Medical Jurisprudence ৪র্থ সংস্করণ ২২৫ পৃষ্ঠায় আছে যে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হরিমোহন মাইতি নামে একজন ৩৫ বৎসর বয়সের বাঙ্গালী কুলাঙ্গার তার ১১ বছর ৩॥০ মাস বয়সের স্ত্রীর প্রতি ঐ রকম করাতে, অতিরিক্ত রক্তস্রাবে ১৩॥০ ঘণ্টা পরে বেচারীর মৃত্যু ঘটে। সরকার ফরিয়াদী হয়ে হরিমোহনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালান। ডাক্তারী পরীক্ষায় সাব্যস্ত হয় যে, সেবারের আগেও কয়েকবার সহবাস হয়েছিল।*

সম্ভবতঃ, এই ঘটনার পর, এই অধঃপতিত দেশে ধর্ম্মের নামে এরূপ বীভৎস ভাবে বালিকা-হত্যা হয়ে থাকে জানতে পেরে, দয়ালু ন্যায়বান সরকার সহবাস সম্মতির বয়স ১০ থেকে ১২ করেন। কিন্তু আজ অবধি এই আইন অনুসারে একটিও মোকদ্দমা হয় নি, কোন অপরাধীর শাস্তি হয় নি। কারণ অত্যাচারিতা বালিকারা মুখ বুজে সব সহ্য করে, সুতরাং ফরিয়াদি কে হবে, আর পুলিশই বা কি করে টের পাবে। বাংলা দেশে দ্বিরাগমন প্রথা প্রায় নেই, আর প্রবর্ত্তন করাও অসম্ভব। কারণ একবার বিয়ে দিলে বাপের বাড়ী মেয়েকে পাঠান না পাঠান সম্বন্ধে মেয়ের বাপের আর কোন জোর থাকে না। বিবাহের পূর্ব্বে এত বছরে পড়ার আগে মেয়েকে শ্বশুর ঘর করতে পাঠান হবে না, এরূপ মৌখিক চুক্তিতে ছেলের বাপ রাজি হলেও, "ধূলো পায়ে দিন" না করলেও

* Calcutta High Court, Queen Enepress versus Harry Mohan Mythee, I, L. R. 18 Cal 49, J. Wilson, July 1890.

বিবাহের পর পণের টাকা, গহনা, দান-সামগ্রী প্রভৃতি মনের মত না হলেই ছেলের বাপ বৈবাহিকের উপর প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেন, অর্থাৎ বৌ নিয়ে গিয়ে আর পাঠান না যতক্ষণ না তিনি আদেশ মত জরিমানা দিয়ে তাঁর তুষ্টিসাধন করেন। চোখের উপর এ সমস্ত দেখে শুনেও কি করে মা বাপ কচি বয়সে, অর্থাৎ জাতির অধঃপতনের যুগে প্রণীত শাস্ত্রানুসারে, নারীত্ব বিকাশের পূর্ব্বে, মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন ? থাকুক না কেন বাল্য বিবাহের দুই একটি গুণ। সব দিক বিচার করে দেখলে ১৮ বছরের আগে মেয়ের বিয়ে না দেওয়াই ভাল।

(৪) শাশুড়ী ননদ প্রভৃতির দ্বারা বালিকা বধূর প্রতি যে সব অমানুষিক অত্যাচারের (প্রহার, লোহা পুড়িয়ে গায়ে ছেঁকা দেওয়া, অনাহারে ছোট অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রাখা, প্রভৃতি) কথা মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখা যায়, (কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত আহিরীটোলার আনন্দময়ীর ও তার কিছুদিন পরের আরও কয়েকটি ঘটনার কথা মনে করুন) আর ঐ রকম বা ওর চেয়ে কিছু কম মাত্রার, অত্যাচার, উৎপীড়ন, যা অনেক বাড়ীতেই হয়, কিন্তু খবরের কাগজে বেরোয় না, এমন কি অনেক সময় পাড়ার লোকেও জানতে পারে না, সে সব, বধূ বালিকা ও অশিক্ষিতা হলে যতটা সম্ভব, যুবতী ও শিক্ষিতা হলে ততটা নয়। সেইজন্য মেয়েদের বাপেদের উচিত যে, মেয়েদের মুখ চেয়ে, তাদের ছোট বয়সে, অশিক্ষিতা, অসহায়া, ভীতা, নিরুপায়া অবস্থায় বিবাহ না দিয়ে, যেন বড় করে, ছেলেদের মত যত্ন করে, বাড়ীতে ও স্কুলে, বাংলা, সংস্কৃত, ও ইংরাজি ভাষা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, অপঘাতের আশু প্রতিকার, রোগীর শুশ্রূষা, শিশুর শরীর পালন ও চরিত্র গঠন, ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রীরোগ, পাটিগণিত, ভূগোল, ইতিহাস, সংসারের হিসাব রাখা, রান্না, আচার, চাটনি, মোরব্বা, জ্যাম প্রভৃতি তৈরী, হাতের ও কলের সেলাই, পোষাকের কাট ছাঁট, ধর্ম্মনীতি, গান বাজনা ও অপর সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান যতদূর সম্ভব যথাসাধ্য শিক্ষা দিয়ে বিয়ে দেন। এরূপ বয়স্থা, (১৬।১৭।১৮ বৎসরের) শিক্ষিতা ও কর্ম্ম নিপুণা বধূর উপর অত্যাচার উৎপীড়নের সম্ভাবনা তুলনায় অনেক কম।

(৫) ১১।১২ বছরের মেয়েকে দেখে সে বড় হলে তার শরীরের গড়ন কেমন হবে তা কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু ১৬।১৭ বছরের বড় মেয়েকে দেখে সেটা অনেকটা আন্দাজ করা যায়। সুতরাং যাঁরা চান যে তাঁদের বংশধরেরা হৃষ্ট-পুষ্ট, বলবান, ও লম্বা চৌড়া গড়নের হোক, রোগা ও বেঁটে না হোক, ছোট মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে অনিশ্চিতের ঝুঁকি তাঁদের নেওয়া উচিত নয়।

(৬) ছেলের বাপেরা প্রায়ই নানা কারণে বৌকে বাপের বাড়ী পাঠান না। ছোট মেয়েকে না পাঠালে তার ও তার মা বাপের যত কষ্ট হয়, বড় মেয়ে হলে তত হয় না।

(৭) ছোট মেয়েকে বৌ করে ঘরে আনলে, সে বড় ও মোটা হলে, তার অনেক গহনা ভাঙ্গিয়ে আবার গড়াতে হয়। মধ্যবিত্ত ও গরীব গৃহস্থের পক্ষে সেটা অনেক লোকসান।

(৮) সমাজের অধিকাংশ মেয়েকে বড় শিক্ষিতা ও কর্ম্মদক্ষ (৪) সংখ্যক দোষের শেষ ভাগে উল্লিখিত মত) করে বিয়ে দিলে বরপণের কামড় অনেক কমে যাবে।

আজকাল বরপণের প্রকোপ এই জন্য বেশী যে—

(ক) মেয়েদের কোন বিশেষ গুণ বা দাম নেই,

(খ) মেয়েদের বিয়ে দিতেই হবে, এবং

(গ) নারীত্ব বিকাশের আগেই বিয়ে দিতে হবে, এই রকম সামাজিক বাধ্যবাধকতা থাকা।

সুতরাং বরপণ প্রথার চোট কমাতে হলে—

(ক) (৪) সংখ্যক দোষের শেষে উল্লিখিত মত মেয়েদের সুশিক্ষা দিয়ে তাদের দাম বাড়াতে হবে, ফলে যে সব শিক্ষিত ছেলেরা শিক্ষিতা স্ত্রী চান, তাঁদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়তে থাকবে। তাঁরা এই রকম সুশিক্ষিতা মেয়ের খোঁজ পেলে, মেয়ের বাপের সাধ্য ও ইচ্ছামত দেওয়া গহনা, ও দানসামগ্রী মাত্র নিয়ে, কোন দাবী দাওয়া খাঁই না করে, বিয়ে করতে রাজি হবেন, ও তাঁদের বাপেদের মধ্যে যাঁরা লোভী, তাঁরাও ছেলের আগ্রহ ও ইচ্ছার কথা জেনে ক্রমশঃ লোভ ছাড়তে বাধ্য হবেন। যাঁদের পয়সা কম অথচ মেয়ে কালো বা সংখ্যায় বেশী, অথবা দুইই—তাঁদের তো এ ছাড়া অন্য পথ নেই, আর পথ আছে গলায় দড়ি।

(খ) মেয়েকে সুশিক্ষিতা করার পর সুপাত্র পেলে

তবেই বিবাহ দেব, এই প্রতিজ্ঞা করা। ফলে নারীত্ব বিকাশের আগে বিয়ে দেওয়া তো হবেই না, কোন কোন মেয়ের হয়ত যোগ্য সুপাত্র সময়ে না পাওয়ার জন্য বিয়ে হবেই না। না হয় নাই বা হল। তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষয়িত্রী, ডাক্তার, ধাত্রী, শুশ্রূষাকারিণী, দরজি প্রভৃতির কাজ করে নিজের ও ছোট ভাই বোন বা বুড় মা বাপের খরচ চালাতে পারবেন। সেটা তাঁদের নিজের, পরিবারের ও সমাজের পক্ষে বিধবা হয়ে দেওর ভাই প্রভৃতির গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে অথবা চরিত্রহীন, মাতাল, মূর্খ, বৃদ্ধ বা দরিদ্র স্বামীর হাতে পড়ার চেয়ে, ঢের কম অকল্যাণকর হবে।

৩—বাল্যবিবাহ ও বাল-বিধবা

সিংহ মহাশয় বলেছেন যে, বাল্যবিবাহের ফলে বাল-বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় (যুক্তি নং (৩) ৬)। পণ্ডিত মহাশয় যদিও এঁর সমস্ত যুক্তির উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এই যুক্তি সম্বন্ধে নীরব। সুতরাং ধরে নিতে পারি যে, এটা তিনি মেনে নিয়েছেন। বাস্তবিক না মেনে উপায় কি ?

৪—অল্প বয়সে সন্তান প্রসবের ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্য নষ্ট ও অকাল মৃত্যু হয় কি না।

সিংহ মহাশয় বলেন হয়। (যুক্তি নং (৩) ১ (খ))। পণ্ডিত মহাশয় কাশীর গঙ্গাস্নানকারিণী বৃদ্ধাদের দেখিয়ে এ কথা অস্বীকার করেন। (যুক্তি নং (২) ২)

(ক) গুটিকতক সেকালের দীর্ঘজীবী লোকের উল্লেখ করা সম্বন্ধে আমার ১ (১) এ যা বলেছি, এখানেও সেই কথা খাটে, অর্থাৎ মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখে একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়। সেই সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম স্থলগুলি সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান ও সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা না করা, অথবা নিজের সুবিধামত চোখ বুজে থাকা, সুবুদ্ধি, সত্য জানার ইচ্ছা, বা ন্যায়বিচারের পরিচয় নয়।

যে বৃদ্ধাগুলি বেঁচে আছেন পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাদেরই দেখেছেন, কিন্তু তাঁদের কত গুণ বার্দ্ধক্যের আগেই স্বর্গে গিয়েছেন, তার হিসাব কে দেবে ?

(খ) তা ছাড়া, কাশীর পথে ঘাটে যাঁদের তিনি দেখেছেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন বিধবা। তাঁদের মধ্যে অনেকে হয়ত মা হবার আগেই বিধবা হয়েছেন, অনেকে মাত্র ২।১টি ছেলের মা হয়ে বিধবা হয়েছেন। অনেকে হয়ত আদৌ বালিকা বয়সে সন্তান প্রসব করেন নি। সুতরাং মোটে সন্তান প্রসব না করায়, বা বালিকা বয়সে সন্তান প্রসব না করায় বা অল্প সন্তান প্রসব করায়, ও তার উপর মিতাচারে থাকা ও গঙ্গাস্নানের জন্য তাঁদের শরীর তো ভাল থাকবারই কথা।

(গ) বাল্য-বিবাহের ফলে নারীত্ব-বিকাশের পূর্ব্বেই স্বামী-সঙ্গ হয়, ফলে অকালে নারীত্ব বিকাশ—আদ্য ঋতু—যৌবনোদ্গম ও বাল-মাতৃত্ব হয়। যার যৌবন শীঘ্র বা অকালে আসে, তার যৌবন শীঘ্র বা অকালে যায়। সুতরাং বাল্য-বিবাহ ও বাল-মাতৃত্বের ফলে আমাদের মেয়েদের যৌবন, স্বাস্থ্য, ও রূপলাবণ্য, যৌবন-বিবাহকারীদের তুলনায়, শীঘ্রই যায়। তারা ঠিক "কুড়ীতে বুড়ী" না হোক, তিরিশ চল্লিশে তো হয়ই। মৃত্যুও তাদের তুলনায় অকালে হয়।

(ঘ) বহু পুরুষ ধরে যৌবনের পূর্ব্বেই বাধ্য হয়ে স্বামী সহবাস ও সন্তান প্রসব করার ফলে, আমাদের মেয়েদের শরীরের দৈর্ঘ্য পুরুষের চেয়ে অনেক কম দাঁড়িয়েছে। গোদের উপর বিষফোড়ার মত, অবরোধ প্রথা এই অবস্থার সহকারী কারণ। মরাঠি ও গুজরাটিদের মধ্যে প্রথম প্রধান কারণটী বাঙ্গালীদের মতই বর্ত্তমান, দ্বিতীয় সহকারী কারণটি নেই, তাই তাদের মেয়েরাও পুরুষের চেয়ে বেঁটে, তবে হয়ত বাঙ্গালীর চেয়ে তাদের গড় তফাত কম। কিন্তু যাদের ভিতর এই দুইটির মধ্যে কোন কারণই বর্ত্তমান নেই, তাদের স্ত্রী পুরুষের দৈর্ঘ্য প্রায় সমান। ইয়োরোপীয়দের মধ্যে আপনারা এটা লক্ষ্য করে থাকবেন, আর পূর্ব্ব আফ্রিকার কাফ্রিদের মধ্যেও, সে দেশে তিন বৎসর বাস করার সময়, আমি লক্ষ্য করেছি।

সারমর্ম্ম

(১) বাল্য বিবাহ যে অকাল-মৃত্যুর কারণ নয়, এমন বলা যেতে পারে না।

(২) গুটি কতক দৃষ্টান্ত দেখে কোন মত খাড়া করা চলে না।

(৩) বাল্য-বিবাহ অকাল-মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

(৪) অকাল-মৃত্যুর একটি কারণ বাল্য-বিবাহ সেকালেও ছিল, একালেও আছে। কিন্তু একালে অকাল-

মৃত্যুর অনেকগুলি নূতন জবর কারণ জোটাতে সেকালের চেয়ে একালে লোকে অল্পায়ু হয়।

(৫) সে কালে বাল্য-বিবাহ না থাকলে, ও আধুনিক ইয়োরামেরিকার মত ধাত্রীবিদ্যা, শিশুপালন, ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদির জ্ঞানের সমাজে প্রসার থাকলে, লোকে আজও দীর্ঘায়ু হত।

(৬) বাল্য-বিবাহের দোষ—

১—অকাল-মৃত্যু। এর মুখ্য কারণ :—

(ক) অপূর্ণ-শরীর সম্পন্ন অপ্রাপ্ত-যৌবন পিতা মাতার সন্তান স্বভাবতই রুগ্ন, দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হয়। (শিশুর অকাল মৃত্যু।)

(খ) বালিকা মার সন্তান প্রসবে কষ্ট, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়। (স্ত্রীর অকাল-মৃত্যু)।

(গ) বালিকা স্ত্রীর নারীত্ব অকালে আসে; সুতরাং যৌবন অকালে যায়, আয়ুও অকালে শেষ হয়। (স্ত্রীর অকাল-মৃত্যু।)

(ঘ) বালক স্বামীর অকালে ইন্দ্রিয় পরিচালন বশতঃ আত্মনাশ হয়। (স্বামীর অকাল-মৃত্যু)।

গৌণ কারণ—

(ক) বালিকা মা শিশুপালনে অজ্ঞ ও অক্ষম হওয়ায় শিশুর রোগ ও মৃত্যু বেশী হয়। (শিশুর অকাল মৃত্যু)।

(খ) বালক পিতা যথেষ্ট রোজগার করতে পারার আগেই অনেকগুলি সন্তান নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে, ফলে দারিদ্র্য; ফলে শিশুর উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাস, চিকিৎসা ও পথ্যের অভাব; ফলে অধিক শিশু-মৃত্যু। (শিশুর অকাল-মৃত্যু)।

২—বালক স্বামীর লেখাপড়ায় ব্যাঘাত হয়।

৩—বালক স্বামীর নিজের ও দেশের উন্নতির সম্বন্ধে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সাহস ও ত্যাগের কাজের উৎসাহ খর্ব্ব হয়।

৪—বাল-বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

৫—সুতরাং সমাজে পতিতা নারীর ও স্ত্রী কয়েদীর সংখ্যা বাড়ে।

৬—শ্বশুর বাড়ীর চাপ ও ভয়ের ভিতর বালিকা বধূর শরীর ও মনের বাড় ভাল হয় না।

৭—তার ফলে তার সন্তানদের শারীরিক ও মানসিক সম্যক উন্নতি হয় না।

৮—নারীত্ব বিকাশের পূর্ব্বে স্বামীর সঙ্গে রাত্রিযাপন করতে বাধ্য হওয়ায়, তার অত্যাচারে বিশেষ কষ্টভোগ করে, মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়।

৯—বালিকা (সুতরাং অশিক্ষিতা অথবা সামান্য শিক্ষিতা) বধূর উপর শাশুড়ী, ননদ, স্বামীর অত্যাচার, উৎপীড়ন, মার, ধোর যত বেশী মাত্রায় হতে পারে, যুবতী ও শিক্ষিতার উপর ততটা সম্ভব নয়।

১০—ছোট মেয়েকে তার শ্বশুরেরা বাপের বাড়ী না পাঠালে তার ও তার মা বাপ প্রভৃতির যত কষ্ট হবে, বড় মেয়ের বেলায় ততটা নয়।

১১—ছোট পাত্রী, বড় হলে, রোগা ও বেঁটে (সুতরাং অবাঞ্ছনীয়) হবে কি না, পাত্র পক্ষ আন্দাজ করতে পারেন না।

১২—ছোট বৌএর গহনা, সে বড় ও মোটা হলে, আবার ভাঙ্গিয়ে গড়াতে হয়।

১৩—বালিকার বিবাহের বয়সের সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকাতে, ও পাত্রী অশিক্ষিতা (সুতরাং শিক্ষিত পাত্রের কাছে সঙ্গীরূপে মূল্যহীন) হওয়াতে বরপণের প্রকোপ কমছে না।

১৪—মেয়েদের দৈর্ঘ্য পুরুষের চেয়ে কমে গেছে।

সমাপ্তি

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব আলোচনাকারিগণ বর্ত্তমান বিষয় প্রসঙ্গে যে সমস্ত সমস্যার অবতারণা করেছেন, তার মধ্যে এই প্রধান চারটি বিষয় সম্বন্ধে এবার আলোচনা করলাম :—

(১) বাল্য-বিবাহ অকাল-মৃত্যুর কারণ কি না।

(২) বাল্য-বিবাহের দোষ।

(৩) বাল্য-বিবাহ ও বাল বিধবা।

(৪) অল্প বয়সে সন্তান প্রসবের ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্যনষ্ট ও অকাল-মৃত্যু হয় কি না।

আগামী বারে তাঁদের আলোচিত নিম্নলিখিত অপ্রধান অপর ১৬টি সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করব—

১ বাল্য-বিবাহ, বালবিধবা ও সামাজিক দুর্নীতি। (১ক) স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কার ইন্দ্রিয়-লালসা বেশী। (২) বাল্য-বিবাহের কথিত গুণ বিচার। (ক) স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা সহজে ও দৃঢ় হয়। (খ) বালিকা বধূ ঘর-ভাঙ্গানী হয় না। (গ) সে শ্বশুরবাড়ীর নূতন চাল ও প্রথা সহজে গ্রহণ করতে পারে। (৩) যৌবন-

বিবাহের কথিত দোষ বিচার। (ক) বড় মেয়ে সহজে নিজেকে শ্বশুর বাড়ীর নূতন আচারের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। (খ) যৌবন বিবাহ প্রচলিত হলেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ চলিত হবে, কিন্তু মনুর মতে গান্ধর্ব্ব বিবাহের ও ইয়োরোপীয় সমাজে বিশৃঙ্খলা। (ঘ) যৌবন-বিবাহ ও ব্যভিচার।

(৪) বাল্য-বিবাহ ও যৌবন-বিবাহের রফা বা সমন্বয়। (৫) প্রাচীন ভারতের গৌরবের যুগে যৌবন-বিবাহ ছিল কি না। (৬) পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ দেওয়া উচিত কি না। (৭) বিবাহের উপযুক্ত বয়স কি? (৮) বাল্য-বিবাহের ফলে অকাল-মাতৃত্ব-নিবন্ধন দোষগুলি বর্জ্জন করে গুণগুলি লওয়া সম্ভব কি না। (৯) পাত্র ও পাত্রী নির্ব্বাচন-প্রণালী। (ক) স্বয়ং নির্ব্বাচনের দোষ। (খ) স্বয়ং নির্ব্বাচনের গুণ। (গ) গুরুজনের নির্ব্বাচনের দোষ। (ঘ) গুরুজনের নির্ব্বাচনের গুণ। (ঙ) কিরূপ পাত্র ও পাত্রী নির্ব্বাচন করা উচিত। (চ) মীমাংসা। (১০) বর্ত্তমান স্কুল কলেজে স্ত্রী-শিক্ষা। (১১) মেয়েদের শিক্ষার ভাল জায়গা বাপের বাড়ী না শ্বশুর বাড়ী? (১২) প্রজাবৃদ্ধি ভাল না মন্দ? (১৩) প্রজাবৃদ্ধি ভাল ধরে নিলে কি তার জন্য বাল্য-বিবাহ হওয়া দরকার? (১৪) অনাবশ্যক লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধি নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায় কি বিধবা-বিবাহ রহিত করা? (১৫) বিধবা-বিবাহ বন্ধের প্রকৃত কারণ কি? (১৬) বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি?

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

বীণা তাহার ঘরে একখানা সোফার উপরে একা শুইয়া উদাস নেত্রে জানালার বাহিরে চাহিয়া পড়িয়া ছিল। অবিরাম রোদনে তাহার চোখ দুটি আরক্তিম ও স্ফীত। একখানি লতাপুষ্পখচিত রেশমি রুমালে সে ক্ষণে ক্ষণে চোখের জল মুছিয়া ফেলিতেছিল।

স্বভাবতই অপূর্ব্ব সুন্দরী সে। এমন উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় রূপ সচরাচর চোখে পড়ে না। সর্ব্বদা সযত্নরচিত বেশভূষা, সাজসজ্জায় সেই সংস্কৃত ও মার্জ্জিত সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ প্রভায় দর্শকের দৃষ্টি ও মন মুগ্ধ করিয়া তুলিত। সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই সে রূপ অপূর্ব্ব ও নয়নাভিরাম। আজও তাহার সেই অশ্রুসিক্ত ম্লান করুণ রূপে তাহাকে সুদক্ষ শিল্পীর রচিত মনোরম চারু প্রতিমার ন্যায় দেখাইতেছিল।

সে অত্যন্ত কোমল ও লঘুপ্রকৃতি। অজস্র আদরে ও প্রশ্রয়ে পালিত হওয়ায় তাহার প্রকৃতি গঠিত হইতে পারে নাই। সে প্রজাপতির মতই মনোরম—প্রকৃতিও তাহার সেইরূপ সুখী ও আমোদপ্রিয়; সংসারে অভাব বা দুঃখ-কষ্টের কল্পনামাত্রও সে সহিতে পারে না। তাহার জীবনের এই প্রথম আঘাতে সে সত্যই প্রথমটা একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

লীলা ধীরে নিঃশব্দ-পদে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ মুগ্ধ ও স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ভগিনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার পাশে ধীরে বসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া ডাকিল—দিদি! উচ্ছ্বসিত অশ্রুর আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। বীণা মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই লীলার সজল নয়নের সহিত দৃষ্টি মিলিত হইল।

"লিলি! আমার বুকটা যেন ভেঙ্গে গেছে ভাই!" বীণা বালিশে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। লীলা নিঃশব্দে তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছিল, তাহার চোখের জলে বীণার মাথার চুলের রাশি সিক্ত হইতে লাগিল।

টেবিলের উপর সুদৃশ্য ফ্রেমের ভিতর হইতে অরুণের নিশ্চল প্রতিকৃতি নীরব সহাস্যমুখে এই দুই ক্রন্দনরতা ভগিনীর দিকে চাহিয়া ছিল।

শোকের বেগ একটু প্রশমিত হইলে বীণা বলিল, অরুণের ভাগ্যে যে এমন দুর্ঘটনা ঘটবে, তা কে ভেবেছিল?

চিরজীবনের মত দৃষ্টি হারিয়ে থাকা যে কি ভয়ানক—মনে মনে কল্পনা করতেও পারা যায় না। যা হোক, সব মন্দ জিনিসের ভিতরই কিছু না কিছু ভাল থাকেই,—এখন সেইটাই আমাদের পরম সান্ত্বনা। তুমি যে তাকে একবারে হারাও নি, এইটেই এখন সব চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের কথা নয় কি ভাই?

বালিশের উপর হইতে মুখ তুলিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বীণা বলিল, এখন আর তাতে আমার কোন সান্ত্বনাই নেই।

—"কেন নেই? ভেবে দেখলে এখনো এর ভাল দিক-টাও ঢের আছে। যুদ্ধে অরুণ একেবারে মারা পড়তেও পারতো, তা হলে আর তাকে ফিরে পাবার কোন আশা থাকতো না। এখন সে বেঁচে আছে, এখনো তোমাকে সে আগের মতই বা হয় ত আগের চেয়েও বেশি ভালবাসে। সে আবার তোমারি কাছে ফিরে আসছে। এখন এইগুলোই ত পরম সান্ত্বনা দিদি!"

—"তুমি যে গোড়ার কথাটাই বুঝছো না লিলি! এর পরে আর তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ হতে পারে না। আমি তার সেই দৃষ্টিহীন চোখ, সে মুখ কিছুতেই দেখতে পারবো না। এ কথা মনে করতে গেলে আমি যেন পাগল হয়ে উঠি। আমার বুকের ভিতর যে কি রকম করছে, তুমি বুঝতে পারবে না। মনে হচ্ছে, যে দিকে হোক, ছুটে পালিয়ে যাই,— তাতে যদি মনে শান্তি আসে!"

লীলা সস্নেহে তাহার বিশৃঙ্খল চুলের গোছা গুছাইয়া দিতেছিল। সে বলিল, জীবনের প্রথম আঘাতেই এমন করে ভেঙে পড়ো না ভাই। সংসারে মানুষকে অনেক ধাক্কা খেয়ে, অনেক ঝড় তুফানের মধ্য দিয়ে যেতে হয়,—এত অল্পে কাতর হলে কি চলে? তুমি ত কোন দিন জীবনে কোন কষ্ট পাও নি, দুঃখ সহ্য করতে মোটেই অভ্যস্ত নও,—তাই প্রথমটা এ রকম মনে হচ্ছে। ধীরভাবে গ্রহণ করতে পারলে দেখবে, ক্রমেই এটা সহজ হয়ে আসছে। আরও দেখবে যে, যাকে ভালবাস, এত সহজে তাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায় না। তাকে দেখতে হবে বলে এখন এত ভয় পাচ্ছ, এর পরে দেখবে, তাকে সুখী করা ছাড়া জীবনে তোমার আর প্রার্থনীয় কিছু নেই। আর এ তো এখন তোমারি কাজ দিদি! তোমার ভালবাসার আশ্রয় ছাড়া আর কোথায় তার শান্তি আছে? সংসারে আমাকে কোথাও দরকার নেই তা জানি; কিন্তু ধরো, যদি আমাকে কারু এমনি দরকার হতো, আমি কি তখন পেছিয়ে আসতুম?

টেবিলের উপর সুদৃশ্য পুষ্পাধারে ফুল সাজান ছিল. বীণা একটা গোলাপ তুলিয়া লইয়া বলিল, "উঃ! মাথাটা এমন ধরেছে!"

সে ফুলটি নাকের কাছে ধরিয়া লীলার কথার উত্তরে বলিল, "তুমি যে পিছোতে না, তা আমি জানি লিলি! তুমি চিরদিনের গোঁয়ার, দশ জনে যা করতে ভয় পায়, তুমি না ভেবে চিন্তে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়,—এই তোমার স্বভাব। কিন্তু তুমি তো জানো, আমি ঠিক তার উল্টো প্রকৃতির! আমি বড় অল্পে কাতর; দুঃখ-কষ্ট আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না। অরুণকে বিয়ে করা দূরে থাক, আমি আর কখনো তার সঙ্গে দেখা করতেও পারবো না। মা বলেছেন, এ বিয়ে হলে আমার সমস্ত জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।"

"মার কথা চুলোয় যাক! বয়স তো যথেষ্ট হলো, নিজের কথা একটু নিজে ভাবতে শেখো দিখি!" অত্যন্ত রাগিয়া লীলা এই কথা বলিয়াই তখনি নিজেকে সংযত করিয়া লইল, শান্তভাবে বলিল, "তুমি যদি তাকে সত্যই ভালবেসে থাক, তা হলে এখন তোমার কি করা উচিত বা অনুচিত, এ কথা অন্যের তোমাকে শেখাবার কোন দরকার হবে না। তোমার নিজের মন থেকেই এর উত্তর পাবে। আমি তাই বলছি, এখন মিছে কান্নাকাটি না করে, কথাটা ভাল করে শেষ পর্য্যন্ত ভেবে দেখ, কি তুমি করতে পার। আমার মতে তোমার সর্ব্বপ্রথম কাজ হচ্ছে তাকে লেখা, যে, ঘটনা যেমনি হোক, তার সঙ্গে তোমার যে সম্বন্ধ তা অনিবার্য্য, কেউ তা রোধ করতে পারবে না। তোমার এই কথা তাকে যে কত শান্তি দেবে, তা তুমি এখন বুঝতে পারছো না।"

"আমি কখনো তাকে এ কথা লিখতে পারি না—কখনো না! তুমি কি পাগল হয়েছ লিলি?" উত্তেজনার আতিশয্যে বীণা বিছানায় উঠিয়া বসিল। "আমি যখন নিশ্চয় জানি, যে, তার সঙ্গে আমার বিয়ে অসম্ভব, তখন

খামকা তাকে মিছে আশা দিয়ে চিঠি লিখে লাভ কি? যদিও এ ঘটনায় আমার বুক একেবারে ভেঙ্গে গেছে, তবু তাকে সত্য কথা বলবার মত সাহস আমার যথেষ্ট আছে!"

লীলা একদৃষ্টে বীণার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, সে বলিল, "তুমি যদি এটা একেবারে স্থিরনিশ্চয় বলে মীমাংসা করে রেখে থাক, তা হলে এর ওপর আর বলবার কি আছে! এখন তা হলে মাকে নিশ্চিন্ত হতে বলি গে। তিনিই ব্যস্ত হয়ে আমায় তোমার কাছে পাঠিয়েছিলেন, পাছে তুমি ভালবাসার খাতিরে তাকে কোন আশা দিয়ে চিঠি লিখে ফেল। তাঁর বোঝা উচিত ছিল, আর যে যাই করুক, তাঁর বীণা কখনো এমন কাজ করতে পারে না।"

তার পর একটু হাসিয়া সে আবার বলিল, তোমরা ত জানোই—আমি একরোখা কাঠখোট্টা মানুষ—খাই দাই, ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াই। বড় জোর একটু পড়াশুনা করি। কিন্তু ভালবাসার কোন ধার ধারি না—ও বিষয়টা ভাল বুঝিও না। তুমি আজ যে ভালবাসার নমুনাটা দেখালে ভাই! এই যদি ভালবাসা হয়, তাহলে ও বস্তুকে দূর থেকেই নমস্কার করছি! আমার এই কাঠখোট্টা স্বভাবই ভালো—ও জিনিস বুঝে কোন দিন দরকার নেই বাবা!"

বীণার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে মুখ ভার করিয়া বলিল, "মা যে বলেন, তোমার কিছু মায়া-দয়া নেই, তুমি একেবারে হার্টলেস্—তা সে কথা সত্যি; না হলে তুমি আমার এমন শোকের সময় আমায় এ রকম ঠাট্টা করতে পারতে না!"

লীলা হাসিয়া বলিল, "দোহাই তোমার, রাগ করো না মিছেমিছি! যেটা তুমি শোক বলে ভাবছো, ওটা শোক নয়—শোকের অভিনয় মাত্র। তোমাদের সমাজের নিয়ম ও ফ্যাসান যে, এ রকম ঘটনা হলে নায়িকার বুক-ভাঙ্গা পতন, মূর্চ্ছা, শোক ইত্যাদি হওয়া উচিত,—তুমিও সে নিয়মটা উল্টে দিতে পারো না। কাজেই যা যা করতে হয়, সবই করেছ; আর দু এক ঘণ্টা বাদে একেবারে চাঙ্গা হয়ে উঠবে—এখন কোন ভয় বা ভাবনা নেই। যথার্থ আঘাত যার লাগে, সে কি সে সময় বসে বসে নিজের ভাল মন্দ সম্বন্ধে এখন চুলচেরা বিচার করতে পারে? যা হোক, আমি এখন যাই—তোমাকে সান্ত্বনা দেবার বিশেষ কিছু ত দরকার দেখছি না। ভাল কথা, অরুণের চিঠিখানার কি জবাব দেবে তা হলে?"

—"সে আমি ওই টেবিলের ওপর লিখে রেখেছি। কিন্তু লিলি, তুমি সব সময় আমার সঙ্গে এমন নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার কর—এ একেবারে আমার পক্ষে অসহ্য!"

বীণা রুমালখানা তুলিয়া লইয়া আবার চোখ ঢাকিল।

লীলা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল, "এর মধ্যেই লিখে ফেলেছ? কই, দেখি?"

টেবিলের উপর হইতে খোলা চিঠিখানা চকিতে তুলিয়া লইয়া লীলা পড়িতে লাগিল—

"প্রিয় অরুণ! তোমার দুর্ভাগ্যের সংবাদ আমায় একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে। আমি যে কি যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছি, সে লিখে জানাতে পারবো না। তুমি আমাদের বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিতে চেয়েছো, আমিও অনেক ভেবে দেখেছি—এখন সেইটাই উচিত। কারণ এখন তোমার যে রকম স্ত্রীর দরকার, আমি তার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আমি অত্যন্ত অল্পেতেই কাতর হয়ে পড়ি—ধৈর্য্য ও সহ্য করবার শক্তি আমার মোটে নেই। সেবা ও যত্ন—যা তোমার এখন সারা জীবন অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন—আমি তাতে একবারে অক্ষম। মা-ও বলেছেন, এ বিবাহ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া এখন আমাদের দুজনের পক্ষেই অত্যন্ত কষ্টকর, তাই আমার মনে হয়, এ কষ্ট স্বীকার করবার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমি তোমায় কখনো ভুলবো না, কখনো না! প্রার্থনা করি—তোমার অবশিষ্ট জীবন যতদূর সম্ভব—যেন সুখী হয়! এখন তবে বিদায়!

বীণা—

লীলা পত্র পাঠ করিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—এ কি হৃদয়হীনের মত নিষ্ঠুর উত্তর! পত্রের কোনখানে একটা আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা বা সমবেদনার লেশমাত্র নাই! মানুষ যাহাকে ভালবাসে, তাহার দুরবস্থার সময় এমনি করিয়া এক কথায় তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে?

বীণা কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে বলিল, লিলি! তুমি এখানা ডাকে ফেলিয়ে দিতে পারবে? অরুণ এখন কিছু দিন কিরণের কাছে থাকবে।

লিখেছে। চিঠিখানা বসন্তপুরের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেই চলবে।

লীলার আর কোন কথা বলিবার প্রবৃত্তি ছিল না। সে পত্রখানা হাতে করিয়া নিঃশব্দে কক্ষ ত্যাগ করিল।

(৬)

অপরাহ্নে মিঃ রায়ের ভবন সংলগ্ন টেনিসকোর্টে বীণা তাহার বন্ধুদের সঙ্গে টেনিস খেলিতেছিল। লীলার কথাই ঠিক—সমস্ত দিন একা ঘরে বন্ধ থাকিয়া ও প্রচুর অশ্রুবর্ষণ করিয়া তাহার হৃদয়ের ভার লঘু হইয়া গিয়াছিল। সে প্রজাপতির মতই মনোরম—ও তাহারি মত চঞ্চল ও লঘু-প্রকৃতি—তাহার মধ্যে কোন গভীরতা ছিল না। যেমন সে অল্প আঘাতে মুহ্যমান হইয়া পড়ে—তেমনি অল্পেতেই সব ভুলিয়া যায়। কোন কিছুই তাহার অন্তরে স্থায়ী ভাবে ছাপ রাখিতে পারে না।

লীলা তাহার সঙ্গে ক্লবে আসিয়াছিল,—সে খেলায় যোগ না দিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া সকলের খেলা দেখিতেছিল। আজ তাহার মনে প্রতি দিনের মত আনন্দ বা স্ফূর্ত্তি ছিল না,—সমস্ত দিনের মধ্যে আজ সে একবারও তাহার অভ্যস্ত লেখাপড়ায় বা কোন কাজে মন দিতে পারে নাই। অরুণের শোচনীয় পরিণামের কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। এ সম্বন্ধে তাহার নিজের কাতরতা দেখিয়া নিজেই সে মনে মনে বিস্মিত হইতেছিল। সকলেই এ সংবাদ শুনিয়াছিল, ও শুনিবামাত্র আহা! উহু! করিয়া দুফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া হৃদয়ভার লঘু করিয়া ফেলিয়া, এ সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে, স্থির করিয়া—প্রতি দিনের মত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে খুই সহজেই ত মন দিল; কিন্তু তাহার এ হইল কি! যাহাকে সে কোন দিন চক্ষে দেখে নাই, যাহার সঙ্গে তাহার কোন পরিচয় মাত্র নাই, তাহারি কথা ক্ষণে ক্ষণে মনে হইয়া কেবলি আজ তাহার চোখে জল আসিতেছে, এ কথা সে কাহাকে বলিবে, কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না।

ও পাশের কোর্ট হইতে টেনিসের ব্যাট হাতে লইয়া নির্ম্মলা ছুটিয়া আসিল। "লীলা! খেলতে যাবি নি! দাঁড়িয়ে আছিস যে?"

লীলা বলিল, আজ আমি খেলবো না ভাই! তোরা যা, খেলগে,—আমার আজ ভাল লাগছে না কিছু!

নির্ম্মলা কাছে আসিয়া লীলার মুখের কাছে মুখ লইয়া কিছুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সকৌতুকে বলিল, তোর আবার আজ হলো কি? মন ভাল না থাকা, মুখ ভার, এ সব উপসর্গ তোর ত কোন কালে ছিল না,—ও সব ত আমাদেরি একচেটে জিনিস। কিন্তু আজ উল্টো রকম দেখছি যে! না ভাই! চল্! একজন পার্টনার না হলে আমাদের খেলা হচ্ছে না! আমার সঙ্গে তুই খেলবি চল! নির্ম্মলা লীলার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

লীলা হাত ছাড়াইয়া বলিল, না ভাই নিলি! আজ আমি খেলতে পার্ব্বো না। সত্যিই কিছু ভাল লাগছে না! ওই ওধারে প্রভা দাঁড়িয়ে আছে,—ওকে ডেকে নিয়ে তোরা খেলগে যা!

—"ও কিছু খেলতে পারে না। কিন্তু তাও না হয় ওকে নিয়েই খেলছি; কিন্তু তোর হল কি—সেটা বল? এখানে একা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবি তুই—এই রকম মুখ করে—দেখে আমি খেলতেই বা যাই কি করে?"

বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজিয়া ওঠায় লীলা উৎকর্ণ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া ছিল,—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও কাহাকেও না দেখিয়া বলিল, হবে আর কি! মনটা বিশেষ ভাল নেই! কিন্তু কিরণ আজ কেন এখনো আস্‌ছে না বল্ তো? সে তো এত দেরি কোন দিন করে না?

নির্ম্মলা লীলার দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, অবাক করেছিস তুই! এই জন্যে মুখে বিশ্বের বোঝা নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস বুঝি? যা হোক, এতক্ষণে একটা হদিস্ পাওয়া গেল! আহা মরে যাই আর কি!

নির্ম্মলা তাহার পরিপুষ্ট শুভ্র বেলফুলের মত মুখখানি লীলার মুখের কাছে আনিয়া সকৌতুকে গাহিল—

"ওই বাঁশী-স্বর তার, আসে বার বার
সেই শুধু কেন আসে না—
এই হৃদয় আসন শূন্য পড়ে থাকে
কেঁদে মরে শুধু বাসনা।"

লীলা রাগিয়া তাহাকে এক ধাক্কা দিয়া বলিল, যা—দূর হ এখান থেকে, বিশ দিন না বলেছি—কিরণ আমার

বন্ধু—তাকে নিয়ে তোদের ঐ সব চিরকেলে পচা ঠাট্টা করবিনি কখনো ?

নির্ম্মলা বলিল, ও বাবা! মেয়ের যে একেবারে মিলিটারী মেজাজ দেখ্‌ছি! মরগে যা তবে এখানে একলা দাঁড়িয়ে! কিরণ এলে এর শোধ নিয়ে তবে আমার অন্য কাজ!

নির্ম্মলা চলিয়া গেলে লীলা এদিক ওদিক ঘুরিয়া হলের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পিতা ও মিঃ ঘোষ ব্রীজ্ খেলায় মত্ত ছিলেন, সে কিছুক্ষণ তাহাই দেখিতে লাগিল।

মিঃ রায় বলিলেন, লিলি যে আজ এদিকে? খেলতে যাও নি ?

লীলা শ্রান্ত কণ্ঠে বলিল, না বাবা! আজ খেলতে ভাল লাগ্‌ছে না!

তাহার পরই সে মিঃ ঘোষের বিশাল পরিপুষ্ট স্কন্ধদেশে তাহার হাত রাখিয়া আবদারের সুরে বলিল, কাকা! আপনি যে নতুন বাগানবাড়ী কিনলেন, আমরা বুঝি সেখানে যেতে পাব না? কবে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন, বলুন!

মিঃ ঘোষ তাসের হিসাব একমনে করিতেছিলেন, সহসা আক্রান্ত হইয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, তোরা যে দিন যাবি—সেই দিনই—ওর আর আমি দিন ঠিক করব কি রে পাগলী? নির্ম্মলাকে বলে তোরা একটা দিন ঠিক করে চল্ না—কালই কি পরশু, যেদিন তোদের সুবিধে হয়।

তাঁহারা আবার খেলায় মন দিলেন। লীলা শূন্যমনে ঘুরিতে ঘুরিতে মায়ের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

ক্লবঘর উজ্জ্বল আলোকমালায় শোভিত—ঘরে ঘরে বিলিয়ার্ড খেলা, তাস খেলা চলিতেছে। বারাণ্ডার স্থানে স্থানে তরুণীর দল তাহাদের ভক্ত উপাসক-বৃন্দে বেষ্টিত হইয়া আলাপে মগ্ন—মাঝে মাঝে তাহাদের সুমিষ্ট হাসির ধ্বনি ও গল্পের মৃদু গুঞ্জন অস্পষ্টভাবে শোনা যাইতেছিল। প্রবীণা গৃহিণীর দল এক স্থানে সমবেত হইয়া পরস্পরের চর্চ্চায় চিত্তবিনোদন করিতেছিলেন।

মিসেস দত্ত পাটনা সহরের একটি গেজেটবিশেষ—সহরের সর্ব্বসাধারণের ঘরের খবর তাঁর নখদর্পণে বিরাজ করিত। কে তাহার ঘরে কি দিয়া ভাত খায়, অমুক বাড়ীর ছেলেটা কত রাত্রে বাড়ী ফেরে, কোন বাড়ীর মেয়েদের লজ্জা ও শীলতার সীমা অতিক্রম করিতেছে, কোন বাড়ীতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব নাই, এ সমস্তই তিনি মুখে মুখে বলিয়া দিতে পারিতেন। একবার কাহাকেও নিরীক্ষণ করিলেই তিনি তাহার রীতি-চরিত্র, নাড়ী-নক্ষত্র—সব অবলীলাক্রমে বলিয়া দিতেন। তাঁহার কথার বিরুদ্ধে কেহ কোন প্রমাণ আনিলেও, তাঁহার রায়ের কখনো পরিবর্ত্তন হইত না। তিনি বিজ্ঞের মত হাসিয়া বলিতেন, আমরা হলুম সবজান্তা লোক, আমাদের কাছে চালাকি? হুঁ! ইহার পর আর কোন কথা চলিত না।

লীলা শুনিল—এ হেন প্রথিতযশা মিসেস দত্ত তাহার মাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছিলেন, তা তুমি বেশ করেছ দিদি! এ ক্ষেত্রে বিয়ে ভেঙে না দিয়ে আর উপায় কি? মেয়েটাকে ত আর হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারো না? আর মেয়ে বলে মেয়ে! এমন মেয়ে এ সহরের কথা ত ছেড়েই দাও—বাংলা দেশে খুঁজলে আর একটা পাবে না—এ আমি এই বড় গলায় জোর করে বলতে পারি! কি দুঃখে এমন সোণার প্রতিমা অন্ধের হাতে ধরে দেবে ?

মিসেস রায় এই সহানুভূতিতে একবারে গলিয়া গেলেন। বীণা অদূরে একখানা সোফায় বসিয়া বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করিতেছিল। মিসেস রায় একবার সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তাই তোমরা পাঁচজনে বল ত ভাই! এতে কি আমার অন্যায় হয়েছে কিছু? বিশেষ যখন প্রস্তাবটা সে নিজেই করেছে! মেয়ে সকাল থেকে আর ঘর থেকে বেরোল না, কেঁদে কেঁদে খুন! আমার এত ভাবনা হয়েছিল, সে কি আর বোলবো! বিকেলে যখন কাপড় ছেড়ে নেমে এলো, তখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম! যা হোক, তবু কতকটা সামলেছে দেখে এখানে নিয়ে এসেছি,—পাঁচজনের মধ্যে থাকলে মনটা শীঘ্র ভাল হবে!

মিসেস দত্ত বলিলেন, বেশ করেছ! খেলাধুলো করুক, আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে মিশুক, সব ভুলে যাবে! ও মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা! কত লোকে মাথায় করে নিয়ে যাবে! এই দু'চার দিনের ভিতর কলকাতা থেকে আমার এক বোন-পো আসছে, ছেলে যাকে বলতে

হয়! চেহারা কি! তরুণ কোথা লাগে তার কাছে! বাংলা দেশে মস্ত জমিদারী—রাজা উপাধি তাদের, এলে দেখো তখন...

একজন মহিলা বলিলেন, আজকাল সরলাকে যে আর দেখতে পাই নে? সে তো এদিকে আসা এক রকম ছেড়েই দিয়েছে দেখছি! পাটনায় আছে, না চলে গেছে কলকাতায়?

মিসেস রায় বলিলেন, না, সে এখানেই আছে। সেদিন একটা চিঠি দিয়েছিল,—শরীর ভাল থাকে না, তাই আসতে পারে না লিখেছে।

মিসেস দত্ত একটু হাসিয়া বলিলেন, ও সব বাজে কথা! বাড়ীর পাশে থাকি আমি! আমার কাছে কি আর কোন খবর লুকানো থাকে! যে সব ব্যাপার চলছে আজকাল... কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি নীরব হইলেন।

তখন চারিদিক হইতে সমস্বরে 'কি হয়েছে'? 'ব্যাপার কি'? ইত্যাদি প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। যা হোক এতক্ষণে একটা মুখরোচক বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে!

মিসেস দত্ত তখন জাঁকিয়া বসিয়া একটি বিরাট ভূমিকা ফাঁদিলেন,—ব্যাপার আর কি! স্বামী স্ত্রীতে বনিবনাও হচ্ছে না! মেয়েরা ত অল্প বয়সে নিজের মন ভাল করে বোঝে না—খালি ওপরচটক দেখে ভুলে যায়! যাই বল দিদি! আমি ঐ সব বিদেশী লোকগুলোকে বিয়ে করার একেবারে বিপক্ষে! ওতে কখনো সুফল হতে ত দেখলুম না। এই সরলা—গোড়ায় বুঝলে না—ঢের বুঝিয়েছিলুম—এখন টের পাচ্ছেন ত? কথাটা শেষ করিয়া তিনি একবার বিজয়গর্ব্বে সকলের মুখের দিকে তাকাইলেন।

—"কিন্তু সরলা ত খুব ভাল মেয়ে? তার সঙ্গে না বনবার কারণ কি?"

—"কারণ আর কি? মারাঠিগুলো যে কাঠখোট্টা গোঁয়ার—ওরা কি কখনো আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারে? যতই লেখাপড়া শিখুক, জাতের স্বধর্ম্ম যাবে কোথা? ও পাঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, মারাঠি সব সমান! বাঙ্গালীর মধ্যে যে কোমলতা, যে ভদ্রতা আছে, আর কোন জাতে ত সেটি কই দেখলুম না।"

মিসেস রায় বলিলেন, তা সরলা যদি এত কষ্টই পাচ্ছে, তা হলে ওদের মধ্যে ত ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া ভালো। সদ্ভাবই যদি না থাকে, তবে মিছে এ সংসারের অভিনয় করে আরো নিজেদের জীবনে দুঃখ ডেকে আনার দরকার কি?

—"ছেলেটি আছে যে! ছেলেকে সে ছাড়তে চায় না! আমি ত কত দিন ও কথা বলেছি তাকে! বল্লেই কাঁদে—বলে, ওর জন্যে আমি সব সহ্য করে বেঁচে থাকবো।"

এ কথায় উপস্থিত মহিলাদের সকলের মনই একটি করুণ সহানুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মিসেস দত্ত অতঃপর কোন্ প্রসঙ্গ তুলিয়া সভা জমাট রাখিবেন, এই অবসরে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

লীলা বিরক্ত হইয়া হল ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিরণ সেদিন একটু দেরী করিয়া আসিয়াছিল। লীলা বলিল, আর একটু হলেই তোমার সঙ্গে আজ আমার বিষম ঝগড়া হয়ে যেত!

'অপরাধ'?—বলিয়া হাসিয়া কিরণ লীলার হাত ধরিল। খোলা বারাণ্ডা দিয়া উন্মুক্ত চাঁদের আলো তাহাদের দুজনের মুখে চোখে রজতধারা ঢালিতেছিল।

লীলা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নির্ম্মলা আসিয়া তাহাদের নিকটে দাঁড়াইল। বলিল, এই যে কিরণবাবু! এই এলেন বুঝি? আজ আপনার বড় দেরী হয়েছে! লীলা বিকেল থেকে যা ব্যস্ত হচ্ছিল! বলিয়া সে অর্থপূর্ণ কটাক্ষে লীলার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল।

কিরণ কিছু না বুঝিয়া সরলভাবে বলিল, তাই না কি? এত ব্যস্ত হবার কারণটা কি লিলি? দরকার ছিল কিছু?

নির্ম্মলা নিরীহের মত বলিল, আপনাদের যে কেমন স্বভাব! দরকার না থাকলে বুঝি আর মানুষ কারুকে খুঁজতে পারে না? যাক, বসুন আপনারা, আমি বাড়ী যাই! রাত হয়েছে!

কিরণ বলিল, কিছু রাত হয়নি এখনো! তুমিও বসো না—গল্প করা যাক খানিকটা!

—নাঃ! আমার আজ কাজ আছে! একটা গান প্র্যাকটিস্ করতে হবে! ঐ যে ভাল—সেই গানটা

আপনি জানেন কিরণবাবু? 'হায়! মিলন হলো! যখন যৌবন ফুরালো আর বসন্ত গেলো!'—ঐটে?

কিরণ একটু বিব্রতভাবে মাথা চুলকাইয়া বলিল, ঐটে কেন, আমি ত কোন গানই জানি না, সে তো তুমি জানই!

নির্ম্মলা কথাটা শেষ করিয়াই মুখে রুমাল দিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল,—কিরণের উত্তর শুনিবার জন্য দাঁড়াইল না।

কিরণ কিছুই বুঝিল না; হাসিয়া বলিল, নির্ম্মলাটা আচ্ছা পাগলা দেখছি! কিন্তু সত্যি কেন খুঁজছিলে আমাকে লিলি? কিছু দরকার ছিল?

—"ছিল না? বিশেষ দরকার! বিকেল থেকে খুঁজে খুঁজে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি,—ওঁর আসবার আর সময়ই হয় না! কি করছিলে এতক্ষণ?"

কিরণ অনুতপ্ত হইয়া বলিল, তাই রাগ হয়েছে বুঝি? সত্যি লিলি! একটা কাজ ছিল, সেটা সেরে আসতে একটু দেরী হয়ে গেছে! আমি কি জানি যে, তুমি আমায় খুঁজবে? যাক্, দরকারটা কি তোমার?

—"সে একটা ভয়ানক বিষয়!"

কিরণ হাসিয়া বলিল, যাকগে, ভয়ানক বিষয় পরে শোনা যাবে, আপাততঃ তোমার সঙ্গেও আমার বিশেষ ঝগড়া আছে। তুমি এত ভাল গান গাইতে পার, অথচ আমায় এত দিনের মধ্যে সে কথা কিছুই বল নি! আমি জানতুম, আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে কোন কথা গোপন থাকবে না।

লীলা বলিল, তোমায় কে বলেছে আমি গান গাইতে পারি?

—"বলবে আবার কে? আমি নিজে শুনেছি—তুমি আজ সকালে মাঠে গান গাইছিলে। আমায় গান না শোনালে, আমি তোমার কোন কথা শুনবো না! এত দিন আমায় কিছু বলা হয় নি!

লীলা হাসিয়া বলিল, সে কি আমার দোষ? লণ্ডনে থাকতে আমি গান বাজনা ভাল করেই শিখেছিলুম। এখানে এসে দেখি, সবাই বীণাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত,—আমার বিষয় জানবার বা আমার গান শোনবার কারু অবসর নেই। আমার কেউ খোঁজ করে নি, আমিও নিজে থেকে কারুকে কিছু বলি নি।

—"বেশ করেছ! এখন উঠে এস! আজ আর ছাড়ছি না,—একটা গান শোনাতেই হবে!

—"কিন্তু কিরণ! ওরা সব বড় হাসবে তা হলে!"

—"তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।"

কিরণ লীলার হাত ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে পিয়ানোর কাছে বসাইয়া দিল। (ক্রমশঃ)

চন্দননগরের সাধক ও সিদ্ধপুরুষ (১)

শ্রীহরিহর শেঠ

প্রকৃত সাধু সংসারে খুবই বিরল হইলেও একেবারে দুর্লভ নহে। জটাজটধারী, কৌপিন বা গেরুয়া পরিহিত সংসার-ত্যাগী সাধুর—বেশ-বৈশিষ্ট্যহীন সাধু বা সাধকের পরিচয় আমরা বড় রাখি না। এমন শ্রেষ্ঠতম সাধু যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের স্বরূপ চিনিবার মত লোকও সুলভ নহে। তেমন সাধু চন্দননগরে কয়জন আসিয়াছেন, কয়জন চলিয়া গিয়াছেন, তাহার কথা জানি না। কোন না কোন ক্ষমতা-সম্পন্ন এখানকার সাধু, সাধক বা সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া পরিচিত যে সব মহাপুরুষের কথা জানিতে পারা যায়, তাঁহাদের কথাই এখানে সংক্ষেপে বলিব।

চন্দননগরে কয়েকজন অলৌকিক ও অসাধারণ ক্ষমতাশালী সাধু বা সাধক পদবাচ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের নাম হনুমান দাস বাবাজি, নমাজি সাহেব, আলথু সা ও কানাইদাস বাবাজি। এতদ্ভিন্ন মাখন বৈষ্ণব ও দাতা সাহেব নামক আর দুই জন ছিলেন—তাঁহাদেরও কিছু অসাধারণ ক্ষমতা ছিল; কিন্তু তাঁহাদের চরিত্রগত বিশেষত্বের কথা বড় কিছু শুনা যায় না।

হনুমান দাস বাবাজিকে দেখিয়াছেন, এমন বৃদ্ধ লোক কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও এখানে জীবিত ছিলেন। বাবাজি যখন এখানে থাকিতেন, তখন চন্দননগরের উপকণ্ঠে গঙ্গা-

(১) এই প্রবন্ধে লিখিত মহাত্মাদের কথা ভিন্ন যদ্যপি আর কাহারও কথা কাহারও কিছু জানা থাকে, বা ইহাতে কোন ভুল চুক থাকে, লেখককে চন্দননগরের ঠিকানায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে বাধিত হইব।

তীরে একটী সামান্য কুটীর তাঁহার আবাস স্থান ছিল ; এবং সময় সময় একটি তিন্তিড়ী বৃক্ষের উপর তাঁহাকে কালযাপন করিতে দেখা যাইত। তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল এবং জন্মস্থান কোথায় ছিল, তাহা অজ্ঞাত। তিনি তেঁতুল গাছে থাকিতে ভালবাসিতেন বলিয়াই সম্ভবতঃ লোকে তাঁহাকে হনুমানদাস বাবাজি বলিত। তিনি ছোট ছোট বালক বালিকাদের অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাহারাও সর্ব্বদা তাঁহার নিকট আসিয়া বিরক্ত করিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই কারণেই তিনি গাছের উপর উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন।

নমাজী সাহেবের সমাধি মন্দির (নমাজী পীরের আস্তানা)

তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার সম্বন্ধে এত কথা প্রচলিত আছে যে, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। কথিত আছে, তিনি যাহা মনে করিতেন, তাহাই করিতে পারিতেন। ছেলেরা তাঁহার কাছে যাহা খাইতে চাহিত, তাহাই পাইত। এক দিন স্থানীয় কোন বণিক নৈহাটী হইতে ফরাশডাঙ্গায় নৌকা বোঝাই করিয়া গুড় লইয়া আসিতেছিলেন। বালকের দল ঐ গুড় খাইতে চাহিলে, বাবাজি বণিককে উহা হইতে কিছু দিতে অনুরোধ করেন। তাহাতে বণিক উত্তর দেন,—'ইহাতে গুড় নাই, পাঁক আছে।' পরে দেখা যায়, সমস্ত কলসগুলিই পাঁকে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। শেষে কাতর কণ্ঠে বাবাজিকে সবিশেষ জানাইলে, তাঁহার কৃপায় বণিক তাঁহার গুড় পুনঃপ্রাপ্ত হন।

বাবাজি ভাগীরথীর বারিবক্ষে পদব্রজে যথেচ্ছ ভাবে গমন করিতে পারিতেন। ইচ্ছা করিলেই অদৃশ্য হইতে বা নিমেষ মধ্যে বহুদূরে যাইতে পারিতেন। রথের সময় একই দিনে একই সময়ে তাঁহাকে পুরী ও মাহেশে রথ টানিতে এবং এখানেও ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া যাদুঘোষের রথ টানিতে বা উল্লাসে নৃত্য করিতে দেখা যাইত। তিনি ইচ্ছা করিলে একাসনে বসিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া স্বয়ং যেমন ত্রিভুবন পরিদর্শন করিয়া আসিতে পারিতেন, তেমনই অপরকেও ঐ প্রকারে নানা স্থান দেখাইতে পারিতেন। এক দিন তিনি গঙ্গাসৈকতে বসিয়া ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের সহিত বৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর কথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন ভক্তকে "আমাদের অদৃষ্টে আর রাধাগোবিন্দজীর পাদপদ্ম দর্শনলাভ হলো না"—এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জাহ্নবীর জলে ডুব দেওয়াইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন। এইরূপ শত শত আশ্চর্য্য কার্য্যের কথা শুনা যায়। ক্ষুধার্ত্তের আহার, দরিদ্রের অর্থ, অপুত্রককে পুত্র দান তাঁহার পক্ষে

অতি সামান্য কথা ছিল। এক দিন প্রদোষকালে শ্মশানে রমণী-কণ্ঠ নিঃসৃত আর্ত্তনাদ শ্রবণে ব্যথিত হইয়া তথায় গমন করিয়া তিনি অবগত হন যে, রমণীর একমাত্র সন্তান কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। তিনি দয়া-পরবশ হইয়া মৃতের নিকট গিয়া তাহার কর্ণধারণ পূর্ব্বক "এই বেটা উঠ" বলিয়া সম্বোধন করিবামাত্র, বালক জীবন প্রাপ্ত হইয়া যেন গাঢ় নিদ্রাভঙ্গের পর ধীরে ধীরে উপবেশন করিল। বাবাজি রমণীকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি করিয়া, এ কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। সেই সরল-হৃদয়া রমণী গৃহে প্রত্যাগমনের পর সকলকে তাঁহার অসীম দয়ার এবং পুত্রের অদ্ভুত জীবন-প্রাপ্তির কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। এই ঘটনার পর হইতে ক্রমে তাঁহার কাছে লোক-সমাগম অত্যন্ত অধিক হইতে লাগিল। এই সময় তিনি এক দিন হঠাৎ এখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইহার পর তাঁহাকে আর কেহ চন্দননগরে দেখেন নাই। শুনা যায়, অল্প দিন পরেই তিনি পুরীতে দেহ-রক্ষা করেন। তাঁহার ন্যায় সিদ্ধপুরুষ এতদঞ্চলে আর কেহ ছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

হনুমান দাসের সাধনা, ধ্যান ও যোগের কথা কেহ বলিতে পারেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে কালনায় সিদ্ধ ভগবান দাস নামক অপর একজন মহাপুরুষের কাছে যাইতেন। অনেকের বিশ্বাস, তিনিই হনুমান দাসের গুরু ছিলেন। সেই মহাপুরুষ আজি নাই, কিন্তু সহরের উপকণ্ঠে তাঁহার সামান্য জীর্ণ সমাধি-মন্দিরটী আজিও বিরাজ করিতেছে। তিন্তিড়ী বৃক্ষ কালের নিষ্ঠুর আবর্ত্তনে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আজিও সেই পুণ্যময় স্থানকে লোকে তেঁতুল তলার ঘাট বলে। (২)

নমাজী সাহেবের ক্ষমতা ও সাধুতার কথা এখানে অধিক লোকে বিশেষ ভাবে না জানিলেও, তাঁহার নামে উর্দ্দুবাজারে নমাজী পীরের আস্তানায় সহরের হিন্দু মুসলমান অধিবাসীদের অনেকেই মানসিক করিয়া প্রতি বৃহস্পতিবারে পূজা দিয়া থাকেন, এ কথা অনেকেই বিদিত আছেন। নমাজী সাহেব জাতিতে মুসলমান। তিনি একজন সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন; প্রথমে বাজারে বসিয়া পাটোয়ারি করিতেন। এই সময় সরিষাপাড়া

তিরুপতি মন্দিরের মোহান্ত ও তাঁহার শিষ্য চতুষ্টয়
(ছবির বামদিকে মথমলের পোষাক পরিহিত শ্রীরামচন্দ্র)

পল্লীস্থ মোল্লা হাজির বাগানে তাঁহার বাস ছিল। তিনি সময় সময় মৌনব্রত অবলম্বন করিতেন। কাম, ক্রোধ, লোভাদি রিপুর আক্রমণ-মুক্ত থাকিয়া ভগবৎ-চিন্তায় দিন যাপনই তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল। সঞ্চয়ের স্পৃহা তাঁহার ছিল না। কথিত আছে, এক দিন মিষ্টান্ন ভক্ষণের

(২) ১৩০৭ সালের 'পূর্ণিমায়' মল্লিখিত "হনুমান দাস বাবাজী" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার বিষয় কিছু বিশদভাবে লিখিত আছে।

জন্য তাঁহার লোভ জন্মে। তিনি তখনই বন্য কচু মুখে ঘর্ষণ করিয়া, নিজ রসনাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, ভবিষ্যতে এরূপ হইলে উহাপেক্ষা অধিকতর শাস্তির ব্যবস্থা হইবে। হনুমানদাস বাবাজির ন্যায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার সম্বন্ধেও বহু গল্প শুনা যায়। তিনি চক্ষুর অগোচর স্থানের কথা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিতে পারিতেন; কাষ্ঠ পাদুকা পরিয়া গঙ্গাপার হইতে পারিতেন বলিয়াও শুনা যায়। প্রায় এক শত বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি দেহ-রক্ষা করেন। তাঁহাকে হিন্দু মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধা করিতেন। ৺বিশ্বম্ভর নায়েক নামক তাঁহার জনৈক ভক্ত ভদ্রলোক তাঁহার কৃপায় সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন এই বিশ্বাসে, তিনি শেষাবস্থায় যে স্থানে সর্ব্বদা থাকিতেন, তথায় একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া নিত্য সেবাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। উহাকে জনসাধারণে 'নিয়াজিপীরের আস্তানা' বলিয়া থাকে।

আলথু সাও একজন মুসলমান ফকির,—পাটোয়ারি পাড়ায় রাজা মুসলমানের বাড়ীতে বাস করিতেন। তিনি একজন বিশেষ পরোপকারী এবং সাধু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ঔষধ প্রভাবে তিনি কঠিন ব্যাধি হইতে জনগণকে মুক্ত করিতে পারিতেন ও করিতেন। তাঁহার দেহত্যাগের নির্দ্দিষ্ট সময় তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন।

কানাইদাস বাবাজি নামক একজন নিরহঙ্কার, নিরভিমান প্রকৃত বৈষ্ণবের কথা জানা যায়। প্রায় ৫১ বৎসর পূর্ব্বে গোয়াবাগান নামক স্থানে ইনি বাস করিতেন। ইঁহার আদি বাস চট্টগ্রামে। বৈদ্যনাথ দে নামক এক ব্যক্তি ইঁহাকে এখানে লইয়া আইসেন। ইঁহার অসাধারণত্বের অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইনি সাধারণ ভিক্ষাবৃত্তিধারী বৈষ্ণবের মত ছিলেন। কেবল মৃত্যুর পূর্ব্বে ইনি আত্মীয়—স্বজনকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, যেন তাঁহার দেহাবসানের পর তাঁহার শবদেহ তাঁহারা কেহ স্পর্শ না করেন,—তখনকার কার্য্যের জন্য যথাসময়ে তাঁহার লোক আসিবেন। গঙ্গাতীরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, আত্মীয়গণ পূর্ব্ব নির্দ্দেশমত আর কেহ মৃতদেহ স্পর্শ করিলেন না। এই সময় কোথা হইতে অবধূত বেশে প্রকৃতই দুইজন লোক আসিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া মৃতকে লক্ষ্য করিয়া "এই যে ভায়া দেহত্যাগ করেছেন" —বলিয়া তাঁহারা উভয়ে ধরাধরি করিয়া সেই মুক্ত-প্রাণ দেহ ভাগীরথী-সলিলে নিক্ষেপ করিয়া তথা হইতে কোথায় তিরোহিত হইলেন, তাহা আর কেহ বলিতে পারিল না।

কালনার সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজীর আশ্রম

দাতাসাহেব ও মাখন বৈষ্ণব নামে যে দুইজনের নাম এখানে শুনা যায়, তাঁহারা এমন কি সাধুজনোচিত গুণ-বিশিষ্ট ছিলেন, তাহার কোন পরিচয় জানা যায় না; কিন্তু তাঁহাদিগকে অনেকেই ক্ষমতাবান সাধু বলিয়া মনে করিত।

উভয়েই কোন বিদ্যাবলে লোককে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে পারিতেন, সেই জন্যই বোধ হয় জনগণের উপর তাঁহাদের কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের দেখিয়াছেন এমন লোক এখানে এখনও আছেন। তাঁহারা সাধক বা সিদ্ধপুরুষ হউন বা না-ই হউন, তাঁহাদের এমন কিছু ক্ষমতা ছিল, যাহা সাধারণ লোকের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই কারণেই তাঁহাদের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

মনেও তাঁহার প্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছিল। কথিত আছে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গুপ্তধনের সন্ধানে সরকারি লোক তাঁহার কুটীরে আসিয়া সকল স্থান, এমন কি মাটির নীচে খুঁড়িয়া অনুসন্ধান করেন। বলা বাহুল্য, কিছু না পাইয়া শেষে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া যান।

মাখন বৈষ্ণব সম্বন্ধেও কোন কোন ক্ষমতার কথা জানা যায়। তিনি এখানকার দোয়ারি যুগির যাত্রার

দাতাসাহেব উত্তর-পশ্চিম দেশীয় একজন মুসলমান- প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে পাদরিপাড়ায় একজন ফকিরের ন্যায় একটি ভগ্ন কুটীরে বাস করিতেন। ইঁহার অলৌকিক ইন্দ্রজালের ন্যায় কার্য্যকলাপের কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইনি নিজগৃহে শতগ্রন্থিযুক্ত মলিন বসন পরিধান করিয়া অতি সামান্য ভাবে থাকিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় প্রত্যহ অপরাহ্ণে সুন্দর রেশমি পোষাকে সজ্জিত হইয়া, দশ অঙ্গুলীতে দশটি হীরকাঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া, গজদন্তনির্ম্মিত ছড়ি হস্তে রাজপুত্রের ন্যায় বেশে ভ্রমণে বাহির হইতেন। তিনি সকলের সহিত বেশ মেলা মেশা করিতেন এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বড় ভালবাসিতেন। ছেলেরাও তাঁহাকে বড় ভালবাসিত। সময় সময় তাহারা তাঁহাকে খাওয়াইবার জন্য ধরিলে, তিনি মিঠান্নের দোকানে লইয়া যাইয়া যাহা ইচ্ছা খাইতে বলিতেন। ছেলেরা সমস্ত মিষ্টান্ন খাইয়া ফেলিলে, তিনি সানন্দে দোকানদারকে সমস্ত দাম মিটাইয়া দিতেন। এক সময় কোন স্থানে যাত্রা হইতেছিল। তথায় তিনি এক দোনা পান কিনিয়া, সভাস্থ বহু লোককে যতক্ষণ যাত্রা হইয়াছিল, পান বিতরণ করিয়াছিলেন। কথায় কথায় তিনি অকস্মাৎ প্রচুর অর্থ উৎপন্ন করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে পারিতেন। তাঁহার এই সব কার্য্যের জন্য রাজপুরুষগণের

সিদ্ধ হনুমানদাস বাবাজীর আশ্রম (চন্দননগর তেঁতুলতলার ঘাট

দলে কাজ করিতেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি হনুমানের অংশ অভিনয় কালে অস্বাভাবিক রূপে লম্ফ-প্রদান করিয়া দর্শকবৃন্দকে আশ্চর্য্য করিয়া দিতেন। তাঁহার লম্ফপ্রদান এতই আশ্চর্য্যজনক মনে হইত যে, তখন সে দলে যে পালাই গাওনা হইত, তাহাতে হনুমান রূপে তিনি একবার না দেখা দিলে, দর্শকগণের কিছুতেই

পরিতৃপ্তি হইত না। এতদ্ভিন্ন আরও কোন কোন ক্ষমতার পরিচয় দিয়া তিনি লোককে আশ্চর্য্য করিতে পারিতেন।

স্বামী দেবপ্রসাদ চন্দননগরের একটি রত্ন। সংসার-আশ্রমে ইঁহার নাম ছিল দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ইনি একজন প্রকৃত সাধক ছিলেন। বাদামতলা নামক পল্লীতে ১২৭১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃদেব বলিতেন, তাঁহার জন্মের পর অকস্মাৎ তাঁহার বিশেষভাবে অর্থ-সৌভাগ্য সূচিত হইয়াছিল। তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কলেজে পঠদ্দশায় তাঁহার চাল-চলন সাহেবি ধরণের হইয়াছিল। এই সময়েই তাঁহার বিবাহ হয়। বাটীতে বি এল পড়িবার জন্য, পিতা তাঁহাকে আইন পুস্তক কিনিয়া দিয়া উহার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হন এবং হুগ্লি কলেজে অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত হন। এই কারণেই হোক বা অন্য কোন কারণে হোক, তিনি পিতার বিশেষ বিরাগ-ভাজন হন। এই সময় হইতেই তাঁহার সংসারের প্রতি বৈরাগ্যের ভাব পরিলক্ষিত হয়, এবং পত্নী বিয়োগের সহিত তাহা বেশ সুস্পষ্টাকারে দেখা যায়। একটি শিশু পুত্রকে রাখিয়া তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই সন্তানটিও বিনষ্ট হয়।

ইহার পরই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কানপুরে জনৈক ব্রহ্মচারীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব্বেই সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। তথায় তিনি শাস্ত্রচর্চ্চায় বিশেষ মনোযোগী হন। তৎপরে গুরু সমভিব্যাহারে কয়েক বৎসর ভারতের তীর্থ সকল পরিভ্রমণ করিয়া, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে কিছুদিন অবস্থান করেন। তিনি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। স্বামী দেবপ্রসাদ নাম তাঁহারই প্রদত্ত। গোস্বামী মহাশয়ের সহিত কাশীতে যাইয়া শ্রীমদ ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তিনি তাঁহার কৃপা লাভ করেন। সম্ভবতঃ স্বামীজীর ব্যবস্থানুসারেই তিনি বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এনিবেশান্টের সহিত দেবেন্দ্রনাথের যথেষ্ট পরিচয় ছিল এবং তিনি তাঁহাকে ভালবাসিতেন। গোস্বামীজীর তাঁহার ন্যায় ভক্ত কমই ছিল। দেবপ্রসাদের কানপুরে অবস্থিতি কালে, এক দিন তিনি তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক মাথায় পাদুকা দ্বারা বিশেষ ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, ভক্তপ্রাণ মহাপুরুষ তখন কলিকাতায় ছিলেন। ইহাতে তাঁহারও মাথায় বিশেষ বেদনা ও ক্ষত হইয়াছিল। (৩)

ইনি পুরীতে বানরবধ নিবারণ কল্পে শাস্ত্রের প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া একটি বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং কতকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কিছু দিবস গোস্বামী মহাপ্রভুর নিকট বাস করিয়াছিলেন। ১৩০৫ সালের ২১শে ভাদ্র পুরীর সমুদ্রতীরে সাধনা করিতে করিতে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। কেহ কেহ বলেন, স্বর্গদ্বারের ঘাটে সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। স্বামীজীর এইরূপ মৃত্যুতে প্রভুপাদ অত্যন্ত কাতর হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। আর কাহারও মৃত্যুতে তাঁহাকে কখন কাতরতা প্রকাশ বা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখা যায় নাই। (৪)

শুনা যায়, গোস্বামী প্রভু এই ঘটনার কয়েক দিন পূর্ব্বে শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, যে, তিনি যেন দেখিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে ২১ জনকে সমুদ্র ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। ঘটনার দিন স্নানের পূর্ব্বে স্বামীজী সমুদ্রতীরে উপবেশন পূর্ব্বক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্যানস্থ ছিলেন। ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি গোস্বামী প্রভুর অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মিশ্র মহাশয়ের নিকট কথা-প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে, তিনি ধ্যানাবস্থায় অন্তরীক্ষে বিশুদ্ধ তানলয়সংযুক্ত অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিতেছিলেন। তাঁহার দেহান্তে গোস্বামী প্রভু এই ব্যাপার অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"শাস্ত্রে আছে যে মুক্ত পুরুষদিগের মৃত্যুকালে স্বর্গের অপ্সরা বিদ্যাধরীগণ নৃত্য গীত করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। এই ঘটনা আকস্মিক নহে। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে স্বামীজী পরমপদ লাভ করিয়াছেন।" (৫) স্বামীজীর ন্যায় আর

(৩) প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।—শ্রীজগদ্বন্ধু মৈত্র।

(৪) ঐ ঐ ঐ ঐ

(৫) শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাধনা ও উপদেশ।—শ্রী-অমৃতলাল গুপ্ত।

কোন এতবড় সাধক চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন বলিয়া জানি না। তাঁহার তিরোভাবের পরও গোস্বামীজীউ তাঁহার আত্মার আশ্রমে আগমন জানিতে পারিতেন বলিয়া প্রকাশ আছে। (৬)

এখানে আর একটি যুবকের নাম করিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিব। তাঁহার নাম রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি এখনও সাধু সন্ন্যাসী কিছুই নন, কিন্তু ইনি যে পথের পথিক হইয়াছেন, তাহাতে এই স্থানে ভিন্ন ইঁহার কথা বলিবার সুযোগ নাই। এই যুবকের কথা এখনও দেশের অনেকেই জানেন না; কিন্তু ইনি জীবিত থাকিলে এক দিন মান্দ্রাজ প্রদেশের চিত্তুর জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ তিরুপত্তি মন্দিরের মোহান্ত বা অধিকারী হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। সাধুরা ইহাকে বালাজীর মন্দিরও বলিয়া থাকেন। এককালে ইহা চিত্তুরের রাজার দেবালয় ছিল। এক্ষণে রাজা গিয়াছেন, রাজ্য গিয়াছে, এই প্রাচীন সুবিশাল দেবালয়ই রাজ্যের পূর্ব্ব-গৌরবের স্মৃতি-চিহ্নরূপে বিরাজ করিতেছে এবং মোহান্তই রাজার উপাধি বহন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে লোকে মোহান্তরাজ বলিয়া থাকে। এই মন্দিরের আয় বার্ষিক ১৩ লক্ষ টাকা।

রামচন্দ্র অতি দরিদ্রের সন্তান। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কলে একটি সামান্য বেতনের চাকুরী করিয়া, হেলাপুকুর নামক পল্লীতে একখানি পর্ণকুটীরে অতি কষ্টে দিন যাপন করেন। রামচন্দ্র শৈশব কাল হইতেই অতি শান্ত-প্রকৃতি, পাঠাভ্যাসে রত, মাতা-পিতার প্রতি ভক্তিমান্ ও সত্যবাদী। পিতামাতা ও ভাই ভগ্নীদের নিতান্ত দৈন্যাবস্থা দেখিয়া রামচন্দ্র ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়া, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ১৪৲ টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁহার পাঠেচ্ছা প্রবল, অথচ দৈন্যবশতঃ পাঠের উপায় নাই দেখিয়া, চন্দননগরের নবরত্ন-মন্দিরের সংস্কারক নৃসিংহ বাবাজী নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে বালাজী আশ্রমে লইয়া যান। তাঁহার ধীশক্তি ও সুপ্রকৃতির জন্য তিনি তথায় সকলের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠেন। তথাকার মোহান্তরাজ শ্রীমদ প্রয়াগদাস তাঁহার চারিটি শিষ্যের মধ্যে এক্ষণে তাঁহাকে প্রধান শিষ্য করিয়া তাঁহার সকল ব্যয় ভার গ্রহণ পূর্ব্বক লেখাপড়া শিখাইতেছেন এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে ইঁহাকেই তাঁহার গদি প্রদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। রামচন্দ্র এখন বি এ পড়িতেছেন এবং ছয়টি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছেন। শুনা যায়, তাঁহার জন্মের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মুখের উপর দিয়া একটি বিষধর সর্প চলিয়া গিয়াছিল। (৭)

(৬) প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।—শ্রীজগদ্বন্ধু মৈত্র।

(৭) "নবসঙ্ঘ" ১ম বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা হইতে এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ শেঠের নিকট হইতে রামচন্দ্রের সম্বন্ধে অবগত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র কুণ্ড, শ্রীযুক্ত নীলম্বর ঘোষ ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে এই প্রবন্ধোক্ত অন্যান্য মহাত্মাদের বিষয় লিখিতে সাহায্য পাইয়াছি। সে জন্য সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। —লেখক।

সোমনাথের মন্দির

শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

হে নীলাম্বুর পদমূলে প্রহরীর মত
এ মন্দিরে ছিলে তুমি আজিও যেমন,
সৌভাগ্য-গৌরবে যবে ছিল সমুন্নত,
লুপ্তপ্রভা শোভাহীন কি দশা এখন।
দেব নাই, দেবালয় রয়েছে পড়িয়া,
ভগ্নচূড়, চূর্ণদেহ, কঙ্কালের সম;
অনুপম কান্তি তব লয়েছে হরিয়া,
আবরিয়া আছে, হায়, কি গভীর তম।
প্রভাতে মঙ্গলশঙ্খ উঠে না বাজিয়া,
মুখরিত নহে আর, ভক্ত-কলরবে;
স্তবস্তুতি, গীতবাদ্য, গিয়াছে থামিয়া,
কত শত বর্ষ শত, কেটেছে নীরবে!
সোণার মন্দির আজ, শ্মশানের প্রায়—
হেরিলে কাহার নাহি বুক ভেঙ্গে যায়!

বাউল্—দাদ্‌রা

কথা ও স্থর—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন　　　　স্বরলিপি—শ্রীমতী সাহানা দেবী

যদি তোর হৃদ্‌যমুনা হোলরে উছল রে ভোলা,
তবে তুই একূল ওকূল ভাসিয়ে দিয়ে চল্‌রে ভোলা।
আজি তুই ভরা প্রাণে　　　　ছুটে যা নৃত্যে গানে
　যে আসে প্রেম-প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে চল্‌রে ভোলা।
যে আসে মনের দুখে　　　　যে আসে ফুল্ল মুখে
　টেনে নে সবায় বুকে (তোর) থাক না চোখে জল্‌রে ভোলা।
দুধারের ফুল কুড়িয়ে　　　　চলে যা মন জুড়িয়ে
　মালা তোর হ'লে বিফল করবি কি তুই বলরে ভোলা।
মিছে তোর স্থখের ডালি　　　　মিছে তোর দুখের কালি
　দুদিনের কান্না হাসি (সব) ছল ছল ছলরে ভোলা।
জীবনের হাটে আসি　　　　বাজা তুই বাজা বাঁশী,
　থাক্ সেথা বেচা কেনার দারুণ কোলাহলরে ভোলা।
অরূপের রূপের খেলা　　　　চুপ্ করে দেখ্ দুবেলা
　কাছে তোর এলে কুরূপ (তুই) মুখ ফিরায়ে চল্‌রে ভোলা॥

[ধা]　•　+　১　+
II পা | পা পা া | মা া পধা | পা মগা া | া া পা |
য　দি তো র্　হৃদ্ - য　মু না -　- - হো

•　+　•　+
পা পা পমা | পা ধা ধা | ধা ধনা র্সা | ধর্না া II
ল রে উ　ছ ল্ রে　ভো লা -　-

{ পা | পা ধা র্সা | র্সা র্সা া ; র্সা র্সা া | না র্সা না |
ত　বে তু ই　এ কূ ল্　ও কূ ল্　'ভা সি য়ে

না ধা না | পা ধা ধা | ধা ধনা র্সা | ধনা া | }
দি য়ে -　চ ল্ রে　ভো লা -　-

•　+　১　+
{ মা | মা মা পা | পা পা া | পা পা া ! া া পা |
আ　জি তু ই　ভ রা -　প্রা ণে -　- - ছু
জী　ব নে র　হা টে -　আ সি -　- - বা

•　+　•　+　•
পা পা া | ধা া র্সা | র্সা না র্সা | ধনা ধনসা না | ধা পা া | া া }
টে যা - ন্　তো　গা নে　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-
জা তুই - বা　জা　বাঁ শী　-　-　-　-　-　-　-　-　-　-

{ সা | সা রা গা | মা া মা | গা রা া | া া মা |
দু　ধা রে র্　ফু ল্ কু　ড়ি য়ে -　- - চ

মা মা া | গা া মা | গা রা া | (গরা গা) } া া
লে যা -　ম ন্ জু　ড়ি য়ে -　-　-

•　+　•　+　০
{ পা | ধা ধা ণা | ধা া ণা | ধা সর্ণা ধপা | পা পা ধা | পা মা
যে　আ সে -　প্রে ম্ প্লা　ব　নে　ভা সি যে　নি য়ে
মা　লা তো র্　হ লে -　বি　ফ　ল　ক র্ বি　কি তু
থাক্ সে থা -　বে চা -　কে　না　র্　দা রু ণ　কো লা

+　০　+
পা | গমা গা মা | মা পা া | া া }
-　চ ল্ রে　ভো লা -　- -
ই　ব ল্ রে　ভো লা -　- -
-　হ ল্ রে　ভো লা -　- -

•　+　•　+　•
{ পা | পা ধা না | র্সা র্সা া | না ধা া | া া সা | র্সা র্সা া |
যে　আ সে -　ম নে র　দু খে -　- - যে　আ সে
মি　ছে তো র্　সু খে র　ডা লি -　- - মি　ছে তো র
অ　রূ পে র　রূ পে র　খে লা -　- - চুপ　ক রে -

\+ ০ + + ০ +

না । র্সা । না ধা । (নধা না—) } ।-।-র্সা । র্রা র্রা । । র্রা র্রা র্রা ।

ফু - ল্ল মু খে - - - টে নে নে - স বা য়

দু খে র কা লি - - - দু দি নে র কা - ন্না

দে খ্ দু বে লা - - - কা ছে তো র এ লে -

০ + ০ + ০

র্রা র্রা সর্রগা । র্রা র্সা । । । স । র্সা । না । র্সা । না ধা না ।

বু কে - - - - - ও তোর থাক্ - না চো খে -

হা সি - - - - - - - তুই ছ - ল্ ছ - ল্

ক্ল - - প্ তুই মু খ্ ফি রা য়ে -

\+ ০

পা ধা ধা । ধা পধা নর্সা । ধনা । ধা ।

জ ল্ রে ভো লা - - - "য"

ছ ল্ রে ভো লা - - - "য"

চ ল্ রে ভো লা - - - "য"

বরযাত্রী

শ্রীসুনীতি দেবী বি-এ

নরেশের বৈঠকখানায় সেদিন আমাদের আড্ডাটা ভাল করে জমছিল না। অতুল এক কোণে বসে চোখ বুজে ঘুমোচ্ছিল। তার কাণের কাছেই সুরেনের উদ্দেশ্যহীন তবলার চাঁটি তাকে সজাগ রাখতে পারছিল না। নরেশ আপন মনে থেকে থেকে শব্দ না করে হার্ম্মোনিয়মটার চাবির ওপর আঙ্গুল বুলিয়ে যাচ্ছিল। আর দু'একজন খবরের কাগজ নিয়ে মগ্ন ছিল। আমি চুপ করে থাকতে না পেরে বল্লাম,—বড় চা-তেষ্টা পেয়েছে নরেশ!—নরেশ তখন নিজের জায়গায় বসে বসেই হাঁক দিল—ওরে ও জগা—। জগা তার উত্তরে কল্পতরুর মত তখনই চায়ের পেয়ালাগুলি ট্রের ওপর সাজিয়ে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

অতুলের ঘুমটুম অমনি ছুটে গেল। সে তড়াক করে সোজা হয়ে বসে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে আরম্ভ করে দিল। চা খাওয়া শেষ হলে সুরেন বলে উঠল—ওহে নরেশ, সেই 'কালবৈশাখী' গানটা গাও না। সেদিন বেশ লেগেছিল সুরটা। নরেশ সুর টিপে ধরতেই অতুল বল্ল—রাখ তোমার কালবৈশাখী! ঘরে বসে পা ছড়িয়ে অমন কালবৈশাখী গান ঢের গাওয়াও যায়, শোনাও যায়। একবার তার হাতে আমার মত যদি পড়তে ত বুঝতে মজাটা।

নরেশ বল্ল—শুনি ব্যাপারটা। গান থাক্। গল্পটাই চলুক।—বলে সে হার্ম্মোনিয়ম ছেড়ে উঠে পড়ল।

অতুল যেখানে বক্তা, সেখানে জমে উঠতে দেরি লাগে না। বাঙ্গালীর আসল গুণ বক্তৃতা দেওয়া—তা থেকে বিধাতা অতুলকে বঞ্চিত করেন নি।

সে আরম্ভ করল,—বাবা সেবারে দারজিলিংএ বদলি হয়েছিলেন। সেখানেই আমরা সবাই ছিলাম। আমার মামাতো ভাই কিশোরী আমাদের কাছে ছিল।

নরেশ বল্‌ল—ও, সেই তালপাতার সেপাই ?

অতুল বল্‌লে,—হাঁ, আমরা তাকে তালপাতার সেপাই বলেই ডাক্‌তাম বটে।—তারপর শোন না মজাটা।

কিশোরীর বাবা পাবনায় থাক্‌তেন, তিনি লিখে পাঠালেন, যে, কিশোরীর বিয়ের ঠিক্‌ হয়ে গেছে, অবিলম্বে সে যেন বাড়ী ফেরে। বিয়ের নামে কিশোরী মহা খুসী হয়ে উঠ্‌ল। সে চিরকালই বিয়ে-পাগ্‌লা কি না !

বলেই অতুল একচোট হেসে নিল।—এখন কিশোরীর কিন্তু একলা যেতে ঘোর আপত্তি। আমায় ধরে পড়ল—বরযাত্রী যেতে হবে। আমি কি আর করি, বাবার অনুমতি নিতে যাওয়ার ঠিক্‌ করে ফেল্‌লাম।

সুরেন বল্‌ল—বরযাত্রী যেতে তুমি রাজি হলে,—আশ্চর্য্য ত ! সেবারে বীরুর বিয়েতে কিছুতে গেলে না। মোটে কল্‌কাতা থেকে ব্যারাকপুর- সেই গেলে না। আর দারজিলিং থেকে পাবনা !

অতুল বল্‌ল—আরে কেন যাই না—বোঝ না। সেই একবারে যা শিক্ষা হয়ে গেছে—তার পর থেকে গঙ্গাযাত্রী হতে রাজি আছি, কিন্তু বরযাত্রী ?—ওরে বাস্‌রে—সে আর এ জন্মে অন্ততঃ নয়।

যাক্‌, তার পর কি হল তাই শোন।

যেদিন রওনা হলাম, সেদিন মামাবাবুর চিঠির আদেশ মত, দারজিলিংএর মাখন কিছু নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গালিয়ে বিয়ে বাড়ীর ভোজের ঘি তৈরী করা হবে।

পোড়াদায় ট্রেণ না থাম্‌তেই, কিশোরী মাখনের হাঁড়ি হাতে দাঁড়িয়ে হাঁকডাক আরম্ভ করল—শীগ্‌গীর নেমে পড়, নইলে অন্য গাড়ী ধরতে পারবে না ইত্যাদি। ট্রেণ থামবার আগেই সে এমন হুড়মুড় করে নেমে পড়ল যে, হাত থেকে মাখনের হাঁড়ি পড়ে ভেঙ্গে গিয়ে প্লাটফর্ম্মে গড়াগড়ি ! সে কি দৃশ্য ! আমি, যেটুকু শক্ত মাখন ওঠাতে পারি, তার চেষ্টা করতেই, কিশোরী হাত ধরে আমায় টেনে নিয়ে অন্য ট্রেণে বসিয়ে বল্‌ল—কর কি, এখনই গাড়ী ছেড়ে দেবে যে। আমি হেসে বল্‌লাম—এমন বিয়ের তাড়া ত মানুষের দেখি নি বাপু। আর গাড়ীশুদ্ধ লোক হেসে উঠ্‌ল। গাড়ী ঢের দেরিতে ছাড়ল, তবু আমি, একবারও নাম্‌বার অনুমতি পেলাম না। কিশোরী আমায় আঁকড়ে ধরে কুষ্টিয়া পৌঁছে হোটেলওয়ালাদের হাতে পড়ে যা অবস্থা হল, শ্রীধামের পাণ্ডাদের হাতে পড়লে বোধ হয় তার চেয়ে কিছু খারাপ হত না। কোনমতে দুটি ভাত-ডাল নাকে মুখে গুঁজে গড়াই নদীতে সুন্দরী ষ্টীমারের আশ্রয় নেওয়া গেল।

এইবারে যা হল, তা আর কি বল্‌ব ভাই। একেবারে বাঁচতে বাঁচতে মরে গেলাম।

আমরা হো হো করে হেসে বল্‌লাম—বাঁচতে বাঁচতে মরা আবার কি রকম ? মরতে মরতে বেঁচে গেছ বল !—

অতুল বল্‌ল—ও একই কথা। অমন করে ভুল ধরলে কি গল্প বলা হয় ?

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লাম—আচ্ছা, আর আমরা বাধা দেব না, তুমি বল।

অতুল আর এক পেয়ালা চায়ের ফরমাস করে আরম্ভ করল -

বিকেল বেলা কালবৈশাখী আরম্ভ হল। কবির গানের নয়, একেবারে সত্যিকারের—ভয়ঙ্কর। সে কি বাতাসের গর্জ্জন, আর ঢেউয়ের কি উদ্দাম উচ্ছ্বাস ! সেই উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়িতে 'সুন্দরী' ত দুল্‌তে আরম্ভ করল। মেয়েদের বস্‌বার জায়গাটা মোটা ক্যানভাসে ঘেরা ছিল, সেখান থেকে আর্ত্তনাদ উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তবু মেয়েরা তার ভিতরে বসেই কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, বাইরে বেরুলেন না। ষ্টীমার উল্টে পড়ে পড়ে,—তখন আমার মনে হল,—মেয়েদের ঘেরাও করা বস্‌বার জায়গায় বাতাস আটকাচ্ছে বলেই ষ্টীমারের এমন দশা। তখনই লাফিয়ে পড়ে দুহাতে টেনে টেনে ক্যানভাস ছিঁড়তে লাগ্‌লাম, যেই ছেঁড়া শেষ হল, বাতাস খেল্‌বার জায়গা পেল, অমনি ষ্টিমারেরও দোলা বন্ধ হল। ভাবলাম, কাপ্তেন সাহেব বুঝি বা চটে গেছেন,—যাক ভাগ্যক্রমে তিনি খুসী হয়ে আমায় ধন্যবাদই দিলেন।

প্রাণে বেঁচে বাজিৎপুর ষ্টেসন ঘাটে পৌঁছান গেল। পাবনায় দেখি, বরের ভাই নিতে এসেছে। কিশোরী আমার কানে কানে বল্‌ল—ভায়াকে জিজ্ঞেস্‌ করো ত, মেয়ে সুন্দরী কি না, আর লেখাপড়া জানে কি না। আমি বল্‌লাম—তুমি ত রূপে কন্দর্পকে হার মানিয়েছ,—আর তবু যদি না ম্যাট্রিক ফেল করতে। তোমার আবার এসবের খোঁজ কেন ? কোন্‌ রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী তোমাকে

বরমাল্য দেবেন বল? কিশোরী চটে গিয়ে বল্‌ল—তোমার বক্তৃতা শুনবার জন্য সঙ্গে আনি নি হে। জিগেস্ করবে ত কর নইলে নেই!

আমি মুচ্‌কে হেসে বিনোদকে কিশোরীর প্রশ্নটা বল্‌লাম। সে বল্‌ল—আর বল কেন অতুলদাদা! বাবাকে কি করে যে রাজি করেছে, জানি না। দেখ্‌তে দাদার চেয়েও সরেস। আর লেখাপড়া? তার 'ক' অক্ষর গোমাংস।

আমি এহেন সংবাদ কিশোরীকে কি করে দিই। শেষে ভেবে চিন্তে বল্‌লাম—দেখ্‌তে সে গেরস্তর ঘরের মেয়েদেরই মত,—ডানাকাটা পরী আর কোথা পাওয়া যাবে বল? লেখাপড়া তুমি বরং শিখিয়ে নিও। পাড়াগাঁয়ে বেচারীর শিখবার সুযোগ হয় নি, কিন্তু বেশ বুদ্ধিমতী শুন্‌ছি।

কিশোরী তাদের গ্রামে চলে গেল। আমি পাবনায় আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে রইলাম। কিশোরীকে জিজ্ঞেস করে নিলাম, তারা কবে কোন ষ্টীমারে রওনা হবে। পাবনায় দুটি বন্ধুকে রাজি করালাম—আমার সঙ্গে বরযাত্রী যেতে।

ঠিক্ দিনে বাজিৎপুর ষ্টেসন ঘাটে গিয়ে কিশোরীদের কাউকে দেখ্‌লাম না। শুন্‌লাম একটা ষ্টীমার আগের দিন ছেড়েছে। বোধ হয় তাতেই বর চলে গেছে, তার যে রকম তাড়া! এই মনে করে আমরা তিনজন রোহিণী ষ্টীমারে উঠে পড়লাম। ষ্টীমারটা ছাতুখোরে ভরা,—একজন মাত্র বাঙ্গালী ডাক্তারকে পেয়ে যা হোক একটু খুসী হলাম।

বরযাত্রী হয়ে যাব, বরের মত আদর-যত্নে—তা না, নিজের ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে ডেক্-প্যাসেঞ্জার হয়ে চল্‌লাম। বন্ধুর বাড়ীতে পাবনায় ভাল করে খাওয়াও হয়নি। ষ্টীমারে উঠে মেঠাইমোণ্ডার লোভে পেটে জায়গা রেখেছিলাম। যেই ক্ষিদে পেল, অমনি তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগ্‌লাম। সারা ষ্টীমার খুঁজে ছাতু ছাড়া আর কিছু কিন্‌তে পেলাম না,—আর পেলাম একটি আম। তাও একজন যাত্রী দয়া করে আমাদের দিয়েছিল। আমটি রেখে দিয়ে, ছাতুটুকু খেতে খেতে বিকেল হয়ে গেল।

আর কোথায় যায়! আবার সেই কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠ্‌ল। হঠাৎ চেঁচামেচি শুন্‌লাম, ষ্টীমারের কি একটা ভেঙ্গে গেছে। শুনেই ত আত্মারাম ভয়ে কাঠ! ষ্টীমার নোঙ্গর করে মেরামত চল্‌তে লাগ্‌ল, আর এদিকে ঝড়ের গর্জ্জন, বৃষ্টির ঝাঁট সহ্য করে আমরা চোখ বুজে ধ্যানস্থ রইলাম।

ঝড় শেষে থাম্‌ল, আর মেরামতও শেষ হল। তখন শুনি ষ্টীমার দামুকদিয়ায় যাবে না, সারাঘাটে থামবে। ওমা, তবে কি পদ্মা সাঁতরে পার হব না কি?

যাক্,. ভগবান কথা বল্‌বার শক্তি দিয়েছেন বলেই রক্ষে। খুব মিষ্টবাক্যে সাহেবদের তুষ্ট করে বেশ ভাব জমিয়ে ফেল্‌লাম। তারা শেষে বল্‌ল, আচ্ছা, সারাঘাটে যাত্রী নামিয়ে দিয়ে আমাদের ওপারে পৌঁছে দেবে।

সারাঘাটে নেমে দৌড়ে টাকা দুয়েকের লুচি রসগোল্লা কিনে ষ্টীমারে উঠে পড়লাম। প্রচণ্ড ক্ষিদে, হাউমাউ করে তিনজন খেতে আরম্ভ করেই দেখি, লুচিতে বিকট নারকেল তেলের গন্ধ। সব ফেলে দিতে হল, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছা করছিল।

নরেশ বল্‌ল,—তা আর ইচ্ছা করবে না। খাওয়াটাই হল তোমার জীবনের সার। সেটার অভাবে জলে কি আগুনে ঝাঁপ দেওয়া বিচিত্র কি?

সুরেন বল্‌ল—এই নরেশ থাম! অতুল আবার চটে মটে গল্প বন্ধ করবে।

অতুল খুব উৎসাহের সঙ্গে আবার আরম্ভ করল।—দামুকদিয়াতে নেমে রাত্রে শুই কোথায়, এই হল ভাবনা। দেখি কতকগুলো গাড়ী লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফার্ষ্ট আর সেকেণ্ড ক্লাস চাবি বন্ধ। থার্ডক্লাসে উঠে শুয়ে পড়লাম। বন্ধুরা আমাকে খুব গালাগাল করতে লাগ্‌ল যে, আমার বুদ্ধিতে পড়ে—বরযাত্রী হয়ে নাকাল হতে হচ্ছে। আমিও মনে মনে এবং কখনও প্রকাশ্যে কিশোরীর মুণ্ডপাত করতে লাগ্‌লাম।

ছারপোকার কামড়ে সারারাত ছট্‌ফট্ করে সকালবেলা সবে চোখ বুজে এসেছে, এমন সময় মনে হল ট্রেন চল্‌ছে। ওরে ওঠ্ ওঠ্ বলে ঠেলা দিয়ে বন্ধুদের তুল্‌লাম। তখন আর কি হবে। টিকিট কেনা হয়নি কিছু না,—আর চললামই বা কোথায়। শেষে শুনি সান্টিং হচ্ছে। বাবা,

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আবার দামুকদিয়াতে গাড়ী থামতেই, নেমে পড়ে ঠিক গাড়ীতে উঠলাম। তখন ক্ষিদের চোটে সেই আমটি বার করে খেতে গিয়ে দেখি বিষম টক্। কপাল চাপড়ে বসে রইলাম।

ভেড়ামারায় পৌঁছে দেখি, কাকস্য পরিবেদনা! বর কি বরের তিনকুলের কারও টিকি দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ এক কালো জোয়ানমদ্দ—ইয়া লাঠি কাঁধে, সাম্‌নে এসে দাঁড়াল।—মারবে না কি—বলে এক বন্ধু লাফ দিয়ে সরে গেলেন। সে দাঁত ক'পাটি বার করে পাবনা জেলার মধুর বাঙ্গাল ভাষায় বল্‌ল, সে আমাদের প্রত্যুদ্‌গমন করবার জন্য রয়েছে। তার ভাষা শুনে বুঝলাম, নিশ্চয়ই কিশোরীদের বাড়ীর চাকর। ভরসা করে তার সঙ্গে গিয়ে একটা মোষের গাড়ীতে চড়লাম।

কনের বাড়ী পৌঁছে বরকে খানিক উত্তম মধ্যম দেওয়া গেল। সে তখন আসন্ন বিয়ের কল্পনায় সব মার বেমালুম হজম করে ফেল্‌ল।

পরদিন সকালে খেতে বসে আমরা তিনজনে নিজেদের খাওয়া শেষ হতেই উঠে পড়লাম। অমনি কন্যাপক্ষের লোকেরা চটে লাল। একজন বৃদ্ধ বল্‌লেন—কি রকম অসভ্য ছোকরা সব। সামাজিক খাওয়াতে সবাইকে ফেলে উঠে পড়ল!

আমরা যেন কিছুই জানি না, এই ভাবে চুপ করে রইলাম। আর মনে মনে কন্যাপক্ষকে জব্দ করার ফন্দি আঁটতে লাগ্‌লাম।

পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় উঠানে জায়গা হল। চারদিকে আটচালা, একদিকে ছায়া, অন্যদিকে রোদ। আমরা তিনজন চট্ করে ছায়ার দিকে বসে পড়লাম। তার পর খাওয়া চল্‌ল। সকলের শেষ হয়ে গেল, আমাদের আর কিছুতে শেষ হয় না। বস্‌বার সময় যাতে সবাই শুনতে পায়, এমনি করে বলে নিয়েছিলাম—সামাজিক খাওয়া মনে থাকে যেন, সব্বাইকার খাওয়া শেষ না হলে কেউ উঠ্‌তে পাবে না।

চড়চড়ে রোদে বুড়োদের টাক যখন ফেটে পড়বার যোগাড় হল,—হাত শুকিয়ে চট্‌চট্ করতে লাগ্‌ল, রাগে মুখগুলো কাল-বোশেখীর মেঘের চেয়েও গুরুগম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল,—তখন খাওয়া শেষ করে উঠ্‌লাম।

সন্ধ্যাবেলা আবার আমাদের দুষ্টুমি চল্‌ল। একটা ঢোল জোগাড় করে এনে একজন বাজাতে লাগ্‌ল, আর একজন তার সঙ্গে করতাল জুড়ে দিল। আর আমি আরম্ভ করলাম গান।

—সে কি! বলে আমরা সমস্বরে হেসে উঠ্‌লাম।

অতুল বল্‌ল—বুঝতেই পারছ তাহলে ব্যাপারটা—আমার এই রাসভবিনিন্দিত কণ্ঠের সঙ্গে ঢোল ও করতালের আওয়াজ মিলে কি রকম মধুর রাগিণী উঠ্‌তে লাগ্‌ল! অনেক রাত পর্য্যন্ত এমনি চালালাম। তখন কন্যাপক্ষের লোকেরা চটে গিয়ে লেঠেল ডাকিয়ে আমাদের মারবে বলে শাসাল। আমরাও আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে গেলাম। যাহোক্, বয়োবৃদ্ধ কয়েকজন এসে থামিয়ে দিলেন,—নয় ত সেদিন কি হ'ত—বলা যায় না।

তার পর দিন বিয়ের পর কিশোরী যদিও হাঁড়িমুখ করে রইল (বোধ হয় কনে দেখে)—আমরা খুব উৎসাহে ফেরবার জোগাড় করতে লাগ্‌লাম। গাড়োয়ানের আস্‌তে দেরি দেখে, নিজেরাই গরুর লেজ মলে গাড়ী ছুটিয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত। কন্যাপক্ষের কয়েকটি ছেলে তাই দেখে 'বোম্বেটে' প্রভৃতি বিশেষণে আমাদের আপ্যায়িত করে দিলে।

এবারে কিশোরীদের গ্রামে যেতে হল। সেখানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে দেখা গেল যে, যে ব্যাণ্ডের দলকে আগাম টাকা দেওয়া হয়েছিল, তারা এল না।—কি হল, কি হল—করে' মামাবাবু ছুটোছুটি করতে লাগ্‌লেন দেখে, আমি বল্‌লাম যে, আমি গিয়ে ব্যাণ্ডের দল ডেকে আন্‌ব।

দোগাছিতে শুধু মুচি ডোমের বাস,—তারাই ব্যাণ্ড বাজায়। এ গ্রাম থেকে দোগাছি না কি দুক্রোশ রাস্তা। হাঁট্‌তে আরম্ভ করে দেখি, পথ আর ফুরোয় না। শেষে আমার সঙ্গীটি বল্‌ল—দুক্রোশ নয়, চারক্রোশ পথ! রাত দুটোয় যখন সে গ্রামে পৌঁছিলাম, তখন পথের ধুলো কাদাতে আমাদের চেহারা মুচিডোমের চেয়ে কিছুমাত্র ভাল বলে বোধ হল না।

অনেক হাঁকাহাঁকিতেও কারও সাড়া পাওয়া গেল না দেখে, একটা কুঁড়েঘরের দরজা ধাক্কা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলবার জোগাড় করলাম। তখন একটি মেয়েমানুষ ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে বাইরে এল। তাকে জিজ্ঞেস্ করে জান্‌লাম যে, ব্যাণ্ডের দল অন্য গ্রামে বাজাতে চলে গেছে।

খুব চটেমটে, আবার সেই চারক্রোশ পথ পেরিয়ে, ভোর বেলা এসে মামাবাড়ী পৌছিলাম।

এত কাণ্ড করেও ব্যাণ্ড বাজল না, তখন আমাদের আরও রোখ চেপে গেল। বল্‌লাম, পাবনা সহরে বর নিয়ে শোভাযাত্রা করে তবে ছাড়ব।

পুলিসের অনুমতি নিতে গেলাম। তারা কিছুতেই রাজি হয় না। ক'দিন আগে—আমাদের এক অতিবৃদ্ধ আত্মীয় পঞ্চম পক্ষে বিয়ে করেছিলেন,—তাঁর কথা তুলে দারোগাবাবু রসিকতা করে বল্লেন,—রাইচরণ বাবুর বিয়ের শোভাযাত্রা হলে বরং অনুমতি দেওয়া যেত। সে একটা দ্রষ্টব্য জিনিস দেখে সহরের লোকের উপকার হত!

ঠাট্টাতেও না দমে আমরা নাছোড়বান্দা হয়ে অনুমতি নিলাম। তার পর ধুমধাম করে ব্যাণ্ড বাজিয়ে বর নিয়ে সহর ঘুরলাম।

তার পর দিনই সটাং বাড়ী মুখো রওনা হলাম,—কেন না, হঠাৎ শোনা গেল যে, সহরে বেজায় কলেরা হচ্ছে।

এ রকম অভিজ্ঞতার পর আর কেউ কি দ্বিতীয়বার বরযাত্রী হতে চায়? তোমরাই বল!

আমরা সবাই অতুলের কথায় সায় দিলাম। অতুলের জন্য আর এক পেয়ালা চায়ের ফরমাস হল। আমরাও বাদ গেলাম না।

অতুলকে তার গল্পের জন্য ও সন্ধ্যাটা ভাল ভাবে কাটিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে সভাভঙ্গ করা হল।

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২২)

মন্দির-প্রাঙ্গণের দ্বিতীয় দ্বারটি দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। দেখি, সেই দীর্ঘচ্ছন্দ গৌরবর্ণ পাণ্ডাজি আর সেই লড়ায়ে যুবকটি, বাবাকে দর্শনান্তে বাহিরে আসিয়াছেন। পাণ্ডাঠাকুর বলিতেছেন—"তীর্থক্ষেত্রে কিছু 'তেয়াগ্' কর্‌তে হয়, তাতেই তীর্থের যথার্থ ফল লাভ হয়,—সেইটাই 'প্রতক্‌ষ্' (প্রত্যক্ষ) লাভ। সেবকদের বা গরীব দুঃখীদের দু'এক পয়সা দেওয়াই ভাল; তার সার্থকতা হাতে হাতে। যুবা বিজ্ঞ বুঝদারের মত বলিল—"পয়সা না দিলে তীর্থের ফল হয় না, এ কথা পাড়াগেঁয়ে ভূতেদের বোঝানো সহজ,—আমরা ক্যাল্‌ক্যাটার ছেলে, বুঝেছ পাণ্ডাজি!"

পাণ্ডাজি হাসিমুখে বলিলেন—"এটা বুঝা একটু কঠিন আছে বাবুজি! হাওড়া টিসনে যিনি টিকস্ কোরে পশ্চিমে রওনা হন, তাঁকেই বলতে শুনি—"কলকাত্তা" ঘর আছে! কিন্তু খাতা বগলে ক'রে যখনি যজমানদের খবর নিতে গিছি—কলকাত্তায় বাসাড়ে কেরাণী বাবু ছাড়া কারুর পাত্তা পাইনি; তিরিশ মিল্, ষাট মিল্ মাঠ ভেঙ্গে, কাদা ঘেঁটে, সাঁতার দিয়ে, ঘরের সাক্ষাৎ মিলেছে বাবুজি।"

যুবক সে কথায় কাণ না দিয়া বলিয়া চলিল—"বামুনদের ও সব ব'সে ব'সে পরের মুণ্ডে পেট চালাবার ফন্দি; আমরা "গড়-পারের" ছেলে,—ও সব চাল্ এখানে খাটবেনা;—দিতে হয় অন্ধ-খঞ্জকে দেব।"

পাণ্ডাঠাকুর পূর্ব্ববৎ হাসিমাখা মুখে বলিলেন,—"ও উপদেশটা বুঝি আপনাদের ইংরাজি কিতাবে আছে! বামুনদের শাস্ত্রেও ত' তাদের দিতে বিশেষ কোনো বারণ নেই বাবুজি,—তাই দিননা। দেওয়ার একটা আনন্দ আছে—সেটা প্রাণ অনুভব করে, সেইটাকেই প্রতক্‌ষ্ লাভ বলছিলুম। দান, প্রেম, কি ভালবাসায় অতো বিচার আনতে নেই, তাতে তাদের অপমান কোরে মলিন করা হয়। প্রেমের দরবারে কাট্‌গড়া নেই বাবুজি। আর—দান করা মানে ত' উপকার করা নয়, ওতে যদি কারুর উপকার থাকে তো সেটা দাতার নিজের।"

আমি অবাক হইয়া শুনিতেছিলাম ; এখন সবিস্ময়ে পাণ্ডাজিকে দেখিতে লাগিলাম। এ'তো মামুলি পাণ্ডা নয়! যুবক বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—"এ যুগমে বামুনদের ও সব কথায় 'ভবি' ভুলতা নেই!"

কলকেতার ছেলে যে কথাবার্ত্তায় এমন অসভ্য হইতে পারে, এটা ভাবিতেও আমার লজ্জাবোধ হইতেছিল।

পাণ্ডাঠাকুর পুনরায় সহাস্যেই বলিলেন—"ভবিকে চিরকালই বামুনদের কথায় ভুলতে হবে বাবুজি। ব্রাহ্মণ আপনি কা'কে বলেন? ব্রাহ্মণকে একটা আলাদা জাত ভেবে ভুল করবেননা, ওটা মানুষের একটা অবস্থা। সকল জাতের ভিতরই ব্রাহ্মণ আছেন। দেশ কাল অনুসারে সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান আর বিদ্যাদান করাই তাঁদের কাজ,—সকলের মঙ্গলই তাঁদের কাম্য। তাঁরা চিরদিনই থাকবেন। আজকাল তো বহুৎ প্রাচীন জিনিস বেরুচ্ছে, কই বাবুজি অতগুলা মনু কি ব্যাস পরাশরের মধ্যে কারো অট্টালিকার এক টুকরা ইট পাওয়া গেছে কি, না তাঁদের চৌঘুড়ির চাকা বিল্বগ্রামের বুক চিরে লাঙ্গলের মুখে বেরিয়ে পড়েছে! ত্যাগই যাঁদের ধর্ম্ম, পর্ণ কুটীরে বাস আর ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ—তাঁদের উপর ওরূপ বিদ্রূপ করতে নেই বাবুজি। আপনার কাছ থেকে কেউ তো কিছু কেড়ে নিচ্চেনা।"

এসব কথা পাথরকে শোনান হইতেছিল বলিয়া আমার বড়ই দুঃখ হইতেছিল।

কথাটা কিন্তু আর শোনা হইল না; কোথা হইতে মাতুল ব্যস্তভাবে ঝড়ের মত আসিয়া উপস্থিত! শুনিলাম, তাঁর বৈবাহিক মহাশয় (অমর বাবু) "গত রাত্রে চিঁড়ে চিনি রাবড়ী আর রম্ভার একটি বিরাট তাগাড় মারিয়া তেউড়ে 'হরেকরকম্বা' দাঁড়াইয়া গিয়াছেন, নিরেট হইয়া পড়িয়াছেন;—পেট যেন কচ্ছপের পিট—কোথাও একটু কোঁচ নাই, টিপিলে নোয়না,—একদম আধখানা সুডৌল ভূগোল-পরিচয়! চিৎ হইলে চড়্‌চড়্ করে, উপুড় হইলে চাপে চক্ষু বাহিরে আসিতে চায়, কাৎ হইলেই ব্যতীপাৎ! সকাল হইতে উবু হইয়া বসিয়া নাগাড় সোডা আর গুড়ুক চালাইতেছেন,—যেন কাটের জগন্নাথ!" একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন—"আমার তো মশাই হাত পা আসছেনা; যে-সে কুটুম্ব নয়,—বৈবাহিক, আবার শুধু বৈবাহিক নয়—লাট্ বৈবাহিক—জামায়ের বাপ! তায় মালদার,—এ দেনদারের বাড়ী এ কি ফ্যাঁশাদ মশাই! এক তো প্রথম নম্বর—পরিবারের মাথা নিয়ে বুকের মধ্যে কাঁথা শেলাই চলেছে, তার ওপর আবার 'দ্বিতীয়ে চ' উপস্থিত বৈবাহিকের পেট্!"

আমি বাস্তবিকই চিন্তিত হইয়া পড়িতেছিলাম। বৈবাহিকের রোগ বর্ণনার রুদ্র "রেটরিকের" প্রচণ্ড ঘূর্ণীর মধ্যে হাঁ করিবার ফাঁক ছিলনা। মাতুল যে "বার্কের" বাবা, এই তার প্রথম পরিচয় পাইলাম। এই সঙ্কট অবস্থায় সহসা 'বসন্তের হাওয়ার মত'—'বৈবাহিকের পেট্' উপস্থিত হওয়ায়, সামলাইয়া গেলাম; বলিলাম—"ভয় নেই মাতুল। ও আমি বিশ্বাস করিনা; আপনাকে আঁতুড় বাঁধতে হবেনা,—গিয়ে দেখবেন সামলে গেছেন, কিন্তু এ বেলা যেন জলস্পর্শ না করেন।"

মাতুল বলিলেন—"না—তা করবেননা বলেছেন,—কেবল ফল-স্পর্শ করবেন, তাই পেঁপের তল্লাসে ছুটেছি। বাজারে তার চিহ্নমাত্র নেই, শুনলুম—পড়তে পায়না, বাবুরা লুফে নেন। 'এটা যত অজীর্ণ রোগীর আড়ৎ কি না,—মেয়ে মদ্দের চোঁয়া-ঢেঁকুর চলেছে,—পেঁপের পায়াও বেড়ে চলেছে। আর হবেনাই বা কেন,—চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখি—Birds of Paradiseদের পেঁপে ছাড়িয়ে ডিসে ক'রে দেওয়া হয়েছে! এখানকার শুভ-আগমনকারীদের মধ্যেও অনেকেই Birds of Paradise তো;—কি বলেন?"

আমি চুপ করিয়া থাকায় মাতুল নিজেই বলিয়া চলিলেন—"বলবেন আর কি,—পূর্ব্বজন্মের স্ক্যাভেঞ্জারভরা ভাইস্ নিয়ে আমাদের মত' পাইসহীন রাইস্-হীন birds of "হেলেডাইস্" যে কেন মরতে আসে তা বলতে পারিনা। বাড়ীতে সে-ই দুর্ম্মুস্ হ'য়ে বসলেন, বাইরে একটা পেঁপের জন্যে আমি ক্ষেপে যাবার দাখিল হলুম, ঘুরে ঘুরে পায়ের ডিমগুলো গুঁড়িয়ে গুরগা মেরে গেল;—সাত টাকা দামের নতুন জুতা জোড়াটা ধুলো মেখে যেন ভেড়ার বাচ্চা হয়ে দাঁড়ালো! চুলোয় যাক্ শালা "গ্যাংফুং" (চীনে মুচী),—আর তারই বা দোষ কি, এ কি রাস্তা মশাই—যেন খরশান্,—বেরুলেই এক পুরু

নিয়ে নিচ্চে! যদি খালি পায় হাঁটি তো জ্যান্তো চামড়া নেয়,—এখন করি কি বলুন! আবার বাড়ীতে বলেন—"সব দিকে নজর রাখতে হয়!" আরে শ্বশুরকা-বেটী, জুতোর তলায় নজর দি কি ক'রে! রাস্তা যদি গোরস্থান হ'ত, আর আমি যদি একখানি প্যাচামুখো চশমা পরে গোরে যেতুম—

আমি মাতুলের সম্বন্ধে ভীত হইয়া পড়িতেছিলাম,—তাঁর এলোমেলো কথাগুলি ছুঁতো-বাজির মত এদিক ওদিক ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছিল। সেটাকে প্রসঙ্গান্তরে মোড় ফিরাইয়া দিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্যাচা-মুখো চশমাটা আবার কি মাতুল?" মাতুল উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"ভাখেন নি, ঐ যে যা চোখে দিলে ছেলেদের অমন সুন্দর মুখগুলো কি কদাকারই দেখায়, শিশুরা বাপকে দেখে ভয়ে চীৎকার করে মার কাছে ছোটে! প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল—যশোরের কারখানার নূতন আবিষ্কার, ছোট ছোট মেয়েদের মাথার বাঁক্-চিরুণী! ভাইপো লাবণ্যময়ের কাছে শুনলুম—চশ্‌মা! বল্লেন—"ভারি সুন্দর জিনিস—এই নতুন আমদানী হয়েছে, পরলে আরামও যেমনি, উপকারও তেমনি,—মেটালের মত তাতেনা, নাক কি কাণ ঝল্‌সে যাবার বা ফোশ্‌কা পড়ে দাগী হবার সম্ভাবনা একদম্‌ নেই। কত-বড় সব মাথা এর পেছনে রয়েছে!" ভাবলুম—তা রয়েছে বই কি—আমাদের গ্রহগুলো কি শুধু আকাশেই ঘোরে! বললুম—"কাটামোটা কিসের বাবাজি?" বললেন—"ওটা রোল্‌গোল্ডের ওপর গটা-পার্চা হবে—ভেতরে সোণার ফ্রেম্‌ থাকে।" "ওঃ—গোকুল পিটে বলো,—বোল্‌ গোল্ডের গেলাপ্‌ বললেই হ'ত!" সেদিন সারা বিকেলটা গুড়ুক খেয়েছি আর ভেবেছি—উঃ এখনো ঝাড়া দু'শো বচর!! আসছে বচর ওইতেই চারটি লোম লাগিয়ে আন্‌বে, বাবাজীরাও পাল্লা দিয়ে পরবেন। ঐ গটাপার্চা আরো কটা বাচ্চা ছাড়বে তা ভগবানই জানেন। গয়না-গুলো কবে ঐ পোষাকটা পচন্দ করবে! বেঁচে থাক্‌তে সে সুদিন কি আসবে মশাই!"

আমার দুর্ভাবনা ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল, মাতুলের মাথায় আজ কোন্‌ সরস্বতী ভর করিয়াছিলেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলামনা;—তাঁহার মুখে আজ যে-কোন কথা মহাকাব্য হইয়া বাহিরে আসিতে-ছিল,—পাথর মাত্রেই আজ হিমালয়!—আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম—"কিচ্ছু ভাববেননা মাতুল,—সুদিনটে যখন পশ্চিম থেকে ঝুঁকেছে—সে হুড়্‌মুড় ক'রে এলো বলে। জানেন ত' অমোঘা পশ্চিমে মেঘা!"

শুনিয়া মাতুল বলিলেন—"পায়ের ধুলো দিন মশাই—তাই আসুক। কি বল্‌ব দেব্‌তা—এক ভিনোলিয়ায় লুট লিয়া! আমরা হলুম ফতুর—ফিঙে বায়ু পরিবর্ত্তন কি—

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলাম—"তা'তো বটেই, পৈত্রিক পয়সা উপরি উপায় না থাকলে কি আর বায়ু পরিবর্ত্তনের ঢেউ ওঠে;—আমাদের সনাতন ব্যবস্থা মত' নিজের ঘরে শুয়ে আয়ু বর্জ্জনই বিধি। ওসব ফাল্‌ত পয়সার ফুট্—

মাতুল 'কিন্তু' হইয়া বিমর্ষ ভাবে বলিলেন—"জীবনে এই আমার প্রথম ভুল মশাই। ধর্ম্মের ঘরে পাপ সয় না; বালা জোড়াটা তো জন্মের মত গেলই, এখন বেইমশাই দয়া করে হারছড়াটা ছেড়ে দিলে যে হরিরলুট দিয়ে বাঁচি!" এই কথা কয়টি তিনি ছোট অথচ সার্থক একটি নিশ্বাসের সহিত শেষ করিলেন। বুঝিলাম—এতক্ষণে মাতুল ধাতে নামিয়াছেন।

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া ও অবস্থা ভাবিয়া সত্য সত্যই ব্যথা পাইলাম। আশ্বাস দিয়া বলিলাম—"মাঝে মাঝে অমরের ও-রকম হয়ে থাকে, ওতে ভয়ের কারণ কিছু নেই। ডাক্তার বদ্দি ডাকা তাঁর অভ্যাস নেই, আপনাকেও ডাকতে দেবেননা। চারটি জোনে-নুনে একঢোঁক জলের সঙ্গে খেতে দিলে, তিনি খুসী হ'য়ে খাবেন, সেরেও যাবেন। তাঁকে বলতে শুনেছি—ডাক্তার বদ্দি ডাকার খরচটা বাজি পোড়াবার মত' সেরেফ্‌ একটা বাজে খরচ; তবে বাজিগুলো দয়া ক'রে নিজেরাই পোড়ে, ও'রা গেরোস্তোকে পোড়ান, আর রোগীকে ত' নিশ্চয়ই,—এই যা প্রভেদ।" যাক্,—পেঁপেটা তাঁর খুব পেয়ারের জিনিস, কেউ দিয়ে গেলে খুবই খুসী হ'তে দেখেছি; এখন পাওয়া যাবে কি?"

মাতুল বোধ হয় একটু বল পাইয়া বলিলেন—"শুনেছি, মন্দিরের খুব কাছেই "পাঁড়ের বাগান" ব'লে একটা

বাগিচা আছে; তার ফলের প্রশংসা বৈবাহিকের মুখেই শুনেছি;—চলুন একবার দেখে আসি।" কথাটা শ্রীমানের মুখে আমারও শোনা হইয়াছিল। ভাবিলাম—এটা 'নার্সারির' অঞ্চল, নিশ্চয়ই জবর কিছু হ'বে–দেখা উচিত। তদ্ভিন্ন আমার 'না' বলিবার ত' পথই ছিলনা।

জয়হরি আমার ভাব বুঝিয়া, কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল—"একটা টাকা থাকে ত' দিন, আমি ততক্ষণ একটা চৌপলে হাত লাঠান আর ছুটো বাতি কিনে রাখি। মোটা একগাছা বাঁশের লাঠি পেলেও নেবো,—সন্ধ্যে তো হ'য়েই এলো!"

তাহার কথার অর্থটা বুঝিয়া হাসিও পাইল, লজ্জিতও হইলাম, কিন্তু মাতুলকে ক্ষুণ্ণ করার অভদ্রতা ও নিষ্ঠুরতা আমার নিকট সুস্পষ্ট। বলিলাম—"এই পাশেই বাগান, ফিরতে আমাদের আধঘণ্টাও লাগবে না। এখন বেলা ১০টা বেজেছে মাত্র,—চলনা, ফল কিছু পাওয়া যায় তো পেট ভরেই ভোগ লাগানো যাবে।"

শেষ কথাটায় কাজ হইল।

(২৩)

বাগানে প্রবেশ করিয়াই দেখি—সানবাঁধানো প্রকাণ্ড এক 'কূয়া'। স্বয়ং মালিক পাঁড়েজি স্নান করিতেছিলেন; আমাদের দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন—"আইয়ে বাবুজি—এ আপমকারই বাগিচা আছে। বাঙ্গালী বাবুরা বৈদ্যনাথজি ভি দর্শন করেন,—এ বাগিচা ভি দর্শন করেন। এই কূয়ার জল আউর এই বাগিচার ফল সঙ্কোলে তালাস্ করেন, আর তারিফ করকে খান। বড়া বড়া বাংগালী জজ্, ডিপ্‌টি, লাক্‌পতি সবাইকে আমিই কেলা খাওয়াই। দু' রোজ সবুর করেন—আপনাদেরও খাওয়াবো। একটু আগাড়ী ধুরন্ধর বাবু, জলন্ধর বাবু, হিড়িম্বা বাবু, রজক বাবু আউর মাকুন্দি বাবু,–কেলা ভি, পেঁপিয়া ভি বিলকুল লইয়ে গেছেন। এই হ্যাখেন পাঁচ টাকা দশ আনা পড়িয়ে রয়েছে। কলকাত্তা সে দুই বড়া বড়া ব্যলিস্‌চোর (ব্যারিষ্টার) সাহেব আইয়েছেন,—মছলি শিকার করবেন। এ-স্থানে দরদস্তুর নেই বাবুজি,–কেলা খেয়ে খুসী হ'য়ে টাকা ফেলে হ্যান!" ইত্যাদি বিরক্তিকর বক্তৃতার পর পাঁড়েজি বলিলেন—"যাইয়ে একবার বাগিচা ঘুরিয়ে আসেন, যো ফল পছিন্দ হোবে, এখানে টিকস্ আছে, আপন্ দস্তখৎ করকে, তাতে লোট্‌কে দেন; পাকলে লইয়ে যাবেন। এখানে অবিশ্বাসের কাজ নেই বাবুজি,—এ তীর্থস্থান আছে।"

বাগিচার দিকে চাহিয়া কিছুই বুঝিলাম না, কোথাও নির্দ্দিষ্ট কোন' পথও দেখিলাম না;—যিনি যে স্থান দিয়া যান—সেইটিই তাঁর পথ। সেই হিসাবেই অগ্রসর হওয়া গেল। দেখিলাম নেবু, পেঁপে, পেয়ারা আর কলাবন, বোধ হয় আম, কাঁটাল, আনারসও ছিল। অবশিষ্ট স্থান বড় বড় ঘাস আর আগাছায় ভরা;–দৃশ্য আদৌ উপভোগ্য নহে। পেঁপে গাছে পেঁপে, কলাগাছে কলা, পেয়ারা গাছে পেয়ারা (অবশ্য উল্লেখযোগ্য নহে) রহিয়াছে;—সব ফলই কাঁচা।

একটু তফাতে একটা পেঁপে গাছে একটি পেঁপেয় রং ধরিয়াছে দেখিতে পাইয়া মাতুল সাগ্রহে ও সবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া পরক্ষণেই দ্বিগুণ বেগে চেষ্টা খাইয়া পশ্চাতে (বিপরীত) লাফ মারিতে গিয়া, ঝাঁটি বনে মাটি লইলেন!

আমাদেরই মত' ফলান্বেষী আর দুইটি বাবুও 'চোর-কাঁটার' ভয়ে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া সন্তর্পণে ঘুরিতে ছিলেন। নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু হইবে ভাবিয়া, তাঁহারা চোরকাঁটার চিন্তা ত্যাগ করিয়া পড়ি তো মরি' ভাবে ছুটিয়া একদম গেটে (gateএ) হাজির! গেট্‌টি ছিল—আগড়ের ক্রমোন্নতির অবস্থা বিশেষ।

আমি দ্রুত গিয়া দেখি—মাতুল উঠিবার পূর্ব্বে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেশগুলি সারিয়া লইতেছেন! বুদ্ধিটা বিচলিত হওয়ায়, কি ভদ্রতার খাতিরে ঠিক্ বলা কঠিন, একটা দুঃসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিলাম;—তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিতে গেলাম। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথাটা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মাতুলকে তুলিতে যাওয়া মানেই নিজের পড়িতে যাওয়া; কারণ তিনি ছিলেন আমার তিন গুণ ভারি। যাহা হউক, মাতুল নিজ গুণেই উঠিয়া পড়িলেন, আমি রক্ষা পাইলাম। উঠিয়াই কোঁচা ঝাড়িতে আর চোরকাঁটা বাছিতে মন দিলেন। মাতুল আসলে ছিলেন প্রচ্ছন্ন-বিলাসী। দেহটিকে তোয়াজে রাখা, প্রসাধন-প্রীতি, পোষাকপ্রিয়তা, পরিচ্ছন্নতা, এ সব ছিল তাঁর ধাতের জিনিস; তাই সামান্য কোন আঁচ লাগিলেও তিনি অসামান্য চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। যাক্—

ওদিকে গেটের বাহিরে গিয়া পূর্ব্বোক্ত বাবু দুটি এখন 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক পাড়িতেছেন—"ওখান থেকে শীগ্‌গীর চলে আসুন মশাই, শীগ্‌গির; আঃ, করচেন কি—ওখানে আর তিলার্দ্ধ দাঁড়াবেন না!" এ সহানুভূতির অর্থ—ব্যাপারটা ফাঁকে ফাঁকে শুনিয়া সরিয়া পড়া। না শুনিয়াও নড়িতে পারিতেছেন না।

জয়হরি তখন বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া পাঁড়েজীর পেয়ারা গাছে উঠিয়া যথালাভ হিসাবে—আস্তো একটা কোঠো পেয়ারা মুখে পুরিয়াছে, এবং আর একটা ঐ জাতীয় মেওয়া লক্ষ্য করিয়া হাত বাড়াইয়াছে। তাহার কাণে সহসা ওরূপ তাড়ার-ডাক্ প্রবেশ করিতেই,—পটাস্ করিয়া সেই নাবালক ফলটি সংগ্রহ করতঃ এক লম্ফে ভূমি স্পর্শ ও এক দৌড়ে জমি পার হইয়া কূয়াতলায় হাজির হইল। পাঁড়েজী তখন উচ্চরবে "সর্ব্ব মাঙ্গল্যে মঙ্গলা শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকা" আবৃত্তি করিতে করিতে জল তুলিতেছিলেন। জয়হরি পিপাসা জানাইয়া জল পানার্থে অঞ্জলি পাতিতেই, তিনি এক বাল্‌তি জল তুলিয়া পিপাসিতের হস্তে ঢালিতে লাগিলেন। মাতুলকে লইয়া আমিও আসিয়া পৌছিলাম।

বালতিটি খুব বড় না হইলেও বেশ মাঝারি সাইজের ছিল। তাহার সমস্ত জলটুকু নিঃশেষ করিয়া জয়হরি উটের মত গড়্ গড়্ শব্দে একটা লম্বা উদ্‌গার শেষ করিল। পাঁড়েজি অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতেছিলেন, পরে বলিলেন—"সাবাস্ বাবুজি—গেইয়াকে ভি (গরুকেও) হারায় দিয়েছেন!" তাহার পর আরম্ভ করিলেন—"এ বাগিচার পেয়ারা কেমন মিঠা বলুন,—এক বাল্‌তি জল টানিয়েছে। পিতল বাবু (সম্ভবতঃ প্রতুলবাবু) একঠো এক আনা করকে লিয়ে যান।"

আমিও পাড়েজীর শেষের কথাগুলি শুনিয়া কম অবাক হই নাই,—তাঁহার দূরদর্শিতা তথা সূক্ষ্মদর্শিতা লক্ষ্য করিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। জয়হরি বাগিচার এক প্রান্তে ঝোপের মধ্যে পেয়ারা-পর্ব্বে মন দিয়াছিল, কিন্তু পাড়েজীর স্তোত্র-স্তিমিত চক্ষু তাহা এড়ায় নাই। তাঁহার কথাগুলি ত' কেবল শব্দ নয়, সে যে দু' আনার বিল্ (bill)! যাক্ যে কারণেই হউক, সেটা আর তিনি লন নাই।

আমি তখন এ মধুবন হইতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচি। পাড়েজীর বক্তৃতায় বাধা দিয়া বলিলাম—"আজ তবে নমস্কার হই—বেলা হয়েছে।" তিনি খুসী হইয়া বলিলেন,—"দু'চার রোজ বাদ আসবেন বাবুজী।" তথাস্তু।

গেটের বাহিরে আসিতেই সেই বাবু দুইটি ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং দু'ই জনেই সচিন্ত আগ্রহে মাতুলকে প্রশ্ন করিলেন—"কি সাপ্ মশাই,—গাছেই ছিল?"

মাতুল এসব বিষয়ে বেশ হুঁসিয়ার, তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"কি সাপ আবার জিজ্ঞাসা করচেন—আসল্ 'খোয়ে'"!

শুনিয়া উভয়ে শিহরিয়া বলিলেন—"বাপরে, বলেন কি!"

মাতুল ভয়-ভক্তি মিশ্রিত মুখে বলিলেন—"ভগবান রক্ষে করেছেন মশাই, খেয়েছিল আর কি!" এই বলিয়া ভগবানের উদ্দেশে শূন্যে নমস্কার করিলেন।

বাবু দুইটি প্রশ্ন করিলেন—"কত বড় হবে মশাই?"

মাতুল সেই ভাবেই বলিলেন—"কি ক'রে ব'লব মশাই—তিন চার পাক্ তো গাছেই ছিল, আর ফণা তুলে ঝুলে এসেছিল তাও তিন হাতের কম হবে না,—আর যদি এক পা বাড়াই"—এই পর্য্যন্ত বলিয়া মাতুল এমন শিউরে উঠলেন যে বাবু দুটিও কাঁপিয়া গেলেন। একজন আর একজনকে বলিলেন—"আর পেঁপে খেয়ে কাজ নেই বাবা, জান্‌টা জন্মের মত যেতো আর কি! বাপ্—বাগিচা না যমের বাড়ী!"

দ্বিতীয়টি বলিলেন—"আর এক মিনিট্ এর ত্রিসীমায় নয় বাবা, সরে পড়'—সরে পড়'।" এই বলিয়াই তাঁহারা দ্রুতপদে অন্যপথ ধরিলেন।

ব্যাপারটা জানিবার জন্য আমিও মাতুলকে বার তিনেক প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছিলেন—"পরে বলচি"। এখন আবার ঔৎসুক্যের সহিত বলিলাম—"বলো কি মাতুল—সত্যি সাপ না কি?"

মাতুল বলিলেন—"সে কপাল আমার নয় মশাই—এখনো কষ্টের এরিয়ার (arear) মেটাতে পাক্কা তিরিশ ইয়ার (year) নেবে। গিয়ে যদি দেখতে হয় বৈবাহিক উদুখল্ মেরে দাওয়ায় খাড়া বসে আছেন,—তার চেয়ে আমার সর্পাঘাত ভাল ছিল মশাই!"

মাতুলের এসব কথা 'কথার কথা' মাত্র, মরিবার ভয় তাঁর অতিরিক্ত, এগুলা সাময়িক জ্বালার উচ্ছ্বাস। আমি আশ্বাস দিয়া বলিলাম,—"গিয়ে দেখবেন চা খেয়ে তিনি চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন—সে ভাব কেটে গেছে।"

মাতুল। আঃ—তাই বলুন মশাই।

বলিলাম—"ভাববেননা, ও সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। কলিতে চা'র চেয়ে আর ওষুধ নেই। মেয়েদের হিষ্টিরিয়া সেরে যায়,—অন্ততঃ চা খাবার ওক্তোটিতে হয় না। আহা—স্মরণ পড়ে,স্মৃতিতীর্থ মশাইকে গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া গেল, তাঁর শেষ মুহূর্ত্ত প্রায় উপস্থিত, পুত্র ব্যোপদেবকে সকলে বললেন—"ফোঁটা ফোঁটা গঙ্গাজল মুখে দা'ও!" কথাটা তাঁর কাণে পৌঁছেছিল, তিনি অতি কষ্টে ঘাড় নেড়ে বললেন—"উহুঁ—উহুঁ, এক-টু—চা।" দু'মিনিট পরেই ছুটি! যাক্—আচ্ছা এখন বলুন তো, পেঁপে দেখতে গিয়ে অমন চম্‌কে পেছু হটেছিলেন কেন?"

মাতুল। পায়ের ধূলো দিন,—বলচি।

এটা ছিল মাতুলের খ'নেদি বিনয়।

বলিলেন—"চেয়ে দেখি—পেঁপের গায়ে টিকিট্ মারা,—তাতে লেখা রয়েছে—Right reserved—advanced annas ten (সত্ব সংরক্ষিত, দশ আনা আগাম দেওয়া হইয়াছে) তার পর ইনিশিয়াল (initial) কি একটি ছুঁচো, তা লেখা দেখে বোঝা কঠিন। দেখেই ত' মশাই মাথাটা বোঁ করে উঠলো,—মনে হ'ল—ফলটিতে ত' দু'বেলার মত' মাল নেই—মূল্য কিন্তু দশ আনা! সুতরাং এই ফল-হরি-পুজো আমাকে কিছুদিন কায়েম রাখতে হ'লে—হারছড়াটাও গেল! কপালে অমনি কে যেন চাট্ মারলে,—তার পরই বীরশয্যা!

মহাকাব্যের সূচনা দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম—"বল কি মাতুল—একটা পেঁপে দশ আনা! বৈবাহিককে ত' বেদানা খাওয়ালেই হয়।"

মাতুল বলিলেন—"আমি সম্ভ্রম সামলাবার জন্যে বেদানার কথাই তুলেছিলুম। তাতে যা শুনলুম তা এই—"না—না, বেদানা আমি প্রায়ই খাচ্চি, কালও খেয়েছি। ওতে পয়সা খরচ করতে যেওনা;—পেঁপেটা যত' পাও এনো।" শুনে আমি ত' মশাই একদম এতটুকু! কখন খেলেন, কে এনে দিলে—কিছুই জানিনা; তবে কি নিজে কিনে খাচ্চেন! বড়ই অপ্রতিভভাবে বললুম—"এ. কি কথা বেই—আপনি নিজে,—আমাকে একটু হুকুম করলেই ......বৈবাহিক বললেন,—"আমি বেদানা কিনে খাবো—শেষে এইটে তুমি ঠাওরালে! তা'হলে আমি পাগল হয়েছি বলো!—স্বপ্নে হে—স্বপ্নে,—স্বপ্নে খাই। তাতে আস্বাদেরও তফাৎ নেই, পেটও ভরে,—আবার কি চাই! তবে একটু সর্দ্দিভাব আসে,—বেশী খাওয়া হয়ে যায় কি না।" শুনে আমি তো মশাই "থ"! ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বন্! আমার তো মশাই এই পঁয়তাল্লিস বচরে, স্বপ্নে একটা আমড়াও জোটেনি।"

অমরের সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়, তাই এই অভিনব বেদানা খাওয়ায় আমার আশ্চর্য্য হইবার কিছুই ছিলনা। ...

(২৪)

দেখি—দুইটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক দ্রুতবেগে বাগান-মুখো আসিতেছেন। একটি বৃদ্ধ হইলেও সঙ্গী যুবকটির সহিত 'কুইক্-মার্চ' চালাইয়াছেন। আমাদের পেঁপে-প্রসঙ্গ বন্ধ হইয়া গেল।

উভয়কেই পোষ্ট-অফিসের দাঁড়া মজলিসে দেখিয়াছিলাম। সামনা সামনি হইতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন—"এই যে,—আপনার কথা রোজই হয়:—আমরা ভাবলুম চলে গেছেন,—দেখতে পাইনা যে বড়! বাগিচায় গেছলেন বুঝি,—ও যেতেই হবে। হুঁ হুঁ—আমরাও চলেছি। আহারের পর fruits (ফল) একটা important item (আবশ্যক বস্তু) কি না; যেমন উপকারী তেমনি palatable (মুখরোচক)—তালু তর্ করে দেয়। না? এখন এমন অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে—ও নাহলে যেন নেড়ানেড়া বোধ হয়!"

বলিলাম—"তা'তো হবারই কথা, ওটা যেমন বিবাহের পর বাসর। বাসরটি না থাকলে বিবাহ ব্যাপারটাই আলুনি মেরে যেত, তার স্মৃতিতে মজাই থাকতোনা।"

বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন—"ইয়াঃ! আপনি একদম ওর মর্ম্মস্থানটিতে পৌচেচেন।"

বলিলাম—"আমি আর কি পৌঁছুব, বৃহদারণ্যক-ঘোঁটা ডাব্‌উইন্ সাহেবের মতে আমরা যাঁদের বংশাবতংস তাঁরা ফল খেয়েই থাকেন, বলও তেমনি ধরেন, বাঁচেনও

আমাদের চেয়ে বেশী, আবার বুদ্ধিতেও কম যাননা। য়ুরোপ-আমেরিকার আত্মীয়েরা ওটা বুঝে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে আরম্ভ করে দিয়েছেন,—বাঁচ্‌চেনও বেশ লম্বা।"

বৃদ্ধ সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—"very ঠিক" (খুব ঠিক) কিন্তু আমাদের দেশ ওটা ধরতে পারেনি।"

মাতুল—আমাদের এরূপ অজ্ঞতার অভিযোগ সহ্য করিতে বরাবরই নারাজ। ভারতে ছিলনা জগতে এমন কিছুর নূতন আবিষ্কার হইয়াছে, বা ভারতের লোক কোন একটা বিষয় জানিত না—যাহা অন্যদেশের লোক আগে জানিয়াছে,—এসব কথা তিনি বিশ্বাস করেননা, সহিতেও পারেননা। তাই তিনি সুরু করিলেন "মাপ্ করবেন মশাই—একটা কথা নিবেদন করি,—ওরা কত দিনের সভ্য মশাই যে ওরা ধরে ফেললে আর আমাদের দেশ সেটা ধরতে পারলেনা,—হাঁ করে বোসে 'চোল্' ধরিয়ে ফেল্‌লে! যিনি যাই বলুন মশাই—ভাষা সুরু হয়েছে "গালাগাল্" থেকে—এটা স্বীকার করতেই হবে। আদিতে মাত্র "মুখভঙ্গী" ছিল। পরে রোকের চাড়ে গলা চিরে মুখ ছুট্‌লো বা ফুট্‌লো "গালাগালে";—আর তখন থেকেই আমরা পুরুষানুক্রমে বড়দের কাছ থেকে—"কলা গোড়া খাও," এই উপদেশটা পেয়ে আসছি। কলার গুণ ধরতে না পারলে তাঁরা কখনই এ ব্যবস্থা করতেন না।—কি বলেন?"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আচমকা একজন অপরিচিতের challengeএর (যুদ্ধংদেহির) এই চোট্ পেয়ে, মাতুলের দিকে নির্ব্বাক চেয়ে রইলেন।

মাতুল মেতে গিছলেন। আমি মনে মনে প্রমাদ গণিলাম,—তিনিও সুরু করিলেন,—কলাটা দেবপ্রিয় ফল, আর্য্যাবর্ত্তে হনুমানজির প্রতিষ্ঠা গ্রামে গ্রামে; তদ্ভিন্ন ঐটাই আমরা পঞ্চমবর্ষে পদার্পণের পর থেকেই (অর্থাৎ পাঠশালে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই) ঘরে বাইরে পেতে আরম্ভ করি, সে কথার আভাস পূর্ব্বেই দিয়েছি, তাই কলার সম্মান সর্ব্বাগ্রে দেওয়াই আমি উচিত মনে করি। এতে বোধ হয় কারো আপত্তি থাকবেনা, থাকা ত উচিত নয়।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বিপদে পড়িয়া বলিলেন—"বলুন"।

মাতুল বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমাদের দেশে ওর গুণ ধরা না পোড়্‌লে,—বরণডালায় উনি ষোল-কলায় উপস্থিত থেকে বরের কপাল স্পর্শ করে তাঁর ভাগ্য পর্য্যন্ত পৌঁছুবার সুযোগ পেতেন না। দেবতার নৈবেদ্যে "অষ্টরম্ভার" বিধানও আজকের নয়। গুণ জানা থাকলে তার আদর তার সম্মান সকলেই করে থাকেন, এমন কি তার নামটি প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে স্মরণীয় করে রাখেন, যেমন Victoria Hall, Edward's School (ভিক্‌টোরিয়া হল্, এডোয়ার্ডস্ স্কুল) ইত্যাদি। আমাদের দেশেও 'কলা'কে সেই সম্মান অজানা প্রাচীন যুগ থেকে প্রদত্ত হয়ে আসছে। দু'একটার উল্লেখ করি,—সুন্দরী স্বর্গ বিদ্যাধরীর নাম রাখা হয়েছিল—"রম্ভা", সত্যনারায়ণের কথার প্রধানা নায়িকা—"কলাবতী"; দুর্গোৎসবে—"কলা বউ"। উপাধিতে—"কলানিধি"। স্থান সংশ্রবে—"কলা-বাড়ী জয়নগর";—"কলাগেছে"; কোথাও গৌরবার্থে—"কাঁদি"। ইত্যাদি ইত্যাদি—

জয়হরি যেন মুকিয়ে ছিল, সেও বলিয়া উঠিল—"আর অজন্তা গুহায়—পাতুরে কলা! সে-তো আজকের কথা নয় মশাই—শোনা যায় জরাসন্ধ ফলিয়ে গেছেন!

আমি তাহার উৎসাহ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কিংকর্ত্তব্য ভাবিতেছি, দেখি সে আবার আরম্ভ করিল—"ব্যাকরণের দিকে ছেলেরা ঘেঁশতে চায়না; তাদের লোভ দেখাবার জন্যে 'গোলাপ' কথার অনুকরণে ব্যাকরণের নামকরণ হ'ল—"কলা"-প!"

কি প্রলাপ! আবার এও যে বেজায় চড়োয়া হইয়া উঠিল! বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি একবার আমার দিকে চান, একবার তার দিকে তাকান। তাঁহার যুবা সঙ্গীটি সম্ভবতঃ জামাই হইবেন, তাই B. Sc. হইয়াও নীরব হাস্যে শ্রোতা হইয়াই রহিলেন।

কি বিপদ—জয়হরি থামেনা! "বুঝলেন মশাই" বলিয়া আরম্ভ করিল—"আমাদের দেশে কলার শ্রীবৃদ্ধি দিন দিন দ্রুত বেড়ে চলেছে, এই ধরে নিন্‌না,—সব বিদ্যামন্দিরেই কলাচাষের জোর আয়োজন চলেছে, অচিরেই ছেলেরা সব কলাবিদ্যায় পেকে বেরুবে—তখন প্রেমসে কলা ভক্ষণ (উপভোগ) করুননা—'কত' করবেন।"

কথাটা শুনিয়া আমি সঙ্কুচিত হইতেছি, এমন সময় বৃদ্ধ যুবা সকলেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

আলপনা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চৌধুরী

[Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

[আ]মিও তাহাতে যোগ দিয়া বলিলাম—"জয়হরি তোমারি [জি]ত।" সে দু'হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

মাতুল গম্ভীর ভাবেই দেশের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, তিনি সেই ভাবেই বলিলেন—"অত কথাতেই বা [কা]জ কি, এই যে আমাদের এক একটি নধর মূর্ত্তি [দে]খছেন, আঁতুড়ের ষেটেরাপুজো থেকে শ্রাদ্ধ-বাসরে [পি]ণ্ডি খাওয়া পর্য্যন্ত কলায় বে-ফাঁক ভরাট্! আর বিশেষ [ক]রে এই জন্যেই আমাদের পুত্রের দরকার হয়, 'পুত্র [পি]ণ্ড প্রয়োজনম্' কিনা! সুপুত্রেরা বেইমানি করেন না; [বু]দ্ধিমানেরা, বেঁচে থাকতেই আরম্ভ করে দ্যান।"

বৃদ্ধ লোকটি সহাস্যে বলিলেন—"ঠিক্ বলেচেন।"

মাতুল উৎসাহ পাইয়া বলিলেন—"মশাই যাদের কথা পূর্ব্বে বলেছেন, তারা ক'দিনই বা কলা খাচ্চে? আমাদের [হি]সেবে ওরা ত' এই সেদিন সুরু করেছে! তবে ওরা [যে]রকম বুদ্ধিমান জাত, চট্ আমাদের টোপ্‌কে যেতে [পা]রে। তা মশাই কারুর মন্দ চাইনা,—আশীর্ব্বাদ করি ভালই হোক্।"

পরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া মাতুল বলিলেন—"আপনি [যে] চুপ করেই রইলেন, এত বড় কথাটায় একটুও [যে] [ম]তামত ছাড়ছেন না।"

বলিলাম—"দু'জনে কলা সম্বন্ধে বলার ত' কিছু বাকি রাখনি, কেবল কাঁচা, মোচা আর থোড় বাদ দিয়েছ। বলা দরকার যে আমরা ওগুলির চর্চ্চাও রীতিমত রাখি।"

এতক্ষণ পরে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন —"আমার বলবার উদ্দেশ্য ছিল—ওঁরা regularly (নিয়মিত ভাবে) আহারান্তে fruitsটা (ফলটা) ব্যবহার ক'রে থাকেন,—ওটা ওঁদের চাই-ই। আমাদের তেমন কোন routineও নেই, চাড়ও নেই। তাই বলতে হয়—ওর উপকারিতা জানা থাকলেও সে উপকারটা নেওয়া সম্বন্ধে আমরা বড়ই উদাসীন।"

কিছু বলিবার ভারটা যেন আমার উপর দিয়া মাতুল আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন; বলিলাম—"আপনি যা বললেন্ তা ঠিক্—কিন্তু 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' বলে একটা বহু প্রাচীন সত্য চলে আসছে। আদি-পুরুষদের ওপর টেক্কা মেরে কাপড় পরেই সেটা ঘটিয়ে বসেছি; কাপড়-খানা ফেলতে পারলে, আবার regularity রক্ষা করে সকলের মাথার ওপর বেড়ানো যায়। তা ছাড়া এটা আমাদের হিঁদুর দেশ, আমরা হনুমানজির মন্দিরও বানাই, পূজাও করি। শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগে তাঁর পরিচয় পেয়েছিলেন। আর ডারউইন্ সাহেব অনেক খুঁজে এই সে-দিন পূর্ব্বপুরুষ বার করেচেন বটে, কিন্তু তাঁদের মুখ চাননি। বেচারারা একটি ফলে হাত বাড়ালে পটাপট্ গুলি করতেও রাজি, অথচ ও জিনিসটি যুগ-যুগান্তর ধরে ওঁদেরই ভোগদখলে ছিল! আমরা কিন্তু অমন regularly (নিয়মিত ভাবে) অন্যের অধিকার গ্রাস করতে নারাজ!"

বৃদ্ধ বলিলেন "এর ওপর আর কথা চলে না, কিন্তু (মাতুলকে দেখাইয়া) এঁকে দেখে ত' বোধ হয় স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে ইনি বেশ নজর রাখেন। উনি যা-ই বলুন, নিজে কিন্তু নিশ্চয়ই fruit (ফল) ব্যবহার করে থাকেন; digestive systemকে (পাকস্থলী) সবল না রাখলে, চেহারায় কখনই অমন লাবণ্য থাকত না। দেখলে আনন্দ হয়।"

কথাটায় মাতুল বেশ একটু আন্তরিক আনন্দ অনুভব করিলেন। চট্ রুমালখানা পকেট্ হইতে টানিয়া, মুখখানা সজোরে মুছিয়া, বিনীত ভাবে বলিলেন—"কোথায় পাবো মশাই, সবই পয়সার খেলা, তার ওপর দশজনেই দেহটা দ-পড়িয়ে দিলে!"

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"ও আপনি কি বলচেন,—নিজের শরীরটে আগে মশাই,—পাঁচজন তার পরে।"

বুঝিলাম—এ চ্যাপটার্ (অধ্যায়) আরম্ভ হইলে জয়হরির অনুমানই ঠিক্ হইবে, সেও লাগান না কিনিয়া ছাড়িবে না। তাড়াতাড়ি ভদ্রলোকটিকে বলিলাম "ওঁর fruit খাওয়া সম্বন্ধে আপনার অনুমানটা নির্ভুল বললেই হয়, তবে বুদ্ধি খেলিয়ে উনি সেটাকে এমন সহজ করে নিয়েছেন যে অসময়েও, এমন কি মরুভূমেও ওঁর ফল খাওয়াটা নিয়মিতই চলে।"

ভদ্রলোকটি সাগ্রহে ও সানুনয়ে বলিলেন—"বলতে যদি বাধা না থাকে ত' বড়ই উপকার করা হবে। আমার ওটা আফিংএর মতই অনিবার্য্য দাঁড়িয়ে গেছে, আমি বেঁচে যাই মশাই।"

বলিলাম—"আজ্ঞে উনি ফ্রুট্-সল্ট্ (fruit-salt) ধরেছেন!"

ভদ্রলোকটি হাসিয়া উঠিলেন ; ও বলিলেন—"জিত কিন্তু আমারি রইলো। আপনার সঙ্গে প্রথম দেখার পর এত আনন্দ উপভোগ একদিনও করিনি। আপনার সঙ্গী-ভাগ্য খুব জবর বটে, তা না ত' এমন সরস যোগাযোগ ঘোটত না।"

বলিলাম—"এই তেরোস্পর্শের কথা বলছেন! ওর যে একটা কারণ আছে—"

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"সেটাও বলতে হয়েছে মশাই।"

বলিলাম—"শোনবার মত কিছু নেই, সংক্ষেপেই বলি। আবির্ভাবটা আমার খাস আর্য্যাবর্ত্তেই ঘটেছিল। ষষ্ঠীপূজার পুরোহিতও পাওয়া গিছলো খাঁটী ইক্ষ্বাকুবংশের। আমার ভাগ্যলিপি লেখবার লেখনির জন্যে মা ঐ ইক্ষ্বাকু-বংশীর ওপর খাঁকের কলম এনে দেবার ভার দেন, কারণ অন্য কলম না কি বিধাতা-পুরুষের হাতে অচল। তিনি যা এনে দ্যান সেটা খাঁক নয়—আক,—যে আক হাতীর খোরাক,—অপেক্ষাকৃত সরু হলেও, তাকে বাগিয়ে ধরা এক বিধাতাপুরুষেরই সম্ভব ছিল।—তাই দিয়েই তিনি আমার ভাগ্যলিপি দেগে দিয়ে যান। তাই বরাবরই আমার ভাগ্যে রসস্ত সঙ্গীই জোটে,—সন্ত্রস্তও থাকতে হয়।

ভদ্রলোকটি উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন "বাঃ বেশ,—বেশ আছেন আপনারা!"

পিয়ারী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল্

বরানগর কুটীঘাটা ফেরি-ষ্টেশনের একটু উত্তরে গঙ্গার উপর পরিচ্ছন্ন একখানি বাগান বাড়ী। তার ঠিক পাশেই কতকগুলা পুরানো ঘাটের পর বহুকালের একখানি জীর্ণ একতলা বাড়ী। এই বাড়ীর পশ্চিমের ঘরে বসিয়া অমল কবিতা লিখিতেছিল। রাত্রি তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে ; আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ, গাছপালা বাহিয়া তার জ্যোৎস্না-ধারা পৃথিবীর গায়ে ঝরিয়া পড়িতেছে। ফাগুন-মাস। বেশ মিঠা হাওয়াও বহিতেছে। অর্থাৎ সময়টুকু কবিতা লিখিবার পক্ষে খুবই যোগ্য।

তরুণ কবির ঘরে সে একা—দ্বিতীয় জন-মানব নাই। পাড়ায় একজনের বাড়ী অমল দু' বেলা দু'টী ছেলে পড়ায় ; তাদের বাড়ীতেই দুইবেলার আহার বরাদ্দ আছে—তা' ছাড়া হাত-খরচ যা মেলে, তাতেই তার চলিয়া যায়। কাজেই সে কষ্ট করিয়া আরো দুই পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টায় বাহিরে ছুটাছুটী করিবার দুরাশা ও শ্রম ত্যাগ করিয়া অবসর-মত ঘরে বসিয়া কবিতা লেখে। নিজের লেখা কবিতা পড়িয়া নিজেই সে তৃপ্তি পায় ; স্বতন্ত্র বহি বা মাসিক-পত্রে সে সব কবিতা ছাপাইবার দুঃসাহস বুকে লইয়া সে যে ছাপাখানা বা মাসিক-সম্পাদকের দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইবে, তত বড় জ্ঞানও তার ছিল না। অর্থাৎ ছাত্রদুটীকে পড়াইয়া অত্যন্ত নিরীহের মত সে বাকী সময়টুকু তার এই জীর্ণ গৃহ-বিবরেই পড়িয়া থাকিত ; কখনো নদীর ধারে পায়চারি করিত, বাড়ীর ছাদে বসিয়া কখনো বা ও-পারে সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিত, কখনো-বা নদীর জলে তরঙ্গের নৃত্য-ভঙ্গিমা আর নৌকার শ্রেণী লক্ষ্য করিত, আর এ-সব দেখিয়া প্রাণে ভাব আসিলে খাতা খুলিয়া কবিতা লিখিত।

তার কবিতার উৎসও ছিল...সে চপলাসুন্দরী। তা থাকিলেও, এ কথাটা পাছে বাহিরে কেহ জানিতে পারে, এইটাই ছিল তার দারুণ ভয়! আর এই ভয়ের জন্যই সে যে-সব কবিতা লিখিত, তাহা লোকচক্ষুর অগোচরেই গোপন রাখিত। যদি সেগুলি কোন দিন কাহারো চোখে পড়ে—এ কথা মনে হইলে লজ্জায় তার মাথার মধ্যে রক্তটা ছলাৎ করিয়া উঠিত। তার কারণ, এই চপলাসুন্দরী পল্লীর কোনো বালিকা বা তরুণী নয়—সে ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী। বাংলায় এমন রসিক কেহ নাই যে অভিনেত্রী চপলাসুন্দরীর নাম জানে না!

অমল বহুকাল পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় পড়িত, অবস্থা

যখন তার এমন হীন হইয়া পড়ে নাই, তখন সে ইণ্ডিয়ান্ থিয়েটারে গিয়া চার-পাঁচ বার চপলাসুন্দরীর অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছে। প্রথম দেখে, কপালকুণ্ডলা। কাপালিকের হাতে নবকুমারের জীবনের যখন চরম-ক্ষণ উপস্থিত, তখন পৃষ্ঠে সেই মুক্ত কৃষ্ণ কেশের ঝালর দুলাইয়া, রক্ত-বস্ত্রে রূপের ছটায় চারিদিকে বিস্ময় ফুটাইয়া কপালকুণ্ডলা সেই যে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল,—তার চরণ-ভঙ্গীতে আশ্বাস ঝরিয়া পড়িতেছে, চোখে সরলতা উছলিয়া উঠিয়াছে, বিশ্বের বিস্ময় যেন কোন্ বিজন লোক হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে—সে রূপ, সে ছবি ভুলিবার নয়। তার পর হইতে কত বিনিদ্র রাত্রি যে অমলের ঐ রূপের ধ্যানে কাটিয়া গিয়াছে! আর একদিন শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা গীতিনাট্যে দেখিয়াছে, ঐ চপলাসুন্দরী বিরহিণী রাধার ভূমিকা লইয়া গানে-কথায় প্রাণের মধ্যে অশ্রুর সাগর রচিয়া তুলিয়াছিল—তারপর আরো দুই-তিন বার চপলাসুন্দরীর অভিনয় সে দেখিয়াছে, যখনই দেখিয়াছে, তখনই মুগ্ধ তন্ময় হইয়া ফিরিয়াছে। নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া জগৎ ভুলিয়া সে যে তখন কি স্বপ্নে-গড়া কল্প-রাজ্যে প্রবেশ করিত! তারপর চপলাসুন্দরী হঠাৎ একদিন থিয়েটার ছাড়িয়া কোথায় যে অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল! থিয়েটার-পাগল দর্শকের হায়-হায় রবে চারিদিকে দারুণ বিশৃঙ্খলা জাগিয়া উঠিল; অমলের প্রাণটাও তার মধ্যে নিজের কাতর দীর্ঘশ্বাস মিশাইয়া হাহাকারে বিদীর্ণপ্রায় হইয়াছে!

ঠিক সেই সময়েই তার ভাগ্যাকাশে নিবিড় কালো মেঘ আসিয়া উদয় হইল, এবং সেই মেঘ প্রবল ঝড় তুলিয়া তাহারি প্রচণ্ড আবর্ত্তে তাহাকে একেবারে নিরুপায় আশ্রয়হীন করিয়া এই জীর্ণ ঘরের মধ্যে আছড়াইয়া আনিয়া ফেলিয়াছে। অর্থাৎ একটা বৈষয়িক মামলায় তার অদৃষ্ট একেবারে ছন্নছাড়া হইয়া গেছে!

এত-বড় বিপদে প্রথমে সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া কঠিন রোগে পড়িলেও বিনা-পরিচর্য্যায় একা এই ঘরে ভুগিয়া-ভুগিয়া সারিয়া উঠিল। যখন সারিয়া উঠিল, তখন মন এমন কুণ্ঠায় ভরিয়া গিয়াছে যে, এই ছোট্ট গণ্ডী ছাড়িয়া বাহির হইতে পা তার আর উঠিতে চাহিল না!...সময় কাটে কি করিয়া? পুরাতনের স্মৃতি-স্তূপ ঘাঁটিয়া নাড়াচাড়া করিতে গেলে কোথা হইতে বুকে অজস্র কাঁটা ফোটে, সে কাঁটার ঘায় বুক একেবারে রক্তে ভাসিয়া যায়! তবুও এ স্তূপ ঘাঁটার বিরাম নাই। এই স্তূপ ঘাঁটিতে গিয়াই চপলার ছবি একেবারে সদ্য-ফোটা তাজা গোলাপের মত একদিন হাতে ঠেকিল। সেই গোলাপটি বুকে ধরিতেই নানা ছন্দে তার প্রীতি একেবারে জীবন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এই গোলাপের শোভায় গন্ধে সান্ত্বনাও মিলিল।

সেই অবধি সে এই চপলাকে লক্ষ্য করিয়া কবিতা লিখিয়াই নিজের রিক্ত শূন্য প্রাণকে সচেতন রাখিয়াছে। এক একবার সাধ হয়, ইণ্ডিয়ান্ থিয়েটারে গিয়া খপর নেয়, চপলা থিয়েটারে ফিরিয়াছে কি না! কিন্তু সে জায়গায় সে যাইবে কি করিয়া! আর গেলেই বা ফল কি! থিয়েটার দেখিতে যাইবার পয়সারও অভাব যে এখন।

বড়লোক না হইলেও এক দিন অমলের অবস্থা খারাপও ছিল না। বৃদ্ধ মাতামহর কাছে থাকিয়া সে পড়াশুনা করিত। এই মাতামহ তাঁর এক সরিকী মকর্দ্দমায় আজীবন কাটাইয়া দিতে দিতে হঠাৎ মামলাটা হারিয়া গেলেন। মেয়ে-জামাই মরিয়া গেলেও তাঁর যে-মন এই মামলার ফলটির দিকে আশা-তৃষ্ণায় পরিপূর্ণ হইয়া সতেজে খাড়া ছিল, মামলা হারিতে সে-মন মচকাইয়া গেল। শত্রুপক্ষ মামলা জিতিয়া ধূমধামে পূজা-ভোজ লাগাইয়া দিল; মাতামহ তখন শোকার্ত্ত মনে শয্যা লইলেন এবং পাছে মৃত্যু আসিয়া এই পৃথিবী ও এই পৃথিবীতে তাঁর প্রধান অবলম্বন মামলাটিকে তাঁর হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া যায়, এই আশঙ্কায় রোগশয্যায় পড়িয়াই তিনি আপীল জুড়িয়া দিলেন। শেষ পয়সাটিকে আদালতের হাতে তুলিয়া দিয়া আবার যখন মাতামহ আশার শেষ শেষটুকু ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন, ঠিক সেইক্ষণে কঠিন নিষ্ঠুর মৃত্যু আসিয়া তাঁর সেই উদ্যত হাতদুটীকে কষিয়া ধরিয়া তাঁকে আপনার দেশে লইয়া গেল! অমল তখন কলেজের পড়া সুরু করিয়াছে। মাতামহর মৃত্যুতে চারিদিকে অকূল সমুদ্র দেখিয়া সে অস্থির আকুল হইল; এবং এ-সব কোলাহল ছাড়িয়া সে তার স্বর্গগত পিতার বহু-কাল-পূর্ব্বে-পরিত্যক্ত জীর্ণ গৃহে আসিয়া উদ্বেগ লজ্জার হাত এড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এই ঘটনাগুলার পর তার মন ও শরীর এমন দমিয়া গেল যে ভবিষ্যতের

সম্বন্ধে কোন আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টার এতটুকুও তার মনে রহিল না। কোনমতে বর্ত্তমানটাকে দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার হাত হইতে ঠেকাইয়া রাখাকেই সে পরম লাভ বুঝিয়া নিশ্চেষ্ট পড়িয়া রহিল। তার এই নিশ্চেষ্টতার মাঝে কবিতাদেবী আসিয়া তার স্কন্ধে ভর করিলেন। সেই অবধি অমল কবিতা লিখিতেছে।

২

বাগান-বাড়ীর একটু দূরে জীর্ণ গৃহে বসিয়া অমল যখন কবিতা লিখিতেছিল, বাগানবাড়ীর মধ্যে আলো হাসি, নাচ গানের সমারোহের অন্তরালে তখন এক প্রকাণ্ড নাট্যের সূচনা গড়িয়া উঠিতেছিল!

সেদিন শনিবার। বাগানে কলিকাতার মধু-পিয়াসী সম্প্রদায়ের একটা দল আমোদ-প্রমোদে গা ঢালিয়া সেখানে নন্দন রচনার আয়োজন করিয়াছিল। আজিকার রাত্রে এ সমারোহের ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী এটর্নি মানগোবিন্দ রায়। আট-দশ বৎসরের প্র্যাক্‌টিশে মানগোবিন্দ এটর্নি পাড়ায় বিলক্ষণ নাম কিনিয়াছে এবং সেই নামকে সর্ব্ব-বিষয়ে সকলের উপর তুলিতে হইলে যে-সব উপকরণের প্রয়োজন, সেগুলির সংগ্রহে ও সাধনায় তার এতটুকু শৈথিল্য ছিল না। তার বিলাস লীলায় প্রধান সহচরী ছিল পাপিয়া। রূপে-গুণে পাপিয়া তখন বিলাসী সমাজের মুকুট-মণি! এই পাপিয়ার প্রসাদ-লোভে বিলাসীর দল মধু-মক্ষিকার মত অহর্নিশি গুঞ্জন-মত্ত থাকিলেও, মানগোবিন্দ বহুৎ টাকা সেলামি দিয়া পাপিয়াকে দখল করিয়া ফেলিল।

বাগানে আজিকার প্রমোদ-লীলায় পাপিয়া সম্রাজ্ঞীর আসন পাতিয়া বসিয়াছিল এবং তাহার চারিদিকে ডালিম, চাঁপা, সরোজিনী, নীহার নক্ষত্রের মত ফুটিয়া রহিয়াছে! নাচে-গানে আনন্দ-সভা যখন মশগুল, পাপিয়া তখন হঠাৎ প্রমোদ-কক্ষ ত্যাগ করিয়া গঙ্গার ধারের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে চাঁদের জ্যোৎস্না ও-পার অবধি আলোর চাদর বিছাইয়া দিয়াছে। মদির স্নিগ্ধ হাওয়া! এই চাঁদের আলো আর মদির হাওয়ার পরশে পাপিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। এমন দৃশ্য সচরাচর চোখে পড়ে না, তাই সে মুগ্ধ নেত্রে ওপারের পানে চাহিয়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওপারের ঐ গাছপালা, প্রান্তর, ঘাট, বাড়ী, নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোৎস্নার রূপালি চাদর গায়ে দিয়া নীরব রহিয়াছে। পাপিয়ার মনে হইল, ওটা যেন স্বপ্ন-দিয়া-গড়া এক মায়ার রাজ্য,—বাস্তবের কঠিন হাত যেন ওর কোথাও পড়ে নাই! ভিতরে হল-ঘরে তখন মহাধূমে নূপুরের তালে তালে নাচ-গানের আসর ভরাট হইয়া উঠিতেছে।

পাপিয়া বারান্দার এক প্রান্তে চলিয়া গেল—আশে-পাশে এপারে ঘাট-বাট নিস্তব্ধ। দু-চারখানা গৃহ দেখা যাইতেছে, চাঁদের আলোয় সে-সব যেন স্বপ্ন দিয়া ঘেরা! সে উদাস নেত্রে জ্যোৎস্না জড়িত সুদূরের পানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর ঠিক নীচেকার ঘর হইতে একটা অস্ফুট ক্রন্দন ও সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ-কণ্ঠে কখনো মিনতি কখনো বা তর্জ্জনের সুর ভাসিয়া উঠিল। পাপিয়া কান পাতিয়া ভাল করিয়া সে-শব্দ শুনিল, তারপর ক্ষিপ্রগতিতে বৈঠক-কক্ষ ছাড়াইয়া সোপান বাহিয়া একেবারে সে নীচেকার ঘরে নামিয়া আসিল।

ঘরের দ্বার ভেজানো ছিল। সন্তর্পণে একটু ঠেলিতেই খোলা দ্বার-পথে সে দেখিল, ঘরে আলো জ্বলিতেছে এবং ঘরের মধ্যে একটা কৌচে এক সুন্দরী তরুণী! অত্যন্ত সঙ্কোচে সে যেন মরিয়া রহিয়াছে, চোখে তার অশ্রু! আর তার সামনে দাঁড়াইয়া একটা মোটা-সোটা লোক তার পানেই চাহিয়া—চোখে তার ক্ষুধা আর বিরক্তির রেখা! পাপিয়া চুপ করিয়া দ্বারে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তরুণী কথা কহিল—অশ্রু-জড়িত মিনতির স্বর! সে বলিল,—আমায় দয়া করে ছেড়ে দিন। আমি বাড়ী যাই...এখনো বাড়ী ফিরতে পারলে কেউ জানবে না, আমারো উপায় থাকবে!

পুরুষ বলিল,—বাড়ী ফিরবে তো এগিয়ে এসেছিলে কেন? তোমার জন্যে আমি অনেক পয়সা খরচ করেছি...সে কি অমনি-অমনি?...অনেক দিন থেকে খেলাচ্ছ আমায়... তাছাড়া আমি তো জোর করে তোমায় আনিনি। তুমি রাজী হয়েছিলে নিজে!..

তরুণী কহিল,—আমি বুঝতে পারিনি...

পুরুষ কহিল,—ও-সব চলবে না। আমি কোন কথা শুনবো না। বলিয়াই সে তরুণীর দুই হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল ও তাকে বক্ষে গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিল।

পাপিয়া ব্যাপারটা নিমেষে বুঝিয়া ফেলিল। তার শিরায় শিরায় চকিতে যেন বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল! তেমনি বিদ্যুৎ-

গতিতে দ্বার ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পুরুষটাকে সজোরে সে ধাক্কা দিল এবং তরুণীকে বাহুর ঘেরে ঘেরিয়া কহিল,—চলে এসো তুমি...

পুরুষটা এই আকস্মিক আক্রমণের বেগে টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। উঠিয়া চমক ভাঙ্গিতে সে দেখে, সামনে দাঁড়াইয়া পাপিয়া। সে বলিল,—এ কি রকম ইয়ারকি! ভালো লাগে না! ছাড়ো ওকে...

পাপিয়া বলিল,—না; ছাড়বো না।

পুরুষ বলিল,—অত আহ্লাদ ভালো নয়। তুমি যা আছ, তাই আছ! আমার ব্যাপারে হাত দিতে এসেছ কেন, বল তো? সরো, ভালো হবে না।

পাপিয়া বলিল,—এ তোমাদের দলে থাকবে না, বাড়ী যেতে চাচ্ছে,—তবু ওকে জোর করে ধরে রাখবে! এই বা কেমন কথা!

পুরুষ বলিল—সে কথা আমি বুঝবো! তোমায় সরফরাজী করতে হবে না। ওঃ, ঘরের বাহিরে নিজে যেচে এসে এখন সতীত্বের ধ্বজা তুলে দাঁড়াচ্ছেন! শোনো পাপিয়া, একে আমি জোর করে আনিনি—ও নিজের ইচ্ছায় এসেছে।

পাপিয়া তরুণীর পানে চাহিল, ঝড়ের মুখে তরুণ পল্লবের মত সে কাঁপিতেছিল। তার দুই চোখে অশ্রুর ধারা চোখ ছাপাইয়া উঠিয়াছে, দুই গাল বাহিয়া সে অশ্রু অঝোরে ঝরিতেছিল। তরুণী বলিল—না, না, আমি এখানে আসতে চাইনি! আমি বুঝতে পারিনি, বুঝতে পারিনি।...ওগো, আমায় ঘরে রেখে এসো...

পাপিয়া কহিল,—কোথায় তোমার ঘর, বল তো?

পুরুষ আরক্ত চোখে পাপিয়ার পানে চাহিল, কঠিন স্বরে কহিল,—ভাল্‌ো হচ্ছেনা পাপিয়া—ছাড়ো ওকে—

পাপিয়াও ভ্রূকুটিপূর্ণ চোখে তার পানে চাহিয়া কহিল—ছাড়বো না!

পুরুষ কহিল—কি করবে, শুনি!

পাপিয়া কহিল—ওকে বাড়ী রেখে আসবো।

পুরুষটা ব্যঙ্গের সুরে কহিল,—যা বললেন!...অমনি... বলিয়া সে পাপিয়ার কবল হইতে তরুণীকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে তার দিকে অগ্রসর হইল। পাপিয়া এ আক্রমণের জন্য নিজেকে আগে হইতে উদ্যত রাখিয়া ছিল—তরুণীকে দ্রুত একপাশে সরাইয়া বুক ফুলাইয়া সে পুরুষটার সামনে রুখিয়া দাঁড়াইয়া ঘরটার চারিধারে একবার নিমেষে চাহিয়া লইল,—ঘরে গরাদে-দেওয়া কয়টা জানালা, একটিমাত্র দ্বার! পুরুষটা তার সামনে আসিয়া কহিল,—তুমি ওকে ছাড়বেনা, তাহলে?

পাপিয়া কহিল,—না।

পুরুষ কহিল,—মানগোবিন্দর কোন খাতির রাখবো না আমি...জেনে রেখো...

পাপিয়া কহিল,—রাখতে হবে না।

পুরুষ কহিল—আমার দোষ নেই তবে...ওকে আমার চাই। আমায় অনেক খেলিয়েছে ও, জান্‌লার আড়ালে নিজের ঘরে বসে! আজ নিজে আসতে চেয়েছিল, তাই এনেছি এ আয়োজনে খরচও ঢের হয়েছে, ফন্দী অনেক খাটাতে হয়েছে...সেগুলো বকাণ্ড-প্রত্যাশার জন্য করিনি। আর এ থিয়েটারী ঢংয়ের জন্যেও না। ছাড়ো ওকে...

পাপিয়া কহিল—বলেছি তো, ছাড়বো না...

—তবে আমার দোষ নেই...বলিয়া পুরুষ পাপিয়াকে সবলে আক্রমণ করিতে গেল। পাপিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল; সে দুই পা সরিয়া গেল, আর পুরুষটা টাল সামলাইতে না পারিয়া আবার পড়িয়া গেল। যেমন পড়িয়া যাওয়া, পাপিয়া অমনি যো পাইয়া চেয়ার কয়খানা টানিয়া ফেলিয়া তার চারিধারে দ্রুত ব্যূহ রচনা করিয়া দিল এবং তরুণীর হাত ধরিয়া টানিয়া তাকে লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল—এবং বাহিরে গিয়া দ্বারটা জোরে টানিয়া বন্ধ করিয়া দিল। বাহিরের দিকে ছিট্‌কিনী ছিল। ছিট্‌কিনী লাগাইয়া তরুণীকে টানিয়া সে একটা কুঞ্জান্তরালে লইয়া গেল। পাপিয়া হাঁপাইতেছিল। তরুণীকে কহিল,—কোথায় তোমার বাড়ী, বল শীগগির...

তরুণী ঠিকানা বলিল। পাপিয়া বলিল, শীগ্‌গির এসো। এক মুহূর্ত্ত দেরী করা চলবে না।...এ পথে কেন এসেছিলে বোন্! ঘরের মধ্যে যত অন্ধকারই থাক্, তবু সে ঘর,...আর বাহিরে যদি কোন আলো দেখে থাকো তো জেনো, সে আলেয়ার আলো, মুহূর্ত্তের চমক, তার পিছনে গাঢ় অন্ধকার!—তার আলোয় মজে ঘর ছেড়ে বার হয়ো না, বিপদের এখানে অন্ত নেই! এর চেয়ে ঘরের মধ্যে নৈরাশ্যে পুড়ে মর যদি তো তাও ঢের ভালো!...এসো ..

তরুণীকে লইয়া পাপিয়া সতর্কভাবে বাগানের ফটকে আসিল। উদ্যান-বিলাসী বাবুদের কয়খানা গাড়ী, মোটর ফটকে দাঁড়াইয়াছিল—ট্যাক্সিও দুই-চারিখানা ছিল। তরুণীকে লইয়া একটা ট্যাক্সিতে চড়িয়া পাপিয়া সোফারকে বলিল—চলো...

ট্যাক্সি তাদের দুইজনকে লইয়া তীব্র গতিতে কলিকাতার দিকে ছুটিল। (ক্রমশঃ)

পাণ্ডুয়া

কুমার শ্রীমুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

সপ্তগ্রামের পর পাণ্ডুয়া হুগলী জেলার মধ্যে অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। কথিত আছে, গৌতম বুদ্ধের পিতৃব্য-পুত্র পাণ্ডু শাক্য বঙ্গ দেশে আসিয়া প্রাচীন সপ্তগ্রাম মহানগরীর পাঁচ ক্রোশ উত্তরে দামোদর নদের তীরে এক ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন ও স্বীয় নামানুসারে রাজধানীর নাম দেন "পাণ্ডুয়া"। রাজধানী উচ্চ প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টিত ছিল। সুরম্য প্রাসাদ, সুবৃহৎ অট্টালিকা, সুদৃশ্য দেব-দেউল, বৌদ্ধ বিহার ও মঠ এবং বহু সুপেয় পানীয় পূর্ণ সরোবরে রাজধানী সুশোভিত ছিল। প্রকৃতিপুঞ্জ সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। রাজ্য ধন-ধান্যে পূর্ণ ছিল।

বৈঁচী মন্দির

রাজ্যে পূজা-পার্ব্বন, যাগ যজ্ঞ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, আনন্দোৎসব লাগিয়াই থাকিত। এহেন সমৃদ্ধ ও রম্য জনপদ ঘটনা-চক্রের কঠোর আবর্ত্তনে ক্রমে হতশ্রী হইয়া পড়িল। লক্ষ্মী চিরদিনই চঞ্চলা, কোথাও চিরস্থায়ীরূপে অবস্থান করেন না। পাণ্ডুয়ার ভাগ্যলক্ষ্মী এক অবোধ সুকুমার শিশু-হত্যা-জনিত পাপ-কর্ম্মের উপলক্ষ করিয়া রাজার প্রতি অপ্রসন্না হন, তাঁহার রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। হিন্দু রাজ্য বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু কীর্ত্তি-কলাপও বিলুপ্ত হইয়াছিল। যাহা কিছু নিদর্শন ছিল, তাহাও বিজয়ী বিধর্ম্মী কর্ত্তৃক রূপান্তরিত হইয়াছিল। বহু শতাব্দী পরে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় বিধর্ম্মীর ভগ্নস্তূপ হইতে আবার তাহা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। পাণ্ডুয়ার হিন্দু-রাজত্বের ইতিহাস কালের অনন্ত তিমিরে সমাচ্ছন্ন—সে তিমির ভেদ করিবার প্রয়াস পাওয়া আমার ক্ষুদ্র শক্তির অতীত।

পাণ্ডুয়া মুসলমান-অধিকারভুক্ত হওয়া সম্বন্ধে নানা প্রবাদমূলক গল্প প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে ; কয়েকটি গল্প এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইল। একটি এই—পাণ্ডুয়ার হিন্দু রাজার একটী পুত্র সন্তান হওয়ায়, রাজবাটীতে মহাভোজ দেওয়া হয়। রাজার জনৈক মুসলমান কর্ম্মচারী, সেই সময় স্বীয় বাটীতে একটী ভোজ দেয়। ভোজ উপলক্ষে গোবধ করিয়া অস্থিগুলি ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখে। রজনী যোগে শৃগালেরা গর্ত্ত খনন করিয়া অস্থিগুলি তুলিয়া

ফেলে। হিন্দু প্রজারা তাহা দেখিয়া উন্মত্তবৎ হয়। রাজা স্বীয় শিশু পুত্রকে এই অমঙ্গলের কারণ স্থির করিয়া হত্যা করেন। মুসলমান কর্ম্মচারী দিল্লীতে পলায়ন করিয়া সম্রাটের সাহায্যে বিপুল সেনা সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডুয়া আক্রমণ এবং যুদ্ধে হিন্দুদিগকে পরাস্ত করেন। (১) আর একটী প্রবাদ এই যে, মুসলমান কর্ম্মচারী পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে গো হত্যা করে। সেজন্য মুসলমানের পুত্রকে রাজাদেশে হত্যা করা হয়। (২) শেষোক্ত বিবরণ সম্ভব বলিয়া অনুমিত হয়। তৃতীয় প্রবাদ এই যে, মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিলে, পাণ্ডুয়ার রাজা মহানাদের রাজার সাহায্য গ্রহণ করেন। মহানাদে "জীয়চ-কুণ্ড" নামক একটী অলৌকিক সরোবর ছিল। তাহার জল স্পর্শ করিলে মৃত ব্যক্তি প্রাণ পাইত ও আহত ব্যক্তি সুস্থ হইত। ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। হিন্দু সৈন্য অটুট রহিল। আজ যাহারা হত বা আহত হইল, পরদিন তাহারা নবজীবন লাভ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিল। মুসলমানেরা নিরুপায় হইয়া হতাশ হইয়া পড়িল। অবশেষে মুসলমান সেনাপতি "জীয়চ বা জীবন কুণ্ডের" অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনিয়া, একখণ্ড গোমাংস কুণ্ডে নিক্ষেপ করতঃ জল অপবিত্র করিয়া দিল। "জীয়চ কুণ্ডের" সঞ্জীবনী শক্তি এইরূপে নষ্ট হওয়ায়, মুসলমানেরা জয়ী হইল এবং পাণ্ডুয়া ও মহানাদ অধিকার করিল। (৩) চতুর্থ প্রবাদটি এই—মহানাদ গ্রামে যখন হিন্দু যোগী রাজগণ রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে দ্বারবাসিনী গ্রামে এক বৃদ্ধ মুসলমান দম্পতী বাস করিতেন। অপুত্রক থাকায় মুসলমান এই মানৎ করিয়াছিল যে, যদি পুত্র হয় তাহা হইলে আল্লার উদ্দেশে সে গরু কোরবাণী দিবে। পুত্র হইলে সে গরু কোরবাণী দিয়াছিল। একটা কুকুর এক খণ্ড অস্থি মুখে করিয়া বশিষ্ঠ-গঙ্গার কিনারায় আনিলে, বশিষ্ঠ-গঙ্গা হইতে ধূম নির্গত হইতে আরম্ভ হইল ও "রাম রাম" শব্দ জল মধ্যে শুনা গেল। রাজার নিকট সংবাদ পঁহুছিলে, তিনি জ্যোতিষ সাহায্যে ব্যাপার কি অবগত হইলেন। এই বশিষ্ঠ-গঙ্গা দেবগণের স্থাপিত এবং দেবগণ বাস করিতেন বলিয়া ইহার জলের সঞ্জীবনী-শক্তি ছিল—মৃত ব্যক্তি ইহার জল স্পর্শ করিলে প্রাণ পাইত। বশিষ্ঠ-গঙ্গার পূর্ব্বোক্ত অবস্থা শুনিয়া রাজা ক্রোধে অন্ধ হইলেন। তখন দেশে কেহ গোহত্যা

পাণ্ডুয়া মিনার—সংস্কারের পর।

(১) The Travels of a Hindu by Bhola Nath Chander Vol, I. pp 141-145.

(২) Rev. J Long's article in the Calcutta Review.

(৩) Calcutta Asiatic Observer of 1824.

করিতে পারিত না। মুসলমান বাদশাহগণও গোহত্যা নিবারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, গোধন রক্ষায় অনেক লাভ—কৃষিকার্য্যের জন্য, লোকের বিশেষতঃ শিশু, বৃদ্ধ ও রুগ্ন লোকের, প্রাণ রক্ষার জন্য গোদুগ্ধের বিশেষ প্রয়োজন। প্রচলিত বিধি অমান্য করিয়া আবার হিন্দুরাজ্য পবিত্র মহানাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে বিনা হুকুমে গোহত্যা করায় রাজা মুসলমান-দম্পতীর সমুচিত শাস্তি দিলেন। মুসলমানের শিশু সন্তানের প্রাণবধের আজ্ঞা প্রদত্ত হইল। মুসলমান-দম্পতী মৃত শিশুর শব লইয়া দিল্লী যাত্রা করিল। সেখানে বাদশাহের নিকট ফকীর মালদহ জেলার বড় পাণ্ডুয়ার প্রধান পীরের অনুমতি আনিতে গেল। প্রধান পীর অনুমতি দিলেন এবং মহানাদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য অর্থ ও সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মুসলমানেরা পাণ্ডুয়ায় শিবির স্থাপন করিয়া মহানাদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মুসলমানদের বার বার পরাজয় হইল। মুসলমানেরা দেখিল যে, আজ যে হিন্দু সেনাপতি যুদ্ধে হত হইল, পরদিন সেই আবার যুদ্ধ করিতেছে। অনুসন্ধান দ্বারা বুঝিতে পারিল যে, বশিষ্ঠ-গঙ্গার সঞ্জীবনী-শক্তি যায় নাই; আর সেই জল স্পর্শেই মৃত ব্যক্তিরা প্রাণ পাইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতেছে।

পাণ্ডুয়া মসজীদের ধ্বংসাবশেষ (১)

নালিশ হইল। বাদশাহ কিছু করিলেন না, বরং মুসলমানকেই দোষী সাব্যস্ত করিলেন। এই ঘটনার পর দিল্লীর বাহিরে আসিয়া মুসলমান-দম্পতী একদল ফকীরকে দেখিলেন এবং তাঁহাদের নিকট নালিশ করিলেন। ফকীর দলের কর্ত্তা পুনরায় বাদশাহের নিকট আবেদন করিলেন। অনেক বাদ-বিতণ্ডার পর এই স্থির হইল যে, ফকীরগণ ইচ্ছা করিলে মহানাদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে; কিন্তু সরকার হইতে কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। তখন ফকীরদল পাণ্ডুয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন তখন মালদহে আবার ফকীর প্রেরিত হইল। বড় পীর বলিলেন, যে-কোন উপায়ে বশিষ্ঠ-গঙ্গায় গোমাংস নিক্ষেপ করিতে হইবে, নতুবা কিছু হইবে না। এদিকে যে মুসলমান গোমাংস নিক্ষেপ করিতে যায়, সেই ধরা পড়িয়া শূলে যায়। তখন আবার মালদহে লোক গেল। পীর বলিলেন যে, ফকীরডাঙ্গার ফকীর সাহায্য না করিলে কিছুই হইবে না। সে কামরূপী—ইচ্ছা করিলে পশু পক্ষীর বেশ ধরিতে পারে, তাহার সাহায্য গ্রহণ কর। মগরা ও পাণ্ডুয়ার মধ্যস্থানে সের শাহের রাস্তার পাশে (এক্ষণে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড)

হয়েড়া গ্রামের পূর্ব্বদিকে 'ফকীর ডাঙ্গা' বলিয়া একটী স্থান আছে, সেইখানে তখন একজন ফকীর বাস করিতেন। পাণ্ডুয়ার ফকীর সম্প্রদায় সেই ফকীরকে গিয়া ধরিলেন। ফকীর অনেক সাধ্য সাধনার পর সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন "গোমাংস নিক্ষেপ করিব, কিন্তু তাহাতে আমার প্রাণ যাইবে। আমার দেহ যেখানে পতিত হইবে, সেইখানে তোমরা কবর দিবে। আমি পক্ষীরূপে পলাইবার চেষ্টা করিব।" যথা সময় ফকীর রাজমল্লিক যোগী বেশে, মস্তকের জটায় গোমাংস রাখিয়া, অতি গোপনে মন্ত্রবল এবং সেই স্থানেই সমাহিত হইল। সেই কবর একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ পাদমূলে অবস্থিত, এবং ইষ্টক নির্ম্মিত ও একটী প্রকাণ্ড কুঠারীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-সমন্বিত। শেরসাহ রাজবর্ত্মের অভিজ্ঞ পথিক অদ্যাপি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ঐ স্থানকে "রাজমল্লিক তলা" বলিয়া ঘোষণা করে। স্থানটী মগরা ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিমে। এইরূপে ফকীর রাজমল্লিক স্বীয় দেহ সংহারের সহিত বশিষ্ঠ-গঙ্গার ও তৎসঙ্গে মহানাদের হিন্দু-রাজশক্তি-রূপ সঞ্জীবনী-শক্তির সংহার করিয়া সমাহিত হইল। মহানাদের

পাণ্ডুয়া মসজিদের ধ্বংসাবশেষ (২)

সাহায্যে গ্রামে প্রবেশ করিয়া বশিষ্ঠ-গঙ্গায় অবগাহন স্নান করিলেন। তৎক্ষণাৎ বশিষ্ঠ-গঙ্গা হইতে সূচীভেদ্য ধূম-স্তম্ভ উদগত হইল, 'রাম রাম' শব্দে দিক পূর্ণ হইল, আর ঘন ঘন ভূকম্প হইতে লাগিল। রাজা মুহূর্ত্ত মধ্যে গণক সাহায্যে ব্যাপার বুঝিয়া ভণ্ড যোগীকে সংহার করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। ফকীর বেগতিক দেখিয়া হাড়গিলা পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া আকাশে উড্ডীয়মান হইল। অমনি পক্ষীর উদ্দেশে শত ধনু হইতে তীর উৎক্ষিপ্ত হইল। পক্ষী শরবিদ্ধ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ফকীর ডাঙ্গায় নিজ আবাস স্থানের পূর্ব্বদিকে পতিত হইল হিন্দুরাজা সসৈন্যে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন ও মুসলমানের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। মুসলমানেরা মহানাদের লুণ্ঠন ও সর্ব্ব হত্যা কার্য্য তিন দিনে সম্পন্ন করিয়া, বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা জন্য ও ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণকে সগর্ব্বে জানাইবার জন্য, পাণ্ডুয়ায় উচ্চ মন্দির ও বিজয়-বার-দোয়ারী প্রস্তুত করিল। তৎপরে ফকীরদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যে যেখানে পাইল চলিয়া গেল। হিন্দুরা কিন্তু এই প্রবাদ গল্প বলেন না, বা কেহ কেহ মাত্র বলেন। তাঁহাদের কথা এই—মহানাদের একজন পরম ধার্ম্মিক বিদেহ যোগীরাজ প্রত্যহ স্বীয় রাজ্য হইতে ৺বারাণসী ধামের

বিশ্বেশ্বরের মন্দির ও মা অন্নপূর্ণার মন্দির দর্শন করিবার জন্য বাসনা করিলে, সদাশিব মহাদেব বিশ্বকর্ম্মাকে ইঙ্গিত করেন। মহাদেবের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা এক রাত্রিতে পাণ্ডুয়ার মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পাণ্ডুয়া রাজ্যের সন্নিকটে দ্বারবাসিনীতে এক সদ্‌গোপ রাজা বাস করিতেন। সেখানকার রাজা দ্বারপাল পাণ্ডুয়ার রাজাকে যুদ্ধে সাহায্য করেন। সেজন্য পাণ্ডুয়া-বিজয়ের পর সেনাপতি মহম্মদ আলীর অধীনে মুসলমান সেনা দ্বারবাসিনী আক্রমণ করে। দ্বারবাসিনীর "জীবৎ কুণ্ডে"র জীবন দানের শক্তি বাঁশবেড়িয়া গড়বাটীর দুর্গাভ্যন্তরে সাত বিঘা ভূমি লইয়া পূর্ব্বোক্ত মত সঞ্জীবনী-শক্তি-সম্পন্ন একটী সুবৃহৎ সরোবর আছে; তাহার নাম "জীয়ন্তা সরোবর।" তাহার শক্তি এখন লুপ্ত হইয়া বহু কুম্ভীরের আবাস স্থান হইয়াছে।

পঞ্চম প্রবাদ মূলক গল্পটি এই—বখ্‌তিয়ার খিলিজি বঙ্গাধিকারের পর পাণ্ডুয়া অঞ্চলে মুসলমান উপনিবেশ স্থাপিত হয়। পাণ্ডুয়া ও মহানাদে একজন হিন্দু রাজা ছিলেন—উভয় গ্রামেই রাজবাটী ছিল। মুসলমান লেখকগণ তাঁহাকে পাণ্ডব রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।
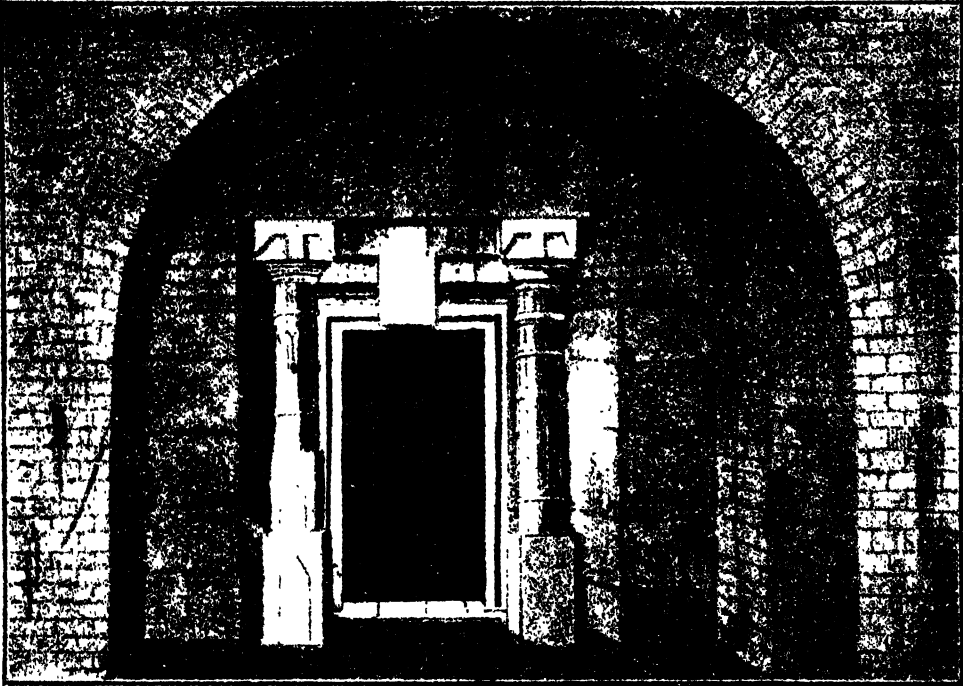
পাণ্ডুয়া বিজয় স্তম্ভের প্রবেশ-দ্বার (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে গৃহীত ফটো)

থাকায়, প্রথমে মুসলমানেরা যুদ্ধে সুবিধা করিতে পারে নাই। অবশেষে পীরসা জোকাইয়ের সাহায্যে গোমাংস নিক্ষেপ দ্বারা এ ক্ষেত্রেও "জীবৎকুণ্ডের" সঞ্জীবনী-শক্তি নষ্ট করিয়া মুসলমানগণ বিজয়ী হয়। পীর জোকাইয়ের সমাধি এখনও "জীবৎ কুণ্ড" সরোবরের সন্নিকটে আছে। শত্রু হস্তে নির্য্যাতিত হওয়ার আশঙ্কায় দ্বারপাল রাজ-বাটীতে অগ্নি সংযোগ করেন; এবং প্রজ্জলিত হুতাশনে সপরিবারে আত্মসমর্পণ করিয়া রাজবাটীর সহিত ভস্মীভূত হন। এখন সেই ভস্মস্তূপ "ধন পোতা" নামে পরিচিত। পাণ্ডব রাজার পুত্রকে আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য একজন মুসলমান শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেই শিক্ষকের পুত্রের ত্বকচ্ছেদ উপলক্ষে একটী ভোজে গোবধ করা হয়। রাজা রাজ্য অপবিত্র করণের জন্য মুসলমানের পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং মুসলমানগণকে আজান ও অন্যান্য মুহম্মদীয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন। রাজাজ্ঞায় ক্ষুব্ধ হইয়া মুসলমানগণ দিল্লীর সম্রাটের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করেন। দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় ফিরোজ সাহ পাণ্ডব রাজাকে শাসন ও

মুসলমান ধর্ম্মানুষ্ঠান পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র ও ভাগিনেয় সাহ সুফী উদ্দীনের অধীনে একদল সেনা বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে তাঁহার সহকারী ছিলেন তাঁহার অন্যতম মাতুল—ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম বিজয়ী জাফর খাঁ গাজী ও বহরম্ সাক্কা। "সাক্কা" অর্থ ভীস্তী। তিনি যুদ্ধে পানীয় জল সরবরাহের কার্য্য করিয়া "সাক্কা" উপাধি পান। তাঁহার সমাধি বর্দ্ধমানে আছে, নাম "পীর বহরামের আস্তানা"। পাণ্ডব রাজা "জাৎ ময়দানের" যুদ্ধে পরাভূত হন এবং তাঁহার রাজবাটী মসজীদে পরিণত করা হয়। তাহাই "বাইশ-দরজা মসজীদ" নামে পরিচিত। সৈন্যগণের মধ্যে সৈয়দ বংশীয় একদল সেনা ছিল; তাহারা

পাণ্ডুয়া ফাত্ খাঁ সুরের মসজীদের শিলালিপি

যুদ্ধে অসীম বীরত্ব দেখাইয়াছিল। আর একদল ফকীর সৈন্য ছিল,—তাহারা ধর্ম্মরক্ষার্থ যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। তাহাদের দলের কর্ত্তা ছিলেন প্রসিদ্ধ মুসলমান পীর মইনুদ্দীন চিশ্তির প্রধান শিষ্য সেখ শারাফুদ্দীন বু আলি কালান্দার। তিনি পানিপথ কর্ণালে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি এই ধর্ম্মযুদ্ধে আল্লার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ফকীর সৈন্যকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া রেল ষ্টেশনের দক্ষিণে লস্কর-ডাঙ্গা হইতে নমাজ-ডাঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমি যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান পাণ্ডুয়া থানার সন্নিকটে গঞ্জি-ই-শাহিদানে স্বধর্ম্মার্থ প্রাণ-বিসর্জ্জনকারী মুসলমানগণ সমাহিত আছেন। এই ধর্ম্মযুদ্ধে মুসলমান পক্ষের হতাহতের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হয় নাই। তাহাদের মধ্যে সাহ সুফীর অনেক বন্ধু ও শিষ্য ছিল। পরবর্ত্তী কালে তাহারা পীর পদবীতে উন্নীত হইয়াছে। পাণ্ডুয়ার দক্ষিণে লস্কর-ডাঙ্গায় গুল বিহিশ্‌টী মামুয়ারের আস্তানা আছে। একজন ফকীর তাহার তত্ত্বাবধারণ করেন। যুদ্ধে তাঁহার দেহ খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার শব-দেহ-খণ্ডগুলি স্বর্গীয় পুষ্পে আবৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সে সময় তাঁহাকে ডাকিবামাত্র তিনি উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি "স্বর্গ-কুসুমে সুশোভিত পীর" নামে পরিচিত। পল্লীর উত্তরাংশে ফকীর দরিয়া গাজীর সমাধি আছে। সেনাপতি সাহ সুফীর দুগ্ধ সরবরাহকারী নগরগুরু যুদ্ধক্ষেত্রে মস্তকে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে। নগরগুরু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বিধর্ম্মী পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। মৃতের মস্তকের ক্ষতস্থান শীতল রাখিবার জন্য তাহার সমাধিতে দুগ্ধ ঢালিবার ব্যবস্থা আছে। পাণ্ডুয়ার হিন্দু অধিবাসীগণ বিজয়ী সেনার হস্তে নিগৃহীত হইবার আশঙ্কায় দেশত্যাগী হইয়া অন্যত্র বাস করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের ত্যক্ত গৃহাদিতে মুসলমান সৈন্যগণ বাস করিতে লাগিল। তদবধি পাণ্ডুয়া হুগলী জেলার মধ্যে মুসলমান-প্রধান স্থান হইয়াছে। কাহারও মতে পাণ্ডুয়া ও মহানাদে দুইজন পৃথক রাজা ছিলেন—আপদে বিপদে পরস্পরের সাহায্য করিতেন।

বখ্‌তিয়ার খিলিজির নবদ্বীপ বিজয়ের এক শতাব্দী পরে পাণ্ডুয়া মুসলমান অধিকারে আসে। এ সম্বন্ধেও নানা মতভেদ আছে। ত্রিবেণী মসজীদে সংরক্ষিত একখানি কুর্শিনামা আছে। তাহা হইতে জানা যায়, চাকলা মুকসুদাবাদ পরগণা কোনওয়ার পর্ত্তুপের অন্তর্গত বর্ত্তমান বীরভূম জেলার রামপুরহাটের দুই ক্রোশ পূর্ব্বদিকে মান্দগ্রাম নামক এক বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীতে জাফর খাঁ গাজী বাস করিতেন। তাঁহার ভাগিনেয় সাহ সুফী উদ্দীনও তাঁহার সহিত বাস করিতেন। সাহ সুফী বারখুরদারের পুত্র ও দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ সাহেরও ভাগিনেয় ছিলেন। জাফর খাঁ ও সাহ সুফী হিন্দুরাজ্য বিধ্বংস ও ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার ও সংরক্ষণ মানসে সপ্তগ্রাম ও পাণ্ডুয়া প্রদেশে

আগমন করেন। ত্রিবেণীর শিলালিপিতে প্রকাশ, জাফর খাঁর প্রতিষ্ঠিত ত্রিবেণী মসজীদ ৬৯৮ হিজরা বা ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে ও মাদ্রাসা ৭১৩ হিজরা বা ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। সে সময় বঙ্গদেশে সুলতান সামসুদ্দীন আবুল মুজাফার ফিরোজ সাহ রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বকাল ৭০২—৭১৮ হিজরা বা ১৩০২—১৩১৮ খৃষ্টাব্দ। পাণ্ডুয়ার প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বের আয়মা সংক্রান্ত একখানি দলিল আছে। খাদিম ও মাতোয়ালীগণের মধ্যে আস্তানা পরিচালন সম্বন্ধে আদালতে এক মামলা হয়। তাহাতে সম্রাট ফিরোজ সাহ প্রদত্ত সনন্দ প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করা হয়। সনন্দখানি দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই; নতুবা তাহা হইতে সম্ভবতঃ পাণ্ডুয়া-বিজয়ের কাল নির্ণয় করিবার সুবিধা হইত। দিল্লীতে তিন ফিরোজ সাহ রাজত্ব করেন। প্রথম ফিরোজ সাহ ১১৩৬ খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয় জালালুদ্দীন খিলিজি ফিরোজ সাহ ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। শেষ ফিরোজ সাহের রাজত্ব-কাল ১৩৫১—১৩৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতেছে। পাণিপথের বিখ্যাত ফকীর শা বু আলি কালান্দার ৭২৪ হিজরা বা ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তিনি দ্বিতীয় ফিরোজ সাহের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পাণ্ডুয়া অভিযানে ফকীর-সৈন্য প্রেরণ করিয়া থাকিলে, ১৩২৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সম্রাট দ্বিতীয় ফিরোজ সাহের রাজত্বকালে পাণ্ডুয়া বিজয় হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ত্রিবেণীর শিলালিপি ও কুর্শীনামা ও পাণ্ডুয়ার আয়মা সংক্রান্ত দলিলেও এই মতের সমর্থন করিতেছে। ভিন্ন মতবাদীরা কিন্তু সপ্তগ্রাম বিজয়ের প্রায় দুই শত বৎসর পরে ১৪৭৭—৭৮ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়া-বিজয়ের কাল নির্ণয় করেন (৪)।

পাণ্ডুয়ার—"বাইশ দরজা" মসজীদ

প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে পাণ্ডুয়া হুগলী জেলার মধ্যে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান। বহু প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডুয়া মিনার বা বিজয়-স্তম্ভ বা "পেঁড়োর মন্দির", দুইটী মসজীদ, একটী সমাধি এবং দুইটি সুবৃহৎ সরোবর এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। বিজয়-স্তম্ভটি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুই শত হস্ত দূরে পূর্ব্বদিকে

(৪) সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা সন ১২১৫ সাল ৭১ পৃঃ ও Bengal Past and Present Vol XIV. Part 1. P. 113 footnote

অবস্থিত। স্তম্ভটি গোলাকৃতি, উচ্চে পাঁচ তল পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। নিম্ন তলের ব্যাস ৬০ ফুট; কিন্তু তাহা ক্রমশঃ সরু হইয়া সর্ব্বোচ্চে ১৫ ফুট দাঁড়াইয়াছে। বহির্ভাগে স্তম্ভের পৃষ্ঠনালী কুব্জাকার। দেওয়ালের অভ্যন্তর ভাগ কাচবৎ মসৃণ মিনা করা ছিল। স্তম্ভের মধ্যভাগ গোলাকার;

পাণ্ডুয়া মসজীদের অভ্যন্তরস্থ কুলুঙ্গী

সোপান-শ্রেণী ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে। প্রত্যেক তল সংলগ্ন একটী করিয়া দ্বার আছে—তাহা দিয়া স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে অপরিসর চাতালে যাওয়া যায়। চূড়া সমেত স্তম্ভটি ১২৫ ফুট উচ্চ ছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পে সর্ব্বোচ্চ অংশ চূড়া সমেত ভাঙ্গিয়া পড়ে। সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী ও পাণ্ডুয়া মসজীদ ও বিজয়-স্তম্ভের সংস্কারের জন্য আমি বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। হুগলীর তদানীন্তন সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট আমার পরম বন্ধু টমাস ইংলিস সাহেব (T. Inglis I.C.S.) আমার প্রস্তাব আন্তরিক ভাবে সমর্থন করেন। তাহার পর সেগুলি Ancient Monuments Preservation Act অনুযায়ী Protected Monuments তালিকাভুক্ত ও পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়-স্তম্ভের সংস্কার-কার্য্য শেষ হয়। প্রায় ২০ ফুট উচ্চ পঞ্চম তলাটি, গম্বুজ ও চূড়া পুনর্গঠিত করা হয়। সংস্কারান্তে স্তম্ভটি উচ্চতায় ১২৭ ফুট দাঁড়াইয়াছে। দেওয়ালগুলি নূতন, বালির কাজ করিয়া কলি ফেরান হইয়াছে। বহিঃ-প্রাচীরের রন্ধ্র পথগুলি পরিষ্কৃত এবং অভ্যন্তরের সোপান-শ্রেণী নবগঠিত হইয়া স্তম্ভ অধিরোহণ সহজ-সাধ্য হইয়াছে। সংস্কারের পূর্ব্বে স্তম্ভের অভ্যন্তর ভাগ বাদুড়ের আরাম-স্থান হইয়াছিল। ক্ষুদ্র গবাক্ষের স্বল্পালোকে সোপানের গভীর অন্ধকার নাশ করিতে পারিত না। অন্ধকারে ভগ্ন সোপান দিয়া একরূপ হামাগুড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হইত। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এক মেলার সময় ভগ্ন সোপান দিয়া বহু লোক উঠা নামা করিতেছিল। একটি লোক উপর হইতে পদস্খলিত হইয়া কয়েকজন লোকের উপর পড়ে; তাহারাও পদস্খলিত হয়। এইরূপে সেদিন লোকের চাপে স্তম্ভের অভ্যন্তরে ৭০ জন লোক মানবলীলা সম্বরণ করে। এই স্তম্ভে কোনও খোদিত লিপি সংযুক্ত নাই। ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা কে ছিলেন—তিনি কবে কি উদ্দেশ্যে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, স্তম্ভচূড়া হইতে ইসলামধর্ম্ম বিশ্বাসীগণকে প্রার্থনায় আহ্বান জন্য ইহা মুয়াজিম্-স্তম্ভ। কেহ বলেন, পাণ্ডুয়ার হিন্দুরাজাকে পরাভূত

করিয়া সেনাপতি সাহ সুফী উদ্দীন স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ এই বিজয়-স্তম্ভ গঠন করেন। আবার হিন্দুরা কহেন যে, স্তম্ভটি দেব-মন্দির ছিল—হিন্দু রাজা নির্ম্মাণ করেন। তিনি সূর্য্যোপাসক ছিলেন। তিনি মন্দির-চূড়া হইতে বাল-সূর্য্য দর্শন ও তাহার উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিতেন। আবার কেহ বলেন, তাঁহার একমাত্র কন্যা প্রত্যহ প্রত্যূষে গঙ্গা দর্শনের অভিলাষ করায়, সেই উদ্দেশ্যে মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। জাত ময়দানের যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া সাহ সুফী সেই মন্দির-চূড়ার উপর তুর্কীর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বিজয়-কেতন উড্ডীন করেন। তদবধি উহা বিজয়-স্তম্ভ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এখনও সাধারণ লোকে উহাকে "পেঁড়োর মন্দির" বলিয়া থাকে। "পেঁড়ো" পাণ্ডুয়ার অপভ্রংশ। ভারতের নানা স্থানে এইরূপ স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়ের ফিরোজা মিনারও পাঁচতল। তাহার নিম্নের ব্যাস ২০ ফুট এবং উচ্চতায় ৯০ ফুট। পুরাতন মালদহের অপর দিকে মহানন্দা নদীর পশ্চিমে মিনা-সরাইয়ে এইরূপ একটী স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ আছে। তাহার নিম্নের ব্যাস ও উচ্চতা উপরিউক্ত স্তম্ভের মত। দিল্লীর কুতব্ মিনারের নিম্নের ব্যাস ৪৭½ ফুট এবং উচ্চতা স্তম্ভের অগ্রভাগ বাদ দিয়া ২৩৮ ফুট।

এই স্তম্ভ হইতে ১৭৫ ফুট পশ্চিমে দ্বাবিংশতি দ্বার-সংযুক্ত "বাইশ দরজা-ওয়ালী মসজিদ" নামে এক মসজীদের ভগ্নাবশেষ আছে। মসজীদটি লম্বাকৃতি; অভ্যন্তর-ভাগের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম। ছাদ এখন পড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেকগুলি অনুচ্চ গম্বুজ ছিল। ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও ৬০টী গম্বুজ ছিল। ২২টী করিয়া দুই সারি ৬ ফুট উচ্চ স্তম্ভোপরি খিলানের উপর ছাদ ছিল। স্তম্ভগুলি দৃঢ় কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরে নির্ম্মিত। তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক আদর্শে গঠিত। মসজীদ-প্রাচীর এবং খিলানগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈষৎ লোহিত বর্ণের ইষ্টকে গ্রথিত। পশ্চিমদিকে ভিতরের-প্রাচীর গাত্রে অনেকগুলি বিচিত্র খর্ব্বাকার কুলুঙ্গী আছে। কুলুঙ্গীগুলিতে চারিস্তর খিলান আছে। খিলানগুলির নিম্নদেশ হীরক নক্সার আদর্শে ঝাপরি বুননের মত জালের কাজের উপর একটী করিয়া প্রস্ফুটিত কৃত্রিম গোলাপে সুচারু রূপে শোভিত। মসজীদের উত্তর-পশ্চিম কোণে দৃঢ়-গাঁথনী উচ্চ বেদী আছে। বেদীটি দেখিলে মনে হয়, যেন এই বেদীর উপর হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি বিরাজ করিত। বেদীর উপরিভাগে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। কথিত আছে, সাহ সুফী ইহা "চিল্লা খানা" বা চল্লিশ দিবস নির্জ্জন তপস্যার স্থান রূপে ব্যবহার করিতেন। কতকগুলি দৃঢ় কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত অসম্পূর্ণ লম্বা স্তম্ভ মসজীদের নিকট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত
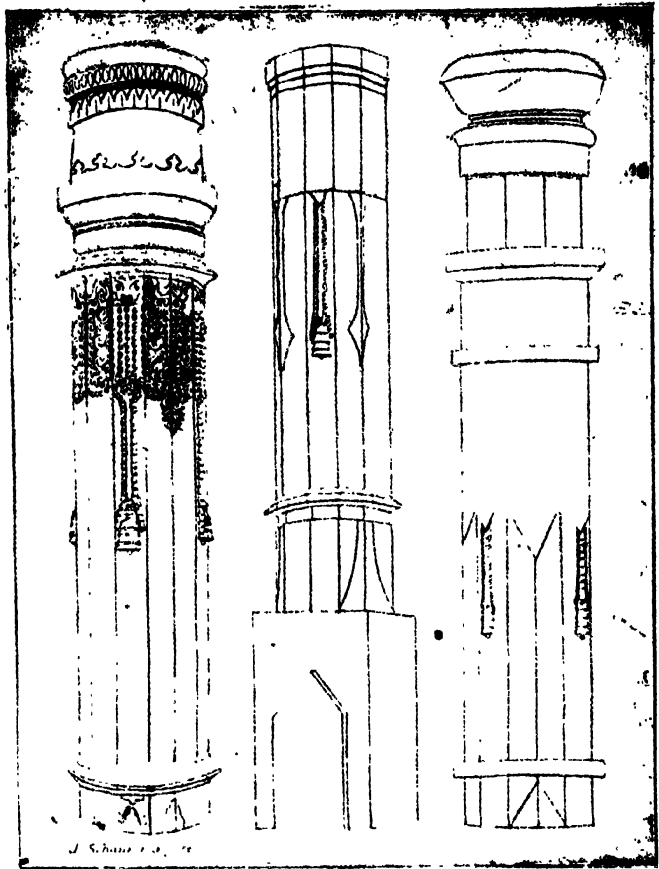
পাণ্ডুয়া মসজীদে বৌদ্ধ ঘণ্টা সংযুক্ত কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ।

রহিয়াছে। কৃষ্ণ প্রস্তরগুলি সম্ভবতঃ গো-যানে রাজমহল পর্ব্বত হইতে আনীত হইয়াছিল। পূর্ত্ত বিভাগ ধ্বংসাবশেষের স্থানগুলি পরিষ্কৃত করিয়াছেন; কিন্তু মসজীদ-সংস্কারের ব্যবস্থা এখনও করেন নাই। এই সুবৃহৎ মসজীদ-সংস্কার বহু অর্থ-সাপেক্ষ। সম্ভবতঃ অর্থ-কৃচ্ছ্রতার জন্য গবর্ণমেণ্ট এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই।

পাণ্ডুয়ার-বিজয় স্তম্ভের দক্ষিণে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের অপর দিকে সাহ সুফী উদ্দীনের আস্তানা বা সমাধি-স্থান আছে। আস্তানাটি মুসলমানেরা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সুসংস্কৃত অবস্থায় রাখিয়াছে। এই আস্তানা সংক্রান্ত কোনও শিলালিপি নাই। ইহার সন্নিকটে মধ্যে মধ্যে মেলা

পাণ্ডুয়া মিনার

বসিয়া থাকে। সে সময় বহু লোক সমবেত হয় এবং অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় অনেকে মানসিক পূজা দিয়া থাকে।

এই সমাধির পশ্চিমে "কেঠরিয়া মসজীদ" বা "মতী মসজীদ" নামে আর একটী মসজীদের ভগ্নস্তূপ আছে। ভগ্নস্তূপ হইতে হিন্দুদের মন্দিরের নিদর্শনসমূহ বাহির হইয়া পড়িয়া আছে। এখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, হিন্দুদের মন্দিরের মাল-মশলা লইয়াই এই মসজীদটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাচীর-গাত্র কতক হিন্দু ও কতক মুসলমান আদর্শে সুশোভিত। মসজীদের অভ্যন্তরে একখানি কৃষ্ণ প্রস্তরের উপর খোদিত লিপি আছে; তাহা বড় টোগরা অক্ষরে আরব ভাষায় অঙ্কিত। তাহাতে কোরান হইতে মহম্মদের আশীর্ব্বচন "আয়াতুন কুর্শি" বা সিংহাসন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ৮৮২ হিজরায় ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে উসুফ শাহের রাজত্বকালে এই মসজীদটি নির্ম্মিত হয়। সাহ সুফীর আস্তানায় তিনখানি প্রস্তরখণ্ডের উপর খোদিত লিপি আছে। তাহা টোগরা অক্ষরে লিখিত থাকিলেও, ইহার বহু পূর্ব্বের অঙ্কিত ত্রিবেণীর শিলালিপির সহিত ইহার পার্থক্য দেখা যায়। ইহাতে আকবরের সময়ের নাস্তালিক অক্ষরের মত অনেকগুলি গোল রেখার বাহুল্য আছে। একখানি শিলালিপিতে প্রকাশ, ১২৭৬

পেঁড়োর মন্দির

হিজরা বা ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে লালকুমার নাথ নামক জনৈক হিন্দু মসজীদটি সংস্কার করিয়া দেন। ইহাতে অনুমিত হয়, দরগাটি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। মতী মসজীদের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে সাহ সুফীর কুস্তী-শিক্ষক পালোয়ান মাকমদুম নূরের সমাধি আছে। আর দক্ষিণদিকে "হুজরা" বা সাহ সুফীর নির্জ্জন আশ্রম ছিল; তাহার চিহ্ন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আস্তানায় রক্ষিত একখানি শিলালিপি লইয়া বড় গোল হইয়াছে। কাহারও মতে সেখানি কৌরিয়া বা মতী মসজীদ সংক্রান্ত; আবার

কেহ-কেহ তাহা "বাইশ দরজা" বড় মসজীদ সংক্রান্ত বলিয়া দ্বন্দ্ব বাধাইয়াছেন। শেষোক্ত মতাবলম্বী লেখক এই শিলা-লিপি হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বড় মসজীদটী ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। বিজয়-স্তম্ভও তাহার সম-সাময়িক অনুমান করিয়া তিনি, পাণ্ডুয়া-বিজয় ঐ সময় হইয়াছিল, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। শিলালিপিতে লিখিত আছে—(ভাবার্থ) সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর বলিয়াছেন—মসজীদ সকল প্রকৃতই ঈশ্বরের। অতএব তোমরা ঈশ্বরের সহিত অন্য কাহাকেও আহ্বান করিবে না এবং তিনি (মহম্মদ) বলিয়াছেন (যাঁহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক) যিনি পৃথিবীতে একটা মসজীদ নির্ম্মাণ করিবেন, ঈশ্বর পরলোকে তাঁহার জন্য সত্তরটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিবেন। ৮৮২ হিজরার প্রথমে মহরম মাসের চতুর্থ দিবসে (বুধবারে) সুলতান মামুদ শাহের পৌত্র, সুলতান বারবক শাহের পুত্র, প্রতি-শোধকারীর বলে বলীয়ান্ সাক্ষ্য ও প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের খালিফা, ধর্ম্ম ও পৃথ্বীর সূর্য্য স্বরূপ বিজয়ী সুলতান সাম্সুদদ্দ ওয়াদ্দীন্ আবুল মোজাফার য়ুসুফ শাহের রাজত্ব-কালে (ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব স্থায়ী রাখুন) অসি ও লেখনীর অধিপতি, কালচক্র ও যুগান্তের পালাভি উলুগ্ মজ্লিস্ই আজাম্ (সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহাকে নিরাপদে রাখুন) কর্ত্তৃক এই বৃহৎ এবং ধন্য মজলিস্ উল মজলিস্ মসজীদ নির্ম্মিত হয়।"

পাণ্ডুয়া মসজীদের অভ্যন্তর

উপরিউক্ত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, সুলতান য়ুসুফ্ শাহের সামরিক অধ্যক্ষ এবং নাগরিক শাসনকর্ত্তা উলুগ্ মজ্লিস্ই আজাম এই মসজীদটি নির্ম্মাণ করেন। য়ুসুফ্ বিদ্বান ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি গৌড়ে দুইটি সুন্দর মসজীদ নির্ম্মাণ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। য়ুসুফ্ সাহ ৮৭৯ হইতে ৮৮৬ হিজরা বা ১৪৭৪—১৪৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাত বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার পিতা রুকুনদ্দীন বারবক শাহ ৮৬৪—৮৭৯ হিজরা বা ১৪৫৯—১৪৭৪ খৃষ্টাব্দ ও তাঁহার পিতামহ নাসিরুদ্দীন আবুল মোজাফার মামুদ শাহ ৮৪৬—৮৬৪ হিজরা বা ১৪৪২—১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। উপরিউক্ত মসজীদ নির্ম্মাণের সময় ৮৮২ হিজরা বা ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দ। সে সময় দিল্লীর সম্রাট ছিলেন লোদী বংশের বালোল লোদী।

কুতুব মহল্লায় মিরপুরে (গভরপুর) কুতুব সাহিব মস-জীদ নামে আর একটী মসজীদ আছে। পারস্য ভাষায় অঙ্কিত একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ১১৪০ হিজরাতে (১৭২৭-২৮ খৃষ্টাব্দ) সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজ-ত্বের নবম বর্ষে ফতে খাঁ সুর নামক পাঠান কর্ত্তৃক এই মসজীদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুতুব শাহের নামে কুতুব মহল্লার নামকরণ হইয়াছে। মসজীদের সম্মুখ ভাগে কুতুব শাহ এবং তাঁহার বন্ধু গুমা মিয়া সমাহিত আছেন। তাহা এখন জঙ্গলাবৃত। কুতুব সাহিব ও মেদিনীপুরনিবাসী দেওয়ান রাজী বা চন্দন সাহিদ ভাগলপুরের মৌলানা সাহ বাজ বা বলন্দ পারওয়াজের শিষ্য ছিলেন। এই মসজীদের শিলালিপিতে লিখিত আছে—

"পরদুঃখকাতর এবং দয়ালু ঈশ্বরের নাম গ্রহণ কর। ঈশ্বর ভিন্ন আর কোনও দেবতা নাই। মহম্মদ ঈশ্বরের দূত

পাণ্ডুয়া কোঁড়িয়া বা মঠী মসজিদের শিলালিপি—১৪৭৭ খৃঃ
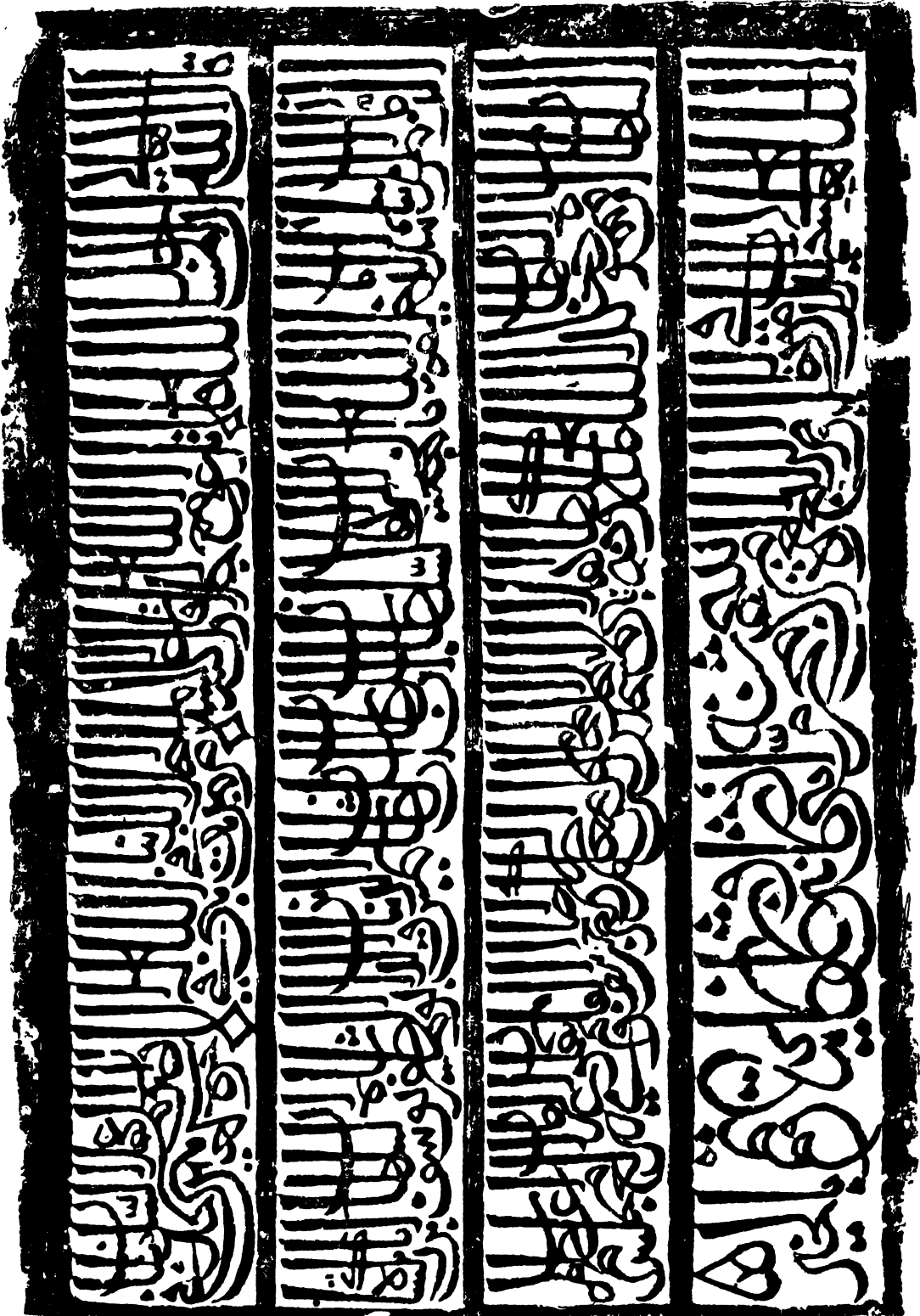
"মহম্মদ সাহ গাজীর রাজত্বকালে যাঁহার সৈন্য ঈশ্বরের সহায়তা লাভ করে ও আশীর্ব্বাদ ভাজন

সুজা আফগানের পুত্র সুর উপাধি বিশিষ্ট ফাত্ খাঁ ঈশ্বরের সাহায্যে যিনি পরিচালিত হইয়াছিলেন

পাণ্ডুয়াতে এমন সুন্দর মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার পবিত্রতায় সূর্য্য ও তেজোময় হইয়াছিল

পাত সাহী জুলুসের নবম বর্ষে এই রম্য গৃহ জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছিল

আজাদ বলিয়াছেন হিজরী পঞ্জিকা মতে কি সুন্দর তারিখ দ্বিতীয় কাবার ন্যায় কি মনোহর মসজীদ নির্ম্মিত হইয়াছে।"

সাহ সুফীকে কেহ সাহ সুফী সুলতান· কেহ মির সাফী, আবার কেহ সাফী উদ্দীন—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। কেহ বলেন, সাহ সুফী বিজয়ী সেনার সহিত ধর্ম্মগুরু রূপে আসিয়াছিলেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষ অপর কোনও ব্যক্তি ছিলেন।

সাহ সুফীর সমাধির দক্ষিণে "রৌজা পুকুর" নামক পুষ্করিণী এবং পীরের নামে উৎসর্গীকৃত "পীর পুকুর" নামে একটী সুন্দর সরোবর আছে। শেষোক্তটি ৪০ ফুট গভীর। ইহাতে দুইটি বড় কুম্ভীর ছিল; তাহাদিগকে "আলে খাঁ ফতে খাঁ" বলিয়া ডাকিবামাত্র পুষ্করিণীর পাড়ে আসিয়া

জাফর খাঁ গাজীর ত্রিবেণী মস্‌জীদ—১২৯৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত

উপস্থিত হইত। এখন একটী কুম্ভীর আছে। আস্তানার ফকীর "কাফের খাঁ মিয়া" বা কেবল "মিয়া" বলিয়া ডাকিলে জল হইতে উঠিয়া আসে। মানসিক পূজা দিবার জন্য নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানগণ এখানে মুরগী বলি দিয়া থাকে।

খাদিমেরা সাহ সুফীর আস্তানার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। বর্দ্ধমান জেলার চৌঘরিয়ার মোল্লা সাহেবেরা বড় মসজীদের মাতোয়ালী। সেই মোল্লা বংশের মোল্লা হামিদ উল্লা খাঁ বাহাদুর বঙ্গদেশে কাজী উল্ কর্জ্জতের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঠাগারে বহু আরব্য ভাষার হস্তলিখিত পুস্তক সংগৃহীত ছিল।

পাণ্ডুয়া বিজয়-স্তম্ভে একটী লৌহ-দণ্ড রক্ষিত হইয়াছে। প্রবাদ, সেই লৌহ-দণ্ডটি সাহ সুফী যষ্ঠী রূপে ভ্রমণকালে ব্যবহার করিতেন।

পাণ্ডুয়ার পূর্ব্ব গৌরব লোপ পাইলেও, ইহা এখনও একটী বৰ্দ্ধিষ্ণু পল্লীগ্রাম। ইহা হুগলীর সন্নিকট কেওটা হইতে ১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সাবেক বাদসাহী রাস্তা বর্ত্তমান গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান

রেলওয়ের পাণ্ডুয়ায় একটী ষ্টেশন আছে। এখানে একটী থানা, ইউনিয়ান কমিটি, ডাকঘর, সব্ রেজিষ্টারী আফিস ও রেল ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে পূর্ত্ত বিভাগের একটী বাংলা আছে। হুগলী জেলার মধ্যে এখানে সুন্নী মুসলমানগণের আধিক্য দেখা যায়। এখানে মুসলমান অধিবাসিগণের মধ্যে আশরফ্ বা সম্ভ্রান্ত বংশের অনেক ঘর আয়মাদার আছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মুসলমান রাজত্বকালে রাজ-কার্য্যে কৃতিত্বের জন্য বহু নিষ্কর ভূমি আয়মা স্বরূপ পাইয়াছিলেন। পাণ্ডুয়া-বিজয়ের পর সৈনিক বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীরা পাণ্ডুয়ায় বাস করেন। এই আশরফ্ বংশ তাঁহাদেরই বংশধর। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম আমলে বিচার-আচারের জন্য প্রধানতঃ ইহাদের মধ্য হইতে কাজী নিযুক্ত করা হইত। প্রধান কাজীর পদ (কাজী অল্ কজ্জৎ) একটী বংশে একচেটিয়া ছিল। বংশ-পরম্পরায় তাঁহাদিগকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইত। এই বংশের শেষ প্রধান কাজী ছিলেন—কাজী মহম্মদ মোজাহার। ইঁহাদের মধ্য হইতে মুফ্‌তি, সদর আমিন আলাও নিযুক্ত করা হইত। এখানে ১লা মাঘ ও ১লা বৈশাখ দুইটি বড় মেলা হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত মেলার দিন অন্যূন দশ সহস্র লোক সমবেত হয়; তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান। বহু পূর্ব্বে দামোদর নদ পাণ্ডুয়ার প্রান্তদেশ বিধৌত করিত এবং অনতি দূরে গঙ্গার সহিত যুক্ত ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ নদীর গতি পশ্চিমে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে—এখন তাহার যে খাদ আছে, তাহা কশাই নদী নামে পরিচিত। তাহাও মৃত নদীর সামিল হইয়াছে। পাণ্ডুয়া রাজধানীর চতুর্দ্দিকে পাঁচ মাইল পরিধি লইয়া পরিখা ও প্রাচীর ছিল। তাহার চিহ্ন এখন প্রায় লুপ্ত হইয়াছে—৬০ বৎসর পূর্ব্বের মানচিত্রেও তাহা অঙ্কিত ছিল। পূর্ব্বে এখানে বহু লোকের বাস ছিল। কিন্তু কাল ম্যালেরিয়ায় ইহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এখানে "বর্দ্ধমান জ্বর" বা ম্যালেরিয়ার প্রথম আবির্ভাব হয়। দশ বৎসরের মধ্যে স্থানটি উৎসন্ন যায়। ৬২৬১ জন অধিবাসীর মধ্যে ৫২২২ জন লোক এই জ্বরাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। প্রাচীন সপ্তগ্রামের ন্যায় এখানেও কাগজ প্রস্তুত হইত। উনবিংশ শতাব্দীতেও অন্যান্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটরা হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁহাদের ব্যবহারার্থ পাণ্ডুয়ার কাগজ সরবরাহ করিবার জন্য প্রায়ই লিখিতেন। হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ হুগলীর কাষ্টমস্ কালেকটরের নিকট হইতে (Customs Collector of Hooghly) তাঁহার আবশ্যক কাগজ আমদানী করিবার জন্য বিনামূল্যে পাশ চাহিতেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি গবর্ণমেণ্টকে লেখেন যে, এই কাগজ সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যে সুলভ ও গুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। য়ুরোপ হইতে কলে প্রস্তুত কাগজের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুয়ার কাগজের ব্যবসায় লুপ্ত হইয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম আমলে পাণ্ডুয়া ডাকাতির জন্য দুর্নাম লাভ করিয়াছিল। এখানকার ডাকাত নির্ম্মূল করিবার জন্য বিশেষ সুদক্ষ পুলিশ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল।

পাণ্ডুয়া হইতে দুই ক্রোশ দূরে মহানাদ গ্রামে ব্রহ্মময়ী ও শিব মন্দির আছে। শিব চতুর্দ্দশীর দিন এখানে জাৎ বা মেলা হইয়া থাকে। এখানে ইউনাইটেড্ ফ্রীচার্চ্চ মিশনের একটী বিদ্যালয় ও ক্ষুদ্র দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। মহানাদে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের একটী ষ্টেশন আছে। পাণ্ডুয়ার যুদ্ধে মীর কাজীমল সাহিব যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করেন। মহানাদে তাঁহার সমাধি-স্তম্ভ আছে। এখানকার জীবন কুণ্ড বা বশিষ্ঠ গঙ্গার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—এখনও সেই পুষ্করিণীটি বিদ্যমান আছে। এখান হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত চারি ক্রোশ ধরিয়া একটী উচ্চ বাঁধ আছে। তাহা "জামাই জাঙ্গাল" নামে পরিচিত। কথিত আছে, এখানকার রাজপুত্রের বিবাহ হইয়াছিল ত্রিবেণীর রাজকন্যার সহিত। জলাভূমি দিয়া শ্বশুরবাড়ী যাইতে কষ্ট হইত বলিয়া জামাতা ত্রিবেণী যাইতে নারাজ হন। শ্বশুর জামাতার মনস্তুষ্টির জন্য এই বাঁধটি নির্ম্মাণ করেন। তদবধি ইহা "জামাই জাঙ্গাল" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

পাণ্ডুয়ার উত্তর-পশ্চিমে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে বৈঁচী গ্রাম অবস্থিত। সেখানেও ই, আই, রেলওয়ের একটী ষ্টেশন আছে। বৈঁচীতে স্থানীয় জমীদার ও ব্যবসাদার স্বর্গীয় বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য দেড় লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে তাঁহার বিধবা পত্নীর মৃত্যুর পর তাঁহার ত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তি দেশ-হিতকর কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে আসিয়াছে। তাঁহার বসত-বাটীতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ও পূর্ব্বের স্কুল-বাটীতে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার বসত-বাটীর সীমানার মধ্যে দুইটি দেব মন্দির আছে। তন্মধ্যে একটী ১৬০৪ শকাব্দে (১৬৮২—৮৩ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বৈঁচী ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামে অনেক ডাকাইতের বাস ছিল।

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীরেবা দেবী

অল্প বয়সেই কমলা বাপ-মার স্নেহে বঞ্চিতা। পিসিমার কাছেই সে মানুষ। পিসিমা থাক্‌তেন শিলংএ; আর সে পড়ত কলকাতার এক নামজাদা কলেজে। তাকে ঠিক সুন্দরী বলা যায় না; তবে তার মধ্যে কি একটা ভাব ছিল, যার জন্য সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট হ'ত। তাকে অনেকে বিয়ে কর্‌তে চায়; কিন্তু বিয়ের চেয়ে তার লেখা-পড়াতেই ঝোঁক ছিল বেশী। পিসিমা কমলাকে বিবাহ সম্বন্ধে দু' একবার উপদেশ দেবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তাতে বেশী কিছু ফললাভ হয়নি।

এক দিন সে অচেনা হাতের একখানা চিঠি পেলে। লেখিকা তার সহপাঠিনী নীহারের মা। অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি স্থির করেছেন যে, গরীব পিতৃ-মাতৃহীন কমলাকে তিনি পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করতে রাজি আছেন। কমলা কিন্তু প্রত্যুত্তরে জানালে যে, সে তাঁর পুত্রবধূর ন্যায় লোভনীয় পদ গ্রহণে রাজি নয়। পিসিমা এই খবরে একটু চিন্তিতা হ'লেন। নীহারের মা যেমন তেমন লোক নহেন,—ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী। আবার শোনা যায়, তিনি না কি জমিদারের কন্যা। কমলার ব্যবহারে রাগ করে যদি তিনি কোন অনিষ্ট করে বসেন, এই ভেবে, পিসিমা এই সম্বন্ধে অনেক বুঝিয়ে কমলাকে একখানা চিঠি দিলেন। চিঠি পেয়ে কমলা হেসেই অস্থির।

ছুটিতে কমলা গেল তার পিসিমার কাছে। অনেক দিন পরে মেয়ে বাড়ী এল—পিসিমা তাকে আদরে-আদরে ভরিয়ে দিলেন। কলেজের খাটুনির পর এই আরামের দিনগুলি কমলার বেশ ভালই লাগ্‌ছিল। তার গলাটা বেশ মিষ্টি ছিল; আর সে বাজাতও ভাল, তাই প্রায়ই বন্ধু মহলে তার ডাক পড়ত। এক দিন একটা পার্টিতে সে কার যেন চোখের আকর্ষণ অনুভব কর্‌লে। ফিরে দেখে, একযোড়া চোখ তারই দিকে চেয়ে আছে। তার পর ভিড়ে সে কোথায় হারিয়ে গেল। বাড়ী ফেরবার সময় তার সঙ্গে পরিচয় হ'ল,—নির্ম্মলচন্দ্র রায় এখানকারই এক বড় ডাক্তার।

নির্ম্মলের সঙ্গে আরও দু' একবার দেখা হ'ল; কিন্তু ভাল করে চেন্‌বার আগেই কমলার ছুটি ফুরিয়ে গেল। কলেজে ফেরবার শেষের ক'দিন কমলা বড়-একটা বাড়ী থেকে বেরুত না। এ ক'টা দিন সে পিসিমার কাছে-কাছেই থাক্‌তে ভালবাস্‌ত।

ফেরবার দিন ষ্টেশনে কমলা একখানা চিঠি পেলে। নির্ম্মল তার পাণিপ্রার্থী। হঠাৎ কোন্ দেবতার মায়া-মন্ত্রে তার জীবনের গতি একেবারে উল্টে গেল। সে যে কেমন করে নির্ম্মলের বাগ্‌-দত্তা পত্নী হ'ল, তা সে নিজেও ঠিক করে বুঝ্‌তে পার্‌লে না। জোর করে সে বল্‌তে পারে নি যে, সে নির্ম্মলকে ভালবাসে, তবুও দিন সুখেই কাট্‌তে লাগ্‌ল। কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়ে সে বাড়ী ফিরে এল।

বিয়ের যখন সব ঠিক, তখন হঠাৎ একটা বিশেষ কাজে নির্ম্মলকে কোল্‌কাতা যেতে হ'ল। কিছু দিন পরে কমলা নির্ম্মলের একখানা চিঠি পেলে। তার মর্ম্ম এই যে, নির্ম্মল তার ভুল বুঝেছে,—সে তাকে ভালবাসে না। অতএব এ বিবাহ না হওয়া উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর। চিঠি পেয়ে কমলা প্রথম বুঝলে যে, সে বরাবরই নির্ম্মলকে ভালবাসে—তা না হ'লে এত ব্যথা পেলে কেন?

অতীতের স্মৃতিগুলি ভোলবার জন্য কমলা নিজেকে ডুবিয়ে দিলে কাযের মধ্যে। অন্যের জন্য নিজেকে দান করে সে ধন্য হ'ল। একজন অযোগ্যের নিষ্ঠুরতায় তার ফুলের মত শুভ্র জীবনটিতে যে কালো ছায়া পড়েছিল, ছোট ছোট বালিকাদিগের নির্ম্মল ভালবাসায় তা' আস্তে আস্তে সরে গেল। প্রথম মনে হয়েছিল, জীবনের এ শূন্যতা, এ দৈন্য, কখনও ঘুচ্‌বে না; কিন্তু ধীরে ধীরে অন্যের সুখ-দুঃখকে আপন করে নিয়ে, নিজের বেদনা অনেকটা সয়ে গেল।

ইতিমধ্যে নীহারের ভাই হেম স্বয়ং একবার চেষ্টা করে দেখ্‌লে, যদি কমলাকে বধূ রূপে পাওয়া যায়। সে কমলাকে তার অনেক দুঃখ জানালে, অনেক বোঝালে; কিন্তু সেও যে মার মত অকৃতকার্য্য হ'ল, তা বলাই বাহুল্য।

কমলা একজনকে তার সর্ব্বস্ব দিয়েছে,—আজ সে রিক্তা। স্নেহ-মমতা সে বহু লোককে দুই হাতে বিতরণ করেছে,—কিন্তু ভালবাসা? কোন স্ত্রীলোক কি একবারের বেশী দু'বার ভালবাস্‌তে পারে? হোক না সে অযোগ্য; এম্‌নি ভাবে কমলার দিনগুলি কাট্‌তে লাগ্‌ল।

ছুটিতে কমলা ফের পিসিমার কাছেই গেল। সেখানে এক দিন নির্ম্মলের সঙ্গে দেখা হ'ল। এই সাক্ষাৎটাকেই সে সবচেয়ে ভয় করত। ঐ কারণেই সে প্রথম থেকে শিলংএ আস্তে চায় নি। এবার কিন্তু পিসিমার বিশেষ অনুরোধ ঠেল্‌তে না পেরে অনেক দিন পরে শিলংএ এসেছিল। পিসিমা কমলার মনের অবস্থা জান্‌তেন; তাই তার হাতে সংসার ছেড়ে দিয়েছিলেন। কমলা সেই নিয়েই ভুলে থাকত। প্রতি সন্ধ্যায় সে পাইন-বনের মধ্যে বেড়াতে যেত। স্থানটি অতি নির্জ্জন। আগেকার মত আর সে লোকের বাড়ী যায় না। সে বেশ বুঝ্‌ত যে, তাকে নিয়ে অনেক হাসি-ঠাট্টা চল্‌ছে। সে তার প্রতিবাদ করতে অসমর্থ,—তাই নীরবে সব সহ্য করত। সে যে সময় বাড়ী থেকে বেরুত. সে সময় প্রায় কারু সঙ্গে তার দেখা হ'ত না। কি জানি, কেমন করে নির্ম্মল তার লুকান স্থান খুঁজে পেয়েছে। কারু মুখে কথা নেই—কমলা প্রাণপণে আপনাকে সংযত কর্‌লে। নির্ম্মলের মুখ মড়ার মত শাদা,—চেহারা দেখলে মনে হয়, বিছানার সঙ্গে সম্পর্ক অনেক দিন ঘুচে গিয়েছে। অনেকক্ষণ পরে সে বল্লে—"ক্ষমা কর কমলা।"

পাইনের গন্ধমাখা ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে তার স্বর মিলিয়ে গেল। কমলা অবিচলিত ভাবে উত্তর দিলে—"ক্ষমা কর্‌বার তো কিছু নেই। আপনি তো ঠিক কাযই করেছেন। যেখানে ভালবাসা নেই, সেখানে বিবাহ করা পাপ। আপনি যে বিবাহের পূর্ব্বে আমাকে জানিয়েছিলেন, তার জন্য ধন্যবাদ।"

"কমলা, তুমি এই চিঠিটা পড়,—দেখ, যদি কিছু বুঝ্‌তে পার।"

কমলা চিঠি পড়্‌তে লাগ্‌ল। চিঠি হেমের লেখা।

"ভাই নির্ম্মল, আমি অপরাধী। সব শুনে যদি ক্ষমা করতে পার, তো আমার পরম সৌভাগ্য। আমি কমলাকে বিয়ে কর্‌তে চাই; কিন্তু সে আমার প্রস্তাবে নিজেকে অপমানিত মনে করে। অহঙ্কারে ঘা পড়লে মনের অবস্থা কেমন হয়, বুঝ্‌তেই পাচ্ছ! সেই দিন হ'তে ঠিক কর্‌লাম. যদি আমি তাকে না পাই, তবে তাকে আর কারও হতে দেব না। ৪ঠা মাঘ মনে আছে? সেই দিন তোমার সকল সুখ ও শান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট করে দিই। কমলার যে ছবি তোমাকে দেখিয়েছিলাম, সেটা কমলার উপহার নয়। এক দিন বোটানিক্সে বেড়াতে যাই। সেখানে একদল মেয়েকে দেখি। তার মধ্যে কমলাও ছিল। এক সময় তাকে দল-ছাড়া হয়ে একলা একরাশ পদ্মফুলের মাঝে দেখ্‌তে পেলুম। লোভ সাম্‌লাতে পারলাম না। কোডাকটা বের করে ছবি তুলে নিলাম। কমলাকে আমি সত্যই ভালবাস্‌তাম, এখনও বাসি। তবে এ ভালবাসায় স্বার্থ নাই। সুরমা এই লক্ষ্মীছাড়ার জীবনের ভার বইতে সম্মত হয়েছে। ভগবানের বিশেষ দয়া। কমলাকে লেখ্‌বার মত সাহস আমার নেই,—তুমি পার তো আমার জন্য মাপ চেও। ইতি,—হেম।"

"কমলা, আমাকে মাপ করতে পার্‌বে?"

"হেমবাবুকে মার্জ্জনা করা সহজ—কিন্তু তোমাকে—?"

"আমি জানি কমলা, তোমার প্রতি অন্যায় করেছি,—তোমাকে অবিশ্বাস করে, তোমার অপমান করেছি। আমি তোমার ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু তুমি তো নির্দ্দয় নও,—এবারের মত ক্ষমা কর।"

"যে আমাকে এতটা অবিশ্বাস করতে পারে, তাকে ক্ষমা করা অসম্ভব।"

"অপরাধ স্বীকার কর্‌লেও?" "হাঁ।"

"আমার এ অন্যায়টাকে কি কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌বে না?" "না।"

"কমলা, তোমার অহঙ্কারটা একবারের জন্য ভুলে গিয়ে আমাকে ক্ষমা কর।"

"সে হয় না। আমি তবে আসি, কাজ আছে।"

"তোমাকে ধরে রাখ্‌বার অধিকার আমার নেই। তবে মনে রেখ, একজনের ব্যর্থ জীবনের জন্য তুমি দায়ী। আর যদি কখনও ভগবানের চরণে অপরাধ কর, তবে সাহস করে ক্ষমা চাইতে যেও না। তুমি আর এখানে থেকে বৃথা সময় নষ্ট কর না,—যাও, বাড়ী যাও। যেখানে ভালবাসা নেই, সেখানে ক্ষমার আশা করা আমার ভুল হয়েছে।"

কমলা চুপ করে রইল,—কোন জবাব দিলে না।

ভগ্ন স্বরে নির্ম্মল বলে উঠ্‌লো—"সত্যি বল্‌ছি কমলা, আমি জান্‌তাম্ না—তুমি এত কঠিন, এত নিষ্ঠুর—"

কমলার উঁচু মাথা নুয়ে পড়ল। মুখ থেকে বের হ'ল কেবল একটি শব্দ—"নির্ম্মল!"

"কিছু বলবার আছে?"

"হাঁ।"

"বল।"

"তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ।"

"কি রকম?"

"আমি নিষ্ঠুর নই!"

"অপরাধীর প্রতি দয়া না করা যদি নিষ্ঠুরতা না হয়, তবে তুমি নিষ্ঠুর নও।"

"আর একটা ভুল শোধ্‌রাতে চাই।"

"কি?"

"ভালবাসি!"

"কমলা!"

জ্যোতির্বিজ্ঞান

শ্রীঅমিয়া বসু

আমাদের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে একটী নীলাকৃতি গোলাকার গম্বুজ দেখিতে পাই। এই নীলাকৃতি নভোমণ্ডল প্রতি অন্ধকার রাত্রিতে অসংখ্য জ্যোতিঃ-বিন্দু-চিহ্নিত দেখা যায়। এইগুলিকে নক্ষত্র আখ্যা দেওয়া হয়। এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে আবার নানা প্রকার শ্রেণী বিভাগ আছে; ইহার মধ্যে কতকগুলিকে গ্রহ বলা হয়।

এই সকল গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব, অবস্থিতি-স্থান প্রভৃতি জানিতে হইলে, আমাদিগকে অঙ্কশাস্ত্রের কতকগুলি পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। এ নিমিত্ত কতকগুলি বৃত্ত কল্পনা করিয়া লইতে হয়। এই বৃত্তগুলির কৌণিক মাপ জানিতে পারিলেই, নক্ষত্র ও গ্রহের অবস্থিতি-স্থান জানা যায়।

যে বৃত্তগুলি কোন একটী গোলাকার গম্বুজের মধ্য-বিন্দু পথে গমন করে, তাহাদিগকে বৃহৎ বৃত্ত ও যেগুলি মধ্য-বিন্দু পথে গমন করে না, তাহাদিগকে ক্ষুদ্র বৃত্ত বলা হয়।

কোন একটী সমতল ভূমিতে দাঁড়াইলে মনে হয় যেন, উপরের আকাশ, নিম্নকার মৃত্তিকার সহিত ধীরে ধীরে একটী গোল বৃত্তাকারে মিশিয়া গিয়াছে। এই গোলাকার রেখাটীকে চক্রবাল কিম্বা দিঙ্‌মণ্ডল বলা হয়। এই পরিদৃশ্যমান দিঙ্‌মণ্ডলকে আবার দৃশ্য-দিঙ্‌মণ্ডলও বলে। এই দিঙ্‌মণ্ডল স্থানভেদে বিভিন্ন প্রকার; অর্থাৎ ইহা দর্শকের অবস্থিতি-স্থানের পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

প্রতি অন্ধকার এবং পরিষ্কার রাত্রিতে আমরা যে তারকাবৃন্দ দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই স্থির নক্ষত্র। তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক অবস্থিতি-স্থানের বিশেষ কোন ব্যতিক্রম হয় না। অর্থাৎ দু'টী নক্ষত্র দর্শকের দৃষ্টিক্ষেত্রে যে কোণ প্রদান করে, তাহা সামান্য পরিবর্ত্তন ভিন্ন সর্ব্বদাই সমান থাকে। এই সামান্য পরিবর্ত্তনও আবার বহু বৎসর ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে তবে বুঝিতে পারা যায়। এই সকল স্থির নক্ষত্রের কতকগুলি পূর্ব্ব গগনে উদিত হয়, ও পশ্চিম গগনে অস্ত যায়, এবং পর দিন সন্ধ্যাকালে আবার পূর্ব্ব গগনে উদিত হয়। এই ভাবে

একটী সম্পূর্ণ বৃত্ত ভ্রমণ করিতে এই সকল নক্ষত্রের ঠিক ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড সময় লাগে।

আবার কতকগুলি নক্ষত্রের কক্ষপথ কখনও দৃষ্টিপথের বাহিরে যায় না। ইহারাও একটী বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া পরিভ্রমণ করে, এবং ঠিক ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে সম্পূর্ণ বৃত্ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এই বিন্দুটীকে ধ্রুব এবং নক্ষত্রবৃন্দকে ধ্রুবকেন্দ্রীয় নক্ষত্র বলা হয়।

এই সকল গ্রহ-তারকার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত একটী দূরবীণ রাখা হয়। ইহার মুখটী ইচ্ছামত ঘুরান ফিরান যায়। এই দূরবীণের সহিত একটী ঘড়ির কাঁটা সংযুক্ত থাকে। এই কাঁটাটী ধ্রুব বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ধ্রুব-কেন্দ্রীয় কোন একটী নক্ষত্রের সহিত সমতালে রাখিয়া চালিত করিয়া দিলে, দূরবীণের মুখটীও সেই নক্ষত্রের সহিত চলিয়া থাকে, এবং ঐ নক্ষত্রটী কখনও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয় না। এই ঘড়ির কাঁটাটী নক্ষত্রের সহিত সমভাবে চলিয়া ঠিক ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে, সম্পূর্ণ বৃত্ত রচনা করে।

যদি আমরা দূরবীণ দ্বারা দিবাভাগে নক্ষত্র এবং সূর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করি, তাহা হইলে, উভয়ের গতির কোন সাদৃশ্য আছে কি না বুঝিতে পারি। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়, উহাদের গতির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। বস্তুতঃ সূর্য্যও স্থির নক্ষত্রের ন্যায় পূর্ব্বগগনে উদিত হয়, পশ্চিম গগনে অস্ত যায়, এবং পর দিন পুনরায় পূর্ব্বগগনে উদিত হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সূর্য্য ঠিক ২৪ ঘণ্টায় একটী বৃত্ত পর্য্যটন করে, কিন্তু স্থির-নক্ষত্র ঠিক ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড সময়ে বৃত্ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, সূর্য্য স্থির-নক্ষত্র অপেক্ষা ৪ মিনিট অধিক সময়ে পর্য্যটন শেষ করে।

যদি কোন একটী দেয়ালের প্রান্তভাগে সূর্য্যের প্রান্ত পৌছিলে, সে সময়টি দেখিয়া লওয়া হয়, এবং পর দিবস ঠিক ঐ স্থানে সূর্য্য পৌছিতে কত সময় লাগে তাহাও দেখা হয়, তবে দেখা যায় যে, ঠিক ২৪ ঘণ্টা সময়ে উহা ঠিক পূর্ব্বস্থানে আসিয়াছে। এই পরীক্ষাটী কোন একটী স্থির-নক্ষত্রের উপর প্রয়োগ করিলে দেখা যাইবে যে, উহা ঠিক ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড সময়ে পূর্ব্ব স্থানে আসিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে, স্থির নক্ষত্রের সহিত তুলনায় সূর্য্যের অবস্থিতি-স্থান প্রতি দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সূর্য্য প্রতিদিন পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে অতি মন্থর গতিতে স্থান পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রতি দিন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গমন করিবার সময় সূর্য্য স্থির-নক্ষত্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।

যদি আমরা দিবাভাগে দূরবীণ ব্যতিরেকে নক্ষত্র দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে স্থির-নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য্যের এই মন্থর গতি দেখিতে পাইতাম। সূর্য্য প্রতি দিন স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে স্থির-নক্ষত্র সমূহের মধ্যে ঠিক পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসে। এই সময়কে বৎসর বলা হইয়া থাকে।

আরও অন্য উপায়েও সূর্য্যের এই মন্থর গতির প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে। যদি সন্ধ্যাকালে পশ্চিমগগনস্থ কতকগুলি স্থির-নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তবে দেখা-যাইবে, ঐ নক্ষত্র-পুঞ্জ সূর্য্য অস্ত যাইবার অনেকক্ষণ পরে অস্ত যাইবে। এইরূপে উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস পর্য্যবেক্ষণ চালাইলে দেখা যাইবে, সূর্য্যের অস্ত যাইবার সময় অপেক্ষা ঐ তারকা-পুঞ্জের অস্ত যাইবার সময় ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। পরিশেষে দেখা যাইবে, উহারা সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বেই অস্ত যাইতেছে, এবং সন্ধ্যা রাত্রে আর উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

যদি সে সময় প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্বগগনে নেত্রপাত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, ঐ নক্ষত্র-বৃন্দ সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বেই উদিত হইয়াছে।

এইরূপে যদি ৩৬৫ দিন উপর্য্যুপরি পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, স্থির নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য্যের অবস্থিতি স্থান ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় হইয়াছে, এবং বর্ণিত তারকা-বৃন্দ ঠিক পূর্ব্বস্থানে—সন্ধ্যারাত্রিতে দেখা যাইতেছে। তাহা হইলে আমরা সূর্য্যের দুইটী গতি দেখিতে পাই:—(১) সৌরজগতস্থ প্রতি জ্যোতিষ্কের ন্যায়, প্রতি দিন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সূর্য্যের আহ্নিক-গতি। (২) স্থির-নক্ষত্রসমূহ মধ্যে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে সূর্য্যের বার্ষিক গতি।

পুরাকালীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ এই সকল স্থির-

নক্ষত্রকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহাদিগকে রাশি কহে। সূর্য্য প্রতি মাসে যথাক্রমে এক এক রাশি সম্ভোগ করিয়া থাকে। ইহাদের নাম—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

চন্দ্রকেও আমরা পূর্ব্বে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতে দেখিতে পাই। ইহা ভিন্ন স্থির নক্ষত্রের মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রেরও পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে একটী গতি আছে। এই গতি সূর্য্যের বার্ষিক গতি অপেক্ষা অনেক দ্রুত। চন্দ্র সূর্য্য এবং পৃথিবীর সম্পর্কে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বীয় কক্ষপথ ভ্রমণ করিয়া থাকে। এই সময় মাস নামে কথিত হয়।

হিন্দুজ্যোতিষ শাস্ত্রমতে চন্দ্র ২৭টী নক্ষত্রভোগ করিয়া থাকে। ইহাদিগের নাম যথাক্রমে—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, আর্দ্রা, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, ইহার কতকগুলি নক্ষত্রের মাস হইতে আমাদের মাসের নামকরণ হইয়াছে।

স্থির-নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে সূর্য্যের পরিদৃশ্যমান বার্ষিক কক্ষকে ক্রান্তি-বৃত্ত বা গ্রহণ-কক্ষ বলা হয়। এই সূর্য্য কক্ষ একটী বৃহৎ বৃত্ত দ্বারা ব্যক্ত করা যায়। যদি, চন্দ্র স্বীয় মাসিক কক্ষপথ পরিভ্রমণ করিবার কালে, কোন অমাবস্যা, কিম্বা পূর্ণিমা তিথিতে, এই গ্রহণ-কক্ষ অতিক্রম করে, তবে গ্রহণ হইয়া থাকে। অমাবস্যার সময় সূর্য্যগ্রহণ, এবং পূর্ণিমার সময় চন্দ্র গ্রহণ হয়;—এই কারণে ক্রান্তি-বৃত্তের অন্যতম নাম গ্রহণ-কক্ষ।

ক্রান্তি-বৃত্ত খগোলিক বিষুব রেখা হইতে ২৩° ডিগ্রি, ২৮ সেকেণ্ড দূরে তির্য্যকভাবে অবস্থান করে। ইহাকে সূর্য্য-কক্ষের বা ক্রান্তি-বৃত্তের সহিত বিষুব রেখার তির্য্যক মাপ বলে। এই দুইটী বৃহৎ বৃত্ত পরস্পরকে দুইটী বিন্দুতে অতিক্রম করে। এই দুইটী বিন্দুকে বিষ্ণুপদ ও হরিপদ আখ্যা দেওয়া হয়। এই দুই স্থানে আসিয়া সূর্য্যের আহ্নিকগতি-কক্ষ বিষুব রেখার সহিত প্রায় মিলিত হয়। এই স্থানে আসিয়া সূর্য্য ঠিক পূর্ব্বে উদিত হয় এবং ঠিক পশ্চিমে অস্ত যায়;—এবং উহার আহ্নিকগতি-কক্ষের অর্দ্ধভাগ দিঙ্‌মণ্ডলের উপরে এবং অপরার্দ্ধ দিঙ্‌মণ্ডলের নিম্নে অবস্থান করে। সুতরাং এই সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিবারাত্রি সমান হয়। এই সময়কে সায়ন বলে। যখন সূর্য্য বিষ্ণুপদে, (ইংরাজী ২১শে মার্চ্চ) আসিয়া উপনীত হয়, তখন যে সায়ন হয়, উহাকে বাসন্তী সায়ন, এবং যখন হরিপদে (ইংরাজী ২৩শে সেপ্টেম্বর) আসিয়া উপনীত হয়, তখনকার সায়নকে শারদীয় সায়ন বলে।

প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ, পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বাহির করিয়াছিলেন যে, চন্দ্র এবং গ্রহগণ কখনও ক্রান্তি বৃত্ত অপেক্ষা অধিক দূরে গমন করে না। তাঁহারা এই নিমিত্ত ক্রান্তি-বৃত্তের উভয় পার্শ্বে ৮০ ডিগ্রি ব্যাপিয়া একটী বৃত্ত কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। এই বৃত্তের মধ্যেই চন্দ্র, গ্রহ-সমষ্টি, এবং সূর্য্যকে দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহারা এই চক্রকে পূর্ব্ব-বর্ণিত রাশিবর্গের অবস্থিতি স্থান বলিয়া রাশিচক্র নামে অভিহিত করিতেন।

যদি আকাশস্থ কোন জ্যোতিষ্ক হইতে একটী লম্ব বৃত্তাংশ দিঙ্‌মণ্ডলের উপর অঙ্কিত করা হয়, তাহা হইলে এই বৃত্তাংশের কৌণিক মাপকে ঐ জ্যোতিষ্কের উচ্চতা বলা হয়। এই বৃত্তাংশের পাদদেশ হইতে ধ্রুবপ্রোত বৃত্তের মধ্যবর্ত্তী দিঙ্‌মণ্ডলীকে আশাংশ বলা হয়। কোন একটী জ্যোতিষ্কের অবস্থিতি স্থান নির্ণয় করিতে হইলে, সেই জ্যোতিষ্কের উচ্চতা এবং আশাংশ জানিলেই উহা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু দিঙ্‌মণ্ডল পৃথিবীর আহ্নিক গতির নিমিত্ত সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু ধ্রুবপ্রোতবৃত্ত এবং দিঙ্‌মণ্ডল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার; সুতরাং উচ্চতা এবং আশাংশ কোন একটী জ্যোতিষ্কের অবস্থিতি-স্থান, কোন এক বিশেষ সময়ে এবং বিশেষ স্থানে, মাত্র নির্ণয় করিতে সক্ষম হয়।

এই নিমিত্ত কোন নক্ষত্রের অবস্থিতি-স্থান নির্ণয় করিতে হইলে দিঙ্‌মণ্ডলের পরিবর্ত্তে বিষুব রেখাকে গ্রহণ করা হয়। এই ভাবে যে মাপ লওয়া হয়, তাহা দর্শকের স্থান এবং কালের উপর নির্ভর করে না, এবং বহুকাল পরে পরিবর্ত্তিত হয়। কোন একটী জ্যোতিষ্ক হইতে বিষুব রেখার উপর যে কৌণিক মাপ লওয়া হয় উহাকে ক্রান্তি বলে। ঐ কৌণিক মাপ লইতে হইলে

যে লম্ব বৃত্ত অঙ্কিত করা হয়, ঐ বৃত্তাংশের পাদদেশ হইতে বিষ্ণুপদ পর্য্যন্ত যে বৃত্তাংশ বিষুব রেখার উপর থাকে, উহাকে নিরক্ষোদয় বলা হয়।

ইহা ভিন্ন আরও একটী মাপ লওয়া হয়। তাহা খগৌলিক বিক্ষেপ, এবং খগৌলিক ধ্রুবক। কোন একটী জ্যোতিষ্ক হইতে ক্রান্তিবৃত্তের উপর যে কৌণিক মাপ লওয়া হয়, তাহাকে বিক্ষেপ বলে। ঐ বিক্ষেপ মাপিবার জন্য যে লম্ব বৃত্তাংশ অঙ্কিত করা হয়, ঐ বৃত্তাংশের পাদদেশ হইতে বিষ্ণুপদ পর্য্যন্ত যে ক্রান্তিবৃত্তের অংশ থাকে, তাহাকে ধ্রুবক বলে।

এই খগৌলিক বিক্ষেপ এবং ধ্রুবকের সহিত ভূগৌলিক বিক্ষেপ এবং ধ্রুবকের কোন সাদৃশ্য নাই।

ক্রান্তি এবং বিক্ষেপ ০° ডিগ্রি হইতে ৯০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত কমে বাড়ে। এদিকে নিরক্ষোদয় এবং ধ্রুবক ০° হইতে ৩৬০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত কমে বাড়ে।

বিষুব রেখার ধ্রুব বিন্দু দিয়া যে বৃহৎ বৃত্ত গমন করে, তাহাকে ক্রান্তিসূত্র বলে; কারণ, এই বৃত্তের উপরই ক্রান্তি মাপ লওয়া হয়। ধ্রুবপ্রোত বৃত্তের সহিত ক্রান্তি সূত্র যে কোণ প্রস্তুত করে, তাহাকে সময় কোণ বলা যায়; কারণ, এই কোণ জানা থাকিলে নক্ষত্রের গতির সময় নিরূপণ করা যায়। আমরা জানি যে কোন একটী নক্ষত্র ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে ৩৬০° ডিগ্রি গমন করে; সুতরাং এই সময় সময়-কোণ জানা থাকিলে, ঐ নক্ষত্র কখন ধ্রুব-প্রোত-বৃত্ত অতিক্রম করিবে, কিম্বা শেষ কোন সময়ে উহা অতিক্রম করিয়াছে, তাহা গণনা করিয়া বলা যায়।

যখন সূর্য্য বিষ্ণুপদ সায়নে অবস্থিতি করে, তখন উহার ক্রান্তি—শূন্য ডিগ্রি। তৎপরে উহার ক্রান্তি ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে, এবং মধ্য-গ্রীষ্মে, প্রায় ২১ শে জুন উহা সর্ব্বোচ্চ ক্রান্তিস্থানে উপনীত হয়। সেই সময় উহার ক্রান্তি—২৩° ডিগ্রি ২৮ মিনিট। এই সময়কে নিদাঘ স্থিতি বলা হয়; কারণ, এই সময় সূর্য্য কিছু দিনের জন্য স্থির থাকে বলিয়া বোধ হয়। তৎপরে সূর্য্যের ক্রান্তি আবার কমিতে থাকে, এবং প্রায় ২৩ শে সেপ্টেম্বর হরিপদ সায়নে পৌছিয়া শূন্য ডিগ্রি হয়।

ইহার পর সূর্য্যের ক্রান্তি আবার বাড়িতে থাকে, এবং মধ্য-শীতে, প্রায় ২১ শে ডিসেম্বর উহা আবার ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট হয়—ইহাকে শৈত্য স্থিতি বলা হয়।

বলা বাহুল্য, সূর্য্য ক্রান্তি-বৃত্তের উপর থাকে বলিয়া, উহার বিক্ষেপ সর্ব্বদাই শূন্য ডিগ্রি থাকে।

যদি বিষুব রেখা হইতে ২৩° ডিগ্রি ২৮ মিনিট দূরে উহার সহিত সমান্তরাল ভাবে দুইটী বৃত্ত অঙ্কিত করা হয়, তাহা হইলে এই দুইটী বৃত্ত সূর্য্যের আহ্নিক-গতি-কক্ষের সহিত ২১শে জুন এবং ২১শে ডিসেম্বর প্রায় মিশিয়া যাইবে। ইহাদিগকে কর্কট মণ্ডল ও মকর মণ্ডল বলা যায়।

প্রেমতত্ত্ব

অধ্যাপক শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

আমরা এ সংসারে কেন যে আসিয়াছি, তাহা যথার্থ ভাবে কেহই বলিতে পারি না। তবে এক রকমে যে জীবনটা কাটিয়া যায়, সে বিষয়ে সকলেই সাক্ষ্য দিবেন। হর্ষ ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ আমাদের প্রাণের উপর খেলা করিয়া যায়; তাহারা কেহই আমাদের জীবনের সঙ্গী নয়; অথচ চিরন্তনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। সমুদ্রের তরঙ্গরাশি যেমন সমুদ্রের অন্তঃস্থল নহে, সেইরূপ মনের ভাবগুলি যাহা উঠিতেছে ও পড়িতেছে, তাহাও আমাদের জীবন নহে। তবে আমাদের জীবন কোথায়? এ জগতে আমাদের অবলম্বন কি?

কবিরা বন্দনা লইয়া থাকিতে পারেন, দার্শনিকগণ বুদ্ধি-বিকাশের গৌরবে ডুবিয়া থাকিতে পারেন, ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা সহজেই ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারেন। যাঁহার যাহা বিশেষত্ব, তাহাই তাঁহার নিজ জীবনের কেন্দ্র হইতে পারে। কিন্তু সমস্ত জগতের মধ্যে সকল জীবের একটি সাধারণ বিশেষত্ব আছে; এবং তাহারই উপর জীবনী-শক্তি সর্ব্বদা নির্ভর করে। সে বিশেষত্বের পীঠস্থান হৃদয়। শরীর বা মনের যে কোন স্থানে আঘাত লাগুক, মানুষ বাঁচিতে পারে। কিন্তু মানুষ যদি হৃদয়ে আঘাত পায় বা হৃদয়ের কার্য্য যদি কোন

প্রকারে থামিয়া যায়, তাহা হইলে মানুষের জীবনী-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। যাহা মানুষের পক্ষে সত্য, তাহা সকল জীবের পক্ষেও সত্য। হৃদয় আমাদের সমগ্র জীবনের আধার।

হৃদয়ের মধ্যে যে সকল ভাবরাশি উঠে, তাহাই আমাদের জীবনের সকল কার্য্যের মূল। হিংসা, রাগ, অভিমান, ভালবাসা সকলই হৃদয়ের ভাবপুঞ্জের রূপান্তর মাত্র। এই ভাবগুলি হৃদয়কে ধ্বংস করিতে পারে, আবার গড়িতেও পারে। আমাদের মনে হয়, ভালবাসার মধ্যে জীবনের জয়-পরাজয়ের যতটা পরিচয় পাই, এতটা আর কোন হৃদয়-বৃত্তিতে পাই না। সেইজন্য আমরা মনোজগতে হৃদয়ের কার্য্য বলিতে ভালবাসার কথাই বলিয়া থাকি। মানুষের ভালবাসা বা প্রেম যত পূর্ণ হয়, তাহার জীবনও সেই ভাবে উচ্চতর স্তরে অগ্রসর হইয়া থাকে।

ভালবাসা কাহাকে লইয়া? আমাদের মনে হয়, ভালবাসার মধ্যে তিনজন আছেন—আমি, সংসার, ও আমার প্রেমাস্পদ। আমি ও আমার প্রেমাস্পদের মধ্যে দূরত্ব ও সান্নিধ্য বোধ থাকিত না, যদি মধ্যে সংসার না থাকিত। অতএব সংসার মিলন-বিরহের সৃষ্টি করে এবং সেই হিসাবে সংসারকে বাদ দিয়া কোন প্রেমিকজন প্রেমের প্রথম সোপানগুলিতে তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। যে সময় আমার ও আমার প্রেমাস্পদের মধ্যে ঘনিষ্টতর যোগ সম্পন্ন হয়, সে সময় সংসার আমাদের মধ্যে নাই বলিলে হয়। কিন্তু সচরাচর প্রেমের লীলা সংসার মধ্যে না থাকিলে সম্পূর্ণ হয় না।

এইবারে দেখা যা'ক্, আমার ও আমার প্রেমাস্পদের মধ্যে ভালবাসা কি ভাবে বৰ্দ্ধিত হইতে পারে। ভালবাসার বৃদ্ধির সম্বন্ধে আজ অবধি কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কিসে ভালবাসা বাড়ে, কিসে ভালবাসা কমে, আমরা তাহা জানি না। জানিলে পর-জীবনের ভার বলিয়া কোন জিনিস থাকিত না। আমরা যদি ইচ্ছা করিলেই ভালবাসিতে পারিতাম, আবার ইচ্ছা করিলেই না বাসিতে পারিতাম, তাহা হইলে ভালবাসাকে জীবন বলিতে পারিতাম না; ভালবাসা জীবনের একটা অঙ্গমাত্র হইয়া থাকিত। আমাদের প্রেম, যাহাকে আমরা জীবনের জীবন বলিয়া জানি, তাহা ভগবৎ-প্রেম-ধারার অংশ বলিয়া উপলব্ধ হয় কি না, তাহা পরে দেখা যাইবে। আপাততঃ এইটুকু জানিতে হইবে যে, যে দিন আমরা এ জগতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, সেই দিন হইতে আমাদের অন্তঃকরণে অলক্ষ্যে প্রেম প্রবাহ বহিতেছে ও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বহিবে। এবং মৃত্যুর পর যদি আমাদের বিনাশ না থাকে, তাহা হইলে আমাদের জীবনের মূল ধারাটুকু অর্থাৎ ভালবাসা থাকিবে কি না, তাহাও স্থিরভাবে ভাবিবার বিষয়।

মানবজীবনের প্রধান আনন্দ, আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি, ভালবাসায় চিরমগ্ন হওয়া। দেখা যা'ক, প্রেমের স্তরে স্তরে ইহা কি ভাবে সহজ হইয়া থাকে।

জীবনের প্রভাতে যখন আমার শরীর ও মন প্রথম অনুভব করিতে পারিয়াছি, তখন আমি সামান্য হইতে পারি, কিন্তু আমার প্রেম সামান্য নহে। সে নানা ভাবে নিজেকে ব্যক্ত করিতে চাহে। সে যে কল্পনা দ্বারা বা অপরের সঙ্কেত দ্বারা নিজ প্রেমাস্পদকে চিনিয়া লয়, তাহা সত্য নহে। আমার প্রেমাস্পদ যে আমার নিকটে আসিবার জন্য অনন্ত কাল ধরিয়া আমার কাছে ধরা দিতেছেন, এ বিশ্বাস প্রেমিকমাত্রেই করিয়া থাকেন। প্রেমের গুরু চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

"মাটির জনম ছিল না যখন
তখন করেছি চাষ;
দিবস রজনী ছিল না যখন
তখন গণেছি মাস।"

অতএব আমার ও আমার প্রেমাস্পদের মধ্যে সম্বন্ধ অনন্তকাল ছিল; তবে কি অনন্ত কাল থাকিবে না?

তবে সংসারের মধ্যে প্রেমাস্পদের পরিচয় আমরা ধীরে ধীরে পাইয়া থাকি। আমাদের প্রেমাস্পদ ক্রমশঃ আমাদের সমস্ত বিষয়ই অধিকার করিয়া ফেলেন; এবং সেই ভাবে আমাদের প্রেমও বাড়িয়া যায়। প্রেমাস্পদ ও প্রেমের এই প্রকার অনন্ত রূপ ধারণ মানব-জীবনের এক মহাসত্য।

সাধারণ ভাবে দেখা যা'ক্, ইহা কি ভাবে সাধিত হয়। প্রেমের ইতিহাসে দুইটি বিভাগ আছে; প্রথম অবস্থায় প্রেমাস্পদ আমার কেন্দ্র; উত্তরোত্তর অবস্থায় আমার প্রেমই আমার কেন্দ্র। প্রথম অবস্থায় যখন বহির্মুখীন

প্রেম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তখন প্রেমের কয়েকটি রূপ দেখিতে পাই—

(১) অধিকারের ইচ্ছা। ঐ যে সুন্দর ফুলটি উহা আমার হউক্। এই অবস্থায় পড়িয়া বোধ করি সেকালের নবাবগণ সুন্দর পুরুষ বা সুন্দরী রমণী দেখিলেই তাহাদের আপন প্রাসাদে দাসদাসী রূপে রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন।

(২) ফলের নিমিত্ত ভালবাসার প্রসারণ। পরীক্ষার্থী পাঠ্য পুস্তকগুলিকে যত্ন করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন, যতদিন না তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ হয়। তার পর অতীতের সামগ্রীর মধ্যে পুস্তকগুলি চিরদিনের জন্য অপসৃত হয়। প্রেমের এই স্তরে থাকিয়া অনেকে ভাবিয়া থাকেন, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"। ভার্য্যার সহিত যে আত্মিক যোগ আছে, সে কথা এ সময়ে মনে হয় না।

(৩) সাক্ষাতে এবং অসাক্ষাতে সকল অবস্থায় ভালবাসার টানে আত্মসমর্পণ করা। গরীব ছাত্র কবে কোন্ সময়ে একটি সত্যবাণী পাঠাগার হইতে সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবনে চিরদিনের সম্পদ হইয়া রহিল। প্রেমের এই স্তরে একজন ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন—

"To see her is to love her;
To love her is for ever.
For Nature made what she is,
And never made another."

এই অবস্থায় পৌঁছিতে গেলে প্রেমের স্বরূপ ও অনেক রকমে বদলাইয়া যায়। ওমর খাইয়ামের কবিতার অনুবাদে দেখিতে পাই, "Heart, my heart, if you free yourself from earth, you will become soul and scale the skies." অন্তর্মুখীন প্রেমের স্তরগুলি নির্দ্দেশ করিতে প্রেমিকজন প্রাণে বড় ব্যথা পা'ন। অনেকে বিশ্লেষণ করিতে চা'ন না। আমরা শুধু মহাপ্রভু চৈতন্যের সহিত রামানন্দ রায়ের কথোপকথনের প্রসঙ্গে যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহাই জানাইতে চাই। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। রামানন্দ রায় যখন বলিলেন, "প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্যসার" তাহার পর গুলি বিবৃত হইয়াছে:—

"প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর
রায় কহে, দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার।
প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর
রায় কহে, সখ্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার।
প্রভু কহে, এহোত্তম আগে কহ আর
রায় কহে, বাৎসল্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার।
প্রভু কহে, এহোত্তম আগে কহ আর
রায় কহে, কান্তভাব সর্ব্ব সাধ্যসার।
* * * *
প্রভু কহে, এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।
রায় কহে, ইহার আগে পুছে হেন জনে
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি।"

তবেই দেখা গেল, অন্তর্মুখীন প্রেমের এই পাঁচটি স্তর আছে,—দাস্যভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব, মধুরভাব ও রাধাভাব। মানুষ যতই উপরে উঠিতে থাকে, ততই ভাবগুলির সমন্বয় বাড়িতে থাকে। যিনি মধুরভাব সম্ভোগ করিয়াছেন তিনিই জানেন, পতি-পত্নীর প্রেমের মধ্যে দাস্যভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব ও মধুরভাব একীভূত হইয়াছে। তিনি আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথচ তাঁকে ভালবাসি—ইহাই হ'ল দাস্যভাব। তিনি ও আমি স্বইচ্ছায় এক ও পৃথক—ইহার মধ্যে সখ্যভাব বিরাজমান। তিনি আমার আপন এবং আমি তাঁকে ভালবাসি, ইহাই বাৎসল্যভাব। তিনি ও আমি দৈব ইচ্ছায় এক ও পৃথক—ইহাই মধুর ভাব। দৈব যেখানে ছাড়াছাড়ি করিতে পারে না, আমার ইচ্ছার যেখানে স্বস্তি হইয়া গিয়াছে, সেখানে তিনি ও আমি মিলেমিশে একাকার, দেশ, কাল বা নিমিত্ত সেখানে ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারে না—ইহাই হ'ল রাধাভাব। বাঙালীর প্রাণ প্রেমের গুরু গৌর নিতাইকে স্মরণ করিয়া এই ভাবে চিরদিনের জন্য আত্ম-বিক্রয় করিতে চায়। বৈষ্ণব ভক্তগণ এই ভাবগুলি ভগবৎ প্রেমের স্তর বলিয়া জানিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয়, এই বিভাগগুলি মানব-হৃদয়ের অভিব্যক্তির সোপান। ভক্তগণের মনে দুঃখ দিতে চাহি না, কিন্তু প্রেমের সম্বন্ধে সত্য বই মিথ্যা

কেমন করিয়া বলিব? আমাদের বিশ্বাস, ভগবৎ-প্রেম অন্তরে প্রগাঢ় ভাবে থাকুক বা না থাকুক, প্রেমের এই স্তরগুলি মানব-জীবনে চিরন্তন সত্য। তবে যদি কোন একটি ভাব (যথা বাৎসল্য ভাব) কেহ আত্মদান পূর্ব্বক উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাঁহার জন্য উত্তরোত্তর ভাবগুলির প্রয়োজন না হইতে পারে। নচেৎ এই স্তরগুলি ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই। ঈশ্বরে বিশ্বাস, সেও ত ঈশ্বরের করুণা,—তাহা তিনি দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন। কিন্তু সকল প্রাণীকে যখন হৃদয় দিয়াছেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে প্রেম দিয়াছেন। প্রেমের স্তরগুলি হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারা যাইতেছে। আমার প্রেমাস্পদ যখন আমার অন্তরে অসীম হইয়া গেলেন ও তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ রাধাভাবে পরিণত হইল, তখন প্রেমই কি জীবের প্রতি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া স্বীকার করিব না?

ভগবান্‌কে টানিয়া আনিয়া বিষয়টিকে জটিল করিয়া ফেলিলাম। যখন প্রেমের মধ্যে আমি ও আমার প্রেমাস্পদ চিরমগ্ন হইয়াছি, আর কিছুই যখন ভাল লাগে না, আর কিছুই যখন হৃদয় চাহে না, তখন ঈশ্বর কি পূজার আঙিনার বাহিরে রহিয়া গেলেন? তাঁর জন্য কি স্বতন্ত্র ভাবে আসন রচনা করিতে হইবে? এ প্রেম-মন্ত্রে কি তাঁর পূজা হইবে না? ধন্য সেই প্রেমিক-যুগল—যাঁহারা নিজেদের প্রেমের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম অনুভব করিয়াছেন—পরস্পরের চক্ষে ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন ও নিজেদের প্রাণের মধ্যে ভগবৎ-প্রেমের আস্বাদ লাভ করিয়াছেন। আমরা শুধু এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, এ অবস্থায় ধার্ম্মিক সাজিবার প্রয়োজন হয় না, চেষ্টা বা আয়োজনের ব্যর্থতা থাকে না। এখনকার মন্ত্র গীতার ভাষায়—

জানামি ধর্ম্মম্ ন চ মে প্রবৃত্তি জানাম্যধর্ম্মম্ ন চ মে নিবৃত্তি
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

" হৃষীকেশ যখন হৃদয়ে আসীন, তখন জাগতিক বা শাস্ত্র কথিত ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যাপারে আর অভিরুচি নাই। এক্ষণে প্রেম ধর্ম্ম, প্রেম কর্ম্ম, প্রেমই অনন্ত জীবন। আমাদের মনে হয়, এই প্রেম সাগরের কূলে দাঁড়াইয়া সাধু পল বলিয়াছিলেন "All things belong to me and I belong to Christ"—যেখানে যাহা কিছু আছে সকলই আমার এবং আমি খৃষ্টের। প্রেমিকগণও অহরহ আপন অন্তরে বলিয়া থাকেন, জগতের যাহা কিছু তাহা আমার পর নহে, কিন্তু আমি একান্তই আমার প্রেমাস্পদের। যাঁর প্রেমে, যাঁর কাছে আত্মদানে আমরা শুদ্ধ হই, তিনিই ত আমাদের খৃষ্ট, তিনিই ত আমাদের প্রেমাস্পদ।

তবেই দেখা গেল, প্রেমের সাহায্যে সংসার সরস হইল, প্রেমাস্পদ গৌরবান্বিত হইলেন, প্রেমিকের জীবন ধন্য হইল। কিন্তু যে প্রেম জীবনকে মধুময় করিল, তাহা কি জাগতিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? কিছুই ত সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিব না, তবে কি প্রেমও সঙ্গে যাইবে না? যাহা এ জীবনে ছাড়িয়া থাকিতে পারিলাম না, তাহা কি মরণে আমাকে ছাড়িয়া যাইবে? যাহা অনন্ত কাল ছিল, তাহা কি অনন্ত কাল থাকিবে না? যাহা জীবিত অবস্থায় আমাকে অনন্ত রূপ দেখাইল, তাহা কি মরণে আমাকে ক্ষুদ্র ও অসহায় রাখিয়া যাইবে?

এইখানে মানব-চিন্তা হার মানিয়া যায়। প্রেমকে প্রথম স্তরে হৃদয়-বৃত্তি বলিয়া জানিলাম। শেষে প্রেম আমাকে এই জগতেই মহাজীবন দান করিল। এইখানেই কি প্রেমের অন্ত? প্রেম যখন দেহের ও মনের সীমা অতিক্রম করিয়া একছত্র রাজা হইয়া বসিল, সে প্রেম কি আবার মৃত্যু সময়ে দেহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? অথবা মনের সহিত জড়িত হইয়া বিকৃত হইয়া যাইবে? বুদ্ধি, বিবেক প্রভৃতি খর্ব্ব হইতে পারে; কারণ, যাহার সম্পর্কে তাহারা পরিচিত সেই সংসারের দ্বন্দ্ব যদি মরণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে তাহারা সজীব ভাবে থাকিবে কিরূপে? কিন্তু যে প্রেম অন্তর্মুখীন হইয়াছে, যে প্রেম সংসারকে ছাড়াইয়া আত্মরূপ ধারণ করিতে সমর্থ, তাহার কি মৃত্যুর সহিত সমাপ্তি সম্ভব?

উপনিষদকার ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, প্রেমই আমাদের মৃত্যু হইতে অমৃতলোকে লইয়া যাইতে সমর্থ। এ কথা আমরা বিশ্বাস করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিব না কি? আমি যদি থাকি, আমার প্রেম যদি থাকে, তবে কি আমার প্রেমাস্পদ দূরে থাকিবেন?

প্রেম পূর্ণ হইবে, আমি পূর্ণ হইব, আমার প্রেমাস্পদ পূর্ণ হইবেন। অলক্ষ্যে সংসার ও ঈশ্বর যেমন মিলেমিশে পূর্ণ আছেন, তার চেয়েও গভীর ভাবে আমার কাছে পূর্ণ হবেন। আমার প্রেম আমাকে লোকলোকান্তরে ঘিরিয়া থাকিবে।

মুরলা *

অধ্যাপক শ্রীসত্যভূষণ সেন

পার্ব্বত্য উপত্যকায় ক্ষুদ্র নগর। তিন সপ্তাহ ধরিয়া নগর শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ। শত্রুপক্ষ এখনও নগর দখল করিয়া লয় নাই সত্য, কিন্তু নগর-সীমার চারি দিকে তাহাদের বেষ্টন ক্রমেই নিবিড়তর হইয়া আসিতেছে। রাত্রিতে মশালের দীপ্তিতে যখন শত্রুশিবির আলোকিত হইয়া উঠে, তখন সে দৃশ্য নাগরিকগণের মনে ভীতির সঞ্চার করে। শত্রুদলের সুপুষ্ট অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শ্রবণে এবং নিশ্চিন্ত শত্রুসেনার ইতস্ততঃ সঞ্চরণ দেখিয়া তাহাদের ঈর্ষা হয়। শত্রুশিবিরে হাস্যধ্বনি ও আমোদ উল্লাসের শত কলরব নাগরিকদের প্রাণে পীড়া জন্মায়। কাহারও আনন্দ-কলরব যে অপরের প্রাণে পীড়া জন্মাইতে পারে, ইহা অস্বাভাবিক ব্যাপার হইলেও, এক্ষেত্রে সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম সম্ভবপর হইয়াছে।

শিকারী যেমন শিকার নিশ্চিত আয়ত্তের মধ্যে জানিয়াও হঠাৎ তাহা হস্তগত করে না—কিছুকালের জন্য তাহার সাফল্যের আনন্দটা উপভোগ করিয়া লয়, এস্থানে শত্রুপক্ষের ব্যবহার অনেকটা তাহারই অনুরূপ। যে স্রোতস্বতী নগরে জল সরবরাহ করে, শত্রুসেনারা তাহাতে মৃতদেহ ভাসাইয়া দিল; নগরের চারিদিকে যে দ্রাক্ষার ক্ষেত শোভা পাইত, তাহারা তাহা জ্বালাইয়া দিল; সমস্ত শস্যক্ষেত্র পদদলিত করিয়া, নগর-সীমার চারিদিককার বৃক্ষসমূহ কাটিয়া ফেলিয়া, নগরটিকে রিক্ত উন্মুক্ত করিয়া দিল।

নগরবাসীদের বাহির হইতে কোন প্রকার সাহায্যের প্রত্যাশা ছিল না। নগর-সীমার ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়া তাহারা ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল,—তাহাদের মুখে আর হাসি দেখা যায় না। পুরুষেরা নগরের পথে পথে প্রহরা দেয়,—স্ত্রীলোকেরা ভগবানের নাম স্মরণ করে। ছেলেমেয়েরা হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায় সত্য, কিন্তু পিতামাতার মুখের দিকে চাহিয়া সহানুভূতির সাড়া পাওয়া যায় না। অদূরে পর্ব্বতশ্রেণীর বিরাট গাম্ভীর্য্য, মাথার উপরে চন্দ্রমার অস্ফুট আলো, আকাশে অগণিত নক্ষত্রের পাংশু দীপ্তি—সমস্ত প্রকৃতিই যেন নীরব।

নগরে কাহারও গৃহে প্রদীপ জ্বলে না। ঘন কুয়াসার আবরণে রাত্রির অন্ধকার যেন আরও গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। এই অন্ধকারের মধ্যে কাল পোষাকে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া একটি স্ত্রীলোক এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। রাস্তার লোকেরা দেখিলেই বলাবলি করিত—"এই না সেই?" "হাঁ, এ সে-ই।"

প্রহরীদের সঙ্গে দেখা হইলেই তাহারা স্ত্রীলোকটিকে শাসাইয়া দিত—"আবার তুমি বাহিরে এসেছ, মুরলা? খবরদার! বাহিরে এক মুহূর্ত্তও কেউ নিরাপদ নয়। কে কখন কার প্রাণ বিনাশ করে, কেউ তার খোঁজও পায় না।" কিন্তু মুরলা কাহারও কথার কোন প্রত্যুত্তর করিত না। সে যেরূপ নিঃশব্দে আসিয়া দেখা দিত, সেইরূপ নিঃশব্দেই চলিয়া যাইত। রাত্রির অন্ধকারে কাল-পোষাক-পরিহিত তাহাকে নগরের দুর্ভাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইত।

মুরলা ছিল এই নগরের একজন পুরাতন অধিবাসিনী, এবং এক সন্তানের জননী। তাহার চিন্তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল—তাহার পুত্র এবং তাহার জন্মভূমি। তাহার সৌম্য-কান্তি পুত্র এখন উল্লাসে উন্মত্ত এবং সে-ই শত্রুদলের নেতা হইয়া বর্ত্তমানে এই নগরের ধ্বংস-কার্য্যে ব্যাপৃত। বেশী দিন হয় নাই—যখন এই পুত্রই ছিল তাহার হৃদয়ের আনন্দ,—তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বর্ণ-সিংহাসন। এই নগরের প্রতি প্রস্তরখণ্ড, প্রত্যেক গৃহ-প্রাচীরের সহিত মুরলার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাহার পূর্ব্বপুরুষেরাই এই নগরের প্রাচীর তৈরী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার পিতৃ-পিতামহ এবং স্বর্গগত কত-শত আত্মীয়স্বজন এই বায়ু হইতেই নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। তাঁহাদের শেষ নিশ্বাস হয় ত এখনও এই বায়ুমণ্ডলে ঘুরিয়া

---

* রুষ ঔপন্যাসিক গোর্কী (Gorki) হইতে।

ফিরিতেছে,—তাঁহাদের দেহাবশেষও এই দেশের মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। এই দেশের কত কাহিনী, কত গাথা, তাহার দেশবাসীর কত আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রাণের সহিত জড়িত। এই জন্মভূমির প্রতি মুরলার মমতা এতই গভীর ছিল যে, সে মনে করিত, তাহার পুত্র যেন জন্মভূমির কল্যাণ সাধনের জন্য তাহারই সৃষ্ট একটি মঙ্গলময় শক্তি। এই পুত্রকে সে তাহার জন্মভূমির জন্য উৎসৃষ্ট মনে করিয়া মনে মনে গৌরব বোধ করিত। এখন সেই ত তাহার জন্মভূমি পড়িয়া রহিয়াছে—কিন্তু কোথায় তাহার পুত্র!

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মুরলা পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। যাহারা অপরিচিত, তাহারা ইহার সান্নিধ্য পরিহার করিয়া চলিত—অন্ধকারে ঐ কাল মূর্ত্তি দেখিয়া উহাকে মৃত্যুর অগ্রদূত বলিয়া মনে হইত।

নগরের এক প্রান্তে একটা পরিত্যক্ত স্থানে আসিয়া মুরলা দেখিল, আর একটি স্ত্রীলোক একটি মৃতদেহের পার্শ্বে নতজানু হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। মুরলা নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি তোমার স্বামী?" স্ত্রীলোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল "না,—আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে আজ তের দিন হইল। এটি আমার পুত্র।" মুহূর্ত্তকাল উভয়ে নীরব। পরে স্ত্রীলোকটি একবার ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া যেন ভগবানকে প্রত্যক্ষ জানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল—"ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক,—তুমি আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ গ্রহণ কর।" মুরলা চমকিয়া উঠিল, বলিল, "সে কি! তুমি কি মৃত্যুর হাতে সঁপে দেবার জন্যই পুত্র প্রসব করেছিলে?" স্ত্রীলোকটি শান্ত ভাবে জানাইল—"হউক না মৃত্যু,—এ মৃত্যু ত অর্থশূন্য উদ্দেশ্যবিহীন মৃত্যু নয়—সে যে তার দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে! অধুনা আমার পুত্র বিলাসিতায় এবং আমোদ প্রমোদে মেতে উঠেছিল। মানুষের জীবনে আমোদ প্রমোদের খুবই প্রয়োজন আছে; কিন্তু অত্যধিক চপলতার দরুণ স্থির বুদ্ধি এবং বিবেকানুবর্ত্তিতায় অনেক সময় শিথিলতা এসে পড়ে। আমার কেবলই আশঙ্কা হ'ত—পাছে আমার পুত্র এমন কোন কাজ ক'রে বসে, যাতে দেশের স্বার্থহানি হয়—যেমন মুরলার পুত্র ক'রেছে। দেশদ্রোহী কুলাঙ্গার! ধিক তার জীবনে,—ধিক তার মাতৃত্বে, যে এমন পুত্রের জন্ম দিয়েছে!"

মুরলা হঠাৎ অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

পর দিন মুরলা নগর-রক্ষকদের নিকট হাজির হইয়া বলিল—"আমার পুত্র দেশদ্রোহী হইয়া তোমাদের সহিত শত্রুতা সাধন করিতেছে। তোমরা হয় সেই অপরাধে আমাকে হত্যা কর, না হয় পথ উন্মুক্ত করিয়া দাও—আমি আমার পুত্রের নিকট চলিয়া যাই।"

"তোমার পুত্র চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তোমার দেশ আছে। এখন তোমার পুত্র যেমন আমাদের, তেমনই তোমারও শত্রুস্থানীয়।"

"কিন্তু আমি তাহার মা। তাহার শত অপরাধ হইলেও, আমিই সেজন্য অপরাধী।"

"তা হয় না,—তোমার পুত্রের পাপে তোমার হত্যা হইতে পারে না। আমরা জানি, সে কখনও তোমা হইতে এই পাপের প্রেরণা লাভ করে নাই। তোমার যে ইহাতে কত দুঃখ, তাহাও আমরা বুঝিতেছি। কিন্তু জান, তোমার পুত্র এখন আর তোমার ভাবনা ভাবিয়া নিজেকে ক্লিষ্ট করে না—সে হয় ত তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে। যদি তোমার কোন প্রকার শাস্তির প্রয়োজন থাকে মনে কর, তবে এই তোমার শাস্তি—তোমার পুত্র তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে। এই ত শাস্তি—মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।"

"হাঁ, মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।"

* * * *

নগর-দ্বার উন্মুক্ত হইল,—মুরলা বাহির হইয়া গেল। নগর-প্রাচীরের বাহিরে তাহারই দেশাধিবাসী কত বীর মৃত্যু-শয্যায় শায়িত—মুরলা তাহাদের উদ্দেশে প্রণাম করিল। ইহাদের শোণিতে ভূমি সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে,—তাহারই পুত্র স্বজাতির শোণিতে ধরণী কলঙ্কিত করিয়াছে। মুরলা চক্ষে অন্ধকার দেখিল। পথে কত প্রকার অস্ত্রশস্ত্রের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে,—দেখিয়া, মুরলার মাতৃ-হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—ধ্বংস কার্য্যে ত মাতৃ-হৃদয় সায় দিতে পারে না। অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়া, মুরলা দৃষ্টি ফিরাইয়া, একবার দেশের দিকে দেখিয়া লইল। অপর দিক হইতে শত্রুসেনারা তাহাকে দেখিতে পাইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাহার পরিচয় পাইলে, তাহারা সসম্ভ্রমে মুরলাকে তাহার পুত্র—তাহাদের নেতার নিকট লইয়া চলিল। তাহারা তাহাদের নেতার শৌর্য্য-বীর্য্যের ও কর্ম্ম-

কুশলতার অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিল। শত দুঃখেও মুরলার মাতৃ-হৃদয় পুত্র-গৌরবে আনন্দলাভ করিল। এই ত পুত্র শৌর্য্য-বীর্য্যের আধার,—সর্ব্বলোকের প্রশংসাভাজন, কিন্তু—

শত্রু-শিবিরে সুবা-সিং মহার্ঘ্য পরিচ্ছদে ভূষিত,—কটিতে তাহার মহামূল্য তরবারি—মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত। মুরলা তাহার মাতৃ-হৃদয়ে স্বপ্ন-দৃষ্টিতে তাহাকে যে অবস্থায় দেখিয়াছিল, এ যেন সেই মূর্ত্তি। পুত্রকে দেখিতে পাইয়া মুরলা যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইল; কারণ, এই পুত্র ত পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাহার স্নেহের অধিকার লাভ করিয়াছিল; এবং বর্ত্তমানে শত অপরাধ সত্ত্বেও তাহার জন্য মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহের ধারা ত এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

সুবা-সিং মাতৃ-পদে প্রণাম করিয়া বলিল—"মা, তুমি এসেছ? তুমি আমার অভিপ্রায় জান্তে পেরেই এসেছ নিশ্চয়। আমি এত দিন তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম—এইবার—কালই এই নগরটা অধিকার করে ফেলব।"

"কিন্তু বৎস, এই নগরই ত তোমার জন্মভূমি।"

"সমস্ত পৃথিবীই আমার জন্মভূমি। আমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি—পৃথিবীতে একটা কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। বর্ত্তমানে এই নগরটা আমার গতিপথে কণ্টকের মত হয়ে রয়েছে; এখন আমার প্রথম কাজ—এই নগরটা শেষ করে ফেলে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়া।"

"এই নগরের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড তোমার পরিচিত।"

"হউক পরিচিত। এখন প্রস্তরখণ্ডের পর্য্যন্ত সুখ-দুঃখ দেখ্‌তে গেলে আমার চল্‌বে না। প্রস্তরখণ্ডের প্রয়োজন হবে—যখন পুরাতন সমস্ত ভূমিসাৎ করে নূতন দুর্গ, নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হবে তখন,—তার পূর্ব্বে নয়।

"দেশের লোকগুলিও কি তোমার কেউ নয়?"

"হাঁ, মানুষে আমার প্রয়োজন আছে বই কি। মানুষ না থাক্‌লে আমার কীর্ত্তিগাথা গাইবে কে—আর তা শুনবেই বা কে।"

"কিন্তু কীর্ত্তিমান সে-ই, যে জগতের দিকে দিকে নব নব বিষয়ে সৃষ্টি ফুটাইয়া তোলে—ধ্বংস ত কীর্ত্তিমানের কর্ম্ম নয়।"

"কেন নয়? আকবর ও সাজাহানের নাম যেমন সবাই জানে,—তৈমুর, চেঙ্গিজখাঁর নামও তো ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে যায় নাই।"

"তৈমুর, চেঙ্গিজখাঁ ত নিজের দেশ ধ্বংস করে নাই।"

মাতা-পুত্রে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল,—পুত্রের জবাব শুনিয়া মাতার কথা বলিবার উৎসাহও ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। পুত্র-গৌরবে উন্নত মস্তক তাহার নত হইয়া আসিল।

মাতা সৃষ্টি-স্বরূপিণী, তিনি জননী,—তাঁহার নিকট প্রলয়ের কথা, ধ্বংসের কথা—তাঁহার জীবনের মূলে পর্য্যন্ত গিয়া আঘাত করে। কিন্তু পুত্র যৌবন-মদে মত্ত হইয়া এত কথা চিন্তা করিবার অবসর পায় না। যে হস্ত জগতের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত না হইয়া প্রলয় সাধনে অগ্রসর হয়, মাতার নিকট চিরদিনই তাহা ঘৃণ্য।

সুবা-সিং এসব কথা কোন দিন চিন্তা করিয়া দেখে নাই। এখন সে নিজ ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার চিন্তায়ই ব্যস্ত। সুবা-সিং জানিত না যে, মাতৃ-হৃদয় যে স্থলে সৃষ্টি-স্বরূপিণী জননী রূপে অভিব্যক্ত, তাহার সেই স্বাভাবিক ক্ষেত্রে বাধা পাইলে, মাতৃ-হৃদয়ও কিরূপ প্রলয়ঙ্করী হইয়া উঠিতে পারে।

মুরলা তাঁবুর ভিতরে বসিয়া ছিল। তাহার মস্তক অবনত, চক্ষে জ্যোতিঃ নাই, প্রাণে উৎসাহ নাই। তাঁবুর বাহিরে চাহিয়া দেখিল—অদূরে তাহার জন্মভূমি দেখা যাইতেছে। শুধু জন্মভূমি নয়—এই নগরেই নবীন যৌবনে সে তাহার প্রথম পুলক-স্পর্শ লাভ করে এবং যথা সময়ে তাহার প্রথম সন্তান সুবা-সিংএর জন্ম হয়। এই সেই সুবা-সিং! অস্তায়মান সূর্য্যের শেষ স্বর্ণ-রশ্মি নগরের সৌধ-চূড়ায়, গৃহে গৃহে, প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতি-ফলিত হইল,—জানালা-দরজার কাচের উপরে পড়িয়া সমস্ত রক্তরঞ্জিত করিয়া তুলিল; মনে হইল, যেন প্রকাণ্ড নগরটা আহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে,—আর তাহার আহত স্থানসমূহ হইতে শতধারে রক্তধারা ছুটিয়া বাহির হইতেছে। সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। অল্পক্ষণ যাইতে না যাইতেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। সমস্ত নগরটা একটা মৃতদেহের ন্যায় পড়িয়া রহিল। শবাধারের পার্শ্বে বাতির মত মাথার উপরে একটি একটি করিয়া নক্ষত্র

জ্বলিয়া উঠিল। মুরলা মানস-নয়নে দেখিতে পাইল যে, নগরের অধিবাসীরা গৃহে বাতি জ্বালিতে ভরসা পায় না,—সকলেই অন্ধকারে আনাগোনা করিতেছে,—তাহাদের গতি শিথিল, দৃষ্টি অবনত। নগরে যত কিছু তাহার পরিচিত, সকলই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—দাঁড়াইয়া যেন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। চির-পরিচিত নগর যেন কিসের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আজ তাহার সহিত অধিকতর আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িত। আজ মুরলার প্রাণে যেন বাৎসল্যের নব অনুরাগ জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যে, নগরের সকল অধিবাসীই যেন তাহার সন্তান—সে যেন এক দিনেই সকলের মাতৃস্থানীয়া হইয়া উঠিয়াছে।

পর্ব্বত-শিখর হইতে ধীরে ধীরে মেঘ নামিয়া আসিতেছিল। সুবা-সিং বলিয়া উঠিল—"রীতিমত অন্ধকার হ'লে, আজ রাত্রিতেই নগর আক্রমণ করব।" মুরলা বসিয়া ছিল, সুবা-সিং তাহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া ছিল। পুত্রের কথা শুনিয়া মুরলার মুখে হাসি দেখা দিল—কিন্তু এ হাসি ত হাসি নয়, এ যেন উদ্যত অশ্রু রুদ্ধ হওয়াতে বিকৃত হইয়া হাসি রূপে দেখা দিল।

মাতা পুত্রের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"এখন ও-সব কথা ছেড়ে দাও; এই শান্ত, মৌন সন্ধ্যায় একটু অন্য চিন্তা কর। একবার স্মরণ কর সেই শৈশবের কথা, যখন সকলের সঙ্গে একটা প্রীতির সম্বন্ধ ছিল, সকলে তোমায় কেমন ভালবাস্‌ত!"

"এখন আর অন্য চিন্তায় আমার মন যায় না। আমি কেবল ভাবি ভবিষ্যতে আমার যশ, মান, গৌরবের কথা।"

"একটা কাজ বাকী রয়েছে,—এখন ত তোমাকে বিয়ে করে সংসারী হ'তে হবে।"

"না মা, বিয়ে করা আমার হয়ে উঠবে না। আমি ভেবে দেখেছি, পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আমার মন কিছুতেই পোষ মান্‌বে না।"

"সে কি! তুমি কি সন্তান কামনা কর না?"

"সন্তান কিসের জন্য মা! আমার মত আবার কেউ এসে তাদের হত্যা করে যাবে—এই ত তার পরিণাম! তখন হয় ত হত্যার প্রতিশোধ নেবার মত সামর্থ্য আমার থাকবে না। অতএব, সন্তান শুধু দুঃখের কারণ হবে বই ত নয়।"

"দেখ, আকাশের বিদ্যুৎ দৃশ্যতঃ অতি চমৎকার, কিন্তু তার কোনরূপ সার্থকতা দেখা যায় না। তোমার জীবনেও ঐশ্বর্য্যের বিদ্যুৎ একদিন ঝল্‌সে উঠতে পারে, কিন্তু তথাপি জীবন তোমার ব্যর্থ ব'লেই গণ্য হবে।"

"হাঁ, ঠিক বলেছ মা, আমি আকাশের বিদ্যুৎ!"

মাতা-পুত্রে এইরূপ আলাপ চলিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সুবা-সিং ঘুমাইয়া পড়িল।

মুরলা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে নিজেকে প্রস্তুত করিয়াই আসিয়াছিল—এখন আর তাহার মনে কোন দ্বিধা রহিল না। মুরলা যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের নিকট দেশের কল্যাণ-সাধনই পরম ধর্ম্ম। প্রয়োজন হইলে স্নেহ, প্রেম সকলই তাহার নিকট বলিদান প্রাপ্ত হয়। মুরলা উঠিয়া একখানা কাল কাপড়ে সুবা-সিংএর সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিল, এবং একখানা তীক্ষ্ণধার ছোরা লইয়া পুত্রের হৃদয়ে আমূল বসাইয়া দিল। সুবা-সিংএর দেহ ঈষৎ কম্পিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবিয়োগ হইল—কারণ, মুরলা তাহার মা,—পুত্রের হৃৎস্পন্দনটুকু কোথায়, তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত।

সুবা-সিংএর রক্ষিগণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মুরলা তাহাদিগকে বলিল—"আমি ঐ নগরের একজন অধিবাসী—সেই হিসাবে জন্মভূমির প্রতি যথাসাধ্য আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি। আমি সুবা-সিংএর মাতা—সেই হিসাবে আমি আমার পুত্রের নিকটেই থাকিব। আর একটি সন্তানের জন্ম দেবার মত বয়স আমার নাই,—কাজেই দেখিতেছি, আমার জীবনটা বৃথাই গেল—আমার দ্বারা দেশের কোন কাজ হইল না।" এই বলিয়া একবার জন্মভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুত্রের রক্তরঞ্জিত সেই ছোরাখানা নিজের বক্ষস্থলে বসাইয়া দিল।

শিবির-কাহিনী

কর্পোরাল শ্রীমাখনলাল সমাদ্দার

পূজোর ছুটীর দিন কয়েক আগে শুনলাম যে, আমাদের নভেম্বর মাসে Campএ যেতে হ'বে। ছুটীতে হাতুয়া বেড়াতে গেলাম, বাবার সঙ্গে সেখানকার দশহরা দেখ্‌তে। সেখানে এক দিন খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুর বেলায় শুয়ে শুয়ে রাজুদার সঙ্গে (প্রাইভেট রাজেন্দ্রলাল মিত্র) গল্প কচ্ছি, এমন সময় পিওন এসে রাজুদাকে একখানা রেজিষ্টারী চিঠি দিল। সে চিঠিটা পড়ে বল্‌লে, "ওহে Radamas, (আমার কলেজের ডাক-নাম। 'Samadar' নামটা উল্টে দিলে এই অদ্ভুত নামটা হয়।) Campএ যাচ্ছ ত?" "নিশ্চয়," বলে আমি লাফিয়ে উঠে চিঠিখানা খপ্ করে কেড়ে নিলাম। পড়ে দেখি, "You are hereby summoned to attend for training at (Station) Patna (armoury) at (hour) 07-00 on the first day of November, 1924, failing which you will render yourself liable to trial by court-martial or by criminal court.. .." ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ কি না "তুমি পয়লা নভেম্বর সকাল সাতটার সময় পাটনা অস্ত্রাগারে অবশ্য উপস্থিত থাক্‌বে; নইলে তোমার সামরিক আদালতে কিংবা ফৌজদারী আদালতে বিচার হ'বে।" এরকম চিঠি আমরা দেখলাম এই প্রথম।

নন্ কমিশণ্ড অফিসারগণ

কিছু দিন পরে হাতুয়া থেকে পাটনা ফিরে এসে, camp এ যাবার যোগাড় কর্ত্তে লাগলাম। আমার চিঠিখানা বড়দা হাতুয়ায় redirect করে পাঠিয়েছিল, সেখানাও ঘুরে ফিরে আবার পাটনায় আমার হাতে এসে পড়্‌ল। চিঠির সঙ্গে একখানা রেলওয়ে পাশ ছিল, অবশ্য পাশখানা আমার কোনও কাজে লাগ্‌ল না। বড়দার যাবার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হঠাৎ অসুখে পড়ায় এবার ভুগায়ে না গিয়ে একলাটীই যেতে হ'ল।

পয়লা নভেম্বর ভোর বেলায় লটবহর নিয়ে পাটনা "আরমারী"তে হাজির হলাম। দেখলাম, বাঙ্গালীর সংখ্যা পূর্ব্বকার চেয়ে কম। বেহারীদের campএ যাবার

চাইতেও কোর্ট মার্শালের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার আগ্রহটা ঢের বেশী ছিল। আমার এক বিহারী বন্ধু জানত যে, কোর্ট মাশাল মানে একেবারে "To be shot dead." এই কোর্ট মার্শালের ভুল মানে করে অনেকে এমন কি camping শেষ হবার দু তিন দিন আগে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

আন্দাজ নটার সময় সার্জ্জেণ্ট কিংএর "Quick March"এর কমাণ্ড পেয়ে, আমরা পাটনা থেকে রওনা হলাম। সংখ্যায় ছিলাম আমরা ৬০ জন। সকলের লাইন চলে গেছে। এরই কাছে পাটনার Residential University করবার কথা হয়েছিল।

ফুলওয়ারীতে পৌছে N. C O.দের (non-commissioned officer) rank দেওয়া হ'ল। দুজন আগে সার্জ্জেণ্ট ছিলেন, এখন হলেন তাঁরা Platoon Commander; আর ৪ জন কর্পোরাল হলেন সার্জ্জেণ্ট। এই Platoon Commanderদের মধ্যে সার্জ্জেণ্ট চিত্তরঞ্জন দাশ বি-এস্‌সি শীঘ্র কমিশন পাবেন। সার্জ্জেণ্ট বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল Indian

কোয়ার্টার গার্ডস্ ও শিবিরের অন্য প্রান্ত

কোমরে web equipment,—তাতে water bottle আর Haversack বাঁধা, আর কাঁধে রাইফল্। সেবারকার মত আর নয় মাইলের ধাক্কা ছিল না, তাই প্রায় ১১টার সময় আমরা গন্তব্য স্থানে পৌছে গেলাম। আমাদের camping ground ফুলওয়ারী বলে একটা যায়গায় স্থির হয়েছিল। জায়গাটা Government Houseএর মাইল আধেক দূরে। Campingএর পক্ষে বেশ ভাল। চারদিকে খোলা মাঠ, মাঝে মাঝে তালের আর ছোট-বড় গাছপালার ঝাড়; তার পাশ দিয়েই ই, আই, রেলওয়ে Territorial forceএ যোগদান করেছেন। ইনি সেখানে হাবিলদার হয়ে যাচ্ছেন। ইনিও শীঘ্রই কমিশন পাবেন, এ রকম আশা করা যাচ্ছে। আমাদের Adjutant Major Ransford এঁদের দুজনের কাযে খুব সন্তুষ্ট। এঁরা ছাড়া (অর্থাৎ Platoon Commander ও Sergeant ছাড়া) দু'জন কর্পোরাল ও আটজন লান্স কর্পোরাল হ'লেন। গেল বারে বেহারীদের কেউ rank পায়নি,—এবারে কয়েকজন পেয়েছে। এই সব কায শেষ হয়ে গেলে, সার্জ্জেণ্ট কিং "guard mount" করিয়ে আমা-

দের "dismiss"এর হুকুম দিলেন। আমরাও তাড়াতাড়ি তাঁবুগুলিকে খাড়া করে, যে যার জিনিস-পত্তর নিয়ে বিছানা অর্থাৎ খড় ও কম্বল বিছিয়ে নিলাম। এইখানে "guard mounting" ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া ভাল। রোজ দুপুর বারোটার সময় প্রাইভেটদের মধ্যে থেকে ৯ জন quarter guards নেওয়া হ'ত; তা ছাড়া দুজন N. C. O. থাক্‌ত—একজন guard commander, আর একজন conducting relief। Guardদের প্রত্যেকের ৮ ঘণ্টা করে Sentry duty পড়্‌ত; পালা করে ৪ ঘণ্টা অন্তর ২ ঘণ্টা করে। guardরা ২৪ ঘণ্টা পরে ছুটী পে'ত।

শিবিরের এক প্রান্ত

Campএ এবার সুন্দর বন্দোবস্ত। খাবারের ভার দেওয়া হয়েছিল "কলেজ রেস্তরাঁকে"। যে ক'দিন campএ ছিলাম, সে ক'দিন কোনরকম খাবারের অসুবিধা ভোগ করিনি। সেবারকার Patna Hotel যে কুকীর্ত্তি করেছিল, তার আর পুনরাবৃত্তি হয়নি। এবারকার হোটেল-কর্ত্তারা আমাদের সুখের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন; মাছ, মাংস, ডিম আমরা রোজ পেতাম। এমন কি, অতিবৃষ্টির দিনও আমাদের খিচুড়ী আর পোলাও বাদ পড়েনি। মধ্যে মধ্যে অবসর সময়ে এঁরা আমাদের গান বাজনা শোনাতেন।

শনিবার দিন (অর্থাৎ যে দিন ফুলওয়ারীতে পৌছলাম) আর প্যারেড হ'ল না। তার পরদিন রবিবার,—সে দিনও ছুটী। তাই খেয়েদেয়ে সকলেই আরামের যোগাড় দেখ্‌তে লাগলেন। সে দিনটা বেশ হেসে খেলে কাটিয়ে দেওয়া গে'ল। সোমবার থেকে সব রীতিমত সুরু হ'ল। সকাল ৭॥০টা থেকে ৮টা পর্য্যন্ত physical exercise হ'ত। এতে যেমন ব্যায়ামও হ'ত, তেমনি ফুর্ত্তিও ছিল। "Relay race"এ, আর "Snake trying to bite its own tail" ইত্যাদি খেলায় সবচেয়ে মজা হ'ত। আমাদের মেজর ও কাপ্টেন সব সময় উপস্থিত থাকতেন, আর স্বয়ং সার্জ্জেণ্ট কিং (আমাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতেন। একদিন খেলার সময় সার্জ্জেণ্ট কিং) চোর হলেন। মারের চোটে তাঁর যা অবস্থা হয়েছিল, তা দেখবার মতন। এমনি আমুদে কিং সাহেব যে, কর্পোরাল অরুণ

রায় তাঁকে আস্তে মেরেছিলেন ব'লে অনুযোগ করলেন, বল্‌লেন, "Why don't you beat me as hard as you can ?" এ রকম আমোদ প্রায়ই হ'ত। Physical exerciseএর পর ৮৷৷৹টা থেকে ১০৷৷৹টা পর্য্যন্ত Full uniformএ কোন দিন arms drill, কোন দিন Platoon drill, কোন দিন Bayonet fighting, কোনও দিন Company drill, 'Company in attack' এই সব হ'ত। আবার বিকেল বেলায় ৩টা থেকে ৪৷৷ টা পর্য্যন্ত ঐ রকম drillএর পরে আমরা সব খেল্‌তে যেতাম। আপন আপন রুচি অনুসারে কেউ ফুটবল, কেউ হকি খেলতেন; আবার কেউ কেউ দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতেন। যাঁরা এ দিক দিয়ে যেতেন না, তাঁরা বেশীর ভাগই হয় হারমোনিয়াম, নয় বাঁশী নিয়ে পড়ে থাকতেন। মেজর আর কাপ্টেন কল্ড-ওয়েলও মধ্যে মধ্যে আমাদের সঙ্গে হকি খেলায় যোগ দিতেন। খেলা ছাড়া আর একটা জিনিসে আমরা আমোদ পেতাম বেশী। সেটা হচ্ছে, "Targeting" বা "Musketry", অর্থাৎ লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শেখা। এটা সকাল বেলায় কিংবা বিকেল বেলায় হ'ত। এতে সার্জ্জেণ্ট দাশ ও ল্যান্স-কর্পোরাল দীনেশচন্দ্র রায় বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছেন; কিন্তু sportsএর দিন রাজুদা হয়েছিল ফাষ্ট´।

বেশ সুখে দিন কাট্‌ছিল আমাদের। কিন্তু ভগবান তাতে বাদ সাধলেন। Campএ আসার প্রথম সপ্তাহের শেষ দিন (৭ই নভেম্বর) ভীষণ বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। শীত কালের বৃষ্টি, তাতে আবার অনবরত ২৪ ঘণ্টা ধ'রে। আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। তাঁবুর ভিতর জল ঢুকতে লাগল। খাল কেটে আর বাঁধ দিয়েও জল বন্ধ করা গেল না। বাধ্য হয়ে সমস্ত জিনিস-পত্তর নিয়ে যেতে হ'ল গর্দ্দানিবাগে। সেখানে হাইস্কুলে থাকার ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু কতকগুলি অভাগা থেকে গেল camp আর জিনিস-পত্তর পাহারা দেবার জন্য। ললাটের লিখন,--সেদিন আমি ছিলাম Guard commander। রাত্রিবাস করতে হ'ল সেই জনমানবহীন ভিজে জায়গায়। তার পর দিন চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। গর্দ্দানিবাগে এসে শুনলাম যে, স্কুলের সঙ্গে আমাদের ফুটবল ম্যাচ্। বিকেল বেলায় খেলা হ'ল, আমরা এক গোলে জিতে গেলাম। ফুর্ত্তির চোটে রাত্রে আমার জ্বর হ'ল। অথ ফলম্—সকাল বেলায় হাসপাতালে গমন! জ্বর ত ভাল হয়ে গে'ল দুদিন পরে; কিন্তু গোদের উপর বিষফোড়া গোছের এক কাণ্ড হ'ল। বেয়নেটের খোঁচা খেয়ে আমার হাঁটুতে সামান্য একটু আঁচড় লেগে গিয়েছিল,—সেই কাটা যায়গা septic হয়ে অসম্ভব রকম ফুলে উঠ্‌ল। Camp শেষ হবার ৪ দিন আগে সেই ঘা operation হ'ল, আর আমিও অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়াতে বাধ্য হয়ে বাড়ী চলে এলাম।

মন কিন্তু পড়ে রইল সেইখানে। তাই একটু ভাল হয়েই ফের ফিরে গেলাম campএ। সেখানে এসে দেখি, আমাদের sports হচ্ছে। পা তখনও একেবারে ভাল হয়নি বলে, আমি যোগ দিতে পারলাম না; আর সেইজন্য বড় আপশোষ হ'ল। Sportsএ ল্যান্স কর্পোরাল হীরেন্দ্রনাথ সেন সব বিষয়েই বাহাদুরী দেখালেন। প্রায় সবতাতেই ইনি ফাষ্ট´ হয়েছিলেন। Prize বিতরণ করলেন আমাদের Commanding Officer Captain Caldwellএর স্ত্রী।

১৫ দিনের মধ্যে দুদিন রাত্রি ১১টা থেকে ২টা পর্য্যন্ত night parade ছিল। প্রথম দিন আমরা camp থেকে ৬ মাইল দূরে একটা যায়গায় যাই। যেখানে সার্জ্জেণ্ট কিং ৪ জন লোক নিয়ে একটা মস্ত বড় মাটীর ঢিবির নিকটে ছিলেন। এই ৪ জন লোককে একটা দল বলে মেনে নেওয়া হ'ল। কথা ছিল যে, তাঁরা ঐ যায়গাটী রক্ষা করবেন, আর আমরা সেইটা আক্রমণ করব। প্রায় রাত্রি ১১টার সময় আমরা যাত্রা করলাম। সেই যায়গা থেকে কিছু দূরে যখন আমরা, তখন আমাদের ২।১ জন হঠাৎ হোঁচোট খেয়ে পড়ায়, আর চাঁদের আলো আমাদের মুখের ওপর পড়ায়, সার্জ্জেণ্ট কিংএর দল আমাদের advanceটা ধরে ফেল্লে। আমি Scouting dutyতে ছিলাম। সার্জ্জেণ্ট কিংএর দল একটা প্রকাণ্ড কুয়ার পাশে আড্ডা গেড়েছিল। এগুতে এগুতে আমি যাঁহাতক সামনে আসা—অমনি "গুড়ুম্" শব্দ। আমি মাটীতে শুয়ে পড়্‌লাম। পরে সার্জ্জেণ্ট কিং আমার কাছে এসে বল্‌লেন, "well, you are dead"। আমি গম্ভীর

ভাবে উত্তর কর্‌লাম, "Please then, inform my father!" উত্তর শুনে সার্জ্জেণ্ট ত হেসেই অস্থির। কিছুক্ষণ পরে লড়াই জমে উঠ্‌ল; কিন্তু সার্জ্জেণ্ট কিংএর চালাকিতে পড়ে, আমাদের দল হঠাৎ "between cross fire"এ পড়ে গেল; আর তার ফলে আমাদের পরাজয় ও পলায়ন। আর এক রাত্রে আমাদের "Listening patrols" বা শক্রর অগ্রসর কি করে ধরা যায় তাই শেখান হয়েছিল।

বয় স্কাউটবেশে কর্পোরাল সমাদ্দার

Campingএর স্মরণীয় দিন—যে দিন (বুধবার, ১২ই নভেম্বর) আমাদের দানাপুরের Cheshire Regimentএর সঙ্গে encounter বা কৃত্রিম যুদ্ধ হয়। সে দিন আমরা রাত্রি থাকতে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। এক একজনকে ১০ রাউণ্ড করে blank cartridge" দেওয়া হ'ল। আমরা তিন দলে বিভক্ত হয়ে দানাপুরের দিকে এগুতে লাগলাম। Cheshireরা পাটনা আক্রমণ করবে, আর আমরা তাদের আক্রমণ repulse কর্‌ব, অর্থাৎ বাধা দেব। দুই দলে বেলা প্রায় ৮টার সময়, দানাপুর ও পাটনার মধ্যে যে শোন-নদের খাল আছে, তার দুইধারে এসে দাঁড়াল। আমরা আগেই খাল পেরিয়ে যায়গা ঠিক করে নিয়েছিলাম। আমরা সংখ্যায় মাত্র ৬০ জন; তার মধ্যে ৮ জন guard dutyতে campএ ছিল; অর্থাৎ কি না আমরা মাত্র ৫২ জন তাদের ১৮০ জনকে রুখে দাঁড়ালাম। তাদের সঙ্গে মেসিনগান, কামান থেকে sappers ও miners (ট্রেঞ্চ খুড়বার ও রাস্তা করবার জন্য লোক) পর্য্যন্ত এসেছিল। দূর থেকে তাদের পোষাকের বহর, আর ঘোড়ার উপরে তাদের কর্ণেলকে দেখে, আমাদের চমক লাগ্‌ল। আগেই বলেছি যে, আমরা ভাল জায়গা বেছে নিয়েছিলাম। তাই তারা bridgeএর দিকে আসা মাত্র, একসঙ্গে কতকগুলি গম্ভীর আওয়াজ হ'ল—"গু-ড়ু-ম," "গু-ড়ু-ম," "গু-ড়ু-ম", আর তারা সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়্‌ল। তার পর অনবরত "blank cartridge"এর আওয়াজ, commanderদের চীৎকার, machine gun এর পড়্ পড়্ শব্দ—এই সব মিলে যেন এক তুমুল কাণ্ডের সৃষ্টি হ'ল। কাণ প্রায় ঝালাপালা হয়ে যাবার যোগাড়। সেই শব্দে দূরে রাস্তায় লোক জমে গেল। তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। রাস্তার একদিকে ধোঁয়া আর আওয়াজ, আর একদিকে এককা, টম্‌ টম্‌, বগি ও মোটরে লোক কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে।

Cheshireদের machine gunএর ঠেলায় আমরা আস্তে আস্তে খাল পার হবার command পেলাম। খালের মধ্যে প্রায় গলা সমান জল—তাতে আবার পাঁকে ভরা। Bridgeএর ওপর দিয়ে পার হবার সময়ও ছিল না, আর সুবিধেও ছিল না ব'লে সকলেই খালের জল ও পাঁক মেপে অন্য পারে এলাম। আমাদের মধ্যে যারা একটু বেঁটে তাদের

দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। প্রাইভেট বিভূ ভৌমিক ও মুটু ব্যানার্জ্জির অবস্থা দেখবার মত হয়েছিল। যা'হক, খালের এপারে এসে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। আবার কিছুক্ষণ গুলি-গোলার আওয়াজে কাণ ঝালাপালা হয়ে গে'ল। হঠাৎ "Bugle" বেজে উঠল—"Stop. Stand fast !" এ সঙ্কেত দুপক্ষের জন্যই ছিল; তাই চারদিকের আওয়াজ থেমে গেল। যে যেখানে ছিল, উঠে দাঁড়াল। তখন দেখা গেল যে, Cheshireরা খাল পার হয়ে এসেছে; আর আমরা প্রায় খাল থেকে ১০০ গজ দূরে। কায তখন শেষ হয়ে গিয়েছে। Cheshireরা ভেবেছিল যে, আমাদের ১০ মিনিটের মধ্যে হটিয়ে দেবে। কিন্তু তার বদলে তাদের প্রায় ১৷৷০ ঘণ্টা লেগেছিল। যুদ্ধ শেষ হ'লে Cheshire Regimentএর কর্ণেল আমাদের খুব সুখ্যাতি করলেন। বললেন যে, দু'বছরে আমরা আশাতীত রূপ সাফল্য লাভ করেছি। এ সাফল্যের মূলে ছিলেন—আমাদের কাপ্টেন কল্ডওয়েল, মেজর, ও বিশেষতঃ সার্জ্জেণ্ট কিং। কিং সাহেবই আমাদের শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। আমরা যে এতক্ষণ Cheshireদের রুখে ছিলাম তা কেবল মাত্র কিং সাহেবের জন্য। Campএ যখন ফিরে এলাম, তখন ১২টা বেজে গিয়েছে।

Sports যে দিন শেষ হ'ল, তার পর দিন (১৫ই নভেম্বর) আমাদের ফিরবার কথা। মোটের উপর বেশ সুখে ১৫টা দিন কেটে গেল। বাড়ী যাবার ইচ্ছা তখন কারুরই ছিল না। শনিবার দিন সকাল বেলায় আমাদের Inspection হ'ল। বিহার ও উড়িষ্যার এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিলের মেম্বর ও সহকারী সভাপতি অনারেবল সার হিউ ম্যাক্‌ফারসন, শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী সার মহম্মদ ফকরুদ্দিন, স্বায়ত্ত-শাসনের মন্ত্রী বাবু গণেশ দত্ত সিংহ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলর মিঃ সুলতান আহম্মদ, শিক্ষা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর মিঃ ফকাস্ ও এখনকার ডিরেক্টর মিঃ ল্যাম্বার্ট আমাদের পরিদর্শন করলেন। সার ম্যাক্‌ফারসন, সার ফকরুদ্দিন ও মিঃ সুলতান আহম্মদ আমাদের কাযের প্রশংসা করে ছোটখাট বক্তৃতা দিলেন। এই সব কায শেষ হলে আমরা নাওয়া-খাওয়ার চেষ্টায় গেলাম।

বেলা প্রায় ২টার সময় আমরা মার্চ্চ আরম্ভ করি। আমি এর আগেই আর জনকতকের সঙ্গে ১১৷৷০ সময় জিনিস-পত্তর নিয়ে গরুর গাড়ীর সাথে রওনা হই। তারপর—তার পর আর কি—আরমারীতে ফিরে এসে, জিনিস পত্তর জমা দিয়ে, যে যার বাড়ীর দিকে চল্লাম। Camp lifeএর স্বপ্নরাজ্যের মায়া টুটে গে'ল। বাস্তব রাজ্যে এসে মনে পড়ল, একটা অপ্রীতিকর বিভীষিকাময় বাস্তব হাঁ করে রয়েছে—৮ই ডিসেম্বর আমাদের test examination !

এখন আমাদের বিষয় দু'এক কথা বলে প্রবন্ধ শেষ করব। এখন আমাদের কোরের মোট সংখ্যা এক শত। আমাদের Adjutant হচ্ছেন, Mojor R. M Ransford, Commanding Officer Captain K. S. Caldwell (ইনিই পাটনা কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক) আর Instructor, Sergeant King। সুখের কথা যে, এখন আমাদের full N. C. O. s (অর্থাৎ Sergeants and Corporals) প্রায় সকলেই বাঙ্গালী। কিন্তু একটা দুঃখের বিষয় যে, কিং সাহেব আমাদের ছেড়ে নিজের Regimentএ (Worcester) চলে গেলেন (২৪শে নভেম্বর)। তাঁর বদলে এখন অন্য একজন এসেছেন। কিন্তু আমাদের ভরসা আছে যে, এখন যিনি এসেছেন, তিনি কিং সাহেবের মত আমাদের কার্য্যের সফলতার সহায়তা কর্বেন।

আজের্‌বায়জান্‌ ও বোখারা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

একটা ফরাসী প্রবাদ বাক্য আছে যে, "যদি তুমি একজন রুষকে আঁচড়ে দেখ তা হ'লে দেখবে সে একজন তাতার !" এই প্রবাদ বাক্যটির মধ্যে যে কিছু সত্য আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাতারীরা মোঙ্গলীয়দের জ্ঞাতি। তারা রুষিয়ার পূর্ব্বাংশটা সমস্তই ঘুরে বেড়িয়েছে এবং অনাদি কাল থেকে সমগ্র দেশের সঙ্গে কারবার সম্পর্কে তাদের একটা সম্বন্ধ ছিল। অনেকে বলেন তারা চেঙ্গিজ্‌ খাঁর আমলে তাঁর সঙ্গেই এখানে এসে পড়েছিল, কিন্তু প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, তার বহু পূর্ব্বেও রুষিয়ায় তাতারের অস্তিত্ব ছিল।

আজেরবায়জানের মানচিত্র

এই তাতারীরা যে অনেক পরিমাণে রুষের জাতীয় চরিত্রকে প্রভাবান্বিত করে তুলেছিল, সে বিষয়ে এখন আর মতভেদ নাই। পারস্য ও চীন সভ্যতার শিক্ষা ও উৎকর্ষতা তারাই রুষদেশে বহন করে এনেছিল। প্রাচ্য শোণিতের সঙ্গে পাশ্চাত্য 'শ্লাভ' রক্তের সম্মিলন তাদের দ্বারাই সর্ব্বপ্রথম সংসাধিত হয়েছিল এবং প্রাচ্য রাজনীতি ও শাসনপ্রথা প্রতীচ্যে তারাই প্রথম প্রচলিত করেছিল। রুষ জাতির প্রকৃতির মধ্যে একটা হিংস্র ভীষণতার সঙ্গে যে কোমলতা ও বন্ধুত্বের ঔদার্য্যটুকু দেখতে পাওয়া যায়, সে কেবল ওই তাতারী সংশ্রবের ফল।

তা ব'লে কেউ যেন না মনে করেন যে, রুষ আর তাতারী বুঝি তবে এক। এক ত তারা নয়ই,—বরং তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ও পরস্পরের অনেক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এখনও দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া, এই দুটো জাত যে পরস্পরের সঙ্গে একেবারে মিশে যাবে, এরূপ কোনও প্রয়োজনীয়তাও কখনও উপস্থিত হয়নি। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, তাদের পরস্পরের ধর্ম্ম ছিল পৃথক। তাতারীরা পুরাকালে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। বৌদ্ধ শ্রমণ

দু'জন তাতারী যোদ্ধা

বেশেই তারা প্রথমে এদেশে পদার্পণ করে; কিন্তু পরে মুসলমানদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের যুগে তারা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়; এবং সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত তারা মুসলমানই র'য়ে গেছে।

রুষ-বিদ্রোহের ফলে যে আজের্‌বায়জান্‌ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল, তার ইতিহাস একটু বিশেষ রকম চিত্তগ্রাহী; কারণ, এইটিই হ'চ্ছে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান গণতন্ত্রমূলক রাজ্য। বাকুপ্রদেশ, ইলাইজাবেতোপোল, কাশ্যপ হ্রদের তীরবর্ত্তী কতকটা স্থান এবং পশ্চিম ক্যকেসুশ্‌ পর্ব্বত ও

মীর আরব মাদ্রাসা (এটি মধ্য-এশিয়ার একটী প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়)

বোখারার চৌরাস্তা

দক্ষিণে পারস্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত এই রাজ্যের বিস্তৃতি। এদেশের অধিবাসীরা অধিকাংশই তাতারী।

এদের চ্যাপ্টা চওড়া মুখ, পীতবর্ণ, ছোট ছোট বাঁকা চোখ, উঁচু চোয়াল, পাতলা চুল, এবং শ্মশ্রুহীন দাড়ী দেখলেই সহজেই এদের রুষ, আর্মেনীয়ান বা জর্জ্জিয়ান নয় বলে চিন্‌তে পারা যায়। মোঙ্গলীয়দের আকৃতি যদিও অনেকটা এই রকমেরই, তবু তাদের চেহারার এই বিশেষত্ব-গুলো এত বেশী রকম সুস্পষ্ট যে, তারা তাতারী নয়—এটা

রেজিস্থান, বা বোখারার বড় বাজার

পশুলোম ব্যবসায়ীদের বাজার

বেশ বোঝা যায়। তাতারীদের চেহারা মোঙ্গলীয়দের চেয়ে সুশ্রী। তারা সকলেই কঠোর পরিশ্রমী, বিশ্বাসী, চতুর ও তৎপর। তাদের সঙ্গে শত্রুতা না করলে তারা বেশ ঠাণ্ডা হ'য়ে তাদের স্বধর্ম্মীদের সঙ্গে কিম্বা বিদেশী খৃষ্টানদের সঙ্গে তোফা মিলে মিশে থাকতে পারে।

এদের কোনদিনই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করা হয়নি। রুষের চাষাভুষো লোকেরা বলে "ভগবান আমাদের

জন্য যেমন খৃষ্টধর্ম্ম দিয়েছেন, তেমনি ওদের জন্য মুসলমান ধর্ম্ম দিয়েছেন।" কেবল জারের রাজত্বকালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মাঝে মাঝে গুপ্তচর ও ভাড়াটে প্রচারকদের দ্বারা তাদের মধ্যে একটা খৃষ্টান-বিদ্বেষ জাগিয়ে দিয়ে, তাদের ক্ষেপিয়ে তুলে; একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়ে তাদের হীনবল করে দেওয়া হতো। দুর্ভাগ্য-ক্রমে তাতারীদের মধ্যে যারা বেশ শিক্ষিত, তারাই ছিল বেশী ধর্ম্মের গোঁড়া। কেবলমাত্র ধর্ম্মপুস্তকের সাহায্যে ও আশ্রম-পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ফলে তাদের হৃদয় উদার, উন্নত ও মন প্রসারিত না হ'য়ে বরং নানা কুসংস্কারের কুটিল আবর্ত্তে পড়ে নীচ ও সঙ্কুচিত হয়ে উঠতো। তার ফলে বিধর্ম্মীদের সঙ্গে তাদের বিরোধ আরও দিন দিন বেড়ে উঠে, পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের পরিখাটাকে উত্তরোত্তর গভীর ও অলঙ্ঘ্য ক'রে তুলেছিল। তাতারী মুসলমান ছাত্রেরা খৃষ্টান ছেলেদের কাফের বলে ঘৃণা করে; আবার

ক্যাকশীয় দম্পতি।— (এরা বাকুর উত্তরে পাহাড়ের উপর কাঠের ঘর বেঁধে বাস করে। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে একটি ঘোড়াতে চড়েই বেড়াতে যায়।)

বোখারার তিন জন মোল্লা

সভ্যতার পথে। (এই দুটী তাতারী শিশুর জর্জ্জিয়ান মাতা এদের মাতুলগোষ্ঠীর বেশে সাজিয়ে দিয়েছে। এদের পিতা একজন ধনী ও শিক্ষিত তাতারী।)

খৃষ্টান বালকেরাও মুসলমান ছেলেদের ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বলে অশ্রদ্ধা করে। তারা পরস্পর কোন দিনই প্রাণ খুলে মেলা মেশা করে না। সৌভাগ্যবশতঃ তাতারীদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, কাজেই বিরোধ কেবল মুষ্টিমেয় মাত্র লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হ'য়ে আছে। অশিক্ষিত মূর্খ তাতারীরা বেশ দিলদরিয়া, খোসমেজাজী; জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সবাইয়ের তারা সমান খাতির যত্ন করে। কাউকে ঘৃণা করে না।

তাতারীদের মধ্যে অনেকেই এখনও ভবঘুরের মতো দেশ দেশান্তরে বেড়িয়ে বেড়ায়। মেষ পালন তাদের একমাত্র উপজীবিকা। তারা সেই ভেড়ার দল তাড়িয়ে নিয়ে চির জীবনটা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। যারা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসবাস ক'রছে, তারা সকলেই কৃষিজীবি। কোনও তাতারপল্লীতে গিয়ে যদি কেউ একরাত্রি আতিথ্য গ্রহণ করে, তাহলে সে কম্বল মুড়ি দিয়ে মোটা পশমী গদীর ওপর বেশ আরামে

বোখারার একটি প্রাচীন গলিপথ

পুরুষ অতিথির সেবায় তাদের যোগ দেবার কোনও উপায় নেই। সে জন্য অতিথির বিশেষ ক্ষুণ্ণ হবার কোনও কারণ নেই। কেন না তাতারী মেয়ে দেখতেও তেমন সুন্দরী নয় এবং মনোরঞ্জনেও তারা সম্পূর্ণ অপটু। অতিথি সৎকারের পর তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্য গীত বাদ্যের আয়োজনও হয়ে থাকে। বাঁশীটাই হচ্ছে তাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র। বাঁশীর সুরের সঙ্গে সঙ্গে তারা নৃত্যও করে, অতিথিরাও সৌজন্য রক্ষার জন্য তাদের সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিতে বাধ্য হয়।

আজেরবায়জানের প্রধান সহর হ'চ্ছে বাকু। কাস্পিয় হ্রদের একটী সুন্দর তীরে এই সহরটি প্রতিষ্ঠিত। জলের উপর থেকে এই সহরের শাদা বাড়ীগুলি কোনটি পাহাড়ের উপর, কোনটী বাগানে ঘেরা,

নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা যেতে পারবে, কেননা ওদের মধ্যে অতিথির সম্মানটা বড্ড বেশী। অতিথির ধন প্রাণের তারা কিছুতেই ক্ষতি করে না। অতিথিকে দেবতার মত আদর অভ্যর্থনা করে। একটি আস্ত ভেড়া জবাই ক'রে অতিথি সেবার জন্য রেঁধে দেয়, রুটী ও শাক সব্জী ঘরে থাকলে তাও দিতে কার্পণ্য করে না। বাড়ীর কর্ত্তা নিজে পাত্র থেকে উৎকৃষ্ট মাংসের টুকরো বেছে তুলে নিয়ে স্বহস্তে অতিথির মুখে তুলে দেন। এটা হ'চ্ছে অতিথির আগমনে তাঁর আনন্দ জ্ঞাপন করা। তার পর ঘোড়ার দুধ, যাকে বলে তারা "কৌমিস্" পাত্রের পর পাত্র পূর্ণ হ'য়ে অতিথির তৃষ্ণার্ত্ত অধরের সম্মুখে উত্তোলিত হয়।
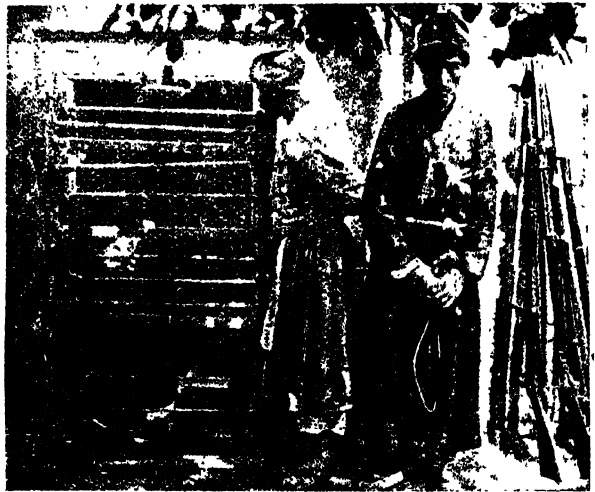
আমীরের প্রাসাদ অভ্যন্তরস্থ কারাগার (দ্বারের বহির্দ্দেশে প্রহরী ও ঘাতক দাঁড়িয়ে)

তাতারী মেয়েরা মুসলমানদের চির-প্রচলিত প্রথা অনুসারে বোরখা প'রে মুখ ঢেকে পর্দ্দার আড়ালে থাকে। বড় চমৎকার দেখায়। পেট্রোলিয়ম তেলের কারবারে যাঁরা বহু অর্থ উপার্জ্জন ক'রে লক্ষপতি হ'য়েছেন, তাঁদের

মধ্যে অনেকেই এই বাকু সহরে ইন্দ্রভবন তুল্য সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেছেন। তা ছাড়া বড় বড় সরকারী বাড়ীও বাকুতে অনেকগুলি আছে।

বাকুর উত্তরে মাইল দশেক দূরে একটি অগ্নিপূজকদের মন্দির আছে। এই মন্দিরটি পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম। পারস্যের প্রাচীনতম অগ্নি-পূজা-পদ্ধতি এখনও সেই মন্দিরে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। দূর দেশ বিদেশ থেকে বহু তীর্থযাত্রী এই মন্দিরে কোন্ অজ্ঞাতকাল থেকে প্রজ্বলিত সেই অগ্নিশিখা দর্শন করতে আসে। বাকু এককালে পারস্যের শাহ সম্রাটদেরই সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রুষেরা পারস্যের নিকট হ'তে বাকু জয় ক'রে নিয়েছিল। সেই থেকে বাকু যদিও রুষের অধিকারেই ছিল তথাপি এর নাম বড় একটা কেউ শুন্‌তে পেতো না। তার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন প্রকাশ হ'ল যে, বাকুতে পেট্রোলিয়ম তেলের খনির সন্ধান পাওয়া গেছে, তখন জগতের দৃষ্টি এই বাকুর উপর এসে পড়ে। রুষ গভর্ণমেণ্ট সেই সময় বাকুর কতকটা জমী ইজারা দিয়ে প্রায় পনের লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেছিলেন। তখন লোকের ধারণা ছিল যে, বুঝি কেবলমাত্র ওই বিশেষ স্থানগুলিতেই তৈলের খাদ আছে। কিন্তু শীঘ্রই জান্‌তে পারা গেল যে, বাকুর তৈল ভাণ্ডার অফুরন্ত ও অতল-স্পর্শী। এমন কি আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত তৈলখনিগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাকুই

জনৈক দরবেশ

আজেরবায়জানের কয়েকজন বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রীপুরুষ
(এদের পোষাকের পার্থক্য থেকে জাতিভেদ বোঝা যাচ্ছে)

শেষে শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী বলে প্রতিপন্ন হ'ল। তার পর থেকে অসংখ্য ব্যবসায়ীর দল সেখানে এসে পড়ে, বাকু অঞ্চলটাকে একেবারে তেলের কারখানার একটা বিকট মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করে ফেলেছে। বাকু প্রদেশের অনেকটা স্থান এমন বীভৎস দেখতে হয়েছে যে, বাকু-বাসীরা সে জায়গাটার নাম রেখেছে 'শয়তানের বাজার।' কেবলমাত্র এই তেলের খনির জন্য আজেরবায়জান্ অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর একটা সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী রাজ্যে পরিণত হবে। তৈলখনি আবিষ্কৃত না হ'লেও বাকু কোনও দিন দরিদ্র দেশ বলে পরিগণিত হ'ত না; কারণ,
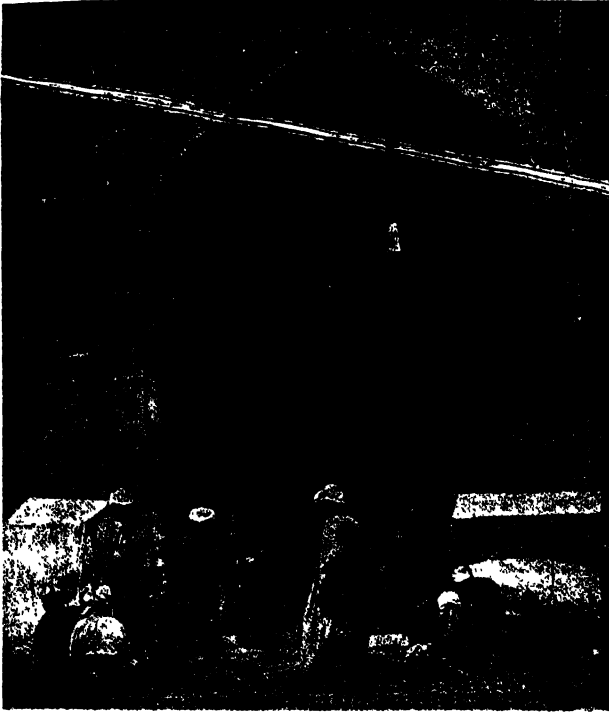
বোখারার বিদ্যাপীঠ (ছাত্র ও শিক্ষকেরা জলযোগ করিতেছে)

বাকুর জমী অত্যন্ত উর্ব্বরা। মৎস্য ব্যবসায়ের জন্যও বাকুর সম্পদ বড় অল্প নয়। নানাবিধ সুস্বাদু মৎস্যের জন্য বাকুর প্রসিদ্ধি আস্ত্রাখানের অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নয়। অরণ্য-সম্পদেও বাকু বড় কম যায় না। ওক প্রভৃতি মজবুত ও দামী কাষ্ঠও সেখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

আজের্‌বায়জানের কোনও অভাব নেই, কেবল চাই সেখানে এখন অচলা শান্তি। দেশের অধিবাসীরা সবাই শান্তির প্রয়াসী বটে; কিন্তু তারা শান্তি স্থাপনের ঠিক উপায় নির্দ্ধারণ ক'রতে পারছে না। এটা যেন তাদের একটা সমস্যা হ'য়ে উঠেছে। প্রথমে তারা জর্জ্জিয়া ও আর্মেনিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে একটা ক্যকশীয় স্বাধীন যুক্তরাজ্যে পরিণত হয়েছিল; কিন্তু সে অবস্থায় বর্ষাধিক কালও তারা থাকতে পারলে না—শীঘ্রই বলশেভিকদের আক্রমণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল! তার পর ১৯২২ সালে রুষিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তারা আবার সেই মিলিত গণতান্ত্রিক রাজ্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করেছে।

বোখারা একটি প্রাচীন দেশ। পৃথিবীর পুরাতন যুগে এক সময়ে এই বোখারা আপন গৌরবে গরবিনী এক রঙ্গিলা দেশ বলে বিখ্যাত ছিল। আজ তার সে গৌরব-চূড়া ধ্বংস হয়ে গেছে। অতীতের তুলনায় আজ সে বিগত-শোভা, বিচূর্ণ গর্ব্বের ভগ্ন স্তূপে পরিণত। বর্ত্তমান বোখারা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের এক চরম নিদর্শন রূপে ভূপৃষ্ঠে এখনও বিরাজ করছে।

বোখারার পূর্ব্ব ও মধ্যভাগ পর্ব্বত সমাকুল এবং এর বিস্তৃত মরুপ্রান্তর হয় ত এত দিন মনুষ্য বাসের অযোগ্য হ'য়ে উঠ্‌তো, যদি না হেমন্তের তুষাররাশি বিগলিত হয়ে শীতান্তে প্রতি বৎসর একে সরস ক'রে তুলতো।

বাকু-প্রবাসী একদল পারসিক। (প্রাচীন পারসিকরাই এদেশে এসে সর্ব্বপ্রথম বাকুর তৈল-খনির সন্ধান পায়। এরাই এ দেশের নাম রেখেছিল 'আজেরবায়জান'। আজেরবায়জান্‌' মানে "অনন্তশিখ তীর্থ' অর্থাৎ যে দেশে অগ্নিশিখা চির-অনির্ব্বাণ)

ক্ষণস্থায়ী বসন্তকে গ্রাস করে সত্বর সেখানে নিদারুণ গ্রীষ্ম এসে আত্মপ্রকাশ করে। নবমুঞ্জরিত কুসুমাকীর্ণ
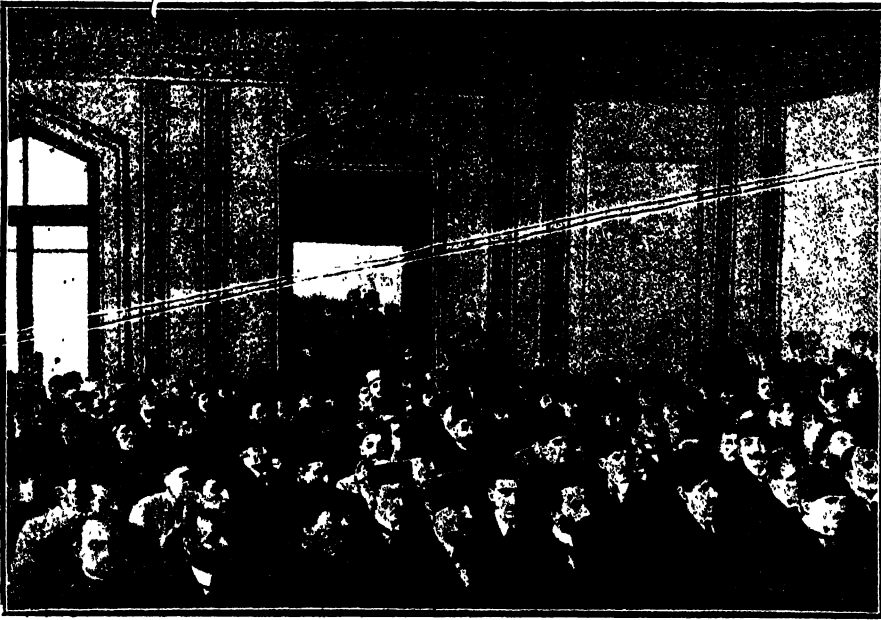
গণতন্ত্রবাদী শিক্ষিত তাতারী দল (এরা সকলেই শাসন পরিষদের সভ্য। নবযুগের তরুণ-পন্থী তাতারীরা সকলেই য়ুরোপীয় বেশভূষার অনুকরণ করেছে ; কেবল শিরঃ শোভাটা এখনও বদলায়নি।)

শান থেকে সেই সীমা-রেখা বেঁকে 'ন্যু রা তা ও' কে বেষ্টন করে প্রায় দক্ষিণে প্রসারিত হয়েছে, এখান থেকে উঠে আবার সেই দাগ উত্তরে সামারখান্দ্ গিরি-শ্রেণীর পূর্ব্ব পার্শ্ব পর্য্যন্ত চলে গেছে। দক্ষিণে আমুদরিয়া বা অক্ষস্ নদী এবং পশ্চিমে বিশাল কারাকুম মরুভূমি।

প্রজাতন্ত্রমূলক শাসন পরিষদের প্রথম অধিবেশন

তরুতৃণরাজি দেখতে দেখতে ভীষণ আতপতাপে দগ্ধ পাদপে পরিণত হয়ে যায়। সেখানকার আবহাওয়া কখন হিমাঙ্কের (Freezing point) মাত্রা ছাড়িয়ে একেবারে ৪৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নীচেয় নেমে যায়—আবার গ্রীষ্মের দিন তাপাঙ্কের ১২২ ডিগ্রী উপরেও উঠে! এই সময় সেখানে লু' ছোটে, তপ্ত ধূলাবালির আঁধিয়া উড়ে সূর্য্যকে পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলে।

বোখারার আমীরের অধিকার-সীমানা প্রধানতঃ পূর্ব্বদিকে খিভা থেকে আলাই পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জারাফ্-

বোখারা সহরের চারিদিকে ২৩ ফুট উঁচু দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সহরটা দেখলেই প্রথমটা কেমন যেন মনে একটা নির্জ্জনতার নিরুৎসাহ ভাব এসে পড়ে। ঢালা ছাদওয়ালা পাশাপাশি বাড়ীগুলোর ভিত্তিগাত্র সেখানকার

রাজপথ এমন কি গম্বুজ কটা পর্য্যন্ত যেন বর্ষাধারার মতো বাণবিদ্ধ বলে মনে হয়। সেখানে সূচ্যগ্র কোনও চূড়া নেই; মীনারের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প, তবে মস্‌জেদ্‌ ও মাদ্রাসার বাহুল্য সে অভাব অনেকখানি মোচন ক'রে দিয়েছে। সহরের ঠিক মাঝখানে পাহাড়ের উপর আমীরের প্রকাণ্ড প্রাসাদ, তার নাম আরক্‌। প্রাসাদের চতুঃপার্শ্ব উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। সহরের স্থানে স্থানে জর্দ্দালু বা খুবানী

তাতার ব্যাপারী। (উটের পীঠে ভেড়ার চামড়া বোঝাই করে বাজারে চলেছে।)

গাছ, দেবদারু, মজ্‌নু বা উইলো গাছ এবং আখরোট্‌ গাছ আছে। এই সব গাছ বাড়ীর ছাদ ছাড়িয়ে উঠেছে দেখা যায়। মাঝে মাঝে হৌজ, বা জলাশয়ের ধারে সবুজ কুঞ্জ দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে বড় একটা কাউকে বাইরে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না; কিন্তু প্রভাতে ও অপরাহ্নে শ্বেত-উষ্ণীষ-ধারীরা এমন দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে যে, রাস্তাঘাট দেখে মনে হয়, যেন শরতের শুভ্র কাশগুচ্ছ বাতাসে দোল খাচ্ছে। নিদাঘের স্তব্ধ মধ্যাহ্নে কাউকে দেখা না গেলেও অনেকেরই সাড়া পাওয়া যায় কিন্তু! কোথাও বা কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রছে, গর্দ্দভের চীৎকার উঠছে, আবার ঘুঘু পাখীর কোমল সুর এবং সারসের কর্কশ সঙ্গীতও তার মাঝেমাঝে ভেসে আসছে। রাস্তা দিয়ে সারা দিন উটের গাড়ী ঘোড়সোয়ার ও ভারবাহী গর্দ্দভের মিছিল চলেছে দেখা যায়। বোখারার সামাজিক জীবনের কতকটা সজীব চিত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায় সেখানকার হাটে, বাজারে, ঘাটে, ময়দানে বা কুয়োর পাড়ে। এই সব আড্ডায় প্রাচ্যের সুচারু রঙীণ বেশভূষায় সুসজ্জিত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতীয় লোককে দেখতে পাওয়া যায়।

বোখারার ধাতুদ্রব্য নির্ম্মাণকারকেরা বিশ্ববিখ্যাত। যদিও তারা এখনও সেই সাবেক মামুলি পদ্ধতিতে হাপোর, হাম্বোর, হাতুড়ী হাতেই পিটে, পুড়িয়ে, ঝেলে কিম্বা ছেনি দিয়ে কেটে কাজ ক'রছে, কলকজা বা মোটর ইলেকট্রিকের সাহায্য নেয়নি, তবু তাদের হাতের কাজ শিল্প-দক্ষতায় আজও পর্য্যন্ত যন্ত্ররাজকে ছাড়িয়ে চলেছে। চামড়ার কাজেও বোখারার মিস্ত্রীরা খুব সুদক্ষ। মীর-আরব মাদ্রাসা ও নাস্তি-কালান মস্‌জিদের মাঝখানে যে মাঠ পড়ে আছে, সেখানে তুলোর বাজার বসে। এই তুলোর বাজার একটা দেখ্‌বার জিনিস। এইখানে তুলো গাঁট বাঁধা হ'য়ে উটের পিঠে বোঝাই হ'য়ে দেশ বিদেশে চালান হয়। ফলের বাজারও বেশ সুদৃশ্য। উঁচু উঁচু কাঠের চৌকীর উপর পরিপাটী করে ফলগুলি সাজানো, এবং দড়ীর বা তারের আলনায় আঙুর আপেলের গুচ্ছগুলি ঝুলানো—দেখ্‌তে ভারি সুন্দর লাগে। এই ফলের বাজারে এলে বোখারার বোর্‌খা-পরা সুন্দরীদের দুর্লভ দর্শনলাভের সৌভাগ্য ঘটে বটে; কিন্তু রূপ-পিপাসুর আঁখি তাতে তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। বোর্‌খার সেই যুগল জালাবরণ ভেদ ক'রে সুন্দরীদের চপল আঁখি-পাখী

দু'টিকে দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করতে না পেরে শিকারীরা ব্যর্থকাম হ'য়েই গৃহে ফিরে আসে।

কার্শী সহরটি বোখারার মধ্যে ফুলবাগানের জন্য বিখ্যাত। পূর্ব্বে এ সহরটী ছিল সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছোরা-ছুরীর জন্মস্থান বলে প্রসিদ্ধ। রাজা-রাজড়া নবাব বাদশাদের কোমরবন্ধে গুঁজে রাখবার মত সৌখীন ও মূল্যবান অথচ তীক্ষ্ণধার ছুরি আগে এই কার্শী ছাড়া আর কোথাও তেমন ভাল পাওয়া যেতো না। এই সহরের লোকসংখ্যা মাত্র পঁচিশ হাজারের বেশী হবে না। তারা অধিকাংশই উজবেগ্। কার্শীর পরই 'সহর-ই সাবাজ্' বা সবুজ শহরের নাম করা যেতে পারে। সবুজ সহরের লোকসংখ্যা প্রায় বিশ হাজার হবে। এ সহরটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এই সহরের এলাকার মধ্যে নব্বুইটি মস্‌জিদ্ আছে। সবুজ সহরের পাশেই হচ্ছে 'কীতাব' নগর। এখানে আমীর সাহেব মাঝে মাঝে এসে বাস করেন। এই সহরে আমীরের বৃহৎ একটি সেনানিবাস আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়েও এ সহরগুলির এবং আরও অন্যান্য কয়েকটি সহরের বিশেষ প্রাধান্য আছে। আমীর যদিও এখানকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তবু তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন না। রুষ গভর্মেন্টের প্রতিনিধির সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে রাজদণ্ড পরিচালনা ক'রতে হোতো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রুষ গভর্মেন্টই ছিল এখানকার প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ। কিন্তু রুষিয়ায় সোভিয়েট্ শক্তি প্রবল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিক আন্দোলনের সময় বোখারা রুষের কবল থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯১৯ সালের আগষ্ট মাসে তরুণ উজবেগের দল আমীর সৈয়দ্ মীর আলীকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে সেখানে গণতন্ত্রমূলক শাসন-প্রথার প্রবর্ত্তন ক'রেছে। বোখারার আমীর দেশত্যাগ ক'রে উপস্থিত আফ্‌গানীস্থানের আমীরের অতিথিরূপে বাস করছেন।

বোখারার সৈন্যদল য়ুরোপীয় প্রণালীতে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত হয়েছে। রুষ থেকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা ক'রে এসে বোখারার সৈন্যাধ্যক্ষগণ দেশীয় সৈন্যদলকে রুষ রণনীতি মতে সুশিক্ষিত করে তুলেছে। সৈন্যদের পোষাক পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রও সমস্ত রুষের অনুকরণে প্রস্তুত।

পাঠশালা (মেষচর্ম্মের উষ্ণীষ পরা একজন তুর্কমান ও টুপী মাথায় শ্মশ্রুধারী জনৈক উজ্‌বেগ এই পাঠশালা পরিদর্শন করতে এসেছে।)

বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন অবস্থা ও প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পার্থক্য অনুসারে সেখানকার লোকেদের জীবনযাত্রার রীতি ও পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন রকম। কোথাও বা তারা চাষ আবাদ ক'রে দিনাতিপাত ক'রছে। কোথাও বা তারা ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি পালন করে জীবিকা নির্ব্বাহ ক'রছে, কোথাও বা কেবল ব্যবসাদারীটাই বেঁচে থাকবার একমাত্র উপায়। বোখারাবাসীদের মধ্যে পারস্য দেশীয়রা ও তুর্কজাতি-উদ্ভূত উজবেগরা—এই দুই জাতের লোকের সংখ্যাই বেশী। আরববাসীও আছে; তবে তাদের সংখ্যা

মস্জেদের সম্মুখে । (উপরে নামাজকারিগণ, পথে ইহুদি একজন মরু-পথিক)
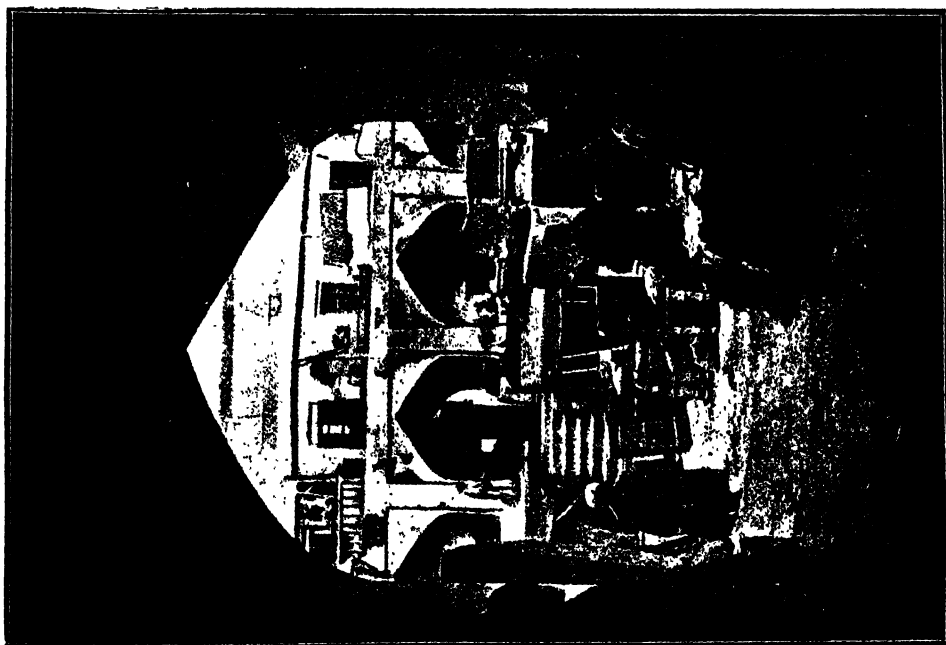
বোখারার একটি পুরাতন সরাইখানা

নিতান্তই কম। বোখারায় হিন্দুও আছে বিস্তর, কিন্তু তারা কেউ সেখানে ঘরবাড়ী তৈরী করে বাস করে না। তাদের অনেকেরই ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে অল্প দিনের জন্য সেখানে থাকা। তাছাড়া মহাজনী কারবারটাও সে অঞ্চলে হিন্দুদের যেন একেবারে একচেটিয়া। য়িহুদি, আর্ম্মেণীয়ান ও জীপ্সীদেরও সেখানে দেখ্তে পাওয়া যায়। বোখারার পাহাড়ীরা, 'তাজিক্' নামেই পরিচিত। তাজিকরা পাহাড়ী বটে কিন্তু দুর্দ্দান্ত নয়। ঠাণ্ডা মেজাজের লোক, চাষবাস করবার প্রতি তাদের বিশেষ অনুরাগ আছে। কি পাহাড়ী, কি সহুরে—তাদের সবারই চেহারাটা কিন্তু ভারি সুন্দর। তাজিক্ মেয়েরা সবাই অপূর্ব্ব রূপসী। যদিও দেখ্তে তারা ঈষৎ খর্ব্বকায়, কিন্তু মুখের গঠন তাদের ভারি সুন্দর। চোখদুটি যেন পটোলচেরা, বেশ দীর্ঘায়ত ভ্রমরকৃষ্ণ আঁখিতারা। মাথায় মেঘের মতো একরাশ কালোচুল। সর্ব্বদা—অবগুণ্ঠনাবৃত ও পর্দ্দা-নসীন থাক্তে হয় বলেই তাদের গৌরবর্ণ তেমন উজ্জ্বল নয়, বরং একটু যেন পাণ্ডুর। পূর্ব্বেই বলেছি যে উজ্‌বেগদের মোঙ্গলীয়ানদের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তবে এদের চেহারা আরও ভাল এবং চোখদুটিও একটু বড় বড় আছে। কিন্তু তাজিক্‌দের চেহারার সঙ্গে উজ্‌বেগদের তুলনাই হয়না। তাজিকরা অবয়ব সৌষ্ঠবে উজ্‌বেগ্‌দের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। তুর্কমানরা এখন চাষবাস করে বটে, কিন্তু এক সময় তারা যাযাবর ছিল। এদের কোনও কোনও দল এখনও স্থায়ীভাবে এক জায়গায় বসবাস করে না। কীরগীজ্‌দের মতো কম্বলের তাঁবু খাটিয়ে আজ এখানে কাল ওখানে করে ঘুরে বেড়ায়। এরা কেউ লিখতে পড়তে জানে না। যাদের পয়সা আছে তারা একজন তাজিক্ মোল্লাকে মাইনে ক'রে রাখে তাদের লেখাপড়ার কাজ চালাবার জন্য। এই তাজিক্ মোল্লারা এক রকম জোর ক'রেই তাদের ছেলে মেয়েদের একটু আধটু লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করে। বোখারার অধিবাসীদের ভাষা হ'চ্ছে 'চাঘতাই'। 'চাঘতাই' তুর্কীভাষারই একটা গ্রাম্য রূপ। 'চাঘতাই' ভাষায় কথা বলতে পারলে যে কোন বিদেশী বোখারার সর্ব্বত্র বেশ স্বচ্ছন্দে ঘু'রে বেড়াতে পার্ব্বেন।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বোখারায় খৃষ্টধর্ম্মই প্রচলিত ছিল, কিন্তু সপ্তমশতাব্দীতে সেখানে ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও পার্শী অগ্নিপূজকদের ধর্ম্মও প্রবেশ করেছে দেখা যায়। এই দুই শেষোক্ত ধর্ম্মের মধ্যে দিনকতক ঘোর প্রতিযোগিতা চলেছিল প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা নিয়ে! শেষকালে হ'ল ইস্‌লাম ধর্ম্মেরই জয়। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে সমস্ত বোখারায় ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিস্তৃত হ'য়ে প'ড়ল। ঘরে ঘরে কোরাণ পাঠও সুরু হয়ে গেল। কেবল বোখারার পূর্ব্বাঞ্চলবাসীদের মধ্যে ঋষি জরাথুস্ত্রের প্রবর্ত্তিত

একজন ভিখারিণী

প্রাচীন পারসীক ধর্ম্ম এমনই গভীর-ভাবে প্রবেশ করেছিল যে প্রবল ইস্‌লাম ধর্ম্মের বন্যা তাকে কিছুতেই স্থানচ্যুত করতে পারেনি। তাই সেখানে অগ্নি-পূজার মন্দির ও অগ্নিপূজক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব এখনও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সুফী সম্প্রদায়ের প্রাধান্যই ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী বোখারায় এখন সকলের চেয়ে বেশী।

বোখারা-বাসী-দের আমোদ-প্রমোদ অধিকাংশই ধর্ম্ম-সংক্রান্ত উৎসব ব্যাপারের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। শিকার করাও তাদের একটা প্রধান ব্যসন। মেড়ার লড়াই, মুর্গীর লড়াই প্রভৃতিও তাদের সৌখীন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিশেষ আমোদ রূপে গণ্য। নাচ্‌টাও তারা খুব ভালবাসে। তবে স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দানসীন ব'লে সেখানে মেয়ে নর্ত্তকীর পরিবর্ত্তে কিশোর বালক নর্ত্তকের দলই নাচের মজ্‌লিশ রক্ষা করে।
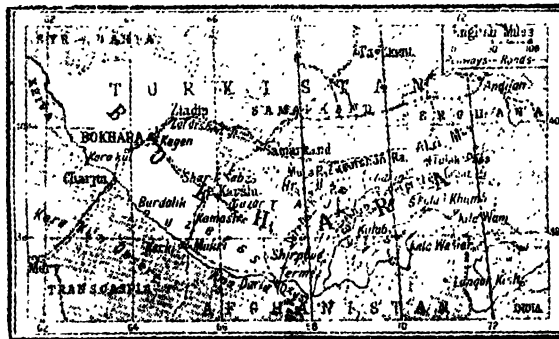
একদল উজ্‌বেগ।

বোখারার মানচিত্র।

পীড়াগ্রস্ত হ'লে তারা ডাক্তার বা হকিমের ধার ধারেনা। টোট্‌কা ওষুধ ও দৈবী দাওয়াই ব্যব-হারেরই তারা বেশী পক্ষপাতী। তাবিজ, পদক, ধুকধুকী, মাদুলী, এসবের প্রচলন তাদের মধ্যে খুব বেশী। ঝাড়ফুক্ মন্ত্র-তন্ত্র প্রভৃতি বুজরুকীতেও তারা যথেষ্ট আস্থাবান।

খাদ্য তাদের প্রধানতঃ টাট্‌কা ফল মূল, রুটী, ভাত আর চাল বাদাম পেস্তা কিস্‌মিস্ আখরোট খোবাণী খেজুর :এসবেরও তারা খুব ভক্ত। তরমুজ তাদের একটা সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। মাংস তারা খায় বটে, কিন্তু খুব কম। প্রত্যহ কেউই মাংস খায়না। খাবার জন্য তারা তৈজস পত্রের তোয়াক্কা রাখে না। একখানা রুমাল বা তোয়ালে বিছিয়ে তার উপর খাদ্য সাজিয়ে নিয়ে খেতে বসে যায়।

তুলসী

ভিষগ্‌রত্ন কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, কবিশেখর এল-এ-এম-এস, এচ-এম-বি

হিন্দুর নিকট তুলসী যতটা পবিত্র বস্তু এমন আর কিছু নহে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর পূজার প্রধান বৃক্ষই হইয়াছে তুলসী। যিনি যাহারই উপাসক হউন না কেন, তুলসীর আদর সকল উপাসককেই সমান ভাবে করিতে হয়। বাস্তবিক বলিতে কি, হিন্দু আমরা, আমাদের নিকটে বিষ্ণু অপেক্ষাও তুলসী যেন বেশী প্রিয় ও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। আমি এ কথা যে অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি তাহা নহে। স্বয়ং ভগবানকেও এ কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। "হরিভক্তি-বিলাসে" আছে,—

> "তুলসী দল মাত্রেন জলস্য চলুকেন বা
> বিক্রীনীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥"

অর্থাৎ—ভক্তি পূর্ব্বক তুলসীদল বা জলাঞ্জলি দিবা মাত্রই ভক্তবৎসল শ্রীহরি ভক্তদিগের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলায় আমরা দেখিতে পাই,—

> "কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন,
> তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন
> 'জল তুলসীর সম কিছু নাহি অন্য ধন।
> তারে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন।'
> এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন;
> গঙ্গাজল তুলসী মঞ্জরী অনুক্ষণ
> কৃষ্ণ পাদপদ্মে করেন সমর্পণ।"

'চণ্ডীদাস' কৃষ্ণ পাদপদ্মে যখন দেহ সমর্পণ করিতেছেন, তখন তিনি এই বলিয়া আত্মনিবেদন করিতেছেন,—

> "কানু অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু, তিল তুলসী দিয়া।"

এত বড় কথা আর কেহ বলিতে পারিয়াছেন কি না জানি না। কারণ, তিল তুলসী দিয়া যে দান করা যায়, তাহা আর ফিরাইয়া লওয়া যায় না—ইহাই মানবের শেষ দান।

শ্রীশ্রীপাগল হরনাথ বলেন—"তুলসীর ছোট বড় নাই।" ইহা খাঁটী সত্য কথা।

তুলসী সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা লিখিয়াছেন। আমি আর সে কথা বলিতে চাহি না। তুলসী যে কেবলই আমাদের ধর্ম্মপথের সহায়—পূজার প্রধান বৃক্ষ—এ সব কথা বলিয়া তুলসী-মাহাত্ম্য বাড়াইতে চাহি না। তুলসী আমাদের কতটা প্রয়োজনীয় বৃক্ষ, সেই কথাই বলিব।

তুলসীর রোগনাশিনী শক্তি সম্বন্ধে 'আয়ুর্ব্বেদ' শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

> "তুলসী কটুকা তিক্তা হৃদ্যোষ্ণা দাহপিত্তকৃৎ।
> দীপনী কুষ্ঠকৃচ্ছ্রাস্র পার্শ্বরুক্কফবাতজিৎ॥
> শুক্লা কৃষ্ণা চ তুলসী গুণৈস্তুল্যা প্রকীর্ত্তিতা।"

অর্থাৎ:—তুলসী—কটু, তিক্তরস, হৃদ্যগ্রাহী, উষ্ণবীর্য্য, দাহজনক, পিত্তকারক, অগ্নিপ্রদীপক এবং কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, পার্শ্বশূল, কফ ও বায়ুনাশক। শুক্লতুলসী ও কৃষ্ণতুলসী উভয়ই তুল্য গুণবিশিষ্ট।

তুলসীর পর্য্যায়:—

> "তুলসী সুরসা গ্রাম্যা সুলভা বহুমঞ্জরী।
> অপেত রাক্ষসী গৌরী ভূতঘ্নী দেবদুন্দুভিঃ॥"

অর্থাৎ—তুলসী, সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, অপেত রাক্ষসী, গৌরী, ভূতঘ্নী ও দেবদুন্দুভি এই কয়টী তুলসীর পর্য্যায়।

এইবার আমি ভিন্ন ভিন্ন রোগে তুলসীর ব্যবহারের কথা বলিব। নবজ্বরে তুলসী—(১) প্রবল সর্দ্দীযুক্ত জ্বরে প্রত্যহ এক ঝিনুক করিয়া প্রাতে ও বৈকালে তুলসীপত্রের রস সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। (২) কৃষ্ণ তুলসী, শিউলী পাতা ও উচ্ছে পাতার মিলিত এক তোলা রস গরম করিয়া মধু ও পিপুল চূর্ণ সহ সেবন করিলে কফ-জ্বর (Catarrhal Fever) ভাল হয়। (৩) শিশু ও বালকবালিকাদের জ্বর হইলে প্রত্যহ দুই বেলা তুলসী পাতার রস এক ঝিনুক করিয়া সেবন করাইলে তিন চারি দিনের ভিতর জ্বর ভাল হয়।

বৃশ্চিক দংশনে তুলসী—তুলসীর মূল পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত পূর্ব্বক সেই গুড়িকা বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে লাগাইলে জ্বালা নিবারিত হয়।

বোলতা ভীমরুলের বিষ প্রশমন করিতে তুলসী পত্রের রস বিশেষ কার্য্যকরী।

"সপত্র তুলসী শাখা হস্তে ধারণ করিয়া থাকিলে, তাহার গায়ে

মশক দংশন করিতে পারে না। মশকগণ তুলসী বৃক্ষের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। মশক ম্যালেরিয়া-বাহী বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা প্রত্যহ তুলসী ভক্ষণ ও তুলসীর রস অঙ্গে মর্দ্দন করুন, মশক নিকটে যাইবে না। তুলসীর রস ভক্ষণ ও গাত্রে মর্দ্দন করিলে চর্ম্ম রোগগ্রস্তের ও বিশেষ উপকার হয়।

বজ্রাঘাতে হতজ্ঞান রোগীকে সত্বর তুলসীর রস ভক্ষণ করাইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার দেহে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার জ্ঞান-সঞ্চার হয়। দুইবেলা তুলসী পত্র ভক্ষণ করিলে শরীর মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হয়। তুলসীর মূল বাহুতে বন্ধন করিয়া রাখিলে তাহার বজ্রাঘাতের ভয় থাকে না। অনেক গৃহস্থ নূতন গৃহ নির্ম্মাণ কালে মটকার কাষ্ঠে হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্রে তুলসীর মূল বাঁধিয়া দেন,—সে গৃহে কখন বজ্রাঘাতের ভয় থাকে না। শাস্ত্রকার বলেন—"যাহার গৃহে সতেজ তুলসী বৃক্ষ থাকে, তথায় বজ্রপাত হয় না।"

রক্তপিত্তে (Hæmorrhage) তুলসী—তুলসী ও কামিনী পাতার রস সেবনে রক্তপিত্ত ভাল হয়।

কুষ্ঠে (Leprosy) তুলসী—প্রত্যহ দুইবেলা তুলসীর রস এক তোলা করিয়া সেবন করিলে ও তুলসী পত্রের রস গাত্রে উত্তম রূপে মর্দ্দন কাবলে এবং প্রফুল্ল অন্তঃকরণে গোমূত্র পান করিলে কুষ্ঠব্যাধি সাধ্য হইয়া থাকে।

শ্বাস (Asthma) রাজযক্ষ্মা (Phthisis) রোগীরা প্রত্যহ তুলসী রস সেবন করিলে উপকার হয়।

তুলসীর মালা—তুলসী কাষ্ঠের মালা ধারণ করিলে বহু প্রকার অসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে। যাঁহারা বহুবিধ চিকিৎসা করাইয়া জীবনে হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা তুলসী কাষ্ঠের মালা ধারণ করিবেন। দেখিবেন—মন্ত্র-শক্তির ন্যায় অচিরে রোগমুক্ত হইয়া নবজীবন প্রাপ্ত হইবেন। সর্ব্বদা মনে রাখিবেন—তুলসী বৃক্ষে বৈদ্যুতিক শক্তি বড়ই প্রবল ভাবে বহিয়া থাকে। তুলসী সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত—

শ্বেত তুলসী—উষ্ণ, ঘর্ম্মকারক ও পাচক। বালকের প্রতিশ্যায় ও কফরোগে (given to children in cold and catarrh) প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বাবুই তুলসী—ঘর্ম্মকারক, পিচ্ছিল, বায়ুনাশক ও উষ্ণ। ইহা আমাতীসার, কফরোগ, প্রসবের পরবর্ত্তী বেদনা, জীর্ণ জ্বরের শৈত্যাবস্থায় (cold stage of intermittent fever) এবং বমন প্রশমনার্থ (and to allay vomiting) ব্যবহৃত হয়। ইহা রক্তমূত্রে (urinary disorders) বৃক্কের পীড়া, আমবাত (Rheumatism) রক্তাতিসার ও কাস রোগে সেবিত হইয়া থাকে।

(শ্বেত তুলসী ও কৃষ্ণ তুলসী—শীত স্নিগ্ধ, কফনিঃসারক, জ্বরনাশক। মরিচের সহিত ফুসফুসের শ্লেষ্মা ও কফরোগে সেব্য। শুষ্ক পত্র চূর্ণের নস্য পীনস (Ozæna) ও কীট বিনাশার্থ (For destroying maggots) ব্যবহৃত হয়। শুঠী ও শ্বেত মরিচ চূর্ণ সহ পিষ্ট তুলসী পত্র সবিরাম ও অবিরাম (Intermittent and remittent fevers) জ্বরে সেব্য। তুলসী কল্ক দ্বারা পক্ক তৈলের নস্য, কর্ণশূল ও পূতি নাসা স্রাবে হিতকর (The medicated oil is used as drop into the ears in ache and in purulent discharges and into the nose in ozena)। লেবুর রস সহ পিষ্ট তুলসীপত্র দদ্রুগ্রস্ত অঙ্গে মর্দ্দন করিবে। ইহার বীজ—পিচ্ছিল (mucilaginous) মূত্রকারক, অতএব মূত্রকৃচ্ছ্র এবং কাসে প্রযোজ্য।

রামতুলসী—শীতস্নিগ্ধ, বায়ুনাশক। ইহা অন্যান্য কফনিঃসারক বস্তুর সহিত কফরোগে ব্যবহৃত হয়।

রামতুলসী—সদাহ মূত্রকৃচ্ছ্রাদি মূত্র রোগের পক্ষে হিতকরী (strangury and kidney diseases)। হস্তপদ স্ফীতিতে ইহার প্রলেপ হিতকর। তুলসীর কাথে স্নান বা তুলসীর ধূম গ্রহণ আমবাতের পক্ষে হিতকর।" (মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া—আর, এন কোরীকৃত, ২য় খণ্ড ৪৯১, পৃঃ)

ম্যালেরিয়ায় তুলসী—আগে হিন্দু সংসারে তুলসী এবং কৃষ্ণচূড় ফুলের গাছ যত্নপূর্ব্বক পুঁতিয়া রাখা হইত। ইহারা রস টানিয়া সাঁৎসেঁতে ভূমি শুষ্ক করে বলিয়া ইহাদিগকে পুঁতিয়া রাখায় হিন্দু সন্তান ধর্ম্ম ভিন্ন স্বাস্থ্য রক্ষার সুখও অনুভব করিতে সমর্থ হইত। এখন এ প্রথাও দেশ হইতে বিলুপ্ত। কিন্তু ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে আবার সে প্রথার প্রচলন করিতে হইবে। আমার মনে হয়, প্রত্যেক হিন্দু-সন্তান যদি একটী করিয়া তুলসী বৃক্ষ যত্নপূর্ব্বক বাড়ীতে পুঁতিয়া রাখার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আবার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হইতে পারিব।

বাংলায় পাট

শ্রীহরিচরণ চট্টোপাধ্যায়

পাট চাষের আঁধার দিকটা দেখিয়ে এবং পাটের ব্যবসায় নখদন্তের উল্লেখ করে—অনেকে পাট চাষ সম্বন্ধে নানা অনুযোগ অভিযোগ করেন। কেহ বলেন, পাটের চাষের জন্য দেশে নিত্য দুর্ভিক্ষ। কেহ বা বলেন, এই যে দেশব্যাপী ভীষণ ম্যালেরিয়া, যার প্রকোপে সোণার বাংলা শ্মশান হতে বসেছে—পাটের চাষই তার মূল। আবার অনেকে পাটের উপর অন্য কারণে খড়্গহস্ত; কেন না, পাট বেচা টাকায় চাষারা বাবুয়ানী কর্চ্ছে—বিলাসী হয়ে পড়ছে।

প্রথম অভিযোগটা সম্বন্ধে এ কথা এক রকম নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে, পাটের চাষকে দেশের দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করা চলে, যদি পাকা অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পাটের চাষের বাহুল্যে ধানের চাষের জমী কমে গেছে বা যাচ্ছে—পাটের চাষ ধানের চাষের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সে প্রমাণ কোথায়? যাঁরা বাংলায় চাষ

বাদের খবর রাখেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে ইংরাজী ১৮৯৫ সালেও যত বিঘা পাটের আবাদ হয়েছিল, ইং ১৯২৩ সালেও প্রায় তত বিঘাই পাটের আবাদ হয়েছে ; সুতরাং এ কথা এক রকম ঠিক যে, পাটের চাষের জন্য ধানের চাষ হ্রাস পায় নাই। যে সমস্ত জেলায় পাটের চাষ হয়, সেখানকার মোট চাষ জমীর হিসাবে পাটের জমী বোধ হয় বড় জোর দশ ভাগের এক ভাগ ; অধিকন্তু দেখা যায় যে, অনেক জমীতে পাটের পরে আবার ধান রোওয়া হয়। এরূপ অবস্থায় ধান চাষ কমে যাচ্ছে বলে পাটের চাষের বিরুদ্ধে চীৎকার একান্তই অন্যায়—নিতান্তই অসঙ্গত। সত্যি কথা আমাদের কারো অজ্ঞাত নয় যে, আমাদের দেশে খাদ্য শস্যের অভাবে কখনও দুর্ভিক্ষ হয় না। এখানে দুর্ভিক্ষ হয় অন্নাভাবে নয় ;—অর্থাভাবে। আমাদের দেশে আজও যে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশী। একটা কথা এখানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, অনেক দেশ পৃথিবীতে আছে, যেখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না, অথচ টাকার অভাব নাই বলে সে সব দেশের লোক দুর্ভিক্ষ কাকে বলে জানেই না।

অভিজ্ঞ ও সন্ধানী যাঁরা তাঁদিগকে বলা বাহুল্য যে, পাট চাষের দ্বারা বাংলার চির-আর্ত্ত কৃষকের আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। পাট চাষ না থাকিলে বাংলার কৃষকের দুর্ভিক্ষের দ্বারে বাস কায়েমী হয়ে যেতো এবং তার বুক-ফাটা হাহাকারে বাঙালীর কাণে তালা লেগে যেতো। যাঁদের জমী জায়গা আছে, তাঁদের কারো অবিদিত নেই যে, যে বছর চাষীর মরণহরণ পাট চাষ বিফল হয়—সে বছর চাষী প্রজার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সে খাজনা দিতে পারে না—তার ঘরে ভীষণ দৈন্য রিরি কর্ত্তে থাকে। এক মুঠো ভাতের জন্য, লজ্জা নিবারণের একটুকরা কাপড়ের জন্য সে উপায়ান্তরের অভাবে মহাজনের দ্বারস্থ হয়।

চাষীর জীর্ণ জীবনের ও তাহার নিরানন্দ জীবন যাত্রার সব কথা খুঁটিয়ে বুঝে ও খতিয়ে দেখে একটা কথা বেশ জোর করে বলা যায় যে, বাংলার চাষীর জীবন-পথে পাথেয়ের চির-অভাবের মূল কারণ হ'চ্ছে তাহার সর্ব্বনেশে আলস্য। এই আলস্যের জন্যই তার জীবনে মরণবীণার কঠিন সুর কখনও একেবারে থামে না। সে বছরের মধ্যে ৩।৪ মাস খেটে পাটটী ও ধানটী তৈরী করে ; প্রয়োজন সত্ত্বেও, শক্তি থাকিতেও, বাকী কয় মাস পায়ের উপর পা দিয়ে আরামে বসে খায়। হতে পারে যে, এই আলস্যেরও মূল অন্নাভাবজনিত শক্তির অভাব ; কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন মতভেদ থাকতে পারে না যে, বাংলার চাষী যদি ভাল করে বেশী করে টাকার মুখ দেখতে চায়, তাহলে তার কুড়েমী করে চল্‌বে না। অসীম দারিদ্র্যের গুরু অন্ধকার ঘুচিয়ে উদার আলো যদি সে তার জীবনে দেখতে চায়, তাহলে তাকে নিরলস হয়ে বারো মাস সমানে খাটতে হবে। জমী বছরের মধ্যে ৬ মাস ফেলে না রেখে যথোপযুক্ত জমীর খোরাক যুগিয়ে—তাতে সোণা ফলিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় শক্তির অব্যবহার, অপব্যবহার ও কর্ম্মপরতায় শৈথিল্যের ফলে দিনে দিনে তাহার মরণ পরিণাম শীর্ণতা অবশ্যম্ভাবী।

দ্বিতীয় অভিযোগটা ষোল-আনাই অমূলক। বাংলার যে সব জায়গায় পাটের চাষ বেশী হয়—সে সব জায়গায় তেমন ম্যালেরিয়া নাই। তাছাড়া ডাক্তারদের কথাটা যদি সত্য হয় যে, ম্যালেরিয়া দরিদ্রের রোগ—অনশন অর্দ্ধাশনের অবশ্যম্ভাবী ফল—তাহলে প্রশ্রয় দিতে হবে পাটের চাষের, যাতে করে দেশে বেশী টাকা আসে। এই টাকা আসবার পথে আগোড় বেঁধে দিলে ফল যে ভাল হবে না, তা অস্বীকার করা শক্ত।

তৃতীয় অভিযোগটী সম্বন্ধে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, নিত্য দুর্ভিক্ষ-দ্বার-বাসী চাষীরা নিজেদের আটপৌরে জীবনের অভাব অসচ্ছলতার কথা ভুলে গিয়ে পাট বেচা টাকা নানারকম সখের জিনিস কিনে নষ্ট করছে। কিন্তু তাই বলে পাটের চাষ বন্ধ করে দেবার পরামর্শ কি সৎপরামর্শ? পাট-বেচা টাকা বাসনার ঘোরে বিলাসিতায় ব্যয় করা যে খুব অবিবেচনার কাজ, সে সম্বন্ধে দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু পাট তার জন্য দায়ী বা দোষী নয়। টাকা উড়িয়ে পুড়িয়ে দেওয়া যার স্বভাব, সে যে রকম কোরেই টাকা রোজগার করুক না কেন, উড়িয়ে দেবেই ; কিন্তু তাই বলে উপায়ের পন্থাটাকে দোষ দেওয়া যায় কি? চাষীর বিলাস-ব্যাধির মূল দূর কর্ত্তে গেলে, তাহার অর্থাগমের পথ অবাধ রাখিয়া তাকে সংযমী ও সঞ্চয়ী হতে শেখাতে হবে। দরদের ভিতর দিয়ে তাকে বোঝাতে হবে, শেখাতে হবে যে, অপ্রয়োজন ব্যয় মাত্রেই অপব্যয়। সংযম না শিখিলে বিলাস হিসাবে চির-তৃষিত চির-উপোসিত কৃষক তাহার সহজ প্রকৃতির বশেই চলিবে। অন্ন-বস্ত্রের অভাব মিটিয়া টাকা হাতে থাকিলেই সে বিলাস বাসনে খরচ করিবেই ; কারো মানা শুনিবে না। কিন্তু সেই অজুহাতে পাট চাষ বন্ধ করে দিলে চোরের উপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়ার মতই বোকামো হবে।

এ কথায় বোধ হয় মতভেদ নাই, যে, পাটের দৌলতে বাংলার ঘরে কি বছর অল্প বিস্তর টাকা আসছে, এবং তার ফলে, যে চাষী ছেলে পুলে নিয়ে অনশনে অর্দ্ধাশনে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিন কাটাতো, সে পেটপুরে খেতে পাচ্ছে, সহজে জমীদারের খাজনা—গোমস্তার তহুরী-পার্ব্বণী ও মহাজনের পাওনা আদায় দিচ্ছে। তবে স্থায়ী-ভাবে যে চাষীর অবস্থা সচ্ছল ও উন্নত হচ্ছে না—সে যে আজও সবার নীচে—সবার পিছে পড়ে আছে, তার কারণ সে সংযমী নয়, সঞ্চয়ী নয়, হিসাবী নয়, দূরদর্শী নয়। দুর্দ্দিনের চির ক্রীড়নক সে—শাশ্বত অভাব তার চির-সহচর—কাজেই সামান্য আর্থিক সচ্ছলতা তাকে বাঁধন-হারা—আত্মহারা করে তোলে। সে আপাতমধুর বিলাসের খতিরে নানা রকমে পয়সা নষ্ট করে। বিলাসের সেই আপাতমোহন দুঃখ-পরিণাম আহ্বানে কাণ দিতে বা সাড়া দিতে কেহ নিষেধ করিলে, বলিয়া ওঠে, "আজ খেয়ে নেড়া নাচে, কাল গোবিন্দ আছে।" তবে চাষীর বিলাসিতা সম্বন্ধে যাঁরা বড্ড বেশী আক্ষেপ বা ক্রন্দন করেন তাঁদিগকে একটী কথা এখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যেতে পারে যে, বিলাসিতার পরিণাম নির্ধনের পক্ষে বিষময় হলেও, The enjoymen of

luxuries affords an incentive to exterior and promotes progress in many ways."

পাট বাংলার একচেটে জিনিষ। উহার তুলা জিনিস আজও কেহ অন্য কোথাও আবিষ্কার করে পারেনি। এরূপ অবস্থায় পাটের দাম বিদেশী বণিক বা দেশী ব্যাপারী কেহই কমাতে পারেন না, যদি চাষী বেশ চেপে বসে থাকতে পারে। চাষী ইচ্ছা করলে শক্তি সঞ্চয় করে ক্রেতাকে উপেক্ষা কর্ত্তে পারে। কারণ, ক্রেতার পাট একান্তই দরকার নাহ'লে চলবে না। "ক্রেতার গরজে বিক্রেতার সুযোগ," অথচ পাটের চাষী এ সুযোগ পায় না; কেন না, সে মাল ধরে চেপে বসে থাকতে পারে না। যদি সে পারিত, তাহলে তার হাল আমরা আজ অন্য রূপ দেখতাম। কিন্তু কথা হচ্ছে, চাষী কি মাল ধরে রাখতে পারে? আমার মনে হয় পারে, যদি সে জমিদারের খাজনার ও নিজের সংসারের মেকদার—খাদ্যশস্য উৎপাদন করে—আর যদি চাষীরা সকলে একমত হয়ে পাটের পড়তা খতিয়ে বিক্রীর দর ঠিক করে মাল বিক্রী করে। এই দুইটা উপায়ের প্রথমটা কিছুই শক্ত নয়। দ্বিতীয়টি একটা সমবায়ের মধ্যে মিলিত হইয়া একযোগে কাজ করা—আমাদের এই অনৈক্যের দেশে একটু শক্ত বটে, কিন্তু খুব শক্ত বলে আমার মনে হয় না।

অর্থনীতি শাস্ত্র আমি জানি না; কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, "বিদেশের টাকা দেশে এলেই এবং দেশে থাকিলেই দেশ ধনী হয়; আর দেশের টাকা বিদেশে গেলেই দেশ দরিদ্র হইয়া পড়ে।" তবে যদি কেহ বলেন যে, সোণা-রূপা হীরা-জহরৎ ধন নয়, জীবন ধারণের উপযোগী সামগ্রীই ধন; তাহলে সে আলাদা কথা। অর্থতত্ত্বের সে সব জটিলতা নিয়ে সুচারু রূপে নাড়াচাড়া করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে "ভারতবর্ষ" "ভাত কাপড়" নামক প্রবন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় চাষীর সুবিধার জন্য উৎপাদককে এবং ভোক্তাকে মুখোমুখী করে পাট কেনা-বেচার পরামর্শ দিয়েছেন। পরামর্শটা নিঃসন্দেহ খুবই ভাল এবং চাষীর পক্ষে পরমহিতকর; কিন্তু পরামর্শটা এ সংসারে কাজে লাগানো বোধ হয় অসম্ভব। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্র থেকে মাঝের তৃতীয় ব্যক্তিকে সরানো বড় কঠিন, বোধ হয় অসম্ভব। আমার মনে হয় যে ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাপারীরও একটা উপযোগিতা আছে।

চাষীর পক্ষে মহাজন ও ব্যাপারী হয়ত দুষ্টগ্রহের মত, কিন্তু ঐ দুটী না হলেও তার চলবার যো নাই। চাষীরা শিল্পীরা যে আজও বিপদ আপদ ঠেলে, দুর্দ্দিন দুর্যোগ কাটিয়ে কায়ে প্রাণে সম্বন্ধ রেখে বেঁচে আছে ও দেশের লোকের রসদ যোগাচ্ছে, এবং অভাব মেটাচ্ছে, তা নিয়ত-নিন্দিত এই দুই শ্রেণীর লোকের সাহায্যে ও অনুগ্রহে।

পূর্ব্বেই বলেছি, আমি অর্থনীতিজ্ঞ নই। হয়ত এই আলোচনায় আমি এমন সব মত প্রকাশ করলাম, যা পড়ে পাঠকেরা পক্ষে হাসি চেপে রাখা শক্ত হয়ে পড়বে। তথাপি ভুল শোধরাবার অবসর পাব বলে ব্যাপারটা আমি যেমন বুঝেছি তেমনি বললাম। আমার ধারণা—অর্থনীতি শাস্ত্রে যতই পাণ্ডিত্য প্রকাশ থাক না কেন, লোকে উহার কথার মারপ্যাঁচে ভুলে গিয়ে উহাকে যথাই অভ্রান্ত বলে মনে করে, সত্যি সত্যি উহা ততটা অভ্রান্ত নয়। কারণ, উহার ভিত্তি কতকটা শোনার ভিতর দিয়া জানা, আর বাকী সবটাই নিছক অনুমান। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, অনুমান চিন্তা ও গবেষণার ফল হলেও অনুমান বই আর কিছু নয়।

ডাক্তার সুবোধ মিত্র এম-ডি (বার্লিন)

যে সকল ভারতবাসী বিদেশে গিয়া নানা দিক দিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, ডাক্তার সুবোধ মিত্র তাঁহাদের অন্যতম। এই মেধাবী কর্ম্মবীর নবীন বাঙ্গালী ডাক্তার দুই বৎসর পূর্ব্বে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া জার্ম্মাণী যাত্রা করেন, এবং সেখানে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধাত্রীবিদ্যা

ডাক্তার সুবোধ মিত্র এম-ডি

বিষয়ক মৌলিক গবেষণায় তৎপর হন। দুই বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার মৌলিক গবেষণা জার্ম্মাণ পণ্ডিতদের নিকট আজ সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার মৌলিক গবেষণার ফল

জার্ম্মাণীর অনেক মনীষি আপনাদিগের গ্রন্থে উদ্ধৃত করিতেছেন। একজন বাঙ্গালীর নাম ও তাঁহার গবেষণার ফল এইরূপ ভাবে জার্ম্মাণ ভাষায় গুণগ্রাহী জার্ম্মাণ পণ্ডিতদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইতেছে, ইহা ভারতের পক্ষে গৌরবের কথা। সম্প্রতি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এম ডি ডিগ্রি দিয়াছেন। ধাত্রীবিদ্যায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি ইনিই প্রথম বাঙ্গালী। বার্লিনের Charitie Female হাসপাতাল জার্ম্মাণী সাম্রাজ্যের ভিতর একটী বিরাট প্রতিষ্ঠান। এই ধাত্রী-মন্দিরে এ পর্য্যন্ত কোন বঙ্গবাসী, শুধু বঙ্গবাসী কেন, কোন ভারতবাসী সহ্য করা এক দিকে যেমন জার্ম্মাণদিগের উদারতার পরিচায়ক, অন্য পক্ষে তাহা ডাক্তার মিত্রের প্রতিভার গৌরবকেও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। জার্ম্মাণীর অন্তর্গত Innsbruck বিজ্ঞান মহাসভা (যেখানে ইয়োরোপের বড় বড় পণ্ডিতগণই শুধু বক্তৃতা দিবার অধিকার পান) ডাক্তার মিত্রকে তাঁহাদিগের আগামী অধিবেশনে জার্ম্মাণ ভাষায় ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ক একটী হৃদয়গ্রাহী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে এপ্রিল মাসে X Ray বিষয় লইয়া বার্লিনে Rontzen Congress
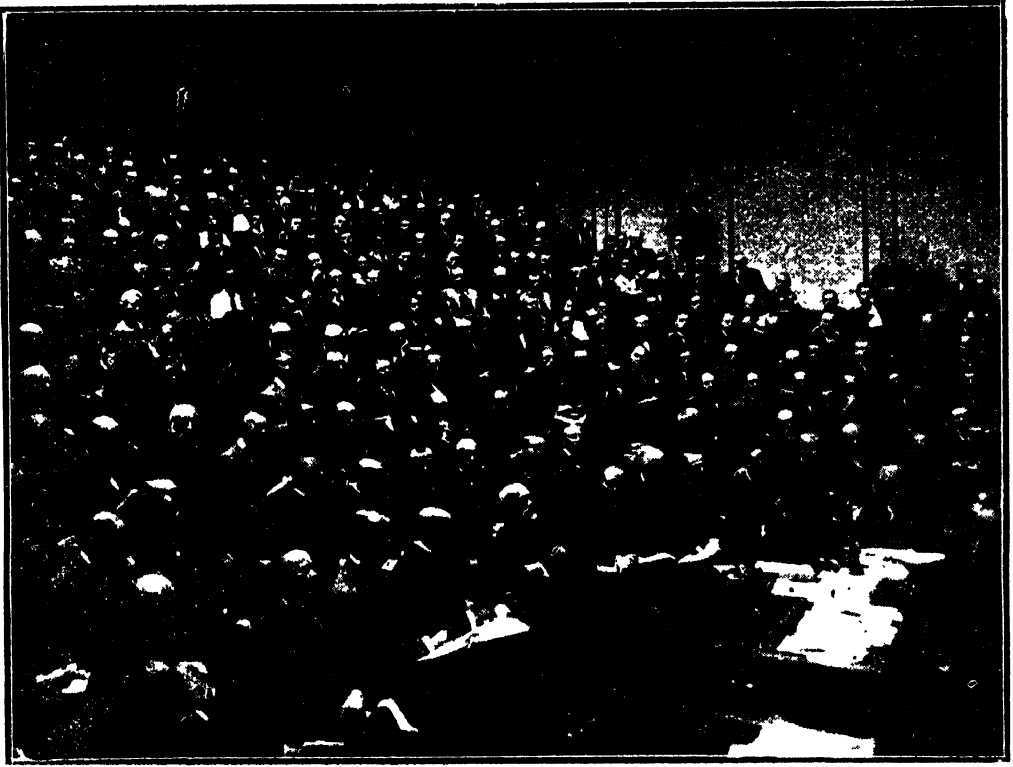
বার্লিনের রণ্‌জেন কন্‌গ্রেস

প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ডাক্তার মিত্রের অধ্যাপক Charitie Female হাসপাতালের ডিরেক্টার জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ মাননীয় Dr. Franz তাঁহার বাঙ্গালী শিষ্যের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এই Charitie Female হাসপাতালে সহকারী করিয়া লইয়াছিলেন। শুধুই তাহাই নয়। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তার মিত্রকে তাঁহাদের Gynaecological Society র অনারারী মেম্বর করিয়া লন, এ সংবাদ Berlin Medical Correspondence নামক সংবাদ-পত্রে বাহির হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। দিনের পর দিন একজন বঙ্গবাসীর হস্তে জার্ম্মাণ রমণীদের অস্ত্রোপচার হয়। সেখানেও একমাত্র ভারতবাসী ডাক্তার মিত্র নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার সুবোধ মিত্র Innsbruck বিজ্ঞান মহাসভায় যোগদান করিবার জন্য, ভিয়েনা, প্রাগ, ব্রাসেলস্‌ প্যারিশ, এডিনবরা, রতুণ্ডা, কুণ্ডা প্রভৃতি সমগ্র ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ক হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়া লণ্ডনে ফিরিবেন। সুদূর বিদেশের সুধী-সমাজে একজন উদীয়মান বাঙ্গালী চিকিৎসক সম্মানিত হইতেছেন, ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে শ্লাঘনীয় সন্দেহ নাই। ডাক্তার মিত্রের সঙ্কল্প ও চির-ঈপ্সিত সাধনা সার্থক হউক, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত সার ওঙ্কারমল জেঠিয়া কে-টি (কলিকাতার বর্ত্তমান শেরিফ)
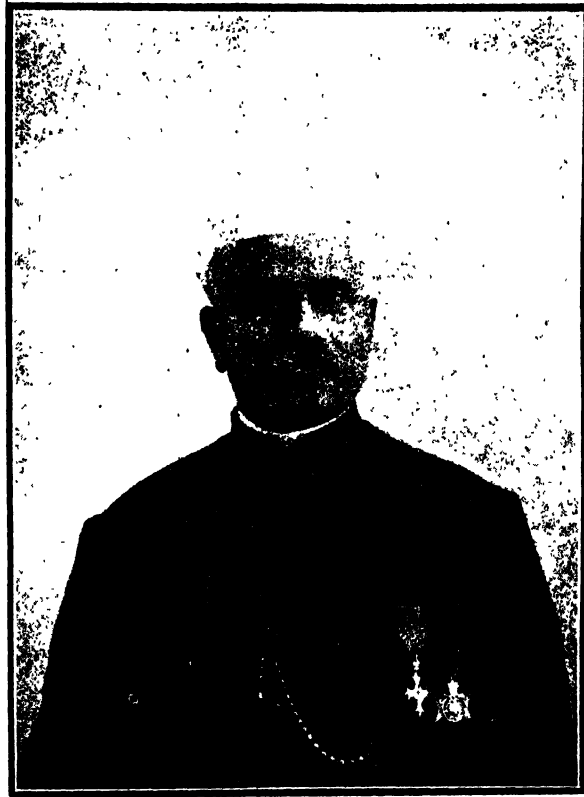
জ্যোৎস্নার পরিচয়

শ্রীরমলা বসু

সমস্ত পূব-আকাশখানা গোলাপী আভায় রাঙ্গা হয়ে উঠেছে, দু'একটা মেঘের টুকরো সে রঙ্গিণ আভায় ভাগ বসিয়ে, তাদের ধূসর গায়ে সে সোণালী রং মেখে নেবে বলে, প্রভাত বাতাসে ভর করে দুষ্টু ছেলের মত ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিয়েছে। পাহাড়ের পায়ের তলে এঁকেবেঁকে অনেক দূর পর্য্যন্ত লাল মেটে রাস্তা চলেছে। দুধারে সবুজ ধানের ক্ষেত দিগন্তে মিশিয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে বড় বড় বাঁশের ঝাড় বাতাসের মৃদু ঠেলায় দীর্ঘতনু সুন্দরীর সরল রেখাটুকুর মাধুর্য্য ধার করে নিয়ে দুলে দুলে উঠছে। তাদেরি মাঝে দুএকটা ঘুমন্ত গ্রাম তখনো অলস জড়তা ভরে নিঃশব্দে পড়ে আছে।

দূরে তারি একখানির ওপর তখনও নিশারাণীর ওড়নার ধূসর প্রান্তটুকু দেখা যাচ্ছে। যত কাছে আসা যায়, তত সেখানা কেঁপে কেঁপে দূরে সরে পালিয়ে যায়। মনে হচ্ছে, যেন একখানি সযত্ন আঁচলের আড়ে ঘুমন্ত গ্রামখানিকে কে না জানি ঢেকে রেখেছে,—যাতে হঠাৎ ভোরের আলো চোখে লেগে ঘুম না তার ভেঙ্গে যায়!

নীলাম্বরী সাড়িখানি পরে, কালো চুলের রাশ এলিয়ে দিয়ে, হাসনাহানার গন্ধ মেখে, হাতে তারার সহস্র প্রদীপের আরতির থালাখানি জ্বালিয়ে, বিফল সাজে, বিফল পূজার আয়োজনে সারারাত কার আশায় নিশারাণী বসে থাকে কে জানে! প্রতি রাতই এমনি ভাবেই কাটে তার।

তার পর প্রভাতের আগমনে যখন সমস্ত জগতে একটা আনন্দ ও জীবনের সাড়া পড়ে যায়, ঊষারাণী হেসে হেসে তার নূতন জীবনের নূতন আনন্দ ও শোভার ডালি নিয়ে অরুণদেবের অভিনন্দনের জন্যে এসে উপস্থিত হয়, তখন ক্লান্ত শ্রান্ত নিশার শোভা আরো ম্লান হয়ে আসে। ধীরে ধীরে পূর্ণ জাগ্রত জগতের এ হাসিখেলা ও জীবনের মেলা দেখতে দেখতে বুকভরা বিষাদ ও তাচ্ছিল্য নিয়ে সে বিদায় হয়। প্রতি দিনই এমনি হয়।

তবে মাঝে মাঝে আজকের দিনের মতই নিজেকে সে সামলে রাখতে পারে না আর,—অনেক দিনের সাবধানতার বাঁধ সব টুটে যায়। নিজেকে লুকিয়ে রেখে একটীবার দয়িতের চিরবাঞ্ছিত মুখখানি দেখে নেবার লোভ ছাড়তে পারে না আর; কিন্তু হাজার সতর্ক হলেও দুষ্টু অরুণ সব টের পায়, তাই সে শত রকম ফন্দিতে নিশারাণীর এই প্রচ্ছন্ন দেখবার চাতুরীটুকু ধরে ফেলবার চেষ্টা করে, তখন নিশা পালাবার পথ পায় না।

ক্রমে আকাশখানা গোলাপী থেকে সিন্দুর রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে উঠল—কিন্তু তখনো অরুণদেবের দেখা নাই। এমন সময় হঠাৎ একটুকরো মেঘের আড়াল থেকে একগাল দুষ্টু হাসি নিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন—আর নিশারাণীর আঁচলের প্রান্তটুকু দেখতে পেয়ে, দুষ্টুমি করে তার আগায় একটুখানি তাঁর কিরণের আভা ছড়িয়ে দিলেন। ধূসর রঙ্গের ওড়নার কোণাটুকু হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্যে, আগুনের মত জ্বলে উঠল, আর তার পর মুহূর্ত্তেই ছুট ছুট—অমনি নিশারাণীর পলায়ন। এ লুকোচুরী ধরাধরির খেলা নিশা ও অরুণের যুগ-যুগান্তর ধরে চলেছে,—কবে শেষ হবে কে জানে?

রোজই অরুণ এমনি করে ধরতে যায়, রোজই নিশা পালিয়ে যায়। অরুণের এ নিত্য-নূতন ধরবার ফন্দিতে নানা আমোদ, নানা হাসি,—কিন্তু নিশার শুধু বুকভরা অভিমান। সে ভাবে অরুণের এতে কিসের লাভ? এমনি করে তার গোপন প্রয়াসটুকু ধরে ফেলে, এমনি করে সহস্র রকমে স্বীকার করিয়ে নিয়ে তার প্রাণের কথা, তার কি লাভ? যা অরুণের কাছে দুদণ্ডের হাসিখেলার ব্যাপার, তাই যে তার বুকের মধ্যে লুকানো,—ঐ পূব-গগনের মতই শোণিত রাঙ্গায় রঞ্জিত চিরদিনের সঞ্চিত ধন, —তা সে চিরদিনই লুকানো থাক্ না কেন? সে তো চির-রজনীর পুঞ্জীভূত অন্ধকার দিয়ে এত দিন ধরে কুতূহলী দৃষ্টির বাহির হতে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে এসেছে।

অরুণের নিত্য-সঙ্গিনী ঊষা। তাদের হাসিখেলা, তাদের আলোখেলা নিয়ে তারা সুখী থাক না কেন? নিশা তো তাদের কিছু চায় না। তবে থাকতে পায় না কেন সে তার অন্ধকার বিষাদরাশির মধ্যে,—বুকভরা অন্ধকার নিয়ে? বড় অভিমানিনী, বড় অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে সে,—হয় সর্ব্বস্ব, নয় কিছু না, এই তার পণ। তাই সে উপরে তাচ্ছিল্য ও ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়ে, বুকজোড়া বেদনার স্মৃতি নিয়ে এতকাল কাটিয়ে এসেছে। সে দুঃখ, সে বেদনা যেন তার একটা অমূল্য সম্পত্তি হয়ে উঠেছে,—যা সে যক্ষের ধনের মত সর্ব্ব চক্ষুর অন্তরাল করে রাখতে চায়। তাই প্রতি রজনীতে এই নিবিড় অন্ধকারের জাল রচনা করে বসে থাকে।

অনেক দিন আগে সৃষ্টির প্রথমে, দুটীতে তারা দুজনার চিরসঙ্গী হয়ে জন্মেছিল,—এক মুহূর্ত্ত তাদের ছাড়াছাড়ি বিচ্ছেদ ছিল না। নিশার মনে সংসারের আর কেউ স্থান পেত না,- সে জেনেছিল অরুণও বুঝি সে ছাড়া আর কারুর পানে তাকাবে না। তারই রইবে একাধিপত্য। এমন সময় এক দিন অরুণ আর একটী খেলার সাথী জুটিয়ে আনলে —মাথায় তার মল্লিকা ফুলের মালা, পরণে আলোক-বরণ সাড়ী,—সারা দেহে একটা তরুণ চাঞ্চল্যের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। মুগ্ধ অরুণ কিছুক্ষণের জন্যে এই তরুণী সঙ্গিনীটিকে নিয়ে, তার চিরসাথীকে ভুলে গিয়ে, খেলায় মত্ত হল। যখন নিশারাণীকে মনে পড়ে গেল, তাদের খেলায় যোগ দেবার জন্যে আহ্বান করতে মুখ তুলে চেয়ে শুধু দেখতে পেলে তার ধূসর ওড়নার একটুখানি প্রান্ত, ও শুধু মুহূর্ত্তের জন্যে দুইখানি অভিমান-আহত চক্ষের বাষ্পাকুল চাহনী। সে বাষ্প এখনও প্রতি রজনীতে শিশির-কণা রূপে গাছপালা কচি ঘাসের ওপর ঝরে পড়ে।

অরুণ দু হাত দিয়ে ধরতে গেল—কিন্তু ততক্ষণে নিশারাণী একেবারে অদৃশ্য। তার ব্যথিত, ক্ষুব্ধ অভিমান ক্ষত চিত্ত নিয়ে চির-অন্ধকারের পথ দিয়ে সে, সে ব্যথা সে বেদনা ঢেকে রাখবার জন্যে সরে গেল চিরদিনের জন্যে অরুণ-দেবের পথ ছেড়ে। তার অভিমানী হৃদয় তার পূর্ণ

অধিকার না পেলে চাইল না আর কিছু। তার চেয়ে সে চিরদিনের জন্যে নূতন দুটী সাথীর পথ ছেড়ে চলে যাবে। তার বুক পূর্ণ করে চির'দন দয়িত তার চির-রাজত্ব করবে,—কিন্তু মুখ ফুটে সে আর কোন দিন তা জানতে দেবে না,—প্রাণ গেলেও সে ধরাও দেবে না। তাতে বুক ফেটে যায় তাও ভালো, তবু অভিমান তার অটল থাকবে। এমনি অদ্ভুত অভিমানী মেয়ে সে। তাই নিশারাণীর বুক জুড়ে চির অন্ধকার।

তবে মাঝে মাঝে কার স্নিগ্ধ মধুর বিমল আভায় কিছু দিনের জন্যে নিশারাণীর অমন বুকভরা জমাট অন্ধকারকেও হাল্কা করে তোলে? কে সে? কে সে নিশাপতি, যে নিশারাণীর অরুণগত প্রাণে আপন প্রতিবিম্ব ফেলে কিছু দিনের জন্যেও এমন করে আশার আলো ফুটিয়ে তুলতে পারে? জানো না কি? কার আলোয় নিশাপতির আলো? কার কিরণে সে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে,—তার নিজস্ব কিছু আছে কি? নিশারাণীর বুকে যে নিশাপতি অরুণেরই স্নিগ্ধ মানসী মূর্ত্তি! নিশারাণীর যত লুকোচুরী, যত লজ্জা, যত অভিমান অরুণ-দেবের সাথে,—অরুণ-দেবের মানস-মূর্ত্তি নিশাপতির সাথে নয়।

নিশাপতিকে বুকে ধরে নিশারাণী তার সব বেদনা, সব অশ্রু, সব কথা অকপটে নিবেদন করতে পারে; আর তখন তাই তার, পুঞ্জীভূত জমাট অন্ধকার ভেদ করে আশার স্নিগ্ধ আলোয় মন তার ভরে ওঠে,—নিখিল জগতে তখন সে আলো জ্যোৎস্না-কিরণ রূপে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু হায়, চিরদিন এমনি যায় না। শুধু দয়িতের মানস-মূর্ত্তি গড়ে, চিরদিনের প্রাণের ক্ষুধা ও সাধ মেটে কই? তখন সব আশার আলো নিভে গিয়ে আবার বিষাদের অন্ধকারে বুক তার ভরে যায়,—জগতে অমানিশার প্রকাশ রূপে।

এমনি চলে আসছে যুগ যুগ ধরে; কত দিন চলে যাবে আরো এমনি করে কে জানে? ধরা দেবে কি অভিমানিনী? না,—প্রতি সন্ধ্যায় বিষাদিনী বিফল পূজার আয়োজন নিয়ে এমনি করে আসবে যাবে?

প্রাচীন কলিকাতা

(১) চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী মন্দিরে নরবলি

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর, বি-এ

কলিকাতার উত্তর-সীমায় 'বাগবাজার-খাল' অবস্থিত। 'বাগবাজার-খালের' উত্তরে গঙ্গাতীরে 'চিৎপুর'-নামক স্থান। এই 'চিৎপুর' বহু দিন হইতেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজ-উদ্দৌলা যখন কলিকাতা অবরোধ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্ব-প্রধান সেনাপতি মীরজাফর এই চিৎপুরেই সেনা-নিবেশ করিয়া 'মারহাট্টা-ডিচের' দক্ষিণ-দিগ্বর্ত্তী বাগবাজারে স্থিত হলওয়েল সাহেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধস্থানকে এখনও লোকে 'বারুদ-খানা' বলিয়া থাকে। এখনও বাগবাজার-খালের তীরভাগে মীর-জাফরের কয়েকটী কামান পোঁতা রহিয়াছে। একদিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁকে এই চিৎপুরে আনিয়া অন্নক্লিষ্ট প্রজাগণের দুর্দ্দশা দেখাইয়া 'বিশ-লাখী' দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। এই চিৎপুর ও বাগবাজারের পশ্চিম-ভাগে গঙ্গাবক্ষে পেরিন সাহেবের ১৪খানি জাহাজ বাঁধা থাকিত। বর্ত্তমান হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট্ হইতে অন্নপূর্ণা ঘাট পর্য্যন্ত এই সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া একটী মনোহর উদ্যান ছিল। লোকে এই উদ্যানকে "পেরিনের বাগান" (Perrin's Garden) বলিত। সস্ত্রীক ওয়ারেন্ হেষ্টিংস, স্যার্ ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ প্রভৃতি বড় বড় সাহেবরা এই উদ্যানে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে বায়ুসেবন করিতে আসিতেন। তৎকালে 'লালদীঘির বাগান' ও 'পেরিনের বাগান'ই সাহেবদিগের

অতি আদরের ধন ছিল। তখন বাগবাজার-খাল হয় নাই; কারণ, বহু দিন পরে (১৮২৪ খৃষ্টাব্দে) ইহা খাত হইয়াছিল। তৎকালে একমাত্র 'মারহাট্টা-ডিচ্' বিদ্যমান ছিল। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে এই 'মারহাট্টা-ডিচ' খনন করা হইয়াছিল। এই চিৎপুরেই মহম্মদ রেজাখাঁর একটী সুবৃহৎ মনোহর বাগানবাটী বিরাজ করিত। আমিও বাল্যকালে এই বাগানবাটীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছি। লোকে এই স্থানকে অদ্যাপি 'নবাবপটী' বলিয়া থাকে। এই চিৎপুরে নবাব মীরজাফরের স্থাপিত একটী মস্জিদ্ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই চিৎপুরে "চিত্রেশ্বরী" ও "সর্ব্বমঙ্গলা" নামা দুইটী ভগবতীর মূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজ করিতেছেন। কোন্ ব্যক্তি কোন্ সময়ে এই দুইটী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। এই চিত্রেশ্বরীদেবীর মন্দিরে বহু দিন হইতেই প্রচুর-পরিমাণে নরবলি দিবার প্রথা ছিল। ১৬০০ খৃষ্টাব্দেও যে এই মন্দিরে নরবলি দেওয়া হইত, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়! 'মনোহর ঘোষ' নামক এক জন কায়স্থ সুবর্ণরেখা-নদীর তীরে বাস করিতেন। তৎকালে মহারাজ মানসিংহ আফ্গানদিগের সহিত সুবর্ণরেখার তীরে যুদ্ধ করিতেছিলেন। মনোহর ঘোষ মানসিংহের অধীনতায় কর্ম্ম করিয়া কোটীশ্বর হইয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় তাঁহার প্রচুর ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হওয়ায়, যৎসামান্য অর্থ লইয়া তিনি চিৎপুরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনিই "সর্ব্বমঙ্গলা" ও "চিত্রেশ্বরী" দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে নরসিংহ নামক এক মোহান্ত এই দেবীদ্বয়ের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। মনোহর ঘোষ, দেবীদ্বয়ের সেবার নিমিত্ত যথেষ্ট ভূমি-সম্পত্তিও প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই।

১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মনোহর ঘোষের মৃত্যু হইয়াছিল। তৎকালে চিত্রেশ্বরী মন্দিরে এত নরবলি দেওয়া হইত যে, মনোহর ঘোষের পুত্র রামসন্তোষ ঘোষ, চিত্রেশ্বরী মাতাকে প্রত্যহ প্রাতঃকালে প্রণাম করিতে গিয়া বহুসংখ্যক নরমুণ্ড দেখিতে পাইতেন। এই ভীষণ ব্যাপার অসহ্য হওয়ায় তিনি চিৎপুর ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে গিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরিশেষে কোন কারণ বশতঃ তাঁহার একমাত্র পুত্র বলরাম ঘোষ, বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া চন্দননগরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইনি অতি বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তৎকালে ফরাসী গভর্নর ডিউপ্লে সাহেব, চন্দননগরে বসিয়া সমগ্র বাঙ্গালা দেশে ফরাসী রাজ্য স্থাপনের কল্পনা করিতেছিলেন। বলরাম ঘোষ স্বীয় বুদ্ধিবলে ক্রমে ক্রমে ডিউপ্লে সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অবশেষে তাঁহার দেওয়ান হইয়া বসিলেন। তৎকালে দেওয়ান হইলেই মানুষ রাতারাতি ধনাঢ্য হইয়া পড়িত। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজ-উদ্দৌলা কলিকাতা অবরোধ করিয়াছিলেন। এই বৎসরেই বলরাম ঘোষের মৃত্যু হইয়াছিল। বলরাম ঘোষের প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র রামহরি ঘোষ এবং শ্রীহরি ঘোষ চন্দননগর ত্যাগ করিয়া বাগবাজারে কাঁটাপুকুর নামক স্থানে সুবৃহৎ ও মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। শ্যাম-বাজারে স্বর্গগত মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বাটীর সম্মুখ দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত যে একটী অতি পুরাতন রাস্তা আছে, তাহার নাম "বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট্"। বলরাম ঘোষের নামানুসারেই এই রাস্তার নাম এইরূপ হইয়াছে। হোগলকুঁড়িয়ায় যে "হরি ঘোষের ষ্ট্রীট্" নামক একটী রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও বলরাম ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীহরি ঘোষের নামানুসারেই চলিয়া আসিতেছে। কাঁটাপুকুরে হরি ঘোষের যে বৃহৎ বাটী ছিল, আমিও বাল্যকালে তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছি।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, মনোহর ঘোষ "চিত্রেশ্বরী-মন্দির" নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। কেহ কেহ কহেন যে, বেহালা-বড়িষার সাবর্ণ-চৌধুরী মহাশয়েরাই এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, চিৎপুরে "চিতে"—নামক একজন ডাকাত বাস করিত। সেই ব্যক্তিই একটী কালী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল, এবং অনুচর-গণ লইয়া ডাকাতী করিতে যাইবার সময় কালী-মাতার পূজা করিয়া ও সময়ে সময়ে নরবলি দিয়া যাইত। উত্তরে দক্ষিণেশ্বর হইতে দক্ষিণে বেহালা-বড়িষা পর্য্যন্ত সমগ্র স্থান সাবর্ণ-চৌধুরী বাবুদিগের জমীদারী ছিল। এরূপ হইতে পারে যে, সাবর্ণ বাবুদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে চিতে ডাকাত ৺কালী-মূর্ত্তির স্বত্বত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

চিতে ডাকাতের নামানুসারে "চিৎপুর" ও "চিৎপুর-রোড্" হইয়াছে। যাত্রিগণ চিৎপুরে "চিত্রেশ্বরী-দেবী" দর্শন করিয়া গভীর জঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমান "চিৎপুর-রোড" দিয়া গঙ্গাপারে রামকৃষ্ণপুরের পশ্চিম-দিগ্বর্ত্তী বেতোড়ে "ব্যাতাই চণ্ডী" দর্শন করিতে যাইতেন। পরে সে স্থান হইতে জঙ্গলপূর্ণ গোবিন্দপুরের মধ্য দিয়া কালীঘাটে ৺কালীমাতার চরণ দর্শন করিতেন।

এইখানে একটী হাস্য-জনক গল্প না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বড়িষার সাবর্ণ-চৌধুরী বাবুরা তৎকালে অতি বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্ম-কার্য্যে মুক্তহস্ত এবং পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারাই এক দিন সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা হইয়াছিলেন। এই বংশের আদি-পুরুষ কামদেব ব্রহ্মচারী। তৎপুত্র লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার, তৎপুত্র গৌরহরি, তৎপুত্র শ্রীমন্ত ও তৎপুত্র কেশবরাম রায় চৌধুরী। এই কেশবরামই বড়িষার প্রকৃত জমীদার। ইঁহার চতুর্থ পুত্রের নাম শিবদেব রায় চৌধুরী। সাধারণ লোকে তাঁহাকে 'সন্তোস রায়' বলিয়া ডাকিত। সন্তোষ রায়, ভীমের ন্যায় বলবান্ ও ঔদরিক পুরুষ ছিলেন। তৎকালে তাঁহার মত দাতা, ভোক্তা ও ভোজয়িতা আর কেহই ছিলেন না। শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি লক্ষাধিক বিঘা ভূমি দেবত্র ও ব্রহ্মত্র স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। তিনিই কালীঘাটে ৺কালীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

১৭৪১ খৃষ্টাব্দে "বর্গীর হাঙ্গামা" হইয়াছিল। ইহার ভীষণ প্রভাবে সমগ্র বাঙ্গালা-দেশের অধিবাসিগণ বিকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। বর্গীরা নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর নিকটে "চৌথ" চাহিয়া বসিল। নবাবও উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহা দিতে স্বীকার করায় বর্গীরা শান্ত ভাব ধারণ করিল। নবাব কিরূপে "চৌথ" দিবেন, ইহাই তাঁহার ভীষণ চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। তাহার ধনাগার শূন্য। তখন বিপদে পড়িয়া তিনি জমীদারদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। জমীদার-গণও অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় নিরন্ন প্রজা-গণের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও সন্তোষ্ রায় নিরূপিত রাজস্ব না দিতে পারায় আলিবর্দ্দীর কারাগারে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, আলিবর্দ্দীকে চিৎপুর ও বাগবাজারের প্রজাগণের দুর্দ্দশা দেখাইয়া "বিশ-লাখী দায়" (কুড়িলক্ষ টাকার দেনার দায়) হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এখন সন্তোষ রায় মহাশয় কিরূপে আলিবর্দ্দীর কারাগার হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও পাঠকগণের অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। সন্তোষ রায় মহাশয় ভীমের ন্যায় বলবান্ ও ভোজনপটু ছিলেন। তিনি বাটীতে যেরূপ মনের মত আহারীয় বস্তু দ্বারা উদর-পূর্ত্তি করিতেন, নবাবের কারাগারে তিনি সেরূপ আহারীয় সামগ্রী পাইতেন না। এই হেতু তাঁহার মহাকষ্ট হইতে লাগিল। নবাবের একটী বৃহৎকায় ও বলিষ্ঠ প্রিয় খাসি ছিল। এক দিন এই খাসি লইয়া নবাবের একজন খানসামা মুরশিদাবাদের কোন এক রাস্তায় বেড়াইতে গিয়াছিল। রায় মহাশয় লোভ-সংবরণ করিতে না পারিয়া সেই খানসামার নিকট হইতে খাসিটী ছিনাইয়া লইলেন এবং তাহাকে বধ করিয়া নিজ পাচক-ব্রাহ্মণ দ্বারা সেই সমগ্র খাসিটী রন্ধন করাইয়া একাকীই ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। খানসামা এই কথা নবাবের কর্ণ-গোচর করিল। নবাব সন্তোষ রায়কে ডাকাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। কিন্তু সন্তোষ রায়ের কথায় নবাবের বিশ্বাস না হওয়ায় তিনি তৎপর দিন তাঁহাকে আর একটী বৃহৎ খাসি খাইতে দিলেন। সন্তোষ রায়ও তাহা বধ ও রন্ধন করাইয়া অবলীলাক্রমে উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া নবাব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমি তোমার অদ্ভুত আহার-দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। যে ব্যক্তি এত অধিক আহার করিতে পারে, সে যে আমার খাজনা বাকী রাখিবে, ইহা আর বিচিত্র কি! তোমার দেনার টাকা আমি তোমায় মকুব করিয়া দিলাম। যাহাতে আহারের জন্য আর আমার খাজনা বাকী না রাখ, তজ্জন্য তোমায় একখানি জমীদারী দান করিলাম।" এই সূত্রে সন্তোষ রায় মহাশয়, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট হইতে একখানি জমীদারী লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী। ইহার নাম "অবৃ খোরাকী-মহল" বা "খোরাকী মহল"।

চিৎপুরে "চিত্রেশ্বরী মন্দিরে" যে কত শত নরবলি হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস" সংগ্রহ করিতে আরম্ভ

করিয়াছিলাম। এইহেতু তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত কে, এম্, বাঁড়ুয্যে (K. M. Banerji) মহাশয়ের নিকটে যাতায়াত করিতাম। তাঁহার মুখে যখন কলিকাতার প্রাচীন কথা শুনিতাম, তখন তাঁহার কন্যা স্বর্গতা মনোমোহিনীও আমার নিকটে আসিয়া বসিতেন। উভয়েই বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের মুখে কলিকাতার পুরাতন কথা শুনিয়া বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতাম। তখন তিনি প্রসিদ্ধ "কলিকাতা-মিউজিয়ম্" বাটীর পূর্ব্বদিকে সদর ষ্ট্রীটে ৭নং বাটীতে বাস করিতেন। এক দিন কথায় কথায় বাগবাজার ও চিৎপুরের কথা উঠিল। তিনি বলিলেন, "মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা মহাশয়ের বাটীর পূর্ব্ব দিকের গলি মধ্যে একখানি বাটীতে আমার জন্ম হইয়াছিল। তৎকালে কলিকাতায় কোন ভদ্রলোক বালকদিগকে অপরাহ্ণ ৪টার পরে বাটী হইতে বাহিরে যাইতে দিতেন না। সেই সময় "ছেলেধরার" এত ভয় ছিল যে, তাহা বলা যায় না। আমরা যখন তখন শুনিতাম, অমুকের ছেলেকে পাওয়া যাইতেছে না। ছেলের মাতাপিতা বাগবাজার ও চিৎপুরে গিয়া ছেলের অনুসন্ধান করিত। যাহারই ছেলে হারাইত, অমনি তাহাকে বাগবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে যাইতে হইত। অতি নীচ জাতির ছেলেকেই সহজে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইত। চণ্ডাল জাতীয় ছেলেই অধিক প্রার্থনীয় ছিল। বাগবাজার ও চিৎপুরের নাম কাণে শুনিতাম বটে, কিন্তু ২৪ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এই দুইটী স্থান চক্ষে দেখি নাই। হরীতকী-বাগানে সহাধ্যায়ী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বাটীতেই প্রাতঃকালে ও দুপুর বেলায় মধ্যে মধ্যে যাইতাম। ২৪ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বাগবাজার ও চিৎপুরে যাওয়া দূরে থাকুক, হেদুয়া-পুষ্করিণীর উত্তর-দিকে পদার্পণ করি নাই। এই পুষ্করিণীর পশ্চিম-দিকে যে গির্জ্জা-ঘর আছে, তাহা আমারই যত্নে স্থাপিত হইয়াছিল। যখন এই গির্জ্জা-ঘর নির্ম্মিত হইতেছিল, তখন একটী চণ্ডাল-জাতীয় মিস্ত্রীর ১২ বৎসর বয়সের পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, সেই ছেলেটী কোন "ছেলেধরা"র হাতে পড়িয়া থাকিবে।"

স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরও মুখে একটী গল্প শুনিয়াছিলাম। তিনি এক দিন রামগতি ন্যায়রত্ন ও আমার সম্মুখে গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "হরীতকী-বাগানে বাবার টোল ছিল। আমি ও আমার এক জন সমপাঠী এক দিন দুপুর বেলায় হেয়ার সাহেবের বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমাদের সাহস আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য তিনি আমাদিগকে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত আট্‌কাইয়া রাখিলেন। অপরাহ্ণে বেলা ৪টার পূর্ব্বে বাটীতে ফিরিবার জন্য বাবা আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। বাবার আজ্ঞা পালন করিতে না পারায় মনে মনে বিষম ক্ষুণ্ণ হইলাম। সন্ধ্যার সময় হেয়ার সাহেব বলিলেন, এখন তোমরা বাটীতে যাইতে পার। একে বৈশাখ মাস, তাহাতে আবার "কাল বৈশাখী"। বর্ত্তমান ছোট আদালতের দক্ষিণ-দিকে হেয়ার সাহেবের বাটী ছিল। লালবাজারে আসিয়াই ঝড়বৃষ্টি পাইতে আরম্ভ করিলাম। তৎকালে আমার ভূতের ভয় ছিল। আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে বাবার মুখে শুনিয়াছিলাম, "রাম-নাম" করিলে নিকটে ভূত আসিতে পারে না। কাজেই আমরা উভয়ে সমস্ত পথ 'রাম-নাম' করিতে করিতে হেদুয়া পুষ্করিণীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তৎকালে এই স্থান অতি ভয়ঙ্কর ছিল। সন্ধ্যার সময় কোন ভদ্রলোকই এই স্থানে আসিতে সাহস করিতেন না। সেই সময়ে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে দুইটীমাত্র বেড়ির তেলের আলোক জ্বলিত। একটী অক্রূর দত্তের বাটীর সম্মুখস্থ গলির মোড়ে, এবং আর একটী হেদুয়া-পুষ্করিণীর উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল। এখন যেখানে ৺কাশীপ্রসাদ ঘোষের বাটী ঠিক তাহারই সম্মুখে দেখিলাম, দুইটী দীর্ঘকায় বলবান পুরুষ দণ্ডায়মান। তখন হেদুয়া-পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে নিবিড় কেয়া-গাছের বন ছিল। এই বনের ভিতর হইতেই উক্ত দুই মহাত্মা লাঠী হাতে করিয়া বাহির হইল। আমরা তাহাদিগকে ভূত-প্রেত মনে করিয়া ক্রমাগত রাম নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। ঠিক সেই সময়ে পশ্চাদ্দিক্ হইতে "ভূদেব, ভূদেব" এই শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছন ফিরিয়া দেখি, হেয়ার সাহেব একখানি ছোট টম্‌টম্-গাড়ী হাঁকাইয়া আসিতেছেন। ঝড়-বৃষ্টিও তখন বিলক্ষণ চলিতেছিল। হেয়ার সাহেব তাঁহার গাড়ীতে উঠিবার জন্য আমাদিগকে বলিলেন

আমি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে 'শ্যালক' বলিয়া সম্বোধন করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। হেয়ার সাহেবকে দেখিয়া সেই দুইটী ভীষণ মূর্ত্তি কেয়া-বনের ভিতরে প্রবেশ করিল। আমি ও আমার বন্ধু, সাহেবের গাড়ীতে না উঠিয়া পদব্রজে আমাদের হরীতকী-বাগানের বাটীর দিকে আসিতে লাগিলাম। পিছনে পিছনে সাহেব মহাশয়ও গাড়ীতে চড়িয়া আসিতে লাগিলেন।

"সন্ধ্যাকাল অতীত হইয়া গেল, তথাপি আমরা উভয়েই বাটীতে আসিলাম না। এই হেতু আমাদের বাটীতে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। দুর্ভাগ্য-বশতঃ সেই দিন বৈকালে দুইটী 'ছেলে-ধরা' আসিয়া আমাদের পাড়া হইতে একটী বাগ্দীর ছেলেকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। ছেলেটীর অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় আমার মাতাপিতার কিরূপ দুর্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা দুই বন্ধু ও হেয়ার সাহেব তিনজনেই একসঙ্গে আমাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদিগকে দেখিয়া তখন মাতাপিতার চিন্তা দূর হইল। হেয়ার সাহেব বাবাকে বলিলেন, আপনার পুত্র আমাকে 'শ্যালক' বলিয়াছে। ইহা শুনিবামাত্র বাবা আমাকে ক্রোধভরে বলিলেন, সাহেব তোর গুরু। গুরুকে এই দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিস্। এখনই ইহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা কর্। আমি সাহেবের পা ছুঁইলাম না, এজন্য বাবা ক্রোধভরে আমার ডান হাত লইয়া তাঁহার পাদস্পর্শ করাইয়া দিলেন।"

এখন পাঠক-গণ! বুঝিয়া দেখুন, এক শত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় মানুষের কিরূপ প্রাণের ভয় ছিল। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ২৪ এপ্রিল তারিখের (১১৯৫ বঙ্গাব্দে ১৫ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার দিবসের) "কলিকাতা-গেজেটে" সম্পাদকীয় স্তম্ভে চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী মন্দিরে একটী নরবলির সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অনুবাদ দেওয়া গেলঃ—"আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইলাম যে, বিগত ৬ এপ্রিল (২৭ চৈত্র, রবিবার) অমাবস্যার রাত্রিতে চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী মন্দিরে একটী ভীষণ নরবলি হইয়া গিয়াছে। ঘোর অন্ধকারের সুবিধা পাওয়ায় এই ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু কে যে এরূপ কার্য্য করিয়াছে, তাহা অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই। পরদিন প্রাতঃকালে নিম্ন-লিখিত ব্যাপার সকল জানিতে পারা গিয়াছে। রাত্রিকালে কোন লোক দরজা ভাঙ্গিয়া মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। কালী মূর্ত্তির পদতলে নরমুণ্ড এবং মন্দিরের চৌকাটের উপরিভাগে দেহের অবশিষ্ট অংশ পড়িয়া ছিল। নরবলি দিবার সময় দেবীর অঙ্গ, নূতন বহুমূল্য বস্ত্র এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত কণ্ঠ-ভূষণ ও বাহু-ভূষণে মণ্ডিত করা হইয়াছিল। পূজার উপযোগী পাত্রাদিও সেই স্থানে পাওয়া গিয়াছে। যেরূপ শাস্ত্রীয় নিয়মে নরবলি দিবার বিধান আছে, পাত্রগুলিও ঠিক তদনুরূপ। নরবলি-যজ্ঞের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া বোধ হয়, ইহা কোন ধনাঢ্য শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরই দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। যাহাকে বলি দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে চণ্ডাল বলিয়াই বোধ হয়। চণ্ডাল-জাতীয় লোককে বলি দেওয়াই শাস্ত্র-সঙ্গত। কোন্ কোন্ ব্যক্তি এই কার্য্যে লিপ্ত ছিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত কলিকাতার ফৌজদার নিত্য-পূজক পুরোহিতকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনরূপ সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।"

ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য

ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, ডি-এস্‌সি, এম-বি

দেশের স্বাস্থ্যের দিকে এখন অনেকেরই নজর পড়িয়াছে। পল্লীগ্রামে নানাপ্রকার স্বাস্থ্যসমিতি, পল্লীমণ্ডলী প্রভৃতি গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। বড়ই আশার কথা সন্দেহ নাই। অনেকে ভাবেন, পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করিলেই বুঝি কাজ শেষ হইল। সহরে মিউনিসিপ্যালিটী আছেন, গভর্মেণ্ট আছেন, সহরবাসীর শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা ইঁহাদেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু সাধারণের ব্যক্তিগত চেষ্টা ভিন্ন, গভর্মেণ্টের সহস্র চেষ্টাতেও সহরের স্বাস্থ্যের উন্নতির আশা নাই। সুখের বিষয়, কলিকাতায় মিউনিসিপ্যালিটির বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলিতে স্বাস্থ্য-সমিতি গঠিত হইতেছে। ইঁহারা পাড়ায় পাড়ায় সহরবাসীর স্বাস্থ্যের উপর লক্ষ্য রাখিবেন। কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে। গভর্মেণ্ট সাধারণভাবে স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করিয়াও, বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ প্রকারের

বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। সৈন্যদের স্বাস্থ্য কিসে ভাল থাকে, গভর্মেণ্ট তাহা বিশেষ যত্নসহকারে দেখেন। অনেক সওদাগরী আপিসে কেরাণীদের স্বাস্থ্য-পরিদর্শনের জন্য ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। বড় বড় কারখানায় ও চা-বাগানে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্যও ডাক্তার নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। দেশের ভবিষ্যতের আশা-ভরসা ছাত্রমণ্ডলীর স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে, সে বিষয়ের চেষ্টার আবশ্যকতা কাহাকেও বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। ইয়োরোপের সর্ব্বত্র ও আমেরিকা জাপান প্রভৃতি দেশে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিবার সুবন্দোবস্ত আছে। ইংলণ্ডের সহিত আমাদের সম্পর্ক অধিক। ইংলণ্ডবাসী ও আমরা একই গভর্মেণ্ট দ্বারা শাসিত। এই ইংলণ্ডে স্কুলের বালক-বালিকাগণের স্বাস্থ্যের ভার "বোর্ড অব্ এডুকেশনে"র হস্তে ন্যস্ত। স্যার জর্জ নিউমান্ এই বোর্ডের প্রধান ডাক্তার। বোর্ড প্রতি বৎসর বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যের একটি করিয়া রিপোর্ট প্রকাশ করেন। বোর্ডের কার্য্যে বিভিন্ন স্থানীয় সমিতিগুলি সাহায্য করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ১৯২৩ সালের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। এই বৎসরে ১৭,৫৪,৯১৯টি ছাত্র পরীক্ষিত হইয়াছে। এই ছাত্রদের মধ্যে শতকরা প্রায় ১৯জন কোন না কোন গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত। ইহাদের চিকিৎসা আবশ্যক। সামান্য সামান্য অসুখের কথা ধরিলে দেখা যায়, প্রায় শতকরা ৫০জন অসুস্থ। এই সকল ছাত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা স্থল কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠিত প্রায় ১,০৭৬ School Clinic বা চিকিৎসালয়ের হস্তে ন্যস্ত। ইহা ছাড়া কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া প্রায় ৬৯০টি হাসপাতাল ছাত্রদিগকে নিখরচায় চিকিৎসা করিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে স্বাধীন চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরাও স্বেচ্ছায় ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত বিশেষ বিশেষ শারীরিক ও মানসিক দোষ বা ত্রুটিযুক্ত ছাত্রদিগের জন্য ৫৩০টি স্বতন্ত্র স্কুলের ব্যবস্থা আছে। একবেলা হিসাবে ধরিলে, কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রায় এককোটি দশ লক্ষ বেলার আহার যোগাইয়াছেন। বোর্ডের মতে, তাঁহাদের চেষ্টার ফলে ছাত্রের মাতা-পিতারা তাঁহাদের বালক-বালিকাদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অধিক যত্নবান্ হইয়াছেন। এত করিয়াও বোর্ড নিজেদের কাজে সন্তুষ্ট নন। তাঁহারা বন্দোবস্ত আরও সুচারু করিবার চেষ্টায় আছেন। এই সকল অনুষ্ঠানে যে কিরূপ ব্যয় হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। একমাত্র খাওয়াইবার খরচই প্রায় দেড় কোটি টাকা।

এখন আমাদের দেশের অবস্থা কি দেখা যাউক। দু'এক স্থলে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে চেষ্টা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। চিকিৎসার ব্যবস্থা ত কিছুই নাই। সম্প্রতি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবেন মনস্থ করিয়াছেন, কিন্তু কাজে এখনও বিশেষ কিছু ঘটিয়া উঠে নাই। কলিকাতার বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৩০ হাজারের কাছাকাছি এবং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, পরীক্ষা করিলে শতকরা ৫০টিরও অধিক ছাত্রের চিকিৎসার প্রয়োজন। জাতির ভাবী আশা ভরসা কি এইরূপেই নষ্ট হইবে? আমরা কি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এখনও উদাসীন থাকিব? হয় ত চোখের দোষে, কাণের দোষে বা অন্য ব্যাধির ফলে ছাত্র পাঠে মন দিতে পারে না,—শিক্ষক স্কুলে তাহাকে শাসন করেন, বাড়ীতে পিতামাতা তাড়না করেন। ইহাই ত এখানকার অবস্থা। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আমাদের গরীব দেশে আর উপায় কি? কষ্ট সহ্য করিতেই হইবে। কিন্তু সকলে যদি উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করেন, তবে ইহার একটা প্রতীকার হইতে পারে। আপাততঃ ৫০ হাজার টাকা হইলে কাজ ভাল করিয়াই আরম্ভ হইতে পারে। এই টাকা তোলা কি এতই কঠিন?

স্কুলে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলেও, বিশ্ববিদ্যালয় স্বীয় অধীনস্থ কলেজগুলির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন নহেন। প্রায় ৪॥০ বৎসর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের Student Welfare Committee কলেজের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতেছেন। এ যাবৎ প্রায় ১০ হাজার ছাত্রের পরীক্ষা হইয়াছে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে, যে, তিনজন ছাত্রের মধ্যে দুইজনের কোন না কোন অসুখ আছে এবং তাহার চিকিৎসা আবশ্যক। ছাত্রদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ১৬ বৎসরের পর হইতেই ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে। এই সকল ছাত্রের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিতে হইলে যে পরিমাণ টাকার আবশ্যক, কমিটির হাতে তাহা নাই। কমিটি বাৎসরিক প্রায় ১৩ হাজার টাকা ব্যয় করেন। বিলাতের হিসাব দেখিলে বুঝা যাইবে যে, কার্য্যের অনুপাতে এ টাকা কিছুই নহে। সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

এতদিন কোন বাঙ্গালীর ছেলে বয়সের হিসাবে মোটা কি রোগা, তাহার দেহের ওজন কম কি বেশী—ইত্যাদি বিষয় জানিবার কোন উপায় ছিল না। Student Welfare Committeeর পরীক্ষায় এ বিষয়গুলি এখন অনেকটা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কমিটির রিপোর্ট হইতে পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় একটি তালিকা তুলিয়া দিলাম। ইহা দেখিলে কত বয়সের ছেলের কতটা লম্বা হইলে কতটা ওজন হওয়া উচিত, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। এরূপ তালিকা এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। যাঁহারা ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আরও বিশদরূপে জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই, বিনামূল্যে রিপোর্ট পাইবেন:—
The Hony. Secretary Student Welfare Committee
Durbhangá Buildings Senate House Calcutta.

আমার অনুরোধ, দেশের এই নবজাগরণের দিনে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য বিষয়ে দেশ-হিতৈষীরা আর যেন নিশ্চেষ্ট না থাকেন।

তালিকা *

খাড়াই ও বয়স হিসাবে ছাত্রদিগের (১৬ হইতে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত) ওজনের তালিকা ওজন—পাউণ্ডে দেওয়া আছে—(প্রায় ২ পাউণ্ডে ১ সের) খাড়াই—ফুট ও ইঞ্চিতে

খাড়াই ফিট—ইঞ্চি	মোট		বয়স—১৬		বয়স—১৭		বয়স—১৮		বয়স—১৯		বয়স—২০		বয়স—২১		বয়স—২২		বয়স—২৩		বয়স—২৪	
	ওজন	কমবেশী	ওজন	কমবেশী	ওজন	কমবেশী	ওজন	কমবেশী	ওজন	কমবেশী	ওজন	কমবেশী	ওজন	কমবেশী	ওজন	কমবেশী	ওজন	কমবেশী	ওজন	কমবেশী
৪—৭½	৮২·৫	৭·৩১			৭৭	২·৯২			৯৯১											
৪—৮½	৭৯·২	৬·৬			৭৯·২	৬·৬														
৪—৯½	৮১	৭·৭	৭৩	৪ ১	৮৬	—	৭৭	২৯·২					৯৯	—	৯২·৪	—				
৪—১০½	৮৯	৮·০৭	৭১·২	—	৮৮	১১	৮১·৯৫	৫·৮৫	৯০	৭·৪৮	৯২·৯	১০·৫৬	৮৭·৯	২৪·৭	৯০·২	৫·৭	৯৯	—		
৪—১১½	৯২·৬	৯ ৬	৮৪	৬·৭	৮৯	৭·৩৫	৯৬	৯·৪১	৯০·১	৭·৯৬	১০৯·১	১৩ ২	৯৮	৭·৭	৮৬	৪·৪	...	...	১২৫·৪	—
৫—০½	৯৬·৫	৮·৬	৯২·৯	১১·৯	৯৫·২	৮·৭১	৯৬·৫	৯·৫৭	৯৮	৯·৩২	৯৮·৩৪	৪ ৯	৯৩ ১	৪·৮৪	১০১ ২	৭·২৬	৯৯	৪·৪	১০৬	—
৫—১½	৯৯·৬	৯·২৪	৯৬	৯ ৯	৯৭	৮·৩৬	১০০ ৩	৪·৪	৯৯	৮·২	১০৩ ৪	১২·৫	৯৯·২	৯·৩	১০২·১৬	৭·৯৪	১০৩·৮	১১·২২	১০০·৩২	৪ ৬২
৫—২½	১০২	৯·৮৫	৯৫·৫	৮·৫৮	৯৯	১০·৯৩	১০১·৭	৯·৭৯	১০৩·৪৫	৯·২৬	১০৩ ৪	৯	১০২·৫	৭৯·২	১০৭·৩৬	১০·৯৩	১০৪·১	৬·৫৩	১০৮·৫	১৪·২
৫—৩½	১০৬·১	১০·৪৯	১০০·৫	৮·১৪	১০২	৯·০২	১০৬·৪	১০·৫	১০৬·৩	১০·৩২	১০৯·১	৯ ৬	১০৭·৩৬	৯·২৪	১১৪·১৮	১২··৫	১০৪·১৯	৮·৯৫	১১৩	১২·৬৫
৫—৪½	১০৯·৫	১১·৩	১০২	৮·৫৮	১০৮·৫	১১·১৫	১০৭	৯·৫৭	১০৩	১১·১৩	১১০	১০·৫	১১৩ ১	১১·৫৫	১১৭·৫	১৩·৯	১১৮	১৩·৭৫	১০৯·৪৫	১২·১
৫—৫½	১১৩·৩	১১·৬	১০৭	১১·৪	১১০	১১·১৭	১১৩	১০·১	১১২	১০·৭	১১৫	১১·১৬	১১৭ ৫	১৪ ০৩	১১১ ৭৬	১০·৪৫	১২০·১	১২·৫৮	১২৩·৩৩	১২·২
৫—৬½	১১৬·২	১১·৪	১১৩·৯	১২ ৭৬	১১৪·৫	১১·৪৮	১১৪	১১·৯	১১৬·৯	১১·৭	১১৮	১০·৬	১১৭·৩	১০·৩৬	১১৫·২	১০·৭৮	১১৭·৩২	১২ ৮	১১৮	৮·২১
৫—৭½	১২০·২	১১·৪	১১৯·৬	১২·৫	১১৯·৫	১৫ ৭৩	১২৩	১৩·৯	১১৭·৪	১১·১৭	১২৩ ২১	১৩·৩	১১৯·২	১১·১৬	১২৫	১২·৩৮	১২১	১৪·৪৫	১২৩·৮	১০·৬৫
৫—৮½	১২৩·৯	১২·৭৬	১২৮	২২·৯	১১৮·৯	১০·৩৮	১২০·১	১১·৮	১২২·৩	১০·৯	১২৮	১৪·৬	১২৭·১৬	১৪·৭৪	১২২	১২·৮৭	১৩৪·৯২	৯·১৫	১৩৩	১০·৪৫
৫—৯½	১২৭	১৪·৩	১১৪ ৩	৭·২২	১১৮	১০·৯৩	১২৭	১২·১	১৩০·১	১০·৮৩	১২৮·৪৩	১৫·৮	১২৬·৮	১৩ ৯৪	১২৮	১৩ ৩১	১১৫·২	৯·৫৪	—	—
৫—১০½	১৩০	১৫·৬	১৩২	১৩·২	১১৭·৯০	১৩·১১	১২৭·২	১২·৮	১৩২	১৬·৫	১২৮·১৫	১২·৪	১৩৪·২	১০·৫৬	১৩৩	২২·৮৮	১২৯·৮	১০·২৫	১২৫·৪	৬·৬
৫—১১½	১২৮·৫	৮·১	১২৫·৪	—	১২৬	৮·৮	১২৭·৯৫	৭·৩২	১৩৪·২	১১·৭	১২৪·৯	৪ ৮৬	১২৫ ৪	—	১৩১	১৯·৮	১১২·২	—	১৩১	—
৬—০½	১৩০·২	১৬·০১	—	—	১১৭	৫·৮৫	১৯·১	nil	১২৯	৯·৯	১২১	১৬·৫	১৫২ ২	১৬·৫	১২১·৪	৬ ৬				
৬—১½	১৩৫·৬	১১·২	১৫১·৮	—	—	...	১৩৫·৬	১·১	১৪৯	৩·৩	১২২·১	১·৯	১১৯	—	১৩৯	—	...			

* এই তালিকা হইতে কোন ছেলের ওজন স্বাভাবিক বা অতিরিক্ত কিংবা কম তাহা বুঝা যাইবে। মনে করুন, কোন ছেলের বয়স ১৬, খাড়াই ৫ ফুট ও ওজন ১ মন ১০ সের। এই ছেলের ওজন ঠিক আছে কিনা তাহা দেখিতে হইলে তালিকায় ৫ ফুট খাড়াই ও ১৬ বছরের ঘরে কত ওজন আছে দেখা দরকার। ৫ ফুট খাড়াইএর কোন ঘর নাই, কিন্তু ৫ ½´ খাড়াইএর ঘর আছে, সে জন্য এই ঘরই দেখিতে হইবে। ½ ইঞ্চি তফাতের জন্য বিশেষ কিছু যায় আসে না। এই ঘরের ১৬ বছরে নীচে ওজন লেখা আছে ৯২·৯ কম বেশী ১১·৯ অর্থাৎ এইরূপ খাড়াইএর ১৬ বছরের ছেলের ওজন ৯২·৯+১১·৯ বা ১০৪·৮ পাউণ্ড হইতে ৯২·৯—১১·৯ বা ৮১·০ এর ভিতর হইলে স্বাভাবিক জানিতে হইবে। উদাহরণের ছেলের ওজন ১ মন ১০ সের অর্থাৎ—১০২ পাউণ্ডের কিছু ... বয়সের হিসাব না করিয়া বিভিন্ন বয়স্ক ছেলেদের একত্র ধরিলে, কেবল খাড়াই অনুসারে যে ওজন স্বাভাবিক, তাহা এই তালিকার "মোট" ঘরে পাওয়া যাইবে।

জ্যান্ত জগন্নাথ

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীদেহখানি রীতিমত সেবার অভাবে দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। প্রসাদের অনাটনে পাণ্ডা-ঠাকুরটির ভুঁড়িতে ভাঁটা পড়িতেছে।—প্রভুজীর নবকলেবর ধারণের পূর্ব্বেই যেন দেশবাসিগণ এদিকে একটু নজর দেন।

প্রসাদ-প্রত্যাশী

শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্‌সি

নব জ্যোতিষ্কমণ্ডল

সম্প্রতি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রাকৃতিক আবহাওয়ার বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হ'চ্ছে দেখে বৈজ্ঞানিকরা এর তথ্য অনুসন্ধান ক'রে জান্‌তে পেরেছেন যে, সূর্য্যের চারিদিক হ'তে ঘিরে এককোটি ক্রোশব্যাপী একটি বিরাট নব জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে। চন্দ্র, শুক্র, পৃথিবী প্রভৃতি অনেক গ্রহ উপগ্রহ এই মণ্ডলের মধ্যে থেকে সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে তার চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরছে। সেই বিরাট জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের মধ্যে সকল দিকের তাপ সমান নয়; এবং যখনই পৃথিবী বা অন্য কোনও গ্রহ বা উপগ্রহ জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের অধিকতর তাপবিশিষ্ট অংশের মধ্যে এসে পড়ে, তখন সেই গ্রহের তাপ বৃদ্ধি পায়; আবার সেই স্থান হ'তে দূরে চলে গেলে গ্রহের আভ্যন্তরিক তাপ অনেক কমে যায়। এই জন্যই একই দিনের মধ্যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে গ্রীষ্ম ও শৈত্যের বিপরীত অনুভূতি হয়।
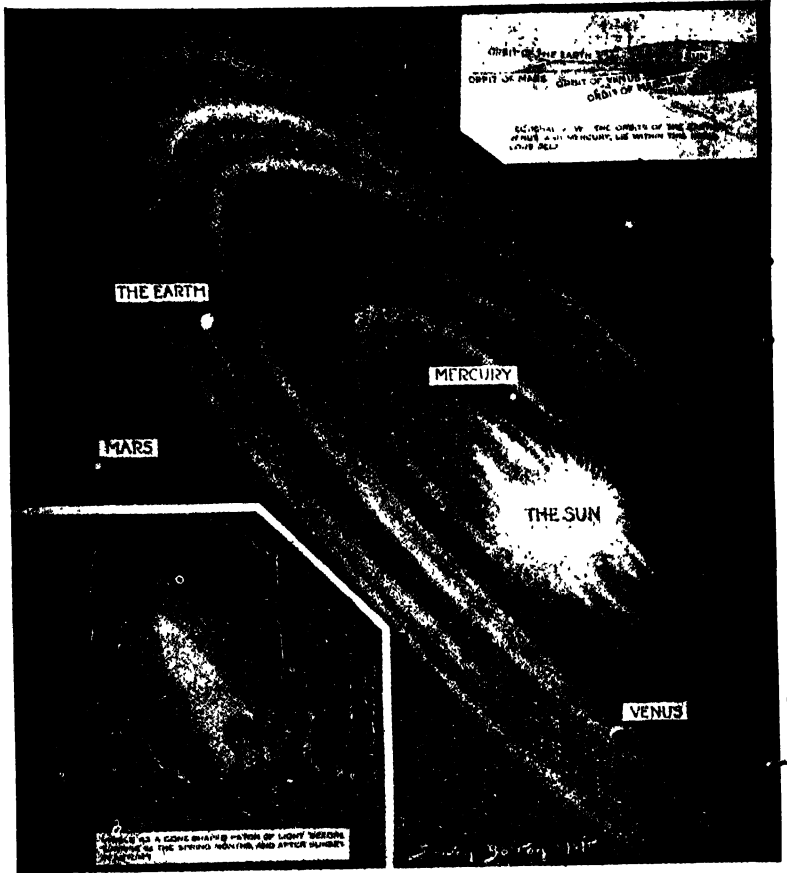
নব জ্যোতিষ্কমণ্ডল। (বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত নব জ্যোতিষ্কমণ্ডলের একখানি ছবি। সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে, চন্দ্র শুক্র, পৃথিবী ইত্যাদি সব গ্রহ উপগ্রহ চক্রাকারে নব জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের মধ্য দিয়ে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে)

বৃক্ষের হ্রাসবৃদ্ধি

বৃক্ষের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয় করবার জন্য একজন বৈজ্ঞানিক "ডেন্‌ড্রোগ্রাফ" (Dendrograph) নামে একটি সুন্দর যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রেছেন। এই যন্ত্রটি নিরূপিত সময়ে বৃক্ষকাণ্ডের চারিদিকে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন ক'রে দিলে বৃক্ষটি দৈর্ঘ্যে বা প্রস্থে সমস্ত দিনের মধ্যে কতটা হ্রাস বা বৃদ্ধি লাভ ক'রে
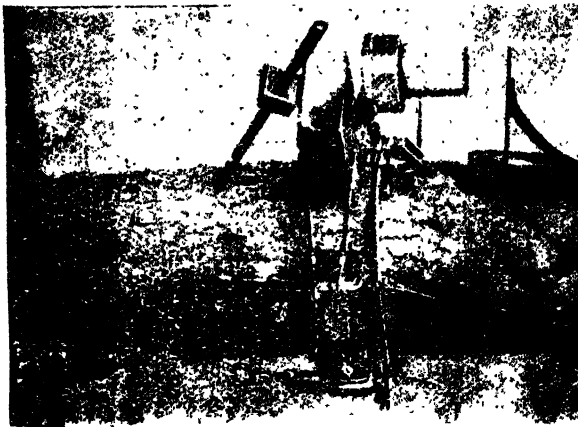
বৃক্ষের হ্রাসবৃদ্ধি। (বৃক্ষের হ্রাসবৃদ্ধি নিরূপণ ক'রবার যন্ত্র বৃক্ষে সংলগ্ন ক'রে তার পরীক্ষা হচ্ছে)

তা' যন্ত্রে সংবদ্ধ একখানি কাগজের উপর আপনিই লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বৎসরের মধ্যে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছের সব চেয়ে বৃদ্ধি ও পৌষ মাঘ মাসে হ্রাস হয়ে থাকে।

নৈসর্গ-নিকেতন

মার্কিন দেশের ওয়াসিংটন সহরে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিলিত হয়ে সম্প্রতি একটি বিজ্ঞানাগারের উদ্বোধন করেছেন। মার্কিন দেশের লোকেরা তা'র নাম দিয়েছে নৈসর্গ-নিকেতন। যত বৈজ্ঞানিক অদ্ভুত ব্যাপার যা' সাধারণ মানুষের কল্পনায়ও আসে না, তা' এই নূতন বিজ্ঞানাগারে সকলকে দেখান হয়। সূর্য্যের কিরণ কাঁচে প্রতিফলিত করে সূর্য্যের মধ্যকার কৃষ্ণরেখা বা অগ্নিবর্ণ দাগ পরিস্ফুট ক'রে তা'র আকার, অবস্থা ও অবস্থিতি পরিষ্কার ভাবে সাধারণ লোককে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

নৈসর্গ-নিকেতন (নৈসর্গ-নিকেতনের একটি ঘরে সাধারণ লোকেরা এসে সূর্য্যের মধ্যকার কৃষ্ণবর্ণ রেখা বা অগ্নিবর্ণ দাগের আকার, অবস্থা ও অবস্থিতি প্রত্যক্ষ ক'রছে)

আবার সূর্য্য-কিরণের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ক'রে তার গুণাগুণ লোকের সামনে প্রত্যক্ষ করান হচ্ছে। বৃক্ষ-জীবনে সূর্য্য-কিরণ কি বিদ্যুৎ প্রবাহ—কে বেশী উপকারী, তাও প্রমাণ ক'রে সাধারণ লোককে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

(নৈসর্গ নিকেতনের এই ঘরে সূর্য্য-কিরণের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ক'রে সাধারণকে

(নৈসর্গ-নিকেতনের কাচের ঘরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ও সূর্য্য-কিরণে সঞ্জীবিত বৃক্ষের হ্রাসবৃদ্ধি নিরূপিত হচ্ছে)

বেতারের লিপিযন্ত্র (বৈজ্ঞানিক বেতারে লেখার হরফে অন্যস্থলে সংবাদ পাঠাচ্ছেন)

বেতারের লিপিযন্ত্র

সম্প্রতি আমেরিকার নৌ-বিভাগের একজন অধ্যক্ষ একটি নূতন রকমের লিপিযন্ত্রের উদ্ভাবন ক'রেছেন, যদ্দ্বারা বেতারের সংবাদ যেখানে খুসি লেখার হরফে পাঠান যায়। লিপিযন্ত্রে (Typewriter) যেরূপ কথা লেখবার প্রয়োজন হ'লে বিভিন্ন চাবি টিপে কথাটি লিখ্‌তে হয়, সেরূপ বেতার লিপিযন্ত্রে চাবি টিপলে কথার প্রতিধ্বনি, যেখানে সংবাদ পাঠানোর প্রয়োজন, সেখানে যায়, এবং সংবাদ-গ্রাহকের লিপিযন্ত্রে সেটি লেখার হরফে ফুটে উঠে।

সিনোপাস (এই পশু বর্ত্তমান গণ্ডারের পূর্ব্বপুরুষ। এই সকল পশু কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে বিচরণ করত)

অতীত যুগের শ্লথ (sloth)

প্রাগৈতিহাসিক যুগের পশু

প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে কত নূতন রকমের পশুর জন্ম ও প্রাচীন জাতীয় পশুর বংশলোপ পা'চ্ছে, তার কোনও হিসাব নেই। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল পশু পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিদ্যমান ছিল, এখন কালের বিবর্ত্তনে ২।১টি খুব পুরাতন জঙ্গল ভিন্ন তা'দের আর দেখ্‌তে পাওয়া

পেলিওসিওপস্ (Paleosyops)
(এরা প্রায় ছ' কোটি বৎসর পূর্ব্বে নদীর ধারে ধারে বিচরণ করত। Wyomingএ এদের অস্থি-পঞ্জর সব পাওয়া গেছে)

খড়্গধারী ব্যাঘ্র
(এই জাতীয় ব্যাঘ্রও তুষারযুগের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে কোথাও কোথাও বিদ্যমান ছিল। ব্যাঘ্রের মাথার উপরে তারই সমযুগের শকুনি বসে রয়েছে)

বিরাট টিক্‌টিকি। (Thunder Lizards) (বর্ত্তমান কুম্ভীর ও অষ্ট্রিচ পক্ষীর পূর্ব্বপুরুষ। এরা প্রায় কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে থাকত)

যায় না। আবার হয় ত যে সকল পশুর নাম প্রাণীতত্ত্বের ইতিহাসে কখনও পাওয়া যায়নি, এখন কালের বিবর্ত্তনে দেশে দেশে তা'দের প্রচুর পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। মানুষের ইতিহাস তা'র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চল্‌তে পারে না। আমরা এখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কয়েকটি প্রাণীর চিত্র দিলাম।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের পশু। (তুষার যুগের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই সকল লোমশ ম্যাস্টোডন (hairy Mastodon) মার্কিন দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি ক'রত)

আইরিশ হরিণ (এই সকল হরিণ পূর্ব্বে আয়ার্ল্যাণ্ডে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত; এখন তাদের পৃথিবীর কুত্রাপি পাওয়া যায় না)

টর্পিডো গাড়ী

হগ্ ডাল (Haug Dahl) নামক একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক এক রকম নূতন ধরণের মোটর গাড়ী তৈরী ক'রেছেন, যদ্দ্বারা তিনি প্রতি মিনিটে তিন ক্রোশ ক'রে পথ অতিক্রম ক'রতে পারেন। এই গাড়ীটির আকার অনেকটা টর্পিডোর মতো। কেবল হাওয়া যাতায়াতের জন্য সম্মুখভাগে কয়েকটি ছিদ্র আছে। সংঘর্ষণের ফলে যা'তে গাড়ীটি চট্ ক'রে ভেঙে না যায়, এজন্য গাড়ীটির সমস্তই মজবুত ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরী।

একচাকার গাড়ী

রোম সহরের ডেভিড্ গিস্লাঘি (Davide Gislaghi) নামক একজন মোটরবিদ্ একটি সুন্দর একচক্র যান নির্ম্মাণ ক'রেছেন, যদ্দ্বারা তিনি অনায়াসে বহুচক্রবিশিষ্ট যানের গর্ব্বও খর্ব্ব ক'রতে পারেন। এই গাড়ীটির বাইরের দিক্‌টিতে

টর্পিডো গাড়ীর পার্শ্বদৃশ্য (গাড়ীখানি মিনিটে তিন ক্রোশ পথ যখন অতিক্রম করছে তখনকার একখানি ছবি)
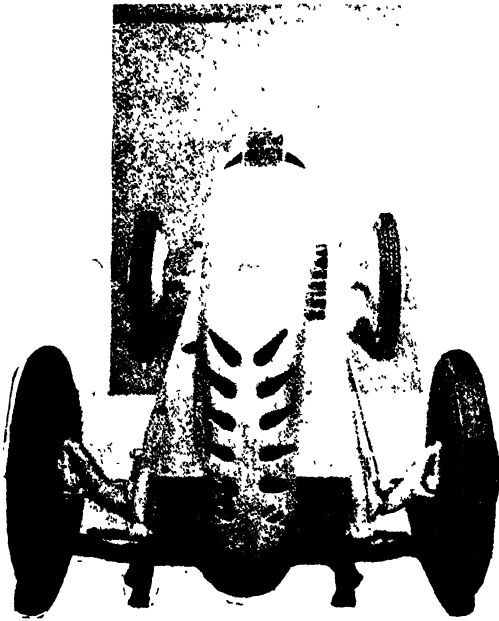
টর্পিডো গাড়ীর সম্মুখ দৃশ্য

টর্পিডো গাড়ী (হগ ডাল গাড়ী চড়্‌বার পোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছেন)
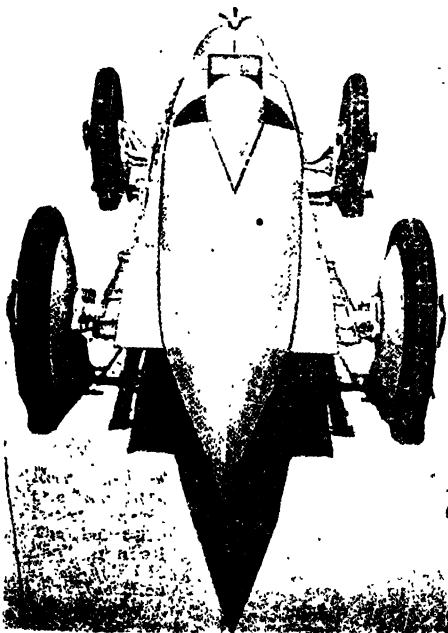
টর্পিডো গাড়ীর পিছনকার দিকের একটি দৃশ্য

এক চাকার গাড়ী। (ডেভিড্‌ গিল্লাম্বি ও তাঁর মেমসাহেব দুজনে দু'খানি একচাকার গাড়ী চড়ে পথ দিয়ে যাচ্ছেন)

লৌহবেষ্টনীর উপর আঁটা একটি রবারের চাকা আছে। ভিতর দিকে ঠেসান দিয়ে বসবার যায়গা ও মোটর-এঞ্জিনের যন্ত্রপাতি আর একখানি বিভিন্ন লৌহবেষ্টনীর উপর আঁটা থাকে। সেটি বাইরের চাকা ঘুরলেও তা'র সঙ্গে না ঘুরে ঠিক সমানভাবে থাকে। গাড়ীতে ঠেসান দিয়ে ব'সে গাড়ী চালালে প'ড়ে যাবার কোনও সম্ভাবনা নেই, অনায়াসে যত খুসি তত জোরে চালান যেতে পারে।

শিশির-শোভিত উর্ণনাভের দ্বিতীয় দৃশ্য

শিশির-শোভিত উর্ণনাভের একটি দৃশ্য

শিশির শোভিত উর্ণনাভের তৃতীয় দৃশ্য

শিশির-শোভিত উর্ণনাভের চতুর্থ দৃশ্য

শিশির-শোভিত উর্ণনাভের পঞ্চম দৃশ্য

শিশির-শোভিত উর্ণনাভের ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রকৃতির খেলা
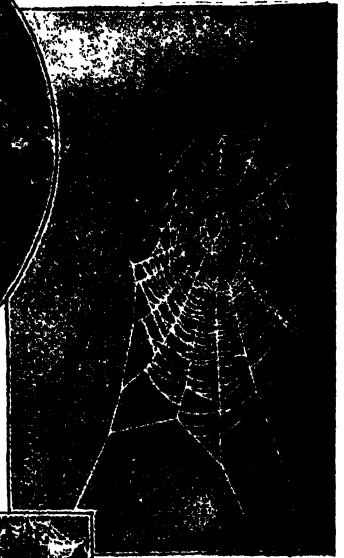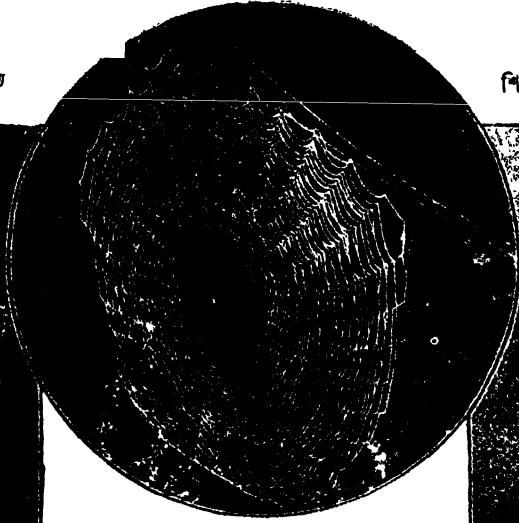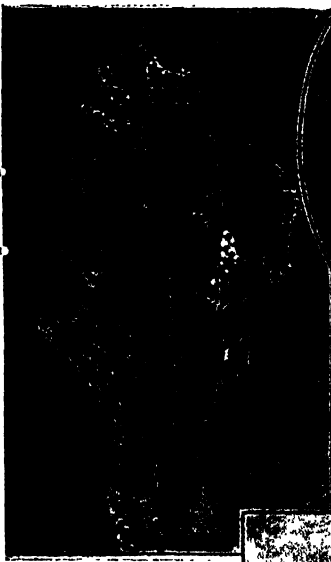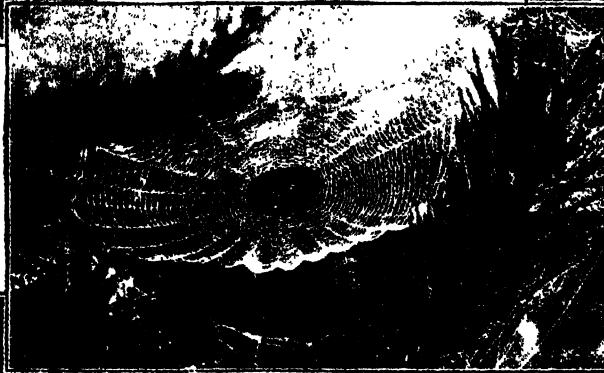
মাকড়সার জালকে আমরা আবর্জ্জনা বলেই মনে করি; কিন্তু অনেক সময় অনন্ত লীলাময়ী প্রকৃতি খেলার ছলে তা'দের এমন ক'রে সাজিয়ে প্রাতঃকালে কোনও উদ্যানের ঝোপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে মুক্তার মতো শিশির বিন্দু থরে-বিথরে মাকড়সার জালের ওপর প'ড়ে, সেই কদর্য্য জিনিসকে [illegible]

সাময়িকী

এ মাসের 'ভারতবর্ষের' প্রচ্ছদ পটে যে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তিনি সর্ব্বজনপরিচিত, সর্ব্বজনপূজনীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। তাঁহার বিশেষ পরিচয় আর কাহাকেও দিতে হইবে না।

যে তিন নম্বর রেগুলেসন ও অর্ডিনান্সের বলে বাঙ্গালা দেশের কয়েক জনকে অন্তরীণে আবদ্ধ করা হইয়াছে, আইন অনুসারে তাহার মেয়াদ মাত্র ছয় মাস। ছয় মাস পরে হয় পুনরায় মেয়াদ বাড়াইয়া দিতে হইত, আর না হয় রদ করিতে হইত। এই কারণে উক্ত অর্ডিনান্সের বিধানগুলি আইনে পরিণত করিবার জন্য বিগত ৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশন হয়। এই আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য সরকার পক্ষের আয়োজনের ত্রুটী ছিল না; উভয় পক্ষেই ভোট সংগ্রহের জন্য যথোচিত চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সরকার পক্ষের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; স্বয়ং লাটবাহাদুর কাউন্সিলে উপস্থিত হইয়া এই আইনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন; তাহাতেও কোন ফল হয় নাই; আইনের সপক্ষে ৫৭ ভোট এবং বিপক্ষে ৬৬ ভোট হওয়ায় আইন নামঞ্জুর হইয়াছে। এখন লাট বাহাদুর তাঁহার বিশেষ ক্ষমতাবলে যাহা হয় করিবেন। গবর্ণমেন্টের পক্ষে যে কয়জন হিন্দু ও মুসলমান ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—বাবু অমূল্যধন আড্ডা, রায় বাহাদুর প্যারীলাল দাস, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাননীয় নদীয়ার মহারাজা, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, রাজা মণিলাল সিং রায়, মিঃ আলতাফ আলি, খাঁ বাহাদুর সুজাত আলি বেগ, নবাব বাহাদুর নবাব আলি চৌধুরী, খাঁ বাহাদুর মৌলবী মহম্মদ চৈমুদ্দীন, মিঃ এ, কে, গজনবী, খাঁ বাহাদুর কাজি জহরুল হক, খাঁ বাহাদুর মৌলবী মোসারফ্ হোসেন, মৌলবী ফজলল হক, খাজে নাজিমুদ্দীন, মৌলবী আবদুল জব্বর পালোয়ান, মাননীয় সার আব্দর রহিম, মৌলবী আব্দাস্ সালাম ও মৌলবী আলাবক্স সরকার।

বড়দিনের সময় সারা ভারতবর্ষে সভা-সমিতির একেবারে ধুম লাগিয়া যায়; সর্ব্বত্র শুধু সভা আর সমিতি। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন কন্গ্রেস ও খিলাফত সম্মিলন; তাহার পর ছোট বড় অনেক আছে; তাহাদের কতক রাষ্ট্রীয়, কতক সামাজিক, দুই একটা শিক্ষা বিষয়কও আছে। এবার কন্গ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল বেলগাঁয়ে, সমারোহও খুব হইয়াছিল, কারণ এবার সভাপতি ছিলেন মহাত্মা গাঁধি মহোদয়। বহু দূর হইলেও বাঙ্গালা দেশ হইতে কয়েক জন নেতা কন্গ্রেসে গিয়াছিলেন; কন্গ্রেসের কার্য্যও সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

এবারকার কন্গ্রেসে একটা কথার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। এতদিন দেশের লোক 'স্বরাজ' কথাটাই শুনিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু স্বরাজের স্বরূপ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে নানা জন নানা ব্যাখ্যা দিয়াছেন; কেহ কেহ বা একেবারে শেষ উত্তর দিয়াছেন—"স্বরাজ কি না স্বরাজ; ইহার ব্যাখ্যা নাই।" এবার কিন্তু সভাপতি মহাত্মা গাঁধি মহোদয়, স্বরাজের অর্থ কি, তাহা সরল ভাবে সহজ কথায় বলিয়া দিয়াছেন। অবশ্য, এ ব্যাখ্যা তাঁহার নিজের; কিন্তু ইহারই উপর নির্ভর করিয়াই স্বরাজের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ হইবে। আমরা নিম্নে মহাত্মা কর্ত্তৃক বিবৃত স্বরাজের খসড়া দিতেছি।

মহাত্মা গাঁধি স্বরাজ-সম্বন্ধে যে বারটী দফা দিয়াছেন, তাহা এই—

১। ভোটাধিকারের যোগ্যতা সম্পত্তি অথবা পদমর্য্যাদার উপর নির্ভর করিবে না। কায়িক শ্রমের উপরই উহা নির্ভর করিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কংগ্রেসের প্রস্তাবিত ভোটাধিকার বিধির কথা উল্লেখ করা যায়। পাণ্ডিত্য এবং ঐশ্বর্য্যের যোগ্যতা অভিজ্ঞতা হইতে একটা মোহ মাত্র বলিয়াই বুঝা গিয়াছে। যাঁহারা শাসন পরিচালনে অথবা রাষ্ট্রের হিতসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন, কায়িক শ্রমই তাঁহাদিগকে সে সুবিধা দান করিবে।

২। সর্ব্বনাশী সামরিক ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইবে। কেবল সাধারণ অবস্থায় ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাহাই রাখিতে হইবে।

৩। সুবিচার লাভের উপায় সুলভ ও সহজ প্রাপ্য করিতে হইবে এতদুদ্দেশ্যে চূড়ান্ত বিচার লাভের আদালত লণ্ডনে না করিয়া দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়া আবশ্যক। অধিকাংশ দেওয়ানী মামলার পক্ষগণকে সালিশী দরবারে মামলা মিটাইবার জন্য উপস্থিত করিতে বাধ্য করিতে হইবে। এবং যদি কোন দুর্নীতি বা আইনের অপব্যবহার হইয়াছে এরূপ কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পঞ্চায়েতের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। উচ্চ নীচ ক্রমে স্তরে স্তরে আদালতের শ্রেণী কমাইয়া দিতে হইবে। বিচার প্রণালীর আমূল সংস্কার করিতে হইবে। আমরা এতকাল ক্রীতদাসের মত বহুল আড়ম্বর পূর্ণ ইংলণ্ডীয় বিচার প্রথার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি। উপনিবেশগুলিতে বিচার প্রথা সহজ বোধ্য করিবার আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইতেছে, যাহাতে প্রত্যেক মামলাকারী সহজে নিজের দিকটা উপস্থিত করিবার সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪। সর্ব্বপ্রকার মাদকদ্রব্যের উপর আয়কর অর্থাৎ আবগারী বিভাগ উঠাইয়া দিতে হইবে।

৫। সমর বিভাগ ও শাসন বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের বেতন দেশের সাধারণ অবস্থার অনুপাতে কম করিয়া ধার্য্য করিতে হইবে।

৩। ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রদেশগুলি পুনরায় নূতন করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে। এবং প্রত্যেক প্রদেশকে সম্ভবমত স্বাতন্ত্র্য (অটোনমি) প্রদান করিতে হইবে ও আভ্যন্তরিক শাসন ও রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবার যথাযোগ্য অধিকার দিতে হইবে।

৭। বৈদেশিকগণের যে সমস্ত একচেটিয়া অধিকার আছে, তাহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য এক কমিশন বসাইতে হইবে। এবং যে সমস্ত সুবিধা বৈদেশিকগণ, ন্যায়সঙ্গত উপায়ে অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা, কমিশনের নির্দ্দেশানুসারে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮। ভারতীয় সামন্ত-নৃপতিগণের অধিকার ও কর্ত্তব্যপালনে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কোন বাধা প্রদান করিবেন না। তবে দেশীয় রাজ্যের কোন প্রজা ফৌজদারী আইন মোতাবেক অপরাধী না হইয়া যদি অন্য কোন কারণে দেশীয় রাজ্য ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাকে স্বায়ত্ত শাসিত ভারতে আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। সমস্ত স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতা বিলোপ করিতে হইবে।

১০। উচ্চপদগুলি, যোগ্যতা হিসাবে সকলের জন্যই উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। সামরিক ও শাসন বিভাগের পদগুলির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১১। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির ভাব রক্ষা করিয়া এবং কাহাকেও বাধা প্রদান না করিয়া সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই ধর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবে।

১২। প্রাদেশিক শাসন বিভাগে, ব্যবস্থাপরিষদে এবং আদালতে কিছুকালের জন্য প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহৃত হইবে এবং প্রতি কাউন্সিল বা সর্ব্বোচ্চ আদালতে হিন্দী ভাষা ব্যবহৃত হইবে—উহা দেবনাগরী কিম্বা পার্শী অক্ষরে লেখা চলিবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ও ব্যবস্থা-পরিষদের ভাষা হিন্দী হইবে। পররাষ্ট্র বিভাগে ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হইবে।

এই বড়দিনে সব রকম সভারই অধিবেশন হইয়াছিল, শুধু বাঙ্গলা-সাহিত্য সম্বন্ধে কোন সভাসমিতির উদ্যোগ না দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছিলাম; কিন্তু বাঙ্গালা দেশে না হইলেও বিহারের অন্তর্গত জামসেদপুর-প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণ সে ত্রুটী সংশোধন করিয়াছেন। তাঁহারা এই বড়দিনে জামসেদপুর সাহিত্য-সভার বার্ষিক উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন। 'আমাদের ভারতবর্ষের'র সম্পাদক মহাশয়কেই এই উৎসবের নেতৃত্ব করিতে হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত সার ডোরাব টাটা মহোদয় এই সাহিত্য-উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া সাহিত্যিকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম-এ মহাশয় সমাগত সাহিত্যিকগণকে অভ্যর্থনা করিয়া যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণও সাহিত্যিকগণ সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুইদিনের অধিবেশনে যে সমস্ত প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত আশুতোষ সান্যাল মহাশয়ের 'নাট্যশাস্ত্রের ইতিহাস', শ্রীযুক্ত গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লৌহের জন্মকথা', শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের 'কয়লার bye-product', সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা 'ভারতের নারী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় প্রবাসীবাঙ্গালীদিগের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সত্যসত্যই প্রশংসনীয়।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "জাল-মোহান্ত" প্রকাশিত হইল। মূল্য—২৷৹ টাকা ও ৮৬।৮৭ সং রহস্য-লহরী সিরিজের নূতন পুস্তক "পঞ্চরত্ন" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৹।

শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন কবিতা পুস্তক "মধুমালতী" ও "পল্লীব্যথা" প্রকাশিত হইয়াছে—মূল্য প্রত্যেক খানি ১৲।

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন নাটক "বন্দিনী" প্রকাশিত হইল, মূল্য—১৲।

পালি হইতে অনুবাদিত বৌদ্ধগল্প "রাজগৃহের ইন্দ্রগুপ্ত" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য—৷৹।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "কৃতান্তের বঙ্গদর্শন", ও "জোর বরাত" প্রকাশিত হইল, মূল্য প্রত্যেক খানি ৷৹ আনা।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.

সন্ধ্যা-প্রদীপ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

ফাল্গুন, ১৩৩১

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাদশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

জৈন 'হরিবংশ' পুরাণে কৃষ্ণচরিত

[অধ্যাপক শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে 'জৈন সাহিত্যে রামায়ণের কথা'র পরিচয় [ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩০] দিয়াছি। আজ শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে উদ্গীত কৃষ্ণচরিত্র, জৈন সাহিত্যে কিরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

আমাদের আর্য্যশাস্ত্রে যেরূপ অষ্টাদশ পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতি প্রচলিত আছে, সেইরূপ দিগম্বর সম্প্রদায়েও চতুর্ব্বিংশতি পুরাণে ঋষভ দেবাদি চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করের চরিত্র এবং ৩৯ উপপুরাণে ১২ চক্রবর্ত্তী, ৯ নারায়ণ, ৯ প্রতিনারায়ণ ও ৯ বলভদ্রের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

নেমিনাথ, দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর। নেমিনাথের পিতার নাম সমুদ্রবিজয়, মাতার নাম শিবাদেবী। নেমিনাথের পিতৃব্য বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ও রোহিণীর গর্ভে বলদেবের জন্ম হয়। জৈন শাস্ত্রের মতে শ্রীকৃষ্ণ নবম নারায়ণ ও বলদেব নবম বলভদ্র। 'হরিবংশ' পুরাণে বিশেষ ভাবে নেমিনাথের চরিত্র বর্ণিত হইলেও, প্রসঙ্গতঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অন্যান্য যাদববংশীয়গণের চরিত-কথাও কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহাভারতের অন্তর্গত 'হরিবংশে'র নামকরণ শ্রীকৃষ্ণের নামানুসারেই হইয়াছে; কিন্তু জৈন মতে রাজা আর্য্যের ঔরসে মনোরমার গর্ভে 'হরি' নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, ইঁহারই নামানুসারে হরিবংশের প্রসিদ্ধি হয়।

এই 'হরিবংশের' রচয়িতা—পুন্নাটগণীয় আচার্য্য জিনসেন। এই জিনসেন যে 'আদিপুরাণ', 'পার্শ্বাভ্যুদয়' প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য জিনসেন হইতে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে প্রবন্ধান্তরে ['মেঘদূতের সমস্যা পূরণ', "আর্য্যাবর্ত্ত", জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯] প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। 'আদিপুরাণ'কার জিনসেন সেনসঙ্ঘীয় আচার্য্য বীরসেনের শিষ্য; আলোচ্য 'হরিবংশ'কার জিনসেন, কীর্ত্তিষেণের শিষ্য। তা'রপর,

দ্বিতীয় জিনসেন তাঁহার 'হরিবংশের' প্রথমে সমন্তভদ্রাদি প্রাচীন জৈনাচার্য্যগণের সহিত 'পার্শ্বাভ্যুদয়' প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তা জিনসেনেরও নামোল্লেখ করিয়াছেন (১)। কাজেই রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, ডাক্তার ফ্লিট ও কে, বি, পাঠক 'আদিপুরাণ'কার ও 'হরিবংশ'কার জিনসেনকে যে একই ব্যক্তি বলিয়াছেন, তাহা ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত বলা ভিন্ন উপায় নাই।

মূল সংস্কৃত হরিবংশ পুরাণ মুদ্রিত হয় নাই; ইহা বার হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ। প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসী জৈনগণ তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ মুদ্রিত হইয়া যার তার হাতে পড়ে, ইহা ইচ্ছা করেন না। এইজন্য 'ভারতীয় জৈনসিদ্ধান্ত প্রকাশিনী সংস্থা'র মহামন্ত্রী, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পান্নালাল বাকলীওয়াল, ন্যায়তীর্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গজাধরলালের দ্বারা ইহার হিন্দী অনুবাদ করাইয়া 'গান্ধী হরিভাই দেবকরণ জৈনগ্রন্থমালা'য় বাহির করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে দৌলৎরাম নামক একজন জৈন পণ্ডিতও 'হরিবংশে'র জয়পুরী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। দৌলৎরামের অনুবাদ আমি দেখি নাই, কিন্তু গজাধরলালের অনুবাদ সর্ব্বত্র ঠিক মূলানুগত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না—অনেক স্থানে ভাষাগত অশুদ্ধিও দৃষ্টিগোচর হইল। তথাপি সাধারণের পক্ষে "হরিবংশে"র প্রতিপাদ্য বিষয় জানিবার পক্ষে এই অনুবাদই প্রধান গ্রন্থ। বন্ধুবর পান্নালালজীর প্রসাদে আমার হস্তলিখিত মূল সংস্কৃত 'হরিবংশ' দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। তাঁহার আগ্রহে ও অনুরোধে 'হরিবংশ' হইতে কৃষ্ণচরিত্রের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। পাঠক-পাঠিকাগণ, এই কৃষ্ণচরিত্রের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের তুলনা করিয়া দেখিবেন।

জিনসেন 'হরিবংশে'র শেষে গ্রন্থকারের পরিচয় ও গ্রন্থরচনার সময় সম্বন্ধে যে শ্লোক (২) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, ৭০৫ শকাব্দে হরিবংশ পুরাণ রচিত হয়।

একবিংশ তীর্থঙ্কর নমিনাথের সময়ে হরিবংশে 'যদু' রাজার জন্ম হয়। এই যদু, হরিবংশরূপ উদয়াচলে সূর্য্যস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইনিই যাদববংশের আদিপুরুষ। (১৮শ সর্গ, ৬ শ্লোক)

নিম্নে যদুবংশের তালিকা লিপিবদ্ধ হইল,—

রাজা অন্ধকবৃষ্ণি, শেষ জীবনে জ্যেষ্ঠপুত্র সমুদ্রবিজয়ের হস্তে রাজ্য ও বালক কনিষ্ঠপুত্র বসুদেবের ভার অর্পণ করিয়া ভগবান্ সুপ্রতিষ্ঠিতের নিকটে দিগম্বর দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক তপস্যা করিতে যান। রাজা সমুদ্রবিজয়ের পট্টমহিষী

(১) "বীরসেনগুরোঃ কীর্ত্তিরকলঙ্কাবভাসতে।
পার্শ্বাভ্যুদয়ে তস্য জিনেন্দ্রগুণসংস্তুতিঃ॥
স্বামিনো জিনসেনস্য কীর্ত্তিং সঙ্কীর্ত্তয়ত্যসৌ।"

হরিবংশ, ১ম সর্গ, ৪০ শ্লোক

(২) "শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাং
পাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাম্।
পূর্ব্বাং শ্রীমদবন্তিভূভৃতি নৃপে বৎসাদিরাজেঽপরাং
সৌর্য্যাণামধিমণ্ডলং জয়যুতে বীরে বরাহেঽবতি॥
কল্যাণৈঃ পরিবর্দ্ধমানবিপুল শ্রীবর্দ্ধমানে পুরে
শ্রীপার্শ্বালয়নন্নরাজবসতৌ পর্য্যাপ্তশেষঃ পুরা।
পশ্চাদ্ দোস্তটিকাপ্রজাপ্রজনিতপ্রাজ্যার্চ্চনাবর্চ্চনে
শান্তেঃ শান্তিগৃহে জিনেশ্বরচিতো বংশো হরীণাময়ম্॥"

৬৬ সর্গ, ৫৩—৫৪ শ্লোক

ছিলেন—শিবাদেবী। অক্ষোভ্য প্রভৃতি আটটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, রাজা সমুদ্রবিজয় প্রধান প্রধান নৃপতিগণের কন্যার সহিত তাহাদিগের বিবাহ দিয়াছিলেন। ধৃতি, স্বয়ম্প্রভা, সুনীতা, সিতা, প্রিয়ালাপা, প্রভাবতী, কালিন্দী ও সুপ্রভা—এই আটজন রাজকুমারীর সহিত ক্রমানুসারে অক্ষোভ্য প্রভৃতি অষ্ট কুমারের বিবাহ হয়। অলৌকিক রূপবান্ কুমার বসুদেব এই সময়ে কৈশোর ও যৌবনের সীমায় বর্ত্তমান ছিলেন।

বসুদেব যে সময়ে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহিরে আসিতেন, সেই সময়ে শৌর্য্যপুরের রমণীগণের মধ্যে একটা আকুলতা জাগিয়া উঠিত।—

"নির্য্যাতি সূর্য্যদীপ্তাঙ্গে চন্দ্রসৌম্যমুখাম্বুজে।
তত্র শৌর্য্যপুরে স্ত্রীণাং ভবত্যাকুলতা পরা॥'

১৯শ সর্গ, ১০ম শ্লোক

কুমার বসুদেবকে দেখিবার জন্য সমস্ত আবশ্যক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুরন্ধ্রীগণ গবাক্ষদ্বারে উপনীত হইতেন। বসুদেবের সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা, অন্তঃপুরের এক প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। নগরের এই বিচিত্র ভাব অনুভব করিয়া রাজধানীর প্রধান পুরুষগণ নিজেরা পরামর্শ করিয়া এক দিন রাজার নিকট আসিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন,—

"প্রভো, আপনার রাজত্বে আমরা সর্ব্বপ্রকার সুখ ও সুবিধায় থাকিলেও এক বিষয়ে বড় দুঃখ ভোগ করিতেছি। কুমার বসুদেব, প্রতি দিন ক্রীড়ার্থ প্রাসাদের বাহিরে আসেন, সেই সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া নগরের স্ত্রীলোকগণ যেন পাগল হইয়া যায়। তখন তাহারা কুমারকে দেখা ছাড়া আর সমস্ত কার্য্য বিস্মৃত হয়। মনে হয় যেন তাহাদের চক্ষুঃ ব্যতীত আর কোনও ইন্দ্রিয় নাই। তাহারা এই সময়ে স্ব স্ব শিশুকে স্তন্য পান করাইতেও ভুলিয়া যায়। রাজন্, কুমার বসুদেবের সচ্চরিত্রতায় আমাদের যথেষ্ট আস্থা আছে; কিন্তু এইরূপ বিক্ষোভ, নগরের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে হয় না। এ সম্বন্ধে আপনি সমুচিত বিচার করেন, ইহাই প্রার্থনা।"

রাজা সমুদ্রবিজয়, নগরবৃদ্ধগণের এই প্রার্থনা শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন, পরে তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন যে, "আমি আপনাদের অনুকূল ব্যবস্থাই করিব। রাজার এই আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া নগরবাসিগণ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। ঠিক এই সময়েই কুমার বসুদেব, ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, এবং ভক্তিপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নমস্কার করিলেন। রাজা সমুদ্রবিজয়ও তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কোলে বসাইলেন ও প্রগাঢ় স্নেহের সহিত কনিষ্ঠের শিরশ্চুম্বন করিলেন। কুমারকে অত্যন্ত শ্রান্ত দেখিয়া রাজা সমুদ্রবিজয় বলিলেন,—

"বৎস, তুমি বহুক্ষণ নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়াছ, তোমার মনোরম সৌন্দর্য্যে মালিন্যের ছায়া পড়িয়াছে। শরীরকে অবসাদগ্রস্ত করিয়া কেন এইরূপ যথেচ্ছ ভ্রমণ কর? অতঃপর তুমি স্নানের সময়ে স্নান এবং আহারের সময়ে আহার অবশ্য করিবে। যদি ভ্রমণ করিতে হয়, অন্তঃপুরের উপবনে সানন্দে ক্রীড়া করিও।" —ইহা বলিয়া রাজা লজ্জাবনত কনিষ্ঠের হাত ধরিয়া মহারাণী শিবাদেবীর মহলে গেলেন এবং বসুদেবের সহিত একত্র স্নান ভোজন সমাপ্ত করিলেন। রাজা এই সময় হইতে মহলের ভিতরেই কুমারের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

এক দিন এক পরিচারিকা রাণী শিবাদেবীর জন্য কোনও প্রসাধন সামগ্রী লইয়া যাইতেছিল, কুমার বসুদেব তাহা পথিমধ্যে কাড়িয়া লইলেন। ইহাতে পরিচারিকা বিরক্ত হইয়া কহিল, "এই সকল চাপল্যের জন্যই তোমাকে এই অন্তঃপুরে আটক করা হইয়াছে।" দাসীর মুখে এই বিচিত্র বাক্য শুনিয়া কুমার সমস্ত জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলে, রাণীর পরিচারিকা তাহাকে আমূল বৃত্তান্ত বলিল। কুমার বসুদেব তখন সমুদ্রবিজয়ের কপট ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া ছদ্মবেশে অন্তঃপুর হইতে প্রস্থান করিলেন।

কুমার বসুদেব ছদ্মনামে ও ছদ্মবেশে নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নিজের গুণপণা প্রকাশ করেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ ও গুণে মুগ্ধ হইয়া অনেক রাজা বসুদেবকে নিজ নিজ কন্যা দান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। নানা দেশ পরিক্রমণের পর কুমার অরিষ্টপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সংগ্রামচতুর রাজা রোধন এই সময়ে অরিষ্টপুরের অধিপতি ছিলেন। পরমনীতিবেত্তা, মহা-পরাক্রমশালী হিরণ্যনাভ, রোধনের পুত্র। হিরণ্যনাভের

রোহিণী নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে স্বয়ম্বর-সভার আয়োজন হয়। এই সভায় জরাসন্ধ, সমুদ্রবিজয় প্রভৃতি বড় বড় রাজারা সমবেত হইয়াছিলেন। কুমার বসুদেবও সেই সভায় উপস্থিত হইয়া যেখানে বীণাবাদকেরা বসিয়া ছিল, সেইখানে বীণা হাতে বসিয়া গেলেন। এমনই তাঁহার ছদ্মবেশ ছিল যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সমুদ্রবিজয়ও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। যখন সমস্ত লোক নিজ আসনে উপবেশন করিলেন, তখন রোহিণী স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হইলেন। কন্যা রোহিণীর ভুবনমোহন রূপে আকৃষ্ট হইয়া যুগপৎ সমস্ত নরপতি তাহার দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল যেন তাঁহারা নেত্র-কমলের দ্বারা রোহিণীর পূজা করিতেছেন।

"তদা চ সর্ব্বভূপালৈর্বর্গিতৈরলমাকুলৈঃ।
সালোকি যুগপন্নেত্রৈরর্চ্চয়দ্ভিরিবাম্বুজৈ ॥"

৩১ সর্গ, ১৬ শ্লোক

রোহিণীর সহিত এক প্রবীণা ধাত্রী ছিল, সে জরাসন্ধ, উগ্রসেন, সমুদ্রবিজয় প্রভৃতি প্রত্যেক রাজার নিকটে রোহিণীকে লইয়া গিয়া তাঁহাদের গুণ ও ঐশ্বর্য্যাদির বর্ণন করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাঁরা কেহই রোহিণীর মনোনীত হইলেন না। এমন সময়ে রোহিণীর কাণে এক অপূর্ব্ব বীণাধ্বনি প্রবেশ করিল। এই ধ্বনি শুনিয়া ধাত্রীও চমকিয়া উঠিল। সে রোহিণীকে বলিল, "রাজপুত্রি, এইখানে আসিয়া দেখ, এই বীণা বলিতেছে, 'তোমার চিত্তচোর রাজহংস এইখানে বসিয়া আছে।' কুমারী রোহিণী বসুদেবের সমস্ত রাজলক্ষণমণ্ডিত অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং ঈষৎ নত হইয়া তাঁহার কণ্ঠে বরমাল্য পরাইয়া দিল। এইরূপ অজ্ঞাতকুলশীল একজন বীণাবাদকের গলায় বরমাল্য অর্পণ করায় উপস্থিত রাজন্যগণ অত্যন্ত অপমান বোধে বসুদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়া কন্যা কাড়িয়া লইবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু জরাসন্ধ প্রমুখ সমস্ত রাজবৃন্দই বসুদেবের কাছে পরাস্ত হইলেন। এই যুদ্ধব্যাপারে রোহিণীর পিতা ও ভ্রাতা রথ ও অস্ত্র শস্ত্র দিয়া বসুদেবকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে সমুদ্রবিজয়ের সহিত যুদ্ধ সময়ে বসুদেব নিজ নামাঙ্কিত বাণ ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল—"আপনাকে না বলিয়া যে বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছিল, আপনার কনিষ্ঠ ভাই সেই বসুদেব আজ শত বর্ষ পরে আপনার চরণে প্রণাম করিতেছে।" সমুদ্রবিজয় ইহা পড়িয়াই হাত হইতে ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া দিলেন ও পরম স্নেহভরে কনিষ্ঠকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। বসুদেবও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণে প্রণত হইলেন। এক বৎসরকাল বসুদেব রোহিণীর সহিত শ্বশুরালয়ে বাস করেন, এই খানেই রোহিণীর গর্ভে বলরামের জন্ম হয়।

কুমার বসুদেব দেশে ফিরিয়া অনেক কুলীন রাজপুত্র-দিগের আগ্রহে তাহাদিগকে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এক দিন কুমার ধনুর্ব্বিদ্যায় নিপুণ কংস প্রভৃতি নিজ শিষ্যগণকে লইয়া জরাসন্ধের রাজধানী রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া রাজার এই ঘোষণা শুনিলেন যে, "সিংহপুরনিবাসী রাজা সিংহরথ, অত্যন্ত উদ্ধত, সে সিংহচালিত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করে। যে তাহাকে জয় করিয়া আমার কাছে আনিতে পারিবে, আমার পরমাসুন্দরী কন্যা জীবদ্‌যশার সহিত তাহার বিবাহ দিব এবং তাহার ইচ্ছানুসারে যে কোনও প্রদেশ তাহাকে উপঢৌকন দেওয়া হইবে।" রাজা জরাসন্ধের এই ঘোষণা শুনিয়া কুমার বসুদেব সিংহরথকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য নিজ শিষ্য কংসকে আদেশ করিলেন। কংস গুরুর আদেশে সিংহরথকে জয় করিয়া বাঁধিয়া লইয়া আসিলেন। শস্ত্র-বিদ্যায় কংসের এই পরম নৈপুণ্য অনুভব করিয়া বসুদেব সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন, কিন্তু কংস বলিলেন, "আবশ্যক হইলে বর চাহিয়া লইব।" ইহার পর, বসুদেব সিংহরথকে লইয়া রাজা জরাসন্ধের নিকট উপস্থাপিত করিলেন। জরাসন্ধ, তাঁহার পরমশত্রু সিংহরথকে তদবস্থ দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং নিজের প্রতিজ্ঞানুসারে কন্যা জীবদ্‌যশার সহিত বসুদেবের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু কুমার বসুদেব বলিলেন যে, "সিংহরথকে পরাজিত করিবার কীর্ত্তি আমার প্রাপ্য নহে, কংসই ইহার অধিকারী—সে-ই সিংহরথকে জয় করিয়া বাঁধিয়া আনিয়া-ছিল, অতএব তাহাকেই আপনার কন্যা সম্প্রদান করা উচিত।" রাজা জরাসন্ধ ইহা শুনিয়া কংসকে তাহার জাতি জিজ্ঞাসা করিলেন। কংস তাহার জাতি কুলের কোনও পরিচয় জানিত না—সে কৌশাম্বী নগরীতে

মন্দোদরী নাম্নী এক মদ্যবিক্রেত্রীর কাছে পালিত হইয়াছিল, তাহারই নাম করিল। জরাসন্ধ মন্দোদরীকে আনিবার জন্য কৌশাম্বীতে লোক পাঠাইলেন, মন্দোদরী যে সিন্ধুকে কংসকে পাইয়াছিল, সেই সিন্ধুক লইয়া রাজদরবারে উপস্থিত হইল। মন্দোদরীর কাছে জরাসন্ধ কংসের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,—

"আমি এই কংসকে গঙ্গাতীরে সিন্ধুকের মধ্যে পাইয়াছিলাম। ইহাকে বাড়ীতে আনিয়া প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু এই বালক বড় হইয়া অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠে। মদ্যক্রয়ের জন্য বেশ্যা-কন্যারা উপস্থিত হইলে এই বালক তাহাদের সহিত মারামারি করিত। সকলে এজন্য আমাকে অনুযোগ করিলে আমি ইহাকে তাড়াইয়া দেই।"

তখন সিন্ধুক খোলা হইলে তাহার মধ্যে কংসের পরিচয়-পত্র পাওয়া গেল। রাজা জরাসন্ধ, সেই পত্র পড়িতে লাগিলেন,—

"এই বালক রাজা উগ্রসেনের পুত্র। গর্ভাবস্থায় মাতার নিরতিশয় ক্লেশের কারণ হওয়ায় পাছে ভবিষ্যৎ কালে এই পুত্রের দ্বারা কোনও অমঙ্গল হয়, এই আশঙ্কায় ইহাকে সিন্ধুকে ভরিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হইল। যদি এই বালক পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে বাঁচিয়া থাকে, তবে আমি ইহার ভরণ পোষণের জন্য দায়ী হইব না।"

রাজা এই পরিচয়-পত্র পাঠে কংসকে নিজ ভাগিনেয় জানিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং কন্যা জীবদ্‌যশার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন।

কংস আত্ম জীবনের এই ভয়ঙ্কর ঘটনা শুনিয়া পিতার প্রতি অতিমাত্র রুষ্ট হইলেন। মথুরায় আসিয়া তিনি পিতার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করেন। কংস এই সময়ে বসুদেবকে সাদরে মথুরায় আহ্বান করিয়া গুরুদক্ষিণাস্বরূপ নিজের ভগিনী অপরূপলাবণ্যবতী দেবকীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। বসুদেবও দেবকীকে লইয়া মথুরায় বাস করিতে লাগিলেন।

এক দিন কংসের রাজপ্রাসাদে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুনিরাজ অতিমুক্তক পারণের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাণী জীবদ্‌যশা প্রণাম করিলেন, কিন্তু চঞ্চল স্বভাবের জন্য দেবকীর রজস্বলা অবস্থার বস্ত্র দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ, তোমার ভগিনী দেবকীর আনন্দ-বস্ত্র।" ইহাতে মুনিরাজ অত্যন্ত অমর্য্যাদা অনুভব করিয়া ঐশ্বর্য্যমদমত্তা রাণী জীবদ্‌যশাকে বলিলেন,—"এই দেবকীর গর্ভেই যে বালক জন্মিবে, সে তোমার পতি এবং পিতার প্রাণনাশক হইবে।" মুনিরাজ অতিমুক্তকের এই এই ভয়ঙ্কর কথা শুনিয়া রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামী কংসের নিকটে গিয়া এই অভিসম্পাতের কথা জানাইলেন। কংস তখন বসুদেবের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে বর দিতে চাহিয়াছিলেন, আমি বলিয়াছিলাম, আবশ্যক হইলে লইব। আজ আমি আপনার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছি, দেবকী যেন এই রাজপ্রাসাদে সন্তান প্রসব করেন।" কুমার বসুদেব কংসের কূটনীতি বুঝিতে পারিলেন না—তিনি বিনা বিতর্কে কংসের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। দেবকী কংসের প্রাসাদে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণ জন্মের পূর্ব্বে দেবকী তিনবারে ছয় যমজ পুত্র প্রসব করেন। ইন্দ্রের আজ্ঞায় জন্মের পরক্ষণেই এই সকল পুত্র মুনিগম নামক দেবতা দ্বারা সুভদ্রিল নগরের শ্রেষ্ঠী সুদৃষ্টির স্ত্রী অলকার প্রসূতি-গৃহে নীত হইয়াছিল এবং অলকার মৃত যমজ পুত্র দেবকীর সূতিকাগারে স্থাপিত হয়। দেবকীর এই ছয় পুত্রের নাম– নৃপদত্ত, দেবপাল, অনীকদত্ত, অনীকপাল, শত্রুঘ্ন ও জিতশত্রু। কংস সূতিকাগৃহ হইতে সেই মৃত সন্তানগুলিকেই শিলাখণ্ডে আছাড় দিয়া মনকে সান্ত্বনা দিল।

দেবকী এক দিন রাত্রির শেষভাগে উদীয়মান সূর্য্য, পূর্ণ চন্দ্র, দিগ্‌গজের দ্বারা অভিষিক্ত লক্ষ্মী, ব্যোমযান, জ্বলন্ত অগ্নি, ধ্বজা ও রত্নরাশি স্বপ্ন দেখিলেন। আর এই স্বপ্ন দর্শনের পর দেবকীর অনুভব হইল যে, এক পরাক্রমশালী সিংহ তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। প্রাতঃকালে বসুদেবের নিকট দেবকী সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। বসুদেব বলিলেন, "প্রিয়ে, তোমার গর্ভে শত্রুনিষূদন, সর্ব্বলোকপ্রিয়, পরম সৌভাগ্যশালী, রাজ্যাভিষেকযোগ্য, কান্তিমান্ পুত্র উৎপন্ন হইবে।"

যথাকালে দেবকীর গর্ভধারণের সংবাদ প্রচারিত হইল। কংস, গর্ভের মাস গণনা করিতে লাগিল। কংসের ধারণা ছিল যে, দশম মাসেই যথানিয়মে সন্তান প্রসূত হইবে।

কিন্তু কৃষ্ণ ভাদ্র মাসে শ্রবণা নক্ষত্রযুক্তা দ্বাদশী তিথিতে সপ্তম মাসেই ভূমিষ্ঠ হইলেন। কৃষ্ণের জন্ম সময়ে সাত দিন হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল। বলদেব বালক কৃষ্ণকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং বসুদেব তাহার উপর ছত্র ধারণ করিলেন। এইভাবে দুইজনে গোপনে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন। তখন রাত্রি ছিল, নগর একেবারে সুষুপ্ত। বসুদেব ও বলরাম নির্ব্বিঘ্নে প্রাসাদের সিংহদ্বার অতিক্রম করিলেন।

পথে যাইবার সময়ে কৃষ্ণের প্রভাবে নগরাধিদেবতা বৃষ মূর্ত্তিতে শৃঙ্গের উপর দীপ রাখিয়া বসুদেব ও বলরামকে পথ দেখাইতে লাগিলেন। স্রোতস্বিনী যমুনা হঠাৎ অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায়া হওয়ায় তাঁহারা অনায়াসে যমুনা পার হইয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া বসুদেব সুনন্দ নামক গোপালকের হস্তে কৃষ্ণকে অর্পণ করিয়া কহিলেন,—

"প্রবদ্ধনায়ং নিজপুত্র বুদ্ধ্যা।"

৩৫ সর্গ, ২৯ শ্লোক।

এই সময়ে নন্দপত্নী গোয়ালিনী যশোদারও এক কন্যা জন্মিয়াছিল। কংসের বিশ্বাসের জন্য বসুদেব সেই কন্যাকে আনিয়া দেবকীকে দিলেন এবং বলরামের সহিত গুপ্তভাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে দেবকীর প্রসবের সমাচার, কংসের কর্ণগোচর হইল। কংস উক্ত সংবাদ শুনিয়াই সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যদি এই কন্যার স্বামীর দ্বারা কোনও অনিষ্ট ঘটে, এই আশঙ্কায় কংস মুষ্ট্যাঘাতে তাহার নাক চ্যাপ্টা করিয়া দিল।

এদিকে কৃষ্ণ গোকুলে বাড়িতে লাগিলেন। যথাকালে তাঁহার জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইল। বালকের নাম রাখা হইল,—কৃষ্ণ।

কৃষ্ণের করচরণে গদা, খড়্গ, চক্র, অঙ্কুশ, শঙ্খ, পদ্ম প্রভৃতি উত্তমোত্তম রেখা অঙ্কিত ছিল। কৃষ্ণের এমনই মোহন সৌন্দর্য্য ছিল যে, বৃন্দাবনবাসী গোপগোপীগণ তাহাকে পুনঃপুনঃ দেখিয়াও তৃপ্ত হইত না।

এক দিন বরুণ নামক কংসের হিতৈষী এক জ্যোতিষী কংসকে বলিলেন যে, কোনও নগর অথবা বনে তোমার শত্রু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। তোমার উচিত, শীঘ্র অন্বেষণ করিয়া তাহাকে আবিষ্কার করা। বরুণের কথা শুনিয়া কংস অত্যন্ত ভীত হইল। তাহার পূর্ব্বজন্মের অতি উগ্র তপস্যা ছিল, সেই তপস্যার প্রভাবে দেবীগণ কংসের বশীভূত হইয়াছিলেন। কংস এই দেবীগণকে এইরূপ প্রতিশ্রুত করাইয়াছিল যে, যদি পরজন্মে প্রয়োজন হয় ত আমার সহায়তা করিতে হইবে। এই জন্য কংস স্মরণ করিতেই দেবীগণ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কংস তাহাদিগকে কহিলেন যে, "কোনও স্থানে গুপ্তভাবে আমার শত্রু আবির্ভূত হইয়াছে, তোমরা তাহাকে সন্ধান করিয়া এই দণ্ডে বধ কর।"

এই দেবীগণ পক্ষী, পূতনা, পিশাচিনী, যমল, অর্জ্জুন প্রভৃতি নানা মূর্ত্তিতে কৃষ্ণকে মারিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃষ্ণ তাহাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়া দিলেন। অবশেষে একজন দেবী প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। এই আকস্মিক ভয়ঙ্কর ব্যাপারে গোকুলের নরনারী পশু পক্ষী সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কৃষ্ণ তখন বিশাল বাহু দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ছত্রের মতন নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া সকলকে রক্ষা করিলেন।

জৈন 'হরিবংশ' পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও লীলা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রায়শঃ আমাদের শ্রীমদ্-ভাগবতাদিরই অনুরূপ। শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও লীলা সম্বন্ধে আচার্য্য জিনসেন লিখিয়াছেন,—

"সুপীতবাসোযুগলং বসানং বনে বতংসীকৃতবর্হিবর্হণ।
অখণ্ডনীলোৎপলমুণ্ডমালং সুকণ্ঠিকাভূষিতকম্বুকণ্ঠম্॥...
"স বালভাবাৎ সুকুমারভাবগুথৈবমুষ্টিন্নকুচাঃ কুমারঃ।
সুযৌবনোন্মাদভরাঃ স্বরাসৈররীরমৎ কেলিষু গোপকন্যাঃ॥
করাঙ্গুলিস্পর্শসুখং স রাসেষ্বজীজনৎ গোপবধূজনস্য।
সুনির্ব্বিকারোঽপি মহানুভাবো সুমুদ্রিকানদ্ধমণির্যথাঽর্ঘ্য।॥"

৩৫ সর্গ, ৫৫ ও ৬৫—৬৬ শ্লোক।

জৈন 'হরিবংশ' পুরাণে কালিয়দমনের কথাও আছে,—

নিজভুজবলশালী হেলয়ৈরাবগাহ্য
হ্রদমপি কুপিতোত্থং কালিয়াহিং মহোগ্রম্।
ফণিমণিকিরণৌঘোদ্গীর্ণবহ্নি স্ফুলিঙ্গ
ব্যতিকরমতিকৃষ্ণং মংক্ষু (?) কৃষ্ণো মমর্দ্দ॥"

৩৬ সর্গ, ৭ শ্লোক।

কংস, কৃষ্ণকে বধ করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া মল্লযুদ্ধের আয়োজন করিল। এই মল্লযুদ্ধে গোকুলের সমস্ত গোপালক আহূত হইলেন। সামান্য সামান্য মল্ল-যুদ্ধের পর, কংস, পর্ব্বতবৎ ভীষণকায় বানুরমল্লকে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ করিল। কৃষ্ণ তাহাকে কুলিশকঠোর বাহুদ্বয়ের দ্বারা পেষণ করিয়া মারিয়া ফেলিলেন। তখন কংস ক্রোধভরে নিষ্কাশিত অসি লইয়া কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইলে, কৃষ্ণ তাহার উদ্যত অসি কাড়িয়া লইলেন এবং তাহার পা ধরিয়া এক আছাড় মারিলেন। কংসকে এই ভাবে নিহত করিয়া কৃষ্ণ উগ্রসেনকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন এবং যাদবগণের আজ্ঞায় তাঁহাকেই মথুরার রাজত্ব দিলেন। কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি দ্বারকায় চলিয়া আসেন।

কৃষ্ণের এইরূপ অলৌকিক পরাক্রমের কথা শুনিয়া বিজয়ার্দ্ধ পর্ব্বতের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী রথনূপুর নামক নগরের অধিপতি রাজা সুকেতু, কৃষ্ণের সহিত নিজ কন্যা সত্য-ভামার বিবাহ দিলেন। এই সুকেতুর ভ্রাতা রতিমালের কন্যা রেবতীর সহিত বলরামের বিবাহ হয়। সত্যভামা ও রেবতীর সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

প্রথমমদনরঙ্গে শার্ঙ্গিণঃ সত্যভামা
হৃদয়মহরদিষ্টা রেবতী সীরপাণেঃ।
গুণিতগুণকলাণাং সুপ্রয়োগৌতয়োস্তা
কুচিত করণকালে ন স্খলন্তি প্রগল্‌ভাঃ॥"

৩৬ সর্গ, ৬৩ শ্লোক।

এক দিন নারদ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নূতন বাসভবন দেখিতে আসিলেন। ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের পট্টমহিষী সত্যভামা মণিময় দর্পণে নিজের রূপ দেখিতেছিলেন। সত্যভামা এমনই তন্মনস্ক ছিলেন যে, নারদের আগমন সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। ইহাতে নারদ অত্যন্ত অনাদর মনে করিয়া সত্যভামার প্রতি ভীষণ রুষ্ট হইলেন। তিনি আর একজন অসাধারণ লাবণ্যবতী রমণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া সত্যভামার রূপগর্ব্ব চূর্ণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। নারদ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারকা হইতে আকাশমার্গে কুণ্ডিন নগরে উপনীত হইলেন।

এই সময়ে কুণ্ডিন নগরে ভীষ্ম নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম রুক্মী, কন্যার নাম রুক্মিণী। রুক্মিণী অত্যন্ত সুন্দরী ও সর্ব্বগুণসম্পন্না। নারদ রুক্মিণীর রূপ দেখিয়া মনে ভাবিলেন, এই কন্যাই শ্রীকৃষ্ণের সকল প্রকারে উপযুক্তা। ইহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ সম্বন্ধ করাইয়া সত্যভামার সৌভাগ্য গর্ব্ব দূর করিব। রুক্মিণী স্বভাবতঃই অত্যন্ত বিনীতা ছিল, সে নারদকে দেখিয়াই ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিল। নারদ আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বৎসে, তুমি দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের বল্লভ হও।" ইহা শুনিয়া রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো, দ্বারকা নগরী কোথায়, এবং তাহার অধিপতি কে?" নারদ তখন সবিস্তরে দ্বারকাপুরী ও শ্রীকৃষ্ণের এমন ভাবে বর্ণন করিলেন যে, রুক্মিণী কৃষ্ণের প্রতি পরম অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। নারদ, রুক্মিণীর একখানি চিত্র আঁকিয়া লইয়া দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলেন। নারদ সেই চিত্রপট, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ চিত্র কাহার, এমন রূপ ত কখনও দেখি নাই।" নারদ তখন রুক্মিণীর পরিচয় দিলেন। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

রুক্মিণীর এক পিসী, তাহাকে বড় ভালবাসিতেন্। তিনি সকল বৃত্তান্ত জানিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। কেন না, রুক্মী, রাজা শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিল। রুক্মিণীর পিতৃষ্বসা অনেক চিন্তা করিয়া গোপনে এক দূতের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই পত্র পাঠাইলেন,—

"ত্বন্নামগ্রহণাহারপ্রীণিতপ্রাণধারিণী।
হরে কাঙ্ক্ষতি তে রক্তা রুক্মিণী হরণং ত্বয়া॥
শুক্লাষ্টম্যাং হি মাঘস্য যদি মাধব রুক্মিণীম্।
ত্বমেত্য হরসি ক্ষিপ্রং তবেয়মবিসংশয়ম্॥
অন্যথা তু বিতীর্ণায়াশ্চৈদ্যায় গুরুবান্ধবৈঃ।
ত্বদলাভে ভবেদস্যাঃ শরণং মরণং হরে॥"—

হরিবংশ, ৪২ সর্গ, ৬০—৬২ শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণ পত্র পাঠ করিয়া রুক্মিণীহরণের প্রতিজ্ঞা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যথাসময়ে বলরামের সহিত উপস্থিত হইয়া রুক্মিণীকে রথে তুলিয়া লইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইয়া নিজেদের প্রস্থান সংবাদ জানাইয়া

দিলেন। পথিমধ্যে রুক্মী ও শিশুপালের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের যুদ্ধ হয়, রুক্মিণীর প্রার্থনায় রুক্মীর প্রাণরক্ষা হইল, কিন্তু কৃষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা শিশুপালের মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন। কৃষ্ণের সহিত বলরামও ছিলেন। গিরনার পর্ব্বতে রুক্মিণীর সহিত কৃষ্ণের বিবাহ হয়, পরে উভয় ভ্রাতা দ্বারকানগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

যথাসময়ে সত্যভামা ও রুক্মিণীর দুই পুত্র হয়। সত্যভামার পুত্রের নাম ভানু, রুক্মিণীর পুত্রের নাম প্রদ্যুম্ন। প্রদ্যুম্নের সহিত দুর্যোধনের কন্যা উদধিকুমারীর বিবাহ হয়।

ইহার পর, রাজা জাম্ববের কন্যা জাম্ববতী, রাজা শ্লক্ষ্ণরোমের কন্যা লক্ষণা, রাজা সুরাষ্ট্রের কন্যা সুসীমা, রাজা মেরুর কন্যা গৌরী, রাজা হিরণ্যনাভের কন্যা পদ্মাবতী, রাজা ইন্দ্রগিরির কন্যা গান্ধারী—এই ছয় রাজকুমারীর সহিত কৃষ্ণের বিবাহ হয়। সত্যভামা ও রুক্মিণী মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণের আটজন পট্টমহিষী ছিলেন।

"মহাদেবীভিরিষ্টাভিরষ্টাভিরবরোধনে।
প্রসাধিতাভিরাশাভিরিব তাভিরুপাসিতঃ॥
বিন্দন্ ভোগফলং ভূরি গোবিন্দঃ পুণ্যবৃক্ষজম্।
সন্দদজ্জনতানন্দং ননন্দ পুরুষোত্তমঃ॥"

৬৪ সর্গ, ৫০—৫১ শ্লোক।

অন্যান্য মহিষীর গর্ভেও শ্রীকৃষ্ণের অগ্নিশিখ, অকম্পন, বিষ্ণুসঞ্জয়, প্রসেনজিৎ, শম্ব প্রভৃতি অনেক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর জরাসন্ধের সহিত যদুবংশের ঘোর যুদ্ধ হয় ও সেই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিনারায়ণ জরাসন্ধকে সুদর্শন-চক্র লাভ করিয়া তাহাকে বধ করেন ও নারায়ণত্ব প্রাপ্ত হন।

পরিশেষে বলদেবের মাতুল দ্বীপায়নের দ্বারা কুবেরের স্বহস্তনির্ম্মিত দ্বারকার সমস্ত শোভা সম্পদ্ নষ্ট হয় এবং বসুদেবেরই অপর পুত্র জরৎকুমারের হস্ত-নিক্ষিপ্ত বাণে বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। বলদেব বৈরাগ্যপূর্ণ হৃদয়ে তপস্যা করিতে গেলেন। অন্তে বলদেবের পঞ্চম স্বর্গ লাভ হয়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথজী

শ্রীকনকলতা ঘোষ

পুরীধামের অধিস্বামী জগৎস্বামী জগন্নাথ,
সিন্ধুতীরে শ্রীমন্দিরে তোমায় করি প্রণিপাত।
মূর্ত্তি তোমার দুঃখহরা—হেরেছি দেব এই নয়নে,
সকল দুঃখ উজাড় করে দেয় যে মানব ওই চরণে।
দেবালয়ের পুষ্পগন্ধ আজো যেন আস্‌ছে ঘ্রাণে,
মধুর সে যে বাদ্যধ্বনি ভাস্‌ছে যেন আজো কাণে।
লক্ষ লক্ষ নরনারী যাচ্ছে সারা বরষ ধরে,
দরশ পেয়ে ধন্য হয়ে আস্‌ছে ফিরে যে যার ঘরে।
শ্রীচৈতন্য, শঙ্করদেব, তোমার প্রেমে ভেসেছিল,
বিজয়কৃষ্ণ, সাধু হরিদাস, কত লোকের মন মজিল।
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা হয় যে মানব এ মহীতে,
হেথায় তারে আর ত কভু হয়না কোন ক্লেশ সহিতে।

পবিত্র সৌরভে পূর্ণ তোমার মন্দির মাঝে,
অপূর্ব্ব মধুর ভাব মুগ্ধ এ হৃদয়ে রাজে।
সহস্র কণ্ঠে উঠিছে নিনাদি জয় জগবন্ধু বলরাম,
চঞ্চল সলিলা সিন্ধু তোমার গাহে বন্দনা অবিরাম।
বীর হনুমান ও সিংহকেশরী তোমার দ্বারের প্রহরী,
সম্মুখদ্বারে, চণ্ডাল তরে "পতিত পাবন" মুরারি।
ধন্য ধন্য ধন্য দেব জাগ্রত হে ভগবান,
উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে কর ভক্ত হৃদে অধিষ্ঠান॥
কত সাধু মহাজন স্মৃতি বুকে ধরি,
সমুদ্র সৈকতে এই সুমধুর পুরী॥

রাজগী!

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

(১৭)

চার বৎসর হয় সম্পত্তি আমার হাতে আসিয়াছে। আমার হাতে ঠিক আসে নাই, দেওয়ানের হাতেই আছে, তবে আমি তার আইনসঙ্গত মালিক এবং বিনিয়োগ-কর্ত্তা। সম্পত্তির দেখা শোনা আমি মোটেই করি না, তাহা বলাই বাহুল্য,—কোনও খবরই রাখি না। দেওয়ানজী মারা গিয়াছেন, গোবিন্দকে তাঁর পদে বহাল করিয়াছি। ঠিক আমি করি নাই, করিয়াছেন রাণীমা ও সাবিত্রী। আমি তার কাছে লিখিলাম আমার কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু সে যেন টাকা পয়সা সরবরাহ বিষয়ে কোনও আপত্তি না করে। সুবুদ্ধি গোবিন্দ আনন্দের সহিত সম্মত হইল।

রাণীমা আমাকে দেশে লইয়া যাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাবিত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া ছয় মাস ছিলেন, আমি ধরা দিই নাই। তাঁরা আসিবামাত্র আমি এক-রকম এক-বস্ত্রে কাশী চলিয়া গেলাম ;-তার পর যত দিন তাঁরা কলিকাতায় ছিলেন, তত দিন আমি দেশ-দেশান্তরে কেবলি ঘুরিয়া বেড়াইলাম। মা কাঁদিয়া কাটিয়া আমাকে লিখিলেন, "অন্ততঃ কলিকাতায় ফিরিয়া এসো।" আমি লিখিলাম, "তোমরা চলিয়া গেলেই আসিব।" অগত্যা সাবিত্রীকে লইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া গেলেন।

তার পরই তাঁর মৃত্যু হইল। আমি টেলিগ্রাম পাইয়া খুব ঘটা করিয়া তাঁর চতুর্থী শ্রাদ্ধ করিলাম। তিন দিন শুদ্ধাচারেই ছিলাম। শ্রাদ্ধ করিয়া উঠিয়া মনটা একটু খারাপ হইল। রাণীমার কাছে শৈশবে যে স্নেহ পাইয়াছিলাম, সে সব কথা স্মরণ হইল। সে স্নেহের পরিমাণ খুব বেশী না হইলেও, তাহাও এখন আমার পক্ষে দুর্লভ। এখন আর কেহই রহিল না যে, আমাকে এক ফোঁটা স্নেহ করে। ভাবিতে আমার শুষ্ক হৃদয় নিঙাড়িয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

পরে বুঝিয়াছি যে আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। পবিত্র স্নেহ-মমতা আমাকে ঘিরিয়া আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া রহিয়াছে,—কেবল আমি মূঢ়ের মত তাহাকে ছাড়াইয়া পলাইয়া বেড়াইতেছি। সে কথা জানিলাম তিন বৎসর পরে।

আমি কলিকাতায় আমার প্রকাণ্ড প্রাসাদে থাকিতাম, কিন্তু কারও আমার কাছে প্রবেশের অধিকার ছিল না। সন্ধ্যার পর হইতে সকাল দশটা পর্য্যন্ত কোনও ভদ্রলোক আমার কাছে অগ্রসর হইতে পারিত না,—তখন আমি নরকে বেষ্টিত হইয়া থাকিতাম। দ্বিপ্রহরে আহারান্তে আমি একা আমার লাইব্রেরীতে বসিয়া পড়াশুনা করিতাম। ঘুমের বালাই আমার ছিল না। প্রায় তিন চার মাস

প্রায় সম্পূর্ণ অনিদ্রায় কাটাইয়াছি। লাইব্রেরীতে যতক্ষণ থাকিতাম, ততক্ষণ কাহারও তথায় প্রবেশের অধিকার ছিল না। আমি একাগ্রভাবে বইগুলির মধ্যে প্রাণ ডুবাইয়া দিয়া তিন চারি ঘণ্টার জন্য ক্লেদশূন্য বিস্মৃতি লাভ করিতাম।

এক দিন হঠাৎ লাইব্রেরীতে আসিয়া ঢুকিলেন নরেন বাবু! তিনি সকল বাধা অস্বীকার করিয়া, অপমান গ্রাহ্য না করিয়া আসিয়াছেন—তাহা তাঁহার কুঞ্চিত ভ্রূযুগল দেখিয়াই বুঝিলাম। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া অপরাধী ছাত্রের মত তাঁর সম্মুখে দাঁড়াইলাম।

কোনও বাগাড়ম্বর না করিয়া তিনি বলিলেন, "দ্বিজেশ, তুমি কাপড় চোপড় ছেড়ে শীগ্‌গির আমার সঙ্গে এসো।"

আমি বলিলাম, "চলুন। কোথায় যেতে হ'বে?"

"বিধুর কাছে।"

একটা সুদূর স্বপ্নের মত এখন হইয়াছে বিধু! তার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। বিধুর সঙ্গে সঙ্গে জড়িত আছে আমার একটা অতীত সত্তা, যার সঙ্গে আমার এখন আর কোনও সম্বন্ধই নাই। সেই অতীত তখন বড় দুঃখ-ভরা মনে হইয়াছিল; কিন্তু এখন মনে হইল, বর্ত্তমানের তুলনায় সে দিন কত গভীর আনন্দে ভরা ছিল। সেই স্মৃতিতে আমার অজ্ঞাতসারে আমি একটা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলাম।

আমি বলিলাম, "চলুন। কোথায় আছে সে?"

"সে আছে ডাক্তার বসুর নার্সিং হোমে—সে মৃত্যু-শয্যায়।"

এই কথা আমার সমস্ত অন্তরের ভিতর দিয়া একটা তীক্ষ্ণ শলাকার মত ভেদ করিয়া গেল। আমি এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ বিস্ময়ে আমার গুরুর নিশ্চল শান্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সেই এক মুহূর্ত্ত আমার কথা কহিবার শক্তি রহিল না।

নরেনবাবু বলিলেন, "আর দেরী করো না, তার একেবারে শেষ অবস্থা। তিন দিন ধরে তোমার সন্ধানের চেষ্টা ক'রছি, দ্বারোয়ানের কাছে প্রায় গলাধাক্কা খেয়ে বিদায় হ'য়েছি। আজ এখন তাকে জীবন্ত দেখতে পাব কি না কে জানে।"

আমার বুক একটা তীব্র অস্পষ্ট ব্যথায় ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। আমার পরণে চটিজুতা ও গায় একটা হাত-কাটা ফতুয়া ছিল। আমি সেই অবস্থায়ই নরেনবাবুর সঙ্গে বাহির হইলাম। ডাক্তার বসুর নার্সিং হোম আমার বাড়ী হইতে বেশী দূরে নয়। দশ মিনিটের মধ্যে আমরা সেখানে পৌঁছিলাম।

বিধু তখনও মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে; তার চক্ষু বড় বড় হইয়া উঠিয়াছে, শ্বাস-কষ্ট সবে আরম্ভ হইয়াছে। সেই বড় বড় চক্ষু দুটি দিয়া সে দরজার দিকে চাহিয়া ছিল। আমি যাইতে সে অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বিপুল চেষ্টায় সে বলিল, "পায়ের ধুলা দেও।"

একটু সঙ্কোচ বোধ করিলেও মুমূর্ষুর ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম।

সে আবার বলিল, "আর জন্মে যেন তুমি আমার স্বামী হও, আশীর্ব্বাদ কর!"

আমি চক্ষু ঢাকিয়া বলিলাম, "আশীর্ব্বাদ ক'রছি বিধু।" আর একটি কথা সে বলিল। আমি তার শীতল হাতখানা আমার দুই হাতের ভিতর ধরিয়া তার বিছানায় বসিয়া ছিলাম। সে বলিল, "রাজা বাবু, তুমি ভাল হও।" এই ছোট প্রার্থনা সে মুখে বলিল, কিন্তু সমস্ত মুখ চক্ষু তার একান্ত মিনতি জানাইল, যেন সে আমার প্রতিশ্রুতি পাইলেই শান্তিতে মরিতে পাবে। এ কথার পর আর সে কথা বলিতে পারিল না। প্রচণ্ড চেষ্টায় কথা বলার পর তার অবসাদ আসিল, তার পর তার চক্ষু স্থির হইয়া আসিল, মুখ নিশ্চল হইয়া গেল, কিন্তু তবু সে চোখ যেন আকুল মিনতিভরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম, "তোমাকে কথা দিলাম বিধু, আমি ভাল হ'ব।"

এই কথা শুনিবার জন্য সে শেষ কয় মুহূর্ত্তের সমুদায় শক্তি চক্ষু কর্ণের ভিতর নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু যখন আমি বলিলাম, তখন সে শুনিতে পাইল কি না, ভগবান জানেন। তার পর তার মুখের কোনও বিকৃতি হইল না,—অমনি পাথরের মূর্ত্তির মত আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কখন যে তার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল, ঠিক টের পাইলাম না। সেই বিছানার উপর মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া আমি আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে

নরেনবাবু সজল নয়নে আমার কাছে আসিয়া আমাকে টানিয়া তুলিলেন।

তখন সব নিঃশেষে শেষ হইয়া গিয়াছে। এক মুহূর্ত্ত আগে যে বিধু ছিল, এখন সে একটা শব মাত্র।

আমি অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। এত বড় শোক, এত ব্যথা আমি জীবনে কখনও পাই নাই। আজ বিধুকে হারাইয়া বুঝিলাম, বিধু আমার কতবড় বন্ধু, কতবড় হিতৈষী ছিল, কত ভাল সে বাসিত আমায়। আমি তাকে ভালবাসিয়াছিলাম, তাকে আশ্রয় করিয়াই আমার মনে প্রেম প্রথম দেখা দিয়াছিল। সে ভালবাসা আমি হারাইয়াছিলাম, কিন্তু আর কাহাকেও তার পর ভালবাসি নাই। আজ বুঝিলাম, সে ভালবাসা আমার ভিতর পাপের বিপুল ভারে চাপা পড়িয়া ছিল, মরে নাই। তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া অজস্র অশ্রুধারে প্রবাহিত হইল। আমি কিছুতেই আমার অন্তরের এ তীব্র শোকোচ্ছ্বাস থামাইতে পারিলাম না।

বিধুর সৎকারের আয়োজন হইল। আমি উপযাচক হইয়া তার দেহ স্কন্ধে বহন করিয়া শ্মশানে গেলাম। আপন হাতে আমি তার মুখাগ্নি করিলাম, একাগ্র চিত্তে ভগবানের কাছে পরলোকে তার মঙ্গলকামনা করিলাম। প্রার্থনা করিলাম যে, যদি মানব-জন্মই তার আবার গ্রহণ করিতে হয়, তবে যেন সে আমার ধর্ম্মপত্নী হয়।

চিতা নিভিয়া গেল, আমি হতাশ হৃদয়ে তার শেষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দিকে চাহিয়া রহিলাম। নরেন্দ্র বাবু আমাকে স্নেহালিঙ্গনে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন।

পথে তাঁর কাছে শুনিলাম যে, দশ দিন পূর্ব্বে বিধুর ব্যারাম হয়। সংবাদ পাইয়া নরেন্দ্রবাবু তাহাকে দেখিতে যান। ব্যারামের রকম সকম দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া তিনি বিধুকে ডাক্তার বন্ধুর নার্সিং হোমে লইয়া আসেন। সেখানে তার সুচিকিৎসা হইল, কিন্তু মারাত্মক ব্যাধির উপশম হইল না। ব্যারামের গতি খারাপ বুঝিয়াই বিধু নরেন্দ্র বাবুকে বলিয়াছিল একবার আমাকে খবর দিতে। প্রথমে নরেন্দ্রবাবু খবর দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই, কেন না, জীবিতাবস্থায় আমার সঙ্গে বিধুর আর দেখা হওয়া তাঁর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যখন বুঝিলেন যে বিধুর মৃত্যু নিশ্চয়, তখন তিনি আমাকে খবর দিতে চেষ্টা করিলেন। তিন দিন ব্যর্থ চেষ্টার পর, আজ বিধুর শেষ অবস্থা দেখিয়া, তিনি সকল অপমান অগ্রাহ্য করিয়া জোর করিয়া আমার ঘরে ঢুকিয়াছিলেন।

* * * *

আমাকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া নরেন বাবু বাড়ী ফিরিলেন। লাইব্রেরীর ভিতর আমার বসিয়া পড়িবার কয়েকখানা পুরু গদীওয়ালা নানারকম কলকব্জার চেয়ার ছিল। তার একটার উপর শুইয়া পড়িয়া আমি শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম সম্মুখের দেয়ালের দিকে। কিছুই দেখিলাম না, সুধু চাহিয়া রহিলাম।

সম্মুখের দেওয়ালে ছিল একখানা বড় তৈলচিত্র। বিলাতের এক বিখ্যাত রূপসী নর্ত্তকীর মূর্ত্তি সেটা। তার তুল্য পরিপূর্ণ অঙ্গ সৌষ্টবযুক্ত সুন্দরী ইয়োরোপে কোথাও নাই, এমনি সবাই স্থির করিয়াছিল। ছবিখানা তার সম্পূর্ণ নগ্ন মূর্ত্তি,—বিলাতের এক কুশলী শিল্পীর তোলা। অনেক টাকা খরচ করিয়া ছবিখানা বিলাত হইতে আনাইয়াছিলাম। এমন অনেক ছবিই আমার এই লাইব্রেরীর দেওয়ালে টানান ছিল। কেন না এ ঘরে কারও আসিবার অধিকার ছিল না। এ সব ছবির ভিতর আর্টের বংশও ছিল না, কেবল ছিল সুন্দরী নারীর নগ্ন মূর্ত্তি; তাদের নানা বিলাস লাস্য। অনেকক্ষণ পর ছবিখানা নজরে পড়িল। এখন দেখিয়া আমার ভয়ানক ঘৃণা বোধ হইল। ঐ নগ্ন মূর্ত্তির দিকে চাহিতে যেন আমার অন্তর বিরক্ত হইয়া উঠিল। আমি যে কোনও দিন এই কদর্য্য দৃশ্য দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, তাই ভাবিতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমি মুখ ফিরাইয়া বসিলাম। কিন্তু চারিদিকেই এমনি নগ্ন মূর্ত্তি আমার চক্ষুকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। এই সব মূর্ত্তি বিষের ছুরির মত আমার বুকের ভিতর গিয়া বিঁধিতে লাগিল।

এমনি একখানি সুকুমার তরুণ দেহ তার সদ্যোদ্ভিন্ন যৌবনের সকল সৌষ্টব লইয়া আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—সেই দেহ আজ আমি আপন হাতে পুড়াইয়া ছাই করিয়া আসিয়াছি! সেই চিতার আগুন আজ আমার অন্তরে জ্বলিয়া এই সব নগ্ন দেহের ক্লেদময় রূপরাশি পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিল,—এগুলির দিকে আমি চাহিতে পারিলাম না। আমি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া

আসিলাম। একটি কর্ম্মচারীকে আদেশ দিলাম, সব ছবি নামাইয়া পোড়াইয়া ফেলিতে। সে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া আমি এ ছবিগুলি কিনিয়াছিলাম, তাহা সে জানিত। তাই সে অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

আমি তীব্র জ্বালাময় হাস্যের সহিত বলিলাম, "অবাক হ'চ্ছ দেবেন, যে আমি এত হাজার হাজার টাকা পুড়িয়ে ফেলতে বলছি! এ দশ বছরে যে কত লক্ষ টাকা আমার ছাই হ'য়ে গেছে, তার খবর রাখ না?"

দেবেন ছবিগুলি নামাইয়াছিল; পুড়াইয়াছিল কি না খবর লই নাই।

আমি বাহিরে আমার বসিবার ঘরে গেলাম। আমার মাথার ভিতর চিতার আগুণ জ্বলিতেছিল, প্রাণ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। অভ্যাস বশতঃ বেয়ারাকে ডাকিয়া একটা পেগ দিতে বলিলাম। বেয়ারা বোতল আনিয়া ঢালিতে লাগিল। আমি হঠাৎ তাহাকে বলিলাম "রাখ্! ঘরে ক' বোতল মদ আছে?" সে বলিল, বেশী নাই, এক ডজন শ্যাম্পেন আছে, আর তিনটা হুইস্কি। আমি বলিলাম, "সব এখানে নিয়ে আয়।"

ভৃত্য একটু অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। আমি একটা ধমক দিতেই, সে সব বোতলগুলি আনিয়া একটা ছোট টেবিলের উপর জড় করিল। আমি তখন একটা বোতলের গলা ধরিয়া তাহা দিয়া জোরে আর একটা বোতলে ঘা মারিলাম। অনেকগুলি বোতল গড়াইয়া পড়িয়া ভাঙ্গিল। যা রহিল, তাহা ক্ষেপার মত আছাড় দিয়া ভাঙ্গিলাম। এমনি করিয়া আমি সেই পোনেরো বোতল বিষ নিজ হাতে নিঃশেষ করিলাম। আমার বসিবার ঘরে মদের স্রোত বহিয়া গেল। ভৃত্যকে পরিষ্কার করিতে বলিয়া আমি বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

(১৮)

নরেন্দ্রবাবু আসিলে আমি তাঁহার পায় পড়িয়া তাঁহাকে বলিলাম, "দাদা, আর আমাকে ছেড়ে দেবেন না। বিধুর মৃত্যু-শয্যায় যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তা যদি আমার রাখতে হয়, তবে আপনাকে ছাড়া আমার চলবে না। আপনি আমার ভার নিন।"

নরেন্দ্রবাবু আমাকে পায়ের তল হইতে তুলিয়া স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার য. সাধ্য আমি ক'রবো ভাই, কিন্তু তোমার ভাল হওয়া না হওয়া তো আমার উপর নির্ভর করে না, তুমি নিজে যদি পার তবেই তুমি পারবে।"

"আমি পারবো দাদা। আর ভুল হ'বে না, কেবল আপনি যদি আমায় আশ্রয় দেন।"

আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, "আপনি প্রফেসারী ছেড়ে দিন, আমার ভার নিন। আমার গুরু হ'য়ে আপনি আমার সংসারে কর্ত্তৃত্ব করুন।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তা পারবো না ভাই। তার কারণ, তোমার কাছে মাইনা নিয়ে আমি চাকরী ক'রবো না। কেন না, প্রথমতঃ, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা টাকা-পয়সার লেন-দেনের সম্পর্ক হয়, এ আমি ইচ্ছা করি না। দ্বিতীয় কারণ এই যে, যতই আমি এ বিষয়ে চিন্তা ক'রছি, ততই আমি নিশ্চয় বুঝতে পারছি যে, জমীদারী ব্যাপারটা একটা প্রকাণ্ড সামাজিক অবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। জমীদারের টাকা অন্যায়ের রোজগার—তার কোনও অংশ নিয়ে আমি এই সামাজিক অন্যায়টাকে কোনও মতেই স্বীকার ক'রতে পারি না।"

অনেক দিনকার পুরাতন তর্কটা আজ আবার মনে পড়িল। দাদা যেদিন আমাকে একটা মস্ত বড় ত্যাগে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, আমাকে জমীদারী ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, সে কথা আমি এই কয় বৎসরে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আজ তিনি আমাকে আবার স্মরণ করাইয়া দিলেন। আমি উপস্থিত কথা ভুলিয়া গিয়া সেই কথাই ভাবিতে লাগিলাম।

দাদা বলিলেন, "এই জমীদারী জিনিসটা যে কতবড় অন্যায়, কত ভীষণ অকল্যাণকর, এ সম্বন্ধে আমার যদি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকতো, তবে তোমার দশা দেখে তা মিটে যেতো। তোমার মত বুদ্ধিমান আমাদের দেশে খুব বেশী নেই। তুমি না ক'রতে পারতে এমন কাজ নেই। পোনেরো বৎসর আমি ছেলে পড়াচ্ছি। অনেক ছেলেই আমার হাত দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তার মধ্যে অনেকে মস্ত লোক হ'য়েছে। কিন্তু এ কথা জোর করে' বলতে পারি যে, তোমার মত এত প্রকাণ্ড ধীশক্তি, এতবড় উদার আত্মা আমি বিশেষ দেখতে পাই নি। কিন্তু তোমার এই

ত্রিশ বৎসর বয়সে তুমি কুচরিত্র ভিন্ন আর কোনও বিষয়েই কৃতিত্ব দেখাতে পারলে না। বাইশ বৎসর বয়সে পিট প্রধান মন্ত্রী হ'য়েছিলেন, আর তোমার চেয়ে অল্প বয়সে অনেক লোকে জগতের পণ্ডিত-সমাজে একটা চিরস্থায়ী প্রভুত্ব লাভ ক'রেছেন। ত্রিশ বৎসর মানুষের জীবনে তো কম সময় নয় ভাই।"

আমি লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিলাম। অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিলাম, "আপনি আমাকে স্নেহচক্ষে খুব বড় করে দেখছেন দাদা। কিন্তু আমি আজ অন্তরে অন্তরে অনুভব ক'রছি যে, আমার দুর্দ্দশার জন্য আমি নিজে ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়, কিছুই দায়ী নয়।"

"সে কথা সত্য। আমাদের যে অধঃপতন হয়, অবস্থা তার সুযোগ ঘটায় বটে, কিন্তু অধঃপতনের জন্য দায়ী আমরাই। কিন্তু তোমার মত চরিত্রের দুর্ব্বলতা নিয়ে জন্মেও অনেকে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে যাচ্ছে। কেন না, তোমার দুর্ব্বল চরিত্রের পতনে সহায়তা ক'রেছে যে সব অবস্থা, তা' তাদের বেলায় ছিল না। যাকে মাথার ঘাম পায় ফেলে জীবিকা উপার্জ্জন ক'রতে হয়, যার বিদ্যাচর্চ্চা ক'রতে হয় প্রধানতঃ জীবনে সফলতা লাভ করবার জন্য, তার মধ্যে এই সব দুষ্প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ ক'রবার অবকাশ পায় না। কিন্তু তুমি মস্ত জমীদার। তোমার টাকার অভাব নেই। চিঠি লিখলেই তোমার টাকা আসে। জমীদারী দেখা শুনাও তোমার ক'রতে হয় না, মাইনা করে' লোক রেখে তুমি সে কাজ চালাতে পার। জমীদারীটা হ'চ্ছে তোমার আলস্যের endowment; অথচ তোমার ভিতর এমন একটা অশান্ততা আছে, যাতে তোমার কেবল অলস হ'য়ে ঘুমিয়ে দিন কাটান অসম্ভব। কাজেই তোমার চিত্ত আপনার পরিতৃপ্তির অবসর খুঁজে নিয়েছে দুষ্কার্য্যে। এই অশান্ততা অবশ্য অন্য ভাবেও ফুটে উঠতে পারতো। তুমি জ্ঞান-চর্চ্চায় আত্ম-নিয়োগ করেও নিজের জীবন সার্থক ক'রতে পারতে। কিন্তু তোমার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা, সমস্ত সংস্কার তার বিরুদ্ধ। ছেলে বয়স্ থেকে আলস্যে তুমি দীক্ষিত, পরিপুষ্ট। জ্ঞান-চর্চ্চার ভিতর যে আয়াস, তার জন্য যে বিপুল পরিশ্রমের প্রয়োজন তা' করবার বিরুদ্ধে তোমার শরীরের অণু পরমাণু পর্য্যন্ত বিদ্রোহী হ'য়ে র'য়েছে। কাজেই, তুমি সহজ পথে কেবল শরীরের পরিতৃপ্তি করেই তোমার চিত্তের অশান্ততাকে তৃপ্ত ক'রেছ। জমীদারী শতকরা নব্বই জায়গায় এই আলস্যের পরিপুষ্টি সাধন ক'রছে। কখনও কখনও সে আলস্য কেবল পরিপূর্ণ আলস্যেই পরিণতি লাভ ক'রছে, আর কখনও বা তার থেকে নৈতিক অধোগতি হ'চ্ছে। এই তো বাঙ্গলার জমীদারদের পোনেরো আনার ইতিহাস। একই বাঙ্গলা দেশের জল বায়ুতে এক সমাজে এক cultureএর ভিতর জমীদার ও অজমীদার মানুষ হ'চ্ছে। তবু জমীদারের মধ্যে দুশ্চরিত্রতা বেশী, এটা যে জমীদারীর একটা পরোক্ষ ফল নয়, এ কথা প্রমাণ ক'রতে অনেকটা সাহসের প্রয়োজন।"

এ কথার প্রতিবাদে অনেক কথা আমার মনে উঠিতেছিল। আমি দীনতার সহিত অনুভব করিতেছিলাম যে, আমার জানার ভিতর অনেক সচ্চরিত্র ধর্ম্মপরায়ণ জমীদার আছেন,—এমন অনেকে আছেন, যাহারা আলস্য কাহাকে বলে জানেন না, যাহারা দিনরাত সৎচিন্তায়, সৎকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। মনে হইল যে, নরেনবাবু আমাকে দেখিয়া সব জমীদারের উপর অবিচার করিতেছেন। মনে হইল যে, আমি হতভাগ্য কেবল নিজেকে কলঙ্কিত করি নাই—সমস্ত জমীদার শ্রেণীর উপর কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়াছি। এমনি অনেক কথা মনে হইল, কিন্তু তর্ক করিলাম না। আমি বলিলাম, "সে কথা থাক। আমি আমার জীবনের সম্পূর্ণ ভার আপনার হাতে তুলে দিলাম,—এ আপনি যেমন করে ইচ্ছা, গড়ে নিন। আমাকে দিয়ে যা' ক'রতে হয় করুন। আপনি আমার কাছে বেতন না নিতে চান না নিলেন,—কি ব্যবস্থা করে' আপনি ভার নিতে পারেন বলুন।"

দাদা বলিলেন, "আমাকে যদি ভার নিতে বল, তবে আমার প্রথম কাজ হ'বে তোমার হাতে সে ভার ফিরিয়ে দেওয়া। নিজে নিজের ভার নিতে না পারলে, কোনও কাজই হয় না। মানুষ হ'য়ে পরের হাতে চালিত হওয়ার মত দুর্ভাগ্য আর নেই। আমি তোমাকে নিজে নিজের ভার নিতে শেখাব। তার জন্য তোমার সঙ্গে আমার সর্ব্বদা থাকা হ'লে ভাল হয়। কিন্তু সে কেবল এক উপায়ে সম্ভব হ'তে পারে। তুমি যদি তোমার বাড়ী

ঘর ভেঙ্গে চুরে আমার সঙ্গে এসে আমার মত হ'য়ে থাকতে পার, তবেই আমি তোমার ভার নিতে পারি।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনার কাছে আমি আসবো, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই! কিন্তু আপনার মত হ'য়ে থাকার মানে কি?"

"মানে অত্যন্ত সহজ। ঠিক আমি যেমন থাকি, তেমনি করে' থাকবে। নিজের উপার্জ্জনে নিজের খরচ চালাবে, জমীদারী থেকে টাকা এনে নয়।"

আমি থমকিয়া গেলাম। দাদা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসার; বেশ মোটা মাইনা পান এখন। তাঁর পক্ষে নিজের রোজগারে জীবন যাপনের কথা বলা সহজ, কিন্তু আমার যে শিক্ষাদীক্ষা, ইহাতে আমি কি এমন রোজগার করিতে পারিব, যাহাতে আমার নিজের খরচ চালাইতে পারিব?

আমি বলিলাম, "কি উপার্জ্জনই বা আমি ক'রতে পারি?"

"সে বিষয় চেষ্টা ক'রতে হ'বে। ভেবে চিন্তে একটা উপায় বের ক'রতেই হ'বে। যাতে সমাজের হিত হয়, এমন একটা কাজ করে' তুমি যাতে রোজগার ক'রতে পার, তার চেষ্টা আমি ক'রবো। যে পর্য্যন্ত তোমার রোজগার না হয়, সে পর্য্যন্ত আমি তোমার ভার নিতে রাজী আছি।"

আমি সম্মত হইতে পারিলাম না। দাদার কাছে, "ভাবিয়া দেখিব" বলিয়া সময় লইলাম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে বুঝিলাম—পারিব না। তার পর দাদার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, উপস্থিত কিছু দিন অন্ততঃ আমার দেশে গিয়া বাস করা উচিত।

পথে পড়িবার জন্য নরেন বাবু আমাকে কয়েকখানা বই দিয়াছিলেন। Marxএর Capital হইতে আরম্ভ করিয়া Sydney Webb, H. G. Wells, Ramsay Macdonald প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থকারদের কয়েকখানা বই ছিল। আমি দীর্ঘ ষ্টীমার পথে বসিয়া সেই বইগুলির উপর চোখ বুলাইয়া গেলাম। ভূসম্পত্তি সম্বন্ধে যেখানে যাহা পাইলাম, তাহা আগ্রহের সহিত পড়িলাম। সেই সব বই পড়িয়া ভয়ানক ভাবিতে লাগিলাম।

(ক্রমশঃ)

ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জিকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

পুণা থেকে বোম্বাই হয়ে আমেদাবাদে গিয়ে সেখানে এক-জন ধনী ব্যবসায়ীর বাটীতে অতিথি হয়ে ৭।৮ দিন বেশ কাটানো গিয়েছিল। বড়মানুষরা সংসারে এক জাতই আলাদা—সাধারণের এ ধারণাটা বোধ হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। তবে আমার গুজরাতী host ভদ্রলোককে এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য কর্ত্তে হয়েছিল। তাঁর মধ্যে সত্যকার অমায়িকতা, ধনের আড়ম্বর জাহির করার অনিচ্ছা, অনুগত সকলের প্রতিই সদয় ব্যবহার, ও সর্ব্বোপরি cultural জিনিষের উপর শ্রদ্ধা—আমাকে বাস্তবিকই বড় তৃপ্তি দিয়েছিল। ভারতবর্ষে এঁর মতন অগাধ অর্থ বোধ হয় খুব অল্প লোকেরই আছে, কিন্তু তবু আশ্চর্য্য এই যে, (১) ইনি পড়াশুনো করে থাকেন, (২) নিজের ধনাগমের উদ্ভাবনী শক্তির কথা অভাগ্য অভ্যাগতের উপর বর্ষণ করেন না ও (৩) ধন লাভের চিত্তাকর্ষক উপায়গুলি ছাড়াও অন্য অনেক নিষ্প্রয়োজন জগতের খবর রাখেন। তাঁর মনোরম অট্টালিকার মধ্যে আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছিল তিনটি জিনিষ:—প্রথম, তাঁর সুরম্য বাগান, দ্বিতীয়, তাঁর সন্তরণ-হর্ম্ম্য (swimming-bath) ও তৃতীয়, তাঁর পুস্তকাগার। তাঁর সাঁতার দেবার ঘরটি প্রস্তর-নির্ম্মিত ও ২।১ দিন অন্তর পরিষ্কার জলে পূর্ণ করা হ'ত। তাতে তিনি তাঁর ছোট ছোট পুত্র কন্যা নিয়ে যখন একত্রে নেমে সাঁতার দিতেন, তখন তাঁদের সঙ্গে যোগদান করাটা ভারি উপভোগ্য ছিল। তাঁর প্রকাণ্ড বাগানটিও ছিল অতি মনোরম। তাঁর সুরুচির এখানে একটা মস্ত সার্থকতা

মিলেছিল। অর্থব্যয় যদি সুরুচির দিকে দৃষ্টি রেখে করা যায়, তবে তার মধ্যে বোধ হয় সে ব্যয়ের অনেকটা সার্থকতা মেলে। অন্ততঃ দানের পরেই সত্য সত্য culture এর দিকে অর্থব্যয়টা বোধ হয় সব চেয়ে বেশি প্রশস্ত। এঁর কুঞ্জবন-ফলফুল-শোভিত বাগানে রোজ প্রত্যূষে গান কর্ত্তে কর্ত্তে বেড়াবার সময় প্যারিসের একজন কোটীপতির বাগানের কথা মনে পড়ত। অবশ্য সে রকম সুন্দর private বাগান আমি জীবনে কখনও দেখিনি। তবু আমার গুজরাতী hostএর বাগানটিও ছোটখাট জিনিষের মধ্যে একটা উপভোগ্য বিচরণস্থান ছিল। বাগান সম্বন্ধে সব চেয়ে নিপুণ শিল্পী ও নির্ম্মাতা বোধ হয় ফরাসী জাতি। তাই সমগ্র য়ুরোপ ফরাসী জাতির বাগান নির্ম্মাণ-কৌশলকে অনুকরণ কর্ত্তে বাধ্য হয়েছে। তবে ভারতবর্ষের মধ্যে ২টি বাগান আমার খুব ভাল লেগেছিল। এক এই গুজরাতী কোটীপতির বাগান ও অপরটি মহীশূরের লালবাগ।

নির্জ্জন অগম্য স্থানে প্রকৃতিদেবী অনেক সময়ে যে বন্য সুষমা দুহাতে বিলিয়ে দিয়ে থাকেন, সে শোভা বোধ হয় সব চেয়ে গরীয়সী ও মহিমময়ী; কিন্তু আমি মানুষের শিল্পী হস্ত-নির্ম্মিত বাগানেরও অনুরাগী। মানুষের স্বহস্ত-রোপিত সযত্ন-সেবিত উদ্যানও আমাদের নিবিড় আনন্দ দিতে পারে, এ কথা আমি প্যারিসের Bois de Boulogne, Jardin de Luxembourg বা সে কোটীপতির বাগানে যেন বিশেষ করেই উপলব্ধি করেছিলাম। শেষোক্ত ভদ্রলোকটির বাগানের মধ্যে কোথাও বা ছিল জাপানী ছোট্ট ছোট্ট গাছ ও লতাপাতা, কোথাও বা গোলাপের কেয়ারী, কোথাও চীনের ছোট্ট পর্ণকুটীর, কোথাও ছোট ছোট প্রস্তর স্তূপ, কোথাও ছোট্ট নির্ঝরিণী,—ইত্যাদি নানা ভাবে তিনি তাঁর উদ্ভাবনী শক্তিকে নিয়ত বিকশিত করে তুল্‌তেন। আমার এ গুজরাতী বন্ধুর বাগানের জন্য সেরূপ অনন্যসাধারণ খরচও হয় নি বা সেজন্য সেরূপ অধ্যবসায়ও ছিল না বটে; কিন্তু তবু তাঁর এদিকে যতটা দৃষ্টি ছিল, আমাদের দেশের ধনীদের যদি তার সিকি অংশ দৃষ্টিও থাকৃত, তাহলে বোধ হয় অৰ্দ্ধসভ্য ধনীর অর্থের আড়ম্বররূপ উদ্যত ফণা সভ্য মানুষকে এতটা আঘাত কর্ত্তে পারত না।

কোথায় পড়েছিলাম যে, আমেরিকান কোটীপতিরা যদি এমন ভাবেও জীবন যাপন কর্ত্তে জান্তেন যে, তাতে তাঁদের অন্ততঃ সভ্য ভাবে ভোগ করারও একটা নিদর্শন পাওয়া যেতে পার্ত্ত, তাহলেও বা বরং তাঁদের অগাধ ও অর্থহীন ধনের খানিকটা সমর্থন করা সম্ভব হ'ত। কিন্তু অধিকাংশ ধনীই ধনার্জ্জনের অদম্য পরিশ্রমে যে জন্য ধনার্জ্জন করেন সেই আসল জিনিষটার কথাই ভুলে যান। অর্থাৎ—ভোগের জন্য তাঁরা ভোগ বিসর্জ্জন করে, দেহপাত ক'রে শেষটা ভুলেই যান কেন দেহপাত করলেন। ফলে হয় এই যে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থোপার্জ্জনের আদর্শে একজন লক্ষপতি যখন অজস্র ধনসঞ্চয় করেন, তখন he only invites guests to sumptuous dinners in which he is but a passive spectator. হেতু—স্বাস্থ্যভঙ্গ।

আমার গুজরাতী বন্ধুটি কিন্তু যেমন সুশ্রী ও সুশীল, তেম্‌নি স্বাস্থ্যবান্। বস্তুতঃ সব দিক্ জড়িয়ে তিনি একজন মানুষ, যেটা বড়মানুষদের মধ্যে মেলা এত বিরল।

গুজরাতী ধনীদের সঙ্গে মাড়োয়ারি ধনীর তুলনা করে কষ্ট বোধ হ'ত। কটকে এক দিন পূজনীয় আচার্য্য প্রফুল্ল-চন্দ্রের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমি তাঁকে বলেছিলাম, "আপনার অন্নসমস্যা সমাধানের চেষ্টায় সব সহৃদয় লোকই সহানুভূতি প্রকাশ কর্ত্তে বাধ্য, তবে যখন আপনি বলেন যে, এ সমাধান মিল্‌তে পারে—এক মাড়োয়ারি হওয়ার মধ্যে, তখনই মুস্কিল হয়ে পড়ে।"

উত্তরে আচার্য্যদেব যা বলেছিলেন, সে কথাটি যে সত্য, তা গুজরাতী ধনীদের দৃষ্টান্তে প্রমাণ হয়। তিনি বলেছিলেন "তোমরা আমাকে ভুল বোঝ কেন? আমি জিজ্ঞাসা করি অর্থের সঙ্গে কি cultureএর সতীন সম্পর্ক? তোমরা গুজরাতী ও ভাটিয়া ব্যবসায়ীদের দৃষ্টান্ত না নিয়ে মাড়োয়ারিদের দৃষ্টান্তই বা নেও কেন?"

আমার গুজরাতী অনেক ধনী বন্ধুর পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষা, সুশীলতা ও বিনয়ের দৃষ্টান্তে আচার্য্যদেবের এ কথার যাথার্থ্যের প্রমাণ সত্যই পেয়েছিলাম।

আমেদাবাদে একটি সঙ্গীত-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল। তবে সে সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে লিখেছি বলে আজ আর সে বিষয়ে পুনরুক্তি করতে চাই না।

আমেদাবাদে মহাত্মাজীর জাতীয় বিদ্যালয় দেখ্‌তে যাওয়া গেল। সেখানে অনেক ছাত্র ছাত্রীর মুখেই একটা আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা আমার বড়ই ভাল লেগেছিল। তবে গুজরাতী শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে ইচ্ছে করে অত্যন্ত কুশ্রী বেশ পরিধান কর্ত্তেন। সেটা আমার ভাল লাগ্‌ত না। বেশভূষার মধ্যে সরলতার সঙ্গে সুশ্রী ও মার্জ্জিত রুচির নিদর্শন মেলা অসম্ভব কেন বুঝতে পারি না। যা সুন্দর তার মধ্যে একটা সত্য আছেই আছে। হতে পারে বর্ত্তমানের দুঃখ-দারিদ্র্যে অধিকাংশ মানুষ সুন্দরের সংস্পর্শে আস্‌তে পায় না। কিন্তু তা থেকে প্রমাণ হয় না যে, আমাদের বেশ-বাস প্রভৃতির মধ্যে সৌন্দর্য্যের আমদানীর যে সহজ প্রবণতাটি আছে, তাকে উৎপাটিত না করলে কোনও মহৎ আদর্শের উপলব্ধি অসম্ভব। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন স্রোতের আমদানী হবেই। কেন না এ হচ্ছে জীবনের ধর্ম্ম। তাই আমার মনে হয় না যে এ স্রোতকে কাটিয়ে কোনও মতে চলে যাওয়ার মধ্যেই জীবনের মস্ত কোনও সার্থকতা মিল্‌তে পারে। আমার মনে হয়, অরবিন্দ একটা মস্ত সত্য কথা বলেছেন, যখন তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "It is a great error to suppose that spirituality flourishes best in an impoverished soil." (The Renaissance in India)

আমেদাবাদ থেকে কাথিওয়াড়ের রাজধানী ভাওনগরে যাওয়া গেল। সেখানে এক গুজরাতী বন্ধুর আতিথ্যে নগর দর্শন প্রভৃতি করা গেল। তবে সেখানে আমার সব চেয়ে বড় লাভ হ'ল (১) গোবিন্দ রাও পাণ্ডের গান (২) বৃদ্ধ রহিম খাঁর সেতার ও (৩) কাথিওয়াড়ের বিখ্যাত বাই চন্দ্রপ্রভার তানালাপ শ্রবণ।

গোবিন্দরাও পাণ্ডে একজন গুণী লোক। তবে সংসারে এক শ্রেণীর গুণী আছেন, যাঁরা ভাল গাইলেও কেমন যেন কোথাওই কল্‌কে পান না। পাণ্ডেজী সেই সম্প্রদায়ভুক্ত। বেশ গান করেন—জানেন শোনেন, তাললয় শুদ্ধ, কণ্ঠস্বরও অমিষ্ট নয়; অথচ এঁকে বিধাতা কোথায় যেন মেরে রেখেছেন—সেটা প্রথমটা সহজে বুঝতেই পারা যায় না। পাণ্ডেজীর সঙ্গীতে অকৃতকার্য্যতার একটা প্রধান কারণ মনে হ'ল—তাঁর personalityর অভাব। গানের মতন শিল্পে বোধ হয় personalityর প্রভাবটা অন্য অনেক শিল্পের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। কারণ, গানের মধ্য দিয়ে শিল্পীর personality একটু বেশি প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। অভিনয় শিল্পেও এ কথা খাটে। ভালই অভিনয় হচ্ছে—অথচ personalityর অভাবে তা শ্রোতাকে স্পর্শ কর্ত্তে পারছে না—এরূপ দৃষ্টান্ত অভিনয়-জগতে বিরল নয়। যাই হোক্‌, পাণ্ডেজীর গান বাজনায় অনুরাগ অদ্ভুত। ওস্তাদদের কত গাঁজা সেজে দিয়ে, কত পদসেবা করে—কত অসাধ্য সাধন করে যে ইনি গান শিখেছেন, সে কাহিনী শুন্‌লে মনটা আর্দ্র না হয়েই পারে না। এঁর গান কেউ শুন্‌তে চাইলে ইনি যেন হাতে স্বর্গ পান। অথচ এঁর গান বড় একটা কেউই শুন্‌তে চায় না। আমি নিজে শিক্ষার্থী বলে এঁর অনেক রাগের আলাপ শুনতে ভালবাস্‌তাম। তাতে এঁর কৃতজ্ঞতার যেন সীমা ছিল না। লোকটিকে আমার ভাল লেগেছিল, অথচ ইনি লোকপ্রিয় নন—যেহেতু এঁর মধ্যে নাকি গায়ক-সুলভ উগ্র মেজাজটির একটু বেশি প্রাদুর্ভাব ছিল।

রহিম খাঁর মতন উৎকৃষ্ট সেতার আমি বড় কমই শুনেছি। ইনি ভাওনগরের রাজার সভাবাদক। বয়স আশীর কাছাকাছি। সত্য শিল্পী। তবে গল্প কর্ত্তে ইনি বড় বেশি ভালবাস্‌তেন। গায়করা অনেক সময়ে ভাবেন যে, তাঁদের নীরস শিক্ষা-কাহিনী সাধারণের কাছে বড়ই চিত্তাকর্ষক। রহিম খাঁ সময়ে সময়ে তাঁর নিজের শিক্ষা-পদ্ধতির খুঁটিনাটির প্রশংসায়, ও অপরের শিক্ষা-পদ্ধতির নিন্দাবাদে, এমন পঞ্চমুখ ও কণ্ঠভরা বিষ হয়ে উঠ্‌তেন যে, তখন তাঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে সেতারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া আর গতি থাক্‌ত না। তাঁকে এ কথাটা সহজে বোঝান যেত না যে, ভাল বাজিয়ে হলেই সরস আলাপী হওয়া যায় না।

খাঁসাহেবের গায়ক-সুলভ অন্যান্য অনেক গুণেরও অভাব ছিল না,—যথা, নিজে ছাড়া অপর সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর গুণী, রাগাদি ও ঠাট সম্বন্ধে তাঁর ছাড়া অন্য সকলের মতই ভ্রমের চরম গর্ত্তে নিমজ্জিত, বাজানোর ভঙ্গী সম্বন্ধে এক তাঁর ছাড়া বিশ্বে আর কারুরই কিছু জানা নেই—ইত্যাদি ধারণা। তার উপর তাঁর মেজাজটি ছিল নবাবের—

কেবল তিনি যেন নবাবী-যোগভ্রষ্ট হয়ে হঠাৎ ওস্তাদদের ঘরে জন্মগ্রহণ করে ফেলেছিলেন। যেন তাঁকে মরজগতে পাঠাবার সময় কেবল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ার দরুণই বিধাতা নবাবের অন্য সকল প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য তাঁতে আরোপ করে হঠাৎ বংশবৈশিষ্ট্যটি আরোপ কর্ত্তে ভুলে গিয়েছিলেন। তবে বিধাতার এ ভুলটি সংশোধন করার চেষ্টার যে খাঁ সাহেবের বিরাম ছিল না, এ কথা তাঁর শত্রুতেও স্বীকার কর্ত্তে বাধ্য। তাই খাঁ সাহেব সঙ্গীত-জগতে নিজের সমকক্ষ কাউকে খুঁজে পেতেন না; তাই তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে অপরের সঙ্গে অণুমাত্রও মতভেদ হলে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠ্‌তে দ্বিধামাত্র কর্ত্তেন না; তাই তিনি অপর কোনও গায়ক বাদকের গানবাজনা শুনতে কখনও বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ কর্ত্তেন না;—ও তাই তিনি এক দিন গভীর প্রেরণার বশে সঙ্গীত রাজ্যে তাঁর একাধিপত্য অকাট্য যুক্তিবলে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। সেদিন শরতের শান্ত সন্ধ্যায় আর একজন সেতারী আলাপ কর্ত্তে কর্ত্তে ভৈরবীতে বুঝি কড়িমধ্যম না রামকেলীতে কোমল নিখাদ বা এম্‌নিই একটা লোমহর্ষক পর্দ্দা লাগিয়েছিলেন। এ গর্হিত কাজটি তিনি করেছিলেন না কি বেশি মিষ্ট করার জন্য। কিন্তু খাঁ সাহেবের কাণে সে বেদ-নিষিদ্ধ পর্দ্দা গরম সীসা ঢেলে দিয়েছিল। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে তিনি নিজের সেতারখানি তুলে সে বাজিয়ের মস্তকের উপর এমন আঘাত করেছিলেন যে, তাঁর মস্তকটি না কি সেতার বিদ্ধ করে তাকে কণ্ঠমালাতে পরিণত করেছিল (ঘটনাটি না কি বেশি অতিরঞ্জিত নয়)।

অস্মদ্দেশীয় গায়ক বাদকদের মধ্যে আর যাই গুণ থাকুক, একটি জিনিষের বোধ হয় কোনও বালাই-ই নেই—যার নাম সহিষ্ণুতা বা toleration! তাই তাঁরা রাগরাগিণীর ঠাটের চুলচেরা বিচারে নিজেদের সঙ্গে অপর কোনও গুণীর মতভেদ হলে, এত সহজে ও প্রচণ্ড ভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন। আমি একবার কোনও সঙ্গীতাভিজ্ঞ ও হিন্দুস্থানী ওস্তাদদের বিরাট তর্ক শুনেছিলাম। বসন্তে পঞ্চম লাগে কি না এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসাই ছিল তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অন্ততঃ তাঁদের সার্দ্ধ তিন ঘণ্টা ব্যাপী বাগাড়ম্বর, কটূক্তি ও অট্টরব শুনে এই রকমই আমার মনে হয়েছিল। এ তর্কের ফল কি হ'ল জানতে এক অনভিজ্ঞেরই একটু কৌতূহল হতে পারে; কারণ, অভিজ্ঞের কাছে এ কথা অগোচর থাক্‌তেই পারে না যে, ওস্তাদী তর্কের কোনও মীমাংসা হওয়া অন্ততঃ এ মরজগতে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। অর্থাৎ, এ গুরুতর ও ত্রিঘণ্টা ব্যাপী আলাপের পর প্রত্যেকেই স্থির সিদ্ধান্ত করে বস্‌লেন যে, প্রতিপক্ষ সঙ্গীতে গণ্ডমূর্খ। সৌষ্ঠবজ্ঞান (sense of proportion) বস্তুটি বোধ হয় গান-বাজনার চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিতে উবে না গিয়েই পারে না—অন্ততঃ গান-বাজনা বিষয়ে ত বটেই।

যাই হোক্, রহিম খাঁ বাজাতেন অতি চমৎকার। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর মনোহর সেতার উপভোগ কর্ত্তাম। তাঁর মিড়ের হাত, প্রকাশভঙ্গী, দরদ সবই ছিল অপূর্ব্ব। আহা, যদি কেবল বিধাতা তাঁর মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণ করে গড়তেন!

ভাওনগরের বিখ্যাত বাই চন্দ্রপ্রভার নাম আমি দু চারজন বন্ধুর কাছে আগেই শুনেছিলাম ও পড়েছিলাম (Fox Strangways মহোদয় তাঁর "Music of Hindustan"এ চন্দ্রপ্রভার কণ্ঠস্বরের খুবই প্রশংসা করেছেন)। তাই ভাওনগরে এঁর গান শুনবার জন্য আমি অনেক দিন থেকেই অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলাম। তবে শুন্‌লাম, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহের আয়তন ও ধর্ম্মচর্চ্চার আগ্রহের বৃদ্ধি হওয়ার দরুণ তিনি ভজনপূজন ছাড়া আজকাল আর কিছুই করেন না। তাঁর বয়স বোধ হয় ৫০এর বেশি হবে না। কিন্তু তাঁর মতন বিপুল কায় একটা দ্রষ্টব্য বস্তু। তিনি সম্প্রতি ধর্ম্মাচরণে একনিষ্ঠ হয়ে অবধি না কি গোযান ছাড়া অন্য কোনও যানে আরোহণ করেন না। মোটরযান ম্লেচ্ছব্যাপার বলেই তিনি সনাতন গোযানেরই এত পক্ষপাতী ছিলেন কি না ঠিক্ জানা নেই,—তবে যারা জানে এমন দুচারজন দুষ্ট লোক না কি কাণাকাণি করত যে, তিনি গোযানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কেবল এই জন্য যে, অন্য কোনও যানে প্রবেশ করা তাঁর কাছে অনায়াসসাধ্য ছিল না। তাঁর বিপুল পরিধি না দেখলে দুষ্ট লোকের এ জল্পনার সদর্থ ঠিক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

যাই হোক্, তিনি গান আরম্ভ করলেন। আমাদের দেশে কোনও স্ত্রীলোকের এত খাদে গলা নামতে আমি শুনি নি। এরূপ গলাকে য়ুরোপে বলে contralto ও

পাশ্চাত্য জগতে এর আদরও খুব। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের এরূপ খাদে গলা বোধ হয় খুব বেশি লোকে পছন্দ করবে না। কিন্তু তাহ'লেও তাঁর গলার জম্‌কালো গম্ভীর আওয়াজ ও প্রায় তিন সপ্তক range একটা শোন্‌বার জিনিষ। তবে তাঁর গানের ঢং মোটেই কোমল ঢং নয়। যাকে বলে মর্দ্দানা ঢং, সেইটেই তিনি বিশেষ-রকম আয়ত্ত করেছেন। তবে (এ আয়ত্ত করার ফলে কি না জানি না) তাঁর কৃতিত্ব বা বাহাদুরির দিক্ দিয়ে লাভ যথেষ্ট হ'লেও মিষ্টত্বের দিক্ দিয়ে যেন লোকসানই হয়েছে মনে হ'ল। কারণ, তিনি সোহিনী, মালকোষ প্রভৃতিতে যে পরিমাণ তানবিস্তার করলেন, সে পরিমাণ রস আমদানী কর্ত্তে পারলেন না। মনে আছে, এই মালকোষ আলাপেই আবদুল করিম খাঁ এক দিন আমাদের চোখে জল এনেছিলেন। চন্দ্রপ্রভার মধ্যে খাঁ সাহেবের সে আবর্ত্তনীয় শিল্পীর দরদ্ নেই। তাই তাঁর তানালাপ প্রায় মামুলি প্রাণহীন ওস্তাদী ঢঙের মতন হয়ে পড়েছে। জোহারা বাই গ্রামোফোনে তিন মিনিটেও শুদ্ধকল্যাণ বা ভূপালী বা মুলতানে যে সুধাবর্ষণ করেছেন, তার সিকি মিষ্টত্বও চন্দ্রপ্রভা সাক্ষাতে গেয়ে সৃজন কর্ত্তে পারলেন না। আমাদের দেশে বড় বড় বাইজীরা গানকে ভারি মিষ্ট কর্ত্তে পারে। কিন্তু চন্দ্রপ্রভা তা পারেন না। তবে তাঁর গানে নৈপুণ্যকে বাহবা না দিয়েই পারা যায় না।

ভাওনগরে হামীর খাঁ বলে আর একজন বড় ওস্তাদের গান শোনা গেল। এঁকে টেলিগ্রাফ করে কাছের কোন এক রাজার সভা থেকে আনানো হয়েছিল। তবে হামীর খাঁর চেহারাটা ছিল অনেকটা "তালপত্রের-সিপাহী-খাঁ'র" মতন। কারণ না কি তাঁর অত্যধিক ধূম্রবিশেষের প্রতি আসুরক্তি। বিধাতা কেন যে বিশেষ করে ভারতবর্ষের ওস্তাদদের এতটা রঙীণ-চিত্ত করে গড়েছিলেন, তা তিনিই জানেন। কিন্তু কারণ যাই হোক্, রঙের এমন একনিষ্ঠ ভক্ত বোধ হয় জগতের অন্য কোনও সম্প্রদায়েই মেলে না। তাছাড়া এ সম্প্রদায় এ বিষয়ে যেমন বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী, নেশার জাতিভেদে তেমনি উদারপন্থী। অর্থাৎ, কোনও নেশায়ই ভাবতীয় ওস্তাদের আপত্তি বা অরুচি নেই এবং অহোরাত্রের মধ্যে কোনও সময়ই তাঁর নেশার অনুপযোগী নয়। হামীর খাঁ আমাকে গান শোনাতে এসেছিলেন সকালে—কিন্তু তখনই তাঁর অনুপম মুখবিবরে বিবিধ পানীয়, আহার্য্য ও ধূম্রের মিলিত সৌরভ কেমন যেন এক জমাট ভাব ধারণ করে সকলকে আমোদিত করে রেখেছিল।

হামীর খাঁর চেহারা যে তাঁর নেশা-গবেষণার ফলে বিশেষ উন্নতিলাভ করে নি, এ কথা বোধ হয় বলা বাহুল্য। তদুপরি গানের সময় তাঁর মুদ্রাদোষের প্রাচুর্য্যে ও স-দোক্তা তাম্বুলরসের শীকরোৎক্ষেপে শ্রোতৃবর্গ তাঁর সঙ্গে "শতহস্তেন" রূপ ব্যবহার কর্ত্তে বাধ্য হতেন, বিশেষত. শুভ্রবেশী শ্রোতা।

হামীর খাঁ কিন্তু ওস্তাদ লোক। খুব বিশুদ্ধ গাইতে পারেন। তানকর্ত্তবও খুব। কিন্তু—একজন নির্জলা ওস্তাদ। গানের মধ্যে প্রাণ বলে জিনিষটির কোনও ধারণাই এঁর নেই। তাল, লয়, তান, আস্থায়ী, অন্তরা সব শুদ্ধ হ'লেও যে সঙ্গীত আসল সঙ্গীতের পর্য্যায়ভুক্ত হ'তে পারে না, তার যদি কেউ প্রত্যক্ষ প্রমাণ চান, তবে তিনি যেন কাথিওয়াড়ের হামীর খাঁর গান একবার শোনেন।

ভাওনগর থেকে আমেদাবাদে ফিরে বরোদায় যাওয়া গিয়েছিল রাজ-অতিথি হ'য়ে। এবার রাজ-অতিথি হয়ে রামপুরের মতন অবস্থা হয় নি। অর্থাৎ এবার রাজার পরিচারকগণ প্রমাণ কর্ত্তে চেষ্টা পান নি যে, অতিথির স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হরণ না কর্লে তাঁর চূড়ান্ত সৎকার করা অসম্ভব।

দেওয়ানের কৃপায় বরোদায় Fredilis সাহেবের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ভদ্রলোক রুষ-ইহুদী-জর্ম্মান আরও যেন কত কি;—অন্ততঃ তাঁর স্বীয় পরিচয়ে ঐ রকম একটা অস্পষ্ট ও বিচিত্র ধারণাই আমার মনে জন্মেছিল। ইনি রাজার সঙ্গীত-স্কুলের প্রিন্সিপাল। ভারতীয় সঙ্গীতকে ইনি যে খুব ভালবাসেন, সে কথা আমাকে বার বার বল্‌লেন। তবে যখন বল্‌লেন যে ভারতীয় সঙ্গীতকে য়ুরোপীয় স্বরলিপি দ্বারা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা এখনই সম্ভব, তখন তাঁর ভারতীয় সঙ্গীতের বিকাশ সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টির উপর আমার যে খুব শ্রদ্ধা জন্মায় নি, এ কথা বোধ হয় বলাই বেশি। শ্রেষ্ঠতম ভারতীয় সঙ্গীত যে আলোছায়া ও সূক্ষ্ম কাজে ওতঃপ্রোত, তার খবর যিনি রাখেন, তিনি স্বরলিপি

পদ্ধতির সন্তোষজনকতা সম্বন্ধে কখনই গদ্‌গদ হ'য়ে উঠ্‌তে পারেন না বলেই আমার মনে হয়। কিন্তু সে যাই হোক্ Fredilis সাহেবের মধ্যে য়ুরোপীয় সুলভ একটি ধারণার প্রাচুর্য্য ছিল যে, সব বিষয়ে অন্তর্দ্দৃষ্টি বলে জিনিষটি শ্বেতচর্ম্ম জাতিরই একচেটে। তাই স্বরলিপি সম্বন্ধে আমার সঙ্গে প্রচণ্ড তর্ক করে ইনি এই অনড় অটল সিদ্ধান্ত করে বস্‌লেন যে, এ বিষয়ে তিনিই ঠিক্ ও আমিই ভ্রান্ত, অথচ এ কথা তিনি জানেন, আমি জানি না। তাঁর এ মৌলিক আবিষ্কারে আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লাম, "তথাস্তু, কিন্তু বরোদার বিখ্যাত ফৈয়াস খাঁর গান ও জমালুদ্দীন খাঁর বীণা শুনিয়ে আমার ভ্রান্ত মনকে আলো দেখাবেন কি?" তাতে তিনি রাজি হলেন—একটু মৃদু মধুর হেসে।

ফৈয়াস খাঁর গান দুদিন শুন্‌লাম। খাঁ সাহেব খেয়ালে আবদুল করিমের অনেক নীচে ও এমন জোরে হার্ম্মোনিয়াম বাজিয়ে খেয়াল গান যে, তাঁর এত নাম শুনে এসে তাঁর খেয়াল শুনে বড়ই নিরাশ হয়ে পড়লাম। কিন্তু পর দিন তাঁর ঠুংরি শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। একজন প্রকৃত শিল্পী বটে। কি দরদ! কি ছোট ছোট তানের কান! কি তালের উপর আধিপত্য! ও কি অফুরন্ত বিচিত্র তানালাপ। ফৈয়াস খাঁ না কি কল্‌কাতার অনেক বড় বড় বাইজীকে গান শিখিয়েছেন। ঠুংরি যদি শিখিয়ে থাকেন, তবে সে সব বাইজী নিশ্চয়ই খুব লাভ করেছে। তবে খেয়াল যে ইনি খুব চমৎকার শেখাতে পারেন, তা মনে হ'ল না। তাছাড়া খেয়ালের ধারণাই এঁর তেমন নেই। ঠুংরির পক্ষে এঁর গলা বেশ সুন্দর—যেহেতু সূক্ষ্ম কাজে ভরা, যদিও খুব যে মিষ্ট তা বলা যায় না। তবে মনে হয়, এক সময়ে এঁর গলা আরও মিষ্ট ছিল। আমাকে Fredilis সাহেবও বল্লেন যে, আজকাল না কি নানা কারণে এঁর কণ্ঠস্বর খারাপ হয়ে গেছে। তবে সে কারণের উল্লেখ না করাই ভাল।

বরোদায় তসদ্দুক হোসেন বলে আর একজন গায়কের গান শুন্‌লাম। গলাটি বড় তীক্ষ্ণ ও দরদ বড়ই কম। কাজেই আমার হোসেন খাঁর গান শুনে যে খুব ভাল লেগেছিল, এ কথা শপথ করে বল্‌তে পারি না।

জমালুদ্দীন খাঁ কাতর কণ্ঠে বল্‌লেন যে, তাঁর জ্বরে খিন্ন অবস্থা। কাজেই তাঁর বীণা শোনা হ'ল না।

বরোদায় Fredilis সাহেব এক ভারতীয় ব্যাণ্ড করেছেন। শুনতে নিয়ে গেলেন। বরোদায় এক প্রকাণ্ড বাগানে বাজনা হ'ল। অনেক রকম যন্ত্রীই এল ও বাজনাটা বেশ শ্রুতিমধুরও লাগ্‌ল। মনে হ'ল, এ দিক্ দিয়ে আমাদের যন্ত্র-সঙ্গীতের একটা নূতন বিকাশ হওয়া অসম্ভব নয়। তবে তার অধ্যক্ষ একজন বিদেশী হলে চল্‌বে না। আমাদের দেশেরই কোনও উদারপন্থী, সঙ্গীতজ্ঞ ও প্রতিভাবান্ লোকের মৌলিকতার সাহায্যেই এ কাজ হবে। কারণ এ কথাটা আমাদের ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, বিদেশী আমাদের শিল্প সম্বন্ধে হয় ত অনেক নূতন আলো দিতে পারে, বা শিল্প সম্বন্ধে নূতন তথ্যও জ্ঞাপন কর্ত্তে পারে; কিন্তু একটা জিনিষ সে পারে না। অর্থাৎ সে পারে না—আমাদের শিল্পে তার প্রতিভার দ্বারা আমাদের বিশিষ্ট ধারা বজায় রাখ্‌তে। তাই আমাদের শিল্প সম্বন্ধে বিদেশী সমজ্‌দারের মতামত আমরা মন দিয়ে শুন্‌তে পারি, তা থেকে লাভও কর্ত্তে পারি—কিন্তু একটা জিনিষ পারি না; অর্থাৎ কি না আমরা পারি না কেবল—তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আমাদের শিল্প-জগতে মৌলিক সৃষ্টি করতে।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

তরুণীদের মধ্যে একটা অস্ফুট হাসি ও গুঞ্জনধ্বনি উঠিল। "লীলা ত একটা ঘোড়-সওয়ার ছিল, তাই জানতুম। সে আবার গাইয়ে হয়ে উঠলো কবে থেকে?" "কিরণের আবার আদর করে টেনে এনে পিয়ানোর কাছে বসান হচ্ছে? আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বলে যায়!" "যে বেহায়াগিরি করে দুজনে বেড়ায়, কোন কি লজ্জা-সরম জ্ঞান আছে?" "আঃ, থাম্ না তোরা! একবার লীলার গানের নমুনাটা শোনা যাক!"

লীলার কিন্তু এ সব দিকে দৃষ্টি ছিল না, সে একমনে একটি সুর বাজাইতেছিল। বহু দিনের অনভ্যস্ত অঙ্গুলীর মৃদু আঘাতে সে প্রথমে সব সুরটা অস্ফুট ভাবে আয়ত্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিল।

মিসেস রায় চারিদিকের অস্ফুট পরিহাসে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়া আসিলেন। লীলা যে গোঁয়ার,—তাহার ত কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই,—এখনি একটা হাস্যকর কাণ্ড ঘটাইয়া বসে আর কি!

—"লীলা! উঠে এস! তোমার ত এ সবে হাত তেমন অভ্যস্ত নয়! বাড়ীতে আগে প্র্যাকটিস করো—তবে ত হবে!"

লীলা মায়ের কথায় কাণ দিল না। এতক্ষণে সে সব সুরটি আয়ত্ত করিয়াছিল। পিয়ানোর স্বরের সহিত তাহার উচ্চ মধুর কণ্ঠ মিলাইয়া সে গান ধরিল। গানটি নোয়েল জনসনের বিখ্যাত গান 'ইফ্ দাউ ওয়ার্ট ব্লাইণ্ড!"

কক্ষের অস্ফুট পরিহাস-ধ্বনি অকস্মাৎ থামিয়া গেল। লীলার সতেজ কণ্ঠের মধুর স্বর লহরে লহরে কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। মিসেস রায় চকিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

সে গাহিতেছিল—

"যদি তুমি দৃষ্টিহীন হতে, হে বন্ধু! আমি আমার দৃষ্টি নষ্ট করে ফেলতুম, পাছে তোমার এই অন্ধত্ব আমাকে তোমার কাছ হতে দূরে রাখে!"

"যদি তুমি মূক হতে, হে বন্ধু! আমি আমার স্বর রুদ্ধ করে ফেলতুম! যাতে আমার এই চির-নীরবতা আমাকে তোমার নিকটে টেনে আনতে পারে!"

এই আত্ম-বিসর্জ্জী প্রেমের করুণ সুর কাঁদিয়া কাঁদিয়া কক্ষময় লুটাইতে লাগিল। শ্রোতা ও শ্রোত্রীর দলে কক্ষ ভরিয়া গেল! যাহারা কক্ষান্তরে ব্রীজ্ ও বিলিয়ার্ড খেলায় মত্ত ছিল, তাহারা মন্ত্রমুগ্ধের মত ছুটিয়া আসিয়া ভিড় ঠেলিয়া একবার গায়িকাকে দেখিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল।

লীলা ভাবের আবেগে তখন আত্মহারা—তাহার চক্ষু মুদিত—উচ্ছ্বাসের ভরে তাহার দুই নয়নে অশ্রুধারা—সে গানটিতে তাহার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়া গাহিতেছিল—

"যদি তুমি দীন হতে, হে বন্ধু! আমি আমার সম্মান ও গর্ব্ব নষ্ট করতাম, যাতে নম্র ও সম্ভ্রমশূন্য হয়ে আমি তোমার কাছে বাস করতে পেতাম!"

"যদি তুমি প্রাচীন হতে, হে বন্ধু! আমি আমার যৌবন নষ্ট করে ফেলতাম, যাতে তোমার প্রৌঢ়ত্ব আমাকে তোমার নিকট হতে দূরে না রাখে!"

"যদি তোমার মৃত্যু হত, হে বন্ধু! আমি আমার জীবন ত্যাগ করতুম—কেবল সেই আশায়, যাতে মরণের পরে আমি তোমার সঙ্গ লাভ করতে পারি!"

দুই বার—তিন বার আবৃত্তির পর যখন গানের শেষ কলি মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনির মত মিলাইয়া আসিল, তখন প্রথমে কিছুক্ষণের জন্য সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পরে চারিদিক হইতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার একটা বিষম হট্টগোল একযোগে উঠিয়া বিচিত্র কোলাহল সৃষ্টি করিল।

কক্ষের শেষ প্রান্তে বীণা তাহার এক সিভিলিয়ান বন্ধুর সহিত গল্প করিতেছিল। সকলে যখন একযোগে লীলার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে—সেই সময় সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

তখন, আর একটা তুমুল কোলাহল বাধিয়া উঠিল।

মিসেস রায় মিঃ দত্তের সাহায্যে বীণাকে সোফার উপর শোয়াইলেন। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাহারা লীলার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা বীণার প্রতি সহানুভূতির আধিক্যে একবাক্যে লীলার নিন্দা আরম্ভ করিল।

—"লীলা কি নিষ্ঠুর—হার্টলেস্! জানে যে বোনটার মনের এই শোচনীয় অবস্থা! এই সময় কি ওই গান গাওয়া ওর উচিত?"

—"কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে—আর কি!"

—"জানিই তো!—ও মেয়ে চিরদিন গোঁয়ার! ওর কি দয়া মায়া বলে আছে কিছু? ওর উচিত ছিল—যুদ্ধে যাওয়া!"

—"ঠিক ব'লেছ দিদি! মেয়ে তো নয়! যেন তুরুক্ সওয়ার! দিন রাত মাঠে মাঠে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াচ্ছেন!"

লীলা কিন্তু এ সব নিন্দা বা প্রশংসায় কাণ না দিয়া ছুটিয়া ছাতের উপর পলাইল। উচ্ছ্বসিত আবেগে তখন তাহার বুকের ভিতর ফুলিয়া উঠিতেছিল। সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে নীচের গোলমাল একটু থামিলে, কিরণ আসিয়া তাহার পাশে বসিল। "লিলি?"

লীলা মুখ তুলিয়া চাহিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন, একটা সূক্ষ্ম কালো আবরণে চতুর্দ্দিকের সৌধমালা আবৃত হইয়া আসিতেছিল। আমগাছের ঘন পাতার অন্তরাল হইতে ইতস্ততঃ গবাক্ষ-নিঃসৃত আলোর রেখা মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছিল, এবং ছায়ান্ধকার ম্লান আকাশের নীচে শ্রেণীবদ্ধ তালগাছের সারি চিত্রাঙ্কিত ফলকের ন্যায় নিঃশব্দে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

—"আজ তুমি কি সুন্দর গান গেয়েছ লীলা! আমার কাণে যেন সেই সুর এখনো বাজছে!"

—"যাও, ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি? ওই জন্যেই ত আমি কারু কাছে গান গাইতে চাই না!"

—"এটা কি ঠাট্টার কথা হলো? যাক্—এ বিষয়ে পরে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে! তোমরাও দেখছি অরুণের খবরটা শুনেছ! আমি সমস্ত সন্ধ্যাটা ভাবছিলুম যে, সে তোমাদের জানিয়েছে কি না? অবশ্য জিজ্ঞাসা করাটা ভদ্রোচিত নয় বলে কিছু বলি নি।"

—"তোমার প্রীতিকর হয়, তো আরো একটা খবর তোমাকে দিতে পারি। অরুণের চিঠি পেয়ে বীণা তার সঙ্গে সব সম্বন্ধ ত্যাগ করেছে। কত বোঝালুম তাকে, কোন ফল হলো না।"

—"তুমি যদি বীণা হতে, তা হলে অরুণ অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করতে না কি?" সন্ধ্যার অস্পষ্ট তারার আলোয় কিরণ সাগ্রহে লীলার মুখের দিকে চাহিল।

—"তাতে আর কোন সন্দেহ আছে? তার এই অসহায় অবস্থা—যখন তার জীবনে আরো বেশি ভালবাসা, ঢের বেশি আদর যত্নের দরকার—সে সময় তাকে ফেলে দিতে পারি আমি! তা হলে আর কোন্ অবলম্বন নিয়ে সে বাঁচবে?"

কিরণ নীরবে কিছুক্ষণ কি ভাবিতে লাগিল। পরে বলিল, তুমি তখন বীণার কথা বলবার আগে—'যদি তোমার প্রীতিকর হয়' এ কথাটা বল্লে যে?

লীলা হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ অরুণ সরে গেলে বীণার সম্বন্ধে তোমাদের একটা সুযোগ আসে, তাই বলছিলুম।—

কিরণও হাসিল। সে হাসি উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের। সে বলিল, আমি আপাততঃ সে জন্যে বিশেষ ব্যস্ত নই, তুমিও তা জানো। কিন্তু তা হলে তুমি বলতে চাও—যাকে তুমি ভালবাস, তার যা কিছু অবস্থান্তর হোক না কেন, তবু তুমি তাকে বিয়ে করবে?"

"আমি ত ভাবতেই পারি না যে, কেউ এর অন্যথা করতে পারে!"

—"কিন্তু এটা বড় উঁচুদরের স্বার্থত্যাগ—সারা জীবনভোর এ রকম স্বার্থত্যাগ করা কি মুখের কথা?"

—"যদি সত্য ভালবাসা থাকে, তা হলে কিছু মাত্র কষ্টকর নয়—আমার ত এই ধারণা। আমার ত এখনো আশা আছে, বীণা এক দিন তার ভুল বুঝবে, আর অরুণকে আবার ফিরিয়ে নেবে। সেই জন্যই ত ও গানটা গেয়েছিলুম আমি!"

—"তুমি বড় ছেলেমানুষ—লীলা! তুমি কি ভাব—গানটায় যে যে কথা আছে, মানুষের বাস্তব জীবনে কখনো তা সম্ভব হয়?"

লীলা তাহার গভীর ভাবে ও বিশ্বাসে ভরা প্রশান্ত দৃষ্টি কিরণের মুখের উপর তুলিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া

রহিল। বলিল, কেন হবে না? তোমার বিশ্বাস হয় না?

—কি জানি! তবে যদি সত্য হয়, তবে জীবনটা বড় সুখের হয়! সে অন্যমনস্কভাবে গানের চতুর্থ কলি গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিল—

"যদি তুমি প্রাচীন হতে—হে বন্ধু! আমি আমার যৌবন ত্যাগ করতাম—যাতে তোমার বয়সের আধিক্য আমায় তোমার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন করতে না পারে!"

বহুক্ষণ পরে কিরণ ডাকিল, লিলি! একবার আমার মুখের দিকে চাও!

লীলা তাহার কালো চোখের সরল দৃষ্টি কিরণের মুখে তুলিয়া ধরিল।

—"আমার বয়স কত হবে বলে তোমার মনে হয়?"

লীলা একটু ভাবিয়া বলিল, এই তিরিশ কি পঁয়ত্রিশ হবে।"

কিরণ হাসিয়া বলিল, চমৎকার আন্দাজ! আমার বয়স বত্রিশ বৎসর! তোমার চেয়ে আমি অনেক বড়—নয় কি লীলা?

—"তাতে আর হয়েছে কি?"

—"না—হয় নি কিছু! আমি ভাবছিলুম, আমি একটি কুড়ি বছর বয়সের মেয়েকে জানি,—সে আমার এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও আমায় তার সঙ্গীরূপে নিতে পারে কি না?"

লীলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, আমার কথা বোলছো বুঝি? তুমি কি জান না, যে, তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু?

কিরণ কিছুক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে লীলার প্রফুল্ল সরল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে যে দিক হইতে কথাটা বলিয়াছে, লীলা যে তাহা ধরিতে পারে নাই, তাহা সে বুঝিল, কিন্তু আর পীড়াপীড়ি না করিয়া সেও সরল ভাবেই বলিল, আমি তা জানি। তুমি আমায় চিরদিন এই ভাবেই গ্রহণ করো, তাই আমার একান্ত প্রার্থনা!

কিছুক্ষণ পরে লীলা বলিল, কিরণ! আমি একবার অরুণের সঙ্গে দেখা করতে চাই! সেই কথার জন্যেই তোমাকে সন্ধ্যা থেকে খুঁজছিলুম! তার সঙ্গে আলাপ করবার আমার অনেক দিন থেকেই ইচ্ছে ছিল—এখন এই ঘটনার পর আরো বেশি তাকে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে। তোমার বাড়ীতে গিয়ে কি আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারি না?

কিরণ একটু ভাবিয়া বলিল, যেতে পারবে না কেন? তবে আমার মনে হয়, তোমার না যাওয়াই ভালো। মিসেস রায় শুনলে কি বলবেন? তুমি তো জান, আমার বাড়ীতে মেয়েরা কেউ নেই।—"তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না। ও সব আমি গ্রাহ্য করি না কিছু। তবে মায়ের কাণে কথাটা উঠলে একটা গণ্ডগোল হবে বটে, তা সে জন্যে আর কি করি বল? মার তো সব কথা নিয়েই গোলমাল করা একটা স্বভাব,—সে ভেবে কাজ করতে গেলে আমার চলে না।"

কিরণ বলিল, তা ছাড়া, আমার চাকরেরা এ কথা নিয়ে কাণাকাণি করতে পারে। তাই থেকে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে একটা কুৎসার সৃষ্টি হবে। লোকজনদের মুখে মুখেই সত্য মিথ্যা জড়ান যত আজগুবী খবর বাইরে ছড়ায়, জানো ত?

লীলা রাগিয়া বলিল, খুব জানি! আর সেই জন্য চাকরদের ভয় করে চলতে হবে আমাকে, এই ত বোলতে চাও তুমি? তুমি পাড়ার সব বুড়ো গিন্নীদের মত কথা বলতে শিখেছ দেখছি! আমি ও সব কথা শুনতে চাই না। শুধু তোমার বাড়ী আমি যেতে পারি কি না, তাই বল!

কি পাগলামি তোমার লিলি! কিরণ লীলার রাগ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, আমার বাড়ীতে তুমি যাবে তার মধ্যে আবার জিজ্ঞাসা করবার কি আছে? নিশ্চয়ই যেতে পার! আমি শুধু কথাটা তোমায় একটু ভেবে দেখতে বলছিলুম,—এ নিয়ে তোমার নামে একটা বিশ্রী চর্চ্চা হতে পারে তাই। জানো ত, তোমার সম্বন্ধে অপ্রিয় কোন কথা শোনা আমার পক্ষে কি রকম কষ্টকর?

—"তুমি নিশ্চিন্ত থাক! লোকে কি বলবে না বলবে সে সব আমি গ্রাহ্য করি না। যাবো বলেছি যখন তখন নিশ্চয়ই যাবো, কোন বাধা মানবো না। তবে তুমি তাকে এখন আমার সম্বন্ধে কোন কথা বোল না। আমাদের প্রথম আলাপটা আমি একলাই করতে চাই। যে সময় তুমি বাড়ী থাকবে না, আমি সেই সময় যাব।"

—"বেশ। তা হলে সকালেই যেও। আমি চা খেয়ে বাইরে যাই, বারোটার আগে কোন দিন ফিরি না। তখন গেলে তাকে একলাই পাবে তুমি! এইবার সন্তুষ্ট হয়েছ ত? না আর কিছু আবদার আছে?" কিরণ হাসিয়া লীলার দিকে চাহিল।

লীলাও হাসিয়া বলিল, না—উপস্থিত আর কিছু ত মনে আসছে না। তুমি না হলে আমার এক দণ্ড চলবার যো নেই। এই ত সমস্ত দিন কি করে তার সঙ্গে দেখা হবে, কি কোরবো—সমস্ত সন্ধ্যা ভেবে ভেবে অস্থির হচ্ছিলুম। তুমি আসবামাত্র এক কথায় সব ঠিক হয়ে গেল। আচ্ছা কিরণ? তার সম্বন্ধে সব কথা জানবার আমার বড় আগ্রহ হচ্ছে। সে তোমার ওখানে এসে পর্য্যন্ত কি করছে, কি কথাবার্ত্তা বলেছে বল না!

লীলার এই সাগ্রহ প্রশ্নে কিরণ গম্ভীর হইয়া বলিল, এখন আর তার সম্বন্ধে বলবার মত কিছুই নেই লীলা! কাল থেকে আজ বিকেল পর্য্যন্ত সে দুটো চারটে নিতান্ত সাধারণ কথা ছাড়া আর বেশী কিছুই বলে নি। যারা তাকে আগে দেখেছে, শুধু তারাই বুঝবে যে, তার পক্ষে এ ভাবটা কত অস্বাভাবিক। তার সমস্ত অন্তরটা যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। এর চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে তার মৃত্যু হলেও ভাল ছিল। মনে কর, তার সারা জীবনটা এমনি জীবন্মৃত অবস্থায় কাটাতে হবে, এ কথা যখন সে ভাবে, তার মনটা তখন কি রকম হয়? সমস্ত আশা ভরসা নষ্ট হয়ে, জীবনের সব চেয়ে প্রিয় জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়ে বেঁচে থাকা—এ যে কি দুঃখ, তা যার হয়েছে—সেই শুধু জানে।

লীলা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, আমি সেটা নিজের মন দিয়ে খুব ভাল করেই বোধ করছি কিরণ! তাই আর সকলের মত কথাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেল্‌তে পারছি না। খালি মনে হচ্ছে, তার জন্য কি করতে পারি আমি? তুমি ত কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাক, সব সময় তার কাছে থাকতে পার না,—আমি যদি মাঝে মাঝে গিয়ে কথায় বার্ত্তায় গল্পে তাকে কতকটা আনন্দ দিতে পারি, সেই জন্যেই তার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছি। এ ছাড়া আর কিই বা করতে পারি আমি? কিন্তু এখন রাত হয়েছে, এসো এবার নীচে যাওয়া যাক্। (ক্রমশঃ)

ওয়ালটেয়ার

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

এক দিন ভাদ্রের অপরাহ্নে ওয়ালটেয়ারে যাইব বলিয়া মান্দ্রাজ মেলে আরোহণ করিলাম। হাওড়া হইতে খড়্গপুর পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত রেল পথের দুই পাশের ভূমি জলপ্লাবিত হইয়াছিল। এক কোমর জলে নামিয়া দরিদ্র রমণীরা জলজ শাক সংগ্রহ করিতেছিল। চারিদিকে জলের মধ্যে একটু একটু উচ্চ ভূমির উপর দুই চারিটি করিয়া বৃক্ষাবৃত কুটীর দেখা যাইতেছিল।

জলপ্লাবিত দেশ এবং বর্ষাস্ফীত নদনদী দেখিতে দেখিতে চলিলাম। বর্ষার জলে রূপনারায়ণ রুদ্র-মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। খড়্গপুরের পর বৃষ্টি পাইলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রীতিমত দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া ট্রেণ চলিতে লাগিল। নিবিড় অন্ধকার। মধ্যে মধ্যে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া সৌদামিনী কখনও সম্মুখে, কখনও পশ্চাতে, কখনও নিকটে, কখনও দূরে খেলা করিতে লাগিলেন। অন্ধকার অপেক্ষা সে বিদ্যুতের আলোক যেন আরও ভয়ানক মনে হইতেছিল। অধিক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

গাড়ী যখন বহরমপুর (গঞ্জামে) পৌছিল, রাত্রি তখন প্রায় প্রভাত হইয়াছে। বহরমপুরের পর আর বড় নদী নাই। এখান হইতে যত দক্ষিণে যাওয়া যায়, ট্রেণ হইতে প্রায় অবিচ্ছিন্ন পর্বত-শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্বতশ্রেণী এবং সদ্যোবর্ষণপুষ্ট স্রোতস্বিনীগুলি পথটি বড় রমণীয় করিয়াছিল। কখনও সূর্য্যালোকে প্রকৃতি হাসিয়া উঠিতেছিলেন, আবার কখনও অরণ্য ও পর্বতের উপর শুভ্র আবরণ টানিয়া দিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিতেছিল। বেলা একটার সময় ট্রেণ ওয়ালটেয়ার ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইল।

ওয়ালটেয়ার ভিজিগাপটম জেলার অন্তর্গত।

ভিজিগাপটম জেলার আকার ভারতবর্ষের সকল জেলার অপেক্ষা বৃহত্তম। মান্দ্রাজ প্রদেশের মধ্যে এই জেলার লোক-সংখ্যাও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। জেলার প্রধান নগরের নাম ভিজিগাপটম—সংক্ষেপে ভাইজাগ বলা হয়। ভিজিগাপটম শব্দটি বিশাখপত্তন শব্দের অপভ্রংশ। বিশাখপত্তন শব্দের অর্থ কার্ত্তিকের মন্দির। শোনা যায়, এখানে সমুদ্রতীরে একটী প্রাচীন কার্ত্তিকের মন্দির ছিল। এখন তাহা সমুদ্রগর্ভে অন্তর্হিত হইয়াছে। এই ভিজিগাপটম বা ভাইজাগ নগরের সহরতলী (Suburb) এর নাম ওয়ালটেয়ার। ভিজিগাপটম এবং ওয়ালটেয়ার উভয় স্থানই সমুদ্রতীরে অবস্থিত,—ভিজিগাপটম নিম্নভূমির উপর, ওয়ালটেয়ার উচ্চ পার্ব্বত্যভূমির উপর। উচ্চভূমির উপর বলিয়া এবং বিরল-বসতি বলিয়া ওয়ালটেয়ারের স্বাস্থ্য ভাল। এ জন্য ইংরাজেরা ওয়ালটেয়ারে বাস করেন। ভাইজাগে দেশী লোকেরা থাকেন। অনেক ফিরিঙ্গিও (Eurasian) ভাইজাগে থাকেন।

ভাইজাগে একটি পান্থশালা আছে—তাহার নাম Turner's choultry। দুই চারি দিন থাকিবার পক্ষে এ স্থানটি সুবিধাজনক। সমুদ্রতীরে Piroj Mansions নামক বাড়ীতে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। তবে সেখানে ফিরিঙ্গির প্রাদুর্ভাব বেশী। ওয়ালটেয়ারে ইংরাজদের থাকিবার একাধিক হোটেল আছে। বাড়ীভাড়াও পাওয়া যায়। তবে পুরীর ন্যায় এখানেও প্রায় সব বাড়ীতেই যক্ষ্মা রোগী ছিল বলিয়া কিছু বিপজ্জনক।

ওয়ালটেয়ারের নিকটে সমুদ্রতীর প্রায় পূর্ব্ব-পশ্চিম ভাবে বিস্তৃত। পূর্ব্বাংশে ওয়ালটেয়ার, পশ্চিমাংশে ভাইজাগ। ভাইজাগের পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র নদীর মোহানা (১) আছে। তাহার অপর পারে একটী পাহাড় সমুদ্রের মধ্যে প্রসারিত হইয়াছে। সমুদ্রের জল হইতে পাহাড়টি উঠিয়াছে। পাহাড়টি Dolphin's nose নামে পরিচিত—

সমুদ্রতীর

জানি না ডলফিন নামক মৎস্যের নাসিকার সহিত ইহার সাদৃশ্য কিরূপ। ভাইজাগের শেষ প্রান্ত হইতে ওয়ালটেয়ার পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরে একটা সুদীর্ঘ রাজপথ আছে। পথের ধারে মাঝে মাঝে বসিবার স্থান আছে। এইরূপ একটী বসিবার বাঁধান জায়গার নাম Scandal Point। লাল পথ, দুই পাশে নারিকেল গাছের সারি, পশ্চাতে নগর, সম্মুখে সমুদ্রের দিগন্ত-বিস্তৃত নীল জলরাশি। সমুদ্র-তীর হইতে একটি রাস্তা ওয়ালটেয়ারের উচ্চ ভূমি আরোহণ করিয়াছে। এই পথ দিয়া কিছু দূর উঠিলে সমুদ্র বেশ সুন্দর দেখায়। নীচে—

(১) নদীর মুখটি সাধারণতঃ Back water নামে পরিচিত।

কিছু দূরে—সমুদ্রের জলরাশি একখণ্ড সুবৃহৎ নীল কাচের ন্যায় দেখায়। দূর হইতে তরঙ্গগুলি ছোট দেখায়, তীরের নিকটে যেখানে তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সেখানে সারি-সারি শুভ্র নির্মাল্যের ন্যায় বোধ হয়। সমুদ্রের ভীম গর্জন এখানে শুনিতে পাওয়া যায় না,—অনুচ্চ মর্মরধ্বনি সমুদ্রের বাতাসে ভাসিয়া আসে। পশ্চাতে চাহিলে, নিকটে ও দূরে পর্বতশ্রেণী, পাহাড়ের উপর বাড়ী ও গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। চারি দিকে ভূমি উচ্চ-নীচ—কোথাও সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, কোথাও গভীর খাদ, উজ্জ্বল রক্ত বর্ণ পর্বত গাত্রের উপর অসংখ্য স্রোতের চিহ্ন। (২)

পাহাড়—তাহার নাম Ross' Hill—তাহার উপর গির্জ্জা; একটি পাহাড়ের উপর একটি মসজিদ; অপর পাহাড়টির উপর একটি হিন্দু মন্দির। এই ভাবে তিনটি পাহাড়ের উপর তিন ধর্ম্মের তিনটি দেবালয় আছে।

ওয়ালটেয়ারের নিকটে যে সকল দ্রষ্টব্য স্থান আছে তাহাদের মধ্যে সিংহাচলের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। মন্দিরে নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি আছে বলিয়া পাহাড়ের নাম সিংহাচল—প্রচলিত কথায় ইহাকে সীমাচল বলে। ওয়ালটেয়ার হইতে সিংহাচল পাহাড় ৫ ক্রোশ। সিংহাচলে যাইব বলিয়া আমরা দুইটি খাণ্ডি ঠিক করিয়াছিলাম।

সিবিল হস্পিটাল ও মেডিকেল কলেজ

ভাইজাগে সমুদ্রতীরে একটি প্রাসাদ তুল্য গৃহে Town Hall বা club আছে। এখানকার হাসপাতালটি খুব বড়। একটি Medical College এবং Engineering Schoolও আছে। ভাইজাগের পশ্চিম দিকে নগরের কিয়দংশকে Fort বলে, এখানে ডাকঘর, Custom House, Light House প্রভৃতি আছে। নগরের পশ্চিম প্রান্তে নদীর ধারে তিনটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে—এক পার্শ্বে Dolphin's Nose, অপর পার্শ্বে এই পাহাড়গুলি, মধ্যে নদী। একটি

(২) "The Scene from this high ground is probably the most beautiful on the east, coast of India."—District Gazetteer, Vizagapatam.

খাণ্ডি একরকম গরুর গাড়ী। গাড়ীটি আমাদের ঘোড়ার গাড়ীর ন্যায়, তবে কিছু ছোট। অপর প্রভেদ এই যে ঘোড়ার গাড়ীর দুই পাশে দরজা থাকে; কিন্তু খাণ্ডির মাত্র পশ্চাদ্ভাগে একটি দরজা থাকে। গরুতে টানে, কিন্তু গরু প্রায় দৌড়িয়া যায় বলিয়া খাণ্ডি দ্রুতগতিতেই চলে। ৫ক্রোশ পথ চলিতে ২॥০ ঘণ্টা লাগে।

ভোর চারটার সময় খাণ্ডি আনিতে বলিয়াছিলাম। গাড়ী ঠিক সময়েই আসিয়াছিল। গাড়োয়ানদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গিল। উঠিয়া দেখিলাম, চন্দ্রকিরণে বিশাল সমুদ্রবক্ষ এবং তীরস্থ বৃক্ষরাজি উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র উজ্জ্বলভাবে

দীপ্তি পাইতেছে। পূর্বগগনে সূর্য্যের অরুণচ্ছটা তখনও প্রকাশ পায় নাই। যাইবার আয়োজন করিতে এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। আমরা যখন গাড়ীতে উঠিলাম, তখন ভোরের আলো বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আকাশে নক্ষত্রমালা ম্লান হইয়া গিয়াছে। এবং একটি বৃহৎ অর্ণবপোত নক্ষত্রের ন্যায় তিনটি আলো জ্বালিয়া দুর সমুদ্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

রাস্তায় দুই চারিটি করিয়া লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছিল। কদাচিৎ দুই একটি গাড়ীও চলিতেছিল। নগরের উঁচু নীচু রাস্তা দিয়া আমরা চলিলাম। ক্রমে সহর ছাড়াইয়া ষ্টেসনের নিকট রেললাইন পার হইলাম। পাঠশালাতে বসিয়া শিশুগণ পাঠ অভ্যাস করিতেছে। গ্রামে একটি ডাকঘর এবং দাতব্য চিকিৎসালয় দেখিলাম। জলের কল আছে। সীমাচলের পাহাড়ের হনুমন্ত বং নামক নদী হইতে নলে করিয়া ভাইজাগ পর্য্যন্ত জল গিয়াছে—এ জন্য ক্ষুদ্র গ্রামেও জলের কল বসান সহজ হইয়াছে। রাস্তার দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ ঘর। সেখানে মন্দিরের কর্মচারী এবং পুরোহিত প্রভৃতি থাকেন। গৃহশ্রেণী এবং রাজপথের মধ্যে পরিচ্ছন্ন ভূমি—তাহাতে দুই চারিটি ফল ও ফুলের গাছ আছে। তেলেগু রমণীগণ গৃহ-কর্মে নিরত ছিল, কেহ বা প্রয়োজন বশতঃ গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতেছিল।
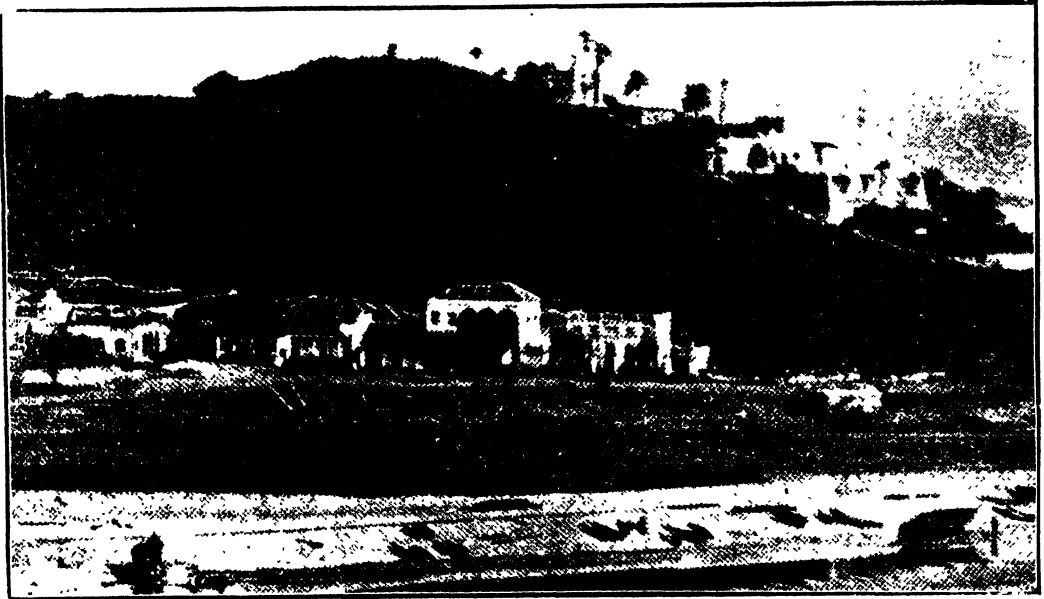
রস হিলের উপরে মসজিদ

পথের ডানদিকে পাহাড়। পর্বতের নিম্নদেশে ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষরাজির মধ্যে একটি শুভ্র দেবালয় দেখা যাইতেছিল—শুনিলাম উহা মাধোধারা। পর্বতগাত্র গুল্মসমাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া চাষ করা হইয়াছে। ক্ষেত্রের সীমাগুলি পর্বতগাত্রে পরিষ্কার ভাবে দেখা যাইতেছে।

আমাদের পথটি পাহাড় ঘুরিয়া তাহার অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইল। দুর হইতে দুইটি পাহাড়ের সন্ধিস্থলে একটি ক্ষীণ রেখা দেখা যাইতেছিল। উহাই সীমাচলে উঠিবার সোপান। একটু পরেই আমরা সীমাচল গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামটি ক্ষুদ্র হইলেও পরিষ্কার।

গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিলাম, সম্মুখে বিস্তৃত প্রস্তরবদ্ধ সোপানশ্রেণী পাহাড়ের উপর উঠিয়া গিয়াছে। পথের দুই ধারে বহুসংখ্যক ভিখারী জীর্ণ মলিন বস্ত্র পাতিয়া বসিয়া আছে। দুইটি স্ত্রীলোকের মাথায় আমার জিনিসপত্র তুলিয়া সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমেই সোপানের উপর একটি বৃহৎ তোরণ। এই তোরণের নিকটে এবং সোপানের ধারে অন্যান্য স্থানে প্রস্তর-গঠিত দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। সোপানের পাশে প্রস্তরবদ্ধ পয়ঃপ্রণালী। অনেক যাত্রী পর্বতে আরোহণ করিতেছিল। পথের দুই ধারে ঘন জঙ্গল। তাহাতে

বিবিধ বন্য কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তরুলতার অন্তরালে বিহগকুল বিচিত্র কলরব করিতেছে। একটি নির্ঝরের মর্ম্মরধ্বনি পর্বত-গাত্র মুখরিত করিয়াছে। সোপানাবলির ধারে বৈদ্যুতিক তার এবং আলোকমালা দেখিতে পাইলাম—উৎসবের সময় এই সকল আলোক জ্বালিয়া দেওয়া হয়। নির্ঝরিণীর জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে সোপানে আরোহণ করিতেছিলাম। মধ্যে মধ্যে ক্লান্তি বিনোদনের জন্য সোপান-পার্শ্বে উপবেশন করিতেছিলাম। শীতল পর্বত-সমীরণ সেবন করিয়া, নির্ঝরের মর্ম্মরধ্বনি ও উচ্ছ্বসিত বিহগ-কাকলী শ্রবণ করিয়া, কুসুমিত তরুলতাচ্ছন্ন পর্ব্বতগাত্র দেখিয়া শীঘ্রই ক্লান্তি দূর হইতেছিল। কিছু দূর উঠিয়া দেখিলাম, পাহাড়ের কিয়দংশ ধসিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত প্রস্তরবদ্ধ সোপানও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পাশ দিয়া একটি নূতন পথ নির্মিত হইয়াছে। আমরা সেই পথ দিয়া চলিলাম।

কিছুক্ষণ পরে আর একটি তোরণের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহার নাম হনুমান তোরণ। তোরণের পার্শ্ব দিয়া বারিরাশি প্রচণ্ড বেগে উপর হইতে পড়িতেছে। ইহাকে আকাশ-গঙ্গা বলে। এক্ষণে বর্ষাতে নির্ঝরের জল বাড়িয়া সোপানাবলি প্লাবিত করিয়া বহিয়া গিয়াছে। জলপ্লাবিত শৈবালসমাচ্ছন্ন সোপানাবলি অতি সন্তর্পণে অতিক্রম করিলাম। ক্রমে পর্ব্বতের শিরোভাগে অপেক্ষাকৃত সমতল অংশে উপস্থিত হইলাম। মধ্যে মধ্যে দুই একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখা যাইতেছিল।

সীমাচল পাহাড়ে উঠিবার সিঁড়ির সংখ্যা সহস্রাধিক। অবশেষে সোপানাবলি শেষ হইল। পর্বত-পৃষ্ঠে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র গৃহ দৃষ্ট হইল। গৃহগুলির মধ্য দিয়া দুইটি পাথরে বাঁধান পথ। একটী প্রধান মন্দির অভিমুখে চলিয়াছে—পথের দুই পাশে সারি সারি দোকান। অপর পথটি গঙ্গাধারা নামক নির্ঝর এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সীতারামের মন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমরা প্রথমে একটি ছত্রে গেলাম। ছত্রটি পাথরের তৈয়ারি। চারিধারে সারি সারি ঘর, মাঝে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। আমরা একটী ঘরে জিনিসপত্র রাখিয়া গঙ্গাধারায় স্নান করিতে গেলাম। গঙ্গাধারা মন্দির হইতে ৫।৭ মিনিটের পথ। এখানে পাথরে বাঁধান স্নান করিবার স্থান আছে। জলরাশি উপর হইতে ২।৩ হাত নীচে পড়িতেছে। জল খুব জোরে পড়িতেছে। জলের নীচে বসিলে বেশ একটু আঘাত লাগে। পাশে আরও দুই একটী জলধারা আছে। একটী প্রস্তর-নির্মিত শিবলিঙ্গের উপর অনবরত জল পড়িতেছে। স্ত্রীলোকেরা ফুলের মালা বিক্রয় করিতেছে। তীর্থের

ওয়ালটেয়ার ক্লব

ব্রাহ্মণেরা পয়সা চাহিতেছে। পাশে রামসীতার মন্দির। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন মন্দিরের দ্বার বন্ধ ছিল।

গঙ্গাধারায় স্নান করিয়া আমরা প্রধান মন্দিরে চলিলাম। মন্দিরের সম্মুখে পথের দুই ধারে অনেক ছোট ছোট দোকান। তাহাতে তিলকের মাটি, সিন্দুর, পিতলের ছোট ছোট ঘণ্টা ও করতাল, কাঠের খেলনা, গালার চুড়ি প্রভৃতি বিক্রয় হয়। এখানে চন্দন কাঠ বিক্রয় হইতেছে দেখিলাম। চন্দন কাঠ এখানে সস্তা। পথ হইতে অনেকগুলি সিঁড়ি উঠিয়া ফটক পার হইয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। প্রাঙ্গণ হইতে আরও কয়েকটি সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরটি বিজিয়ানাগ্রামের রাজার সম্পত্তি। রাজ-মুখমণ্ডপটি অতিক্রম করিয়া আমরা প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এখানে নরসিংহদেবের বিগ্রহ স্থাপিত। এখানে আসিয়া যখন শুনিলাম যে, নরসিংহদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না, তখন বড়ই দুঃখিত হইলাম। মূর্ত্তিটি প্রত্যহ চন্দন দিয়া সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া রাখা হয়। তখন ইহা চন্দনময় একটি বৃহৎ শিবলিঙ্গের ন্যায় দেখায়। শুনিলাম, বৎসরে এক দিন মাত্র যাত্রিগণ নরসিংহদেবের দর্শন পায়—অক্ষয়া তৃতীয়ার দিন। এখানে ধূপদীপ এবং নারিকেল কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি ফল নিবেদন করিয়া পূজা দেওয়া হয়। পূজারি চরণামৃত খাইতে দেন, কর্পূরের দীপশিখা স্পর্শ করিতে দেন এবং মাথায় দেবতার পিত্তলময় পাদুকা

মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি

কর্ম্মচারিগণ মন্দিরের তত্ত্বাবধান করেন। মন্দিরে প্রবেশ করিবার পথে একজন কর্ম্মচারী থাকে, সে প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে চারি পয়সা লইয়া একটি টিকিট দেয়। মন্দিরটি দুই ভাগে বিভক্ত। একটি প্রধান মন্দির—তাহাতে বিগ্রহ থাকেন। অপরটি মুখ-মণ্ডপ—প্রধান মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত। মুখমণ্ডপের ছাদ সারি সারি প্রস্তর-স্তম্ভের উপর স্থাপিত। স্তম্ভগুলি বিচিত্র শিল্পকার্য্য দ্বারা সমলঙ্কৃত। মন্দিরটি অন্ধকার, এজন্য দিনের বেলাতেও বিদ্যুতের আলো জ্বালা হয়। মুখমণ্ডপের এক পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিষ্ণু, লক্ষ্মী প্রভৃতির পিত্তল মূর্ত্তি রহিয়াছে।

ছোঁয়াইয়া দেন। পূজান্তে বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করিয়া আমরা মূল মন্দিরের বাহিরে আসিলাম। এক স্থানে প্রসাদ বিক্রয় হইতেছে দেখিলাম। দুই তিন প্রকারের অন্নময় প্রসাদ পাওয়া যায়। কোনটি খিচুড়ির ন্যায়, কোনটি তেঁতুল সরিষা প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত। ঝাল এবং টকের প্রাধান্য কিছু বেশী। পদ্মপত্রে উত্তপ্ত প্রসাদ পরিষ্কার ভাবে বিতরণ করা হয়।

মন্দিরের দেওয়ালে বাহিরের দিকে বহুসংখ্যক প্রস্তর-মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি সুগঠিত, আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট। কতকগুলি মূর্ত্তি মুসলমানগণ নষ্ট

করিয়াছে। ভিজিয়ানাগ্রামের রাণীর আদেশে কতকগুলি মূর্ত্তি চুণ দিয়া আবৃত করা হইয়াছে। শোনা যায় যে, মূর্ত্তিগুলি অশ্লীল বলিয়া রাণী এইরূপ আদেশ দেন।

প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে নাট্যমণ্ডপ। ইহ' ৯৬টি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। ৬সারি স্তম্ভ আছে, প্রতি সারিতে ১৬টি করিয়া স্তম্ভ। এখানে নরসিংহদেবের স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসন, লক্ষ্মীদেবীর রৌপ্য সিংহাসন এবং বৃহৎকায় কাঠের হাতী, ঘোড়া, রথ, হাঁস, গরুড় প্রভৃতি বহুবর্ণে চিত্রিত বিবিধ মূর্ত্তি দেখিলাম। বৎসরে এক দিন নরসিংহদেব শোভাযাত্রা করিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া নদীতে স্নান করিতে যান,—সেদিন এই সকল মূর্ত্তি বাহির করা হয়। এই ঘরে তিনটি উচ্চভূমি-বেষ্টিত। ভিজিয়ানাগ্রামের রাজবংশ ২০০ বৎসরের উপর এই মন্দিরের স্বত্বাধিকারী। বাৎসরিক ৩০,০০০ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি তাঁহারা মন্দিরকে দান করিয়াছেন। স্থলপুরাণে না কি উল্লেখ আছে যে, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে সমুদ্রে ফেলিয়া তাঁহার উপর সিংহাচল পাহাড় চাপাইয়া দিয়াছিলেন,—বিষ্ণু নরসিংহ রূপ ধারণ করিয়া পাহাড়টি সরাইয়া দেন,—তখন প্রহ্লাদ বাহির হইয়া আসেন। প্রহ্লাদই না কি মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্জাবে প্রবাদ আছে যে, হিরণ্যকশিপুর রাজধানী ছিল মুলতানে। এখনও মুলতানকে প্রহ্লাদনগরী বলে।

বাজার ও ক্লকটাওয়ার—ভিজিয়ানাগ্রাম

প্রস্তরময় সুললিত মূর্ত্তি দেখাইয়া প্রহরী বলিল, ইহারা রম্ভা, মেনকা এবং উর্ব্বশী।

প্রাঙ্গণের এক কোণে এক প্রস্তর-নির্ম্মিত রথ দেখিলাম। পাথরের চাকা এবং ঘোড়াগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর। আকারে এবং শিল্পচাতুর্য্যে কোনারকের বিখ্যাত প্রস্তর-রথের সহিত তুলনীয় না হইলেও, ইহা অনেকটা সেই ধরণে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাঙ্গণে দুই তিনটি ক্ষুদ্র মন্দিরও আছে।

সীমাচল পাহাড়ের উচ্চতা ৮০০ ফিট। পাহাড়ের উত্তর দিকে—প্রায় শিখরের নিকটেই মন্দির। মন্দিরের চারিদিক

ইহা হইল পৌরাণিক কথা। ঐতিহাসিক এখনও ঠিক করিতে পারেন নাই—মন্দিরটি ঠিক কোন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটি শিলালিপির তারিখ ১০৯৮ খৃষ্টাব্দ—তখনই ইহা একটি বিখ্যাত স্থান ছিল। অপর একটি শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, রাজা তৃতীয় গোঙ্কের রাণী মূর্ত্তিটি সুবর্ণাবৃত করিয়াছিলেন। ঐ রাজার সময় ১১৩৭—৫৬খৃঃ। তৃতীয় একটি শিলালিপিতে উল্লেখ আছে, গঙ্গা-বংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহ (১২৬৭ খৃঃ) প্রধান মন্দির, মুখমণ্ডপ এবং নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের নানা স্থানে বহুসংখ্যক শিলালিপি আছে। অন্যূন ১২৫টি

শিলালিপির পাঠ উদ্ধার করা হইয়াছে। এই সকল শিলা-লিপি হইতে জেলার ইতিহাস সংগ্রহ হইতে পারে। (৩)

ভিজিগাপটম প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহা কটকের গজপতি রাজগণের শাসনাধীন হইয়াছিল। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব গজপতি প্রতাপরুদ্রকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্যের বিবিধ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সিংহাচলের শিলালিপিতে তাঁহার বিজয়-কাহিনী লিখিত আছে। কৃষ্ণদেব এবং তাঁহার রাণী ৯৯১ মুক্তার একটি হার এবং বিবিধ অলঙ্কার বিগ্রহকে উপহার দিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-কাহিনীতে সিংহাচলের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা অনেকটা এই সময়েই হইবে; কারণ, গজপতি প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর সমসাময়িক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায়।

পূর্ব্বরীতে প্রভু আগে গমন করিলা।
জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে কতদিনে গেলা॥
নৃসিংহে দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্যগীত স্তুতি॥
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদের জয় পদ্মমুখ পদ্মভৃঙ্গ॥
এই মত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল।
নৃসিংহ সেবক মালা প্রসাদ আনি দিল॥
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রি তাহা রহি করিলা গমন॥

ওয়ালটেয়ারের নিকটে সিংহাচল ব্যতীত আরও কয়েকটি দেখিবার স্থান আছে। একটির নাম Valley Garden। নগরের পশ্চিম প্রান্তে যে নদী (Back-water) আছে, তাহা পার হইয়া Valley Gardenএ যাইতে হয়। নদী পার হইবার জন্য খেয়া নৌকা আছে—ভাড়া প্রতি লোকের ৫ পয়সা। Valley Gardenএর তিন দিকে পাহাড়—এক দিকে Backwaterএর জল। একটি ঝরণা পাহাড় হইতে আসিয়া বাগানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া Backwaterএর সহিত মিলিত হইয়াছে। বাগানে সারি সারি নারিকেল গাছ আছে, অন্য বিবিধ ফল ফুলের গাছও আছে, এবং দুইটি সুন্দর বাড়ী আছে। ১৯২৩ সালের বিখ্যাত Cycloneএ বাগানের অর্দ্ধেক গাছ পড়িয়া গিয়াছে। বাগানটি রাজার সম্পত্তি। তিনি পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন। ঝটিকায় যাহা নষ্ট হইয়াছে, তাহার আর সংস্কার হয় নাই। তথাপি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বাগানটি এখনও অতি মনোরম রহিয়াছে। বাগান-

ল্যানডাল পয়েণ্ট

(৩)......the many other grants inscribed on its walls (the Government epigraphist's lists give no less than 125 of these) make it a regular repository of the history of the district.—Madras District Gazetteer, Vizagapatam.

সমুদ্রতীর—জেটি

স্যানডাল পয়েন্টের তীরের দৃশ্য

বাড়ীতে কেহ থাকে না। দেয়ালে অনেকে নাম লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। অনেকে এখানে আসিয়া বনভোজন করিয়াছিল, সে কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

এক দিন Dolphin's Nose পাহাড়ে উঠিয়াছিলাম। পাহাড়ে উঠিবার পাথর-বাঁধান পথ আছে। পূর্বে বলিয়াছি, পাহাড়টি ঠিক সমুদ্র হইতে উঠিয়াছে। পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে পথ হইতে সমুদ্রের শোভা অতি সুন্দর দেখায়। তীরের নিকটে সমুদ্রের ঢেউগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কিন্তু

তীর হইতে কিছু দূরে ঢেউগুলি আর ভাঙ্গিয়া যায় না। সেখানে ঈষৎ নীলাভ জলরাশি সারি সারি দীর্ঘ সরল তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে থাকে। তরঙ্গগুলি আকারে অতি বৃহৎ। পাহাড়ের উপর হইতে চারিদিকের দৃশ্যও অতি সুন্দর। এক দিকে যত দূর দেখা যায়, সমুদ্রের নীল জল; অন্য দিকে যত দূর দেখা যায়—পর্বতমালা। সমুদ্র ও পর্ব্বত বেষ্টিত সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর নগরের ঘন-সন্নিবিষ্ট গৃহগুলি, Light House, সারি সারি তরঙ্গগুলির তটভূমি অভিমুখে অবিরামগতি, এবং তটভূমির নিকটে আসিয়া সশব্দে ফেণ-রাশিতে পরিণতি – সব মিলিয়া একটি পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যের

প্রধান রাজপথ

ন্যায় প্রতীত হইল। নগরের একদিকে যেমন Dolphin's Nose, অপর দিকে কিছু দূরে দুইটি পাহাড় সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছে দেখা গেল। সম্প্রতি দুই দিন খুব বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে নগরের নিকটবর্ত্তী ভূমি জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। সেই জলরাশিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া রেলওয়ে লাইন এবং তাহার নিকটবর্ত্তী তারের স্তম্ভগুলি দেখা যাইতেছিল। এখান হইতে যতগুলি পাহাড় দেখা যায়, তাহার মধ্যে সিংহাচল পাহাড়টিই সব চেয়ে বড়।

Dolphin's Nose পাহাড়ের উপর দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। কয়েকটি ভাঙ্গা বাড়ী, ভাঙ্গা দেয়াল এবং পরিত্যক্ত কূপ দেখিতে পাইলাম। অন্য লোকালয় নাই। ছোট ছোট তরুলতা পাহাড়টিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এখানে একটি নূতন জিনিস দেখিলাম—সজীব শঙ্খ। কাঁকড়ার ন্যায় একপ্রকার মাংসল জীব শাঁখের মধ্যে থাকে, শাঁখটি জীবের পশ্চাদ্ভাগে থাকে—জীবটি যখন চলে, তখন মনে হয়, যেন শাঁখটি পিঠে বহন করিয়া চলিতেছে। একটু শব্দ শুনিতে পাইলে তৎক্ষণাৎ জীবটী সঙ্কুচিত হইয়া আবরণের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন ক্ষুদ্র শাঁখগুলি সাদা পাথরের মত দেখায়। সন্ধ্যার ছায়া পাহাড়ের উপর নামিয়া আসিতেছিল। শাঁখগুলি বোধ হয় পর্বত-গাত্রস্থ স্ব স্ব গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের পক্ষে পাহাড়টিই বিশাল জগৎ। এতগুলি শাঁখ দেখিয়া আমরা পাহাড়টির নাম শঙ্খ-পাহাড় রাখিলাম।

আমরা যখন পাহাড় হইতে নামিলাম, তখন পশ্চিম আকাশে কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। অনেক ডাকাডাকির পর ওপার হইতে খেয়া নৌকা আসিল। আসন্ন ঝটিকার আভাস পাইয়া Back waterএর কৃষ্ণ বারিরাশি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। নৌকাখানি খুব দুলিতে লাগিল। আমরা শঙ্কিত হৃদয়ে নৌকায় উঠিয়া Back water অতিক্রম করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

ওয়ালটেয়ারের নিকটে সীতামধারা নামক একটি স্থান আছে। প্রবাদ—এখানে সীতা স্নান করিয়াছিলেন। পর্বতের পাদদেশে একটি মনোরম উদ্যান আছে। উদ্যানের পার্শ্বে একটা গৃহ। গৃহের সম্মুখে মালতী ফুলের ঝাড়। চারি দিকে বিবিধ ফল ফুলের গাছ। নির্ঝরের জল একটি ক্ষুদ্র প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া উদ্যানের বৃক্ষাবলিতে জল সেচন করিতেছিল। শুনিলাম, সীতামধারার তীর্থে যাইতে হইলে, পাহাড়ের উপর এক মাইল পথ উঠিতে হইবে। বেলা অধিক হইয়াছিল—সঙ্গে ছেলেমেয়েরা ছিল, তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য আমরা ফিরিয়া আসিলাম—সীতামধারা দেখা হইল না।

আমরা শরৎকালে ওয়ালটেয়ারে গিয়াছিলাম। সে সময় এখানে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইত। দুই তিন দিন পরিষ্কার থাকে, বোধ হয়, সমুদ্রের হাওয়া জোরে বহিতে থাকে। তাহার পর পশ্চিমের পাহাড় হইতে নিবিড় কৃষ্ণ মেঘ নামিয়া আসে, এবং প্রচণ্ড বর্ষণ আরম্ভ হয়। বৃষ্টির পর তীর-ভূমি হইতে কর্দমাক্ত জল সমুদ্রের উপর নামিয়া আসে। তখন নীল এবং লাল জলে মিশিয়া বেশ দেখায়। দুই তিন দিন অনবরত বৃষ্টির পর বর্ষণের সময় সমুদ্রকে অতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিতে দেখিয়াছিলাম—যেন রক্তের সমুদ্র। কোন কোন দিন বৃষ্টি থামিয়া গেলে, সমুদ্র নূতন রূপ ধারণ করিতেন! এক দিন মনে আছে, দুপুরে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল। বৈকালে বৃষ্টির একটু বিরাম পাইয়া গাড়ী করিয়া সমুদ্র তীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সমুদ্রের নীল রং আর দেখা যায় না। তাহার পরিবর্ত্তে একটা গাঢ় ধূসর রং সমুদ্রকে আরও ভয়ানক, আরও রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছিল। ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তোন্মুখ হইলেন—মেঘাচ্ছন্ন দিবসের অল্প আলোক আরও ক্ষীণ হইয়া আসিল। দুই চারিটি জেলে-ডিঙ্গি এমন দুর্দ্দিনেও বাহির হইয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিতেছে দেখা গেল। কি সুন্দর সে দৃশ্য! যেন জীব ইহলোক হইতে পরলোক যাত্রা করিয়াছে,—অনন্ত অজানা রহস্যময় পথ—কোন সঙ্গী নাই—পরপারে কখন পৌঁছিবে, কেমন সে দেশ—কিছুই জানা নাই।

জয়দেব

১

(জন্মকাল)

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

বাঙ্গালার অদ্বিতীয় বৈষ্ণব কবি জয়দেব যখন জন্মগ্রহণ করেন, বাঙ্গালার সে এক সঙ্কটময় সময়। অনুমান বঙ্গাব্দ সন ছয়শত সাল অথবা খৃষ্টাব্দ দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ;—সমাজ ব্যভিচারে পূর্ণ, প্রকৃতিপুঞ্জ মোহগ্রস্ত, রাজশক্তি অবসন্ন, রাজ্যেশ্বর প্রতীকারে অসমর্থ। যে বাঙ্গালী প্রজা এক দিন নিজেদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিকে সিংহাসনে বসাইয়া দেশে মাৎস্যন্যায় প্রশমিত করিয়াছিল, আজ তাহারা পাশব ব্যসনে উন্মত্ত, বৈদেশিক আক্রমণের আসন্ন সম্ভাবনায়ও নিরুদ্বেগ। যে রাজ্যের পরাক্রান্ত নৌবাহিনী ক্ষেপণী-উৎক্ষিপ্ত জলধারায় এক দিন চন্দ্রমণ্ডলের কলঙ্ক প্রক্ষালনের স্পর্দ্ধা রাখিত, আজ প্রমোদ তরণীতে প্রমদাগণের নয়ন-কজ্জলে তাহাদেরই গণ্ড কালিমা-মণ্ডিত, তাহারা সেই সোহাগেই অচৈতন্য। ভারতের বাহিরে কোথায় কি ঘটিতেছে, ভারতের ভিতরে কোথায় কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, সে সংবাদ লওয়া তো দূরের কথা—নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবনাও কাহারো মনে স্থান পায় না। দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, সর্ব্বনাশ সমীপবর্ত্তী, কিন্তু রাজ্যে নিত্য উৎসব লাগিয়াই আছে। কবিরা কাব্য রচনা করিতেছেন, সুরচিত বিস্তৃত প্রশস্তি-গাথায় নৃপতির যশের কাহিনী কীর্ত্তিত হইতেছে, সমগ্র দেশ এক কল্পিত শান্তির মৃতকল্প জড়তায় তন্দ্রাচ্ছন্ন। বাঙ্গালীর সৌভাগ্য-সূর্য্য তখন ধীরে অস্তাচল-মূলে ঢলিয়া পড়িতেছিল, আর তাহার শেষ রশ্মিটুকু গ্রাস করিবার জন্য এক রণদুর্ম্মদ জাতির বিজয়-বৈজয়ন্তী, আপন গৌরবোজ্জ্বল অর্দ্ধচন্দ্র-

প্রভায় অলক্ষ্যে বাঙ্গালার সান্ধ্য-গগনে অভ্যুত্থিত হইতেছিল। এমনি দিনেই জয়দেব গোস্বামীর আবির্ভাব.—এমনি এক দিনেই সংস্কৃত-গীতিকাব্যের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি বীরভূমের অজয়-নদ-তীরবর্ত্তী কেন্দুবিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি-বিরচিত 'শ্রীগীতগোবিন্দ' হইতে জানিতে পারা যায়—কবির পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী, পত্নীর নাম পদ্মাবতী এবং তাঁহার প্রিয়বন্ধু ছিলেন পরাশর প্রভৃতি। কেহ কেহ বলেন, কবির অপরা এক পত্নী ছিলেন—তাঁহার নাম রোহিণী। কাহারো কাহারো মতে, রোহিণী পদ্মাবতীরই অপর নাম, আবার কেহ বলেন, রোহিণী ছিলেন কবির পরকীয়া। কিন্তু তাহার কোনো উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নাই।

কথিত আছে, কবিরাজ গোস্বামী জয়দেব বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্,—সম্রাটের পঞ্চরত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন। সভার অপর চারিটী রত্নের নাম উমাপতিধর, শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, এবং ধোয়ী। প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দির-প্রশস্তিতে উমাপতিধরের নাম পাওয়া যায়,—ইনি লক্ষ্মণ সেনের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় উল্লিখিত আছে—"শ্রীজয়দেব সহচরেণ মহারাজ লক্ষ্মণ সেন মন্ত্রীবরেণ উমাপতিধরেণ" ইত্যাদি। গোবর্দ্ধনাচার্য্য তাঁহার আর্য্যা সপ্তশতীর একটী শ্লোকে লিখিয়াছেন—

সকল কলা কল্পয়িতুং প্রভো প্রবন্ধস্য কুমুদ বন্ধোশ্চ।
সেনকুলতিলক ভূপতিরেকো রাকা প্রদোষশ্চ॥

"প্রবন্ধের (নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টীকলা) এবং কুমুদবন্ধুর (ষোল কলা) সকল কলার সম্পূর্ণতা সাধনে একমাত্র সেনকুলতিলক ভূপতি বা পূর্ণিমার সন্ধ্যাই সমর্থ। অর্থাৎ পূর্ণিমা-প্রদোষে যেমন চন্দ্রের পূর্ণতা সংসাধিত হয়, তেমনি সেন-রাজের সময়ে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ সকল সংরচিত হইয়াছিল। পণ্ডিতগণের মতে এই সেন-কুলতিলক ভূপতিই লক্ষ্মণ সেন। ধোয়ী কবি তাঁহার পবন-দূত কাব্যে যুবরাজ লক্ষ্মণ সেনকেই নায়ক কল্পনা করিয়াছেন; এবং তিনি যে এই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার আরো অনেক প্রমাণ আছে। শ্রীগীতগোবিন্দের একটী শ্লোকে এই পাঁচজন কবিরই নাম পাওয়া যায়,—

বাচ. পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিংগিরাং
জানীতে জয়দেবএব শরণঃ শ্লাঘো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর সৎ প্রমেয় রচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী
কবিক্ষ্মাপতি॥

অনেকে বলেন, শ্রীরূপ সনাতন ভ্রাতৃদ্বয় না কি নবদ্বীপে লক্ষ্মণ সেনের সভাগৃহ-দ্বারে নিম্নোক্ত শ্লোকটী ক্ষোদিত দেখিয়াছিলেন—

গোবর্দ্ধন শরণো জয়দেব উমাপতি।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ॥

এই শ্লোকে ধোয়ী—কবিরাজ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন।

সম্রাট লক্ষ্মণ সেন ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, যে, কবি জয়দেব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

বীরভূমে কেন্দুবিল্ব গ্রাম আজিও বর্ত্তমান আছে। আজিও অজয়ের জল কলস্বনে কবি-বিরচিত শ্রীরাধা-গোবিন্দ-গাথার বিজয়-গীতি প্রতিধ্বনিত হয়। আজিও প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতে প্রায় অর্দ্ধলক্ষাধিক নরনারী কেন্দুবিল্বে সমবেত হইয়া কবির পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে। কবির সহিত লক্ষ্মণ সেনের যেখানে প্রথম পরিচয়,—কেন্দুবিল্বের অনতিদূরে অজয়ের দক্ষিণ তীরে সেই শ্যামারূপা গড়ের ধ্বংসস্তূপ আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। জনশ্রুতি আছে—তান্ত্রিক সাধনার জন্য বল্লাল সেন না কি এক নীচ জাতীয়া রমণীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই লইয়া পিতা-পুত্রে মনোমালিন্য ঘটে, এবং লক্ষ্মণ সেন কিছু দিনের জন্য শ্যামারূপা গড়ে গিয়া বাস করেন। (১) এই সময়েই

(১) এই মনোবিবাদ উপলক্ষে পিতা পুত্র না কি পত্র বিনিময় হইয়াছিল। পত্রগুলি সংস্কৃতে লেখা। পত্রের সংস্কৃত শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল। সংস্কৃতের আড়াল থাকিলেও পিতাপুত্রের মধ্যে যে এরূপ পত্রের আদান-প্রদান চলিতে পারে, ইহা বিশ্বাস হয় না। অবশ্য কুলগ্রন্থের এই সব কাহিনীও যে কতদূর বিশ্বাস্য, তাহাও বিবেচনার বিষয়। তবে যুবরাজ লক্ষ্মণ সেনের শ্যামারূপা গড় পরিদর্শনে আসা, অথবা এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমিতে আসিয়া কিছু দিন অবস্থিতি করা একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। ধোয়ী কবির "পবন-দূতে" যুবরাজের প্রবাস-বাসের বর্ণনা আছে। সে আবাসভূমির নাম—বিজয়পুর জয়-স্কন্ধাবার।

লক্ষ্মণসেন পিতাকে লিখিলেন :—শৈত্যং নাম গুণ স্তবৈব সহজঃ

যুবরাজের সঙ্গে কবির পরিচয় হয়। রাঢ়ে সেনাধিকারের বহু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। আইন-ই-আকবরী-প্রণেতা আবুল ফাজেলের মতে বীরভূমির প্রধান নগরি লক্ষুর বা লক্ষণোর বল্লাল সেনের প্রতিষ্ঠিত। পালরাজগণের প্রাধান্য লোপ করিয়া গৌড় বঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সেনরাজগণ যে রাঢ় দেশও অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। এই জন্যই শ্যামারূপা গড়ের সংস্রবে যুবরাজের সঙ্গে জয়দেবের সৌহার্দ্দ-সম্বন্ধ আমরা কেবল কিংবদন্তী বলিয়াই অবিশ্বাস করি না।

বৈষ্ণব সহজিয়াগণ জয়দেবকে নবরসিকের একজন রসিক বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি-আই-ই মহাশয়ের মতে জয়দেবই বৈষ্ণব সহজিয়াগণের আদিগুরু। সহজ-যানের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"বুদ্ধদেবের তিরোধানের অত্যল্প দিন মধ্যেই তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। তাহারই এক ভাগ নানা শাখা-প্রশাখায় রূপান্তরিত হইয়া কালে সহজযানে পরিণতি লাভ করে। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাস্থবির এবং মহাসাঙ্ঘিক এই দুইটী দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। মহাস্থবিরগণ বলেন, বুদ্ধ আগে, তাহার পরে ধর্ম্ম এবং সংঘ ; সাঙ্ঘিক দল বলেন, না,—ধর্ম্ম আগে ; বুদ্ধ এবং সংঘের স্থান তাহার পরে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নাগার্জ্জুনের নেতৃত্বে মহাসাঙ্ঘিক দলের একাংশ লইয়া মহাযান সম্প্রদায় গঠিত হয়। ইঁহারা প্রজ্ঞা (ধর্ম্ম) উপায় (বুদ্ধ) এবং বোধিসত্ত্বের (সংঘ) উপাসক। খৃঃ ছয় কি সাত শতাব্দীতে এই ত্রিদেব, তারা, নিত্যবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বরূপে কল্পিত হন,—বজ্রযানের সৃষ্টি হয় উড়িষ্যাদেশে,—খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ; উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি, তাঁহার পুত্র পদ্মসম্ভব ও কন্যা লক্ষ্মীঙ্করা এবং জামাতা শান্ত রক্ষিতের সাহায্যে এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। এই সম্প্রদায়ের উপাস্য—পদ্ম, বজ্র এবং বোধিসত্ত্ব। ইহারই অন্যতম শাখার নাম সহজযান। রাঢ়দেশের আচার্য্য নাড় পণ্ডিত, পণ্ডিতপত্নী নিগু বা জ্ঞান ডাকিনী, এবং সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ ও দারিক প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। শূন্য, বজ্র, ও বোধিসত্ত্ব ইঁহাদের উপাস্য। খৃষ্টীয় দশম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। নরনারীর মিলন-সুখই ইঁহাদের মতে চরম ও পরম সুখ। এই সুখ সম্ভোগের জন্য দেহতত্ত্ব লইয়া সাধনা করিয়া ইঁহারা বহুবিধ উপায়ে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে জয়দেব এই সহজিয়াগণের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। সহজিয়াগণ নরনারীর যে মিলন-সুখকে একমাত্র কাম্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, জয়দেব শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনকে সেই সুখের আশ্রয়রূপে বর্ণনা পূর্ব্বক নিজকে তাহার দর্শক স্বরূপে কল্পনা করিয়াছেন, এবং দেখিয়াই যেন পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।" (২) এক হিসাবে এই মতবাদ অস্বীকার করা যায় না। সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের সময়ে যে বাস্তবিকই এইরূপ সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার ইঙ্গিত আছে।

সম্রাট লক্ষ্মণসেন রাজনীতি-ক্ষেত্রে অদূরদর্শী হইলেও, সমাজনীতিতে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন না। সমাজের দুর্দ্দশা তাঁহার নেত্রে যেরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, ভবদেব ভট্টের অনুকরণে স্মৃতির অনুশাসনে তিনি তাহার সংস্কার-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। মন্ত্রী হলায়ুধের "মৎস্য-সূক্ত" এবং "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" গ্রন্থ সেই চেষ্টারই নিদর্শন।

স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা কিংক্রমংশুচিতাং অবস্থি শুচয় স্পর্শেন যস্যাপরে কিম্বান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতি পদং যজ্জীবিনাং জীবনং ত্বঞ্চেন্নীচ পথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ

বল্লালসেন পুত্রকে উত্তর দিলেন—তপোনাপগতস্তৃষা নদকৃষা ধৌতান ধূলিস্তনো ন স্বচ্ছন্দ মকারি কন্দ কবলং কা নাম কেলী কথা দূরোৎক্ষিপ্ত করেণ হস্ত করিনা স্পৃষ্টানবা পদ্মিনী প্রারব্ধো মধুপৈরকারণ মহো ঝঙ্কার কোলাহলং

লক্ষ্মণ সেন আবার লিখিলেন—

পরীবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং তথাপ্যেযো নূনং হরতি মহিমান, জনরবঃ তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকট নিহতাশেষ তমসো রবেস্তাদৃক তেজো নহি ভবতি কন্যাং গতবতঃ।

বল্লাল পুনরুত্তর দিলেন

সুধাংশো জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা বিধাতুর্দোষোহয়ং নচগুণনিধেস্তস্য কিমপি চন্দ্রো নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চ্চন মণির্ণ বাহন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিম্বা ন বসতি

(২) বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধুর ভজনে ইহাই সখিভাবের উপাসনা ; প্রভেদ এইটুকু যে সখীগণ শুধু দেখিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন না, অন্তরঙ্গা সেবিকা রূপে তাঁহারা যুগলের মিলনানন্দের অংশ-ভাগিনী হইয়া থাকেন। শ্রীগীতগোবিন্দে এই শেষোক্ত ভাবই সুপরিস্ফুট।

সম্রাট বুঝিয়াছিলেন, যদিও বল্লালসেনের বেদাভ্যুদয় এবং বৌদ্ধ-উচ্ছেদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি ছিল, তথাপি তাঁহার প্রবর্ত্তিত তান্ত্রিকতায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচারই প্রসারলাভ করিতেছিল। কিন্তু ইহা বুঝিয়াও লক্ষ্মণসেনও বৌদ্ধ প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাকেও বীরাচারী-দিগের অভিমত একজটা, উগ্রতারা এবং ত্রিপুরা দেবীর পূজাক্রম ও মন্ত্রোদ্ধার প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। মন্ত্রী হলায়ুধ বেদের প্রশংসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকেও বৌদ্ধতন্ত্রানুমোদিত মহাচীনক্রমের তারাসাধন এবং নীল সারস্বত ক্রমের মাঝে মাঝে অতি সন্তর্পণেই তাহা করিতে হইয়াছে। মৎস্যসূক্তের তারাস্তব বৌদ্ধতন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি ; যথা—

"জয় জয় তারে দেবী নমস্তে
প্রভবতি ভবতি যদিহ সমস্তে
প্রজ্ঞাপারমিতামিত চরিতে
প্রণতজনানাং দূরিত ক্ষয়িতে"
(মৎস্যসূক্তোক্ত ৭ম পটল)

এই প্রজ্ঞাই যে বৌদ্ধগণের সম্প্রদায়-ভেদে তারা, পদ্মা, এবং শূন্য নামে অভিহিতা হইয়াছেন, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সম্রাটের অনুমোদিত এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়া সংস্কারের প্রচেষ্টা হয় ত জয়দেবও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার আর একটা দিক আছে। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের দিক হইতে এই প্রসঙ্গে আরো কিছু বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালার এক সুবৃহৎ সম্প্রদায় যে সম্প্রদায়ে বৈয়াকরণ, দার্শনিক ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব নাই—শ্রীগীত-গোবিন্দ গ্রন্থখানিকে হিন্দুর চির-পবিত্র পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্য বলিয়া মনে করেন কেন, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের এই কথাগুলি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

প্রতিবেশ-প্রভাব হইতে পরিত্রাণ লাভ প্রায় অসম্ভব ; সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জয়দেবের জীবনে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমাজ এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাঢ় দেশ যদিও চির স্বাধীন, চিরস্বাতন্ত্র্য-প্রয়াসী, তথাপি দেশবাসীর ধাতু-প্রকৃতির অনুকূলে হিন্দু ধর্ম্মই এদেশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালী কোনো কালেই পুরাতনকে আশ্রয় করিয়া, একান্তরূপে জড়াইয়া ধরিয়া অচলায়তন গড়িয়া তোলে নাই। এ জাতি চিরকালই নূতনকে বরণ করিয়া, সমাজ ও ধর্ম্মের নব নব বার্ত্তা লইয়া বিশ্বের পথে জয়যাত্রা করিয়াছে। সেই বৈশিষ্ট্য লইয়াই রাঢ়দেশ, গাণপত্য, সৌর, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, এবং আরো নানা সম্প্রদায়ের মিলনভূমিরূপে, তীর্থ-গৌরবের অধিকারী হইয়াছে। সেই জন্যই সেকালের অতি বড় দুর্দ্দিনেও আমরা জয়দেবের মত মহাকবিকে লাভ করিয়াছি।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের পাশাপাশি হিন্দুধর্ম্মও এদেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তরাজগণ যখন মহোদধির উপকণ্ঠ-স্থিত এই তালীবন-শ্যামলদেশ জয় করেন, তখন হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্ম এদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করে ; চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির উপাসনা সেই সময়েই প্রচলিত হয়। তাহার পর আচার্য্য শঙ্কর প্রবর্ত্তিত শৈবধর্ম্ম এবং পরবর্ত্তীকালে প্রচারিত শক্তি-উপাসনা রাঢ়ে বহুলরূপে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। গৌড়েশ্বর পালরাজগণ যদিও বৌদ্ধ ছিলেন, তথাপি হিন্দু-গণের উপর তাঁহাদের কোনো বিদ্বেষ ভাব ছিল না। অপিচ বৃহস্পতি তুল্য ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণের যজ্ঞশালায় যজ্ঞশেষে শান্তিবারি-সেচনে বার বার তাঁহাদের মুকুটহীন মস্তক যে অভিসিক্ত হইয়াছে, ইতিহাস অকপটে সে কথার সাক্ষ্য দান করে। যদিও পালরাজগণের আশ্রয়েই নাড় পণ্ডিত এবং লুইপাদ প্রভৃতি আচার্য্যগণ সহজ মতবাদ প্রচার করেন, তথাপি সমসাময়িক দুইজন হিন্দু-প্রধানের প্রভাবে তাহা যেন কিছু বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ইহাঁদের একজন ছিলেন বৌদ্ধ-বিদ্বেষী, আর একজন ছিলেন হিন্দু-বৌদ্ধে মিলন-প্রয়াসী। ইহাদের একজন রাঢ়ের "দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ বালবলভী ভুজঙ্গ ভবদেব ভট্ট", আর একজন স্বনামধন্য দিগ্বিজয়ী ভূমিপাল "চেদীপতি কর্ণদেব"। ভবদেব ভট্ট ছিলেন বঙ্গেশ্বর হরিবর্ম্মদেবের পররাষ্ট্র সচিব। শস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় বিদ্যাতেই তাঁহার সমান দক্ষতা ছিল। ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মূর্ত্তি এবং মন্দির আজিও তাঁহার গৌরব-কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। রাঢ়ের অধিকাংশ হিন্দুর জন্ম হইতে মরণোত্তর কর্ত্তব্য বিধান, আজিও ইহাঁরই সঙ্কলিত "দশকর্ম্ম-পদ্ধতি" অনুসারে সম্পাদিত হয়। কর্ণদেবের কথাও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। বীরভূমের পাইকোড়

গ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায়—তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, এবং রাঢ় দেশ কিছুদিনের জন্য তাঁহার অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিল। (৩) ইহাঁরই সংস্রবে কর্ণাটকগণের সঙ্গে রামানুজ-প্রবর্ত্তিত ভক্তিবাদ পরবর্ত্তীকালে রাঢ়ে প্রবেশলাভ করে। মালবরাজ উদয়াদিত্য এবং তৎপুত্র লক্ষদেবের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায়—"কর্ণাটকগণ চেদীবংশীয় গাঙ্গেয় দেব এবং কর্ণদেবের দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ ছিলেন।" সুতরাং কর্ণাটকগণের রাঢ়ে অভিযান অনৈতিহাসিক ব্যাপার নহে। সেনরাজগণও যে কর্ণাটকগণের অনুরক্ত ছিলেন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ,—"কর্ণাটলক্ষ্মী লুণ্ঠনকারীর দণ্ডবিধান করিয়া হেমন্ত সেন একাঙ্গ বীররূপে খ্যাত হইয়াছিলেন।" কর্ণাটভূমি যে ভক্তিবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র,—নিম্নোক্ত শ্লোকে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়—

"উৎপন্না দ্রাবিড়েভক্তি বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে প্রলয়ং গতা॥"

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া অনুমিত হয় যে, রাঢ়ে সেকালে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবও বিশেষ নিষ্প্রভ ছিল না, এবং জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ সে প্রভায় যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছে।

কবি জয়দেব দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শ্রীজগন্নাথ দেবের নামে উৎসর্গীকৃতা কবি-পত্নী পদ্মাবতীর পিত্রালয় ছিল দক্ষিণ দেশে। নৃত্য-গীতে নিপুণা এই নারী কি ভগবদ্ভক্তিতে আর কি পাতি-ব্রত্যে, উভয়তঃই আদর্শ স্থানীয়া ছিলেন। কবি তাঁহাকে জীবনাধিক ভালবাসিতেন। সংস্কৃত ভক্তমালে বর্ণিত আছে,—

উভৌ তো দম্পতী তত্র এক প্রাণ বভূবতু।
নৃত্যন্তৌ চাপি গায়ন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন তৎপরৌ॥

প্রবাদ-বর্ণিত "স্মরগরল খণ্ডনং" কবিতার পাদপূরণ প্রসঙ্গে পদ্মাবতীর সৌভাগ্য-কাহিনী আজিও ভক্তের চক্ষে আনন্দাশ্রুর সঞ্চার করে।

উড়িষ্যার সঙ্গেও কবির বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। সভ্যতার আদান প্রদানে উড়িষ্যা ও রাঢ় এই দুইটি প্রতিবেশী প্রদেশ চিরকালই ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ। জয়দেবের জীবনে এই সম্বন্ধ আরো ঘনিষ্টতর হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাতীর্থ পুরীধামের সঙ্গে কবি-জীবনের অনেক কাহিনী ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলি আজিও ত্রিসন্ধ্যা গীত হইয়া থাকে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা বলিতেছি না, সম্ভব-অসম্ভবের বিচার করিতেছি না,—কিন্তু জয়দেবের জীবনী লইয়া নীলাচলের দারুব্রহ্ম বিগ্রহের অনুগ্রহ উপলক্ষে ভক্ত ও ভগবানের রহস্য লীলার যে প্রবাদ রচিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়—দেশবাসীর দৃষ্টিতে জয়দেব কেবল কবি বলিয়াই নহেন, পরন্তু ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত, ভক্ত ও সাধক, ভাবুক ও প্রেমিক বলিয়া তিনি চিরপূজ্য রূপে বরণীয় হইয়া আছেন। যত কাল বাঙ্গালী বাঁচিবে,—কবি জয়দেব এই পূজার আসনে—বাঙ্গালার হৃদয়-মন্দিরে চির-প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৩) পাইকোড় গ্রামে মৎস্য মাংস দিয়া গোপালের ভোগ হয় এবং শিবপূজায় তুলসী পত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকের অনুমান, কর্ণদেবের সঙ্গে গৌড়েশ্বর নয়পালের বৈবাহিক সম্বন্ধের ফলে হিন্দু বৌদ্ধের মিলনে এই সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। পাইকোড়ে অধুনা গোপাল এবং শিবরূপে যে দেবতা দুইটীর পূজা হয়, তাঁহাদের প্রাচীন রূপ যে কি ছিল, আজি আর তাহা জানিবার কোনো উপায় নাই।

পিয়ারী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

তরুণীকে নিরাপদে তার গৃহে পৌঁছাইয়া ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পাপিয়া বাগানে ফিরিল। বাগানের মধ্যে তখন মহা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। মানগোবিন্দকে শাসাইয়া সেই মোটা লোকটা এমনি তর্জ্জন সুরু করিয়াছে যে তার হুঙ্কারে বাগানে দক্ষযজ্ঞের অভিনয় হইবার জো! লোকটার নাম শশধর। এই গোলমালের মধ্যে পাপিয়া আসিয়া প্রমোদ-কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইল। পাপিয়াকে দেখিবামাত্র শশধর রুখিয়া তার দিকে অগ্রসর হইল। আর দুই-চারিজন তাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল,—কর কি হে, মেয়েমানুষের সঙ্গে লড়তে চলেছ!.. অবলা পাপিয়া সুন্দরী!

শশধর সক্রোধে কহিল,—ও-সব কোন কথা শুনচি না। আমি একবার ওকে দেখতে চাই...ছাড়ো...বলিয়া প্রবল ঝট্‌কায় নিজেকে ছাড়াইয়া সে পাপিয়ার দিকে মার মূর্ত্তিতে অগ্রসর হইল। পাপিয়া দেখিল, শয়তান জাগিয়াছে—সে মেয়েমানুষ, উহাকে এখন আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না—তাছাড়া উত্তেজনায় তার সর্ব্বাঙ্গ তখনো কাঁপিতেছিল। সে কি করিবে, ঠাহর করিতে না পারিয়া ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসিল। নীচে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল; কিন্তু পরক্ষণেই সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ শুনিয়া বুঝিল, শত্রু তার পাছু লইয়াছে। সে তখন বাগানটা ঘুরিয়া বেড়া টপ্‌কাইয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া পড়িল—এবং নদীর ধার দিয়া ছুটিতে ছুটিতে আরো একটা ঘাট পার হইয়া একেবারে অমলের জীর্ণ গৃহের সম্মুখে আসিল। গৃহের দ্বার খোলা ছিল। সে সেই খোলা দ্বার-পথে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল, এবং বাড়ীতে ঢুকিয়া একটা ঘরে আলো জ্বলিতেছে দেখিবামাত্র নিঃশব্দ পায়ে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমল তখন কবিতা লিখিতেছিল,—

গোপনে চরণ ফেলিয়া তুমি এলে,
ওগো আমার চিত্ত-বনের মাঝে···
তোমার ঐ আঁচলের পরশ পেয়ে, দেখ,
শুষ্ক তরু রঙীন ফুলে সাজে!

এই কয় ছত্র লিখিয়া সে দ্বারের পানে চাহিয়া ছিল, ভাবের সন্ধানে...আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একরাশ ফোটা-ফুলের রূপ লইয়া পাপিয়া নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিল। অমল অবাক হইয়া গেল। এ কি সে স্বপ্ন দেখিতেছে...না... তার কল্পনা আজ রূপসীর মূর্ত্তি ধরিয়া তার সামনে আসিয়া উদয় হইল! কি, এ! কে...এই নীরব রাত্রে তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল! অমল ভালো করিয়া চাহিয়া দেখে, এ তো স্বপ্ন নয়! এ যে সত্যই এক রূপসী তরুণী!...

পাপিয়া ঘরে ঢুকিয়া এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইল, তার পর মৃদু হাসিয়া অমলের দিকে অগ্রসর হইল। অমল বিস্ময়ে পুলকে অবাক হইয়া কবিতার খাতা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পাপিয়া তার কাছে আসিয়া তার শয্যার এক প্রান্তে বসিল, এবং অমলের বিস্ময়-কৌতূহলের মাত্রাটাকে অনেকখানি বাড়াইয়া তার সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরচ্ছলে কহিল,—একটু আশ্রয় চাই···

অমল আরো অবাক হইয়া গেল। তার জীর্ণ জীবনের মাঝে কোথা হইতে তাজা রোমান্সের এ একটা রঙীন পৃষ্ঠা অকস্মাৎ এমন ঝরিয়া পড়িল! এ যে তার কল্পনার অতীত···স্বপ্নেও যে এমন ঘটে না কখনো!

অমল নিথর দাঁড়াইয়া রহিল; বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে পাপিয়ার পানে চাহিয়া! তার চেতনা যেন তখনো কিসের ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল! পাপিয়া তার পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল,—কি দেখচেন!...আমি ভূত নই, প্রেতও নই, মানুষ...তার পর ক্ষণেক অমলের পানে চাহিয়া আবার বলিল,—এখনো আপনার চমক ভাঙ্গলো না!...চমকাবার কথা বটে! গঙ্গার তীর, কাছে বোধ হয় শ্মশান-টশানও আছে, নিস্তব্ধ রাত,...এ সময় ওধার থেকেই তো মানুষের

মূর্ত্তি ধরে তারা এসে থাকে...কিন্তু আপনি কি দেখেছেন কখনো ?

অমলের বিস্ময় বাড়িয়াই উঠিতেছিল। অপরিচিতা, তরুণী, সুন্দরী, বেশ-ভূষায় ঐশ্বর্য্যের পরিচয় মাখানো... অথচ গতি ও আলাপের ভঙ্গীতে তাব না আছে কুণ্ঠা, না আছে বাধা...গানের সুরের মত চারিধারে এ কি রেশ সে জাগাইয়া তুলিল! অমল কথা কহিল; বলিল,—কি দেখার কথা বলছেন ?

পাপিয়া বলিল,—ঐ যাঁদের কথা বলছিলুম...

অমল এমন বিস্ময়াবিষ্ট ছিল যে পাপিয়ার আগেকার কথাগুলা তেমন মনোযোগী হইয়া শোনেও নাই, তা কি জবাব দিবে! কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল। পাপিয়া বলিল—ঐ যে শ্মশানে যাঁরা রাত্রে ঘোরেন...

—ওঃ! বলিয়া অমল হাসিল, কহিল,—এতকাল তো এখানে আছি, ও-সব দেখিও নি কখনো...

পাপিয়া হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তাই তো বলছিলুম, আমাকে তাঁদেরই একজন ভেবে ভয়ে গুম্ হয়ে গেলেন বুঝি ? কথার জবাবই দিলেন না তাই!

—কি কথার জবাব ?...অমল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পাপিয়ার পানে চাহিল।

পাপিয়া বলিল,—এসে আশ্রয় চাইলুম,—

—আশ্রয়...!

—হ্যাঁ, আশ্রয়ই। আমি ভারী বিপন্ন হয়েছি। তাই এসে এখানে উঠেছি—অবশ্য লক্ষ্য স্থির করে আসিনি।... বিপদে পড়ে ছুটতে ছুটতে একটু আশ্রয়ের সন্ধানে ঢুকে পড়েছি...তা আশ্রয় দেবেন কি ?

অমল ভাবিল, তরুণী পরিহাস করিতেছে! এখানে জন-মানবহীন এই নির্জ্জন কোণে ইনিই আসিলেন কোথা হইতে, তার ঠিক নাই—আর আসিলেন যদি, তো এমন কি বিপদে পড়িলেন যে তার জীর্ণ পরিত্যক্ত গৃহ-গহ্বর ছাড়া আশ্রয়ের আর দ্বিতীয় স্থান খুঁজিয়া পাইলেন না! সে পাপিয়ার পানে চাহিল, কহিল,—বিপদ... ?

পাপিয়া কহিল,—হ্যাঁ, সম্প্রতি হঠাৎ একটু বিপদে পড়া গেছে,তার আগাগোড়া ইতিহাস বলে আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনে। তবে আশ্রয়ের জন্য এসেছি, নিরুপায় হয়ে—দু'দণ্ডের অতিথি আমি।...আশ্রয় দেবেন কি ?

অমল কহিল,—যদি আপনার রুচি হয়, স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন...

পাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বাহিরে উঁকি দিয়া কহিল,—কিন্তু আর কাকেও যে দেখচিনে বাড়ীতে ?—আপনি একা থাকেন ?

অমল কহিল,—হ্যাঁ।

পাপিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। সামনেই দুটো বড় জানলা খোলা ছিল। সেই খোলা জানলা দিয়া জ্যোৎস্না-মাখা গঙ্গার জল, আর সেই জ্যোৎস্নারি তুলিতে আঁকা ছবির মত ও-পারের গাছপালাগুলা রেখার মত দেখা যাইতেছে। জানলার ধারে দাঁড়াইয়া ওপারের পানে চাহিয়া পাপিয়া কহিল,—বেশ জায়গাটি কিন্তু... বলিয়াই সে অমলের পানে ফিরিল। অমল তখন অতি-সন্তর্পণে বিমূঢ়ের মত তার কবিতার খাতাখানিকে গুটাইয়া রাখিতেছে।

পাপিয়া তার কাছে আগাইয়া আসিয়া কহিল,—আপনি কি লিখছিলেন না, যখন আমি এলুম ? তা আমার জন্যে কাজ ফেলে রাখবেন না। আমি এই জানলা খুলে বসে গঙ্গা দেখি ভারী চমৎকার লাগছে!—আপনি লিখুন। কথা কয়ে আপনাকে জ্বালাতন করবো না। তবে, কি লিখছিলেন ? বৌকে চিঠি বুঝি ? বৌ বুঝি বাপের বাড়ী গেছে ? থাকলে বেশ হতো, আলাপ করতুম!

পাপিয়া যত কথা বলে, অমলের বিস্ময় ততই বাড়িয়া ওঠে! কে এই তরুণী ?...রূপে চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, মুখের কথায় যেন সাতটা সুর অপরূপ তালে নাচিয়া চলিয়াছে—এ যেন ফাল্গুন হাওয়ার সলীল উচ্ছ্বাস!...কে এ অপরিচিতা ? তার মনটা এমনি অপূর্ব্ব ভাবে ভরিয়া উঠিতেছিল যে সে-ভাবের ঘোরে তার চোখের সামনে হইতে নিত্যকার এই মাটীর জগৎ কোথায় যেন বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল! এ যেন বিশ্বের বিস্ময় আজ তার জীর্ণ কুটীরে মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া উদয় হইয়াছে!...

পাপিয়া আবার অমলের কাছে আসিয়া কহিল,—বৌকে চিঠি লিখছিলেন,...না ? তা যদি হয়তো আমায় দেখাতে হবে! সত্যি, সে আমার ভারী ভালো লাগবে।...দেখাবেন ?

অমল অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে কহিল,—আমি বৌকে চিঠি লিখিনি তো...

পাপিয়া কহিল,—বৌকে চিঠি লেখেন নি? তবে এই নির্জ্জন রাত্রে বিছানায় না শুয়ে থেকে তন্ময় হয়ে লিখছিলেন...সে তবে আবার কি লেখা! ইস্কুল কলেজের কিছু বুঝি?

অমল বলিল,—স্কুল-কলেজে পড়ি না আমি।

পাপিয়া কহিল,—আমায় যে অবাক করলেন আপনি! এই বয়সে স্কুল-কলেজে পড়েন না, বৌকেও চিঠি লেখেন না...সে হাসিয়া উঠিল এবং সে হাসি থামিবার পূর্ব্বেই আবার কহিল—বৌকে চিঠি লেখেন না কেন? রাগ হয়েছে বুঝি?

অমল ভাবিল, কে এ তরুণী! কথায় সরমের বা সঙ্কোচের কোন আবরণ নাই! সে বলিল—বৌ নেই। আমি বিয়েই করিনি...

—বিয়ে করেন নি! পাপিয়া বিস্মিত নেত্রে অমলের পানে চাহিল; চাহিয়া ভালো করিয়া তাকে দেখিতে লাগিল। যৌবনের দীপ্ত স্পর্শে মুখে-চোখে দিব্য একটি দীপ্তি ফুটিয়াছে! দুই চোখে বিশ্বাস আর সরলতা হীরার মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে! সে অনেক তরুণকে দেখিয়াছে—কিন্তু তাহাদের কাহারো মুখে চোখে এ দীপ্তির চিহ্নও পায় নাই কোনদিন! এই নিঃসঙ্গ তরুণের প্রতি পাপিয়ার কেমন মমতা জাগিল। আহা, বেচারী! নেহাৎ একা! পাপিয়া কহিল,—তবে ও কি লিখছিলেন আপনি?

একটু কুণ্ঠিত স্বরেই অমল কহিল,—কবিতা।

—কবিতা! বিস্ময়ে পাপিয়ার দুই চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পাপিয়া কহিল,—কবিতা! আপনি তা'হলে কবি! ...দেখি আপনার কবিতা—আমি কবিতা গান এ-সব পড়তে ভারী ভালোবাসি। লজ্জায় অমলের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। সে মাথা নামাইল।

পাপিয়া একেবারে তার সম্মুখে গিয়া তার ঠিক পাশেই বসিল ও কবিতার খাতায় হাত দিয়া কহিল, দেখি না! লিখে লুকিয়ে রাখবার জন্যে তো কবিতার সৃষ্টি নয়! পাঁচজনকে তা পড়ানো চাই!

পাপিয়ার কথায় কি যে ছিল—মানুষ তাতে মাতাল হইয়া ওঠে! অমলও তার কথা শুনিয়া মাতাল হইয়া উঠিতেছিল। নিঃসঙ্গ গৃহ-কোণের কীট...আজ তার দ্বারে এমন সুন্দর অতিথি আসিয়া নিজে সাধিয়া তার প্রাণের গান শুনিতে চাহিতেছে! সে মন্ত্রমুগ্ধের মত নিঃশব্দে কবিতার খাতাখানি পাপিয়ার হাতে তুলিয়া দিল। পাপিয়া মুখে-চোখে দীপ্ত হাসি আর কৌতূহল লইয়া খাতা খুলিয়া পড়িতে লাগিল—

গোপন তব চরণ ফেলে, এলে কে তুমি প্রাণে!
চকিতে মম হৃদয় ভরে দিলে গো সুরে-গানে!

দুই ছত্র পড়িয়াই সে বলিল,—এটা রবিবাবুর গান না?

অমল কহিল,—রবিবাবুর গান!...তা তো জানি না! আমার মনে এই ভাব এসেছিল, তাই লিখেছি।

পাপিয়া কহিল,—তাঁর গানের সঙ্গে লাইনে-লাইনে মিল নেই বটে,—তবে ভাব মিলে যাচ্ছে!

অমল কহিল,—কিন্তু আমি তাঁর গান পড়িনি।

পাপিয়া কহিল,—বাঃ, ভারী আশ্চর্য্য তো! এ তো বেশ উঁচু দরের লেখা হয়েছে...বলিয়া সে আরো কয় পৃষ্ঠা উল্টাইয়া আরো কয়েকটি কবিতা পড়িল। তার পর পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একটা পৃষ্ঠায় দেখিল, একখানা ছবি! ছবিখানার প্রতি দুই চোখের একাগ্র দৃষ্টি সে স্থাপন করিল! এ কি, এ যে...! হাঁ, এই যে তলায় লেখা . চপলা!

পাপিয়া কহিল,—এ কার ছবি? চপলাদিদি...মানে, ঐ থিয়েটার করতো যে চপলা, তার না? ঐ অপেরায় শ্রীরাধা সাজার ছবি...!

কে যেন অমলের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। এটা যে তার দুর্ব্বলতা, সে তাহা এই দণ্ডে আজ স্পষ্ট বুঝিল! লজ্জায় তার মুখ শুকাইয়া গেল। পাপিয়া কহিল,—তারই ছবি না? ঐ হ্যাণ্ডবিলে থিয়েটারওলারা ছেপে দিয়েছিল, সেই ছবি,...না?

অমল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

পাপিয়া কহিল—এ ছবি এখানে আঁটার মানে?

অমল কোন কথা কহিল না।

পাপিয়া খাতাখানার পাতা উল্টাইয়া কহিল,—এই যে খাতার নাম, চপল-প্রাণের গান!...পাপিয়া সবিস্ময়ে অমলের পানে চাহিল, কহিল,—আপনি একে চেনেন না কি? আলাপ-পরিচয় ছিল?

অমল কহিল,—না।

—তবে ?

এ তবের জবাব নাই! প্রাণ গেলেও অমল তাহা বলিতে পারিবে না। পাপিয়া তার পানে চাহিয়া রহিল; তার কথার কোন জবাব না পাইয়া আরো দুই-চারি পৃষ্ঠা উল্টাইয়া একটা কবিতা পড়িতে বসিল—

চপলা তুমি চপল তব নৃত্যে
আকুল করি তুলিলে মোর চিত্তে!
পরাণ মম তোমায় চেয়ে
বিশ্বময় ঘুরিছে, গেয়ে
তোমারি কথা—বাকী যা-সব মিথ্যে!
সত্য শুধু তুমিই আজ চিত্তে!

এইটুকু পড়িয়া পাপিয়া স্থির দৃষ্টিতে অমলের পানে চাহিল। অমল মাথা নীচু করিয়া জড়ের মত নিস্পন্দ বসিয়া ছিল। পাপিয়া হাসিল; হাসিয়া কহিল,—এ তা হলে ঐ চপলার নামেই কবিতা লেখেন আপনি! বটে!—চপলা দিদি জানে এ কথা ?

অমল নিরুত্তর। পাপিয়া বলিল,—বলুন না...শুনি। চপলাদিদি তো আমাদের ঘরের লোক...বলুন। এ কথা শুনলে সে খুব খুশী হবে'খন।

অমল লজ্জা-জড়িত দুই চোখের দৃষ্টি পাপিয়ার প্রতি বদ্ধ করিয়া কহিল,—না।

—তবে এ লিখে ফল...?

—এমনি লিখি।

অমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল; কহিল,—ফলের প্রত্যাশা করিও না তো! কবিতা লেখা বলেই কবিতা লিখি...

পাপিয়ার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলিল। দুষ্টামি করিয়া সে বলিল,—আপনি তাকে ভালো বাসেন খুব,...না?... বলুন না, ঘাড় নামাচ্ছেন কেন! এতে আর লজ্জা কি?... তার প্রেমে পড়েছেন!

এ কথার ঘায় অমলের মন একেবারে চূর্ণ রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। তার মনের অতি-গোপন গহনে যে-কথাটুকু সে চিরদিন ইষ্টমন্ত্রের মত লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সে কথা আজ এমন করিয়া ইহার কথার খোঁচায় ঘা পাইয়া এমন মূর্ত্তিতে বাহির হইয়া আসিল...! এ তীব্র ব্যথায় তার মনটা ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল।

অমলকে নিরুত্তর দেখিয়া আরো একটু দুষ্টামি করিবার অভিপ্রায়ে পাপিয়া কহিল,—আমায় বলুন সব...চান্ যদি তো চপলাদিদির সঙ্গে আপনার দেখাও করিয়ে দিতে পারি...

অমলের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। অদম্য কৌতূহলে, অসহ্য আশায় চিত্ত তার নাচিয়া উঠিল! মনে হইল, সে ইহার হাত ধরিয়া বলে, পারো, পারো?...ওগো...

চকিতের জন্য সে চোখ তুলিয়া পাপিয়ার পানে চাহিল। পাপিয়া বক্র কটাক্ষে অমলের পানে চাহিয়া ছিল। সে-দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা অমলের মর্ম্মে এমন বিঁধিল যে তার কথা কহিবার সাহস হইল না। পাপিয়া বলিল,—আচ্ছা, ও-সব কথা হবে'খন।...এখন আপনার ঘর যখন দখল করলুম, তখন আর একটু জ্বালাতন করবো...রাত্রিটা এখানেই আমায় থাকতে দিন। বাইরে নিরাপদ নয়।...বলিয়া সে অমলের মলিন শয্যাটির পানে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। অমল কোনমতে সুযোগ পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাড়াতাড়ি নিজের বিছানাটা ঝাড়িয়া পুনরায় পাপিয়ার পানে চাহিয়া কহিল—এখানে আপনি শুতে পারেন।

পাপিয়া দৃষ্টিতে কৌতুক মিশাইয়া অমলকে লক্ষ্য করিতেছিল; অমলের কথার উত্তরে কহিল,—আর আপনি...?

অমল চারিদিকে চাহিয়া একটু অপ্রতিভের মত দাঁড়াইল; পরে কহিল,—আমি ওই দালানে একধারে শোবো'খন—বলিয়া সে বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিল।

পাপিয়া বাধা দিয়া তার সামনে দাঁড়াইয়া কহিল,—তা হবেনা। এত বড় অকৃতজ্ঞ আমি নই যে আপনার ঘরখানি সম্পূর্ণ দখল করে আপনাকে পথে দাঁড় করাবো! তা হবে না। তার চেয়ে...

অমল পাপিয়ার পানে চাহিল।

পাপিয়া কহিল,—দেখুন আমি ঠিক ব্যবস্থা করছি। বলিয়া সে অমলের শয্যা হইতে একটা মাদুর টানিয়া বাহির করিল ও সেখানা মেঝেয় পাতিয়া নিজের গায়ের শিল্কের চাদরখানা খুলিয়া বালিশের মত জড়াইয়া মাদুরের উপর রাখিয়া বলিল,—আপনি আপনার বিছানায় শোবেন, আর আমি মেঝেয় এই মাদুর পেতে শোবো'খন...

. অমল শিহরিয়া উঠিল। এই সুন্দরী...ধনীর কন্যা...সে শুইবে মেঝেয় ঐ ছেঁড়া মাদুরটায়! এমনিতেই তো তার জীর্ণ স্যাঁৎসেঁতে ঘরে সুন্দরী বেড়াইতেছে বলিয়া সঙ্কোচে সে মরিয়া যাইতেছে, তার উপর তরুণী শুইবে ঐ মেঝেয় ছেঁড়া মাদুরে!...কখনো না।

অমল কহিল,—তা হতেই পারে না। আপনি ঐ বিছানায় শোবেন। আমি বরং মাদুরটা নিয়ে বাইরের দালানে শুই গিয়ে।...

পাপিয়া ভ্রূ বাঁকাইয়া কহিল,—উঁহু, তা হতেই পারে না। একলা অজানা ঘরে ভূতের ভয়েই মারা যাব তাহলে।

অমল কহিল,—তাহলে বেশ, এই ঘরেই মাদুর পেতে আমি শুই—আর আপনি তক্তাপোষে বিছানায় শোবেন···

পাপিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিতেছিল। অমল নতজানু হইয়া বলিল,—আপনার পায়ে পড়ি। আপনি নিজে বলেছেন তো, আপনি আজ আমার ঘরে দুদণ্ডের অতিথি! আমায় আতিথ্য করার পুণ্যটা না হয় সঞ্চয় করতে দিলেনই! তাছাড়া আপনি মহিলা,—মহিলার মর্য্যাদা যে রাখতে জানেনা, সে নরাধম, বর্ব্বর!

হাসিয়া পাপিয়া কহিল,—বেশ, তাই হোক্।...তা, আপনার খাওয়া-দাওয়া হবে কি?

অমল কহিল,—সে হয়ে গেছে। আপনার..?

পাপিয়া কহিল,—পেট ভরে আছে। দু'দিন আমার কিছু না খেলেও চলে যাবে।...তা হলে, শুয়ে পড়াই যাক। আপনিও শোবেন কি, না, কবিতা লিখবেন?

অমল কহিল,—না, কবিতা আর লিখবো না।

পাপিয়া কহিল,—তবে বেশ, শুয়েই পড়ুন। শুয়ে শুয়ে আপনার পরিচয় দিন্ বরং। একলাটি এখানেই বা আপনি থাকেন কেন...শুনি! আপনাকে আমার ভারী ভালো লাগছে! রাত্রে বিপদে পড়ে এক-রকম ভালোই হয়েছে, দেখচি। নাহলে তো আপনাকে দেখতেও পেতুম না... আপনার সঙ্গে আলাপও হতো না!

৪

মাদুরে গা গড়াইয়া অমলের মনে হইল, এবার সে একবার ভালো করিয়া বুঝিয়া দেখিবে এই যে ব্যাপারখানা চোখের সামনে ঘটিতেছে, এটা সত্য,—না, এ তার কল্পনার খেলা শুধু! এমন সময় পাপিয়া ডাকিল,—শুনচেন...? না, ঘুমুলেন?

এ তো স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়, এ যে সত্য, সত্য! ঐ যে তাহারি ঐ জীর্ণ মলিন শয্যায় শুইয়া তরুণী রূপের লহর খুলিয়া দিয়াছে!...কিন্তু আজ যেন এঁর নিরম্বু উপবাসেই কাটিবা গেল। কাল সকালে অতিথির সামনে সে কি ধরিয়া দিবে! দিনের আলোয় সে যে এক দুর্ভাবনার সৃষ্টি হইবে! এই কথাটা ভাবিতে গিয়া অমলের চিন্তা সুদীর্ঘ পথে যাত্রা করিল। কে এ তরুণী...? কোথায় ঘর...? এই রাত্রে এখানেই বা সে আসিল কি করিয়া!...বিপদ! বিপদে পড়িলে মানুষ কখনো অমন হাসি-মুখে অত কথা বলিতে পারে! তরুণী কথায় যে বান্ ছুটাইয়াছিল, সে কথার বানে বিপদের একটু কালো কুটাও যে ভাসিতে দেখা যায় না কোথাও!...তবে?

অমলের সন্দেহ হইল,—এ কি তবে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে!—কিন্তু তাহা হইলে এমন সাজিয়া-গুজিয়া আসা কি সম্ভব! আর তাই যদি আসিবে তো লোকালয়ের বাহিরে এমন বিজন নদীর তীরেই বা কার আশায় আসিবে!···ভাবিয়া সে কোন কূল-কিনারা পাইল না! ফিরিয়া সে তরুণীর পানে চাহিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। তরুণীর পানে চাহিতে দেখে, তরুণী তারই পানে চাহিয়া আছে। অপ্রতিভভাবে অমল চক্ষু মুদিল।

তরুণী হাসিল, হাসিয়া কহিল,—জেগেই আছেন তাহলে?...জবাব দিলেন না যে?

এ ও তো মস্ত সমস্যা! কি জবাব সে দিবে। অমলের সারা অঙ্গ বহিয়া একটা বিদ্যুতের তরঙ্গ ছুটিল। সে কহিল,—কি বলবেন, বলুন?

পাপিয়া কহিল,—ঘুম হবে না, বোধ হয়। নতুন জায়গায় কখনোই আমি ঘুমোতে পারি না। সারা রাত আপনাকে বকুনির জ্বালায় অস্থির করে তুলবো, দেখচি!···আপনার ঘুম পাচ্ছে?

অমল বলিল,—না।

পাপিয়া কহিল,—তাহলে আপনার কথা বলুন। এখানে একলাটি থাকেন যে...আপনার লোকজন কাকেও তো দেখচি না।

অমল বলিল,—আমার আপনার জন কেউ নেই...

তার কথার সুরে কাতরতা মিশানো ছিল। পাপিয়া তাহা লক্ষ্য করিল। আহা!

পাপিয়া কহিল —কতদিন এমনি আছেন?

অমল কহিল,— তা প্রায় বছর খানেকের ওপর।...

পাপিয়া অমলের পানে চাহিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস তার অন্তর মথিত করিয়া বাতাসে মিশিয়া গেল। পাপিয়া পাশ ফিরিয়া খোলা দ্বার-পথে বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া স্তব্ধ রহিল।...

...ঝোপের মাঝে কি ও? জোনাকি—? না! আলোর বিন্দু..একটা, দুইটা, তিনটা...ও...লণ্ঠন—সঙ্গে অনেক লোকজন। এই দিকেই আসিতেছে যে...! তবে কি তারই খোঁজে...!

সে ধড়মড়িয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। অমল বলিল -কি...?

পাপিয়া বলিল,—আপনার বাইরের দোরটা বন্ধ করে দিন,—সাবধানে। এধারে কারা আসছে...বুঝি আমারি খোঁজে! আমি লুকোই। যদি ওরা এসে আমায় খোঁজে তো বলবেন কেউ আসেনি।

অমল গভীর বিস্ময়ে তার পানে চাহিয়া রহিল।

পাপিয়া বলিল,—আপনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন!...কিন্তু এখন সব কথা বলবার সময়ও নেই।..ওরা আমায় পেলে মেরে গুঁড়ো করে দেবে...এই অবধি বলিয়া সে আগাইয়া আসিয়া একেবারে অমলের দুই হাত চাপিয়া ধরিল এবং মিনতির স্বরে কহিল—ওদের হাতে আমায় তুলে দেবেন না—দোহাই আপনার! যে আশ্রয় দিয়েছেন, তা থেকে বঞ্চিত করবেন না আমাকে! পাপিয়ার চোখের পিছনে উদ্বেগের কাতর অশ্রু ঠেলিয়া আসিল।

অমল তা দেখিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিঃশব্দে গিয়া সদরের দ্বার বন্ধ করিয়া খিল লাগাইল। তারপর ঘরে ফিরিয়া দেখে, পাপিয়া তক্তাপোষের পিছনে বসিয়া লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে। অমল বলিল--অত কষ্ট করার দরকার নেই।...আপনি বিছানায় বসুন...

পাপিয়া সভয়ে কহিল,—যদি এখানে আসে?

অমল কহিল,—ভদ্দর লোকের কথায় অবিশ্বাস করে তার অন্দরের ঘরে ঢুকবেন কি?

পাপিয়ার উদ্বেগ কাটিল। সে উঠিয়া বিছানায় বসিল। অমল উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, দ্বারে কখন্ ওরা আসিয়া করাঘাত করে।

কিন্তু কেহ আসিল না। বহুক্ষণ এমনি স্তব্ধভাবে কাটিয়া যাইবার পর অমল উঠিল। পাপিয়া ধীর পায়ে আসিয়া অমলের পানে চাহিল, এবং চোখের ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, কোথায় যাও?

অমল মৃদু কণ্ঠে কহিল,—একবার দেখি; না হলে সারা রাত তাদের ভয়ে এমনি কাঠ হয়ে বসে থাকবো কি!

ঠিক! সে সরিয়া আসিয়া বিছানায় বসিল। অমল গিয়া নিঃশব্দে বাহিরের দ্বার খুলিয়া সতর্কভাবে উঁকি দিয়া দেখিল, কাছে কেহ নাই। সামনের আলো বহু দূরে গলির ওদিকে চলিয়া গিয়াছে! সে দ্বার বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিল, কহিল,—ওঁরা ভাবছেন তো কত—

পাপিয়া বলিল তা ভাবেন ভাবুন গে, তাতে কোন ক্ষতি নেই!

ক্ষতি নাই! অমল অবাক হইয়া পাপিয়ার পানে চাহিল। পাপিয়া বলিল,—অবাক হলেন যে আমার কথা শুনে! সব কথা যদি শোনেন, তা হলে আর অবাক হবেন না।...পাপিয়া নিশ্বাস ফেলিল, তার পরে বলিল,—যাক্, সে সব কথা আর কেনই বা তোলা!

অমল পুতুলের মত নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল। পাপিয়া বলিল,—নাঃ, ঘুমোন আপনি। জুলুম যা করবার, তা তো ঢের করলুম। আর কেন জ্বালাই! আমিও ঘুমোবার চেষ্টা দেখি—বলিয়া পাপিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। অমল তবুও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া পাপিয়া বলিল,—এখনো দাঁড়িয়ে রইলেন যে! কবিতা লিখবেন, বুঝি?

অমল কহিল,—না।

—তবে শুয়ে পড়ুন।

অমল মাদুরে দেহ-ভার লুটাইয়া দিল

পরদিন সকালে চোখ মেলিয়া অমল দেখে, পাপিয়া জানলার পাশটিতে বসিয়া তার কবিতার খাতা পড়িতেছে। মাথায় কাল রাত্রে যে কবরীকে বেশ আঁটসাঁট বাঁধা দেখিয়াছিল, তার বাঁধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে—চূর্ণ কুন্তলের গোছার নীচে তরুণীর মুখখানি আরো কমনীয়

দেখাইতেছে! অমল উঠিয়া হাসিয়া কহিল—ও কি করছেন! আমার পাগলামি দেখছেন?

পাপিয়া কহিল,—পাগলামি কি! চমৎকার লেখা। আমার ভারী ভালো লাগছে—

অমলের মনে হইল, কিন্তু এইবার! আর তো কাব্য নয়, স্বপ্ন নয়, কল্পনাও নয়! তার ঘরে অতিথি! কি দিয়া যে এই অপূর্ব্ব অতিথির সে তৃপ্তি বিধান করিবে!... অমল সমস্যায় পড়িল।

পাপিয়া তার এ ভাব দেখিয়া কহিল,—কি ভাবছেন?

অমল কহিল,—আপনার খাবার আয়োজন করি।

পাপিয়া কহিল,—কোন দরকার নেই।...তার চেয়ে দয়া করে একটি কাজ করেন যদি?

অমল কহিল,—কি?

পাপিয়া কহিল,—ওধারে ঐ যে বড় বাগানটা আছে—ঐ যার ফটকে ইলেকট্রিক আলো—ঐ বাগানের দরোয়ান কি মালী, কাকেও চুপি চুপি ডেকে আনতে পারেন?—বাগানের কেউ যেন বুঝতে না পারে...

অমলকে কে যেন বহু উর্দ্ধে কোন্ কল্পলোক হইতে ঠেলিয়া বহু নিম্নে কঠিন ভূমিতলে ফেলিয়া দিল। ঐ বাগান!...ও বাগানে...অমল পাপিয়ার পানে চাহিল, চকিতের জন্য! চাহিয়া তখনই মুখ নামাইল। ও-মুখে কালির রেখা কিন্তু নাই তো!...

পাপিয়া বলিল,—যেতে পারবেন?

—এখনি যাচ্ছি। বলিয়া অমল বাহির হইয়া গেল ও পর মুহূর্ত্তেই মালীকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

মালী আসিলে পাপিয়া তাহাকে একান্তে লইয়া গিয়া তার সঙ্গে কি সব কথাবার্ত্তা কহিল; তার পরে মালী বাহির হইয়া গেলে অমল আসিয়া তার সামনে দাঁড়াইল।

পাপিয়া কহিল,—আপনাকে একটুও ব্যস্ত হতে হবে না। আমার লোকজন এসেছে। কালকের রাত্রিটা আপনার কাছে আপাততঃ হেঁয়ালি হয়েই থাক্! যদি দিন পাই, আর এক সময় এসে সব কথা বলে যাবো।...পাপিয়া চুপ করিয়া, পরে একটা ঢোক গিলিয়া কহিল,—কালকের রাত্রিটা আমার জীবনে কি বিচিত্র সুখই যে এনে দেছে...! যে-সুখ বিলাস ঐশ্বর্য্যে পাইনি...কলকাতার প্রাসাদে যে-সুখ পাইনি, তা কাল রাত্রে এখানে পেয়েছি!... কালকের রাত্রির কথা যতদিন বাঁচবো, সোনার অক্ষরে বুকে লেখা থাকবে! সে লেখা মোছবার নয়, মেলাবার নয়!...

অমলের প্রাণ বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! বিদায়ের পালা এবার!...তার আঁধার ঘরে বিজলীর যে আলো জ্বলিয়াছিল, তা এত শীঘ্র মিলাইয়া গেল! আবার যে-আঁধার সেই আঁধারেই সে পড়িয়া থাকিবে!

পাপিয়া কহিল,—আপনাকে শত-সহস্র ধন্যবাদ! এখানে কাল আশ্রয় না পেলে আমার যে কি দুর্গতি হতো, তা ভাবতেও পারি না। যাই হোক, আমায় একেবারে ভুলে যাবেন না,...আর-একটা অনুরোধ করতে পারি?

অমল পাপিয়ার পানে চাহিল। পাপিয়া কহিল,—কালকের রাত্রে আমার ঐ দম্‌কা ঝড়ের মত আসা, আর আপনাকে বিব্রত করা—এই নিয়ে আপনার মনে যে ভাব হয়েছিল, তা নিয়ে একটা কবিতা লিখতে পারেন?

এ কি ব্যঙ্গ, না বিদ্রূপ? পাপিয়া আবার কহিল,—তা যদি লেখেন কখনো তো খপর দেবেন। সে কবিতা আমি দাম দিয়ে কিনে ভালো ফ্রেমে বাঁধিয়ে আমার ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখবো—কালকের মধু-যামিনীর উজ্জ্বল স্মৃতি!..

মালী আসিয়া বাহির হইতে ডাকিল,—মা...

পাপিয়া কহিল,—যাই—

পাপিয়া গমনোদ্যত হইল। অমল বেদনাতুর চক্ষে পাপিয়ার পানে চাহিল। পাপিয়া কহিল,—ভালো কথা ...আপনার নামটি?

অমল বলিল,—শ্রীঅমলচন্দ্র গুপ্ত।

পাপিয়া বলিল,—আমার নামটাও বলে যাই। আমার নাম পাপিয়া...লোকে আমাকে পিয়ারী বিবি বলেও ডাকে!...তাহলে আসি। পিয়ারীকে মনে রাখবেন!...

রাত্রির সুখ-স্বপ্নের মত পাপিয়া তার রূপের পশরা লইয়া বিদায় হইল। অমল বজ্রাহতের মত স্তম্ভিতভাবে দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া তারি পানে চাহিয়া রহিল......দূরে কতকগুলা ঝোপের আড়ালে পাপিয়ার রূপের বিদ্যুৎ চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেলে সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

(ক্রমশঃ

বিবিধ-প্রসঙ্গ

অগ্রহায়ণ মাস

শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় তন্ত্রভূষণ

বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের মধ্যে এই মাস অষ্টম, এবং "মার্গশীর্ষ" নামে প্রসিদ্ধ। পরন্তু ইহার ব্যবহারিক নাম "অগ্রহায়ণ"ই সদা সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে।

রাশিচক্রে বা মেষাদি দ্বাদশরাশিতে সূর্য্যের গতির দ্বারা বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের ভেদ হয়। সূর্য্যের এই রাশি-সংক্রমণ বা এক এক রাশি-ভোগ-কাল সৌর মাস নামে খ্যাত। প্রতি মাসীয় শুক্ল প্রতিপদাদি অমাবস্যান্ত বা কৃষ্ণ প্রতিপদাদি পূর্ণিমান্ত ত্রিশটী তিথি পরিমিত কালই চান্দ্রমাস নামে খ্যাত। বৈশাখাদি মাস সৌর হিসাবে গণিত হইলেও চান্দ্রমাসানুসারে ইহাদের নামকরণ হইয়াছে। প্রতি চান্দ্রমাসীয় পূর্ণিমাতে যে নক্ষত্রের মিলন হয়, সেই নক্ষত্রের নামে মাসের নামকরণ প্রচলিত আছে। চান্দ্র বৈশাখী পূর্ণিমায় বিশাখা নক্ষত্রের সমাবেশ হয়; তাই এই মাসের নাম "বৈশাখ" হইয়াছে। এইরূপ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের পূর্ণিমা মিলনে "জ্যৈষ্ঠ মাস"। এইরূপে পূর্ব্বাষাঢ়া, শ্রবণা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্যা, মঘা, পূর্ব্বফাল্গুনী ও চিত্রা, এই সকল নক্ষত্রের যথাক্রমে তত্তন্মাসীয় পূর্ণিমা সম্মিলনে আষাঢ়াদি মাসের নামকরণ হইয়াছে। সৌরমাসের প্রকৃত নাম মেষাদি রাশির নামে জ্যোতিষ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। যথা, বৈশাখের নাম "মেষ"; জ্যৈষ্ঠের নাম "বৃষ" ইত্যাদি। শ্রুতি বা বেদ মধ্যে বৈশাখের নাম "মাধব"; জ্যৈষ্ঠের নাম "শুক্র"; এবং আষাঢ় "শুচি"; শ্রাবণ "নভাঃ"; ভাদ্র "নভস্য"; আশ্বিন "ইষং"; কার্ত্তিক "উর্জ্জ"; মার্গশীর্ষ "সহা"; পৌষমাস "সহস্য"; মাঘ "তপ": ফাল্গুন "তপস্য"; এবং চৈত্র "মধু" মাস নামে উক্ত আছে।

আমাদের আলোচ্য "অগ্রহায়ণ" মাসে রবি বৃশ্চিক রাশি ভোগ করেন; তাই এই মাস "বৃশ্চিক" নামে খ্যাত। এবং এতন্মাসীয় পূর্ণিমায় মৃগশিরা নক্ষত্রের মিলন হয়, তাই, ইহাকে 'মার্গশীর্ষ" বলে। ইহার বেদোক্ত নাম "সহা"। তবে, আগুপ্তবি "অগ্রহায়ণ" নামটী কোথা হইতে আসিল? এই প্রশ্ন অনেকের মনে উদয় হইয়া থাকে। উক্ত প্রশ্নের এক জ্যোতিষিক সমাধান আমাদের যেরূপ জানা আছে পাঠকগণের অবগতির জন্য অগ্রে তাহার উল্লেখ করিয়া পরে অন্যান্য শাব্দিকগণের ব্যুৎপত্তি ও এতৎ সম্বন্ধের মীমাংসার যথাসাধ্য আলোচনা করা যাইবে।

প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পৃথিবীর বার্ষিকগতি বা সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি পরিভ্রমণের পথে তিনটী সীমাসূচক বিন্দুর নির্দ্দেশ করিয়া সূর্য্যগতির কাল নির্ণয় করিয়াছেন। পৃথিবীর নিরক্ষ বৃত্তের ন্যায় ভ-চক্র বা রাশি-চক্রের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে বেষ্টিত যে রেখা কল্পিত হয়, তাহার নাম "বিষুব রেখা" বা "বিষুবদ্‌বৃত্ত"। সূর্য্যাদি গ্রহগণ যে পথে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন, তাহাকে "অয়ন মণ্ডল" বলে। উক্ত অয়ন মণ্ডল বা রাশিচক্রের যে স্থানে বিষুব রেখার সম্পাত বা মিলন হইয়াছে, সেই স্থানে "ক্রান্তিপাত" বা "বিষুবায়ন বিন্দু" নামে একটী বিন্দু কল্পিত আছে। বিষুব রেখা হইতে রাশি চক্রের ২৩½ অংশ উত্তরে, এবং ২৩½ অংশ দক্ষিণে সূর্য্যগতির শেষ সীমা স্বরূপ যে দুইটী বিন্দু কল্পিত হয়, উহাদের নাম "অয়নান্ত বিন্দু"। সচরাচর এই দুই নির্দ্দিষ্ট বিন্দু-চিহ্নিত রেখাকে "কর্কট ক্রান্তি" ও "মকর ক্রান্তি" বলে। উত্তরায়নান্ত বিন্দু বা কর্কট ক্রান্তি হইতে দক্ষিণস্থিত মকর ক্রান্তি পর্য্যন্ত সূর্য্যের গমনে বৎসরের মধ্যে যে ছয় মাস অতীত হয় তাহাই "দক্ষিণায়ন"; এবং মকরক্রান্তি হইতে কর্কট-ক্রান্তি পর্য্যন্ত সূর্য্যের উত্তরাভিমুখ গতির ছয় মাস "উত্তরায়ন" নামে খ্যাত। এই দুইটী অয়নের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বিষুব-রেখার ক্রান্তিপাত-বিন্দুতে সূর্য্যদেব বৎসরের মধ্যে দুইবার পদার্পণ করেন। মকরক্রান্তি হইতে উত্তরায়নে তিনমাস পরে একবার, এবং কর্কট ক্রান্তি হইতে দক্ষিণায়নে তিনমাস পরে আর একবার, বিষুবায়ন বা ক্রান্তিপাত বিন্দুতে সূর্য্যদেবের শুভাগমন হয়। তাঁহার উত্তরায়নের ক্রান্তিপাত বিন্দু "বাসন্তিক ক্রান্তি" নামে ও দক্ষিণায়নের ক্রান্তিপাত বিন্দু "শারদীয় ক্রান্তি" নামে অভিহিত হয়। উক্ত ক্রান্তিপাত দিনদ্বয়ে দিবা ও রাত্রিমান সমান অর্থাৎ দিবামান ৩০ দণ্ড ও রাত্রিমান ৩০ দণ্ড হইয়া থাকে। তৎপরে ক্রান্তিপাত হইতে সূর্য্যদেব যত উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়েন, বিষুব রেখার উত্তরস্থিত তত্তৎ স্থানের দিবামানের ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও রাত্রিমানের হ্রাস হইতে থাকে। এবং তৎকালে ক্রান্তিপাতের দক্ষিণস্থ ভূপৃষ্ঠে ক্রমে রাত্রিমানের বৃদ্ধি ও দিবামানের হ্রাস হয়। আবার যখন ক্রান্তিপাত হইতে দক্ষিণদিকে সূর্য্যের গতি হয়, তখন বিষুবরেখার দক্ষিণাংশে দিবামানের বৃদ্ধি ও রাত্রিমানের হ্রাস হইতে থাকে, এবং উক্ত রেখার উত্তরাংশে তৎকালে নিশামানের বৃদ্ধি ও দিবামানের হ্রাস হয়।

অস্মদ্দেশে প্রচলিত বর্ষমাসাদি কাল বিভাগের আদি প্রবর্ত্তন সময়ে উত্তরায়ন-পথে যেদিন মেষরাশির আদি বিন্দুতে প্রথম ক্রান্তিপাত বা সূর্য্যাবিষ্ঠানে দিবারাত্রির সমতা লক্ষিত হইয়াছিল, সেই মেষ সংক্রমণ দিন "মহাবিষুব সংক্রান্তি" নামে খ্যাত হয়। সেই বৎসর, দক্ষিণায়ন পথে তুলারাশির আদি বিন্দুতে বিষুব ক্রান্তিপাত হওয়ায়, সূর্য্যের তুলা সংক্রমণ দিন "জলবিষুব সংক্রান্তি" নামে অভিহিত হইয়াছে। তৎকালে

বিষুব ক্রান্তির গতিহীনতা উপলব্ধি হওয়ায় ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্গণ মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে নিরয়ন বা • শূন্য অয়ন ধরিয়া বর্ষমাসাদির নিরূপণ করিয়াছেন। ঐ সময় হইতেই নব সৌর বৎসর প্রবর্ত্তিত, এবং বৈশাখ মাস বৎসরের আদি মাস বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। • শূন্য অয়ন বা হায়নে বৈশাখের প্রবর্ত্তনা হেতু উক্ত বৈশাখ মাস "হায়ন' (হ=০ × অয়ন=গতি) নামে অভিহিত হইয়াছিল। হায়নাখ্য বৈশাখে বর্ষারম্ভ হওয়ায় লক্ষণা দ্বারা বৎসরের নাম "হায়ন" প্রচলিত আছে।

আবার কার্ত্তিকের জলবিষুব সংক্রান্তিতে শারদীয় ক্রান্তিপাত • শূন্য অয়ন বা হায়নে হইয়াছিল বলিয়া কার্ত্তিক মাসও "হায়ন" মাস নামে খ্যাত হয়।

মেষের আদিতে সূর্য্যের সর্ব্বোচ্চ বা সুতুঙ্গ স্থানে বাসন্তিক ক্রান্তি-পাত হওয়ায় মেষরাশি হইতেই বৎসরের প্রথম মাস গণনা প্রচলিত হইয়াছিল। পরন্তু তুলারাশির আদিতে সূর্য্যের সর্ব্বনিম্ন বা সুনীচ স্থানে শারদীয় ক্রান্তিপাত হইয়াছিল বলিয়া তুলা বা কার্ত্তিক মাস হইতে বৎসরাদি গণনা ব্যবহৃত হয় নাই।

তৎকালে সূর্য্যদেব মকরক্রান্তি বা পৌষান্ত সংক্রান্তির দিনই সর্ব্ব-প্রথম উত্তরায়নে যাত্রা করিতেন বলিয়া ঐ দিন "উত্তরায়ন সংক্রান্তি" (Xmasday) নামে অভিহিত হইয়াছিল। ঐ দিন হইতেই ক্রমে দিবামানের বৃদ্ধি ও রাত্রিমানের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইত। আবার কর্কট ক্রান্তি বা আষাঢ়ান্ত সংক্রান্তিতে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত বলিয়া ঐ দিন "দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি" নামে খ্যাত হইয়াছিল। উক্ত দিন হইতে ক্রমশঃ দিবামানের হ্রাস ও রাত্রিমানের বৃদ্ধি হইতেছিল।

পরন্তু সূর্য্যাদি গ্রহের গতির অসমতা প্রযুক্ত অয়নমণ্ডল বা রাশিচক্র পৃথিবীর সমসূত্রপাত হইতে ক্রমে সরিয়া যাইতেছে। তাই, প্রতিবৎসর ৫৪´ বিকলা পরিমিত দূরে বিষুবরেখার ক্রান্তিপাত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতি ৬৭ বৎসর ৮ মাসে এক এক অংশ দূরে সূর্য্যের অয়ন গতির (ক্রান্তিপাত) সংঘটন হয়। ইদানীং বিষুব সংক্রান্তির • শূন্য অয়ন হইতে দক্ষিণে কিঞ্চিদধিক ২১° অয়নাংশ দূরে ক্রান্তিপাত হইতেছে। সেই জন্য সংপ্রতি ৯ই চৈত্র ও ৯ই আশ্বিন দিবা ও রাত্রিমান সমান হইতেছে। উক্ত কারণ বশতঃই ইদানীং ৯ই আষাঢ়ে দক্ষিণায়ন এবং ৯ই পৌষ হইতে উত্তরায়নের আরম্ভ হইতেছে।

হায়ন বা • শূন্য অয়নাত্মক বৈশাখ ও কার্ত্তিক মাসের "হায়ন" এই আখ্যা কোনও স্থানে প্রচলিত বা শাস্ত্রাদিতে মুখ্যভাবে উল্লিখিত না থাকিলেও শাস্ত্রের যুক্তিমূলক গৌণপ্রয়োগাদি দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়।

বৈশাখ মাস সৌর বৎসরের প্রথম বলিয়া "অব্দমুখ" নামে খ্যাত। "বৈশাখোহব্দমুখঃ স্মৃতঃ।" এই অব্দ বা বৎসরের হায়ন নাম সদা সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, বৈশাখের "হায়ন" নামটী কালক্রমে বৎসরের পর্য্যায়ে বিলুপ্ত হইয়াছে। কার্ত্তিক মাসের "হায়ন" নাম মার্গশীর্ষের "অগ্রহায়ণ" নামেই পর্য্যবসিত। হায়নাখ্য কার্ত্তিকের অগ্রবর্ত্তী মাস বলিয়া "মার্গশীর্ষ" তৎকালে "অগ্রহায়ণ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাই আমাদের পরিজ্ঞাত জ্যোতিষিক সমস্যা। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—"মাস সমূহের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষক মাস"। তাই, বোধ হয় দ্বাদশ মাসের শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ মার্গশীর্ষের "অগ্রহায়ণ" এই নাম করণ করিয়া কার্ত্তিকেরও হায়ন নামের সম্মান বজায় করা হইয়াছে।

হায়নরূপ বৈশাখের অগ্র বা জ্যেষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাসে যেমন জ্যেষ্ঠপুত্র কন্যার বিবাহাদি কর্ম্মের নিষেধ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বোক্ত অগ্রহায়ণেও তথাবিধ নিষিদ্ধতার প্রসিদ্ধি আছে।

এক্ষণে আলোচ্য অগ্রহায়ণের বর্ত্তমান বয়ঃক্রম গণনাকল্পে আমরা হায়নের নব কলেবরের কাল নির্ণয় অনায়াসে করিতে পারি। পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে যে, • শূন্য অয়ন বা হায়ন হইতে ক্রান্তিপাত এক্ষণে ২১° অংশ দূরে হইতেছে। ১° অয়নাংশ যাইতে ৬৭ বৎসর ৮ মাস লাগিলে ২১° অয়নাংশে ১৪০০ বৎসর হয়। অতএব বলা যাইতে পারে যে, হায়ন বা অগ্রহায়ণের বর্ত্তমান বয়স ১৪০০ বৎসর মাত্র।

অগ্রহায়ণ সম্বন্ধে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক হইলেও শাব্দিক ও ঐতিহাসিকগণ অন্যরূপে ইহার ব্যুৎপত্তি ও মীমাংসা করিয়া থাকেন। সাহিত্যসেবী পাঠকগণের সমীপে তৎসম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

অভিধানাদিতে এইরূপ ব্যুৎপত্তি দেখা যায়,—"হায়নস্য বর্ষস্য অগ্রঃ অগ্রহায়ণঃ।" অথবা "অগ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ হায়নো ব্রীহিঃ অস্মিন্ ইত্যগ্রহায়ণঃ।" অর্থাৎ বৎসরের অগ্র, প্রথম বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অগ্রহায়ণ নাম হইয়াছে। কিংবা শ্রেষ্ঠ হায়ন বা ধান্য যে মাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই "অগ্রহায়ণ"। বস্তুতঃ "শ্রেষ্ঠ হায়ন" হৈমন্তিক বা শালিধান্যেরই নামান্তর। সুশ্রুত ও ভাবপ্রকাশাদি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত শালিধান্যকে আমাদের দেশে "আমোন ধান" বলে। আমাদের আলোচ্য অগ্রহায়ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা "শালিধান্য"ই গুণাদিতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বরুচিসম্মত। অগ্রহায়ণ মাসেই উক্ত ধান্য পরিপক্ক হয় এবং এই মাসেই কৃষকেরা ধান্যচ্ছেদন আরম্ভ করে। তাই, আমাদের ধান্য লক্ষ্মীর গৃহ প্রবেশের অগ্রগণ্য মার্গশীর্ষ কৃষিযুগের নববর্ষের প্রথম মাসরূপে এক সময়ে "অগ্রহায়ণ" নাম ধারণ করিয়াছিল।

এ বিষয়ে পুরাতত্ত্ববিদ্গণের সিদ্ধান্ত এই যে, অতি প্রাচীনকালে আর্য্য ঋষিগণ যখন ভারতের উত্তর পশ্চিমস্থ পার্ব্বত্য ও উচ্চভূমি সমূহে ইতস্ততঃ বসতি বিস্তার করেন, তৎকালে তদ্দেশজাত যব গোধূমাদি শূকধান্য তাঁহাদের শস্যসম্পৎ ও প্রধান অন্নরূপে অবলম্বনীয় ছিল। ধান্যরাজ, পবিত্রধান্য, দিব্য বা দেবধান্য প্রভৃতি যবের পর্য্যায় দেখিলে প্রতীতি হয় যে, পুরাকালে যবই দেবতা ও মনুষ্যের প্রধান খাদ্য ছিল। অদ্যাপি অস্মদ্দেশে দেবকার্য্যে নান্দী শ্রাদ্ধাদিতে যবের ব্যবহার, এবং গয়াধামে যবচূর্ণের দ্বারা পিতৃলোকের পিণ্ডদানের

ব্যবস্থার প্রচলন রহিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও অদ্যাবধি তদ্দেশসুলভ গোধূমচূর্ণ (গমের আটা), চনকশক্তু (বুটের ছাতু) প্রভৃতি প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রাদি আলোচনায় আরও বুঝা যায় যে, ষষ্টিকাদিব্রীহি বা আশুধান্যাদি গ্রীষ্মজাত ধান্যও তাৎকালিক আর্য্যগণের উষর ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইত; পরন্তু সে সময়ে সকলে নিম্নভূমিজ হৈমন্তিক শালিধান্যের প্রভাব বা প্রতিপত্তি আদৌ ছিল না। গ্রীষ্মজ ব্রীহিধান্য ভাদ্র আশ্বিন মাসে (শরৎকালে) এবং শিশির সঞ্জাত যবাদি চৈত্র বৈশাখে (বসন্তকালে) পরিপক্ব, কর্ত্তিত ও ব্যবহৃত হইত। তাই, প্রাচীন স্মৃতিকার হারীত নবান্নকৃত্য বিষয়ে বলিয়াছেন,—"গৃহমেধী শরদ্বসন্তয়োঃ ব্রীহিযবাভ্যাং যজেত।" ইত্যাদি অর্থাৎ আর্য্যগৃহমেধীগণ শরৎকালে ব্রীহিধান্যের দ্বারা এবং বসন্তকালে যবের দ্বারা নবান্ন শ্রাদ্ধাদি করিবেন। অস্মদ্দেশেও অদ্যাপি বৈশাখের মহাবিষুব সংক্রান্তিতে দেবতা ও পিতৃলোকোদ্দেশে যবশক্তু উৎসর্গ ও ভক্ষণরূপ নবান্নকৃত্য বিহিত আছে।

পরবর্ত্তীকালে আর্য্যগণ যখন নানা ফল পুষ্প পরিশোভিত প্রচুর শস্য সম্পত্তির অধিষ্ঠানভূত প্রকৃতিদেবীর প্রমোদোদ্যান সরস উর্ব্বর বঙ্গভূমিতে পদার্পণ পূর্ব্বক উদ্ভিজ্জ বিদ্যা ও কৃষিতত্ত্বের গবেষণায় ও কার্য্যোদ্যমে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই এতদ্দেশ-সুলভ শালি ধান্যের প্রভাব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত, এবং বঙ্গের প্রতি গৃহে ইহার বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল। তৎকাল হইতেই বোধ হয়, অস্মদ্দেশে অগ্রহায়ণ মাসে নূতন শালি তণ্ডুলের নবান্নশ্রাদ্ধ ও ভক্ষণ প্রচলিত হইয়াছিল। সেই শুভযোগেই আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য পরম মাননীয় হেমন্তশীর্ষ মার্গশীর্ষ মাস হৈমন্তিক শ্রেষ্ঠ হায়নের আধার স্বরূপে "অগ্রহায়ণ' এই অভিনব আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

অস্মদ্দেশে চির-প্রচলিত ভগবদর্চ্চনাদি মহোৎসবে মুখরিত—হিন্দু রমণীবৃন্দের বিবিধ ব্রতাদির অনুষ্ঠানে পুণ্যপূত বৈশাখ মাস যেমন ব্রাহ্মণ্যযুগ প্রবর্ত্তিত বৎসরের প্রথম মাস বলিয়া কীর্ত্তিত আছে, তদ্রূপ আমাদের হিন্দু কুমারীবৃন্দের সন্ধ্যাবতী (সাঁঝ পুজানী) ব্রতারম্ভে সমন্বিত—বঙ্গীয় কুল কামিনীগণের আদিত্য লক্ষ্মী ইতু দেবীর অর্চ্চনায় চর্চ্চিত—হিন্দু গৃহমেধিগণের নব-যজ্ঞ নবান্নোৎসবে গৌরবিত "অগ্রহায়ণ মাসও" কৃষি-যুগ প্রবর্ত্তিত বৎসরের অগ্রবর্ত্তী মাস বলিয়া অগ্রগণ্য হইতে পারে।

এক দিকে "বৈশাখ মাস" যেমন গো-ব্রাহ্মণ্যহিত ব্রহ্মণ্যদেব মাধবের লীলা-নিকেতন—"মাধব মাস" বলিয়া খ্যাত,—অন্য দিকে তেমনি অগ্রহায়ণ মাসও জগদ্ধিতৈষিণী শস্য-সম্ভার-ধারিণী মাধব-প্রিয়া সর্ব্বংসহা ধরণীর নিত্যসঙ্গিনী ক্ষেত্রলক্ষ্মী "ইতু"র লীলাভূমি "সহ" মাস নামে কীর্ত্তিত।

সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যযুগে আর্য্য-মনীষিগণ মধুমাধব বা চৈত্র বৈশাখের সন্ধিস্থল মহাবিষুব সংক্রান্তিতে সবিতৃ দেবের অভ্যুদয় কল্পে অভীষ্ট দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে তৎকাল প্রচলিত দিব্য ধান্য যবের সহিত ঘটোৎসর্গ উপলক্ষে যব শক্তুর নবান্নকৃত্যানুষ্ঠানে তাৎকালিক নববর্ষের নান্দীমুখ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তাই, নব যবান্নে যবীয়ান্ জগৎ-প্রসবিতা সবিতা উত্তরায়ণে ধাবিত অশ্বিনী পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক মেষরাশি সংলগ্ন করিয়া শূন্য অয়নে বিশাখাসক্ত পূর্ণ সুধাকর-করোজ্জ্বল বৈশাখ রূপ অব্দ-মুখ চুম্বনাশায় অগ্রসর হইয়াছিলেন।

অনন্তর কার্ষীয বা কৃষি যুগে হেমন্তের হিমকর বিশীর্ণ তপন দেবের তাপন শক্তি সংরক্ষণ কল্পে বৃশ্চিকের আদ্যন্ত মধ্যবর্ত্তী রবির অধিষ্ঠানভূত দিন সমূহে আদিত্য শক্তি ইতু লক্ষ্মীকে তৎকাল-সুলভ শালি-তণ্ডুল পিষ্টকাদি উপচার দানে অর্চ্চনা এবং হৈমন্তিক নবান্নাদির অনুষ্ঠানে ভাবী রবিশস্যের অভিবৃদ্ধির কামনা করিয়া তাৎকালিক আর্য্য গৃহমেধিগণ অগ্রহায়ণের অগ্রগণ্যতা বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। তাই, এক্ষণে মৃগোৎসঙ্গ পূর্ণশশীকে স্বপ্রেয়সী মৃগশিরসী সঙ্গপ্রয়াসী জানিয়া তাপন-শক্তি-সঞ্চয়ে আশান্বিত তপনদেব এই মাসের প্রারম্ভেই পুণ্যময় বৈশাখের পূর্ণচন্দ্রপ্রিয়া বিশাখার শেষ চরণোপান্তে উপনীত হইয়াছেন।

বাস্তবিক মৃগশিরা নক্ষত্রাধিপতি চন্দ্রদেব অগ্রহায়ণ মাসেই তাঁহার বাঞ্ছিতা ও আশ্রিতার সহিত পূর্ণকলায় সঙ্গত হয়েন; এবং সূর্য্যদেবও বিশাখা নক্ষত্রের শেষপাদে বৃশ্চিক রাশি প্রবেশ করেন।

ফলতঃ সৌর মাস কৃত্যাধিক্য হেতু উত্তরায়ণিক বৈশাখ মাস যেরূপ পুণ্যময়, চান্দ্রমাসকৃত্যাধিক্য হেতু দক্ষিণায়নিক "অগ্রহায়ণ" মাসও পুণ্যকালত্বে তদপেক্ষা বিশেষ ন্যূন নহে।

জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে বৃষ্টিকাল নির্ণয়ে অগ্রহায়ণ মাসকেই অগ্রবর্ত্তী করিয়াছেন। যথা,—

"আরভ্য শুক্ল প্রতিপত্তিথি মার্গাত্তু চৈত্রকম্,
গর্ভো নীহার জলদৈরিতি প্রাবৃট্ পরীক্ষণম্।"

অর্থাৎ বর্ষা নির্ণয়ের জন্য অগ্রহায়ণ মাসে শুক্ল প্রতিপৎ তিথি হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত নীহার বা শিশির সঞ্জাত মেঘ দর্শনে গর্ভ স্থির করিবে।

"অন্নং জগতঃ প্রাণঃ প্রাবৃট্ কালস্য চ ন্নমায়ত্তম্,
যস্মাদতঃ পরীক্ষ্য প্রাবৃট্ কালঃ প্রযত্নেন।"

অর্থাৎ অন্ন জগতের প্রাণ স্বরূপ, সেই অন্ন বর্ষা বৃষ্টির আয়ত্ত।" অতএব সযত্নে বর্ষার পরীক্ষা কর্ত্তব্য।

হিম বা শিশিরই বর্ষার কারণ। এই মাসের হিমপাত বা শিশির বর্ষণেই নবীনা প্রকৃতি সর্ব্বপ্রথম ঋতুমতী হইয়াছেন। তাই, এই মাস হইতেই হেমন্তাদি ষড় ঋতুর সূচনা। মেঘমালা ধৃত রুদ্র যামলে বলিয়াছেন,—

"দশম্যাদুত্তরো বাতঃ সিতায়ামপি বায়তে।
মার্গশীর্ষে হ্যহোরাত্রং স্নাতৃস্নানমুদীরিতম্।"

অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লাদশমীতে দিবা রাত্রি যে উত্তর বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাকেই ঋতু স্নান বলে।

শিশির সঞ্জাত মেঘে বিদ্যুদ্দর্শন হইলে তৎকালে মেঘের গর্ভ

স্থির করা যায়। উক্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"পুমান্ স্ত্রী গর্ভ সংযোগো বিদ্যুন্মেঘস্তথৈবচ।" এইরূপ গর্ভে দৃষ্টে আষাঢ়াদি মাসের বর্ষণ কাল নিরূপিত হয়।

মার্গশীর্ষস্য মাসে তু নক্ষত্রং পিতৃ দৈবতং
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্থ্যাং তু সবিদ্যুন্মেঘদর্শনম্
তদৈব মৃক্ষমাষাঢে জলপূর্ণা মহীভবেৎ।
রাত্রৌ দৃষ্টে দিনে বৃষ্টি র্দিনেদৃষ্টে ভবেন্নিশি।

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতে মঘা নক্ষত্র যোগে সবিদ্যুন্মেঘ দর্শন হইলে, আষাঢ় মাসে ঐ নক্ষত্র যোগে পৃথিবী জলপূর্ণা হইবে। রাত্রিতে উক্ত মেঘ দৃষ্ট হইলে আষাঢ়ের দিনমানে এবং দিনে দৃষ্ট হইলে রাত্রিতে বৃষ্টি হইবে। এইরূপে অগ্রহায়ণে অষ্টমী তিথিতে চিত্রা নক্ষত্রে ও নবমীতে স্বাতী নক্ষত্রে বিদ্যুন্মেঘ দর্শন হইলে আষাঢ়ের সেই নক্ষত্রে মহীতল জল পূর্ণ হয়।

এইরূপ বহু বহু প্রমাণ রহিয়াছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা সে সকল উদ্ধৃত করিলাম না। আবার অগ্রহায়ণের রাশিচক্রের গ্রহ সংস্থান দৃষ্টে গ্রীষ্ম শস্যাদির শুভাশুভ নির্ণয়ের ব্যবস্থা জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। পাঠকগণ তাহা তত্তদ্‌গ্রন্থে অনুসন্ধান করিবেন। এতাবৎ আলোচনায় বেশ বুঝিতে পারা যায় যে "অগ্রহায়ণ" কৃষি যুগে নববর্ষের প্রথম মাস বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

মিরা সেটী

শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম-বি-এ-এ

অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতবর্ষে' নিখিল-প্রবাহ নিবন্ধের প্রথমেই "সূর্য্যের চেয়েও তেজস্কর গ্রহ" নামে একটী সঙ্কলন আছে। এই প্রকারের সঙ্কলন হইতে জ্যোতিষ-তত্ত্ব-অনভিজ্ঞ পাঠকগণ উহাদের সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারেন না; পরন্তু, জ্যোতিষ্ক-তত্ত্বজ্ঞ পাঠকগণের নিকট উহা অত্যন্ত বিসদৃশ লাগে। এই হেতু কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণের জন্য মিরার কাহিনী লিখিত হইল।

প্রথমতঃ, constellation whaleএর বাঙ্গলা করা হইয়াছে তারা প্রকোষ্ঠ। সুধু constellationকে তারা প্রকোষ্ঠ বলিলে, উহার একটা মানে বুঝা যাইত, কিন্তু whale কথাটী গেল কোথায়? তার পর মিরা সেটীকে যে কিছু দিন হইতে দেখা যাইতেছে তাহা নহে, মিরা বহুকালের প্রাচীন জ্যোতিষ্ক—Old Mira। তার পর লেখা হইয়াছে "মিরা সেটী নামে একটী উজ্জ্বল গ্রহ"......কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মিরা গ্রহ নহে, উহা নক্ষত্র বা তারা,—একটী নয়, দুটী নয়, তিনটী তারার সম্মিলনে রচিত একটী বহুরূপ তারা। বহুরূপ মানে উহার জ্যোতির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। হিন্দু জ্যোতিষে আমাদের সূর্য্য গ্রহ-পর্য্যায় ভুক্ত; কিন্তু জ্যোতিষ্ক-তত্ত্ববিদগণের নিকট সূর্য্য একটী ক্ষুদ্র তারা বই আর কিছুই নহে। মিরাও সেইরূপ একটী তারা,—কিন্তু আমাদের সূর্য্য হইতে বহুগুণ বড়, তেজস্কর ও বহু প্রাচীন। আকাশে যে সকল রক্তবর্ণ তারা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উহাদের তেজ কমিয়া ক্রমেই অঙ্গারে পরিণত হইতেছে। পরিণামে উহারা জ্যোতিঃ হীন জ্যোতিষ্কে পরিণত হইবে।

মিরা অতি প্রাচীন তারা,—কত প্রাচীন, তাহার কোন ইতিহাস নাই। প্রাচীন যুগের জ্যোতিষ্ক-তত্ত্ববিদগণের নিকট মিরা পরিচিত ছিল কি না, আমরা তাহাও অবগত নহি। আধুনিক যুগের David Fabricius নামা জনৈক জ্যোতিষ্ক-তত্ত্ববিদ ১৫৯৬ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে সর্ব্বপ্রথম উহাকে লক্ষ্য করেন এবং কিছুদিনের পর্য্যবেক্ষণে উহার জ্যোতির হ্রাস বৃদ্ধি বুঝিতে পারেন। অতঃপর কিছুদিনের জন্য তারাটী হারাইয়া যায়। তৎপরে ১৭০০ খৃঃ অঃ আবার উহা দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার পরে মিরা তদানীন্তন জগতের জ্যোতিষ্ক তত্ত্ববিদগণের মনোযোগ আকর্ষণ করে। Holwarda নামা জ্যোতিষ্ক-তত্ত্ববিদ ১৬৩৮ খৃঃ অঃ উহাকে সাময়িক নক্ষত্র (Periodic Star) বলিয়া স্বীকার করেন। পরে ১৬৪৮ খৃঃ অঃ হইতে Hevelius Sir William Herschel, Schroter, Argelander প্রভৃতি মিরার নিয়মিত পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করেন।

মিরা ৩২০ হইতে ৩৭০ দিনের মধ্যে একবার স্থূলতম জ্যোতিঃ ১.৭ হইতে ক্ষীণতম জ্যোতিঃ ৯.৬ স্থূলত্বে পরিণত হইয়া আবার স্থূলতম জ্যোতি ১.৭ এ উপনীত হয়। হারভার্ড মানমন্দিরের পরলোকগত অধ্যক্ষ E. C. Pickeringএর মতে মিরা ১৭২ দিনে ক্ষীণতম জ্যোতিঃ হইতে স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হয়। কিন্তু নিয়ত পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা জানা গিয়াছে যে, মিরার হ্রাস বৃদ্ধির কাল-পরিমাণ ও উজ্জ্বলতা প্রতিবারে ঠিক থাকে না। মিরা কোনবার ৫ম কোনবার ৪র্থ এবং কখনও বা ৩য় শ্রেণীর তারায় উপনীত হয়; কদাচিৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর তারার উজ্জ্বলতা লাভ করে। আবার কখনও বা ৮ম শ্রেণীর, কোনবার ৯ম শ্রেণীর এবং কদাচিৎ ১০ম শ্রেণীর তারার স্থূলত্বে পরিণত হয়। মোটের উপর মিরা কমবেশী আঠার সপ্তাহ মাত্র খালি চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, অবশিষ্ট কাল অদৃশ্য থাকে। এই সময়ে দূরবীক্ষণ যোগে উহাকে দেখিতে হয়। ভগোল চিত্র, তারা, Popular Hindoo Astronomy প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা জ্যোতিষ্কতত্ত্বের পণ্ডিত স্বর্গগত কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মিরার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,"মিরার পৌরাণিক নাম মার। মার তারা কামরূপ তারা-জগতের শিরোমণি। তিনশত একত্রিশ দিন আট ঘণ্টা সময় মধ্যে মার তারা নানা রূপ ধারণ করে। পনর দিন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থূলত্ব ভোগ করিয়া এই তারা তিন মাস যাবৎ ক্রমে কমিয়া কমিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে অদৃশ্য হয়। এই অদৃশ্য অবস্থায় মার পাঁচ মাস কাটাইয়া, তৎপরে ষষ্ঠ শ্রেণীর তারা রূপে আবার দৃষ্টিগোচর হয় এবং তিন মাসের মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।"

এই তারাটীর এবম্বিধ অদ্ভুত চরিত্র অবগত হইয়া উহাকে মিরা

নামে অভিহিত করা হইয়াছে। Mira লাটীন Miraculum শব্দজাত—ইহার ইংরাজি প্রতিশব্দ Wonder। এই তারাটী Cetus নামক রাশিতে অবস্থিত। Cetusও লাটীন শব্দ—ইহার Genitive caseএ Ceti হয়। তজ্জন্য এই তারাটীকে Mira Ceti বলে। Cetusএর ইংরাজি প্রতিশব্দ Whale এবং বাঙ্গলায় তিমি। স্বর্গগত পণ্ডিত কালীনাথ মুখোপাধ্যায়, Constellation whale এর তিমি মণ্ডল নামকরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু Constellationএর মণ্ডল নাম সর্ব্ববাদিসম্মত না হওয়ায় এবং উপযুক্ত বাঙ্গলা প্রতিশব্দ না পাওয়ায় আমরা উহাকে রাশি নামে অভিহিত করিয়া থাকি।

রাশি বলিলে যদিও মেষাদি দ্বাদশ রাশিকে (Signs of the Zodiac) বুঝায়, তথাপি, রামায়ণাদি পৌরাণিক গ্রন্থে মেষাদি দ্বাদশ রাশি ব্যতীত অপর নক্ষত্রমণ্ডলকেও রাশি নামে অভিহিত করা হইয়াছে, যথা ব্রহ্ম রাশি (Constellation Auriga)।

আকাশের তারাগুলিকে চিনিবার জন্য জ্যোতির্ব্বিদ Bayer প্রধান প্রধান তারাগুলিকে গ্রীক বর্ণমালার সহযোগে চিহ্নিত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি Cetus Constellationএর ঐ অদ্ভুত তারাটীতে গ্রীক বর্ণমালার 'O' (Omicron) অক্ষর যোজনা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য মিরা Omicron Ceti নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

মিরা অত্যুজ্জ্বল রক্তবর্ণ বহুরূপ তারা। খালি চক্ষে একটি তারাই দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯২৩ খৃঃ অঃ ১৯ অক্টোবর লিক মান-মন্দিরের সহযোগী অধ্যক্ষ আচার্য্য এইটকিন (Professor Robert G. Aitken, Associate director of the Lick Observatory) মিরাকে যুগল নক্ষত্র দেখিয়াছেন। উহার সহচর বা দ্বিতীয় তারাটী নীলবর্ণের এবং মিরা হইতে ০·৫ উজ্জ্বলতায় কম। তারাদ্বয়ের পরস্পরের দূরত্ব ১''·০১, কৌণিক অবস্থান ১৩২°·৩। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ১৯০৩ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে এবং ১৯০৫ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি এবং Dolittle সাহেব মিরাকে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সহচরের কোন সন্ধান পান নাই। সম্ভবতঃ তারা যুগলের পরস্পরের দূরত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় এক্ষণে উহাদিগকে পৃথক দেখা যাইতেছে। ১৯২৩ খৃঃ অঃ মার্চ্চ মাসে মিরা যখন উজ্জ্বলতম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন Yearkis Observatory হইতে Barnard সাহেবও উহাকে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সহচরের কোন সন্ধান পান নাই। Webb's Celestial Objects vol. ii. পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বহু পূর্ব্ব হইতেই মিরাকে তিনটী তারা বলিয়া জানা আছে। Burnham সাহেব উহার দুইটী সহচরের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহাদের একটীর স্থূলত্ব ৮·২, মিরা হইতে দূরত্ব ১১৬''·০ কৌণিক অবস্থান ৮২°·৪, অপরটীর স্থূলত্ব ১৩·০, দূরত্ব ৭৫''·৩, কৌণিক অবস্থান ৮৮°·৫। তাঁহার মতে সহচরদ্বয়ের স্থূলত্ব ও আবর্ত্তন কাল সকল সময়ে এক প্রকার থাকে না। আমরা তিন ইঞ্চি দূরবীণে মিরার নিকটে ১০ সেকেণ্ড পূর্ব্বদিকে ৯·১১ স্থূলত্বের তারাটী দেখিতে পাইয়া থাকি। ঐটী Burnhamএর কথিত ৮·২ স্থূলত্বের তারা কি না তাহা ঠিক বলা যায় না, উহার সহিত মিরের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়াও মনে হয় না।

Aitkenএর নীল সহচর এবং Burnhamএর ১৩·০ স্থূলত্বের সহচর দুইটী যদি স্বতন্ত্র তারা হয়, তাহা হইলে মিরা তিনটী তারার সংহতি। এই প্রকার তারা সংহতিকে Binary system বলে। বাঙ্গালায় যৌথ তারা জগৎ বলা যাইতে পারে। Binary systemএর সহচরগুলি কখনও দৃশ্য, কখনও অদৃশ্য হইবার কারণ আছে,—তাহা এ প্রসঙ্গের বিষয় নহে।

১৫৯৬ খৃঃ অঃ হইতে ১৯০৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ৩১৩ বৎসরে মিরা ৩৪৪ বার স্থূলতম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১২৭ বারের হিসাবে কোনই সন্দেহ নাই। অবশিষ্ট ২১৭ বার সূর্য্যের নিকটে থাকায় হিসাব ঠিক মত পাওয়া যায় নাই।

আজকাল (৭ই অগ্রহায়ণ) মিরা খালি চক্ষে অদৃশ্য আছে। ৫ই অগ্রহায়ণ রাত্রি ১২টার সময় আকাশ অত্যন্ত নির্ম্মল হইয়াছিল। ঐ সময়ে আমরা মিরাকে খালি চক্ষে দেখিয়াছি। তখন উহার স্থূলত্ব ৬·৭ ছিল। এরূপ স্থূলত্বের তারা সাধারণ লোকে খালি চক্ষে দেখিয়া চিনিতে পারেন না।

আগামী ২৬এ ডিসেম্বর উহার স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হইবার কথা। গতপূর্ব্ব বৎসর মিরা তৃতীয় শ্রেণীর তারার স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, গত বৎসর মাত্র পঞ্চম শ্রেণীর তারার স্থূলত্বে উপনীত হইয়াই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। এবারে মিরার কত দূর বৃদ্ধি পায় তাহা দেখিবার জন্য জগতের জ্যোতিষ-তত্ত্ববিদগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। আমরাও আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য লইয়া তাঁহাদের সহকারিতায় রত আছি।

মেষ ও মীন রাশির দক্ষিণে তিমি রাশি অবস্থিত। অশ্বিনী নক্ষত্রের Beta ও Gamma তারাদ্বয়ের যোগ রেখা দক্ষিণে প্রসারিত করিলে উহা অদূরে পঞ্চ তারাত্মক একটী তারাক্ষেত্র ভেদ করিবে। উহারা দক্ষিণ পশ্চিম হইতে ক্রমে উত্তর দিক দিয়া পূর্ব্বে দক্ষিণে ঘুরিয়া গিয়াছে। উহাদের অবস্থান ঠিক একটী মাছ ধরা বঁড়শীর ন্যায় বক্র। উহারা তিমি রাশির Beta, Eta, Theta, Zeta এবং Tau তারা। এই তারা-পঞ্চকে তিমির দেহ বিবেচিত। উহাদের মধ্যে Beta তারা সকলের অপেক্ষা উজ্জ্বল ও তিমির পুচ্ছে অবস্থিত। ইহার ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ Zeta তারার অদূরে তিমির গ্রীবায় মিরা অবস্থিত।

সংক্ষিপ্ত নব্য অলঙ্কার শাস্ত্র

শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী

ছন্দ

বিশ্বের প্রাণ ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে, তাই প্রথমে ছন্দেরই পরিচয় দেব। ছন্দ এক হাজার তিন শ' পাঁচ রকম, তার ভেতর আজ পর্য্যন্ত পাঁচ শ' সাত রকমের ছন্দ তৈরি হয়েছে। বাকীগুলি এখনও ভাবী কবিদের মাথার ভেতরই ঘুমিয়ে আছে,—রাজপুরীতে ঘুমন্ত রাজকন্যার মতো সোণার কাঠীর স্পর্শে এখনও জাগ্রত হয়ে ওঠে নি।

ছন্দ হবে নর্ত্তনশীল—ভোরের আলোয় খঞ্জনের মতো; এক টানা—বৃষ্টি ধারায় নদীর মতো; ঝুরঝুরে ভর সন্ধ্যার ফুরফুরে হাওয়ার মতো; ছোয়া যায় যায় না—মিলগুলি যার ধরা যায় যায় না—ও-পাড়ের নাইতে-আসা মেয়েটিকে চেনা যায় যায় নার মতো।

নাচুনী ছন্দ

জরদ রঙের গরদ পরা সোণার আঁচল গায়,
কাজল চোখের সজল দিঠি এদিক ওদিক্ চায়,
মেয়েটি ওই যায়—
নীলপরী কি সবুজ পরী কে চেনে গো তায়?
ছায়ার মায়ার স্বপন রচি', মেঘের মেখলায়
আজকে আকাশ সেজেছে এই নবীন বরষায়
জলো হাওয়ায়—
শিরশিরিয়ে উঠছে গাটা পথ চলা যে দায়।
অজানা কোন পথে যেতে কোন সে বালিকায়
চমকে দিয়ে চিকুর হানে, আকাশ চিরে ধায়,
বজ্র হেঁকে যায়—
ধপাস্ করে পিছল পথে পড়ল সে ধরায়।

ঝুরু ঝুরু ছন্দ।

বাতাস ঝুরু ঝুরু, মনটি উড়ু উড়ু,
গগনে গুরু গুরু, বুকটি দুরু দুরু,
তুলিতে আঁকা ভুরু তুলিয়া চায়;
কে সে কার গুরু? পুকুর পাড়ে তরু,
ছায়ায় চরে গরু ঠ্যাংটি সরু সরু বকটি যায়।

ছোয়া-যায়-যায় না ছন্দ।

অচিন পাখী যায় না ধরা;
শ্যামল কোমল কিসলয়ের কোন সে আড়াল থেকে,
বাদল ভেজা পাতার পরে
পিছলে পড়া রোদ,—
উঠল ডাকি
মধু ভরা
কণ্ঠে পাখী, ভোরের আলোর রাঙা আবীর মেখে.
হঠাৎ যেন কিসের ব্যথা ভরে
কণ্ঠ হ'ল রোধ।

এক টানা ছন্দ।

হালকা হাওয়া জলকে যাওয়া
কলসী কাঁকে পথের বাঁকে,
কাজল কালো চোখের আলো;
ঘুঘু ডাকা ছায়ায় ঢাকা,
স্বপন মাখা পথটি বাঁকা;
দয়েল ডাকে পাতার ফাঁকে,
আলোর রেখা যাচ্ছে দেখা;
ভোরের বেলা ফুলের মেলা,
মাথার পরে বকুল ঝরে;
কিসের তরে এমন করে,
নেতিয়ে পড়ে কোন যে ঝড়ে;
মনটি তাহার? সবুজ পাতার,
আড়াল থেকে যাচ্ছে ডেকে;
কোকিল ভায়া মোহন মায়া,
ঝাঁঝর বাজে আজকে সাঁঝে;
ঝিল্লি ডাকে নদীর বাঁকে,
ভাসিয়ে ভেলা করছে খেলা;
জেলের ছেলে পাখনা মেলে,
শুভ্র পালের জলের তালের
সঙ্গে নাচি যাচ্ছে আজি
নৌকাগুলি ঘোমটা খুলি
দেখছে চেয়ে কিষাণ মেয়ে;
রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ মাঠটি খাঁ-খাঁ,
চরছে ধেনু বাজায় বেণু
রাখাল দলে গাছের তলে;
পথের ধূলি উড়িয়ে তুলি
বইছে বাতাস সুনীল আকাশ
মেঘের ছায়ায় আঁধার ঘনায়;
জ্যোৎস্না ঝরে ধরার 'পরে,
মিষ্টি হাওয়া গন্ধে ছাওয়া
বনের ফুলের কাহার চুলের?
দাদুর ডাকে বজ্র হাঁকে,
জলের ছিটা লাগছে মিঠা;
গুমট্ গেল বর্ষ এল;
মুখটি তোল নয়ন খোল,
সবুজ ঘাসে পাতার পাশে
ঘুমিয়ে পড়া দাওগো সাড়া
সবুজ পরী সোনার তরী

দাওগো খুলি চোখটি গেল
ডাকছে পাখী ফটিক জল—

নদীর স্রোত—তার শেষ কোথায়? একটানা ছন্দেরও শেষ নেই। তবে, যখন খুঁজে পাওয়া যাবে না মিল, থামতে হবে তখনই, মরুর মাঝে হারিয়ে যাওয়া নদীর মতো।

উপরে যে চারটি ছন্দের উদাহরণ দেওয়া গেল, এই কটি আয়ত্ত করতে পারলে আরগুলি আপনিই আসবে।

ভাষা।

ভাষা হবে সরল, সহজবোধ্য, ঝঙ্কারময়। যেমন—

জানি জানি ভাল মতে বেজায় তোদের হিম্মত,
আলোচাল, কাঁচা কলা, দুটো পয়সা কিস্মত!
আর্কফলার মার্কামারা,
তর্ক পেলেই হর্ষে হারা,
শম্বুকেতে নস্যি পোরা,—জম্বুদ্বীপে ফনা
কম্বুকণ্ঠীর নাগাল পাবি, নীল নয়নের না না
দেখলে নয়ন যাবে খুলে
তর্ক ফর্ক যাবি ভুলে,
দোদুল তালে নাচতে হৃদি, বুঝবে রে তোর প্রাণ
দীন দুনিয়ার মালিক তিনি কতই মেহেরবাণ।

ভাব।

যা মনে আসিবে তাই; সুতরাং উদাহরণ দেওয়া অনাবশ্যক।

অনুপ্রাস।

অনুপ্রাসের বিকাশ ভিন্ন কবিতার প্রকাশ নিতান্তই হা হুতাশ। অতএব—

নন্দনবন মন্দ পবন
ক্রন্দন কেন আর?
স্বপন নয়ন বিরহ মগন
জড়িত তন্দ্রাভার।
গগন কাঁদিছে ফুল্লচন্দ্র,
করুণ বাঁশীর হাসির মন্ত্র,
নিখিল তারকা হার—
শ্বসিয়া হাসিয়া ফুঁসিছে পবন,
ভাসিয়া আসিয়া ছাইছে গগন
সজল জলদ কাজল বরণ,
ঢাকিল চন্দ্র ঢাকিল তপন
নিবিড় অন্ধকার;
নন্দনবন মন্দ পবন
ক্রন্দন কেন আর?

রস।

রস ছিল নয় রকম; তার ভেতর কয়েকটির আজকাল আর তেমন ব্যবহার হয় না। আবার কয়েকটি নূতন রসের সৃষ্টি হয়েছে। প্রধান কয়টির উদাহরণ দিচ্ছি—

আদিরস।

বক্ষে তুলি চুমো খেনু চক্ষু গেল বুঁজি,
প্রাণ মোর মরিতেছে তবু কারে খুঁজি।

করুণ রস।

বিলাপিছে মন্দোদরী নয়ন আসার
অঝর ঝোরে মিশিতেছে লবণাম্বুসনে।

বীর রস।

কোঁৎকা হাতে এলেন তখন মস্ত রোস্তম বীর,
তাই না দেখে সোরাব মিঞার চক্ষু হল স্থির।

রৌদ্ররস।

রৌদ্র ঝাঁ-ঝাঁ আকাশ কোণে জমছে কালো মেঘ,
ঈশান বুঝি বাজায় বিষাণ—ডেকে উঠলো ভেক।

হাস্যরস।

অট্টহাসির হট্টরোল
কথং এমন গণ্ডগোল?
চিমটি আমায় কেটেছে যে বোসেদের ওই মেয়ে।

উপরে দেওয়া উদাহরণ কটি থেকেই বুঝতে পারবেন, যে রসকে সৃষ্টি করতে হবে, ভাষা এবং ছন্দ তার উপযোগী হওয়া চাই। একটি নূতন রসের পরিচয় দিচ্ছি—

লীলারস।

আড়নয়নে চাওয়া,
মুচকি হেসে যাওয়া,
বাঁকা গ্রীবা, আঁকা ভুরুর একটু আকুঞ্চন,
লীলা ভরা মৃণাল বাহু দুটি,
বসন প্রান্ত যাচ্ছে ধরায় লুটি,
তাইতে আমার মন—
জুতো পরা গতির মাঝে আজকে হল বন্দী,
প্রিয়া তুমি জান কত ফন্দি।

আর একটি নূতন রস হচ্ছে তরল রস। চায়ের পেয়ালা বা অমনি একটা কিছুতে মনঃসংযোগ করুন, উদাহরণের দরকার হবে না।

গোপন দুঃখ

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় এম-এ

মেয়েরা ঘরে ঘরে তখন সন্ধ্যাদীপ দেখাইতেছে।

এমনি সময় ভিন্ গাঁ হইতে জগদীশ ফিরিয়া আসিয়া পুকুরের ঘাটে বসিল। পায়ে একরাশ ধূলো, শরীর অবসন্ন, চুল উস্কখুস্ক—তাহাকে অনেকটা পথ হাঁটিয়া আসিতে হইয়াছে যে। বিবশ শরীর এক দিন তাহার সুস্থ হইবে,—কিন্তু মনের রক্তের দাগ তো মুছিবার নয়। আজ সে তাহার ছোট বোন বিন্দুকে শেষ বিদায় দিয়া আসিয়াছে। রাধাপুরে যাইয়া বোনের চেহারা দেখিয়া সে অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। অতি সুন্দর সুঠাম দেহ যেন মসীলিপ্ত কঙ্কালে পরিণত। কই, যাহার হাতে দিয়াছিল, সে তো গুটীতিনেক পাশ করিয়াছে; বাড়ীর অবস্থাও অসচ্ছল নয়। তাই গত কাল হইতে এই সত্য সে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিয়াছে যে, একজামিন পাশ আমাদের মনে যে ছাপ আঁকিয়া দেয়, তাহাতে মনুষ্যত্ব এক বিন্দুও বাড়ে না। যখন বিন্দু নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল যে, তাহার মৃত্যু আসন্ন—দরজা জানালার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিতেছে, কখন ঘরে ঢুকিবে ঠিক নাই—তখন সে দাদাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল। বাপ অনেক দিন মারা গিয়াছেন—তাঁহার কথা তো বিন্দুর মনেই পড়ে না। মা-ও আজ দেড় বৎসর নাই। গভীর রাত্রিতে যখন শয্যাপার্শ্বে অপর কেহ নাই, তখন সে জগদীশের হাত তাহার উষ্ণ হাতে লইয়া বলিয়াছিল, দাদা আমার যে এত অসুখ, তা এখানে কেউ বিশ্বেস কর্ত্তে চাইত না। আর সে কোনও কথাই বলে নাই। পর দিন বেলা এগারটায় বিন্দুর মৃত্যুর পর সে বাড়ী হইতে বিদায়ের সময় ভগিনীপতি নরেনকে বলিয়াছিল, হাঁ হে, বিন্দুকে এই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তোমার কি কিছু কর্ব্বার ছিল না? সে অতিমাত্র বিনয়ের সহিত বলিয়াছিল, কি কর্ব্ব বলুন, বাবা মা রয়েচেন—বাংলা দেশের শিক্ষিত ছেলে এতবড় পিতৃমাতৃ-ভক্তি দেখাইবার অবসর কেন ত্যাগ করিবে?

এই সব কথা একটীর পর একটী তাহার মনে হইতেছিল।

ঘাটে জগদীশ বসিয়া রহিল। কাল রাত্রি হইতে সে অভুক্ত। এইমাত্র চার ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে। পুঞ্জীভূত দুঃখ কষ্টে তাহার দেহ-মন এমনি অবসন্ন ও শিথিল যে, গৃহের দিকে তাহার চলিবার সামর্থ্য যেন আর নাই। রাত্রি বাড়িয়া চলিল; দূরে মহেশ বোষ্টোমের আখড়ায় যে কীর্ত্তন হইতেছিল, তাহাও গভীর রাত্রি ঘোষণা করিয়া থামিয়া গেল। সে পুকুরের নিস্পন্দ কালো জলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে, এমনি সময় কে আসিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। প্রথমটা কথা কহিল না। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে বলিল, জগদীশ দা, বাড়ী যাবে চল—ওঠো।

জগদীশ মুখ তুলিল, দেখিল। তার পর ধীরে বলিল, কে রে, মিনু?

মৃন্ময়ী একটু থামিয়া জগদীশের পা স্পর্শ করিয়া বলিল, না, তুমি চল—তুমি কিছুই খাওনি, তোমায় খেতে হবে। জগদীশ মিনিট তিনেক পরে ধরা গলায় বলিল, 'তুই জানিস নে বুঝি'—'আমি সব শুনেচি' বলিয়া হু হু করিয়া মৃন্ময়ী কাঁদিয়া উঠিল। বিন্দু ও মিনু সমবয়সী ছিল—খেলাধূলোরও সাথী, ঝগড়াঝাঁটীরও সঙ্গী। মৃন্ময়ীর দ্বিতীয় পক্ষের বরের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল। গত বছর সে বিধবা হইয়া ফিরিয়া আসিয়া থান-পরা মূর্ত্তিতে জগদীশকে প্রণাম করিয়া কহিয়াছিল, এ একরকম ভালোই হোলো দাদা। দুঃখ কর্ব্বার কিছু নেই,—জানো তো সব।

বিন্দুকে হারান যে জগদীশের কতখানি, তাহা মৃন্ময়ী জানিত। তাই আজ সে পথের দিকে দুটী চক্ষু পাতিয়া রাখিয়াছিল। জগদীশকে তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া মৃন্ময়ী বলিল, দোর বন্ধ কোরো না যেন, আমি এখুনি আসচি। তোমায় একটু কিছু মুখে দিয়ে জল খেতে হবে, না কর্লে আমি শুনবো না—বলিয়া সে চক্ষে আঁচল দিয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

দিন বিশেক পর। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে; কিন্তু

চৈত্রের রৌদ্রের তেজ কমে নাই। জগদীশ শোবার ঘরের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া কাশীদাসী মহাভারতের শান্তি-পর্ব্ব পড়িতেছিল। একখানা ভিজা গামছা ছোট ভাইয়ের মাথায় দিয়া তাহাকে কোলে করিয়া মৃন্ময়ী আসিয়া বসিল। জগদীশ মুখ না তুলিয়াই বলিল, কি রে?

একটা নারকেলের সন্দেশ আর ঘি মাখা মুড়ি এখুনি খেয়ে ফেল তো বলিয়া সে তাহার হাতের রেকাবীখানা আগাইয়া দিল। জগদীশ বলিল, কেন বল্ তো? মৃন্ময়ী বলিল, তোমারই বা আজ খাওয়া হয়নি কেন বল তো? জগদীশ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, কেন হবে না রে! এ খবর তোকে দিলে কে? মৃন্ময়ী বলিল, উপস করে আছ তো, তা আবার লুকোও, তুমি কি আমাকেও ভুলোতে পার মনে কর? জগদীশ গাঢ় কণ্ঠে বলিল, না রে, তোকে ভুলোতে পারি নে। তবে উপস কর্ব্ব কেন? ঘরে ময়দা গুড় ছিল, তা গুলে খেয়েচি ভাত বেড়ে ওঘরে গেচি, এসে দেখি, ও বাড়ীর কুকুরটা—খাক তাতে কষ্ট হয়নি। আর দিন দুই পরে মাধব ফিরে আসবে—সে রান্না বান্না করে, জানিস তো—তখন আর কষ্ট কি?

মৃন্ময়ী অনেকক্ষণ কথা কহিল না। শেষে একটা বড় রকম দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। সেই শব্দে জগদীশ বলিল 'ও কি রে?' মৃন্ময়ী তাহাতে কাণ না দিয়া বলিল, দেখ, পৃথিবীতে এক একজন লোক আসে ভোগ কর্ত্তে, পুজো পেতে। সে রাজত্বই করে যায়। আর একজন আসে দুঃখ পেতে, সেবা কর্ত্তে। সে দাসত্বই করে যায়। আর এক রকম লোক আছে—তারা কি করে জান?

জগদীশ তাহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না। মৃন্ময়ী বলিল, তারা সাধ করে কষ্ট পায়, অথচ তারা এটা না পেতেও পারে। তুমি সেই অভাগাদের দলে।

জগদীশ মৃন্ময়ীর মাথাটা নাড়িয়া দিয়া হাসিয়া বলিল, আর তুই কোন্ দলের?

মৃন্ময়ী এবার একটু তীব্রকণ্ঠে বলিল, দেখ জগদীশদা, বাজে কথায় আমায় ফাঁকি দেবার সাধ্যি তোমার নেই—সে চেষ্টা তুমি কোরো না। যা বলি তাই কর।

'কি কর্ত্তে হবে বল তো' বলিয়া জগদীশ মহাভারতখানা বন্ধ করিল। মৃন্ময়ী বলিল, বিশেষ কিছু নয়, একটা বিয়ে কর। জগদীশ এবার পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলিল, এই কথা! তা তোর সঙ্গেও তো আমার বিয়ের কথা হয়েছিল, কেন হোলো না রে?

মৃন্ময়ী জগদীশের কথা বলিবার ভঙ্গীতে আর না হাসিয়া পারিল না। সেও হাসিয়া বলিল, হয়েছিল তো কর্লে না কেন? আজও মাছ ভাত খেতে পারতুম—একাদশীও কর্ত্তে হতো না। তার এই পরিহাসের আবরণের নীচে যে কতখানি গূঢ় ব্যথা ছিল, তাহা জগদীশ জানিত। জগদীশ তাহার স্থির প্রশংসমান দৃষ্টি মৃন্ময়ীর খর যৌবন দীপ্ত মুখের উপর রাখিয়া বলিল, তোর ভারি বুদ্ধি রে। আমি এক একবার ভাবি, তোকে আমি আমার সব সম্পত্তি লিখে দেবো, তাই থেকে তুই আমায় চাট্টি চাট্টি খেতে দিস্।

মৃন্ময়ী অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, বেশ তাই দেবো। তার পর কিছুক্ষণ বাদে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল, সন্ধ্যে হয়ে এলো দেখি—তোমার আলোটা জ্বেলে দিয়ে যাই। তার পর বিছানা করিতে যাইয়া বলিল, জগদীশদা, তোমার বিছানার চাদর কই? বালিশেরও যা ছিরি দেখচি—ওমা, এ পাশে যে তুলো বের হয়ে পড়েচে।

জগদীশ হাসিল, বলিল, ও কথা রাখ্—মহাভারত পড়ি, শোন্—পুণ্যি হবে। স্বামীকে ভালোবাসতিস না—শোন্, তা হলে ভালোবাসতে পার্বি।

মৃন্ময়ী বলিল, ঐ ভয়েই তো আরোও শুনবো না। ওতে আমার কাজ নেই বাপু। আচ্ছা বল তো—চাদর নেই, এই তো বিছানার চেহারা; সময়ে খাওয়া নেই—এ সব কি? এতে তুমি কি সুখ পাও বল তো?

'সুখ,—সুখ আবার কিরে? নেই—যেমন অনেকের অনেক জিনিস থাকে না। তোরই কি সব জিনিস আছে?' একটু খোঁচা দিবার জন্য জগদীশ বলিল, 'যেমন তোর স্বামী নেই—তার জন্যে ব্যথাটুকুও নেই।' মৃন্ময়ী না উঠিয়াই বলিল, যাই, সন্ধ্যে হয়ে গেল। দেখ, আমি তোমার রাত্রের খাবার নিয়ে আসচি একটুকু বাদে। মাধব যে কদিন ফিরে না আসে, সে কদিন রাত্তিরে আমি তোমার খাবার দিয়ে যাব, কাকীমা-ও তাই বলেচেন। দিনে তুমি আমাদের বাড়ী গিয়ে খাবে—বুঝলে। আর দেখ, বিছানার চাদরের বদলে আমার একখানা ধোয়া থান কাপড় পেতে দিয়ে যাব—ধোওয়া চাদর আমার কাছে নেই। জগদীশ এ সবের প্রতিবাদ করা নিষ্ফল জানিয়া প্রতিবাদ

করিল না। মৃন্ময়ী বলিল, যে নিজে সাধ করে এত কষ্ট পায়, তার জন্যে কিছু কর্ত্তে ইচ্ছে হয় না, তবুও করি, সে—

'তবুও করিস কি জন্যে রে?'

মৃন্ময়ী চলিতে চলিতে রূঢ় স্বরে বলিল, আমার শ্রাদ্ধের জন্যে।

পরদিন বেলা গোটা আটেক হইবে—জগদীশ তাদের বাড়ীর সামনে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের গুঁড়ির উপরে বসিয়া ছিল। কিছুক্ষণ বাদে দেখিল, মৃন্ময়ী কাঁধে একখানা রাঙা গামছা ফেলিয়া ঘাটের দিকে চলিয়াছে। জগদীশ বলিল, মিনু, এত সকালেই নাইতে যাচ্ছিস যে? মৃন্ময়ী বলিল, নেয়ে বড়ি দেবো। তার পর একটু থামিয়া বলিল, আচ্ছা, একটু আগে তোমার কাছে কারা সব এসেছিল জগদীশদা?

জগদীশ হাসিয়া বলিল, এইটেই হোলো তোর এত সকালে ঘাটে যাবার আসল কারণ – বড়িটড়ি সব ফাঁকি।

মৃন্ময়ী চটিল, কিন্তু অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, দেখ, ঐ হুসেনপুরের মুসলমানদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে যেও না, ওখানে তুমি যেতে পাবে না।

জগদীশ বলিল, শুনেচিস তো—কাল দুপুরে কেশব চাঁড়ালের ছোট মেয়ে যশোদা ধান শুকুচ্ছিল,—জনকতক মুসলমান তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেচে।

মৃন্ময়ী বাধা দিয়া বলিল, যাগ্‌গে—ঢের লোক আছে গাঁয়ে বাপু – তোমার এ সব ঝক্কি কেন? যেও না, যেও না,—আমার কথা না শুনলে আর তোমার বাড়ীর চৌকাট মাড়াব না। মৃন্ময়ী ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল।

জগদীশ ভাবিতেছিল, কেন এমন হয়? অথচ সমস্ত মুসলমান সমাজ এর জন্যে লজ্জিত হয় না। যখন দেশে সত্যিকার জমিদার ছিল, তখন এর শাসন ছিল। অথচ কবে কোন বিলাতী সিভিলিয়ান ঐতিহাসিক বলিলেন যে, জমিদার বড় অত্যাচারী আর সেইটাই লোকে মানিয়া বলিল 'সত্যিই তো'।

গোটা এগারোর সময় মৃন্ময়ীর খুড়তুত ভাই মণি জগদীশকে খাইতে ডাকিতে আসিয়া দেখিল, বাড়ীতে কেউ নেই, দরজায় শেকল। শুধু বাহিরের দাওয়ায় নফর পরামানিক শুইয়া আছে। মণি যাইয়া বাড়ীতে এ সংবাদ দিল। মৃন্ময়ী শুনিল। ক্রোধে বিরক্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। জগদীশ খাইবে মনে করিয়া সে সকাল হইতে নিজে যে সব ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছে, সেগুলি না হয় নষ্টই হইল। কিন্তু আজ সকালেই সে কত না নিষেধ করিয়া আসিয়াছে! ওঃ, জগদীশের এই অভুক্ত অস্নাত দুর্ব্বল দেহ; তাতে পাকা তিন ক্রোশ দূর হুসেনপুর—সে গ্রামে অধিকাংশই দুর্দ্দান্ত মুসলমান। সে আর ভাবিতে পারিল না। নিজেই মনে মনে বলিল, 'মরুক গে, আমি কি কর্ব্ব?' এই কথা বলিতেই সে জিব কামড়াইয়া ধরিল—'মরুক গে' এ কথা সে উচ্চারণ করিল কেমন করিয়া! গৃহ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ মদনমোহনের সামনে বারবার প্রণাম করিয়া কহিল, আজ হঠাৎ সে যাহা বলিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে জগদীশের যেন কোনও অমঙ্গল না হয়।

জগদীশ রাত্রি গোটা দশেকের সময় ফিরিয়া আসিল। খানিক বাদে রাত্রির আহার্য্য হস্তে মৃন্ময়ী উপস্থিত হইল। সঙ্গে আলো লইয়া বাড়ীর দাসী পাঁচুর মা। মৃন্ময়ীর চোখে যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। সে কোনও কথা না বলিয়া ঘরের মেঝেতে খাবার রাখিয়া মিনিট দুই বারান্দার খুঁটী ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জগদীশ বুঝিল যে মৃন্ময়ী খুব রাগিয়াছে। সে বলিল, মিনু, খুব রেগেচিস বুঝি—কথা কচ্ছিস না যে? জগদীশের কথা শেষ না হইতেই মৃন্ময়ী ধীরে অথচ তীক্ষ্ণ স্বরে একটী একটী করিয়া বলিল, দেখ, তুমি পাগল—তোমার ওপর রাগ করে কি হবে?

কয়েক দিন হইতে জগদীশের শরীর ভাল ছিল না। আজ সমস্ত দিন সে জলস্পর্শ করে নাই। তাহার উপর এই পথশ্রম। বিরক্তিতে তাহার মন যেন আজ একবার সহসা জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, কি, আমি পাগল?

মৃন্ময়ী পুনরায় স্থির কণ্ঠে বলিল, হাঁ, তুমি পাগল। ক্ষ্যাপা নইলে এণ্ট্রান্সে জলপানি পেয়ে, এক বছর কলেজে পড়ে তুমি পড়া ছেড়ে দিলে! তোমার সম্পত্তি আছে, বাড়ীঘর আছে—তোমার সময়ে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, এ সব তো পুরো-দস্তুর পাগলামি। আমার কথা বিশ্বেস না হয়, ওই যে পাঁচুর মা দাসী বসে রয়েচে, ওকেই জিজ্ঞেস কর। গাঁ-শুদ্ধ লোক তোমার এ সবই নিছক পাগলামি মনে করে। কিছু মনে কোরো না—সত্যি কথাই গুটী কয়েক বল্লুম। তুমি বিন্দুর দাদা তাই আসি।

'নইলে পাগলের কাছে আসতিস না—কেমন ?'

'ঠিক তাই। আমার মনের সত্যি কথাটাই তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়েচে—আমায় আর বলতে হোলো না'—বলিয়া মৃন্ময়ী আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

আজ মৃন্ময়ীর এই অপ্রচ্ছন্ন রূঢ় তিরস্কার যেন এই সদানন্দ যুবকটীর মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিল। মৃন্ময়ী যত দিন যাহা কিছু আভাসে বলিয়াছে, সমস্তই যেন আজ জগদীশের চোখে বিকৃত হইয়া গেল। আজ প্রথম তাহার মনে হইল যে, তাহাকে চিরদিনই মৃন্ময়ী অপদার্থ পাগল ভাবিয়া আসিয়াছে। তাহার কথায় ব্যবহারে এ ইঙ্গিত তো বরাবরই ছিল। সে বোকা তাই বুঝিতে পারে নাই। সে এই মমতাহীন মসীমলিন অতীতের পৃষ্ঠাখানি নিজের মন হইতে যদি মুছিয়া ফেলিতে পারিত, তাহা হইলে যেন শান্তি পাইত। কিন্তু এ কি! জল স্থল আকাশ বাতাসের গায়ে কে যেন কালি ফেলিয়া দিয়াছে—বিন্দু পরিমাণ স্থানও ফাঁক যায় নাই। সে তাহার সমস্তদিনব্যাপী পরিশ্রম, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া গেল। প্রথমে চৌকাট ধরিয়া উঠানের শূন্য আঁধারের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

মৃন্ময়ী জগদীশকে যে বাক্যবাণে বিঁধিয়া আসিয়াছে, তাহা যেন দ্বিগুণ বেগে তাহার নিজের বুকেই ফিরিয়া আসিল। বাড়ী ফিরিয়াই তাহার মনে হইল যে, এমন গর্হিত কথা জগদীশকে সে কেমন করিয়া বলিল! তাহার কত গুরু অপরাধেও জগদীশ একটী রূঢ় কথা বলে নাই, এতটুকু বিরক্ত হয় নাই—তাহার ও বিন্দুর সব অত্যাচার হাসি মুখে গ্রহণ করিয়াছে। আর আজ সে এই অবস্থায় দূর গ্রাম হইতে ফিরিল—তাহার উপর এ কি নির্ম্মম, হীন অত্যাচার সে করিল! সে নিজে শয্যা গ্রহণ করিয়া ছটফট করিতে লাগিল। ঘণ্টা খানেক পরে উঠিয়া সে আবার জগদীশের বাড়ীর দিকে একাই চলিল। নিদ্রিত খুড়তুত ভাইটী শয্যায় পড়িয়া রহিল। জগদীশের বাড়ীর সামনে আসিয়া খোলা দরজার মধ্য দিয়া দেখিল, জগদীশ চৌকাটের পাশে বসিয়া রহিয়াছে—ঘরে আহার্য্য তেমনি পড়িয়াই আছে। সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না সত্য, কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া অশ্রু সংবরণ করা তাহার অসাধ্য হইয়া উঠিল। সে শয্যায় প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু চোখ বাহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অপরাধের ভারে তাহার হৃদয় যেন নুইয়া পড়িয়াছে। বহু দিন পূর্ব্বে গ্রামে একটী ফটোগ্রাফার আসিয়াছিলেন। তিনি বিন্দুর ছবি তুলিয়াছিলেন। তাহারই একখানা মৃন্ময়ীর কাছে বহু দিন হইতে আছে। বিন্দুর চেহারা ঝাপসা হইয়া গিয়াছে; মুখের কতকাংশ ও শাড়ীর পাড়টা ছাড়া আর কিছুই বোঝা যায় না। মৃন্ময়ী আবার উঠিল। বিন্দুর সেই ছবিখানি বাহির করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, বিন্দু, আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর—আমি আর জগদীশদাকে এমন কথা কখনও বলবো না।

রান্না আজ একটু সকাল সকাল হইয়াছিল। কাকীমা জগদীশকে ডাকিতে মণিকে পাঠাইলেন দেখিয়া, মৃন্ময়ী নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না। মণি ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল যে, জগদীশ নিজে রান্না করিয়া আহারে বসিয়াছে। কাকীমা এ সংবাদে বিরক্ত হইলেন। পূর্ব্বদিনও তাহার জন্য প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন নষ্ট হইয়াছে, আজও তাহাই হইল। কিন্তু যখন মণির কাছে জগদীশের আহার্য্য বস্তুর কথা শুনিলেন, তখন না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। মণি বলিল, কলাপাতে ভাত ঢেলে নিয়েচেন। একটা আলু আর একখানা তেঁতুল ভাতে। পাতে নুন নেই। জিজ্ঞেস কর্ত্তে বল্লেন, 'নেই রে, নফরকে আনতে বলতে ভুলে গেচি'—ইহা বলিয়া মণি হাসিয়া কুটিকুটি।

ঘরে মৃন্ময়ী তখন সলতে পাকাইতেছিল। প্রত্যেক কথাটি সে শুনিল। তার বুকের ভিতরটা জ্বালা করিয়া উঠিল। মাত্র সাত আট দিন পূর্ব্বে জগদীশ জ্বর হইতে উঠিয়াছে। পূর্ব্বদিন ও রাত্রি সে অনাহারে পরিশ্রমে ও উদ্বেগে কাটাইয়াছে। তাহার উপর সে নিজেও তীব্র বাক্যে পোড়াইয়া আসিয়াছে। আজ সে নিজে দুটা সিদ্ধ করিয়া আহারে বসিয়াছে—পাতে নুনটুকুও নাই। জগদীশ জ্বর হইতে উঠিয়া অবধি কিছুই খাইতে পারিত না, ইহা মৃন্ময়ী জানিত! তাই বুঝি এই তেঁতুল-সেদ্ধ ভাত, হায় রে কপাল!

কাকীমা হাসিয়া বলিলেন, ছোঁড়ার মাথার একটু ছিট্ আছে। এ কথা মৃন্ময়ীর সহ্য হইল না। কত না কটু

কথা সে কাল নিজে বলিয়া আসিয়াছে ; কিন্তু জগদীশের এতটুকু অপমান অপরে করিলে অসহ্য হয় ! সে কাকীমার কথার উত্তরে বলিল, আছে বৈ কি কাকীমা, নইলে গাঁয়ে তিন চারটী ছেলের স্কুলের মাইনে এত লোক থাকতে জগদীশদাই বা দিতে যাবে কেন ? কোন্ বিধবা খেলে কি না, কার পরবার কাপড় নেই, সে খোঁজ সেই বা নিতে যায় কেন ? সেবার অসুখে তোমার কি সেবাটাই করেচে এত লোক গাঁয়ে থাকতে— ছিট আছে বৈ কি !

ভিতরটা না কি তাহার খুব জলিতেছিল, তাই দুপুরে মৃন্ময়ী হাসিয়া পাঁচুর মাকে বলিল, মাসি শুনেচিস, জগদীশদা আজ অসুখ শরীরে আগুণে তেতে রেঁধে তেঁতুল সেদ্ধ ভাত খেয়েছেন। আচ্ছা তুই বল তো, কাল রাত্তিরে তুই তো সঙ্গে ছিলি, আমি কি খাবার কথা কিছু তাকে বলেছিলুন ? তা আজ যে রাগ করে নিজেই রেঁধে খাওয়া হোলো, এ কি জন্য শুনি ? এই পুরাতন দাসী একটু থামিয়া বলিল, না—তুমি খাবারের কথা কিছুই বল নাই বটে, তবে বড়ই শক্ত কথাগুলি বলেছিলে দিদি।

মৃন্ময়ী অশ্রু গোপন করিতে উঠিয়া গেল। তাহা হইলে সে সত্যই এমন অনুচিত কথা বলিয়াছে, যে তাহার এ অপরাধ বাড়ীর দাসীর কাছেও সুস্পষ্ট !

মাধব ফিরিয়া আসিয়াছে। যেমন করিয়া জগদীশের দিন পূর্ব্বে কাটিত, এখনও তেমনি কাটিতেছে। মৃন্ময়ী সেদিনের পর আর জগদীশের গৃহে আসে নাই ; কিন্তু ছোট ভাই মণির কাছে প্রায় প্রত্যহই জগদীশের খবর জানিতে পারিত। কারণ সেই বাড়ীই ছিল ছেলেদের খেলার আড্ডা। ভিতরে যখন সমস্ত খুঁটিনাটি কৌতূহল ও ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না—মুখে তখনও সে শান্ত নির্ব্বিকার তাচ্ছিল্যের ভাব বজায় রাখিত।

শীতের বেলা তখন বাড়িয়া উঠিতেছে। মৃন্ময়ী তার ধরাবাঁধা কাজ যাহা আছে তাহা করিল। ডাল বাছিল, তরকারী কুটিল, ছোট ছেলেদের খাওয়াইল। এমনি করিয়া বেলা যখন দুপুর ছাড়াইয়া গিয়াছে, তখন পেছনের দরজার সামনে আসিতেই দেখিল, মাধব ঐ পথে চলিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, মাধব ভাল আছ তো ? মাধবঠাকুর হাসিয়া বলিল, হাঁ দিদি, পেন্নাম হই। কই আমাদের বাড়ী একবার দেখি নি ? সে কথার উত্তর এড়াইয়া মৃন্ময়ী বলিল, কোথায় চলেছ এখন ? মাধব বলিল, যাই একবার ভুলুর মার কাছে—একটু আচারটাচার যদি পাই। এসে দেখি, বাবু কিছুই খান না। আচারের কথা কালকে বাবু নিজমুখে বলেছিলেন—তাই যাই একবার, দেখি যদি পাই। মৃন্ময়ী তাহাকে ডাকিয়া গৃহে লইয়া গেল। কাকীমা তখন রান্নাঘরে কাযে ব্যাপৃত। সে দুটী পাথরের বাটিতে নানারকম আচার সাজাইয়া বলিল, দেখ, এটাতে রইল আমের ঝাল আচার, নেবু আর জলপাই—এটাতে রইল চালতে আর আমলকি। পাশে কুল আর মিষ্টি আমের। বুঝেচ, জগদীশ-দাকে রোজ দিও। মাধব দেখিয়া সুখী হইল। সে ভুলুর মার কাছে পাইত কি না সন্দেহ। পাইলেও এতটা পাইত না। মাধব ফিরিবার উপক্রম করিতেই মৃন্ময়ী কাগজে মোড়া কি তাহার হাতে দিল। মাধব জিজ্ঞাসা করিল, এটা কি দিদি ঠাকরুণ ? 'এ কখানা আমসত্ব, মাধব। জগদীশদাকে রাত্তিরে দুধের সঙ্গে খেতে দিও।'

আজ এইটুকু যে মৃন্ময়ী জগদীশের জন্য করিতে পারিয়াছে, তাহাতে তাহার মন অত্যন্ত লঘু বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস বলিয়া যে কথাটা প্রচলিত আছে, তাহা বোধ হয় কতকটা এইরূপই, যাহা পরে ঘটিল। ঘণ্টা দুই পরে মাধব সমস্ত জিনিস তেমনি অবিকৃত অবস্থায় ফেরত লইয়া আসিল। তাহা দেখিয়া মৃন্ময়ীর চোখ মুখ পাথর হইয়া গেল। অথচ সে অতি শান্ত স্বরে একটু হাসিয়া বলিল, তোমার বাবু বুঝি ফিরিয়ে দিলেন, নিলেন না, কেমন ? চির পরিচিত 'জগদীশ দার' বদলে আজ 'তোমার বাবু' এ কথাটা মাধবের অশিক্ষিত কাণেও বাজিল। মাধব অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, হাঁ দিদিমণি, তিনি নিলেন না।

মৃন্ময়ীর ইচ্ছা হইল একবার বলে যে, দেখ, তোমার বাবুকে একটু ভদ্র হোতে বোলো। কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল।

মাধব ফিরিয়া গেলে জগদীশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, ফিরিয়ে দিয়ে এসেচিস ? মাধব কথা কহিল না—নত মস্তকে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, দিয়া আসিয়াছে। 'মিনু কি বল্লে ?' মাধব ঘাড় নাড়িয়া পুনরায় জানাইল যে, কিছুই বলে নাই।

'কিছুই না—একটা কথাও না ?'

মাধব বলিল 'না।'

আজ এই দুঃখ অপমানের দিনে মৃন্ময়ীর তিন জনের কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়িল—তার মা, জগদীশের মা ও বিন্দু। ইহাদের যে কেহ আজ বাঁচিয়া থাকিলে, তাহাদের ভিতরকার গ্লানি যাহা জমিয়া উঠিয়াছে, তাহা ধুইয়া মুছিয়া দিত।

বিকালের দিকে যখন জগদীশের মনে হইল যে, আজ সকালে সে কি নিরর্থক ছেলেমানুষী করিয়াছে, তখন সে বিলম্ব না করিয়া মৃন্ময়ীদের বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইল, অভিপ্রায় মৃন্ময়ীকে ডাকিয়া দুটো কথা কহিবে। সে যখন মৃন্ময়ীদের বাড়ী প্রবেশ করিল, তখন মৃন্ময়ী তাহার ঘরের বারান্দায় বসিয়া ছিল, জগদীশকে দেখিয়া ঘরের মধ্যে গেল। ইহাতে প্রার্থিত সন্ধি তো হইলই না, বরং চিত্তের তিক্ততা বাড়িয়া গেল।

সমস্ত দিন ঘর-বাহির করিয়াও মৃন্ময়ীর মনের দাহ কমিল না। এ অর্থহীন দুঃখের বোঝা সে কোথায় নামাইবে? কর্ম্মে তাহার আনন্দ নাই, অথচ বিশ্রামও ভয়াবহ। সন্ধ্যায় সে মুখুয্যেদের বাড়ী কথকতা শুনিতে গেল। কথকতার প্রথম দিকে এমন কিছুই ছিল না, তবুও সে অনেক চোখের জল ফেলিল; এবং অর্দ্ধেক হইতে না হইতেই বাড়ী ফিরিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

এমনি করিয়া বিরোধের যে আলো-ছায়া তাহাদের দুজনের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছিল, তাহা নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইল। তাই যে সঙ্গ পরস্পরের কাছে অতিমাত্র প্রিয় ও বাঞ্ছিত ছিল, তাহা দুজনেই এড়াইয়া চলিত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ইহাতে ইহাদের হৃদয়-মন সায় দিত না।

মৃন্ময়ীর বছর দেড়েক বিবাহিত জীবনের মাত্র মাস ছয়েক সে শ্বশুর-বাড়ীতে কাটাইয়াছে, সেই ছয়মাসই তাহার কাছে অসহনীয় বোধ হইয়াছিল। রোজ ভোর হইলে জগদীশের মুখ দেখিয়া তাহার শৈশব কৈশোর কাটিয়াছে। শ্বশুরগৃহে ছয় মাস অবস্থানকালে জগদীশকে সে দেখিতে পায় নাই। উঃ, সে দিনগুলি কি ব্যথাতেই কাটিয়াছে। সে তাহার প্রৌঢ় স্বামীকে ভালবাসিতে পারে নাই, এবং ইহাতে সে লজ্জাবোধ করে নাই, ইহাও সত্য। স্বামীর মৃত্যুতে মৃন্ময়ী ব্যথা একটু বোধ করিলেও, ফিরিয়া জগদীশকে দেখিতে পাইবে এই চিন্তা তাহার ব্যথাকে ফিকা করিয়া দিয়াছিল। শুধু কি মৃন্ময়ী একা! জগদীশ কাহার আকর্ষণে কলিকাতার কলেজ ছাড়িয়া গাঁয়ে আসিয়া বসিল? তাহার ইচ্ছা কি শুধু পরের উপকার এবং গ্রামের উন্নতি সাধন? মুখে জগদীশ কিছু না বলিলেও, মৃন্ময়ীর অন্তর্যামীর তো ইহা অগোচর ছিল না।

মৃন্ময়ী তবু আজ নিজে নিজেই বলিল, 'আচ্ছা বেশ' এবং দিন দুই পরে কাঁচি দিয়া সে তাহার সুদীর্ঘ একরাশ চুল কাটিয়া ফেলিল, যাহা তাহার দেহের অতিবড় সৌন্দর্য্য ছিল; এবং সর্ব্ব বিষয়ে জীবনযাত্রার কঠোরতা সুরু ক'রয়া দিল।

আকাশে মেঘ করে, জল হয়, ফুল ফোটে, পাতা ঝরে, দিন মাসে গড়াইয়া পড়ে, মাস বছরের দিকে অগ্রসর হয়। যদি পরিচিত অপরিচিত কেহ জগদীশের কথা তোলে, সে কোনও জবাব দেয় না।

রোজ যেখানে দেখা হইবার কথা, অথচ দেখা হয় না, হইলেও তেমন করিয়া হয় না, ইহা যখন মৃন্ময়ী ভাবে, তখন দুঃখে ক্ষোভে তাহার বুকটা ভরিয়া ওঠে। তাহার আর যাইবার স্থান নাই এক শ্বশুরবাড়ী ছাড়া। সেখানে নির্ম্মম শাশুড়ীকে মনে পড়িল, মমতাহীন যাকে মনে হইল। সমস্ত দিন সংসারে খাটিয়াও সেখানে এতটুকু হাসিমুখ কি মিষ্টিকথা ছিল না। তবুও সে সেই শ্বশুরবাড়ীতেই যাইবে ঠিক করিয়া, কাকীমাকে তাহার ইচ্ছা জানাইল।

কথাটা জগদীশও দিন দুই পরে শুনিল। তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, কিসের জন্য মৃন্ময়ী আবার শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে। সেই নীরস কর্ত্তব্য-কঠোর পূর্ব্ব-জীবনকে মৃন্ময়ী কেন বরণ করিতেছে।

আবাল্য-পরিচিত গৃহত্যাগে মৃন্ময়ীর যে কি ব্যথা, তাহা জগদীশকে বড় বাজিল। জগদীশের গাঁয়ে অনেক কাজ করিবার ছিল, কিন্তু মৃন্ময়ীর থাকা যে চাই-ই। এ যে তাহার অনেক দিনের মিনু,—তাহার সুখের মিনু, দুঃখের মিনু, এ যে বিন্দুর মিনু!

তার পরদিন গোটা দুই ট্রাঙ্ক গরুর গাড়ীর সামনে বসাইয়া জগদীশ ষ্টেশনের দিকে চলিল। গাঁয়ের পথ তখন বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধে ভরা। দূরে কোন্ একটী ছেলে টিনের ভেঁপু বাজাইতেছিল; আর সপ্তমীর চাঁদ আকাশে টুকরো মেঘের আড়ালে হাসিতেছিল।

চারিদিকে প্রকৃতির যখন এই মহোৎসব, তখন তাহার হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা লইয়া গো যানের এই তরুণ যাত্রিটী চালককে বলিতেছিল, নফর, একটু শীগ্‌গিরি ক'রে চালিয়ে নে ভাই—ট্রেণটা যেন ধর্ত্তে পারি।

বার্লিন

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ

(১৪)

ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার ওস্কার ফোন মিলার সর্ব্বদাই তড়িতের ডাকে সাড়া দিতে দিতে হয়রাণ হইতেছেন। বিদ্যুতের কতগুলা কারখানা ইঁহার নিজের হাতে গড়া তাহা গুণিয়া উঠিতে পারিলাম না। জার্ম্মাণ মুল্লুকের প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই ফোন মিলারের তলব পড়িয়াছে। জলের তেজ লইয়া মাথা খাটানো আজকাল ইঁহার এক মস্ত কাজ।

ইঁহার মতন লোকের আবহাওয়ায় কিছুকাল ধরিয়া সময় কাটাইবার সুযোগ পাওয়া যুবক ভারতের পক্ষে এক মহা সৌভাগ্যের কথা বিবেচিত হইবে। যে সকল ভারতীয় সুধী বিদেশে আসিয়া এঞ্জিনিয়ারিঙ্‌ লাইনে ডিগ্রি লইতেছেন, তাঁহারা এই ধরণের কেজো লোকের সাগ্‌রিতি করিতে পারিবার পূর্ব্বে কর্ম্মক্ষম হইতে পারিবেন কি না সন্দেহ।

মিউনিকের "ড্যয়চেস মুজেয়ুম্‌" ইজার দরিয়ার ভিতরকার এক দ্বীপের উপর গড়িয়া উঠিতেছে। এই সংগ্রহালয়ের তদবির করা ফোন মিলারের এক বড় কাজ। এই ধরণের এত বড় মিউজিয়াম জার্ম্মাণিতে আর নাই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এ যাবৎ দুনিয়ায় যাহা কিছু আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত হইয়াছে, সবই এই সংগ্রহালয়ে ধারাবাহিকরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি-ঘটিত সকল প্রকার আবিষ্কার এই বিপুল ভবনে সংগৃহীত হইতেছে।

এক কথায় কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ক্রম-বিকাশে বৈজ্ঞানিক এবং যান্ত্রিক স্রষ্টারা মানবজাতিকে কোথা হইতে কোথায় ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, ফোন মিলারের তত্ত্বাবধানস্থ এই জ্ঞান-মন্দিরে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শহরের অন্য এক ইমারতে এত দিন ধরিয়া সংগ্রহগুলা রক্ষিত হইতেছিল। আগামী বৎসর নবগৃহে প্রবেশ হইবে।

ল্যাণ্ডস্‌হুট্‌

(১৫)

বাড়ীওয়ালী বিধবা,—এক প্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসকের পত্নী। স্বামী যা কিছু টাকা পয়সা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া

গিয়াছিলেন, সবই মার্কের পতন হাঙ্গামায় রসাতলে গিয়াছে। কাজেই বিধবা এক প্রকার পথের ভিখারী।

এক মেয়ে ব্যাঙ্কে কাজ করে,—প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া। আর এক মেয়ে এক জমিদারের বাড়ীতে ছেলেদের অভিভাবক। এই দুই কন্যার রোজগারের উপর বিধবার জীবন ধারণ নির্ভর করিতেছে। মাকে খাওয়াইবার জন্য মেয়েরা আজ পর্য্যন্ত বিবাহের দিকে নজর দিতে ঝুঁকে নাই। ইহাদের বয়স ত্রিশের কোঠা পার হইয়াছে।

ইঁহাদের আত্মীয়-স্বজন সকলেই উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক। বাড়ীওয়ালীর এক ভাই ডাক্তার, এক ভাই এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি। বোনদেরও বিবাহ হইয়াছে এই ধরণেরই উচ্চ শিক্ষিত মহলে। এক ভগ্নীপতি যুক্তরাষ্ট্রে কন্সাল,—

চার্মার্কের বাড়ী—নয় মার্কট

অপর এক ভগ্নীপতি জার্ম্মাণির এক শহরে ওষুধের দোকানের মালিক।

বাড়ীওয়ালীর মাসী ছিয়াশি বৎসরের বুড়ী। এই বুড়ীর সঙ্গে আলাপ করিয়া ভাবিতেছি, চুল পাকিলেই লোকে বুড়া হয় না। জার্ম্মাণির এক উড়ো জাহাজে আজ বহুলোক জার্ম্মাণি হইতে আমেরিকায় পৌঁছিয়াছে—এই খবরটা পর্য্যন্ত বুড়ীর জানা আছে। আর এই সংবাদে যৌবন-সুলভ আবেগও তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছে। বলিতেছেন—"জার্ম্মাণির ভবিষ্যৎ তাহা হইলে অন্ধকারময় নয়।"

বুড়ীর নিকট "সেকালের" গল্প অনেক শুনিলাম। বলিলেন:—"তোমরা আজকাল মোটরকারে উড়িয়া উড়িয়া দেশ দেখ। সেকালে আমরা ঘোড়ার ডাকগাড়ীতে হাঁটিয়া হাঁটিয়া প্যারিস যাইতাম। আজ মিউনিকে দেখিতেছ দশ লাখ লোক। আমার আমলে এখানে এক লাখ লোকও ছিল না। যে সব বড় বড় ইমারত দেখিতেছ, তাহার প্রায় সব কয়টাই আমি উঠিতে দেখিয়াছি"

বুড়ীর স্বামী ছিলেন প্রসিদ্ধ চিত্রকর ফোন মেন্‌ৎসেল। "নয়ে পিনাকো টেক" নামক নব্য চিত্র-শিল্পের সংগ্রহালয়ে ফোন মেন্‌ৎসেলের আঁকা ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামীর ভাইয়েরা কেহ কেহ সেনাপতির পদে উঠিয়াছিলেন। বুড়ী বলিলেন:—"মিউনিকের নবরত্নের সঙ্গে আমাদের আনাগোনা বেশ ছিল। রাজ-শিল্পী জোসেফ ষ্টীলারের পুত্র কবি কার্লের ঘরে আড্ডা বসিত অনেক। তে হি নো দিবসা গতাঃ! আজকালকার নতুন নতুন ঢঙের লোকজনের সঙ্গে মেলা-মেশা আর পোষায় না। এখন কেবল দিন গুণিতেছি।"

বুড়ীর চোখে জল নাই। সকল কথার সঙ্গেই প্রাণভরা হাসি।

১৬

ব্যাহ্বেরিয়ার লোকেরা রাজতন্ত্রের সপক্ষে আন্দোলন চালাইতেছে। "কোনিসম্ বুন্ড" বা রাজদল নামক সমিতির অধীনে ব্যাহ্বেরিয়ার নরনারীরা ক্রোনপ্রিন্‌স্ বা যুবরাজ রুপরেক্‌ট্‌কে গদিতে বসাইবার জল্পনা কল্পনা করিতেছে। লাণ্ডস্‌হুটে, তাহার আঁচ পাইয়াছি। পল্লীতে পল্লীতে তাহার সাড়া দেখা গিয়াছে। মিউনিকেও এই আন্দোলন বেশ গরম থাকিবারই কথা।

"হোফ ব্রয় হাউস" নামক বিয়ার ভবন রেষ্টরাণ্টে একসঙ্গে প্রায় হাজার নর-নারীর অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখা গেল। মিউনিকে আসিয়া এই রেষ্টরাণ্টে খানা খায় না এমন বেরসিক লোক কেহই নয়।

এক টেবিলে গল্প জুড়িয়া দেওয়া গেল। মজুর, কেরাণী, বাবু, ব্যাঙ্কার, চিত্রকর, ইস্কুল মাষ্টার ইত্যাদি

সকল শ্রেণীর লোকই এই হাটে এক গেলাসের ইয়ার। পর্য্যটকের স্থাপস্যাক ঘাড়ে বহিয়া এক মহিলা তাঁহার স্বামীর সঙ্গে আসিয়া হাজির হইলেন। প্রসিদ্ধ বাস্তু-শিল্পী অধ্যাপক পেৎসোল্‌ড আমাদের সঙ্গী ও নগর-প্রদর্শক।

মহিলা বলিলেন,—"হিট্‌লারের আন্দোলনে আমাদের সহানুভূতি পুরাপুরিই ছিল। ব্যাহ্বেরিয়া হইতে ইহুদি ছোকরাদের হাতে দেশ-উদ্ধারের ভার থাকলে অনেক সময়ে এইরূপ আহাম্মুকি ঘটিতে বাধ্য।"

পত্নীর কথায় সায় দিয়া স্বামী বলিতেছেন,—"প্রশিয়ায় ব্যাহ্বেরিয়ায় আদায় কাঁচকলায় সম্বন্ধ। প্রশিয়ার দৌরাত্ম্য ব্যাহ্বেরিয়ানরা কোনো মতেই সহিবে না। জার্ম্মাণি দুই টুক্‌রা হইয়া গেলে আমাদের কোনো ক্ষতি নাই। প্রশিয়া উত্তর জার্ম্মাণির কর্ত্তা থাকুক। আর আমরা দক্ষিণ

ডোনডোর্ফ পল্লীর একটি দৃশ্য

জাতটাকে খেদাইয়া দেওয়া ছিল হিট্‌লারের সাধ। সেই কাজে প্রত্যেক খাঁটি ব্যাহ্বেরিয়ান নর-নারী সাহায্য করিতে রাজি। কিন্তু সেনাপতি লুডেনডোর্ফটার সঙ্গে মিশিয়া হিট্‌লার নেহাৎ কাঁচা কাজ করিয়াছিল। হাজার হইলেও হিট্‌লার ছোকরা যুবা।"

জার্ম্মাণিতে একটা নয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রজা হইব। সেই রাষ্ট্রে ব্যাহ্বেরিয়ার সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার (কম সে কম টিরোলের) সংযোগ সাধিত হইতে পারিবে।"

এক ব্যক্তি বলিলেন:—"লুডেনডোর্ফের কি আস্পর্দ্ধা! তার ইচ্ছা যে, ব্যাহ্বেরিয়া প্রশিয়ার লেজুর মাত্র থাকুক, আর প্রশিয়ার ক্রাউণপ্রিন্স—হোহেন্‌ৎসোলার্ণ দ্বিতীয় হ্বিল্‌হেল্মের পুত্র—নয়া জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের বাদশা হউক। কেন? আমাদের হ্বিট্টেলবাখ বংশ কি দোষ করিল? হিট্‌লার লুডেনডোর্ফের ধড়িবাজি ধরিতে পারে নাই। ব্যাহ্বেরিয়ার যা কিছু সম্পদ দেখিতে পাইতেছেন সবই আমরা হ্বিট্টেলবাখদের সৎপ্রয়াসে লাভ করিয়াছি। যুবরাজ

আমি থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম:—"কি রকম? লুডেন-ডোর্ফকে এত হেয় পদার্থ বিবেচনা করিতে-ছেন কেন?"

ডোনডোর্ফ পল্লীর অপর দৃশ্য

প্রথমেই বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া মহিলা বলি-লেন:—"লুডেনডোর্ফ আবার সেনাপতি? ব্যাহ্বেরিয়ার সেনাপতিদের কাছে লুডেনডোর্ফ দাঁড়াইবার উপযুক্ত লোকই নয়। ব্যাহ্বেরিয়ায় এত পাকা মাথা থাকিতে হিট্‌লার কি না প্রশিয়ার এই আনাড়িটাকে দলের কর্ত্তা বাছিয়া লইল? লজ্জার কথা। দুঃখের কথাও বটে। বিগত নবেম্বরের এমন সুযোগটা মাঠে মারা গেল। ছেলে

রুপ্‌রেক্‌টকে ছাড়িয়া আমরা কি হোহেন্‌ৎসোলার্ণদের চরণ সেবা করিতে ছুটিব? তাহা কখনই সম্ভবপর নয়।”

টেবিলে একটা ছোট খাটো রাজনৈতিক মজলিশ উপভোগ করিতেছি। ব্যাহ্বেরিয়ার খাঁটি স্বদেশী স্বরাজ সম্বন্ধে ভিতরকার কথা অনেক বাহির হইয়া পড়িল। তবে রুপ্‌রেক্‌ট রাজতক্তে বসিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। কেন না ইহুদিরা ব্যাহ্বেরিয়ায়ও ধনদৌলতে খুব পুরু। আর বোলশেভ্বিক সর্দ্দারদের গলার আওয়াজও বেশ চড়া।

(১৭)

বইয়ের দোকানে ছবির বাজার জার্ম্মাণির এক বিশেষত্ব। অধিকন্তু দোকানগুলা এরূপ ভাবে সাজানো বিশেষ। “গালারি” বা “কুন্‌ষ্ট হাণ্ডলুঙ” নামে অগণিত দোকানের সারি দেখিতেছি কোনো কোনো মহাল্লার প্রত্যেক সড়কে। আবার প্রত্যেক মহাল্লায়ই এই ধরণের দুই চারটা হাট নজরে আসিতেছে। দোকানগুলা ঐশ্বর্য্য-পূর্ণও বটে।

পশু-শিল্পী টিড্‌য়েনের চিত্রশালায় খোস-গল্প হইল। শুনিলাম কম সে কম বিশ হাজার নর নারী ছবি আঁকিয়া অথবা মূর্ত্তি গড়িয়া এই শহরে অন্ন সংস্থান করে।

অন্যান্য শহরের মতন মিউনিকেও নানা “দলে”র সুকুমার শিল্প চলিতেছে। এই সকলের প্রদর্শনীও বসে বৎসরে কয়েকবার। প্রত্যেক দলের ভিন্ন ভিন্ন হাট বাজার যে প্রবেশ করিলেই মনে হয় যেন সুকুমার শিল্পের প্রদর্শনী বা হাট দেখিতেছি। তাহা ছাড়া সচিত্র কেতাবের ছড়াছড়ি।
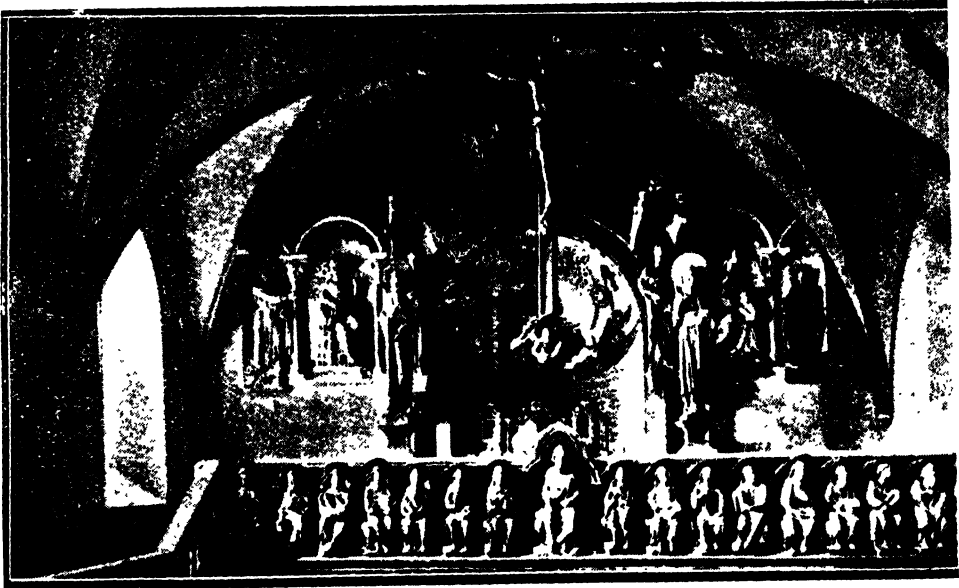
ট্রাউস্‌নিট্‌স দুর্গের ভিতরকার গির্জ্জা—ল্যাণ্ডস্‌হুট

ছবি ও মূর্ত্তির দোকান জার্ম্মাণির অলিতে গলিতে অনেক দেখিয়াছি। “কুন্‌ষ্ট হাণ্ড লুঙ” অর্থাৎ সুকুমার শিল্পের ব্যবসা প্যারিসে বেশী কি জার্ম্মাণ মুল্লুকের নগরে নগরে বেশী বলা সহজ নয়। হ্বিয়েনা, ড্রেস্‌ডেন, য়েনা, বার্লিন, ইন্‌স্‌ব্রুক,—সর্ব্বত্রই শিল্পের বাজার যে সে লোকেরই চোখে পড়ে। মিউনিক এই হিসাবে একটা রাজধানী সন্দেহ নাই। তবে প্যারিসের “গ্রাঁ প্যালে, “পেতি প্যালে” ইত্যাদি ভবনের মতন সার্ব্বজনিক প্রদর্শনীর জন্য এক বিপুল প্রাসাদ এখানেও দেখিলাম। নাম “গ্লাস পালাষ্ট” বা কাচের প্রাসাদ। এই শিষ-মহলের ছাদ ও দেওয়াল সবই কাচের তৈয়ারি। কাজেই বাস্ত ও চিত্রগুলার উপর আলো পড়িতেছে যথেষ্ট। গতানুগতিক রীতি হইতে সুরু করিয়া ভবিষ্যপন্থী পর্য্যন্ত সকল প্রকার মালই দেখা গেল। এখন চলিতেছে গ্রীষ্মের বাজার।

“কুন্‌ষ্ট” নামক সচিত্র শিল্প-পত্রিকার সম্পাদক কিখেল

এবার ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে সংবাদ চাহিতেছেন। পত্রিকায় ভারতবর্ষ এখনো প্রচারিত হয় নাই। জার্ম্মাণদের শিল্প পত্রিকাগুলায় দুনিয়ার শিল্প সংবাদ ঠাঁই পায়। অধিকন্তু পত্রিকাগুলার সাহায্যে শিল্প বাজারের কেনা বেচাও সাধিত হয়।

সমর বিভাগের "মায়োর" বা মেজর পদস্থ সেনাপতি কিছুকাল "বেকার" বা নিষ্কর্ম্মা ছিলেন। সম্প্রতি ইনি বাহ্বেরিয়ার "কুনষ্ট গেহ্বেবে ফারাইন" অর্থাৎ সুকুমার-

মাডোনা—নোল্ডে প্রণীত

শিল্প-ব্যবসায়-পরিষদের সম্পাদক হইয়াছেন। পরিষৎটা পঁচাত্তর বৎসরের পুরানা প্রতিষ্ঠান।

ইহাঁদের বাজারে দেখিলাম চীনামাটীর বাসন-কোসন হইতে সুরু করিয়া খাট, টেবিল, ছেলেদের খেলনা, মেয়েদের গহনা, বাবুদের ছড়ি, বাগ-বাগিচার আসবাব আর ছবি ছাপা, মর্ম্মর মূর্ত্তি আর কাঠের ফ্রেম পর্য্যন্ত। "সুকুমার শিল্প" শব্দটা ফ্রান্সে জার্ম্মাণিতে অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেখানেই রূপ সৃষ্টি আর রংয়ের খেলা সেইখানেই সুকুমার শিল্প। ছুতার মিস্ত্রী, কামার, কুমার, স্যাকরা, চিত্রকর, ভাস্কর সকলেই এ সকল দেশে "স্রষ্টা", "রূপদক্ষ" বা শিল্পী। আটপৌরে জীবনে এই কারণেই সৌন্দর্য্য, সৌষ্ঠব, সৌকুমার্য্য ইত্যাদির ছায়া পড়িতে পায়।

(১৮)

"রেসিডেন্‌ৎস" বা রাজবাড়ীতে হ্বিট্টেলবাখ বংশের বাস্তুভিটা দেখা গেল। পশ্চিমারা আগ্রা দিল্লী দেখিয়া না দেখিয়া "প্রাচ্যের বিলাস" প্রচার করিতে অভ্যস্ত। যে সকল প্রাচ্যের নরনারী হ্বার্সাই, পট্‌সডাম, ড্রেসডেন, হ্বিয়েনা ইত্যাদি শহরের প্রাসাদ দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন এই হিসাবে প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে কোনো দিনই প্রভেদ নাই। হীরা-জহরৎ সোণায় মোড়া দেওয়াল, সোণার খাট আর সোণার চেয়ার রাজারাজড়া মাত্রেরই "সামান্য ধর্ম্ম।"

হ্বিট্টেলবাখ বংশের বাদশামহাল আর বেগমমহাল দেখিয়া সেই "সামান্য ধর্ম্মের"ই আর একটা পরিচয় পাওয়া গেল মাত্র। এই প্রাসাদের দেওয়ালে দেওয়ালে যে সকল "গোব্‌লাঁ" ঝুলিতেছে সেই সব বোধ হয় মিউনিকের একটা "সেকেলে"—অর্থাৎ ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর

চিত্রশিল্পী লিবারমান—শিল্পীর নিজের আঁকা

বিশেষত্ব। আজকাল না কি এই ধরণের গালিচা বা সুজনী ব্যাহ্বেরিয়ায় তৈয়ারী হয় না। দেখিলে চোখ জুড়ায়। বুননগুলা যারপরনাই উৎকৃষ্ট সৃষ্টিকৌশলের সাক্ষী।

রেসিডেন্‌ৎসের দেওয়ালে ও ছাদে চিত্রাবলী আছে

দস্তুর মতন। রাজারা দেশ বিদেশ হইতে যে সকল ছবি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই সবও কোনো কোনো ঘরে মজুত দেখিতেছি। পর্যটক মাত্রেই একটা ঘরে ভিড় করিয়া জটলা করিতেছে। সকলের মুখেই শুনিতেছি,—"বাঃ! খুবসুরত! ওন্দা" ইত্যাদি।

ঘরটায় রক্ষিত হইতেছে জোসেফ ষ্টীলার প্রণীত "শ্যেন্‌হাইট্‌স্ গালারি" অর্থাৎ "সুন্দরীর হাট"। ষ্টীলার ছিলেন রাজশিল্পী। রাজার নজরে কোনো রূপসী পড়িবামাত্র শিল্পীর ডাক পড়িত। তৎক্ষণাৎ রূপসী চিত্রে দেখা দিতেন। রাজকুমারী হইতে রাস্তার ভিখারী পর্য্যন্ত
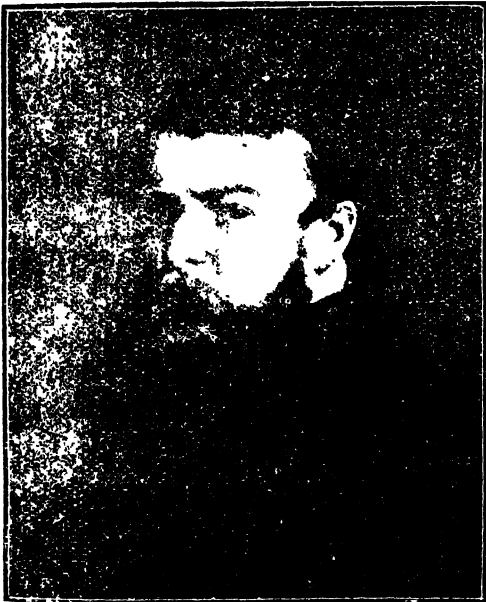
চিত্রশিল্পী টোমা—শিল্পীর নিজের আঁকা

কেহই এই হাটে বাদ পড়ে নাই। গোটা পঞ্চাশ পটমূর্ত্তি দেখিতেছি। ষ্টীলার গোটের আমলের লোক। গোটের ছবি ষ্টীলারের এক প্রসিদ্ধ কাজ। সে যুগের রুশ বাদশাও ষ্টীলারের হাতে রূপ পাইয়াছিলেন। ষ্টীলারের আঁকা ছবি পট্‌সডামের "সাঁসুসি" প্রাসাদে দেখিয়াছি। মিউনিকের "নয়ে পিনাকোটেক" মিউজিয়ামেও দেখিতে পাওয়া যায়।

(১৯)

বুড়া কের্শেন ষ্টাইনারের যৌবন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। জুলাই মাসে (১৯২৪) সত্তর পার হইয়াছেন। এই উপলক্ষে সরকারের তরফ হইতে এবং জন-সাধারণের তরফ হইতেও মহা সমারোহের সহিত সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতের শিক্ষকমহলে কের্শেন ষ্টাইনার পরিচিত কি না বলিতে পারি না। আমেরিকায় থাকিবার সময়েই কের্শেন ষ্টাইনারের নাম শুনিয়াছি। ১৯১৪।১৫ সালে ইঁহার দুই একখানা বইয়ের ইংরেজি তর্জ্জমা প্রকাশিত হয়। "শিক্ষাবিজ্ঞানের" সাহিত্যে ষ্টানলি হল এবং জন ডুয়ী ইত্যাদির যে স্থান, কের্শেন ষ্টাইনারেরও সেই স্থান।

কের্শেন ষ্টাইনারের একটা বিশেষত্ব আছে। সেইদিকে ভারতবাসীর নজর পড়া আবশ্যক। জার্ম্মাণিতে "বেরুফস্-শুলে" অর্থাৎ ব্যবসায়-বিদ্যাপীঠ এবং "ফোর্ট-বিল্ডুংস্-শুলে" অর্থাৎ "কন্‌টিনুয়েশন"-পাঠশালা নামক কতকগুলা ইস্কুল আছে। সেই সকল ইস্কুলে মজুরেরা নিজ-নিজ ব্যবসায়ে অবৈতনিক শিক্ষা পায়। অন্ততঃ পক্ষে আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক মজুর শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য। গবর্মেণ্টের অধীনে, না হয় শিল্প-কারখানার অধীনে ইস্কুলগুলা চলিয়া থাকে।

মনে রাখিতে হইবে যে,—চোদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক বালক বালিকাই সরকারী অবৈতনিক ফোল্‌কস্-শুলে বা প্রাথমিক পাঠশালায় ভারতীয় ম্যাট্রিকুলেশন বিদ্যার অধিকারী হইতে অভ্যস্ত। অর্থাৎ কোনো মজুরের বিদ্যাই ম্যাট্রিকুলেশনের কম নয়। তাহার পর কাজে ঢুকিয়াও মজুরেরা আরও চার বৎসর নিজ নিজ শিল্পে বা ব্যবসায়ে বিদ্যা বাড়াইবার সুযোগ পায়।

এই ধরণের বিদ্যা বাড়াইবার সুযোগ সৃষ্টি করাই কের্শেন ষ্টাইনারের আসল কীর্ত্তি। ১৯০০ সালের পূর্ব্বে মিউনিকে কন্‌টিনুয়েশন পাঠশালা একটাও ছিল না। কের্শেন ষ্টাইনার একটা একটা করিয়া ৪৬টা ইস্কুল কায়েম করিয়াছেন। কোনো ইস্কুলে জুতা তৈয়ারি করা শিখানো হয়, কোনো ইস্কুলে ঘড়ির কাজ শিখানো হয়। ছাপাখানার কাজ, বই বাঁধাইয়ের কাজ, ঘোড়ার লাগাম তৈয়ারি করা, দর্জ্জিগিরি করা, গাড়ী প্রস্তুত করা, বাগানের মালীর কাজ, পিঠাপুলি প্রস্তুত করা, হোটেল চালানো, ও ফুলের দোকান চালানো, কাঠের খোদাই, তড়িতের যন্ত্রপাতি চালানো ইত্যাদি প্রত্যেক শিল্প ও ব্যবসায়ের জন্য স্বতন্ত্র

বিদ্যাপীঠ আছে। মিউনিকের সকল বেরুফস্‌-শুলেতে প্রায় পনর হাজার ছেলে-মেয়ে—তরুণ-তরুণী—মজুরি করিবার ফাঁকে-ফাঁকে—বিনা পয়সায় বিদ্যা অর্জ্জন করিতেছে। কের্শেন ষ্টাইনারের নাম জানে না রাস্তায় ঘাটে এমন কোনো লোক নাই। কের্শেন ষ্টাইনারকে জার্ম্মাণ সমাজের অন্যান্য অঞ্চলেও একজন পথ-প্রদর্শকরূপে পূজা করা হইয়া থাকে।

সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে থাকিবার সময় কের্শেন ষ্টাইনারের কেতাব ফরাসী ভাষায় দেখিয়াছি। জেনেভার "আঁ্যাস্তি-তিউ জাঁ জাক্‌ রুসো" নামক শিক্ষা-বিজ্ঞানের বিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর ভিতর এই জার্ম্মাণ (ব্যাভেরিয়াণ) শিক্ষাবীরের পরিচয় পাওয়া যায়।

কের্শেন ষ্টাইনারের পত্নী বলিলেন,—"আমি সেই আঁ্যাস্তিতিউর পরিচালক ডক্‌টর ক্লাপারেদের ছাত্রী ছিলাম।" মহিলা মার্কিণ দার্শনিক জেম্‌সের চিত্ত-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ জার্ম্মাণ ভাষায় তর্জ্জমা করিয়াছেন। জার্ম্মাণির জ্ঞানমণ্ডলে মোসাফিরি করিতে করিতে লক্ষ্য করিয়াছি যে অধ্যাপকদের পত্নীরা অনেকেই বিদুষী এবং গ্রন্থকর্ত্রী।

মহিলা গিন্নীগিরির কাজে ঢিল দিতে অভ্যস্ত নন্‌ দেখিলাম। ঝী আছে বটে, কিন্তু ঘরকন্নার সকল দিকেই নজর ইঁহার তীক্ষ্ণ। দু একবার যাওয়া আসা করিতে করিতে কুটুম্বিতা বাড়িয়া গেল। কের্শেন ষ্টাইনারের পত্নী বলিলেন,—"এস তোমাদিগকে আমাদের ঘরগুলা দেখাই। এই যে 'ষ্টুবে' বা বৈঠকখানাটার আসবাব দেখিতেছ, সবই টিরোলী ঢঙের জিনিষ। শোবার ঘরের খাট, টেবিল, সাজসজ্জাও সবই আমরা টিরোল হইতে আনাইয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে বাড়ীটা যখন তৈয়ারি করানো হয়, তখন আমার স্বামী টিরোলী বাস্তু-রীতির ভিতর-বাহির মনে রাখিয়া এঞ্জিনিয়ারকে কাজে নামাইয়াছিলেন।"

(২০)

বাস্তুশিল্পী পেৎসোল্ডের "আটেলিয়ে" বা কর্ম্মশালায় গতিবিধি চলিতেছে। কাঠে, কাচে, পোর্সলেনে, পাথরে নানাপ্রকার পদার্থেই শিল্পীর রূপদক্ষতা বিরাজ করিতেছে।

এক ব্যক্তির বসতবাড়ী তৈয়ারি হইতেছে। সম্মুখের দেওয়ালে মান্ধাতার আমলের "নিবেলুঙ্" বীরদের কাহিনী খোদাই করা তাঁহার সাধ। সেই ফরমায়েস পাইয়া পেৎসোল্ড কাদামাটি দিয়া মূর্ত্তি গড়িতে লাগিয়া গিয়াছেন। এই ধরণের বহু সেকেলে কাহিনী পেৎসোল্ডের হাতে প্রথম মূর্ত্তি পাইয়াছে। রূপের বাজারে পেৎসোল্ড "ক্লাসিক" অর্থাৎ গ্রীক-রোমাণ রীতির প্রতিনিধি। ইঁহার সঙ্গে দু এক মহিলা সাগরেত পোর্সলেনের কাজে বাহাল আছে। পেৎসোল্ডের বাল্যবন্ধু ডিল আজীবন সহশিল্পী রহিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক মূর্ত্তিটাই একসঙ্গে দুইজনের হাতের কাজ।

বনের হরিণ—মার্ক প্রণীত

পেৎসোল্ড বলিলেন,—"যত দিন আমরা অবিবাহিত ছিলাম, তত দিন আমরা এক বাড়ীতে বসবাস করিয়াছি। বিবাহের পর এক বাড়ীতে দুই পরিবারের স্থানাভাব। কাজেই বসবাস এখন আলাদা। কিন্তু কাজকর্ম্ম সবই যৌথ।"

"এংলিশার গার্টেন" বা বিলাতী বাগিচা হইতে প্রিন্‌ৎস রেগেণ্টেন ষ্ট্রাসেতে আসিলে প্রথমেই পড়ে নাট্‌সিওনাল মুজেয়ুম। এইখানে ইজারের উপর এক সুন্দর সাঁকো। অপর পাড়টা কথঞ্চিৎ উঁচু,—পাহাড় সদৃশ। তাহার

উপর এক বিজয়-স্তম্ভ শোভিতেছে। মাক্‌সিমিলিয়ান-বাগিচার এই বাস্তু-সম্পদ যে কোনো মিউনিক-পর্য্যটকের চিত্ত আকৃষ্ট করিবে। এই স্তম্ভ পেৎসোল্ড এবং ড্রিয়েলের গড়া।

পেৎসোল্ড বলিলেন,—"১৮৭১ শান্তিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য ১৮৯৫ সালে মিউনিক শহরের কর্ত্তারা শিল্পী মহলে ফরমায়েস পাঠাইয়াছিল। তখন আমরা সবেমাত্র আকাডেমি বা শিল্পবিদ্যালয় হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছি। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশজন নামজাদা বাস্তুশিল্পীর

ভোনমায়েরর আঁকা ছবি

মোসাবিদা নগর-শাসকদের হস্তগত হয়। আমরাও একটা খসড়া পাঠাইয়াছিলাম। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরাই জয়ী হই। তিন বৎসর দিনরাত খাটিয়া ফ্রিডেন্‌স-ডেঙ্কমাল বা শান্তি-স্তম্ভ তৈয়ারি করিয়াছি। এইটাই আমাদের প্রথম কাজ। তাহার পর হইতে আমাদের কাজ নানা সরকারী ও সার্ব্বজনিক ফরমায়েস অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।"

যৌবনে নামজাদা হওয়া সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু সতীর্থ সুহৃদ্‌গণের হিংসার আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয়,—কি প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে,—কি শিল্পীমহলে কি সুধীমহলে। পেৎসোল্ড বলিতেছেন,—"লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা আমাদের কপালে একপ্রকার খতম হইয়াছে। নিজেরা ঘরে বসিয়া নিজ নিজ ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছি। সামাজিক লেনদেনের হট্টগোলে ভিড়িলে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিবে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনারা যে সময়ে যুবা, হিল্‌ডেব্রাণ্ড সেই সময়ে বোধ হয় খুব প্রবীণ লোক। তাঁহার সঙ্গে আপনাদের বনিবনাও কিরূপ ছিল?"

পেৎসোল্ড বলিলেন:—"হিল্‌ডেব্রাণ্ডকে আমরা গুরুস্থানীয় বিবেচনা করিতাম। ঘটনাচক্রে—সৌভাগ্য-ক্রমে তিনিও আমাদিগকে সুনজরেই দেখিতেন। আমরা যে সময়ে ডেঙ্কমালটার ফরমায়েস পাই, প্রায় সেই সময়েই—১৮৯৫ সালে—হিল্‌ডেব্রাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি মাক্‌সিমিলিয়ানস্ প্লাট্‌সে রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। হ্বিট্টেল্‌স বাখার ব্রুন্নেল নামে যে অপূর্ব্ব জলের ফোয়ারা দেখিয়াছেন সেইটা হিল্‌ডেব্রাণ্ডের গড়া।"

পথিকেরা রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে ঐ চৌরাস্তায় হাজির হইলে ব্রুন্নেলটার চমৎকার পরিকল্পনা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে বাধ্য। আশে পাশের আকাশ এবং আবেষ্টনের ইমারত-গুলার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এই প্রস্তরশিল্পের বিশেষত্ব। হিল্‌ডেব্রাণ্ডের রূপতত্ত্ব "ডফোর্ম" নামক গ্রন্থে প্রচারিত আছে।

(২)

বাড়ীওয়ালী ফ্রাওয়েন-কির্খে নামক মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "নয়ে ষ্টাট্‌স্ গালারি"তে জার্ম্মাণ চিত্র শিল্পের বিপুল মেলা বসিয়াছে। এইটা না দেখিয়া মিউনিক ছাড়িয়া গেলে অন্যায় করা হইবে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের জার্ম্মাণ কাজ এইখানে দেখানো হইতেছে। জার্ম্মাণির ভিন্ন ভিন্ন মিউজিয়াম এবং দূরদেশস্থ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ছবিগুলা আনা হইয়াছে।"

দেখা গেল। সংগ্রহ উঁচু দরের বটে। জার্ম্মাণির অন্যান্য নগরেও মনে হইয়াছে,—চিত্রশিল্পের আসরে দুনিয়ার লোক জার্ম্মাণদিগকে সম্মান করিতে শিখে নাই। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিত্রশিল্পে জার্ম্মাণরা কোনো মতেই অন্য কোন জাতি হইতে নিকৃষ্ট জীব নয়। ১৮৭৫—১৯২৪ এই পঞ্চাশ বৎসরের কাজগুলা

দেখিবা মাত্র সেই ধারণাই আবার বদ্ধমূল হইল। বার্লিনের নাট্সিওনাল গালারিতে বর্ত্তমান সংগ্রহের কোনো কোনোটা পূর্ব্বেই কয়েকবার দেখিয়াছি।

ফরাসী শিল্পীদের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিব,—কোন মারে (১৮৩৭—৮৭) জার্ম্মাণির সেজান-স্থানীয়। ইঁহাকে নব্য চিত্রশিল্পের অন্যতম জন্মদাতা বলা যাইতে পারে। ইঁহার রূপরঙ দেখিয়া গতানুগতিকরা মোটের উপর খুসীই হইবেন। তবে "ছোকরারা"ও এই সকল কাজে নবযুগের সুপ্রভাত ঠাওরাইতে ছাড়িবেন না।

এই লাইনের কাজে ফ্রান্সে মার্ক (১৮৮০—১৯১৫) অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছিলেন। ভবিষ্য-পন্থিতার অনেক দাগ মার্কের পশু ও প্রকৃতির গড়নে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণগুলা বেশ মোলায়েম ভাবে মিশানো আছে। কাজেই চরম মতের গতানুগতিকরা ছাড়া অন্যান্য সমঝদারেরা মার্ককে বয়কট করিবে না।

কিন্তু ভবিষ্যপন্থীদের চরমে ঠেকিয়াছেন ফাইনিঙ্গার (১৮৭১—)। এই শিল্পীর রূপ রঙ বিলকুল "জ্যামিতিক"। প্যারিসের আল্‌বেয়ার গ্লেজ ফাইনিঙ্গারকে জুড়িদার বিবেচনা করিবেন। চরম মতের নবীনেরা আজকাল কোকোশ্‌কা, পেখষ্টাইন, নোল্ডে ইত্যাদিকে পাঁড় বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। যাহারা বোল্‌শেভিক কাণ্ডে ভয় পায় তাহাদের পক্ষে এই সকল উদ্দাম রূপদক্ষতার সম্মুখে না আসাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরে গতানুগতিক রীতিও কম পুষ্টিলাভ করে নাই। সেই রীতির প্রতিনিধিও অনেক দেখিতেছি। আজকাল বার্লিনের আকাডেমির কর্ত্তা লিবারমান। তাঁহার চিত্রশিল্পের নাম-ডাক আছে। বোক্‌লিন (১৮২৭—১৯০১) এই রীতিরই একজন জার্ম্মাণ "বীর"। বৎসর কয়েক হইল হান্‌স টোমার (১৮৩৯—১৯২১ মৃত্যু হইয়াছে। টোমাকে লইয়া জার্ম্মাণরা খুব মাতামাতি করিয়া থাকে। পশু-শিল্পী জিগেলকে (১৮৫০—) টিউ্‌বেন দীক্ষাগুরু বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

উনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মাণ চিত্রকরদের অনেকেই কোনো কোনো বয়সে মিউনিকে আসিয়া ইজারের ঘাটে জল খাইয়া গিয়াছেন। আজকালকার জার্ম্মাণ শিল্পীরাও মিউনিকের ডাকে সকলেই সাড়া দিয়াছেন। এ মিউনিকের কম গৌরব নয়।

(২২)

জার্ম্মাণিতে আজকাল আর দিনে দশবার করিয়া মার্কের দাম কমে না। কাগজের নোট ছাপাছাপি অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। নবেম্বর হইতে নয় মাস ধরিয়া "পাকা টাকা" জারি হইয়াছে। নাম তার "রেন্টেন মার্ক।" জার্ম্মাণির সকল ব্যাঙ্ক, কারখানা এবং

ইহুদিদের দল—কোকাশ্‌কা প্রণীত

কৃষি সম্পত্তির মালিকেরা সমবেত হইয়া এই টাকা চালাইবার ভার লইয়াছে। গবর্মেণ্ট দুই বৎসর ধরিয়া দেউলিয়া ভাবে চলিতেছিল। রেন্টেনমার্কের মালিকেরা গবর্মেণ্টকে কিছু টাকা ধার দিয়া তাহার ইজ্জদ বাঁচাইতে সাহায্য করিয়াছে। তবে গবর্মেণ্ট এখন আর নিজ খেয়াল অনুসারে যখন তখন টাকা জারি করিতে অর্থাৎ নোট ছাপিতে অধিকারী নয়। মুদ্রার উপর ষোল আনা কর্ত্তৃত্ব না থাকা গবর্মেণ্টের পক্ষে অপমানের কথা সন্দেহ নাই।

ইতিমধ্যে বিলাতে মজুর-রাজ কায়েম হইয়াছে রামজে-ম্যাকডোনাল্ডের সর্দ্দারিতে দুনিয়ার স্বর্ণযুগ আসে নাই বটে,—কিন্তু বিশ্বসমস্যা যেরূপ জটিল তাহাতে মজুর-দলকে নেহাৎ গালাগালি করাও বেকুবি। ফ্রান্সেও

পয়কারের রাজত্ব নাই। তাঁহার ঠাঁইয়ে সোশ্যালিষ্ট এরিয়ো হইয়াছেন রাষ্ট্রের কর্ণধার। এরিয়ো আর রামজে মাক্‌ডোনাল্ড দুয়ে মিলিয়া ইয়োরোপকে মেরামত করিবার কাজে ব্রতবদ্ধ হইয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত লণ্ডনে বৈঠক বসিল। বাদানুবাদ চলিতেছে।

এই বাদানুবাদে "খানিকটা" যোগ দিবার অধিকার পাইয়াছে জার্ম্মাণিও। জার্ম্মাণিতে ন্যাশন্যালিষ্টরা দলে

দাঁড়বাহী—ভোন মারে প্রণীত

ফুলিয়া উঠিয়াছে বটে এবং কমুনিষ্টদের সংখ্যাও অনেক সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুই চরম দলের চেয়ে বেশী প্রতাপশালী লোক হইতেছে সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাটিশে পার্টাই অর্থাৎ সোশ্যালিষ্ট-পন্থী দল। ইহাদিগকে এক কথায় এরিয়ো, রামজে-মাকডোনাল্ড ইত্যাদিরই "দলের লোক" বলা চলে।

জার্ম্মাণরা লণ্ডনের সমঝোতাটা হজম করিয়া লইল। রুর-রাইণ হইতে বিদেশী পল্টন এখনো সরানো হইবে না। জার্ম্মাণ শিল্প-বাণিজ্যের উপর বিজেতাদের কড়া চৌকি এখনো বজায় থাকিবে। তবে ইহারা সকলে মিলিয়া জার্ম্মাণ গবর্মেণ্টকে কয়েক কোটি টাকা ধার দিতে রাজি হইয়াছে। সেই টাকা পাইলে গবর্মেণ্ট আবার নিজের তাঁবে মুদ্রা চালাইতে সমর্থ হইবে। তখন রেণ্টেনমার্ক তুলিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে।

ন্যাশন্যালিষ্টরা বলিতেছে :—"এক মুঠা অন্নের জন্য সোশ্যালিষ্টরা আবার বিজেতাদের নিকট স্বদেশকে বিকাইয়া দিল।" লুডেনডোর্ফ এবং হিণ্ডেনবুর্গ যুবার দল ক্ষেপাইবার কাজে মোতায়েন আছেন। ব্যাভেরিয়ায়ও লণ্ডনের সমঝোতার বিরুদ্ধে লোকমত কম জবর নয়। কিন্তু দেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে মাতব্বর লোক ন্যাশন্যালিষ্টরা নয়, কমুনিষ্টরাও নয়। এই বিভাগের আসল ওস্তাদ ইহুদি এবং ইহুদি-নিয়ন্ত্রিত সোশ্যালিষ্ট দল। তবে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বহু খৃষ্টান এবং রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে ন্যাশন্যালিষ্ট-পন্থী শিল্প-পতিরা সোশ্যালিষ্টদের মতেই সায় দিয়াছে।

তিন বৎসর পূর্ব্বে আগষ্ট মাসের শেষে প্যারিস হইতে জার্ম্মাণিতে পৌছিয়াছিলাম। জার্ম্মাণ মুলুকের আওতায় পুরা তিন বৎসর কাটিল! ইতিমধ্যে দুইবার অষ্ট্রিয়ায় কাটিয়াছে মাস দেড়েক, উত্তর ইতালিতে দুই-বারে মাস দুই এবং সুইটসার্ল্যাণ্ডে ছয় মাস। মোটের উপর ছাব্বিশ সাতাইশ মাস জার্ম্মাণ সমাজে বসবাস করা হইল। জার্ম্মাণি এত বড় দেশ যে এখানে ভারত-সন্তান ছাব্বিশ সাতাইশ বৎসর কাটাইলেও প্রতিদিনই স্বদেশের জন্য নতুন নতুন "স্বকার্য্য সাধনে"র ফিকির ঢুঁড়িয়া পাইবেন।

তুমি মোরে করেছ কামনা

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

তুমি মোরে করেছ কামনা,
আমি আনমনা
দেখি নাই চেয়ে—তুমি যে না পেয়ে ;
চলে গেছ কতখানি দূরে ;
আজি তব বাঁশরীর সুরে
পড়ে গেল মনে, আজি কেমনে
তোমারে ফিরাব বল আর ?
চারি ধারে আঁধারের এসেছে জোয়ার !

তবু মোর টল মল তরী,
তব আশা ধনে ভরি
দিলাম খুলিয়া,
আঁধারে ভুলিয়া,
এ যদি গো যেতে নাহি পারে
তোমার সুদূর পারে,
তবু মোর যা ছিল দিবার,
সব দিয়ে একেবারে বাঁচিনু এবার

মেঠো হাকিমের কড়চা

শ্রীমুহ্‌তমিম্‌ বন্দোবস্ত্‌

ঝুট্‌ গোপুচ্ছ

এক

সেবার হাজারিবাগ জেলার বগোদর থানার চিত্রামো গ্রামে তাঁবু ফেলিয়া, মুহরী, মুন্‌সরিম্‌, আমিন, পেস্কার, কানুন্‌গো প্রভৃতি দলবলসহ তসদিক্‌ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। চিত্রামো গ্রামখানি আয়তনে বড়; ইহার তিনটি ডিহি বা টোলা। প্রধান ডিহিতে 'গঞ্জু' নামক আদিম জাতির বাস, আর দুইটিতে সাঁওতালদের বাস। গ্রামের বাহিরে হোলঙ্গ যাবার পাকা রাস্তার ধারে, এক-প্রস্ত ঢালু উচ্চ ভূমির উপর আমরা 'ডেরা' পাতিয়াছি। চিরন্তন প্রথানুসারে, ৬০ ফিট লম্বা আর ৬০ ফিট চওড়া যায়গা বাঁশের বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার কাছারী স্থাপিত হইয়াছে। ঐ ঘেরার মধ্যে আমার ভ্রমণশীল এজলাস। পশ্চিমদিকে বিপুলকায় এক বটবৃক্ষ আমাদিগকে ছায়া দানে আপ্যায়িত করিত। দক্ষিণ কোণে, বিরাটকায় কতকগুলি শালতরুও যথাশক্তি অতিথি সৎকারে পরাঙ্মুখ ছিল না। আমি ছায়ার লোভে প্রাতে এই শালবৃক্ষতলে, আর বৈকালে বটবৃক্ষমূলে, বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিতাম। এজলাসের আড়ম্বর কিছুই ছিল না। একখানি ক্যাম্প টেবিল, জীর্ণ একখানি ক্যাম্প চেয়ার, পাশে একখানি বেঞ্চ। কিছু দূরে লালটুলের পাগড়ী শোভিত আর্দ্দালি বিভীষিকাময় কণ্ঠে আদালতের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিত; আর নিরীহ সাঁওতালদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিত আর্দ্দালি সিংহেশ্বর সিং।

তখন মাসের শেষ। তাম্বুর নিকটেই হোলঙ্গের বাঙ্গলা। চারি দিকে পলাশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। শাল, মহুল, পিয়াশাল বৃক্ষ নব পল্লবিত হইয়া স্নিগ্ধ শোভা ধারণ করিয়াছে। মাঝে মাঝে কুসুম গাছের লাল ঝাঁকড়া পাতায় বন আলো করিয়া আছে। বিহঙ্গকুলের বিচিত্র কাকলীতে বনভূমি সদাই মুখর। শালপুষ্পের মধুর মোলায়েম গন্ধে সমীরণ মাতিয়া আছে। আমার কিন্তু এই মনোলোভা শোভা উপভোগ করিবার অবসর ছিল না। নীরস খসড়া, খতিয়ান, খেবট লইয়া, জমিজমার বিচার ও ব্যবস্থা করিতেই দিন রাত কাটিয়া যাইতেছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব হইতে দূরে বন-জঙ্গল, পাহাড়ের মধ্যে, বন্দোবস্ত-বিভাগের কঠোর বিধানের শৃঙ্খলে জড়িত থাকিলেও, হাস্য-চঞ্চলা প্রকৃতি হৃদয়-রাজ্যে অপূর্ব্ব ভাবের তড়িৎ-প্রবাহ ছুটাইয়া দিতে চাহিত; কিন্তু সে ক্ষণেকের তরে!

রাত্রে সে রাজার পুণ্যদেশ ধন্য করিয়া এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। প্রভাত-সমীরণ কানন-কুসুমের সুবাসের সঙ্গে পূত বনভূমির সুগন্ধ আনিয়া দিতেছিল। তপনালোক উজ্জ্বল ও অরুণ; কিন্তু সুশীতল সমারণ আলিঙ্গনে তাপহীন। উচ্চশির শাল তরুতলে বসিয়া, আমি চিত্রামোর বিবাদ-তালিকা আনিবার আদেশ করিলাম। যথাসময়ে চিত্রামোর বিবাদের ফর্দ্দ টেবিলে প্রসারিত হইল। যথা সময়ে আর্দ্দালি-পুঙ্গব ভীমগর্জ্জনে চিত্রামোর 'মালিকি' স্বত্বের বাদী ও বিবাদী, সদাশিবলালা ও গোবর্দ্ধন মাহাতোকে ডাক পাড়িল। বেড়ার সম্মুখে রাস্তা পর্য্যন্ত লোকে ভরিয়া উঠিল। সমবেত জনসঙ্ঘের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্যের অস্ফুট ধ্বনি ক্ষণে উঠিয়া ক্ষণে মিলাইল।

চিত্রামোর মধ্যে ভেলাইডিহার মুরিল হাঁসদা 'খুঁটকাটি প্রধান'; কাজেই তাহার সামাজিক প্রতিষ্ঠা খুব বেশী। তাহার পিতা সিংহরায় হাঁসদার সমাজে মান-সম্ভ্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। জঙ্গল কাটিয়া, বনভূমি পরিষ্কার করিয়া যারা গ্রামের প্রথম পত্তন করে, এ দেশের আইনে তাদের বলে 'খুঁটকাটি প্রধান'। লোকে

তাদের বলে 'মাহাতো'। 'মাহাতো' আখ্যা আভিজাত্য সূচক। বাপের পুণ্যে মুরিল মাহাতোরও সমাজে বেশ খাতির ছিল। মুরিল একে জাতিতে সাঁওতাল, তায় বুনিয়াদি বংশের ছেলে। কাজেই এই মামলায় সে একজন প্রধান সাক্ষী।

বাদী সদাশিবলাল বিশ্বম্ভর লালার একমাত্র সন্তান। বিশ্বম্ভরের পূর্ব্বপুরুষেরা নিরীহ নিরক্ষর বন্যজাতিদের নিকট হইতে ছলে বলে ও কৌশলে যে জমীজমা ও সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিল, বিশ্বম্ভর বিলাসে ও গৃহবিবাদে তার সমস্তই খোয়াইয়াছে। বিশ্বম্ভরের বড় সাধের চিত্রামো মৌজা ঋণের দায়ে এখন পরহস্তগত। সদাশিব এই সম্পত্তি উদ্ধারের ছল খুঁজিতেছিল,—জরীপ ও জমাবন্দীর হুজুগে সে সুযোগ পাইয়া বিবাদ বাধাইয়াছে।

গোবর্দ্ধন মাহাতো—জাতিতে সুকুলীয়ার। বাংলা দেশের নমঃশূদ্রের তুল্য। পেশা তার মহাজনী ও বাণিজ্য। ক্ষমতার জোরে নিজের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি করিয়া এখন ভূস্বামীও হইয়াছে। শত্রুর অভাব তার ছিল না।

সাঁওতাল জাতির সত্যবাদিতার উপর গোবর্দ্ধনের অটল বিশ্বাস। সেই জন্য বোধ হয় তাহার মুখে আশঙ্কার চিহ্নমাত্র ছিল না, এবং জয়াশার অস্ফুট আলোক-রশ্মিতে তাহার নয়নযুগল উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল।

'কিসের বিবাদ'—এই বলিয়া আমি বিচার আরম্ভ করিলাম।

'বিবাদের কিছুই নাই, ধর্ম্মাবতার'—গোবর্দ্ধন উত্তর করিল।

'সব সাক্ষী আমার হাজির আছে',—সদাশিব বলিয়া উঠিল।

গোবর্দ্ধন বলিল, 'আচ্ছা, তাঁরই সাক্ষী নিয়ে বিচার করা হোক্, আমার অন্য প্রার্থনা নাই। মুরিল মাহাতো ত এ অঞ্চলের সকলেরই সম্মানভাজন ব্যক্তি,—মুরিল গোপৃষ্ঠে হাত দিয়া বলুক—ছ'বছর ধরে সে কাকে মাল-গুজারি আদায় দিচ্ছে। সে যদি বলে সদাশিবকে দিচ্ছে, আমি আর চিত্রামো যাব না, এই মুখেই বাড়ী চলে যাব।'

'এ কথা যুক্তিযুক্ত'—আমি বলিলাম।

'আচ্ছা তাই হোক্'—কম্পিত কণ্ঠে সদাশিব সম্মতি জানাইল।

আর্দালিকে গাই আনিবার আদেশ দিলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সিংহেশ্বর সিং গাভী লইয়া উপস্থিত হইল। ভিড় দেখিয়াই হোক্, অথবা এ সব মামলা মোকদ্দমায় স্বকীয় পুচ্ছ কলঙ্কিত করিবার অনিচ্ছাতেই হোক্, গাভী বেজায় শিং নাড়িতে লাগিল, লাফাইতে লাগিল। চারিজন বলিষ্ঠকায় সাঁওতাল তাহাকে এজলাসের সামনে ধীর হইয়া থাকিবার শিষ্টতা শিক্ষা দিতে লাগিল।

লোকে লোকারণ্য, কিন্তু টুঁ শব্দ নাই কোথায়ও 'এবার মুরিল',—আমি ডাকিলাম।

'আমার আপত্তি নেই, তবে গোপুচ্ছের আবশ্যক কি আছে হুজুর!'—মুরিল ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

'সত্য কথা যদি বল্‌বে, তবে গোপুচ্ছকে ভয় কেন মুরিল'—গম্ভীর ভাবে আমি জবাব দিলাম।

জনসঙ্ঘ চমকিত হইল। সকলের চক্ষু মুরিলের উপর গিয়া পড়িল। মুরিলের মুখের ভাব প্রসন্ন নহে। তাহার মনের মধ্যে একটা তুমুল ঝড় উঠিয়া তাহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছিল।

'দেরী কেন?'—আবেগ ও উৎকণ্ঠায় গোবর্দ্ধন চেঁচাইয়া উঠিল।

'না, দেরী নাই' বলিয়া মুরিলের অনিচ্ছা-চালিত হস্ত গাভীর পুচ্ছে সংযুক্ত হইল। রুদ্ধকণ্ঠে মুরিল বলিল, 'সদাশিবের কাছ থেকে আমি ছ'বছরের রসিদ পেয়েছি।' বলিবামাত্র গাভী সবেগে লম্ফ প্রদানে বিচারস্থল পরিত্যাগ করিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বেড়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ হইতে কে একজন বজ্রনির্ঘোষে বলিয়া উঠিল, 'ঝুট্ গোপুচ্ছ করলস্—এ হুজুর, মুরিল ঝুট্ গোপুচ্ছ করলস্।'

তরুণ শাল পল্লবের আড়ালে প্রভাতের তরুণ কিরণ যেন খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমার হাত হইতে কলম খসিয়া পড়িল।

দুই

সমবেত জনমণ্ডলী নির্ব্বাক হইয়া সেই বজ্রনিনাদী কণ্ঠস্বরের দিকে মুখ ফিরাইল। দেখিল, এক সুদীর্ঘবপু সাঁওতাল তখনও থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার দীর্ঘ,

কৃষ্ণ কেশপাশ পৃষ্ঠদেশে তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছে। তাহার বৃহদাকার চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত হইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতেছে। কান্তি তাহার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; দেহ সুদৃঢ় হইলেও যেন ঈষৎ শীর্ণ। দক্ষিণ হস্তে বজ্রমুষ্টিবদ্ধ দণ্ড যেন কাহার দণ্ডবিধানের জন্য ক্ষণে ক্ষণে বিচ্যুত হইতে চাহিতেছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলে বিস্মিত, ভীত হইল।

দেখিলাম, তাহার আরক্ত নয়নযুগল যেন মুরিলকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়াছে। মুরিল সেই তীব্র চাহনি সহিতে না পারিয়া, নতশিরে, ভূমি-সংলগ্ন দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া বেতস-পত্রের মত কাঁপিতেছে। বুঝিলাম, মুরিল মিথ্যা 'গোপুছ' করিয়াছে।

চিত্রামোর বিবাদ আর ফয়সালা হইল না। সেদিনকার মত কার্য্য বন্ধ রাখিবার আদেশ দিয়া সেই দীর্ঘকেশ, কৃষ্ণকান্তি ব্যক্তিকে সম্মুখে ডাকিলাম,—চিনিলাম তাহাকে। সে যে ফুলশোলের প্রধান, মেঘরায় মুর্ম্মু।

'গোপুছ ঠিক হয় নাই'—মেঘরায় নিবেদন করিল। সোৎসুক হৃদয়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? 'এসব সদাশিবের কাণ্ড! দোহাই তোর, হুজুর, সদাশিব ত গরীব বটে, তবে ধরম আগে, না সদাশিব আগে?'—মেঘরায় উত্তেজিতকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল। 'তুই গোপুছ্ মানিস না,—মানুষ কি সব এক রকম আছে? বুঝে ছাখ্, তার পর বিচার কর্।'

মেঘরায়ের এই কথাগুলি আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিল। তখনকার জন্য আমি আইন-কানুনের বাঁধাবাঁধি বিস্মৃত হইলাম,—সত্য উদ্ঘাটন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলাম। আদালত বন্ধ করিলাম। বলিয়া দিলাম, সদাশিবের মামলার বিচার পরে হইবে।

'কেন, আজ হইলেই ভাল হয়', সদাশিব প্রতিবাদ করিল। 'সন্দেহ আছে, তদন্ত করিব', আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। 'গোপুছের উপর আবার সন্দেহ কি আছে, খোদাবন্দ্?' সদাশিব তর্ক ধরিল।

'আমারও তাই জানা ছিল; আজ কিন্তু আমার সে বিশ্বাস টলেছে'—আমার এ স্থির উত্তরে সদাশিব ক্ষুব্ধ হইল। কিন্তু সিংহেশ্বরের ভ্রূকুটিতে আর বাক্যব্যয় করিতে সাহসী হইল না।

তিন

আমি তাম্বুতে ফিরিলাম। সমস্ত দিন অশান্তিতে কাটিল। রাত্রে নিদ্রা আসিল না। ভোর যখন ৪টা, আমি শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলাম। সাঁওতাল প্রহরীগণের আগুন তখনও ধীরে ধীরে জ্বলিতেছে। বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে তাড়াতাড়ি ক্যাম্পের বাহির হইয়া পড়িলাম। ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে, ঈষৎ মন্থর গতিতে ফুলশোলের দিকে রওয়ানা হইলাম।

মেঘরায়ের কুটীর-দ্বারে যখন পৌঁছিলাম তখন পাঁচটা। মেঘরায়, তার স্বল্প-পরিসর দাওয়ায় বসিয়া শুকনা শালপাতা মোড়া তামাকের ধূম পানে রত ছিল। আমাকে দেখিয়া বিন্দুমাত্রও চমকিত হইল না। বলিল 'কি, এ হুজুর, এত ভোর আসলি? কথা কি?' 'বলছি' এই বলিয়া আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া, দাওয়ায় মেঘরায়ের পাশে বসিলাম।

'বস্, বস্, বড্ডি ভোর আস্লি', মেঘরায় আরম্ভ করিল। 'হাঁ, চিত্রামোর সেই তানাজা—' আমি কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিলাম।

'হাঁ, আমি জেনেছি। সদাশিব কি বেইমান লোক—বড্ডি বেইমান, হুজুর, বড্ডি বেইমান! হোক্ না সে বেইমান! কিন্তু মুরিল কেন ঝুট্ গোপুছ করলে? মুরিল যে সাঁওতাল, সিংরায় হাঁসদার বেটা! কাজ ভাল করলে না!' ধীরে ধীরে, সংযত কণ্ঠে মেঘরায় এই কথাগুলি বলিল।

'কথাটা কি—জানবার জন্যেই তোর কাছে এলাম, আমাকে সব কথা খুলে বল্'—আগ্রহের স্বরে আমি অনুরোধ করিলাম।

'শুনবি, শুনবি, সব শুনবি! সাঁওতাল ঘরের ছেলে হ'য়ে, পর্‌ধান হ'য়ে, সিংরায়ের বেটা হ'য়ে, মুরিল কি না ঝুট্ গোপুছ করলে!—বল তুই যাবি? মুরিলকে সমঝাই; মুরিল ছেলেমানুষ, পয়সারও টানাটানি আজ কাল হ'য়েছে। সদাশিব শয়তান লোক,—তার শয়তানিতে এই হ'ল। চল্ যাই' এই বলিয়া মেঘরায় কুটীরে প্রবেশ করিয়া, কাঁধে আর একখানি কাপড় ঝুলাইয়া, হস্তে এক খণ্ড যষ্টি লইয়া বাহির হইল।

মেঘরায় আগে আগে চলিল। আমি আস্তে আস্তে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলাম। মেঘরায়ের ঘর হইতে

বাহির হইয়া, অড়হর ক্ষেতের ভিতর দিয়া, একেবারে শালবনে প্রবেশ করিলাম। মানুষ চলা রাস্তা।

মেঘরায় বলিল, 'আগে চল্ রতনডিহার টীপা সরেনের ঘর।'

'তাই চল্'—আমি আর আপত্তি করিলাম না।

'আচ্ছা, হুজুর, কথাটা তুই কি বুঝেছিস্, বল দেখি'—মেঘরায় প্রশ্ন করিল।

'আমার ত মনে হয়, চিত্রামো খরিদ করার পর থেকে, গোবর্দ্ধনই খাজনা-পত্র আদায় করছে। তুই কি বলিস'—আমি সন্দেহের স্বরে জবাব দিলাম।

'ঐ-য়্যা কথা, ঐ-য়্যা কথা, তুই ঠিক কথা ধরেছিস' মেঘরায় আগ্রহের স্বরে বলিল।

'বিশম্ভর লাল ভাল লোক; সে এ সব নষ্টামির কথায় নাই' মেঘরায় পুনরায় বলিতে লাগিল। 'সদাশিব,—সদাশিব,—সদাশিবই ত যত নষ্টামির মূলে। এই যে দিন তোর তাম্বু বনাশোতে ছিল, তখনই ত শয়তানটা এত কাণ্ড কর্‌ল।'

'কি, এই সে দিন ?' আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম।

'মুরিলকে হাত করলে এই হালে। মাহাতোকে ত হয়রানি করেছে ঢেরই। কিছুই করতে পারে নাই। হকের পাওনা কাড়বে কে ? এই জরীপ আসতে সদাশিব মতলব করেছে, এক চাল চেলে দেখবে। দুষমন তার ঘাড়ে চেপেছে। ধূ-রো— হুজুর, ছি ছি ছি—ধরমকে তার ডর নাই।'

কথায় কথায় আমরা রতনডিহি পৌছিলাম। টীপা সরেনই রতনডিহির প্রতিষ্ঠাতা। সে তখন ঘরের কাছেই সুরগুজা ক্ষেতে চাস দিতেছিল। অশ্বপৃষ্ঠে টুপীওয়ালা দেখিয়া আতঙ্কিত হইবার পূর্ব্বেই মেঘরায় তাহাকে ডাকিল। সে তাহার দ্বাদশবয়স্ক পুত্র অর্জ্জুনের জিম্মায় লাঙ্গল দিয়া আমাদের নিকটে আসিল। করজোড়ে, মাথা নোয়াইয়া, পৃষ্ঠ বাঁকাইয়া টীপা টুপীওয়ালাকে অভিবাদন করিল।

'মাহাতোর ফারকতি সব আন'– টীপার উপর মেঘ রায়ের আদেশ হইল। টীপা নিঃশব্দে তাহার কুটীরের দিকে ছুটিল। আমি ঘোড়া হইতে নামিলাম না। রাশ ছাড়িয়া দিয়া সিগারেট ধরাইলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই টীপা বাঁশের একটি চোঙ্গা লইয়া উপস্থিত হইল। মেঘরায় তাহা হাতে লইয়া, বাঁশের ছিপি টানিয়া খুলিয়া ফেলিল। চোঙ্গা ঈষৎ নীচের দিকে ঝাঁকড়াইয়া, তাহার মধ্য হইতে, কতকগুলি কাগজ লইয়া বলিল—

'এই দেখ, হুজুর, ফারকতি কার ছাখ্' বলিতে, বলিতে, সে কাগজগুলি বাছিয়া ছোট ছোট দুটি তাড়া করিয়া ফেলিল। বাম হস্তে বিশ্বম্ভর লালের সহি ও মোহর-যুক্ত সাবেকের দাখিলা, আর দক্ষিণ হস্তে গোবর্দ্ধন মাহাতোর দাখিলা লইয়া আমার সম্মুখে ধরিল। আমি দেখিলাম, গত ছ'বছরের চেক দাখিলাগুলি সমস্তই গোবর্দ্ধন মাহাতোর দেওয়া। দেখিয়া কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের স্বরে বলিলাম—

'তবে এই দাখিলাগুলি নিয়ে কাল আমার এজলাসে হাজির হয় নাই কেন ?'

মেঘরায় গম্ভীর স্বরে জবাব দিল– 'কেমন করে যায় হুজুর,—সদাশিব ছ'জন বরকন্দাজ ভাড়া করে এনেছে। চিত্রামোর তিন ডিহিতে দুজন করে মোতায়েন রেখেছে। অপমানের ভয় ত আছে সকলেরই,—সাধ করে কে বেইজ্জত হতে যাবে! সদাশিবের বরকন্দাজ যাকে যাকে তাম্বুতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তারাই ত হাজির হচ্ছে। যে যে কাগজ নিয়ে যেতে বলছে, তাই লোকে নিয়ে যাচ্ছে।– কি নষ্টামি হুজুর, কি নষ্টামি! ধরমকে ডর করে না, হাকিমকে ডর করে না!'

মেঘরায় থামিল। আমি টীপাকে সব চেক দাখিলা লইয়া ক্যাম্পে দশটার সময় হাজির হইতে বলিলাম।

চার

'এখন চল ভেলাইডিহা'– মেঘরায় অগ্রসর হইল। বনের মাঝে চলা পথ। বন হইতে বাহির হইয়া আমরা সরু, ঢালু ধানের ক্ষেতে পড়িলাম।

নীরবে অনেক পথ চলার পর মেঘরায়ের মুখ ফুটিল। সে বলিল—'মুরিল তার মায়ের সামনে মিথ্যা কথা বলবে না। তার মা ত সদাশিবকে মোটেই আমল দেয় না। সে বার বার বলেছে, মুরিল যেন সদাশিবের পাল্লায় না পড়ে, তার বাপের ধরম যেন না খোয়ায়। চল্ দেখি'—

আধ ঘণ্টা পরে আমরা ভেলাইডিহাতে উপস্থিত হইলাম। গ্রামে প্রবেশ করিবার পর হইতেই, টুপীওয়ালা

ও ঘোড়া দেখিয়া কৌতূহলে, নানাবিধ কৌতুকবাক্য ও হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া, সাঁওতাল বালকবালিকার দল আমার পিছু লইয়াছিল। মুরিলের ঘরের সম্মুখে আসিয়াই আমি ঘোড়া হইতে নামিলাম। জিনের পেটিটা ঈষৎ ঢিলা করিয়া দিয়া, লাগামটা ঘোড়ার মাথায় ঝুঁটির আকারে বাঁধিয়া, অপেক্ষাকৃত বয়স্ক একজন সাঁওতাল বালককে তাহার খবরদারী করিতে বলিলাম। অল্পক্ষণেই অশ্বরাজের শান্ত ও শিষ্ট স্বভাবের পরিচয় পাইয়া বালক-বালিকার দল অত্যন্ত পুলকিত হইল।

মুরিলের ঘরের বাইরের প্রশস্ত দাওয়া এখন জীর্ণ। বিস্তীর্ণ গোয়ালঘর আংশিক ভগ্ন। ঘরখানি পশ্চিমদ্বারী। সুপ্রশস্ত উঠানের পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে থাকিবার ঘর, উত্তরে গোয়ালঘর, মধ্যে ধানের গোলা। থাকিবার ঘর দুইটির দাওয়া বেশ উঁচু। উঠান, দাওয়া, ঘরের মেজে, গোবরমাটি দিয়ে সুন্দর ও পরিপাটী রূপে নিকানো। মেঘরায়ের পিছনে পিছনে আমি ঘরে ঢুকিলাম। মেঘরায় একখানা বাবুই দড়ির চারপায়া আনিয়া আমাকে বসিতে দিল। আর একখানা খাটিয়ায় সে বসিল। বসিয়াই বলিল, 'আমি যা ভয় ক'রেছিলাম, তাই হ'ল। মুরিলকে শয়তান ডেকে নিয়ে গেছে।' আমি ভাবিলাম, সব শ্রম পণ্ড হ'ল। মুরিলের মা সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মুরিল কই?'

'ঐ ত বিক্রাম সিং তাকে তোর তাম্বুতে ডেকে নিয়ে গেল। বল্‌লে চিত্রামোর তানাজা আজ ফয়সালা হবে, হাকিম তোকে ডেকেছে, চল্।'

আমি ত অবাক! আমি যে আজ ভোরে এখানে আসিব, সদাশিবের লোক সে সন্ধান কেমন করিয়া পাইল? বিক্রাম সিং চিত্রামোর মুল, অর্থাৎ গঞ্জুডিহির প্রধান।

'ভালা রে গঞ্জু!' মেঘরায়ের মুখ ঘৃণায় বিকৃত হইল। 'গঞ্জুদের যদি লাস্ না পেত, তা হ'লে সদাশিব কোথা দাঁড়াত। আজ এক মাস ধ'রে বিক্রম সদাশিবের বাড়ী যাতায়াত করছে। সকলকে বুঝাচ্ছে যে, সদাশিব কাছের মানুষ, পুরানো মালিক। সে থাকলে কত ভালই হবে তাদের। সুদ্‌খোর মহাজনের কাছে কি তার এক কড়াও পাবে? সদাশিব না কি ছ'বছরের বাকী খাজনা রেহাই দিতে রাজী হয়েছে'—মেঘরায় বর্ণনা করিল।

'কথাটা যে বেজায়, তা বলা যায় না'—মেঘরায়ের মন পরীক্ষা করিবার জন্য আমি বলিলাম।

মুরিলের মা বলিয়া উঠিল 'বেজায় বৈ কি, বেজায় না ত কি, বল্ ত? বেজায়, বেজায়, ভারি বেজায়! ভালাই আমাদের হতে পাবে, তাই বলে ঝুট্ বলতে হবে? ভালাই আমাদের হতে পারে, তাই বলে কি বেইমানি করতে হবে? ধরম বিচার কর, হজুর, ধরম বিচার কর।'

আমি অপ্রতিভ হইলাম। মেঘরায় মুরিলের মার কথায় সায় দিয়া বলিল, 'গঞ্জুরা সুখে থাকে থাকুক, আমরা সাঁওতালেরা, না হয়, দোস্‌রা গাঁয়ে গিয়ে বাস কর্‌ব্বো!'

'তা কেন করবি' বলিয়া আমি সামলাইয়া লইলাম। 'যেরকম লোভ দেখা'ল সদাশিব, তাতে সহজেই লোক তার দিকে ঝুঁকবে। তা তোরা যদি সব কথা না বলবি, তাহ'লে কেমন করে' ধরম বজায় থাক্‌বে? আর যদি মুরিলের মত লোক ঝুট্ গোপুছ করবে, তাহলে ধরম বিচার আমি কেমন করে' করি?'

এই কথা শুনিয়া মুরিলের মা ক্রোধ, ঘৃণা ও বিস্ময়ে মেঘরায়ের দিকে মুখ ফিরাইল। 'কথা ঠিক', বলিয়া মেঘরায় মুরিলের মাতার সন্দেহ ভঞ্জন করিল।

মুরিলের মা কাঁদিয়া ফেলিল।

'আমার কাছে কিরিয়া খেয়ে গেল, মাহাতোর ফারকতি নিয়ে গেল, তাও ঝুট্ বেইমানি করল?' মুরিলের মা, ক্ষণেকের জন্য নীরব হইল।

আবার বলিতে লাগিল, 'তার বাপ মরে যেতে আমাদের দুঃখু কষ্ট ঢেরই যাচ্ছে। দু' বছর মালিকের মালগুজারী বাকী পড়েছিল। গেল বছর মুর্গী বেচে এক বছরের মালগুজারী দেওয়া হল। মুরিল গোঁ ধরেছিল, পরজাদের কাছে চাঁদা তুলে মালগুজারী দিবে। ঘরে মুর্গী থাক্‌তে, ছাগল গরু থাক্‌তে, আমি তা কেমন করে নিব? বেধরম হবে যে!' আবার নীরব। কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতে আরম্ভ করিল, 'আমার মুরিল কি কর'ল, সাঁওতাল ঘরের বেটা হ'য়ে, মাঝিঘরের বেটা হ'য়ে, তোর কাছে ঝুট্ বল্‌লে! আমাদের সুরাহা করে' দে, হজুর, আমাদের সব যে যাবে!'

'এখনও উপায় আছে' বলিয়া আমি সাহস দিতে চেষ্টা করিলাম। 'মুরিলকে বাঁচিয়ে দে, মুরিল ছেলেমানুষ।

ভারি কষ্ট আজকাল, তাই কথার ঠিক নাই, মেজাজেরও ঠিক্ নাই। তা হোক্, ধরম কেন খোয়াব? মুরিলের একটা উপায় বাত্‌লে দে—' মুরিলের মাতার কাতরতায় আমি বিচলিত হইলাম।

মুরিলের মা আবার কাঁদিতে লাগিল।

পাঁচ

'মুরিল আজ কিছু কাগজপত্র নিয়ে গেল?' অনেকক্ষণ পরে আমি নীরবতা ভঙ্গ করিলাম।

'কি কি ত ফারকতি নিয়ে গেল, হজুর, দেখি' এই বলিয়া মুরিলের মা পুবের ঘরে ঢুকিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে মাটীর একটি ছোট হাঁড়ি লইয়া বাহিরে আসিল। হাঁড়ির মধ্য হইতে ছেঁড়া কাপড়ের একটি পুঁটুলি বাহির করিয়া, গিঁট খুলিয়া মেঘরায়ের হাতে দিল। মেঘরায় তাহার মধ্যে কয়েকটি কাগজ বাছিয়া লইয়া আমার হাতে দিয়া বলিল 'থাখ্ ত, এসব ছাপা ফারকতি কার?' আমি কাগজগুলি ঘাঁটিয়া, পুরাতন হাতচিঠা, আবরা পাটা, রাজার হুকুমনামা, জঙ্গল ছাড়, ও রসিদপত্রের মধ্যে গোবৰ্দ্ধন মাহাতোর দেওয়া ছ'বছরের চেক্ রসিদগুলি বাছিয়া লইলাম। 'এগুলি দেখ্‌ছি, মাহাতোর দেওয়া ফারকতি' আমি বলিলাম—'এগুলি আমাকে দে, কাজ হবে'। মুরিলের মা আপত্তি করিল না। আমি বাকী সমস্ত কাগজ তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম।

'মুরিল আস্‌লে আমার কাছে পাঠাস্' বলে আমরা উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

'পাঠাবো বই কি, তার যাতে ভালাই হয়, তা করিস হজুর' এই বলিয়া মুরিলের মা বিদায় গ্রহণ করিল।

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, ছেলের দল আমার বাহনকে লইয়া বিবিধ রঙ্গ-কৌতুক করিতেছে। তাহার সম্মুখে ঘাসের স্তূপ সাজাইয়া দিয়াছে। তাড়াতাড়ি পেটি কসিয়া সোয়ার হইলাম। মেঘরায়কে বলিলাম, 'চল আমার তাম্বুতে, মুরিলকে সেখানে পেতে পারি।' মেঘরায় নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আমার অনুসরণ করিল। আমরা সেই শালের বনের ধারে, সরু চলাপথ দিয়া যাইতেছিলাম। কিছু দুর গিয়া মেঘরায় বলিল, 'গঞ্জুদের কাছেও এ রকম ফারকতি ছিল। সদাশিব সেগুলি কেড়ে নিয়েছে। সদাশিব ঠিক করেছিল, সে দিন কেবল গঞ্জুদেরই গোহাই হবে। মাহাতো মুরিলকে প্রথম ডাকায়, গঞ্জুদের সাক্ষী আর দিতে পারলে না। বিক্রমই ত সদাশিবের জোর। বিক্রমকে যদি হাত না করতো, তা হলে কোন গঞ্জুই তার দিকে হ'ত না। মুরিলও দেখছি বিক্রমের কথা ঠেল্‌তে পারে নাই।'

'গঞ্জুরা কি এতই শঠ' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

'সকলেই কি ধরম মানে, হজুর?' মেঘরায় বলিল; 'তাদের জেঠ্‌রাইয়ত ও পূজারী, রঘু সিং গোড়ায় রাজী হয় নাই। সদাশিব তাকে টাকা দিয়ে বশ করল। ছোকরাদের ভিতর অর্জ্জুন সিং ধরম খোয়াতে নারাজ ছিল। বিক্রম ও রঘুর ডরে, তাকেও দলে মিশতে হ'ল।—'

এমন সময়, সম্মুখে, কিছু দূরে, মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেল। দেখিতে পাওয়া গেল, কে যেন আমাদিগকে দেখিয়া, তাড়াতাড়ি পথ পরিত্যাগ করিয়া ধান ক্ষেতের দিকে নামিয়া গেল।

মেঘরায় জোর গলায় ডাকিল—'মুরিল!'

কোনো উত্তর আসিল না। মেঘরায় কিছু দূরে দৌড়াইয়া গিয়া, আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া, বলিয়া উঠিল—"হাঁ, মুরিলই বটে।" আমরা উভয়ে নিকটে গেলে, মুরিল ক্ষেত হইতে উপরে উঠিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'তুই লুকালি কেন?'

মুরিল নীরব। আবার প্রশ্ন করিলাম। একটু গলা টিপিয়া মুরিল উত্তর করিল—'ডরে!'

'কোথা গিয়াছিলি', আমরা উভয়ে জেরা ধরিলাম।

'এই সে দিকে'—মুরিল ঢোক গিলিল।

'কোন্ দিকে? ঠিক কথা বল্'—দৃঢ় স্বরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

'এই তোর তাম্বুর দিকে। বিক্রম সিং তোর নাম করে ডেকেছিল'—মুরিল সাহসভরে বলিল।

'তার পর?'

'সেখানে গিয়ে দেখলাম, তুই নাই। সদাশিব মিছে তোর নাম করে ডেকেছিল। বল্‌লে, হাকিম তোর ঘরকে যাবে, আমার দেওয়া ফারকতি দেখাস্'—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম —'কই সে ফারকতি?'

মুরিল তাড়াতাড়ি বাঁশের চোঙ্গা হইতে টাট্‌কা নব ধবে ছ'খানি ছাপা চেক রসিদ বাহির করিয়া দিল। আমি

পকেট হইতে তাহার মাতার নিকট হইতে সংগৃহীত গোবর্দ্ধন মাহাতোর দাখিলা ছয়খানি, গোল পাকাইয়া তাহার দিকে ছুঁড়িয়া বলিলাম, 'আর এই সব ফারকতি কার?' মুরিল থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, এবং পথের ধারে একটা শালের গুঁড়ি ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

ঘোড়ার পিঠ্ হইতে নামিয়া তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে মুরিলকে বলিতে লাগিলাম—'ছি, মুরিল, ছি! সাঁওতাল হ'য়ে, সিংরায় হাঁসদার বেটা হ'য়ে, তুই কি না শেষে ঝুট গোপুছ্ করলি? আমি জানতাম, সাঁওতাল কখনও মিছা কথা বলে না। মুরিল, তুই নিজের ধরম খোয়ালি, আর তোর ঘরের আর জাতির মুখে কালি দিলি—ছি! ছি!'

বেশী বক্তৃতা দিতে হইল না। সমস্ত জানিতে পারিয়াছি দেখিয়া, মুরিল কাঁদিয়া আমার দুই পা জড়াইয়া ধরিল। আমি পা সরাইয়া লইলাম; বলিলাম, 'যে ঝুট্ গোপুছ করে, তার মরণই ভাল!'

ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মুরিল বলিল, 'গুণা মাফ্ কর, হুজুর, আজ আমি সব কথা ঠিক্ ঠিক্ বল্‌ব!'.

'তোর খুসী! আমি তোকে আর কিছু বলতে চাইনে'—তাচ্ছিল্যভরে আমি জবাব দিলাম।

মেধরায় বলিল—'সব ঠিক হবে, আর ভয় নাই। মুরিলের ভূত ছেড়ে গেল। আমি এখন যাই, দু'পহরে তোর তাঁবুতে আবার দেখা হবে।'

'তাই হবে; মুরিল যেন সব কাগজ পত্র সঙ্গে নিয়ে ঐ সময়ে আসে' এই বলিয়া আমি সোয়ার হইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম।

* * * *

৬

আজ মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর, কিছু বিলম্বেই, আমার বটতলার এজলাসে গিয়া বসিলাম। দেখিলাম, প্রায় হাজার লোক বটতলায় আসিয়া জমিয়াছে। আমি বসিতেই সকলে বসিয়া পড়িল। সকলেই নীরব, কেহ এতটুকু টুঁ-শব্দও করিতেছে না। টেবিলে বিবাদের ফর্দ্দ খোলা হইয়াছে, সদাশিব-গোবর্দ্ধনের ডাক পড়িল।

আমি বলিলাম—'চিত্রামোর তানাজা আজ ফয়সলা করবো। আর সরজামিন তদারক করিয়া যে সমস্ত সাক্ষী পেয়েছি, তাদের এজেহার আগে হ'বে।'

সদাশিব বোকার মত চাহিয়া রহিল। গোবর্দ্ধন ঘাড় বাঁকাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

প্রথমে ডাকিলাম—'মুরিল!' জনসঙ্ঘ কাঁপিয়া উঠিল। দৃঢ় পাদবিক্ষেপে মুরিল সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। টেবিলের উপর আপনা হইতেই সদাশিব ও গোবর্দ্ধনের দাখিলা রাখিয়া দিল।

হলপ্ পড়ান হইল—

ধরম্ ধরম্ রোড় মে,
এঁ্যাড়া কথা বাউ রোড়া

মুরিল আস্তে আস্তে, প্রত্যেক কথাটি পরিষ্কার উচ্চারণ করিয়া, হলপ্ পড়িল। আমি বলিলাম—'কথা যা, তা বল্, ডর ভয় নাই কিছু।' মুরিল দৃঢ় কণ্ঠে আরম্ভ করিল "আজ ছ' বছর হলো, বিশম্ভরলালের দেনের দায়ে, চিত্রামো মৌজা বিক্রী হতে, পোদমার গোবর্দ্ধন মাহাতো তা খরিদ করে। আমরা সেই ছ'বছর থেকে মালগুজারি মাহাতোকেই দিতে আছি। গেল বছর যখন সরকারের জরীপ চড়্‌লো, তখন বিশম্ভরের বেটা সদাশিব বল্‌লে 'তানাজা দিব।' জরীপের হাকিম বল্‌লে, 'তা হবে নাই, দখল নাই'—

আমি উৎসাহ দিয়া বলিলাম 'তার পর?'

মুরিল অবিচলিত কণ্ঠে পুনরায় আরম্ভ করিল—"তার পর, এ বছর, যখন তোর ডের বনাশোতে, তখন এক দিন সদাশিব মৌজাকে এল। বল্‌লে—'তোদের ভালাই হবে যদি তোরা আমার দিকে সোহাই দিস্।' আর বল্‌লে, যার যত বাকী আছে মালগুজারী, তা সে রেহাই দিবে। জঙ্গলের কর নাই লিবে। আরও বল্‌লে, গোবর্দ্ধন মাহাতোরা মহাজনী কারবার করে, সুদ খায়, আদালত করে। তারা এই জরীপের পর মালগুজারী বাড়া'বে টাকায় টাকা হিসাবে। তা ছাড়া তারা বেঠ বেগারীর বদলে নগদ লিবে। এক কিস্তির টাকা বাকী পড়লে, তারা নালিশ করে, ডিগ্রী করে, সব ধান জমী খাস করে লিবে। জাতে তারা সুকলিয়ার, বিনা গুণায় আমাদের বেজায় বেইজ্জত করবে। আর বল্‌লে যদি সদাশিবের তরে সোহাই দি আমরা, তাহলে সে বাপ-দাদার মৌজা ফিরে পাবে। জরীপের পর তারা এক পয়সাও মাল বাড়াবে নাই। বেঠ্ বেগারী আপন খুসী। তারা বুনিয়াদের মালিক, পরজাদের অনেক ভালাই করবে। পরথম্

পরথম্, আমরা কেই রাজী হলাম নাই। দু'চার দিন যেতে বিক্রম সিং গঞ্জু আমাদের সম্ঝাতে এলো। বল্‌লে সদাশিব মালিক হলে ভাল; মাহাতোরা লোক ভাল নাই। আর বল্‌লে গঞ্জুরা সব সদাশিবের তরফ সোহাই দিবে। মৌজা তাহ'লে সদাশিবের হবে। সদাশিব তখন সাঁওতালদের মৌজা থেকে উঠাঁই দিবে। এই সব কথা বল্‌তে আমাদের তরাস্ হ'ল।—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মুরিল হঠাৎ থামিল। তাহার চাহনিতে বুঝিলাম সে যেন এখনও কার ভয়ে ত্রস্ত।

আমি অভয় দিলাম 'কিছু ডর নাই, মগের মুল্লুক ত নাই। সরকারের রাজ্য। অন্যায় কিছু হতে পারে না। কথা যা, তা ঠিক্ ঠিক্ বলে যা মুরিল।'

চারি দিকে একবার চাহিয়া মুরিল আবার বলিতে লাগিল—'ছ জনা বরকন্দাজ কোথা থেকে এলো আমাদের মৌজায়। তিন ডিহিতে দুজনা করে মোতায়েন্ থাকল। তারা কেবল মালিকির কথা বলে। কখনও ডর দেখায়, শাসন করে। আবার কখনও বলে মাহাতোরা পাজি লোক, অনেক পরজার খুঁট্ তুলে দিয়েছে।'

মুরিল আবার থামিল। গুরুতর এক বিপদের আশঙ্কায় যেন তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। আমি বলিলাম—'খুঁট্ তুল্‌তে পারে না, সরকারের আইন আছে। তার পর? তার পর কি হ'ল বল্।'

মুরিল আবার বলিতে লাগিল—"তার পর, তোর তাম্বু যখন চিত্রামো আসবার খবর হ'লো, তখন এই সব বরকন্দাজ, সদাশিবের দেওয়া ছ'খানি করে ফারকতি সকল প্রজাকে দিল। বল্‌লে—এই ফারকতি নিয়ে তগ্‌দিক্ করাতে হবে। খেমা চিত্রামোতে আস্‌তে বিক্রম খালি আমার কাছে যায়। কত কথা বলে। বলে সারা মৌজার পরধানী আমার করে দিবে সদাশিব। বাকী মালগুজারী আমাকে আর লাগবে না। আমি চুপ করে থাকি। বলি আচ্ছা, হোক, দেখ্‌ব।"

"যেদিন চিত্রামোর মালিকি তানাজার ফয়সলার লেগে ডাক হ'ল তার আগের দিন, সাঁঝের বেলায়, সদাশিব এ'ল আমার দুয়ারুকে। বললে, আমি সাক্ষী দিলে সদাশিব মৌজা পায়। আমার মা বল্‌লে 'ধরম খোয়াব নাই'। সদাশিব অনেক সম্ঝালে।

"তোর তাম্বুতে আসবার আগে, মা বল্‌লে 'বেটা বাপ মুরিল, তোর বাপের ধরম, সাঁওতালের ধরম রাখিস্'। আমি চুপ করে রইলাম, কিছু জবাব করলাম নাই। তার পর মাহাতো যখন বল্‌লে গোপুছ করতে, আমার মন চাইল না। তার পর ভূত এসে আমার ঘাড়ে সোয়ার হ'ল, আর আমার হাত গাইয়ের পুছে ছোঁয়ালে; আর যা মনে করি নাই, তাই বলালে, আর—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'বস্ বস্, আর কিছু বল্‌বার দরকার নাই'। তার পর দাখিলাগুলি তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, 'এই দাখিলাগুলি তোর আসল, মাহাতোর দেওয়া; আর এগুলি সদাশিবের বরকন্দাজ দিয়েছে, কেমন?' মুরিল বলিল 'হুঁ'।

আমি বলিলাম 'এবার তুই বস্'।

উদ্বেলিত-হৃদয় জনসঙ্ঘের মধ্যে ক্ষণেকের জন্য অস্ফুট উৎকণ্ঠার ধ্বনি ঢেউ খেলিয়া গেল।

ডাক পড়িল, টীপা সরেন! আবার গাঢ় নিস্তব্ধতা। টীপাও মুরিলের অনুরূপ এজেহার দিল। এক এক করিয়া, অনুপা টুডু, অনুপা অরেন, পট মাঝী, কাঁদনা মর্ম্মু, এবং সর্ব্বশেষে, মেঘরায়ের এজেহার লওয়া হইল। সকলের মুখেই সেই এক কথা। মেঘরায়কে বসিতে বলিয়া, আমি বলিলাম—'আর সাক্ষীর দরকার নাই। আমার বিশ্বাস ছিল যে সাঁওতালজাতে মিথ্যা বলে না। কাল সদাশিবের চক্রান্তে মুরিল ঝুট বলেছিলো। আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করলে। আমার বিশ্বাস দৃঢ় হ'ল সাঁওতাল কখনও মিথ্যা কথা বলে না—'

আমার কথা শেষ না হইতেই বিক্রম সিং কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'তবে কি গঞ্জুই মিথ্যা বলে, হুজুর?' বিক্রম ও রঘুসিং, যাহাদিগকে আজ সমস্ত দিন নজরবন্দী রাখিয়াছিলাম, এতক্ষণ পুতুলের মত দাঁড়াইয়া, সাঁওতালদের এজেহার শুনিতেছিল। সাঁওতালদের সত্যবাদিতার প্রশংসা আর গঞ্জুদের অপবাদ, তাহাদের জাত্যাভিমানকে মরমে মরমে আঘাত দিতেছিল। এতক্ষণ তাই প্রবল জাত্যাভিমান তাহাদিগকে সদাশিবের পাপ প্রলোভনের বাহিরে আনিয়া দিল।

'কে বলে গঞ্জু মিথ্যাবাদী?' আমি সোৎসাহে বলিলাম, 'সত্যবাদী যে, আমার সম্মুখে আসিয়া ধরম্

ধরম্ এজেহার দিক্।' বিক্রম ক্ষিপ্র পাদবিক্ষেপে টেবিলের সামনে দাঁড়াইল। সে হলপ্ লইয়া অবিচলিত চিত্তে, মুরিলের এজেহারের বর্ণে বর্ণে পুনরাবৃত্তি করিল।

বিক্রমের এজেহার শেষ হইলে, রঘুসিং আসিয়া বলিল—'ধরম বড় না সদাশিব বড়? ধরম ধরম ব'লব, আমাকেও হলপ্ দে'। রঘু সদাশিবের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথমতঃ তাহার প্রতিবাদের কথা বলিয়া, এক এক করিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। শেষ হইলে আমি বলিলাম—'গঞ্জুদের মধ্যে আর কে এজেহার দিতে চায়?"

একজন বলিষ্ঠ যুবক দূর হইতে প্রত্যুত্তর করিল—'সকলেই হজুর, সকলেই। ধরম কথা লুকাবে কে? মাহাতোরা ত আমাদের কোনো অনিষ্ট করে নাই। সদাশিব বুনিয়াদের মালিক বটে, তবে হক্ নাই তার। হক্ যার সে মালিকি পাবে, আমরা কেন ধরম খোয়াই?' যে বলিল সে অর্জ্জুন সিং। তাহাকে সম্মুখে আসিতে ইঙ্গিত করিলাম; আসিলে হলপ্ দিয়া এজেহার নিলাম। সে প্রথমেই বিক্রম ও রঘুসিংহের দুর্ব্বলতা ও লঘুচিত্ততার উল্লেখ করিয়া, মুরিলের হঠকারিতার যথেষ্ট নিন্দা করিল। তাহার পর সদাশিবের ষড়যন্ত্র জাল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিন্যাস করিল। তাহার বক্তব্য শেষ হইলে, আমি বলিলাম—'আর না, যথেষ্ট হয়েছে। সদাশিব কই?'

কেহ লক্ষ্য করে নাই, সদাশিব, একটা মুড়িচেকের বোচ্‌কার উপর মাথা রাখিয়া, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে, তাহার বৃদ্ধ পিতা বিশ্বম্ভর লাল, হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'সদাশিবের বাপের পাপের যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত আজ হ'ল, ধর্ম্মাবতার, দয়া করুন, সদাশিবকে ক্ষমা করুন!'

ঠিক্ সেই সময়ে সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মিলিত ঘৃণার দৃষ্টি, মূর্চ্ছিত সদাশিবের উপর পতিত হইল।

* * * * *

সেদিনকার মত আদালত বন্ধ হইল।

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৫)

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বলিলেন—"এতদূর এলুম, বাগিচাটা একবার দেখেই যাই, কি বলেন?"

বলিলাম—"আমরা বাগিচা থেকে এই আসছি, পাকা ফল একটিও নেই, নিষ্ফলই ফিরতে হবে। পাঁড়েজি খুব অমায়িক লোক, তিন চার দিন পরে আসতে বললেন। আজ সকালে কে ধুবন্ধববাবু, জলন্ধরবাবু, হিড়িম্বাবাবু, রজকবাবু, মাকুন্দিবাবু—যা ছিল সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছেন। "বেহারী" বাবুদেরও ফলের ঝোঁক্ চেগেছি দেখছি।"

ভদ্রলোকটি হো হো করিয়া হাসিয়া, সঙ্গী ছোকরাটিকে বলিলেন—"চিন্‌তে পারলে? আমাদের "বম্পাসে"র ধরণীধর বাবু, জলধরবাবু, হেরম্ববাবু, রজতবাবু আর মুকুন্দবাবু! ওঁদের "ধরণী ধামে" আজ ভারি ধুম, কলকেতা থেকে দুজন ব্যারিষ্টার গেষ্ট্ (guest) আসছেন—(কি এসে গেছেন)—মিষ্টার পাজা and মিষ্টার কাড়া; শুনলুম ক্যালক্যাটা "বারে"র (Barএর) shining star (উজ্জ্বল নক্ষত্র)। ভারি শিকারের ঝোঁক, ব্রিফ্ ফেলে দিয়ে ছিপ্ নিয়ে বেড়ান। আমিও কার্ড (card) পেয়েছি। আজ অনেক কাজ,—হুইল্ ঠিক করতে আছে, কেঁচো কম্‌সে কম দু'শো চাই, ওটা অব্যর্থ টোপ্।" পরে আমাকে বলিলেন, "আপনার নিশ্চয়ই এ সখ আছে,—বিকেলে চলুন না; hunting and sportingএর মত interesti g and manly game আর নেই (শিকারের মত চিত্তপ্রিয় মরদের খেলা আর নেই)। ওতে শরীর মন দুই সতেজ থাকে। আমার ওতে ভারি বাই মশাই—"

নীরব ভাষা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বরদাচরণ উকীল   Bharatvarsha Halftone & Printing Works

বলিলাম—"ও আর আমাকে মনে করিয়ে দেবেন না ; ১৩।১৪ বচর বয়সেই ওটা সুরু করেছিলুম ; উঃ কি ফুর্ত্তিই ছিল। এখনো মনে হ'লে muscle (মাংসপেশী) নিস্-পিস্ করে—"

ভদ্রলোকটি খুব উৎসাহের সহিত বলিলেন,—"১৩।১৪ বচর—বলেন কি ! historyটা (হিষ্টিটা) শুনতেই হবে,— ১৩।১৪ বচরে এরকম sporting spirit খুব rare, দেখা যায় না। এইতেই পূর্ব্ব সংস্কার মানতে হয়।"

বলিলাম—"আপনাদের বেলা হ'য়ে যাবে "

তিনি বলিলেন—"তা হোক্, শিকারের কথা ক'জন বাঙ্গালীর মুখে শুনতে পাই বলুন !"

বলিলাম—"কথাটা খুব সামান্যই, তাই স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি—কথাটা beginnerদের (নূতন ব্রতীদের) সম্বন্ধে, কাজেই beginningটা small—হাতে খড়িরই মত।"

তিনি বলিলেন—"তাতে হয়েছে কি, "প্রিন্‌সিপল্" নিয়ে কথা।"

মাতুলকে একটু দূরে জয়হরির নিকট দেখিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলাম—"তখন ইংরিজি ইস্কুলে ঢুকেছি, বাঙ্গলা ব'য়ের মধ্যে ছিল কেবল "বোধোদয়" ; গ্রীষ্মের ছুটি হ'ল। সব কাজেই "মানব" ছিল আমার "guiding spirit" (নাটের গুরু) ; আর আমি ছিলুম তার "constant quantity" (জেলে হাঁড়ি)—সর্ব্বক্ষণই তার পাশে হাজির। সে ছিল পাকা বীর-বংশোদ্ভব। তার বৃদ্ধ পিতামহ কিলিয়ে কচ্ছপ মেরে, সাবর্ণ চৌধুরী মশাইদের বাড়ী থেকে বার্ষিক আদায় করেছিলেন ! মানব তাঁরই প্রতিনিধিরূপে— ঘোড়ার চালে দু'ধাপ পেছিয়ে দেখা দেয়।

গ্রামের ওস্তাদদের মুখে শুনলুম—শালিখ পাখীর বোশেখী-বাচ্চা পাওয়াটা বড় ভাগ্যের কথা,—তারা না কি অষ্টম গর্ভের সন্তানের মত' ধুরন্ধর হয়,—যা শোনে তাই শেখে,—পুরো জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হয়ে দাঁড়ায়। শুনে কিন্তু দুজনেই একটু দোমে যাই,—ভাল পড়াশোনা যে হবে না সেটা বুঝতেই পারলুম ; কারণ দু'জনেরি জন্ম কার্ত্তিক মাসে। বিবাহের আশা পর্য্যন্ত ঘুচে গেল ! মানব হেসে বল্লে—"চুলোয় যাক্, তবে পড়াশোনা আর কার জন্যে।"

ওটা তার রহস্যের কথা, কারণ লেখাপড়া সম্বন্ধে মানবের স্বতন্ত্র এক অদ্ভুত ধারণা ছিল। এতদিন পরে সব কথাগুলো তার নিজের ভাষাতে দিতে পারব' বলে' মনে হয় না। সে বোলত'—পরের এঁটো খাওয়া ভাল নয় রে, তাতে মানুষ নিজেকে হারিয়ে—পরের কথা, পরের ভাব, পরের ধাত পেয়ে—প্রকৃতি বোদলে পর-ই হয়ে যায় ! এত বড় ক্ষেতি আর নেই রে। আমি বেশ করে' দেখেছি—একটা গাছের দুটো পাতা কি দুটো ফল—ঠিক্ একরকম নয়। দু'টো মানুষও এক রকম নয়, তাদের পাওনাও (পাথেয় বা মাল-মশলাও) এক রকম নয়। তাদের সবাইকে এক ছাঁচে ঢাললে, তাদের জন্মটাই মাটি করে' দেওয়া হয়,— তাদের যে কাজের জন্যে আসা, তা থেকে জগৎকেও বঞ্চিত করা হয়। তার নিজের সম্পত্তি নষ্ট করে' সে নিজের মধ্যেই পর হয়ে যায় ; তাতে হয় এই—সে নিজেকে ত' পেলেই না, আর ঠিক্ ঠিক্ পর হ'তে পেরেছে কি না তা' বলাও কঠিন। আমার মনে হয়—সদা সত্য কথা কহিবে, চুরি করা পাপ, হিংসা করিও না, কাহাকেও মনঃকষ্ট দিও না, সকলকে ভালবাসিবে,—এ কথাগুলো সবার তরেই এক। ভাল ভাল লোকের বিশ ত্রিশখানা ইংরিজি বাংলা ভাল ভাল বই পড়তে আর বুঝতে পারলেই ঢের হ'ল। রামায়ণ মহাভারত নিশ্চয়ই পড়বি। একটা কথা মনে রাখিস—নিজের ধর্ম্মগ্রন্থ ভাল করে' না বুঝে খবরদার পরের ধর্ম্ম-পুস্তক পড়িস নি। কিন্তু কারুর ধর্ম্মকে ছোটও ভাবিস নি। জাতি-বিচার ছেড়ে গরীবকে দেখবি— ভালবাসবি, তাদের সঙ্গে দু'টো মিষ্টি কথা ক'বি—আহা, তারা তাও পায় না রে ! ঘৃণা কারুকে করিস্‌নি। "মন" ইচ্ছা করলেও "প্রাণ" যদি খুঁৎ খুঁৎ করে, সে কাজ কখ্‌খনো করবিনি, জান্‌বি—মা বারণ করচেন। বাস্ এই আমার লেখা পড়া।" এই বলে' সে হাসতো। আমি এসব কথা তখন ভাল বুঝতে পারতুম না, তার ভালবাসা-মুগ্ধ শিষ্যের মত' শুধু হাঁ করে' শুনতুম।

কোন' কোন' ছেলে ছেলেবেলা থেকেই স্বাভাবিক সর্দ্দার ;—তারা অনেক অনন্যসাধারণ গুণ নিয়ে জন্মায়— যেগুলোকে সমাজের বিজ্ঞেরা সইতে না পেরে মুখখুমি বলেন, কিন্তু বিপদে পোড়লে সেই মুখখুদেরই সাহায্য নিয়ে উদ্ধার হন। তার পর নেপথ্যে এই "সেয়ানা কোম্পানীর" সহাস

চোখ টেপাটিপি চলে! সে যা হোক্—মানব সেই সব ছেলেদেরই একজন ছিল। যাক্—

ছুটির মুখে আমাদের ঝোঁক চাগ্‌লো শালিখের বোশেখী-বাচ্চা সংগ্রহ করতেই হবে। রোজ রোদোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বোধোদয় মুড়ে অনুসন্ধান সুরু করা গেল। সেটা ছিল বেস্পতিবার,—দেখি মানব কপালে রক্তের ধারা নিয়ে ছুটে আসছে; পাঁচ ছটা শালিখ সচীৎকারে ঠোকরাতে ঠোকরাতে তার পশ্চাতে ধাবমান! আমি বিদ্যুৎবেগে একটা ভেরেণ্ডার ডাল ভেঙ্গে অকুতোভয়ে সেই শত্রুব্যূহ নিমেষে ছিন্নভিন্ন করে দিলুম। মানব ততক্ষণে নিরাপদ স্থান নিয়ে ফেলেছে। দেখি, তার দু'হাতে দুই বোশেখী-বাচ্চা! সে কি আনন্দ!

চৈত্রমাসে মানব বাবা তারকনাথকে মাথার চুলগুলি দিয়ে এসেছিল। দেখি মাথাটা ঠুকরে আর খুব্‌লে যেন কোল্‌কের "পাস্খাপ্রুফ্" ঢাক্‌নি বানিয়ে দিয়েছে। যাক্—সেদিকে তার লক্ষ্যই রইল না;—কাজের ঘটা পড়ে গেল,—খাঁচা, বাটি, ছাতু ইত্যাদি।

তার পর শিকারের শুভ beginning (সূচনা),—ফড়িং চাই! পাঁচ সাতগাছা খেজুর ছড়ি বানিয়ে গঙ্গা ফড়িং, গোদাফড়িং, ঘোড়া ফড়িং, এস্তোক খড়্‌কে ফড়িং শিকারে, নির্ভয়ে বনজঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত, কন্দর-কান্তার, মাঠ তট নিত্য প্রবলবেগে তাড়না ক'রে বেড়াতে লাগলুম।

আপনি বোধ করি পাহাড় পর্ব্বতের কথা শুনে সন্দেহ করছেন! Adventurerরা ("ঘোরাবাইগ্রস্ত" ডানপিটেরা) দেখে থাকবেন—বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে বড় বড় বংশের বড় বড় বাড়ীর অতিকায় ভগ্নস্তূপের উপর দুব্বো গজাচ্চে। দু'এক শতাব্দি পরে শশীবাবু এসে যদি "ভূগোল পরিচয়" লেখেন, তখন ছেলেরা পড়'বে,—বঙ্গভূমি একটি পর্ব্বত-বহুল পাহাড়-প্রধান অসমতল দেশ!

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বলিলেন—"very true and very interesting - বাঃ খুব ঠিক্—তার পর?"

বলিলাম—"তার পর জয়দ্রথ বধের পালা! শ্রীকৃষ্ণ যেমন সুদর্শন দিয়ে সূর্য্যদেবকে ঢেকেছিলেন, আমাদেরও তেমনি বোশেখ জ্যোষ্ঠির সমস্ত রদ্দুরটুকু মাথায় করে ফড়িংমারা মৃগয়া চলতে লাগ্‌লো। মানব প্রতিজ্ঞা করলে মাণ্ডব্যমুনির কীর্ত্তিটা ম্লান ক'রে ছাড়বে। একটুও সময় নষ্ট করা ছিল না,—দু'গাছা ছিপও সঙ্গে থাকতো, পুকুর পেলেই যথালাভের পন্থা চল্‌তো। ফেরবার সময় ফড়িং আর মাছ নিয়ে আসা যেত। বাড়ীর বকুনি এড়াতে মাছের মত জিনিস আর নেই,—মাছ দেখলেই মেয়েরা খুসী;—সঙ্গে সঙ্গেই তার পর দিন বেশী ক'রে আনবার জন্যে উৎসাহ দান! রসনার তৃপ্তির এই লোভটুকুই সকল ছোটবড় কাজের কলকাটি,—প্রাণশক্তি! দেখুন না—যুদ্ধ করতে গিয়ে, আসোরের মাঝখানে অর্জ্জুন কি রকম ভোড়্‌কে গিছলো,—বলে ঘাম্ দিচ্ছে! তাকে চাঙ্গা করতে কেষ্টকে পূরো আটারো পর্ব্বের আমদানী করতে হয়েছিল। কি ফাঁসাদ বলুন দিকি! কেন?—কারণ ওতে রসনা-তৃপ্তির কিছুই ছিলনা; সেটি না থাকলে সব রকম মৃগয়ায় "মৃ"টুকু মুছে গিয়ে সেরেফ্ "গয়া" প্রাপ্তি ঘটে! যদি কর্ণের কালিয়া কি শকুনী সড়্‌সড়ি চল্‌তো, তা'হলে দেখতেন কেষ্টকে কষ্ট করে অত বাজে বোক্‌তে হ'ত না,—অর্জ্জুনের গাণ্ডীব আপনিই বোঁ-বোঁ ক'রে বাণ ছাড়্‌তো। নয় কি?"

বৃদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"এটি অকাট্য কথা;—তার পর?"

কি মুস্কিল,—এখনো "তার পর"! লোকটি আর দু'একটি "তার পর" ছাড়িলেই জয়হরিকে "পর" করিয়া ছাড়িবেন দেখিতেছি। বলিলাম—"তার পর তিন হপ্তায় মাথার সব রসটুকু সূর্য্যদেব শুষে নিয়ে মগজ দুটিকে "খড়্‌লি" বানিয়ে দিলেন! নাড়লেই আকরোটের শুকনো শাঁসের মত খট্‌খট্ ক'রে নড়ে। মানব হেসে বললে—"তাতে হয়েছে কি—মস্তিষ্কের জল মোরে খাঁটি দাঁড়াচ্চে রে! বিশ্বাস না হয় শিবনাথ শাস্ত্রী মশাইকে জিজ্ঞেস কর,—তিনি ত' মিছে কথা কবেন না। ওরে বলে—টনক নড়া—টনক্ নড়া,—ওটা বড় লোকের চিহ্ন রে। আমাদেরও মাথাটা বোধ হয় এইবার "টনকে" দাঁড়িয়ে গেল"! শুনে মনে মনে একটু গর্ব্ব-সুখ অনুভব করলুম,—কারণ মানব ছিল আমার চেয়ে বচর দেড়েকের বড়, আর তার প্রধান গুণ ছিল—সে কোন অবস্থাতেই মিছে কথা কইত না,—বাঘা বেণী মাষ্টারের বেতের ভয়েও নয়।

(২৬)

গুরুগর্জ্জনে বর্ষা এসে পোড়্‌ল'—মানব বললে—

এইবার শিকারের মজা রে!" মহাদেবের মাথায় গঙ্গা নেবেছিলেন, আমাদের সর্ব্বাঙ্গে বর্ষা নাবলেন। একদিন বিকেলের দিকটায় মানব বললে—"জ্বর এলো রে"। বললুম—"তবে আর কাজ নেই—বাড়ী ফেরা যাক।" সে বললে—"একটু জ্বর এসেছে ত' হয়েছে কি—"চকোসা" দেখা দিয়েছে,—দীঘিটে দেখে যাই চ।"

তখন পশ্চিম আকাশ রক্তবর্ণ,—কিন্তু পূবদিকে একখানা মেঘ উঠছে। দীঘির ধারে পৌঁছেই দেখি—৮।৯ হাত দূরে, জলের প্রায় ওপরেই একটা মস্ত' কাতলা মাছের মন্দ গতি। মানবকে বলবার আগেই একখানা আদলা ইট ঝপাং ক'রে মাছটার মাথায় গিয়ে পোড়লো। মানব—"ঠিক্ লেগেছে" বলেই এক-লাফে ৬।৭ হাত দূরে পড়েই ডুব। মিনিট খানেকের মধ্যেই মাছ নিয়ে ভেসে উঠলো। মাথা তুলে চেয়েই—"শীগ্‌গির নোনা গাছটায় উঠে পড়—শীগ্‌গির" বলেই, দু' সেকেণ্ডে ডাঙ্গায় এসে উঠলো। বললুম—"কেন?" সে ধমক দিয়ে বললে—বলছি আগে ওঠ্, শীগ্‌গির—শীগ্‌গির!"

আর বলতে হ'ল না, হাত ৩।৪ উঠেই ফিরে দেখি—সর্ব্বনাশ! একেবারে কাট-মেরে গেলুম! সাকাবার শব্দ আর জলনাড়া পেয়ে, এক ভীষণ কেউটে দীঘির ভেতর থেকে মাথা তুলে, মানবকে লক্ষ্য করে, তীরবেগে আসছে! আমার মুখ থেকে কেবল বেরুলো—"পালাও",—এখন তার আর গাছে ওঠবার সময় নেই। মানব মাছটা ডাঙ্গায় ছুঁড়ে দিয়ে, কাছেই একটা হাঁড়ি পড়েছিল, সেটা বাঁ-হাতে নিয়েই এক-হাঁটু-গেড়ে ব'সতে না ব'সতে—সেই বিস্তৃতফণা সাপ্ একদম সামনে এসেই—প্রায় আড়াই হাত খাড়া হ'য়ে মানবের বুকে সজোরে ছোবোল্ মারলে! অগ্র-পশ্চাতের জ্ঞান ছিল না—বোধ হয় একসঙ্গে আর এক সময়েই—মানবের মুখ থেকে এমন জোরে "খবরদার" শব্দটা বেরুলো যে জল, জঙ্গল, আকাশ, বাতাস, শিউরে উঠলো; দীঘির ধারের পানকউড়ি আর ডাকপাখীগুলো সভয়ে ডাকতে ডাকতে ছুটে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলো; আমি কেঁদে "মা গো" বলেই চোখ বুজলুম। পরক্ষণেই মানব ডাকলে "শীগ্‌গীর আয়"।. পোড়তে পোড়তে গিয়ে দেখি—সাপের মুখ আর ফণার প্রায় অর্দ্ধেকটা মানবের মুটোর মধ্যে!

বৃদ্ধ লোকটি একটা দম্‌কা দম ফেলে ব'লে উঠলেন—"ওঃ, God is great! ধন্য ভগবান!" যুবাটি বললেন "miraculous—অলৌকিক!"

আমি বলিলাম—সাপটা তখন তার হাতে জড়াবার চেষ্টা পাচ্ছে,—মানব তাকে একটা জিওল্ গাছের গুঁড়িতে অছড়াচ্ছে আর এক একবার তার মুখটা সেই গাছেই ঘষ্‌ছে'। মিনিট দশেক এই কস্তাকস্তির পর, সাপটা নির্জ্জীব হয়ে পোড়লো, মুখদে কতকটা রক্ত বেরিয়ে গেল। তখন মানব সেটাকে "যা বেটা" বলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে; দেখি তখনো সে সাড়ে চার হাত!

মানব সাপটাকে এত জোরে ধরেছিল যে, সেটাকে ফেলে দেবার পর দেখি—হাতের তেলোটা লাল হয়ে ঘেমে উঠেছে, আর তাতে যেন ফণার ফটো উঠে এসেছে; সেটা ছাল্ কি আঁশ বুঝতে পারলুম না। মানব এক মুঠো মাটি নিয়ে দীঘির জলে বেশ করে হাতটা ধুয়ে ফেললে। আমার চোখে সে ছাপ কিন্তু এমন পাকা রংয়ে আঁকা হয়ে গিছলো—আমি তখনো তার তেলোয় সেই ভীষণ বিষধরের ফণা দেখছিলুম। বললুম—"কামড়ায়নি তো?" মানব আমার জলভরা আওয়াজ পেয়ে, আমার মুখের ওপর চেয়ে বললে—"কি রে—মেয়েমানুষ না কি, কাঁদচিস কেন? ও কামড়ালে পাঁচ মিনিটও কেউ বাঁচে না। মনে রাখিস—মানুষ সবার বড়, নিজেকে ছোট মনে করলেই মোরবি। জ্বরে হাতের ঠিক ছিল না—যদি ফস্‌কায়,—বল কি না,—ভাবলুম গেলুম। মাকে ডাকতেই—সব ঠিক হয়ে গেল। আর নয়—বাড়ী চ'। মাছটা আমি নিতে পারব না—৮।৯ সের হবে। মাথাটা দপ্ দপ্ করচে—জ্বর বোধ হয় তিনের কম নয়, দেখ'চি তোর কাঁধে ভর দিয়েই যেতে হবে,—আমার হাতে পায়ে আর বল নেই। এটা সাপের আড্ডা রে, আসবার সময় আরো দুটো দেখেছিলুম ভয় পাবি ব'লে বলিনি; একলা কখখনো এদিকে আসিস নি।"

অন্ধকার ক'রে বৃষ্টি এল', কিন্তু মানবের গায়ের "তাতে" আমার কাঁধ পুড়ে যেতে লাগল। সে টোল্‌তে টোল্‌তে বাড়ী ঢোকবার সময় কেবল—"ভয় কি রে" বলে একটু হাসলে। তার সেই হাসি-মুখের মাঝে আমার সব শক্তি, সব উৎসাহ, সব সুখ বেখে বাড়ী ফিরলুম।—তা আর ফিরে পাইনি।

বৃদ্ধ চমকিয়া বিহ্বল ভাবে—"অ্যাঁ—বলেন কি,—ওঃ

হো-হো—unbearable—হায় হায় এমন ছেলেও যায়!" বলিতে বলিতে দুই তিনবার চক্ষু মুছিলেন।

তাঁহার যুবা সঙ্গীটি—"দুর্ভাগ্য দেশ থাকবে কেন!" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র শ্বাস মোচন করিলেন।

বলিলাম—"কিন্তু সেই চরম ক্ষণে হরিসভার অশ্রু-উৎস, পরম ভক্ত সিধু ভট্‌চায্যি গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যা করছিলেন, তিনি রাখাল রায়কে বললেন—"একটা এখনো রইলো!"

বৃদ্ধ ঘৃণার স্বরে বলিলেন—"বলেন কি—a beast—পশু!"

যুবা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"পাপিষ্ঠ পিশাচ,—তাঁর এত বড় রোষের কারণ?"

বলিলাম—"সে পাপ কথা শুনে আর কাজ নেই,—আপনাদের বেলা হ'চ্চে—"

যুবা সাগ্রহে বলিলেন—"তা হোক্—আপনি অনুগ্রহ ক'রে বলুন। এখন বাঙ্গলা দেশে এ ছেলের জীবন-কথা—সত্য নারায়ণের কথা। আপনি কিছু বাদ দেবেন না। চাকরি করবার মত আর গল্প লেখবার মত লেখাপড়া জানা ছেলে ঢের রয়েছে।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি যুবার কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করায় বলিলাম—"গ্রামে এই ঘটনাটিই মানবের কর্ম্ম-জীবনের শেষ সাক্ষ্যরূপে রয়ে গেছে। এখন যা বলচি—এটা আমাদের সেই দুর্দ্দিনেরই উপসংহার।

(২৭)

তখন দিনের আলো ছিল কি না জানি না; যদিও থাকে ত' মেঘ-বৃষ্টিতে সেটুকু ঢেকে দিছলো। মানব আমার কাঁধে খুব আল্‌গা ভর দিয়ে আসছিল—পাছে আমার কষ্ট হয়। কিন্তু জ্বরটা খুব বেশী বেড়ে চলায়, তার অজ্ঞাতে তার সে চেষ্টা মাঝে মাঝে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল',—তার মাথাটা আমার কাঁধের ওপর অসহায়ের মতই লুটিয়ে পড়ছিল। আবার চমক এলেই সে মাথাটা তুলে নিচ্ছিল আর বলছিল,—"আমি বড্ড' ভারী, না? তোকে আজ বড় ভোগাচ্চি!"

হায়—আজ আমার মনে হচ্চে—তার মাথা চিরদিন নিশিদিন কেন আমার স্কন্ধ-সংলগ্ন রইল না, আমি আনন্দে তা বহন করে সুখী হতুম; আমার কোন ভারই বোধ হত না,—তার সেই সুমধুর ভালবাসাই আমাকে বল যোগাত'। তার বিরহে যে ব্যথা বইলুম—সে যে শুধুই কঠিন,—একান্ত নির্ম্মম! যাক্—

তখন পল্লীর মধ্যে ঢুকে পড়েছি,—পাড়ার আঁকাবাঁকা কাঁচা পথে চলেছি। সহসা কে যেন কিসের ওপর কঠিন আঘাত করলে—এই রকম একটা শুষ্ক শব্দ কাণে এলো। সঙ্গে সঙ্গে মানব সবেগে আমার কাঁধ থেকে মাথা তুলে উৎকর্ণ হয়েছে। পরক্ষণেই মূকের একটা অস্পষ্ট অন্তিম যন্ত্রণা-কাতর ধ্বনির মত' শোনা গেল। কোথায় গেল মানবের একশো তিন ডিগ্রি জ্বর,—কোথায় গেল তার পায়ের জড়তা, সে তীরের মত বেরিয়ে গেল। আমার নিষেধ তার কাণে পৌছবারও সময় পেলে না,—ছুটলুম।

সামনের বেঁকটা ফিরেই দেখি,—একটা পাঁচ সাত হাত বংশ-খণ্ড হাতে সিধু ভট্‌চায্যি রাগে ফুলচেন,—এক পায় খড়ম, কাচাটা কাদায় লুটোপুটি খাচ্চে। তিন চার হাত তফাতে একটা গরু চক্ষু কপালে তুলে, সারা দেহটা রাস্তার ওপর এলিয়ে নিস্পন্দ প'ড়ে। তার কপাল আর কাণ সুতো বেয়ে রক্তের ধারা নেবেছে। ভক্ত ভট্‌চায্যি মশাই তার একটা শিং সাবাড় ক'রে দিয়েছেন! মানব কাদার ওপর ব'সে গরুটির গলায় ধীরে ধীরে হাত বুলুচ্চে। আমাকে দেখতে পেয়েই বল্‌লে—"শীগ্‌গির জল আন ভাই"। জলের অভাব ছিল না—পাশেই পুকুর; একটা প'রিত্যক্ত হাঁড়ি কুড়িয়ে জল এনে দিতেই ভট্‌চায্যি পাঁচ পা পেছিয়ে দাঁড়ালেন। মানব গরুটির চোখ-মুখ ধুইয়ে, ধীরে ধীরে তার মাথায় আর সেই সদ্য-ভগ্ন শিংয়ের মূলে জল ঢালতে লাগলো। তিন চার হাঁড়ি জল এনে দেবার পর আমাকে বললে—"এখন ধীরে ধীরে ওর গায়ে হাত বুলো।" সে একটা মানপাতা এনে তার মাথায় হাওয়া করতে লাগলো।

মিনিট দশেক পরে গরুটা কাণ নাড়লে। মানব বললে "এইবার চট্ করে হরেদের বাড়ী থেকে একটু রেড়ির তেল নিয়ে আয় ভাই।" তেল আনতেই নিজের কাপড় ছিঁড়ে তেলে ভিজিয়ে সেই ভাঙ্গা শিংয়ের গোড়ায় যে সাদা অংশটুকু বেরিয়ে পড়েছিল তাইতে জড়িয়ে বেঁধে, জবজবে ক'রে তেলে ভিজিয়ে দিলে। গরুটা একটু একটু মাথা নাড়তে লাগলো, আর তার চোখ দিয়ে জল গড়াতে

লাগলো। পা চারখানা দু' একবার নেড়ে যেন ওঠবার চেষ্টা করলে,—পারলে না।

মানব নিজের কোঁচা দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছিল', সে বলে উঠল'—"এতক্ষণ অজ্ঞান হ'য়েছিল, এইবার যাতনা অনুভব করছে; উঃ, ভারী কষ্ট পাচ্ছে রে—বলতে তো পাচ্চে না!" মানবের গলার আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখি—তারও চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে! তার চোখে এই আমার প্রথম জল দেখা। আমি অবাক হয়ে গেলুম। সে বললে—"ও এখন উঠতে চায়, উঠতে পারলে বোধ হয় নিজের ইচ্ছে মত' স্বস্তির উপায় খুঁজে নিতে পারে—আমরা তো সেটা জানি না! আমার আজ হাতে পায়ে এমন বল নেই যে ওকে তুলে দি,—তোর কম্মও নয়।"

পাড়ার ঐ গলি পথটার ধারেই সিদ্ধেশ্বর ভট্চায্যির রাংচিত্তিরের বেড়া ঘেরা খানিকটে জমি। তার মধ্যে কালকাসুন্দে, আপাং, ওকড়া আর সেওড়া গাছের সঙ্গে সমন্বয় করে ৫।৭টা বেগুণ গাছও মিলে-মিশে ছিল; অবশ্য সূক্ষ্মদর্শী ছাড়া সেটা অন্যের নজরে পড়া কঠিন। বেড়ার গায়ে শজনে গাছটির সে বচরের মত' "বেন্" ফুরোবার পর, ভট্চায্যি মশাই মাচা হিসেবে তার ওপর একটা লাউ গাছ তুলে দিছলেন,—কারণ কবিতা বনিতা আর লতার একটা আশ্রয় দরকার;—তিনি অশাস্ত্রীয় কাজ করেননি। কিন্তু শাস্ত্র-জ্ঞানহীন একটা ল্যাউডগা আশ্রয় ছেড়ে স্বাধীন ভাবে গলি-পথের ওপর ঝুলে পড়ায়, কাণ্ড-জ্ঞানহীন গরুটা তার হাত দেড়েক্ টেনে নিয়ে খাবার উদ্‌যোগ করছিল, ইতিমধ্যে এই দুর্য্যোগ!

গরুটা নড়চে না দেখে ভটচায্যি ভয় খেয়ে দাঁড়িয়ে গিছলেন,—তার পর তাকে একটু নড়তে দেখে, তাঁর সে ভাবটা ফিকে হ'য়ে আসছিল। এমন সময় গরুটাকে দাঁড় করিয়ে দেবার কথাটা তাঁর কাণে পৌঁছুতেই, হাতের বাঁশটা বাগানের মধ্যে ফেলে ব্যস্ত ভাবে বললেন—"আমি ধরচি।" অর্থাৎ—তিনি তখন বামাল সরিয়ে—চোখের আড়াল করতে পারলে বাঁচেন,—অন্যত্র যা' হয় হোক্ গে;—মতলবটা এই।

মানব সবেগে মাথা তুলে বললে—"খবরদার, এদিকে আসবেন না। নিজের নিজের যমকে সকলেই চেনে! আমি স্বচক্ষে দেখেছি—কসাই কাছে এলে গরু শুয়ে পড়ে—থর্ থর্ ক'রে কাঁপে। এখন যাতনায় ওর প্রাণ ওলোট্ পালোট্ খাচ্ছে, আপনাকে দেখলেই ও ম'রে যাবে।"

সিধু ভটচায্যি বুঝেছিলেন—গরুটা এ যাত্রা আর মরচে না। সেই সাহসে চোখ রাঙ্গিয়ে বললেন—"কি, তুই আমাকে কসাই বলিস!"

মানব সহজ ভাবেই বললে—"আমার বলবার তো দরকার নেই ভটচায্যি মশাই, ও যে সেটা বুঝেছে!"

ভটচায্যি চীৎকারের মাত্রা বাড়িয়ে বললেন—"কি—ব্রাহ্মণকে এত বড় কথা,—উচ্ছন্ন যাবি;—জানিস তোর জ্যাঠা আমার পায়ের ধুলো নেয়! দিনান্তে দু'টো শাস্ত্রীয় গ্রাস মুখে দিতে হয়, তাই কত' ক'রে দুটো সাত্ত্বিক আহারের বীজ চারিয়ে রেখেছি—এর মূল্য তোরা কি বুঝবি। এর যে অন্তরায়,—তার একটা কেন—একশোটাকে খুন—

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"তবে আর ভাবনা কি—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এজন্মে আপনার সাত্ত্বিক আহারের অভাবই হবে না।"

ভস্মলোচন কি ভাবে চাইতেন জানি না, কিন্তু সিধু ভটচায্যি আমার দিকে যে ভাবে চাইলেন, তাতে আমার সেই সার্থক-চক্ষু রক্ষটিকেই মনে প'ড়েছিল।

মানব একটু উৎফুল্ল মুখে সহসা আমাকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলো—"মা কালীকে কখ্‌খনো ভুলিসনিরে—অমন মা আর নেই! বিপদে ডাকলেই উপায় করে দেন;—যেই ডেকেছি—ঐ ছাখ্ মা "দোস্ত"কে পাঠিয়ে দেছেন! এ আমি অনেকবার দেখেছি রে।"

(২৮)

চেয়ে দেখি, সত্যিই আজিজ্ আসছে। আজিজকে আগে আমরা আগা-সায়েব বলে' ডাকতুম। সে আমাদের গ্রামে মেওয়া বেচতে আসতো। তার সঙ্গে মানবের বন্ধুত্বের একটু ইতিহাস আছে,—সেটা না বললে কথাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে,—ওদের দু'জনকে ঠিক্ ঠিক্ বুঝতে পারবেন না।

যুবাটি বলিলেন—"দয়া করে সবটাই বলবেন।"

বলিলাম—"একুশ-বাইশ বচরের এই গাড়ে ছ'ফুট্ পুরুষটি সাতফুট্ লাঠি হাতে ক'রে, বড় বড় কুচকুচে চুল

আর ঢিলে পোষাকের ওপর কোমরে নীল রংয়ের চাদর আর মাথায় কাল রঙ্গের পাগড়ি বেঁধে, প্রথম যেদিন আমাদের গ্রামে প্রবেশ করে, সেদিন মেয়ে পুরুষ সকলেই সভয়ে দোরে খিল্ দিছল, আর ছেলে মেয়ে সামনে ছিল;—এমন কি বারবার গুণে দেখেছিল—সবগুলো আছে কি-না! কারণ—লোকটি যে "ছেলেধরা" তার প্রমাণ খুঁজতে কারুরই বাড়ীর বার হবার দরকার হয় নি—তার সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা আর তার মেওয়ার ঝোলাটাই সেটার প্রমাণ দিচ্ছিল। তার ওপর তার কোমরে একখানা ছোরা থাকায়, আর তার বাঁটের ওপর পেতলের পেরেক-গুলো ঝক্-ঝক্ করে' জ্বলতে থাকায়—সকলকে ভয়ে আড়ষ্ট করে' দিয়েছিল। তার অমন সুন্দর নাক চোখ আর গোলাপী আভাযুক্ত গৌরবর্ণটাও—তার বিপক্ষেই দাঁড়িয়ে গিছলো, কারণ—ঐ বাড়াবাড়িটাই ত' ভাল নয়!

গ্রামে তা-'বড়' তা-'বড়' নিরীহ-পীড়ক মামলাবাজ, "বাস্তু-ভক্ষক" সুধীর থাকা সত্বেও সেদিন কারো সাড়াশব্দ ছিল না। কেবল ১৩ বচরের মানবই একা—"পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়" শব্দের মধ্যে, এগিয়ে গিয়ে তাকে বলেছিল—"তুমি কোন্ হায়,—তোমারা বাড়ী কোথায়,—এখানে কেন' আয়া,—মতলব কি হায়?" ইত্যাদি। আজিজ তাকে সহাস্য মোলায়েম কণ্ঠে উত্তর দেয়,—সে কাবুলের লোক, মেওয়া বেচতে এসেছে, কিছুদিন "উদর-পোড়ায়" (উত্তরপাড়ায়) থাকতো, এখন "হালুমবাজারে" (আলমবাজারে) থাকে।

এইরূপ প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দু'জনের প্রথম আলাপ হয়। পরে মানব তাকে বলে—"আচ্ছা ভাই, বেশ বাত্ হায়—অন্য দিন আও;—আমি সকলকে বোল্‌কে রাখবো,—আজ কিন্তু চোল্‌কে যাও। তোম্‌কো দেখে মেয়েরা ডর্ পেয়েছে—বেরুতে পারতা নেই।"

আজিজ্ জিজ্ঞাসা করে—"কেয়া "মরদ্-লোগ্" ভি ডর্‌তা হায়?" তাতে মানব বলে—"হ্যাঁ-তা ডর্‌তা বইকি—সব "মেয়ে-মরদ্" হায় যে! তাদের আমি সব বুঝিয়ে দেগা, তুমি দু'চার দিন পর্-মে এসো।"

আজিজ্ খুব খুসী হ'য়ে বললে—"তুম্ সাচ্চা মরদ্ হায়,—আজ্‌সে তুম্ হামারা দোস্ত,—হাত্ মিলাও",—এই বোলে হাত বাড়াতেই, মানবও হাত বাড়িয়ে দিলে। আজিজ্ সপ্রেমে তার হাত ধরে বল্‌লে—"আচ্ছা দোস্ত্—আজ হাম্ যাতা হায়;—ইস্‌মে সে যো খুসী উঠা লেও—ইয়ে তোমারাই হায়" বোলে মেওয়ার ঝোলা খুলে তার সামনে রেখে দিলে।

মানব ইতস্ততঃ করে' বললে—"তুমি বেচ্‌তে আয়া হায়, আমি তোমারা লোকসান করতে পারেগা নেই"। আজিজ তাতে বলে—তা হ'লে আমি এখান থেকে একপা নড়চি না। পরে তার সবিনয় আর সপ্রেম অনুরোধ এড়াতে না পেরে মানব বললে—"আচ্ছা ভাই হাম্‌কো একটা বেদানা দেও-সন্ন্যাসী জেলের লেড়কার বড় বিমার, তারা বড় গরীব-কিনতে পারতা নেই,—তাকে দেগা। তাতে তোমার ভালো হোগা—তারা কতো আশীর্ব্বাদ করেগা।"

আজিজ্ আধ মিনিট তার মুখের পানে অবাক-দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে, একটা ছোট নিশ্বেস ফেলে,—চোখে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে—"বাঃ খোদা—মরদ আওর দরদ্ এক্‌হিমে—বাঃ! ইয়ে লেও তোমারা সাঁড়াশীকে লেড়কাকে ওয়াস্তে,"—এই বোলে—দুটো বেদানা আর দুটো অ্যাপেল্ দিয়ে তার দু'হাত জোড়া করে' দিয়ে, চট্ করে তার কোঁচাটা টেনে নিয়ে, তাতে চারটে বেদানা, চারটে অ্যাপেল্ এক পেটি আঙুর আর এক আঁজলা আক্‌রোট্ বেঁধে দিলে; মানবের কোন ওজর কোন আপত্তি কাজ দিলে না। তখন সে বললে—"আচ্ছা—এক দিন এর্ বদ্‌লা আমি লেগা, তখন মজা টের পায় গা!"

শুনে আজিজ্ হো হো করে' হাসতে হাসতে বললে—"আচ্ছা দোস্ত লেনা,—দেখা যায়গা!"—তার সেই বিশাল বুকভরা সরল হাসি, আর মুখভরা আওয়াজ্ আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানার রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে গিছলো। তার পর সে মানবদের বাড়ী দেখে নিয়ে,—"আচ্ছা দোস্ত্—আজ হাম্ বড়া খুস্ হোকে চলা" বোলে, তার সঙ্গে সেলামের আদান প্রদানের পর—স্ফূর্ত্তি আর আনন্দ-মাখা মুখে মশ্-মশ্ করে' বেরিয়ে গেল।

এইবার যে-যার নিরাপদ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে মানবকে ঘিরে, কেহ তিরস্কার, কেহ উপদেশ, কেহ পরামর্শ বিলুতে আরম্ভ করলেন। কেহ বললেন—"ডানপিটে ছেলে কোন্ দিন মরবে দেখচি।" রাখাল রায় বললেন—

"আমরা বেরুলুম না আর মদ্দানি করে' উনি এগিয়ে গেলেন। গ্রামে তো আর মাতব্বর কেউ ছিল না! কেন—ওকে আমাদের ভয় ছিল না কি! অমন ঢের দেখেচি! তবে কি না ও-বেটারা ম্লেচ্ছাচারী মন্ত্রবাজ; তুক্‌তাক্ ঢের জানে। হিঁদুর ছেলে—মন্ত্রশক্তি তো মানি,—তাই! যাক্—ওসব কাছে রাখিসনি, আমি কাপড় ছেড়ে এসেছি, দে গঙ্গায় দিয়ে আসি।"

দীন গাঙ্গুলী কথা কবার জন্যে তিনচার বার হাঁ করে'-ছিলেন, ফাঁক পেতেই বলে উঠলেন—"ওরে বাপরে—শুনেছি ওদের কাবুলে বাড়ী, সেটা কি মানুষের দেশ! হুঁ-হুঁ—কামিখ্যে থেকেই মানুষ ফেরে না, আর কাবুল তো তার আরো উদিকে! খবরদার ও সব খাস্‌নি, রক্ত উঠে মর'বি,—ফেলে দে—

সিধু ভটচায্যি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন—উহুঁ-উহুঁ—আমি ওর ব্যবস্থা ঠাউরেছি,—যেমন কুকুর তেমনি মুগুর না হলে হবে না;—বেটা আমাদের কাছে মামদোবাজি দেখাতে এসেছে! ও-সব দে-দিকি আমায়,—নারায়ণকে নিবেদন করে' দিয়ে ওর ভিরকুটি বার্ করে দিচ্চি! হুঁ-হুঁ—আমার বাড়ীতে জাগ্রত দামোদর রয়েছেন—যা দেবে তখুনি ভস্ম! বেদানা ত' বেদানা—কেল্লার কামান উড়ে যায়! শুনলে—ব্যাটা আর এ পথ মাড়াবে না। তোর কোনো ভয় নেই,—দে তুই আমাকে দে।" এই বলে কোঁচাটা পাতলেন। মানব প্রথমটা 'থ'-মেরে গিছলো; সিধু ভট্টচার্য্যির কথা শুনে বললে—"বাঃ, ঠাকুর-দেবতা আমাদের মা-বাপ না? যা নিজে খেতে পারি না—তাই খাইয়ে মা-বাপের মুখে রক্ত তোলা কেন?"

রাখাল রায় বলিলেন—"ঠাকুর দেবতার কথা আর আমাদের কথা! ও পাপ রাখিসনি—ল্যাঠা চোকাতে দে—"

মানব একদম সাফ্ জবাব দিলে—"যান্—আমি দেব'না।"

রায় মশায় তখন চটে বললেন—"তবে মরগে যা—তখন কেউ যেন না বলে—সিধু ভটচায্যি, রাখাল রায় এঁরা উপস্থিত থেকে, আর সব জেনে শুনে কোনো কথা কন্‌নি। তোমরা সবাই শুনলে তো,—বস্ আমরা খালাস্।"

মানব সন্ন্যাসী জেলের ছেলেটির জন্যেই সব বেদানা আর অ্যাপেল দিয়ে এলো; আঙুরগুলো পরে দেবে বলে' রাখলে। কেবল একটা বেদানা আর একটা অ্যাপেল নিলে,—আর আকরোটগুলো সব। ছেলেদের দিলে পাছে তাদের মা-বাপ ভয় পান. তাই দিতে পারলে না,—আমরা দু'জনেই গঙ্গার ঘাটে বোসে ভোগ লাগালুম।

* * * *

আজিজের সঙ্গে মানবের এই প্রথম দিনের পরিচয়। তার পর সেটা কি প্রেমেই পরিণত হয়েছিল! যাক্, কি বলতে গিয়ে কি সব বলে চলেছি! মানব কি আজিজের কথা পড়লে আমার হুঁস্ থাকে না,—মাপ করবেন। এ জীবনে আর আমার এ দুর্ব্বলতা যাবে না। বললেই হত'—আজিজ ছিল কাবুলী মেওয়াওলা, মানবের সঙ্গে ছিল তার খুব ভাব।

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"আপনি মাপ্ করবার কথা কি বল্‌চেন! আপনার দুর্ব্বলতার দৌলতেই না পুরো জিনিসটে শুনতে পাবার পথ পেয়েছি। আজ তিন মাস তিনটি "প"য়ের পাল্লায় পড়ে—জীবনটা বড় একঘেয়ে বোধ হচ্ছে; সকালে 'পোষ্ট আপিস', দুপুরে 'পাশা', বিকেলে 'পাইচারি';—রাতের 'পরোটা' ভক্ষণটা না হয় বাদ্ দিলুম,—কারণ যেখানেই থাকি—পেটে ওটা পড়াই চাই! না—তা হবে না মশাই, ওটা in detail—ওর সবটা বলতেই হবে।"

হাসিয়া বলিলাম—"আগে গরুটারই একটা উপায় হোক্!"

ভদ্রলোকটি একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিলেন—"ইস্ তাই ত, তা তো বটেই—মাপ্ করবেন।

সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক ?

শ্রীরাধারাণী দত্ত

"সতীত্ব" কথাটা লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিপুল বাগ্-যুদ্ধ চলিতেছে বটে, কিন্তু এই 'সতীত্ব' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি এবং সতীরই বা প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা এ পর্য্যন্ত খোলাখুলি ভাবে কোথাও আলোচিত হয় নাই।

দেহের অপবিত্রতা না ঘটিলেই সতীত্ব অব্যাহত থাকে, না মন অশুচি হইলেই অসতী হইতে হয়, এই সমস্যার একটা সহজ সরল সমাধান আবশ্যক। মানুষের মনের স্বাভাবিক ধর্ম্মই এই যে, যেখানে সে উদারতা, মহানুভবতা প্রভৃতি সদ্গুণের বা দেবত্বের বিকাশ দেখে, সেইখানেই সে ভক্তি ভালবাসা কিম্বা শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়ে। সদ্গুণ ও সৌন্দর্য্যের প্রতি চিত্তের স্বতঃই আকৃষ্ট হওয়া মনোধর্ম্মেরই একটা দিক ; সাংখ্যকার মনের এই অবস্থাকে 'আকৃতি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'আকৃতি' অনেকটা মনের Subconscious অবস্থা ; অর্থাৎ যেমন বৎসকে দুগ্ধ পানার্থ অগ্রসর হইয়া আসিতে দেখিয়া পয়স্বিনী গাভীর স্তনাগ্র হইতে দুগ্ধ আপনিই ক্ষরিত হইতে থাকে, গাভী স্বেচ্ছায় দুগ্ধ ক্ষরণ করে না, বা ইচ্ছানুসারে উক্ত দুগ্ধ ক্ষরণ রোধ করিতে পারে না,—মনের সেই অবস্থাকেই 'আকৃতি' বলে। জড়পরমাণুরাশিও এই আকৃতির আক্রমণের অতীত নহে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই বিশেষ গুণকে sympathy ও antipathy বা 'সম্বেদ-নির্ব্বেদ' বলিয়া গিয়াছেন ; ইহাকে অনুরাগ-বিরাগও বলা যাইতে পারে। সাংখ্যকার বলেন, সূক্ষ্মতম আকাশ যে পৃথ্বীরূপে পরিণত হইয়াছে, ইহা অনুলোম-ক্রমে বায়ু, তেজ ও সলিলের মধ্য দিয়া যখন পিণ্ডীভূত হয়, তাহাও একরূপ আকৃতির প্ররোচনায়। জড়পরমাণুগুলির কয়েকটি যদি active হয়, অর্থাৎ move করে, তবে তাহাদের আশেপাশের পরমাণুগুলিও সেই movementএ যোগ না দিয়া থাকিতে পারে না। জগতের এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা sympathyকেই সাংখ্যকার বলিয়া গিয়াছেন 'আকৃতি'।

যেখানেই মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখে অথবা দেবোচিত ভাব উপলব্ধি করে—স্নেহ, প্রেম, করুণা, বাৎসল্য, মমতা, প্রীতি, ধৈর্য্য, ঔদার্য্য, বীর্য্য, ক্ষমা, মহত্ব, তিতিক্ষা প্রভৃতি সদ্গুণ ও সদবৃত্তিগুলি যেখানে অধিকতর সুপরিস্ফুটভাবে প্রত্যক্ষ করে, সেইখানেই সে নিজের অজ্ঞাতসারে স্বতঃই অবনত হইয়া পড়ে। ইহাকেও ঐ সাংখ্যকারের উক্ত আকৃতিরই প্রবর্ত্তনা বলা যাইতে পারে। এ জিনিষ পুরুষ অথবা নারীতে বিভিন্ন বিচারে প্রবর্ত্তিত হয় না। পুরুষ পুরুষের নিকট অথবা নারী নারীর নিকট কিম্বা পুরুষ যদি নারীর নিকট উল্লিখিত স্বতঃ-চিত্তাকর্ষী সুন্দর মনোবৃত্তিগুলির প্রভাবে অবনত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বড় একটা কেহ তাহাতে আপত্তি করেন না ; কারণ, যাহা

মানবের স্বভাব-ধর্ম্ম—সেই সৎ ও সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটা তাঁরা কেহই দূষণীয় বলে মনে করেন না ; কিন্তু সেই একই কারণে নারী যদি কোনও পুরুষের নিকট নত হইয়া পড়ে, তখনই কেবল চারিদিক হইতে আপত্তির ঘোর কোলাহল শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, প্রশ্ন হইতেছে এই যে, উহাতেও কি সতীত্বের হানি হয়? অনেকে হয় ত বলিবেন যে, নারী পুরুষের সহিত সমান অধিকার পাইতে পারেন না ; কারণ, উভয়ের বাহ্যিক, এমন কি, আভ্যন্তরিক অবস্থারও প্রভেদ বা পার্থক্য অনেকখানি। সুতরাং পুরুষের পক্ষে যাহা দূষণীয় নহে অথবা শোভন, নারীর পক্ষে তাহা হয় ত অত্যন্ত দূষ্য। কাজেই উপরিউক্ত ব্যাপারে নারীর সতীত্বের হানি হয়। পুরুষেরও নারীর প্রতি কোনও সততার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে কি না, সে বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া যদি মানিয়াই লওয়া যায় যে, তাঁহাদের মন্তব্যই ঠিক, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, কয়জন নারী এই নিখিলমানবধর্ম্মগত—এই তাবৎ জীবধর্ম্মগত স্বভাবের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন? আমার বিশ্বাস, কোনও নারীই তাহা পারেন না ; কারণ, যাহা স্বভাবগত ধর্ম্ম, জীবের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ও পরিণতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহা স্বতঃই উদ্বুদ্ধ ও পূর্ণত্ব লাভ করে। তবে যিনি অস্বাভাবিক উপায়ে সমগ্র ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করিয়া বহির্জ্জগৎ হইতে, সদসতের সম্পর্ক হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, নিয়ত মনকে কঠোর শাসনে চোখ রাঙাইয়া জড়পিণ্ডে পরিণত করিবার ব্যর্থপ্রয়াসে কেবলমাত্র আত্ম-প্রবঞ্চনা বা আত্ম-প্রতারণা করেন, তাঁর কথা স্বতন্ত্র!

এমন কে নারী আছেন, যাঁহার মন মহত্ত্বের মহিমান্বিত চরণে প্রণত না হয়? সু-স্বভাব, সদ্‌গুণ, সুন্দর চরিত্র যাঁহার চিত্তাকর্ষণ করে না? মানব-মনের এই প্রকৃতিগত স্বভাবের ব্যতিক্রম কেহই ঘটাইতে পারেন না। অথচ, একটা ভ্রমাত্মক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সকলেই আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়া চলিবার ব্যর্থপ্রয়াসে জীবনপাত করতঃ, পুরুষের চক্ষে এবং সমাজের চক্ষে—আপন-আপন সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করেন মাত্র! যিনি বলেন, আমার মন কোনরূপ চিত্তাকর্ষক সদ্‌গুণ—মহত্ত্ব বা দেবত্বের নিকট অবনত হয় না, তিনি 'সতী'র প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও সম্মানের অপেক্ষা লোকের ঘৃণা ও কৃপার পাত্রী হইবারই যোগ্যা। কারণ, তিনি হৃদয়হীনা, কাষ্ঠ-প্রস্তরাদি জড় বস্তুর ন্যায় তাঁহার মনও জড় ভাবাপন্ন! যে হৃদয় মহত্ত্ব, উদারতা প্রভৃতি উচ্চ সদ্‌গুণ দর্শনে প্রীত ও মুগ্ধ হয় না, বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট রূপ ও অনন্ত সৌন্দর্য্যও যে তাহার পাষাণ-চিত্তে কোনও কিছু রেখাপাত করিতে পারে না, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়া দাঁড়ায়। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের অতীত হইতে না পারিলে, কোনও নারীই উল্লিখিত জড়-ভাবাপন্ন হইতে পারেন না ; এবং সেরূপ জড়-স্বভাবা স্ত্রীলোকের হৃদয়ে স্বামী-প্রেমের অঙ্কুরমাত্রও জন্মিতে পারে না। আবার ঐ একই কারণে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের ফলে ও জ্ঞানের উৎকর্ষতার জন্য, তাদের হৃদয়ের সম্প্রসারণ ও ক্রমবিকাশ লাভও অসম্ভবে পরিণত হয়!

সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়া মানবের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। সুরঞ্জিত সুন্দর পুষ্প, সুচিত্রিত-পক্ষ বিহঙ্গ, মেঘবর্ণোজ্জ্বল আকাশ দেখিয়া কাহার চিত্ত না মুগ্ধ হয়? দুর্গন্ধময় পঙ্কিল পয়ঃপ্রণালী দর্শনে মনে যে বিকার উপস্থিত হয়, প্রভাতের অরুণালোকে উদ্ভাসিত বিগলিত রজতধারাবৎ ফেনোচ্ছ্বসিত, কল-হাস্যময়ী নির্ম্মল পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী দৃষ্টেও কি মনে ঠিক তেমনিই ভাবের উদয় হয়? শেষোক্ত শোভা কি চিত্তকে একটুও মুগ্ধ করে না? ক্ষণকালের জন্যও কি সেই নির্ঝরিণীর নৃত্যলীলা চাহিয়া দেখিতে প্রবৃত্তি হয় না? নিশ্চয়ই হয়। মানুষ মাত্রেরই হয়। বিবেক বা ঔচিত্য-বোধ হয় ত অবস্থানুসারে তোমাকে নির্ঝরিণীর সম্মুখে আঁখি মুদ্রিত করিতে ও পঙ্কিল পয়ঃ-প্রণালীতে অবহিত হইয়া অবগাহন করিতে উপদেশ দিবে। কিন্তু কেহ যদি বলে যে, আমার মন স্বতঃই পয়ঃপ্রণালীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং নির্ঝরিণীর প্রতি বিরূপ হইয়াছিল,—আমি বিবেক বা ঔচিত্যবোধের বিন্দুমাত্র সাহায্য লই নাই, তবে কি সে বিকৃত-স্বভাব জীব অথবা মিথ্যাবাদী ও আত্ম-প্রবঞ্চক নহে?

সত্য, শিব ও সুন্দরই যখন মানুষের চিরারাধ্য বস্তু, এবং এই তিনের সমাবেশ যদি নিখিলমানব চিত্তকে অনাদিকাল হইতেই হরণ করিয়া থাকে, তবে প্রকৃত 'সতী' কে? সতীত্বের যথার্থ অর্থ কি? আমার ধারণা—'একে' অটুট

নিষ্ঠার নামই সতীত্ব। 'একের' প্রতি গভীর প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেই সতীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়। সেই 'এক' শব্দের অর্থ 'সত্য' ভিন্ন অন্য কিছু নহে। 'সত্য' অথবা সতের একনিষ্ঠ অনুরাগিণী যিনি, সেই নিষ্ঠাবতীই প্রকৃত 'সতী'। কিন্তু সেই 'সৎ' বা 'সত্য'—'এক' বস্তুটি কি? 'এক' বা 'সত্য' কেবল সেই অখণ্ড অব্যয় অনাদি ব্রহ্মকেই বলা যাইতে পারে। সুতরাং যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ সেই পরমব্রহ্মে অর্থাৎ ঈশ্বরে নিষ্ঠাবতী, তিনিই 'সতী'। কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রমে নারী মাত্রেই যদি এইভাবে 'সতী' হ'ন, অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্রহ্মানুরাগিণীই হ'ন, তাহ'লে সৃষ্টি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাই বোধ হয় নারীর পক্ষে স্বামীকে ব্রহ্মের প্রতীকং—অর্থাৎ সাকার দেবতা রূপে খাড়া করা হইয়াছে। স্বামীকে সেই এক সত্য বা ঈশ্বরের বিগ্রহ-রূপ ভাবিয়া তাঁর উপর সুগভীর নিষ্ঠাযুক্ত ঐকান্তিক ভালবাসা স্থাপন করিতে পারিলে, আর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও অবরোধের উচ্চ প্রাচীর তুলিয়া সতীত্ব রক্ষার প্রয়োজন থাকে না। মনুষ্যত্বের উচ্চ বিকাশ দর্শনে বা মানুষের মহৎ গুণের নিকট মন অবনত হইলে ও তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে, আত্মপ্রসারণ ও স্বীয় মনুষ্যত্বের উন্নতিই সাধিত হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস!...গুণের আদর বা মহত্বের পূজায় নারীর সতীত্ব যদি ক্ষুণ্ণ হয়, তবে সে সতীত্বের কোনও মূল্য নাই; যে বিধি হৃদয় ও মনকে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া নরকের বিভীষিকা ও সমাজের উৎপীড়নের ভয় দেখাইয়া ক্রমাগত নিজের অন্তরস্থ চিরমুক্ত স্বাধীন মানবাত্মাকে সঙ্কুচিত ও মৃতপ্রায় করিয়া তোলে, তাহা কোনও দিনই জাতি ও সমাজের কল্যাণকর হইতে পারে না। একটা ভ্রান্ত সংস্কারের মোহে আমরা জীবনের অনাবিল সরলতা, প্রফুল্লতা ও সজীবতা বিসর্জ্জন দিয়া, মিথ্যার কপট আবরণে আজীবন আপনাকে ও পরকে সমানভাবে প্রতারণা করিয়া যাই।

মহত্ত্ব ও সৎগুণের পূজা করিলে সতী স্ত্রীকে কোনও দিনই স্বামীর নিকট প্রত্যবায়গ্রস্তা হইতে হয় না, অর্থাৎ নারীর সতীত্বের হানি হয় না—যদি না সেই স্থলে একেবারে অভিভূতা হইয়া পড়া যায়। যেখানে রূপ গুণ বা মহত্ব দর্শনে নারী অভিভূতা হইয়া পড়ে, সেই-খানেই আসক্তি আসে এবং এই আসক্তিকেই সতীত্বের হানিকর বলা যাইতে পারে। এই অভিভূত অবস্থা ও আসক্তি হইতে সতীকে রক্ষা করে তার বিবেক; ও তদপেক্ষা অধিকতর রক্ষা করে তাহার একনিষ্ঠ সুগভীর স্বামী-প্রেম। স্বামীর প্রতি সেই সুগভীর প্রেম ও নিষ্ঠার স্থাপনা দুই প্রকারে হইয়া থাকে; এক হইতেছে—উভয়ের যথার্থ হৃদয় বিনিময়ে—অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের রূপ গুণ ও প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া; আর এক হইতেছে দোষগুণের বিচার-বিহীন যে স্বতোৎসারিত প্রেম, অর্থাৎ স্বামী যে ব্রহ্মের প্রতীক্ বা ঈশ্বরের সাকার বিগ্রহ কিম্বা নারী জাতির একমাত্র ইষ্ট, ইহাতে অচল অটল সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনার দ্বারা। এই সুদৃঢ় বিশ্বাসই ভক্তি ও নিষ্ঠা আনয়ন করে; আর তাহারই পূর্ণ পরিণতি হয় প্রেমে। এই জন্যই অনেক কুৎসিত, কুরূপ, অসৎ ও অত্যাচারী স্বামীর অদৃষ্টেও সতী স্ত্রী লাভের সৌভাগ্য ঘটিতে দেখা যায়।

যে 'সতীত্ব' লইয়া আমাদের দেশে এত গর্ব্ব, এত অহঙ্কার, এত গৌরব প্রকাশ করা হয়, সে 'সতীত্ব' আজ এখানে বিধিবিধান-বহুল যন্ত্রের চাপে প্রাণহীন, চেতনাশূন্য, মৃতের ন্যায় জড় অবস্থাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই যন্ত্র-নিষ্পেষিত জড় সতীত্বের অহঙ্কার করা মোটেই শোভন বলিয়া মনে হয় না। অন্য দেশের সহিত তুলনায় আমাদের দেশের সতীর সংখ্যা হয় ত হিসাবে শতকরা অনেক বেশী হইতে পারে; কিন্তু সেই 'সতী-সুমারী'র অনুপাত দেখিয়া গর্ব্বে ও উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিবার কোনও কারণ নাই; কেন না, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আমাদের সতীর সংখ্যা যেমন অন্য দেশের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তেমনি এ কথাও সত্য যে, আমাদের দেশের সতীত্বের মধ্যে গলদ, গোঁজামিল ও ফাঁকিও অনেক বেশী। কিন্তু এই কঠিন সত্য উচ্চারণ করিবার স্বাধীনতা এ দেশের লোকের নাই। একটু ধীর ভাবে বিচার করিলে যদিও সকলেই এ বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্মাব-ধারণ করিতে পারিবেন নিশ্চয়, কিন্তু খুব কম লোকেই তাহা প্রকাশ্য ভাবে স্বীকার করিতে সাহসী হইবেন।

'আকুতি' বা মনোধর্ম্মের উপরই যে আমি অধিক stress দিয়াছি, এ কথা যেন কেহ না মনে করেন। কেন না, তাহা হইলে লেখিকার উপর অবিচার করা হইবে। প্রবৃত্তির স্রোতে 'গা-ভাসান' দেওয়ার স্বপক্ষে আমি সে

কথা বলি নাই। আকৃতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে মনের স্বাভাবিক গতি বা ক্রিয়ার কণ্ঠরোধ করতঃ উহাকে হত্যা করিয়া অন্তরস্থ মনুষ্যত্বকে জড়ে পরিণত করা অনুচিত, ইহাই আমার বক্তব্য। হয় ত অনেক স্থলে যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি, বলিবার দোষে তাহা সুপরিস্ফুট হয় নাই। আর একটি কথা নিবেদন করিয়া আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চাই। যাহাকে প্রকৃত সত্য বলিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারা যায়, তাহা অকপট চিত্তে স্বীকার করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। আমাদের দেশে এক সম্প্রদায়ের সাধু আছেন, যাঁহারা কামরিপু জয় বা উহার উচ্ছেদ সাধনের জন্য আপনাদের পুরুষাঙ্গ পর্য্যন্ত ছেদন করেন। তাঁহাদের এই অমানুষিক কার্য্য এদেশে চিরদিন প্রশংসাই লাভ করিয়াছে; কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাতে উক্ত সাধু সম্প্রদায়ের রিপুদমনের অক্ষমতাই পরিব্যক্ত হইতেছে! তাঁহাদের 'কামজিৎ' অপেক্ষা 'কামভীত' নামেই অভিহিত করা উচিত। আমাদের দেশের সতীত্ব রক্ষাও উপস্থিত অনেকটা এই প্রণালীরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সত্যের উপর সংস্কারের মোহ, সমাজভীতি, স্তুতি, নিন্দা, অহঙ্কার, আত্মগরিমা ইত্যাদি রাশি রাশি স্বার্থের আবরণ চাপাইয়া, অন্তরের প্রকৃত মানবত্বকে নিষ্পেষিত ও আবরিত করিয়া, মিথ্যার পতাকাকে অধিকতর মিথ্যার ঝালরে সজ্জিত করিয়া সত্যের কেতন রূপে প্রকাশ্য পূর্ব্বক আমরা আত্মগৌরব ও আত্মপ্রসাদ লাভ করি! এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না, যিনি অন্তরের পূর্ণ সত্যকে নির্ভীক চিত্তে, অকপটে, প্রকাশ্য দিবালোকে, সর্ব্বলোক চক্ষের সম্মুখে সম্পূর্ণ অনাবৃত রূপে উপস্থিত করিয়া, এই কপট ভণ্ডামীর ছদ্মশোভায় সজ্জিত মিথ্যার উচ্চ পতাকার বিরুদ্ধে সোজা হইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে পারেন। তাই অসহায়ের মতই অন্তরের সেই অন্তরতম পুরুষের নিকট আজ সকাতরে কবীন্দ্র রবীন্দ্রের ভাষায় শুধু প্রার্থনা করি:—

"এ দুর্ভাগ্য দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়;
এই চির-পেষণ-যন্ত্রণা ধূলি তলে,
এই নিত্য অবনতি দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু ত্রস্ত নত শিরে
সহস্রের পদপ্রান্ত-তলে বারম্বার
মনুষ্য-মর্য্যাদা-গর্ব্ব চির পরিহার;
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর কর। মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।"

নূতন যাত্রী

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন

স্বরলিপি—শ্রীমতা সাহানা দেবী

কালেংড়া—দাদরা

তোর কাছে আসব মাগো শিশুর মত ;
সব আবরণ ফেলব দূরে
(আমার) হৃদয় জুড়ে আছে যত।
দৈন্য যে মা মনের মাঝে
ঘুচবে না তা মিথ্যা সাজে।
সব আবরণ করব খালি,
দেখবি মা তুই মনের কালি ;
শূন্য যে মোর প্রেমের থালি
তাই চরণে করব নত।
মারবি মাগো যতই মোরে,
ডাকব আমি ততই তোরে।
ধরব যখন জড়িয়ে হাত,
দেখব কেমন করবি আঘাত।
তখন মা তুই পাবি ব্যথা
ব্যথা দিতে অবিরত।
মনের হরষ মনের আশে,
বলব সরল শিশুর ভাষে।
সুখের খেলনা হাতে পেয়ে,
তোর কাছে মা যাব ধেয়ে।
তোর স্নেহাশীষ মাথায় লয়ে
ভবের খেলা খেলব কত॥

II গা | মা পা দা | পা র্সা না | দা পা -া | দপা দপা মা |
তো র্ কা ছে আ স্ ব মা গো - - - শি

মমা পদা পা | মগা মগা II
শু র্ ম তো -

{ না | না র্সা সঋা | র্সা না র্সনা | দা পা া | া -া -া |
সব আ ব রণ্ ফে ল্ ব দূ রে

দা পা মগা | মা পা দপা | মা মমা পদা | পা মগা } II
আ মার্ হৃ দয় জু ড়ে আ ছে য ত

{ সা | সা মা মা | মা মা া | মা মা া | পমা পমা গা |
দৈ ন্য যে মা ম নের্ মা ঝে - - - ঘুচ্
মার্ বি মা গো য ত ই মো রে - - ডাক্
ম নের্ হ রষ্ য নে র্ আ শে - - বল্

গা মা পা | গা মা মগা | ঋা সা া | -া -া | }
বে না তা মি - থ্যা সা জে - - -

বো আ মি ত ত ই তো রে - - -
ব স রল শি শু র্ ভা যে - - -

{ দা | দা না র্সা | ঋা া সা | না র্সা া |
সবঃ আ ব রণ্ কর্ ব খা লি
ধর্ ব ব খন্ জড়ি - য়ে হাত
সু খের্ খেল্ না' হাতে - পে য়ে

\+ ° + °
সা না সা | র্গা র্ঋা সা | না সা র্সনা | দা পা া |
দে খ্ বি মা তুই ম নে র্ কা লি
দে খ্ ব কে মন্ কর্ - বি আ ঘাত্
তো র্ কা ছে মা যা বো - ধে য়ে

\+ ° + °
া -া } { সা | না র্সা র্সর্ঋা | র্সনা র্সা না | দা পা া |
শূ ন্য যে মোর্ প্রে মে র্ থা লি -
ত খন্ মা তুই ব্য থা - পা বি -
তোর স্নে হা শীষ্ মা আ য় ল 'য়ে -

\+ + ° + ° +
(া -া) } দপা দপা মগা | মা পা দপা | মা মা পদা | পা নগা া | া া |
তাই চ র ণে ক র্ ব ন ত - - -
ব্য থা দি তে অ বি - র ত - - -
ভ বের্ খে লা খে ল্ ব ক ত - - -

শীয়েড়া লেয়েঁা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

ইংরাজ-অধিকৃত আফ্রিকার পশ্চিম কূলে এই শীয়েড়া লেঁয়ো উপনিবেশ। এখানে মেন্দী অধিবাসীই সব চেয়ে বেশী। এরা খাঁটি কাফ্রী জাত (নিগ্রো)। আকৃতি নাতিদীর্ঘ, দৃঢ় সবল সুগঠিত দেহ। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পরিশ্রম করবার শক্তি ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা অনন্যসাধারণ। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ সহ্য ক'রে তারা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ক্ষেতের কাজে খাটে। চাষবাস ছাড়া কুটীর-শিল্পও তাদের মধ্যে অনেকের প্রধান অবলম্বন ছিল, তবে সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রেলপথ বিস্তার ও সরকার বাহাদুরের তত্ত্বাবধারণের ফলে সেখানে সুলভ মূল্যে বিদেশী পণ্য দ্রব্যের প্রচুর আমদানী হওয়ার জন্য তাদের অনেকগুলি প্রধান প্রধান শিল্প-কার্য্য ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে।
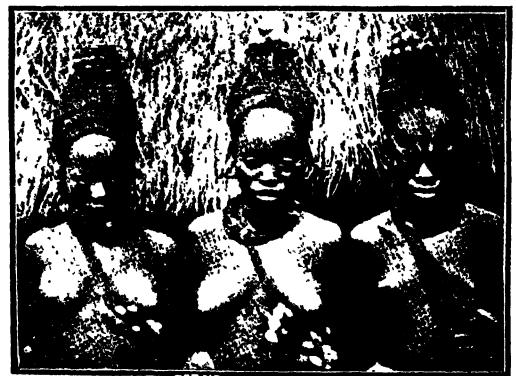
'শে' খেলা

মেন্দি মেয়েদের কবরী

সেই সঙ্গে তাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের সময় থেকে প্রচলিত কত প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতি ও আনন্দ-উৎসবও একে একে অদৃশ্য হতে আরম্ভ হ'য়েছে।

বল না কেন, তাঁরাই হচ্ছেন সেখানকার প্রধান ও সব চেয়ে বড় সহায়ক।

মেন্দীদের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে।

বুন্দু মেয়েদের সন্ধ্যা-বন্দনা

মীনেশ্বরী মন্দিরে নৃত্য-গীত

ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে মেন্দীর সর্দ্দারেরাই রাজ্য-শাসন করতেন। উপস্থিত তাঁদের ক্ষমতা বহু পরিমাণে খর্ব্ব ক'রে দেওয়া সত্ত্বেও, সৎ বা অসৎ যে কোনও কাজই

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক একটি গুপ্ত সমিতি আছে। তার মধ্যে 'পোরো' ও 'বুন্দু' এই দুটাই হ'চ্ছে প্রধান। 'পোরো' হচ্ছে কেবল মাত্র পুরুষদের সমিতি। এর মধ্যে মেয়েদের

প্রবেশাধিকার নেই। আর 'বুন্দু' কেবলমাত্র মেয়েদেরই সম্প্রদায়, পুরুষের ছায়া পর্য্যন্ত এর মধ্যে আসবার অধিকার পায় না। এদের এই সম্প্রদায়গুলোর ব্যাপার অনেকটা আমাদের কুলাচারী, বামাচারী, বীরাচারী প্রভৃতি তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মতোই। অতি সঙ্গোপনে এদের বৈঠক বসে এবং সমিতির দীক্ষিত সভ্য ব্যতীত বাইরের কেউ সে বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পায় না। 'পোরো' সম্প্রদায়ের প্রাধান্য এত বেশী যে, মেন্দী জাতির যা কিছু রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক সমস্যা, সে সমস্তই এদের বৈঠকে সমাধানের জন্য পেশ হয়। এদের বৈঠক বসে সাধারণতঃ গভীর জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে খানিকটা জায়গা এই বৈঠক বসবার জন্য বিশেষ ভাবে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। কেবলমাত্র

মেন্দি পল্লীর কুটীর

নব দীক্ষিতা বুন্দু

সুমোরী দেবতার বিগ্রহ

রা সমস্যা সমাধানের জন্য যে বৈঠক হয়, সেটা প্রায়ই পল্লী ও জনপদের সন্নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে বসে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সে বৈঠকে যোগ দিতে দেওয়া হয় না। ভয়ে বৈঠকের কোনও সভ্যই সে সম্বন্ধে একটি কথাও কাউকে বলতে সাহস করে না। পোরোদের মধ্যে তিন রকম শ্রেণী আছে, প্রথম 'আয়ুইরা' অর্থাৎ নিম্ন সম্প্রদায়,

'বুন্দু' মেয়েদের প্রাতঃ প্রণাম

সামাজিক বৈঠক সমস্তই সেই জঙ্গলের মধ্যে "পোরো কুঞ্জে" আহূত হয়। সেখানে যদি কোনও মামলার বিচারে কেউ প্রাণদণ্ডের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তাহ'লে তাকে দ্বিতীয় 'বিনিমিশি', অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, তৃতীয় 'কাইমাহুন্' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়। 'আয়ুইরা' কেবলমাত্র নীচ জাতীয়দের জন্য, 'বিনিমিশি' প্রধানতঃ মুসলমান ও

দোলনায় নৃত্য। (তিরিশ ফুট উঁচু একটি দোলনার উপর দুলতে দুলতে নানারূপ নৃত্যকলা প্রদর্শন করা এদের একটা বিশেষত্ব। দোলনার উপর যখন নৃত্য হ'তে থাকে, তখন সেই নৃত্যের তালে তালে নীচেয় আর একদলের গীত বাদ্যের ঐক্যতান চল্‌তে থাকে।)

তৎক্ষণাৎ হত্যা ক'রে সেই বৈঠকের অধিবেশন ভূমিতেই প্রোথিত করে ফেলা হয়। তার বিষয় বাইরের লোকেরা আর কেউ কিছু জান্‌তে পারে না, কারণ শপথ ভঙ্গ হবার বিধর্ম্মীদের এবং 'কাইমাহুন' কেবলমাত্র সর্দ্দারদের জন্য। কাইমাহুনরাই সম্প্রদায়ের আইন-কানুন নির্দ্ধারিত করে এবং 'বিনিমিশি' ও 'আয়ুইরা' তা নতশিরে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

মেন্দিরা কেউ লিখতে পড়তে জানে না। হস্তলিপি সম্বন্ধে তারা একেবারেই অজ্ঞ। সেইজন্য খবরাখবর পাঠাবার প্রয়োজন হ'লে তাদের বিশ্বস্ত লোক মনোনীত

মীনেশ্বরী দেবীর বিগ্রহ

ক'রে দৌত্য কার্য্যে নিয়োগ ক'রতে হয়। এই সংবাদ-বাহী দূতেদের তারা বলে "উজা"। 'পোরো' সমিতির দীক্ষিত লোক না হলে আবার 'উজা' হবার অধিকারী হয় না। সকল বিষয়েই এদের একটা অপদেবতার ভয় লেগে আছে। এরা সদাই সশঙ্কিত পাছে ভূতে কোনও অনিষ্ট করে। তাই মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড় ফুক প্রভৃতির দ্বারা ও তাগা মাদুলী কবচ ইত্যাদি ধারণ করে এমন কি সুস্থ শরীরে ক্ষত করেও (অর্থাৎ যাকে দেগে দেওয়া বলে) তারা অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা পাবার নানারকম উপায় অবলম্বন করে।

'বিনিমিশি' সম্প্রদায়ের সভ্যরা প্রায় অধিকাংশই মুসলমান। এদের ভূত আবার আরও ভয়ানক। মাম্‌দো ভূতের যে গল্প আমরা ছেলেবেলায় পড়েছি এদের ছেলে বুড়ো সবাই সেই ভূতের ভয়ে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত। বিনোদের মধ্যে ভূতের পূজো একটা খুব বড় উৎসব। এই উৎসবে ভূতের ওস্তাদরা ভূত সেজে নৃত্য করে। সে সাজ অতি অদ্ভুত রকমের। ঘাস ও গাছের আঁশের তৈরী আপাদ-লম্বিত দীর্ঘ আঙ্‌রাখায় সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে, মাথায় একটা চামড়ার কাণ-ঢাকা হনুমান টুপী পরে, মুখটি পর্য্যন্ত একে-বারে চাপা দিয়ে, কেবল চোখ দুটির কাছে দুটি ফুটো রেখে তারা উৎসবে আবির্ভূত হয়। গলায় কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে চির-প্রচলিত সেই ধুক-ধুকী ও পদকের মালা এবং হাতে তাবিজ বাঁধা থাকে। পদকে ফার্সী-হরফে সব ভূত ছাড়ানো মন্ত্র লেখা থাকে। তারা যখন উৎসবে নৃত্য করতে থাকে, তখন তাদের সেই গলার পদকগুলো ঝম্ ঝম্ করে বাজে। আর সেই সঙ্গে উৎসব বেশে তাদের দলবল ছোট ছোট বাঁশের লক্‌ড়ী বাজাতে বাজাতে এমন বিকট চীৎকার করতে থাকে যে, কাণ ঝালাপালা হয়ে যায়।

মেন্দিস্থানে পর্য্যটকেরা হয় ত' কোনও দিন প্রাতর্ভ্রমণে

মেন্দি নারীর কেশ-বেশ

বেরিয়ে হঠাৎ একটা করুণ কোমল সুরের সুদীর্ঘ রেশ শুনতে পেয়ে, বিস্ময় কৌতূহলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রবেন। ভাববেন, প্রভাতের শান্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে

সাঙবে বাদকের দল

এ কোন্ রহস্যময় অলৌকিক ধ্বনি এমন জনহীন অরণ্যের নির্জ্জনতাকে ব্যাকুল করে তুলছে। এ কিসের শব্দ? কোথা থেকে আসে?! জান্‌বার একটা অদম্য আগ্রহ মনকে অস্থির করে তুলবে। কারণ, সে সুর একবার কাণে প্রবেশ ক'রলে, আর তাকে জীবনে কোনও দিন ভুলতে পারা যায় না। প্রথমটা খুব ধীরে অতি কোমল পর্দ্দায় সে সুরের করুণ নিঃস্বন শোনা যায়, তার পর ক্রমেই তা উচ্চ হ'তে উচ্চতর পর্দ্দায় উঠতে থাকে। তার পর ধীরে ধীরে আবার বাতাসে মিলিয়ে যায়। যারা এ সুরের সঙ্গে পরিচিত, তারা জানে এ কোনও অলৌকিক ব্যাপার নয়, এ 'বুন্দু' সম্প্রদায়ের দীক্ষার্থিনী বালিকাদের মন্ত্রগান! প্রভাতের পথিক এ সুর শুন্‌তে পেলে বুঝবে যে, সে কোনও 'বুন্দু কুঞ্জে'র সন্নিকটে এসে পড়েছে!

ভূত শান্তির বেড়ী

'বুন্দু' সম্প্রদায়ের নিয়ম কানুন, আচার ব্যবহার অধিকাংশই 'পোরো' সম্প্রদায়েরই অনুরূপ; কেবল মন্ত্রগুপ্তিসম্বন্ধে এদের একটু বেশী রকম কঠোরতা দেখতে পাওয়া যায়। পোরো কুঞ্জের আশে পাশেও তবু লোক যেতে সাহস করে; কিন্তু বুন্দু কুঞ্জের ত্রিসীমানায়ও কেউ ঘেঁসতে চায় না, এমনিই তাদের একটা প্রবল আতঙ্ক আছে এই নারী সমিতিটির ডাইনী প্রভাবের উপর। পোরোদের

মতো বুন্দুদেরও তিনটি শ্রেণী আছে। 'দীগূবা' বা ইতর আশ্রম, "নোর্ম্মে" বা 'মধ্য সম্প্রদায়' এবং 'সাউওয়ে' বা শ্রেষ্ঠ সমাজ। শেষোক্ত শ্রেণীর সভ্য হচ্ছে বড় সর্দ্দার পত্নী ও সর্দ্দার পুরনারীরা। পুরুষদের মধ্যে কোনও একটা সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে দীক্ষিত হওয়াটা যেমন একটা অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে

বুন্দু বালারা

"বুন্দু" প্রেতুনী সম্প্রদায়
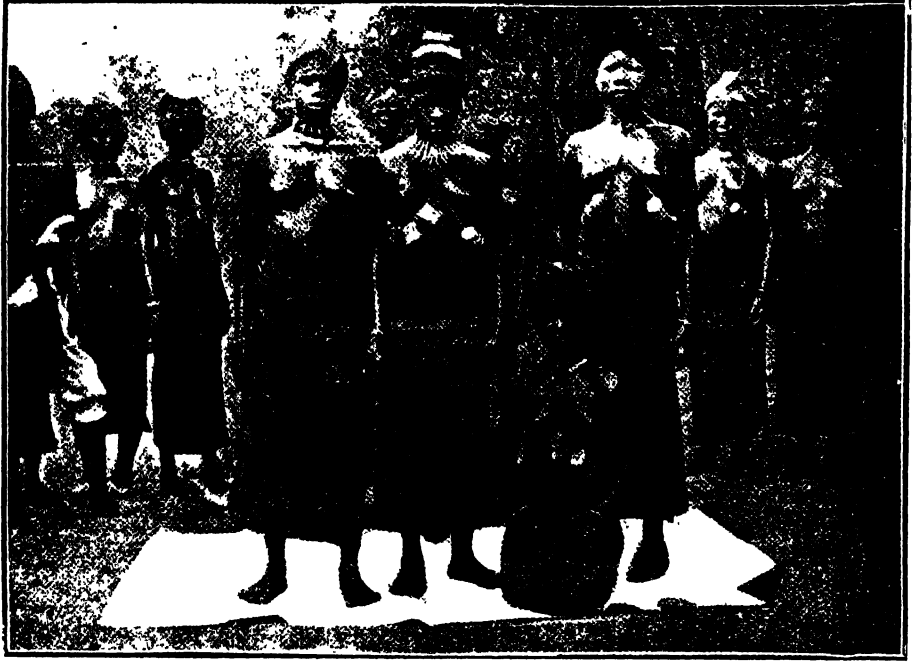
মেয়েদের ভিতর যদিও সে রকম কোনও বাধ্যতা-মূলক নিয়ম নেই, তবু অধিকাংশ মেয়েই বুন্দু সম্প্রদায়ের দীক্ষিত সভ্য হলে, তারা সামাজিক সুবিধা অনেক রকমই পায়; তা ছাড়া, তাদের মান মর্য্যাদাও কতকটা বাড়ে।

নৃত্য গীত ও বাদ্য বুন্দু মেয়েদের একান্ত প্রিয় কার্য্য। প্রায় প্রতি দিনই তারা দিনের কাজ শেষ ক'রে, আনন্দের উজ্জ্বল বেশে সজ্জিত হ'য়ে নৃত্য গীতে যোগদান করে। বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশী ও পরিবারস্থ ব্যক্তিরাই প্রধানতঃ তাদের শ্রোতা। নাচের মজলিসের প্রধান বাদ্য যন্ত্র হচ্ছে "শেগুড়া"। শুকনো লাউ খোলায় তৈরি, ডান হাতে ধরবার জন্য বোঁটার দিকটা হাতোলের মতো সরু ও লম্বা করে বানায়। দেখ্‌তে অনেকটা আমাদের দেশের ছোট ছেলে মেয়েদের কাঠের ঝুমঝুমির মতো, কেবল আকারে একটু বড়। তুম্বীর উপরটা সুতোর বোনা জাল দিয়ে ঘেরা থাকে এবং সেই জালের অপর প্রান্ত বেণীর মত ঝোলানো। ডান হাতে বাঁটটি ধরে বাজাবার সময় মেয়েরা বাম

বুন্দু প্রেত্নী'দর মুখোস

হাতে শেগুড়ায় সেই সুতোর বেণীটি আকর্ষণ করে রাখে। তুম্বীর জাল আবরণের মধ্যে আবার ফলের বীজের ঘুঙুর গেঁথে রাখে বলে, ঝুমঝুমী নেড়ে বাজাবার সময় তালে তালে ঘুঙুরগুলিও মিঠে সুরে বেজে ওঠে! মেয়েরা সব দল বেঁধে এক সঙ্গে নাচে। তাদের নাচ অতি চমৎকার। যে তরুণীর নৃত্য সকলের চেয়ে সুন্দর হয়, শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন বয়স্থা নারী উঠে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে—তার মুখমণ্ডলে, গ্রীবায়, স্কন্ধে নারিকেল তৈল মর্দ্দন করে দেয়। অবশিষ্ট শ্রোতারা তখন সকলে মিলে সমস্বরে আনন্দধ্বনি ও উল্লাসজনক অঙ্গভঙ্গী ক'রতে থাকে।

দীক্ষা গ্রহণ করবার পুর্ব্বেই অধিকাংশ মেয়ে বিবাহের জন্য 'পণবদ্ধা' বা 'বাগদত্তা' হ'য়ে যায় বটে, কিন্তু দীক্ষাকাল সমাপ্ত হবার পুর্ব্বে তাদের আর পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। দীক্ষা সম্পূর্ণ হ'লে তখন বাগদত্তা কন্যারা তাদের ভাবী পতির সঙ্গে দেখা করতে পায়। দীক্ষাব্রত উদ্‌যাপনের দিন মহাসমারোহের সঙ্গে কন্যার একটা স্নান-যাত্রার উৎসব হয়। স্নান-যাত্রার উৎসবের দিন যে সব মেয়েরা এখনও পর্য্যন্ত বাগদত্তা হয় নি, অথচ দীক্ষা সম্পূর্ণ হ'য়েছে, তাদেরও বুন্দু কুঞ্জ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'তে হয়, এবং সকলে একত্রে মিছিল করে সারা গ্রামটা প্রদক্ষিণ করে আসে। মেয়েদের যত আত্মীয়ারাও সেদিন সেই মিছিলে ক্রমে যোগ দেন। মিছিলের পুরোভাগে স্বয়ং 'গুরুমা', অর্থাৎ যিনি মন্ত্রতন্ত্রে ও ঔষধপত্রে সকলের চেয়ে বিশেষজ্ঞ, তিনি থাকেন; এবং তাঁর সঙ্গে ভৌতিক বিদ্যা ও ইন্দ্রজাল-সিদ্ধ যোগিনীরাও থাকেন। এই মিছিলের নাম "তিফে"; কারণ, মিছিলের সমস্ত মহিলাদের হাতে সেদিন মাঙ্গলিক চিহ্ন স্বরূপ একরকম গাছের পাতা থাকে—সেই গাছকে তারা বলে 'তিফে'।

মিছিল সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করে আবার বুন্দু কুঞ্জে ফিরে আসে; এবং সেখানে কেবলমাত্র বাগদত্তা মেয়েদের মাথায় "শোবোরো" লাগিয়ে দেওয়া হয়। 'শোবোরো' হ'চ্ছে বুন্দু কুঞ্জের মন্ত্রপূত ও ঔষধ রস মিশ্রিত কাদামাটি। এই কাদামাটি মাথায় মেখে তারা নদীতে নাইতে যায়। স্নানের সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষাব্রতেরও উদ্‌যাপন হয়ে যায় এবং মেয়েরা যে যার ঘরে ফিরে আসে।

স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কিন্তু প্রত্যেক মেয়েকে সর্দ্দার ভবনে ত্রিরাত্রি যাপন করতে হয়। এই তিন রাত্রি তারা পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে পায় না, সর্দ্দার-বাড়ীর মেয়েদের তত্ত্বাবধানে থাকে। কিন্তু দিবাভাগে তারা ভাবী পতি, পুরুষ আত্মীয় বা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে পারে। দীক্ষাব্রত উদ্‌যাপনের পর থেকে বিবাহ কালের মধ্যে কোনও কুমারী যদি পুরুষের সহিত রাত্রিবাস করে, তাহ'লে সে দেবতার কোপে পতিতা হ'য়ে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়—এইরূপ একটা ধারণা তাদের মধ্যে একেবারে বদ্ধমূল হ'য়ে আছে। এই জন্য বিবাহের পূর্ব্বে কোনও বালিকা সহজে পুরুষের সংসর্গ করতে সম্মত হয় না।

মুখোসের পশ্চাৎদিক

প্রেম-মূলক বিবাহ মেন্দিদের মধ্যে একেবারে নাই বল্লেও চলে। প্রত্যেক বিবাহই তাদের অভিভাবক ও আত্মীয় পরিজনেরাই দেখে শুনে স্থির করে দেন। অনেক সময় সেখানে পুরুষকে একটি মনোমত স্ত্রী ক্রয় ক'রে নিতে হয়। তবে পত্নীর মূল্যটা নিতান্ত 'দাম' বলে না দিয়ে 'যৌতুক' বা 'উপহার' বলেই দেওয়া হয়। ঠিক আমাদের বাংলা দেশে মেয়ের বাপেদের যেমন আজকাল টাকা দিয়ে জামাতা ক্রয় করতে হয়! ছেলের গুণাগুণ ও অবস্থা প্রভৃতির বাছ-বিচার করে যেমন তার দরদস্তুর কসা মাজা এমন কি, যাচাই পর্য্যন্ত করে মেয়ের বাপকে পণের টাকা হিসাব করে দিতে হয়, তেমনি এদের মধ্যে ছেলেকে বা ছেলের অভিভাবককে মেয়ের জন্য পণের টাকা হিসাব করে দিতে হয়। শোনা যায়, কিছুকাল পূর্ব্বে এই রকম প্রথা এ দেশেও না কি প্রচলিত ছিল। কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সেটা উল্টে গিয়ে এখন ঠিক তার বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেন্দিদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। এক একজন সর্দ্দার যতগুলি ইচ্ছা বিবাহ করতে

নর্ত্তকীর বেশে বুন্দু বালিকাদ্বয়। (দীক্ষাব্রতী বালিকারা নৃত্য করবার সময় সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত করে)

খোসমা-বাসিন্দীর দল

পারে। প্রত্যেক স্ত্রীই পতিগৃহে আসবার সময় অনেকগুলি দাসদাসী সঙ্গে করে নিয়ে আসে। তাদের দ্বারা অনেক কাজ পাওয়া যায় বলে, বহু-বিবাহ এদের মধ্যে শুধু একটা গৌরবের নয়, লাভের ব্যাপারও বটে। বিবাহ হবার পূর্ব্বে কন্যাকে ভাবী পতির নিকট বাগ্‌দত্তা হ'তে হয়। এই বাগ্‌দত্তা হবার দিন তাদের মধ্যে দস্তুর মত একটা উৎসবের আয়োজন হয়। পাত্র স্বয়ং গিয়ে কোনও পাত্রীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে না, তার কয়েকজন বন্ধু ও একজন আত্মীয়া পাত্রীর গৃহে গিয়ে বিবাহের বন্দোবস্ত পাকা করে আসেন। পাত্রের যদি পূর্ব্বের আরও বিবাহ থাকে, তাহ'লে হয় ত অনেক সময় তার কোনও একজন স্ত্রীকেই যেতে হয় সতীন সংগ্রহের দৌত্যকার্য্য নির্ব্বাহ করবার জন্য!

পাত্রীর গৃহে উপস্থিত হয়ে তারা সুপারি, তামাক পাতা ও এক বোতল মদ উপহার দিয়ে বিবাহের কথা উত্থাপন করে। পাত্রীকে একখানি মূল্যবান রুমাল বা অন্য কোনও দ্রব্য উপহার দিয়ে তারা পাত্রীর অভিভাবকদের অতি সবিনয়ে বলে আপনার

মেন্দি মেয়ে

"বিনী" ভূত সম্প্রদায়। (মাঝখানে ভূতনাথ স্বয়ং এবং আশে পাশে তাঁর শক্তিধর অনুচরেরা)

গৃহে আমরা একটি অমূল্য রত্নের সন্ধান পেয়েছি। সেই সুন্দর মণি-টিকে আমরা আহরণ করে নিয়ে যেতে চাই। তারই জন্য যে আমরা এই সব উপহার এনেছি।

পাত্রী যদি পূর্ণবয়স্কা হয় (কারণ অপ্রাপ্তবয়স্কা, এমন কি সদ্যোজাত কন্যাও অনেক স্থলে তাদের মধ্যে বাগ্‌দত্তা হয়ে থাকে) তাহ'লে তাকে ডেকে সেই সব উপহার সামগ্রী দেখানো হয় এবং অতিথি-দের আগমনের উদ্দেশ্য তাকে বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কন্যাকে সেই উপহার সামগ্রী গ্রহণ ক'রে বা প্রত্যাখ্যান ক'রে, তার ভাবী স্বামীকে চোখে না দেখেই তাকে
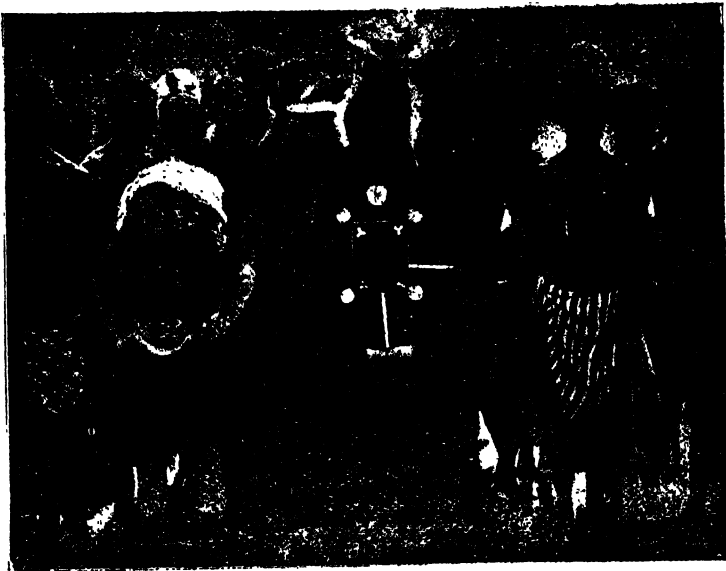
মেন্দি সর্দার

বিবাহ করবার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা জ্ঞাপন করতে হয়। উপহার সামগ্রী গ্রহণ করলে বিবাহে সম্মতি জানানো হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে পাত্রকে প্রত্যুপহারও পাঠাতে হয়। তার পর উভয় পক্ষের অভি-ভাবকদের মধ্যে যৌতুক বা পণের পরিমাণ নিয়ে দর কসাকসি চলে। পণের মূল্য যত বেশী নিবেদন করতে পারা যায়, পাত্রী হাত-ছাড়া হবার ভয় তত কমে যায়। অনেক সময় পণের হিসাব ছাড়া অতিরিক্ত আরও কতকগুলি সর্ত্ত হয়; যেমন, এ বিবাহ কন্যার পক্ষে আজীবন পত্নীত্ব কি না?—অর্থাৎ বিবাহের অল্প দিন পরে পতির মৃত্যু হলে কন্যা অপর কাহাকেও বিবাহ করতে পারবে না। মৃত পতির গৃহেই তাকে আজীবন অবস্থান করতে হবে। বড় জোর সে তার মৃত স্বামীরই অন্য কোনও ভ্রাতাকে বিবাহ ক'রতে পারবে এই মাত্র! এরূপ সর্ত্ত ক'রতে হ'লে পণের টাকা কিছু বেশী দিতে হয়। এই সর্ত্ত থেকে এটাও বেশ বোঝা যায় যে, তাদের মধ্যে বিধবা বিবাহটাও প্রচলিত আছে।

মেন্দিরা জন্মান্তর মানে। মৃত্যুর পর মানুষকে যে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়, এ কথাটা তারা

"পোরো" গুপ্ত সমিতি

খানি বিশ্বাস করে, তার চেয়েও অনেক বেশী বিশ্বাস করে কথাটায় যে, মানুষ মরে যাবার পর কিছু দিন ভূত থাকে প্রেতাত্মা হয়ে বাস করে। এই অন্ধ বিশ্বাসের জন্যই, স্ত্রী পুরুষ কাহারও মৃত্যু হ'লে, তারা ভীত হয়ে পড়ে; এবং যতক্ষণ না প্রায়শ্চিত্ত বা সপিণ্ডকরণ ইত্যাদি দ্বারা ভূত শান্তির ব্যবস্থা হয়, ততক্ষণ তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

ভূত শান্তির একটা সহজ ব্যবস্থা হচ্ছে পায়ে বেড়ী পরা। বেশী দিন পরতে হয় না, মাত্র একদিন সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এই বেড়ী পরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তবে একটা অসুবিধা হচ্ছে এই যে, এ বেড়ী লোহার বালার তৈরি নয়, এ বেড়ী কলাগাছ কেটে একহাত আন্দাজ লম্বা টুকরো করে, তারই মধ্যে ছিদ্র করে পায় গলিয়ে রাখতে হয়। স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই এই ভূত শান্তির বেড়ী পরতে হয়।

পুরুষের মৃত্যু হলে চার দিন ও স্ত্রীলোকের মৃত্যু হ'লে তিন দিন পরে একটা ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। সেটাকে তারা বলে 'তাঁউ-যামা' অর্থাৎ "বৈতরণী উত্তরণ"। মৃত্যু-নদী পার হয়ে জীবনের পরপারে আত্মাকে যাত্রা করতে হয়, এই ধারণাটা আমাদের মতো তাদের মধ্যেও খুব বেশী প্রচলিত। তাদের বিশ্বাস যে, জীবনের ওপারের সেই যাত্রা-পথ অতি দীর্ঘ; তাই মৃত্যুর তিন দিন বা চার দিন হবার ঠিক পূর্ব্ব-সন্ধ্যায় মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বন্ধু ও পরিবারবর্গ সদলে তার সমাধিস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়; এবং পরিবারের যিনি কর্ত্তা, তিনি মৃতের কবর স্পর্শ করে বলেন, "ওগো, আমরা এসেছি তোমায় জানাতে যে, তোমাকে আমরা কেউ ভুলিনি। পরপারের দীর্ঘ পথে পা দেবার পূর্ব্বে আমরা তোমাকে অন্ন পানীয় দিয়ে পরিতুষ্ট ক'রতে চাই। অতএব তুমি কাল প্রভাত পর্য্যন্ত আমাদের জন্য অপেক্ষা

শিক্ষানবীশ কুকু মেয়েদের নৃত্য। (নৃত্যকালে এরা জালের জামা গায়ে দেয়। ঘাসের চামর হাতে বাঁধে। কোমরে একখানা ঝাড়ন জড়ায় এবং ঘুঙুর বাঁধা জাঙিয়া পরে)

করে থেকো।" পরদিন চাউল ও মুর্গী রন্ধন করে; তার কতক অংশ মৃতের উদ্দেশে তার কবরের উপর রেখে আসা হয়, এবং বাকীটার আত্মীয়-বন্ধুরাই সদ্ব্যবহার করেন।

একজন সর্দ্দারের মৃত্যু হলে, তার শবদেহ গ্রামের মধ্যেই সমাধিস্থ করা হয়; কিন্তু সাধারণ লোকদের মৃতদেহ গ্রামের সীমান্তে নিয়ে গিয়ে কবর দিতে হয়। সর্দ্দারদের সমাধির উপর মঠ বা একটি ছোট আটচালা নির্ম্মাণ করে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে; এবং পরপারের দীর্ঘ যাত্রা যাতে সে সচ্ছন্দে সমাপ্ত করতে পারে, এই উদ্দেশ্যে মৃত আত্মার ব্যবহারের জন্য একটি দোলনা তার কবরের উপর ঝুলিয়ে

দেওয়া হয়। মৃত সর্দ্দারের পরলোক গমন উপলক্ষে শোক প্রকাশের জন্য একটা দিন স্থির করা হয়। সেদিন সেই সর্দ্দারের অধীনস্থ সকলেই কাজকর্ম্ম বন্ধ রেখে হাহাকারে রোদন করে যে গভীর শোক প্রকাশ করে, তার উপশম করবার জন্য এবং শোকার্ত্তদের সান্ত্বনা দিতে সেদিন প্রচুর সুরার স্রোত প্রবাহিত হয় এবং একটি ; আস্ত ষাঁড়ের মাংসে শোকার্ত্তদের পরিতোষ করে ভোজন করানো হয়।

তাদের প্রধান দেবী হচ্ছেন "মীনেশ্বরী" (!) (Minseri) এবং দেবতা হচ্ছেন 'মুমোরী'। 'মুমোরী' এক প্রকার কোমল পাথরের তৈরী মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি কারা নির্ম্মাণ করে কিছু জানা যায় নি। জিজ্ঞাসা করলেও কেউ বল্‌তে পারে না। তারা বলে বহু পুরাকাল থেকে কয়েকটি মূর্ত্তি তাদের কয়েকজনের কাছে মাত্র আছে। পুরুষ-পরম্পরায় তারা এর পূজা করে আসছে! নূতন মূর্ত্তি কেউ নির্ম্মাণ করে না এবং করতে পারেও না! সে যাই হোক, তাদের বিশ্বাস, এই 'মুমোরী' বিগ্রহ যাদের কাছে আছে, তাদের ভাগ্য সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন ; কারণ, মুমোরী হচ্ছেন সিদ্ধিদাতা। এঁকে প্রসন্ন রাখতে পারলে সুখ-সৌভাগ্য অক্ষয় হয়, ও সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করতে পারা যায়।

কৃষক যদি তার ক্ষেতে মুমোরী ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে তাঁর পূজা দেয়, তবে ফসল যে দ্বিগুণ হবেই, সে বিষয়ে তাদের আর কোনরূপ সন্দেহ থাকে না। একটি তাল-পাতার ছোট্ট ছাউনী করে তার মধ্যে একখানি বাঁশের তৈরি চৌকীর উপর মুমোরী বিগ্রহ বসানো হয়। ক্ষেতের কোথায় যে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, ক্ষেত্রস্বামী ও তাঁর পরিবারবর্গ ছাড়া আর কেউ সে সন্ধান জানতে পারে না। মুমোরীর পূজার জন্য ভাত, মুর্গীর মাংস ও প্রচুর তাড়ীর নৈবেদ্য দেওয়া হয়। এ না দিলে, তাদের বিশ্বাস, মুমোরী রুষ্ট হয়ে তাদের অনিষ্ট করবেন। আবার অনেক সময় উপযুক্ত পূজা অর্চ্চনা সত্ত্বেও যদি ক্ষেতের ফসল আশানুরূপ না হয়, তাহ'লে কৃষকেরা নির্দ্দয় ভাবে এই বিগ্রহকে চাবুক মারতে আরম্ভ করে। তাদের বিশ্বাস যে, এই চাবুক খেয়ে মুমোরী অন্যের ক্ষেতের ফসল তুলে নিয়ে এসে তাদের ক্ষেতে রোপণ করে দেবো। মেন্দিরা বলে, এই মূর্ত্তির মতো যাদের আকৃতি ছিল, তারাই আমাদের সর্ব্ব প্রথম এই দেশে নিয়ে এসেছিল। এই বিগ্রহের মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে মেন্দিদের চেহারার কোনই সৌসাদৃশ্য নেই। এদের বড় বড় টানা চোখ, এদের নাক টিকোলো একেবারে খড়্গাকৃতি। মেন্দিরা যাই বলুক না কেন, এগুলি যে শিল্পীর হাতের তৈরী প্রতিমূর্ত্তি, সে

মেন্দি মেয়েদের নাচ

বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ; তবে কোন যুগের কতকালের এবং কাদের দ্বারা তৈরি, সে সম্বন্ধে এখনও সবিশেষ জানা যায় নি।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, সঙ্গীতপ্রিয়তা মেন্দিদের একটা প্রধান বিশেষত্ব। নৃত্য গীত ও বাদ্য এই তিনটির তারা অত্যন্ত পক্ষপাতী। স্ত্রীলোক মাত্রেরই বাদ্য-যন্ত্র হচ্ছে 'শেগুড়া' বা ঝুমঝুমী ; আর পুরুষদের হ'চ্ছে 'সাঙবৈ' বা জগ-ঝম্প। বাদ্যযন্ত্রটি কেবল-মাত্র ঝুমঝুমী হ'লেও, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মেয়েরা তার মধ্য হ'তেই এত রকমের বিভিন্ন পর্দ্দার সুর ঝঙ্কৃত করে তুলতে পারে যে, বহু মূল্যবান বাদ্য যন্ত্রেও তা অনেক সময় পারা যায় না। এরা জগঝম্প পেটে কাঠির পরিবর্ত্তে দুই হাতে চাপড়ে!

(১) মেন্দিদের মধ্যে প্রচলিত লৌহ মুদ্রা (২) শ্রেগুরা বা ঝুমঝুমী (৩) লৌহ কঙ্কণ (৪) হাতীর দাঁতের চুড়ি (৫) চামড়ার বাজু তাবিজ (৬) চামড়ার কণ্ঠহার (৭) গোমেদের মালা (৮) সর্দ্দারের চাবুক (৯) শঙ্খের কুণ্ডল

মেন্দিদের মধ্যে খেলা-ধূলা খুবই কম আছে। একট খেলা যা তাদের মধ্যে খুব বেশী রকম প্রচলিত, তার নাম হচ্ছে 'ওয়াড়ী'। দু'জন লোক বসে সতরঞ্চ খেলার মতো খেলে। এ খেলাটা খুব মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি করে খেলতে হয়। নৌকোর আকারে কাটা একখানা মোটা কাঠের উপর, দু'পাশে ছটা ছটা বারোটা আঙুল ঢোকাবার মতো গর্ত্ত কাটা থাকে। সেই গর্ত্তগুলোকে তারা বলে 'গ্রাম।' প্রত্যেক গ্রামখানিতে চারজন ক'রে যোদ্ধা থাকে। কড়াইশুঁটি ও সীম সংগ্রহ করে পরস্পরের বিপক্ষ যোদ্ধা সাজিয়ে নিয়ে খেলা সুরু হয়। নিয়ম হচ্ছে যে, এই বারোটা গ্রাম যে দখল করে নিতে পারবে, তারই জিত। সতরঞ্চ খেলার মতো এ খেলাতেও বোড়ের মার আছে। যে বিপক্ষের সমস্ত বা অধিকাংশ যোদ্ধাকে বন্দী করে ফেলতে পারবে, সেই বারোটা গ্রামের মালিক হবে; সুতরাং মারের দিকে ঝোঁকটা সব খেলোয়াড়েরই খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

"শে" ব'লে আর একটা খেলা আছে ; এটা তারা বাজী ধরে জুয়া খেলার মতো খেলে। শে খেলা চারজনে মিলে খেলতে হয়। চারটে হাতির দাঁতের লাট্টু নিয়ে চারজনে একে একে এক-খানা মাদুর চাপা চৌকের উপর দু' আঙুলে ধরে ঘুরিয়ে ছেড়ে দেয়। যার লাট্টু ঘুর'তে ঘুরতে আর একজনের লাট্টুকে ধাক্কা মেরে চৌকি থেকে ফেলে দিতে পারবে, সেই জিতবে। "জিগী" বলে আর একটা তাদের কড়ি-খেলা আছে, সে একেবারে আমাদের দেশেরই কড়ি-খেলার মতো!

পথের আলো

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

(এক)

সেদিন এক আষাঢ়ের বাদল-ঝরা সকাল। রাত্রির কোন্ এক সময় হ'তে মেঘের কোন্ বিরহ ব্যথার কান্না সুরু হয়েছে, এখনো তা'র বিরাম নেই। মেঘ যেন গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদ্‌ছে—টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়্‌ছে, আর মধ্যে মধ্যে গুরু-গুরু রবে গর্জ্জে উঠ্‌ছে।

পঙ্কজ সে দিনও অন্য দিনের মত সকালেই আপিস যাবার জন্যে বের হয়েছিল। আপিসে তা'কে খুব ভোরেই হাজিরা দিতে হ'ত। দ্বিচক্রযানে চড়ে' 'বর্ষাতি' জড়িয়ে সে বের হ'য়ে পড়েছিল। রাস্তার পিছল ও কাদার জন্য তা'কে খুব সাবধানে চল্‌তে হচ্ছিল। রাস্তা সংক্ষেপ কর্‌বার জন্যে সে যে গলিটায় ঢুক্‌লো, সে গলিটার কিছু দূরে যাবার পরই বৃষ্টি খুব জোরে আরম্ভ হ'লো—কিছুতেই আর এগুতে পার্‌লে না। বৃষ্টির হাত হ'তে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে একটি ছোট বাড়ীর বারাণ্ডার নীচে গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু জলের ছাটে কাপড়-চোপড় সব ভিজে গেল। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ না দেখে, বাড়ী ফিরে যাবে কি না দোমনা হ'য়ে ভাব্‌ছে, ঠিক এমনি সময় এক প্রৌঢ়া বোধ হয় কি কাজের জন্য সেই বাড়ীর দরজা খুলেই, তাকে দেখেই তাড়াতাড়ি দরজা আধ-বন্ধ ক'রে দিলেন। পঙ্কজও কেমন কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়্‌লো। চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, এমনি সময় তিনি ডেকে বল্‌লেন,—বাবা, ভিতরে এসে বসো না, বৃষ্টি থাম্‌লে বাড়ী যেও · বলে' তিনি দরজা খুলে দিলেন। পঙ্কজ ভিতরে যেতে ইতস্ততঃ কর্‌ছে দেখে, তিনি একটু সনির্ব্বন্ধ সুরে বল্‌লেন,—এতে কিন্তু হবার তো কিছু নেই বাবা! লোক বিপদে আপদে পড়্‌লে তাকে সাহায্যও কর্‌তে হয়, আর লোককে সাহায্য নিতেও হয়। পঙ্কজ সে কথা অবহেলা কর্‌তে পার্‌লে না। আর বৃষ্টির হাত হতে নিষ্কৃতি পেয়েও মন একটু খুসী হয়ে উঠ্‌লো। সে রমণীর পিছন পিছন ভিতরে ঢুক্‌লো। তিনি পঙ্কজকে উপরের একটা ঘরে বসিয়ে, তা'র নিষেধ সত্বেও শুক্‌নো কাপড় আন্‌তে চলে গেলেন।

ঘরে ঢুকেই পঙ্কজের কেমন একটু সন্দেহ হ'লো। তা'র সন্দেহের কারণ—ঘরের আসবাবপত্র। সেগুলো ঠিক ভদ্র গৃহস্থ-ঘরের মত নয়।—এই দেখে সে কেমন চম্‌কে উঠ্‌লো। ঘরের দেয়ালে চারিধারে নগ্ন সুন্দরীর কুৎসিত ছবি। দুটো কাচের আলমারী-ভরা নানারকম খেল্‌না। ঘরের কোণে একটা ছোট গোল তিনপায়া টেবিল। তা'র উপর একটা ডিকেণ্টার ও কতকগুলো কাচের গেলাস, পাশে একটা খালি মদের বোতল। ঘরের মেঝেয় একটা চিনেমাটির ডিসে কতকগুলো অর্দ্ধভুক্ত চপ-কট্‌লেট্। ঘরের অবস্থা তখন ঠিক যেন,—কোনো অত্যাচারিতা নারী এইমাত্র তা'র আততায়ীর হাত হ'তে নিজেকে কোনো রকমে মুক্ত করে', স্খলিত আলুথালু বস্ত্রে নিজের মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে বিশ্বের পানে চেয়ে আছে।—ঘরের চারিধারে বিছানা বালিশ ছড়ানো,—এইমাত্র সেখানে যেন একটা বর্ব্বর উল্লাস অভিনীত হ'য়ে গেছে।

ঘরের এই অবস্থা দেখে সন্দিগ্ধ মনে পঙ্কজ চলে যাবার জন্যে এগিয়ে দরজার কাছে এসেছে, এমনি সময় ঘরে ঢুক্‌লো এক তন্বী তরুণী—হাতে একখানি শুক্‌নো কাপড় নিয়ে। তরুণী ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে বল্‌লে,—এই কাপড় নিন্। আপনার ভিজে কাপড় ছেড়ে বসুন। বলে একপাশে চুপ করে' দাঁড়ালো। পঙ্কজ একবার বিবক্তিভরে তরুণীর শীর্ণ ঋজু দেহখানির দিকে তাকালে। কিন্তু তা'র ভিতর সে কোনো পাতিত্যের আভাস পেলে না। তবু ঘরের এই অবস্থা, ও একজন অপরিচিতা তরুণীর একজন অপরিচিত পুরুষের সাম্‌নে বের হওয়া—তা'র কেমন বিসদৃশ লাগ্‌লো। সে বিনা উত্তরে ঘর হতে চলে যাবার উপক্রম কর্‌তেই, তরুণী একটু এগিয়ে এসে সঙ্কোচের সঙ্গে

আস্তে আস্তে বল্লে,—আমায় গোটা পাঁচ টাকা দিয়ে যান, যদি আপনার কাছে থাকে। নইলে মা আমায় বক্‌বে। না দিতে পার্‌লে বড় যন্ত্রণা দেয়। এই বলে' তরুণী মুখ নীচু করে' দাঁড়ালো। পঙ্কজ তরুণীর কথা শুনে আর একবার তা'র মুখের দিকে তাকালে। সে দেখ্‌লে, তরুণীর চোখ দুটি অশ্রু-সজল হয়ে উঠেছে। দু' একবিন্দু অশ্রু তার সুগৌর গণ্ডের উপর ঝরে পড়ে' গণ্ডের উপরই জমে শুভ্র মুক্তা-দুলের মত টল্ টল্ কর্‌ছে। দু' একটা রুক্ষ অশান্ত চুল খোঁপার বাঁধন না মেনে চুম্বন আশায় মুখের উপর এসে পড়েছে, আর তা'তে করে' তরুণীকে আরো সুন্দর করে' তুলেছে।

পঙ্কজের মন সহানুভূতিতে ভরে উঠ্‌লো। মনে একটু দুঃখও হ'লো। কিন্তু যেটুকু সহানুভূতি তা'র প্রাণে জম্‌লো, সেটুকুতে তা'র প্রাণের গ্লানি দূর কর্‌তে পার্‌লে না। তবু সে তা'কে কিছু দেবার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে, প্রথমেই হাতে করে' তুল্‌লে একখানা দশটাকার নোট। আর সেইখানাই তরুণীর গায়ের উপর ফেলে দিয়ে, কোনো কথা না বলে' একরকম ছুটেই চলে গেল। তরুণী সেইখানে অবাক নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার দু'চোখ দিয়ে বৃষ্টি-ধারার মতই অশ্রু ঝর্‌তে লাগ্‌লো। কতখানি দুঃখে—বেদনায় সেই টাকা সে চেয়ে নিতে পেরেছে,—আর তা'রই বেদনায় তা'র অশ্রু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে।

এমনি সময় সেই রমণী ঘরে ঢুকে, তা'কে কাঁদ্‌তে দেখেই, চোখ রাঙিয়ে চীৎকার করে' উঠ্‌লো,—কি লো, বলি সকাল বেলা বসে বসে কান্না হচ্ছে কেন শুনি। খুব ঢঙ্ শিখেছিস কিন্তু। বাবুর কাছ থেকে কিছু পেলি, না শুধু শুধু ঢঙ্ করে' কাঁদ্‌তে বসেছিস। আজ যদি কিছু না নিয়ে থাকিস্ তো তোরই এক দিন কি আমারই এক দিন। বলে' রমণী এগিয়ে এলো। তরুণী কোনো কথা না বলে' রমণীর পায়ের কাছে নোটখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। কারণ, তার সকাল বেলায় এই চাইবামাত্র, চাওয়ার অতিরিক্ত পাওয়ায় প্রাণে যে ব্যথা লেগেছিল, সেটাকে সে আর কতকগুলো তীব্র তিরস্কারের বোঝায় ভারী করতে চায় না। আর এই নোটখানাও তা'র হাতকে গরম লোহার মতই পুড়িয়ে দিচ্ছিল। তাই সে সকল দিকে মুক্ত হবার জন্য নোটখানা রমণীর পায়ের কাছে ফেলে দিলে।

রমণী সাগ্রহে নোটখানা কুড়িয়ে নিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তরুণীর দিকে চেয়ে দেখলে যে, সে আর কিছু টাকা লুকিয়ে রেখেছে কি না। কারণ, তা'র এতদিনকার অভিজ্ঞতায় এ কথা কিছুতেই বলে না যে, যে এক কথায় দশটাকা দেয়, সে আরো বেশী কিছু পায় নি। আচ্ছা থাক, পরে আদায় না করে' সে ছাড়্‌বে, এমন মেয়েই সে নয়। তার পর নোটটা সে আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে, যে সুর একেবারে উচ্চ সপ্তকে উঠেছিল, তাকেই খাদ সপ্তকে নামিয়ে এনে, সহানুভূতির স্বরে মল্লিকার গায়ে হাত বুলুতে বুলুতে বল্‌লে,—কাঁদিস্ নে বাবু, মানুষের কথা সব সময় ধর্‌তে নেই। তারা খেয়ালী লোক, আর সেইজন্যেই তো বাবু। এ কাজে থাক্‌তে গেলে মন অত নরম কর্‌তে নেই। কত লোকে কত কথা বলে—সব কি গায়ে মাখ্‌তে আছে। নিন্দুকের স্বভাবই নিন্দে করা। তা শুন্‌লে তো আর আমাদের চলে না। তুই আয়, কাপড়-চোপড় কাচ্‌বি আয়। বলে রমণী ঘর হতে চলে' গেল।

(দুই)

রমণী কাপড় কাচ্‌তে চলে যেতে, মল্লিকা সেই এলো-মেলো বিছানার উপর লুটিয়ে পড়্‌লো,—একরাশ ফুট মল্লিকা ফুলের মতই। অন্তরের সকল ব্যথা আজ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। চোখের জলে বিছানা ভিজে উঠ্‌লো। তা'র পূর্ব্ব বংশের কোন্ এক অভাগিনী যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল লালসার বশীভূত হ'য়ে এই পাপের পথে পা দিয়েছিল। তার পর বংশ-পরম্পরায় সকলেই সেই পাপের বোঝা নিজের নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে, জীবনগুলো ছিনিমিনি খেলে কাটিয়ে দিয়ে গেছে। আজ তাই মল্লিকাকেও তার জের টান্‌তে হচ্ছে।

মল্লিকার মা যখন মল্লিকাকে বছর খানেকের রেখে মারা যায়, তখনই তার 'গঙ্গাজল' ভুবন স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে মল্লিকার ভার নেয়। মল্লিকার মা ভুবনকে অনুরোধ করে যে, মল্লিকা একটু বড় হলেই ভুবন যেন তা'কে কোনো মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে দেয়। তা'কে যেন আর এই পাপের নদীতে ডুবিয়ে না মারে। মল্লিকার অনুতপ্তা জননী

মৃত্যুর সময় একটা মহা ভুল করেছিল—ভুবনকে বিশ্বাস করেছিল। নিজে আজীবন পাপের পসরা মাথায় করে' বয়েও কেন যে সে তারই সমকর্ম্মী ভুবনকে এতটা বিশ্বাস করে' নিজের মেয়েকে তা'র হাতে সমর্পণ করেছিল, এটা তা'র মত মৃত্যু-পথ-যাত্রীর পক্ষে সত্যই আশ্চর্য্য। মল্লিকার মা যখন ভুবনের হাতে মেয়েকে সমর্পণ করে' দিচ্ছিল, তখন ভুবন মুখে খুব সহানুভূতি দেখাচ্ছিল। কিন্তু মনে মনে বেশ খুসী হ'য়ে উঠেছিল। মল্লিকার সেই নিটোল-শুভ্র গড়ন দেখে, সে ভবিষ্যতে উন্নতির আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিল। আর তার পর থেকেই সে সাগ্রহে মল্লিকাকে মানুষ করে' এসেছে। এক দিনের জন্যেও জান্‌তে দেয়নি যে, সে মল্লিকার মা নয়। মল্লিকা তাকেই মা বলে জান্‌তো।

মল্লিকাকে নিয়ে ভুবন তা'র নিজের পল্লী ছেড়ে এই ভদ্র-পল্লীতে বাড়ী নিলে। নিজেও ভদ্র ভাবে থাক্‌তে লাগ্‌লো। তা'র বন্ধুরা ভাব্‌লে, ভুবন হয় তো মল্লিকার মার শেষ অনুরোধ পালন কর্‌বার জন্যেই এ-পাড়া হ'তে চলে গেল। ভুবন কিন্তু মোটেই সে ধার দিয়ে যায় নি। সে মতলব করেছিল যে, মল্লিকাকে লেখাপড়া শিখিয়ে ব্যবসাটাকে আর একটু নূতনতর করে' জাঁকিয়ে তুলবে।

ভুবন মল্লিকাকে এক মিশনারীদের মেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি করে' দেয়। তা'র জন্ম-বৃত্তান্ত সে তা'কে তখনো বলে নি, আর নিজের বাড়ীতে বড় একটা আন্‌তো না—পাছে জানা-জানি হয়ে গিয়ে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ আর মল্লিকাকে না রাখেন। কিছু দিন এমনি দূরে দূরেই থেকে মল্লিকার লেখাপড়া চল্‌তে লাগ্‌লো।

স্কুলের আর সব মেয়েদের মতই মল্লিকার মন গড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। সে নিজেকে জান্‌তো আর সব মেয়েদের মতই। সকল কাজে সে তাদের মতই দাবী কর্‌তো, তাদের মতই মনের মধ্যে নানা রকম আশার বীজ বুন্‌তো। কিন্তু হঠাৎ এক দিন তার সকল আশা, সকল গর্ব্ব, সকল ভরসা কোথা দিয়ে যে চূর্ণ হ'য়ে গেল, তা' সে নিজেই টের পেলে না। এত দিন সে তা'র জীবন ঠিক শরৎকালের নির্ম্মল আকাশের মতই দেখে এসেছে। কিন্তু সেই নির্ম্মল আকাশের কোথায় কোন্ এক কোণে এক টুক্‌রো কালো মেঘ জমে ছিল, আর সেই মেঘ হঠাৎ এক দিন সমস্ত আকাশ জুড়ে বসে তা'র জীবনের উপর বজ্র হেনে জীবনকে পুড়িয়ে ছাইয়ের স্তূপ করে' দিলে। সে নিজেকে আর তার ভিতর থেকে খুঁজে পেলে না। সময় সময় চেষ্টা কর্‌তো নিজেকে খুঁজে বের কর্‌তে; কিন্তু খুঁজে পেতো না, আর পেলেও পূর্ব্বের সেই স্বরূপ দেখ্‌তে পেতো না।

মল্লিকার দেহখানির উপর যখন নবযৌবন—বসন্তের নবজাগরণের সাড়া সবেমাত্র পড়েছে,—ঠিক এমনি সময় সে শুন্‌লে যে, ভুবন আর তাকে স্কুলে রাখ্‌তে চায় না,—কালই তা'কে বাড়ী যেতে হবে। মল্লিকা তা'র পড়া ছাড়্‌বার কথা শুনে খুবই আশ্চর্য্য হয়ে গেল! ব্যাপার কি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লে না। বেশ পড়্‌ছিল শুন্‌ছিল—হঠাৎ এ কি সংবাদ!

বাড়ীতে এসে ভুবনকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—হ্যাঁ মা, আমায় পড়া ছাড়িয়ে নিলে কেন?

ভুবন গম্ভীর ভাবে উত্তর কর্‌লে—কোনো কারণে আর পড়াশুনা করা উচিত নয়। সে কারণও দু'দিন বাদেই তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে। বলে' মুখ মুচ্‌কে হেসে ভুবন সেখান হতে চলে গেল, মল্লিকার আশা-জাগ্রত মনকে দু'পায়ে থেঁত্‌লে।

মল্লিকা আশা করেছিল যে, ভুবনের উত্তরে তা'র মনের সকল গোলমালের সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু সমাধান হওয়া তো দূরের কথা—সেগুলো যেন আরো তাল পাকিয়ে জটিল হয়ে উঠ্‌লো। ভুবন ছাড়া আর কেউ নেই যে, যাকে জিজ্ঞেসা করে' হৃদয়ের সকল উদ্বেগের মীমাংসা করে। সে হতাশ হ'য়ে চুপ করে' বসে রইলো।

শীতের সন্ধ্যার ঘন কুয়াসা যেন পৃথিবীর উপর দিগন্ত-প্রসারি কালো ঘোম্‌টা টেনে দিয়েছে। সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে, তারা-বধূরা লাজ-নম্র চোখের দীপ্তিহীন মিট্‌মিটে চাহনিতে উঁকি মার্‌ছে,—নব বধূর ঘোম্‌টার ভিতর থেকে উঁকি-মারা কৌতূহলি দৃষ্টির মত।

মল্লিকা বসে' বসে' ভাব্‌ছিল। ভুবনের আজকালকার ব্যবহার যেন ক্রমশঃ তা'র কাছে প্রহেলিকার মত হ'য়ে পড়্‌ছে। নিজের জীবনও সঙ্গে সঙ্গে তেমনি নিজের কাছে দুর্বোধ্য হ'য়ে পড়্‌ছে। সদাই তা'র মনের ভিতর কি একটা অমঙ্গল আশঙ্কা ফেনিয়ে উঠ্‌তো। কারো সঙ্গে যে দু'টো কথা বলে মন খোলসা কর্‌বে, তারও কোনো

উপায় ছিল না। ভুবনের কড়া পাহারায় তা'র এক পাও কোথাও নড়বার উপায় ছিল না। আর ভুবনকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে সে এমন সব উত্তর দিতো, যার মানে খুঁজতে মল্লিকাকে আরো ভাবিয়ে তুল্‌তো। কোন্ খানে যে কি একটা গোলমাল হ'য়ে তা'র জীবন এমন ভারাক্রান্ত করে' তুলেছে, কিছুতেই সে ধর্‌তে পার্‌ছিল না। কাজেই ভাবনা ছাড়া তা'র আর কোন উপায় ছিল না। এক একবার মনে হ'তো—কোথাও ছুটে পালিয়ে গিয়ে, খুব খানিক কেঁদে, মনকে হাল্‌কা করে' নেয়। কিন্তু তা'রও কোন উপায় ছিল না।

মল্লিকা ভাবনায় যখন তলিয়ে গিয়েছিল, ঠিক এমনি সময় তার ভাবনা ভাঙিয়ে ভুবন ঘরে ঢুকে বলে উঠ্‌লো—ওলো মল্লিকা, এই বাবুর সঙ্গে দুটো গল্প টল্প কর—গানটান শোনা।

মল্লিকা চম্‌কে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে দেখ্‌লে যে, ভুবন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে, আর তার পিছনে একজন লোক। ভুবনের হাসিতে তার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌লো। এ হাসি তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ হাসি প্রাণে আতঙ্কই আনে—আনন্দ মোটেই দেয় না। তার চোখের সামনে সব ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল।

ভুবন মল্লিকার দিকে চেয়ে আবার সেই প্রাণ-আতঙ্ককর হাসি হেসে বল্‌লে,—আমি চল্‌লাম। দেখিস্, বাবুর যেন অযত্ন করিস্ নে। বলে' ঘরের দোর ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

মল্লিকার কাণে সব কথাগুলো ঠিক যাচ্ছিল না। সে ভাবছিল—এ সব কি ভোজবাজী না কি। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ের অবধি ছিল না। ভুবনের এ কি কাণ্ড! একজন অপরিচিত পুরুষ, তায় মাতাল,—তাকে এনে তার ঘরে দিয়ে, তার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে বলে গেল—এ সব কি ব্যাপার! সমস্ত ঘটনাগুলো যেন জোট পাকিয়ে উঠ্‌তে গেলো। হৃদয়ের ভিতর বোঝা-না-বোঝার একটা গভীর দ্বন্দ্ব চল্‌তে আরম্ভ হলো। মুখ দিয়ে তার কোনো কথা বের হ'লো না। সে শুধু নির্ব্বাক বিস্ময়ে অবুঝের মত চেয়ে রইলো।

মাতালটা এগিয়ে এসে বল্‌লে—কি গো, অমন করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, এসো একটু ফুর্ত্তি করি—বলে' মল্লিকার হাত চেপে ধরলে।

হাত ধর্‌তেই মল্লিকার চমক ভেঙে গেল। বিদ্যুতের ধাক্কা খেলে মানুষ যেমন ছিট্‌কে দূরে সরে যায়, তেমনি করে সরে গিয়ে মল্লিকা চীৎকার করে উঠ্‌লো—বেরিয়ে যাও বল্‌ছি, আমার ঘর হ'তে,--নইলে খুন কর্‌বো তোমায়—বলে' হাতের কাছে জলের কুঁজো ছিল, সেইটে দু' হাতে তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। জলের কুঁজোই যেন তখন তার নারীর সম্ভ্রম, মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌বার অস্ত্র বলে মনে হলো! তখন আর অত বিচার ক'রে দেখ্‌বার ক্ষমতাও তার ছিল না। হাতের কাছে যা পেলে তাই তুলেই তার সর্ব্বস্ব রক্ষা কর্‌তে রুখে দাঁড়ালো। চোখ দুটো কোটর ছেড়ে রক্ত মেখে বেরিয়ে আস্‌বার যোগাড় হলো। তা'র তখনকার সেই মূর্ত্তি দেখে মাতালের নেশা তো ছুটে গেলই, উপরন্তু তার স্ফূর্ত্তি করার স্পৃহাও তখনকার মত চলে গেল। সে পালাতে পার্‌লে বাঁচে। তাড়াতাড়ি ঘর হ'তে বেরিয়ে চলে গেল। সিঁড়িতে ভুবনের সঙ্গে তার দেখা হতে, ভুবন এত শীঘ্র চলে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে, কিন্তু কোনো উত্তর পেলে না। ভুবন ব্যাপার কি জান্‌বার জন্যে উপরে দেখ্‌তে এলো।

লোকটা চলে গেলেও, মল্লিকা নিজের অবস্থা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লে না। আর এই না-বোঝাই তাকে বেশী পীড়ন কর্‌তে লাগ্‌লো। সে অবশের মত বিছানার উপর বসে পড়্‌লো—দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌লে না,—হাত পা সব কাঁপ্‌ছিল। হৃদয়ের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগ্‌লো। চোখ দিয়ে যেন আগুনের হল্‌কা বের হচ্ছে। অন্তরের গোপন স্থান থেকে কান্না উদ্বেল হয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু বাইরে তা ঝরে পড়্‌তে পেলে না—বাইরের আগুনে যেন বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে লাগ্‌লো। ক্রমে যখন যন্ত্রণা একটু সাম্‌লে নিলে, তখন দু'চোখে অশ্রুর বান ডেকে গেল! দু'হাতে বুক চেপে ধরে এত দিনের সঞ্চিত কান্নাকে সে আজ মুক্ত করে দিলে।

যখন সে কান্নার বন্যায় নিজেকে ভাসিয়ে দেবার যোগাড় করেছে, ঠিক এমনি সময় ভুবন ঘরে ঢুকে তীব্র ঝঙ্কারে ব'লে উঠ্‌লো,—হ্যাঁলা, বাবুকে বসালিনে যে বড়। তোর যে বড় তেজ দেখ্‌ছি। বেশ্যার মেয়ের আবার অত সতীপনা কেন রে বাপু। ও সব সতীগিরি কি করে ভাঙতে হয়, তা' এ ভুবনি খুব ভাল করেই জানে। দু'দিন

সবুর করো, তার পর দেখ্‌বো। কোঁকড়া কাঠ রাঁধার মুখে আপনি সোজা হয়ে আস্‌বে। বলে' মল্লিকাকে কোনো কথা বল্‌বার বা জিজ্ঞাসা কর্‌বার অবসর না দিয়ে, সে ঘর হতে চলে গেল, মল্লিকাকে কথার জলন্ত আগুনের ঝাঁজে পুড়িয়ে।

ভুবনের কথা শুনে মল্লিকা একবার চম্‌কে উঠেই স্থির হয়ে বসে রইলো—যেন প্রাণহীন অসাড়। ভুবনের প্রতি কথা তার প্রাণে গিয়া আগুনের গোলার মত লাগ্‌ছিল। আর সেই রকমই প্রাণ পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিল। এ সে কি শুন্‌ছে! তা'র আজন্মের বাস্তব কল্পনা আজ এক আঘাতেই কাঁচের পেয়ালার মত ভেঙে ছড়িয়ে পড়্‌লো। সমস্ত কল্পনা, জীবনের সকল সাধ, উচ্চাশা স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। পিছনে রেখে গেল শুধু তীব্র প্রাণ-দহনকারী স্মৃতি।

মল্লিকা প্রথমে কেমন মূঢ়ের মত হয়ে পড়্‌লো। তার পর কান্না উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌লো। একবার অন্ততঃ মিথ্যা করেও বলো যে, সে যা তা নয়। তা হ'লেও মনকে কতক বোঝাতে পার্‌বে। তার জীবন এমন করে গড়ে দু' পায়ে পেঁতলে দলিত কর্‌বার কি প্রয়োজন ছিল। শৈশবের প্রথম থেকেই তাকে তার জন্মের সঙ্গে পরিচিত কর্‌লেই তো হতো। এমন করে একবার মাত্র চোখ ফুটিয়ে জ্যোতিঃ দেখিয়ে, চিরদিনের মত চোখের সাম্‌নে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন টেনে দিলে কেন। কি অপরাধ করেছিল সে, যার জন্যে এমন শাস্তি। কিন্তু সব সময় তো অপরাধ মিলিয়ে সাজা হওয়া আমরা ঠিক বুঝ্‌তে পারি না, আর সেই জন্যেই গোলে পড়ি। সাজা হয় তো অপরাধ অনুযায়ীই হয়; কেবল আমরা মনে করি এতটা সাজা ঠিক হলো না। এতটুকু অপরাধের জন্য সময় সময় একের দুঃখের বোঝা, পাপের সাজা কোন্ সূত্রে অন্যের ঘাড়ে চাপে, তা বোঝাই যায় না। কেবল চিরজীবন বোঝা বয়েই যেতে হয়।

তাই আজ মল্লিকাও শুধু তার জন্মের জন্য দায়ী হয়েই এমনি করে শাস্তি ভোগ কর্‌তে লাগ্‌লো। আর আজই হলো তার প্রথম। সেই জন্যে ধাক্কা লাগ্‌লোও খুব প্রবল ভাবে। কিন্তু কান্না দিয়ে ধাক্কা সাম্‌লানো ছাড়া তার আর অন্য উপায় ছিল না, কাজেই সেই কান্নাই সে অবলম্বন কর্‌লে।

(তিন)

ভুবন এক দিন মল্লিকার সমস্ত জীবন-বৃত্তান্ত তার কাছে খুলে বলে' তাকে একেবারে নগ্ন, নিঃসম্বল করে' বিশ্বের মাঝে ছেড়ে দিলে। কোথাও এতটুকুও বাঁধন থাক্‌তে দিলে না। মল্লিকা ভুবনের দুটো পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বল্‌লে,—ওগো, একবার অন্তত মিথ্যা করেও বল যে, যা বল্‌ছো এগুলো সব মিথ্যা। কেন আমাকে এমন করে দগ্ধাচ্ছ।

ভুবন বিরক্তিভরে জোর করে' তার পা ছাড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে—অত সত্যি মিথ্যে জানিনে। যা সত্যি তাই বল্‌লাম। এর আর ঢাকাঢাকি কি? তোর মতন এখনো অত ঢঙ্ শিখিনি। বলে মুখ বেঁকিয়ে বিরক্ত হয়ে ঘর হতে বেরিয়ে গেল। মল্লিকা সেইখানে লুটিয়ে পড়্‌লো।

তার পর প্রতিদিন তার ঘরে নূতন নূতন লোক আস্‌তে লাগ্‌লো। কোনো দিন সে তাদের তাড়িয়ে দিতো, কোনো দিন সম্মোহিতের মত বসে থাক্‌তো। তার পর ভুবনের পীড়ন। যে দিন টাকা দিতে না পার্‌তো, সে দিন তো কথাই নেই—ভুবনের পীড়ন একেবারে চরম সীমায় পৌছতো।

এই রকম ক্রমাগত আঘাত খেতে খেতে তার যৌবন-জাগরিত নারী-প্রকৃতি ক্রমশঃ অসাড়, অবশ হয়ে পড়্‌ছিল। সে নিজের সত্তা ভুলে নির্জীবের মত কাজ কর্‌ছিল। এক এক সময় সে এই সবের বিপক্ষে রুখে দাঁড়াতো,—ঠিক মেরুদণ্ড ভাঙা সাপের নিষ্ফল ফণা তোলার মত। তার পরক্ষণেই ভুবনের তীব্র তিরস্কারে—সাপের আঘাত পেয়ে মাথা নীচু করার মতই—নুয়ে পড়্‌তো। ভুবন সদাই তাকে চোখে চোখে রাখ্‌তো—পাছে সে কিছু করে। এমনি করেই ক্রমশঃ কোথা দিয়ে যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌লে, তা সে নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌লে না। প্রাণের ভিতর থেকে ভাল মন্দ কোনো সাড়াই আর পেতো না। কেবল যন্ত্রচালিতের মত কাজ করে যেতো। নিজের সঙ্গে লড়াই করে করে সে ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়্‌লো। শরীরে ভাঙন ধরে গেল—সে রুগ্ন হয়ে পড়্‌লো।

তার পর সে-দিন বহু দিন পরে আবার তার অসাড় নারী-প্রকৃতি জেগে উঠে তাকে ধাক্কা দিলে, যেদিন সে পঙ্কজকে দেখ্‌লে। পঙ্কজের সেই করুণাভরা চাহনি, তার সেই দান—মল্লিকার প্রাণে নারী-জীবনের কত সাধের ছা

ফুটিয়ে তুল্‌লে। এর আগে কত দিন তার মনে হয়েছে যে, এই প্রাণ নিয়ে মিথ্যে খেলা সে আর কর্‌বে না। প্রাণ কি এতই মূল্যহীন? কিন্তু যখনই আর কতকগুলো অসাড়, প্রাণহীন প্রাণের সঙ্গে তার আপন প্রাণ মিশিয়ে গেছে, তখনি সব গোলমাল হয়ে খেই হারিয়ে গেছে। জাগ্রত নারী-প্রকৃতি আজ তাকে বল্‌লে—আর কেন, এইবার সোজা হয়ে দাঁড়া—সব মিথ্যা ছলনার খেলা ছেড়ে। মিথ্যা যা তা চিরদিন মিথ্যা। সত্যকে যখন পেয়েছিস্‌, তখন তাকেই আঁকড়ে ধর। সত্য চিরদিন সত্য হয়েই ফুটে উঠ্‌বে। কেউ তোকে চাক্‌ না চাক্‌, তুই এমন করে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিস্‌নে। নিজের জন্যে অন্তত কিছু রাখ। বাজে খরচ সবটাই করিস্‌নে। তা হলে হিসেব মিলুবি কেমন করে।

সেই দিন থেকে সে মরিয়া হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। না, সে আর এই জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন কর্‌বে না। যাতে করে নিজের মনের কাছেই নিজেকে ছোট হতে হয়, সে কাজ সে কর্‌বে না। এর জন্য ভুবন তাকে যৎপরোনাস্তি পীড়ন কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে; কিন্তু তবুও তাকে বিশেষ করে বাগ মানাতে পার্‌লে না। পীড়নের ফলে ও মনের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়ে সে ক্রমশ শয্যাশায়ী হয়ে পড়্‌লো। তার উত্থানশক্তি প্রায় রহিত হয়ে পড়্‌লো। মনে তখন তার একটু সান্ত্বনা এলো যে, হয় তো আর বেশী দিন এ রকম যন্ত্রণা তাকে ভোগ কর্‌তে হবে না।

সেই দিন থেকে পঙ্কজেরও মন কেমন গুলিয়ে গেল। প্রথম বাড়ী এসে তার ভারী রাগ হয়েছিল। সকাল বেলাতেই সে একটা পতিতার দুফোঁটা চোখের জল দেখেই দশ দশ টাকা একেবারে দিয়ে ফেল্‌লে। ওদের কাছে চোখের জলের মূল্য কি? হাসি-কান্নার তো এক দর। কোথাও হাসি দিয়ে কাজ হাসিল করে, কোথাও বা কান্না দিয়ে। এই দু'টো জিনিষের জোরেই তাদের ব্যবসা চলে। আর লোক চেনবার ক্ষমতা তাদের অসীম। লোক বুঝে তা'রা এই দু'টোর একটা দিয়ে কাজ ও স্বার্থ সিদ্ধি করে। নাঃ, সে ভাল করেনি অতগুলো টাকা দিয়ে।

কিন্তু না দিয়েও যে তার উপায় ছিল না। মন তার এই রকম কতকগুলো সারহীন যুক্তি দেখিয়ে তাকে বিপক্ষে নিয়ে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু মল্লিকার সেই ব্যথা-ভরা কান্নার চাওয়ায় না দিয়েও যে থাকবার উপায় ছিল না। সে কান্না, সে মিনতি-ব্যাকুল চাহনি অবহেলা কর্‌বার সামর্থ্য পঙ্কজের তো নেই-ই, হয় তো অনেকেই পারে না, অন্তত যার প্রাণ আছে। সে তো পতিতার পাতিত্যের রঙিন্‌ কান্না নয়, সে যে দীনা, ব্যথিতা, প্রপীড়িতা নারীর কান্না,—যে নারী চিরকুমারী, চিরজাগ্রতা। কাজেই পঙ্কজ সে চাওয়াকে উপেক্ষা কর্‌তে পারে নি। তারই টানে সে টাকা দিয়েছে। ক্রমশ তার মনও নরম হয়ে মল্লিকার দিকে ঝুঁকে পড়্‌লো।

প্রথম পঙ্কজ মনকে অনেক যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝালে যে, এটা অন্যায়। যাকে সমাজ পরিত্যাগ করেছে, সে ভাল হলেও তাকে পরিত্যাগ কর্‌তে হবে। মন কিন্তু তা'র সে যুক্তির দোহাই মান্‌লে না। বল্‌লে—সমাজ কি সব সময় নিজের স্বার্থ ছেড়ে ভালমন্দ বিচার কর্‌তে পারে? সমাজ নিজের স্বার্থের জিদ বজায় রাখ্‌তে গিয়ে কত যে অন্যায় কর্‌ছে, তার সীমা কোথায়? সেগুলো বোঝা গেলেও মুখে কিছু বলা যায় না; কারণ, সে যে সমাজের শাসন। ন্যায় হোক অন্যায় হোক শাসন কর্‌বার অধিকার তো সমাজেরই আছে। কিন্তু সব সময় সে যুক্তি খাটানো হয় তো উচিত নয়, আর খাটেও না। নিজের প্রাণ যেটা ভাল মনে কর্‌ছে, তার বিচার সমাজকে কর্‌তে দিলে, হয় তো ফল ভাল না-ও হতে পারে। কাজেই, তার ভাল-মন্দের বিচার নিজেকেই বুঝে কর্‌তে হবে। সমাজ তো নিজের স্বার্থ বজায় রাখ্‌তে গিয়ে ক্রমশ পঙ্গু হয়ে পড়্‌ছে। তার বিচারের ন্যায়পরায়ণতা কোথায়?

মনের কাছে এই রকম উত্তর পেয়ে পঙ্কজ বরং খুসীই হয়ে উঠ্‌লো। মল্লিকার ভিতর সে যে নারী-প্রকৃতির সজাগ মূর্ত্তি দেখে এসেছে, সে মূর্ত্তি পূজা কর্‌বার—মাটির পুতুল মনে করে দু'পায়ে থেঁতলাবার নয়। কোনো দিকে আর সে চাইবে না, তাকে পূজাই দেবে তার সামর্থ্য-মত।

সেই দিন থেকে পঙ্কজের আপিস যাবার পথ হলো মল্লিকার বাড়ীর সামনে দিয়ে। রোজ যাওয়া-আসা চল্‌তে লাগ্‌লো সেই পথ দিয়েই,—শুধু মল্লিকাকে দেখবার আশায়। কিন্তু বাড়ীর ভিতর গিয়ে তাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে হলেও মনে সাহস পেতো না,—কি জানি, যদি কোনো মোহ এসে

পড়ে তাকে দুর্ব্বল করে দেয়। এই ভয়েই সে বাড়ী গিয়ে দেখ্‌বার ইচ্ছাকে দমন করে রেখেছিল। বাইরে থেকে দেখা কিন্তু সব দিন পেতো না। তবু সে সে-পথের মায়া ত্যাগ করতে পারে নি—যদি দেখা পায় এই আশায়।

মল্লিকাও ক্রমশঃ কে জানে কেমন করে পঙ্কজের যাওয়া-আসার সময় টের পেয়ে, দু'বেলা তার প্রতীক্ষায় বারাণ্ডায় উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তো। এক এক দিন পঙ্কজ দেখ্‌তে পেতো, সকাল বেলা তার গাড়ীর মোড় ফের্‌বার সতর্ক-ঘণ্টা শুনে, মল্লিকা নিদ্রালস-চোখে স্খলিত-বসনে, ত্রস্ত-পদে, মূর্ত্তিমতী প্রভাতের মত বারাণ্ডায় বেরিয়ে আস্‌তো, আর তার মুখে এসে পড়্‌তো দেবতার আশীর্ব্বাদের মত প্রভাতের রক্তিম কিরণ। তার এই ছুটে দেখ্‌তে আসার দরুণ লজ্জা-লালিমার মিলন হতো সিঁদুর-রাঙা রোদের সঙ্গে। পঙ্কজ সেই অপূর্ব্ব লাজ-ভঙ্গিমা-জড়িত মুখের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাক্‌তো। আর চাওয়ার ভিতর দিয়েই দুজনের হৃদয়-বিতানের সকল পুষ্পগুলি মুঞ্জরিত হয়ে উঠ্‌তো,—মৃদু আন্দোলনে আন্দোলিত হয়ে উঠ্‌তো।

পঙ্কজ বেশী দিন ঘনিষ্ঠতা করবার লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লে না। সেদিন তার খেয়াল হলো—সে মল্লিকার কাছে যাবে। এই ঠিক করে সে আর কোনো দিক না ভেবে-চিন্তে, বরাবর মল্লিকার ঘরে গিয়ে উঠ্‌লো। মল্লিকা ঘরে একলা বসে কি ভাব্‌ছিল। পঙ্কজকে ঘরে ঢুক্‌তে দেখেই সে প্রথমে একটু চম্‌কে উঠ্‌লো। তার পর একটু ম্লান হেসে বল্‌লে,—বসুন। মুখ দিয়ে তার আর কোনো কথা বের হলো না। পঙ্কজও হতভম্বের মত কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে চলে গেল। সেও কোনো কথা বল্‌তে পার্‌লে না। কেবল দু'জনেই ভাব্‌লে, এ কেমন হলো।

সেই দিন থেকে পঙ্কজের সাহস বেড়ে গেল। কিন্তু মল্লিকা তার সঙ্গে দু'একটা কথা বলেই উঠে চলে যেতো, আর ঘরে আস্‌তো না। পঙ্কজ বসে বসে উঠে চলে যেতো,—ভাবত, এ কি! এর যে কিছুই বোঝ্‌বার যো নেই! এর কি প্রাণ বলে' কিছু নেই?

প্রাণ মল্লিকার ছিল। কিন্তু সে হয়ে পড়েছিল ঠিক ঘন পানা-ঢাকা পুকুরের মত। উপর থেকে দেখ্‌লে মনে হয়, যেন একটা মাঠ, জলের কোনো চিহ্নও নেই। কিন্তু যারা জানে, তারা আটক দিয়ে পানা ঠেলে সরিয়ে, জল বের করে', তাকে কাজে লাগায়। তখনই জলের তরলতা বেরিয়ে পড়ে।

মল্লিকার প্রাণও তেমনি ঢাকা পড়ে গিয়েছিল,—খুঁজে পরিষ্কার করে দেবার লোকের অভাবে। পঙ্কজ একটু পরিষ্কার করেছিল বটে; কিন্তু ভালো জানা না থাকাতে, ঠিক কাজের মত করে নিতে পারেনি,—কেবল পানার ফাঁকে জলের চিক্‌চিকিনি দেখ্‌তে পেয়েছে। কাজের মত জল পানা ঠেলে বের করতে পারেনি। এই জন্যেই যা একটু গোলমাল।

কিছু দিন না যাওয়ার পর, পঙ্কজ আজ মল্লিকার ঘরে এসে দেখ্‌লে, মল্লিকা শুয়ে রয়েছে। তার সাড়া পেয়েও মল্লিকা চোখ মেলে চাইলে না, বা নড়্‌লে না। পঙ্কজ একটু চুপ করে থেকে, তার খাটের কাছে এগিয়ে এসে, সঙ্কোচের সঙ্গে দ্বিধা-কম্পিত চিত্তে তার মাথায় সন্তর্পণে হাত দিলে। হাত দিয়েই চম্‌কে উঠলো—জ্বরে মল্লিকার গা পুড়ে যাচ্ছে। সে তার মাথার কাছে বসে তার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লো। কিছুক্ষণ পরে মল্লিকা একটি ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পঙ্কজের মুখের দিকে চোখ টেনে চাইলে। চেয়ে আবার আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করলে। সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোণ বেয়ে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়্‌লো। পঙ্কজও একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে রইলো।

(চার)

সেই দিন থেকে পঙ্কজের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠ্‌লো। পঙ্কজের আগমনে মল্লিকা বেশ খুসীই হতো, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌তো। তার সঙ্গে দু'টো কথাও বল্‌তো। কিন্তু কিছু দিন পরে সে যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌লো। পঙ্কজ যত বেশী যাওয়া-আসা করতে লাগলো, মল্লিকাও যেন তত বেশী সঙ্কুচিতা ও বিরক্ত হয়ে উঠ্‌তে লাগলো। পঙ্কজ এলে সে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাক্‌তো, গায়ে হাত দিলে ঠেলে সরিয়ে দিতো, কথা বলা তো দূরের কথা।

মল্লিকা সেদিন অসুখের ঝোঁকে অসাড় নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে ছিল। এমনি সময় পঙ্কজ এসে ঘরে ঢুকে তার কাছে বস্‌তেই, মল্লিকা আস্তে আস্তে চোখ মেলে চাইলে। তার পর হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো,—ওগো, কেন তুমি

এরকম করে আমার কাছে এসো। আমাকে কি একটু স্বস্তিতে মর্‌তেও দেবে না। আর যদি কোনো দিন আসবে তো আমি অনর্থ কর্‌বো। যাও, এখুনি বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। একটু থেমে শ্লেষের সঙ্গে বল্‌লে—বেশ্যার ঘরে এসে তার সেবা কর্‌তে লজ্জা করে না।

পঙ্কজ মল্লিকার তখনকার সেই মূর্ত্তি দেখে, কিছু না বলে আস্তে আস্তে ঘর হতে বেরিয়ে গেল; কিন্তু কিছু বুঝতে পার্‌লে না যে, কেন হঠাৎ মল্লিকা এরকম রেগে উঠলো। একবার মনে হলো, সত্যই তো, ও তো বেশ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেন তার জন্যে অত মাথাব্যথা। সে কতদূর নেমে গেছে। মন মাথা নেড়ে বল্‌লে,—না গো না, ওসব তোমার বাজে মন-ভোলান কথা। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের পরিচয় হয়ে উঠেছে, আর সেই জন্যেই তো ও তোমার স্বকীয়া।

পঙ্কজ ঘর থেকে চলে যেতেই মল্লিকা বালিশে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। সে তার প্রিয়কে যে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে। আর সেই জন্যেই সে তাকে এই নগ্নতার মধ্যে টেনে এনে ফেল্‌তে চায় না। তা হলে যে সে একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়বে। মল্লিকা তাকে কাছে এনে আপন কর্‌তে চায় না, পাছে সে কলুষিত হয়ে পড়ে। সে চায় তাকে দূরে রেখে আপন কর্‌তে। সেই জন্যেই যেদিন থেকে পঙ্কজ যাওয়া-আসা আরম্ভ করেছে, সেই দিন থেকেই সে ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। মুখ ফুটে কত দিন বল্‌তে চেয়েছে, ওগো, এ তুমি কি কর্‌ছো। ভাবছো, কাছে এসে আপন করবে। কিন্তু তা' তো হবে না। তুমি কাছে এসে যতখানি আপনার কর্‌তে চাইছো, ঠিক ততখানি দু'জনে দু'জনের কাছ হতে দূরে সরে যাচ্ছি। কেন তুমি এমন হলে। তুমি কি বুঝতে পার্‌ছো না যে, বিশ্ব আমাদের দু'য়ের মাঝখানে একটা কত বড় ব্যবধান সৃজন করে রেখেছেন। এজন্মে তোমায় পাবার আশা করতে পারিই না, পরজন্মে তোমার আশায় বসে থাক্‌বো।

এই কথাগুলো রাত দিন তার বুকের ভিতর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, মুখ দিয়ে বার করে নিষ্কৃতি সে পায়নি। বলতে গেলেই গলার কাছে কোথায় আটক খেয়ে যেতো—বলা হতো না। এই রকম করেই এত দিন বলা না বলার দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে দিন কাটিয়ে এসেছে। তার পর যে দিন দেখলে যে, তার সঙ্কোচের জন্যে তার কামনার ফল অন্য রকম হতে চলেছে, সেই দিন সে সঙ্কোচের গলা টিপে ধরে কথাগুলো বলে ফেল্‌লে। ভেবেছিল যে, একটু গুছিয়ে বুঝিয়ে বল্‌বে। বল্‌বার সময় কিন্তু সেগুলো সব উল্টে গিয়ে অন্য রকম হয়ে দাঁড়ালো, আর তারই আক্ষেপে তার অন্তর পুড়ে যেতে লাগলো। ওরে, কেমন করে তুই এমন কঠোর কথাগুলো মুখ দিয়ে বার কর্‌লি। তার আগে তোর মুখ পুড়ে গেল না কেন। পরক্ষণেই ভাবলে, না, এই ঠিক হয়েছে। আমার কষ্ট হয় তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু বুঝিয়ে বল্‌লে হয় তো পঙ্কজ নাও শুন্‌তে পার্‌তো।

পঙ্কজ ক' দিন আর সেই পথ দিয়ে গেল না। তার রাগ হয়েছিল মল্লিকার উপর। কেন সে এ রকম কঠোর হলো। তার প্রাণ যেমন মল্লিকার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে, মল্লিকারও কি তেমনি হয়নি? আবার ভাবলে, না, মল্লিকা ঠিকই করেছে। কামনা ও লালসার ভিতর দিয়ে তো তাকে আমি পাওয়ার দাবী কর্‌তে মোটেই পারি না। সেইখানেই তো কলুষ এসে পড়্‌বে। তাহলে তো সে মিলন বিশ্ব-মিলনের ধারার বাইরে গিয়ে পড়্‌বে। মল্লিকা এই কথা বুঝতে পেরেছে বলেই তাকে কাছে আস্‌তে বারণ করেছে। মল্লিকার জীবনে দুঃখ যে ক্রমাগত ফেনিয়েই উঠেছে। ফুঁ দিয়ে যত সে ফেনা ফেলে দিতে চেয়েছে, ফেনা ততই ফুলে উঠেছে। দুঃখকে দুঃখ বলে চিন্‌তে পেরেছিল বলেই সে দুঃখের ভিতর থেকে সুখকে সত্য বলে চিনে বার কর্‌তে পেরেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে যতক্ষণ না সুখকে চিন্‌তে পারা যায়, ততক্ষণ সুখকে সুখ বলে জান্‌তে পারাই যায় না। সেই জন্যেই মল্লিকা আজ এই ভাবে বারণ কর্‌তে পেরেছে।

মল্লিকাকে ক'দিন না দেখার দরুণ পঙ্কজের মন বড় উন্মনা হয়ে উঠেছিল। বিশেষ তার বাড়াবাড়ি অসুখ দেখে এসেছে। ভাবনা-বিভোর মন নিয়ে একটু সকাল সকাল বাড়ী হতে বের হয়েছিল। ভেবেছিল, আপিস যাবার পথে তার শুধু খোঁজ নিয়ে যাবে।

প্রভাত তখন উষাদেবীর কপালে সবে মাত্র সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিচ্ছেন। পঙ্কজ মল্লিকার বাড়ীর গলির মোড় ফিরে মল্লিকার বাড়ীর কাছে এসেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে

গেল। মল্লিকাকে রাস্তায় বের করেছে, আর খুব ভিড় হয়েছে তার চারিপাশে। যে খাটে মল্লিকা শুতো, সেই খাটে সেই বিছানায় মল্লিকা, একরাশ ফুটন্ত মল্লিকা ফুলের মত, চোখ বুজে শুয়ে রয়েছে। এত দিন তার প্রাণ পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মুক্ত হবার ব্যর্থ চেষ্টায় পিঞ্জরে মাথা ঠুকে রক্তাক্ত হওয়ার মতই আহত হয়েছে। আজ সে মুক্ত হয়ে কোন্ অজানা তীর্থ-পথের যাত্রী হয়েছে। তার বাড়ীর সামনের রাস্তার পাশের আমগাছটার পাতার ফাঁক দিয়ে প্রভাত-সূর্য্যের রাঙা আলো তার সারা দেহের উপর পড়ে তাকে যেন কুম্‌কুম্‌-চর্চ্চিত করে দিয়েছে। বিশ্ব-দেবতা আজ তাঁর নিজের জিনিষ নিজে সাজিয়ে কাছে টেনে নিয়েছেন। তাঁরও বোধ হয় একটু ভুল হয়েছিল মল্লিকাকে এমন ভাবে পৃথিবীর বুকের উপর ছেড়ে দিয়ে। তাই আজ নিজের ভুল শোধরাবার ছলেই তাকে কাছে টেনে নিলেন।

আর সকল দর্শকের মতই পঙ্কজও দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। শুধু তার অজ্ঞানতে দু' ফোঁটা অশ্রু চোখের কোণ বেয়ে ঝরে পড়ে, মৃতের উদ্দেশে শ্রদ্ধা-তর্পণ কর্‌লে। মল্লিকা আজ তার মিলনকে শাশ্বত কর্‌বার জন্যে এগিয়ে গেল; কারণ, তার দাবী যে বেশী। মল্লিকা ফুল যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট ঋতুতে ফুটে উঠে ঋতু-অন্তে আপনি শুখিয়ে ঝরে যায়, এও যে ঠিক তেমনি। কোন্ এক হেমন্তের শিশির-কান্নার নীরব সন্ধ্যায় জন্মে বসন্তের আগেই ঝরে গেল। পিছনে রেখে গেল তার দুঃখ-বেদনার স্মৃতি।

পঙ্কজ সেখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌লে না। আস্তে আস্তে স্খলিতপদে সেখান হতে চলে এলো। সেই স্মৃতির বেদনায় তার বুকের ভিতর কান্না উদ্বেল হয়ে উঠ্‌লো। পঙ্কজ আজ এত দিন পরে সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে, আর জীবন-সম্বল কর্‌লে মল্লিকার স্মৃতিটুকু।

এলেনবরা ময়দানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সেনা-শিবির

শ্রীবিভাসচন্দ্র রায় চৌধুরী

পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় সৈন্যদলের বাৎসরিক শিক্ষা কার্য্য শেষ হয়েছে। চিরন্তন একঘেয়ে কলেজ-জীবনের মধ্যে এ যেন ছিল একটু মুক্তির স্পর্শ। এক দিকে গঙ্গার ঘোলা জলের লীলা-নর্ত্তন, অপর দিকে বহুদূর বিস্তৃত গড়ের মাঠ, পার্শ্বে সৈন্যদের বাসভূমি ফোর্ট উইলিয়ম। চমৎকার দৃশ্য! এ হেন জায়গায় চার পাঁচ শত ছাত্রের আনন্দপূর্ণ কর্ম্ম-জীবন যিনি দেখিয়াছেন, তিনি কখনো তা' ভুলতে পারবেন না।

১৫ই ডিসেম্বর কলেজে গিয়েই একটি পরোয়ানা পেলুম যে, ১৮ই ডিসেম্বর থেকে আমাদের শিবির পড়ছে এলেন্‌বরা মাঠে,—আমাকে যেতে হবে। কাগজখানা নিয়ে দেখলুম, কাপ্তেন পাঠাচ্ছেন কোর অফিস থেকে, Failure to attend without sufficient cause will entail discharge. যাহোক কাপ্তেনের যখন আদেশ, কি আর করি, সেটাকে তো আর অবহেলা করা যায় না। কেন না, আমরা জানি, মিলিটারি লাইনে পান থেকে চুণটি খস্‌লেই court-martial হয়। সুতরাং যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলুম।

পরোয়ানা অনুসারে বেলা এগারটার সময় আমরা শিবিরে গিয়ে পৌছুলুম। তাঁবুগুলো আগে থেকেই খাটান ছিল, কাজেই বিশেষ কষ্ট পেতে হোল না। আমরা নিজের নিজের তাঁবু বেছে নিয়ে, জিনিসপত্র গুছোতে লাগলুম। অন্যবার হতে এবার ছাত্র-সংখ্যা অনেক বেশী হোয়েছিল। তেরোটা কলেজের সমষ্টি নিয়ে এই শিবির গঠিত হোয়েছিল। মোট ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৪৩১। সব নিয়েই একটা Battalion তৈরী হোল। একটা Battalionএ চারটা Company, ষোলটা Platoon ও চৌষট্টিটা Section থাকে। এক একটি কলেজ নিয়ে

একটি Platoon তৈরী হোল। কোন কোন কলেজে দুটীও হোল, কিন্তু আশুতোষ কলেজের মত সংখ্যায় অত বেশী নহে।

Companyতে। আমাদের Platoon no. হোল চৌদ্দ ও পনর। কোম্পানী-কমাণ্ডার হলেন লেঃ অজিতকুমার ঘোষ, আর প্লেটুন সার্জ্জেণ্ট হলেন শ্রীরণেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

শিবির-দৃশ্য

উপরের ঐ বিভাগ অনুসারে চারটা Companyর প্রত্যেকটীতে এক একজন লেফ্‌টেনাণ্ট Company-Commander হলেন। অতিরিক্ত তিনজন লেফ্‌টেনাণ্ট মাষ্টার ঘোস-মল্লিক, মিষ্টার সরকার ও মহারাজা বাহাদুর

রণেন্দ্রনাথবাবু ভারী চমৎকার লোক, এরূপ সামরিক শিক্ষক খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। এত অল্প সময়ের মধ্যে ইনি যেরূপ উন্নতি করেছেন, তা' ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। কিছুক্ষণ পরে সার্জ্জেণ্ট রায় চৌধুরী আমাদিগকে ফোর্টের

আশুতোষ কলেজ

(ইনি দিনাজপুরের মহারাজা) এঁদের সহকারি হলেন।

যা হোক, এই বিভাগ অনুসারে আমরা পড়লুম 'D'

ভিতরে South Barrackএ নিয়ে গেলেন। লেফ্‌ট্ রাইট্ করতে করতে কোন রকমে Head quartersএ পৌছান গেল। সেখান থেকে প্রত্যেকে একখান সতরঞ্চি, একখান

কম্বল, একটা করে "গ্রেট্‌কোট্‌" ও Armoury থেকে নিজের নিজের রাইফেল নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলুম। মাটী থেকে ঠাণ্ডা উঠে পাছে অসুখ বিসুখ হয়, তার জন্যে গবর্ণমেণ্ট থেকে এক বাণ্ডিল করে খড় পাওয়া গিয়েছিল,

প্যারেডে আশুতোষ কলেজ

সতরঞ্চির তলায় পাতবার জন্যে। এ গুলো পাওয়ার জন্য আমাদের শীতে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়নি।

ক্রমে সন্ধ্যা হোল। গঙ্গার ধারের রাস্তাগুলোতে অসংখ্য গ্যাসের আলো জ্বলে উঠ্‌লো। কেল্লা ও চারিদিক

লক্ষ্য-পরীক্ষা ও বেয়োনেট্‌ ফাইটিং

থেকে বৈদ্যুতিক আলোগুলো একে একে জ্বলে উঠলো। আমরা কয়জন 'চা' পানের আশায় গ্রেট্‌কোট্‌টী গায়ে চাপিয়ে কেল্লায় ঢুকে পড়লুম। 'সেণ্টজর্জ্জের' গেট ছাড়িয়ে দুই এক পা যেতেই সুন্দর বাজনা বেজে উঠলো।
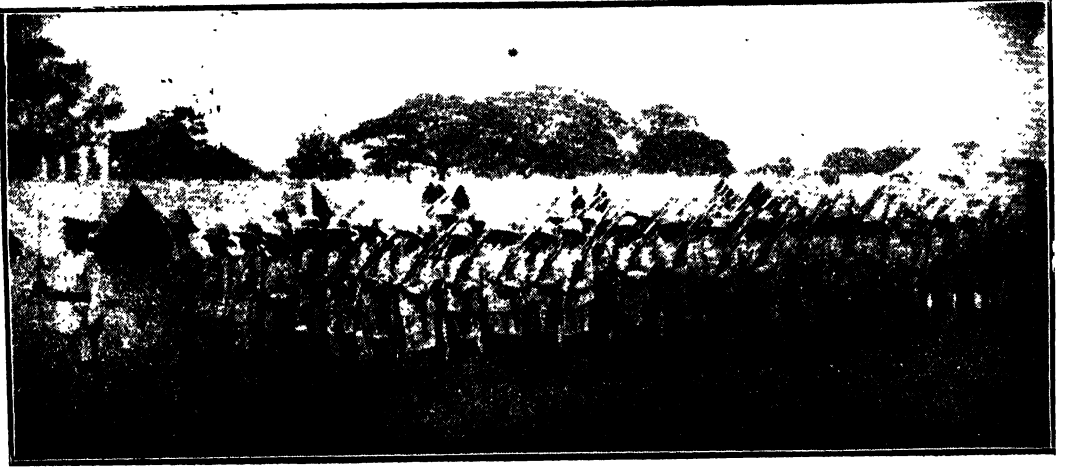
শুন্‌লুম, সে দিন সেখানে থিয়েটার। আমরা সোজা রাস্তা ধরে চায়ের দোকানের দিকে ছুটলুম। খাওয়া শেষ হলে, দুই একটা খুচরো জিনিস কিনে নিয়ে, শিবিরের দিকে রওনা দিলুম। তখন রাত ৮-৩০। আমাদের জানা ছিল না যে, ৮টার সময় Rampart গেটটী বন্ধ হয়ে যায়। সবে Main gateটী পার হয়েই, Rampart gateএ এসে দেখি, গেট বন্ধ। আমাদের তখন মহা সমস্যা উপস্থিত হোল। সন্ধ্যার পরে শিবির ত্যাগ নিষেধ, ধরা পড়লে বিশেষ শাস্তি পেতে হয়। কি করা যায়, সেই ভাবনাই সকলের মনে জাগতে লাগলো। তখনো "পুলিস গেট"টী খোলা ছিল। পুলিস গেট দিয়ে যদিও বাইরে যাওয়া যায়, কিন্তু তা' দিয়ে শিবিরে ঢোকা একেবারে

অসম্ভব, কেন না চারিদিকে তখন Sentry অর্থাৎ প্রহরী বসে গিয়েছে। সামনে পড়লেই who comes there—haltএ জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেতে হবে। তার পরে তো Advance to be recognised তো আছেই। সুতরাং পরামর্শ করা গেল, পুলিস গেট দিয়ে বেরিয়ে, সামনে যে জলের ট্যাঙ্ক আছে, তার নীচে দিয়ে গিয়ে, একেবারে শিবিরে উঠ্‌বো। পরামর্শ মত ঠিক জলের ট্যাঙ্ক পর্য্যন্ত এলুম ; কিন্তু আমাদের আর নীচে দিয়ে যেতে হলো না। সামনে দেখলুম, ১০০ বাতি শক্তিসম্পন্ন এক "দে-লাইট্‌" টানান হয়েছে। সেই আলোর তলে বিস্তর ছেলে জমেছে, সেখানে মেম্বরদের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ (Boxing) চলেছে—কাপ্তেন হাইড্‌ ও লেঃ বিকাশ ঘোষ তাদের উৎসাহ দিচ্ছেন। আমরা এই সুযোগে তাদের সঙ্গে মিশে গেলুম।

আগেকার চাইতে এবার শিবিরের বন্দোবস্ত যে অনেক ভাল হয়েছিল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। খাওয়ার বন্দোবস্ত এবার বিশেষ প্রশংসনীয়। শুনলুম, এবার এরূপ হবার একমাত্র কারণ, অন্যবার Contractorএ খাবার যোগাতো, এবার কোরের মেম্বররাই এর বন্দোবস্তের ভার নিয়েছেন ; এবং তার জন্যে লেঃ অজিতকুমার ঘোষ, লেঃ বিভূতি সরকার, কোয়াটার মাষ্টার সার্জ্জেণ্ট নির্ম্মল চাটার্জ্জি ও সার্জ্জেণ্ট খগেন্দ্রনাথ ঘোষের কাছে আমরা বিশেষ ভাবে ঋণী। তাঁদের এরূপ ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্ন না থাক্‌লে, আমরা এ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারতুম না। রোজ সকালে এক কাপ্‌ চা, মাখন-লাগান চার স্লাইস রুটী ও দুটো ডিম—এই ছিল বরাদ্দ। দুপুরে পেতুম ভাত, ডাল, বেগুণভাজা, নিরামিষ তরকারি ও মাছের ঝোল। রাত্রিতে মাছের বদলে মাংস ও চাটনী পাওয়া যেতো। যাঁরা নিরামিষভোজী ছিলেন, তাঁরা মাংসের বদলে মাখন ও দই বেশী পেতেন।

শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু, শ্রীরাধিকানাথ বসু, শ্রীবিভাসচন্দ্র রায় চৌধুরী

রোজ সকালে বিউগ্‌ল বাজ্‌তো, তাতে আমরা দিনের আগমন-বার্ত্তা জানতে পারতুম। অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্লেটুন সার্জ্জেণ্ট এসে হাঁক্‌তেন Flasp out everywhere। একে ত পৌষ মাস, তাতে আবার প্রাতঃকাল ; সে সময় লেপ ছেড়ে ওঠা যে কি কষ্টকর, তা' ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। তবু উঠ্‌তে হোত, কেন না, এ যে মিলিটারি লাইন। প্লেটুন সার্জ্জেণ্ট রোজ ভোরে এসে দিনের কার্য্যাবলী (প্রোগাম) দিয়ে যেতেন। ৬-৩০ থেকে ১২টা পর্য্যন্ত প্যারেড হোত। অবশ্য এর মধ্যে এক ঘণ্টা চা খাওয়ার ছুটী পাওয়া যেতো। এর মধ্যে অনেক নতুন

জিনিস হোত, যা শিখতে বেশ আনন্দ হোতো। Squad drill, Platoon drill, Company drill, Battalion drill, Extended order drill, Bayonet fighting, Shooting, Guard mounting, First aid Military manœuvres বা কৃত্রিম যুদ্ধ প্রভৃতি কতই হোত, তার সংখ্যা করা যায় না। এ ছাড়া Bugle party, Band partyও ছিল। বারোটার পর থেকে একেবারে ছুটী পাওয়া যেত।

প্যারেড্ শেষ হলেই স্নান করতে যেতাম। স্নানের জন্য আমাদের বিশেষ কষ্ট পেতে হোত না। শিবিরের ভেতরেই কুড়ি পঁচিশটা কল ছিল, তাতে আমাদের স্নান ও অন্যান্য কাজ বেশ চলে যেতো। এ ছাড়া সামনেই ছিল গঙ্গা। প্যারেডের পর কলে ভীষণ ভিড় হোত বলে, অনেকেই গঙ্গা স্নান করতে যেতো। গঙ্গায় স্নান করে আমরা বেশ তৃপ্তিলাভ করতাম। সাম্‌নে দিয়ে অসংখ্য ষ্টীমার গঙ্গা-বক্ষ ভেদ করে চলে যেতো—ভয়হীন নিরুদ্দেশ পথের যাত্রীর মত। ঢেউগুলো নিরুপায় হয়ে এমনি ভাবে ভেঙে পড়্‌তো—দেখলে মনে হোত, এ যেন দুর্ব্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচার। তার মাঝে আনন্দ-মুখর হয়ে উঠ্‌তো শত শত ছাত্র-সৈন্যের সন্তরণ কলরব। মাঝিদের নৌকায় চড়ে বহু অত্যাচার করা হোত, কিন্তু এই তরুণ নবাগত সৈন্যদের "হুম্‌কি" দেখে কেউ কিছু বল্‌তে সাহস পেতো না, পাছে যদি পুলিসে যেতে হয়।

একঘেয়ে খাটুনী যে শরীরের পক্ষে একেবারেই উপকারী নয়, এ বিষয়ে কাপ্তেনের বেশ নজর ছিল। বেলা চারটে বাজ্‌তেই কারো তাঁবুতে থাক্‌বার হুকুম ছিল না, সকলকে খেল্‌তে যেতে হোত। বিভিন্ন রুচির লোক ছিল বলে বিভিন্ন রকমের খেলারও আয়োজন ছিল। ক্রিকেট, হকি, ফুটবল প্রভৃতি খেলা হোত। খেলায় সকলেরই বেশ উৎসাহ দেখা যেতো। কোম্পানীর সঙ্গে কোম্পানীর ম্যাচ্ চল্‌তো। যারা এই খেলায় জিত্‌তে পারতো, তারা এক 'কাপ্' করে চা ও একটা করে 'কেক্' পেতো। এ ছাড়া, প্রত্যেক খেলায় একটা করে রৌপ্য-নির্ম্মিত 'কাপ'ও ছিল। 'ডি' কোম্পানী কয়েক দিন উপরি-উপরি ম্যাচ্ জিতে তাদের প্রাপ্য বক্‌শিশ্ আদায় করেছিল। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দাস ও শ্রীসুধীরচন্দ্র বসু এতে বেশ নাম কিনেছিল।

রান্নাঘর

শিবিরের মধ্যে সবচেয়ে আনন্দ-জনক ছিল Shooting

Competition বা গুলি ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় প্রতি বৎসর যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে থাকে, লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল হবস্‌ তাকে নগদ ১০০৲ টাকা ও রৌপ্য-নির্ম্মিত একটি Challenge Cup পুরস্কার দিয়ে থাকেন। সুতরাং এতে সকলেরই বেশ আগ্রহ দেখ্‌তে পাওয়া যেতো। এবার কল্‌কাতায় শিবির পড়লেও, গুলি ছোঁড়বার জন্যে আমাদের দু'দিন বেলঘোরে Rangeএ যেতে হয়েছিল। প্রথম দিন দুই শত গজ ও দ্বিতীয় দিন তিন শত গজ থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। ভোর ৬-৩০টা সময় প্রাতঃরাশ শেষ করে, দুপুরে খাওয়ার জন্যে ৮ স্লাইস রুটী ও দুটো করে ডিম Haver-sackএ পূরে

যথা সময়ে ট্রেণে চড়ে বেলঘোরের দিকে রওনা দিতুম। গাড়ী প্লাট্‌ফরম্‌ ছাড়তেই অনেকের আনন্দের বাঁধ ভেঙ্গে "বন্দেমাতরম্‌" ধ্বনিতে ষ্টেসন মুখরিত হয়ে উঠতো। একদিন দমদম্‌ ষ্টেসনে গাড়ী থেমেছে, এমন সময় প্রাইভেট্‌ অম্বিক মজুমদার গান ধরলো—

আমরা বাঙ্গালী সৈন্যদল—
দেশ-জননীর পূজা-মন্দিরে
জ্বালায়েছি হোমানল;
নবীন বাংলা জাগিয়াছে আজ,
লুপ্ত হয়েছে প্রাচীন সমাজ,

কাপ্তেন হাইড্‌ ও অফিসারগণ

নিয়ে বেল্‌ঘোরে মুখো রওনা দিতাম। পূর্ব্বেই ট্রাম রিজার্ভ করা থাক্‌তো, আমরা ট্রামে উঠে শিয়াল্‌দার দিকে ছুটতুম। গাড়ী গানে ও গল্পে গুল্‌জার হয়ে উঠ্‌তো। এস্‌প্লানেডে এসে যখন গাড়ী থাম্‌তো, তখন বাংলার ভবিষ্যৎ আশার আলোক এই তরুণ যুবকদের সৈনিকবেশে দেখবার জন্যে কাতারে কাতারে লোক জমে যেতো। তাঁদের অদ্ভুত-অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেতাম; অর্থাৎ কি না আমরা কোন্‌ যুদ্ধে যাচ্ছি, কত দিন সেখানে থাক্‌তে হবে, আমরা স্বরাজের দিকে না গিয়ে গবর্ণমেণ্টের দিকে আছি কেন?—ইত্যাদি। উত্তর দিতে-দিতে আভিজাত্যের গৌরবটুকু বজায় রাখ্‌তে কোন দিনই ভুল হয়নি।

পাষাণ ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া এসেছি
মুক্ত ঝরণা জল;
আমরা বাঙ্গালী সৈন্যদল।—ইত্যাদি

গায়কের সেই করুণ উন্মাদকারী স্বর, সকলের প্রাণে একটা অপূর্ব্ব আনন্দরসের সৃষ্টি করেছিল। গাড়ী ছেড়ে দিলে প্লাট্‌ফরম্‌ হতে একটি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক চীৎকার করে বলে উঠ্‌লো,—"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।"

সন্ধ্যার সময় শিয়ালদা থেকে Route march করে এসে যখন শিবিরে পৌছুতুম, তখন অনেকের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াতো। সারাদিনের অনাহার-ক্লিষ্ট

ক্লান্ত শরীরটাকে নিয়ে অনেকেই মাঠের ওপর শুয়ে পড়্‌তো। দু'একজন অভিভাবক দূরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তেন আর হেসে বল্‌তেন,—ক্যাম্পটা ১৫ দিন না হয়ে একমাস হলেই ভাল হোত, তা'হলে এই কষ্টটা বাঙ্গালীর ছেলে-গুলোর কিছু ধাতস্থ হয়ে যেতো।

আমাদের এই পনের দিনের জীবনের মধ্যে সব চেয়ে মজার জিনিস ছিল মেডিক্যাল্ টেণ্টে। রোজ সকালে একবার করে Sick fall in হোত, যারা অসুস্থ হোত তারা সেখানে গিয়ে দাঁড়াতো। মেজর চাটার্জ্জি প্রত্যেককে পরীক্ষা করে উপযুক্ত ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দিতেন। এদিকে প্যারেডে অত্যন্ত খাটুনী দেখে, অনেকেই প্যারেড্ ফাঁকি দিয়ে, Sick fall in করে দাঁড়াতো। যারা মিছিমিছি Sick fall in করতো, তাদের জন্যে এই শাস্তি ছিল যে, তাদের নিয়মিত প্যারেড্ তো করতেই হবে, তা' ছাড়া বিকেলে এক ঘণ্টা অতিরিক্ত প্যারেড্ করতে হবে। অবশ্য ডাক্তার সাহেব কোন ছেলেকেই এরূপ অতিরিক্ত প্যারেডে পাঠান্‌নি। তিনি ছেলেদের রোগের কথা জিজ্ঞেস করলেই, তারা হয় পেটের অসুখ, নয় আমাশা, নয় তো ঐরকমই যা হয় একটা কিছু নাম করে দিতো। পায়ে ফোস্কা কিংবা গায়ে সামান্য একটু ঘা হলেও, ঐ একই রোগের নাম করতো। কেন না, ডাক্তার সহেবকে ফাঁকি দিতে গেলে এর চেয়ে ভাল রোগ আর নেই। ডাক্তার সাহেবও তাদের রোগ বুঝ্‌তে পেরে, রোগের উপযুক্ত ওষুধ দিতেন—দু'খানি পাঁউরুটী আর এক টিন Condensed milk.

প্রতি সন্ধ্যার সময় Amusement committee বা আনন্দসভা নামে একটি সভা বস্‌তো। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর একটু শান্তি দেবার জন্যেই এই সভার প্রতিষ্ঠা। কাপ্তেন সাহেব ও অন্যান্য অফিসরগণও এতে যোগদান করতেন। ইংরিজি, বাংলা, হিন্দী, তেলেগু, গুজরাটী, প্রভৃতি গান, রঙ্গব্যঙ্গ, নাচ, বক্তৃতা, গ্রামোফোন প্রভৃতি কত যে হোত, তা' লিখে শেষ করা যায় না। সব চাইতে ভাল লাগতো যখন অম্বিক মজুমদার গান ধরতো। প্রথম দিন যখন সে গাইলে,—

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
মোদের বাঁধন টুটবে;
ওদের আঁখি যত রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে।"

তখন সত্য সত্যই অনেকের মনের মধ্যে আশার আলো জলে উঠেছিল। এই তরুণ বয়সেই সে যে সব বড় বড় রাগরাগিণীর গান ধরে, তা' শুন্‌লে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। আর একটি ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়। রত্নেশ্বর বাবুর গলাটি এত মিষ্টি, যে পুরুষ মানুষের সচরাচর এরকম গলা দেখা যায় না। বাঙ্গালীর ছেলেদিগকে খাটুনীর এই জাঁতা কলে পড়ে ছট্ ফট্ করতে দেখে, তিনি একদিন ব্যঙ্গ করে গেয়েছিলেন,—

তোরা সবে পালা
পারবি নারে সইতে ওরে
সেপাইগিরির জ্বালা;
গাধার বোঝা ঘাড়ে করে,
খাট্‌তে হয় যে,—তার ওপরে
N. C. O দের দাঁত খিঁচুনি
অফিসারদের ঠেলা।
মিলিটারির জ্বালা ভারি
খস্‌লে পরে চুণ,
সুদের ওপর আসল দিয়ে
শাস্তি হয় দ্বিগুণ;
একটি মিনিট দেরী হবে,
আহার সেদিন বন্ধ হবে,
ক্ষিধের আগুণ জ্বলবে পেটে
এ তো নিয়ম ভালা।—ইত্যাদি

এ ছাড়া Boxing প্রতিযোগিতা প্রায় রোজই চল্‌তো। একটা Loud Speaker Radiophone'ও পাওয়া গিয়েছিল। এটা দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুর (যিনি আমাদের লেঃ ছিলেন) আমাদের ব্যবহারের জন্যে দিয়ে-ছিলেন। ক্যাম্প ভাঙ্‌বার ঠিক আগের দিন ইনি আমাদের জন্য নানা রকম খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের প্রতি তাঁর এই অশেষ প্রীতির জন্যে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২৯শে ডিসেম্বর জেনারেল টম্‌সন্ আমাদের দেখ্‌তে আসেন। তিনি সমস্ত Battalionএর প্যারেড দেখে বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। ভবিষ্যতে এই কোরের

কার্য্যাবলী যাতে আরো আনন্দপ্রদ হয়, তিনি তার চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান।

১লা জানুয়ারি নববর্ষের দিনে প্রত্যেকবারেই কলিকাতা গড়ের মাঠে একটা করে Military demonstration হয়ে থাকে। একে Proclamation Parade বলা হয়। আমরা প্রত্যেক বৎসরে এই প্যারেডে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে থাকি, এবারও পেয়েছিলাম। যাবার আগে ভয় হয়েছিল যে, অত বড় জনসঙ্ঘের সামনে দাঁড়িয়ে Regular Armyদের সঙ্গে কেমন করে আমরা প্যারেড্ এসেছিল। প্যারেড্ দেখে তাদের সকলের মুখে আশা ও আকাঙ্ক্ষার এক আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটে উঠেছিল।

ক্যাম্প ভাঙ্‌বার ঠিক আগের দিন একটি ছোট খাট রকমের Sports হয়েছিল। এতে সাধারণ Sports হতে অনেক নূতন বিষয় ছিল। অবশ্য এটি আমাদের বাৎসরিক Sports নহে, সেটি সম্ভবতঃ ফেব্রুয়ারি মাসে হবে। Sports অন্তে যে উপহার বিতরণ হয়েছিল, তার সমস্ত ব্যয়ই Lady Stephenson বহন করেছিলেন এবং Sir Hugh Stephenson'ও বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রদের উৎসাহিত করেছিলেন।

'ডি' কোম্পানী নন্ কমিশণ্ড অফিসারগণ

করবো। কিন্তু প্যারেডে আমাদের যে সাফল্য হয়েছিল, তা' আমাদের মুখে না শুনে ইঙ্গ-ভারতীয় কাগজওয়ালাদের মুখ থেকে শুনুন,—(১) It was noticed that Calcutta University Training Corps looked very smart on parade—Englishman. (২) The second (Cal.) Battalion University Training Corps is very smart unit, brought up on the left. Completing an impressive display—Statesman. বাংলার ছাত্রদের সাফল্য দেখ্‌বার জন্যে বহু দূর-দূরান্তর হতেও লোক

তার পরে ক্রমে ক্যাম্প ভাঙ্‌বার দিন এল। সেদিন অনেকের মন বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। বাংলা মায়ের এতগুলো সন্তান একসঙ্গে বড় মিল্‌তে পায় না। এই পনের দিনের জীবন-যাত্রায় সকলের হৃদয়ে হৃদয়ে এমনি একটা মিলনের সূত্র গেঁথে গিয়েছিল, যা এ বিচ্ছেদের দিনে সকলকে কাঁদিয়ে তুলেছিল। আজ বাড়ী এসে এই কথাটাই শুধু মনে হচ্ছে যে, গভীর ভালবাসা ও প্রীতির ওপর যে জিনিসটা গড়ে উঠেছিল, তা আজ স্বপ্নের মত মিলিয়ে যাচ্ছে।

সমাজ-বিজ্ঞান

স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী

সমাজের উৎপত্তি ও স্বরূপ বর্ণন

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। ইহার কি কোন আদি নাই? জগতের আদি থাকুক আর না-ই থাকুক, তোমার তো আদি আছে। ইতিপূর্ব্বে তোমাকে দেখি নাই, হঠাৎ কোথা হইতে দৃশ্য রূপে আসিলে? কোথা হইতে আসিলে, কি প্রকারে আসিলে, কি ভাবে ছিলে—ছিলে কি না ছিলে—এ সকল তর্ক এখন নয়। আসল কথা তো এই—যখনই অদৃশ্য তোমাকে দৃশ্য রূপে পাইলাম, তখনই তোমার সৃষ্টি বা আদি মানিয়া লইলাম। এই বিস্তীর্ণ জগদন্তর্গত তুমি আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ অণু-পরমাণু বই তো নই। অণু পরমাণু সদৃশ তোমার আমার সৃষ্টি মানিলাম—আদি মানিলাম। এ সকল তোমাতে আমাতে কোথা হইতে কেমনে বর্ত্তিল? অংশে যাহা বিদ্যমান, পূর্ণে তাহার অভাব কেমনে মানিব? তোমার আমার আদি বা সৃষ্টি মানিলে, জগতেরও আদি বা সৃষ্টি মানিয়া লওয়া হয় না কি?

যত্র-তত্র গোময় দেখিতে পাও। একটু ধৈর্য্যাবলম্বনে দেখিলেই দেখিবে যে, এক দল গোবরে-পোকার সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা ছিল না তাহা হইল। অকূল সমুদ্র মাঝে প্রথম বালুময় একটী দ্বীপ দেখিলে। কিছু দিন পরে উহাতে মাটী দেখিলে। তাহার পর নানা প্রকারের কীটাণুকীট দেখিলে, দূর্ব্বা আগাছা দেখিলে। ক্রমে বন জঙ্গল হইল, পশু পক্ষীর আবাসভূমি হইয়া শেষে মানুষের লীলাভূমিতে পরিণত হইল। এ সকলই প্রত্যক্ষের বিষয়,—অনুমান প্রমাণের অপেক্ষা নাই। গোময় হইতে পোকা সকলের উৎপত্তি, অকূল সমুদ্রে দ্বীপের উদ্ভব, আবার ঐ দ্বীপের মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির লীলাভূমিতে পরিণত হওয়া—এ সকল যে নিয়মের অন্তর্গত, জগৎ বা জগদন্তর্গত সকলই ঠিক সেই নিয়মের অনুবর্ত্তী। মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সকল সমাজই ঠিক সেই নিয়মের অন্তর্গত।

কার্য্য দেখিয়াই কারণের অনুমান হয়। কার্য্যের কারণ কারণ, আর কারণের কারণ কার্য্য,—"কার্য্যকারণয়োর-ভিন্নত্বাৎ।" কার্য্য কারণে অবিচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধ। অর্থাৎ

কার্য্যটাই কখনও কারণরূপে থাকে—কখনওবা কার্য্য রূপে প্রকাশিত হয় মাত্র। কারণ কার্য্যে নিত্য বিদ্যমান। কেবল সেই জন্যই 'ক' নামক পরমাণু লতায় পাতায়, ফলে ফুলে, পশুপক্ষী প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুতে ভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার সংস্কার-সম্পন্ন হয়। আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ নামক দুইটী শক্তি আছে। সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র-তারা-সমন্বিত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যে বাস্তব-রূপে প্রতীয়মান হইতে পারিতেছে—কেবল ঐ শক্তির বলে। ইহার কোন একটীর ন্যূনতায় বা শূন্যতায় মুহূর্ত্তে সকলই ধ্বংসাকার বা শূন্যাকারে পরিণত হইবে। কেবল সেই জন্যই সমগুণসম্পন্ন পরমাণু সকলের সংযোগ এবং বিষম-গুণসম্পন্ন পরমাণু সকলের বিয়োগ সম্ভব হইতেছে।

সমগুণধর্ম্মসম্পন্ন পরমাণু সকলের সংযোগ যেমন স্বাভাবিক, ঠিক তেমনই সমগুণধর্ম্মসম্পন্ন জীব সকলের সঙ্ঘবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ হওয়াও স্বাভাবিক। অথবা, ভাষান্তরে ইহাও বলা চলে যে, সমগুণধর্ম্মসম্পন্ন সকলের স্বজনপ্রিয়তাও স্বাভাবিক! এই স্বজনপ্রিয়তা ও পরজন হইতে নিজ-জনের হানি সম্ভাবনায় আত্মরক্ষা বা স্বজনরক্ষার চেষ্টাই সঙ্ঘ বা সমাজবদ্ধ হওয়ার মূল কারণ।

সমাজ আমাদের সকল শিক্ষারই নিদান স্বরূপ! সমাজবদ্ধ না হইলে কোন শিক্ষাই উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। শিল্পকলা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উৎকর্ষসাধনকল্পে সমাজবদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। অবশ্যই বলা চলে, এ সকল বিদ্যার উৎকর্ষসাধন কল্পেই সঙ্ঘবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ হও নাই। ইহা সঙ্ঘ বা সমাজবদ্ধ হওয়ার আনুষঙ্গিক ফলমাত্র।

শিক্ষার উৎকর্ষের অমৃতসেচনে সমাজদেহ অভিষিক্ত হইলেও, উহার বিষের জ্বালায় যে জর্জ্জরীভূত না হয় এমন নহে। শিক্ষার এ বেগ বন্ধ হওয়া সহজসাধ্য মনে হয় না।

তুমি বিজ্ঞানবিদ্ চৌতালার নিভৃত কোণে বসিয়া যন্ত্র আবিষ্কার করিলে। পঞ্চাশ মাইল দূর হইতে ইঙ্গিত মাত্র কোটী কোটী জীবের ধ্বংস সাধন হইল। বিজয়ের উন্মত্ততায় পৃথিবী কাঁপিল, জগৎ বিজ্ঞানবিদের অলৌকিক ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধা-ভয়-ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিল। ইঙ্গিত মাত্রেই কোটী কোটী জীবের হিংসা কার্য্যের সহায়ক বিজ্ঞানবিদের পূজা হইল। তুমি বলিতে পার, এক দিকে কোটী জীবের প্রাণ হরণ করিয়া অপর দিকে কোটী জীবের প্রাণ দান হইল। কোটী জীবের প্রাণের বিনিময়ে যদি কোটী জীবের প্রাণদানই হয়, তাতেই বা কি হইল। ইহাতে তোমার বিশেষত্ব কোথায়? যাহা লইয়াছ, তাহা তোমার দেয়। দেয় দিলে, ঋণমুক্ত হইলে মাত্র, তোমার প্রাপ্য কিছুই নাই। আর বাস্তবিক প্রাণদানই বা করিলে কোথায়? প্রাণ নিলে বটে, কিন্তু দিলে না,—ঋণীই থাকিলে। হিংসার আদিগুরু হইলেও তুমি শান্ত, দান্ত, ধীর, গম্ভীর—তুমি সকল জগতের সকল প্রশংসার পাত্র।

ঐ যে কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত অজ্ঞ মূর্খ কাহারও মাথায় লাঠি মারিল, রক্ত পড়িল। যদিও সে প্রাণে মরিল না, তথাপি গুণ্ডা বদমাইস জ্ঞানে আঘাতকারীর জেলের ব্যবস্থা হইল। কোটী কোটী জীবধ্বংসকারীর পূজা আর ঈষৎ রক্তপাত-কারীর জেলের ব্যবস্থা! (বা রে জগৎ—বা!) এ না হইলে কি আর শিক্ষার গৌরব! ধন্য তোমার সমাজ, ধন্য তোমার সামাজিকতা, ধন্য তোমার ন্যায়-ধর্ম্ম-বিচার, আর ধন্য তোমার শিক্ষা।

শিক্ষা শুধু ইন্দ্রিয়সেবার উপায় হইলে, ইহাতে অপরের কি আসিয়া যায়। এ শিক্ষা সমাজকে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা শিক্ষা ছাড়া আর বড় কিছু দেয় বলিয়া মনে হয় না। তুমি কিছু লেখা পড়া শিখিলে, অতীতের অভিজ্ঞতা লইয়া ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমান গঠন করিতে লাগিলে—শুধু কি নিজের সুখের জন্য ব্যস্ত হইলে?—তাহা নহে। পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবে বলিয়া ছলে, বলে, কলে, কৌশলে গরীবের রক্ত চুষিয়া ধনকুবের সাজিলে। ধনীর ধন, বিদ্বানের বিদ্যা, জ্ঞানীর জ্ঞান, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি যদি ধর্ম্মের দ্বারা শাসিত, নিয়মিত হইয়া পরহিতব্রতে নিয়োজিত না হইল, তবে ইহার পরিণাম যে বিষময় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শিক্ষাভিমানই বল, ঐশ্বর্য্যাভিমানই বল, আর জাত্যাভিমানই বল, সকলেরই পরিণাম দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তুমি জাত্যাভিমানে উন্মত্ত হইয়া বালকের ন্যায় ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছ। এই অভিমানের কোন ন্যায্য কারণ নির্দ্দেশ করিতে পার কি? ইহার কি কোন ভিত্তি আছে? অন্ন-বিক্রেতা, জুতা-বিক্রেতা, মাংস-বিক্রেতার জাত্যাভি-

মানেও সমাজ কম্পিত হয়। এ সকলের অনুকূলে তোমার কোন সঙ্গত যুক্তি বা শাস্ত্রানুমোদন আছে কি? তা না থাকিলে কেবল একদেশদর্শী হইয়া এসব ভেল্কি-বাজীর প্রশ্রয় দেওয়া কেন? হৃদয়-দুয়ার খুলিয়া দাও,—সত্যের আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হউক; যদি এ সৎসাহসটুকু না থাকে, তবে আর এ অভিমান কিসের?

যে অগ্নি আমাদের শরীর রক্ষার সহায়ক, সেই অগ্নিই আবার ব্যবহারের অসাবধানতায় সর্ব্বনাশ সাধন করে। সকল বিষয়, সকল শিক্ষা, সকল জ্ঞান, সকল বল ও সকল ধন যদি লোকহিতকর-কার্য্যে নিয়োজিত থাকে, তবেই ইহার উপযোগিতা আছে; নতুবা অগ্নির ন্যায় এ সকলই সর্ব্বনাশের জনক মাত্র। হিংস্র-জন্তু-সঙ্কুল সাগরের অতল জলে মুক্তা-প্রবালাদি রত্নরাজি আছে সত্য, মনুষ্য-চক্ষুর অন্তরালে বসুন্ধরার গর্ভে হীরকাদি বহুমূল্য ধাতব পদার্থ বিরাজিত,—সেও সত্য; কিন্তু সে সকল দুর্লভ বস্তুতে তোমার আমার কি? যাহা পাব না, পাবার কোন সম্ভাবনা মাত্র নাই, তাহার অস্তিত্ব-জ্ঞান শুধু চিত্ত-বিক্ষোভ ছাড়া আর কি? তোমার বিদ্যা, তোমার জ্ঞান, তোমার ধন-রত্নাদি সম্বন্ধেও তাই। এ সকলে যদি পরোপকার না হয়, তবে অবশ্যই পরাপকার সাধিত হইতেছে সন্দেহ নাই। ব্যাঘ্রকে দৃঢ় লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া বাহিরে লোভনীয় তরুণ ছাগশিশু ছাড়িয়া দিয়া ব্যাঘ্রের শুধু চিত্ত-বিক্ষোভ জন্মাইলে না কি? দারিদ্র্য রূপ দৃঢ় পিঞ্জরাবদ্ধ আমার দুষ্প্রাপ্য তোমার ভোগ-বিলাসের সামগ্রীগুলি আনিয়া তাই করিলে না কি?

একদেশদর্শী হইয়া অন্যায় সুখ-সম্পদ-ভোগে তোমার অধিকার কি? তুমি ত তোমারই শিক্ষা, দীক্ষা, সুখ, সম্পদের ভাবনায় বিব্রত! ক্ষণিকের জন্যও তোমাকে আমার ভাবনায় ভাবিত হইতে দেখি না। তুমি বহুদর্শী, বিজ্ঞ হইলেও আমার সুখ-সম্পদে দৃষ্টি রাখা তোমার আবশ্যক বোধ হয় না। অল্পদর্শী অজ্ঞ আমি, বিদ্বেষী না হইয়া তোমার সুখ-সম্পদে কি করিয়া সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে পারি? তুমি পরোপকার বুঝ, পরোপকারের ভিতরেও নিজের উপকার লুক্কাইত,—ইহা কার্য্যে না হউক, অন্ততঃ কথায়-বার্ত্তায়, কাগজে-কলমে জান। কিন্তু এ জানার ফলই বা কি? উদ্দেশ্যই বা কি? না জানাতেই বা কি ক্ষতি ছিল? অজ্ঞের অপরাধ—সে জানে না; কিন্তু বিজ্ঞ তুমি,—জানিয়া শুনিয়াও সেই একই অপরাধে অপরাধী। ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি? আছে বৈ কি। কিন্তু চোখ ফুটলে তো। যাদের নিশি-দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের উপর তোমার সুখ-ভোগ, আরাম-আয়েস, তাহারা তোমাকে শুধু তোমার সুখ-সম্পদের জন্য বিব্রত দেখিতে চায় না। তুমি তোমার সুখ-সম্পদে যতটা বিব্রত হও, তাদের সুখ-সম্পদ, মান-মর্য্যাদার জন্যও ঠিক ততটাই বিব্রত হও, ইহাই তাহারা দেখিতে চায়। শুধু আপনাকে লইয়া বিব্রত হওয়া পশুত্ব ছাড়া আর কি? অন্তরে নিশ্চয় জানিও,—তোমরা সমুদ্রে ফেন, বুদ্বুদ, তরঙ্গ মাত্র,—অনন্ত সমুদ্র এ সকলের পশ্চাতে রহিয়াছে, যাহার আধারে তোমার এ সুখ, সম্পদ, আনন্দ, উল্লাস। তোমার অস্তিত্ব কোথায়, বুঝিতে পার কি? নিরাধার হইলে যে—মুহূর্ত্তে শূন্যে উড়িয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যাইবে। যে অগণিত কৃষককুলের নিশিদিন অজস্র পরিশ্রমে তোমার তিষ্ঠিয়া থাকা সম্ভব হইতেছে, ভাবিয়া দেখ ইহার অভাবে তোমার স্থান কোথায়? ফেন-বুদ্বুদ হইয়া যদি তিষ্ঠিয়া থাকিতে চাও,—তবে যাহাতে সাগর উদ্বেলিত না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য কর। তোমার এবং ঐ কৃষককুলের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কর, তাদের দুঃখ-দৈন্য বুঝ, তাদের অভাব অভিযোগ শুন ও তাহার প্রতিবিধান কর। প্রতিবিধান কি দয়াপরবশ হয়ে?—তা নয়,—নিজে বাঁচিবে বলিয়া। হয় তো এখনও চোখ ফুটিলে তোমার মান-মর্য্যাদা রক্ষা পাইতে পারে,—তুমি বাঁচিয়া থাকিতে পার।

এই যে সমাজের প্রতি স্তরে স্তরে বিদ্বেষ-বহ্নি ধিকি-ধিকি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কোথা হইতে কেমনে জ্বলিয়া উঠিল, বলিতে পার কি? দূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভাবী অমঙ্গলের চিহ্ন সকল যদি না দেখিলে, তবে আর দূরদর্শিতা কি?—বৃথাই চক্ষুর অভিমান। আবার দেখিয়াও যদি ঐ বিদ্বেষ-বহ্নি নির্ব্বাপিত না কর, অথবা ঐ অমঙ্গলের দূরীকরণে সচেষ্ট না হও, তবে আর কর্ত্তব্যপরায়ণতা কোথায়?—বৃথাই কর্ত্তব্য-পরায়ণতার অভিমান। তুমি কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য বলিয়া জগৎ-সংসার, আকাশ-পাতাল মুখরিত করিলে, কিন্তু কর্ত্তব্য তোমার কি? কোন্ কষ্টি-পাথরে তোমার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিলে? ইন্দ্রিয়-সেবনই কি কষ্টি-পাথর? তোমার কর্ত্তব্য নিরূপক কে? যে বুদ্ধি কর্ত্তব্য-

নিরূপক হইবে তোমার সে ধর্ম্ম-বুদ্ধি কোথায়? বুদ্ধি ধর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত না হইলে অগ্নির অযথা ব্যবহারের ন্যায় কি সর্ব্বনাশ যে ঘটিয়া যায়, তাহার কল্পনাই হৃদয়-বিদারক। তুমি আজ আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে, শিক্ষায় সভ্যতায়, আচারে-ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকারে আপনহারা হইয়াছ। জানি না—কবে তুমি আবার আত্মস্থ হইবে। পিতাকে পিতা বলিবে, মাতাকে মা, ভাইকে ভাই বলিবে, ভগিনীকে ভগিনী—হায়! কবে এমন দিন হইবে, যবে সকল বিশ্ব-সংসার এক সমাজ বা এক পরিবার বলিয়া সকল হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিবে—সকল হৃদয় মানিয়া লইবে—সংসার স্বর্গ হইবে! প্রীতি ও প্রেম—হিংসা, দ্বেষ ও ঘৃণার স্থান অধিকার করিয়া লইবে। তোমার তোমাতে, আমার আমিকে দেখিয়া, সকলের সকলেতে আমার আমিকে জানিয়া, আমার আমিতে সকলকে বুঝিয়া কেবলই বলিব—কি সুন্দর! কি সুন্দর!! বলিতে বলিতে বাক্‌রোধ হইবে, হয় তো বলা হবে না, কেবল অন্তরে জানিব সুন্দর, অতি সুন্দর! আপনাতে আপনাকে দেখিয়া, সকলেতে আপনাকে জানিয়া কেবল আপনাময়—আমিময় হইব। চরাচর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কেবল আমিই থাকিয়া যাইব। আমি ছিলাম, আমি আছি, আমিই থাকিব। আহা!—কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ! কেবল আনন্দ! আমি মহান, অতি মহান, অত্যতি মহান। আমি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, আমি অণু পরমাণু।

ভূপৃষ্ঠ হইতে তোমার চলে যাবার সম্ভাবনায় কত ম্রিয়মান, কত দুঃখী হও, তোমার ভ্রান্তিই ত এ সকলের জনক, তুমি যাবে কোথায়?—আছ। অনাদি অনন্তকাল ব্যাপিয়া তুমি এক ভাবেই আছ। তুমি অজর, অমর, নিত্য, শাশ্বত; তুমি বুদ্ধ, মুক্ত, চির-জাগ্রত;—তুমি সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থী, গৃহী, ব্রহ্মচারী। তুমি দেবতা, দানব, দৈত্য, মানব;—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ভৃঙ্গব; তুমি সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ; তরু, শাখা, লতা, গুল্মসমূহ। এই সার-ধর্ম্ম; যাহা জীবন-প্রদ,—প্রাণ-প্রদ, যাহা মৃত-সঞ্জীবনী সুধা যাহা মানুষকে সিংহ-বিক্রম দেয়, জীবের নশ্বরত্ব, জীবত্ব, ঘুচাইয়া অমরত্ব, ঈশ্বরত্ব প্রদান করে, চরাচর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিবার ক্ষমতা দান করে;—সেই সর্ব্বতোমুখী প্রসারিত মহান বীরধর্ম্মের আসনে অনার্য্যসেবিত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকে বসাইয়া শূদ্রত্বকে বরণ করিয়া লইবার পথ প্রশস্ত করিতেছে মাত্র।

তাই বলিতেছিলাম, কবে সকল হৃদয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে এক পরিবার জ্ঞানে মানিয়া লইবে, কবে পরিবারস্থ সকল, সকলের ভিতর আপনাকে দেখিয়া সকলের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইবে। হস্ত পদাদি প্রত্যেকেই ভিন্ন অথচ একের দুঃখে সকলেরই দুঃখানুভূতি। নিজ নিজ পরিবারে পিতা, মাতা, ভাই ভগিনী প্রত্যেকেই ভিন্ন অথচ একের পীড়ায় সকলেই পীড়িত, একের দুঃখে সকলেই দুঃখিত। এই নিখিল বিশ্ব পরিবারের সম্বন্ধেও তাই। আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, আচার ব্যবহার সকলই এক বিরাট বিশ্ব-পরিবারের অভিমুখী হউক। আমাদের তপস্যা এক হউক, মন্ত্র এক হউক, আমাদের সকল চেষ্টা, সকল কামনা, সকল জীবন, সকল সাধনা, সকল সমাজ, সকল উপাসনা, একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হউক। আমাদের আর মন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই, যাগ নাই, যজ্ঞ নাই, তপস্যা নাই, সাধনা নাই। আমাদের সকল মন্ত্র, সকল তন্ত্র, সকল যাগ, সকল যজ্ঞ, সকল তপস্যা, সকল সাধনা এক বিশ্ব-পরিবার হউক,—এক সত্য পরিবার হউক!

মায়ের মিনতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

(দরিদ্রা জননীর একমাত্র পুত্র। আড়কাটী অর্থের প্রলোভন দিয়া তাহাকে দূর দেশান্তরে লইয়া যাইতে চায়।)

আমার একটী বই পায়রা নাই ধ-রো-না।
নইলে বাঁচি কই যাচি ওই করুণা।
দেখ খোপের কোণ উদাস মন কাঁদিছে,
আহা বেয়াকুল লতার ফুল হরো না।
নাই সোণার ওর ঘুঙুর জোড় চরণে,
নাই নিক্কণ নীল ঝিলিমিল্ বরণে।

নয় শ্যামা পিক তুমি ঠিক জানো ত,
নয় খঞ্জন ও দিঠি নয় তরুণা।
নয় ময়না এ চায় না যে পড়িতে,
নাই সাধ্য নাই অন্য পাখ্ ধরিতে।
শুধু গুঞ্জন ওর জন্য মোর জাগেরে,
দিয়ে চাঁদির চাঁদ দারুণ ফাঁদ গড়ো না।

নানা কথা

প্রাচীন যুগে রেশম ব্যবসায়

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার বিদ্যারত্ন বি-এ

লুপ্ত অতীতের কোন প্রাচীন যুগে মনুষ্য-জগতে সর্ব্বপ্রথম রেশমের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা সঠিক নির্ণয় করিয়া বলা সুকঠিন।

(১) প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তুঁত বৃক্ষ নিম্নে ক্রীড়ারতা এক চীন বালিকা রেশম গুটিকা ভূতলে নিপতিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়।

রেশমকে ইংরাজী ভাষায় "সিল্ক" বলে ; সিল্ক শব্দ চীনীয় "সিস্" মংগোলীয় "সির্কেক" ও গ্রীসীয় "সের" হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। রেশম ব্যবসায়ী তিব্বতীয় ও তুর্কীগণ গ্রীসীয়-দিগের নিকট "সেরেস" নামে পরিচিত ছিলেন। চীনের পৌরাণিক উপাখ্যানে, খৃঃ পূঃ ২৯ শতাব্দীতে সম্রাট্ ফুহির রাজত্বকালে বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণে রেশমী সূত্র ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

খৃঃ পূঃ ২৭ শতাব্দীতে চীন সম্রাজ্ঞী লিয়িৎসু গুটিপোকা পোষণ ও গুটি হইতে রেশম তন্তু সংগ্রহ করিবার প্রণালী উদ্ভাবন করেন ; এবং তন্তুগুলিকে সূত্রাকারে পরিণত করিয়া তদ্দারা বস্ত্র বয়ন করিবার পদ্ধতিও সর্ব্বপ্রথম তৎকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়।

ক্রমে ক্রমে রেশমী বস্ত্রে নানাবিধ রং ও চিকণের কাজ করিবার প্রথা প্রচলিত হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই রেশমীবস্ত্র ধনী ও বিলাসিগণের পরম আদরের বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইয়া পড়ে।

খৃঃ পূঃ একাদশ শতাব্দী হইতে সংরক্ষিত চৌলী নামক চীনদেশের বিবরণী হইতে অবগত হওয়া যায় যে চীনরাজ সরকারের তত্বাবধানে চীনের নানাস্থানে বহু পরিমাণে গুটিপোকার চাষ, রেশম প্রস্তুত ও চিকণ সূচীকার্য্য সম্বলিত নানা রঙের রেশমীবস্ত্র বয়ন প্রভৃতি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত।

(২) রেশম শিল্পের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা মধ্য এসিয়ার যাযাবর জাতিগণের সাহায্যে পাশ্চাত্য জগতে প্রবেশ লাভ করে, এবং তদবধি রেশম ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার লইয়া রোমক প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতি ও পার্থিয়ার মধ্যে বহুকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতে থাকে। কিন্তু পার্থিয়া, জলস্থল উভয় পথ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সতর্কভাবে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হওয়ায়, কেহই কোনরূপ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন না।

কোন সময়ে এবং কোন পথে রেশম সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য জগতে নীত হইয়াছিল, তাহা সঠিক নির্ণয় করিয়া বলা বড়ই দুরূহ ব্যাপার।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বিভিন্নদেশীয় রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক প্রেরিত উপহার ও উপঢৌকনাদির মধ্যে (১) মহার্ঘ ক্ষৌম বস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

রামায়ণে মিথিলাধিপতি জনক কর্ত্তৃক প্রদত্ত কন্যাধনের মধ্যে (২) "কৌশেয় বসন" এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

সুতরাং উত্তরাপথে যে বহু প্রাচীন কাল হইতেই বিবিধ প্রকারের রেশমী বস্ত্র ব্যবহারের প্রচলন ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের তদানীন্তন কেন্দ্রস্থল সিন্ধু সাগর সঙ্গম হইতে যে রেশম তৎকালে আরও পশ্চিমে নীত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে!

পারস্য কর্ত্তৃক মিশর বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মিশরের কোন ইতিহাস বা বিবরণীতে রেশমের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ ডেরিয়স্ বা জারক্সসের রাজ্য মধ্য দিয়া রেশম ভূমধ্যসাগর তীরবর্ত্তী দেশ সমূহে প্রথম প্রবেশ লাভ করে।

অনেকে অনুমান করেন যে, মহাবীর আলেকজাণ্ডারএর দিগ্বিজয়া-ভিযান হইতে গ্রীসীয়গণ রেশমের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত হন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা বহু পূর্ব্বেই পারস্যের নিকট হইতে রেশম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আরিষ্টটল লিখিত—History of Animalsএ গুটিপোকার যে বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে আরিষ্টটলের সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই তদ্দেশে রেশমের ব্যবহার প্রচলিত হয়।

সিজার ও আগষ্টাসের সময়ে রেশমী বস্ত্র Coa Vestis (বা transparent gauze) নামে পরিচিত ছিল।

প্লিনি বলেন "Pamphile daughter of Plates of the

---

(১) সভাপর্ব্ব—সপ্তবিংশতি অধ্যায়। ২

(২) বালকাণ্ড—চতুঃসপ্ততিতম সর্গ। ১

খুকুর দুঃখ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

sland of Cos discovered the art of unwinding the silk from bobbins and spinning a tissue therefrom"।

Lucan তৎকৃত Pharsila নামক পুস্তকে ক্লিওপেট্রার রূপ বর্ণনা কালে রেশমীবস্ত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—Her white breasts resplendent through the Sidonian fabric which wrought in close texture by the skill of the Seres, the needle of the workman of the Nile has separated and has loosened the warp by stretching out the web.

যাহা হউক পাশ্চাত্য জগতে রেশমব্যবহার এতদূর প্রসার লাভ করিয়াছিল যে, স্বর্ণের ওজনে রেশম বিক্রীত হইত, এবং দেশবাসীকে আসন্ন অর্থ সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রোম রাজসভা, সম্রাট টাইবিরিয়াসের রাজত্বকালে, রেশমীবস্ত্র ব্যবহার নিষেধক (পুরুষ পক্ষে) এক আইন প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সম্রাট অরেলিয়ান ও তৎসম্রাজ্ঞী নিজেরা কখনও রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না।

বহুকাল পর্য্যন্ত চীন ও পার্থিয়া রেশম ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিয়া পাশ্চাত্য জাতিগণের অর্থে বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাঁহাদিগের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া দুইটী খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক গুটিপোকা গ্রীসে নীত হওয়াবধি প্রাচ্যের রেশম বাণিজ্যের ক্রমাবনতি ঘটিয়া প্রতীচ্যের ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে।

(৩) কথিত আছে যে, ৪১৮ খৃষ্টাব্দে জনৈক খোটানদেশবাসী ভারতীয় রাজপুত্রের সহিত চীনরাজ দুহিতার বিবাহ সংঘটিত হয়, এবং রাজকুমারী স্বামীগৃহ যাত্রাকালে মস্তকাচ্ছাদন বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকায়িত করিয়া গুটিপোকা ও তুঁত বীজ ভারতে আনয়ন করিয়াছিলেন।

ভারতবাসীর হস্তে রেশম চাষ ও রেশমীবস্ত্র বয়ন বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এবং ভারতজাত রেশমী বসন বহুকাল পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সমাদৃত হইত। কিন্তু ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য ক্রমে বিলাত হইতে বাষ্প চালিত বয়ন যন্ত্র ও তাঁত প্রভৃতির আমদানির সঙ্গে সঙ্গে এদেশ হইতে হস্তচালিত তাঁত ও চরকা প্রভৃতি একেবারে অন্তর্দ্ধান-প্রায় হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে ভারতের জগদ্বিখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ের সম্যক্ লোপ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

যে ঢাকাদেশ বাসী মস্‌লিন্ বস্ত্র নির্ম্মাতা তন্তুবায়গণ একদিন বয়নশিল্প নিপুণতার নিমিত্ত সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সে সম্মানের অধিকারী হইতে তাহাদিগের মধ্যে ধামরাই গ্রামবাসিনী দুইটী বৃদ্ধা ব্যতীত আর কেহই অবশিষ্ট ছিল না। বৃদ্ধা দুইটীর মৃত্যুর পরে আর কেহ সে স্থল পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছে কি না কে জানে। আজ যে শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে ভারতে "খদ্দর আন্দোলনও উপস্থিত হইয়াছে এ সময়ে যদি ভারতবাসী আপনার অতীত কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া বয়ন শিল্পের পুনরুদ্ধার কল্পে বদ্ধপরিকর হয়, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, দূর ভবিষ্যতে ভারত আবার রেশম ব্যবসায়ের নিমিত্ত জগতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিবে।

(৩) অমৃত বাজার পত্রিকা—১৬ই অক্টোবর—Secret of Silk.

প্রেততত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীচণ্ডীদাস মজুমদার বি-এ, বিদ্যারত্ন, সাহিত্যভূষণ

পূর্ব্ব প্রবন্ধে "প্রেততত্ত্ব" সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রেততত্ত্বের সহিত ধর্ম্মতত্ত্বের কি সম্বন্ধ, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।" কথাটা খুবই সত্য। জগতে কত শত ধর্ম্ম বর্ত্তমান রহিয়াছে—কেবল ভারতবর্ষেই হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্শী প্রভৃতি কতই না ধর্ম্ম বিরাজ করিতেছে। ইহারা পরস্পর বিভিন্ন, অনেক স্থলে পরস্পর বিরোধী। তবে সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সকল ধর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ মূল সূত্র (Common principles) আছে। সেগুলিকে নিম্নলিখিত রূপে বিভাগ করা যাইতে পারে—

(১) সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরে বিশ্বাস

(২) আত্মার অস্তিত্বে ও অমরত্বে বিশ্বাস

(৩) ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয়ে বিশ্বাস।

প্রেততত্ত্ব বা Spiritualism বাস্তবিক পক্ষে এই তিনটি মূল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবাত্মা পরমাত্মার অংশ বিশেষ—শরীর ধ্বংস হইলে উহা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না—পরন্তু ইহলোকের কর্ম্মানুসারে নবদেহ ধারণ করিয়া মানবাত্মা বিভিন্ন লোকে ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বিরাজ করে। ধার্ম্মিক দিব্য দেহ লাভ করিয়া পরলোকে পরম শান্তি ভোগ করে—আর পাপী কর্ম্মফলে মৃত্যুর পর নানা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। ফলতঃ Spiritualism এই তত্ত্বই শিক্ষা দেয়; এবং পরলোকবাসী আত্মা মিডিয়মের মধ্য দিয়া এই সকল কথাই জগতে প্রচার করিয়া থাকেন। সুতরাং যাহা সকল ধর্ম্মের মূল—সকল ধর্ম্মের সার—প্রেততত্ত্ব বা Spiritualism আমাদিগকে তাহাই শিক্ষা দেয়। এইখানেই প্রেততত্ত্বের সহিত ধর্ম্মতত্ত্বের নিকট সম্বন্ধ। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রেততত্ত্বের গণ্ডীর মধ্যে আসিতে পারেন; এবং আমার মনে হয় Spiritualismএর মধ্য দিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে এক মধুর মহামিলন সংস্থাপিত হইতে পারে।

আর এক কথা। পরোপকার যে একটি প্রধান ধর্ম্ম, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। প্রেততত্ত্ববিদ্‌গণ নানা প্রকারে পরোপকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা চাক্ষুষ প্রমাণের সাহায্যে শোকার্ত্ত নরনারীকে বুঝাইয়া দেন যে, তাঁহাদের মৃত আত্মীয় স্বজন একেবারে বিনষ্ট হয়

নাই—পক্ষান্তরে তাহারা নূতন দেহ, নূতন শক্তি ও নূতন আনন্দ লাভ করিয়া চির-মধুময়, চির-শান্তিময় অমরলোকে বাস করিতেছে; এবং সর্ব্বদাই মর্ত্ত্যবাসী প্রিয়জনের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি রাখিয়াছে। তাহাদের সহিত পরলোকে আবার মিলন অসম্ভব নহে। এটা যে কতদূর আশার কথা—আনন্দের কথা—তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কবি সত্যই বলিয়াছেন—

"Alas, for love ! if thou wert all
And naught beyond, O Earth !"
"ভাসায়ে অকূলনীরে ভবের সাগরে
জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার,
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে
হুহু ক'রে দিবানিশি প্রাণ জ্বলে যার।"

বাস্তবিকই তাহার পক্ষে প্রেততত্ত্ব-কথা অমৃত অপেক্ষাও শীতল, মধুর, চন্দন অপেক্ষাও তৃপ্তিপ্রদ। তাই আমার মনে হয়, ধর্ম্মপ্রাণ মুক্তিকামী ভারতবাসীর পক্ষে প্রেততত্ত্বের আলোচনা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অবশ্য কর্ত্তব্য। সুখের বিষয়, আজ ২।৩ বৎসর হইতে All India Spiritualistic Conferenceএর অধিবেশন হইতেছে। এবার ইয়োরোপে Paris নগরে সমগ্র জগতের প্রেততত্ত্ববিদ্‌গণের সম্মিলনী বসিবে। আশা করি ভারতবাসী ঐ মহাসম্মিলনীতে যোগ্য প্রতিনিধি পাঠাইতে ত্রুটি করিবেন না। আমার বিশ্বাস, অতি অল্পকাল মধ্যেই পরপারের দুর্ভেদ্য যবনিকা উত্তোলিত হইবে—এবং অধ্যাত্মবাদের প্রবল বন্যায় সারা বিশ্ব পরিপ্লাবিত হইবে।

চা

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়

একবর্ণাত্মক কথাগুলি প্রায়ই সাংঘাতিক প্রকৃতির হইয়া থাকে, যথা—'হাঁ' 'না' ইত্যাদি। এই সকল কথার উপর আর কথা চলে না, তাই বড় বড় বৈষয়িক ব্যাপারে বিচক্ষণ সুধিবৃন্দ এই সমুদায় কথাকে সাধ্যমত এড়াইয়া চলেন—সহজে কেহ মুখ হইতে 'হাঁ' কি 'না' বাহির করেন না—এমন ঘুরাইয়া বলিয়া থাকেন, যাহাতে কেহ তাঁহাদের কায়দায় না ফেলিতে পারে। এমন যে একবর্ণাত্মক কথা, ইহারই পর্য্যায়ে যখন 'কালো' পদার্থটীর নাম-করণ হইয়া 'চা' নামে সাধারণ্যে পরিচিত হইল, তখনই ভাবিয়াছিলাম যে একে কালো তাহাতে আবার এক অক্ষরে নাম,—এ বস্তু যে-সে বস্তু নয়।

এইখানে একটু ভুল করিলাম; কেন না চায়ের নাম-করণের সময় আমারই নাম-করণ হইয়াছিল কি না, এবং হইলেও, এ গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার মত বয়স আমার হইয়াছিল কি না, তাহার সঠিক ইতিহাস আমার জানা নাই। তবে এ কথা জোরের সহিতই বলিতে পারি যে, 'চা' যখন শিশু শয্যাতেই পড়িয়া ছিল, তখন আমার বেশ জ্ঞান হইয়াছে—সাদা কথায় যাহাকে 'জ্ঞান হওয়া' বলে, অন্য অর্থ এখানে না টানিয়া আনিলেই ভাল হয়। তখন মুদীর দোকানে, বেণের দোকানে, মণিহারী দোকানে বা কোন দেশী দোকানে কৌটায়-কৌটায় 'চা' বিক্রয় হইতে দেখা যাইত না। আর কলিকাতা সহরে তৈয়ারী চায়ের দোকান ফাঁদিয়া বসিবার স্বপ্নও তখন কোন ব্যবসাদারই দেখেন নাই।

আরও কতিপয় বৎসর কাটিয়া যাইবার পর দেখা গেল যে, কলিকাতার কোনও বিদেশীয় সওদাগর দেশীয় লোকের মারফতে খামে-মোড়া চা বিতরণ করিতেছেন; এবং সেই বিতরণের ঘাঁটী হইয়াছে ক্লাইব ষ্ট্রীট্ ও হাবড়া পোলের মোড়। শুধু তাহাই নহে। এই সওদাগরী অফিসে একটি তৈরী চায়ের সত্র ছিল, এবং যিনি দয়া করিয়া সেখানে পদধূলি দিতেন, তিনি বিনা পয়সায় চা খাইয়া আসিবার সময় একটি চিনামাটীর পেয়ালা ও সসার বখশিস্ পাইতেন। এই প্রকারে কত টাকার চা-ই যে তাঁহারা বিতরণ করিলেন, সে তাঁহারাই জানেন। কিন্তু বৎসর পার হইতে না হইতেই এই চা'য়ের খামগুলির মূল্য হইয়া গেল এক পয়সা, দুই পয়সা করিয়া।

ইহারই কিছু দিন পরে যুবরাজ সপ্তম এডোয়ার্ড সিংহাসন গ্রহণ করেন ও সেই উপলক্ষে কলিকাতায় খুব ধুম-ধাম পড়িয়া যায়। নানারূপ আমোদ-প্রমোদের মধ্যে গড়ের-মাঠে গরিব দুঃখীদের ভূরী-ভোজনও দেওয়া হয়। এই ভূরী-ভোজনেও 'চা' কেহ প্রত্যাশা না করিলেও, এক বিদেশীয় বণিক স্বেচ্ছায় গরিব-দুঃখীদিগকে চা বিতরণ করেন। ইহার বৎসর তিন চার পূর্ব্বেও না কি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক-জুবিলী উপলক্ষে এইভাবে তৈয়ারী চা বিতরণ হইয়াছিল। হায় রে সেকাল—তখন না চাহিলেও লোকে গায়ে চা ঢালিয়া দিত; আর এখন এক পেয়ালা চা খরচের ভয়ে বন্ধু-বান্ধবগণ দরজায় দাঁড়াইয়া কথা কহিয়াই বিদায় দেন। কেন না আদরে ঘরে বসাইয়া চা দিবার মত কোন ঐশ্বর্য্যই এ গরিব ব্রাহ্মণে তাঁদের শ্যেন দৃষ্টি খুঁজিয়া পায় না।

যাহাই হউক, মহারাজ সপ্তম এডোয়ার্ডের সিংহাসনে বসিবার পর হইতেই শিশু চা প্রতিষ্ঠালাভের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহারই পর হইতে দু-একখানি তৈয়ারী চায়ের দোকান কলিকাতা সহরে খুলিতে দেখা গেল ও ঠিক এই সময়ে একজন ভদ্রলোক দুধ ও শর্করা মিশ্রিত চায়ের আরক জুতার কালির কৌটার মত কৌটায় প্যাক করিয়া বাজারে ছাড়িয়া দিলেন। ইহা দেখিতে ঠিক চিটাগুড়ের মত ছিল ও একটি ছোট চামচ করিয়া এক চামচ আরক, এক পেয়ালা গরম জলে মিশ্রিত করিলে বেশ সুখসেব্য পানীয় প্রস্তুত হইত। অবশ্য বাজারে ইহা চলিল না—ভারতের আবিষ্কার-কর্ত্তাদের কল্পনা দোষে। ইহার পর এই বিশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা রাজধানীর সর্ব্বাঙ্গে চায়ের দোকান ঠিক ঘামের মত 'পিলপিলিয়ে' বাহির হইয়া পড়িল। এখন অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, চাকরীকে 'দুরতেরী' করিয়া যদি একখানি চায়ের দোকান খুলিয়া বসিবার ইচ্ছা

নয়, তবে সমস্ত সহর 'গাবাইয়া' বেড়াইলেও একখানি ঘর জোটা ভার। ইহারই মধ্যে কিছুদিন পূর্ব্বে চায়ের বড়িও (tablet) সাহেবী দাওয়াইখানায় দর্শন দিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের লোক তখনও এবং এখনও ততদূর সভ্য হয় নাই বলিয়া, তাহারা ইহার মর্ম্ম বুঝিল না, সুতরাং বড়িকেও পাড়ি জমাইতে হইল।

শুধু সহরে নয়,—বৎসর দশ বার পূর্ব্বে মফঃস্বলের ঘাঁটীতে-ঘাঁটীতেও চা বিতরণের এমন সব ব্যবস্থা হইয়াছিল, যাহা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞেও হয় নাই। সেই সকল চা বিতরণের ছাউনিতে হারমোনিয়ম, ডুগি-তবলা, গ্রামোফন, প্রভৃতি আড্ডা জমাইবার সমস্ত সরঞ্জামই রাখা হইত। শুধু রাখা নয়, সাধারণকে যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতেও দেওয়া হইত। আর বিনা পয়সায় পিয়ালার পর পিয়ালা চা যত পার খাও।

সাদা বল, লাল বল, হ'লদে বল, সবুজ বল, সব রংয়ের সেরা রং হইতেছে কালো। আর এই কালোর মর্ম্ম ভারতবাসীরা বুঝিয়াছেন বলিয়া দেবতাগণের গায়ের রং পর্য্যন্ত কালো বলিয়া অনুমান করিয়া লইয়াছেন। আর ইয়োরোপবাসীরা যতই কালা-বিদ্বেষ দেখান না কেন, কালো নইলে তাঁদের এক দণ্ডও চলবার উপায় নাই, তাঁদের জামা-কাপড় কালো, জুতা কালো, জুতার কালি কালো, অফিসে কালো কালি ও কালা বাঙ্গালীই একমাত্র সহায়, কালো আলকাতরা তাঁহারা যত ব্যবহার করেন, তত এদেশের লোক পারেন না। আর কালো চা তাঁহাদের প্রধান পানীয়। এই শ্রেষ্ঠ রঙ্গে রঙ্গান চা নিজে কালো হইলেও—জলে সিদ্ধ হইয়া যখন ভিন্ন রূপে প্রকট হন, তখন তাঁহার উজ্জীবক কুলির রক্তও সে রঙ্গের কাছে হার মানে।

অন্য সব নেশাকে লোকে লক্ষ্মীছাড়া নেশা বলে ; কারণ, তাহাদের আশ্রয় লইলে ভক্তের বাস্তুভিটা উৎসন্ন যায়। আর চায়ের আশ্রয় লইয়া চল্লিশ না পেরোতেই ভগবানদত্ত দেহভিটাখানিকে অজীর্ণ রোগের জ্বালায় দেওঘর, সিমুলতলা ছুটাছুটি করিতে হয়। এমন যে নেশা তাহাকে যিনি খেলো ঠাওরান, নিশ্চয়ই তিনি পরশ্রীকাতর—অন্যকে বড় করিয়া কখনও তিনি দেখিতে শিখেন নাই। অন্য নেশার কবলে পতিত হইলেও, চেষ্টার দ্বারায় তাহাকে দূরীভূত করা যায়। আর তাহা না পারিলেও, কোন সময় দূরীভূত করিবার চেষ্টাও আসে। কিন্তু চায়ের নেশা একবার ধরিলে, তাহাকে তাড়াইবার ইচ্ছাই কখনও মনের মধ্যে জাগিবে না! এ মোহ কি সহজ মোহ! এ মোহ কি সোজা মোহ? অন্য সব নেশা কাহারও মধ্যে প্রবেশ করিলে, তাহাকে অভদ্র বা ইতর ভাবা যায় ; কিন্তু চা'কে মধ্যে প্রবেশই করিতে হয় না, তাহার আধার পিয়ালাটি যদি কাহারও পার্শ্বে পড়িয়া থাকে, তবে সে যেই হোক না কেন তাহাকে আপ্ টু ডেট্ (up to date) ভদ্র-লোক ভাবিতেই হইবে, অবশ্য তিনি যদি চা সরবরাহকারী খানসামা না হন। এমন যে সর্ব্বত্র-অপ্রতিহত-গতি নেশা—একে অন্য নেশা অপেক্ষা খাটো করে কাহার সাধ্য। মূল্য হিসাবেও এ নেশাকে উপেক্ষা করিবার উপায় নেই। কারণ, এক দিন কলিকাতা হইতে কাশী পর্য্যন্ত যাইবার পথে প্রতি বড় বড় ষ্টেশনে আট আনা দিয়া আট পেয়ালা শুধু চা-ই খাইয়াছিলাম। আর আমার পার্শ্বেই বসিয়া এক সাধু এক আনার গঞ্জিকাতেই কার্য্য সমাধা করিলেন। অবশ্য আট আনা মূল্যের বোতল শেষ করিবার মত যাত্রীও যে সে গাড়ীতে ছিলেন না তাহা নহে।

আপনারা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ নেশা চায়ের দু-একটি কার্য্য-কলাপ আমার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। আর সে সমুদায় সত্য ঘটনা—একটিও মনঃকল্পিত নহে। একটী একটি করিয়া সংক্ষেপে তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম।

আফিস অঞ্চলে শত-শত ছোকরাকে দেখিয়াছি—চায়ের খাতিরে নিজের পেট মারিয়া সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর ঘরে যায়। ইহারা সামান্য বা বিনাবেতনে কাজ করিয়া থাকে। সুতরাং মধ্যাহ্নে জলযোগের জন্য চারি পয়সার অধিক কাহারও বরাতে বরাদ্দ নাই। ইহারা ইচ্ছা করিলেই মধ্যাহ্নে ক্ষুধার অনলে এক পয়সা মুড়ি ও এক পয়সার ছোলা-সিদ্ধ আহুতি দিয়া নিজের শরীর রক্ষাও করিতে পারে এবং অসময়ের জন্য বাকি দুটি পয়সা জমাইতেও পারে। কিন্তু সেদিকে বড় কেহ যায় না। দুইটা বাজিতে না বাজিতেই তাহারা চায়ের দোকানে ছুটিয়া গিয়া দুই পয়সার এক পেয়ালা চা পান করিবে ও বাকি দুই পয়সায় একটি কাঁচি মার্কা ও গোটা দুই পান সংগ্রহ করিয়া, নবাবের মত পান চিবাইতে-চিবাইতে ও সিগারেট্ ফুঁকিতে-ফুঁকিতে শীঘ্রই ভবের শিঙ্গে ফুঁকিবার দাগা মক্স করিতে থাকিবে। এ ঠিক যেন মদে খাওয়া মাতালের মত কোথাও দু-চার আনা পেয়েছে কি অম্নি শুঁড়ির বাড়ী ছুট্,—সেই পয়সায় পেটে কিছু দিবার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা নাই।

একটি সুখের সংসার ছারখার করিবার মূলে ছিল ঐ কালো 'চা'। সে বাড়ীর কর্ত্তা কারবার করিতেন ও কার্য্যস্থানের সংলগ্ন একটি বাস-বাড়ীতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা লইয়া বাস করিতেন। পুত্রটি প্রায় উপযুক্ত হইয়াছিল,—সে পিতার কাজ-কর্ম্মও দেখিত, নিজের পড়া-শুনাও করিত। বাড়ীর কর্ত্তা প্রত্যহ প্রাতে চা খাইয়া শৌচ কার্য্য সমাধা করিতেন ও বাহিরে আসিয়া স্বকীয় বৈষয়িক কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। এক সময় বাটীর দাসী ছুটিতে বাড়ী যায়। সাংসারিক কার্য্যে বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়ার দরুণ যথা সময়ে চা হইয়া উঠিত না। সেজন্য বাটীর কর্ত্তা প্রায়ই অসন্তুষ্ট হইতেন। যথাসময়ে চা না-পাবার কারণ তাঁহার বাঁধাবাঁধি কাজে যথেষ্ট অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। এক দিন তিনি ধৈর্য্য হারাইয়া ক্রোধ প্রকাশ করেন, ও গৃহিণী ব্যস্ততার সহিত চা তৈয়ার করিতে লাগিয়া যাইলেও তিনি আর কখনও চা খাইবেন না বলিয়া বাহিরে চলিয়া যান ও খুব একটা জরুরি কাজে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। পাঁচ-সাত মিনিট পরেই পুত্র কাঁদ-কাঁদ ভাবে পিতাকে আসিয়া সংবাদ দেয় যে, মাতা বাটী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন, খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। মাথায় বাজ পড়িলে মানুষের ঠিক কিরূপ হয় জানি না, কিন্তু মনে হয় তাহাতেও লোকের

যত যন্ত্রণাই হোক তাহা ক্ষণিক। আর স্থায়ী মানসিক যন্ত্রণা লইয়া কর্ত্তা গৃহিণীকে খুঁজিতে ছুটিলেন। অনভ্যস্তা গৃহিণীর বাহিরে যাইতে পা সরে নাই, তিনি বহির্ব্বাটীতেই এক ভিত্তি কোণে লুকাইয়া ছিলেন। সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া গেল এবং অনুসন্ধানে জানা গেল, যে, উনানে আগুণ ধরাইতে বিলম্ব ঘটার জন্য পুত্রও যথাসময়ে জলখাবার পাইতেছিল না, তাই সেও এই অবসরে মাতার উপর এক-হাত লইত। গৃহিণী মাথার ঠিক রাখিতে না পারিয়া প্রথমে তাহা মেঝেতে টিপ্ টিপ করিয়া ঠুকিতে থাকেন, পরে অন্দর মহলের চৌকাট্ পার হন। মাতাকে পাওয়া যাইবার পর পুত্র অভিমানের প্রতিশোধ লইতে কোথায় চলিয়া গেল; ও গৃহিণীর এইরূপ আচরণে কর্ত্তার মনে এমন বৈরাগ্য দেখা দিল যে, তিনিও কাহাকে না বলিয়া বিবাগী হইয়া গেলেন। মাস তিনেক পরে বৈরাগ্যের ঝোঁক কাটিলে পর তিনি যখন বাটী ফিরিলেন, তখন দেখিলেন, তাঁহার বিশ হাজার টাকার কারবারের কোন চিহ্নই নাই; খুঁজিয়া-খুঁজিয়া গৃহিণীকে তাঁহার বাপের বাটীতে পাইলেন, ও পুত্রের কোন সন্ধানই পাইলেন না।

এইরূপ আরও কত কাহিনীর উল্লেখ করিতে পারা যায়; কিন্তু থাক—আর না।

অন্যান্য নেশা শুধু মগজে যাইয়া কার্য্য করে; কিন্তু চায়ের নেশা সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের। এ নেশার উত্তাপ স্পর্শেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করে, এ নেশার রং দর্শনেন্দ্রিয়ের সুখ জন্মায়, এ নেশার নাম শ্রবণেন্দ্রিয়ের শান্তি আনিয়া দেয়, এ নেশার গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ব্যাকুল করে, আর রসনার তো কথাই নাই।

বহু পূর্ব্বে আমাদের দেশে 'চা' নামে যে একপ্রকার পদার্থ ছিল, ও ধনাঢ্য পরিবারে যে তাহা ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই 'চা' খাইবার, অথবা মাখিবার, কি পরিধান করিবার সামগ্রী ছিল, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। আমরা দাস-দাসীদের চলিত কথায় চাকর ও চাকরাণী বলিয়া থাকি। এই চাকর নিশ্চয়ই 'চা'কর বা চা-প্রস্তুতকারক ছিল। আর চাকরাণী নিশ্চয়ই 'চা'কারিণী বা চা-প্রস্তুতকারিণী ছিল। চা-কারিণী নিপাতনে সিদ্ধ হইয়া অর্থাৎ ব্যাকরণের সূত্র নিপাতিত হইয়া চাকরাণীতে দাঁড়াইয়াছে। এই চাকর চাকরাণী কথা স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে ও এই শ্রেণীর লোকের উদ্ভব প্রথমে ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহেই হইয়াছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক সে আদিম চা আমাদের দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক, এখন চা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সে চা প্রথমে হিন্দুসমাজের মধ্যে অবাধ প্রসার-প্রতিপত্তি জমাইবার সুযোগ পায় নাই। হিন্দুসমাজ ঘুম চোখে অন্ধকার দেখিয়া দেখিয়া—আলোকহীন জগৎ, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে বলিয়া যখন সবার মনে হইল—তখন তাহাদের স্কুলে পড়া বিজ্ঞ ছেলেরা বাহির হইতে একটু-আধটু আলোক (?) ধার করিয়া আনিয়া তাহাদের চোখের সম্মুখে ধরিল। সে আলোককে উচ্ছৃঙ্খলতা বিশৃঙ্খলতা বলিয়া শত গালি পাড়িলেও, নিজের ঘরের সন্তানকে সমাজ তাড়াইয়া দিতে পারিল না। লুকাইয়া লুকাইয়া ফাউল-খাওয়া, চা-খাওয়া ছেলের দল সমাজের মধ্যে বসিয়া বসিয়া যখন দলে পুরু হইতে লাগিল, তখন প্রথমে সৌখিন পুরুষ মহলে চা দেখা দেয়। পরে যাদের বালিসে ওয়াড় জুটিত না, বিছানায় চাদর জুটিত না, এমন অবস্থার পুরুষ মহলেও চা চলিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে হিন্দুর 'সূর্য্য চন্দ্র পবনের গমনাগমন রহিত' অন্দর মহলেও চা প্রবেশাধিকার লাভ করিল। এখন আবার শুনিতেছি যে, অন্তঃপুরচারিণী লক্ষ্মীদের গর্ভেও এই চাকে ছুটিতে হইতেছে। কেন না, গর্ভস্থ ভ্রূণ আজকাল এক পেয়ালা চা না খাইয়া মাতৃ-জঠর-শয্যা পরিত্যাগ করিতে আর রাজি নহে। তাই বিচক্ষণ ডাক্তাররা গর্ভস্থ ভ্রূণের ধাত বুঝিয়া আশু প্রসবের জন্য প্রসবার্থিনী গর্ভিনীদের গরম গরম চা খাইতে দেন। ধন্য চা—কালো ছেলের গুণ এই প্রকারই হইয়া থাকে।

চায়ের প্রচলন হিন্দুসমাজে কিরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কোন 'ক্রিয়া কর্ম্মে' বেশ বুঝিতে পারা যায়। কোন ক্রিয়া উপলক্ষে দু'-দশ জন আত্মীয় কুটুম্বকে নিমন্ত্রণ করিলে কর্ম্ম কর্ত্তাকে যদি অর্দ্ধমণ মিষ্টান্নের যোগাড় করিতে হয়, তবে চায়ের জন্য অন্ততঃ পক্ষে পাঁচসের চিনির যোগাড় রাখিতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে মেঠাই মোণ্ডায় যত মিষ্ট খাইবেন, এক চায়ে তাহার এক চতুর্থাংশ সর্করার সদ্ব্যবহার করিবেন। তাহা ব্যতীত, আমি বাটীতে একক দুবেলা চা খাই,—আমার কেবল চায়ের জন্য সপ্তাহে অর্দ্ধসের চিনি খরচ হয়, আর আমার পাশের বাটীতেও একটি ক্ষুদ্র পরিবারে স্বামী-স্ত্রীতে বাস করেন—তাঁহাদের চিনির খরচ শুধু চায়ের জন্য সপ্তাহে দেড় সের। ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাংলা দেশে শুধু চায়ের জন্য কি পরিমাণ বিলাতি চিনি নিয়মিত ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে ও বিনিময়ে কত টাকাই না বিদেশী বণিকের বাক্সে গিয়া উঠিতেছে। কাহারও যদি হিসাব করিয়া লইতে অসুবিধা হয়, তবে আমিই হিসাব করিয়া দিতেছি—সে টাকার পরিমাণ কেবল বাঙ্গলা দেশ হইতে মাসিক চার কোটীর কম নহে; অর্থাৎ, বৎসরে প্রায় পঞ্চাশ কোটী। হয় তো মোট এত টাকার চিনি সারা ভারতেই সমস্ত বৎসরের মধ্যে আমদানী নাও হইতে পারে; কিন্তু সকলেই জানেন যে, হিসাবের গরু বাঘে খাইবার যো নাই। শুধু তাহাই নহে, সকল সময়ে সকল স্থানে টাটকা গাভী দুগ্ধ পাওয়া যায় না বলিয়া, বিলাতি দুগ্ধব্যবসায়ীরও পোহাবার। এবং সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলের বিষয় এই যে, আমরা বিলাতি কাপড় পোড়াইয়া, খদ্দর বেচিয়া, বক্তৃতা দিয়া, এমন কি সর্ব্বস্বত্যাগী ফকির হইয়া যখন বাটীতে ফিরি, তখন ক্লান্ত দেহকে চাঙ্গা করিবার জন্য এই দেশের ধনাপহরণকারী চায়েরই আশ্রয় লইব। আর সকল বর্জ্জনে রাজি আছি—চা বর্জ্জন করিতে বলিলে আমি কোন দলেই নাই। এহেন চায়ের নেশা কোন নেশার অপেক্ষা উপেক্ষনীয়?

চায়ের কৃপায় অনেকে আবার মানুষ হইয়া গিয়াছে—সে দৃষ্টান্তও

বড় কম নয়। কেহ যেন মনে করিবেন না, তাহারা পূর্ব্বে বাঘ, ভল্লুক বা উট, গাধা ছিল। অর্থহীন মানুষ এ কালে মানুষই নয় বলিয়া, ঐ শব্দ ব্যবহার করিলাম। যে কোম্পানী সারা ভারতের ঘাঁটীতে ঘাঁটীতে চা বিতরণের ছত্র খুলিয়াছিলেন তাঁহারা একশত দেড়শত টাকা বেতন দিয়া অনেক বাঙ্গালীর ছেলেকে এই সকল ছত্র পরিদর্শকের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, প্রত্যেক ঘাঁটীতে চা বিতরণের জন্য ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেতনের এক একজন কর্ম্মচারীও থাকিতেন। এই মহার্ঘ চাকরীর বাজারে বাঙ্গালীর ছেলের ভাগ্যে কি কম সুযোগ ঘটিয়াছিল? তাহার পর চা-বাগানগুলি আছে বলিয়া আমাদের দেশের গরিব দুঃখীরা দু পয়সা করিয়া খাইতেছে। নহিলে এ কুলীর দেশে একটা কুলীও কি আজ বাঁচিয়া থাকিতে পারিত? আর কলিকাতা সহরেও না কি শুনিয়াছি, কেহ কেহ তৈরী চায়ের দোকান দিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই চার পাঁচখানি বাড়ী করিয়া ফেলিয়াছেন—চার পাঁচখানি, এক আধখানি নয়—তাহাও আবার এই বাজারে—যে বাজারে বাপ দাদার পরিত্যক্ত পুরাতন বাটীতে চুন বালি ধরাইয়া তাহার লজ্জা নিবারণ করা ও তাহাকে রক্ষা করা দায় হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু স্বমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার ক্ষমতা চায়ের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জাহির হইয়াছে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে—অবশ্য বাঙ্গালা সাহিত্যে। অধুনা এমন গল্প প্রায়ই নজরে পড়ে না, যাহাতে চায়ের প্রসঙ্গ নাই। এবার দেখিতেছি, নায়ক নায়িকা না হইলেও গল্প লেখা চলিবে—যদি কেবল চায়ের কৃপাদৃষ্টি থাকে। গত দুই বৎসরের মধ্যে যতগুলি মাসিক পত্রিকা পাঠ করিয়াছি, তাহার শতকরা পঁচাত্তরটী ক্ষুদ্র গল্পে কোন আবশ্যক না থাকিলেও, যে কোন অছিলায়, কোন না কোন স্থলে সপেয়ালা চাকে জোর করিয়া টানিয়া আনা হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন এই ক্ষুদ্র গল্পগুলি—কমিসনভোগী বিজ্ঞাপন-দাতাগণের প্রচারকল্পে চায়ের বিজ্ঞাপন। ইংরাজি নাটক নভেলও তো এমন অনেক পাঠ করা যায়, কৈ তাহাতে তো চা এ হুইস্কির এত ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায় না। এত বড় বাঙ্গলা দেশের প্রাণস্বরূপ পান তামাকের নাম গন্ধও আজকালকার সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই বাঙ্গালী জাতি অকস্মাৎ কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে যদি নষ্ট হইয়া যায়, তবে দশ বিশ বৎসর পরে ইহাদের সাহিত্য হইতে জগতের অন্যান্য জাতি এই স্থির করিয়া লইবে যে, এদেশের লোক কেবল চায়েই সাঁতার দিত; আর পান তামাক বলিয়া কোন সামগ্রী এ দেশে কখনও প্রচলিত ছিল না। হায় চা—বঙ্গবাণীকে কি আষ্টে পৃষ্ঠেই ধরিয়াছ!!!

চুম্বন

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

ভুবনে প্রথম নয়নের নীরে কে দিল রচিয়া ঘুমবন!
সে যে গো প্রথম চুম্বন!
তার আগে ছিল মর্ত্ত্য স্বর্গ ছিল শুধু ভোগ সুখ হাস—
ছিল না মৃত্যু, ছিল না অশ্রু, ছিল না কো শোক দুখ-পাশ!
ছিল অমৃতের অধিকার—
চপল চরণে ছিল না মরণে গতি তার!
ছিল জাগরণ অনিবার!

আকাশ সেদিন কেঁদেছিল সুখে হয়েছিল তার মন উদাস
বাতাস ফেলেছে ঘনশ্বাস—
এ কি মানবের সুখ-দানবের দেশে বনবাস!
কে আনিল ব্যথা সুখ-পাশ করি চূর্ণ?
মরণ মথি' কে করিল জীবন অমৃত পরিপূর্ণ?
বেদনার মাঝে চেতনা আনিয়া জাগালো নবীন এ ভুবন—
সে যে গো প্রথম চুম্বন!

সেদিন হতে যে মর্ত্ত্য মর্ত্ত্য, স্বর্গ রহিল মনে তার,
স্বপ্নের মাঝে ব্যথা বাজে কভু জাগে স্মৃতি অকারণে তার!
মর্ত্ত্য রচিল মরণ বেদনা-স্বপ্ন-অশ্রু-ভুল-হার
নিতি ঝরে পড়ে নিতি সে ফোটায় ফুল তার!
ব্যথার সাগরে ফোটে তার রূপশতদল,
অশ্রুর হারে করে চুম্ অনুপ ঝলমল!
সেদিন বিশ্বে আনিল প্রথম যৌবন
সে যে গো প্রথম চুম্বন!

সেদিন পরশ লভিল পরম ভুমারই
প্রথম কুমারে যেদিন প্রথম কুমারী
আপনারে দিয়ে আপনারে পেল—সেদান প্রথম চুমারি!
আদি ঋষি যেন আদি কবি হ'য়ে গাহিয়া উঠিল কোন্ গান—
"ওগো অমৃত-পুত্রেরা আজি পেয়েছি সুধার সন্ধান!

আঁধারের পারে সূর্য্যের মত জ্যোতি তার
বেদনার রসে স্বপনের মত গতি তার !
তোমার মাঝারে সেই সুধা আছে, দাও যদি তুমি পাও তবে ;
মরণ কোথায়, বিরহ কোথায় ? আনন্দে গান গাও সবে !"
বিশ্বে সেদিন কবে কেটে গেছে, পুরানো দিন্ ত' আর নাই !
সেদিন এ পথে যে পথিক গেছে পায়ের চিহ্ন তার নাই !
আজি ধরণীর বক্ষে নবীন অঞ্চল—
শুধু হিয়া মাঝে সেই সুর বাজে আজো দোলে চির-চঞ্চল !
শুধু ফুল ফোটে আজো ফুল টোটে আছে শুধু সে কুসুমবন !
আছে সেই ব্যথা আর আছে সেই চুম্বন !

আজি মর্ত্ত্যের বাঁকা পথে প্রেম ভয়ে ভয়ে করে অভিসার ;
সে চরণধ্বনি শুধু ওঠে রণি ছন্দে ছন্দে কবিতার ;
দিকে দিকে শির তুলেছে অধীর পাষাণ-বধির কারাগার—
তারি চাপে আজি পতিত মথিত ব্যথিত করিছে হাহাকার !
আজিকে দৈত্য মেলেছে লক্ষ বাহুপাশ—
নৃত্য-ছন্দ রস-আনন্দ সৌন্দর্য্যেরই রাহুগ্রাস !
অমৃত কই ? আনন্দ কই ? আগে চাই আর পিছু চাই—
দিকে দিকে শুধু হা হা কারার হাহাকার—আর কিছু নাই !
তিলে তিলে আজ মানুষ আপন বাঁধিছে মরণ-ফাঁস প্রাণে
তারই হা হুতাশ মেলেছে পিঙাস্ আঁধি-আবরণ আস্‌মানে ।
সে গগন ব্যেপে হাহাকার ছেপে সুর কেঁপে ওঠে চুম্ চুম্—
বেদনা বিরহ কোথা মিশে যায়, নয়নে ঘনায় ঘুম ঘুম্ !
দিকে দিগন্তে বেতার যন্ত্রে বেজে ওঠে সুর গুঞ্জন—
বন্ধু বঁধুর নিতেছে মধুর চুম্বন !

চুম্বন শুধু উছলিছে না ত ধরণীর এই কারাতে ;
চুম্বনধারা হয়ে পথহারা কাঁপিছে তারাতে তারাতে !
দিতেছে অদূরে অনন্ত দূরে বন্ধু বঁধুরে চুম্‌চুম্
অসহ পুলকে দ্যুলোক-ভূলোকে বেজে ওঠে রি-রি-ঝুম্ ঝুম্ !
চুম্বন আছে, তাই ত মানুষ বন্ধন মাঝে গায় গান,
চুম্বন আছে তাই চরাচর মরণের মাঝে পায় প্রাণ !
চুম্বন আছে তাই ত ফুটেচে বিল্‌কুল্
গগন-কুঞ্জে পুঞ্জে-পুঞ্জে নীল ফুল !
জীবনের স্রোত গ্রহে গ্রহে বেগে তাই ছোটে অভিযান-পথে ;
অসীমের দেশে শেষে গিয়ে মেশে প্রাণ পেয়ে আন্ প্রাণ হতে।
চুম্বন আছে তাই আনন্দে তালে তালে
নেচে যায় তারা পুলকছন্দে লোকে-লোকান্তে কালে কালে !
মৃত্যু-বিরহ দুঃখ ত নেই—শুধু চিরসুধাভুঞ্জন !
অনাদিকালের অমরের ক্ষুধা চুম্বন !
সোণার কাঠির জাগরণ যেন রূপালী কাঠির নিদ্‌মোহ—
চুম্বন যেন মানবের চির-বিদ্রোহ !
চুম্বন যেন জীবন মরণ রণ,
চুম্বন যেন বিধির আপন পণ !
আপনারে মাগি বিশ্বভুবন সারথি
নিজেরে নিঃস্ব করে চুম্বন-আরতি !
চুম্বন-টানে বাঁধা আছে তাই খসিছে চন্দ্র সূর্য্য না !
চুম্বন যেন অনাদি কবির গভীর ছন্দ-মূর্চ্ছনা !
চুম্বন যেন নটীর নৃত্য-গোপন মনের হর্ষ,
চুম্বন যেন মুকুল ফোটানো পরশমণির স্পর্শ !
মানুষের যত ব্যগ্র বাসনা দিশেহারা
আনন্দে যেন চুম্বনে আসি মিশে তারা !
চুম্বন যেন শিহরণ তোলা মধুর দখিণ থেকে হাওয়া,
চুম্বন যেন দূরে পথ-ভোলা অচিন্ পাখীর ডেকে যাওয়া !
চুম্বন যেন নন্দন থেকে খসে-পড়া কোন্ মন্দার,
চুম্বন যেন ভুবন-মাতানো সুরভি যোজনগন্ধার ।
চুম্বন যেন উষার মধুর হাসিটী
চুম্বন যেন কৃষ্ণের সুর বাঁশীটি !
চুম্বন যেন কে দেছে গগনে গালে গাল,
উষা-সন্ধ্যায় সেই রাগে সে যে হয়ে ওঠে আজো লালে-লাল !
আদি নাই তার, সীমা নাই তার, শেষ নাই সে যে অনন্ত,
চুম্বন যেন লোকে লোকে চিরবসন্ত !
চুম্বন যেন তুফানের মতো উল্লরোল
বন্যার মতো ঢেউয়ে ঢেউয়ে তার ফুলদোল !
চুম্বন যেন 'ভালবাসি' শুধু বলে যাওয়া,
জোৎস্নার মত মোহ ছাওয়া মধু গলে যাওয়া !
চুম্বন যেন বিদ্যুতাহত চেতনা ;
অভিসার-পথ-কণ্টক-ক্ষত-বেদনা !
চুম্বন-তৃষ্ণা দূরে সরে যাওয়া মরীচিকা ;
মরণে-মিলায় চিরজ্বালা ছাওয়া ওরি'শিখা !
চুম্বন যেন পুলক রোঁয়াতে রোঁয়াতে
মূর্চ্ছা যেন সে ফুলের পেলব ছোঁয়াতে !

চুম্বন যেন শিরায় শিরায় সঞ্চিত
জমাট-রক্ত বাজে বেদনায় ঝঙ্কৃত !
চুম্বন যেন আননে মাখায় কুঙ্কুম—
চুম্ চুম আনে নয়ন-পাখায় ঘুমঘুম !
চুম্বন যেন যেন যুঁই ঝরে পড়া বনতলে
মন হানি যেন মন-জানাজানি কোন্ ছলে !
কোন্ ঢেউ এসে লাগে অধরের কূলে হায়,
পলকে বিশ্বভুবন পুলকে ভুলে যায় !
এ কোন্ সেতার সুরে বেঁধে দিল বীণ্‌কার
পরশে যে তার ক্ষণে বেজে ওঠে গান সেথা চিরদিনকার !
চুম্বন যেন অডোর মালার বন্ধনহারা বন্ধন,
চুম্বনে জাগে বন্দীশালার অপরূপ রূপ নন্দন !
চুম্বন যেন সাপের ছোবল—বিষে করে' তনু জর্জ্জর
যেন ধরার তৃষিত অধরে আদরে ভরা ভাদরের ঝরঝর !
চুম্বন যেন মদের পেয়ালা রঙীন্ মৃত্যু টল্ টল্ !
যেন সমরে সমুখে মরীয়ার বুকে মোহন সঙীন্ ঝল্‌মল্ !
আপন খেয়ালে নেচে ঝরে পড়া অপরূপ খোস্‌খেয়ালী—
চুম্বন যেন জোস্‌নার রোশনাইভরা জোশ্ দেয়ালী !
চুম্বন যেন দাবানলে ওঠে বন জ্বলি,
চুম্বন যেন নিশির শিশির অঞ্জলি !
চুম্বন যেন নটরাজ নট নর্ত্তন
চুম্বন যেন গ্রহে গ্রহে সমাবর্ত্তন !
চুম্বন যেন ধ্বংস প্রলয়—আবার অতুল সৃষ্টি !
চুম্বন যেন অচিন্ হৃদয়ে অজানা আকুল দৃষ্টি !
নববন্যার আবর্ত্ত চুমো, পুরানো প্রেমের জোড়াতালি,
পঙ্কিল পথে শঙ্কিল গতি মরুভূর বুকে চোরাবালি !
চুম্বন যেন ঘূর্ণীপাকের হাওয়া
ঝঞ্ঝার সুরে বজ্রডাকের গাওয়া !
সাগরের বুকে কালবৈশাখী দুর্জ্জয়
মন্দ মলয় ঐ না কি ফুর্ ফুর্ বয় !
চুম্বন যেন কাটাঘায়ে মেশে ঝাল্‌নুন্
চুম্বন যেন শিশিরের শেষে ফাল্‌গুন !
চুম্বন যেন কাঁটার ফুলের বরমালা
পুলক-পরশ মাখা তারি সাথে খরজ্বালা !

রুদ্র যেন সে এক হাতে করে অবিরাম সব নির্ম্মল,
আরেক হাতের ছোঁয়ায় সেতার মুকুল ফোটায় বিল্‌কুল্ !
চুম্বন যেন লালসালুব্ধ বাহু-ফাঁস—
দাবানল জ্বালা তৃষ্ণাক্ষুব্ধ হা-হুতাশ !
চুম্বন যেন আফিমের ফুল মরণের,
আলেয়ার আলা যেন তারি মালা বরণের !
চুম্বন যেন মত্ত কি আশা দুনিয়ার—
চুম্বন যেন রক্ত-পিয়াসা খুনিয়ার !
চুম্বন যেন সর্ব্বনাশের নেশা গো,
চুম্বন যেন অক্টোপাশের পেষা গো !
চুম্বন যেন যাদুর চাহনি বিষে ছাওয়া,
চুম্বন যেন পরমাণু হয়ে মিশে যাওয়া !
চুম্বন যেন অগ্নিবাণের হানাহানি,
অধরে অ-ধর কোন্ অজানার জানাজানি !
চুম্বন যেন পড়ে সারা ফুলবন ঝরি,
গন্ধে ব্যাকুল বকুল মুকুল মঞ্জরী !
চুম্বন যেন শান্ত পরশ স্নিগ্ধ অমল প্রভাতের
চুম্বন যেন ফেণিলোচ্ছ্বাস উজ্জ্বল জলপ্রতাপের !
কৈশোরে সে যে কৌতুক হাসিখুসি ঢালা খুশ্ কুতূহল !
যৌবনে স্মৃতিস্বপ্নের—তৃষা-বেদনা জ্বালার তুষানল !
প্রেম কথা কয় চুম্বনে যেন ঝর্‌ণার কল কল কথা !
চুম্বন যেন যুগান্তবাহী ক্ষণিকের চলচপলতা !
চুম্বন যেন কিছুটা বিষের, কিছুটা সে-গড়া অমৃতের,—
তাই কিছু তার গাওয়া যায় গানে, কিছু থাকে ধরা অগীতের !
কিছুটা তাহার ফুলে ফুলে ওঠে দুলে দুলে
কিছুটার ঢেউ লাগে তারকার কূলে কূলে !
কিছুটা ত পেল দিল আর নিল মন যার,
কিছুটা গোপনে ভুবনে ভুবনে দিল মনে মনে ঝঙ্কার !
কিছু ঘরে ঘরে শান্তির দীপ জেলে দিল,
কিছু গগনে গগনে জ্যোতির আসন মেলে দিল !
একটী বুকের বাঁশরীতে কিছু সুর ছায়,
বিশ্ববীণার তারে তারে কিছু মূরছায় !
কিছুটা তাহার শূন্যে মিলাল কিছু লুটে নিল ত্রিভুবন—
পলকের দান চির-অফুরান চুম্বন !

বাদ-প্রতিবাদ

কান্ত কবি রজনীকান্ত

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার এল-এম-এস্

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রণীত আমাদের রাজসাহীর প্রিয় কবি স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের জীবনী পাঠ করিলাম। এই গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠায় "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" গীতের রচনার ইতিহাসের সংশ্রবে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর কর্ত্তৃক আমার নামের উল্লেখ দেখিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। কিন্তু বিনীত ভাবে জানাইতেছি, গীতের যে ইতিহাস তিনি দিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটু ভ্রম আছে। তঁাহার জীবিতকালে ইহার মীমাংসা হওয়া উচিত মনে করিয়া, আমি যাহা জানি তাহা লিখিলাম। রজনীবাবু আমাদের মেসে কখনই উঠিতেন না। তিনি এবারও আমাদের মেসে উঠেন নাই। তিনি অন্য মেসে তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকট উঠিয়াছিলেন। তিনি যখনই কলিকাতায় আসিতেন, তখনই আমার খোঁজ লইতেন। সে সময় বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে সমগ্র বাঙ্গলা দোদুল্যমান। তখন আমি ৫২ নং হ্যারিসন রোডের মেসে থাকিতাম ও মেডিকেল কলেজে পড়িতাম। সেই সময় তিনি এক দিন আমার খোঁজ করিতে আমার মেসে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। ১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে বঙ্গব্যবচ্ছেদ-ঘোষণার কয়েক দিন পরে কলিকাতায় একটি বিরাট মিছিল বাহির হইবার কথা থাকে। আমি ও আমাদের মেসের অন্যান্য ছাত্রেরা তাঁহাকে মিছিলে গাহিবার উপযুক্ত একটি গান রচনা করিয়া দিবার জন্য ধরিয়া পড়ি। তিনি তখনই গান রচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ করেন। কিন্তু সেই গানের সুরটি একটু কটমট হওয়ায় বা অন্য কোন কারণে আমাদের পছন্দ হয় না। তখন তিনি বলেন, রাজসাহীতে মিছিলে গাহিবার জন্য একটি গান রচনা করিয়াছিলেন। উহা তথায় গীত হইয়াছিল। সেই গানটীর সুর ও ভাবা ভাল,—আমাদের বেশ পছন্দ হইবে। এই কথার পর তিনি "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই' গানটি লিখিয়া দেন। আমাদের মেসের ছাত্রগণ ও ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের কতিপয় ছাত্র, আমাদের মেসে বসিয়া রজনী বাবুর নিকট এই গানটি ও অপর একটি গান আয়ত্ত করে। এখন আমার সকল ছাত্রের নাম স্মরণ নাই। দুইজনের নাম বেশ স্মরণ আছে। ইঁহারা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। একজনের নাম শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ (তুলু); ইনি এখন যশোহর জজ আদালতের উকিল। অপরটির নাম ৺জহরলাল বসু বি-এল; ইনি পুরুলিয়ার উকিল ছিলেন।

গান ছাপাইবার ভার আমার উপর পড়ে। শ্রীযুক্ত জলধর বাবুকে স্মরণ করিয়া আমি সে ভার গ্রহণ করি। যে দিবস গান গাহিতে হইবে, সেই দিবসই আমাকে ছাপাইয়া লইয়া আসিতে হইবে। আমি আহারাদি করিয়া দুপ্রহরে তখনকার "বসুমতী" আফিস গ্রেষ্ট্রীটে যাইয়া উপস্থিত হই। তখন জলধর বাবু বাগবাজারে কোন বাসায় থাকিতেন। তাঁহাকে তখন "বসুমতী" আফিসে না পাইয়া তাঁহার বাগবাজারের বাসায় যাই। তিনি বলেন যে "বসুমতী" প্রেসে ছাপান সুবিধা হইবে না; আমি অন্য প্রেসে ছাপাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি," এই বলিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া বাগবাজারের কোন কবিরাজ মহাশয়ের ছাপাখানায় লইয়া যান। সেইখানে বসিয়াই তিনি গান দুটির শিরোনামা দিয়া দেন "কান্তের নিবেদন।" আমাকে তথায় রাখিয়া তিনি "বসুমতী" আফিসে চলিয়া আসেন। আমি ও আমার সহযাত্রীগণ গান ছাপা হইলে লইয়া আসি। কবিরাজ মহাশয় গান ছাপাইবার জন্য আমাদের নিকট কিছুই গ্রহণ করিয়াছিলেন না, এমন কি কাগজের মূল্যও নহে। সেই দিন বৈকালেই ঐ গান দুটি আমাদের মেসের ছাত্রগণ ও ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক গোলদীঘিতে গীত হইয়াছিল। ইহার পর "সঞ্জীবনীতে" "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" সমগ্র গানটি মিছিলের বিবরণ সহ প্রকাশিত হয়। আমার বেশ মনে হয় "সঞ্জীবনীর" পূর্ব্বে কোন কাগজে এ গানটি প্রকাশিত হয় নাই। বোধ হয়, খোঁজ করিলে আমাদের রাজসাহীর বাড়ী হইতে দুই এক খণ্ড "কান্তের নিবেদন' বাহির হইতে পারে। আমার যাহা মনে আছে, তাহা সবিস্তার লিখিলাম। অনুগ্রহ করিয়া ইহা প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

বাঙ্গালার পাট

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিশ্র

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাঘ মাসের 'ভারতবর্ষে' বাংলায় পাটের চাষ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অনুমান হয় যে, বাংলার পল্লীবাসী চাষীদের অবস্থা তাঁহার নিকট সুপরিচিত নয়। মাননীয় লেখক মহাশয় যদি পল্লীবাসী ও নিজে চাষী হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, পাটের চাষের পক্ষে এইরূপ অভিমত পোষণ করিতে পারিতেন না। বাল্যকালে দেখিয়াছি, আমাদের এই ক্ষুদ্র পল্লীতেই মাঠের পর মাঠে পাটের আবাদ হইত,—ধান্য রোপণ অতি কমই হইত। এমন গৃহস্থও ছিল, যাহারা পাটের

চাষ ভিন্ন অন্য কোন চাষই করিত না। পাটের চাষের অপকারিতা সম্বন্ধে উপর্য্যুপরি আন্দোলন হওয়ায় এবং পাটের মূল্য যুদ্ধ বিগ্রহাদির জন্য হ্রাস হওয়ায়, পাট-চাষের ক্ষেত্র অধুনা অনেক কমিয়াছে। কিন্তু গত বৎসর হইতে পাট-চাষের পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীগুলিরও এইরূপই অবস্থা। পাট-চাষ ধান-চাষের অন্তরায় হয় না—ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ যথেষ্ট পরিমাণেই থাকিল। কেন না, অধুনা ধান চাষের জমি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাট-চাষ অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে। উঁচু জমিতে পাট-চাষের পর ধান চাষ হয় বটে, কিন্তু ধানের ফসলের পরিমাণ হ্রাস হয়। ঐরূপ জমির সংখ্যাও বাংলার অতি অল্প। বাংলা স্বভাবতঃ নিম্ন প্রদেশ। আবার যে সকল স্থান পাট-প্রধান, সেগুলি আরও নিম্ন সে সকল স্থান বন্যা-প্লাবনে অন্ততঃ কম পক্ষে দু'মাস জলগর্ভে থাকে। এরূপ অবস্থায় পাট-চাষের পর ধান্য রোপণ কতদূর সম্ভবপর, তাহা চাষীরাই বুঝিতে পারে। খাদ্য শস্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ হয় না, কথাটি যুক্তিসঙ্গত নয়। আবার খাদ্য শস্য যথেষ্ট পরিমাণে হয় না, ইহাও যুক্তিযুক্ত নয়। ঘর বুঝিয়া ব্যয় করিবার ক্ষমতা হইতে আমরা বঞ্চিত; কাজেই রপ্তানির দৌলতে খাদ্য শস্যের অভাব ও তার জন্য বাংলায় দুর্ভিক্ষের এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। পাট-চাষে কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি আপাততঃ শুনিতে ও দেখিতে বেশ লাগে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষকের ভাগ্যে সেই পুনর্মূষিক অবস্থাই ঘটিয়া থাকে। পাট-চাষ জন্য খাদ্য ফসলের জমি কম হয়। ফলে খাদ্য দুর্মূল্য হয়। এই দুর্মূল্য খাদ্য খরিদ করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, কিরূপ অনটনে পড়িতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছে। প্রয়োজন মত খাদ্য ফসলের জমি রাখিয়া বাকী জমিতে পাট চাষ করিলে এই আর্থিক কষ্ট কথঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব হইতে পারে; কিন্তু বাংলার কৃষকের যেরূপ দীন অবস্থা, তাহাতে তাহাদের প্রয়োজনের অধিক জমিও নাই, আবার আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফসল বপন করিবার ক্ষমতাও নাই। পাটের চাষে ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করে না, বরং ম্যালেরিয়া নিবারণের উপযুক্ত পন্থা ইহা, —এইরূপ ধারণার মূলে কতদূর সত্য আছে, তাহা যাঁহারা পাট-পচা দুর্গন্ধের ঘ্রাণ লইবার অবসর পাইয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। রেল লাইনের কর্তৃপক্ষ অর্থনীতি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এই দুর্গন্ধ পল্লী-বাসীদের একচেটিয়া করিয়া দিয়াছেন। পাট-চাষ ম্যালেরিয়ার মূল কারণ নয়; কিন্তু অন্যান্য কারণের মধ্যে একটী কারণ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অবশ্য যাঁহারা পচা দুর্গন্ধ স্বাস্থ্যের অনিষ্ট-কারক নয় বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অন্য কথা। চাষীদেরা শক্তি সঞ্চয় করিয়া ক্রেতাকে গরজে আনা কতদূর সম্ভবপর, তাহা ভুক্তভোগী চাষী না হইলে বুঝিতে পারা যায় না। ফল কথা যেদিন নিজের ঘরের কর্ত্তা নিজে হইতে পারিব, আমদানি রপ্তানি নিজেদের গরজ বুঝিয়া করিবার ক্ষমতা থাকিবে, সেই দিন এই বাংলার একচেটিয়া পাট বাংলাকে সকল দিক হইতে সমৃদ্ধিশালী করিতে সমর্থ হইবে; নতুবা কোন যুক্তিই চলিবে না। বর্ত্তমানে বাংলার চাষীরা পাটের চাষকে প্রশ্রয় দিলে ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইবে। মধ্য হইতে বিদেশী বণিকদের অর্থশালী হইবার সুযোগ ও আমাদের উপর তাহাদের প্রভুত্ব কায়েমী বন্দোবস্ত করিবার অবসর দেওয়া হইবে।

নবদ্বীপ—মায়াপুর

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট স্বর্গীয় কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ জমিদার শ্রীনফর দাস পাল চৌধুরীর সাহায্যে, কলিকাতায় রীতিমত কমিটী করিয়া আগড়-তলার মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের বহু-বহু ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিম পারে মিঞাপুর নামে পরিচিত স্থানটীকে মায়াপুর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সেই সময়েই ইহার বিরুদ্ধে বিশদরূপ প্রতিবাদ হইয়াছিল। নবদ্বীপনিবাসী, হুগলীর মোক্তার স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী মহাশয় নবদ্বীপ-তত্ত্ব নামক একখানি গ্রন্থ প্রচারিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় পূর্ণিমা কাগজে স্বর্গীয় কেদারবাবুর কার্য্যের প্রতিবাদ করেন। তাহার অনেক দিন পরে শ্রীব্রজমোহন দাস নবদ্বীপ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া কেদার বাবুর ভুল দেখাইয়া দেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ একটী কমিটী করিয়া কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী বা শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের মতই সমর্থন করেন।

প্রাচীন মায়াপুরের স্থান নির্ণয় লইয়া এই প্রকার মতদ্বৈধ চলিতেছে। ইহার মীমাংসা হয় নাই এবং হইতেও পারে না। কারণ ব্যাপারটী কেবল ভৌগোলিক নহে, ইহার সহিত ধর্ম্ম-ব্যাপারের স্বার্থ—Church interest রহিয়াছে। কেদারবাবু যে কেবল শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত জন্মস্থান আবিষ্কার করিয়াই নিবৃত্ত ছিলেন, তাহা নহে। সেখানে মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রণামী গ্রহণ, দীক্ষা দান প্রভৃতি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে দেশের লোক মোহান্তগিরির বিরুদ্ধে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। কালে দেবলীলার স্মৃতির দ্বারা পরিবৃত স্থানের আয় হইতে ভোগ-বিলাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়া একজন লোক বা একদল লোক অমিত ও অন্যান্য সুবিধা ভোগ করে, বাঙ্গালার হিন্দু যুবকগণ ইহা আর সহ্য করিতে অনিচ্ছুক। এই গেল বর্ত্তমান সময়ের নব্য-বঙ্গের মানসিক অবস্থা (Mentality)। এ সময়ে এই মোহান্তগিরির উদ্ভব কি প্রকারে হয়, তাহার সবিশেষ আলোচনা আবশ্যক। এমন কিছু করা আমাদের মোটেই উচিত নহে, যাহাতে উদীয়মান মোহান্তগিরি সাহায্য পাইতে পারে। ছাপা কাগজ-পত্র পড়িয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন, স্বর্গীয় কেদার বাবুর পর মায়াপুরের বা মিঞাপুরের মঠ কি ভাবে চালিত হইতেছে। তাঁহারা প্রথমতঃ দাবী করেন, স্বর্গীয় কেদারবাবু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-

সম্প্রদায়ের সপ্তম গোস্বামী, এবং জীবিতকালে তিনি এই সম্প্রদায়ের একমাত্র গুরু ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তৎকর্তৃক দীক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ গুরুগিরি করিবার অধিকারী নহেন। সম্প্রদায়-বিশেষের একচেটিয়া মালিক হওয়ার রীতি পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজে ছিল না। রোমের পোপ দাবী করিতেন এবং এখনও করেন,—স্বর্গের চাবী কেবল তাঁহার নিকটেই আছে। খৃষ্টান ধর্ম্ম Credal ধর্ম্ম—অর্থাৎ একটী বিশিষ্ট মতবাদ এবং একজন মাত্র পরিত্রাতার উপাসনা। কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্ম তাহা নহে। হিন্দু-ধর্ম্ম অধিকার ও রুচিভেদে প্রবর্ত্তিত বহু প্রকারের মতবাদের সমষ্টি। এবং অসংখ্য অবতার ও পরিত্রাতার সমবায়। কাজেই নবদ্বীপের পরপারে মিঞাপুর-মায়াপুর হইতে এই একচেটিয়া ধর্ম্মের অভ্যুদয় হিন্দু-সমাজের বুকে একটা অভিনব অভিনয়।

মিঞাপুর-মায়াপুরের মত সম্বন্ধে আর একটী দরকারী কথা আছে। তাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মণ বংশে যাঁহারা জন্মিয়াছেন, সে ব্রাহ্মণ প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহেন, তাঁহারা শৌক্র ব্রাহ্মণ। যাঁহারা মিঞাপুর-মায়াপুরের মতে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা দৈক্ষ ব্রাহ্মণ বা প্রকৃত ব্রাহ্মণ; যে কোনো বর্ণের লোক এই দীক্ষা লইতে পারেন। ধর্ম্ম বা সমাজ-বিষয়ক কোনো মত লইয়া "ভারতবর্ষের" ন্যায় সার্ব্বজনীন সাহিত্যের কাগজে বাদানুবাদ করা উচিত নহে—ইহা আমরা খুব ভাল রূপেই জানি। এবং এই প্রকারের সংশয়-সংকুল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত মঠ, মন্দির এবং নানা প্রকারের উৎকট ও উদ্ভট মতবাদ পূর্ণ ধর্ম্মান্দোলন সম্বন্ধে কোনো সম্মানিত সংবাদ পত্রে বা সাময়িক পত্রে আলোচনা হওয়াও অবৈধ। কারণ এই আলোচনার দ্বারায় উদীয়মান মোহান্তগিরির পোষকতা করা হইতে পারে। কাজেই মায়াপুর সম্বন্ধে এক দিক যখন ভারতবর্ষে বাহির হইয়াছে, তখন ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিবার জন্য আমরা আর এক দিক পাঠাইয়া দিলাম।

জ্ঞান ও রস

শ্রীপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় গত কার্ত্তিক মাসের "ভারতবর্ষে" 'রস-তত্ত্ব' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা অতি উপাদেয় এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তিনি ভগবদ্ভক্ত, সুতরাং প্রবন্ধটী যে অতি মধুর এবং প্রাণস্পর্শী হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তাঁহার নিপুণ লেখনীর গুণে বর্ণনার সৌন্দর্য্য আরো পরিস্ফুট হইয়াছে। রসের মহিমা ভাষা সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত করিতে অসমর্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত প্রেমিকের হস্তে ভাষা, ভাবের অনেকটা অনুবর্ত্তন করে, এবং রসের মূল প্রস্রবণের নিকট পঁহুছাইয়া দিতে না পারিলেও, তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারে। এক্ষেত্রে লেখকের প্রগাঢ় প্রেম-রসের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য পাঠক-পাঠিকাবর্গের মর্ম্মে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তাহাদিগের নীরস হৃদয়কে সরস করিয়া দিয়াছে। এরূপ প্রাঞ্জল এবং সুললিত ভাষায় অতি অল্প লেখকই ইতিপূর্ব্বে এই বিষয়ের আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আমরা মূল বিষয় সম্বন্ধে তাহার উক্তিগুলির অধিকাংশ স্থলেই প্রতিবাদ করিতে চাহি না। কিন্তু প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া কেহ-কেহ ভ্রমে পতিত হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় কয়েকটী কথা লেখা সঙ্গত বিবেচনা করি। তাঁহার লেখার ভঙ্গীতে কেহ-কেহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন যে, জ্ঞান ভক্তি হইতে নিকৃষ্ট; কারণ, তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন যে, "জ্ঞান যেখানে ব্যাহত, রস সেখানে সমর্থ"। কিন্তু ইহা কি ঠিক? তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—"রস অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, চিন্ময়"—"ইহা চৈতন্যের রশ্মিপাতে স্বপ্রকাশ।" তিনি পুনশ্চ লিখিয়াছেন,—"জ্ঞানের প্রবাহ হইতে সেটী (রস-প্রবাহ) স্বতন্ত্র, অথচ দুইটী এমন পাশাপাশি ভাবে চলিয়াছে যে, একটী অপরটীকে যেন ছায়ার মত অনুবর্ত্তন করিতেছে।" যদি একটী অপরটীকে ছায়ার ন্যায় অনুবর্ত্তন করে, তাহা হইলে একটী অপরটী হইতে নিকৃষ্ট হইতে পারে না। তাঁহার কথানুসারেই দুইটী "সমান্তরাল রেখার ন্যায় মনের রাজ্যে বহে।"

ভগবানের নাম সচ্চিদানন্দ। 'সৎ', 'চিৎ', 'আনন্দ' এই তিনটীই তাঁহার স্বরূপ; কোনটীই তাঁহার উপাধি বা গুণ নহে। চিৎ ই জ্ঞান, রস-ই আনন্দ। এই জন্যই তৈত্তিরীয়োপনিষদে "রসো বৈ সঃ" বলা হইয়াছে। লেখকও এই জন্য বলিয়াছেন—"জগতের অতীত স্থানে ইহার (রস-ধারার) জন্ম।" চিৎ এবং রস বা আনন্দ, উভয়ই ভগবানের স্বরূপ হইলে, একটী অপরটী হইতে নিকৃষ্ট হইবে কিরূপে? যেখানে রস, সেখানে চিৎ; যেখানে চিৎ, সেখানে রস।

"বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ)। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐতরেয় উপনিষৎ)। এই বিজ্ঞান এবং প্রজ্ঞানই চিৎ। চিত্তের ধর্ম্ম যে জ্ঞান বা knowledge, তাহা চিৎ নহে। এই জ্ঞান চিৎ দ্বারা উদ্ভাসিত হয় বটে, কিন্তু চিৎ তাহা হইতে স্বতন্ত্র। চিৎ তাহার দ্রষ্টা। চিৎ স্বপ্রকাশ।

"তমেব ভান্তং অনুভবতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" কঠ ৫ বল্লী, ১৫।

"ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত।" গীতা ১৩অ, ৩৩।
লেখক এই জ্ঞান সম্বন্ধেই বলিয়াছেন,—"যেখানে জ্ঞান ব্যাহত, রস সেখানে সমর্থ।" লেখক যে রসের প্রকৃত মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কিসের সাহায্যে? এই বিজ্ঞানের সাহায্যে নয় কি?

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" ২য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ৭।

'অখণ্ড' বস্তুর অখণ্ড বিজ্ঞানের দ্বারাই হইতে পারে। রস যে

'অখণ্ড' এবং 'স্বপ্রকাশ' তাহা খণ্ড জ্ঞান দ্বারা বুঝা যায় না। লেখক লিখিয়াছেন—"রসাস্বাদন দ্বারা আমাদের যে অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি হয়, তাহা সে-ই জানে যাহার অনুভূতি হয়"—ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অনুভূতির সহিত জ্ঞানের যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহা 'সে ই জানে' এই উক্তি দ্বারা নিজেই দেখাইয়াছেন।

প্রবন্ধের এক স্থলে দার্শনিকদিগের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে, কিন্তু যে সকল দার্শনিকের সেখানে উল্লেখ আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই আত্ম-জ্ঞান-বিরহিত। যাঁহারা আত্মজ্ঞানী তাঁহারা পরম ভক্ত না হইয়াই পারেন না।

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং, স চ মম প্রিয়ঃ॥"
গীতা ৭অ, ১৭।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥
গীতা, ১৮অ, ৫৪, ৫৫।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন!।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ গীতা ১১অ, ৫৪।

যে আত্মজ্ঞানী দার্শনিক ভগবানের রস আস্বাদন করেন নাই, যিনি প্রেমিক ভক্ত নহেন, তিনি হতভাগ্য। জ্ঞানের সহিত ভক্তির যে কোন বিরোধ নাই, এবং জ্ঞানীই ভক্ত, এবং ভক্তই জ্ঞানী, তাহা গীতা পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন। দর্শনের মূল যে উপনিষদ গ্রন্থসমূহ, তাহাতেই রসের এবং শাশ্বত সুখ বা আনন্দের ভূরি-ভূরি উল্লেখ রহিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ভক্তির যেরূপ অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা রহিয়াছে, অন্য কোন গ্রন্থে তাহা নাই। ভগবৎ-প্রেমিকের নিকট এই গ্রন্থখানি অমূল্য, এবং অতি আদরের সামগ্রী। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়েই সাংখ্য এবং বেদান্তদর্শনের তত্ত্বগুলি পুনঃপুনঃ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অথচ এই গ্রন্থকারই রাসলীলার বর্ণন করিয়াছেন। রসের চরম তত্ত্ব এই রাসলীলায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। দার্শনিকের অমৃতময় লেখনীতে রসের লোকোত্তর চমৎকারিত্ব যেরূপ ফুটিয়াছে, জগতে তাহার তুলনা নাই। প্রবন্ধকার স্বয়ং দার্শনিক পণ্ডিত, ইহাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিত হইয়াছে—"জ্ঞানী দেখেন ব্রহ্ম অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অচক্ষু, অশ্রোত্র—আবছায়া মাত্র।" এ কথা কি সত্য? ইতিপূর্ব্বে যিনি "অরূপের রূপ" ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের প্রীতি-বর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁহার মনের এটী প্রকৃত কথা হইতে পারে না। পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির প্রতি এই 'জ্ঞানী' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। ভগবানের নিকট বাক্য এবং মন পঁহুছিতে পারে না সত্য, কিন্তু ভগবান কি আবছায়া বা কল্পনা মাত্র? পাশ্চাত্য দার্শনিক যেখানে 'আবছায়া দেখেন, তাহা 'নেতি-নেতির' রাজ্য হইলেও চক্ষুষ্মান্ মহর্ষিদিগের নিকট পূর্ণ আলোক।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥"—শ্বেতাশ্বতর ৩ অ, ৮।

"যদাতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি
র্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥"—শ্বেতাশ্বতর ৪ অ, ১৮।

লেখক নিজেই কঠোপনিষৎ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন (৫।১৫)

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

পাশ্চাত্য দার্শনিক খণ্ডজ্ঞানের বাহিরে যাইতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার নিকট অতীন্দ্রিয় বস্তু অজ্ঞেয়। কিন্তু ভারতবর্ষের পূজ্যপাদ মহর্ষিদিগের নিকট তাহা জ্ঞানগম্য, এবং তাঁহারা জানেন যে বিজ্ঞানের সত্তাই এই নেতি রাজ্যে।

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ কঠ ৬ বল্লী, ৯।

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥
কঠ ৩ বল্লী, ১২।

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥"
৩য় মুণ্ডক, ১ম খণ্ড, ৮।

"তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্।" শ্বেতাশ্বতর ৩অ, ২০।

'অখণ্ড' ব্যতীত 'খণ্ড' জ্ঞান অসম্ভব। 'নির্ব্বিশেষ' না থাকিলে 'বিশিষ্টতা' অর্থহীন। 'অরূপ-ই' রূপের আশ্রয়। ব্রহ্মই সকল জ্ঞানের মূল। জ্ঞানই ব্রহ্ম।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২ বল্লী ১ অনুবাক।

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

অতি-জাগতিক প্রদেশ হইতে যে প্রজ্ঞা প্রসৃতা, তাহার সাহায্য ব্যতীত ঐ জগতের সংবাদ কে পাইবে?

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ।"

৩য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড, ৩।

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।"

'নেতির' রাজ্যেই সত্যের অধিষ্ঠান। ব্রহ্মই সৎ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"

চরাচর ভূতসকল যাহাতে অবস্থিতি করিতেছে, তিনি যে 'সত্য' বা 'সৎ', তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তিনি 'অব্যক্তমূর্ত্তি' বলিয়া কি আকাশকুসুম?

এই স্থানেই অমৃত। যেখানে 'সৎ', সেখানে মৃত্যুর অবস্থিতি কি সম্ভব?

"য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি"
যদেবেহ তদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।।"

কঠ ৪ বল্লী, ১০।

যিনি ব্রহ্মকে নানারূপে দেখেন, তিনি পুনঃপুনঃ মৃত্যুর অধীন হন। গীতাও বলিয়াছেন—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।।" ৬অ, ৩০।

ইহাকে লাভ করিলেই সাধকের অভয় প্রাপ্তি হয়। 'অমৃত' লাভ না করিলে মৃত্যুভয় অনিবার্য্য।

"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যে, নাত্মেহ, নিরুক্তে, নিলয়নেহ ভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোহভয়ং গতো ভবতি।"

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২ বল্লী ৭ অনুবাক্।

যখন এই অদৃশ্য, অশরীর, নির্বিশেষ এবং অনাধার ব্রহ্মে সাধক নির্ভয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন।

এই যে "নঞতৎপুরুষাত্মক পদের" দ্বারা ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এগুলি সত্যই কি "হতাশের আক্ষেপ"? উপনিষদ্ বাক্যগুলি যে অভয় বাণী শুনাইতেছেন, তাহা কি উন্মত্ত প্রলাপ?

যেখানে অমৃত, সেইখানেই আনন্দ।

"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"
"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি।"

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

লেখক লিখিয়াছেন—"অনন্ত শব্দটী মনের ব্যর্থতার নিদর্শন।" এস্থলে মন অর্থে চিত্ত। তিনি জানেন অনন্তই ব্রহ্ম। তিনি পুনশ্চ বলিয়াছেন "রসের অভিধানে 'অনন্ত' শব্দ নাই।" অথচ তিনি রসকে অখণ্ড, অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয়, লোকোত্তর, চমৎকার প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া জগতের অতীত রাজ্যেরই সংবাদ দিয়াছেন। তিনি ইহাও জানেন, "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং" ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৭অ, ২৩ খণ্ড। "যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং" ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৭অ, ২৪ খণ্ড।

পতঙ্গের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়া লেখক প্রেমের আকর্ষণ বুঝাইয়াছেন। পতঙ্গ অগ্নি-শিখায় আত্ম-সমর্পণ করিয়া যে প্রেমযজ্ঞে আহুতি প্রদান করে, সেই প্রেমে স্বার্থের লেশমাত্র নাই। এই প্রেম আত্মহারা প্রেম। আত্ম-বিসর্জ্জনে এই প্রেম-লীলার অবসান। ধর্ম্মের অভিধানে ইহাই ব্রহ্মনির্ব্বাণ খণ্ডের অখণ্ডে, বিশিষ্টের নির্ব্বিশেষে, লয়। খণ্ড অখণ্ডকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া বুঝিতে পারিলে, অখণ্ডের তীব্র আকর্ষণে তাহার প্রতি ধাবিত হয়, এবং পরিশেষে আত্মবলিদান করে। ইহাই রসের চরম পরিণতি। ইহাই রাসলীলা।

"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্"

আত্মজ্ঞান ব্যতীত অপর কাহারো একপ অনন্য-ভক্তি সম্ভবে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উক্ত প্রবন্ধের প্রতিকূল সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; লেখকের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝাইয়া দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। তিনি দীর্ঘজীবী হউন, এবং মধ্যে মধ্যে ভগবদ্প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাদের ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করুন।

ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিগত আষাঢ় মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় লিখিত 'সঙ্গীতের সংস্কার' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহারই একটি প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষে ছাপিবার জন্য পাঠান। কিন্তু লেখক কি কারণে জানেননা তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত প্রতিবাদ-প্রবন্ধ ফেরৎ আসায় "বাধ্য হয়ে গরম গরম প্রবন্ধটি একেবারে জুড়িয়ে যাবার আগে তাকে বঙ্গবাণীর উদার অঙ্কে ন্যস্ত" করেছেন। প্রবন্ধটি 'বঙ্গবাণীর' মাঘের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীযুক্ত প্রমথবাবু তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন "—আমি সেই প্রত্নতত্ত্ববিৎকে বেশী তারিফ করি যে একখানি তাম্রশাসন খুঁড়ে বের করেছে ও পড়েচে—কিন্তু সে কবিকেও তারিফ করিনা যে নতুনের গান না গেয়ে কেবল 'নতুন কিছু করো'র গান গেয়েছে।" প্রবন্ধটি

কেন যে ফেরৎ আসিয়াছে তাহা বুঝা কঠিন নয়। খুব সম্ভব, ভারতবর্ষের বুড়া সম্পাদক দিলীপকুমারের প্রবন্ধের প্রতিবাদে তাঁহার স্বর্গগত বন্ধুর প্রতি এই অহেতুক কটাক্ষ হজম করিতে পারেন নাই। এবং সেই কবি কোন নূতন গান না গেয়ে "শুধু কেবল 'নতুন কিছু করোর' গানই গেয়েছেন"—প্রমথবাবুর এই উক্তিটিকে অসত্য জ্ঞান করে এই উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধটিকে ত্যাগ করে থাকেন ত তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

সে যাই হোক. না ছাপিবার কি কারণ তা তিনিই জানেন. কিন্তু দিলীপকুমারের বিরুদ্ধে অধিকাংশ বিষয়েই প্রমথ বাবুর সহিত আমি যে একমত তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। এমন কি ষোল আনা বলিলেও অত্যুক্তি হইবেনা। প্রমথবাবু হিন্দুস্থানী সঙ্গীত নিয়ে চুল পাকিয়েছেন, তথাপি দিলীপের বক্তব্যের অর্থগ্রহ করা শক্তিতে তাঁর কুলায় নাই। প্রমথবাবু বলিতেছেন তিনি কথার কারবারী নহেন, সুতরাং 'বিনাইয়া নানা ছাঁদে' কথা বলিতে পারিবেননা—তবে মোদ্দা কথায় গালিগালাজ যা করিবেন তাহাতে ঝাপ্‌সা কিছুই থাকিবেনা।

প্রমথবাবুর চুল পাকিয়াছে, আমার আবার তাহা পাকিয়া ঝরিয়া গেছে। দিলীপ বলিতেছেন "আমাদের সঙ্গীতে 'একটা নূতন কিছু' করবার সময় এসেছে, তা আমাদের সঙ্গীত যতই বড় হোক—কেননা প্রাণধর্ম্মের চিহ্নই গতিশীলতা।" কিন্তু বলিলে কি হইবে? দিলীপের একগাছিও চুল পাকে নাই; অতএব, এ সকল কথা আমরা গ্রাহ্যই করিনা।

দিলীপ বলিতেছেন, "যে আসলটুকু আমরা উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছি,—তাকে হয় সুদে বাড়াও, না হয় আসলটুকু খোয়া যাবে, এই হচ্ছে জ্ঞানরাজ্যের ও ভাবরাজ্যের চিরন্তন রহস্য।"

প্রমথবাবু বলিতেছেন, "এ সাধারণ সত্য আমরা সকলেই জানি।" জানিই ত!

পুনশ্চ বলিতেছেন, "কিন্তু সৃজন কাজটা এত সোজা নয় যে যে-কেউ ইচ্ছা করলেই পারবে। এ পৃথিবী এত উর্ব্বর হলে * * * * হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারায় যদি ৫০।৬০ বৎসর কোন নূতন সৃষ্টি না হয়ে থাকে তা'হলে সেটা এতবড় দীর্ঘকাল নয় যে আমাদের অধীর হয়ে উঠ্‌তে হবে।"

আমারও ইহাই অভিমত। আমাদের চুল পাকিয়াছে, দিলীপের পাকে নাই। আমরা উভয়ে সমস্বরে বলিতেছি অধীর হইয়া ছট্‌ফট্‌ করা অন্যায়। পৃথিবী অত উর্ব্বর নয়। ৫০।৬০ বছরের বেশি হয় নাই, যে ইহার মধ্যেই ছট্‌ফট্‌ করিবে! আর যতই কেন করনা, কিছুই হইবেনা সে স্পষ্টই বলিয়া দিতেছি,—ইহাতে ঝাপ্‌সা কিছুই নাই।

কিন্তু ইহার পরেই যে প্রমথবাবু বলিতেছেন, "যখন কোন স্রষ্টা সৃষ্টির প্রতিভা নিয়ে আসবে, তখন সে সৃষ্টি করবেই, শৃঙ্খল ভাঙবেই, অচলায়তন ভূমিসাৎ করবেই—তাকে কেউ ঠেকিয়ে কেউ দাবিয়ে রাখ্‌তে পারবেনা..."

কিন্তু প্রমথবাবুর এ উক্তি আমি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিনা। কারণ, সংসারে কয়টা লোকে আমার নাম জানিয়াছে? কয়টা লোকে আমাকে স্বীকার করিতেছে? ও পাড়ার মনু দত্ত যে মনু দত্ত, সে পর্য্যন্ত আমাকে দাবাইয়া রাখিয়াছে! পৃথিবীতে অবিচার বলিয়া কথাটা তবে আছে কেন? যাক্, এ আমার ব্যক্তিগত কথা। নিজের সুখ্যাতি নিজের মুখে করিতে আমি বড়ই লজ্জা বোধ করি।

কিন্তু ইহার পরেই প্রমথবাবু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় উচ্চসঙ্গীত সম্বন্ধে যে সত্য ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার সাধ্য কাহারও নাই। প্রমথবাবু বলিতেছেন, "ভারতের উচ্চ-সঙ্গীত ভাবসঙ্গত। কেবল সা রে গা মা পর্দা টিপে শ্রুতি-সুখকর শব্দ-পরম্পরা উৎপন্ন করলেই সে সঙ্গীত হয়না। এক কথায় রাগ রাগিণীর ঠাট বা কাঠাম ভাবগত, পর্দ্দাগত নয়।"

আমিও ইহাই বলি, এবং আমাদের নাগ মহাশয়েরও ঠিক তাহাই অভিমত। তিনি পঞ্চাশোর্দ্ধে লড়াইয়ের বাজারে অর্থশালী হইয়া একটা হারমোনিয়ম কিনিয়া আনিয়া নিরন্তর এই সত্যই প্রতিপন্ন করিতেছেন। তিনি স্পষ্টই বলেন, সা রে গা মা আর কিছুই নয়, সা'র পরে জোরে চেঁচাইলেই রে হয়, এবং আরও একটু চেঁচাইলে গা হয়, এবং আরও জোর করিয়া একটুখানি চেঁচাইলেই গলায় মা সুর বাহির হয়। খুব সম্ভব, তাঁহারও মতে উচ্চ-সঙ্গীত ভাবগত, পর্দ্দাগত নয়। এবং ইহাই সপ্রমাণ করিতে হারমোনিয়মের চাবি টিপিয়া ধরিয়া নাগ মহাশয় ভাবগত হইয়া যখন উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের শব্দ-পরম্পরা সৃজন

করিতে থাকেন সে এক দেখিবার শুনিবার বস্তু। শ্রীযুক্ত প্রমথবাবুর সঙ্গীত-তত্ত্বের সহিত তাঁহার যে এতাদৃশ মিল ছিল আমিও এতদিন তাহা জানিতামনা। তখন যারদেশে যে প্রকারের ভিড় জমিয়া যায় তাহাতে প্রমথবাবুর উল্লিখিত ওস্তাদজীর রেয়াজের গল্পটির সহিত এমন বর্ণে বর্ণে যে সাদৃশ্য আছে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

প্রমথবাবু বলিতেছেন, "যে চালের ধ্রুপদ লুপ্তপ্রায় হয়েছে, এবং যা লুপ্ত হয়ে গেলেও দিলীপকুমারের মতে আক্ষেপ করবার কিছুই নেই, আমার মতে সেই হচ্চে খাঁটি উঁচুদরের ধ্রুপদ। এ ধ্রুপদের নাম খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ।"

ঠিক তাহাই। আমারও মতে ইহাই খাঁটি উঁচুদরের ধ্রুপদ। এবং, মনে হইতেছে নাগ মহাশয় সম্প্রতি এই খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদের চর্চ্চাতেই নিযুক্ত আছেন। তাঁহার জয় হোক।

বৈশাখের ভারতীতে দিলীপকুমার কোন ওস্তাদজীকে মল্লযোদ্ধা এবং কোন ওস্তাদজীর গলায় বেসুরা আওয়াজ বাহির হইবার কথা লিখিয়াছেন, আমি পড়ি নাই, কিন্তু অনেকের সম্বন্ধেই যে এই দুটি অভিযোগই সত্য তাহা আমিও আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সত্য বলিয়া জানি। প্রমথবাবু বাঙলা দেশের প্রতি প্রসন্ন নহেন। চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে মশায়ের মুখের গান তাঁহার ভাল লাগেনা, কিন্তু বেশিদিনের কথা নয়, এই দেশেরই একজন চক্রবর্ত্তী মশাই ছিলেন, প্রমথবাবুর বোধ করি তাঁহাকে মনে নাই।

প্রমথবাবু লিখিতেছেন, "যে জন্য আলাপের পর ধ্রুপদ, ধ্রুপদের পর খেয়াল এবং খেয়ালের পর টপ্পা ঠুংরির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই জন্যই ওই সবের পর বাংলাদেশে কীর্ত্তন, বাউল ও সারি গানের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই শেষোক্ত তিন রীতির সঙ্গীত আমার খাঁটি বাংলার জিনিস হলেও উচ্চ সঙ্গীতের তরফ থেকে আমি তাদের বিকাশকে অভিনন্দন করতে পারিনা। কেন?"

কেন? কেননা আমরা বল্‌চি যে "তারা অতীতের সঙ্গে যোগভ্রষ্ট!"

কেন? কেননা আমরা বল্‌চি "তারা অনেকটা ভুঁই-ফোঁড়ের মত নিজের বিচ্ছিন্ন অহঙ্কারে ঠেলে উঠেছে।" এমন কি একজনের পাকা চুল এবং আর একজনের ন্যাড়া মাথার অহঙ্কারের উপরেও।

কেন? কেন না, "আজকাল এইটেই বড় মজা দেখ্‌তে পাই যে, অতীতকে তুচ্ছ করে কেবল প্রতিভার জোরে ভবিষ্যৎ গড়তে আমরা সকলেই ব্যগ্র!"

শুধু প্রতিভার জোরে ভবিষ্যৎ গড়বে? সাধ্য কি! আমরা পাকা চুল এবং ন্যাড়া মাথা বল্‌চি সে হবে না! বাধা আমরা দেবই দেব!

"আজকাল প্রতীচ্যের অনেক বিজাতীয় সঙ্গীতের স্রোত এম্‌নি ভাবে আমাদের মনের মধ্যে ঢুকে পড়েচে যে আমরা যখনই আমাদের প্রাচ্য সঙ্গীতের চাল বা প্রকাশ-ভঙ্গীকে এতটুকু বিচিত্র করতে যাই তখনই তা একটা জগাখিচুড়ি হয়ে ওঠে।"

কেন? কেননা আমরা বলচি, তা জগাখিচুড়ি হয়ে ওঠে!

কেন? কেননা আমরা বল্‌চি,—একশবার বল্‌চি, ও-দুটো তেল জলের মত পরস্পর বিরোধী!

আমরা পাকাচুল এবং ন্যাড়ামাথা একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে বল্‌চি ও-দুটো অগুরু চন্দনের সঙ্গে ল্যাভেণ্ডার ওডি-কোলনের মত পরস্পর বিরোধী! উঃ! অগুরু চন্দন ও ল্যাভেণ্ডার ওডিকোলন! এত বড় যুক্তির পরে দিলীপ-কুমারের আর যে কি বক্তব্য থাকিতে পারে আমরা ত ভাবিয়া পাইনা।

অতঃপর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নালিশ করিতেছেন, "খাড়া পর্দ্দা হতে খাড়া পর্দ্দার উপরে সেইভাবে লাফিয়ে পড়া যে ভাবে কোন বীরপুঙ্গব স্বর্ণলঙ্কার এক ছাদ হতে আর এক ছাদে লাফিয়ে পড়েছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।"

ইহা অতিশয় ভয়ের কথা! এবং প্রমথবাবুর সহিত আমি একযোগে ঘোরতর আপত্তি করি। যেহেতু ছাদের উপরে নৃত্য সুরু করিলে আমরা যাহারা নীচে সুনিদ্রায় মগ্ন তাহাদের অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে। তদ্ভিন্ন অন্য আশঙ্কাও কম নয়। কারণ আমার যদিচ ন্যাড়ামাথা, কিন্তু স্বর্ণ-লঙ্কার প্রতি যিনি বিরূপ তিনি যদি বাঁড়ুয্যে মশায়ের পাকা চুলকে গায়ের শাদা লোম ভাবিয়া ছাদে ছাদে লম্ফ দিতে বাধ্য করেন ত বিপদের অবধি থাকিবেনা।

প্রমথবাবু কহিতেছেন, "ধ্রুপদ ও খেয়াল দুইই ভারত-সঙ্গীতের দুটি বিচিত্র ও মৌলিক বিকাশ, কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে ধ্রুপদই যে অধিক সৌন্দর্য্যশালী তা নিরপেক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করবেন।"

স্বীকার করিতে বাধ্য! স্বীকার না করিলে তিনি হয় নিরপেক্ষ নহেন, না হয় সঙ্গীতজ্ঞ নহেন। হেতু? হেতু এই যে, একজন পাকাচুল এবং একজন ন্যাড়ামাথা উভয়ে সমস্বরে বলিতেছি! জোর করিয়া বলিতেছি! ইহার পরেও যে সংসারে কি যুক্তি থাকিতে পারে আমরা ত ভাবিয়া পাইনা! আমরা পুনশ্চ বলিতেছি যে "ধ্রুপদ হচ্চে সব রীতির গানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গরিষ্ঠ ও পূজ্যতম!" দুনিয়ায় এমন অর্ব্বাচীন কে আছে যে এতবড় অখণ্ড যুক্তির সম্মুখেও লজ্জায় অধোবদন না হয়! তবু ত শক্তি-শেল হানিলাম না। বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের 'মুখপাতের' যুক্তিটা চাপিয়া গেলাম!

আমাদের ওস্তাদদের সম্বন্ধে দিলীপকুমার বলিয়াছেন যে আমরা ছাত্রদের পক্ষে মাছি-মারা নকলের পক্ষপাতী, অর্থাৎ ছাত্রদের আমরা গ্রামোফোন করিয়াই রাখিতে চাই, দিলীপকুমারের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

প্রমথবাবু ত স্পষ্টই বলিতেছেন "আমি ত কোনদিনই আমার ছাত্রদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করিনি—কেন না স্বাধীন স্ফূর্ত্তির অবসর না দিলে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। ইত্যাদি।"

আমার নিজের ছাত্রদের সম্বন্ধেও আমার ঠিক ইহাই অভিমত। এবং শিক্ষাদানের যথার্থ উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায় তাহা আমরা কেহই চাহিনা। (অবশ্য কিঞ্চিৎ অবান্তর হইলেও এ কথা বোধ করি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমার নিজের ছাত্র নাই। কারণ, যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন ছাত্রই আমার কাছে শিখিতে চাহেনা। লোকের মুখে-মুখে শুনিতে পাই এমন দুর্ব্বিনীত ছাত্রও আছে যে বলে, যে ওঁর কাছে শেখার চেয়ে বরঞ্চ প্রমথবাবুর কাছে গিয়া শিখিব।)

সে যাই হোক, কিন্তু ছাত্রদের সম্বন্ধে আমরা উভয়েই দিলীপকুমারের অভিযোগের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ করি। এইরূপ হীন পন্থা আমরা কেহই অবলম্বন করিনা। উনিও না, আমিও না।

আরও একটা কথা। আমাদের ওস্তাদদের মুদ্রাদোষ সম্বন্ধে দিলীপকুমার যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অসার এবং অসঙ্গত। প্রমথবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, "মানুষ যখন কোন একটা ভাবের আবেশে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন তখন আর জ্ঞান থাকেনা।" সত্যই তাই। জ্ঞান থাকেনা। আমাদের নাগ মশায় যখন খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ চর্চ্চা করেন দিলীপকুমার আসিয়া তাহা স্বচক্ষে একবার দেখিয়া যান! বাস্তবিক, জ্ঞান থাকেনা!

কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, আর না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রত্যেক ছত্রটি তুলিয়া দিবার লোভ হয়, কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে বলিয়াই বিরত রহিলাম। তাঁহার পক্ষি-সমাজের 'এক ঘরে' হওয়ার বিবরণটিও যেমন জ্ঞান-গর্ভ, তেমনি বিস্ময়কর। শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। পরিশেষে প্রবন্ধ সমাপ্তও করিয়াছেন তেমনি সারবান কথা বলিয়া—"আসল কথা, সকল বিষয়েই অধিকারী ভেদ আছে।" অর্থাৎ, গান গাহিতে জানিলেই যে প্রবন্ধ লিখিতে হইবে, এবং এক কাগজে না ছাপিলে আর এক কাগজে ছাপিতেই হইবে, তাহা নয়;—অধিকারী ভেদ আছে।

পারের ডাক

শ্রীপরিতোষ চন্দ্র

ওরে, ডাক এসেছে ওপার হতে, যেতে হবে—হবেই যেতে,
মিছামিছি তবে কেন বাজে কাজে থাকিস্ মেতে?
থাক্ পড়ে তোর যা সব আছে, বিষয়-আসয় হাই হোক্,—
যেতেই হবে, শুনবে না কো, যেমন তেমন নয় সে লোক।

প্রিয়ার চুমা আলিঙ্গনে বাঁধতে তোরে পারবে না,
ছেলে মেয়ের কান্নায় সে যে টল্‌বে না রে টল্‌বে না;—
পিতার শাসন, মায়ের আশীস্ সহোদরের স্নেহের ডাক,—
মানবে না সে,—শুনবে না রে; বুকটা যে তার মস্ত ফাঁক।

জমিজমা, থামারবাড়ী, "আজমহলী" রাজ-প্রাসাদ,—
টাকার থলি, সুদের হিসাব, লাঙ্গল গরু, চাষ-আবাদ,—
থাকিস্ নে আর আঁকড়ে সে সব, ফেলে দিয়ে আয় চলে,—
যেতেই যখন হবে—তখন কাঁদিস্ রে তুই কি বলে?

বাগ্-বাগিচা, সহর বাড়ী, পাহাড় নদী সমুদ্দুর,—
পথের মাঝে আছে কত, ঠিকানা যে বহুৎদূর।
থাকতে বেলা আয় এই বেলা, সূর্য্য বসে ওই পাটে,
ওরে, খেয়ার মাঝি ডাক দিয়েছে পারা পারের এই ঘাটে।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্‌সি

মৃত্যুবাণ

যুদ্ধের সময় বিপক্ষদলের বিমান বোমা বা অন্য কোনও সংহার-যন্ত্র নিক্ষেপ ক'রবার জন্য শত্রু-শিবিরের উপর উড়ে এলে, তা'কে যাতে সহজে ধ্বংস করা যায়, Earnest Welsh নামে একজন ইংরাজ সৈনিক তা'র এক চমৎকার উপায় উদ্ভাবন ক'রেছেন। সম্প্রতি বহু পরীক্ষার পর তিনি একটি নূতন রকমের খ'ধূপ নির্ম্মাণ ক'রেছেন, যার নাম "মৃত্যুবাণ"(Death-rocket)। এই মারণাস্ত্র দিয়ে আড়াই ক্রোশ উর্দ্ধে উড্ডীয়মান বিমানকে অনায়াসে ভেঙে চুরমার ক'রে দেওয়া যেতে পারে, বা তা'র পক্ষ চূর্ণ ক'রে তা'কে আরোহী সমেত নীচে নামিয়ে আনা যেতে পারে।

মৃত্যুবাণ (উৎক্ষিপ্ত মৃত্যুবাণ একখানি বিমানের পক্ষ চূর্ণ ক'রে দিয়ে, আর একখানি বিমানকে ধ্বংস ক'রছে)

মৃত্যুবাণ (বৈজ্ঞানিক মৃত্যুবাণ উৎক্ষিপ্ত ক'রবার যোগাড় যন্ত্র ক'রছেন)
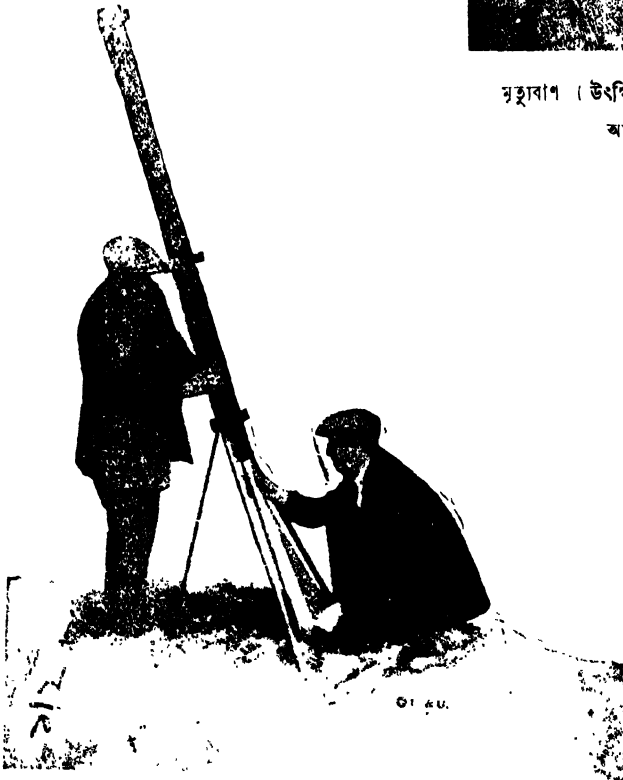
মৃত্যুবাণ (Earnest Welsh তাঁ: উদ্ভাবিত মৃত্যুবাণ হাতে ক'রে দাঁড়ি: আছেন)

নারী বনাম পুরুষ

ভবিষ্যতে নারী কি পুরুষ—কর্ম্মক্ষেত্রে কে জয়ী হবে, তা' একটি সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সকল কার্য্যক্ষেত্রে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পুরুষ মাত্রেই স্থান পে'ত, এখন রমণীরা কার্য্যক্ষম হয়ে ধীরে ধীরে সেই সকল কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'চ্ছেন। বিজ্ঞান, অর্থনীতি, দর্শন-শাস্ত্র ইত্যাদি অনেক দুরূহ শাস্ত্র ও সাহিত্যে নারী পারদর্শিনী হ'য়ে পুরুষের সমকক্ষ হ'চ্ছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রেও রমণী বিরল নয়। ব্যায়াম আগে পুরুষকেই বলশালী ক'রত, এখন রমণী-কেও দুর্জ্জয় শক্তিধারিণী ক'রে তুলছে।

রাজনীতিতে নারী (Miss Robertson এবং Miss Nolan দুজনে করমর্দ্দন করছেন। এঁরা দুজনেই U. S. A কংগ্রেসের সভ্যা)

বিজ্ঞানে নারী (কীটাণুতত্ত্ববিদ্ Miss Aime Potter দূরবীণের ভিতর দিয়ে কীটাণু দেখ্‌তে দেখ্‌তে একখানি কাগজে তাদের অবস্থার চিত্র অঙ্কিত ক'রছেন)

ছায়াচিত্রে নূতনত্ব

একজন লোকের অনেকগুলি ছায়াচিত্র একখানি প্লেট বা ফিল্‌মের উপর এক সঙ্গে তোলা কিছুদিন পূর্ব্বেও অসম্ভব বলে অনেক লোকের ধারণা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি একজন সখের ফটোগ্রাফার এক প্রকার নূতন যন্ত্র আবিষ্কার ক'রেছেন, যেটি একটি সাধারণ ক্যামেরার সঙ্গে সংলগ্ন ক'রে দিলে, তা'র সাহায্যে একটি প্লেটে বা একখানি মাত্র ফিল্‌মে, একজনের বহু চিত্র তুল্‌তে পারা যায়। যন্ত্রটি ক্যামেরার সঙ্গে এরূপ ভাবে সংলগ্ন থাকে যে, প্লেটের বা ফিল্‌মের অল্প একটু অংশ ফটো তোলবার জন্য

ছায়া চিত্রে নূতনত্ব (একখানি প্লেটে তোলা বহু চিত্র)

ছায়াচিত্রে নূতনত্ব (একটি সাধারণ ক্যামেরার উপর আঁটা নবোদ্ভাবিত কলটি)

ব্যবহৃত হ'তে পারে। পরে ফটো তোলা সমাপন হ'লে পর, সেই স্থানটি আপনই বন্ধ হয়ে যায়; এবং প্লেটের বা ফিল্মের অপর অংশ ফটো তোলবার জন্য উন্মুক্ত হয়। এইরূপে একই প্লেট বা ফিলমের উপর একজনের এক সঙ্গে বা পর পর বহু ছায়াচিত্র তোলা যেতে পারে।
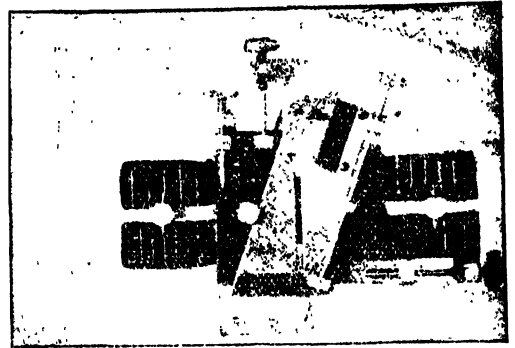
ছায়া চিত্রে নূতনত্ব (এই মাপে বৈজ্ঞানিকের নবোদ্ভাসিত কলটি চল্‌তে থাকে; আর চিত্র আপনাআপনি ফুটে উঠ্‌তে থাকে)

বিচিত্র বাহন

মানুষের নানা প্রকার খেয়াল থাকে, যা' পুরণ ক'রবার জন্য তা'দের বিশেষ অর্থব্যয় কর্‌তে হয়। W. B. Harkins নামে একজন মার্কিণ ধনী ব্যক্তি নানাপ্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত
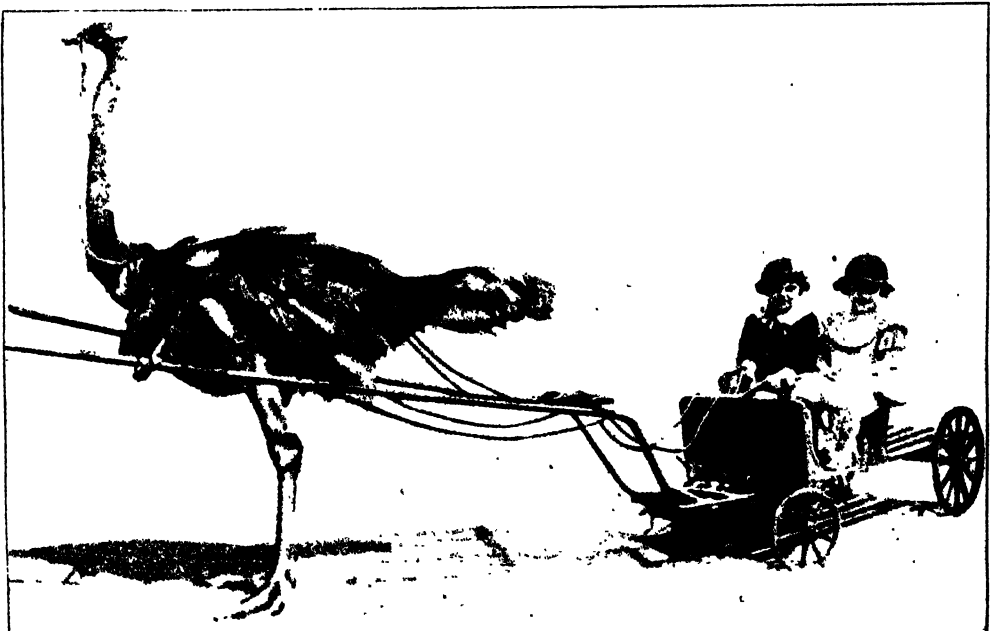
পশু ক্রয় ক'রে খেয়ালের খেসারৎ দিচ্ছেন। সম্প্রতি তিনি অনেকগুলি কুম্ভীর, বিলাতী শিকারী কুকুর, অষ্ট্রিচ পক্ষী, শুভ্র মহার্ঘ ছাগল, বৃহৎ উষ্ট্র, ক্রয় ক'রে প্রত্যহ তা'দের এক এক-জনকে গাড়ীর বাহন ক'রে বৈকালে বায়ু সেবন ক'রতে বাহির হ'ন। পরে তারা পোষমানা হ'লে তাদের শিশুদের গাড়ীর বাহন ক'রে দেন।

বিচিত্র বাহন (হারকিন্‌স্ সাহেব কুম্ভীরের গাড়া আরোহণ ক'রে বায়ু সেবন ক'রতে বাহির হ'য়েছেন)

বিচিত্র বাহন (হারকিন্স ও তাঁর বন্ধু দুজনে শুভ্র ছাগলের গাড়ী আরোহণ ক'রে, ভ্রমণ ক'রতে যাচ্ছেন)

নির্ব্বাক টেলিফোণ

সাধারণ টেলিফোণে মূক ও বধির-দের কথা বলা বা শোনা অসম্ভব। এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য একজন মূক ও বধির বৈজ্ঞানিক William E. Shaw এক রকম নূতন ধরণের টেলিফোণ উদ্ভাবন ক'রেছেন, যদ্দ্বারা মূক ও বধিরেরা অনায়াসে বার্ত্তা গ্রহণ ও প্রদান ক'রতে পারে। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক আলোক গোলকের উপর ইংরাজী অক্ষর লেখা থাকে। যখনই বার্ত্তা প্রদান ক'রবার প্রয়োজন হয়, বৈদ্যুতিক চাবি টিপিলে সংবাদ গ্রাহ-কের ঘরে ইংরাজি অক্ষর লিখিত গোলকগুলি জ্বলে উঠে, এবং সংবাদ-গ্রাহক অনায়াসে সংবাদ আদান প্রদান ক'রে থাকে।

নির্ব্বাক টেলিফোণ (বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে নবোদ্ভাবিত টেলিফোণের পরীক্ষা ক'রছেন)

মুখোসের কাজ

ধাতু নির্ম্মিত মুখোস শুধু, সমুদ্রগর্ভে ডুবুরীদের কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, এই আমরা জানি। কিন্তু জমীর উপর অনেক কারখানায় ও ভূগর্ভে অনেক খনিতে লোকের প্রাণরক্ষার জন্য যে ধাতু-নির্ম্মিত মুখোস প'রতে হয়, তা' আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না। অনেক লৌহের কারখানায়, যেখানে লৌহ গলান হয়, সেখানে গলিত লৌহ দেখা অনেক সময় আবশ্যক হয়। সেই সময়ে মুখ বা দেহ যাতে ঝলসে পুড়ে না যায়, সেজন্য ধাতু-

নির্ম্মিত মুখোস ও পোষাক প'র্‌তে হয়। খনি যখন দূষিত বাষ্পে পরিপূর্ণ হয়, তখন অভ্যন্তরস্থ লোকের প্রাণরক্ষার জন্য ধাতু-নির্ম্মিত পোষাক ও মুখোস প'রবার প্রয়োজন হয়।
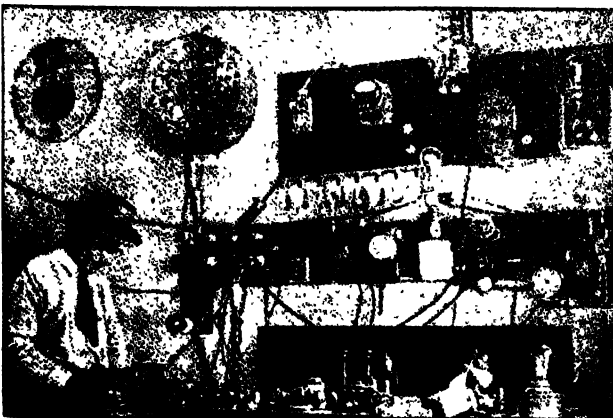
খেলায় মুখোস (Basketball) খেলবার সময় যাতে চোখের চশমা না ভাঙ্গে, সে জন্য মুখে ধাতু-নির্ম্মিত ঢাকা পরে খেলবার আয়োজন হ'চ্ছে)

রণজেনে মুখোস (রণজেন রশ্মি ব্যবহার করবার সময় যাতে হস্ত পদাদিতে ক্ষত না জন্মায়—সেজন্য একটি মুখোস ও ধাতু-নির্ম্মিত হাত ঢাকা পরে, একজন লোক কাজ ক'রছে)

কারখানায় মুখোস (একজন লোক গলিত লৌহের

খনিতে মুখোস (খনির লোকজনের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মুখোস ইত্যাদি পরে' একজন লোক খনির নীচে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছে)

ভূগর্ভের শক্তি

Sir Charles A. Parsons K. C. B, F. R. S. নামক একজন বৈজ্ঞানিক বলেন যে, যদি তিনি ১২ মাইল নীচে ভূগর্ভ থেকে পৃথিবীর উপর পর্য্যন্ত একটি কায়েমী গহ্বর তৈয়ারী ক'রতে পারেন, তা'হলে সেই গহ্বরের সাহায্যে ভূগর্ভ থেকে বাষ্প গ্রহণ ক'রে, সেই বাষ্পের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ ক'রে, একটি বিস্তৃত দেশ আলোকিত ও বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানা নিখরচায় বৎসরের

পর বৎসর চালাতে পারেন। তিনি আরও বলেন যে এই গহ্বর তৈরী ক'রতে যে ব্যয় হবে, তা'র অন্ততঃ বিশগুণ লাভ যে এক বৎসরের মধ্যে হবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

ভূগর্ভের শক্তি (পার্সন সাহেব নবোদ্ভাবিত যন্ত্র দ্বারা সুরঙ্গ তৈরী ক'রছেন। উপরে ভূগর্ভস্থিত বাষ্প গ্রহণ ক'রবার যন্ত্র বসান রয়েছে)

রাসায়নিক সুবর্ণ

বার্লিন টেক্‌নিক্যাল স্কুলের এক-জন অধ্যাপক Prof. Miethe বহু-পরীক্ষা ও গবেষণার পর পারদ থেকে সুবর্ণ তৈয়ারী ক'রতে সমর্থ হ'য়েছেন। এই পরীক্ষার ফল পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকদের নিকট স্বপ্ন বলে মনে হ'ত ; কিন্তু এখন বিজ্ঞানের কল্যাণে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এই পরীক্ষার জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় নয় লক্ষ টাকা এবং এই ব্যয়-ভার জার্ম্মান গভর্মেণ্ট বহন করেছে।
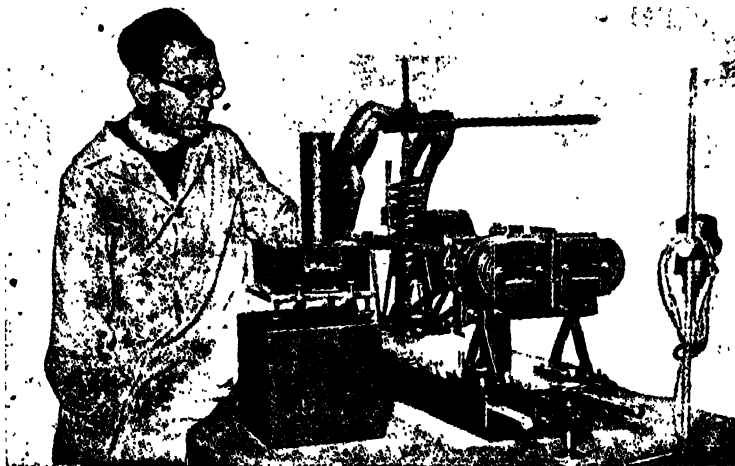
রাসায়নিক সুবর্ণ (মিথি সাহেব রাসায়নিক সুবর্ণ তৈরী ক'রে তা'র পরীক্ষা ক'রছেন)

ভূমিকম্পনির্দ্দেশক যন্ত্র

সম্প্রতি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে অকালে অতর্কিত ভাবে ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হ'চ্ছে দেখে, বৈজ্ঞানিকরা ভূমিকম্পের আগমনের সময় নির্ণয় ক'রবার একটি যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হয়েছিলেন। সম্প্রতি Rev. Francis A. Tondroff নামক একজন বৈজ্ঞানিক একটি নূতন ধরণের যন্ত্র আবিষ্কার ক'রেছেন, যেটি এত সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী যে, ভূমিকম্পের সম্ভাবনা হলেই, সেই মুহূর্ত্তে সেই যন্ত্রে ভূমিকম্পের শক্তি, অবস্থা, ও অবস্থিতি নিরূপিত হয় এবং বৈজ্ঞানিক তদানুযায়ী সকলকে যথাসময়ে সাবধান ক'রতে সমর্থ হন।

ভূমিকম্প নির্দ্দেশক যন্ত্র (টনডরফ্ সাহেব তাঁর নবোদ্ভাবিত যন্ত্র বিজ্ঞান সমাজে আন্‌বার পূর্ব্বে তা'র পরীক্ষা ক'রছেন)

কোকো রুটি (বে'ল সাহেব রুটি তৈরী করে পরীক্ষা ক'রছেন)

কোকো-রুটি

ময়দার রুটির পরিবর্ত্তে সম্প্রতি মার্কিন দেশের লোকেরা কোকো দিয়ে তৈয়ারী রুটি ব্যবহার ক'রছেন। বিজ্ঞানমতে কোকো পরিপাক ও উত্তেজনক শক্তিবর্দ্ধক। এজন্য বৈজ্ঞানিকেরা কোকো রুটির ব্যবহার প্রচলিত ক'রবার চেষ্টা ক'রছেন। এই বিজ্ঞানসম্মত রুটি সর্ব্বপ্রথমে L. H. Bailey নামক একজন রুটিওয়ালা সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার ক'রে।

পুস্তক-পরিচয়

কিশলয়—শ্রীমতী লীলাদেবী বিরচিত, মূল্য তিন টাকা।

নামেই পরিচয়—ইহা একখানি কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে আছে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৮টী কবিতা—সুখানি কাব্যগ্রন্থের উপাদান। এজন্যও বটে এবং এই কবিতাগুলির ভিতর এত বিভিন্ন রসের সমাবেশ করা হ'য়েছে—সেজন্যও কতকটা বটে—এই গ্রন্থখানির প্রকৃষ্ট ও বিশদ সমালোচনা করা যে-কোনও মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় সম্ভবপর নয়। ঠিক এই জন্যই কবিতাগুলির শ্রেণী-বিভাগ করাও একটা ক্ষুদ্র প্রবন্ধের ভিতর বিশেষ সহজ ব্যাপার ব'লে মনে হয় না। অতএব সে চেষ্টা না ক'রে এখানে এ গ্রন্থখানির একটা সাধারণ পরিচয় দেবার চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত।

এ যুগের কবিতায় কোথাও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করবার কোন সফল আয়োজন দেখা যায় না। শ্রীমতী লীলাদেবী তা' পারেনও নি এবং তার বৃথা চেষ্টাও করেন নি। তাতে যে তাঁর নিজস্ব প্রতিভা কিছুমাত্র খর্ব্ব হ'য়েছে, তা' বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের উপরে উঠ্‌তে পারেন একমাত্র তিনিই—যাঁর প্রতিভা রবীন্দ্রনাথেরই সমশ্রেণীস্থ। সেরূপ কবি এদেশে তো এখন নাই, পাশ্চাত্যেই বা কয়জন আছেন? শ্রীমতী লীলাদেবীর কৃতিত্ব হ'চ্ছে এই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে নিজের কবিতার উপর একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ দিতে পেরেছেন—যেটা শুদ্ধমাত্র অনুকরণে একেবারেই সম্ভব হ'ত না।

বাংলা মাসিকে আজকাল অনেক মহিলাই গদ্যে-পদ্যে লেখনী চালনা করেন এবং তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রমুখ দু'একজনের লেখায় একটা অনন্যতন্ত্রতার পরিচয় পাওয়া যায়—যা' যে-কোনও দেশের লেখক-লেখিকার পক্ষে গর্ব্বের বিষয় ব'লে গণ্য হ'তে পারে। শ্রীমতী লীলাদেবীর গদ্যের সঙ্গে অনেকে এখনও বিশেষরূপ পরিচিত নন, কিন্তু "কিশলয়ে" যে কয়টী কবিতার অর্ঘ্য নিয়ে তিনি বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দির-সোপানে দাঁড়িয়েছেন, তা' যে দেবীর কাছে সাদরে গ্রহণীয় ব'লে গণ্য হবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই; এমন কি মন্দিরের অন্যান্য পূজারীদের কাছেও তা' যে নিতান্ত সাধারণী ব'লে উপেক্ষিত হবে না—এ কথাও নিঃসংশয়ে ব'লতে পারা যায়।

ভূমিকায় কবির বিষয়ে যে ব্যক্তিগত উল্লেখটুকু আছে—তা' বাস্তবিকই করুণ। "তাঁহার মর্ম্মস্থানের দারুণ আঘাতে" এ কবিতা-গুলির সৃষ্টি; বোধ হয় সেই জন্যই এগুলি এত প্রাণস্পর্শী হ'য়েছে। এ কথায় শেলির সেই পুরাতন লাইনটা মনে পড়ে—Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. বোধ হয় এই আঘাতেই কবি যাকে তাঁর "তৃতীয় দৃষ্টি" ব'লেছেন, তাই ফুটে উঠেছে—

দম্‌কা ঝড়ের হাওয়া
নিভিয়ে দিল ঘরের বাতি
চোখে চোখে চাওয়া;
এলিয়ে দিল ঘরের আগল
ঝিলিক্ মারা পাগল বাদল—
তাই চোখে নয় সবার প্রাণে
দৃষ্টি এবার পাওয়া।

এই বিশেষ দৃষ্টিটুকুর অঙ্কন-পরিচয় তাঁর প্রায় সমস্ত কবিতাতেই পাওয়া যায়।

প্রতিভাকে সমালোচকের মনগড়া একটা গণ্ডীর ভিতর ফেলা যায় না; তার কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়াও চলে না। কিন্তু ঠিক এই চেষ্টাই অনেক সময় প্রতিভার দীপ্তি-অন্ধ ভক্তেরাই ক'রে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এরূপ চেষ্টা অনেকবার হ'য়েছে এবং বিফল-মনোরথ হওয়া সত্ত্বেও সে চেষ্টা এখনো অনেকে ছাড়েন নি। কবি-সম্রাটের উপর এই সব আব্দার স্মরণ ক'রেই "কিশলয়ের" কবি বোধ হয় লিখেছেন—

তাহারে বেঁধোনা বেঁধোনাক তারে
তাহারে নারিবে ধরিতে,
বৃন্তের বাঁধা শিথিল করে সে
তরু হ'তে তলে ঝরিতে!
সে যে সুবাসের মত উবিয়া
যায় পুষ্পের মত ঝরিয়া,
রয় সকলের প্রাণ ভরিয়া—
তাহারে নারিবে বুঝিতে।
সাধ ক'রে যায় ফুলবীথি ছাড়ি
কাঁটা পথে ফুল খুঁজিতে।

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে রচিত আর একটী কবিতায় আছে—

আপনাকে সে বিশ্বে সঁপি
বিশ্বে ওঠে উদ্ভাসি—
গান-গাওয়া তার হৃদয়খানি বড়ই ভালবাসি।

শ্রদ্ধার সুরের এই সারল্যের মূর্চ্ছনায় পবিণতিটী বড়ই মধুর।

ভক্তির সৌরভে পূর্ণ "স্বামী বিবেকানন্দ" শীর্ষক কবিতাটী ছন্দ-গৌরবেও সরল-সুন্দর। বিবেকানন্দের উপর বর্ত্তমান লেখকের একটা স্বাভাবিক পক্ষপাত থাকা সত্ত্বেও, স্থানাভাব বশতঃ সমগ্র কবিতাটী তুলে দেবার লোভ সম্বরণ ক'রতে হ'ল। এ কবিতাটী প'ড়ে বোঝা যায় যে, সেই তেজোদ্দীপ্ত সন্ন্যাসীর প্রভাব বঙ্গ অন্তঃপুরিকাদের মধ্যেও কতটা বিস্তৃত হ'য়েছে। লেখিকা তাঁকে কখনো দেখেন নি, তবুও—

যেন অতীতের ছিল কত জানা, যেন গো দেখেছি স্বপনে মনে,
যেন গো শুনেছি মন্ত্র মধুর তেজোময়ী বাণী গভীর স্বনে
সে কি অপূর্ব্ব অমৃত নিছনি সুধাময় ভাষা জ্ঞানের খনি,
বিপুল পুলকে ধ্যানে মনোলোকে আজিও জাগিছে সে সুরধ্বনি !
সব অবতার মিলেছে তোমাতে নবযুগে নব হে অবতার,
হে মহাপ্রেমিক, প্রণমি তোমারে, ধর এ ভক্তি পুষ্পহার !

কাব্যে উপেক্ষিতা উর্ম্মিলার বিরহ-চিত্রটী বড়ই করুণ। বাল্মীকি সীতার দুঃখটাই বড় ক'রে দেখিয়েছেন, কিন্তু এই রাজ-অন্তঃপুর-চারিণীর দীর্ঘ বিরহের ইতিহাস আমাদের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত : তার যা দুঃখ—

দেখেনি কেহ তাহা বলেনি কেহ আহা,
সীতারই কথা বলে,
বুনিয়া জাল !

সব চেয়ে বেশী দুঃখ এই যে তাঁর এ তপস্যাও বিফল হয়েছিল ; কেন না—

পতিতে তন্ময় তুমি যে চিন্ময়
পাওনি প্রতিদান
কাছেতে তাঁর ;
দেখেনি সন্ন্যাসী সে ব্যথা বিন্যাসি
শ্রীরামময় ছিল
হৃদয় যাঁর !

"কিশলয়ের" কবি রমণী-জীবনের এই ট্রাজেডিটুকু উর্ম্মিলার বিরহের মধ্য দিয়ে নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

"কিশলয়ের" দু' একটী কবিতার কল্পনা-লীলা বৈষ্ণব কবিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় :—

নলিনী-পত্রে অশোকের তলে শয়ন বিছায়ে সাধা,
বিহগেরা উড়ে, খস্ খস্ করে—মনে হয় আজো রাধা
হে শ্যাম, তোমার লাগি
নিবিড় নিশির অভিসারে থাকে কত-না রজনী জাগি !

এই ছত্রগুলিতে জয়দেবের "পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে......... পশ্যতি তব পন্থানম্"—এর কথা মনে পড়ে। "নিবেদন" কবিতাটীর ভাব চণ্ডীদাসের "কি আর কহিব আমি" ইতি শীর্ষক গানটীর ভাবের সঙ্গে তুলনীয়।

"কিশলয়ের" অনেক কবিতার গভীর আধ্যাত্মিকতা কবির মনের একটা দিকের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেয়। বাহুল্য ভয়ে সে গুলির উল্লেখ করা গেল না।

ছন্দবৈচিত্র্যেও এই কাব্যখানি খুব উচ্চস্থান অধিকার করেছে ;—প্রয়োগে কোথাও এতটুকু ত্রুটী নেই, অথচ কবিতা কোথাও ছন্দের গতিতে আত্মহারা হয়ে পড়েনি।

"কিশলয়ের" প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে—তার সহজ স্বচ্ছন্দ গতি ; যেটা কবিতার সজীবতার প্রমাণ। বাস্তবিক এই কবিতাগুলির ভিতর একটা সত্যকার প্রাণ আছে এবং সে প্রাণের ভিতর আছে গভীরতা এবং বিশালতা—দুই-ই। দুঃখের বিষয় অনেক ভাল কবিতারই এখানে পরিচয় দিতে পারা গেল না।

কয়েকখানি অনমুকরণীয় চিত্র-সম্পদে "কিশলয়ের" কবিতাগুলি আরও পরিস্ফুট হয়েছে। চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই মনোজ্ঞ ও সুন্দর।

বইখানির ভূমিকা লিখেছেন মাস্তবর স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। ভূমিকাতে ইঙ্গিত না থাকলেও, সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যে তাজা সবুজপত্রের চেয়ে জীর্ণ পীতাভ পথিপত্রের বেশী অনুরাগী, তা' অনেকেরই কাছে নিতান্ত অজানা ছিল না ; অতএব কিশলয়ের চিরসবুজ মধুরিমাও যে তাঁর নজরে অন্য একটা রং নিয়ে ফুটে উঠবে—তাতেও আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। তা' সত্ত্বেও আমরা "কিশলয়ের" নবীন কবিকে সাদরে সবুজ-সভায় আহ্বান করে নিচ্ছি। এবং তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, "কিশলয়ের" বিভিন্ন ভাবের ভিতর দিয়ে যে সুরটী ফুটে উঠেছে, তা' একাধারে সবল এবং তাজা—যা' এই ন্যাকামিতন্ত্রের যুগে একান্ত দুর্লভ এবং সেই জন্যই বিশেষরূপে উপভোগ্য। ভূমিকার ipse dixit সত্ত্বেও হয়ত এটা মনে করা নিতান্ত অন্যায় হবে না যে "সবুজছায়ার সান্নিধ্য" বশতঃই সেটা সম্ভবপর হ'য়েছে।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

বেগম সমরু—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

বাঙ্গালাদেশে এখন ইতিহাস-চর্চ্চা বেশ জোরে চলিতেছে বলা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐতিহাসিক সত্য-নির্ণয়ের বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী এখনও আমরা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি নাই। ব্রজেনবাবুর বইখানি ছোট, দামও মোটে আট আনা ; বিজ্ঞাপনও যে তিনি বেশী দিতে পারিবেন তাহা বোধ হয় না। কিন্তু পৃষ্ঠার সংখ্যা, গ্রন্থের আকার, বা ছাপিবার খরচ দিয়া বইর আসল দাম ঠিক করা যায় না। গ্রন্থকার original source কাহাকে বলে তাহা জানেন, এবং ঐতিহাসিক সত্য কিরূপে নিপুণভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করিতে হয় তাহাও জানেন। বেগম সমরু উত্তর ভারতের একজন মহিলা জাগীরদার মাত্র। ইতিহাসে তাঁহার স্থান খুব উচ্চ নহে। কিন্তু ব্রজেনবাবু এই প্রতিভাশালিনী মহিলার জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলনে অপরিসীম পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি মারাঠী, পারসী, ও ইংরাজী ভাষার মুদ্রিত উপাদানগুলি ত যত্নসহকারে পরীক্ষা করিয়াছেনই, কলিকাতার ইম্পিরীয়াল রেকর্ড বিভাগের অমুদ্রিত চিঠি পত্রও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ফলে "বেগম সমরুর" দ্বিতীয় সংস্করণ তাঁহাকে একেবারে নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির ভাষা প্রাঞ্জল। নয়খানি প্রামাণ্য চিত্রে

গ্রন্থের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বেগম সমরু বরাবরই খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

নির্ম্মাল্য—মূল্য এক টাকা। লেখক শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ সাহিত্য-ক্ষেত্রে নবীন হইলেও, তিনি যে প্রতিভার পরিচয় তাঁহার প্রথম কবিতা গ্রন্থে দিয়াছেন, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। আলোচ্য বইখানিতে ৩৩টী কবিতা আছে এবং উহা কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে উৎসর্গ করা হইয়াছে। কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে লিখিত হইলেও, নবীন কবির ভাবে ও ছন্দে বেশ একটু নূতনত্ব আছে। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় গ্রন্থের ভূমিকায় সত্যই লিখিয়াছেন যে, তরুণ কবি তাঁহার রচনার অঙ্গ সৌষ্টব সম্পাদনে অনেক বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত ও সতর্ক। বিশেষতঃ কবির কল্পনা, চিন্তাশীলতা ও দেশ-হিতৈষণাপূর্ণ। আমরা শ্রীমান্ বিমলচন্দ্রের সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠার কামনা করি।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

পৃথিবীর ও-পিঠ—শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম প্রণীত, মূল্য আট আনা।

যামিনীকান্ত বাবুর রচিত শিশুপাঠ্য এই রসাল পুস্তকখানির বিজ্ঞাপন দেখিয়া প্রথমে মনে হইয়াছিল, তিনি হয়ত পৌরাণিক উপকথা মহারাবণের গল্প লিখিয়াছেন। কিন্তু পুস্তকখানি হাতে পড়িলে দেখিলাম, ইহা কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার-কাহিনী। তিনি এই আবিষ্কার-কাহিনী অতি সরল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখিয়া এ দেশের বাহাদুর ছেলেদের হাতে উপহার দিয়াছেন। আমাদের দেশের ছেলেরা স্কুলে ইতিহাস পাঠ করা প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছে। এ অবস্থায় গল্পের ভিতর দিয়া যে সকল লেখক তাহাদের ইতিহাস শিখাইতেছেন—তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। এই পুস্তকখানিতে ছেলেরা আমোদের সঙ্গে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিবে। পুস্তকখানির ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, কোথাও আড়ষ্ট হয় নাই; এবং গল্পটি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমান কৌতূহলোদ্দীপক ও সুখপাঠ্য। এ পুস্তক পড়িয়া ছেলে মেয়েরা খুব আমোদ পাইবে। শিশুপাঠ্য গল্পপুস্তকগুলির মধ্যে এই পুস্তকখানির স্থান অনেক উর্দ্ধে,—এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। আট আনা পয়সা খরচ করিয়া এই পুস্তকখানি কিনিলে তাহাদের পয়সা জলে পড়িবার আশঙ্কা নাই। গ্রন্থকার দিল্লী-প্রবাসী। বঙ্গদেশ হইতে অত দূরে থাকিয়াও তিনি যে স্বদেশীয় শিশু-সাহিত্যের পুষ্টি সাধনের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন—ইহাতেই বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রাণের টান বুঝিতে পারা যায়। আমাদের বিশ্বাস, শিশু সাহিত্যে তাঁহার এই দান ব্যর্থ হইবে না। পুস্তকখানির ছাপা কাগজ অতি উৎকৃষ্ট; অনেকগুলি ছবি আছে, ছবিগুলিও সুন্দর। দেশের ছেলেরা খুব আগ্রহের সঙ্গেই পুস্তকখানি পাঠ করিবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বন্দিনী—শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা। এই নাটকখানি মহা-সমারোহে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে এবং দর্শকেরও অভাব হইতেছে না; ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বন্দিনী যথেষ্ট আদর লাভ করিয়াছে। গল্পের আখ্যানভাগ বড়ই মর্ম্ম-স্পর্শী; প্রেম-প্রত্যাখ্যাতা যুবতী কেমন রাক্ষসী হইতে পারে, আবার প্রিয়তমার জন্য কেমন করিয়া যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি কঠোর যন্ত্রণায় প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেওয়া যায়, এই বন্দিনীতে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা শ্রীযুক্ত অপরেশবাবু তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার কর্ণার্জ্জুন, ইরাণের রাণীর ন্যায় এই বন্দিনীও যথেষ্ট জনাদর লাভ করিবে।

ব্রহ্মানন্দ-প্রশস্তি—শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত, মূল্য বার আনা। যাঁহারা রামকৃষ্ণ মঠের সহিত সামান্য পরিচিত, তাঁহারাই এই সুন্দর পুস্তকখানির নাম দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এখানি স্বধামগত মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বা রাখাল মহারাজের জীবন-কথা। এ অপূর্ব্ব জীবন-কথার পরিচয় অল্প পরিসরে দেওয়া অসম্ভব। শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয় পরম ভক্ত, সুতরাং তাঁহার লিখিত এই প্রশস্তি যে মনোরম হইবে, তাহা না বলিলেও চলে।

রক্ত-রাগ—গোলাম মোস্তাফা বি-এ, বি-টি প্রণীত, মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা-সংগ্রহ। মোস্তাফা মহাশয়ের অনেক কবিতা মাসিক-পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে; সে সমস্ত কবিতা যে সকলেই আদর করিয়া পড়েন, তাহাও আমরা জানি। এই সংগ্রহে যে কয়টি কবিতা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই সুন্দর, মনোমদ, কবির পবিত্র হৃদয়ের মনোহর অভিব্যক্তি। এই বইখানি পড়িয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"তব নব প্রভাতের 'রক্ত রাগ' খানি
মধ্যাহ্নে জাগায় যেন জ্যোতির্ম্ময়ী বাণী।"

কর্ম্মফল—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দে প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা। এখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস। উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি পাপমতি কর্ত্তা-গৃহিণীগণের পরিণাম ফল যে কিরূপ শোচনীয় হয়, তাহাই দেখাইবার জন্য এই উপন্যাসখানি লিখিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনি বেশ সুন্দর ভাবে চরিত্রগুলি চিত্রিত করিয়াছেন।

বিদ্রোহী—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য পাঁচ সিকা। অশিক্ষিত শ্রমিকদিগেরও মন বলিয়া যে একটা কিছু আছে, এবং তাহা যে শিক্ষিত মনের মতই অনুভব করিবার ক্ষমতা রাখে, ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে ও নিতান্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে, এই অতিবড় সত্যটা জ্বলন্ত ভাবে দেখাইবার জন্য এই বিদ্রোহী উপন্যাসের অবতারণা; শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ এ চেষ্টায় সাফল্যলাভ করিয়াছেন।

প্রহ্লাদ—শ্রীরেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। এখানি কাব্য; পৌরাণিক প্রহ্লাদ-চরিত্র অবলম্বন করিয়া এই কাব্যখানি লিখিত হইয়াছে। লেখক মহাশয়ের অমিত্রাক্ষর ছন্দে

লিখিবার শক্তি এই কাব্যে বেশ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই কাব্যখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

পাগলের প্রাণের কথা—শ্রীমুনীন্দ্রনাথ দে সম্পাদিত, মূল্য বার আনা। এই পাগলের কথা পড়িয়া আমরা বড়ই শান্তিলাভ করিলাম। সম্পাদক মহাশয় বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইবেন। তাঁহার প্রাণের কথা—সত্যসত্যই প্রাণের কথা; ইহাতে কোনও আড়ম্বর নাই।

প্রতিমা-বিসর্জ্জন—শ্রীরেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা। ইহা কয়েকটি প্রবন্ধের সংগ্রহ। প্রবন্ধগুলি প্রায়ই 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র অনুকরণে লিখিত। তাহা হইলেও সবগুলি সুপাঠ্য হইয়াছে।

দোপালি—শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১॥০ টাকা। এই উপন্যাসখানি বেশ সুলিখিত; গ্রন্থকার অতি নিপুণ হস্তে বইখানি লিখিয়াছেন, চরিত্রগুলি বেশ ফুটিয়াছে। আমরা এই উপন্যাস পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি।

রেণুকণা।—শ্রীমতী শৈলবালা দেবী প্রণীত, মূল্য বার আনা। 'রেণুকণা' কয়েকটী কবিতার সংগ্রহ, কবিতাগুলি একেবারে পবিত্রতা মাখানো; পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। আজকাল যে সকল মামুলী কবিতা পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, রেণুকণার স্থান তাহাদের অনেক উপরে।

নীল-পাখী।—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত, মূল্য আট আনা। বেলজিয়মের বিখ্যাত লেখক মেটারলিঙ্ক 'ব্লু বার্ড' নামক যে উৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়াছেন, তাহারই আখ্যানভাগ লইয়া গ্রন্থকার নীল পাখী লিখিয়াছেন। লেখা বেশ সরল, সহজ ও সুন্দর হইয়াছে।

খাদিম্যানুয়াল। শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত লিখিত দুই খণ্ড, প্রথম খণ্ডের মূল্য ২৲ দ্বিতীয় খণ্ড ১৲

আমরা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস গুপ্তের দুইখণ্ড 'খাদিম্যানুয়াল' সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। বই দুইখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিত। সমালোচনার অর্থ ভিতরের জিনিসের পরিচয় প্রদান করা। 'খাদিম্যানুয়ালের' পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন আছে। কেবলমাত্র গ্রন্থ হিসাবে নয়, দেশের প্রয়োজন হিসাবেও এ বই বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। দেশের ভিতর অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা যখন নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে, তখন যে গ্রন্থ তাহার সমাধানের পথ চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, তাহার পরিচয় দেওয়ার দায়িত্ব সাময়িক পত্রের নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু 'খাদিম্যানুয়াল' এত অসংখ্য তথ্যে পরিপূর্ণ, এত জানিবার ও ভাবিবার কথায় ভরা যে, তাহার সম্যক পরিচয় প্রদান করাও কঠিন। সুতরাং বইখানির দিকে জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া, আমরা ইহার বিশেষ কোনো পরিচয় এত স্বল্প পরিসর স্থানে দিতে পারিব বলিয়াও ভরসা হয় না।

'খাদিম্যানুয়ালের' প্রথমখণ্ডের বিষয় বিশেষ ভাবে ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দেখা যায়, আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘ দিন টিকিতে পারে না! প্রথমে যথেষ্ট আড়ম্বর লইয়া তাহারা কাজ সুরু করে, কিন্তু বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই তাহাদিগকে 'লালবাতি'ও জ্বালাইতে হয়। ইহার কারণ কেবলমাত্র অর্থের অভাব নহে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাব,—শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিবার শক্তির অভাব। 'খাদিম্যানুয়ালে'র এই এই খণ্ডটি পাঠ করিলে ব্যবসায়ের পদ্ধতি কিরূপ হওয়া দরকার, সে সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। হিসাবের খতিয়ান না খতাইয়াই আমাদের দেশের বড় বড় কর্ত্তারা বড় বড় ব্যবসায়ে জয়ী হইতে চান। হিসাব তাঁহারা নিতেও চান না—দিতেও চান না। দেনা পাওনার কারবারে দেনা-পাওনাকেই বাদ দিয়া চলিবার তাৎপর্য্য কি, তাহা অধিকাংশ স্থলে বোঝা না গেলেও, তাহার ফল কি হয়, তাহার চেহারা দু'দিন বাদেই ধরা পড়ে! 'খাদিম্যানুয়ালে' যে সব হিসাব-নিকাশ, যে সব শৃঙ্খলার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, শুনিতেছি, তাহা সমস্তই খাদি প্রতিষ্ঠানে কড়াক্কড় ভাবে অনুসৃত হয়। সুতরাং মনে হয়, এই দুর্দ্দিনে দেশের দুর্দ্দশা ঘুচাইবার জন্য যে প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কেবল মাত্র সাফল্যের দিক দিয়াই নহে, ব্যবসায়ের দিক দিয়াও দেশের ভিতর নূতন একটি আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

এই খণ্ডের একটি অধ্যায় কেবল মাত্র চরকার খুঁটিনাটি আলোচনায় নিয়োগ করা হইয়াছে। চরকার দ্বারাই যদি দেশের বস্ত্র-শিল্পের অভাব মোচন করিতে হয়, তবে তাহার সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা হওয়াই দরকার। চরকার প্রত্যেকটি অংশ, তাহার প্রয়োজনীয়তা, তাহার বৈশিষ্ট্য, তাহার প্রয়োগ কৌশল—অর্থাৎ তাহার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই এই অংশে বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয় হইতেছে বস্ত্র-শিল্প, তুলার চাষ প্রভৃতি। এ খণ্ডের ভিতর ব্যবসায়ের technicalities বিশেষ নাই; অথচ সাধারণের জানিবার এবং ভাবিবার অজস্র জিনিস আছে। ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্প এক দিন সমস্ত দুনিয়ার অভাব মিটাইয়াছে—সে শিল্প তাহার কেন নষ্ট হইল, তাহা আমরা জানি না—জানিবার চেষ্টাও করি না। সতীশবাবু নানা গ্রন্থের—(সে সমস্ত গ্রন্থের বেশীর ভাগই ইংরেজের লেখা)—ভিতর হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহার ধ্বংসের ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই ইতিহাস যেমন করুণ, তেমনি বীভৎস অত্যাচারের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। জাতির জাগরণের এই সময়টাতে এ ইতিহাসের সহিত পরিচয় থাকা দেশের আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলেরই পক্ষে সঙ্গত।

এ দেশের উপযোগী তুলার চাষ বন্ধ করিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের উপযোগী লম্বা আঁশের তুলা উৎপন্ন করিবার যে চেষ্টা এখনও চলিতেছে, তাহার ভিতরের রহস্যও সতীশবাবু উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। খদ্দরের আন্দোলনের এই শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার এ যুক্তিগুলিও

চের কাজে লাগিবে বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহার দ্বারা দেশের পক্ষে কোন্ রকমের তুলা যে বিশেষ ভাবে উপযোগী, তাহা নিঃসন্দেহে বোঝা যায়।

দেশের লোক যদি খদ্দর পরে ও বোনে, তবে খদ্দরের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভবিষ্যতের চেহারাটাও যে ফিরিয়া যায়, এই গ্রন্থ পড়িলে সে সম্বন্ধে আর কোনই সন্দেহ থাকে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই স্বল্প পরিসরে এ গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়—ইহার পরিচয় দিতে হইলে গোটা বইটা এখানে তুলিয়া দেওয়া দরকার—ইহার প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা এমনি সব জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। আমরা সকলকেই বইখানি পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। সতীশবাবুর কাছেও আমাদের একটি অনুরোধ আছে—সে অনুরোধ বাঙ্গালী পাঠকদের জন্য। এই বইখানির, বিশেষ ভাবে ইহার দ্বিতীয় খণ্ডটির একখানি বাংলা সংস্করণ হওয়া সঙ্গত। কারণ, এরূপ বই এ দেশের ছেলেমেয়ে, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই হাতে পৌঁছান দরকার।

শ্রীমান্ সুহৃদকুমার রায় ডি-এসসি ও পিএইচ-ডি

প্রশান্ত—শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালা উপন্যাস ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত। তাঁহার অনেক গল্প ও উপন্যাস বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। 'প্রশান্ত' তাঁহার অন্য ধরণের উপন্যাস। ইহাতে মামুলী প্রেমের কথা নাই, যুবক-যুবতী নাই, চমকপ্রদ ঘটনা সংস্থানও নাই; কিন্তু, যাহা আছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বপ্রধান কথা—ছেলেদের সুশিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা। বহুদর্শী শিক্ষক মাণিকবাবু সুদীর্ঘকাল ছেলেদের শিক্ষাবিধানে নিযুক্ত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাই নিরঞ্জন বাবুর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। আমাদের ছেলেদের কি ভাবে শিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য, তাহা এই উপন্যাসখানিতে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নিরঞ্জন বাবুর প্রতিষ্ঠিত 'মায়ের কোল' নামক আশ্রমের বিধি-ব্যবস্থা বোলপুরের শান্তি-নিকেতনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সুন্দর উপন্যাসখানি শুধু বালক-বালিকা নহে, তাহাদের পিতা মাতার হাতে দেখিলে আমরা সুখী হইব। শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের দৃষ্টিও এই বইখানির দিকে আকৃষ্ট করিতেছি, এখানি বালকগণের পাঠ্য-শ্রেণীভুক্ত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব

শ্রীমান্ সুহৃদকুমার রায় জার্ম্মানীর টিফেনষ্টাইন্ প্রদেশস্থ সাউথ্ ব্ল্যাক্ ফরেষ্ট্ ও তৎপার্শ্বস্থ হার্সাইনীয়ান পর্ব্বতমালার ভূতত্ত্ব (Geology) ও শিলাতত্ত্ব (Petrography) সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা লিপিবদ্ধ করিয়া জুরীক্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচ-ডি উপাধি পাইয়াছেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙালী ছাত্র, যিনি জুরীক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন। এবং ইনিই প্রথম ভারতবাসী, যাঁকে জুরীক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপকের পদ দেওয়া হইয়াছে।

ইঁহার বয়ঃক্রম উনত্রিশ বৎসর মাত্র। ১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "বি-এসসি" উপাধি-পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ইনি মেসার্স গ্লাসন্ গীবসন এ্যাণ্ড শেবেয়ার কোম্পানীর অধীনে বাংলার অরণ্য-বিভাগের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি এরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন যে অতি সত্বর তাঁহার পদোন্নতি হইয়াছিল। এই সময় তিনি ভুটানের সীমান্ত-প্রদেশে "গ্র্যাফাইট্" গর্ভ আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হন। বাংলার বিপ্লববাদের যুগে ইনি দেড় বৎসর ইণ্টার্ণ হইয়াছিলেন। পরে ১৯২৫ সালে তিনি আরও অধিকতর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার উৎকর্ষতা লাভের জন্য য়ুরোপে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন এবং চারি বৎসর-কাল জার্ম্মানী ও সুইটজারল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাধীন থাকিয়া ডি-এসসি ও পিএইচ-ডি উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন।

শোক-সংবাদ

পরলোকগত ডাক্তার সুব্রাহ্মণ আয়ার

ভারতের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার সুব্রাহ্মণ আয়ার এ দেশে সর্ব্বজন পরিচিত। তিনি মান্দ্রাজের 'Grand old man ছিলেন। প্রথমে মান্দ্রাজ হাইকোর্টের উকিল ও পরে জজ হন; তাহার পর অবসর গ্রহণ করিয়া জাতীয় মহাসমিতিতে যোগদান করেন। এমন তেজস্বী পুরুষ ভারতে অতি কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বড়লাটের নিকট তাঁহার পত্র এবং সম্মানজনক নাইট উপাধি পরিত্যাগের ঘটনা এখনও অনেকের মনে আছে। বৃদ্ধ সুব্রাহ্মণ্য আয়ার মহাশয়ের দেহত্যাগে দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা কি আর পূরণ হইবে?

পরলোকগতা সরোজনলিনী দত্ত

গত ১৯শে জানুয়ারী প্রাতে ৫ ঘটিকার সময়, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের কৃষি-শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুত গুরুসদয় দত্তের পত্নী সরোজনলিনী দত্ত সাউথ সুবার্ব্বান হাসপাতাল রোডে রোমেণ্ট নার্সিং হোমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার মহিলাগণের উন্নতির জন্য বিবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই সুরী বালিকা বিদ্যালয়ের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বাঁকুড়া ও বীরভূমে তিনি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সরকার তাঁহাকে এম, বি, ই, উপাধি প্রদান করেন। কলিকাতার অনেক মহিলা প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি মিঃ বি, দে মহাশয়ের চতুর্থ কন্যা। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৩৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান বীরেন্দ্রসদয় দত্তের বয়স বর্ত্তমানে ১৫ বৎসর।

৺নীহারকান্তি ঘোষ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র নীহারকান্তি ঘোষ গত ১৮ই মাঘ শনিবার বেলা ১২টার সময় পরলোকে গমন করিয়াছেন। নীহার বাবুর বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার বিশেষ কোন ব্যাধিও ছিল না; শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা পর্য্যন্ত তিনি ভালই ছিলেন। হঠাৎ হাঁপানির আক্রমণে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। নীহার বাবু কয়েক বৎসর যাবৎ অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম সহকারী সম্পাদক রূপে কার্য্য করিতেছিলেন। আমরা শোকসন্তপ্ত ঘোষ পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবনে দেশের এবং বিশেষতঃ বিধবা মেয়েদের কল্যাণোদ্দেশ্যে বিস্তর কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র মিঃ এ, আর, বানার্জ্জী মহীশূরের দেওয়ান। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

আশুর নষ্টামি

শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

চলিত কথায় "ত্যাঁদড়" বলিতে যাহা বুঝায়, আশু সরকার লোকটা ছিল তাই। এত রকমের দুষ্টবুদ্ধি তাহার মাথায় খেলিত যে, তাহা বলা যায় না। কাহারও জুতা লুকাইয়া রাখা, অর্শ রোগীর তরকারিতে গোপনে লঙ্কাবাটা মিশাইয়া দেওয়া, শয়নকালে মশারির পেরেক বা বালিশ লুকাইয়া রাখা, প্রভৃতি রূপ কার্য্য তাহার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে ছিল। সে কুঠীর মালিক বড়-বাবুর স্বগ্রামবাসী এবং অতিশয় প্রিয়পাত্র বলিয়া, এইরূপে অত্যাচারিত কর্ম্মচারিগণ, অনেক সময় বিরক্ত হইলেও, সে বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া, তাহার এই সব অত্যাচারকে পরিহাসচ্ছলেই গ্রহণ করিত। নতুবা কর্ম্মচারী হিসাবে সে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিল না। সে ছিল খাদ সরকার। বড়বাবুর ঠেস না থাকিলে, ছোট বড় কর্ম্মচারী নির্ব্বিশেষে এমন অত্যাচার করা দূরে থাক, ম্যানেজার প্রভৃতি বড় কর্ম্মচারীদের সহিত কথা কহিবার যোগ্যতাও তাহার থাকিত না। এক দিকে যেমন এই সমস্ত দুষ্টামি তাহার ছিল, অন্য দিকে তাহার সদগুণেরও অসদ্ভাব ছিল না। কাহারও রোগের সময় সে অক্লান্ত ভাবে তাহার সেবা করিত; লোকের বরাত খাটিতে সারা কুঠির মধ্যে অমন আর দ্বিতীয়টী ছিল না। অনেকটা এই জন্যেও লোকে তাহার অত্যাচার নির্ব্বিবাদে সহিয়া যাইত। আমি তাহার অনুগত ছিলাম বলিয়া, আমার উপর কখনও সে অত্যাচার করিত না। বরং এই সমস্ত কাজে, তলপে'টে হিসাবে আমাকে খাটাইত, এবং একমাত্র আমারই সহিত এই সমস্ত বিষয়ে গোপনে পরামর্শ করিত। মালিক বড়বাবুর প্রিয়পাত্র যে,—তাহার অনুগ্রহ পাইয়া আমি কৃতার্থ বোধ করিতাম। বড়বাবুকে বলিয়া দুইবার সে আমার পদোন্নতি করিয়া দিয়াছে। কিন্তু নিজে সে যে বেতনে প্রবেশ করিয়াছিল সেই বেতনেই আছে। কারণ বিদ্যা তাহার যতটুকু, তাহাতে ইহার অপেক্ষা আর কোন বড় কাজ করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না,—থাকিলে হয় ত সে এত দিনে ম্যানেজার হইত।

সে সময়টায় বরাকরের চারিদিক হইতে চুরি-ডাকাতির সংবাদ আসিতেছিল; এবং ম্যানেজারবাবু কেবলমাত্র পাহারা দিবার জন্য চার জন পৃথক চাপরাসী বাহাল করিয়াছিলেন। এই চুরি-ডাকাতির গল্প শুনিয়া, এবং ম্যানেজার, খাজাঞ্চি প্রভৃতির ভয় দেখিয়া, আশুর খেয়াল হইল যে, সকলকে ভয় দেখাইলে বেশ মজা হয়। কেমন করিয়া ভয় দেখাইলে ঠিক ভয় পাইবে, এই লইয়া কয়েক দিনই আমরা দুইজনে পরামর্শ করিলাম। শেষে যাহা স্থির হইল, সেই গল্পই আজ বলিতেছি।

সে-রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে নিজ নিজ শয্যায় বসিয়া যখন তামাকু সেবন করিতেছিল, তখন আশু সরকার ইঙ্গিতে আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিল। আমাদের বাংলোর পশ্চিম দিকে ফুলের এবং সব্জীর বাগান, এবং দক্ষিণে খানিকটা দূরে নিম্ন দিয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পূর্ব্ব-পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে নামিয়া আসিয়া আশু সরকার আমাকে বলিল—খুব মোটা গলায় তুই বল্ "বাংলো মে কোই হায়? বাগিচাপর ডাকু হায়।" আমার কিন্তু সে সাহস হইল না। তাহার মত তো আমার সাতখুন মাপ নহে। ম্যানেজার বা কেহ যদি আমার স্বর ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে, তবে এই মারাত্মক তামাসার জন্য (Practical joke) আমার চাকরী লইয়া টানাটানি হওয়াও অসম্ভব নহে।

আশু সরকার এই যুক্তি মানিল। শেষে একজন হিন্দুস্থানী পথচারীকে দুই গণ্ডা পয়সার প্রলোভন দেখাইয়া ঐ কথা কয়টী বলিতে রাজি করিল; এবং বলিল, আমরা বাংলোয় প্রবেশ করিবার পর যেন সে ঐরূপ চীৎকার করিয়াই পলায়ন করে। হইলও ঠিক তাহাই। আমরা আসিয়া যখন নিজ নিজ শয্যায় বসিয়াছি, তখন দিগন্ত কাঁপাইয়া চীৎকার শব্দ হইল "মাহাতো বাবুকা কোঠি পর কোই হায়? বাগিচাপর ডাকু হায়।" সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হইল, যেন নালমারা জুতা পায়ে পাথরের রাস্তার উপর দিয়া কে ছুটিয়া পলাইতেছে।

ফলও ফলিল। স-কৌতুকে দেখিলাম, কুঠিশুদ্ধ লোক উৎকর্ণ হইয়া ঐ চীৎকার এবং পলায়নের শব্দ শুনিল; কিন্তু সকলেই নির্ব্বাক। কেবল তোত্‌লা বৃদ্ধ খাজাঞ্চি তারিণী চক্রবর্ত্তী কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে "বু বু" করিয়া এক রকম শব্দ করিতে লাগিল। পরে বোঝা গেল, তিনি যাহা বলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা তোতলামি এবং ভীতির দরুণ বাধা প্রাপ্ত হইয়া ওই "বু বু"তেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। এমন সময় বোঝা গেল, বারান্দায় যে চাপরাশীরা শুইয়া ছিল, তাহারা জুতা পরিয়া লাঠি লইয়া দ্রুত বাগানাভিমুখে ধাবিত হইল। আশু সরকার চাপরাশীদের এই ডাকাত অনুসন্ধানের অর্থ করিল যে, চাপরাশীরা ভয়ে সব ভাগিল। তখন বাংলোর মধ্যে কক্ষে কক্ষে যে দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হইল, তাহা বলি।

তোত্‌লা বৃদ্ধ খাজাঞ্চি—তারিণী চক্রবর্ত্তীকে উদ্দেশ করিয়া আশু সরকার বলিতে লাগিল, "আমাদের আর কি? তারা দেখেই বুঝতে পারবে যে, আমরা ছোট কর্ম্মচারী,—আমাদের হাতে কিছুই নাই; ধরতে ধরবে খাজাঞ্চিকে—যার হাতে টাকা পয়সা।" মানভূমবাসী তোত্‌লা খাজাঞ্চি তোত্‌লাইয়া তোত্‌লাইয়া করুণ স্বরে যাহা বলিল, সরল করিয়া বলিতে গেলে তাহা এইরূপ দাঁড়ায়—"এশো, বেহ্ম বাম্ভুন হঁয়ে তুঁর পায়ে ধরছি বাবা, তুঁ ক্ষেমা দে।" উত্তরে আশু বলিল "আমার পায়ে ধরলে কি হবে খাজাঞ্চি বাবু? ডাকাতদের পায়ে ধরবেন যে কাজে লাগবে। টাকার জন্যেই ডাকাতি—আগেই তো আপনাকে ধরবে।" খাজাঞ্চি রাগান্বিত ভাবে কহিলেন, "হঁ, তারা চিনে বসে রইছে, যে আমি খাজাঞ্চি?"

আশু বলিল "আপনি কি মনে করেন—যারা ডাকাতি করতে এসেছে, তারা সন্ধান না নিয়েই এসেছে? ঐ মাথা-জোড়া টাক আর পেট-জোড়া ভুঁড়ি দেখেই তারা চিনবে, কে খাজাঞ্চি। কাউকে চিনিয়ে দিতে হবে না।"

কাতর এবং বিরক্তিপূর্ণস্বরে খাজাঞ্চি বলিল, "তা চিনে চিনবে বাবা, সত্ত তুঁ থাম্" এই বলিয়া তিনি বাক্যালাপ বন্ধ করিলেন; এবং হাতে পইতা জড়াইয়া মনে মনে, বোধ করি, দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন। তিনি আর বাক্যালাপ করিবেন না; সুতরাং তাঁহাকে লইয়া আর মজা নাই বুঝিয়া, আমোদ উপভোগ করিবার জন্য আমরা উঠিয়া কক্ষান্তরে চলিলাম।

একাউন্ট্যান্ট ভূষণবাবুর কক্ষদেশে একটি ফোড়া হইয়াছিল। কিছু দিন আগে তিনি সেটা কাটাইয়াছিলেন। কোলিয়ারির কম্পাউণ্ডার প্রত্যহই রাত্রে এই সময় ক্ষতটী ধুইয়া মুছিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিত। পুরাতন ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ক্ষতটী সে ধুইয়াছে মাত্র, এমন সময়ে ঐ শব্দ উঠে; এবং তামাকু-সেবন-রত ভূষণবাবু ভয়ে কাঁপিয়া উঠায়, কলিকা হইতে একখণ্ড জলন্ত টিকা ঠিক তাঁহার ক্ষতের উপরই পড়ে। সেই জ্বালায় তিনি তখন 'বাবা রে, ম'লাম রে' শব্দে প্রাণপণে চীৎকার করিতেছেন। ইহারই সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাড়াতাড়ি আশু সরকার খাজাঞ্চিকে জানাইল যে, ডাকাতেরা বোধ হয় খাজাঞ্চি ভ্রমে ভূষণ বাবুকে ধরিয়া প্রহার করিতেছে।

খাজাঞ্চি উচ্চকণ্ঠে বার-দুই 'তারা তারা' বলিয়া লেপ-মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। লেপের ভিতর তিনি মূর্চ্ছা গেলেন, কি ভয়েই নিস্তব্ধ রহিলেন, তাহা বুঝা গেল না।

পিছনের বারান্দায় আসিতে দেখি, ম্যানেজারবাবু চাকরদের একটী অতিরিক্ত খাটে এবং ময়লা কাপড় পরিয়া চাকর সাজিয়া, একটি কলিকা-হস্তে উঠানের দিকে উঁকি মারিতেছেন—যেন ডাকাতরা তাঁহাকে ম্যানেজার বলিয়া চিনিতে না পারে। তাঁহার একটী দশ-বারো বৎসর বয়স্ক পুত্র তাঁহার নিকটে থাকিয়া চিরকুণ্ডা স্কুলে পড়িত। ম্যানেজারবাবুকে দেখিয়া আশু তাঁহার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি কথা না কহিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তাঁহার ঘর দেখাইয়া দিলেন। ছেলের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখিবার জন্য আমরা তাঁহার ঘরে ঢুকিলাম; কিন্তু ঘরে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। দরজার সম্মুখে মৃদুভাবে যে একটী হারিকেন জ্বলিতেছিল, তাহার আলো কক্ষের একাংশ মাত্র আলোকিত করিতেছিল। যে অংশে ম্যানেজারবাবুর খাট অবস্থিত, সে অংশটী ঘুটঘুটে অন্ধকার। আশুর আদেশমত হারিকেনটা ভিতরে আনিলাম, এবং অনুমানেই খাটের তলা এবং বেঞ্চির তলা ইত্যাদি অনুসন্ধান করিলাম; তথাচ ছেলেটিকে দেখিতে পাওয়া গেল না। যেন আপন মনেই আশু বলিল 'আরে গেল, ছেলেটাকে লুকুলো কোথায়?' অতি

ক্ষীণ মৃদুস্বরে উত্তর আসিল 'এই যে আমি।' শব্দানুসরণে খাটের নিকটে গিয়া দেখি, বালকের উপর রাজ্যের লেপ তোষক বালিশ স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া, বালককে ভরসা দিয়া আশু বলিল, "ডাকাতেরা পালিয়েছে, তোর কোন ভয় নাই, চুপ করে শুয়ে থাক্।"

এই বলিয়া বালককে আশ্বস্ত করিয়া, যে কক্ষে মালিকদের আত্মীয় বিরাট-দেহ কেষ্টবাবু সপুত্র বাস করিতেন, সেই দিকে চলিলাম। দেখা গেল, কপাট দুটীর মধ্যে একটী খোলা এবং একটী আধখোলা ভাবে রহিয়াছে। ঘরে প্রবেশের সুবিধার জন্য আধখোলা কপাটটীকে আশু ঠেলিয়া খুলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কপাটটি খোলা দূরে থাক, খানিকটা পিছাইয়া, যেন স্প্রিংএর বলে, পুনরায় সেই পূর্ব্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং ঠেলার দমকের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একরকম 'কোঁক্ কোঁক্' শব্দ উঠিতে লাগিল।

একপাট কপাটের এমন অবস্থা কেন হইল, দেখিতে গিয়া দেখা গেল, কপাটটির গায়ে ঠেস দিয়া বিরাটদেহ কেষ্টবাবু তাহারই অন্তরালে আত্মগোপনের চেষ্টা করিয়াছেন।

আর না ঘাঁটাইয়া আমরা নিঃশব্দ ভাবে বাহিরে অবস্থান করিতে লাগিলাম। কেষ্টবাবুর গঞ্জিকাসেবী যুবক পুত্রটীর নাম গোপেশ্বর। ইঁহারাও মানভূমবাসী। ক্ষণেক পরে শুনিলাম "কুথা রইছিস্ গুপ্?" বলিয়া কেষ্টবাবু ক্ষীণস্বরে হাঁকিলেন, এবং সমান ক্ষীণস্বরে গুপু উত্তর দিল 'চিঁচাচ্ছ কেনে? খাটের তলায় রইছি যে।"

এমন সময় চাপরাসীরা ফিরিল এবং সগর্ব্বে জ্ঞাপন করিল "ডাকু কাঁহা,—কোই নেহি হ্যায়। হামলোক হেধার ওধার ঢোঁড়কে সব দেখা,—খালি একঠো আদমি ভাগতা রহা। বহুত তগ্‌লিফসে, বহুত দূরমে ওস্‌কো পাকড়া। দো ডাণ্ডা দেনেকে বাদ, ও কবুল কিয়া—ইয়ে কোঠীকো এক বাবু, দো আনা পয়সা দেকে ওস্কো এসা চিল্লানে বোলা। হামরা মালুম হোয়, ও জরুর আশুবাবু হোগা।"

যেমন গঙ্গা সিং এই কথা বলিয়া থামিল, অমনি বৃদ্ধ খাজাঞ্চি তারিণী চক্রবর্ত্তী, যেন যুবকের শক্তিতে লেপ ফেলিয়া তড়াক করিয়া উঠিল, এবং যথায় দাঁড়াইয়া আশু চাপরাসীদের বিবরণ শুনিতেছিল, সেইখানে আসিয়া অন্ধভাবে আশুকে মারিতে লাগিল। গালাগালিও কতকগুলা কি দিল বটে, কিন্তু একে তোতলা, তাহার উপর রাগিয়াছে, সুতরাং একবর্ণও বোঝা গেল না।

নিমেষমধ্যে বাংলোময় প্রচার হইয়া গেল যে, ডাকাত মিথ্যা, এ সমস্তই আশুর নষ্টামি। সকলে মিলিয়া তখন আশুকে খুঁজিতে আরম্ভ করিল। আশু তখন খাজাঞ্চির হাত ছাড়াইয়া এমন এক স্থানে লুকাইয়াছে, যেখানে নিয়মিত ভাবে সকাল-সন্ধ্যা ব্যতীত অন্য সময় সহজে কেহ প্রবেশ করিতে চায় না। ভাগ্যে সে লুকাইয়াছিল, নতুবা বাংলোশুদ্ধ লোক এই মারাত্মক তামাসায় যেরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহাতে আশুকে সম্মুখে পাইলে, সে যে মালিকের প্রিয়পাত্র - এ কথা অনেকে স্মরণ রাখিতে পারিত কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আমি নিতান্ত ভালমানুষের মত এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিলাম এবং শুনিতেছিলাম; কিন্তু ভয়ে আমার বুক গুর্ গুর্ করিতেছিল—পাছে কোন রকমে আমার নামটা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

বস্তুতান্ত্রিক

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

ভাসে হাসিখানি, আসে শুধু বাণী,
জানি তুমি আছ কাছে ;
তোমার পায়ের ছন্দে আমার
চপল পরাণ নাচে।
তোমার চুড়ীর শিঞ্জন পথে
নয়ন আমার বুলে,
যদি চোখে চোখে হয় বিনিময়
কোনো দিন মনোভুলে।
তোমার নিবিড় এলোকেশ-ছায়া
পড়ে বাতায়ন-কাচে ;
অসহ পরশ-পিয়াসে, অধর
কত তারে চুমিয়াছে !

* * *

তোমার বিলোল বসন-প্রান্ত
চকিতে কখনো দেখি ;
নিখিল-উজল কিশোর তনুর
দিক্ নির্দ্দেশ সে কি !
তব কবরীর ফুল'কণা কভু
অঙ্গনে মোর ঝরে ;
কি গোপন লিপি, হে শোভনে, তার
সুরভি-হৃদয় ধরে'
তব পারাবত-মিথুন আমার
কক্ষ-প্রাচীর তলে
ইঙ্গিত কোন্ জানাইয়া যায়
ঘন চুম্বন ছলে !

* * *

কবে এক দিন খাতায় আমার
অকারণ লীলাভরে,
তব সুধানাম লিখেছিলে সখি
সুন্দর মৃদু করে !
প্রতি রেখা তার, ধমনী শিরার
আজি যে অযুত পাকে
বিঁধিয়া বিঁধিয়া তব দেহহার
শোণিতবর্ণে আঁকে !
মসী-যবনিকা পড়ে খসি' তার
ওই মুখ জাগে মনে ;
প্রতি স্মৃতি তার হইল সজল
সিক্ত আঁখির কোণে।

* * * *

হে ভাষা-অতীত, সোহাগ আমার
যে রাঙ্গা রাখীর বেশে
তোমার কোমল বাহুর বাঁধনে
ধরা দিল ভালবেসে,
দীপ্তি তাহার হ'য়েছে কি ম্লান,
তৃপ্তি কি ঘুচিয়াছে ?
সকল মাধুরী বুঝি সখি তার
নিঃশেষে মুছিয়াছে !
তাই আজি তব মিলন-রিক্ত
আনন্দহীন পুরে
ব্যাকুল হিয়ার বিরহ-বাঁশরী
বাজে বেদনার সুরে।

* * * *

লহ মরমের বন্দন-মালা
রাতুল চরণ-তলে ;
দরশ তৃষিত ভক্তেরে আর
ছলিয়ো না কৌশলে।
চিত্ত-বিহগ যাচে সুখ'নীড়
কাতরকণ্ঠে কুজি'—
কল্পনা আজি ফিরিছে তাহার
অমিয়-আধার খুঁজি'।
আলিঙ্গনের প্রভাতে উঠুক্
ইসারার উষা ফুটি,
রূপের লক্ষ্মী এস গো আমার
ভাবের কমল টুটি'।

সাময়িকী

এ মাসের 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদ-পটে যাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তিনি কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়। ১৩০০ সালের ২৮শে ফাল্গুন রাজকৃষ্ণ রায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন—সে আজ ৩১ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেই জন্য তাঁহার জীবন-কথা অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ১২৬২ সালে রাজকৃষ্ণ বাবু জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবে পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় ইনি অতি কষ্টে লালিত-পালিত হন। প্রথমে ইনি আলবার্ট প্রেসের ম্যানেজার হন। সেই সময়েই ইঁহার কবিত্বশক্তি দর্শনে সাহিত্য-সমাজ মুগ্ধ হন। তাহার পর ইনি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইঁহার রচিত 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটক বহু দিন বঙ্গ রঙ্গালয়ে বিশেষ প্রশংসার সহিত অভিনীত হয়। এই সময়ে ইনি কলিকাতা মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে 'বীণা থিয়েটার' নাম দিয়া এক রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই রঙ্গালয়ের বিশেষত্ব ইহাই ছিল যে, ইহাতে বালক ও যুবকদিগের দ্বারা অভিনেত্রীদিগের ভূমিকা অভিনয় করান হইত। তাঁহার এ চেষ্টা সফল হয় নাই,—এই অনুষ্ঠানে তিনি প্রকৃতপক্ষেই সর্ব্বস্বান্ত হন, তাঁহার যাহা কিছু ছিল, সমস্ত বিক্রয় হইয়া যায়। এই সময়েই তিনি সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। আমরা জানি, রাজকৃষ্ণ বাবু এমন দ্রুত কবিতা রচনা করিতেন যে, দুইজন লেখক অবিশ্রান্ত লিখিয়াও তাল সামলাইতে পারিত না। ৩৯ বৎসর বয়সে রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় অকালে পরলোকগত হন। আমরা আজ পরম শ্রদ্ধাভরে কবিবর রাজকৃষ্ণের নাম স্মরণ করিতেছি।

রাজকৃষ্ণ বাবু ছেলে বেলা হইতেই কেমন উপস্থিত কবিতা লিখিতে পারিতেন, তাহার একটা দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। রাজকৃষ্ণবাবু সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু বলিয়াছেন "রাজকৃষ্ণবাবু যখন 'বিদ্বজ্জন-সমাগমে' আসিতেন, তখন তিনি উদীয়মান্ কবি; সবে মাত্র সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে একবার আমি, গুণুদাদা, আমার ভগ্নীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ও আমাদের একজন আত্মীয় কেদার, এই কয়জনে পূজার সময় পশ্চিম বেড়াইতে যাইতেছিলাম। মধ্যে কি একটা ষ্টেশনে রোগা, পরণে ময়লা কাপড়, খালি পা, একটি ছোক্‌রা আসিয়া আমাদিগকে বলিল—'আমি মামার বাড়ী যাইব, হাতে পয়সা নাই, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাড়াটি আপনারা দিয়া দেন ত বড় উপকৃত হই।' যদুবাবু বড় আমুদে লোক ছিলেন। তিনি তামাসা করিতে বড় ভালবাসিতেন, রহস্য করিয়া গম্ভীর-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কবিতা টবিতা লিখিতে পার?" বালক অমনি সপ্রতিভভাবে মৃদুস্বরে বলিল "হাঁ পারি।" আমরা ভাবিলাম—লোকটা পাগল না কি? যদুবাবু অধিকতর কৌতূহলী হইয়া রহস্যচ্ছলে আবার বলিলেন—"তা বাঃ, বেশ বেশ। দেখ, এই কেদার আমায় আমার প্রেয়সী 'তারা'র নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া চলিয়াছে! বল ত বাপু, এমনি করিয়া কি ভদ্রলোককে দুঃখ দিতে হয়? তুমি এই বিষয়ে একটি কবিতা আমায় লিখিয়া দাও দেখি!" বালক তৎক্ষণাৎ একখানি চোতা কাগজে পেন্সিল দিয়া ফস্ ফস্ করিয়া একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তাহার প্রথম দুই ছত্র এখনও আমার মনে আছে:—

"কেদার দেদার দুখ দিলেন আমায়
তারা ধনে হারা করে' আনিয়া হেথায়।" ইত্যাদি।

আমরা জানিতাম না—এই বালকই তখনকার উদীয়মান কবি রাজকৃষ্ণ রায়। আজ বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি—তাঁহার রচিত নাটক এখনও কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গ-সাহিত্যে আদরের বস্তু।"

বাঙ্গালীর নাম ইংরাজী কায়দায় লিখিলে যে কি গোলযোগ হয়, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিগত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে যে সমস্ত সদস্য সরকার-পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই নাম ইংরাজী কায়দায় লিখিত হইয়াছিল। তাঁহাদের

মধ্যে একটী নাম ছিল মিঃ এস, এন. রায় (Mr. S. N. Rai.) এই এস, এন, রায় নাম দেখিয়া আমরা বিগত মাসের 'ভারতবর্ষে' পূর্ণ নাম বাঙ্গালায় লিখিয়াছিলাম শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়। আমরা পরে জানিতে পারিলাম যে, এই এস. এন, রায় আমাদের বেহালার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় নহেন, এ এস, এন, রায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়। ইংরাজী কায়দায় নাম প্রকাশিত হওয়াতেই আমরা এই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় তিন নম্বর আইনের বিপক্ষেই ভোট দিয়াছিলেন।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের জন্মদিন ১২ই মাঘ তারিখে তাঁহার জন্মস্থান যশোহর সাগরদাঁড়িতে একটী সম্মেলনের আয়োজন হয়। এই উপলক্ষে কবিবরের অমর কবিতা 'কপোতাক্ষ নদ' প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ হইয়া তাঁহার বড় সাধের কপোতাক্ষ-তীরে আম্রকাননে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নদীয়ার খ্যাতনামা সাহিত্যিক, অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর এই প্রস্তর-ফলক নিজব্যয়ে উৎকীর্ণ করাইয়া সকলের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর এই স্মৃতি-স্তম্ভ উন্মোচনের জন্য মধু-তীর্থ সাগরদাঁড়িতে গমন করিয়াছিলেন; এবং কলিকাতা হইতে মধু-স্মৃতির লেখক কবিভূষণ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, কবিবর শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়গণ এই উপলক্ষে সাগরদাঁড়ি গিয়াছিলেন। ধানদিয়ার জমিদার ও কলিকাতার খ্যাত-নামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত কুমুদমোহন দত্ত মহাশয়ের আতিথ্য-সৎকার ও সৌজন্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। স্থির হইয়াছে প্রতি বৎসর মহাকবির জন্মদিন ১২ই মাঘে সাগরদাঁড়িতে উৎসব হইবে।

আগামী গুড্ ফ্রাইডের ছুটীতে ঢাকা মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। বিগত বৎসরে যখন রাধানগরে সম্মেলনের অধিবেশন হয়, সেই সময় হিন্দুর পুরাতন রাজধানী রামপালে সম্মেলনের অধিবেশন করিবার জন্য রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় নিমন্ত্রণ করেন। রামপাল এখন জঙ্গলাকীর্ণ; পথঘাটেরও তেমন সুবিধা নাই; বাসস্থানের ব্যবস্থা করাও একপ্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। এই কারণে রামপালের নিকটস্থ মুন্সীগঞ্জেই সম্মেলনের অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছে; সাহিত্যিকগণ যাহাতে রামপাল দেখিতে যাইতে পারেন, তাহার বন্দোবস্ত করা হইবে। আগামী সম্মেলনে নাটোরের মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর প্রধান সভাপতি পদে বৃত হইয়াছেন ও সাহিত্য-শাখার সভাপতি হইয়াছেন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ইতিহাস-শাখার সভাপতি হইয়াছেন দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়; বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইয়াছেন শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়, এবং দর্শন-শাখার সভাপতি হইয়াছেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত মহাশয়। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছেন।

বিগত ২৬শে মাঘ রবিবার অপরাহ্ণকালে বৈদ্যবাটী যুবক-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনে বঙ্গের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অভিনন্দিত করা হয়; প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সর্ব্বাংশে উপযুক্ত সাহিত্য-রথীকে যথাযোগ্য ভাবে অভিনন্দিত করিয়া বৈদ্যবাটী যুবক-সমিতিই সম্মানিত হইয়াছেন। এই সম্মেলনে কলিকাতা ও বৈদ্যবাটী অঞ্চলের অনেক গণ্যমান্য সাহিত্য-সেবক উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। আমরা বৈদ্যবাটী যুবক সমিতির এই অনুষ্ঠানের প্রশংসা করিতেছি।

বিগত মে মাসে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ঝাড়ুদারেরা ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্যে অনুপস্থিত হয়। তাহারা বলে যে, তাহারা যে বেতন পায়, তাহাতে তাহাদের কুলায় না; সেইজন্য তাহাদিগকে কাবুলীদিগের নিকট অতিরিক্ত সুদ দিয়া টাকা ধার করিতে হয় এবং সে ধার শোধ দিবার কোন উপায় না থাকায় তাঁহাদের

অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত, তাহারা যে সকল মুদীর নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে, তাহাদিগের নিকট মূল্য বাকী রাখিতে হয় বলিয়া মুদীরা বাজার-দর অপেক্ষা তাহাদের নিকট অধিক দরে জিনিস দেয়। তাহাদের এই দুর্দ্দশা দূর না করিলে তাহারা মিউনিসিপালিটীর চাকরী করিবে না। মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারীরা তিন দিন ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে পারিলেন না। অবশেষে, মিউনিসিপালিটীর মেয়র শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তাহাদিগকে একত্র করিয়া বলিলেন যে, তিনি এক মাসের মধ্যে তাহাদের এই অসুবিধার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া ঝাড়ুদারেরা চতুর্থ দিনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সুযোগ্য মেয়র ও সদস্যগণ ঝাড়ুদার ও সামান্য বেতনের নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগের উপরিউক্ত অসুবিধা দূর করিবার জন্য যে সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহারই দিকে দেশের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এবং সেই ভাবে নিজেদেরও ব্যবস্থা করিবার জন্য আমরা কথাটা তুলিলাম। মিউনিসিপালিটীর সদস্যগণ নিম্ন কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া করদাতৃদিগের বোঝা ভারী করেন নাই; তাঁহারা যে সুব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা এই। এই ব্যবস্থার মূলে যিনি ছিলেন, তাঁহার নাম এখানে শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতেছি,—তিনি দুগ্ধ যোগান কমিটীর সুযোগ্য ডেপুটী চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। তিনিই নিম্নলিখিত ব্যবস্থা মিউনিসিপাল সভায় উপস্থাপিত করেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেই ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। ব্যবস্থা হইল যে, কুড়ি হাজার টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার ১ ও ৪ নম্বর ডিষ্ট্রীক্টে দুইটী খাদ্যদ্রব্যের ডিপো সংস্থাপিত হইবে। এই মূলধন সংগ্রহের জন্য একটা সমবায় সমিতি হইবে; মিউনিসিপালিটীর অতি অল্প বেতনের ঝাড়ুদার মেথর ও ঐ শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা এই সমবায় সমিতির মেম্বর হইবে। ঐ কুড়ি হাজার টাকা তুলিবার জন্য আট হাজার অংশ বিক্রয় করা হইবে; সুতরাং, প্রতি অংশের মূল্য হইবে আড়াই টাকা। এই আড়াই টাকা প্রত্যেক অংশীর বেতন হইতে মাসিক চারি আনা হিসাবে কাটিয়া লইয়া দশমাসে সমস্ত টাকা তুলিয়া লওয়া হইবে। কিন্তু এখনই ত কুড়ি হাজার টাকা উঠিতেছে না; এ জন্য মিউনিসিপালিটী বিনা সুদে ছয় বৎসরের জন্য দশ হাজার টাকা ধার দিবেন; সমিতি এই ধার শোধের জন্য প্রতি মাসে দুই শত টাকা করিয়া মিউনিসিপালিটীকে দিবেন। এই সমিতি হইতে সস্তা দরে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করা হইবে; বাজার হইতে না কিনিয়া, যাহারা দ্রব্যাদি উৎপন্ন করে, তাহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিলে যে খুব সস্তায় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, তাহা না বলিলেও চলে; কারণ চার-পাঁচ হাত ঘুরিয়া, চার পাঁচ পক্ষকে লাভের অংশ দিয়া জিনিস যখন মুদীর দোকানে পৌঁছে, তখন সে জিনিসের দর যে কত বাড়িয়া যায়, তাহা সকলেই জানেন। মিউনিসিপালিটীর সমবায় সমিতি এই অংশীদিগকে বাজার হইতে অনেক সস্তা দরে জিনিস সরবরাহ করিতে পারিবেন এবং খরচখরচা বাদে কিছু লাভও করিতে পারিবেন। এই লাভও অংশীদিগের মধ্যে বিতরিত হইবে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী এই প্রকার দুইটী ডিপো ১ ও ৪ নম্বর ডিষ্ট্রীক্টে খুলিয়া সামান্য বেতনের কর্ম্মচারীদিগের অসুবিধা যে কি করিয়া দূর করিয়াছেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

এখন আমাদের কথা হইতেছে এই যে, যে ভাবে কলিকাতা মিউনিসিপালিটী সামান্য বেতনের কর্ম্মচারীদিগের অসুবিধা দূর করিলেন, এই প্রকার সমবায় ডিপো কি কলিকাতায়, অন্যান্য সহরে ও মফস্বলের গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না? আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের কষ্টের কথা সকলেই জানেন। এই কলিকাতা সহরেই এমন অল্প বেতনভোগী ভদ্রলোক আছেন, যাঁহাদের ভরণ-পোষণ যে কি ভাবে নির্ব্বাহিত হয়, তাহা ভগবানই জানেন। নিম্ন শ্রেণীর কুলী মজুরেরা স্ত্রী-পুরুষে উপার্জ্জন করে, ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রোজগার করিয়া থাকে; ভদ্র গৃহস্থের সে উপায় নাই। হয় ত একজন সামান্য উপার্জ্জন করেন, আর তাঁহার অবশ্য-প্রতিপাল্য দশজন আছে। তাঁহাদের কষ্টের অবধি নাই। আমরা এমন

অনেক ভদ্র গৃহস্থের কথা জানি, যাঁহারা দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পান না; মহাজন ও কাবুলীর কাছে যাঁহাদের মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকাইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থের জন্ত পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে কি উপরিউক্ত প্রকার সমবায় ডিপো প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না? এ কার্য্য ত তেমন কঠিন বা আয়াস-সাধ্য নহে; দুই চারিজন ধনী যদি কলিকাতা মিউনিসি-পালিটীর মত, কিছু দিনের জন্ত দশ কুড়ি হাজার টাকা বিনা সুদে মূলধন দেন, তাহা হইলেই এই প্রকারের ডিপো প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ধনীর মূলধন মারা যাইবার কোন আশঙ্কাই নাই; কারণ, তাঁহারা এবং সমবায়ের অংশীরাই ত সমিতির সদস্ত হইবেন; এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই অংশের সমস্ত টাকা আদায় হইয়া যাইবে। আমাদের দেশের কত শিক্ষিত যুবক, কত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী সামান্ত বেতনের চাকরীর জন্ত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়া, কত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াও অকৃতকার্য্য হইতেছেন, তাঁহারা কি এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন না? এই কলিকাতা সহরের ভিন্ন ভিন্ন মহল্লায় কি এই ভাবের গোলা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর নহে? আমরা জানি, এই কলিকাতা সহরেই এই প্রকার একটী সমবায় ডিপো আছে। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ব্যবস্থামত এবং উক্ত কলেজের অধ্যাপকদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় উক্ত কলেজের ছাত্রাবাসগুলির দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্ত এই প্রকার ষ্টোর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার কার্য্যও ভাল রূপে চলিতেছে। কলিকাতায় আর কোথাও এ চেষ্টা হইয়াছে কি না, তাহা আমরা জানি না। মফস্বলের দুইটী স্থানের সংবাদ আমরা জানি। পূর্ব্ববঙ্গ রেললাইনের কাঁচড়াপাড়া রেলকারখানায় এই প্রকার সমবায় ডিপো আছে; আর উত্তরবঙ্গে সৈদপুরের রেলকর্ম্মচারীদিগের একটী ডিপো আছে। আমরা শুনিয়াছি, এই সকল সমবায় সমিতির অংশীরা যে কেবল অল্প মূল্যে দ্রব্যাদিই পান, তাহা নহে,—বৎসরান্তে লাভের হিসাবেও তাঁহারা যথেষ্ট অর্থ পান। এই দুর্ম্মূল্যের দিনে আমাদের এই প্রস্তাব কি দেশহিতৈষী ও দেশ-নেতৃগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না? যত যা বলুন, অন্নচিন্তা সকলের অপেক্ষা প্রধান চিন্তা। এই অন্নচিন্তার সমাধান করিলে তবে অন্ত কথা।

চন্দননগরের অক্লান্তকর্ম্মা দেশসেবক, সুধী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি চন্দননগরে প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া এত দিন তাহার কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। সকলেই জানেন যে, এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য—দেশের লোক যাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়া মানুষ হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত মতিলাল বাবু প্রভৃতি ঋণজালে জড়িত হইয়াও স্বীয় সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই। তাঁহার সম্পাদিত 'প্রবর্ত্তক' নামক সাময়িক পত্রখানিও অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছিল। কিন্তু, কাহার প্ররোচনায় বলিতে পারি না, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট মতিলাল বাবুর এই সত্কার্য্য অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ও তাঁহার সম্পাদিত 'প্রবর্ত্তক' পত্র-খানিকে ভাল দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই; তাঁহাদের ধারণা—মতিবাবু রাজদ্রোহ প্রচার করিতেছেন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ বিপ্লববাদীদিগের আড্ডা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তিনমাসের জন্ত 'প্রবর্ত্তকে'র প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমরা নিয়মিত ভাবে 'প্রবর্ত্তক' পাঠ করিয়া আসিতেছি; কিন্তু ইহাতে রাজ-দ্রোহের গন্ধ আমরা কোন দিনই পাই নাই।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্য প্রণীত "প্রশান্ত" প্রকাশিত হইল। মূল্য—১৷৹।

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ছোট পাতা" প্রকাশিত হইল। মূল্য—১৷৹।

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় সঙ্কলিত "দ্বিজেন্দ্র-গীতি" স্বরলিপি দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। মূল্য—১৷৹।

শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত নূতন উপন্যাস "অবাক্" প্রকাশিত হইল। মূল্য—১৷৹।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার সম্পাদিত 'স্বর্ণময়ী সিরিজে'র প্রথম গ্রন্থ "দেশভক্তি বা আত্মোৎসর্গ" প্রকাশিত হইল। মূল্য—১৲।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea.
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1. Cornwallis Street. CALCUTTA.

ঊষা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন গুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

ভারতবর্ষ

চৈত্র, ১৩৩১

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাদশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

ওঁ

প্রণবের ব্যাখ্যা

সত্যভূষণ শ্রীধরণীধর শর্ম্মা

১৩৩০ সালের মাঘ মাসের "ভারতবর্ষে" (পৃষ্ঠা ২৩১—৩২) প্রকাশিত "প্রণবাদিতে সকলেরই অধিকার" শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে—"হিন্দুদিগের অন্য সংখ্যাতীত বিষয়ে বিরোধ সত্বেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকারে হিন্দুমাত্রেই একমত। ব্রাহ্মণ-পরিত্যক্ত হিন্দু আছে ব্রাহ্মণত্যাগী হিন্দু নাই। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে উৎপত্তিকুল ও সম্প্রদায় অনুসারে যতই ভেদ থাকুক না কেন, ওঁকার ও গায়ত্রী গ্রহণে ব্রাহ্মণ নামধারী ব্যক্তি মাত্রেই একমত।" বিষয়টীর সবিস্তার আলোচনার জন্য বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা।

যদি খ্রীষ্টিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তোমার ধর্ম্ম কি, খ্রীষ্টিয়ান তাহার ধর্ম্মমূলক বিশ্বাস একে একে বর্ণনা করিতে পারিবেন। সেই বিশ্বাস যাহার আছে সে খ্রীষ্টিয়ান, যাহার নাই সে খ্রীষ্টিয়ান নহে। মুসলমানকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে মুসলমান কলমার আবৃত্তি করিবেন। বৌদ্ধ পাঁচশীলা পড়িবেন। কিন্তু হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলে, এমন কোন উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না যে, একজন হিন্দু যাহা হিন্দুধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস বলিয়া উল্লেখ করিবেন, তাহা অপর কোন হিন্দু বিনা আপত্তিতে তথাস্তু বলিয়া গ্রহণ করিবেন। পুনর্জ্জন্ম, কর্ম্মফল প্রভৃতি যে সকল মতে সাধারণতঃ হিন্দুদিগের বিশ্বাস, তাহাতে সাধারণতঃ বৌদ্ধদিগেরও বিশ্বাস। এজন্য ঐ সকল মত হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব বলিয়া উল্লেখের অযোগ্য।

এরূপ স্থলে অন্য পন্থা অবলম্বন না করিলে, হিন্দুত্ব যে কি, তাহার নির্দ্ধারণ অসম্ভব। প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক যে, হিন্দু এক জাতির নাম ও হিন্দু এক ধর্ম্মের নাম। এই ভারতবর্ষে খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান ভিন্ন অপর যে সকল লোক

বাস করে, তাহাদের সাধারণ জাতিবাচক নাম হিন্দু। এ নাম প্রাচীন নহে। মুসলমান প্রভাবের কালে এই নামের সৃষ্টি না হইলেও ইহার এদেশে সাধারণ্যে প্রচার হয়। প্রাচীন পারস্য ভাষায় সকারের স্থলে 'হ'কার উচ্চারিত হইত, যেমন এখনও পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত হয়। তদনুসারে ভারতের পশ্চিম সীমাস্থ প্রাচীন সিন্ধুনদই প্রাচীন পারষিকের নিকট 'হিন্দু' বলিয়া পরিচিত ছিল। জেন্দা বেস্তায় 'হপ্ত হিন্দ' শব্দের উল্লেখ আছে, এ কথা তদ্বিষয়ক পণ্ডিতেরা বলেন। এই হিন্দু শব্দই শব্দের আদিতে হ'কার উচ্চারণে অক্ষম গ্রীকদিগের মুখে 'ইন্দস' ইন্দিয়া এই আকার ধারণ করে। ইদানীন্তন পারস্য ভাষায় কৃষ্ণবর্ণ এই অর্থে হিন্দু শব্দের প্রচলন আছে। ভারতবাসী অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া পারস্যবাসীর নিকট হিন্দু। তন্ত্র বিশেষে উক্ত হইয়াছে যে, "হীনং দূষয়তীতি হিন্দুঃ।" সে যাহা হউক, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান ভিন্ন ভারতবাসীই যে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী, ইহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। ভুটিয়া, পাহাড়ী, কুকী প্রভৃতিকে বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া কোন মতেই উল্লেখ করা যায় না। ইহা স্পষ্ট যে, এক দিক হইতে চাহিলে হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ কোন সাধারণ বন্ধনী দেখিতে পাইবেন না।

অতএব হিন্দুর সাধারণ বন্ধনী আবিষ্কারের জন্য অন্য দিক হইতে অনুসন্ধান আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ভিন্ন হিন্দু নাই। হিন্দুনামধারী যাহাদিগকে ব্রাহ্মণ পরিত্যাগ করেন, তাহারাও ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ ও অমান্য করেন না। ব্রাহ্মণত্যক্ত হিন্দু আছে; কিন্তু ব্রাহ্মণত্যাগী হিন্দু নাই। ব্রাহ্মণগণ পঞ্চ দ্রাবীড় ও পঞ্চ গৌড় ও তাহার শাখা-প্রশাখা লইয়া বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। যৌন সম্বন্ধের কথা দূরে থাকুক, এই সকল শ্রেণীর মধ্যে সহভোজন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ; এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্যের নিয়মও বিভিন্ন। কিন্তু যেমন ব্রাহ্মণ ভিন্ন হিন্দু নাই; তেমনই প্রণব ও গায়ত্রী ভিন্ন ব্রাহ্মণ নাই। যেমন হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, তেমনই সমস্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে ওঁকার গায়ত্রীর প্রাধান্য সর্ব্ববাদিসম্মত। বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়বিধ শাস্ত্রেই প্রণব ও গায়ত্রীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। গায়ত্রী সপ্রণব। ওঁকার উচ্চারণের পরে গায়ত্রীর উচ্চারণ। যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ত্যাগী সন্ন্যাসী, তাঁহারা শিখা সূত্রের সহিত গায়ত্রী ত্যাগ করিলেও প্রণব ত্যাগ করেন না। এজন্য ওঁকারকে হিন্দুধর্ম্মের সামান্যগুণ এবং অন্য ধর্ম্মের সহিত প্রভেদক বিশেষ গুণ বলিয়া উল্লেখ দোষাবহ নহে। বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষে সপ্রণব মন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়; কিন্তু শুদ্ধ ওঁকারের ব্যবহার অবিদিত। যদি বা কুত্রাপি ব্যবহার থাকে, তাহা হইলেও প্রচলিত বৌদ্ধশাস্ত্রে তাহার প্রাধান্য লক্ষিত হয় না। অন্ততঃ হিন্দু-দিগের মুখ্য শাস্ত্র বেদে যেরূপ ভাবে ওঁকারের ব্যবহার ও পরমার্থ সাধনে প্রয়োগ, তাহা অন্যত্র নাই—এ কথা প্রতি-বাদের আশঙ্কাশূন্য। এ কারণ হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্ম আবিষ্কারার্থ ওঁকারের শাস্ত্রীয় প্রয়োগ যথাযথ ভাবে আলোচ্য।

হিন্দুগণ সাধারণতঃ নিজধর্ম্মকে সনাতন বলিয়া গ্রহণ করেন। অর্ব্বাচীনশব্দ মূলতঃ যাহার অর্থ পশ্চাদ্বর্ত্তী তাহা অধম এই অর্থে ব্যবহৃত। এক বেদ শাস্ত্রই নিত্য বা সনাতন বলিয়া গৃহীত। বেদের নিত্যতা সম্বন্ধে বেদোক্তি আছে। যথা—

> যো ব্রহ্মাং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবৈ
> বেদাংশ্চ প্রহিনোতি তস্মৈঃ।
>
> —শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ। ৬।১৮

অর্থাৎ যিনি জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার অন্তরে বেদ সকল প্রেরণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে দ্রষ্টব্য যে—পরমার্থ-জ্ঞান সহজ জীব-বুদ্ধির অপ্রাপ্য। সেই জ্ঞান বিনা জীবের শ্রেয়ঃ সিদ্ধ হয় না। যাহার বাক্য-ময় প্রকাশের নাম শ্রুতি (১) তাহা পরমেশ্বরী লিখিত পুস্তিকারূপে ব্যক্তি বিশেষে সমর্পণ অথবা হঠাৎ কোন ব্যক্তি বিশেষের মুখ হইতে নির্গত করেন নাই। সেই জ্ঞান তাঁহার আদেশে যিনি সৃষ্টি করেন, তাঁহার দ্বারাই জীব (২) কুলে সর্ব্বকালে প্রচারিত রাখিয়াছেন—ইহাই বেদের অভিমত এবং এই জন্যই বেদ নিত্য। শব্দ সৃষ্টির পূর্ব্বেও বেদ। সেই বেদ নিত্য বলিয়া কোন বিশেষ স্থানে, কালে, সমাজে বা ব্যক্তিতে ইহার পর্য্যবসান সম্ভবপর নহে। বেদে যে সকল নাম আপত-দৃষ্টিতে ব্যক্তির নাম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, তাহা কোন বিশেষ ব্যক্তির নাম নহে। ব্যক্তি বিশেষের উদয় স্থান ও কাল বিশেষকে অপেক্ষা করে।

---

(১) ইংরেজিতে প্রতি বাক্য Revelation.

(২) "God has never kept Himself without a witness."

ব্যক্তির অভিব্যক্তির বা ব্যক্তি ভাবের আদি আছে, অন্ত আছে, স্থান নির্ণয় আছে। এজন্য নিত্য বেদে অনিত্য ব্যক্তির নাম আছে এরূপ হইলে, যে বেদ-বাক্যে সেই নামের উল্লেখ, সেই বাক্য যে ব্যক্তির সেই নাম তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা অদেশ-বর্ত্তী হইতে পারে না অর্থাৎ দেশ কালের অতীত বা তৎ-কর্ত্তৃক অপরামৃষ্ট নিত্য নহে। অতএব উক্ত প্রকারের নাম কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে, ব্যক্তিত্বভাব বিশেষের নাম। সেই ভাবাপন্ন ব্যক্তি সর্ব্বকালে সর্ব্ব স্থানেই উদিত হইতে পারেন—ঐ প্রকার উদয়ের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। নিত্য যে বেদবাক্য তাহার অর্থ স্মরণ করিয়া তাহারই দেশকালপাত্রানুসারে প্রয়োগার্থে ব্যবহার ও পরমার্থ বিষয়ক স্মৃতি শাস্ত্র। পূর্ব্ব মীমাংসকগণের ইহাই অভিমত কি না, পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।

হিন্দু গৃহীত অপর এক শ্রেণীর শাস্ত্র আছে, যাহার নাম তন্ত্র। বেদ যেমন ব্রহ্মাকে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত, তেমনি তন্ত্রশাস্ত্র মহাদেব ও তাঁহার অংশ সম্ভূত ভৈরব-দিগকে অবলম্বন করিয়া প্রচারিত। বৈদিক আচার কাল সহকারে অসাধ্য হইয়াছে। এক্ষণে তান্ত্রিক আচারই ব্রাহ্মণ-প্রমুখ সমাজের একমাত্র আশ্রয়। আচার তান্ত্রিক হইলেও বিচার বেদ বিরুদ্ধ হইলে হেয়। ইহা সর্ব্বজনসম্মত। ইহাতে মতভেদ নাই।

প্রণব সর্ব্বশাস্ত্রানুসারে পরমাত্মার নামের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে প্রাপ্তব্য যে,

ওমিত্যে তদক্ষরমুদ্গীথ মুপাসীত।
ও মিত্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানং॥

—খণ্ড ১।১।

অর্থাৎ ওম ইহাই উদ্গীথ। ইহাকে উপাসনা করিবে। ওঁ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সামগান করে। এজন্য ওঁকারের নাম উদ্গীথ। তাহারই এখানে উপব্যাখ্যান অর্থাৎ উপাসনার প্রকার বিভূতি ও ফল কথন। ভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের উক্তি এই :—

তদক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্টং অস্মিন্ হি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি। প্রিয় নাম গ্রহণ ইব লোকঃ। তদিহ ইতি পরং প্রযুক্তং অভিধায়কত্বাৎ ব্যাবর্ত্তিতং শব্দ স্বরূপ মাত্রং প্রতীয়তে। তথাচ অর্চ্চাদিবৎ পরমাত্মনঃ প্রতীকং সম্পদ্যতে। এবং নামত্বেন প্রতীকত্বেন চ পরমাত্মো-পাসন সাধনং শ্রেষ্ঠং ইতি সর্ব্ব বেদান্তেষু অবগতং। জপ কর্ম্ম স্বধ্যায়ান্তেষুচ বহু প্রয়োগাৎ প্রসিদ্ধমস্য শ্রৈষ্ঠং। (৩)

অর্থাৎ, "ওঁ এই যে অক্ষর ইহা পরমাত্মার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী নাম। ইহার প্রয়োগে তাঁহার প্রসন্নতা হয়—যেমন লোকের প্রিয় নাম গ্রহণে প্রসন্নতা। তবে এখানে ইতি শব্দের প্রয়োগ বশতঃ নাম ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ওঁকার শব্দ মাত্র অভিপ্রেত বলিয়া প্রতীত হইতেছে এবং প্রতিমাদির ন্যায় আত্মার প্রতীক বলিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। সর্ব্ব বেদান্তে প্রাপ্ত যে, এই প্রকার নাম ভাবে বা প্রতীক ভাবে পরমাত্মার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ সাধন। জপ কর্ম্ম ও স্বাধ্যায়ের আদ্যন্তে বহু প্রয়োগ বশতঃ ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রসিদ্ধ।" উক্ত আচার্য্য বাক্যানুসারে পরমার্থ সাধক স্বেচ্ছাক্রমে দুই ভাবের অন্যতর ভাবে ওঁকার গ্রহণে সক্ষম। এক ভাবে ওঁকার পরমাত্মার বাচক বা নাম এবং অন্য ভাবে তাঁহার অর্চ্চা, প্রতিমা, প্রতীক অর্থাৎ রূপক বা চিহ্ন। প্রথমোক্ত ভাবে ওঁকার অর্থযুক্ত। সেই নাম নিজের অর্থ দ্বারা বুদ্ধিকে পরমাত্মারই অভিমুখী করে। ওঁকার নামে বুঝায়—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা পরমেশ্বর। যাঁহার কার্য্য জ্ঞেয়, স্বরূপ অজ্ঞেয়, চিন্মাত্র সত্তা মাত্র, আনন্দ মাত্র। কবির উক্তি—

নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ সৃষ্টে
কেবলাত্মনে।
গুণত্রয় বিভাগায় পশ্চাদ্
ভেদমুপেয়ুষে॥

সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণ মনের আড়াল করিয়া তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিলে তিনি একাক্ষর ওঁকার। এই তিনটী গুণ তাঁহারই শক্তি; তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে বর্ত্তাইতে অক্ষম। এজন্য ইহারা সত্তা বিহীন,—সত্তাস্বরূপ তিনি ইহাদেরও সত্তা। সেই সত্তা অখণ্ড, যেহেতু সত্তার দ্বারা সত্তার বিভাগ হওয়া অসম্ভব। আর অসত্তা যাহা নাস্তি তাহার দ্বারা বিভেদ বা অপর কিছুই হইতে পারে না। যাহা নাই তাহার কার্য্যও নাই—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে সমর্থ নহেন। উল্লিখিত শক্তি বা গুণের এক

(৩) ভাষ্যের অবশিষ্ট অংশ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অনাবশ্যক।

একটী ভিন্ন করিয়া তাঁহার বিশেষণ রূপে গৃহীত হইলে তিনি ব্রহ্মা স্থষ্টি কর্ত্তা, বিষ্ণু পালন কর্ত্তা ও মহেশ্বর লয় কর্ত্তা। যোগ সাধকের পক্ষে যিনি ওঁকার তিনিই ক্লেশ-কর্ম্মাদি বিরহিত সর্ব্বজ্ঞতার বীজ স্বরূপ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর। "তস্যবাচকঃ প্রণবঃ" (৪) অর্থাৎ তাহার নাম হইতেছে প্রণব। "তজ্জপস্তদর্থ ভাবনং॥" অর্থাৎ তাহার জপ ও তাহার অর্থ যে ঈশ্বর তাঁহার ভাবনা। তাহাতে যে কি হয় তাহা পরের সূত্রে প্রকাশিত; যথা—ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোপ্যন্তরায়া ভাবাশ্চ; অর্থাৎ তাহাতে ঈশ্বরের স্বরূপ বোধ ও তৎপক্ষে বিঘ্নের অভাব হয়। ভগবদ্গীতাতেও ইহাই প্রাপ্তব্য। যথা—

ওঁ মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যবহরণ্ মামনুস্মরণ্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং সযাতি পরমাং গতিং।

অঃ ৮।১০

অর্থাৎ "ওঁ এই যে একাক্ষর ব্রহ্ম তাঁহাকে উচ্চারণ ও পরমেশ্বরকে যথোপদিষ্ট ভাবে স্মরণ পূর্ব্বক যিনি দেহত্যাগ করিয়া যান, তিনি পরম অর্থাৎ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠগতি যে মুক্তি তাহা লাভ করেন"। ভগবান মনুর ইহাই উপদেশ। যথা—

ক্ষরন্তি সর্ব্ব বৈদিক্যো জুহোতি যজ তি।
অক্ষরস্ত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্মচৈব প্রজাপতিঃ॥

অঃ ২।৮৪

অর্থাৎ, "বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাগ সকলেই স্বভাবতঃ এবং ফলতঃ নাশকে পাইবেন; কিন্তু জগতের পতি যে ব্রহ্ম, তৎস্বরূপ ওঁকারের নাশ কদাপি হয় না।"

(রামমোহন রায় কৃত অনুবাদ)

উদ্ধৃত স্মৃতির মূল যে শ্রুতি তাহা এই। যথা—

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তারণিং
ধ্যান নিমর্থণাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্ নিগূঢ় বৎ।

—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ ১।১৪

অর্থাৎ, নিজের দেহকে অরণি কি না অগ্নি উৎপাদনের কাষ্ঠ ও প্রণবকে উপরের অরণি করিয়া ধ্যানাভ্যাস রূপ ঘর্ষণ পূর্ব্বক কাষ্ঠ গুপ্ত অগ্নির ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় দেবকে দর্শন করিবে।

আচার্য্যোক্ত পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে অর্চ্চা, প্রতিমা ও প্রতীক শব্দের অর্থ চিন্তায় ওঁকার অবলম্বনে পরমার্থ সাধন সম্বন্ধীয় শ্রৌত উপদেশ অক্লেশে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা। অর্চ্চা শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত। এই শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিমা।

সাধন বা পূজাদি বিষয়ে প্রতিমা শব্দে চক্ষুর গোচর মূর্ত্তি বিশেষ বুঝায়। কিন্তু প্রণব, শব্দ বলিয়া শ্রুতি গোচর মাত্র, দৃষ্টিগোচর নহে। তবে প্রণব কি প্রকারে ব্রহ্মের প্রতিমা হইবার সম্ভাবনা? অতএব প্রতিমা শব্দের ধাতু প্রত্যয় অনুসারে যে অর্থ হয়, তাহাই অনুসন্ধেয়। প্রতিমীয়তে অনয়া ইতি প্রতিমা; অর্থাৎ যাহার দ্বারা মুখ্যের বা আসলের সাদৃশ্য মাপা যায়, তাহাই প্রতিমা। উপাসনার সৌকর্য্যার্থে ধরা যাউক যে, ব্রহ্মের প্রতিমা হইতেছে শব্দ। এইটি ধরিয়া লইয়া তবে প্রণবকে ব্রহ্মের প্রতিমা বলা নির্দ্দোষ। নতুবা ব্রহ্মের প্রতিমা আছে, এ সিদ্ধান্ত শ্রুতিবিরোধ বশতঃ দোষাবহ। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি (অঃ ৪।১৯।) দেখাইতেছেন যে,

নতস্য প্রতিমাস্তি যস্যনাম মহদযশঃ।

এখানে ভাষ্যে প্রাপ্তব্য যে, "তস্যৈব ঈশ্বরস্য অখণ্ড সুখানুভবত্বাৎ এতাদৃশ দ্বিতীয়াভাবাৎ প্রতিমা উপমানাস্তি। যস্যনামমহদ যশঃ=যস্য (অর্থাৎ) ঈশ্বরস্য নাম (অর্থাৎ) অভিধান মহৎ (অর্থাৎ) দিগাদ্যনবচ্ছিনং পরিপূর্ণং যশঃ (অর্থাৎ) কীর্ত্তিঃ"। অর্থাৎ ঈশ্বর অখণ্ড সুখের অনুভবত্ব; এজন্য তদ্রূপ দ্বিতীয়ের অভাববশতঃ তাঁহার প্রতিমা অর্থাৎ উপমা নাই। সেই ঈশ্বরের নাম মহদ্ যশঃ, অর্থাৎ দিক আদির দ্বারা অবচ্ছেদশূন্য সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ যশ, অর্থাৎ কীর্ত্তি। সুবোধ্য করিবার জন্য মূলে বিসন্দিপূর্ব্বক কএকটী চিহ্ন ও "অর্থাৎ" শব্দ কয়েকবার সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পণ্ডিত-গণ স্পর্দ্ধা ক্ষমা করিবেন। এখানে প্রতিমা শব্দ উপমা অর্থে আচার্য্য গৃহীত। এইরূপ অর্থভেদ গ্রহণেই উভয়ত্র এলাকাত্ব সংরক্ষিত। এক্ষণে প্রতীক শব্দের অর্থ চিন্তনীয়। আচার্য্যপাদ প্রণবকে ব্রহ্মের প্রতীক বলিতেছেন, অথচ প্রণবে ব্রহ্ম উপাসনায় মুক্তি—ইহাও শ্রুতির উপদেশ বলিতেছেন। যথা—

তানি এতানি উপাসনানি সত্ত্ব শুদ্ধি করত্বেন বস্তু তত্ত্বাবভাবকত্বাৎ অদ্বৈত জ্ঞানোপকারকাণি। আলম্বন

---

(৪) পাতঞ্জল যোগসূত্র। ১ম পাদ ২৭ ও পরবর্ত্তী সূত্র। ক্লেশ-অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগদ্বেষ, অভিনিবেশ।

বিষয়াকত্বাৎ সুখ সাধ্যানিক।—ছান্দোগ্য ভাষ্য ভূমিকা।

অর্থাৎ, উল্লিখিত এই সকল উপাসনা অন্তঃকরণের বৈশুদ্ধিকর বলিয়া বস্তুর সত্য ভাবের প্রকাশক এবং তদ্রূপ প্রকাশক বলিয়া অদ্বৈত জ্ঞানের উপকারক। উপরন্তু আলম্বন কিনা ধ্যানের আশ্রয়রূপ পদার্থ (উক্তরূপ) উপাসনার বিষয় বলিয়া তাহা সুখসাধ্য।

প্রতীক শব্দের আভিধানিক অর্থ অঙ্গ বা এক দেশ। এবং এই অর্থে প্রতীক উপাসনার যে ফল, তাহাও স্থানান্তরে প্রকাশিত। যথা—

অপ্রতীক আলম্বনাৎ নয়তি ইতি বাদরায়ণ উভয়থা অদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ। ব্রহ্মসূত্র। ৪।৩।১৫

এই সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য বলিতেছেন যে, "স্থিতমেতৎ কার্য্য বিষয়া গতির্ণপর বিষয়েতি। ইদমিদানীং সন্দিহ্যতে। কিং সর্ব্বান্ বিকারালম্বনাম বিশেষেনৈবমানব পুরুষঃ প্রাপয়তি ব্রহ্মলোক মত কাংশ্চিদেবতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তং ? সর্ব্বেষামেবৈষাং বিদুষামন্ত্র পরস্মাদ ব্রহ্মণো-গতিঃস্যাৎ। তথাহি "অনিয়মঃ সর্ব্বাষাম্" (ব্রঃ সূঃ ৩,৩।৩) ইত্যত্রোঽবিশেষেণৈবৈষাবিদ্যান্তরেষু অবতারিতেতি। এবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ অপ্রতীকাবলম্বনামিতি প্রতীকাব-লম্বনাম্ বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বানন্যান্ বিকারালম্বান্নযতি ব্রহ্ম লোকমিতি বাদরায়নাচার্য্য মন্যতে। নহ্যেবমুভয়থা ভাবমত্যুপগনে কশ্চিদ্দোষোঽস্তি। অনিয়ম ন্যায়স্য প্রতীকব্যাতিরিক্তেষ্বপ্যুপাসনেচুপপত্তিঃ! তৎক্রতুশ্চাস্যো-ভয়থাভাবস্য সমর্থক হেতু দ্রষ্টব্যঃ। যোহি ব্রহ্মক্রতুঃ সব্রাহ্মৈম্বর্য্যমাসীদেদিতি শ্লিষ্যতে। যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি ইতি শ্রুতেঃ। নতুপ্রতীকেষুব্রহ্মক্রতুত্ব মস্তি। প্রতীক প্রধানত্বাদুপাসনসা। নম্বব্রহ্মক্রতুমানা-পরপি ব্রহ্ম গচ্ছতি ইতি শ্রূয়তে। যথা পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াম্ 'সএনান্ ব্রহ্মগময়তি' ইতি। ভবতু। যত্রৈবমাহত্যবাদ উপলভ্যতে। তদভাবেঘোৎসর্পিকেন তৎক্রতুন্যায়েন ব্রহ্ম ক্রত্বুনামেতৎপ্রাপ্তি নেতরেষামি তি মন্যতে।

(কালীবর বেদান্ত বাগীশকৃত অনুবাদ।)

"সিদ্ধান্ত হইল যে, গতিশাস্ত্র (ব্রহ্মে গমন করে, এই কথা) কার্য্যব্রহ্মবিষয়ে পর্য্যবসিত। সম্প্রতি অন্য এক সংশয় এই যে, অমানব পুরুষেরা 'কি অবিশেষে সমুদায় উপাসকদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়? কি সে বিষয়ে কোনরূপ বিশেষ (নির্দ্দিষ্ট নিয়ম) আছে? কোন্ কোন্ ব্রহ্মবিকারাবলম্বী অমানব পুরুষ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হয়? (কি ব্রহ্মবিকারাবলম্বী মাত্রেই নীত হয়?) পাওয়া যায় কি? পাওয়া যায় যে, পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সমুদায় উপাসক ব্রহ্মলোকগামী হয়। "অনিয়মঃ সর্ব্বাষাম্" এই সূত্রে উক্ত বিষয়ের বিচার অবতারিত হইয়া কথিত প্রকার সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই পূর্ব্বপক্ষ তৎপ্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইল, অপ্রতীকাবলম্বীরাই ব্রহ্মলোকে নীত হয়। আচার্য্য বাদরায়ণ (ব্যাস) মানেন যে, প্রতীকোপাসক ব্যতীত অন্য যে কোন ব্রহ্মবিকারোপাসক, সকলকেই অমানব পুরুষেরা ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "অনিয়মঃ সর্ব্বাষাম্" পরে আবার বলা হইল, প্রতীকো-পাসক নহে, এই দুই কথা বা উভয় প্রকার গতি বলা হইল বলিয়া দোষ মনে করিও না। অর্থাৎ বিরুদ্ধ বলা হয় নাই। কারণ পূর্ব্বোক্ত অনিয়ম ন্যায় (সূত্র) প্রতীকো-পাসক ভিন্ন অন্য উপাসকের উদ্দেশে প্রবর্ত্তিত (এই ১৫ সূত্রের দ্বারা সে সূত্র সঙ্কোচার্থে পর্য্যবসিত হইবে)। এই উভয়থা ভাব অর্থাৎ একবার বলা হইয়াছে, সকলেই ব্রহ্মলোকে যায়, সে বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, আবার বলা হইল, প্রতীকোপাসক যায় না,—এই দ্বি প্রকার উক্তি তৎক্রতু ন্যায় সমর্থন করিতে সক্ষম আছে। বুঝিতে হইবে যে তৎক্রতু ন্যায়ই ঐ দ্বি প্রকার বলিবার কারণ। (ক্রতু সঙ্কল্প অর্থাৎ ধ্যান করা। তৎক্রতুন্যায় যে যাহা নিরন্তর ভাবে বা ধ্যান করে সে তাহা পায়, এই নিয়ম বা শ্রুতিমূল যুক্তি) যে ব্রহ্মক্রতু (ব্রহ্মধ্যানী) হয় সে যে ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য পাইবে তাহা বিচিত্র কি? পাওয়াই সঙ্গত। শ্রুতিও বলিয়াছেন "তাঁহাকে যে যে ভাবে ভাবে তাহার নিকট তিনি সেইরূপ হন।" ভাবিয়া দেখ, প্রতীক উপাসনায় (প্রতীক-দ্বারীভূত আলম্বন। যেমন প্রতিমা অথবা নাম।) ব্রহ্মক্রতুত্ব অবসন্ন হয় না অর্থাৎ তাহাতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মধ্যান হয় না। প্রতীক উপাসনায় প্রতীকই প্রধান, ব্রহ্ম তাহাতে অপ্রধান থাকেন। (সেই কারণে অর্থাৎ ব্রহ্মধ্যান না হওয়ায় সে ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য পায় না।) অব্রহ্ম-ধ্যায়ীরাও ব্রহ্মলোকে যায়, এ কথা শ্রুতিতে আছে সত্য। যথা ছান্দোগ্য পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় কথিত হইয়াছে—তাহা

ইহাদিগকে ব্রহ্ম পাওয়ায় ইত্যাদি। পরন্তু থাকিলেও বাধা হইতেছে না। আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন, যেখানে আহত্যবাদ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিধান আছে সে স্থানে তাহা অবশ্যই হইবে। যেখানে আহত্যবাদ নাই সেস্থানে সামান্যতঃ প্রবৃত্ত তৎক্রতু শাস্ত্রের দ্বারা নিশ্চয় করিবে যে, ব্রহ্মক্রতুরাই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, অন্যে নহে।"

অনুবাদের দোষগুণ পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন। বর্ত্তমানে ইহাই যথেষ্ট যে প্রতীক ও অপ্রতীক উপাসনার ফল বৈষম্য শাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া আচার্য্য সঙ্গত। বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় উদ্ধৃত সূত্রের টীকায় প্রতীক শব্দের বৃদ্ধ প্রয়োগ অনুসারে অর্থ করিয়াছেন যে, "আশ্রয়ান্তর প্রত্যয়স্যা শ্রয়ান্তরে প্রক্ষেপঃ প্রতীক ইতিহিবৃদ্ধাঃ" অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া যে প্রত্যয় বা অনুভব অন্য আশ্রয় যাহাতে সে প্রত্যয়ের অভাব সেই অন্য আশ্রয়ে সেই প্রত্যয়ের নিক্ষেপই প্রতীক ইহাই বৃদ্ধ প্রয়োগ। যে সকল প্রতীক-শ্রোত্য আহত্যবাদের বিষয় বলিয়া গ্রাহ্য ও অন্যবিধ বলিয়া যাহা অগ্রাহ্য তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কি? দুই ভিন্ন স্থানে দুই ভিন্ন অর্থে প্রতীক শব্দের প্রয়োগ, এই ধারণা করিলে বিষয়টি মনে রাখিবার পক্ষে সে বিষয়ে অনৈক্য। প্রতীক শব্দের অঙ্গ বা একদেশ এই রূঢ়ী বা প্রচলিত অর্থে ছান্দোগ্য ভাষ্যে "প্রতীয়তে প্রত্যেতি বা" এই অর্থে প্রতিপূর্ব্বকই ধাতুর উত্তর ইকন প্রত্যয় সিদ্ধ প্রতীক শব্দ—ইহাই কি পণ্ডিতসম্মত নহে। তথায় ইহার অর্থ চিহ্ন, যাহার দ্বারা ব্রহ্ম চিহ্নিত বা পরিচিত। প্রণবকে ব্রহ্মের পরিচায়ক চিহ্নরূপে গ্রহণ করিয়া প্রণব উপাসনায় বিশুদ্ধ সত্ত্বের অনায়াসে ব্রহ্মলাভ, ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মপ্রাপ্তি নামক সংসার বন্ধন বিমুক্তি হয়—ইহাই আচার্য্যের শ্রুতির অনুগত উপদেশ।

অপর দুইটী সূত্রের আলোচনায় বিষয়টী সুগমতর হইবার সম্ভাবনা। ব্রহ্ম সূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম পাদের ৪র্থ সূত্রটী এই। যথা—

"ন প্রতীকেন হিসঃ।"

(শঙ্কর ভাষ্য)

মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মম্। অথাধিদৈবত মাকাশো ব্রহ্মেতি। ছান্দ ৩।১৮।১ তথা আদিত্যোব্রহ্মেত্যা দেশঃ। (ছাঃ ৩।১৯।১) স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। (ছাঃ ৭।৫।৪) ইত্যেবমাদিষু প্রতীকোপাসনেষু সংশয়ঃ। কিং তেম্বপি আ... গ্রহকর্ত্তব্যোনবেতি। কিং যাবৎ প্রাপ্তং? তেম্বপ্যাত্মগ্র... এব যুক্তঃ। কস্মাৎ। ব্রহ্মণঃ শ্রুতিম্বাত্মত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ। প্রতীকানামপি ব্রহ্ম বিকারত্বাৎ ব্রহ্মত্বে সত্যাত্মত্বোপ পত্তেঃ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। সপ্রতীকেম্বাত্ম মতিং বধ্নীয়াৎ। নহ্যু পাসকঃ প্রীতকানি ব্যস্তাত্মত্বেনাকল্পয়েৎ। যৎ পুনঃ ব্রহ্ম বিকারত্বাৎ প্রতীকানাং ব্রহ্মত্বং ততশ্চাত্মত্ব মিতি। তদসৎ প্রতীকাভাব প্রসঙ্গাৎ। বিকার স্বরূপোপমর্দ্দনেনহি নামাদি জাতস্য ব্রহ্মত্ব মেবাশ্রিতং ভবতি। স্বরূপোপমর্দ্দশ্চচ নামাদিনাম কুতঃ প্রতীকত্বমাত্মাগ্রহো বা। নচ ব্রহ্মণ আত্মত্বাৎ ব্রহ্ম দৃষ্ট্যুপদেশেম্বাত্ম দৃষ্টিকল্প্যা কর্ত্তৃত্বাদ্য নিরাকরণাত্বৎ। কর্ত্তৃতাদি সর্ব্ব সংসার ধর্ম্ম নিরাকরণেন হি ব্রহ্মত্ব আত্মত্বোপদেশ স্তদ নিরাকরণেন চোপাসনা বিধানং। অতশ্চো পসকস্য প্রতীকে সমত্বা দাত্মগ্রহো নোপপদ্য তে ন। হিরু চক স্বস্তিকয়ো রিতরেতর আত্মত্বং অস্তি। সুবর্ণাত্মনৈব তু ব্রহ্মাব্রহ্মণৈকত্বে প্রতীকভাব প্রসঙ্গাভাবোচামঃ। অতোন প্রতীকেন আত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে।

(কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত অনুবাদ।)

"মন ব্রহ্ম, এইরূপ উপাসনা করিবে। ইহা অধ্যাত্ম উপাসনা। অনন্তর আধিদৈব উপাসনা। আধিদৈব উপাসনা আকাশ ব্রহ্ম, এইরূপে কর্ত্তব্য। "আদিত্য ব্রহ্ম, এতৎ-প্রকার উপাসনার উপদেশ আছে।" নামই ব্রহ্ম যে এইরূপে উপাসনা করে।" এইরূপ অনেক প্রকার প্রতীক উপাসনা আছে সে সকলে সংশয় এই সেই সকল প্রতীকে অহংজ্ঞান উৎপাদন করিতে হইবে কি না। পূর্ব্ব পক্ষে পাওয়া যায়, ঐ সকল প্রতীকে (উপাসনার আলম্বনে) আত্মমতি করাই যুক্তিসিদ্ধ। কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্ম আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে কোন প্রতীক হউক না কেন, সমস্তই যখন ব্রহ্মবিকার (ব্রহ্মোপন্ন) তখন অবশ্যই সে সকল প্রতীক ব্রহ্ম। যাহা ব্রহ্ম তাহাই আত্মা। সুতরাং প্রতীকে আত্মভাব উৎপাদন বা স্থাপন অনুপন্ন নহে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা হইল প্রতীকে আত্মমতি অর্থাৎ অহংজ্ঞান প্রাবাহিত করিতে হইবে না। কারণ এই যে, প্রতীকোপাসক কোন প্রতীককে আত্মভাবে দেখেন না, আত্মা বলিয়া অবগত নহেন। (মনকে অহং বলিয়া জানেন না, আকাশকে অহং বলিয়া জানেন না।)

…িয়াছিলে যে প্রতীক সকল ব্রহ্মের বিকার বলিয়া ব্রহ্ম …ং ব্রহ্মই আত্মা এইরূপ জ্ঞান পরম্পরায় প্রতীকেও …ং দৃষ্টি স্থাপিত করা যাইতে পারে। আমরা বলি, …াহা পারে না। তাহা অত্যন্ত অসৎ। কারণ, তাহাতে প্রতীকের প্রতীকত্ব বিলোপ হইতে পারে। নাম প্রভৃতি প্রতীক (উপাসনার আলম্বন) ব্রহ্মের বিকার সত্য, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্ম দৃষ্টি প্রবাহিত করিতে গেলে বিকার ভাব উপমর্দ্দিত (বিনষ্ট) হইবে এবং সে সকলে ব্রহ্মভাব আশ্রয় করিবে। যদি নামাদির স্বরূপ বিলুপ্তই হইল, তাহা হইলে প্রতীক থাকিল কৈ? কিসে অহংজ্ঞান প্রবাহিত করিবে? ব্রহ্মই আত্মা, এই ভাব স্থির রাখিলে ব্রহ্ম দৃষ্টির উপদেশে আত্ম দৃষ্টি (আত্মজ্ঞান) সিদ্ধ হওয়াব কল্পনা করিতে পার বটে ; কিন্তু তাহাতেও ইষ্ট সিদ্ধ হইবে না। কারণ সেরূপ দর্শনে (জ্ঞানে, কর্ত্তৃত্বাদি সর্ব্ব সংসার ধর্ম্ম নিরাকৃত হয় না। ব্রহ্মই আত্মা, এই দর্শনই কর্ত্তৃত্বাদি সর্ব্ব সংসার দর্ম্ম নিরাকরণ পূর্ব্বক উদিত হয়, তাহার অনিরাকরণ অবস্থায় ঐসকল উপাসনার বিধান। ফলিতার্থ এই যে, উক্তবিধ কল্পনার উপাসক প্রতীকের সহিত সমান হইতে গেলেও কদাপি তাহাতে প্রতীকে অহংজ্ঞান জন্মিবে না। (জীবের ও প্রতীকের স্বরূপগত ভেদ থাকায় এবং বিধির শ্রবণ না থাকায় প্রতীকে অহংগ্রহ উপাসনা আদৌ সম্ভব হয় না।) যাহা রুচক তাহাই স্বস্তক (রুচক ও স্বস্তক পূর্ব্বকালের অলঙ্কার বিশেষ) এরূপে ঐক্য নাই। তবে কি না সুবর্ণরূপে ঐক্য আছে। (এও সুবর্ণ, সেও সুবর্ণ ; এইভাবে ঐক্য আছে। অতএব, সুবর্ণত্ব প্রকারে অভেদ থাকিলেও তদ্দ্বয়ের (স্বস্তিকের ও রুচকের) স্বরূপে যথেষ্ট বিশেষ (প্রভেদ) আছে। সুবর্ণত্ব প্রকারে রুচক স্বস্তকের একতার ন্যায় ব্রহ্মাত্মভাবের একতা গ্রহণ করিতে গেলে প্রতীকাভাবের প্রাপ্ত হয়, এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে এবং সেই কারণেই প্রতীকে আত্মদৃষ্টি (অহং-জ্ঞান) করিতে পারা যায় না।

আলোচ্য অপর সূত্রটি পূর্ব্বে সূত্রের আসন্ন পরবর্ত্তী।

ব্রহ্ম দৃষ্টিরুৎ কর্ষাৎ।

ইহার ভাষ্য উদ্ধারের পক্ষে অতি বিস্তৃত। ভাষ্যের একটী বাক্য চিন্তনীয়। যথা—"ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং যৎ প্রতীকেষু তদ্দৃষ্ট্যধ্যারোপনং প্রতিমাদ্বেব বিষ্ণ্বাদীনাম্ অর্থাৎ যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু প্রভৃতি উপাসনা একের ভাব অপরে অধ্যারোপ দ্বারা সাধিত হয়। প্রতীকে ব্রহ্মের উপাসনাও সেইরূপ। নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টের অধ্যারোপে যে কার্য্য হইতে পারে, উৎকৃষ্টে নিকৃষ্টের অধ্যারোপে তাহা সম্ভবপর নহে। রাজকর্ম্মচারীকে রাজা বলিয়া ব্যবহারে কার্য্যোদ্ধার ; কিন্তু রাজাকে লইয়া কর্ম্মচারীরূপে ব্যবহারে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রস্তাবিত ভাবগুলি অল্প কথায় ব্যক্ত করিলে মনে স্থায়ী হইবে এই বিবেচনায়, উদ্ধৃত সূত্রগুলির শঙ্কর ভাষ্যের অনুগত রামমোহন রায় কৃত সংক্ষিপ্ত অর্থ নিম্নে লিখিত হইল। যথা—"প্রতীক বা অবয়ব উপাসক ভিন্ন যে উপাসক তাহাকে অমানব পুরুষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত করেন এই ব্যাসের মত হয়। যেহেতু প্রতীকের উপাসনাতে এবং ব্রহ্মের উপসনাতে যদি উভয়েতেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় তবে প্রভেদ থাকে না। তাহার কারণ যে যাহার প্রতি শ্রদ্ধা করে সেই তাহাকে পায় এই যে ন্যায় তাহা মূর্ত্তি পূজা করিয়া পাইলে অসিদ্ধ হয় এবং বেদেও কহিয়াছেন, যে যে কামনা উদ্দেশ করিয়া ক্রতু অর্থাৎ যজ্ঞ করে সে সেই ফলকে পায়।"— ব্রঃ সূঃ ৪।৩।১৫

"মন আদির দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিলে মন আদি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম না হয় যেহেতু বেদে এমত কথা নাই এবং অনেক ব্রহ্ম স্বীকার করা অসম্ভব হয়। যদি মন আদি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম না হইল তবে ব্রহ্মেতে মন আদির স্বীকার করা যুক্ত নহে। মন আদিতে ব্রহ্ম বোধ করা যুক্তি হয়• কিন্তু ব্রহ্মেতে মন আদির বুদ্ধি কর্ত্তব্য না হয়। যেহেতু ব্রহ্ম সকল হইতে উৎকৃষ্ট হয়েন যেমন রাজার অমাত্যকে রাজবোধ করা যায়। কিন্তু রাজাকে রাজার অমাত্যবোধ করা কল্যাণের হেতু হয় নাই।"—ঐ ৪।১।৪-৫

অপেক্ষাকৃত আরও অল্প কথায় উদ্ধৃত বাক্য সমূহের মর্ম্ম প্রকাশের চেষ্টা নিষ্ফল না হইতেও পারে। ব্রহ্মেবদ্ধ-লক্ষ্য উপাসকের সপ্রতীক উপাসনায় দেবযানে ক্রম মুক্তি আর প্রতীকেই বদ্ধ লক্ষ্য উপাসকের অন্যগতি—ইহাই শ্রুতির উপদেশ বলিয়া ব্যাস ও শঙ্করের অভিমত। এইটি মনে রাখিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত ছান্দোগ্য ভাষ্যের ভূমিকায় প্রাপ্ত আচার্য্য বাক্য বিশদ হইবে ইহা কি দুরাশা?

ছান্দোগ্য প্রাপ্ত উপদেশ এই যে, সাধক ওঁকারকে পরমাত্মার প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে পরমাত্মার

রসতমস্থ অর্থাৎ আনন্দের পরাকাষ্ঠা অনুভব লাভের জন্য প্রয়াসী হইবেন। সেই অনুভব লাভের উপায় শ্রুতি দেখাইতেছেন, যথা—

এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যা আপোরসঃ, অপাম্ ওষধয়ো রসঃ, ওষধীনাং পুরুষো রসঃ, পুরুষস্য বাগ্ রসঃ, বাচ ঋগ রসঃ, ঋচঃ সাম রসঃ, সাম্ন উদ্গীথো রসঃ। এই শ্রুতি স্পষ্টার্থ বলিয়া ভাষ্যোদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। কেবল উদ্গীথ অর্থে এখানে ওঁকার ইহাই দ্রষ্টব্য। ভাষ্যটি এই উদ্গীথ প্রকৃতত্বাৎ ওঁকার অর্থাৎ উদ্গীথের স্বভাব ওঁকার। পরমাত্মা সাক্ষাৎ রস স্বরূপ এজন্য ওঁকার অবলম্বনে যিনি উপাসক তাঁহার পক্ষে ওঁকারই রসানাং রসতমঃ। উপাসনা সিদ্ধির জন্য এই ধারণার প্রয়োজন। শ্রুতি এখানে ওঁকারের অর্থ সম্বন্ধে দৃষ্টিশূন্য।

প্রস্তাবিত উপাসনা মুণ্ডকোপনিষদে সবিস্তারে উপদিষ্ট। সেই উপদেশের মর্ম্ম এই যে একই আত্মা পিণ্ডাস্থ যে জীব দেহ এবং তাহার অতিরিক্ত যে ব্রহ্মাণ্ড তাহাতে সমভাবে প্রকাশমান এবং জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেও সমভাবে প্রকাশমান। বর্ণিত প্রকারে সমভাবে অর্থাৎ অভেদে প্রকাশমান বলিয়াই এই তিন ভাবের কোন একভাবে বা একাধিকের সম্মিলনোত্থ যে কোনভাবে যথার্থতঃ বা স্বরূপতঃ প্রকাশমান নহেন, এইটি বুঝাইবার জন্যই তাঁহার তুরীয় বা চতুর্থভাব শ্রুতিতে উপদিষ্ট। যথা—অদৃষ্টং অর্থাৎ কোন জ্ঞাতার তিনি জ্ঞানের বিষয় নহেন, অতএব "অব্যবহার্য্যং" অর্থাৎ তিনি কোন কর্ত্তার কোন প্রকার ক্রিয়ার কর্ম্ম নহেন, "অগ্রাহ্যং" অর্থাৎ হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণের সম্ভবপর নহেন। "অলক্ষণং" অর্থাৎ তাঁহাতে কোন লক্ষণ কিনা লিঙ্গ বা অনুমান উৎপাদক চিহ্ন কিছু নাই বলিয়া অনুমান দ্বারা উপলব্ধব্য নহেন, "অচিন্ত্যং" অনুমানের বিষয় নহেন বলিয়া চিন্তা বা ধ্যানের বিষয়ও নহেন, "অব্যপদেশ্যং" অর্থাৎ শব্দের দ্বারা উল্লেখের বিষয় নহেন, "একাত্ম প্রত্যয় সারং" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তিন অবস্থাতে সমভাবে প্রকাশমান আত্ম-চৈতন্য তিনি এই প্রত্যয় বা স্থায়ী বোধের সার হয়েন, "প্রপঞ্চোপশম" অর্থাৎ জগ্রদাদি তিন অবস্থার ধর্ম্ম বিযুক্ত হয়েন, "শান্তং" অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদি শূন্য হয়েন, "শিবং" অর্থাৎ শুদ্ধ স্বরূপ হয়েন, "অদ্বৈতং" অর্থাৎ তাঁহার সম বা বিষম সত্তান্তর শূন্য হয়েন। তিনিই সেই যিনি আছেন বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ আছে এই গুণান্বিত ভাবে প্রকাশমান। আছে বা থাকা যেমন সর্ব্ব পদার্থের গুণ বা ধর্ম্ম তেমনই থাকা সত্বেও না থাকা তাহাদের গুণ বা ধর্ম্ম। থাকিবার সময়ে না থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এজন্য তাহারা স্বয়ং সত্ত্বা নহে। কিন্তু তিনি সত্তা এই জিনিষ না থাকার সম্ভাবনার অভাবে থাকা তাহার গুণ বা ধর্ম্ম হইতেই পারে না এজন্য তাহাকে সৎ বা স্বয়ংসত্ব বলা হয়। কিন্তু ইহাও একটা কথার কথা। যেহেতু সত্তার বহির্ভূত বলিয়া যাহা মনে হয় তাহার যখন অস্তিত্বই নাই তখন কাহা হইতে ভিন্ন দেখাইবার জন্য তাঁহাকে কে সৎ বলিবে? মূল কথা তিনি স্বয়ং সত্তা। অপর বলিয়া যাহারা প্রতীয়মান তাহারা আশ্রিত সত্তা। তিনি আছেন বলিয়া অপর সকল আছে ও আছি। অপর না থাকিলেও তিনি যাহা তাহাই। ব্যক্তি, গুণ ক্রিয়া, ভাল মন্দ প্রভৃতি সকলই সেই অপর। এইটুকু কহিবার জন্যই অদ্বৈত উপদেশ। এই উপদেশের পরিপাকে সগুণ নির্গুণ, সক্রিয় নিষ্ক্রিয় প্রভৃতি সর্ব্ব বিবাদের চির শান্তি। (৫)

যিনি প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অগোচর তাঁহার অনুসন্ধা-নের জন্য জীবের এক মাত্র সম্বল শব্দ। যাঁহার নাম, অভিধান বা প্রতীক ওঁকার সেই নামীয় অভিধেয় বা স্বরূপ যাঁহার সম্বন্ধে মাণ্ডুক্য শ্রুতির যে উপদেশ আলোচিত হইল পরবর্ত্তী শ্রুতিতে ওঁকারে তাহার প্রয়োগ দর্শিত। পরমাত্মা যেমন জাগ্রতাদি তিন পাদ বা অবস্থার অধিষ্ঠাতা অথচ চতুর্থ বা তুরীয় আত্মা বলিয়া বর্ণিত, তেমনই ওঁকার ও অকার, উকার, মকার এই তিন মাত্রার অবস্থিত অথচ মাত্রাহীন, অভিন্ন এক। আত্মার এক এক পাদ ওঁকারের এক এক মাত্রা। জগতের অধিষ্ঠাতা যে বৈশ্বানর নামে বর্ণিত আত্মা তিনি বিরাট পুরুষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎব্যাপী আত্মা। অকারও দৃষ্টি বিশেষে সর্ব্বশব্দব্যাপী। তিন অবস্থার গণনায় জাগ্রত প্রথম, মাত্রা গণনায় অকার প্রথম এরূপ

---

(৫) বর্ত্তমানে ইংরেজি ভাষার যেরূপ প্রচার তাহাতে প্রস্তাবিত ভাবটি ইংরেজিতে বলিলে হিতকর হইবার সম্ভাবনা। God is being or reality *per se*, all the rest are contingent being or reality. He is they are. They are not and yet He is. He is of nature distinct from all.

সাম্যও আছে। স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা আত্মা যাহার নাম তৈজস পুরুষ তিনি ওঁকারের মধ্য মাত্রা, উকার। কেন না অকার অপেক্ষা উকার উৎকৃষ্ট। স্বপ্ন যেমন জাগ্রতের সকল পদার্থতে ব্যাপ্ত হইতে বাধ্য নহে—অনেক বিষয়ে স্বাধীন, সেইরূপ উকারও সর্ব্ব শব্দতে ব্যাপ্ত হইতে বাধ্য নহে, অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। স্বপ্ন যেমন জাগ্রত ও সুষুপ্তির মধ্যবর্ত্তী, উকারও তেমনই। অকার ও মকারের মধ্যবর্ত্তী। সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা যাঁহার নাম প্রাজ্ঞ তিনি মকার। যেমন জাগ্রত ও স্বপ্ন সুষুপ্তিতে ভেদ ত্যাগ করিয়া একীভূত সুষুপ্তিরূপ হয়, তেমনই অকার ও উকার ওঁকার উচ্চারণের সমাপ্তি কালে মকারে একীভূত হয়। যেমন সুষুপ্তি হইতে স্বপ্ন জাগ্রতের পুনঃপ্রকাশ, তেমনই ওঁকার পুনরুচ্চারণের সময় মকার হইতে অকার উকারের পুনঃ প্রকাশ। অ-মাত্র একাক্ষর, ওঁকার তুরীয় আত্মার স্বরূপ। তুরীয় যেমন অবস্থাত্রয়ের অতীত, তেমনই ওঁ এই শব্দ মাত্রাত্রয়ের অতীত।

গ্রন্থের শেষে আত্মার উপাধি ও স্বরূপ বিষয়ক উপদেশের পরবর্ত্তী ওঁকারের উপাধি ও স্বরূপের উপদেশ। কিন্তু গ্রন্থের আদিতে উপদেশের পর্য্যায় বিপরীত—প্রথমে প্রতীক যে ওঁকার তাহার প্রস্তাবনা; পরে স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহার। যথা—

"ওঁ মিত্যেতদক্ষর মিদং সর্কং
সর্ব্বং তস্যোপ ব্যাখ্যানং॥"

অর্থাৎ ওঁ এই যে অক্ষর ইহাই সর্ব্ব। তাহারই প্রকৃষ্টরূপে ব্যাখ্যা (এই উপনিষৎ।) এই প্রথম মন্ত্র। দ্বিতীয় মন্ত্রে দেখাইতেছেন,—

"সর্ব্বং হ্যে তদ্ ব্রহ্ম।"

এখানে ভগবান ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, যেমন এই সমস্তই ওঁকার, তেমনই এই সমস্তই ব্রহ্ম। এই দৃষ্টিতে ওঁকার ব্রহ্মরূপে উপাস্য। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে ওঁকার এই সমস্ত হইতে পারে না, এজন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন, "অদ্বয়াত্মা পরমার্থঃ সন্ প্রাণাদি বিকল্পস্য আস্পদো যথা তথা সর্ব্বেপি বাক প্রপঞ্চ, প্রাণাদ্যত্মে বিকল্প বিষয় ওঁকার এব। সচ আত্ম স্বরূপ মেবতদভিধেয়ত্বাৎ। ওঁকার বিকার শব্দ অভিধেয়শ্চ। সর্ব্ব প্রাণাদ্যাত্ম বিকল্পঃ অভিধান ব্যতিরেকেন নাস্তি।" অর্থাৎ অদ্বয় আত্মা পরমার্থ কি না নিত্য অপরিবর্ত্তিত হইয়াও যেমন প্রাণাদি বিকল্পের কি না অনিত্যের আশ্রয়, তেমনই প্রাণাদি আত্ম বিকল্প যাহার বিষয় সেই বাক্যসমূহ ওঁকারই। সেই ওঁকার আত্মার নাম বলিয়া আত্মার স্বরূপ। সর্ব্ব শব্দ ওঁকারের বিকার। (আর) শব্দ যাহার নাম সেই প্রাণাদি সকলে আত্ম বিকল্প। নাম ব্যতিরেকে তাহাদের অস্তিত্ব নাই।

শব্দ মাত্রেই ওঁকারের বিকার এবং নাম ব্যতিরিক্ত নামীসের নাস্তিত্ব ভাষ্যে প্রাপ্ত এই দুইটি ভাব সুবোধ্য করিবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজনীয় হইবে না। ইহা এই, ইহা এই নহে এই প্রকার স্থির, সবিশেষ ধারণা কোন অনুভূত পদার্থ বা অনুভাবক সম্বন্ধে নাম ব্যতিরেকে ঘটে না—ইহা সর্ব্বজনবিদিত। জ্ঞানের বিষয় ও বিষয়ী উভয়েরই ব্যবহারার্থ নামের প্রয়োজন। এই কারণে ইহাদিগকে পদার্থ বলা হয়। পদ যে নাম তাহার দ্বারা সূচিত অর্থ যে গুণ ক্রিয়া সম্বন্ধ-বান দ্রব্য বা সত্তাই বিশেষ্য। বিশেষণ পরিত্যাগে যাহা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ নির্বিশেষ বিশেষ্যের ধারণা বা ব্যবহার অসম্ভব। সম বা বিষম অন্যের অভাবে তাহার "এই ইত্যাকার" নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ধারণা সম্ভবে না। আর গুণ ক্রিয়া সম্বন্ধ প্রভৃতির অভাবে পরিবর্ত্তন শূন্য বলিয়া তাহাকে লইয়া ক্রিয়া ব্যবহারও সম্ভবে না। এই দৃষ্টিতে পদার্থ নাম সুপ্রযুক্ত। যাবতীয় পদ, নাম বা শব্দ বর্ণমালার অন্তর্গত। অকার যাহার তান্ত্রিক নাম শ্রীকণ্ঠ ও ক্ষকার যাহার তান্ত্রিক নাম সুমেরু ইহারই অন্তঃপাতী বঙ্গীয় বর্ণমালা। এজন্য অঙ্গন্যাসাদি অনুষ্ঠান দ্বারা বর্ণমালার সর্ব্বময়ত্ব সূচি। অজপা হংস মন্ত্র অমাত্র একাক্ষর ওঁকার স্থানীয় প্রপঞ্চোপশম তুরীয় চৈতন্য।

বর্ণ স্বর ও ব্যঞ্জন এই দুই ভাবে বিভক্ত। ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরের সাহায্য বিনা উচ্চারিত হয় না বলিয়া বীজ বা অচেতন এবং স্বরবর্ণ শক্তি বা চেতন (অং অঃ ইহারাও স্বর বর্ণের অন্তর্গত)। স্বর বর্ণের মধ্যে অকার ইকার ও উকার উচ্চারণ বিষয়ে স্বপ্রধান অন্যের আশ্রয়ের অপ্রত্যাশী। বাক যন্ত্রের সর্ব্ব নিম্ন স্থান হইতে অকার উচ্চারিত বলিয়া আদি আর উকার উচ্চারণে ওষ্ঠদ্বয় পুটিত হয় বলিয়া প্রয়োগান্তর ভিন্ন পুনরুচ্চারণ অসম্ভব এজন্য উকার অন্ত। অভিধান অভিধেয়ের অভিন্নতা দৃষ্টিতে অকার সর্ব্বাদি, উকার সর্ব্বান্ত। অকার উকারের সম্মিলনোত্থ ওকারে

বাকশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। অনুনাসিক সংযোগে পূর্ণতা-প্রাপ্ত ওঁকারই ওঁকার।

প্রাচীন পরম্পরা-প্রাপ্ত উপদেশে অনেক শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানবান্ হিন্দু লিখিত ওঁকারকে পরমাত্মার যন্ত্র বা চিত্রিত রূপক বলিয়া গ্রহণ করেন। বেদে ওঁকারের যে রূপ তাহাতে মনুষ্যের মস্তক বিন্দু। কণ্ঠের অস্থি (blle leoni) অর্দ্ধ চন্দ্র। উভয়ের মধ্যে বিভেদক গ্রীবা স্থলই অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী শূন্য স্থান। এই অস্থির নিম্ন হইতে দক্ষিণ বাহুর পার্শ্ব দিয়া কটীদেশে কুঞ্চিত হইয়া উদরের নিম্নে প্রসারিত বাম পার্শ্বগামী রেখা ওঁকার। কুঞ্চন স্থান হইতে দক্ষিণ মুখী হইয়া পরে উর্দ্ধগামী রেখা দক্ষিণ হস্ত। ওঁকারের বৈদিক আকৃতির সূচনা এই যে মনুষ্য দেহ পরমেশ্বরের যন্ত্র। তিনি অন্তর্যামী যন্ত্রী।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽ-
র্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়েৎ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি
মায়য়া॥ (গীঃ ১৮ অঃ। ৬১।)

অর্থাৎ, হে অর্জ্জুন ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি মায়া শক্তির দ্বারা দেহযন্ত্রারূঢ় সর্ব্বভূতকে চালনা করেন।

প্রদর্শিত প্রণালী ক্রমে সপ্রণব উপাসনায় দেশ কাল পাত্র নির্ব্বিশেষে মনুষ্য মাত্রেরই পরমার্থ সিদ্ধি—ইহাই সর্ব্ব ব্রাহ্মণশাস্ত্রের উপদেশ এবং ইহাই সার্ব্বভৌম হিন্দুধর্ম্ম। এ ধারণার সাধুত্ব নির্মৎসর পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন—এই বিনীত প্রার্থনা রহিল।

ইদং ব্রহ্মার্পণমস্তু।

দরিদ্রতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

জানি তুমি সব গুণরাশি-নাশী.
সকল শক্তি-হরা ;
করুক তব দুখীর রক্ত
আঁখির সলিলে ভরা।
গড়েছে তোমার রুক্ষ মূরতি
সব চকমকি শিলা,
ডাকিনীর মত লহু চুষে খাও
অনন্ত তব লীলা।
অসীম ক্ষমতা মমতাবিহীন,
হীরা গলে যায় তাপে—
সচল তালকে মাটীতে নোয়াও
ক্ষীণ অঙ্গুলি চাপে।
হিমের নিলামে কমল ফেরার
সলিল প্রাসাদ ছাড়ে ;
গঙ্গা চলেন কয়লা বহিয়া
রত্নাকরের দ্বারে।
গুণী বট তুমি এ কথাও মানি,
এ কথাও যায় শোনা—
দুখের আগুনে পোড়ায়ে পোড়ায়ে
উজ্জ্বল করো সোণা ;

তুমি শ্রীহরির বাহন গরুড়—
অমৃতের অধিকারী ;
মহনীয় তুমি, সহনীয় তুমি,
সুহৃদ ও সরল ভারী।
তুমি যে আমার বাল্য বন্ধু
তুমি সেটা ভাল জানো ;
তবে কেন ভাই নূতন করিয়া
বিকট নয়না হানো !
বাঘের মতন তুলে নিয়ে যাও,
না কেঁদে রহিতে পারি,—
টানিবে নোংরা কাঁটাবন দিয়ে
সেইটে সইতে নারি।
সবল মরালে শর বিঁধে মারো
সহিতে পারিবে সেটা,
বিমল পালক ময়লা কর না
লাগায়ে কাঠীর আটা।
যূথিকারে তুমি খাতক ক'রো না
হীন 'সেয়াকুল' কাছে,
পাপিয়ারে তুমি চাতক ক'রো না,
কবি এ করুণা যাচে।

রাজগী !

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

(১৯)

দশ বৎসর পরে নবাবগঞ্জের রাজবাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। এর মধ্যে অনেক দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছি, যদিও বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়াছি কলিকাতায়। কাব্যব্যাধি আমার মোটেই ছিল না, এমন কি, যে দেশের ভিতর বাস করিয়াছি এবং যার ভিতর দিয়া যাতায়াত করিয়াছি, তার দিকে চাহিয়াও কোনও দিন দেখিবার অবকাশ আমার হয় নাই। আমি নিজেকে লইয়া এত ব্যস্ত ছিলাম যে, নিজের বাহিরে কোনও দিন চাহিতে পারি নাই। কিন্তু আজ আমার সেই চিরপরিচিত পূর্ব্ববঙ্গ, তার অশেষ রূপের পশরা লইয়া, আপনাকে আমার চক্ষের ভিতর প্রবেশ করাইয়া আমাকে আনন্দ-রসে অভিষিক্ত করিল।

ভাদ্রের শেষ, পূজা আসে আসে। নদীর জল কূল ছাপাইয়া সমস্ত দেশ ভাসাইয়া দিয়াছে। তার ভিতর ভাসিতেছে সহস্র সহস্র "কুমুদ-কহ্লার"। তার পাতাগুলি তাদের ক্ষীণ সৌষ্ঠব জলের উপর মেলাইয়া দিয়া বিপুল আনন্দে ভাসিয়া রহিয়াছে। উজ্জ্বল নীল আকাশ একখানা ঝক্ ঝকে স্ফটিকের ঢাকনার মত সমস্ত পৃথিবীকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। সেই জলরাশির মাঝে মাঝে সবুজ দ্বীপের মত এক একখানা বাড়ী। চারিদিককার ঘন সবুজ পরদার ভিতর দিয়া তার জীর্ণ ধূসর চালা মাঝে মাঝে উঁকি মারিতেছে। আর সমস্ত দিগন্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে বর্ষাধৌত উজ্জ্বল স্নিগ্ধ সবুজ-গাছের অবিচ্ছিন্ন মালা।

সর্ব্বত্র এমন একটা ঝকঝকে উজ্জ্বল তরুণ ভাব— এমন একটা সজীব সজাগ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, আমার অকবির চক্ষুও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। এমন স্নিগ্ধ, এমন শান্ত, এমন উজ্জ্বল, এমন সুন্দর দেশ কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু দেশের রূপের চেয়ে বেশী মুগ্ধ করিল তার স্নেহ। সমস্ত দেশ যেন তার মঙ্গল আলিঙ্গনে আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিবার জন্য ব্যাকুল ভাবে হাত বাড়াইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের "ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী"তে একটা কথা পড়িয়াছিলাম, মনে পড়িল, "এমন মায়ের মত দেশ কোথায় আছে!" বজরার ছাদের উপর বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি কেবলি দেখিতে পাইলাম, আমার দেশের এই মাতৃমূর্ত্তি। আমার চিরদিনের মাতৃস্নেহ-বুভুক্ষিত হৃদয় স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার সময় নবাবগঞ্জের রাজবাড়ার দেউড়ী দেখা গেল। অস্তমান সূর্য্যের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তার উচ্চ চূড়া। তার দিকে চাহিয়া আমার চক্ষু ফিরিল না। আমার হৃদয় যেন দুই হাতে ঐ চিরপরিচিত গৃহকে বেষ্টন করিয়া ধরিতে চাহিল।

বজরা হইতে নামিয়া বাড়ীতে উঠিলাম। চারিদিক হইতে লোকজন আসিয়া আমাকে ঢিপ ঢিপ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। ছেলে বেলায় যখন এখানে ছিলাম, তখন বুড়ো বুড়ো ভদ্রলোকেরা আসিয়া আমাকে দিন রাত প্রণাম করিয়া গিয়াছে। বরাবর তাতে এতটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম যে, তাহাতে গায় লাগিত না। কিন্তু আজ এতকালের অনভ্যাসের পর আমার এই সব বুড়ো বুড়ো ভদ্রলোকদের কাছে প্রণাম লইতে ভয়ানক বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। যে শিক্ষায় ও সংসর্গে আমি এত দিন মানুষ হইয়াছিলাম, তাহাতে আমার ব্রাহ্মণ্য-গর্ব্ব দুই দিক হইতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। এক দিকে নরেন্দ্রবাবু তাঁর সাম্যবাদ লইয়া ইহার ভিত্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। আর একদিকে আমার ইয়ার বন্ধু ও রমণীর দল এ আভিজাত্যকে দিনরাত পদদলিত করিয়াছিল। তাই আমি বড় কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম।

আমি বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম। একে একে লোক আসিয়া পায়ের ধূলা লইতে লাগিল, সকলের সঙ্গে অল্পস্বল্প আলাপ করিলাম। তা' ছাড়া প্রজারা দলে দলে আসিয়া নজর দিয়া সেলাম করিল বা পায়ের ধূলা লইল। খুব বেশী প্রজা আসিল না, লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু তবু নজরের টাকায় আমার সম্মুখের টেবিলের উপরটা বেশ ভরিয়' উঠিল। এই নজরটা আমাকে আরও বেশী কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল। ইহা আমার ন্যায্য প্রাপ্য নয়, এবং ইহা ঠিক সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত দানও নয়। পীড়ন করিয়া ইহা আদায় করা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হইল না, কিন্তু বাহ্যিক উৎপীড়ন ছাড়া যে মামুলের একটা ভিতরকার পীড়ন আছে, তাহা এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপেই ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। তা ছাড়া, পীড়ন হউক বা না হউক, এ টাকায় আমার যখন অধিকার নাই, তখন এটা লওয়া—হয় পরস্বাপহরণ, না হয় দান গ্রহণ। দুইটাই হীন বলিয়া আমার মনে হইল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস হইল না। টাকাগুলি লইতে অস্বীকার করিতে পারিলাম না, কিন্তু হাত দিয়া তুলিতেও সঙ্কুচিত হইলাম। আমি একজন কর্ম্মচারীকে আদেশ দিলাম, সে টাকাগুলি তুলিয়া লইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে এই টাকা দিয়া একটা ইঁদারা করিতে হুকুম দিলাম। ইঁদারার সঙ্গে পাম্প লাগাইয়া দিয়া গ্রামবাসীদের ভাল জল জোগাইবার ব্যবস্থা করিব, স্থির করিলাম। এ টাকাটা অন্ততঃ প্রজার হিতার্থেই খরচ হউক!

অনেকক্ষণ দরবারের পর বেশ একটু রাত্রি হইলে আমি অন্দরে গেলাম। অন্দরে যাইতে আমার বুক কাঁপিতে লাগিল। একবার মনে হইল যে অন্দরে দুইটি চিরপরিচিত মুখ দেখিতে পাইব না। রাণী-মা নাই, দাইমাও নাই। তাঁরা তাঁদের পাপের, পুণ্যের, স্নেহের, অস্নেহের সকল স্মৃতি ফেলিয়া কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছেন। আজ বিশেষ করিয়া আমার মনে হইল তাঁদের স্নেহের কথা, তাঁদের পুণ্যের কথা!—আমার অপরাধ-কলুষ হৃদয়ে আমি আজ তাঁদের অপরাধের কঠোর বিচার করিতে পারিলাম না। স্মরণ করিলাম আমার শৈশবে তাঁদের স্নেহ ও যত্নের কথা, তাঁদের দেবসেবায় উৎসাহের কথা, গরীব ভিখারীর প্রতি তাঁদের দয়ার কথা, তাঁদের দানের কথা—আমার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

আর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল সাবিত্রীর কথা স্মরণ করিয়া। সাবিত্রী এখন এ সংসারের অধিষ্ঠাত্রী—সে আমার স্ত্রী, ধর্ম্ম-পত্নী। তার শাসনপরায়ণ কঠিন অন্তরের কথা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তার সঙ্গে যে আমার এখন, এত দিন পরে দেখা করিতেই হইবে, সে কথা ভাবিতে আমার অন্তরাত্মা ভীত হইয়া উঠিল। আজ আমার অন্তর সুধু বিদ্রোহের বিরাগে চঞ্চল হইল না। আজ মনে হইল আমি অপরাধী, সে সাধ্বী—তার সামনে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইতে আমি ভয়ানক সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলাম।

মুখ হাত ধুইয়া আমি গিয়া খাইতে বসিলাম। খাওয়ার ঘরে সাবিত্রীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। সে দুয়ারের কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। তার তেইশ বছরের যৌবন তার অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া অপরূপ রূপরাশি বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল। অনেক সুন্দরী দেখিয়াছি, ভারতের নানা দেশে ঘুরিয়া নারী-সৌন্দর্য্যের অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, সাবিত্রীর মত সুন্দরী দেখি নাই।

...ক আমি এক ফোঁটাও ভালবাসি না, তার ও যৌবনের জন্য আমার এক ফোঁটাও কামনা নাই, আমি চিরদিন তাকে আমার জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ বলিয়া মনে করিয়াছি। তবু রূপসী হিসাবে তাকে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে সব নারীর উপর স্থান দিতে পারি।

সাবিত্রী দাঁড়াইয়া ছিল। তার মুখ স্থির, শান্ত, গর্ব্বিত। তার চক্ষু সে নত করিয়া ছিল, তার বিম্বলাঞ্ছিত ওষ্ঠাধর যেন একটু শক্ত করিয়া চাপিয়া ছিল। সে যে খুব জোর করিয়া আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা এক নজরেই বুঝিতে পারিলাম। তার দীর্ঘ ঋজু সুগঠিত দেহখানির ভিতর আগাগোড়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ফুটিয়া রহিয়াছে। সে অকরুণ বিচারকের মত কঠোর আবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে চাহিয়া আবার চক্ষু নত করিল। তার পর আমার পায়ের কাছে নতজানু হইয়া প্রণাম করিয়া আমার পদধূলি গ্রহণ করিল।

এক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেলাম। গর্ব্বিতা সাবিত্রীকে পদতলে দেখিয়া আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য একটু বিচলিত হইয়া গেলাম। এত রাশিকৃত রূপের মধ্যে যেটুকুর অভাব তার সমস্ত সৌন্দর্য্যকে অসম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই বিনয়-নম্রতা যেন এই প্রণত সৌন্দর্য্যের ভিতর ফুটিয়া উঠিল ; তাই আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তার পর সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল। তার মুখে একটুও ভাবান্তর লক্ষ্য করিলাম না। সে যেন সবটা কাজ একটা শিখান পার্টের মত করিয়া গেল,—এ প্রণামের ভিতর তার হৃদয়ের যে এক ফোঁটাও যোগ আছে, এ রকম মনে হইল না। আমার মোহ কাটিয়া গেল। আমি চট্ করিয়া বুঝিলাম যে, সাবিত্রী যাহাকে প্রণাম করিল সে আমি নয়, যে নিরুপাধিক স্বামিত্বের আমি একটা তুচ্ছ প্রতীক, সে তাহাকেই প্রণাম করিল। সে প্রণাম রক্ত মাংসের দ্বিজেশচন্দ্রের সঙ্গে তার কোনও যোগ সাধন করা দূরে থাকুক, তাকে দুই হাতে ঠেলিয়া তফাৎ করিয়া দিল।

আমার মনটা তার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। হঠাৎ আমার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিল বিধুর সেই মৃত্যু-মলিন মুখ। মনে হইল যে সাবিত্রীর কঠোর বিচার হইতেই বিধুর যত দুর্গতি, ও আমার অধঃপতন। আমার অন্তর কঠিন হইয়া গেল। প্রণত সাবিত্রীর প্রতি যে আশীর্ব্বাদ আমার অলক্ষিতে অন্তরে গঠিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা নিবৃত্ত করিয়া আমি নীরবে খাইতে বসিলাম।

সাবিত্রী আমার সামনে সেই শ্বেত-পাথরের মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। তার পর ঠাকুরকে, ঝিকে হুকুম করিয়া এটা-ওটা দেওয়াইতে লাগিল, আমাকেও এক আধবার এটা-ওটা খাইতে অনুরোধ করিল, ঠিক যেমন রাণী-মা করিতেন। আমি আবার একবার তার মুখের দিকে চাহিলাম। সে শান্ত, ভাবশূন্য, কঠিন দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে চাহিল। কি পাথরের মত নির্ম্মম সে দৃষ্টি! আমি আবার নীরবে খাইতে লাগিলাম।

আহারান্তে মুখ ধুইয়া শুইবার ঘরে গেলাম। দেখিলাম, সাবিত্রী সেখানে সোণার-কাজ-করা রূপার বাটায় পাণ লইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। সে বাটা খুলিয়া আমার সামনে ধরিল, আমি পাণ তুলিয়া একখানা চেয়ারে বসিলাম। সাবিত্রী আমার সম্মুখে বসিল।

আমি বলিলাম, "তুমি খেতে গেলে না?"

সে বলিল, "আজ আমার সাবিত্রী-ব্রতের উপবাস।"

আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। সাবিত্রীও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শেষে সে বলিল, "ক'দিন থাকবে তুমি?"

আমি আবার তার মুখের দিকে চাহিলাম। পাথরের মূর্ত্তি সে—তার কঠোরতা আমার অন্তরকে ভয়ানক পীড়ন করিতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম না যে, চিরদিন বাড়ী থাকিব বলিয়াই আমি আসিয়াছি। বলিলাম, "ঠিক নেই।"

আবার চুপ। কেহ কোনও কথা কহিলাম না।

ঘরে একটা ঝি এতক্ষণ বিছানা-পত্র ঝাড়া-ঝুড়ি করিয়া মশারী ফেলিতেছিল।

সাবিত্রী বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার কয়টা কথা আছে। আজ অনেক রাত্রি হ'য়েছে, তুমি এখন শোও ; কাল সময় পাও তো কথা কটা শুনো।" বলিয়া সে দৃপ্তা রাণীর মত উঠিয়া ঝির সঙ্গে সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি একটু অবাক্ হইলাম, একটু বিরক্ত হইলাম, কিন্তু বাঁচিলাম। বাপ্! এই পাথরের মুর্ত্তি পাশে লইয়া যদি আমার রাত কাটাইতে হইত, তবে আমি হাঁপাইয়া উঠিতাম! সাবিত্রী আমাকে যে রেহাই দিয়া গিয়াছে, তাহাতে আমি যেন রক্ষা পাইলাম।

(২০)

আমি বিপুল উৎসাহের সহিত জমীদারীর কাগজপত্র দেখিতে লাগিলাম। জমীদারীর কাজকর্ম্ম আমি কিছুই জানি না, তার কাগজপত্রের সব নামও জানি না। গোবিন্দ আমাকে সব বুঝাইতে লাগিল। চিঠা পৈটা, আমদানী, তলব বাকী, প্রভৃতি ও সেট্‌লমেন্টের সংক্রান্ত পাটা খতিয়ান প্রভৃতি নানাবিধ কাগজপত্র লইয়া সে এমন একটা জটিলতার সৃষ্টি করিল যে, তার মধ্যে আমি একদম খেই হারাইয়া ফেলিলাম। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু বুঝিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করিয়া মাস খানেকের মধ্যে সমস্ত জমীদারী কারবারটার একটা মোটামুটি চেহারা আয়ত্ত করিয়া লইলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বুঝিলাম যে, এই জটিল ব্যাপারের একটা ভাল রকম সমাধান করিয়া, জমীদারীর পরিচালন-ভার গ্রহণ করা আমার সাধ্যাতীত।

রাধাচরণ আমাদের স্থমারনবিশ। সে সমস্ত কাগজ পত্র লইয়া গোবিন্দের পাশে বসিত। গোবিন্দ গদীয়ান হইয়া বসিয়া ফরমায়েস করিত, আর সে খাতা বাহির করিয়া যেটা আবশ্যক সেটা দেখাইত। ঠিক আবশ্যকের অতিরিক্ত কোনও কথা সে কহিত না।

এক দিন আমি সন্ধ্যার সময় নদীর ধার দিয়া একা বেড়াইতেছি; রাধাচরণ তখন হাট হইতে ফিরিতেছে। তার বগলে ছাতা, পরণে ময়লা কাপড়, চেহারা মোটের উপর ভারী দীন ও মলিন। আজ দিনের মধ্যে তার সঙ্গে আমার এই পঞ্চমবার সাক্ষাৎ, তবু সে আমার সামনে অবনত হইয়া আমার পায়ের ধুলা লইল। তার বয়স বছর পঞ্চাশেক। ছেলেবেলায় তাহাকে আমি বেশ সম্মান করিতাম। তাকে এতটা বিনীত হইতে দেখিয়া আমার হাসিও পাইত, দুঃখও হইত।

এ কথা সে কথার পর সে বলিল, "মহারাজ কি বোটে যাচ্ছেন?"

আমি একখানা ছোট মোটর-বোট আনাইয়াছিলাম। প্রায়ই সন্ধ্যাবেলায় আমি তাহাতে চড়িয়া একলা চার দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার দেশের নগ্ন সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া বেড়াইতাম।

আমি বলিলাম, "নাঃ, আজ আর বোটে যাব না মনে ক'রছি।"

সে চারিদিকে চাহিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, "যদি বোটে যেতেন, তবে আমি একটু মহারাজের সঙ্গে আসতাম। কয়েকটা কথা আমার বলবার ছিল।"

আমি বলিলাম, "বেশ তো, চলুন না, আমার আপত্তি নেই।"

বোটখানা ঘাটে বাঁধা ছিল, আমি চাবী খুলিয়া রাধাচরণকে উপরে উঠাইয়া নিজে তাহা ঠেলিয়া লাফাইয়া উঠিলাম। তার পর যন্ত্রপাতি লইয়া কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করিয়া তাহাকে ছুটাইয়া দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই অনেকটা দূর চলিয়া গেলাম।

রাধাচরণ নানা রকম ভণিতা করিয়া বক্তব্যটা যথাসম্ভব দীর্ঘ করিয়া যে কথা আমাকে বলিল, তাহা শুনিয়া আমার রক্ত ধাঁ করিয়া গরম হইয়া উঠিল।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই:—গোবিন্দ আমাকে ডুবাইতে বসিয়াছে। গত ১৪।১৫ বৎসরের মধ্যে কেহই জমীদারী দেখাশুনা করেন নাই। স্বর্গীয় রাণীমা জমীদারীর বিশেষ কিছুই বুঝিতেন না; তবু আগে তিনি একটু দেখাশুনা করিতেন বলিয়া, ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানজী ভয়ে ভয়ে বেশী কিছু করিতে ভরসা পান নাই। আর গোবিন্দের যদিও রাণীমার উপর ভয়ানক আধিপত্য ছিল, তবু সেও, দেওয়ানজী মাথার উপর থাকিতে, হাতে মাথা কাটিতে পারে নাই। দেওয়ানজী ও গোবিন্দ দুই জনেই তখনই বেশ গুছাইয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তবু খুব বেশী কিছু অনিষ্ট করিতে পারেন নাই।

তার পর আমার রকম সকম দেখিয়া রাণীমার ভয় হইল যে, আমি সাবালগ হইলে তাঁহাকে হয় তো পথের ভিখারী হইতে হইবে। তাই তিনি দেওয়ান ও গোবিন্দের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া নিজের কাজ গুছাইবার চেষ্টায় মনোযোগ করিলেন। তার পর হইতে একটা ভীষণ রকম লুটতরাজ আরম্ভ হইল। রাণীমা দুই হাতে লুটিয়া সব নিজের

...ইয়ের বাড়ী পাঠাইতে লাগিলেন। এই অপকার্য্যে ...ওয়ানজী ও গোবিন্দ হইলেন তাঁহার সহায়। কাজেই ...দের লুটতরাজেও রাণীমার বাধা দিবার বিশেষ শক্তি রাহল না। আবার, আমি টাকার জন্ত তাগাদার পর তাগাদা ও মনোহর সার গদীতে চিঠির পর চিঠি ছাড়িতে লাগিলাম। এই ত্রিধারায় বহিয়া আমার সম্পত্তি এই কয় বৎসরের মধ্যে প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

তার পর বৃদ্ধ দেওয়ান স্বর্গারোহণ করিলেন, তাহাতে সম্পত্তি লুটের ভাগ কমিলেও পরিমাণ কমিল না, বরং অনেকটা বাড়িয়া গেল। গোবিন্দ দুপুরে ডাকাতি আরম্ভ করিল। রাণীমার চোখে ধূলা দিতে তার যত সুযোগ ছিল, এতটা বৃদ্ধ দেওয়ানজীর ছিল না। রাণীমার অভাবের পর তো সে সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হইল। রাধাচরণ বলিল, "বুড়া দেওয়ানজীর তবু একটু ধর্ম্মজ্ঞান ছিল, ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টা-চরিত্র ছিল। বর্ত্তমান দেওয়ানের সে বালাই নাই। বুড়া দেওয়ানজী আদায় তহশীলটা রীতিমত করিতেন, আর আদায়ের টাকা সুমারে জমা হইত। কিন্তু বর্ত্তমান দেওয়ানজীর আমলে আদায় তহশীল চুলায় গিয়াছে, তিনি কেবল প্রজার কাছে দুই হাতে ঘুস কুড়াইতেছেন।"

গোবিন্দর এত বড় সম্পত্তি দেখাশুনা করিবার ক্ষমতা মোটেই নাই। কাজেই তার অক্ষমতার ফলে আদায়পত্র বন্ধ হইয়াছে; কতকগুলি মহাল আজ পাঁচ ছয় বৎসর বিদ্রোহী, প্রায় তিন লক্ষ টাকার খাজনা তামাদী হইয়া গিয়াছে। মফঃস্বলের নায়েব গোমস্তারা গাফিলি করিয়া সদর খাজনা না দিয়া কতকগুলি মহাল নিলাম করাইয়া বেনামীতে কিনিয়া লইয়াছে। অপর পক্ষে হাতের গোড়ায় গোবিন্দ যাহাকে পাইয়াছে তাহাকে ...বিমতে উৎপীড়িত করিয়াছে। প্রজাদের কাছে ঘুস আদায় করিয়া করিয়া তাহাদের উদ্বাস্ত করিয়া তুলিয়াছে, নায়েব গোমস্তার কাছে ঘুস খাইয়া পেট মোটা করিয়াছে; আর মারপীট করিয়া, ঘর জ্বালাইয়া নিতান্ত বাধ্য প্রজাদের বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে।

রাধাচরণ বলিল, "এই ধরুণ অছিমদ্দি সর্দ্দার,—সে ...রকারের জন্ত কতবার জান কবুল করে লড়াই ...'রেছে। এমন বাধ্য প্রজা আর ছিল না। সে মরে গেলে দেওয়ানজী তার স্ত্রীকে বেইজ্জত করেন। তাই নিয়ে তার ভাই একটা ফৌজদারী করে। মামলায় সে হেরে গেল। তার পর দেওয়ানজী তাকে উদ্বাস্ত করে তার জোত জমী সব মিথ্যা মোকদ্দমা করে বিক্রী করে' নিজে কিনে নিয়েছেন,—আর তার স্ত্রীকে যে নাজেহাল করেছেন তা বলবার নয়। অছিমদ্দির ভাই করিমদ্দি এখন কামার-হাটিতে গিয়ে সাত আনীর প্রজা হ'য়েছে। সেখানে সে আমাদের সব প্রজাকে বিদ্রোহী করে তুলেছে। অছিমদ্দির স্ত্রী রাবেয়া এখন বাজারে গিয়া বেশ্যা হইয়াছে।"

অছিমদ্দি! সেই সরল-প্রাণ সেবাপরায়ণ অছিমদ্দি! তার সেই সুন্দরী সরলা বুদ্ধিহীনা পত্নী—আমিই বোধ হয় তার প্রথম সর্ব্বনাশ করি! বিপিন বলিয়াছিল যে, সে শতমুখে আমার ব্যাখ্যানা করিয়াছে। আমি নিজকর্ণে শুনিয়াছি যে, সে তার স্বামীকে বলিয়াছিল, "রাজাবাবু বড় হ'লে আর রায়তের দুঃখ থাকবে না!" খুব কথা বলে-ছিলি রাবেয়া! খুব সত্য তোর আন্দাজ!

সেই সুদূর অতীতের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার হাত পা অসাড় হইয়া আসিল। আমার বুকের ভিতর যেন শ্মশানের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। হায় রে আমার পোড়া অদৃষ্ট। আমি বিপথে যাইয়া কেবল আমার নিজের সর্ব্ব-নাশ করি নাই, সঙ্গে সঙ্গে অছিমদ্দির মত, রাবিয়ার মত আমার কত শত শত প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়াছি!

ভাবিতে আমার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িল,—ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিল। আমার বোট যে আমি কোন্ দিকে চালাইলাম তাহা আমার হুঁস রহিল না। আমার সামনে বসিয়া রাধাচরণ যে কি কথা বলিতেছিল, তার এক বর্ণও আমি শুনিতে পাইলাম না। আমার কেবল কাণে বাজিল আমার গুরু, নরেন বাবুর একটা কথা, "এত ছোট আমা-দের জীবন, ভগবানের দয়ার দান। এর দুটো দুটো বছর এমনি করে অপচয় ক'রেছ।" দুই বছর নয়, দশ বারো বছর আমি অপচয় করিয়াছি। কেবল হারাই নাই—এ কয় বৎসর, এত দিন ধরিয়া যত্ন করিয়া সংসারের উর্ব্বর ভূমিতে দুই হাতে বিষবৃক্ষের বীজ ছড়াইয়াছি। এত দিনে সে বৃক্ষে ফল ধরিতে সুরু হইয়াছে।

হঠাৎ সজাগ হইয়া টের পাইলাম যে, একটা মোড় ঘুরিয়া ভাটির মুখে বোট ছুটাইয়া দিয়াছি।

প্রবল স্রোতে এতটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছি যে, বাড়ী ফিরিতে প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি হইবে।

তাড়াতাড়ি বোট ঘুরাইলাম। তখন রাধাচরণ বলিতেছে, "মনোহর সার কাছে আজ পর্য্যন্ত সাত লাখ টাকা দেনা হ'য়েছে। সম্পত্তির যা আদায় আজ কাল, তাতে তার সুদও পোষায় না—আপনাদের খরচ তো দূরের কথা। এখনও দেখে শুনে সম্পত্তি শাসন ক'রে খরচ পত্র কমিয়ে দিলে, এ দেনা শোধ হ'তে পারে; কারণ, এখনও সব ঝড়তি পড়তি বাদ দিয়ে আপনার ছিয়ানব্বই হাজার স্থিত আছে। কিন্তু এখন না সামলাতে পারলে আর উপায় নেই। মনোহর সা সম্পত্তি বন্ধকের জন্য বড় পীড়াপীড়ি ক'রছে। আমার মতে সেটা করে ফেলে সুদের হারটা কমিয়ে নিয়ে একটা ব্যবস্থা ক'রলেই ভাল হয়। আর যদি একজন ভাল লোক দিয়ে হিসাব নিকাশ করিয়ে, দেওয়ানজী আর নায়েবদের কাছ থেকে তাদের খাওয়া টাকা বের ক'রতে পারেন, তবে তো সমস্তই সহজ হ'য়ে যাবে।"

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম। এত টাকা দেনা হইয়াছে! আমার বিপুল সম্পত্তি বিনাশের কাছাকাছি আসিয়া পৌছিয়াছে! কি সর্ব্বনাশ!

ক্রমে শুনিতে পাইলাম যে, যে সব স্কুল হাঁসপাতাল ডিস্পেন্সারী প্রভৃতি আমাদের ব্যয়ে চলিত, সেগুলি হয় সব উঠিয়া গিয়াছে, না হয় জেলাবোর্ড লইয়া গিয়াছে। আমার সম্পত্তির আয়ের এক পয়সাও এখন লোকহিতে অপব্যয় হয় না। বেশ কথা। শুনিয়া তৃপ্ত হইলাম।

রাধাচরণ আবার বলিল, "আর একটা কথা নিবেদন করি। ছোট রাণীমার খরচের হাতটা একটু কমান দরকার বোধ হয়। এখন সম্পত্তির যে অবস্থা তাতে তাঁর মত দান ধ্যান ব্রতপূজা চলা কঠিন। এই তিনি সেদিন ঠাকুর মশায়কে একটা দোতলা বাড়ী করে দেবেন ব'লেছেন। গুরুদেবের কাছে যখন কথা দিয়েছেন, তখন অবশ্যই দিতে হ'বে। ঠাকুর ম'শায় এক বাড়ী ফেঁদে ব'সেছেন, তাতে পঁচিশ হাজার টাকার কমে নিষ্পত্তি হ'বে বোধ হয় না। তার পর ঠাকুর ম'শায়ের নূতন পুত্রবধূকে তিনি সেদিন তাঁর একসুট গয়না দিয়ে ফেললেন। এদিকে মহোৎসবের মাত্রা তিনি ভয়ানক বাড়িয়ে দিয়েছেন। টোলের জন্য যত রাজ্যের মূর্খ ব্রাহ্মণদের জন্য তিনি পঁচিশ টাকা ক'রে বার্ষিকের বরাদ্দ ক'রেছেন। মা আমার ধর্ম্ম-প্রাণ, লোকের দুঃখ কষ্ট সইতে পারেন না। কিন্তু আপনি একটু বুঝিয়া বলবেন যে, এখন অবস্থা বিবেচনায় একটু দান ধ্যান কম করলেই ভাল হয়।"

আমি বুঝাইব! আমার কি সে অধিকার আছে? বাড়ী ফিরিবার পথে একটা ঘাটে নৌকা লাগাইয়া, আমি রাধাচরণকে তার বাড়ীর কাছে নামাইয়া দিলাম। যাইবার পূর্ব্বে সে পাঁচ সাতবার আমার পায়ের ধূলা লইয়া আমার পায়ে ধরিয়া বলিয়া গেল যে, সে যে এ সব কথা বলিল, এ সব যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না হয়। হইলে দেওয়ানজী তাহাকে সবংশে নিধন করিয়া ছাড়িবেন। (ক্রমশঃ)

চট্টগ্রামের কয়েকটী দৃশ্য

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত

সমগ্র চট্টগ্রাম ব্যাপিয়া যে অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সম্পদ ছড়াইয়া আছে, খণ্ড-খণ্ড ভাবে তাহার অতুলনীয় শোভার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় কিম্বা কলা-কুশলী লেখকের লেখনীতে তাহার যৎসামান্য প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে তাহার বিচিত্র রূপ অপার্থিব-ও অবর্ণনীয়। চট্টগ্রামে প্রকৃতির ত্রিবিধ বিচিত্র রূপ সম্মিলিত হইয়াছে বলিয়া, ইহাকে প্রকৃতির রহস্যভূমি বলিলে ইহার যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়। পালি গ্রন্থে ইহার নাম রহস্যভূমি। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই সম্ভবতঃ বৌদ্ধগণ এই শস্যশ্যামলা, নদ-নদী-পর্ব্বত-সমুদ্র-নির্ঝরিণী ও অসংখ্য জলপ্রপাত-পরিবেষ্টিত চট্টলভূমিকে রহস্য-ভূমি নামে অভিহিত করিয়াছেন। একাধারে নদী, গিরি ও সমুদ্রের সম্মিলনে রহস্যভূমি প্রকৃতির যথার্থ স্নেহের নিধি হইয়া পড়িয়াছে। চট্টগ্রামের মেখলায় কর্ণফুলী নদী আপনার বিচিত্র ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছে। মস্তকে গিরিশৃঙ্গ মুকুটস্বরূপ শোভা পাইতেছে এবং
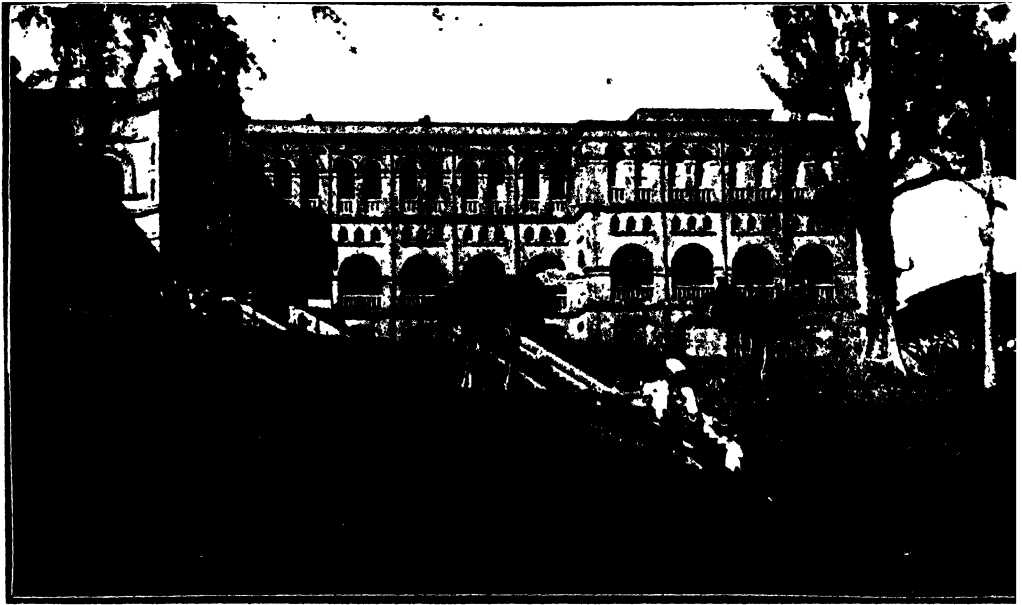
কোর্ট বিল্ডিং

পদতলে নীল সমুদ্র অশ্রান্ত কলরবে চ৷দিক মুখরিত করিতেছে। ইহার গোপন গিরিগহ্বরেও কত শত প্রস্রবণ জন্মলাভ করিয়া, আপন শোভায় আপনি মুগ্ধ হইয়া আছে। প্রকৃতির অন্তরের সেই নিভৃত প্রদেশের কান্ত-মধুর-রূপ আজ উদ্ঘাটিত করিতে পারা গেল না; কিন্তু তাহার বাহিরের যে রূপ সতত সকলের সম্মুখে
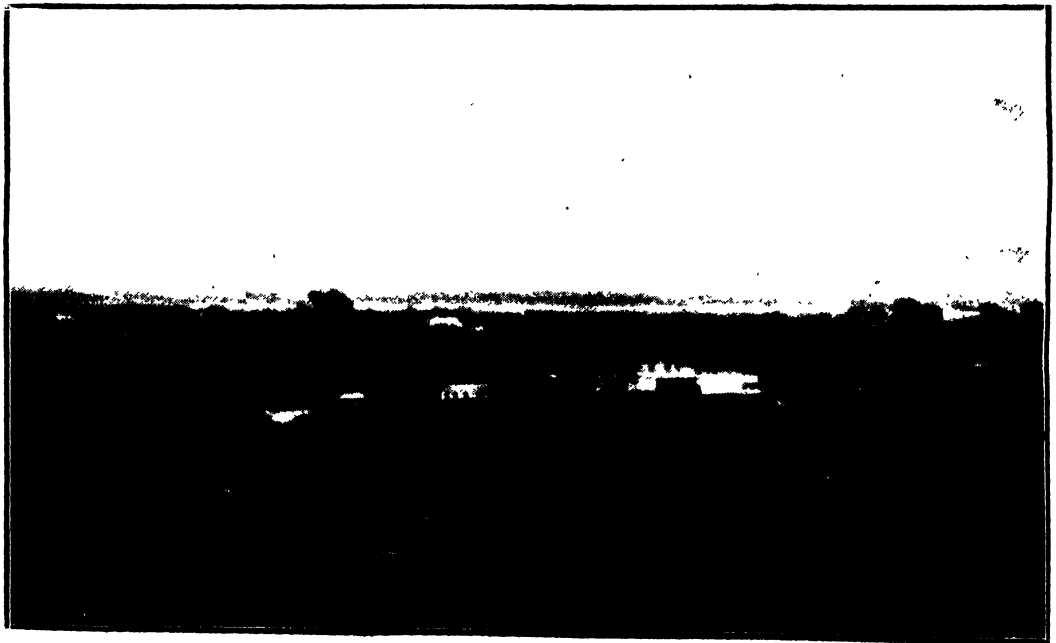
কোর্ট বিল্ডিং হইতে একটি মনোরম দৃশ্য

কোর্ট বিল্ডিং হইতে অপর একটি দৃশ্য

প্রতিভাত হইয়া আছে, তাহার কিঞ্চিৎ এই স্থলে প্রকাশিত হইল।

(১) কোর্ট বিল্ডিং। ইহা একটী গিরিশৃঙ্গের উপর অবস্থিত। এই স্থান হইতে চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য
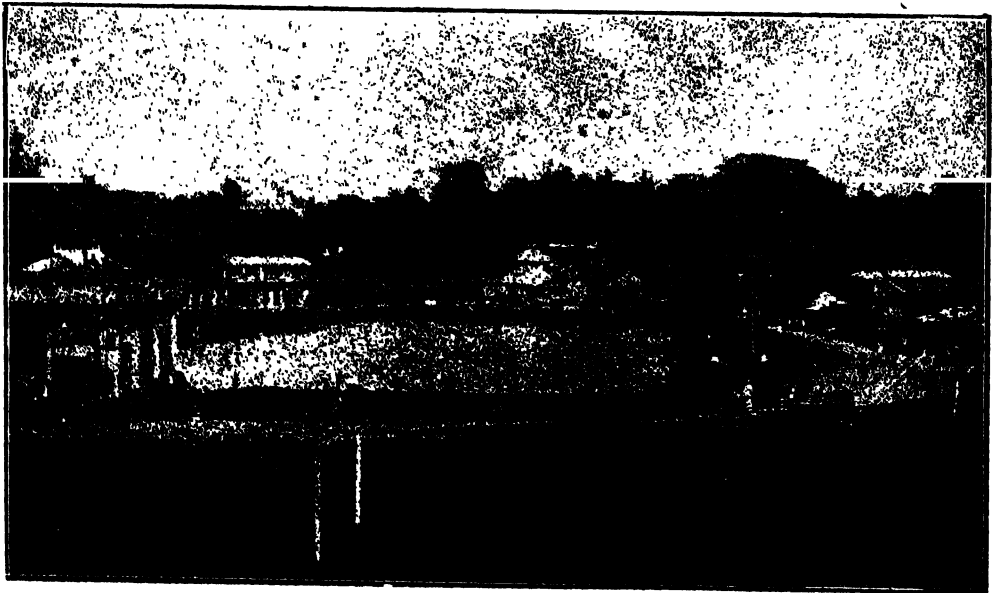
সহরের মধ্যস্থিত লালদীঘি ও আন্দরকিল্লা রোড

অতীব রমণীয়। এখানে গমনাগমনের সুবিধার জন্য পাহাড় কাটিয়া রাস্তা করা হইয়াছে।

(২) কোর্ট বিল্ডিং হইতে চট্টলের একটী মনোরম দৃশ্য।

(Phynong) এই তিনটি সরিৎ একত্র হইয়াই কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত সরিৎত্রয়ের সম্মিলন-স্থান হইতে কর্ণফুলী নদীর দৈর্ঘ্য ১৫০ মাইল।
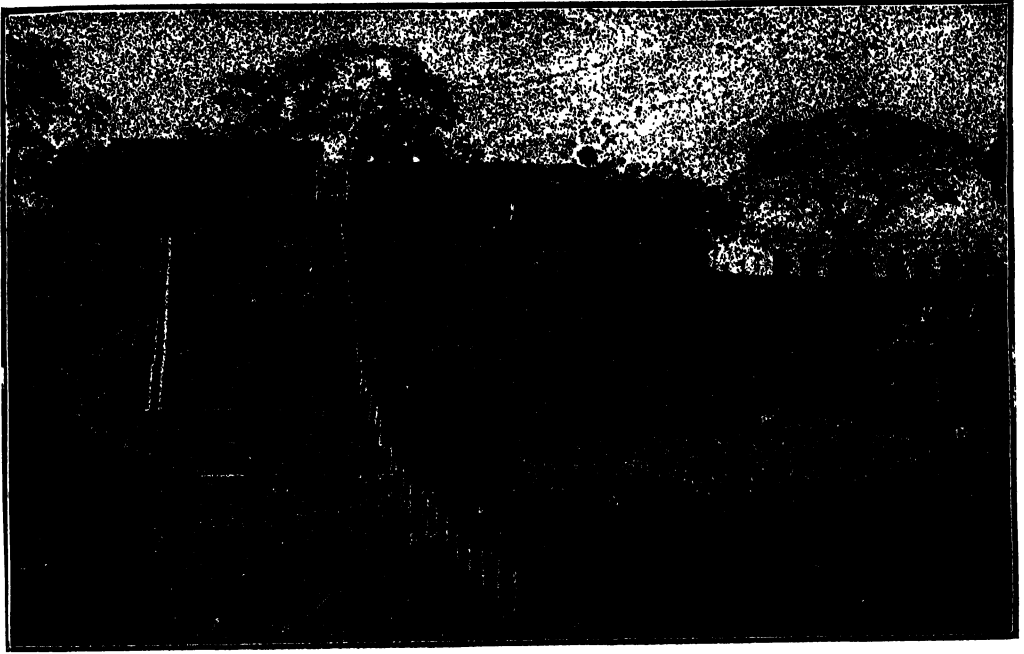
টেলিগ্রাফ বিল্ডিং

(৩) কোর্ট বিল্ডিং হইতে অপর একটী দৃশ্য।

(৪) সহরের মধ্যস্থিত লালদীঘি ও চট্টগ্রামের সর্ব্ব প্রধান আন্দরকিল্লা রোড্।

(৫) টেলিগ্রাফ বিল্ডিং। ইহাও একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত। টেলিগ্রাফ আফিস বিল্ডিং হইতে কর্ণফুলী নদীর মোহানার দৃশ্য অতীব রমণীয়।
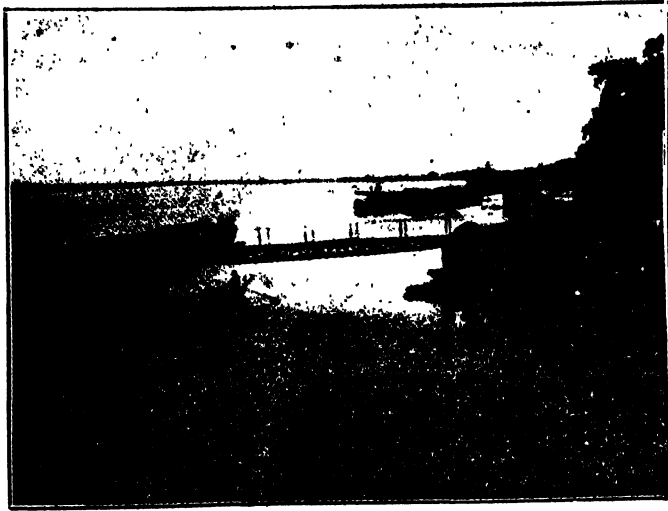
কর্ণফুলীর একটী দৃশ্য। সম্মুখে এতদ্দেশীয় নৌকা। ইহাকে দেশীয় ভাষায় "সাম্পান" বলে

(৬) কর্ণফুলীর একটী দৃশ্য। সম্মুখে এতদ্দেশীয় নৌকা। ইহাকে দেশীয় ভাষায় "সাম্পান" বলে। লুসাই পাহাড়ের কাউয়াদং (Kowadong) দেদং ও ফিনাঙ

(৭) কর্ণফুলীর একটী দৃশ্য।

(৮) চট্টগ্রামস্থ খাস্তগির High English বালিকা বিদ্যালয়ের সম্মুখ দৃশ্য। বিদ্যালয়ের সম্মুখ ভাগে যে রাস্তাটী দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম। বিদ্যালয়ের দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী পাহাড়—মধ্যস্থলে সমতল ভূমির উপর স্কুল গৃহটি অবস্থিত।

(৯) মিউনিসিপালিটীর বহির্দ্দেশে অবস্থিত পুলিস কোয়াটার।
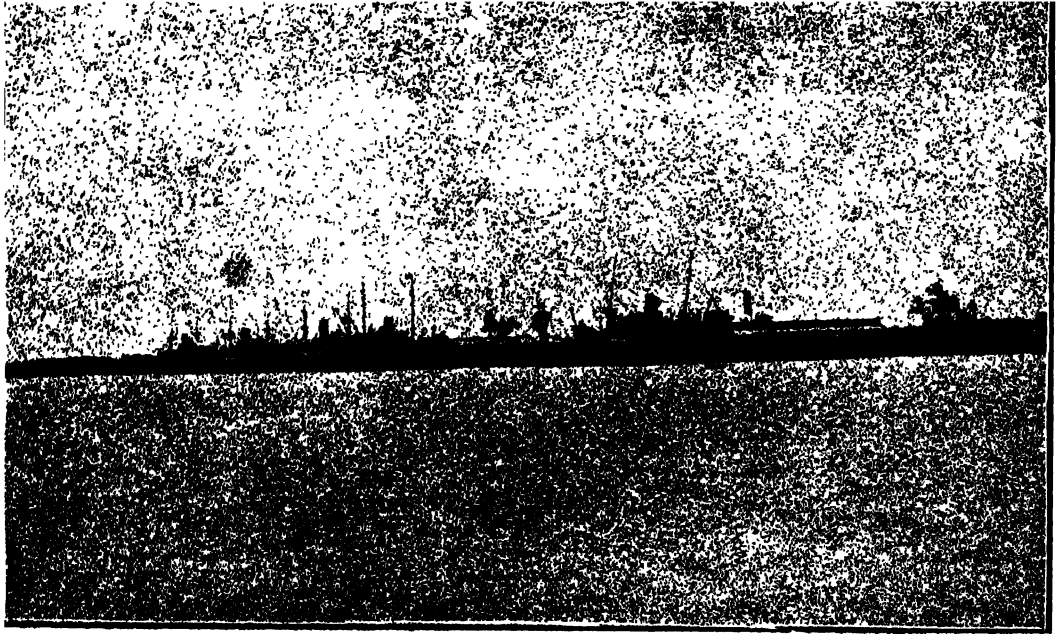
কর্ণফুলীর অপর একটি দৃশ্য
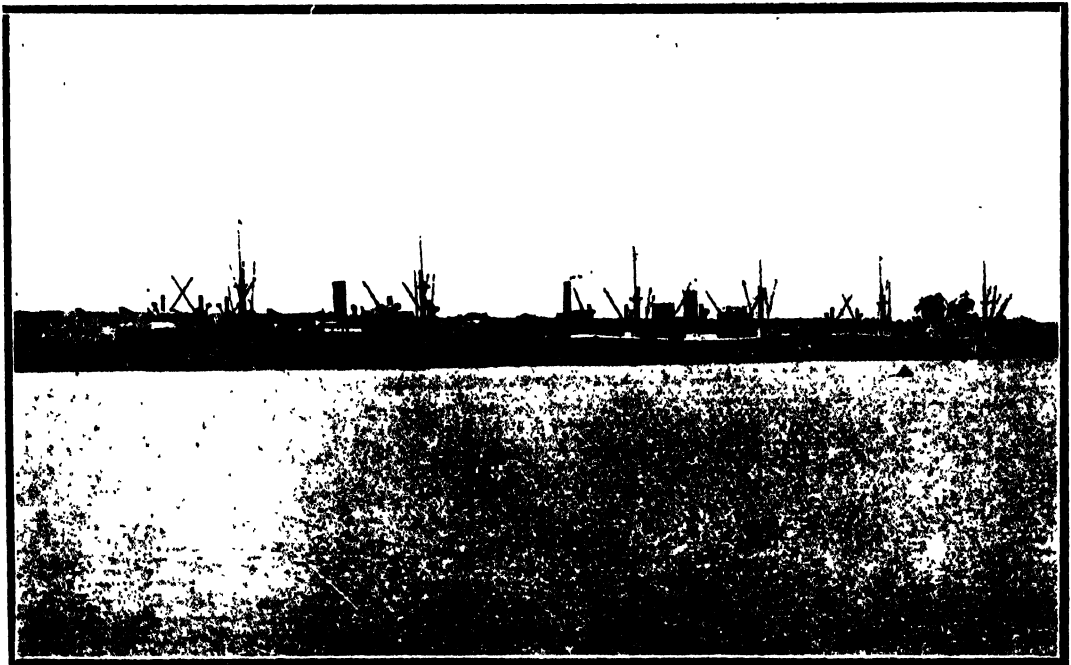
কর্ণফুলীর একটি দৃশ্য

চট্টগ্রাম খাস্তগির বালিকা-বিদ্যালয়ের সম্মুখ দৃশ্য
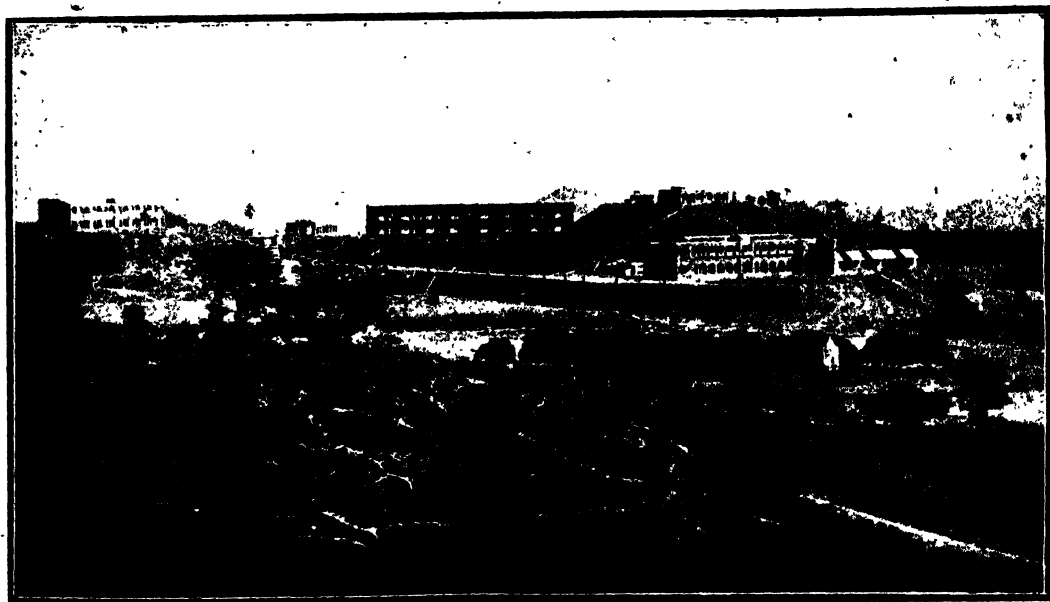
মিউনিসিপালিটির বহির্দ্দেশে অবস্থিত পুলিস কোয়াটার
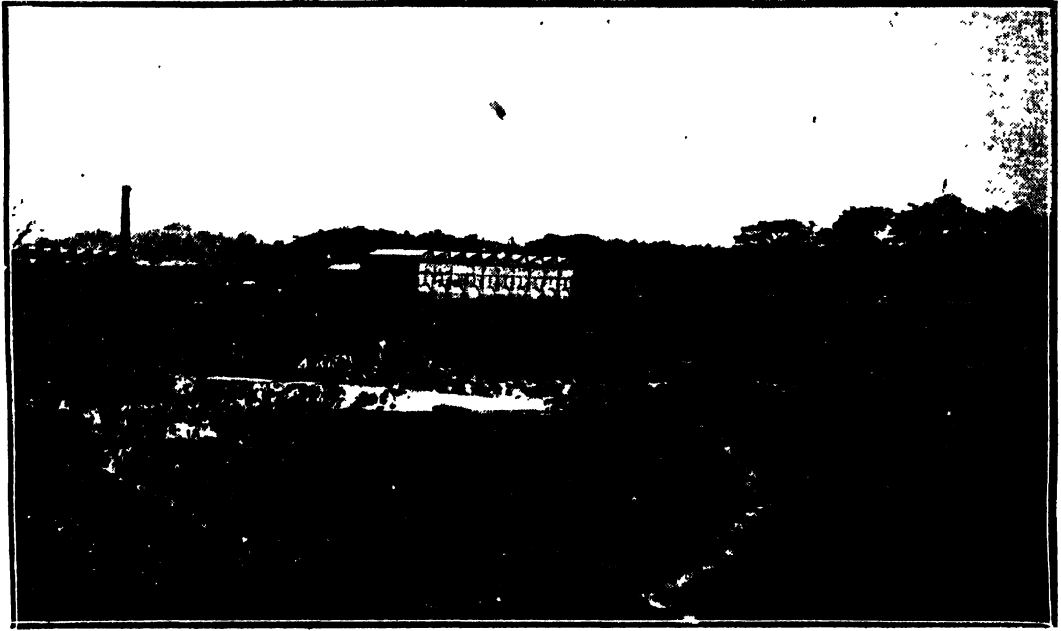
পাহাড়তলীর একটি দৃশ্য

এ, বি, রেলওয়ে হাসপাতাল রোড্

কক্সবাজার খেয়াঘাট

সমুদ্রতীরবর্ত্তী কক্সবাজারের রাজপথ

(১০) পাহাড়তলীর একটী দৃশ্য। পর্ব্বত শ্রেণীর পাদ দেশে অবস্থিত বলিয়াই ইহার নাম পাহাড়তলী।

(১১) এ, বি, রেলওয়ে হাসপাতাল রোড্।

(১২) কক্সবাজার (Cox-Bazar) একটী স্বাস্থ্যকর ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী রমণীয় স্থান।

পূর্ব্বে ইহাকে ফালোংক্ষি বলা হইত। কক্স সাহেব এখানে বাজারের পত্তন করিয়াছেন—এই নিমিত্ত ইহার নাম কক্স-বাজার। দেশ-বিদেশ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত নর-নারী বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী কক্স্বাজারে আসিয়া বসবাস করেন। এটী চট্টগ্রামের অন্তর্গত একটী মহকুমা। সহর হইতে ষ্টীমারে সমুদ্র-পথে মাত্র ৬ ঘণ্টার পথ। দিন শেষে বিদায়-রবির ক্লান্ত-রঙ্গীন কিরণ যখন পশ্চিম-সমুদ্রের অতলস্পর্শী সিন্ধুর সহিত কোলাকুলি করিতে থাকে, সেই মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক মধুর রূপটির নিকট চিত্রকরের অঙ্কন-পটুতা, কবির কল্পনা, বক্তার বাক্চাতুর্য্য ও লেখকের শব্দ-বিন্যাস কৌশল প্রভৃতি আপনা হইতেই পরাজয় স্বীকার করে। যিনি সমুদ্রের সৈকতভূমিতে থাকিয়া স্বচক্ষে সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছেন, তিনিই ইহার কান্ত মধুর রূপ দর্শনে নির্ম্মল আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, যেন ব্যথিতের হা হুতাশ—কালের ভৈরবী মূর্ত্তি এখানে নাই;—আছে শুধু এক অনির্ব্বচনীয় নিখিল ভরা আনন্দ—আর আনন্দ।

(১৩) সমুদ্র-তীরবর্ত্তী কক্সবাজার রাজ-পথটিও অতীব রমণীয়। রাস্তার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান বিটপী-শ্রেণীই ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। সন্ধ্যা সমাগমে এই ছায়া-ঘেরা বিজন পথটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পথিকের প্রাণ-মন দুই আকৃষ্ট হয়। বৃক্ষ শ্রেণীর কিয়দ্দূরে কক্সবাজার Goveranment Office দৃষ্ট হইতেছে। চট্টগ্রাম জিলাটীকে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র বলিলেই ইহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে চট্টগ্রামের ন্যায় এমন রমণীয় সহর আছে কি না সন্দেহ।

[চট্টগ্রাম ডবলমুরিং জেটী (Double moorings Jetty) সহর হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। ভুলক্রমে পূর্ব্ব প্রবন্ধে তদ্স্থানে ২২ মাইল ছাপা হয়।—লেখক]

কপোতাক্ষী তীরে

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

কপোতাক্ষী! স্মরি' তব মৃদু কলধ্বনি,
ফরাসী প্রবাসে কবি বিরহ ব্যথায়,
গাহিলা যে গীত!—সম মহামূল্য মণি—
খচিত মর্ম্মর বুকে কি দিব্য প্রভায়!
উচ্ছল-উর্ম্মিল-নীল-অনাবিল-নীরে,
আছে মধু কবিতার করুণ ঝঙ্কার!
অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে আঁকা চিররম্য তীরে,
বাল্যের বিমল ছবি বিশ্ব প্রতিভার!
স্নিগ্ধ-স্বচ্ছোজ্জ্বল-বারি-মুকুরে-বিম্বিত
(সার্থক ও নাম তব খ্যাত চরাচর!)
শ্রীমধু মূরতি শ্যাম!—হিল্লোলে কম্পিত
সে রূপ-মাধুরী ভরা প্রকৃতি সুন্দর:
উর বাণী-বর-পুত্র এ তীর্থ-দেউলে,
লহ অর্ঘ্য, স্মৃতি-পূজা, চিত্ত-বনফুলে! *

* ১২ই মাঘ, ১৩৩১ সনে মধুসূদনের জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষী তীরে 'কপোতাক্ষ নদ' শীর্ষক কবিতা উৎকীর্ণ স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে।

পল্লী-বিধবা ও শিক্ষা

শ্রীগিরিবালা রায়

আজ আমি বাঙ্গালার পল্লী-বিধবাদের সম্বন্ধে গুটিকতক কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ নগণ্য লেখিকার কথা একেবারে উড়াইয়া দিবেন না।

বাঙ্গালার সহায়সম্পদহীনা হিন্দু বিধবাদের অবস্থা যে কতদূর মর্ম্মান্তিক, সমাজের বিধি-নিষেধের উপর দাঁড়াইয়া যে তাঁহারা কি ভয়াবহ জীবন-ভার বহন করেন, সে কথা চিন্তা করিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

হিন্দু বিধবার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য পালনই কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম, পরোপকারই তাঁহাদের ব্রত, ত্যাগ ও সংযমই তাঁহাদের আদর্শ—মানিলাম; কিন্তু কয়জন বিধবা এ সুযোগ, এ শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? যাঁহারা পরিণত বয়সে বিধবা হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এমন বিধবাগণের সম্বন্ধে তবু আশা করা যায় যে, তাঁহারা নিজ ব্যবস্থা নিজে কতক পরিমাণে করিতে সমর্থ হয়েন; কিন্তু বাল-বিধবাগণের জীবন বড়ই দুঃসহ। শিক্ষার অভাবে আমাদের পল্লীগ্রামের কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই প্রায় অতি সঙ্কীর্ণচেতা হইয়া থাকেন। পর-নিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, দ্বেষ, কলহপ্রিয়তা—এ সব লইয়াই প্রায় তাঁহাদের সাংসারিক জীবন। সুতরাং বালবিধবা আত্মীয়াকে যত্ন করিবার, ভালবাসিবার মত মন ও শক্তি সামর্থ্য—কিছুই তাঁহাদের না থাকা অত্যাশ্চর্য্য না হইতে পারে, কিন্তু আজকাল শিক্ষিত নামধারী বাবুরাও—বিধবা ভ্রাতৃবধু কি বোন অথবা অন্য কোন আত্মীয়া যেই থাকুন, তাঁহাকে সমান প্রীতি দেখান তো দূরের কথা,—দাসী চাকরের প্রাপ্য করুণাও তাঁহারা দান করেন না। তবু তাঁহাদের কাছে থাকিতে উহারা বাধ্য। সধবা মেয়েরা ত এক লহমার ঘটনা-চক্রে নিজেরাও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন; তথাপি স্বামীদের আদর্শই তাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সধবা নারী বিধবা নারীর কদর একটু বুঝিতে চাহেন না। তাহার কারণ—মেয়েদের নিজেদের বুদ্ধি-বিবেকের উপর নির্ভর করিবার বিন্দুমাত্র সাহস নাই বলিয়া।

বিশেষ আজকালকার হাল ফ্যাসানের সংসারে প্রায়ই দেখা যায় যে, নিজ সন্তান পরিবার ছাড়া অন্য আত্মীয়ের ভার বড় কেহ বহন করিতে চাহেন না। কদাচিৎ দুই-একটি একান্নবর্ত্তী কর্ত্তব্যপরায়ণ সংসার দেখা যায় সত্য,—কিন্তু একটা সংসার দেখিয়া তো জগৎ-সংসারের ব্যবস্থা করিলে চলিতে পারে না। এখন সেদিন নাই, সে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা নাই। অর্থ নাই, একের উপার্জ্জনে দশের দিন চলা এখনকার মতে বিধেয় নহে। তবে শুধু পূর্ব্বের ব্যবস্থার দোহাই দিয়া এ সব পাপের ফল একা বিধবারাই ভোগ

করেন কেন? প্রকৃত প্রাণের দরদী না হইলে, শুধু মৌখিক ভালবাসায় একটা জীবন চলিতে পারে না। অথবা তাহার কর্ত্তব্য পালনে সে আনন্দ ও উৎসাহ পায় না। পরের জন্য স্বার্থ-ত্যাগে বড় একটা সুখ আছে, যদি সে বুঝিতে পারে—ইহাতে তাহারও কিছু উপকার আছে। প্রত্যেক জীবই সুখান্বেষী, আরাম-প্রয়াসী; বিধবা হইলেই তাহার অন্তরের বৃত্তিগুলি তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এরূপ বোধ হয় কেহই স্বীকার ও বিশ্বাস করিতে পারেন না।

সমাজ বিধবাদের প্রতি অতি নির্দ্দয় ও কঠিন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বদা তাঁহাদের সতর্ক দৃষ্টি বিধবাদের গতিবিধির উপরে আছে। সামান্য একটু ছুতা পাইলেই, তাঁরা কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সে ব্যবস্থায় তাঁদের উপকার তো হয়ই না, বরং অধোগতির পথ আরো মুক্ত হয়; জীবনে একদিনের ভুলের জন্য,—বিচারকের দণ্ডে—আর ফিরিয়া জীবনটা গড়িয়া তুলিবার পথ থাকে না। সমাজচ্যুতি, একঘরে অর্থাৎ ধোপা বন্ধ, নাপিত বন্ধ,—পাড়ায় দিন-রাত্রি তাঁদের সম্বন্ধে কুৎসা গাহিয়া বেড়ানই হয় তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা। কিন্তু এই যে সমাজের এত সতর্কতা সত্ত্বেও পতিতা বিধবার সংখ্যা বস্তুতঃ কম নহে—তাহার কারণ কি এই সমাজের অতি-শাসন বা অবিমৃষ্যকারিতাই নয়?

আমাদের আদর্শ অনেকই আছে, কিন্তু সেই আদর্শের মূল কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখেন কি? পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য তাঁহার বাল-বিধবা কন্যা লীলাবতীকে কিরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন? বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধের বৃহৎ মন্ত্রণাগৃহে রায়-রাইয়াঁদের সঙ্গে পরামর্শ-ক্ষেত্রে, আমাদের একজন বাঙ্গালী বিধবা রমণী (রাণী ভবানী) সমান আসন লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত সু-যুক্তি তাঁহার মস্তিষ্ক হইতেই বাহির হইয়াছিল। এই রাণী ভবানী, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও হিন্দু বিধবার কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গিয়াছেন। একাহার, ভূমিশয্যা কিছুতেই তাঁহার ত্রুটী ছিল না। তাই বলিতেছি, এখনকার বিধবাদের মত পরের লাথি না খাইয়া আর পরমুখাপেক্ষিনী না হইয়া, নিজের পায়ে ভর করিবার সাহস অবলম্বন করিলে বৈধব্য জীবনের কোন ধর্ম্মের হানি হয়, এমন কল্পনা কাহারও মনে না থাকাই সঙ্গত। যে দেশের নারীগণ ধর্ম্মের জন্য কৃপাণ ধরিত, সে দেশের নারীগণ নিজ মর্য্যাদা রক্ষার দাবীটুকুও এখন করিতে পারে না কেন? দুর্ব্বলা, শক্তিহীনা বলিয়া পঙ্গু হইয়া সমস্ত শক্তি তাহাদের ধ্বংসের পথে যাইতেছে।

মনের জোরে শারীরিক শক্তিও বৃদ্ধি পায়, এটা বিজ্ঞান-সম্মত কথা। এখনকার মেয়েদের ন্যায় তখনকার মেয়েদের এই দুরবস্থা ছিল না। তখন ছিল—ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরও সমান শিক্ষা। মস্তিষ্কচালনা, যুদ্ধ-বিদ্যা, শাস্ত্র অধ্যয়ন, রাজ-নীতিক গূঢ়-তত্ব—সর্ব্বক্ষেত্রেই সমান অধিকার তাঁরা পাইতেন। এখন তো সে সব স্বপ্নের কথা। আমাদের এই ভারতেই তারাবাই, লক্ষ্মীবাই, অহল্যাবাই, রাজপুত ও মারাঠী রমণীগণ অদ্ভুত শিক্ষার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আর এখন আমরা নিজেদের হইয়া একটা কথা বলিবার অধিকার পর্য্যন্ত রাখি না, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়? আবার এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা মেয়েদের কোন কথা বলিতে দেখিলে অমনি চীৎকার করিয়া উঠেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া গেল সব রমণী রসাতলে,—চাই সে ইংরাজি জানুক আর নাই জানুক। অবশ্য এঁদের কথায় ভয় পাইলে আর আমাদের এখন চলিবে না। প্রাচ্যের রমণী প্রাচ্যকে পুরুষ অপেক্ষা কম ভালবাসে না। যে সীতা সাবিত্রী লইয়া এত মাথা কুটাকুটি, তাঁদের গোড়া কয় জনে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন? তাঁরাও পূর্ণ-শিক্ষিতা স্বাধীনা রমণী ছিলেন। দ্যুমৎসেন-পত্নী আদর্শ-শিক্ষিতা, জ্ঞানবতী রমণী ছিলেন। তাই নারী-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিয়া, বধূকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন—স্বামীসহ বন গমনে। রাজা অশ্বপতি, কন্যা সাবিত্রীকে রথারোহণে পাঠাইয়াছিলেন নিজ স্বামী বাছিয়া আনিতে, ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন কি? তাই বলিতেছি—দেশের দুর্ভাগ্য যে, মেয়েদের হইয়া কোন মেয়ে দুইটা কথা বলিলেই সে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা ও কুলবধূদের মাথা খাইতেছে বলিয়া গালি খায়। তাঁহাদের মতের শিক্ষা—বোধোদয়ের বিদ্যা; বাঙ্গলা হরপ শিখিয়া দুই পাতা পড়িতে পারা। সে বিদ্যার চোটে মেয়েদের যার তার লেখা নাটক নভেল কণ্ঠস্থ করা, আর স্বামীর কাছে দীর্ঘ-দীর্ঘ প্রেম-পত্র লেখা—এই পর্য্যন্ত

[...]দের জ্ঞানের পরিসমাপ্তি। সুতরাং এই সব কারণেও [...]য়েদের উচ্চ-শিক্ষার প্রয়োজন। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, [...]তে, দর্শনে তাঁহাদেরও পুরোপুরি দখল থাকা আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্র বুঝিতে হইলেও তাঁহাদের বিশেষ শিক্ষার দরকার। নারীদের কর্ত্তব্য কি, তাহা নারীদের অনুধাবন করা কি সুযুক্তিসঙ্গত নহে? সংযম-ত্যাগের আদর্শ সংসারে বিরল,—কাহার দেখিয়া কে শিখিবে? সংসারে একা ত্যাগ করিবে শুধু বিধবাগণই! প্রত্যেক সংসারই এই ঘোর ভ্রান্তির বশীভুত।

শুধু পল্লী-বিধবাদের কথা কেন, এই কলিকাতা সহর-বাসী ধনীলোকদের গৃহেও প্রায় অনেক পরিবারেই দেখা যায়—দু'একটি বিধবা আত্মীয়া আছেন, সংসারের সব ঝি-রাঁধুনীর কাজ করিতে। ঝি-রাঁধুনীর তবু একটা নিজস্ব স্বাধীনতা আছে, কাজ করে—পয়সা নেয়। এ-যে বিনে মাহিনায়, আর আধপেটা খেয়ে!

বিধবা মেয়েরা সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রতি প্রত্যেকের সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া-দেখিয়া নিজেরাও ঘোর সঙ্কীর্ণ-চেতা হইয়া পড়েন। কোন একটি মেয়ে যদি তাহাদের নিয়মের মাপ-কাঠি হইতে একটু এ-দিক্ ও-দিক্ করিল, তবেই তাহার আর রক্ষা নাই। কেহ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদের ভুল বুঝাইয়া দিবেন না, সর্ব্বত্র তাঁহাদের দোষের ডঙ্কাই বাজাইয়া বেড়াইবেন,—ইহাই না কি তাঁহাদের সনাতন রীতি।

সত্য-কথা বলিতে কি, আমাদের দেশের পতিতা মেয়েদের মধ্যে প্রায় বেশীর ভাগই অল্প-বয়স্কা বিধবা। তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে আরো দেখা যায় যে,—প্রায় অনেকেই প্রবৃত্তির তাড়না অপেক্ষা পেটের জ্বালায় ও সমাজের নির্য্যাতনের ফলে এই আপাত-মধুর পাপের পথে ধাবিত হইয়াছে। সে দিন এখন আর নাই যে তাহার অনুশোচনা সত্বেও কোন একটি পতিতা মেয়েকে কেহ প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে পারে। আমরা বৌদ্ধ-সাহিত্য হইতে জানিতে পারি, সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মথুরা-বাসিনী একটি পতিতাকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। সে সব যুগ এখন অন্তর্হিত, কিন্তু পাপের লীলা ঠিকই আছে। যে-সব লম্পটের দোষে আজ হতভাগিনীদের এই দুরবস্থা, তাহারাই কিন্তু সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় হইয়া থাকে। যদি কোন মেয়ে কখনো প্রবৃত্তির দোষে কিছু অপরাধ করিয়া থাকেন, তাতেই বা তার এত অভিশপ্ত জীবন বহন করিতে হয় কেন? প্রবৃত্তির নিয়মানুসারেই মানুষের মনের গতি চলিবে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুতরাং কি প্রকারে এক-ই সংসারে দুইটী মেয়ে (কোন কোন স্থলে তাহারা সমবয়স্কাও হইয়া থাকে) সম্পূর্ণ বিপরীত নিয়মে চলিতে পারে ও তাহাতে তাহাদের আদর্শ জীবন গঠিত হইতে পারে? যাঁহার স্বামী আছে, তাঁহার সাত খুন মাপ। যত বড় বিলাসিতাই হউক না কেন,—সম-বয়স্কা বিধবা জা কি ননদ অথবা অন্য আত্মীয়াই হউক,—তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহারা তাহা অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিয়া থাকেন। এবং তাঁহাদেরই বিলাসের সব সামগ্রী বহন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে এই সব বিধবা আত্মীয়াকে। তাহাতেও তাঁহাদের নিস্তার থাকে না। যদি পাণ হইতে চুণ খ'সে, তবেই কর্ত্তব্য-ভঙ্গের অপরাধে বহুবিধ বাক্যবাণ, অনেক স্থলে তদপেক্ষা অধিক শাস্তি পাইতে হয়। আশ্চর্য্যের কথা এই যে—শাশুড়ী পর্য্যন্ত বিধবা বউকে স্নেহের চক্ষে দেখেন না। তিনিও সময় বুঝিয়া সধবা পুত্র-বধূর স্বার্থ-হানির আশঙ্কায় বিধবা পুত্র-বধূকে যথেষ্ট নির্য্যাতন করিয়া থাকেন। এই শাশুড়ীগণই আবার কেহ কেহ শিশু সন্তানদের লইয়া বিধবা হইয়া আত্মীয়দের নিকট বহু লাঞ্ছনা পাইয়া দশ-দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া তবে ছেলেদের অর্থোপার্জ্জনক্ষম করিয়া থাকেন।

যে সংসারে বালিকা বিধবা হয়, তাহাকে যদি প্রকৃত ভাবে সকল মনোবৃত্তি দমন করিয়া থাকিতে হয়, তবে তাহার অভিভাবকদের তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ জীবন যাপন করিতে হয়, নতুবা কখনো এমন অদ্ভুত নিয়মে শুভ উৎপন্ন হইতে পারে না।

পল্লী-গ্রামের বহু অল্পবয়স্কা বিধবাকে দেখা যায় যে—তাঁরা দারুণ শীতে ভোর পাঁচটায় উঠিয়া শুধু এক বস্ত্রে (দ্বিতীয় বস্ত্র গ্রহণ না কি তাঁহাদের পাপ) সংসারে বহু-বিধ কাজ নিজ হস্তে করিয়া থাকেন। সমস্ত দিন খাটিয়া প্রত্যেকের সুখ সুবিধা দেখিয়া বেলা পাঁচটায় তাহাদের হবিষ্যান্নের যোগাড়ে যাইতে হয়। "পর-সেবাই ধর্ম্ম" এই মহাবাক্য যথার্থ সন্দেহ নাই; কিন্তু যে সেবা করিবে ধর্ম্ম শুধু

তাহারই একলাকার নয়, যাহাদের সেবা করিবে তাহাদেরও তো একটা ধর্ম্ম থাকা উচিত। জানি না সেই শুদ্ধ শাস্ত্র পূর্ণ-ব্রহ্ম ঋষিগণ শুধু অভাগা বিধবাদের জন্যই এ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন কি না। মূল কথা—এইরূপ জীবন যাপন অপেক্ষা, যদি তাঁরা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, তবে নিজ জীবিকা নিজে অর্জ্জন করিয়াও সৎকাজের জন্য অনেক সময় পাইতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দ বারংবার বলিয়া গিয়াছেন—"আগে মেয়েদের উন্নত কর, নতুবা এই অধম জাতির উপায় নাই।" মেয়েদের উন্নতি তো দূরের কথা, পুরুষজাতির সহৃদয়তায় তাঁহাদের জাতি ক্রমশঃ নিম্নস্তরেই যাইতেছে। প্রভুরা সর্ব্বদা কর্ত্তা সাজিয়া চক্‌মকি ঠুকিয়া আলোক-জ্যোতিঃ দেখাইতেছেন। বিধাতা বোধ হয় জন্ম দিবার পূর্ব্বেই চিত্রগুপ্তের খাতায় "পুরুষদের স্বর্গ, মেয়েদের নরক অবশ্যম্ভাবী" এ ব্যবস্থা লিখিয়া রাখেন।

দেশ, কাল, পাত্র হিসাবে সমাজ সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যেমন দেবমন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া ঘর, দরজা, ঘটী, বাটী, থালা কোন জিনিসেরই সংস্কার না করিলে ক্রমে নষ্টের পথেই যায়, তেমনি সমাজেরও চির-পুরাতন ব্যবস্থা ধরিয়া থাকিলে, সমাজ নষ্টের পথেই চলিবে। সমাজই হইয়াছে জাতির জীবন-মরণ; চট্‌ করিয়া নূতনে যাওয়া গর্হিত, কিন্তু চির-পুরাতন ধরিয়া থাকাও ঠিক্ নহে। আস্তে আস্তে সংস্কার করিলে তবে জাতিও ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে উঠিতে পারিবে।

আর্য্য ঋষিগণ হিন্দু সমাজকে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। এখন ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়াছে, আবর্জ্জনাটুকুই পড়িয়া রহিয়াছে। অলসতার জন্যই হিন্দু মরিতে বসিয়াছে। স্বামীজি যে বলিয়া গিয়াছেন "আমাদের অদ্ভুত ধর্ম্ম ও'দের শিক্ষা দিব, আর ও'দের সামাজিক নিয়ম আমরা গ্রহণ করিব" তাহার অর্থ বিলাতী উচ্ছৃঙ্খলতা গ্রহণ নহে,—তাহাদের কর্ম্মপ্রবণতা গ্রহণ করা।

দেওঘরে সাধু বালানন্দের নিকট এক দিন গিয়াছিলাম। তিনি আমাদের উপদেশ দিলেন—"শ্রূয়তাং ধর্ম্ম সর্ব্বস্বং যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পর পীড়নম্॥" তাঁর মুখ হইতে তখন এই ছোট্ট শ্লোকটী বড়ই মধুর শুনিয়াছিলাম। সমাজ অসহায়া বিধবার প্রতি যে দয়া দেখাইতেছেন, তাহাতে সমাজের পুণ্যের বোঝা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে সন্দেহ নাই। যাক্, ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরও জীবন-যাত্রার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন। সাংসারিক কার্য্য মেয়েদের, অর্থোপার্জ্জন ছেলেদের—কে তাহা অস্বীকার করিতেছে? গ্রীষ্মকালের দুপুর রৌদ্রে—যে মেয়ের ভাগ্যে আছে—তাঁহার স্বামী আফিস্ কলেজে থাকুন, তিনি ঘরে বসিয়া ছেলে মেয়ে লইয়া ঘুম-পাড়ানি গীত গাহুন, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিবার হেতু নাই। মেয়েরা মাতৃত্বের অধিকারিণী, এই কারণেই ঘরকন্নায় মেয়েদের একান্ত প্রয়োজন। নির্ভরের জন্য নয়, আরামের জন্য নয়, ভোগের জন্য নয়;—মুক্তির জন্য। মাতৃত্বকে মেয়েরা এত ভালবাসে যে তাহাকে বন্ধন বলিয়া তাহারা মনে করে না,—এ যে তাহাদের পরম মুক্তি। কিন্তু ভাগ্য-বিধাতার নিদারুণ দণ্ডে এসব হইতে যাহারা সম্পূর্ণ বঞ্চিতা, তাঁহাদের জীবন-যাত্রার একটা পন্থা চাই তো? নিজের জীবনটা দলিয়া পিষিয়া ধ্বংসের দিকে পাঠাইয়া দেওয়াই তো আর একটা জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। বিধবা বিবাহ হইতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বিশেষ বড় বড় পণ্ডিতগণ এ বিষয় লইয়া বহু গবেষণা করিতেছেন। তাঁহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে কি সিদ্ধান্ত স্থির হয় তাহা দেখিবার জন্যই লেখিকা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব।
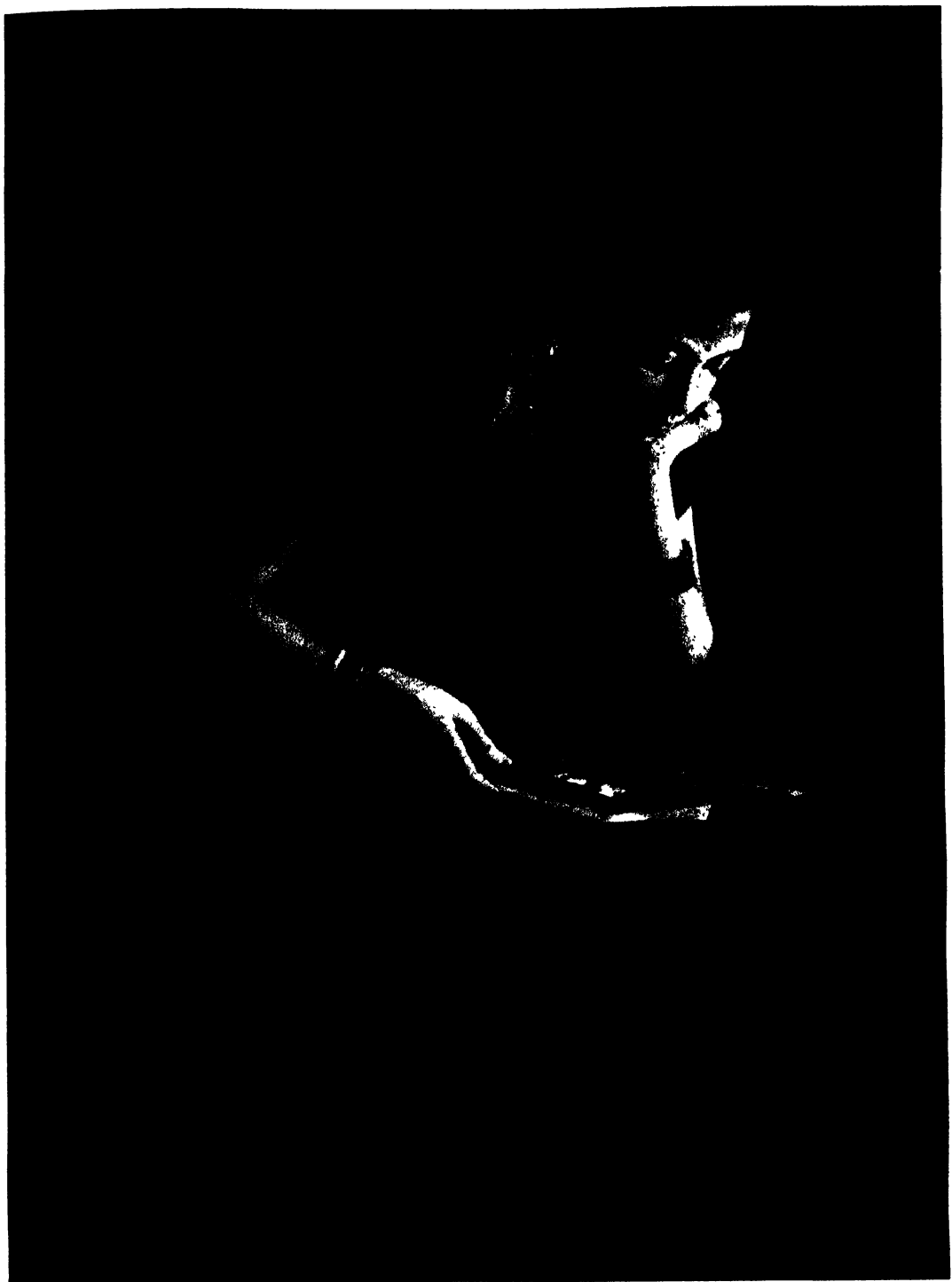
তন্ময়

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দে

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৮

পাটনা সহর হইতে অনেক দূরে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া অসিত পূর্ব্বাকাশে নবীন সূর্য্যের উদয়ের শোভা দেখিতেছিল। দুই দিকে সুদূর-বিস্তৃত আমবাগান, মধ্যে অপ্রশস্ত রাজপথ। বহুদূর পর্য্যন্ত লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। মাঝে মাঝে দুই একখানা ভগ্ন অযত্ন-পতিত বাসগৃহ জীর্ণ অবস্থায় কোনমতে দাঁড়াইয়া সুদূর অতীতে এ স্থানে মানুষের বসতির সাক্ষ্য দিতেছিল। উষার মৃদুরঞ্জিত অরুণ আলোর রেখা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট আঁধার অরণ্যানীর মাথায় মাথায় জাগিয়া উঠিতেছিল। সদ্য-জাগ্রত বিহগকুলের আনন্দ-কলরবে চারিদিক তখন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

অসিতের বয়স ২৬।২৭, দীর্ঘ সুগঠিত অঙ্গসৌষ্ঠব, মুখশ্রী গম্ভীর, গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি,—সহসা তাহাকে দেখিলেই দর্শকের মনে একটা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব উদয় হয়।

অসিত অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতর ফিরিয়া আসিল। ষ্টোভে চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া সে একখানা বই লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে, সেই সময় নিঃশব্দে আর একটি যুবক তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়াই অসিতের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বই ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ব্যগ্র ভাবে বলিল, এই যে পরেশ! এত দেরি হলো তোমার? কাল থেকে তোমার অপেক্ষায় আমি এই জঙ্গলে বসে আছি। তার পর, খবর কি সব? ওদিককার কাজ সব ঠিক হয়ে গেল?

পরেশ ঝুপ করিয়া মাদুরের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ শুষ্ক, দেহ ঘর্ম্মাক্ত। অত্যন্ত শ্রান্ত ভাবে সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছিল।

অসিতের প্রশ্নের প্রতি সে কোন মনোযোগ না দিয়া বলিল, এক কাপ্ চা আগে চট্ করে এগিয়ে দাও ত দাদা! তার পরে সব কথা-বার্ত্তা হবে 'খন! উঃ! সারা রাত্তির ধরে ঝোপ-ঝাড়, বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসতে হয়েছে! দম্ বেরিয়ে গেছে একেবারে!

অসিত আর কিছু না বলিয়া চায়ের কেটলিতে চা ভিজাইতে দিল। তার পর ষ্টোভে দুধ চড়াইয়া কুলুঙ্গী হইতে একটা বিস্কুটের টিন পাড়িয়া আনিয়া পরেশের সামনে রাখিল।

"বাঃ! এ যে একবারে রাজভোগ! এ জঙ্গলের মধ্যে এটা কোথায় পেলে?" লুব্ধ দৃষ্টিতে পরেশ টিনটার দিকে চাহিল।

—"কাল এখানে আসবার সময় সহর থেকে নিয়ে এসেছিলুম। আর কিছু হোক্ বা নাই হোক, চায়ের যোগাড়টা ত ভাল করে রাখতে হবে?" অসিত এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া পরেশকে আগাইয়া দিল। তার পর নিজের পেয়ালায় চা ঢালিয়া লইয়া বলিল, এইবার বল দেখি তোমার খবরটা কি? কাল এলে না যে? কোথায় ছিলে?

পরেশ চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া পরম পরি-তৃপ্তির সহিত চক্ষু মুদিয়া বলিল, হচ্ছে! হচ্ছে! ক্রমশ সব রহস্যই প্রকাশ করা যাবে। একটু জুত করে চা'টা এখন খেতে দাও বাবা! সারা রাত্তিরের পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর এ জিনিসটা যে কি 'অমৃতোপম' লাগছে, তা তোমার মত কাঠগোঁয়ার বুঝবে কোথা থেকে? সত্যি! আমার মনে হচ্ছে, চায়ের উপরে আমি একটা কবিতা লিখে ফেলি!

অসিত একটু হাসিয়া বলিল, সাধু সংকল্প! তবে সেটা একটু শীঘ্র শীঘ্র আরম্ভ করে ফেলো,—নয় ত ভাব জুড়িয়ে যেতে পারে! কিন্তু তুমি রাত-ভোর বন-বাদাড় ভেঙ্গে আসতে গেলে কেন? কেউ কিছু সন্দেহ করেছে না কি?

—"শুধু সন্দেহ? একেবারে পিছু পিছু ধাওয়া! কাল বিকেলে ষ্টেশন থেকে যেমন বেরিয়েছি, তখন থেকেই

মনে হল, একটা লোক আমার উপর লক্ষ্য রাখছে। ভাল করে সেটা জানবার জন্যে আমি হন্ হন্ করে এগিয়ে খানিকটা দুর চলে গেলুম। অনেকক্ষণ পরে পিছনে চেয়ে দেখি, অন্য ফুটপাত ধরে সেও সঙ্গে সঙ্গে আসছে। একটা গলির ভিতর ঢুকে তখন একটা দোকানে ঢুকে পড়লুম। প্রায় এক ঘণ্টা সেখানে বসে বসে কাটিয়ে দিয়ে, প্রায় সন্ধ্যার সময় উঠে গলি থেকে বেরিয়ে দেখি, সে লোকটা একটা আলোর পোষ্টের কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। তার হাত এড়াবার উপায় ভাবতে ভাবতে কতক দূরে এসে দেখি, একটা জায়গায় খুব সোরগোল হচ্ছে,—একটা ছোকরা মেয়েদের মত সাজগোজ করে মিহি সুরে গান ধরে ঘুরে ঘুরে নাচছে, আর দুজন লোক তার গানের সঙ্গে মাথা নেড়ে, নানা অঙ্গভঙ্গী করে, হেলে দুলে সারেঙ্গী আর তবলা বাজাচ্ছে। রাস্তার লোকে হাঁ করে সেই অদ্ভুত তামাসা দেখছে। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। তার পর সময় বুঝে অন্ধকারের মধ্যে এক দিক থেকে বেরিয়ে গিয়ে চলতে লাগলুম। রাত্রে এক চাষীর দাওয়ায় আশ্রয় নিয়ে ঘণ্টা দুই তিন কাটিয়েছি। তার পর রাত থাকতে উঠে এই ক্ষেত-খামার, বাগান-টাগানের ভিতর দিয়ে চলে আসছি। সোজা পথে গেলুম না,—কে আবার কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে, কাজ কি ?"

অসিত বলিল, সে ভালই করেছ। এখানে যে ক'দিন থাকতে হবে, তত দিন এ আস্তানার সন্ধান কেউ না পেলেই ভালো। তার পর, ওদিকে সব কি হলো ?

পরেশ তার চায়ের পেয়ালা আগাইয়া দিয়া বলিল, সে সব ভেস্তে গেছে! কিন্তু তুমি এখন আর এক কাপ দাও অসিত-দা—এক বাটিতে হলো না কিছু। তার পর সে দুইখানা বিস্কুট মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, খবর অনেক আছে। তোমার কাছে সব কথা বলবার জন্যেই ত তারা আমায় তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরিয়ে দিলে। কিন্তু ওদিককার যা কিছু এত দিনের কাজ, যা কিছু আয়োজন, সব পণ্ড হয়ে গেল,—এইটেই বড় আপশোষের কথা !

অসিত চা ঢালিয়া দিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পরেশও তাহার ভাব দেখিয়া, আর কিছু না বলিয়া, নীরবে চা খাইতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে অসিত বলিল, যাক্, দু' এক দিনে বা সামান্য চেষ্টায় কোন মহৎ কাজ হয় না। বারবার ব্যর্থতার মধ্যে দিয়েই আমরা সফল হব। এতে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। এখন বল, তারা কি বলতে তোমায় পাঠিয়েছে।

তাহারা দুইজনে নিম্নস্বরে কথা বলিতে লাগিল ও ক্রমশঃ সেই আলাপের মধ্যে এমন মগ্ন হইয়া গেল যে, আর কোন কিছু মনে রহিল না। বেলা বাড়িয়া চলিল, তাহাদের সম্মুখে অভুক্ত খাদ্য পড়িয়া রহিল, চা জুড়াইয়া জল হইয়া গেল,—তাহারা তাহা জানিতেও পারিল না।

অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দে ও নারীকণ্ঠ-নিঃসৃত আর্ত্তনাদে সেই নির্জ্জন স্থান মুখর হইয়া উঠিল। অসিত ও পরেশ চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহারা দুইজনেই বারাণ্ডায় গিয়া দেখিল, একখানা প্রকাণ্ড মোটরের টায়ার ফাটিয়া, সেখানা রাস্তার ধারের একটা গাছে ধাক্কা লাগিয়া কাৎ হইয়া পড়িয়াছে; এবং একটি যুবক ভিতরের আরোহীদের বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে।

পরেশ একবার অসিতের মুখের দিকে চাহিল। অসিত বলিল, চল, এখানেই তুলে আনতে হবে।

দুইজনে চক্ষের নিমেষে ছুটিয়া নামিয়া গেল। যুবকের সাহায্যে তাহারা গাড়ীর ভিতর হইতে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক ও একটি মহিলাকে নামাইয়া পথের উপর দাঁড় করাইল।

মহিলাটির হাত কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছিল। বৃদ্ধ সে দিকে চাহিয়াই ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, উঃ! নির্ম্মলার হাতে বড় চোট লেগেছে কিরণ! ভয়ানক রক্ত পড়ছে যে! কি করা যায় ?

কিরণ তখন একটু আশ্রয়ের জন্য চারিদিকে দেখিতেছিল। অসিতকে দেখিয়া বলিল, মশায়! এখানে কাছাকাছি কোথাও বসবার মত জায়গা আছে কি ?

অসিত তাহাদের ভাঙ্গা বাড়ীখানা দেখাইয়া দিয়া বলিল, সামনে এইটে ছাড়া আর কোথাও স্থান নেই। ওটাকে যদিও ঠিক বাড়ী বলা যায় না, তবু···

"যথেষ্ট! যথেষ্ট! এঁকে একটু বসাবার মত জায়গা পেলেই বাঁচা যায়। এস নির্ম্মলা!" বলিয়া কিরণ নির্ম্মলার হাত ধরিল।

অসিত সকলকে লইয়া উপরে আসিল। পরেশ মিঃ ঘোষকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আপনার কোথাও লাগে নি ত?

"আমার? নাঃ, আমার বিশেষ কিছু হয় নি। কিন্তু নির্ম্মলা—ওঃ! ওর বড় কষ্ট হচ্ছে! এখানে কোন ডাক্তার কাছাকাছির মধ্যে পাওয়া যাবে কি?"

অসিত একবার নির্ম্মলার বিবর্ণ যন্ত্রণা-কাতর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, বলিল, এখানে চার পাঁচ কোশের ভিতর ডাক্তার ওষুধ কিছুই পাওয়া যাবে না। বলেন ত আমি ওঁর হাতের রক্তটা ধুয়ে একটা ব্যাণ্ডেজ করে দিতে পারি,—তাতে কতকটা আরাম পেতে পারেন।

কিরণ বলিল, উপস্থিত তাহলে ওঁর হাতটা আপনি ব্যাণ্ডেজ করেই দিন,—আমি একটু এগিয়ে একখানা গাড়ী বা ট্যাক্সির সন্ধান করি গে। সহরে না পৌছতে পারলে ত কোন ব্যবস্থাই করতে পারা যাবে না!

"তাই যাও, তাহলে যেমন করে হোক এখন বাড়ী পৌছতেই হবে।" মিঃ ঘোষ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

কিরণ উঠিয়া দাঁড়াইতেই অসিত বলিল, আপনি উঠছেন কেন? গাড়ী আনাবার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি,—আপনি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করুন। যে স্থানে এসে পড়েছেন, এখানে আপনাদের সাহায্যের জন্যে আর কিছুই করা যায় না। পরেশ, দেখ ত উঠে একবার,—গাড়ী বা ট্যাক্সি যা সামনে পাবে, একখানা এঁদের জন্যে নিয়ে এস।

পরেশ নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গেল। অসিত দড়ীর উপর হইতে একখানা পরিষ্কার চাদর টানিয়া লইয়া লম্বালম্বি ভাবে ছিঁড়িয়া ব্যাণ্ডেজের মত পাকাইয়া লইল—পরে পরিষ্কার জলে নির্ম্মলার আহত স্থান ধোয়াইয়া ক্ষিপ্র নিপুণ হস্তে হাতটি ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিল।

এই অপরিচিত যুবকের করস্পর্শে নির্ম্মলার ক্লিষ্ট পাণ্ডুবর্ণ মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হাত বাঁধা হইবার পর সে অনেকটা সুস্থ বোধ করিল—ও তাহার স্নিগ্ধ কৃতজ্ঞ দৃষ্টি অসিতের মুখের দিকে তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, হাতটা এখন অনেক ভাল মনে হচ্ছে। এতক্ষণ হাতের ভিতর যা কন্‌কন্ করছিল।

অসিত মুখে কিছু না বলিলেও, তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কিরণ সকৌতুকে বলিয়া উঠিল, মশায় কি মেডিকেল কলেজের ষ্টুডেণ্ট? না—রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কোন সেবক?

অসিত সহসা তাহার সম্বন্ধে এই কৌতুকপ্রদ প্রশ্নে হাসিয়া বলিল, কেন বলুন ত? হঠাৎ আমার সম্বন্ধে আপনার এরূপ ধারণা হলো যে?

—"আপনি যে রকম সুন্দর ব্যাণ্ডেজ করে ফেল্লেন, তাই দেখে আমার মনে হচ্ছে, এ ত অজ্ঞ লোকের হাতের কাজ নয়,—পাকা হাত না হলে এ রকম দক্ষতা দেখা যায় না—তাই আমার অনুমান..."

অসিত বাধা দিয়া হাসিয়া বলিল, আপনার তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির প্রশংসা করলেও, আপনার অনুমান এ ক্ষেত্রে একেবারেই ভুল,—আমি ও দুটি পর্য্যায়ের কোনটির মধ্যেই নয়। তবে এ সব কাজ আমাদের কতকটা শিখতে হয়েছে বটে,—কত সময় কত দরকারে লাগে।

কিরণ এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া গৃহের সজ্জা দেখিতেছিল। একধারে দড়ির উপর খান-দুই পরিধেয় বস্ত্র, ঘরের একটি কোণে ষ্টোভ, তার অন্য পাশে চায়ের সরঞ্জাম ছড়ানো, সকালের অভুক্ত চা ও বিস্কুট তখনো সেখানে পড়িয়া ছিল। একটা কুলুঙ্গীর উপর একটা ছোট অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি ও একখানা থালা ও খানকতক বই তোলা ছিল। গৃহের মধ্যে একমাত্র শয্যা—একখানা মাদুর, তার উপর মিঃ ঘোষ ও নির্ম্মলা বসিয়া ছিলেন।

সে বলিল, তবেই হল। আমার অনুমান একেবারে ভুল বলতে পারেন না আপনি। আমি বলেছি—শিক্ষিত হাত ছাড়া এমন কাজ হয় না,—এবং সাধারণতঃ যে শ্রেণীর লোকে এ সব শিক্ষা করে থাকেন, তাঁদের কথাই মনে হয়েছিল। আপনি সে শ্রেণীর যদি নাও হন, তবু এসব শিক্ষা করতে হয়েছে ত?

"তা অবশ্য বলতে পারেন" বলিয়া অসিত একান্ত করুণার্দ্র নেত্রে মাদুরের উপর শায়িত নির্ম্মলার ক্লান্ত করুণ মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

নির্ম্মলা অবসন্ন শরীরে মাটিতে মাদুরের উপর লুটাইয়া এলাইয়া পড়িয়াছিল। তার চক্ষু মুদ্রিত, গাঢ় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ

নিটোল শুভ্র পুরন্ত গণ্ডের উপর বিশ্রাম করিতেছিল। মিঃ ঘোষ উদ্বিগ্ন চিত্তে গাড়ীর আশায় কন্যার মাথার কাছে নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া ছিলেন।

কিরণ বলিল, আর একটা কথা,—আমরা না হয় এখানে একটা দৈব দুর্ঘটনায় এসে পড়েছি,—কিন্তু আপনারা দুজনে এখানে কোথা হতে এসে পড়লেন? এটা ত মানুষের বসতির স্থান বলে মনে হচ্ছে না! দু' চার ক্রোশের মধ্যে ত জন-মানবের কোন চিহ্ন নেই দেখছি!

অসিত বলিল, তা নেই সত্যি! তবে আমরা এখানে মাঝে মাঝে এসে থাকি। এটা আমাদের একটা ছোট খাট আস্তানা।

"এখানে থাকেন? সত্যি না কি?" কিরণ এবার সবিস্ময়ে অসিতের মুখের দিকে চাহিল। সে মনে মনে একটা কিছু ভাবিতেছে বুঝিয়া অসিত হাসিয়া বলিল, এবারও আমার সম্বন্ধে একটা কিছু অনুমান করছেন না কি?

কিরণ এবার গম্ভীর ভাবে বলিল, এ ক্ষেত্রে অনুমানটা ঠিক প্রয়োগ করতে পারছি না। কারণ, স্থানটি এমন কিছু লোভনীয় নয়, যার জন্যে স্বেচ্ছায় মানুষ এখানে এসে বাস করতে পারে। তবে এক যদি কেউ যোগ সাধনা করতে চায়—

অসিত বাধা দিয়া সপরিহাসে বলিল, ঠিক ধরেছেন এবার! জানেন ত, নির্জ্জনে না হলে যোগ সাধনা হয় না?

কিরণ উঠিয়া অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে বলিল, এগুলো তবে যোগের বই বুঝি? সে একখানা বই খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে দুই এক পাতা পড়িয়া সেখানা রাখিয়া অন্য বইগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তার পর একবার অসিতের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া অসিতও আর কোন কথা বলিল না। কিছুক্ষণ পরে কিরণ মিঃ ঘোষকে বলিল, আপনারা বসুন, আমি একবার আমাদের গাড়ীখানার অবস্থা কি রকম—ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে আসি। ওটা আবার নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে ত?

মিঃ ঘোষ এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই। কিরণ চলিয়া গেলে তিনি অসিতকে বলিলেন, সত্যই কি আপনারা এই জঙ্গলের ভিতর থাকেন? আমি আরো কয়েকবার এই পথে যাতায়াত করেছি। এ ভাঙ্গা বাড়ীটার প্রতি অবশ্য কোন দিন লক্ষ্য করি নি। কিন্তু এদিকে কখনো কোন মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে বলে ত মনে হচ্ছে না।

অসিত বলিল, আমরা ত সর্ব্বদা এখানে থাকি না, কখন কখন আসি, হয় ত দু এক দিন থাকি, আবার চলে যাই। যে সময়টায় থাকি—তাও প্রায় বাড়ীর ভিতরেই পড়া শুনা নিয়ে থাকি, পথে বেরোবার কোন দরকারই হয় না। তাতেই আমাদের সঙ্গে কারো দেখা হওয়া সম্ভব নয়।

নির্ম্মলা এসব কথা শুনিয়া, এতক্ষণ সবিস্ময়ে চারিদিকে চাহিয়া গৃহের অপূর্ব্ব সজ্জা দেখিতেছিল। সে বলিল, এই রকম জায়গায়—এত নির্জ্জনে একলা থাকতে আপনাদের কোন কষ্ট হয় না? কি করে থাকেন? খাওয়া দাওয়ারই বা কি ব্যবস্থা করেন?

অসিত হাসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। বলিল, কষ্ট কিসের বলুন? আমরা জীবন থেকে সব রকম বাহুল্য বর্জ্জন করে চলতে অভ্যস্ত হয়েছি। তাই আর কোন কষ্টই আমাদের কষ্ট বলে মনে হয় না। অভাব, দুঃখ, কষ্ট এ সব অনেকটা আমরা নিজেরা তৈরি করেছি—তারি ফলে কষ্ট পাই। যথার্থ অভাব আমাদের খুবই কম।

মিঃ ঘোষ এ কথা শুনিয়া সহসা অত্যন্ত খুসি হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, এই ত যথার্থ জ্ঞানীর মত কথা! উনি ঠিক কথাই বলেছেন নির্ম্মলা! আমাদের চার পাশের যত কিছু দুঃখ, কষ্ট, অভাব—সবই আমরা নিজেরা গড়ে তুলেছি। সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করলে—যেমন সব আগেকার কালে জ্ঞানী লোকেরা থাকতেন, সে ভাবে থাকলে,—অভাব যে কত অল্প, তা এখনকার লোকে ধারণাও করতে পারে না!

নির্ম্মলা নিজেও এ বিষয়ে কিছুই ধারণা করিতে পারে নাই। তাহার মনে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকমালা-সজ্জিত, মূল্যবান গৃহসজ্জায় শোভিত, সুখময় রম্য গৃহের চিত্র ভাসিয়া উঠিল। বন্ধু-বান্ধবের প্রীতি-প্রফুল্ল সম্ভাষণ, সেবাতৎপর সুদক্ষ দাস-দাসী-পূর্ণ, নিশ্চিন্ত আরামে পূর্ণ

গৃহ ছাড়িয়া—এই গভীর জনমানবশূন্য জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙ্গা ঘরে মাটির উপর একা পড়িয়া থাকা কেমন করিয়া সুখকর হইতে পারে, সে তাহা বুঝিল না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া অসিত নিজেই আবার বলিল, আর খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন? তা আর এমন শক্ত কি! ঐ হাঁড়িটায় কয়েক মুটো চাল, গোটা কতক আলু দিয়ে সিদ্ধ করে, বা চাল আর ডাল এক সঙ্গে সিদ্ধ করে নিতে পারলেই, খাওয়ার প্রয়োজন মিটে যায়। স্টোভে হাঁড়িটা চড়িয়ে দিয়ে সামনে বসে বই পড়তে পড়তে সে কাজ আধঘণ্টার মধ্যে হয়ে যায়। শোবার জন্যে এই মাদুরই আমাদের যথেষ্ট। তবে আর কষ্ট কি?

অসিত হাসিয়া এ কথা বলিলেও, নির্ম্মলা মনের ভিতর শান্তি পাইল না। তাহার ভিতরকার সেবাপরায়ণ নারী-প্রকৃতি অসিতদের এ অবস্থায় থাকা সুখকর বলিয়া মানিয়া লইতে পারিল না। কিন্তু এই অত্যল্প কালের পরিচয়ে আর কিছু বলা যায় না; কাজেই সে চুপ করিয়া গেল।

অসিত তাহার মুখ দেখিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিল। এই নীরব সহানুভূতিতে তাহার স্বভাবতঃ সর্ব্ব-বিষয়ে-উদাসীন কঠোর চিত্তও কেন যে একটা মধুর আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল, সে তাহা নিজেই বুঝিল না। সে কতকটা আত্মবিস্মৃত ভাবে বলিল, তবে আপনার আজ অত্যন্ত কষ্ট হল! আপনাদের ত এ রকম ভাবে থাকা অভ্যাস নেই কখনো! এই অসুস্থ শরীরে একটু শান্তি পেলেন না।

নির্ম্মলা এ কথায় হঠাৎ অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, না! না! সে জন্যে আপনি ভাববেন না কিছু! আমার এমন বিশেষ কিছু কষ্ট হয়নি।

মিঃ ঘোষ বলিলেন, আপনাদের সঙ্গে একটা দুর্ব্বিপাকের মধ্যে পড়ে পরিচয় হয়ে গেল। এই সঙ্কটের সময় যেমন আপনাদের কাছে উপকার পেয়েছি, তেমনি এই পরিচয় হওয়ায় অত্যন্ত সুখী হলুম। আশা করি, আমাদের এ বন্ধুত্বের এখানেই শেষ হবে না। মধ্যে মধ্যে আপনাদের সাক্ষাৎ পেলে আমরা সকলেই বড় সুখী হবো।

অসিত এ কথার কোন উত্তর না দিয়া নীরবে রহিল। মিঃ ঘোষ সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া বলিতে লাগিলেন, এখান থেকে আর খানিক দূরে আমি একটা বাগানবাড়ী কিনেছি। নির্ম্মলার বন্ধু-বান্ধবেরা সেখানে এক দিন সবাই পিকনিক করবে বলে ধরেছে। বাড়ীটা এখনো ভাল করে গোছান হয় নি। তাই আমরা আজ সকালে কতকটা গুছিয়ে নেবার জন্যে যাচ্ছিলুম। তা এখন ত কিছু দিনের মত সে সব বন্ধ হয়ে গেল,—নির্ম্মলা ভাল হোক আগে! তার পর আবার সব ব্যবস্থা করা যাবে। ভাল কথা, আপনারা যখন এখানে না থাকেন, তখন আর কোথায় আপনাদের পাওয়া যাবে?

অসিত কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কিরণ উপরে আসিয়া বলিল, পরেশবাবু গাড়ী নিয়ে এসেছেন নির্ম্মলা! কেমন আছ এখন? আপনি নীচে যেতে পারবে ত?

মিঃ ঘোষ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হাতের উপর ভর রাখিয়া নির্ম্মলা ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল, তা পারবো বোধ হয়। মিঃ ঘোষ তাহাকে লইয়া সিঁড়ীর দিকে অগ্রসর হইলে, কিরণ অসিতের প্রতি চাহিয়া বলিল, আজ অকস্মাৎ আমরা বাড়ী চড়াও হয়ে এসে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে আপনাদের নির্জ্জন শান্তি ভঙ্গ করলুম! কিন্তু আপনারা ছিলেন বলে আজ এ বিপদের সময়ে যথেষ্ট উপকার পাওয়া গেল। না হলে বড় মুস্কিলেই পড়তে হত। যা-হোক, এখন থেকে তা হলে মাঝে মাঝে আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে ত?

অসিত একটু ভাবিয়া বলিল, সেই কথাটাই ঠিক করে বলা শক্ত। পরিচয় যখন আপনাদের সঙ্গে হলো—তখন মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হলে আমরা খুব খুসী হতুম। তবে কাজের গতিকে আমরা কখন যে কোথায় থাকি, তা আমরা নিজেরাই সব সময় ঠিক জানি না, সেই জন্যে কোন কথা দিতে সাহস হয় না।

কিরণ বলিল, তা বলে আমরা আপনাদের ছাড়ছি না মশায়! আপনারা সহরে যদি আমাদের ওখানে যান—সে ত খুব আনন্দের বিষয়। না হলে, আমিই এখানে এসে আজকার মত চড়াও হতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবো না—জানবেন।

অসিত হাসিয়া বলিল, কিন্তু তাতে ত কোন ফল হবে না। হয় ত আমরা এখানে আর নাও আসতে পারি!

দুইজনে কথা কহিতে কহিতে নীচে নামিয়া দেখিল—

মিঃ ঘোষ নির্ম্মলাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া তাহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন।

পরেশ দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। কিরণ তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে গেলে, নির্ম্মলা অসিতকে নমস্কার করিয়া বলিল, তা হলে সুবিধা মত এক দিন আমাদের ওখানে যাচ্ছেন ত?

অসিত হাসিমুখে যুক্ত-করে তাহাকে নমস্কার করিতেই, মিঃ ঘোষ বলিয়া উঠিলেন, যাবেন বৈ কি! নিশ্চয়ই যাবেন! এমনিতে ত যেতেই হবে, তোমার 'পিকনিকের' দিনও আমাদের এই নতুন বন্ধুদের ছাড়া হবে না—কি বল নির্ম্মলা? বলিয়া নিজের কথায় নিজেই প্রচুর হাস্য করিয়া অসিতকে বলিলেন, সহরে যাকে বলবেন—সেই আমার বাড়ী দেখিয়ে দেবে। নিবাস যদিও আমার অনেক দূরে, রাজসাহী জেলায়, তবু এখানে অনেক দিনের বাস কি না, বহুকাল এখানেই কেটে গেছে, সকলেই জানে। আমার নাম গিরীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। আপনার নামটি কি?

অকস্মাৎ অসিত দুই পা পিছু হটিয়া গেল। ঘোর উত্তেজনায় তার মুখ রক্তবর্ণ ও দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া উঠিল। ক্রোধে ও প্রতিহিংসায় বিকৃত সে মুখ দেখিয়া, মিঃ ঘোষ স্তম্ভিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। অসিত সগর্জ্জনে বলিল, আপনিই রাজসাহীর মণ্ডলগড়ের জমীদার গিরীন্দ্র ঘোষ? আমি সেখানকার রাসগোবিন্দ দত্তের পুত্র, আমার নাম—অসিতকুমার দত্ত!

মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত মিঃ ঘোষের উন্নত মস্তক তাঁহার বক্ষের উপর ঝুলিয়া পড়িল। অর্দ্ধস্ফুটস্বরে তিনি বলিলেন, তুমি অসিত? তুমি অসিত? ওঃ! এত দিন পরে!

(ক্রমশঃ)

মহম্মদপুর

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তোফী

(আলোক-চিত্র—শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মণ, এম-আর-এ-এস মহাশয়ের সৌজন্যে)

(১)

বহু দিনের বাসনা ছিল রাজা সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুর দেখিব। কিন্তু ঐ অঞ্চলে পরিচিত কেহ না থাকায় অবশেষে মহম্মদপুরের পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলাম। তিনি সেই পত্র নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের মহম্মদপুরের নায়েব মহাশয়কে দেন। নায়েব মহাশয় ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত। তিনি তৎক্ষণাৎ মহম্মদপুর দেখিতে যাইবার জন্য সাদরে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করেন।

পূজনীয় ললিত দাদা, শ্রীমান অরীণ ভায়া ও একটি লোক সহ ২৩ শে ডিসেম্বর রাত্রি ৯—২৪ মিনিটের খুলনাগামী ট্রেণে শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে যাত্রা করিলাম। মহম্মদপুরে ষ্টীমার ষ্টেসন থাকিলেও, কলিকাতায় উহার টিকিট পাওয়া দুষ্কর দেখিয়া, উহার পরের ষ্টেসন বোয়ালমারীর টিকিট লইয়াছিলাম। বড়দিনের বন্ধ উপলক্ষে ট্রেণে অত্যন্ত ভীড় ছিল। ভোর ৪॥০ টার সময় ট্রেণ খুলনা পৌঁছিল। চালান যাইবার জন্য সেখানে নদীর ধারে ঝুড়ি ও বাক্স-বন্দী হইয়া যে মৎস্য ছিল, তাহার দুর্গন্ধ বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছিল। খুলনা ভৈরব নদের উপরে অবস্থিত। নদের ধারে সাতটি ঘাটে সারি সারি ষ্টীমার দাঁড়াইয়া আছে। আমরা নং ৪ ঘাটে খুলনা—গোপালগঞ্জ—মাদারিপুর লাইনের ষ্টীমারে অতি কষ্টে একটু স্থান সংগ্রহ করিলাম।

২৪ শে ডিসেম্বর প্রাতে প্রায় ৬॥০ টার সময় ষ্টীমার ছাড়িল। দেখিলাম, ভৈরবের জলে অসংখ্য কচুরী পানার বৃহৎ দাম ভাসিতেছে ও জল অপরিষ্কার করিয়াছে। ভৈরবের উভয় তীরে প্রচুর নারিকেল, সুপারী, তাল ও খেজুরের গাছ আছে। কিয়ৎদূর অতিক্রম করিলে দেখা গেল যে, নদের দুই পার্শ্ব হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও খাল বাহির হইয়াছে; দুই দিকে মাঠ ধু ধু করিতেছে,

...চিৎ কোথাও দুই একটি গ্রাম আছে। ক্রমে আমরা কালীগঙ্গা নদী বাহিয়া চলিলাম। আমাদের ষ্টীমার সর্ব্বপ্রথম কালিয়ার ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। কালিয়া এই অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতির বাস আছে। ইহার কিছুক্ষণ পরে বেলা প্রায় ১২ টার সময় টোনা ঘাটে যাইতে দেখিলাম যে, দক্ষিণ দিকে নবগঙ্গা নদী বাহির হইয়া গিয়াছে।

ষ্টীমার ২॥০ ঘণ্টা লেট থাকায়, আমরা গোপালগঞ্জের প্রহরের সময় টোনাঘাটে অবতরণ করিয়া স্নান আহার সারিয়া একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া হালিফ্যাক্স খালের মধ্য দিয়া মঙ্গলপুর ঘাট উদ্দেশে চলিলাম। এই খাল নবগঙ্গা ও মধুমতী নদীদ্বয়কে সংযুক্ত করিতেছে। বেলা অনুমান ২॥০ টার সময় আমরা মঙ্গলপুর ঘাটের কুঁড়ে-ঘর-সম্বল ষ্টেসনের সম্মুখে অবতরণ করিয়া বোয়ালমারীগামী ষ্টীমারের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অনুমান ৪॥০ টার সময় উক্ত ষ্টীমারে স্থান সংগ্রহ করিয়া মহম্মদপুর অভিমুখে চলিলাম। এইবার আমরা মধুমতী নদী দিয়া যাইতেছি।
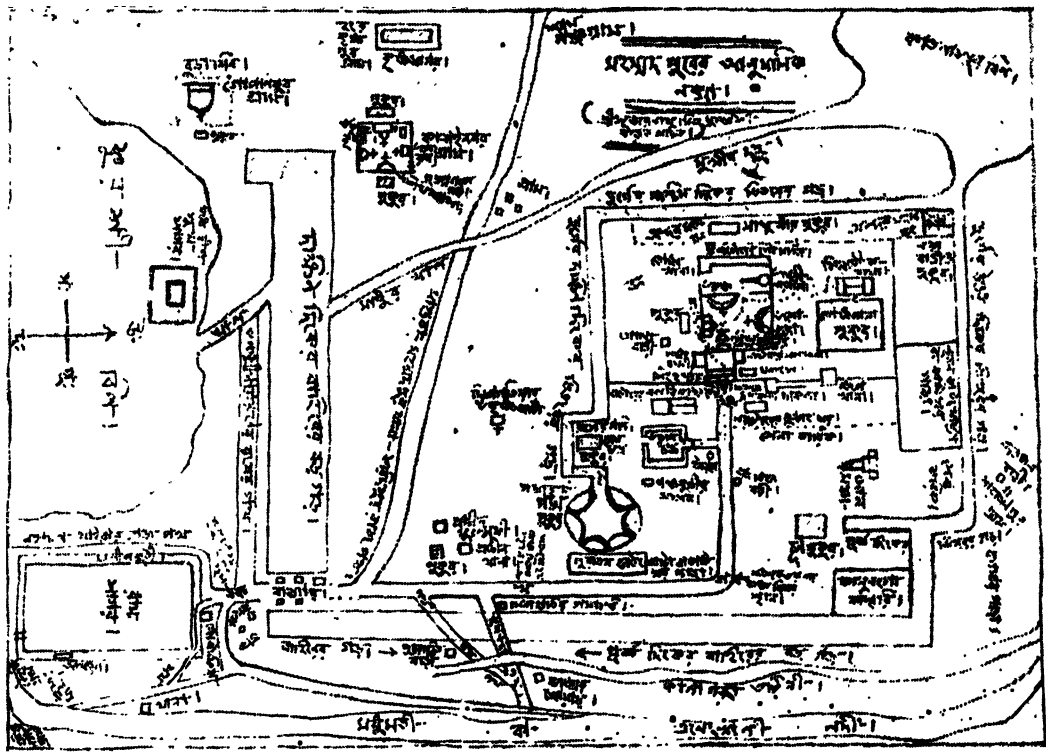
মহম্মদপুরের আনুমানিক নক্সা

ঘাটে যথাসময়ে বোয়ালমারীগামী ষ্টীমার ধরিতে পারিব কি না, ইহা ষ্টীমারের সারেঙ্গকে জিজ্ঞাসা করায়, সে ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করিল। জনৈক যাত্রী আমাদিগকে পরামর্শ দিলেন যে, টোনা ঘাটে অবতরণ করিয়া যদি হাঁটা পথে, বা হালিফ্যাক্স খাল দিয়া নৌকাযোগে আমরা অদূরবর্ত্তী মঙ্গলপুর ঘাটে গমন করি, তাহা হইলে যথেষ্ট সময় থাকিবে; এমন কি স্বপাকে আহারাদি করিয়াও মঙ্গলপুর ঘাটে বোয়ালমারীগামী ষ্টীমার ধরিতে পারিব। অগত্যা দুই ভাবিলাম, এইবার হাত পা ছড়াইয়া বসিতে পারিব। কিন্তু এ যাত্রায় তাহা হইবার নহে। আমাদের শয্যার পার্শ্বে অপর একটি শয্যায় একটি ভদ্র মুসলমান তাঁহার বালক পুত্র সহ বসিয়া ছিলেন। সন্ধ্যার পরে বালকটি ২।৪ বার "বাবা বাবা" বলিয়া ডাকিয়াই, সহসা মুখ-বিবর সাহায্যে সশব্দে এমন একটি বিশ্রী প্রক্রিয়া করিয়া বসিল, যাহার জন্য আমাদিগকে বাকী রাস্তা বিছানা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইল। তাহার পিতা রাগিয়া বলিতে লাগিলেন, "যখনই

বাবা বলিয়াছিস, তখনই বুঝিয়াছি, এইরূপ একটা কিছু করিয়া বসিবি।"

সার্চ্চলাইট ফেলিয়া পথ দেখিতে দেখিতে আমাদের ষ্টীমার রাত্রি অনুমান ১০॥০ টার সময় মহম্মদপুর ঘাটে লাগিল। এখানে ঘাট বলিয়া কিছু নাই,—অত্যুচ্চ পাড়ের এক স্থানে কোন প্রকারে সিঁড়ি লাগাইয়া দিল। আমরা মহম্মদপুরের ভূমিতে পদার্পণ করিয়া ধন্য হইলাম। নদীর অপর পারে বহু দূরে ভূষণা। অপর পারে অবস্থিত হইলেও এককালে মহম্মদপুর ভূষণার প্রধান সহর ছিল। এক্ষণে মহম্মদপুর যশোর জেলার অন্তর্গত ও ভূষণা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হইয়াছে।

নাটোর-রাজের মহম্মদপুরের নায়েব মহাশয়ের ব্যবস্থানুসারে আমাদের জন্য ষ্টীমার-ঘাটে লোক ছিল। ষ্টীমার-ঘাট হইতে সীতারামের দুর্গাভ্যন্তরস্থ নাটোর রাজ-কাছারী প্রায় ১॥০ মাইল দূর হইবে। একে কৃষ্ণ পক্ষের গভীর রজনী, তায় বন্য বরাহ ও ব্যাঘ্র-সঙ্কুল অরণ্য মধ্যস্থ পথ। কোন প্রকারে পথ অতিক্রম করিয়া কাছারিতে উপস্থিত হইলাম। রাণী ভবানীর স্থাপিত ৺রামচন্দ্র বিগ্রহের ঠাকুরবাটীর একটি দালানে এই কাছারি অবস্থিত। আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে রাত্রি ১॥০টা বাজিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম।

মহম্মদপুরের পথে—নদীর ধারের গ্রামের দৃশ্য

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া সীতারামের কীর্ত্তিসমূহ দেখিতে চলিলাম। আমরা কোথা হইতে কোথায় গেলাম, তাহা, এই সঙ্গে যে নক্সা দেওয়া হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। মধুমতী নদীর তীর হইতে আসিয়া, সীতারামের গড়-বেষ্টিত দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথমে দুর্গ-পরিখার বাহিরে সীতারামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি রামসাগর নামক দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকে কহে যে, ইহার মাপ ১৭৬৫×৮৭৫ হাত। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, ইহার মাপ অনুমান ১০০০×৪০০ হাত। এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার "যশোহর-খুলনার ইতিহাসে" ইহার মাপ লিখিয়াছেন ১৬০০×৬০০ হাত। দীঘিটি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ; ইহার জল স্বচ্ছ ও সুপেয়। ইহাতে শীতকালে ৮।১০ হাত জল থাকে।

একটি প্রবাদ আছে যে, যে স্থানে এক্ষণে রামসাগর অবস্থিত, পূর্ব্বে ঐ স্থানে একটি দরিদ্র বৃদ্ধার গৃহ ছিল। বৃদ্ধার পুত্রের নাম সীতারাম। একদা রাজা সীতারাম যখন ঐ বৃদ্ধার কুটীরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন বৃদ্ধা আপন পুত্রের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছিল। বৃদ্ধাকে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে শুনিয়া, রাজা বৃদ্ধার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আমাকে কেন ডাকিতেছ?" বৃদ্ধা রাজাকে বিনীত স্বরে কহিল যে, সে তাহার পুত্রকে ডাকিতেছিল, রাজাকে ডাকে নাই। বৃদ্ধার কি অভাব আছে—রাজা তাহা বার বার জিজ্ঞাসা করায়, বৃদ্ধা কহিল যে, তাহার জন্য একটি কূপ খনন করিয়া দিলে তাহার জলকষ্ট দূর হয়। বৃদ্ধা কূপের জন্য যে স্থান নির্দ্দেশ করিল, তথায় একটী লাউ গাছ ছিল। উহার তলদেশ খনন কালে এক ঘটী টাকা (গুপ্তধন) বাহির হইল। সীতারাম ঐ অর্থ দ্বারা কূপের পরিবর্ত্তে একটি দীঘি খনন করাইবার মানসে, তাঁহার সেনাপতি মেনা হাতীকে যত দূর সাধ্য একটা তীর নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। তখন মেনা হাতী —এই দীঘির যেখানে এখন উত্তর সীমা, তথায় দাঁড়াইয়া, দক্ষিণ দিকে যে তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, উহা এক সহস্র গজ দূরে নৈহাটী গ্রামে পতিত হইয়াছিল। তীর

এতদূর যাইবে তাহা সীতারাম আশা করেন নাই। ঐ পর্য্যন্ত দীঘি কাটাইলে বহু ব্রাহ্মণের বাসগৃহ ধ্বংস হয় দেখিয়া, দীঘিটি ছোট করিয়া কাটাইতে বাধ্য হয়েন।

এক্ষণে দীঘির পাড়গুলিতে যে চাষ-আবাদ হইতেছে, তাহাতে বর্ষাকালে ঐ মাটী ধুইয়া দীঘিতে পড়ে। এই কারণে জলাশয়টী শীঘ্র মজিয়া আসিতেছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে একবার ইহার জল পচিয়া অব্যবহার্য্য হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে, সীতারাম এই দীঘি খনন করাইয়া, ইহার জল নির্দ্দোষ ও সুপেয় করিবার জন্য তাল গাছের গুঁড়িতে পারদ পূর্ণ করিয়া ইহার জলে নিমজ্জিত করাইয়াছিলেন। এরূপ জলাশয় যশোহর জেলায় আর একটীও নাই। ইহা এক্ষণে নাটোরের মহারাজার সম্পত্তি। জেলেরা ইহাতে মৎস্যের চাষের জন্য বাৎসরিক ৪৮০৲ টাকা খাজনা দিয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহার উত্তর ও পূর্ব্ব পাড়ে সান-বাঁধান ঘাট ছিল, এখন তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। ইহার উত্তর পাড়ে মহম্মদপুর পোষ্টাফিস অবস্থিত; পূর্ব্ব পাড়ে বৈষ্ণবদের একটী আখড়া আছে, তথায় সীতারাম কর্ত্তৃক স্থাপিত ৺রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি আছেন। পূর্ব্ব পাড়ে এক স্থানে কয়েকটী চালা ঘর আছে। চালগুলি ধনুকের ন্যায় বক্র ও সেকালের বাঙ্গলা ঘরের চালের নিদর্শন। ঘরগুলির মটকা অনুন্নত; দেয়াল বাঁশের ছেঁচা বেড়া দিয়া প্রস্তুত। ছেঁচা বেড়ার উপর কাদার প্রলেপ দেওয়ার প্রথা বা মাটীর দেয়াল এখানে দেখিলাম না।

আমরা রামসাগরের উত্তর পাড়ে অবস্থিত পোষ্টাফিসের নিকট হইতে বাম দিকে বাঁকিয়া পূর্ব্ব পাড় বেষ্টন করিয়া চলিলাম। রামসাগরের পূর্ব্ব ও মধুমতীর উত্তর দিকে সীতারামের "সুমার খোলা" মাঠ আছে—তথায় সীতারামের রাজত্বকালে মজুর প্রভৃতির হাজিরা লওয়া হইত। পূর্ব্ব পাড় ঘুরিয়া দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, মধুমতী নদী পাড় ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে দীঘির এই স্থানের ২৫০ হাতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে মধুমতী ½ মাইল প্রশস্ত হইবে এবং উহা অত্যন্ত বক্র হইয়া গিয়াছে। তৎপরে আমরা দক্ষিণ পাড়ে উপস্থিত হইলাম।

প্রবাদ আছে যে, এই স্থান হইতে আরও কিঞ্চিৎ দক্ষিণে সীতারামের অন্যতম সেনাপতি মৃন্ময় ক্ষত্রিয় মধুমতীর তীরে কামান পাতিয়া নবাবী সৈন্যের গতিরোধ করিয়াছিলেন। এই দীঘির দক্ষিণ পাড়ের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে সীতারামের দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের পূজা-বাটী, মঠ ও পুকুর ছিল; পুকুরটি ছাড়া আর সকলই মধুমতীর গর্ভে গিয়াছে। তৎপরে আমরা দীঘির দক্ষিণ পাড় ঘুরিয়া পশ্চিম পাড়ে উপস্থিত হইলাম। এই পাড়ে পূর্ব্বকালে কোন সাহেবের নীলকুঠী ছিল, আজিও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। আমরা এক্ষণে পশ্চিম পাড়ের নহাটা রোড দিয়া উত্তর দিকে চলিলাম। যে ম্যালেরিয়া জ্বর এক্ষণে সমগ্র বাঙ্গলা দেশে বাসা বাঁধিয়াছে, উগ্র যে পূর্ব্বাবস্থা মহামারীরূপে গদখালি, উলা প্রভৃতি বহু সমৃদ্ধিশালী জনপদ ধ্বংস করিয়াছে, সেই মহামারী এই স্থানে সর্ব্ব প্রথমে দেখা দেয়। হাণ্টার

মহম্মদপুর—রামসাগরের উত্তর পাড়ের দৃশ্য

সাহেব বলেন যে, ঢাকা—যশোর রোডের যে অংশ এই রামসাগর ও ইহার পশ্চিমে হরেকৃষ্ণপুর গ্রামের মধ্যে অবস্থিত—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ৫০০।৭০০ জন কয়েদী উহার সংস্কার করিতেছিল। উহাদিগের মধ্যে হঠাৎ জ্বররূপী মহামারী দেখা দিয়া নিমেষমধ্যে ১৫০ জন কয়েদীর প্রাণ সংহার করিলে রক্ষীগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। তৎপরে এই ব্যাধি মহম্মদপুরে ৭ বৎসর থাকিয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিল ও ক্রমে যশোর জেলার নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু ডাক্তার এলিয়ট সাহেবের মতে এই ব্যাধি মহম্মদপুরে ১৮২৪।২৫ খৃষ্টাব্দে

প্রথমে দেখা দেয়। এলিয়টের মত ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়।

রামসাগরের পশ্চিম পাড় হইতে "সুখ সাগর" দেখিতে পাওয়া গেল। তৎপরে আমরা দীঘির উত্তর পাড়ের মধ্যস্থলে বা পোষ্টাফিসের পশ্চিম দিকে আসিয়া দুর্গে যাইবার পথ ধরিয়া উত্তর দিকে চলিলাম। পোষ্টাফিসের উত্তরে ও রাস্তার পূর্ব্ব দিকে ডাক বাঙ্গলার ২।৩টি চালাঘর আছে। ডাক বাঙ্গলার ঠিক উত্তর হইতে সীতারামের দুর্গের বাহিরের পরিখা আরম্ভ হইয়াছে।

মহম্মদপুর—রামসাগরের দক্ষিণ পাড়ের দৃশ্য

এই স্থানে আক্রমণকারী শত্রুকে প্রথম বাধা দিবার ব্যবস্থা ছিল। উত্তর দিকে যাইতে আমাদের বামে সীতারামের দুর্গের দক্ষিণ দিকের বাহিরের বড় গড় আছে, ও আমাদের ডাইনে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে দুর্গের পূর্ব্ব দিকের বাহিরের গড় রহিয়াছে দেখিলাম। এই দুই বাহিরের গড়ের মধ্যস্থ ভূমিখণ্ডে বাজার আছে। বাজারটি এক্ষণে অতি ক্ষুদ্র। ছয়-সাতখানি চালা ঘরে দোকান আছে। তন্মধ্যে আফিম ও গাঁজার দোকান একটি, জুতা ও কাপড়ের দোকান একটি, মিষ্টান্নের দোকান একটি, ও বাকীগুলি মুদীর দোকান। প্রত্যহ বাজার হয়, উহাতে ৪।৫ মণ দুগ্ধ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া শনি ও মঙ্গলবারে হাট হয়। সীতারামের সময় এই বাজার রামসাগরের উত্তর পাড় হইতে সীতারামের দুর্গের ভিতরের গড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ও আয়তনে অনেক বড় ছিল। বাজারের জন্য এই স্থানটি সীতারাম দুর্গ-প্রাকারের মৃত্তিকা দ্বারা প্রশস্ত ও উচ্চ করিয়া প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

সীতারামের যে দুর্গ মধ্যে আমরা এক্ষণে প্রবেশ করিতেছি, উহা মৃন্ময় দুর্গ, এবং প্রায় সম-চতুষ্কোণ। উহার প্রত্যেক দিক ½ মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক দীর্ঘ। দুর্গের চারিদিকে প্রথমে একটি পরিখার বেষ্টনী আছে,—ইহাকে ভিতরের গড় বলা হয়। এই প্রথম পরিখার বাহিরে কোন দিকে বিল, কোন দিকে দহ আছে। যেখানে তাহা নাই, সেখানে কোথাও খাল, কোথাও বা আর একটি করিয়া গড় কাটা হইয়াছে। ইহাকে বাহিরের গড় কহে। এই রূপ বাহিরের গড় দুর্গের দক্ষিণ দিকে একটি ও পূর্ব্ব দিকে একটি আছে।

বাজারের নীচেই উহার পশ্চিম দিকে যে বাহিরের বড় গড়টি আছে, উহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে অনুমান এক মাইল দীর্ঘ ও প্রায় ১৩০ হাত প্রশস্ত। উহাতে ৭৮ হাত জল আছে। ইহার পশ্চিম প্রান্ত কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। এই বড় গড়ের দক্ষিণে ফুরনী বিল। খাল কাটিয়া ফুরনী বিলের সহিত এই বড় গড়ের দক্ষিণ দিকের মাঝামাঝি স্থলের সংযোগ করা আছে। এই গড়ের উত্তর-পশ্চিম দিকে আর একটি খাল কাটা আছে—উহা মাধুর খাল; উহারই উত্তরে মুন্সীর দহ। এই খাল ও দহ দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে স্থিত কাতলাপুর বিলকে ও দুর্গের দক্ষিণ দিকের বাহিরের পূর্ব্বোক্ত বড় গড়কে সংযুক্ত করিতেছে। আবার দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে এই কাতলাপুর বিল দুর্গের ভিতরের গড়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। দুর্গের পূর্ব্ব দিকের ভিতরের গড়ের উত্তরাংশ হইতে গড়ের একটি শাখা পূর্ব্ব দিকে কিঞ্চিৎদূর গিয়া পুনরায় বাঁকিয়া দক্ষিণ দিকে বাজার পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শেষোক্ত অংশটি পূর্ব্ব দিকের বাহিরের গড় বলিয়া পরিচিত। এই বাহিরের গড়ের পূর্ব্ব দিক দিয়া কালীগঙ্গা নাম্নী ক্ষীণা তটিনী উত্তর-দক্ষিণে বহিতেছে। কালীগঙ্গার পূর্ব্ব দিকে অদূরে মধুমতী বা এলেংখালী নদী উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছে। এই-

.. এই দুর্গ একাধিক বার জলের বেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত ..। বাজারের পশ্চিমে যে দক্ষিণ দিকের বাহিরের বড় ..ড় আছে, উহার দক্ষিণ পাড়ে ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের ..থ টানিবার একটি রাস্তা আছে,—উহা অর্দ্ধমাইলের উপর দ..র্ঘ। এই দক্ষিণ পাড়টি নলদীর জমিদারের অর্থাৎ পাইক-..াড়ার রাজবংশের সম্পত্তি।

বাজার ছাড়াইয়া উত্তর দিকে যাইতেই, বামে অর্থাৎ ..শ্চিম দিকে মাগুরা যাইবার রাস্তা পড়িয়া আছে। এই রাস্তা বামে রাখিয়া সোজা আরও কিয়ৎদূর উত্তর দিকে ..ইলে, বাম দিকে একটি ভূমি খণ্ড আছে। তথায় ইংরাজ ..মলের মুন্সেফী আদালতের ও পুলিশের থানার ভিটা ও তৎসংলগ্ন পুকুরের খাত বর্ত্তমান আছে; কিন্তু এক্ষণে ..থায় চাষ-আবাদ হইতেছে।

মুন্সেফীর কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে বনজঙ্গলময় একখণ্ড ভূমি আছে—উহা দিঘাপতিয়ার রাজার জমিদারী। ঐ স্থানে অরণ্য মধ্যে একঘর লোকের বসতি আছে; ও তাহার সন্নিকটে ৺ কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুরের একটি একতালা কোঠা আছে। দিঘাপতিয়ার জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায় নাটোরের রাজা রামজীবনের পরিবর্ত্তে সীতারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে মহম্মদপুরে আসিয়া যে ৺কৃষ্ণবিগ্রহটি দিঘা-পতিয়ায় লইয়া গিয়াছিলেন, সেই বিগ্রহটি হয়ত তিনি কিছু দিন এখানে রাখিয়াছিলেন। কোঠাটির সম্মুখের বারান্দায় তিনটি খিলান-করা ফোকর আছে; দুইটি গোল থাম উহাদিগকে বিভক্ত করিয়াছে। কোঠাটির মধ্যস্থলে একটি বড় ঘর আছে, ও উহার দুই পার্শ্বে অর্থাৎ উহার পূর্ব্ব দিকে একটি ও পশ্চিম দিকে একটি কুঠারী আছে। কোঠাটির ছাদে কড়ির উপরে কোণাকুণি বা বাঁকা করিয়া বরগা বসাইয়া তাহার উপর টালি বসাইয়া ছাদ করা হইয়াছে। গৃহটির উপরে ও চতুষ্পার্শ্বে বন জঙ্গল জন্মিয়াছে। এই গৃহটির উত্তর দিকে রাণীভবানীর প্রতিষ্ঠিত ৺ রাম-চন্দ্রের পুকুর আছে।

পূর্ব্বোক্ত বাজারের মধ্যস্থ রাজপথ ধরিয়া আরও কিঞ্চিৎ দূর উত্তর দিকে যাইলে, এই পথ ডাইন দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে দুর্গের পূর্ব্ব দিকের বাহিরের গড়ের ও কালীগঙ্গার সঙ্গম স্থল অতিক্রম করিয়া মাঠের মধ্য দিয়া মধুমতীর তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই স্থান হইতে গড়ের পূর্ব্ব পাড়ের কিঞ্চিৎ দূরে সীতারামের পুরোহিত শ্রীহরি বাচস্পতির কোঠা বাড়ী আছে। তথায় তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন। সীতারাম পুরোহিতকে স্ত্রী ও পুরুষ-দিগের জন্য দুইটি পৃথক্ পুকুর, একটি কোঠাবাড়ী ও চারিটি মৌজা ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

উক্ত মাঠ অত্যন্ত নিম্নভূমি; দেখিলে মনে হয় যে, উহা কোন নদীর খাত। কথিত আছে যে, পূর্ব্বে মধুমতী মহম্মদপুরের পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিত ছিল; এবং মহম্মদ-পুরের এই দিকে কামান সাজাইয়া স্বয়ং সীতারাম ভূষণার ফৌজদার আবু তোরাপের সেনাপতি পীর খাঁর গতিরোধ করিয়াছিলেন। উক্ত রাজপথ যে স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে
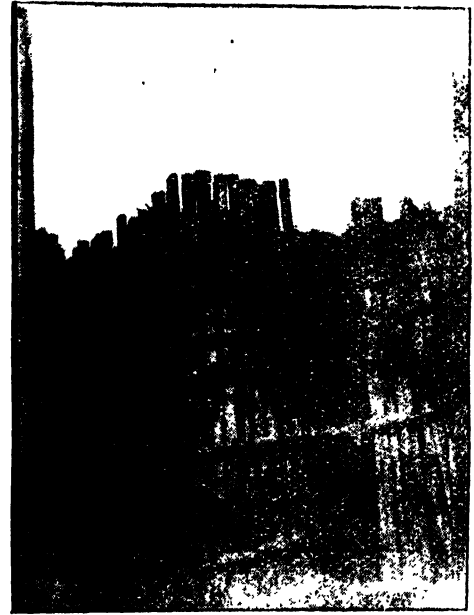
মহম্মদপুর—ব্যাঘ্র ধরিবার খোঁয়াড়

বাঁকিয়া গিয়াছে সেই স্থানে আসিয়া পূর্ব্ব দিকে যাইতেই, উক্ত গড় ও রাস্তার সঙ্গম-স্থানের বাম পার্শ্বের কোণে ও উক্ত গড়ের পশ্চিম পাড়ে একখণ্ড বনজঙ্গলময় ভূমিতে সীতারামের প্রধান সেনাপতি বীর, চিরকুমার ও দেবচরিত্র মেনাহাতীর ওরফে রামরূপ ঘোষের সমাধির ধ্বংস-স্তূপ আছে। উহারই নীচে কালীগঙ্গা গড়ে আসিয়া মিশিয়াছে। কিম্বদন্তী আছে এবং ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, গুপ্তঘাতকগণ এক দিন প্রাতে কুজ্ঝটিকার সময় মেনা-

হাতীকে পশ্চাৎ দিক হইতে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া তাহার মুণ্ড কাটিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। কথিত আছে যে, ঐ মুণ্ড মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। এদিকে সীতারাম মেনাহাতীর মুণ্ডহীন দেহের সৎকার করাইয়া চিতাভস্ম ও অস্থি এই স্থানে সমাহিত করাইয়া তদুপরি একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। অন্য দিকে মেনাহাতীর ছিন্ন মুণ্ড নবাব সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি বীরের বিশাল মুণ্ড দেখিয়া শিহরিলেন, এবং এরূপ বীরকে হত্যা না করিয়া বন্দী করা

মহম্মদপুর—৮ লক্ষ্মীনারায়ণের দোলমন্দির

উচিত ছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া মুণ্ডটি মহম্মদপুরে ফেরৎ দিয়াছিলেন। তখন ঐ মুণ্ডও এই স্থানে সমাহিত করা হইয়াছিল। মেনা হাতীর আসল নাম রামরূপ ঘোষ। তিনি যশোহর জেলার রায় গ্রামের আকনা সমাজের দক্ষিণ রাঢ়ী কুলীন কায়স্থ ছিলেন। মেনাহাতী শব্দের অর্থ এই যে, তিনি দেখিতে একটি ছোটখাট হস্তীর ন্যায় ছিলেন এবং সাধারণ মানব অপেক্ষা প্রায় এক হস্ত পরিমাণ উচ্চ ছিলেন। সীতারাম ইঁহার উপর মহম্মদপুর রক্ষার ভার দিয়াছিলেন। এক্ষণে মেনাহাতীর সমাধি-স্থলে জঙ্গল মধ্যে একটি ইষ্টকের ঢিবি আছে মাত্র।

এই স্থানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিকে গ্রাম-প্রান্তে ব্যাঘ্র ধরিবার জন্য বংশ-দণ্ড নির্ম্মিত একটি ঘর বা খাঁচা আছে; উহার মধ্যে ছাগ রাখিয়া ব্যাঘ্র ধরা হয়।

মেনা হাতীর সমাধি ডাইন দিকে রাখিয়া উত্তর দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, রাস্তার বাম দিকে সীতারামের পদ্মাকৃতি পদ্মপুকুর আছে। ইহার মধ্যে ঘাস, দাম ও বন-জঙ্গল জন্মিয়া কতক অংশ মজিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে ২-২৷৷০ হাত জল আছে। তাহাতে বালি হাঁসের ঝাঁক আসিয়া বসে ও আনন্দ-কলরবে চতুর্দ্দিক মুখরিত করে। এই পদ্ম পুকুরের ধারে সীতারামের সময় হিন্দুস্থানী খোট্টারা বাস করিত। সেজন্য ইহাকে কাট খোট্ট পাড়া বা উহার অপভ্রংশ কাষ্ঠ ঘর পাড়া বলা হইত। ইহারই কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে শত্রুপক্ষকে দ্বিতীয় বার বাধা দিবার ব্যবস্থা ছিল।

এইবার উক্ত রাস্তা যেখানে পশ্চিম দিকে বাঁকিয়া দুর্গের প্রথম পরিখার বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিল, সেই স্থানে শত্রুকে তৃতীয় বার বাধা দিবার ব্যবস্থা ছিল ও এই স্থান কামান দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এই বাঁকের উত্তর দিকে দুর্গের পূর্ব্ব দিকের ভিতরের ও বাহিরের গড়ের ঘোঁজের মধ্যে সীতারামের কানুনগো-কাছারীর ভিটা আছে। তথায় এক্ষণে একঘর ধোপা বাস করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত রাস্তা ধরিয়া সামান্য দূর পশ্চিম দিকে যাইলে ডাইন দিকে সীতারামের চুণপুকুরের খাত আছে। এই চুণ পুকুরে সীতারামের মন্দির ও হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের জন্য চুণ প্রস্তুত হইত। এই স্থান হইতে সামান্য দূর পশ্চিমে গেলে, রাস্তার বাম দিকে কিঞ্চিৎ দূরে ও উক্ত পদ্মপুকুরের পশ্চিম দিকে সীতারামের পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে। আসনের উপরে একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত বেদী আছে। বেদীর নিকটে একটি অতি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। প্রবাদ আছে যে, বিখ্যাত সাধক নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ এই আসনের উপরে বসিয়া সাধন করিতে সমর্থ হন নাই। এই স্থানে দীপান্বিতা কালী-পূজা হয় ও পৌষ সংক্রান্তির সময় বাস্তু-পূজা হয়। সীতারাম প্রথমে শক্তি-উপাসক ছিলেন। পরে তিনি তাঁহার নূতন গুরু কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা লয়েন। কৃষ্ণবল্লভ মুর্শিদাবাদের টেঁয়া গ্রাম নিবাসী ছিলেন। মহম্মদপুরের নিকটে ঘুল্লিয়া গ্রামে এখনও তাঁহার বংশধরগণ বাস করেন।

প্রবাদ আছে যে, এই পঞ্চমুণ্ডীর অদূরে মহম্মদ শাহ নামক এক মুসলমান ফকির বাস করিতেন। এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করিবার জন্য সীতারাম সেই ফকিরকে স্থান ত্যাগ করিতে বলিলে, তিনি প্রথমে অসম্মত হয়েন। কিন্তু পরে কহিলেন যে, তাঁহার নামে রাজধানীর নামকরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, তিনি স্থান ত্যাগ করিবেন। তদনুসারে সীতারাম উক্ত মুসলমান ফকিরের নামানুসারে তাঁহার রাজধানীর মহম্মদপুর নামকরণ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, বঙ্গেশ্বর মামুদশাহের নামানুসারে এই স্থানের নাম মামুদপুর হইয়াছিল ও উহা হইতে মহম্মদপুর হইয়াছে।

উক্ত পঞ্চমুণ্ডীর উত্তর দিকের রাস্তার পার্শ্বে সীতারামের পঞ্চবটী আছে। এক্ষণে পঞ্চবটীর মধ্যে ত্রিবটী, যথা, বেল, হরিতকী ও আমলকীর গাছ একত্র দণ্ডায়মান আছে।

এই স্থান হইতে পশ্চিম দিকে অল্প দূর গেলে, ডাইন দিকে এক খণ্ড উন্মুক্ত মাঠের উত্তর দিকে সীতারামের ৬লক্ষ্মীনারায়ণ শিলার দোল-মন্দির বা মঞ্চ আছে। দোলমঞ্চটি ইষ্টক-নির্ম্মিত ও অতি সুশ্রী। ইহার চারিটি থাক আছে—প্রথমে মাটীর উপরে ৫॥০ হাত উচ্চ একটি সমচতুষ্কোণ রোয়াক আছে, উপরে ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট কিন্তু ৫॥০ হাত উচ্চ আর একটি সমচতুষ্কোণ রোয়াক আছে, তাহার উপরে তদপেক্ষা আরও কিঞ্চিৎ ছোট আর একটি ৩ হাত উচ্চ সমচতুষ্কোণ রোয়াক আছে। এই শেষোক্ত তৃতীয় রোয়াকের উপরে যেন কোন সুখ-স্বপ্নের ছবির ন্যায় দেখিতে ক্ষুদ্র দোল-মন্দিরটি আছে। বহু দিনের অযত্নে মঞ্চে উঠিবার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও রোয়াকগুলির উপরে ও মন্দিরে বন জঙ্গল হইয়াছে এবং মন্দির মধ্যে চামচিকায় বাসা করিয়াছে। শুনিলাম, এখনও এখানে ৬লক্ষ্মীনারায়ণের দোল হয়। এই দোলমঞ্চের উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে সীতারামের সেনা-বারিক ছিল, এবং ইহার সম্মুখের মাঠে সৈন্যদের কুচ-কাওয়াজ হইত। কথিত আছে যে, নবাবের সহিত যুদ্ধকালে, এক দিন কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন প্রভাতে দুর্গাধ্যক্ষ সেনাপতি মেনাহাতী যখন এই দোলমঞ্চের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন, তখন গুপ্ত-ঘাতকগণ তাঁহাকে পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণ করিয়া তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া লইয়া গিয়াছিল। উক্ত দোলমঞ্চের পশ্চাতে আধুনিক কাট খোট্টা বা কাষ্ঠ ঘর পাড়া আছে। তথায় মাত্র একঘর কনৌজীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন।

দোলমঞ্চের দক্ষিণ দিকের মাঠের দক্ষিণে নাটোরের রাণী ভবানীর স্থাপিত ৬রামচন্দ্রের পূজা-বাটী আছে। ইহা অনুমান ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত। ইহার প্রবেশ-দ্বারটি দ্বিতল। দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিতে ইহার দুইপার্শ্বে ইষ্টক-নির্ম্মিত দুইটী ক্ষীণদেহ ক্ষুদ্র হস্তীর উপরে মাহুত বসিয়া আছে। দ্বারের প্রত্যেক

মহম্মদপুর—৬রামচন্দ্রের বাটীর সিংহদ্বার ভিতর হইতে

পার্শ্বে বাহির দিকে একটি করিয়া দুইটি ও ভিতর দিকে ঐরূপ দুইটি কুঠারী আছে। প্রবেশ-দ্বারের দ্বিতলে প্রত্যেক পার্শ্বে একটি করিয়া দুইটি ঘর আছে। এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থলে নহবতের জন্য খিলান-করা ছাদ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ঘরটির সম্মুখে ও পশ্চাতে বাঙ্গালা ঘরের আকৃতি-বিশিষ্ট দুইটি ক্ষুদ্র চূড়ার ন্যায় আছে বলিয়া প্রবেশ-দ্বারের শোভাবৃদ্ধি হইয়াছে। দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ির ধাপগুলি অত্যন্ত উচ্চ। পূজাবাটীর কর্ম্মচারীগণের নিকট শুনিলাম যে, বর্ষাকালে জ্যোৎস্না রাত্রে এই সিংহদ্বারের উপরে বন্দুক লইয়া বসিয়া থাকিলে সহজে

ব্যাঘ্র শিকার করা যায়। সীতারামের দুর্গের মধ্যস্থিত জঙ্গলে যে সকল ব্যাঘ্র ও বন্য শূকর আছে, উহারা এই স্থান দিয়া যাতায়াত করে। এই ব্যাঘ্রগুলি গুল্ বা গো-বাঘা। রামচন্দ্রের বাটীর মধ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন উঠান আছে। উঠানের এক দিকে প্রবেশ-দ্বার ও অপর তিন দিকে খিলান-করা ছাদ-বিশিষ্ট একতলা গৃহ আছে। পূর্ব্ব দিকের দালানে এক্ষণে নাটোরের মহারাজার কাছারি হয়। আমরা এই দালানে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। এই দালানটির সম্মুখদেশে পাঁচটি খাঁজ-কাটা দ্বারের খিলান আছে। দক্ষিণ দিকের দালানে লোকজন আহারাদি

মহম্মদপুর—৺রামচন্দ্রের বাটীর ঠাকুরদিগের ঘর

করে; এবং পশ্চিম দিকের পাঁচ-ফোকরের বারান্দা-শোভিত খিলান করা ছাদবিশিষ্ট ঘরে সীতারামের ৺লক্ষ্মী নারায়ণশিলা, নিম্ব-দারু-নির্ম্মিত ৺হরেকৃষ্ণ ঠাকুর, অষ্ট-ধাতুর ৺কালিকা ঠাকুরাণী এবং রাণী ভবানীর প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর নির্ম্মিত ৺রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান এবং নিম্ব-দারুর ৺বলরাম বিগ্রহ আছেন। এই শেষোক্ত গৃহটির সম্মুখের দেয়ালে কিঞ্চিৎ কারুকার্য্য করা আছে। পূর্ব্বে সীতারামের হরেকৃষ্ণ ঠাকুর ও রাণী ভবানীর বলরাম অদূরবর্ত্তী কানাইনগর গ্রামে তাঁহাদের আপনাপন মন্দিরে ছিলেন এবং সীতারামের লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা দুর্গমধ্যস্থ লক্ষ্মীনারায়ণের দ্বিতল মন্দিরে ছিলেন। তখন ঐ সকল মন্দিরে লোকজন ছিল, ও তথায় বিগ্রহগুলির নিত্য সেবা ও অতিথি-সেবাদি হইত। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই অনেক মন্দিরগুলির উপরে বৃক্ষাদি জন্মিয়াছিল। শুনিলাম যে, ১৩২৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে মহম্মদপুরের বিগ্রহগুলি হঠাৎ এক দিন নাটোরে লইয়া যাওয়া হয়। অনুমান ৫ বৎসর পরে ১৩৩০ সালের শ্রাবণ মাসে নাটোরের সহৃদয় মহারাজা বাহাদুর প্রজাদিগের কাতর প্রার্থনায় বিগ্রহগুলিকে পুনরায় মহম্মদপুরে ফেরৎ পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তখন দীর্ঘ ৫ বৎসরের অব্যবহারে হরেকৃষ্ণ, বলরাম ও লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির ধ্বংসোন্মুখ হইয়া অব্যবহার্য্য হওয়ায়, বিগ্রহগুলিকে রামচন্দ্রের গৃহে রাখা হইয়াছে। রামচন্দ্র বিগ্রহের সহিত একই ঘরে ইঁহাদের পূজাদি হইতেছে। রামচন্দ্রের বাটীর গাঁথনি পাকা—সীতারামের কোঠ-গুলির ন্যায় মাটীর গাঁথনি নহে। ইহার দেওয়ালে বালির পরিবর্ত্তে মিহি সুরকী দিয়া মাজিয়া তাহার উপর চূণকাম করা হইয়াছে। গৃহগুলির খিলান-করা ছাদের উপরে ঘাস ও গাছ জন্মিয়াছে এবং ছাদ ভেদ করিয়া গৃহগুলির মধ্যে বৃষ্টির ধারা পড়ে। সমগ্র মহম্মদপুর দুর্গের মধ্যে এই পূজাবাটী অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছে। এখনও রামচন্দ্রের রামনবমী যাত্রা ও দীপ যাত্রা উৎসব হইয়া থাকে।

রামচন্দ্রের বাটীর দক্ষিণ দিকে রামচন্দ্রের পুকুর আছে। এই পুকুরের পশ্চিম দিকের পাড়ের মাঝামাঝি স্থানে একটি স্থান আছে—উহাকে রসের গলি বলা হয়। ঐ স্থানে সীতারামের সময় বেশ্যা-পল্লী ছিল।

তৎপরে রামচন্দ্রের বাটীর উত্তর দিকের পথে আসিয়া দুর্গের মধ্যে সীতারামের ঠাকুরবাটী প্রভৃতির ধ্বংস দেখিতে চলিলাম। ঐ পথ দিয়া রামচন্দ্রের বাটী ছাড়াইয়া পশ্চিম দিকে যাইতে রামচন্দ্রের বাটীর পশ্চিম দিকে কয়েকটি কুঠারীর ধ্বংসাবশেষ দেওয়াল ও ইষ্টকের স্তূপ আছে। একটি কুঠারীর ভিতরে মাপিয়া দেখিলাম যে, উহা ৯×৫।০ হাত। এই স্থানে পূর্ব্বে একটি প্রাচীর বেষ্টিত বাটী ছিল। ইহা সীতারামের মৃত্যুর পরে প্রস্তুত ও নলদী জমিদারীর কাছারি ছিল। ইহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুর্গাভ্যন্তরে যাইবার পথের উত্তর পার্শ্বে

... টারের রাজাদিগের পুণ্যাহ ঘরের ধ্বংস-স্তূপ আছে। ...ও কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে যাইলে পথের ডাইন পার্শ্ব হ...ত আরম্ভ করিয়া উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ একটি গৃহ ছিল। ...র যে অংশ পথের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল, তথায় পূর্ব্বে ...তারামের চাকলা কাছারি ছিল। এই স্থানে রাজস্ব ...দায় হইত এবং জমিদারীর আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা হইত। এই গৃহের যে অংশ উত্তর দিকে বিস্তৃত ছিল, তথায় সীতারামের জেলখানা ও সাজাখানা ছিল। যে সকল প্রজা রাজস্ব দিতে বিলম্ব করিত, তাহাদিগকে এই স্থানে শাস্তি দেওয়া হইত ও কারারুদ্ধ করা হইত। ইহারই পশ্চিমে সীতারামের তোষাখানার পুকুর আছে। এই সমুদায় স্থানে এক্ষণে ধ্বংস স্তূপ, ভগ্ন দেওয়াল ও বন-জঙ্গল আছে।

এই চাকলা কাছারি ছাড়াইয়া রাস্তা দিয়া পশ্চিম দিকে যাইতে, সম্মুখে সীতারামের প্রথম সিংহদ্বারের ধ্বংস স্তূপ আছে। সিংহদ্বারের উপরে খিলান ও দেওয়াল প্রভৃতি এখন আর কিছুই নাই। শুধু রাস্তার দুই পার্শ্বে ইষ্টক স্তূপ ও সিংহদ্বারের সম্মুখের দুই পার্শ্বের গোল স্তম্ভগুলির সামান্য অংশ মাত্র ভূমির উপরে ২।৩ হাত উচ্চ হইয়া দণ্ডায়মান আছে। কথিত আছে যে, একটি গম্বুজের গোলকের ভিতরের ফাঁপা দিকের অর্দ্ধাংশ বাহিরের দিকে করিয়া বসাইলে যেরূপ হয়, এই সিংহ-দ্বারের উপরের খিলানের সম্মুখভাগ দেখিতে সেইরূপ ছিল। সিংহদ্বারটি এরূপ উচ্চ ছিল যে, পৃষ্ঠে হাওদা ও লোকসহ হস্তী অনায়াসে ইহার মধ্য দিয়া যাইতে পারিত। সিংহদ্বারের মধ্যস্থ পথ ৭।৮ হাত প্রশস্ত। এই সিংহদ্বার হইতে সীতারামের প্রাচীর-বেষ্টিত পূজাবাটী ও অন্দর-মহলাদি আরম্ভ হইল। এই সিংহদ্বারের সম্মুখে শত্রুপক্ষকে চতুর্থ-বার বাধা দিবার ব্যবস্থা ছিল। এক্ষণে এখানে ধ্বংস-স্তূপ ও বন জঙ্গল আছে।

সিংহদ্বারের উত্তর গায়ে সীতারামের পুণ্যাহ ঘর ছিল। সিংহদ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে, সম্মুখে একটি ছোট উঠানের তিন দিকে তিনটি কোঠা ঘর ছিল। সিংহদ্বারের সম্মুখের ঘরটি সীতারামের মালখানা ছিল। বাম দিকের অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের ঘরে সীতারামের শরীর-রক্ষীগণ থাকিত। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব বলেন যে, সীতারামের পতনের পরে নাটোরের রাজগণ এই গৃহ দুটিকে ঐ দুই কার্য্যের জন্যই ব্যবহার করিতেন। কিন্তু অনুমান ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নলদী জমিদারী নাটোর-রাজবংশের হস্তচ্যুত হইলে, উহার ক্রেতা এই দুই গৃহ হইতে নাটোরের লোক-জনকে বলপূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তখন অগত্যা নাটোরের রাজা এই উঠানের উত্তর দিকের ছোট ঘরটি প্রস্তুত করাইয়া উহাতে মালখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে এ সকল স্থানে বন-জঙ্গল ও স্তূপ আছে।

সীতারামের পূর্ব্বোক্ত মালখানার দক্ষিণ দিকে

মহম্মদপুর—৺ লক্ষ্মীনারায়ণ শীলা ও ৺ হরেকৃষ্ণ ঠাকুর

সীতারামের সময় একটি ছোট সিংহদ্বার ছিল; উহা দিয়া মালখানার পশ্চাৎ দিকের একটি ছোট উঠানে যাওয়া যাইত। এই উঠানের পশ্চিম দিকে নাটোরের রাজাদিগের একটি সাধারণ শিবমন্দির ছিল, এবং দক্ষিণ দিকে সীতারামের গোলাবাড়ী ছিল। এই সকল স্থান এক্ষণে ইষ্টকস্তূপ ও বনজঙ্গলে পূর্ণ হইয়া আছে।

এই অংশের পশ্চিমে অন্য একটি অংশে সীতারামের ঠাকুরবাটী আছে। এই ঠাকুরবাটীর উঠানে প্রবেশ করিবার একটি দ্বার ও নহবৎখানা ছিল; এখনও লোকে দক্ষিণ দিকে তাহার স্থান দেখাইয়া দেয়। ঠাকুরবাটীর

মধ্যস্থলে উঠান আছে। এই উঠানের উত্তর দিকে সীতারামের ৺দশভূজার মন্দির আছে; পশ্চিমে কারুকার্য্য-খচিত ৺কৃষ্ণের মন্দির আছে। নহবৎ-কোঠা ভূমিসাৎ হইয়াছে। কৃষ্ণের মন্দিরটি একটি বৃহৎ জোড় বাঙ্গলা মন্দির। ইহার সম্মুখ দিকে মন্দির গাত্রে ইষ্টকের উপর খোদাই-করা নানা দেবদেবী, ফুল, লতা, পাতা ও জীবজন্তু প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। মন্দিরটির বাঙ্গলা ঘরের চালের আকৃতি-বিশিষ্ট খিলান-করা ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে ও চতুষ্পার্শ্বে বনজঙ্গল জন্মিয়াছে।

মহম্মদপুর—৺দশভূজার ঘর

সীতারামের পতনের সময় তাঁহার দুর্গ শত্রু-করতলগত হইলে, এই মন্দিরের প্রস্তরময় ৺কৃষ্ণ বিগ্রহটি দয়ারাম রায় দিঘাপতিয়ায় লইয়া যান; তথায় উহা আজিও পূজিত হইতেছে। ৺দশভূজা দেবীর প্রাচীন মন্দিরটি ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তৎপরে এই ভগ্ন মন্দিরের দেওয়ালের উপরে কড়ি-বরগা দিয়া ছাদ নির্ম্মাণ করিয়া যে গৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল, উহা ১৩১৬ সালে পড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে সেই পুরাতন দেওয়ালের উপরে টিনের চাল হইয়াছে। এই দশভূজা মূর্ত্তিটি অষ্টধাতু নির্ম্মিত ও অনুমান ১।০ হাত উচ্চ হইবে। মূর্ত্তিটির সর্ব্ব অবয়ব অতি সুশ্রী। সীতারাম পূর্ব্বে যখন শাক্ত ছিলেন, তখন সর্ব্ব প্রথমে এই মূর্ত্তিটির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের লুপ্ত স্মৃতি-ফলকে এইরূপ লিখিত ছিল:—

মহাভুজ রসক্ষৌণী শাকে দশভুজানয়ম্।
অকারি শ্রীসীতারাম রায়েন * * মন্দিরম্॥

অর্থাৎ ১৬২১ শকে বা ১৬৯৯।১৭০০ খৃষ্টাব্দে সীতারাম এই মন্দির প্রস্তুত করেন। এই দেবী অত্যন্ত জাগ্রত বলিয়া লোকের বিশ্বাস। প্রবাদ আছে যে, একবার দেবীর ভোগে একটি কেশ পড়িয়াছিল, তাহাতে দেবী স্বপ্ন দিয়াছিলেন যে তিনি অভুক্ত আছেন। দেবীর নিত্য সেবা হয়। এক্ষণে এই দেবী নাটোরের মহারাজার সম্পত্তি। এখানে দেবীর বাসন্তী পূজা হয় এবং দুর্গোৎসবের সময় মৃন্ময় দুর্গাপ্রতিমার পূজা হয়। এই গৃহ মধ্যে এক পার্শ্বে প্রায় ৫।৬ হাত দীর্ঘ একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত পদার্থ আছে। উহার দুই মুখ সরু, লোকে ইহাকে সীতারামের চড়কের পাটবান কহে। দশভুজার মন্দিরের সম্মুখের উঠানের পশ্চিমে দশভুজার পুকুর আছে। উহাও সীতা-রামের অন্যান্য কীর্ত্তির ন্যায় অযত্নে ধ্বংস-পথে চলিয়াছে।

দশভুজার মন্দিরের পশ্চিমের রাস্তা দিয়া কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে গেলে, সম্মুখে সীতারামের ৺লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম-শিলার দ্বিতল অষ্টকোণ মন্দির আছে। মন্দির-গাত্রে কোন কারুকার্য্য নাই। একতলার ও দ্বিতলের ছাদ খিলান-করা কিন্তু সমতলপ্রায়। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে ও ছাদে গাছপালা জন্মিয়া মন্দিরটিকে ধ্বংস-পথে লইয়া যাইতেছে। মন্দির-পার্শ্বের ঘোরান সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলাম যে, ছাদের খিলান ভেদ করিয়া অশ্বথ-বটের শিকড় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। গৃহমধ্যে এক পার্শ্বে মেঝের উপর কয়েকটি দুগ্ধফেণ-সন্নিভ লক্ষ্মী পেঁচার বাচ্চা হইয়াছে। এই দ্বিতলের ঘরে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর পূজান্তে বিশ্রাম করিতেন। পূর্ব্বে এই মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণের নিত্য সেবা হইত, কিন্তু শিলাটি অন্যান্য বিগ্রহ সহ নাটোরে লইয়া যাওয়ার পর হইতে মন্দিরটি দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের অব্যবহারে ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। এক্ষণে শিলাটি পূর্ব্বোক্ত রামচন্দ্রের গৃহে অন্যান্য বিগ্রহের সহিত অবস্থান করিতেছেন। প্রবাদ আছে যে, একদা সীতারাম যখন অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার অশ্বের ক্ষুর কর্দ্দমের মধ্যে প্রোথিত হইয়া গেল।

[...] আর পা উঠাইতে পারিতেছে না দেখিয়া, সেই স্থান [...] করিয়া দেখা গেল যে, অশ্বের ক্ষুর একটি মন্দির-[...]রের ত্রিশূলে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই মন্দির [...] এই শিলা ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সীতারামের পিতা এই শিলাটি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং সীতারাম পরে এই মন্দিরটি করাইয়া দেন। যাহা হউক, এই শালগ্রাম শিলা পাইবার পর হইতেই সীতারামের সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। এই মন্দির-ললাটের লুপ্ত স্মৃতি-ফলকে এইরূপ লেখা ছিল :—

লক্ষ্মী-নারায়ণ স্থিতৈ তর্কাক্ষিরসভূশক।
নির্ম্মিতং পিতৃ পুণ্যার্থং সীতারামেন মন্দিরম্॥

অর্থাৎ সীতারাম পিতৃ-পুণ্যার্থে এই মন্দিরটি ১৬২৬ শকে বা ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করান।

লক্ষ্মী-নারায়ণ এক্ষণে নাটোরের সম্পত্তি এবং এখনও ইঁহার দোল ও রথ প্রভৃতি উৎসব হয়। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব একটি জন-প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন যে, বহুকাল পূর্ব্বে যখন মহম্মদপুরের দেবত্র সম্পত্তি কিছুকাল নড়াইলের জমিদারী-ভুক্ত হইয়াছিল, সেই সময় আসল লক্ষ্মী-নারায়ণ শিলাটি বদল করিয়া নড়াইলে লইয়া যাওয়া হয়, ও তৎপরিবর্ত্তে অন্য একটি ছোট শিলা মহম্মদপুরে রাখা হয়। আসল শিলাটি নড়াইলে থাকিয়া গিয়াছে, ফলে নড়াইলের উন্নতি হইয়াছে ও মহম্মদপুর মহামারীতে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই কিম্বদন্তীর কথা মহম্মদপুরের জনৈক পুরোহিতের মুখেও শুনিয়াছি। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরের দক্ষিণে কয়েকটি ভগ্ন গৃহের দেওয়াল মাত্র অবশিষ্ট আছে। শুনা যায় যে, পূর্ব্বে ঐ স্থানে সীতারামের অতিথিশালা ছিল।

লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরের পশ্চিম দিকে উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ সীতারামের তোষাখানা আছে। উহার ছাদ খিলান-করা ও ঘরের ভিতর হইতে দেখিতে বাঙ্গলা ঘরের চালের ন্যায় বা হস্তী পৃষ্ঠের ন্যায়। দুইটি ঘর এখনও অভগ্ন অবস্থায় আছে এবং আর দুইটি ভগ্ন ঘরের দেওয়াল মাত্র অবশিষ্ট আছে; ঘরগুলির মধ্যে দুইটি বড় ও দুইটি ছোট। বড় ঘর দুইটির প্রত্যেকের মাপ অনুমান ২২×৬ হাত ও ছোট দুইটির প্রত্যেকের মাপ অনুমান ১০×৫ হাত। এই খানে একটি ভগ্ন গৃহের দেওয়ালে মাটী চাপা একটি ছোট দ্বারের খিলান দেখাইয়া আমাদের পথ-প্রদর্শক বলিলেন যে, ঐ স্থানে একটি সুড়ঙ্গ আছে। উহা দিয়া সীতারামের আমলে দুর্গের বাহিরে যাইবার গোপন পথ ছিল। তোষাখানার বাটী দ্বিতল, উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। কিন্তু গৃহ মধ্যে অসংখ্য চামচিকা থাকায়, উহাদের বিষ্ঠার দুর্গন্ধে তথায় ক্ষণকাল থাকাও দুষ্কর। এই তোষাখানায় সীতারামের রাজকীয় স্বর্ণ-রৌপ্যের আসাসোটা ও তৈজসপত্রাদি থাকিত। এক্ষণে এই বাটীর উপরে ও চতুর্দ্দিকে বন জঙ্গল জন্মিয়াছে। তোষাখানার উত্তর গাত্রে সংলগ্ন কয়েকটি বড় ঘরের ভগ্ন দেওয়াল দণ্ডায়মান আছে। শুনা যায় যে, এই সকল গৃহে সীতারামের সময় রক্ষীগণ থাকিত।

তোষাখানার পশ্চাতে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে যাইবার জন্য তোষাখানার দক্ষিণ দিকে একটি দ্বার ছিল। উহা দিয়া তোষাখানার পশ্চাতে যাইলে, পশ্চিম দিকে নাটোর রাজবংশের স্থাপিত একটি ক্ষুদ্র শিবমন্দির ছিল। তাহার পশ্চাতে বা পশ্চিমে আর একটি মহল ছিল, উহা সীতা-রামের অন্দর মহল। এক্ষণে তথায় ভগ্ন স্তূপ ও বন জঙ্গলের মধ্যে ব্যাঘ্র ও বন্য শূকর নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। স্থানীয় লোকে বলে যে, এই অন্দর মহল একটি ছোট গড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল ও উহার সহিত দুর্গের গড়ের সংযোগ ছিল। অন্দর মহলের পশ্চিমে গড়ের ধারে সাধুখাঁর পুকুর আছে। সাধুখাঁ ওরফে গোপেশ্বর ঘোষ খাঁর সহিত সীতারামের কনিষ্ঠা ভগিনী রাইরঙ্গিনীর বিবাহ বৎসরে এই পুকুর কাটা হইয়াছিল।

তৎপরে পুনরায় দশভুজার মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইয়া উহার পশ্চিম দিক দিয়া উত্তর দিকে চলিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া সীতারামের দ্বিতল আবাস-গৃহে বা বৈঠক-খানা-বাটীতে উপস্থিত হইলাম। বৈঠকখানাটি দ্বিতল, পশ্চিমদিক ইহার সম্মুখ। ইহার একতলায় মধ্যস্থলে একটি বড় ঘর আছে। উহার মাপ অনুমান ১৭×৬ হাত। এই বড় ঘরের উত্তরে একটি ও দক্ষিণে একটি কুঠারী আছে, উহাদিগের প্রত্যেকের মাপ অনুমান ১৪½×৬ হাত। বড় ঘরের পূর্ব্ব দিকে একটি দালান আছে, উহার মাপ অনুমান ১৭×৬ হাত। নীচের তলার দেয়াল ২।০ হাত স্থূল, এবং সীতারামের যাবতীয় গৃহ ও মন্দিরের ন্যায় ইহার গাঁথনি কাদায়। নীচের তলায় পূর্ব্বদিকে পাঁচটি

খিলান-করা দ্বার আছে, উত্তর দিকে দুইটি, দক্ষিণ দিকে তিনটি ও পশ্চিম দিকে একটি দ্বার আছে। দ্বিতলের মধ্যের ঘরটি এখনও আছে। সীতারামের যাবতীয় গৃহ ও মন্দিরের ছাদের ন্যায় এই বাটীর ছাদ খিলান-করা, কিন্তু অনেক স্থলে ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে।

এই বাটীর নীচে পূর্ব্ব দিকে একটি পুকুর আছে। উহাকে ৺লক্ষ্মী-নারায়ণের পুকুর বা তোষাখানার পুকুর বা ধনাগার-পুকুর বলা হয়। এই পুকুরের দক্ষিণ দিকে পূর্ব্বোক্ত দশভুজার মন্দির আছে। পুকুরের পূর্ব্ব দিকে আধুনিক কাট খোট্টা বা কাষ্ঠঘর পাড়া আছে। এই পুকুরটি সমচতুষ্কোণ ও বেশী বড় নহে। ইহার চারিধার ও জলের মধ্যে ইহার তলদেশ ইষ্টক দ্বারা আগাগোড়া বাঁধান আছে। শুনা যায় ইহার তলদেশে সাতটি চাড়ি বা নাদাবসান কূপ ছিল; ঐ কূপগুলির প্রস্রবণে পুকুরটি পূর্ণ হইত। সীতারাম এই পুকুরে তাঁহার ধনরত্ন নিক্ষেপ করিতেন ও বিশেষ প্রয়োজন হইলে আবশ্যক মত উঠাইয়া লইতেন। শুনা যায়, কিয়ৎকাল পূর্ব্বেও কেহ কেহ এই পুকুরে ধন পাইয়াছে। পুকুরের চতুর্দ্দিকে জলের ধারে জলের মধ্য হইতে যে প্রাচীর গাঁথিয়া তোলা হইয়াছিল, ঐ প্রাচীরে জলের উপরে এক হাত ব্যবধানে একটি করিয়া সুশ্রী খাঁজ-কাটা খিলান-করা কুলুঙ্গীর সারি ছিল; প্রত্যেক কুলুঙ্গীর মাপ ১॥ হাত উচ্চ × ১ফুট প্রশস্ত। এই এই সকল কুলুঙ্গীতে সীতারামের সময় রাত্রে প্রদীপের সারি জ্বালিয়া দেওয়া হইত। তদ্দ্বারা পুকুরটির অপূর্ব্ব শোভা হইত ও তস্করের ভয় নিবারিত হইত। উক্ত কুলুঙ্গী-শোভিত প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ এখন উত্তর-পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাড়ের স্থানে স্থানে আছে। এই প্রাচীরের তিন হাত দূরে উত্তর-পূর্ব্ব দিকের পাড়ের উপরে পূর্ব্বকালে আর একটি করিয়া প্রাচীর ছিল, আজিও স্থানে স্থানে উহা ২।৩ হাত উচ্চ হইয়া দণ্ডায়মান আছে। বহুকালের অযত্নে এক্ষণে সীতারামের সাধের পুকুরটি ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। পুকুরের মধ্যে অনেক স্থলে দাম, শ্যাওলা ও হোগলা জাতীয় তারাজি নামক জলীয় গাছের বন হইয়াছে। স্থানে স্থানে পুকুরে এখনও ৩।৪ হাত জল আছে। স্থানীয় লোকের নিকট শুনিলাম যে, এই ৩।৪ হাত জলের নীচে ৬।৭ হাত পাঁক মাটি আছে, তাহার নীচে পুকুরের তলদেশ ইষ্টক দ্বারা আগাগোড়া বাঁধান আছে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, প্রাচীন কালে একবার নড়াইলের বাবুদের লোকে পুকুরটি ছেঁচিয়া ফেলিয়া ধনের সন্ধান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই; কারণ, রাত্রির মধ্যে পুকুরটি জলপূর্ণ হইয়া যাইত।

সীতারামের পূর্ব্বোক্ত দ্বিতল বৈঠকখানা বা আবাস বাটীর কিঞ্চিৎ দূরে দুর্গের ভিতরে উত্তর-পশ্চিম কোণে গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ ও একটি পুকুর আছে। উহাকে লোকে নয়া বা নূতন বাড়ী ও তৎসংলগ্ন পুকুর কহে। সম্ভবতঃ এই স্থানে সীতারামের কোন স্ত্রীর আবাস ছিল। এক কালে এই নয়াবাড়ীতে নড়াইলের জমিদারী কাছারি স্থাপিত হইয়াছিল।

দুর্গ মধ্যে আরও নানাস্থানে জঙ্গলের মধ্যে ধ্বংস-স্তূপ আছে। কিন্তু দুর্ভেদ্য জঙ্গল ও শ্বাপদ-সঙ্কুল বলিয়া সে সকল স্থানে যাওয়া যায় না, এবং সে সকল স্থানে কোথায় কি ছিল তাহা লোকে জানে না।

পাগল

(কবীর)

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

সবাই দেখ্‌ছি পাগল, ছিক্! ছি! গোটা জগৎ পাগল যে!
সাঁচ্চা কইলে মারতে ধাইছে, চাইছে ঝুঁঠা নকল কে।
হিন্দু কইছে "আমার যে রাম", "রহীম" গাইছে মুসলমান;
জান্‌লনা কেউ মরম, দিচ্ছে লড়াই করে'ই দু'দল জান্।
ঘর ছেড়ে হায় পালায় দুঃখে মুসলমানের মেহের, আর
হিন্দুর দয়া; একজন 'বলি', তিনজন কর্‌লেন 'জবাই' সার!
আগুন লাগ্‌ল দু'য়ের ঘরেই, নিজ্ রাই আগুন লাগাচ্ছে;
ঠাট্টার হাসি হেসে' বৃথাই আমার পানে তাকাচ্ছে।
ওরা ভাব্‌ছে—জানা ওরা; কবীর ভাব্‌ছে—পাগল যে।...
ওরা, কবীর, এদের মধ্যে, বল্‌বে, সত্যি পাগল কে?

বিবিধ-প্রসঙ্গ

পল্লী-সংস্কার ও সংগঠন

শ্রীগুরুসদয় দত্ত এম-এ, আই-সি এস্

মানব যেমন স্বীয় শৈশবকাল দোলায় অতিবাহিত করিয়া পুষ্টিলাভ করে, তেমনই জাতীয় জীবনের শৈশব পল্লীগ্রামের ক্রীড়াভূমিতে অতিবাহিত হয়। পল্লীবাসিগণের সমৃদ্ধি ও মঙ্গলের উপরেই জাতির শক্তি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। এই কথা জগতের সকল দেশের পক্ষেই খাটে বটে, কিন্তু আমাদের দেশে ইহা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। বঙ্গদেশের সমগ্র অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা ৯৩ জনের অধিক পল্লীগ্রামে বাস করে। বর্ত্তমানে এই সকল পল্লীগ্রাম অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। পল্লীবাসিগণের অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, রোগ ও পরস্পর বিবাদে তাহাদের দুর্গতির চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়াছে। পল্লীগ্রামসমূহের এই দুর্গতি ও অবনতিই আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি ও মঙ্গলের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবনতি ও দুর্গতির কারণ কি, এবং কি প্রকারেই বা ইহার প্রতীকার করা যাইতে পারে? এই কারণ ও প্রতীকারের উপায় নির্ণয় করিতে হইলে, যে সকল বিধানে সামাজিক ক্রমবিকাশ ও উন্নতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, সেই সকল বিধান ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ এই বিষয়কে কেবল রাজনীতির দিক হইতে দেখিয়া থাকেন। কেহ বা সমাজনীতির সাহায্যে ইহার মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হন। আবার অনেকে স্বাস্থ্য বা শিক্ষার দিক হইতে এই সমস্যার সমাধান করিতে চান। কিন্তু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে ইহা প্রতীতি হয় যে, এই কয়টী উপায়ের একটীর দ্বারাও এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ ও প্রকৃত সমাধান হইতে পারে না; ইহা প্রকৃত-প্রস্তাবে জীবতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। এই বিষয়ে যে গভর্ণমেণ্টের কোন কর্ত্তব্য নাই, তাহা বলিতেছি না। তাহা হইলেও, আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিকর উপায় আমাদিগকেই অবলম্বন করিতে হইবে।

ইহা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক যে, কেবলমাত্র উপর হইতে সরকারের হুকুম জারি হইলে, অথবা বহু গবেষণা সহকারে উদ্ভাবিত স্বাস্থ্যরক্ষা বা শিক্ষা বিস্তারের কোন প্রণালী সরকার কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইলেই, এ প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না। আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য যে মনুষ্যসমূহের যে সমষ্টিকে সমাজ নামে অভিহিত করা যায়, তাহার একটা প্রাণ আছে—তাহা জীবন্ত, তাহা জড়পদার্থ নহে। একটী সমগ্র জাতি এই প্রকার একটী সজীব সমষ্টি; ইহার অন্তর্ভুক্ত এই প্রকারের ক্ষুদ্রতর বহু সমষ্টির একত্র অবস্থানের জন্যই জাতির গঠন ও কার্য্যপ্রণালী জটিল হইয়াছে। এই সকল অন্তর্ভুক্ত সমষ্টির নিম্নতম স্তরে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আমাদের পল্লীসমাজ। সামাজিক সমষ্টির মধ্যে ইহাই ক্ষুদ্রতম; সুতরাং প্রত্যেক পল্লীকে একটী জীবন্ত সমষ্টি বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। ধারণা করিতে হইবে যে, পল্লীর মধ্যে প্রাণ আছে; অথবা আমরা চেষ্টা করিলে মৃত পল্লী-সমষ্টিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারি, মৃতদেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারি।

এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, উপকার যদি প্রকৃত-প্রস্তাবে স্থায়ী করিতে হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র বাহির হইতে বা উপর হইতে রোগের উপসর্গসমূহের উপশমকারী ঔষধ প্রয়োগ করিলে চলিবে না;—সেই প্রাণকে শক্তি ও ক্ষমতা দিতে হইবে, যে প্রাণ ভিতর হইতে প্রাণীর স্বাস্থ্য, শ্রী ও সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিতে পারে।

বাহির হইতে অপর লোকের চেষ্টায় পল্লীগ্রাম 'উদ্ধার' করিবার কথা শুনিলে মনে এই ধারণার উদয় হয়, যেন পল্লীসমাজ জড়পদার্থ মাত্র, যেন বাহির হইতেই কোন ব্যবস্থা প্রয়োগ করিলে পল্লীগ্রামকে রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, বাহির হইতে আমরা কেবল পল্লীসমাজগুলিকে বাঁচিয়া থাকিতে ও সমৃদ্ধ হইতে সাহায্য করিতে পারি; কিন্তু এই বাঁচিয়া থাকার জন্যই সমাজের অভ্যন্তরস্থিত প্রাণটীকে জাগ্রত রাখিবার প্রয়োজন, যাহাতে সেই প্রাণ বাহির হইতে সাহায্য আহরণ করিয়া নিজের কাজে লাগাইতে পারে, এবং বাহির হইতে কোন ব্যবস্থা প্রয়োগ করিলে পল্লীসমাজের ভিতরে তাহার সাড়া পাওয়া যায়। পল্লীসমাজের মধ্যে যদি সেই প্রাণের অস্তিত্ব কোথাও না থাকে, তাহা হইলে বাহিরের কোন চেষ্টায় পল্লীসমাজের মধ্যে কোন সাড়া পাওয়া যাইবে না; এবং পল্লীর উন্নতিকল্পে বাহির হইতে প্রযুক্ত যাবতীয় চেষ্টা পরিণামে ব্যর্থ হইবে। সুতরাং এই কথা পুনরায় বলিতেছি যে, গ্রামবাসিগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া, গ্রামে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, যাহাতে তাহারা গভর্ণমেণ্ট বা অন্য কোন তরফ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, সেই অবস্থার সৃষ্টি করিতে না পারিলে, পল্লীবাসিগণকে রক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব।

এখন দেখিতে হইবে, পূর্ব্বে যে সকল সজীব সমষ্টির কথার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার লক্ষণ কি? এই সমষ্টির প্রত্যেক অংশ সংঘবদ্ধ, ও সমষ্টির অন্তঃস্থিত প্রাণ সকল অংশেই পরিব্যাপ্ত। ইহার অস্তিত্ব যে ইহার বিভিন্ন অংশের সম্মিলনের উপর নির্ভর করে, তাহা অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। ইহার এমন সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকা চাই, যাহা দ্বারা ইহা সমগ্র সমষ্টির এবং প্রত্যেক অংশের মঙ্গলের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে। এই সাধারণ মঙ্গল লাভের ব্যবস্থা নির্ণয় করিতে ও তদনুরূপ কার্য্য করিতে যে বিচারবুদ্ধি ও কার্য্যকরী শক্তির প্রয়োজন, তাহাও চাই।

এক সময়ে ভারতবর্ষের—বিশেষতঃ বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামে এই প্রকার প্রাণ বর্ত্তমান ছিল। পুরাতন ভাবতে পল্লীসমাজ সঙ্ঘবদ্ধ ও কার্য্যকরী ছিল। তাহাতে সামাজিক জীবনের আবশ্যক যাবতীয় কার্য্য সকলে একত্র হইয়া সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহ করিত। সেই সকল পল্লীসমাজের হয় ত কোন না কোন দোষও ছিল; কারণ, তাহা যে জাতিভেদ ও ধর্ম্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা আধুনিক অবস্থার উপযোগী নহে। কিন্তু যত দিন আমাদের সেই পুরাতন পল্লীসমাজগুলি বর্ত্তমান ছিল, তত দিন তাহাদের দ্বারা গ্রামের অভাব দূর করা এবং উন্নতির ব্যবস্থা করা—এই দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল।

সেই সকল পল্লীসমাজ সম্পূর্ণ ভাবে লোপ পাইয়াছে। এই লোপ পাইবার কারণ এত বহু সংখ্যক ও এত জটিল যে, আপাততঃ তাহা বুঝাইয়া বলা অসম্ভব; কিন্তু সেই পুরাতন পল্লীসমাজগুলি যে লোপ পাইয়াছে, ইহা ধ্রুব সত্য। আমাদের দেশের মধ্যে গ্রাম আছে এবং প্রতি গ্রামেই কতকগুলি মনুষ্য বাস করে; কিন্তু যাহাকে পল্লীসমাজ বা পল্লীবাসীর সজীব সঙ্ঘবদ্ধ সমষ্টি বলা যাইতে পারে, এখন আর তাহা কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

পুরাতন পল্লীসমাজগুলি কালক্রমে ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত পল্লীবাসিগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় এক গ্রামেই পরস্পরের নিকট বাস করে সত্য; কিন্তু সমগ্র গ্রামের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়া একত্র এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। মিলন ও একতার পরিবর্ত্তে প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা আমরা দেখিতে পাই, তাহাকে এক গ্রামের অধিবাসিগণের মধ্যে অবিশ্রান্ত যুদ্ধের অবস্থা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোথাও বা প্রকাশ্য যুদ্ধঘোষণা না করিয়া গ্রামবাসিগণ পরস্পরের সহিত অ-সহযোগিতা করিয়া বসিয়াছে; ইহাতেও পরস্পরের যুদ্ধের ন্যায় পল্লীবাসীদের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, আমাদের পল্লীগ্রামগুলি মনুষ্যজাতির চিরশত্রু—দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও রোগের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হইয়াছে। যুগের পর যুগ ধরিয়া মনুষ্যজাতি এই সকল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে; এবং ইহাদেরই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সমাজ গঠিত হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যজাতির এই সকল চিরন্তন শত্রু ত বর্ত্তমান রহিয়াছেই—উপরন্তু পূর্ব্বকালে ভারতের পল্লীগ্রামগুলি জগতের অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন ও আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ থাকাতে যে সুবিধা ভোগ করিত, তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ফলে, পৃথিবীর শিল্পপ্রধান দেশসমূহের সঙ্ঘবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত কৃষক ও শিল্পীদের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের পরস্পরের সহিত বিযুক্ত হীনবল কৃষকগণ দাঁড়াইতে পারিতেছে না। এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকেও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। সুতরাং ইহা বুঝা যায় যে, আমাদের পল্লীগ্রামসমূহকে এবং সমগ্র জাতিকে দুই প্রকারের সংগ্রামে নিযুক্ত হইতে হইবে। একটী দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও রোগের সহিত—অপরটী নানাদেশের নানাপ্রকার শিল্পী ও বণিক-সঙ্ঘের সহিত। এই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে, আমাদের পল্লীগ্রামগুলিকে সজীব করিয়া পুনর্গঠন করিতে হইবে—অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। প্রত্যেক গ্রাম বা কয়েকটী গ্রামের মণ্ডলীর জন্য এমন এক একটী সমিতি গঠন করার প্রয়োজন, যাহা একত্র হইয়া সাধারণের হিতকর বিষয়ের আলোচনা করিবে; এবং সরকার ও অন্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে নির্দ্ধারিত উপায় অনুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা করিবে; এই সকল সমিতির সাহায্যে গভর্ণমেণ্ট অথবা জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী প্রতিষ্ঠানগুলি ঐ পল্লীর অধিবাসিগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধনসম্পত্তি ইত্যাদির উন্নতিকর ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। পল্লীবাসিগণের সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য এবং সাধারণ অভাবগুলি দূর করিবার জন্য আমাদিগকে "প্রতিবেশী-মণ্ডলী" গঠন করিতে হইবে।

এই সকল সমিতি তিন প্রকারের হইতে পারে। যথা:—

(ক) গভর্ণমেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত এবং কোনও নির্দ্দিষ্ট আইনের দ্বারা অনুমোদিত ও উপযুক্ত কার্য্যকরী ক্ষমতাবিশিষ্ট শাসন-সমিতি।

(খ) পল্লীবাসিগণের ইচ্ছায় গঠিত সম্পূর্ণ বে-সরকারী সমিতি।

(গ) আইনের বিশেষ বিধান অনুসারে গঠিত এমন সকল সমিতি, যাহার সভ্যগণ স্বেচ্ছায় সমিতির নিয়মানুসারে কাজ করিতে অঙ্গীকার করেন। সভ্যগণ ব্যতীত অপর কাহারও উপর এই সমিতির ক্ষমতা চলে না।

ইউনিয়ন বোর্ড, ইউনিয়ন কমিটী ইত্যাদি কয়েকটী স্বায়ত্তশাসনের সমিতি (ক) শ্রেণীর অন্তর্গত। পল্লীসংস্কার, কৃষি ও সামাজিক উন্নতির জন্য স্থাপিত "পল্লীসমিতি" (খ) শ্রেণীর উদাহরণ; এবং ঋণদান ও অন্য প্রকারের সমবায় সমিতিগুলি (গ) শ্রেণীর অন্তর্গত। বাহুল্য ভয়ে এই তিন প্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার তুলনা করিয়া আলোচনা করিলাম না। কিন্তু এই বিষয়ে আমার মত এই যে, উক্ত তিন প্রকারের সমিতি একত্র বর্ত্তমান থাকিয়া একই ক্ষেত্রে পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করিলেই পল্লীবাসিগণের সম্পূর্ণ উপকার সাধিত হইবে।

বস্তুতঃ পল্লী-সংস্কারের কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ। এই কার্য্যক্ষেত্রকে নিম্নলিখিত মতে বিভাগ করা চলে:—

(ক) ধনবৃদ্ধি, (খ) স্বাস্থ্যের উন্নতি; (গ) শিক্ষার বিস্তার, (ঘ) উৎসব ও আমোদের ব্যবস্থা; (ঙ) গ্রাম্য বিবাদের শালিসি নিষ্পত্তি।

ধনবৃদ্ধির জন্য চাই রাস্তা-ঘাটের উন্নতি, নূতন শিল্পের প্রচলন, কৃষি ও অন্য বর্ত্তমান শিল্পসমূহের উন্নতি এবং ঋণদান, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য পল্লীবাসিগণকে সমিতিবদ্ধ করা। এই সকল কাজ সম্পন্ন করিতে হইলে বিজ্ঞান, শিক্ষা, সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রণালী এবং অর্থনীতির সাহায্য লইতে হইবে। এমন কি গ্রাম্য বিবাদসমূহের মীমাংসা করাও ধনবৃদ্ধির উপায়সমূহের মধ্যে গণনা

হয়া উচিত; কারণ, তুচ্ছ বিষয় উপলক্ষে মোকর্দ্দমা করিয়া অর্থের অপব্যয় পল্লীবাসিগণের দারিদ্র্যের একটী প্রধানতম কারণ।

স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চাই—স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তার, স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা এবং সেই সকল ব্যবস্থা কেহ লঙ্ঘন করিতে না পারে তাহার জন্য সমিতি গঠন।

শিক্ষার জন্য চাই—বালক, বালিকা এবং প্রাপ্তবয়স্কগণের জন্য সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা, সকলের জন্য কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা, গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয় স্থাপন ও নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা।

সকল দেশেই দেখা যায় যে, পল্লীগ্রামে আমোদ প্রমোদের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকাই অবস্থাপন্ন লোকদিগের পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে আসিবার অন্যতম কারণ। সুতরাং পল্লীবাসীদের জীবনকে আনন্দময় করিবার জন্য উপযুক্ত আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন।

এই সকল কাজ করিবার জন্য প্রতি গ্রামে বা কয়েকটী গ্রাম মিলিত হইয়া একটী সমিতি গঠন করা আবশ্যক। সম্ভব হইলে তাহাদিগের তত্ত্বাবধানের জন্য জেলায় একটী প্রধান সমিতি এবং কলিকাতায় একটী কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপন করা আবশ্যক। এই সকল সমিতি ডিঃ বোর্ড এবং সরকার হইতে সাহায্য লাভ করিবে।

শ্রীগুরুসদয় দত্ত এম-এ, আই-সি-এস্

তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন ইংলণ্ডের পল্লীজীবন পুনর্গঠন ও উন্নত করিবার জন্য সেই দেশের প্রধান প্রধান জননায়কগণ নানাপ্রকার সমিতি গঠন করিয়া যে আন্দোলন করিতেছিলেন তাহা দেখিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলাম। পল্লীজীবনের প্রতি জনসাধারণের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা কৃষিকার্য্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেছিলেন; শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা যাহাতে পল্লীগ্রামে থাকিয়া কৃষিকার্য্য করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতেছিলেন; বর্ত্তমান গৃহশিল্পের উন্নতি ও নূতন গৃহশিল্পের প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছিলেন; Oxford ও Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে নানা পল্লীগ্রামে বিবিধ বিষয়ের বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, পল্লীজীবন চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য আমোদ প্রমোদ ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ইংলণ্ডের গ্রাম্যসমিতির এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার জন্য আরও অনেক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে; যথা—Workers' Educational Union, ও Women's Institute। জাপানেও দেখিলাম যে গ্রামে গ্রামে কৃষিসমিতি গঠিত হইয়াছে ও যুবকেরা গ্রাম্য সমিতি গঠন করিয়া নিজ নিজ গ্রামে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। ইংলণ্ড ও জাপানের ন্যায় শিল্পপ্রধান দেশেও যদি এই প্রকার গঠনমূলক কার্য্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে ভারতবর্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক বেশী। কারণ, এই দেশে অধিক লোক গ্রামে বাস করে এবং জাতীয় ধনের অধিকাংশ গ্রামেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং পল্লীজীবনের উন্নতি বিষয়ে আমরা উদাসীন হইয়া থাকিলে জাতীয় জীবনের অবনতি অনিবার্য্য।

বর্ত্তমান অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? প্রথমতঃ যুবক ও বৃদ্ধ সর্ব্বশ্রেণীর লোকের চিন্তা ও মনোযোগ এই বিষয়ে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এ যাবৎ দেশের দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তি প্রণালীবদ্ধ ভাবে এ বিষয়ে তাঁহাদের চিন্তাশক্তির প্রয়োগ করেন নাই। পল্লীজীবন পুনর্গঠনের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, তাহার নিম্নতম স্তরে এক একটী গ্রামের শাসনপ্রণালীর আলোচনা করা আবশ্যক। গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক প্রচলিত আইন অনুসারে

প্রাথমিক শিক্ষা, ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য এবং যাতায়াতের পথ নির্ম্মাণ ও সংরক্ষণের জন্য গ্রাম্য সমিতি (Union Board) গঠন করা যাইতে পারে। আমি শুনিয়াছি যে, এই প্রদেশের নানা অংশে—বিশেষতঃ ঢাকা, বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলায়, এই প্রকার গ্রাম্য সমিতির কাজ বেশ ভাল হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই সকল সমিতির প্রকৃতি ও কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, দেশের অনেক লোক..ইহা অনুমোদন করেন না। এই শ্রেণীর লোকদিগের নিকট আমার ইহাই বক্তব্য যে, যে সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য গ্রাম্য সমিতি (Union Board)স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযোগী যে একটা বন্দোবস্ত থাকা উচিত, ইহা ত কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। পল্লীগ্রাম-সমূহকে আসন্ন ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে সমগ্র দেশে, প্রদেশে—এমন কি সমগ্র জেলায় কেবল সুশাসনের ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হইবে না। পল্লীগ্রামের ছোট ছোট দৈনন্দিন কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করিবার জন্য, গ্রাম্য পাঠশালার সুব্যবস্থার জন্য, দরিদ্র ও পীড়িত ব্যক্তিগণের দুঃখ মোচনের জন্য, গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার জন্য, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের জন্য, গ্রামবাসিগণের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ করিবার জন্য এবং সর্ব্বশেষে তাহাদের ছোট ছোট বিবাদের আপোষ নিষ্পত্তির জন্য গ্রামের মধ্যে যথোচিত ব্যবস্থার প্রয়োজন।

এই সকল কাজ সরকারের দ্বারা সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব। অর্থের দ্বারা, উপদেশের দ্বারা এবং বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীর দ্বারা এই সকল বিষয়ে সাহায্য করা সরকারের কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, গ্রামের মধ্যে এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহের কোন রীতিমত ব্যবস্থা না থাকায়, সরকারের সেই সকল সাহায্য ব্যর্থ হইতেছে। দুঃখের বিষয় যে, গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের যে একটা রীতিমত ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন, তাহা আমাদের দেশের লোক সম্যক্ উপলব্ধি করিতেছেন না। জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এবং জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ইত্যাদি সমস্যার মীমাংসার জন্য এই প্রকার ব্যবস্থা না হইলেই চলে না। ইয়োরোপের সভ্য দেশসমূহে গত ৭০।৭৫ বৎসরের মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসনের উন্নতির দ্বারা সেই সকল দেশের অধিবাসিগণের পরমায়ু পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। যে সকল রোগ অনায়াসে নিবারিত হইতে পারে, তাহাতে আক্রান্ত হইয়া আমাদের দেশের অনেক লোক মারা যায়। এই অকালমৃত্যু আমাদের জাতীয় উন্নতির একটী প্রধান অন্তরায় এবং ইহা দূর করিতে হইলে গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসনের সুবন্দোবস্ত করা একান্ত আবশ্যক।

বঙ্গদেশের জনসাধারণ বা তাহাদের কোন সম্প্রদায় যদি গ্রাম্য সমিতি (Union Board) বিষয়ক বর্ত্তমান ব্যবস্থার অনুমোদন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান ব্যবস্থার দোষ সংশোধন করিয়া, আমাদের অবস্থার উপযোগী উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার আবিষ্কার করুন। কিন্তু আমাদের পল্লীবাসিগণকে ও সমগ্র জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের মুখ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য কোন না কোন ব্যবস্থা করা অতীব আবশ্যক। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের এবং যাঁহারা রাজনীতি ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের তত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে গবেষণা. আলোচনা ও পরীক্ষা করিবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রহিয়াছে। জাতির উন্নতির জন্য বালক ও বালিকাদিগের সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং উপযুক্ত শিল্পশিক্ষা আবশ্যক বটে; কিন্তু কেবলমাত্র সরকারের দ্বারা এই দুই বিষয়ের ব্যবস্থা হইতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষা ও শিল্পশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে হইলে, গ্রামে গ্রামে তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য গ্রাম্য সমিতির সাহায্য একান্ত আবশ্যক।

এখন পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সমিতির কথা বলিব। সমবায় সমিতি ও গ্রাম্য আলোচনা সমিতি গঠন করিয়া যুবক ও বৃদ্ধ সকলেই আপন আপন গ্রামের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতে পারেন। দেশের সকলেই এই গঠনমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সমিতি, মণ্ডলী, সভা ইত্যাদি গঠনে প্রবৃত্ত হউন। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি এবং ধনবৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্য্যের অসীম ক্ষেত্র আমাদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। গ্রামে গ্রামে সমাজের নানাবিধ হিতসাধনের জন্য সমিতি গঠন করুন, কৃষিকার্য্য ও অন্য উপায়ে ধনের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য সমিতি স্থাপন করুন, যাঁহারা পরস্পরের নিকট বাস করেন, তাঁহারা একত্র হইয়া প্রতিবেশী মণ্ডলী গঠন করুন এবং সমবায় সমিতি গঠন করিয়া ঋণগ্রহণের, কৃষি ও শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ও বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করুন। পূর্ণবয়স্ক লোকদের শিক্ষার ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য এই প্রকার সমিতির সাহায্যে পল্লীবাসী কৃষক ও শিল্পীর নিকট বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল উপস্থিত করিতে পারা যাইবে। সমবায় সমিতির সাহায্যে কৃষিকার্য্য ও অন্যান্য শিল্পের জন্য যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা যাইবে এবং সরকার, জেলাবোর্ড বা ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যাইবে।

রায় গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের নেতৃত্বে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের প্রতিষেধক যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে, গ্রামের লোকেরা সমবায় প্রণালীতে একতাবদ্ধ হইলে উত্তম কাজ হইতে পারে। আমি আপনাদিগকে রায় বাহাদুরের প্রণালী অনুসারে গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য সংরক্ষণী ও ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছি। বাঁকুড়া ও বীরভূম জিলায় যে জল সরবরাহ সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং এই প্রদেশের নানা স্থানে ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত যে সকল সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিলে কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি সম্ভবপর। পল্লীবাসিগণ একতাবদ্ধ হইয়া জলসেচন ও অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনায়াসে সহস্র সহস্র টাকার সংস্থান করিতে পারে। এই সকল জলসেচন সমবায় সমিতির চেষ্টায় স্থানীয়

... যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং নানাবিধ রোগের প্রকোপ ...ইয়াছে।

...ই সকল জেলার অবনতি এই উপায়ে নিবারিত হইতে ...। কিন্তু সমস্ত পল্লীবাসিগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এই প্রকার ...গঠন করিতে হইলে অনেক অ-বৈতনিক কর্ম্মীর প্রয়োজন। ...মে রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, ও বাঁকুড়ায় শ্রীযুক্ত ...শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রচেষ্টার উন্নতিকল্পে যাহা করিতেছেন, ... বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আশা করি, দেশের অন্যান্য স্থানের ...গণ তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

...ঙ্গীয় স্বাস্থ্যসংরক্ষণ-সমিতির নেতা ডাঃ ভট্টাচার্য্যের চেষ্টার ফলে ...হা প্রমাণিত হয় যে, সম্পূর্ণ বে-সরকারী সমিতিও প্রণালীবদ্ধ ...র্ পরিচালিত হইলে, দেশের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতে পারে। ...গ্রীষ্মকালে যখন বীরভূম জেলার নানাস্থানে ভীষণ কলেরা রোগের ...বির্ভাব হইয়াছিল, তখন এই সমিতি কি প্রকার কাজ করিয়াছিলেন, ...হা সকলে অবগত আছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া শত শত শিক্ষিত যুবকও কোদালি লইয়া স্বহস্তে জলাশয় খনন ও কূপ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে এই প্রকারের উদ্যম ও এই প্রকারের সমিতির বিশেষ প্রয়োজন। কর্ম্মবীর ডাঃ ডি, এন, মৈত্র মহাশয়ের নেতৃত্বে বঙ্গীয় 'হিত-সাধন-মণ্ডলী' যে কাজ ক...তেছেন, তাহার দ্বারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পল্লীসেবাতে প্রচার কার্য্যের উপকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে এই মণ্ডলীর শাখা গঠন করিতে আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। ...ঃ মৈত্রের প্রতিষ্ঠিত 'হিত-সাধন-সঙ্ঘে' সমাজসেবাবিষয়ক বক্তৃতা ...ং কর্ম্মিগণের উপদেশের জন্য নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ...হারা বঙ্গের পল্লীসমূহকে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে চাহেন, ...হারা এই সকল ক্লাসে যোগদান করিয়া সমাজ-সেবা রূপ মহৎ ক...জের জন্য আপনাদিগকে প্রস্তুত করুন।

অপরের কাজের সমালোচনা না করিয়া এবং সরকারের উপর ...র্ণরূপে নির্ভর না করিয়া নিজেরা গঠনকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। এই সকল বিষয়ে সাহায্য করা সরকারের কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই; বঙ্গীয় ...লেরিয়া-নিবারণী-সমিতি ও অন্যান্য সমিতির কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট অর্থ-...হায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টো-...ধ্যায় ও উল্লিখিত অন্যান্য ব্যক্তিগণ সরকারের সাহায্যের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন নাই। সমিতি গঠন করুন—সর্ব্বান্তঃকরণে ...ই কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন—প্রয়োজনীয় অর্থের কখনও অভাব হইবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সমবায় প্রণালীতে কাজ করিবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। এ বিষয়ে Finland দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। যখন তাহারা দেখিল যে, তাহাদের দেশের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিতেছে—এবং জগতের অন্যান্য জাতির তুলনায় তাহাদের দেশ পিছাইয়া পড়িতেছে, তখন তাহারা দেশকে সমবায়-প্রণালীতে সংগঠন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল; এবং যত দিন পর্য্যন্ত না সমস্ত দেশকে উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য সমবায়-প্রণালীতে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দেশের অবনতি নিবারণ করিল ও দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিতে পারিল, তত দিন তাহারা বিশ্রাম করে নাই।

কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বভারতী'র অন্তর্গত 'শ্রীনিকেতনে'র পল্লীসংস্কার বিভাগে পল্লীগ্রামের অবনতির কারণ আলোচিত হইতেছে এবং পাঠশালার শিক্ষকগণকে ও ব্রতী বালকগণকে (Village Scouts) পল্লীসংস্কার কার্য্যে দীক্ষিত করা হইতেছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। এই সকল শিক্ষক ও বালকেরা Scouting, বস্ত্রবয়ন, কৃষি ও অন্যান্য গৃহশিল্পে শিক্ষালাভ করিতেছেন। আশা করি যে, জেলা-বোর্ড ও গ্রাম্য সমিতিসমূহ শিক্ষক ও বালকদিগকে পল্লীসংস্কার কার্য্য শিক্ষা দিবার এই সুযোগ অবহেলা করিবেন না। পল্লীগ্রামের নিম্নপ্রাথমিক ও মধ্য ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মনে কৃষিকার্য্য ও নানাবিধ গ্রাম্যশিল্পে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

পল্লী-সংগঠন প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে অর্থনীতির দিক হইতে দু'একটী কথা বলা উচিত। পল্লীর শিল্পসমূহের অবনতিই পল্লী-গ্রামের অবনতির প্রধান কারণ। সেই সকল শিল্পের মধ্যে কৃষি কার্য্যই সর্ব্বপ্রধান। পল্লীসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে ও জাতির উন্নতি করিতে হইলে ই কথা আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে গ্রাম্যশিল্পের মধ্যে কৃষি কার্য্যই সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম। পল্লীগ্রামগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে কেন? লোকে গ্রাম ছাড়িয়া সহরে যাইতেছে কেন? কারণ, কৃষিকার্য্যে ও অন্যান্য গ্রাম্যশিল্পে যথেষ্ট অর্থাগম হয় না। সুতরাং এই সকল শিল্প যাহাতে অর্থকরী হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন। ই সকল শিল্পের উন্নতি করিবার একটী মাত্র উপায় আছে,—বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর প্রবর্ত্তন ও উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্য দুইটী উপায়ে সাধিত হইতে পারে। পল্লীবাসিগণকে এরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে তাহারা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন করিতে পারে; এবং তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া উপযুক্ত অর্থ পাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয় উপায় এই যে, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষি ও অন্যান্য শিল্পকার্য্য অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে কাজ চালাইবেন। আমি দেশের শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে বারংবার এই কার্য্যে আহ্বান করিয়াছি; কিন্তু তাঁহারা মনে করেন ইহাতে তাঁহাদের সম্মানের হানি হইবে। আত্মসম্মানের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে হইবে। এবং কায়িক পরিশ্রমের প্রতি মর্য্যাদাই যে জাতীয় উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ, এই কথা শিক্ষিত যুবক-বৃন্দের মনে বদ্ধমূল করিতে হইবে। সুতরাং আপনাদের প্রতি আমার এই উপদেশ যে, যদি আপনারা পল্লীসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিতে এবং দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিতে চাহেন, তবে সরকারী চাকরীর জন্য লালায়িত না হইয়া যাহাতে দেশের ধনবৃদ্ধি হয় সেইজন্য কৃষি ও শিল্প ইত্যাদি ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন। ইহাতে আপনারা

ব্যক্তিগত ভাবে ধনলাভ করিবেন—দেশের ধনবৃদ্ধি হইবে—জাতীয় জীবন উন্নত হইবে এবং পল্লীগ্রামের সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিবে।

যত দিন দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত না হইবেন, ততদিন কৃষিকার্য্যের প্রধান অন্তরায়গুলি দূর হইবে না। কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজন—বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর প্রয়োগ, কায়িক পরিশ্রম লাঘব করিবার যন্ত্রাদির ব্যবহার, কৃষিজাত দ্রব্য বহুল পরিমাণে উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা, ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্রকে একত্রী-করণের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই সকল অন্তরায় দূর না হইলে কৃষিকার্য্য হইতে যতদূর ফললাভ করা সম্ভব তাহা পাওয়া যাইবে না। মনে রাখিবেন যে, কৃষিকার্য্যের উন্নতি ব্যতীত দেশের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না—ইহার অন্য উপায় নাই। তৈত্তীরিয় উপনিষদের কবি যাহা বলিয়াছেন তাহা মনে রাখিবেন—"অন্নং বহু কুর্ব্বীত, তদ্ ব্রতং।" যত দিন পর্য্যন্ত দেশের সকলেই কোন না কোন উপায়ে ধনবৃদ্ধি করিতে নিযুক্ত না হইবেন, তত দিন পর্য্যন্ত দেশের উন্নতি ও পল্লীগ্রামের শ্রীবৃদ্ধির আশা দুরাশা মাত্র। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই কি কোন না কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অথবা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া যদি আমাদের জাতীয় আত্মশ্লাঘায় আঘাত দিই—তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন; কিন্তু সত্যের খাতিরে উত্তর দিতে হয়—না। চারিদিকে কেবল আলস্য এবং উকালতি করিবার বা সামান্য সরকারী চাকরী পাইবার ব্যগ্রতাই দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ব্যতীত দেশে অনেক সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা কৃষি বা শিল্প কোনটাই অবলম্বন না করিয়া পরের গলগ্রহ রূপে অপরের উপার্জ্জিত অন্নে প্রতিপালিত হইতেছেন। সম্ভবতঃ আমাদের দেশের সামাজিক ব্যবস্থাই এই শ্রেণীর আলস্যের প্রশ্রয় দেয়;—অবিলম্বেই ইহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। কারণ ইহা ধ্রুব সত্য যে যদি কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত বহুসংখ্যক লোক আলস্যে দিন যাপন করে, তাহা হইলে সেই জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। ইহা আমার দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। কয়েক দিন মাত্র হইল একটী প্রধান Municipalityর Chairman আমার নিকট আসিয়া তাঁহার একটী আত্মীয়কে ৩০৲ টাকা বেতনে Demonstrator নিযুক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করিতেছিলেন—এই আত্মীয়টী সরকারী কৃষিবিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছিল। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, তাঁহার আত্মীয় যে প্রকার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন—তাহাতে কৃষিকার্য্য অবলম্বন করাই তাঁহার পক্ষে বিধেয় এবং ইহার জন্য সামান্য কিছু জমী ও কিছু মূলধন ব্যতীত আর কিছুই আবশ্যক নাই। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন যে, জমী বা মূলধনের অভাব হইবে না; কিন্তু উক্ত আত্মীয় বা তাঁহার পিতামাতা এই প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইবেন না, এমন কি তাঁহাদের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সাহসও তাঁহার নাই। ৩০৲ টাকা বেতনের চাকরী পাইবার জন্য তাঁহারা কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই বাক্যালাপের সময় Director of Agriculture মহাশয় উপস্থিত ছিলেন—তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ঐ যুবকটীকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত কোনও কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষানবীশ করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ঐ যুবক ও তাহার পিতামাতার কৃষিকার্য্যে আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না। এই প্রকারের অনেক অভিজ্ঞতা আমার ঘটিয়াছে। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, জমীদারগণ তাঁহাদের শিক্ষিত পুত্রের জন্য ৫০৲ টাকা বেতনের চাকরী যোগাড় করিতে উদ্‌গ্রীব—অথচ তাঁহাদের নিজের জমীদারীতে কৃষির অভাবে জমী পতিত রহিয়াছে এবং তাঁহাদের শিক্ষিত পুত্রেরা চেষ্টা করিলে অনায়াসে কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং জমীদারীর আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের যুবকগণ এমন কাজ চাহেন যাহাতে, যতই কম হউক না কেন, একটা মাসিক আয় অবধারিত আছে। কোন প্রকার ধন উৎপাদন করিবার নিমিত্ত যে উদ্যম, উৎসাহ, প্রবৃত্তি ও উদ্যোগের প্রয়োজন, তাহার তাঁহাদের একান্তই অভাব। প্রাচীন শাস্ত্রকারের বচনে তাঁহাদের এতই আস্থা যে, ধ্রুব আয় ছাড়িয়া কিছুতেই তাঁহারা অধ্রুবের সন্ধানে যাইতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে পঞ্চাশ হইতে একশত টাকা বেতনের জন্য চিরজীবন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করা বরং ভাল; তথাপি নিজের মানসিক ও শারীরিক শক্তি প্রয়োগের দ্বারা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুব্যবহার করিয়া উক্ত বেতনের দশগুণ বা শতগুণ উপার্জ্জন করার যে সম্ভাবনা আছে, সামান্য অনিশ্চয়তার জন্য সেই পথ অবলম্বন করা কিছুতেই শ্রেয়ঃকর নহে। সুতরাং ধনলাভের এই সকল উপায় হয় অশিক্ষিত গ্রামবাসিগণের না হয় উদ্যমশীল বিদেশীয়গণের করায়ত্ত হয়। কৃষি ও অন্যান্য ছোট ছোট শিল্প সম্বন্ধে এই কথা খাটে।

কোনও শিক্ষিত যুবককে দর্জ্জির কাজ, জুতা প্রস্তুত করা বা ছুতারের কাজ শিক্ষা করিতে বলিলে, তিনি শিক্ষিত বলিয়াই তাহাতে অসম্মত হ'ন। কিন্তু অন্যান্য দেশে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে এই সকল ব্যবসায় পরিচালিত হইতেছে বলিয়াই, তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দেশের কয়জন লোক কর্ম্মহীনতার সমস্যা, দারিদ্র্য সমস্যা ও স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্যা এই দিক হইতে মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন? প্রকৃত প্রস্তাবে দেশে অধিক পরিমাণে ধন উৎপাদিত না হইলে দারিদ্র্য ও রোগ কিছুতেই নিবারিত হইবে না। অতএব আপনাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে সকলে সমবেত ভাবে চেষ্টা করিয়া আমাদের সহর ও পল্লীগ্রাম সমূহের অলস ব্যক্তিগণকে ধনবৃদ্ধির নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া এই অলস সম্প্রদায়ের সমূলে উচ্ছেদ-সাধনে প্রবৃত্ত হউন। সকলে এই প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত না হইলে দেশের ধনবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, এবং ধনবৃদ্ধি ব্যতীত দারিদ্র্য ও রোগ নিবারণ করা যাইবে না। কৃষিকার্য্যের উন্নতি ব্যতীত ম্যালেরিয়া রোগকে সম্যক্‌রূপে নষ্ট করা যাইবে না। কারণ বিশেষজ্ঞ-দের মত এই যে কৃষিকার্য্যের অবনতিই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ।

জাপানের ন্যায় উন্নতিশীল দেশে পল্লীগ্রামের সমৃদ্ধির নিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা করা হয়, তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি। মিনামী ...গুণ জেলার লোকেরা একপ্রকার বৃক্ষ উৎপাদন করিতেন এবং ... কাষ্ঠের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। কিন্তু ঐ জেলার অধিবাসিগণ এই ব্যবসায়ে সন্তুষ্ট না থাকিয়া রেশমের ব্যবসায়েও মনোনিবেশ করিয়াছেন। ১৮৮২ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ঐ জেলার একটিমাত্র পরিবারে রেশমের চাষ হইত। ঐ পরিবারের কর্ত্তা Yuchir অধ্যবসায়ের ফলে এক কর্দ্দি কাগজের উপরিস্থ ডিম হইতে প্রায় দশ সাড়ে সের গুটি উৎপন্ন হইয়াছিল। Yuchir বয়স এখন প্রায় ৭০ বৎসর; তথাপি তিনি গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া এই আবশ্যকীয় বিষয়ে সকলকে উপদেশ দিয়া বেড়ান। তাঁহার চেষ্টার ফলে ঐ জেলায় এমন গৃহস্থ নাই, যাহার রেশম কীট পালনের জন্য একটি ঘর নির্দ্দিষ্ট নাই; এবং প্রতি গৃহস্থ গড়ে ৮।৯ সের গুটি উৎপাদন করেন।

রাসিয়ার সহিত যুদ্ধের অবসানকালে Jnahasi গ্রামের প্রধান ব্যক্তি Aichi স্বগ্রামবাসিগণকে এই উপদেশ দেন যে সকলে রেশমের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে ঐ গ্রামের আয় ৩০০০০ 'ইয়েন' বেশী হইতে পারে এবং সমগ্র দেশ এই পথ অবলম্বন করিলে জাপানের আয় ১০ কোটী 'ইয়েন' অধিক হইতে পারে। এই উপায়ে যুদ্ধের ঋণ সহজেই পরিশোধ হইতে পারে। ঐ গ্রামের লোকেরা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করাতে এখন গৃহে গৃহে রেশমের ব্যবসায় প্রচলিত হইয়াছে।

কি উপায় অবলম্বন করিয়া গ্রামের এবং সমগ্র জাতির ধনবৃদ্ধি করিতে পারা যায়, এবং কৃষকদের অবসরকালে অন্য ব্যবসায় দ্বারা অর্থাগমের ব্যবস্থা হয়, এই দৃষ্টান্ত হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

যাঁহারা সহরে বাস করেন তাঁহারা অনেক সময় পল্লীসংগঠন বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়েন। তাঁহারা মনে করেন যে পল্লীর উন্নতি বা অবনতিতে তাঁহাদের কোন স্বার্থ নাই। এই ধারণা ঠিক নহে। সকল দেশেই দেখা যায় যে, পল্লীর সমৃদ্ধি এবং কৃষি ও অন্যান্য শিল্পের উন্নতির উপর সহরের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। অতএব কলকারখানার মালিক বা জমীদার, ব্যবহারাজীবী বা সংবাদপত্রের লেখক, ছাত্র বা শিক্ষক, আপনারা সকলেই সাবধান হউন। যত দিন পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্য বা অন্যান্য গৃহশিল্পের সম্পূর্ণ সুব্যবস্থা না হয়, এবং যত দিন জাতির প্রয়োজনের উপযোগী অর্থাগমের ব্যবস্থা না হয়, তত দিন আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিবেন না। এ কথা মনে রাখিবেন যে, পল্লীসমাজের পুনর্গঠন ও গৃহশিল্পের উন্নতি আমাদের জাতির উন্নতির একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ; ইহার সহিত সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছে। পল্লীসমাজকে পুনর্গঠিত করিতে হইলে ও গৃহশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইলে আমাদিগকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। কেবলমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে নহে, সামাজিক ও আর্থিক অবনতি এত বেশী এবং সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করা ও দেশের ধনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা এত কঠিন বলিয়াই বর্ত্তমানকালে যাঁহারা এই সকল কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহারা স্বদেশসেবার সমধিক সুযোগ পাইবেন।

এখন প্রয়োজন এই যে দেশের সামাজিক, আর্থিক ও জাতীয় সমস্যগুলি যত্নসহকারে আলোচনা করিয়া আর্থিক উন্নতি ও ধনবৃদ্ধির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে—যাহাতে আমাদের মধ্য হইতে অলস-সম্প্রদায় একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় এবং গৃহে গৃহে স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা হয়।

আয়ুর্ব্বেদের সংস্কার না সংহার ?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন, ভিষক্‌শাস্ত্রী

(১)

কিছু দিন যাবৎ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা, উন্নতি প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচনা চলিতেছে। দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে। মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটী আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় গভর্ণমেণ্ট অদ্যাপি কোন সংকল্প প্রকাশ না করিলেও কলিকাতা কর্পোরেশন মহানগরীতে একটী আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহা আনন্দের কথা সন্দেহ নাই।

কিন্তু অমিশ্র আনন্দ বিধাতা আমাদের কপালে লিখেন নাই। আয়ুর্ব্বেদাকাশ এই নব দিবসের প্রথম কিরণচ্ছটায় আলোকিত হইতে না হইতেই, আশঙ্কার করাল জলদমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার প্রণালী লইয়া বিষম মতবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। মান্দ্রাজস্থ গভর্ণমেণ্ট আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস মূর্ত্তি মহাশয় ইতোমধ্যেই (আয়ুর্ব্বেদ কন্‌ফারেন্সে) মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সমূহের সংস্কার করিয়া (বা করাইয়া) পঠনপাঠনাদি প্রচলন করা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস মূর্ত্তি মহোদয়ের আয়ুর্ব্বেদে কতদূর অধিকার, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে তাঁহার কাপ্তেন উপাধি পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষার নিদর্শন—স্বীকার করিতেছি। বর্ত্তমানে আমরা কাপ্তেন মহাশয়ের মত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না; কারণ, তাঁহার সম্পূর্ণ বক্তৃতা পড়ি নাই, বা উচ্চ মন্তব্যের সমর্থনসূচক সমর্থিনী যুক্তি জানিতে পারি নাই। বিশেষতঃ, কাপ্তেন মহোদয় উক্ত মতের প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন। সুতরাং এই মতের আলোচনা করিতে হইলে মূল প্রবর্ত্তকগণের অনুসরণ আবশ্যক।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে আয়ুর্ব্বেদালোচনার সূত্রপাত শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিতগণের কীর্ত্তি। তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার ওয়াইজকে অগ্রণী বলা যাইতে পারে। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসমূহ বহু পরিমাণে ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ এবং পুনঃ সংস্কার-সাপেক্ষ এই অভিনব মতের প্রবর্ত্তন ডাঃ ওয়াইজ না করিলেও, ইহার সূচনা বা ইঙ্গিত তিনিই তৎকৃত গ্রন্থে (Commentary on Hindu Medicine) করিয়া

যান। এই মতের প্রকৃত বীজ-বপন কর্ত্তা ডাক্তার রাডলফ্ হোর্ণলে, এম্ এ, পিএইচ-ডি, সি-আই ই। ইনি বর্ত্তমানে সুপ্রসিদ্ধ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক এবং বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত। তাঁহার ডাক্তার উপাধি পাণ্ডিত্যসূচক, চিকিৎসাশাস্ত্রের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। এই সাহেব পণ্ডিত মহোদয় কোন্ উদ্দেশ্যে আয়ুর্ব্বেদালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি তৎকৃত গ্রন্থে (Studies in the Ancient System of Hindu Medicine Vol. I, Osteology)—চরকাদি অন্য কোন আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতাকারই শারীরতত্ত্ব জানিতেন না বা বুঝিতেন না, সুশ্রুত কিঞ্চিন্মাত্র বুঝিতেন বটে কিন্তু তাহাও অসম্পূর্ণ এবং ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ, বিশেষতঃ, শরীরের বহির্ভাগ ব্যতীত অভ্যন্তরের বৃত্তান্ত সুশ্রুতও অবগত ছিলেন না—ইত্যাদি মহামূল্য তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। স্বীয় প্রতিভা বলে চরক সুশ্রুতের অভিনব অর্থোদ্ধার বা ব্যাখ্যা করিয়া সেই ব্যাখ্যার সহিত খ্যাতনামা পাশ্চাত্য-শারীরবিদ্যাবিদ্ ডাক্তার টমসন সাহেবের সাহায্যে পাশ্চাত্য-শারীরবিদ্যার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া, ডাক্তার হোর্ণলে এতাদৃশ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; এবং তিনি যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার দেশীয় শিষ্যগণ তাহা সযত্নে অঙ্কুরিত এবং পুষ্পিত করিয়া তুলিয়াছেন। [১] মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম্-এ, এল্-এম্-এস (ইত্যাদি) কৃত 'প্রত্যক্ষ শারীরম্' 'সিদ্ধান্ত নিদানম্' প্রভৃতি গ্রন্থ সেই বীজোৎপন্ন মহাবৃক্ষের ফল।

বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার্থিগণকে প্রাচীন চরক সুশ্রুতাদির পরিবর্ত্তে এই সকল এবং এতজ্জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থ সাহায্যে কৃতবিদ্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রাচীন সম্প্রদায় অবশ্য নব্য সম্প্রদায়ের এই অভিনব মতের বিরোধী এবং তজ্জন্যই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। এই মত বিরোধের মীমাংসা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে উল্লিখিত প্রত্যক্ষ শারীরাদি গ্রন্থের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। সূত্রধার ডাঃ হোর্ণলের গ্রন্থ ত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ শারীরাদি গ্রন্থ আলোচনা করিবার কারণ (১) হোর্ণলে সাহেব ডাক্তার বা কবিরাজ দুইয়ের কোনটাই নহেন; সুতরাং তাঁহার মত সাধারণ বৈষয়িকের (Layman) মত বলিয়া অনেকে উপেক্ষা করিতে পারেন; (২) তাঁহার গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় লিখিত এবং আয়ুর্ব্বেদবিদ্যার্থিগণের পাঠ্য বিষয়ীভূত নহে; (৩) প্রত্যক্ষ শারীর গ্রন্থে হোর্ণলে সাহেবের বহু মতই গৃহীত হইয়াছে, এবং এই গ্রন্থ হোর্ণলে সাহেবের অনুমোদিত এবং উচ্চ প্রশংসাপ্রাপ্ত। (৪) বর্ত্তমানে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ-সংস্কার-প্রয়াসী বা তদুদ্দেশ্যে গ্রন্থ লিখিতেছেন, তাঁহাদের ইহা আদর্শ বা অবলম্বন স্বরূপ। অতএব প্রথমে আমরা "প্রত্যক্ষ শারীরম" নামক গ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আলোচনার পূর্ব্বে দুইটী কথা বলা আবশ্যক। প্রথম কথা এই, আমরা ব্যক্তিগত ভাবে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথের বিদ্বেষী নহি বরং কবিরাজ মহাশয়ের মত আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিই কামনা করি এবং এই প্রত্যক্ষ শারীর গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও আমরা তাঁহার সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন। কবিরাজ মহাশয়ের মত আমরাও আয়ুর্ব্বেদবিদ্যার্থিগণকে শারীরতত্ত্ব শিক্ষাদানের একান্ত পক্ষপাতী। কেবল তাহাই নহে, আমাদের দৃঢ় ধারণা, যে সকল কারণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি ঘটিয়াছে, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শল্য (Surgery and Midwifery) শালাক্য (Diseases of Ear, Nose, Throat etc.) প্রভৃতি অঙ্গের চর্চ্চা লুপ্ত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদের শারীরাংশের দুর্ব্বোধ্যতা বা অবোধ্যতা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। যেমন সর্ব্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা তত্তৎ ভাষার ব্যাকরণ-শিক্ষা-সাপেক্ষ, সেইরূপ সর্ব্বদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র শারীর প্রকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল চিকিৎসাশাস্ত্র নহে, যাবতীয় শাস্ত্রেরই কতকগুলি নিজস্ব পরিভাষা আছে, সেই সকল সংজ্ঞা বা পরিভাষার সম্যক্ তাৎপর্য্য বোধ না হইলে, তত্তৎ শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ অসম্ভব। যে সকল সংজ্ঞা বা পরিভাষা-বাহুল্যে আয়ুর্ব্বেদ-গহন কণ্টকিত, তাহাদের মূল আয়ুর্ব্বেদের শারীর-প্রকরণেই প্রচ্ছন্ন এবং সেই সংজ্ঞা-প্রতিপাদ্য পদার্থের যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদের অন্যান্য অঙ্গের কথা দূরে থাকুক, কায় চিকিৎসা অঙ্গেও (Medicine) সম্যগ্ ব্যুৎপত্তি জন্মিতে পারে না; কেন না নিদান, সম্প্রাপ্তি (Etiology and Pathology) লক্ষণ প্রভৃতি বিবরণ উক্ত সংজ্ঞাসমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। দ্বিতীয় কথা এই, আমরা গ্রন্থের ভাষা, ব্যাকরণাশুদ্ধি এবং ঐতিহাসিক বা দার্শনিক অংশের কোন আলোচনাই করিব না, কেবলমাত্র শারীরাংশেই আমাদের আলোচনা নিবদ্ধ থাকিবে।

(২)

'প্রত্যক্ষ শারীরম্' গ্রন্থের প্রারম্ভে দুইটী বিস্তৃত উপক্রমণিকা আছে। একটী ইংরাজী ভাষায়, অপরটী সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত উপক্রমণিকা (উপোদ্ঘাত) সমধিক বিস্তৃত। গ্রন্থকার এই দুইটী উপক্রমণিকার পর মূল গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের পর গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনাদি কতিপয় শ্লোকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী এই:—

"ধান্বন্তরীয় মত মাকুলতামুপেতং, যচ্ছংপুনর্বিদধতা মৃতকান্ পরীক্ষ্য।
অগ্রন্থি সম্প্রতি ময়া নবকো নিবন্ধো,বোদ্ধা প্রসন্ন যদি তং শিরসানমামি॥

অর্থাৎ ধন্বন্তরির মত বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে; মৃত (দেহ) পরীক্ষা (ব্যবচ্ছেদাদিসহকারে) করিয়া সেই মত পুনরায় নির্ম্মল করিতে আমি এই নূতন নিবন্ধ রচনা করিয়াছি, ইত্যাদি। গ্রন্থকার এ স্থলে মাত্র

[১] শ্রীযুক্ত চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃত Interpretation of Ancient Hindu Medicine নামক একখানা গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভ এই ভাবে করা হইয়াছে:—প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থকারগণের কাহারও শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বা যথার্থ জ্ঞান ছিল না; যাহা ছিল, তাহাও স্থূল এবং শরীরের বহির্ভাগ বিষয়ক—ইত্যাদি। মূল ইংরাজী উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের ভার বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক মনে করিলাম।

ধন্বন্তরির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি আত্রেয়, পুনর্ব্বসু, অগ্নিবেশ, চরক এমন কি সুশ্রুতের নামও উল্লেখ করেন নাই। আমরা পূর্ব্বে ডাঃ হোর্ণলের প্রকটিত যে অদ্ভুত তত্ত্বের কথা বলিয়াছি, ইহা তাহারই অনুবাদ। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, সুশ্রুত সংহিতাতে ধন্বন্তরির মতই নিবদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং স্বতন্ত্র ভাবে সুশ্রুতের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন এবং চরক-সংহিতাপেক্ষা সুশ্রুতেই শারীর সমধিক বিস্তৃত, সেই জন্য চরকের কথা বলেন নাই। তাহার উত্তরে গ্রন্থকার-লিখিত ইংরাজী উপক্রমণিকা (Introduction) হইতে কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি:— "Thus the so called Anatomy of all extant Ayurvedic texts including the summaries called Charaka and Sushruta Sanhita bristles, as a matter of fact, with omissions, interpolations and inaccuracies of ages and is neither Systematic nor descriptive" (P. 12) এই ইংরাজী রচনার পার্শ্বে গ্রন্থকার দুইটী টিপ্পনী (Marginal notes) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। The original works on Anatomy lost. Fanciful Anatomy took its place। উদ্ধৃত অংশের অর্থ এই: চরক এবং সুশ্রুত সংহিতা নামক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থদ্বয় লইয়া প্রচলিত যাবতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাবলীতে যে তথাকথিত শারীর (শরীর বিবরণ বা শরীর বিজ্ঞান) পাওয়া যায় তাহা প্রকৃতপক্ষে স্খলন (চ্যুতি) প্রক্ষিপ্ততা এবং কালোচিত ভ্রান্তি সমূহে কণ্টকিত এবং সুশৃঙ্খলাবদ্ধও নহে, (বিশদ) বিবরণাত্মকও নহে। পার্শ্ব-টিপ্পনী দুইটীর অর্থঃ—শারীর সম্বন্ধীয় মূলগ্রন্থ সমূহ লুপ্ত হইয়াছে; তৎপরিবর্ত্তে কল্পনাবিজৃম্ভিত শারীরের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য্য অনায়াসেই গ্রহণ করা যায় যে, ধন্বন্তরির প্রকৃত মত প্রচলিত সুশ্রুত [২] গ্রন্থে বিকৃতরূপে প্রচারিত হইতেছে; তাহার নির্ম্মলতা সম্পাদনই প্রত্যক্ষ শারীরকারের উদ্দেশ্য। এক্ষণে গ্রন্থকার কি ভাবে এই মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন দেখা যাউক।

উপোদ্‌ঘাতের (সংস্কৃত উপক্রমণিকার) ৭৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "ইদানীং শারীর প্রতিসংস্কারঃ ষোঢ়া সংবিধাতব্যঃ"; অর্থাৎ বর্ত্তমানে শারীরের প্রতিসংস্কার ছয় প্রকারে করিতে হইবে—এই বলিয়া ছয়টী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পঞ্চম উপায় "প্রত্যক্ষানুগত্যা প্রামাদিক পাঠ সংশোধনেন" প্রত্যক্ষের অনুগামী হইয়া প্রামাদিক পাঠ সংশোধন করিতে হইবে। আমরা সর্ব্বপ্রথমে এই পঞ্চম উপায়ের আলোচনা করিব। কারণ পরে পরিস্ফুট হইবে। গ্রন্থকার স্বয়ং উপোদ্‌ঘাতে এবং মূলে এইরূপ কতিপয় পাঠ সংশোধন করিয়াছেন। উপোদ্‌ঘাতের ৬৭—৬৮ পৃষ্ঠায় প্রথম পাঠ সংশোধন প্রণালী এই ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন:—

"ফুস্‌ফুস পরিচয়শ্চ সুশ্রুতে নৈব লভ্যতে, নবা কচিত্তস্য শ্বাসযন্ত্র মিত্যভিধানম্। শার্ঙ্গধরেতু দৃশ্যতে—"উদানবায়োরাধারঃ ফুস্‌ফুস প্রোচ্যতে বুধৈ"রিতি। নচ "শোণিতফেণ প্রভবঃ ফুস্‌ফুস" ইত্যনেন ফুস্‌ফুসস্য স্বরূপজ্ঞানং সম্ভবতি। তৎস্বরূপাববোধস্ত্বাপি কথঞ্চিৎ গতানুগতিক প্রতেবেব।

এবঞ্চ ক্লোমপদার্থ ব্যাকুলীভাবোঽপি স্ফুটএব। তথাহি কেচিৎ দামাশয় পশ্চাদ্বর্ত্তিনি অগ্ন্যাশয়াখ্যেযন্ত্রে১ [১ গ্রন্থপাদটীপ্পনী Pancreas] ক্লোমপদং প্রযুঞ্জতে সাম্প্রতিকাঃ; তৎপ্রামাদিকম্। যতঃ "শুষ্কক্লোম গলাননঃ"—ইত্যাদি প্রয়োগদর্শনাৎ (সু°উ°তন্ত্রে ৪১ অ°), ক্লোম্ন পিপাসাস্থানত্বেন নির্দ্দেশাচ্চ গলসমীপবর্ত্তী কোঽপ্যবয়বঃ ক্লোমেতি শক্যমুন্নেতুম্। "ক্লোমস্যাদ্ গলনাড়িকা"ইতি দেবযাজ্ঞিক ভাষ্যদর্শনাৎ সুশ্রুতেন মণ্ডলাখ্যস্যাস্থিসন্ধেঃ ক্লোম্নি (সু°শ°৫অ°) দৃষ্টান্ত প্রদর্শনাচ্চ তরুণাস্থি চক্র পরিবেষ্টিতঃ শ্বাসপথ২ [২ গ্রন্থপাদটীপ্পনী ২ Trachea] এব কণ্ঠপুরঃস্থঃ ক্লোমেতি নিশ্চয়োঽস্মাকম্। শ্বাসপথশ্চায়ং ফুস্‌ফুসদ্বয়ে বিভক্ত ইতি উরোমধ্যতোঽপ্যস্য স্থানম্। যত্ত "হৃদয়স্যাধোবামতঃ প্লীহা ফুস্‌ফুসশ্চ [৩] দক্ষিণতো যকৃৎ ক্লোমচেতি সৌশ্রুতঃপাঠঃ, তত্র লিপিকর প্রমাদ এব দরীদৃশ্যতে। "হৃদয়স্যাধো বামতঃ প্লীহা দক্ষিণতো যকৃৎ উভয়তঃ ক্লোম ফুস্‌ফুসৌচে"তি তু সাধীয়ান্ পাঠঃ।

উদ্ধৃত অংশের অর্থ এই:—ফুস্‌ফুসের পরিচয়ও সুশ্রুতে পাওয়া যায় না, কিংবা কোথাও ইহা শ্বাসযন্ত্র এইরূপ কথিত হয় নাই শার্ঙ্গধরে কিন্তু দেখা যায় "পণ্ডিতগণ ফুস্‌ফুসকে উদান বায়ুর আধার বলিয়াছেন" "ফুস্‌ফুস শোণিতফেণ প্রভব" [৪] ইহা দ্বারাও স্বরূপজ্ঞান সম্ভব নহে। ইহার (ফুস্‌ফুসের) স্বরূপজ্ঞান অদ্যাবধি পূর্ব্বাপর যেরূপ শুনা যাইতেছে, তদনুসারেই কোন প্রকারে চলিতেছে (বা করিতে হইবে?) এইরূপ ক্লোমপদের অর্থ লইয়াও বেশ গোলযোগ (আছে) তাহার উদাহরণ আধুনিক কেহ কেহ আমাশয়ের পশ্চাতে অবস্থিত অগ্ন্যাশয় নামক যন্ত্র (গ্রন্থকারকৃত পাদটীপ্পনী Pancreas) ক্লোম পদের অর্থ বলিয়াছেন। তাহা প্রামাদিক, কেননা "ক্লোম গলা ও মুখ শুষ্ক হয়" এইরূপ বচন দেখা যায় (সুশ্রুতে) এবং ক্লোম পিপাসার স্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা গলার নিকটস্থিত কোন অবয়ব ক্লোম এইরূপ উদ্ধার (অর্থোদ্ধার) করা যায়। দেবযাজ্ঞিক ভাষ্যে দেখা যায় "ক্লোমের অর্থ গলনাড়ী"। সুশ্রুতও মণ্ডলনামক অস্থি সন্ধির উদাহরণ ক্লোমে প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব চক্রাকার তরুণাস্থি দ্বারা বেষ্টিত কণ্ঠসম্মুখস্থ (?) শ্বাসপথই (গ্রন্থকার কৃত পাদটিপ্পনী Trachea) ক্লোম আমরা (এই) নির্ণয় করিয়াছি। এই শ্বাসপথ দুইটী ফুস্‌ফুসে বিভক্ত হইয়াছে বলিয়া বক্ষোঽভ্যন্তরেও অবস্থিত। "হৃদয়ের নিম্নে বামদিকে প্লীহা ও ফুস্‌ফুস, দক্ষিণদিকে যকৃৎ ও ক্লোম (অবস্থিত)"

[২] গ্রন্থকার বিলাপ করিয়াছেন "শারীরে সুশ্রুতো নষ্টঃ"—উপোদ্‌ঘাত ৬০ পৃঃ

[৩] প্রচলিত মুদ্রিত গ্রন্থে ফুপ্‌ফুসঃ এই পাঠ দৃষ্ট হয়। কচিৎ ফুস্‌ফুসঃ এই পাঠ পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ শারীরে সর্ব্বত্রই ফুস্‌ফুস পঠিত হইয়াছে।

[৪] ব্যাখ্যা দিলাম না কারণ পাঠক স্বয়ংই পরে বুঝিবেন। এই পঙ্‌ক্তি সুশ্রুতের।

[৫] সুশ্রুতে এই যে পাঠ (দেখা যায়) তাহাতে লিপিকর প্রমাদই পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হইতেছে "হৃদয়ের নিম্নে বামদিকে প্লীহা দক্ষিণদিকে যকৃৎ দুইদিকে ক্লোম এবং দুইটী ফুস্‌ফুস (অবস্থিত)" ইহাই সুসঙ্গত পাঠ।

প্রত্যক্ষশারীরকার মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয় সুশ্রুতের একটী পঙ্‌ক্তিতে পাঁচটী ভুলের সংশোধনোদ্দেশ্যে পূর্ব্বোদ্ধৃত সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। ভুলগুলির মধ্যে ফুস্‌ফুস সম্বন্ধীয় ভুল তিনটী—(১) ফুস্‌ফুসের একবচন (২) বামতঃ (৩) এবং অধঃ—ক্লোম ঘটিত ভুল দুইটী (৪) দক্ষিণতঃ (৫) এবং অধঃ। আমরা যথাক্রমে এইগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। প্রথমতঃ ফুস্‌ফুসের রহস্য দেখা যাউক।

সুশ্রুত সংহিতার প্রচলিত (পূর্ব্বোদ্ধৃত) পাঠে ফুপ্‌ফুস বা ফুস্‌ফুস পদটী একবচনান্তরূপে পঠিত হইয়াছে; কিন্তু কেবল এস্থলে নহে সর্ব্বত্রই এইরূপ একবচনান্ত পাঠ দৃষ্ট হয়, এবং অন্য কোন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থেই একবচনান্ত ব্যতীত দ্বিবচনান্ত পাঠ দৃষ্ট হয় না। ইংরাজী শারীর গ্রন্থের যাঁহারা বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইংরাজী Lungs অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহক যন্ত্রদ্বয়ের প্রতিশব্দরূপে ফুস্‌ফুস এই সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ শারীরের মূলে (১০ পৃঃ) ও "উরোগুহায়াং ফুস্‌ফুস দ্বয়ম্"...অর্থাৎ বক্ষোগহ্বরে দুইটী ফুস্‌ফুস... এবং পাদটিপ্পনীতে ফুস্‌ফুসের ইংরাজী নাম Lungs এইরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু Lungs একটী নহে দুইটী, তাহাদের অবস্থানও সুশ্রুতের বিবরণানুযায়ী হৃদয়ের নিম্নে বা এক (বাম) পার্শ্বে নহে, দুই দিকে; সুতরাং Lungsএর সহিত সুশ্রুতোক্ত বর্ণনার কোন সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে না; তথাপি পাঠ-প্রমাদের সংশোধনের নিমিত্ত মহামহোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করিয়াছেন :—

(১) সুশ্রুতে কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না, অথবা ইহা শ্বাসযন্ত্র, এরূপ উক্তিও কোথাও নাই। আমরা ইহার সহিত আর একটী যুক্তিরও উল্লেখ করিতে পারি যে ফুস্‌ফুস আক্রান্ত হইলে শ্বাস কাসাদি পীড়া হয় এমন কথাও কুত্রাপি নাই।

(২) ফুস্‌ফুস শোণিতফেণ প্রভব এই উক্তি (সুশ্রুতের) দ্বারা ফুস্‌ফুসের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। এই সুশ্রুতোক্তি দ্বারা মহামহোপাধ্যায় মহাশয় কি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই।

(৩) শার্ঙ্গধরের বচন—গ্রন্থকার ইহার তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করেন নাই। উদান নামক বায়ু সামান্যতঃ কণ্ঠদেশে অবস্থিত। শার্ঙ্গধর টীকাকার আঢমল্ল কণ্ঠদেশস্থ উদান বায়ুর আধার ফুস্‌ফুস [৬] এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং এতদ্দারা কি পরিচয় পাওয়া যায় বুঝা যায় না, এইমাত্র বলা চলে।

[৫] প্রচলিত বঙ্গানুবাদ।

[৬] শার্ঙ্গধর স্বয়ং "উদানঃকণ্ঠদেশস্থঃ" (পূঃ৭০৫অং) এইরূপ বলিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও আমরা গ্রন্থকারকে স্মরণ করাইয়া দিই যে, তিনি স্বয়ং উপোদ্ঘাতের ৬১ পৃষ্ঠায় শার্ঙ্গধরের যে শ্লোকটী ("নাভিস্থঃ প্রাণপবনঃ"—ইত্যাদি) উদ্ধৃত করিয়া শ্বাসক্রিয়ায় অক্সিজেন বায়ুর গ্রহণরূপ অন্যত্র দুর্লভ বিষয় বর্ণনার জন্য শার্ঙ্গধরকে অভিনন্দিত করিয়াছেন, সেই শ্লোকেও ফুস্‌ফুসের কোনই উল্লেখ নাই; তৎপরিবর্ত্তে 'নাভি' শব্দই দেখা যায়; এবং গ্রন্থকারও এই জন্য উক্ত সন্দর্ভের পাদটিপ্পনীতে শবচ্ছেদাভাবজনিত শার্ঙ্গধরের ভ্রান্তির কথা বলিয়াছেন।

(৪) পূর্ব্বাপর যেরূপ শুনিয়া আসিতেছেন তদনুযায়ী চলিয়াছেন।

এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে গ্রন্থকার সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ বা চিরপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়া এমন কি দোষ করিয়াছেন? ইংরাজী শারীরানুবাদকগণও কি এই ব্যাখ্যা কল্পনা করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক এবং অপ্রাসঙ্গিক হইলেও নিরপেক্ষ পাঠক মহোদয়গণের সন্তোষবিধানের জন্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

(০) ইংরাজী শারীরের অনুবাদকগণের কল্পনা শক্তির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহাদের Nerve অর্থে স্নায়ু শব্দ প্রয়োগের প্রতিবাদ স্বয়ং প্রত্যক্ষ শারীরকারই এই গ্রন্থে করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা স্বীকার করিয়া লইতেছি যে, অন্যত্র যাহাই হউক ফুস্‌ফুসের এই অর্থ তাঁহাদের আবিষ্কৃত নহে। গতানুগতিক অর্থাৎ পূর্ব্বাপর শ্রুতির মূল মহামহোপাধ্যায় মহাশয় নির্দ্দেশ না করিলেও আমরা করিতেছি :—

(০০) এই ব্যাখ্যার প্রথম উদ্ভাবক বা প্রবর্ত্তক সম্ভবতঃ সুশ্রুতের প্রাচীন টীকাকার ডল্লন। তিনি লিখিয়াছেন "ফুপ্‌ফুসঃ হৃদয়নাড়িকা মগ্নঃ স্বনামখ্যাতঃ।" ডল্লন অবশ্য সুশ্রুতের পঙ্‌ক্তিতে কোন পাঠ পরিবর্ত্তন করেন নাই।

(০০০) কিন্তু ডল্লন ঐরূপ লিখিয়াছেন বলিয়াই যে এই ব্যাখ্যা চিরপ্রচলিত বা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ তাহা বলা চলে না। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ে কিঞ্চিৎ শরীর বিবরণ আছে। সে স্থলে "প্লীহাবহননম্.." এই সংজ্ঞা দুইটীর ব্যাখ্যায় 'সুপ্রসিদ্ধ মিতাক্ষরা নামক টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন "প্লীহা আয়ুর্ব্বেদ প্রসিদ্ধঃ অবহননং ফুপ্‌ফুসঃ তৌচ মাংসখণ্ডকারৌ [৭] সব্যকুক্ষিস্থিতৌ" [৮]। অর্থাৎ প্লীহা এবং ফুস্‌ফুস (উভয়েই) বাম উদরে অবস্থিত। অবশ্য মিতাক্ষরাকার আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বা আয়ুর্ব্বেদ ব্যাখ্যায় তাঁহার উক্তিই প্রামাণিক এমন কথা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। বিষ্ণুসংহিতোক্ত শরীর বিবরণের ব্যাখ্যায় টীকাকার নন্দ পণ্ডিতও মিতাক্ষরাকারের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। প্রমাণান্তরের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয়,

(১) সুশ্রুতে ফুস্‌ফুসের পরিচয় বা স্বরূপ বিবরণ নাই

(২) অস্পষ্টশার্ঙ্গধরোক্তি—এবং

[৭] ইহার স্থলে "মাংসপিণ্ডাকারৌ" এই পাঠও দৃষ্ট হয়

[৮] "স্থিতৌ" স্থলে "শ্রিতৌ" এই পাঠও দৃষ্ট হয়।

(৩) পূর্ব্বাপর শ্রুতি ("গতানুগতিক")

এই ত্রিবিধ উপকরণ বা প্রমাণের সাহায্যে সুশ্রুতের গ্রীবাভঙ্গে ... হইয়াছেন। ইহাই "প্রত্যক্ষের অনুগামী হইয়া প্রামাদিক পাঠ শোধনের" অথবা "শারীর প্রতি সংস্কারের" আদর্শ কি না, পাঠক ... দিগকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিব না, তাঁহাদিগকে কেবল জিজ্ঞাসা করিব, ধন্বন্তরির বিকৃত মত স্বচ্ছ হইতেছে ত?

অতঃপর ক্লোমের কথার আলোচনা করিব। গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ, ক্লোম সম্বন্ধে যে গোলযোগ আছে তাহা স্বীকার করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ, যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক আধুনিক একটী মত খণ্ডন করিয়াছেন; তৃতীয়তঃ, প্রমাণান্তর সহযোগে স্বয়ং নূতন অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন; চতুর্থতঃ, তাঁহার এই নূতন আবিষ্কার প্রতিষ্ঠার জন্য সুশ্রুতের পাঠ সংশোধন করিয়াছেন।

ক্লোম বলিতে যাঁহারা Pancreas বা মহামহোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত-নামাঙ্কিত (অগ্ন্যাশয়) যন্ত্র বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হয় নাই। আমরা অন্ততঃ একজনের নামোল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। খ্যাতনামা কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তৎকৃত "সুশ্রুতার্থ সন্দীপন ভাষ্য" নামক সুশ্রুত-সংহিতার নবীন টীকাগ্রন্থে এই ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রত্যক্ষ শারীর গ্রন্থকারের খণ্ডনাদি পর্য্যালোচনা করা যাউক।

১ম যুক্তি—সুশ্রুতের বচনাংশ "শুষ্ক ক্লোম"। এই বচনাংশটী সুশ্রুতের শোষ (যক্ষ্মা) প্রতিষেধাধ্যায়ের। উক্ত অধ্যায়ে রাজযক্ষ্মার কারণ লক্ষণাদি বর্ণনার পর শোক, পথ ভ্রমণ (অতিরিক্ত) প্রভৃতি কতিপয় কারণে যে (ক্ষুদ্র বা মৃদু প্রকারের) ক্ষয় হয়, তাহারই লক্ষণ উক্ত বচনে কথিত হইয়াছে। অতিরিক্ত-পথ-ভ্রমণ-জনিত ক্ষয়ে ক্লোম গলা মুখ শুষ্ক হয়, ইহাই উক্ত বচনাংশের তাৎপর্য্য। কবিরাজ মহাশয়ের মতে কি অতিরিক্ত পথ ভ্রমণে Trachea অর্থাৎ ক্লোম শুষ্ক হয়? ইহা কি তাঁহার প্রত্যক্ষ পরীক্ষালব্ধ, না ইহার অন্য প্রমাণ আছে? যদি বলা যায় যে, সর্ব্বশরীরেরই (সুতরাং Tracheaরও) আর্দ্রত্ব অর্থাৎ স্বাভাবিক শ্লেষ্মাদিস্রাব কমিয়া যায়, তাহা হইলে কেবল Pancreas কি অপরাধ করিল, অথবা সুশ্রুত Tracheaর উর্দ্ধদেশস্থ কণ্ঠ (নাড়ী) কে বঞ্চিত করিয়া Tracheaর প্রতি পক্ষপাত করিলেন কেন, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

(২য় যুক্তি) "ক্লোম পিপাসাস্থান" ইহার প্রমাণভূত কোন গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ সুশ্রুত বা চরক সংহিতায় (মূলে) কুত্রাপি এমন কথা নাই। ইহা চক্রপাণি, শার্ঙ্গধর প্রভৃতি টীকাকার ও সংগ্রহকারগণের উক্তি।

কিন্তু মহামহোপাধ্যায় গ্রন্থকার ত এই সকল প্রাচীন নিবন্ধকারগণের মস্তকে "জীর্ণবলভ্যামেব হত্র দৃশ্যন্তে ভূতবেতালানিবসন্তঃ" ! [*] অর্থাৎ ভাঙ্গা বাড়ীতেই ভূত-বেতালের বাস দেখা যায়, ইত্যাদি পুষ্পচন্দন বৃষ্টি করিয়াছেন, এখন কি তাঁহাদের উক্তিই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলেন? "প্রয়োজনাপেক্ষিতয়া প্রভুনাম্"—? (প্রভুগণ প্রয়োজন বশতই—?) ভাল কথা। Pancreasটী পিপাসার স্থান হইতে পারে কি না, সে কথা শ্রীযুক্ত কবিরাজ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির বিচার্য্য, আমাদের নহে। কিন্তু Trachea যে পিপাসার স্থান, এ তত্ত্বসুধা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্ বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত গ্রন্থকার প্রাচ্য অথবা প্রতীচ্য কোন শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনের ফলে লাভ করিয়াছেন, জানিতে পারি না কি? পাঠক ডাক্তার মহাশয়গণের নিকটও আমরা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভের ভরসা রাখি। (৩য় যুক্তি) "ক্লোমের অর্থ গলনাড়ী" এই দেবযাজ্ঞিক ভাষ্য। গ্রন্থকার ইংরাজী উপক্রমণিকায় (Introduction-p. 15) ক্লোমের অর্থ নির্ণয় তাঁহার বৈদিক গ্রন্থালোচনালব্ধ আবিষ্কার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

আমরা এস্থলে সরলভাবে অজ্ঞতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি; কেন না এই ভাষ্যকার কে এবং ইহা কোন্ গ্রন্থের ভাষ্য—গ্রন্থকার সে বিষয়ে আমাদিগকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখিয়াছেন। এক দেবরাজযজ্বা যাস্ককৃত নিরুক্ত নামক বৈদিক নিঘণ্টু (অভিধান) র ভাষ্যকার। উক্ত ভাষ্য আমরা ভালরূপ অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। প্রয়োজনও অনুভব করি নাই। তাহার এক কারণ, উক্ত দেবরাজ যজ্বার পৌত্র দুর্গাচার্য্য তৎকৃত উল্লিখিত যাস্কনিরুক্তের উত্তর ষট্‌কের টীকায় বাগ্‌ভট হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং এই দেবরাজযজ্বা অন্ততঃ বাগ্‌ভটের সমসাময়িক। তৎকৃত ভাষ্য বৈদিক গ্রন্থপদবাচ্য কি না, বা "ক্লোম গলনাড়ী" প্রমাণান্তরশূন্য এই উক্তি তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সুশ্রুতের (বা তৎপ্রতিসংস্কর্ত্তার) বচন ব্যাখ্যায় কতদূর প্রামাণিক অথবা তদনুরোধেই ক্লোম সম্বন্ধীয় আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিবরণ উন্মূলিত করা কর্ত্তব্য কি না, সে বিষয়ে আমরা সন্দিহান। সুতরাং এ বিষয়ে আর কিছু বলিব না। কেবল একটা কথা বলিব। প্রত্যক্ষ শারীরকারের এই অর্থাবিষ্কারের বহুকাল পূর্ব্বে বিশ্রুতকীর্ত্তি স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় তৎকৃত চরকের "জল্পকল্পতরু" টীকায় লিখিয়াছিলেন, "ক্লোম কণ্ঠোরসোঃ সন্ধৌ" (চঃ বিমা) অর্থাৎ ক্লোম কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধিতে (অবস্থিত)।

(৪র্থ যুক্তি) "সুশ্রুত মণ্ডল নামক অস্থি সন্ধির উদাহরণ ক্লোমে দেখাইয়াছেন" গ্রন্থকার এস্থলে সুশ্রুতের পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করেন নাই; আমরা করিতে বাধ্য হইলাম। "কণ্ঠহৃদয়নেত্র ক্লোমনাড়ীষু মণ্ডলাঃ" এই বচন দ্বারা কেবল প্রত্যক্ষ শারীরকারের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতেছে না, যাঁহারা ক্লোম বলিতে Pancreas গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতও চূর্ণ হইয়াছে। আমরা অনুবাদ দিলাম না; কিন্তু পাঠক মহাশয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক মনোযোগ করিলেই বুঝিতে পারিবেন—উদ্ধৃত পাঠে মহামহোপাধ্যায় মহাশয় "ক্লোমনাড়ী"—যথাশ্রুতার্থেই গ্রহণ করিয়াছেন; কেন না তিনি দেবযাজ্ঞিক ভাষ্যে দেখিয়াছেন, "ক্লোম অর্থে গলনাড়ী"। আর শ্বাসপথ বা Trachea ত বাংলায় এতাবৎকাল শ্বাসনাড়ী নামেই প্রসিদ্ধ।

---

[*] উপোদ্ঘাত ৬০ পৃষ্ঠা—বিস্ময়চিহ্ন (!) টী আমাদের দত্ত নহে।

"সুশ্রুতার্থ সন্দীপন ভাষ্য"কার কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তৎকৃত উক্ত টীকায় ক্লোম Pancreas এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভের অন্য সদুপায় না পাইয়া উল্লিখিত সুশ্রুতোক্ত সমগ্র পঙ্ক্তিই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিয়া নিষ্কণ্টক হইয়াছেন। তৎপ্রদত্ত যুক্তি এই :—উক্ত পাঠে "ক্লোম" শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বেই "নেত্র" শব্দ আছে ; সুতরাং কেবল "ক্লোম-নাড়ী" নহে "নেত্রনাড়ী"ও এই পাঠের উদ্দিষ্ট ; কিন্তু নেত্রনাড়ীতেও মণ্ডল নামক অস্থিসন্ধি আছে ইহা নিতান্তই প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ। মহামহোপাধ্যায় মহাশয় অবশ্য চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই যুক্তি খণ্ডনের প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার তুল্য পথযাত্রী (উভয়েই যেন তেন প্রকারেণ আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন পাঠ উন্মূলনে প্রবৃত্ত) বলিয়া অথবা অন্য কারণে [১০] তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না। আমরা কেবল পাঠক মহাশয়গণকে সেই বাংলা প্রবাদ বাক্যটী স্মরণ করাইয়া দিয়াই এ ক্ষেত্রে নিবৃত্ত হইব :—

"ছিল ঢেঁকি হল তুল, কাট্‌তে কাট্‌তে নির্ম্মূল।"

গ্রন্থকার তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে প্রমাণ চতুষ্টয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা সেইগুলি আলোচনা করিলাম ; কিন্তু সম্পূর্ণ সংশয় নিবৃত্তি হইল না। কারণ :—

(•) চতুর্থ প্রমাণভূত যে সুশ্রুত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আর একটী পঙ্ক্তি দৃষ্ট হয় :—"নাড়ীষু হৃদয় ক্লোম নিবদ্ধাসু অষ্টাদশ" (সু• শা• ৫অ•) অর্থাৎ হৃদয় ও ক্লোম নিবদ্ধ নাড়ী সমূহে আঠারটী (অস্থি) সন্ধি আছে [১১]। সুশ্রুতে এই সন্ধি গ্রীবা ও তদূর্দ্ধগতসন্ধি কথন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। ক্লোম অর্থে ত Trachea বুঝিলাম। এখন Trachea নিবদ্ধ কোন্ নাড়ী (বা নাড়ী সমূহে)তে ১৮টী সন্ধি পাইব, তাহা ত গ্রন্থকার মহাশয় বলিয়া দিলেন না। ইংরাজী শারীর গ্রন্থে Tracheaটী ১৮—২ টী চক্রাকার তরুণাস্থিসমূহে নির্ম্মিত, এইরূপ লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলে এই পাঠও কি প্রামাদিক এবং সংশোধন-সাপেক্ষ ?

(• •) চরক সংহিতা [১২] এবং সুশ্রুত সংহিতা এই উভয় গ্রন্থেই কথিত হইয়াছে : তালু এবং ক্লোম উদকবহ স্রোতের মূল (চ: বিমা: ৫অ:—সু• শা• ৯ অ•)। এই উদকবহ স্রোত কি এবং ক্লোম বা Tracheaতে এই লক্ষণ কিরূপে সংলগ্ন হয়, সে সম্বন্ধেও গ্রন্থকার আমাদিগকে কোন উপদেশ দেন নাই। উক্ত বচনগুলিও কি প্রামাদিক বিবেচনা করিতে হইবে ?

(• • •) বৈদিক গ্রন্থ আলোচনা পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদের অর্থাবিষ্কার চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের সম্পূর্ণ আলোচনা কি তৎপক্ষে একান্তই নিষ্প্রয়োজন ?

(• • • •) প্রাচীন এবং আধুনিক অষ্টাদশ (বা তদধিক) জন গ্রন্থকার ক্লোম সম্বন্ধে তাঁহাদের মত লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে অন্যতম বর্ত্তমান কালের খ্যাতনামা দর্শনাচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় লিখিয়াছেন, ক্লোম (অর্থে) Gall Bladder (ইহা বাংলায় পিত্তকোষ বা পিত্তথলী নামে প্রচলিত [১৩]। প্রত্যক্ষ শারীরকার এই সকল মত সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, আমরা সমধিক নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিতাম।

আর একটী কথা বলিয়াই আমরা ক্লোম প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব।

কবিরাজ এবং ডাক্তার গ্রন্থকার মহাশয়ের এই সংস্কারের আলোকে কেবল প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ নহে, নবীন পাশ্চাত্য শারীরও বিলক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কেন না, তৎকৃত এই "নূতন" সুশ্রুতে ক্লোম অর্থাৎ Trachea হৃদয়ের দুই দিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভরসা করি, প্রত্যক্ষ জ্ঞান অথবা পাশ্চাত্য শারীর বিদ্যা আর নূতন গোল বাধাইবে না। ডাক্তার মহোদয়গণ অভয় দান করিলেই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থিগণ নিঃশঙ্ক চিত্তে এই নূতন বিদ্যার্জ্জনে ব্রতী হইতে পারে। [১৪]

দুইটী বিষয় জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহল হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ সংস্কারের মন্ত্রগুরু ডাঃ হোর্ণলে তৎকৃত গ্রন্থে এই Tracheaই আয়ুর্ব্বেদোক্ত "জত্রু" সংজ্ঞাবাচ্য—বিপুল গবেষণার (?) ফলে এইরূপ নির্ণয় করিয়াছিলেন ; মহামহোপাধ্যায় মহাশয় সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃশব্দ রহিয়া গেলেন কেন ? আর "প্রত্যক্ষ শারীরের" প্রশংসাপত্র দান কালে আচার্য্যের চিত্তেই বা তাঁহার ধনঞ্জয়তুল্য শিষ্য কৃত (তৎকৃত গবেষণার) এই শ্রদ্ধা-মৌন প্রতিবাদ দর্শনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল ?

পাঠক মহোদয়গণ কি বলেন ? ধন্বন্তরির বিকৃত মত অত্যন্ত নির্ম্মল হইতেছে কি না ? ভরসা করি, এরূপ জিজ্ঞাসার ফলে কেহ মনে করিবেন না যে আমি তাঁহাদিগকে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটী স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি :—

"দুর্ব্বোধ যা কিছু ছিল হয়ে গেল জল।
শূন্য আকাশের মত অত্যন্ত নির্ম্মল।"

গ্রন্থকার এই (পূর্ব্বোদ্ধৃত) সন্দর্ভের উপাদেয় উপসংহার

---

[১০] প্রত্যক্ষ শারীরের মূলে ১১পৃষ্ঠার পাদটিপ্পনীতে গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন "* * * অগ্ন্যাশয়ঃ—Pancreas সোঽয়ং ক্লোমেত্যপরে। তচ্চিন্ত্যম্, দৃশ্যতামুপোদ্ঘাতঃ।" অর্থাৎ অন্যে ইহাই (Pancreas) ক্লোম বলেন। তাহা চিন্তনীয় ইত্যাদি। ইহা হইতে এই মতটী অদ্যাপি তাঁহার বিবেচনাধীন কি না বুঝিলাম না।

[১১] প্রচলিত বঙ্গানুবাদ।

[১২] চরকের উল্লেখ ভয়ে ভয়ে করিলাম ; কেন না, গ্রন্থকার ধন্বন্তরির বিকৃত মত স্বচ্ছ করিবেন, চরকের সহিত সম্বন্ধ কি ?

[১৩] History of Hindu Chemistry—By Sir P. C. Ray—Vol. II, Mechanical, Physical, Chemical theories of the Hindus, By Dr. B. N. Seal.

[১৪] বলা আবশ্যক, দ্বিতীয় (আধুনিকতম) সংস্করণ হইতেই এই সমস্ত উদ্ধৃত হইয়াছে।

করিয়াছেন। আমরা যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারি নাই, তজ্জন্য পাঠক মহাশয়গণের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। "অন্যথা ন কনাপি কথমপি শক্যং সমাধাতুন্" (উপোদ্ঘাত ৬৮ পৃঃ) অর্থাৎ অন্যথা (অর্থাৎ সুশ্রুতের পাঠ এই ভাবে সংশোধন না করিলে) কেহই কোনরূপেই মীমাংসা করিতে সমর্থ হইবেন না। আমরা ইহার উপর আর কি বলিব? মহামহোপাধ্যায় মহাশয় কি মহাকবি ভবভূতির সেই "কালো'হ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী" (—কাল অনন্ত এবং পৃথিবীও বিশাল) উক্তি বিস্মৃত হইয়াছেন? না উহাও প্রামাদিক বিবেচনা করেন?

আমরা "প্রত্যক্ষ শারীরের" "উপোদ্ঘাতো"ক্ত প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের প্রথম পাঠ সংস্কারের পরিচয় পাইলাম। অতঃপর মূলগ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 'উপোদ্ঘাতে আরও দুই চারিটী পাঠ সংশোধিত হইয়াছে (বিস্তারিতের জন্য গ্রন্থকার পরিশিষ্টে'র অপেক্ষায় থাকিতে বলিয়াছেন)। কিন্তু কেবল উপোদ্ঘাত লইয়া ব্যস্ত থাকিলে আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না; বিশেষতঃ মূল আলোচনা উপলক্ষেই উপোদ্ঘাতোক্ত অবশিষ্টাংশের পরিচয় গ্রহণেরও সুযোগ হইবে।

গ্রামের পথে

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির]

পিয়ারী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

৫

চার পাঁচ দিন পরের কথা।

সে রাত্রির কথাটা অমল স্বপ্ন বলিয়াই উড়াইয়া দিয়া আবার নিশ্চিন্ত হইয়াছে। মিথ্যা তার কথা ভাবিয়া কি হইবে! নাম তো বলিয়া গেল, পাপিয়া, পিয়ারী বিবি! তার পর ঐ বাগান হইতে আসিয়াছিল! ও বাগানে কারা আসে, এতকাল এখানে থাকিয়া সে তা ভালো করিয়াই জানে! পিয়ারা বিবি নামটাও ভদ্রঘরের মহিলার হইতে পারে না! তাই বটে অমন কুণ্ঠাহীন ভঙ্গী! কথাবার্ত্তাতেও এতটুকু সরমের খোঁচ নাই!...কিন্তু এই যে, যাকে সে ইষ্ট দেবীর মত নিজের অন্তরে বসাইয়াছে, সেই বা কে! ঐ পিয়ারী তাহাকে দিদি বলিল! তবে কি সে ঐ কাব্য-লোকেরই জীব নয়! স্বপ্নে রচা কোন্ সুদূর কল্পলোকেই তার বাস নয়!...তারো পিছনে এমনি মূর্ত্তি...এই পরিচয়! অমল শিহরিয়া উঠিল, না, না, সে কল্পলোক-বিহারিণী কাব্যের নায়িকা মাত্র— তার অন্য পরিচয় নাই! অন্য পরিচয় তার থাকিতে পারে না।

সন্ধ্যা হইলে অমল প্রদীপ জ্বালিয়া খাতা খুলিয়া বসিল। বাহিরে বাতাস একটু বেগে বহিতেছিল ..কিসের উচ্ছ্বাসে যেন সে ফুলিয়া ফুলিয়া বহিতেছিল! গাছের পাতার অন্তরাল ভেদ করিয়া প্রকাণ্ড চাঁদ দুই হাতে অজস্র কিরণ বর্ষণ করিতেছে। এমন সময়ে দ্বারে কে ডাকিল— অমলবাবু আছেন?

এ সেই স্বর! পিয়ারীর···! অমল উঠিয়া বহির্দ্বারে আসিল। পিয়ারীই বটে! চাঁদের ঝরা কিরণ-রাশির মাঝে, জ্যোৎস্নায় আরো রঙ ফলাইয়া জ্যোতি ফুটাইয়া এ যে পিয়ারীই তার দ্বারে দাঁড়াইয়া...! দুই ঠোঁট হাসিতে ভরা!

পিয়ারী বলিল,—বাগানে এলুম...কিন্তু সেইটেই প্রধান লক্ষ্য নয়। আপনার সঙ্গে পুরোনো আলাপটুকু ঝালাতে এসেছি।···চলুন, একটু বসি—

পাপিয়ার অঙ্গ বাহিয়া কৌতুকের নির্ঝর ঝরিয়া পড়িতে-ছিল! সে অমলের আহ্বানের অপেক্ষা না করিয়াই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ঘরে ঢুকিয়া পাপিয়া কবিতার খাতাখানা হাতে তুলিয়া লইল, এবং তার পৃষ্ঠাগুলা আগাগোড়া নাড়িয়া চাড়িয়া কহিল,—কৈ, সে রাত্রের কথা কিছু লেখেন নি তো?

অমল মৃদু কণ্ঠে কহিল—না।

বক্র কটাক্ষে পাপিয়া অমলের পানে চাহিল, অমল মাটীর দিকে চাহিয়া ছিল। পাপিয়ার পানে সে সময় চাহিলে দেখিত, পাপিয়ার দৃষ্টিতে কিসের একটা তীব্র স্ফুলিঙ্গ!

পাপিয়া কহিল,—তার পরে শুধু একটা কবিতা লিখেছেন, দেখ্‌চি...

অমল কহিল,—হ্যাঁ···

পাপিয়া কহিল,—এই যে!...বলিয়া সে পড়িল,—

> কোন্ অপরাধে অপরাধী দেবী?
> ভুলিলে এ দীন ভক্তে!
> তোমারি লাগিয়া আকুল হৃদয়
> চূর্ণ, লোহিত রক্তে!
> দুটী দিন—তার দীর্ঘ এ ক্ষণ,
> শূন্য হৃদয়ে পড়েনি চরণ!
> তোমারি ধেয়ানে রয়েছি মগন,
> এত সুকঠিন—ভক্তে!

এইটুকু পড়িয়াই বলিল,—বাঃ, বেশ হয়েছে!...ত এই একটি কবিতাই লেখা হয়েছে তার পরে? এ ক'দিন মাথা কোটাকুটি করেও তাঁর দর্শন মেলেনি, হঠাৎ বুঝি তাই এ উচ্ছ্বাস?

অমল কোন কথা কহিল না। লজ্জায় তার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

পাপিয়া আবার হাসিল। হাসিয়া তার পরে কহিল,—

...ো দিদিকে বললুম আপনার কথা—নির্জ্জন বনে ...নার এই ধ্যানের কাহিনী...

অমল উৎকর্ণ হইল, তীব্র কৌতূহলে পাপিয়ার পানে ...হিল।

পাপিয়া সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল। সে দৃষ্টি ছুরির ফলার মতই ...র বুকে বিঁধিল। পাপিয়া বলিল,—তা কাকেই বা বলা! সে ...খন বাবু নিয়ে এমন মশগুল্!...বলে, বাবুর জন্যে ...িয়েটারই ছেড়ে দিলে! আজো তার জন্যে থিয়েটারের ...লোকেরা কত দুঃখ করে!...আখের খোয়ালে বাবুর কথায় ভুলে!

শেষের কথাগুলা শুনিয়া অমলের মুখ মলিন হইয়া গেল। তার বুকে কে যেন সজোরে চাবুক মারিল! ...ার মানসী প্রতিমা...সেই বিরহিণী শ্রীরাধা... শ্যামের প্রেমে তার সে তন্ময়তা—সে সব তার ছদ্মবেশে কৃত্রিম অভিনয় মাত্র! ছলনার চাতুরী! তাতে সে এমন ...াকা যে সে ভাবগুলা হুবহু সত্যকার রঙে অমন রঙীন করিয়া তোলে! অমলের বুকের মধ্যে কে যেন মুগুরের ঘা মারিয়া তার সে মানসী ছবিখানি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল!

পাপিয়া অমলের সে ভাবান্তর লক্ষ্য করিল; লক্ষ্য করিয়া একটু খুশীও হইল। সে আবার বলিতে লাগিল,—এত বললুম যে, দিদি, একবার দেখবে চল।—কি রকম ভক্ত, কি রকম প্রাণের গান গায় তোমার ধ্যানে!...তা হেসে বললে, তোর সাধ হয় দেখ্‌গে যা, আমি তো পাগল হইনি যে কোন্ হতভাগার রঙ্গ দেখতে যাবো!...চপলা দিদির ঐ তো মস্ত দোষ—সব-তাতে এ!

অমল হতাশভাবে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল। ঘরের প্রদীপের আলোটুকু তার চক্ষে নিবিয়া গেল। সে স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিল। তার একমাত্র সম্বল,—তার এ বজ্রাহত জীর্ণ জীবনে একটু এই যে বসন্ত-সমীরের ঝলক...তাও আজ মিলাইয়া যায়!...কিন্তু, এই নারী...এর কি সুখ, এ-ভাবে তাকে আঘাত করায়!···সে-রাত্রে অমল তাকে আশ্রয় দিয়াছিল, তার বিনিময়ে তার এই একটুমাত্র সুখ, সেটাকে দুই পায়ে এ মাড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিতে চায়!... পাপীয়সী, পিশাচিনী!

মুহূর্ত্তে অমলের মন রাগে কাঁপিয়া উঠিল। সে তীব্র দৃষ্টিতে পাপিয়ার পানে চাহিয়া বলিল,—চলে যাও, তুমি—কেন এখানে এসেছ!...এ-সব কথা আমার কাছে কেন মিছে বলচো! তুমি জানো এ-সব কথা বলে কি করলে তুমি, আমার কত-বড় ক্ষতি . ?

পাপিয়া অমলের স্বরের এই রূঢ় ভঙ্গীতে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া অমলের পানে চাহিল। তার মুখের উপর এমন করিয়া কথা বলে! তাকে বলে, চলিয়া যাও...এমন লোকও আছে!...পাপিয়ার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অমল তীব্র স্বরে কহিল,—এখনো দাঁড়িয়ে রইলে যে! ...যাও, যাও তুমি...কেন তুমি এখানে এসেছ...আজ তো আর আশ্রয়ের দরকার নেই! চলে যাও।...এ আমার ঘর, আমি এ-ঘরের মালিক...

পাপিয়ার বিদ্বেষ তখন দলিত সর্পের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। রাগের বিষ তার ফণায় মিশাইয়া সে বলিল,—বুঝেছি, এ রাগ হঠাৎ কেন হলো!...তুমি কাঙাল, ভিখিরী, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে পড়ে সিংহাসনের স্বপ্ন দ্যাখো তুমি! ...এর চেয়ে বেকুবি আর কি হতে পারে!

অমল জবাব দিল,—আমি বেকুব হই, যাই হই, তোমায় তো সাধিনি আমায় বুদ্ধি দিতে!...কেন তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছ?...যাবে না?

পাপিয়া রাগিয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া দাঁড়াইল, কঠিন স্বরে কহিল—না, যাবো না!

বিস্ময়ে অমলের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না! এ নারী এ বলে কি!

পাপিয়া তার দিকে ফিরিয়া রুদ্ধ অভিমানে কহিল,—আমি যাবো না।...কেন যাবো? জোর করে তাড়িয়ে দিতে পারো যদি তো দাও...দাও তাড়িয়ে···তুমি পুরুষ-মানুষ, গায়ে জোর আছে তোমার...সে জোর ফলাও .. দাও, দাও আমায় তাড়িয়ে...

শেষের দিকটায় পাপিয়ার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া অশ্রুর বাষ্পে জড়িত হইয়া উঠিল। অমল বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পাপিয়ার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এবং তার বিস্ময়ের সে চমক ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই পাপিয়া কম্পিত স্বরে আবার বলিয়া উঠিল—তোমায় দেখতে

এসেছি,—বিলাস, খেলা, সব ছেড়ে তোমায় শুধু দেখতে এসেছি...আর তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ! তোমার এতটুকু মায়া হচ্ছে না···? কি পাষাণ গো তুমি! আমার যে কিছু ভালো লাগচে না—ধন, জন, গহনা, স্তব-স্তুতি... এ-সবের মায়া কেটে তোমার এই ভাঙ্গা ঘরে চলে এসেছি... এর জন্যে তোমার একটু দরদ হয় না? একবার সাধ হয় না, জিজ্ঞাসা করতে যে কেন এসেছ! বলিতে বলিতে বিরাট অশ্রুতে ফাটিয়া সে একেবারে অমলের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।

অমল নির্ব্বাক, নিস্পন্দ!···

পাপিয়া অশ্রুজড়িত কণ্ঠেই কহিল,—তোমার ঐ নিষ্ঠা, ও অনুরাগ একটা কত-বড় পিশাচীর উদ্দেশে তুমি উৎসর্গ করে বসে আছ, তা যদি জান্‌তে!...একটা নরকের কীট, প্রাণ নেই, মন নেই, পুরুষকে যে খেয়াল মেটাবার যন্ত্র বলে শুধু জেনে রেখেচে...ওঃ! অমল পায়ের নীচে পাপিয়াকে অনুভব করিয়া তার হাত ধরিয়া তাকে উঠাইল, উঠাইয়া কহিল—তুমি না বললে, বাগানে এসেচ···!

—না, না, না...ছাই বাগান। পাপিয়া আর্ত্ত স্বরে বলিয়া উঠিল,—বাগানে আমার কোন লোভ নেই,···কোন সাধ নেই।...আমি এসেচি,···আমি...তোমার আশায়... একটিবার অমনি করে আমার উদ্দেশে দুটী ছত্র কবিতা লিখে আমায় শোনাও তুমি...আমার এ হীন জীবন সার্থক হয়ে উঠুক!···সে রাত্রে...জানো, আমি কি করেছি ..?

অমল আবার বিস্ময়াবিষ্ট নেত্রে পাপিয়ার পানে চাহিল। পাপিয়া কহিল,—সারা রাত এতটুকু ঘুমোই নি...! সারা রাত তোমার ঐ মুখের পানে চেয়ে বসেছিলুম... তোমায় মশা কামড়াচ্ছিল—আমি সাবধানে আঁচল দিয়ে সেই মশা তাড়িয়েছি,—পাছে তোমায় কামড়ায়, কষ্ট হয়, পাছে তোমার ঘুম ভেঙ্গে যায়!...চেয়ে থেকে থেকে মনে কি সাধ যে জাগছিল—আর নিজেকে কি চেষ্টায় অটল রেখেছিলুম...! কেবলি মনে হচ্ছিল, জগতে আর আমার কোনো ঠাঁই যদি না থাকতো...তাহলে এই আশ্রয়কেই জড়িয়ে চির-জীবন পড়ে থাকতুম! আমি লুকোব না— সত্য বলচি, সেই লক্ষ্মীছাড়া রাক্ষসীর ভাগ্যের হিংসা করেছি শুধু...কি দিয়ে যে সে তোমায় মুগ্ধ করেছে...তার মধ্যে কী তুমি পেয়েছিলে...

অমল পাপিয়াকে বাধা দিয়া কহিল—এ-সব কি বলছো তুমি! ছি! জ্ঞান হারিয়ো না···তুমি কি নেশা করেছ? ··

পাপিয়া তীব্র স্বরে গর্জ্জিয়া উঠিল,—না, মিছে কথা! আমি নেশা করিনি। এ চার-পাঁচদিন কেবলি সেই রাত্রির কথা ভেবেচি···যাবার সময় বলে গেছলুম না—আমার মধু-যামিনী? তুমি অন্ধ, তাই আমার পানে চেয়েও তখন আমার মনের ভিতরকার কোন সন্ধান পাওনি!... সেদিন যাবার সময় পা আমার চৌকাঠে বেধে গেছলো, পা সরছিল না,···তুমি অন্ধ, তা দেখেও দেখোনি!

অমল কহিল,—এখনো বলচি, তোমার মনের ঠিক নেই। অসুস্থ হয়ে থাকো, বল, তোমার লোকজনদের ডেকে আনি। তোমার...

পাপিয়া কহিল,—কাকে ডাকবে! আমি একলা এসেছি ভাড়া গাড়ী করে। সে গাড়ী চলে গেছে...তাকে কাল সকালে আবার আসতে বলেছি।

অমল কহিল—আজ রাত্রে থাকবে কোথায়?

পাপিয়া কহিল—এখানে, এই ঘরে, এই বিছানায়, আমার এই স্বপ্নের স্বর্গে...বলিয়া পাগলের মত পাপিয়া বিছানায় একেবারে লুটাইয়া পড়িল।

অমল প্রমাদ গণিল। এ কি কুহকিনীর হাতে পড়িল সে! এ যে একেবারে অসম সাহসে তাকে আয়ত্ত করিতে আসিয়াছে...রমণী কি উন্মাদিনী...!

পাপিয়া বিছানায় অবসন্ন মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া রহিল। অমল ভাবিল, অমনি ও পড়িয়া থাকুক—উহাকে ঘাঁটাইয়া কাজ নাই! যে কিছু বুঝিবে না, তার সঙ্গে বাদানুবাদে ফল কি!—চরিত্র-হীনা নারী...তার উপর হয়তো মদ খাইয়া যা-তা বকিতেছে!...

অমল চুপ করিয়া জানলার ধারে গিয়া বসিল। জোয়ারের জল চাঁদের জ্যোৎস্না গায়ে মাখিয়া ছল-ছল বহিয়া চলিয়াছে...

কতক্ষণ এমনি ভাবে সে বসিয়াছিল—বাহিরের পানে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া, হত-চেতনের মত।...হঠাৎ কার করস্পর্শে চেতনা হইল। সে চাহিয়া দেখে, পাপিয়া।

পাপিয়া কহিল—রাগ করো না। তোমার রাগ আমি সহ্য করতে পারবো না।...বল, রাগ করবে না?— এখানে সেই একটি রাত্রি বাস...তার ফলে যেন আমার

পুনর্জন্ম হয়েছে...! কি করে হলো, জানি না। খেয়াল ভেবে নিজের মনকে অনেক বুঝিয়েচি—মন বোঝে নি!... আজ আর থাকতে পারছিলুম না, তাই চলে এসেছি... একটু প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার পানে চাও...চাও না গো!... আমার এই রূপ, এই দেহ...চেয়ে দেখ,—এ কি সত্যিই উপেক্ষা করবার মত?

অমলের রক্ত হিম হইয়া গেল,—তার বুক যেন নিমেষে পাষাণে পরিণত হইয়া পড়িল। সে কেমন যন্ত্র-চালিতের মত পাপিয়ার পানে চাহিল; পাপিয়া তখন অমলের দুই কাঁধে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছে! তার উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস-বায়ু ঝড়ের মত অমলের মুখে লাগিল—সে বাতাসে কি তাপ!... পাপিয়ার দুই চোখে জল,—আবেগে সে কাঁপিতেছে! অমল কহিল,—তুমি স্থির হয়ে বসো দিকি...এ-সব কি যে বলচো তুমি, আর কাকেই বা বলচো, তা তুমি কিছুই বুঝচো না...

পাপিয়া খানিকটা নিশ্বাস লইয়া স্থির দৃষ্টিতে অমলের পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল—আমি কিছু ভুল বুঝচি না···যা বলছি,...তা তুমি যে কেন বুঝচো না?—এ যে আমার প্রাণের কথা···

অমল নিরুপায়ভাবে চুপ করিয়া রহিল। পাপিয়াও স্তব্ধভাবে তেমনি আকুল দৃষ্টিতে অমলের পানে চাহিয়া রহিল। কাহারো মুখে কোন কথা নাই...

এমন সময় দিগন্ত কাঁপাইয়া প্রলয়ের কোলাহল তুলিয়া ঝড় উঠিল। মড়-মড় শব্দে গাছপালা দোলাইয়া ভাঙ্গিয়া ভীষণ ঝড়! অমলের জীর্ণ গৃহের দ্বার-জানালাগুলা দুম্‌দাম্‌ শব্দে কাঁপিয়া মাথা আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল—দম্‌কা বাতাসে ঘরের ক্ষীণ প্রদীপের আলোটুকুও নিবিয়া গেল। জমাট কালো অন্ধকার ঘরখানিকে সুনিবিড় আলিঙ্গনে ঘিরিয়া ধরিল...বাহিরে চাঁদের আলো নিবিয়া গিয়াছে... চাঁদ তার কিরণরাশি কুড়াইয়া লইয়া কোথায় একটা বিরাট মেঘের আড়ালে লুকাইয়া পড়িয়াছে! অন্ধকারের আবরণে বিশ্ব আপনাকে সন্ত্রাসে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

ভয়ে পাপিয়া অমলকে ধরিল এবং তার শরীরের উপর আপনার সমস্ত ভার দিয়া লতার মত আশ্রয় মাগিল। অমল নিরুপায়ভাবে পাপিয়াকে টানিয়া শয্যায় বসাইয়া দিল, এবং দ্বার-জানলাগুলা বন্ধ করিয়া ঘরে আবার প্রদীপ জ্বালিল। প্রদীপ জ্বালিয়া তারি আলোয় সে চাহিয়া দেখে, পাপিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া দুই চোখে জলের ধারা বহাইয়া দিয়াছে। সে এক-বার মুহূর্ত্তের জন্য পাপিয়ার পানে চাহিল, তার পর মেঝের একধারে একটা বাক্সে ঠেশ দিয়া বসিয়া পড়িল, বসিয়া চক্ষু মুদিল।

৬

তার পর রাত্রে কখন ঝড় থামিল, আর কখনই বা সে ঘুমাইয়া পড়িল, সে-সব অমল কিছুই জানে না। সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সে চাহিয়া দেখে, ঘরে সে একা, পাপিয়া নাই! অমল উঠিয়া নিজের ছোট গৃহের বাহিরে খুঁজিল, পাপিয়া নাই। তখন সে ঘরে ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখে, তার কাপড়-চোপড়গুলি পরিপাটী করিয়া সাজানো রহিয়াছে; খাতা ও বইগুলা কাঠের বাক্সর উপর ছড়ানো পড়িয়া ছিল, সেগুলিও কে গুছাইয়া রাখিয়াছে! নিশ্চয় এ পাপিয়ার কাজ! অমল বইগুলা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। একখানা বহির মধ্যে একটা চিঠি...! সে চিঠিখানা তুলিয়া পড়িল। চিঠিতে লেখা আছে...

"তুমি নিষ্ঠুর পাষাণ-বুকে যার চিন্তাটুকু লইয়া আমার পানে ফিরিয়া চাহিলে না, জানো না, সে কত বড় পাষাণী, কত বড় রাক্ষসী! সে তোমার এ ধ্যানের দাম জানে না, বোঝেও না তা! তবু তুমি তারই জন্য আমার পানে ফিরিয়া চাহিলে না! আমায় যেমন নিরাশ করিয়া ফিরাইয়াছ, তার কাছে এর চেয়ে ঢের বেশী নিরাশা পাইয়া জ্বলিবে, তা তুমিও জানো! তবু তারি ধ্যানে তোমার কি সুখ, তা তুমিই বোঝো!

আমার কি নাই? ধন, জন, ঐশ্বর্য্য, রূপ, যৌবন... মানুষ যা কিছু কামনা করে, আমি তা সব তোমায় দিতে পারিতাম! তুমি মূর্খ, তাই হেলায় তুমি রাজার রাজত্ব হারাইলে!

কে তুমি? পথের কাঙাল! কি তোমার আছে? কি তুমি দিতে পারো?···কিছু না! তবু কেন তোমার কাঙাল হইয়া অমন নির্লজ্জের মত আসিয়াছিলাম? তার কারণ জানো কি? আমার আশে-পাশে ভক্তের দল ষোড়শোপচারে আমায় পূজা যোগাইতেছে—সে পূজা

পাইয়া পাইয়া আমি শ্রান্ত হইয়াছি, মন আর তাতে বসেও না! তোমার ঘরে আসিয়া তোমার যে নিষ্ঠা, যে ধ্যান দেখিয়া গিয়াছি, তার জন্যই আকুল হইয়াছিলাম! যদি এই বনের মধ্যে এই ভাঙা কুঁড়েয় আমায় পাশে রাখিতে, তা হইলে আমি সব ত্যাগ করিয়া তোমারি হইতাম!...

তোমার জন্য আমি সব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম। সে ত্যাগের মর্ম্ম.. তুমি মূর্খ, উন্মাদ, কি বুঝিবে!

এর জন্য কোনদিন কি তুমি অনুতাপ করিবে না? আমি বলিতেছি, করিবে। ঐ রাক্ষসীর ধ্যানে নিরাশার ঘা খাইয়া খাইয়া যেদিন জীর্ণ হইবে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে, সেদিন বুঝিবে, কি-বস্তু কি মিথ্যা দর্পের ভরেই তুমি হারাইয়াছ! একদিন এই আমারি জন্য তুমি পাগল হইবে! কিন্তু তখন—থাক্ সে কথা!

যদি কোনদিন আমায় চাও, ডাকিয়ো...তোমায় রাজার ঐশ্বর্য্যে ভরাইয়া দিব। তোমার আশা একেবারে ছাড়িতে পারিলাম না—তবে এমন দীন ভিখারিণীর মতও তোমার দ্বারে আর আসিব না, জানিয়ো। যদি মন না মানে, মনের গলা টিপিয়া মারিব।...যাইবার সময় তোমার কপালে একটি চুম্বন রাখিয়া গেলাম।...মূঢ় মন!

পিয়ারী।

চিঠি পড়িয়া অমল স্তব্ধভাবে শয্যায় বসিয়া পড়িল। তার চোখের সামনে বাগান গাছপালা সব ঝাপ্সা হইয়া গেল—পায়ের নীচে পৃথিবীখানা বিষম দোলে দুলিয়া উঠিল।... চিঠিখানা আর-একবার খুলিয়া সে চোখের সামনে ধরিল... এ কি এ, অক্ষরগুলা যেন আগুনের মত জ্বলিতেছে—! সর্ব্বনাশ! এ কি লিখিয়াছে পিয়ারী! নিতান্ত সরল মনে কোনো সাধ-আশার সন্ধান না রাখিয়া নিতান্ত নিরীহের মত সে শুধু কবিতা লেখে,...চপলা কোথায় থাকে, কোনদিন তার দেখা মিলিবে কি না, তাকে পাওয়া তো পরের কথা—এ-সব না ভাবিয়াই সে কবিতা লেখে...সেই কবিতার কয়টা ছত্র পড়িয়া এই সুন্দরী, তরুণী, ঐশ্বর্য্যের রাণী—সে এক দুঃখী কাঙালের হৃদয়-মনের দ্বারে এমন ভিখারিণীর মত আসিয়া লুটাইয়া পড়িল! এ কি এ—সেও পাগল হইয়াছে, তাই এগুলাকে সত্য ভাবিতেছে! না, না, এ সব স্বপ্ন! সে জাগিয়া আরব্য উপন্যাসের রঙীন স্বপ্ন দেখিতেছে! ...স্বপ্ন ছাড়া এ আর কিছু হইতেই পারে না!

কিন্তু না, স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিবারো তো উপা[য়] নাই! পিয়ারী যে আসিয়াছিল তা সত্য, কঠিন সত্য! আ[র] এই চিঠি সেই কঠিন সত্যের মূর্ত্তি লইয়া তাহারি চোখে[র] সামনে!

অমল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তা[র] মাথার মধ্যে কি যেন দপ্‌দপ্ করিতেছিল, বুক অসহ্য ভা[বে] ভারী বোধ হইতেছিল। উদ্‌ভ্রান্তের মত সে ঘরের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার ঘোরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। হঠা[ৎ] মনে হইল, অলস কল্পনায় কি সে এমন লিখিয়াছে যা পড়িয়া...

অমল কবিতার খাতা তুলিয়া তার পৃষ্ঠাগুলার উপর চোখ বুলাইয়া লইল। মিথ্যা কথা, মিথ্যা সাধ, মিথ্যা আশার মালা গাঁথিয়াছে সে! দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি ধরিয়া এই অলস কল্পনা!...মিথ্যা নেশা, এ মিথ্যা মোহ! সে যে এই লিখিয়াছে—

ওগো বিজন বনের মাঝে একা,...
বড়ই একা, আমি বড় একা ..
কোনোদিন কি কোনো সন্ধ্যাবেলায়,
জ্যোৎস্না-রাতে চাঁদের লীলাখেলায়
এই বিজনে মনের মত্ত মেলায়
পাব না কি ওগো, তোমার দেখা!

এ কি সত্যই সে এমন আশা করিয়া লিখিয়াছে যে, একদিন উত্তেজনার বশে তার জীর্ণ গৃহে সে আসিয়া দেখা দিবে?... না, না।...সে জানে, এ আশা তার বাতুলতা! তবে? কবিতা লেখা বলিয়াই লিখিয়াছে। সে তো সত্যই অন্ধ নয়, মূঢ় নয়, বাতুল নয় যে, এমন আশা করিবে!

অমল খাতার পাতা উল্টাইতে লাগিল...এ কি, সামনের পাতায় চপলার যে ছবিখানি আঁটা ছিল, সে ছবিখানিকে কালি লেপিয়া তাকে কদর্য মলিন অস্পষ্ট করিয়া দিল কে! এই যে ছবির তলায় লেখা—"সর্ব্বনাশী, পোড়ারমুখী...নিপাত যা।" এ যে...অমল চিঠির লেখার সহিত এ লেখা মিলাইল। এ পাপিয়ার হস্তাক্ষর!...ছবিখানায় কালি লেপা? এ'ও তবে তার কাজ!—অমল অবাক হইল। তার রা[গ] হইল—একখানি নিরীহ ছবি...তার প্রতি এ কি প্রচ[ণ্ড] বিদ্বেষ এই নারীর! অমল শিহরিয়া উঠিল।

বহুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া থাকিবার পর সে শয্যা[য়]

গিয়া বসিল। বালিশটা কোলে লইতেই কি একটা হাতে ঠেকিল! একটা আংটি! তাতে মস্ত এক-টুকরা চুণী পাথর বসানো...লাল টকটক করিতেছে...এ পিয়ারীর আংটি! নিশ্চয়! ফেলিয়া গিয়াছে! সর্ব্বনাশ!

অমল আংটি হাতে লইয়া বাগানের দিকে ছুটিল। মালীকে ডাকিয়া খপর লইয়া জানিল, বিবি সকালে একবার আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সে চকিতের জন্য! বাগানে আসিয়া মুখ-হাত ধুইয়া একটু চা খাইয়াছে, তারপর একটা ভাড়া গাড়ী কোথা হইতে আসিয়া ফটকে দাঁড়াইল, তিনিও অমনি সেই গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছেন!

অমল চোখে অন্ধকার দেখিল। তাই তো, আংটিটা তবে ফিরানো যায় কি করিয়া! রাখিয়া দিবে?...যদি হারাইয়া যায়?...কি বিপদ! মালীর কাছে রাখিয়া যাইবে? না। কি জানি, ছোট লোক, যদি গাপ্‌ করিয়া বসে! তার চেয়ে ঠিক! সে মালীকে প্রশ্ন করিল,—বিবি কোথায় থাকে, ঠিকানা জানো?

মালী কৌতূহল দৃষ্টিতে অমলের পানে চাহিল। অমল কহিল,—আমার একটু দরকার আছে তাঁর কাছে। জানো তাঁর ঠিকানা?

মালী একটু অবাক হইয়াই বলিল, ঠিকানা সে জানে। কাগজে লেখা আছে।

অমল কহিল,—দেখি।

মালী অমলকে লইয়া ঘরে গেল, এবং তার কালো কাঠের বাক্স খুলিয়া একটা গেঁজিয়া বাহির করিল। তার পর গেঁজিয়ার মধ্যে হাত পুরিয়া একটুকরা কাগজ বাহির করিল। অমল সেই টুকরা কাগজে লেখা ঠিকানাটা লইয়া বাগান ছাড়িয়া নিজের ঘরে ফিরিল।

ফিরিয়া সে তখনি আবার উঠিল। যাইবে কি সেখানে!...কি জানি, এ-সব ব্যাপারের পর অভ্যর্থনা কেমন হইবে! যদি আবার এম্‌নি সব কথার বাণ সহ্য করিতে হয়...তেমনি মিনতি! তেমনি অশ্রুময় আবেদন··· কত লোকের সামনে...! যদি বিবাদ ঘটে.। যদি বাবুরা তার এ-সব রহস্য বুঝিয়া তাকে নির্য্যাতন করে!

অমল হাসিল, এও কি সম্ভব! বাবুরা এ-সবের কিছু জানেও না! চরিত্রহীনা নারী! তার কি না সংযম! এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় নেশার ঝোঁকে কি সব বকিয়া গিয়াছে—তা কি তার নিজেরই এখনো মনে আছে! সে পাগল, তাই ঐ কথাগুলা লইয়া এমন করিয়া ভাবিয়া মরিতেছে! এ সব কিছু নয়—রঙ্গিণীর ক্ষণিক রঙ্গ, খেয়ালী নারীর মুহূর্ত্তের খেয়াল শুধু, নেশা...! তাছাড়া আর কিছু নয়...!

অমল স্থির করিল, দুপুর বেলায় সে যাইবে—এখন তো ছাত্র দুটীকে পড়ানো চাই। আংটিটা সযত্নে বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া সে ঘর বন্ধ করিল এবং ছাত্রদের পড়াইবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু পড়াইবার মন কোথায়! কাণের কাছে ঝড়ের সেই বিকট গর্জ্জন...আর তার অন্তরালে সেই বেদনা-আকুল আর্ত্ত স্বরে মিনতির ধারা...! অমলের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল।

দুপুরবেলায় সে ভাবিল, অত লোকের ভিড়ে, সেই কোলাহলের মাঝে সে যাইবে কি করিয়া! হয়তো সে তার সহচর-সহচরী লইয়া কালিকার ঘটনাটা দুঃস্বপ্নের ব্যাপার বলিয়া তাকে বিদ্রূপ-বাণে জর্জ্জরিত করিয়া সেখানে কত রঙ্গই করিতেছে! সে গেলে তখনি হয়তো তার কবিতাগুলিকে, তার মনের অতি-গোপন গানকে কি খোঁচায় যে জর্জ্জরিত করিবে!—তার প্রসঙ্গ লইয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িবে...না, না, এ সে সহ্য করিতে পারিবে না!...ছবি—একটা তুচ্ছ ছবিকেই কালি লেপিয়া বিশ্রী কদর্য্য করিয়া দিয়া গেল!···তার অসাধ্য কি আছে!

অমল ভাবিতে লাগিল। তার শান্তিভরা বিজন ঘর, তার সহজ তৃপ্ত সরল মন—এ লইয়া সে নিশ্চিন্ত আরামে বাস করিতেছিল···ঝড়ের মত সে আসিয়া তার সে ঘরে অশান্তি-বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া, সে মনে ঝড় তুলিয়া এ কি করিয়া গেল!...অমল তো তার কাছে কোন অপরাধ করে নাই...তার দ্বারে তার শান্তি-সুখে এতটুকু আঘাতও কোন দিন দিতে যায় নাই! তবে? সে কেন এমন করিয়া অমলকে দারুণ বিশৃঙ্খলার মাঝে ফেলিয়া গেল!...খেদে হতাশ্বাসে অমলের দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। (ক্রমশঃ)

হস্তপদাদির বিকৃতি ও বৈচিত্র্য

কাপ্তেন শ্রীসত্যকুমার রায়, এম্-বি

অস্থি আমাদের শরীরের ঠাট বা কাঠাম। শরীরের বিভিন্ন অস্থির সামঞ্জস্য ও পরিপুষ্টিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন সুন্দর হয়, ও দেহ কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। জন্মাবস্থায় এই কাঠামটি যথাবিন্যস্ত না থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব পরিপুষ্ট ও যথাযথ সুন্দর রূপে পরিবর্দ্ধিত হয় না। সর্ব্বাঙ্গ-পুষ্ট অবয়ব-বিশিষ্ট লোক বড়ই বিরল। অবশ্য পিতামাতার দৃষ্টিতে তাঁহাদের সকল সন্তানই সুন্দর।

বর্ণ উজ্জ্বল থাকিলেই লোক সুন্দর দেখায় না। অঙ্গ-সৌষ্ঠবই সৌন্দর্য্যের পরিমাপক; তাহার সহিত যদি বর্ণ উজ্জ্বল গৌর হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই।

প্রকৃতির বৈচিত্র্যে সময় সময় আমরা বিকলাঙ্গ মনুষ্য দেখিতে পাই। কার্য্যক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে হস্তই আমাদের বিশেষ কার্য্যকরী। সেই জন্য হস্তের গঠন-বিকৃতি বা অসামঞ্জস্যের দিকেই আমাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। বিকৃত-পদ মনুষ্যের সংখ্যাও কম নহে। পদের বিকৃতি চলিবার সময় ধরা পড়ে। হস্ত-পদ বেশ কার্য্যক্ষম থাকিলে, শরীরের অন্যান্য অস্থি-গুলিও সম্যক রূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে পায়।

সাধারণ লোকের হাতে ও পায়ে পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলি আছে। কিন্তু সময় সময় ইহাদের সংখ্যা কমিয়া বা বাড়িয়া যাইতে দেখা যায়। হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের স্থানে দুইটিও দেখা যায় (১ নং ছবি); আবার ছয়টি, আটটিও অনেক সময় দেখা যায়। (২, ৩নং ছবি) এমন কি, দশটি বা বারটি পর্য্যন্তও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ছয়টির বেশী অঙ্গুলি হইলে সেইগুলি প্রায়ই বাঁকা ও ছোট হয় এবং সেইজন্য সেই আঙ্গুলগুলি অকর্ম্মণ্য হয়। বংশানুক্রমে এইরূপ বহু-অঙ্গুলিবিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মিতে দেখা যায়। কিন্তু ষষ্ঠ অঙ্গুলিবিশিষ্ট লোকের অঙ্গুলি-সঞ্চালন ভাল করিয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, তাহার ছয়টী অঙ্গুলিই বেশ কার্য্যক্ষম; বরং এই ষষ্ঠ অঙ্গুলিটি তাহার কাজের অধিক সহায়তা করে। এই ষষ্ঠ আঙ্গুলটি প্রায়ই কনিষ্ঠ বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পর দৃষ্ট হয়। সময় সময় এই ষষ্ঠ অঙ্গুলিটি (৪ নং ছবি)

হস্তের অঙ্গুলির বিকৃতি

এই দুই অঙ্গুলি হইতে ঝুলিয়া থাকে; তখন কিন্তু ইহা কার্য্যকরী হয় না। এ অবস্থায় ঐ অঙ্গুলিটি কাটিয়া ফেলিলেই ভাল হয়। কখন কখন একটি আঙ্গুল দ্বিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। (৫ নং ছবি)

কাহারও কাহারও কয়েকটি অঙ্গুলি যুক্ত অবস্থায় দেখা যায়। কেবল যদি দুইটি অঙ্গুলি জোড়া থাকে (৬ নং ছবি), তাহা হইলে কাজের কোন অসুবিধা হয় না। আঙ্গুলগুলি আবার কখন কখন হাঁসের পায়ের মত পাত্‌লা চামড়ায় জোড়া থাকে (৭ নং ছবি)। এই চামড়া কাটিয়া আঙ্গুলগুলি ফাঁক করিয়া দিলে তাহারা কার্য্যক্ষম হয়। শিশু অবস্থায় ইহাতে অস্ত্রচিকিৎসা করা যায়। অন্য প্রকারে জোড়া থাকিলেও ৪ বা ৫ বৎসর বয়সে অস্ত্রচিকিৎসা করান উচিত। আঙ্গুল বাঁকা বা শরীরের অবয়বের তুলনায় খুব ছোট বা সরু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা হাতের আঙ্গুলের মত কমিয়া বা বাড়িয়া যায়।

আঙ্গুলের বিকৃতি ছাড়া, সমুদায় হাতটি বাঁকা হইতে পারে (৮ নং ছবি)। বাঁকা হাত অপেক্ষা বাঁকা পা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজীতে এইরূপ বাঁকা পা-কে "টেলিপিজ্‌" (Telipes) বা "ক্লাব্‌ ফুট্‌ (Clubfoot) বলে। এই বিকৃতি অবস্থাপন্ন শিশুরা চলিতে আরম্ভ করিলে পায়ের তলা ভূমিতে সমান ভাবে পড়ে না। তাহারা কখনও বা ঘোড়ার মত কেবল পায়ের অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া (৯ নং ছবি) চলে; কখনও বা কেবল গোড়ালি দিয়া চলে (১০ নং ছবি)। আবার কখন বা য়ের ভিতর বা বাহির দিকটা দিয়া চলে (১১, ১২ নং ছবি)। এই বিকৃতির বেশীর ভাগই এক রকম হয় না। উপরি-উক্ত দুই বা ততোধিক বিকৃতি এক পায়েই থাকে। সেই জন্য পায়ের বক্রতাও বেশী হয়।

১২ ১১ যুক্ত অঙ্গুলি ও বিকৃত পদ ৯ ১০

এই সকল বিকৃতির কারণ কি, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে প্রথমে আমাদের পা দুইটি ঐরূপ বক্রাবস্থায় থাকে, কিন্তু জন্ম হইবার পূর্ব্বে উহারা ঘুরিয়া সোজা হয়। অনুমান হয় যে, গর্ভাশয়ের

কোন দোষ বশতঃ পা না ঘুরিতে পারিলে, উহা বক্র ভাবেই থাকিয়া যায়। ইহা ছাড়া অন্য কারণও আছে, যাহাতে পা বাঁকিয়া যাইতে পারে। যেমন সময় সময় শিরদাঁড়ার (Vertebral Columa) নীচের দিকের হাড় জোড়া না লাগার দরুণ ফাঁক থাকে। এইরূপ অবস্থার নাম ইংরাজীতে "স্পাইনা বাইফিডা" (Spina Bifida)। এই ফাঁকের ভিতর দিয়া মেরুদণ্ডের স্নায়ু সমস্ত স্থানচ্যুত হয় এবং অবশ হইয়া যায়। আমাদের পায়ের পেশীসমূহ এই সব স্নায়ুর দ্বারা পরিচালিত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। স্নায়ুর অবশতার জন্য মাংসপেশীও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই মাংসপেশীগুলি হাড়ে সংযুক্ত আছে; সুতরাং পায়ের হাড়গুলিও যথাস্থানে না থাকিয়া বক্র ভাব ধারণ করে।

পায়ের মত একটা বা দুইটা হাঁটু বাঁকা হয় (১৩ নং ছবি)। কখনও চলিবার সময় দুই হাঁটু ঠেকে, পা দুটি ফাঁক থাকে (১৪ নং ছবি); আবার পা দুইটি জোড়া করিলে ধনুকের মত হাঁটু দুইটি বাহিরের দিকে বাঁকিয়া ফাঁক থাকে। কখনও বা হাঁটু পশ্চাতে বা সম্মুখেও বাঁকে।
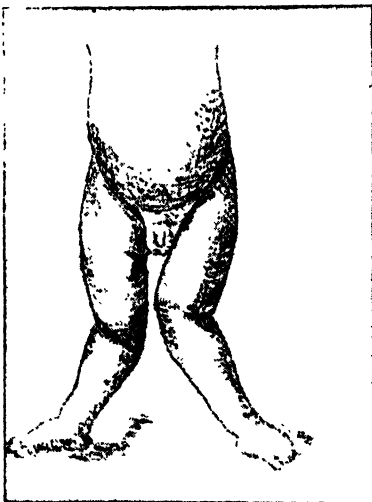
১৩ নং বক্র পদ

উরুর অস্থি (Femur), শিরদাঁড়ার অস্থি, বুকের অস্থি বা পাঁজরা ইত্যাদি সমুদায় বাঁকা হইতে পারে। জন্মজ কারণ ব্যতীত নানারূপ রোগেও অস্থি প্রথমে সোজা থাকিলেও পরে বাঁকা হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে "রিকেট" (Ricket) ব্যাধিতে অস্থির ক্ষতি বেশী হয়। এই ব্যারামটিও আমাদের দেশে বড় কম দেখা যায় না। ইহাতে শিশুদিগের একটু একটু জ্বর হয়, পরিপাক-শক্তি কমিয়া যায়; শিশুরাও রুগ্ন হয়। আহারের দোষে এই ব্যারামের উৎপত্তি হয়। বহু-সন্তানবিশিষ্ট গৃহে বা খুব গরীব অবস্থার জন্য শিশুর নিয়মিত আহার ও যত্ন না হওয়ায়, অস্থি

১৪ নং ধনুকের মত পদ
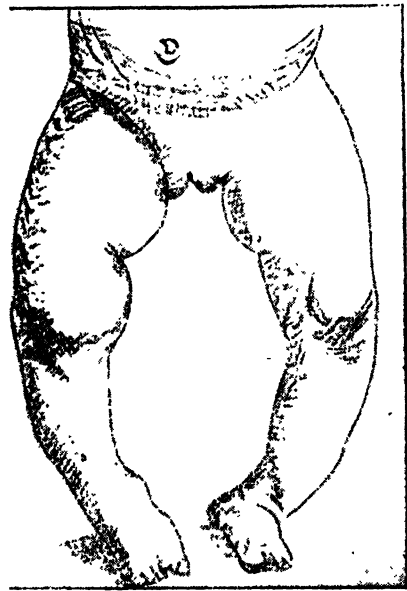
পরিপুষ্ট হইতে পায় না; এবং ফলে নরম হইয়া নানা বক্র রূপ ধারণ করে। এই ব্যারামে শরীরের সমস্ত হাড়ই বাঁকা ও ছোট হইয়া যাইতে পারে। আবার "এক্রোমেগালি" (Acromegaly) নামক আর এক প্রকার ব্যারামে এই "রিকেট" ঠিক উল্টা হয়। ইহাতে হাড় খুব বড় হয়,—এত বড় হয় যে মানুষের আকার ভীষণ দেখায়।

"ইনফেন্টাইল পেরালিসিস্" (Infantile paralysis) নামক আর এক ব্যাধি আছে। ইহাতে শিশুদিগের দুই এক দিন জ্বর হয়। তাহার পর দেখা যায় যে, তাহারা আর হাত বা পা নাড়িতে পারে না। এই ব্যারামে হাত পায়ের কতকগুলি স্নায়ুর মূল নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্নায়ুর সহায়তায় মাংসপেশী চালিত ও পরিপুষ্ট হয়। সুতরাং ইহারা নষ্ট হইয়া গেলে মাংসপেশী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যায়; ও সঙ্গে সঙ্গে হাড়েরও অনিষ্ট হইয়া উহারা বক্র ভাব ধারণ করে। কিন্তু প্রথম হইতে যত্ন সহকারে চিকিৎসা করাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। এই ব্যারামের চিকিৎসায় সুফল লাভ করিতে

অনেক দিন লাগে। যাহাতে মাংসপেশী সমূহ ক্ষীণ না হয় ও হাড় বাঁকিয়া না যায়, তাহার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রথম হইতে অবহেলা করিলে, পরে যথারীতি চিকিৎসাতেও তেমন আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে কিম্বা সরিয়া গেলে, যদি তাহা যথাস্থানে বসান না হয়, তাহা হইলে হাড় বাঁকা ভাবেই জুড়িয়া বা থাকিয়া যায়। সেইজন্য এইরূপ অবস্থায় যত্ন সহকারে চিকিৎসা করা উচিত। একবার বক্রভাবে জোড়া লাগিলে সেই অঙ্গটি আগের মত আর কার্য্যক্ষম হয় না। এই রূপ বক্র অস্থি আজ কাল অস্ত্র চিকিৎসায় সোজা করা যায়।
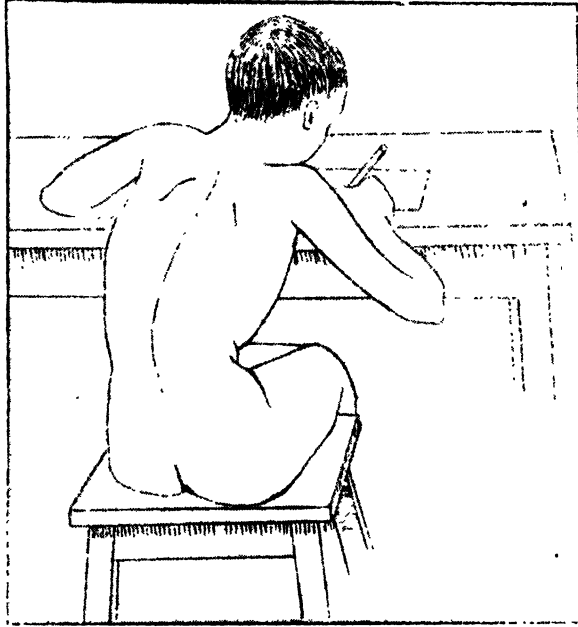
আবার ব্যবহার বা অভ্যাস দোষেও হাড় বাঁকিয়া যায়। শিশুরা যদি কুঁজা হইয়া বা বাঁকিয়া বসিতে অভ্যাস করে (১৫নং ছবি), তাহা হইলে তাহাদের মেরুদণ্ডের নরম হাড়গুলি সামনে বা পাশে বাঁকিয়া যায়; আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের হাড়ও বাঁকে। যাহারা খুব ভারি দ্রব্য স্কন্ধে বা মস্তকে সর্ব্বদা বহন করে, তাহাদেরও শিরদাঁড়ার হাড় বাঁকিতে দেখা যায়। আমাদের জুতার দোষেও পা বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। খুব সরু-মুখ জুতা পরিলে পায়ের আঙ্গুলগুলি খেলিতে পায় না,—ক্রমশঃ ছোট হাড়গুলি বাঁকিয়া যায়। গোড়ালী উঁচু হইলে শরীরের সমুদায় ভার আঙ্গুলগুলির উপর গিয়া পড়ে, সুতরাং তাহারা বাঁকিয়া যায়। এইরূপ পায়ে ভাল হাঁটা যায় না। এই সব বিকৃতি বা বিকলাঙ্গের কথা অনেক বলা যাইতে পারে; এবং উহাদের চিকিৎসারও আজ কাল এত উন্নতি হইয়াছে যে, চিকিৎসার ফল দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বাঁকা হাড় কাটিয়া সোজা করা যায়, আবার হাড় না থাকিলে অন্য কাহারও দেহাস্থি অসম্পূর্ণ স্থানে লাগান যায় (Bone transplantation)। মাংস-পেশী অবশ হইয়া গেলে সুস্থ মাংসপেশীর সহিত উহা জোড়া লাগাইয়া (Tendon transplantation) পুনরায় কার্য্যক্ষম করান হয়। স্নায়ু অবশ হইয়া গেলে সুস্থ স্নায়ুর সহিত যোগ করাইয়া (Nerve Transplantation) পুনরায় তাহার দ্বারা কাজ করান হয়। অন্যান্য দেশে এই সব চিকিৎসার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

১৫নং বক্র মেরুদণ্ড

কিসের ডর ?

শ্রীবা———

মানুষ ওরাও, ওদের কেন করিস্ তবে ডর ?
দেবতা নয়, দানব নয়, ওরা নয় ত অমর।
ওদের জুতা মাথায় করে ঘুরিস্ কেন তবে ?
মাথা ঝেড়ে ওঠ্ না কেন, নাম রাখ্ না ভবে!
পরের জুতা, পরের লাথি, লাগে এতই ভাল ?
বুঝিস্ না কি এতে দেশের মুখ হ'য়েছে কাল ?
মোটা কাপড়, মোটা ভাতেই থাক্তে সুরু কর,
পরের দেশে হুলুস্থুল বাধবে এরই পর।

ওদের জিনিষ এলে হেথায় কিন্বি না ভাই কভু,
কি ভয়! ওরা সত্য সত্য নয় ত তোদের প্রভু!
সমান করে পা ফেলে ভাই চল্ রে ওদের সনে,
বুক ফুলিয়ে চল্তে শেখ, সাহস কর্ রে মনে।
ওদের দমন করতে গেলে মিলন আগে চাই,
তোদের মধ্যে সে জিনিষটা একেবারেই নাই।
নিজের মধ্যে দলাদলি করিস্ যদি ভাই,
ওরা হাসবে, আর ভাব্বে সবাই "এই ত আমরা চাই!"

চন্দননগরের ক্রীড়া-কৌতুক *

শ্রীহরিহর শেঠ

পূর্ব্বে দেশে কুস্তি খেলার বিশেষ আদর ছিল; সুতরাং কুস্তিগির পালোয়ান এবং কুস্তির আখড়া স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইত। অধুনা পালোয়ান বলিয়া কাহারও পরিচয় এ প্রদেশে বড় একটা শুনা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে পালোয়ানের কথা শুনা যাইত এবং সেখানে দেখিতে পাওয়া যাইত। অবশ্য উহার উদ্দেশ্য বিষয়ে বিশেষ কিছু সাফল্য লাভ হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় না। যে দুই পাঁচজন পালোয়ান বা কুস্তিগিরের এখানে এ পর্য্যন্ত উদ্ভব হইয়াছে, তাহা তাহারই ফল বলিয়াও মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে এখানে কুস্তি খেলার

আই, এফ, এ, শিল্ডের বিজয়ী মোহন বাগান।—১৯১১
ছবির মধ্যের লাইনের বামদিকের প্রথম—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সরকার ওরফে হাবুল সরকার

লোকে তাহাদের নাম করিত, প্রতিযোগিতা হইত, বল-বত্তার আলোচনা চলিত। আজকাল থিয়েটার, ফুটবল বা ভেল্ দিগ্ দিগ্ খেলা যেমন সহরের পল্লীতে পল্লীতে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে এক সময় কুস্তি খেলা ও জিমনাষ্টিকের আড্ডাও তেমনি চন্দননগরের যেখানে ইতিহাস বা বিবরণ তেমন কিছু বলিতে পারিব না, মাত্র কয়েকজন পালোয়ানের কথা বলিব।

গোন্দলপাড়ায় রাধানাথ বেড়েল নামক গোপ জাতীয় একজন প্রসিদ্ধ পালোয়ান ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা অসীম ছিল। কথিত আছে, এক সময় কলিকাতার দুর্গ

* এই প্রবন্ধে লিখিত বিষয়ের মধ্যে কেহ কোন ভুল দেখিলে বা কাহারও কোন নূতন কথা জানা থাকিলে, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখককে চন্দননগরের ঠিকানায় জানাইলে বাধিত হইব।

মধ্যে ইয়োরোপ হইতে একজন মহাবলশালী কুস্তিগির পালোয়ান আইসেন। তিনি ঘোষণা করেন, মল্ল যুদ্ধে যে কেহ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন, তিনি তাঁহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন; এবং পরাজিত হইলে ঐ পরিমাণ টাকা তাঁহাকে দিতে হইবে।

তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়বংশীয় স্বর্গীয় রামধন বাবুর তখন বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি রাধানাথকে বড়ই স্নেহ করিতেন। সাহেবের এই ঘোষণার কথা শুনিয়া, তিনি রাধানাথকে উহার সহিত কুস্তি করিতে অনুরোধ করিলেন। পরাস্ত হইলে, রাধানাথের হাজার টাকা দূরে থাক, হাজার পয়সা দিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং এই অনুরোধে তাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, রাধানাথ পরাস্ত হইলে টাকা তিনি দিবেন, আর জয়ী হইলে প্রাপ্ত টাকা রাধানাথই পাইবে। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া রাধানাথ উক্ত সাহেবের সহিত মল্লযুদ্ধের জন্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত কলিকাতার কেল্লায় গমন করিলেন। সাহেব ইহাতে সম্মত হইয়া দুর্গাধ্যক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

উভয়ের কুস্তির জন্য যে স্থান স্থির হইল, তথা হইতে কতকগুলি কামান গোলা অন্যত্র স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হওয়ায়, অধ্যক্ষের আদেশে বহু সংখ্যক কুলিকে ঐ কার্য্যে নিয়োজিত করা হইল। কুলিদের বিশেষ পরিশ্রম সত্ত্বেও এক একটি কামান সরাইতে অনেক সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাধানাথ বলিল,—"এতগুলি কামান এই ভাবে সরাইতে হইলে ত দশ দিনেও এ কাজ শেষ হইবে না,—বল, কোথায় রাখিতে হইবে, আমি রাখিয়া আসি।"—এই বলিয়া এক একটি কামান লইয়া তিনি স্বচ্ছন্দে অন্যত্র রাখিয়া আসিতে লাগিলেন।

ফুটবল ম্যাচ

রাধানাথের এই কার্য্যে তাঁহার অমানুষিক বলের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সেই পালোয়ান সাহেব আর তাঁহার সহিত কুস্তি করিতে চাহিলেন না; এবং নিজের পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতি মত হাজার টাকা দিলেন।

রাধানাথের পূর্ব্বে ও পরে আর তেমন পালোয়ান এখানে কেহ হইয়াছেন বলিয়া জানিতে পারি নাই। অন্য যাঁহাদের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে পালপাড়ার

৺হারাণচন্দ্র ও তৎপুত্র ৺নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; গোন্দল-পাড়ার ৺ দাশরথি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত নলিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুৎ ব্রজেন্দ্রনাথ বসু; সরিষাপাড়ার কালাচাঁদ চন্দ্র ওরফে কালু চন্দ্র; কাঁটাপুকুরের ৺গগনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গোস্বামীঘাটার ৺জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে পল্টু, ইহারাই প্রধান। ৺হারাণ ও নবীন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পালপাড়ায় উদয়চাঁদ নন্দীর বাগানে আখড়া ছিল। হারাণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় যথেষ্ট বলশালী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি উদয়চাঁদ নন্দীর বাগানে একটি বড় লিচু গাছ বিনা অস্ত্র সাহায্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। দুই জনে সজোরে তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিলেও তিনি একটি রম্ভা গলাধঃকরণ করিতে পারিতেন। নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দৈহিক বল অপেক্ষা কুস্তির কৌশল সকল ভাল জানা ছিল। ৺দাশরথি মুখোপাধ্যায় ডম্বেল ও লাঠি খেলায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতার সহিত সাহসও যথেষ্ট ছিল। শুনা যায়, একবার শিয়ালদহ ষ্টেশনে তিনজন সাহেবের সহিত তাঁহার মারামারি হয়, তিনি একাই তিনজনকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুষ্টি যুদ্ধে এবং ব্রজেন্দ্রবাবু, কালাচাঁদ চন্দ্র, ৺গগনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই কুস্তিতে অল্প বিস্তর পারদর্শী ছিলেন; এবং সকলেই বিলক্ষণ বলবান ছিলেন। কথিত আছে, গগন বাবু তাঁহার কর্ম্মস্থান ছোটনাগপুরে একটি দুরন্ত ঘোড়াকে ভূমি হইতে শূন্যে তুলিয়াছিলেন।

আজকাল মজুমদারগড়ের শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও পদ্মপুকুর সায়রের সুপ্রসিদ্ধ যাত্রার দলের অধিকারী ও খ্যাতনামা বাদক ৺মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর পালোয়ান বলিয়া খ্যাতি আছে। বয়সে প্রাচীন হইলেও কুস্তিতে এখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমকক্ষ এখানে কেহ নাই। তিনি সুপ্রসিদ্ধ পালোয়ান অম্বু গুহ মহাশয়ের শিষ্য। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ন্যায় বলশালী লোক এখানে উপস্থিত আর কেহ আছেন কি না সন্দেহ। ৫।৬টি বলদে যে সব রোলার টানিয়া থাকে, তিনি একাকী তাহা টানিতে পারেন। তাঁহার এই বলের পরিচয় পাইয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কোন পদস্থ পুলিশের কর্ম্মচারী তাঁহাকে একটি পুলিশের কাজ দেন। তিনি এক্ষণে পুলিশের ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিতেছেন।

এখানে কুস্তির আদর ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। চন্দননগরে এক সময় জিমনাষ্টিকেরও খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। এই উভয় বিষয়েই সহরের উত্তরাংশের লোকের কিছু অধিক উৎসাহ ছিল। শ্রীযুত কান্তিপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, কেশবলাল ধড়, কালীপদ নন্দন, অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সেখ করিমবক্স, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী, নারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু, রামচন্দ্র গোস্বামী ও লক্ষ্মণচন্দ্র গোস্বামী ইঁহারা জিমনাষ্টিক খেলায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহাদের উদ্যোগে দুই তিনটি ভাল জিমনাষ্টিকের দল গঠিত হইয়াছিল। শশীবাবু স্কেটিং ও তারের খেলায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে পালপাড়ার ৺বীরচাঁদ বড়ালের বাটীতে পালপাড়ার দলের উদ্যোগে ফরাসী গভর্ণর বাহাদুরকে দেখাইবার জন্য একবার ব্যায়াম-ক্রীড়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। লাট সাহেব তাহা দেখিয়া বাঙ্গালীর ছেলের বল ও সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ফুটবল ও ক্রীকেট খেলার প্রচলনের পূর্ব্বে এখানে ছেলেদের ঘোড়াছুটি, ধাঁসা ও গুলি-ডাণ্ডা খেলার খুব ধুম ছিল। ঘোড়াছুটি কতকটা ভেল্ দিগ্ দিগের মত খেলা। ছেলেদের মধ্যে মারবেল খেলাও পূর্ব্বে খুব প্রচলিত ছিল। ভেল্ দিগ্ দিগ্ প্রাচীন জাতীয় খেলা হইলেও তখন আজকালের মত এত বেশি প্রচলিত ছিল না। উহার পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ছোট ছেলেদের মধ্যে হাপু খেলা নামে একপ্রকার খেলার খুব আদর ছিল। ভেল্ দিগ দিগ্ খেলায় যেমন মুখে একদমে দিগ্ দিগ্ বা একটা কিছু উচ্চারণ করিতে হয়, সেই খেলায়ও একটি ছড়ার মত বলিত। উহা এই রূপ,—

হাপু হাটে হাপু বাটে হাপু কেনে হাপু বেচে।
হাপু খায় হাপু ধায় হাপু নাচে হাপু গায়॥

শুনিয়াছি পল্লীগ্রামে এখনও কোথাও কোথাও এই খেলা প্রচলিত আছে।*

বালক ও যুবকদের মধ্যে ঘুড়ি উড়ান এখানে বহু পূর্ব্বকাল হইতে বেশি রকম প্রচলিত ছিল। এখনও ছেলেরা

* শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের নিকট হইতে এই খেলার কথা জানিতে পারি।—লেখক

ঘুড়ি উড়ায়, কিন্তু পূর্ব্বের তুলনায় অনেক কম। কেহ কেহ অনুমান করেন, নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের তুলনায় এখানে এ খেলার অধিক প্রচলনের কারণ, এখানে তন্তুবায়ের আধিক্য। তাঁতিদের ছেলেরা বস্ত্র বয়নের সূতা দুই চারি খাই একত্র করিয়া সেকালে ঘুড়ি উড়াইত। তাহা হইতেই ঘুড়ি উড়ানর প্রচলন হয়। এ কথার সপক্ষে এই একটি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এখানে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা ও বিজয়া দশমীর দিন ছেলেদের মধ্যে ঘুড়ি উড়ানর আধিক্য দেখা যাইলেও, বিশ্বকর্ম্মা পূজার দিন এ খেলার সর্ব্বাপেক্ষা ধুম দেখা যাইত। অবশ্য অনেকেই জানেন, ঐ দিন তাঁতিদের বয়ন যন্ত্রাদির পূজা হইয়া থাকে, এবং ব্যবসায় কার্য্য বন্ধ থাকে। শুনিয়াছি, ঢাকার তন্তুবায়-প্রধান পল্লীতে ঐ দিন ছেলেরা খুব ঘুড়ি উড়াইয়াথাকে।

৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে মেড়ার লড়াই ও শিকরের লড়াই নিম্নশ্রেণীর মধ্যে একটি আমোদজনক খেলা ছিল। ভদ্র লোকদের মধ্যে এসব না থাকিলেও, খেলার সময় দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে ভদ্রলোকের অভাব থাকিত না। ভারতের অন্যান্য স্থানেও পূর্ব্বে শিকরে এবং মোরগের লড়াই বড়ই আমোদের ব্যাপার ছিল। তখনকার সাহেবরাও এই খেলায় বিশেষ আমোদ উপভোগ করিতেন। সুবিখ্যাত চিত্রকর জোফানির (Zoffany) ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে অঙ্কিত কুক্কুটের লড়াই (Colonel Mordant's Cock Match) নামক একখানি চিত্রে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। উহার মধ্যে জেনারেল মার্টিন (Major General Blaud Martin) কর্ণেল মরডান্ট্ প্রভৃতি কতিপয় পদস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

শত বৎসর পূর্ব্বে চন্দননগরের ভদ্রলোক, বিশেষতঃ ধনীদের মধ্যে মধ্যে ভাল ভাল পাখী পোষার খুব সখ ছিল। বৈকালে বেড়াইতে যাইবার সময় অনেককেই একটি
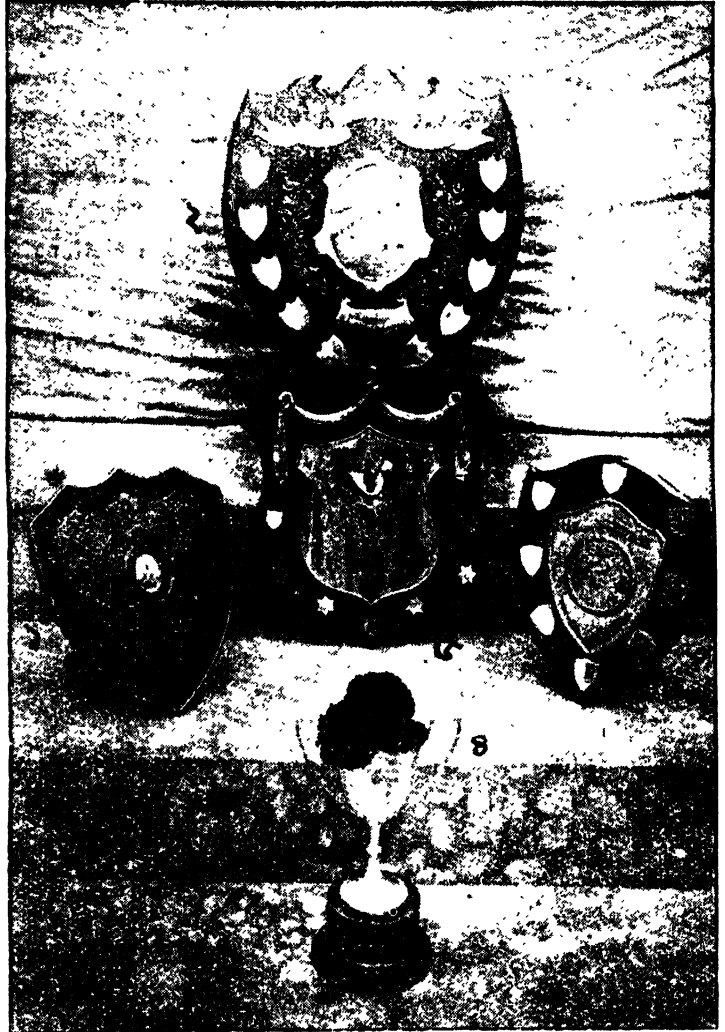
ভেল দিগ্ দিগ্ খেলার প্রতিযোগিতার ঢাল ও কাপ্
(১) বঙ্গীয় ভেল দিগ্ দিগ্ ঢাল (বোড়াই চণ্ডীতলা)
(২) চন্দননগর ভেল দিগ্ দিগ্ ঢাল (কন্ধি)
(৩) চন্দননগর ভেল দিগ্ দিগ্ লীগ্ (কন্ধি)
(৪) ফটকগোড়া ভেল দিগ্ দিগ্ কাপ্ (ফটকগোড়া)
(৫) নিখিল বঙ্গ ভেল দিগ্ দিগ্ ঢাল (পালপাড়া)

করিয়া পাখী হাতে করিয়া বেড়াইতে যাইতে দেখা যাইত।

ক্রীকেট ও ফুটবল খেলার দল এখানে অনেকগুলি ছিল এবং এখনও কয়েকটি আছে। চন্দননগর স্পোর্টিং

ক্লাবই তন্মধ্যে প্রধান। তৎপরে টাওয়ার ওয়াচ্, বেঙ্গল স্পোর্টিং ও ডায়মণ্ড জুবিলী ক্লাবের নাম করা যাইতে পারে। শেষোক্ত দুইটি এখন উঠিয়া গিয়াছে। বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাবেরও এক সময় খ্যাতি ছিল।

চন্দননগর স্পোর্টিং ইং ১৮৮৮ সালে কতিপয় বাঙ্গালী ও ইয়োরোপীয় যুবক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ৺নন্দলাল দত্ত এবং ক্যাপটেন্ ছিলেন শ্রীযুত গগনচন্দ্র ভড়। চন্দননগরের এড্‌মিনিষ্ট্রেটর ইহার সভাপতি। মোহন বাগান, ন্যাস্‌ন্যাল্, এরিয়ান্, হেয়ার

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পলশাই

স্পোর্টিং প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর খেলার দলগুলির নাম যখন সাধারণের নিকট এত খ্যাত ছিল না, চন্দননগর স্পোর্টিংয়ের নাম এতদঞ্চলে তখন বহু লোকের নিকট সুপরিচিত ছিল। ভাদুড়ী ভ্রাতৃদ্বয়, সুকুল, উমেশ মজুমদার প্রভৃতি খেলোয়াড়দের নাম যখন তাদৃশ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই, তখন চন্দননগর স্পোর্টিংয়ের পলশাই (শ্রীযুত সতীশচন্দ্র পলশাই) এর নাম ক্রীড়ক ও ক্রীড়ামোদী ব্যক্তিদের নিকট তখনও সুপরিচিত ছিল। এই ক্লাব্ ইং ১৯১১ সালে ট্রেড্‌স্ কাপ্ (I. F. A. Trades Cup) ১৯১৪ না ১৬ এবং ১৯১৮ না ২১ সালে জি, কে, শিল্ড, (G. K. Shield) ১৯১৭ তে এলেন্ মেমোরিয়াল্ লিগ্, (Allen Memorial League) ১৯১৫তে বার্ণাড্ কাপ (Bernard Cup) এবং ১৯১৪তে ভিক্টোরিয়া কাপ্ (Victoria Cup) লইয়াছিলেন।

ইং ১৯১১ সালে যে বৎসর প্রথম বাঙ্গালী দল—'মোহন বাগান' সুপ্রসিদ্ধ ইষ্ট ইয়র্কস্ (East Yorks) দলকে পরাজিত করিয়া আই, এফ, এ শিল্ড (I. F. A. Shield) লন এবং ১৯০০ সালে যে প্রথম বাঙ্গালী দল 'ন্যাশন্যাল' (National association) ট্রেডস্ কাপ্ লন্ তাহাতে যথাক্রমে এখানকার শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র সরকার ওরফে হাবুল এবং পলশাই সাহায্য করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ পার্ল জিম্‌খানা দল (Pearl Gymkhana) কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ইং ১৯০০ সালে পলশাই বোম্বাই গিয়াছিলেন এবং তথায় কয়েকটি খেলায় বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন এবং সুবর্ণ পদকাদির দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। এই দলের শ্রীযুত ভাগীরথী ঘোষ এরিয়ান্ (Aryans) দলের হইয়া সময় সময় খেলা করিয়াছেন।

উক্ত সকল খ্যাতনামা ক্রীড়ক ভিন্ন আর যে কতিপয় ভাল ফুটবল খেলোয়াড় আছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র নন্দী ও শ্রীযুত বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। হাবুলও অন্যান্য দলের সহিত ভারতের বহু স্থানে খেলিতে গিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ক্রীকেট খেলাতেও তাঁহার সুনাম আছে। তিনি এখন কলিকাতায় থাকেন। ক্লাবের সৃষ্টি হইতেই পলশাই ইহার সহিত জড়িত আছেন এবং এখনও উহার প্রাণস্বরূপ।

চন্দননগর স্পোর্টিং কাপ্ নামে একটি কাপ্ প্রতিযোগিতা খেলার এখানে ব্যবস্থা আছে। অনেক ভাল ভাল দল ইহাতে যোগ দিয়া থাকেন। এই ক্লাবে ফুটবল ক্রীকেট্ ভিন্ন টেনিস্ ও হকি খেলাও হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর হইতে ইহার উদ্যোগে একটি বাৎসরিক স্পোর্টস প্রতিযোগিতা খেলাও হইতেছে। অন্যান্য বহু স্থানের তুলনায় ইহা অনেক ভাল। ইহাতেও কয়েকটি কাপ্ মেডেল ও অন্যান্য মূল্যবান পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। স্বর্গীয় তিনকড়িনাথ বসু মহাশয় যখন ইহার

সম্পাদক ছিলেন, তখন তাঁহার দ্বারা ইং ১৯১৮ সালে ইহা প্রবর্ত্তিত হয়। *

এখানে আরও কয়েকটি বাৎসরিক স্পোর্টস্ প্রতিযোগিতা খেলা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সন্তান সম্প্রদায় এবং পালপাড়া ও সাউলির যুবকবৃন্দের দ্বারা অনুষ্ঠিত খেলা তিনটির নামোল্লেখ করিতে পারা যায়। গত তিন বৎসর হইতে সন্তান সঙ্ঘ অষ্টমী পূজার দিন একটি সন্তরণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত তিন বৎসর হইতে যে প্রসিদ্ধ ২২ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইতেছে; তাহা চন্দননগরের চৌধুরী ঘাট হইতে আরম্ভ হয়। অবশ্য ঢাল ও পদক দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এক্ষণে বাঙ্গলায় শুধু পল্লীগ্রামে নয়, অনেক সহরেও এই ভাবের খেলা হইয়া থাকে। এই জাতীয় খেলাকে সুসংস্কৃত করিয়া শিক্ষিত সমাজের কাছে আদরণীয় করিবার মূলে চন্দননগরের কৃতিত্ব বহু অংশে বিদ্যমান। সহরের কতিপয় যুবক দ্বারা প্রধানতঃ নবভাবে এই খেলা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রায় ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে সুবিখ্যাত 'হিতবাদী' পত্রে, সম্পাদক মহাশয় "দেশীয় ও বিদেশীয় খেলা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে চন্দননগরের যুবকবৃন্দের বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সাগরকালী ঘোষ মহাশয় লিখিত

ট্রেডস্ কাপ্ বিজয়ী স্থাসন্তাল এসোসিয়েশন।—১৯০০
কাপের বামদিকে প্রথম শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পলশাই

ইহাতে চন্দননগরের কোন কৃতিত্বের কথা নাই। বরং প্রতিযোগী প্রভৃতিদের যোগ্য সমাদর না করিতে পারায় চন্দননগরের ক্রটীই হইয়া থাকে।

আজকাল চন্দননগরে ভেল্ দিগ্ দিগ্ খেলার খুবই প্রচলন হইয়াছে। প্রাচীন ভেল্ দিগ্ দিগ্ বা কপাটি খেলাকে কতকটা আধুনিক ভাবে সংস্কার করিয়া এখন এই খেলা হইয়া থাকে এবং ইহার প্রতিযোগিতায় কাপ্, উহার নিয়মাদি সম্বলিত একখানি ছোট পুস্তিকা বোড়াই চণ্ডিতলা বঙ্গীয় ভেল্ দিগ্ দিগ্ ঢাল প্রতিযোগিতা হইতে প্রকাশ করেন। এখানকার বহু সংখ্যক দলের মধ্যে সপ্তরথী, সন্তান, পালপাড়া, (চন্দননগর) কল্কি, গোন্দলপাড়া ও বাগবাজার দলই উল্লেখযোগ্য। ইহাদের কোন কোন দলের প্রতিযোগী খেলার জন্য একখানি করিয়া ঢাল আছে। সপ্তরথী, পালপাড়া, সন্তান ও কল্কি ও অন্য স্থানের বহু দলকে পরাস্ত করিয়া বহুবার প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়াছেন। এই সব খেলার দিন কোন কোন ক্ষেত্রে চন্দননগরের এড্‌মিনিষ্ট্রেটর, স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ

* শ্রীযুত সতীশচন্দ্র পলশাই ও শ্রীযুত মাণিক লাল বড়াল মহাশয়ের নিকট হইতে ক্রীড়কদিগের ও স্পোর্টিং ক্লাবের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। লেখক

প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

তাস, পাশা ও দাবা খেলার এখানে বরাবরই প্রচলন থাকিলেও, ২।৩ বৎসর হইতে এখানে 'রয়েল অক্শান্ ব্রীজ' নামক তাস খেলার বিশেষ আদর হইয়াছে এবং ইহাতেও গত দুই বৎসর হইতে 'এককড়ি নাথ বসু চ্যালেঞ্জ কাপ' নামক একটি কাপ প্রতিযোগিতা খেলার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ বৎসর 'বেণীমাধব নিয়োগী' ও 'মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল কাপ' নামক দুইটি নূতন 'কাপ' খেলার ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতার শ্রীযুত অমরনাথ মিত্র মহাশয়কেই এখানে এই সকল ক্রীড়া-কৌতুকের প্রবর্ত্তনের প্রধান উদ্যোগী বলা যাইতে পারে।

দোলনা

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির

গর্‌মিল *

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(প্রথম অংশ)

১

রায়বাহাদুর মুকুন্দ মজুমদার অনেক দিন হইল জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটী কাজে অবসর লইয়াছেন। কলিকাতার নিকটস্থ রাজনগরে তাঁহার কিছু পৈতৃক জমীদারী ছিল। হাকিমী কাজে যথেষ্ট নগদ টাকা উপার্জ্জন করিয়া তিনি সেইখানেই আসিয়া দস্তুরমত সাহেবী চালে বাস করিতেছিলেন।

পরিবারের মধ্যে তাঁহার পুত্রশোকাতুরা পত্নী কল্যাণী, সদ্য বিধবা পুত্রবধূ কমলা ও নব-বিবাহিতা কন্যা লীলা। একমাত্র পুত্র শশাঙ্কসুন্দর বিবাহের অল্প দিন পরেই তিন দিনের সামান্য জ্বরে মজুমদার পরিবারকে বজ্রাহত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কমলার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া শশাঙ্ক তাহাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিল। সে দরিদ্রা, পিতৃমাতৃহীনা জানিয়াও পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শশাঙ্ক তাহাকে বিবাহ করিয়া আনিতে একটুও ইতস্ততঃ করে নাই। পত্নীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, ও একমাত্র পুত্রটী পাছে অসুখী হয় এই আশঙ্কায়, রায় বাহাদুরও শেষ পর্য্যন্ত এ বিবাহে তেমন জোর আপত্তি করিতে পারেন নাই।

কমলা মজুমদার-গৃহে আসিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই স্বামীর সকল আত্মীয়কেই নিজ গুণে আপন করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু জনমদুঃখিনী অনাথা তাহার ললাট-লিখিত দুর্ভাগ্যকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, বৎসর না ফিরিতেই স্বামীকে হারাইয়াছে। কল্যাণী ও মুকুন্দবাবু এই গুণবতী পুত্রবধূকে লইয়া একমাত্র পুত্রের অভাব-বেদনা যেন কতকটা ভুলিয়াছিলেন। তার পর, এই সেদিন লীলা যখন নরেশকে বরণ করিল এবং রায় বাহাদুর তাহাকে স্বর্গগত পুত্রের স্থলাভিষিক্ত করিয়া আপন গৃহেই চিরদিন রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন, শশাঙ্কর মৃত্যুর পরে এই শোকার্ত্ত পরিবার অনেক দিনের পরে আবার যেন একটু সুস্থ হইয়া উঠিল।

লীলার বিবাহের এখনও এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই। রায় বাহাদুর মুকুন্দ মজুমদার সেদিন সকালে একটি আপাদলম্বিত ড্রেসিং-গাউনে আবৃত হইয়া তাঁহার ড্রয়িং-রুমের একখানি আরাম-চৌকীতে হেলান দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। নরেশ ঘরে ঢুকিয়া শ্বশুরের পাশের চায়ের টেবিলটার দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিল "যাক্, বড় বেঁচে গেছি! আজ যখন চা আসেনি এখনও, তখন নিশ্চয়ই আমার উঠ্‌তে বেশী দেরী হয়নি!"

মজুমদার সাহেব খবরের কাগজ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নরেশের দিকে চাহিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন। নরেশ তাহা দেখিয়া শশব্যস্তে শশুরের নিকট সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি? আজ কি কাগজে কিছু ভয়ানক খবর বেরিয়েছে? জার্ম্মানরা প্যারিসে ঢুকে পড়েছে বুঝি?"

মজুমদার সাহেব জামাতার পোষাকের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "এই দারুণ শীতে তুমি কেবল একটা ফ্লানেলের সার্ট গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লে কি বলে? তোমরা ছেলে-ছোকরার দল শরীর সম্বন্ধে বড্ড অসাবধানী! এখনি হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে জানো? যাও, যাও, শিগ্‌গীর তোমার ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে এসো।"

নরেশ শান্ত বালকের মতো তৎক্ষণাৎ ভিতরে গিয়া ওভারকোটটী পরিয়া আসিল। মজুমদার সাহেব একটা মোটা চুরুট ধরাইয়া বলিতে লাগিলেন "দেখ নরেশ, ওই কোরেই সে ছোঁড়াটা বাঁচ্‌লো না। সকালে রোজ ঘর থেকে বার হবার সময় কিছু না পাও তো অন্ততঃ বিছানার চাদরখানাও গায়ে জড়িয়ে তবে বাইরে বেরোবে। খবর্দ্দার যেন হঠাৎ ঠাণ্ডা না লাগে।"

---

* Bjorns jernee Bjornson's De Nygifte (Newly Married Couple) শীর্ষক নাটিকা অবলম্বনে।

নরেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল "যে আজ্ঞে, এবার থেকে তাই কোরবো।"

চায়ের সরঞ্জাম সমেত একখানি ট্রে হাতে করিয়া কমলা এবং তাহার পশ্চাতে একখানি রেশমী পাড়-বসানো খয়েরি রংয়ের আলোয়ানে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া কল্যাণী ঘরে আসিবামাত্র মজুমদার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "লীলার কি হোলো? সে আজ এখনও ওঠেনি কেন?"

"এই যে বাবা আমি উঠেছি—! আমার অল্‌ষ্টারটা খুঁজে পাচ্ছিনি, তাই ঘর থেকে বেরোতে পাচ্ছিনি। এই যে পেয়েছি—" বলিতে বলিতে একটা চমৎকার লেডীজ্ অল্‌ষ্টার্ হাতে করিয়াই লীলা আসিয়া উপস্থিত হইল। নরেশ তখন শ্বশুরের পরিত্যক্ত খবরের কাগজখানা একমনে পড়িতে সুরু করিয়াছে।

কমলা চায়ের টেবিলের উপর ট্রে'খানি গুছাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

কল্যাণী মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন "উঠ্‌তে এত বেলা করলি যে লিলি! কোন অসুখ বিসুখ করেনি তো?"

লীলা অল্‌ষ্টারটা পরিতে পরিতে মরাল গ্রীবাটি লীলায়িত ভঙ্গীতে সঞ্চালন করিয়া বলিল "না মা, রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি বলে, ভোরের দিকটায় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তোমার কাশিটা একটু কমেছে কি?"

কল্যাণী ইহার কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মজুমদার সাহেব বলিয়া উঠিলেন "তোমার মার শরীর বড্ডই খারাপ। কাল রাত্রে খুব কেশেছেন। আমি ডাক্তার চাটার্জ্জীকে আসবার জন্যে লিখে পাঠিয়েছি।" পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "ডাক্তার এলে লিলিকেও একবার দেখে যেতে বোলো। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না বল্‌ছে, ওটা তো ভাল কথা নয়।"

লীলা চায়ের পেয়ালাগুলি ভর্ত্তি করিয়া সবার হাতে একটী একটী তুলিয়া দিল, কেবল নরেশের বাটিটা টেবিলের উপরই একটু নরেশের দিকে ঠেলিয়া রাখিয়া, নিজের জন্ত এক পেয়ালা হাতে লইয়া মার পাশের একখানি সোফায় আসিয়া বসিল।

কল্যাণী চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে বলিলেন "লিলি, আমি বোধ হয় আজ চারুদের ওখানে নিমন্ত্রণে যেতে পারবো না!"

লীলা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন মা! শরীরটা কি আজ বড্ড খারাপ বোধ হচ্ছে!"

মজুমদার সাহেব চাম্‌চে দিয়া চায়ের পেয়ালার চিনিটুকু নাড়িয়া লইয়া বলিলেন "এইমাত্র আমার কাছে শুন্‌লে তো লিলি, যে কাল সমস্ত রাত উনি কেশেছেন, তবু আবার—"

কল্যাণী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন "সমস্ত রাত বোল না, মোটে দু'বার তো কেশেছিলুম।" বলিতে বলিতে কল্যাণী কাশিয়া উঠিলেন। মজুমদার সাহেব তাড়াতাড়ি একঢোঁক চা গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন "ওই দেখ, এখনও কাশছো, আর বল্‌ছো মোটে দুবার! এই ঠাণ্ডায় রাত্রে তোমার কিছুতেই নেমন্তন্নে যাওয়া হ'তে পারে না।"

লীলা চায়ের পেয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া বলিল "মার যখন এতো অসুখ, তখন আমরাও কেউ আর নেমন্তন্নে যাবো না।"

লীলার এই কথা শুনিয়া মজুমদার সাহেব উৎসাহিত হইয়া বলিলেন "সেই ভালো, এই হিমে তোমাদেরও আর গিয়ে কাজ নাই, সময়টা বড় খারাপ, চারিদিকে অসুখ বিসুখ হচ্ছে।"

কল্যাণী তাড়াতাড়ি বলিলেন "না না, সেটা ভালো দেখায় না। চারু এসে অমন কোরে সকলকে যাবার জন্ত বলে গেছে,—কেউ না গেলে সে কি মনে করবে? কি বল নরেশ?—"

নরেশ খবরের কাগজখানি ভাঁজ করিয়া টেবিলের উপর রাখিল; নিঃশেষিত চায়ের পেয়ালাটি তাহার উপর চাপাইয়া দিয়া বলিল "আমিও ওই কথাই বোল্‌বো মনে করছিলুম। কারুর না যাওয়াটা একটু অভদ্রতা হবে।"

মজুমদার সাহেব বলিলেন "তাতে আর কি হ'য়েছে, একখানা চিঠি লিখে তাকে আগে থাক্‌তে খবর দাও না যে তোমরা কেউ যেতে পার্ব্বে না।"

নরেশ যেন একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল "হ্যাঁ, তা'করলেও হয় বটে, কিন্তু কারুর একেবারে না যাওয়াটা কি ভালো দেখাবে?—"

লীলা তাহার পিতার দিকে চাহিয়া বলিল "মার অসুখের কথা লিখে দিলে তাঁরা বোধ হয় কিছু মনে কর্ব্বেন না, কি বল বাবা?"

নরেশ তখন শাশুড়ীর দিকে ফিরিয়া বলিল "আপনি জানেন তো মা, চারু আমাদের বিয়ের সময় এখানে ছিল না। আমেরিকা থেকে এসে যেদিন শুনেছে, সেই দিন থেকেই আমাদের একদিন নিয়ে গিয়ে আমোদ ক'রবে বল্‌ছে। আজকে সে যখন তার সমস্ত আয়োজন করেছে, নিজে স্ত্রীকে সঙ্গে করে এসে আমাদের সকলকে যাবার জন্য বিশেষ ক'রে বলে গেছে, তখন অন্ততঃ আমাদের দুজনের নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত, কি বলুন ?"

কল্যাণী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "নিশ্চয়, কেন না তোমাদের দুজনের খাতিরেই সে আজ খরচপত্র করে এই আয়োজন করছে।"

লীলা অসহিষ্ণুর মত বলিয়া উঠিল "কিন্তু তুমি তো যেতে পার্ব্বে না মা ! তোমার এই অসুখ শরীর ; তোমাকে ফেলে রেখে আমি একলা সেখানে গিয়ে তো একটুও আমোদ পাবো না !"

ইহার উত্তরে গম্ভীর ভাবে নরেশ বলিল "আমোদ পাওয়া যায় না এমন অনেক কাজই সংসারে থাক্‌তে হলে মানুষকে করতে হয়।"

লীলা একবার চকিতে নরেশের দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল "সে হয় কর্ত্তব্যের খাতিরে, কিন্তু এখানে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে মার ভাল-মন্দ দেখা। এই রোগা মানুষকে একলা বাড়ীতে ফেলে রেখে আমি কি আমোদ করতে যেতে পারি ?"

নরেশ একটু অপ্রতিভের মত মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল "কেন, বৌদি তো রয়েছেন, তিনিই তো সব দেখেন শোনেন—তিনি কি—"

বাধা দিয়া লীলা বলিল "মার প্রতি মেয়েরও তো একটা কর্ত্তব্য আছে। হাজার কেন যেই থাক না, তবু আমার কাজ তো আমাকে করতে হবে। আমি বুড়ো মেয়ে, তাঁর এমন অসুখ দেখেও কি বলে সেজেগুজে নেমন্তন্ন খেতে যাবো ?"

নরেশ কাতরভাবে গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "হ্যাঁ মা, আপনার কি বড্ড অসুখ ? আমি কিন্তু এতক্ষণ তা বুঝতে পারিনি !"

ইহার উত্তরে রায় বাহাদুর মুকুন্দ মজুমদার তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর আরও গম্ভীরতর করিয়া বলিলেন "তুমি কি শুন্‌তে পাওনি নরেশ, আমি সকাল থেকে দশবার বলিছি যে ওঁর শরীর বড্ডই খারাপ, কাল সমস্ত রাত কেশেছেন ?"

কর্ত্তার কণ্ঠস্বরে বিচলিত হইয়া কল্যাণী বলিলেন "আমি যে নিজে বলিছিলুম গো, যে মোটে বার-দুই কেশেছি,—তাই বোধ হয় নরেশ মনে করেছে আমার অসুখটা তেমন কিছু নয়" বলিতে বলিতে গৃহিণীর দৃষ্টি পড়িল জামাতার রুদ্ধরোষে আরক্ত ও অপমানে আহত অবনত মুখের উপর। তিনি বলিতে লাগিলেন "আর যথার্থই তো তাই ! এমনিই বা কি অসুখ করেছে আমার ? তোমাদের বাপু কেমন যেন বাড়াবাড়ি করাটা একটা অভ্যেস ! একটু কেশেছি বই ত নয় !"

"কাশিটাকে সামান্য বলে অগ্রাহ্য করা ঠিক নয়" বলিয়া মজুমদার সাহেব খবরের কাগজখানা তুলিয়া লইয়া আবার পড়িতে সুরু করিলেন ; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে আবার সেখানি মুড়িয়া রাখিয়া দুই একবার গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন "আর কি জানো—কাল থেকে আমার নিজের শরীরটাও তত ভাল বোধ করছিনে। কেমন যেন—"

ব্যস্ত হইয়া কল্যাণী বলিয়া উঠিলেন "তাইতো, তোমার গলাবন্ধটা তো আজ নাওনি দেখ্‌ছি ? দাঁতের গোড়াটা বোধ হয় কন্ কন্ করছে ; ও লিলি, যা মা, ওঁর গলাবন্ধটা ও ঘর থেকে শীগ্‌গির এনে দে।"

লীলা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া গলাবন্ধটা লইয়া আসিল এবং অতি যত্নের সহিত পিতার কণ্ঠে জড়াইয়া দিতে লাগিল। কল্যাণী বলিতে লাগিলেন "তাইতো বলি, আজ আমাদের কাগজ পড়ে লড়াইয়ের কোন খবর শোনালে না কেন ; আমি মনে করিছিলুম আজ বুঝি কাগজে তেমন নতুন খবর কিছু নেই।"

রায় বাহাদুর ডানদিকের দাঁতের গোড়াটায় হাত চাপা দিয়া অন্ধ নাচারের মতো কাতর কণ্ঠে বলিলেন "আজ নরেশ আমাদের কাগজটা প'ড়ে শোনাক্ ; আমার শরীরটা তত ভাল নেই।"

নরেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে যেন শোনাচ্ছি, কিন্তু চারুর ওখানে নেমন্তন্নে যাবার কি হবে, তার তো একটা কিছু ঠিক হোল না।"

লীলা এবার নরেশের দিকে একটু ভ্রূকুটি করিয়া মাকে

বলিল "আচ্ছা মা, উনি কেন একলাই নেমন্তন্ন রাখতে যান না।"

নরেশ তৎক্ষণাৎ চেয়ার সমেত গৃহিণীর নিকট আরও সরিয়া আসিয়া বলিল "দেখুন মা, এটা যদি অন্য কোনও একটা সামাজিক ব্যাপারের নেমন্তন্ন হোতো, তা হ'লে ওকে নে যাবার জন্যে আমার কোনই মাথা-ব্যথা ছিল না। আমি একলা গিয়েই স্বচ্ছন্দে নেমন্তন্ন রেখে আসতে পারতুম। কিন্তু, আপনি তো জানেন, কেবল ওকে নিয়ে যাবার জন্যেই সে আজ এই আয়োজন করেছে। যার জন্যেই সব, তিনিই যেতে পারবেন না! এ সব ছেলে-মানুষী কথা নয়?"

গৃহিণী ইহাতে সায় দিয়া বলিলেন "তা বই কি! নরেশ না গেলেও হয়ত' চোলতো, কিন্তু তোমার না যাওয়াটা ভারি অন্যায় হবে লীলা।"

নরেশ উৎসাহিত হইয়া বলিল "সেই জন্যেই তো আমি এতটা পেড়াপিড়ি করছি, নইলে আপনার অসুখ শুনেও আমি কি নেমন্তন্ন যাওয়ার কথা মুখে আনতে পারতুম?"

বিরক্ত হইয়া লীলা বলিল "তা হ্যাঁ মা, তোমার এই অসুখ, বাবার শরীরটাও ভাল নয়, এ অবস্থায় আমি কি ক'রে নেমন্তন্ন রাখতে যাই বল তো? এটা ওঁর মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না কেন জানিনি।"

নরেশ এবার রাগিয়া উঠিয়া বলিল—"শুনলেন তো মা, কি রকম আহাম্মুকের মত কথা! উনি যে আমার স্ত্রী, সেটা একেবারেই বেমালুম ভুলে গেছেন। চারু যখন কেবল আমার আর আমার স্ত্রীর অভিনন্দনের জন্যেই আজকের এই সমারোহ ব্যাপারটা খাড়া করেছে, তখন আমার স্ত্রী হিসেবে ওর সহস্র ক্ষতি স্বীকার করেও যে আজ সেখানে উপস্থিত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন, এটা ও কিছুতেই বুঝতে পার্চ্ছে না।"

রায় বাহাদুর মুকুন্দ মজুমদার তাঁহার দামী চামড়ার খাপ হইতে আর একটা বড় চুরুট বাহির করিয়া ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন "আচ্ছা, এক কাজ করা যাক্ নরেশ। ওদের সকলকে একদিন আমাদের এখানে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে বেশ পরিতোষ করে খাইয়ে দেওয়া যাক্, কি বল? এই তো আসছে মাসে লীলার বের ঠিক এক বছর পূর্ণ হবে, সেদিন একটা সাম্বৎসরিক উৎসবের আয়োজন করা যাবে এখন। বেশ নতুন রকমের একটা ব্যাপার হবে, অনেকটা ইংরিজী ধরণের, কি বল?"

কল্যাণী মৃদু হাস্যে তাঁহার সম্মতি জানাইয়া বলিলেন "মন্দ নয়, সে একটা বেশ নতুন রকমের আমোদ হবে বটে। জন্মতিথির পুজো, বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, এ সবই আমাদের রয়েছে, কিন্তু বিয়ের তো কই কিছু সাম্বৎসরিক স্মৃতির ব্যবস্থা নেই! ওটাও আরম্ভ করে দিলে মন্দ হয় না।"

নরেশ ইত্যবসরে উঠিয়া গিয়া লীলার পিছন হইতে তাহার সোফার পিঠের উপর ভর দিয়া তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, চুপি চুপি বলিতেছিল "পুজোর সময় তোমায় যে নেক্‌লেসটা কিনে দিয়েছি, সেটা পরলে তোমায় কেমন মানায় আমার সেটা একবার দেখবার ইচ্ছে আছে। সেইটি পরে আজকে তোমায় নেমন্তন্নে যেতে হবে।"

লীলা ঘাড় নাড়িয়া মৃদু স্বরে বলিল "উহুঁ, মা-বাবাকে এ রকম অবস্থায় ফেলে রেখে আমি নেমন্তন্নে গিয়ে একটুও স্বোয়াস্তি পাবো না। নেকলেস্ ছড়াটা আমার গলায় যেন সাপের মতো জড়িয়ে ধরেছে বলে মনে হবে।"

এমন সময় রায় বাহাদুর বলিলেন "তা'হলে রাজি আছো নরেশ! উৎসবের আয়োজনটা তবে সুরু করে দিই?"

ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ নিরাশ ও ব্যথিত চিত্তে নরেশ লীলার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া বলিল "আচ্ছা, সে যা হোক এর পর করা যাবে না হয়, এখন যখন না যাওয়াটাই সাব্যস্ত হোলো, তখন এই বেলা আমি তাদের একটা খবর পাঠিয়ে দিইগে" বলিতে বলিতে নরেশ মুখখানি অন্ধকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, মজুমদার সাহেব তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "ওহে, শোন, শোন, চিঠিটা আমিই লিখে দিচ্ছি। তোমার লেখার চেয়ে আমার লিখে দেওয়াটাই এস্থলে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে।"

কল্যাণী বলিলেন "সেই ভাল, তুমি যখন বাড়ীর কর্ত্তা, তখন আমাদের সকলের হোয়ে তুমিই চারুকে লিখে পাঠাও। না যেতে পারবার কারণটা বেশ স্পষ্ট করে লিখো। আর দেখ, আমার নাম করে আর একটু লিখে দিও যে, এই যে আজ আমরা কেউ তার ওখানে উপস্থিত

. .ত পারলুম না, এটা আমাদের একটা পরম দুর্ভাগ্য বলে : .ন হচ্ছে; আর এই দুর্ঘটনার জন্যে সব চেয়ে বেশি দুঃখিত হোয়েছেন লীলার মা।"

কর্ত্তা শুনিয়া নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত বলিলেন "আচ্ছা, আচ্ছা, থামো, সে জন্যে তোমার কোনও চিন্তা নেই। আমি আজ এই বিশ বছরের ওপোর শুধু কলমের জোরেই এতগুলো জেলা শাসন করে এসেছি; কি লিখতে হবে না হবে সে আর তোমাকে আমার কাছে বাত্‌লে দিতে হবে না।"

এমন সময় কমলা আসিয়া দ্বারের বাহির হইতে বলিল "বাবা, আপনার নাইবার জল গরম হোয়েছে, স্নানের ঘরে পাঠিয়ে দেবো? এখন নাইবেন কি?"

কমলাকে দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন "হ্যাঁ বৌমা, তুমি তো কই আজ চা খেতে এলে না?"

লীলা বলিয়া উঠিল, "বৌদি যে চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, আর কোন দিন খাবে না বলেছে।"

নরেশ শুনিয়া বলিল "সত্যি বৌদি, কি ক'রে তুমি চা খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে বল ত? চা না খেয়ে আজ এ ক'দিন আছো কেমন করে?"

কমলা ইহার কোনও উত্তর না দিয়া নতমুখে ঈষৎ হাসিয়া শ্বশুরকে আবার স্নানের তাগিদ্‌ দিল। কর্ত্তা তখন ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাই তো, স্নানের সময় হোয়েছে দেখছি! তা'চল, স্নানটা সেরে নিই।"

ড্রেসিং গাউনটা খুলিতে খুলিতে মজুমদার সাহেব উঠিয়া কমলার সহিত বাহির হইয়া গেলেন। কল্যাণীও উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "যাই—একবার রান্নাবান্নার কতদূর কি হচ্ছে দেখে আসি। নতুন বামুনঠাকুরকে নিয়ে বৌমা একা ভারি মুস্কিলে পড়েছে।"

লীলা বলিল "কিন্তু লোকটা রাঁধে ভালো।"

"বাঙালী বামুন কি না, সব জানে শোনে" বলিয়া গৃহিণীও বাহির হইয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

ভোরের বায়

মৌলবী গোলাম মোস্তফা বি-এ, ব-টি

(আরবী ছন্দ—মোজারাহ্‌)

ছন্দ-সূত্র :—

মফা- । ঈল ফাএলাত । মফা- ঈল ফাএলাত

ভোরের । বায় বও যবে । প্রিয়ার । দ্বার-পাশ দিয়ে

ভোরের বায় বও যবে, প্রিয়ার দ্বার পাশ দিয়ে　　ব্যথার দাগ নাই দিও কোমল তার প্রাণ-পুটে!
এস তার আধ-ফোটা কুসুম গা'র বাস নিয়ে।　　বুকের নীল চিল বাসে দোদুল দোল নাই দিও,
চারু শ্যাম কেশ-পাশে ছাওয়া তা'র মুখখানি,　　গোপন ধীর পা'য় সেথা ক্ষণ- কাল তিষ্ঠিও;
চির- পূত প্রেম-সুধায় ভর- পুর বুকখানি।　　বুকে লীন যেই ভাষা চির মূক প্রেম-লাজে,
যেন শ্যাম পত্র-ছায় শোভা পায় লাল্‌ গোলাপ　　শুনো তাই কাণ দিয়ে পশি' তার বুক মাঝে!
মুখে ধীর-স্নিগ্ধ হাস, বুকে লাজ রক্ত-ছাপ!　　বুকে তার কোন্‌ আশা সদা যায় চঞ্চলি—
ছাড়ি' সে-ই ফুল-রাণী কেন যাও ফুল-বাগে,　　করে কার প্রেম-পূজা ভরি' তার অঞ্জলি'
কেন আন্‌-ফুল দেখি' তব তায় মন লাগে?　　হিয়া কার পথ চাহি সারা রাত রয় জেগে,
ওগো মোর প্রেম-দূতী, আমি চাই চাই তোমায়,　　ফোটে কোন্‌ প্রেম্‌-বাণী সেথা কার রং লেগে!
এনে দাও তা'র খবর ব্যথা- ম্লান এই হিয়ায়!　　সেকি মোর নাম জপে, কভু মোর গান কি গায়?
দখিন্‌ দ্বার-তার খোলা, সেথা যাও চুপ করি'　　কভু মোর প্রেম-পরশ বুকে তার প্রাণ কি চায়?
শিথিল তার কেশ-পাশে বেড়াও ধীর সঞ্চরি!　　এনে দাও সেই খবর আজি দূর পর্‌বাসে
ঘুমের ঘোর দুই চোখে যেন তার নাই টুটে,　　হৃদি- দ্বার মোর খুলি' আছি আজ সেই আশে।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত বি-এ

"পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকাগৃহ—আর এক দৃশ্য শ্মশান—" এই দুই দৃশ্যের দুই দিকে যে ঘনতমসাবৃত যবনিকা রহিয়াছে, তাহা উত্তোলন করিবার জন্য মানুষ আদি কাল হইতেই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। সেই চেষ্টার ফলে সে লাভ করিয়াছে—অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। সুখ দুঃখের মধ্যে থাকিয়াও মানুষ আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চায়। সে "জলের তরঙ্গ জলে হবে লয়"—এই ধারণাকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারে না। আর তাহা পারে না বলিয়াই আকুলি বিকুলি করিয়া জানিতে চায়, ঐ ঘনকৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে কি লুক্কায়িত আছে। এই জীবন—এই হাসি-কান্না—সুখদুঃখের তরঙ্গ—সবই কি তবে দু' দিনের? দু'দিনের হাসি কি দু'দিনেই ফুরাবে, জীবন-দীপ কি অনন্ত অন্ধকারে নিবিয়া যাইবে? তবে এ ব্যর্থ সৃষ্টির—এ ছেলে-খেলার কি প্রয়োজন ছিল? মানুষের অন্তর-দেবতা বলিলেন না, এ দুদিনের নয়, জীবন স্বপন নয়—সৃষ্টি মায়া-প্রহেলিকা নয়—তার পিছনে বাস্তব সত্য একটা আছে—তার অনুসন্ধান কর। সেই অনুসন্ধানের ফল—অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান।

অনন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষায় মানব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিল—কি, মানবের ভিতরে যে অনন্তের বীজ রহিয়াছে, তাহাই তাহাকে অনুসন্ধানে প্রেরণা দিয়াছিল—এখানে তাহার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তবে অনুসন্ধানের প্রথম লক্ষ্য ছিল, জীবন—এই পার্থিব মৃত্যুর পরে মানুষের অস্তিত্ব থাকে কি না, তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।

ভারতে অতি প্রাচীন কালেই যে এই বিজ্ঞানের যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়াছিল, তাহা প্রাচীন সাহিত্য একটু আলোচনা করিলেই জানা যায়। কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, আমাদের চরম পরিণতি কি—এ সমস্যার সমাধান করিবার জন্য প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। জগতের সমস্ত সভ্য জাতিই অল্পাধিক পরিমাণে এ সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা

করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতের মনীষীদের মত এত উন্নত স্তরে অন্য কোন জাতি পৌঁছিয়াছিলেন কি না জানি না।

মানুষকে সমগ্র ভাবে দেখিতে গেলে, সমস্ত জগৎকে দেখিতে হয়,—ইহকাল ও পরকাল অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে। তখন অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানে গিয়া পৌঁছায়। আমাদের দেশে এই বিজ্ঞানই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল বলিলে হয়ত অত্যুক্তি হইবে—কিন্তু উহাই যে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগোপযোগী ভাবে আমরা সেই জ্ঞানালোচনায় অনেক পশ্চাৎপদ রহিয়াছি—এটা আমাদের পক্ষে খুব প্রশংসার কথা নয়।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের পূর্ণাবস্থা—ব্রহ্মজ্ঞান—সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না—বলিবার শক্তিও নাই। তবে বর্ত্তমান অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দু'একটী কথা এ প্রবন্ধে বলিতে চেষ্টা করিব।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা হইয়া থাকিলেও, বর্ত্তমান বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে আলোচনা অধিক দিন যাবৎ আরব্ধ হয় নাই। আমাদের দেশে যে আলোচনা ও গবেষণা প্রাচীন পদ্ধতিতে হইয়াছে, তাহা ধর্ম্ম-সাধনার অঙ্গীভূত যোগ-প্রণালীর সাহায্যে,—ব্রহ্মসাধনার আনুষঙ্গিক বিষয় রূপে। তাই ইহা কিরূপে জনসাধারণের আয়ত্তাধীন হইতে পারে, সে চেষ্টা হয় নাই। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সেই চেষ্টা করিতেছে এবং তাহার সম্বন্ধেই এই প্রবন্ধে দু'একটী কথা বলিবার ইচ্ছা আছে।

এ বিষয়ে আর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে নব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। আমাদের দেশে এ বিষয়ে আলোচনা খুব বেশী হয় নাই, এবং খুব বেশী লোকেও এ আলোচনা করেন নাই। যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাও অনেকে ইংরেজী ভাষার সাহায্য লইয়াছেন। তাই এই বিজ্ঞানের পুনঃজাগরণের দিনে তাহার নাম-তত্ত্ব লইয়া একটু আলোচনা করা বোধ হয় একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সম্প্রতি 'ভারতবর্ষে' 'প্রেত-তত্ত্ব' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ দেখিলাম। আমরা যে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি—সেটা খুব সুখের বিষয়। কিন্তু নাম ও সংজ্ঞা (Nomenclature) সম্বন্ধে আমাদের একটু অবহিত হইতে হইবে।

'প্রেত' শব্দটার প্রাচীন কালে যে অর্থই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে উহা ঘৃণার্থ ব্যবহৃত হয়। পুরাণাদিতেও উহা ঘৃণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা এই পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে 'প্রেত' শব্দে অভিহিত করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। ধরুন, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বা নিজের কোন আত্মীয়ের পরলোকগত আত্মাকে 'প্রেত' বা 'প্রেতাত্মা' বলিয়া অভিহিত করা কি সঙ্গত হইবে? অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানেও 'প্রেত' শব্দে অতি নিম্নস্তরের বিগতাত্মাকে (Evil Spirit) বুঝায়। ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরও এরূপ স্থলে 'প্রেত' শব্দের ব্যবহারে আপত্তি করিয়াছেন, এবং পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ভেদে 'আত্মিক' ও 'আত্মিকা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আমরাও উহা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। অথবা 'বৈদেহিক আত্মা' 'বিগতাত্মা' প্রভৃতিও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান শব্দও আমরা ইংরেজী "Psychical Science" অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। Spiritualismএর পরিবর্ত্তেও বাংলায় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; কিন্তু Psychical Science, এবং Spiritualismএ একটু তফাৎ আছে। Spiritualism বলিলে spirit অথবা মৃতাত্মা ও পরলোক সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বুঝায়। অবশ্য spirit শব্দ soul অর্থেও ব্যবহৃত হয়—কিন্তু বর্ত্তমানে উহা প্রথমোক্ত অর্থেই প্রচলিত হইয়াছে। Psychical Science, অথবা Psychic Philosophy, Spiritualismএর চেয়ে অনেক বিস্তৃত ক্ষেত্র অধিকার করে। মনোরাজ্যের যাবতীয় বিষয় উহার অন্তর্ভুক্ত। তাই Psychical Science = অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, এবং Spiritualism = আত্মিক বিজ্ঞান, এইরূপ অভিধাই সঙ্গত মনে করি। আত্মিক বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের একটা অংশ মাত্র। অন্যান্য সংজ্ঞা সম্বন্ধে যথা সময়ে আলোচনা করা যাইবে।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ব্রহ্ম-সাধনার আনুষঙ্গিক বিষয় রূপে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা হইয়া

ছিল; কিন্তু স্বতন্ত্র বিজ্ঞান রূপে উহা আমাদের অবধান আকর্ষণ করে নাই। অপর পক্ষে অনেক স্থলে ব্রহ্ম-সাধনের অন্তরায় বলিয়া উহার নিন্দা করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবও 'অষ্টসিদ্ধি'কে অতি ঘৃণ্য পদার্থের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ যোগমার্গ অবলম্বনে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের চর্চা সহজসাধ্যও নয়। এই সমস্ত কারণে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। সাধারণ লোক উহাকে দৈব শক্তি ভাবিত, এবং সাধারণের আয়ত্তাধীন নয় মনে করিয়া দূরে থাকিত।

এই দৈবজ্ঞানকে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জনসাধারণের আলোচনার উপযোগী করিয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হয়ত প্রাচ্য যোগ-বিজ্ঞানের উন্নত পূর্ণাবস্থা এখনও পায় নাই; কিন্তু এখন সকলেই উহার অল্প-বিস্তর আলোচনা করিতে পারেন। পাশ্চাত্য সহজ প্রথার অনুসরণে যাহাতে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান প্রাচ্য যোগ-বিজ্ঞানের ন্যায় এত উন্নত না হইলেও, আমাদের অনেক উপকার সাধন করিয়াছে। এই পরদেশাগত বিজ্ঞানের মুকুরে আমরা নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া নিজেকে চিনিতে পারিয়াছি। কথাটা বাহ্যতঃ একটু পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হইলেও—সত্য। প্রথমতঃ আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র আলোকে নিজেকে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিলাম—আমাদের নিজেদের যাহা কিছু তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্যই যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম। অবশ্য এ ভাব স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু উহার প্রভাব একেবারে নষ্টও হয় নাই। তাই যখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমাদের নিজস্ব ধনের মূল্য কষিয়া দিতে লাগিল, তখনই আমরা একটু আশ্বস্ত চিত্তে ঘরের ধন সামলাইতে মনোযোগ দিলাম। ইহার আরও একটা কারণ ছিল। তুলনা ব্যতীত কোন বিষয়ের সম্যক জ্ঞান লাভ হয় না। যখন কেবল মাত্র আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা সম্বল ছিল—তখন উহার উপর আমরা সম্যক আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই—একপেশে জ্ঞান বলিয়া একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিতাম। কিন্তু যখন দেখা গেল—বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে থাকিয়া ভিন্ন পথাবলম্বনে অন্তেও সেই একরূপ জ্ঞানই লাভ করিয়াছে, তখন আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না—নিঃসংশয়ে আমরা সেই জ্ঞানকে সাদরে বরণ করিয়া লইলাম।

তাই আজ আমাদের নিজ দেশের সাধন-লব্ধ অধ্যাত্ম জ্ঞান আর সন্দেহের বিষয় নয়। বিশেষতঃ উহা এখন প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল বলিয়া অন্যান্য জড়-বিজ্ঞানের সঙ্গে সমান আসন পাইয়াছে। জড়-বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের তুলনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়—আমরা কেবলমাত্র উভয় বিজ্ঞানের আলোচনার উপায়ের সমতার কথা বলিতেছি। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সব সন্দেহ, অজ্ঞানতা দূর হইবার আরও একটা বিশেষ কারণ এই যে, উহা আজ কেবল মাত্র জনকয়েক যোগী বা ধর্ম্ম-সাধক সংসার-ত্যাগীর মধ্যে আবদ্ধ 'দৈব শক্তি' বা 'গুপ্ত-বিদ্যা' নয়—অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান আজ জনসাধারণের লভ্য বস্তু।

এই নূতন পন্থায় প্রাচীন সাধনার ফলকে লোকের সাক্ষাতে ধরিতে হইবে। বেদ, উপনিষদ, তন্ত্রে যে অভিজ্ঞতার ফল লিপিবদ্ধ আছে, তাহা যে গঞ্জিকা-সেবীর উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা নয়—বাস্তব সত্য, তাহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ বিজ্ঞানের সাহায্যে দেখাইতে হইবে। শ্রীযুক্ত অরবিন্দবাবু তাঁহার গীতার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—কেহ যদি বলে যে একজন হিপনোটিষ্ট তাহার সাবজেক্টকে (Subject) সম্মোহিত করিয়া দূর বঙ্গদেশের সংবাদ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা আমরা বিশ্বাস করি; কিন্তু তাহার চেয়ে বহুগুণে বেশী অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন ব্যাসদেবের কৃপায় সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষু লাভ হইয়াছিল, এ কথাটা আমরা বিশ্বাস করি না! এই বিশ্বাস না করার কারণ অনেকটা উপরে বলিয়াছি। বিশ্বাস নয় শুধু—জ্ঞান আনিতে হইবে—বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহস্র-শক্তি বিদ্যুতালোকের সাহায্যে আমাদের ভাণ্ডারের রত্ন খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কিরূপে খুঁজিতে হইবে শ্রীযুক্ত অরবিন্দের একটা উদাহরণেই তাহা স্পষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু এ কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় পন্থায় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা করা দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে তাহা উপযুক্ত পরিমাণে অবধান আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আমাদের দেশের যে কয়জন মনীষী এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে প্রকাশ করিব।

বৈরাগ্য

শিল্পী—শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র গোস্বামী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.
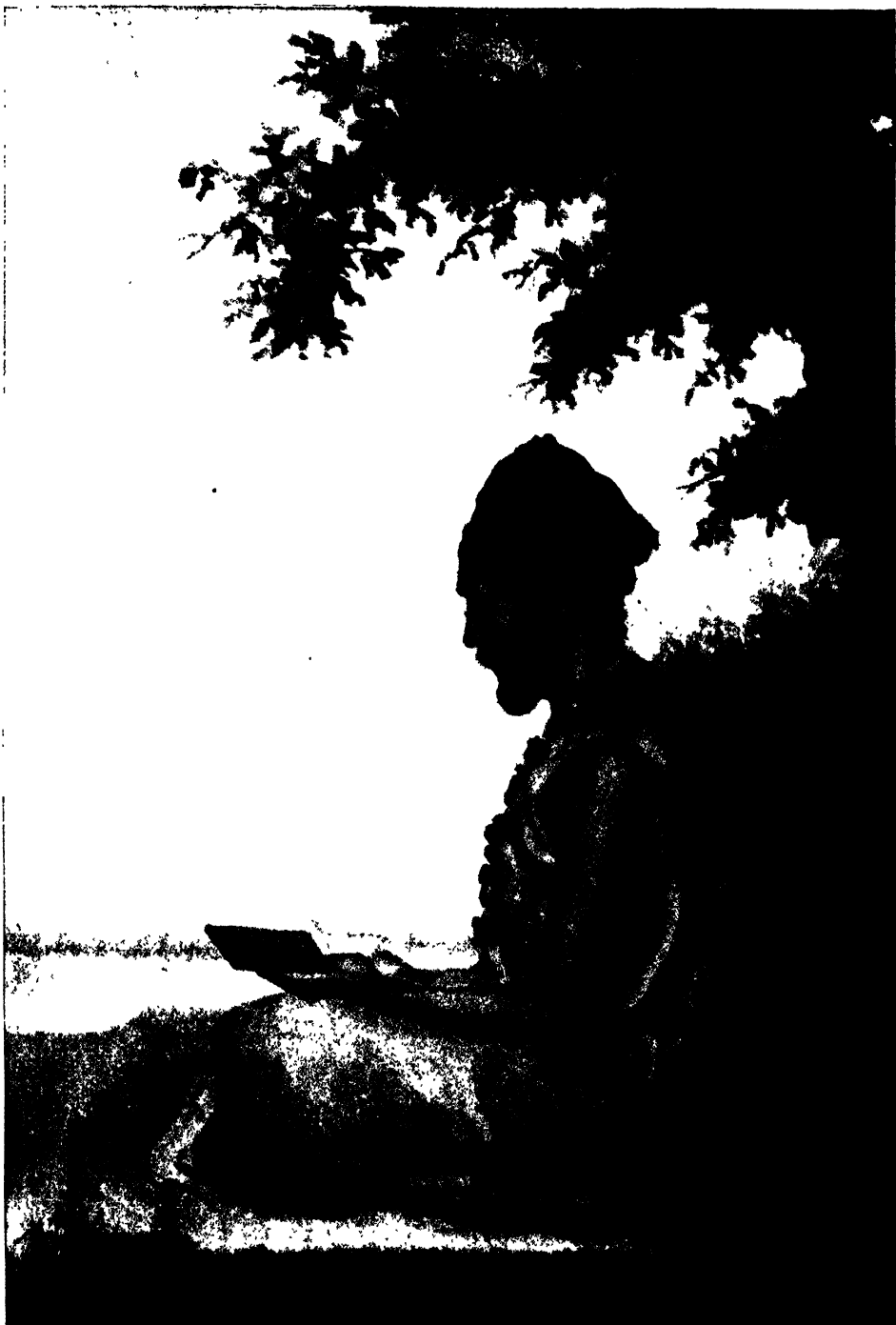
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-পন্থায় যে বৈষম্য রহিয়াছে, সে বিষয়েও অনুসন্ধান করা দরকার। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু 'প্রবাসী'তে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি যেমন সূত্রাকারে গ্রথিত—সাধনলব্ধ জ্ঞানও তেমনি সূত্রে নিবদ্ধ। হঠযোগের ফলে মানুষ 'অষ্টসিদ্ধি' লাভ করিতে পারে। সে অষ্টসিদ্ধি কি, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে। কিন্তু সাধনার কোন শক্তি বলে কোন ক্রমে বা পদ্ধতিতে কোন ধারায় মানুষের মধ্যে ঐ শক্তি বিকাশলাভ করে, তাহার কোন ইতিহাস বা বর্ণনা নাই। এ যেন জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা (Proposition) ও তাহার ফল (Conclusion) একত্র লিখিয়া রাখিয়া মধ্যের প্রমাণগুলি মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। তাই সেখানে শুধু বিশ্বাসের বশে, বড় জোর ফল দৃষ্টে—কাজে অগ্রসর হইতে হয়,—মাঝখানের বিচার-বুদ্ধিকে ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সব শৃঙ্খলা-বাবা বজায় রাখে, স্তরের পর স্তর অনায়াসে অনুসরণ করা যায়। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও আমাদের দেশে উচ্চাঙ্গের সাধনলব্ধ ফলের বর্ণনা আছে; কিন্তু মাঝখানের শৃঙ্খলসূত্র নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদিগকে সেই সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগ যুক্তিবাদের যুগ—এই যুগধর্ম্মকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। 'কেন হইল' 'কিরূপে হইল' এ প্রশ্ন প্রত্যেক স্তরে আসে—আর তার উত্তরও যুক্তি ও বিজ্ঞানের সাহায্যে দিতে হইবে। অবশ্য মানুষের বিচার-বুদ্ধি এখন পর্য্যন্ত এত উন্নত হয় নাই যে, সে যুক্তি ও বিজ্ঞান-বলে জাগতিক সমস্ত সমস্যারই সমাধান করিতে পারিবে; কিন্তু তাই বলিয়া যুক্তি ও বিজ্ঞানকে আর ঠেলিয়া রাখা যায় না।

আমাদের নিজ দেশের সাধনালব্ধ ফলের পিছনের বিচার-শৃঙ্খলা আমরা না হারাইলে, আজ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের সাহায্য লইবার প্রয়োজন হইত না। নূতন পন্থায় নূতন উপায়ে পুরাতনে পৌছিবার চেষ্টা করার আবশ্যকতা আছে। যাহা কেবলমাত্র কয়েকজনের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল বা আছে, তাহা জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত করিতে হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাউক—পরকালের কথা। পরকাল আছে, পাপপুণ্য আছে, এ কথা শুধু বিশ্বাস করিতে বলিলে চলিবে না—তাহা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই মানুষ, জড়-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যেমন ভাবে গ্রহণ করে, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের ফলও তেমন ভাবে গ্রহণ করিবে। হাজার হাজার বৎসরের চেষ্টায় ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ যাহা করিতে পারে নাই, তাহা অতি সহজেই সুসম্পন্ন হইবে।

এই নব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের জন্ম খুব বেশী দিনের কথা নয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩১ শে মার্চ্চ জগতের মঙ্গলজনক এই নব বিজ্ঞানের জন্ম হয়। আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্কের কোন পল্লীতে একজন ভদ্রলোক বাস করিতেন। তিনি এই বাড়ীতে আসার পর হইতেই বাড়ীর মধ্যে নানাবিধ টক্‌টক্, হট্‌হট্ ইত্যাদি শব্দ শুনিতেন। ক্রমশঃ বাড়ীতে নানাবিধ অলৌকিক উপদ্রব আরম্ভ হইল। এক দিন উক্ত ভদ্রলোকের নবম বর্ষীয়া কন্যা ফেমী তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত শুইয়া আছে, এমন সময় ঘরের মধ্যস্থ টেবিল ঠক্‌ঠক্ শব্দ করিতে লাগিল—সজীব প্রাণীর ন্যায় চলিতে লাগিল। মেয়েরা ভীত হইয়া চীৎকার করায়, তাহাদের পিতামাতাও আসিয়া এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। ছোট মেয়েটী "ওহে বুড়ো, আমার মত শব্দ কর ত দেখি" বলিয়া হাত দিয়া এক প্রকার শব্দ করিল—প্রত্যুত্তরে টেবিল হইতেও এইরূপ শব্দ আসিল। সকলে অবাক হইয়া গেলেন। গৃহস্বামিনী তাঁহার পুত্রকন্যার সংখ্যা জানিতে চাহিলেন—ঠিক উত্তর পাওয়া গেল। তখন চারিদিকে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল—সেই রাত্রেই একজন বৈজ্ঞানিক কৌশল পূর্ব্বক ইংরেজী বর্ণমালার সাহায্যে টেবিলস্থ আত্মিকের কাহিনী জানিলেন। সে একজন ফেরিওয়ালা ছিল। এই গৃহের পূর্ব্বতন মালিকের নিকট আসিয়া তৎকর্ত্তৃক সে হত হয়। সেই অবধি সে ঐ বাড়ীতেই ঘুরিয়া বেড়ায়, মানুষের অবধান আকর্ষণ করিবার জন্য নানাবিধ শব্দ করে ও উপদ্রব বাধায়। চারিদিক হইতে লোক আসিতে লাগিল—তন্মধ্যে সন্দেহবাদী বৈজ্ঞানিকও ছিলেন। অশেষ কঠোর পরীক্ষার পর তাঁহাদেরও সন্দেহ দূর হইল—মৃত্যুর পরপারেও যে জীবন আছে, তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিলেন, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের জন্ম হইল।

ক্রমশঃ আমেরিকার নানা স্থানে এ সম্বন্ধে আলোচনা,

গবেষণা চলিতে লাগিল। ক্রমে সেই আলোচনার তরঙ্গ ইয়োরোপে আসিয়া পৌছিল। বৈজ্ঞানিকগণ কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইংলণ্ডে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা সভা (Society for Psychical Research) স্থাপিত হইল। দেশের প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিকগণ সভার সদস্য হইলেন। যথারীতি চিরাচরিত প্রথায় প্রতিবাদ-নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। ধর্ম্মবিজ্ঞানের একচেটিয়া অধিকারী পুরোহিতগণ ও গোঁড়ার দল এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। সুখের বিষয়, তখন ইনকুইজিসনের (Inquisition) যুগ চলিয়া গিয়াছিল। নতুবা না জানি কত মহাপুরুষকে গিলোটিন ও অগ্নির কোলে প্রাণ আহুতি দিতে হইত বা!

ক্রমশঃ এই বিজ্ঞান-তরঙ্গ ভারতের উপকূলে আসিয়া আঘাত করিল; কিন্তু যে পরিমাণে সাড়া দেওয়া উচিত ছিল, ভারত সে পরিমাণে সাড়া দেয় নাই। আমরা নিজকে অধ্যাত্ম-জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম; এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডারের কণামাত্র পাইয়া জড়বিজ্ঞান-মূঢ় পাশ্চাত্য দেশ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া, একটুখানি সহানুভূতি মিশ্রিত অবজ্ঞার হাসি হাসিলাম। কিন্তু নব-অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের মধ্যে আমাদের গ্রহণীয় কিছু আছে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বেশী প্রয়োজন মনে করি নাই।

এই সঙ্গে আরও একটি শক্তি অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সহায়তা করিল—তাহা থিয়োসফি (Theosophy)। থিয়োজফিষ্টরা ও অধ্যাত্মবাদী, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবাদ সম্বন্ধে অনেক মিল আছে। বিশেষতঃ থিয়োজফিষ্টরা ভারতীয় সাধনার অনুসরণ করেন। নব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও থিয়োসফি এই উভয় মিলিত শক্তি আমাদিগকে একটু সজাগ করিয়া তুলিল। আমাদের কয়েকজন মনীষী বৈজ্ঞানিক প্রথায় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনায় মন দিলেন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষেও দু-একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই বিষয়ক পত্রিকাও কয়েকখানা আছে।

বাংলাদেশে যাঁহারা নব প্রথায় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৺শিশিরকুমার ঘোষ, ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও ৺সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শিশিরবাবু একখানা ইংরেজী পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন—নাম Hindu Spiritual Magazine। উহা এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আবার ঐ পত্রিকাখানি প্রকাশ করা হইবে বলিয়া শুনিয়াছিলাম—কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। মধ্যে "অলৌকিক রহস্য" নামক একখানা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা বাহির হইয়াছিল—কিন্তু উহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। বাংলা ভাষায় কয়েকখানি মাত্র বহি আছে, তাহাও অসম্পূর্ণ। অবশ্য একখানা বহিতে সমস্ত বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। বাংলা সাহিত্যে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের পুস্তকের সংখ্যাও অল্প।

এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি যদি আকৃষ্ট হয়, তবেই সুখের বিষয়।

বাংলার বাহিরে দু-একটী অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-সভার খবর জানি; কিন্তু তাঁহারা ইংরেজী ভাষাতে পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশ করেন। বাংলাদেশে উপযুক্ত পরিমাণে সাহিত্য ও পত্রিকা যাহাতে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য বিশেষজ্ঞগণ চেষ্টা করিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

অধ্যাত্মবাদিগণ কিরূপে এই নব বিজ্ঞানকে জগতের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করিতেছেন, তাহার একটু আভাষ ভবিষ্যতে দিবার ইচ্ছা রহিল।

নৃতত্ত্বে জাতি-নির্ণয়

অধ্যাপক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ

সাধারণ লোক মধ্যে নৃ-তত্ত্ব একটি অজ্ঞাত বিষয়। নৃ-তত্ত্ব অর্থে অনেকে জাতি-নির্ণয় বুঝেন; এবং জাতির কথা উত্থাপিত হইলেই অনেকে চমকিয়া উঠেন। কারণ "জাতির" অর্থ লোকে সাধারণতঃ রাজনীতিক অর্থেই গ্রহণ করেন। অমুক "জাতি" ভাল, আর অমুক জাতি খারাপ, ইহা তাঁহারা লোক মুখে শুনিয়া, নিজেদের কোন দলে গণ্য হইতে হইবে, সেই ভয়েই ভীত হন।

বিগত ত্রিশ বৎসর ইয়োরোপে সাম্রাজ্যবাদীরা "জাতি"

শব্দটার অতি কদর্য্য অর্থ করিয়াছে, নৃ-তত্ত্বকে রাজনীতির কার্য্যে খাটাইয়াছে; এবং আনাড়ীর দল নিজেদের বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচয় দিয়া, সাম্রাজ্যবাদকে জাতীয়তাবাদের আবরণে ঢাকিয়া, বিজ্ঞানকে রাজনীতির প্রয়োজনে নিযুক্ত করিয়া, একটা অদ্ভুত নৃ-তত্ত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। এই অজ্ঞানতাই (pseudo science) লোক-সমাজে নৃ-বিজ্ঞান নামে অভিহিত, এবং তাহার ঢেউ বিশেষ ভাবে ভারতে আসিয়া লাগিয়াছে। সেই জন্যই ভারতে অমুক আর্য্য, অমুক দ্রাবিড়, অমুক মঙ্গোলো-দ্রাবিড় ইত্যাদি অদ্ভুত বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়, এবং ফলে লোক মধ্যে ঈর্ষা ও দ্বেষের উদ্ভব হয়। কিন্তু আসল বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এ ভাবের উদয় হয় না। যাহারা বিজ্ঞান ও জাতীয়তাবাদের খিচুড়ি করিয়া জগতে স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা কেহই বৈজ্ঞানিক নহে।

জার্ম্মাণিতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে; এবং জার্ম্মাণিই নৃ-বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছে; কিন্তু সেই সঙ্গে খাঁটির সঙ্গে মেকিও চলিয়াছে; এবং এই ঝুঁটা মালই জগতে বেশী চলিয়াছে! আসল নৃ-বৈজ্ঞানিকদের মত জগতে বিশেষ পরিচিত নহে; কিন্তু Houston, Chamberlain, Wilser, Poesche, Penka, প্রভৃতির ঝুটা মতগুলা বাজারে বিশেষ পরিচিত; কারণ, ইহা রাজনৈতিক দলাদলির গলাবাজী! অথচ ইহাঁদের কেহই নৃ-বৈজ্ঞানিক নহেন। ইহাঁদের মতে, মুল "আর্য্য-জাতি" হয় সুইডেন, না হয় জার্ম্মাণিতে সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং জার্ম্মাণরাই খাঁটি আর্য্যত্বের অধিকারী। এই মতটা জার্ম্মাণিতে সৃষ্ট হইলে, ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদীরা তাহা লুফিয়া লয় এবং তথা হইতে তাহা আমেরিকায় যায়। এই মতের মর্ম্ম এই:—নীলচক্ষু, কপিশকেশ লাল রঙ্গের উত্তর ইয়োরোপের লোকেরাই খাঁটি আর্য্য, এবং তাহারাই Teuton বা German নামে আজ পরিচিত; এবং তাহারা মনুষ্যের সমস্ত গুণের আকর, অতএব জগৎটা তাহাদেরই জন্য! অবশ্য ফ্রান্স, ইতালী, রুষ প্রভৃতি দেশের নৃ-বৈজ্ঞানিকেরা অন্য কথা বলেন। ফলে, বিজ্ঞানের দলাদলি হইতে জাতীয়তার দলাদলি, এবং কোন জাতি জগতে বড় আর কোন জাতি জগতে ছোট, তাহা লইয়া বিবাদ চলিতেছে!

কিন্তু আজকাল একটা নূতন দল উঠিতেছে, যাঁহারা বিজ্ঞানকে রাজনৈতিক বা জাতীয়তার বিবাদের ভিতর আনিতে চাহেন না। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে নবীন, কিন্তু জনকতক প্রবীণ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকও এই সঙ্গে আছেন। ইহাঁরা বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের চক্ষেই দেখেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বের উদ্গারিত বিষকে নষ্ট করিতে সময় লাগিবে। আর আমাদের দেশে, নৃ-বিজ্ঞানের সংবাদ অতি কম লোকেই রাখেন,—সাধারণতঃ "পরের মুখে ঝাল খাইয়া" ঈর্ষা ও দলাদলিতে মজেন।

নৃ-তত্ত্ব অর্থে বিশদ ভাবে মানবের কার্য্যের সমস্ত বিভাগই বুঝায়; সমাজ-তত্ত্ব, অর্থনীতি, শারীরিক নৃ-বিজ্ঞান, রাজনীতি, জাতি-তত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তই নৃ-তত্ত্বের বিষয়। সঙ্কীর্ণ ভাবে সাধারণতঃ শারীরিক নৃ-বিজ্ঞান (physical anthropology বা somatology) এবং জাতি-তত্ত্ব (ethnology) নৃ-তত্ত্বের অনুসন্ধানের বিষয়। শারীরিক নৃ-বিজ্ঞান জাতির (race) উৎপত্তির পরিচায়ক; কোন্ দেশের লোকদের বাহ্যিক আকৃতি কি প্রকার এবং তাহার সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী জাতির কি প্রভেদ বা ঐক্য, ইহাই শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানের বিচারের বস্তু। এস্থলে শারীরিক নৃ-তত্ত্বের একটা মোটামুটি পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

ইয়োরোপীয় ভাষায় race কথাটার নানা অর্থ। অনেক সময় এই শব্দটা people অর্থে ব্যবহৃত হয়। অমুক দেশের লোকেরা অমুক raceএর অন্তর্গত বলিলে আজকাল কোন অর্থবোধ হয় না; কারণ বর্ত্তমান কালের নৃ-বৈজ্ঞানিকেরা দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক দেশের লোকেরাই নানা racial elementsএর সমষ্টি। পূর্ব্বের উল্লিখিত প্যান-জার্ম্মাণিষ্ট পণ্ডিতের দল যখন বলিলেন যে, জার্ম্মাণ বা টিউটনদের ধমনীতে খাঁটি আর্য্যরক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তখন ইতালীর Sergi বা ইংলণ্ডের Karl Pearson বা সুইডেনের Lundbory দেখাইয়া দিলেন, খাঁটি টিউটন জাতি বলিয়া জাতি বিদ্যমান নাই, জার্ম্মাণ-ভাষী জাতিসমূহ মিশ্রজাতি; এবং Sergi বলেন, কোন কালে একটা খাঁটি টিউটন বা জার্ম্মাণ জাতি জগতে ছিল কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়! কেল্ট ও শ্লাভদের সেই প্রকার অবস্থা। প্রাচীন গ্রীকেরা নিজেদের সব এক জাতীয় বলিয়া স্পর্দ্ধা করিত; কিন্তু আধুনিক শারীরিক নৃ-বৈজ্ঞানিকেরা

দেখাইয়াছেন যে, তাহাদের ভিতরেও ভিন্ন ভিন্ন racial elements ছিল! অতএব race শব্দটার অর্থ কি? ব্লুমেনবাকের (Blumenback) আমল হইতে "শ্বেত জাতি" "পীতজাতি" প্রভৃতি জাতিবাচক নামের পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু এই সব শব্দ ভ্রমপূর্ণ ও জাতির পরিচায়ক নহে। বরং আজকাল ইহা রাজনীতিক দলাদলির পরিচায়ক। তৎপরে Caucasian, Mongolian প্রভৃতি জাতি-পরিচায়ক নামগুলিরও অবস্থা তদ্রূপ! একজন আমেরিকান নৃ-বৈজ্ঞানিক আমায় বলিয়াছিলেন যে, Caucasian শব্দটার অতি জঘন্য (vicious) অর্থ হইয়াছে! এই সব কারণে race, ও তাহার পরিচায়ক লম্বা-চওড়া নামগুলি বিজ্ঞান হইতে উঠিয়া যাইতেছে। আজকাল Biology ও Physical anthropologyতে race শব্দ ব্যবহৃত হয় না; তৎপরিবর্ত্তে biotype ও phenotype শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে race অর্থে লোকে যাহা বুঝিত, আজকাল biotype অর্থে তাহাই বুঝে। Biotype জিনিসটা তাহাই, যাহা একটি জাতির মধ্যে অবিনশ্বর ও বংশপরম্পরায় প্রকট শারীরিক লক্ষণের সমষ্টি। যদি একটি বিশিষ্ট লোকমণ্ডলী মধ্যে সকলেই এক বাহ্যিক আকৃতির লক্ষণালঙ্কৃত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একটি biotypeএরই সন্ধান পাওয়া যাইবে, এবং সেই মণ্ডলীটি বিশুদ্ধ বলিয়াই পরিগণিত হইবে। যদি এই কল্পিত বিশুদ্ধ লোকমণ্ডলীর একটা curve অঙ্কিত করা যায়, তাহা হইলে binomial theorem অনুসারে তাহা একটা polygonal curve হইবে। কিন্তু এ প্রকারের বিশুদ্ধতা জীব-জগতে পাওয়া যায় না। সেই জন্যই বলিতে হইবে যে, কোন জাতি আর বিশুদ্ধ নয়। তৎপরে phenotype হইতেছে প্রত্যেক মানুষের বাহ্যিক আকৃতি; অর্থাৎ আজকালকার মানুষের দেহে নানা প্রকার রক্ত মিশ্রিত। সে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত বহু সহস্র পূর্ব্বপুরুষের লক্ষণের সম্মিলন (mosaic)। সেই জন্য প্রত্যেক মানুষ খাঁটি biotypeএর পরিচায়ক নহে; সে ব্যক্তিগত ভাবে একটি phenotype।

ইহাতে দেখা গেল যে, race শব্দের পরিবর্ত্তে আজ কাল biotype শব্দ ব্যবহৃত হয়; এবং biotypeদের পরস্পরের সহিত প্রভেদ করিবার জন্য কোন্ biotype কোন শারীরিক লক্ষণালঙ্কৃত তাহার পরিচয় দেওয়া হয়। ইহা গেল ইয়োরোপীয় ভাষার ব্যবস্থা; কিন্তু আমাদের ভারতীয় ভাষাসমূহে race, tribe, peaple, nation প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থবাচক শব্দের পরিচায়ক ভারতীয় শব্দের অভাব। সংস্কৃত "জাতি" অথবা ফার্শি "কৌম" শব্দ এই প্রকার ইয়োরোপীয় শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে যথার্থ অর্থ গ্রহণে অনর্থ ঘটে! সংস্কৃত "জন" শব্দ tribe ও nation উভয় অর্থে প্রযুজ্য। ইহাতে বৈজ্ঞানিক অর্থের প্রাঞ্জলতার লাঘব হয়। আশা করি যে, আমাদের দেশের সাহিত্য-পরিষদসমূহ এই সব বৈজ্ঞানিক শব্দের ভারতীয় প্রতিশব্দের সৃষ্টি করিবেন। শুনা যায় যে, হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আরবী হইতে মূল শব্দ সংগ্রহ করিয়া উর্দ্দু ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দসমূহের সৃষ্টি করিতেছেন। জানি না, তাহা ভারতে সার্ব্বজনীন হইবে কি না।

পূর্ব্বে মানবজাতিকে নানা প্রকারে বিভক্ত করিয়া নানা নামে অভিহিত করা হইত। সুইডেনের Linneus মনুষ্য জাতিকে—আমেরিকান, ইয়োরোপীয়ান, এসিয়াবাসী ও আফ্রিকান এই চারি জাতিতে (race) বিভক্ত করেন। তিনি গাত্রের রংএর দ্বারা মানবকে বিভক্ত করেন নাই; কারণ, তিনি বলিয়াছিলেন, nihim credo colori (আমি রংএ বিশ্বাস করি না)! তৎপরে আসেন Blumenback। তিনি রং দ্বারা মানবজাতিকে, Caucasian (শ্বেত), Mongolian, (পীত), Ethiopian (কৃষ্ণ), American (লাল) ও Malay (brown) এই পাঁচ জাতিতে বিভক্ত করেন। কিন্তু এ বিভাগ যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন নহে। ইহার পর অন্যান্য লেখকেরা মানবকে আরও নানা ভাগে বিভক্ত করেন এবং জগতে অজস্র জাতির (race) সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন! এই প্রকারে Buffon ছয় জাতি, Peschel সাত জাতি, Agassit আটজাতি, Morton বাইশ জাতি, Crawford ষাট জাতির সৃষ্টি করেন! আবার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন নৃ-বৈজ্ঞানিক Gustave Fritsch এই জাতিগুলিকে গুলিয়া তিনটিতে দাঁড় করান! তাঁহার মতে, জগতে তিন প্রকারের মানব জাতি আছে; যথা, মূল জাতি (Protomorphope), মিশ্রিত জাতিসমূহ (metamorphope),

আর শাসক জাতিসমূহ (archimorphope)! ইহাতেই দৃষ্ট হয় যে "race" এই শব্দটার মানে স্থিরীকৃত করা যাইতে পারে না। তবে কোন স্থানের বিশিষ্ট শারীরিক লক্ষণযুক্ত সাধারণ লোক-সমষ্টিকে,—যাহারা এই লক্ষণ-সমূহের বিশেষত্ব দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবাসী হইতে কম-বেশী ভাবে পৃথক প্রতীয়মান হয়—তাহাকে একটা race বলিলে কতকটা মানে হয়। কিন্তু আজকাল এবম্প্রকার বিশুদ্ধ raceকে biotype বলে। উপরি উক্ত তালিকা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানবজাতিকে যথেচ্ছভাবে বিভক্ত করাকে কোন বৈজ্ঞানিক স্থিরীকৃত ভিত্তির উপর স্থাপন করা যায় না। যাঁহার যেমন ইচ্ছা তিনি তদুপযোগী একটা মত দিয়াছেন। যাহাদের "শ্বেত" জাতি বলা হইয়াছে, তাহারাই একমাত্র শ্বেতচর্ম্মী নহে। যাহাদের "পীত" বলা হয় তাহারা পীত নহে, ইত্যাদি। তৎপরে যাহাদের Caucasian বলা হয়, তাহাদের সঙ্গে Caucasus প্রদেশের কোন সম্পর্ক নাই, ইত্যাদি!

এতক্ষণ আমরা race শব্দটার বিচার করিলাম। এক্ষণে কথা হইতেছে, মানব কোন্ সময়ে সর্ব্বপ্রথম এ জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, ও সেই প্রকাশ-স্থল কোথায়? বিভিন্ন ধর্ম্মের Cosmogonyতে নানাপ্রকার গল্প আছে। সে সব কিংবদন্তী বিজ্ঞান হইতে একেবারেই বাদ দিতে হইবে। অনেক dilettantও মানবের জগতে প্রকাশের বয়স নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু এ চেষ্টা বৃথা হইয়াছে। কারণ, আমরা আজ পর্য্যন্ত নিশ্চয় রূপে জানি না, কোন্ সময়ে প্রথম মানব তাহার পশু সদৃশ পূর্ব্বপুরুষ হইতে পৃথক হইয়াছে। অবশ্য ইহা ধারণা করা যাইতে পারে যে, অগ্নিকে সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করিয়া মানবের পূর্ব্বপুরুষ প্রকৃত মনুষ্য-পদবাচ্য হইয়াছে। কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, কার্য্যকরী যন্ত্রাদি (tools) ব্যবহারের জন্য আয়ত্ত করিয়া, অথবা একটি উচ্চারিত ভাষা ব্যবহার করিয়া, মানব তাহার পূর্ব্বপুরুষ হইতে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে।

শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই ডারউইনের মত অবগত আছেন যে, বানর হইতে মনুষ্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। এ অভিব্যক্তি principleটা আজকাল অন্য আকারে গৃহীত হয়। মানব "বনমানুষে"র বংশধর নহে; বরং মানব ও বানরজাতি (primates) উভয়েই Lemur নামক ক্ষুদ্র পশু হইতে পাশাপাশি অভিব্যক্ত হইয়াছে। মানব ও গরিলা, সিম্পাঞ্জি, ওরাংউটাঙ্গ প্রভৃতি মানব সদৃশ বানর জাতির (anthropoid apes) পূর্ব্বপুরুষ এই Lemur। এই জন্তু বর্ত্তমান সময়ে মাদাগাস্কারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আকৃতিতে ইহা বানরের মতন নহে; কিন্তু শরীরের আভ্যন্তরীন (anatomical) গঠন বানরজাতি সদৃশ। এই পশুই মানবের primateদের পূর্ব্বপুরুষ। সেই জন্য গরিলা, সিম্পাঞ্জি ও মানবের মধ্যের missing link (সংযোগের হারান শিকল) সন্ধান করিবার জন্য আজকাল কেহ ব্যস্ত নহেন। কিন্তু মাঝে যবদ্বীপে একটি মানবসদৃশ জন্তুর অস্থি-কঙ্কাল (skeleton) আবিষ্কৃত হওয়ায়, বৈজ্ঞানিক জগতে হুজুগ উঠিয়াছিল যে, মানব ও বানরের মধ্যবর্ত্তী missing link প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই অস্থির অধিকারী জন্তুকে pithecan-thropos erectus নামে অভিহিত করা হয়। এই জীবের অস্থির পায়ের বুড়া অঙ্গুলি মানবের সদৃশ ছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন না—এ বিষয়ে মানব ও বানরের ব্যবধান কোথায়! তৎপরে মানবের খাড়া হইয়া চলার অভ্যাস নিশ্চয়ই অনেক geologic periodএর অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া গমন করিয়াছে! এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই অস্থি missing linkর নহে, ইহা একটি বড় মানব সদৃশ বানরের (anthropoid ape)! তৎপরে ভূতত্ত্ববিদেরা (Geologists) বলেন, ভূগর্ভের যে স্তরে এই অস্থি পাওয়া গিয়াছে, তাহা আধুনিক যুগের। সে সময়ের ভূ-স্তরে মানবের অস্থিই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই সব কারণে, কোন্ সময়ে যথার্থ মানব উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণ করা অতি শক্ত ব্যাপার। মানবের সভ্যতার উৎপত্তির সময় বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছেন। পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা বলিতেন যে, প্রস্তর-যুগ (stone period) কাংস্য-যুগ (Bronze period) ও লৌহ-যুগ (iron period) গড়ে ২০০০ বৎসর করিয়া ছিল। অতএব ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে মানব-সভ্যতার আরম্ভ হইয়াছে! কিন্তু আজকাল স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, উত্তর ইয়োরোপে লৌহ খৃঃ পূঃ ৩০০ সালে সার্ব্বজনীন হয়, এবং বাবিলন ও আসিরীয়ায় খৃঃ পূঃ ৯০০

সালের পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। খৃঃ পূঃ ৫০০ সালে (500 B-C) পশ্চিম ইয়োরোপে ও আলপ্স প্রদেশে Hallstatt period of cultureএর সময় কাংস্য যুগ বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু ৪০০ খৃঃ পূঃ La-Te'ne cultureএর সময়ে কাংস্যের ব্যবহার কম হইতে আরম্ভ হয়। কখন তাম্র হইতে কাংস্য নির্ম্মাণ-পদ্ধতির আবিষ্কার হয়, তাহা এখনও অজ্ঞাত। কেহ কেহ বলেন যে, খৃঃ পূঃ ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে বোধ হয় মিশরে উহা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই কাংস্য যুগের পূর্ব্বে neolithic period—যে সময়ে ধারাল প্রস্তরের, ও প্রস্তরের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া দাণ্ডা লাগাইয়া যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নির্ম্মিত হইত,—কয়েক সহস্র বৎসর বিদ্যমান ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, neolithic period (নূতন প্রস্তরের যুগ) বিশ সহস্র বৎসর বর্ত্তমান ছিল। এই যুগের পূর্ব্বে আবার প্রাচীন প্রস্তরের যুগ (palaeolithic period) অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া বর্ত্তমান ছিল। এই যুগ কত দিন ব্যাপী ছিল, তাহার স্থিরতা এখনও হয় নাই। বার্লিনের ভূতত্ত্বের (geology) অধ্যাপক A Penck বলেন যে, তিনি ইয়োরোপে অনেকবার glacial periodএর (বরফের যুগ) অস্তিত্ব পাইয়াছেন। অর্থাৎ একবার বরফ যুগ আসিয়া সব ধ্বংস করিয়া দেয়; আবার বরফ হটিয়া যায় ও উত্তর ইয়োরোপ জীবের বসবাসের উপযোগী হয়। আবার বরফ নামিয়া সব ধ্বংস করিয়া দেয়। এই প্রকারে কতিপয়বার বরফ-যুগ উত্তর ইয়োরোপে অবতীর্ণ হয়। এই যুগগুলির ব্যবধান কাল এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। কিন্তু এই ব্যবধান সময়ে যখন বরফ বর্ত্তমান ছিল না, তখনকার প্রস্তরের যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন dilettant এই একটি ব্যবধান-সময় এক লক্ষ বৎসর বা দেড় লক্ষ বৎসর বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু এই প্রস্তর-যন্ত্রপাতির সৃষ্টি ও ব্যবহার যে অনেক লম্বা geologic period দ্বারা সংগঠিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব যথার্থ মানব যে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিত ও একটা ভাষায় কথা কহিত এবং বাস করিবার জন্য একটা আস্তানা নির্ম্মাণ করিত, সে যে কখন এ জগতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই।

মানবের সভ্যতার প্রথম উদয়-কাল প্রাচীন প্রস্তর-যুগ। এ যুগ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান ছিল। তবে তাহার আয়ু বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের। এ স্থলে ইয়োরোপের প্রস্তর ও অন্যান্য যুগের কথার উল্লেখ করিলাম; কারণ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা ভূখণ্ড তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন। অন্য ভূখণ্ডে (উত্তর আমেরিকা ব্যতীত) এ প্রকারের অনুসন্ধান বিশেষ ভাবে হয় নাই। এই স্থলে পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উল্লেখ করিলাম যে, ভারতেও প্রস্তর যুগের অস্তিত্ব Seton Kerr আবিষ্কার করিয়াছেন। সে যুগের ব্যবহৃত প্রস্তরের হাতুড়ি ইত্যাদি (tools) অনেক বাহির হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের অধিকারীরা কোন ভাষা-ভাষী ছিল তাহা অন্য কথা; কিন্তু আর্য্যভাষা-ভাষী নিশ্চয়ই নহে।

এক্ষণে আমরা দেখিলাম যে, বিজ্ঞান মানবের উৎপত্তির সময় নিদ্ধারণ করিতে এখনও অক্ষম। কিন্তু সর্ব্ব প্রাচীন মানবের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রাচীন প্রস্তর-যুগের সময়ের মানবের অস্থিকঙ্কাল Neanderthal, Spy, Gibralter, ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থান ও Croatiaর Krapina হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কঙ্কালের মস্তক পরীক্ষা করিয়া দৃষ্ট হয় যে, ইহার লক্ষণসমূহ হইতে ইহাকে "primitive" (অতি প্রাচীন) পদবাচ্য করা যায়। এই মস্তকের চক্ষের ভ্রূযুগল বড় ঠেলিয়া বাহির হওয়া (গরিলার মতন) লক্ষণযুক্ত, গঠন বড় শক্ত ও brutal লম্বাকার। অন্যান্য লক্ষণাদি বড়ই প্রাচীন। তৎপরে উপরিউক্ত বিভিন্ন স্থানের কঙ্কালের মস্তকগুলি দেশের ব্যবধান সত্ত্বেও এক প্রকারের। এই জন্য তাহাদের বিভিন্ন species বলা যায় না। এবম্প্রকার কঙ্কালের অধিকারী যে প্রাচীন প্রস্তর-যুগে জীবিত ছিল, তাহাকে নৃ-বৈজ্ঞানিকেরা Homo neandertalensis (কারণ নিয়াণ্ডার উপত্যকায় এই প্রকারের কঙ্কাল প্রথম আবিষ্কৃত হয়) অথবা Homo primigenius (প্রথম মানব) বলিয়া অভিহিত করেন। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, এই প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানব—বর্ত্তমান Homo sapiens (জ্ঞানবিশিষ্ট) মানবের সহিত এক Zoologic speciesএর অন্তর্গত কি না? অর্থাৎ এই প্রাচীন মানব হইতে বর্ত্তমান মানব জাতির উৎপত্তি হইয়াছে কি না? এ বিষয়ে বিভিন্ন মত বিদ্যমান। Gustav Schwalb—যিনি এই কঙ্কাল বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন—বলেন "না"। অর্থাৎ, তাঁহার মতে, এই

প্রাচীন লক্ষণাক্রান্ত মনুষ্যজাতি লোপ পাইয়াছে। আর এখনকার মানব অন্য species; অর্থাৎ তাহার উৎপত্তির মূল বিভিন্ন। কিন্তু পরলোকগত বিখ্যাত Kollmann বলেন যে, বর্ত্তমান কালের অনেক জীবিত ইয়োরোপীয়ান যে তাহাদের স্কন্ধের উপর এই প্রাচীন লক্ষণাক্রান্ত মস্তক লইয়া বেড়াইতেছে, তাহা তাহারা atavistic উপায়ে প্রাপ্ত হইয়াছে (বিখ্যাত জার্ম্মাণ সঙ্গীতাচার্য্য wagnerএর এবম্প্রকারের লক্ষণাক্রান্ত মস্তক ছিল, অবশ্য তাহা তাঁহার কঙ্কাল-মস্তক পরীক্ষায় স্বিবীকৃত হয়)। তাহার অর্থ এই যে বর্ত্তমান কালের ইয়োরোপীয়ানরা সেই প্রাচীন প্রস্তর-যুগের Homo neander-talensisএর বংশধর। আমার পরলোকগত অধ্যাপক Von Luschen ও তাহাই বলেন। তিনি মানবজাতির একতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আজকালকার মানব-জাতির উৎপত্তির মূল সেই পুরাতন মানব-জাতি হইতে বিভিন্ন, এরূপ বলিবার প্রমাণ নাই,—বর্ত্তমান ইয়োরোপীয়েরা প্রাচীনদের বংশধর। এই তর্ক উদয় হইবার কারণ এই যে, neandertal মানবের অস্তিত্বের পরে যখন ইয়োরোপে cro magnon মানবের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তখন শেষোক্ত মানবের মস্তক বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় মস্তকের সদৃশ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। আর প্রাচীন ও নব-আবিষ্কৃত কঙ্কালের মস্তকের সাদৃশ্য নাই; এবং দুয়ের মধ্যে যে ব্যবধান সময় আছে, তাহাতে অন্য লক্ষণাক্রান্ত মানবের ক্রমবিকাশের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অষ্ট্রেলিয়ার কতকগুলি আদিম অধিবাসীদের মস্তক এই Homo neandertalensisএর লক্ষণযুক্ত! ইহাতেই অনুমান হয় যে, ইয়োরোপের প্রাচীন মানবজাতির সহিত অষ্ট্রেলিয়ার আদিম মানবজাতির "জাতিগত" (racial) সম্পর্ক ছিল। অবশ্য এই স্থলে উল্লেখ্য যে, neandertal কঙ্কালের মস্তক ব্যতীত অন্য অস্থির সহিত অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সাদৃশ্য বা ঐক্য নাই। কিন্তু তাহা দেশ ব্যবধানে বিভিন্ন হইতে পারে বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মস্তকের (skull) উপর জোর দিতেছেন। এই জন্য বোধ হয় যে, প্রাচীন প্রস্তরযুগে ইয়োরোপ ও অষ্ট্রেলিয়ার সংযোগ ছিল।

আবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি skull পাওয়া গিয়াছে, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে Homo Rhoden-siensis তাহার সঙ্গে Homo primigenius এর না কি সাদৃশ্য আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে স্থলেই প্রাচীন মানবের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা প্রায় একই লক্ষণাক্রান্ত।

এই প্রাচীন মানব কি প্রকারে নানা অবস্থার মধ্য দিয়া বর্ত্তমানে নানা প্রকারের মানব জাতিতে পরিণত হইল, তাহা ক্রমশঃ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

অজ্ঞাত পর্ব্ব

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুদীর্ঘ বনবাস তো বটেই, তাহার উপর আবার কিছুকাল অজ্ঞাতবাস,—এইরূপ ব্যবস্থা লইয়া পাণ্ডবগণ আজ এখানে কাল সেখানে করিয়া কাটাইতে লাগিলেন দুরাচার কৌরবদের চর ছিনে লাগিয়াই আছে কিসে তাঁহাদের অনিষ্ট করিবে। বনবাস-কাল এমনি করিয়া কাটিয়া গেল, কিন্তু অজ্ঞাতবাস তো এ ভাবে চলে না! অজ্ঞাতবাস, জ্ঞাত হইলেই সর্ব্বনাশ, পুনরপি নিশ্চয় বনবাস!

কাজেই তাঁহাদিগকে গভীর অরণ্যানী, পাহাড়-পর্ব্বতাদি দুর্গম স্থানের আশ্রয় লইতে হইল। এ হেন অজ্ঞাতবাসাবস্থায় তাঁহারা কিছু দিন [illegible] বিশোভিত বিশাল [illegible] সুবর্ণরেখা স্রোতস্বতী তট [illegible] করেন. এ প্রবাদ এ প্রদেশে আবহমানকাল [illegible] ঘাটশীলা, লেখকের কর্ম্মস্থান জেমসেদপুর হইতে

কলিকাতার দিকে রেলে মাত্র ২২ মাইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, অযুত বলশালী ক্ষিপ্রগতি ভীম, বীরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন, রণদুর্ম্মদ ভ্রাতৃদ্বয় নকুল ও সহদেব যেখানে 'গা-ঢাকা' দিয়া কিছুকাল কাটাইয়া গিয়াছেন,—ধর্ম্মজ্ঞান-বিরহিত, ক্ষীণকায়, দুর্ব্বল, শম্বুকগতি, ভীরুর অগ্রগণ্য, গৃহকোণে অসম-সাহসী লেখকেরও সেই স্থানে কিছু দিন অজ্ঞাতবাসের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। তাই সেদিন সদলবলে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম।

করিলাম। শুনিলাম, তিনি আমাদের থাকিবার ব্যবস্থাদি করিয়া গিয়াছেন। মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হইল। বাসার,—হায় হায়, Gross insult—সব ক্ষমা করিবেন, এ যে changeএর দেশ!—বাংলার, চাকর-বাকর—না-না, বেহারা ও খানসামারা, যে যার গৃহে প্রস্থান করিল। বারান্দায় বসিয়া আমি এদিক-ওদিক চাহিতেছি ও অদূরের অনতিবৃহৎ গাছটা বট না আর কিছু

ঘাটশিলা গিরিবর্ত্ম—চাইবাসা-মেদিনীপুর রোড

শ্রীপার্ব্বতীচরণ মাইতি গৃহীত ফটো

উপস্থিত তো হইলাম,—কিন্তু যাঁহার গৃহে এই অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা, তিনি অনুপস্থিত ও অন্যত্র—সুতরাং নিজেই অজ্ঞাত। কাজেই ব্যবস্থা এই পাহাড় ও পাথরের দেশে তখন অকূল পাথার। সন্ধ্যা তখন হয়-হয়,—ধীরে-ধীরে বন্ধুর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও এক পা দুই পা করিয়া তাঁহার বাংলায় অনধিকার-প্রবেশ পূর্ব্বক বারান্দায় একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া অনধিকার-উপবেশনও

তাহাই ভাবিতেছি, এবং সাম্‌নের ঝোপ-ঝাড়ের উপর দিয়া ডোবার জলের খানিকটা ও তদুপরি অসংখ্য পদ্মের সারি দেখিতেছি,—আশে-পাশে ধানের ক্ষেতও নজরে পড়িতেছে। সবেমাত্র আসিয়াছি,—অন্ধকারও হইয়াছে,—চারিদিক কেমন যেন একটু ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। এমন সময় একটী বালক একপাল গরু লইয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। আঁধারের ঘনত্ব

অনুভব করিতে করিতে আমি ভাবিলাম, ব্যস্‌— "and leaves the world to darkness and to me!" অন্ততঃ এক রাত্রির জন্যও আমি 'গ্রে',—সম্মুখের পদ্মপুকুরের পাড় "a country churchyard,"—ভাব্য বিষয় "Elegy"; সামনের ঝোপ-ছাড়গুলি "those rugged elms." আর সেই বড় গাছটা that yeu tree; এবং অজ্ঞাতবাসে আসিয়া হয়ত অজ্ঞাত Village Hampden ও Cromwellএর অস্তিত্ব অচিরেই সকলকে জ্ঞাত করাইবে। কিন্তু যাহা হইবার নয়, তাহা হইতেও পারে না। কাজেই আমারও তাহা হইল না।

অজ্ঞাতবাসে আসিয়া প্রথমেই শুনিলাম যে, এখন চেঞ্জের (changeএর) সময়; এজন্য বাড়ী ভাড়া পাওয়া যাইতেছে না। কি করি, বাড়ী না মিলিলে আমার অজ্ঞাতবাসও এই পর্য্যন্ত; কারণ, সপরিবারে আসিয়াছি।

পরদিন প্রত্যুষে এক বন্ধুর পরিচয়পত্র দলিল স্বরূপ লইয়া মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর তহশীলদার,—তাঁহার এক আত্মীয় ভদ্রলোকের বাসায় উপস্থিত হইলাম। উদ্দেশ্য—যেমন করিয়া হউক, তাঁহার মারফত একটী বাসা জোগাড় করা। এ মুলুক উক্ত জমিদারী কোংর এলাকায়; সুতরাং তাঁহার দ্বারা এ কার্য্য হওয়াই সম্ভব। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় ফিরিতেছি, এমন সময় ডাকঘর দেখিয়া মনে পড়িল যে, আগের দিন যখন ট্রেণ হইতে নামিয়া আসি, তখন ডাকঘরের ভিতর হইতে পোষ্টমাষ্টারবাবু গলা ছাড়িয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছিলেন। কিন্তু তখন বুঝি নাই যে, অজ্ঞাতবাসে আসিয়াছি, তথাপি আমাকে চিনিল কে। আন্দাজ করিলাম, হয়ত ভদ্রলোক আমাকে কোথাও দেখিয়া থাকিবেন, এবং দৈবাৎ হয়ত নামটা কোন প্রকারে মনেও রাখিয়াছেন। তিনি শুধু ডাকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে নিমন্ত্রণও করিয়াছিলেন—আবার যেন দেখা হয়।

ঘাটশিলার একটি প্রপাত
শ্রীপার্ব্বতীচরণ মাইতি গৃহীত

তথাস্তু, আমার নিজের স্বার্থ বজায় রাখিতে এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহার অনুরোধ মত (?) একবার তাঁহার উপর চড়াও করাই স্থির করিলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি এরূপ ভাবে অভ্যর্থনা করিলেন—যেন কত দিনের আলাপ। অনুমানে বুঝিলাম যে, সাত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সহিত ২।১

দিন মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আলাপ যে বিশেষ কিছু হইয়াছিল তাহা নহে। তথাপি তিনি আমাকে মনে করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতেই বুঝুন, তিনি কি ধরণের লোক। আমিও বুঝিলাম যে, যে এতটা মনে করিয়া রাখিতে পারে, এবং ঘরের ভিতর হইতে, কিছু দূরস্থিত পথে চলন্ত লোককে এরূপ অকস্মাৎ চিনিতে পারে,—সে কাজও কিছু করিতে পারে।" সুতরাং গৌর-চন্দ্রিকা না করিয়াই, কত দিন ওখানে থাকিব, তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম যে, সেই বৈকালেই ফিরিব। পক্ষকাল অজ্ঞাত-বাসের জন্য আসিয়াছিলাম; কিন্তু বাসা না পাওয়ায় ফিরিতে জ্ঞান কিছু হয় নাই; নহিলে, হিতোপদেশের সোজা কথাটাও জানে না—অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসঃ দেয় ন কস্যচিৎ! নহিলে, বলে কি না, ডাকঘরের সংলগ্ন বাড়ীতে স্থান দিবে! তাহাও আবার আজকালকার বাজারে। ভাবিলাম, লোকটা হয় বোকা, নয় পাগল। কিন্তু পরে যাহা শুনিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে, দুয়ের কিছুই নয়—বরং তিনিই লোককে তাহা বানাইতে পারেন।

কয়েকটা বাংলো ঘুরাইয়া, বাস্তবিকই তিনি তৎক্ষণাৎ একটী ছোট বাংলো ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্টের চেয়েও অধিক। ভাড়াও আশাতীত কম।

সুবর্ণরেখার পারাপারের শালের ডোঙ্গা

শ্রীশঙ্কররাও গৃহীত

হইতেছে। আমি ইতিমধ্যেই সংবাদ লইয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে, এখন Change-এর Season ও বাস্তবিক সমস্ত বাড়ীই বায়ুসেবীদের দ্বারা বায়না হইয়া গিয়াছে, একটীও খালি নাই। পোষ্টমাষ্টার বাবু বলিলেন, সবই সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া পক্ষকাল থাকিতে আসিয়া, একটী বাসা অভাবে ফিরিয়া যাইব, তাহা হইতেই পারে না। যেমন করিয়াই হউক, ঐ দিনই তিনি একটী বাসা ঠিক করিয়া দিবেন—নেহাৎপক্ষে ডাকঘর সংলগ্ন তাঁহার বাসা তো আছেই। আমি তো অবাক যে, লোকটা বলে কি? বোধ হয় লেখাপড়া কিছু শেখে নাই, অন্ততঃ ৪০৲/৫০৲ হইতে ১৫০৲/২০০৲ যেখানে বাংলোর ভাড়া, সেখানে আমার বাংলো একরূপ বিনা ভাড়ায় বলিলেও চলে। তার পরই চারিদিকে তিনি লোক পাঠাইতে লাগিলেন। কয়লা পাওয়া যায় না—কেহ কাঠের সন্ধানে গেল, কেহ গেল বাজারে, কেহ ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করিল। জিনিসপত্র বাসায় আনিবার জন্য একখানি গাড়ী করিয়া দিলেন। নিজের বাড়ীর দাসীকে আমার বাসায় কাজ করিতে পাঠাইলেন। বিছানার জন্য খাট পাঠাইলেন। এইরূপে যাহা কিছু আবশ্যক সমস্ত অচিরে বন্দোবস্ত হইয়া গেল,—দেখি, হাঁ, Village Postmaster

বটে। শুধু কি তাই, আবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে,—কেমন করে কি বেতারে জানি না,—আমার আগমন-বার্ত্তা শুনাইয়া দিলেন। আমরা হাঁপ ছাড়িয়া অজ্ঞাতবাস শুরু করিলাম।

নূতন বাসার বারান্দায় বসিয়া আছি, এমন সময় পাড়ার কালী মোড়ল একগাড়ী কাঠ লইয়া উপস্থিত। নূতন বাসা বলিলাম, তাহার কারণ, সাহেবী প্যাটার্ণের লোকের বা সাহেব বা ইংরাজদের বাংলোয় বা বাংলায় বাস বেশ মানায়, কিন্তু আমার মত পাড়াগেঁয়ে বাঙ্গালার বাংলায় বাস কি ভাল সয়? থাক্, যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। মোড়লের-পো, বলা বাহুল্য, একেবারেই পাড়াগেঁয়ে, আমারই মত—সম্পূর্ণ খাজা বলিলেও চলে। আমাকে দেখিয়া সোজা তাঁহার নিজের ভাষায় বলিলেন,—"আপন্যাই আস্যাছেন বটেক?" আমি বলিলাম "হঁা।" দেখিলাম, বেশ আলাপী লোক; তাতে আবার খাস এখানকার; সুতরাং আমিও একটু ঘেঁসিলাম—তাহার কাছে তাহাদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি কিছু কিছু জানা যাইবে বলিয়া।

সে বলিল, "এজ্ঞে, আপনাদের ঘরটা কল্‌কাতায় বটেন!" আমি বলিলাম, "হঁ, লগিজ্যাই (কাছেই) বটেন।" সে তৎক্ষণাৎ বলিল, "হঁ, এই কল্‌কাতালেই তো বাবুরা সব হাঁওয়া খেতে আস্‌ছেন।" সে জানে যে, এখানকার যত বায়ুসেবী বাবু—সব কলিকাতার আমদানী। অন্য স্থান হইতে যে কেহ আসিতে পারে, সেটা তাহার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নহে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কলকাতার গিরিশ বাবুকে জানেন?" আমি ভাবিলাম, লোকটা সমজদার বটে, নিশ্চয়ই থিয়েটারের খোঁজ খবর রাখে। আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে আবার কথা কহিল—যেন আমাকে ঠকাইতে পারিলে বাঁচে। বলিল "চিন্‌লেন নাই? গিরিশ বাবু আমাদের ই-ঠিনে (এখানে) কিরাণী বাবু ছিলেন, ভারী কিরাণী বটেন।" আমি চিনি না শুনিয়া সে একটু আশ্চর্য্য বোধ করিল। তাহার পর তাহাদের দেশের রসিক ময়রাকে চিনি কি না একবার জিজ্ঞাসা করিল, কারণ সেও কলিকাতায় থাকে। তাহাকেও চিনি না শুনিয়া সে ঠাওরাইল যে, তবে আমি কলিকাতার কিছুই জানি না। তাহার পর সে বেশ স্পষ্টই বলিল—"এই দেখ্‌ছেন নাই, দ্যাশে তো বাবুগুলানের কুছু খাঁতে নাই মিল্‌ছেন, তাই ই-ঠিনে হাঁওয়া খাঁতে আঁসে কোঁরে হামাদের মাথাগুলানকে খাঁলেন। আমরা চুকুড়ি পৈলা (কাঠা পালি) চাল কিন্‌তি। এক কুড়ি দশ পৈলা হোলোক, এক কুড়ি হোলোক, অখন্ (এখন) গার পৈলা নাই মিল্‌ছেন। কুঁকড়া (মুরগী) গুলা বাবুরা

সুবর্ণরেখার সাধারণ দৃশ্য
শ্রীশঙ্কর রাও গৃহীত

খাঁইয়ে খাঁইয়ে মাঙ্গা করে দিলেক। আট দশ আনার কম একটা নাই মিল্‌ছেন। এক টাকায় দু টাকায় একটা ডাগর পাঠা মিলতক্‌, খাতে লারতি (পারিতাম না), আর অখন বার আনা সের মাঙ্গছেন্‌। ঝিলা, রামতরই (ঢেঁড়স) কাঁকড় (শশা), দিঙ্‌লা (কুমড়া) কি আর কিইনে খাঁতি? অখন দেখছেন নাই চার গণ্ডা দিতে মাঙ্গলে বাবুরা তিন গণ্ডা মাঙ্গ্‌ছেন" ইত্যাদি।

বাবুদের উপর মোড়লের এইরূপ সু-উচ্চ ধারণা দেখিয়া আমি অন্য কথা পাড়িলাম। আগেই শুনিয়াছিলাম যে, এই সময়ে এ দেশের প্রধান পর্ব্ব হইয়া থাকে। আমাদের দুর্গোৎসবও শরৎ কালেরই উৎসব। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কোন না কোনরূপ শারদোৎসব আছেই। এ দেশেও আছে, তবে এখানে ইহা প্রধানতঃ হো, কোল্‌, সাঁওতাল-দের। সুতরাং আমার পক্ষে এ এক অজ্ঞাত পর্ব্ব।

পরব এদের অনেকগুলি, যথা—মাঘীপরব, বা-পরব, দামুরাই পরব, হীরা পরব, বাতায়ুলী পরব, জাম্‌-নাসা পরব, কালাম্‌ পরব ইত্যাদি। কিন্তু ঘাটশীলায় বিঁধা পরব ও ইন্দ্‌-পরবই প্রধান।

মোড়লকে তাহাদের বর্ত্তমান বিঁধা পরবের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে যেরূপ বলিল আমি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

"হঁ, বিঁধা বটেক। দেখ্‌বেন ভারী পরব। দু দশ বিশ কুড়ি লোক আস্‌বেন। এ-কে-বা-রে লোকে লো-কা-র-ণ। আপনারা ই-ঠিনলেই (এখান থেকেই) জানতে পারবেন। আজ রাত দুপুর বাজে পরব সুরু হবেন। বাজী চল্‌বে, আগোন, আগোন, (আগুন, আগুন,) বোমা ফাট্‌বেন্‌ দুল্‌-দুল্‌ (দুম্‌-দুম্‌), ঘুমাতে লারবেন। সারা রাত আপনাদের পথটায় লোক চলবেন। তার পর উঠিনে রিঙ্কিনি মন্দিরে রাজা আস্‌বেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্‌ রাজা। সে তো অবাক্‌! কারণ, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি "কোন্‌ রাজা"; তাহাদের রাজার কথা জানে না—এরূপ যে কেহ আছে, তাহা তাহার অজ্ঞাত।

সে বলিল "এজ্ঞে বুঝ্‌লেন নাই? ধলভূঁঞার রাজা বটেন। ভারি রাজা। রাজার উল্‌ আছেন, ডিগ্‌রি আছেন (উইল ও ডিক্রী)। যেমন তেমন কি বটেন? হাঁকোটলে (হাইকোর্ট হইতে) হুকুম আস্‌লো। কে পারবেক রাজাকে। সি (সে) বারে মোকর্দ্দমা কর্‌লেক্‌, ৭ হাঁজার টাকা মিল্‌লেক।" মোড়ল আবার খেই হারিয়েছে দেখে, আমি বিঁধার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম যে,

ঘাটশিলার আর একটি প্রপাত

শ্রীপার্ব্বতীচরণ মাইতি গৃহীত

"রাজা আঁসে করে কি করবেন?" তখন সে আবার বলিতে লাগিল, "এজ্ঞ্যা রাজা হাঁওয়াগাড়ীনে আঁসে কোরে কাঁড়্যা দিবেন।" আমি বলিলাম, "সে কি?" সে বলিল,—"রাজা আঁসে করে কাঁড়্‌লে কাড়াটাকে বিঁধবেন। (অর্থাৎ তীর দ্বারা মহিষ শাবককে বিঁধিবেন।) ইহাই তো বিঁধা বটেক।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তার পর"—সে বলিল "তার পর সাঁওতালরা কাড়াটাকে কাঁট্যা দিবেন। রাজা কাড়াটার রক্ত লিঁয়ে কপালে ফোঁটা দিবেন, জিভে দিবেন—আর সকলাইও দিবেন। তার পর পাঁঠা পড়্‌বেন তো পড়্‌বেনই, কি একটা দুটা! পাঁঠার পর্ব্বত হবেন। তার পর সেই

রক্ত লিঁয়ে কয়্যা সব ছিঁটায়ে দিবেন। আর সাঁওতাল মেয়েরা সব লাচ্‌বেন আর জঙ্গলীরাও লাচ্‌বেন; কত রকম বাজনা বাজবেক।"

মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীশ্রীরঙ্কিণী দেবী
শ্রীপার্ব্বতীচরণ মাইতি গৃহীত

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজই হবে, না পরেও আরো হবে।" সে বলিল, "এজ্যা কাল বেলা তিন পহরেও হবেক দেখ্‌বেন আপ্‌নারা।"

মোড়লের পো বক্তৃতা শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে সংবাদ পাইয়া পূর্ব্বকথিত তহশীলদার বাবু আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে নানাবিধ জিনিস-পত্র। বলিলেন, আমরা নূতন আসিয়াছি—নিশ্চয়ই জিনিসপত্রের অভাবে কষ্ট হইতেছে; সুতরাং তাঁহার সামান্য কিছু দ্রব্যাদি লইতেই হইবে, তাহা নহিলে তিনি ছাড়িবেন না। এবং দ্বিতীয়তঃ, আমরা এখানে বাসা না করিয়া, তাঁহার বাসায় থাকিলে, তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। আপনারাও যে হইবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষ তিনি আবার নিমন্ত্রণও করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে পোষ্টমাষ্টার বাবু আসিয়া উপস্থিত। অবশ্য ইতিমধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে এদিক ওদিক হইতে কিছু জানিয়াও লইয়াছিলাম। তাঁহার নাম শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জেম্‌সেদ্‌পুর হইতে তিনি লড়ায়ের সময় মেসোপটেমিয়া, আরব, পারস্য, পারস্যোপসাগর, রুষ ইত্যাদি অনেক স্থানে গমন করেন। সুতরাং তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। বেশ মোটা মাহিনায় কাজ করিতেন; সুতরাং বড় বড় circleএ চলা-ফেরাও করিতেন। একেবারে আপ্‌ টু ডেট্‌ (up to date)। সঙ্গে সঙ্গে পরোপকারী যতদূর হইতে হয়—এ কথা সেখানে সকলেই বলিতেন। তাঁহার সহিত বিঁধা পরব সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল; দেখিলাম, তিনি মোড়লের কথারই প্রায় সমর্থন করিলেন।

এত বড় একটা ব্যাপার যখন, তখন স্থির করিলাম যে, সংবাদপত্রাদির প্রতিনিধি রূপে রাজা ও রাজ-কর্ম্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ইহার ইতিবৃত্ত বিশেষ ভাবে সংগ্রহ করিয়া আপনাদের সকলকে শুনাইব। কিন্তু শুনিলাম, ইহাতে কিছু ফল হইবে না। হোরে বলিবে "রামা জানে", রামা

সুবর্ণরেখা-তটে বালুকা-পাহাড়
শ্রীশঙ্কর রাও গৃহীত

বলিবে "আমা বুল্‌লেও বুল্‌বেক্—হামি লারব" (পারিব না)।

এ সব 'হোপলেস্'(!) বুঝিয়া গভীর গবেষণা (?) দ্বারা একটা অজ্ঞাত পর্ব্বের আলোচনা করাই যুক্তযুক্ত স্থির করিলাম।

প্রথমতঃ দেখ যাক্—যাহাদের এই দেশ ও পরব, তাহারা কাহারা, এবং কোথায় তাহাদের উৎপত্তি।

এ দেশের নাম সিংভূম বা সিংহভূম। অর্থাৎ সিং বা সিংহ রাজাদের দেশ। আদিমদের এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তাহারা বলে যে, সিংভূমেই জগৎ প্রথম সৃষ্ট হয়। জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা, 'সিংবোঙ্গা'র নামানুসারে, দেশের নামও 'সিংবোঙ্গা' হয়। সিংভূম তাহারই অপভ্রংশ। 'সিংবোঙ্গা' অর্থে সূর্য্য।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রথম যুক্তিই ঠিক। মানসিংহ যখন উড়িষ্যা-বিজয়ে ব্যস্ত, সেই সময় এ দেশের ভুঁইঞা রাজারা 'হো'দের দ্বারা উত্যক্ত হইয়া তাঁহার শরণ লন। মানসিংহ তিনজন রাজপুতকে তাহাদের সাহায্যার্থ

সুবর্ণরেখার সান্ধ্য প্রতিচ্ছবি

শ্রীশঙ্কর রাও গৃহীত

পাঠান। তাঁহারা তিন ভাই। জ্যেষ্ঠ কাশীনাথ সিং হো-গণকে পরাভূত করিয়া রাজা হন। ভুঁইঞা রাজারা তাঁহার অধীন জায়গীরদার রূপে গণ্য হন। অন্য দুই

সুবর্ণরেখা—ঘাটশিলা

শ্রীপার্ব্বতীচরণ মাইতি গৃহীত

ভ্রাতাও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের রাজা হন। কাশীনাথ সিংয়ের রাজ্যের নাম ছিল পরাহাট। ক্রমশঃ তাঁহাদের বিস্তৃত রাজ্যের নাম পরে সিংভূম হয়। এদিকে ধলরাজাদের দেশ ক্রমে ধলভূম নামে পরিচিত হয়। ঘাটশীলা সিংভূমের ধলরাজগণের সদর স্থান।

এ দেশের আদিম অধিবাসীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহাদের শাস্ত্রে যেরূপ বলে—Col. Tickell ১৮৮৪ খৃঃ তাঁহার কোল্‌হান নামক প্রবন্ধে, এবং তাঁহার সমসাময়িক Col. Dalton তাঁহার Ethnology of Bengal নামক গ্রন্থে তাহা এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ওটেবোরাম ও সিংবোঙ্গা স্বয়ংসিদ্ধ আদি দম্পতি ও ভগবান-ভগবতী। তাঁহারা প্রথমতঃ নগ্না ধরিত্রীকে বৃক্ষ-পত্র-লতা-তৃণ-গুল্মে আচ্ছাদিত করেন। তৎপরে যে সকল প্রাণী মানুষের গৃহপালিত হইবে, তাহাদিগকে সৃষ্টি করেন। তৃতীয়তঃ বন্যজন্তু। এবং চতুর্থতঃ এক বালক ও এক বালিকা। সিংবোঙ্গা এই বালক বালিকাকে এক পাহাড়ের গুহায় রাখিয়া দেন। বয়ঃপ্রাপ্তি সত্ত্বেও তাহা-

দিগকে দাম্পত্য-ধর্ম্মে অমনোযোগী দেখিয়া, তিনি 'ইলি' বা পাসেশ্বরী (মদ) প্রস্তুত ও পান-বিধি তাহাদিগকে শিখাইয়া দেন। ইহাতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং সেই বালক-বালিকা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পিতা-মাতা হ'ন। তাঁহাদের ১২টী পুত্র ও ১২টী কন্যা হয়। সিংবোঙ্গা যথাকালে তাহাদের সকলকে এক ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। তথায় নিম্নলিখিত ভাবে মাংস সাজাইয়া রাখা হয় মহিষ, গরু, ছাগ, মেষ, শূকর, মুরগী ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন তরিতরকারীও ছিল। সিংবোঙ্গা একসঙ্গে একটী বালক ও একটী বালিকাকে দম্পতি রূপে আসিতে বলিয়া, তাহাদের ইপ্সিত খাদ্য লইয়া যাইতে আদেশ দেন। প্রথম ও দ্বিতীয় দম্পতি গরু ও মহিষ মাংস গ্রহণ করে ও তাহাদের সন্ততিরা 'কোল,' অথবা 'হো' এবং 'ভূমিজ' বলিয়া পরিচিত হয়। যাহারা শুধু তরি-তরকারী গ্রহণ করে, তাহাদের সন্ততিরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হয়। ছাগ ও মেষ-খাদকের সন্ততিরা শূদ্র এবং মৎস্য-খাদকের সন্ততিরা 'ভূ ইঞা' হয়। যাহারা শূকর গ্রহণ করে, তাহাদের সন্ততিরা 'সাঁওতাল' হয়। কোন দম্পতি দেরীতে আসায়, কিছুই পায় নাই। এজন্য প্রথম দম্পতি তাহাদের ভুক্তাবশিষ্ট কিছু তাহাদিগকে দেয়। তাহাদের সন্ততিরা 'ঘাসী' বলিয়া পরিচিত হয়। যেহেতু তাহাদের ভাগ্যে কিছুই ছিল না—অন্যের প্রদত্ত খাদ্য তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল, এজন্য ঘাসীদের কোনরূপ কাজ-কর্ম্ম করিতে নাই—পরের অন্নে দিন কাটানই প্রথা (যথা, চৌর্য্য-বৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি)। হো'দের মতে, ইংরাজেরা, প্রথমোক্ত গো বা মহিষ-মাংসগ্রহী দম্পতির সন্ততি; অর্থাৎ কোল বা হো বা ভূমিজদের জাতি।

এই সব জাতিদের পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে ১৮৪০ খৃঃ Col. Tickell লিখিয়াছেন—"The women of the lowest order went about in a disgusting state of nudity wearing nothing but a miserably insufficient rag round the loins." এবং Col. Dalton লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"The men care little about their personal appearance. It requires a great deal of education to reconcile them to the encumbrance of clothing; and even those who are wealthy move about all naked, as proudly as if they were clad in purple and fine linen. The women in an unsophisticated state are equally averse to superfluity of clothing. In remote villages they may still be seen with only a rag between the legs, fastened before and behind to a string round the waist."
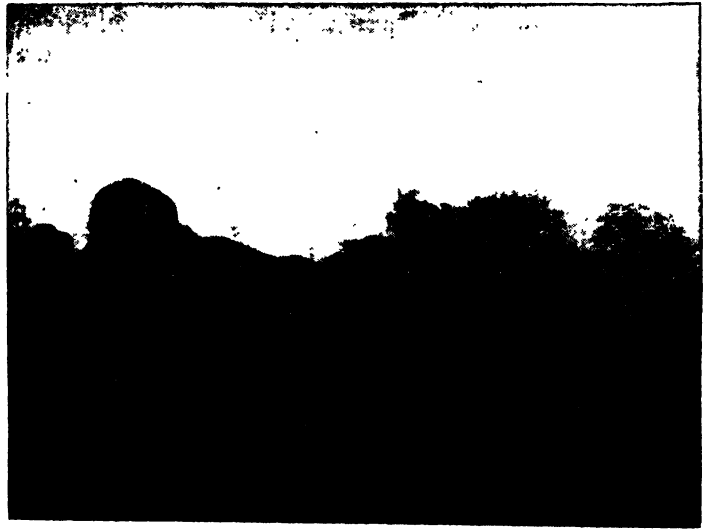
বিঁধা পরবে নৃত্য
শ্রীপার্ব্বতীচরণ মাইতি গৃহীত

এখন অবশ্য তাহারা অনেক সভ্য হইয়াছে। পর্ব্ব উপলক্ষে তাহাদের চাল-চলন কিরূপ হয়, তৎসম্বন্ধে Ethnology of Bengal গ্রন্থে যাহা পাইয়াছি তাহা এই—

"The religious ceremonies over, people give themselves up to feasting, drinking immoderately of rice beer till they are in the state of wild ebriety most suitable for

the process of letting off steam. As the utmost liberty is given to girls, the parents never attempting to exercise any restraint, the girls of one village sometimes pair off with the young men of another, and absent themselves for days. The festival becomes a Saturnale, during which servants forget their duty to their master, children their reverence for parents, men their respect for women, and women all notions of modesty, delicacy and gentleness. Their natures appear to undergo a temporary change. Sons and daughters revile their parents in gross language, and parents their children. Men and women, become almost like animals in the indulgence of their amorous propensities. It cannot be expected that chastity is perserved when the shades of night fall on such a scene of licentiousness and debauchery."

বিঁধা পরবে দেখিলাম, ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য। অধিক টীকা অনাবশ্যক। বিঁধার বর্ণনা মোড়ল যাহা করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া বিশেষ কিছুই দেখিলাম না। প্রকাণ্ড মেলা, ১২ দিন উৎসব, সাঁওতাল নাচ, কোল নাচের ছড়াছড়ি। তবে সে নাচ দেখিবার উপযুক্ত। এক স্থানে ৪।৫টী সাঁওতাল বা কোলবালা নৃত্য আরম্ভ করিল,—বাদ্যকরেরা কাড়ানাকাড়া লইয়া তাহাদের অদূরে তালে তালে বাজাইতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই ৪।৫ জন নৃত্যশীলার সহিত ৪।৫ শত নৃত্যশীলা দিল্ খুলিয়া চক্রাকারে যোগদান করিয়া একেবারে সমগ্র স্থানটীকে নূতন আকার প্রদান করিল। বাদ্যকরগণ তখন সেই চক্রব্যূহের মধ্যে পড়িল। নর্ত্তকীগণ পরস্পরের সহিত হস্ত সংবদ্ধ। নৃত্যের ভঙ্গী লঘু, গতি সরল, আবর্ত্তন মৃদু, বিবর্ত্তন ধীর, ভাব গম্ভীর ও বাহ্যিক দর্শন ছবি স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত,—যেন কলের পুতুল বা বায়োস্কোপের ছবি একতালে, একমনে, একভাবে, এক-প্রাণে নাচিয়া যাইতেছে। কোন গোলমাল নাই, বাক্যালাপ নাই, হাবভাবের ছড়াছড়ি নাই, নয়ন-কোণে বিদ্যুৎ-লেখাও নাই। কোন আগন্তুকী নৃত্যে যোগদান করিতে আসিলে, যাহার হাত সে ধরিতে চাহে, সে আসিবামাত্র অতি সুন্দর কুর্ণিশের ভঙ্গীতে উভয়ে উভয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক নৃত্য আরম্ভ করিবে। কোন কোন মুহূর্ত্তে ৪০।৫০ জন ঠিক ঐভাবে নৃত্যের বিভিন্ন অংশে যোগদান করে। এই এক প্রকার নৃত্য। সকলেরই একই ধরণে কাপড় পরা, প্রায় সকলেরই মস্তকে একটী করিয়া রূপা বা কাঁসার অদ্ভুত দর্শন চোঙাকৃতি শিরোভূষণ, ও গলায়,সঙ্গতি হিসাবে, কাহারো টাকার, কাহারো আধুলির, কাহারো বা সিকির মালা। আবার কাহারো বা দুই প্রস্থ, যথা টাকা ও আধুলি, বা আধুলি ওসিকি, অথবা টাকা ও সিকির মালা।

দ্বিতীয় প্রকার নাচ এই প্রকারই, তবে তাহাতে প্রতি ২০।২৫ জন নর্ত্তকী বিভিন্ন সঙ্গীতের আলাপনে নিযুক্তা। ইহাদের সঙ্গীত দুর্ব্বোধ্য হইলেও সুমিষ্ট ও শ্রুতি-সুখকর। সকলে ঠিক একই সময় কোন একটী তাল একই সুরে আরম্ভ করে, আবার একই সময়ে তাহা ছাড়িয়া দেয়।

আবার অন্য প্রকার নাচও আছে। কোথাও বা একমাত্র নর্ত্তকী লম্ফ-ঝম্প প্রদান করিয়া নানা ভঙ্গীতে ব্যায়ামোচিত নর্ত্তনে নিযুক্তা। আবার কোথাও বা ৪।৫ জন হইতে আরম্ভ করিয়া ২০২৫ জন পর্য্যন্ত একসঙ্গে অনুরূপ ভঙ্গীতে, আবার কখনও বা প্রত্যেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে, নৃত্য-পরায়ণা। সঙ্গে কাড়া-নাকাড়া সর্ব্বদা তাল যোগাইতেছে ও বোধ হয় উৎসাহ দানেও নিযুক্ত। এসব সামরিক নৃত্য, এবং বাস্তবিকই তাই,—প্রতি চরণ-ক্ষেপে, প্রতি ভঙ্গীতে, অথবা প্রত্যেক লম্ফে-ঝম্পে বীরত্বের ব্যঞ্জনা বিশেষ ভাবে বিকশিত।

পরবের মোটামুটী একটা বিবরণ এই পর্য্যন্ত। এখন ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে সঠিক কেহ কিছু বলিতে পারিল না। একজন বলিলেন, পূর্ব্বকালে এদেশের এক রাজা এক দিন সদলবলে শিকারে বাহির হন। সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও কোনরূপ শিকারের সুবিধা না হওয়ায়—রাজা অতি ম্রিয়মান ও চিন্তিত হইয়া পড়েন। এমন সময় এক বন্য মহিষ দর্শনে সকলে সোৎসাহে তাহার পশ্চাদ্ধাবন

করিলেন। মহিষও দ্রুতবেগে পলায়নপর হইল। ঠিক সন্ধ্যার সময় রাজার অব্যর্থ সন্ধানে মহিষ শরবিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইল। শিকারের সফলতায় মহোল্লাসে সকলে রাজার নিকট হইতে শিকারের প্রসাদ গ্রহণ করিল। বর্ত্তমান বিঁধা পরব সেই শিকার পর্ব্বেরই স্মরণোৎসব। শিকারে সফল মনোরথ হইয়া পূর্ব্বে যেমন তাহারা পূজাদি প্রদান করিত, এখনও সেইরূপ বর্ত্তমান উৎসব পূজা-প্রাঙ্গণেই হইয়া থাকে।

এ বিবরণ কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। তবে ইহা যে এ প্রদেশের শারদোৎসব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উপরন্তু বোধ হয়, ইহা এ অঞ্চলের রাজপুত রাজগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত রাজপুতানার শারদীয় আহেরিয়া উৎসবেরই অনুরূপ বা পরিবর্ত্তিত সংস্করণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সিংভূম বা সিংহভূম নামের উৎপত্তি—সিংহ রাজগণের নাম হইতে। এ দেশে সামন্তরাজই অধিক, এবং তাঁহারা প্রায়শঃই রাজপুত বংশোদ্ভূত।

সে দিন কাল নাই, সে বীরদর্পও নাই, তাই সে সকল উদ্দীপনাময় অনুষ্ঠানও নাই। তাই এখন পূজা-প্রাঙ্গণে নিরীহ গৃহপালিত অসহায় ভীত-ত্রস্ত মহিষ-শিশুকে দৃঢ় পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া শিকারের অভিনয়ে চারিদিক হইতে খোঁচাইয়া মারা হয়। তৎপরে অন্ততঃ ১০৮টী ও ঊর্দ্ধ সংখ্যা যতগুলি সম্ভব ততগুলি ছাগ-শিশুকে প্রাণহীন করা হয়।

বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটের রাজগণের ন্যায় ধলভূমের রাজগণ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ বর্ত্তমান। কাহারো মতে ইঁহারা আসলে রাজপুত বংশোদ্ভূত; কিন্তু দৈব-বিপাকে ধোপার গৃহে পালিত হওয়ায়, ধল আখ্যা প্রাপ্ত হন (ধল অর্থে ধবল বা ধব বা ধোপা)। আবার কাহারও মতে ইঁহারা রাজপুত বংশোদ্ভূত নহেন। সিংভূম গেজেটীয়ারের গ্রন্থকারও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সঠিক অভিমত দিতে পারেন নাই। তবে তিনি ধলভূম রাজগণের প্রথমোক্ত দাবীর কথার প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন।

যে রুক্মিণী দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, সেই রুক্মিণী দেবী সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যাক্।

রুক্মিণী দেবী এ অঞ্চলে সর্ব্ববিদিত ও তিনিই ধলভূম রাজগণের কুলদেবতা—সুতরাং বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি আগে ছিলেন এক পাহাড়ের উপর। তথায় না কি বহু নরবলি হইত। এজন্য একজন শ্বেতাঙ্গ ডেপুটী কমিশনার তাঁহাকে বর্ত্তমান স্থানে থানা-প্রাঙ্গণে আনিবার ব্যবস্থা দেন, যাহাতে তাঁহার সম্মুখে আর কেহ নরবলি দিতে না পারে। রুক্মিণীর প্রস্তরময়ী সিন্দুর-বিভূষিতা অষ্টভুজা মূর্ত্তি। উপরের দুই হস্তে একটী ঐরাবত উত্তোলিত অবস্থায় রক্ষিত,—বোধ হয় তাঁহার অসাধ্য-সাধনের চিহ্ন স্বরূপ।

অতঃপর কালীয়দমন ও কালীয়দহ দেখিয়া আমরা পঞ্চ-পাণ্ডব দর্শনে চলিলাম। ভীষণ জঙ্গল, অদূরে সুবর্ণ-রেখা। লতা-গুল্ম-তৃণহীন একটী পাহাড়ের মাথায় কতকগুলি মূর্ত্তি খোদিত। প্রবাদ, ইহাই পঞ্চ-পাণ্ডবের মূর্ত্তি। দেখিয়া বিশেষ ভক্তি হইল না। শুনিয়াছিলাম, অশ্ব-পদচিহ্ন, অক্ষ, গদা ইত্যাদিও অঙ্কিত আছে; কিন্তু আমরা তাহা দেখিলাম না। খোদিত রেখাগুলির যেরূপ অবস্থা, তাহাতে অনুমান, আর ২০।২৫ বৎসরের মধ্যেই হয়ত তাহা একেবারে মুছিয়া যাইবে।

যাহাই হউক, হয়ত ইহা বহুকাল হইতে আছে,—এবং যখন এতবড় একটা প্রবাদ, তখন গোঁড়া হিন্দু হইয়া অবিশ্বাস করি কিরূপে?

ইহাই অজ্ঞাত বাস ও অজ্ঞাত পর্ব্ব, এবং ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই আপনারা এ সকল দেখিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

জাগরণ

শ্রীরেবা দেবী

সুতারা যখন মাত্র এক বৎসরের, তখনই সে তার মাকে হারায়। জ্ঞান হয়ে-অবধি সে বৃন্দাকেই মা বলে জানে। বৃন্দা ছিল তার মার বাপের বাড়ীর ঝি। ছোট মেয়েটি রেখে সুতারার মা যেদিন চোখ বুজ্‌লেন, সেইদিন থেকে বৃন্দা এই মা-মরা মেয়েটাকে বুকে তুলে নিলে।

সুতারার বাপ একজন অবসর-প্রাপ্ত সিভিলিয়ান। স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের সহিত তাঁর প্রায় সকল সম্বন্ধ শেষ হয়। সুতারা যখন সবে পাঁচ বছরের, তখন ঠিক মত শিক্ষার জন্য তার বাপ তাকে পাঠিয়ে দিলেন একটা মেয়ে বোর্ডিংএ। যাবার সময় সুতারা বৃন্দাকে বলে গেল—"দাই মা, তুমি কেঁদ না, ছুটি হ'লে আবার তোমার কাছে ফিরে আস্‌ব।" বৃন্দার তিন চার দিন একরকম অনাহারেই কাট্‌ল।

বোর্ডিংএর মেয়েরা এই ফুট্‌ফুটে, টুক্‌টুকে ছোট্ট মা-মরা মেয়েটিকে বড় আদরের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে টেনে নিলে। এখানে ছোট বড় সকলের আদরের মধ্যে থেকে সে সদ্য বাড়ী ছাড়ার শোক অনেকটা ভুলে গেল। তার বিশ্বাস ছিল, স্কুলে কেবল পড়া করতে হয়, আর কোন ত্রুটি হ'লেই বেতের ঘা ছাড়া আর কিছু উপায় নেই। এখানে কিন্তু লেখা-পড়ার চেয়ে সে খেলা কর্‌ত বেশী। এখানে সকলেই তাকে "পুতুল" বলে ডাকত। এম্‌নি ভাবে সুতারা বাড়্‌তে লাগ্‌ল। সে যাদের সাম্‌নে বেড়ে উঠ্‌ল, তারা কিন্তু তাকে "পুতুল" ছাড়া আর কিছুই ভাব্‌তে পার্‌ত না। সে যখন ষোলয় পা দিল, তখনও সকলে তাকে সেই পাঁচ বছরের খুকীই মনে কর্‌ত।

এক দিন হঠাৎ তার বাপ তাকে স্কুল ছাড়িয়ে নিলেন। দু'দিন পরে স্কুলে খবর এল সুতারার বিয়ে। তাদের সেই কচি মেয়ের বিয়ে? সকলের বিস্ময়ের সীমা রইল না। স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী প্রভা-দি'র কাছে সুতারার নিজের হাতের লেখা একখানা চিঠি এল। সে চিঠি পড়লেই বোঝা যায় যে, লেখিকার সংসার সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান নেই। সে লিখ্‌ছে—এ বিয়েতে সে খুব খুসি, কারণ, বাবা তাকে অনেক সুন্দর সুন্দর কাপড় ও গয়না কিনে দিয়েছেন, বাবার বন্ধুদের কাছ থেকে সে এত ভাল ভাল জিনিস উপহার পেয়েছে যে, তাঁদের না দেখিয়ে সে কিছুতেই সুখী হ'তে পার্‌বে না, ইত্যাদি। প্রভা-দি একবার তাড়াতাড়ি চোখটা মুছে নিলেন। আহা, পুতুল যে নিতান্ত শিশু, সে বিবাহের কি জানে? কাপড় গহনাই যে বিবাহের আসল জিনিস নয়, কে তাকে বোঝাবে? তার মাও নেই যে তাকে বুঝিয়ে দেবে—এই বিবাহটা পুতুল-খেলার মত সরল, সহজ ব্যাপার নয়।

যা' হো'ক, শুভক্ষণে শুভলগ্নে অরুণের সঙ্গে সুতারার শুভ বিবাহ হয়ে গেল। বিয়ের আগের দিন সুতারার বাপ অরুণকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বল্লেন—"অরুণ, তোমার বাপ-মা আমার অনেক দিনের পুরান বন্ধু। আজ তাঁরা ইহলোকে নাই বটে, তবুও স্বর্গ হ'তে তাঁরা এই বিবাহে সুখী হ'বেন। আমার ঐ একমাত্র মাতৃহীন মেয়েটাকে তোমার হাতে দিয়ে এবার আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে মর্‌তে পার্‌ব। একটা কথা—সুতারা যদিও ষোলয় পড়েছে, তবুও তার সংসার সম্বন্ধে জ্ঞান খুব কমই,—ও এখনও ঠিক শিশুর মত সরল। তুমি ওকে সাবধানে রেখ।" খুব গর্ব্বের সঙ্গেই অরুণ উত্তর দিয়েছিল—"আমি চোখ খুলেই ওকে নিচ্ছি। আমি জানি, ও ক্ষুদ্র বালিকা মাত্র। ও যতদিন নিজের দায়িত্ব না বুঝ্‌বে, আমি ওর কাছে কোন দিনই কিছুই দাবী কর্‌ব না।"

শুভদিনে সুতারা চ'লে গেল স্বামীর ঘরে,—সঙ্গে গেল বৃন্দা। অরুণ তাকে ছোট মেয়ের মত স্নেহ আদরে ভরিয়ে দিলে। প্রায় প্রতি দিন তাকে নূতন নূতন যায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেত,—অনবরত নানা রকম উপহার দিয়ে তার কচি মুখে হাসি ফোটাতে সে বড় ভালবাস্‌ত। স্বামীর ঘরে এসে সুতারার কোনই পরিবর্ত্তন হ'ল না,—সে ঠিক আগের মতই দাইমার বুকে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়্‌ত। অরুণ নিজের ঘরেই থাক্‌ত, কেউ কারু স্বাধীনতায় বাধা

..ত না। এম্‌নি ভাবে বিবাহের প্রথম বৎসরটা একরকম .তুল খেলেই কেটে গেল।

এক দিন সন্ধ্যাবেলা কি একটা প্রয়োজনে অরুণ সুতারার ঘরে গেল। তার কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে, ঘরের সাম্‌নের বারাণ্ডায় গিয়ে দেখে, একটা মাদুরের উপর সুতারা ঘুমিয়ে আছে,—চারিদিকে একরাশ বেলফুল ছড়ান,—একটা অসমাপ্ত মালা তার হাতের মধ্যে রয়েছে। অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে অরুণ সাম্‌নের জীবন্ত ছবির দিকে চেয়ে রইল। কে যেন তার কাণে কাণে বল্লে—"একে নিয়ে তুমি কি চিরজীবন পুতুল-খেলা কর্‌বে? এ যে তোমার বিবাহিতা স্ত্রী! তুমি কি পুরুষ নও?" অরুণ এক পা এগিয়ে আবার দু' পা পিছিয়ে গেল। মনে পড়ে গেল তার প্রতিজ্ঞা।

এর পর থেকে অরুণ আস্তে আস্তে সুতারার কাছ থেকে সরে যেতে লাগ্‌ল। তার সঙ্গে ঘনিষ্টতা রাখ্‌তে সাহস হ'ল না। নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস নেই,—কে জানে, যদি কোন দিন এমন কিছু করে বসে, যা'র জন্যে চিরদিন তাকে অনুশোচনা ভোগ কর্‌তে হয়। সুতারার ভাল বন্দোবস্তই করে দিলে—তার বাহিরের অভাব কিছু রইল না। কিন্তু অরুণ আর তার সঙ্গে ছেলে-খেলা কর্‌তে নারাজ।

সুতারা কিন্তু এর কিছুই বুঝ্‌লে না,—কেবল তার মনে হ'ল, অরুণ আর পূর্ব্বের মত নেই,—তাকে তো আর বেড়াতে নিয়ে যায় না, পুরাতন সোফেয়ারের সঙ্গে সে তো আজ-কাল একাই বেড়াতে যায়। আগের মত ভাল ভাল ইংরেজি বইও তো আর অরুণ তাকে প'ড়ে শোনায় না। কথা কইতে গেলেই কায আছে বলে উঠে যায়। এ সবের মানে কি? অরুণ কি কোন কারণে তার উপর বিরক্ত হয়েছে? হঠাৎ মনে পড়্‌ল—অরুণ তাকে কাঁচা তেঁতুল খেতে মানা করেছিল, সে তো তার কথা শোনে নি,—তাই বুঝি সে রাগ করেছে?

এক দিন সুতারা আর থাক্‌তে না পেরে, সোজা অরুণের কাছে গেল। অরুণ তখন একটা খবরের কাগজ খুলে বসে ছিল। সুতারাকে আসতে দেখে, চোখ না তুলেই বল্লে—"কি চাও?" অরুণের গম্ভীর স্বর শুনে সুতারার ভয় হ'ল, সে ধীরে ধীরে বল্লে—"তোমার কথার অবাধ্য আর কখনও হব না,—আমি আর কোন দিনও কাঁচা তেঁতুল খাব না,—তুমি আমার উপর রাগ করো না।" অরুণ অনেকক্ষণ কিছুই বল্লে না। পরে কেবল বল্লে—"আমি তোমার উপর রাগ করিনি,—আজ আমার অনেক কায আছে,—তুমি এখন উপরে যাও।" সুতারা এক গাল হেসে বল্লে—"তা হ'লে কা'ল তুমি আমায় সিনিমা দেখ্‌তে নিয়ে যাবে?" "যাব।"

এ রকম করে কিন্তু আর কত দিন চলে,—রোজ রোজ তো অরুণকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে যাওয়া যায় না? সব কাজে অরুণের সঙ্গ পাবার আশা সুতারা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলে। আর সে অরুণের কাছে কোথাও যাবার জন্যে আব্দার ক'রে না। তার এত দিনে যতটুকু জ্ঞান হয়েছিল, তাতে সে বুঝেছিল যে, যে-কোন কারণেই হোক, অরুণ তার সঙ্গে বেশী সম্পর্ক রাখ্‌তে চায় না। সেও তাই জেনে নিলে।

ক্রমে অরুণের বেশীর ভাগ সময় কাট্‌তে লাগ্‌ল বাইরে। রাত্রে শোয়া ভিন্ন বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক একরকম শেষ। বাইরের লোক তার মধ্যে বেশী কিছু পরিবর্ত্তন দেখ্‌লে না। পূর্ব্বেরই মত সে হাস্‌ত, কায কর্‌ত। কেবল তার বিশেষ বন্ধুরা তার হাসির মধ্যে একটা বিষাদের ছায়া দেখ্‌তে পেত,—যেন একটা গোপন ব্যথা সে হাসি দিয়ে লুকোতে চায়। এই ভাবে আরও এক বৎসর কেটে গেল।

যদিও সকলে সুতারাকে বালিকার মতই দেখ্‌ত, কিন্তু সত্যি তার বয়স বাড়্‌ছিল বৈ কম্‌ছিল না। এখন সে ১৮ বৎসরের যুবতী। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞান-বুদ্ধি ধীরে ধীরে পরিপক হ'ল। সে এত দিনে নিজেকে বেশ করে পরীক্ষা করে দেখে বুঝ্‌লে যে, তার কোথায় কি একটা অভাব আছে। তার খাওয়া-পরার কোনই কষ্ট নেই,—যখন ইচ্ছা সে বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যায়,—তার নিজের জন্যে আলাদা একটা মোটর আছে—সে যেখানে ইচ্ছে যায়, কেউ বাধা দেয় না। তবুও তার জীবন কেন এত শূন্য?

বিয়ের প্রথম বৎসর সে বড় একটা কারু সঙ্গে মেশেনি। অরুণকে পেলেই সে সুখী হ'ত,—তাই তার বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম। আজ কাল কিন্তু সে নিতান্তই একা হয়ে পড়েছে। অরুণ আর তার কাছে আসে না,—বৃন্দা ভিন্ন

আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় না। এইরূপ সঙ্গী-হীন জীবন তার কাছে বড়ই কষ্টকর হ'ল।

অনেক সময় ঐ সামনের বাড়ীর মেয়েটির সঙ্গে ভাব করতে তার ইচ্ছা হয়, কিন্তু হ'য়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে ও-বাড়ীর মেয়েটি তার ছোট্ট ফুলের মত শিশুটিকে কোলে ক'রে জানলায় দাঁড়ায়, মায়ে-ছেলেতে কত কথাই না কয়! সুতারার ইচ্ছা হয়, তাকে একবার প্রাণ ভ'রে আদর করে। তার খেলবার মোমের পুতুলগুলি এই সদ্য-প্রস্ফুটিত মাতৃ-হৃদয়টিকে সান্ত্বনা দিতে অক্ষম।

তার বড় রাগ হয়—কেন তাকে সকলে বালিকার মত দেখে? এমন কি, তার স্বামীও তাকে দুগ্ধ-পোষ্য শিশু মনে করে,—কিন্তু সে যে এখন স্বপ্নোত্থিত নারী। আগে যে-সবে সে আনন্দ পেত, এখন যে তার মধ্যে সে কিছুই পায় না।

এক দিন হঠাৎ তার চোখ পড়ল—তার খেলনা দিয়ে-সাজান ছোট্ট কাচের আলমারীর উপর। বিরক্তিতে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। একটানে সব চুরমার করে ভেঙ্গে ফেলে, সে বালিসে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। বৃন্দা মনে করলে, সাধের খেলনাগুলো ভেঙ্গে গিয়েছে, তাই না তার "তারা" এত কাঁদছে?—সে তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল যে, জামাই বাবুকে ব'লে তার জন্যে এক বাক্স নূতন খেলনা আনিয়ে দেব,—এর জন্যে কি সারা রাত না খেয়ে কাটাতে হয়? বেচারা বৃন্দা "তারার" যে কোথায় ব্যথা, সেটা বুঝল না।

দিন তার কাটতে চায় না। সংসারের কাযে তাকে একেবারে হাত দিতে হয় না,—ঝি-চাকরের অভাব নেই। সে যখুনি যা চায়, তখুনি তা পায়,—কেবল মুখ থেকে কথা খসালেই হ'ল। এমন ভাবেই কি চিরজীবন কাটাতে হ'বে? উপায় না দেখে সে লেখাপড়ায় মন দিলে। যেখানে যে বই সে পে'ত, তাই প'ড়ে ফেলত। এক দিন রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীখানা তার হাতে এল। এর পর সে রবিবাবুর সব বই একে একে পড়তে সুরু করলে। মনে হ'ল, কি একটা হারান জিনিস সে আজ এই কবিতাগুলোর মধ্যে খুঁজে পেলে। কবি যেন তার অন্তরের কথাগুলি এনে সারি সারি বসিয়ে গিয়েছেন।

এদিকে অরুণ তার নিজের চিন্তায় মগ্ন,—কখন যে তার বালিকা বধূ প্রাণে যৌবনের সাড়া পেলে, সে তার কিছুই খোঁজ পেলে না।

ফাল্গুনের সন্ধ্যা। সুতারা অন্যমনস্ক ভাবে রবিবাবুর একটা গানের বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল,—হঠাৎ চোখ পড়ল—"মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী, সখি জাগো, মেলি রাগ-অলস আঁখি, সখি জাগো। আজি চঞ্চল এ নিশীথে, জাগো ফাল্গুন গুণ গীতে, অয়ি প্রথম-প্রণয়-ভীতে, মম নন্দন-অটবীতে পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি, সখি জাগো!"

নীচে একটা মোটর থামবার আওয়াজ হ'ল। অরুণ এইমাত্র বাড়ী এসে আবার কোথা বেরিয়ে গেল। কি একটা আকর্ষণীশক্তি তাকে টেনে নিয়ে গেল অরুণের ঘরে। পড়বার ঘর ছেড়ে সে তার শোবার ঘরে ঢুকল। স্তব্ধ হয়ে সে এই ঘরের সব জিনিস দেখতে লাগল মনে হ'ল—এখান-কার সবই যেন তাকে নীরব ভাষায় ভর্ৎসনা করছে। তার সর্ব্ব শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল।

খাটের পাশের টেবিলের উপর ছিল একখানি বই ও একটি হাস্যময়ী নারীর ছবি। কম্পিত হস্তে ছবিখানি তুলে নিয়ে দেখলে তার নীচে লেখা আছে—"মা আমার—১৯০১।" ছবিখানি ভিজে গেল সুতারার চোখের জলে। কোন রকমে বেরিয়ে এসে সে অরুণের বসবার ঘরে এক-খানা চৌকির উপর বসে বড়ল। কতক্ষণ যে সে এমন ভাবে বসে ছিল, বলা যায় না; তবে হঠাৎ চারিদিকে আলো জ্বলে উঠাতে, সে চমকে চেয়ে দেখে যে, সামনে অরুণ তারই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্ত্তের জন্যে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে সে বল্লে—"রাত্রে পড়বার জন্যে একটা বই নিতে এসেছি।" অরুণ অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলে—"এখানে তোমার পড়বার মত বই নেই, কাল আনিয়ে দেব।"

পরদিন সুতারার জন্য অরুণ এক বাক্স বই পাঠিয়ে দিলে। সে আনন্দের সঙ্গে বাক্স খুলে দেখে, একের পর এক বই বেরুচ্ছে—ছেলেদের রামায়ণ, বেহুলা, রবিন্‌শন ক্রুশো, রত্নদীপ, ভূতের জাহাজ—" সুতারা হাসতে গিয়ে কে জানে কেন কেঁদে ফেল্লে।

অরুণ আর সুতারার মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল, বৃন্দার তা মোটে ভাল লাগত না; এক দিন থাকতে না পেরে, বিরক্ত

সে বল্লে—"আচ্ছা তারা, তুমি কি বাছা দিন দিন কচি খুকি হচ্চ? দেখ্‌ছ না, জামাই বাবু যে মোটে বাড়ী থাকেন না! তা তারই বা কি দোষ! পুরুষ মানুষ এমন করে কত দিন থাক্‌বে? তোমার তো কোন হুঁস্ নেই,—তাকে ঘরবাসী কর্‌বারও চেষ্টা কর না। বাবুকে তখুনি বল্লাম, ও সব ইস্কুলে-মিস্কুলে পাঠিও না,—মেয়ে যেন একেবারে ধিঙ্গি হয়ে পড়েছে। কেন রে বাবু—জামাইবাবুকে কি মনে ধরে না? অনেক ভাগ্যির জোরে অমন বর পেয়েছ,—একেও যদি তোমার পছন্দ না হয় তবে তোমার জন্যে ফর্‌মাস দিয়ে গোড়ুতে হ'বে। কি জানি বাপু বড়লোকের কি কাণ্ড।" সুতারা করুণ কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—"দাই মা, তুমিও আমায় বক্‌ছ?" তার সেই স্বর বৃন্দার মরমে গিয়ে বিঁধ্‌ল। ধরা-গলায় সে বল্লে—"মাণিক আমার, তোমাকে কি বক্‌তে পারি? তবে যখন দেখি—জামাইবাবু একদণ্ড বাড়ী থাকেন না, আর তুমিও তাকে কিছু বল না—তখন সত্যি রাগ ধরে।" বৃন্দা বুঝ্‌লে যে, তার তারার কচি প্রাণে একটা গভীর আঘাত লেগেছে,—কিন্তু সেটা যে কিসের ব্যথা, তা বৃন্দা ঠিক বুঝতে পার্‌লে না। খানিক চুপ করে থেকে সুতারা বল্লে—"আচ্ছা দাই মা, মা কেন আমায় অত ছোট রেখে চলে গেলেন?" বৃন্দার চোখের জল বাঁধ মান্‌লে না। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে—"কেন রে তারা, আমি কি তোকে মার থেকে কিছু কম ভালবাসি?" "না, না, তা' নয়; তবে মা থাক্‌লে অনেক বিষয় জান্‌তে পার্‌তাম, গোড়াতেই এমন ভুল হ'ত না। যাক্, কি হ'বে, চল শুতে যাই।" বৃন্দা চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্লে—"তারা, আমি না হয় জামাই বাবুকে তোর কাছে একবার ডেকে দিই,—তুই বুঝিয়ে বল্, সে নিশ্চয় তোর কথা শুন্‌বে।" সুতারা তাড়াতাড়ি বল্লে—"না দাইমা তুমি জামাই বাবুকে একটিও কথা বোল না,—যদি বল তো আমার মরা মুখ দেখ্‌বে।" "ষাট্ ষাট্, এমন দিব্যিও গাল্‌তে হয়! কি জানি বাছা—তুমি কি অমঙ্গল টেনে আনো।"

এক দিন অরুণের বেয়ারা এসে সুতারার হাতে এক টুক্‌রো কাগজ দিলে; তাতে লেখা ছিল—"তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ দরকার আছে; কখন সুবিধা হ'বে জানিও—অরুণ।" এর উত্তরে সে লিখে দিলে—"তোমার যখন সময় হয় এস।" সকালটা কেটে গিয়ে যখন সন্ধ্যা নাম্‌ল, তখনও অরুণের দেখা নেই। শুতে যাবার একটু আগে অরুণ এসে বল্লে—"আমার এক মামাত বোন অনেক দিন পরে কল্‌কাতায় আস্‌ছে,—তাকে কিছু দিন এখানে রাখ্‌তে চাই। তাতে তোমার কিছু অসুবিধা হবে কি?" কথার উত্তর দিতে গিয়ে সুতারার গলাটা কেঁপে গেল, চোখে জল এল। পর মুহূর্ত্তে একটু হেসে বালিকারই উপযুক্ত ভঙ্গীতে বল্লে—"সে বুঝি আমাকে পড়াতে আস্‌বে? আমি কিন্তু আর পড়ব না।" "তোমাকে পড়াবার মত তার বিদ্যে নেই।" "সে আমাকে এসে বোক্‌বে না তো? আমি বাপু রাঁধ্‌তে টাঁধ্‌তে জানি না।" শুষ্ক হাসি হেসে অরুণ বল্লে—"না।" "তবে তাকে আস্‌তে বল।" "আর একটা কথা—আমার এ ক'দিন উপরে শোওয়া উচিত—" বাধা দিয়ে সুতারা বল্লে—"ও বুঝেছি, তোমার ভগ্নী-পতিকে নীচের ঘরটা ছেড়ে দিতে চাও? তা এ খাটটা তো বেশ বড়—তিন জনকে বেশ ধরে যাবে।" "দাইমাকে নীচে শুতে হ'বে।" "ও বাবা, দাইমার কাছে না শুলে আমার ঘুমই হবে না। তার চেয়ে একটা কাজ কর—আমাকে কিছু দিনের জন্যে বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও। তোমার বোনকে বোল আমার শরীর ভাল নেই। সত্যি আমার গা হাত পা কেমন ব্যথা কর্‌ছে—বোধ হয় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হ'বে।"—"তোমাকে বাবার ওখানেই পাঠিয়ে দেব।" বলে অরুণ ধীরে ধীরে নেমে গেল।

প্রায় ছয় মাস হ'ল সুতারা বাপের বাড়ী এসেছে। তার বাবা নিজের বই নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন; সুতারার চেহারা যে দিন দিন ম্লান হয়ে যাচ্ছে, তা তাঁর লক্ষ্য ছিল না। বৃন্দার কথায় যখন চমক্ ভাঙ্‌ল, তখন তিনি কাউকে কিছু না বলে, অরুণকে আস্‌বার জন্যে একখানা চিঠি দিলেন।

সন্ধ্যাবেলা চোখের উপর হাত রেখে সুতারা শুয়ে ছিল। হঠাৎ কার স্পর্শ অনুভব করে চেয়ে দেখে, অরুণ তার খাটের উপর বসে আছে। তার শাদা মুখ যেন আরও শাদা হয়ে গেল। কিছু না ভেবেই বলে উঠল—"তুমি কেন এখানে এসেছ?" "কেন, এখানে কি আমার আস্‌তে নেই?"

"না—না, তা' নয়,—বাবা বুঝি তোমায় লিখেছেন,—আমার অসুখ করেছে? ও কিছু নয়,—ব্যস্ত হবার কিছু নেই,—তুমি বাড়ী যাও।"

"তুমি তো বল্‌ছ, ব্যস্ত হবার কিছু নেই,—কিন্তু আমার চোখ বল্‌ছে, ব্যস্ত হবার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ, তুমি কি রকম রোগা হয়ে গিয়েছ! তার পর তোমার চোখের কোলে কোন দিন ত অত কালি ছিল না।"—"ও সব কিছু নয়।" "আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না।"—"তুমি কেন বৃথা সময় নষ্ট করছ; আমি বল্‌ছি, আমার কিছু হয় নি,—তুমি বাড়ী যাও।"

"এমন ভাবে আমায় তাড়িয়ে দেবার মানে কি ?"

সুতারা কোন উত্তর দিলে না। অরুণ সহসা বুঝ্‌লে, তার বালিকা পত্নী ঠিক আগের মত আর নেই,—কোথায় একটা কি বদল হয়েছে। মনে হ'ল, কিসের একটা দুঃখ সে চেপে রাখ্‌তে চায়। অরুণের ধারণা—সেই তার জীবনে দুঃখ এনেছে, কোন কারণে হয় ত সে তাকে সুখী কর্‌তে পারে নি। ধীরে ধীরে কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিতে গিয়ে সুতারার চোখের উপর হাত পড়্‌ল। চম্‌কে উঠে অরুণ বল্লে—"এ কি তারা, কাঁদ্‌ছ ? আমি যে এত দিন আমার সব কষ্ট তোমার ঐ হাসিমুখ দেখে ভুলে ছিলাম। তোমার চোখের জল যে আমার কিছুতেই সহ্য হয় না। জানি, তোমাকে তখন বিয়ে করাটা অন্যায় হয়েছিল,—তুমি যে তখন সংসারের কিছুই বুঝ্‌তে না। তোমায় দেখেই আমার মনে বড় সাধ হয়েছিল—তোমার ঐ সুন্দর আধ-ফোটা হৃদয়খানি আমি ভালবাসা দিয়ে ফোটাব। বড় ইচ্ছা হয়েছিল—তোমার ঐ সাধের ঘুমটাকে চুম্বন দিয়ে ভাঙ্গাব। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, সে ক্ষমতা ভগবান আমায় দেন নি। যে সোণার কাঠী দিয়ে তোমায় জাগাব ভেবেছিলাম, সে কাঠীর সন্ধান আর এ জীবনে পেলাম না। এখন এই পাক-চক্রের মধ্যে থেকে তোমাকে কেমন ক'রে বাঁচাব তাই ভাব্‌ছি।"

একটা ছোট হাত অরুণের হাতের উপর রেখে সুতারা বল্লে—"তুমি ভারী বোকা, কিছুই বোঝ না।" অধীর হয়ে অরুণ বল্লে—"স্পষ্ট করে বল তারা, আমি সত্যি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

"আমি ছোট বেলাতেই মাকে হারিয়েছিলাম বলে, সকলেই আমায় একটু অতিরিক্ত আদর দিত। ভালবাসায় অন্ধ হয়ে কিন্তু কেউ দেখ্‌লে না যে, আমি চিরকালই খুকী থাক্‌তে পারি না। এমন কি, তুমিও আমায় ক্ষুদ্র শিশুর মত দেখ্‌তে,—কখনও স্ত্রী বলে ভাবনি। প্রথম প্রথম এই বাইরের চাপে আমি সত্যি ভাব্‌তুম—আমি বুঝি সেই ছোট্টটি আছি। কিন্তু আমার অজ্ঞাতসারেই আমার সুপ্ত নারীত্ব জেগে উঠল। তখন দেখি, তুমি আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছ। এক একবার ভাবতুম, সব মান-অপমান ভাসিয়ে দিয়ে, নিজেই গিয়ে ধরা দিই। কিন্তু কোথা থেকে একটা গভীর অপমান এসে আমায় ঘিরে ফেলত। ঠিক করেছিলাম যে, যে আমায় চিন্‌তে না পারে, তাকে নিজে থেকে চেনাব না। তার পর অভিনয়ের পালা সুরু হ'ল। তুমি আমাকে যেমন ছোট মেয়ে মনে কর্‌তে, আমি সেই রকমই নিজেকে গড়ে তুল্‌ছিলাম। শেষে দেখলুম, বাস্তব নিয়ে এমন খেলা চলে না,—তাই সব ছেড়ে দিয়ে এখানে পালিয়ে এলাম—"

সুতারার কথা আর শেষ হ'ল না,—সে তখন অরুণের দুই বাহুর মধ্যে আবদ্ধ।

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯

'আজিজ হাসি-মুখে উপস্থিত হয়ে—মানবের চোখমুখ দেখেই বলে উঠলো—"কেয়া দোস্ত—তোমারা ক্যা হুয়া!" পরে গরুটির ওপর দৃষ্টি পড়ায়—"ইয়ে ক্যা হায়, শিং কোন্ তোড়া, মর্ গিয়া!"

এই সময় গরুটা আর একবার ওঠবার চেষ্টা করায়, সে বলে উঠলো—"সুকুর খোদা (ভগবানকে ধন্যবাদ) জিতা হায়।" মানব বললে—"হাঁ দোস্ত্ জিতা হায়, কিন্তু বড় কষ্ট পাতা হায়, উঠতে চাতা—উঠতে পারনে সেক্তা নেই। আমার বড় জোর্-বোখার হয়েছে ভাই, তাকত্ নেই যে খাড়া করকে দি। তাই বোসকে বোসকে ভাবতা থা, কালীমা তোমাকে পাঠিয়ে দিয়া, একবার হাত লাগাও দোস্ত্। কিন্তু ছোড়্কে মত্ দিও; কি জানি দাঁড়ানে

পারেগা কি না, বড় সাংঘাতিক চোট্ খেয়েছে ভেইয়া। বোলতে তো পারতা নেই”—বলতে বলতে মানবের গলা আবার ধরে এলো। সে মাথা নীচু করে গরুটির চোখ মুছিয়ে দিতে লাগলো; লুকিয়ে নিজের চোখও মুছে ফেললে! সেটা আজিজের চোখ্ এড়ালো না।

আজিজ ঠাউরেছিল—মানব বোধ হয় কোন কারণে রাগের মাথায় হঠাৎ মেরে থাক্‌বে! এখন তার আর সে সন্দেহ রইল না; সে দ্রুত মানবের পাশে বসে পড়ে, তার পিঠে হাত দিয়েই চম্‌কে গেল! আজিজের মুখের গোলাপী আভা ফস্ করে ফ্যাঁকাসে হয়ে গেল; সে স্নেহমধুর আগ্রহে বললে—“চলো দোস্ত্ তুমকো পহলে ঘর্ পৌঁছাদে;—ইয়ে কাম্ হামারে উপর ছোড়ো।” মানব বললে—“আমি আচ্ছা আছি ভাই, তুমি ইস্‌কো ধীরে ধীরে একবার খাড়া কোর্‌কে দাও—আমি দেখি।”

আজিজ আর দ্বিরুক্তি না করে—ঝোলা ফেলে, আস্তিন গুটিয়ে, গরুটিকে কায়দা করে ধরতেই, মানব তার গলা তুলে ধরলে। আজিজ নিমেষ মধ্যে তাকে বেড়াল ছানাটির মত তুলতেই, মানব ব্যস্তভাবে বলে উঠলো,—“পাক্‌ড়ে থাক্‌না ভাই।” আজিজের মুখে একটু হাসি এলো, সে বললে—“ডরো মত্ ভাই, হাম্ ছোড়েঙ্গে নেই।”

দাঁড় করিয়ে দিতেই গরুটি একটা কাতরধ্বনি করলে, সঙ্গে সঙ্গে তার নাক দিয়ে আধপোয় বেশী রক্ত সর্‌সর্ করে বেরিয়ে গেল। “সব মিথ্যে হ’ল, সাত্বিক গোহন্তা অ্যাকেবারে মেরে ফেলেছে রে,—তুই দেখিস লোকেন, যে অজ্ঞান অসহায়কে এমন করে মারে, তার কখ্‌খনো ভাল হবে না!” আজিজ শুন্‌লে—বোধ হয় বুঝলে; সব চেয়ে বেশী বুঝলে তার দোস্ত্‌কে লোকটা কি বেদনা দিয়েছে; কিন্তু কথা কইলে না,—সেই ৩।৪ মোন জীবটিকে এক ভাবেই ধরে রইল। গরুটি কেবলই নিজের ভারটা চারটি পায়ে চারিয়ে দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা পাচ্ছিল। ওই রক্তটাই প্রাণপথ রোধ করে' তার যাতনার কারণ হয়েছিল। সেটা নিঃশেষে বেরিয়ে যেতেই সে ফোঁশ্ করে একটা জমাট্ নিশ্বেস ফেলে চার পায়ে ভর দিতে পারলে।

শিশু যখন প্রথম হাঁটবার আগ্রহ দেখায়, মা যেমন আনন্দ-গভীর অন্তরে—হাসিভরা চোখে, হাত ধরে ধরে তাকে অজানা জীবন-পথে যাত্রার প্রথম পা-ফেলাটি শেখান, আজিজও আজ গরুটিকে সেই ভাবে মিনিট দশেক মক্স করিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলে। মানব বলতেই আমি তাড়াতাড়ি জল এনে গরুটাকে খাওয়ালুম। কি তেষ্টাই তার পেয়েছিল! সোঁ সোঁ করে তিন হাঁড়ি জল খেয়ে ফেললে। তার পর সে মাথা তুলে একবার আজিজকে, একবার আমাকে দেখে নিয়ে—চঞ্চল ভাবে ডান দিকে ফিরেই তখুনি বাঁ দিকে গ্রীবা বক্র করে স্থির হ’ল। মানব আর দাঁড়াতে পারছিল না, বেড়ায় ঠেশ দিয়ে বসে পড়েছিল! তাকে দেখতে পেয়েই গরুটা দু’পা ঘুরে তার দিকে এক দৃষ্টিতে অপলকনেত্রে চেয়ে রইল; তার চোখ দুটো আবার জলে ভরে উঠলো! মানব তাড়াতাড়ি উঠে এসে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে গলায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এই ভাবে দু’চার মিনিট কাটবার পর, মানব তাকে বললে—“যাও মা—এইবার বাড়ী যাও।” শুনেই সে ধীরে ধীরে পা ফেলতে ফেলতে গিয়ে অক্ষয় গুরুমশার পাঠশালায় আশ্রয় নিলে।

ব্যাপারটা দেখে আজিজ বলে উঠলো—“বাঃ খোদা! তুহি সবকুছ।” আমি অবাক হয়ে গেলুম। ঘটনাটা ভুলতে পারিনি। বহুদিন পরে কাশীতে একজন পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হয়, তিনি জিজ্ঞাসা করেন—“বেদান্ত পড়া হয়েছে?” আমি বলেছিলুম—“আজ্ঞে না পড়া হয় নি,—দেখা হয়েছে।”

মানব বললে—“লোকেন, ওকে আজ ফ্যান এনে খাওয়াস,—তাতে একটু নুন দিস ভাই; আমি আজ আর কিছু পারছি না। আর একটা কাজ করিস,—আমি পারলুম না, তোকেই করতে হবে ভাই। ঐ সাত্বিক-খেগো পোক্কোসের লাউডগাগুলো একটাও যেন ওর সাত্বিক গর্ভে না যায়,—সবগুলি কেটে গরুকে খাওয়াবি। আহা—মুখে মাত্র করেছিল,—পাষণ্ড খেতেও দেয়নি—ঐ পড়ে রয়েছে দ্যাখনা! আজ রাতেই খাওয়াতে হবে,—জড়টা আর মারিস নি। কেমন—পারবি তো?”

আমি একটা “কাজের-মত’-কাজ” পেয়ে খুব উৎসাহে ঘাড় নেড়ে একটা জোর্ “হুঁ” দিলুম। তার তরে তো বড় কাজ পাবার জো ছিল না—বেলদার হয়েই থাকতে

হত'। এতে এমন বুঝবেন না যে সেটা সে বাহাদুরী নেবার জন্যে কোরত; আমাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলার জন্যেই কোরত',—আমার গায়ে না আঁচ লাগে। তেমন ভাল আর কে বাসবে,—সে ভালবাসা আর কারুর কাছে পাইনি!

আজিজ বাংলা কথা বুঝতে শিখেছিল; এতক্ষণ পরে বলে উঠলো—"আব্ কহো তো দোস্ত্ ইয়ে কোন্ কসাইকে কাম হায়?" মানব তাড়াতাড়ি বললে—"উস্কো তুমি নেহি জান্তা,—যানে দেও ভাই।" কিন্তু আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"জান্তা বই কি, ঐ যে হরিসভামে সবসে বেশী কুদ্তা আর কাঁদতা!" আমি তখন লক্ষ্য করিনি যে এতক্ষণে আজিজের আফ্গান রক্ত চোখে মুখে ছুটে এসেছে; মানব সেটা লক্ষ্য করে তাকে থামাবার তরেই বলেছিল—"তুমি তাকে নেহি জানতা,—যানে দেও ভাই।" আজিজ আমার দিকে চেয়ে বললে—"ওহি সিদেশাঁড় ভুট্টাজি (সিদ্ধেশ্বর ভট্চায্যি)? কাফর্, বেদরদ্ সয়তান, হামারা দোস্ত্কা দিল্ এতনা দুখায়া কে আঁশু (অশ্রু) দেখনে পড়া! উস্কো হাম্ জান্সে মার দেগা—আজ-ই!"

সন্ধ্যার ঠিক্ পূর্ব্বক্ষণেই মেঘটা সরে গিয়ে, একটু চাঁপা রংয়ের আলো দেখা দিছলো। আজিজের দিকে চেয়ে দেখি—

সর্ব্বনাশ! আমার বুক কেঁপে গেল! মানব আমার দিকে তিরস্কারপূর্ণ চোখে চেয়েই, ধীর পদে এগিয়ে—আজিজের হাত দুটি ধরে' তার বুকে মাথাটি রাখলে। মুহূর্ত্তেই আজিজের বুকটা স্ফীত হয়ে একটা তপ্ত শ্বাস বেরিয়ে গেল; তার তুলিদে-আঁকা চোখ দুটি নত হয়ে মানবের কাতর মুখটির ওপর স্থির হ'ল,—সে মানবের পিঠে সস্নেহে হাত বুলুতে লাগলো। মানব নিজের আবেদনপূর্ণ চোখ দুটি আজিজের চোখের উপর রেখে বললে—"ভাই, 'আমার দোস্ত্ কি কভি না-মরদ হতে সেক্তা, সে শিয়াল নেহি মারতা—শের্ (বাঘ) মারতা! সরম্ মত্ নিয়ো দোস্ত্ ওকে মাপ করো।" আজিজ আধমিনিট্টাক তাকে বুকে চেপে থেকে শেষ বলে উঠলো—"তুম হামারা সচ্চা বাহাদুর হায়,—আচ্ছা দোস্ত,—আব্ চলো ঘর্ পৌছাদে।"

দোরগোড়ায় পৌছে মানব আজিজকে সেলাম করে, বালকের মত সরল কণ্ঠে বললে—"ফের্ কব্ আসবে?" আজিজ বললে—"সোচো মত্—হাম্ রোজ আওয়েগা দোস্ত্।" মানব তখন আমার দিকে ফিরে—"দাঁড়াতে পাচ্ছি না রে—সকালে আসিস ভাই," বলতে বলতে ভেতরে চলে গেল। আজিজ আর আমি তখনো সেই-খানেই আছি, দেখি মানব ফিরে আসছে। আজিজ বলে উঠলো—"কেয়া দোস্ত—কোই বাত হায়?" মানব কেবল—"ভুল গিয়াথা" বলে, হাসিভরা চোখে আজিজকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করে'ই জলভরা চোখে দ্রুত বাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল! আজিজের মুখ থেকে রংটা সহসা সরে গেল, ঠোঁট দু'খানা ফাঁক হয়ে গেল, সচিন্ত-সুরে তার মুখ থেকে বেরুলো "ইয়ে ক্যা"! আমি কথা কইতে পারলুম না। আজিজ যেন কেমন হয়ে গেল!

সে আমার হাত ধরে খানিকটে নিয়ে গিয়ে একটা পোলের ওপর বসিয়ে নিজেও বসলো; তার পর সেদিন-কার সারাদিনের সব ঘটনা শুনতে চাইলে। আমি এক এক করে সব বলে গেলুম,—জ্বর গায়ে এক ঢিলে জলের মধ্যে ৭।৮ সের মাছ মারা,—সঙ্গে সঙ্গেই ডুব,—উঠেই এক প্রকাণ্ড কেউটের সামনাসামনি,—সাক্ষাৎ-মৃত্যু সেই ভীষণ ক্রোধোন্মত্ত ক্রূর বিষধরকে নিমেষে মুঠোর মধ্যে ধরা, আর তাকে শেষ করে ফেলে দেওয়া; ভিজে কাপড়ে আমার কাঁধে মাথা রেখে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় চলতে চলতে লাঠির শব্দ আর কাতরধ্বনি শুনে তীরবেগে ছুট,—গরুর শুশ্রূষা,—তার পর আজিজ নিজেই সব দেখেছিল।

আজিজ গর্ব্বোৎফুল্ল ভাবে বলে উঠলো—"হামারা দোস্ত্ পুরা "আলি" হায়,—তোমারা বাংলাকে শের্ হায়!" পরক্ষণেই তার ভাবান্তর দেখ্লুম; চিন্তিত ভাবে বললে—"বোখারকে উপর বহুত্ ধাক্কা লগা,—খুন্ শিরমে পৌছ গিয়া হোগা;—বোখার বিগড়্ যা সক্তা; আচ্ছা হাকিম্ বোলানে কহো। রূপেয়া কোই চিজ্ নেহি—হাম্ দেগা;—সম্ঝা বাহাদুর!" (আজিজ্ আমাকে বাহাদুর বোলতো।) এই বলে ছটা বেদানা আর একপেটি আঙ্গুর আমার হাতে দিয়ে বল্লে—"দোস্তকে ওয়াস্তে হায়,—দে-কে ঘর্ জানা। কহনা—হাম্ রোজ্ আয়গা।" আজিজ্ চলে গেল।

৩০

আমি মানবদের বাড়ী বেদানা আর আঙ্গুর দিয়ে ফিরলুম;—তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। মানবের হুকুম মনে পোড়্‌ল,'—বাড়ী যাওয়া হল না। সোজা গিয়ে সিধু ভট্‌চায্যির শজনে গাছে উঠলুম। ছুরি ট্যাঁকেই থাকতো, বার করে হাতে নিতেই—দোর খোলার শব্দ পেলুম। এক হাতে লাণ্ঠান, এক হাতে একটা হাঁড়ি নিয়ে—এদিক-ওদিক দেখে, গামচা-পরা সিধু ভট্‌চায্যি বেরুলো। ভাবলুম—দেখতে পেলে না কি; লাউপাতার আড়ালে স্থির হয়ে রইলুম। দেখি—বকের মত' পা-ফেলে এসে, যেখানে গরুটা শুয়ে পড়েছিল—সেইখানে লাণ্ঠান্ নিয়ে—দু-পা ফাঁক করে—কখনো বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়ে,—একাগ্র দৃষ্টিতে কি দেখতে লাগলো। পরে লাণ্ঠান আর হাঁড়ি রেখে—আঁজ্‌লা আঁজ্‌লা মাটী তার ওপর চাপা দিতে লাগলো। বুঝলুম- গোরক্ত গোপন করা হচ্চে। তার পর পবিত্র করণের মশলা-গোলা হাঁড়ি নিয়ে, তার ওপর ছড়া দিয়ে, চোরের মত' চট্ গিয়ে দোরে খিল দিলে। হিন্দুধর্ম্ম হাসলেন কি কাঁদলেন বলতে পারি না।

আমি অনেক কষ্টে হাসি চেপে—সাত্বিক লাউ-ডগাগুলি নির্ব্বিঘ্নে সাফ্ করে নাবলুম; সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে গুরুটির সামনে ধরে দিয়ে গর্ব্ব-মিশ্রিত আনন্দ নিয়ে বাড়ী গেলুম। ঘণ্টাখানেক পরে ফ্যান্ খাওয়াতে এসে দেখি—ডগাগুলি প্রায় সবই খেয়ে ফেলেছে,—সকাল না হতে বাকি ক'গাছার চিহ্নও থাকবে না,—সে সম্বন্ধে আর উদ্বেগ রইল না।

মাছ দেখে দিদি এত' সুখী ছিলেন যে ফ্যান্ কি নুন চাওয়ায়, সেদিন—"ক্যান্ র‍্যা" পর্য্যন্ত তাঁর মুখে আসেনি! যাক্, সেদিন একলা একটা কাজের মত কাজ করে'—মুখে আর বুকে আনন্দ আর গর্ব্ব ধরছিল না। মানব শুনে কি খুসীই হবে,—এই কথাটাই ছিল তার প্রধান আশ্রয়! যে কাজের বাহবা দেবার কেউ নেই—মানুষ সে কাজ স্বইচ্ছায় করে না,—সে কাজ যে প্রেমশূন্য! এখন কিন্তু বুঝেছি—মানুষ নানা কারণে নানা কাজ করে থাকে। বুঝে কিন্তু সুখ পাইনি,—না বুঝাই ছিল ভাল।

শরীর মন দুই-ই শ্রান্ত আর অবসন্ন ছিল;—ঘুম থেকে উঠে দেখি বেলা হয়ে গেছে। মানবের কাছে ছুটলুম। দেখি—গরুটা সামলে উঠেছে,—আমাদের পাড়ায় চরে বেড়াচ্চে। একটা ভাবনা গেল।

মানব জেগেই ছিল;—আমি ঘরে ঢুকতেই—"গরুটাকে দেখে এসেছিস তো,—বোস," বলেই আমার মুখের দিকে চেয়ে উঠে বোসলো। তার চোখ তখনো লাল হয়ে রয়েছে দেখে, খবরটা হেসে দিতে গিয়ে পারলুম না; সহজ ভাবেই বললুম—"সে আমাদের পাড়ায় চরে' বেড়াচ্চে।" শুনে সে বললে—"হবে না—মা কালীকে জানিয়েছিলুম,—তবু ভাল করে বলতে পারিনি রে! মাথা যেন ফেটে যাচ্ছিলো,—দেখলি তো!" জিজ্ঞাসা করলুম—"এখন কেমন আছ?" "ততোটা নেই,—তবে আছে।"

গায়ে হাত দিয়ে দেখি—বেশ গরম! সে হেসে বললে—"ও কিছু নয়;—হ্যাঁ—সিধু ভট্‌চায্যির সাত্বিক ডগাগুলোর কিছু করতে পারিসনি বোধ হয়,—ও কি তুই রাত্তিরে পারিস্!" আমি সগর্ব্বে বললুম—"কেন' পারব না,—তুমি ত আমাকে কিছু করতে দাও না—তাই! সে কাজ সেরে, গরুকে দিয়ে তবে বাড়ী গিছলুম, একটি ডগাও রাখিনি।" সে আনন্দে আমার হাত দুখানা নিজের হাত দুখানার মধ্যে চেপে ধরে—একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে—"ইয়াঃ—এই তো চাই!" পরে হাত ছেড়ে দিয়ে বললে—"আমি কি জানি না রে—তুই পারিস; কি কোরবো ভাই—যে কাজে একটুও বিপদের ভয় থাকতে পারে, সে কাজ যে তোকে একা করতে দিতে আমার মন সরে না,—তোর যে মা নেই, তোকে সামলাবে কে ভাই! কিছু হলে—তোকে উঠ্‌তে বস্‌তে হাজারো কথা শোনাবে, পাঁচ দিন উপোসী থাকলে ডেকেও কেউ খাওয়াবে না, তখন অন্যের দোষগুলোও তোর ওপরেই চাপবে;—দিদি কথা কইতে পারবেন না; লুকিয়ে কেবল কাঁদবেন। ওরে, যার মা নেই রে—উঃ!" এই পর্য্যন্ত বলেই হঠাৎ সে থেমে গেল, তার গলাও ভার হয়ে এসেছিল। আমার চোখে জল দেখে—আমার পিঠে হাত দিয়ে,—জোর করে চোখের কোণে একটু হাসি টেনে, বললে—"ওসব বলতে হয় তাই বলা,—ভয় কিরে—বড়-মা তো মরে না, মা কালী আছেন—আমাদের আবার ভাবনা কি, সেই তো আসোল মা রে! এইবার থেকে সব কাজ তুই-ই করিস; আপনাকে বাঁচাবার জন্যে মিছে কথা কইতে পারিনি

কিন্তু। যা কিছু করা সবই তো দুঃখী আর দুর্ব্বলের তরে, তাতে আবার ভয়টা কি? কেমন, পারবি তো?" তার কথাগুলো এমন একটা উৎসাহ আর স্নেহ মেখে বেরিয়ে আসতো—তাতে সব ভুলে যেতুম। প্রাণটা নেচে উঠলো, বললুম—"কেন পারব না,—তুমি বললেই পারবো।"

মানবের মা দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সে তা দেখতে পায়নি। যখন সে বলেছিল—"ওরে যার মা নেইরে—উঃ—!" তিনি আর দাঁড়াতে পারেননি, চোখে আঁচল চেপে নিঃশব্দে সরে যান।

আমি তার কোন কথাই আজ পর্য্যন্ত ভুলতে পারিনি। অনেক দিন সেই সবই ছিল আমার ধ্যান। কিছু দিন পরে বুঝেছিলুম—"যার মা নেই রে—উঃ" উচ্চারণ করেই, সে বুঝেছিল—এ কথাটা আমার কতদূর ভেদ করবে; বোলে ফেলে নিজেও সে খুব ব্যথিত হয়েছিল, তাই পরক্ষণেই আমার মনটাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নেবার জন্যেই অতগুলো উৎসাহের কথার অবতারণা করেছিল, —তার মধ্যেও অসত্যের আশ্রয় সে এতটুকু নেয়নি। অমন ব্যথার ব্যথাও আর দেখলুম না!

আমি যখন—লাঠান হাতে সিধু ভট্চায্যির প্রবেশ,—চারিদিক চেয়ে গো-রক্তের গোর্ দেওয়া, আর তার ওপর গোবোর জল ছড়া দিয়ে স্থান শুদ্ধি করণ, শেষ চোরের মত অন্তর্ধানের কথা বললুম, শুনে মানব হেসে বলেছিল —"মিথ্যেটাকেই লোক মিথ্যে দিয়ে ঢাকতে যায়, আর ঢাকতে চায়! এই চাপা ঢাকাই আমাদের সত্য ধর্ম্মটাকে গলা টিপে মারলে রে! বুঝতে পারি না—এরা ঐ সঙ্গে নিজের মনটাকে চাপাচুপি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে কি করে!" এখন ভাবি—জ্বর অবস্থায় সে যেসব কথা বলেছিল, সেসব যেন—আমার গর্ব্বের সাথী—আমার খেলার সঙ্গী মানবের কথা নয়।

* * * *

তার পর জ্বর কমে বাড়ে,—ছাড়ে না। গ্রামের ডাক্তার আসেন যান, ওষুধ দেন—আশ্বাসও দেন। আমি সর্ব্বক্ষণই কাছে থাকি। আজিজ রোজই আসে; —এসে প্রথমেই বেদানা আর আঙ্গুর পাঠিয়ে দেয়। কে অত' খাবে—পাঁচ ভূতে খায়। তার পর সে সারাদিন উদাস দৃষ্টিতে বাইরে বোসে থাকে। বাড়ী থেকে যে বেরোয় তাকেই জিজ্ঞাসা করে—"দোস্ত্‌কে কেমন দেখলে, কোনো ভয় নেই তো!" তা ছাড়া আমাকে দশবার ডেকে পাঠায়, কত প্রশ্নই করে,—"দোস্ত্ এখন কি করছে" ইত্যাদি। ফিবারেই সেই একই সব প্রশ্ন! হঠাৎ যেন চট্‌কা ভেঙ্গে তাড়াতাড়ি নিজেই বলে "তুমি দেরি কোরো না দোস্তের কাছে যাও!" সন্ধ্যে হয়ে গেলে —বিমনার মত' ধীরে ধীরে চলে যায়।

ন'দিনের দিন বিকার দেখা দিলে, গ্রামের ডাক্তার বললেন—"ভয় নেই।" আজিজ শুনেই বসে পোড়ল। একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ রেগে বলে উঠলো—"তোমরা দোস্ত্‌কে মেরে ফেলবে,—আমি বরাবর বলচি ভালো ডাক্তার ডাকো—টাকার জন্যে চিন্তা নেই,—তোমরা যে কেন শুনচো না জানি না! আজ আমি দোস্ত্‌কে একবার দেখবই, কারুর মানা শুনবো না,—কোন 'বাধা' মানবো না।" তার মুখের ভাব দেখে সকলেই ভয় পেলে।

৩১

আজিজকে দেখবার জন্যে মানব রোজই অধীর হত,' আজিজও তার জ্যাঠামশাই তারিণী বাঁড়ুয্যের কাছে নিত্য হাত জোড় করে দেখবার অনুমতি চাইত; কিন্তু কোন ফল হত না,—ধর্ম্ম না কি পথ জুড়ে ছিল! মানব যে ঘরে ছিল, সে ঘরে যেতে হলে—ঠাকুর ঘর পেরিয়ে (অর্থাৎ তার পাশ দিয়ে) যেতে হয়!

এই বিচ্ছেদ মানবকেও যত কাঁদিয়েছে, আজিজের বুকেও ততোধিক বেদনা দিয়েছে। শেষ—মানবের জাটতুতো ভাই রজনী, বাপকে বললে—"বেশ ত' ঠাকুরকে পঞ্চগব্য দিয়ে নাইয়ে নিলেই ত হবে—সে আর শক্তটা কি! না হয় ঠাকুরকে অন্য ঘরে নিয়ে রাখুন না! রাজমিস্ত্রীরা ঘর ম্যারামত্ করতে এলে তো তাই করা হয়। না হয় গোপনে আমি ওদের দেখা করিয়ে দেব। তা না হলে—সে যে ধাতের ছেলে—ভারী অভিমান আর অপমান বোধ করবে;—এত বড় অসুখের ওপর সে আঘাতে মানব মারা যাবে—দেখবেন!" বাপ বললেন—"খবরদার —লুকিয়ে যেন কিছু করা না হয়,—সে কথা চাপা থাকবে না,—ধর্ম্মের ঢাক্ বাতাসে বাজে! আচ্ছা,—আগে আমি পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি—তার পর বোলবো।" ইত্যাদি।

গ্রামের বড় বড় নামজাদা অর্থাৎ জোঁদা মাতব্বরদের পাশা খেলার আড্ডা ছিল—তারিণী বাঁড়ুয্যের বাড়ী। সন্ধ্যার পর—খড়ম পায়—হুঁকো হাতে, অনেকেই হাজির হতেন। সে দিনও—রাখাল রায়, দিন গাঙ্গুলী, সিধু ভট্টচায্যি, হর মুকুর্য্যে উপস্থিত হলেন। পাঁচজনে মিলে—রজনীর উত্থাপিত প্রস্তাব ধরে—পরামর্শ সভা বোসলো। কিন্তু মঞ্জুরী পাওয়া গেল না! সাব্যস্ত হল'—আজিজ শুধু মোছরমান নয়,—সুয্যি মামার দেশের লোক—ওরা মগ্,—আবার "দোম্বা" খায়—যার কুকুদটা হয় পশ্চাতে! সুতরাং সব ফেঁশে গেল। এটা ছিল—জ্বরের সপ্তম দিনের কথা।

* * * *

অনেক করে' আজিজকে নিরস্ত করলুম,—বললুম—মানবের বাপ নেই, জ্যেঠাই অভিভাবক, তুমি ও কাজ করলে, এরা আর মানবকে দেখবে না,—সে অযত্নে মারা যাবে। আজিজ বুঝলে, একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—"হামারা দোস্তকে মাফিক্ দরদী হাম নেহি দেখা,—ইয়ে লোগ্ কেঁও অ্যায়সা বেদরদ্ হায়!" এই কটি কথা বল্‌তে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো; সে চুপ করে রইল। পরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে—"হাম্ মাহিন্দর বাবুকো লানে চলা—উও বড়া ডাক্তার হায়; রূপেয়া হাম্ দেগা।"

বরানগরের মহেন্দ্র বাবু সত্যই বড় ডাক্তার ছিলেন; বাগবাজারের পোলের উত্তরে পাঁচ ছ' কোশের মধ্যে অতবড় ডাক্তার আর কেউ ছিলেন না। মানবের অসুখ ছিল আজিজের দিন রাতের দুর্ভাবনা,—সে তাই বড় ডাক্তারের নাম ধাম সংগ্রহ করেছিল!

আজিজের সঙ্কল্প শুনে রজনী ব্যগ্রভাবে বললে—"আগা সাহেব দাঁড়াও, আমি বাবাকে একবার জানিয়ে, তোমার সঙ্গেই যাচ্চি;—বাবাই টাকা দেবেন।"

সে অনেক বুঝিয়ে বাপকে রাজি করে এসে আজিজকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। রজনী ছিল মানবের চেয়ে অনেক বড়; কিন্তু মানবের ওপর তার একটা টান কখনও দেখিনি,—এটা হঠাৎ দেখা দিছল;—বোধ হয় আজিজের ব্যবহার দেখে। একজন বিদেশী বিধর্ম্মীর কাছে ছোট না হতে হয়!

মহেন্দ্র ডাক্তার তিন দিন এলেন। আজিজ আসবার সময় গাড়ীভাড়া করে তাঁকে নিয়ে আসতো। গাড়োয়ানকে নিজেই যাতায়াতের ভাড়া আগাম দিয়ে রাখতো।

মহেন্দ্রবাবুর আসবার চারদিনের দিন সকালে শুনতে পেলুম,—তারিণী জ্যোঠামশাই রুক্ষকণ্ঠে রজনীকে বলচেন,—"মহেন্দ্র ডাক্তারের রোজ আসবার দরকারটা কি? কি হয়েছে কি, জ্বর বইতো নয়। বেটা মগ্ ভারি মজা পেয়েছে! তার ইচ্ছে মত চলতে হবে না কি! বেটা আমার ভিটেয় বসে' নেমাজ্ পড়ে—তাও সয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আর সইব না। শুনলে না কাল সিধু ভট্‌চায্যি টুকে গেল! যাবেনা,—সৎ ব্রাহ্মণে সইতে পারে কি,—হিছুঁর পাড়া! ডাক্তারকে আজ বলে দিও—তিনচার দিন অন্তর এলেই হবে। ওরা নামেই বড় ডাক্তার,—উপকারটা কি হচ্ছে! গোবিন্দ নাপ্‌তের পিল্ খেলে জ্বর এদ্দিন বাপ্ বাপ্ করে পালাতে পথ পেতো না। লেখাপড়া নাইবা জানলে—লোকটা ধন্বন্তরী;—আট আনা দাও তাতেই খুসী। কেবল তোমার আবদারে"—ইত্যাদি। ছেলের সঙ্গে একটু বচসাও হয়ে গেল।

আজিজের ব্যাকুলতা নিত্যই বেড়ে চলেছিল। কাজ কর্ম্ম তো ছেড়েই দিছলো,—তারিণী জ্যাঠার সদরে সারাদিন উদাস বসে' থাকত'। এখন আর সে এক স্থানে স্থির থাকতে পারছিল না,—ছট্‌ফট্ করে' বেড়াতো! ডাক্তার মানবকে দেখে নীচে এলে,—তাঁর কাছে খবর নিয়ে, আর সেখানে দাঁড়াতোনা। ম্লান মুখে চলে এসে আমাদের কাঁটাল তলায়, ঘাসের উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকতো। সব দিন তার নাওয়া খাওয়া ছিল বলে' বোধ হয় না। দুর্ব্বল হয়ে আসছিল, তাতেও কিন্তু ডাক্তারের কাছে ছুটোছুটির তার কমি ছিল না,—মাঝে মাঝে হঠাৎ উঠেই বেরিয়ে যেতো।

সেদিন সকালে গিয়ে সে মহেন্দ্র ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে আর বলেছে—"হামারা দোস্তকো আচ্ছা করদো বাবুজি,—পরদেশী'পর মেহেরবাণী করো! হাঁম গরীব হায়—যো কুছ্ হায়—ইয়েই হায়,—ইয়ে গেয়ারা শো রূপেয়া তুম্ লো, ভাইকো আচ্ছা করদো, খোদা তোমারা আচ্ছা করেগা, তুমকো সব কুছ দেগা।" এই বলে' তার চামড়ার ব্যাগটি তাঁর পায়ে রেখে দিয়েছিল!

মহেন্দ্রবাবু ভাবতেন—রোগীর বাড়ীর সঙ্গে লোকটার

মেওয়া বিক্রী সূত্রে পরিচয় আছে; আর এই অঞ্চলেই থাকে—তাই সে-ই তাঁকে নিতে আসে,—এতটা পথ গাড়ীতেও তার যাওয়া হয়। কত ক্ষুদ্র আমাদের হিসাব আর অনুমান গুলো।

সেদিন তিনি তাই আশ্চর্য্য হয়ে বোকার মত চেয়ে রইলেন। এই পাঠানের পাষাণের মত বুকটা ঢাকা এমন স্নিগ্ধ-কোমল জিনিসও থাকতে পারে! ডাক্তার নিজে ছিলেন শোক-সন্তপ্ত লোক,—ভিজে চোখে ভারী গলায় বললেন—"আগা সাহেব, এ টাকা তোমার কাছেই থাক, আমি তোমার দোস্ত্‌কে আরাম করতে প্রাণপণ চেষ্টা পাব', যতবার যাবার দরকার বুঝবো নিজেই যাব'। খোদা যদি কৃপা করেন, তুমি বাইশ দিনের দিন আমাকে যা দেবে আমি তাই লাকো টাকা ভেবে নেব'। এখন নিজের কাছে রাখো। খোদা ভালই করবেন,—চলো তোমার দোস্ত্‌কে দেখে আসি।"

সেদিন ডাক্তার অনেক করে' আজিজকে টাকা তুলে রাখতে রাজি করে' আসেন। রোগীর এক ভাবই চলছিল। দেখার পর ডাক্তার বাড়ীর কর্ত্তাকে বললেন—"আমাকে ভিজিটের টাকা আর দিতে হবে না, আমি যতবার আসা দরকার বোধ কোরবো, নিজেই এসে দেখে যাব'। এ নটা দিন বোধ হয় এই ভাবেই চলবে,—এ জ্বর তাড়াহুড়ো করে' তাড়ানো যায় না।" আজিজও কি জানি কি বুঝে আমাদের কাঁটালতলাতেই আস্তানা নিলে,—সেইখানেই নেমাজ পোড়তো—সময় অসময় ছিল না। তারিণী জ্যেঠামশাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। রজনীকে বললেন—"দেখলি—নারায়ণের কাছে সৎ-ব্রাহ্মণের প্রার্থনা ব্যর্থ হয় না,—এখনো সে তেজ রাখি।" রজনী কেবল বললে—"মানবের জন্যেও একটু জানাবেন বাবা।"

৩২

ঊনিশ দিনের শেষ রাত্রে মানব সহসা "মা" বলে' ডাকলে। মা সেই ঘরের মেঝেতেই পড়ে ছিলেন। আজ দশ দিনের পর মায়ের চিরকাম্য প্রাণ-জুড়ানো দুর্লভ শব্দটি কাণে যেতেই,—"কেন বাবা—এই যে আমি" বলেই তিনি পাগলিনীর মত এসে, তার বুকে হাত দিয়ে বোসে বললেন, "কি বাবা মানু,—কেমন আছ বাবা!"

"কাদচো কেন'—বেশ আছি ত' মা! তুমি পায়ের ধূলো দাও" বলে' নিজেই তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় মুখে দিলে, আর বললে—"ঠাকুরদের চরণামৃত একটু দাও না মা"। মা তাতাতাড়ি কাপড় ছেড়ে চরণামৃত এনে তার চোখে মুখে দিলেন। "আর ভয় কি মা" বলে—মার হাতটা নিয়ে নিজের মাথায় দিলে। মা ধীরে ধীরে তার এলোমেলো চুলগুলি সরিয়ে সরিয়ে যথাস্থানে দিতে লাগলেন।

আমি তার বাঁ-দিকে একখানি চেয়ারে বসে থাকতুম, সময় মত' ওষুধ খাওয়াতুম, বেদানার রস দিতুম, 'টেম্পারেচার' নিয়ে লিখে রাখতুম। আজিজের ছোঁয়া জল অচল বলে, তার আনা বরফ ব্যবহার করতে মানা হয়ে গিছলো, কাজেই সব দিন জুট্‌তো না! মানব জিজ্ঞাসা করলে—"মা, লোকেন কেমন আছে?" মা বললেন—"সে-ই ত' দিন রাত তোমার কাছে রয়েছে বাবা!" "এই যে আমি ভাই" বলে' কাছে যেতেই, একগাল হেসে সে আমার হাতখানা জোরে চেপে ধরলে। বললে—"আমি তোর তরে মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করছিলুম রে; দোস্ত কেমন আছে ভাই!"—"সে সারাদিন এইখানেই থাকে" এইটুকু মাত্র বললুম। "আচ্ছা শোন্—একটা কথা আগে বলি—আবার ভুলে যাব;—দোস্তকে তো ভোলবার ভয় নেই!"

তার শেষ কথাটা খুবই ঠিক্। বিকারে কেবল দোস্তের কথাই কয়েছে, মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কথাও ছিল, আর মা কালী আর ছিরু দুলে। কিন্তু এত অসম্বন্ধ যে ভাল বুঝতে পারতুম না।

বললে—"ভাল করে' শোন্। আমার সেই র‍্যাপারখানা শিবুর কাছে রেখে, তিনটাকা এনে ঐ ব্রাকেটটার ওপর রেখেছি—একদম্ থালের গা ঘেঁশে। টাকাকটা ভাই ছিরুকে আজই দিয়ে আয়, গরীব বড় বিপদে পড়েছে। মজুরী কোরে রোজ দশটি পয়সা পায়—পাঁচটি লোক খেতে। চালে খড় নেই—দুআনার বিচুলি কিন্‌তে পারে না—সবাই বসে বসে' ভেজে। আজই দিস ভাই—তা না ত' কসাই ছাড়বে না। আজ কি বার্ র‍্যা!"

বললুম—"বুধবার"। বললে—"শুক্কুরবার তার ঘটি-বাটী টেনে নে যাবে বলেছে! আর মা বলেছে—যাক্!"

ইতিমধ্যে যে দু শুক্কুরবার চলে গেছে, সেটা মানবের

খবর নেই! ভাবলুম—বিকার অবস্থার খেয়াল—এখনো সে-ঝোঁক পুরো কাটেনি। বললুম—"কে টেনে নে যাবে, স্বপ্ন দেখলে না কি!"

"ওরে না না—তোকে বলা হয় নি বুঝি,—শোন্। দু'মাস আগে—ছিরু রাখাল রায়ের কাছে আটআনা ধার করেছিল,—দু'মাসে তার সুদ্ চাই দু'টাকা! দেখি রায় মশাই একদম তার দাওয়ায়,—আর ছিরু হাত জোড় কোরে অবস্থা জানিয়ে কাঁদচে,—"একটু সবুর করতে হবে ঠাকুর মশাই—হরি জানেন সবাই আজ পাঁচ দিন মুড়ি আর জল খেয়ে কাটাচ্চি,—কাজ মিলচে না," ইত্যাদি। পাষণ্ড তার বিধবা মেয়েকে দেখিয়ে এমন একটা খারাপ্ কথা বললে, ইচ্ছে হ'ল এক চড়ে তার মুখটা ভেঙ্গে দি! ছিরু নিজের কাণদুটো দু'হাতে চেপে কাঁদতে লাগলো। "হুঁ—তোদের ঘরে আবার অ্যাতো! আচ্ছা—শুক্রুরবার টাকা না পেলে কি হাল্ করি তা দেখবি,—ওর কাপড় টেনে,"—বলেই আমাকে দেখতে পেয়ে, চট্ নেবেই সরে' গেল। রজনীদার সখের টেবিল্ হারমোনিয়মটা আমার মাথায় ছিল, আঁকড়া থেকে বাড়ী আনতে বলে-ছিলেন। বেকায়দায় তাড়াতাড়ি নাবানোও যায় না,—জানিস তো কি রকম লোক—মাথাটা জ্বলে উঠলো,—চুপ করে চলে আসতে হল—পাপ হল' কিন্তু। উঃ—আবার মাথাটা কেমন করে' উঠছে রে!"

বললুম—"থাক্—আর কথা কয়ে কাজ নেই,—আমি ছিরুকে দিয়ে আসবো অখন।"

"আর কেবল একটা কথা—দোস্ত্‌কে একবার দেখাতে পারলিনি ভাই,—তাকে পেলে আমি সেরে উঠতুম!" এই কথা কটি এমন উদাস আর কাতরকণ্ঠে বলে একটা নিশ্বাস ফেললে,—আমার মর্ম্মটা যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে দিলে! পীড়িত পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ যেন আজ শৃগালের কাছে ভিক্ষার আবেদন পাঠালে! বুকটা ফেটে গেল, ইচ্ছা হ'ল ছুটে গিয়ে আজিজকে ডেকে আনি। হায়—কতটুকু দুর্ব্বলতায় মানুষের ক্ষমতা, মানুষের স্বাধীনতা আটকে থাকে! কেঁদে ফেললুম, বললুম—"কি করে' তা হবে ভাই, ওঁরা বলেন—হিন্দুর বাড়ী,—ঠাকুর রয়েছেন!"

মানব একটু ম্লান-হাসি মুখে এনে হতাশ ভাবে বল্লে—"ঠাকুরই আমার বাধা হলেন! ছিঃ, ঠাকুরের নামে এমন বদনাম্ কখনো করিসনি ভাই।" এই বলে ঠাকুরের উদ্দেশে দু'হাত এক করে মাথায় ঠ্যাকালে। তার পর সে যেন ভাবনা-চিন্তার পরপারে দাঁড়িয়ে মুক্ত পুরুষের মত বললে—"দোস্ত্‌কে আমার সেলাম্ জানাস্—মাপ্ করতে বলিস। আর ছাখ লোকেন—হিঁদু হোস্‌নি ভাই,—মানুষ হোস্। একটু জল"—জল খেয়ে সে পাশ ফিরে শুলো। বাইরে তখন আলো দেখা দিয়েছে।

আজ বিশ দিন। বেলা সাড়ে আটটার সময় ডাক্তার এলেন, সব শুনলেন;—দেখলেন কিন্তু নিত্য যা দেখেন,—সেই পূর্ব্বভাব। ওষুধ লিখে কতকগুলি উপদেশ দিয়ে গেলেন।

আমরা ভেবেছিলুম বিকার কেটে গেছে। মা-ও তাই আজ অনেক দিন পরে গঙ্গাস্নান করে' মা মুক্তকেশীর পূজা দিতে গিছলেন।

ক'দিন পরে আজিজ আজ কাণ প্রাণ সজাগ করে' আমার কাছে সব শুনলে। "দোস্ত্‌কে পেলে আমি সেরে উঠতুম,—দোস্ত্‌কে আমার সেলাম জানাস্, আমাকে মাপ্ করতে বলিস্"—মানবের এই কথা কয়টি, সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চার পাঁচবার আমাকে বলালে আর নিজে শুনলে। তার পর ঝড়ের মত একটা নিশ্বাস ফেলে,—সামর্থ্য সত্বে উপায়হীনের মত' বলে' উঠলো—"হাম্ তোমারে ওয়াস্তে জান্ দে সেক্তা দোস্ত্, লেকিন তোমারে পাশ নেহি পৌঁছ সেকা! হিন্দু তোম্‌কো মার্ ডালা—আউর হাম্‌কো আউরাৎ বানা দিয়া! দোস্ত্ হাম ক্যা করে—হাম্ ক্যা করে—হাম্ ক্যা করে!!" নিরুপায়ের এই শেষের তিনটি মর্ম্ম-ছেঁড়া উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সে এমন জোরে মাথা নেড়েছিল—আর তার লম্বা লম্বা রেশমগুচ্ছের মত চুলগুলি শূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে এমন সবেগে ইতস্ততঃ ছড়াচ্ছিল, দেখে আমার ভয় হ'ল—নিদারুণ হতাশায় তার প্রাণটা বুঝি ঐ সঙ্গে বেরিয়ে যায়,—না হয় সে পাগল হ'য়ে গেল!

একটু পরে আমার দিকে চেয়ে বিরক্তিমাখা হুকুমের সুরে বল্‌লে—"যা-ও"। ভয়ে আমার বুকটা কেঁপে উঠলো,—আমি তাড়াতাড়ি সরে এলুম। আড়াল থেকে দেখি, সে ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে ছেলেদের মত ফুলে ফুলে কাঁদছে, তার সর্ব্বাঙ্গ নড়ে নড়ে উঠছে! আমিও না কেঁদে থাকতে পারলুম না,—আড়ালে খানিকক্ষণ কেঁদে

নিলুম। মানবের ঘরেই দিনরাত কাটাই,—সেখানে পাষাণের মত থাকতে হয়।

অন্য দিনের মত' সেদিন আর আজিজের কাছে যেতে সাহস হয়নি। সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল—তাই যাবার আগে ডেকে পাঠায়। আমি যেতেই সে আমার মাথায় পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে বললে—"হাম্ আজ তুমকো বড়া দুখ দিয়া, মাপ করো বাহাদুর; হামারা মগজ্ ঠিকানামে নেহি ভাই।" আমি কেঁদে ফেললুম। সে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে আমার চোখ মোচাতে মোচাতে—দশবার নিজের চোখও মুছলে। সে স্নেহের তুলনা নেই! মানবের তরে আমাদের উভয়ের চোখই অশ্রুতে উব্‌চে থাকতো,—যে কোনও উপলক্ষ্য ধোরে সে বেরিয়ে আসতো!

তার পর আজিজ বেশ স্পষ্ট আর দৃঢ় কণ্ঠে বললে,—"বাহাদুর, কাল্ হাম দোস্ত্‌কো দেখেগা। হাম গঙ্গাজিমে নাহাকে কাপড়া বদল্‌কে আওয়েগা। কাল্ হাম্‌কো কোই নেহি রোক্ সেকেগা।" এই বলেই সে—দ্রুত চলে গেল।

উদ্বোধন

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় এম-এ

সাঁজ সকালে রক্ত রবি
রঙীন আলোর আল্পনা,
বিজন রাতে চন্দ্র তারা
জানায় যাঁহার কল্পনা;

তপোবনের যজ্ঞধূমে
যাঁহার চরণ যায় গো চুমে,
বিভূতি যাঁর নবীন রাগে
জাগায় প্রাণে বন্দনা।

সাগরে যাঁর ছড়িয়ে আছে
নীলবরণা উত্তরী,
বসন্ত যার কর্ণভূষা
পরায় মুকুল মঞ্জরী.

বিদ্যুতে যাঁর নিশান উড়ে—
দিগ্‌গজেরা আকাশ যুড়ে
মেদুর মেঘে জয়ধ্বনি
ধরার বুকে দেয় ভরি।

পরশে তাঁর মনের বনে
জাগল হাওয়া হিল্লোলি,
তুষার গলা প্রাণের ধারা
উঠ্‌ল আবার কল্লোলি,

অরুণ কিরণ আঁখির পাতে
ফুটল নব সুপ্রভাতে
থর-বিথরে মানস সরে
শতদলের সব কলি।

হে অপরূপ, নিত্যস্বরূপ,
বিরাট, বিভু, নিরঞ্জন!
বক্ষে তব স্পর্শ হান,
চক্ষে বুলাও জ্ঞানাঞ্জন!

অভয় তব মা ভৈঃ বাণী
দুর্ব্বলেরে তুলুক টানি,
ফুটিয়ে তোল দৈন্য মাঝে
রাজার ছবি শ্রীলাঞ্জন।

বেলজিয়ম

শ্রীনরেন্দ্র দেব

য়ুরোপ-যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা বেলজিয়ম ঘুরে এসেছেন, তাঁরা কেউ এসে অষ্টেণ্ডের প্রশংসা করেন। কেউ বলেন রুবেঁর মত চমৎকার সহর বেলজিয়মে নেই। আবার কারুর মুখে রেমব্রাণ্টের সুখ্যাতি আর ধরে না! কেউ কেউ আবার ব্রাশেলস্ সহরের বড় বড় আদালত বাড়ীগুলোর খুবই তারিফ করেন। সুতরাং এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, বেলজিয়ম দেশটা দেখবার মতো। তবে বেলজিয়ানরা কি রকম লোক, এ প্রশ্ন করলে, কেউ বেশ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না। তার কারণ আর কিছুই নয়, বেলজিয়ানরা এমন চাপা লোক যে, অল্প দিনের পরিচয়ে তাদের ঠিক চেনা যায় না।

লেস বোনার কৌশল!

বেলজিয়ানরা সবাই এক জাত নয়। তাদের মধ্যে ফ্লেমিশ আর ওয়ালুন্ এই দুটী সম্পূর্ণ পৃথক জাতের লোক দেখতে পাওয়া যায়। ফ্লেমিশরা অনেকটা ওলান্দাজদের জাতি। এরাও অ্যাংলো-স্যাক্সনদের মতো সেই একই টিউটন বংশের সন্তান। ওয়ালুনরা প্রায় ফরাসীদেরই খুড়তুতো ভাই! ফ্লেমিশরা গৌর বর্ণ, এবং ঠিক খর্ব্বকায় না হলেও অনেকটা খর্ব্বাকৃতি বটে; কিন্তু ওয়ালুনরা পাণ্ডুর শ্যাম বর্ণের লোক এবং তাদের আকৃতিও ফ্লেমিশদের চেয়ে অনেক বড়। ফ্লেমিশরা কিন্তু ওয়ালুন্‌দের চেয়ে ঢের বেশী পরিশ্রমী। আবার ওয়ালুনরা ওদের চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান। ওয়ালুন্ মেয়েরা কিন্তু খুব কাজের লোক। তারা খুব ভাল রান্না করতে পারে। গৃহকর্ত্রীর কাজেও তারা বেশ চৌকস্ এবং সৌখীন; পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ফ্লেমিশ্ মেয়েদের চেয়ে তাদের নজর ও পছন্দ অনেক ভাল।
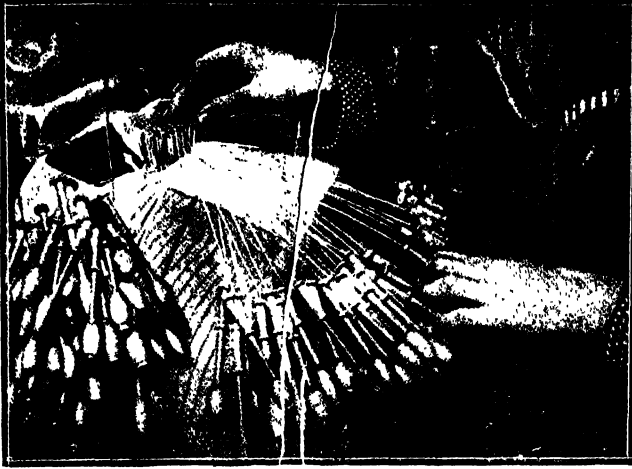
চরিত্রের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে ততটা পার্থক্য নেই, যতটা তাদের বাহ্য রূপের দিক দিয়ে সৌসাদৃশ্যের অভাব দেখে মনে হয়। প্রায় পাঁচ শতাব্দীর উপর এই দুটি পৃথক জাতি একই রাজার অধীনে বরাবর একত্র

জেলেনী

বাস করছে। এ পর্য্যন্ত কোনও দিন তারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ বিবাদ করেনি। তারা উভয় জাতিই সেই একই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বলে, আর ফ্লেমিশরা তাদের সেই আদিম কালের ফ্লেমিশ ভাষাই বলছে। এ পর্য্যন্ত এই উভয় জাতকে একটি মাতৃভাষায় কথা বলাবার কোনও চেষ্টাও হয়নি। তবে

চাষারা ক্ষেতে কাজ করছে

মিছিলের অপর অংশ। (দেবদূতেরা গান গাহিতে গাহিতে যাচ্ছেন)

তারা এ পর্য্যন্ত বরাবর দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষায় কথা কয়ে আসছে! ওয়ালুনরা এখনও সেই ফরাসী ভাষাতেই কথা আজ-কাল ফ্লেমিশরা ওয়ালুনদের ফরাসী ভাষায় কথা বলা সম্বন্ধে আপত্তি জানাচ্ছে।

ওয়ালুন্‌রা ওদের চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষিত, সভ্য ও ভদ্র বটে, কিন্তু ফ্লেমিশদের যে একটা চরিত্রবল আছে, সেটার একান্ত অভাব ওই ওয়ালুন্‌দের। তবে একটা গুণ তাদের উভয় জাতিরই আছে সেটা হচ্ছে—আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ভাবাদর্শের ভণ্ডামী অস্বীকার করে' তারা দুটি জাতই এক সঙ্গে ইহকালের উন্নতির প্রতিই বিশেষ মনোযোগী। এই জিনিসটা আছে বলেই তারা পরস্পরে নির্ব্বিবাদে একই দেশে একই রাজার অধীন এতকাল কাটাতে পেরেছে। নইলে আমাদের মত আধ্যাত্মিক ভাবে ভাবিত হলে, ক্ষুদ্র বেলজিয়মের স্বাধীনতা বহু পূর্ব্বে লোপ পেয়ে যেতো।

দ্বিতীয় লিওপোল্ডের মতো রাজাকেও বেলজিয়ম শুধু সহ্য করা নয় শ্রদ্ধা করেছে, ভালবেসেছে! অথচ এই বেলজিয়ম পতি দ্বিতীয় লিওপোল্ডকে পৃথিবীর অন্য সব জাতিই ঘৃণার চক্ষে দেখে; কারণ, তিনি নাকি উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোক ছিলেন। ব্যভিচার তাঁর জীবনের প্রধান কলঙ্ক। তিনি না কি এমন সব কুৎসিত কাজও ক'রেছেন,

ফ্লেমিশ গোয়ালিনী। (সুরূপা ও সুসজ্জিতা)
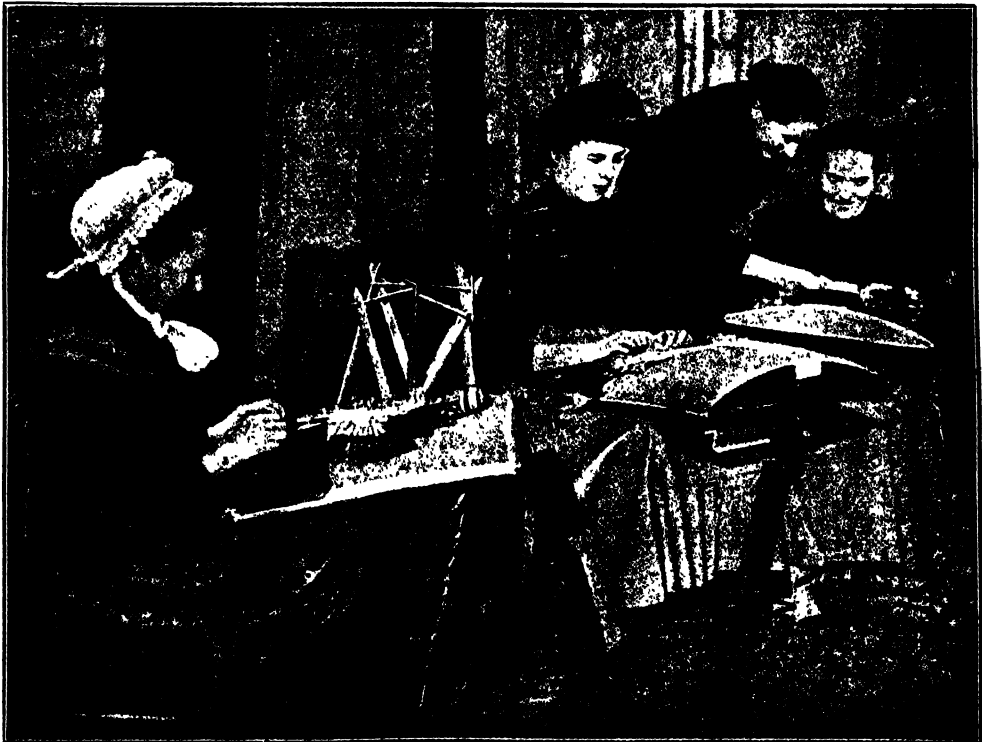
লেস্ বোনা। (অবসর কালে মেয়েরা বাড়ীতে বসে লেস্ বোনে)

যাতে রাজ-পদের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু বেলজিয়ানরা বলে—ব্যক্তিগত জীবন তাঁর যেমনই হোক্ না কেন, রাজা হিসাবে তিনি বেলজিয়মের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। তিনি তাঁর রাজকোষে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ জাতীয় উন্নতি কল্পে ব্যয় করেছেন। ব্রাশেলস্ পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র প্রাদে-

মুচী (কাঠের জুতা (সাবট্) তৈরী করছে।)

শিক সহর ছিল মাত্র! কিন্তু এই দ্বিতীয় লিওপোল্ডের আজীবনের যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রমে ব্রাশেলস্ আজ যে কোনও দেশের রাজধানীর সমকক্ষ হয়ে উঠেছে।

পরের অধীনতা ও অনন্ত দুঃখদরিদ্রতা থেকে মুক্তি পেয়ে এত শীঘ্র স্বায়ত্ত-শাসন ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনও দেশই খুঁজে পাওয়া যায় না। অষ্ট্রিয়ানদের শাসনপাশ থেকে মুক্তি পাবামাত্র বেলজিয়মের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই নানা দিকে কাজ করবার একটা প্রবল উৎসাহ ও উদ্যম দেখা দিয়েছিল। যাদের মাথায় সব বিরাট মতলব ছিল, তারা সকলেই বড় বড়

ওয়ালুন্ রমণী। (এরা একটা বেতের ঝুড়ীতে ছেলেকে শুইয়ে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়ায়।)

কাজে লেগে গেল। নিজের একখানি বাড়ী করবো, চাষ বাস ও ব্যবসা বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন কোরবো এবং শেষ বয়সের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রেখে যাবো—এমনিই সব সংবুদ্ধি ও সংযুক্তি দেশের রামা শ্যামাদের মাথায় পর্য্যন্ত খেল্‌তে লাগল। দেশের লোকের এই নবীন উদ্যম ও নবপ্রচেষ্টাকে দেশের রাজসরকার থেকে

প্রচুর উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হ'তে লাগল। ফলে তারা অতি শীঘ্রই মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠ্‌ল।

যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে বেলজিয়ম এত শীঘ্র মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলে, তার ষোলআনা কৃতিত্ব বেলজিয়মের বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা-প্রণালীর প্রাপ্য। সে শিক্ষা যেমনিই সহজসাধ্য, তেমনিই ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী। জনকয়েকের উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যস্ত না হয়ে, যাতে সকলেই আবশ্যকমত অল্পসল্প লিখ্‌তে পড়্‌তে এবং

মন্দিরে উপাসনা (ফ্লেমিশ মেয়েরা অত্যন্ত ধর্ম্ম-প্রাণ, তাঁরা নিয়মিত ভাবে দেবমন্দিরে এসে ভক্তিভরে উপাসনা করেন।)

হিসাব রাখতে শেখে, সেই দিকেই তারা বেশী লক্ষ্য রেখেছিল। ছেলেদের জন্য কৃষি-শিল্প প্রভৃতি ব্যবহারিক শিক্ষা, ও মেয়েদের জন্য বোনা, সেলাই, রন্ধন প্রভৃতি শেখাবারও ব্যবস্থা হয়েছিল।

বেলজিয়ানরা বেশ স্বল্পে সন্তুষ্ট জাতি। অন্যান্য দেশের তুলনায় তাদের দেশের জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয় যদিও খুব অল্প, এবং তাদের দেশের কুলি-মজুরদের পারিশ্রমিকও

গোয়ালার মেয়ে
(এদেশের গোয়ালার মেয়েরাও সুন্দরী ও সুবেশা !)

ফ্লেমিশ জেলে

এ কথা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে যে, ইহজীবনের দুঃখ-কষ্ট যা কিছু সব পরজন্মে দূর হয়ে যাবে।

বেলজিয়ানদের আহারও অতি অল্প এবং নিতান্ত সাদাসিধে ধরণের। সকালে উঠে তারা কফি আর

বালক উপাসকদ্বয়
(শৈশব থেকেই বেলজিয়ানদের ধর্ম্ম-শিক্ষা আরম্ভ হয়।)

বেলজিয়মের চরকা (সেখানে প্রত্যেক চাষার বাড়ীতে চরকা আছে এবং মেয়েরা চরকায় সূতো কেটে সেই সূতো নিজেরা তাঁতে বুনে নিজেদের কাপড় তৈরি করে নেয়।)

যৎসামান্ত বটে, তথাপি তারা বেশ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'র্‌ছে। য়ুরোপের অন্যান্য দেশের ঐশ্বর্য্যের তুলনায় বেলজিয়মকে অত্যন্ত দরিদ্র বলা চলে; কিন্তু তথাপি তাদের মধ্যে দারিদ্র্যের হীনতা নেই। বেলজিয়ানরা ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ও সরল প্রকৃতির লোক। তারা
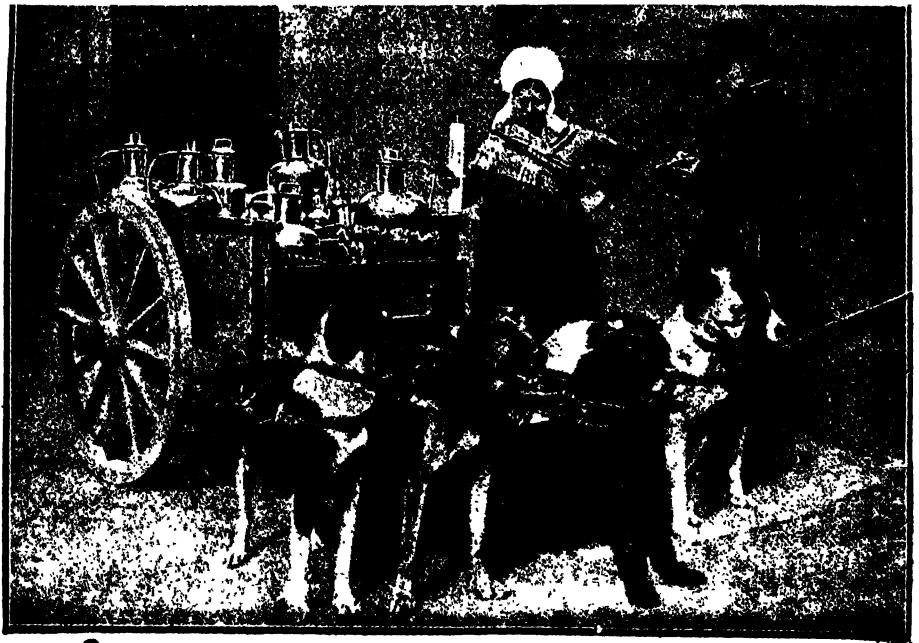
দুগ্ধ পরীক্ষা (সরকারের পরিদর্শকেরা পথে দুধের গাড়ী ধরে দুগ্ধ পরীক্ষা করছেন।)

পাউরুটি খায়। বেলা দশটার সময় একটুক্‌রো রুটি আর একটু মাখন কিম্বা পণীর। মধ্যাহ্নে একটু শূকর মাংস কিম্বা দু'একটা ছোট মাছ। বিকেলে আবার একপাত্র

বেলজিয়ান কৃষকেরা অসুখ কাকে বলে জানে না এবং তারা সকলেই বেশ দীর্ঘজীবী।

বাইরের লোকে তাদের দেখে মনে করে যে, সকাল

মিউজ নদীতে মাছ ধরা

কয়লার খনির মেয়ে মজুরণীরা

কফি এবং সন্ধ্যের পর রুটী আর সুপ—এই হচ্ছে তাদের সারাদিনের খোরাক। এই খেয়েই তারা বেশ সুস্থ শরীরে সবল দেহে দিবারাত্রি পরিশ্রম করতে পারে।

থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত যারা এমন গাধার মতো খাটে, তারা নিশ্চয়ই জীবনে আমোদ প্রমোদ কাকে বলে কখন জানতে পারে না। কিন্তু তাদের এ ধারণা ভুল। প্রতি রবিবার

ছুটীর দিনে তারা উৎকৃষ্ট বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে শূকর বা শশকের মাংস কিম্বা মাছ যথেষ্ট পরিমাণ শাক-সব্জীর সঙ্গে দেখ্‌লে বুঝতে পারা যায় যে, এরা আমোদ প্রমোদও যথেষ্ট করে থাকে।

বেলজিয়ান গাড়োয়ান

কুকুরের গাড়ী (ছোট ছোট কুকুরের গাড়ী চড়ে মফঃস্বলের গোয়ালিনীরা দুধ বিলি করে বেড়ায়। ফেরিওয়ালারাও অনেকে কুকুরের গাড়ী ব্যবহার করে।)

ভোজন ক'রে, যখন কোনও সাধারণ প্রমোদ-উদ্যানে বা বিশ্রামাগারে গিয়ে বাজ্‌না শুনতে বসে, তখন তাদের এই বিশ্রামাগার ও সাধারণের প্রমোদ-উদ্যান বেলজিয়ানদের জীবনের একটা প্রধান আবশ্যক বস্তু হয়ে

দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক গণ্ডগ্রামখানিতে পর্য্যন্ত গ্রামবাসী-দের এক একটা নিজস্ব বাজনার দল আছে। এই বাজনার দলের উৎকর্ষতা নিয়ে প্রত্যেক ইস্কুল কলেজে ও গ্রামে গ্রামে পরস্পরের মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা চলে।

তীর ধনুক নিয়ে খেলা করা মানুষের একটা প্রাচীন আমোদ,—বেলজিয়ানরা এখনও এ আমোদটাকে লোপ করে দেয়নি। ফ্লেমিশরা এই তীর ধনুক ছোঁড়্বার কায়দায় একেবারে সিদ্ধ-হস্ত! বেল-জিয়ানদের আর একটা প্রধান আমোদ হচ্ছে, 'কারমেশ' বা বার্ষিক মেলা! এই মেলা কিছুদিন বেশ জোর চলে; তার পর ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়। আগে এই মেলা ছিল প্রধানতঃ ধর্ম্মমূলক; আজকাল কিন্তু সকলের কাছেই ধর্ম্মের চেয়ে আমোদটাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

ওয়ালুন্রাও এসব আমোদ-প্রমোদে খুব যোগ দেয় বটে, কিন্তু তাদের অনেকেরই মরিয়া ভাবটা,—চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা এত প্রচণ্ড যে, মনে হয় তারা ভগবানকে ডেকে যেন বলছে—কুচপরোয়া নেই, চালাও।

একটা গল্প আছে যে, এক-বার একজন ওয়ালুন্ সর্দ্দার, পথের ধারে এক কুয়োর পাড়ে বসে একটি সুন্দরী যুবতীকে কাঁদতে দেখে, তাকে আদর-যত্ন করে তুলিয়ে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে নিজের বাড়ীতে এনে রাখে। সারারাত মেয়েটি সর্দ্দারের বাড়ীতেই রইল; সকালে উঠে তাকে দেখতে গিয়ে সর্দ্দার দেখলে যে, সে তরুণী সুন্দরীর পরিবর্ত্তে এক

মিছিলের একঅংশ (জোসেফ্ ও মাতা মেরী শিশু যীশুকে নিয়ে দেবালয়ে পূজা দিতে যাচ্ছেন।)

পাঁজ তৈরি করা (চরকায় সুতো কাটবার জন্য এরা গাছের আঁশ আঁচড়ে পাঁজ তৈরী করছে।)

বিকটাকার যমদূত সেখানে উপস্থিত! সর্দ্দার তাতে কিছু-মাত্র না দমে, সহাস্য মুখে যমদূতের সঙ্গে করমর্দ্দন করে ব'ললে, "সুপ্রভাত! নরকে ফিরে গিয়ে বলবেন যে, আমার এখানে আপনার একরাত্রি মন্দ কাটেনি; কেমন?"

তারা সমবায় সমিতি গঠন করে চালাচ্ছে। বেলজিয়ম এই সমবায় সমিতিতে একেবারে ভরে. গেছে। সেখানকার থিয়েটার, বায়োস্কোপ, পান্থশালা ও পানভবন পর্য্যন্ত এই সমবায়-সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত।

পুণ্য-শোণিতোৎসব। (১১৫০ সালে ফ্ল্যাণ্ডাসের কাউণ্ট থওডোরিক পুণ্য-ভূমি প্যালেষ্টাইন থেকে প্রভু খৃষ্টের পুণ্য-শোণিত-বিন্দু সংগ্রহ করে এনেছিল। ব্রুজেসের এক মন্দিরে উহা সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রতি বৎসর ঐ দিনটির স্মরণে একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়। সেদিন লর্ড বিশপ স্বয়ং সেই পুণ্য-শোণিতাধার স্কন্ধে বহনপূর্ব্বক রাজপথ দিয়ে মিছিল করে ঘুরে আসেন। এই মিছিলে প্রভু যীশুখৃষ্টের জীবনের যাবতীয় ঘটনা পরের পর দেখানো হয়। ভক্তেরা স্বয়ং সেজে সেই সব ব্যাপারের অভিনয় করেন।)

বেলজিয়মের ধর্ম্ম-যাজক সম্প্রদায়ের সেখানে খুব প্রতি-পত্তি। তারা সাধারণতঃ একটু উচ্চ-শিক্ষিত লোক; কিন্তু পৌরোহিত্য পেশা বলে' বিদ্যার আভিজাত্যটা তাদের মধ্যে নেই। তারা মোটা চালে বাস করে এবং নানা লোক-হিতকর অনুষ্ঠান নিয়ে দিন কাটায়। দেশের শিক্ষা কার্য্যে তারাই হচ্ছে প্রধান ব্রতী। তাদের তত্ত্বাবধানে নানা রকমের সব সাহায্য-সমিতি পরিচালিত হয় বলে' রাজনীতি ক্ষেত্রে তাদের একটা খুব উচ্চ স্থান হয়ে গেছে! শাসন পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচনের সময় ভোটের জন্য অধিকাংশ লোককেই এদের শরণাপন্ন হতে হয়। কারণ, সাধারণের উপর এদের প্রভাব এতট বেশী যে, এরা যাকে ইচ্ছা করবে তাকেই নির্ব্বাচিত করে দিতে পারবে।

কৃষি-জীবীরাই হ'চ্ছে বেলজিয়মের প্রধান অধিবাসী। তারাই দলে ভারি বলে' ভোটের ব্যাপারে তাদের মতটার খুব জোর আছে। আবার এরাই

বেলজিয়মের যে অঞ্চলে এই ওয়ালুনরা থাকে, সেই-খানেই বেলজিয়মের যত কয়লার খনি! কয়লা বেল-জিয়মের অর্থাগমের একটা প্রধান পণ্য! অধিকাংশ ব্যবসা

হচ্ছে বেলজিয়মের সব চেয়ে ধর্ম্ম-ভীরু লোক। কাজে কাজেই ধর্ম্ম-যাজক সম্প্রদায়ের খাতিরটাও এদের কাছেই সকলের চেয়ে বেশী। সুতরাং নির্ব্বাচন ব্যাপারে

পুরোহিত মণ্ডলীর হাতই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

ফ্লেমিশরা বেশ আমোদ-প্রিয় লোক; কিন্তু বিদেশী বা অপরিচিতদের তারা বড় সন্দেহের চক্ষে দেখে। যতক্ষণ না তাদের স্থির বিশ্বাস হচ্ছে যে, এর দ্বারা আমাদের কোনও অনিষ্ট হবে না, ততক্ষণ তারা প্রাণ খুলে অপরিচিত বিদেশী-দের সঙ্গে মেশে না। কিন্তু ওয়ালুনরা দিলদরিয়া লোক, সকলের সঙ্গেই নির্ভয়ে প্রাণ খুলে মেশে। ফ্লেমিশরা সবাই সঞ্চয়ী লোক! এদের মতো মিতব্যয়ী গৃহস্থ প্রায় অন্য কোনও দেশে দেখতে পাওয়া যায় না। এরা অধিকাংশ লোক স্বকৃত উপার্জ্জনে নিজেদের বাড়ী তৈরি করে নিতে পেরেছে! বেলজিয়মের লোক সংখ্যার অন্ততঃ এক-দশমাংশের নিজেদের চাষবাস বা বাগানের জন্য জমি আছে। কিন্তু বড় বড় জমিদারের সংখ্যা সেখানে খুবই কম।

বেলজিয়ান জাতটা স্বাধীন-চেতা, কষ্ট-সহিষ্ণু এবং নির্ভীক। নিজেদের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিতে তারা ভারি হুঁসিয়ার। তারা যে মিতব্যয়ী, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি; এবং এর ফলে তারা সঞ্চয়ী হ'য়ে উঠেছে। অল্প খরচে বেশী পাওয়া যায় যাতে, সেই দিকে এদের খুব দৃষ্টি! বেলজিয়মের যারা বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোক, তারাও নিতান্ত মোটা চালে বাস করে। তাদের সামাজিক আচার ব্যবহারেও ব্যয়-বাহুল্যের স্থান নেই। কোনও পর্ব্ব বা উৎসব উপলক্ষে পরস্পরের বাড়ী উপঢৌকন বা ভেট পাঠাবার রেওয়াজ এদের মধ্যে নেই। খৃষ্টের জন্মদিনের স্মরণে এরা পরস্পরের বাড়ীতে কেবলমাত্র 'কার্ড' পাঠিয়েই খালাস,—উপহার দেওয়া ও ভোজের আয়োজন করা এসব হাঙ্গামা তাদের নেই।

রাজ-কর্ম্মচারীদের সম্মান ও খাতির বেলজিয়মে সকলের চেয়ে বেশী। সেই জন্য বেলজিয়ান পিতামাতারা তাদের সন্তানের রাজ-সরকারে একটা চাকরী হয়েছে শুনলে সব চেয়ে খুসী হন। ব্রাশেলসের হালচাল এই রকম বটে, কিন্তু এণ্টোয়ার্পে ঠিক এর উল্টো! এণ্টোয়ার্প ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রধান সহর। এখানে যে ছেলে

চাষা বউ সজী বেচ্‌ছে!
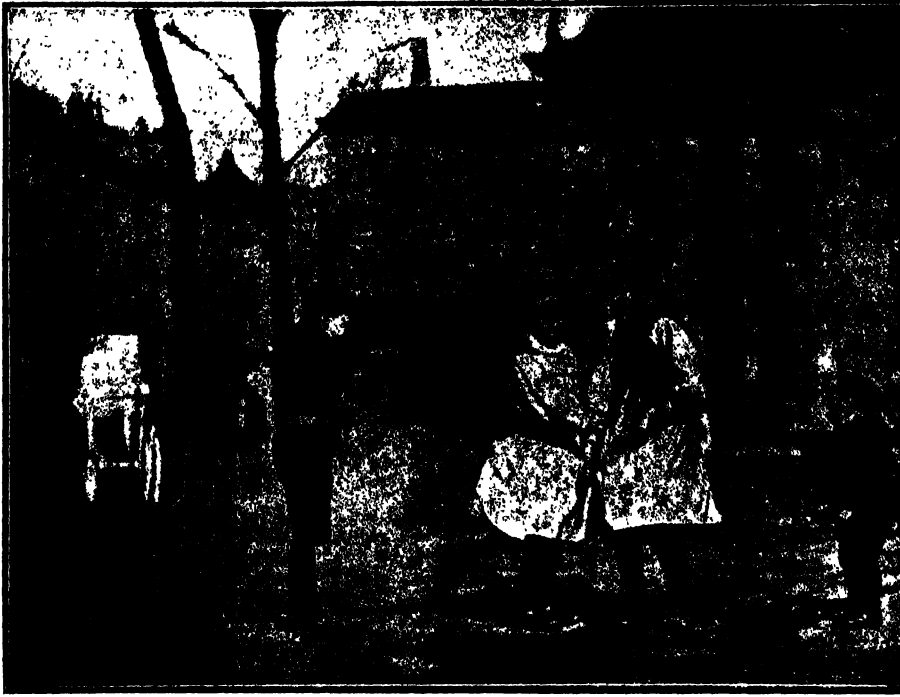
ক্রীড়ারত বালক-বালিকারা

ব্রাশেলসের লোক অতিথি সৎকার পর্য্যন্ত করতে চায় না, কিন্তু এণ্টোয়ার্পে ঠিক এর বিপরীত। এণ্টোয়ার্পের লোকেরা অতিথি-সৎকার করবার জন্য সতত প্রস্তুত। এণ্টোয়ার্পের আর একটা বিশেষত্ব হ'চ্ছে, সেখানকার উদার সমাজ। এ সমাজে উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধনের কোনও প্রভেদ নেই। কিন্তু

ক্রশ বাহকের দল

ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই পিতামাতার নয়নানন্দদায়ক। আর যে চাকরী করতে যায়, তাকে এণ্টোয়ার্পের লোকেরা ঘৃণা করে। নেপোলিয়ান যখন বেলজিয়ম জয় করেছিলেন, তখন তিনিই প্রথম এই এণ্টোয়ার্প বন্দর তৈরী করেছিলেন। আজ এণ্টোয়ার্প পৃথিবীর একটা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। ব্রাশেলসের অধিবাসীরা সহজে কাউকে নিমন্ত্রণ করে না। নিতান্ত জানা শুনা না থাকলে

ব্রাশেলসে এটি হবার জো নেই; সেখানে কেবলমাত্র সমান সমান লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা চলে। সেইজন্য সেখানকার সমাজে দলাদলিটা খুবই বেশী। ডাক্তার ডাক্তারের সঙ্গে, উকীল উকীলের সঙ্গে, রাজ-কর্ম্মচারী রাজ-কর্ম্মচারীদের সঙ্গে, কেরাণী কেরাণীর সঙ্গে ছাড়া মেলা-মেশা করবার
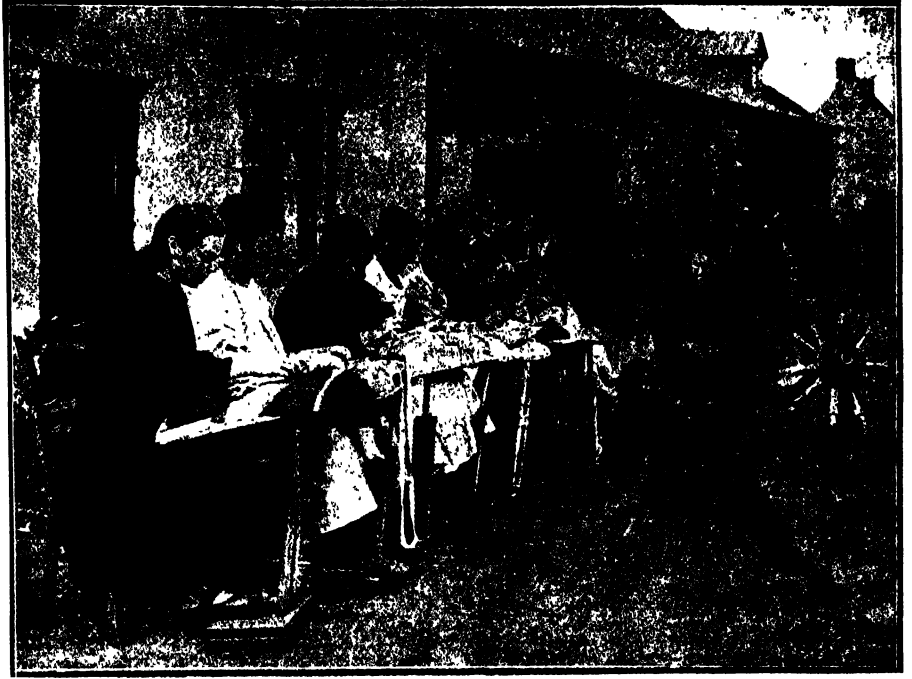
লেশ-প্রস্তুতকারিণীগণ

মাঠে শন শুকানো হইতেছে

দ্রষ্টব্য ব্যাপার। ঘেণ্ট্ লেশ্ ও চিকণের শিল্প কার্য্যের জন্যই বিখ্যাত; কিন্তু আজকাল যত রকম কলকব্জা মায় এঞ্জিন পর্য্যন্ত এখানে তৈরি হচ্ছে বলে, এ সহরটিও খুব জাঁকিয়ে উঠেছে! ব্রুজেস্ ও জীব্রাগ্ সহরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সহরের প্রত্যেক বাড়ীতেই একখানি ক'রে ঘর বহুমূল্য আস্‌বাব পত্রে সুসজ্জিত করে রাখা হয়। এ ঘরখানি হচ্ছে

সুযোগ পায় না। ব্রাশেলস রাজধানী হলেও কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা এণ্টোয়ার্পের অধিবাসীদের চেয়ে বোকা। ঘেণ্ট্, লীজ ও নামুর প্রভৃতি প্রাদেশিক সহরেও ভাল ভাল উচ্চশিক্ষিত লোক ও বিদুষী মহিলা একাধিক দেখতে পাওয়া যায়। মিউজের বিখ্যাত লোহার কারখানা লীজ সহরের একটা প্রধান

বৈঠকখানা। বাড়ীর লোকেরা কেউ এ ঘরখানি ব্যবহার করতে পায় না। এঘর কেবলমাত্র অতিথি অভ্যাগত এলে তাদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। যাদের বাড়ীতে এই রকম একটি বৈঠকখানা নেই, তারা সম্ভ্রান্ত লোক বলে পরিগণিত হতে পারে না।

সহরবাসী ছাড়া বেলজিয়মের অনেক লোক খালে ও

নদীতে নৌকো বা বজরার উপর বাস করে। বজরাখানিকে এরা ঠিক বাড়ীর মতো করেই সাজিয়ে রাখে। মধ্যাহ্ন ভোজটাই হচ্ছে বেলজিয়ানদের প্রধান আহার। কাজ-কর্ম্মের বেশীর ভাগ তারা সকালের মধ্যেই সেরে ফেলতে চেষ্টা

ব্রুজেস্ সহরের পোল
(ব্রুজেস্ সহরের চারিদিকের খাল পার হবার জন্য অনেকগুলি পোল বা Bridge আছে বলেই এই সহরের নাম হয়েছে ব্রুজেস্!)

করে। বারোটা থেকে দুটো পর্য্যন্ত এই দু'ঘণ্টা তারা কোনও কাজ করে না। এই সময়টা তারা মধ্যাহ্ন ভোজনে লিপ্ত থাকে। মধ্যাহ্ন ভোজনের সঙ্গে তারা পানীয় হিসাবে বিয়ার খায়, বিকেলা কফি খায় ও রাত্রে অল্পসল্প মদ্যপান করে। রাত্রের আহার তাদের প্রায় আটটার মধ্যেই চুকে যায়। রাত্রে তারা খুব সকালেই শুয়ে পড়ে এবং ওদিকে খুব ভোরে উঠেই কাজ করতে লেগে যায়। সুতরাং পড়াশুনো করবার তাদের বড় একটা সময় নেই এবং জাতটাও তেমন অধ্যয়নশীল নয়। কিন্তু তাদের যে সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়, তা এতো শ্রেষ্ঠ ধরণের, যে, সকল রকম লোকই সাগ্রহে তা পাঠ করে। বেলজিয়মে ফরাসী আর ফ্লেমিশ এই দু'রকম ভাষায় সংবাদপত্র ছাপা হয়।

হাটের পথে (বেলজিয়ান কৃষকপত্নীরা ঘোড়ায় চড়ে বাজারে চলেছে)

সাহিত্য-চর্চ্চা সে দেশের অতি অল্প লোকেই করে। তারা নিজের দেশেরই বড় সাহিত্যিকের সংবাদ রাখে না; সুতরাং বিশ্ব-সাহিত্য তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাদের প্রতিভাশালী বিশ্ববরেণ্য কবি ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত মরিস মেটারলিঙ্ককে বাইরের লোকে যত জানে, তাঁর দেশের লোকে তাঁকে তত জানে না!

মেটারলিঙ্কের বিষয় একটু না বলে' বেলজিয়মের কথা শেষ করা যায় না। মেটারলিঙ্কের সাহিত্য-জীবনের প্রথম উদ্বোধন প্যারি সহরেই হয়েছিল। তিনি এখন নর্ম্মাণ্ডিতে বাস করেন এবং ফরাসী ভাষায় তাঁর গ্রন্থাবলী

রচনা করেন বটে, কিন্তু তিনি একজন ফ্লেমিশ বেলজিয়ান। তাঁর নাটক তাঁর নিজের দেশে অভিনীত হবার বহুপূর্ব্বে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অভিনয় হয়ে গেছে। তবে এজন্য মেটারলিঙ্ক মোটেই দুঃখিত নন। তিনি বলেন, পার্থিব সুখের প্রতিষ্ঠায় আমার দেশের লোক এখনও

বেলজিয়মের মানচিত্র।

এত ব্যস্ত যে, শিল্প ও সাহিত্য সম্ভোগের উপযুক্ত অবসর তাদের এখনও আসেনি! মেটারলিঙ্কের মতো বেলজিয়মের অন্যান্য বড় বড় লেখকেরাও ফরাসী ভাষাতেই তাদের গ্রন্থ রচনা করেছেন; কিন্তু বেলজিয়ানরা ফরাসী ভাষাকে আর এতটা আমোল দিতে চাচ্ছে না! তারা এইবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্লেমিশ ভাষাকেই প্রধান স্থান দিয়েছে, এবং লেখকদের সকলকে ফ্লেমিশ ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করতে উৎসাহ দিচ্ছে। এর ফলে বেলজিয়ান ও ডচ্ ফ্লেমিশদের মধ্যে একটা সহানুভূতির সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপিত হবার সূত্রপাত হয়েছে। তবে বেলজিয়মের উচ্চ শিক্ষিত একটা দলের মধ্যে ফরাসী ভাষার আদর ও প্রতিপত্তি এখনও সমান ভাবেই আছে। এই দলটিকে দেশের সবাই খাতির করে। শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে এদের অভিমত ও নির্ব্বাচন সবাই নতশিরে মেনে নেয়। কলা-ক্ষেত্রে বেলজিয়মে একদল তরুণ-পন্থী শিল্পীর অভ্যুদয় হয়েছে। এরা এক দিক দিয়ে দেশের প্রাচীন শিল্পকলাকে রক্ষা করবার জন্য যেমন যত্নবান, অন্য দিকে দেশে নব নব ভাবে শিল্পের গতি ও উন্নতি সাধন তাদের প্রধান লক্ষ্য।

বেলজিয়মের ইতিহাস এক সুদীর্ঘ যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী। খৃঃ পূর্ব্ব ৫৭ অব্দে যখন বিশ্ব-বিশ্রুত রোমান বীর জুলিয়াস্ সীজার বেলজিয়ম আক্রমণ করে' বিজয়-গর্ব্বে তাকে রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন, তখন থেকে সুরু করে ফরাসীর আক্রমণ, জার্ম্মাণীর আক্রমণ, অষ্ট্রিয়ার আক্রমণ, স্পেনের আক্রমণ ধারাবাহিক রূপে বেলজিয়মের উপর দিয়ে ঝড়ের মতো বহে গেছে। আমরা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সব ঐতিহাসিক কাহিনীর আর উল্লেখ না ক'রে, এইখানেই বেলজিয়মের কথা শেষ করলাম।

মেঠো হাকিমের কড়চা

শ্রীমুহ্তামিম্ বন্দোবস্ত্

বাভনের ইমান্দারী

এক

আমার জরীপের হাতে-খড়ি হইল হাজারিবাগ জিলার উত্তরে। নূতন কার্য্যের আবেগময় উদ্যমের দিনে, প্রকৃতির প্রিয়-লীলাভূমি ঐ প্রদেশ স্বপ্নপুরী বলিয়া মনে হইয়াছিল। কত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ স্রোতস্বিনী, ঐ প্রদেশে জন্মলাভ করিয়া হাসিতে ও নাচিতে শিখিয়াছে! উচ্চ-শির গিরি-শ্রেণী স্তরের পর স্তরে উঠিয়া, গম্ভীর অথচ শান্ত শোভায় দর্শককে তৃপ্ত করে। আবার সুগভীর অরণ্যের স্নিগ্ধ ঘনচ্ছায়ায় চিত্ত সংযত ও কোমল হয়। সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম এই প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দ। স্বচ্ছ-সলিলা, স্বল্পতোয়া স্রোতস্বতীর ন্যায় তাহারা সরল ও কোমল-হৃদয়; আবার

তাহাদেরই মত নির্ম্মল আনন্দে সদা হাস্য-চঞ্চল ও নৃত্যগীতপর। সভ্যতার জটিলতা ও কৃত্রিমতা, তাহাদের সরলতা ও সত্যবাদিতাকে স্পর্শ করে নাই, খর্ব্ব করে নাই; তাহাদের সরস হৃদয়ের সজীবতাকে, সভ্যতাভিমানীর প্রাণহীন স্পন্দনে পরিণত করে নাই।

প্রথম পৌষ। মুঙ্গেরের সীমান্তে একটি সীমা-বিবাদ তদন্ত করিবার জন্য সুদীর্ঘ ও দুর্লঙ্ঘ্য মঠ-পাহাড় পর্ব্বত-শ্রেণী পার হইয়া যাইতে হইবে। মঠ-পাহাড় ভেদ করিয়া কিলিনদী হাজারিবাগ হইতে মুঙ্গের জিলায় গিয়া পড়িয়াছে। সকাল সকাল আহার করিয়া আটটার সময় তাম্বু হইতে বাহির হইলাম। অচেনা পথ,—পথের মধ্যে বাঘের ভয় আছে। দুইজন সাঁওতালকে পথি-প্রদর্শক ও শরীর-রক্ষক রূপে সঙ্গে লইলাম। তাম্বু হইতে এক মাইল পথ যাইতে না যাইতেই, আমরা গভীর অরণ্যানী-সমাকীর্ণ পর্ব্বত-গাত্রে চড়াই-উৎরাই আরম্ভ করিলাম। পাঁচ মাইল চড়াই-উৎরাইএর পর, আমরা পশ্চিম মুখে ক্রমাগত নামিতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মঠ-পাহাড় পার হইবার কোনো চলা-পথ নাই,—ঘোড়া লইয়া যাওয়া ত দূরের কথা। অগত্যা কিলি নদীর গর্ভ বাহিয়াই মঠ-পাহাড় পার হইবার সঙ্কল্প করিয়া নদীতে নামিলাম।

বেলা যখন এগারটা, তখন আমরা কিলির গর্ভে প্রবেশ করিলাম। দৃশ্য অতীব মনোহারী। উভয় পার্শ্বে উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। পর্ব্বত-গাত্র এত মসৃণ, দূর হইতে স্ফটিক বলিয়া ভ্রম হয়। সত্তর হইতে একশত ফুট পর্য্যন্ত এইরূপ চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে গিরিদেহ,—কেহ যেন প্রতিদিন মাজিয়া ঘষিয়া রাখিয়াছে। বেলা হইয়াছে, কিন্তু সূর্য্যকিরণ দেখা যাইতেছে না। ঊর্দ্ধে, সুনীল আকাশ-তল চন্দ্রাতপের ন্যায় বোধ হইতেছিল। কিলি আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। যেন তাহার প্রতি পাদ-বিক্ষেপে গিরিবর তাহাকে আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছে, আর সে যেন অভিমানভরে ক্রমাগত পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইয়াছে! বোধ হয় বা, নির্ম্মম কঠোর শিলাগাত্রে আঘাত পাইয়া, কোমলাঙ্গী কিলি, নিজ দেহ সঙ্কীর্ণ করিয়া, তাহার সহিত কত না যুঝিয়াছে! প্রতি মুহূর্ত্তে শৈলরাজ যতই তাহাকে বাধা দিয়াছে, কিলি যেন গর্ব্বিতা ফণিনীর মত, ততই তাহাকে দংশন করিয়া, আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে। কিলি-গর্ভের সেই প্রাণ-মন-হরণকারী দৃশ্য জীবনে ভুলিবার নহে।

নীরবে আমরা চলিয়াছি। সাঁওতাল সঙ্গীদের পায়ের থপাস্‌-থপাস্‌ শব্দ, ও আমার বাহনের খুরের ঠকাস্‌-ঠকাস্‌ শব্দ ব্যতীত আর কিছু শোনা যাইতেছিল না। কদাচিৎ একটা খরগোস বা হরিণ, ঘোড়ার পায়ের শব্দে ভীত হইয়া পলায়ন করিবার সময়, পর্ব্বত-গাত্রে খস্‌খস্‌, খুট্‌খুট্‌ আওয়াজ করিতেছিল। কিলির গর্ভ শিলা ও উপলখণ্ডে পরিপূর্ণ। কোনো কোনো প্রস্তরখণ্ড এরূপ শ্বেত ও স্বচ্ছ যে, সহজেই মার্ব্বেল বলিয়া ভ্রম হয়। ছোট ছোট শিলাগুলির প্রত্যেকটিই যেন শালগ্রাম। কত শতাব্দী ধরিয়া যে তাহারা কিলির স্নেহ-সলিল-ধারায় এই সুন্দর কান্তি ধারণ করিয়াছে, তাহার ধারণা করা যায় না!

আত্মীয়-পরিজন ভুলিয়া, জরীপ-জমাবন্দী ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া, স্বভাবের মনোলোভা শোভা উপভোগ করিতেছিলাম,—হঠাৎ, সুললিত কণ্ঠে সঙ্গীতের তান কর্ণ-কুহরে অমৃত বর্ষণ করিল। চমকিত হইলাম। এই নির্জ্জন শ্বাপদ-সঙ্কুল প্রদেশে, এমন সুমধুর মনুষ্য-কণ্ঠ-স্বর কোথা হইতে আসিল? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? সঙ্গীদের সুধাইলাম 'কে গায়?'

'ঐ যে বাভন্‌ ছোক্‌রা'!

দুই

সম্মুখে দেখিলাম, তটিনী-তটে বৃহৎ মসৃণ এক শিলা-খণ্ডের উপর বসিয়া, ষোড়শ বর্ষীয় একটি বালক স্রোতের জলে পা দুলাইতেছে। উজ্জ্বল শ্যাম তার বর্ণ। বাব্‌রী-কাটা চুল তাহার সুগঠিত স্কন্ধে ঈষৎ দুলিতেছিল। ডাগর দুইটি চোখ। ভ্রূযুগল যুক্ত। দক্ষিণ বাহুতে সোণার তাগায় কতকগুলি মাদুলি। দুই হাতে সোণার বালা। বালক সুন্দর! দেখিবামাত্র যেন সে আমার সমস্ত স্নেহ, সমস্ত ভালবাসা কাড়িয়া লইতে চাহিল।

বালক আনমনা হইয়া গান গাহিতেছিল, আর স্রোতের জলে পা দুলাইয়া তাল রাখিতেছিল। সে গাহিতেছিল—

শ্যামলিয়া তেরে সঙ্গ, আজু মৈ কৈসে ঝুলুঁ, পিয়ারী!
সব্‌ আয়েঁ কৈলাস কা পতি, সর্প্‌ লপেটে অঙ্গ,,
ইন্দর্‌ লোগ্‌সে ইন্দ্রজী আয়েঁ, বর্‌বা আয়েঁ সঙ্গ্‌
আজু মৈ কৈসে ঝুলুঁ, পিয়ারী!

খোল বাজে, কর্‌তাল বাজে, আউর বাজে মৃদঙ্গ,
শ্যামলিয়া কা বন্‌সী বাজে, আলম্ হো গয়া দম্ !
আজু মৈ কৈসে ঝুলুঁ, পিয়ারী !
সুরদাস ঝুলে হিন্দোলা, জামা পহীরে সু-রঙ্গ,
নীলবরণকা সাড়ী পঁহীরে রাধা ঝুলে পালঙ্গ,
আজু মৈ কৈসে ঝুলুঁ, পিয়ারী !

প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর শোভা, তার উপর সুন্দর কণ্ঠের মধুর তান, চিত্তকে তখনকার জন্য সংসার হইতে দূরে লইয়া গিয়াছিল।

গান থামিলে নিকটে গিয়া বালকের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। আনমনা ভাবেই বালক উত্তর করিল, 'কেন? আমার নাম আস্‌রফী।'

'তুমি ত সুন্দর গান গাও',—আমি মনের কথা বলিয়া ফেলিলাম। বালক কৈশোর-সুলভ লজ্জা ও বিনয়ে দৃষ্টি নত করিল; তাহার গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিল! আমার মত আগন্তুক বিদেশী লোকের কর্ণে সুধা ঢালিবার উদ্দেশ্যে যেন সে গান গাহে নাই! আমি একটু অপ্রস্তুত হইলাম।

'কোথায় বাড়ী, কি জাতি?'—আমি নাছোড়বান্দা।

'ঘর আমার চন্দ্‌রথা, জাতিতে বাভন আমরা'—বালক এবার নির্ভয়ে জবাব দিল।

'এখানে একাকী ভয় করে না?' আমি সুধাইলাম।

'কিসের ভয়? তুমি যে যাচ্ছ? কোথায় যাবে? কোথায় তুমি থাক? কি কাজে যাচ্ছ?' কৌতুহলী বালক এক সঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়া ফেলিল। আমি বালকের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলাম। বালক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—

'ফিরবে কখন?'

'৪টা নাগাদ। তুমি আমার সঙ্গে যাবে ফেরবার সময়?'

'বাবাকে বোলো' বালকের স্বাভাবিক উত্তর আসিল। উত্তরের ভাবে বুঝিলাম, আসিবার ইচ্ছা তাহার আছে। সন্দেহে আবার সুধাইলাম,—'তোমার বাপ বলিলে যাবে?'

'কোথায়, তিসরি?'

'হাঁ তিসরিতে,—আমার তাম্বুতে?'

'তাম্বুতে যে তুমি থাক!'

'আমার সঙ্গেই ত থাক্‌তে হবে?'

'তোমরা যে কিরিস্তান, মুর্গী খাও!'

'না, আমরা হিন্দু, ব্রাহ্মণ,—মাছ মাংস খাই না, হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণে পাক করে।'

'তাহ'লে বাপ যেতে দিতে পারে', বালক তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিল না।

'আচ্ছা, তোমার বাপকে ব'লব। এখন যাই, দূরে যেতে হবে।' এই বলিয়া আমি বিদায় লইলাম। যতদূর দেখা গেল—বালকের দৃষ্টি আমাদের অনুসরণ করিল।

তিন

সাঁওতাল সঙ্গীগণের নিকট আস্‌রফীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। আস্‌রফী চন্দ্‌রথার ব্রহ্মদেও নারায়ণ সিংএর একমাত্র পুত্র। ব্রহ্মদেও ভূমিহার ব্রাহ্মণ,—চলিত কথায় যাহাদের বাভন বলে। পেশা তার তেজারতি। মহাজনীর সঙ্গে সঙ্গে জমীজমাও বিস্তর করিয়াছে। এ অঞ্চলের মধ্যে ব্রহ্মদেও বেশ অবস্থাপন্ন লোক; জমিদারেরা তাহার নিকট টাকা ধার করে। প্রতাপ-প্রতিপত্তিও তাহার যথেষ্ট। তবে সে নিষ্ঠুর, কৃপণ ও কুটিল। ভক্তি তাহাকে কেহই করিত না,—ভয় করিত সকলেই। এ অঞ্চলের লোকে কিন্তু আস্‌রফীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে। আস্‌রফী যেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত, অর্থলোলুপ পিশাচ-হৃদয় ব্রহ্মদেও নারায়ণের ঘরে জন্ম লইয়াছে। বাভন ঘরের কোনো লক্ষণই আস্‌রফীতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। সর্ব্বদা যেন তাহার উদাসভাব। বেশভূষা, টাকাকড়ি, কিছুতেই তাহার মন বসিত না। ব্রহ্মদেও যথাসাধ্য তাহাকে যথার্থ বাভন-পন্থায় দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু সকলই বিফল হইত। অপরাপর বাভন বালকের মত, সে ডেড়াই, আড়াইয়া, চৌঠাই, ইত্যাদি সুদের হিসাব মুখস্থ করা দূরে থাক্, তাহার একবর্ণ বুঝিতে পর্য্যন্ত চেষ্টা করিত না। গরীব দুঃখীদের জন্য সে নীরবে চোখের জল ফেলিত। সুদের জন্য তাহার বাপ কাহাকেও মারধর করিলে, তাহার সেদিন আহার বন্ধ হইত। বাপের আদেশে কাহাকেও সুদের জন্য তাগাদা দিতে হইলে, সে ঘরের বাহির হইয়া, কিলির তীরে নির্জ্জনে বসিয়া গান গাহিত।

সাঁওতাল সঙ্গীরা বলিতে লাগিল—একমাত্র পুত্র আস্‌রফীর এতাদৃশ অবাভনোচিত স্বভাবের জন্য ব্রহ্মদেও

নিরতিশয় ক্ষুব্ধ থাকিত। তবে সে আশা করিতে ছাড়িত না যে, বয়স হইলে আস্‌রফী নিজের হিসাব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে পারিবে। বিষয়কর্ম্মে এই অবহেলার জন্য আস্‌রফীকে সে তিরস্কার করিতে চাহিত বটে, কিন্তু পারিত না। সে যে তাহার একমাত্র পুত্রসন্তান,—বংশের বাতি! ব্রহ্মদেও বলিত, সে আস্‌রফীরই সুখের জন্য সদা সর্ব্বদা সচেষ্ট; আস্‌রফী সে কথা বুঝিলে তাহারই ভাল। ধন-দৌলত রাখিতে পারে, সুখে থাকিবে সে-ই; না রাখিতে পারে, কষ্ট হইবে তাহারই। সময়ে সময়ে ব্রহ্মদেও প্রার্থনা করিত, ভগবান যেন তাহার আস্‌রফীকে কষ্ট না দেন; অন্ততঃ তাহার কষ্ট যেন তাহাকে দেখিতে না হয়। তাহার এই প্রার্থনায় বিধি হাসিতেন কি না, জানিবার উপায় নাই; তবে অলক্ষ্যে গ্রামের সকলেই হাসিত।

এ হেন আস্‌রফীকে আমার নিকট কয়েক দিন, রাখিবার প্রস্তাব করিলে, ব্রহ্মদেও রাজী হইবে কি না, সন্দেহ ছিল। তবুও ফিরিবার পথে, চন্দ্‌রখা হইয়া আসিলাম। ব্রহ্মদেওএর সহিত দেখা করিয়া বলিলাম, 'তোমার ছেলেটি বড় ভাল। আমার ইচ্ছা, যে ক'দিন আমি তিসরিতে থাকি, তাহাকে কাছে রাখি। তোমার কি অমত আছে?' ব্রহ্মদেও ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আস্‌রফী ছেলেমানুষ, সে কি আপনার কাছে থাক্‌তে পারবে?'

'খুব পার্ব্বে—এখন তুমি ছেড়ে দিলেই হয়।'

'আপনার মেহেরবাণী। তবে তার মাকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার।'—ব্রহ্মদেও নূতন আপত্তি উত্থাপন করিল।

'হাঁ, তা জিজ্ঞাসা কর না, এখুনি কর' আমি বলিলাম।

'আপনার নেক্‌নজর্‌,—তা, কাল আমি তিসরি গিয়ে আপনাকে সংবাদ দিয়ে আস্‌ব'—ব্রহ্মদেও বিনীতভাবে নিবেদন করিল। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে পাছে ব্রহ্মদেও একেবারে 'না' বলিয়া বসে, এই ভাবিয়া নিরস্ত হইলাম। যাইবার সময় বলিলাম, 'তাকে নিয়ে এসো ঠিক্‌—আস্‌রফীর থাকবার ইচ্ছা খুব, আমার কাছে। আজ আমাদের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গেছে।'

আমার এই আচম্‌কা অভিনব প্রস্তাবে ব্রহ্মদেও নারায়ণের মনে একটি ছোটখাটো আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। জরীপের হাকিম তাহার ছেলেকে কাছে রাখিতে চায় কেন? হাকিমি খেয়াল, না কিছু মতলব্‌ আছে? জরীপের অজুহাতে এ অঞ্চলের অনেক লোক ত তাহার সহিত বিবাদ করিবেই। সে শুনিতে পাইয়াছে যে, এ হাকিম সাঁওতাল কোলেদের অতিশয় প্রিয়। যে সব জমী থেকে মহাজনেরা তাদের বেদখল করিয়াছে,—যে উপায়েই হোক সে সব জমী তাদের ফিরাইয়া দেওয়াই তাহার ইচ্ছা। ব্রহ্মদেও নালিশ করিয়া, ডিক্রী করিয়া, জোরজবরদস্তী করিয়া, অনেকেরই জোতজমী, বাস্তভিটা গ্রাস করিয়াছে। তাহার ছেলেকে হাত করিয়া, এ সবের উদ্ধার করিয়া, তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবার ফন্দী কি হাকিম করিয়াছে? এদিকে, হাকিমের কাছে তাহার অনেক কাজ। ইচ্ছা করিলে, নানা উপায়ে, তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এ হাকিম। আস্‌রফীকে পাঠাইয়া হাকিমকে তুষ্ট করিলে, তাহার কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। তাহার অনিষ্ট আর কি করিতে পারে? আইন আছে, আদালত আছে, উকীল মোক্তার আছে, পয়সাও যথেষ্ট আছে। হাকিম যদি বেইন্‌সাফ্‌ কিছু করে,—কিছু অর্থব্যয় করিলেই, ব্রহ্মদেও তাহা শোধরাইয়া লইতে পারিবে, জরীপ উঠিয়া গেলে। ওদিকে, হাকিমকে হাত করিতে পারিলে, তাহাকে কোনো বেগ পাইতে হয় না, হয়রাণি ও পয়সা খরচ হইতে সে বাঁচিয়া যায়। ব্রহ্মদেওএর মনে এইরূপ নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। সে রাত্রি এই চিন্তাতেই কাটিয়া গেল।

চার

পর দিন বৈকালে আস্‌রফীকে লইয়া ব্রহ্মদেও তাম্বুতে উপস্থিত হইল। বলিল, 'অনেক বুঝিয়ে বলায়, আস্‌রফীকে আপনার কাছে আট দশ দিন রাখতে রাজী হ'য়েছে তার মা। আপনি মেহেরবাণী করে' দেখবেন,—সে বড় আবদারী ছেলে।'

'তার জন্যে তোমাদের ভাব্‌তে হবে না,—তুমি রোজ এসে একবার করে দেখে যেও'—আমি ভরসা দিলাম।

'আপনার কাছে থাক্‌বে, তাতে আমাদের আর ভাবনা কি? কষ্ট তার কিছুই হবে না তা জানি। তবে বাপ-মার মন মানে না। তাকে ছেড়ে আমরা কখনো থাকিনি যে'—ব্রহ্মদেও বলিল।

অর্ঘ্য

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

'আস্‌রফী না হয় এক দিন অন্তর তার মাকে দেখে আসবে, কেমন ?'

'তা হলে বড়ই ভাল হয়,' ব্রহ্মদেও নিবেদন করিল। তাহার সম্বন্ধে হাকিমের কি ধারণা, তাহা সঠিক জানিয়া লইবার এই সুযোগ পাওয়াতে ব্রহ্মদেও খুশী হইল। তাহার পর, আস্‌রফীর দুষ্টামির কথা, আহার বিষয়ে তার পছন্দ-অপছন্দর কথা, আরও অনেক খুঁটিনাটি কথা বলিয়া ব্রহ্মদেও বিদায় লইল।

তাহার অভি তার সম্পূর্ণ বাহিরের একজন নূতন লোকের নিকট থাকিবার প্রস্তাবের নূতনত্বই আসরফীকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। সঙ্কোচ ভাঙ্গিতে বেশী দেরী হইল না। সঙ্কোচ যখন ভাঙ্গিল, তখন নানা প্রশ্নে সে আমাদের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ করিয়া লইল। এক দিন দু'দিন কাটিতেই, সে যেন আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ জনের মত হইয়া গেল। এক দিন অন্তর তাহার মাকে দেখিয়া আসিবার কথাও তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইত। প্রাতে যখন আমি তদারকে বাহির হইতাম, তখন আস্‌রফী, মুনসরিম আমলাদের কাছে গিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিত ; আর প্রজারা আসিয়া, পর্চা লইয়া তাহাদের জমীজমা কেমন করিয়া 'বুঝারত' করে তাই শুনিত। যদি বুঝিত যে, বাভন ছোকরাকে দেখিয়া কোনো রাইয়ত তার সব কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছে, তখনই সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, তাম্বুর পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। দ্বিপ্রহরের পর আমি ফিরিলে এক সঙ্গে আহার করিত। আহারের সময়, তাহার সকালবেলাকার দেখা ও শুনা সব ঘটনা ও কথা আমাকে বলিত। বৈকালে যখন আমার মেঠো এজলাস বসিত, সে আমার পাশে বসিয়া সব শুনিত, আর মাঝে মাঝে আমার কাণে কাণে মন্তব্য প্রকাশ করিত। সন্ধ্যার পর সঙ্গীত, আর শয়নের পূর্ব্বে সে অঞ্চলের সমস্ত কাহিনী, উপকথা আমাকে শুনাইত।

ক্যাম্পে ব্রহ্মদেওএর প্রত্যহই কাজ থাকে। তাহার তেজারতির বেড়াজালে সে মুলুকের অনেকখানিই আচ্ছন্ন। ফিরিবার সময় একবার সে আস্‌রফীকে দেখিয়া যাইত। কথাবার্ত্তা খুব বেশী হইত না। 'কেমন আছিস্ রে বেটা ?' ব্রহ্মদেওএর সাধা প্রশ্ন ছিল। 'বেশ আছি, মা ভাল আছে ?' আস্‌রফীর বাঁধা উত্তর ছিল। দিন যত যাইতে লাগিল, বাপের প্রতি আস্‌রফীর মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। তাহার বাবার উপর যেন তার মনে সন্দেহের একটা গাঢ় দাগ পড়িয়া গেল। প্রত্যহ বৈকালিক আদালতে, আমার পাশে, ক্যাম্বিসের দোলান চেয়ারে আস্‌রফী বসিয়া থাকিত। বাংলা ইংরাজী খবরের কাগজ ও মাসিক পত্রিকার ছবি দেখাই ছিল তার কাজ। ব্রহ্মদেও হাকিমের পাশে তাহার পুত্রকে দেখিয়া খুব উৎফুল্ল হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু একটির পর একটি করিয়া প্রত্যেক মৌজার প্রজা আসিয়া যখন ব্রহ্মদেও সিংএর নামে নালিশ করিত, তার আদালত ফৌজদারী, জাল জুয়াচুরী, জোর জবরদস্তীর কথা বিবৃত করিত, আস্‌রফীর মন তখন বিকৃত হইয়া যাইত। মুখ বিবর্ণ করিয়া সে তাম্বুর ভিতর পলাইত। আমি যখন কাজ সারিয়া তাম্বুর ভিতরে যাইতাম, দেখিতাম, আস্‌রফী নীরবে শুইয়া আছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ দুইটা ফুলিয়া গিয়াছে।

এ ত ভারি বিপদ হইল! বালকের মনে আঘাত দেওয়া ত আমার উদ্দেশ্য ছিল না। মনে করিতাম, কৌতূহলপরবশ হইয়াই সে আমার মেঠো আদালতের বিচারাভিনয় দেখে। এ অভিনয় তাহার কোমল মনে কিসের ছাপ অঙ্কিত করিতেছে, তাহার সন্ধান লই নাই। এক দিন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা আস্‌রফী, তোমার কি ভাল লাগছে না,—তুমি কি তোমার মার কাছে ফিরে যাবে ?'

'কোথায়, চন্দ্‌রথা ?'

'হাঁ, তোমার বাড়ী ?'

'না, আমি চন্দ্‌রথায় যেতে চাই না।' কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'মা যে সেখানে আছে,—তা না হলে আমার ইচ্ছা হয়, তোমার সঙ্গে বিদেশে চলে যাই।'

'কেন ?'

বালক উত্তর করিল না। তার পর হাসিয়া বলিল—'এ দেশে একটা প্রবাদ আছে জান ?'

'কি প্রবাদ, বল না!'

'বাভন লোগ্ সব হ্যায় বেইমান।
পাঁচ্‌পোনিয়া কা লে গিয়া জান!'

'দেখ হাকিম, এত দিন আমি ভাবতাম, বাভনদের

টাকা আছে, তাই দুষ্ট প্রজারা, হিংসায় তাদের নামে এই মিথ্যে অপবাদ রটিয়েছে। কিন্তু এ ক'দিন তোমার এজলাসে থেকে যা শুনলাম, তাতে মনে হয়, সাঁওতাল, ভূমিজদের কথাই ঠিক।'

বালকের মুখে এই মন্তব্য শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তাহার মনে কিসের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ধরিতে পারিলাম। তাহাকে ভুলাইবার জন্য আমি বলিলাম, 'তাতে তোমার কি? তুমি ত আর কিছু বেইমানী করনি!' 'বড় হ'লে আমিও করব। আমিও ত বাভন!' বালকের উত্তরে নিজের জাতির উপর একটা অবিশ্বাসের নিঃশ্বাস পড়িল। আমি তাহার অবিশ্বাস ঘুচাইবার জন্য বলিলাম—'তা হোক্ না, সব বাভনই কি এক রকমের?'

বালক বলিল—'তা কে জানে? এই দেখ না আমার বাপের কাণ্ড! উঃ! কত পরজার সর্ব্বনাশ তিনি করেছেন!'

আমি বুঝাইয়া বলিলাম—'পরজারা যা বলে, সবই কি সত্যি? নিজের জমীজমা ফিরে পাবার মতলবে, তারা অনেক বানিয়ে বলে।'

বালক অটল; বলিল—'সকলেই কি বানিয়ে বলে? দেখতে পাও না, তাদের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে, কত প্রজা কেঁদে ফেলে! মিথ্যামিথ্যি কি লোকে কাঁদে?'

আমি দেখিলাম, বালককে সহজে শান্ত করিতে পারিব না। বলিলাম, 'এসব কথা নিয়ে তুমি ভাব কেন? তুমি ছেলেমানুষ, বড় হলে সব বুঝতে পারবে। এখন থেকে সংসারের কথা ভেবে কেন তুমি মন খারাপ কর?'

'মন যে খারাপ হয়, গরীবদের কথা শুনে যে কান্না পায়'— বালকের নয়নযুগল ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'তুমি কাল থেকে আর এজলাসে যেও না।' বালক বলিল 'কেন?'

'তোমার মন খারাপ হবে। তোমার বাবা যদি জানতে পারেন, তুমি এই রকম ভাবনা কর, তাহলে সেই মুহূর্ত্তেই তোমাকে বন্দরখা নিয়ে যাবেন।' আমি বলিলাম।

'না, আমি কিছু ব'লব না। এজলাসে আমি চুপ করে বসে থাকবো। আর কাঁদবো না' বলিয়া বালক নীরব হইল।

'আচ্ছা, তাই হবে,' বলিয়া আমি সে কথা চাপা দিলাম। আরও দু'চারদিন এমনি ভাবে কাটিল।

পাঁচ

সেদিন বিবাদের সংখ্যা বেশীই ছিল। শেষের দিকে একটু তাড়াতাড়িই সেগুলি নিষ্পত্তি করিতেছিলাম। জোছনা রাত। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে আমি বলিলাম, সেদিন আর কোনো তানাজা লওয়া হইবে না। একে একে সকলে বাড়ী চলিয়া গেল। তাম্বুর দরজার সম্মুখে বসিয়াই আমি চা ও ধূম পানে সমস্ত দিনের ক্লান্তি অপনোদনে নিযুক্ত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে বাহিরের দিকে তাকাইতেই দেখিলাম, তাম্বুর বেড়ার গায়ে দাঁড়াইয়া একজন বৃদ্ধ,—তাহার দক্ষিণ হস্তে একখানি কাঁচা শাল কাঠের সুদীর্ঘ যষ্টী, তাহার বাম হস্ত একটি দশ বছরের মেয়ের স্কন্ধে ন্যস্ত। আমি চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'এই, এত রাত্তিরে কি চাস্?' বৃদ্ধ শুনিতে পাইল না। বালিকা তাহাকে কি বলিল। বৃদ্ধ দুই হাত জোড় করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল 'এ-হুজুর, আমার কথাটা আজ শুনে লে!'

আমি বিরক্তির স্বরে বলিলাম—'আজ আর পারি না. কাল আসিস্!'

বৃদ্ধ বলিল 'রোজই আস্ছি রে বাপ্, আজ এক মাস ধরে রোজই আস্ছি। আমার কথা কেই শোনে নারে বাপ্—আমি ভারি গরীব!'

তাহার প্রত্যেক কথার মধ্যে যে বেদনা ভরা ছিল, আস্রফীর কোমল হৃদয়ে তাহা আঘাত করিল। আস্রফী বলিল 'শোনোই না ওর কথা আজ,—কাল আবার নানা কাজে ওর কথা ভুলে যাবে।'

আস্রফী সুন্দর সাঁওতালি বলিতে পারিত। সে বৃদ্ধকে টেবিলের কাছে ডাকিয়া আনিল। নীচে, খড়ের উপর সতরঞ্চি পাতা ছিল। বৃদ্ধকে বসিতে বলিল। বৃদ্ধ আপত্তি জানাইয়া বলিল—'হাকিমের কাছে আমার দুঃখের কথা জানাতে এসেছি, বস্‌বো না।' আমি বলিলাম 'বস তুই, বসে-বসেই বল, আমি তোর সব কথাই আজ শুন্‌বো; তোর সঙ্গে এই মেয়েটি কে?'

বৃদ্ধ বলিল—'এটি আমার নাতনি; আর কেই নাইরে বাপ আমার। সবাই গেল; আমি আছি আর এই নাতনিটি আছে!'

দেখিলাম, বৃদ্ধের বয়স সত্তরের উপর হইবে। এক কালে যে সে খুব বলিষ্ঠ ছিল, তাহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার নিদর্শন রয়েছে। গায়ে তার মুটিয়া কাপড়ের ময়লা ছেঁড়া চেড়না। পরনে যে ধুতি তাকে কৌপীন বলা চলে। মাথার চুলগুলি পাকা, তেলের অভাবে জটা বাঁধিয়াছে। উচ্চ তার কপাল। সুদীর্ঘ তার নাক। চোখ দুটি তার রক্তবর্ণ, এ বয়সেও জল্ জল্ করিতেছে। বৃদ্ধ বসিলে, নাতনিটি তাহার পাশে বসিল।

'এখন তোর কি কথা বল্' আমি আরম্ভ করিলাম। বৃদ্ধ বলিতে লাগিল।

"চাম্পাই মাঝি আমার নাম। আমি সাঁওতাল লোগ্। গামার টিকায়েৎ ঘরে আমি সর্দ্দার পাইক্ ছিলাম। বয়েস হ'ল, ছানা-পিনা বড় হ'ল, আমি টিকায়েৎকে বল্লি, 'রাজা, আমাকে ছেড়ে দে, আমি চাষবাস করি।' রাজা বল্লে, 'কেনরে, এখনো ত তোর গায়ে তাকত আছে, কেন যাবি, কোথা যাবি?' আমি বল্লি—'অনেক দিন তোর তাঁবে থাক্লি—এখন আমাকে ছাড়ান দে।' রাজা বল্লে 'তোর পাইকান ভুঁই বার বিঘা, নক্রি না করলে সে ভুঁই যে তোর যাবে।' আমি বল্লি 'সে ভুঁই তুই দোসরাকে দে, আমাকে তুই একটা ছাড় চিঠা লিখে দে, আমি জঙ্গল কেটে ভুঁই বানাব।' অনেক বলাতে, টিকায়েৎ রাজী হ'ল। ছাড়চিঠা লিখে দিল। মোহর দস্তখত করে দিল। আমি গামা ছেড়ে আস্লি। ঐ ডুঙ্গরির ধারে যে খাল আছে, সেখানে জঙ্গল কাট্লি, ডেরা বাঁধলি। টাঁর করলি, ফসল দিলি। খাল বাঁধলি, জমী করলি, ধান দিলি। ছানা-পিনা ডাগর হ'ল, জোয়ান হ'ল। সাদি বিহা দিলি। দুচার ঘর পরজা আসি বস্ল। এক দিন টিকায়েৎ এল শিকারে। ঘর দুয়ার, জমী, সব দেখ্লে। বল্লে, 'চাম্পাই, তুই জঙ্গল কেটে আবাদ কর্লি, মৌজা কর্লি, এর নাম হ'ল চাম্পাই-ডিহা। দু'টাকা মাল বছরে দিবি আমাকে।' আমি বল্লি 'রাজা, এ সব তোরই ভুঁই, তুই যা বলবি তাই হবে।' এই বলিয়া বৃদ্ধ থামিল। তাহার পর আবার বলিতে লাগিল, 'দিন ত সুখেই কাট্ছিল রে বাপ্, সুখেই কাট্ছিল। আমার পাঁচ বেটা। তারা খাটে, আবাদ বাড়ায়। ধান পান কিছু জমতে লাগল। কাড়া, ভৈঁস্, গাই, কতেক কিন্লি। মঠপাহাড়ে গেলি, মঠবোঙ্গার পূজা দিলি। নাই সইল। মাঝিয়ান মারা পড়্ল। বড়বেটা হপ্নার তিনটা বেটাছানা, পর পর মারা পড়্ল। সেই বছর পাহাড় থেকে জল নাম্ল, খালের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, ধানজমী সব বালিচাপা হল। আমি বেটাদের বল্লি তোরা ভিন গাঁয়ে যা, সিংবোঙ্গার নজর খারাপ।' বৃদ্ধ এই বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার পর বলিতে লাগিল "হপনা বলে—'আপা, তুইও চল।' আমি বল্লি 'আমি নাই যাবো। তোরা যা।' বেটারা শেষে রাজী হলো। মুনিস, মাতাল মাঝি, থাক্ল আমার কাছে। তারা চন্দ্রথায় গেল। কাড়া, ভৈঁস, বেচে কিছু জমী করল। মাল আবার দিতে থাকে। সে বছর যখন দেশে দেবতা পানি নাই দিল, ফসল সব পুড়ে গেল। রাজার মাল বাকী পড়ল। মহাজনের ঘরে ধান এনে পেটের ভাত হ'ল। বছর যায়, দু'বছর যায়, তিন বছর যায়, রাজার বাকী মাল দিতে নাই পারলে। মহাজনের ধান বেড়ে গেল। কি যে হিসাব তা নাই জানি, মুরখু সাঁতাল লোগ আমরা। চাষের ধানের আধা ত দিতে থাকে বেটারা, কিন্তু মহাজনের খাতার হিসাবে ধান ত বাড়তেই থাকে। কি বলে তার ডেড়াই, চৌঠাই, মুরখু সাঁতালে তার কি বুঝে রে বাপ, হাকিম। ধান যখন খা'লি, দিতে ত হবে! দিয়ে যায়। এক দিন সদর থেকে পিয়াদা এল, বল্লে হপনার সব জমী নিলাম হ'ল দেনের দায়ে। তাদের দখল ছেড়ে দিতে হবে। শুনে আমি গেলি। মহাজনকে বল্লি—'বেটার জমী ছেড়ে দে রে বাপ মহাজন, আমি তোকে চাম্পাইডিহা লিখে দিচ্ছি। হপনা বলে—তা' হবে নাই, মহাজন জাল করেছে। আমরা জমী ছাড়ব নাই। জমীর ধারে পেয়াদা আস্লে, মহাজনের লোক আস্লে—আমরা পাঁচ ভাই মিলে তাদের কাঁড় বাঁশ দিয়ে বিঁধবো।' আমি বলি 'লড়াই না কর রে বেটা, মহাজনের সাথে, বড়লোকের সাথে, পেয়াদার সাথে লড়াই করে কি বাঁচবি?' বেটা শুনলো না।

"আমি মহাজনকে ডেকে নিয়ে গেলি। তার সাথে সদরে গেলি। চাম্পাইডিহা লিখে দিলি মহাজনকে; আঙ্গুলের টীপ্ দিলি—"

বাধা দিয়া আস্রফী বলিল—

'কে সেই মহাজন?'

বৃদ্ধ বলিল—'কেন, সেই বাভন, বরমদেও সিং!'

আস্‌রফী চুপ করিল। বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিল। "আমি চাম্পাইডিহি ফিরে গেলি। অনেক বছর গেল। বেটারা কেউ আসে না। আমি দুবার একবার যাই, দেখে আসি। আমার মৌজার খাল বাঁধ্‌তে লাগ্‌লি। দুবছর চন্দ্‌রখা নাই যাই। আজ দশ বছর হ'ল। এক দিন আমার ছোট ছানা বিসাই, সাঁঝের বেলা এলো। এই নাত্‌নিটা তার কোলে, সঙ্গে নাই আর কেউ। তার ঠোঁট দেখলি শুখা, গা দেখলি আগুন। আমি বল্লি— 'কি হ'লরে বাপ্‌ বিসাই? কেন আস্‌লি?' বিসাই বল্‌লে 'মাই এলো, বৌকে নিল। আমাকেও চায়। তাই এই কুঁরীকে তোর কাছে রাখতে আলি।' 'সে কি কথারে বাপ, বিসাই, আর ভাইরা তোর কোথায় গেল?' বিসাই বল্লে, 'সে খবর কি তোর কাছে নাই পৌঁছেরে আপা? ক্ষেতজমী ত সব নিল নিলামে ডেকে, সেই বাভন। হপনা মনের দুঃখে মুলুক ছেড়ে গেল। তারা ব'ল্ল রাজার মাল বাকী, কোর্‌কী এল। চান্দ ভাই, রন্‌বাজ ভাই, সুন্দ্‌রা ভাই, ঘর থেকে বেদখল হ'তে, চাবাগিচায় খাট্‌তে গেল। আমি রই—সেই বাভনের জমী, মোদেরই জমী, ভাগে করি—'

আবার আস্‌রফী বাধা দিয়া বলিল—'কে সেই বাভন?'

চাম্পাই বলিল—'কেন, বাভন সেই চন্দ্‌রখার মহাজন বরমদেও।'

বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিল—

"বিসাইএর গলা কাঠ হ'ল। বল্লে 'বড্ড পিয়াস, ছাথি ফাটে।' জল দিলি। দু'দিন বেহুঁস্‌ থাকে। তার পর জীউ ছাড়ে। জীউ ছেড়ে চলে গেলরে বাপ্‌, চলে গেল, এই কুঁরীকে রেখে। পাঁচ বেটার কেই রইল না কাছে রে বাপ্‌! চান্দদের তল্লাস করি। কোন সন্ধান্‌ মিলল না।—"

বৃদ্ধ এবার থামিল।

আমি লক্ষ্য করি নাই—আস্‌রফীর দুই গণ্ড বাহিয়া চক্ষুর জল গড়াইতেছে। চাম্পাইএর নয়ন-কোণ অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছিল, কণ্ঠ তার রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। সেদিন, সেই জ্যোৎস্না-প্লাবিত ধরণীর নির্জ্জন এক প্রান্তে, চাম্পাইএর করুণ কাহিনী আমাকে আত্মহারা করিয়া তুলিল। আমি বলিলাম—'চাম্পাই, আজ এইখানে থাক্‌; কাল আবার তোর কথা শুনব।'

চাম্পাই বলিল—'আমার দুখের কথা আর কত তুই শুনবি রে বাপ হাকিম্‌! আমার কথা যা বলতে এসেছি, তা আজই তোকে বলি। এমন করে আমার কথা ত কেউ নাই শুনে রে বাপ্‌!'

আমি বলিলাম 'তবে বল্‌।'

ছয়

বৃদ্ধ গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া আবার আরম্ভ করিল।

"আজ দশ বছর এমনি করেই কাট্‌ছে রে বাপ। মুনিস জন লাগাই, খেতের কোদো, অরহর, ধান সব ঘরে আনি। বাভন আসে, দুভাগ নিয়ে যায়, এক ভাগ আমার লাগে রাখে। ক'দিন আর বুড়া আছে, রে বাপ। দিন ত ফুরাইএ এল রে বাপ্‌। এখন ভাবনা এই নাত্‌নিটাকে নিয়ে। তাকে কে রাখেরে বাপ্‌, তাকে কোথায় রাখি? মৌজা যদি পায়, তিসরির প্রধান অনুপা, তার বেটার সাথে কুঁরীর বিহা দিতে চায়। মৌজা কইরে আমার, চাম্পাইডিহা ত বাভন ঘরে বাঁধা!

"আমার খুঁটকাটা এই ডিহি। আমার মেহনতে এর বিল, এর জমী। আমার পয়সায় এর খাল বাঁধা হয়ে ধান হল। দু' চার ঘর পরজা যা আমিই বসালি। আমার ত বেটা পুত কেই রইল না। আমার হাতের তৈরী এই ডিহিটাকে মরণকালে যদি এই নাত্‌নিটাকে দিয়ে যেতে পারি, তা হলে সুখে মরি!'

"বাভনকে বলি আমার গাই, ভৈঁস, কাড়া, সব নিয়ে মৌজা ছেড়ে দে রে বাপ্‌ মহাজন। বাভন বলে 'তা হতে পারে না, মৌজার হক্‌ মালিকি তার হলো।' আমি সুধাই, 'কবে তা হ'লে রে বাপ্‌ মহাজন?' বাভন বলে, 'আদালতের ডিক্রী হ'ল, বাঁশগারি দখল হলো।' আমি এসবের কিছুই না জানি। মুরখু সাঁতাল, ডিক্রীর কথা বাঁশগারির কথা, কি জানেরে বাপ হাকিম্‌!

"এখন ত সরকারের জরীপ চ'ড়ল রে বাপ। আমার কিছু কিনারা করবি কি না বলে দে। মহাজনের হকের

টাকা আমি মিটাএ দিব রে বাপ্। হকের ধন কেন রাখবো রে! দেরে বাপ্ হাকিম্ আমার মৌজা ফিরাএ দে, আমি সব বেচে খুচে মহাজনের দেনের টাকা শুধে দিচ্ছি,' এই বলিয়া বৃদ্ধ দাঁড়াইল। তার কোমরে বাঁধা ছোট একটি বাঁশের চোঙ্গা হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া আমার টেবিলে রাখিয়া বলিল—'এই টিকাইয়ৎএর দেওয়া আমলনামা আমার দলিল, আর কিছু নাই রে বাপ, আমার।'

আমি বলিলাম—'জরীপের সময় বিবাদ কেন নাই দিলি ?"

বৃদ্ধ বলিল—"বিবাদ ত দিলি, কিন্তু নাই লিখ্‌ল তোর আমিনে। বাভন তাকে কাগজ কি দেখাল। আমিন বল্‌লে "চাম্পাই তোর দখল নাই। তোর হক্ বার বছর হল নিলামে খরিদ করল বরমদেও সিং। তারি নামে চাম্পাইডিহা জরীপ হবে।' আমি বলি—'কি বলিস্‌রে বাপ্ আমিন, যেদিন থেকে জঙ্গল কেটে ডিহি হ'ল, সেই দিন থেকে আজও আমি চাম্পাইডিহা দখল করে আছি। চাষ-আবাদ আমিই করছি, পরজাদের খাজনা চাঁদা আমিই আদায় করছি। আমার নামে মৌজা না লিখে, বাভনের নামে নাই লিখ বাপ্ আমিন—ধরম হবেক্ নাই।' আমিন শুন্‌ল না আমার কথা। তার পর থেকে রোজই আসি তোর তাম্বুতে। সব গাঁয়ের লোক আসে। তাদের জমী জমা বুঝায়ত করে যায়, আমার ডাক নাই হয়। তোকে ধরব, ধরব নিতি নিতি মনে করি, তোকে একা পাই না। আজ ত পাইলি, সব কথা বল্‌লি। এখন আমার উপায় করে দেরে বাপ্! নাতনিটার কিনারা করে দে।"

বৃদ্ধ থামিল। আমি বলিলাম—'কাল কাগজপত্র দেখে বলব।'

'তোর সোণার কলম হবে রে বাপ্ হাকিম, দেখিস, আমার কথা নাই ভুলিস'—এই বলিয়া চাম্পাই নাতনির হাত ধরিয়া বিদায় লইল।

সাত

শয়নের পূর্ব্বে আসরফীর মুখে এক উপকথা শুনিয়া চাম্পাইএর কথা ভুলিব, এ আশায় সেরাত্রি নিরাশ হইতে হইয়াছিল। আহারের পর অন্যদিনের মত সে খাটে না গিয়া চেয়ারে বসিল। বলিল—'একটা কথা বলব।'

আমি বলিলাম—'কি কথা বল।'

আসরফী বলিল—'আমি এ বুড়ার মামলায় কি কর্ত্তে পারি ?'

আমি বলিলাম—'ব্যাপার যা শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে, তোমার বাপ ওর সব পথ মেরে রেখেছেন। আইনের জোরে বুড়োর উপকার কিছুই করতে পার্ব্বো না, মনে হচ্ছে।' বালক উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রশ্ন করিল—'তবে কি উপায় তার কর্ব্বে তুমি ?'

আমি বলিলাম—'তাই ভাব্‌ছি। আইনে ত কোনো উপায় খুঁজে পাই না!'

বালক হঠাৎ গম্ভীর হইল। কি ভাবিয়া আবার বলিল—'তবে কেমন তোমার আইন, আর কিসের তুমি হাকিম ? চাম্পাইএর মৌজা চাম্পাইএর নামে না লিখে তোমরা আমার বাপের নামে লিখবে ? এটা কি ধরম হবে ?'

সরলচিত্ত বালকের মুখে এ কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। হাসিয়াই আমি বলিলাম 'আইন কানুন, ধরম অধরমের কথা তুমি কি জান আসরফী ?'

আসরফী দমিল না—বলিল 'তা না বুঝি, কিন্তু চাম্পাই-ডিহা চাম্পাইএর নামেই তোমাকে লিখ্‌তে হবে। আমার বাপের নাম কেটে দাও।'

আমি বলিলাম 'আচ্ছা, কাল দেখব।'

দুজনেই নীরবে শয্যা গ্রহণ করিলাম। পরদিন অতি প্রত্যূষেই উঠিয়া, আসরফী বন্দ্‌রখা যাইবার অনুমতি চাহিল। কিছু মতলব আঁচিয়াছে ভাবিয়া আমি তাহাকে আর বাধা দিলাম না।

বৈকালে যখন এজলাসে বসিলাম, দেখিলাম, বেড়ার এক ধারে চাম্পাই তার নাত্‌নির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সামনে অনেক লোক। সকলেরই মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন। আমার সেই একঘেয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি চলিতে লাগিল। দেরী কিছুই লাগিতেছিল না। নবমীর পাঁঠা বলির মত, একের পর এক, বাদী প্রতিবাদীকে ডাকা হইতেছিল। দু'চার মিনিট তাহাদের বক্তব্য শুনিয়া, নাম কাটা ও নাম যোগ, যন্ত্রের মতই চলিতেছিল।

বেলা যখন পাঁচটা, দেখিলাম, আসরফী আসিয়াছে।

সে আমার টেবিলের ধারে, লাল খেরুয়ায় বাঁধা দলিল দস্তাবেজের একটি প্রকাণ্ড বোচ্‌কা আনিয়া রাখিল। আমার কাণে কাণে বলিল 'বাপও এসেছে, তাকে সাম্‌নে ডাক।' ইঙ্গিতে ব্রহ্মদেও আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আস্‌রফীর মুখে আজ এক অপূর্ব্ব আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। গণ্ডদ্বয় তার আরক্তিম। অধরে তার হাসির তরঙ্গ খেলিতেছে। ব্রহ্মদেওএর আনন আজ বিবর্ণ। সুগৌর সুউচ্চ তার কপাল আজ যেন কালিমামাখা। চক্ষু তার কোটরগত। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক।

পিতা-পুত্রের এই ভাবান্তর দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য বলিলাম 'ব্রহ্মদেও, আজ তোমার বিশেষ কিছু কাজ আছে না কি আমার কাছে?'

ব্রহ্মদেও বলিল—'বিশেষ জরুরী কাজ, ধর্ম্মাবতার! আজ আস্‌রফী তার বাপের সব পাপ্ ধু'য়ে ফেলতে চায়। আস্‌রফীই আমার একমাত্র সন্তান। তাকে অসুখী করে, ধন দৌলত জমি-জরাত নিয়ে কি আর হবে, হুজুর? ছেলেবেলা থেকেই দেখছি, আস্‌রফীর অন্য রকম ভাব। জাতের ধরম সে বুঝে না! তা, তারই জন্যে আমি এত করেছি—সে যদি তা তুচ্ছ করে', পায়ে ঠেল্‌তে চায়, আমি কেন তাতে বাধা দিতে চাই! সে আজ যা কাণ্ড করতে যাচ্ছিল, ভগবান তার থেকে আস্‌রফীকে বাঁচিয়েছেন, এই আমার পরম ভাগ্য।'

বাধা দিয়া আস্‌রফী বলিল, 'কাজের কথাটা বলিয়া ফেল না বাবা, রাত হয়ে যাচ্ছে যে, অনেক দূর থেকে তোমার খাতকরা সব এসেছে যে'—

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আস্‌রফী খাতকদের কথা কেন বলে? ব্রহ্মদেওকে বলিলাম—'কি ব্যাপার, খুলেই বল না।'

ব্রহ্মদেও বলিল "বল্‌তেই ত এসেছি আজ, ধর্ম্মাবতার! 'আস্‌রফী আজ কুঁয়ায় ডুবে মরতে চেয়েছিল। সে তান ধরেছে, আজ ষোল বছর ধরে আমি ধান আর টাকার জন্যে যে সমস্ত জমী-যায়গা, ক্রোক করে দখল করেছি, তা সব দেনীদের ফিরিয়ে দিতে হবে। সব দলিল আজ তোমার সামনে পুড়িয়ে দিতে হবে। আমার বুকের রক্ত আজ জল হয়ে গেল। ছেলের সঙ্গে ছেলের মাও বাহানা নিলে "আস্‌রফীর আমার কিসের অভাব। পৈতৃক যা আছে, তা নিয়ে সকলের সুখেই কাটবে। পরের ধন সব ফিরিয়ে দাও।" কাণ্ড যা হল তা আর কি বলব! মায়ে পোয়ে দুজনেই সারাদিন ইন্দারার ধারে পা ঝুলিয়ে বসে। আমি কত বুঝালাম। তারা শুন'ল না। যাদের সুখের জন্যে আমার এই সারা জীবনের খাটুনি, তারাই যদি মাথার লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে চায়, তা হলে আমি আর কি করতে পারি?"

ব্রহ্মদেও একটু থামিল। পাগড়ীর কাপড়ের কোণ দিয়া চোখের জল মুছিল। তার পর আরম্ভ করিল—"আস্‌রফী যেদিন থেকে জন্মেছে, আমার তেজারতির হিসাবপত্র, জমিজমা, দলিল-দস্তাবেজ সব তারই নামে করা হয়েছে। ধরতে গেলে সে-ই এ সবের মালিক। সে যদি তা দান করতে চায়, বিলিয়ে দিতে চায়, খুইয়ে দিতে চায়, সেই-ই তার ফল ভোগ করবে। আমি তার কাছ থেকে কিছুই চাই না। কাল থেকে আমি কাশীবাসী হব। আস্‌রফী তার সাধ পূর্ণ করুক। আমি কণ্টক হতে চাই না তার পথে।' ব্রহ্মদেও থামিল। আস্‌রফী বলিল, 'তোমার সামনেই এ বিষয়ের নিষ্পত্তি হবে। তবে, হুজুর, তোমার খতিয়ান আনাও। আমি এক এক করে এই দলিলগুলি ছিঁড়ে যাচ্ছি—তুমি সঙ্গে সঙ্গে মূল আসামীদের নাম লিখে যাও। শেষ হ'লে বাপ আর আমি সব সই করে দেব।'

আমি হাকিমি চালে উপদেশ দিতে চাহিলাম—"ব্রহ্মদেও, তুমি আপন ইচ্ছায় এতে রাজী আছ ত? আস্‌রফী তুমি যা করছ, তার ফল কি তা ভেবে দেখেছ ত?

ব্রহ্মদেও বলিল—'আমি আর কদিনই বা বাঁচব? আস্‌রফীকে হারিয়ে ধন-দৌলত নিয়ে কি কর্ব্ব? আমাদের মন ঠিক করেছি, হুজুর, আপনি সব ব্যবস্থা করে দিন।'

আস্‌রফী বলিল—'পরের ধন নিয়ে বড় হ'য়ে কি লাভ আমি বুঝি না বুঝি, এ দলিলগুলির শেষ টুকরোকে পুড়িয়ে ছাই না করলে আমার তৃপ্তি নাই।'

* * * *

এক এক করিয়া নাম পড়িতে লাগিল আস্‌রফী এক এক করিয়া নাম কাটিতে লাগিলাম আমি। টুকরা টুক্‌রা হইয়া টেবিলের নীচে সব দলিল জমা হইতে লাগিল

সর্ব্বশেষে পড়িল চাম্পাই মাঝী। চাম্পাই নিকটে আসিলে—আস্‌রফী সুধাইল 'কই তোর বেহাই অনুপা ?'

চাম্পাই কহিল 'এই যে আছে।'

আস্‌রফী বলিল—'চাম্পাই, চাম্পাইডিহা তোর নামেই থাক্‌ল—কুঁরীর সাদিতে আমাকে ডাক্‌বি ত ?'

চাম্পাই আনন্দে অধীর হইয়া বলিল—'ভালারে বাপ্, বাভন ছোক্‌রা, তোরা না আসলে আমার নাত্‌নিটার সাদি কে দিবে রে বাপ।'

সেদিনকার মত কাজ শেষ হইল। আস্‌রফী নিজের হাতে ছেঁড়া দলিলের টুকরাগুলি কুড়াইয়া লইয়া, অদূরে এক গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিল। দূরে দেখা গেল, দীর্ঘ যষ্টী হাতে চাম্পাই যাইতেছে। বাম হস্ত তার নাত্‌নির কাঁধে। পিছনে তার অনুপা আর তার বেটা বিরুধা।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এসসি

দ্রুতগামী গাড়ী

পৃথিবীতে যতগুলি গাড়ী আছে, তার মধ্যে তিনখানি হ'চ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী। প্রথম মার্কিণ বৈজ্ঞানিক Malcolm Campbellএর গাড়ী ঘণ্টায় ১৬৮ মাইল চলে; দ্বিতীয় একজন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকের গাড়ী ঘণ্টায় ১১৬ মাইল চলে; তৃতীয় মিশর যুবরাজ Djelaleddinএর গাড়ী ঘণ্টায় ১১৪।১১৫ মাইল চলে। যুবরাজের গাড়ীর বিশেষত্ব হ'চ্ছে এই যে, তাঁর গাড়ীর যন্ত্রপাতি সব পিছন দিকে, আর বসবার জায়গা সামনের দিকে। বলা বাহুল্য যে, এ তিনখানি গাড়ীই মোটরকার।
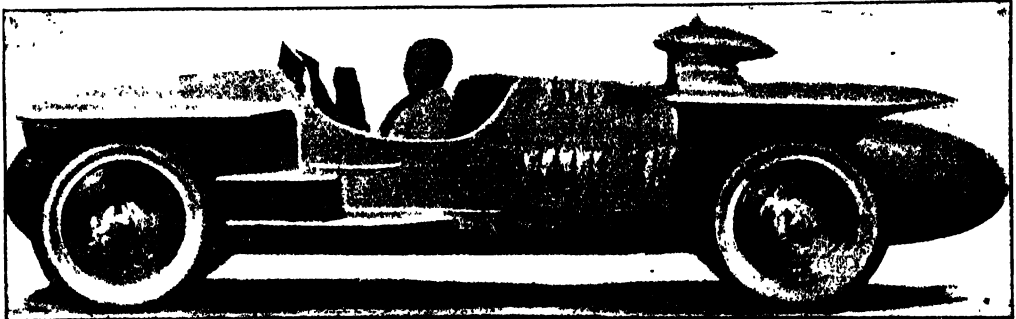
মিশর যুবরাজের গাড়ী
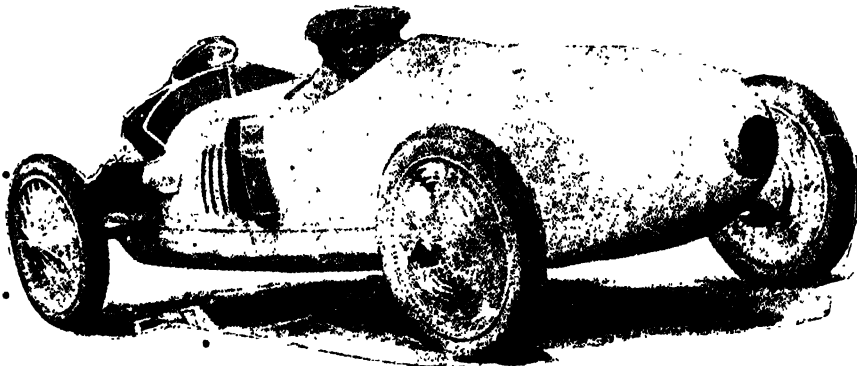
জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকের গাড়ী
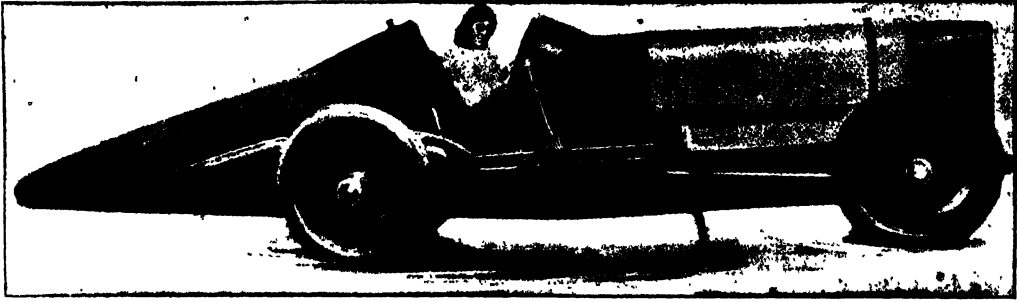
মার্কিন বৈজ্ঞানিকের গাড়ী

স্বপ্ন-সঞ্চার। (Adrenalin glandএর রস সেবন ক'রে এক ব্যক্তি পতনের স্বপ্ন দেখ্‌ছে। তার মনে হ'চ্ছে, সে যেন একটি ১৮ তলা বাড়ীর ছাতের উপর [illegible])

স্বপ্ন-সঞ্চার

প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ স্বপ্ন ব্যাপারটাকে একেবারে অলীক বলে সিদ্ধান্ত ক'রেছেন। তাঁরা বলেন, স্বপ্ন শুধু খাদ্যের গুণের উপরই নির্ভর করে; অর্থাৎ খাদ্য যদি উগ্রজাতীয় হয়, আমাদের শরীর ও মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তখন আমরা নানারূপ উদ্ভট স্বপ্ন দেখি; কিন্তু খাদ্য যদি স্নিগ্ধ জাতীয় হয়, আমাদের শরীর ও মস্তিষ্ক শীতল থাকে, তখন আমরা সুখে নিদ্রা যাই। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ আজকাল নানারূপ ঔষধ প্রয়োগে যে কোনও লোককে ইচ্ছানুরূপ স্বপ্ন দেখাবার ব্যবস্থা ক'রেছেন। Adrenalin, Pituitary glandএর রস পান করিয়ে বহু লোককে কলহ, ভয়, পতন ইত্যাদির স্বপ্ন তাঁরা ইচ্ছামতো দেখিয়েছেন।

সূর্য্য-কিরণ

রৌদ্র মানব-জীবনে যে কত উপকারী, তা' আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না। সম্প্রতি Dr. C. B. Little ও W. T. Bodie নামক দুজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক'রে দেখেছেন যে, সূর্য্য-কিরণ মানবের অস্থিসমূহ দৃঢ় ক'রে তাদের শক্তিশালী ক'রে তোলে। তাঁরা বলেন "এমন কি জন্মাবধি দুর্ব্বল, ক্ষীণজীবী শিশুকে যদি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে সূর্য্য-কিরণে রাখা যায় সে যে শীঘ্রই সুস্থ সব

হবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই জন্যই বোধ হয় সদ্যোজাত শিশুকে প্রত্যহ রৌদ্রে দেওয়ার একটা নিয়ম প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে প্রচলিত আছে।

সূর্য্য-কিরণ। (একটি রুগ্ন, ক্ষীণজীবী শিশুকে নিয়মিতভাবে রৌদ্রে রাখবার পর তা'র একখানি ছবি)

জলের সাইকেল।(বৈজ্ঞানিক নব-নির্ম্মিত সাইকেল আরোহণ ক'রে জল-বিহার ক'রছেন)

জলের সাইকেল

জলের উপর যাতে বেশ ইচ্ছামতো বেগে একজন লোক ভ্রমণ ক'রতে পারে, সেজন্য একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক George R. Stevenson একটি নৌকাযুক্ত দ্বিচক্রযান নির্ম্মাণ ক'রেছেন। গাড়ীটির উপর দিকে বসবার জায়গা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সমস্তই একটি দ্বিচক্র যানের (Bicycle) মতো, এবং নৌকাগুলির তলায় চাকা লাগান আছে। বাইসাইকেলের মতো চালালেই নৌকাগুলি জলের উপর চাকার সাহায্যে সবেগে ভেসে চলে; এবং আরোহী নিজের ইচ্ছামতো গতির হ্রাসবৃদ্ধি ক'রে জলের উপর ভেসে চলেন।

প্রেমত্রাণ চিরুণী

সম্প্রতি Lettice Apperley নাম্নী একজন মার্কিণ কুমারী সেখানে এক রকম সুন্দর চিরুণীর প্রচলন ক'রেছেন, যেটা মাথায় থাকলে কোনও কুমারী যে কারুর প্রেমে আবদ্ধ হয়েছেন, সেটা লোকে বেশ স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারে। সেই চিরুণীগুলির উপর কোনও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রণয়ীযুগলের চিত্র অঙ্কিত থাকে। সুতরাং সেই
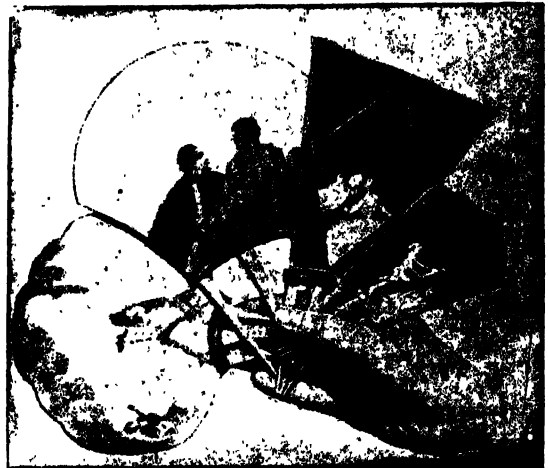
প্রেমত্রাণ চিরুণী।

চিরুণী ব্যবহার ক'রলে, যে-কোনও কুমারী অসংখ্য কুমারের অবিরাম প্রেমভিক্ষা করার যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেয়ে যান।

সঙ্গীতের সঙ্গে নিদ্রাভঙ্গ

S. D. Snavely নামক একজন সৌখীন ভদ্রলোক ফনোগ্রাফের সঙ্গে ঘড়ির alarmএর সংযোগ ক'রে প্রত্যহ সকালে গান শুন্‌তে শুন্‌তে নিদ্রাভঙ্গ ক'রবার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার ক'রেছেন। ফনোগ্রাফের সঙ্গে নিদ্রাভঙ্গের নিরূপিত সময়ে alarm bellএর কাঠিটি
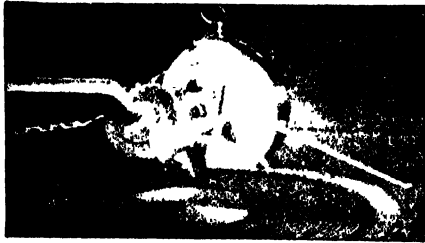
সঙ্গীতের সঙ্গে নিদ্রাভঙ্গ। (এই নবোদ্ভাবিত যন্ত্রের দ্বারা Snavely সাহেবের প্রত্যহ সকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়)

নড়ে উঠলে, রেকর্ড চক্রের গতিরোধক যন্ত্রটি রেকর্ড চক্রের তলদেশ থেকে সরে যায়, অমনি রেকর্ডটি ঘুরতে থাকে। Sound boxটি রেকর্ডের উপর পূর্ব্ব হ'তেই ঠিক ক'রে বসান থাকে বলে' সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডের গান বাজ্‌তে থাকে, আর তাই শুন্‌তে শুন্‌তে ভদ্রলোকের নিদ্রাভঙ্গ হয়।

দেশভক্তের ব্রত

নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে দেশের অর্থবৃদ্ধি করার

তুষারমণ্ডিত Alaskaর একটি দৃশ্য

(ব্রত তুষার-মণ্ডিত Alaskaয় Smith সাহেব অর্থ অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছেন)

উদাহরণ Dr. Philip S. Smith নামক একজন মার্কিণ দেখিয়েছেন। সুদূর উত্তরে তুষারমণ্ডিত Alaskaয় কোনও মণিরত্নখনি প্রাপ্ত হওয়া যেতে পারে কি না, তা' দেখবার জন্য দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ধরে তিনি ক্রমাগত চেষ্টা ক'রে এসেছেন। চেষ্টার ফলে কোনও খনি বা রত্নগর্ভা নদী তিনি আবিষ্কার ক'রতে পারেন নি বটে, তবে কয়েকটি

দেশভক্তের ব্রত (Philip S. Smith এর একখানি ছবি)

Smith সাহেবের নবাবিষ্কৃত নদীগুলির মানচিত্র

নূতন নদী আবিষ্কার করেছেন, যদ্দ্বারা বাণিজ্য হিসাবে মার্কিণ রাজ্য ভবিষ্যতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন ক'রতে পারবে।

বাক্‌যন্ত্র

Cancerএর মতো দুরারোগ্য ব্যাধি গলদেশে জন্মিলে, চিকিৎসকগণ রোগীর প্রাণরক্ষার জন্য সেই স্থানে অস্ত্রো-পচার ক'রে থাকেন। এইরূপে রোগীর প্রাণরক্ষা হয় বটে, কিন্তু সে তার বাক্‌শক্তি চিরকালের জন্য হারায়।

বাক্‌যন্ত্র (বৈজ্ঞানিক রোগীকে বাক্‌যন্ত্র পরিয়ে দিচ্ছেন)
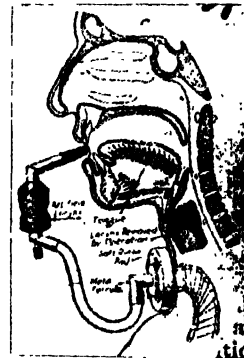
বাক্‌যন্ত্র (বাক্‌যন্ত্র প'রবার ও তা' দিয়ে কথা কহিবার প্রণালী)

এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিলিত হয়ে একটি সুন্দর যন্ত্র নির্ম্মাণ ক'রেছেন, যেটি গলদেশে সংলগ্ন ক'রে দিলে, রোগী ইচ্ছামতো কথা কহিতে পারে, কোনও অসুবিধা হয় না।

প্রাচীন ছবি
(১৮৪০ খৃষ্টাব্দে Kodak ক্যামেরায় তোলা একখানি আলোক

আলোকচিত্রের জন্মকথা
(দুইশত বৎসর পূর্ব্বে নবীন কেরাণীর অবসর সময়ে ফটো তোলবার একটি দৃশ্য)

আলোকচিত্রের জন্মকথা

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কোনও অফিসের একজন নবীন কেরাণী অবসর-সময়ে বিজ্ঞানের চর্চ্চা ক'রতে ক'রতে "ফটোগ্রাফের" উদ্ভাবন করেন। কোনও লোককে অন্ধকার ঘরের ভিতর বসিয়ে বাহির হতে দেওয়ালের একটি ছিদ্র দিয়ে একখানি Sensitised কাগজের উপর তীব্র আলোক নিক্ষেপ ক'রে সেই ব্যক্তির আলোকচিত্র গ্রহণ ক'রতে হ'ত। এইজন্য সেই ব্যক্তিকে প্রায় দীর্ঘ ২০।২৫ মিনিট ধরে স্থিরভাবে এক জায়গায় বসে থাক্‌তে

বর্ত্তমান কোডাক (Kodak) ক্যামেরার প্রাচীনতম পুরুষ

হ'ত। পরে কালের বিবর্ত্তনে নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়ে বর্ত্তমান উন্নত ক্যামেরার জন্ম হয়েছে।

বেতারে ফটো

বেতারে সংবাদ আদান-প্রদান হতে পারে, কিন্তু তা' দিয়ে আলোক-চিত্রের আদান-প্রদান যে সম্ভবপর হতে পারে, তা' বৈজ্ঞানিকদের কল্পনার বাহিরে ছিল। সম্প্রতি মার্কিন বেতার অফিসের একজন বৈজ্ঞানিক Capt. Richard H. Rogers বেতারে আলোক-চিত্র তোলবার ব্যবস্থা ক'রেছেন। একখানি আলোক-চিত্রের ভিতর দিয়া তীব্র আলোক একটি যন্ত্রের উপর নিক্ষেপ ক'রতে হয়। সেই নিক্ষিপ্ত আলোক

১৮৮৪ সালের তৈয়ারী কোডাক ক্যামেরা

বেতার ফটো ১

বেতারে ফটো ২ (বেতারে ফটো পাঠাবার ও বেতারে ফটো গ্রহণ করবার যন্ত্র)

বেতারে ফটো (এই যন্ত্রের দ্বারা বেতার পরিবর্ত্তক বলে পরিণত আলোকচিত্র গ্রহণ ক'রতে হয়)
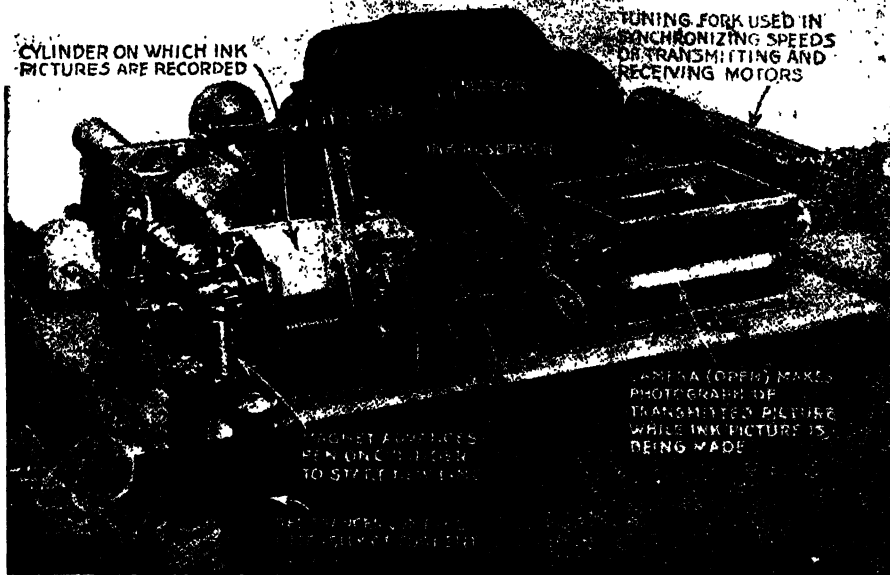
বেতারে ফটো (এই যন্ত্রের দ্বারা আলোকচিত্রগুলি বেতার পরিবর্ত্তক বলে পরিণত হয়)

President Coolidge এর একখানি আলোকচিত্র

বেতারে ফটো
(President Coolidge এর লণ্ডন হইতে বেতারে নিউইয়র্ক সহরে প্রেরিত আলোকচিত্র)

যন্ত্রের ভিতরে গিয়া প্রথমে বৈদ্যুতিক পরিবর্ত্তক বল (impulse) ও তৎপরে বেতার পরিবর্ত্তক বলে পরিণত হয়। তৎপরে যন্ত্রের সাহায্যে সেই আলোক-চিত্রের প্রতিকৃতি স্থানান্তরে প্রেরিত হয়। এইরূপে লণ্ডন হইতে নিউইয়র্ক সহরে অনেকগুলি প্রতিকৃতি পাঠান হয়েছে।

ক্যামেরায় চোর ধরা

ধড়িবাজ চোর বা হত্যাকারীকে অনেক সময় ধরেও ধরতে পারা যায় না ; সেজন্য লোকার্ড (Locard) নামক একজন বৈজ্ঞানিক একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করেছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির পোষাক পরিচ্ছদ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ধূলো ময়লা গ্রহণ ক'রে তাঁর নব-নির্ম্মিত ক্যামেরার দ্বারা বৃহত্তর চিত্র নিয়ে তা' থেকে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের সমর্থন ক'রতে পারেন। এমন কি সেই ধূলো ময়লার পার্থক্য থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন্ শ্রেণীর চোর, তা'ও নিরূপণ ক'রতে পারেন।

চোরধরা ক্যামেরা—(Locard সাহেব তাঁর নবাবিষ্কৃত ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন)
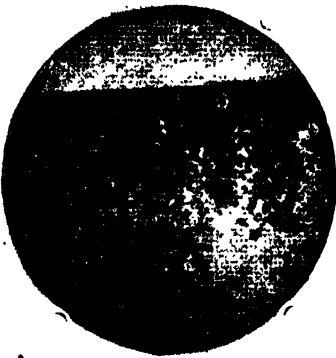
চোরধরা ক্যামেরা ১

(Locard সাহেব ক্যামেরা দিয়ে নোট জালিয়াতের নখের ভিতর থেকে ময়লা সংগ্রহ ক'রে তা'র ফটো তুলে তার দোষের সমর্থন ক'রছেন)
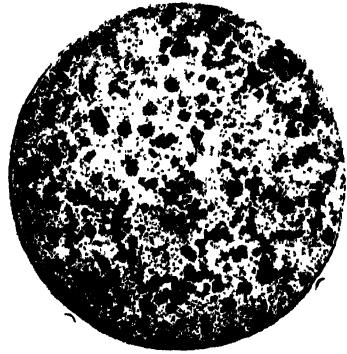
চোরধরা ক্যামেরা ২

(Locard সাহেব ক্যামেরা দিয়ে টাকা জালিয়াতের নখের ভিতর থেকে ময়লা সংগ্রহ ক'রে তা'র ফটো তুলে তার দোষের সমর্থন ক'রছেন)

নিশীথ-রাতের ঘুম

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ

[দান্তে গাব্রিয়েল রসেটীর My Sister's Sleep
কবিতাটীর ভাবাবলম্বনে]

যীশুর জন্মিবার পূর্ব্বদিন। রাত্রি প্রায় ১২টা। অত্যন্ত শীত পড়িয়াছে। ছিন্ন-ভিন্ন, শুভ্র মেঘের ফাঁক দিয়া ম্লান চন্দ্রালোক কুয়াসাচ্ছন্ন ধরণীর উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। একটী ছোট দোতলা বাড়ীর নীচের ঘরে একটী ম্লান দীপ জ্বলিতেছিল। এক ধারে খাটের বিছানার উপর একটি তরুণী এক মাস অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা ভোগের পর সবেমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মেয়েটীর মা এক মাস রাত্রি-জাগরণের পর কন্যার বিছানা হইতে নামিয়া একটি ছোট্ট স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন, ও একটী ছোট টুলের উপর বসিয়া ম্লান দীপালোকে মেয়েটীর জন্য একটী পশমের গলাবন্ধ বুনিতে লাগিলেন। মাঝখানের দুয়ার খুলিয়া, পাশের ঘর হইতে বছর বাইশের একটি যুবক প্রবেশ করিল।

যুবক। প্রমীলা কেমন আছে মা?

মা। চুপ, আস্তে কথা বল। এইমাত্র ঘুমিয়েছে। আজ এক মাস ধরে সারারাত ছট্‌ফট্‌ করেছে; এক দিনও ত এমন ঘুমায়নি অরুণ?

যুবক। "ঘুমিয়েছে! আঃ বাঁচলুম!" বলিয়া যুবকটি তরুণীর শয্যার কাছে গিয়া, ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। একটু পরে স্তব্ধ হইয়া মাতার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর ঘরের কোণে, একখানি চেয়ারে বসিয়া, একখানি পুস্তকের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

মা। এই যে গলাবন্ধটা দেখ্‌ছ অরুণ, এটা আজ রাত্রেই শেষ হয়ে যাবে; কাল সকালে ওকে এটা পরিয়ে দিতে পারব। ওকে কত দিনে ভাত দেওয়া যাবে অরুণ?

যুবক কথার জবাব দিল না। একদৃষ্টে খোলা বইখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

মা। এই যে জাফ্‌রাণী রঙটা, এটা ও ভারী পছন্দ করে; তাই আগাগোড়াই জাফরানী রঙের করলুম।

[যুবক কথার উত্তর দিল না। একটা নিশাচর পাখী ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল। বহু দূরে একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। স্তব্ধ রাত্রি। আরও নিস্তব্ধ সেই ছোট্ট ঘরখানি; এত নীরব যে নীরবতার পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। কিছুক্ষণ বাদে টং টং করিয়া গির্জ্জার ঘড়িতে বারটা বাজিল। বিক্ষুব্ধ শান্তি, একটু আন্দোলিত হইয়া আবার ধীরে ধীরে স্থির হইয়া আসিল। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যুবকটি কহিল,—

"ভগবান যীশু জন্মালেন মা।"

মা। যীশু জন্মালেন? এমনি একটা নিশীথ রাত্রে ভগবান কৃষ্ণও আঁধার কারায় জন্মেছিলেন। নমস্কার কর বাবা।

[সহসা উপরের ঘরে একটা চেয়ার সরানর শব্দ হইল। মনে হইল কে যেন এতক্ষণ বসিয়া ছিল,—হঠাৎ ঘড়ির আওয়াজ শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল। সেই শব্দে ত্রস্ত হইয়া মাতা তাড়াতাড়ি নিদ্রিতা কন্যার বিছানার নিকট গেলেন। মেয়েটির মুখের দিকে তিনি অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর কন্যার কপালে হাত দিয়াই তিনি পাথরের মত নিশ্চল হইয়া গেলেন। অসহ্য বেদনায় তাঁহার মুখ বিকৃত হইয়া গেল। তিনি কহিলেন "এ কি হল অরুণ, আমার প্রমীলা কোথায় গেল?"

যুবকটি বই হইতে মুখ না তুলিয়া বলিল—"আমি অনেকক্ষণ থেকে জেনেছি মা, ও নেই।"

সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। তাহার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া ফোঁটা কয়েক অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। আর তাহার মা অর্দ্ধসমাপ্ত গলাবন্ধটা হাতে করিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

[রচনা—শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ]

কত ভয়ে ভয়ে আকুল হৃদয়ে—
কত ব্যথা সয়ে দাঁড়ানু এসে ;
লাজে নত শিরে নয়নের নীরে,
তোমারি দুয়ারে দিবস শেষে ।

মোহের বিকারে বিপদ আঁধারে,
সীমারেখাহীন কাল পারাবারে ;
আপনারে ছলি', পথে একা চলি',
দিশেহারা শুধু বেড়ানু ভেসে ;
তাই বারেবারে বাঁচাতে আমারে
এস কাণ্ডারি নিমেষ হেসে !

তোমারি আসন রাখিয়া শূন্য
সয়েছি জীবনে অশেষ জ্বালা ;
আপনার মাঝে গেঁথেছি শুধুই
হাসিকান্নার দীর্ঘ মালা !

ধূলি মাঝে যাহা হয়েছিল ধূলি,
কণ্ঠে যখন নিজে নিলে তুলি ;
অন্ধ নয়ন গেল মোর খুলি
নিমেষ পরশে বুঝিনু শেষে—
আমারি লাগিয়া আছ হে জাগিয়া
ভুবনে ভুবনমোহন বেশে !!

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা]

ইমন-কল্যাণ—একতালা ।

স্থায়ী ।

	০				১				২´			
II {	নর্সা	নধা	পধনা	|	পক্ষা	পা	পধনা	I	পধনা	ধা	পক্ষাপা	|
	ক০	ত০	ভ০০		যে০	ভ	য়ে০০		আ০০	কু	ল০০	

	৩				০				১			
|	পধনা	ধপক্ষা	গমগরা	|	রগা	রা	গমা	|	গরা	রা	ন্া	I
	০হৃ০০	দ০০	য়ে০০০		ক০	ত	ব্য০		থা০	স	য়ে	

	২´				৩				০			
I	ৃরা	গরা	ন্রা	|	গমা	গরা	-ন্রসা	|	সন্া	সা	রা	|
	দাঁ	ড়া০	নু০		এ০	সে০	০০০		লা০	জে	ন	

১ ২´ ৩

| গা মগা রা I সা ন্‌সন্‌া ধ্‌া | ন্‌ধ্‌া প্‌া জ্ঞ্‌প্‌া |

ত শি॰ রে ন য়॰॰ নে র॰ শী রে॰

০ ১ ২´

| জ্ঞ্‌া ধ্‌া ন্‌ধ্‌র্‌া | রা গা জ্ঞগা I পা পা পধা |

তো মা রি॰॰ দু য়া রে॰ দি ব স॰

৩

| নসা নধপা -জ্ঞগজ্ঞপা } II

শে ষে॰॰ ॰॰॰॰

অন্তরা।

০ ১ ২

II { গা গা পজ্ঞা | ধা পা র্সনা I সা র্সা নর্রা |

মো হে র॰ বি কা রে॰ বি প দ॰

৩ ০ ১

| র্সা না সা | না র্রা র্গর্মা | র্গা র্রা -র্রা |

আঁ ধা রে সী মা রে॰ খা হী ন

২´ ৩ ০

I না -র্সা নধা | পধা নপা জ্ঞগা } | { গা গা জ্ঞপা |

কা ল্ পা॰ রা॰ বা॰ রে॰ আ প না॰

১ ২´ ৩

| নধা জ্ঞা পা I পা জ্ঞা ধা | নধা পধা পজ্ঞগা |

য়ে॰ ছ লি প থে এ কা॰ চ॰ লি॰॰

০ ১ ২

| রা গা জ্ঞপা | গা মা গরা I ন্‌া রা গা |

দি শে হা॰ রা ও ধু॰ বে ড়া য়

৩ ০

| সরা গমা -পধনর্সধপজ্ঞগরসা } | { সন্‌া -সা রা |

ভে॰ সে॰ ॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰ তা॰ ই বা

১				২´				৩			
গা	মগা	রা	I	সা	ন্সা	ন্া	|	ধ্ন্া	ধ্া	প্ক্ষ্প্া	|
রে	বা॰	রে		বাঁ	চা॰	তে		আ॰	মা	রে॰॰	

০				১				২			
ক্ষ্া	ধ্া	ন্ধ্ন্া	|	রা	গা	-া	I	ক্ষা	গা	ক্ষপা	|
এ	স	কা॰ণ্		ভা	রি	॰		নি	মে	ষ॰	

৩			
পা	পধনা	-র্সনধপক্ষগক্ষপা	}II
হে	সে॰॰	॰॰॰॰॰॰॰॰	

সঞ্চারী।

	০				১				২´			
II {	সা	ন্সা	পা	|	পা	নধা	-পা	I	ক্ষা	ধা	নধা	|
	তো	মা॰	রি		আ	স॰	ন্		রা	খি	য়া॰	

৩				০				১			
ক্ষপা	ক্ষা	-গরা	|	রা	:গা	ক্ষপা	|	গমা	গা	রা	I
শূ॰	ন্য	॰॰		স	য়ে	ছি:॰		জী॰	ব	নে	

২´				৩				০			
ন্া	রা	সরা	|	গরা	ন্রা	-সা	|	ন্া	সা	রগা	|
অ	শে	ষ॰		জা॰	না॰	॰		আ	প	না॰	

১				২´				৩			
রা	সন্া	ন্া	I	রা	সা	ন্া	|	ধ্ন্া	ধ্া	ক্ষ্প্া	|
র	মা॰	ঝে		গেঁ	থে	ছি		শু॰	ধু	ই॰	

০				১				২´			
ন্া	রা	গা	|	-ক্ষক্ষা	পা	ধা	I	-না	র্সা	-র্রসা	|
হা	সি	কা		ন্না	র	দী		প্	ঘ	॰॰	

৩			
নর্সা	র্সনা	-ধপক্ষপা	} I
মা॰	লা॰	॰॰॰॰	

আভোগ।

০ ১ ২
| { গা গা মপা | ধর্সা সা র্সা I র্সধা না র্সা |
ধূ লি মা০ ঝে০ যা হা হ ০ য়ে ছি

৩ ০ ১
| র্সা র্রর্সা র্সা | না -র্রা র্গা | র্মা -র্রা নর্সা I
ল ধ্ ০ ০ লি ক ন্ ঠে য থ ন্ নি ০

২´ ৩ ০
I র্সনা র্রা র্সা | নধা পধপক্ষা -গরা | সা -ররা গা |
জে০ নি লে তু০ লি০০০ ০ ০ অ ন্ধ ন

১ ২ ৩
| ক্ষপা -া রা I গা ক্ষপা -া | পা ক্ষধা -া |
য় ০ ন্ গে ল মো০ র্ খু লি০ ০

০ ১ ২´
| গা ক্ষা পা | পা ধনা না I ক্ষা ধা নর্সা |
নি মে ষ প র০ শে বু ঝি সু ০

৩ ০ ১
| র্সা নধা -পমপা } | { সনা সা রা | গা মা গরা I
শে ষে০ ০ ০ ০ আ০ মা রি লা গি য়া০

২ ৩ ০
| সা নসা না | ধা নধা পক্ষপা | ক্ষা ধা নধনা |
আ ছ০ হে জা গি০ য়া ০ ০ ভু ব নে ০০

১ ২´ ৩
| রা গা ক্ষা I গা ক্ষা পা | পা পধনা -র্সনধপক্ষাগক্ষাপা } II II
ভূ ব ন মো হ ন বে শে০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০

শোক-সংবাদ

৺কালীনাথ মিত্র

গত ২৭শে মাঘ সোমবার কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণীগণের অগ্রণী কালীনাথ মিত্র সি-আই-ই মহাশয় ৮৫ বৎসর বয়সে অমর-ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি কেবল যে বিজ্ঞ, বহুদর্শী, প্রবাণ আইনজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নয়; সকল প্রকার জনহিতকর অনুষ্ঠানেও তিনি যোগ দিতেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যরূপে তিনি কলিকাতাবাসীর যথেষ্ট মঙ্গল-সাধন করেন। ১৮৯৯ সালে মেকেঞ্জী স্বায়ত্ত-শাসন আইনের প্রতিবাদ-কল্পে কলিকাতা কর্পোরেশনের যে ২৮ জন সদস্য পদত্যাগ করিয়া তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দেন, কালীনাথ মিত্র মহাশয় সেই সাবাস আটাশের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে, বাঙ্গালার আইন-ব্যবসায়, কলিকাতা হাইকোর্ট এবং সাধারণ প্রতিষ্ঠান যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহার আর পূরণ হইবার নহে। আমরা কালাবাবুর পরিবার-বর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺কালীনাথ মিত্র

৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী

বাঙ্গালাদেশের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বিশ্তার ওস্তাদ রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামী মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। বাঙ্গালা-দেশের মধ্যে সেকালে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর সঙ্গীতের প্রধান কেন্দ্র ছিল; বিষ্ণুপুরের রাজবংশ সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গোস্বামী মহাশয় এই বিষ্ণুপুরেই জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনান্ত পর্য্যন্ত সঙ্গীতেরই চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন এবং দেশের মধ্যে প্রধানতম সঙ্গীত বেত্তা বলিয়া সমাদর লাভও করিয়াছিলেন। অল্পদিন পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ নগরীতে যে সঙ্গীত-মজলিসের অধিবেশন হয়, গোস্বামী মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ভারতীয় সঙ্গীত-বিশারদগণ তাঁহার সঙ্গীত-পারদর্শিতার যথেষ্ট সমাদরও করিয়াছিলেন—তিনি সেখানে উচ্চ পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই তিনি শয্যাগত হন, এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই লোকা-

স্তরে গমন করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশ একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তা হারাইয়া প্রকৃতপক্ষেই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমরা গোস্বামী মহাশয়ের আত্মীয়-স্বজনগণের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺যতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

"নায়কে"র অন্যতম স্বত্বাধিকারী যতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ৭ই ফাল্গুন প্রত্যূষে ইহলোক ত্যাগ করিয়া, পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪১ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে কিছুদিন ধরিয়া তিনি রোগ-শয্যাশায়ী ছিলেন। নায়কের স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনি মধ্যম পুত্র। যুগল ভ্রাতার সহযোগিতায় নায়কের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ, মিষ্টভাষিতা, আশ্রিত-বাৎসল্য প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে তিনি পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার নাবালক চারিটি পুত্র, একটী জ্যেষ্ঠ ও একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বিধবা পত্নী, বৃদ্ধা জননী বর্ত্তমান। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জানাইতেছি।

৺দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি, বাঙ্গলার সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহারই উদ্যোগে বঙ্কিমের জন্মস্থান কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হইয়া বঙ্কিম-তীর্থে প্রতি বৎসর বাংলার সাহিত্যিকবৃন্দের সমাবেশ হইয়া আসিতেছে। তিনি সম্প্রতি মাতামহের জীবন-চরিত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—কিন্তু আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই অকালে প্রস্থান করিলেন। প্রার্থনা করি, তাঁহার পরলোকগত আত্মা শান্তিলাভ করুন।

বাদ-প্রতিবাদ

সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক?

(প্রতিবাদ)

শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিগত ফাল্গুন মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত লিখিত "সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের প্রারম্ভে লেখিকা আক্ষেপ করিয়াছেন যে "সতীত্ব' কথাটা লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে আজকাল বিপুল বাগ্‌যুদ্ধ চলিতেছে, কিন্তু এই 'সতীত্ব' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি এবং সতীত্বই বা প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা 'এ পর্য্যন্ত খোলাখুলি ভাবে কোথায়ও আলোচিত হয় নাই।" উক্ত প্রবন্ধে তিনি এই বিষয়ের খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করিয়া নারীর সতীত্ব-সমস্যার যে সমাধান প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও সৎসাহসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার এই সমাধান তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা বিদুষী রমণীর পক্ষে সত্য হইলেও, তাহা যে আমাদের নারী-সমাজের ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক নারীর পক্ষেই সত্য, এ কথা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। আমার বোধ হয়, লেখিকা এ কথা অবগত নহেন যে, অনেক সময়ে দেশ-কাল-পাত্রাদিভেদে, বিশেষতঃ সামাজিক ব্যাপারসমূহে, প্রকৃত সত্য যাহা,—সমাজের মঙ্গল হেতু, অন্ততঃ প্রকাশের জন্য সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করিয়া,—তাহাও কিছু সময়ের জন্য অপ্রকাশ রাখিতে হয়; নতুবা সামাজিক অবস্থা সকলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, এবং দেশ-কাল-পাত্রাদি বিবেচনা না করিয়া, অসাময়িক সত্য প্রকাশের ফলে, জগতের ইতিহাসে, সত্যের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয়াধিক্য হইয়া মানব-সমাজে কতবার কত যে ভীষণ অকল্যাণ সংঘটিত হইতে শুনা গিয়াছে তাহার সীমা নাই।

যে আশঙ্কার কথা আমি বলিলাম, সেই আশঙ্কা যে লেখিকার মনেও প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে অতর্কিতে দুই একবার উঁকি মারে নাই, তাহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায়? তিনি যে 'আকৃতি' বা মনোধর্ম্মের প্রভাব বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—'প্রবৃত্তির স্রোতে গা-ভাসাইয়া দেওয়ার স্বপক্ষে তিনি কিছু বলেন নাই, এবং পাঠক-পাঠিকারাও যেন সেরূপ মনে না করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে',—তাঁহার এ সকল উক্তির তাৎপর্য্য কি? ইহাতে তো স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সমাজের অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার এই সত্য প্রকাশ করিতে তিনিও মনে একটু আশঙ্কা ও সংশয় অনুভব করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আজ যখন নারী-সমাজ হইতেই কোনও উচ্চশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা কর্ত্তৃক ঐ সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তখন তাহাতে আনন্দিত হইবারই কথা। কিন্তু আনন্দের পরিবর্ত্তে আমার মনে যুগপৎ যে সংশয় ও আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছে, সম্যক্‌ভাবে আলোচনা দ্বারা তাহা দূর করিয়া কোনও স্থির মীমাংসায় উপনীত হইবার ইচ্ছায়, লেখিকার প্রকাশিত সত্য সম্বন্ধে যাহা আমি সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। আমার বক্তব্য এই যে, যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের সমাজে নারীগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সম্যক্ উন্নতি হইয়া, তাঁহারা সভ্য ও শিক্ষিত জগতের অন্যান্য নারী-সম্প্রদায়ের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মের প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ হইয়া সর্ব্বপ্রকারে পুরুষের সাহায্যকারিণী হইতে এবং অত্যাচার নির্য্যাতন প্রভৃতি হইতে বুদ্ধি ও কৌশলে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থা না হয়েন, তত দিন পর্য্যন্ত লেখিকার প্রকাশিত সত্য বর্ত্তমান নারী-সমাজে প্রচারিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত নহে। কেন না, শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব হেতু, অশিক্ষিতা দুর্ব্বলচেতা নারী তাঁহার এই সত্যের প্রকৃত মর্য্যাদা না বুঝিয়া, পুরুষের স্বতঃ চিত্তাকর্ষী দেবোপম কোনও মহৎ গুণে আকৃষ্ট হইলে, এবং দেহ ও মনের পবিত্রতা রক্ষা করতঃ সেই গুণের আদর বা পূজা করিবার জন্য উন্মুক্ত বাতাসে স্বাধীন ভাবে বাহির হইতে পারিলে, যে, প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবে না, তাহাতে বিশ্বাস কি? সুতরাং লেখিকা তাঁহার এই সত্য বর্ত্তমান সমাজে প্রকাশিত করিয়া সঙ্গত কি অসঙ্গত আচরণ করিয়াছেন, তাহার বিচারের ভার স্বয়ং লেখিকা এবং 'ভারতবর্ষের' অন্যান্য পাঠক-পাঠিকাগণের উপর ন্যস্ত করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। এক্ষণে তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন লেখিকার প্রবন্ধের তাৎপর্য্য, আমার বক্তব্য বিষয়, এবং আমাদের বর্ত্তমান দুর্ব্বল নারী-সমাজের সকল প্রকার হীনাবস্থার বিষয়, বিশেষভাবে বিবেচনা ও বিচার করিয়া তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করেন।

প্রবন্ধের শেষভাগে লেখিকা কবীন্দ্র রবীন্দ্রের ভাষায় কুসংস্কার-প্রপীড়িত দুর্ভাগ্য দেশের মঙ্গল কামনাচ্ছলে, তাঁহার আপন প্রাণের অতি উচ্চ গোপন আকাঙ্ক্ষা, ভগবানের নিকট কাতর ভাবে জানাইয়া যে প্রার্থনা করতঃ প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন, তাহাতে আরও মনে হয় যে, তিনি শুধু উচ্চ শিক্ষিতা নহেন, তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ভগবানে ভক্তি বিশ্বাসও আছে; তবে দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি বোধ হয় আমাদের নারী-সমাজের সমগ্র নারীকেই তাঁহার কল্পিত আদর্শে গড়িয়া লইয়াছেন; নতুবা, তাঁহার এই সতীত্ব সমস্যার সমাধান কখনই তিনি সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতে সাহসী

হইতেন না। আমাদের নারীসমাজের অধিকাংশই অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা। তাঁহারা এই সত্যের মর্য্যাদা বুঝিয়া, দেহ-মনের পবিত্রতা রক্ষা করতঃ, তাঁহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মজীবনের সমস্ত আচার ব্যবহার সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে সমর্থা আছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। পরন্তু লেখিকা যদি তাঁহার এই সত্য প্রকাশিত করিবার জন্য ব্যগ্র না হইয়া উহা মনে মনে রাখিতেন, এবং অন্যান্য নারীগণকে উহার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদের গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি কর্ম্মে ও আচার ব্যবহারে এই সত্যের সম্যক্ অনুষ্ঠান ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা সাধন করিতে মৌখিক উপদেশ প্রদানে যত্নবতী হইতেন, তাহা হইলে মনে হয়, তাঁহার এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং মহৎ উদ্দেশ্য কালে পরিপূর্ণ হইবার আশা সুদূর হইলেও খুব সুনিশ্চিত হইত। লেখিকা বলিয়াছেন যে, প্রকৃত মহত্ব বা গুণের আদর বা পূজা করিলে তাহাতে নারীর সতীত্বের হানি হয় না—যদি না তাহাতে অভিভূতা হইয়া পড়া যায়। কিন্তু এ কথা তাঁহার বুঝা উচিত যে, শিক্ষিতা নারীর ন্যায়, অশিক্ষিতা নারীর মনোধর্ম্মগুলি শিক্ষার অভাব হেতু সুসংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত না হওয়ায়, সে কথনই বিবেকবুদ্ধির বলে সেই অভিভূত অবস্থা বা আসক্তি হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থা হয় না; এবং কেবলমাত্র সামাজিক কঠোর শাসনের ভয়ে ভিন্ন, জ্ঞানের প্রভাবে স্বামীকে ব্রহ্মের প্রতীক্ বা ঈশ্বরের সাকার বিগ্রহ-স্বরূপ উচ্চ ভাব হৃদয়ে পোষণ করতঃ তাঁহাতে অটল অচল ও সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা সুগভীর স্বামী-প্রেমে এক নিষ্ঠাবতী হইতেও পারে না। সুতরাং এইরূপ অশিক্ষিতা নারী উন্মুক্ত বাতাসে স্বাধীন ভাবে বেড়াইবার অধিকারও পাইতে পারে না; নতুবা যিনি স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ সুগভীর প্রেম অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখিতে সমর্থা, তিনি দেহ মনের পবিত্রতা রক্ষা করতঃ উন্মুক্ত বাতাসে বেড়াইবার স্বাধীনতা পাইবারও যোগ্যা এবং তিনি স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের কোনও মহৎ গুণের পূজা বা আদর করিয়াও স্বামীর কাছে প্রত্যবায়ভাগিনী হয়েন না এবং সমাজেও তাঁহার আচার ব্যবহার দূষণীয় বিবেচিত হয় না; কিন্তু যেখানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, সেইখানেই চারিদিক হইতে আপত্তি ও সোরগোল হইতে থাকে। কেন না সমাজ কখন ব্যভিচার সহ্য করিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত তো আমরা প্রতি দিনই সমাজে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

আর একটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। লেখিকা বলিয়াছেন যে, অন্যান্য দেশের নারী সমাজের তুলনায় আমাদের নারী-সমাজে সতী নারীর সংখ্যা যে শতকরা হিসাবে অনেক বেশী, তাহাতে আমাদের আনন্দে অধীর হইবার বা গর্ব্ব প্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই। কেন না আমাদের দেশের নারীর সতীত্বে গোঁজামিল, গলদ ও ফাঁকির মাত্রাও খুব বেশী। কিন্তু যদিও এ কথা অনেকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন, তথাপি খুব অল্প লোকেই তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সাহসী হইবেন। নারী-সমাজের সে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া কোন লাভ নাই, বরং ঘরের কথা পরের কাছে প্রকাশ না করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। ইহাতে আমাদের সৎসাহসের অভাব আছে বলিয়াও লেখিকার আক্ষেপের কোনও কারণ দেখি না। যাহা হউক, লেখিকার এই কথাটী সত্য হইলেও, এ সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে, আমাদের নারীগণের সতীত্বে যে সকল গোঁজামিল, গলদ ও ফাঁকি বর্ত্তমানে দেখা যায়, তাহার জন্য আমাদের দেশের বহুদর্শী ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য মুনি ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত শাস্ত্রসকল ও প্রাচীন কালের সামাজিক বিধি-বিধানসমূহ সম্পূর্ণ দায়ী নহে। আমাদের শাস্ত্র ও সামাজিক বিধি-বিধান সকল, যাহা আধুনিক শিক্ষিত সমাজে কুসংস্কার বলিয়া বিবেচিত ও উপেক্ষিত হয়, তাহা এক সময়ে নারীর সতীত্বের যে অতি উচ্চ মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, কালপ্রভাবে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সতীত্বের সে মহান্ আদর্শের ভাব আমাদের বর্ত্তমান নারী সমাজ হইতে ক্রমশঃই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এবং ইহাই, অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অনুকরণ যে সতীত্বের গোঁজামিল, গলদ ও ফাঁকির মাত্রাধিক্যের অন্যতম প্রধান কারণ, এ কথা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য। আমাদের দেশের নারীর শিক্ষা সভ্যতা ও কর্ম্ম আমাদের দেশের উপযোগী হওয়াই উচিত। বিদেশীয় ভাষা শিক্ষায় কোন দোষ হয় না, কিন্তু বিদেশীয় আচার ব্যবহার ও সামাজিক রীতিনীতির অনুকরণ করিলে মানব-সমাজে কিরূপ শোচনীয় অধঃপতিত অবস্থায় থাকিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত হতভাগ্য বঙ্গসন্তান, ততোধিক তাহাদের অশিক্ষিত দুর্ব্বল নারী-সমাজ। বর্ত্তমানে যতই গোঁজামিল, ফাঁকি, গলদ আমাদের দেশের নারীর সতীত্বে দেখা যাক্ না কেন, লোকে যখন সুদৃঢ় সমাজ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া সমাজের বিধি, নিষেধ ও শাসন সকল মানিয়া চলিত, সমাজ-বন্ধন যখন এত শিথিল ছিল না, সেই প্রাচীন কালের কথা বাদ দিলেও, বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় সভ্য ও শিক্ষিত জাতির নারী-সমাজের তুলনায় ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের নারী-সমাজেই প্রকৃত সতী নারীর সংখ্যা অধিক, এবং বর্ত্তমান যুগে প্রকৃত সতীত্বের আদর্শ যদি জগতে কোথাও কিছু থাকে, তবে তাহা এই বঙ্গদেশেই আছে। নারী মাত্রেই সৃষ্টির আদিকারণভূত মহা-আদ্যাশক্তির অংশ বিশেষ। বিশেষতঃ ভারতের মধ্যে বঙ্গনারীতে সেই মহাশক্তির যে কি মহাবিকাশ আছে, তাহা যেদিন বঙ্গের নারী-সম্প্রদায় সুশিক্ষার প্রভাবে সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, সেই দিন হইতেই বাস্তবিক ভারতের আবার সুদিন ফিরিয়া আসিবার সূত্রপাত হইতে থাকিবে। আমার বোধ হয়, এই জন্যই বুঝি, বঙ্গের নারী-শক্তির প্রভাব ও মর্য্যাদা অনুভব করিয়া, স্বার্থত্যাগী মহানুভব দেশবন্ধু দাস মনোমোহন নাটমন্দিরের রঙ্গমঞ্চে স্বর্গীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতিকল্পে আহূত কোনও এক সভাতে কবিবরের কোনও একখানি প্রসিদ্ধ সামাজিক নাটকের সমালোচনায় কথা প্রসঙ্গে বক্তৃতাচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর অন্য সকল দেশের নারী-জাতির তুলনায় আমাদের বঙ্গনারীর এমন কোনও বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা অন্য দেশের নারীতে নাই; আর এই জন্যই বোধ হয়, বর্ত্তমান সময়ে ভারতব্যাপী গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের সহিত

ভারতীয় নারী-সমাজ-সমস্যার সমাধানেরও তীব্র আন্দোলন ও আলোচনার সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। অধঃপতিত পরাধীন জাতির পক্ষে তাহাদের নারী-সমাজের এই মহাজাগরণ যে সত্যই অদূর-ভবিষ্যতে শক্তি ও স্বাধীনতা লাভের নিদর্শন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের কর্ত্তব্য এখন, নারী-সমাজের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করতঃ নারীগণকে যোগ্যতানুসারে স্বাধীনতা এবং কর্ম্মক্ষেত্রে নারী-জনোচিত সকল প্রকার কর্ম্মের প্রতিযোগিতায় প্রবেশাধিকার দেওয়া। তাহা হইলে তাঁহারা বিপদকালে আত্মরক্ষা করিতে এবং পুরুষ-সমাজকে সকল প্রকার কার্য্যে সহায়তা প্রদান করিতে পারিবেন। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কুসংস্কারের সীমাবদ্ধ গণ্ডী সকল কাল-মাহাত্ম্যে আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। নতুবা অসময়ে গর্ব্ব ও অহঙ্কারের সহিত জোর পূর্ব্বক তাহাদের উচ্ছেদসাধন করিতে গেলে, বরং বিপরীত ফল ফলিবারই সম্ভাবনা অধিক। যত দিন আমাদের নারী-সমাজ সম্যক্ রূপে সুশিক্ষিতা হইয়া স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য না হইতেছেন, তত দিন সামাজিক কুসংস্কারের উচ্ছেদসাধন করতঃ তাহাদিগকে অন্যায় স্বাধীনতা দিয়া এবং লেখিকার প্রকাশিত সতীত্ব-সমস্যার সমাধান নারী সমাজে প্রচারিত করিয়া দিলে, বহু দিনের পুরাতন বাঁধ ভাঙ্গিয়া দুর্ব্বল নারী-সমাজের উপর দিয়া যখন স্বাধীনতার প্রবল বন্যার প্রবাহ বহিতে থাকিবে, তখন অধিকাংশ অশিক্ষিতা নারীই যে লেখিকার এই সত্য-সমাধানের দোহাই দিয়া উচ্ছৃঙ্খল-বৃত্তি-পরায়ণা ও যথেচ্ছাচারিণী হইয়া সেই প্রবাহের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে দিশেহারা হইয়া চলিয়া যাইবে, তাহার পরিণতিই বা কি হইবে, কে বলিতে পারে? লেখিকা কি তখন তাহাদিগকে সেই প্রবল প্রবাহের মুখ হইতে ফিরাইয়া রক্ষা করিতে পারিবেন? যদি না পারেন, তবে আমাদের নারী-সমাজের মধ্যে সতীত্বের যে গোঁজামিল, গলদ ও ফাঁকি দেখিয়া তিনি আশঙ্কিত হইয়াছেন, তাহার মাত্রা যে আরও অধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে এবং তাহার পরিণাম নারী-সমাজের পক্ষে যে কি ভয়াবহ হইয়া উঠিবে, তাহা কি তিনি একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? আমার মনে হয়, তিনি যে মহান্ সত্য প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই মহাসত্যের অনাবিল আনন্দ ও মত্ততায় এত অধিক পরিমাণে অধীরা ও আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, এতদূর ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিবার শক্তি তাঁহার তখন ছিল না, অথবা থাকিলেও তিনি সে বিবেচনা করিবার কোন আবশ্যকতাই বোধ করেন নাই। আমাদের দেশের নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে যদি এইরূপ শাস্ত্রীয় কঠোর বিধি-বিধানের দ্বারা নিয়ম ও সংযমের মধ্য দিয়া সামাজিক সুশাসন ও সুশৃঙ্খলার ব্যবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে এ অধঃপতিত পরাধীন দেশের অশিক্ষিত দুর্ব্বল নারী-সমাজের আজ যে আরও কত ভীষণ শোচনীয় দুরবস্থা চোখে দেখিতে হইত, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে! তাই আবার বলি, যত দিন আমাদের নারী-সমাজ সম্যক্ রূপে শিক্ষিতা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বলবতী হইয়া আত্মরক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে সমর্থা না হয়, তত দিন লেখিকার প্রকাশিত সতীত্ব-সমস্যার এই সমাধান সমাজে প্রচারিত হইয়া নারী সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত বা প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহার ফল সমাজের পক্ষে কখনই শুভজনক হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

সাময়িকী

এই চৈত্র মাসের 'ভারতবর্ষে' যে মহাত্মার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তাঁহারও কি পরিচয় প্রদান করিতে হইবে? বাঙ্গালা দেশে এমন কেহ কি আছেন, যিনি 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি, বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের পরিচয় জানেন না?

——

আমাদের দেশে পূর্ব্বে দেখিয়াছি, চৈত্র মাস পড়িলেই গ্রামের গ্রহাচার্য্যগণ ধনী-নির্ধন সকলের বাড়ীতে যাইয়া আগামী বৎসরের পঞ্জিকা শুনাইয়া আসিতেন; কে রাজা, কে মন্ত্রী, কত আড়া জল, দুর্গোৎসবে দেবীর কোন্ যানে গমনাগমন, ফলং কি, এ সকল কথা গৃহস্থগণ গ্রহাচার্য্যের মুখে শ্রবণ করিতেন এবং বৎসরের ফলাফল শ্রবণে পুণ্য-সঞ্চয় করিয়া গ্রহাচার্য্যগণকে দক্ষিণা দানে পরিতুষ্ট করিতেন। এখন বাজারে নূতন পঞ্জিকার ছড়াছড়ি হওয়াতে গ্রহাচার্য্যগণের একটা আয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে; বিশেষ 'কে বা হইল রাজা, আর কে বা মন্ত্রীবর' এ সংবাদ এখন গ্রহাচার্য্যের নিকট না লইয়া 'রয়টারের' মারফৎই জানিতে পারা যায়। এখনকার নূতন পঞ্জিকা অন্য ক্ষেত্র হইতে শুনিতে হয় এবং তাহার ফল, মনোকষ্ট, হা হুতাশ!

——

কিন্তু তাহা বলিয়া উপায় নাই; 'ভারতবর্ষের পাঠক-পাঠিকাদিগকে ইংরাজী মতে নববর্ষের পঞ্জিকা শ্রবণ করাইব। সে পঞ্জিকার বিলাতী নাম বজেট অর্থাৎ আগামী বৎসরের আয় ব্যয়ের আনুমানিক তালিকা। এ তালিকা সকলেরই শুনিয়া রাখা কর্ত্তব্য; কারণ ইহাতে বড় রসের সমাবেশ আছে, এবং এই তালিকার তালিম

দেওয়া উপলক্ষে ব্যবস্থাপক সভাদিতে যে বাগ্‌বিভূতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা স্বয়ং মহাদেবও কখন প্রদর্শন করিয়াছেন কি না, এবং করিতে পারেন কি না, সন্দেহ। অতএব 'বৎসরের ফলাফল' 'পশুপতি'র নিকট না শুনিয়া ভারতের ও বাঙ্গালার রাজস্ব-সচিবদ্বয়ের মুখে অবগত হউন।

প্রথমেই ভারতের আয়-ব্যয়ের কথা নিবেদন করিতেছি। অশ্বিন বর্ষে (অর্থাৎ ১৯২৫ এপ্রিল হইতে ১৯২৬ মার্চ্চ পর্য্যন্ত) রাজস্ব-সচিব ভারতের রাজস্বের আয় **১৩৩ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা** বরাদ্দ করিয়াছেন আর খরচের বাবদ ধরিয়াছেন **১৩০ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা**। তাহা হইলে **৩ কোটী ২৪লক্ষ টাকা আয় উদ্বৃত্ত হইবে** বলিয়া আশা করা যায়। বজেটে যে সকল বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তাহার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা :—

বাঙ্গালাকে তাহার দেয় রাজস্বের মধ্য হইতে যে ৬৩ লক্ষ টাকা কয়েক বৎসর হইল মকুব দেওয়া হইয়া আসিতেছিল, তাহা আরও তিন বৎসর মকুব দেওয়া হইবে।

মান্দ্রাজকে ১২৬ লক্ষ টাকা, যুক্তপ্রদেশকে ৫৬ লক্ষ টাকা, পাঞ্জাবকে ৬১ লক্ষ টাকা ও ব্রহ্মদেশকে ৭ লক্ষ টাকা দেয় রাজস্বের মধ্য হইতে মকুব দেওয়া হইবে।

এবারের বজেটের মোট খরচের বরাদ্দের পরিমাণ ১৩০ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে **৫৬ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা সমর বিভাগের খরচ** বাবদ ধরা হইয়াছে।

চাকুরী কমিশনের সুপারিশ মত ভারত সরকারের উপরিতম কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি বাবদে ২৫ লক্ষ টাকা অধিক খরচা ধরা হইয়াছে।

১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত নূতন দিল্লী নির্ম্মাণের বাবদ ১০ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা খরচ হইবে।

এবার ইন্‌কম ট্যাক্সের আয় ১৭ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

বাণিজ্য শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে। তুষা মালের উপর শতকরা ২৷৷০ টাকা হারে যে আমদানী শুল্ক লওয়া হইত তাহা তুলিয়া দেওয়া হইবে ও এক্ষণে প্রতি এক এক গেলন পেট্রলে মাত্র চারি আনা হিসাবে শুল্ক লওয়া হইবে।

১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে টাকার মূল্য হইবে দেড় শিলিং করিয়া। গত বৎসরে টাকার দর ইহা অপেক্ষা কম ছিল।

বিমান বিভাগের ইমারত তৈয়ারী বাবদ ৪৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

ডাক মাশুল বা লবণের শুল্ক হ্রাস করা হইবে না।

উপরিলিখিত বর্ণনার মধ্যে যে কয়টি কথা বড় হরফে আমরা প্রকাশ করিলাম, তাহা পাঠ করিলেই এবং তৎপ্রতি মনোযোগ করিলেই ভারত-গবর্ণমেণ্টের বজেটের স্বরূপ অবগত হইতে পারিবেন; সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের ন্যায় বৃথা বক্তৃতা করিয়া সময় নষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। একটী বিষয়ের দিকে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইতেছে। বাঙ্গলা দেশের রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর ৬৩ লক্ষ টাকা ভারত-গবর্ণমেণ্টের সেলামী দিবার ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু বিশেষ দয়া-পরবশ হইয়া এবং বাঙ্গালা দেশের অবস্থা কাহিল দেখিয়া, ভারত গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব কয়েক বৎসর উক্ত সেলামী রেহাই দিয়াছিলেন, এবং এ বৎসর ঘোষণা করিতেছেন যে আগামী তিন বৎসরের জন্য এ সেলামী রেহাই দেওয়া হইল। এ জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে বেইমানী করা হয়।

অতঃপর ঘরের কথা, অর্থাৎ আগামী বৎসরে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে বাঙ্গালার রাজস্ব-সচিব মহোদয় কি বলিতেছেন তাহা শ্রবণ করুন।

গত বৎসর কাউন্সিল বজেটে ১০, ২৬, ৯৮,০০০ টাকা আয় এবং ১০ ৩০, ৯৭০০০ টাকা ব্যয় দেখান হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরের সমস্ত আয় ব্যয় খতাইয়া দেখা যাইতেছে যে, এবার আমাদের ৬৬৷৷০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে যদি আমাদিগকে আমাদের প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ভারত সরকারকে ভাগ দিতে হইত, তবে আমাদের ২৬৷৷০ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি পড়িত।

আগামী বর্ষে মোট আয় ১০, ৫৫, ১১০০০ টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। উহা গত বৎসরের রাজস্ব হইতে ১০॥০ লক্ষ টাকা বেশী। আবগারী বিভাগ হইতে ১৭ লক্ষ টাকা আয় বেশী হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা ক্রমে ভাল হইতেছে বলিয়া ষ্টাম্প হইতে ১০ লক্ষ টাকা আয় বেশী হইবে ধরা হইয়াছে। আগামী বর্ষে মোট ব্যয় ১১,৪৪,১১০০০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান হইয়াছে। উহা বর্ত্তমান বৎসরের সংশোধিত ব্যয়তালিকা হইতে ১৩৬ লক্ষ টাকা বেশী। আমাদের বর্ত্তমান বৎসরের আয় হইতে ব্যয় ৮৯ লক্ষ টাকা বেশী হইবে।

সাধারণ শাসন বিভাগে বর্ত্তমান বৎসরের সংশোধিত ব্যয় তালিকা হইতে আগামী সনে ৬॥০ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইবে। ইহার কারণ বর্ত্তমান বৎসর ঐ বিভাগের ব্যয়ে মন্ত্রীদের বেতন ব্যয়ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ৮৩,০০০ টাকা গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসনের জন্য সার্কেল অফিসার নিয়োগের বাবদ ব্যয় হইবে।

পুলিশ বজেটে, গত বৎসরের সংশোধিত ব্যয় তালিকা হইতে ৩ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় ধরা হইয়াছে। এই বৃদ্ধির কারণ লী-কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে কার্য্য করায় খরচ বৃদ্ধি ভ্রমণের ভাতা এবং বিপ্লববাদীদিগকে দমন করিবার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়।

উপরে যে সকল ব্যয়ের বিবরণ দেওয়া হইল, সে গুলি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের খাস বিভাগের ব্যয়। ইহা ব্যতীত আর একটী বিভাগ আছে, যাহার নাম হস্তান্তরিত বিভাগ। এ বিভাগের ব্যবস্থা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের মতানুসারে মন্ত্রীগণ করিয়া থাকেন। গত বৎসর ত মন্ত্রী-বিভ্রাটের জন্য স্বয়ং লাট বাহাদুরকেই এই 'হস্তান্তরিত' বিভাগকে আবার 'হস্তে' লইতে হইয়াছিল। এবার না কি পুনরায় মন্ত্রী বাহাল হইবে এবং হস্তান্তরিত বিভাগগুলি পূর্ব্বের মত হস্তান্তরিত হইবে, এবং তাহার ব্যয়ের বিবরণ বজেটে বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে তাহার সার সঙ্কলিত হইল।

স্বাস্থ্য

আগামী বৎসরের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগে ১,২৫,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। এই টাকা দেশবন্ধু দাশের প্রস্তাবানুসারে পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে জেলা বোর্ড সমূহের হস্তে দেওয়া হইবে।

শিক্ষা

বর্ত্তমান বৎসরে শিক্ষা বিভাগে, গত বৎসরের চেয়ে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় ধরা হইয়াছে। উহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ২ লক্ষ টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চট্টগ্রাম কলেজের জন্য একটী হিন্দুহোষ্টেলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল স্কুলের জন্য সাহায্য করা হইবে।

পল্লীগ্রামে জলকষ্ট নিবারণ

গত বারের বজেটে পল্লী গ্রামের জলকষ্ট নিবারণের জন্য মোট ৫০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এবারকার বজেটে পল্লীর জলকষ্ট নিবারণের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা ধরা হইয়াছে।

কচুরী পানা ধ্বংস

বাঙ্গালা দেশে কচুরীপানা ধ্বংসের জন্য এবারকার বজেটে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ২১ হাজার টাকা। আর বাঙ্গলা দেশে খেজুরে গুড়ের উন্নতি বিধানের জন্য ৬ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

বিগত শিবরাত্রির ছুটীর সময় মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলনের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। দুই দিন সভার অধিবেশন হয়। প্রথম দিনে মঙ্গলাচরণের পর মেদিনীপুরের জজ সাহেব উৎসবের উদ্বোধন করেন। তাহার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্থানীয় খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মাইতি মহাশয় অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুললিত অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণে তিনি রাজা

রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সমস্ত পরলোকগত সাহিত্যিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সাহিত্য-সেবার বিবরণ বিবৃত করিয়াছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার পর পরিষদের সদস্যগণ রবীন্দ্রনাথের 'রাজা-রাণী'র অভিনয় করেন। পরদিনের সভায় কয়েকটী প্রবন্ধ পঠিত হয়; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম-এ, বি-এল মহাশয়ের প্রবন্ধ বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। নাড়াজোলের কনিষ্ঠ কুমার বাহাদুর এবং ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়দ্বয় বিদেশাগত সাহিত্যিকগণের অভ্যর্থনার বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন এবং কনিষ্ঠ কুমার বাহাদুর সকলকে প্রীতিভোজনে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের সাহিত্য-সেবকগণের, বিশেষভাবে স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত মনীষি বাবু ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর একাগ্রতা ও আগ্রহ বিশেষ প্রশংসার্হ।

———

পূর্ব্বে আমাদের দেশে যাঁহারা লাট-বেলাট হইয়া আসিতেন, তাঁহারা পাঁচ বৎসর ব্যাপী কার্য্যকালের মধ্যে কেহই ছুটী লইয়া 'হোমে' যাইতে পারিতেন না, পাঁচ বৎসর পরে একেবারে বিদায়। ইহাতে না কি লাট বাহাদুরেরা এখন হাঁফাইয়া উঠিতেছেন; বিশেষতঃ দেশের যে প্রকার অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে না কি বিলাতের কর্ত্তাদের সঙ্গে বড়লাট বাহাদুরের মধ্যে মধ্যে পরামর্শের প্রয়োজন হইয়াছে; সে পরামর্শ তার বা পত্রযোগে হওয়া নানা কারণে বাঞ্ছনীয় নহে। এই শেষোক্ত কারণে আমাদের বড় লাট মাননীয় লর্ড রেডিং বাহাদুর আগামী এপ্রিল মাসে বিলাত যাইতেছেন; চারি মাস পরেই তিনি ফিরিয়া আসিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বাঙ্গলার গবর্ণর মাননীয় শ্রীযুক্ত লর্ড লিটন বাহাদুর বড় লাটের কার্য্য করিবেন এবং মাননীয় ষ্টিফেন্‌সন সাহেব এই চারিমাস বাঙ্গলার লাটগিরি করিবেন। বিহারের লাট মাননীয় সার হেনরী হুইলার বাহাদুরও এপ্রিল মাসে তিন মাসের ছুটীতে বিলাত যাইবেন।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ প্রণীত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত নূতন পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক "গোলকুণ্ডা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—১৲।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বি-এল প্রণীত (নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু লিখিত ভূমিকা সহ) "রাণীর কবর" প্রকাশিত হইল; মূল্য—৷৹।

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত বি এ প্রণীত উপন্যাস "লাল-পতাকা" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৲।

৺দীননাথ ধর প্রণীত "উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর" প্রকাশিত হইল; মূল্য—॥৹।

পরশুরাম রচিত ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন বিচিত্রিত "গড্ডালিকা" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১।৹।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত—মহাকবি বিদ্যাপতি বিরচিত "কীর্ত্তিলতা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—১৲।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম-এ প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "বুকের বালাই" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৲।

ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা প্রণীত "প্রাচীন হিন্দু দণ্ডনীতি" প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল; মূল্য—১।।৹।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "সোহাগী" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৸৹।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201. Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvursha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.

নাগ পঞ্চমী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

বৈশাখ, ১৩৩২

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাদশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

বেদ ও বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

বেদ ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক কথা বলিয়াছি, আরও দুই-একটা কথা বলিব। প্রথমেই প্রশ্ন এই, দক্ষ প্রজাপতি কে? 'দক্ষ্' ধাতুর মানে বাড়া। বীজ বাড়িয়া যখন গাছ হইতেছে, ভ্রূণ বাড়িয়া যখন জীবদেহ হইতেছে, তখন এই 'দক্ষ্' ধাতুর দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। সৃষ্টির বেলায় কিরূপ হইবে? সৃষ্টির গোড়ায় যে অখণ্ড বস্তুটি, তাঁহাকে আমরা অদিতি বলিয়া ডাকিয়াছি, কিন্তু তিনি অব্যক্ত। তাঁহাকে বুঝিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হারি মানেন। সেই অব্যক্ত বস্তুটি ক্রমে ব্যক্ত হইতেছেন,—সৃষ্টি সম্বন্ধে ইহাই বৈদিক রহস্য। সেই অব্যক্ত বস্তুটিকে যেমন অদিতি বলিয়া ডাকা হইয়াছে, তেমনি আবার তাহাকে 'অসৎ', 'রাত্রি' 'বিশ্বব্যাপী জলরাশি' ইত্যাকার নানা প্রতীকের সাহায্যে আমাদের আভাসে চিনাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহারই যে ক্রমশঃ জগৎ রূপে বিকাশ বা বিজ্ঞান, তাহাই হইল দক্ষ প্রজাপতির সৃষ্টি, অথবা সৃষ্টি যজ্ঞ। মূল অব্যক্ত বস্তুটিকে সাংখ্যের প্রধান বা প্রকৃতির মত জড় এবং পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র ভাবিবেন না। যে দেখিতেছে এবং যাহা দেখিতেছে—দ্রষ্টা ও দৃশ্য—এই দুইটাকে আলাদা করিয়া সরাইয়া লইয়া সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি। এই হিসাবে চেতন ও জড়ের লক্ষণ আর এক দিন বুঝিয়া লইয়াছিলাম কিন্তু অনুভবে (Experienceএ) দ্রষ্টা ও দৃশ্য ঠিক আলাদা নয়। গোড়ায় যে অনুভব হয় তাহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় নির্ব্বিশেষ ভাবে জড়িত থাকে। পরে ছুরি চালাইয়া, বিশ্লেষণ করিয়া, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (Subject ও Object) কে আলাদা করিয়া লইতে হয়। আপনারা নিজে নিজে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, এমন ধারা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ছুরি আমরা প্রায়ই চালাই না। যখন একখানা মেঘের দিকে চাহিয়া আছি, তখন আমার অন্তঃকরণ ঐ মেঘের আকারেই আকারিত হইয়া থাকে। খানিকক্ষণ পরে হয় ত সুপ্তোত্থিতের মত

ভাবি—আমি মেঘমালা দেখিতেছিলাম। কি দেখিতেছ?—এ কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমায় অবশ্য জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে তফাৎ করিয়াই বলিতে হয়। বলিতে গেলে তফাৎ করিয়া বলিতে হয়, বুঝিতে গেলেও তফাৎ করিয়া দেখিতে হয়; কিন্তু গোড়ায় অনুভবে তাহারা তফাৎ থাকে না। গোড়ায় যে অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয় একটা অনুভব হয়, সেইটাকে ইংরাজিতে বলে Intuition। আমি আমার দার্শনিক লেখাগুলিতে ইহার নামকরণ করিয়াছি Fact। এই Fact is logical, অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়। ইহাকে ভাবিতে বুঝিতে বলিতে গেলেই কাটিয়া ছাঁটিয়া বিশ্লেষণ করিয়া লইতে হয়। Fact অদিতি, তাঁহাকে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ইত্যাদি রূপে কাটিয়া দিতিকে পাইতে হয়। ঠিক ফ্যাক্‌ট লইয়া অনুভব চলে, কারবার চলে না, কথা-বার্ত্তা কওয়া চলে না। ফ্যাক্‌টকে কাটিয়া যে সমস্ত টুকরায় আমরা ভাগ করি, সে গুলির নাম আমি দিয়াছি Fact-sections। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, পুরুষ ও প্রকৃতি এইরূপ ফ্যাক্‌ট-সেক্‌সন্‌স্—তত্ত্বের ভগ্নাংশ, পুরা তত্ত্ব নহে। পুরা তত্ত্ব যেটি সেটি অনুভবমাত্র, সেটা খণ্ডহীন হইলেই তাহা অদিতি। এই গোড়াকার অনির্ব্বচনীয় অনুভবের বিশ্লেষণ নানা ভাবে হইয়া থাকে। এক রকম দ্রষ্টা ও দৃশ্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (Subject and Object) এই ভাবে। আর এক রকম হইতেছে চিৎ ও শক্তি, এই ভাবে। একটা শক্তি জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছে, আর এক চৈতন্য সেই শক্তির খেলাটিকে প্রকাশ করিতেছেন। একজন নৃত্য করিতেছেন, আর একজন তাঁহাকে বুকে ধারণ করিয়া আছেন এবং প্রকাশ করিতেছেন। যিনি প্রকাশ করিতেছেন ও ধারণ করিতেছেন তিনি চিৎ—তিনি তন্ত্রশাস্ত্রে শুভ্র কলেবর চিৎ করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া শক্তিস্বরূপিণী কালীকে বুকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। শিব হইতেছেন চিৎ, প্রকাশক, কাজেই কর্পূরকুন্দেন্দুধবল; নিষ্ক্রিয়, কাজেই শববৎ। কালী শক্তিরূপা, কাজেই চিরচঞ্চলা, নৃত্যোল্লাসবিহ্বলা। শক্তির স্বরূপ অনির্ব্বাচ্য—চৈতন্যের মত ইহা প্রকাশরূপ নহে—কাজেই কালী মহা-মেঘপ্রভা ঘোরা। গোড়াকার মূল তত্ত্বটার এই এক আকার বিশ্লেষণ। বেদান্ত এই মূল তত্ত্বটারই আর এক রকম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। একজন পরমেশ্বর, অপরজন মায়া। তন্ত্র ও বেদান্ত কিন্তু একেবারে আলাদা করিয়া ফেলেন নাই। একেরই যে দুইটা দিক, তাহা ঐ ভাব-বিশ্লেষণের মধ্যে স্পষ্টতই আমরা দেখিতে পাই। আর বেশি দুর ঢুকিয়া পড়ার দরকার নাই,—এইবার দক্ষ-প্রজাপতি কে, তাহা আমরা চিনিতে পারিলাম কি?

যে মূল অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বটিকে আমরা অদিতি বলিয়াছি, তাহারই গর্ভে শিব-শক্তি, পুরুষ-প্রকৃতি, ঈশ্বর-মায়া—এবংবিধ সকল দ্বৈতই নিহিত রহিয়াছে, এবং সেই গর্ভ হইতেই সকল দ্বৈত প্রসূত হইতেছে, এ কথাটা আমরা আমাদের সাধারণ অনুভবের সাহায্যেই বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। বোধ হয় চেষ্টা একবারে নিষ্ফল হয় নাই। এতক্ষণ পরে আবার একবার পূর্ব্বোদ্ধৃত সেই ঋক্‌টি শুনুন—"ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহারা গর্ভধারণ পূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল, তাহা হইতে, দেবতাদিগের একমাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হইলেন। সেই বিশ্বভুবনব্যাপী ভূরি পরিমাণ জলই গোড়াকার অব্যক্ত অনুভব অথবা অদিতি। সেই আদিম অনুভবের মধ্যে "আমি"টাকে প্রথমে উদ্ধার করিয়া লইলাম। ধরুন, তদ্‌গত চিত্তে ঐ নিমাই সন্ন্যাসের ছবিখানা দেখিতেছি। খানিকক্ষণ হয় ত ঐ ছবিটার মধ্যেই আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া থাকি। ইহাই অব্যক্ত গোড়াকার অনুভব। তার পর মনে হয়—ওহো, আমি যে দেখিতেছি। "আমি"র কথা মনে জাগিল। অদিতির গর্ভে ইনিই প্রথম প্রসব। বেদ ইঁহাকে বলিতেছেন অগ্নি। সাটে বলিতেছেন জলের গর্ভে অগ্নির উদ্ভব হইল। তার পর? তার পর "আমি" হয় ত ভাবিলেন—ঐ ছবিখানা সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা ত আমারই জ্ঞান। "আমি" একটা বৃত্তি বা প্রত্যয় বিশেষে অধ্যাস করিলেন। ঐ ছবির দৃষ্টান্তে জগতের ব্যাপারটাও বুঝিয়া লউন। গোড়ায় একটা অনির্ব্বচনীয় অনুভব। ইহা অদিতি। তার পর ইহার মধ্য হইতে একটা "আমি"র জ্ঞান ফুটিয়া উঠিল। তার পর সেই "আমি" ভাবিলেন, এ অনুভব যে আমারই অনুভব, এ জগৎ যে আমারই জগৎ। বিশ্বের উদয়ে "আমি"র এই প্রকার যে অভিনিবেশ বা অধ্যাস, তাহা হইল ঐশ্বর্য্য, ঈশ্বরপদবী। ইহাই বেদের প্রাজাপত্য। প্রজাপতি দক্ষ তাই অদিতির

গর্ভে জন্মিয়া, তাঁহাকে আবার কন্যারূপে পাইলেন। কন্যারূপে কেন? জগতের মূল উপাদানটি হইতে "আমি", অর্থাৎ দক্ষ, জন্মিয়া ভাবিলেন, এ উপাদানটি আমাদেরই, আমাকে ইহা লইয়া ভাঙ্গিতে গড়িতে হইবে। ইহাই হইল দক্ষের ঈক্ষণ—তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়। তার পর তিনি ঈক্ষণ পূর্ব্বক তেজ সৃষ্টি করিলেন; তার পর অপ্‌, ইত্যাদি। এই ঈক্ষণের ফলে জগতের মূল বস্তুটি তাঁহারই যেন গড়িয়া-পিটিয়া লওয়ার বস্তু হইল। অর্থাৎ অদিতি তাঁহার কন্যা হইলেন। গোড়ায় অদিতির যা মানে, পরে কিন্তু ঠিক সেই মানে লইলে চলিবে না। গোড়ায় অদিতি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, পরে তিনি যেন হইলেন মায়া বা প্রকৃতি। আরও পরে হয় ত আকাশ ও ঈথার হইলেন। সত্য সত্যই আগে পরে মনে করিবার অধিকার আমাদের আছে কি না, জানি না; তবে সৃষ্টি মানিতে গেলে, এবং সেটাকে বুঝিতে গেলে, আমাদিগকে 'আগে, পরে' এই ভাবেই কথাবার্ত্তা কহিতে হয়। একটা বৈদিক হেঁয়ালির সমাধানের চেষ্টা ত আমরা করিলাম। পুরাণে, তন্ত্রে এই রকম অনেক সব হেঁয়ালি আছে। প্রথমটা তাহা নিতান্তই আজগবি বলিয়াই মনে হয়। শিব শুইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার নাভি হইতে একটা কমল নির্গত হইয়াছে; সেই কমলে বসিয়া শ্যামা শিশু-রূপী শিবকে স্তন্যপান করাইতেছেন। আদিম জলরাশির মধ্যে এক অণ্ড উৎপন্ন হইল। সেই অণ্ডের মধ্য হইতে হিরণ্যগর্ভ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহাকে দুই ভাগ করিয়া ফেলিলেন; উপরে হইল দ্যুলোক, নীচে হইল ভূলোক, মাঝখানে অন্তরীক্ষ। এ ডিম্বকে আপনারা হয়ত অনেকে অশ্ব-ডিম্বই ভাবিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এ জাতীয় কথা-বার্ত্তাগুলি সাঙ্কেতিক (symbolic)। অদিতি ও দক্ষের যে উপাখ্যান আমি আজ আপনাদের শুনাইলাম, তার পর, আশা করি, আপনারা এই সমস্ত তান্ত্রিক ও পৌরাণিক রহস্যগুলিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে হঠকারিতা প্রকাশ করিবেন না। তন্ত্র ও পুরাণের কথা থাকুক, বেদের মধ্যে অনেক স্থলেই হেঁয়ালির ভাষায় কথাবার্ত্তা কহা হইয়াছে। ইহা যেন—"যেবা পার বুঝহ সন্ধান"। কোন কোন স্থলে হেঁয়ালির মর্ম্ম বুঝিতে বেশি বেগ পাইতে হয় না; আবার অনেক স্থলে বুঝিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতে হয়—আজিকে যেমন। ১।৯৫।৪ বলিতেছেন—"অন্তর্নিহিত অগ্নিকে তোমাদের মধ্যে কে জানে? সে অগ্নি-পুত্র হইয়াও হব্য দ্বারা তাঁহার মাতাদিগকে জন্মদান করেন। মহৎ অগ্নি জলের গর্ভ স্বরূপ, এবং সমুদ্র হইতে নির্গত হয়েন। "ক ইমং বো নিণ্যং আ চিকেত" ইত্যাদি। সায়ণ ভাষ্য লিখিতেছেন - "সোঽয়মগ্নির্বৎসঃ মেঘস্থানাং অপাং বৈদ্যুতাগ্নিরূপেণ পুত্রস্থানীয়ঃ মাতৄঃ তস্য মাতৃস্থানীয়ানি বৃষ্ট্যুদকানি স্বধাভির্হবির্লক্ষণৈ রন্নৈর্জনয়ত উৎপাদয়তি। তথা চ স্মর্য্যতে—অগ্নৌ প্রাস্তাহুতি সম্যগাদিত্য-মুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ইতি। অপিচ বহ্বীনাং মেঘস্থানাং অপাং গর্ভঃ বৈদ্যুতরূপেণ গর্ভস্থানীয়ঃ সোঽগ্নি।" ইত্যাদি। মেঘের জল হইতে বিদ্যুৎ হয়, অতএব বৈদ্যুতাগ্নি জলের বৎস। আবার অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া যায়, তাহার সূক্ষ্ম অংশগুলা আদিত্যে গিয়া বৃষ্টির সৃষ্টি করে। অতএব অগ্নি আবার জলকে জন্ম দেন, তিনি বৎস হইয়াও মাতাকে উৎপন্ন করেন। এ হেঁয়ালিটা সায়ণ এইরূপ সোজাসুজি ভাঙ্গিয়া দিলেন। অবশ্য কথাটায় আমাদের সংশয় মিটিল না। মেঘে বিদ্যুৎ দেখিতেই পাই, কিন্তু হয় কিরূপে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আবার, আগুণে আহুতি দিলাম, সে আহুতির অংশগুলি আদিত্যে কেমন করিয়া পৌঁছিল, এবং তার ফলে বৃষ্টি যে কেমন করিয়া হইল তাহা আদপেই বুঝিলাম না। এইখানে নব্য-বিজ্ঞান টীকা লিখিতে বসিবেন। আমরা সে টীকা পরে শুনিব। আপাততঃ আরও দুটো-একটা হেঁয়ালির নমুনা শুনুন। ১।৯৫।১ বলিতেছেন—"বিভিন্নরূপ বিশিষ্ট দুই কাল বিচরণ করিতেছে; তাহারা পরস্পরে পরস্পরের বৎসকে পালন করে।" "দ্বে, বিরূপে চরতঃ স্বর্থে অন্যান্যা বৎসং উপধাপয়েতে" ইত্যাদি। সায়ণ ভাষ্য লিখিতেছেন—"তে চ অহোরাত্রে অগ্নেঃ সূর্য্যস্য চ জনন্যৌ তত্র রাত্রেঃ পুত্র সূর্য্য সহি গর্ভবদ্ রাত্রৌ অন্তর্হিতঃ সন্ তস্যাশ্চরয়ভাগাদুৎ-পদ্যতে। অহঃ পুত্রোঽগ্নিতা সহি তত্র বিদ্যমানোপি প্রকাশরাহিত্যেন অসৎকল্পঃ সন্ তস্মাদহ্ন সকাশান্নির্মুক্তঃ প্রকাশমানং স্বাত্মানং লভতে। অনয়ো রেতায়বঃ পুত্রত্বং চ তৈত্তিরীয়ৈ রাম্নায়তে—তয়ো বেতে বৎসৌ অগ্নিবাদিত্যশ্চ রাত্রের্বৎস শ্বেত আদিত্যঃ অহ্নোঽগ্নি স্তাম্রারুণ ইতি।" রাত্রির গর্ভে অন্তর্হিত থাকিয়া তাহার

চরমভাগে সূর্য্য প্রকাশিত হন, অতএব শ্বেত সূর্য্য রাত্রির বৎস। আবার, অগ্নি দিবাভাগে নিষ্প্রভ থাকিয়া সন্ধ্যায় তাম্রারুণ রূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠেন, অতএব অগ্নি দিবার বৎস। কালো গাইয়ের বাছুরটি সাদা, আর সাদা গাইয়ের বাছুরটি তামাটে, তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠক হইতে নজির তুলিয়া সায়ণ এ হেঁয়ালি ভাঙ্গিলেন। এ ভাষ্যের উপরও নব্য-বিজ্ঞান যে টীকা লিখিবেন, তাহা আমাদের ক্রমশঃ শুনিতে হইবে। আপাততঃ আমরা এইটুকু দেখিলাম যে, বেদ নানা যায়গাতে হেঁয়ালির ভাষায় যে সব কথা কহিয়াছেন, সে-সব কথা আজগবি বলিয়া হঠাৎ উড়াইয়া দিতে গেলে চলিবে না। সে সব হেঁয়ালির সমাধান করিতে বসিয়া অনেক স্থলে নব বিজ্ঞানের সূত্র বেশ কাজে লাগিবে; কোন কোন স্থলে আবার আধিভৌতিক ব্যাখ্যায় কুলাইবে না, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত উঠিতে হইবে। আজ আমাদের অদিতির রহস্য বুঝিতে গিয়া তাহাই করিতে হইয়াছে। Physicsএ কুলায় নাই; Meta-Physics পর্য্যন্ত উঠিতে হইয়াছে। একেবারে গোড়ার কথা শুধু জড়বিদ্যার সূত্র-নির্দ্দেশ হইতে বুঝিতে যাওয়া চলিবে না। বেদ যে জগতের গোড়ায় চৈতন্যকেই বসাইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ করা চলে না। বিলাতী পণ্ডিতেরা বলিতেন যে, সাবেক মন্ত্রগুলিতে সর্ব্বব্যাপী একটা চিৎপদার্থের কোনই সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না; হালের মন্ত্রগুলিতে, বিশেষতঃ দশম-মণ্ডলের কোন কোন সূক্তে, সেই চিৎপদার্থ ইন্দ্ররূপে, প্রজাপতিরূপে, বিশ্বকর্ম্মা-রূপে অথবা হিরণ্যগর্ভরূপে ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। গোড়ায় বৈদিক ঋষিদের শিশুর মত সরল দৃষ্টি,—ক্রমশঃ প্রবীণতার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টির গভীরতা ও প্রসার হইয়াছে। এ বিলাতী মতের কোনও জমাট ভিত্তি আমি ত বেদের মধ্যে খুঁজিয়া পাই না। বরং স্থূল ও স্পষ্ট জিনিসগুলিকে সাম্‌নে ধরিয়া ও প্রতীক্ ভাবে লইয়া সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধান বেদের সকল "স্তরে"ই হইয়াছে বলিয়া ত আমার মনে হয়। বেদের মন্ত্রের যথাযথ ভাবে অর্থ-চৈতন্য করিয়া লইতে পারিলে, তাহাদের মধ্যে ঋষিদের শৈশবের কোনই কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে অবশ্য অন্যান্য মণ্ডল অপেক্ষা দশম মণ্ডলে ঠিক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে জগৎটাকে দেখার আয়োজন কিছু বেশী আছে। গোড়ার দিকে আধ্যাত্মিক ভাবের ফল্গু-প্রবাহ প্রবাহিত হইলেও আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভাবের কথাই স্পষ্টতঃ সাম্‌নে উপস্থিত রহিয়াছে। কাজেই ঠিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বোঝা পড়া এই সব যায়গাতেই হওয়ার সুযোগ বেশি।

অকূলে

অধ্যাপক শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্

জাগরণে ঘুমের ঘোরে' তোমায় জড়াই নানা ডোরে,
ফক্কা গেরো শুধু;
আকাশ করে ধু-ধু।
আবার ফিরে পাকাই দড়ি; বিশ্ববেড়া জালটি গড়ি;
আমি বলি বাহা।
শুনি ধ্বনি হা-হা।
নিংড়ে ব্যথা গোটা-গোটা যে জল ফেলি ফোঁটা ফোঁটা
কেউ ভেজে না তাহে;
আমি জ্বলি দাহে।
অবোধ্যকে বলি মায়া,— উদ্‌ভ্রান্ত ভাবের ছায়া;
ঘোচে না তায় জ্বালা,—
দুঃখ-শোকের পালা।

কোন্ সাগরের ঢেউ লাগে রে ও পারে কি কেউ জাগে রে?
চিন্তা কাঁপে শুধু;
অকূল করে ধু-ধু।

রাজগী।

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(২১)

দ্বিপ্রহর রাত্রে যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন সাবিত্রী শাইবার ঘরের সামনের বারান্দায় একলা বসিয়া,—লণ্ঠনের সম্মুখে বসিয়া সে কি একখানা বই পড়িতেছে। আমি আসিতেই সে বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমি মুখ হাত ধুইয়া আসিলে, সে আমার খাবার দিল। আমার আসন করা ছিল, রূপার গেলাসে জল ভরিয়া সরপোষ দিয়া ঢাকা ছিল। সে সামনের জায়গায় একটু জল ছিটাইয়া হাত দিয়া মুছিয়া দিল। তার পর ঠাকুরকে ভাত আনিতে বলিল। খাওয়ার সময় বসিয়া সে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার চিত্তে আমার খাওয়ার তদ্বির করিতে লাগিল।

আমি খাইয়া উঠিলে, সে সেই পাতে খাইতে বসিল। আমি গিয়া আমার ঘরে শুইয়া পড়িলাম।

খানিক পরে সাবিত্রী ঘরে আসিল। বাতিটা কমাইয়া দিয়া সে একটা রূপার গ্লাসে জল গড়াইয়া আমার বিছানার পাশে একটা টিপায়ের উপর রাখিল। গ্লাশটা রাখিবার আগে আঁচল দিয়া টিপায়খানি বেশ করিয়া মুছিয়া রাখিল।

সে দিন রাত্রে ভয়ানক গরম হইয়াছিল। পাখা টানিবার চাকর তখনও আসে নাই; আমি একখানা পাখা লইয়া নিজেকে বাতাস করিতেছিলাম।

সাবিত্রী এক মুহূর্ত্ত আমার দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিল। অর্দ্ধ আলোকে মনে হইল, বুঝি বা তার মুখখানা লজ্জায় একটু লাল হইয়া উঠিল। তার পর সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পাশেই তার শুইবার ঘর, সেখানে আলমারী খোলা ও বন্ধ করার শব্দ পাইলাম।

একটু পরে আবার সে ঘরে আসিল। আমার বিছানার উপর মশারির ভিতর উঠিয়া বসিল। আমি ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। একটু অস্বস্তি বোধ করিলাম। কিন্তু সাবিত্রী সম্পূর্ণ নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মত আমার শিয়রের কাছে বসিয়া একখানা বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

আমি ভয়ানক সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। নিতান্ত অপরাধীর মত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়া রহিলাম,—সাবিত্রী বসিয়া বাতাসই করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, "আজ এত রাত্রে যাওয়া হ'য়েছিল কোথায় ?"

স্পষ্ট অভিযোগ ও সন্দেহের সুর! সেই চির-পরিচিত সাবিত্রীর বিচারক মূর্ত্তি! সপাং করিয়া পিঠে চাবুক মারিয়া কে যেন আমাকে সম্পূর্ণ সজাগ করিয়া দিল।

আমি তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিলাম, "মহাভারতের কথা শুনছিলাম।"

শ্লেষটা সাবিত্রী অবশ্যই বুঝিতে পারিল না। তার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু স্পষ্টই বুঝিলাম যে তার মুখে একটা ভাবান্তর হইয়া গেল।

টানা পাখা একটু পরে নড়িয়া উঠিল। চাকর খাইয়া আসিয়াছে।

সাবিত্রী পাখা রাখিয়া মশারীর বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া স্থির কণ্ঠে বলিল, "আমার গোটাকয়েক কথা আছে আমি তোমাকে বলেছিলাম। তা' এত দিন তো তোমার শোনবার সুবিধা হ'ল না। আজ অনেক রাত্রি হ'য়েছে; কাল বাইরে যাবার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা করো'—কথা কটা তোমায় বলবো। তার আগে বাহিরে যেও না তুমি।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে গর্ব্বিতা নারী দীর্ঘ সুগঠিত দেহে দৃপ্ত শোভার তরঙ্গ তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি রুষ্ট-দৃষ্টিতে সেই দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। তার পর ছাদের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নিশ্চল ভাবে পড়িয়া রহিলাম।

পাশ ফিরিয়া শুইতে হাত পড়িল সেই পাখাখানার উপর। পাখাখানা হাতে করিয়া তুলিয়া দেখিলাম। অপূর্ব্ব সুন্দর সে পাখা। তার ভিতর অতি সূক্ষ্ম ছুঁচের কাজ করা—সাবিত্রী যে এত সুন্দর শিল্পকার্য্য জানে, তাহা আমি জানিতাম না। পাখাখানা দেখিয়া আমার মনটা ভয়ানক বিচলিত হইয়া উঠিল।

এই পরিত্যক্তা নারী যে আজিকার এই অবসরের প্রতীক্ষায়ই এই পাখাখানা তার সকল কলাকুশলতা ঢালিয়া বুনিয়া সোনার হাতল বাঁধাইয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রহিল না। তাই মনটা বিচলিত হইয়া উঠিল। আমি এখানে আসিবার পর হইতে সে যে নিপুণ নিষ্ঠার সহিত আমার সেবা করিতেছে, তাহা আমি লক্ষ্য না করিয়া পারি নাই। সে সেবায় আমাকে কুণ্ঠিত লজ্জিত করিয়াছে, আমি আপনাকে কতকটা হীন বোধ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে আমার অন্তর এত দিন এত বিচলিত করিতে পারে নাই। আজ এই পাখাখানার হঠাৎ আবির্ভাবে আমার স্পষ্ট মনে হইল যে, এই সেবা ও নিষ্ঠা সাবিত্রীর কেবল একটা সাময়িক খেয়াল ন[illegible] ইহা তার দীর্ঘ সাধনার বস্তু। বিধুর লাঞ্ছনার পর হই[illegible] এই বোধ হয় তার সঙ্গে দীর্ঘ সহবাস। এত দিন তা[illegible] কাছে আমি আসি নাই, তার সঙ্গে একটা কথাও ক[illegible] নাই, তার নিয়মিত পত্র আমি নিয়মিত রূপে আগুনে পুড়াইয়াছি। এত দিন তার এমন আশা করিবার কোন[illegible] কারণ হয় নাই যে, আমি আবার ফিরিয়া তার কাছে আসিব, আবার সে আমার সেবার অবসর পাইবে। ত[illegible] সে যে আশা করিয়াছে এবং এই অবসরের জন্য আকুল ভাবে প্রতীক্ষা করিয়াছে,—সে আমাকে কামনা করিয়াছে।

মনটা ভারি অস্থির হইয়া উঠিল। আমার নিজেকে ভারী অপরাধী মনে হইল। এই পতিপ্রাণা সাধ্বীকে আমি এই দীর্ঘ কয় বৎসর কঠোর লাঞ্ছনা করিয়াছি ভাবিয়া, আমার মন অনুতাপে ভরিয়া উঠিল। মনে মনে তার নিঃসঙ্গ জীবনের স্নেহহীন, আশ্রয়হীন বেদনার কথা ধ্যান করিলাম। এত ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে বসিয়া সে তার ভালবাসা ও তার সেবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া কি ব্যথাতুর ভাবে এ দীর্ঘ কয় বৎসর কাটাইয়াছে! ভাবিতে তার উপর সমবেদনায় প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল।

আমি উঠিয়া বসিলাম। তার পর বিছানা হইতে উঠিয়া ঘরে পায়চারী করিতে লাগিলাম। মনটা ভারি বিষণ্ণ, অনুতাপদিগ্ধ হইয়া উঠিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য্য পুলকে শরীর মন স্নিগ্ধ হইয়া আসিল। এত দিন আমি নারী-প্রসঙ্গে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু পতিপ্রাণা সাধ্বীর প্রেম লাভ যে কি সৌভাগ্য, কি আনন্দ—তাহা কোনও দিনই বুঝি নাই। আজ সেই সৌভাগ্য কল্পনা করিতে হৃদয়ে আনন্দের মন্দাকিনী বহিয়া গেল। সাবিত্রীর গৌরবময়ী মূর্ত্তিখানি, তার এই মাসাধিক কালব্যাপী স্নিগ্ধ-নিপুণ সেবা আমার সমস্ত হৃদয়-মন আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

আমার মনে হইল—কি মূর্খ আমি! দশ বছর আগে চটুলা বুদ্ধিহীনা বালিকা কি কথা বলিয়াছিল, কি করিয়াছিল, তাই স্মরণ করিয়া আমি তার জীবনভরা শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলাম! ইহার মধ্যে একটিবার তাকে তার মনের কথা বলিবার অবসর দেই নাই। হয় তো সে কত অনুতাপ-ভরা পত্র লিখিয়াছে, হয় তো কত

…হের সম্ভাষণ সে করিয়াছে! না জানি, কত আকুল ক্রন্দন সে করিয়াছে তার সেই সব পত্রে, যা আমি একেবারে না পড়িয়া অগ্নিতে বিসর্জ্জন করিয়াছি। এক একবার চিঠিগুলি পড়িয়া দেখিলে আমার কোনও ক্ষতি ছিল না। কোনও দিন তার চিঠির উত্তর সে পায় নাই, তবু চিঠি বরাবরই সে লিখিয়াছে। বরাবরই সে হয় তো তার হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া আমার কাছে ধরিয়া আসিয়াছে—আমি দয়া করিয়া তাহা পড়িবার অবসর পাই নাই। যদি দেখিতাম, তবে হয় তো জীবনের অর্দ্ধেক ভুল করিতাম না। তবে হয় তো সময় থাকিতে ফিরিতে পারিতাম। আজ আমার সম্পদ খোয়াইয়া চরিত্র ও প্রতিষ্ঠা সব হারাইয়া, প্রহৃত কুক্কুরের মত তার কাছে ফিরিতে হইত না। রাণী হইয়া সে জন্মিয়াছে, রাণী হইয়া সে আমার ঘরে আসিয়াছে। চিরদিন আমি তাকে রাণী করিয়া রাখিতে পারিতাম, নিজের সৌভাগ্য দু হাতে কুড়াইতে পারিতাম! কিন্তু আজ! আজ তো আর তাকে রাণী করিয়া রাখিবার শক্তি আমার নাই। এখন যে আমার সম্পত্তি যায়-যায়। কে জানে আমায় পথের ভিখারী হইতে হইবে কি না?

আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া সামনের বারান্দায় গেলাম। কে যেন আমাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। আমি চলিলাম সাবিত্রীর ঘরের দিকে।

বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। অন্দরের সব ঘর স্তব্ধ, এদিকে লোকের সাড়া মাত্র নাই। পাখাওয়ালা ছোকরা নীচতলায় বসিয়া পাখা টানিতেছে। তবু আমি সচকিত-দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া পা টিপিয়া অগ্রসর হইলাম। কোনও অপকার্য্য করিতে কোনও দিন এত সঙ্কুচিত হই নাই। ভদ্র পরনারীর আপন শয়ন-কক্ষে যাইতেও আমি কখনও এত কম্পিত হই নাই। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি অতি কুণ্ঠিত-চিত্তে সাবিত্রীর দরজার সামনে আসিলাম। দেখিলাম দুয়ার বন্ধ, খিল দেওয়া।

আমি থমকিয়া গেলাম। ভয়ানক আকাঙ্ক্ষা হইল, ছুটিয়া পলাই; আবার তীব্র ইচ্ছা হইল, দুয়ারে ঘা দেই। শেষে ধীরে ধীরে দুয়ারে ঘা দিয়া ডাকিলাম "সাবিত্রী!" কোনও উত্তর পাইলাম না। এত শীঘ্র সে কখনও ঘুমায় নাই। দরজার ফাঁক দিয়া এইটুকু দেখিলাম যে, তার ঘরে আলো উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে। এত উজ্জ্বল করিয়া আলো জ্বালিয়া সাবিত্রী নিশ্চয় ঘুমায় না। আমি আবার আস্তে ডাকিলাম। সাড়া পাইলাম না। আর ডাকিতে সাহস হইল না। মনে হইল, আমি ভয়ানক স্পর্দ্ধার কাজ করিতেছি,—সাবিত্রী সাধ্বী, ধর্ম্মপরায়ণা,—আমি পাপিষ্ঠ। সে আমাকে স্বামী বলিয়া সেবা করিতে পারে, পূজা করিতে পারে,—তাই বলিয়া সে যে আমার মত নীচ-চরিত্রকে স্বামীর পরিপূর্ণ অধিকার দিবে, ইহা সম্ভব নয়। যাহা পাইয়াছি, তাই আমার যথেষ্ট। এর বেশী আমার আশা করা উচিত নয়। আমি তো সাবিত্রীর যোগ্য নই।

তাই আর ডাকিতে সাহস হইল না, ফিরিলাম। ফিরিবার সময় সাবিত্রীর ঘরে শব্দ শুনিলাম। তাহাতে বুঝিলাম, সে এখনো জাগিয়া আছে। তবে সে ইচ্ছা করিয়াই আমার ডাকে সাড়া দেয় নাই,—আমার মন বুঝিয়া সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এ কথা ভাবিতে একটু রাগ হইল; কিন্তু অপরাধ-কাতর চিত্তে রাগ বেশীক্ষণ থাকিল না! তার কোনও দোষ আমি দিতে পারিলাম না। মনটা বিষণ্ণ হইল; তবু তার উপর রাগ করিবার অধিকার আমার নাই, তাহা বুঝিলাম।

কিন্তু সাবিত্রীর উপর যে প্রীতি এতক্ষণ আমার অন্তরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা দমিয়া গেল। আমি অনুভব করিলাম যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সাবিত্রীর কথার ঝাঁঝ কমিয়াছে, ব্যবহার সংযত হইয়াছে; কিন্তু তার অন্তর ঠিক আগের মত ক্ষমাশূন্য বিচারপরায়ণ হইয়াই আছে। সে আমার সেবা যতই করুক, ভাল সে আমায় বাসে না। আমি তার হয় তো একটা পূজার প্রতীক, স্বামিত্বের একটা বিগ্রহ মাত্র,—তার সেবা তার ধর্ম্মের অঙ্গ, অন্তরের প্রীতির প্রকাশ নয়।

রাধাচরণের কাহিনীতে আমার অন্তর ভয়ানক দমিয়া গিয়াছিল। সাবিত্রীর প্রেমের কল্পনা আমার সে অবসাদ সম্পূর্ণ দূর করিয়া আমার ভিতর জীবনের আশা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সে আশা এই চিন্তায় একদম মুশড়াইয়া গেল। দ্বিগুণ অবসাদে আমি শুইয়া শুইয়া ভাবিতে

লাগিলাম, আমার ভবিষ্যতের কথা, আমার আর্থিক ব্যবস্থার কথা, গোবিন্দের শয়তানির কথা, সাবিত্রীর কথা, আমার প্রেম-পিপাসিত বঞ্চিত অন্তরের কথা, বিধুর কথা, তার মৃত্যুর কথা। আকাশ-পাতাল তোলপাড় করিয়া ভাবিলাম। মাথার ভিতর দপ্ দপ্ করিতে লাগিল, শরীর উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

এমনি করিয়া রাত্রি প্রভাত হইলে, আমি উঠিয়া খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইলাম। উষার স্নিগ্ধ বাতাস লাগিয়া মাথাটা অনেক ঠাণ্ডা হইল। স্নানের ঘরে জল ছিল, আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিয়া কতকটা সুস্থ হইয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

(২২)

স্নানের পর কাপড় চোপড় পরিয়া আমি সাবিত্রীর ঘরে গেলাম। বেশ একটু শক্ত হইয়াই গেলাম। সে রক্ত-মাংসে-গঠিত আমাকে তো চায় না, সে চায় আমাকে পাথরের মূর্ত্তির মত পূজা করিতে। আমি পাথরের মত শক্ত হইয়াই তার কাছে গেলাম।

আমি বাহিরে চা খাই, কিন্তু আজ চাকরকে বলিয়া দিলাম সাবিত্রীর ঘরে চা দিতে।

সাবিত্রীর ঘর খোলাই ছিল। এঘরে এত দিন প্রবেশ করি নাই,—আজ ঢুকিতে ভয়ানক নূতন নূতন বোধ হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, নূতন ঠেকিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

রাণীমা থাকিতে ঘরের যে সজ্জা ছিল, তার খুব কম জিনিসই আছে। একধারে একটা দামী বেভেল-করা কাঁচের বড় ড্রেসিং টেবিল আছে। ঘরের মাঝখানে একখানা খাট, দুটি বড় বড় আলমারি, একটা বড় লোহার আলমারী। তা ছাড়া আর কিছুই নাই।

দেখিতে পাইলাম, খাটের উপর বিছানা নাই। খাটের এক পাশে মাটিতে একখানা পুরু লামদা বিছান আছে, তার উপর চাদর পাতা, এবং তার একধারে একটা বালিস। বুঝিলাম, ইহাই সাবিত্রীর বিছানা।

সাবিত্রী আমার আসার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, তাহা বুঝিলাম। আমার ঘরেই সে আমার সঙ্গে কথা কহিতে চাহিয়াছিল। সেও অনেকক্ষণ হইল উঠিয়াছে। স্নান করিয়া একখানা মুগার শাড়ী পরিয়া সে ঘরের এক কোণে পূজায় বসিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া সে ভয়ানক অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হইয়া উঠিল। তার সমস্ত মুখ গোলাপ ফুলের মত টুক্‌টুকে হইয়া উঠিল, ঠোঁট দুখানি একটু সলজ্জ হাস্যে বিস্তৃত হইয়া গেল।

আমি দেখিলাম পাষাণ-মূর্ত্তিতে প্রাণ-সঞ্চার হইয়াছে। তার এই পূত-শুদ্ধ মূর্ত্তি মুগার শাড়ীতে বেষ্টিত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। তার গায় জামা নাই, অঙ্গের স্বাভাবিক সৌষ্ঠব চারিদিকে কাপড়ের ভিতর দিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মাথায় তার কাপড় নাই, সদ্যঃস্নাত দীর্ঘ কেশরাশি তরঙ্গায়িত হইয়া সমস্ত পিঠ ছাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

সে অঞ্জলি ভরিয়া ফুল তুলিয়া মন্ত্র পড়িতেছিল,—পূজায় সে তন্ময় হইতে পারে নাই। আমি যে পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, তাহা অনুভব করিয়া সে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল, তাহা দেখিতে পাইলাম। সে লজ্জা খুব বেদনাময় বলিয়া আমার মনে হইল না। আমি তন্ময় হইয়া তার এই পবিত্র রূপরাশি দেখিতে লাগিলাম। নারীর রূপ অনেক দেখিয়াছি,—কখনও এমনটি দেখি নাই। আর, কখনও এমন পবিত্র শুদ্ধ চিত্তে নারীর সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিতে পারি নাই। আমার সমস্ত অন্তর একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আপ্লুত হইল।

তার দিক হইতে চক্ষু সহসা ফিরাইতে পারিলাম না। যখন পারিলাম, তখন তার সম্মুখে পূজার আয়োজনের দিকে চাহিলাম। দেখিতে পাইলাম, টাটের উপর পাথরের শিব একেবারে ফুল বেলপাতায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তার ওধারে দেখিলাম—আমারই একখানা ফটোগ্রাফ। সাবিত্রীর শিবপূজা হইয়া গিয়াছে, সে পুষ্পাঞ্জলি সঙ্কল্প করিয়া দিতেছিল আমারই ছবির পায়!

হঠাৎ সাবিত্রী ফিরিয়া সে পুষ্পাঞ্জলি আমার পায় দিয়া, গলায় আঁচল জড়াইয়া আমাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া বসিল। তার সমস্ত মুখ এমন লজ্জায় রঙ্গিন হইয়া উঠিয়াছিল যে, আমি তার সেই শোভা হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না।

সাবিত্রীর ঘরে চেয়ারের বালাই ছিল না। সে তাড়াতাড়ি একখানা গালিচা টানিয়া খাটের উপর ফেলিয়া

আমাকে বসিতে বলিল, এবং নিজে একখানা জলচৌকী টানিয়া লইয়া পায়ের কাছে বসিল।

আমি যে রকম কাঠখোট্টা ভাবে কথা আরম্ভ করিব স্থির করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই হইল না। সাবিত্রীর এই পূজা আমার মনটা এত নরম করিয়া দিয়াছিল যে, আমি কোনও কথাই বলিতে পারিলাম না। তার দিকে চাহিয়া এমন একটা অনির্ব্বচনীয় ভাব হইল, যাহা আমি পূর্ব্বে আর কখনও অনুভব করি নাই। প্রীতিতে আমার হৃদয় অভিসিক্ত হইল; কিন্তু এমন মনে হইল না যে, সাবিত্রীকে সাপটিয়া কোলে জড়াইয়া ধরি। তাকে এতটা জীবন্ত দেবীর মত মনে হইতেছিল যে, তাহাকে আলিঙ্গন করা যেন একটা দারুণ অপরাধ হইবে বলিয়া মনে হইল। শ্রদ্ধা আমার প্রীতিকে অভিভূত করিল।

সাবিত্রীরও কথা কহিতে স্পষ্টই সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। তার পূজার মহামুহূর্ত্তেই যে সে এমন করিয়া ধরা পড়িয়া গেল, সেই লজ্জায় যেন তার কথাবার্ত্তা একেবারে শুকাইয়া গেল। সে কেবল মাটির দিকে চাহিয়া লজ্জিত ভাবে হাতে নখ খুঁটিতে লাগিল।

আমরা দুজনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

একটি ঝি একখানা ট্রে'তে করিয়া আমার চা লইয়া আসিল। আমি চাকরকে বলিয়াছিলাম,—জানিতাম না যে, এ ঘরে চাকরের প্রবেশ নিষেধ। ঝি চা আনিতেই, সাবিত্রী তার হাত হইতে সেটা লইয়াই, তাহাকে ধমক দিয়া উঠিল। ঝি এ কাজে অভ্যস্ত নয়,—ট্রে বহিয়া আনিতে সে আমার খাবারের ভিতর অন্যমনস্ক ভাবে একটু চা ফেলিয়া দিয়াছে।

সাবিত্রী ট্রেটা মাটীতে নামাইয়া রাখিয়া, একখানা চাদর গায় জড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে একখানা রূপার রেকাবীতে সুন্দর করিয়া খাবার সাজাইয়া আনিল; এবং চায়ের বাটী ফরসা কাপড় দিয়া খুব করিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া, তাহাতে এক পেয়ালা চা তৈয়ার করিয়া আমার সামনে রাখিল।

সাবিত্রীর সেবা-নৈপুণ্যে আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

চা খাওয়া হইলে আমি বলিলাম, "কি কথা বলতে চেয়েছিলে সাবিত্রী?"

সাবিত্রী একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "কথাটা বড় গুরুতর—হয় তো অপ্রিয়ও। কিন্তু রাগ করো না। বলতে চেয়েছিলাম, তোমার সম্পত্তির ব্যবস্থার কথা। তোমার যেমন খরচ-পত্র, তাতে সম্পত্তি থাকাই কঠিন। দেওয়ানজী তো—আমি টাকা চাইলেই বলেন যে, তোমার টাকাই তিনি দিয়ে উঠতে পারছেন না। এতে আমার ভয়ানক অসুবিধা হ'চ্ছে। আমি কয়েকটা সামান্য কাজ হাতে নিয়েছি; সদা সর্ব্বদাই আমার টাকার দরকার হয়। তাই বলছিলাম কি, যে, তুমি আমাকে কতকটা সম্পত্তি লিখে দেও,—অন্ততঃ তার উপস্বত্বটা দিয়ে দেও, যাতে আমি ইচ্ছামত ধর্ম্ম-কর্ম্ম ক'রতে পারি।"

কথাটা আমার বর্ত্তমান মেজাজে অত্যন্ত বেসুরা ঠেকিল। এটা যেন ভয়ানক স্বার্থপরের মত বোধ হইল। এমনও একটু সন্দেহ হইল যে, বুঝি-বা আমার সেবা পূজার এত আড়ম্বর আমাকে ভুলাইয়া এই সম্পত্তিটুকু আদায় করিবার জন্যই। এ কথাও একটু মনে হইল যে, এমনও হইতে পারে যে, এই স্বামী-পূজাটা একটা তুক-তাকের অঙ্গ, যাহাতে স্বামীকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া তাহার কাছে এই সম্পত্তি আদায় করা যায়। কিন্তু আমি ঠিক চটিলাম না।

ধীর ভাবেই আমি বলিলাম, "আচ্ছা, সে কথা আমি বিবেচনা করে' দেখবো। কিন্তু এই সম্পর্কে আমার তোমাকে একটা কথা বলা দরকার। তুমি হয় তো জান না, আমি কি রকম দেনায় জড়িত হ'য়ে পড়েছি। আর আমার সন্দেহ হয় যে, দেওয়ান আর নায়েবগুলো মিলে আমার অনেকটা লোকসান করে' ফেলেছে।"

মাথা খাড়া করিয়া সাবিত্রী বলিল, "আমি জানি না? আমি তো তোমাকে তিন বৎসর আগে সব কথা জানিয়েছিলাম। বাবাকে এনে সব দেখতে শুনতে ব'লেছিলাম। তিনি বল্লেন যে, তুমি না বল্লে তিনি ভার নিতে পারেন না। তাই তোমাকে সব কথা জানিয়ে বাবাকে লিখতে ব'লেছিলাম। তা' তুমি তো সে কথা গ্রাহ্য করনি। সে চিঠির জবাবই দেওনি। কোন্ চিঠিরই বা জবাব দিয়েছ?"

সাবিত্রী একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমিও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "যা'ক, সে সব

কথা তুলে' আর কি হবে? যা ব'লছিলাম,—আমার বিষয়ের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ বোধ হ'চ্ছে। এখন আমরা খুব ব্যয় সংক্ষেপ করে' না চালালে, আর আমাদের উদ্ধারের আশা নেই। আমি শুনলাম, তোমার খরচপত্র ভয়ানক বেশী। তোমার খরচের হাতটা একটু না কমালে তো চলে না, সাবিত্রী!"

সাবিত্রীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, তার কপালের শিরা ঈষৎ স্ফীত হইল। সে একটু উঁচু গলায় বলিল, "বেশ, বেশ, আমার খরচ বেশী! এই কথা বলবে বই কি! আমার খরচ বেশী ব'লে তোমার মনোহর সার কাছে দেনা হ'য়েছে, না? তা বেশ, শুনি কি শুনেছ তুমি? আমার কোন খরচটা বেশী? আমার কাপড় চোপড়, গয়না, না আসবাব, না মোটর বোট? কি দেখছো বেশী খরচের?"

মোটর বোটের কথার মধ্যে বেশ একটু খোঁচা ছিল। সে খোঁচাটা আমার মনে বিষের হুলের মত বিঁধিল। আমিও একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিলাম, "এই ধর না, তুমি প্রায় তিন চার শো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পঁচিশ টাকা করে' বার্ষিক দিয়ে ব'সেছ। এটা অপব্যয়। প্রথমতঃ যে দানটা ক'রছো সেটা অপাত্রে প'ড়ছে; কেন না, এই চারশো ব্রাহ্মণের বাড়ী খুঁজে দেখলে, চারটা টোলও বেরুবে কি না সন্দেহ। তা ছাড়া, যত বড়ই সৎপাত্র এরা হ'ক না কেন, এখন আমাদের যা আয়, তাতে বছরে আট দশ হাজার টাকা ব্রাহ্মণকে বার্ষিক দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

সাবিত্রীর চোখ লাল হইয়া উঠিল, সে বলিল, "হুঁ, বুঝলাম। তার পর আর কি খরচ শুনি?"

"তা ছাড়া, তোমার মহোৎসবের খরচ, ব্রতনিয়মের খরচ আবশ্যকের অনেকটা অতিরিক্ত। হ'তে পারে যে আমাদের অবস্থা যখন এর চেয়ে ভাল ছিল, তখন তোমার এ-সব খরচ পোষাত। কিন্তু এখনকার অবস্থায় তা চলে না।"

উদ্যত রোষ যে সাবিত্রী কষ্টে আংশিকভাবে মাত্র দমন করিল, তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল। সে বলিল, "আচ্ছা, হিসাব করে দেখেছ—এই সব বাজে খরচে কত টাকা গিয়েছে? সব নিয়ে এখানে বোধ হয় বিশ বাইশ হাজার টাকার বেশী আমি বছরে খরচ করি নি। হিসাব ক'রেছ কি—তুমি ক'লকাতায় বসে' কত টাকা খরচ ক'রেছ কেবল মদ আর মেয়েমানষের পেছনে? গেল বছর তুমি তিন লক্ষ টাকা খরচ ক'রেছ, অথচ তোমার সম্পত্তির আয় এখন লক্ষ টাকাও হয় না।"

কথাটা সত্য। এ কথা স্মরণ করিয়া আমি কাল সমস্ত রাত্রি অশান্তি ভোগ করিয়াছি। কিন্তু এমনি ভাবে এ কথাটা সাবিত্রীর মুখে শুনিয়া আমার অন্তরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আমি খুব কড়া কথা বলিতে গিয়া থামিয়া গেলাম। বলিলাম,

"সে সব তো যা'হোক হ'য়ে ব'য়ে গিয়েছে। যা' হ'য়েছে তার তো আর চারা নেই। এখন অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে কি, তাই ভেবে দেখতে হ'বে। দেখে শুনে তোমার আমার দুজনেরই হাত টেনে খরচ ক'রতে হ'বে, না হ'লে একেবারে ডুববো। এই যে তুমি বল্লে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র খরচ করেছো, সেও ঠিক নয়। তুমি গোসাঁই ঠাকুরকে যে বাড়ী করে দিচ্ছ, তার দরুণই পঁচিশ হাজার টাকা তাঁকে দিতে হ'বে। এ টাকাটা বর্ত্তমান অবস্থায় তোমার নেহাৎই অপব্যয়।"

"হাঁ—অপব্যয় নয়? অপব্যয় বই কি? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বার্ষিক দেওয়া অপব্যয়, দেবতা ব্রাহ্মণকে দেওয়া অপব্যয়। গুরুদেব ইষ্টদেবতা, যিনি পৃথিবীতে জাগ্রত ভগবান, তাঁকে কুঁড়ে ঘরে রেখে নিজে প্রাসাদে বাস না করলে সেটা অপব্যয়। এ সবই অপব্যয়। আর একটা বেশ্যার স্মৃতিমন্দিরে দশ হাজার টাকা খরচ বোধ হয় খুব সদ্ব্যয়!"

এই কথাটা তীক্ষ্ণ শলাকার মত, আমার ব্যথা যেখানে সব চেয়ে বেশী, ঠিক সেইখানে গিয়া বিঁধিল। এ ইঙ্গিতের অর্থ ছিল। আমি এখানে আসিয়াই, বিধুর যেখানে বাড়ী ছিল, সে স্থানটা খাস করিয়া লইয়াছিলাম, এবং সেখানে একটা সুন্দর বাড়ী ফাঁদিয়া বসিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম এখানে আমি ধর্ম্মশালা করিব, কিন্তু মনে মনে সঙ্কল্প ছিল যে, এখানে অনাথ শিশুদের জন্য একটা ছোটখাট আশ্রম করিব। মন্দিরটি কলিকাতার শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে দিয়া নকস করাইয়া করিতেছিলাম,—তার খরচ দশ হাজার টাকার বেশী বই কম হইবে না।

বলা বাহুল্য যে, এ মন্দির বিধুরই স্মৃতিমন্দির, যদিও সে কথা আমি কাহাকেও খুলিয়া বলি নাই।

যখন আমি মন্দিরের পত্তন করিয়াছিলাম, তখন পর্য্যন্ত আমি আমার আর্থিক দুরবস্থার কথা ঠিক জানি নাই। রাধাচরণ বলিবার আগে কেহই আমাকে এ কথা বুঝাইয়া দেয় নাই, আমারও আবিষ্কার করিবার অবসর ঘটে নাই। কাল রাত্রে রাধাচরণের কথা শুনিয়াই আমার মনে হইয়াছিল যে, বিধুর স্মৃতিমন্দির তবে আমায় ছাড়িয়া দিতে হইবে। ভাবিতে বড় কষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু মন স্থির করিয়াছিলাম,—যদি কখনও অবস্থা ফেরে, তবেই ইহা সম্পূর্ণ করিব; আপাততঃ ইহা স্থগিত থাকিবে।

সাবিত্রী যে কথাটা ঠিক আঁচ করিয়াছে, তাহাতে আমি বিস্মিত হইলাম না। কিন্তু বিধুর স্মৃতির এমনি অপমান আমার অন্তরে এত জ্বালা ধরাইয়া দিল যে, আমি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া আমি বলিলাম, "দেখ, যা'খুসী তাই বলো না। আমার টাকা আমি যেমন করে' ইচ্ছা খরচ করবো, তাতে তোমার কিছু বলবার নেই। তোমার যদি তেমনি বেপরোয়া হ'য়ে খরচ করবার ইচ্ছা থাকে, তবে বাপের বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে এসো।"

সাবিত্রীও উঠিয়া সমান তেজে উত্তর করিল, "অতখানি তেজ করে আমার সঙ্গে কথা কয়ো না। শাস্ত্র খুলে দেখ গিয়ে, তোমার সম্পত্তিতে আমার অর্দ্ধেক অধিকার! তোমার চোখ রাঙানিতে আমি আমার ধর্ম্মের অধিকার ছাড়বো না।"

"তোমার অধিকার নিয়ে তুমি চুলোয় যাও" বলিয়া আমি উঠিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে চলিয়া গেলাম।

ক্রোধের আবেগ কাটিয়া গেলে মনটা ভয়ানক অপ্রসন্ন হইয়া গেল। আজ সকালের এমন মধুর আরম্ভটা এমন করিয়া খাক হইয়া গেল, ভাবিতে প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

জয়দেব

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

(কবি এবং কাব্য)

কবি কে, এবং কাব্য কি, কোন্ কবি বড়, মাঝারি অথবা ছোট, কোন্ কাব্য ভাল, মন্দের ভাল, কিম্বা মন্দ—পণ্ডিতগণ তাহার বিচার করেন। কবি জয়দেব এবং তাঁহার গীত-গোবিন্দ কাব্য লইয়া এইরূপ বিচারের অভাব নাই। স্বদেশের এবং বিদেশের প্রাচীন ও আধুনিক অনেকেই এই বিচারে যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু বিচারে মতবিরোধ ঘটিয়াছে বড় বিষম,—দুই দলে একেবারে আকাশ-পাতাল ব্যবধান! এক পক্ষ বলেন—(ইঁহারা প্রাচীন, অথবা প্রাচীনপন্থী আধুনিক) জয়দেব মহাকবি, তাঁহার গীত-গোবিন্দ কাব্য সর্ব্ব রসের আকর, মাধুর্য্যের অফুরন্ত নির্ঝর, প্রেমভক্তির পীযূষ-প্রস্রবণ,—পবিত্রতায় শ্রীমদ্ভাগবতের সমতুল্য। অপর পক্ষ বলেন,—(আধুনিক শিক্ষিত দলের অনেকেই এই পক্ষের অন্তর্ভুক্ত)—জয়দেবকে বিশেষ বড় কবি বলিতে পারা যায় না; যেহেতু, তাঁহার গীতগোবিন্দ কাব্যখানা অত্যন্ত অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, এবং অতি নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার কথা লইয়া রচিত, ভদ্র-সমাজের অপাঠ্য! উভয় দলেই পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আছেন; কিন্তু এক পক্ষ দেখেন ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে, অপর পক্ষ দেখেন সাধারণ ভাবে। প্রথম পক্ষ বলেন,—সকলকেই যে সব কিছু জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, অথবা সব পুঁথিই পড়িতে হইবে, এমন কি কথা আছে? কবি জয়দেব তো তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে মুখবন্ধ করিয়া গিয়াছেন—

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস কলাসু কুতুহলম্।
মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্" ॥

"যদি হরি স্মরণে মনকে সরস করিতে চাও, যদি তাঁহার বিলাস-কলা জানিতে তোমার কৌতূহল থাকে, তাহা হইলে জয়দেব সরস্বতীর মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী শ্রবণ কর।" অন্যথায় কি করা কর্ত্তব্য, জয়দেব তাহা না বলিয়া দিলেও,

দ্বিতীয় পক্ষ তাহা হাতে কলমে করিয়া দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ এই অধিকারবাদ মানিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন হরিস্মরণে মনকে সরস করিবার জন্য ঐ অশ্লীল কাব্য ঘাঁটাঘাঁটি করিবার আবশ্যকতা কি? তাহার তো অন্যবিধ অনেক উপায় আছে। এতদ্ভিন্ন হরিস্মরণের ইচ্ছা না থাকিলে যে গীতগোবিন্দ পড়িতে পাইব না, তাহারই বা অর্থ কি? গীতগোবিন্দ যখন একখানা কাব্য, তখন তাহা লইয়া বিচার করিবার অধিকার সকলেরই আছে।

যত গোল বাধিয়াছে ঐখানে। কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায়—গীতগোবিন্দ অশ্লীল, তাহা হইলেও কবিকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, জাতির জীবনে যে সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হয়, সেই সঙ্গীতে কণ্ঠ মিলাইয়া এক উচ্চতর গ্রামে সুর বাঁধিয়া দেওয়াও কবির কার্য্য। যে কবি সাময়িক ভাবের উপর কাব্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজকে উচ্চতম আদর্শ দান করেন,—লোকশিক্ষক, লোকগুরু হিসাবে তিনিও পূজা পাইবার যোগ্য। "সেখশুভোদয়া" প্রভৃতিতে সেকালের যে চিত্র অঙ্কিত আছে—নদীয়ার রাজপথ যখন প্রকাশ্য দিবালোকে বারাঙ্গনাগণের নূপুর-নিক্বণে ধ্বনিত হইত, সুরধুনীর পুলিন-পরিসর যখন নায়ক-নায়িকাগণের কাম-কথা সংলাপে মুখরিত থাকিত, তখনকার দিনে, সে চিত্রের রূপান্তর সাধনে শ্রীগীতগোবিন্দের মত কাব্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। যে রিপুর বিশ্বগ্রাসী লালসা দুষ্পূরণীয়, উপভোগে যাহা "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব" দিগ্দাহী দাবানলের মত বাড়িয়াই চলে, সে ক্ষুধাহরণের একমাত্র সুধা প্রেম, তাহার নির্ব্বাপনের শান্তিজল আছে শুধু ত্যাগে। তাই শ্রীগীতগোবিন্দে দেখিতে পাই—

"শ্রীজয়দেব ভনিত মিদ মুদয়তি হরিচরণ স্মৃতিসারং।
সরস বসন্ত সময় বন বর্ণন মনুগত মদন বিকারং"॥

কবি সরস বসন্তের বনানী-সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন, অনুগত মদন-বিকারের কথাও বিস্মৃত হন নাই; কিন্তু সে সমস্তই "উদয়তি হরিচরণ স্মৃতি সারং"—তাঁহাকেই স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য,—যিনি বিশ্ব-শরণ। অখিলের নিখিল সৌন্দর্য্য যাঁহার অঙ্গদ্যুতি, প্রকৃতির রূপে যদি তাঁহারই স্মৃতি জাগ্রত করিয়া না দিবে, বিশ্বের মাঝে বিশ্বেশ্বরের অনুভূতি জাগাইয়া না তুলিবে, তবে আর সে সৌন্দর্য্যের সার্থকতা কোথায়? সৌন্দর্য্যে হৃদয় উল্লসিত হইয়াছে, প্রিয়জনের জন্য মন চঞ্চল হইয়াছে, ইহাকে বিকার বলিতে পার,—ভাব মাত্রেই তো বিকার—"নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাব. প্রথম বিক্রিয়া"—কিন্তু এ বিকার তাঁহারই জন্য যিনি "সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ"। কামনা বটে—তবে রূপে রসে গানে গন্ধে বিশ্বে-বিলসিত বিশ্বপতির সেবা করিবার কামনা। ইহাই রসস্বরূপের উপাসনা, আনন্দময়ের সাধনা, ভাবগ্রাহীর ভাবনা।

জয়দেবে এই ভাব আছে বলিয়াই,—মূলতঃ শ্রীমদ্ভাগবত প্রতিষ্ঠাভূমি হইলেও,—গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রধানতঃ শ্রীগীতগোবিন্দের ভিত্তির উপরেই রচিত হইয়াছে। কিঞ্চিদধিক চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব এই কাব্যের ভাবের উচ্চতায় বিমুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের তথা প্রেমসূত্রের প্রামাণিক গ্রন্থরূপে ইহার প্রতি যে সমাদর দেখাইয়া গিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যের গোদাবরীতীরে "সাধ্য সাধন" নির্ণয়ে পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতার, রসতত্ত্বজ্ঞতা ও ভাবুকতার অপূর্ব্ব নিকষে ইহার যে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, জয়দেবের প্রকৃত মুল্য নির্দ্ধারণে আমরা তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। ধর্ম্ম কখনো মিথ্যাকে ধরিয়া গড়িয়া উঠে না, প্রত্যেক ধর্ম্মই সত্যোপেত। সে সত্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে দ্রষ্টার দৃষ্টি-ভঙ্গীকে, তাহার শাস্ত্রকে উপেক্ষা করিলে চলে না। সত্য যাহা,—তাহা চিরন্তন, তাহা বিশ্বজনীন; কিন্তু দেশ কাল পাত্রভেদে তাহার বিকাশের ধারা, প্রকাশের ভঙ্গী সর্ব্বত্রই প্রায় বৈচিত্র্যপূর্ণ ও রহস্যময়। সে রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে হইলে তত্ত্বান্বেষীকে সম্প্রদায়ের ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এই বিশ্বাসেই আমরা এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি। কয়েকটী ধারাবাহিক প্রবন্ধে আমরা এই ভাবেই কবি জয়দেব ও তাঁহার কাব্যখানিকে বুঝিবার চেষ্টা করিব। পরে প্রয়োজন হইলে প্রাচীন ও আধুনিক উভয় পক্ষের মতবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

কাব্যের সম্বন্ধে সন্দেহ উঠিয়াছে, সে কথা পরে বলিতেছি। পাছে "অজয়" ও "জয়দেব" নাম দেখিয়া এইরূপ কোনো সন্দেহ উঠে, তজ্জন্য কবির সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলা আবশ্যক। বলা বাহুল্য যে সংস্কৃত সাহিত্যে জয়দেব কবির অভাব নাই। "শৃঙ্গার মাধবীয় চম্পূ"

প্রণেতা একজন কবির নাম জয়দেব, ইঁহার উপনাম কৃষ্ণদাস। আর একজন জয়দেব ছিলেন, তাঁহার উপাধি "পীযূষবর্ষ"। তিনি "চন্দ্রালোক অলঙ্কার" ও "প্রসন্ন রাঘব নাটক" প্রণয়ন করেন। কৌণ্ডিল্যগোত্র-সম্ভূত এই কবির পিতার নাম মহাদেব, মাতার নাম সুমিত্রা। "চন্দ্রালোক অলঙ্কারে অভিধা স্বরূপাভিধানো নাম দশম ময়ূখে" উল্লিখিত আছে—

"পীযূষবর্ষ প্রভবং চন্দ্রালোক মনোহরং।
সদা নিধান মাসাস্ত শ্রদ্ধয়াং বিবুধামুদং॥
জয়তি যাজক শ্রীমন্মহাদেবাঙ্গ জন্মনঃ।
সূক্ত পীযূষ বর্ষস্য জয়দেব কবের্গিরঃ॥

শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, ডি-লিট্ মহাশয় খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে গুরু অর্জ্জুন সংকলিত গ্রন্থসাহেব হইতে দুইটী কবিতা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেও কোনো জয়দেব কবির ভণিতা আছে।

(১)

পরমাদি পুরুষ মনোপি মংসতি আদি ভাবরতং।
পরমং দ্রুতং পরকৃতি পরং যদি চিংন্তি সর্ব্বগতং॥
কেবল রাম নাম মনোরমম্।
বদি অমৃত তত্ত্বময়ং॥
নদনোতি জস মরণেন জন্ম জরাধি মরণ ভয়ম্॥
ইচ্ছসি য়মাদি পরাভয়ং যশ স্বস্তি সুকৃত কৃতং॥
ভবভূত ভাব সমবৃয়ং পরমং প্রসন্ন মিদং॥
লোভাদি দৃষ্টি পরগৃহং যদি বিদ্ধি আচরণং।
ত্যজি সকল দুহকৃত দুর্ম্মতী ভজু চক্রধর শরণং
হরি ভগত নিজ নিহ কেবলারিদ্ কর্ম্মণা বচসা।
যোগেন কিং যজ্ঞেন কিং দানেন কিং তপসা॥
গোবিংদ গোবিং দে তিজপিনরস কল সিদ্ধিপদং।
জয়দেব আই উতস স্ফুটং ভবভূত সর্ব্ব গতং॥

(২)

চংদ সত ভেদি যানাদ সত পূরিয়া সুর সত
ষোড়সাদত্তু কীয়া।
অবলবল তোড়িয়া অচল চল থপ্পিয়া
অধড় ধড়িয়া তহা আপি উচ্চীয়া॥
মন আদি গুণ আদি বখানিয়া।
তেরীদু বিধাদৃষ্টি সম্মানিয়া॥
অন্ধকৌ অরধিয়া সরধিকৌ সরধিয়া
সলল কৌসল লি সম্মানি আয়া।
বদতি জয়দেব কৌ রম্মিয়া ব্রহ্ম নির্ব্বাণ
লিবলী নপায়া॥

কথা উঠিয়াছে—সম্পূর্ণ কাব্যখানি জয়দেবের রচিত নহে। পদাবলীর আরম্ভে ও শেষে যে সমস্ত কবিতা আছে তাহা প্রক্ষিপ্ত,—গীতগোবিন্দকে কাব্যের আকারে গড়িয়া তুলিবার জন্য পরবর্ত্তী কালে কেহ সেগুলি যোজনা করিয়া দিয়াছেন। এরূপ সন্দেহ করিবার হেতু এই যে, গীতগোবিন্দে যে চব্বিশটী পদ আছে—তাহা যেরূপ মধুর-কোমল-কান্ত, অপর শ্লোকগুলি সেরূপ নহে। জয়দেব কিন্তু মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলীর কথাই সূচনায় বলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্লোকগুলি না থাকিলেও পদাবলীর কোনো ক্ষতি হইত না, ইত্যাদি। আমাদের মনে হয়, এরূপ সন্দেহ নিতান্তই ভিত্তিহীন। জয়দেব যেমন আপন মধুর কোমল-কান্ত পদাবলীর কথা বলিয়াছেন, তেমনই সন্দর্ভশুদ্ধির কথাও বলিয়াছেন। এই সন্দর্ভশুদ্ধির উদাহরণ স্বরূপ তিনি যে ঐ শ্লোকগুলি রচনা করেন নাই, তাহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে? অলঙ্কারে, ঝঙ্কারে, ভাষায় এবং ছন্দে শ্লোকগুলি যেরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ, তাহাতে বরং ইহাই অধিক সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়, যে, উমাপতিধর, গোবর্দ্ধন, শরণ এবং ধোয়ীর রচনায় যে গুণ পৃথক পৃথক ভাবে বর্ত্তমান ছিল, জয়দেবের রচনায় একাধারে তাহা বর্ত্তমান আছে,—ইহা দেখাইবার জন্যই তিনি পদাবলী ও শ্লোকগুলির একত্র সমাবেশ করিয়াছিলেন। শ্লোকগুলি না থাকিলে পদাবলীর অর্থবোধে কোনো ব্যাঘাত ঘটিত কি না,—ব্যক্তিবিশেষের রুচির উপর তাহা নির্ভর করে না। সেকালে হয় ত এইরূপই রীতি ছিল; অথবা এইরূপ শ্লোক না থাকিলে সেকালে গীতিকাব্যের অর্থবোধে ব্যাঘাত ঘটিত, এমনও হইতে পারে। আমাদের এরূপ অনুমানের কারণ, জয়দেবের সময়ের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর এবং দেড়শত বৎসরের মধ্যে গীতগোবিন্দের যে দুইখানি টীকা রচিত হইয়াছে, তাহাতে পদাবলী ও শ্লোকগুলি সহ সম্পূর্ণ কাব্যেরই ব্যাখ্যা আছে। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একখানি কাব্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক প্রবেশলাভ করিয়াছে—ইহা

কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? এ পর্য্যন্ত গীত-গোবিন্দের যে কয়েকখানি টীকা পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে, কাহারো কাহারো মতে, "সারদীপিকা" টীকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহার রচয়িতার নাম "জগৎহরি"। মেবারের রাণা কুম্ভ রচিত "রসিক প্রিয়া" টীকা—জয়দেবের দেড়শত বৎসর পরে রচিত। এতদ্ভিন্ন মহামহোপাধ্যায় শঙ্কর মিশ্র কৃত "রসিক মঞ্জরী", পূজারী গোস্বামী-রচিত "বালবোধিনী", কৃষ্ণদাস প্রণীত "গঙ্গা" এবং নারায়ণ কবিরাজ-বিরচিত "সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী" টীকাও নিতান্ত আধুনিক নহে। ইহার সকল গুলিতেই বর্ত্তমানে প্রচলিত গীত-গোবিন্দের সমস্ত শ্লোকই (গান ও কবিতা) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তবে "রসিক প্রিয়ার" সঙ্গে "বালবোধিনীর" কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে; টীকাকার পূজারী গোস্বামী

"ভজন্ত্যা স্তল্লান্তং * *
* * * * *
* * * * *
* * * দূর মৃগদৃশঃ"

একাদশ সর্গের শেষ ভাগে এই যে দ্বিতীয় শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "রসিক প্রিয়া"কার তাহার পরে—

সানন্দং নন্দ সূনু দিশতুমিতিং পরং সংমদং মন্দ মন্দং।
রাধামাধায় বাহ্বোর্ব্বিবর মনুদৃঢ়ং পীড়য়ন্ প্রীতিযোগাৎ।
তুঙ্গৌ তস্যা উরোজা বতনু বরতনৌ নির্গতো মাস্মভূতাং
পৃষ্ঠে নির্ভিদ্য তস্মাদ্বহিরিতি বলিত গ্রীব মালোকয়ন্ বঃ॥

এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা দিয়াছেন। পূজারী গোস্বামীর একাদশ সর্গ শেষ হইয়াছে—

"জয়শ্রী বিনস্তৈঃ * *
* * *
* * *
* * * * ভুজদণ্ডো সুরজিতঃ"

এই তৃতীয় শ্লোকটীর ব্যাখ্যায়; রসিকপ্রিয়াকার তাহার পর এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

সৌন্দর্য্যৈক নিধেরনঙ্গ ললনা লাবন্য লীলা পুষো,
রাধায়া হৃদি পল্লবে মনসিতা ক্রীড়ৈক রঙ্গস্থলে।
রম্যোরোজ সরোজ খেলন রসিত্যাদাত্মনঃ খ্যাপয়ন্।
ধ্যাতুর্মানস রাজহংস নিভৃতাং দেয়াম্মুকুন্দোমুদং॥

দ্বাদশ সর্গের—সর্গ সমাপ্তি সূচক—

"ত্বামপ্রাপ্য * * * *
* * * *
* * * *
* * * * হরিঃ পাতু বঃ॥"

এই তৃতীয় শ্লোকটী বালবোধিনীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু মেবারপতি এই শ্লোকটী গ্রহণ করেন নাই। কাব্য শেষে "শ্রীভোজদেব প্রভবস্য" শ্লোকের ব্যাখ্যায় যেখানে পূজারী গোস্বামী সর্গ শেষ করিয়াছেন, রাণা কুম্ভ তাহার পরেও—

"ইত্থং কেলী ততী বিহৃত্য যমুনাকুলে সমং রাধয়া,
তদ্রোমাবলী মৌক্তিকাবলী যুগে বেণীভ্রমং বিভ্রতী।
তত্রাহ্লাদী কুচ প্রয়াগ ফলয়োর্লিপ্সা যতোর্হস্তয়ো,
র্ব্যাপারাঃ পুরুষোত্তমস্য দদতু স্ফীতামুদাং সম্পদং॥

এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য ইহা হইতে এমন প্রমাণিত হয় না যে, গীতগোবিন্দের সংগীত ভিন্ন অপর সমস্ত শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত! তবে রসিক-প্রিয়াকার তাঁহার ব্যাখ্যাত ঐ "বারটী চরণ" কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, সে বিষয়ে একটা অনুসন্ধান হওয়া উচিত। আশা করি, বৈষ্ণব-শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

জয়দেব-চরিত্র-প্রণেতা বনমালী দাস একটী গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার সহিত এ বিষয়টীর কোনো সম্বন্ধ আছে কি না, তাহাও বিচার্য্য। বনমালী দাস লিখিয়াছেন—শ্রীগীতগোবিন্দের প্রসিদ্ধি দেখিয়া শ্রীক্ষেত্রের তদানীন্তন অধীশ্বরের মনে এইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রণয়নের বাসনা বলবতী হয়। তিনি একখানি অভিনব গীতগোবিন্দ প্রণয়ন করিয়া শ্রীক্ষেত্রের সর্ব্বত্র তাহা গীত হইবার আদেশ দান করেন। পাত্রমিত্রগণ ইহাতে আপত্তি করিলে পরীক্ষা মানসে দুইখানি গীতগোবিন্দই প্রভু-সান্নিধ্যে রাখিয়া শ্রীমন্দির বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখা গেল, শ্রীজগন্নাথদেব কবিরাজ-প্রণীত গ্রন্থ বক্ষে ধারণ করিয়া, পুরীরাজ-প্রণীত গ্রন্থ পদতলে রাখিয়া দিয়াছেন। অভিমানী পুরীরাজ এজন্য আত্মহত্যার কামনা করিলে—দৈববাণী হইল—

"জয়দেব কৃত গ্রন্থ দ্বাদশ যে সর্গে
তব কৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে"

কেহ কেহ বলেন, রসিক-প্রিয়ায় গৃহীত উক্ত তিনটী শ্লোকের বারটী চরণ উপরি উদ্ধৃত প্রবাদের সমর্থন করিতেছে। বনমালী দাসের পয়ার দুইটীর অর্থ ঠিক্ বুঝা যায় না। "জয়দেবের দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত কাব্যে তোমার কৃত বার শ্লোক অগ্রে থাকিবে, অথবা দ্বাদশ সর্গেই বারশ্লোক অগ্রে থাকিবে? এই অগ্র শব্দের অর্থ শেষ না প্রথম?" সমস্তই রহস্য জড়িত, এবং এই পয়ার দুইটীর উপর নির্ভর করিয়া প্রক্ষিপ্ত শ্লোক নির্ব্বাচন করিতে যাওয়া আমরা পণ্ডশ্রম বলিয়াই মনে করি। আমাদের বিশ্বাস, সংগীত ও শ্লোকসহ সমস্ত গ্রন্থখানিই জয়দেবের রচিত, এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত সংস্করণখানিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য; কারণ, শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়াছিল। বালবোধিনী টীকা তাহার অনতিকাল পরেই রচিত। পূজারী গোস্বামী শ্রীধাম বৃন্দাবনে পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতির সান্নিধ্যে এই টীকা রচনা করিয়াছিলেন। পূজারী গোস্বামীর পরিচয় পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

(৯)

অরুণের ডায়েরী হইতে—

প্রবল ঝড়ের পরে বিক্ষোভিত মথিত উন্মত্ত বিশ্ব-প্রকৃতি যেমন আবার ধীরে ধীরে শান্ত স্থির হয়ে আসে, সেদিনের সেই প্রচণ্ড অন্তর্বিপ্লবের পরে আজ দারুণ অবসাদে আমার এ উন্মত্ত বিদ্রোহী হৃদয় যেন ছিন্নমূল তরুর মত মাটিতে লুটিয়ে পড়তে চাচ্ছে। যতক্ষণ সংসারে মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষার কণামাত্রও অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ তার সবই থাকে। সেই ক্ষীণ আশার রেখাটুকুই তাকে তার সব সর্ব্বনাশের পরেও বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু যার সেই শেষ রেখাটুকুও মুছে গেছে, যার আর কোন দিকে কোন অবলম্বন না থাকে, সে আর সংসারে কোন্ সুখে কোন্ আশায় বেঁচে থাকবে? আমার আজ ঠিক সেই অবস্থা। সংসারে আজ আমাকে কারও প্রয়োজন নেই, আমারো ভবের হাটে এবারের মত সব দেনা-পাওনা শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার জীবনে আশা নেই, মরণে সুখ নেই, তবু আশ্চর্য্যের কথা এই—এখনো আমি আছি। বাঁচবার কোন দরকার ছিল না, তবু বেঁচে আছি। শুধু তাই নয়—এখনো বসে বসে সুখ-দুঃখের বিশ্লেষণ করছি!

নিজের কথা ভাবতে গেলে, থেকে-থেকে কেবল সেই ভীষণ দিনটার কথাই আমার মনে হয়! সে-দিনকার সে যুদ্ধের কথা কোন দিন ভোলবার নয়! প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের জয়ের আশা সন্নিকটবর্ত্তী হয়ে আসছে, জগতে চির-পদদলিত অধম বাঙ্গালীর বীরত্বে, শৌর্য্যে-বীর্য্যে অপরাজেয় জার্ম্মাণ সৈন্য অধীর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তারা যত পিছনে হটছে, আমাদের উৎসাহ, শক্তি ও সাহস তত যেন দুর্জ্জয় হয়ে উঠছে! সেদিন আমার কোন জ্ঞান চৈতন্য ছিল না; মনে হচ্ছিল—আজ নিজেদের রক্ত ও জীবন দিয়ে এই রণক্ষেত্রে বাঙালীর ভীরুতার চির-অপবাদ ক্ষালন করবো! এগিয়ে চল! এগিয়ে চল! কোন দিক দেখবার দরকার নেই, কিছু ভাববার নেই—এগোও! কেবল এগোও! সেদিন সে কি অপূর্ব্ব উন্মাদনা! প্রাণ দেবার সে কি তীব্র বিপুল আনন্দ!

সেই বিচিত্র উত্তেজনার মধ্যে আমার নিজের রেজিমেণ্ট নিয়ে আমি কতদূর এগিয়ে গেছি, তা আমি নিজেই জানি না—অকস্মাৎ পিছন থেকে একটা তীব্র-মধুর স্বর শুনতে পেলুম,—লেফটেন্যাণ্ট্! লেফটেন্যাণ্ট্ ঘোষাল!

তখন আর ফিরে দেখবার সময় ছিল না; কিন্তু আর বেশী দূর যেতেও হলো না। ভীষণ বজ্রনাদের মত ভয়াবহ শব্দে সামনেই একটা কামানের গোলা ফেটে চারিদিকে

ছড়িয়ে পড়ল,—আমার চারিদিকে হত-আহতদের তীব্র আর্ত্তনাদে সহসা দিগ্মণ্ডল পূর্ণ হয়ে উঠলো,—মাথার ভিতর একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লেগে সেইখানে আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লুম।

যখন আমার জ্ঞান হলো, দেখলুম, আমার মাথা থেকে চোখ পর্য্যন্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা,—কিছু বুঝতে পারলুম না। ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে পারলুম না,—সর্ব্ব-শরীরে দারুণ বেদনা। কি করব ভাবছি—এমন সময়ে আমার পাশ থেকে কে বল্লে,—এই যে! তুমি জেগেছ দেখছি! কিন্তু এখন নড়বার চেষ্টা কোর না—স্থির হয়ে থাক।

সে স্বর আমার পরিচিত। আমি বল্লুম,—কে? লিজি না কি?- হাঁ! আমি! কিন্তু তুমি বেশি কথা বলো না, ডাক্তার বারণ করেছেন।—আমি বল্লুম, আমার কি হয়েছে? তোমরা আমায় হাসপাতালে এনেছ না কি? —লিজি বল্লে, তুমি বড় আহত হয়েছ, তোমার মাথায় ও চোখের স্নায়ুতে গোলার 'শক' লেগেছে। ডাক্তার বলেছেন, এখন কিছু দিন তোমায় খুব সাবধানে ও স্থিরভাবে থাকতে হবে। আমি তোমার কাছে কাছেই আছি। কিন্তু তুমি আর কথা না বলে ঘুমোও।

ওঃ! আমি তা হলে আহত! মনটা কেমন মুষড়ে গেল—কত দিন এখন জড়পদার্থের মত এখানে পড়ে থাকতে হবে! আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম, তা হলে এখন আমি কিছুদিনের মত তোমার চার্জ্জে এই হাসপাতালে পড়ে থাকবো, কেমন?

"আবার? তুমি ত বড় অবাধ্য রোগী দেখছি! কি বল্লুম—এতক্ষণ ধরে?" এলিজাবেথ শাসন ছলে এই কথা বলে তার ফুলের মত নরম হাতখানি আমার মুখের ওপর চেপে ধরলে।

আমি তার হাতটা সরিয়ে বুকের ওপর চেপে রাখলুম। বল্লুম, আর একটি কথা লিজি! সেই কথাটা হয়ে গেলেই আমি চুপ করে ঘুমিয়ে পড়বো, সত্যি বলছি। আমি শুধু জানতে চাই, সেদিনকার যুদ্ধের ফলটা কি হলো?

—"ওঃ! সেদিন তোমাদেরি জিত হয়েছে। জার্ম্মানরা সে যায়গাটা ছেড়ে পালিয়েছে। সে স্থান এখন আমাদের হাতে। কিন্তু সেদিন অনেক লোক মারা গিয়েছে,—আহতের সংখ্যাও অত্যন্ত বেশি।"

বুকটা যেন আনন্দে ফুলে উঠলো! সেদিনকার সব পরিশ্রম সার্থক হয়েছে তা হলে? আমি বল্লুম, ধন্যবাদ! এই খবরটা জেনে মন বড় সুস্থ হল। ভাল কথা, আমার এখন মনে হচ্ছে, সেদিন আমি আহত হবার আগে, আমায় কে পিছন থেকে সাবধান করে দিচ্ছিল—সে কি তুমি? তুমি সেখানে কি করছিলে তখন? লিজি বল্লে, আমরা ত ঠিক তোমাদের পিছনেই ছিলুম! বলেছি ত—সেদিন হতাহতের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হয়েছিল; কাজেই আমাদের কাজও বড় বেড়ে গিয়েছিল। তুমি আগে লক্ষ্য কর নি, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলুম, গোলাটা কাছাকাছি এসে পড়েছে। সাবধান হবার কোন উপায় নেই তাও বুঝছি—তবু দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হয়ে, আমি হঠাৎ তোমার নাম ধরে, চীৎকার করে উঠলুম! ওঃ! কি ভয় আমি সেদিন পেয়েছি যে! আমার মনে হচ্ছিল, বুঝি তোমায় একবারেই হারিয়েছি! শেষ যখন ডাক্তার পরীক্ষা করে বল্লে তুমি শুধু আহত হয়েছ, তখন আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। —লিজি তার কথা শেষ করে দুই হাতে আমার ডান হাতটা জড়িয়ে ধরলে।

তার অন্তরের এই নিঃস্বার্থ ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে আমি বল্লুম,—লিজি! আমার প্রতি তোমার এ পবিত্র স্নেহের কোথাও তুলনা নেই।

লিজির হাতের সুকোমল আবেষ্টনটিতে আমি তার অন্তরের নিবিড় স্নেহের স্পর্শ অনুভব করতে করতে সেদিন ঘুমিয়ে পড়লুম।

দেশে থাকতে যে ছোট গণ্ডীটুকুর মধ্যে বাস করতুম, তার সীমার বাইরে উদার উন্মুক্ত জগতের মাঝে এসে যেদিন দাঁড়ালুম, সেদিন সহসা যেন চোখের ওপর থেকে একটা পর্দ্দা খসে গেছে—এই রকম মনে হল।

নতুন জীবন—নতুন দৃষ্টি—অফুরন্ত প্রাণ! চারিদিকে যা দেখছি—সে সবও যেন অতীতের কঙ্কালের ওপর নব নব রূপ পরিগ্রহ করে চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে! সে সব আমার আগেকার সীমাবদ্ধ জ্ঞান, সংস্কার ও জড়তার অন্ধ ধারণার সঙ্গে কোথাও খাপ খায় না।

মনে হত—চারিদিকে, অবাধ উন্মুক্ত জীবনের স্রোত উদ্দাম গতিতে বয়ে চলেছে—কর্ম্ম, জ্ঞান, শক্তির অনন্ত

প্রবাহ—সকলে চঞ্চল—ব্যস্ত—নিজের নিজের কাজে—অবিরাম ছুটেছে !

এই কর্ম্মমুখর জীব-জগতের পাশে কল্পনায় আমাদের সনাতন ভারতবর্ষকে আমার মনে হত, যেন সে বহু দিনের প্রাচীন অহিফেন-সেবীর মত নেশায় জড় হয়ে ঝিমোচ্ছে, ও এক-একবার মাথা তুলে—'ব্রহ্ম সত্য—জগৎ মিথ্যা' "কা তব কান্তা" জপ করছে—আবার নেশার ঘোরে তার মাথা ঝিমিয়ে পড়ছে।

আমার এই নতুন জগতে সবই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সুন্দর, কিন্তু সব চেয়ে যে বস্তু আমার চোখে অপূর্ব্ব মহিমায়, গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে আমায় মুগ্ধ করে তুলেছিল—সে হচ্ছে—সে দেশের নারী।

নারী যে কত বড় হতে পারে,—শিক্ষায়, জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে নারী যে কত উৎকর্ষ লাভ করে, ঠিক পুরুষের মতই কর্ম্মক্ষেত্রে তার পাশে দাঁড়িয়ে তার সাহস ও শক্তি বাড়িয়ে বড় করে তুলতে পারে,—এ আমি এদের দেখে মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝেছি—ও সেই সঙ্গে নিজেদের দেশের মেয়েদের দৈন্য অনুভব করে' মন আমার লজ্জা ও ধিক্কারে ভরে গেছে। পুঁথি-পত্রে, রচনায়, শাস্ত্রে তাদের গৌরবের অন্ত নেই—কিন্তু যথার্থ জীবন থেকে তারা আজ কত দূরে !

এখানে যেসব মেয়েদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে—তাঁরা সকলেই ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা—ইংরাজ, ফরাসী, মার্কিন, রুষিয়ান্—সব দেশীয়া নারীই আছেন। দেশে থাকতে শুনতে পেতুম—ও দেশের মেয়েরা অত্যন্ত অলস ও বিলাসিনী,—তারা ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যায়,—শুধু প্রজাপতির মত আমোদ-আহ্লাদ, বিলাস-ব্যসন নিয়েই তারা ব্যস্ত,—বাস্তব জীবনের দুঃখ-কষ্টের ভিতর না কি এই প্রজাপতির দল ভিড়তে চায় না। এখানে এসে আমার এত দিনের সে ধারণা একেবারে বদলে গেছে।

যে দিন জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে ডাক পড়লো, সে দিন তাদের সুখশান্তি-পূর্ণ, নিশ্চিন্ত-আরামে-ভরা ঘর ছেড়ে এই সব মেয়েরা এই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের মতই সহজে হাসি-মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানকার জীবনের নানা অসুবিধা, অভাব, অস্বাচ্ছন্দ্য কিছুই তাদের এ কর্ত্তব্যের আহ্বান থেকে দূরে রাখতে পারেনি। তারা জানে—শুধু অন্তঃপুরই নারীর কর্ম্মক্ষেত্র নয়, জগতের কাজেও পুরুষের মতই তারও প্রয়োজন আছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণতা—চারিদিকের মৃত্যুযন্ত্রণাপূর্ণ আর্ত্ত-নাদ—অবিরল বারুদ ও ধূমে আচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় স্থানে প্রাণের ভয় অগ্রাহ্য করে, এরা পরম যত্নে আহতদের তুলে নিয়ে আসছে। তার পর সে কি সেবা—কি মমতা—এই সব দুর্ভাগ্য আহতদের না দেখলে শুধু কথায় বোঝান যায় না! এদের কাজ, এদের প্রকৃতি যতই আমি দেখেছি—ততই আমার মন শ্রদ্ধায় ভরে গেছে।

আমার সহকারী সেন বলে একটি ছেলের সেবার পায়ের ভিতর গুলি ঢুকে গিয়েছিল। তার পা অস্ত্র করে সে গুলি বের করবার ফলে তাকে বেশ কিছু দিন হাস-পাতালে থাকতে হয়। আমি যখন তাকে দেখতে যেতুম, সেই সময় লিজির সঙ্গে আমার পরিচয়। পরে সেই পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ট বন্ধুতায় পরিণত হয়।

সেন যেদিন হাসপাতালে যায়, তার পরে দু'তিন দিন আমি নানা কাযে ব্যস্ত থাকায়, তাকে দেখতে যাবার সময় করতে পারিনি। যে দিন প্রথম তার কাছে গেলুম, তখন সে একটু ভাল আছে,—তার মাথার কাছে একটা চৌকি পেতে লিজি বসে তার সঙ্গে গল্প করছিল।

সেন তার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিতে, সে প্রথমে তার সুনীল চোখের বিস্মিত দৃষ্টি আমার মুখের উপর তুলে। কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। তার পরে একটু মধুর হেসে, হাত বাড়িয়ে বল্লে, সেনের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। তার বন্ধুরা সকলেই নির্ব্বিচারে আমার বন্ধু।

আমি তার করমর্দ্দন করে বসলুম। তিনজনে অনেকক্ষণ ধরে গল্প-গুজব করা গেল। লিজি তার অন্যান্য রোগীদের দেখতে উঠে গেলে আমি সেনকে বল্লুম, এখানে কেমন আছ? সেবা-যত্ন রীতিমত হচ্ছে ত? না—যেমন হাসপাতালে গোলে-হরিবোল কাণ্ড হয়ে থাকে, তেমনি?

সেন একটু হেসে বল্লে, নিজেদের দেশের হাসপাতাল দেখে-দেখে আমাদের এমনিই ধারণা হয়েছে বটে। এখানে সে রকম কিছু নয়। কোন কষ্ট বা অভাব নেই—আর সেবার কথা আর কি বলবো! এখানকার নর্সদের কাছে যে রকম সেবা পাচ্ছি, বোধ হয় নিজের মা-বোন থাকলে এমন সেবা হয় না। বিশেষ ঐ যে মেয়েটি এখান থেকে

উঠে গেল, ও যে কি মমতাময়ী—কি করে বল্লে যে ওর সব কথা ঠিক বোঝান যায়—তা আমি ভেবেই পাই না। ও এ কয় দিন আমায় এত যত্ন করছে—

আমি হেসে বল্লুম, তুই যে একেবারে নর্সের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলি! দেখিস্—যুদ্ধ করতে এসে যেন কিছু গোলযোগ বাধাস নি ;

সেন গম্ভীর মুখে বল্লে, না ভাই অরুণ! ওদের সম্বন্ধে ও রকম কথা বলা চলবে না; সত্যি, কি উঁচু এদের মন! আর যাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, সেই সব ভিন্নদেশী ভিন্ন-ভাষী মানুষের জন্য এদের কি বুক ভরা মমতা! আমি যখন যন্ত্রণায় গোঙাতুম,—ওর চোখে মুখে এমন তীব্র বেদনার চিহ্ন জেগে উঠতো,—আমি দেখে অবাক্ হয়ে যেতুম! খুব তীব্র ভাবে অনুভব না করলে, মানুষের এমন রূপান্তর হ'তে পারে না। আমাদের পোড়া দেশে নারীর দেবত্ব, মমতা, ভালবাসা সবই পুঁথিগত হয়ে রইলো,—জগৎ তার কোন সন্ধানই পেলে না। তাই বলছি—এদের ভালবসবার কথা আমার মনেই ওঠে না—এরা তার চেয়ে অনেক উচ্চে! আমি শুধু ওদের শ্রদ্ধা করতে পারি—ভক্তি করতে পারি! তার পর থেকে আমি সময় পেলে সেনকে দেখতে যেতুম। লিজির সঙ্গে বন্ধুত্ব ক্রমে ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়ালো।

ক্রমে সেন সুস্থ হয়ে আবার কাজে যোগ দিলে; কিন্তু লিজি সময় পেলে আমার সঙ্গে দেখা করতো। আমরা দু'জনে সন্ধ্যাটা প্রায়ই একসঙ্গে কাটাতুম। তার সঙ্গ—তার সাহচর্য্য আমার স্বল্প অবসরটুকু রমণীয় করে তুলতো।

ক্রমশঃ আমার মনে একটা সন্দেহের ছায়া জেগে উঠতে লাগলো। কিছু দিন থেকে আমার মনে হচ্ছিল,—লিজি যেন আমার সম্বন্ধে সাধারণ বন্ধুত্বের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বীণার চিন্তায় আমার সমস্ত চিত্ত ভরে আছে,—তার রূপ সর্ব্বক্ষণ আমার অন্তরে বাহিরে জাগ্রত রয়েছে,—আমার মনে আর কারো জন্যে তিলমাত্র স্থান ছিল না,—আমি লিজির জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লুম।

লিজির মত মেয়ের ভালবাসা পাওয়া যে কত বড় সৌভাগ্যের কথা—সে আমি বুঝি। বীণার চেয়ে তুলনায় সে অনেকাংশে হয় ত উচ্চও হতে পারে—কিন্তু তাতে কি? যোগ্য অযোগ্য বিচার করে ত মানুষ ভালবাসতে পারে না। যাকে তার ভাল লাগে, সে তাকেই ভালবাসে। আমার মন বীণার প্রেমে মুগ্ধ,—আত্মহারা। লিজির জন্যে আমার মনের কোথাও স্থান নেই। তাই সময় সময় আমার মনে হত,—যদি আমার অনুমান সত্য হয়, তবে লিজি বেচারা অনর্থক কি দুঃখ পাবে।

এক দিন আমরা দু'জনে একটা হ্রদের ধারে বসে ছিলুম। এ যায়গাটার কাছে একবার যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে,—স্থানটা এখন ফরাসীদের হাতে। আশে পাশে ধ্বংসের নৃশংস চিহ্ন তখনো বেশ পরিস্ফুট,—চারিদিকের বাড়ী-ঘর সব ভেঙ্গে চুরে স্তূপের মত এখানে ওখানে জড় হয়ে আছে। সুন্দর বিস্তৃত প্রান্তর ধূ ধূ করছে—জনমানবের বসতির চিহ্ন মাত্রও নেই। এক সময় যেখানে কলরবময় মানুষের আবাস ছিল, এখন সে স্থান শূন্য শ্মশানের মত পড়ে আছে। যত দূর দৃষ্টি যায়—নির্জ্জন-নিস্তব্ধ। হ্রদের স্থির জলে তীরের একটা অর্দ্ধভগ্ন গীর্জ্জার ছায়া পড়ে, মৃদু বাতাসে জলের বুকে নানা ছন্দে নানা রেখার জাল বুনছিলো।

লিজি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। থেকে থেকে সে বল্লে, তোমাকে দেখলে কিন্তু ইণ্ডিয়ান্ বলে মনে হয় না।

আমি সকৌতুকে হেসে বল্লুম, কেন—বল ত? হঠাৎ এ কথাটা যে মনে উঠলো?

সে তার সুনীল সাগরজলের মত স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টি আমার মুখের ওপর স্থির রেখে বল্লে, হঠাৎ নয়—এ কথাটা প্রায়ই আমার মনে হয়। তোমার হয় ত মনে থাকতে পারে; প্রথম আমি যেদিন তোমায় দেখি—সেন তোমায় তার দেশের লোক ও বন্ধু বলে পরিচয় করে দিতে, আমি অবাক হয়ে চেয়ে ছিলুম! তুমি দেখতে বড়ই সুন্দর তাদের চেয়ে, সত্যিই বলছি—ভারি সুন্দর তুমি! তার চোখে মুখে কি মনোহর একটা আলো জ্যোতির মত তখন ফুটে উঠেছিল—আমি হঠাৎ কি বোলবো বুঝতে পারলুম না। মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে গেল।

সে আমার সামনে বসে ছিল। বেশভূষার কোন আড়ম্বর ছিল না। একটি পরিচ্ছন্ন সাদা পোষাক। সোণালি চুলগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে অনাবৃত তুষার-শুভ্র কাঁধের ওপর থেকে পিঠে লতিয়ে পড়েছে। পশ্চিম আকাশ থেকে একটি রক্তিম রশ্মি তার মুখে পড়েছিল—কি অপূর্ব্ব সুন্দরী

সে! আমি মুগ্ধনেত্রে তাকে দেখতে দেখতে বল্লুম, সে কথা বরং তোমার সম্বন্ধেই বলা যেতে পারে! তোমার মত এত সুন্দর আমি আর কোথাও দেখি নি!

আমি এ কথা বলতেই, তার সমস্ত মুখ ঘোর আরক্ত হয়ে উঠলো। আর কোন দিন আমি এমন আত্মবিস্মৃত হয়ে তার রূপের প্রশংসা করি নি। সে আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলে না। তার অন্তরের অগাধ প্রেমে ও ভালবাসায় পূর্ণ চোখ দুটি তুলে সে মৃদুস্বরে বল্লে, এ কি সত্যি কথা—ঘোষাল? সত্যিই কি আমাকে তোমার এত সুন্দর বলে মনে হয়? কথা শেষ করেই সে আমার হাতটা আবেগভরে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে। ব্যাপার দেখে আমি প্রথমটা থতমত খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু এ যে কত বড় অন্যায় হচ্ছে, সে কথা মনে হতে আমি তখনি নিজেকে সামলে নিয়ে খুব সহজ ভাবেই বল্লুম, সত্যিই বলছি—লিজি! আমি তোমার মত এত সুন্দর আর কোথাও দেখি নি—অবশ্য—একজন ছাড়া—আমার বাগ্দত্তা পত্নী—তার কথা তোমায় বলি নি—বোধ হয়—সেও ঠিক এমনিই সুন্দর দেখ্তে!

লিজির মুখ হঠাৎ মড়ার মত সাদা হয়ে গেল। অত্যন্ত চমকে উঠে, আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে সে বলে উঠলো, তোমার বাগ্দত্তা পত্নী? তুমি এন্‌গেজড্ তা হলে? এ কথা এত দিন ত বল নি?

আমি অপরাধীর মত নিস্তব্ধ হয়ে রইলুম। সেও মুখ ফিরিয়ে ভাঙ্গা গীর্জাটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে বহুক্ষণ নিস্পন্দ বসে রইলো। আমি যে তাকে কত বড় আঘাত দিয়েছি, আর সে যে নিঃশব্দে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করছে, সে সবই আমি নিজের মন দিয়ে বুঝতে পারছিলুম,—তাকে কিছু বলবার আমার সাহস ছিল না।

দিনের স্বল্পাবশেষ আলোটুকু মিলিয়ে ক্রমে সন্ধ্যার আঁধারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে এলো। আকাশে দু' একটি তারা ফুটে উঠে, স্তিমিত দৃষ্টিতে হ্রদের তটে উপবিষ্ট এই দুই স্তব্ধ প্রাণীর দিকে চেয়ে রইলো। আমরা দুজনেই তেম্নিই বসে রইলুম।

বহুক্ষণ পরে এলিজাবেথ একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে আমার দিকে মুখ ফিরালে। আমি চেয়ে দেখলুম, সে মুখ তখন পূর্ব্বের মতই স্থির ও গম্ভীর,—মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে প্রেম ও অনুরাগের প্রবল উচ্ছ্বাসে যে মুখ পুলকাবেশে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল, এখন আর তার কোন চিহ্ন ছিল না।

সে স্থির কণ্ঠে বল্লে, তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে তোমাকে আমি অত্যন্ত ভালবেসেছিলুম—এ কথা আর অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু এর পরে আর কোন কথা চলতে পারে না। যাক্—আমি সে জন্যে দুঃখিত নই। মানুষের জীবনে নানা দিক আছে। এক দিক রুদ্ধ হলেও, অন্যান্য দিক থেকেও সে সার্থকতা লাভ করতে পারে। তোমার স্ত্রী নিশ্চয়ই সব দিক থেকে তোমার উপযুক্ত হবেন? তুমি কিছু মনে করো না, আমি বন্ধু ভাবে জিজ্ঞেস করছি। আমরা এখান থেকে শুনি কি না—তোমাদের দেশের মেয়েরা অত্যন্ত পিছিয়ে আছে?

আমি বল্লুম, তিনি সেখানকার হাইকোর্টের জজের মেয়ে। লণ্ডনে সাত আট বছর থেকে, আধুনিক সর্ব্ব রকম শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে, সম্প্রতি দেশে ফিরে গেছেন।

লিজি শুনে বল্লে, আমি বড় সুখী হলুম। প্রার্থনা করি, তোমাদের বিবাহিত জীবন সুখের হোক। যখন তুমি দেশে ফিরে যাবে, আমার কথা তাঁকে বোলো—আমার শুভ ইচ্ছা তাঁকে জানিও। তার পর সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে, আর আমরা দুজনে ঠিক আগের মতই পরস্পরের বন্ধু—কেমন?

আমি সাগ্রহে প্রসারিত হাতখানি ধরে বল্লুম, অন্তর্যামী জানেন—এর চেয়ে সুখের বিষয় আমার আর কিছু নেই।

তার পর থেকে তার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ আগের চেয়ে কমে এসেছিল। তবু মাঝে মাঝে অনেক অপরাহ্ণ আমরা একত্র কাটাতুম। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই আমি আহত হয়ে হাসপাতালে এলুম।

আমার চিকিৎসা বেশ ভাল ভাবেই চলছিল। সুচিকিৎসা ও লিজির সেবার গুণে শীঘ্রই আমি সুস্থ হয়ে উঠলুম—আমার দুর্ব্বলতা ও শরীরের গ্লানি সবই সেরে গেল। শুধু আমার চোখের ব্যাণ্ডেজ তখনো খোলা হল না।

লিজি প্রাণ ঢেলে দিয়ে আমার সেবা করত। তার সমস্ত অবসর সময়টুকু সে বিশ্রাম না করে আমার কাছেই কাটাত। গল্প করে, সেবা করে, বই পড়ে শুনিয়ে আমায় প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করতো। কিন্তু তবু আমার

যেন মনে হত, সে বুঝি সর্ব্বক্ষণ কি একটা প্রচ্ছন্ন বেদনায় কষ্ট পাচ্ছে,— কথা বলতে বলতে সে কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে! আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে, যেন অশ্রু সম্বরণ করতে উঠে যায়! আমি তার এ ভাবান্তরের কারণ কিছু বুঝতে পারতুম না।

এমনি করে প্রায় তিন হপ্তা কেটে গেল। সুস্থ সবল শরীরে এমন করে পড়ে থাকতে ক্রমেই আমি অধৈর্য্য হয়ে উঠছিলুম। প্রতি দিনই এ জন্যে ডাক্তারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতুম। কত দিন যে বীণাকে চিঠি লেখা হয় নি— সে হয় ত এত দেরি দেখে উদ্বেগে আশঙ্কায় আকুল হয়ে উঠেছে। রোগ-শয্যায় পড়ে পড়ে আরো বেশি করে কেবল তার কথাই আমার মনে হতো। সন্ধ্যার সময়ে আমি মনে মনে সুদূর পাটনা নগরের এক প্রান্তে মিঃ রায়ের সুরম্য বাসভবনটি প্রায়ই কল্পনায় দেখতে পেতুম। সেখানকার বিস্তৃত টেনিস্ ক্ষেত্রে বীণা, কিরণ, নির্ম্মলা, চৌধুরী সবাই মিলে খেলা করছে! বীণার মুখ ঈষৎ ম্লান, বিষণ্ণ,—সে যে কত দিন আমার কোন সংবাদ পায় নি! এই দারুণ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষেত্রে যে তার প্রিয়কে ছেড়ে দিয়ে, একটু পত্রের আশায় পথের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকে, তার পক্ষে এত বিলম্ব যে কতখানি উদ্বেগ, কত আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে, সেটা উপলব্ধি করে আমি একেবারে অধীর চঞ্চল হয়ে উঠতুম,—মন আমার উধাও হয়ে সেই দূর সমুদ্র পার হয়ে বীণার পাশে ছুটে আসবার জন্যে পাগল হয়ে উঠতো,—ফরাসী দেশের শত সেবা-যত্ন, লিজির প্রাণঢালা নিঃস্বার্থ ভালবাসা, কিছুই আমায় সেখানে বাঁধতে পারতো না,—আমি তখন কেবল অধীর হয়ে ভাবতুম, কত দিনে এরা আমায় মুক্তি দেবে?

যা হোক, সংসারে সব জিনিসেরই শেষ আছে, আমারও এক দিন মুক্তির আদেশ এলো। কিন্তু সে একেবারে অতর্কিত বজ্রাঘাতের মত!

সে দিন সকালে ডাক্তার এসে যথারীতি পরীক্ষাদির পর বল্লেন, লেফটেন্যানট্ ঘোষাল! তোমাকে আজ বলবার একটা বিষয় আছে। তুমি এখান থেকে যাবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে। আমি এখন দেখছি, আর তোমাকে এখানে আটকে রাখবার কোন দরকার নেই। কাল তুমি এখান থেকে মুক্তি পাবে।

আমি মুক্তির আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম। এত দিন পরে তবে আবার সেই আগেকার মুক্ত আনন্দময় জীবন! বল্লুম, ধন্যবাদ! শত শত ধন্যবাদ আপনাকে! এই মুক্তিটুকু পাবার জন্যে আমি যে কত দিন থেকে ব্যাকুল হয়ে রয়েছি—তা আপনি বুঝতে পারবেন না। চোখটা এত দিনে সেরে গেছে তা হলে? আজ কি তা হলে আমার ব্যাণ্ডেজটা খুলে দেবেন?

ডাক্তার একটু চুপ করে থেকে বল্লেন, ব্যাণ্ডেজটা রাখবার আর দরকার নেই,—তোমার নস্‌কে বলে যাচ্ছি, সেই ওটা খুলে দেবে। তবে হাঁ—চোখের কথা! তা ঐখানে একটু গোলযোগ হয়েছে—কিন্তু লেফ্‌টেন্যাণ্ট! কথাটা তোমাকে খুলে বলাই ভাল,—তুমি বীর সৈনিক পুরুষ,—আশা করি, সৈনিকের মতই এ আঘাতটা গ্রহণ করবে!

আমি চমকে উঠলুম! এত ভূমিকা কিসের—আমার হয়েছে কি? আতঙ্কে রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলুম, ডাক্তার! এ কি বোলছো তুমি? আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না! স্পষ্ট করে বল—আমার হয়েছে কি?

ডাক্তার বল্লেন, অর্থাৎ তোমার মাথায় সেই যে গোলার 'শক্' লেগেছিল,—মনে আছে ত? তাতেই—চোখের যে দৃষ্টি-বহা স্নায়ু—যার জন্যে আমরা সব জিনিস দেখতে পাই— সেইটা আক্রান্ত হয়েছে। আমাদের যতদূর সাধ্য, আমরা চেষ্টা করে দেখলুম—বিশেষ ফল হল না। চোখের কোন স্পেশ্যাল চিকিৎসার ব্যবস্থাও নেই এখানে। তাই আমরা স্থির করেছি—তুমি কাল বম্বে চলে যাও। সেখানে সব রকম ব্যবস্থা আছে। সেখানকার বড় মেডিকেল বোর্ড— তোমার সম্বন্ধে যা করা দরকার—সবই করবেন। আমরা এখান থেকে সে ব্যবস্থা করেছি। এখানে অনর্থক দেরি করবার কোন দরকার নেই,—কালই বেরিয়ে পড়ো। তোমার সঙ্গে যাবার লোকেরও আমরা ব্যবস্থা করেছি। আমি বড় দুঃখিত হচ্ছি ঘোষাল—তোমার জন্যে কিছু করতে পারলুম না—যদিও চেষ্টা যতদূর করবার সবই করা গেল। আচ্ছা—এখন তবে বিদায়!

মস্ মস্ করে জুতোর শব্দ হল। বুঝলুম—ডাক্তার চলে গেল। কি যে সব বলে গেল—ঠিক মর্ম্ম বুঝতে পারলুম না—সভয়ে ডাকলুম, লিজি!

সে কাছেই ছিল—আমি বল্লুম, ডাক্তার কি বলে গেল? আমি কি আর দেখতে পাব না? আমার চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে?

লিজি বোধ হয় নিঃশব্দে কাঁদছিল, সে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বল্লে, ওঁরা তাই সন্দেহ করছেন।

আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। মনে হতে লাগলো—একটা বিরাট সূচীভেদ্য অন্ধকার ধীরে ধীরে আমার চোখের ওপর নেমে আসছে। আজ এক মাস হতে গেল—আমি আহত হয়ে হাসপাতালে চোখ-বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছি। এক দিনের জন্যও আমার মনে কোন চিন্তা বা আতঙ্ক আসে নি। মনে যথেষ্ট ভরসা ছিল,—আমি আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দিতে পারবো। কিন্তু আজ এরা এ কি বলছে? আমি অন্ধ! আমার চোখের দৃষ্টি-শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে! এ কি কখনো সম্ভব? এমনি করে আমার এত সাধের,—আশায় উৎসাহে ভরা জীবন এক কথায় ব্যর্থ হয়ে যাবে? অসম্ভব!

উদ্বেগে ও হতাশায় আমি পাগলের মত চীৎকার করে বল্লুম, লিজি! লিজি! আমার চোখের বাঁধনটা খুলে দাও! আমি নিজে একবার দেখতে চাই! আমি কি সত্যই একেবারে অন্ধ হয়ে গেছি?

এলিজাবেথ এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে ব্যাণ্ডেজটা খুলতে লাগলো! সমস্তটা খুলতে যেটুকু সময় লাগলো, তাতেই আমি অধৈর্য্য হয়ে উঠছিলুম। শেষ পাকটা খোলা হতেই, আমি সজোরে তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে, প্রাণপণে চোখ খুলে চেয়ে দেখলাম—অন্ধকার! সব ঘোর অন্ধকার! তবু বিশ্বাস হলো না। মনে হলো—বহু দিন চোখ বাঁধা ছিল বলে হয় ত—পাতা ভাল করে খোলে নি—দুই হাতে পাতাগুলো জোর করে খুলে আবার ব্যাকুল নেত্রে চাইলুম—অন্ধকার, সামনে পিছনে আশে পাশে বিরাট অন্ধকার!

তবে সবই সত্য! সত্যই আমি অন্ধ! শরীর অবসন্ন হয়ে এলো! আর কিছু ভাবতে পারলুম না। পৃথিবীর আলো আমার চোখের ওপর নিভে গেছে! আজ থেকে তবে জীবনের সমস্ত আশা, সুখ, আনন্দ—সবই শেষ! আজ আমার জীবনের অবসান হলো!

ভীত কম্পিত কণ্ঠে ডাকলুম, লিজি! তুমি কোথায়? আমার কাছে এসো! বড় ভয় করছে!

আমার সেই অসহায় ভীত মুখের ভাব দেখে, সে স্নেহময়ী মাতার মত ছুটে এসে, আমার মাথাটা তার বুকের মধ্যে চেপে ধরলে। বল্লে, ভয় কি? আমি ত তোমার কাছে কাছে সর্ব্বদা রয়েছি। তার পরে সে তার চোখের জল মুছে বল্লে, যে দিন ওরা প্রথম থেকেই তোমায় পরীক্ষা করে এ কথা বল্লে—সে দিন থেকে কি মর্ম্মান্তিক যাতনাই যে আমি ভোগ করছি, সে আর কি বোলবো! এত দিন তবু আমার কাছে ছিলে,—এইটুকু আমার সান্ত্বনা ছিল,—আজ থেকে তাও গেল। আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ওরা আজ তোমায় এই অসহায় অবস্থায় কোথায় কত দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছে!

আমাদের রেজিমেণ্টের আদেশ আমি অমান্য করতে পারি না,—কাজেই বিদায়ের আয়োজন আরম্ভ হল। এক দিন আমি এখান থেকে মুক্তির জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলুম,—কিন্তু যখন সত্যই সে মুহূর্ত্ত উপস্থিত হলো, তখন আর তেমন আগ্রহে তাকে গ্রহণ করতে পারলুম না। তখন বুঝলুম, এলিজাবেথ কত দিক থেকে, কত রকমে, কত মধুময় বন্ধনে আমায় বেঁধে রেখেছে।

বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে আমরা দু'জনে নিস্তব্ধ হয়ে বসে ছিলুম। আমাদের প্রথম পরিচয়ের পর থেকে সমস্ত ঘটনা এক এক করে তখন মনে হচ্ছিল। কত দিনের কত মধুর সন্ধ্যা, কত আলাপ, কত আমোদ-প্রমোদ—যেন ছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠছিল,—আজ সে সবেরি শেষ! গভীর বিষাদের ভারে দু'জনেরি মন তখন এমন ম্রিয়মাণ—কোন কথা তখন বলা যায় না। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে থেকে এলিজাবেথ শেষে বলে উঠলো, দেখ! মানুষ আশাতেই বেঁচে থাকে,—আমরাই বা শেষ আশাটুকু ছাড়বো কেন? যদি বম্বের মেডিকেল বোর্ডের ব্যবস্থানুযায়ী চিকিৎসায় তুমি সেরে ওঠো, তা হলে আর কখনো কি এদিকে আসবে না?

তার স্নেহকাতর, সেবা-পরায়ণ নারী-প্রকৃতি যে আমায় দূরে ছেড়ে দিতে কত ব্যাকুল হয়ে উঠছে—আমি তার এ কথায় তা বুঝলুম। তাকে মিথ্যা আশা দিতে আমার প্রবৃত্তি হলো না; কারণ, আমার মন একেবারে ভেঙে গিয়েছিল,—আবার সুস্থ হবো, এ আশা তখন আমি আর

করতে পারছিলুম না। আমি ব্যথিত চিত্তে বল্লুম, বল্লেতঃ আমার সম্বন্ধে ভাল মন্দ যে কোন ফলই হোক—এখানকার রেজিমেণ্টে সে খবর আসবে। সুতরাং তুমি খোঁজ করলেই সে খবর পাবে। ভাল যদি হই, তা হলে নিশ্চয়ই আবার আসবো, সে তুমি ঠিক জেনো। আর তা যদি না হই—তা হলে দেখা আর আমাদের মধ্যে হবে না,—চিঠি-পত্র দিয়ে খোঁজ নেওয়াও হয় ত আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। কিন্তু লিজি! আমি কোন দিন জীবনে তোমায় ভুলতে পারবো না। এই তিন মাস তুমি একাধারে কত কত রূপে যে আমার জীবন পূর্ণ করে রেখেছিলে, তা আজ বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছি। আমার জীবনের সকল অভাব ভরিয়ে রেখেছিলে তুমি! সুখের দিনে তোমায় ঘনিষ্ট বন্ধুর মত আমার পাশে পেয়েছিলুম! দুঃখের দিনে তুমি মায়ের স্নেহ বুকে নিয়ে এই দুর্ভাগ্য অসহায় অন্ধের অক্লান্ত পরিচর্য্যা করেছ! আর কি বেশি বোলবো,—আমার মনের ভিতর তোমার স্মৃতি জীবনদাত্রী দেবীর মত চিরজাগ্রত হয়ে থাকবে!

আমার হাত ধরে লিজি বল্লে, ও রকম করে কথা বোল না তুমি! আমার বড় কষ্ট হয়! তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে যাচ্ছ,—তাঁদের সঙ্গে, তাঁদের স্নেহে যতটা সম্ভব শান্তি পাবে। তা ছাড়া তোমার স্ত্রী আছেন,—তোমার সেবা করবার তাঁরই অধিকার। আমার কোন কথা বলবার অধিকার নেই,—বলা উচিতও নয়। তবু আজ এই বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে বলছি,—তোমার পাশে থেকে যাবজ্জীবন তোমার সেবা করা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু কাম্য নেই।

অজস্র অশ্রুজলে ভাসতে ভাসতে এলিজাবেথ আমায় জাহাজে তুলে দিয়ে বিদায় নিলে। সে চলে যাবার পর আমি যেমন নিজেকে অসহায় বোধ করতে লাগলুম, জীবনে কোন দিন এমন মনে হয় নি। তিন মাস পূর্ব্বে এক দিন দেশ থেকে অদম্য আশা ও উৎসাহপূর্ণ চিত্তে, ফ্রান্সের উপকূলে এসে নেমেছিলুম,—সে দিন মনে কি দুর্জ্জয় সাহস। কি অজেয় শক্তি! নবলব্ধ অধিকার পেয়ে তখন আমরা কি করে যে বাঙালীর পরাক্রম জগৎকে দেখিয়ে সকলকে মুগ্ধ ও চকিত করে তুলবো,—নিশিদিন সেই চিন্তায় আত্মহারা! আজও আমার মনে সে দিনের সেই উৎসাহ, সেই সাহস, সেই অজেয় শক্তি—সবই বিদ্যমান! কিন্তু মানুষের ভাগ্যের কি পরিবর্ত্তন! আজ আমি সেই উপকূল থেকে জীর্ণ, ভগ্ন হৃদয়ে, দৃষ্টি-শক্তি হারিয়ে, নিতান্ত দীন-হীনের মত আবার দেশে ফিরে চলেছি! আজ আর সংসারে আমার আশা বা আকাঙ্ক্ষা করবার কিছুই রইলো না!

বাস্তবিক, আমার এই অন্ধত্বটা আমার কাছে বিধাতার অত্যন্ত অবিচার ও অত্যাচার বলে মনে হয়! জাহাজের সুদীর্ঘ পথ আমি শুধু শূন্য-মনে এই কথাটাই এক মনে ভাবতুম,—যুদ্ধে অন্য কত লোকের মত আমার প্রাণ গেলেও ত যেতে পারত? তা হলে আজ অভিযোগ করবার ত কিছুই থাকতো না! কিন্তু তা হলো না! কত লোকের হাত পা উড়ে গেছে! তারা কতক কষ্ট পেয়েছে বটে, তবু বিজ্ঞানের কৃপায় মানুষ তাদের জোড়া-তাড়া দিয়ে কোন রকমে আবার খাড়া করিয়ে দিয়েছে! আমার সে রকমও কিছু হলো না! আমি অন্ধ! সবল সুস্থ,—অটুট স্বাস্থ্যে, যৌবনের শক্তিতে ভরপুর হয়েও আমি অক্ষম অসহায়! আমার আর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই পূর্ণ কার্য্যক্ষম থাকা সত্ত্বেও আমি অন্ধ! তাই আমার সব শক্তি থেকেও কিছু নেই! সব থেকে শুধু আমার চোখ দুটিই নষ্ট হয়ে গেল—যার আর প্রতিকার করবার কোন উপায় নেই! আশ্চর্য্য!

এক এক সময় একটা রুদ্ধ রোষে ও আক্রোশে আমার বুকটা ফুলে ফুলে উঠতো! কার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ,—কাকেই বা এর জন্যে শাস্তি দিতে চাই,—তা জানি না,—তবু মনের ভিতর একটা অশান্ত বিদ্রোহ জেগে উঠে, আমায় চঞ্চল করে তুলতো। আবার এক এক সময় একটা দারুণ নিরাশা ও অবসাদে সমস্ত মন মুহ্যমান হয়ে ভেঙে পড়তো। আমি অন্ধ! জগতের সকল সুখ-সাধে বঞ্চিত! আমার জীবনে কোন দিক থেকে আর কোন সুখের আশা নেই! কেন তবে এ দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা বয়ে মরা! একটি গুলিতে ত এই দুঃখময় জীবনের সব দুঃখ হতে অব্যাহতি লাভ করতে পারি? ক্ষোভে নিরাশায় যখন সত্যই আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা বলবতী হয়ে উঠতো, তখন আমার এই দগ্ধ হৃদয়-পটে ধীরে ধীরে একখানি মধুর মুখ জেগে উঠে, আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিত।

সে মুখ আমার বীণার! বিদায়ের দিনের সেই কাতর অশ্রুপ্লাবিত সুন্দর মুখ! আমার মন বলতো, সে তোমার আশায় সেখানে পথ চেয়ে বসে আছে, আর তোমার এই আচরণ? একটি বিশ্বস্ত প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে তোমার লজ্জা হয় না? সেই মুখ মনে করে তখন আমার সব দুঃখ, সব গ্লানি ভুলে যেতে সাধ হতো। ভাবতুম, আমার সব গেলেও এখনো আমার বীণা আছে,—সে আমার পাশে থাকলে আমি জীবন-ভোর এ দুঃখ হাসিমুখে সহ্য করতে পারি!

আশা মায়াবিনী! কখনো বা সে তার কুহকজাল রচনা করে একটি মনোহর চিত্র আমার মনের উপর ধরতো! তখন ভাবতুম, আর যদিই বা বম্বের হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়ে আবার আমার চোখ ভাল হয়ে ওঠে? ডাক্তার ত বলেই ছিল—সেখানে চোখের চিকিৎসার স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা নেই। ভাল রকম চিকিৎসা হলে হয় ত আমার চোখ সুস্থ হওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে!

মানুষ সহজে এতটুকু আশাও ছাড়তে চায় না। এই ক্ষীণ আশার সূত্রটুকু ধরে আমিও অনেক সময় একটু শান্তি পাবার চেষ্টা করতুম।

প্রথম প্রথম এলিজাবেথের ভারি অভাব বোধ করতুম। এই আত্মীয়-স্বজন-শূন্য প্রদেশে, কঠোর সৈনিক-জীবনে, স্নেহের প্রতিমার মত সে আমায় কি অসীম যত্ন ও ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রেখেছিল! আমি অযাচিত ভাবে কেবলই তার কাছ থেকে অপরিমেয় ভালবাসা পেয়ে এসেছি, প্রতিদানে তাকে কিছুই দিতে পারি নি, কিন্তু তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর প্রতিক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তে তার অভাবের তীব্র বেদনা আমায় জর্জ্জরিত করে তুলছিল।

জাহাজের অন্যান্য আরোহী ও আরোহিনীর দল সকলেই নিজের নিজের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে খেলায়, গল্পে, আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত,—আমিই শুধু একা তাদের আনন্দ-কলরবের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতুম। অন্ধের এই নিরানন্দ বৈচিত্র্যহীন জীবন! তার দিকে কারো মনোযোগ আকৃষ্ট হতো না। আমার সহচর সন্ধ্যায় আমায় ডেকের উপর চৌকি পেতে বসিয়ে দিয়ে যেত। আমি একা বসে বসে কল্পনা নেত্রে দেখতুম,—নক্ষত্র খচিত, মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ,—জোছনার রজত ধারায় চারিদিক প্লাবিত,—তারি মাঝে সুনীল অনন্ত-প্রসারিত সাগরের বারিরাশি মথিত করে আমাদের জাহাজ ছুটে চলেছে। সমুদ্র-তরঙ্গের অবিরাম গর্জ্জন আমার কাণে বাজতো। আশ পাশ থেকে মাঝে মাঝে গল্পের মধ্য থেকে কথার টুকরো বা হাসির শব্দ কাণে ভেসে আসতো। কখনো বা কোন প্রণয়ীযুগলের মৃদু উচ্ছ্বাসপূর্ণ আলাপ,—কোথাও বা কোন দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষ তান!

ধীরে ধীরে আমার মনে অতীত জীবনের কত উজ্জ্বল দিনের মধুর স্মৃতি জেগে উঠতো,—আমিও তো এমনি করে জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণ করে কত দিন এ সংসারের সমস্ত আনন্দ, রস, সৌন্দর্য্য পিপাসা মিটিয়ে পান করেছি! সেই আমি আজো বর্ত্তমান,—অপরিতৃপ্ত মনের তৃষ্ণা তেমনি অব্যাহত রয়েছে,—কিন্তু সে দিন আজ কোথায়? কোন্ পাপে, কার অভিশাপে আমার জীবনের সমস্ত সুখের আশা নিমেষে লুপ্ত হয়ে গেল?

হতাশায়, অভিমানে কত সময় আমার চোখ জলে ভরে আসতো। আবার তখনি মনে হত,—আজ আর আমার পাশে স্নেহময়ী এলিজাবেথ নেই,—যে আমায় এতটুকু কাতর দেখলে, তখনি ছুটে এসে, তার অন্তরের সমস্ত মাধুর্য্য ঢেলে দিয়ে, আমার মনের বেদনা মুছে দেবার চেষ্টা করবে! আজ সে আমার কাছ থেকে অনেক—অনেক দূরে! নিজের ব্যথায় নিজেই কেঁদে কেঁদে অবসন্ন হয়ে পড়ে নিজেই নিরস্ত হতুম।

আশা ও নিরাশার মধ্যে এমনি করে দোল খেতে খেতে অবশেষে এক দিন বোম্বাইয়ের উপকূলে জাহাজ এসে থামলো।

আবার আমি বোম্বাইয়ের হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করলুম। যথারীতি আমার পরীক্ষা এবং চিকিৎসা চলতে লাগলো। যখন আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে সেখানকার হাসপাতালে ছিলুম, তখন আমার কোন আশঙ্কা ছিল না। আমার যে দৃষ্টি-শক্তি নষ্ট হতে পারে, এ সম্ভাবনা পর্য্যন্ত কখনো আমার মনে আসে নি। সেই জন্য মন বেশ সুস্থ সবল ছিল। কিন্তু এখানে দিন দিন আমার মনের উদ্বেগ যেন অসহ্য হয়ে উঠছিল। এরা যে কোন্ দিন কি বলবে,

সর্ব্বক্ষণ সেই উৎকণ্ঠায় আমার মন এমনি উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতো, যেন সেই একটি কথার উপর আমার সমস্ত জীবন মরণ নির্ভর করছে!

বম্বে এসে পর্য্যন্ত আর একটি কারণে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠছিল। আমার এ চাঞ্চল্যের কারণ—বীণা! যত দিন আমি তার কাছ থেকে অনেক দূরে ছিলুম, যখন ইচ্ছা করলেই ছুটে চলে আসবার কোন উপায় ছিল না, তখন বাধ্য হয়ে মনও বেশ সংযত ছিল। কিন্তু এখন এত কাছে এসে তার কাছ থেকে এত দূরে থাকা,—এ যেন আমার পক্ষে একেবারে অসহ্য বলে মনে হচ্ছিল। বম্বে থেকে পাটনা—এইটুকু সামান্য ব্যবধান! এক এক সময় মনে হোত—সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে,—এদের চিকিৎসার এই যে বন্ধন, এ সব ছিঁড়ে ফেলে, ছুটে তার কাছে চলে যাই! অন্তরের মধ্যে যার চিন্তা এত তীব্র ভাবে সদা জাগ্রত রয়েছে, তাকে বাইরে থেকে পাওয়া কি এতই কঠিন?

বম্বের মেডিকেল বোর্ড প্রায় এক মাস আমার চোখের চিকিৎসা ও নানাবিধ পরীক্ষা করে দেখে, অবশেষে এক দিন তাঁদের সকলের মত প্রকাশ করলেন—চিকিৎসা-শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের বিশ্বাস—আমার দৃষ্টিশক্তি আর ফিরে পাওয়া যাবে না! দৃষ্টিবহা স্নায়ু একবারে অবশ হয়ে গেছে,—তার কার্য্যকরী শক্তি আবার ফিরিয়ে আনা তাঁদের শক্তির বাহিরে। সুতরাং এক কথায় আমার ভাগ্য নির্ণয় হয়ে গেল!

সে দিন—তখন সন্ধ্যা,—আমি একা আমার ঘরে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলুম,—অন্তরের মধ্যে তখন তুমুল ঝড় চলছিল। চারিদিকের সমস্ত বন্ধন থেকে বিযুক্ত হয়ে, আমি যেন একটা আশ্রয়হীন মহাশূন্যের মধ্যে এসে পড়েছি, আমার জীবনের যে এইখানেই পরিসমাপ্তি তা যেন বুঝছি,—কিন্তু কেন? কিসের জন্য? সংসারে আর সকলে ঠিক আগেকার মতই সুখে আনন্দে তাদের জীবন-তরণী বেয়ে চলেছে,—আর আমিই শুধু এই ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়ে অতলে তলিয়ে যাবো? কোন্ অপরাধে আমার এ শাস্তি? এ অত্যাচার, এ অবিচারের কি কোন প্রতিবিধান নেই? মানুষের কি এমন কোন শক্তি নেই যে, সে এই অদৃশ্য শক্তির প্রতি-রোধ করে' এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারে? আমার মনে তখন ঠিক যে কোন্ ভাবের উদয় হচ্ছিল,—কি যে তখন আমি ঠিক ভাবছিলাম,—তা আমি নিজেই ঠিক জানি না। কেবল একটা উৎকট প্রতিহিংসা বা প্রতি-শোধের তীব্র বাসনায় আমার সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে গর্জ্জে গর্জ্জে উঠছিল! কার জন্যে আমার জীবন এমন ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল!

বাইরে যখন ঝড় উঠে, সে তার প্রবল বিক্রমে প্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত মথিত করে' ধ্বংসের চিহ্ন রেখে যায়। তার সে ভীম পরাক্রমের প্রতিরোধ করতে জগতের কোন শক্তিই তখন তার সামনে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু মানুষের মনের ভিতরে যে দুর্জ্জয় বিপ্লব চলতে থাকে, বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই। একটা উন্মাদ বাসনায় আমার তখন কেবল মনে হচ্ছিল—প্রলয়ের একটা তাণ্ডব সংহার-লীলার মধ্যে জগৎটা ভেঙে-চুরে গুঁড়ো হয়ে যাক্; ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝায় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক,—চন্দ্র সূর্য্য তারা নিবে যাক্,—গ্রহ উপগ্রহের ভীষণ সংঘাতে উল্কাপাতে সমস্ত সৃষ্টি রসাতলে যাক্! কিন্তু হায়, মানুষ কোন এক অদৃশ্য শক্তির হাতের ক্রীড়নক মাত্র! তার জীবনের সব শুভাশুভ, সুখ-দুঃখ সেই শক্তির ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে! তার নিজের কোথাও কোন শক্তি নেই! তার বুকফাটা অভিশাপে বাহ্য জগতের কোনই ক্ষতি হয় না,—শুধু সে নিজের নিষ্ফল আক্রোশে নিজেই জলে পুড়ে মরে!

সেদিন সন্ধ্যা থেকে সমস্ত রাত্রি টেবিলের ধারে চৌকির ওপর বসে বসেই কেটে গেল। শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাসে যখন উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ও অবসন্ন দেহ একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে এল, তখন টেবিলের ওপরেই মাথাটা রেখে অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতের মত লুটিয়ে পড়লুম।

যতক্ষণ মানুষের মাথার ওপর কোন একটা আসন্ন বিপদের ছায়া উদ্যত হয়ে থাকে, ততক্ষণ তার জন্যে কত আশঙ্কা, কত উৎকণ্ঠা তাকে সব সময় উদ্বিগ্ন ও কাতর করে রাখে। কিন্তু যখন সে আর দূরে না থেকে একেবারে তার মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়ে—তখন দেখা যায় যে, কষ্ট আছে বটে, তবে তার সঙ্গে সঙ্গে যে শান্তিটুকু অযাচিত ভাবে পাওয়া যায়, তার মূল্যও বড় কম নয়।

পরের দিন যখন আমি জাগলুম, তখন আমার মনের ঠিক তেমনি অবস্থা। দু'মাস ধরে যে আশা ও নিরাশা,

...নন্দ ও উদ্বেগ আমার সারা চিত্ত ভরে থেকে জীবনটা ...কবারে অশান্তিময় করে তুলেছিল, আজ সে সবের অবসান হয়েছে। ভাগ্য আমার আজ নিশ্চিত ভাবে নিরূপিত হয়ে গেছে; সুতরাং কি হবে, এ কথা ভাববার আর কোন প্রয়োজন নেই। সুখের আশা ও দুঃখের আশঙ্কা দুইই তখন আমার মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে,—মন তখন একটা নির্ব্বিকার শান্ত বৈরাগ্যের ভাবে ভরপুর!

সেই সম্পূর্ণ আশাহত, উদাসীন চিত্তে সর্ব্বপ্রথম আমার বীণার কথা মনে হল। আজ দু'মাস ধরে নিয়ত যার নাম ...করে, যার রূপ ধ্যান করে নিশিদিন অধীর আকাঙ্ক্ষা ...কে নিয়ে কাটিয়েছি, তার কথা মনে করে আজ আর আমি কোন আনন্দ পেলুম না। বরং মনে হল, আমার এ দুর্ভাগ্য অভিশপ্ত জীবনের সঙ্গে তার তরুণ সুকুমার জীবন জড়িত করে তাকে তার জীবনের সকল আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে রাখবার আমার কি অধিকার আছে? এমন অদ্ভুত ও অসঙ্গত বাসনা কি করে এত দিন আমার মাথায় ঢুকেছিল,—আজ আমি তা ভেবে পেলুম না।

তাকে মুক্তি দিতে হবে! হয় ত দু'দিন তার একটু কষ্ট হতে পারে, তার পরে সে এ সব কথা ভুলে গিয়ে আবার জীবনে সুখী হবে! মাত্র তিন মাসের পরিচয় আমাদের! এই পরিচয়ে সারা জীবনের মত এই জীবন্মৃত অঙ্কের পাশে সব সুখ শান্তি হারিয়ে কাটানো,—এ কখনো বীণার দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়! চিরদিনের সুখপালিতা সে,—কখনো কোন কষ্টে অভ্যস্তা নয়! তার প্রতি এত বড় অবিচার,—এ আমি কখনো করতে ...রবো না।

তখনি বসে বসে বীণাকে একখানা চিঠি লিখলুম। ...র সমস্ত কথা বিবৃত করে পরে লিখলুম, আমাদের ...নের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল,—আমার এ অবস্থার আর তার কোন প্রয়োজন নেই। অনর্থক তোমার ...ন এমন ব্যর্থ হয়ে যাবে, আমি তা চাই না। সেইজন্যে ...দের বিবাহের প্রস্তাব ভঙ্গ করে দেবার জন্যে এই ... লিখছি। আমার আশা আছে,—তুমিও সব দিক ...চনা করে দেখে, এ প্রস্তাবে সম্মতি দেবে।

সম্পূর্ণ অকুণ্ঠিত ও বেদনামুক্ত হৃদয়ে আমি বীণার ...র সব দাবী-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে, এই ত্যাগ-পত্র লিখে ফেললুম। আজ আর তার জন্যে আমার মনের কোন কোণে একটুও ব্যথা বাজলো না।

এখন আবার নিজের কথা ভাববার সময় হলো। হাসপাতালে আর আমার থাকবার প্রয়োজন নেই; সুতরাং এখন এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু কথা এই যে, এখন আমি যাই কোথায়? আমার ঘর কোথা?

ঘরের কথা মনে হতে, আমার এ নিস্পন্দ, অসাড় প্রাণও আবার যেন চঞ্চল হয়ে কণ্ঠাগত হয়ে উঠলো! সংসারে আমার বাড়ী ঘর ধন ঐশ্বর্য্য জমিদারী—সবই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে; কিন্তু এ সবের মধ্যে কোথায় যে আমার একটু আশ্রয় হতে পারে, তা ভেবে পেলুম না।

আত্মীয়-স্বজনের ভিতর বিধবা মা ও দুটি ভগ্নী। তারা দুজনেই বিবাহিতা, যে যার ঘরে স্বামী পুত্র লইয়া ঘর করিতেছে। তাদের কাছে গিয়ে তাদের নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রার মধ্যে একটা দুর্ব্বহ বোঝা চাপাতে ইচ্ছা হল না।

আর মা? তিনি আমাদের দেশের বাড়ীতে আছেন। তবে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অত্যন্ত অল্প। একে ত একটু বড় হবার পর থেকেই আমি তাঁর কাছছাড়া। যদি বা মাঝে মাঝে ছুটি হলে তাঁর কাছে দাঁড়াতে গেছি,—তাতে বিশেষ আমোল পাই নি। তিনি তাঁর সন্ধ্যা-আহ্নিক, পূজা-অর্চ্চনা, ভাঁড়ার, ঠাকুরঘর নিয়েই ব্যস্ত। আমরা সহরে থেকে থেকে যে রকম অনাচারী হয়ে উঠেছি,—কখন যে কোন্ অসাবধান মুহূর্ত্তে তাঁর শুচিতার সংসার ছুঁয়ে ফেলে নষ্ট করে দেবো, সেই ভয়েই তিনি সর্ব্বক্ষণ শশব্যস্ত! তাঁর এই ভাব দেখে ক্রমে আমিও যথাসাধ্য অন্তরে অন্তরে কাটিয়ে তাঁকে শান্ত মনে থাকবার অবসর দিয়েছি বটে, তবে এর ফলে আমাদের মধ্যেকার স্নেহের বন্ধন শিথিল হয়ে, দু'জনেই যে দু'জনের কাছ থেকে বহু দূরে চলে গেছি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই আজ সব হারা হয়েও মার কাছে একটু আশ্রয় পাবার কথা মনে করে বিশেষ কোন শান্তি পেলুম না। অনেক ভেবে ভেবে শেষ এক জনের কথা আমার মনে লাগলো। সে আমার অভিন্ন-হৃদয় বাল্যবন্ধু কিরণ!

ছোটবেলা থেকে আরম্ভ করে কলেজের শেষ পর্য্যন্ত আমরা দু'জনে বরাবর একসঙ্গে পড়েছি, একত্র থেকেছি। আমাদের মধ্যে সেই অবিচ্ছিন্ন সদ্ভাব এখনো পূর্ণ মাত্রায়

বর্ত্তমান আছে। আমি চিরদিনই অত্যন্ত চঞ্চল, আমোদ-প্রিয় ও খামখেয়ালি প্রকৃতির। কিরণ ছোট বয়স হতেই শান্ত, গম্ভীর ও মিতভাষী। সে মুখে বেশি কথা বলে না; কিন্তু তার মনের বল অসীম। সে একান্ত সত্যনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। বয়সে সে আমার সমবয়স্ক হলেও, কাযে সে কতকটা আমার অভিভাবকের মত ছিল। আমার প্রতি তার স্নেহও ছিল তেমনি অগাধ,—নিজের ছোট ভাইয়ের মতই সে আমায় ভালবাসতো। পঠদ্দশায় তার ওপর সর্ব্ব বিষয়ে নির্ভর করে আমি বেশ নিশ্চিন্ত আমোদে দিন কাটিয়েছি। আজ আবার এই পরিশ্রান্ত অবসন্ন মন তার সবল হৃদয়ের স্নেহের আশ্রয়ে কিছু দিন একটু শান্তিতে কাটাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

সেই দিনই তাকে চিঠি দিলাম। তার পরে আবার যাত্রার পালা আরম্ভ হলো। শরীর মন আর বয় না। এ ভাগ্য-তাড়িত হতভাগ্যের যাত্রা কোথায় গিয়ে কত দিনে শেষ হবে?

কিরণ আমাকে ঠিক পূর্ব্বের মত গভীর স্নেহে গ্রহণ করলে। প্রথম সাক্ষাতেই সে আমায় তার বুকে টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো। তার পরে গাঢ় স্বরে বল্লে, তোমার যে ক্ষতি হয়েছে,—বন্ধুর জীবনব্যাপী স্নেহ দিয়েও যদি তার কিছুমাত্রও পূরণ হয়, তবে তার ক্রটী হবে না। এখন থেকে আমরা দু'জনে বরাবর একসঙ্গেই থাকবো। আর কোথাও তোমাকে যেতে দেব না। বহু দিন পরে আমার অবসাদগ্রস্ত ক্লিষ্ট অন্তর এই স্নেহের স্পর্শে যেন কথঞ্চিৎ শীতল হলো।

আবার সেই পাটনা! পাঁচ মাস আগে কিরণের কাছে বেড়াতে এসে, এখানেই বীণাকে প্রথম দেখেছিলুম। আজ আবার সব শেষ হবার সময়ও অদৃষ্ট-সূত্রে সেইখানেই এসে দাঁড়িয়েছি! এ কথা মন থেকে কিছুতেই যেতে চায় না! সব আশাই ত ছেড়েছি—তবে আর কেন?

এখানে আসার দু'দিন পরে সকালে চা খাবার পর কিরণ বেরিয়ে গেছে,—আমি একলা টেবিলের ধারে বসে নিজের চিন্তায় ব্যস্ত,—কার মৃদু পায়ের শব্দ, সে সময় আমার কাণে গেল। ডাকলুম, কে, বেহারা? উত্তর পেলুম না। কে তবে? কিরণ কি এখনি ফিরে এলো? বল্লুম, কিরণ? উত্তর নেই। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। কে একজন এসে কাছে দাঁড়িয়েছে,—তার মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ আমার কাণে আসছে,—তবু সে কথা বলে না কেন? এবার আমি ব্যাকুল ভাবে বল্লুম, কে ওখানে? কিরণ কি? কথা বলছো না কেন? এবার অত্যন্ত মৃদু, কম্পিত স্বরে উত্তর হলো,—কিরণ এখনো ফেরে নি। আমিই শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি। এ কি ব্যাপার? কি এ? আমার একান্ত পরিচিত সেই মধুর স্বর শুনে আমি পাগলের মত চৌকি ছেড়ে লাফিয়ে উঠলুম,—বীণা! তুমি? তুমি আমায় দেখতে এসেছ? এই কথা বলেই, শব্দ লক্ষ্য করে. তার হাত ধরে আমার কাছে টেনে আনলুম। তার পর হঠাৎ আমার এত দিনের সঞ্চিত বেদনা ও অভিমান অশ্রুর আকারে অবাধে তার মাথায় ঝরে পড়তে লাগলো!

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

শ্রীরামেন্দু দত্ত

ধুয়ে দাও হৃদি পুণ্য-সলিলে
ওগো হৃদয়ের নিবাসী।
মুছে নাও মলা চরণ-পরশে
আবিলতা যত বিনাশি'॥
হে দেবতা এস এ দীনের ঘরে,
নহে দিনেকের, চিরদিন তরে—
আমি বসে আছি; মিলন দিনের
তোমার দরশ-তিয়াসী॥

না জানি' না বুঝি' শৈশবে কত
মহাপাপ আমি করেছি,
সুচির দিনের সুখের শান্তি
ক্ষণিকের ভুলে হরেছি।
তাহার ভাবনা মহাভার হয়ে
দিতেছে যাতনা, মোরে র'য়ে র'য়ে,
আজিকে তোমার অমৃত-শান্তি
লাভের আশার পিয়াসী॥

যুদ্ধে বাঙ্গালী

ডাক্তার শ্রীনিবারণচন্দ্র মিত্র, এম্-বি

বিগত যুদ্ধের সময় মানব-সমাজের অনেক পরিবর্ত্তনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। য়ুরোপ ও এসিয়ার রাষ্ট্রীয় মানচিত্রে অদল-বদল,—আচার-ব্যবহার, সমাজ শাসনে অনেক বৈচিত্র্য ও শিথিলতা বিশেষ ভাবে দেখা দিয়াছে। নানা জাতির একত্র সমাবেশে একটা আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা অনেক স্থলে প্রকাশ পাইয়াছে। য়ুরোপীয় জাতিদের মধ্যেই এগুলি বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে, সুদূর বাঙ্গালা দেশের "ভেতো বাঙ্গালী"র প্রাণকেও অদৃশ্য ভাবে যে আন্দোলিত না করিয়াছে, এমন নহে। বাঙ্গালী এখন সিপাহী হইবার জন্য ব্যগ্র। পিতা-মাতার আদরের দুলাল উন্নতির চেষ্টায় চুপি-চুপি গৃহত্যাগ করিয়াছে—ইহা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এমন কি, চাষার ছেলে, যাহাকে কখন গ্রামের বাহির হইতে দেখা যায় নাই,—যাহার পক্ষে খুলনা, যশোর পৃথিবীর আর এক প্রান্তের গ্রাম,—তাহাকেও হংকং বোগদাদ, উগাণ্ডা, কেনিয়া, ইজিপ্ত, মরক্কো এবং য়ুরোপের ফ্রান্স, ইতালী, গ্রীস্, তুরস্ক প্রভৃতি স্থানে যাইতে দেখিয়াছি। ইহারা না কি "ননীর পুতুল"—অন্ধের মাণিক! কিন্তু এই সব ননীর পুতুল আফ্রিকার গরমে গলিয়া যায় নাই—তাহারা দুঃখক্লিষ্ট ভারত-মাতার অন্ধপ্রায় নয়নে নূতন জ্যোতিঃ আনিয়া দিয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরা চিরকাল লড়াই করিয়া আসিয়াছে,—যুদ্ধ তাহাদের নিকট ব্যবসায়ের সামিল। তাহারা লড়ায়ে যাইতে পেছপাও হইলে হয় ত বরং ঘোর লজ্জার বিষয় হইত। এ সময় বাঙ্গালী তাহার চিরন্তন জড়তা জঞ্জালের মত ঠেলিয়া ফেলিয়া হঠাৎ বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল, ইহার কারণ কি? ইহার মূলে বিশেষ রকমের সত্যকার একটা তাড়ার পরিচয় আছে। পেটের দায় হঠাৎ তাহাদের প্রবল হইয়া উঠে নাই,—সেটা বহু দিন হইতেই ছিল। অতএব সেটা যে মূল কারণ নয়, তাহা বেশ বুঝা যায়। আমি চা-বাগানের আড়কাটীদের সঙ্গে কুলীদের যাইতে দেখিয়াছি,—যেন একপাল ভেড়া। তাহারা মাঝে মাঝে একটু হাসিবার বা হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু সে চেষ্টা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতেছে না। চালানী কুলী ভবিষ্যতে কি একটা রাজত্ব পাইবে, এই আশার কুহকে মজিয়া সুদূর দক্ষিণ আমেরিকায় যাইতেছে; কিন্তু সে যাওয়াতে স্ফূর্ত্তি নাই, একটা উদ্দাম ও বিপুল ইচ্ছা নাই। সে যাওয়া বিজয় সিংহের মত উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে যাওয়া নহে,—হাড়কাটে যাওয়া। আর এখন স্ব-ইচ্ছায় জানিয়া শুনিয়া অনেক বাঙ্গালী যুদ্ধে গিয়াছে। আমি এমন অনেককে জানি, যাহারা সিপাহী হইবে, এই আশায় আসিয়াছিল; পরে তাহাদের হাসপাতালে রোগীর সেবায় লাগাইয়া দেওয়াতে তাহারা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। অনেকে আবার স্পষ্টই বলিয়াছিল, তাহারা স্বাধীন চাষার ছেলে;—সরকারের নফর হইয়াছে শুধু সিপাহী হইবার জন্য,—অন্য কাজের জন্য নহে।

এই যুদ্ধ ব্যাপারের সংস্রবে বাঙ্গালীকে (হিন্দু ও মুসলমান) নানা কাজের দায়িত্ব লইতে দেখা গিয়াছে। ইহাতে তাহাদের সকল শ্রেণীর লোক ছিল। প্রথমতঃ ফরাসী চন্দননগরের বাঙ্গালী ভাইদের কথা বলি। তাঁহাদের বীরত্ব-গাথা ভার্দ্যুনের সমরক্ষেত্রে, মরক্কো ও আনামে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। দলে ভারী না হইলেও, তাঁহারা যে বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা ভুলিবার নহে। ভার্দ্যুন, যেখানে ফ্রান্সের শেষ পরীক্ষা ও যেখানকার দৈনিক মৃত্যুর তালিকা ১০,০০০এর উপরে, সেখানেও অবস্থান করিতে ভেতো বাঙ্গালীর বুক কাঁপে নাই। সেখান হইতে তাহারা আত্মপ্রাণরক্ষার্থ পলাইয়া যায় নাই; অথবা পাগল বা রোগী সাজিয়া কাজে ফাঁকি দেয় নাই। তাহারা সে কয়টা দিনের ঘোর ঝঞ্ঝার সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছিল। আজ তাহাদের কেহ কেহ অমরধামে,—কিন্তু তাহাদের আত্মদান পশ্চাদ্বর্ত্তীদের মধ্যে উৎসাহের বীজ বপন করিয়া গিয়াছে।

ইংরাজের এলাকায় বাঙ্গালীরা অনেক প্রকার কাজে লিপ্ত ছিলেন,—যেমন, লড়াই; ডাক্তারী, রেলওয়ে, হাস-

পাতালের ও কমিসারিয়াটের কাজ, জাহাজের খালাসী এবং "লেবার কোর" অর্থাৎ কুলীর দল। ইহাতেই বুঝা যায় যে, সকল অবস্থাতেই বাঙ্গালী আসরে নামিয়াছিলেন। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। ইহাদের ২।৪ জন চাষী, এবং বেশীর ভাগ চাষার ছেলে। ইহারা ফ্রান্সে যায় নাই। আফ্রিকার ও মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ইহাদের দেখিয়াছি। আর দেখিয়াছি—ভারতের দুর্গম পশ্চিমোত্তর প্রান্তে মাসুদদের রাজ্যে। সরকারী পোষাক পরিয়া বুটপটী আঁটিয়া সকলেই নিজেকে সিপাহী মনে করিত,—কিন্তু কাজ তাহাদের ছিল মাটীকাটা, রাস্তা তৈয়ার করা, বন-জঙ্গল সাফ করা।

একদিন বেলুচিস্তানের একটা পাহাড়া পথ ধরিয়া পল্টনের সহিত যাইতেছি,—রাত প্রায় ১০টা হইবে। হঠাৎ অস্পষ্ট গানের শব্দ কাণে পৌঁছিল। পল্টন দাঁড়াইয়া গেল। অফিসারেরা সতর্ক হইলেন; কিন্তু গানের ভাষা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে কর্ণেল কখন যে আমার দিকে তাকাইয়াছেন তাহা জানিতে পারি নাই। আমি তখন তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছি। হঠাৎ গায়ে হাত পড়ায় চমক ভাঙ্গিল। আমি বলিলাম, কর্ণেল, এ বাঙ্গালা গান। শুনিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। কুচ করিতে করিতে আমরা যে ক্যাম্পের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহা প্রথমটা বুঝিতে পারি নাই। আমাদেরই লেবার কোরের বাঙ্গালীরা উচ্চৈঃস্বরে মেঠো গান ধরিয়াছিল! একটা বাদল দিনের গান। সে দিন বাতাস বোধ হয় প্রিয় পরিজনের স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়া ঘরছাড়া বেচারীদের প্রাণটার মধ্যে তোলপাড় করিয়া দিতেছিল। তাই বেলুচিস্তানের মরুভূমির তপ্তশ্বাসের সহিত তাহাদের মর্ম্মোচ্ছ্বাস বড়ই করুণ শুনাইতেছিল।

ইহাদের নায়করা সকলেই বিদেশী—শিখ বা পাঞ্জাবী মুসলমান। এক দিন একটি হাবিলদারকে—এই রোগা বাঙ্গালীরা কেমন লোক, জিজ্ঞাসা করিলাম। হাবিলদার উত্তরে বলিয়াছিল, ইহারা একেবারে বেশী কাজ করিতে পারে না বটে, তবে দিনের শেষে অন্য জাতের লোকদের কাজের তুলনায় বেশী পেছিয়ে থাকে না। ইহারা এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। সদাই প্রফুল্ল ভাব। তামাক ছাড়া অন্য নেশা করে না,—বিনামূল্যে পাইলেও না। কোনরূপ বে-আইনি কাজ করে না। কথা বলিলে শোনে। বুদ্ধি আছে; এবং যদিও ভাত খায়, তবুও সিপাহীদের মত কষ্টসহিষ্ণু—হাঁটিতে সমান মজবুত। কিন্তু সাহেব, আমার জান খাইয়া ফেলিল—ভাত ভাত করিয়া। আমি বলি,—"আরে রুটী খাও,—গায়ে আরও জোর হইবে;—এতদূরে সবকার চাল কোথা পাবে?" ইহাদেরই জাতভাইরা হাসপাতালে ভিস্তি ও রসুইয়া ব্রাহ্মণের কাজে ভর্ত্তী হইয়াছিল। যখন পল্টনের সহিত থাকিতে হইত, তখন ইহাদেরও কুচ করিতে হইত। ২০ মাইল হাঁটার পর সিপাহীরা যখন আরাম করে, তখন ইহারা খোলা কাটিয়া তাহাদের রাঁধিয়া খাওয়াইতে ব্যস্ত। কাহারা যে বেশী বাহাদুর, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

তবে এক দিন বাস্তবিকই ইহারা ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। সেটা তুর্কীর দেশের কনষ্টান্টিনোপল সহরে, শীতের দিনে। চার দিন ধরিয়া বরফের ঝড় বহিতেছিল; তাপ ১৫° ফা মাত্র। বলা বাহুল্য, জলাশয় সব জমিয়া গিয়াছিল। দারুণ জলকষ্ট। চারিদিকে একহাঁটু বরফ জমিয়াছে। তখন সমস্যা—জল পাওয়া যায় কোথায়। সকলেই জলাভাবে প্রাণনাশের আশঙ্কায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর যখন তাহাদের বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইয়া দিলাম যে, ঐ গুঁড়া বরফ লইয়া গলাইলে জল হইবে,—এবং পরখ করিয়া দেখাইয়া দিলাম, তবে তাহাদের মুখে হাসি বাহির হইয়াছিল। তখন তাহারা আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেল। এইরূপে তাহারা তিনটা শীত কাটাইয়াছে। যাহারা কখন বরফ দেখে নাই,—বাঙ্গালার শীত সহ্য করা যাহাদের অভ্যাস,—তাহাদের পক্ষে যে ইহা কি কঠোর পরীক্ষা তাহা না বলিলেও চলে। কিন্তু এইরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াও কেহ মরে নাই,—কাহারও নিউমোনিয়া পর্য্যন্ত হয় নাই। অপরন্তু ৩ বৎসরের শেষে, সরকারী নিয়মানুসারে, ডাক্তারী পরীক্ষার সময়ে, সকলেই একবাক্যে বলিয়াছে, "যুদ্ধের জন্য শরীরে কোন জখম হয় নাই, এবং সে জন্য সরকার হইতে কিছু দাবী করিতে পারি না। বাড়ী হইতে যে প্লীহাটী সঙ্গে আনিয়াছিলাম, তাহাও অন্তর্ধান করিয়াছে।"

আর একটি ছোট কাজ লইয়া একটি বাঙ্গালীকে

তপোবনে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

দেখিয়াছিলাম। বাড়ী তাহার বর্দ্ধমান জেলায়। তোপখানাতে ঘোড়সওয়ার হইয়া ভর্ত্তী হইয়াছিল। পলটনে বাঙ্গালীকে লওয়া হয় না বলিয়া, সে নিজের নাম "হরিদাস পাল" গোপন করিয়া, "হুবলাল" বলিয়া গিয়াছিল। পায়ে চোট লাগার জন্য চিকিৎসা করাইতে আসিয়াছে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থা হইতে আছে। তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল "যদিও এটা রেসালা পলটন নহে (তাহাকে অন্ততঃ সেরূপ আভাষই দেওয়া হইয়াছিল), তবুও মোটের উপর ভালই আছি। তবে দলটা বড় খারাপ—সব হিন্দুস্থানী অন্ত্যজ জাতি।" নিজের ঘোড়ার সব কাজ করিতে হয় বলিয়া, হিন্দুস্থানীর মধ্যে হাড়ী চাঁড়াল প্রভৃতি জাতিকেই সাধারণতঃ এই কাজে বাহাল করা হয়।

এইবার বাঙ্গালী পলটনের কথা। ইহাদের সুখ্যাতি সকলেই শুনিয়াছেন। যুদ্ধ ইহাদের না করিতে হইলেও, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ অতি সুচারুরূপেই তাহারা সম্পন্ন করিয়াছে। অবশ্য, সচরাচর ম্যাট্রিক-পড়া সিপাহী দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি এইরূপ চারজনকে হাসপাতালে রোগীর সেবার জন্য পাইয়াছিলাম। ইংরাজী বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে অনেক বিদেশী সাব-আসিষ্টাণ্ট-সার্জনের চেয়েও ইহারা ভাল ছিল। ইহাদের উপর ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতাম। একবার শিখাইয়া দিলে পুনরায় আর বলিয়া দিতে হইত না। কেরাণীবাবুদের দলকে গোলাগুলির গোলমাল ছাড়া আর সব কষ্টই রীতিমত সহ্য করিতে হইত। ইহারা সব ভদ্রলোকের ছেলে—লেখাপড়া জানে। দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বেকার নিয়মানুসারে, কতক বিষয়ে ইহাদিগকে ভিস্তি পাচকদের সামিল করা হইত। ইহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ৩০০৲ টাকা মাহিনা পাইতেন। বেশ বুড়া হইয়াছেন এবং চাকুরী শেষ করিয়া চুল পাকাইয়াছেন। কিন্তু এখনও বুক ফুলাইয়া সোজা হইয়া হাঁটেন; এবং তাঁহাকে কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম (কুচ কাওয়াজ) হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে শুনি নাই। আমেরিকায় যে সব বন্ধুরা ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিতেছিলেন, তাঁহাদেরও এই সময় কতক কতক যুদ্ধ ব্যবসা শিখিতে হইয়াছিল। কখন কাজে লাগে, তাহা ত জানা নাই। ইঁহাদিগকে জেণ্টেলম্যান ক্যাডেট, অর্থাৎ অফিসারের শিক্ষানবীশ বলা হইত। ইঁহাদিগকে গাঁতি, কোদাল লইয়া দিনের পর দিন মাঠে থাকিয়া স্বহস্তে রাস্তা ঘাট পোল ইত্যাদি তৈয়ার করিতে হইত। শীত কালেও এ কাজের বিরাম ছিল না। তখন মাঠে প্রায়ই বরফ থাকিত; আর সেই সব যায়গায় কম্বল মুড়ী দিয়া খোলা মাঠে রাত্রিযাপন করিতে হইত। এই দুধের বাছা বাঙ্গালীদের কিন্তু এক দিনের তরেও সর্দ্দী হয় নাই।

একবার গুটিকতক বাঙ্গালীকে জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারি ও ইলেক্ট্রীক কাজে দেখিয়াছিলাম। তবে জাহাজের কাজে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন বাঙ্গালী খালাসীরা। উত্তরে আর্কেঞ্জাল, দক্ষিণে ম্যাজিলান যোজক, পূর্ব্বে জাপান ও পশ্চিমে হনলুলু ইহাদের গতিবিধির সীমানা ছিল। এই ব্যাপারে প্রায় হাজারের উপর লোক জীবন দান করিয়াছে। টরপেডো, সাবমেরীন, জলের মাইন ইত্যাদির আশঙ্কা পদে পদে ছিল। "ঐ দূরে সাবমেরীন দেখা গিয়াছে" এইরূপ মিথ্যা আশঙ্কার কথা প্রায়ই শোনা যাইত। তখন সকলেই লাইফ বেল্ট পরিয়া দুর্গানাম জপ করিত বটে, কিন্তু বাঙ্গালীদের অনর্থক ব্যস্ত হইয়া মাথা খারাপ করিতে দেখি নাই। আবার একদিন যখন সত্যকার বাঘ আসিল, অর্থাৎ জাহাজের গায়ে টরপেডো লাগিল, তখনকার সেই ভয় ও নৈরাশ্যের দৃশ্যের বর্ণনা করা যায় না। সকলেই ভয়ে কাঁটা,—জাহাজ মেডিটারেনিয়ানের মাঝখানে। নিকটে কোনরূপ সাহায্য পাইবার আশা নাই। ছোট ছোট নৌকায় আগে ছেলে-মেয়েদের নামিয়ে দেওয়া হল। তাহার পর জাহাজ ডুবিল। সকলে নৌকায় বা তক্তায় (raftএ) ভাসিতে লাগিলেন। সেই সময়ে জনৈক ইংরাজ রমণীর মুখে বাঙ্গালীর বীরত্বের পরিচয় শুনিয়া, নিজে বাঙ্গালী বলিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিয়াছিলাম।

আর একটা কাজ—যাহা জগতে নূতন এবং করিতে গেলে বিশেষ মনের জোরের প্রয়োজন, সে কাজও অবলীলাক্রমে বাঙ্গালীকে করিতে দেখিয়াছি। আমি এরোপ্লেনে চড়িয়া যুদ্ধ করার কথা বলিতেছি। দুইজন মাত্র বাঙ্গালীর—ফ্লাইট ক্যাপ্‌টেন বার্নাজ্জী এবং ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট রায়ের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

অবস্থা-বিশেষে পড়িলে ভিতরকার মানুষটী যে নিজেকে প্রকাশ করিতে চায়, তাহা বাঙ্গালী ডাক্তারদের মধ্যেও

দেখিয়াছি। কখনও কোনরূপ লড়াইয়ের কাজ জানা নাই। কলেজ হইতে সদ্য-পাশ-করা যুবক নিজের মান-ইজ্জত বজায় রাখিয়া যেরূপ ভাবে কাজ চালাইয়াছিল, তাহা বিস্ময়ের বিষয়; এবং সুযোগ পাইলে যে সে চিকিৎসা-বিদ্যা বিদেশী শিক্ষকদের শিখাইয়া দিতে পারে, ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শত শত রোগীর ব্যবস্থা করা, প্রত্যহ বেলা ৯টা হ'তে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত (কখন কখন রাত্রেও) অপারেশন করা, এবং তাহার পর হাসপাতালের অন্যান্য কাজ দেখা, কর্ত্তৃত্ব করা, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে। এই রূপ কাজ দিনের পর দিন ছয় মাস ধরিয়া করিয়াও কোমর ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অন্য দিকে, গ্রীষ্ম-কালে পল্টনের সহিত ৬দিনে ১৩৭ মাইল পথ পায়ে হাঁটিয়া, বিপন্ন ফৌজের সাহায্য করিতে যাইতেও পায়ে ফোস্কা পড়ে নাই,—পায়ে তেল মালিষ করিতে হয় নাই। আনা-তালিয়ার ভীষণ শীতে (—২° ফা) থাকিয়াও সে জমিয়া যায় নাই। উপরন্তু, সন্তোষজনক কাজের জন্য মেন্সাওইন্ ডেস্পাচেশ অর্থাৎ সরকারী রিপোর্টে বিশেষ ভাবে তাঁহার নামোল্লেখ করা হইয়াছে।

মেকলের তুলিকায় অঙ্কিত বাঙ্গালীর সে প্রতিকৃতি এখন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইতেছে; এবং তাহার স্থলে আর একটা নূতন মূর্ত্তি—যাহার বলিষ্ঠ দেহ, উন্নত বক্ষ, উদ্দাম তেজ, অসীম মনোবল—আবার পুরাকালের ন্যায় গম্ভীর অথচ দৃঢ়স্বরে বলিতেছে—বন্দে মাতরম্।

ফাঁকি

বন্দে আলী মিয়া

কৌতুক তব লেগেছিল ভালো দু'দিনের লুকোচুরি,
চক্ষের ভাষা অধরের ছাপ্ হাস্যের ফুলঝুরি।
যৌবনতরী চলেছিল যবে জীবনের আব্ডালে,
কাণ্ডারী মোরে করিলে কি তায় নির্জ্জন নিশাকালে!
পথিকের কোন্ পথ্‌ভোলা গীতি
সহসা তোমার আদরের ভীতি
সুদূরের পথে শান্তির ছোঁয়া এঁকে দিল মোর ভালে।
জানি না কি প্রিয়া তব আঁখি ছায়া
না-আসা-দিনের গড়ি রূপ্-কায়া
ঘর কোণে মোরে রাখিল না আর দেখাইল মায়াপুরী।
দুদিনের লুকোচুরি।

কৌতুক তব লেগেছিল ভালো—নয়নের মরীচিকা—
মৌ-বনে যবে জ্বলেছিল তব ছলনার আলো-শিখা।
দুই জোড়া আঁখি মিলি এক ঠাঁয়—হাসি দিয়ে বিনিময়,
দুইখানি রূপ পান করে মোরা হইতাম অক্ষয়।
চুপ্ করে লেখা হরফের বুকে
দুইখানি প্রাণ থাকিত যে লুকে'
কত কথা তার অজ্ঞাত যেন—সীমা ছাড়া কেহ কয়।
মুখোমুখি বসে মোরা দুই জনে,
মায়া-বাঁশী যবে বাজাতেম মনে,
জানিতাম প্রিয়া মোর শুধু তুমি পূজারিণী অনিমিখা।
আজি সব মরীচিকা।

কৌতুক তব লেগেছিল ভালো—বাদলের কিছু আগে;
যায়নি তখন নয়নের মোহ জীবনের রাঙা ফাগে।
একা ঘরে আজ মনে হয় যেন রাত শেষে শরতের,
ছলনায় মোরে ভুলায়েছ তুমি নহো কভু দরদের।
অতীতের বাণী স্বপনের প্রায়
মরীচিকা সম ওই মিশে যায়;
ছিঁড়ে গেল মোর আকাশের ফুল ছোঁয়া লেগে মরতের।
দুইখানি বুকে অভিমান-দেয়া
বন্ধ করেছে লিপিকার খেয়া—
অবেলায় আজি আশাহত প্রাণ কেন তায় মিছি মাগে।
প্রভাতের কিছু আগে।

শিকার

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম এ

(১)

সুধার মাতুল হরদাস পিতৃমাতৃ-হীনা ভাগ্নীর বিবাহ দিয়া গ্রামের মধ্যে যে যশ অর্জ্জন করিয়াছিল—বোধ করি সীতার বিবাহ দিয়া জনক রাজার ভাগ্যেও তাহা ঘটে নাই। জামাতা নীলমণি কলিকাতার কোনও প্রেসে কম্পোজিটারি করিয়া মাসিক ত্রিশটি মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া থাকে—সুতরাং এ হেন স্বামী-লাভ যে সুধার পূর্ব্বজন্মের শিবপূজার ফল, এ বিষয়ে যেমন সবাই নিঃসন্দেহ হইয়াছিল, তেম্‌নি হরদাসের ভাগ্‌নী-প্রীতিও একটা আদর্শের রূপ ধরিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিল। সুধাকে বিদায় দিয়া হরদাস শুষ্ক চক্ষু মুছিয়া মুছিয়া লাল করিয়া ফেলিলে, পাড়া-প্রতিবাসী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বুঝাইতে লাগিল—"দুঃখ্‌ করে আর কি করবে হরদাস! মেয়ে তো পরের ঘরে যাবার জন্যই লালন করা!"

হরদাস আর্ত্তস্বরে কহিল—"কিন্তু মন যে তা' বোঝে না। দিদি যখন ওকে এতটুকু রেখে দুচোখ বুজলেন, সেই থেকেই যে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি।"

সকলে বলিল—"আহা, তা সত্যিই তো। একটা কুকুর-বেড়াল পুষলেই মায়া পড়ে যায়,—এ তো বোনের গর্ভের সন্তান। তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। যেমন বাপ-মা-মরা মেয়ে, তেম্‌নি রাজার হাতে তুলে দিয়েছ। ওর আর দুঃখের মুখ দেখ্‌তে হবে না।"

হরদাস প্রসন্ন হইয়া কহিল—"তাই তোমরা আশীর্ব্বাদ করগো, সুধা যেন আমার রাজরাণী হয়। ওকে পার করতে কি কম চেষ্টা করেছি—নিজের মেয়ের বেলাতেও কেউ এমনটি করে না।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"তা তো বটেই, তা তো বটেই। সে কথা কে না জানে।" হরদাস তখন উৎসাহিত হইয়া জামাতা সংগ্রহের কল্পিত ইতিহাসটি আর একবার বলিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিল।

(২)

পিতৃমাতৃ-হীনা সুধার বিবাহ একটু বেশী বয়সেই হইয়াছিল। সুতরাং মাতুলের সংসার ছাড়িয়া এক অজানা ঘরে আসিতে তাহার খুব যে বেশী কষ্ট হইয়াছিল, তাহা নয়। বরং মামা-মামীকে এত শীঘ্র রেহাই দিতে পারিয়াছে মনে করিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সকলে তাহার স্বামী-ভাগ্য দেখিয়া যখন তাহার অদৃষ্টের প্রশংসা করিতেছিল—তখন তাহার এই কথাটাই মনে জাগিয়াছিল, আর যাহাই হউক, এইবার সে মামা-মামীর কথার খোঁচা হইতে চিরদিনের মত পরিত্রাণ পাইয়াছে।

স্বামী নীলমণি তাহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসিল। এক বস্তির দুখানি খোলার ঘর লইয়া নীলমণির সংসার। সংসারে এক নীলমণি ছাড়া আর কেউ নাই। সুতরাং সুধা একেবারে গৃহের কর্ত্রী হইয়া বসিল। প্রতি দিন স্বামীর জন্য রাঁধিয়া, স্বামীর অপরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরিষ্কার করিয়া, স্বামীর ঘর মনের মত করিয়া সাজাইয়া-গুছাইয়া সে সময় কাটাইত।

নীলমণি বেলা আটটা নয়টায় প্রেসে যায়। তার পর সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া, অপরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় ছাড়িয়া, কিছু জলযোগ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। আর সুধা সেই শূন্য গৃহে একাকী ভয়ে আড়ষ্ট ভাবে রাত্রির অনেকটা কাটাইয়া দেয়। তার পর নীলমণি গভীর রাতে ফিরিয়া আসিয়া আহার করিলে, তাহার পাতের প্রসাদ খাইয়া সে স্বামীর পাশে বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। কোনও দিন সে এ প্রশ্ন করিতে সাহস করে না—কেন প্রতি রাতে তাহাকে একলা ফেলিয়া সে এম্‌নি করিয়া চলিয়া যায়,—তাহার কত ভয় করে একলা থাকিতে।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে আশেপাশের খোলার ঘর গুলিতে নানা রকমের কাণ্ড চলিতে থাকে। কোথা

বা হারমোনিয়াম-ডুগি-তবলার শব্দ, কোথাও বা মেয়েলি গলার বেসুরো সঙ্গীত, কোথাও বা মাতালের জড়িত স্বর। তাহাদের বাড়ীটিকে ঘিরিয়া যাহারা বসবাস করিয়া থাকে, তাহাদের সহিত তাহার কোনও পরিচয় না হইলেও, সে বুঝিতে পারে, যে স্থানে তাহারা বাস করে, সেথায় আর যাহারই হউক, ভদ্রলোকের বাস করা চলে না। তাই সন্ধ্যা হইতে না হইতে তাহার গা এক অজানা ভয়ে কাঁপিতে থাকে।

সেদিন নিতান্ত ভয়ে ভয়ে সুধা বলিল—"দেখ, একা থাকতে আমার বড় ভয় করে।"

নীলমণি সহাস্যে কহিল—"তাহলে পাহারা দেবার জন্য আর কাউকে আন্‌বো কি?"

কুণ্ঠিত ভাবে সুধা কহিল—"না, তা বলছিনে,—আমার মনে হয়, আশেপাশের লোকগুলো তেমন ভাল নয়।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া নীলমণি কহিল—"কারও সাথে আলাপ-পরিচয় হয়েছে না কি?"

সুধা ভীত ভাবে বলিল—"তা নয়। তবে আমি ওদের ভাবে বুঝতে পারি।"

নীলমণি উত্তর দিল—"নিজে ভাল থাকলেই হ'লো। অন্যে কি করছে তা দেখবার তোমার দরকার কি শুনি?"

সুধা কহিল—"এ বাড়ী ছেড়ে দিলে হয় না?"

"কেন? রাজরাণী তো আর নয় যে, এতে মন উঠ্‌চে না। বলি, গেঁয়োভূত সহরে এসেছ, সেই তো খুব। বেশী আবদার ভাল নয়।"

তা বটে! সুধা চুপ করিল। কিন্তু কেন যে সে সে-বাড়ী ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিল, স্বামী তাহা বুঝিল না বলিয়া সুধা মর্ম্মাহত হইল।

(৩)

বছর তিন-চার পরের কথা বলিতেছি। এই কয়েক বছরের মধ্যেই সুধার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে এখন আর ছোটটি নয়—এক সন্তানের জননী। যে সুধা মুখ ফুটিয়া একটি কথা বলিতে পারিত না—সে এখন স্বামীর সঙ্গে তেজের সহিত কথা বলে; আর তারই ফলে তাহার দেহ প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠে। কিন্তু তবু যে সে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সে নিজের অদৃষ্টলিপি অনেকটা পড়িয়া ফেলিয়াছে—ভবিষ্যতে তাহার জন্য যে ভাগ্য-লিপি অপ্রকাশিত রহিয়াছে, তাহারও অনেকটা বুঝি বা সে অনুমানে বুঝিয়া লইয়াছে।

স্বামী-ভাগ্য তাহার যেমনই হউক, কিন্তু পুত্রটিও যে পৃথিবীর সমস্ত ব্যাধির আকর হইয়া জন্মিয়াছে, ইহাই তাহাকে সর্ব্ব সময়ে পীড়া দিতেছিল। রুগ্ন পুত্রের জন্য সুধার মাতৃ-হৃদয় যতই আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে—নীলমণি ততই তাহাকে আঘাতের পর আঘাত দেয়। স্বামী যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে—এই লইয়াই উভয়ের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়।—তার পর সে বাড়ীর বাহির হইলে সুধা রুগ্ন পুত্রকে কোলে লইয়া কাঁদিতে থাকে, আর ভগবানকে প্রত্যহ জানায়—"স্বামীর সুমতি দেও ভগবান!"

কিন্তু নীলমণির মতি ফিরিবার কোনও লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। বরং সে ধাপে-ধাপে এম্‌নি নিম্নস্তরে নামিয়া চলিল যে, ক্রমশঃ তাহার বাড়ী আসা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। সুধা প্রমাদ গণিল।

তিন-চার দিন পরে এক দিন নীলমণি বাড়ী ফিরিলে, সুধা কহিল—"এত দিন কোথায় ছিলে? আমার দিকে না চেয়ে দেখ, ছেলেকে তো দেখ্‌তে হয়।"

নীলমণি রক্ত চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া কহিল—"ও—আমার বড় দায় রে! যার দরদ সেই দেখুক।"

সুধা কহিল—"আমি মেয়েমানুষ—যত দরদই করি না কেন—কিন্তু টাকা তো রোজগার করতে পারিনে। সে তো তোমাকেই জোগাতে হবে। তুমি আর যাই কর, এইটুকু দেখো, যেন খেতে না পেয়ে মরি।" সুধার চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

নীলমণি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—"মামার বাড়ী বার ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খেতে যে, এখানে খাওয়া জুট্‌ছে না,—না? মেয়েমানুষের মত এমন নেমকহারাম জাত আর দুটি নাই।"

সুধা গর্জ্জিয়া উঠিল, কহিল—"নেমকহারাম? তাই বটে!" এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই একটা বাটীতে খানিকটা জলীয় সাদা পদার্থ স্বামীর পায়ের কাছে ধরিয়া দিয়া কহিল—"নেমকহারাম আমি—তাই তোমার দেওয়া অন্ন-ব্যঞ্জন রোচে না। কিন্তু কেন তোমার ছেলেকে দুধের বদলে খড়ি গুলে খাওয়াতে হয়? কেন তার তিন দিন দুধ তো দূরের কথা—একটু বার্লি

পর্য্যন্ত জোটে না? নেমকহারাম মেয়েমানুষ—তাই তোমাদের লাথি ঝাঁটা খেয়েও মুখ বুজে পড়ে থাকে।"

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া নীলমণি বলিয়া উঠিল—"ওঃ, কি আমার সতী সাধ্বীরে!"

"না—আমি সতী নয়,—তুমি বড় সৎ। ত্রিশ টাকা মাইনের চাকুরে—নিজে খেতে পান না—বউ-ছেলেকে খেতে দেবার সামর্থ্য নাই—সে যায় 'ফর্ত্তি' উড়াতে। আমি যাই হই, ভগবান দেখছেন—কিন্তু তুমি যে কত বড় বদমায়েস, তাও তাঁর জান্‌তে বাকি নেই।"

নীলমণি এইবার মরিয়া হইয়া সুধার দিকে ধাইয়া আসিল। তার পর তাহার চুলের মুষ্টি ধরিয়া, সজোরে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া, সরোষে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সুধা অনেকক্ষণ সেই জায়গায় স্তব্ধ নীরব হইয়া রহিল—তাহার চোখ দিয়া একবিন্দু জল বাহির হইয়াও তাহার বুকের জ্বালা লঘু করিল না।

(৪)

সেদিন প্রায় সন্ধ্যাকালে সুধা স্বামীর প্রেসের কালী-মাখা মলিন জামা-কাপড় লইয়া সাবান দিয়া ধৌত করিতেছিল, এমন সময় নীলমণি বাড়ী আসিল। কিন্তু আসিয়াই তাহার কাপড় জামার অবস্থা দেখিয়া রাগে আগুন হইয়া কহিল—"এতক্ষণে বুঝি কাপড়ে হাত দেওয়া হয়েছে?"

সুধা ধীর স্বরে কহিল—"চুপ, আস্তে কথা কও। ছেলে এইমাত্র ঘুমিয়েছে; চেঁচামেচি করলে উঠে পড়বে—আমার আর কাপড় কাচা হয়ে উঠ্‌বে না।"

নীলমণি গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল—"চুপ করবে তোর ছেলের ভয়ে! এতক্ষণে কেন কাচা হয়নি হারামজাদি?"

দাঁতে দাঁত চাপিয়া সুধা কহিল—"হারামজাদি! খেতে দেবার কেউ নয়, গাল দেবার সোয়ামি! বাবু যাবেন রোজ ধোয়া কাপড় পরে সন্ধ্যার পর ফর্ত্তি উড়াতে, আর আমি ঐ জ্বরে-গা-পোড়া ছেলেকে ফেলে রেখে নিত্যি কাপড় কেচে দেব!"

নীলমণি মারমুখি হইয়া কহিল—"মেরে যে রোজ হাড় গুঁড়ো করে দি'—তাতেও তোর লজ্জা হয় না? কেবল মুখের উপর কথা! যদি কাজ করতেই না পারবি—তবে এখানে পড়ে আছিস্ কেন? মামাবাড়ী চলে গেলেই পারিস্।"

সুধা কহিল—"কেন সেখানে যাব? যদি খেতে দিতে না পারবে, যদি আমি তোমার এম্‌নি ভার হয়ে দাঁড়াব,—তাহ'লে কেন আমায় বিয়ে করেছিলে,—কেন আবার ছেলের সখ হয়েছিল?"

নীলমণি মুখ ফিরাইয়া কহিল—"আমি কি তোকে সেধে বিয়ে করতে গিয়েছি যে লম্বা কথা শোনাচ্ছিস্? কেন তোর মামা পায়ে ধরে সেধে নিয়ে গিয়েছিল, তাই জিজ্ঞেস করি?"

সুধার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, কহিল—"তা' জানিনে। শুধু এইটুকু জানি, তুমি আমায় তোমার ঘরে স্থান দিয়েছ, তুমি আমার স্বামী। তুমি আমার উপর যত জুলুম কর সহ্য হবে—কিন্তু ঐ রোগা ছেলের দিকে একটু তাকাও। ওকে ডাক্তার দিয়ে দেখাও। আজ তিন দিন জ্বরের ঘোরে বেহুঁস্ হয়ে রয়েছে—ও বুঝি আর বাঁচ্‌বে না।"

নীলমণি বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে কহিল—"অমন ছেলের মরাই ভাল। যে ছেলে জন্মে অবধি জ্বালাচ্ছে—তাকে গলা টিপে মেরে ফেলা ভাল।"

"তবে তাই কর গো, তাই কর। তোমার ঐ হাত দিয়ে আগে আমার গলা টিপে মেরে ফেল—তার পর ছেলের দফাও নিকেশ করে দাও। আমরা সকল জ্বালা থেকে উদ্ধার পাই। কিন্তু কেন ছেলে জন্ম অবধি এম্‌নি ভাবে জ্বালাচ্ছে আর নিজেও জ্বলছে? সেও তোমারই পাপে। ওর সারা গা দিয়ে যে ঘা বেরিয়েছে—সেও তোমারই পাপের ফলে। তোমরা পুরুষ মানুষ, তাই এততেও মুখ দিয়ে জোরের কথা বেরোয়—কিন্তু আমাদের একটু কিছু হলে লজ্জায় আর মুখ দেখানো চলে না।"

নীলমণি সুধার কথার অর্থ বুঝিয়া ভ্রূকুটি করিয়া কহিল—"কে তোমায় বলেছে,—আমারই দোষে ছেলের সর্ব্বাঙ্গে ঘা বেরিয়েছে?"

"কে আবার বলবে—ডাক্তার বলেছে। তুমি কি মনে কর, বাপ হয়ে তুমি চুপ করে আছ বলে' আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌তে পারি। এ যে মায়ের প্রাণ। তাই লজ্জা-সরম ত্যাগ করে আমাকেই ডাক্তার ডাক্‌তে হ'লো। যার স্বামী এমন অপদার্থ—তার আবার স্ত্রীর মানসম্ভ্রম কোথায়!"

নীলমণি ব্যঙ্গ করিয়া কহিল—"কিন্তু ডাক্তার ডাকবার খরচটা কে দিলে শুনি? সেটা কি ধারে চলুছে,—না নিজের ইজ্জত দিয়ে ছেলের চিকিৎসা হচ্ছে?"

তাহার কথার অর্থ সুধা পরিষ্কার বুঝিতে পারিল। কিন্তু সেও তেজের সহিত জবাব দিল—"তাও হয় তো এক দিন না এক দিন দিতে হবে। সমর্থ স্ত্রীকে একলা এই নরককুণ্ডে ফেলে রেখে যে স্বামী দিনের পর দিন বাইরে কাটায়, তার ইজ্জত কি করে বেশী দিন থাকবে? আমি বলেই এত দিন টিঁকে আছি—আর কেউ হলে—"

মুখ ফিরাইয়া নীলমণি কহিল—"আর কেউ হলে খাতায় নাম লিখাতো। কিন্তু কি আস্পর্দ্ধা—আমার মুখের সাম্‌নে এ কথা বল্‌তে তোর লজ্জা হ'লো না?"

"লজ্জা? রাতদুপুরে যার ঘরের দরজায় পাড়ার বদমায়েসেরা ঘা মারে,—যাকে উদ্দেশ করে বাড়ীর সাম্‌নে বিনা বাধায় অশ্লীল গান গায়,—যার দিকে দিনের পর দিন মন্দ লোকের কুৎসিত দৃষ্টি পড়ে আছে—তার আবার সম্ভ্রম কোথায়? যার স্বামী এমন হৃদয়হীন পিশাচ যে স্ত্রীর অপমান দিন-দিন বাড়িয়ে তুলছে, তার আবার লজ্জা কিসের? না, আমার লজ্জা নাই, অপমান নাই, সম্ভ্রম নাই, ইজ্জত নাই—সব গিয়েছে সেইদিন থেকে, যেদিন আমার ভাগ্যে তোমার মত অপদার্থ স্বামী জুটেছে!"

"চুপ কর হারামজাদি! আমি হলুম অসৎ, আর যে ইয়ারকি দিয়ে লোকের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে—সে হ'লো সতী!"

সুধা আর সহ্য করিতে পারিল না। সে উদ্দীপ্ত চোখে স্বামীর দিকে চাহিয়া তেজের সহিত কহিল—"চুপ কর, ওগো, চুপ কর। এখনও চন্দ্র সূর্য্য উদয় হচ্ছে—অমন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করো না, ভগবান সহ্য করবেন না।"

"না—ভগবান তোমার কীর্ত্তিকলাপ সহ্য করবেন। কিন্তু আমিও তোমায় উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে যাব। সদর-দরজায় তালা বন্ধ করে বেরিয়ে যাচ্ছি—যত দিন না এইখানে ছেলে সুদ্ধ না খেতে পেয়ে মরছিস্—তত দিন আর এমুখো হচ্ছিনে। দেখি—কোন্ ভগবান তোকে রক্ষা করে।" এই বলিয়া সে দ্রুত বাহির হইয়া গেল। সুধা সেই জায়গায় নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। স্বামী যে তাহার কথানুযায়ী কাজ করিল—সদর-দরজায় তালা-চাবি লাগানোর শব্দ শুনিয়াই তাহা বুঝিতে তাহার আর বিলম্ব হইল না।

(৫)

"মা"—

সুধা পুত্রের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল—"বাবা!" অতি ক্ষীণ কণ্ঠে দুই বৎসরের শিশু কহিল "জল!" সুধা আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—"ভগবান্!"

আজ তিন দিন সুধা এই ঘরে বন্দিনী। আহার নাই, নিদ্রা নাই,—এমন কি, আজ একবিন্দু জল পর্য্যন্ত মুখে পড়ে নাই! প্রত্যহ রাস্তার কল হইতে সুধা জল লইয়া আসিত—কিন্তু সদর-দরজায় তালা বন্ধ বলিয়া আজ তিন দিন জল আনা হয় নাই। যেটুকু ছিল, এ দুদিন চলিয়াছে,—এখন আহার তো দূরের কথা—জল অভাবেই মরিতে হইবে। তাহার কণ্ঠতালু শুকাইয়া সমস্ত দেহ একবিন্দু জলের প্রতীক্ষায় ছটফট করিতেছিল। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও নিদারুণ যন্ত্রণা—মৃত্যুশয্যায় শয়ান পুত্রটির মুখে একবিন্দু জল দিতে পারিল না। ক্ষুদ্র শিশু মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে বারংবার জল চাহিতেছে—কিন্তু সে এমনি হতভাগিনী যে, ঔষধ-পথ্য দূরের কথা—পুত্রের শেষ সময়ে এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত তাহার জুটিল না রে!

আজ সারাদিন সে নিজের দেহ-মনের সহিত যুঝিয়াছে। মনকে বুঝাইয়াছে যে, এম্‌নি করিয়া পুত্র সহ সেও ইহলীলা সম্বরণ করিবে। কিন্তু যখনই শিশু পুত্রের পিপাসা-কাতর মৃত্যু-ছায়া-মণ্ডিত শুষ্ক মুখের দিকে সে চায়—অম্‌নি দেহ-মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সে ভাবে—যাক তার ইহকাল-পরকাল, যাক তার ধর্ম্ম—সে আর কিছু চাহে না,—শুধু বিনিময়ে একটু জল!

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হওয়ায় আশেপাশের ঘরগুলি ক্রমশঃ নিস্তব্ধ, নীরব হইয়া আসিল। কিন্তু সুধার বক্ষ-স্পন্দন আরও দ্রুত তালে চলিতে লাগিল। আজ এই কদর্য্য পল্লীতে আশেপাশের কদর্য্য হল্লা তাহার বুকে যে কতটা বল দান করিতেছিল, তাহা এখন সে যতটা বুঝিতে পারিল, এম্‌নটি আর পূর্ব্বে অনুভব করে নাই। সে একবার পুত্রের মুখের দিকে চাহিল, একবার ভগবানের নাম স্মরণ করিল। তার পর অস্থির-পদে ঘরের সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে বারংবার পদচারণা করিয়া ফিরিতে লাগিল।

আবার অতি ক্ষীণকণ্ঠে সুদূর পথের যাত্রী শিশু ডাকিল—"মা!"

সুধা কাণ পাতিয়া সেই শব্দ শুনিয়া, ছিন্ন শয্যার প্রান্তে আসিয়া, শিশুর মুখের উপর পড়িয়া আবেগ-ভরে ডাকিল—"খোকা, বাবা!"

"একটু জল!"...সহসা বাড়ীর সামনে রাস্তায় কদর্য্য প্রেমের সঙ্গীত শুনিয়া সুধার মুখে ক্রুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। অস্বাভাবিক কণ্ঠে সে কহিল—"জল! জল! মাণিক আমার, একটু সবুর কর, এখুনি দিচ্ছি।" তড়িৎবেগে সুধা রাস্তার পাশের জানালাটি অনেক দিন পরে খুলিয়া তীক্ষ্ণ-স্বরে ডাকিল—"বিপিন!"

বিপিন জানালার নিকটে আসিতেই, সুধা অস্বাভাবিক স্বরে কহিল—"একটু জল দিতে পার!...একটুখানি জল! পরিবর্ত্তে তুমি যা চাও, তাই পাবে। আর আমি আপত্তি করবো না।"

বিপিন সহসা যেন থতমত খাইয়া গেল, কহিল—"এর মানে কি?"

"তুমি যদি এই মুহূর্ত্তে একটু জল ভিক্ষা দিতে পার, আমি আজীবন তোমার দাসী হয়ে থাকবো।"

বিপিন আর ইতস্ততঃ না করিয়া, বলিষ্ঠ নিপুণ হস্তে দরজার তালা ভাঙ্গিয়া, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই, ঘটি লইয়া বাহির হইয়া গেল, এবং কিছুক্ষণ পরেই জল সমেত ফিরিয়া আসিল।

সুধা জল লইয়া পুত্রের মুখে দিল—কিন্তু শিশুর তখন এমন সাধ্য নাই যে, এক বিন্দু জলও গিলিতে পারে। জলটুকু গলায় আটকাইয়া তাহার চোখ কপালে উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষীণ প্রাণটুকুও বাহির হইয়া গেল। সুধা পুত্রের মুখের দিকে অপলক-নেত্রে চাহিয়া রহিল। তার পর তাহার হাতের পাত্রটি সজোরে নিক্ষেপ করিয়া, শয্যাপ্রান্ত হইতে উঠিয়া বলিল—"চল।"

হতবুদ্ধি বিপিন কহিল—"কোথায়?"

"যেখানে নিয়ে যাবার জন্য দিনের পর দিন আমায় উত্যক্ত করে তুলেছিলে! সব কি এরই মধ্যে ভুলে গেছ? না,—আজ তোমাকে কিছুতে ছাড়ছিনে। ভাব্‌ছো, বুঝি পাগল হয়ে গিয়েছি। না গো না—এ যে নারীর প্রাণ, এতে অনেক ঘা সয়।"

বিপিন ইতস্ততঃ করিতেই, সুধা ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল—"এখন সাহস হচ্ছে না বুঝি! কিন্তু আমি তো সেই সুধাই আছি, যাকে উদ্দেশ করে তোমাদের অফুরন্ত প্রেমের গান চলতো,—যাকে নরকের পথে সঙ্গী করবার অভিলাষে কত অভিসন্ধিই না তোমাদের করতে হয়েছে। নাও—আর দেরী করো না।"

বিপিন ভাবিল—সুধা পাগল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মুখে কহিল—"খোকা"—

"হ্যাঁ—ওকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাব বৈ কি!" তার পর সন্তানের শয্যাপ্রান্তে ফিরিয়া, মৃত শিশুকে বুকের উপর জাপটাইয়া ধরিয়া, তাহার মুখে অসংখ্য চুমো খাইতে খাইতে, বিকৃত স্বরে বলিতে লাগিল—"আহা, বাছা আমার! এক ফোঁটা জলের অভাবে অভিমান করে চলে গেলি। না, রাগ করিস্‌নে মাণিক, এমন জায়গায় তোকে এবার রেখে আসবো যে, আর জলের অভাব হবে না।"

তার পর বিপিনকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—"চল বিপিন, এইবার খোকাকে আমার গঙ্গা মায়ের কোলে দিয়ে আসি।"...এই বলিয়া সে নিজেই বিপিনের হাত ধরিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

দিন সাতেক পরে নীলমণি বাড়ীতে ফিরিয়া, সদর-দরজা উন্মুক্ত দেখিয়া, একেবারে আগুণ হইয়া ঘরে ঢুকিল। কিন্তু ঘরে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পুত্রের শেষ শয্যা তেম্‌নি পাতা রহিয়াছে, অদূরে মেঝের উপর গেলাসটি ধূলায় গড়াইতেছে, কিছু দূরে খানিকটা জলসমেত পিতলের ঘটিটি পড়িয়া আছে—ইহা ছাড়া ঘরে—সুধা বা তাহার পুত্রের অস্থি-মাংস দূরের কথা—একগাছি কেশ পর্য্যন্ত নাই। নীলমণি দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিতে লাগিল—"সতী সাধ্বী নিজের পথ দেখেছেন! যাক্—আপদ গিয়েছে।" এই বলিয়া সে ঘটিটি তুলিয়াই, ঢক ঢক করিয়া খানিকটা জল পান করিয়া লইল। তার পর সেইখানেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

খৃষ্টান তীর্থরাজ পাদোহ্বা

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ

(১)

হ্বেরোণা হইতে ঘণ্টা দুয়েকে পাদোহ্বায় পৌঁছানো গেল। এই শহরকে ফরাসীরা জানে "পাদু" বলিয়া। ইংরেজি নাম প্যাডুয়া। জার্ম্মাণদের উচ্চারণে ইহার রূপ পাডোহ্বা। ভারতবাসীও ইচ্ছা করিলে পাদোহ্বার এক ভারতীয় সংস্করণ জারি করিতে পারেন। বাধা দিবার কেহ নাই।

মাইলের পর মাইল চোখে পড়িল কেবল বিকট ন্যাড়া ডালপালাহীন গাছের সারি। মাঠগুলা সমতল। আশে পাশে দূরে অতি দূরেও কোনো পাহাড়-পর্ব্বতের টিকি দেখা যাইতেছে না। শীত এবার জবর পড়িয়াছে —মায়, পাদোহ্বা অঞ্চলেও বরফ! ইতালিয়ানরা হিন্দু হইলে এই ধরণের কাণ্ডকে বলিত "কাশীতেও ভূমিকম্প!" এখনও চাষের লক্ষণ মালুম হওয়া সম্ভব নয়।

ষ্টেশনে কেহই জার্ম্মাণও জানে না, ফরাসীও জানে না। শহরে প্রবেশ করিবার পথেই চুঙ্গির আফিস। বাক্স পেঁট্রা খোলাখুলির ধুম পড়িয়া গেল। "নয়া কোনো চিজ আছে কি? থাকিলেই মাশুল!"

গোশকটে মুমূর্ষু সান্তোনিও (১১ জুন ১২৩১)

(২)

বড় সড়কটা মফঃস্বলের শহরের পক্ষে নিন্দনীয় নয়। কয়েকটা মস্ত মস্ত ইমারতও নতুন মাথা তুলিয়াছে। অনতিদূরে ফ্যাক্টরি মহাল্লার চিহ্নও দেখা যাইতেছে। একটা পুল (পোন্তে মোলিনো) পার হইতে হইল।

ঘর-বাড়ীগুলা সাধারণতঃ দোতালা বা তেতালা। খিলান আর জানালার সারি মনোরম। বারান্দার স্তম্ভগুলা পর পর সাজানো। এই দৃশ্য গলি ঘোঁচের ভিতরেও অজস্র। ইটের দালান। পাথরের রেওয়াজ বেশী নয়।

কোনো কোনো গলির দুই "ফুট পাথ"ই দালানগুলার বারান্দা বিশেষ। রাস্তার এক কিনারা হইতে অপর

কিনারায় পৌঁছিতে আকাশের নীচে নামিতে হয় না। জল-বৃষ্টির সময়ও বিনা ছাতায়ই এইরূপ বারান্দা-ফুট-পাথের সাহায্যে বহু দুর চলা-ফেরা করিতেছি।

আগাগোড়া পাড়াগাঁ বলিলেই চলে। বড় সড়কটায় যা কিছু শহুরে জীবনের ধুম-ধাম। মধ্যযুগের বাস্তু দু' একটায় জাঁক কিছু কিছু দেখিতেছি। ভারতীয় মফঃস্বলের দ্বিতীয় শ্রেণীর শহরে আর পাদোহ্বায় বড় একটা প্রভেদ পাওয়া যাইবে না। তবে আধুনিকতার সাক্ষী এখানে বিজুলীবাতী আর তাড়িতের ট্রাম। মোটরকারও অবশ্য চলিতেছে। তবে বৃষ্টির সময় কাদা, আর রোদ উঠলে ধুলা সকল রাস্তায়ই নিত্য-সহচর।

নাক চোখ ও মুখের ভঙ্গী ছাড়া ইহুদি চিনিবার আর এক উপায় হইতেছে গায়ের রঙ্। ইহুদিরা কিছু কালো। কাজেই ইয়োরামেরিকায় যে সকল ভারতসন্তান বসবাস করে তাহাদের রঙ কথঞ্চিৎ ফর্সা হইলে লোকে প্রথমেই তাহাদিগকে ইহুদি জাতির অন্তর্গত করিয়া বসে। কিন্তু অনেক স্থলেই কি মুখশ্রী কি রঙ্ দুইই ইহুদি খৃষ্টান ও ভারতীয় ইত্যাদি জাতি-ভেদের কাজে ভুল সাক্ষ্য দেয়।

ইতালিয়ান নারী মহলেও "ইহুদি-সুলভ" মুখ চোখ এবং রঙ্ সর্ব্বদা চোখে পড়িতেছে। খাঁটি ইতালিয়ানদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে বুঝিতেছি, আমার অনুমান আগা-গোড়া অঠিক। অর্থাৎ খৃষ্টান ইতালিয়ান নর-নারী

মোলিনো সাঁকো (পাদোহ্বা)

অনেকেই কিছু কালোও বটে। আর ইহাদের মুখ কথঞ্চিৎ চ্যাপটা এবং নাকের মাঝখানটা কিছু উঁচাইয়াও উঠে।

(৩)
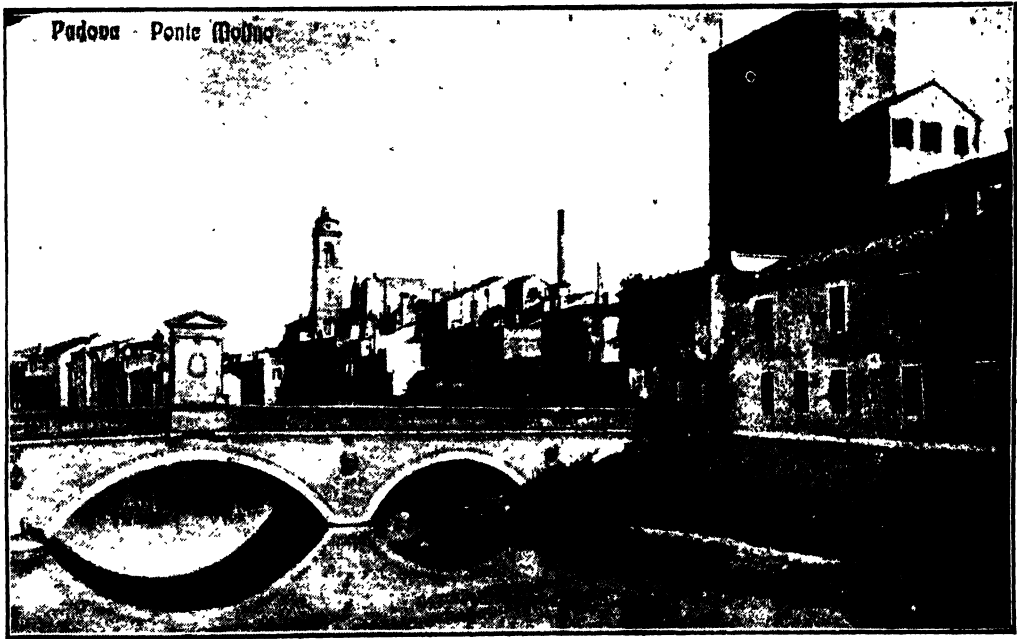
ইতালিয়ানদের চেহারায় ইতিমধ্যেই প্রধানতঃ দুই শ্রেণী দেখিতেছি। কোনো কোনো পুরুষকে জার্ম্মাণিতে কিম্বা ফ্রান্সে বা আমেরিকায় দেখিলে ইহাদিগকে নিশ্চয়ই ইহুদি বিবেচনা করিতাম। ইহুদি জাতীয় নাক চোখ ও সাধারণ মুখশ্রী এ পর্য্যন্ত রেলে এবং পাদোহ্বার পথ-ঘাটে হামেশা পাইয়াছি। ইহাদের অনেকেই ইহুদি নয়। অর্থাৎ খৃষ্টান।

ইহুদি ও খৃষ্টান জাতি-ভেদের "নৃতত্ত্ব"টা রপ্ত হইয়া গেলেও, ইতালিতে আর এক সমস্যায় আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। যে সকল লোককে কোনই মতেই ইহুদি শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায় না,—অর্থাৎ খাঁটি শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান ইতালিয়ানদেরও অনেকেরই চুল কোঁকড়া। এইখানে

নিগ্রো নৃতত্ত্বের মামলা। মিশরের মুসলমান মহলে এই ধরণেরই চুল দেখা যায়।

চুলগুলা কেবল কোঁকড়া মাত্র নয়। অনেকটা উস্‌খু-খুস্‌কুও বটে। ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের মাথায় প্রায় এই ধরণের চুলই দেখিয়াছি। ইতালিতে বলিব যে—উত্তর আফ্রিকার চুল বিরাজ করিতেছে। এ ঠিক নিগ্রো চুল নয়।

এই সকল বিশেষত্বহীন "ইয়োরোপীয়ান-সুলভ" অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পাদোহ্বার হাটে-বাজারে নজরে আসিতেছে। কিন্তু তবুও মামুলি ধাঁচের ইতালিয়ান নর-নারীকে কাজেই চীন, জাপান, ভারতের লোকজনের মতন ইতালিয়ান নর-নারীও শীত বরদাস্ত করিতে ভয় পায় না। কিন্তু ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরেজ, আমেরিকান ইত্যাদি পাশ্চাত্যেরা ফেব্রুয়ারী মাসে বাঘা শীতের জন্য প্রস্তুত থাকে। চোপর দিন ঘর গরম রাখা ইহাদের দস্তুর। এই সব জাতীয় লোক ইতালিতে আসিলে মহা বিপদে পড়ে। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর হোটেল ছাড়া ইতালির কোনো শহরে ঘর গরম করিবার আয়োজন নাই। অবশ্য এই ধরণের হোটেলে বসবাস করা বহু লোকের পয়সায়ই কুলায় না।
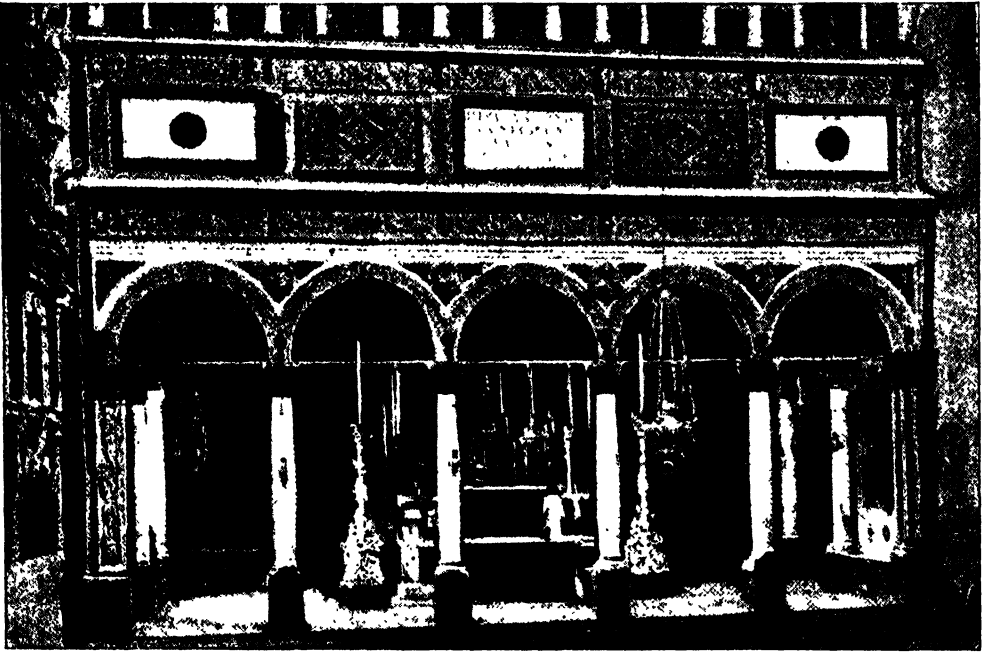
আন্তোনিয়ো গির্জ্জার ভিতরকার দৃশ্য (পাদোহ্বা)

দেখিবামাত্র জার্ম্মাণ বলিয়া ভ্রম হওয়া কঠিন। শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান ইতালিয়ানরা "ছিপ্‌ছিপে" "রোগা"। অর্থাৎ বহরে ইহারা সাধারণতঃ বিশাল নয়। অধিকন্তু চুল ইহাদের কালো বা কৃষ্ণাভ অথবা বাদামি। কিন্তু জার্ম্মাণরা সাধারণতঃ "ব্লণ্ড্‌" বা শ্বেতাভ চুলের অধিকারী। আর জার্ম্মাণদের বপু—স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই—বেশ কিছু বিস্তৃত পরিমাণ আকাশ দাবী করিতে অভ্যস্ত।

(৪)

শীতকালেও ঘর গরম করা ইতালিয়ানদের দস্তুর নয়।

বেচারা ভারত-সন্তান দশ বৎসর ইয়োরামেরিকায় থাকিতে থাকিতে শীতকালে গরম ঘরের মহিমা মর্ম্মে মর্মে বুঝিতেছেন! পাদোহ্বায় পদার্পণ করা মাত্র ইতালিতে এই হিসাবে "আধুনিকতার অভাব" বেশ লক্ষ্য করিতেছি। ইহার নাম "গরীবের ঘোড়া রোগ"। শীত যদিও দিল্লী লাহোরের মাত্রা ছাড়ায় না, তবুও ঠাণ্ডা ঘরে কয়েক ঘণ্টা কাটানো এক প্রকার অসম্ভব বোধ হইতেছে।

শাস্ত্রে আছে,—"শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়।" সুতরাং ঠাণ্ডা ঘরে বসবাস করা ইতালিয়ান

জাপানী, চীনা, ভারতবাসী ইত্যাদির পক্ষে একটা অতি-কিছু কৃচ্ছ্রসাধন নয়। কিন্তু অপর দিকে, একবার গরম ঘরের মায়ায় পড়িলে সে মায়া কাটাইয়া উঠা রক্তমাংসের শরীরের পক্ষে অতি মাত্রায় সংযম পালন,—যাহার শেষ নিষ্পত্তি হয় সর্দ্দি কাসিতে, ইনফ্লুয়েঞ্জায়, ম্যালেরিয়ায়।

যাহা হউক, একজন ছোটখাটো জমিদারের ঘরে অতিথি হইয়াছি। ইতালিয়ান জমিদারকে বলে "বারোণ"। ইঁহার পত্নী অষ্ট্রিয়ান (জার্ম্মাণ)। কাজেই বাড়ীতে উনন জ্বালিয়া ঘর গরম রাখা হইতেছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইহাকে

সালোনে প্রাসাদ ও বাজার (পাদোহ্বা)

"জার্ম্মাণ কুল্টুরে"র এক অঙ্গ বিবেচনা করিতে হইবে। কেন না "বারোণ" শ্রেণীর অন্যান্য ইতালিয়ান পরিবারে ঘর গরম করা হয় না। বাবু ব্যবসাতে চিকিৎসক। অধ্যাপক হিসাবে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও নাম লেখানো আছে।

(৫)

পরিবারে এক শিশু। ছেলে শাসন করিবার কায়দায় দেখিতেছি—ইতালিয়ান বাবুটি ভারতবাসীর মাসতুত ভাই। মারপিট, চেঁচামেচি, চোখরাঙানি ইত্যাদি যন্ত্র কায়েম হইয়া থাকে যখন তখন। জননী এ বিষয়ে বিপরীত। এতদিন ইয়োরামেরিকার পরিবারে পরিবারে শিশু সন্তানের লালন পালন যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে লাঠ্যৌষধি নজরে পড়ে নাই। ছেলেপুলেদিগকে কথায় কথায় ট্যাঁ ট্যাঁ করিতেও দেখি নাই।

বাড়ীতে দুই ঝী ঘরের কাজ করে। ইহারা আসিয়াছে বাবুর জমিদারী হইতে। বেতন দিতে হয় না। খোর-পোষ পাইয়াই ইহারা সন্তুষ্ট। প্রত্যেক উঠা-বসায় ইহারা গিন্নীকে "বারোণো" রূপে সম্বোধন করিয়া থাকে।

এক অদ্ভুত চিজ খাওয়া যাইতেছে। নাম "বোলেন্তা"। ভুট্টার আটা সিদ্ধ করিয়া আগুনে সেঁকা হয়। খাইতে হয় গরম গরম। বাবুটি দুইবেলা বোলেন্তা খান। সঙ্গে থাকে স্যালাডের কচি পাতা। ব্যস্‌। ইহাতেই ইনি খুসী। গিন্নী জার্ম্মাণ কন্যা। তাঁহার পক্ষে "বোলেন্তা" গলাধঃকরণ করা যে-সে কথা নয়। জার্ম্মাণদের বিবেচনায় বোলেন্তা "ছোট লোকের" খাদ্য। বড় জোর সপ্তাহে একবার করিয়া মুখ বদলানো চলিতে পারে!

অষ্ট্রিয়ানরা রান্নাবাড়িতে ওস্তাদ। রান্নাবাড়ি বলিলে ঘরকন্নার সকল প্রকার কাজই বুঝিতে হইবে। এই হিসাবে ইতালিয়ানরা না কি নেহাৎ পশ্চাৎপদ। শুনিলাম:—"অতি উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোকের মেয়েরাও না জানে ঘর সুন্দর

রাখিতে, না জানে রান্নাঘরের কোনো কাজ সামলাইতে। ইহারা বাড়ীর বাহিরে আসিবার সময় খুব দামী পোষাক পরিয়া লোক সমাজে দেখা দেয়। কিন্তু ঘরের ভিতর বিরাজ করে চরম নোংরামি, শৃঙ্খলাহীনতা আর দুর্গন্ধ।"

(৬)

ইতালিয়ানদের ঘরকন্না কিরূপ—এখনই বিচার করিতে বসা কঠিন। কিন্তু জার্ম্মাণ-অষ্ট্রিয়ানরা যে এ বিষয়ে উচ্চতম মাপকাঠি অনুসারে নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি চালাইয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনা (পাদোহ্বা)

জার্ম্মাণদের রান্নাঘরে প্রবেশ করিলে আগন্তুক মাত্রের আনন্দ হয়। দেখা যায়,—নুন, চিনি, ঘি, চর্ব্বি, মশলা, আটা, তরকারী ইত্যাদি প্রত্যেক জিনিস যথাস্থানে রক্ষিত হইতেছে। ভাঁড়গুলার গায়ে ছাপার অক্ষরে প্রত্যেক জিনিসের নাম লেখা থাকে। এমন কি দেওয়ালের, টেবিলের এবং আলমারির কোন্ কোণে কোন্ ভাঁড়টার ঠাঁই তাহাও ছাপার অক্ষরে দেখিতে পাই। বাসনকোসন পরিষ্কার করিবার জন্য যে তোআলে বা ন্যাকড়া ব্যবহৃত হয়, তাহার স্বতন্ত্র ঠাঁই আছে। টেবিল পরিষ্কার করিবার ন্যাকড়ার ঠাঁই স্বতন্ত্র। আবার হাত মুছিবার জন্য তোআলেও স্বতন্ত্র জায়গায় ঝুলাইয়া রাখা হয়।

জার্ম্মাণ-সমাজের যেখানে যেখানে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছি, সর্ব্বত্রই এইরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর নিয়ম-বদ্ধতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইয়াছে। প্রত্যেক পরিবারের গিন্নীই অতিথিকে নিজ রান্নাঘরটা দেখানো এক চরম গৌরব ও গর্ব্বের বিষয় বিবেচনা করিয়া থাকে। অতি উচ্চশিক্ষিতা নারীও হেঁসেল-ঘরের রাণী রূপে নিজের কৃতিত্ব জাহির করিতে লজ্জা বোধ করে না।

(৭)

আমেরিকার রান্নাঘরেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করিবার বস্তু। তবে জার্ম্মাণরা এ বিষয়ে বোধ হয় একেবারে চরমে গিয়া ঠেকিয়াছে। ইতালিয়ানরা জার্ম্মাণদের নিকট পারিবারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার নিয়ম শিখিয়া থাকে। ঠাকু'মা বা ঠানদির নিকট যাহা কিছু শিখা যায়, জার্ম্মাণ বালিকারা একমাত্র তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে না। গিন্নীপনার বিদ্যালয় জার্ম্মাণিতে, অষ্ট্রিয়ায় বিশেষ ইজ্জৎজনক

প্রতিষ্ঠান। এই সকল প্রতিষ্ঠানে বড়ঘরের মেয়েরাও হাতে-কলমে গিন্নী হইতে শিখে।

এই বিদ্যাপীঠে কয়েক বৎসর কাটাইয়া যাহারা সংসারে প্রবেশ করে, তাহারা কম-সে-কম দুই হাজার "পদ" রাঁধিতে শিখে। "শুক্তানি হইতে আরম্ভ করিয়া ভুনী খিঁচুড়ি, বা পোলাও কোপ্তা" ইত্যাদি বলিলে ভারতে নবরসের খানাপিনার বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ হয়। জার্ম্মাণ বালিকারা ইয়োরামেরিকান খানাপিনার বিশ্বকোষখানা পুরাপুরি দখল করিতে বাধ্য থাকে।

ইহার ভিতর "পিঠাপুলি পক্কান্নের" কোনো কিছু বাদ যায় না। পেটের অসুখ হইলে কিরূপ পথ্য দরকার, তাহাও গিন্নীপনার বিদ্যাপীঠে জানা হইয়া যায়। দাঁতের ব্যথা, সর্দ্দি, জ্বর, ইত্যাদি ব্যাধি হিসাবে পথ্য তৈয়ারি করা গিন্নীগিরির অন্তর্গত। এক কথায়, পরিবার যদি ঘটনাচক্রে রোগীর বাথানে বা হাসপাতালে পরিণত হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণ গিন্নীরা পথ্য তৈয়ারি সম্বন্ধে হা-হুতাশ করে না।

রান্নাবাড়ির শিক্ষায় আগুনের তাপ ও মাত্রা, খাদ্য দ্রব্যের রাসায়নিক দোষ-গুণ ইত্যাদি "বৈজ্ঞানিক" তথ্যও প্রচারিত হয়। অধিকন্তু, খরচপত্রের অঙ্ক কষিয়া এক একটা খানার দাম নির্দ্ধারণ করাও গিন্নী-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের শিক্ষনীয়।

যুবক ইতালির প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা মাৎসিনি

(৮)

রান্নাবাড়ি আর রোগীসেবা গৃহস্থালীর দুই বড় কাজ। আর এক বড় কাজ হইতেছে কাঁথা শেলাই করা, জামা মেরামত করা, আর কাপড় চোপড় ধোলাই করা। অর্থাৎ বুনন বলিলে যাহা কিছু বুঝা যায়—জার্ম্মাণ "হাউস হাল্টুঙস্-শুলে"তে তাহার সকল দফাই শিখিতে হয়। কাপড় কাচা বড় সহজ চিজ নয়। তুলা, লিনেন, রেশম, পশম ইত্যাদি ভেদে ধোলাই ভেদ হইয়া থাকে। তাহার উপর ইস্ত্রী করার ঝঞ্ঝাট ও রকমারি বলাই বাহুল্য।

গৃহস্থালী এইখানেই সম্পূর্ণ হয় না। ঘরের ভিতর বাহির পরিষ্কার করা আর মেরামত সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান রাখাও গিন্নীগিরির সামিল। তাহার উপর চেয়ার টেবিল ইত্যাদি আসবাব-পত্রের সেবা আছে। ছবি, মূর্ত্তি ইত্যাদি সুকুমার শিল্পের সৌখীন দ্রব্যে ঘর সাজাইবার কায়দাও না শিখিলে গিন্নীর লাইনে কেহ ওস্তাদ হইতে পারে না। অধিকন্তু, সঙ্গীত এবং শারীরিক ব্যায়ামের জন্য এই বিদ্যা-পীঠেই ছাত্রীদের অভ্যাস গড়িয়া তোলা হয়।

শুনিতেছি, ইতালিতে গিন্নী-শিল্পের জন্য এই ধরণের কোনো রূপ উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নাই। নেহাৎ "প্রিমিটিভ" বা আদিম অবস্থায়ই ইতালিয়ানদের পারিবারিক জীবন চলিয়া থাকে। ইহারা বৈঠকখানাটা ফিট্‌ফাট রাখে। কিন্তু রান্নাঘর, শোবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর ইত্যাদি কুঠ্‌রিতে অতিথিকে লইয়া যাইতে ইতস্ততঃ করে।

(৯)

মফঃস্বলের শহরেও চৌরাস্তায় চৌরাস্তায় স্থাপত্যের ছড়াছড়ি দেখিতেছি। শহরের অতি-লোক-সমাগমপূর্ণ লোকেরা উঠতে বস্‌তে এই দুই কর্ম্মবীরের মূর্ত্তি দেখিতে পাইবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে।

সেই যুগের "রিসোর্জিমেন্তো" বা বিপ্লব-প্রচেষ্টায় পিয়েমোন্তে প্রদেশের রাজা বা নবাব বিপ্লবীদের সহায় হন। তাঁহার নাম ভিক্তর এমানুয়েল। পিয়েমোন্তে উত্তর-ইতালির পশ্চিমতম জেলা,—ফ্রান্সের লাগাও। ভিক্তর এমানুয়েলের বিরাট মূর্ত্তিও পাদোভাবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম :—
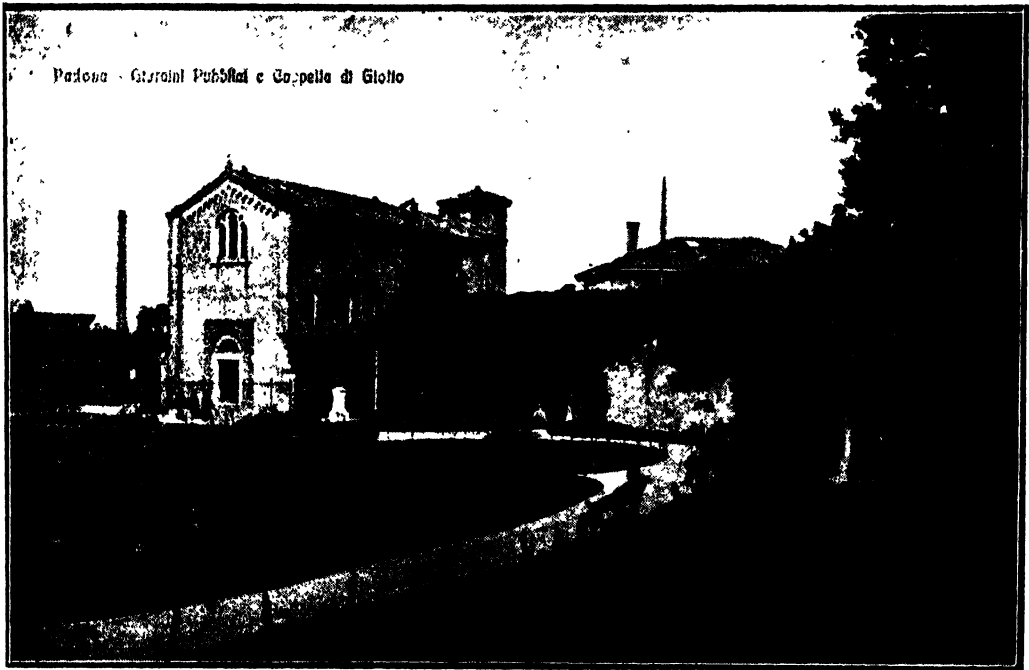
জ্যোত্তের গির্জ্জা (পাদোভা)

স্থানে "পিয়াৎসা কাভুর।" পিয়াৎসা শব্দের অর্থ প্লাস, প্লাট্‌স্ বা প্লেস্, অর্থাৎ চৌরাস্তা জাতীয় রাস্তার উপরকার উঠান বিশেষ।

"পিয়াৎসা গারিবাল্‌দি" ও শহরের বড় কেন্দ্র। কাভুরের কৌটিল্যনীতি আর গারিবাল্‌দির সমর-শক্তি ইতালিকে অষ্ট্রিয়া হইতে স্বাধীন করিয়াছে। সে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের কথা। ভেনেৎসিয়া এবং লম্বার্দি এই দুই জেলা অর্থাৎ গোটা উত্তর ইতালি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারির অধীনস্থ প্রদেশ ছিল। কাজেই উত্তর ইতালির "রিসোর্জিমেন্তোর সকল বীরেরই মূর্ত্তি দেখিতেছি। কিন্তু মাৎসিনির মনুমেণ্ট কোথায়?" সে "মাৎসিনি পিয়াৎসায়" লইয়া গিয়া বলিল :—"এই দেখুন মাৎসিনি মূর্ত্তি।" পাড়াটা ঠিক জাঁকজমকপূর্ণ নয়, কিন্তু মূর্ত্তি অন্যান্য মূর্ত্তি-গুলার জুড়িদারই বটে।

(১০)

মাৎসিনিকে ইয়োরোপে এবং ভারতে যত বড় বিবেচনা করা হইয়া থাকে, ইতালিয়ানরা স্বয়ং তত বড় বিবেচনা করে না। ইতালিয়ানদের চিন্তায় বীর ত বীর গারিবাল্‌দি

বীর। গারিবাল্‌দি বড় কি কাহ্বুর বড়—ইতালিতে এই বিষয়ে তর্ক-প্রশ্ন চলে। কিন্তু গারিবাল্‌দি বড় কি মাৎসিনি বড়, অথবা কাহ্বুর বড় কি মাৎসিনি বড়—এই ধরণের সওয়াল সাধারণতঃ উপস্থিত হয় না।

ভারতে ১৯০৫ সাল যাঁহারা সুরু করিয়াছিলেন তাঁহারা মাৎসিনি এবং গারিবাল্‌দি এই দুইজনকে সমান চোখেই দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই দুই জনের চিন্তা ও কর্ম্মরাশি ভারতীয় জননায়কগণকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধে বিশেষ রূপেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বলিতে কি, মাৎসিনি-গারিবাল্‌দি ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের দীক্ষাগুরু স্থানীয়। ইঁহাদের নাম জপ করা সেকালে স্বাদেশিকতার অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইত।

মাৎসিনি আদর্শ প্রচারক, ভাবুক, দার্শনিক। যুবক ইতালিকে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া তিনি স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া আর একটা জাতিকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া দুই স্বতন্ত্র বস্তু।

ইতালিয়ান যুবক বলিতেছেন—"সেনাপতি গারিবাল্‌দির সমর-প্রচেষ্টাই ইতালীকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছে। জনসাধারণ সেই কর্ম্মবীরের অসাধ্য-সাধনই পূজা করিতে অভ্যস্ত। দার্শনিক, কবি বা আদর্শ প্রচারকের সাহায্যে সে যুগের ইতালিবাসীর চিত্ত কতখানি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা আলোচনার সামগ্রী। বলা বাহুল্য, দেশের সাধারণ লোক সে সব বুঝে সুঝে না। গারিবাল্‌দি না থাকিলে ইতালি স্বাধীন হইত না,—এ কথা যে-সে লোকই বুঝিতে পারে। কিন্তু মাৎসিনির মতন লোক না থাকিলে ইতালিয়ান জাতি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিত না,— এ কথা স্বীকার করিতে বহু লোকই রাজি হইবে না।

(১১)

স্বদেশ-সেবা, স্বার্থত্যাগ, কষ্ট-স্বীকার, নির্য্যাতন ভোগ ইত্যাদি হিসাবে মাৎসিনি গারিবাল্‌দিতে উনিশ-বিশ করিতে বসিবার প্রয়োজন নাই। বরং অনেকে হয় ত মাৎসিনিকে উচ্চতর স্থানই দিবে।

কিন্তু স্বাধীনতা চিজটা বক্তৃতার বা লেখালেখির মাল নয়। "কেজো" লোকের বীরত্ব, কেজো লোকের ধড়িবাজি, লাঠিসোটার আওয়াজ, এই সব যেখানে নাই, স্বাধীনতা সেখানে মুখ দেখায় না। গারিবাল্‌দি এই কেজো লোকের একজন। এই জন্যই ১৯২৪ সালের ইতালিতে গারিবাল্‌দি যত বড়, মাৎসিনি তত বড় নন। এই কারণেই আবার কাহ্বুরও মাৎসিনির চেয়ে ইতালিয়ান সমাজে বেশী পরিচিত।

দান্তে (জ্যোত্তোর আঁকা)

অথচ যখন গোটা ইয়োরোপের সাহিত্য বা দার্শনিক চিন্তার ধারা আলোচনা করিতে বসি, তখন দেখি যে, মাৎসিনির কিম্মৎ অতি উঁচু। উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় চিন্তামণ্ডলে মাৎসিনি এক যীশুখৃষ্ট। চিন্তায় আর

কর্ম্মে এই প্রভেদ। কর্ম্মবীর পূজ্যতে স্বদেশে, দুনিয়ায় পূজ্যতে চিন্তাবীর,—এই সূত্র প্রচার করিতে প্রলুব্ধ হইতেছি। চিন্তা জিনিসটা বিশ্ববাসীর সম্পত্তি,—কর্ম্মের প্রভাব প্রধানতঃ স্বজাতি ও স্বদেশের দেওয়ালের ভিতর ঘেরাও হইয়া থাকে।

যুবক ভারত,—"যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্"! পথগুলা সবই বড়, সবই মহান, সবই উঁচু। কিন্তু কে কোন্ পথে চলিবে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ খেয়াল, শক্তি ও সুযোগের উপর নির্ভর করে।

(১২)

পাদোহ্বার পথঘাটে ইতিহাস-বিশ্রুত বিজ্ঞানবীর, সাহিত্যবীর ইত্যাদির "বাস্তভিটা"র সঙ্গে পরিচিত হইতেছি। গালিলেও নামক জ্যোতির্ব্বিদের কথা ভারতে কে না জানে? সেই যুবা প্রবর্ত্তক বৈজ্ঞানিকের পর্য্যবেক্ষণালয় এই শহরেরই এক স্মৃতিস্তম্ভ।

পিয়াৎসা গারিবাল্দি (পাদোহ্ব)

কবিবর পেত্রার্কা (১৩০৯-১৩৭৪) ছিলেন ইতালির অন্যতম যুগান্তর সাধক। ভারতে আমরা অন্ততঃ এইটুকু জানি যে, তিনি ছিলেন প্রেমের কবি। আর, "সনেট্" বা চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর জন্মদাতা রূপেও পেত্রার্কা ভারতে পরিচিত বটে। বোধ হয় মধুসূদনের কাব্যে পেত্রার্কার কিছু পরিচয় আছে। সেই পেত্রার্কার মূর্ত্তিও পাদোহ্বায় দেখিলাম।

মহাকবি দান্তে (১২৬৫-১৩২১) কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লোক। তাঁহার বিরাট মূর্ত্তিও দেখিতেছি "প্রাতো দেল্লা হ্বাল্লে" নামক পিয়াৎসায় বা পার্ক-সদৃশ চৌরাস্তায়। পার্শ্বেই বিরাজ করিতেছে চিত্রশিল্পী জ্যত্তোর মূর্ত্তি। জ্যত্তো দান্তের সমসাময়িক। দান্তেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীর যুগাবতার বিবেচনা করা চলিতে পারে।

"প্রাতো দেল্লা হ্বাল্লে" এক অপূর্ব্ব বাগান। গড়নে ডিম্বাকৃতি। সীমানার উপর সারি সারি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মূর্ত্তিগুলায় হ্বেনেৎসিয়া প্রদেশের মধ্যযুগ বাঁচিয়া রহিয়াছে।

মূর্ত্তি গড়িতে ইতালিয়ানরা চিরকালই ওস্তাদ। পাদোহ্বার মতন একটা ছোটখাটো শহরেও "রূপদক্ষ"দের তৈয়ারি এতগুলা স্থাপত্য একটা বিশেষ-কিছু, সন্দেহ নাই। ইয়োরোপের সকল দেশেই স্থাপত্যের এত ছড়াছড়ি দেখা যায় না।

(১৩)

ব্যবসাপাড়ার এক কাফেতে খানিকক্ষণ কাটানো গেল। পাশেই এক ব্যক্তিকে গম্ভীর ভাবে কাগজ পড়িতে দেখিতেছি। বিশেষ মনোযোগের সহিত ইনি "ষ্টক-এক্স্চেঞ্জে"র দরগুলা পড়িতেছেন। নয়া পুরানা কতকগুলা চিঠির তাড়া কাফির পেয়ালার নিকট টেবিলের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। পরিচয়ে জানা গেল ইনি দালাল। ফরাসী এবং জার্ম্মাণ দুই-ই ইঁহার জানা আছে। পূর্ব্বে হ্বিয়েনায় গতিবিধি ছিল।

দালাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম:—"ফরাসীদের সঙ্গে ইতালির বন্ধুত্ব আর কত দিন টিঁকিবে?" ইনি বলিতেছেন:—"লড়াই থামার পর হইতেই ফ্রান্সের সঙ্গে ইটালিয়ানদের মন-কষাকষি চলিতেছে। মুসোলিনির আমলে আজকাল শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাকুলি ছাড়া আর কিছু নাই। ফ্রান্সের সঙ্গে বনিবনাও হওয়া ইটালির পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব।"

অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ইটালির ঝগড়া ছিল ত্রেন্তিনো বা দক্ষিণ টিরোল লইয়া। আর একটা বিবাদের কারণ ছিল আদ্রিয়াতিক সাগরের ত্রিয়েস্থ বন্দর। দুই মুল্লুকই আজকাল যুদ্ধের ফলে ইটালির হাতে। কাজেই অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখিয়া চলাই ইটালির বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতি।

আর, জার্ম্মাণির সঙ্গে প্রকৃত প্রস্তাবে ইতালির কোনো

ঝগড়াই ছিল না। বর্ত্তমানে মুসোলিনি জার্ম্মাণির সপক্ষে ইতালির চিত্ত গড়িয়া তুলিতেছেন। দালাল মহাশয়ের নিকট শুনিলাম—"জার্ম্মাণ ভাষা শিখিবার দিকে ইতালির ছাত্রসমাজে বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাইবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ইস্কুল কলেজে জার্ম্মাণ একপ্রকার অবশ্য-পাঠ্য। তাহা ছাড়া, ইতালির বড় বড় ফ্যাক্‌টরিতে জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ার ও রাসায়নিক বাহাল করিবার ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণির শিল্প-বিজ্ঞান ও বাণিজ্য-শক্তির সাহায্য না পাইলে ইতালি উন্নতি-লাভ করিতে পারিবে না।"

(১৪)

ফ্রান্সের সঙ্গে আড়াআড়িই আজকাল ইতালির রাষ্ট্রীয় জীবনের বড় কথা। দালালের নিকট এক কাগজওয়ালা আসিয়া বসিলেন। ইনি ফরাসী জানেন। ইতালিয়ান পররাষ্ট্রনীতির চর্চ্চা চলিতে থাকিল।

কাগজওয়ালা বলিতেছেন:—"ভূমধ্য সাগর লইয়া ইতালিতে ফ্রান্সে ঠোকাঠোকি অনিবার্য্য। জার্ম্মাণির সঙ্গে এই বিষয়ে ইতালির কোন গোলযোগ হইতেই পারে না। স্পেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব আমাদের পাকিয়া উঠিতেছে। রুশিয়াকে হাত করিবার জন্য মুসোলিনির চেষ্টার ক্রটী নাই।"

জিজ্ঞাসা করিলাম:—"ভূমধ্য সাগরের আসল মালিক ত ইংরেজ। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে ইতালির যোগাযোগ আজকাল কিরূপ?" জবাব:—"ইংরেজের নিকট ইতালি অনেক কিছু পাইয়াছে। ১৯১৫ সালে লণ্ডনে যে গুপ্ত সন্ধি হয়, তাহার জোরেই আমরা অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়াছিলাম। কথা ছিল, যুদ্ধে জয়লাভ হইলে উত্তর ইতালির ত্রেন্তিনো প্রদেশ আর ত্রিয়েস্ত বন্দর আমরা পাইব। ইংরেজের সাহায্যে ইতালির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। কাজেই সকল বিষয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে এক মতে কাজ করা ইতালিয়ানদের স্বার্থ।"

আফ্রিকার কেনিয়া প্রদেশের জুবালাণ্ড জেলা লইয়া আলোচনা হইল। এই মুল্লুকটাও ১৯১৫ সালের গুপ্তসন্ধি অনুসারে ইতালির পাওয়ার কথা। কিন্তু এখনো ইংরেজ ইতালির হাতে জুবালাণ্ডের দখল সমঝাইয়া দেয় নাই। কাগজওয়ালা বলিতেছেন—"এই লইয়া মুসোলিনি-র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডে কথা-কাটাকাটি চলিতেছে। আপোষ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী।"

(১৫)

"বাঙ্কা নাৎসিওনালে দি ক্রেদিতো" নামক ব্যাঙ্কের এক শাখা কাহ্বুর চৌরাস্তার উপর অবস্থিত। ভিতরে প্রবেশ করিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করা গেল। ব্যাঙ্কটা গত বৎসর (১৯২৩) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তির ইতিহাস বিচিত্র।

১৯২১ সালে "বাঙ্কা ইতালিয়ানা দি স্কোন্তো" নামক রোমের বিপুল ব্যাঙ্ক ফেল মারে। ব্যাঙ্ক ফেল মারার কারণ অতি সোজা। লোকেরা যে টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখে, ব্যাঙ্কওয়ালারা সেই টাকা লোহার সিন্দুকে পুঁতিয়া রাখে না। সেই টাকা নানা ব্যবসায়ে খাটাইয়া লাভ

আন্তোনিয়ো গির্জ্জা (পাদোহ্বা)

উঠানোই ব্যাঙ্কের কাজ। যে যে ব্যবসায়ে টাকা খাটিতেছে, সেই ব্যবসাগুলার এদিক-ওদিক ঘটিলেই ব্যাঙ্ক স্বয়ংই টলমল করিতে বাধ্য।

লড়াইয়ের হিড়িকে "দিস্কোন্তো বাঙ্কা"র জন্ম হয়। ইতালিতে লোহা-লক্কড়ের যন্ত্রপাতির কারবার পূর্ব্বে এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে। ইতালিয়ান শিল্পপতিরা ভাবিয়াছিল যে, যুদ্ধসামগ্রী জোগাইবার অর্ডার পাইলে লোহা-লক্করের কারখানা ইতালিতে পা গাড়িতে পারিবে।

যুদ্ধের সময়টায় গবর্মেণ্টের সাহায্যে অবশ্য কারখানা-গুলা চলিতেছিল একপ্রকার ভালই। কিন্তু লড়াই থামিবার পর গবর্মেণ্টের তরফ হইতে লোহার কারখানায় নিয়মিত প্রচুর চাহিদার আমল উঠিয়া যায়। কাজেই

ইতালির "স্বদেশী" লোহার কারখানাগুলা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে থাকে।

এই সব লোহার ব্যবসায়েই দিস্কোন্তো ব্যাঙ্কের টাকা লাগানো হইয়াছিল অনেক। কারখানাগুলার বিপদের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কটা লইয়াও টানাটানি পড়ে। গবর্মেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া ইতালিয়ান্ নরনারীকে সর্ব্বনাশ হইতে বাঁচাইতে পারিয়াছে। "দিস্কোন্তো" ব্যাঙ্ককে তুলিয়া দিয়া তাহার ঠাঁইয়ে, তাহার জমাপুঁজি কাগজপত্র ইত্যাদি লইয়া একটা নতুন ব্যাঙ্ক কায়েম করা হইয়াছে। তাহার নাম "বাঙ্কা নাৎসিওনালে দি ক্রেদিতো"।

ম্যানেজার বলিলেন :—"পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাঙ্কে যাহাদের টাকা জমা ছিল, তাহাদিগকে প্রায় দশ আনা অংশ দিয়া নয়া ব্যাঙ্কের সূত্রপাত হইয়াছে। এই নতুন প্রতিষ্ঠানের আর ভয়ের কোন কারণ নাই।"

জোর জবরদস্তি করিয়া কতকগুলা ফ্যাক্টরি খাড়া করিলেই "স্বদেশী আন্দোলন" সুরু করা সম্ভব নয়। কোন্ কারবারটা টেঁকসই, সে সম্বন্ধে অনেক পাকা মাথা খেলানো দরকার।

সেণ্ট আন্তোনিয়ো

(১৬)

পাদোভা রোমাণ ক্যাথলিক খৃষ্টানদের অন্যতম তীর্থরাজ। সেইণ্ট বা সাধু আন্তোনিয়োর কবর এই নগরে অবস্থিত। সেই কবরের উপর যে মন্দিরটা উঠিয়াছে, তাহার নাম-ডাক দুনিয়ার সর্ব্বত্র। "গথিকের" ছায়া ইহার গড়নে কিছু কিছু লক্ষ্য করিতেছি।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, গির্জ্জায় বহুমূল্য ধাতু-রত্নের উপহার জুটিয়াছে প্রচুর। খৃষ্টানদের দেবালয়গুলা আমাদের মঠ-মন্দিরের মতনই উপাসকদের ভক্তির চিহ্নস্বরূপ বহুবিধ "কাঞ্চন মূল্যং" পাইয়া থাকে। দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রীরা অনেক প্রকার দেবোত্তর প্রদান করিতে অভ্যস্ত। "ধাতুরত্নের সংগ্রহ" তীর্থযাত্রীদিগকে দেখাইবার ব্যবস্থাও আছে।

আন্তোনিয়ো দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। পাদোভার নিকটবর্ত্তী এক পল্লীতে তাঁহার অসুখ হয়। গরুর গাড়ীতে করিয়া তাঁহাকে মঠে লইয়া আসা হইয়াছিল। সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীরা রোগী মুমূর্ষু সাধুকে গাড়ী হইতে নামাইতেছে—এই বিষয় লইয়া সেকালের এক চিত্র আছে।

ইতালিতে গরুর গাড়ীর চল মধ্যযুগের মামুলি কথা। গরুর গাড়ী আজও ইতালির পল্লী হইতে উঠিয়া যায় নাই। গরুর গাড়ীর ভিতর যতখানি ভক্তিযোগ এবং আধ্যাত্মিকতা মূর্ত্তি গ্রহণ করে, তাহা একমাত্র ভারতবর্ষেরই একচেটিয়া গুণ নয়। খৃষ্টানরাও সেই রসে বঞ্চিত নয়।

(১৭)

সাধু আন্তোনিয়োর সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত

আছে। "ঠাকুরমার ঝুলি"র ভিতর ক্যাথলিক বালক-বালিকারা সেই সব ছেলেবেলায়ই শুনিয়া থাকে।

আন্তোনিয়ো "ভগবান" যীশুকে "শিশু" ভাবে পূজা করিতেন। দেবতার শিশুত্ব ছিল তাঁহার ভক্তিরসের উৎস। এই কারণে নিজ নিজ শিশুর জীবনে মঙ্গল কামনা করিবার জন্য ক্যাথলিক নর-নারীরা আন্তোনিয়োকে পূজা করে।

আন্তোনিয়োর নামে "মানত্" করা, আন্তোনিয়োর মন্দিরে তীর্থ-যাত্রা করিতে আসা সেই পূজারই অন্তর্গত। জাপানী বৌদ্ধরা "জিজো"র এবং বাঙালীরা "মা মঙ্গলচণ্ডী" বা "মা ষষ্ঠী"র কৃপায় ছেলেপুলেদের জন্য যা কিছু লাভ করিয়া থাকে—ক্যাথলিকরা আন্তোনিয়োর মাহাত্ম্যে সেই সবই পায়।

একজন জার্ম্মাণ মহিলা ব্যাভেরিয়ার লাণ্ডশুট্ নগর হইতে এই তীর্থে আসিয়াছেন। ভক্তির মাত্রায় ইনি ভারতের যে কোন নারীকে হটাইতে সমর্থ, এইরূপ বিশ্বাস করিতেছি। অন্ততঃ সমানে সমানে টক্কর চলিবে। এই ক্যাথলিক নারী "ভদ্রলোকে"র ঘরেরই মেয়ে, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত এবং সম্পত্তিপন্ন লোক ইঁহার স্বামী।

গরমিল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(প্রথমাংশ)

২

গৃহিণী পিছন ফিরিতে না ফিরিতে, নরেশ তড়াক্ করিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া লীলা যে সোফাটায় বসিয়াছিল, তাহার উপর একেবারে লীলার গা ঘেঁসিয়া গিয়া বসিল। এবং তাহার কাঁধের উপর একটী হাত দিয়া তাহাকে ঈষৎ নিজের দিকে টানিয়া লইয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার গোটা কতক কথা আছে, এরা কেউ এসে পড়বার আগে তোমায় বলে নিই, শোনো।"

লীলা তখন একখানা বাঙলা মাসিকপত্র খুলিয়া দেখিতেছিল। নরেশকে বলিল, "দেখ, এবার কেমন সুন্দর ছবিখানি দিয়েছে! ওমার খৈয়ামের মুখখানি ঠিক যেন দাদার মতো হয়েছে, না?"

ব্যাকুল হইয়া নরেশ বলিল, "চারুর ওখানে আজ তোমায় নেমতন্ন যেতেই হবে লীলা, নইলে আমি আর তাদের মুখ দেখাতে পার্ব্বো না!"

লীলা মাসিক পত্রখানা আঙুলের ফাঁকে মুড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমিও ঠিক মনে করিছি, তুমি এই কথাই বলবে।"

"তাহলে যাবে তো, কেমন?"

"কি ক'রবো, কিছু ঠিক করতে পারছিনি।"

"আমি তোমায় অনুরোধ করছি চল!"

"কিন্তু মার আর বাবার সে ইচ্ছে নয়।"

"কিন্তু আমার যে একান্ত ইচ্ছে!"

"মা বাবার অমতেও!"

"দেখ, তুমি যে আমার স্ত্রী, এটা তোমার মনে থাকে না কেন?"

"আমি যে ওঁদেরই মেয়ে, এটাই বা তোমার মনে থাকে না কেন?"

"তাহলে ওই সম্পর্কটাই তোমার বেশি হ'ল, কেমন?"

"সেটা হওয়া কি কিছু বিচিত্র ব্যাপার? ভূমিষ্ঠ হবার দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত যাদের স্নেহ-মমতায়, যাদের আদর-যত্নে এত বড় হোয়ে উঠলুম, তাদের ওপর টানটা বেশি হওয়াই কি স্বাভাবিক নয়?"

নরেশ সোফার উপর সজোরে একটা চাপড় মারিয়া বলিয়া উঠিল, "আলবাৎ নয়! বরং বিবাহের পর বাপের বাড়ীর ওপর মেয়েদের বেশি টান থাকাটাকে আমি অস্বাভাবিক বলেই মনে করি। বে'র দিন কি মন্ত্র পড়ে

আমাকে বরণ করেছিলে, মনে আছে? সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে, চিরদিন তুমি আমার অনুগামিনী হবে বলে অগ্নি আর দেবতা সাক্ষী করে যে সেদিন প্রতিশ্রুত হয়েছিলে।"

লীলা হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল "দেখ, সে অনেক রাত্রে লগ্ন ছিল, ঘুমের ঘোরে ঢুলতে ঢুলতে কি যে বলিছি কিছুই জানি নি। তার ওপর মন্ত্র-তন্ত্র তো সবই সংস্কৃত—কেবল অনুস্বর বিসর্গ আর চন্দ্রবিন্দুতে ভরা; তার মানে যে কি তার একবিন্দুও আমি বুঝ্‌তে পারি নি। এ ছাড়া তার অর্দ্ধেক কথাও আমার মুখ দিয়ে উচ্চারণই হয় নি। বোধ হয় তোমারও হয়েছিল তাই। কেন না, সংস্কৃত ভাষায় তুমি যে আমার চেয়ে বেশি পণ্ডিত নও, এ কথা নিজেই কত দিন ব'লেছো। সে যাই হোক, সেই দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র আউড়ে আমি আর যাই বলে থাকি না কেন, তা বলে নেমতন্ন-বাড়ীতেও যে আমি বরাবর তোমার অনুগামিনী হবো, এ রকম প্রতিশ্রুতি আমি নিশ্চয়ই দিই নি। বিয়ের মন্ত্রটা কিছুই বুঝ্‌তে না পারলেও, আমার বিশ্বাস, তার ভেতর কোথাও এমন উপদেশের উল্লেখ নেই যে, লুচি সন্দেশের আহ্বান কদাচ উপেক্ষা করবে না!"

"কিন্তু আমার আহ্বান যে তোমায় সর্ব্বদা মানতে হবে, এ সম্বন্ধে ত কড়া হুকুম আছে!"

"তা জানি, আর এও জানি যে, স্বামী আমার বাপ-মার অবাধ্য হতে কখনই আহ্বান করবেন না।"

"অবস্থা বিশেষে সে রকম আদেশেরও যে প্রয়োজন হয় লীলা!"

"ভগবান করুন, আমার জীবনে যেন সে রকম অবস্থা কখন না আসে!"

"ভগবান কি করবেন না করবেন বলতে পারি নি; কিন্তু নেমন্তন্নে আজ তোমার যাওয়াই চাই।"

"বেশ তো, ওঁদের মত করাতে পারো যদি, আমার যেতে কোনই আপত্তি নেই।"

"তাঁদের মতামতে কিছু এসে যায় না। আমি যদি মত করি, তা হলেই তোমার যাওয়া উচিত। কেন না, স্ত্রী কখনও স্বামীর অবাধ্য হবে না—এ উপদেশটা বোধ হয় কোনও মেয়ে মানুষেরই অজানিত নেই।"

"না, কিন্তু তার অনেক আগে থাকতেই যে, পিতা মাতার কখনও অবাধ্য হবে না, এ শিক্ষাটাও তারা পায় সেটাই বা চট্ করে ভুলি কেমন করে?"

"তাহ'লে দেখ্‌ছি স্বামীর চেয়ে পিতামাতাই তোমার বেশি আপনার!"

"শুধু আমার কেন, সকল স্ত্রীলোকেরই। স্ত্রী কোন গুরুতর অপরাধ করলেই স্বামীরা তাদের অনায়াসে ত্যাগ করে; কিন্তু সহস্র দোষে দোষী হলেও বাপ মা কখনও মেয়েটিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দিতে পারেন না—এটা তো জানো।"

"তা হ'লে তুমি স্বামীকে চাও না, পিতা মাতাকে পেলেই সুখী—কেমন?"

"না, আমি স্বামীকে চাই, কিন্তু পিতামাতাকে পরিত্যাগ ক'রে নয়।"

"বাপ মা কি সবার চিরকাল থাকে?"

"সে অশুভ দিনের কথাটা এত আগে আলোচনা ক'রে কোনও লাভ নেই বোধ হয়।"

"তোমার কোনও লাভ না থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমার যথেষ্ট আছে। আমি জান্‌তে চাই যে, ওঁদের অবর্ত্তমানে তোমার আমার মধ্যে সম্পর্কটা ভবিষ্যতে কি রকম দাঁড়াবে?"

লীলার বড় বড় দুটি চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সে নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

নরেশ তাড়াতাড়ি নিজের কোঁচার কাপড় দিয়া সস্নেহে তাহার চোখ দু'টি মুছাইয়া দিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল "কেঁদে ফেল্‌লে লিলি! কেন, আমি তো তোমায় আঘাত দেবার জন্যে কোনও কথা বলি নি। আমি শুধু জান্‌তে চেয়েছিলুম যে, তোমার পিতামাতার চেয়েও তোমার ওপর আমার বেশি অধিকার আছে কি না?"

লীলা কোনও উত্তর দিল না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া আঁচলে চোখ রগড়াইতে লাগিল।

নরেশ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল "আচ্ছা বেশ, আমি না হয় আর স্বেচ্ছায় আমার স্ত্রী হিসেবে তোমার ওপর নিজের কোনও দাবী করবো না। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা যত দিন না তুমি পিতা-মাতার সঙ্গে কন্যার সম্পর্কের চেয়েও বড়

ক'রে দেখ্‌তে শিখ্‌বে, তত দিন না হয় তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা ক'রে থাক্‌বো লিলি !"

অভিমানে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে লীলা বলিল, "কেন তুমি আজ আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ,—কি করিছি আমি ?"

আর্ত্ত ও বিপন্নের মতো কাতর কণ্ঠে নরেশ বলিল, "আর তুমি যে আজ আমার মনে কি কষ্ট দিচ্ছ লিলি—তা বোধ হয় নিশ্চয় বুঝ্‌তে পারতে, যদি তুমি একটুও আমাকে ভালবাস্‌তে !"

লীলার চোখ দুটি আবার জলে ভরিয়া উঠিল, ঠোঁট দুখানি কাঁপিতে লাগিল। অভিমান ও অনুরাগে ভরা অশ্রু-সজল আঁখি দু'টি স্বামীর দিকে ফিরাইয়া জড়িত অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল "আমি বুঝি বাসিনি ?"

তরুণী পত্নীর কম্পিত অধরপুটের এই কটি সোহাগের বাণী, সলিল-সিক্ত নয়ন-কোণের একটুকু কেমন সেই অনুরাগ-বিচ্ছুরিত দৃষ্টি, অভিমানে উচ্ছ্বসিত কিশোরীর পরিপুষ্ট সুন্দর গণ্ডদ্বয়ের সেই অরুণ-রাঙা রক্ত-আভা, নরেশকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দিল। নরেশ তাহাকে আবেগ ভরে আপন বাহু-বন্ধনে টানিয়া লইয়া, অভিমানিনীর সজল আঁখি-পল্লব দু'টিতে বারবার চুম্বন করিয়া সহাস্য মুখে বলিল, "বাসো ? আচ্ছা, তবে বল দেখি লীলা, ও কথাটার মানে কি ? ওটা তো আর সংস্কৃত কথা নয় !"

লীলাও হাসিয়া ফেলিল। হাসিতে হাসিতে নিজেকে নরেশের আলিঙ্গন-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, "ছাড়, সকাল বেলা—কেউ এসে পড়বে এখুনি ; কিন্তু মনে থাকে যেন—আর ওসব অলুক্ষুণে কথা মুখে আন্‌বে না। তাহ'লে আমি ভয়ানক কাঁদবো, আর মা বাবা শুনতে পেয়ে দৌড়ে আসবেন, খালি জিজ্ঞেসা করবেন 'কি হ'ল—কি হয়েছে ?' তখন কি যে হয়েছে আমি কিছু তাঁদের বলতেও পার্ব্বো না ! সে একটা মস্ত বড় কেলেঙ্কারী হ'বে কিন্তু !"

লীলার মুখে আবার তাহার পিতা-মাতার উল্লেখ শুনিয়া নরেশের মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়া মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল। অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে নরেশ বলিল "চিরজীবন চোখের জল ফেলার চেয়ে এইবেলা দু' ফোঁটা কেঁদে নেওয়াই কি ভাল নয় লীলা ?"

লীলা নরেশের এ প্রশ্নের অর্থটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। সহাস্য প্রফুল্ল মুখখানি সহসা বিচ্ছিন্ন কমলের মতো বিবর্ণ হইয়া গেল। সভয়ে বালিকা জিজ্ঞাসা করিল "কেন ? আমি কি করিছি যে আমার অত বড় শাস্তি হবে ?"

নরেশ যেন উদাস ভাবে বলিতে লাগিল—"বিবাহিত জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য যারা মাল্য-দানের সঙ্গেই চুকিয়ে বসে থাকে, হৃদয় দান করে না,—বিবাহ-বন্ধনের সূত্রে প্রেমাস্পদের কাছে নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে আপনাকে যে সম্পূর্ণ ভাবে ধরা দেয় না,—যাদের পরিণয়ের মধ্যে প্রেমের যোগ সম্পর্ক নেই, ভালবাসার অটুট বন্ধন নেই,—যারা মুখে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হবে স্বীকার করেও কার্য্যতঃ পশ্চাৎপদ হয়—তাদের ভবিষ্যৎ জীবন নিশ্চয়ই অন্ধকার হ'য়ে ওঠে ! যে পরিণয়ের পুণ্য-ছায়ায় দু'টি হৃদয় একত্র মিলিত হ'য়ে স্নেহে, প্রেমে, অনুরাগে সার্থক ও ধন্য হ'য়ে ওঠে, মানুষের জীবনের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ-সম্পদ থেকে আজ আমি শুধু বঞ্চিত নই লীলা, আমার জীবন বোধ হয় ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে ! আমার ভয় হচ্ছে, হয় ত এর পর আমার বেঁচে থাকাও দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠবে !"

ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে লীলা বলিতে গেল "আমার দোষেই কি—"

বাধা দিয়া অসহিষ্ণুর মতো নরেশ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং ঘরের ভিতর ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "দোষ কারুর নয় লীলা ! দোষ আমার অদৃষ্টের ! আমি চোখের সামনে আমার শোচনীয় ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েও তবু এখনও আশার ছলনায় ঘুরে মরছি ! আমি ভেবেছিলুম, আমার এই অগাধ উচ্ছ্বসিত ভালবাসার স্রোতে তোমাকেও ভাসিয়ে নিয়ে স্বচ্ছন্দে এক দিন আমার হৃদয়ের প্রেমাস্তীর্ণ উপকূলে টেনে নিয়ে আসতে পারবো, কিন্তু আজ আমার সকল চেষ্টা—সকল যত্ন—যেন ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছে ! তোমার প্রতি আমার অপরিসীম ভালবাসা আজ যেন আমাকেই উপহাস করছে ! কিন্তু তবু এখনও আমি একেবারে হতাশ হই নি লীলা ! প্রাণপণে তোমাকে জয় কর্ব্বার একটা

শেষ চেষ্টা করেও যদি অকৃতকার্য্য হই, তখন তোমার কাছ থেকে আমি জন্মের মতো বিদায় নেবো, তার আগে নয়।"

নরেশের এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া লীলা বলিল "তুমি কি বল্‌ছো আমি বুঝ্‌তে পারছি নি! আমাকে জয় কর্ব্বার জন্যে প্রাণপণে একবার শেষ চেষ্টা করবে, এ সব কথার মানে কি?—আমি তো তোমার হাতেই আত্ম-সমর্পণ করিছি—"

নরেশ আবার তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "একে আত্ম-সমর্পণ বলে না লীলা। আমি জানি, আমি কি পেয়েছি। মাণিকের লোভে নন্দনের কোনও এক অপূর্ব্ব ভুজঙ্গিনীর অবহেলায় পরিত্যক্ত বিচিত্র খোলসটাকে আমি আজ বড় আগ্রহে কণ্ঠে দুলিয়েছি। তাই তার শিয়রের মণি আমার হৃদয় আলো করতে পারলে না। জান কি লীলা, আমি তোমায় কতখানি ভালবাসি—?"

লীলার ঠোঁট দুখানি তখন রাগে অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। মুখখানি হেঁট করিয়া সে বলিল, "তা যদি বাসতে, তা'হলে কখনই আমায় এমন সব ভয়ানক কথা বলে কষ্ট দিতে না। আমি তো এক দিনও এমন শক্ত শক্ত কথা বলে তোমাকে ব্যথা দিই নি!"

অস্থির হইয়া অধীর ভাবে নরেশ বলিতে লাগিল, "কেন দাও না, কেন তুমি দাও না!—আমি তো দংশনের ভয় করি নি, গরলের জ্বালাকে গ্রাহ্য করি নি—আমি যে 'মণি' চেয়েছিলুম, শুধু মণি চেয়েছিলুম!—কিন্তু কই, পেয়েছি কই?—দাও, দাও লীলা, তোমার প্রেমের পরশমণি দিয়ে আমাকে সার্থক করে দাও,—আমাকে ধন্য করে দাও—!"

নরেশের ভাবগতিক দেখিয়া—তাহার এই উন্মাদের মতো অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা শুনিয়া—লীলা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ভীত বিবর্ণ মুখে বলিল, "তুমি যে কি চাইছো, আমি তো তা ঠিক্ বুঝ্‌তে পারছিনি!"

নরেশ তখন একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া একেবারে লীলার সম্মুখে আসিয়া বসিল। তাহার হাত দুইখানি সাদরে নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া বলিল, "আমি জানি, তুমি আমার সব কথা ভাল বুঝ্‌তে পারো না লিলি, কিন্তু এক দিন পারবে। আজ শুধু কর্ত্তা-গিন্নীর অমত থাকলেও, কেবল আমার অনুরোধ রাখতে তুমি চারুর ওখানে চল।"

লীলা নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

নরেশ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল "যাবে কি? বল,—পার্ব্বে না?"

অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত কুণ্ঠিত ভাবে লীলা বলিল, "তুমি কেন এ বিষয়ে এত পেড়াপিড়ি করে আমাকে মুস্কিলে ফেল্‌ছো? তুমি কি জান না যে, তাঁদের অমতে আমি কিছুই করিনি।"

নিতান্ত বিরক্তির সহিত লীলার হাত দুটীকে নিজের মুঠার ভিতর হইতে সজোরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সশব্দে চেয়ারখানাকে তিন হাত পশ্চাতে ঠেলিয়া নরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। পাশের টেবিলটার উপর একটা প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া বলিল "ব্যস্—আর না—আজই আমাকে এর একটা হেস্ত নেস্ত করতেই হবে।"

লীলাও উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখখানি আঁধার করিয়া বলিল "আজ তোমার কি হয়েছে,—তুমি তো কখন এমন রাগারাগি কর না।"

তীব্র কণ্ঠে নরেশ উত্তর করিল, "আর আমি সহ্য করতে পার্‌ছি নি লীলা! এ রকম করে আর আমাদের চল্‌বে না। হয় তুমি বাপ-মাকে ছাড়, নয় তো আমায় ছেড়ে দাও—"

লীলা কাঁদিয়া ফেলিল। নরেশের কাছে ইতিপূর্ব্বে সে আর কখনও এমন ভৎর্সনা পায় নাই। আপন বস্ত্রাঞ্চলে চোখ দুটী চাপা দিয়া অভিমানিনী ফোঁপাইতে লাগিল।

নরেশ অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, শেষে ধীরে ধীরে তাহার নিকটে অগ্রসর হইয়া, অসীম মমতার সহিত তাহাকে আপন বক্ষের উপর টানিয়া লইল। পরম স্নেহে তাহার স-অঞ্চল হাত দুখানিকে চোখের উপর হইতে নামাইয়া দিল—কপালের উপর হইতে মাথার চুলের উপর দিয়া পিঠের দিক পর্য্যন্ত অতি সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে, আদরের সহিত বলিল, "কেঁদ না, ছিঃ! চুপ কর। তোমায় তো কোনও দোষ দিচ্ছি নি আমি। তোমার একটা অপরাধ শুধু এই যে, তুমি হাসির মধ্যেও যেমন অপরূপ সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হোয়ে ওঠো, কান্নার ভিতর দিয়েও ততোধিক!—তোমার এই ফুলের কুঁড়ির

মতো মুখখানি যেন প্রতি দিন আমার চোখে নিত্য নূতন শোভায় বিকশিত হোয়ে উঠ্‌ছে! তোমার অকলঙ্ক হৃদয়ের মধু-সৌরভে আমার চিত্ত বিহ্বল হোয়ে যায়! আমি তোমাকে চাই লীলা! একেবারে পুরোপুরি দখল করে থাকতে চাই। তোমার ওপর অন্য কারুর অধিকার—তা সে যেই হোক্ না কেন—আমি কিছুতেই সহ্য করতে পার্চ্ছি না। আমি তোমাকে নিয়ে আমার চারিদিক ভরিয়ে রাখতে চাই। আমার দুঃখ, আমার বেদনা আমি তোমার শুভ্র হাস্যে ডুবিয়ে দিতে চাই! ছিঃ, চুপ কর; লক্ষ্মী আমার—কেঁদ না। ও কি, আবার চোখ রগড়াচ্ছ! চোখ দু'টি রাঙা হোয়ে উঠলো যে! কেউ দেখে জিজ্ঞেসা করলে কি বল্‌বে বল তো?—দাঁড়াও, আমি মুছিয়ে দিচ্ছি—ওই কে আসছে যেন—মা বোধ হয়,—নাঃ, বৌদি—"

এমন সময় কমলা কক্ষের ভিতর আসিয়া,—যেন কত রাগিয়াছে এমনি ভাবে বলিতে লাগিল, "বলি, সকাল থেকে দুটিতে মিলে কি এতো গুজ্‌ গুজ্‌ ফুস্‌ ফুস্‌ হচ্ছে শুনি?—কতখানি বেলা হোয়েছে, হুঁস আছে? আজ কি আর তোমাদের নাইতে খেতে হবে না? ওঁরা যে সব বকাবকি করছেন।"

কমলা কথাগুলা খুব রাগ করিয়া বলিবার চেষ্টা করিলেও, তাহার অধর প্রান্তে যে গোপন হাসির রেখাটুকু উঁকি মারিতেছিল, উহাই তাহার ক্রোধের সমস্ত কৃত্রিমতাটুকু ধরাইয়া দিল। নরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই যে ভাই, এখনি যাচ্ছি। হুকুম করলেই তো হয়, অত রাগারাগি করবার কি দরকার?—যাও তো লীলা, একছুটে গিয়ে নেয়ে নাওগে তো—"

লীলা বলিল "তুমি আগে যাও। সত্যি, ঢের বেলা হ'য়ে গেছে!"

"এই যে আমি এলুম বলে—তুমি ততক্ষণ এগোও না। তোমার বৌদির সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।"

"আচ্ছা, তুমি আগে বল যে আমার ওপোর একটুও রাগ করনি?"

"একটুও না। আমি তো কতবার বলিছি, যে, তোমার ওপর আমি জীবনে বোধ হয় কখনও রাগ কর্‌তে পারবো না।"

"আচ্ছা দেখ্‌বো। বৌদি, তুমি সাক্ষী রইলে ভাই। যদি করে, তাহ'লে তোমার ওপোর ওর শাস্তির ভার রইল।"

কমলা তাহার কৃত্রিম রাগ ভুলিয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "সেজন্যে তোর ভাবনা নেই,—এমন শাস্তি দোবো তখন, যে, শেষ তুইই হয় ত এসে বলবি 'এবারটি ওকে মাপ কর ভাই বৌদি!' তখন কিন্তু আমি কারুর কথা শুনবো না, তা আগে থাক্‌তে বলে রাখ্‌ছি।"

"হ্যাঁ—তা বই কি,—আচ্ছা দেখবো তখন।" বলিতে বলিতে লীলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

ব্যাণ্ডেল

কুমার শ্রীমুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ"—জগতে সুখ এবং দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রাচী এবং প্রতীচীর বাণিজ্য-বন্দর-সঙ্ঘ মধ্যে পশ্চিম-বঙ্গের রাজকীয় বন্দর পুণ্যতোয়া মুক্তবেণী ত্রিবেণী-সংলগ্ন সপ্তগ্রাম মহানগরী এক কালে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। সেকালে বিপুলকায়া সরস্বতী-বক্ষ পণ্য-সম্ভার-পূর্ণ পোত-সমাবেশে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত। সুদূর রোমক ও কার্থেজ রাজ্য, প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ, চীন সাম্রাজ্য, সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও মলয়প্রদেশবাসীগণ পণ্যের বিনিময়ে সপ্তগ্রামের ধনভাণ্ডার সুবর্ণে পূর্ণ করিয়া দিত। শ্রীমন্ত, ধনপতি, চাঁদ সওদাগরের গৌরবময় কাহিনীর স্মৃতি সপ্তগ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের নিত্যলীলা-ভূমি,—সর্ব্বত্যাগী ভগবৎ-প্রেম বিহ্বল রঘুনাথ ও উদ্ধারণের সিদ্ধপীঠ সপ্তগ্রাম নিয়তির অনিবার্য্য বিধানে অতি শোচনীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বন্য বরাহ, শিবা ও শার্দ্দূলের বিকট আরাবে ও ঘোরা নিশীথিনীতে

পেচকের কর্কশ রবে জনহীন গহন কানন দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইলেও, ভক্ত উদ্ধারণ-রোপিত মাধবীকুঞ্জ ও মুসলমান আমলের মসজীদ ও সমাধির ভগ্নাবশেষ পূর্ব্ব-কীর্ত্তি-গরিমার স্মৃতি অদ্যাপি সজাগ রাখিয়াছে।

ভাঙ্গা গড়া জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম। সপ্তগ্রামের লয়ে হুগলীর অভ্যুদয়। হুগলীর অভ্যুদয়ের কারণ পর্ত্তুগীজ আগমন। পর্ত্তুগীজেরা কবে হুগলীতে প্রথম আগমন করে, তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না—অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী য়ুরোপের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাচার্য্য পোপ পঞ্চম নিকোলাস্

লেডী অফ্ দি রোজারির বেদী, ব্যাণ্ডেল

পর্ত্তুগাল-রাজ পঞ্চম এলফনসোকে প্রাচ্যে আবিষ্কৃত যাবতীয় রাজ্য উপভোগের ক্ষমতা অর্পণ করেন। ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে ডিয়াজ (Diaz) নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ উত্তমাশা অন্তরীপ সর্ব্বপ্রথম অতিক্রম করেন। সেই পথে পোতারোহণে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট জগদ্বিখ্যাত পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ভারতোপকূলে কালিকাট সহরে প্রথম পদার্পণ করেন। জলযানে য়ুরোপবাসীর ভারতবর্ষে এই প্রথম আগমন। ভাস্কো-ডা-গামার উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা অর্থোর্জ্জন। তাঁহার উদ্দেশ্য আশাতীত ভাবে সফল হইয়াছিল। দুই বৎসর ভারতে অবস্থানের পর, তিনি বহু ধনরত্ন ও ভারত-জাত অপূর্ব্ব দ্রব্যসম্ভারে বাণিজ্যতরী পূর্ণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ক্রমে ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রতীচীর পুরুষকার ও উদ্যম-শীলতায় আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ভারতের দুর্দ্দিনের সূত্রপাত হইল। গামার স্বদেশবাসিগণ তাঁহার অভাবনীয় অতুল বৈভব দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা শুনিল, ভারতে কল্পতরু বৃক্ষ আছে, নাড়া দিলে মোহর ঝরে। তাহারা স্বর্ণ-লোভে ভারতে আসিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইল। এক দুই করিয়া জলযানে পর্ত্তুগীজ বণিকগণ ভারতে আসিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে তাহারা বাণিজ্য-ব্যপদেশে আসিতেছিল; ক্রমে এখানে অল্প অল্প করিয়া ভূমি ক্রয় করিতে লাগিল; আত্মরক্ষার জন্য দুর্গও নির্ম্মাণ করিল। দেখিতে দেখিতে তাহাদের রাজ্যলাভের বাসনা হইল। সুযোগ বুঝিয়া তাহারা কয়েক স্থান অধিকার করিয়া লইল। গোয়া, সিংহল, মলক্কা, অরমাজ পর্ত্তুগীজ-করতলগত হইল। এই সকল অধিকারে আনিলেন পর্ত্তুগীজদিগের ক্লাইভ্—আলফন্সো আলবুকার্ক। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর মামুদ পাঠান সেনাপতি শের শা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ায়, সাহায্যের জন্য গোয়ার পর্ত্তুগীজ রাজ-প্রতিনিধির নিকট আবেদন করেন। তিনি বঙ্গেশ্বরের সাহায্যার্থ বঙ্গদেশে নয়খানি রণতরী প্রেরণ করেন ; কিন্তু, রণতরী পৌছিবার পূর্ব্বেই মামুদ পরাভূত হইয়া মোগল সম্রাট হুমায়ুনের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে পর্ত্তুগীজদের এই প্রথম সেনা-সমাবেশ। ১৫১৭ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ব হইতে ব্যবসার জন্য পর্ত্তুগীজদের বাণিজ্য-পোত বাঙ্গালায় আসিত বটে, কিন্তু তখনও রণপোত প্রবেশ করে নাই। রণতরীসমূহের সেনাপতি সাম্প্রিয় যখন হুগলীতে আসিয়া পৌছিলেন, তখন সম্রাট হুমায়ুন শের শার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। পর্ত্তুগীজরা অনেক-দিন হইতে বাঙ্গালায় উপনিবেশ সংস্থাপনের জন্য ব্যগ্র ছিল ; সুতরাং এরূপ সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। সাম্প্রিয় হুগলীই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থির করিলেন্। হুগলীতে একটী কুঠী স্থাপিত হইল। এই সময়ে গৌড়াধিপতির অনুরোধে দেশের

অন্তর্বিপ্লব দমন জন্য কয়েকজন পর্ত্তুগীজ সৈন্য গৌড়ে প্রেরিত হয়। সাম্প্রিয় অধিক দিন হুগলীতে অবস্থান করেন নাই। তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল গোয়া। সেখানে তিনি বাহুবলে প্রধান শাসনকর্ত্তার আসন পরিগ্রহ করেন। অল্প দিন পরে পর্ত্তুগাল-রাজ মুনীয় নামক জনৈক রাজপুরুষকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। সাম্প্রিয় শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় লিস্‌বনে প্রেরিত হন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে জন্ ডি ক্যাষ্ট্রো পর্ত্তুগীজ-ভারতের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইঁহার সময়ে পর্ত্তুগীজদের প্রবল প্রতাপে সমুদ্রতীরবর্ত্তী জনপদ-সমূহ সর্ব্বদাই প্রকম্পিত হইত। ক্যাষ্ট্রোর শাসন-গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য তাৎকালিক পর্ত্তুগীজ কবি ক্যামিয়ন্স স্বজাতি-প্রেমে অন্ধ হইয়া গাহিয়াছিলেন—
(বঙ্গানুবাদ)

মন্দাকিনীর পুলিনে পুলিনে সিন্ধুর তীরে আর
লুণ্ঠনহৃত কণ্ঠে কণ্ঠে উঠে না ক হাহাকার।
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, শান্তি-দেবীর কৃপা-মন্দার ফোটে,
হেম পুষ্পিত সহকার-শাখা শোভে মঙ্গল ঘটে।
কাস্ত্রো আজিকে শাসিছে প্রাজ্ঞ নীতিশাস্ত্রের বলে
বিশাল প্রাচ্য পর্ত্তুগালের নিদেশ মানিয়া চলে।

কবির কল্পনা চিরপ্রসিদ্ধ,—তাঁহারা অকিঞ্চিৎকর বিষয়কে গুরুতর করিতে পারেন। কোথায় সিন্ধুনদ আর কোথায় গঙ্গা! এত বিস্তৃত রাজ্য তাঁহার স্বদেশবাসিগণ কোথায় পাইল? আটক হইতে কটক তখন সম্রাট আকবরের রাজ্যভুক্ত। পর্ত্তুগীজরা সমুদ্রোপকূলে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা পশ্চিম উপকূলে। ক্যামিয়ন্সের ন্যায় সৌজা (Souza) স্বদেশ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে চীন উপকূল পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। সম্ভবতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ঐ সকল স্থানে পর্ত্তুগীজ-দিগের যাতায়াত ছিল। আবুল ফাজ্‌ল্ বলেন, সম্রাট আকবর খৃষ্ট-ধর্ম্ম বিষয় অবগত হইবার জন্য ব্যগ্র হন। সেজন্য ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে পাদ্রী রডালফ্ একোয়াভিডা আকবরের নিকট গমন করেন। দুইজন খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকও তাঁহার সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন।

হুগলী এ যাবৎ নগণ্য অবস্থাতেই ছিল। কবিকঙ্কনের চণ্ডী ১৪৯৯ শক বা ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। চণ্ডীতে গঙ্গার পূর্ব্বকূলের গৌরীপুর, হালিসহর প্রভৃতির ও পশ্চিম কূলের সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী প্রভৃতির উল্লেখ আছে, হুগলীর কোনও উল্লেখ নাই। সে সময় পর্ত্তুগীজরা হুগলীতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকিলে, কবিকঙ্কন নিশ্চয় তাহার উল্লেখ করিতেন। হিজলীর পথে ফিরিঙ্গির দেশ বলিয়া চণ্ডীতে লিখিত আছে, আর হুগলীর উল্লেখ থাকিবে না, তাহা সম্ভবপর নহে। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বিংশ বৎসর পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজরা হুগলীতে উপনিবেশ স্থাপন করে। আইন-আকবরী-প্রণেতা কহেন যে, হুগলী এবং সপ্তগ্রাম ফিরিঙ্গিদের অধীন ছিল; তন্মধ্যে

ব্যাণ্ডেল কনভেণ্টের উচ্চ বেদী

শেষোক্ত স্থান হইতে রাজস্ব আদায় হইত। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে রাল্‌ফ ফিচ (Ralph Fitch) নামক ভ্রমণকারী হুগলীতে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে হুগলী পর্ত্তু-গীজদের এক প্রধান সুরক্ষিত স্থান। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে এক-দল সৈন্য বিদ্রোহী হয়—সে সময় হুগলী পর্ত্তুগীজদিগের অধীন বলিয়া প্রকাশ। বর্দ্ধমানের নিকট সালিমাবাদ নামক স্থানে মোগল সেনাপতি মির নাজাৎ পাঠান সেনা-পতি কতলু খাঁ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া হুগলীর পর্ত্তুগী

শাসনকর্ত্তার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। আকবরনামার হস্তলিপিতে উক্ত শাসনকর্ত্তার নাম প্রতাব্‌বর ফিরিঙ্গি বলিয়া উল্লিখিত আছে। তিনি রাজস্ব প্রদান উপলক্ষে সস্ত্রীক দিল্লী গমন করিয়াছিলেন। উপরি উক্ত ঘটনাবলী হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, পর্ত্তুগীজরা খৃষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে হুগলীতে উপনিবেশ সংস্থাপন করে।

ইহারা যখন প্রথম হুগলীতে আগমন করে, তখন সেখানে যে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতে পাইবে, তাহা ভাবে নাই। ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া ধনোপার্জ্জনই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। তাহারা অস্থায়ী বংশ-নির্ম্মিত কুটীরে বৎসরের কতকাংশ সময় অবস্থান করিয়া অর্জ্জিত অর্থ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিত। সম্রাট আকবর ইহাদের বিষয় অবগত হইয়া রাজধানীতে জনৈক পর্ত্তুগীজকে নমুনা স্বরূপ প্রেরণ করিবার জন্ত বঙ্গদেশের সুবাদারকে আদেশ প্রদান করেন। আগরা হইতে হুগলী অনেক দূর; কাজেই পত্র আসিতে অনেক সময় লাগিল। পত্র পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পর্ত্তুগীজরা স্বদেশে গমন করিয়াছিল। সুতরাং সে বৎসর পর্ত্তুগীজ নমুনা প্রেরিত হইল না। সেজন্ত সম্রাট সুবাদারকে এক শ্লেষাত্মক পত্র প্রেরণ করেন। তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে এরূপ মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগে যে, তিনি অবিলম্বে পীড়িত হইয়া মানব-লীলা সম্বরণ করেন। পর বর্ষে নব সুবাদার সম্রাটের সন্তোষ বিধানার্থ ট্যাভারেজ নামক পর্ত্তুগীজ পোতাধ্যক্ষকে আগরায় প্রেরণ করেন। আকবর ট্যাভারেজের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, এবং হুগলীর নিকট যে কোনও স্থানে সহর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিবার অনুমতি প্রদান করেন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার ও উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণেরও অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। আকবরের সময় পর্ত্তুগীজদিগের সুবর্ণ-যুগ বলা যাইতে পারে। জাঁহাগীরের সময়েও পর্ত্তুগীজরা নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর তাঁহার বিদ্বেষভাব ছিল না। বাণিজ্যের প্রসারে দেশের উন্নতি হইবে ভাবিয়া, ও পর্ত্তুগীজরা বঙ্গোপসাগর হইতে জলদস্যুগণকে বিদূরিত করিবার ভার গ্রহণ করায়, তিনি পর্ত্তুগীজদিগকে নির্ব্বিবাদে হুগলীতে রাজত্ব করিতে দিয়াছিলেন। এই সময়ের পর্ত্তুগীজদিগের অবস্থা সম্বন্ধে ভ্রমণকারী পার্চ্চাস এইরূপ লিখিয়াছিলেন:—"The Portuguese have here Porto Grande (Sun-dip) and Porte Pequens (Hooghly) but without Forts and Government; every man living after his own lust and for the most part, they are such as dare not stay in those places of better Government for some wickedness by them committed."
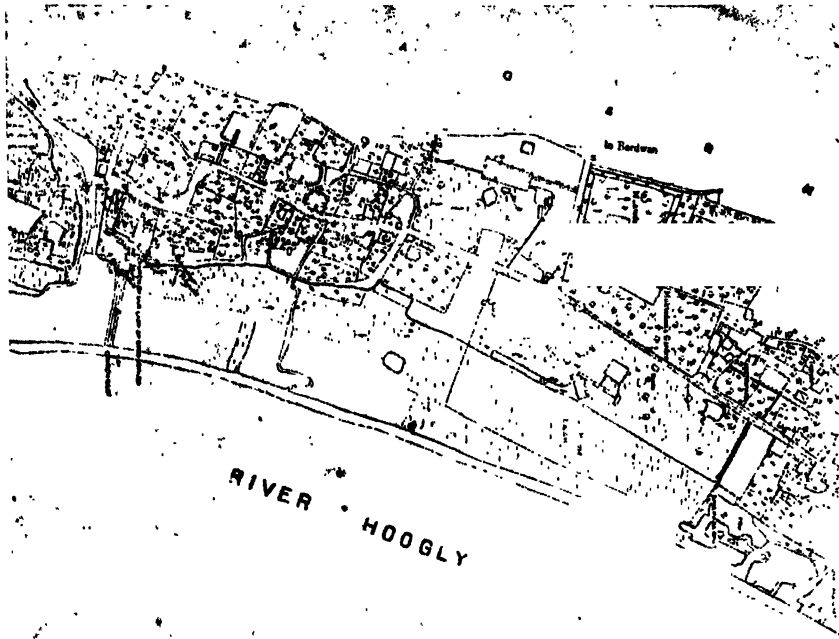
হুগলীর উত্তরাংশের মানচিত্র

সম্রাট সাহজাঁহার আমলে পর্ত্তুগীজদিগের পতন হইলেও, তিনিই ইহাদিগকে ৭৭৭ বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন।

হুগলীর নামকরণ কবে হইল? ফেরিয়া ডি সৌজার পর্ত্তুগীজ ইতিহাসে (১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়) হুগলীর নাম "গলিন" বলিয়া উল্লিখিত আছে। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে পাটনা হইতে হিউজ এবং পার্কার সাহেব যে পত্র লেখেন, তাহাতে উল্লিখিত আছে যে, নিম্নবঙ্গে পর্ত্তুগীজদের দুইটি দুর্গ আছে,—একটী পীর পুল্লীতে (সম্ভবতঃ পিপ্‌লী) আর একটী "গলির" বা "গলিন" নামক স্থানে। ডাচ্ শাসনকর্ত্তা বাউচ্ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে হুগলীর নাম "ওয়েগৃলী" বা "হোয়েগৃলী" বলিয়া লিখিয়াছিলেন। ডি লেইটোর "ইণ্ডিয়া ভেরা" নামক পুস্তকে "উগেলী" বলিয়া উল্লিখিত আছে। উপরিউক্ত নামগুলির সহিত হুগলীর অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। টিপু সুলতানের পাঠাগারের গ্রন্থসমূহের ৩৭নং বিস্তারিত তালিকার পরিশিষ্টে হুগলীর উৎপত্তির বিষয় লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু নগর কোন সময় স্থাপিত হয়, তাহার নির্দ্দেশ করা হয় নাই। সুতরাং ইহার সঠিক মীমাংসা হওয়া দুষ্কর।

পর্ত্তুগীজ-দুর্গের ভগ্নাবশেষ—হুগলী

ভারতে পর্ত্তুগীজ রাজত্বের প্রধান রাজধানী ছিল গোয়া নগরে,—সেখানে রাজপ্রতিনিধি বাস করিতেন। অন্যান্য স্থানে উচ্চ কর্ম্মচারী বা প্রতিনিধি নিযুক্ত থাকিতেন। বঙ্গদেশে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন,—তিনি হুগলীর কুঠীতে অবস্থান করিতেন।

সপ্তগ্রাম এতকাল পর্য্যন্ত রাজকীয় বন্দর ছিল। পর্ত্তুগীজরা হুগলীকেই এ প্রদেশের প্রধান বন্দর রূপে পরিণত করাই স্থির করিল। নূতন সৌষ্টবে হুগলী সপ্তগ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দণ্ডায়মান হইল। সপ্তগ্রামের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী বিরূপা হইলেন। সরস্বতী নদীর জল শুষ্ক হওয়ায়, তাহার উপর দিয়া বৃহৎ জলযানে যাতায়াত একরূপ বন্ধ হইয়াছিল। সুতরাং পর্ত্তুগীজদিগের মনস্কামনা পূর্ণ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। ক্রমশঃ হুগলীর শ্রীবৃদ্ধি ও সপ্তগ্রামের অধঃপতন হইতে লাগিল। সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা হুগলীর অভ্যুদয় ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। হুগলীর উন্নতির পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিবার জন্য তিনি স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পর্ত্তুগীজরা প্রমাদ গণিল। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হইল। হুগলী সুরক্ষিত করিবার জন্য পরিখা খনন ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিল। হুগলীর প্রথম পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তার নাম পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ গোয়া হইতে নিযুক্ত কোনও ব্যক্তি ঐ কার্য্য করিতেন। আর তিনি যিনিই হউন, তাঁহার ক্ষমতা সম্ভবতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। হুগলীতে খৃষ্টোপাসনা করিবার জন্য এতকাল কোনও ধর্ম্মমন্দির ছিল না। এই অভাব দূরীকরণ মানসে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হুগলীতে একটী সুন্দর উপাসনালয় ও মঠ নির্ম্মিত হয়। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে যখন হুগলী অবরুদ্ধ হয়, সেই সময় উক্ত গির্জ্জা মোগল সেনা কর্ত্তৃক তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে গির্জ্জাটি পুনঃনির্ম্মিত হয়। গির্জ্জায় প্রবেশের দ্বারে একখানি প্রস্তরফলকে সর্ব্বপ্রথম গির্জ্জা নির্ম্মাণের তারিখ ১৫৯৯ বলিয়া অঙ্কিত আছে। বিগত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে গির্জ্জাটির কয়েক স্থান ভগ্ন হইয়াছিল; পর বৎসর তাহার সংস্কার করা হয়।

অল্পকালের মধ্যে পর্ত্তুগীজেরা হুগলীতে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলেও, প্রকৃত পক্ষে তাহারাই

হুগলীর সর্ব্বময় প্রভু ও হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা যথা নিয়মে বা যথা সময়ে রাজস্ব প্রদান করিত না; তাহারা বল প্রকাশ করিয়া অধিবাসীগণকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিত। যাহারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিত, তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা হইত। অনেকে রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। এমন কি, এক জন স্বীয় কর্ম্মদক্ষতায় হুগলীর শাসনকর্ত্তার কার্য্য পর্য্যন্ত পাইয়াছিল।

মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাভূত হওয়ার পর একেবারে হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল।

আকবর ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎপুত্র সেলিম্ জাহাঁগীর উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

এই সময় পর্ত্তুগীজ দস্যুপতি সিবাশ্চিয়ন গঞ্জেলিসের অধীন জলদস্যুদিগের অত্যাচারে বঙ্গদেশ বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গ শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া পণ্য

ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার দক্ষিণাংশ
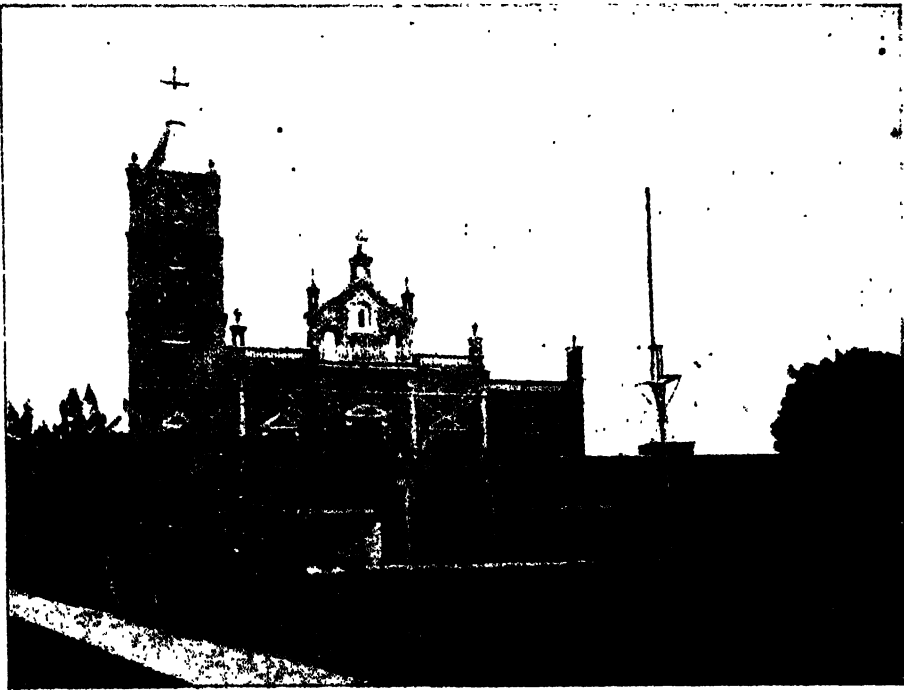
যত দিন সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তত দিন পর্ত্তুগীজেরা একরূপ নির্ব্বিবাদে হুগলীতে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি লাভ করিতেছিল। আকবর বঙ্গদেশে দুর্দ্ধর্ষ পাঠানদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। এই সুযোগে পর্ত্তুগীজেরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে দাউদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠানদিগের আধিপত্য হ্রাস হইয়াছিল বটে, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত তাহারা সম্পূর্ণ রূপে করায়ত্ত হয় নাই। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে পাঠানেরা মোগল সেনাপতি মহারাজা

পূর্ণ জলযান ও গ্রাম লুণ্ঠন করিত, এবং অধিবাসীগণকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া ক্রীতদাস রূপে বিক্রয় করিত। হুগলীর পর্ত্তুগীজেরা অবাধে এই জলদস্যুদিগের দাস-ব্যবসায়ের সহায়তা করিত। তাহারা অল্প মূল্যে পাইকারি দরে নৌকা পূর্ণ দাস ক্রয় করিয়া নানা দেশে তাহাদিগকে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিত। এ সম্বন্ধে মোগল রাজত্বে ফরাসী ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার বলেন—

"Even the Portuguese of Hooghly in Bengal purchased without scruple these

wretched captives, and the horrid traffic was transacted in the vicinity of the island of Galles, near Cape das Palmas. The pirates by a mutual understanding waited for the arrival of the Portuguese who bought whole cargoes at a cheap rate; and it is lamentable to reflect that other Europeans, since the decline of the Portuguese power, have pursued the flagitious commerce with the pirates of Chittagong, who boast that they convert more Hindoos to Christianity in twelve months than all the missionaries in India do in ten years. A strange mode this of propagating our holy religion by the constant violation of its most sacred precepts, and by the open contempt and defiance of its most awful sanctions."

পর্তুগীজ জলদস্যুগণের অত্যাচারে পূর্ব্ববঙ্গ বিধ্বস্ত হইতেছিল। কাজেই তাহার প্রতিরোধ জন্য রাজমহল হইতে ঢাকায় বাঙ্গালার রাজধানী স্থানান্তরিত করা হইল। ঢাকার নামকরণ হইল 'জাহাঙ্গীরনগর'। এই সময় ইসলাম খাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগের প্রতাপ কথঞ্চিৎ হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তবে তাহাদিগকে একেবারে বশীভূত করিতে পারেন নাই। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার পদে কাশিম খাঁ নিযুক্ত হন। ইঁহার পর ইব্রাহিম খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি বীর ও সুশাসক ছিলেন। ইঁহার চেষ্টায় দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল।

ঐতিহাসিকগণের মতে সম্রাট জাহাঁগীর সৎ ও উদার-প্রকৃতির সম্রাট ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সাম্রাজ্যের অমঙ্গলের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি শাসন করিবেন কি, তিনি নিজেই তাঁহার প্রিয় বেগম জগদ্বিখ্যাত নূরজাহান কর্ত্তৃক শাসিত হইতেন। তিনি নূরজাহানের হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলিকাবৎ ছিলেন। জাহাঁগীরের পুত্রদের মধ্যে খুরম (সাহজাঁহা) নিঃসন্দেহ সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার বহু সদ্‌গুণ সত্বেও তিনি নূরজাহানের বিষ নয়নে পতিত হইয়াছিলেন। নূরজাহান সম্রাটের চতুর্থ পুত্র সারিয়ারকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তাঁহার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত একমাত্র কন্যার সহিত সারিয়ারের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল; সুতরাং নূরজাহান যে তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবার প্রয়াস পাইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। ব্যাপার

ব্যাণ্ডেল কন্‌ভেণ্ট—পূর্ব্বাংশ

দেখিয়া ১৬২১ খৃষ্টাব্দে খুরম (সাহজাঁহা) বিদ্রোহী হন। তিনি সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করেন। কিন্তু রাজ-সৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত হন। রাজ-সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলে, তিনি পলায়ন করিয়া বর্দ্ধমানে আসিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময় হুগলীর পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা মাইকেল রড্রিগেজ তাঁহার সহিত বর্দ্ধমানে সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। সাহজাঁহা তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার জন্য তাঁহার নিকট কয়েকটি কামান ও একদল সশস্ত্র য়ুরোপীয় সৈন্য প্রার্থনা করেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে তিনি নানা রূপ পুরস্কার অঙ্গীকার করেন। সম্রাটের বিরাগ উৎপাদনের আশঙ্কায় রড্রিগেজ তাঁহাকে কোনও রূপ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন নাই। সাহজাঁহা তাহাতে আন্তরিক বিরক্ত হন এবং উপযুক্ত সুযোগ পাইলে ইহার প্রতিফল প্রদানে মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করেন। পর্ত্তুগীজদিগের নিকট সাহায্য না পাইলেও তিনি সৈন্য-সামন্ত সহ পুনরায় যুদ্ধে ব্রতী হইলেন। এবার ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হন। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজেকে বঙ্গেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন। দুই বৎসর রাজত্বের পর রাজকীয় সৈন্য কর্ত্তৃক তিনি পুনরায় পরাস্ত হইয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সেবারকার মত পরিত্রাণ পান।

১৬২৭ খৃষ্টাব্দে জাহাঁগীরের মৃত্যু হইলে সাহজাঁহা দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পর বৎসর তিনি তাঁহার প্রিয় সদস্য কাশিম খাঁকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত করেন। ইঁহার শাসন কালের প্রধান ঘটনা হুগলীর অবরোধ ও পতন।

বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হওয়ার কয়েক বৎসর পরে কাশিম খাঁ পর্ত্তুগীজদিগের দুর্ব্বিনীত ও উদ্ধত ব্যবহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট সাহজাঁহার সমীপে তাহাদের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ-লিপি প্রেরণ করেন। তাহাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ (১) ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে হুগলী নামক স্থানে কতকগুলি পর্ত্তুগীজ পৌত্তলিককে ব্যবসা করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল; তাহাদের কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া থাকিবার কথা, তাহা না থাকিয়া, বিনা অনুমতিতে দুর্গ নির্ম্মাণ ও পরিখা খনন দ্বারা তাহারা হুগলী সুরক্ষিত করিয়াছে। (২) তাহাদের হুগলীর কুঠীর সম্মুখস্থ গঙ্গার উপর দিয়া যে সমুদায় নৌকা ও বাণিজ্য-পোত যাতায়াত করে, তাহাদের নিকট হইতে তাহারা অন্যায় রূপে শুল্ক আদায় করিয়া থাকে। (৩) তাহারা প্রাচীন সপ্তগ্রাম বন্দরের যাবতীয় বাণিজ্য আকর্ষণ করিয়া এত দিনের বন্দরটি একেবারে নষ্ট করিয়াছে। (৪) তাহাদের অত্যাচারে সাম্রাজ্যের অধিবাসীগণ বিশেষরূপ লাঞ্ছিত হইতেছে। তাহারা ছেলে চুরী এবং গরীবের সন্তান ক্রয়

সপ্তগ্রাম মাধবী—কুঞ্জ

করিয়া ভারতের নানা স্থানে তাহাদিগকে ক্রীতদাস রূপে বিক্রয় করিয়া থাকে। (৫) পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ মগেদের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া থাকে। এই গুরুতর অভিযোগলিপি প্রাপ্ত হইয়া সম্রাটের হৃদয়ে প্রতিহিংসানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি বঙ্গের শাসনকর্ত্তাকে তাঁহার রাজ্য হইতে পৌত্তলিক পর্ত্তুগীজদিগকে বিদূরিত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

কাশিম খাঁ জানিতেন যে, আদেশ দেওয়া যেরূপ সহজ, আদেশ পালন করা ততদূর সহজ-সাধ্য নহে। বিশেষ হুগলী

জেস্থট কলেজের টাবী—সাওপালো উদ্যান, ব্যাণ্ডেল
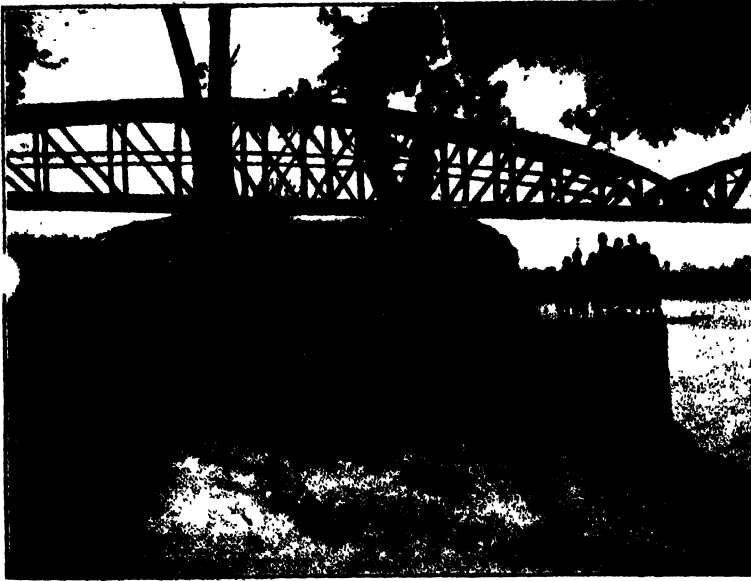
সুরক্ষিত ছিল। নদীর দিক হইতে আক্রমণের সুবিধা ছিল না; কারণ সদা সর্ব্বদা সেখানে অনেক পর্ত্তুগীজ জাহাজ থাকিত। আর দুর্গটি পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। পরিখা সর্ব্বদা জলে পূর্ণ থাকিত। সুতরাং হুগলী আক্রমণের জন্য বিশেষ আয়োজন করিতে হইয়াছিল। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের বিরাট আয়োজন আরম্ভ করা হইল। যুদ্ধোদ্যম যাহাতে পর্ত্তুগীজরা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে না পারে, কাশিম তাহার ব্যবস্থা করিলেন। যুদ্ধের আয়োজন সমাপ্ত হইলে, তিনি প্রকাশ করিলেন যে, তিনি মুকসুদাবাদ ও হিজলীর রাজদ্রোহী জমীদারদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে বাহাদুর কুম্বুর অধীনে একদল সেনা ঢাকা হইতে মুকসুদাবাদাভিমুখে প্রেরিত হইল। একদল সেনা সহ কাশিম খাঁর পুত্র এনায়াৎউল্লা বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। খাজা শিয়ারের অধীনে তৃতীয় দল সেনা হুগলীর পদপ্রান্তে প্রবাহিত ভাগীরথী নদী রক্ষার জন্য প্রেরিত হইল। খাজা শিয়ারের আদেশে পর্ত্তুগীজদিগের পলায়নের পথ রোধ করিবার জন্য শ্রীরামপুরের সম্মুখে ভাগীরথীর উপর একটি নৌকার সেতু নির্ম্মিত হইল।

খাজা শিয়ার যথাস্থানে পৌছিয়া, সেখানে সসৈন্যে সমবেত হইবার জন্য অপর সেনাপতিদ্বয়ের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র ১০৪১ অব্দের (১৬৩২ খৃঃ অব্দে) ২রা জিলিজি (১১ই জুন) রাজকীয় সৈন্য কর্ত্তৃক হুগলীর চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ হইল। পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত স্থানসমূহ লুণ্ঠন ও সম্মুখে যে কোনও পর্ত্তুগীজ পড়িবে তাহাকে হত্যা করিবার আদেশ দিয়া তদ্দণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েক দল সেনা চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইল।

হুগলী এ প্রদেশের প্রধান বন্দর হওয়ায় অনেক বিদেশী নাবিক ও নৌচালক হুগলীর নিকটে বাস করিত। মোগলেরা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া কামান রক্ষার স্থান নির্ম্মাণ ও কামান দাগিবার কার্য্যে নিয়োজিত করিল। বলা আবশ্যক, মোগলেরা কামান দাগিতে পটু ছিল না।

সার্দ্ধ তিন মাস ব্যাপিয়া হুগলী অবরুদ্ধ ছিল। ইতিমধ্যে পর্ত্তুগীজেরা অনেকবার বশ্যতা স্বীকার করিতে এবং একলক্ষ টাকা বার্ষিক রাজস্ব প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজেরা য়ুরোপ কিংবা গোয়া হইতে সৈন্য সাহায্য পাইবার প্রতি মুহূর্ত্তেই আশা করিতেছিল। সে জন্য তাহারা আত্মরক্ষার তৎপরতায় কিছুমাত্র নিশ্চেষ্ট হয় নাই। তাহারা সর্ব্বদাই গোলাগুলি নিক্ষেপ করিয়া অবরোধকারীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল।

সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতে দেখিয়া মোগল সেনাপতিগণ কূট নীতি অবলম্বন করিলেন। ডি মেলো নামক একজন বর্ণসঙ্কর পর্ত্তুগীজ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মোগল সেনাপতিদিগকে একটি গুপ্ত পথ দেখাইয়া দিল। তাঁহারা সেই পথের অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। পর্ত্তুগীজেরা দুর্গাভ্যন্তর হইতে তাঁহাদের গতির প্রতিরোধ করিতে লাগিল। দুর্গ আক্রমণ ব্যর্থ দেখিয়া সুড়ঙ্গ খনন করিয়া দুর্গ তোপে উড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প স্থিরীকৃত হইল। অপর স্থান অপেক্ষা গির্জ্জার নিকটস্থ পরিখা স্বল্প-পরিধি-বিশিষ্ট থাকায় পয়ঃপ্রণালী খনন করিয়া পরিখা শুষ্ক করতঃ সুড়ঙ্গ খনন কার্য্য আরম্ভ হইল। সুড়ঙ্গ খনন কালে পর্ত্তুগীজদিগের একটি সুড়ঙ্গ দেখা গেল। সম্ভবতঃ পলায়নের জন্য ঐ সুড়ঙ্গটী খনন করা হইয়া থাকিবে। সেই সুড়ঙ্গটী নষ্ট করিয়া বাহাদুর কুম্বুর অধীনস্থ লোকেরা দুর্গচূড়ার নিম্নভাগ পর্য্যন্ত আর একটি সুড়ঙ্গ খনন করিল। এই উচ্চ চূড়ার নিম্নে অবরুদ্ধ বহু সেনা প্রত্যহ সমবেত হইত। ১০৪২ অব্দে ১৪ই রুবিয়াল্ আভাল্ তারিখে সুড়ঙ্গ খনন সমাপ্ত হইলে সুড়ঙ্গটি বারুদে পূর্ণ করা হইল। তৎপরে দুর্গচূড়া লক্ষ্য করিয়া একদল মোগল সেনা অগ্রসর হইল। পর্ত্তুগীজগণ অবরোধকারীদিগকে দুর্গচূড়া আক্রমণ করিতে দেখিয়া বহু সেনা সহ সেখানে যুদ্ধার্থ গমন করিল। কিছুকাল উভয় পক্ষে অজস্র গোলাগুলি বর্ষণ চলিতে লাগিল। অবশেষে বাহাদুর কুম্বুর আদেশে বারুদ পূর্ণ সুড়ঙ্গে অগ্নি প্রদান করা হইল। নিমেষ মধ্যে প্রচণ্ড শব্দে সমবেত সেনা সহ উচ্চ চূড়া ও দুর্গের কতকাংশ শূন্যে উড়িয়া গেল। মোগল সৈন্যগণ এই শুভ ঘটনায় প্রোৎসাহিত হইয়া সকলে একযোগে দুর্গ আক্রমণ করিল। এই ভীষণ সংঘর্ষে কত যে পর্ত্তুগীজ ইহলোক পরিত্যাগ করিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অনেকে নৌকায় বা জাহাজে পলায়ন করিতে গিয়া সন্তরণ কালে জলে ডুবিয়া মরিল। কেহ কেহ নিরাপদে জাহাজে পৌঁছিল বটে, কিন্তু তাহারা অবিলম্বে খাজা শিয়ারের অধীনস্থ সেনাগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জাহাজখানিতে দুই সহস্র লোক ধনরত্নসহ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এক্ষণে মোগল সেনার হস্তে পতিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া জাহাজের অধ্যক্ষ স্বীয় জাহাজ তোপে উড়াইয়া দিলেন। অন্যান্য অনেকগুলি জাহাজ সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। হুগলী অবরোধের পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজদিগের সর্ব্বসমেত ৩২১ খানি জলযান হুগলীর দুর্গের সম্মুখে নঙ্গর করিয়া ছিল। যুদ্ধাবসানে দেখা গেল কেবল-মাত্র তিনখানি জল-যান লইয়া কয়েকজন পর্ত্তুগীজ পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীরামপুরের নৌকার সেতুতে অগ্নি লাগিয়া কতকাংশ নষ্ট হওয়ায় সেই সুযোগে তাহারা প্রস্থান করিতে পারিয়াছিল; নতুবা তাহাদের পলায়নের কোনই সম্ভাবনা ছিল না।
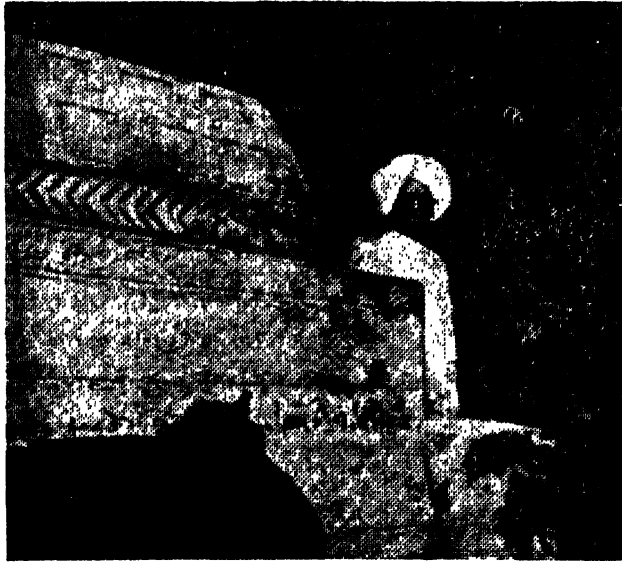
ফকীরদিনের সমাধি-স্তম্ভ

যে কোনও সম্পত্তি অগ্নিমুখ হইতে রক্ষা পাইল, তাহা বিজয়ী সেনা কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইল। তাহারা গির্জ্জার অভ্যন্তরস্থ সুন্দর সুন্দর চিত্রপটগুলি ও প্রতিমূর্ত্তি সকল নষ্ট করিয়া ফেলিল।

অবরোধের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দশ সহস্র পর্ত্তুগীজ মৃত্যুমুখে পতিত ও স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা ও ধর্ম্মযাজক লইয়া মোট ৪৪০০ জন পর্ত্তুগীজ বন্দী হইয়াছিল।

ইহাদের মধ্যে পাঁচ শত সুন্দর যুবক ও সুন্দরী যুবতী অবিলম্বে আগরার রাজধানীতে প্রেরিত হইল। যুবতীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীগুলি সম্রাটের অন্তঃপুরে রক্ষিত হইল। অবশিষ্ট যুবতীগণকে প্রধান প্রধান ওমরাহগণের মধ্যে বিতরণ করা হইল। যুবকগণকে ত্বকচ্ছেদ করিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইল। জেসুট ধর্ম্মযাজকগণকে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিবার জন্য নানা রূপ ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। বহু কষ্টে কয়েক মাস কারাবাসের পর তাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করিয়া গোয়া প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। এ সম্বন্ধে খ্যাতনামা ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার বলেন—
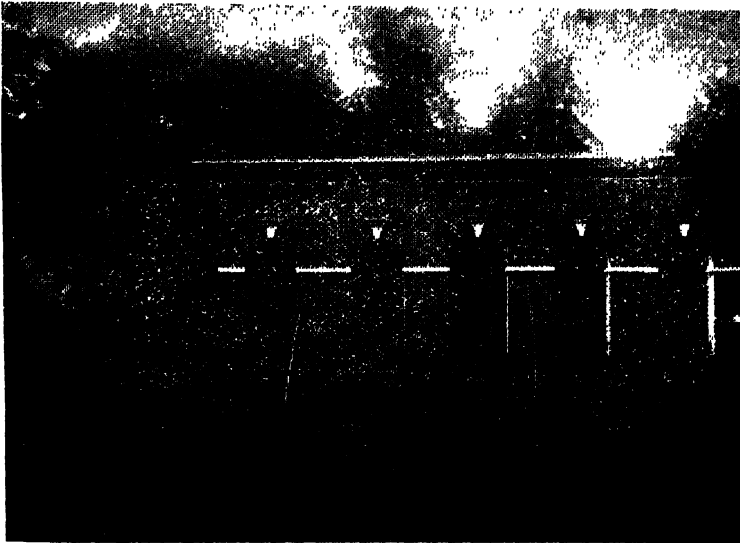
সপ্তগ্রাম—রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পাট

"The misery of the people is unparalled in the history of modern times ; it nearly resembled the grievous Captivity of Babylon ; for, even the children, priests and monks shared the universal doom. The handsome women, as well as married as single, became inmates of the Seraglio ; those of a more advanced age, or of inferior beauty, were distributed among the omrahs ; little children underwent the rite of circumcision, and were made pages ; and the men of adult age, allured for the most part, by fair promises or terrified by the daily threats of throwing them under the elephant's feet renounced the Christian faith. Some of the monks, however, remained faithful to their creed, and were conveyed to Goa, and other Portuguese settlements, by the kind exertions of the Jesuits and missionaries at Agra, who notwithstanding all this calamity continued in their dwelling, and were enabled to accomplish their benevolent purpose by powerful aid of money, and the warm intercession of their friends."

পর্ত্তুগীজেরা দশ সহস্র এ দেশীয় লোককে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। মোগল সেনাপতির আদেশে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করা হইল। এই যুদ্ধে এক সহস্র মোগল সৈন্য হত হইয়াছিল। হুগলী বিজয়ের তিন দিবস পরে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা কাশিম খাঁ ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

হুগলী পতনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে পর্ত্তুগীজদিগের পতন। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ সেনাপতি সাম্প্রিয় প্রথম হুগলীতে পদার্পণ করেন। আর ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে এক শতাব্দী সমাপ্ত হইতে না হইতে পর্ত্তুগীজগণ বঙ্গদেশে নগণ্য হইয়া পড়িল। তাহাদের প্রতাপ দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছিল, যদি তাহাদের গতির এইরূপ প্রতিরোধ না হইত, তাহা হইলে কালে যে তাহারা প্রভূত ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া মুসলমান রাজ্যের অধঃপতনকালে বঙ্গদেশে স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিত না, তাহা কে বলিতে পারে?

পর্ত্তুগীজ দুর্গের ভিতর একটী গির্জ্জার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তথায় উপাসনাদি হইত। তখন পাদ্রী ছিলেন ফ্রা দে ক্রুজ। তিনি একজন পরম ভক্ত ছিলেন।

সেই গির্জ্জার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর (Blessed Lady of our Happy Voyage) বেদীর নিম্নে বসিয়া তিনি অনেক সময় ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিতেন। এই দেবীর নিকট অনেকে মানসিক করিত এবং ফলও পাইত। ফ্রা দে ক্রুজের একজন অন্তরঙ্গ বণিক বন্ধু ছিলেন। তিনি যখনই বাণিজ্য করিতে বিদেশ যাত্রা করিতেন, এই দেবীর নিকট ভক্তির সহিত মানসিক করিতেন—দেবীর কৃপায় তাঁহার আশাতীত অর্থলাভ হইত। দেবীই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধির মূলীভূত কারণ বলিয়া দেবীর প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। অবরোধ কালে যখন দুর্গ রক্ষা হওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল, তখন সেই ভক্ত বণিক দেবী-মূর্ত্তিকে বেদী হইতে নামাইয়া লইলেন। শত্রু হস্তে নিপতিত হইলে মূর্ত্তিটি পদদলিত, বিচূর্ণিত ও নানারূপে নিগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই তিনি মূর্ত্তি সহ সন্তরণ করিয়া গঙ্গার পরপারে নিরাপদ স্থানে তাহা সংরক্ষণ করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু গুরুভার বশতঃ মূর্ত্তি সহ জলমগ্ন হন। কিছুকাল পরে পর্ত্তুগীজ দুর্গ মোগল করতলগত হয়। বিজিত পর্ত্তুগীজগণের সহিত পাদ্রী ফ্রা দে ক্রুজ ও কয়েকজন ধর্ম্ম-যাজকও আগরায় বন্দী রূপে প্রেরিত হন। তাঁহাকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাইবার জন্য নানাবিধ প্রলোভন ও নির্য্যাতন যখন ব্যর্থ হইল, তখন বাদশাহ হস্তী-পদদলিত করিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। একটী প্রচণ্ড মাতঙ্গকে কয়েক দিন অভুক্ত রাখা হইল। সহরের বহির্ভাগে এক বিস্তৃত ভূখণ্ডে বন্দী দে ক্রুজকে করি-পদ-পিষ্ট করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। নাগরিকগণকে তথায় উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। নির্দ্ধারিত কালে স্বয়ং বাদশাহ মহা সমারোহের সহিত শোভা-যাত্রা করিয়া বধ্য-ভূমিতে উপনীত হইলেন। তাহার পূর্ব্বে স্থানটি জন-সঙ্ঘে পূর্ণ হইয়াছিল। বন্দী বধ্য-ভূমির মধ্যস্থলে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আনীত হইলে, বুভুক্ষু মাতঙ্গকে তাঁহাকে পদ-পিষ্ট করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল। হুঙ্কার করিতে করিতে ক্রোধোন্মত্ত মাতঙ্গ শূন্যে শুণ্ড উত্তোলন করিয়া প্রচণ্ড বেগে তাঁহার উদ্দেশে প্রধাবিত হইল। সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া দর্শকগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। সকলে বুঝিল, নিমেষের মধ্যে সব শেষ হইয়া যাইবে—হস্তি-পদ-পিষ্ট হইয়া অবিলম্বে বন্দী ধূলিকণার সহিত মিশিয়া যাইবে। সকলে আগ্রহের সহিত সেই শেষ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। অকস্মাৎ এক অচিন্তনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল। বন্দীকে দেখিবামাত্র মত্ত মাতঙ্গ স্তম্ভিত হইয়া শান্ত ভাব ধারণ করিল ও শুণ্ডের দ্বারা তাঁহার পদ-সম্বাহন করিতে আরম্ভ করিল। এই অভাবনীয় দৃশ্যে সকলে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বন্দীর উদ্দেশে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বাদশাহের বদনমণ্ডল কালিমায় সমাচ্ছন্ন হইল। এই আকস্মিক ব্যাপারে তিনিও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। জনসঙ্ঘের উত্তেজিত ভাব দেখিয়া তিনি বন্দীকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার আদেশ দিলেন ও তাঁহাকে অন্যান্য বন্দিগণ সহ হুগলীতে বাস করিবার ও গির্জ্জা পুনর্গঠন করিবার অধিকার প্রদান করিলেন। এতদুপলক্ষে

ত্রিবেণী—গঙ্গাসরস্বতী-সঙ্গম

ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার জন্য সপ্তগ্রাম সরকার হইতে পৃথকীকৃত করিয়া বাদশাহ ৭৭৭ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন ও গির্জ্জাধ্যক্ষকে নরহত্যা ব্যতীত সর্ব্ব রকম বিচারের ক্ষমতা প্রদান করেন।

হুগলী নগরের উত্তরে এবং কেওটা সার্কিট হাউস বা ডাকাতি কমিশনরের বাটীর দক্ষিণে বলাগড় নামক পল্লী অবস্থিত আছে। এবার সেইখানে গির্জ্জা পুনঃ নির্ম্মিত হইল। পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপনের পর হইতে বলাগড় "ব্যাণ্ডেল" নামে পরিচিত হয়। "ব্যাণ্ডেল" বন্দর কথার অপভ্রংশ। গির্জ্জা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব রাত্রিতে পাদ্‌রী সাহেব স্বপ্ন দেখিলেন, যেন গির্জ্জার পূর্ব্ব দিকে ভাগীরথীর তটভূমি অপূর্ব্ব আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়াছে—আর তাহার মধ্যস্থলে সেই জলমগ্না দেবী-মূর্ত্তি দণ্ডায়মানা হইয়া আছেন। আর সেই বণিক উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—"উঠ—উঠ, জাগ্রত হইয়া দেখ, আমি মাতৃদেবীকে লইয়া আসিয়াছি!" পাদরী সাহেব ব্যস্ত হইয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন ও গবাক্ষ-দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখিলেন; কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তিনি শয়নকালে এই দেবী-মূর্ত্তির কথাই ভাবিতেছিলেন। মনে হইতেছিল, গির্জ্জা প্রতিষ্ঠার সময় মূর্ত্তিটি বেদীর উপর সংরক্ষিত হইলে কেমন সুশোভন হইত। তাই ভাবিলেন, বুঝি বা সেই চিন্তাধারাই অলীক স্বপ্নের সৃষ্টি করিয়াছে।

মুক্তবেণী—ত্রিবেণী

এইরূপ স্থির করিয়া তিনি পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। নিদ্রাবেশে আরও দুইবার ঐরূপ স্বপ্ন দেখিলেন। প্রাতে জন-কলরবে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। উঠিয়া দেখিলেন, গঙ্গার ঘাটে বহু লোক সমবেত হইয়াছে। পূর্ব্ব রজনীর স্বপ্নের কথা স্মরণ হওয়ায়, তিনি ব্যগ্র হইয়া সেখানে গিয়া দেখিলেন, গির্জ্জার ঘাটে স্বপ্নাদিষ্ট সেই দেবী-মূর্ত্তি। তখন সেই মূর্ত্তি গির্জ্জাভ্যন্তরে আনীত ও প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেই মহোৎসবের দিন আর একটি অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। সান্ধ্যভোজের অব্যবহিত পূর্ব্বে সহসা একখানি অর্ণবপোত আসিয়া গির্জ্জার ঘাটে লাগিল। পোতাধ্যক্ষ জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া পাদরী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইলেন, তিনি সাগর-পথে বিস্কে উপসাগরে বড়ই বিপন্ন হইয়াছিলেন—জাহাজ রক্ষার কোনও উপায়ই ছিল না। নীলাম্বুর উত্তাল তরঙ্গমালা জাহাজখানিকে স্বীয় কুক্ষিস্থ করিবার উপক্রম করিলে, তিনি এই গির্জ্জার দেবী-মূর্ত্তির উদ্দেশে আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করিবামাত্র সমুদ্র শান্ত ভাব ধারণ করে ও জাহাজ রক্ষা পায়। তিনি এই দেবীর নিকট জাহাজের মাস্তলটি মানসিক করিয়াছিলেন, তাহাই প্রদান করিতে আসিয়াছেন। পরদিন জাহাজ হইতে সেই মাস্তল খুলিয়া আনিয়া গির্জ্জার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে তাহা প্রোথিত করা হয়। সেই মাস্তল সর্ব্বধ্বংসী কালকে উপেক্ষা করিয়া এখনও সেখানে দণ্ডায়মান আছে। এখনও সেই দেবীর নিকট অনেকে মানসিক দিয়া থাকে। অনেককে ৪।৫ হাত লম্বা মোমবাতি মানসিক দিতে দেখিয়াছি। অনেকে পুত্র পর্য্যন্ত মানসিক করে। তাহাকে দান করিয়া ধর্ম্ম-যাজককে ছাগশিশু বা মেষশাবক বিনিময়ে দিয়া পুত্র ক্রয় করিয়া লয়। আপদ বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য,

কঠিন ব্যাধি হইতে মুক্তির আশায় রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীরা নানারূপ মানসিক করে ; এমন কি, হিন্দুদের ন্যায় মস্তকের কেশরাশি মানসিক রূপে প্রদত্ত হয়। পাদরী সাহেব প্রথমে কেশগুচ্ছ কর্ত্তন করেন। তাহার পর নর-সুন্দরেরা অবশিষ্ট কেশের গতি করে। সেণ্ট জেবিয়ার কলেজের হোষ্টেন্ সাহেব স্বচক্ষে এই কেশ কর্ত্তন দেখিয়া লিখিয়াছেন যে, ইহা আন্তরিক বিশ্বাসের কার্য্য—ইহাকে কুসংস্কার বলা মহা ভ্রম ও অতীব অন্যায়। তিনি তদুপলক্ষে লিখিয়াছেন—

"Not less curious nor less edifying is the case that came under my notice to-day (January. 6, 1914). A Bengali Christian and his wife had brought with them their two children, one a baby, the other a boy of seven. Again a vow. For why do you think was the boy wearing such long tresses, something like a jogi's matted head of hair ? Because in the time of his illness, his parents had vowed never to let scissors, razor or other sharp instrument injure his head, till he came to the age of reason, and now he was 7 years old. Therefore they had come, all the way from Barisal, visiting every church in Calcutta, and keeping Bandel as their seventh and last station. The Padre Sahib would now cut one of the pretty boy's ugly, tortuous, rattan-twisted tresses, and the barber in the Bazar would do the rest. Oh, a happy day for the boy and his parents ! Their days of grief and penance were over at last, and joy and happiness would sit down once more at the fire side.

Rank superstition ! someone will say. A Hindu practice, no doubt. Let him call it what he likes, but not superstition. What does he call superstition ? Can he define ? Does he call superstition every form of worship to which he is not himself addicted ? What shall we call so many practices of his, worse than bondage, which we abominate ? Let him set his house in order first, sweep out of doors his belief in lucky horse-shoes and tigers' claws, in spirit-

উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাঠ
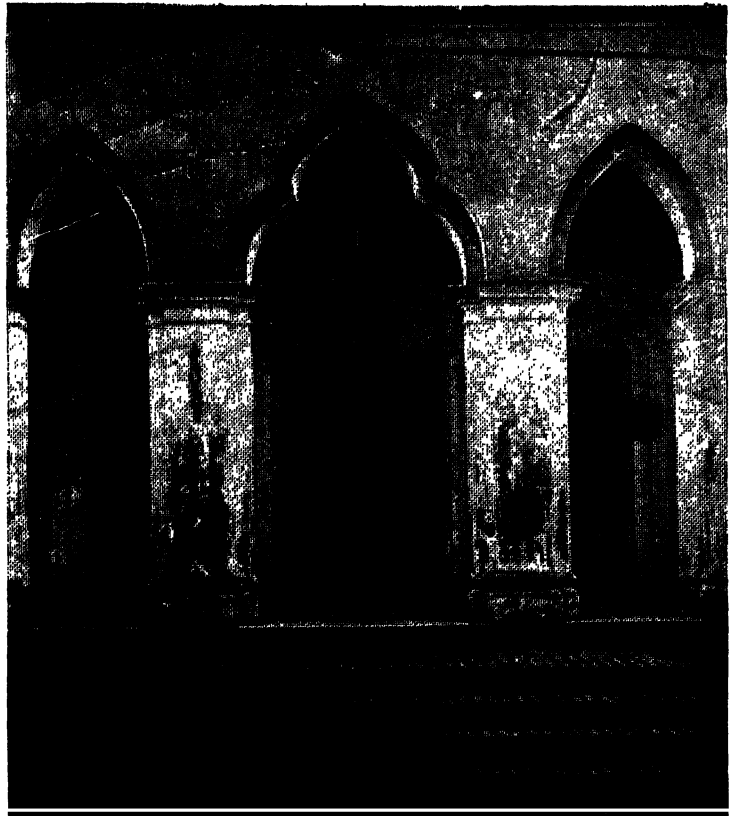
rapping and table-turning, in astrology and palmistry, in masonic triangles, John-from-over-the-water, mahatmas or the Dalai Lama. The saffron-clothed Jogi with matted hair, who shakes his Vishnu trident in the streets and mumbles his prayers on the 108 beads of his rosary, has more piety in him, even if he misdirects his worship, than the dandy with neatly trimmed moustache who humbugs the Creator by thinking him too great for his prayers and his bowing his knees. Grief and penance sits down on the dung-hill in sackcloth and ashes. It shows itself in the long dishevelled hair of the Nazarite. It is symbolised in cropped head of the Hindu widow lamenting her husband's death. Her short hair are her widow's weeds, and she will carry them with her to the grave. Such practices and the like are not Hindu, nor Asiatic. They are mundial, for they are human. They have their reason in the heart of man, and man can give reason for his belief in them, but not for your modern forms of witchcraft."

দেবোদ্দেশে সন্তান উৎসর্গ করা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল—সেই জন্যই দেবদাসী প্রভৃতির সৃষ্টি। রোমান ক্যাথলিক সমাজেও কঠিন পীড়া বা অন্য কারণে সন্তান উৎসর্গের প্রথা আছে। তবে এখানে সচরাচর "দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতে" নিয়মের অনুসরণ করা হয়। ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার এইরূপ একটি ঘটনার কথা হোষ্টেন সাহেব (H. Hosten, S. J.) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জনৈক মান্দ্রাজী মহিলা খড়্গপুর হইতে তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক পুত্রকে ব্যাণ্ডেল গির্জ্জায় উৎসর্গ করিতে লইয়া আসেন। তিনি পাদরী সাহেবকে বলেন "বালক শৈশবে কঠিন পীড়াক্রান্ত হওয়ায় সে আরোগ্য লাভ করিলে গির্জ্জাকে দান করিব এইরূপ মানস করিয়াছিলাম। সে আরোগ্য হইয়াছে; আমি তাহাকে এখানে আনিয়াছি; আপনি গ্রহণ করুন।" তদুত্তরে পাদরী বলেন "আমি ইহাকে গ্রহণ করিলাম।" গির্জ্জায় দীর্ঘকাল ধরিয়া সুগন্ধি ধূপ ধুনা ও বর্ত্তিকা প্রদান ও পূজা অর্চ্চনার 'পর বালকের মাতা প্রফুল্ল অন্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন—বালকও তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। পাদরী বলিলেন "ও কোথায় যাইবে, আমি যে উহাকে লইয়াছি, বালকটি যে আমার।" মহিলাটি বলিলেন "কিন্তু বাবা......" পাদরী বলিলেন "কিন্তু মা তোমার মানসিক কি ছিল?" মহিলাটি বলিলেন "ভাল, বালকটিকে ক্রয় করিয়া লইবার জন্য আমরা কোনও দ্রব্য আনিয়াছি।" "তোমরা যা এনেছ, সেটা কি?" "একটি ছাগ-শিশু।"

সপ্তগ্রাম মসজীদ (১৫২৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত)

তাহার মূল্য বালকের সমতুল্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল।

পর্ত্তুগীজেরা হুগলীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহাদের পূর্ব্ব-গৌরবের পুনরুদ্ধার হইল না। তাহাদের পতনের অব্যবহিত পরে ইংরাজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি যুরোপীয় জাতিরা বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আবির্ভূত হওয়ায়, তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। অনন্যোপায় হইয়া তাহারা দলে দলে মোগল সেনাভুক্ত হইতে লাগিল। অনেকে অন্যান্য যুরোপীয় জাতির কুঠীতে পাঁউরুটী, পনির, চাট্‌নি, মোরব্বা, সূতি ও পশমের মোজা প্রস্তুত করিয়া তাহার বিক্রয় লব্ধ অর্থে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিল। আবার অনেকে জীবিকার্জ্জনের জন্য কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে লাগিল। ঐতিহাসিক অর্মে (Orme) বলেন, বঙ্গের নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা অবরোধ কালে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে দুই সহস্র পর্ত্তুগীজ পুত্র-কলত্র লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তখনও হুগলীতে পর্ত্তুগীজের বাস ছিল। কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন কালে সিরাজউদ্দৌলা হুগলীর পর্ত্তুগীজগণের নিকট হইতে পাঁচ সহস্র মুদ্রা জরিমানা আদায় করেন। পর্ত্তুগীজেরা এদেশীয় নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া এক বর্ণসঙ্কর জাতির সৃষ্টি করে। হুগলীতে বর্ত্তমানে কোনও পর্ত্তুগীজের বাস নাই। তাহাদের বংশধরেরা এখন কলিকাতায় বহুবাজার, বৈঠকখানা ও তালতলা অঞ্চলে বসবাস করিয়া আছে। পর্ত্তুগীজ শক্তি লুপ্ত হইলেও পর্ত্তুগীজ ভাষা যুরোপীয় অন্যান্য জাতিগণের মধ্যে সাধারণ চলিত ভাষা রূপে পরবর্ত্তী কালেও অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দে একটি সর্ত্ত ছিল যে, ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণকে কর্ম্ম গ্রহণের এক বৎসর মধ্যে পর্ত্তুগীজ ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। প্রথম প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনরী কারনাণ্ডার্ সাহেব পর্ত্তুগীজ ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। ইংরাজী অপেক্ষা পর্ত্তুগীজ ভাষা তাঁহার নিকট সহজ-বোধ্য ছিল।

ব্যাণ্ডেল গির্জ্জা পর্ত্তুগীজদিগের শেষ স্মৃতি অদ্যাপি জাগরূক রাখিয়াছে। এই গির্জ্জাভ্যন্তরে "লেডী অফ্ দি রোজারী" ও অন্যান্য দেবী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। গির্জ্জার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উচ্চ চূড়ার পূর্ব্ব দিকে পূর্ব্বোক্ত মাতৃ-মূর্ত্তি (Lady of our Happy Voyage) স্থাপিতা হইয়াছেন। মাতৃ-মূর্ত্তি শিশু যিশুকে ক্রোড়ে করিয়া দণ্ডায়মানা আছেন। গির্জ্জা সংলগ্ন অনাথাশ্রম ও খৃষ্টীয় নান্ বা কুমারী তপস্বিনীগণের জন্য আশ্রম ছিল। সাও পোলো উদ্যানে জেসুটদিগের একটী কলেজও প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন কেবল মাত্র ব্যাণ্ডেল গির্জ্জাটি সংস্কৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। গির্জ্জাতে একজন "প্রায়র" (Prior) উপাধিধারী পাদরী থাকেন। তিনি মেলিয়াপুর ও গোয়ার প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যের অধীনে কার্য্য করেন। সম্রাট শাহজাঁহা প্রদত্ত ৭৭৭ বিঘা ভূমির মধ্যে বর্ত্তমানে ৫৮০ বিঘা জমি ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার অধীনে আছে। তাহার বার্ষিক আয় ১২৪০৲। শত বর্ষ পূর্ব্বেও ব্যাণ্ডেলে অনেক সুন্দর সুন্দর বাটী ছিল। কলিকাতা অঞ্চল হইতে এক জোয়ারে আসা যায় বলিয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেক কলিকাতাবাসী 'সপ্তাহ শেষ' (Week

সরস্বতী-তীর

end) এখানে অতিবাহিত করিয়া যাইতেন। এখন ব্যাণ্ডেল ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট জঙ্গলময় স্থানে পরিণত হইয়াছে।

পাদরী লং সাহেব এসিয়াটিকাসের (Asiaticus) লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া ব্যাণ্ডেলের দুর্নীতিপরায়ণতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"The lascivious damsels of this once gay city now slumber under its ruins, when pomp withdrew from hence, debauchery vanished, poverty now stalks over the ground. Where once beguiling priests led the unwary stranger in the morning to the altar of God, and in the evening to the chamber of riot ; regardless of their Sacredotal robes here Priests for gold were the Factors of Pleasure."

পর্ত্তুগীজরা পূর্ব্বে ধর্ম্মে, শৌর্য্য-বীর্য্যে, ধনে-মানে অদ্বিতীয় ছিল। তাহাদের পরাক্রম এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তাহাদের নামেই ভীতির সঞ্চার হইত ; কিন্তু কাল ক্রমে সকল সদ্‌গুণ বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা অধর্ম্মাচরণে, ব্যভিচারে ও সকল প্রকার পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত হইল ; এবং ক্রমে ক্রমে জগতের ঘৃণিত ও হেয় জাতি রূপে পরিণত হইল। পাপের ফলে আজ তাহাদের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত। ব্যাণ্ডেল গির্জ্জাটি মস্তকোত্তোলন করিয়া অতীত যুগের ও পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিতেছে মাত্র। তখন ব্যাণ্ডেলের পাদদেশ বিধৌত করিয়া যে ভাগীরথী প্রবাহিত হইত, এক দিন যে ভাগীরথী-তীর পঞ্চবিংশ সহস্রাধিক পর্ত্তুগীজ-সন্তানের কলরবে মুখরিত ছিল, এখনও সেই ভাগীরথী কুলকুল রবে সাগরোদ্দেশে সেই রূপই ছুটিয়াছে, নাই কেবল পর্ত্তুগীজেরা। অতীতের সাক্ষীস্বরূপ গির্জ্জাটি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গির্জ্জাটি যত দিন থাকিবে, তত দিন পর্ত্তুগীজদিগের স্মৃতি দেদীপ্যমান থাকিবে। গির্জ্জাটির সঙ্গে সঙ্গে পর্ত্তুগীজ স্মৃতি কালের অনন্ত গর্ভে একেবারে বিলীন হইয়া যাইবে।

মুক্তি-বাঁধন

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

যাই যবে স্নিগ্ধ শ্যামাঙ্গন ছাড়ি' তব—
হে আমার বঙ্গভূমি ! রূপ অভিনব,
ম্লান হ'য়ে আসে মম চোখে। বারবার—
তোমা লাগি' ঝরে মম নয়নের ধার ;
মাতৃহারা শিশুর মতন। ত্যজি' মান ;
বাঙ্গালার কিবা হিন্দু কিবা মুসলমান—
কাছে পেলে, আকড়িয়া বলি কাঁদি হাসি—
ভাই ভাই দুইজনে—মোরা বঙ্গবাসী !

সজল নয়নে চাহি একান্ত নীরবে,—
ছেড়ে যাই ভারতের উপকূল যবে,—
তালীবন-রেখাঙ্কিত দিগন্ত-সীমায়,
জননীর স্নেহাঞ্চল ধীরে মিশে যায়,—
অস্ত-রবি-রশ্মি সম। নীল সিন্ধুজল,
বিরহীর বেদনায় উথলে চঞ্চল ;

যদি পাই ভারতের হোক্ না মারাঠী
অথবা পাঠান, শিখ কিবা গুজরাটী—
সাধ যায়, কহিবারে হ'য়ে আগুয়ান ;—
ভাই ভাই মোরা সব ভারত-সন্তান।

দিবসের শ্রান্তি শেষে এক দিন যবে—
মুদিয়া আসিবে মম চোখ দু'টী ভবে !
গন্ধ, গান, রূপ, রস—এ বিশ্ব ধরার—
মুছে দিবে ঘনায়িত সন্ধ্যার আঁধার ;
যদি কারো সনে দেখা হয় লোকান্তরে—
হোক না জনম তার এসিয়ার 'পরে,
অথবা সে ইউরোপে ! ধনী কি নির্ধন,
শিশু, যুবা, কিম্বা বৃদ্ধ হোক না সেজন—
কোলাকুলি করি' তারে বলিব সম্ভাষি,—
বিশ্বমানবের ভাই—আমি বিশ্ববাসী !

নারী-প্রসঙ্গে ইস্‌লাম্

মুহম্মদ অব্‌দুল্লাহ

[বর্ত্তমানে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রধান সমস্যা হিন্দু-মুস্‌লিমের মিলন-সংঘটন। অন্যান্য কারণের মধ্যে, আমার মনে হয়, এই দুইটি সমাজের পরস্পর বিরোধিতার একটি প্রধান কারণ—পরস্পরের ধর্ম্ম ও সমাজের বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব। শুধু তাই নহে, নিজের-নিজের ধর্ম্মের সম্বন্ধেও সকলের পর্য্যাপ্ত জ্ঞান নাই। যদি বা হিন্দুর সে বিষয়ে কিছু সুবিধা আছে,—ধর্ম্মের প্রকৃত সত্য জানাইয়া দিবার জন্য বাংলার মুস্‌লিমের প্রায় কেহই নাই। যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য। তাহা ছাড়া, একদল লোক ধর্ম্মশিক্ষার নামে হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য অধর্ম্মই শিক্ষা দিয়া থাকেন। সেই কারণে আমি আমার অযোগ্য হস্তেই লেখনী ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, এই উপায়ে নিজের ক্ষুদ্র শক্তিমত সামান্য পরিমাণেও দেশ ও সমাজের সেবা করিতে সমর্থ হইব।—লেখক।]

"হে মানবগণ! তোমরা তোমাদের প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্যের বিষয়ে অবহিত হও, যিনি তোমাদিগকে একমাত্র সত্ত্ব হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও একই প্রকার হইতে ইহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই দুইটি হইতে বহু নরনারী বিস্তৃত করিয়াছেন;...এবং পরস্পর আত্মীয়তার সম্বন্ধের প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্যের বিষয়ে অবহিত হও (৪:১; ৫৩১, ৫৩২)"[১]। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, নারী পুরুষের সহজাত অর্দ্ধাংশ।

নারী ও পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে সৃষ্টিক্রিয়া হইতে যে সাদৃশ্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আছে, এবং একতর অন্যতরের সহিত তুলনায় যে কোনক্রমেই ছোট বা বড় নহে, এই বাক্যে তাহাই সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা আরও সপ্রমাণ হইতেছে যে, এই উভয়ের মধ্যে একজন অন্যের নিরপেক্ষ হইলে চলিতে পারে না; কারণ, বাহ্য আকৃতি দুইটি হইলেও মূল উদ্দেশ্য এক। উভয়েরই লক্ষ্য অভিন্ন, কিন্তু সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন গুণ, কার্য্য ও উপায়ের ভার গ্রহণ করিয়া উভয়েই নিজ-নিজ নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিয়াছে। তথাপি লক্ষ্য সাধনের পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য একে অপরের সহায়তা ব্যতীত কিছুই করিতে পারে না। এ বিধান শুধু মানবের জন্য নহে,—সমগ্র জীবজগৎ, উদ্ভিজ্জগৎ এবং প্রাকৃতিক জগতের জন্যই এই একই বিধান। তবে মানব বিবেক-সম্পন্ন জীব, তাহার জন্য এই বিধানের মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে।

সৃষ্টিকর্ত্তা নারী পুরুষের সৃষ্টির মধ্যে যে সাম্যের জ্ঞান

[১] মৌলবী মুহম্মদ্ অলীর (লাহোর) অনূদিত পবিত্র কুর্‌আনের ইংরাজী সংস্করণ।

ও নিদর্শন দিয়াছেন, সমাজ-জীবনে মানব-জাতি যদি সাধারণ ভাবে সেই জ্ঞান ও নিদর্শনের মূল্য ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিত, তবে মানব-সমাজে কোন দিন নারী ও পুরুষের মধ্যে সঙ্কোচ ও অবিশ্বাসের ফলে কোন রূপ অনাচার ও ব্যভিচার স্থান পাইত না। কিন্তু চিরকাল সমান যায় না। মানুষ শরীরী জীব, রক্ত-মাংসের দেহই তাহার প্রধান জ্ঞান ও সেবার বিষয়ীভূত। সেই দেহের বাহু শক্তিকেই সে শক্তি বলিয়া চিনিয়াছে; এবং সে শক্তি লাভ করিতে নারী অপেক্ষা পুরুষেরই সুযোগ অধিক। অধিক পরিমাণে বাহু শক্তি লাভ করিয়া নারী অপেক্ষা পুরুষ অধিক শক্তিমান্ হইল,—নারীও জ্ঞানের অল্পতাহেতু পুরুষের শক্তিমত্তা অস্বীকার করিতে পারিল না। সেই হইতে নারীর অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইতে লাগিল। কাজেই নারীর উপর পুরুষের অযথা কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকারও সেই সঙ্গে বাড়িতে লাগিল। তাহার ফলে নারী পুরুষের হাতের পুতুল, লালসার দাসী হইয়া পড়িল।

প্রাচীন যুগে পৃথিবীর প্রায় সকল অংশেই মানব-সমাজের অবস্থা এইরূপ ছিল। তবে কদাচিৎ কোন কোন সভ্য দেশের ইতিহাসে কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আংশিক ভাবে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। আমাদের প্রাচীন ভারত তাহার মধ্যে একটি।

জগতে মানব-সৃষ্টির আদিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম্মশিক্ষক সকল দেশে এবং সকল যুগে আবির্ভূত হইয়াছেন (২:১৩৬; ১৭৫)[১]। কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত নারীজাতির কল্যাণের ও উন্নতির জন্য কেহই আমাদের পক্ষে সন্তোষজনক সাম্যের বাণী শুনাইয়া যান নাই। সম্ভবতঃ তাহা এই কারণে যে, সে সকল যুগের মানব-সমাজের বুদ্ধি-বৃত্তি যথেষ্ট পরিপক্কতা লাভ করে নাই। যাহা হউক, সে অবস্থা চিরকাল টিকিতে পারিল না। প্রায় তের শতাব্দী পূর্ব্বে মানব-সমাজ হইতে অন্য সকল দোষের ন্যায় এই দোষটিও দূরীভূত করিবার ভার লইয়া আরবের প্রচণ্ড মরুভূমির মধ্যে এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষ এই সাম্য-বাণীর পতাকা হস্তে আবির্ভূত হইলেন। ইনি প্রেরিত মহাপুরুষ মুহম্মদ্—তাঁহার উপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হোক।

যে যুগে প্রেরিত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, সে যুগের আরব জাতির ইতিহাস একটু জানা আবশ্যক। সে কালে সমগ্র পৃথিবীর প্রায় সকল অংশই অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল। এ বিষয়ে আরবের অবস্থা ছিল আবার সকলের অগ্রগণ্য। ধর্ম্ম বলিয়া তখন আরব জাতির কোনই জ্ঞান ছিল না। তাহারা পাপময় হিংস্র জীবনকেই গৌরবময় মনে করিত। মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধবিগ্রহই ছিল তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রমোদের বিষয়। দেশে সম্পূর্ণ অরাজকতা বিদ্যমান ছিল। যে যতখানি দক্ষতার সহিত বর্শা চালাইতে পারিত, সেই তত অধিক সম্পত্তির অধিকার লাভ করিত (৫৪৪)[১]। একপ্রকার অশ্লীল প্রেমাত্মক কাব্য ব্যতীত তাহাদের মধ্যে প্রায় কোন প্রকার কলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শনের চর্চ্চা ছিল না। নারীর প্রতি তাহাদের যে ব্যবহার ছিল, তাহা আরও বীভৎস। নারী তাহাদের সম্ভোগের সামগ্রীতেই পরিণত হইয়াছিল। পিতার পরিত্যক্তা পত্নী (বিমাতা) ও ক্রীতদাসীদিগকে তাহারা অস্থাবর সম্পত্তির মতই ভাগ করিয়া লইত। এদেশে গঙ্গায় সন্তান নিক্ষেপের ন্যায় তাহারা অনেক সময় কন্যাদিগকে জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ করিত। এককালে তাহারা অনির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক পত্নী গ্রহণ করিতে পারিত। তাহা ছাড়া, কুলক্রোধের বশে শত্রু-নিধনের প্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে বংশানুক্রমে চলিয়া আসিত। বহুকাল হইতে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই, অনেক সংস্কারকও এই পরিবর্ত্তন ঘটাইতে গিয়া ব্যর্থ-প্রয়াস হইয়াছিলেন। কিন্তু এক দিন তাহাদের এই সমস্ত পাপের মাত্রা চরম সীমায় উপনীত হইল; অবস্থার পরিণতি দেখিয়া বিশ্বপ্রভু সমগ্র জগতের ধর্ম্ম ও সমাজের উপর প্রচণ্ড বিপ্লবের তরঙ্গ নিক্ষেপের জন্য একজন উপযুক্ত সংস্কারক প্রেরণ করিলেন।

প্রেরিত মহাপুরুষ মুহম্মদ্ নারীজাতির উন্নতির জন্য কি করিয়াছেন, সে বিষয়ে প্রথমে কয়েকজন বিখ্যাতনামা মুস্‌লিম্ ও অমুস্‌লিমের মত উদ্ধৃত করিব। স্বনামধন্যা মনস্বিনী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সিংহলে একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—"I wonder how many of the Christian ladies here today realise that the first status of houour, the first status of legal right and responsibility, was conferred

on woman by the Islamic Faith. How many of my own co-religionists, how many of the Buddhist people, how many of the Christian communities, understand that thirteen hundred years ago a Prophet rose and said: 'Chattel! Be thou woman and stand upright and face the sun!' That is a very different conception from what the (Christian) missionary writers give of the position of the Islamic womanhood."

"মানবজাতির ইতিহাসে ভ্রাতৃত্বের সম্মেলনে নারী এই প্রথম পুরুষের পার্শ্বস্থিত তাঁহার উপযুক্ত আসন লাভ করিলেন।"—মুহম্মদ অলা (লাহোর)।

"তেরশত বৎসর পূর্ব্বে মুহম্মদ্ মুস্‌লিম্‌দিগের মাতা, পত্নী ও কন্যাদিগকে যে মর্য্যাদা ও সম্মান দিয়া গিয়াছেন, প্রতীচ্যের আইনে আজ পর্য্যন্ত তাহা সাধারণ ভাবে নারীর প্রাপ্য হয় নাই।...নারী ও পুরুষের মধ্যে মুহম্মদ্ সম্পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।"—Pierre Carbites.

মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে নারী ও পুরুষের আসন পৃথক্ নহে। নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই সৎকার্য্যের অনুরূপ ফললাভ করিবে (৩৩:৩৫)[১]। কিন্তু শারীরিক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। সমাজ-জীবনেও তাহা কতক পরিমাণে আছে; এবং ইহা শুধু সাংসারিক কার্য্য ও কার্য্যক্ষেত্র লইয়া, যাহা নিতান্ত স্বাভাবিক ও যাহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। দৈহিক ব্যাপারে যে পার্থক্য আছে, তাহার ফলে কোন কোন বিশিষ্ট গুণের নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করে। নারী তাঁহার স্বভাবজাত দৈহিক সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তায় পুরুষকে পরাস্ত করেন, এবং পুরুষের দৈহিক গঠনের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার নিকট তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। নারীর ভরণ পোষণের ভার পুরুষকে বহন করিতে হয় এবং নারীও নিজের পালামত অন্য ভাবে তাহার প্রতিদান দিয়া থাকেন। (২:২২৮; ২৯৭; ৪:৩৪; ৫৬৮)[১]।

ইস্‌লামে মাতা ও কন্যার সম্মান কিরূপে করা হইয়াছে তাহা দেখা যাক। গর্ভধারিণীই প্রকৃত মাতা। পুরুষগণের পক্ষে সৃষ্টিকর্ত্তার পরে মাতা অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মানের পাত্র আর কোন ব্যক্তিই নহে। অল্লাহ্‌র আদেশ ও উপদেশাদি লঙ্ঘন করিতে না হইলে মায়ের যে কোন আদেশ বা ইচ্ছা মানিয়া চলা প্রত্যেক পুরুষের কর্ত্তব্য। মাকে যে কতখানি গৌরব ও সম্মানের পাত্রী করা হইয়াছে, তাহা প্রেরিত মহাপুরুষের একটি প্রবচন হইতে বুঝা যাইবে। তিনি বলিয়াছেন, স্বর্গ তোমাদের মাতৃগণের চরণতলে অবস্থিত। জননী কেবল স্বর্গাদপি গরীয়সী নহেন, তাঁহার চরণ-যুগলেরই স্থান স্বর্গের মস্তকে। তাহা ছাড়া তিনি আরও বলিয়াছেন, যে স্বর্গে প্রবেশ করিতে চায়, তাহাকে তাহার মাতা ও পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। জননীকে যে সম্মানের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, পিতাও তাহা হইতে বঞ্চিত। ইস্‌লাম্ সর্ব্বত্রই নারীজাতির প্রতি এইরূপ সুবিচার করিয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বর্ব্বর আরবগণের মধ্যে অনেক সময় কন্যাদিগকে জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ করিবার নিষ্ঠুর প্রথা ছিল (৮১ :৮৯; ২৬৭৫)[১]। এরূপ কন্যা-হত্যার, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে পুত্রবলিরও, বর্ব্বর প্রথা শতবর্ষ পূর্ব্বেও আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। আরও কত দেশে ছিল, এবং আজ পর্য্যন্ত তাহা চলিতেছে কি না, তাহাও ঠিক করিয়া বলা যায় না। কিন্তু আরব্য সমাজে এই প্রথা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইলেও, প্রেরিত মহাপুরুষ স্বল্প-কালের মধ্যে, মাত্র তেইশটি বৎসরের প্রচারের ফলে এই বর্ব্বর প্রথা সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন আরব জাতির নিষ্ঠুরতাই গতি-পরিবর্ত্তন করিয়া জ্ঞানের আলোক পরিণত হইল; আরবগণ তখন অন্যান্য বহু দেশের আদর্শ-স্থানীয় হইয়া পড়িল। কন্যাদিগের সম্বন্ধে প্রেরিত মহাপুরুষ বহু প্রকারে আদেশ ও উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুইটি এ ক্ষেত্রে উদ্ধৃত হইল:—

(১) যাহার কন্যা আছে, সে যদি তাকে জীবন্ত সমাধি না করে, তিরস্কার না করে, অথবা অন্যান্য সন্তানগণের [অর্থাৎ পুত্রসন্তানগণের] প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে তবে অল্লাহ্ তাহাকে স্বর্গে স্থান দিবেন। (২) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ কি, তাহা কি আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিব না? ইহা তোমাদের স্বামি-পরিত্যক্তা কন্যার প্রতি সদয় ব্যবহার। তিনি তাঁহার কন্যা ফাতিমাকে বড় ভাল

াসিতেন,—কন্যা স্বামীগৃহ হইতে পিতৃগৃহে আসিলে তিনি কন্যার প্রত্যুদ্গমনের জন্য অগ্রসর হইতেন। কন্যাকে তিনি াদর্শ নারী রূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এ বিষয়ে Miss Grace Ellison লিখিয়াছেন, "স্ত্রী জাতির যাহা কিছু সত্য, সুন্দর ও পবিত্র, তাঁহার কন্যা 'স্বর্গের নারী' সে সকলের আদর্শ ছিলেন।"২

পুরুষ যেমন কোন আত্মীয় বা আত্মীয়ার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে, নারীর জন্যও সেই-রূপ ব্যবস্থা আছে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নারী ইচ্ছামত নিজের সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব বা তাহার ব্যবহার করিতে পারিবেন, তাহাতে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী বা পুত্র কাহারও কোন বাধা খাটিবে না। প্রাগ্-ইস্‌লামী যুগে আরবে বর্শা চালাইবার দক্ষতা-অনুসারে যে উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণীত হইত, এক্ষণে আর তাহা টিকিল না। (৫:৭; ৫৫৪)১

এইবার বিবাহ ও দাম্পত্য-জীবনের কিছু আলোচনা করিব। সামর্থ্য ও যোগ্যতার অভাব না হইলে, নারী হোক, পুরুষ হোক, প্রত্যেকেরই বিবাহ করা উচিত,—ইহাই পবিত্র কুর্‌আনের আদেশ (২৪:৩২ ; ১৭৫৩, ১৭৫৪)১। এবং প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, ইস্‌লামে সংসার-বৈরাগ্য নাই। বিবাহের প্রারম্ভ হইতে বিবাহিত জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই অধিকার সমান। ইস্‌লামে বিবাহ-ব্যাপারে অনাবশ্যক আড়ম্বর নাই। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই স্বেচ্ছায় বিবাহে নিজ নিজ মত দিতে পারিবে এবং তাহাদের মত ব্যতীত বিবাহ হইতে পারিবে না। এই মত-গ্রহণের জন্য কোনরূপ উৎপীড়ন করা চলিবে না। স্বামী বা স্ত্রীর জন্য উভয়েই ইচ্ছামত পুরুষ বা নারীকে পছন্দ করিয়া লইতে পারিবে। শুধু তাই নহে, প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, বর কন্যাকে বা কন্যা বরকে ব্যক্তিগত ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে যে, সে তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে কি না ; কারণ, (তিনি বলিয়াছেন,) তাহাতে দম্পতির ভবিষ্যৎ মনোমালিন্যের পথ রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। তবে তাহা কেবল স্পষ্ট ভাবেই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে ; সেজন্য গোপনে অযথা প্রেমালাপ করিবার কোন রূপ সুযোগ তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না।

কিন্তু যদি তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, তবে উভয় পক্ষের অভিভাবক দ্বারাই তাহারা বিবাহিত হইতে পারিবে। কিন্তু যদি সে বিবাহে বরের বা কন্যার অথবা উভয়েরই অমত থাকে, তবে বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর অবিলম্বে তাহার প্রতিবাদ করিলে সে বিবাহ অগ্রাহ্য হইতে পারিবে। এজন্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পরই তাহাদের বিবাহ হওয়া উচিত।

দুশ্চরিত্রতা বা ব্যভিচারের জন্য কেবল নারীকেই সমাজচ্যুত করা হইবে না, এজন্য লম্পট পুরুষও সমাজচ্যুত হইতে বাধ্য। এরূপ কোন পুরুষ বা নারী কোন নির্ম্মল-চরিত্র নারী বা পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিবে না, ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী নারীকেই বিবাহ করিতে পারে। (২৪:৩ ; ১৭৩৭)১। ইহা ছাড়া কেহই কোন সচ্চরিত্রা নারীর নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিতে পারে না। যে কেহ তাহা করিবে সে অল্লাহ্‌র অভিশপ্ত (২৪:২৩-২৬ ; ১৭৪৬)১। এই ব্যবস্থা যদি কার্য্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে সমাজের বিশ্রী কলঙ্ক-কালিমা মুছিয়া যাইতে পারে।

বিবাহের জন্য একমাত্র সর্ত্ত আছে,—স্ত্রীধন বা যৌতুকের ব্যবস্থা। ইহা স্ত্রীর প্রাপ্য। নগদে বা ঋণ-স্বরূপে, যে প্রকারেই হোক ইহার ব্যবস্থা না হইলে বিবাহ হইতে পারে না। (৪:৪)১। সাধারণতঃ স্ত্রীকে স্বামীর সমান অবস্থায় তুলিয়া লইবার জন্য ইহার ব্যবস্থা আছে (৫৩৭)১। এই সম্পত্তির উপর স্ত্রীরই একমাত্র অধিকার, স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে স্বামীও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

"নারীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে" (৪:১৯)১, ইহাই পবিত্র কুর্‌আনের আদেশ। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, অল্লাহ্‌ নারীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা আমাদের মাতা, কন্যা ও মাসী (বা, পিসী)। যে সকল পুরুষ তাহাদের স্ত্রীগণকে প্রহার করে, তাহারা ভাল ব্যবহার করে না। যে নারীকে বিপথে যাইতে শিক্ষা দেয়, সে আমার পথের পথিক নহে। ইহা সমগ্র নারী-জাতির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। কিন্তু দাম্পত্য-জীবনে পবিত্র

২ Harem, Purdah or Seclusion by M. H. Kidwai.

কুর্আনের বাণী ও প্রেরিত মহাপুরুষের প্রবচন হইতে আমরা কি কি আদেশ ও উপদেশ লাভ করিতে পারি, তাহা দেখা যাক। দাম্পত্য-জীবনে পশুর ও মানুষের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। মানব শুধু প্রকৃতির বিধান অনুসারে নূতন জীবের সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, সে আত্মার খাদ্যরূপে আরও কিছু আশা করে। মহাজ্ঞানী বিশ্বস্রষ্টাও তাহার এই সঙ্গত বাসনা পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে জ্ঞান ও প্রেমের মহিমা দ্বারা স্বকীয় নিদর্শন স্থাপন করিয়াছেন। "তাঁহার একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদিগ হইতেই তোমাদের জন্য সঙ্গিনীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা তাহাদের মধ্যে হৃদয়ের শান্তি লাভ করিতে পার, এবং তিনি তোমাদের উভয়ের মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতির সৃষ্টি করিয়াছেন; নিশ্চিতই যে জাতি চিন্তা করিয়া থাকে, তাহাদের জন্য ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে" (৩০:২১)[১]। ইস্লামে দাম্পত্য-বন্ধন শান্তি, প্রীতি ও সহানুভূতির বন্ধন। যে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এই বন্ধনের অভাব, তাহার মধ্যে প্রাণ নাই এবং দম্পতি রূপে তাহাদের কোনই মূল্য ও মর্য্যাদা নাই। এরূপ দম্পতি আত্মা-বিহীন দেহের ন্যায়। তাহা দ্বারা সমাজ-শরীরের পুষ্টি হয় না, ক্ষয়ই হইয়া থাকে।

স্বামীর কার্য্যক্ষেত্র সাধারণতঃ গৃহের বাহিরে,—স্ত্রীর তাহার ভিতরে। সুতরাং একে অপরের অপেক্ষা রাখিতে বাধ্য। স্বামী যেমন স্ত্রীর নিকট শান্তি ও প্রেমের আশা করে, স্বামীর নিকট স্ত্রীরও সেরূপ আশা থাকে। পবিত্র কুর্আনে উক্ত হইয়াছে, "তাহারা [স্ত্রীরা] তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ" (২:১৮৭)[১]। পরিচ্ছদ আবরণের কাজ করে, লজ্জা নিবারণ করে ও শীতাদির কষ্ট দূর করিয়া থাকে। সেইরূপ পরস্পরের দোষ ও লজ্জা নিবারণ করা এবং প্রীতি ও সহানুভূতি দ্বারা হৃদয়ের শান্তি বিধান করা স্বামি-স্ত্রীর কর্ত্তব্য। উভয়েরই অধিকার সমান, তাই নারীর সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রেরিত মহাপুরুষ উপদেশ দিয়াছেন, 'নারীদিগের অধিকার পবিত্র; দেখিও যেন নারীগণের নির্দ্ধারিত অধিকারে তাহাদিগকে রক্ষা করা হয়।

তার পর গার্হস্থ্য জীবনের কথা। স্বামি-গৃহে নারী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী,—ইহাই এ বিষয়ে প্রেরিত মহাপুরুষের মত। গৃহের যাহা কিছু ব্যাপার, সে সকলেরই তত্ত্বাবধান করিবেন গৃহিণী। ইহা অবশ্যই শুধু রান্নাশাল বা ঢেঁকিশালের কাজ নহে, অনেক ক্ষেত্রে এক-একটি পরিবারের যাবতীয় ব্যাপার বেশ একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অনুরূপ। সকল দিক্ বজায় রাখিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করা কম ক্ষমতার কাজ নহে, এবং তাহাতে সম্মানের মাত্রাও সামান্য নহে। গৃহের কর্ত্রীর উপরই অন্তঃপুরের সকল কাজের ভার থাকে, গৃহ-স্বামী সেখানে কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকারী নহেন। কিন্তু সকল গৃহিণীর যোগ্যতা সমান নহে; এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে অনেকেরই ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। তখন স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত না হইয়া কোমল ভাবে সদুপদেশ দেওয়াই স্বামীর কর্ত্তব্য। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন:—(১) তোমার স্ত্রীকে সদুপদেশ দিবে। যদি তাহার মধ্যে সদ্গুণ থাকে, সে অবিলম্বে তাহা গ্রহণ করিবে এবং অনাবশ্যক কথা বলা ছাড়িয়া দিবে, এবং তোমার সুশীলা পত্নীকে ক্রীতদাসের ন্যায় প্রহার করিও না। (২) সেই সকলের চেয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত মুস্লিম্, যাহার প্রকৃতি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আর তোমাদের মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যাহারা তাহাদের স্ত্রীর প্রতি শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করে। (৩) অল্লাহ্ ও তাঁহার সৃষ্টির সমক্ষে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যাহারা তাহাদের পরিজনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এ সকল ছাড়া স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের কর্ত্তব্যের বিষয়ে আরও অনেক উপদেশ আছে। সে বিষয়ে প্রেরিত মহাপুরুষের কয়েকটি প্রবচন উদ্ধৃত হইল:—(১) মুস্লিম্ তাহার স্ত্রীকে ঘৃণা করিতে পারিবে না; যদি সে তাহার একটি অসদ্গুণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে সে যেন তাহার একটি সদ্গুণ দেখিয়া সন্তোষ লাভ করে। (২) সেই আদর্শ স্ত্রী যে, যখন তুমি তাহার দিকে তাকাও, তোমাকে সন্তুষ্ট করে; যখন তুমি তাহার প্রতি আদেশ কর, তাহা পালন করে; এবং তোমার প্রবাসের সময় নিজের সম্মান ও তোমার সম্পত্তি রক্ষা করে। (৩) স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকারের বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, যখন তুমি নিজে আহার করিবে, তখন তাহাকেও আহার করাইবে; যখন তুমি নিজে পরিধানের জন্য বস্ত্র ব্যবহার করিবে, তাহাকেও পরিধানের জন্য বস্ত্র দিবে; তাহার মুখে চপেটাঘাত করিতে, এমন কি তাঁহাকে কটু কথা বলিতেও বিরত

থাকিবে; আর বাড়ীর মধ্যে ছাড়া তোমার স্ত্রী হইতে পৃথক্ থাকিবে না। (৪) তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি ব্যবহারের বিষয়ে অল্লাহ্‌কে ভয় করিবে, কারণ তাহারা তোমাদের সহায়ক; অল্লাহ্‌র অভয় দিয়া তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ, আর অল্লাহ্‌র বাণী দ্বারাই তাহাদিগকে বৈধ করিয়াছ। (৫) তোমাদের স্ত্রীদের সহিত সদ্বিষয়ে পরামর্শ করিবে, কারণ তাহারা তোমাদের সাহায্যকারী। নারীর মূল্য নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন:—(১) পৃথিবী ও তাহার মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুই মূল্যবান্, কিন্তু পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যে পুণ্যবতী নারীর মূল্যই সকলের চেয়ে বেশী। (২) গুণবতী স্ত্রী মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্।

মুস্‌লিমের অন্দর-মহল হরেম বলিয়া পরিচিত। ইহার অর্থ, যাহাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। এ সম্বন্ধে Von Hammerএর মত একটু উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, "হরেম পবিত্র স্থান; অভ্যাগতগণের ইহাতে প্রবেশাধিকার নাই। এবং তাহা যে নারীর প্রতি অবিশ্বাসের কারণে তাহা নহে, বরং তাহার রীতিনীতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য। উচ্চ এশিয়া ও ইয়োরোপে (মুস্‌লিম্ দেশসমূহে) নারীকে যেরূপ সম্মান দেওয়া হয় তাহাই এ কথার স্পষ্টতম প্রমাণ।"[২]

স্ত্রীকে প্রহার করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইস্‌লামের নামে অভিযোগ করা হয়। ইহা যে আদৌ সত্য নহে—উপরি-উদ্ধৃত প্রেরিত মহাপুরুষের কয়েকটি প্রবচন হইতে তাহা সহজেই সপ্রমাণ হইবে। তবে, যদি কোন স্ত্রী অন্যায় ভাবে স্বামীর অবাধ্য হইয়া কোন অসঙ্গত কার্য্যে লিপ্ত হয় বা তাহার প্রশ্রয় দেয়, তবে তাহা হইতে বিরত হইবার জন্য প্রথমে তাহাকে সদুপদেশ দিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে ফল না হইলে তার শয্যা ত্যাগ করা এবং তাহাও বিফল হইলে তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করাই বিধান। এই শাস্তির অর্থ,—লাঠি, ছড়ি, বা কিল, চড়, ঘুশির দ্বারা প্রহার করা নহে। দাঁতন-কাঠি বা তাহার অনুরূপ 'দণ্ডের' দ্বারা সামান্য আঘাত করিবার অনুমতি আছে। তথাপি কার্য্যতঃ ইহাও দমন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ফলতঃ, ইহার উদ্দেশ্য প্রহার করা নহে, স্ত্রীর হৃদয়ে আত্মাবমাননা বা আত্মনির্বেদ জাগানই ইহার আসল উদ্দেশ্য। এই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ব্যবস্থা সমাজের সেই স্তরের লোকের জন্য করা হইয়াছে, যে স্তরের লোক (বিচারশক্তি-বিহীন মস্তিষ্কের উত্তেজনার ফলে) কথায় কথায় স্ত্রীকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়। (৫৭২)[১]

পবিত্র কুর্‌আনে সন্তানের মাতার আকারে স্ত্রীকে এইরূপে তুলিত করা হইয়াছে—"তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের কৃষিক্ষেত্র" (২:২২৩)[১]। নারী যে কেবল পুরুষের সম্ভোগের পাত্রী নহেন, এবং পত্নীরূপে নারী যে সংসারক্ষেত্রে নিতান্ত গুরুতর দায়িত্ব লইয়া অবতীর্ণ হন, এই কথায় তাহাই সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। উদ্ভিদ্ যেমন ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াই নিরস্ত হয় না, নিজের পুষ্টির জন্যও ক্ষেত্রেরই উপর নির্ভর করিয়া থাকে, সেইরূপ শুধু সন্তান প্রসব করিলেই জননীর কর্ত্তব্য শেষ না, সন্তানের লালন-পালন ও চরিত্র-গঠনের ভারও তাঁহারই উপর ন্যস্ত থাকে (২৮৮)[১]। জননীর উপর এই মহৎ দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের বোঝা অর্পণ করিয়া পবিত্র কুর্‌আন্ নারীজাতিকে বিপুল সম্মান ও গৌরবে বিভূষিত করিয়াছেন। অধঃপতিত বাঙ্গালীর জননী এই গৌরবময় কর্ত্তব্য-পালনের মহিমায় মণ্ডিত হইয়া বীরপ্রসূ আখ্যা কত দিনে লাভ করিবেন?

এই প্রসঙ্গে বহু-বিবাহ অর্থাৎ এককালে পুরুষের একাধিক পত্নী গ্রহণের বিষয়ে কিছু বলা দরকার। পুরুষের পক্ষে এককালে একাধিক পত্নী গ্রহণের অনুমতি আছে, (অনেকের বিশ্বাসমত) আদেশ নহে। পুরুষ এককালে দুই, তিন বা চারিটী পর্য্যন্ত পত্নী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু বিনা সর্ত্তে নহে। (৪:৩)[১]। যুদ্ধবিগ্রহ বা ঐরূপ কোন বিশিষ্ট কারণে, বহু পুরুষের প্রাণনাশের ফলে, যদি সমাজের জনশক্তি নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া আশঙ্কা থাকে, অথবা সমাজের নৈতিক অধোগতির কারণ ঘটে, তবে এইরূপ বিবাহ বিহিত হইবে। বিগত মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপের সামাজিক অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল; এবং সেইজন্য ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে পুরুষদিগের একাধিক পত্নী গ্রহণের বিষয় লইয়া নানারূপ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তিন বৎসর যুদ্ধ হইবার পর দেখা যায়, জার্ম্মানীর প্রায় সাঁইত্রিশ লক্ষ ও ফ্রান্সের প্রায় বাইশ লক্ষ সৈন্যের প্রাণনাশ হইয়াছিল। তাহার ফলে ফ্রান্সের

অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, সকল নারীর বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রত্যেক পুরুষের ছয়টি করিয়া পত্নী গ্রহণ করা আবশ্যক। তাহার উপর লক্ষ লক্ষ আহত সৈন্য বিবাহের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। Professor Oldenbergএর মতে জার্মানীকেও এই কারণে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। জন্ম ও বিবাহের সংখ্যাও দ্রুত হ্রাস পাইতেছিল। (*The Herald*—July 28, 1917) ৩। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই বিবাহের ব্যবস্থা না হওয়ায় পাশ্চাত্য দেশসমূহে গণিকালয়ের সংখ্যা ও জঘন্য রোগের প্রসার অতিমাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কারণে তুরস্ক দেশও রুশীয় গণিকাদিগের লীলাক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছিল। আবার কিছু দিন পূর্ব্বে যখন তুরস্কে বহু-বিবাহ বন্ধের আইন প্রণয়ন করা হয়, তখন তথাকার দরিদ্র জনসাধারণ তাহার প্রতিবাদ করে। এই প্রতিবাদের কারণ বলিয়া তাহারা যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিল, তাহার আলোচনা করিলে এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যায়।

যাঁহারা আমাদের জননী ভগিনী, তাঁহারা যে বিবাহের পূর্ব্বেই সন্তানের জননী হইবেন, এই ধারণা প্রেরিত মহাপুরুষ কোন অবস্থাতেই পোষণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার যুগে আরবে বিবাহের নির্দ্দিষ্ট বিধান ও পত্নীর কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। কিন্তু তিনিই বিদ্রোহী হইয়া সেই সকল জঘন্য প্রথা রহিত করিয়া এই সংযত ও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন; একমাত্র পত্নী গ্রহণেরই তিনি বিধান দিয়াছিলেন,—তবে নিতান্ত প্রয়োজনের জন্যই শুধু বহু-বিবাহের অনুমতি মাত্র দিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে, যাহারা এককালে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে সকল স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার করিতে, এবং প্রত্যেকের জন্য পৃথক্ পৃথক্ আবাসের ব্যবস্থা করিতে, আদেশ দিয়াছেন। ইহা কেবল সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত,—পুরুষের স্বৈরাচারের প্রশ্রয়ের জন্য নহে। (৫৩৫ ; ৪: ১২৯)১। কিন্তু প্রতীচ্যে এক-বিবাহের নামে এই স্বৈরাচার গুপ্তভাবের ভান করিয়া বেশ চলিয়া আসিতেছে। তাই সে সকল দেশে 'অবিবাহিতা জননী'র সংখ্যা আদৌ বিরল নহে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক Schopenhauer বলেন, "There is no arguing about polygamy; it must be taken *de facto* existing everywhere, and the only question is as to how it shall be regulated." ৩ এক্ষেত্রে ইস্‌লামের মতই কি গ্রহণযোগ্য নহে?

বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষয়েও যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি। কারণ তাহাতেও নারী ও পুরুষের অধিকার কিরূপ তাহা জানা যাইবে। বিবাহ-বন্ধনের ন্যায় বিবাহ-বিচ্ছেদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য সৃষ্টির সহায়তা করা ও আত্মার তৃপ্তির জন্য হৃদয়ে শান্তি লাভ করা। যে মিলনে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাকে মিলনই বলা চলে না,—সে মিলনের কোনই মূল্য নাই। নৈতিক হিসাবে তাহাকে মিলন না বলিলেও, সামাজিক প্রথাকে একেবারে অমান্য করা যায় না। তাই যে ভাবে সমাজের বিধান অনুসারে মিলনের বন্ধন হইয়াছিল, মিলনের বিচ্ছেদের জন্যও সেই ভাবে তাহার মতে কাজ করা দরকার।

স্বামী বা স্ত্রীর ক্লৈব্য কিংবা মারাত্মক জঘন্য ব্যাধি থাকিলে (ইহা সুপ্রজননের ঘোর অন্তরায়), অথবা দম্পতির মধ্যে প্রকৃত মিলন সংঘটন অসম্ভব হইলে, প্রধানতঃ বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। এরূপ অবস্থায় সমাজের কল্যাণ এবং দম্পতির নৈতিক স্বাস্থ্য বিচার করিয়া দেখিলে ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যবস্থা কিছুই পাওয়া যায় না। এইরূপ গুরুতর কারণ না ঘটিলে, আজকালকার প্রতীচ্য খৃষ্টান সমাজের ন্যায় ইচ্ছামত কথায় কথায় বিবাহ বিচ্ছেদ করিবার কোন প্রকার বিধান নাই, এবং তাহা নিতান্ত গর্হিত ও জঘন্য রুচির পরিচায়ক। (২৯৭)১। এ বিষয়ে প্রেরিত মহাপুরুষের প্রবচন এইরূপ :—(১) যাহা বৈধ অথচ অল্লাহ্‌র অপ্রিয় তাহাই বিবাহ বিচ্ছেদ। (২) অল্লাহ্‌ পৃথিবীতে যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়া অপেক্ষা প্রিয়তর তাঁহার নিকট আর কিছুই নাই, এবং বিবাহ বিচ্ছেদ অপেক্ষা অপ্রিয়ও আর কিছুই নাই। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, নিতান্ত দায়ে না

৩ Polygamy by M. H. Kidwai,

পড়িলে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে না।

এই বিচ্ছেদ সহজে ঘটিতে পারে না। প্রথমে দুইবার অস্থায়ী বিচ্ছেদ হইবে এবং প্রত্যেক বারে দম্পতির পুনর্ম্মিলনের চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতেও যদি মিলন প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বিচ্ছেদের আকাঙ্ক্ষা আকস্মিক ক্রোধাদি উত্তেজনার ফল নহে। সুতরাং তৃতীয় বারে বাধ্য হইয়া স্থায়ী বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (২৯৮, ২৯৯)[১]।

উপযুক্ত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী করিতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই সমান অধিকার আছে। "নারীদের বিরুদ্ধে তোমাদের যে সমস্ত দাবী আছে, তোমাদের বিরুদ্ধেও তাহাদের ঠিক তেমনিই দাবী আছে" (২ : ২২০)[১]। স্বামীর ইচ্ছায় যদি বিচ্ছেদ হয়, তবে সে স্ত্রীকে যাহা কিছু দিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া লইতে, বা তাহার দেয় স্ত্রীধন না দিয়া স্ত্রীকে বিদায় করিতে পারে না। এবং স্ত্রীর পক্ষ হইতে বিচ্ছেদ ঘটিলে স্বামীর প্রদত্ত বা স্বামী হইতে প্রাপ্য যাহা কিছু সমস্তই সে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। বিদায়ের সময় পরিত্যক্তা স্ত্রীর প্রতি কোন রূপ অসদ্ব্যবহার করা চলিবে না, সদয় ভাবে বিদায় দিতে হইবে (২:২২৯)[১]। (বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান ও ব্যবস্থা—২:২২২-২৪২ ও সে সকল শ্লোকের টীকা)[১]।

ভারতীয় মুস্‌লিম্ সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা প্রতি লক্ষ লোকের মধ্যে একটি করিয়া। আফগানিস্তান ও তুরস্কের অবস্থাও এইরূপ। তবে আরব ও মিশরে কিছু বেশী।[৪]

স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে পুরুষ যেমন পুনর্বিবাহে অধিকারী, স্বামীর মৃত্যুতে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে নারীরও সেইরূপ অন্য পতি গ্রহণ করিবার অধিকার আছে (২:২৩৪ ; ৩১০)[১]। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু বা বিচ্ছেদের পর পুনর্বিবাহের নিমিত্ত নারীকে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য (সাধারণতঃ প্রথম কারণে চারি মাস দশ দিন ও দ্বিতীয় কারণে তিন মাস) অপেক্ষা করিতে হইবে (২:২৩৪ ; ৩০৯ ; ২:২২৮)[১]। স্ত্রী মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির নির্দ্দিষ্ট অংশের উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে না এবং স্ত্রীধনের প্রাপ্যও তাহাকে দেওয়া হইবে (৪:১২)[১]। স্বামীর মৃত্যু হইলে অথবা স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে প্রাপ্য স্ত্রীধন ছাড়া সেরূপ কারণ থাকিলে (২:২৪০ ; ৩১৭)[১] নির্দ্দিষ্ট কালের ভরণপোষণের জন্য নারী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অতিরিক্ত ব্যয় পাইতে পারিবে (২:২৪০, ২৪১ ; ৩১৭, ৩১৮)[১]। বিবাহাদি যে কোন মাঙ্গলিক ব্যাপারে বা উৎসবে ও ব্যসনে বিধবার স্পর্শ, উপস্থিতি প্রভৃতি আদৌ দোষাবহ নহে ;—ইস্‌লামে এরূপ কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। বস্তুতঃ বিধবা রূপে নারী কুমারী বা সধবা অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহেন,—ইহাই উদার ইস্‌লামের মত। এই সকল বিধান রীতিমত মানিয়া চলিলে, বাঙ্গালী সমাজের বিধবাগণের দুঃখময় জীবনের নিত্য অভিনয় দেখিবার যন্ত্রণা আর ভোগ করিতে হয় না।

নারীর জন্য কঠোর অবরোধ বা পর্দার অন্যায় ব্যবস্থা করিয়াছে বলিয়া ইস্‌লামের নামে কলঙ্ক আরোপ করা হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলে, আশা করি, সকলেই ইস্‌লামকে সেই অন্যায় কলঙ্কের হাত হইতে মুক্ত রাখিতে সচেষ্ট হইবেন। এ বিষয়ে সংক্ষেপে স্থূল বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

ইস্‌লাম্ পর্দা সম্বন্ধে যেরূপ মত দিয়াছে, ভারতবর্ষীয় মুস্‌লিম্ সমাজে, বিশেষতঃ বাংলার তথা কথিত 'শরীফ্' (সম্ভ্রান্ত) শ্রেণীর মধ্যে, পর্দার প্রচলন তাহা অপেক্ষা বহু পরিমাণে কঠোর। শয়্‌খ্ মুশীর্ হুসয়্‌ন্ কিদ্‌ৱাঈ সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তার মধ্যে তুরস্কের ধর্ম্মনেতা (শয়্‌খুল্ ইস্‌লাম্) মুসা কাযিম্ আফেন্দী ভারতীয় মুস্‌লিম্ সমাজের নারী অবরোধের অতিরিক্ত কঠোরতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। মুস্‌লিম্ সমাজের পর্দার কঠোরতা ভারতের ন্যায় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নাই।[১] যাহা হউক, পর্দার আবশ্যকতা আছে এবং তাহা নারীরই জন্য, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

যে কোন কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য নারী একাকিনীও গৃহের বাহিরে যাইতে পারিবেন। নারীর হাটবাজারে যাইবার অধিকারও ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, তোমাদের নারীদিগকে

মস্‌জিদে আসিতে বাধা দিও না। কিন্তু পরপুরুষকে দেখিয়া তাঁহাকে দৃষ্টি নত করিতে হইবে। (পুরুষও পরদার দেখিয়া দৃষ্টি নত করিতে বাধ্য)। পরপুরুষের সহিত অতিরিক্ত অবাধ সংমিশ্রণ নারীর পক্ষে শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। (১৭৫০, ১৭৫১)[১]।

বাহিরে যাইতে হইলে নারীকে তাঁহার অলঙ্কার সকল আবরণের মধ্যে রাখিতে হইবে এবং তিনি জোরে পা ঠুকিয়া চলিতে পারিবেন না। হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডল ব্যতীত শরীরের অন্য সকল অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতে হইবে এবং সেজন্য তাঁহাকে ওভারকোট, বোর্‌কো (চলিত কথায়, বোর্‌কা), বা সেইরূপ কোন পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইবে। বুক, মাথা, চুল ও কাণ যাহাতে ভাল রূপে ঢাকা থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (২৪: ৩১; ১৭৫১ক; ৩৩:৫৯; ২০১১)[১]।

বাহিরে যাইতে হইলে নারীর জন্য chaperonএর সাহায্য না হইলেও ক্ষতি নাই। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, যদি কোন নারী এক দিনের অধিক পথে যাত্রা করে, তবে তাহার কোন পুরুষ নিকট আত্মীয়ের (যাহার সহিত সকল অবস্থাতেই বিবাহ নিষিদ্ধ) সঙ্গে যাওয়া উচিত। এ ব্যবস্থা এইজন্য করা হইয়াছে যে, পথিমধ্যে রাত্রি যাপন করিতে হইলে একাকিনী অবস্থায় নারীর কষ্ট ও বিপদের সম্ভাবনা। প্রাচীনাগণের এ সকল বিধান মানিবার প্রয়োজন নাই।

সমাজ-জীবনে নারী সাধারণের কাজ করিবার অধিকার পাইয়াছেন, এবং সেজন্য তাঁহার বাহিরে যাইবার আবশ্যকতা আছে। প্রয়োজন হইলে নারী আদালত প্রভৃতিতে দাঁড়াইতে পারিবেন, তাঁহার সাক্ষ্যও অগ্রাহ্য হইবে না। সমাজে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় চুক্তিনামা ইত্যাদি লিখিত হয়, তাহাতেও নারীর সাক্ষী হইবার অধিকার আছে (২:২৮২, ৩৭৪)[১]। প্রয়োজনানুরূপ আবরণের মধ্যে থাকিয়া এই সকল কাজ করিলে বা সভাসমিতি ইত্যাদির যে কোন ন্যায়সঙ্গত কাজে যোগ দিলে কোনও আপত্তি হইতে পারিবে না।

ইহাই ইস্‌লামের পর্দার বিধান। ইহা অতি সুযুক্তি-পূর্ণ ও সুরুচিসম্পন্ন কি না, নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ তাহার বিচার করিবেন।

শিক্ষা সম্বন্ধেও নারীর অধিকার কোনও রূপে খর্ব্ব করা হয় নাই, শিক্ষায় নারী ও পুরুষের সমান অধিকার। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, নারী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মুস্‌লিমের শিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। গার্হস্থ্য জীবনে গৃহের কর্ত্রী রূপে ও সন্তানের মাতৃ রূপে নারীর উপর যে সকল দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের ভার অর্পণ করা হইয়াছে, তাহা পালন করিতে যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, সুশিক্ষা লাভে নারীর অধিকার কতখানি। আজকালকার মৃতপ্রায় মুস্‌লিম্ সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া মুস্‌লিমের উন্নতির যুগে বিশ্ব মুস্‌লিমের সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, মুস্‌লিম্ অঙ্গনাগণ কেবল গৃহকর্ম্মে স্বামীর সহায়তা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, জগতের সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, দর্শনের গৌরব ও সম্পদ্-বৃদ্ধিরও তাঁহারা সহায়তা করিতেন। এমন কি রণক্ষেত্র, রাজনীতিক্ষেত্র এবং বিচারক্ষেত্রের কার্য্যেও তাঁহাদের পারদর্শিতা অল্প ছিল না। ইস্‌লাম্ ধর্ম্ম যিনি সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করেন, তিনি একজন নারী,—প্রেরিত মহাপুরুষের পত্নী খদীজা। প্রেরিত মহাপুরুষের সমস্ত প্রবচনের প্রায় সিকি অংশের জন্য বিদুষী আরব-ললনা আয়েশা সমগ্র মুস্‌লিম-জগতের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্রী। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের আধুনিক রমণীগণের ন্যায় খৃষ্টান রমণীগণ পর্দায় অবরুদ্ধ থাকিতেন, যখন অজ্ঞানতার পর্দাসমূহ তাঁহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিত, যখন শুধু সন্তান-প্রসব ও আহার যোগান এবং পুরুষের দাসী হওয়াই তাঁহাদের কাজ ছিল, মূরীয় স্পেনের সাহিত্য তখন একটির পর একটি করিয়া এমন সকল নারীর নাম প্রকাশ করিত, যাঁহাদের মধ্যে দার্শনিক, কবি, গণিতজ্ঞ, জ্যোতিষী, এমন কি, ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের উদার মত সকলের উৎকৃষ্ট প্রচারকও ছিলেন।" এ সকল এখন কেবল গৌরবময় অতীতের দুঃখময় স্মৃতির আকারেই আমাদের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। বাঙ্গালার মুস্‌লিম্ নারীর (শুধু নারীর নহে, পুরুষেরও) অবস্থা আজ অজ্ঞানতার ঘোর তিমিরে আবৃত। পশ্চিম-ভারতের নারীর অবস্থা তার চেয়ে ঢের ভাল।
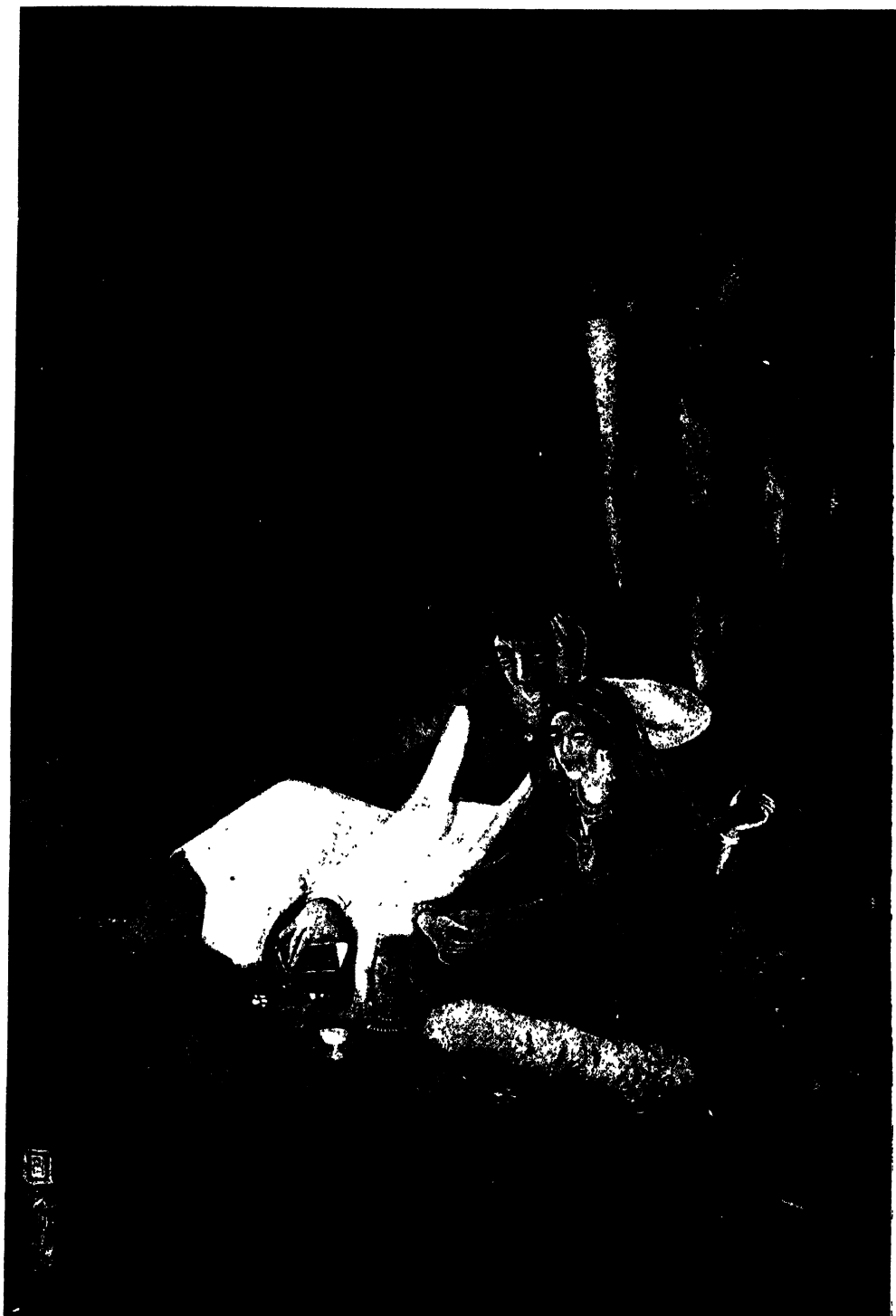
সেই নিরালা পাতায়-ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায় ; খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায় !
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু স্বর—; সেই তো সখি স্বপ্ন আমার সেই বনানী স্বর্গপুর !

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ওমর খৈয়াম—কান্তিচন্দ্র ঘোষ

এক্ষণে নারী-প্রসঙ্গে যাহা বলা হইল, তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ :—ইস্‌লামে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহ, দাম্পত্য-জীবন, পুনর্বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে নারীর জন্য পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। উত্তরাধিকারিত্বেও নারীর প্রাপ্য অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। শিক্ষালাভের বিষয়েও সেইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে নারী-পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার। মাতৃ-রূপে নারী পিতা অপেক্ষা অধিক সম্মান ও গৌরবের পাত্রী। গৃহই নারীর প্রধান কার্য্যক্ষেত্র হইলেও, বহির্জগতের সহিত সম্পর্ক রাখা এবং প্রয়োজন হইলে যে কোন কর্ত্তব্য কার্য্যে লিপ্ত হওয়া ও পরপুরুষের সহিত কথাবার্ত্তা কহা নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। নারীর পর্দা সম্বন্ধে অযথা কঠোরতা নাই। নারীর ন্যায্য অধিকারে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। পুরুষের ন্যায় নারী ভাল-মন্দ বিবেচনা করিয়া ইচ্ছামত সকল কার্য্য করিবার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন। ইস্‌লামে নারী পুরুষের দাসী নহেন, উপযুক্ত সঙ্গিনী ও সহায় বা বন্ধু। এক কথায়, সুরুচি, সুবিচার ও সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ইসলামের শাস্ত্র নারীর জন্য সকল বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করিয়াছেন এবং কোন অবস্থায়ই নারীর মর্য্যাদা, গৌরব ও সম্মান এবং স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা কোনক্রমে ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

হিন্দুর বর্ত্তমান অবস্থা

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল্

হিন্দুসমাজে এমন সব লোক আছেন, যাঁরা মনে করেন যে, হিন্দু ধর্ম্ম সত্যসত্যই সনাতন। এটা তাঁদের কাছে একটা মামুলী কথামাত্র নয়; ইহা তাঁহারা প্রাণের সহিত বিশ্বাস করেন, এবং এই বিশ্বাস তাঁহাদের জীবনের মূলে নিহিত। তাঁরা সত্যসত্যই ভাবেন যে, যাহা সনাতন, তাহা নিশ্চয়ই সব চেয়ে সত্য; সুতরাং ধর্ম্ম সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা এবং শেষ কথা হিন্দু ধর্ম্মে বলা হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, নিজের ধর্ম্মের প্রতি এরূপ আস্থা এবং শ্রদ্ধা যে কেবল বিশ্বাসী হিন্দুরই আছে, এমন নয়; প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তিই নিজের ধর্ম্মের প্রতি এমনি আস্থাবান্। অবশ্যই ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সত্য যদি এক বই দুই না হয়, তাহা হইলে, এই প্রকার গাঢ় বিশ্বাসে বিশ্বাসীর প্রাণের আকুলতা যতটা প্রকাশ পায়, সত্যের জ্ঞান ততটা প্রকটিত হয় না। ধর্ম্মে ধর্ম্মে যেখানে পার্থক্য রহিয়াছে, সেখানে দুটাকেই সমান সত্য বলাও কঠিন, কোনও একটাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পৃথক্ করিয়া লওয়াও কম কঠিন নয়। এ সব ক্ষেত্রে একমাত্র মীমাংসা এই যে, "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—একই সত্যকেই নানা পণ্ডিত ব্যক্তি নানা ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহার সোজা অর্থ এই যে, সকল ধর্ম্মই প্রকৃত পক্ষে সমান সত্য; তবে, যে যেমন

কিন্তু এই মীমাংসায় একটু মুস্কিল এই যে, ইহাতে সকল ধর্ম্মকেই সনাতন বলা হয়। ধীর এবং শান্ত ভাবে বিচার করিবার সময়, এ কথাটা যে কেহ অস্বীকার করিবে, এমন মনে হয় না; কিন্তু ঝগড়ার বেলায় সকলেই যে যার নিজের ধর্ম্মকেই একমাত্র সত্য বলিয়া বাকীগুলিকে একেবারে জাহান্নমে যাইবার পথ ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে চাহিবে না। নিজের ধর্ম্মকে যখন সনাতন বলিয়া কেহ বড় গলায় ঘোষণা করিয়া থাকেন, তখন প্রকৃত পক্ষে তাঁহার মনে অন্য ধর্ম্মের প্রতি যে একটু অবহেলার ভাব থাকে না, এমন নয়। অথচ প্রকৃত পক্ষে এটা কিন্তু ভুল।

পরের ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করায় কোনও পুণ্য না থাকিলেও, নিজের ধর্ম্মে একান্ত আস্থাবান্ হওয়ায়ও কোন পাপ নাই। সুতরাং কোনও হিন্দু যদি বাস্তবিকই নিজের ধর্ম্মকে সনাতন মনে করে, তাহাতে তাহার কোন অপরাধ হয় না।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। যাহা কালে কালে ক্ষয় পায় তাহাকে সনাতন বলে না। খড়ের ঘর-খানা দু'বছরে বিনষ্ট হয়; পাকা বাড়ী একশ' বছরও টিঁকিতে পারে। আবার ভুবনেশ্বরের মন্দিরের হয় ত আরও হাজার বছরেও কিছু হইবে না। কিন্তু এক দিন

আয়ুর পরিমাণ এক না হইলেও, ইহারা সকলেই বিনশ্বর,—সনাতন কেহই নহে। হিন্দু ধর্ম্মকে যাঁরা সনাতন মনে করেন, তাঁরা কিন্তু একটা বিচারে ভুল করিয়া থাকেন। তাঁরা এক দিকে বলেন যে, উহা সনাতন ধর্ম্ম; আবার একই নিশ্বাসে বলিয়া থাকেন যে, কলিতে উহার একপাদমাত্র রহিয়াছে,—বাকি ত্রিপাদই অন্তর্হিত হইয়াছে! যাহা সনাতন, তাহা কি শুধু সত্য যুগেই থাকিবে, পরে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া একেবারে লয় প্রাপ্ত হইবে? তাহা হইলে, জগতে অসনাতন কোন্ জিনিসটী? কলির প্রভাবে যে সকল পাষণ্ডদের ধর্ম্মমত ক্রমশঃ সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে অভিভূত ও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, সেই সব ধর্ম্মমতকেও কি সনাতন বলা যায় না?

বিশ্বাস ও আন্বীক্ষিকী সব সময় হাত ধরাধরি করিয়া চলে না; বিশ্বাসীদের এরূপ যুক্তির ভুল মাঝে মাঝে হইয়াই থাকে। কিন্তু একটা অনুধাবনের বিষয় এই যে, এ ক্ষেত্রে এই ভুলের অর্দ্ধাঙ্গ একটী বিরাট সত্য! ধর্ম্মটাকে সনাতন মনে করা না করা লোকের ইচ্ছা; কিন্তু ধর্ম্মটার তথা ধর্ম্মীদের ক্ষয় যে বেশ দ্রুতই হইতেছে, তাহা সকলকেই মানিতে হইবে।

ধর্ম্মের ক্ষয় হয় দুই প্রকারে; ধর্ম্মীরা যখন ধর্ম্মান্তরের অনুসরণ করে, অন্যবিধ আচার-বিচার গ্রহণ করে, প্রচুর ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিতে থাকে, তখনই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় বলিয়া, পূর্ব্বতন ধর্ম্মের গ্লানি হয়। আবার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিয়াও, পূর্ব্বপুরুষদের ধর্ম্মকে একেবারে সনাতন বলিয়া কঠিন আলিঙ্গনে ধরিয়া থাকিয়াও, সংখ্যায় ইহারা ক্রমশঃ শূন্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে; ইহাতেও ধর্ম্মের লোপ হয়। কখনও বা এই উভয় প্রণালীই এক সঙ্গে কার্য্যকরী হইয়া থাকে। ভারতে যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে, তাহাও বোধ হয়, এই দুই উপায়েই হইয়াছে; অনেক স্থলে বৌদ্ধেরা হয় ত হিন্দু ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিয়াছে—অনেক স্থলে আবার হয় ত অত্যাচারে ইহারা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

হিন্দু ধর্ম্মকে যাঁরা সনাতন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা শুধু এইটাই বিশেষ করিয়া ভাবিয়া থাকেন যে, ম্লেচ্ছ ভাব, পাষণ্ড মত, নাস্তিক্যবাদ প্রভৃতি অসনাতন;—এখন যদিও ইহারা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং পূর্ব্বেও হয় ত ছিল, তথাপি এ সকল তেমন সত্য নয়; রাহুর গ্রাসের মত কখনও কখনও সনাতন ধর্ম্মের নির্ম্মল জ্যোতিঃ যদিও ম্লান করিয়া দিতে পারে, তথাপি দীর্ঘকাল উহাকে গ্রাস করিয়া থাকিতে পারিবে না। রোগের বিকারের মত এই সাময়িক উৎপাত এক দিন না এক দিন দূরীভূত হইবেই।

এমন আশা যুগে যুগে ধর্ম্ম-বিশ্বাসীরা করিয়া আসিয়াছে। ইহুদীরা করিয়াছে; যারা কল্কি-অবতারের আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, তারাও করে। কিন্তু এমন কি লক্ষণ দেখা যাইতেছে, যাহাতে এই প্রতীক্ষাকে বাতুলতা হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে?

পক্ষান্তরে, ইহা কি সত্য নয় যে, হিন্দু সংখ্যায় কমিতেছে? আর, ইহাও কি সত্য নয় যে, যারা এখনও হিন্দু আছে, তাদের মধ্যেও অনেকেই তথা-কথিত সনাতন ধর্ম্মের অনেক অংশই ছাঁটিয়া ফেলিতেছে?

সংখ্যায় ঠিক থাকিয়া কোনও সমাজ যদি দুই একটা আচার কিংবা বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াই ফেলে, তাহা হইলে, সনাতন-বাদীরা যতই আতঙ্কিত হউক না কেন, ক্ষতিটা খুব বেশী হয় না। রাহুগ্রস্ত শশীর মত সে সমাজ তখন ম্লান হইয়া পড়ে, কিংবা রাহু-মুক্ত চন্দ্রের মত আরও নির্ম্মল জ্যোতিঃ বিকীরণ করে,—সে সম্বন্ধে সকলের ঐকমত্য না হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সুতরাং ম্লেচ্ছভাবাপন্ন বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের প্রতি সকরুণ কটাক্ষপাত করিয়া মনু-পরাশরের দোহাই দিয়া সনাতনবাদীরা যতই স্তম্ভিত হউন না কেন, প্রকৃত পক্ষে ইহার চেয়ে গুরুতর ক্ষতি যে হিন্দু-সমাজের হইতেছে, সে বিষয়ে তাঁহারা অন্ধ। তাঁহারা ভয় পাইতেছেন,—বুঝি বা পিতৃ পিতামহদের আচার-অনুষ্ঠান সবই ক্রমশঃ লোপ পাইয়া যাইবে; এবং সেই আচারগুলি রক্ষা করিবার জন্য তাঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই বজ্র আটুনীর চেষ্টায় গেরো যে অনেক সময় ফস্কিয়া যাইতে পারে, সেদিকে তাঁদের লক্ষ্য নাই। প্রাচীন আচারগুলিকে সমাজে বদ্ধমূল করিতে গিয়া তাঁরা যে বহু লোককে সমাজের বাহিরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছেন, সেদিকে দৃষ্টি নাই। সমাজদেহ ক্রমশঃ যে ভাবে সঙ্কুচিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, এই সঙ্কোচন যদি অপ্রতিহত থাকিয়া যায়, তাহা হইলে অদূর-ভবিষ্যতে ইহার বিলোপও হইতে পারে।

হাজার সত্য হউক, সব চেয়ে সনাতন হউক, তথাপি কোন আচারকে যদি কেহ অনুসরণ না করে, তাহা হইলে, শুধুই তাহার সনাতনত্বের দোহাই দিলেই ত চলিবে না। আচার-বিশেষ পরিত্যাগ করিয়া লোক যদি ক্রমশঃই হিন্দু-সমাজের গণ্ডীর বাহিরে গিয়া পড়ে, তবে, এই বিরাট সনাতন সত্যের কি যে অবশিষ্ট থাকিবে, তা ত জানি না।

কিন্তু বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজের ইহাই ত একমাত্র ক্ষতি নয়। আস্তে আস্তে নানা কারণে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া কিম্বা সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অনেকে ত হিন্দু-সমাজ হইতে সরিয়া পড়িতেছেই; তা ছাড়া, যারা হিন্দু থাকিতেছে, তারাও যে সংখ্যায় দিন-দিন হ্রাস পাইতেছে! হিন্দুজাতি যে মরিতে বসিয়াছে, এই রব আজ অনেক দিন উঠিয়াছে। অথচ, এই সোজা সত্যটাও আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই; কেন না, হিন্দুধর্ম্ম যে সনাতন! বৃদ্ধি পাওয়াই মানব-সমাজের স্বাভাবিক রীতি। বৃদ্ধি না হইয়া জন্ম-মৃত্যু যদি সমান সমান থাকে, তাহা হইলেই চিন্তার বিষয় হয়। কিন্তু যেখানে জন্মের চেয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলে, সে সমাজ কত দিন সনাতনত্বের বড়াই করিবার জন্য জগতের বুকে দাঁড়াইয়া থাকিবে? অথচ, হিন্দু-সমাজের যে এই অবস্থাই ঘটিতেছে!

কিন্তু এইখানেই আমাদের দুঃখের কাহিনী শেষ হইল না। আমরা কেহ দুঃখ করিতেছি সংখ্যায় কমিতেছি বলিয়া, আবার কেহ দুঃখ করিতেছি, সনাতন আচার হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি বলিয়া। কিন্তু

আমরা যে উন্মূলিত বৃক্ষের ন্যায় ভিত্তিহীন হইয়া পড়িতেছি এবং পাদ-বিহীন ব্যক্তির ন্যায় পরের কাঁধে আশ্রয় লইতেছি, সে খবর আমাদের জানা আছে কি?

বর্ত্তমানে কেহ যদি সূর্য্যলোক কিংবা চন্দ্রলোক হইতে বাংলাদেশের হিন্দু-সমাজের উপর দৃষ্টিপাত করিত, তবে সে দেখিতে পাইত যে, ভূমি হইতে হিন্দু-সমাজের শিকড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ভূমি যারা চাষ করে, ভূমি হইতে যারা শস্য উৎপাদন করে, তাদের অধিকাংশই অসনাতন, অহিন্দু,—ভিন্ন ধর্ম্মের উপাসক। হিন্দুরা যে কোন দিন এ দেশের মাটী চাষ করিত না, এমন নয়; কিন্তু ভদ্রলোক হইবার আকাঙ্ক্ষা হিন্দুদের এত প্রবল যে, আয় অনেক কম হইলেও, অনেকেই ক্রমশঃ লাঙ্গল ছাড়িয়া কলম ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মাছ ধরা দীর্ঘকাল যাবৎ হিন্দু জেলেদেরই অনন্যসাধারণ উপজীবিকা ছিল। মাছ বিক্রয়ও তারাই করিত। মাছ বিক্রয়ের কাজটাতে ক্রমশঃ মুসলমানেরা প্রবেশ করিলেও, মাছধরার কাজটা এতকাল এক রকম জেলেদেরই হস্তগত ছিল। কিন্তু ভদ্র হইবার লালসা ইহাদিগকেও পরিত্যাগ করে নাই; সুতরাং ইহারাও ক্রমশঃ এই বৃত্তি পরিত্যাগ করিতেছে।

নৌকা বাহকের কাজটা কত দ্রুত হিন্দুদের হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে, তাহা সকলে লক্ষ্য করিয়াছেন কি না, জানি না; কিন্তু জলপথে পূর্ব্ববঙ্গের খালে, বিলে, যাদের চলা-ফেরা করিতে হয়, তাদের দৃষ্টি সেদিকে নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে।

এইরূপে আরও অনেক বৃত্তি এবং ব্যবসায়ই যে হিন্দুদের হাতছাড়া হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সকলগুলির নাম করিয়া তালিকা বড় করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এটা কে না জানে যে, যেসব হিন্দু এই সকল তথা-কথিত নীচ কর্ম্ম করিত, তারা, ভদ্রলোক হইবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া, অনেক সময় প্রয়োজন হইলে স্থান পরিত্যাগ করিয়া—এমন কি, উপাধি বদল করিয়াও—কর্ম্মান্তরে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে? যে নৌকা বাহিত, সে বর্ম্মন্ উপাধি গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রোচিত অসির বদলে কায়স্থোচিত মসী-বৃত্তি আরম্ভ করিতেছে। যে ভূমি চাষ করিত এবং 'দে' উপাধিতেই সন্তুষ্ট ছিল, সে এখন 'সরকার' কিংবা 'রায়' প্রভৃতি কাল্পনিক উচ্চ শ্রেণীর উপাধি ধারণ করিয়া চাকরীর উমেদার হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। যে মাঘের শীতকেও অগ্রাহ্য করিয়া গলাজলে নামিয়া মাছ ধরিত, তাহার সন্ততিরা আজ উচ্চবংশোদ্ভব বলিয়া হাকিম হইবার জন্য জোর দাবী করিতেছে। যাদের উপাধি তাদের বৃত্তির পরিচায়ক, তারা সে-সব উপাধি পরিত্যাগ করিয়া 'রায়', 'বিশ্বাস', 'মল্লিক', 'মজুমদার' প্রভৃতি সর্ব্বব্যাপক উপাধিতে ভূষিত হইয়া ভদ্র-শ্রেণীতে উন্নীত হইবার চেষ্টা করিতেছে।

ব্যক্তি বা শ্রেণী-বিশেষের উন্নতির পরিপন্থী কোন বিবেচক ব্যক্তিই হন না। কিন্তু এই তথা-কথিত উন্নতির মোহে হিন্দু-সমাজ যে জল হইতে নির্বাসিত এবং ভূমি হইতে বিচ্যুত হইতেছে, এই কথাটাই আমরা বলিতে চাহিতেছি। কেন যে হিন্দু-সমাজকে এই মোহ আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার বিচার স্বতন্ত্র; কিন্তু এটা যে একটা মোহ সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? দৃষ্টান্তস্থলে দেখান যাইতে পারে যে, মুসলমান-সমাজে এরূপ কোন মোহ নাই। তাদের ভিতর কোনও একটা কাজ করিয়া কেহ 'পতিত' হয় না; এবং সেই জন্যেই যে যে কাজের উপযুক্ত এবং যার যে কাজ করিবার সুবিধা আছে, সে সেই কাজেই ঢুকিয়া পড়ে। তাহার জন্য সময়ান্তরে ভদ্রলোক হইতেও তাহার কোন অসুবিধা হয় না।

হিন্দুর ছুঁৎমার্গ তাহার সমাজের এই অবস্থার জন্য দায়ী কি না, বিবেচনার বিষয়। কিন্তু কারণ যাহাই হউক না কেন, সনাতন ধর্ম্ম-বাদীদের মনে রাখা উচিত যে, এদেশের ভূমির সহিত হিন্দুর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কিছু নাই। সুতরাং আজ যদি প্রজা-জমিদারে বিলাতের মত কোন বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেটা প্রকারান্তরে হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষে পরিণত হইবে।

কেহ হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহাতে এমন আতঙ্কিত হইবার কি আছে? তাঁহাদের জানা উচিত যে, যে সমাজে 'ছোটলোক' নাই, সবই ভদ্রলোক, যে সমাজের লোক ভূমি চষে না, শারীরিক পরিশ্রমের কাজ কিছুই করিতে চায় না,—সে সমাজের সনাতনত্বে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। হিন্দুরা যদি সবই মসীজীবী ভদ্রলোক হইয়া যায়, আর লাঠি মারিবার সময় যদি অহিন্দুর সাহায্যই সর্ব্বদা লইতে হয়, তাহা হইলে হিন্দু-অহিন্দুর কলহ কোনও দিন উপস্থিত হইলে, হিন্দুর অবস্থা কি হইবে, তাহাও কি বলিয়া বুঝাইতে হইবে?

চাষীরা যদি খাজনা না দেয়, তবে, শুধু জমীদার মরিবে না, মরিবে হিন্দু; কুলি যদি মোট বইতে না চায়, অসুবিধা হইবে শুধু ভদ্রলোকের নয়, হিন্দুর। প্রজায় জমীদারে, কিংবা ভদ্রলোক ইতর লোকে কলহ যে কোন সমাজে ঘটিতে পারে; কিন্তু তাহাতে কোনও একটা শ্রেণীর যতই অসুবিধা হউক না কেন, ধর্ম্মবিশেষের তাহাতে হানি হয় না। বিলাতে যে শ্রমজীবীদের লড়াই চলিতেছে, সেটা খ্রীষ্টান অখ্রীষ্টানের লড়াই নয়; এক শ্রেণীর খ্রীষ্টান আর এক শ্রেণীর খ্রীষ্টানের বিরুদ্ধেই লড়িতেছে; কাহারও জয়-পরাজয়েই খৃষ্ট ধর্ম্মের বিশেষ কোন হানি হইবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু হিন্দু সমাজের অবস্থা স্বতন্ত্র। আজ যদি বাংলা দেশ হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠিয়া যায়, তাহা হইলে লোপ পাইবে এক শ্রেণীর হিন্দু; দেশের ভূমি যদি চাষীরই ষোল আনা সম্পত্তি হইয়া যায়, তাহা হইলে বিত্ত লোপ পাইবে হিন্দুর; এবং বর্ত্তমান অবস্থায়ও আত্মরক্ষায় অক্ষমতা যদি কোনও সমাজের আসিয়া থাকে, তবে, সে সমাজটী হিন্দুর।

সুতরাং বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজের অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছে এই যে, ইহাতে ছোটলোক কেহ থাকিতেছে না; ধর্ম্মান্তর কিংবা কর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া তাহারা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। ইহাদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ফলে, হিন্দুসমাজের যে ক্ষয় হইতেছে, তাহা সুস্পষ্ট; কিন্তু

কর্ম্মান্তর গ্রহণের ফলও প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষ ভাবে হানিজনক; কেন না, ইহাতে সমাজ ক্রমশঃ ভিত্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। ভূমির সহিত হিন্দুর সম্বন্ধ ক্রমশঃ দূর হইতে দূরতর হইয়া পড়িতেছে; এবং সমাজ রক্ষা করিবার জন্য আরও যে সব বৃত্তি এবং উপজীবিকার প্রয়োজন, যে সবও ক্রমশঃ হিন্দুর হাত হইতে সরিয়া যাইতেছে। যাঁরা ধর্ম্মটাকে সনাতন মনে করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নাক ডাকাইতেছেন, তাঁরা মনু পরাশরের বিধানগুলিকে যতই সনাতন মনে করুন না কেন, হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে, তাহার শক্তি কমিতেছে, বিত্ত কমিতেছে, জীবন-সংগ্রামের ক্ষমতা কমিতেছে এবং কালের করাল গ্রাস তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে। বর্ত্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনযন্ত্রের একটা চক্র আশ্রয় করিয়া সে বাঁচিয়া আছে; কিন্তু মানুষের সমাজে ভূমিকম্পের মত বিরাট আন্দোলন যে মাঝে মাঝে দেখা যায়, তারই একটা যদি কোন দিন এ দেশে আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মেরও একান্ত তিরোভাব, একেবারে কল্পনার বাহিরে নয়।

পতিতা-সমস্যা

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী, বি-এল্

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ও ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন মহাশয় পতিতা-সমস্যা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে আলোচনা আরম্ভ করেন। তাহার পর "ভারতবর্ষে" মহলানবিশ মহাশয় ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। নরেন্দ্রবাবু বলেন, বর্ত্তমানে পতিতার সংখ্যা যে ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে শীঘ্র যদি তাহাদের এই ক্রম বর্দ্ধনশীল অবস্থা বন্ধ করা না হয়—তবে সমাজের অশেষ অকল্যাণ হইবে। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে এই কার্য্য সম্ভব হইতে পারে, তিনি তাহার কোন পথ নির্দ্দেশ করেন নাই।

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন নরেন্দ্রবাবু অপেক্ষা আর একটু অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি সমাজ-সেবার (Social Service) দিক দিয়া, এই শ্রেণীর মধ্যে সেবার ভাব জাগ্রত করিয়া, ইহাদের আকাঙ্ক্ষা সাধু-পথে চালিত করিলে সুফল হইতে পারে বলিয়াছেন। ইহাতে বেশী সুফল আশা করা যায় না। কারণ, এই সমস্যার মূল কোথায়, তাহা সর্ব্বপ্রথমে জানা আবশ্যক। ইহার মূল কারণ বন্ধ করিতে পারিলে,—ইহাদের সংখ্যা আপনা-আপনি কমিয়া আসিবে বলিয়া মনে হয়। পতিতা-সমস্যার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, তাহার প্রসার বন্ধ করিবার জন্য কার্য্যকরী (Practical) উপায় অবলম্বন করিলে, একেবারে না হউক, অনেকটা পরিমাণে, আমরা সমাজের এই ব্যাধির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিব বলিয়া আশা করা যায়।

আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে কোন কার্য্যকরী পথ অবলম্বিত হয় নাই। য়ুরোপে বহু দিন হইতে এ বিষয়ে গবেষণা, আলোচনা প্রভৃতি চলিতেছে।

এ কার্য্যে হাত দিবার পূর্ব্বে য়ুরোপের আলোচনার ফলাফল আমাদের জানা আবশ্যক।

আমি সেই জন্য এই প্রবন্ধে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের বর্ত্তমানের অবস্থা মিলাইয়া, কি উপায়ে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে, সে সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলব।

পতিতা কত দিন হইতে সমাজে আছে, এ কথা সহজে কেহ বলিতে পারে না। তবে জার্ম্মানীর সুপ্রসিদ্ধ ধন-বিজ্ঞানবিদ্ এঙ্গেলস বলেন যে, পৃথিবীতে ধনবাদের প্রচলনের সহিত পতিতা-সমস্যার অঙ্গাঙ্গি ভাবে যোগ আছে। কারণ, পুরুষ নিজের সঞ্চিত ধনের উত্তরাধিকারীর জন্য নিজের পরিবার, বা জাতিগত স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, স্ত্রী জাতির উপর কঠোর আইন-কানুন লিপিবদ্ধ করিয়াছে। অথচ তাহার বহুদার-প্রবৃত্তি নিজের ভার্য্যার একনিষ্ঠ প্রেমে সংযত করিতে পারে নাই। ঘরের পবিত্রতা বজায় রাখিবার জন্য পুরুষ নারীর উপর কঠোর বিধি জারী করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার নিজের লালসা-তৃপ্তির জন্য সে বাহিরে নারীর অমর্য্যাদা করিয়াছে ও তাহাকে দূষিত বলিয়া সমাজের বাহিরে চিরদিন স্থান দিয়া আসিয়াছে।

সমাজে পতিতার উৎপত্তির ইহাই অন্যতম সমীচীন কারণ বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাড়া, জগতের প্রাচীন ধর্ম্মোপাসনার সহিত গণিকার সংস্রব ছিল। একমাত্র ইহুদী জাতির মধ্যে গণিকার প্রচলন ছিল না। তাহা বাদে মিশর, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, চালদিয়া এবং পারস্যের মন্দিরের সংস্রবে গণিকার স্থান ছিল। ভারতবর্ষের মন্দিরেও দেবদাসী থাকিত। বাইবেলের Old Testamentএ প্যালেষ্টাইন দেশে পতিতার বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত বর্ব্বর জাতি-গণের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষে অবাধ যৌন মিলনও জগতে 'পতিতা-নারী' সৃজনে সহায়তা করিয়াছে। কখনও কখনও তাহাকে ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে অঙ্গাঙ্গী ভাবে রাখা হইয়াছে, কখনও বা দেবসেবার দাসীরূপে সে মন্দিরে স্থান পাইয়াছে। সোলনের সময় গ্রীস দেশেই সর্ব্ব-প্রথমে পতিতাদের সংযত করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হয়। সোলনের বিধি জন-সাধারণের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই প্রণয়ন করা হয়। ইহাতে পতিতাদিগকে রাষ্ট্রীয় বিধির অধীন করিয়া কতকগুলি সরকারী পতিতা-গৃহ স্থাপন করা হয় এবং তাহাদিগকে নগরের অংশ বিশেষেই আবদ্ধ রাখা হয়।

বর্ত্তমান য়ুরোপে পতিতাদের নাম রেজেষ্টরী করিবার যে নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা সর্ব্ব প্রথমে রোমের গণতন্ত্রের সময়েই হয়। রোমকগণ পতিতাদের উপর খুব কড়া নজর রাখিতেন। প্রত্যেক পতিতাকে তাহার নাম রেজেষ্টরীর জন্য এডিলের (Ædiles) নিকট দরখাস্ত করিতে হইত এবং তথা হইতে তাহাদের পাশ লইতে হইত।

ইহার পর খৃষ্টীয় যুগ—ঈশার ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণ য়ুরোপীয় সমাজে বহুল প্রচার লাভ করে এবং সমাজ-পরিত্যক্তা এই নারীদের বিরুদ্ধে অনেক কঠোর আইন-কানুন তুলিয়া

দেওয়া হয়। ফ্লোরেন্টাস নামক জনৈক নাগরিক পতিতাদের উপর নির্দ্ধারিত জিজিয়া-কর নিজেই বহন করিতে স্বীকৃত হওয়ায়, রোম-সম্রাট থিউডিসিস পতিতা-কর উঠাইয়া দেন।

ইহার পর য়ুরোপের Chivalry বা বীর-যুগ। এই সময় ক্রুসেডের প্রেরণায় নর-নারী বীর ও ধর্ম্মভাব দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে, ও নারী জাতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হয়। নাগরিক ও ধর্ম্ম-যাজকদের সম্মিলিত চেষ্টায় য়ুরোপের সর্ব্বত্র পতিতাদের উদ্ধারের জন্য সাড়া পড়িয়া যায়—সমাজ-পরিত্যক্তা নারীদের জন্য উদ্ধারাশ্রম স্থাপিত হয়।

ইহার পর য়ুরোপের মধ্যযুগ। মধ্যযুগে য়ুরোপে জমীদার সম্প্রদায়ের প্রভাব সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠে, এবং ধনবাদের প্রতিষ্ঠার অবশ্যম্ভাবী অন্যান্য কুফলের সহিত পতিতার সংখ্যাও পুনরায় অবাধে বিস্তার লাভ করে।

তাহার পর য়ুরোপের গৌরবময় (Renaissance) নব-অভ্যুদয়ের যুগ। ঠিক এই সময়ে য়ুরোপে অতি ভয়াবহ মড়কের আকারে কুৎসিত ব্যাধি—উপদংশ রোগ দেখা দেয়। ১৫ শত খৃষ্টাব্দে ভিনিসের উপদংশের মড়ক হইতেই জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের নজর এ বিষয়ে খুব কড়া ভাবে পড়ে। এবং এই সময় পতিতাদের উচ্ছেদ-কল্পে য়ুরোপে নানা আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হয়। ১৫৬০ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের প্যারী নগরীতে এক আইন পাশ হয়। তাহাতে পতিতাদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নগর ছাড়িয়া যাইবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। ১৬৩৫ খৃঃ অব্দে প্যারী নগরীর আর এক আইনে এই ব্যবস্থা হয় যে, যাহারা নারীদের কুলত্যাগে সাহায্য করিবে, তাহাদের আজীবন জাহাজের লস্করের কাজ করিতে হইবে, ও ভ্রষ্টা নারীদের মাথা কামাইয়া নগর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে।

ইংলণ্ডে এই সময় পিউরিটান গোঁড়ামীর প্রভাব। ইংলণ্ডও এই সময় পতিতা নারীদের উপর কম নির্য্যাতন করে নাই। খৃষ্টীয় ১৬।১৭ শতাব্দী পর্য্যন্ত য়ুরোপ ও ইংলণ্ডে সমভাবে পতিতা-নির্য্যাতন চলিতে থাকে।

য়ুরোপে ১৭ শতাব্দীর শেষভাগে উপদংশ রোগের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ১৮ শতাব্দীতে পুরাতন রোমীয় প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন হয়। অর্থাৎ পতিতাদের উপর পুলিশের কড়া নজর পড়ে ও তাহাদের প্রত্যেককে নাম রেজেষ্টরী করিতে ও পাশ লইতে বাধ্য করা হয়।

১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত য়ুরোপ যে ভাবে এই সমস্যার সমাধান করিয়াছে, তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, পতিতার সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত সমাজে কুৎসিত ব্যাধির অসম্ভব প্রসারের জন্য জন-সমাজের দৃষ্টি এই দিকে পতিত হয়; ও তাঁহারা উঠিয়া-পড়িয়া, যাহাতে এই কুৎসিত ব্যাধি সমাজে প্রসার লাভ না করে, তাহার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করেন।

য়ুরোপের অভ্যুদয় যুগে শিক্ষার বহুল প্রচার হওয়াতে, জনসাধারণ ও দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তি সমবেত হইয়া ইহার নিবারণ-কল্পে উঠিয়া-পড়িয়া লাগে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ভারতবর্ষেও মন্দিরের সংস্রবেই সমাজে দেব-দাসীর আবির্ভাব হয়। কিন্তু নানা কারণে উহা অনেক দিন পর্য্যন্ত মন্দিরের চতুঃসীমানাতেই আবদ্ধ থাকে। পররাজ্য জয়, ধনবাদ ও ধনিক-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হওয়ার সহিত ক্রমে ক্রমে পতিতা ভারতবর্ষের সমাজে তাহার স্থান করিতে থাকে। কিন্তু কোন দিনই আমাদের দেশে পতিতা সমাজে এত ব্যাপক ভাবে দেখা দেয় নাই। মন্দিরের সংস্রবে যাহার জন্ম, তাহা অনেক দিন ধনীর বিলাস-উপকরণের সামিলই ছিল।

পতিতা—চতুঃষষ্টী কলাবিদ্যায় সুশিক্ষিতা ছিল। তাহার জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য কখনও সে দেহ বিক্রয় করিত না এবং সমাজে তাহার সম্মানের স্থান ছিল।

বৌদ্ধযুগে অম্বপালীর মত পতিতা নারী বুদ্ধদেবকে তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল এবং পাটলীপুত্রের পতিতারা বাৎস্যায়নের কামসূত্রের এক টীকা পর্য্যন্ত রচনা করিয়া-ছিল। বৌদ্ধযুগে অনেক পতিতা ভিক্ষুণী হইয়া অর্হতের সম্মান পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছে। তার পর যখন ভারতের গৌরব-রবিকে পরাধীনতার কালরাহু গ্রাস করিল—তখনও—মুসলমান রাজত্বের নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া পতিতা নারী—তয়ফা, মুজরাওয়ালী হইয়া ভারতের সঙ্গীত-ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। সে অবস্থাতেও তাহারা বিবাহ করিয়া সুমধুর দাম্পত্য-জীবন যাপন করিয়াছে। পতিতা নারী কচিৎ কোথাও বা একাধিক পুরুষের সংস্রবে আসিয়াছে; কিন্তু কখনও এক সময়ে একাধিক পুরুষের অঙ্ক-শায়িনী হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। এবং হইলেও তাহাদের সংখ্যা খুব অল্প ছিল।

মুসলমান আমলের অবসানের সময় য়ুরোপ হইতে ওলন্দাজ দিনেমার, ফরাসী ও ইংরেজ প্রভৃতি বণিকরা আগমন করে! তাহাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে বর্ত্তমানের পতিতা শ্রেণী জন্মগ্রহণ করে ও দিন দিন বাড়িতে থাকে। The English brought prostitution to India. "That was not specially the fault of the English."—said a Brahmin to Jules Bois—"it is the crime of your civilisation. We have never had prostitutes. I mean by that horrible word the brutalised servants of the gross desire of the passerby. We had and we have castes of singers and dancers who are married to trees—yes trees—by touching ceremonies which date from Vedic times; our priests bless them and receive much money from them. Kings have made them rich. They represent all the arts; they are the visible beauty of the Universe."

(Jules Bois—Visions de l' Inde, p. 55) quoted from Havelock Ellis—Part VI Page 235.

তাহার পূর্ব্বে আমাদের দেশে এ ব্যাধি ছিল না। বর্ত্তমান সময়ের পতিতা অর্থে—যাহারা দেহকে পণ্যে পরিণত করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে ও অর্থের বিনিময়ে একই সময়ে একাধিক পুরুষের নিকট আত্মদান করে। গত দেড় শত বৎসরের মধ্যে এই শ্রেণীর পতিতা এত বাড়িয়া চলিয়াছে যে, আজ তাহা প্রকৃতই ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। এবং এই গণিকাবৃত্তির প্রসারের সহিত সমাজে কুৎসিত ব্যাধিও কম প্রচার লাভ করে নাই। (Prostitution and Venereal diseases go hand in hand. Stop Prostitution and you shall have no venereal diseases—Iwan Block) আজ এই ক্রমবর্দ্ধনশীল পাতিত্যের কারণ কি? তিনটী কারণে নারী পতিতা হয়।

১। দারিদ্র্য।

২। সামাজিক নির্য্যাতন।

৩। অতিরিক্ত রিরংসা-প্রবৃত্তি।

দারিদ্র্যের জন্য ভারতবর্ষে পূর্ব্বে কোন দিনই নারী আত্মবিক্রয় করিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই; কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা করিতেছে। ইহার কারণ কি?

ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে লোকে গ্রামে থাকিত—নিজের দেশ ছাড়িয়া বাহির হইত না। সুতরাং তুলনামূলক জ্ঞান লাভের তাহার কোন সুযোগ ছিল না। ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের সহিত গ্রাম ভাঙ্গিয়া শহর গড়িয়া উঠিয়াছে, একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের শত দোষের মধ্যেও সমাজে নারীগণ সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত থাকিতেন ও নিজেদের হাজার অসন্তোষ চাপিয়াই রাখিতেন;—সংসারের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নিজের অভাব অভিযোগ ভাবিবার সময় পাইতেন না। কিন্তু আজ কাল তাহা হইতেছে না। আজ গ্রাম ভাঙ্গিয়া শহর গড়িয়া উঠায়, নারী তুলনামূলক জ্ঞান লাভের অধিকারিণী হইয়াছেন—নিজের দৈন্য আজ সহস্রফণা নাগের মত তাহার চিত্তকে অহর্নিশ দংশন করিতেছে।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের বাঁধন না থাকায় নারী আজ অনেকটা স্বাধীন হইয়াছে। বহু দিনের পরাধীন চিত্ত সদ্যোজাত স্বাধীনতাকে সংযত করিতে পারিতেছে না; কুলোকের প্রলোভনে পড়িয়া নারী কুলত্যাগ করিতেছে।

২। সামাজিক নির্য্যাতন—সামাজিক নির্য্যাতন নারীর প্রতি চিরদিনই সমভাবে আছে। পূর্ব্বে তাহা চাপা পড়িত, আজ তাহা হইতেছে না। সমাজে যাহা ইচ্ছা করিবার অধিকার পুরুষের আছে,—নারীর নাই। নারীর কখনও যদি পদস্খলন হয়, তবে আর সমাজে তাহার স্থান নাই,—বাধ্য হইয়াই নারী আজ পতিতা হইতেছে। পূর্ব্বে গ্রামে থাকার জন্য অনেক সময় ভ্রূণ হত্যা করিয়া বা পুরুষের রক্ষিতা হইয়া সে থাকিত,—আজ তার চিত্ত সমাজের নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সমাজের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায় (উচ্চ বর্ণের দেখাদেখি) সমাজে গোপন ব্যভিচার যে কি ভাবে প্রসারিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। গ্রামে যেখানে ভ্রূণ হত্যা করিয়া ধরা পড়িবার ভয় ছিল, সেখানে শহরে আসিবার সুবিধা থাকার জন্য নারী সহজেই এই পথে আসিতেছে। তাহা ছাড়া, পণ-প্রথার নিষ্ঠুর অত্যাচারে দুই তিনটি মেয়ের বিবাহ দিতে আজকাল বাঙ্গালী প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। অনেক স্থলে নারী মনোমত পতি লাভে বঞ্চিত হয়। যেন তেন প্রকারেন দুস্থ কন্যার পিতা কোন রকমে দায়-সারা ভাবে এই দায় হইতে উদ্ধার লাভ করিতে বাধ্য হয়। যেখানে দায়-সারা কাজ, সেখানে উভয় পক্ষের প্রীতি থাকিতেছে না। তার পর নববধূর ছোটখাট ত্রুটী ধরিয়া, কন্যার পিতার তত্ত্বের পরিমাণে হতাশ হইয়া, অনেক শাশুড়ী ননদ প্রভৃতি বধূর উপর নির্য্যাতন করিতেছে। সে নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া কুলোকের প্রলোভনে পড়িয়া নারী এই পথে আসিতেছে। এরূপ ঘটনাও নিত্য হইতেছে। বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্যা বহু পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার প্রতিকারের উপায় কি?

বাংলা দেশের প্রধানতঃ তিন চারিটি কেন্দ্র হইতে এই শ্রেণীর নারী কলিকাতায় আমদানী করা হয়।

যদি কলিকাতায় একটী কেন্দ্রীয় নারী-রক্ষা-সমিতি স্থাপন করিয়া ঐ সব স্থানে শাখা-সমিতি স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে এই পতনোন্মুখী নারীদের রক্ষার একটা ব্যবস্থা হইতে পারে। পতিতা-জীবনে অভ্যস্ত হইতে অন্ততঃ নারীদের ৩।৪ মাস সময় লাগে। ঐ সময় তাহাদের মনে অনুতাপ,—পুরুষের প্রতি অবিশ্বাস ও ভবিষ্যতের অন্ধকারময় জীবনের কথা ভাবিয়া হতাশে পরিপূর্ণ থাকে। এই সময় সহৃদয় ও নিঃস্বার্থ ব্যবহার করিয়া অনেককেই এই পথ হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইতে পারে।

এইখানে দুইটী ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৎসর খানেক হইল যশোর হইতে একটী স্ত্রীলোক (বিধবা) আসিয়া ইডেন হস্পিটালে প্রসব করেন। এই হতভাগিনী নারীকে কেবল সন্তানের দুধের জন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কোথাও আশ্রয় পাইলেন না, সমাজ এক বাক্যে তাঁহার দূষিত সংস্রব বর্জ্জন করিল। অনেকের নিকট পায়ে ধরিয়া রাঁধুনী হইবার জন্য কত অনুনয় করিলেন। যাহার জাতি গিয়াছে—তাহার হাতের জল অচল—কেমন করিয়া তাহাকে রাখা যায়। দাসী-বৃত্তিও তাঁহার জুটিল না। সেই সময় আমেরিকা হইতে টেলার-দম্পতী—Mr. ও Mrs. Taylor আমাদের দেশের পতিতা-সমস্যার আলোচনার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আশ্রয় দিতে চাহিলেন। কিন্তু এই নারী জীবনের শেষ অবলম্বন তাঁহার ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে চাহিলেন না। অবশেষে গত্যন্তর না দেখিয়া তিনি এই পথে আসিলেন। অথচ যে নরপশুর মোহে পড়িয়া আজ তাঁহার এই দুর্দ্দশা, সেই পিশাচ স্বচ্ছন্দে সমাজে বিচরণ করিতেছে। তাহার জাতিও যায় নাই। কুলশীল ও জাত্যাভিমান বজায় রাখিয়া সকলে অবাধে তাহার হাতের জল পান করিতেছে। এই তো সমাজ।

দুর্ব্বলের প্রতি—অসহায়ের প্রতি অত্যাচারই ইহার চিরন্তন প্রথা।

আর একটি ঘটনাও আমাদের জানা আছে। কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কন্যা বিপথগামিনী হয়। পিতা তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যান। মেয়েটি পুনরায় বিপথে চলিয়া আসে। পরে ঘৃণ্য জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া মেয়েটি পুনরায় ঘরে ফিরিয়া যায়। নানা কারণে পিতা আর তাহাকে আশ্রয় দেন না। মেয়েটির কোন সন্তানাদি না থাকায় বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতার জনৈক প্রসিদ্ধ ডাক্তারের অধীনে নার্স নিযুক্ত হইয়া সৎপথে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। পথভ্রষ্টা অনুতপ্তা নারীর বহু দৃষ্টান্ত খুঁজিলে পাওয়া যাইতে পারে। সমাজে ফিরিবার, এমন কি—সৎভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার সব পথ বন্ধ। এই সব স্ত্রীলোক অকথ্য মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বাঁচিয়া আছে। অথচ সমাজ কেবল ইহাদের বর্জ্জন করিয়া নিজের শুচিতা রক্ষা করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে।

এখন কথা এই—পতিতাদের নাম রেজেষ্টরী ও লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত কি না?

য়ুরোপের সর্ব্বত্র পতিতাদের বাধ্যতামূলক নাম রেজেষ্টরী ও লাইসেন্স গ্রহণের আইন আছে। নাম রেজেষ্টরী না করিয়া ও লাইসেন্স না লইয়া এই বৃত্তি অবলম্বন করিলে তাহাকে দণ্ড ভোগ করিতে হয়। আমার মতে এই প্রথার প্রচলন আবশ্যক। নাম রেজেষ্টরী করা দরকার এবং বিনা লাইসেন্সে এ বৃত্তি অবলম্বন করিলে তাহার শাস্তিও হওয়া উচিত। তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যার দিকে নজর থাকিবে ও কুৎসিত ব্যাধির প্রতিকারের উপায় করায়ত্ত হইয়া আসিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—পতিতাবৃত্তি ও কুৎসিত ব্যাধি এই পথের দুই যমজ সন্তান।

জার্ম্মানিতে কোন কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্তা স্ত্রীলোক এই ব্যবসা করিলে তাহাকে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের মত এই যে, একজন ব্যাধিগ্রস্তা স্ত্রীলোক তিন জন পুরুষে এই ব্যাধি সংক্রামিত করে। গত আদমশুমারীর রিপোর্টে কলিকাতায় পতিতা সংখ্যা পনের হাজার। অন্যূন পঁয়তাল্লিশ হাজার লোক প্রতি বৎসর এই রোগে এক কলিকাতাতেই আক্রান্ত হইতেছে। এই সব কুৎসিত ব্যাধির চিকিৎসা হয় না। প্রথমে লোকে হাতুড়ে, টোটকা প্রভৃতি করে। পরে পেটেন্ট ঔষধ খায়। ডাক্তার কবিরাজের কাছে কচিৎ কদাচিত যাহারা যায়, তাহাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নহে। এক মেয়ো হাসপাতালে out doorএ গত বৎসর ১২০০ লোক এই সব কুৎসিত ব্যাধির জন্য চিকিৎসিত হইয়াছিল।

তাহা হইলেই বুঝুন, এই ব্যাধি কিরূপ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে ও সমাজের অঙ্গে দুষ্টব্রণ রূপে দেখা দিয়াছে।

[illegible] পতিতাদের মধ্যে এই ব্যাধি [illegible] লাভ করিতে না পারে

য়ুরোপে সেজন্য নানা আইন-কানুন ও অসংখ্য উপায় অবলম্বিত হইতেছে।

নানা কারণে এদেশে সে সবের কোনটাই সম্ভবপর নহে। য়ুরোপের সর্ব্বত্রই পতিতাদের নিয়মিত ভাবে ডাক্তারের নিকট হাজির দিতে হয়। দূষিত রোগগ্রস্তা নারীকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়।

এই প্রথা এখানে অবলম্বন করিলে চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে। নীতিবাগীশেরা বলিবেন যে, রোগ সারাইয়া যদি তাহাদের কুৎসিত বৃত্তি অবলম্বনে সাহায্য করা হয়, তবে প্রকারান্তরে এই কুৎসিত কার্য্যে সহায়তা করা হইবে। বাহিরের যুক্তির দিক দিয়া এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া আর দশজনকে ব্যাধিগ্রস্ত করিতেছে, তাহা তো নিবারণ করিতে হইবে। একমাত্র সেই যদি তাহার কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিত, তবে কোন কথাই ছিল না। য়ুরোপে পুলিশের কড়া পাহারা এ বিষয়ে আছে সেই জন্য অনেক সময় জুলুম হয় এবং নিরপরাধিনীর উপর অত্যাচারও হয়।

আমাদের দেশে যদি কর্পোরেশন ও মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তবে এই সব কুৎসিত রোগের প্রসার অনেকটা বন্ধ করা যাইতে পারে।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে একটী বা দুইটী লেডী ডাক্তার নিযুক্ত করা উচিত। তাঁহারা ঐ সব স্থানে গিয়া এই সব কুৎসিত রোগের ভয়াবহ পরিণাম ইত্যাদি কথায় ও ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে বুঝাইয়া দিলে অনেকটা সুফলের আশা করা যায়। কারণ, একমাত্র শিক্ষা ব্যতীত লোককে কুপথ হইতে ফিরাইবার অন্য উপায় নাই।

এই সঙ্গে, যাহারা সৎপথে আসিতে চাহে, তাহাদের কার্য্যকরী স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের জন্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সম্প্রতি জনৈক ডাক্তার সদস্যের চেষ্টায় কলিকাতা কর্পোরেশন এই কার্য্যের জন্য দুইজন লেডী ডাক্তার নিযুক্ত করিতে সম্মত হইয়াছেন, ও একটী কুৎসিত ব্যাধির হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা চলিতেছে। বর্ত্তমানে আলিপুরে ঐ সব রোগের একটী পৃথক ওয়ার্ড আছে। তাহাতেই রোগী সংখ্যা ৮০।৯০ জন।

আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, পাপের প্রতি আমাদের বিদ্বেষ—পাপীর প্রতি নহে।

সহরের এই মোটামুটি ব্যবস্থা ছাড়া—গ্রামের দিকেও নজর দেও বিশেষ প্রয়োজন।

আমরা বাহির হইতে অবশ্য ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরে দিন দি মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিতেছি। তাহা খুবই সত্য; কিন্তু এ সব কালাজ্বর, ম্যালেরিয়ার আবরণ ভেদ করিয়া যদি দেখি, তবে কি দেখিতে পাই? গ্রামের শতকরা ৯৯ জন কৃষক কোন না কোন কুৎসি ব্যাধিগ্রস্ত। গ্রাম্য মেলায় গিয়া সস্তায় তাহারা এই রোগ কিনি আনে। দেশের যেখানে বড় বড় মেলা হয়, তাহার সঙ্গে পতিতাদে আমদানী করা হয়। সেই সব মেলায়—সোস্যাল সার্ভিস

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে লোক পাঠাইয়া বক্তৃতা ও ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে নিরক্ষর গ্রাম্য চাষাকে এই সব রোগের ভয়াবহ পরিণাম চোখে আঙুল দিয়া দেখান উচিত।

দিন দিন বাঙালী নির্বীর্য্য হইতেছে। কিছু দিন এই ভাবে চলিলে বাঙালীর অস্তিত্ব আর থাকিবে না। বহু গ্রাম শ্মশান হইয়াছে। যাহা আছে তাহাও হইতে বসিয়াছে। এখনও সময় আছে।

আমি যতদূর পারিয়াছি—সংক্ষেপে এই সমস্যার আলোচনা করিয়াছি। এদিকে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমার কথাগুলি দয়া করিয়া তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন—আমার কথা অতিরঞ্জিত কি না। এই সমস্যা আমাদের জাতির মরণ-বাঁচনের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে আর আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না।

হিন্দী ভাষা ও কবি-সমাদর

লেফ্‌টেনাণ্ট শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

গেল বছরের পৌষের "ভারতী"তে প্রকাশিত "হিন্দী সাহিত্য ও ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছিলাম, "হিন্দী ভাষায় কাব্যগ্রন্থ ও কবিতা অজস্র আছে। অনেক বড় বড় কবি বহু প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। নানা ছন্দের এত কবিতা বোধ হয় অন্য ভাষাতে কমই আছে। পূর্ব্বে কবিগণের সম্মান ও আদর যে কত বেশী ছিল, এবং লোকে যে তাদের কি শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌ত, তা জান্‌লে এ দেশকে শতমুখে প্রশংসা করতে হয়। রইস্ ও রাজাদের সভায় বরাবরই একজন করে প্রসিদ্ধ কবি থাকতেন। এক একটি নতুন ছন্দের জন্য একজন কবি ছত্রিশ লাখ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার পেয়েছেন।"......

হিন্দী ভাষার পুরানো ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে, কবিদের প্রতি জনসাধারণের অবিচলিত শ্রদ্ধা, অপরিসীম সমাদর ও অগাধ সহানুভূতি। দারিদ্র্য ও নানা প্রকারের সাংসারিক কষ্ট যাতে কবিকে না সইতে হয়, নিরুদ্বিগ্ন মনে যাতে তাঁরা কবিতা রচনা করতে পারেন, তার জন্য ধনী-গরীব সবাই মিলে নানা প্রকারের বন্দোবস্ত করত। এ কবি-সমাদর যেমনি অসীম ছিল তেমনি আন্তরিক ছিল।

হিন্দী ভাষার অতীত যুগ অত্যন্ত উজ্জ্বল ও গৌরবের ছিল। এক এক জন মহাকবি তাঁদের অমর কাব্যগ্রন্থ রচনা করে লোকের নিকট চির আদরণীয় হয়ে রয়েছেন।

কবিদের মধ্যে কবিবর ভূষণ সকলের চেয়ে বেশী সম্মান ও সমাদর পেয়েছিলেন। তিনি আওরঙ্গজেব বাদশার আমলের কবি। তাঁর অপূর্ব্ব কাব্যরচনা শক্তি দেখে তখনকার পণ্ডিতগণ তাঁকে কবিভূষণ উপাধি দিয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি এত বেশী লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁকে সবাই ভূষণ কবি বলে ডাকত। আসল নাম তাঁর এখনও অনাবিষ্কৃত। এঁরা ছিলেন চার ভাই—চিন্তামণি, ভূষণ, মতিরাম ও নীলকণ্ঠ। চারজনই অসাধারণ কবি ছিলেন; কিন্তু তার মধ্যে ভূষণ ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আওরঙ্গজেব বাদশার দরবারে থেকে তাঁকে কবিতা রচনা করতে হোতো। সেখানে তাঁর ভাই চিন্তামণিও থাকতেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব হিন্দু বিদ্বেষী হওয়ার দরুণ তিনি তাঁর সভা ত্যাগ করে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের সভা-কবি নিযুক্ত হন্। শিবাজী তাঁর কবিতা শুনে তাঁকে লক্ষ লক্ষ টাকা ও বহু জায়গীর দিয়েছিলেন। শিবাজীর দরবার থেকে বাড়ী ফিরবার সময় একবার ভূষণ বুন্দেলার মহারাজা ছত্রশালের বাড়ী গিয়েছিলেন। বহুমান-ভাজন ভূষণ কবির যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করে বিদায় দেওয়ার সময় মহারাজা কবির পাল্‌কীর দণ্ড নিজ স্কন্ধে ধারণ করেছিলেন। ভূষণ কবির রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্চে "ভূষণ হজারা" ও "ভূষণ উল্লাস" ইত্যাদি।

কবিবর হরিনাথ শাজাহান বাদশার অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। হরিনাথের কবিতা শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন এবং বহু ধন ও জায়গীর তাঁকে দান করে পুরস্কৃত করেছিলেন। শাজাহান বাদশা তাঁকে অনেকবার হাতী, ঘোড়া, পাল্কী ও রথ দান করেছিলেন। হরিনাথ যেমনি অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী কবি ছিলেন, তেমনি মহাপ্রাণ দাতা ছিলেন। একবার তিনি অম্বরের রাজা সেওয়ার মানসিংহকে কবিতা শুনিয়ে মহা খুশী করেছিলেন। পথে ফিরবার সময় এক গরীব ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হয়। সে একটী কবিতা মুখে মুখেই রচনা করে কবিকে শুনিয়ে বল্লে। রাজা মানসিংহ কবিকে এক লাখ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। কবি হাতীতে চড়ে যাচ্ছিলেন। গরীব ব্রাহ্মণের কবিতা শুনে তিনি তখনই হাতীর হাওদা থেকে নেমে, তাঁর সাথে যা ছিল, সব ঐ গরীব ব্রাহ্মণকে দান করে দিলেন, আর নিজে রিক্ত হস্তে বাড়ী ফিরে এলেন।

কবিবর গঙ্ আকবর বাদশার সময়ের কবি এবং রাজ দরবারে গঙ্ কবির প্রতিষ্ঠা ছিল। দেশের রাজা-রাজড়া ও ধনী ব্যক্তিগণের অনেকেই গঙ্ কবিকে কাব্য রচনার জন্য নানাপ্রকারের পুরস্কার দিয়েছিলেন।

আকবর বাদশার "নবরত্নে"র অন্যতম রত্ন নবাব আবদুল রহীম খান্‌খানা সাহেবের সঙ্গে গঙ্গ কবির গভীর সৌহার্দ্দ ছিল। রহীম নিজে একজন হিন্দী ভাষার বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা অতি উচ্চ ধরণের। সম্রাটের পরম প্রিয়, সাম্রাজ্যের একজন উচ্চ পদাধিকারী, দানবীর, ভক্ত, রসিক কবি রহীমের কীর্ত্তির কথা লোক-মুখে আজও শ্রদ্ধার সহিত বর্ণিত হয়ে থাকে। গঙ্ কবির কবিতা শুনে একবার রহীম এতই মুগ্ধ হন্ যে, তিনি তাঁকে ছত্রিশ লাখ টাকা দান করেছিলেন! এত বড় দান আর কোনো কবির ভাগ্যে জুটেছে বলে শোনা যায় নি।

পারসী ও আরবীর একটি শব্দ ব্যবহার না করে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল

হিন্দীতে তিনি অবাধে কবিতা রচনা করে যেতেন। তাঁর রচিত "রহীম সতসই" প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

কবি কেশোদাস হিন্দী ভাষার আর একজন মহাকবি ছিলেন। ওড়ছার মহারাজা রামসিংহ তাঁকে নিজের সভা-কবি নিযুক্ত করে-ছিলেন। মহারাজার ভাই ইন্দ্রজিৎ সিংহের সহিত কবির পরম মিত্রতা ছিল। মহারাজা বীরবল এঁর রচিত একটি কবিতা শুনে ছয় লাখ্ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। বীরবল নিজেও একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। কবিদের অনেকেই দেশবাসীগণের নানা প্রকার উপকার করবার চেষ্টাও করতেন। নরহরি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তখন আকবর বাদশা দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন। কয়েকটী ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সহরে কসাইরা অসংখ্য গো-বধ ক'রে, দেশের গোধন কমিয়ে দিচ্ছিল। একবার কসাইর হাত থেকে কোনো রকমে পালিয়ে একটি গাই কবি নরহরির বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেয়। গরুটির অবস্থা দেখে কবির খুব দয়া হোলো এবং দুঃখও হোলো। তিনি এক টুকরা কাগজে দু'লাইন এক কবিতা লিখে গরুর গলায় ঝুলিয়ে তাকে একেবারে আকবর বাদশার দরবারে হাজির করিলেন। বাদশা প্রকৃত ঘটনাটি জানতে পেরে এতই দুঃখিত হয়েছিলেন যে, তিনি গো-বধ-প্রথা একেবারে উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আওরঙ্গজেব বাদশার পুত্র শাহজাদা মুয়জ্জমের প্রিয় কবি ছিলেন আলম। ইনি নানা রকমের সমস্যা পুরণের কবিতা রচনা করতেন। একবার তাঁর মাথার পাগড়ীটি রং করবার জন্য, এক টুকরা কাগজে মুড়ে শেখ বলে এক রংওয়ালীর (হিন্দীতে বলে রংরেজিন) দোকানে পাঠিয়ে দেন। সেই পাগড়ী বাঁধা কাগজে কবি আলমের রচিত কবিতার একটি লাইন লেখা ছিল—অনেক চেষ্টা করেও তিনি ঐ কবিতার পরের লাইনটি লিখে কবিতার মিল করতে পারেন নি। শেখ পাগড়ীর মোড়ক খোলবার সময় ঐ কাগজ দেখলে এবং পরের লাইনটি তৎক্ষণাৎ রচনা করে আলমের লিখিত লাইনটির নীচেই লিখে দিলে। তার পর নূতন রংকরা পাগড়ী ঐ কাগজে মুড়ে কবির আলমের কাছে পাঠিয়ে দিলে। কবি পাগড়ী খোলবার সময় কাগজে দেখলেন যে, তাঁর সেই রচিত কবিতাটির এক লাইনের নীচেই কে আর এক লাইন লিখে কবিতার মিল ঠিক করে দিয়েছে।

তিনি শেখ রংরেজিনের দোকানে গিয়ে সব জান্তে পার্লেন এবং ভারী খুসী হয়ে পাগড়ী রং করার বাবদ এক আনা আর কবিতা-পুরণের জন্য এক হাজার টাকা শেখকে দান করে এলেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্টতা হোলো এবং অবশেষে তা বিবাহে পরিণত হোলো।

আলম-শেখ মিলিত হয়ে হিন্দীতে অনেক কবিতা রচনা করে গেছেন। একই কবিতা ভাগাভাগি করে দুজনেই লিখেছেন। দুজনের কবিতাই প্রেমের কথায় ভরপুর।

আলম-শেখের একটি ছেলে হয়েছিল—তার নাম রাখা হয় 'জাহান'। অপূর্ব্ব প্রতিভাময়ী কবি শেখের যেমনি অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি ছিল, তেমনি আশ্চর্য্য বাক্‌চাতুর্য্যও ছিল। একবার শাহজাদা মুয়জ্জম ব্যঙ্গ করে শেখের কাছে জিজ্ঞেস্ করেন,—"আলম কী আওরাত আজ হি হাঁয়?" উত্তরে শেখ বল্লেন, "জাহাপনাহ, জাহান্ কি মা ময় হিঁ হু।" শাহজাদার রসিকতা সেখানেই থেমে গিয়েছিল।

সুরদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি কবি ও অন্যান্য অনেক বিখ্যাত কবির কথা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখতে পারি নি। তাদের কথা বলতে গেলে একটি বড় প্রবন্ধও কুলোবে না।

হিন্দী কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে দেশবাসীর অপার আনন্দের ধারা বহুমুখী হয়ে বয়েছে—এ কথা ভাব্‌তে গেলে মন অপূর্ব্ব পুলকে ভরে উঠে। বারান্তরে আরো সর্ব্বজন-সমাদৃত হিন্দী কবির বিষয় উল্লেখ করা যাবে।

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩৩)

অঙ্কুশ দিনের দিন বেলা আটটার পর গগনভেদী হাহাকার ভেদ করে, মানবের দেহটী মাত্র নিয়ে যখন বাইরে আসা হ'ল,—সামনেই দেখি, আজিজ বজ্রাহতের মত নিস্পন্দ, নিষ্পলক দাঁড়িয়ে। সে আজ হিন্দু-মতে গঙ্গাস্নান ক'রে, শুচি হয়ে, নূতন একখানি নীল লুঙ্গী পরে', নূতন একখানি খানি রংয়ের উত্তরীয় মাত্র গায়ে দিয়ে, খালি পায়ে দাদাকে দেখবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এসেছিল। তার সেই লম্বা লম্বা চুল বেয়ে মুক্তাধারার মত জল ঝরছিল। অদূরেই তার ভিজে কাপড়, ভিজে ঝোলা—; আর তার ওপর তার ছোরাখানি পড়ে আছে দেখলুম আজিজকে দেখাচ্ছিল, যেন নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে প্রবেশে প্রস্তুত ইন্দ্রজিৎ।

তার ধীর গম্ভীর কণ্ঠ হতে বেরুল'—"উতারো!" শুনে সকলে চমকে গেল,—সকলে তারিণী জ্যেঠার দিকে চাইলে।

দীনু গাঙ্গুলী বললেন—"তারিণীর দিকে চাইছ কি, —গ্রামের মঙ্গলামঙ্গল ত' ওঁর একার নয়,—"তোলা মড়া" কি নাবাতে আছে!" নবীন বাবু বললেন—"তাতে এমন দোষটা কি,—লোকটা ওকে ভালবাসত',—একবার দেখতে ইচ্ছে করে; এই যে দূর থেকে যারা আনে, তাদের মাঝে মাঝে ত নাবাতেই হয়।" রাখাল রায় বললেন—"ওঃ—নবীন সিমলের বড় দপ্তরে চাকরী করে কি না!" সিদু ভট্‌চায্যি বললেন—"দূরে থেকে আসলে নাবায়—সেটা আমরাও জানিছে;—তারা নিজের গ্রামে নাবায় কি বল্‌তে পার?" নবীনবাবু বললেন—"যেখানেই নাবাক—কোন' গ্রাম ত' সেটা,—সে গ্রামেও লোক থাকে, তাদেরও ত' মঙ্গলামঙ্গল আছে।"

"ওঃ"—"ইস্‌" প্রভৃতি শব্দের মধ্যে আজিজ বজ্র-কঠিন কণ্ঠে বললে—"হাম্ দোস্তকো দেখেগা—উতারো!" সকলে চম্‌কে গেল। যারা কাঁধ দিয়েছিল তারা "এই রইল" যেই বলা, তারিণী জ্যেঠা তাড়াতাড়ি—"এই—এই,—এই রাস্তাটায়" বলতে না বলতেই, তারা দোরের পাশেই নাবিয়ে সরে দাঁড়াল';—আমি স্পর্শ করে রইলুম।

"দোস্ত!" বলেই আজিজ মানবের মুখের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পোড়লো। মিনিট খানেক তার দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থেকে বললে—"মেরে যানেসে আগর তোমারে হিন্দু লোগ্ তোমারা তজ্‌বিজ্ (যত্ন) না-করে—তোমকো নফরত্ (ঘৃণা) করে, ইস্ ডর্‌সে হম্ ধোখা খা গেয়া—তোমারে পাশ্ পঁউচ্ না সেকা; নহি তো জান্ দেনে জো তৈয়ার্ থা উস্‌কো কৌন্ রুখ্ সেক্‌তা! হম্‌কো মাফ করো, হম্ বড়া ধোকা খায়া। দোস্ত তুম্ হমারা জান্ বাঁচায়া, হাম্ একদফে হাজির ভি না হো সেকা,—হামারা কিস্‌মত্!" তার পর একটু থেমে বললে—"অচ্ছা আব্ এক বাত্ কহে যাও ভাই,—তুম্ যাঁহা চলে—হম্ উঁহা তুম্‌সে মিল্ সেকেগা?—উঁহা তো হিন্দু নেহি!—বোলো—বোলো দোস্ত্—তো হাম্"—বলিতে বলিতে কে যেন তাহাকে বাধা দিলে, সে হতাশ ভাবে বললে,—"লেকিন্ তুম্ হাম্‌কো কহা থা—'হমারা দোস্ত্ না-মরদ্ নেহি হ্যায়,—না মর্দ্দিকে সরম্ শির্‌মে না উঠাও'!—তো হম্ ক্যা করেঁ"—বলেই আশাহত উন্মাদের মত সজোরে মাথা নাড়লে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের জল ঠিক্‌রে গিয়ে মানবের ঠোঁট্ ভিজিয়ে যেন তার দোস্তকে দেখবার—এই বিশ দিনের প্রচণ্ড পিপাসা আজ মিটিয়ে দিলে!

ঘনকৃষ্ণ ভ্রূর নীচে আজিজের চোখ দুটি এতক্ষণ যেন পাষাণ-মূর্ত্তির ওপর পালিশ্-করা ইস্পাতের মত ঝক্‌ঝক্ কোরছিল,—এইবার সেই পাষাণ ফেটে ঝর্ণা বেরিয়ে এল। সে মানবের বুকের ওপর মাথা রেখে কি অশান্ত কান্নাটাই কাঁদলে। তার বুকের দুধার বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল। আমার ঠিক বোধ হল—মানবের এই বিশ দিনের বিচ্ছেদ-দগ্ধ বুকটা সে জুড়িয়ে দিলে। তার পর সে মুখ তুলে' যা বললে' তা এই,—"আজ একুশ দিন হল বন্ধু—এই দুষ্মণ্ জ্বরের প্রথম দিন তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে আসি। তুমি সেলাম করে ভেতরে চলে গেলে, পর-ক্ষণেই দেখি—ছুটে ফিরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে বল্লে—"দোস্ত্—ভুলে গিছলুম্—প্রাণটা কেমন করে উঠল"—বলেই আবার ছুটে ভেতরে চলে গেলে। প্রাণটা আমার ধাঁৎ করে উঠেছিল, কিন্তু বুঝিনি—তুমি শেষ বিদায় নিলে। "আও দোস্ত্—আজ ছুট্টিকা দিন্ হমারা ছাতিপর্ আও"—বলেই তাকে ভাব্‌ড়ার পুতুলটির মত বুকে তুলে নিয়ে দাঁড়াল;—দেবতা যেন সত্যব্রত নির্ভীক নিষ্কলুষ "মানব"কে তুলে নিলেন—শিব যেন সতীদেহ নিয়ে দাঁড়ালেন!

আজিজ মানবের বুকে মাথা রাখতেই "ইস্—পর কালটাও গেল!" প্রভৃতি সময়োচিত ইঙ্গিত কানে এসেছিল; এখন "হাঁ—হাঁ" শব্দের সঙ্গে "ছোঁড় জাতিচ্যুত—ধর্ম্মচ্যুত হল" প্রভৃতি স্বজনোচিত গুঞ্জন শোনা গেল;—গুঞ্জনকারীদের পশ্চাতে হল্‌টা থাকেই,—সেটাও দেখা দিলে—"ও মড়া ছোঁবে কে!"

আজিজ দোস্তকে সযত্নে—সন্তর্পণে শুইয়ে দিয়ে—ব্যাগ থেকে দুবার দুমুঠো টাকা নিয়ে তার দুপাশে রেখে আমার দিকে চেয়ে বললে—"দোস্তকা কোই কামে লগে তো অচ্ছা,—নহি তো গরীবোঁকা বাঁট্ দেনা বহাদুর।" তার পর উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে বিষাদ মিশ্রিত বিনয়ে বললে—"আব্ বো খুসি করো ভাই।"

প্রবীণেরা তারিণী জ্যেঠাকে ঘিরে কর্ত্তব্য নির্দ্ধার

ব্যস্ত হলেন। পাঁচ মিনিট পরেই লাস উঠে গেল। আজিজ হাঁটু গেড়ে সেলাম করলে।

মানবের মৃত্যু-সংবাদে গ্রামের মেয়ে-পুরুষ—বিশেষ কোরে ইতর সাধারণ,—জেলেপাড়া, দুলেপাড়া, মুসলমান-পাড়া ভেঙ্গে পড়েছিল; সকলের মুখেই "হায় হায়—" আর তার কাছে কে কবে কি উপকার পেয়েছিল, কবে কি বিপদে সে কাকে রক্ষা কোরেছিল—সেই সব কথা; সকলের চোখেই জল।

আজিজ এই পাঁচ-সাতশো লোকের সহানুভূতি দেখে উৎসাহে বলে উঠল—তোমারা বাদশা চলা গয়া, "—মরদ অওর নহি রহা,—আব্ একদফে দোস্তকে সাথ সাথ যাও ভেইয়া" বলে হাতজোড় করতেই, জনতা মন্ত্রচালিতের মত তার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে চল্‌ল। জমীদার কি রায় বাহাদুরের মৃত্যুতে এ দৃশ্য দেখিনি! আমি তখন টাকা গুণে তারিণী জ্যেঠার হাতে দিচ্ছিলুম,—তাঁর মিতেরা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আজিজ ডাকলে "বহাদুর"! এমন সুমিষ্ট মৃদু-মধুর কণ্ঠ পূর্ব্বেও শুনিনি—পরেও শুনিনি,—যেন শিরায় শিরায় শিরীষ ফুল বুলিয়ে দিলে। ইচ্ছে হল—তার বুকে লুটিয়ে গিয়ে পড়ি। আমার দিকে চাইতেই তার চোখে জল গড়িয়ে এল,—পিঠে হাত দিয়ে বিষাদ-বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে "বহাদুর—যাও ভাই, দেখো যাকে—দোস্তকে সব কাম পুরা পুরা ঠিক্ ঠিক্ হোয়ে;—যাও হঁহা আওর কোন্ কাম্ রহা ভাই! আওর এক বাত—মায়ীকো জরুর দেখনা বাহাদুর"—এই বলে তার ধানি রংয়ের উত্তরীয় দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিলে,—আর "অচ্ছা যাও" বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। আমি অনিচ্ছায় ধীরে ধীরে এগুলুম। তাকে ছেড়ে যেতে আমার পা উঠ্‌ছিল না। মানবের শেষ কথা—"তোর মা নেই লোকেন,—তাই তোকে মা দিয়ে চল্লুম"—মনে হয়ে' চোখের জলে কিছু দেখতে পাচ্ছিলুম না।

মানব পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলা করতে ভালবাসত';—খেলায় হার-জিৎ উপলক্ষ কোরে—নিজে হেরে—তাদের ইচ্ছামত খাবার এনে খাওয়াত';—খেলার জিনিসও কিনে দিত। দশ-বারো বছরের ছেলেদের নিয়ে মধ্যে মধ্যে লাফানো, দৌড়োনো, সাঁতার দেওয়া, গাছে ওঠা, আর বাচ্‌খেলার পরীক্ষা হ'ত,—পুরস্কার দেওয়াও হ'ত। তাই সে তাদের উপাস্য বন্ধু ছিল। সেদিন সব ছেলেমেয়েই ছুটে এসেছিল; বন্ধুহীন বিষাদে ছল ছল চোখে চুপচাপ্ দাঁড়িয়ে ছিল;—যাদের জ্ঞান হয়েছে, তারা মাঝে মাঝে চোখ মুছছিল।

আমি চলে গেলে আজিজ তার ঝোলাটি উপুড় করে তাদের সামনে ছড়িয়ে দিয়েই দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করে—সে আর পেছু ফিরে চায়নি। সেদিন কেবল বেদানা আর আপেল ছিল—অনেক। ছেলেমেয়েগুলির মনের অবস্থা এমন ছিল যে সে সব কুড়ুতে তাদের উৎসাহই ছিল না,—কেবল ৪।৫ বছরের কয়েকটি ছেলেমেয়ে দু' একটি ফল হাতে কোরেছিল মাত্র;—অমনি উপস্থিত বুদ্ধিমানেরা হুঁকো ফেলে ক্ষুধার্ত্ত কাঙ্গালের মত এসে পড়েন—"ভূতে খেলে আর হবে কি, নারায়ণকে দিলে কাজ হবে" বলে' কোঁচড় ভর্ত্তি করে সত্বর যে যায় বাড়ী ফেরেন।

নবীনবাবু এই ব্যাপার দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যান। আমি এ কথা তাঁর কাছেই শুনেছিলুম। চূড়ামণি মশাই শুনে বলেছিলেন "ওরাই জাতটার মুখ পোড়ালে।"

*　*　*　*　*

আমাদের গ্রামের প্রচলিত প্রথা ছিল,—দিনের যে কোন সময়ে সৎকার শেষ হলেও—সন্ধ্যায় "তারা" দেখে স্নানান্তে প্রত্যাবর্ত্তন। তাই সন্ধ্যার সময় স্নান করে যখন উঠি,—তখন অনেকেই গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যা-বন্দনাদি কচ্ছিলেন। সেই সময় সিধু ভটচায্যি চাপা গলায় রাখাল রায়কে বলছেন শুনতে পেলুম—"এখনও একটা রইল!" এই কথাটার কারণটা জানতে চেয়েছিলেন,—এখন বোধ করি বুঝতে পেরেছেন।"

ভদ্রলোকটি ছোট একটী ক্ষীণ "হুঁ" দিয়েই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"আজিজের কি হল মশাই?"

বললুম—ফিরে গিয়ে দেখি—তার ভিজে কাপড়গুলি আর ছোরাখানি যেখানে সে ফেলেছিল—সেইখানেই পোড়ে আছে;—ঝোলাটা একটু তফাতে পেলুম। তুলে নিয়ে গিয়ে নিজেদের বেড়ার গায়ে শুকুতে দিলুম,—ছোরাখানি তুলে রাখলুম।

পরদিন চারপাঁচজনের কাছে এক কথাই শুনলুম,—আজিজ এক মনে রাস্তার একধার ধোরে যখন দ্রুত চলে-ছিল, তখন তার চোখ ফেটে রক্ত গড়িয়ে বুকে এসে

হ'ল! তার এই অবস্থা দেখে আর মানবকে মনে পড়ে, পরিচিত লোকের প্রাণ হুহু করে কেঁদে উঠেছে,—কিন্তু কেউ কোন কথা কইতে সাহস করেনি—অনেকেই সরে গেছে। অপরিচিত লোকে ভেবেছে—উন্মাদ না হয় খুনে। রোড ইনিস্‌পেক্টার রাসমোহন বাবু সাইকেল্ ছুটিয়ে থানায় গিয়ে খবর দেন। দারোগাবাবু বড় ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি দুজন কনেষ্টবল নিয়ে রাস্তায় এসে অপেক্ষা করেন। আজিজকে তিনি চিনতেন। তাকে দেখেই তাঁর ধারণা হয়—চোখে নিশ্চয়ই কিছু বিঁধে আছে—না হয় কোন কিছুর খোঁচা লেগেছে; তাই ব্যস্তভাবে বলেন—"একদম কাশীপুর হাঁসপাতালে চলে যাও।" আজিজ কোন উত্তর দেয়নি।

তার পর কত খুঁজেছি, কত খবর নিচ্ছি,—দিন গেছে, মাস গেছে, বছরের পর বছর গেছে,—আজিজ আর ফেরে নি। তার কাপড়গুলি এক এক করে গরীব দুঃখীদের দিয়ে দিছি। কেবল তার হাতের ছোরাখানি অন্তের হাতে দিতে পারিনি,—অযোগ্যের হাতেই রয়ে গেছে।

চোখ দিয়ে রক্ত পড়ার কথাটা অনেকেই বিশ্বাস করেনি,—আমিও ও সম্বন্ধে অনেক দিন ভেবেছিলুম।

পাঁচ বছর পরে ভেবেচি—পাহাড়ঘেরা মরুধূসর খুন-খেলার—দেশের লোকের প্রাণে এ ভালবাসা—এ প্রেম কোথা থেকে এল,—এর সামনে যে বিশ্ব ভেসে যায়!—এ যে সৃষ্টিও করতে পারে, প্রলয়ও আনতে পারে।

দশ বছর পরে ভেবেচি—পাহাড়ের মুক্তবায়ু, ঝর্ণার মুক্তধারা,—আঙ্গুর-আপেলের সরস যৌবন-সৌন্দর্য্য,—পিচ ফুলের হোলিরাগ,—সৌরভ-মন্দির গোলাপ-কুঞ্জের উষা-লাবণ্য,—শূন্যভরা বিহঙ্গ-সঙ্গীত,—সর্ব্বোপরি তার বাধাহীন স্বাধীন জীবনই তার হৃদয়টাকে প্রেম-মধুর করে গড়ে তুলেছিল,—তার বিশাল বুকখানাকে প্রেম-সম্পদে ভরে দিছলো।

বিশ বছর পরে যখন দেখলুম—প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মশাই বলেছেন,—"কখন-কখন উপাসনার সময় প্রবল হৃদয়াবেগে কেশব বাবুর চোখে রক্ত বেরিয়ে আসত," তখন বিচ্ছেদ-ব্যথা-মথিত প্রেমোন্মত্ত আফগানের 'রক্ত-বেগ-তরঙ্গিত' বুকের রক্ত যে আজিজের চোখ দিয়ে গড়িয়েছিল সে সম্বন্ধে আমার আর দ্বিধার অবকাশ থাকেনি।

আজ আমি তাদের দুজনকেই গভীর শ্রদ্ধায় নমস্কার করি।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আর তাঁর সঙ্গী যুবাটি উভয়েই হাত তুলে নমস্কার করলেন। ভদ্রলোকটি বললেন—"মাফ করবেন—আপনাকে বড্ডই মনঃকষ্ট দিলুম,—আমরাও কিন্তু কম পেলুম না।"

বলিলাম—"আমার এই কষ্টের মাঝে প্রকাশের একটা আনন্দও আছে, তা না ত' কি অনাবশ্যক এতটা বকতে পারি,—না শিকার থেকে বিকারে গিয়ে পৌছুতে পারি। পূর্ব্বেই আপনাদের বলেছি—মানব কি আজিজের কথায় আমি সব ভুলে যাই—মাত্রাজ্ঞান থাকেনা। তারা যে আজও আমার দিনের চিন্তা—রাতের স্বপ্ন।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"হোতেই পারে—আমরাও বোধ হয় ভুলতে পারবনা। তা হোক্—এ ব্যথা বহন করেও সুখ আছে।"

ইহার পর কাহারো আর কোন কথার উৎসাহ রহিলনা, দু'একটা শোকোচ্ছ্বাসের পর তাঁহারা বিদায় লইলেন।

স্মরণে

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

আমার ললাটে তব মঙ্গল পরশ
পেয়েছিনু কত দিন প্রভাতে সন্ধ্যায়,
কর্ম্মহীন, খ্যাতিহীন মধ্যাহ্ন অলস
শীতলি' রাখিলে তুমি তব স্নেহছায়।
কত না সুদীর্ঘ রাতি ব'সেছিলে জাগি'—
বাহিরে আঁধার ঘন, ঘরে দীপ জ্বালা,
একটী চরণ-শব্দ শুনিবার লাগি'—
উন্মুক্ত দুয়ার-পাশে একান্ত নিরালা।

আজো আসিয়াছি ফিরে মৌন সন্ধ্যারাতে,
অবসন্ন দেহভার, ক্লান্ত খিন্ন মনে—
দুয়ারে দাঁড়ায়ে নাই গন্ধ-দীপ-হাতে
কল্যাণ মুরতিখানি পূজা সমাপনে।
আমার যা' কিছু চাওয়া—স্নেহ, সেবা, প্রীতি—
তুমি নিয়ে গেছ চলে'—আছে শুধু স্মৃতি!

*
*   *

বাদল নিশীথে আজো চমকিয়া জাগি'—
রুদ্ধ ঘরে দেখি যেন—ঝঞ্ঝার প্রলয়ে
ফিরে আসিয়াছ তুমি; অপলক-আঁখি—
শিয়রে দাঁড়ায়ে আছ অনিশ্চিত ভয়ে।
স্বপনে ললাট-'পরে নিঃশ্বাস পরশ
পাই যেন মনে হয়—যেন মোর লাগি'
বসে' আছ ধ্যানরতা নিস্পন্দ অবশ—
দেবতা-চরণে মোর শুভ ভিক্ষা মাগি'।

যেন শুনিবারে পাই অশরীরি বাণী—
মরতের স্নেহ-ভীত আকিঞ্চনে ভরা—
সুদূর স্বরগ হতে'—জানি, ওগো জানি—
বহে' আনে বার্ত্তা তব সর্ব্বভয়হরা।
যেন বলিবারে চাহে আমারেই 'যাচি'—
বেঁচে আছি'—বেঁচে আছি—আমি বেঁচে আছি।

ভালবেসেছিলে তুমি—চাহ নাই কভু,
বিনিময়ে আনন্দের তুচ্ছ আয়োজন;
পাও নাই স্নেহ-স্পর্শ—মেনেছিলে তবু
বিদ্রোহী চিত্তটী—তার নিঠুর শাসন।
শুনেছিলে, স'হেছিলে প্রসন্ন বয়ানে
কত না কঠোর বাণী; বুঝেছিলে মোর
অশান্ত হিয়াটী যাহা ক্ষুব্ধ অভিমানে
জানে নাই—আপনার গরবেতে ভোর।

ফুটেছিল কণ্ঠে তব শেষ আশীর্ব্বাণী,
মরণ-আহত করে স্নেহের পরশ
ল'য়েছিনু শিরে তুলি' পুণ্য ব'লে' মানি—
শুষ্ক হিয়া অশ্রু মোর রসনা অবশ।
তবু কেন মনে হয়—অন্তিম শয়ানে
মু'খানি জাগিয়া ছিল মৌন অভিমানে!

*
*   *

অপমান-ক্ষত হিয়া—নতশিরে ফিরি'
শূন্য ঘরে বসে' থাকি নীরবে একেলা—
বিশ্বের আনন্দটুকু কল্পনাতে ঘিরি'
কেটে যায় অন্তরের শুষ্ক দীর্ঘ বেলা।
তোমারে তো বলি নাই রুদ্ধকণ্ঠে কভু
ক্ষুব্ধ হিয়াটীর মোর দীর্ঘ ইতিহাস,
গোপন ব্যথাটী তার; বুঝেছিলে তবু—
অভিমানে ছিল কত অতৃপ্ত পিয়াস।

আজি জেগে নাই কারো পথ-চাওয়া আঁখি
মোর গৃহ-বাতায়নে—তপ্ত অশ্রু দিয়া
মুছিতে লাঞ্ছনা-ক্ষত বক্ষপুটে ঢাকি'—
মোর তরে চিররুদ্ধ নিখিলের হিয়া।
অভিমান? কার 'পরে? শুধিব কি দিয়ে
সর্ব্বহারা আজি আমি সবটুকু নিয়ে!

মহম্মদপুর

শ্রীসৃজননাথ মিত্র মুস্তৌফী

(আলোক-চিত্র—শ্রীযুত ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মণ মহাশয়ের সৌজন্যে)

(২)

সীতারামের দুর্গাভ্যন্তরের কীর্ত্তিগুলি দেখিয়া, দুর্গের বাহিরে তাঁহার যে সকল কীর্ত্তি আছে, আমরা তাহা দেখিতে চলিলাম।

সীতারামের উত্তরের গড়ের উত্তর পাড়ে কামারপাড়া ছিল। তথায় কামান, বন্দুক ও অস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। এখনও তথায় কোঠাবাড়ী, পুকুর ও দেবালয়াদির ধ্বংসা-

কানাইনগরের ৺হরেকৃষ্ণ ঠাকুরের মন্দিরের নক্সা
(জে, ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের চিত্রের অনুকরণে অঙ্কিত)

বশেষ নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। পূর্ব্বে এইস্থানে দুর্গোৎসব, কালীপূজা ও দোল প্রভৃতি উৎসবে বহু সমারোহ হইত। এক্ষণে তথায় জনমানব নাই, গভীর অরণ্য মধ্যে ব্যাঘ্র, সর্প ও শূকর নির্ভয়ে বাস করিতেছে।

কামারপাড়ার পশ্চিম দিকে নারায়ণপুর গ্রামে সীতারামের দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের বাটী ও পুকুরের ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত আছে।

লোকমুখে শুনিলাম যে, মহম্মদপুরের পূর্ব্বদিকে মধুমতীর জলের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতে একটি মোটা লোহার শিক আছে। উহা কি জিনিস, তাহা কেহ জানে না। ইহা শুনিয়া, আমরা পূর্ব্বোক্ত ব্যাঘ্র ধরিবার খাঁচার পার্শ্বস্থ ভূষণা যাইবার রাস্তা দিয়া মধুমতী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, যেখানে নদীর পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে চারি হস্ত পরিমাণ মাটীর নীচে দিয়া একটি মোটা ও অতি দীর্ঘ লোহার শিকের ন্যায় পদার্থ জলের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। উহা টানিলে নড়ে, কিন্তু উঠিয়া আসে না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, উহা ইংরাজ আমলের অতি প্রাচীন কালের পরিত্যক্ত টেলিগ্রাফের তার বা কেব্‌ল (Cable)। আলকাতরা-সিক্ত ক্যাম্বিস জড়ান তামার তারের চতুর্দ্দিকে গোল করিয়া সাতটি লৌহ শিক বসান আছে। তাহার উপরে উপর্য্যুপরি দুই অঙ্গুলি প্রশস্ত দুইটি করিয়া লোহার পাত মজবুদ করিয়া মুড়িয়া উহাদের মুখ ঝালিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেব্‌লটি এইরূপে বরাবর লোহার পাত দিয়া মোড়া থাকায়, উহা দেখিতে সর্পের খোলসের ন্যায় হইয়াছে, এবং আজিও উহার মধ্যে জল প্রবেশ করে নাই।

তৎপরে আমরা দুর্গে ফিরিয়া আসিয়া, বাজারের পশ্চিম দিকে স্থিত পূর্ব্বোক্ত বাহিরের বড় গড়ে জলভ্রমণের জন্য চলিলাম। বাজারের নীচে জেলে-ডিঙ্গিতে বসিয়া পশ্চিম

দিকে চলিলাম। দুর্গের দক্ষিণ দিকের এই বাহিরের বড় গড়টির উত্তর ও দক্ষিণপাড়ে বেত, যজ্ঞ-ডুমুর, জিউলি জাতীয় হিজল গাছ ও অন্যান্য আগাছার বন হইয়া আছে। উহাদের পাতা পচিয়া এই সুবিশাল গড়ের জল নষ্ট হইতেছে। গড়ের দক্ষিণ পাড়ে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের রথ টানিবার পথ আছে। এই গড় ও ইহার দক্ষিণ পাড় এক্ষণে নলদীর জমিদার পাইকপাড়া রাজবংশের সম্পত্তি।

আমরা এই গড়ের দক্ষিণ দিকের খাল দিয়া ফুরশী বিলে পড়িলাম; ও বিলের ধান গাছের মধ্য দিয়া লগি ঠেলিয়া সীতারামের সুখসাগরের পূর্ব্ব দিক বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ দিক দিয়া উহার বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই সুখসাগরটি প্রায় সমচতুষ্কোণ। ইহার প্রত্যেক দিক অনুমান ১৬০ হাত দীর্ঘ। একটি সমচতুষ্কোণ জলের বেষ্টনীর মধ্যস্থলে একটি চতুষ্কোণ দ্বীপ আছে। পূর্ব্বে এই দ্বীপে হাওয়াখানার ত্রিতল অট্টালিকা ছিল। তথায় সীতারাম গ্রীষ্মকালে বাস করিতেন। এক্ষণে দ্বীপের মধ্যস্থলে স্থানে স্থানে ভগ্ন অট্টালিকার ইষ্টকাদি বনাকীর্ণ হইয়া আছে। দ্বীপের চতুর্দ্দিকে জলের ধার ইষ্টক দ্বারা বাঁধান ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও আছে। আমরা বনাকীর্ণ দ্বীপটির সম্মুখে নৌকাসহ উপস্থিত হইবামাত্র, তিন চারিটি অতি বৃহৎ গোসাপ—কুম্ভীর বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না—জঙ্গলের মধ্য হইতে বাহির হইয়া, ক্রোধব্যঞ্জক একপ্রকার বিশ্রী শব্দ করিতে লাগিল। আমরা নৌকাসহ দ্বীপটি প্রদক্ষিণ করিয়া, উহাতে অবতরণ করিয়া, বেতবন ও জঙ্গল ভেদ করিয়া, ক্ষত-বিক্ষত দেহে দ্বীপের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলাম। মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ যজ্ঞ-ডুমুরের গাছ আছে। উহাতে নানা জাতীয় লতা আশ্রয় লইয়াছে। শীতাবসানে এই দ্বীপে বিষাক্ত সর্প দেখা যায়।

সুখসাগর হইতে পুনরায় বড় গড়ে ফিরিয়া আসিলাম। উক্ত গড়ের পশ্চিম প্রান্তে কানাইনগর গ্রাম আছে। অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের পশ্চিম-প্রান্তে বনের মধ্যে সীতারামের দারুময় হরেকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজাবাটী আছে। উত্তর-পূর্ব্ব কোণার দ্বার দিয়া এই বাটীতে ঢুকিলে মধ্যস্থলে উঠান আছে। এই উঠানের উত্তর দিকে একটি দক্ষিণদ্বারী একতলা কোঠা আছে,—উহা পূর্ব্ব-বর্ণিত রাণী ভবানীর দারুময় বলরাম বিগ্রহের গৃহ। এই গৃহটির ছাদে কড়ি-বরগা দেওয়া আছে। ইহার সম্মুখের দেওয়ালে ইষ্টকের উপরে যৎসামান্য কারুকার্য্য আছে। উঠানের পশ্চিম দিকে ৺হরেকৃষ্ণ ঠাকুরের সীতারাম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সুউচ্চ পঞ্চচূড় মন্দির আছে। এই মন্দিরের সম্মুখ দিকে মাঝের দরজায় খাঁজ-কাটা খিলানের উপরে দুই পার্শ্বে দুইটি পৌরাণিক যুগের ঘোড়ার ন্যায় মুখবিশিষ্ট কোমর-সরু সিংহ ইষ্টকের উপর উৎকীর্ণ আছে। ইহা ছাড়া সম্মুখের দেওয়ালে সর্ব্বত্র নানারূপ নক্সা ও পুত্তলিকা প্রভৃতি ইষ্টকের উপর উৎকীর্ণ আছে। কোন কোন স্থানের কারুকার্য্য

৺বুড়াশিবের বটাচ্ছাদিত ভগ্ন মন্দিরের পশ্চাৎভাগ

ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িয়া আছে। কিন্তু এই কারুকার্য্য ভাল হইলেও অত্যুৎকৃষ্ট নহে। মন্দিরের সম্মুখ দিকে খিলান-করা ছাদবিশিষ্ট তিন ফোকরযুক্ত বারান্দা আছে। মধ্যের যে ঘরটিতে বিগ্রহ থাকিতেন, উহাতে অসংখ্য চামচিকা বাস করিতেছে। এই বিগ্রহ থাকিবার ঘরের পূর্ব্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে এক একটি দ্বার আছে। মন্দিরের উত্তর দিকের বারান্দার পাঁচটি খিলান-করা ফোকরের মধ্যে পূর্ব্ব দিকের দুইটি ইট দিয়া গাঁথিয়া বন্ধ করা আছে, এবং উহার পার্শ্বে অর্দ্ধভগ্ন একটি ক্ষুদ্র একতলা ঘর আছে। মন্দিরের পশ্চাতে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে কোন

দ্বার নাই। দক্ষিণ দিকের বারান্দাটি সর্ব্বপ্রকারে উত্তর দিকের বারান্দার ন্যায় ছিল, কিন্তু এক্ষণে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। মন্দিরের উপরে বড় বড় অশ্বত্থ-বট জন্মিয়া উহাকে দ্রুত ধ্বংস-পথে লইয়া যাইতেছে। এই হরেকৃষ্ণের মন্দিরের লুপ্ত স্মৃতি-ফলকে লেখা ছিল :—

বানদ্বন্দাঙ্গ চন্দ্রে পরিগণিত শকে কৃষ্ণতোষাভিলাষী।
মদ্বিশ্বাসভাষোদ্ভব কুলকমলে ভাসকো ভানুতুল্যঃ।
অজস্রং সৌধযুক্তে রুচিররুচিহরে কৃষ্ণগেহং বিচিত্রং।
শ্রীসীতারাম রায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমানুৎসসর্জ্জ।

অর্থাৎ বিশ্বাস বংশোদ্ভব সীতারাম ১৬২৫ শকে কৃষ্ণ-তোষাভিলাষী হইয়া যদুপতিনগরে অর্থাৎ কানাইনগরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উঠানের দক্ষিণ দিকে অশ্বত্থ-বটাচ্ছাদিত আর একটি মন্দির আছে। উহার সম্মুখ দিকে

মহম্মদপুর—সুখসাগর।
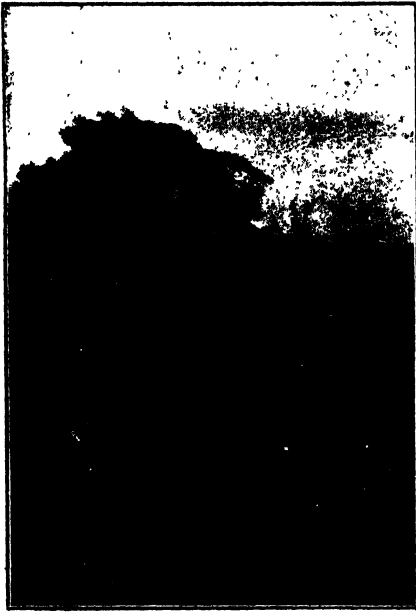
কিঞ্চিৎ কারুকার্য্য আছে। মন্দির মধ্যে দারুণ অন্ধকার। উঠানের পূর্ব্ব দিকে আর একটি মন্দিরের সম্মুখের দেওয়ালটি মাত্র দণ্ডায়মান আছে। সম্মুখের দেওয়ালের গাত্রে ইষ্টকের উপর নানা প্রকার মূর্ত্তি ও কারুকার্য্য আছে। শেষোক্ত দুইটি মন্দিরে কোন বিগ্রহ ছিল কি না, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, একটিতে ভোগ রান্না এবং অপরটিতে অতিথিশালা ছিল। অশ্বত্থ ও বটের ছায়ার জন্য এই পূজাবাটীতে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে না। কানাইনগরের এই পূজাবাটীর হরেকৃষ্ণ ও বলরাম ঠাকুরকে নাটোরে লইয়া যাইবার পর হইতে, দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের অযত্নে বহুকালের অসংস্কৃত এই মন্দিরগুলি সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে এই বিগ্রহ দুইটি দুর্গের মধ্যে ৺রামচন্দ্রের গৃহে আছেন। ৺হরেকৃষ্ণ ঠাকুরের এই বাটী পূর্ব্বে প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল, এখনও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। এই ঠাকুরবাটীর উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ভগ্ন দোলমঞ্চের স্তূপ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আছে। বাটীর পূর্ব্ব দিকে ৺হরেকৃষ্ণ ঠাকুরের পুকুর আছে। উহাতে দাম, শ্যাওলা ও তারাজীর গাছ হইয়াছে; সামান্য জল আছে। বাটীর পশ্চিম দিকে আর একটি পুকুর আছে, দাম শ্যাওলার জন্য উহার জল দেখিতে পাওয়া গেল না;—ইহাকে লোকে ৺বলভদ্র বা বলরামের পুকুর কহে। পূর্ব্বে এই ঠাকুর-বাটীর চতুর্দ্দিকে বহু গোয়ালার বাস ছিল,—এখনও ৩।৪ ঘর গোয়ালা এই ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করে।

৺হরেকৃষ্ণ ও ৺বলরাম সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী আছে—কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী বল্লভপুর গ্রামের জনৈক কৃষক একদা রাত্রিকালে তাহার মটরের ক্ষেতে পাহারা দিবার সময় দেখিতে পাইল যে, জ্যোৎস্নালোকে দুইটি বালক তাহার ক্ষেতের মটরশুঁটি তুলিয়া খাইতেছে। ইহা দেখিয়া সে বালক দুইটির পশ্চাদ্ধাবন করিল। বালক দুইটি সরিষার ক্ষেতের মধ্য দিয়া দৌড়িয়া পলাইল। কৃষক পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কানাইনগর গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, বালক দুইটি ৺হরেকৃষ্ণের ঠাকুরবাটীতে প্রবেশ করিল। কৃষক এই ঘটনা সকলকে বলিবার পর, পূজারি আসিয়া হরেকৃষ্ণ ও বলরামের মন্দির-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন যে, বিগ্রহ দুইটির বস্ত্রে সরিষার ফুল ও মুখে মটরশুঁটির অংশ লাগিয়া আছে। এই সংবাদ উক্ত কৃষকের কর্ণগোচর হইলে, সে ভক্তিভরে কহিল যে, ঐ মটরশুঁটির ক্ষেত ও উহার ফসল ৺ঠাকুরের হইল। তৎপরে সে প্রতি বৎসর ঐ ক্ষেতের ফসল নিজ ব্যয়ে উৎপাদন করিয়া ঠাকুরের সেবার জন্য দিত।

হরেকৃষ্ণের মন্দিরের সিকি মাইল দূরে পশ্চিম দিকে একটি ধান্যের মাঠের অপর পারে হরেকৃষ্ণপুর গ্রাম আছে। তথায় কৃষ্ণসাগর নামক উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ সীতারামের

একটি দীঘি আছে। ইহার জলকর প্রায় ৬৫০×২২৫ হাত হইবে, এবং ইহাতে যথেষ্ট সুপেয় জল আছে। বর্ষার পঙ্কিল জলে যাহাতে দীঘির জল খারাপ না হয়, এজন্য দীঘিটি কাটাইবার সময় ইহার মাটী দূরে লইয়া গিয়া, চতুর্দ্দিকে প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ করিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে।

তৎপরে হরেকৃষ্ণপুর হইতে পুনরায় কানাইনগরের পশ্চিম দিকে উপস্থিত হইয়া, দক্ষিণ দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল যাইয়া গোপালপুর গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এই গ্রামটি সীতারামের দুর্গ হইতে প্রায় ১।০ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে সীতারামের উত্তরদ্বারী বুড়া শিবের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। ভগ্ন মন্দিরটির উপরের খিলান ও পূর্ব্ব দিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মন্দিরের সম্মুখ দিকের দেওয়ালের ইটের উপর নানা দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও কারুকার্য্য করা আছে। এখানে একটি প্রাচীর-বেষ্টিত ঠাকুরবাটী ছিল। ভগ্ন মন্দিরের সম্মুখের উঠানের উত্তর দিকে একটি ক্ষুদ্র করগেট টীনের ঘরে কৃষ্ণ-প্রস্তরের বুড়াশিব নামক শিবলিঙ্গ আছেন; আজিও শিবের পূজা হয়। বুড়াশিবের ভগ্ন মন্দিরে এক্ষণে বনজঙ্গল জন্মিয়াছে। বুড়া শিবের বাটীর পূর্ব্ব পার্শ্বে বুড়া শিবের পুকুর আছে, উহাতে সামান্য জল আছে।

বুড়া শিব দেখিয়া আমরা পূর্ব্বোক্ত বড় গড়ের পশ্চিম প্রান্তে নৌকায় উঠিয়া সীতারামের দুর্গের বেষ্টনী—ভিতরের গড় দেখিতে চলিলাম। বড় গড়ের প্রায় মাঝামাঝি আসিয়া মাধুরখাল দিয়া দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে স্থিত কাতলাসুর বিলে পড়িলাম। তৎপরে বিলের মধ্যস্থ ধান গাছের মধ্য দিয়া লগি ঠেলিয়া পূর্ব্ব দিকে নৌকা চালাইলাম। অতঃপর কাতলাসুর বিল ছাড়িয়া, সীতারামের ভিতরের গড়ের উত্তর-পশ্চিম কোণা দিয়া গড়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়া, দুর্গের উত্তর দিকের গড়ের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব দিকে চলিলাম। আমাদের ডাইন দিকে দুর্গ মধ্যে সীতারামের নয়া বাড়ী ও অন্যান্য কীর্ত্তি জঙ্গলাবৃত হইয়া আছে। ভিতরের এই গড় দুর্গের প্রত্যেক দিকে অনুমান সিকি মাইল দীর্ঘ ও ২০।২২ হাত প্রশস্ত হইবে; এবং ইহাতে অনুমান ৩।৩।০ হাত জল আছে। গড়ের দুই পাড়ে নানা প্রকার বৃক্ষলতা ও বনজঙ্গল জন্মিয়াছে এবং জলের মধ্যে হিজল ও যজ্ঞডুমুরের গাছ জন্মিয়া অপূর্ব্ব শোভা ও ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা এই ছায়া-সুশীতল জলের পথ দিয়া নৌকা বাহিয়া চলিলাম। দুর্গের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে আসিয়া পূর্ব্ব দিকের ভিতরের গড় দিয়া দক্ষিণ দিকে নৌকা চালাইলাম। এই পূর্ব্ব দিকের ভিতরের গড় দক্ষিণ দিকে অল্প দূর যাইয়া শেষ হইয়াছে। এই স্থানে পূর্ব্ব দিকের ভিতরের গড়ের পূর্ব্ব দিকে ও পূর্ব্ব দিকের বাহিরের গড়ের পশ্চিম দিকে অর্থাৎ এই দুই গড়ের মধ্যস্থ ভূমিখণ্ডে সীতারামের পূর্ব্ববর্ণিত কানুনগো কাছারীর ভিটা আছে। তৎপরে আমরা পুনরায় উত্তর দিকে কিঞ্চিৎ ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্ব দিকের ঘোঁজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাঁকিয়া পূর্ব্ব দিকের বাহিরের গড়ে প্রবেশ করতঃ দক্ষিণ দিকে চলিলাম। দক্ষিণ দিকে গড়ের অর্দ্ধেক দূর যাইলে, পূর্ব্ব-পশ্চিমে-দীর্ঘ ভূষণা যাইবার রাস্তা আছে। যেখানে এই রাস্তা পূর্ব্ব দিকের বাহিরের গড়কে অতিক্রম করিয়াছে, সেখানে রাস্তার উত্তর দিকে ও গড়ের পশ্চিম দিকের কোণায় সেনাপতি মেনাহাতীর পূর্ব্বোক্ত সমাধি আছে। এই স্থানে কালীগঙ্গা তটিনী মেনাহাতীর সমাধির পূর্ব্ব দিকে গড়ে আসিয়া মিশিয়াছে। ভূষণার রাস্তার দক্ষিণ পারে এই বাহিরের গড়ের যে অর্দ্ধাংশ দক্ষিণ
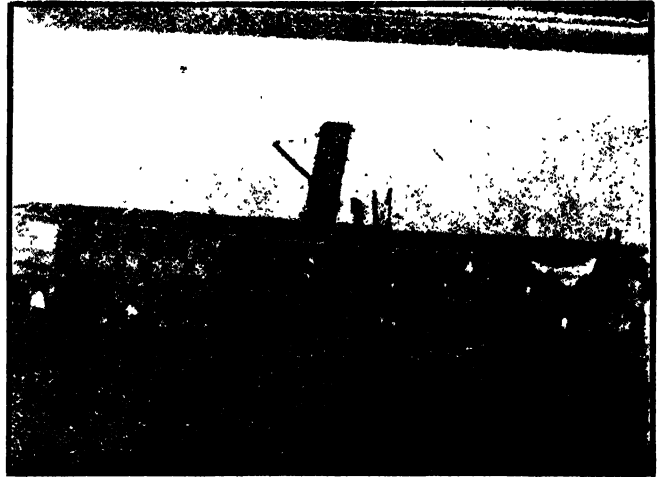
মহম্মদপুর হইতে ফিরিবার পথে ষ্টীমার "দেবলা"

দিকে বাজার পর্য্যন্ত গিয়াছে, উহাতে জল না থাকায় আমরা এই স্থান হইতে ফিরিয়া পুনরায় ভিতরের গড় দিয়া দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে, যেখানে কাতলাসুর বিলের সহিত গড়ের সংযোগ হইয়াছে, সেখানে উপস্থিত হইলাম। ঐ স্থান হইতে আমরা দুর্গের পশ্চিমের গড় দিয়া দক্ষিণ দিকে চলিলাম। আমাদের বাম দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে বনজঙ্গলের মধ্যে সীতারামের অন্দরমহলের স্তূপ ও সাধুখাঁর পুকুর রহিয়াছে। এ গড়েও জলের মধ্যে হিজলাদি গাছ জন্মিয়া গড়টিকে ছায়াময় করিয়া

মহম্মদপুর—দক্ষিণের বড় গড়

রাখিয়াছে। তৎপরে আমরা দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আসিয়া দক্ষিণ দিকের ভিতরের গড় দিয়া পূর্ব্ব দিকে চলিলাম। অবশেষে ৺রামচন্দ্রের পুকুরের পশ্চিম দিকে যেখানে এই গড় দক্ষিণ দিকে বাঁকিয়াছে, সেই স্থানে আসিলাম; এই স্থানটিকে "রসের গলি" কহে। সীতারামের সময় এই স্থানে বেশ্যাদিগের বাস ছিল। এই স্থানটি রামচন্দ্রের পুকুরের পশ্চিম পাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই স্থান হইতে আর পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে পারা গেল না, কারণ, সে দিকের গড়ে নৌকা [illegible] নামিয়া, পদব্রজে গড়ের বাকী অংশ দেখিয়া, খিড়কী দ্বার দিয়া রামচন্দ্রের ঠাকুরবাটীতে ফিরিলাম।

মহম্মদপুরের সন্নিকটে সীতারামের আরও কতকগুলি কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। মহম্মদপুরের প্রায় তিন মাইল উত্তরে ধুলজুড়ি গ্রামের সন্নিকটে তাঁহার "চিত্ত-বিশ্রাম" নামক বাটিকার ভগ্ন প্রাচীর ও স্তূপ এবং তৎসংলগ্ন একটি পুকুর আছে। মহম্মদপুরের অদূরে সূর্য্য-কুণ্ডে তাঁহার গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ আছে। এখানে তাঁহার গড়-বেষ্টিত বাড়ী ছিল। সীতারামের পতনের পরেও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুরনারায়ণ ও তৎপুত্র প্রেমনারায়ণ এই স্থানে বাস করিতেন। মহম্মদপুর হইতে পশ্চিম দিকে অনুমান ১॥০ ক্রোশ দূরে মাগুরা যাইবার রাস্তার পার্শ্বে শ্যামগঞ্জ গ্রামে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামসুন্দর বাস করিতেন। শেষোক্ত এই দুই স্থানে সীতারামের সময়ের বাটী, পুকুর ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। শ্যামগঞ্জের নিকটে ঘোষপুরে তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দুইটি আখড়ার একটিতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ও অপরটিতে গিরিধারী প্রভৃতির বিগ্রহ আছেন। মধুমতীর পরপারে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে হরিহর-নগর গ্রামে তাঁহার পৈত্রিক ভিটার ধ্বংসাবশেষ আছে; এখানেও তাঁহার গড়-বেষ্টিত বাড়ী ছিল। মহম্মদপুরের পূর্ব্ব দিকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে শেখর নামক স্থানে তাঁহার একটি দীঘি ও পুকুর প্রভৃতি আছে।

(৩)

ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, রাজা সীতারাম রায় কাশ্যপ-দাসবংশীয় উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন। অনুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার অধীন খড়গ্রাম থানার কুনিয়া বা কনে সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে বাস করিতেন। সীতারামের বৃদ্ধ প্রপিতামহ হিমকর মুর্শিদাবাদে কল্যাণগঞ্জ থানার অধীন গিধনা গ্রামে বাস করিতেন। সীতারামের বংশ সম্বন্ধে ঘটকদিগের একটি ছড়া আছে—

"হাল বয় তাল খায় গিধনায় বাস।
তার ছেলে কায়েত হ'ল বিশ্বাস খাস॥"

হিমকরের পুত্র শ্রীরাম দাস নবাব সরকার হইতে "খাস বিশ্বাস" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীরামের পৌত্র উদয়নারায়ণ ফৌজদারের তহশীলদার রূপে ভূষণায় আসেন, এবং তিনি নবাব সরকার হইতে "রায়" উপাধি প্রাপ্ত

হন। এই উদয়নারায়ণের পুত্র সীতারাম। উদয়নারায়ণ মধুমতীর পরপারে হরিহর নগরে বাস স্থাপন করেন। আজিও তাঁহার বংশধরগণ তথায় আছেন। উদয়নারায়ণ এতদঞ্চলে যে সকল তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন, উহাই সীতারামের পৈত্রিক সম্পত্তি।

নবাব সায়েস্তা খাঁ কোন একটি বিদ্রোহ দমনের জন্য সীতারামকে নলদী পরগণা জায়গীর দিয়াছিলেন। যখন নবাব ইব্রাহিম খাঁ বঙ্গের সুবেদার ছিলেন, সেই সময় দিল্লীর বাদশাহের ও নবাবের সম্মতি অনুসারে চাকলা ভূষণার অনেক স্থান সীতারাম নিজ জমিদারীভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন; ও ক্রমে নদীবহুল সমুদায় ভূষণা পরগণা অধিকার করিয়াছিলেন। আধুনিক ফরিদপুর জেলা ও নলদী পরগণা লইয়া তৎকালের ভূষণা পরগণা গঠিত ছিল। "রিয়াজে" উল্লিখিত আছে যে, সীতারাম সমুদায় সরকার মামুদাবাদ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। খুলনার শ্রীপুর অঞ্চলের অধিবাসী ঘোষবংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ মুণীরাম রায় সীতারামের পরামর্শদাতা ছিলেন। রায়গ্রাম নিবাসী ঘোষ-বংশীয় দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ রামরূপ ঘোষ—ডাক-নাম "মেনাহাতী"—সীতারামের সেনাপতি ও দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত দস্যু-সর্দ্দার বক্তার খাঁ, নিকারী জাতীয় ফকিরা মাছ-কাটা, নমঃশূদ্র জাতীয় রূপচাঁদ ঢালী, মোগল জাতীয় আমল বেগ—ডাক-নাম "হামলা বাঘা"—এবং ক্ষত্রিয় জাতীয় মৃন্ময় নামক সীতারামের কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

বাগজানি মৌজায় খাল ও বিলের মধ্যে সীতারাম তাঁহার রাজধানী মহম্মদপুরের পত্তন করেন, এবং ১৭০২—৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে রাজোপাধি গ্রহণ করেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০৩।৪• খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার পরে, ভূষণার ফৌজদার আবুতোরাপ সীতারামের নিকট কর চাহিলে, তিনি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাহার ফলে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে আবুতোরাপ প্রাণ হারাইলেন ও সমুদায় ভূষণার উপর সীতারামের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। আবুতোরাপের মৃত্যু-সংবাদে বিচলিত হইয়া নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সীতারাম-দমন জন্য বক্সআলি খাঁকে ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া সৈন্যসহ পাঠাইলেন; ও জমিদারদিগের উপর হুকুম দিলেন যে, কেহ যেন সীতারামকে কোন প্রকার সাহায্য বা সুযোগ না দেন ও সর্ব্বপ্রকারে ফৌজদারকে সাহায্য করেন। ফৌজদারের সহিত যে নবাবী-বাহিনী চলিল, উহার সেনাপতি হইলেন সংগ্রাম সিংহ। নবাবের প্রিয়পাত্র ও সীতারাম-ধ্বংসের প্রধান উদ্যোগী, নাটোরের রাজা রামজীবন রায় নবাবের অনুমত্যানুসারে জমিদারদিগের আর একটি সৈন্যদল গঠন করিয়া, নিজ দেওয়ান তিলিবংশীয় দয়ারাম রায়কে উহার পরিচালক করিয়া পাঠাইলেন। এই দয়ারাম রায় দিঘা-পতিয়ার জমিদারীর পত্তন করেন। বক্সআলি ভূষণায় পঁহুছিয়া সীতারাম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ভূষণা অবরোধ করিয়া বসিলেন। এদিকে দয়ারাম ভিন্ন পথে আসিয়া মহম্মদপুরের পশ্চিম দিকে উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁহার "কলিকাতা—সেকালের ও একালের" নামক গ্রন্থে এবং শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ "যশোহর-খুলনার ইতিহাসে" লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, দয়ারামের পরামর্শে গুপ্তঘাতকগণ মহম্মদপুর দুর্গের সেনাপতি মেনাহাতীর মুণ্ড কাটিয়া লইয়া পলায়ন করে ও সেই মুণ্ড মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট প্রেরিত হয়।

হরেকৃষ্ণপুরে কৃষ্ণসাগর।

সেনাপতির মৃত্যু-সংবাদে সীতারাম ভূষণা রক্ষার ভার অন্য সেনানীর হস্তে দিয়া, মহম্মদপুর দুর্গে চলিয়া আসিলেন। ক্রমে মহম্মদপুর দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। তখন তিনি দুর্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক এরূপ আত্মীয়-স্বজন, ও কতক স্ত্রী-পুত্র গুপ্ত-পথে দুর্গের বাহির করিয়া দিলেন। তাঁহার কতক স্ত্রী-পুত্র কলিকাতায় আশ্রয় লইলেন। কথিত আছে যে, তাঁহার দ্বিতীয়া এবং প্রধানা মহিষী শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত দুর্গে ছিলেন। জনপ্রবাদ এই যে, তিনি সর্ব্বশেষে দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, এবং জলে ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্যরূপ।

দুর্গ রক্ষা করা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া, অবশেষে সীতারাম অবশিষ্ট সামান্য সৈন্য লইয়া দুর্গ ত্যাগ করতঃ, শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া, যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইবার সময় বন্দী

মধুমতী-তীরে (এলেংখালী) ত্যক্ত প্রাচীন টেলিগ্রাফ কেবল্

হয়েন। কেহ কেহ বলেন যে, দয়ারাম তাঁহাকে বন্দী করিয়া নিজবাটী দিঘাপতিয়া হইয়া মুর্শিদাবাদ যাইবার পথে, তাঁহাকে কিছু দিন নাটোরের কারাগারে রাখিয়াছিলেন ; পরে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে লইয়া গিয়া, নবাব-সমীপে হাজির করিয়া দেন। কয়েক মাস মুর্শিদাবাদ কারাগারে থাকার পরে, তথায় সীতারামের মৃত্যুদণ্ড বা স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছিল। "রিয়াজে" উল্লিখিত আছে যে, সেই বীরের মুণ্ড গোচর্ম্মে আবৃত করিয়া তাঁহাকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল, এবং তাঁহার ঝাড়ে-বংশে যে যেখানে ছিল, সকলকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। আবার "তারিখ বাঙ্গালা" নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, তাঁহাকে শূলে দেওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক, প্রাণদণ্ড হউক বা স্বাভাবিক মৃত্যু হউক, তাঁহার মৃত্যু মুর্শিদাবাদে হইয়াছিল বলিয়াই বিশ্বাস হয়। মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরে তাঁহার শবদাহ ও তাঁহার পুত্র দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

সীতারাম ধৃত হওয়ার কালে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামসুন্দর শ্যামগঞ্জের বাটীতে ও দ্বিতীয় পুত্র সুরনারায়ণ সূর্য্যকুণ্ডের বাটীতে ছিলেন—তাঁহারা বন্দী হয়েন নাই বা পলায়ন করেন নাই। সীতারামের তৃতীয়া স্ত্রী, রামদেব ও জয়দেব নামক দুইটি অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ও একটি শিশু কন্যা সহ পলায়ন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারাই মহম্মদপুর হইতে পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। নবাবের হুকুমে হুগলীর ফৌজদার কলিকাতার ইংরাজদিগের নিকট সীতারামের পরিবারবর্গ ও ধনরত্ন চাহিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে ইংরাজগণ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ তারিখে সীতারামের দুইটি শিশু পুত্র, একটি কন্যা, ছয়টি স্ত্রীলোক এবং চারিটি ভৃত্যকে হুগলীর ফৌজদার মীর নসীর খাঁর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সীতারামের প্রথম বিবাহ ভূষণার অন্তর্গত ইদিলপুর-নিবাসী জনৈক মৌলিক কায়স্থ-কন্যার সহিত হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ বীরভূমের দশপলসা গ্রামের ঘোষ-বংশীয় সরল খাঁর কন্যা কমলার সহিত হইয়াছিল, এবং তিনিই প্রধানা মহিষী বলিয়া গণ্যা ছিলেন। কমলার গর্ভে শ্যামসুন্দর ও সুরনারায়ণ নামক সীতারামের দুইটি পুত্র হয়। সীতারামের তৃতীয় বিবাহ বর্দ্ধমানের পাটুলী গ্রামে হইয়াছিল। এই স্ত্রীর গর্ভে রামদেব ও জয়দেব নামক পূর্ব্বোক্ত দুই পুত্রের জন্ম হয়, কিন্তু ইহাদের অকাল-মৃত্যু ঘটে। সীতারামের চতুর্থ স্ত্রী নওয়া রাণী বীরপুর গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া শুনা যায়।

সন ১৩১১ সালের চৈত্র সংখ্যার "কায়স্থ পত্রিকা" হইতে সীতারাম সম্বন্ধে আরও কয়েকটি নূতন কথা জানিতে পারা যায়। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ যে, "সীতারামের মাতার নাম দয়াময়ী।* তাঁহার গর্ভে সীতারাম ও লক্ষ্মী-

নারায়ণ নামক দুই পুত্র এবং রঙ্গিণী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কায়স্থ-সমাজের উন্নতিকল্পে চারিটি সমাজের মধ্যে বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথম বিবাহ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত দাসপলসা গ্রামের উত্তর-রাঢ়ীয় সরল খাঁ ঘোষের কন্যার সহিত হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ অগ্রদ্বীপের সন্নিকটস্থ পাটুলী গ্রামের একটি উত্তররাঢ়ীয় কুলীন-কন্যার সহিত সম্পন্ন হয়। তাঁহার তৃতীয় বিবাহ ভূষণা পরগণার ইদিলপুরের বঙ্গজ কায়স্থ রূপনারায়ণ গুহর কন্যার সহিত হয়। তাঁহার চতুর্থ বিবাহ জেলা যশোহরের রায় গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের এক দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ কন্যার সহিত হয়। এই কন্যা সীতারামের প্রধান সেনাপতি মেনাহাতীর আত্মীয়া। তাঁহার পঞ্চম বিবাহ পাবনা জেলার এক বারেন্দ্র কায়স্থ কন্যার সহিত সম্পন্ন হয়।

"রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য সীতারামের শাক্ত কুলগুরু ছিলেন, এবং কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণব গুরু ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব গুরুকে শান্তি ও দৈবকার্য্যের পরামর্শদাতা, এবং শাক্ত গুরুকে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি বিষয়ের পরামর্শদাতা নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান ও ব্রাহ্মণ-চণ্ডালকে বিদ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া একই চক্ষে দেখিতেন। বিবাহে পণগ্রহণ প্রথা অশাস্ত্রীয় বলিয়া তিনি উহা উঠাইয়া দিতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি শত শত কুলীন ব্রাহ্মণ-কন্যার ভরণপোষণ করিতেন, কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহে কখন অর্থসাহায্য করিতেন না। এইরূপ একটি ছড়া আছে :—

কুলীনে কন্যার দায়ে গেলে রাজা পাশে।
সুবামনে কন্যা দেও বলে রাজা হাসে।
অর্থদানে মুক্তহস্ত কুলদায়ে নয়।
ঢালসড়কি গড়ে রাজা করে অর্থক্ষয়।

তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মৌলবী পরিবৃত হইয়া শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করিতেন। তিনি পাবনা জেলার দক্ষিণাংশ হইতে বঙ্গোপসাগর এবং নদীয়া জেলার পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে বরিশাল জেলার মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

"বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ সুচতুর মুনীরাম রায় এককালে সীতারামের দেওয়ান ছিলেন। নবাবের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য সীতারাম তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে আপন উকীল নিযুক্ত করেন, এবং আপন পুত্রের সহিত মুনীরামের একটি কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন। ইহাতে মুনীরাম ক্রুদ্ধ হন। এই বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া মুনীরামের পুত্র আপন ভগিনীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া, পিতার নিকট মৃত্যু সংবাদ পাঠাইলেন। সীতারামই তাঁহার কন্যার মৃত্যুর কারণ ভাবিয়া, মুনীরাম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সীতারামের অভিসন্ধির সকল কথা নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট প্রকাশ
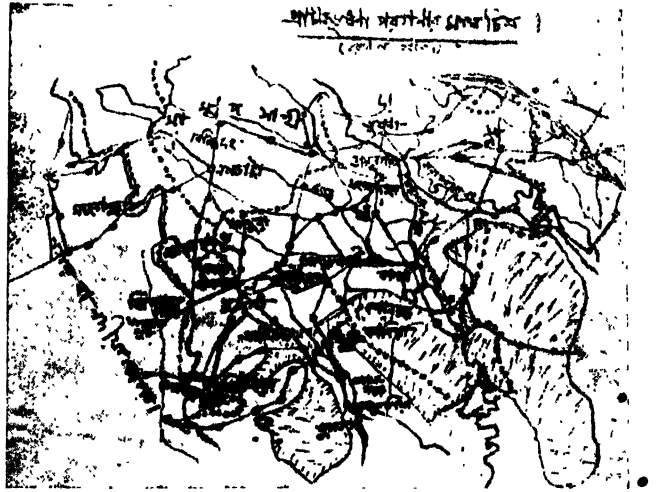
প্রাচীন ভূষণা পরগণার মানচিত্র (রেণেল হইতে)

করিতে লাগিলেন। নাটোরের রাজা রঘুনন্দন মুনীরামের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তৎপরে দয়ারাম রায় ও সংগ্রাম সিংহ সৈন্যসহ মহম্মদপুর আক্রমণ করিয়া, সীতারামের ধ্বংস-সাধন করিলেন।"

সীতারামের নিপাত সাধিত হইলে, চাকলা ভূষণা, যাহার অন্তর্গত নলদী, মকিমপুর ও সাতৈর প্রভৃতি পরগণা ছিল, উহা নাটোরের জমিদারীভুক্ত হইল। কথিত আছে যে, মুর্শিদকুলী খাঁ সীতারামের ধনরত্ন নবাব সরকারে বাজেআপ্ত করিয়া লইয়া, সীতারাম-ধ্বংসের প্রধান উদ্যোগী আপন প্রিয়পাত্র নাটোরের রঘুনন্দনকে পুরস্কৃত করেন ও তস্য ভ্রাতা রামজীবনকে ভূষণার জমিদারী অর্পণ করেন। পরে এই সকল সম্পত্তি রামজীবনের পুত্র রামকান্তের স্ত্রী রাণী ভবানীর তত্ত্বাবধানে আসিয়াছিল।

তৎপরে ঐ সম্পত্তি উক্ত রাণীর পোষ্যপুত্র রামকৃষ্ণের দখলে আইসে। রামকৃষ্ণ একজন মহা শক্তি-উপাসক ও সাধক ছিলেন; এবং সর্ব্বদা হোম, যাগ, যজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। ফলে, তত্ত্বাবধানের অভাবে ১৭৯৫ হইতে ১৮০২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে তাঁহার বৃহৎ সম্পত্তির কতক কর্ম্মচারীবর্গ লুটিয়া খাইল, কতক নিলাম হইয়া গিয়া যৎসামান্য অবশিষ্ট রহিল। এই সময় চাকলা ভূষণা খণ্ড খণ্ড হইয়া পরগণায় বিভক্ত হইয়া নিলাম হইয়া গেল——একজন ক্রেতা নলদী, একজন সাতৈর, একজন মকিমপুর,—এইরূপ একজন এক একটি পরগণা খরিদ করিয়া লইলেন। নিজ মহম্মদপুরে ও উহার আশেপাশে এখনও নাটোরের জমিদারী আছে। নাটোরের রাজগণ মহম্মদপুরের রামসাগর প্রভৃতি ৺রামচন্দ্র জীউর দেবোত্তর সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন; উহাও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাজেআপ্ত করিয়া লয়েন ও পরে নাটোরের রাজাকে পুনরায় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

পূর্ব্বে মহম্মদপুর ভূষণা পরগণার প্রধান সহর ছিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ভীষণ মহামারী জ্বরে ইহা ধ্বংসপ্রায় হয়; পরে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের জ্বরে ইহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তিন দিকে বিল ও এক দিকে মধুমতী নদী কর্ত্তৃক সুরক্ষিত দেখিয়া সীতারাম এই স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু কালে এই বিলগুলি অস্বাস্থ্যকর হইয়া যে ব্যাধির সৃষ্টি করিল, তাহাতেই আজি মহম্মদপুর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। শুধু সীতারামের দুর্গটিই মহম্মদপুর নহে; ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল, যথা, পূর্ব্ব দিকের নারায়ণপুর, পশ্চিম দিকের কানাইনগর, শ্যামনগর, গোকুলনগর প্রভৃতি গ্রাম এই মহম্মদপুরের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইত। উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪।৫ মাইল ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৩।৪ মাইল স্থান জুড়িয়া মহম্মদপুর গঠিত ছিল; এক্ষণে ইহার মধ্যে অনেক পাড়া ও মৌজা হইয়াছে। এখানে ব্যাধির মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক,—আজিকালি কালা জ্বর দেখা দিয়াছে। কোন কোন সময় কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রকোপ হয়। এখানকার অধিবাসীগণ একটি ডাক্তারখানার অভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকেন। এখানে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ও ২।৩ জন কবিরাজ মাত্র আছেন। তাঁহারাই রোগের চিকিৎসা করেন।

সীতারামের দুর্গ মধ্যে এক্ষণে মাত্র ৫।৬ ঘর লোক অরণ্যবাস ও ম্যালেরিয়া ভোগ করেন। দুর্গের বাহিরে চতুর্দ্দিকে কোথাও বিল, কোথাও খাল ও মাঠ আছে। উহার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। তথায় প্রধানতঃ কৃষিজীবীরা বাস করে। দুর্গ হইতে ১৷৷০ মাইল দূরে মধুমতী তীরে ষ্টীমার ঘাটের নিকটে কয়েক ঘর ভদ্রলোকের বাস আছে এবং একটি পুলিসের থানা ও একটি মাইনর স্কুল আছে। দুর্গের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৪০ ঘর ব্রাহ্মণ, ৭০ ঘর কায়স্থ, ৩ ঘর বৈদ্য, ও তিলি, শাঁখারী, যুগী, গোয়ালা, কর্ম্মকার, মালাকর, রাজবংশী, নমঃশূদ্র মেথর এবং মুসলমান, কলু, মশালচী, সেখ, সৈয়দ ও পাঠানের বাস আছে। একটি পোষ্টাফিস আছে, উহা রামসাগরের তীরে অবস্থিত। উহারই পশ্চাৎ দিকে সরকারি ডাক বাঙ্গালা আছে।

এক্ষণে মহম্মদপুরে নাটোরের মহারাজার, দিঘাপতিয়ার রাজার, নলদী পরগণার জমিদার পাইকপাড়ার রাজাদিগের, সাতৈর পরগণার ।৵০ আনার মালিক শ্রীরামপুরের গোস্বামীদিগের, ঐ পরগণার ৵০ আনার মালিক মুর্শিদাবাদের রাজা বিজয়সিংহ দুধুরিয়ার, ঐ পরগণার ৷৷০ আনার মালিক পাবনা জেলার পার্শ্বডাঙ্গার সাহা চৌধুরীদিগের ও নড়াইলের রায় বাবুদিগের অংশ আছে। এতন্মধ্যে নাটোরের আয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

"বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি Proceedings of the Controlling Council of Revenue at Murshidabad" নামক দ্বাদশ খণ্ড গ্রন্থে দরখাস্ত ও পত্রাদির নকল প্রকাশ করিয়াছেন। উহা হইতে জানা যায় যে, রাণী ভবানীর সময়ে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজগণ নাটোরের জমিদারী ও অন্যান্য রাজাদিগের জমিদারী সমূহ হইতে অত্যধিক হারে কর আদায় করিতেছিলেন, সেই সময় রাজসাহীর সুপরভাইজরের সহকারী গ্লাডউইন সাহেব মহম্মদপুরে থাকিয়া মহম্মদপুরের ও নলদী পরগণার বাঙ্গালা ১১৭৮ সনের কর আদায়ের হিসাব দিতেছেন।"

শুনা যায় যে পূর্ব্বে মহম্মদপুরে ২৷৷৵৩ লক্ষ লোকের বাস ছিল। এখন আর সীতারামের সে মহম্মদপুর নাই।

সে নিত্য নব-প্রদেশ-জয়ের ও যুদ্ধের উত্তেজনা, সৈনিকদিগের উৎসাহ-কোলাহল, হস্তীর বৃংহতি-ধ্বনি, অশ্বের হ্রেষা-রব, অস্ত্রের ঝঞ্চনা, কামানের বজ্র-নির্ঘোষ আর নাই। সে শিল্প-কলা, শাস্ত্র-চর্চ্চা, নিত্য-নব-উৎসব, সে সকলের আর কিছুই নাই। নবাবের অনুচরবর্গ এবং ভ্রাতৃঘাতী স্বদেশদ্রোহীদিগের দ্বারা সীতারামের সর্ব্বনাশ সাধিত ও মহম্মদপুর শৃঙ্খলিত হইলে, মহম্মদপুরের ভাগ্য-লক্ষ্মী ধীরে ধীরে বিদায় লইলেন। মহম্মদপুরের গৌরব-রবি অস্তমিত হইতে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের মহামারী রূপী মহাকালের কটাক্ষে নিভিয়া গেল। এখন মহম্মদপুরের শ্মশানে আছে ধ্বংসের মহান্ দৃশ্য—ভগ্ন-মন্দির, শুষ্কপ্রায় জলাশয়, বন-জঙ্গলাকীর্ণ স্তূপ, ও ম্যালেরিয়া। আর আছে দারুণ নিস্তব্ধতার মধ্যে দিবসে পক্ষীর কূজন, রাত্রে গভীর ঝিল্লিরব, মশক-গুঞ্জন, পেচকের কর্কশ ধ্বনি, ব্যাঘ্র ও সর্পের গর্জ্জন এবং শৃগালের আর্ত্তনাদ। আজিকার মহম্মদপুর লুব্ধ পথিকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। আজিও মহম্মদপুরের সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যের কঠিন পদাঙ্ক অঙ্কিত রহিয়াছে।

মহম্মদপুরে সীতারামের কীর্ত্তিগুলির অধিকাংশই এক্ষণে নাটোরের সাহিত্যসেবী ও স্বদেশহিতৈষী মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সম্পত্তি। মহারাজা যদি সীতারামের ধ্বংসোন্মুখ দেবালয় ও গৃহাদির সংস্কার করিয়া, তথায় পুনরায় বিগ্রহগুলিকে স্থাপন করিয়া সীতারামের কীর্ত্তি-সমূহ বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে স্বদেশভক্ত বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন। এখন সর্ব্বাগ্রে সীতারামের ধ্বংসোন্মুখ কীর্ত্তিগুলির এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা যে-কোন প্রকারে হউক বজায় রাখা কর্ত্তব্য। এজন্য দেশবাসীর নিকট হইতে চাঁদা উঠাইবার প্রয়োজন হইলে, সংবাদপত্রসেবীদিগের অবিলম্বে তাহা করা কর্ত্তব্য।

আমরা মহম্মদপুরে তিন রাত্রি বাস করিয়া চতুর্থ রাত্রে কলিকাতা প্রত্যাগমন জন্য যখন রাত্রি ৯॥০ টার সময় বোয়ালমারীগামী ষ্টীমার ধরিতে যাইব, তখন পথে ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিতে থাকায়, অগত্যা একঘণ্টা কাল বিলম্ব করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু এই বিলম্বের জন্য ষ্টীমার ধরিতে পারিলাম না। সে রাত্রি ষ্টীমার ঘাটের নিকটে জনৈক ভদ্রলোকের বহির্ব্বাটীর ছেঁচা বেড়ার ঘরে কোন প্রকারে কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া, রাত্রি ৩॥০ টার সময় খুলনা গামী "দেবলা" নামক ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া, পরের দিন আঠারবেঁকী নদী দিয়া চলিয়া সন্ধ্যার পরে খুলনা ঘাটে পঁহুছিলাম। সেই রাত্রেই খুলনা সহর ঘুরিয়া দেখিয়া রাত অনুমান ১০ টার ট্রেণ ধরিয়া পরদিন প্রাতে কলিকাতায় পঁহুছিলাম।

মহম্মদপুরে থাকিবার কালে নাটোর এষ্টেটের নায়েব মহাশয়, জমানবীশ ও সুমারনবীশ মহাশয় এবং পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় যেরূপ যত্ন ও সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা আজিকালিকার দিনে বিরল। আমরা এজন্য তাঁহাদিগের নিকট এবং ৺রামচন্দ্র জীউর বাটীতে আশ্রয় পাওয়ার জন্য নাটোরের মহারাজা বাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

—গত চৈত্র মাসের ভারতবর্ষের ৫১৯ পৃষ্ঠার বামদিকের স্তম্ভে আমার শুনিবার ভুলের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে যে মহম্মদপুরের বাজারের পশ্চিমে দক্ষিণদিকের যে গড় আছে, উহার দক্ষিণ পাড়টি নলদীর জমিদারের অর্থাৎ পাইকপাড়ার রাজ-বংশের সম্পত্তি। সম্প্রতি নাটোরের মহারাজার মহম্মদপুর কাছারির নায়েব মহাশয় পত্র লিখিয়া উক্ত ভ্রম ধরিয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে উক্ত পাড়টি নাটোরের মহারাজার সম্পত্তি এবং তাঁহার দখলে আছে। পাঠকগণের বিদিতার্থে ইহা প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করিলাম। ইতি—

আমার বাড়ী

শ্রীমানকুমারী বসু

১

আমার বাড়ী কোথায় দেবি, সুধাও ফিরে ফিরে,
বাড়ী আমার অনেক দূরে—সে "মাতৃ-মন্দিরে"।
দেখ্‌লে সে মন্দিরের ছবি,
নীরস পরাণ হয় যে কবি,
শুভ্র-সমীর আতর মেখে সদাই চলে ধীরে।
আমার ঘরে আমার ছাতে,
তপন এসে সুপ্রভাতে,
ছড়িয়ে দেন যে আঁজল ভরি মণি-মুক্তা হীরে;
সোণার বরণ তরুর শাখে,
কোকিল, শ্যামা, দোয়েল ডাকে,
ঝরিয়ে পড়ে সুধার ধারা মন্দাকিনী-নীরে
বাড়ী আমার কাঞ্চনজঙ্ঘা—স্বর্গ-গঙ্গা-তীরে।

২

আমার বাড়ী নিত্য সাঁঝে নীল চাঁদোয়া তলে
সোণার শশী উজ্‌লে হাসি, হীরকের ফুল জ্বলে!
কভু আবার কাদম্বিনী,
সাথে সখী সৌদামিনী,
ঢালেন হেসে সলিল-ধারা আকাশ পড়ে গ'লে!
ভীষণ-ভীষণ বজ্র রবে,
চম্‌কে উঠে প্রাণী সবে,
অমর-অসুর কামান দাগে স্বর্গে রণস্থলে;
প্রবল ধারা, বসুন্ধরা কোথায় ভেসে চলে!

৩

আমার বাড়ী থাকেন লক্ষ্মী নারায়ণের সনে;
চৌদিকে তাই ধানের গোলা, ঘেরা তুলসী বনে।
মা ভারতীর বীণার রাগে,
কালিদাস, মাঘ নিত্য জাগে,
মধু, হেম, আর বঙ্কিম, নবীন—গায় গোবিন্দ সনে।
আমার ঘরে অন্নপূর্ণা
সদাই অমৃতান্ন-পূর্ণা,
মুখটি চেয়ে ভিখারী শিব রহেন ত্রিলোচনে!
ছুটিয়া আসে বালক-বালা,
লুটিতে মা'র প্রসাদ-ডালা,
অন্ধ আতুর মা'র দুয়ারে আসে প্রতিক্ষণে;
এমনি মহোৎসবে রহি আমার নিকেতনে!

৪

তার পরে মা, মনের কথা বলি তোমার সনে—
এই টুকুনি দয়া কোরো কেউ যেন না শোনে—
আমার বাড়া—মায়ের কোলে
আমারি মা'র স্নেহাঞ্চলে,
ছিল যে এক সত্য যুগে, এই ভব ভবনে।
শুধুই স্নেহামৃত মাখি,
রাখিতেন মা আমায় ঢাকি,
ছিল না কো জানা-শুনা দৈন্য অভাব সনে।
যে দিন ছাড়ি গেলেন মা,
সেই থেকে আর কিছুই না,
গৃহহীন উদাসীন আমি ভ্রমি অনুক্ষণে;
এখন কুড়াই অভিশাপ,
বিরক্তি, দুর্গতি চাপ,
বিশ্ব আমার জীর্ণারণ্য মায়েরি বিহনে!
যশোর, খুলনা, কলিকাতায়,
আমার বাড়ী নাই কো কোথায়,
নাই বাঙ্গালায়—নাই ভারতে—নাই মর্ত্ত্য ভুবনে!
এখন যে মা শ্মশান-কালী
আমায় ডাকেন সদাই খালি,
দিবেন আমায় "আমার বাড়ী" তাঁরই শ্রীচরণে!
শুন্‌লে "আমার বাড়ীর" কথা, বুঝ্‌লে চন্দ্রাননে?

পিয়ারী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

৭

জল্পনা করিতে করিতে দুইটা দিন কাটিয়া গেল। বাহির হইবে ভাবিয়া অমল যেই গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়, অমনি কোথা হইতে যেন কারা আসিয়া তার দুই পা জড়াইয়া ধরে, বলে, ছি, কোথায় যাও ? সেই নির্লজ্জা অভিসারিকার কবলে গিয়া পড়িলে লাঞ্ছনার যে আর সীমা থাকিবে না!...অমলও দুশ্চিন্তার ভারে পীড়িত হইয়া ঘরের দ্বারে বসিয়া পড়ে, আকাশের পানে চাহিয়া কত কি ভাবে,—দিনের সূর্য্য মাথার উপর দিয়া মধ্যগগনে উঠিয়া আবার কখন্ তারি মাঝে শ্রান্তিভরে লোহিত কিরণচ্ছটায় ভরা দুই হাত বাড়াইয়া পশ্চিমের আকাশে ঢলিয়া পড়ে...! তৃতীয় দিনে কিন্তু এ-সব বাধা-নিষেধ জোর করিয়া ঠেলিয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িল—কিসের লাঞ্ছনা! লাঞ্ছনা করে, করুক!...তা বলিয়া পরের আংটি নিজের কাছেও এমন করিয়া আর রাখা চলে না! কি সে ভাবিতেছে!

অমল সেদিন সহরের পথে পথে ঘুরিয়া দুই-চারিজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া একটা প্রশস্ত গলির মধ্যে ঢুকিয়া কয়-পা চলিয়া নির্দ্দেশ-মত যে-বাড়ীটার সাম্‌নে দাঁড়াইল,—বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখে, সে যেন এক রাজার প্রাসাদ! ফটক-ওয়ালা বাড়ী,—রাস্তার ধারে দোতলায় দীর্ঘ বারান্দা—বারান্দার বাহারে থামের বুক চিরিয়া পরীর মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে—আর সেই সব পরীর হাতে একটা করিয়া বিচিত্র গাছের ডাল, ডালে নানা লতা-পাতার আবরণের মাঝে টক্‌টকে লাল গোলাপ—আর সেই গোলাপের পাপড়ির মাঝখানে ইলেক্‌ট্রিকের বাতি লাগানো। ফটকে একটা দরোয়ান বসিয়া আছে। অমল গিয়া ভয়ে ভয়ে দরোয়ানকে প্রশ্ন করিল,—এ বাড়ীতে পাপিয়া বিবি থাকে?...

দরোয়ান অমলের বেশভূষা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। এই দীন-বেশ ছোকরাটাও পাপিয়া বিবির সন্ধান করে! সে অমলের পানে তাকাইয়া আবার চোখ ফিরাইয়া নিজের মনে গুম্ফ তৈরী করিতে লাগিল। অমল কহিল,—বল না দরোয়ানজী, পাপিয়া বিবি এখানে থাকে? এই তাঁর বাড়ী?

দরোয়ান তাচ্ছল্যভরে কহিল,—হাঁ, হাঁ...বিবির কাছে কি দরকার?

অমল বলিল, সে কাশীপুরের বাগান হইতে বিবির কাছে আসিয়াছে—জরুরী খপর আছে। কাশীপুরের বাগান শুনিয়া দরোয়ান আর-একবার অমলের পানে চাহিয়া তাকে ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিল; পরে উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। সে গিয়া এত্তালা দিল পাপিয়ার খাস-দাসী রঙ্গিণীর কাছে—রঙ্গিণী তখন পাণগুলা সাজিয়া রাখিবার উদ্যোগ করিতেছে। দরোয়ানের কাছে শুনিয়া সে ভিতরের একতলার ঘর হইতে জানলা দিয়া একবার বাহিরে উঁকি পাড়িয়া দেখিল, পরে দরোয়ানকে বলিল,—আচ্ছা... দরোয়ান খড়ম-পায়ে খট্‌খট্ করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া নিজের টুলে বসিল, এবং অমলকে বলিল,—খপর ভেজা... অমল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রঙ্গিণীর কিন্তু বিবিকে খপর দেওয়ার অবসর মিলিল না। গুপী-বেয়ারাটা কাল রাত্রে আহার সারিয়া ফিট্‌ফাট্ হইয়া সেই যে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিল, আজ বেশ বেলা হইলেই ফিরিয়াছে; ফিরিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছে! কৈফিয়ৎ দেওয়া দূরের কথা, রঙ্গিণীর সঙ্গে দেখাও করে নাই। তার এত-বড় অপরাধের কৈফিয়ৎ লইবার উদ্দেশে রঙ্গিণী তাই পাণ চিবাইতে চিবাইতে রণ-রঙ্গিণীর মূর্ত্তি ধরিয়া গুপীর ঘরের দিকে চলিল।

অমল সেই পথে দাঁড়াইয়াই আছে! ভিতর হইতে কোন আহ্বান নাই, একটা সাড়া অবধি নাই! পথে কত লোক চলিয়াছে। বহুক্ষণ এমনি দাঁড়াইয়া সে এই লোক-চলাচল দেখিল—পরে হঠাৎ হুঁস হইল, তাইতো, বহুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া আছে...হুঁস হইতেই সে দরোয়ানের দিকে

চাহিল, দরোয়ান তখন কি একখানা বই লইয়া সুর করিয়া পড়া সুরু করিয়াছে।

অমল ডাকিল,—দরোয়ানজী, ও দরোয়ানজী......

বিরক্ত হইয়া দরোয়ান মুখ তুলিল। অমল কহিল,—খপর তো এলো না!...আর-একটিবার যাও না...

দরোয়ান কহিল, সময় হইলেই খপর আসিবে। বিবি এখন গোসল করিতেছেন কি না......

অমল বিরক্ত হইল; একবার ভাবিল, চলিয়া যায়—আবার পরক্ষণেই মনে হইল, এতখানি পথ আসিয়া আংটি ফেরত না দিয়াই চলিয়া যাইবে, সে-ও তো ভালো কথা নয়! সে দরোয়ানের দিকে চাহিল—দরোয়ান তখন আবার বইয়ের পড়ায় মনঃ-সংযোগ করিয়াছে। সে তখন দরোয়ানের তোয়াক্কা না রাখিয়া তার অলক্ষিতেই আগাইয়া ফটকে ঢুকিল। ফটক পার হইয়া একটা বড় উঠান—উঠানের চারি-ধারে ঘরের শ্রেণী, উপরে দোতলায় বারান্দা, বারান্দার কোলে ঘর। উপরের ঘর হইতে বাদ্যের ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিতেছে। অমল উঠানে দাঁড়াইয়া চারিধারে একবার চাহিল।

দাঁড়াইবার একটু পরেই একটা স্ত্রীলোক ঘরের মধ্য হইতে কহিল,—কে গা?

অমল চারিদিকে চাহিল,—কিন্তু কে যে কোথা হইতে কথা কহিল, তার কিছুই দেখিতে পাইল না। সেই স্বর লক্ষ্য করিয়াই সে জবাব দিল,—কাশীপুরের বাগান থেকে আমি আসছি—পাপিয়া বিবির কাছে একটু দরকার আছে।

ঘর হইতে জবাব আসিল,—তা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন! ঐ ডাইনে সিঁড়ি—সেই সিঁড়ি ধরে দোতলায় যান্—দেখা হবে।

অমল আর অপেক্ষা না করিয়া ডাহিনের সিঁড়ি ধরিয়া একেবারে দোতলায় গিয়া উঠিল। দোতলায় গিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, বারান্দার দাঁড়ে একটা প্রকাণ্ড কাকাতুয়া, আর একটা ভৃত্য সেই কাকাতুয়াকে খাবার দিতেছে। বারান্দায় অমলকে দেখিয়া ভৃত্যটা তার পানে চাহিল—অমল তাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিল। ভৃত্য আসিলে অমল কহিল,—পাপিয়া বিবিকে একবার খপর দাও তো...আমি কাশীপুর থেকে আসছি।

ভৃত্য জবাব দিবার পূর্ব্বেই ঘর হইতে কে কহিল,—কে রে বিট্টু...?

অমল সে স্বর চিনিল—স্বর পাপিয়ার।

বিট্টু একটু সরিয়া গিয়া কহিল,—একঠো বাবু আয়ছে, কাশীপুরসে...

ঘরের মধ্য হইতে পাপিয়া কহিল,—কে বাবু রে?

কথার সঙ্গে সঙ্গেই পাপিয়া আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। অমল বিস্মিত দুই চোখ তুলিয়া দেখে সাম্‌নে রূপের প্রতিমা! মাথায় কোন আবরণ নাই, স্নানের পর দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশের রাশ পিঠের উপর এলানো, টক্‌টকে লাল-পাড় শাড়ীখানি পরা...অপরূপ রূপসী পাপিয়া তার সাম্‌নে! যেন বহু আঁধার রাত্রির পর ধরাতলে মূর্ত্তিমতী উষার এই প্রথম উদয়...! পুলকের দীপ্তির মত, বিস্ময়ের মত পাপিয়া আসিয়া তার সামনে দাঁড়াইল। মৃদু হাসিয়া পাপিয়া কহিল,—তুমি...? কবি ...?

অমলের বিস্ময় তখনো তাকে এমনি আবিষ্ট রাখিয়াছিল যে, সে কথা কহিয়া উত্তর দিতে পারিল না। সে কেমন মোহাচ্ছন্নের মতই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পাপিয়া আসিয়া অমলের হাত ধরিল, কহিল,—এসো। এবং অমলের দিক হইতে কোন সাড়া উঠিবার পূর্ব্বেই পাপিয়া অমলের হাত ধরিয়া একেবারে তাকে লইয়া আপনার ঘরে গিয়া ঢুকিল। পরিপাটী সজ্জিত ঘর; বিলাসের সর্ব্ব-উপাদানই সে ঘরে যথাস্থানে সংরক্ষিত। পাপিয়া শয্যার উপর অমলকে বসাইয়া নিজে মেঝের বিছানায় তার পায়ের কাছে বসিল, এবং অমলের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—আমার এখানে...হঠাৎ?...মনে দয়া হলো বুঝি...?

অমল নির্ব্বাক বিস্ময়ে ঘরটার চারিধারে চাহিয়া পাপিয়ার পানে চাহিল। সে বিদ্যুতের তীব্র হল্‌কা ত এর কোথাও নাই,—কথায় বিদ্যুতের সে গর্জ্জন নাই, দৃষ্টিতেও সে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ নাই! অমল বলিল—একটু দায়ে পড়েই আমি এসেছি—বলিয়া সে পকেট হইতে আংটিটা বাহির করিয়া পাপিয়ার হাতে দিয়া কহিল,—এই আংটিটা সেদিন আমার ঘরে ফেলে এসেছিলে...তাই এটা দিতে এসেছি।

পাপিয়া আংটিটা হাতে লইয়া দেখিল, কহিল,—

এ তুচ্ছ জিনিসটা কি এমন কাঁটার মত ফুট্‌ছিল...না হয়, এটা রেখেই দিতে !...কোনো দিন যদি সেই একটা রাত্রির কথা মনে পড়তো...! তাছাড়া এ আংটি আমি ফেলেও আসিনি তো—রেখে এসেছিলুম।···আমার একটু স্মৃতি মাত্র···তাও সহ্য করতে পারলে না !

পাপিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল ; নিশ্বাস ফেলিয়া তখনি বলিল,—তুমি যে আমার কি করেছ, তা তুমি জানো না, আর তা বুঝতেও পারবে না···এই আমার বড় দুঃখ !...তোমার জন্যে যে কখনো এমন হবো,' এ কথা দুদিন আগে এমন অসম্ভব ছিল, যে, সে বলবার নয় !...তোমার কি আছে...? যা আমি চাই, যার নেশায় এতকাল মাতাল হয়ে আছি—তার কিছুই তোমার নেই ! তবু তোমার জন্যে এমন হয়েছি যে, পাগলের মত সে-রাত্রে তোমার কাছে ছুটে গেছলুম...। এই তো এত বিলাস ঐশ্বর্য্য দেখচো...এ সব আমার,—তবু তুমি যদি আদেশ কর তো এই দণ্ডে তুচ্ছ ধূলার মত এ-সব ত্যাগ করে তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারি—যেখানে নিয়ে যাবে...বিজন বনে, মরুর প্রান্তে, ..এমন কি মরণের বুকে পর্য্যন্ত !—এখন বুঝলে ?

অমলের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। সে-রাত্রের সে-উচ্ছ্বাসটাকে সে চরিত্রহীনা নারীর সুরার-নেশার প্রলাপ ভাবিয়া কতক নিশ্চিন্ত ছিল, এখন দেখিল, সেটা নেশা নয় ! পাপিয়া নেশা করে নাই...যা বলিতেছে, তা বেশ বুঝিয়াই বলিতেছে !...কিন্তু এ যে আগাগোড়া কি বিশ্রী, কি কুৎসিত ! তার সমস্ত মন যেন এ কথায় কালো হইয়া গেল ! এ যেন জাগিয়াও সে স্বপ্ন দেখিতেছে ! পাপিয়াও বেশ সুস্থ চিত্তেই কি-সব প্রলাপ বকিতেছে...!

অমল উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—ও-সব কথা বলো না আর। ও-সব শোনবার আকাঙ্ক্ষাও আমার নেই...আর কেনই যে তুমি বল...

পাপিয়া বিদ্যুতের মত উঠিয়া দাঁড়াইল ; অমলের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—কেন বলি, তা বোঝো না, এইতেই আরো আমি ভেঙ্গে যাই !···শোনো বলি, আমি যা বলছি,' এ খেয়ালের ঘোর নয় ! ক'দিন কেবল এই কথাই ভাবচি...কিছু ভালো লাগচে না। যাদের নিয়ে মত্ত ছিলুম, কাণের কাছে অহর্নিশি যারা স্তব-স্তুতি শোনায়, যে স্তব-স্তুতির নেশায় বিভোর ছিলুম, সেও ভালো লাগে না আর—তাদেরো ক'দিন কাছে ঘেঁষতে দিইনি... তারা আকুল হয়ে চলে গেছে...অনেক দুঃখ জানিয়ে গেছে, ...তবু টলিনি ! আর তুমি...?

পাপিয়া অমলের পানে চাহিয়া রহিল। অমল কহিল,—কিন্তু কেন এ পাগলামি করছো'! আমি পথের কাঙাল...আমায় কেন যে এ-সব বলছো ! দু'বেলা আমার অন্নও ভালো করে জোটে না যে···

পাপিয়া কহিল,—কেন এত দুঃখ পাও তুমি...? এ শুনলে আমার বুক ফেটে যায় ! আমি এখানে' সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছি—আর তুমি...

অমল কহিল—কিন্তু তোমার এ আকুল হওয়াও যে পাগলামি ! আমি কোথাকার কে···তা'ছাড়া এ পৃথিবীতে কত দুঃখী গরিব কাঙাল আছে, যারা আমারি মত—আমার চেয়েও অসহায়···তাদের কথা ভেবেছ কখনো···?

পাপিয়া কহিল—না,...অত কথা ভাববোই বা কেন !

অমল কহিল—তবে আমার জন্যেই বা...

পাপিয়া কহিল—চুপ কর ! অমন করে বলো না আর। তোমার জন্যে কি, আর কেন যে এ আকুল হওয়া, তা তুমি বুঝলে এমন করে হতাশ্বাসে আমায় জ্বলে মরতে হতো না...! আমি যা দেখেছি···তোমার নির্ম্মল অনুরাগ, নীরব ধ্যান, আশ্চর্য্য প্রীতি...তাতে আমি পাগল হয়ে উঠেছি। আমি আর কিছু চাই না, অমনি করে আমার জন্যে একটুও যদি ভাবতে ..আমার জন্যে ভেবে যদি একটা নিশ্বাসও ফেলতে...তাহলে আমি হাসি-মুখে এই দণ্ডে মরতে পারতুম !···পাপিয়া ক্ষণেক থামিল ; থামিয়া নিশ্বাস লইয়া আবার বলিল,—আরো দুঃখ এই যে যার ধ্যানে তুমি এমন তন্ময়, সে যে কত বড় হতভাগী, কত বড় পাপিষ্ঠা, কত বড় শয়তানী...

বাধা দিয়া অমল কহিল,—থাক্। ও-সব কথায় আমার কোন দরকার নেই। সে শয়তানীই হোক, আর পাপিষ্ঠাই হোক, আমার তাতে কিছু এসে যাবে না।

পাপিয়া কহিল—কেন যাবে না ? নিশ্চয় যাবে।...সে এই—এ জেনেও তার কথা তুমি ভাববে—তারই ধ্যানে কবিতা লিখবে...! কখনো না।

অমল পাপিয়ার পানে চাহিল ; বুঝিল, কথা-কাটাকাটি

করিয়া কোন লাভ নাই, ফলও নাই! সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—আমি তাহলে উঠি ..অনেক দূর যেতে হবে...

পাপিয়া কহিল—না, বসো,···একটু বসো। যাবেই তুমি, জানি—ধরে রাখবো না আমি। ধরে রাখবার স্পর্দ্ধাও আমার নেই! কিন্তু তার আগে একটা কথা আছে...

অমল কহিল—কি?

—একটু বসো·· আমি এখনি আসছি। ভয় নেই, তোমায় খেয়ে ফেলবো না।...আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত বসবে তো? এইটুকু দয়া···

অমল কহিল,—আচ্ছা, বসছি।

পিয়ারী বাহির হইয়া গেল। অমল ঘরের চারিধারে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—এ যে রাজার ঘর! কি-সব জিনিস, কি সব আসবাব-পত্র...! সে যে কল্পনাতেও এমন পারিপাট্য, এমন সজ্জার কথা ভাবিতে পারে নাই কোন দিন!

পাপিয়া তখনই ফিরিল...তার হাতে রূপার রেকাবিতে জল-খাবার। শয্যার পাশে একটা টিপয়ের উপর রেকাবি রাখিয়া সে রূপার গ্লাসে জল গড়াইয়া টীপয়ে রাখিল; তার পর অমলকে কহিল—ওঠো দিকি...

অমল নির্ব্বাক বিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। পাপিয়া কহিল,—হাত-মুখ ধোবে এসো...বলিয়া অমলকে লইয়া পাশের বাথ-রুম দেখাইয়া দিল এবং নিজের হাতে জল লইয়া তার পায়ে ঢালিয়া দিল। পাপিয়া তাব পায়ে হাত দিয়া পা রগড়াইতে গেলে, অমল তার হাত ধরিল, কহিল—ও কি হচ্ছে? ছি!

পাপিয়া আকুল নেত্রে অমলের পানে চাহিয়া বলিল—একটা সাধ পোরাতে দাও...লক্ষ্মীটি, তোমার পা ক্ষয়ে যাবে না এতে ··

অমল দ্বিরুক্তি করিল না। পাপিয়া অমলের পা ধুইয়া জলের পাত্র অমলের হাতে দিয়া বলিল—মুখ-হাত ধোও... ঐখানে সাবান আছে—হাতটি সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলো। বলিয়া সে ঘরে আসিল,—আসিয়া দেরাজ খুলিয়া ধোপ-দোস্ত তোয়ালে বাহির করিয়া আবার বাথ-রুমের দ্বারে ফিরিল। অমলের তখন হাত-মুখ ধোওয়া হইয়া গিয়াছে। তোয়ালেয় হাত-মুখ মুছিয়া ঘরে ফিরিয়া সে শয্যায় বসিল। পাপিয়া তোয়ালেখানা লইয়া কহিল,—এমনি বেহুঁস, পায়ে জল রয়েছে যে—বলিয়া তোয়ালে দিয়া অমলের দুই পা মুছাইয়া দিল, তার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—এবার কিছু মুখে দাও দিকি...অনেক বেলা হয়েছে। কিছু ফেলতে পাবে না!

অমল পাপিয়ার পানে চাহিল। পাপিয়া হাসিল, হাসিয়া কহিল,—সেদিন অমন করে আশ্রয় দিয়েছিলে—তার দরুণ কৃতজ্ঞতাও কি একটু প্রকাশ করবো না!... তুমি এ পুরীতে এসেছ, এই যে ঢের! এ যে আমার ধ্যানের অতীত!...নাও, এখন খাও—খেতেই হবে—নাহলে যেতে পাবে না—ছাড়বো না আমি!···খাও... আমি পাণ সেজে দি···বলিয়া সে বাহিরে গেল ও পর-মুহূর্ত্তেই একটা দাসী আসিয়া পাণের বাটা প্রভৃতি রাখিয়া গেল। পাপিয়াও তখনি ঘরে ফিরিয়া মেঝেয় বসিয়া পাণ সাজিতে লাগিল—অমল নিরুপায়ভাবে রেকাবিখানা হাতে তুলিয়া লইল।

আহারের পর পাপিয়া পাণ দিতে গেলে অমল কহিল,—আমি তো পাণ খাই না।

পাপিয়া কহিল,—খাও না?

অমল কহিল,—না।...বলিয়া হাসিল, হাসিয়া আবার কহিল—বলে, অন্ন জোটাই ভার—তার উপর আবার পাণ···।

পাপিয়া বিদ্যুৎ-ভরা দৃষ্টিতে অমলের পানে চাহিল, কহিল,—বেশ, তবে দুটী মশলা দি, খাও...

অমল কহিল—না, পাণই দাও। এক দিন নয় বাবুই সাজা যাক্...

অমল পাণ লইয়া মুখে দিল, কহিল,—তাহলে এবার উঠি···।

পাপিয়া কহিল,—কি করে এলে এখানে...?

অমল কহিল—তার মানে?

পাপিয়া কহিল—হেঁটেই...?

—তা না তো কিসে আবার আসবো?

পাপিয়া কহিল,—কিন্তু হেঁটে ফেরা হবে না। গাড়ী ডাকিয়ে দি', গাড়ী করে যাও···

অমল কহিল,—কোনো দরকার নেই গাড়ীর।

ভগবান পা-দুটোর সৃষ্টি করেছেন যে, সে তো চলার জন্তেই...

—তা বলে এতখানি পথ !—পাপিয়া শিহরিয়া উঠিল, কহিল,—তা হবে না। এখান থেকে গাড়ী করেই ফিরতে হবে। এর পর পায়ের সদ্ব্যবহার করো সেখানে গিয়ে, আমি বাধা দিতে যাবো না...

অমল ভৃত্যকে ডাকিয়া গাড়ী আনিবার আদেশ দিল। তখনি গাড়ী আসিল। গাড়ী আসিলে অমল যেমন বাহির হইবার উদ্যোগ করিবে, অমনি পাপিয়া কহিল,—দাঁড়াও...বলিয়াই সে গিয়া দেরাজ খুলিল। এবং একটা রেকাবিতে কয়টা টাকা ও আংটিটা তুলিয়া অমলের পায়ের কাছে রেকাবি রাখিয়া প্রণাম করিল, প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—ওগুলি নিতে হবে।...

অমল সবিস্ময়ে পাপিয়ার পানে চাহিল। পাপিয়া কহিল,—না হলে আমি পূজোর ফল পাবো না। অতিথি দেবতা, তাকে পূজা-অর্ঘ্য না দিলে পূজারীর পূজা নিষ্ফল হয় !...কেন আমার পূজোটাকে নিষ্ফল করবে···সে কি ভালো হবে ?

—কিন্তু আংটি...?

—আংটি তো আমি রেখেই এসেছিলুম। ও আর ঘরে ফিরে নেবো না—নিলে পাপ হবে।...ইচ্ছা হয়, রেখো, না হয় গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ো...ঘরের পাশেই তো গঙ্গা !··· কোনো দুঃখ থাকবে না।

এ নারী, না, প্রহেলিকা ! অমল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আর পাপিয়া টাকা কয়টা ও আংটিটা অমলের পকেটে ফেলিয়া দিল।

অমল আপত্তি করিল না ; দ্বারে পা দিয়া একবার সে শুধু ফিরিয়া চাহিল, কহিল,—তোমায় আমায় কিন্তু এই শেষ দেখা !—আর কখনো...

পাপিয়া কহিল,—যেতে মানা করছো ?···বেশ, তাই হবে। পাপিয়ার স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল। অমল চাহিয়া দেখে, পাপিয়ার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল, বসিয়া বাড়ীটার পানে ফিরিয়া চাহিলও না ! যদি চাহিত, তাহা হইলে দেখিত, সেই পরী-ওয়ালা বারান্দায় পাপিয়া দাঁড়াইয়া আছে—চোখে-মুখে সুগভীর বেদনা মাখিয়া !

গাড়ী চলিয়া গেলে পাপিয়া ঘরে আসিয়া বিছানায় অমল যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানটায় আর্ত্ত দীর্ণ মন লইয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িল। তার দুই চোখে শ্রাবণের ধারা ঝরিল।

৮

ভালো লাগে না, ভালো লাগে না, কিছুই আর ভালো লাগে না। বাড়ী, ঘর, বাগান, দাস-দাসী, ঐশ্বর্য্য...প্রেমের গান, এই মিনতি, আবেদন, বেশ-ভূষা...এ-সব একেবারে তিক্ত হইয়া উঠিল। বিছানায় পড়িয়া পাপিয়া তার নিরাশ ব্যথিত চিত্তকে পাঠাইয়া দিত, দূর বিজন বনান্তরালে, সেই জীর্ণ গৃহের মাঝে···যেখানে সেই খোলা জানলা, আর বাহিরে জানালার নীচে দিয়া নদী বহিয়া চলিয়াছে, ওপারে সেই ছায়ারেখার মত অস্পষ্ট কল্পলোক···আর ঘরের মধ্যে ধ্যান-রত কবি কার ধ্যানে বসিয়া কবিতা লিখিতেছে, জগতের কোন বস্তুতে তার কোন কামনা নাই, কোন বাসনা নাই, জগতের পানে ফিরিয়াও সে দেখিতে জানে না,···দেখিবার তার অবসরও নাই।...মানগোবিন্দ আসিয়া ফিরিয়া যায়, স্তাবকের দল ভৎর্সনা খাইয়া সরিয়া পড়ে !···নির্ম্মম অবহেলার ঘা খাইয়া পাপিয়ার ব্যথিত চিত্ত যখন শ্রান্ত হইয়া সেই জীর্ণ বিজন ঘর হইতে ফিরিয়া আসে, তখন কি হাহাকারেই যে প্রাণ তার ভরিয়া যায় ! ··

পাপিয়া সেদিন দলিতা ভুজঙ্গিনীর মত শয্যায় উঠিয়া বসিল—চোখের দৃষ্টিতে কোথা হইতে রাজ্যের জ্বালা আসিয়া মিশিল। শয্যা হইতে উঠিয়া সে বাহিরের পানে চাহিল... চপলা ! ঐ শয়তানী রাক্ষসীই তো তার সুখের পথে কাঁটার পাহাড় রচিয়া রাখিয়াছে···! কি মোহে, কি মন্ত্রেই যে সে অমলকে ভুলাইয়াছে···অথচ তার পাশে পাপিয়া...

পাপিয়া হাসিল। তুচ্ছ একটুকরা কাচের মোহে ভুলিয়া কি রত্নই অমল পায়ে ঠেলিতেছে ! ..

পাপিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। কাছেই চপলার বাড়ী। ভৃত্যকে দিয়া গাড়ী ডাকাইয়া তখনই সে চপলার গৃহে চলিল।

বিছানায় পড়িয়া চপলা নিবিষ্ট মনে একখানা বই পড়িতেছিল,—সঙ্গে সঙ্গে হাত-পাও বিচিত্র ভঙ্গীতে নাড়িতেছিল। পাপিয়া ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল—চপলা দিদি···

বই রাখিয়া চপলা কহিল,—কে...? ইস্, পাপিয়া যে! হঠাৎ...? কি খপর?

পাপিয়া কহিল,—তুমি যে একা আছ...! ভৃঙ্গরাজ কৈ...?

চপলা কহিল,—একাই আছি। থিয়েটার থেকে ওরা ভারী ধরেছে। তাদের কথা কিছুতেই ঠেলতে পারলুম না। তারা এই নতুন বই খুলছে—সীতার বনবাস। তা আমায় ভারী ধরেছে, অন্ততঃ প্রথম রাত্তিরটাতেও যেন সীতা সাজি। তাই সীতার পার্টটা দেখে নিচ্ছি...

পাপিয়া কহিল,—ভৃঙ্গরাজ অনুমতি দেছে...?

চপলা কহিল—অনুমতি দেবে কি! আমার যা খেয়াল হবে, তাই করবো। তাতে ভৃঙ্গরাজের বাধা দেবার ক্ষমতা থাকতে পারে কখনো?

পাপিয়া হাসিয়া কহিল,—তা বটে!

চপলা কহিল—বোস্ না ভাই। আর এই ক'খানা পাতা আছে—পড়ে নি।...

পাপিয়া বসিল। তার হাসি মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। ...ওরে কুহকিনী, ওরে ছলনাময়ী অভিনেত্রী,—শুধু স্বরের ভঙ্গীতে কৃত্রিম সুরে আর কৃত্রিম হাবে-ভাবে...তার কি, স্বর্গই তুই ছিনাইয়া রাখিয়াছিস্! নিজে তুই সে স্বর্গ জানিলি না, জানিবার প্রবৃত্তিও নাই তোর...তবু তোরই জন্য পাপিয়া আজ পথের কাঙাল...তার দুর্ভাগ্যের আজ আর সীমা নাই...!

চপলা বই পড়িতে লাগিল, আর পাপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া তাকে দেখিতে লাগিল। বই পড়া শেষ হইলে চপলা কহিল,—তার পর, খপর কি? হঠাৎ মনে পড়লো যে..?

পাপিয়া কহিল,—হঠাৎ আমি আসিনি। একটু দরকারেই এসেছি।

চপলা কহিল,—কি দরকার, শুনি?

পাপিয়া কহিল,—তোমায় সেই বলেছিলুম, মনে আছে...আমাদের কাশীপুরের বাগানের কাছে একটি ছোকরা থাকে, তোমার উদ্দেশে কবিতা লেখে...?

চপলা একটা সিগারেট ধরাইয়া কহিল,—হ্যাঁ। তা কি করতে হবে শুনি?

পাপিয়া কহিল—বেচারী কি-রকম পাগল যে তোমার ধ্যানে...তা এক দিন তাকে দেখতে চল না!

চপলা কহিল—আমার তো মাথা খারাপ হয় নি যে চিড়িয়াখানা দেখতে যাবো...

পাপিয়া কহিল—না ভাই, অমন করে বলো না তুমি ...আমার কিন্তু দেখে ভারী মায়া হয়েছে তার উপর...

চপলা হাসিয়া কহিল,—দেখিস, যেন স্বয়ংবরা হোস্‌নে! বেচারা মানগোবিন্দ তাহলে পাগল হয়ে যাবে...

পাপিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল! সে ভাগ্য যদি তার হইত!

চপলা কহিল,—চুপ করলি যে!...কি ভাবছিস?

পাপিয়া কহিল,—ভাবচি, তুমি কি নিষ্ঠুর!...আহা, কবে থিয়েটারের সেই বিজ্ঞাপনের কাগজে তোমার কি ছবি বেরিয়েছিল...সেখানিকে কেটে খাতায় এঁটে রেখেছে,—সেই ছবিরই কি আদর!...আমি বলছি, সত্যি, তোমার ভৃঙ্গরাজের চেয়েও ঢের-বেশী কামনার ধন...

চপলা কহিল,—তোরও দেখচি নেশা লেগেচে যে!... দূর!...তুই দেখিস্ নে কখনো, ত্যাখ্—ও-সব নভেলের প্রেম আমার ঢের দেখা আছে।...তা তুই যদি তার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী হোস্ তো তাকে একটা ভালো উপদেশ দিস্ দিকি। তাকে কাজকর্ম্ম করতে বলিস্, কুড়ের মত ও-সব ছাই-ভস্ম লিখে কোনো তো ফল নেই!...হুঁঃ, থিয়েটারে থাকতে কত লোকের কত চিঠিই যে পেতুম... কেউ লিখতো তুমি আমার মাথার মণি,...কেউ লিখতো আমার সাধের সাধনা, শূন্য জীবন-বিহারী! কেউ লিখতো, আমার নিষ্কাম ভালবাসা, শুধু দেখেই খুসী হবো! ...ষ্টেজে ফুলের তোড়া পড়লো তারিফ করে,—দেখি, তার মধ্যে মস্ত চিঠি—কি কাঁদুনি আর কি মিনতিতেই তা ভরা!...চপলাসুন্দরী তো কচিখুকী নয় যে ওতে ভুলবে— দু ছত্র চিঠিতে কি চার ছত্র কবিতায়!...বলে, অত বড় জহরৎওলা যে মাধোরাম—তারি একমাস টাকা পেশ্ করতে দেরী হতে বললুম, পথ ত্যাখো!...

পাপিয়া কোন কথা কহিল না, চপলার পানে চাহিয়া স্থির হইয়া তার কথা শুনিতেছিল।

চপলা কহিল,—আর এক মজার গল্প বলি, শোন্। সে এই বছর-খানেকের কথা। একটা সামাজিক নাটকে পার্ট করেছিলুম,—এক বৌয়ের। বৌটো স্বামীর হাতে নিত্যি মার খায়,—কাঁদলে ওদিকে শাশুড়ী-ননদ হুঙ্কার দিয়ে

এসে পড়ে, খবর্দ্দার হারামজাদী, বাড়ীতে চোখের জল ফেলে অকল্যাণ করিস্!...বৌটোর কোন সুখ নেই! এক দিন বৌটোর শরীর খারাপ ছিল বলে পাতে দুটী ভাত ফেলা গেছলো, এইতে শাশুড়ী তাকে খুব গাল দিয়ে অনেক রাত্রে পথে বার করে সদর-দোর বন্ধ করে দেয়। শীতকাল—বেচারী তো শীতে কেঁপে সারা! তবু শাশুড়ী দোর খোলে না। ...পাড়ার একটি ছেলে তাকে নিজেদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেয়! পরদিন তার মা এসে শাশুড়ী-মাগীকে যাচ্ছে-তাই করে, বৌকে ঘরে দিয়ে যায়। বৌয়ের কিন্তু দুর্দ্দশার সীমা রইল না। ননদ কুচ্ছো করিতে লাগলো।—স্বামীর অত্যাচার চার-পো বাড়লো, আর জটিলে-শাশুড়ী রাম-রাজত্বি সুরু করলে। তখন সেই পাড়ার ছেলেটি তাদের বাড়ী-চড়াও হয়ে তাকে রক্ষা করতে আসতো!...বৌটো তাকেই একমাত্র বন্ধু বলে ভাবতো।...একদিন স্বামীর মার খেয়ে বৌটি হঠাৎ অজ্ঞান হতে সেই ছেলেটি এসে ধম্‌কে বলে, সবাইকে পুলিশে দেবে!...এমনি অত্যাচারে-অত্যাচারে বৌটি মর-মর, শেষে মৃত্যুর সময় সেই ছোকরাও এলো। তা মরবার সময় বৌটি শুধু বলে গেল—ভালোবাসার কাঙাল হয়ে মলুম—একটু ভালবাসাও যদি পেতুম...ছেলেটির পানে চেয়ে তার হাতখানি চেপে ধরে একরকম তারি কোলে মাথা রেখে সে মলো!...তা ভাই, এই বৌয়ের পার্টটিও প্লে করা, অমনি ছোকরার দল চিঠি পাঠাতে লাগলো—ওগো, আমি ভালবাসবো গো—কি-দুঃখে ভালোবাসার কাঙাল হয়ে তুমি মরবে, এমনি!...সব কাব্য করছেন! ষ্টেজের ঐ রঙ-চঙ আর ঢঙে ওঁরা ভুললেও, আমরা ও-সব ফাঁকা কথায় ভুলি কখনো! হায় রে!

পাপিয়া অবাক হইয়া চপলার কথা শুনিতেছিল। তার এই অবহেলা-উপেক্ষার কথাগুলা পাপিয়ার প্রাণে পাথরের কুচির মত আঘাত করিতেছিল! চপলা শুধু টাকাটাই চিনিয়াছে—আর ঐ টাকার পিছনে তার যে প্রেমের উচ্ছ্বাস—সেটা কি পঙ্কিল গন্ধে ভরা, কি স্বার্থের বিষেই যে জড়ানো! আহা, অমল...বেচারা!...নিজের মনে শুধু সে কবিতা লেখে—কোন দিন চপলাকে দেখিবে বলিয়া তো তার ঘরের দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায় নাই, পাওয়ার কামনা, সে তো দূরের কথা।

পাপিয়ার হঠাৎ মনে হইল,—সে তো চপলাকে দেখিতে চায়, চপলাও দেখা দিবে না! তা, এই তো থিয়েটারে 'সীতার বনবাস' অভিনয় হইবে, আর চপলা সে বইয়ে সীতা সাজিবে! অমলকে এ খপর দিলে সে হয়তো সীতার বনবাস দেখিতে আসে—অমনি চপলাকেও একবার চোখে দেখিতে পায়!

সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্ভাবনার কথাও তার মনে জাগিল। অমল যা চায়,...পাপিয়া তাকে তাহারি সন্ধান দিবে... তার পর চপলার পরিচয়ও যাহাতে সে ভালো করিয়া পায়, তাও করিবে...তাহা হইলেও কি চপলার প্রতি এ অন্ধ উন্মত্ত আবেগ তার আর থাকিতে পারে কখনো!... তার উপর যখন অমল জানিবে, অমলের সুখের জন্য পাপিয়াই এই থিয়েটার দেখার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে—তা জানিয়া যদি কোন দিন......

পাপিয়া কহিল,—তোমাদের এ বই কবে খুলবে?

চপলা কহিল,—কবে আবার! আস্‌চে শনিবারে! রাস্তায় বড় বড় কাগজ মেরে দেছে, দেখিস্ নে? এই যে কালই রাত্রে আমি দেখছিলুম, ইডন্ গার্ডন্ থেকে ফেরবার সময়...বড় বড় অক্ষরে লেখা সীতার বনবাস, আর তারি ঠিক তলায় লাল কালিতে সীতা—শ্রীমতী চপলাসুন্দরী...কেবল এক রাত্রির জন্য...

কথাটা বলিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে চপলা পাপিয়ার পানে চাহিল।

পাপিয়া কহিল—না ভাই, আমি অত নজর করিনি। তা বেশ, আজ তাহলে উঠি। তোমায় বিরক্ত করবো না... তুমি তোমার পার্ট ছাখো...

চপলা কহিল,—আর এক দিন আসিস্ না...পাপিয়া!... দুপুরবেলায়...মানগোবিন্দ যখন আপিসে থাকে...

পাপিয়া হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তোমার ভৃঙ্গরাজ চটে যাবে না?

চপলা তাচ্ছল্যের ভরে কহিল,—চটুক্ গে! মেড়ো কোথাকার!...কি বলবো, পয়সা দেয় বহুৎ, না হলে ওরা কি মানুষ, না, প্রাণে কোনো সখ আছে!...

পাপিয়া কহিল,—নেমকহারামি করো না। যা চাইছো, তাই তো দিচ্ছে...

চপলা কহিল,—তা দেবে না তো কি! আমার একটা কথা, একটুক্‌রো হাসির দাম যে লাখ টাকা!...

ব্যাটা কাপড় বেচে কত লাখ টাকাই যে করেছে... তা যাক্‌ ও সব কথা ! থিয়েটার দেখতে যাবি তো ?

—নিশ্চয়। কত দিন বাদে তুমি নাবছো।...তোমার ভৃঙ্গরাজ কটা বক্স নিচ্ছে ?

—একটা নিয়েছে !...মানগোবিন্দকে বলিস্ না, একটা বক্স নিতে...

—সে আর আমায় বলতে হবে না—নিজে থেকেই নেবে'খন।...সত্যি ভাই, আমরা যাদের চাই না, তারাই আমাদের ঘিরে থাকে সর্ব্বক্ষণ...আর যাদের চাই··· পাপিয়ার স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল। সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

চপলা কহিল,—তারা কি···?

পাপিয়া স্বপ্নাভিভূতের মত কহিল,—তারা যে কত দুর্লভ, কত দূরের···

চপলা কহিল,—তোর কি হয়েছে বল্ তো পাপিয়া ? ···তুই কি চাস,—যা পাস না...? মানগোবিন্দর দৌলতে তোর অভাবটা কি, শুনি ? ও-রকম বেইমানী কথা বলিস্ নে।—এই যে সেদিন বলে গেলি, তোর কোন অভাব নেই—তবে···?

পাপিয়া ঈষৎ আত্মজ্ঞাতভাবে কতক মৃদু কণ্ঠে কহিল,—সেদিন কি জানতুম যে সত্য অভাব কাকে বলে...সত্য পাওয়াটাই বা কি...! তার পর আর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তা হলে আজ আসি ভাই ···তুমি পার্ট দুরোস্ত কর। (ক্রমশঃ)

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্‌সি

নূতন টেলিফোণ (গৃহকর্ত্তা বাটী ফিরিয়া সংবাদ গ্রহণ ক'রছেন)

নূতন টেলিফোণ

সম্প্রতি য়ুরোপের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিলিত হয়ে একটি নূতন রকমের টেলিফোণ উদ্ভাবন ক'রেছেন, যেটি একজন লোকের বক্তব্য গ্রহণ ক'রে অন্য লোককে সেই সংবাদ শুনিয়ে, আবার তা'র উত্তর গ্রহণ ক'রে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে সেই উত্তর শুনিয়ে দেয়। বাটীর বাহিরে যাবার সময় গৃহকর্ত্তা নিজের অনুপস্থিতি ইত্যাদি এই টেলিফোণ-যন্ত্রে বলে গেলে, যদি কোন ব্যক্তি সেই সময়ে তাঁকে টেলিফোণ করে, তবে টেলিফোণই সেই ব্যক্তিকে বাটীর লোকের অনুপস্থিতির খবর দিয়ে তার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করে, এবং সেই সংবাদ গৃহকর্ত্তা ফিরে এলে তাঁকে প্রদান করে। এই যন্ত্রটীর আকার অনেকটা প্রাচীন ধরণের টেলিফোণের মতো।

বুদ্ধির মাপকাটি

কোনও ছাত্র স্কুল বা কলেজের পরীক্ষা শেষ ক'রে যখন উচ্চ বিদ্যা লাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী হয়, তখন তার বুদ্ধিবৃত্তির ও চিন্তাশক্তির কতটা উন্নতি

বেতারে নিপুণতা (বেতারে নিপুণতার পরীক্ষা দেবার পর ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতার বিভাগে ভর্ত্তি হবার অনুমতি পেয়েছেন)

জড় পদার্থ বিদ্যার উৎকর্ষতা (জড়পদার্থ বিদ্যার উৎকর্ষতার পরীক্ষা দেবার পর ইনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জড়-বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি হবার অনুমতি পেয়েছেন)

চিন্তাশক্তির পরীক্ষা (চিন্তাশক্তির উৎকর্ষতা পরীক্ষা দেবার পর ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে ভর্ত্তি হবার অনুমতি পেয়েছেন)

অঙ্কশাস্ত্রে নিপুণতা (অঙ্কশাস্ত্রে নিপুণতা সিদ্ধান্ত হ'বার পর ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ত্তবিভাগে ভর্ত্তি হবার অনুমতি পেয়েছেন)

হয়েছে তা' নিরূপণ ক'রবার একটি সুন্দর উপায় কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিলিত হয়ে উদ্ভাবিত করেছেন। তাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতা পরীক্ষা ক'রবার জন্য তাদের কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। যদি বুদ্ধির মাপকাটিতে নিরূপিত সময়ের
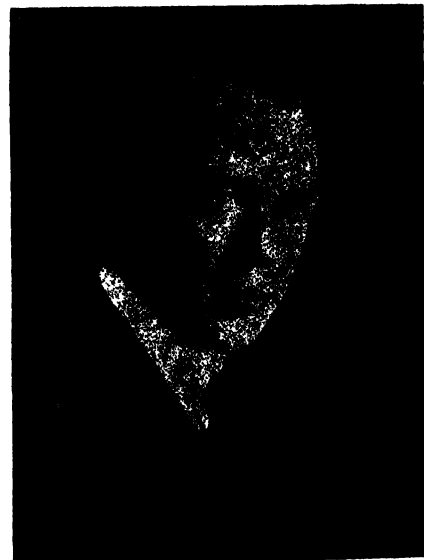
মধ্যে উত্তর পাওয়া যায়, তবেই সেই ছাত্র উচ্চ বিদ্যালাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। অনেক সময় কেবল তাদের চিন্তাশক্তি দেখেও তাদের উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হয়।

কীটের ছল (কীট নিজের জীবনকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা ক'রবার জন্য নিজের গাত্রের বর্ণ বৃক্ষকাণ্ডের মতো ক'রে বৃক্ষকাণ্ডে নিজেকে লুক্কায়িত রেখেছে)

পতঙ্গের ছলনা (পতঙ্গ শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য নিজের গাত্রের বর্ণ বৃক্ষপত্রের মতো তৈয়ারী করে নিজেকে তার মধ্যে লুক্কায়িত রেখেছে)
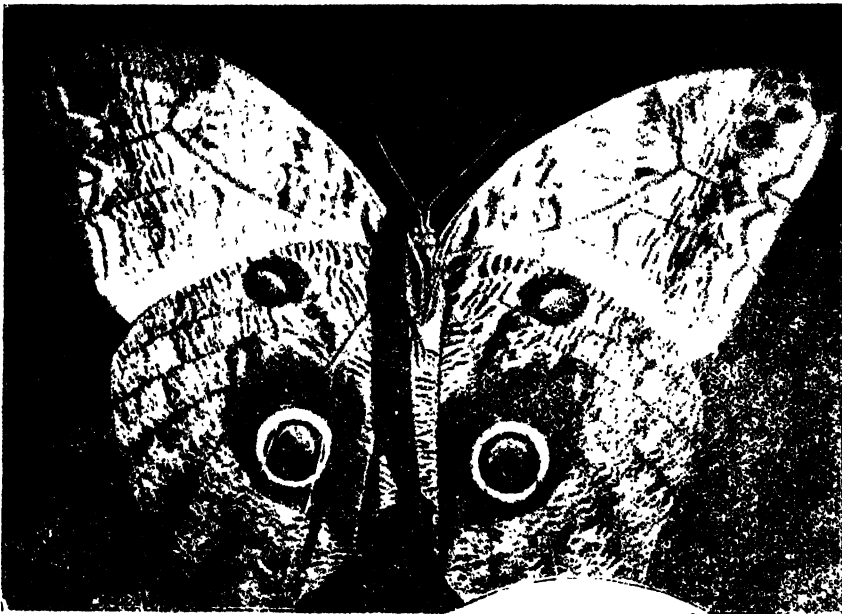
প্রজাপতির কারচুপি (পেচকের নিকট হতে আত্মরক্ষা ক'রবার জন্য প্রজাপতি নিজের ডানার উপর কৃত্রিম চোক তৈয়ারী ক'রে ডানাটিকে পেচকের মুখের মতো তৈয়ারী ক'রে রেখেছে)

প্রকৃতির ছল

অসহায় দুর্ব্বল ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে শত্রুর করাল কবল হ'তে রক্ষা করবার জন্য প্রকৃতি অনেক প্রকার ছলনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছেন। তিনি ঐ সকল প্রাণীর কাহারও গাত্রের বর্ণ বৃক্ষকাণ্ডের মতো, আবার কাহারও বা শুষ্ক বৃক্ষ-শাখার মতো ক'রে রেখেছেন। সুতরাং তারা নিজেদের গাত্রের বর্ণ বৃক্ষপত্র, বৃক্ষ-কাণ্ড বা শাখার সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে থেকে শত্রুর শ্যেন-দৃষ্টিকে অনায়াসে ফাঁকি দিতে পারে।

পতঙ্গের কারচুপি (পতঙ্গ বৃক্ষশাখার মতো নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গায়ের বর্ণ তৈয়ারী করে একেবারে নিখুঁতভাবে তার ভিতরে লুকিয়ে আছে)

জ্ঞানের আলোক

প্রসিদ্ধ ভাস্কর আরন্যালডো জোসি (Arnaldo Jocehi) তাঁর স্বহস্তরচিত এক সুন্দর ভাস্কর্য্য দ্বারা কলম্বাসের (Columbus) অমরত্বকে আরও গৌরবান্বিত ক'রে দিয়ে গেছেন। কলম্বাসের প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশে বিজ্ঞানের একটি কল্পিত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে তিনি জগৎকে দেখিয়ে গেছেন যে, কলম্বাসের পুরুষকারের নিকট বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে হাসিমুখে বর্ত্তিকা ধরে তাঁকে ধীরে ধীরে সুদূরের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রাণীতত্ত্ব-বিজ্ঞানে নারী

লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেকার প্রাচীন যুগের প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রবার জন্য একজন নারী বৈজ্ঞানিক অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রছেন। সম্প্রতি একটী তৈলের খনি খনন ক'রতে ক'রতে কতকগুলি প্রস্তরীভূত প্রাণীর অস্থি পাওয়া গেছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এইগুলিকে বহু প্রাচীনকালের বলে সনাক্ত ক'রেছেন। এই নারী বৈজ্ঞানিক এখন এইগুলির পরীক্ষা ক'রছেন।

(জ্ঞানের আলোক (কলম্বাসের প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশে একটি নারী-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে)

প্রাণীতত্ত্ব বিভাগে নারী (নারী বৈজ্ঞানিক প্রস্তরীভূত [illegible])
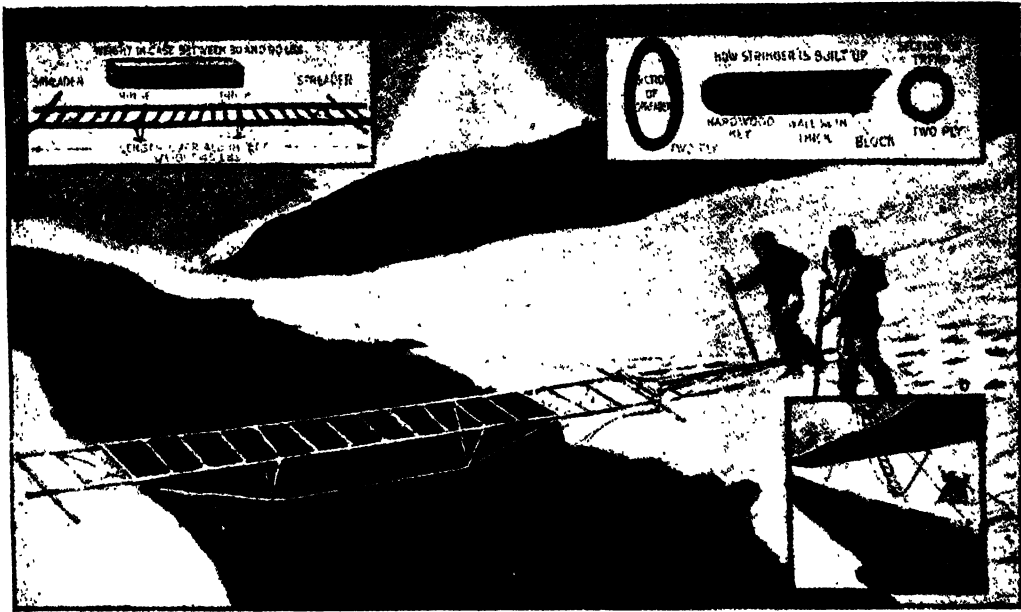
গৌরীশৃঙ্গে অভিযান (বৃহৎ বৃহৎ গর্ত্ত পার হবার সময়কার একখানি চিত্র)

মরণের দ্বারে অভ্রভেদী গৌরী শৃঙ্গের নিকটবর্ত্তী একটি শৃঙ্গের উপর "ক" চিহ্নিত স্থানে বৈজ্ঞানিকগণ উপনীত হয়ে বিশ্রাম ক'রছেন)

গৌরীশৃঙ্গে অভিযান

গৌরীশৃঙ্গে অভিযান ক'রে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ নিজেদের জ্ঞান-প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এই অভিযানে তাঁদের জীবন কিরূপ বিপন্ন হয়েছিল, তা' শুনলে দেহ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। তাঁরা অভিযানে কৃতকার্য্য না হলেও গৌরীশৃঙ্গের এত নিকটে গিয়েছিলেন যে, তাঁরা ভিন্ন আজ পর্য্যন্ত আর কেহই ততদূর উঠতে পারেন নি। এই অভিযানের প্রধান উদ্যোগী কয়েকজন নেতা এই চেষ্টায় তাঁদের প্রাণ হারিয়েছেন।

দেহজাত বৈদ্যুতিক শক্তি

সম্প্রতি কয়েকজন বৈজ্ঞানিক একটি তথ্য আবিষ্কার ক'রেছেন যে, মানুষের হৃৎপিণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ক'রে সেই বৈদ্যুতিক শক্তি মানবের শরীরে সঞ্চারিত করে। পরীক্ষা দ্বারা এই তথ্য সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য তাঁরাএকটি খুব সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণ করেছেন, যেটী মানবের শরীরে বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার নির্দ্দেশ করে। এমন কি এই যন্ত্রের দ্বারা হৃৎপিণ্ডে ও দেহের অপরাপর কোনও অংশে কণামাত্র তাড়িৎশক্তি উৎপাদিত হ'চ্ছে কি না তা'ও নিরূপণ ক'রা যেতে পারে।

দেহজাত বৈদ্যুতিক শক্তি (বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আরম্ভ করবার পূর্ব্বে যন্ত্রটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখ্‌ছেন)
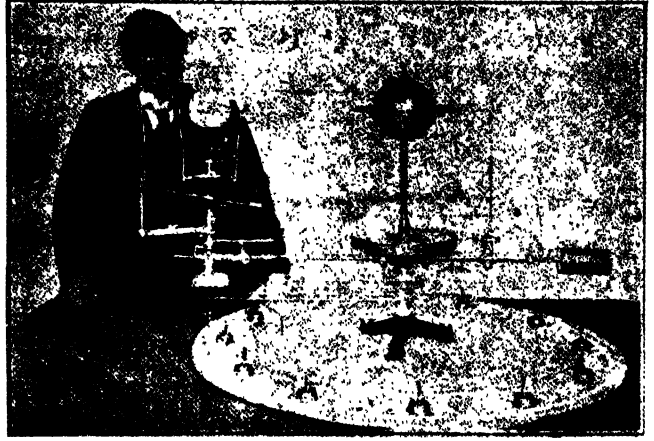
কৃত্রিম সৌরজগৎ (বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কৃত্রিম সৌরজগৎ নির্ম্মাণ করে, সেটিকে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ছেন)

কৃত্রিম সৌরজগৎ

বিদ্যালয়ে বালকদের সৌরজগৎ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার সময়ে চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থিতি ও তাদের পথ নিরূপণ এবং চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্য্যগ্রহণ প্রভৃতির কারণ নির্দ্দেশ ক'রতে গেলে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞান কল্পনার বিষয় নয়। সম্প্রতি London বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এই সমস্যার সমাধান ক'রেছেন। তিনি একটি কৃত্রিম সৌরজগৎ তৈরী ক'রে বালকগণকে ভূগোলের মতো সেইটি দেখিয়ে শিক্ষা দেন। আমাদের দেশের বালকগণকে সৌরজগৎ সম্বন্ধে এই ভাবেই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

চীনামাটীর সেতু

চীনামাটীর সেতু

দক্ষ শিল্পী চীনবাসীরা একটি চীনামাটীর সেতু তৈরী ক'রে তাদের নিপুণ শিল্প-কার্য্যের অদ্ভুত পরিচয় দিয়েছে। সেতুটীর আগাগোড়া সমস্তই চীনামাটীর তৈরী, কোথাও লৌহ বা কাঠের চিহ্ন নাই, অথচ এটি এত সুন্দর ও বৃহৎ যে, শীঘ্রই চীনের প্রাকারের মতো এই সেতুটীও পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্যরূপে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রবে।

বেতারে দিঙ্‌ নির্ণয়

সমুদ্রবক্ষে জাহাজের দিঙ্‌নির্ণয়-যন্ত্রটী যদি দৈবাৎ নষ্ট হয়ে যায়, তাহ'লে জাহাজ আর দিঙ্‌নির্ণয় ক'রতে না পেরে বিপথে চালিত হয়। ইহাতে অনেক সময় জাহাজের জলমগ্ন হ'বার সম্ভাবনা আছে। এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্ত মার্কনি সাহেব একটি সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করেছেন। জাহাজের বেতার-যন্ত্র থেকেই যাতে জাহাজ ঠিক দিঙ্‌নির্ণয় ক'রতে পারে, তিনি তা'রই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জাহাজের চারিদিকে চারিটি aerial থাকে। বিপদের সময় বেতারে চারিদিকে বার্ত্তা

প্রেরণ ক'রলে চারিদিক থেকেই তার উত্তর আসে এবং যে দিকের aerial থেকে বার্ত্তার উত্তর খুব উচ্চে ধ্বনিত হয়, সেই দিকের নিকটেই কোনও দেশ আছে তা' অনুমান ক'রে জাহাজ সেই দিকে নির্ভয়ে অগ্রসর হতে পারে।
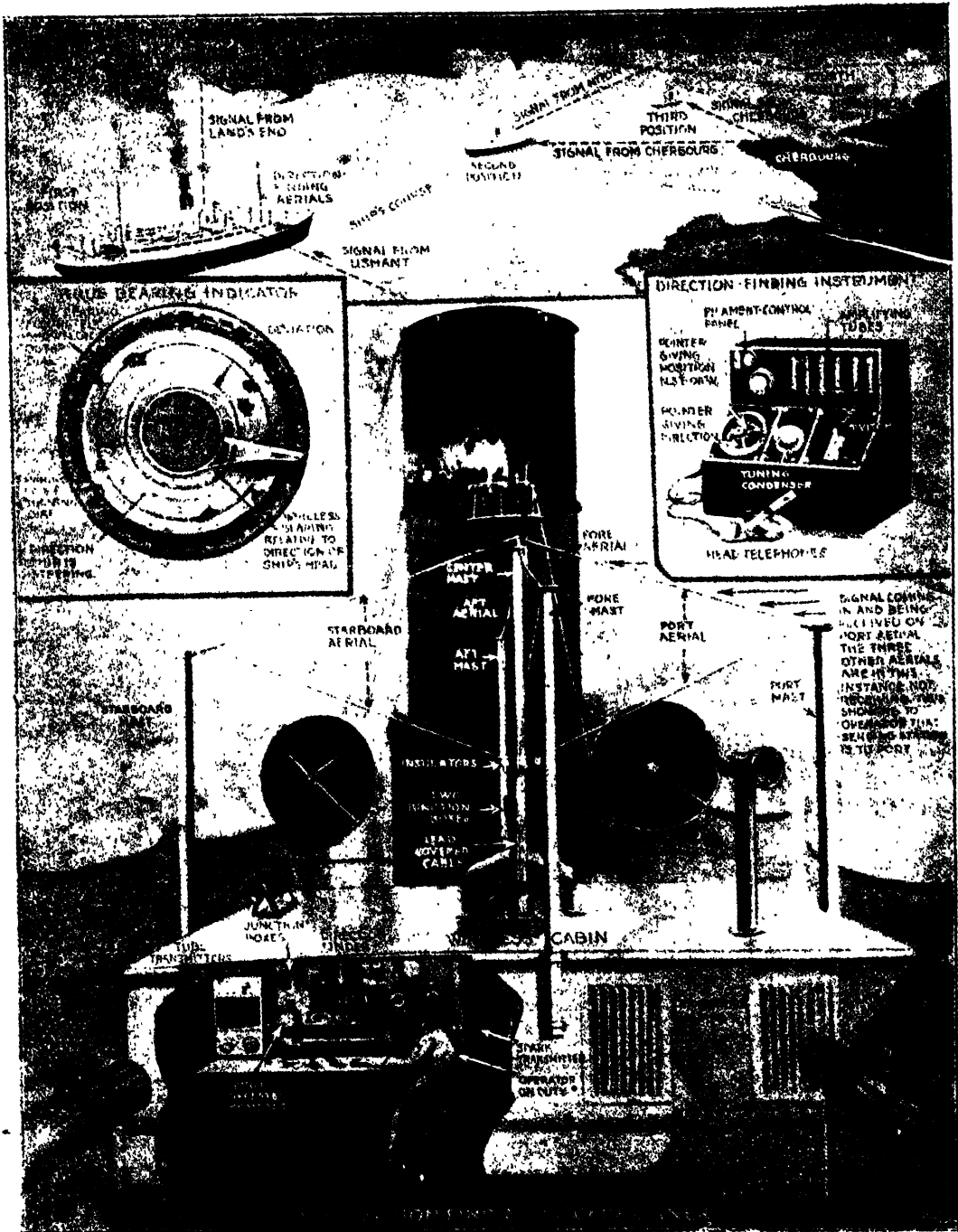
বেতারে দিঙ্ নির্ণয় (জাহাজ বেতার-বার্ত্তা গ্রহণ ক'রবার পর দিঙ্ নির্ণয় ক'রছে) True Bearing indicator দিঙ্ নির্ণয় ক'রবার যন্ত্র। বেতার কেবিন। বেতার কেবিনের ভিতরকার দৃশ্য।

বেতার ও মানুষ

মানুষের দেহের সঙ্গেও যে বেতারের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তা' Dr. Clawson Barnett তাঁর পরীক্ষাগারে বহুকাল ধরে ক্রমাগত পরীক্ষার পর স্থির ক'রেছেন। তিনি বলেন যে, রেডিওফোণ যেরূপ বৈদ্যুতিক শক্তির তরঙ্গে সাড়া দেয়, সেইরূপ মানুষের দেহও বেতার-তরঙ্গে সাড়া দেয়। তিনি এই ব্যাপারটি তাঁর নবোদ্ভাবিত Oscilloclast যন্ত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বেতার ও মানুষ (Barnett সাহেব পরীক্ষাগারে তাঁর নবোদ্ভাবিত যন্ত্রের পরীক্ষা ক'রছেন)

রক্তের টান

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

সে ছিল নেশাখোর, চোর, বদমাইস! তার মতন নেশা করতে তাদের দলে কেউ পারত না। চুরী করতে সে ছিল সিদ্ধহস্ত, বদমাইসিতে সকলের ওস্তাদ। নাম তার হারু। বাপ-মায়ের আদরের শ্রীমান হারাধন, সর্ব্বস্ব হারিয়ে এখন শুধু "হেরো"। পৈতাগাছটা যদিও এখন তার গলায় নাই, আর চেহারাটাতে যথেষ্ট রুক্ষতা মাখানো, কিন্তু সে যে ঐ পটলডাঙ্গার বড় বাড়ীর মুখুজ্যেদের একমাত্র বংশধর "সবেধন নিলমণি" "হারু"—এ পরিচয় কাহাকেও বলে দিতে হয় না। ঐ অত বড় বাড়ীখানা এখন আর তার নয়, দেনার দায়ে বিক্রি হয়েছে। সরকার, দেওয়ান, চাকর—সবাই চলে গেছে। বাড়ীর বিধবা গিন্নি—হারুর মা, রোগে শোকে সে বছর মারা গেছেন। বাড়ীর বৌ—একটী ১৯ বছরের পরীর মত মেয়ে,—নিরাভরণ অঙ্গে স্বামীর দেওয়া কালসিঠার দাগ, মনে দুঃখ, চ'খে অশ্রু, এই সব নিয়ে দু'বছরের ছেলেটির হাত ধ'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেছে! আছে কেবল এই সকলের মালিক শ্রীমান হারু, এতখানি পরিবর্ত্তনের মাঝেও আপনার নিশ্চিন্ততা নিয়ে পথে পথে!

রাত তখন প্রায় ১২টা! টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে; পথে লোক-চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেছে। চোরবাগানের একটা সরু অন্ধকার দুর্গন্ধে-ভরা গলির মধ্যে একটা খোলার বাড়ীর দরজায় ঘা দিতে দিতে একটা লোক চাপা গলায় ডাকলো—"গদা—গদা!"

"কে?"

"আমি হারু—দরজা খোল্।"

যে দরজা খুলে দিল, সে হচ্ছে একজন মোটা, খর্ব্বাকৃতি কালো স্ত্রীলোক। হাতে ছিল তার একটা কেরোসিনের ডিবে, পরনে রামধনু-রংয়ের ছোপান সাড়ি। হারুকে দেখে স্ত্রীলোকটা তার মিশি-দেওয়া কাল দাঁতগুলো বার ক'রে, একটু ভঙ্গী ক'রে হেসে বল্লে "এই যে—এগো!... কিছু হ'ল শিকার?" হারু সে কথার কোন জবাব না দিয়ে, তার পাশ কাটিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে, খুব জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে হাঁপাতে লাগ্‌লো। তার পর আলোয়ানের মধ্য থেকে বার করলে চেইন-সমেত একটা সোণার ঘড়ি ও একটা "মণি-ব্যাগ"। দুটো লোক একটু দূরে একটা

ছেঁড়া মাহুরের ওপর বোসে মদ খাচ্ছিলো। তারা লাফিয়ে উঠে হারুকে জড়িয়ে ধরে বল্লে, "মাইরি হেরো, তোর জন্যই বেঁচে আছি বাবা!" হারু তাদের বিরক্ত ভাবে ঠেলে দিয়ে বল্লে, "সর্ সর্, একটু জিরুতে দে, আজ বড্ড পরিশ্রম হয়েছে—মাইরি!" যে দুটো লোক হারুকে জড়িয়ে ধরেছিল, তাদের একজনের নাম "রমজান", বয়েস প্রায় ৪০। দেখতে খুব বেঁটে, দস্তুর মতন জোয়ান। কাল চোখ দুটো ছোট। মাথায় সামনের দিকটায় ঘোড়ার জুলফির মত একথাবা চুল। অপরটীর নাম "গদা", দেখতে কতকটা কাফ্রিদের মত চেহারা—নাকটা থাঁদা, ঠোঁট দুটো পুরু ভাঁটার মত, মদের নেশায় রক্তবর্ণ। রমজান হারুর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে, ছেঁড়া মাহুরটার ওপর বসিয়ে, মদের বোতলটা হাতে করতেই, হারু তার হাত থেকে বোতলটা নিয়ে ঢক ঢক ক'রে খানিকটা মদ এক নিশ্বাসে খেয়ে, সামনের শালপাতার ঠোঙ্গা থেকে দু'খানা পেঁয়াজের ফুলুরী তুলে মুখে ফেলে দিলে। রমজান "মণি-ব্যাগ"টা খুলে বার করলে চারখানা ১০৲ টাকার নোট, কয়েকটা খুচরা টাকা, শিকি, এক আনি আর কয়েকটা পয়সা এবং একখানা কাটাকাপড়ের দোকানের ৮০৸০ দামের সাড়ির দাম বাবদ রসিদ। রমজান ঘাড় তুলে দরজার দিকে চেয়ে বল্লে, "মুন্না, ওস্তাদকে একবার ডেকে দাও, বিলী হ য়ে যাক্।" যে স্ত্রীলোকটা হারুকে দরজা খুলে দিয়েছিল, সে একটু হেসে ভিতরে চ'লে গেল! গদা, হারুর পিঠে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কি করে কাজ হাঁসিল করলে মাষ্টার?"

হারু একখানা ফুলুরী খেতে খেতে বল্লে, "আজ ভারি ঝুঁকি গেছে বাবা! আর একটু হলেই কেলো শালা ধরা পড়ে সব মার্ডার করেছিলো আর কি!" রমজান একটু ব্যস্তভাবে বল্লে "কি রকম?"

"তবে শোন্—লোকটা কাটাকাপড়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে মোড়ের মাথায় ট্রামের জন্য অপেক্ষা কচ্ছিলো। কেলোকে টিপে দিয়ে আমি লোকটার পাশে এসে দাঁড়ালুম। কেলো যেন ব্যস্ত হয়ে কোথাও যাচ্ছিলো, হঠাৎ থেমে লোকটার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "মশায়, দেখুন তো এখন ক'টা বেজেছে?—শিয়ালদায় আমাকে ৯টার ট্রেণ ধরতে হবে—পাব তো? লোকটা তার বুক-পকেট থেকে ঘড়িটা বার ক'রে, গ্যাস-পোষ্টের ধারে একটু স'রে গিয়ে ঘড়ি দেখবার সময়, আমি তার পকেট থেকে "মণিব্যাগটা" সরিয়ে ওদিকের ফুটপাথে যাচ্ছি, এমন সময় কেলো চিলের মত ছোঁ দিয়ে চেইন সমেত ঘড়ি নিয়ে দে ছুট্! লোকটা "চোর" "চোর" ব'লে চেঁচিয়ে উঠতেই দেখ্‌তে-দেখ্‌তে সেখানটাতে অনেক লোক জমে গেল।"

বাধা দিয়ে গদা বল্লে, "যাক্ বাবা, ধরা পড়ে নি ত'?"

"না, তবে আর একটু হ'লেই ধরা প'ড়তো! হঠাৎ মার্কাস স্কোয়ারের মোড়ে আমার সঙ্গে তার দেখা হতেই, সে আমার কাছে ঘড়ি চেইনটা দিয়ে বল্লে তুই যা—আমি যাচ্ছি।...আমরা দেখতে পাইনি যে কাছের খোলার বাড়ীর রোয়াকে একটা পাহারাওয়ালা অন্ধকারে ব'সে ছিলো। তাকে আমাদের দিকে আস্‌তে দেখেই দুজনে দুদিকে দে ছুট্—সে ঢুকলো কলাবাগানের গলিতে আর আমি এঁকে বেঁকে এলুম এখানে।" হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ হ'তেই হারু চুপ্ করলো। গদা উঠে দোরের ফাঁকে উঁকি মেরে বল্লে, "এই যে··· কেলো এসে হাজির।" দরজাটা খুলে দিতেই ভিতরে ঢুকলো ৩০।৩২ বছর বয়সের একটা লোক,—চেহারা কতকটা ভদ্র গোছের। সে কোন কথাবার্ত্তা না ব'লে সটান এসে মাহুরের উপর শুয়ে প'ড়লো। এমন সময় দলের "ওস্তাদ" আব্বাস খলিফা ঘরে ঢুকে বল্লে, "কেলো যে এসেই শুয়ে পড়লো? কি রে কেলো, ব্যাপার কি?" কেলো একটু দম নিয়ে বল্লে, "আর ওস্তাজি আজ এমন তাড়া পেছুনে ক'রেছিল··· বাপ!" রমজান তার হাঁটুর উপর এক চাপড় মেরে বল্লে, সাবাস—নে, এক গ্লাস খা।"

"না! আজ আবার লিবারে ব্যথা ধরেছে।"

"তবে এক ছিলিম গাঁজা খা—সব সেরে যাবে।" গদা তার হাতের তলায় গাঁজা টিপ্‌ছিলো,—কুলুঙ্গির ভিতর থেকে একটা ন্যাকড়া-জড়ানো কল্কে এনে, তাতে আগুন দিয়ে চোখ বুজে কসে দু-চার টান মেরে, সেটা দিল আব্বাসের হাতে। সে গোটাকতক টান দিয়ে দিল রমজানের হাতে। রমজান মাথা বেঁকিয়ে ক'সে এক টান দিয়ে সেটা দিল হারুর হাতে। হারু গাঁজা খেলে না—কল্কেটা কেলোকে দিয়ে বল্লে, "নে—তুই খা।" আব্বাস তখন ভাগ ক'রে টাকা বিলি করতেই হারু বল্লে, "আমায়

আজ সত্তেরো টাকা দিলে চলবে না—কিছু বেশী দিতে হবে।" আব্বাস তার চোখ্‌টা একটু ছোট করে, ঘাড় বেঁকিয়ে হেসে বল্লে, 'নাও না মাষ্টার আজকের মতো—আর এক দিন না হয় বেশী নিও।' হারু সে কথার কোন জবাব না দিয়ে, টাকাগুলো আর মদের বোতলটা পকেটে ক'রে বাইরে আসতেই, কেলোও তার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে রাস্তায় জিজ্ঞেস করলে, "কোথা যাবে মাষ্টার এত রাত্রে—আমি ত ডেরায় চল্লুম!"

"দেখি কোথায় যাই" বলে হারু বরাবর চিৎপুরের রাস্তা ধ'রে চলতে আরম্ভ করলো। তখন প্রায় ১টা কি আরও বেশী বেজে গেছে,—পথে লোক-চলাচল বন্ধ হ'য়ে এসেছে। রাস্তার দু-ধারের বাড়ীগুলো অন্ধকারে মাথা তুলে কালো-পোষাকে-আপাদ-মস্তক-ঢাকা প্রহরীর মত সোজা দাঁড়িয়ে আছে। কোলাহলশূন্য সহরের বড় রাস্তা যেন শোক-সমাচ্ছন্ন নীরবতায় স্তব্ধ—উদাস। মাঝে মাঝে কেবল দু-একখানা "ট্যাক্সি" তার মর্ম্মভেদী শব্দে এই গভীর নীরবতা ভঙ্গ ক'রে ঘুমন্ত সহরের বুকখানার উপর দিয়ে স্বপ্ন-চাঞ্চল্যের মত ত্রস্ত গতিতে ছুটছে। কুমারটুলীর কাছ বরাবর একটা খোলার বাড়ীর কাছে এসে হারু হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল একজন যুবতী স্ত্রীলোক—যেন তখনও পর্য্যন্ত কারো প্রতীক্ষায়! তার সামনে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছিলো। সে আলোকে স্ত্রীলোকটার আহ্বান-কাতর দৃষ্টির ব্যাকুলতা বুঝতে পেরে, হারু একটু তার কাছে সরে এসে জড়িত স্বরে বল্লে, "কি বাবা, এখনও দাঁড়িয়ে আছ, তীর্থের কাকের মত?" যুবতী একটু হেসে ঘাড় দুলিয়ে বল্লে "এস না!' তার পর আলোটা মুখের সামনে তুলে ধরলে। হারু কিছুক্ষণ স্ত্রীলোকটার দিকে চেয়ে থেকে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্লে,—"আহা বেচারা···সারাটা রাতই বুঝি পাহারাওলার মত ঘাঁটি আগ্‌লে দাঁড়িয়ে থাকবে!... এই নাও...ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকগে যাও!"—হারুর কাছে যে কয়েকটা টাকা-পয়সা ছিল—মুঠোর ভিতরে নিয়ে হাতখানা স্ত্রীলোকটার দিকে এগিয়ে দিল। রমণীকে তার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল করে চেয়ে থাকতে দেখে হারু একটু বিরক্ত ভাবে বল্লে, "যা ব'ল্‌ছি শোন...হাত পাত না ছাই!' স্ত্রীলোকটা একটা কথাও কইলে না, মাটির দিকে চেয়ে রইল। আর কে যেন জোর ক'রে তার হাতখানা হারুর সাম্‌নে এগিয়ে ধরলে। হারু তার হাতের মধ্যে টাকা-পয়সাগুলো গুঁজে দিয়ে টল্‌তে টলতে চলে গেল।

(২)

কেলোর আজ ৭ দিন জ্বর। "বসন্তে" তার গা ভ'রে গেছে! সে একখানা খোলার বাড়ীর একটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে, মাটিতে মাদুরের ওপর পড়ে আছে। চারদিকে মাছি ভন্‌ভন্ কচ্ছে, একটা বিশ্রী গন্ধে ঘরখানা ভ'রে রয়েছে; আর তার পাশে চুপ ক'রে বোসে বাতাস কচ্ছে হারু! কেলো একবার কাসতেই তার মুখ দিয়ে খানিকটা রক্তের চাপ উঠলো! হারু তাড়াতাড়ি একখানা ছেঁড়া গামছা দিয়ে কেলোর মুখখানা মুছিয়ে দিয়ে বল্লে, 'হ্যাঁরে, শরীরটা তোর বড্ডই কেমন কচ্ছে, নয়?—আমি একটা ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি!" কেলো হারুর দিকে মুখটা ফিরিয়ে ক্ষীণ স্বরে বল্লে, "আর ডাক্তার!···আমার হয়ে এসেছে রে...বোধ হয় আজই...আমার নিশ্বেস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে যে হেরো!"

"দূর—জ্বরের জন্য অমন হচ্ছে। গায়ে সব বেরিয়ে গেছে—আর ভয় নেই।" কেলো উদাস দৃষ্টিতে হারুর দিকে চেয়ে বল্লে,—"যাক্, তার জন্য ভাবি না...তবে তুই একা"...

হারু একটু রেগে বল্লে, "ছাখ্, তুই যদি বক্ বক করবি, তা'হলে আমি এই চল্লুম—থাক্ তুই একা পড়ে।" হারু তার হাতের পাখাখানা ফেলে দিতেই, কেলো হাসবার ভঙ্গীতে মুখখানা বিকৃত করে বল্লে, "সে তুই কিছুতেই পারবি না হেরো—এ আমি বেশ জানি! জ্বর হওয়া থেকে সুরু ক'রে আজ'তক রাতদিন আমার পাশে ব'সে আছিস,—নিজে পয়সা খরচ ক'রে পথ্যি যোগাড় কচ্ছিস...চলে কি আর যেতে পারবি আমায় ফেলে"—কেলোর চোখ দুটো দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

"আবার লেকচার? এবার ভাল হ'লে তোকে গোল-দীঘিতে দাঁড় করিয়ে দোব!' কেলোর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিয়ে চোখের নিমেষে মিলিয়ে গেল! একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কেলো বল্লে, "শোন্ হেরো, তোকে একটা কথা আজ আমি বলে যাই—আমি ত ম'রে

রেহাই পেলুম, কেউ আর আমার জন্যে বোধ করি কাঁদবে না···কিন্তু তুই আর রেমোদের দলে মিশিস্ নে ভাই...ওরা অতি ছোট লোক্—স্থাখ, তুই কি ছিলি আর কি হয়েছিস। ...কোথায় গেল তোর বাড়ী-ঘর...কোথায় মাগ্ ছেলে...” কেলো আর বল্‌তে পারলে না—হাঁপাতে লাগলো !

“ফের বক্‌বক্ কচ্ছিস্ !—থাক্ তুই প'ড়ে, আমি চল্লুম” ব'লে হারু সত্যাই ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। কিন্তু তার পা আর চলে না, যেন অবশ হ'য়ে গেছে। সে আজ আশ্চর্য্য হয়ে গেল—এ তার হ'লো কি! আজ কোথা হ'তে বিশ্বের সমস্ত দুঃখ একসঙ্গে দল বেঁধে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এত দিন শত বিপদে, সহস্র দৈন্যের মাঝেও সে আপনাকে অটল রেখেছিল; কিন্তু আজ!—একজন বর্ষিয়সী স্ত্রীলোককে পাশের গলি থেকে বেরুতে দেখে, হারু তাকে বল্লে, “মাসি, কেলোর অবস্থাটা যেন কেমন-কেমন লাগছে—আমি গদাকে চট্ ক'রে একটা খবর দিয়ে আসি—তুমি একটু কেলোর কাছে বোস্‌বে?” স্ত্রীলোকটা বিরক্ত ভাবে বল্লে, “আমার বাছা”···হারু বাধা দিয়ে বল্লে, “একটুখানি বোসো মাসি—আমি ঝাঁ ক'রে এলুম ব'লে···আর এই নাও এই টাকাটা, তোমার নাতি সেদিন সন্দেশ খেতে চেয়েছিল···কিনে দিও।” স্ত্রীলোকটী এবার হেসে টাকাটা নিয়ে বল্লে, “বোসবো বই কি বাবা—তা একটু শিগ্‌গির ক'রে এসো যেন।···ছেলেটাকে একা ফেলে এসেছি কি না”···হারু যেতে যেতে বল্লে, “এই এলুম বোলে”—* * * * *

হারু চ'লেছে উদাস, অন্যমনস্ক ভাবে। একটা কানা লাঠিতে ভর দিয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে ধীরে ধীরে যাচ্ছিলো,—হারুর গায়ে ধাক্কা লেগে লোকটা প'ড়ে যাবার উপক্রম হ'তেই, হারু তাকে ধ'রে ফেল্লে। পকেট থেকে একটা শিকি বার ক'রে তার হাতে দিয়ে বল্লে, “কিছু মনে কোরো না বাপু—হঠাৎ লেগে গেছে!” কানাটা শিকি হাতে ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলে, “এটা কি বাবু—দিলে যা”···“একটা শিকি” ব'লে হারু চ'লে গেল। কিছু দুর এসে হারুর পা যেখানে অচল হ'য়ে থম্‌কে দাঁড়ালো, সে হচ্ছে একটা মদের দোকান। হারু একবার কি ভাবলে। তার পর দোকানে ঢুকে এক বোতল মদ কিনে, একটা খালি বেঞ্চের এক কোণে বোসে মদ খেতে লাগলো। পাশেই, আর এক-খানা বেঞ্চের উপর কতকগুলো ইতর মাতাল বোসে ছোলা আর চাল-ভাজা খেতে খেতে বিকৃত স্বরে চীৎকার ক'রে মাথা ঝাঁকিয়ে গান গাচ্ছিলো “বন্ বন্ চুড়ি সখিয়া রে কাঁহা গৈলে···হোঃ-হো...” হারু তার রক্তবর্ণ চক্ষু তুলে জড়িত স্বরে বল্লে, “এই চোপ্‌রাও, ড্যাম, ব্লাড়ি...!” একটা মাতাল তার ঢুলঢুলো চোখ দুটো অতি কষ্টে বিস্ফারিত ক'রে, ছেঁড়া জামার হাতায় তার গোঁপে-ঢাকা থুথু-ভরা মুখখানা মুছে উত্তর করলে, “কেন বাবা চুপ ক'রবো? তুমি কি লাট-সাহেব এলে?” হারু মদের বোতলটা শূন্যে তুলে চেঁচিয়ে বল্লে, “আলবৎ—চুপ”—তার পর টপ্ ক'রে বেঞ্চের ওপর উঠে, জামার আস্তিনটা গুটিয়ে হাত নেড়ে বল্লে, “আমি বোল্‌ছি চুপ,...শোন্”...সকলে বিস্ময়-আতঙ্কে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে হারুর দিকে চেয়ে রইল। হারু অঙ্গভঙ্গী ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লো “এই শোন্, তোদের আমি ভালবাসি...কেন জানিস্? তোরা গরীব বো'লে'!...ভালবাসা কি?...সে হচ্ছে...হচ্ছে...কিছু না...সে হচ্ছে কেবল একজনের মন ভাল ক'রে বোঝা... চেনা...দেখা!...কিন্তু কেউ বাবা মন দেখে না...সুধু ওপরটা দেখেই বিচার করে...বুঝলি...এই ত দুনিয়া!”—মাতালগুলো হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌তেই, হারু বেঞ্চি থেকে নেমে বল্লে, “দূর, যত সব ছোটলোক,—মুখ্যুর দল, একটা ক্ল্যাপ পর্য্যন্ত দিলি নে”...মদের বোতলটা পকেটে রেখে হারু দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে আবার চল্‌তে লাগ্‌লো। কিছু দুর এসে হারু একটা সরু গলিতে ঢুকে, একটা মারবেল-পাথর-বাঁধানো একতলা ছোট্ট বাড়ীর দালানে উঠে, নত হ'য়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে, মাথা ঠুকে বল্লে, “মা শীতলা, তোমাকে জোড়া পাঁঠা দোব বাবা... দোহাই তোমার—কেলোকে ভালো ক'রে দাও!” একটা লোক একখানা “নামাবলি” গায়ে দিয়ে সেখানে বোসে ছিল, হারুর দিকে চেয়ে সে একটু হাসলে।

“ঠাকুর, এই টাকাটা নাও, মাকে ডাব-চিনি দিয়ে পূজো দিও···আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই, আমি চল্লুম” বলে হারু ঝন্ করে টাকাটা ফেলে দিতেই, ঠাকুর সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বল্লে, “একটু চন্নামেত্ত নেবেন না?”

—“চন্নামেত্ত—হ্যাঁ দিন্···তবে নি' কি করে?··· যায়গা আনি নি তো।”

"একটা পাত্তর-টাত্তর কিছু আনেন্ নি ?"

"নাঃ...আচ্ছা, একটু জল দিতে পারেন আমায়—

"খাবেন ?"

"না কাজ আছে।"

"ও দিক্‌টা যান...ওখানে কলতলা—"

হারু কলতলায় চৌবাচ্ছার কাছে গিয়ে একবার এদিক ওদিক চাইলে। তার পর পকেট থেকে মদের বোতলটা বার ক'রে, নর্দ্দমার ভিতর বোতলের অবশিষ্ট মদটা ঢেলে ফেলে, বোতলটা ভাল ক'রে ধুয়ে নিয়ে, ঠাকুরের কাছে এসে বল্লে, এই এতে দিন···তাতে আর দোষ কি···কি বলেন···হ্যাঁ।..."

পূজারী ঠাকুর হারুর মুখের দিকে একবার চেয়ে তামার বাটি থেকে খানিকটা "চন্নামৃত" বোতলটাতে ঢেলে দিলে। হারু হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে ৺শীতলাকে প্রণাম ক'রে পূজারীকে বল্লে "এখন চল্লুম মশায়—পূজাটা দেবেন কিন্তু···ভুলবেন না।"

হাতিবাগানের মোড়ের বাঁক ফিরতেই হারু দেখলে, তার পরিচিত বদন ডাক্তার গাড়ীতে উঠছে। হারু তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে বল্লে, "ডাক্তারবাবু, একবার চলুন ত···আমার এক বন্ধুর ভয়ানক জ্বর হ'য়েছে...ভারি ছট্‌ফট্ করছে।" বদন ডাক্তার একটু বিরক্ত ভাবে বল্লে, "আমার এখন সময় হবে না...আমি একটা urgent callএ (জরুরী ডাক) যাচ্ছি। address (ঠিকানা) দিয়ে যাও, ফেরবার পথে দেখে আসব'খন।" হারু একটু বিরক্ত ভাবে বল্লে, "চলুন না মশাই—fee (দর্শনি) পাবেন এখন···এটাও খুব জরুরী Case (রোগী)।"

"রোগী কোথায় ?"

"এই কাছেই...শোভাবাজার।"

"আচ্ছা···আমার Caseও (রোগী) ওই quarterএ মহল্লায়)···তা হ'লে এস" ব'লে ডাক্তারবাবু গাড়ীতে উঠ্‌লে পর হারুও উঠ্‌লো। ডাক্তারবাবু গাড়ীর ভিতর থেকে বল্লেন, "চলো শোভাবাজার"... * * *

গাড়ীখানা একটা সরু গলির মুখে আসতেই, হারু চেঁচিয়ে বল্লে, "এই রোথ্‌থ !" হারুর সঙ্গে বদন ডাক্তার কেলোর ঘরে ঢুকেই খানিক্‌টা পেছিয়ে একেবারে দরজার কাছে স'রে গিয়ে বল্লে, "এর যে দেখ্‌ছি Small Pox ···Virulent type !" পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে ডাক্তার তাঁর নাকে চাপা দিলেন। হারু সে কথার কোন জবাব না দিয়ে, কেলোর গায়ের কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে বল্লে "গায়ে খুব বেরিয়েছে—দেখ্‌ছেন !"

বদন ডাক্তার কেলোর ফুলো মুখ,—সমস্ত গা-ময় বড় বড় বসন্তের ফোস্কা দেখেই, ঘর থেকে তখন আস্তে আস্তে রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছেন !

"জল···একটু জল্···পালা, পালা হেরো···ঐ আস্‌ছে ···আঃ···আঃ—" কেলোর তখন ঘোর বিকার ! হারু তাড়াতাড়ি মেটে ভাঁড় থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে কেলোর মুখের কাছে নিয়েই, আবার সেটা সরিয়ে নিয়ে, জলটা ফেলে দিয়ে, পকেট থেকে বোতলটা বার ক'রে খানিকটা চন্নামৃত ঢেলে কেলোকে ডাক্‌লে। কেলো একবার পাগলের মত উদাস দৃষ্টিতে চাইতেই, হারু খুব জোরে জোরে বল্লে, "এই নে মায়ের চন্নামেত্ত এনেছি··· ভক্তি ক'রে খা, সব সেরে যাবে···এই যে—আসুন ডাক্তার বাবু—এইবার দেখুন···তাকিয়েছে···হাঁ কর না শালা"— হারু কেলোর মুখের ভিতর খানিকটা চন্নামৃত ঢেলে দিতেই, থক্ থক্—গোঁ—গোঁ শব্দ করে কেলো দু-তিনবার তার মাথাটা ঝাঁকালো। তার মুখের দু'পাশ দিয়ে চন্নামৃত গড়িয়ে পড়্‌লো,—তার চোখ দুটো কপালে উঠে গেল।

"ডাক্তারবাবু···ডাক্তারবাবু"...পেছন ফিরে হারু সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে, সেখানে তখন কেউ নেই ! দুঃখে, রাগে হারু দাঁতের ওপর দাঁত রেখে চেঁচিয়ে বল্লে, "শালা আবার ডাক্তার ! রুগী দেখে ভয়ে পালায়··· এবার দেখ্‌তে পেলে তোর ভুঁড়ি যদি না ফাঁসাই বদ্‌না, তবে আমার নাম হারুই নয়।···ওরে কেলো··· কেলো···জল খাবি ?"···কেলো চেয়ে আছে অথচ কোন সাড়া দিচ্ছে না দেখে, হারু তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লে, দীপ্তিহীন ঘোলাটে একটা পরদা কেলোর দৃষ্টিকে চিররুদ্ধ করে ছেয়ে প'ড়েছে ! হারু কেলোর নাকে হাত দিয়ে বুঝ্‌লে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে ! আস্তে আস্তে তার কপালে হাত দিয়ে অনুভব করলে—শরীর হিম-শীতল,—কেলো নাই ! হারু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে কেলোর পাণ্ডুর মলিন মুখের দিকে স্থির

দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো, আর তার দুই চোখ বেয়ে ঝর ঝর ক'রে জল পড়তে লাগলো ! !

(৩)

অনেক কষ্টে মাত্র জনচারেক লোক জুটিয়ে, হারু যখন কেলোর শব বহন ক'রে নিমতলার শ্মশানে এসে পৌঁছল, তখন রাত প্রায় এগারটা। "বল হরি হরিবোল" ব'লে খাটটা নামিয়ে হারু একখানা দশ টাকার নোট গদার হাতে দিয়ে বল্লে, "এই নে—যা কিছু দরকার সব কিনে কেটে নিয়ে আয়।" গদা একটু বিরক্ত ভাবে বল্লে, "সবুর কর বাপু, একটু জিরিয়ে নি। এক টান গাঁজা না টেনে আর কিছু কত্তে পারব না, গা গতর সব বিষিয়ে গেছে।" হারু তার ট্যাঁক থেকে কাগজে-মোড়া একটা ছোট্ট মোড়ক দিয়ে বল্লে, "নে—তাহ'লে আর বেশী দেরী করিস না...ওই দিক্‌টাতে গিয়ে সাজ, আমি যাচ্ছি..."

অদূরে কতকগুলি লোক একটি বছর চব্বিশ বয়সের মেয়ের শব চিতায় তুলে দিচ্ছিল। তার সর্ব্বাঙ্গ ফুল দিয়ে সাজানো, মাথায় একরাশ সিঁদুর। কাঠের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে টক্‌টকে আলতা-পরানো পা দুখানা ও লাল চওড়া-পেড়ে সাড়ির একাংশ! হারুর দৃষ্টি সেই দিকে পড়তেই, সে এগিয়ে এসে শবের মুখের পানে চেয়েই শিউরে উঠলো। তার পর কিছুক্ষণ জলন্ত চিতার পানে পলকহীন চোখে চেয়ে রইল। এমনি একখানা মুখ—করুণ, ম্লান! কমলা... কমলা...সেই বিদায়ের বেলা...দু' বছরের ছেলেটির হাত ধ'রে...হারু একটা নিশ্বাস ফেলে বাইরে বেরিয়ে এল! হারুর এই চম্‌কে উঠে পেছিয়ে যাওয়া গদা নজর করেছিল। তাই হারুকে সে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "মড়াটা দেখে অমন চম্‌কে উঠলি কেন রে হেরো?" হারু মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল "ওকে দেখতে ঠিক আমার পরিবারের মত!" গদা হেসে বল্লে, "তাহ'লে মাগের জন্যে তোর এখনো মন-কেমন করে?" হারু এ কথার কোন জবাব না দিয়ে, রেজিষ্ট্রারের ঘরে এসে এক পাশে দাঁড়াল। সেখানে তখন অনেক ভীড়। গদা হারুকে বল্লে, "ঐ বুড়োর লেখান হ'য়ে গেলে তুই যাস্, নইলে আরও দেরী করতে হবে—আজ দেখ্‌ছি মরসুম পড়েছে!" কথাগুলো হারুর কাণে গেল কি না কে জানে—সে তখন পেরেকে-আঁটা মাটির পুতুলের মতন দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার দৃষ্টি উদাস। গদা একটু হেসে বল্লে, "তোর যে দেখ্‌ছি একেবারে ভাব লাগ্‌লো...আচ্ছা, সত্যিই যদি ও তোর পরিবার হ'ত"...বাধা দিয়ে হারু ক্রুদ্ধ স্বরে বল্লে, "থাম্ শালা, মারবো মুখে থাবড়া—মুখ ভেঙ্গে দেব।" হাস্‌তে হাস্‌তে গদা পাশের লোকগুলোকে ধাক্কা দিয়ে স'রে যেতেই, একটা লোক ব'লে উঠল, "মাতলামো করার আর যায়গা পেলে না দেখছি!"

নাকের ডগায় চসমা পরা রেজিষ্ট্রার বাবু একবার চোখ দুটো কপালে তুলে বল্লেন, "এই, গোল করে কে?...হ্যাঁ, কি বলছিলেন—ক'বছরের ছেলে?" বৃদ্ধ উত্তর দিল "আট বছর।"

"কি হয়েছিল?"

"টাইফয়েড্ ফিবার—এই নিন সার্টিফিকেট..."

"...আজ কাল বড্ড টাইফয়েডে মরছে...যাক্—বাপের নাম?"

"হারাধন মুখুজ্যে।"

শব্দটা তীরের মতন হারুর কাণে বিঁধতেই, সে শিউরে উঠলো। মুহূর্ত্তের মধ্যে তার উদাস দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হ'য়ে ব্যাকুল কাতরতা এবং উদ্বেগের চিহ্ন তার দুই চোখে ফুটে উঠ্‌লো। সে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ লোকটির কাছে গিয়ে একটা কথা বলতে গেল—কিন্তু পারল না। তার বিকৃত কণ্ঠের অস্ফুট শব্দে বৃদ্ধটি হারুর মুখের দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য ভাবে বল্লে "আপনি...আপনার...আপনাকে"—

"নিন্ মশায়, রসিদ নিন...শুনচেন...এইটে নিয়ে যান, কাঠ ফাঠ সব পাবেন ওদিকে।" বৃদ্ধ রসিদ খানা হাতে নিয়ে যখন পেছনে চাইলে,—হারু তখন একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে! সকলে যখন লিখিয়ে চলে গেছে, তখন গদা এসে হারুকে জিজ্ঞাসা করলে, "কি রে, লিখিয়েছিস্?" হারু কোন জবাব দিল না। গদা হারুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বল্লে, "কি রে—লেখানো হয়েছে?"—"না...চল্ লেখাই।" গদার সঙ্গে হারু যখন রেজিষ্ট্রারের কাছে এসে দাঁড়ালো, তখন তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো বায়স্কোপের ছবির মত তার অতীত জীবন। হারু তার হাত দুটো চোখের উপর ঢাকা দিল।

"শুনছ হে...কি নাম বল না ছাই?"

হারুর পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে গদা বল্লে "বল্ না

কেলোর নাম টাম্ সব।" হারু অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল "যে মরেছে তার নাম কেলো।"

"হ'য়েছিল কি ?"

"বসন্ত।"

"বয়েস ?"

"৩০।৩২ হবে"।

"বাপের নাম ?"

"বল্‌তে পারি না !"

"আচ্ছা যাও, জমাদারকে দিয়ে রসিদ পাঠিয়ে দিচ্ছি...।"

* * * *

রাস্তায় গদা হারুকে বল্লে, "ওদের দিয়ে কাঠ ফাঠ গুলো আনাব 'খন...চল্ আমরা এক পাত্তর টানিগে"—

"তাই চল" বলে হারু তাড়াতাড়ি শ্মশানের ভিতর দিয়ে গঙ্গার ঘাটে এসে, একটা গভীর নিশ্বাস ছেড়ে, অন্ধকার গাছতলায় যেখানে গদার সঙ্গীরা বসে মদ খাচ্ছিলো, তাদের পাশে এসে বোসলো। গদা এসে লোকগুলোকে বল্লে "ব'সে ব'সে সুধু মাল টানলে চলবে না বাবা—এবার তোমরা যাও ও-দিক্‌টায়। চাপরাশি রসিদ দিয়ে গেলে টাকা নিয়ে গিয়ে কাঠ, কল্‌সি, প্যাঁকাটী ...এ সব নিয়ে এস...আমরা একটু জিরুই !" তাদের ভিতরকার একজন বল্লে, "তা মুখাগ্নিটা মাষ্টার তুমিই ক'চ্ছ ত ?"—

হারু ভাঙ্গা গলায় বল্লে—"না—আমি আর ওখানে যাব না...তোরা যে কেউ হয়—দিস !" "বেশ বাবা...তোমার হ'ল বন্ধুলোক—আর মুখে আগুন দোব আমরা !...আচ্ছা... কুচ্ পরোয়া নাই বাবা..." বলে লোক দুটো চলে যেতেই, হারু মদের বোতলটা নিয়ে ঢক্ ঢক্ ক'রে অনেকটা মদ খেয়ে ফেল্লে। গদাই বল্লে, "তোর আজ কি হ'লরে হেরো ?" হারু উদাস কণ্ঠে বল্লে, "কি জানি, আমার যেন আজ সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে !"

অন্ধকার আকাশে তখন একরাশ নক্ষত্র, গঙ্গার জল কুলকুল শব্দে ঘাটের বাঁধানো লোহার সিঁড়ির উপর আছড়ে প'ড়ছে। দূরে মাঝ-গঙ্গায় ছপ ছপ শব্দে দাঁড়টানা বড় বড় মহাজনি নৌকা বেয়ে মাঝিরা গান গেয়ে চলেছে, আর সেই মিলিত রাগিনীর তান নিশীথের বিরাট স্তব্ধতা ভেদ করে তালে তালে বাতাসের সঙ্গে ভেসে আস্‌ছে। নির্জ্জন সিঁড়ির এক কোণে ব'সে হারু ভাব্‌ছিল, তার এই ছন্নছাড়া জীবনের একটা পরিচ্ছেদের কথা ! এইখানটায় কেলোর জীবনের সঙ্গে তার মেলে নি। কেলো সকলের সঙ্গে হিসাব নিকাশ পরিষ্কার ক'রে ব'সেছিল, কিন্তু তার যে অনেক ঋণ ! সকলকে ফাঁকী দিয়ে কেলোর মত জগতের একধারে একা অন্ধকারের এক কোণে, একটু স্নেহস্পর্শ না পেয়ে এক ফোঁটা চোখের জল না নিয়ে কেমন করে সে চলে যাবে !...তার কমলা—তার সতু—সতু—ঝড় তুফানে নৌকা যেমন তীর লক্ষ্য ক'রে ছোটে, তেমনি এই চিন্তাধারার মধ্য থেকে হারু ছুটে চ'লে গেল উপরে যেখানে একটি ছোট ছেলের শব দাহ হচ্ছিল ! দীপ্ত আলোকে ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে হারু একটা চীৎকার ক'রে পেছিয়ে আসতেই, কাঠের গুঁড়িতে পা বেধে সে সশব্দে প'ড়ে গেল ;...সকলে তাড়াতাড়ি যখন তার কাছে এসে দাঁড়ালো, হারু তখন সংজ্ঞাহীন,—কপালটা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরে প'ড়্‌ছ ! * * *

কতকগুলো লোককে এক যায়গায় জমা হ'য়ে "জল আন্...জল" ব'লে চীৎকার করতে শুনে, গদা তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে হারুকে প'ড়ে থাক্‌তে দেখে, বিস্ময় আতঙ্কে ব'লে উঠলো "হেরো যে !" একটী বৃদ্ধ গদাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "এ বুঝি তোমাদেরি দলের একজন ?"

—"আজ্ঞে"—ব'লে গদা আস্তে আস্তে হারুকে তার কোলের কাছে তুলে বসালো। হারুর মুখখানা তখন একেবারে ফ্যাঁকাসে হ'য়ে গেছে, চোখ দুটো মুদিত, মাথার কাটা স্থান থেকে রক্তের ধারা তখনো গালের এক পাশ বেয়ে ঝরছে ! একটা লোক ছোট মেটে ভাঁড়ে ক'রে জল আন্‌তেই, বৃদ্ধটী হারুর চোখে মুখে জোরে জোরে ঝাপ্‌টা দিতে লাগলো। গদা তার গামছা খানা দিয়ে রক্ত মুছিয়ে বল্লে "শালা লুকিয়ে লুকিয়ে বোধ করি বেশী মাল টেনেছে......রে হেরো... হেরো"......গদা হারুর গা ধরে ঝাঁকুনি দিতেই, বৃদ্ধটী বাধা দিয়ে বল্লে "আঃ...অমন ক'রে ঝেঁকো না বাপু ! ওর কি আর এখন জ্ঞান আছে ?...ওহে সতীশ, হ্যারিকেনটা একবার এদিকে আনো তো"...একজন চস্‌মা-চোখে, ফরসা, ছিপছিপে ধরণের ছোক্‌রা একটু বিরক্ত ভাবে বল্লে, "নায়েব মশাই

যত বাত্তিক্...দেখছেন না, একটা haggard, idiot, নেশাখোর ছোট লোক"—বৃদ্ধ বিরক্ত ভাবে বলে উঠলো "আঃ, থামো না ছোট বাবু...কৈ হে আলোটা···" সতীশ হ্যারিকেনটা এনে হারুর মুখের কাছে উঁচু ক'রে তুলে ধরতেই, বৃদ্ধটী তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, সহসা গদার দিকে মুখ ফিরিয়ে, ভ্রূ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা ক'রল, "এঁর কে মরেছে বাপু?"

"বন্ধু—ছেলো!"

বৃদ্ধ আর কোন কথা না ব'লে, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে, তার কম্পিত হাতখানা হারুর মুখে, গায়ে বুলুতে লাগলো। দলের একজন সতীশের পিঠে আস্তে আস্তে হাত দিয়ে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা ক'রল, "এ কে হে।"

সতীশ গম্ভীর ভাবে বল্লে "সতুর বাবা"!!

* * * * *

প্রভাতের উজ্জ্বল দীপ্তি যখন ধরণীর বুকে ছেয়ে পড়লো, সতুর সুকোমল দেহ তখন ছাইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে...আর তার চিহ্ন মাত্রও নাই! কেবল সেই ভস্মস্তূপের উপর তখনো কয়েকখানা পোড়া কাঠ ছাই ঢাকা আগুন বুকে নিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে চিতার বীভৎসতা সপ্রমাণ করছে। হারু পাথরের মূর্ত্তির মত চিতার পাশে ব'সে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল...সে ত চিতা নয়··· ভস্মস্তূপ নয়...দগ্ধাবশেষ কাষ্ঠখণ্ড নয়...মানুষের চিহ্ন গ্রাস করা শ্মশানক্ষেত্র নয়, এ যে সেই অতীতের গৃহ...প্রাঙ্গণ··· শয়নঘর···তার খাট বিছানা!···আর তারি উপর ঘুমিয়ে তার "সতু"···ঘুমের ঘোরে হাসছে...চাইছে...কথা কইছে···ঐ ত সেই কচি মুখখানায় আধ-আধ হাসি... কমলার আঁচল ধরে ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে চেয়ে আছে···সতু...সতু···বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার ক'রে চিতা থেকে আধপোড়া কাঠখানা তুলে নিয়ে হারু সবলে তার বুকে চেপে ধরলে! সকলে তাড়াতাড়ি হারুর হাত থেকে সেখানা টেনে ফেলে দিল। দেখতে দেখতে ফরসা বুকখানার উপর একটা লাল ফোস্কা প'ড়ে উঠলো! বৃদ্ধ লোকটী বল্লে, "আর পাগলামী ক'রো না বাবা—এস—এক এক কলসী জল চিতের ওপর ঢেলে দাও···ইঃ..। বুকখানায় যে ফোস্কা প'ড়ে গেল!"...

হারু নিঃশব্দে জলভরা কলসীটা নিয়ে চিতার উপর ঢেলে দিল! কলসীটা ভেঙ্গে দিয়ে আর আর সকলে হরিধ্বনি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল! বৃদ্ধ হারুর হাত ধ'রে নিয়ে যাবার সময় হারু আর একবার পিছন ফিরে চাইল··· চোখের কোণ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল গড়িয়ে প'ড়ল! বৃদ্ধ হারুর হাতটা টেনে বল্লে "এস বাবা"—যন্ত্র-চালিতের মত হারুর সঙ্গে সঙ্গে গেল। স্নান শেষ হতেই একটা লোক বল্লে "গাড়ী এসেছে।" চসমা-চোখে ছোকরা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলে, "দিদি এখন কেমন আছে রে?"

"আজ্ঞে, ভোর থেকে আবার ফিট্ হচ্ছে।" সকলে গাড়ীতে উঠে বসলে, হারুকে গাড়ীতে তুলতেই সে এক কোণে মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইল!

গাড়ীখানা একটা বড় বাড়ীর ফটকে ঢুকতেই, বাড়ীর ভিতর থেকে কান্নার রোল উঠলো! সকলে গাড়ী থেকে নেমে আগুন ছুঁয়ে, নিমপাতা, ডাল দাঁতে কেটে, পাশের ঘরে চলে গেল! বৃদ্ধ নায়েব মশাই হারুকে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়ে এগিয়ে আসতেই, একজন ভদ্রলোক কোঁচার কাপড়ে চোখ মুছতে মুছতে বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন, এবং হারুর দিকে একটা কঠোর বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে মুখ ফিরিয়ে পাশের বৈঠকখানায় চ'লে গেলেন। বৃদ্ধটী কি ভেবে হারুকে নিজের ছোট ঘরখানায় নিয়ে গিয়ে তক্তার উপর বসিয়ে বল্লে "বসুন।"

নায়েব চ'লে গেল। হারু বসে রইল। একটী বছর ১২।১৩ বয়সের মেয়ে এসে হারুর সামনে দাঁড়ালো—হারুর ভ্রূক্ষেপ নাই। মেয়েটী কিছুক্ষণ হারুর পানে চেয়ে ভাঙ্গা গলায় বল্লে "চলুন ওপরে।" হারুকে তার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকতে দেখে, একটু এগিয়ে এসে তার হাত ধ'রে বল্লে "চলুন।"

মেয়েটি যখন হারুকে নিয়ে একটা ঘরের সামনে এল, হারু ঘরের দিকে চেয়েই পাশের রেলিংটা ধ'রে ফেলে কোন মতে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের ভিতরে মার্ব্বেল পাথরের মেঝের ওপর প'ড়ে ছিল আলুলায়িত-কেশা, পুত্রহারা কমলা!—শিয়রে ব'সে তার মা।

......"সতু রে..ফিরে আয়"।......

বৃদ্ধা হারুকে দেখে মুখে কাপড় দিয়ে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন-বেগ চেপে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

মেয়েটি হারুর হাত ধরে ঘরে ঢুকে কমলার পাশে ব'সে ভাঙ্গা গলায় আস্তে আস্তে ডাকলে "দিদি!"—কমলার সাড়া নাই! হারু কমলার মাথার কাছে নিশ্চল পাথরের মত বোসে!—তার দৃষ্টি উদাস।

......"সতুরে·· ফিরে আয়"..... সে আর্ত্তস্বর শূন্যে বাতাসে মিশিয়ে গেল! দূরে···আরও দূরে—শুধু একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট শব্দ......আয়......আয়......আয়!!

নৃতত্ত্বে জাতিনির্ণয়

ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, পিএইচ-ডি, (বার্লিন)

(২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে পশ্চিম-জার্ম্মাণির অন্তর্গত নিয়াণ্ডার উপত্যকায় (Neanderthal) মনুষ্যের অস্থি-কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইবার কথার উল্লেখ করিয়াছি। এবম্প্রকার মনুষ্য-কঙ্কাল স্পি (Spy), জিব্রালটার, ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থান, ও ক্রোয়াসিয়ার (বর্ত্তমান যুগো-স্লাভিয়া দেশের অন্তর্গত প্রদেশ) ক্রাপিনা (Krapina) নামক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই অস্থি-কঙ্কালসমূহের অধিকারীরা প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানব ছিল। এবম্প্রকার প্রাচীন ধরণের মনুষ্যের মস্তক আর প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এই জন্য এই জাতীয় মনুষ্যকে Homo-Neandertalensis অথবা Homo-primi-genius বলিয়া অভিহিত করা হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, এই কঙ্কালের মস্তকের লক্ষণসমূহ অতি প্রাচীন ধরণের, এবং বর্ত্তমানের মানব-জাতির সদৃশ নয়। এই জন্যই এই কঙ্কালের অধিকারীকে সর্ব্বপ্রথম মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

এবম্প্রকার অস্থি-কঙ্কালের আবিষ্কারের পর, জার্ম্মাণির হাইডেলবার্গের নিকট মাওয়ার (Mauer) নামক স্থানে মানবের নিম্ন দিকের দন্তপাটির ন্যায় একটী নীচের চোয়াল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই চোয়ালের Canine teeth নামক দন্তগুলি মানবের সেই নামধারী দন্তের সদৃশ বটে; কিন্তু চোয়ালের অস্থির আকার মানবশ্রেণীর বহির্ভূত। এই জন্য এই বিষয়ে নানাবিধ তর্কবিচার সত্ত্বেও, ইহার জাতি-নির্ণয় আজ পর্য্যন্ত অনিশ্চিত রহিয়াছে। তৎপরে আধুনিক কালে দক্ষিণ আফ্রিকায় (Broken Hill-mine, Rhodesia) একটী অতি প্রাচীন অস্থি-কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম Homo-Rhodensiensis দেওয়া হইয়াছে। এই কঙ্কালের মস্তকের নকল দেখিয়া ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, তাহা নিয়াণ্ডারতাল মনুষ্য-জাতির অন্তর্গত বলিয়াই বোধ হয়, এবং তাহা বর্ত্তমান মেলানেসির (Melanesian) ও অষ্ট্রেলিয় আদিম অধিবাসীদের

মস্তকের অনুরূপ। বোধ হয় ইহা সুদূর অতীতে আণ্টার্টিক (Antarctic) ভূখণ্ডের সহিত সম্বন্ধের পরিচায়ক। কিন্তু সন্দেহের বিষয় এই যে, এই নর-কঙ্কালের সঙ্গে যে সব জন্তুর কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা আধুনিক। তৎপরে এই কঙ্কালের সংলগ্ন অন্য অস্থিসমূহের কোন সংবাদ আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই জন্য সুধিমণ্ডলী এই বিষয়ে অধিক মতামত প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, এই প্রাচীন প্রস্তর-যুগের (palaeolithic stone age) সহিত মনুষ্য-জাতির কি সম্বন্ধ? Gustav Schwalbe ও অন্যান্য অনেকে এই জাতিকে বর্ত্তমানের জ্ঞানবিশিষ্ট মনুষ্যজাতির (Homo sapiens) সহিত এক জীবতাত্ত্বিক শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করেন না। কিন্তু Ion Luschan বলেন যে, এই প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মনুষ্য হইতে বর্ত্তমানের মানবজাতির উৎপত্তি বিভিন্ন বলিয়া অনুমান করিবার হেতু নাই। কারণ, যাঁহারা সমগ্র মানব-জাতিকে এক বংশোদ্ভব বলিয়া গণ্য করেন (monogenist), তাঁহারা বলেন যে, এই নিয়াণ্ডারতাল মানবই ক্রম-বিকাশের দ্বারা বর্ত্তমানের জ্ঞানবিশিষ্ট মানবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই মতের বিপক্ষে উপরিউক্ত প্রথম দলের পণ্ডিতদের আপত্তি উত্থাপন করিবার কারণ এই যে, বর্ত্তমানের ইয়োরোপীয় ও ভূমধ্য সাগর-কূলবর্ত্তী দেশসমূহের জাতিগুলির উত্তর-পুরুষ Cro magnan জাতির সহিত নিয়াণ্ডারতাল জাতির কোন সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না। এই উভয় জাতির আবির্ভাবের সময়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান রহিয়াছে; এবং এই দুইটি জাতিকে জাতি-সম্পর্কে সংযুক্ত করিবার ক্রম-বিকাশের শৃঙ্খল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কিন্তু যাঁহারা মানব-জাতির উৎপত্তির একতা-রূপ মতের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন যে, যদিও প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানবের সহিত বর্ত্তমানের মানবের সম্পর্ক পরিষ্কার রূপে এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই, তথাচ বর্ত্তমানের বিভিন্ন মানব-জাতির মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা প্রাচীন প্রস্তর-যুগের নিয়াণ্ডারতাল মানবের নিকট সম্পর্কীয়। কারণ, অষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীদের মস্তকের লক্ষণ নিয়াণ্ডারতাল মানবের ন্যায়। এই জন্যই এক্ষণে নৃবৈজ্ঞানিকেরা অতীতের নিয়াণ্ডারতাল মানবকে ও বর্ত্তমানের অষ্ট্রেলিয়াবাসী কৃষ্ণকায় জাতিকে ঘনিষ্ট সম্পর্কে সম্বদ্ধ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। কিন্তু এই স্থলে কথা উঠে যে, উত্তর-ইয়োরোপের প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানব-জাতির সহিত অষ্ট্রেলিয় জাতির এক-বংশীয়তা অর্থাৎ এক স্থলে ও এক বংশে উদ্ভব কি প্রকারে সম্ভব হইল? ইহার উত্তরে স্বভাবতই বলিতে হয় যে, এক কালে এই দুই জাতির সম্বন্ধ ছিল এবং তাহারা এক যায়গায় জন্ম গ্রহণ করিয়া কালে বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, অষ্ট্রেলিয়া মনুষ্য-জাতির আদিম জন্মস্থান। লুসান বলেন যে, জিব্রাণ্টার হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত একটি লাইন টানিলে যে সকল ভূখণ্ড ইহার অন্তর্গত হয়, তাহার মধ্যে কোন স্থান মানবের প্রথম জন্মস্থল ছিল। এই অনুমানের হেতু এই যে, এই লাইনের অন্তর্গত স্থলসমূহের মধ্য হইতেই Homo Primigeniusএর অস্তিত্ব স্বরূপ অস্থি-কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইতেছে। লুসানের মত এই যে, প্রাচীন কালে অষ্ট্রেলিয়া ও উত্তর-ইয়োরোপের মধ্যে সংযোগ ছিল, এবং ভারতবর্ষ এই সংযোগের সেতু স্বরূপ ছিল। তাঁহার মতে সিংহলের ভেদ্দা, ও ভারতের তামিল জাতিসমূহ উত্তর ইয়োরোপ ও অষ্ট্রেলিয় জাতিদ্বয়ের সংযোগের মধ্যবর্ত্তী শৃঙ্খল স্বরূপ।

এতক্ষণে আমরা ইহাই লক্ষ্য করিলাম যে, নিয়াণ্ডারতাল জাতি সর্ব্বপ্রথম মনুষ্য-জাতি, এবং তাহা বর্ত্তমান কালের জীবিত জাতিসমূহের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণকায় জাতির নিকট সম্পর্কীয়। এবং ঐতিহাসিক বিভিন্ন মানবজাতি স্থান ও জলবায়ুর বিভিন্নতার জন্য ক্রমবিকাশের অভিব্যক্তির দ্বারা বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। অবশ্য যাঁহারা মানবজাতিসমূহের বিভিন্ন উৎপত্তির মতের পরিপোষক (polygenist), তাঁহারা বলেন যে, মস্তকের গঠন, গাত্রের বর্ণ, মস্তকের চুলের লক্ষণ, অবয়বের লক্ষণ, মুখাকৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির মধ্যে যখন এত পৃথক, তখন কি প্রকারে সর্ব্বপ্রকারের মনুষ্যজাতিকে এক বংশোদ্ভব বলা যায়? অর্থাৎ তাঁহারা বলেন যে, শ্বেতকায় ইয়োরোপীয়, কৃষ্ণকায় কাফ্রি, পীতকায় চীনবাসী কি প্রকারে এক পিতার সন্তান বলিয়া গণ্য হইতে পারে? কিন্তু এবম্প্রকারের polygenism মতবাদ বর্ত্তমান কালের নৃ-বৈজ্ঞানিক ও জীব-বৈজ্ঞানিকদের (biologist) দ্বারা

নির্ব্বাসিতা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর পরামাণিক

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

গৃহীত হয় না। এ স্থলে জীবতাত্ত্বিক বিচারের অবতারণা না করিয়া, ইহা উল্লেখযোগ্য যে, জীব-বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, ডারউইনের ক্রমবিকাশ মতানুসারে স্থান ও জলবায়ুর (milien) বিভিন্নতা ও পুরুষানুক্রমে নিজ শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ (Natural selection) প্রভৃতি জীবতাত্ত্বিক নিয়মানুসারে মানব-জাতি কালে নানা-প্রকারের বিভিন্নতা ও বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎপরে বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে বিবাহ করিলে তাহা ফলবতী হয়। তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয়, যে, বিভিন্ন প্রকারের মানব জাতিরা পরস্পরের সহিত নিকট রক্ত-সম্পর্কে সম্বন্ধ। পূর্ব্বে, জাতি-বিদ্বেষের ফলে ইহার বিপরীত সংস্কার ছিল।

যখন আমরা নিরূপণ করিলাম যে, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা প্রাচীনতম মনুষ্যের লক্ষণাক্রান্ত, তখন আমাদের অস্ট্রেলিয়া হইতে বিভিন্ন জাতি নির্ণয়ের সমালোচনা আরম্ভ করিতে হইবে। এই স্থলে বক্তব্য এই যে, একটী জাতির (Race বা people) স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে, কেবল মস্তকের বা নাকের মাপের index গ্রহণ করিলেই তাহা নির্দ্ধারিত হয় না। অথবা কেবল ভাষা দ্বারা জাতি-নির্ণয় হয় না। কিম্বা কেবলমাত্র রীতি-নীতি দ্বারাও তাহা নির্দ্ধারিত হয় না। একটী জাতিসমষ্টির মধ্যে শারীরিক লক্ষণের পার্থক্য দেখিয়া biotypeএর বিভিন্নতা নিরূপণ করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু একটী মানবজাতি—biotype, ভাষা, আচার-ব্যবহার, চর্চ্চা প্রভৃতির সমবায়ে সংগঠিত হয়। সেই জন্য কোন একটি দেশের জাতির স্বরূপ বর্ণনা করিতে হইলে, উপরিউক্ত সর্ব্বপ্রকারের অঙ্গের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

অস্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীরা মনুষ্যজাতির সর্ব্বপ্রথম শাখা। ইহারা লম্বাকৃতি; ইহাদের মস্তকের গঠন লম্বা (dolicocephal), নাক চেপ্টা (chamolrrhine), আমাদের মত কাল লম্বা অথবা ঢেউ-খেলান চুল। ইহাদের চুলের বাহ্যাকৃতি ও তাহার মূলের morphological structure গোলাকৃতি। এ বিষয়ে এই জাতি, সিংহলের ভেদ্দা জাতি, দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের অধিবাসীরা, পশ্চিম এসিয়ার আর্য্য ভাষা ভাষীরা ও ইয়োরোপীয়েরা এক লক্ষণাক্রান্ত। এই কারণে অনেকে উত্তর-ইয়োরোপের প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানবের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য ছাড়া, বর্ত্তমান কালের আর্য্য ভাষা ভাষী জাতিদের ও দ্রাবিড় ভাষা ভাষী জাতিদের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য দেখিতে পান।

এই জাতির অস্ট্রেলিয়ায় কখন আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার নিরূপিত হওয়া সম্ভব নয়। অস্ট্রেলিয়া একটী ক্ষুদ্র মহাদেশ, তাহা এক সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এই জন্যই কাংগারু প্রভৃতি marsupial জাতীয় জন্তু ব্যতীত অন্যান্য মহাদেশে বিদ্যমান বৃহৎ জন্তু-সমূহের আবির্ভাব তথায় সম্ভব হয় নাই। ইহাই সম্ভবপর যে, এ স্থানের মানব-জাতি এই দ্বীপরূপ মহাদেশে অন্যান্য মানব-জাতির সহিত বিচ্ছিন্ন থাকিয়া নিজেদের প্রাচীনতম লক্ষণের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছে। কিন্তু এই "প্রাচীনতম" অবস্থা তাহাদের স্বাভাবিক, অথবা বাহ্যপ্রকৃতির প্রতিকূলতাজনিত কি না,—অবশিষ্ট মানব-জাতির সহিত বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করার দরুণ তাহারা পূর্ব্বেকার উচ্চ সভ্যতার শিখর হইতে অধঃপতিত হইয়াছে কি না, তাহা আজ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত। এই জাতি অতি প্রাচীন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের একেবারে "অসভ্য" বলা যায় না। আজকালকার নৃ-বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, বর্ত্তমান জগতে একেবারে অসভ্য (savage) জাতি বিদ্যমান নাই। যাহাদের "অসভ্য" বলা হয়, তাহারা কিছু না কিছু সভ্যতার স্তরে আরোহণ করিয়াছে। সেই প্রকারে অস্ট্রেলিয় জাতিও নিজের কৃতিত্বে সভ্যতার রাস্তায় কতক অগ্রসর হইয়াছে। ইহাদের সভ্যতার যন্ত্রপাতির মধ্যে দুইটি বিখ্যাত—বুমেরাং ও চওড়া-ফলা-বিশিষ্ট বর্শা-ফলক। এই বুমেরাংটি একটি ক্ষেপণীয় অস্ত্র। তৎপরে ইহাদের সামাজিক আচারের মধ্যে গুটিকতক বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়—প্রথম দলশুদ্ধ বিবাহ (Group marriage); অর্থাৎ কোনও এক স্থলের এক দল যুবক অন্য এক স্থলের এক দল যুবতীকে দল-হিসাবে বিবাহ করে। ইহাতে দলের যুবক যুবতীর ব্যক্তিত্ব কিছুই নাই,—ব্যক্তিগত ভাবে কেহ স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে সম্বদ্ধ নহে,—সমগ্র দলই স্বামী বা স্ত্রী সম্বন্ধে আবদ্ধ। সমাজ-তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ইহা এক প্রকারের প্রাচীন ধরণের বিবাহ-প্রথা। কিন্তু আজকাল নূতন সংবাদ আসিয়াছে যে, অস্ট্রেলিয় জাতির দলশুদ্ধ বিবাহের পূর্ব্ব-প্রচারিত সংবাদ ঠিক নহে,—তাহাদের দল বিবাহ অন্য প্রকারের। তৎপরে ইহাদের

দীক্ষাগ্রহণ প্রথা (initiation ceremony) অদ্ভুত প্রকারের। যখন কোন বালক যৌবনে পদার্পণ করে, তখন তাহাকে এক সামাজিক দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়,—সমাজের এক বয়ঃবৃদ্ধ লোক হাতুড়ি দিয়া দীক্ষা-গ্রহণকারীর একটী দন্ত সর্ব্ব-সমক্ষে ভাঙ্গিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে আর একটী অদ্ভুত প্রথা আছে—যাহা পূর্ব্বে মিশনারিরা একটা terrible rite বলিয়া বর্ণনা করিত; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন ব্যাখ্যা বাহির হয় নাই। তাহা এই: অস্ত্রোপচারের দ্বারা প্রস্রাব-দ্বারের কিয়দংশ ফাড়িয়া দেওয়া হয়। এই প্রথা অস্ট্রেলিয়ার সর্ব্ব জাতি (tribes) মধ্যেই বিদ্যমান।

সর্ব্বশেষে আলোচ্য ইহাদের ভাষা। ইহাদের ভাষার সহিত অন্য কোন দেশের ভাষার সাদৃশ্য আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু বহুকাল পূর্ব্বে Pritchard উল্লেখ করেন যে, ইহাদের ভাষার সর্ব্বনামের প্রথম পুরুষের ("আমি") সহিত দ্রাবিড় ভাষার প্রথম পুরুষের সাদৃশ্য আছে। তৎপরে এই ব্যাপারকে Bleek আরও বাড়াইয়া তুলিয়া হৈ চৈ করেন। শেষে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মাদ্রাজের বিশপ Caldwell তাঁহার "দ্রাবিড় ভাষার ব্যাকরণে" এই একটী কথার কল্পিত সাদৃশ্য দেখিয়া তাহাকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া একটা মত প্রচার করিলেন—যেহেতু দ্রাবিড় ভাষা ও অস্ট্রেলিয় আদিম অধিবাসীদের ভাষার স্থল উৎপত্তি এক, অতএব তাহারা এক বংশ সম্ভূত। কিন্তু তিনি আবার ইহাও বলেন যে, অস্ট্রেলিয় এই শব্দের সহিত বরং ইহার তিব্বতীয় প্রতিশব্দের বেশী মিল আছে। তার পর আসেন Huxley। তিনি বলেন, দক্ষিণ ভারতের বুমেরাং নামক অস্ত্র অস্ট্রেলিয় জাতির সদৃশ, যাহা এই দুই জাতির এক-মূলত্বের আর একটি পরিচায়ক লক্ষণ। তিনি আরও বলেন যে, প্রাচীন মিশরেও এই প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। অতএব জাতিতত্ত্ব(ethnology) হিসাবে ইহারা সকলেই রক্ত-সম্পর্কে সম্পর্কিত।

কিন্তু শারীরিক নৃতত্ত্ব এ কথা একেবারেই মানে না। Craniologistদের মধ্যে জার্ম্মাণির পরলোকগত বিখ্যাত Rudolf Virchow ও ইংলণ্ডের William Turner, তৎপরে শারীরিক নৃ-বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে জর্ম্মাণ Emil Schmidt ও Gustave Fritoch এবং ফরাসী Callamaud প্রভৃতি সিংহলের ভেদ্দাদের ও দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষা ভাষীদের সহিত অস্ট্রেলিয় জাতির কোন সাদৃশ্য দেখিতে পান নাই।

আবার অন্য দিকে Sarassin ভ্রাতৃদ্বয় উপরিউক্ত উড়ো কথার উপর নির্ভর করিয়া বলিলেন যে, অস্ট্রেলিয় এবং ভেদ্দা ও দ্রাবিড় জাতিরা এক বংশ সম্ভূত। আর লুসান সেই সুর ধরিয়া বলিলেন যে, ভারতের আদিম অধিবাসীরা অস্ট্রেলিয় ও ইয়োরোপের প্রাচীন প্রস্তর-যুগের জাতিগুলির মধ্যে সংযোগের সেতু স্বরূপ! তৎপরে সারাসিন Celebes দ্বীপে তোয়ালা (Toala) নামক এক জাতির আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহারা আকৃতিতে না কি তামিলদের সদৃশ! কিন্তু কথা এই যে, প্রাচীন কালে যে এই দ্বীপে তামিলদের উপনিবেশ স্থাপনের ফলে এই তোয়ালা জাতির আবির্ভাব হয় নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? আবার অন্য দিকে Rudolf Martin মালাক্কা দ্বীপে (Senoi) সেনয় নামক একটী জাতি আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা তামিলদের সদৃশ বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন। আসল কথা এই যে, অস্ট্রেলিয় জাতিদের মাথার লম্বা আকৃতি ও সোজা বা ঢেউ-খেলান চুল (straight or wavy hair) ও গাত্রের কৃষ্ণ বর্ণ ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদের সহিত অতি দূর বংশ সম্পর্কের পরিচায়ক হইতে পারে বটে, কিন্তু এই সম্বন্ধ ততটা ঘনিষ্ট, যতটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সহিত বর্ত্তমান ইয়োরোপীয়দের আছে। লুসানের মতকে এই ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, প্রথম মানব জাতির মূল হইতে যে সব বিভিন্ন শাখা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে লম্বা-মস্তক-বিশিষ্ট জাতিরা ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ; এবং ইহারা অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ এসিয়া, আফ্রিকা, ও ইয়োরোপে বসবাস করে। ইহাদের মধ্যে পশম-চুলো (woolly hair) কাফ্রিরা লম্বা মাথা-বিশিষ্ট (dolico cephal) মনুষ্য জাতি হইতে পৃথক হইয়া একটী উপশাখার সৃষ্টি করিয়াছে। আর লম্বা মাথা ও লম্বা চুলওয়ালা জাতিরা নিজেরা আর একটী শাখা ও পরে বিভিন্ন উপশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। আর অস্ট্রেলিয়, দ্রাবিড়, ইয়োরোপীয়েরা বিভিন্ন উপশাখা স্বরূপ। এই ভাবেই লুসানের "ভারত উভয় মহাদেশের সেতু স্বরূপ" বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

এই অষ্ট্রেলিয় কৃষ্ণকায়দের সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। বেশীর ভাগ ইহারা দলবদ্ধ হইয়া মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে বসবাস করে। দক্ষিণ ভাগে যাহারা বসবাস করে, তাহাদের মধ্যে অনেকের ধমনীতে ইয়োরোপীয় শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। বিশুদ্ধ জাতিরা দেশের অভ্যন্তরে ও উত্তরে নিজেদের প্রাচীন অবস্থায় বসবাস করিতেছে। ইহারা কৃষ্ণকায় বলিয়া কেহ কেহ চলিত কথায় ইহাদের "অষ্ট্রেলিয় নিগার" বলিয়া সম্বোধন করে। কিন্তু ইহারা নিগ্রো জাতির সম্পর্কীয় নহে। ইহাদের সহিত ইয়োরোপীয়দের রক্ত মিশ্রিত হইয়া যে সব বর্ণসঙ্কর বংশের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইতেছে। এই বর্ণ-সঙ্করেরা অশ্বতরের ন্যায় "বন্ধ্যা" হয় না। যাহারা এই কৃষ্ণকায় জাতিকে বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যের (Homo Sapiens) মধ্যে গণ্য করিতে চায় না, লুসান উপরিউক্ত প্রমাণ দেখাইয়া তাহাদের মতের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। এই জাতির ছেলেরা স্কুলে শ্বেতকায় ছাত্রদের সহিত সমান ভাবে বিদ্যা অর্জ্জনে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। লুসান বলেন যে, তিনি ১৯১৪ খৃঃ মেলবোর্ণ সহরে এই কৃষ্ণকায় জাতীয় এক বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিয়াছেন। ইনি বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় 'কালচারে'র উচ্চ শিখরে বিরাজ করেন ও উৎসাহের সহিত জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চ্চা করেন।

ইহাদের ধর্ম্ম-জ্ঞানের সংবাদ সবিশেষ জানা নাই। কিন্তু হারবার্ট স্পেন্সার বলেন যে, ইহারা রুদ্রমূর্ত্তিকে ভয় ও ভক্তি করে; এবং ইহাদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অনেকে বলেন যে, মানবের আদিম অবস্থায় ভয় হইতেই ধর্ম্ম-বিশ্বাস উৎপন্ন হয়।

সর্ব্বশেষে এই জাতির বিষয়ে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, ইহারা নিজেদের দেশের Marsupial জন্তুর ন্যায় অবশিষ্ট জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানবজাতির সর্ব্বপ্রাচীনতম শাখার অস্তিত্বের নিদর্শন স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছে। পৃথিবীর অবশিষ্ট মানব-সমাজ ক্রমবিকাশ দ্বারা বর্ত্তমান স্তরে উপনীত হইয়াছে; কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার জাতিসকল পৃথিবীর এক প্রান্তে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিয়া সৃষ্টির একটি প্রাচীন চিহ্ন স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। আর এই মানব-জাতির সহিত ভারতের আদিম অধিবাসীর রক্ত সম্পর্কের প্রমাণাভাব। বুমেরাং যাহা দক্ষিণ ভারতে "ভেলাম তাড্ডি" অথবা এই প্রকার একটা নামে অভিহিত হয়, তাহাকে এরূপ দুইটী জাতির সাদৃশ্যের নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এ বিষয়ে জাতিত্ত্ববিদ্ Prof. Weule বলেন, উভয় জাতির অস্ত্রের উৎপত্তির সূত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে নানা প্রকারের বুমেরাং প্রচলিত আছে। আর যন্ত্র-পাতি, আচার-ব্যবহার, চর্চ্চার দ্রব্য (cultural objects) এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে গৃহীত হয়। এই সকল কারণে আদিম ভারতবাসীকে অষ্ট্রেলিয়বাসী কৃষ্ণকায় অধিবাসীর সহিত এক জাতীয় বলা ভুল বলিয়া মনে হয়; এবং এই ভ্রমপূর্ণ মতটিকে ভিত্তি করিয়া Harry Johnstone এর মত যাঁহারা ভারতবাসীদের "austroloid" জাতি বলেন, তাঁহারা বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচার করেন না।

চিত্রশালায়

শ্রীগোপাল হালদার এম-এ

[বিশলা-নগরীর তরুণ শিল্পী শ্রীলেখ-এর গৃহে বিখ্যাত বণিক্ ধনপতির কন্যা সুনতা এসেছেন তার চিত্রশালার অঙ্কিত পট দেখতে। শ্রেষ্ঠীকন্যা তরুণী; বিশলায় তার বিদুষী ও রসিকা নামে খ্যাতি আছে। সঙ্গে ছিল তাঁর সহচরী শান্তিকা। চিত্রশালার সজ্জিত চিত্রগুলির সম্মুখে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে দেখতে দেখতে সখী এক-একবার পিছিয়ে পড়ছিল।

'আমার পরম-গৌরবের এ দিন, সুনতা। মনে হচ্ছে যেন এখানকার জমানো আঁধারে আজ প্রথম সূর্য্যালোক ঢুকল।'

'আমারি বরং গৌরবের এ দিন, শিল্পি! তাম্রলিপ্ত থেকে তক্ষশিলা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি বিশলার রাজ-শিল্পীর পায়ে শ্রদ্ধা-নম্র-শির;—সেখানকার শত নর-নারীর চিত্ত তাঁর তুলিকার টানে টানে হাসে-কাঁদে, মরে-বাঁচে। কিন্তু তাঁর কলা-মন্দিরের বিচিত্র ঐশ্বর্য্য দেখার মত সৌভাগ্য আজ পর্য্যন্ত কয়জনার হয়েছে?'

'কোন্ শিল্পীরই অদৃষ্টে বা বিশলার নিপুণা বিদুষী

শ্রেষ্ঠীকন্যা সুনতাকে আপনার গৃহে পাওয়ার মত সৌভাগ্য-লাভ ঘটেছে ?'

—'ও পটখানিতে কি আঁকা আছে, শিল্পি ?'

'তপস্বিনী গৌরী।—কেমন বোধ হচ্ছে তোমার, সুনতা ?'

'অপরূপ! মুখের ওই একান্ত সাধনার ভাতিটুকু তুমি কি করে ফোটালে ?'

'তোমার মনে না থাকতে পারে, সুনতা, কিন্তু অনেক উষায় আমি ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে এক সদ্য-স্নাতা পূজারিণীকে অপলক চোখে দেখেছিলুম। সত্যি বলছি, তুমি অতটা লজ্জিত হয়ো না সুনতা, তোমারি মুখের সে শুচিতাটুকু আমি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলুম।'

'না হয় তাই মানলুম; কিন্তু আমাদের মুখের আভা দেবতার মুখে অর্পণ করা কি সমুচিত হয়েছে ?'

'আমি ত ভেবেছি—এক দেবতার মুখের আভাই আর-এক দেবতার মুখে সমর্পণ করলুম মাত্র।'

'শ্রীলেখ, তুমি যা তা বকছ। এরূপ অশ্রদ্ধ কথায় পাপ স্পর্শাবে।'

'খেলাচ্ছলে পাপকে অনেকবার নিমন্ত্রণ করেছি, এক'বার নয় সত্য-সত্য তাকে এমনি বরণ করলুম।'

—'এটি ? এটি কামদেব ?'

'হাঁ—বনপ্রান্তের বৃক্ষান্তরালে মৃদুমন্দ হাসে শর-সন্ধানে ব্যস্ত। এ শরের লক্ষ্য হচ্ছেন স্বয়ং তপোরত মহেশ্বর।'

'সুন্দর!—কিন্তু অধর প্রান্তের ওই হাসিটুকুর আড়াল থেকে কেমনতর একটি ইঙ্গিত ছুটে বেরুচ্ছে না ?'

'শিল্পীর সমস্ত অন্তরের কামনা ওইখানেই মুখর করে তুলতে চেয়েছিল সে। কিন্তু তার কথা বোধ হয় লিখে উঠতে [illegible]রল না।'

[illegible] ওই শর-কটি ? সব কয়টিই এখনো কুঁড়ি যে !'

'লক্ষ্যের অন্তর যখনই শর বিঁধবে, তখনই সব কয়টি কুঁড়ি ফুটে উঠবে। পুষ্প-ধনুর সব কয়টি পুষ্পই এখনো মুকুল—যেন শিল্পীর নবজাত কামনা;—ঈপ্সিতার হৃদয় ছুঁলেই এ কামনা ফুলন্ত হয়ে উঠবে।'

—'এ কে ? কুয়াসার মধ্যে একটি অস্পষ্ট নারীমূর্ত্তি নয় ?'

'হাঁ; এই শোকার্ত্ত রতি। মদন-বিয়োগ-বিধুরা বিরহে ও বিষাদে মরণাপন্না। নিরাশ প্রেমের চিরন্তন ব্যথাই হচ্ছে এর মর্ম্মকথা।'

'কিন্তু এত ধোঁয়া কেন ?'

'অন্তরের আগুণ যখন পথ খুঁজে পায় না, নিরাশার ছাই তাকে যখন ঢেকে ফেলতে চায়, তখন সে এমনি ধূমায়িত হয়ে বেরোয় দীর্ঘশ্বাস রূপে।'

'এর পরে হর-গৌরীর আর কোনো পট নেই যে ?'

'শিল্পীর অন্তর যে পর্য্যন্ত নাগাল পেয়েছে, যেখান পর্য্যন্ত সে এসে পৌঁছেছে, সেইখান পর্য্যন্তই আমি চিত্রিত করেছি।'

'অন্তত একটি হর-গৌরীর মিলনের চিত্র না আঁকলে কিন্তু এ চিত্র কয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।'

'তা সম্পূর্ণ করবার মত সৌভাগ্য আমার হবে কি সুনতা ?'

—'ওখানি কার চিত্র আঁকছ ?'

'ওই ? ওখানি মহারাজের বিশেষ আদেশে আঁকছি রাজকন্যা চন্দ্ররেখার। কাশীর যুবরাজের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে যে দূত যাবে, তার সঙ্গে দেওয়ার জন্য।'

'আর ওই ওখানি ? যেখানি রেশমের বস্ত্রে আচ্ছাদিত, ঠিক তোমার শিল্পাসনের সামনে ?'

'আচ্ছাদন সরিয়েই দেখ না সুনতা।—বিস্মিত হলে যে ? কার চিত্র বলে মনে হচ্ছে ?'

'তাই ত—তুমি ত পিতার আদেশমত আমার প্রতিলিপি তাঁকে দিয়েছ দেখেছি; তবে আবার এই পটখানি এল কোথা থেকে ?'

'ও সে পট নয়, সুনতা। সে পট আমি সত্য-সত্যই দিয়েছি।—এ আমার কলা-লক্ষ্মী—শিল্পীর মানসী-মূর্ত্তি—'

'ওই কোণের পট কয়খানি কি ? মেঝের উপরেই যে অনাদৃত পড়ে আছে।—কতকালের ধূলি জমে উঠেছে ওদের উপরে।'

'ওগুলো আমার খেয়াল-খেলা তুলি আর রং দিয়ে ও সব যাক্। কিন্তু আমার কলা লক্ষ্মীর কথা তোমা[illegible] শুনতেই হবে। যে দিন প্রথমে শ্রেষ্ঠীরাজ তাঁর গৃ[illegible] আমায় চিত্রাঙ্কনের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সে দি[illegible] থেকেই আমার মানস-লোকে এ মূর্ত্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে

ছয় মাস ধরে তাঁকেই আমি নানা দেবদেবীর রেখার বাঁধনে ধরতে চেয়েছি। কিন্তু আজো—ও কি, চলে যাচ্ছ যে!'

'যাচ্ছি না,—ওই পট কয়খানি আনতে গিয়েছিলুম। ইঃ! কী ধূলাই জমেছে!'

'আহা, সুনতা, তোমার বহুমূল্য বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে ওই সামান্য পট কয়খানির ধুলা ঝাড়ছ যে! ছিঃ ছিঃ—নষ্ট হয়ে যাবে যে!'

'তা যাক্। তোমার চিত্রপটের চেয়ে এ রক্তাম্বরের দাম কি বেশী? অন্তত আমাদের তা মনে হয় না।'

'সত্যি বল্ছ সুনতা? তবে আমার সমস্ত চিত্রশালাকে তোমার কাছে সঁপে দেওয়ার মত সৌভাগ্য হবে কি?'

—'বেশ, করুণ এ চিত্রখানি! কার এটি?'

'কিন্তু আমি যে জিজ্ঞাসা করছিলুম তার জবাব?'

'আহা বলোই না এ পটখানি কার?'

'প্রতি প্রভাতে যে ভিক্ষুকের গানে আমার ঘুম ভাঙত, তার। কিন্তু, তুমি যে আমার—'

'আর এইটি?'

'প্রভাতে নদী থেকে স্নান সেরে যে পুরনারীরা আমার বাতায়নের তল দিয়ে গান গেয়ে গেয়ে ফিরে, তাদেরি কারুর। তখনো তোমায় দেখিনি সুনতা। তোমায় যেদিন দেখেছি—'

'এই ক্ষুদ্রায়তন পটটুকু?'

'না, আমার কথা শেষ করে নিই।—সেদিন থেকে আমার সমস্ত শিল্পে তোমারি বন্দনা গেয়েছি—রাগ করো না, আমার এখনো অনেক কথা বলবার আছে। তোমায় তা শুনতেই হবে।'

'তুমি কি যে বলছ, শিল্পি! কথা? কথা আমরা এর পরে ঢের বলতে পাব। কিন্তু আগে চিত্র দেখা সাজ হোক্।'

'সত্যি বল্ছ,—তুমি তা হলে এর পরে আমার যা বলবার আছে, শুনবে। সত্যি বলছ?'

'বেশ।—এখন বল, এ পটটুকু কার?'

'ও! এইটুকু?—বেশ একটা মজা আছে এই পটটুকুর বিষয়ে। মহারাজের মালঞ্চের যে মালাকরকে মহারাজ আমার প্রতি তুষ্ট হয়ে প্রতি দিন প্রভাতে আমায় মালা ও ফুল দিয়ে যেতে আদেশ করেছিলেন, তারি মেয়েটির।—বেশ, এবার তা হলে শোনো আমার কথা—'

'সে মেয়েকে কি করে দেখলে তুমি?'

'সে-ই ত আমার জন্য বেছে বেছে ভালো ভালো ফুলে মালা গেঁথে, সবচেয়ে বেশী সুগন্ধ ফুলে মালা তৈরী করে আমার কাছে তা নিয়ে আসত। এক দিন সে কিশোরীর মুখখানিকে তার হাতের তোড়ার আড়ালে আধ-ঢাকা দেখে আমার বেশ মিষ্টি লাগল। তার বড় চোখ দুটিতে একটি ভীত-চকিত চাহনি ছিল। আমি বললুম 'দ্যাখ, কাল সকাল করে আসিস তোর একখানি পট আঁকব।' পরদিন ঊষায় ঘুম থেকে উঠ্তে না উঠতেই দেখলুম একখানি বাসন্তী রংএর শাড়ী আর রক্তের মত গাঢ় লাল রংএর অঙ্গরাখা পরে সে আমার দুয়ারে বসে আছে। তার চোখ মুখ অস্বাভাবিক রকম দীপ্ত। আমি তাড়াতাড়ি কোনো রকমে একখানি পট এঁকে তাকে দিতে গেলুম। সে আমায় ফিরিয়ে দিয়ে কেঁদে পালিয়ে গেল। তার পরদিন থেকে সে আর আমায় মালা আর তোড়া দিতে এল না। কয়দিন পরে শুনলুম, মালঞ্চের যেদিকটা রাজপুরীর পরিখার দিকে গিয়ে শেষ হয়েছে, এক দিন প্রত্যূষে ফুল তুলতে গিয়ে সে সেখানে পা ফস্কে পড়ে ডুবে মরেছে।'

'তার পর?'

'তার পর আর কি? পটখানি আমার কাছেই রয়ে গেছে তাই। চল, এবার আমরা বসিগে। আমার আজ অনেক কথা বলবার আছে।'

'এই মেয়েটির কথা তুমি আর ভাবো নাই?'

'সে আবার ভাব্বো কি? সে ত আমার ভাবনায় কোনো কালেই ঠাঁই পায় নাই।'

'হুঁ'—

'চলো সুনতা—কই, দাঁড়িয়ে রইলে যে ওই পটটুকুই নিয়ে? বলেছ না আমার কথা শুনবে এবার?'

'হুঁ—শান্তিকা গেল কোথা?'

'ওই পিছনে, চিত্র দেখছে। কি কাজ তাকে?'

'শান্তিকে!—কোথা ছিলি ভাই এতক্ষণ? এবার বাড়ী চল্।'

'কিন্তু আর একটু দেরী করবে না, সুনতা? একটুকু—শুধুমাত্র একটুকু। অন্ততঃ ওই ঘরটা দেখে যাবে না?'

'না, আমি বড় পরিশ্রান্ত। আজ যাই।'

'কিন্তু ওই ঘরখানাতেই যে আমার শ্রেষ্ঠ চিত্রপট কয়খানা রয়েছে। দেখবে, এসো।'

'ক্ষমা করো। আর এক দিন এসে বরং দেখব।—চল্ শান্তিকা।'

'কিন্তু আমার কথা শুনলে না?'

'ওই ছোট মেয়েটির চিত্রখানিই তোমার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। তোমার শিল্পাসনের সামনে ওখানিই রেখে দিয়ো।'

কথা ও সুর—

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

স্বরলিপি—

শ্রীসাহানা দেবী

আশাবরী—কাওয়ালী

ওগো দুঃখের সুখের সাথী,
সঙ্গী দিন রাতি
সঙ্গীত মোর ;
(তুমি) ভব মরু প্রান্তর মাঝে
শীতল শান্তির লোর।
বন্ধুহীনের তুমি বন্ধু,
তাপিত জনের সুধাসিন্ধু,
বিরহ আঁধারে তুমি ইন্দু,
নির্জ্জনজন-চিত চোর।

দীনহীন পথচারী
সম্বল হে তুমি তারি—
সম্পদে উৎসবে জনমনোহারী
সর্ব্ব তরে তব ক্রোড় !

তব পরশ যবে লাগে,
সুপ্ত স্মৃতি কত জাগে ;
বিস্মৃত কত অনুরাগে
রাঙ্গে হৃদয় মন মোর !

(যাহা) বাক্য কহিতে নাহি জানে,
অন্তরে কহ তাই তানে ;
মুক্ত কর তুমি ছিন্ন কর গানে
বন্ধন কঠিন কঠোর।

গীত-মুখর তরু-ডালে
তব প্রেম অমৃত ঢালে,
পুষ্প দোলে তব তালে,
অম্বরে নাচে চকোর।

ভক্ত কণ্ঠে তুমি ভক্তি,
বীর করে নব শক্তি,
সুর, নর, কিন্নর, বিশ্ব-চরাচর
তব মোহ-মন্ত্র-বিভোর ॥

II { মা মা | মা পা পা পর্সা | ণা দা পা পা | মা পা পদা মপা | া- মজ্ঞা রা
ও গো দু - খ সু খে র সা থী স - ঙ্গী দি - ন রা

সা | রা মা পা পর্সা | ণর্সা -া ণদা া | (পা া- দপা দা | মা -া) } পা -া -া -া | া- া-
তি স - ঙ্গী ত - - মো - - - - - র্

পা পদা | মা পা ণা র্সা | ণর্সা র্জ্ঞা র্সরা র্সা | ণা ধা ণা া- | পণা দপা
তু মি ভ ব ম রু প্রা - ন্ত র মা - ঝে - - -

মপা া- | সা া- রা মা | পা া- পা পর্সা | ণর্সা া- ণা দা | পা দমা II
- - শী - ত ল শা - ন্তি র লো - - - - র্

| মা া- মা মা | মা া- মা পা | গমা পদা পা া- | া- া- া- া- | মজ্ঞা া মা মা |
ব ন্ধু হী নে র্ তু মি ব - - ন্ধু - - - - তা পি ত জ
ত ব প র শ ব বে লা গে সু - প্ত শ্ব
গী ত মু খ র ত রু ডা লে ত ব প্রে ম

ণদা া- ণা ণা | ণা র্সা র্সা া- | া- া- া- া- | ণা র্সা সর্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্ঋা র্ঋা
নে র সু ধা সি - ন্ধু - বি র হ আঁ ধা রে
তি ক ত জা গে বি স্মৃ ত ক ত
অ ত ত টা লে পু ষ্প দো লে -

র্সা র্সঋা | ণর্সা ণর্সঋা ণর্সা া- | ণদা া- পা া- | মা া- মা মা | পা া- পা
তু মি ই ন্ দু - - - নি - র্জ ন জ ন চি
অ নু রা গে রা জে হৃ দ য় ম
ত ব তা লে অ ম্ব রে না - চে

ণধা | ণা া- ধা র্সণা | র্সণা া- দা পা | মা া- পা ণদা | া- দা ণা ণা |
ত চো - - - - র্ দী - ন হী - ন প থ
ন মো র্ যা হা বা ক্য ক হি তে না হি
চ কো র্ ভ ক্ত ক - ণ্ঠে তু মি

\+ ৩ ০ ১
ণর্সা া- র্সা া- | া- া- া- া- | ণা া- র্সজ্ঞ জ্ঞা | র্ঋজ্ঞ া ঋার্সা সর্ঋা |
চা রী - - - - - স - ম্ব ল হে - তু মি
জা নে অ স্ত রে ক হ ত্যা ই
ভ ক্তি বী র ক রে - ন ব

\+ ৩ ০ ১ +
ণর্সা ণর্সঋা ণর্সা া- | ণদা া- পা া- | মা া- মা মা | পা া- পদা পা | মপা া- মা
তা - - - রি - - - স - ম্প দে উ ৎ স বে জ - ন
তা - - - লে - - - মু - ক্ত ক র - তু মি ছি - ন্ন
শ - - - ক্তি - - - সু র ন র কি - ন্ন র বি - শ্ব

৩ ০ ১ +
জ্ঞা | রা মজ্ঞা রা সা | রা মা মা মা | পা া- পা পর্সা | ণদা া- পা া- | া- দমা II
ম্ নো - হা রী স - র্ব্ব ত রে - ত ব ক্রো - - - - ড়্
ক র - গা নে ব - ন্ধ ন ক ঠি ন ক ঠো - - - র্
চ রা - চ র ত ব মো হ ম - ন্ত্র বি ভো - - - র্

বাদানুবাদ

সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক?

শ্রীসুনীতি দেবী

প্রতিবাদ

গত ফাল্গুনের ভারতবর্ষে "সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক?' এই শিরোনাম দিয়া একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে—লেখিকা শ্রীরাধারাণী দত্ত। আমি সেই লেখিকাকেই উদ্দেশ করিয়া কয়েকটি কথা বলিব।

শ্রীমতী লেখিকা, তুমি যে মনোধর্ম্মের স্বাভাবিক দিক্ দর্শন করাইয়াছ, ঐ দিক্-দর্শনই তোমার ভ্রান্তি। তুমি সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের রহস্য বুঝ নাই, মনোধর্ম্মের বিচিত্রতা বুঝিতে চেষ্টা কর নাই,—কেবল একটা বিকৃত শিক্ষালব্ধ ভাবের টানে প্রবন্ধ লিখিয়াছ। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি বুঝিয়াছ—জগতের মানব-মাত্রেরই মনোধর্ম্ম একই ভাবে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে? সৌন্দর্য্য-বোধ কি সর্ব্বত্র একই ভাবে ফুটিয়া উঠিয়া থাকে? সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব জাতি কি একই ভাবে মহত্ত্বের অনুভূতি করে? জগতের মানুষ-মাত্রেই কি একই প্রকারে দেবত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে? কৈ, তাহা ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই যে দেখিতে পাইতেছ, দেশ-ভেদে, কালভেদে, জাতিভেদে, স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে, এমন কি ব্যক্তি-ভেদে পর্য্যন্ত রুচি-বৈচিত্র্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহার কোন্‌টা স্বাভাবিক, কোনটা অস্বাভাবিক, তাহা তুমি বলিয়া দিতে পার কি? তুমি কি বলিবে—আমি যে তোমার লেখা দেখিয়া লজ্জা অনুভব করিতেছি,

আমার এ মনোধর্ম্ম অস্বাভাবিক ? আর তুমি হিন্দু রমণীর স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের অপঘাত ঘটাইয়া তাহার স্থানে বলপূর্ব্বক যে বিদেশীয় মনোধর্ম্মের আসন স্থাপন করিয়াছ, এইটা কি স্বাভাবিক ?

ঐ যে আমার বাড়ীর শালগ্রাম-শিলায় আমি দেবত্বের বিকাশ দেখিতেছি, সর্ব্বেশ্বরের অধিষ্ঠান দেখিতেছি,—ভক্তিপূত চিত্তে যদি তাঁহার দ্বারে মস্তক অবনত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি, তাঁহার কৃপায় কত বিপদের হাতে রক্ষা পাইতেছি, কত অমঙ্গল দূর হইয়া যাইতেছে,—আছে কি অন্য কোন জাতির শক্তি এমন দেবত্বানুভবে ? বলিয়া দাও দেখি—কোন্‌টা স্বাভাবিক ?

সতীত্বের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ যাহাই হউক, হিন্দু রমণীর মধ্যে তাহা পাতিব্রত্য অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লেখিকা কি ব্রত-নিয়ম কাহাকে বলে তাহা অবগত আছেন ? লেখিকা যখন স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের স্ফুরণে মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিয়াছেন, তখন সংযমই যে মানুষে ও পশুতে পার্থক্যের বেষ্টনী, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিবেন না। তবে লেখিকা যে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতেও, সংযমের বেষ্টনী-বন্ধনই যে মানুষের শিক্ষার উদ্দেশ্য, আর এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় না বলিয়াই মানুষের আইন, কানুন, স্তুতি, নিন্দা, সামাজিক পারিবারিক শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে মানুষকে সংযমের বেষ্টনীর মধ্যে রক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে—ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। লেখিকা স্বাভাবিক মনোধর্ম্ম ও শরীর-ধর্ম্মের বিকাশে মনুষ্যত্বের সন্ধান পাইলেও, জগতের কোন সভ্য মানুষই তাহা পায় নাই—ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। কারণ, জগতে কোন মানুষই নিজের পুত্র কন্যাগণকে স্বাভাবিক মনোধর্ম্ম ও শরীর-ধর্ম্ম পরিপোষণের জন্য অবাধ-অধিকার দেয় না ; তাহার সংযমের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। তবে হিন্দু ছাড়া সে ব্যবস্থায় অধিক সফল অন্য মানুষ এ পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই। হিন্দুর মত সংযমের মাহাত্ম্য আর কেহ বুঝিতেও পারে নাই। যাউক, সে কথার এ স্থান নহে।

কায়মনোবাক্য পবিত্র ও সংযত করিয়া দেবারাধনার নাম ব্রত। ব্রতের প্রধান অংশই সংযম। কাজেই পবিত্র শরীরে সুনৃত বাক্যে সংযত চিত্তে পতি-দেবতার সেবাই পাতিব্রত্য বা সতীত্ব। এই ব্রতের সংস্কার হিন্দু রমণীর হৃদয়ে স্বভাবতই ফুটিয়া উঠে ; শিক্ষায় উপদেশে সংসর্গে তাহা পরিপুষ্ট হয়। সৌভাগ্যবলে ব্রতাচরণের সুযোগ ঘটিলে ক্রমে অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা দৃঢ় হইয়া যায়।

স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের অনুসরণে ছুটিয়া বেড়াইলে তাহা লাভ করা যায় না। স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের অনুপ্রেরণায়—সৌন্দর্য্যের পায়ে দেহ উপঢৌকন দিলেও এ মহাব্রত পালন করা যায় না।

আমি দর্শন জানি না। তবুও একটু আধটু যাহা শুনিয়াছি, তাহাতেই বলিতে পারি, সাংখ্য-দর্শনের জড়ের আকৃতির কথা লেখিকা মোটেই বুঝিতে পারেন নাই। যদি বুঝিতেন, তাহা হইলে জড়ের আকৃতির সহিত স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের সাম্য স্থাপন করিয়া স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের বিকাশ ঘটান কর্ত্তব্য বুঝিতেন না। সাংখ্য-দর্শনে সৃষ্টি-কার্য্যে জড়ের আকৃতিকে যত প্রাধান্য দান করা হইয়াছে, অন্য কোন দর্শনে তাহা দেওয়া হয় নাই। আবার স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের নিগ্রহকে সাংখ্য মতে যত উচ্চ স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে, তাহাও অন্য কোন দর্শনে করা হয় নাই। সাংখ্য-দর্শনেই বলা হইয়াছে, ত্রিবিধ দুঃখের (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক) অত্যন্ত নিবৃত্তি পুরুষার্থ—অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজন। তাহা লাভ করিতে হইলে, চাই বিষয়-বিতৃষ্ণা, চাই যোগ, চাই তপস্যা, চাই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ—মনো-নিগ্রহ। ইহার সহিত স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের সম্বন্ধ কতটা ? লেখিকা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, "আমি প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবার সপক্ষে কথা বলি নাই ইত্যাদি" ; আর এক স্থানে বলিয়াছেন, "যাহাকে প্রকৃত সত্য বলিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারা যায়, তাহা অকপটে স্বীকার করাই মনুষ্যত্ব"। আবার সত্যং শিবং সুন্দরংও তিনি এক স্থানেই দেখিতে চাহিয়াছেন। সত্যং শিবং সুন্দরং কথা কয়টি লেখিকা যে শাস্ত্র ঘাঁটিয়া বাহির করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রেই বলিতেছে, ত্রিজগতে যাহা কিছু দৃষ্ট বস্তু সব অসত্য, সমস্ত অশিব ও অসুন্দর। তবে এই জগতের সৌন্দর্য্যের পায়ে লুটাইয়া লেখিকা সত্য উপলব্ধি করিবেন কি করিয়া ? দেহ ও মন স্বভাবের পায়ে উপঢৌকন দিয়া প্রবৃত্তির স্রোতে উজান বাহিতে চান—কোন শক্তিতে ?

কেশববাবুর প্রতিবাদের উত্তর

শ্রীরাধারাণী দত্ত

গত মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার মতের সমর্থন করিয়াও যে দুই একটি আপত্তি জানাইয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কিছু আছে।

তাঁহার মতে আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য হইলেও, ঐ সত্য প্রকাশের না কি এখনও সময় হয় নাই! তিনি বলিয়াছেন,—

"উক্ত প্রবন্ধে লেখিকা এই বিষয়ের খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করিয়া নারীর সতীত্ব-সমস্যার যে সমাধান প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও সৎসাহসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার এই সমাধান তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা বিদুষী রমণীর পক্ষে সত্য হইলেও, তাহা যে আমাদের নারী-সমাজের ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক নারীর পক্ষেই সত্য, এ কথা কোনও মতে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।"

তিনি বিশ্বাস না করিলেও, তাঁহার এই কথার উত্তরে আমি বলিতে চাই—যাহা সত্য, তাহা সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থায় সকলকার পক্ষেই সত্য ; কারণ, সত্য কখনও ব্যষ্টি বা সমষ্টির সুবিধা-অসুবিধার অপেক্ষা রাখিয়া প্রকাশিত হয় না। সত্য নিজগুণে স্বতঃসিদ্ধ, স্বতোদ্ভাবিত এবং স্বয়ম্প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা স্থান-কাল পাত্র-ভেদে বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা ঢাকিয়া রাখা চলে না এবং ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা

করিলেও তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। সত্য "ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক নারীর পক্ষেই" স্বরূপে সুপরিস্ফুট হইবে অথচ তাহার বিপরীত দিকের ছায়া-সম্পাত ঘটিবে না এইরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। কারণ, আলোকের পশ্চাতেই যেমন অন্ধকার, সেইরূপ সত্যের বিপরীতে মিথ্যাও জগতে চিরকালই আছে; এবং জগতে কোনও বিষয়ই ও কোন সত্যই "ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক" লোকের উপর সমান প্রভাব বিস্তার করিয়া একই ফল প্রসব করিতে পারে না; কারণ, প্রত্যেক মানবের স্বভাব রুচি ও মনের ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারের; সুতরাং সর্ব্বত্রই একই প্রকার সুফল বা কুফল আশা করা বিড়ম্বনা।

ইহার পর কেশববাবু লিখিতেছেন, "আজ যখন নারী-সমাজ হইতেই কোনও উচ্চ-শিক্ষিতা ভদ্র মহিলা কর্ত্তৃক ঐ সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তখন তাহাতে আনন্দিত হইবারই কথা। কিন্তু আনন্দের পরিবর্ত্তে আমার মনে যুগপৎ সংশয় ও আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছে।"

লেখক মহাশয়ের মতে—যে-সত্য অপ্রিয়, তাহা প্রকাশেও তিনি বিরূপ নহেন, এবং মিথ্যার আবরণে এই সত্য আবৃত করিবারও তিনি প্রয়াসী নহেন, বরং আনন্দিত হওয়া উচিত বিবেচনা করেন। সুতরাং "আশঙ্কা"র উদ্বেগে "সংশয়" সন্দেহের দ্বিধায় সত্যের অবমাননা অথবা সত্য-গোপন করার এই উপদেশ দেওয়া তাঁহার ন্যায় সত্য-গ্রাহীর পক্ষে আদৌ সুশোভন হয় নাই বলিয়া আমি মনে করি। তা' ছাড়া, তিনি আমাকে যে ভাবে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা যে বর্ত্তমান অবস্থারই একেবারে গোড়ার কথা, ও সংস্কার সাহিত্যের মূল-ভিত্তি—এই সাধারণ তথ্যটুকুও অন্ততঃ তাঁর জানা উচিত ছিল।

সত্যের আর একটি নাম 'স্বয়ম্প্রকাশ'। উহা কাহারও চেষ্টায় অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না। আর প্রকৃত সত্যের অনুসরণ করিতে পারিলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই; কারণ, 'সৎ' শব্দ হইতে 'সত্য' শব্দের উৎপত্তি। 'সৎ' শব্দ শুভবাচক,—যাহা সৎ তাহা শুভ। সুতরাং সত্য হইতে অশুভের আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক। যাঁহারা সত্য প্রকাশের ভয়ে অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহারা সত্য-সন্দর্শনে নানা কল্পিত অমঙ্গলের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া উঠিবেন, সন্দেহ নাই। সে কথা স্বতন্ত্র।

কেশববাবুর মতে—"সভ্য ও শিক্ষিত জগতের অন্যান্য নারী-সম্প্রদায়ের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মের প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ হইয়া, সর্ব্ব প্রকারে পুরুষের সাহায্যকারিণী হইতে এবং অত্যাচার নির্য্যাতন প্রভৃতি হইতে বুদ্ধি ও কৌশলে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থা না হওয়া পর্য্যন্ত এ সত্য বর্ত্তমান নারী সমাজে প্রচারিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত নহে। কেন না, শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব হেতু অশিক্ষিতা দুর্ব্বলচেতা নারী এই সত্যের প্রকৃত মর্য্যাদা না বুঝিয়া............প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবে না তাহাতে বিশ্বাস কি?"

তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণ স্বীকার্য্য হইলেও, তাঁহার যুক্তি সমীচীন নহে। তিনি একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে সমর্থ হইবেন যে এই সত্য যদি ঐ সভ্য-জগতের নারী-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ করা যায়, অর্থাৎ—যাঁহাদের কর্ম্ম জ্ঞান, শিক্ষা, দীক্ষায় সমকক্ষ হইতে পারিলে আমাদের 'অশিক্ষিতা বঙ্গনারী সমাজ' এই সত্য-গ্রহণের উপযুক্তা হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, সেই তথাকথিত "উচ্চশিক্ষায়" শিক্ষিতা নারী সম্প্রদায় মধ্যেও "ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক নারীর পক্ষেই" এই সত্যের প্রকৃত মর্য্যাদার উপলব্ধি ও আদর আমাদের বর্ত্তমান নারীগণ অপেক্ষা অধিক-মাত্রায় হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এই সকল তথাকথিত শিক্ষা, জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা থাকিলেই যে তাঁহারা সকলেই এই সত্যের প্রকৃত মর্য্যাবধারণ করিতে বা উহার মর্য্যাদা বুঝিতে সমর্থা হইবেন, ইহার অন্যথা হইবে না—এরূপ মনে করা অন্যায়। সত্যের মর্য্যাদা যদি কেহ বুঝিতে সমর্থ হয়, ইহার অকৃত্রিম স্বরূপ নারীর হৃদয় মধ্যে প্রকাশ করিতে যদি কেহ সমর্থ হয়, তবে সে একমাত্র তাহার বিবেক। এই বিবেক বুদ্ধি মানুষের সহজাত। শিক্ষার দ্বারা তাহার উৎকর্ষতা হয় ত' সম্ভব, কিন্তু তাহা অর্জ্জন করা অসম্ভব।

আধুনিক সভ্য-জগতের জ্ঞানবতী শিক্ষিতা নারীগণ কেবল মাত্র তাঁহাদের শিক্ষা ও জ্ঞান দ্বারা ইহার সত্য স্বরূপ কখনই গ্রহণ করিতে সমর্থা হইবেন না, যদি তাঁহাদের বিবেক স্বাধীন ও জাগ্রত না থাকে। সত্য হইতে মানুষকে বিচলিত বা ভ্রমাত্মক পথে পরিচালিত করে মানুষের চিত্তবল ও সংযমের অভাব। আমাদের দেশে অশিক্ষিতা বা অল্প-শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে যে অসাধারণ আত্মসংযমের প্রকাশ দেখা যায়, তাহা আধুনিক সভ্য-জগতের বিদুষী সুশিক্ষিতা নারীদের অপেক্ষা যে অনেক অধিক পূজনীয় 'দেশবন্ধু'র—উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কেশব-বাবুও ইহা বলিয়াছেন।

আমার মনে হয়, যে সকল নারীর মধ্যে বিবেকের বিকাশ অধিক স্ফুটতর এবং সংযমের প্রকাশ অধিক গভীরতর, তাঁহারাই এই সত্য গ্রহণের সম্পূর্ণ অধিকারিণী ও উপযুক্তা। আর যে নারী-সমাজের মধ্যে সংযমের অভাব অধিক এবং বিবেকও স্বাধীন ও পূর্ণ সচেতন নহে, তাঁহারা সর্ব্ব প্রকারে সুশিক্ষিতা, বিদুষী, জ্ঞানবতী হইলেও এই কঠিন সত্যের সম্পূর্ণ অনধিকারিণী এবং অনুপযুক্তা। পুরুষোচিত গুণের বিচারে ও শিক্ষা ভেদে যে এ সত্য নারী সমাজে প্রকাশ্য, অন্যথা নহে—এরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক; কারণ, একমাত্র সংযম ও বিবেকের তারতম্যানুসারে ইহা সুফল বা কুফলপ্রদ। আমার মনে হয়, বাংলার নারী-সমাজ সভ্য-জগতের নারীগণের তুলনায় শিক্ষা, জ্ঞান ও কর্ম্ম-নিপুণতা প্রভৃতি অনেক মহৎগুণের প্রতিযোগিতায় তাঁহাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেও, এই সত্য গ্রহণে তাঁহারা একটুও অনুপযুক্তা বা অনধিকারিণী নহেন—যেহেতু বিবেক ও সংযমের উচ্চতা গর্ব্বে তাঁহারা পৃথিবীর সকল নারীর অপেক্ষা ভাগ্যবতী। সুতরাং লেখক মহাশয় যে আমাদের দেশের নারীগণের শিক্ষা-হীনতার ছল ধরিয়া এই সত্য "মনে মনে রাখা" এবং "প্রকাশ না করা" উচিত ছিল বলিয়াছেন, তাহা আমি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। আধুনিক যুগে

বাংলার নারী-সমাজে ঐ সত্যের উন্মেষ সূচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যত কাল ইহা গোপন থাকা সম্ভব ছিল—তত কাল তাহা থাকিয়াছে; কিন্তু আজ সত্য যখন আপনিই আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তখন আর গোপন রাখা সম্ভবপর নহে। সত্য গোপনের প্রাণান্তকর চেষ্টাতেই আজ আমরা এতটা দুর্ব্বল, অসহায় ও অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছি।

লেখক অতীতের যে আদর্শ স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান নারী-সমাজের অযোগ্যতার জন্য আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং আধুনিক শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কারকে সেজন্য অপরাধী করিয়াছেন, আমার মনে হয় এখানেও তিনি একটি মারাত্মক ভ্রমে পড়িয়াছেন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর্য্যুপরি বিপর্য্যয় যে এ দেশের নারী সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য কতখানি দায়ী, এ কথা বোধ হয় তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। অতীতের আদর্শ বলিতে যে পাঁচ-সাত শত বৎসর পূর্ব্বের ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থা নহে, উহা যে তাহারও অনেক আগেকার কথা, এইটি রক্ষণশীল বা পরিবর্ত্তন-বিরোধী দলের ধারণার মধ্যে সকল সময়ে থাকে না বলিয়াই তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, বর্ত্তমান শিক্ষা, দীক্ষা, আদর্শ বা নীতি ভারত-নারীর দুরবস্থার জন্য কিছুমাত্র দায়ী নহে। অতীতেই আমরা আমাদের প্রাচীন আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়াছিলাম; এবং বহু কাল আর সে পূর্ব্ব-রীতিনীতির অনুসরণ না করিয়া, সেকালের নব-রচিত স্মৃতির অনুশাসন মানিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম বলিয়াই, আজ এতটা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী যে সকল বিধি-নিষেধের তখন প্রয়োজন হইয়াছিল, আজও যে অবস্থা ঠিক তাহাই আছে, এ কথা, আশা করি, কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না। অতীতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বর্ত্তমানকে অস্বীকার করা যে মৃত্যুরই রূপান্তর মাত্র, এ কথা এসিয়ার অন্যান্য মহাজাতিরা সময় থাকিতে বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই আজও তাঁহারা আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন; নতুবা আমাদেরই মত বেহাল আজ তঁাহাদেরও হইতে হইত।

লেখক মহাশয় যে স্থির করিয়াছেন পাঁজি পুঁথি দেখিয়া শুভ দিন ও শুভ লগ্ন স্থির করিয়া তবে যথাকালে যথাসময়ে সত্য প্রচারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, আমার মনে হয় সে সুদিনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে আমাদের জীবনের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবার পরেও সে সুযোগ আসিবে কি না সন্দেহ। সত্য প্রচার যে যোগ্যতা অর্জ্জনে জাতিকে সাহায্য করে, ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ লেখক গত পঁচিশ বৎসরের রুষ ইতিহাস পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। সুতরাং অসময়ে সত্য প্রচার করিলে যে মহাপ্রলয় হইবে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিতেছেন, তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন। ঐ সত্য প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই, বহু-দিনের-ঢাকিয়া-রাখা সত্য আপনিই সুপ্রকাশ হইতেছে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, যে সমাজের পুরুষেরা নারীকে কঠোর বিধি-নিষেধের লৌহ-বেষ্টনীর মধ্যে পুরিয়া, অবরোধের উচ্চ-প্রাচীরে ঘিরিয়া, চারিদিকে কড়া পাহারা বসাইয়া, অন্তরীণের আসামীর মতো তাহার সতীত্ব রক্ষার আয়োজন করে, তাহারা কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, আমাদের এই কাপুরুষ জাতি ভিন্ন জগতের অন্য কোনও দেশে নারীর এতখানি অবমাননা দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশের পুরুষেরা বঙ্গমহিলার গুণ-কীর্ত্তনে 'পঞ্চমুখ'কেও পরাস্ত করেন বটে, কিন্তু আপন জননী, জায়া, ভগিনী ও দুহিতাকে নিতান্ত হীনচেতা ও নির্লজ্জের মতো সর্ব্ব প্রকারে অবিশ্বাস করিতে এবং তজ্জনিত অবমাননা করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না! ইহাও সমস্যা।

ওর-মধ্যে পাগল কে? *

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, তুমি কতবার ডাক্তার ওব্রের বাড়ীর পাশ দিয়ে গেছ, অথচ একবার মনেও ভাবো নি, কত অলৌকিক কাণ্ড সেখানে অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ীটা দেখ্‌তে সামান্য রকমের, কোন বহির্ভড়ং নেই, কোন চিহ্ন নেই। এমন কি, দরজায় "স্বাস্থ্য নিবাস" এই সাদা-মাটা কথাটাও লেখা নেই। পিতল-রঙের নকলে রং করা একটা ফাটক; তার পরেই গোলাপ প্রভৃতি নানা ফুলের বাগান। ডাইনে দরোয়ানের ঘর। বাঁয়ের ইমারতের ভিতর ডাক্তারের ঘর, ডাক্তারের স্ত্রী ও কন্যার ঘর। প্রধান ইমারৎটা সুদূর প্রান্তভাগে। উহার পশ্চাতে একটা ক্ষুদ্র উপবন—বাদাম প্রভৃতি বড় বড় গাছ তাতে পোঁতা আছে। বাড়ীর জানালা দিয়ে এই উপবনটা দেখা যায়।

ঐখানে ডাক্তার উন্মাদ রোগের চিকিৎসা করেন; তাঁর চিকিৎসায় রোগীরা প্রায়ই ভাল হয়ে যায়। যেখানে সকল রকমের উন্মাদ রোগী আছে, সেই পাগলা গারদে তোমাকে নিয়ে যেতে আমি সাহস করতেম না। ভয়

* Edmond About.

পেয়ো না। বুদ্ধির জড়তা, পক্ষাঘাতের উন্মাদ, কিংবা একেবারে বুদ্ধি-লোপ—এই সব উন্মাদের কষ্টকর দৃশ্য তোমাকে দেখ্‌তে হবে না। তিনি নিজের জন্য একটা বিশেষত্বের সৃষ্টি করেছেন; তিনি এক-ধারণা ব্যাতিকের (monomania) চিকিৎসা করেন। ডাক্তার চমৎকার লোক, বিদ্যা-বুদ্ধিতেও অসাধারণ। একজন প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞানী। তাঁর টাক্-পড়া মাথা, দাড়ি কামানো, কালো পরিচ্ছদ, শান্ত প্রফুল্ল মুখশ্রী; যদি কখনো তাঁকে ত্যাখো ত ভেবে পাবে না,—তিনি ডাক্তার—কি, অধ্যাপক, কি পাদ্রি। তাঁর "ভারী-ভারী" চোখ দুটো খুল্‌লে, তোমার প্রথমেই মনে হবে যেন "বৎস!" বলে তোমাকে সম্বোধন করতে উদ্যত। তাঁর চোখ দুটো বেরিয়ে থাক্‌লেও, কুৎসিত নয়—তিনি যখন চারি দিকে প্রশান্ত দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করেন, তখন মনে হয় সেই দৃষ্টির ভিতর একটা দয়ার অফুরন্ত উৎস প্রচ্ছন্ন আছে। ঐ বড় বড় চোখ দুটি যেন একটি সুন্দর অন্তরাত্মার উন্মুক্ত দ্বার।

তিনি যখন চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে পড়তেন, তখনই তিনি ঠিক্ করেছিলেন, চিকিৎসার কোন্ বিভাগে তিনি জীবন উৎসর্গ করবেন। তিনি "এক-ধারণা" উন্মাদের অনুশীলনে খুব উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হ'লেন। এই রোগে, মনোবৃত্তিদের ভিতর যে গোলযোগ বাধে, স্নায়ুমণ্ডলের কোন প্রত্যক্ষ-গোচর বিকৃতি বা ক্ষতি তার কারণ নয়—তাই নৈতিক চিকিৎসার দ্বারা এই রোগ সারানো হয়। চিকিৎসালয়ের এক বিভাগের পরিদর্শক ছিলেন একটি তরুণ বয়স্কা রমণী—তিনি রোগ-পর্য্যবেক্ষণ সম্বন্ধে ডাক্তারকে সাহায্য করতেন। এই তরুণী, সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। ডাক্তার তাঁর প্রতি আসক্ত হলেন; এবং ডাক্তার-উপাধি পাবার পরেই, তাঁকে বিবাহ করলেন। তিনি যখন সংসারে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর অর্থ-সম্বল বেশী ছিল না। তাঁর একটি ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তি ছিল, সেইটি তাঁর এই হাসপাতাল স্থাপনে নিয়োগ করলেন। একটু বুজরুগির ভান করলে, তিনি বিস্তর টাকা রোজকার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি অল্পতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি নাম চাইতেন না, কোন একটা রোগ আরাম করলে, ছাদের উপর থেকে তা ঘোষণা করতেন না। তাঁর খ্যাতি-প্রতিপত্তি আপনিই গড়ে উঠল—তার জন্য কোন চেষ্টা করতে হয় নি। তাঁর 'যুক্তিমূলক এক-ধারণা-উন্মাদ' গ্রন্থের ৬ সংস্করণ হয়ে গেল—তিনি তার এক খণ্ডও কোন সংবাদপত্রাদিতে পাঠান নি। নম্রতা একটা ভাল গুণ, সন্দেহ নেই; কিন্তু তার বাড়াবাড়িটাও ভাল নয়। কুমারী ওভ্রে ১০ হাজার টাকা বিবাহের যৌতুক পেয়েছিলেন মাত্র—এবং এই এপ্রিল মাসে তাঁর বয়স ২২ বৎসর হবে।

১৫ দিন পূর্ব্বে (বোধ হয় বুধবার, ১৩ ডিসেম্বর) একটা ভাড়াটে গাড়ী ডাক্তার ওভ্রের ফটকে এসে দাঁড়াল। কোচমান ঘণ্টা নাড়লে—ফাটক খুলে গেল। গাড়ীটা ডাক্তারের বাড়ীতে এসে লাগ্‌ল। দুই জন লোক গাড়ী থেকে নেমে, আফিসের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভৃত্য বল্লে,—"একটু বসুন, ডাক্তার রোঁদের কাজ শেষ করে এখনই আস্‌চেন।" তখন বেলা দশটা।

এই অপরিচিতদের মধ্যে এক জনের বয়স ৫০ বৎসর; চওড়া শরীর, শ্যামবর্ণ গায়ে খুব রক্ত, মুখ টক্‌টকে লাল—দেখ্‌তে কুৎসিৎ—বিশ্রী গঠন। কাণ বেঁধানো হাত চওড়া ও প্রকাণ্ড বুড়ো-আঙ্গুল। দেখ্‌লে মনে হয় যেন একজন শ্রমজীবী তার মনিবের পোষাক পোরে এসেছে। ইনি হচ্ছেন;—মোসিও মার্লো।

এই লোকটার ভাগ্‌নে—ফ্রাঁসোয়া-টমাস্;—বয়স ২৩ বৎসর। বর্ণনা করা শক্ত, কেন না, এ ঠিক্ অন্যদেরই মতো। না চওড়া, না বেঁটে; না সুন্দর, না কুৎসিত; ভীমের মতোও প্রকাণ্ড নয়, সৌখিন বাবুর মতোও ছিপ্‌-ছিপে নয়। তার সবই মাঝামাঝি; মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কিছুই নেত্রাকর্ষক নয়। চুলের রঙে কোন বিশেষত্ব নেই—কাপড়ও সেই রকম।

টমাস্ যখন ডাক্তারের বাড়ীতে ঢুক্‌লো, মনে হল যেন খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যেন একটা রাগের মাথায়, এধার হতে ওধারে পায়চালি করছে; কোথাও স্থির হয়ে থাক্‌তে পারছে না। ২০টা জিনিসের দিকে একসঙ্গে তাকাচ্ছে; হাতবাঁধা না থাকলে বোধ হয় সেই সব জিনিস ধরে টান্‌তো। তার মামা বল্লেন;—"একটু শান্ত হও। আমি যা করতে চাচ্ছি, তা তোমার ভালোর জন্যই। তুমি এখানে বেশ সুখে থাক্‌বে; ডাক্তার তোমার ব্যামো ভাল করে দেবেন।"

"আমার ত কোন ব্যামো নেই। আমাকে বেঁধেছ কেন?

"কারণ তুমি আমাকে ধরে গাড়ী থেকে ফেলে দিতে যাচ্ছিলে। তোমার মনের অবস্থা ভাল নয়, ফ্রাঁসোয়া। ডাক্তার ওব্রে তোমাকে ভাল করে দেবেন।"

"মামা, আমি তোমারই মতো পরিষ্কার যুক্তি বিচার করতে পারি, তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি নে। আমার মন পরিষ্কার, বিচার-শক্তি বিশুদ্ধ, আমার স্মৃতি-শক্তিও খুব টন্‌টনে। তোমার সাম্‌নে কতকগুলি পদ্য আবৃত্তি করব কি ?—কতকটা ল্যাটিন তর্জ্জমা করব কি ?—এই দেখ, এই বইয়ের তাকে একটা Tacitus আছে * * * আর কোন রকমের প্রমাণ যদি চাও—আমি পাটীগণিত কিংবা জ্যামিতির সমস্যাও সমাধান করতে পারি * * * আমাকে তোমার নিতে ইচ্ছে নেই ? আচ্ছা বেশ ! আমরা আজ সকালে কি করেছি শোনো :—

"তুমি ৮টা রাত্রে এলে, আমাকে জাগাতে নয়—কেন না আমি তখন ঘুমুই নি—আমাকে শুধু বিছানা থেকে বের করে দিতে। জের্ম্যার সাহায্য না নিয়েও আমি কাপড় পরলুম। তুমি বল্লে, তোমার সঙ্গে ডাক্তার ওব্রের বাড়ীতে আমায় যেতে হবে। আমি রাজি হলুম না। তুমি জেদ করতে লাগ্‌লে। আমি রেগে উঠ্‌লুম। আমার হাত বাঁধতে জের্ম্যা তোমায় সাহায্য করলে। আমি আজ তাকে ছাড়িয়ে দেব। ১৩ দিনের মাইনে তার পাওনা আছে। আর ক্ষতি-পূরণের হিসেবে তাকে তোমারও কিছু দিতে হবে, কেন না, তোমার দরুণই সে "খৃস্‌মাস গিফ্‌ট্"টা পায় নি। আমি যা বল্‌ছি এটা কি যুক্তির কথা নয় ? তুমি এখনও কি মনে করছ, আমাকে পাগল বলে সাব্যস্ত করতে পারবে ? মামা, চারিদিক একটু ভাল করে বিবেচনা করে দেখো ! এটা যেন মনে থাকে, আমার মা তোমার ভগিনী ছিলেন। আমার মা যদি আমাকে এখানে দেখেন তাহলে তিনি কি বল্‌বেন ?—আহা মা বেচারী ! তোমার উপর আমার কোন অসদ্‌ভাব নেই—সমস্তই বেশ ভালোয় ভালোয় বন্দোবস্ত হতে পারে। তোমার একটি মেয়ে আছে—কুমারী "ক্লেয়ার মার্লো"।

"হ্যাঁ—এইখানেই তুমি ধরা পড়েছ। তুমি স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছ, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। আমার মেয়ে আছে ? আমার ? আমি ত একজন অবিবাহিত লোক। একেবারে বন্ধ আইবুড়ো !"

ফ্রাঁসোয়া যান্ত্রিকভাবে উত্তর করিল :—

"হাঁ—তোমার একটি মেয়ে আছে।"

"আচ্ছা, আমার কথা শোনোদিকি বাবু। বেশ মন দিয়ে শোনো। তোমার কি কোন মামাতো বোন্ আছে ?"

"মামাতো বোন ?—না। আমার কোন মামাতো বোন্ নেই। আমার হিসেবে গলদ পাবে না। আমার মামাতো ভাইও নেই, মামাতো বোন্‌ও নেই।"

"আমি তোমার মামা, এ কথা ত ঠিক্ ?—"

"হাঁ, তুমি আমার মামা,—যদিও আজ সকালে সেটা ভুলে গিয়েছিলে।"

"আমার যদি মেয়ে থাক্‌তো, সে তোমার মামাতো বোন্ হত। তোমার যখন কোন মামাতো বোন্ নেই—"

"সে কথা ঠিক্। এই বসন্তকালে, Ems Springsএ সৌভাগ্যক্রমে তার মায়ের সঙ্গে তাকে আমি দেখেছিলুম। আমি তাকে ভালবাসি। আমি যে তার প্রতি উদাসীন নই, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি। আমি তাই তার হস্ত-প্রার্থী। শুধু আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আছি।"

"কার হস্ত ?"

"কুমারী-মহাশয়ার হস্ত—আপনার কন্যার হস্ত।"

মার্লো মনে মনে ভাবিল :—আচ্ছা তাই হোক্। ডাক্তার ওব্রে যদি একে সারাতে পারেন, ত তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। ৩০ থেকে ৬ গেলে—থাকে ২৪। আমি ধনী হব। বেচারী ফ্রাঁসোয়া !

মার্লো সেইখানে বোসে একটা বই খুল্‌লে। যুবককে বল্‌লে—"তুমি ঐখানে বোসো। আমি তোমাকে একটা বিষয় পড়ে শোনাচ্চি। মন দিয়ে শুন্‌তে চেষ্টা কর। তোমার মন শান্ত হবে।"

মার্লো পড়িতে লাগিল :—

'এক-বাতিকের' রোগটা কি ?—না, একটা ধারণা মনে বরাবর লেগে থাকে—মন থেকে কিছুতেই যায় না—একটা আসক্তি মনের উপর আধিপত্য করে। এই রোগের স্থান হচ্চে—হৃৎপিণ্ড ; এই হৃৎপিণ্ডের ভিতরেই রোগটার অন্বেষণ করতে হবে এবং এই হৃৎপিণ্ডের ভিতরই রোগটাকে সারাতে হবে। এর কারণ হচ্চে—প্রেম, ভয়, গর্ব, দুরাকাঙ্ক্ষা, অনুতাপ। সাধারণতঃ আসক্তির সমস্ত লক্ষণ

এতে প্রকাশ পায়। কখন আনন্দ, কখন উল্লাস, কখন নির্ভীকতা, কখন চ্যাঁচামেচি, আবার কখন ভীরুতা, বিষণ্ণতা, ও স্তব্ধতা—এই সব লক্ষণের দ্বারা রোগটা ধরা পড়ে।"

পাঠকালে, মনে হল, যেন ফ্রাঁসোয়ার মন শান্ত হয়েছে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। মার্লো মনে মনে ভাব্‌লো—"বাহবা! ঔষধের কাজ ত' এর মধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। যার না ছিল ক্ষুধা, না ছিল নিদ্রা, সে এই পড়া শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল।" কিন্তু ফ্রাঁসোয়া আসলে ঘুমোয় নি—সে ঘুমোবার ভান করছিল। মধ্যে মধ্যে ঢুল্‌ছিল, আবার নাক্ ডাকাচ্ছিল। মার্লো মামা ওতেই ভুলে গেল। মার্লো চাপা গলায় তখনো পড়তে লাগ্‌ল—ক্রমে হাই তুলতে আরম্ভ করলে, তার পর পড়া বন্ধ করলে, বইটা হাত থেকে খসে পড়ল; চোখ্ বুজে এল। ক্রমে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হল। ভাগ্নে খুব খুসী হল-সে আড় চোখে আড় চোখে মামার কাণ্ড-কারখানা দেখ্‌ছিল।

প্রথমে ফ্রাঁসোয়া তার চৌকিটা সরালে—মার্লো একটুও নড়ল না, গাছের মত স্থির হয়ে রইল। ফ্রাঁসোয়া ঘরের মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। ঘরের মেজের উপর তার জুতোর ক্যাঁচ্‌কোঁচ্ শব্দ হতে লাগ্‌ল। তার পর বাতিকগ্রস্ত লোকটা একটা লেখবার টেবিলের কাছে গেল, সেখানে একটা ঘর্ষণ-যন্ত্র (eraser) দেখ্‌তে পেলে; সেইটে একটা কোণে ঠেসে, হাতলটা দিয়ে দৃঢ়ভাবে আট্‌কে রেখে, তাই দিয়ে তার বাহুতে যে বাঁধন ছিল, সেই বাঁধনটা কেটে ফেল্লে। আপনাকে এই রকম করে মুক্ত করে সে যখন আবার হাতের ব্যবহার ফিরে পেলে, তখন তার কী আনন্দ!—কিন্তু সে আনন্দের উচ্ছ্বাসটা চেপে রইল। আর খুব পা টিপে-টিপে তার মামার কাছে গেল। দুই মিনিটের মধ্যেই মার্লোকে খুব কসে বেঁধে ফেল্লে—কিন্তু এমন সন্তর্পণে যে তার ঘুমের একটুও ব্যাঘাত হল না।

ফ্রাঁসোয়া মনে মনে তার নিজের কাজের খুব তারিফ করলে, আর যে বই-টা মামার হাত থেকে খসে' মাটির উপর পড়েছিল সে বইটা কুড়িয়ে নিলে। "যুক্তিবিচারক্ষম মনোমেনিয়া" গ্রন্থের এটা একটা শেষ সংস্করণ। ঘরের একটা কোণে গিয়ে যতক্ষণ না ডাক্তার আসেন,—ফ্রাঁসোয়া গ্রন্থকীটের মত বইটা তন্নতন্ন করে পড়তে লাগ্‌ল।

২

ফ্রাঁসোয়া ও তার মামার গোড়ার কথাগুলো এখন বলা আবশ্যক। ফ্রাঁসোয়ার পিতা টমাস্ একজন খেলনা-বিক্রেতা ছিল। খেলনা-বিক্রী একটা খুব ভাল কাজ। প্রত্যেক জিনিসটায় শতকরা ১০০৲ টাকা লাভ থাক্‌তো। পিতার মৃত্যুর পর, ফ্রাঁসোয়ার অবস্থা বেশ সঙ্গতিপন্ন ছিল। তার বিশ হাজার টাকা আয় ছিল।

বোধ হয় আমি পূর্ব্বেই বলেছি তার রুচি খুব সাধা-সিধে রকমের ছিল। যে সব জিনিস চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে নয়, সেই সব জিনিসই সে পছন্দ করত। কালো ও শামলার যে সব মাঝামাঝি রঙ্—সেই সব রঙের কোর্ত্তা, ফতুয়া, দস্তানা সে বেছে নিত। খুব ছেলেবেলাতেও সে পালোক, ফিতে প্রভৃতি কাপড়ের সাজসজ্জা ভালবাস্‌ত না। তার ভয় হত, পাছে তার উপর লোকের চোখ পড়ে। বার্ণিস্ করা জুতো দেখ্‌লে তার চোখ্ ঝল্‌সে যেত। যদি জন্মসূত্রে তার কোন জাঁকালো নাম থাক্‌তো, তাহলে তাহার জীবনটা যারপরনাই কষ্টকর হয়ে উঠ্‌ত। ভাগ্যক্রমে "পদ্মলোচন" ধরণের নাম তার হয়নি। ভীরুতার দরুণ সে কোন একটা বিশেষ কর্ম্মবিভাগে প্রবেশ করতে পারে নি। বি-এ পাস করবার পর সে দেখ্‌লে তার সম্মুখে কতকগুলো ব্যবসার পথ খোলা। সে মনে করলে ব্যারিষ্টারের কাজে বড়ই বকাবকি গোলমাল, চিকিৎসা কাজে একটুও বিশ্রাম নেই, শিক্ষকের কাজে বেশী রকম ঔদ্ধত্য, ব্যবসাবাণিজ্য বড়ই জটিল, আর সরকারী কাজকর্ম্মে স্বাধীনতা মোটেই নেই।

আর সৈন্যবিভাগের কথা যদি বল—সে কথা মনে করাই নিরর্থক; যুদ্ধ করতে সে ভয় পেত ব'লে নয়—একটা উর্দ্দি পরতে হবে এই কথা মনে করেই সে শিউরে উঠ্‌ত। তাই সে তার পূর্ব্বের কাজেই রয়ে গেল—কাজটা খুব সোজা বলে' নয়—কাজটা তেমন সম্মানজনক নয় বলেই। তারই আয়ে সে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে লাগ্‌ল।

টাকা নিজে রোজগার করেনি বলে' সে টাকা অবাধে ধার দিত। এই দুর্লভ গুণের পুরস্কার স্বরূপ, ভগবান তার

অনেক বন্ধু যুটিয়ে দিলেন। সে অকপটে বন্ধুদের ভালবাস্‌ত, তাদের সমস্ত ইচ্ছা নিঃসঙ্কোচে পূর্ণ করত। রাজপথে কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে, সেই বন্ধু তার হাত ধরে টানাটানি করত, যেখানে ইচ্ছে তাকে নিয়ে যেত। মনে কোরো না,—সে নির্ব্বোধ, বা মূর্খ ছিল। সে তিন চারটে আধুনিক ভাষা, ল্যাটিন গ্রীক জান্‌ত, আর সব বিষয়েই কালেজে রীতিমত শিক্ষা পেয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা, কৃষি, সাহিত্য এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে তার কিছু কিছু জ্ঞান ছিল। কোন নতুন বই বের হলে; তার মূল্য ঠিক নির্দ্ধারণ করতে পারত। কিন্তু তার মতামত কারও কাছে প্রকাশ করত না।

কিন্তু শুধু মেয়েদের মধ্যেই তার দুর্বলতা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেত। কারও-না-কারও সঙ্গে প্রেমে পড়াই তার স্বভাব-ধর্ম্ম ছিল। যদি প্রভাতে চোখ্‌ রগ্‌ড়াতে-রগ্‌ড়াতে, দিগন্তদেশে প্রেমের কোন রশ্মি দেখ্‌তে না পেত, তাহলে তার মন খারাপ হয়ে যেত, সে প্রায়ই ভিতর দিক্‌ উল্‌টিয়ে সোজা করত। যদি কখনও কন্‌সার্ট কিংবা রঙ্গালয়ে যেত, সে প্রথমেই তার বেশ ভাল লাগে এমন একটা মুখ খুঁজে বের করত, তার পর সমস্তক্ষণ সেই মুখ নিয়ে মুগ্ধ থাক্‌ত। যদি কোন মনের মতন মুখ দেখ্‌তে পেত, তাহলেই নাটকটা ভাল মনে হত, কন্‌সার্টটা মধুর মনে হত, তা নইলে, মনে করত, সকলেই খারাপ অভিনয় করেছে, সকলেই খারাপ গেয়েছে। তার মনের ভিতর একটুও ফাঁকা রাখ্‌তে ভালবাসত না—যদি মাঝারি গোছের কোন সুন্দরী দেখ্‌ত, তাকে নিখুঁৎ সুন্দরী মনে করে সেই ফাঁকটুকু পূরণ করে নিত। এই প্রেম-লালসার ভিতর কোন লাম্পট্য ভাব ছিল না—তার অন্তঃকরণ নিষ্কলঙ্ক ছিল। রমণীদের ভালবাস্‌ত, কিন্তু তাদের কাছে ভালবাসা জানাতে সাহস করত না।

যখন সে কারও প্রেমে পড়ত, তার প্রেমাস্পদকে কত কথা বলবে বলে' মনে মনে আবৃত্তি করত' কিন্তু ঠোঁটের কাছে এসেই সেগুলো মরে' যেত। সে খুব সাধ্যসাধনা করত; অন্তস্তল পর্য্যন্ত খুলে দেখাতো; অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্ত্তা কইত—সেই কথাবার্ত্তার প্রশ্ন উত্তর সে নিজেই রচনা করত। আবেগ-ভরে এমন করে আবেদন করত যে তাঁতে পাষাণ পর্য্যন্ত গলে যায়। কিন্তু কোন নারীই তার মৌন আকাঙ্ক্ষায় আকৃষ্ট হত না। ভালবাসা পেতে গেলে, ভালবাসা চাওয়া চাই। "ইচ্ছে করা" আর "চাওয়া" এর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। "ইচ্ছে করা" মেঘের মধ্যে ভেসে বেড়ায়; "চাওয়া" পাথরের উপর ছুটে চলে। ইচ্ছা শুধু সুযোগের অপেক্ষায় থাকে; কিন্তু "চাওয়া" নিজের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই চায় না। "চাওয়া" বেড়া খাল খন্দ ডিঙ্গিয়ে গন্তব্য স্থানে সোজা আসে; "ইচ্ছেকরা" বাড়ী বসে', মধুর কণ্ঠে চাঁদকে ডাকে।

কিন্তু তথাপি, ঐ বৎসরেরই অগষ্ট মাসে সে একজনের সঙ্গে মুখামুখী প্রেমালাপ করতে সাহস করেছিল। Ems Springsএ একটি তরুণীর সঙ্গে তার দেখা হয়; সে তরুণীও তারই মত লাজুক। তরুণীর লাজুকতা দেখে সে সাহস পায়। সে একজন প্যারিস্‌ রমণী। দেয়ালের ছায়ার দিকে উৎপন্ন ফলের মত সে পল্‌কা ও সুকুমার। নীল শিরাজাল তার স্বচ্ছ চর্ম্মের উপর স্পষ্ট দেখা যায়। তার সঙ্গে আছে তার মা। একটা কি কণ্ঠরোগের দরুণ এখানকার উৎস-জল সেবন করতে এসেছে। মা মেয়ে দুজনেই বোধ হয় লোকালয় থেকে দূরে বাস করত। তাই এখানকার স্নান-কারীদের কোলাহলময় জনতার দিকে ওরা অবাক্‌ হয়ে চেয়ে থাক্‌তো। ফ্রাঁসোয়াই একজন বন্ধু এই মেয়ে দুটির সঙ্গে তার পরিচয় করে দেয়। সেই অবধি একমাস ধরে তাদের প্রতি সে যত্ন দেখাতো; বল্‌তে গেলে, ফ্রাঁসোয়াই ওদের একমাত্র সঙ্গী ছিল। স্পর্শকাতর সুকুমার-প্রকৃতি লোকদের পক্ষে, জনতা একটা বিজন অরণ্য বিশেষ। তাদের চারিদিকে লোকেরা যতই কোলাহল করে, ততই তারা সঙ্কুচিত হয়ে নিজের কোণটিতে গিয়ে, আপনাদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্‌ করে বাক্যালাপ করে।

ঐ প্যারিস্‌-তরুণী ও তার মা, একেবারে ফ্রাঁসোয়ার হৃদয়ের মধ্যে সোজা প্রবেশ লাভ করলে। আমেরিকা-আবিষ্কারক নাবিকদের মত, তারা ঐ হৃদয়ের মধ্যে নিত্য নূতন রত্ন-ভাণ্ডার আবিষ্কার করতে লাগ্‌ল। ঐ অজ্ঞাতপূর্ব্ব নবীন ভূখণ্ডের উপর তারা মনের সুখে বিচরণ করতে লাগ্‌ল। সে ধনী কি দরিদ্র এ প্রশ্ন তাদের মনে কখনো আসেনি। "ভাল লোক" জেনেই তারা সন্তুষ্ট ছিল। সোণার অন্তঃকরণ ছাড়া তাদের কাছে আর কিছুই

মূল্যবান বলে মনে হত না। ফ্রাঁসোয়াও বুঝতে পারলে, তার মনে একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়েছে।

কারও কাছে তোমরা শুনেছ কি—কেমন করে রুস্-দেশে বসন্ত-ঋতুর আবির্ভাব হয়? গতকল্য তুষারে সমস্ত আচ্ছন্ন ছিল। আজ একটা সূর্য্য-কিরণ এসে শীতকে তাড়িয়ে দিল; মধ্যাহ্নে গাছে গাছে ফুলের কুঁড়ি বেরিয়ে পড়ল। রাত্রে পাতায় পাতায় ভরে গেল। আগামী কল্য প্রায় ফল ধরবার মত হল। ঠিক্ সেই রকম ফ্রাঁসোয়ার প্রেম-কুসুম ফুটে উঠ্‌ল—ফলে পরিণত হবে বলে আশাও হল। উত্তাপে যেমন তুষারখণ্ডগুলো গলে যায়, সেই রকম তার আগ্রহ-হীনতা ও সংযম কোথায় যেন ভেসে গেল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ঐ মুখচোরা লাজুক বালক, পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হয়ে উঠ্‌ল।

বয়ঃপ্রাপ্ত ফ্রাঁসোয়া নিজেই নিজের প্রভু ছিল। কিন্তু তার প্রেয়সী তার পিতার অধীন থাকায় তার পিতার সম্মতি গ্রহণ করা আবশ্যক হল। এখন আবার সেই পূর্ব্বেকার ভীরুতা এসে তার মনকে দখল করলে। "ক্লেয়ার" ফ্রাঁসোয়াকে বল্লে,—"অসঙ্কোচে পত্র লেখো; আমার বাবাকে আগেই জানানো হয়েছে—ফেরৎ ডাকে তুমি তাঁর সম্মতি পাবে।" ফ্রাঁসোয়া একবার পত্র লিখ্‌লে, আবার লিখ্‌লে, একশোবার লিখ্‌লে, কিন্তু পত্র পাঠাবে কি না মন স্থির করতে পারলে না। যাই হোক, কাজটা খুব সহজ ছিল; সচরাচর লোকের মত যার বুদ্ধি, সেও এ কাজটা বেশ ভাল রূপেই করতে পারত। ফ্রাঁসোয়া তার ভাবী শ্বশুরের সামাজিক অবস্থা, সম্পত্তি, এমন কি মেজাজ পর্য্যন্ত—সমস্তই জান্‌তো। গুপ্ত ঘরের কথাও তার জানা ছিল। সে একজন ঘরের লোকের মতই ছিল। এখন তার শুধু অল্প কথায় বল্‌তে হবে, সে কি করে ও তার কি আছে। উত্তরটার সম্বন্ধে কোন সন্দেহই ছিল না।

কিন্তু সে এত দীর্ঘকাল ইতস্তত: করতে লাগল যে, একমাস পরে ক্লেয়ার ও তার মা তার সম্বন্ধে সন্দেহ করতে বাধ্য হল। তারা আরও দুই হপ্তা সবুর করতে পারত, কিন্তু বিজ্ঞ বাপ অতদিন সবুর করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলে না। বাপ মনে করলে, যদি ক্লেয়ার প্রেমে পড়ে থাকে, আর যদি তার প্রণয়ী স্পষ্ট করে কোন কথা না বলে, তাহলে, আর সময় নষ্ট না করে, প্যারিসের নিরাপদ স্থানে তার মেয়েকে রেখে দেওয়া ভাল। তার পর ফ্রাঁসোয়া যদি মন স্থির করতে পারে, তখন সেখানে গিয়ে সে বিবাহের প্রস্তাব করতে পারে।

এক দিন ফ্রাঁসোয়া নিত্য নিয়মানুসারে মহিলাদের বাহিরে বেড়াতে নিয়ে যাবে—এমন সময়, হোটেলওয়ালা তাকে বল্লে যে, তারা প্যারিসে চলে গেছে। এরই মধ্যে তাদের ঘরগুলো এক ইংরেজ-পরিবার এসে দখল করেছে। এই কথা শুনে তার মাথায় হঠাৎ যেন বজ্রাঘাত হল। সেই সঙ্গে তার বুদ্ধি লোপ হল। সে হতবুদ্ধি হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল, পূর্ব্বে ক্লেয়ারকে যে সব জায়গায় নিয়ে যেত, সেই সব জায়গায় গিয়ে তাকে খুঁজতে লাগ্‌লো। তার নিজের বাসায় যখন ফিরে গেল—তখন তার মাথায় ভয়ানক বেদনা—কি করে যে সে বেদনাটা সারালে সে ভগবানই জানেন। শরীর থেকে কতকটা রক্ত বের করে দিলে, ফুটন্ত গরম জলে স্নান করলে,নানা রকমে শরীরকে পীড়ন করতে লাগল। তার পর যখন মনে করলে বেদনাটা সেরে গেছে, তখন সে প্যারিসে যাত্রা করলে। তাড়াতাড়ি প্যারিসে গিয়ে রেলগাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ল, বোজ্‌কাবুজ্‌কি সঙ্গে নিতে ভুলে গেল, একটা ঠিকে-গাড়ীতে উঠে পড়ে, কোচম্যানকে বল্লে;—

"তার কাছে নিয়ে চল্—খুব জোরে হাঁকা।"

"কোথায় কর্ত্তা?"

"অমুক লোকের বাড়ী—অমুক রাস্তায়—আর আমি কিছু জানি নে। তার প্রেয়সীর নাম ও ঠিকানা সমস্তই ভুলে গিয়েছিল। "আবার আমার বাড়ীতে আমাকে নিয়ে যা—সেইখানে গেলে সব জান্‌তে পারব।" সে কোচমানের হাতে, তার "কার্ড" দিলে—কোচমান তাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল।

বাড়ীর দরোয়ান একজন নিঃসন্তান বৃদ্ধ লোক—নাম "এম্যানুয়েল"। তাঁর সঙ্গে দেখা হবামাত্রই ফ্রাঁসোয়া খুব নতমস্তকে নমস্কার করে তাকে বল্লে:—

"মহাশয়, আপনার কন্যা আছে। তার নাম কুমারী ক্লেয়ার এম্যানুয়েল। আমি তার হস্তপ্রার্থী হয়ে আপনাকে লিখব মনে করেছিলুম। কিন্তু শেষে মনে হল, নিজের মুখে এই অনুরোধ করাই শ্রেয়।"

তারা বুঝতে পারলে, লোকটার মাথা খারাপ হয়েছে। তখনি তারা "ফোবুর্গ সেন্ট সাঁতোয়ানে" তার মামা মার্লোর কাছে ছুটে গেল।

মামা মার্লো খুব খাঁটি লোক। সে প্রাচীন গ্রীসের আসবাব-পত্র খুব দক্ষতার সঙ্গে তৈরী করত। এস্ট্যাব্লিস্‌মেন্ট খর্চার উপর'কেবল শত করা ৫ টাকার লাভ রেখে জিনিস-পত্র বিক্রী করত। সুতরাং অর্থের চেয়ে সম্মানই সে বেশী অর্জ্জন করত। বিল করবার সময় সে দু তিন বার ঠিক্‌ দিয়ে দেখত, পাছে ভুল হলে, খদ্দেরের ক্ষতি হয়।

শিক্ষানবীশির সময় সে যে রকম ধনী ছিল, ৩০ বৎসর কাজ করবার পরেও সে তার চেয়ে বেশী ধনশালী হয় নি। তার নিযুক্ত খুব ছোট কর্ম্মচারীদের মতই সে তার জীবিকা অর্জ্জন করত। তার ভগিনাপতি, টমাস্‌কে দেখে তার হিংসে হত, সে কেমন করে অত টাকা জমালে। হঠাৎ বড়লোকদের যা হয়ে থাকে,—তার ভগিনীপতি তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখত। কিন্তু মার্লোর আত্ম-সম্মান বোধ বিলক্ষণ ছিল, সে হঠাৎ-নবাব হতে রাজি ছিল না। সে তার মধ্যবিত্ত অবস্থার বড়াই করত; সে অহঙ্কার করে' বলত—অন্তত এটা আমি নিশ্চয় জানি, আমার যা কিছু তা আমার নিজেরই—আমি পরের ধনে পোদ্দারি করি নে।"

মানুষ এক অদ্ভুত জানোয়ার। এ কথা শুধু আমি বল্‌চি নে। এমন সরেশ লোক—সমস্ত সহরতলী যার অতিরিক্ত সততা দেখে উপহাস করত, সে যখন শুন্‌লে তার ভাগনের মাথা খারাপ হয়েছে, তখন তার অন্তরের অন্তস্তলে কেমন একটু সুখানুভব করলে। তার অন্তরের অন্তস্তল হতে আস্তে আস্তে কে যেন ফোস্‌লাতে লাগল—"ফ্রাঁসোয়া উন্মাদ হয়েছে, তুমি তার অভিভাবক হবে।" তার সততা তখনই উত্তর করলে:—"ওর দরুণ আমরা বেশী ধনী হব না"—গূঢ় অন্তর্বাণীটি বল্লে:—"এ নিশ্চয়, উন্মাদের ভরণপোষণে কখনই ১৫ হাজার টাকা খরচ হবে না। তা ছাড়া সমস্ত হাঙ্গামটা আমাদেরই পোহাতে হবে; আমাদের কাজ-কর্ম্ম অবহেলা করতে হবে। এর দরুণ ক্ষতিপূরণ'ত চাই। আমরা কারও উপর অন্যায় করব না।" কিন্তু নিঃস্বার্থপরতা উত্তর করলে:—"তার আত্মীয়দের সাহায্য করা উচিত, তার দরুণ অর্থ গ্রহণ করা ঠিক্‌ নয়।" অন্তর্বাণীটি আস্তে আস্তে আবার বল্লে—"সে ঠিক্‌ কথা, কিন্তু আমাদের পরিবার আমাদের জন্য কিছু করে নি কেন?" তার হৃদয়ের সাধুভাব উত্তর করলে:—"আসলে কিছুই ঘটবে না; এ একটা মিথ্যে আশঙ্কা মাত্র। দু দিনের মধ্যেই ফ্রাঁসোয়া ভালো হয়ে উঠবে। তখন নছোড়বন্দা অন্তর্বাণীটি বল্লে:—"যাই হোক্‌, খুব সম্ভব ঐ রোগে সে মারা যাবে, আর কারও অন্যায় না করে' আমরা তার উত্তরাধিকারী হব। আমরা জর্মান-সম্রাটের জন্য ৩০ বৎসর ধরে' খেটেছি। তাতে কিছুই ত হল না, কে জানে যদি এই পাগলের কল্যাণেই আমাদের শ্রীবৃদ্ধি হয়—আশ্চর্য্য কি, হতেও পারে।"

সজ্জনটি কাণে আঙ্গুল দিয়ে রইল। কিন্তু তার কাণ এত বড়, শাঁখের মত এমন প্রশস্ত যে, সেই ক্ষুদ্র অন্তর্বাণীটি, তার অনিচ্ছা সত্বেও, আস্তে আস্তে তার ভিতর প্রবেশ লাভ করলে। তার নিজের কারখানাটি তার হেড মিস্ত্রীর জিম্মে করে দিয়ে, সে তার ভাগনের সুন্দর ঘরগুলির ভিতর আড্ডা গাড়লে। বেশ পরিপাটী আহারাদি চল্‌তে লাগল—তার অনেক দিনের শূল ব্যথাটা মন্ত্রের মত উড়ে গেল। তার ভাগনের ভৃত্য জর্ম্যাঁ তার পরিচর্য্যা করতে লাগল। এই পরিচর্য্যায় সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। ক্রমে ক্রমে তার ভাগনের রোগটা তার সয়ে গেল। তার মনে হতে লাগল, তার ভাগনের রোগ কখনই আরাম হবে না। তবু, তার অন্তর্দেবতাকে তুষ্ট রাখবার জন্য সে মনে মনে বারম্বার এই কথা আবৃত্তি করত "আমি কারও ক্ষতি করছি নে।"

তিন মাস পরে, একজন পাগলের সঙ্গে বাস করে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ফ্রাঁসোয়ার অবিরাম বকুনি, ক্লেয়ারকে বিবাহ করবার জন্য তার পাগলামি বুড়ের অসহ্য হয়ে উঠল। সে স্থির করলে, বাড়ী থেকে ওকে সরিয়ে, ডাক্তার ওব্রের ওখানে ওকে রেখে দেবে। সে মনে মনে ভাবলে "যাই হোক্‌, আমার ভাগ্নের সেখানে বেশী যত্ন হবে, আর আমিও একটু আরামে থাক্‌ব। বিজ্ঞান শাস্ত্র বলে, পাগ্‌লদের জন্য একটু পরিবর্ত্তন দরকার। আমি আমার কর্ত্তব্য করচি।"

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে মার্লো ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর এই সুযোগেই ফ্রাঁসোয়া তার মামার হাত বেঁধে ফ্যালে। তার পর যখন জেগে উঠল—সে কী জাগরণ! (ক্রমশঃ)

চরকার ভবিষ্যৎ

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

মহাত্মা গান্ধী মাদ্রাজ কর্পোরেশনের অভিনন্দনের উত্তরে সেদিন বলিয়াছেন, "If we are to remove the economic distress under which this land is labouring, if we are to serve the dumb millions of India, we cannot do without Spinning Wheel * * * I ask you to give it a place in your schools, I ask you whether you are an Indian, Hindu or Musalman, or whether you belong to one political school in the country or another, to give place to the spinning wheel and Khadder in your homes. You will find, I assure you, after a little bit of experience of the spinning wheel and Khadder that what I have said is truth."

এ ধরণের কথা মহাত্মা এই প্রথম বলিতেছেন না। ইতিপূর্ব্বে আরো অনেকবার তাঁহার এই নিঃসংশয় অনুরোধ দেশের লোকের মনের দুয়ারে ঘা দিয়াছে। সাড়া যে জাগে নাই তাঁহার প্রমাণ—ঘরে ঘরে চরকা ঘোরা তো সুরু হয়ই নাই; লোকের পরণেও খাদির সন্ধান মিলিতেছে না।

অথচ চরকা যে লোকের অনেক দুঃখ দূর করিতে পারে, তাহার পরিচয় বাংলা দেশে অন্ততঃ আজ খুব অস্পষ্ট নয়। উত্তর বঙ্গের বন্যার সময় যাহারা খাইতে না পাইয়া মরিতে বসিয়াছিল, চরকা তাহাদিগকে কাজ দিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে এবং আজও যে তাহারা চরকা ছাড়ে নাই, তাহার কারণ, কেবলমাত্র দুর্দ্দিনের বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতার বন্ধন নহে,—তাহার কারণ, আজিও চরকা তাহাদিগকে অন্নবস্ত্রের রসদ যোগাইতে কার্পণ্য করিতেছে না।

উত্তর বঙ্গের লোক বন্যার সময় যে দুঃখ ভোগ করিয়াছিল, সে দুঃখ ভারতবর্ষের একরূপ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। স্বচ্ছল অবস্থা, দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন পেট ভরিয়া পাইবার মত অবস্থা—হয় তো দুই চারিজনের থাকিতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ লোকেরই বরাত ঠিক তাহার বিপরীত। খাইতে পায় না, পরণে বস্ত্র নাই; ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জর, মৃত্যু-শয্যাতেও এক ফোঁটা ঔষধ পেটে পড়ে না—এ অবস্থা ভারতবর্ষের শতকরা ৯০ জনের। ভিক্ষুকের দল দিনের পর দিন বাড়িতেছে। রাস্তা-ঘাটে যে সব লোকের চেহারা সাধারণতঃ চোখে পড়ে, দুর্ভিক্ষের যে চেহারার বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আনন্দমঠে দিয়াছেন, তাহার সহিত তাহাদের অধিকাংশেরই কোনো তফাৎ নাই।

এই দুঃখ প্রতি দিন আমরা ভোগ করিতেছি। দুঃখকে সম্পূর্ণ না হোক অন্ততঃ কতকটা দূর করিতে পারে, এমন যন্ত্রেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। দামও তাহার খুব বেশী নয়, ইচ্ছা করিলে নিজের হাতেও তৈরী করিয়া লওয়া যায়। অথচ এ সব সত্ত্বেও যন্ত্রটাকে আমরা ব্যবহারে লাগাইতে পারিতেছি না। ব্যাপারটা অদৃষ্টের একটা অদ্ভুত পরিহাসের মতই মনে হয়।

বস্ত্রশিল্পে স্বাবলম্বী হইতে পারিলে দেশের অনেক দুঃখ যে দূর হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝি। কারণ, এ শিল্পের জন্য একটা মোটা টাকা প্রতি বৎসর দেশের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, এ কথা আমাদের অনেকেরই জানা আছে। টাকার ঠিক অঙ্কের খবর হয় তো অনেকেই রাখে না, তবে রাখা যে ভালো তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ সাধারণ লোকের এ খবর জানিয়া রাখার উপর দেশের ভালো-মন্দ অনেকখানিই নির্ভর করে। খবরটা জানাও খুব কঠিন ব্যাপার নহে—কয়েক বৎসরের বস্ত্রশিল্পের আমদানী রপ্তানীর হিসাবটা লইয়া সামান্য একটু নাড়াচাড়া করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী

বৎসর	কাপড়ের আমদানী		কাপড়ের দাম।	
১৯১৭	১৮৯১৭০০০০০	গজ	৫৫৬৪৬৪০০০	টাকা
১৯১৮	১৫২৩৪০০০০০	"	৪৯৭২৫০০০০	"
১৯১৯	১১২২০০০০০০	"	৪৯৪০০০০০০	"
১৯২০	১০৮০৭৪৮০০০	"	৫১৭৬০০০০০	"
১৯২১	১৫০৯৭২০০০০	"	৮৩৭৮০০০০০	"
১৯২২	১০৮৯৮০০০০০	"	৪৩১৬০০০০০	"
১৯২৩	১৫৭৭৩০০০০০	"	৫৮৫১০০০০০	"

কিন্তু সে যাহাই হোক্, ভারতবর্ষের বিদেশী বস্ত্রের আমদানীর এই আর্থিক অঙ্কগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলেও, এই অঙ্কগুলি যে খুব ছোট নহে, বরং বিশেষ বিপুলকায়, সে কথাটা আমরা সকলেই জানি। এতগুলি টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে দুঃখ হয় না, এরূপ ভারতবাসীও খুব কমই আছে। তথাপি যে পথ ধরিয়া চলিলে এই টাকাগুলি দেশে রাখিতে পারা যায়, সে পথ আমরা ধরিতেছি না। পথের ইঙ্গিত যে পাওয়া যায় নাই, তাহাও নহে। তথাপি পথটাকে আমরা গ্রহণ করিতেছি না কেন?

এই 'কেন'র জবাব সম্ভবতঃ,—যে পথটা দেখানো হইয়াছে, সে পথের উপর দেশের লোকের যথেষ্ট আস্থা নাই। চরকাও যে গোটা ভারতের বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে পারে—মিলের এই পরিপ্লাবনের যুগে সে কথাটা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কেবলমাত্র ভাবের পিছনে ছুটিয়া চলিলে বস্তুর সঙ্গে যখন সংঘাত বাধিবে, তখন হয় তো মার খাইতে হইবে; এই ভয়েই চরকাকে

বস্ত্রশিল্পের হাতিয়ার রূপে গ্রহণ করিতে আমাদের মনেও বাধিতেছে, কাজেও বাধিতেছে। হয় তো আরো অনেক কারণ আছে—ইয়োরোপীয় সভ্যতার মোহ, দীর্ঘ দিনের অনভ্যাস, নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে নিজেদের অনভিজ্ঞতা ইত্যাদি হয় তো এই গ্রহণ না করার আরো কতকগুলি কারণ। কিন্তু মনে হয়, সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারণ—চরকার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ। সুতরাং চরকার উপযোগিতা যদি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায়, লোকে যদি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারে যে চরকার দ্বারাও দেশের বস্ত্রশিল্পের কাজ চলা অসম্ভব নহে, বরং ঢের সস্তায় ঢের বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চরকার দৌলতে লাভ করার সম্ভাবনা আছে, তবে চরকার ভবিষ্যৎ একেবারে অনুজ্জ্বল হয় তো না-ও হইতে পারে।

চরকার দ্বারা মিলের অভাব মিটানো যায় কি না, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, চরকার অতীতকে উপেক্ষা করা যায় না। কারণ, চরকার শক্তির পরিচয় তাহার অতীতের ভিতরেই আছে। আজ যে মিল আমাদের মনোহরণ করিয়াছে, সে মিল খুব পুরানো জিনিস নহে। বড় জোর শ'দুই বৎসর পিছাইয়া গেলে মিলের অস্তিত্ব আর চোখে পড়ে না। অথচ তাহার পূর্ব্বেও বস্ত্রের চাহিদা মানুষের কাছে এখনকার মত এই রকমেরই ছিল। আর সে যুগের বস্ত্র-সমস্যাকে যে যন্ত্রটি সমাধান করিয়াছিল, তাহাও মিল নহে,—তাহা অতি সাধারণ চেহারার লোহা লক্কড়ের বাহুল্য-বর্জ্জিত এই চরকা। চরকার সেদিনের কথাগুলি স্মরণ করিলে এই কয়েকখানা কাঠের সমষ্টির উপরেও আমাদের শ্রদ্ধা অসম্ভব নয়।

চরকার সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সাহিত্যে অনেক রকমের ইঙ্গিত আছে। আর সেই সব ইঙ্গিত চরকার জয়গানেই পরিপূর্ণ। 'চরকার দৌলতে দুয়ারে হাতী' বাঁধিয়া রাখার কথাও এই-সব গানের ভিতর পাওয়া যায়। এ-সব গানের ভিতর কবির অতিশয়োক্তি হয় তো খানিকটা আছে; কিন্তু ইহার আগাগোড়াই যে অতিশয়োক্তি, তাহা মনে করিবার সপক্ষেও কোনো যুক্তি নাই। কারণ, ভারতীয় চরকায় এবং তাঁতে যে-সব বস্ত্র তৈরী হইত, তাহাতে কেবলমাত্র ভারতীয় বস্ত্রের অভাবই পূর্ণ হইত না, ভারতবর্ষের বাহিরেও অনেক স্থানের অভাব তাহাতে মিটিয়াছে।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্প বিদেশের বাজারে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার পরিচয় দিয়াছেন Daniel Defoe—"But it (Indian cotton goods) crept into our houses, our closets and bed chambers; Curtains cushions, chairs, and, at last, beds themselves were nothing but Calicoes or Indian stuffs, and, in short, almost everything that used to be made of wool or silk, relating either to the dress of the women or the furniture of our houses, was supplied by the Indian trade. What remains, then, for our people to do but to stand still and look on, see the bread taken out of their mouths and the East Indian trade carry away the whole employment of their people?"

আজ ল্যাঙ্কাশায়ারে মিলের দৌলতে ভারতবর্ষের যে অবস্থা, দুই শত বৎসর আগে ভারতবর্ষের চরকার দৌলতে বিলাতের ঠিক সেই অবস্থাই হইয়াছিল। ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলগুলি ভারতবর্ষে বস্ত্রের চাহিদা মিটাইয়া যদি কোটি-পতি হইয়া উঠিতে পারে, তবে দুনিয়ার বাজারে বস্ত্রের রসদ যোগাইয়া ভারতবর্ষ যে নিঃস্ব হইয়াছিল, তাহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

এক শত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষ চরকার কল্যাণে তাহার নিজের বস্ত্রের প্রয়োজন মিটাইয়া বাহিরের চাহিদাতেও যে যোগান দিয়াছে, তাহার উদাহরণ বিদেশী গ্রন্থকারদের গ্রন্থ ছাঁকিয়াই অজস্র দেওয়া যায়। একশ' বছর আগেও যে কাজটা চরকা দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে, আজ আর তাহা চরকার দ্বারা হইতে পারে না, একমাত্র গায়ের জোরের ভিতরেই এরূপ যুক্তির সার্থকতা মিলিতে পারে।

কিন্তু দূরের কথায় অনেকে দূরের বলিয়াই কাণ দিতে চান না। তাঁহারা যুক্তি খোঁজেন বর্ত্তমানের ভিতর। দূরের কথা ছাড়িয়া দিয়া এ যুগের কথা ধরিলেও চরকাকে অগ্রাহ্য করিবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ যুগেও অনেক দেশে চরকা মিলের স্থান অধিকার করিয়া আছে, এবং তাহার ফলে সে সমস্ত দেশের বস্ত্র-সমস্যা বিশেষ জটিল হইয়াও উঠে নাই। লোক সংখ্যা এবং বিস্তৃতি হিসাবে চীন ভারতবর্ষ অপেক্ষা ছোট নয়। অত বড় চীনের বস্ত্র-সমস্যাও এই চরকার দ্বারাই মিটিতেছে। চীনে প্রতি বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ গাঁট তুলা জন্মে (প্রতি গাঁট প্রায় ছয় মণ)। এই তুলা সে কি ভাবে খরচ করে? মিঃ ডানষ্টনের লেখা ১৯১০ খৃষ্টাব্দের "Papers and Report on Cotton Cultivation" এর ভিতর তাহার পরিচয় আছে। তিনি লিখিয়াছেন, "Not only is most of the raw cotton of China used at the place of production being spun and woven on numberless spinning wheels and Hand-looms; but since the treaty of Shimonosaky in 1895 a number of cotton mills has been started in China.' যে মিলের কথা মিঃ ডানষ্টন বলিয়াছেন, তাহাতে কতটা তুলা ব্যবহৃত হয়, তাহারও পরিচয় দিয়াছেন Mr. John Todd. তাঁহার "The world's cotton crops" নামক গ্রন্থে আছে "The latter (mills of China) are said to contain a million spindles and to consume about half a million bales of native cotton per annum." অর্থাৎ চীনের ২০ লক্ষ গাঁট তুলার ভিতর মাত্র ৫ লক্ষ গাঁট তাহার মিলে ব্যবহৃত হয়।

এক শত বৎসর পূর্ব্বের চরকার দ্বারা ভারতবর্ষের বস্ত্র-সমস্যা মিটিয়াছে, আর চীনের এখনও মিটিতেছে। সুতরাং চরকার শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ না করিলেও হয় তো তাহা অন্যায় হইবে না। তবে প্রশ্ন

উঠিতে পারে—চরকার দ্বারা বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে গেলে, তাহাতে দেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ বাড়িবে না কমিবে? ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে প্রতি বৎসর ৩০।৩৫ লক্ষ গাঁট তুলা জন্মে, সে দেশে যে বাড়িবে তাহাতে তো সন্দেহ নাই ই, কিন্তু যে সব দেশে তুলা জন্মে না, সে দেশেও যে বাড়ে, তাহার প্রমাণ দিয়াছেন ঐতিহাসিক Townsend Warner। "Landmarks in English Industrial Historyতে তিনি লিখিয়াছেন, "The great sheet-anchor of all cottages and small farms was the labour attached to the handloom * * *. It required 6 or 8 hands to prepare and spin yarn sufficient for the consumption of one weaver. This shows clearly the inexhaustible source there was for labour for every person from the age of 7 to 80 years (who retained their sight and could move their hands) to earn their bread, say 1 to 2 sh. a week without going to parish." এই প্যারিশটা যে কি পদার্থ, তাহার পরিচয় আর একজন দিয়াছেন—"house for the absolutely destitute।"

যে শিল্পের দ্বারা দেশের লোক মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান করিতে পারে, দুর্ভিক্ষকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে, মনের আনন্দ এবং দেহের স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে পারে—সেই শিল্পের উপরেই যে শিল্প-দেবতার স্বচ্ছন্দ সিংহাসন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মিলের বাহিরের চাকচিক্য চোখ-ঝলসানোর মত হইলেও, তাহার দ্বারা সত্যকার সুখসম্পদ যে বাড়ে নাই, তাহার পরিচয় ইয়োরোপের মিল-প্রধান দেশগুলি নিজেরাই প্রদান করিতেছে। সে সব যায়গায় socialism, anarchism, syndicalism ইত্যাদি নানা রকমের 'ism' গুলি এই মিলেরই সৃষ্টি। এ-সব ধনি-সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী-দের অভিযান। দুঃখ কত বড় নিদারুণ হইলে মানুষ দল পাকাইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাহা বোঝা কঠিন নহে। মানুষ তাহার গৃহ হারাইয়াছে মিলের জন্ম, সহরের কদর্য্য পল্লীতে অত্যন্ত নোংরা ভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে মিলের জন্ম, তাহার দেহের স্বাস্থ্য মনের শান্তি নষ্ট হইয়াছে মিলের জন্ম। পল্লীগুলি শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে মিলের জন্ম। সুতরাং এ বিদ্রোহ অস্বাভাবিক নয়।

ধর্ম্মঘট, হানাহানি, মারামারি, যে মিলের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, শান্তি যদি তাহারই বনিয়াদের উপর গড়িয়া উঠে, তবে শান্তির দেবতাও যে বিগড়াইয়া গিয়াছেন,—তাঁহার অনুচরেরা আর যাহাই দিক, সন্তোষ যে দিতে পারিবে না—দুনিয়ার অনেক মনীষী ভাবুক আজ সে রকমের সন্দেহও করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারা বাৎলাইতেছেন ফিরিয়া চলার পথ। ইয়োরোপ যেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিলে বাঁচে, আমরা সেইখানে পৌছিবার জন্মই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি।

ঠেকিয়া শেখা অপেক্ষা দেখিয়া শেখার দুঃখ যে ঢের কম তাহাতে ভুল নাই; এবং সত্য কথা বলিতে গেলে, কেবল দেখার নয় ঠেকারও চূড়ান্ত দুঃখ এবং লজ্জা আমাদের অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। দেখিয়াও যাহারা শেখে না এবং ঠেকিয়াও যাহাদের চোখ ফোটে না, দেবতার ধ্বংসের বজ্র না কি তাহাদের জন্মই গড়িয়া ওঠে। মিল দেশের যে ক্ষতি করিয়াছে, চরকার দ্বারা হয় তো তাহা সুদে আসলে পোষাইয়া লইতে পারা যাইবে, হয় তো বা যাইবে না। কিন্তু মিল যে শ্রেয়র পথ নহে, তাহাতে যখন ভুল নাই, এবং মিলেও চরকা ছাড়া বস্ত্রসমস্যা সমাধানের যখন অন্য পথও পাওয়া যাইতেছে না, তখন চরকা পুরানো পথ হইলেও, তাহাই যে একমাত্র পথ, তাহাও নিঃসংশয়েই বলা যায়। তাহা ছাড়া, যে চরকার অতীত অত উজ্জ্বল, তাহার ভবিষ্যৎকে সন্দেহ করিবারই বা কি কারণ আছে?

আষ্ট্রীয়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

বিষয়-বুদ্ধি ও ব্যবসায়-নৈপুণ্যই যার প্রধান গুণ সে-লোক প্রায়ই মজলিশি বা মিশুক হয় না। কারণ যে মধুর স্বভাবের গুণে মানুষ জনপ্রিয় হয়, ব্যবসায়ীদের অধিকাংশের মধ্যে সেটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সম্পন্ন যে লোক—কিসে দিন-দিন তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়, কিসে তার নামযশ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়, এই দিকেই যার প্রধান লক্ষ্য,—সে রকম লোকের সঙ্গ ও সহবাস মোটেই প্রীতিপ্রদ হয় না। ব্যক্তিগত হিসাবে এটা যেমন সত্য, জাতিগত হিসাবেও এটা তেমনিই সত্য।

এই জন্মই প্রখর বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন ইংরাজ ও জার্ম্মানরা জগতের কাহারও প্রিয় নয়; অথচ আষ্ট্রীয়ানরা সহজেই সকলের চিত্ত জয় করে নেয়। আষ্ট্রীয়ানরা জার্ম্মানদেরই জ্ঞাতিভাই বটে; কিন্তু প্রুশিয়ার প্রবল প্রভাবকে এড়িয়ে সে নিজের বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীনতা ঠিক বজায় রাখতে পেরেছে। তবে যারাই কিন্তু বেশী দিনের জন্ম আষ্ট্রীয়ায় বেড়িয়ে এসেছে, তারাই বলে, যে আষ্ট্রীয়ানরা একটু অলস প্রকৃতির লোক। তারা বেশ ধীরে-সুস্থে কাজ ক'রতে ভালবাসে, তাড়াহুড়ো যেন তাদের জীবনের মধ্যে খুঁজেই

পাওয়া যায় না। আস্ট্রীয়ানদের আর একটা সাঙ্ঘাতিক দোষ আছে এই যে, আমাদের এদেশী রাজ-কর্ম্মচারীদের মতো তাদের রাজ-কর্ম্মচারীরাও একান্ত ঘুষ-খোর। সততার অভাবেই তাদের দেশের শাসন-পরিষদ রাজকার্য্য পরিচালনের সম্পূর্ণ অক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আগে জার্ম্মাণী বেড়িয়ে তার পর আস্ট্রীয়ায় গিয়ে পড়লে যেন মনে হয়, একটা কারখানা বাড়ী থেকে একেবারে একটা বৈঠকখানায় এসে পড়লুম। ঘড়ী ধরে কলের মতো কাজ করার দেশ থেকে এ যেন অনেকটা যা খুসি করার দেশে এসে পড়েছি বলে মনে হয়। কাজেই বাঁধা-ধরা নিয়মের বাইরে আসার যে একটা আরাম ও আনন্দ, সেটা এখানে এসে বেশ স্পষ্ট অনুভব করতে পারা যায়। তা ছাড়া আস্ট্রীয়ার প্রধান সহর ভিয়েনার এমন একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ আছে, এবং এই সহর-বাসীদের সকলেরই মনের মতো আমোদ-প্রমোদ নিয়ে যতদূর পারা যায়, জীবনটাকে উপভোগ করবার প্রবৃত্তিটাই প্রধান বলে, এখানে সর্ব্বদাই এমন একটা আনন্দের হিল্লোল ব'য়ে যায় যে, ভিয়েনায় গিয়ে মানুষ খুসি না হয়ে থাকতে পারে না। বার্লিনের অধিবাসীদের কঠোর মুখভাব এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ গম্ভীর দৃষ্টির পাশে এই ভিয়েনায় হাসিমুখ ও কোমল দৃষ্টি যেন প্রাণে অনেকখানি স্বোয়াস্তি এনে দেয়। ভিয়েনায় মেয়েদের পোষাক ভারি চমৎকার। ভিয়েনার মেয়েদের কাছ থেকে অনেক রকম পোষাকের ফ্যাশান আজ জগতের মেয়েরা শিখেছে। ছিপ্‌ছিপে গড়নের সুশ্রী ও সুন্দরী মেয়ে এখানকার সকল শ্রেণীর মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। বিপদকে এরা যেন মোটেই ভয় করে না,

কারিন্থিয়ানের সুসজ্জিতা কৃষকবালা।

প্রাচীন পোষাকে ভিয়েনার সুন্দরী।

দুর্ঘটনাকেও অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এরা গ্রহণ করতে পারে। রাজনীতির ব্যাপার নিয়েও এরা মোটেই মাথা ঘামাতে চায় না,—যা হবার হবে, বলে বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে থিয়েটার দেখে, নাচ গান করে, পান-ভোজন, উদ্যান-ভ্রমণ ও আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেয়। সহরের এই চাল সেখানকার মফঃস্বলেও খুব সংক্রামিত হয়েছে। ভিয়েনা যা করবে, তার দেখা-দেখি প্রাদেশিক সহরগুলোও সব তাই অনুকরণ করে; কারণ, রাজধানী সকল দেশেরই আদর্শ হয়ে ওঠে।

এখানকার মতো আষ্ট্রীয়াতেও যত উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসাদার, বড় বড় রাজ-কর্ম্মচারী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতকলাবিদ্, সকলেই যে যার দেশ ছেড়ে, ভিয়েনা সহরে এসে বাস করবার জন্য লালায়িত। Ringstrasse অর্থাৎ, রিং ষ্ট্রীটে যেখানটাকে ভিয়েনা সহরের 'চক্‌বাজার' বলা যেতে পারে, সেখানে যে 'ষ্টাইলে' সহরে লোকেরা চলা ফেরা করে, যে রকম 'ফ্যাশানে' পোষাক-পরিচ্ছদ পরে, দেখতে দেখতে আষ্ট্রীয়ায়, সাল্‌সবার্গে, ইন্‌স্‌ব্রুকে, লিঞ্জ্‌ ও গ্রাজে তার হুবহু নকল ছড়িয়ে পড়ে।

টাইরলের ক্ষেত্রপাল।

উত্তর আষ্ট্রীয়া ও দক্ষিণ-আষ্ট্রীয়ার সাধারণ অধিবাসীরা, ষ্টাইরীয়া, কারিন্থিয়া, টাইরোল প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা এবং জার্ম্মাণ ভাষা-ভাষী কয়েকটা প্রদেশের বাসিন্দারা যাদের নিয়েই বর্ত্তমান আষ্ট্রীয়ার অস্তিত্ব, তারা সকলেই নিরীহ কৃষক, চাষ-বাস করাই তাদের পেশা। তারা সবাই নিতান্ত ভাল মানুষ, 'গোবেচারা লোক। তারা রাজনীতির কোনই ধার ধারে না; বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতিই বা কি, আর স্বরাষ্ট্র পদ্ধতিই বা কাকে বলে, এসবের অর্থ পর্য্যন্ত তারা জানে না, কিন্তু তবু শুন্‌লে হয়ত আমরা আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবো, যে তারা সকলেই স্কুলে পড়েছে এবং সবাই তারা বেশ মোটামুটি লেখাপড়া জানা লোক! অষ্ট্রিয়ায় নিরক্ষর মূর্খ লোক কদাচ এক-আধজন দেখতে পাওয়া যাবে।

জার্ম্মানীর সহরগুলি যেমন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, রাস্তা-ঘাটগুলি সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আষ্ট্রীয়ার সে রকম নয়। এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির কাজ একটু ঢিলে-ঢালা গোছের। এখানকার মেথর বা ধাঙড়রাও তেমন চট্‌পটে

'সেলো' বাদক।

চতুর ও কার্য্য-তৎপর নয়। তাদের মধ্যেও যথেষ্ট আলস্য ও কার্য্যে অমনোযোগিতা দেখতে পাওয়া যায়। তবুও এরা কোনও রকমে কাজ চালাচ্ছে দেখে, আশা হয়, হয় ত আমরাও 'স্বরাজ' পেলে এক রকম করে চালিয়ে দিতে পারবো।

আষ্ট্রীয়ায় "ক্রিশ্চান্‌-সোশ্যালিষ্ট" বলে একটা রাজনৈতিক দল আছে। এঁরা নামে "সোশ্যালিষ্ট" হ'লেও

কাজে কিন্তু মোটেই তা নন, বরং ঠিক তার বিপরীত! এঁরা ধনীর স্বার্থরক্ষার দিকেই অধিক মনোযোগী এবং কৃষক-সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ করবার জন্য তাদের প্রতি এত বেশী দয়াপরবশ যে, তাঁদের অনুগ্রহে আষ্ট্রীয়ার খাদ্য-দ্রব্যাদি ক্রমেই দুর্ম্মূল্য হ'য়ে উঠ্‌ছে! এঁরা আবার 'সোশ্যালিষ্ট্' কথাটার আগে একটা 'ক্রিশ্চান্' বিশেষণ যোগ করেছেন! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা ব'লতে গেলে, বলতে হয় যে, তাঁরা 'ক্রিশ্চান্' এই শব্দটা পর্য্যন্ত ব্যবহার করবার যোগ্য নন। য়ুহুদীদের উপর এঁরা যে ভীষণ উপদ্রব ও অত্যাচার করেন, তা যে কোনও সভ্য-জাতির পক্ষে দারুণ লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। আগে তো য়ুহুদীদের এঁরা একেবারে অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় করেই রেখেছিলেন! তখন তারা সহরের য়ুহুদী-পাড়াটুকু ভিন্ন অন্য কোথাও থাক্‌তেই পেতো না। সহরের য়ুহুদী পল্লীর ঘৃণিত নাম ছিল "ঘেটো"। য়ুহুদীদের জায়গা-জমি বা ঘর-বাড়ী কেনবার অধিকার ছিল না। তারা শুধু খুচ্‌রো কারবার আর সুদে টাকা ধার দিয়ে জীবিকা উপার্জ্জন করতো। তার পর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আষ্ট্রীয়ার গভর্মেণ্ট্ বিশেষ আইন জারি করে, য়ুহুদীদের উপর এই অন্যায় অত্যাচার অবিচার দমন করেন। কিন্তু, আইন জারি হওয়া সত্বেও লোকের সংস্কার এখনও দূর হয়নি। এখনও একজন য়ুহুদীর পক্ষে কি সরকারী কাজে, কি সামরিক কাজে উচ্চপদ লাভ করা একেবারেই অসম্ভব! কাজেই তারা এদুটো দিকে বড় একটা ঘেঁসতেই চায় না। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যে, মহাজনী ও তেজারতী কারবারে, এমন কি শিক্ষা-বিভাগে, আইন-ব্যবসায়ে ও সঙ্গীত-বিদ্যায় তারা অনেকেই আজ-কাল প্রধান হয়ে উঠ্‌ছে। "ক্রিশ্চান্ সোশ্যালিষ্ট্‌দের" দলের উদ্দেশ্য ও কার্য্য-পদ্ধতির একটা প্রধান সূত্র হচ্ছে 'য়ুহুদী-নিপাত'; কাজে-কাজেই "সোশ্যাল ডেমোক্রাট" বলে এদের প্রতিদ্বন্দ্বী যে এক দল গ'ড়ে উঠেছে, তাদের খাতায় অনেক য়ুহুদী এসে নাম লিখিয়েছে। এই "সোশ্যাল্ ডেমোক্রাট্" দলটাকে প্রাণপণে সুসংবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত ও শক্তিশালী ক'রে তুলেছিলেন যিনি, সেই মহাপুরুষ 'ভিক্টর এাড্‌লার' স্বয়ং একজন য়ুহুদী ছিলেন। সাম্য ও মৈত্রীই হচ্ছে এই দলের সুদৃঢ় ভিত্তি। ক্রিশ্চান্ সোশ্যালিষ্ট্‌দের চেয়ে এদের দলটি যদিও দৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ, কিন্তু তবুও এই সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের একটা কোনও নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-সূচী নেই! কেবল একটা কাজ এরা খুব মনোযোগ দিয়ে ক'রছে দেখা যায়; সেটা হ'চ্ছে, কোনও শ্রেণী-বিশেষের প্রভাব যাতে না বলবত্তর হ'য়ে

ভিয়ানার পুরাতন ফলের বাজার।

উঠে, অপর শ্রেণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী ক'রতে পারে! অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে গুণানুপাতে ভেদাভেদ বেড়ে গিয়ে যাতে একটা বৈষম্যের সৃষ্টি না করে। আরও একটা খুব ভাল কাজ তারা করছে, পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদায়ের ক্ষমতাকে খর্ব্ব করে রেখে। এ দুটো কাজেই তারা যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছে। সাবালক মাত্রেই রাষ্ট্রীয়

বোহেমীয়ার আপেলওয়ালী

ব্যাপারে ভোটের অধিকারী হবে, এই নিয়মটিও তাদেরই চেষ্টায় আজ আষ্ট্রিয়ায় বিধিবদ্ধ হয়েছে।

নানাদিক দিয়ে দেখতে গেলে, য়ুরোপের পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে আষ্ট্রীয়ার মতো যথার্থ গণতন্ত্র-বাদী জাত আর নাই বললেও হয়। এ ব্যাপারে তারা প্রায় রুষিয়ারই সমকক্ষ। আষ্ট্রীয়ায় এক দীনহীন পথচারী ভিক্ষুক-বালকও এক দিন স্বীয় যোগ্যতার জোরে অনায়াসে আষ্ট্রিয়ার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ আসনে উঠে আসতে পারে। আষ্ট্রীয়ান অভিজাত-বংশীয়েরা এত প্রাচীন ও সর্ব্বজন-পরিচিত সম্ভ্রান্ত লোক, যে তারা জাত যাবার ভয় একটুও করে না। এই জন্যই বোধ হয় শাসন-পরিষদের উচ্চপদে কোনও সামান্য লোক অধিষ্ঠিত হ'লেও তাঁরা কিছুমাত্র আপত্তি করেন না। আষ্ট্রিয়ার সৈন্য-বাহিনীর মধ্যেও জাতিভেদ নেই। অধিকাংশ সৈন্যাধ্যক্ষই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। এক-জন সামান্য সেনানী স্বীয় বলবীর্য্যের গুণে এক দিন

টাইরলের মজুর।

সেনাপতির আসনে উঠে আসতে পারে। আবার আষ্ট্রীয়ার সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে একেবারে অযোগ্য ও সৈন্য-পরিচালনায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোকও যথেষ্ট আছে। আষ্ট্রীয়ার সৈনিকদের প্রকৃতি ঠিক যোদ্ধাদের মত দুর্দ্ধর্ষ নয় এবং তাদের স্বভাবও ততটা নিষ্ঠুর নয়। তাদের বেশ শান্ত ও ভদ্র চেহারা। যোদ্ধৃবেশে তাদের যেমন মানায়, এমন আর কোনও দেশের সৈনিকদের মানায় না। সঙ্গী হিসেবে এরা বেশ আমুদে লোক। বন্ধু হিসেবে অতি অমায়িক; এবং শত্রু হিসেবেও আষ্ট্রীয়ার সৈন্য মোটেই ভয়ঙ্কর নয়।

আষ্ট্রীয়ার চাষারাও ভারি ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক। সপ্তাহে ছ'দিন তারা হাড় ভাঙা খাটুনী খেটে রবিবারটা ছুটি নেয়। এই ছুটির দিনটা তারা সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে উপভোগ করে। ছুটীর দিনে তারা সব রঙীন পোষাক পরে 'জীথার্' বাজিয়ে নাচে, গান গায়, স্ফূর্ত্তি করে। তাদের এই অবসরের আনন্দ উল্লাসে এমন একটা জীবন্ত প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়, যেটা অনেক দেশেই নেই।

আষ্ট্রীয়ার পুরুষেরা হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা ঢিলে পায়জামা পরে, পায়ে সবুজ রংয়ের কিম্বা সাদা মোজা পরতে ভাল-

প্রাচীন টাইরলের বেশভূষা।

বাসে। ফুলদার ও বেলদার চিকণের কাজ করা কামিজ গায়ে দেয়। তার ওপর ছোট একটা কোর্ত্তা পরে, মাথায় বনাতের টুপী দেয়—তাতে আবার একটা পালক কিম্বা একগুচ্ছ পশুলোম এক দিকে চূড়ার মতো আঁটা থাকে।

মেয়েদের পোষাক বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের। কিন্তু সর্ব্বত্রই তা এমন সুন্দর ও শোভন যে তাদের চমৎকার মানায়! কোনও কোনও অঞ্চলে মেয়েদের পোষাকের একটু, বাহুল্য দেখা যায় বটে, বিশেষ তাদের টুপী আর আঙরাখার বাহারের এত বেশী আড়ম্বর যে সেটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে আজ কাল দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এ সব সেকেলে পোষাক পরিচ্ছদ আর বড় একটা পছন্দ করছেন না।

বিগত যুদ্ধের ফলে আষ্ট্রীয়ার যে রকম ক্ষতি হ'য়েছে, অতটা ক্ষতি বোধ হয় যুদ্ধমান আর কোনও জাতিরই হয় নি। যুদ্ধের পূর্ব্বে আষ্ট্রিয়া একটা সাম্রাজ্য ছিল। তখন তাদের আত্ম নির্ভরতার উপায় ছিল। এখন তাদের দুটো প্রধান খনিজ-পদার্থ কয়লা আর লোহা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। সমুদ্র বন্দরও তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে; সেই বিখ্যাত বিরাট সহর এখনও তাদের রাজধানী হ'য়ে ব'সে আছে বটে, কিন্তু রাজ্য তাদের এমনিই হ্রস্বতা লাভ করেছে যে, একটা ক্ষুদ্র সহরের কার্য্য পর্য্যন্ত পরিচালন করতেও সে অক্ষম। আর সে রাজ্যের এখন একমাত্র চাষবাস ছাড়া আর কোনও রকম আয় ও উপার্জ্জনের পন্থাও বন্ধ হয়ে গেছে।

আষ্ট্রীয়ার শ্রেষ্ঠ খনিগুলি ছিল বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া প্রদেশে; কিন্তু সে দু'টি স্থানই এখন জেকোস্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্যালিসিয়ার প্রসিদ্ধ তেলের খনি

টাইরলের বাদ্যকরেরা।

আছে। এই সহর এক দিন সারা রাত বিনিদ্র হ'য়ে শুধু নাচ গান উপভোগ ক'রতো। আলোক-ছটায় ও নানা বর্ণ-বিন্যাসে এক দিন সে সুন্দরী যুবতীর মতোই তরুণী ও মনোহারিণী ছিল। এই সহরের রাস্তা-ঘাট ও ঘরবাড়ী বেশ সুবৃহৎ ও সুনির্ম্মিত। ভিয়েনাকে লোকে এক দিন 'ফুলের সহর' বলে অভিহিত করেছে। ভিয়েনায় যত বেশী "পার্ক" বা সাধারণের জন্য বিহার-উদ্যান আছে, তত আর অন্য কোনও দেশেই দেখতে পাওয়া যায় না। অষ্ট্রিয়ার চারি পার্শ্বের অন্যান্য সহরও এখনও এত সুন্দর ও অক্ষত হ'য়ে আছে যে, তাদের পক্ষে এখনও এতটা আমোদ

এখন পোল্যাণ্ডের অধিকারে। অষ্ট্রীয়ার অরণ্য-সম্পদ যে কার্পেথিয়ান্, তাও এখন তার হস্তচ্যুত হয়ে পড়েছে! অষ্ট্রীয়ার বিশ্ব-বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ ঘোড়া আস্‌তো গ্যালিসিয়া থেকে! অষ্ট্রীয়া যে সব স্বাস্থ্যকর জায়গার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, অষ্ট্রীয়ার সে বিশেষত্বও আজ সে হারিয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যুদ্ধ মেটবার পর, সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে গিয়ে অষ্ট্রীয়া তার সমস্ত ভবিষ্যৎ এমন কি গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় পর্য্যন্ত হারিয়ে বসেছে!

পৃথিবীতে ভিয়েনার মতো আনন্দপ্রদ সহর অতি অল্পই

টাইরলের কৃষক পরিবার।

কৃষকদের ধর্ম্মমূলক গীতাভিনয়।

প্রমোদ করা যেন মোটেই অশোভন মনে হয় না।

কিন্তু আজ সেই ভিয়েনা অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'য়ে প'ড়েছে। আজ যেন তার অস্তিত্বের কোনও প্রয়োজনই নেই! আষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যকে যারা আজ বিভাগ ক'রে দিয়েছে, তারা এ কথাটা বোধ হয় একবার ভেবে দেখেনি যে, আষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যটা গড়েই উঠেছিল তার অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার আকর্ষণে! আষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশটাই বেঁচে থাকবার জন্য পরস্পরের একান্ত মুখাপেক্ষী! এক দিক আর এক দিককে সাহায্য না করলে এর কোন দিকটাই স্বতন্ত্র ভাবে টিকতে পারে না। তাই আষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে যাবার পর এর প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ দুর্ব্বল অসহায় ও দরিদ্র হয়ে পড়েছে। আগে যেখানে যেখানে বড় বড় ব্যবসায়ীরা বাস করতো, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কল কারখানা চলতো, এখন সে সব অঞ্চল যেন নিঃসঙ্গ অন্ধকারের মধ্যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে!

কাঠুরিয়াদের কুটীর।

আষ্ট্রীয়া সহরে বাস করার পক্ষে কতকগুলো অসুবিধাও আছে একেবারে মারাত্মক রকমের। যেমন "বাড়ীওয়ালা"র উৎপাত একটা অসহ

বোবাকংক পার্ব্বত্য পথের যাত্রীরা।

জিয়ানার ফেরিওয়ালী।

অত্যাচার। প্যারিসের বাড়ীওয়ালার নিন্দা অনেক রকম শোনা যায় বটে কিন্তু তারাও আষ্ট্রীয়ার বাড়ীওয়ালাদের মত ছোটলোক নয়। আর একটা হাঙ্গামা আছে পুলিশের। কোনও বাড়ীতে নূতন কোনও ভাড়াটে এলেই পুলিশ এসে বাড়ীওয়ালার কাছে তার আদ্যোপান্ত পরিচয় জানতে চায়, কাজেই বাড়ীওয়ালাকেও ভাড়াটে রাখবার সময় তার নাড়ী নক্ষত্রের হিসাব নিয়ে রাখতে হয়। রাত্রি দশটার পর আইন অনুসারে বাড়ীওয়ালা সদর দরজা বন্ধ করে দিতে বাধ্য। দশটার পর ভাড়াটেদের কারুর বাইরে যাবার দরকার হ'লে অথবা বাড়ী ঢোকবার প্রয়োজন হ'লে ঘণ্টা বাজিয়ে দ্বারবানকে ডাকতে হয়। দ্বারবান কিম্বা তার স্ত্রী উঠে এসে দরজা খুলে দেয়—কাজেই ভাড়াটেদের কার কি রকম স্বভাব চরিত্র সেটা জানতে আর তাদের বেশীদিন সময় লাগে না। পুলিশ এই দ্বারবানদের কিছু কিছু বখশীস্ দিয়ে এদের কাছ থেকেই ভাড়াটের কার কি রকম চাল-চলন, কে কি করে, কার কাছে কে আসে-যায়, গভর্মেণ্টের সম্বন্ধে কার কি রকম মতামত, এই সব সন্ধান নেয়।

গভর্মেণ্ট সর্ব্বদাই তাদের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত! রাজকর্ম্মচারীরা মনে করে যেন তারাই দেশের শাসনকর্ত্তা! তারা যে দেশবাসীরই নিয়োজিত বেতনভোগী ভৃত্য মাত্র, এ কথাটা তাদের মনেই থাকে না! পূর্ব্বেই বলেছি রাজকর্ম্মচারী হবার আকাঙ্ক্ষাটা আষ্ট্রীয়ান যুবকদের মধ্যে এত বেশী প্রবল যে, তারা সবাই রাজসরকারে একটা চাকরী পাবার জন্য বিধিমত চেষ্টা ক'রে, ফলে কাজের চেয়ে কর্ম্মচারীর সংখ্যা সেখানে বেশী হয়ে পড়েছে! বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর যে সব ছেলেরা পাশ করে 'ডুরিষ্ট' হ'য়ে বেরোয়, তারাও আইনের ব্যবসা ছেড়ে রাজসরকারে চাক্‌রী পাবার চেষ্টাটাই আগে করে। ওখানেও 'মুরুব্বীর' জোর না থাকলে কারুর কিছু সুবিধে হবার জো নেই, নিজের দক্ষতায় বড় হ'য়ে উঠবার সুযোগ খুব কম লোকই পায়। কাজেকাজেই সেখানে ওকালতী পাশ করা 'ডুরিষ্ট'-উপাধি-ভূষিত ছেলেরাও দেখা যায় হয়, কেরাণীগিরি করছে নয়ত টাইপিষ্টের কাজ করছে,—কিম্বা হয়ত, এমন সব ছোট-খাট কাজও করছে যা নাকি কেবলমাত্র নিরক্ষর বালকভৃত্যদের করাটাই শোভা পায়।

ভিয়েনার মজুরণীদ্বয়।

ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যাও নাকি আষ্ট্রীয়ায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে পড়েছে।

সংবাদ-পত্রের অবাধ স্বাধীনতা আষ্ট্রীয়ায় বিধিবদ্ধ হয়ে আছে বটে, কিন্তু রাজকর্ম্মচারীরা ইচ্ছা করলেই যে কোনও

সংবাদ-পত্রের প্রকাশ বন্ধ করতে না পারলেও বিক্রয় বন্ধ ক'রে দিতে পারেন। কারণ আষ্ট্রীয়ায় খবরের কাগজ-ওয়ালারা কাগজ ফেরি ক'রে বেচতে পায় না, সেখানে আইন অনুসারে তা নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র চুরুটওয়ালারাই তাদের দোকানে খবরের কাগজ রেখে বেচবার অনুজ্ঞা-পত্র পায়।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভোজনাগারই ছিল আষ্ট্রীয়ানদের প্রধান আড্ডা। এক ভিয়েনা সহরেই প্রায় সাতশ' 'কাফে' বা পানাহার-আলয় ছিল। স্ত্রী পুরুষ উভয় সম্প্রদায়ই অপরাহ্নে বা সায়াহ্নে একবার সবান্ধবে কোনও না কোনও একটা 'কাফে'তে ঢুকে কফি ও রুটি খেতে খেতে ঘণ্টা দুই তিন বেশ আড্ডা দিয়ে কাটায়। পান-ভোজনের পর তারা সেখানে তাশ খেলে, জুয়া খেলে সময় কাটায়। তাশ ও পাশার জুয়া সন্ধ্যের পর আষ্ট্রীয়ার প্রায় প্রত্যেক ছোট বড় হোটেলে খেলা হ'চ্ছে দেখা যেতো। ভাল ভাল পোষাক-পরা বড় ঘরের ছেলে মেয়েরাও দলে দলে হোটেলে ইয়ারকি দিতে আসতো। প্রত্যেক হোটেলেই তখন গান বাজনা, খেলা-ধূলো, নাচ তামাসা, প্রভৃতি আমোদ প্রমোদ অবিশ্রান্ত চ'লতো ব'লে ভিয়েনা সহর একেবারে সরগরম হয়ে থাকতো।

অর্থকরী বিদ্যা বা বৃত্তি শিক্ষার যে ধূয়ো আজ আমাদের দেশে খুব বেশী রকম শোনা যাচ্ছে, আষ্ট্রীয়ায় একেবারে তার চূড়ান্ত আয়োজন দেখতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান আষ্ট্রীয়ার মানচিত্র।

যেখানেই আষ্ট্রীয়ার একটা ছোট খাটো কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায়, অমনি তার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বিদ্যালয়ও চোখে পড়ে। এই বিদ্যালয়ে ছেলেদের শুধু উপার্জ্জনক্ষম করে ছেড়ে দেয় না, সেই বিশেষ শিল্প সম্বন্ধে যাতে ছেলেদের একটা যথার্থ টান থাকে এবং সেই শিল্পের উন্নতি ও বিস্তৃতিকল্পে ভবিষ্যতে তারা যাতে সচেষ্ট হ'য়ে ওঠে, সে শিক্ষাও তাদের দেওয়া হয়।

মেয়েদেরও সেখানে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের এ সবও শিক্ষা দেওয়া হয় যে—কেমন ক'রে সুগৃহিণী হ'তে পারা যায়, কেমন ক'রে কলা ও বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে গৃহস্থালীর যাবতীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করতে হয়, কেমন ক'রে ছেলে-পিলে মানুষ করতে হয়, কেমন ক'রে পরিবারস্থ সকলকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের মধ্যে রাখা যেতে পারে, ইত্যাদি, এ সমস্তও তন্ন তন্ন ক'রে তাদের শেখানো হয়।

ভিয়েনা সহরে ছোটলোকদের 'বস্তী' বলে কোথাও কিছু নেই। লণ্ডন প্রভৃতি অন্যান্য বড় সহরে যেমন এক একটা নরক-তুল্য এই বস্তীর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়, ভিয়েনার দরিদ্র পল্লী ঠিক সে রকম নয়। গরীব দুঃখী ইংরাজ ইতর শ্রেণীদের বাসস্থান অপেক্ষা এখানকার দীন দরিদ্র নিম্ন শ্রেণীদের কুটীর অনেক অংশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এরা থাকেও বেশ আমোদ আহ্লাদে মগ্ন হ'য়ে!

খুন-জখম ও দাঙ্গা হাঙ্গামা এ সব তাদের মধ্যে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়। বেশ সদ্ভাবে মিলে মিশে তারা নিজেদের কাজ নিয়ে দিন কাটায়।

আষ্ট্রীয়ার চাষারা পর্য্যন্ত কি পোষাক পরিচ্ছদে, কি কাজ কর্ম্মে, কি আহার বিহার ও শয়নে সকল বিষয়ে অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোনও কিছু নোংরা তারা একেবারেই দেখতে পারে না।

আষ্ট্রীয়ানরা অধিকাংশই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী। ধর্ম্মযাজকদের সম্মান এখানে সকল দেশের চেয়ে বেশী। পুরোহিতদের উপদেশ যে আষ্ট্রীয়ানরা কেবল ধর্ম্মকার্য্যেই গ্রহণ করে তা'নয়, তাদের অনেক বৈষয়িক ও সামাজিক ব্যাপারেও তারা আচার্য্যদের উপদেশ মেনে চ'লে ও তাঁদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে।

সঙ্গীতে, বিজ্ঞানে, শিল্পে শোভায় এই আষ্ট্রীয়া একদিন জগতের প্রশংসা-দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল; কিন্তু আজ বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের বিষময় ফলে এমন নির্দ্দয়ভাবে তার অঙ্গচ্ছেদ করা হ'য়েছে যে, সে আজ বিশ্বের অবজ্ঞাত ও তাচ্ছিল্যের পাত্র হয়ে পড়েছে! এটা শুধু আষ্ট্রীয়ানদেরই ক্ষোভের ও পরিতাপের বিষয় নয়, বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য য়ুরোপীয় জাতিদের একটা চিরদিনের মতো দুরপনেয় কলঙ্কের পরিচয়!

স্মৃতি-তর্পণ

স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদ আকস্মিক হ'লেও অপ্রত্যাশিত নয়। তাঁর বয়স হ'য়েছিল ৭৬।৭৭ বৎসর—সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের জীবন-অনুপাতে তা' দীর্ঘই ব'লতে হবে। কিন্তু তা' হ'লেও তাঁর মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের যে স্থানটা শূন্য হ'ল—তা' পূরণ করবার লোকের একান্তই অভাব।

তার প্রধান কারণ হ'চ্ছে এই যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের যে-দিকটার দিকে বেশী ঝোঁক দিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর মত প্রতিভা নিয়ে কেউ বড় একটা পদক্ষেপ ক'রতে ইচ্ছুক নন্। সেটা অনুবাদের দিক। বিভিন্ন ভাষা থেকে রত্ন আহরণ ক'রে তিনি মাতৃভাষার ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে গেছেন। এ ঋণ বাঙ্গালী কখনো ভুলতে পারবে না। কিন্তু এর মধ্যে যে কতটা ত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়, তা' ক্ষুদ্র যশাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পক্ষে বুঝে ওঠা অসম্ভব।

৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নূতন-সৃষ্টি করবার ক্ষমতা ছিল—তা' তাঁর "অশ্রুমতী" "সরোজিনী" প্রমুখ নাটক থেকেই বোঝা যায়। তাঁর সুর রচনা করবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। অনেকে হয় ত জানেন না যে, তাঁর সুরে ভাষা দেবার জন্যেই রবীন্দ্রনাথের আগেকার অনেক গান রচিত হয়েছিল। তাঁর চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা রদেনষ্টাইনের মত চিত্রকরেরও প্রশংসা অর্জ্জন ক'রেছিল। উপরিউক্ত যে [illegible] যশঃ অর্জ্জন ক'রতে পারতেন। কিন্তু সে সব আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ ক'রে তিনি বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনে নিজেকে প্রয়োগ ক'রলেন অনুবাদের ভিতর দিয়ে—যা' তাঁর চেয়ে নিকৃষ্ট ক্ষমতা নিয়েও অনেকে করা অসম্মান ব'লে মনে করেন।

জ্যোতিবাবু অনেক বিষয়েই পথি-প্রদর্শক ছিলেন। Art-এর কথা ছেড়ে দিলেও জাতীয় ব্যবসার দিকেও তিনি একটা নূতন পথ উন্মুক্ত ক'রতে চেয়েছিলেন। বরিশাল-খুলনার প্রথম জাহাজ-পথ তিনিই খোলেন—অনেক আর্থিক ক্ষতি সহ্য ক'রে। জাতীয় জীবনের প্রথম প্রাণ-স্পন্দনের পরিচয় যে "হিন্দু মেলায়" পাওয়া গিছ্‌ল—তার একজন উদ্যোক্তা ছিলেন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই জাতীয়ত্ব-বোধই তাঁর প্রায় সমস্ত কর্ম্মের মূলে ছিল ব'লে মনে হয়। প্রৌঢ় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলনের সময় নগ্নপদে শোভাযাত্রায় যোগদান আমাদের এখনও মনে আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাসভবন—মোরাবাদী, রাঁচি

তাঁর বিনয় ছিল অসাধারণ। তিনি নিজেকে সর্ব্বদাই পিছনে রেখে চ'লতেন। এ বিষয়ে তাঁর এতটুকু অভিমান ছিল না। যার যা' প্রাপ্য তা' তিনি তাকে দিতে কখন কুণ্ঠা বোধ করেন নি। গুণগ্রাহিতা তাঁর চরিত্রকে মহিমান্বিত ক'রে তুলেছিল। নিজে নাটককার হ'য়েও গিরিশচন্দ্র-প্রমুখ নাটককারদের লেখা কখনো হাল্‌কা করতে চেষ্টা করেন নি। নিজে চিত্রদক্ষ হ'য়েও অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রতিভা স্বীকার ক'রতে কুণ্ঠিত হন্ নি। নিজে সঙ্গীত-স্রষ্টা হ'য়েও অপরের চেষ্টার প্রশংসা ক'রতে কখনো কুণ্ঠিত হন নি। বাণী এবং কমলার বরপুত্র হ'য়েও নিজেকে ভদ্রতা ও সৌজন্যে মণ্ডিত ক'রে রেখেছিলেন। এইখানেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মহত্ত্ব, এবং এই জন্যই বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাঁর স্থান অক্ষুণ্ণ থাকবে।

বাস্তবিক, তাঁর হৃদয় ছিল যেমন উদার,তেমনি স্নেহ-করুণ। কে না জানে, তাঁর ছোটভাই রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর কি গভীর স্নেহ ছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথের উদীয়মান প্রতিভা তাঁরই স্নেহছায়ে, তাঁরই উৎসাহে পরিবর্দ্ধিত না হ'লে আজ হয় ত তা' বিশ্বব্যাপী হ'তে পারত না। এই দুই ভাইয়ের এতটা ঘনিষ্টতা ছিল—যাতে মনেই হত না যে তাঁদের মধ্যে বয়সের তফাৎ প্রায় বার বৎসর। আজ রুগ্নশয্যায় এই শোক সহ্য করবার ক্ষমতা ভগবান রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয় দেবেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন ছিল সন্ন্যাসীর জীবন। মধ্য-যৌবনে বিপত্নীক হ'য়ে তিনি আর দারপরিগ্রহ করেন নি। এই বিপত্নীক, নিঃসন্তান কর্ম্মযোগীর সাধনাও ছিল নিষ্কাম। তিনি দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে বঙ্গ-জননীর সেবা ক'রে গেছেন—শুধু সেবার্থেই,—যশের জন্য নয়, —অর্থের জন্য নয়,—এমন কি কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশায়ও নয়। ভগবান তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন।
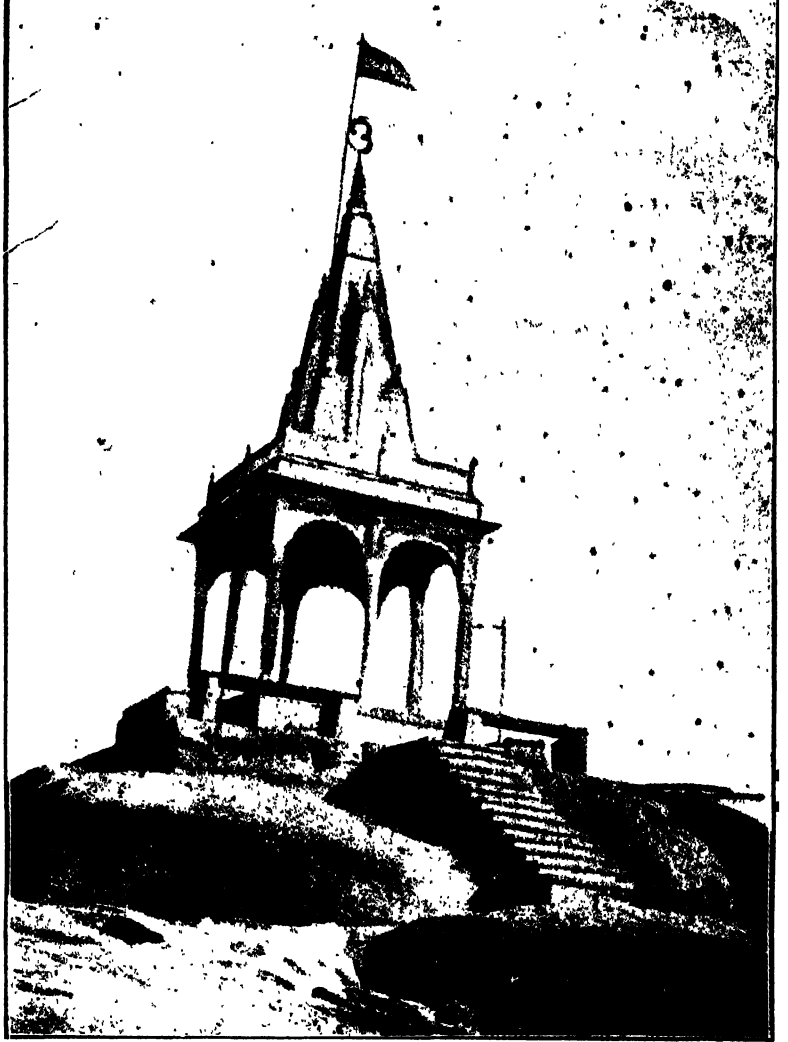
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সাধনা-মন্দির—রাঁচি

লর্ড কার্জ্জন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

নাইক তুমি! হে গুণজ্ঞ, হে মনীষী, পুত্র প্রতিভার—
সৌম্য, তোমার মূর্ত্তিখানি মানস-পটে জাগ্‌ছে বারম্বার।
আমরা তখন ছাত্র ছিলাম, দেখেছিলাম লক্ষ লোকের ভিড়ে
নিন্দা-যশের আঁধার-আলো দিবস-নিশি থাকতো তোমায় ঘিরে।
পড়ছে মনে গড়ের মাঠে, ভিক্টোরিয়ার শ্রাদ্ধ-বাসর-স্মৃতি,
সংকীর্ত্তনের বিরাট মিছিল, শুভ্রবাস আর ভক্তিভরা প্রীতি,
পড়ছে মনে পাসের আইন, পরীক্ষার সে হরেক রকম ভয়,
পড়ছে মনে তোমার কথা, বক্তৃতার সে ভাষা আবেশময়।
বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলনে গালিগালাজ দিয়েছিলাম জোরে;
আস্ত গোটা কাপড়খানা পুড়িয়েছিলাম আতস-বাজি করে

অন্ধকূপের মন্দ স্মৃতি স্থাপলে, দিলাম ক্রুদ্ধ অভিশাপ,
তোমার হাতে নিইনি সনদ, ক্ষুদ্র দোষও দিইনি তোমার মাপ,
কর্ম্মী তোমায় শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি সঙ্গোপনে আমি,
জানি—তোমার কথার চেয়ে হৃদয়খানা অনেক বেশী দামী।
জানি—তোমার দম্ভ মাঝে, উর্দ্ধে তোলার চেষ্টা ছিল নিতি,
বন্ধু তুমি সত্য ছিলে, ভৎর্সনা যে ভালবাসার রীতি।
বসুন্ধরায় বাসতে ভাল, ভ্রমণ করার এমন বাতিক কার ?
মরু থেকে মেরুর সীমা, পেরু থেকে মহাচীনের ধার।
পূর্ণ ছিল বক্ষ তোমার অনিবার্য্য বৃটিশ অহঙ্কারে,
গর্ব্ব করার জিনিস ছিলে—তাই ত বৃটন কাঁদছে শত ধারে।
আকাশচুম্বী সুদূর-বিস্মী ছিল তোমার ব্যক্তিত্ব মহান,
লাগতো গোটা জাতির বুকে তোমার বুকের চুম্বকেরি টান।
ভাষায় ছিল উন্মাদনা, জ্ঞানের ছিল সাগর-গভীরতা,
ইংলণ্ডের সে আলোক-গৃহ—কোথায় তুমি, আজকে তুমি কোথা।
তোমার মত স্মৃতির আদর, পুজ্যপূজা, করতে কজন জানে,
ভাঙ্গার প্রতি এমন প্রীতি, এমন দরদ উথলে কার প্রাণে ?
নষ্ট কীর্ত্তি উদ্ধারিতে প্রাণপণ, এমন প্রয়াস ছিল কার ?
এমন কঠোর মিত্র পেলে ভারতবাসী গর্ব্ব করে তার !
স্মৃতিকে বিস্মৃতি হতে রক্ষা করাই কাজ যে ছিল তব,
বাদ পড়েনি কবির ভিটা, সাধুর আসন, অধিক কি আর কব।
ভগ্ন দেউল করলে খাড়া দীন কবরে চেরাগ দিলে তুমি ;
বর্ব্বরতার হস্ত হতে উদ্ধারিলে পবিত্রতার ভূমি।
তুমি এখন থাকলে হেতায় জীবন ভরে মিটতো আবার সখ,
খাঁটী জিনিস দেখতে পেতে, ছিলে তুমি খাঁটীর উপাসক।
দেখতে পেতে বিরাট পুরুষ খৃষ্ট নূতন গান্ধী মহাত্মায়,
মুগ্ধ হতে সর্ব্বত্যাগী বিত্তহারা 'চিত্ত' মহিমায়।
থাকলে তুমি 'জালিয়া, বাগ' ঘটতো কি না সন্দেহ হয় মোর,
অত্যাচারী সৈন্য তরে রোধ করিলে দরবারেরি দোর।
ভারতবাসীর জাগরণে সত্য তুমি হতে আনন্দিত,
তুমি ছিলে কোবিদ কবি, ছিলে মহা মনস্তত্ত্ববিদ।
রূপ-পূজারি, স্মৃতির কাঙ্গাল, ভিক্টোরিয়া সৌধ তোমার দান ;
তুমি চকোর দিন করেছ ইদের চাঁদের প্রেম-পিয়ালা পান।
দূর অতীতের পাগল মধুপ, কোন্ অমরায় আজকে গেলে উড়ি,
লক্ষ বুকের পারিজাতে তোমার স্মৃতি রাখবে অমর করি।

তর্পণ

(লাইকা ও তরুতীর্থের লেখিকা ৺ হেমনলিনী দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে)

শ্রীনিরুপমা দেবী

আজি ধরা ত্যজিতেছে পুরাতন বৎসর নির্ম্মোক
তোমার তর্পণ তরে আজি মোরা ত্যজি মোহ শোক !
জীর্ণ দেহ উপহার তুলে দিয়ে বসন্তের করে
নব দেহ লভিয়াছ গত মধু-মাধবের বরে।
ত্যজি মহা শোক-ছিন্ন শীর্ণ দেহ হ'য়ে লব্ধকাম
প্রিয় পুত্র ভ্রাতা ভগ্নী সাথে আজি লভিছ বিশ্রাম।
হে প্রেমিক, হে পাগল, হে সাধক, হে অখ্যাত কবি,
ওগো অনুরাগী যোগী; ধরণীর রূপ রস স'বি
প্রাণ-পাত্রে পূর্ণ করি উর্দ্ধে ধরি করেছ আরতি
যাঁহার উদ্দেশে সদা প্রিয় মাঝে যাঁহার মূরতি,
হেরিতে চেয়েছ, আজি সেই প্রিয় প্রিয়তমে তব
লভিতে পেরেছ কিগো নবেন্দ্রিয়ে অনুভব নব ?
এ মহা ঘূর্ণার মাঝে যেই নীড়ে বাঁধিলে আশ্রয়
সেই "প্রেম সুন্দরের" পেলে কোন নব পরিচয় ?
আজি বাৎসরিকে তব তোমারি প্রার্থিত এ তর্পণ
বহু স্মৃতি-গীতি সিক্ত করি তোমা করি সমর্পণ !
যাদের সংযোগ ছিল তব নব যোগের সহায়
ধরণীর বক্ষ হ'তে তুলি আজ নিবেদি তোমায় !
লও এ চাঁদের হাসি, এ আলোক, এ ছায়ার খেলা,
চারু চম্পকের গন্ধ, বেল যুঁই মল্লিকার মেলা !
'ললিত' ঝঙ্কার মাঝে লহ প্রভাতের নব হাসি,
সাঁঝের আকাশ-তলে শোন এই পুরবী উদাসী !
নাও গান, গীতি-প্রাণ, সুর-শুদ্ধ সঙ্গীতের বশ !
সাহিত্য-রসের হংস, কাব্যামোদী, পিও তার রস।
আনন্দের উপাসক প্রীতিবান্ হে সুহৃদ-প্রিয়,
আরো যা বেসেছ ভাল মর্ত্ত হ'তে তুলে আজ নিও।

সাময়িকী

এই মাসের 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদ-পটে যাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তাঁহার নাম ও পরিচয় বাঙ্গালা দেশে কাহারও অজ্ঞাত নহে,—তিনি ঋষিকল্প, স্বধর্ম্মানুরাগী, মহানুভব, সাহিত্য-রথী ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। বাঙ্গালা দেশের সৌভাগ্য, বাঙ্গালীর সৌভাগ্য যে, তাঁহার স্থায় মনস্বী, তেজস্বী মহাত্মা এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেবোপম প্রতিকৃতি দ্বারা প্রচ্ছদ-পট অলঙ্কৃত করিয়া 'ভারতবর্ষ' ধন্য হইল।

এবারকার 'সাময়িকী'র প্রথম কথা বাঙ্গালা দেশের মন্ত্রী-সমস্যা। এ সমস্যা মিটিয়া গিয়াছে, অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য মন্ত্রীদিগের অন্তর্ধান হইয়াছে, এ কথা নিশ্চিত। পাঠক-পাঠিকাগণ সংবাদ পত্রে পড়িয়াছেন যে, বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুর ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদিগের নিকট পত্র প্রচার করেন যে, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশন হইবে, এবং সেই অধিবেশনে সদস্যগণকে অভিমত প্রকাশ করিতে হইবে, তাঁহারা বর্ত্তমান বৎসরের জন্য মন্ত্রী চান কি না। এই কথা জানিতে পারিলে বজেটে মন্ত্রীদিগের বেতনের বরাদ্দ করা যাইবে। তদনুসারে ১৭ই ফেব্রুয়ারী যে অধিবেশন হয়, তাহাতে অধিকাংশ সদস্যের মতে মন্ত্রী নিয়োগই স্থির হয়; অবশ্য স্বরাজী দল তখনও এ নিয়োগের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। যখন মন্ত্রী নিয়োগ স্থির হইল, তখন বজেটে তাঁহাদের বেতনেরও বরাদ্দ হইল; এবং গবর্ণর বাহাদুর তখন শ্রীযুক্ত নবাব নবাব আলী চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, এই দুই জনকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন।

তখনই কিন্তু অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, বজেট বিতর্ক সময়ে যখন মন্ত্রীদিগের বেতনের কথা উঠিবে, তখন হয় ত একটা গোলমাল হইতে পারে; গবর্ণমেণ্টের মনোনীত মন্ত্রী দ্বয় ধোপে টিকিবেন কি না, এ কথা লইয়া তখন হইতেই জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হইয়াছিল। ১৫ দিন মন্ত্রীত্ব করিবার পর ব্যবস্থাপক সভায় যখন তাঁহাদের বেতন মঞ্জুরীর কথা উঠিল, তখন মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। স্বরাজী দল ত পূর্ব্বাপরই মন্ত্রী-নিয়োগের বিরুদ্ধে ছিলেন, এবার অন্যান্য দলের অনেকেও স্বরাজী দলের সহিত যোগ দিলেন; যাঁহারা ১৭ই ফেব্রুয়ারী মন্ত্রী-নিয়োগ প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও কয়েকজন স্বরাজ-পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুর করা হইবে না। তাঁহাদেরই জয় হইল। বেতন যখন মঞ্জুর হইল না, তখন ১৫ দিন অবৈতনিক মন্ত্রীত্ব করিয়া মন্ত্রীদ্বয় পদত্যাগ করিলেন; গবর্ণর বাহাদুরও 'হস্তান্তরিত' বিভাগ পুনরায় 'হস্তগত' করিলেন; এক বৎসরের জন্য 'দ্বৈ-ইয়ারকি'র অবসান হইল। ততঃ কিম্?

এখন সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'ততঃ কিম্?'—তাহার পর কি হইবে? মন্ত্রীরা গেলেন, গবর্ণমেণ্ট সমস্ত বিভাগের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, ব্যবস্থাপক-সভা যদিও ডিস্‌মিস্ হয় নাই, কিন্তু না থাকিবারই সামিল; কারণ, হস্তান্তরিত বিভাগগুলির কার্য্য-পরিচালনের ভারই তাঁহাদের হস্তে ছিল। তাহাই যখন থাকিল না, গবর্ণমেণ্টই যখন সকল কাজ, সকল ব্যবস্থা করিবেন, তখন ব্যবস্থাপক সভার প্রয়োজনাভাব। চারি বৎসর পূর্ব্বে যে ভাবে কার্য্য পরিচালিত হইত, বিগত বৎসরের শেষ কয়েক মাস যে ভাবে কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে, এখন তাহাই হইবে। এখন, যাঁহারা এই দ্বৈত-শাসন অচল করিয়া দিলেন, তাঁহারা কি করিবেন? সে সম্বন্ধে ত কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, দেশের নেতৃবৃন্দ পল্লী-সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, ম্যালেরিয়া-নিবারণ প্রভৃতি হিতকর কার্য্যে তাঁহাদের শক্তি নিয়োগ করিবেন এবং তাহার জন্য চাঁদাও সংগৃহীত হইতেছিল। তাহার পর এত দিনের মধ্যে নেতৃগণ ত তাঁহাদের বর্ণিত কার্য্যে অবতীর্ণ হইলেন না; এমন কি, তাহার একটা খসড়াও জন-সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন না। তাঁহারা বক্তৃতার মুখে যে সমস্ত সংস্কারের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভূত অর্থবল ও একনিষ্ঠ জনবল থাকার প্রয়োজন। তাহার ত কোন আয়োজন দেখিতেছি না।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সদস্য-নির্ব্বাচন তিন বৎসর অন্তর হইয়া থাকে; কিন্তু আইন-অনুসারে মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচন প্রতি বৎসরেই হওয়ার বিধান আছে। তদনুসারে সেদিন বর্ত্তমান বর্ষের মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচন সে দিনকার মিউনিসিপাল সভায় হইয়া গিয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় এ বৎসরের জন্যও মেয়র নির্ব্বাচিত হইলেন এবং বিগত বৎসরের ডেপুটী মেয়র মিঃ সুরওয়ার্দ্দী মহোদয় এবারও ডেপুটী মেয়র থাকিলেন। কলিকাতার করদাতাগণ এই নির্ব্বাচনে আনন্দিত হইবেন; কারণ দেশবন্ধু ও সুরওয়ার্দ্দী সাহেব বিগত বৎসর যে ভাবে কার্য্য-পরিচালন করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই একবাক্যে তাঁহাদের প্রশংসা করিতেছেন।

এবার দিল্লীর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার একটী অতি সুন্দর প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল। সকলেই জানেন যে, মুসলমান ধর্ম্মের বিধান এই যে, কেহ সুদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না, সুদ গ্রহণ হারাম। এই কারণে, উক্ত ব্যবস্থাপক সভায় একজন মুসলমান-সদস্য প্রস্তাব করিয়াছেন যে, অনেক মুসলমান গবর্ণমেণ্টের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে অল্প-বিস্তর টাকা জমা রাখেন; কোম্পানীর কাগজও কাহারও কাহারও আছে। কিন্তু ধর্ম্মের বিধান অনুসারে তাঁহারা সুদ গ্রহণ করিতে পারেন না। মুসলমান সদস্য মহোদয় প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টে যখন সুদ দেওয়ার নিয়ম আছে, তখন সে নিয়মের অন্যথাচরণ হইতে পারে না; মুসলমানগণের প্রাপ্য সুদ বৎসরান্তে হিসাব করিয়া যাহা হইবে, তাহা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করা ঠিক। সকলেই এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে বলা হইয়াছে যে, এ বিষয়ে দেশের মুসলমানগণের সমবেত মত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাহারই জন্য এ প্রস্তাব বিগত অধিবেশনে মুলতবী আছে। আমাদের বিশ্বাস, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানগণ কেহই এ প্রস্তাবের বিরোধী হইতে পারেন না; এবং এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে আলিগড় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের একটা পথ উন্মুক্ত হইবে।

এবারকার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিশেষ সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না, কারণ ২৭শে ও ২৮শে চৈত্র সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনের দিন, তৎপূর্ব্বেই আমাদের কাগজ ছাপা শেষ হইবে। তবে, বিভিন্ন বিভাগের সভাপতিগণ সম্বন্ধে একটু রদ-বদল হইয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিতেছি, পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে, ইতিহাস বিভাগের সভাপতি হইবেন, দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুত শরৎকুমার রায় মহাশয়। এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উক্ত বিভাগের সভাপতি হইবেন। দর্শন বিভাগেও সভাপতি বদল হইয়াছে; পূর্ব্ব-নির্ব্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার পরিবর্ত্তে বোলপুর বিশ্বভারতীর সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় দর্শন শাখার সভাপতি হইয়াছেন। মূল সভাপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথই স্থির আছেন; সাহিত্য-বিভাগের সভাপতি ও সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই আছেন এবং বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়ই আছেন। মুন্সীগঞ্জের অনতিদূরস্থ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রামপালে একটী পুরাতন পুষ্করিণী খনিত হইতেছে। সাহিত্যিকগণ নিশ্চয়ই রামপালে যাইয়া খনন কার্য দেখিয়া আসিবেন। শুনিলাম, খনন কার্য্য কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ কোন দ্রব্য পাওয়া যায় নাই, কেবল একটা ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাটের অংশ বাহির হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে এই খনন কার্য্য হইতেছে।

সাহিত্য-সংবাদ

ডাঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ কৃত মার্চ্চেণ্ট অব ভিনিসের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৲।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী প্রণীত দানের মর্য্যাদা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল; মূল্য—২৲।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস সত্যবালা প্রকাশিত হইল; মূল্য—১।/০।

প্রোফেসার জে চৌধুরী প্রণীত কান্তলালের কলিকাতা দর্শন প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত প্রণীত বেড়াল-ঠাকুরঝি প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—১।০।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত স্বপ্নময়ী প্রকাশিত হইল; মূল্য—৸৶০।

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোগল বিদুষী'র পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—দশ আনা মাত্র।

Publisher— Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
Cornwallis Street, CALCUTTA

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.
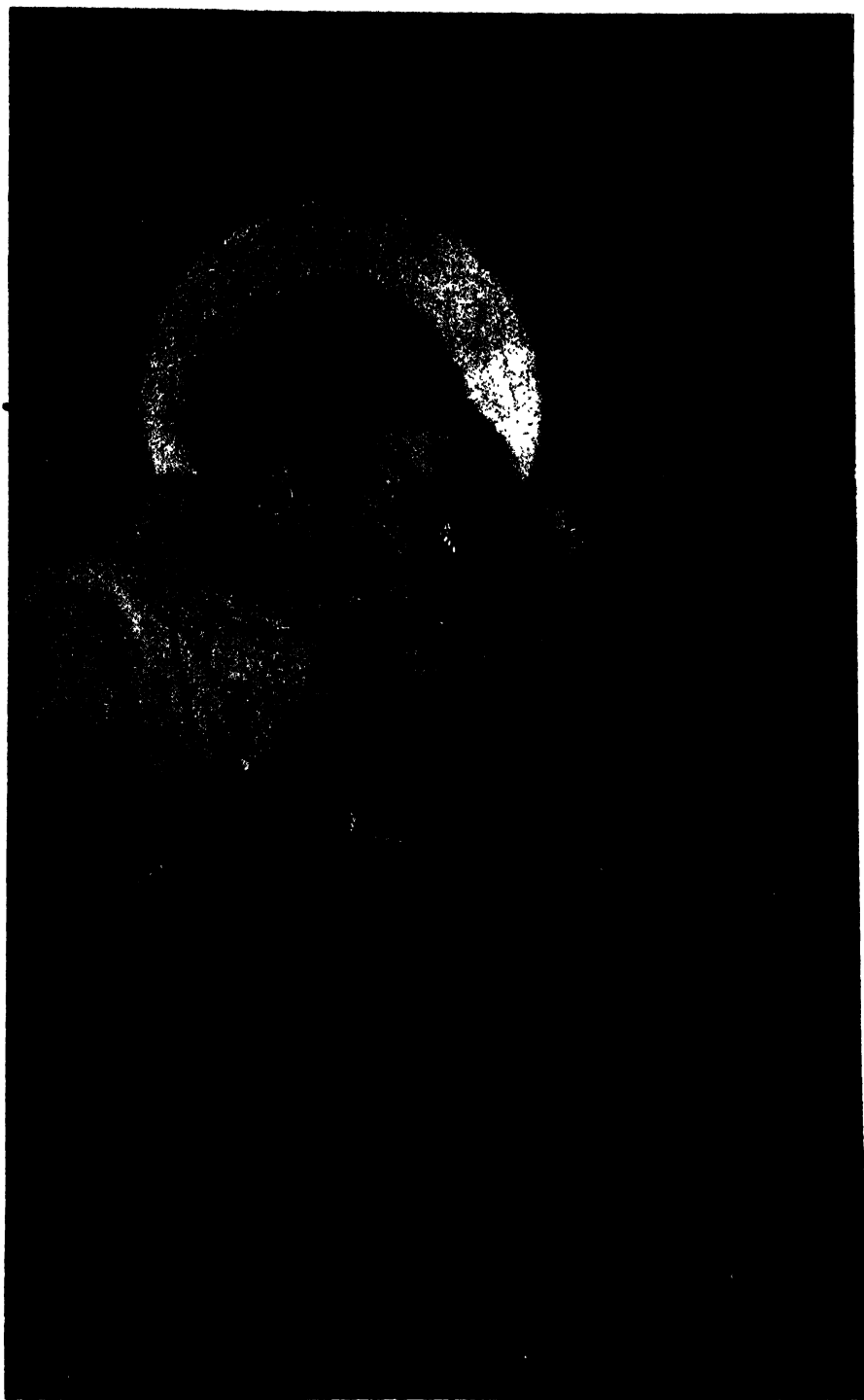
পূর্ণিমা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

ভারতবর্ষ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাদশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

অভিভাষণ

বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর মান্যবর সার হিউ ম্যাক্‌ফর্‌সন কে-সি-আই-ই, সি-এস-আই

[বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর, মান্যবর স্যার হিউ ম্যাক্‌ফর্‌সন কে-সি-আই-ই, সি-এস-আই মহোদয় পাটনা কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে যাহাতে অর্থনীতি সংক্রান্ত তথ্য যথাযথ ভাবে সমালোচিত হয়, তজ্জন্য স্থাপিত "চাণক্য সমিতি"র বাৎসরিক অধিবেশনে যে মূল্যবান অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহাই নিম্নে অধ্যাপক সমাদ্দার কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই সমিতি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ পরলোকগত চার্লস রাসেল মহাশয় কর্ত্তৃক উল্লিখিত উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়—ভাঃ সঃ]

চাণক্য সমিতির সদস্যগণ! অদ্য রাত্রিতে আপনাদের সভার বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি রূপে বৃত হইয়া আমি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি। অবশ্য সত্যের খাতিরে বলিতে হয় যে, ইহা ঠিক বাৎসরিক অধিবেশন নহে। কারণ, তিন বৎসর পূর্ব্বে ইহার অন্ততম অধিবেশন হইয়াছিল। আমি আশা করি যে, অতঃপর আপনারা প্রতি বৎসরই ইহার যথাযথ অধিবেশনে সমর্থ হইবেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাদশ মাসে আপনারা কি কি এবং কিরূপ ভাবে কার্য্য করিলেন, তাহা সাধারণের অবগত হওয়া আবশ্যক।

আপনাদের সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি, অধ্যাপক বাথেজা যখন কয়েক দিন পূর্ব্বে আমাকে এই সভার অধিনায়কত্বের জন্য অনুরোধ করেন, তখন আমি ঘোর সমস্যায় পড়িয়াছিলাম। আমি অর্থনীতি শাস্ত্রে চিরকালই অনুরক্ত এবং তজ্জন্য তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করা সঙ্গত হইত না। পক্ষান্তরে, আমি রাঁচি যাইতে উদ্যত ছিলাম, আমার এক পদ পাটনায়, অন্য পদ রাঁচিতে ছিল। সময়ও অত্যন্ত সঙ্কেপ ছিল এবং আমাকে কোন অভিভাষণ

দিতে হইবে না, এইরূপ সর্ত্তে আমি সভাপতির দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলাম। অধ্যাপক বাথেজা—আমাকে অভিভাষণ দিতে হইবে না, সদস্যগণের সহিত কেবল পরিচিত হইব, তাঁহাদের কার্য্যের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং তাঁহাদের সহিত যৎকিঞ্চিৎ বাক্যালাপ করিব, ইহা'তেই যথেষ্ট হইবে—এইরূপ আশ্বাস দিলে, আমি সভাপতির পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইলাম।

আপনাদের স্থায়ী সভাপতি আমার নিকট হইতে বিদায় লইবার পরে আমি কি বিষয়ে সমিতির সদস্যবর্গের সহিত বাক্যালাপ করিব তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। ত্রিশ বৎসর সরকারী চাকুরীতে অর্থনৈতিক যে সকল সমস্যার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল, এবং সাম্রাজ্যের জনৈক অধিবাসী রূপে যে বিষয়সমূহের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে, আমি তাহারই ২।১টীর সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে স্থিরীকৃত হইলাম। ভারতীয় সিভিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষা দিবার জন্ত প্রস্তুত হইবার সময় হইতেই আমি অর্থনীতিতে আকৃষ্ট ছিলাম। অক্সফোর্ডে পঠদ্দশায় আমি ওরিয়েল কলেজের অধ্যাপক ফিলিপ্স্ মহাশয়ের পদতলে বসিয়া এই বিষয়টী পাঠ করিয়াছিলাম; এবং ভারতবর্ষে আসিবার বহু কাল পরেও তাঁহার সহিত অর্থনীতি-তথ্য সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহার করিতাম। অবশেষে, সরকারী কার্য্য-বাহুল্যে আর ঐরূপ করা সম্ভবপর হয় নাই। তথাপি, রীতিমত ধারাবাহিক রূপে অর্থনীতির আলোচনা না করিতে পারিলেও, আমি এই বিষয়ে অমনোযোগী হই নাই।

মাননীয় সার হিউ ম্যাকফরসন কে-সি-আই-ই সি-এস-আই

যৌবনকালে, উড়িষ্যার এক প্রান্তস্থিত খুর্দ্দা মহকুমার সব-ডিবিশনাল কর্ম্মচারী রূপে তত্রস্থ অধিবাসীদের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্ত আমি ব্যগ্র ছিলাম। পরিবর্ত্তনশীল অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীদের কিরূপ অবস্থা হইতেছে? অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে তাহারা ভাল ছিল, কি মন্দ ছিল? মহকুমার বাৎসরিক রিপোর্টে আমি এই বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী ও আমার মতামত জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। উহা কমিশনরের ছেঁড়া কাগজের ঝড়িতে, সম্ভবতঃ, স্থান পাইয়াছিল।

চাণক্যসমিতির কার্য্যাবলী যেরূপ বহু বিস্তৃত, জনসাধারণের অবস্থার বিষয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীও তদ্রূপ বহু শ্রেণীভুক্ত। ইহা শতধা বিভক্ত এবং আমি ইহার দুই একটী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে প্রয়াস পাইব। জনসাধারণের অবস্থা বলিলে সম্বন্ধ প্রকাশক আপেক্ষিক অবস্থা বুঝায় এবং তুলনাত্মক প্রক্রিয়া দ্বারাই আমরা ইহার অর্থ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা ভারতীয় সাধারণ প্রজার ভীষণ দরিদ্রতার কথা অনেক সময়েই শুনিতে পাই; কিন্তু দরিদ্রতা কোন একটী নির্দ্দিষ্ট দেশে বা স্থানে সীমাবদ্ধ নহে। ইহা আমাদের মধ্যেও এবং সর্ব্বত্রই রহিয়াছে এবং বর্ত্তমানের সহিত অতীতের তুলনায়, সাধারণ অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল কি মন্দ হইতেছে এবং কি করিলে দরিদ্রতা নিবারণ করা যায় অথবা দেশের উন্নতি হয়, প্রত্যেকের নিকটই ইহা সমস্যার বিষয়। আপনারা চাণক্য সমিতির সদস্যরূপে অতীতের সহিত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের তুলনা করিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে আপনারা অনেক কার্য্য করিতে পারেন। এই প্রকারে অনেক বিষয়ের তুলনা করা যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতে প্রজাপুঞ্জের অবস্থা কিরূপ ছিল? আপনাদের সমিতির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয়, রামায়ণ ও মহাভারত যুগের এই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আপনাদের সমিতি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করিয়া অনেক অর্থনৈতিক তথ্য উদ্ধার করিতে পারেন।

চাণক্য সমিতির প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ চার্লস্ রাসেল

মুগল-যুগের বাদশাহগণের রাজস্ব সম্বন্ধীয় কাগজ-পত্র দৃষ্টে অর্থনীতি বিষয়ক অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত যুক্তপ্রদেশের অন্যতম কর্ম্মচারী, মিঃ মোরল্যাণ্ড লিখিত, এই বিষয় সংক্রান্ত একখানি পুস্তক পাঠ করিয়াছি। আমার যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, মুগল যুগাপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা বেশ

ভাল। ব্রিটিশ রাজত্বের প্রারম্ভকালীন অবস্থার সহিত তৎপরবর্ত্তী সময়ের তুলনা করা যাইতে পারে। শেষোক্ত সময়ের অনেক সংবাদ গবেষণার প্রভাবে লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছে। সমিতির অনেক সদস্যই অবশ্য স্যার উইলিয়ম্ হাণ্টারের মনোমুগ্ধকর "গ্রাম্য বাঙ্গলার আখ্যায়িকা" (Annals of Rural Bengal) পুস্তক পাঠ করিয়াছেন। গ্রন্থকার ইহাতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধ শতাব্দীর বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণার অবস্থা বর্ণনার প্রয়াস পাইয়াছেন। বিহার ও উড়িষ্যা প্রত্নতত্ত্ব সরকারী কাগজ পাঠে প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হইতে পারেন। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতগবর্ণমেণ্টের ডিরেক্টর মিঃ ফিন্‌লে সিরাস্ একখানি মূল্যবান রিপোর্টে ১৯১১—১৯১৫ সালে ভারতীয় কৃষকগণের আয় নির্দ্ধারণ এবং উহার সহিত অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের আয়ের তুলনা করিয়াছিলেন। সমিতির সদস্যগণ অবশ্য সেই রিপোর্টের বিষয় অবগত আছেন। এই প্রদেশান্তর্গত বৃত্তান্ত আমাকে পর্য্যালোচনা করিতে হইয়াছিল বলিয়াই আমি ইহার উল্লেখ করিতেছি। বিশেষতঃ, আপনাদের সমিতির
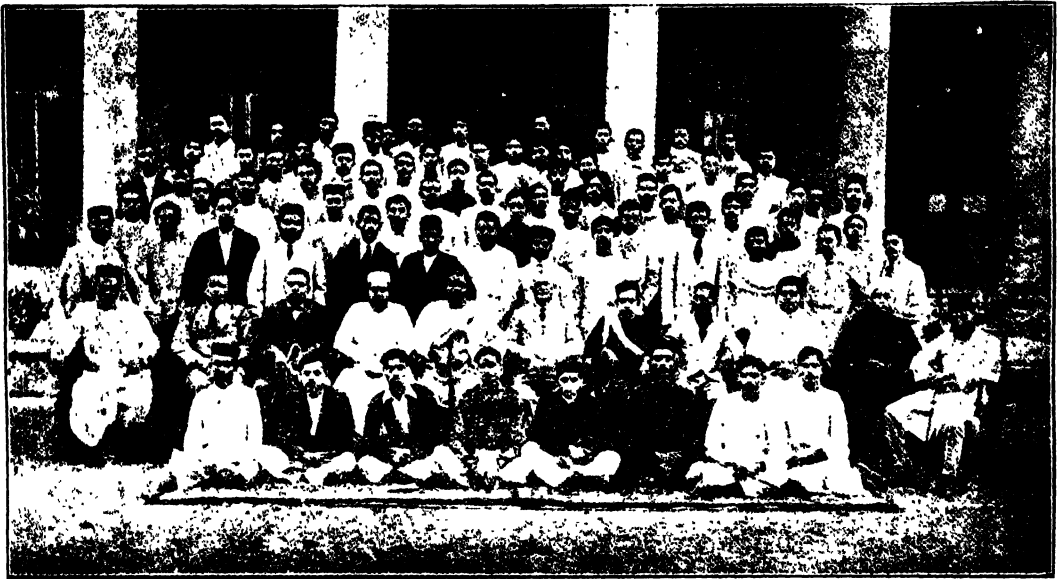
চাণক্য-সমিতির সদস্যগণ

সমিতির আনুকূল্যে ডাক্তার বুকানানের রিপোর্টগুলি প্রকাশিত হইলে, ছাত্রগণের পক্ষে একশত কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের এই প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া বিশেষ সুবিধাজনক হইবে। তখন তৎকালীন ও বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা বিশেষরূপে সুগম হইবে।

গত অর্দ্ধ শতাব্দী সংক্রান্ত সকল বিবরণ এক্ষণে সহজলভ্য। তুলনাত্মক হিসাবে এইগুলি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করা যাইতে পারে। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এই প্রদেশের সকল জিলারই জরীপ সংক্রান্ত যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, ছাত্রগণ সেইগুলি পর্য্যালোচনা করিলে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। অনুসন্ধিৎসু ছাত্রবৃন্দ জিলা রিপোর্ট (District Gazetteers) এবং অন্যান্য সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান অনুসন্ধান—সংসার খরচ ও গ্রামের অবস্থা পর্য্যালোচনা হইতে উল্লিখিত রিপোর্টের অনেক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। এগুলি সমুদায়ই অত্যাবশ্যক। সঠিকরূপে এই সকল বিষয় সংগৃহীত হইলে অতীত ও ভবিষ্যতের সহিত তুলনার জন্য এইগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতি এবং শ্রমিকদের অশান্তি বৃদ্ধির জন্য এই তথ্যগুলি অধিকতর প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের অবস্থার তুলনার জন্য এগুলি অত্যাবশ্যক। বিশেষতঃ, দিন দিন, শ্রমসংক্রান্ত তথ্যগুলি গুরুতর সমস্যায় পরিণত হইতেছে বলিয়া, ইহাদের পর্য্যালোচনাও বিশেষ আবশ্যক।

প্রাদেশিক হিসাবে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের

আয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণে উপরিউক্ত তথ্যগুলি সহায়তা করে। সাধারণ শ্রমজীবী, কৃষক, শিল্পী, জমিদার, উকিল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, সরকারী চাকুরে এবং যাহাদের আয় নির্দ্ধারিত এবং যাহারা বৃত্তিভুক, ইহাদের কাহার কিরূপ আয় তাহা জানা আবশ্যক। মূল্য বৃদ্ধিদ্বারা কি ভাবে প্রত্যেক শ্রেণীর আয়ের তারতম্য হয়, তাহা দেখা যাইতে পারে। কেবল এই প্রদেশ নহে, শুধু ভারতবর্ষ নহে, আন্তর্জাতিক হিসাবেও ইহাদের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

সরকারী কার্য্যে আমি অর্থ নৈতিক যে সকল বিষয়ে লিপ্ত ছিলাম, তন্মধ্যে ১৮৯৬ সালে উড়িষ্যার সেটেলমেন্টের সময় খাজনা ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অষ্টাবিংশ বৎসর আমি এই গুলির সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। চাণক্য-সমিতির সভ্যবৃন্দের দৃষ্টি এই সকল বিষয়ে আকর্ষণ করি। ইতিপূর্ব্বেই আমি উল্লেখ করিয়াছি যে, এই প্রদেশান্তর্গত জিলাসমূহের সেটেলমেন্ট রিপোর্টসমূহ অর্থনৈতিক তথ্যালোচনার পক্ষে প্রশস্ত। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা বিহার ও উড়িষ্যার ভূমিবিষয়ক সমস্যাগুলি অধিকতর বিচিত্র। ইহার কারণ এই যে, অন্ততঃ ছয়প্রকার বিধান এই প্রদেশে প্রচলিত—বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, সম্বলপুর, এবং আণ্ডাল প্রত্যেক স্থানের বিধানই বিভিন্ন। আমি উড়িষ্যার কথার উল্লেখ করিলাম না—তথায় প্রত্যেক রাজ্যে পৃথক পৃথক বিধান।

আপনারা বিহারে থাকেন—সুতরাং বিহারে যে ভূমিবিষয়ক বিধান প্রচলিত, আপনারা সেইগুলি সহিতই অধিক সংশ্লিষ্ট। জমিদার ও প্রজার মধ্যে কি সম্পর্ক, তাহা প্রণিধানযোগ্য। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে এবং প্রজার স্বত্বসংক্রান্ত এই সর্ব্বপ্রধান আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে খাজনা সম্পর্কীয় কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেন, তাহা পাঠ করিলে গত চল্লিশ বৎসরে গ্রাম্যজীবনে কি পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহা অবগত হওয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীর বিস্ময় জন্মে। তৎপূর্ব্বে বিহারের কৃষকের অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। এইরূপ কথিত হয় যে, তাহাকে সর্ব্বদা উচ্ছেদের ভয়ে ভীত থাকিতে হইত। ১৮৮৫ সালের আইন এবং স্বত্বসংক্রান্ত দলিল দ্বারা এই চল্লিশ বৎসরে বিহারে প্রজার অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছে। তথাপি এখনও অনেক সমস্যার সমাধান হইতে বাকী রহিয়াছে। খাজনা বৃদ্ধির কথাই ধরুন। বর্ত্তমান আইনে দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দুই-তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত খাজনা বৃদ্ধি হইতে পারে। অর্থনৈতিক হিসাবে ইহা কি ঠিক? কৃষকদের জমি হস্তান্তরের কথাও ধরুন। রায়তের পক্ষে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে এইরূপ হস্তান্তর করা প্রশস্ত কি না? এবং জমিদারের যাহাতে ক্ষতি না হয় তজ্জন্য এই হস্তান্তরের সময় সর্ত্ত কিরূপ করা উচিত। স্থানীয় আইনসভা বর্ত্তমানে এই বিষয় সকল আলোচনা করিতেছেন বটে, কিন্তু কোন সমস্যার সমাধান হয় নাই। ভবিষ্যতের আইনপ্রণয়নকারীরূপে এইগুলি আপনাদের অনুধাবন করা আবশ্যক। আমার মনে হয়, বর্ত্তমান আইনপ্রণয়নকারীদের কেহ কেহ চাণক্য-সমিতির সদস্য হইলে শোভন হইত। তাহা হইলে তথায় যে অজ্ঞতা দৃষ্ট হয়, তাহার কিছু কিছু হ্রাস পাইত।

কৃষি-সম্বন্ধীয় সমস্যার কথার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের ঋণের কথা মনে না হইয়া যায় না। ইহাতে আমাদের কৃষকগণ জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। সম্মিলিত মহাজনী (Co-operative Credit) অনেক পরিমাণে এই দোষ নিরাকরণের প্রয়াস পাইতেছে। চাণক্য সমিতির সদস্যগণ অবশ্যই এই প্রভূত ফলদায়ক কার্য্যের কথা অবগত আছেন; এবং এই প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার মিঃ কলিন্স্ এক সময়ে এই বিষয়ে আপনাদের অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন জানিয়া আমি সুখী হইয়াছি। আপনাদের সমিতির সদস্যগণ এই সকল সমিতির কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন। ইহা স্বার্থত্যাগী বেসরকারী সাহায্যের উপরই নির্ভর করিতেছে। কার্য্যের সহায়তার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা কৃষিজীবী-শ্রেণীর অবস্থার বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন; সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কার্য্যক্ষেত্রও বিস্তৃত হইতে পারে।

আপনাদের পূর্ব্বের বাৎসরিক অধিবেশনে মিঃ কলিন্স্ এই প্রদেশের ও ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা একটী ভীষণ সমস্যা। দিল্লীর সভায় ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসায়ে রক্ষণশীল মাসুল আবশ্যক কি না বিবেচিত হইতেছে এবং হইলে কি পরিমাণেই বা হইবে? আমাদের এই প্রদেশের প্রান্ত-

সীমায়ই ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা রহিয়াছে এবং তজ্জন্ত আমরা ইহার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। আমাদের প্রধান সেক্রেটারী মিঃ রেণী এই বিষয়ের আলোচনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। আমরা কি ভাবে এই বিষয় সকল পর্য্যালোচনা করিতে পারি? আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায় সংক্রান্ত এই বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কেহ কেহ মনে করেন যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্প অত্যন্ত উন্নতিশীল ছিল এবং ইংরাজ-বণিকের স্বার্থান্বেষী কার্য্য দ্বারাই ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। যাঁহারা এরূপ চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে আমি অধ্যাপক হ্যামিল্টন লিখিত "ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক" (Trade Relation with India) পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমি স্বীকার করি যে, আমি সর্ব্বদাই অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী এবং বহু বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যখন অবাধবাণিজ্য-বাদী এবং রক্ষণশীল দলে ঘোর বিবাদ চলিতেছিল, তখন আমি অধ্যাপক বাষ্টাবেলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম। আমার মনে হইত যে, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য স্বার্থান্বেষী পক্ষদ্বয়ের বিবাদের কারণ নহে—উভয়ের উপকারার্থই উহা আবশ্যক। এখন পর্য্যন্তও আমার ঐ মত; কিন্তু অপরের মত গ্রহণ না করা অন্যায়। "ক্যাপিটাল্" (Capital) নামক সংবাদ-পত্রে দেখিলাম যে, রক্ষণশীলতা সম্বন্ধে কলিকাতার অধ্যাপক কয়াজী পাটনায় বক্তৃতা করিয়াছেন।

জামসেদপুরের ন্যায় স্থানে অসাধারণ সুবিধা আছে বলিয়া তথায় টাটা কোম্পানীর লৌহ এবং ইস্পাতের কার্য্য ওরূপভাবে চলিতেছে। কেহ যদি বিহারের খনিজশিল্প সম্বন্ধে আরও বৃত্তান্ত অবগত হইতে চাহেন, তবে সরকারী পুস্তক পাঠ করিতে পারেন। কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পূর্ব্বে এই সম্বন্ধে যে বৈঠক বসিয়াছিল এবং আমি যাহার সভাপতি ছিলাম, সেই বৈঠকের অনুসন্ধানের ফলেই এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে অনেক পরিমাণে অজ্ঞতা রহিয়াছে; এবং সাধারণতঃ উহা দূর করিবার জন্যই ঐ পুস্তক প্রকাশিত করা হইয়াছে। আমরা খনিজ-শিল্প শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থ ধানবাদে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছি।

সভ্যবৃন্দ, আমি অনেক অসম্বদ্ধ বাজে কথায় আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়াছি। অনেক কথাই ব্যক্তিগত। তবে, চাণক্য-সমিতির কার্য্য কতদূর প্রসারিত হইতে পারে, তাহা উহা হইতে অনুমিত হইতে পারে। জীবন অমূল্য এবং সমিতির প্রত্যেক সদস্যই আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারেন। উৎসাহ, ধৈর্য্য, সত্যানুসন্ধানের ইচ্ছা থাকিলেই কার্য্য করা যাইতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেরূপ অমূলক ভাব ও কুসংস্কার থাকিতে পারে, অন্যত্র কুত্রাপি এরূপ থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষীয় সংবাদ-পত্রেও সাধারণ সভায় অর্থনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে চার্লস্ রাসেল এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আপনারা প্রকৃত অর্থনৈতিক তথ্য উদ্ধারে বদ্ধ-পরিকর। আমি এই সমিতির সফলতা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি; এবং সমিতির সদস্যগণ এই পঞ্চদশ বৎসর ধরিয়া যে উৎসাহ দেখাইয়াছেন, তাহা যেন কিছুতেই ক্ষুণ্ণ না হয়, এই প্রার্থনা করি।

রাজগী !

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

(২৩)

আমি মনোহর সাকে ডাকিয়া পাঠাইতে বলিলাম। ডাকিবার প্রয়োজন ছিল না—সে নিজেই খাতা-পত্র বগলে করিয়া উপস্থিত ছিল।

মনোহর সা আমার সামনেই হিসাবপত্র করিয়া দেখাইল যে, তাহার কাছে আমার আট লক্ষ টাকা দেনা হইয়াছে। তার মধ্যে আসল বোধ হয় পাঁচ লক্ষ, সুদ তিন লক্ষ। দেওয়ানজীরা সুদের টাকাটাও দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই।

আমি গোবিন্দকে ডাকাইলাম। সে আসিয়া ফরাসের উপর গদীয়ান হইয়া বসিল। আমি বলিলাম, "মনোহর সার হিসাবটা দেখুন তো দেওয়ানজী।"

দেওয়ানজী তৎক্ষণাৎ রাধাচরণকে ডাকাইলেন। হিসাবে গোবিন্দ বড় পোক্ত ছিলেন না, এ বিষয়ে তাঁর সম্বল ছিল রাধাচরণ। রাধাচরণ আসিয়া মাথা গুঁজিয়া হিসাব করিতে লাগিল, এবং সম্ভবতঃ ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিল। আজ যে কি একটা কাণ্ড হইবে এবং তার মধ্যে যে সে কি প্রকারে জড়িত হইয়া পড়িবে, সে সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক তার মুখে ছাপ-মারা ছিল।

হিসাবপত্রে দেখা গেল যে, সুদের হিসাবে দশ হাজার টাকার গোলমাল। একবার কিছু টাকা আসলের মধ্যে ওয়াশিল দেওয়া হইয়াছিল। তাহা হইতে সুদ বাদ দিয়া ওয়াশিল দেওয়ায় এই গোল হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মনোহর সা ও দেওয়ানজীর মধ্যে তর্ক লাগিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আমি তর্ক থামাইয়া বলিলাম, "আচ্ছা সে থাক, সুমারনবিশ ম'শায়, গেল আট বছরের আমদানী তহবিল বাকী ও জমাখরচ নিয়ে আসুন দেখি। এত দিনের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশী ওয়াশিল দেওয়া হ'ল না কেন একবার দেখতে হ'বে।"

রাধাচরণ উঠিল। গোবিন্দ তাহাকে থামাইয়া বলিল, "ওয়াশিল আর কোথা থেকে হ'বে। যত টাকা আদায় হ'য়েছে সবই ক'লকাতায় পাঠান হ'য়েছে। তার উপরেও ধার করে টাকা পাঠান হ'য়েছে। একটি দিনও তো আমরা নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাই নি।"

আমি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "খুব সম্ভব তাই। কিন্তু সেই কথাটা আমি খাতা দেখে বুঝতে চাই। যান, খাতা আনুন।"

তখন রাধাচরণ গিয়া পাইকের মাথায় চাপাইয়া কতকগুলি খাতাপত্র আনিয়া উপস্থিত করিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার সম্পত্তির মোট স্থিত কত?"

রাধাচরণ দেওয়ানজীর মুখের দিকে চাহিল। গোবিন্দ বলিল, "স্থিত এখন প্রায় এক লক্ষ টাকা হবে।"

আমি বলিলাম, "দেওয়ানজী, দশ বৎসর আগে বুড়ো দেওয়ানজীর কাছে আমি শুনেছিলাম যে, আমার সমস্ত সম্পত্তির স্থিত এক লক্ষ পঁচিশ হাজার। এ দশ বছরে আপনাদের সুবন্দোবস্তে দেখছি উন্নতি হ'য়েছে।"

গোবিন্দ একটু বিব্রত হইল। সে বলিল, "আমাদের আকালিয়ার চরটা শিকস্তি হ'য়ে যাওয়ায় অনেকটা লোকসান হ'য়ে গেছে। তা ছাড়া—"

"থামুন, মশায় থামুন। মুখের কথায় আমাকে আর কত কি বুঝাবেন। কাগজ-পত্র দেখেই তো সব বোঝা যাবে। আমার এত বড় জমীদারীতে কি খালি শিকস্তিই হ'য়েছে, পয়স্তি কিছু হয় নি! আনুন দিকিনি আমদানী তলব বাকী। গত সন কত আদায় হ'য়েছে দেখি।"

সুমারনবিশ কম্পিত হস্তে হিসাব আরম্ভ করিল। যোগ করিয়া সে দেওয়ানের মুখের দিকে চাহিল। গোবিন্দ কাগজখানা তুলিয়া লইয়া বলিল, "গত সন বড় দুর্ব্বৎসর গেছে। তাতে সমস্ত কাকিয়াদহ ডিহিটা বিদ্রোহী ছিল, তাই আদায় বড় কম হ'য়েছে—মাত্র পঞ্চাশ হাজার ছয় শো বাষট্টি।"

তার পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবে দেখা গেল, আদায় ষাট হাজার। তার পূর্ব্বে বাষট্টি হাজার। এমনি করিয়া দেখা গেল যে, গত দশ বৎসরের মধ্যে কোনও বৎসরেই পঁয়ষট্টি হাজারের বেশী আদায় হয় নাই।

ইহার সঙ্গে গর-আদায়ী টাকা যোগ দিয়া দেখা গেল যে, ক্রমেই মোট স্থিতের পরিমাণ কমিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে আদায় ও অনাদায়ী খাজনা যোগ করিয়া ছিয়ানব্বই হাজারের বেশী কিছুতেই উঠে না।

ক্রমে যতই কাগজ ঘাঁটা গেল, ততই নানারকম কথা বাহির হইল। জমা খরচ ঘাঁটিয়া দেখা গেল, আমার নামে অনেক টাকা খরচ লেখা আছে। অবশ্য আমার নিজের কোনও হিসাবপত্রও ছিল না, কোনও কথা স্মরণও ছিল না; কিন্তু একটা কথা আমার বেশ স্মরণ ছিল। এক সময়ে ভারী বিপন্ন হইয়া আমি গোবিন্দকে পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য লিখিয়াছিলাম। গোবিন্দ টাকা পাঠাইতে অসমর্থ হইয়া লিখিয়াছিল। তখন আমি কলিকাতায় কয়েকটি বন্ধুর নিকট দশ হাজার টাকা ধার করিয়া দায়মুক্ত হই। পরে মনোহর সার কাছে স্বয়ং লিখিয়া দশ হাজার টাকা ধার করি। ঠিক সেই সময়ে আমার নামে দশ হাজার টাকা খরচ লেখা দেখিলাম। আমি তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলাম, "বেইমান্, চোট্টা! এমনি তোমার সব হিসাব বোধ হয়!"

গোবিন্দ বলিল, "এ টাকা সম্বন্ধে ভুল হ'য়ে থাকতে পারে। আমি হয় তো বলেছিলাম টাকাটা পাঠাতে হ'বে, সুমারনবিশ হয় তো ভুল শুনে এটা লিখে থাকবে। সে সব রসীদ দেখলেই পরিষ্কার হ'য়ে যাবে!"

মনোহর সাকে আমি বলিলাম, "কি, সাহজী, তুমি তো দেখছ আমার সেরেস্তার হিসাবপত্র; তুমি কি বল? এ রকম ভুল কি হ'তে পারে?"

মনোহর সা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, তা, হিসাবের ভুল চুক—তা সবগুলি জমাখরচ ভাউচার মিলিয়ে দেখলেই তো ঠিক হ'য়ে যাবে।"

আমি আমার ক্রোধ যথাসাধ্য দমন করিয়া বলিলাম, "শোন মনোহর সা। তোমার কাছে আমার যা দেনা, এ যদি আমার শোধ ক'রতে হয়, তবে যে ক'রেই হ'ক আমার কতক সম্পত্তি তোমাকে দিতে হ'বে। কি রকম ব্যবস্থা হ'বে সে সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবো। যাই হ'ক, তোমাকে এ সম্পত্তির ভার নিতে হবে কতকটা। তুমি এক কাজ কর। তুমি আমার পক্ষে এই দেওয়ানজীর কাছে হিসাব নিকাশ বুঝে নেও। তার পর আমার সম্পত্তির অবস্থাটা বুঝতে পারলে, ঠিক কি উপায়ে তোমার ধার শোধ হ'বে, তা' স্থির করা যাবে। তুমি আজ থেকেই বুঝতে আরম্ভ কর।"

মনোহর একটু দ্বিধা করিয়া শেষে সম্মত হইল; কেন না আমি স্পষ্টই তাহাকে বুঝাইলাম যে, তাহা না করিলে তার ঋণশোধ হইবার সম্ভাবনা বড়ই অল্প। তখনি আমি খাস মুন্সীকে ডাকিয়া মনোহরের নামে এ বিষয়ে একখানা আদেশ-পত্র লিখিয়া দিলাম।

তার পর আমি মোটর-বোটে চড়িয়া চলিয়া গেলাম। আজকার কাণ্ডের পর আর অন্দরে ফিরিবার ইচ্ছা হইল না। সাবিত্রীর উপর আমার মনটা এত দিনে যতটা নরম হইয়াছিল, আজ তাহা ঠিক সেই পরিমাণে শক্ত হইয়া গিয়াছিল। সাবিত্রীর স্বামীপূজা, স্বামীসেবা প্রভৃতি সব

জিনিসের মধ্যেই যে একটা প্রকাণ্ড স্বার্থ আছে, এ সব যে কেবল আমাকে ভুলাইয়া সম্পত্তি আদায় করিবার চেষ্টা, সে বিষয়ে আমার এক ফোঁটাও সন্দেহ রহিল না। তাই তার উপর আমার সমস্ত অন্তরটা তিক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। আগে সাবিত্রীর উপর আমার যথেষ্ট বিরাগ ছিল—তাহার নৈতিক স্পর্দ্ধার জন্য; সে আমার চেয়ে নিজেকে এত বড় মনে করে যে, সে আমাকে উপদেশে দিবার স্পর্দ্ধা করে, সেই জন্য। কিন্তু তাহার উপর রাগ থাকিলেও অশ্রদ্ধা ছিল না। আজ আমার মনে হইল কি হীন স্বার্থপর এই নারী। সম্পত্তির জন্য সে এতটা হীন মিথ্যাচার করিতে কুণ্ঠিত নয়।

সম্পত্তির জন্য এক ফোঁটাও দরদ আমার আর ছিল না। সংসারে কোনও কিছুর উপরই আমার আর টান ছিল না। আমার প্রাণ এখন আকুল হইয়া ছুটিয়াছিল নরেন্দ্রবাবুর দিকে। আমি সব ছাড়িয়া এখন তাঁর আশ্রয়ে যাইয়া খাটিয়া খাইবার চেষ্টা করিব স্থির করিয়াছিলাম। সম্পত্তি বেচিয়া কিনিয়া ধার শোধ করিয়া সাবিত্রীর নামেই লিখিয়া দিব স্থির করিয়াছিলাম। এ অভিশপ্ত সম্পদের সমস্ত অমঙ্গল বহন করিয়া সে সারাজীবন আমাকে যে সন্তাপ দিয়াছে, সেই সন্তাপ নিজে উপভোগ করুক, এই আকাঙ্ক্ষার সহিত আমি তাহাকে অর্দ্ধেক নয় সমস্ত সম্পত্তির দানপত্র করিয়া দিয়া মুক্ত হইয়া বাহির হইব স্থির করিয়াছিলাম। সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে যে কয়টা দিন লাগে, সেই কয়দিন মাত্র অপেক্ষা করিয়া আমি ছুটিয়া পলাইব নরেন্দ্রবাবুর কাছে। এ কয়টা দিন আর সাবিত্রীর কাছে ঘেঁসিতে আমার ইচ্ছা হইল না।

তাই দ্বিপ্রহরে হঠাৎ আমি একা মোটর বোটে গিয়া উঠিলাম। আমার খানসামাকে বলিলাম, একটা ছোট সুটকেসে খানতিনচার কাপড় ও জামা বোটে আনিয়া দিতে।

বোটে অপেক্ষা করিতে করিতে চাকর সুটকেস লইয়া আসিল। সে বলিল "রাণীমা আপনাকে একবার অন্দরে যেতে ব'লেছেন।"

আমি কোনও উত্তর না করিয়া সুটকেসটী তার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া নৌকার উপর ফেলিলাম। খুলিয়া দেখিলাম কি কি জিনিস আছে। বলিলাম, "ওরে যা আবার, আমার ড্রেসিং ব্যাগটা আর ছোট রাইটিং কেসটা নিয়ে আয়।" ভৃত্য অন্দরে ছুটিল। আমি আবার তীরে উঠিয়া খাজাঞ্চীর কাছে গিয়া এক হাজার টাকা চাহিয়া লইলাম।

নৌকায় উঠিতেই দেখিতে পাইলাম যে, অদূরে ভৃত্য ড্রেসিং ব্যাগ লইয়া আসিতেছে। কিন্তু তার পিছু পিছু ছুটিয়া আসিতেছে অবগুণ্ঠিতা সাবিত্রী।

আমি বিস্মিত হইলাম। নবাবগঞ্জের রাজবাড়ীতে এমন কাণ্ড কখনও হয় নাই। রাজবাড়ীর বউয়ের অন্দর ছাড়িয়া হাঁটিয়া আসা অশ্রুতপূর্ব্ব—এমন কাণ্ড কখনও হয় নাই। বিস্মিত হইলাম, কিন্তু উপস্থিত কার্য্য ভুলিলাম না। তাড়াতাড়ি তালা খুলিয়া বোট ছাড়িয়া দিলাম। চাকর বা সাবিত্রী আসিবার বহু পূর্ব্বে আমি ভাটি মুখে তাদের বহু পশ্চাতে ফেলিয়া গেলাম। আর ফিরিয়া চাহিলাম না।

(২৪)

বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরে শ্বশুরালয়ে পৌছিলাম। পথে একটা বাজারে নামিয়া চিড়াগুড় কিনিয়া খাইয়াছিলাম।

শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে সমস্ত অবস্থা খুলিয়া আলোচনা করিলাম। তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন "ঐ গোবিন্দ হারামজাদার পেটের ভেতর থেকে সব টেনে বার ক'রতে হ'বে; তা' হ'লেই সম্পত্তির উদ্ধার হ'য়ে যাবে। ও ব্যাটা বাড়ীতে দোতালা দালান ক'রেছে, চলে ফেরে বাদশার মত। তুমি ওর নামে নিকাশের নালিশ করে সম্পত্তি অগ্রিম ক্রোক কর। তার পর যদি দুই দফা ফৌজদারী করে' দিতে পার, তবে বাপ্ বাপ্ বলে লাখো টাকা বেরিয়ে আসবে এখন।"

আমি বলিলাম, নিকাশের মোকদ্দমা মিটিতে তো তিন বৎসর লাগিবে। তার মধ্যে তো আর দেনা ফেলিয়া রাখিয়া সুদ বাড়িতে দিলে চলিবে না। সে অনিশ্চিত আশায় দেনা শোধের বন্দোবস্ত ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। শ্বশুর মহাশয় এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিলেন। তাঁর মত হইল যে, সম্পত্তি যতটা আবশ্যক বন্ধক দিয়া সুদ কমাইয়া দিতে হইবে। তার পর সম্পত্তি শাসনের সুব্যবস্থা করিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে অন্ততঃ হালের আশি হাজার টাকা ও বকেয়ার অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশ হাজার আদায় হয়,

তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা যদি খরচপত্র কমাইয়া দিতে পারি, তবে ক্রমশঃ কয়েক বৎসরের মধ্যে দেনা শোধ হইবার কথা।

এ যুক্তিও আমার মনঃপূত হইল না। কিন্তু তবু আমি সব কথা তাঁর সঙ্গে খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া আলোচনা করিলাম। তার পর আবার বোটে উঠিয়া সোজা চলিয়া গেলাম জেলার সদরে। গোপাল বাবু আমাদের জেলার বিচক্ষণ উকীল এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিষয়ী লোক। তিনি ওকালতি করিয়া বিপুল সম্পত্তি করিয়াছেন এবং সেই সম্পত্তি হইতে যথাসম্ভব অধিক আয় করিতেছেন।

তাঁর সঙ্গে গিয়া আমি পরামর্শ করিলাম। তিনি অনেক অঙ্ক কষিয়া, অনেক হিসাবপত্র করিয়া, আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করিয়া, নানা রকম বুদ্ধি-পরামর্শের পর, শেষে যে পরামর্শ দিলেন, তাহা আমার সম্পূর্ণ মনঃপূত হইল। সে ব্যবস্থা সোজাসুজী এই। গোপাল বাবুর জমীদারীর সঙ্গে এজমালীতে আমার একটা মস্ত বড় মহাল আছে। গোপাল বাবু তাহা সাত লক্ষ টাকায় কিনিতে সম্মত আছেন। আমি যদি মনোহর সাকে সাত লক্ষ টাকায় রফা করিতে সম্মত করিতে পারি, তবে গোপাল বাবু অবিলম্বে এই মহাল কিনিয়া আমাকে ঋণ-মুক্ত করিতে পারেন। সে মহাল ছাড়িয়া দিলে আমার যে সম্পত্তি থাকিবে, তাহার স্থিত প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা হইবে। এ সম্পত্তিটা সম্পূর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যাইবে।

বুদ্ধি স্থির করিয়া আমি মনোহর সা, রাধাচরণ ও দেওয়ানকে কাগজপত্র লইয়া সদরে আসিতে টেলিগ্রাম করিলাম। গোপাল বাবু দলিলের মুশাবিদা করিতে লাগিলেন।

মনোহর সা ও দেওয়ান আসিল,—তাহাদের সঙ্গে আসিলেন আমার শ্বশুর মহাশয়।—তাঁকে আমি আসিতে লিখি নাই, তাঁকে পাঠাইয়াছিলেন আমার স্ত্রী, আমাকে ধরিয়া বাড়ী লইতে। শ্বশুর মহাশয় বলিলেন "বাবাজি, রাগ করে চলে এসেছ তুমি। আমি আমার মেয়ের হ'য়ে তোমার কাছে মাপ চাচ্ছি, তুমি বাড়ী চল; আমি তোমার সব দুঃখের কারণ দূর করে দেব। সাবিত্রী তিন দিন উপবাসী রয়েছে।"

আমি বলিলাম, "আপনি ভুল অনুমান ক'রেছেন,—আমি রাগ মোটেই করিনি। যত শীঘ্র সম্ভব এই ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে ফেলে, একেবারে বোঝা ঝেড়ে ফেলে বাড়ী যাব। আপনি কোনও চিন্তা ক'রবেন না।"

সাবিত্রী উপবাসী এ কথাটায় মনটা একটু চমকাইয়া উঠিল।

মনোহর সার হিসাব-নিকাশ শেষ হয় নাই; কিন্তু ইতিমধ্যেই রাধাচরণের যত্নে সে প্রায় এক লক্ষ টাকার তছরূপ ধরিয়া ফেলিয়াছে। দেওয়ান তার দায়িত্ব খুব জোর করিয়া অস্বীকার করে; কিন্তু আদালতে তার এ সব টিঁকিবে না। আমি মনোহর সাকে এক লক্ষ টাকা মাপ দিয়া নগদ টাকা লইতে বলিলাম। সে তাহাতে আপত্তি করিয়া নিজে অন্য দুইটা মহাল কিনিয়া লইতে চাহিল। কিছুতেই যখন সে সম্মত হইল না, তখন আমি তাহাকে গোবিন্দের বিরুদ্ধে আমার হিসাব আমলে যাহা পাওনা হয়, সে সমস্ত টাকা আদায় করিয়া লইবার অধিকার দিতে সম্মত হইলাম। সেই সর্ত্তে সে নগদ সাত লক্ষ টাকা লইয়া আমাকে ঋণমুক্ত করিতে স্বীকার করিল।

আমার শ্বশুর মহাশয়ের এ সকল ব্যবস্থা মনঃপূত হইল না। তিনি দুই প্রস্তাব করিলেন। প্রথমতঃ জমীদারী বন্ধক দিয়া আস্তে আস্তে টাকা শোধ করা; দ্বিতীয় প্রস্তাব কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে সম্পত্তি দেওয়া। অনেক ধ্বস্তাধস্তির পর তাঁহাকে বুঝাইয়া সম্মত করিলাম।

দলিলপত্র লেখাপড়া হইয়া গেল। সমস্ত রেজেষ্ট্রী করা হইয়া গেলে ঋণমুক্ত হইয়া আমি আবার গোপাল বাবুর কাছে গেলাম।

গোপাল বাবু বলিলেন, "আবার কি?"

আমি বলিলাম, "আর দুইখানা দলিল ক'রতে হবে। আমার যে সম্পত্তি অবশিষ্ট রইলো, তার অর্দ্ধেক আমার স্ত্রীর নামে দানপত্র করে দেওয়া হবে; আর অর্দ্ধেক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নামে।"

গোপাল বাবু কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। আমি বলিলাম, "আমার মতিগতির কিছু স্থির নাই। আবার যে কি দুর্ম্মতি হ'বে তা জানি না। আর যাতে সম্পত্তি নষ্ট না ক'রতে পারি সেই জন্য এ ব্যবস্থা।"

এ দুইখানা দলিল অতি গোপনে রেজেষ্ট্রী করা হইল

পরের দিন আমি শ্বশুর মহাশয়কে লইয়া মোটর বোটে দেশে ফিরিয়া গেলাম।

নৌকা চালাইয়া দিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম। ভবিষ্যতের ভাবনা আমার ছিল না। আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলাম। আমার স্ত্রী আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি চায়। তাকে অর্দ্ধেক সম্পত্তি ও সমস্ত খানাবাড়ী দিয়া তার কাছে আমার স্বামিত্বের দায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করিব। তার সঙ্গে আমার প্রকৃত স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ কোনও দিন হয় নাই, কোনও দিন হইবে না। কেন না সে আমাকে ভালবাসে না, আমিও তাকে ভালবাসি না। আমার প্রকৃত স্ত্রী ছিল বিধু। সে এই কামনা করিয়া পরলোকে যাত্রা করিয়াছে যে, সে যেন জন্মান্তরে আমাকে স্বামীরূপে পায়। আমিও আমার অবশিষ্ট জীবন ভরিয়া এই সাধনাই করিব যে, জন্মান্তরে যেন বিধুকে ধর্ম্মপত্নীরূপে পাইয়া, এ জীবনে তার উপর যে অত্যাচার করিয়াছি—তার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করিতে পারি।

সাবিত্রীর প্রতি আমার কোনও ক্রোধ নাই। সে আমার নয়,—তার উপর আমার মন্ত্র পড়ার দাবী ছাড়া অন্য কোনও দাবীই নাই। আমি তার একটা অনাবশ্যক বোঝা। এত দিন সে আমার এই বোঝা বহিয়া না-হক কষ্ট পাইয়াছে,—সে জন্য সে আমার করুণা ও সমবেদনার পাত্রী। আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, সে তার বুদ্ধি অনুসারে ধর্ম্ম-কার্য্য করিয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভ করুক।

আমার অবশিষ্ট সম্পত্তির অপর অর্দ্ধেক আমি নরেন্দ্র বাবুর নামে লিখিয়া দিয়াছি। সদর হইতে পূর্ব্বেই তাঁর কাছে টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহাকে নবাবগঞ্জে আসিতে বলিয়াছি। তিনি সেই সম্পত্তি বুঝিয়া লইয়া, যেমন করিয়া ইহার বিনিয়োগ করিলে ঠিক সমস্ত সম্পত্তি আমার প্রজাদের হয় ও প্রজার সব চেয়ে বেশী হিতসাধন হয়, তাহাই করিবেন। আমি তাঁর পরামর্শ অনুসারে কাজ করিয়া যাইব। আমার জীবনের ভার আমি তাঁর হাতে তুলিয়া দিব।

আজ আমার মনে পড়িল তাঁর সেই অনেক দিনের পুরাতন কথা। সেদিন তিনি বলিয়াছিলেন, আমার যে ত্যাগ করিয়া দেশের হিতসাধনের প্রকাণ্ড সুযোগ আছে, তাহার জন্য তিনি আমাকে হিংসা করেন। সে প্রকাণ্ড সুযোগ যখন ছিল, তখন আমি তার সদ্ব্যবহার করি নাই। তখন আমার বিপুল জমীদারী ছিল; তার মায়া আমি ছাড়িতে পারি নাই। সে জমীদারী তো আমি রাখিতে পারিলাম না। এখন তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ অবশিষ্ট আছে। ইহাতে কয়জনেরই বা কতটুকু উপকার হইবে, কয়জন প্রজাই বা তার নিজের পরিশ্রমের পরিপূর্ণ উপস্বত্ব আপনি লাভ করিতে পারিবে?

তখন আমি অর্থের লোভ ছাড়িতে পারি নাই। রাজবাড়ীর পূর্ব্ব অধিকারের দোহাই দিয়া গরীব চাষীর কষ্টার্জ্জিত সম্পদের ভাগ লইয়া আমি সে টাকা অপকার্য্যে উড়াইয়া দিয়াছি। আমি যদি তখন আমার গুরুর আদেশ শুনিতাম, তবে হয় তো আজ সহস্র সহস্র প্রজা সুখী হইতে পারিত। দেশের লক্ষ লক্ষ টাকার অনর্থক অপব্যয় নিবারণ হইতে পারিত। অনেক গরীবের হয় তো জীবন বাঁচিয়া যাইত। করিমদ্দি উৎখাত হইত না, অছিমদ্দির স্ত্রী আজ বেশ্যাবৃত্তি করিয়া উদর পূর্ত্তি করিতে যাইত না।

নরেন্দ্র বাবুর যে যুক্তি তখন এবং তার পরেও আমি বরাবর অস্বীকার করিয়াছি, সে সব যে কত সত্য—আজ আমি দিব্য চক্ষে তাহা দেখিতে পাইলাম। বাঙ্গালার জমীদার তালুকদার ও অন্যান্য অনর্জ্জিত উপস্বত্বভোগীর মধ্যে, আমি যে একাই প্রজার সৃষ্ট অর্থের অপচয় করিয়াছি, এমন নয়। চারিদিকেই এমন দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেছি, চারিদিকেই ঋণের দায়ে জমীদারী লাটে উঠিতেছে। সবাই যে কেবল আমার মত অনর্থক বিলাস উপভোগ করিয়া ঋণগ্রস্ত হইতেছে তাহা নহে; কিন্তু ঋণগ্রস্ত অল্পবিস্তর অনেকেই হইতেছে; আর সেই ঋণের দায়ে সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। এই সম্পত্তি বিক্রয় ব্যাপারটার অর্থ আজ তলাইয়া দেখিতে পাইলাম।

আমার সওয়া লক্ষ টাকা উপস্বত্বের সম্পত্তি ছিল,—আজ তার উপস্বত্ব দেড় লক্ষ টাকা হওয়া উচিত ছিল,—হয় নাই কেবল আমার বন্দোবস্তের অভাবে। আজ যাহা আমার অবশিষ্ট আছে, তার উপস্বত্ব পঁচিশ হাজারের সামান্যই উপরে। আমি এই লক্ষ টাকা উপস্বত্বের সম্পত্তি উড়াইয়া দিয়াছি, অর্থাৎ এই কয় বৎসরে পোনেরো বিশ লক্ষ টাকা উড়াইয়াছি। এই পোনেরো বিশ লক্ষ টাকা

মূল্যের সম্পদের এক পয়সাও আমি নিজ পরিশ্রমে সৃষ্টি করি নাই; সৃষ্টি করিয়াছে আমার চাষী প্রজা। তাহার নিকট হইতে আমি ইহা সংগ্রহ করিয়া ব্যয় করিয়াছি। এমনি, যেখানে যে জমীদারী বা তালুক ঋণের দায়ে বিক্রী হইতেছে, সেইখানেই তার সমস্ত মূল্যটা— দেশের কষ্টার্জ্জিত সম্পত্তি অপচয় হইয়া গিয়াছে। যাহারা তাহা ব্যয় করিয়াছে, তাহারা কোনও সম্পদ সৃজন করে নাই— সমাজের কোনও হিতানুষ্ঠান করে নাই। কেবল বিনা কাজে খাইয়া দাইয়া ও উপভোগ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। পরিশ্রম করিয়া চাষী প্রজা জাতীয় সম্পদ সৃজন করে,— এমন করিয়া ভদ্রলোক আমরা তাহা উড়াইব—আমাদের ইহাতে কি অধিকার আছে? আইনে অধিকার আছে সত্য, কিন্তু ন্যায়ে ধর্ম্মে কি অধিকার আছে? আমরা সমাজের এক ফোঁটা কাজ করিব না, এক কণা সম্পদের সৃষ্টি করিব না,—অথচ কৃষকের কষ্টের ধন লুটিয়া উড়াইব, এ কোন্ ন্যায়ের বিধান?

মনে হইল Marx ও Sydney Webb এর কথা, Wells ও Macdonald এর সরল যুক্তি। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিলাম যে, ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ এবং সমাজের হিতার্থে ভূমিতে পরিপূর্ণ অধিকার তারই থাকা উচিত, যে তাহা ব্যবহার করিতে পারে; এবং যতক্ষণ সে ব্যবহার করিতে পারে, ততক্ষণই তার স্বত্ব থাকা উচিত।

আমার মনে হইল যে, এতদিন যে আমি লক্ষ লক্ষ টাকা আপনার বলিয়া স্বচ্ছন্দে অপব্যয় করিয়াছি, সে সব আমি গরীব চাষীর কাছে অন্যায় করিয়া অপহরণ করিয়াছি। নরেন্দ্র বাবু যখন আমার চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহা দেখাইয়াছেন, তখনও আমি চক্ষু বুজিয়া এই পরস্বাপহরণ করিয়া গিয়াছি। হায়, তখন যদি বুঝিতাম!

শ্বশুর মহাশয়কে তাঁর বাড়ীতে নামাইয়া দিয়া আমি ধীরে সুস্থে নিজ গ্রামে চলিলাম।
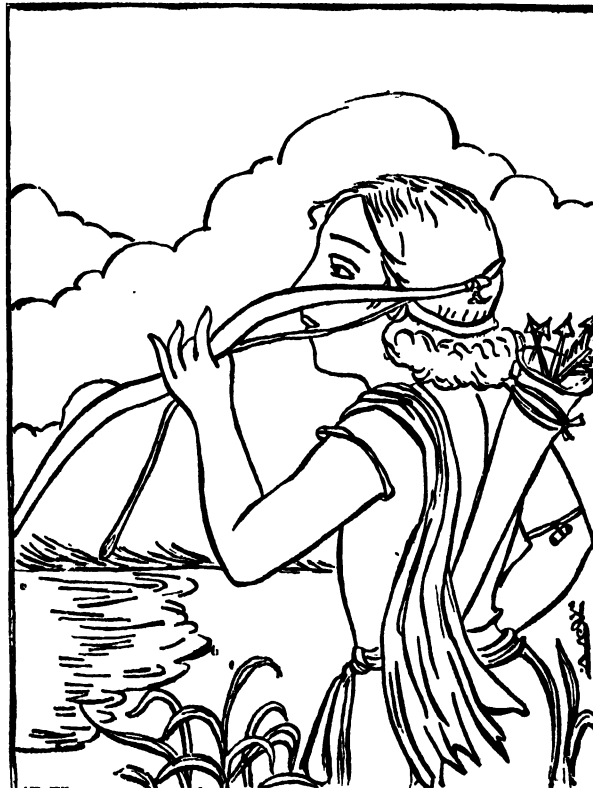
(ক্রমশঃ)

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন খাস্তগির] লক্ষ্য অন্বেষণ

প্রাচীন কথা-সাহিত্য

ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি,

১

ধর্ম্মলব্ধের কথা

পূর্ব্বকালে বারণাসী নগরে ধর্ম্মলব্ধ নামে একজন মহা সমৃদ্ধ বণিক্ বাস করিতেন। তিনি বাণিজ্যের জন্য মহা-সমুদ্রে যাতায়াত করিতেন। বারাণসীর পাঁচ শত বণিক তাঁহার সহিত বাণিজ্যের জন্য সমুদ্র-যাত্রা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ধর্ম্মলব্ধ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "সমুদ্র-মধ্যে রাক্ষসী দ্বীপ আছে। সেই রাক্ষসী দ্বীপের মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে হয়। রাক্ষসী নানা রূপে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে। তোমরা আমার সহিত গমন করিতে সমর্থ হইবে না। রাক্ষসীগণ তোমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া বিপন্ন করিবে।"

বণিকেরা ধর্ম্মলব্ধের কথায় বিশ্বাস করিল না। ধর্ম্মলব্ধ যেরূপ পণ্য লইয়া যখন বাণিজ্যের জন্য যাত্রা করিলেন, তখন তাহারাও সেইরূপ পণ্য লইয়া তাঁহারই সহিত যাত্রা করিল।

রাক্ষসী দ্বীপে উপস্থিত লইয়া ধর্ম্মলব্ধ তাঁহার সঙ্গী-দিগকে বুঝাইলেন তাহারা যেন কোনও প্রকারে রাক্ষসী-দিগের মায়ার অধীন না হয়। রাক্ষসীরা নানা রূপে তাহা-দিগকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু যদি তাহারা রাক্ষসীদিগের বশীভূত হয়, তাহা হইলে আর তাহাদিগকে জম্বুদ্বীপে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। বণিকগণ ধর্ম্মলব্ধের কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহারা রাক্ষসীর মায়ায় মুগ্ধ হইল। মনোহর-রূপ রাক্ষসীদিগের সৌন্দর্য্য তাহাদিগকে আকর্ষণ করিল। তাহারা রাক্ষসীদিগকে বিবাহ করিয়া সেই দ্বীপেই অবস্থান করিল। ধর্ম্মলুব্ধ সপরিজন নির্বিঘ্নে রাক্ষসীদ্বীপ অতিক্রান্ত হইলেন। রাক্ষসীরা সকল বণিককেই ভক্ষণ করিল। তাহাদিগের অস্থিমাত্র অবশিষ্ট রহিল।

বণিকদিগকে ভক্ষণ করিয়া রাক্ষসীগণ সকলে মিলিত হইয়া পরামর্শ করিল—ধর্ম্মলব্ধ এই পথে অনবরত যাতায়াত করে। কুশলেই সে দেশে ফিরিয়া যায়। অন্য বণিক দিগকে সে এই পথে যাইতে নিষেধ করে। আমাদের মধ্যে কি এমন কেহ নাই যে, ধর্ম্মলব্ধকে লুব্ধ করিয়া ভক্ষণ করিতে পারে? বহুমায়া এক রাক্ষসী শত শত বণিক ভক্ষণ করিয়াছিল। সেই রাক্ষসী উক্ত কার্য্যে উৎসাহিত হইল। সে সুন্দরী রমণীর বেশে প্রত্যাগমনকালে ধর্ম্ম-লব্ধের অনুসরণ করিল। নানারূপে তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইল।

ধর্ম্মলব্ধ বারাণসী নগরে উপস্থিত হইলে, সেই রাক্ষসী মায়াবলে ধর্ম্মলব্ধ সদৃশ একটী পুত্র নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মলব্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, যদি তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে, তবে যাও। কিন্তু তোমার এই পুত্রটীকে গ্রহণ কর। তুমি ইহাকে গ্রহণ না করিলে কে ইহাকে পালন করিবে? বণিক্ বলিল—এইটী আমার পুত্র নহে, তুমিও আমার পত্নী নহ। আমি মানুষ, তোমরা—রাক্ষসী। তোমরা শত শত বণিক ভক্ষণ করিয়াছ। রাক্ষসী তথাপি তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। লোকেরা রাক্ষসীর কথা শুনিয়া বণিকের নিন্দা করিতে লাগিল।

রাজা ব্রহ্মদত্ত অমাত্যগণের নিকট ধর্ম্মলব্ধের স্ত্রী-ত্যাগের কথা শুনিয়া উভয়কেই ডাকিয়া পাঠাইলেন। ধর্ম্মলব্ধ রাজার কাছে বিস্তৃত ভাবে সকল কথা বলিলেন। রাজা রাক্ষসীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেন। তিনি বণিকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন না। বণিককে বলিলেন, যদি তুমি ইহাকে গ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমাকে দান কর। বণিক্ রাজাকে নিষেধ করিল। কিন্তু রাজা বণিকের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি সেই রাক্ষসীকে নিজের অন্তঃপুরে গ্রহণ করিলেন।

রাজা রাক্ষসীর রূপে মুগ্ধ হইলেন। রাত্রিকালে সকলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলে রাক্ষসী প্রথমে রাজাকে ভক্ষণ করিল। পরে পুত্রকে রাক্ষসীদ্বীপে পাঠাইয়া সকল

রাক্ষসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইল। রাক্ষসীরা রাত্রির মধ্যেই রাজবাড়ীর সকলকে ভক্ষণ করিল। হস্তী, অশ্বও বাকী রহিল না। রাজগৃহ কেবল অস্থিরাশিতে পূর্ণ হইল।

প্রাতঃকালে অমাত্য, পুরোহিত ও বণিকগণ রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল, দ্বার রুদ্ধ। তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তখন ধর্ম্মলব্ধ বলিলেন—রাজা যখন রাক্ষসীর মোহে পড়িয়াছেন, তখন রাজবাড়ীর আর কেহ জীবিত নাই। রাক্ষসী নিশ্চয়ই সকলকে ভক্ষণ করিয়াছে।

অমাত্যগণ (মই আনাইয়া) প্রাচীরের উপর দিয়া ভিতরে লোক পাঠাইয়া দরজা খোলাইলেন। দেখিলেন, কেবল অস্থি। রাজবাড়ীর মধ্যে আর একটী প্রাণীও জীবিত নাই। তখন অমাত্যগণ প্রথমে রাজগৃহ হইতে কঙ্কালরাশি অপসারিত করাইলেন। নানারূপ শান্তির ব্যবস্থা করিলেন; এবং সৈন্য সমাবেশ করিয়া নগরে শান্তি স্থাপন করিলেন। শান্তি স্থাপিত হইলে অমাত্যগণ, জানপদ সমূহ ও নৈগমবর্গ সকলে মিলিয়া ধর্ম্মলব্ধের ধর্ম্মজ্ঞানে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকেই বারাণসীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিল।

কোশল-রাজের কথা

পূর্ব্বকালে কোশল দেশে পুণ্যশীল বদান্য এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্য অতি সমৃদ্ধ ছিল। দেশে দেশে তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষিত হইত। কাশিরাজ পুনঃ পুনঃ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াও ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিলেন। কাশিরাজের সহিত যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু সহস্র লোক হতাহত হইয়াছিল। কোশলরাজ, রাজ্যের জন্য জনধ্বংস পাপ মনে করিয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাপথের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে এক বৃক্ষের তলে বসিয়া কোশলরাজ বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে দক্ষিণাপথ হইতে আগত, যানবিপন্ন এক বণিক্, তাঁহার কাছে কোশলের পথ জিজ্ঞাসা করিল। দানশীল কোশল-রাজের কাছে সাহায্য লাভের আশায় সে সেই সুদূর প্রদেশ হইতে আসিতেছিল। কোশল-রাজ তাহার নিকট তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিজের দুঃখ-কাহিনী বিবৃত করিলেন। বণিক্ তাহা শুনিয়া হতাশ হইয়া পড়িল। বণিকের নৈরাশ্যে দুঃখিত কোশল-রাজ এক নবীন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কোশল-রাজের কথায়, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, বণিক্ তাঁহাকে বাঁধিয়া কাশিরাজের সমীপে উপস্থিত করিল। কাশিরাজ পূর্ব্বেই তাঁহার মস্তকের জন্য মহাদান ঘোষণা করিয়াছিলেন। এক্ষণে বণিকের মুখে কোশল-রাজার পরার্থে আত্মদান-কাহিনী শুনিয়া পরম বিস্মিত হইয়া তাঁহাকেই কোশলরাজ্যের সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া নিজে স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। কোশল-রাজও সেই বণিককে বহু ধন দান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

ক্ষান্তিবাদি কথা

পূর্ব্বকালে বারাণসীতে কলভ নামক একজন নিষ্ঠুর রাজা ছিলেন। তিনি এক দিন অন্তঃপুরে উদ্যানের মধ্যে অন্তঃপুরিকাগণের সহিত জলক্রীড়া করিয়া শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময়ে উত্তরকুরু হইতে একজন ক্ষান্তিবাদী ঋষি স্বকীয় ঋষিবলে সেই রমণীয় উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্তঃপুরিকাগণ মহাভাগ ঋষিকে দেখিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ প্রার্থনা করিলেন। তিনিও তাহাদিগকে দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, পুণ্যকথা, ও পুণ্যফলকথা উপদেশ করিতে লাগিলেন। রাজা জাগরিত হইয়া অন্তঃপুরিকা-গণকে সম্মুখে না দেখিয়া অসি হস্তে অগ্রসর হইলেন। ঋষির সম্মুখে তাহাদিগকে উপবিষ্ট দেখিয়া রাজার ক্রোধোদয় হইল। তিনি ক্রুদ্ধ ভাবে ঋষির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষি বলিলেন, আমি ক্ষান্তিবাদী ঋষি—তোমার আনন্দ হউক। রাজা বলিলেন, যদি আপনি ক্ষান্তিবাদী, তবে অঙ্গুলী নত করুন। ঋষি অঙ্গুলী নত করিলে রাজা অসি দ্বারা তাঁহার অঙ্গুলী ছেদন করিলেন। মাতার স্তন হইতে পুত্রপ্রেমে যেমন দুগ্ধধারা নির্গত হয়, ঋষির অঙ্গুলী হইতে সেরূপ দুগ্ধধারা নির্গত হইতে লাগিল। রাজার মনে কোনও পরিবর্ত্তন আসিল না। তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁহার হস্ত, পদ, কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিলেন সর্ব্বস্থান হইতেই দুগ্ধধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দেব, নাগ ও যক্ষগণ ক্ষুব্ধ হইয়া মহা নিনাদ করিতে লাগিল। প্রজাগণ সন্ত্রস্ত হইয়া ঋষির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, যে আপনার হস্তপদাদি ছেদন করিয়াছে, তাহার উপর ক্রোধ করুন, কিন্তু আমা দিগকে রক্ষা করুন। ঋষি বলিলেন, যে আমার কর্ণ

নাসিকা, ও হস্ত-পদ ছেদন করিয়াছে, তাহার উপরও আমি ক্রোধ করি নাই—অন্য প্রজাদের কথা তো দূরের কথা। দেব, নাগ, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ বলিতে লাগিলেন, যে অহিংসক ক্ষান্তিবাদী ঋষিকে ছেদন করিয়াছে, তাহার রাজ্য দগ্ধ হউক, বিনষ্ট হউক, নগর ভস্মীভূত হউক। সেই রাজা অমাত্য ও পারিষদগণের সহিত দগ্ধ হউক। প্রজাগণ পুনর্ব্বার ঋষির শরণাপন্ন হইল। ঋষি তাহাদিগকে অভয় দান করিয়া আশ্বস্ত করিলেন। রাজা স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিল, অগ্নিদগ্ধ হইয়া মহানরকে পতিত হইল।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

১০

সেদিনের মোটর-দুর্ঘটনার কিছুদিন পরে মিঃ ঘোষের অন্তঃপুরে রান্নাঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া ক্ষেমঙ্করী ঠাকুরাণী তরকারী কুটিতেছিলেন। নিকটে বসিয়া পুরাতন দাসী বামা বাগান হইতে সদ্য-আহরিত রাশিকৃত কুমড়াশাকের পারিপাট্য সাধনে ব্যস্ত ছিল।

মিঃ ঘোষ তাঁহার একমাত্র শিশু কন্যা নির্ম্মলাকে লইয়া প্রায় উনিশ-কুড়ি বৎসর হইতে পাটনায় বাস করিতেছিলেন। দেশের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না। দু' পাঁচ বৎসর অন্তর কখনো কিছু বিশেষ প্রয়োজন পড়িলে রাজসাহীতে যাইতেন। পাটনা সহরে মিঃ ঘোষ সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁহার উদার ও সদানন্দ প্রকৃতির গুণে ও অসাধারণ দানশীলতায় সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। পরের উপকারে তিনি সদা সমুৎসুক ও দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার নিজের জীবনে বা তাঁহার সংসারের মধ্যে বিশেষ কোন আড়ম্বর ছিল না। নির্ম্মলা একটু বড় হইলে, মিঃ ঘোষ তাহাকে কলিকাতায় বোর্ডিংএ রাখিয়া আসিলেন। পাটনার বাড়ীতে তাঁহার আর কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। সেই দেশীয় ভৃত্যবর্গের উপর নির্ভর করিয়া তিনি একাই দিন কাটাইতেন। কেবল যখন দীর্ঘ অবকাশে বোর্ডিং হইতে নির্ম্মলা বাড়ী আসিত, তখন তাঁহার নিরানন্দ নিঃসঙ্গ ভবন উৎসবে ও আনন্দ-কলরবে মুখর হইয়া উঠিত। নির্ম্মলা যখন বি-এ পাশ করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পাটনায় ফিরিয়া আসিল, তখন মিঃ ঘোষ তাহার সঙ্গে থাকিবার জন্য দেশের বাড়ী হইতে বামা ঝি ও তাঁহার ভগিনী ক্ষেমঙ্করীকে পাটনার বাড়ীতে লইয়া আসিলেন।

নূতন দেশে আসিয়া চারি দিকের অজানা সমস্ত বস্তু ও বিষয়ের সহিত পিসীমা এখনও নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারেন নাই; তাই তাঁহার মেজাজটা প্রায়ই অপ্রসন্ন থাকিত। এ দেশে বাংলার আজন্ম-পরিচিত বাঙালীর নিত্য-প্রয়োজনীয় অর্দ্ধেক জিনিস পাওয়াই যায় না। মানুষগুলার যেমন অদ্ভুত পোষাক, তেমনি তারা নোংরা। কথা যে কি বলে, তার যদি মাথা-মুণ্ড কিছু বোঝা যায়! সব-শুদ্ধ যেন একটা কিম্ভূত-কিমাকার কাণ্ড! এ রকম আজগুবী দেশের প্রতি দাদার এমন অসামান্য অনুরাগের যে কি কারণ থাকিতে পারে, বিস্তর গবেষণা করিয়াও পিসীমা তাহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বামা ঝিও এ বিষয়ে তাঁহার মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করিত।

একটী সুবৃহৎ পেঁপের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে সামনের স্তূপাকার শাকের দিকে চাহিয়া পিসীমা বলিলেন, ফুলগুলো ছিঁড়ে নিয়ে আলাদা রাখ,—দুটো বেশম দিয়ে ওদের ভেজে দেবে। আর খুব নরম দেখে ডগার দিক থেকে দুটি শাক রেখে আর সব ফেলে দে। মালীকে দুটো ডগা কেটে দিতে বল্লুম, তা সে একেবারে ঝাড়ে-মূলে জঙ্গল তুলে দিয়ে গেল,—একটা কথা বোঝে কি ছাই! একে ত এ দেশের শাক-পাতা কিছু মিষ্টি নয়, সব যেন নুন-খরা,—ও আর কতই খাওয়া যায়?

বামা বলিল, মিষ্টি হবে কেমন করে? এ কি আর

আমাদের দেশের মাটির জিনিস? এখানকার মাটি যে একেবারে রুখখু! শুকনো! ঐ যে বলে শোন না? কাঠখোট্টার দেশ! সে ঠিক কথা,—যেমন মানুষগুলো তেমনি জিনিস-পত্তর! আমার ত বাছা এখানকার কিছুই ভাল লাগে না! সেদিন তাই দিদিমণিকে বলছিনু, বলি হ্যাগা দিদিমণি! তোমরা দেশে-ঘরে যাবে কবে? এমন রাজ-ঐশ্বয্যি ছেড়ে এখানে কি সুখে পড়ে আছ? তা দিদিমণি শুধুই হাসে! বলে, তোর বুঝি এখানে মন টি‍ঁকছে না?

পিসীমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মন টেঁকে না, সে তো সত্যি কথাই। তা উপায়ই বা কি? মা-মরা মেয়েটাকে ফেলে যাবই বা কোথায়? ওরা যত দিন থাকবে, তত দিন আমাদেরও থাকতেই হবে। এই ত এতটুকু বয়স থেকে কোথায় কোন্ দূরদেশে বাপ রেখে এলো,—এতটা কাল পরের কাছেই মানুষ হলো,—একটু আদর-যত্ন পেলে না। এখন যদি বা কতকাল পরে বাড়ী ঘরে এলো, এখন কি ওকে একলা ফেলে আর কোথাও তিষ্ঠুতে পারি?

বামা বলিল, তা সত্যি পিসীমা! তোমাদের সংসারে ঐ ত একটা মেয়ে,—কর্ত্তাবাবুর কেমন যে স্থাকাপড়ার বাতিক! এতকাল ধরেও ব্যাটাছেলেদের মত দিদিমণি পাশ করছে তো পাশই করছে। আদ্দিন বিয়ে হলে ওর পাঁচটা ছেলে-মেয়ে হয়ে সংসার-সাজানো ভরপুর হয়ে উঠতো। তা না—খালি পড়া আর পড়া! তা এবার তো সে সব শেষ হলো, এবার কর্ত্তাবাবুকে বলে ওর বিয়ে-থাওয়া দাও বাছা! তোমাদের বাড়ী এতটা কাল কাটলো,—কবে আছি কবে নেই,—দিদিমণির বিয়েটা দেখে মরি! তোমাদের বড় ঘর, তাই যা কর, সবই মানায়! আমাদের দেশে ঘরে অত বড় মেয়ে আইবুড়ো থাকলে জাতে ঠেলে রাখতো!

পিসীমা এ কথায় ঈষৎ আহত হইয়া বলিলেন, আমাদেরি কি আর আগেকার কালে ও-সব হবার যো ছিল? ও-সব এখনকার সময়ে হয়েছে। এই ত আমাদের বিয়ে হয়েছিল, সাত বছর বয়েসে,—মনেও পড়ে না, কবে বিয়ে হয়েছিল,—এই যে নির্ম্মলা! উঠেছ? আজ কেমন আছে হাতের ব্যথাটা?

নির্ম্মলা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। এ কয় দিনে তাহার হাতের বেদনা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। এখনো হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

পিসীমার কথার উত্তরে সে বলিল, ভাল আছি পিসীমা! বোধ হয় আর দু' একদিনের মধ্যেই ব্যাণ্ডেজটা খুলে দেবে। ব্যথা অনেক কমে গেছে!

পিসীমা সস্নেহ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তাই হোক বাছা! সেরে গেলেই বাঁচি! সেদিন যে কাণ্ডটা করে বাড়ী ফিরলে—আমি ত ভয়ে একবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিলুম! আজকালকার যত সব নতুন নতুন সভ্যতা—ততই সব আজগবি বিপদ আপদ সঙ্গে সঙ্গে লেগেই আছে! সাধে কি আমি ঐ মটোরগাড়ী-গুলো দেখতে পারি নে? ওগুলো একবারে মানুষ খুন করা গাড়ী!

নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল, পিসীমা, তোমাদের সময়ে কি কেউ কখনো দৈবাৎ পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙতো না?

পিসীমা বলিলেন—তা ভাঙবে না কেন বাছা? দৈবি-দৈবি কালে-ভদ্রে অমন এক-আধটা হতে পারে! এ যে দিনের মধ্যে ঐ পোড়া গাড়িতে দুটো দশটা খুন হচ্ছেই—হচ্ছেই! এমন কি আর সেকালে ছিল? তা মরুক গে ও কথা! দাদা আজ এখনো উঠলেন না যে? তিনি ত এত বেলা পর্য্যন্ত কোন দিন ঘুমোন না?

নির্ম্মলা মিঃ ঘোষের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে চাহিয়া বলিল, এখনো ত ওঠেন নি দেখছি! আজ ক'দিনই তাঁর উঠতে বেলা হচ্ছে! বোধ হয় রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। সেই সেদিনকার পর থেকে বাবার শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই পিসীমা! জিজ্ঞেস করলে কিছু বলেন না, তবে আমার মনে হচ্ছে।

পিসীমা বলিলেন, আহা—তা আর হবে না? বেশি চোট না লাগুক—সর্ব্বশরীরে একটা নাড়া পেয়েছে ত? বয়স হয়েছে—এখন একটুতেই শরীর খারাপ হতেই পারে। তা তেমন যদি বেশি কিছু মনে হয়, তো তার একটা ব্যবস্থা করো মা! দাদা ত সদানন্দ ভোলানাথ মানুষ, পরের জন্ম প্রাণ দেবে, তবু নিজের কিছু হলে কিছু করতে জানে না!

নির্ম্মলা পিসীমার নিকট হইতে আসিয়া তাহার ঘরের

বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল। আজ কয়েক দিন হইতে সে মিঃ ঘোষের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছিল। এতকাল তাহার জীবনে চিন্তা বা উদ্বেগের ছায়া পড়িয়া তাহাকে উদ্বিগ্ন করে নাই; তাই সে সামান্য কারণেই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে!

মিঃ ঘোষের চিন্তা ছাড়া আর একটী বিষয় মধ্যে মধ্যে তাহার মনে উদিত হইত। সে চিন্তা অসিতের। যদিও অসিত স্পষ্ট ভাবে এখানে আসিবে এমন কোন কথা দেয় নাই, তবু কেমন করিয়া যেন তাহার বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল, সে নিশ্চয় আসিবে। প্রতিদিনই মনে মনে সে তাহার আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কোন ভৃত্যকে একটু ব্যস্ত ভাবে আসিতে দেখিলেই, তাহার মন আনন্দে ও উদ্বেগে দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিত! নিশ্চয় সে অসিতের আসার খবর দিতে আসিতেছে! কিন্তু প্রতিবারই সে হতাশ হইত। অসিত বা পরেশ কেহই এ পর্য্যন্ত তাহাদের সংবাদ লইতে আসে নাই।

নির্ম্মলা নিজের মনে এই সকল চিন্তায় তন্ময় হইয়াছিল, সহসা পিছন হইতে লীলার কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া সে মুখ ফিরাইল,—তোর কি খবর মিলি? খুব বড় রকম একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার করেছিস না কি?

লীলা প্রতিদিন প্রভাতে অশ্বারোহণে বেড়াইতে বাহির হইত, আজও সে সেই বেশেই আসিয়াছে। তাহার শ্রমখিন্ন ললাট ঈষৎ ঘর্ম্মাক্ত—হাতে ঘোড়ার চাবুক!

নির্ম্মলা হাসিয়া বলিল, একেবারে বীরবেশে যে দেখছি! সাধে কি আর মিসেস দত্ত তোকে তুরুক-সওয়ার বলে? সব সময়ে মর্দ্দাণী!

লীলাও হাসিল, বলিল, মিসেস দত্ত উচ্ছন্ন যাক্! সে কি বলে, না বলে, তা জানবার কোন আগ্রহ আমার নেই,—তোর নিজের কথা কি তাই বল্! হাতে বড় বেশি আঘাত লেগেছে শুনলুম! কেমন আছিস এখন?

নির্ম্মলা কৃত্রিম অভিমানে মুখ ফিরাইয়া বলিল, তাই শুনে বুঝি এই পোনের দিন পরে খবর নিতে এসেছিস? অত আর দরদে কাজ নেই তোর! বয়ে গেছে তোকে আমার কোন কথা বলতে! কথা বলিতে বলিতে দুইজনে ঘরে আসিয়া বসিল। প্রভাতের অম্লান সূর্য্যকিরণে তখন কক্ষতল পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

লীলা একটু অপ্রস্তুত ভাবে নির্ম্মলার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতের দিকে চাহিয়া বলিল, তা সত্যি ভাই! আমার আরো আগে তোকে দেখতে আসা উচিত ছিল! কিন্তু রোজই আসব আসব মনে করেও কিছুতে বেরুতে পারি নি,—ক'দিন থেকে যে গোলমাল চলছে বাড়ীতে! তা রোজই খবর নিয়েছি কিরণের কাছে—যে তুই ভালই আছিস! না হলে কি আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারতুম? সত্যি রাগ করেছিস না কি মিলি? লীলা দুই হাতে নির্ম্মলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

নির্ম্মলা তাহার মুখের ভাব দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, তুই ত আচ্ছা পাগল দেখছি! একটা ঠাট্টাও বুঝতে পারিস না? খামকা এমনি মুখের চেহারা করে তুললি, যেন আমি রাগ করলে তোর একবারে মহা সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে! অথচ এদিকে ত দস্যিগিরি কত!

লীলা হাসিয়া বলিল, তা ভাই! আমি দস্যি হতে পারি, তবে মনটা আমার বড় সরল। আমি যাদের ভালবাসি, তাদের ভালবাসা পূর্ণমাত্রায় সব সময়ে পেতে চাই,—না হলে আমার চলে না। তা ছাড়া, একে ত দুনিয়ার কারো সঙ্গেই আমার বনে না,—বন্ধুর মধ্যে এক তুই আর কিরণ,—তোরাও রাগারাগি করলে আমি আর যাই কোথা বল্?

নির্ম্মলা বলিল, যাক্, এখন তো রাগারাগির পালা সাঙ্গ হয়ে মিটমাট হয়ে গেল,—এখন তোদের বাড়ীতে কি গোলযোগ বেধেছে যে বলছিলি? কি হয়েছে? আমি ত আজ দু হপ্তা বাইরে যাই নি,—কোন কিছু খবর-টবর জানি না,—নতুন কিছু আবার ঘটেছে না কি?

লীলা অবজ্ঞার সহিত বলিল, নতুন আবার হবে কি? ওই যে অরুণের খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে কি না? তাই মায়ের আর বীণার যত সব বন্ধু-বান্ধবরা সহানুভূতি প্রকাশ করতে আসছেন! বীণার দুঃখে তাঁদের আর ঘুম আসছে না। অথচ বীণার দুঃখটা যে কি, তা তো আমি কিছু দেখতে পাই না! দিব্বি খাচ্ছে দাচ্ছে, ফূর্ত্তি করে বেড়াচ্ছে। তবে লোকজন কেউ এলেই তার মুখটা বিষণ্ণ হয়, আর চোখ দুটো ছল ছল করে আসে বটে! এই সব ভণ্ডামী দেখলে আমার হাড়ে জ্বালা ধরে! মা তো চব্বিশ ঘণ্টা ভেবেই অস্থির—কি করে বীণা এ আঘাত

সামনে উঠবে! এর মধ্যে মজার কথা এই—যে লোকটা সত্যি সত্যি চোখ হারিয়ে জন্মের মত সব সুখ থেকে বঞ্চিত হলো, তার কথাটা কেউ একবার ভুলেও মুখে আনে না! সাধে কি আর আমার বনে না কারো সঙ্গে?

নির্ম্মলা অনেকক্ষণ কোন কথা বলিল না। বারাণ্ডার কার্ণিসের উপরে বসিয়া কপোতের ঝাঁক অশ্রান্ত গুঞ্জনধ্বনি করিতেছিল। প্রভাতের স্নিগ্ধ ঝিরঝিরে বাতাসে টবের ফুলগাছগুলা মৃদুমন্দ দুলিতেছিল।

নির্ম্মলা সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া এতক্ষণ পরে অন্যমনে বলিল, সত্যি ভাই! বীণাদির যে কি রকম প্রাণ—আমি তাই ভাবি! অরুণ বাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ হয় নি,—সামান্য পরিচয় মাত্র হয়েছিল। তবু যখন তাঁর কথা মনে পড়ে, তখন যেন মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। এত রূপ, এমন গুণ, এমন মহৎ জীবন একটা—সব ব্যর্থ হয়ে গেল! কিন্তু বীণাদি তাকে অত ভালবেসে তার এমন বিপদের দিনে তাকে কি করে এক কথায় ভুললে? তাই এক এক সময় আমার মনে হয়,—ভালবাসাটা কি এতই স্বার্থপর? মানুষ কি শুধু নিজের সুখ ও সুবিধার জন্যেই ভালবাসে? তোর কি মনে হয় লীলা?

লীলার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সে আবেগ-ভরে বলিল, আমার বিশ্বাস—যথার্থ ভালবাসা কখনো এত হীন হতে পারে না। তবে ভালবাসার নাম নিয়ে অনেক মেকি জিনিসও সংসারে চলছে তো? তাতেই এই সব বিকারগুলো অনেক সময় আমাদের চোখে পড়ে। এসব খাঁটি জিনিস নয়।

নির্ম্মলা বলিল, শুধু অরুণ বাবু নয়,—ঐ চৌধুরী, চিনিস তো? হালে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরেছে। সে বেচারা যে কি ভালই বাসে বীণাদি'কে! যদি তার প্রাণ দিতে হয় বীণাদির জন্যে, তাও বোধ হয় সে হাসিমুখে দিতে পারে। মানুষে মানুষকে বুঝি এত ভালবাসতে পারে না। কিন্তু বীণাদি সব জেনে-শুনেও তাকে নিয়ে রঙ্গ-তামাসা ও খেলা করে! মানুষের প্রাণ নিয়ে এমন নিষ্ঠুরতা—ছিঃ! আমার এত খারাপ লাগে!

লীলা বলিল, তা আমাদের খারাপ লাগলেই বা আর কি করছি বল? সে নিজে যা ভাল বুঝবে, তাই তো করবে? আর চৌধুরীই বা অমন করে মরতে যায় কেন? ওরাই তো কুকুরের মত সর্ব্বদা পিছনে পিছনে ফিরে বীণার আস্পর্দ্ধা আরো অত বাড়িয়ে দিয়েছে! আমার ত ঐ অপদার্থগুলোর উপর কোন সহানুভূতি নেই—বরং দেখলে বিষম বিতৃষ্ণা ধরে।

নির্ম্মলা একটু ভাবিয়া বলিল, কিন্তু আমার তো মনে হয় ভাই, চৌধুরী সত্যি অপদার্থ না হতেও পারে। আমার শুধু মনে হয়—ও-বেচারা একেবারে আপনাকে হারিয়ে ভালবেসেছে! বীণাদি ওর সঙ্গে যে ব্যবহারই করুক, ওর তাকে ভাল না বেসে আর অন্য উপায় নেই! ও কি বুঝতে পারে না, ওকে কত তাচ্ছিল্য, কত অবজ্ঞা প্রতিদিন সে করছে? তবু ও নিজেকে কেন সংযত করতে পারে না? সে শক্তি নেই ওর! এইখানে যে মানুষ কত দুর্ব্বল, কত অসহায়—তা ওর অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়।

লীলা হাসিতে হাসিতে বলিল, যে আজ্ঞে মাষ্টারমশায়! এ সম্বন্ধে আপনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মেছে দেখছি! চৌধুরী যা খুসি করুকগে, এখন নিজের কথা একটু বল্ দেখি! কি হয়েছিল সেদিন?

"সে তো কিরণ বাবুর কাছেই সব শুনেছিস—আর কি বোলবো বল্? কিরণ বাবু লাফিয়ে পড়েছিলেন, তাই তাঁর লাগে নি। বাবারও বড়-একটা কিছু হয় নি। আমারি হাতটা একেবারে মুচড়ে গিয়েছিল,—তাতেই হাড়ে অত আঘাত লেগেছে! তা এখন অনেক কমে গেছে—ভালই আছি।"

"আর তোদের সেই অরণ্যচারী বন্ধুদের কথা কিছু বল্? কিরণের সঙ্গে ত আর তাদের দেখা হয় নি,—সে তাদের কথা কিছু বলতে পারলে না। তা এত যায়গা থাকতে তারা সেখানে থাকে কেন ভাই? কেমন যেন একটু বোধ হয় না? তোর তাদের কেমন লাগ্‌লো?"

নির্ম্মলার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, তা আমি কি করে বোলবো? তবে এইটুকু মনে হয়, তাঁরা দুজনেই অত্যন্ত ভদ্র ও উন্নত-প্রকৃতি;—যতক্ষণ আমরা ছিলুম, যতদূর সাধ্য—আমাদের যত্ন করেছেন। আর ছিলুম তো ঘণ্টাখানেক,—তাও হাতের কন্‌কনানিতে প্রাণ তখন অস্থির, সে সময় আর কি-ই বা জানতে পারি বল্?

লীলা এ কথায় বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন? আর কি তাঁদের সঙ্গে তোর দেখা হয় নি? এত দিনের মধ্যে তোদের খোঁজ-খবর নিতে তাঁরা কি একবারও আসেন নি?

নির্ম্মলা এ প্রশ্নে কেন যে নিজেকে বিব্রত বোধ করিল, তাহা সে নিজেই বুঝিল না। কুণ্ঠিত ভাবে মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, কই আর এসেছেন? বাবা, কিরণ বাবু, সকলেই তো বারবার অনুরোধ করেছিলেন আমার জন্যে। আমিও একবার বলেছিলুম। কিন্তু তাঁরা ত কেউ আসেন নি।

লীলা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, ভারি আশ্চর্য্য ত! কিন্তু এটা ভাই তাঁদের অন্যায়! অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও তাঁদের একবার খবরটা নেওয়া উচিত ছিল।

এ চিন্তা নির্ম্মলার অন্তরে অন্তরে সর্ব্বক্ষণ জাগ্রত থাকিয়া তাহাকে পীড়া দিতেছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে সে উদাসীন ভাবে বলিল, অন্যায় আর কি? হয় ত তাঁরা এখানে নেই,—হয় ত আর কোন কারণ থাকতে পারে। যাঁদের কথা কিছুই জানি না, তাঁদের বিষয় বিচার করতে না যাওয়াই ভালো। তার পর সে একটু হাসিয়া বলিল, বিশেষ এ থেকে বোঝা যায়, তাঁরা মানুষের মত মানুষ,—সাধারণ পুরুষ জাতির মত একটা মেয়ের মুখ দেখলেই মূর্চ্ছা যান না, কিংবা পরিচয় করবার একটা সুযোগ পেলেই তাদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ক্ষেপে ওঠেন না। এটা ভাল নয় কি?

লীলা হা হা করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, ভাল হয় ত হতে পারে। কিন্তু তুই তাদের জন্য এত ওকালতি করে মরছিস কেন বল্ দেখি? কিছু গোলযোগ বাধাস নি তো? সহসা নির্ম্মলার রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া সে থামিয়া গেল। বলিল, না ভাই মিলি! রাগ করিস নি। আমি ঠাট্টা করছিলুম! জানোয়ার দেখে দেখে আমার তো বিতৃষ্ণা ধরে গেছে, একজন সত্যিকার মানুষ দেখতে পেলে আমিও তোর চেয়ে তাঁকে কিছু কম শ্রদ্ধা করবো না। কিন্তু আজ উঠি ভাই! অনেক বেলা হলো! তুই তো এখন ভাল আছিস—বিকেলে আমাদের ওদিকে যাস না! বাড়ী বসে বসে কি করিস! খেলতে না পারিস, একটু বেড়িয়ে গল্প টল্প করে চলে আস্‌বি। কেমন, যাবি আজ?

নির্ম্মলা বলিল, দেখি ভাই! বাবা যদি যান, তা হলে যেতে পারি। না হলে তাঁকে একলা ফেলে—

"কেন? কেন? কাকা যাবেন না কেন? কোথায় তিনি? ভাল আছেন তো?"

"ভাল বিশেষ নেই। ক'দিন থেকেই তাঁর শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। ওঠেন নি এখনো।" লীলা উঠিয়া বলিল, তা হলে আজ আর তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না। তোরা বিকেলে যাস তো—ভাল, নয় তো আমি আবার আসবো।

(ক্রমশঃ)

রয়েল সোসাইটী

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাহা

মনীষী এডিসন্ (Addison) বলিয়াছেন, 'The aim of the scientist is to be a Fellow of the Royal Society' অর্থাৎ রয়েল সোসাইটীর সভ্য হওয়া বৈজ্ঞানিক জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এই সমিতিকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান পরিষদ্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকল দেশের প্রায় যাবতীয় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ এই সভার সভ্য। অতীতেও তাহা ছিল। এ যাবৎ তিনজন ভারতীয় এই সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। সর্ব্ব প্রথম মান্দ্রাজের স্বর্গীয় গণিতজ্ঞ রামানুজম্। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক দিয়া তাঁহার তেমন কৃতিত্ব না থাকিলেও প্রতীচ্যের গুণগ্রাহী বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা-সম্ভূত মৌলিক আবিষ্কারে যুগপৎ মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া অনতিবিলম্বে তাঁহাকে পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত করেন। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য, পূর্ণ প্রস্ফুটিত না হইতেই অকালে সে ফুল ঝরিয়া গিয়াছে। তারপর সভ্য মনোনীত হন জগদ্‌বিখ্যাত, ভারতের উজ্জ্বল মুকুটমণি বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু।

এ ক্ষেত্রে তাঁহার ও তাঁহার আবিষ্কারের পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। সর্ব্বশেষে অতি অল্পদিন হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক মান্দ্রাজবাসী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটাপ্পা রমণ সদস্য হইয়াছেন। তাঁহাকে যুবক বলিলেই চলে। তাঁহার গৌরবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবান্বিত। এই সভার সভ্য হইবার উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক যে ভারতে

সার হাম্‌ফ্রে ডেভি পি-আর-এস

আর নাই তাহা নহে। তবে নানা কারণে সম্পূর্ণ উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের মনোনীত করা হয় নি। নাম না বলিলেও পাঠক পাঠিকারা তাঁহাদের নাম সহজেই অনুমান করিতে পারেন।

বাংলা-সাহিত্য-জগতে 'সাহিত্য পরিষদের' যে স্থান, বিজ্ঞান-জগতে এই রয়েল সোসাইটীর স্থানও অনেকটা অনুরূপ। সভাগণ তাঁহাদের আবিষ্কার ও গবেষণাবলী পরিষদে প্রেরণ করেন ও মাঝে মাঝে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া থাকেন এবং পরে সেগুলি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (Proceedings of the Royal Society)। পরিষদের ব্যয় গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ও অনেক ব্যক্তিগত দানের অর্থে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। মূল সমিতির অধীনে অনেক শাখা-সমিতিও আছে। বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখা লইয়া এইগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞানের উন্নতির ইতিহাসে এই পরিষদের
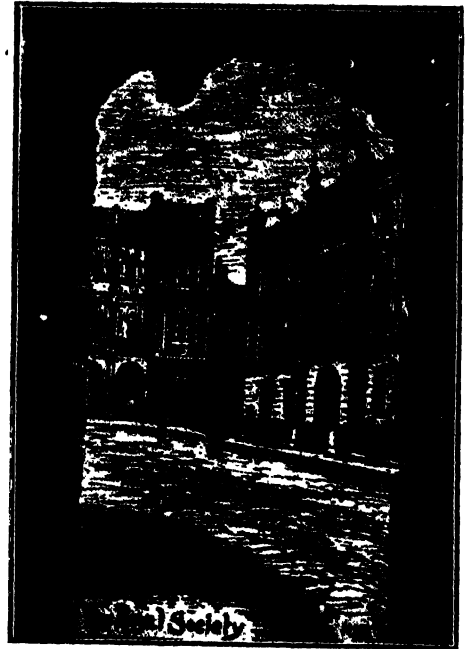
রয়েল সোসাইটী

স্থান অতি উচ্চে। বৃটিশ রাজনীতি-ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট মহাসভার যে স্থান, বিজ্ঞান-জগতেও এই পরিষৎ তদপেক্ষা কম কার্য্যকরী নহে এবং ইহা ইংরাজের এক মহা গৌরবের বস্তু।

১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে কতিপয় গুণবান অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি নব্য বা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (New or Experimental Philosophy) আলোচনা করিবার নিমিত্ত একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি সপ্তাহেই ইঁহাদের বৈঠক বসিত। এই ক্লাব হইতেই রয়েল সোসাইটীর সূত্রপাত বা জন্ম হয়।

জন্ এভিলিন্ (John Evelyn) ছিলেন এই ক্লাবের
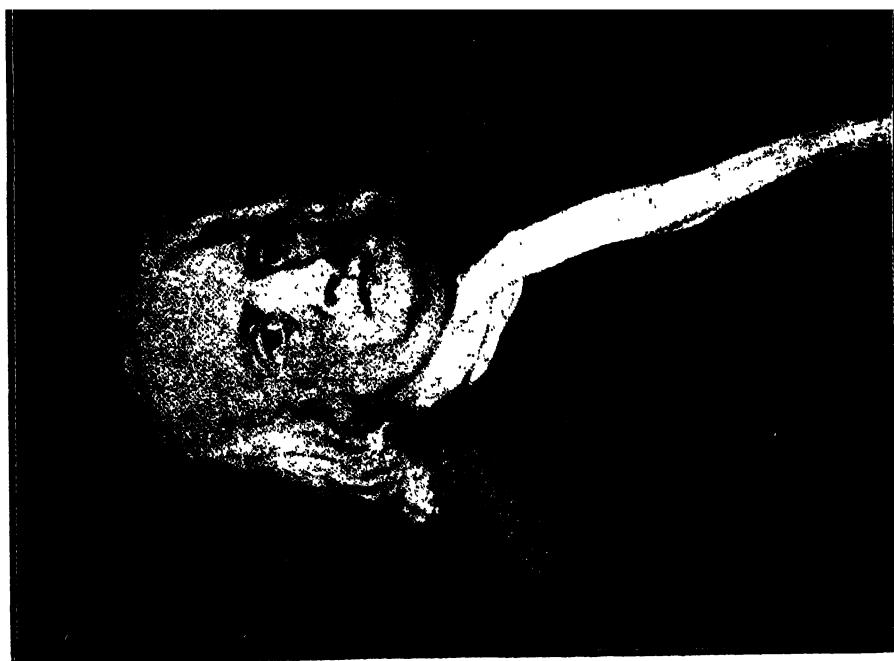
সার আইজাক নিউটন পি·আর-এস

মাইকেল ফ্যারাডে এফ-আর-এস

একজন বিশিষ্ট সভ্য। অসংখ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া তিনি তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের উপর যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে Diary ও Sylva নামক তরু সম্পর্কীয় (arboriculture) গ্রন্থদ্বয়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কল-কারখানা হইতে উত্থিত কয়লার ধূয়াতে লণ্ডন সহরের বায়ু দূষিত হওয়া ও তাহার নিরাকরণের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে Fumifugium নামক অধুনা-বিস্মৃত আর একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকাও তিনি প্রকাশ করেন।

সার টমাস গ্রেসাম

১৬৪৮ হইতে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ক্লাবটি খণ্ডিত-কলেবর হয়। ডাক্তার উইল্‌কিন্স (Dr. Wilkins — ইনি পরে Bishop of Chester হইয়াছিলেন) প্রমুখ কয়েকজন সভ্য অক্সফোর্ডে চলিয়া যাওয়ায় সেখানেও একটি শাখা সমিতি স্থাপিত হয়। প্রথমতঃ এক ঔষধ-বিক্রেতার বিপণিস্থিত ডাক্তার প্রেট্টির (Pretty) আবাসে, পরে ওয়াডহাম (Wadham) কলেজের তদানীন্তন তত্ত্বাবধায়ক (Warden) ডাক্তার উইল্‌কিন্সের কক্ষে এই শাখা-সমিতির বৈঠক বসিত। উইল্‌কিন্স পরবর্ত্তীকালে রয়েল সোসাইটীর সর্ব্বপ্রথম যুগল সম্পাদকের একজন হইয়াছিলেন। যুবকদিগের উপর ইঁহার খুব প্রভাব ছিল। বিজ্ঞানের সেই শৈশবকালেও তিনি জলের নীচে সাবমেরিণ্‌ ও আকাশে এয়ারোপ্লেন চড়িয়া ভ্রমণের কল্পনা করিয়াছিলেন। এই দুইটী সমিতির মধ্যে প্রবন্ধের আদান প্রদান চলিত। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের শাখা-সমিতিটি উঠিয়া যায়।

লণ্ডন সমিতির বৈঠক সাধারণতঃ গ্রেসাম্‌ কলেজে (old Gresham College) বসিত। কিন্তু ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে উহা সৈন্যাবাসে পরিণত হওয়ায় কিছুদিনের জন্য সভার কার্য্য বন্ধ রাখা হয়। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে সভা পুনর্জ্জীবন লাভ করে। এই বৎসরেই ২৮শে নবেম্বরের বৈঠকে "পদার্থ বিদ্যান্তার্গত গণিত শাস্ত্রের পরীক্ষামূলক শিক্ষার প্রসারের (Physico-mathematical Experimental Learning) নিমিত্ত একটি কলেজ স্থাপনার প্রস্তাব গৃহীত হয় ও উপস্থিত ৪১ জন ব্যক্তিকে উহার সভ্য করা হয়। ৫ই ডিসেম্বরের এক সভাতে আরও ৭৩ জন সভ্য সেই প্রস্তাব-পত্রে নাম স্বাক্ষর করেন। তখন প্রতি সপ্তাহে এক শিলিং করিয়া চাঁদা নির্দ্ধারিত হয়। গ্রেসাম্‌ কলেজেই বৈঠক চলিতে লাগিল। ৬ই মার্চ্চ স্যর্‌ রবার্ট মরে (Sir Robert Moray) নামক রাজার উপর বিশেষ প্রভাব-সম্পন্ন প্রিভি কাউন্সিলের একজন সভ্যকে এই নবগঠিত সমিতির সভাপতি পদে বৃত করা হয়। অতঃপর সমিতি অঙ্গীভূত (Incorporation) হইবার অনুমতি চাহিয়া রাজার (Charles II) নিকট আবেদন করেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবরের বৈঠকে সভাপতি স্যর্‌ রবার্ট মরে প্রকাশ করেন যে, তিনি ও স্যর্‌ পল নীল (Sir Paul Neile) সমিতির নামে রাজার হস্ত-চুম্বন করিয়াছেন ও তাঁহাদের আবেদন মঞ্জুর করার অনুগ্রহের জন্য তাঁহাকে সমিতির পক্ষ হইতে ধন্যবাদ করিয়াছেন। তিনি আরও

ফ্রান্সিস বেকন

সার হ্যান্স স্লোয়ান পি-আর-এস
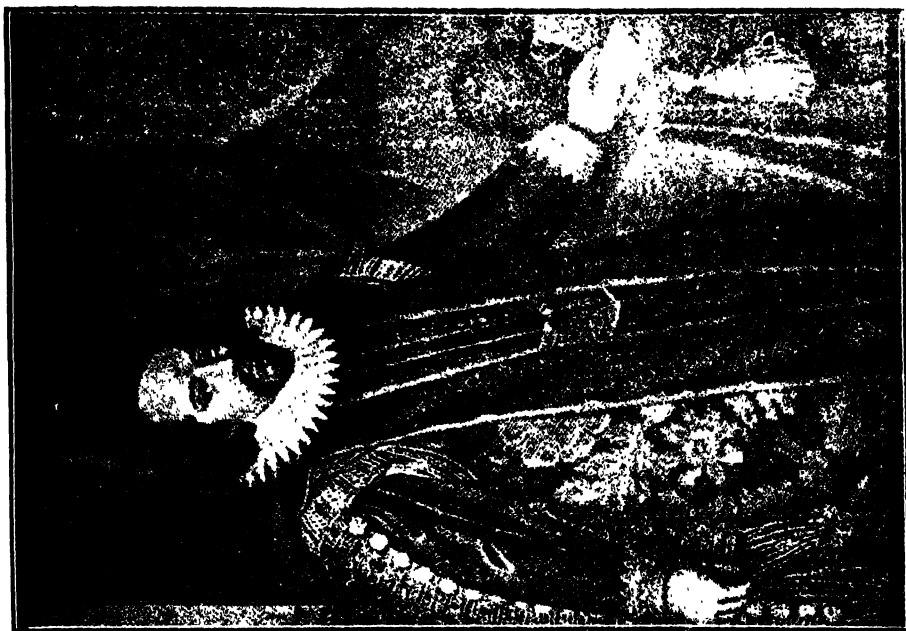
বলিলেন যে, রাজা নিজে সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

১৬৬২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে সমিতির অঙ্গীভূত হইবার সনন্দ-পত্র (Charter of Incorporation) রাজকীয় প্রধান শীল মোহরাঙ্কিত হয় (Passed the Great Seal) সুতরাং এই দিনটিই সমিতির প্রকৃত জন্ম-দিন। ২৯শে আগষ্ট সমিতির প্রথম সভাপতি লর্ড ব্রাউঙ্কার (Lord Brouncker) ও সমস্ত সভ্যগণ রাজাকে ধন্যবাদ করিবার নিমিত্ত White Hall ভবনে গমন করেন।

পর বৎসর ২২শে এপ্রিল সমিতিকে আরও বিশেষ অধিকার প্রদান করিয়া সনন্দ-পত্র দেওয়া হয়। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে Chelsea Collegeএ সমিতিকে ভূমি দান করিয়া তৃতীয় সনন্দ পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় সনন্দানুসারেই সমিতির সংগঠন ও সম্পাদন-ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হয়। আজও সেই পদ্ধতিই চলিয়া আসিতেছে। এই সনন্দানুসারে ২১জন সভ্যকে লইয়া সমিতির একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। তাহার মধ্যে প্রতি বৎসর ৩০শে নবেম্বর (St. Andrews Day) পুরাতন দশজন সভ্যকে পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন দশজন মনোনীত করা হয়। এই সভার সভ্য, সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদকদ্বয় ও নূতন সভ্য মনোনয়ন ব্যাপার মূল সমিতির সাধারণ সদস্যদিগের দ্বারাই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, সমিতির পরিচালন-কার্য্য, আইন কানুন সম্পাদন ও আভ্যন্তরিক নানা প্রকার পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন প্রভৃতি কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সভাপতি ও ২১ জনের সভার উপর (ইহাকে কার্য্যকরী সভা বলা যাইতে পারে) নির্ভর করে। সাধারণ সদস্যদের এ সব বিষয়ে কোনও হাত নাই।

গ্রেসাম কলেজই রয়েল সোসাইটীর স্মৃতিকাগার। ইহা লণ্ডনের Bishop Gate নামক ষ্ট্রীটে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা স্যর টমাস্ গ্রেসামের বাসভবন ছিল। ১৭১০ সাল পর্য্যন্ত এখানেই সমিতির কার্য্য চলিতে থাকে। তবে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্লেগের জন্য ও পরে লণ্ডনের বিরাট অগ্নি-কাণ্ডের জন্য (The Great Fire of London) কিছুদিনের জন্য এখানে সভার বৈঠক বসা স্থগিত থাকে। স্যর টমাস্ গ্রেসাম ছিলেন লণ্ডনের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। ইনি অর্থনৈতিক ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের একজন উপদেষ্টা ছিলেন। ইনিই
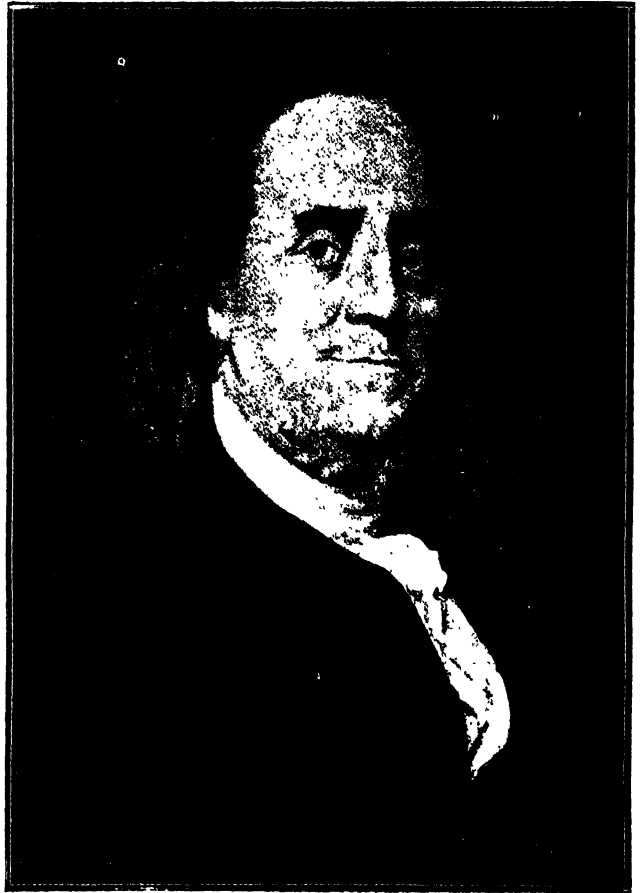
বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এফ-আর-এস

লণ্ডনের রয়েল এক্সচেঞ্জেরও (Royal Exchange) স্থাপয়িতা।

১৭১০ খৃষ্টাব্দে স্যর আইসাক্ নিউটন (Sir Isac Newton সভাপতি থাকা কালীন সমিতি ঋণ করিয়া ফ্লিট্ ষ্ট্রীটে (Fleet street) ক্রেন্ কোর্টে (Crane Court একটি বাড়ী খরিদ করেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমিতির কার্য্য এখানেই চলিতে থাকে। অতঃপর গবর্ণমেণ্ট

অনারেবল রবার্ট বয়েল এফ-আর-এস

ডবলিউ হাইনার কর্তৃক খোদিত একখানি চিত্র হইতে গৃহীত প্রতিলিপি
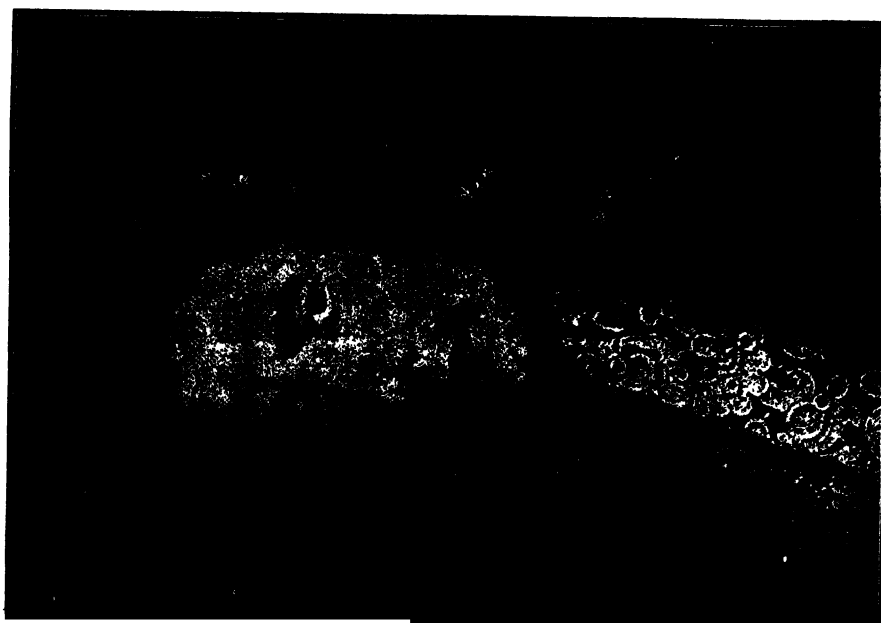
Somerset House-এর কয়েকটি কক্ষ সমিতির জন্য নির্দ্ধারিত করেন। ১৮৫৭ সালে উক্ত কক্ষগুলি রাজ-কার্য্যের জন্য আবশ্যক হওয়ায়, অধুনা Burlington Houseএর যে অংশে Royal Academy of Arts অবস্থিত, সেখানে অস্থায়ীভাবে সভা স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর এই ভবনেরই একাংশে নূতন কক্ষ প্রস্তুত করিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তাহা সমিতির স্থায়ী ভবনরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়।

টমাস ইয়ং এফ-আর-এস
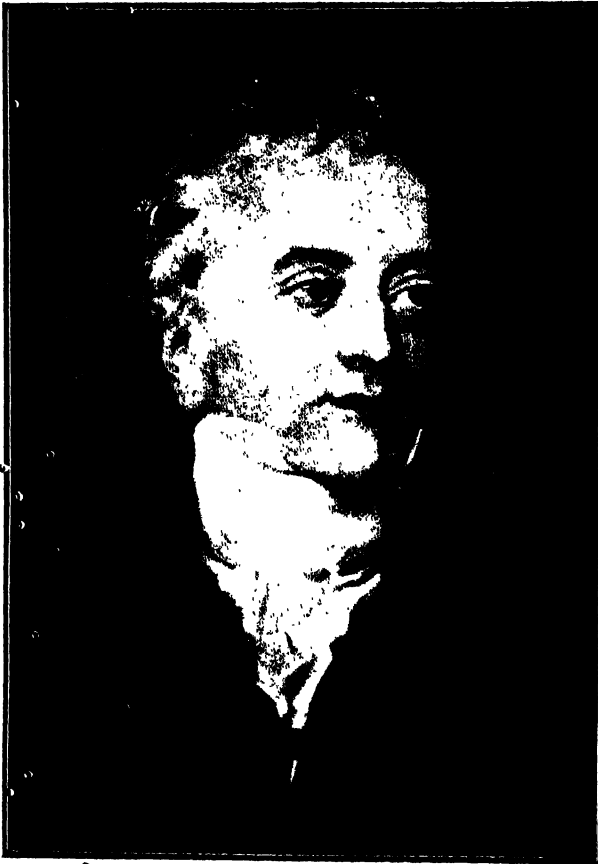
রাজকীয় সনন্দ পত্রের পুস্তিকাটি (The Charter Book) একটি দেখিবার মত জিনিস। ঘোর রক্তবর্ণের মখমলে সোণালী রংএ ইহা সুশোভিত। বহির পাতাগুলি অতি উৎকৃষ্ট vellum কাগজে প্রস্তুত। ইহার পাতায় রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ (Charles II) জেম্স (James), চার্লসের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রিন্স রুপার্ট (Prince Rupert), সমিতির প্রথম সভাপতি লর্ড ব্রাউনকার (Lord Brouncker), হুক্ (Hooke), রবার্ট বয়েল (Robert Boyle), এভিলিন্ (Evelyn), উইল্‌কিন্স (Wilkins) রেন্ (Wren) প্রভৃতি মনীষীদের স্বাক্ষর রহিয়াছে।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেকের সময় ইনি স্বয়ং সমিতির পৃষ্ঠপোষকরূপে এই বহির একটি বিশিষ্ট পৃষ্ঠায় নাম স্বাক্ষর করেন। তাহার নীচে প্রিন্স আলবার্ট (Prince Albert) প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়ম (Frederic William), স্যাক্সনীর রাজা ও ব্রাজিলের সম্রাট ফ্রেডারিক আগাষ্টাস্ (Frederic Augustus) সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড (তৎকালে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স) এবং আলফ্রেড্ ডিউক অব কনট (Alfred Duke of Connaught) প্রভৃতি মহোদয়গণের স্বাক্ষর রহিয়াছে।

স্যার আইজাক নিউটন ১৭০৫ হইতে ১৭২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৪ বৎসর কাল সমিতির সভাপতি ছিলেন। ইনি ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে সমিতিকে তাঁহার স্বহস্ত-নির্ম্মিত একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র (Telescope) প্রদান করেন। যন্ত্রটি ৯ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত, এবং নিউটনের মতে ইহার 'আয়তন বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা' (magnifying power) আটত্রিশ।

এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন সভাপতি স্যর যোশেপ্ ব্যাঙ্কস্ (Sir Josep Banks) স্যর উইলিয়ম হর্শেলের (Sir William Harschel) অনুরোধে ও সভার অনুমত্যানুসারে ঠিক নিউটনের পরিকল্পনানুযায়ী ৪১ ফিট লম্বা ও প্রায় ৪ ইঞ্চি রন্ধ্র (aperture) বিশিষ্ট একটী দূরবীণ প্রস্তুত করাইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা তৃতীয় জর্জ্জের (George III) নিকট একটি পরিকল্পনা (Scheme) উপস্থাপিত করেন। সহৃদয় রাজা তাহা অনুমোদন করেন ও সমস্ত ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হন। তদনুসারে প্রায় ৬০০০০ টাকা ব্যয়ে এই বিরাট যন্ত্রটী প্রস্তুত হইয়া ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে স্লাফ্ (Slough) নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের ৩০এ নবেম্বর সেণ্ট এণ্ড্রুজ দিনে সমিতির প্রথম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হয়। তৎকালে

সমিতির সাধারণ সদস্যগণ St. Andrews Cross of Ribon পরিধান করিতেন, সভাপতি এক বক্তৃতা দিবার সময় ছাড়া তাঁহার টুপি চেয়ারের উপর রাখিতেন ও মার্টিন ফোক্স (Martin Fokes) নামা জনৈক ব্যক্তি-প্রদত্ত সমিতির arms চিহ্নিত প্রকাণ্ড Cornelian ring পরিতেন। কিন্তু অধুনা এই সব প্রথা লুপ্তপ্রায়।

পূর্ব্বে বৈঠক বসিবার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ পরীক্ষা (experiment) প্রদর্শিত হইত; এই জন্য দুইজন লোকও নিযুক্ত করা হইত। রবার্ট হুক্ (Robert Hooke) ই সর্ব্ব প্রথম এই কার্য্যাধ্যক্ষের (Curator) পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে ডেনিস্ পেপিন (Denis Papinকেও দ্বিতীয় কার্য্যাধ্যক্ষের পদ দেওয়া হয়। পেপিন তাঁহার ডাইজেষ্টার (Digester), সেফ্‌টি ভালভ্ (Safety Valve) নামক দুইটী যন্ত্র উদ্ভাবনের জন্যই বিশেষ বিখ্যাত। তিনি আরও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, জল স্বকীয় বাষ্পের চাপে (under the pressure of its own vapour) ফুটিতে থাকিলে উহার স্ফুট-বিন্দুর মাত্রা (boiling point) বাড়িয়া যায়। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথম এঞ্জিন-চালনা কার্য্যে জলীয় বাষ্পকে ব্যবহার করিবার মতলব প্রকাশ করেন। তাঁহার নির্ম্মিত এঞ্জিন পরে নিউ কোমেনের (New Comen) হাতে পড়িয়া কার্য্যকরী এঞ্জিনে পরিণত হয়।

সমিতির কার্য্যক্ষেত্র (Scope) প্রসার লাভ করিলে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে বিশেষ বিশেষ বিভাগের কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত শাখা সমিতিগুলি গঠিত হয়। যথা—

শাখা সমিতির নাম ও সভ্য সংখ্যা

১। যন্ত্র-সম্বন্ধীয় (Mechanical) সভা—
৬৯ জন সভ্যকে লইয়া গঠিত।

২। জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও আলোকবিদ্যা—
১৫ " " " "।

৩। শরীর গঠন তত্ত্ব বিদ্যা (Anatomy)—
সমিতির সমস্ত চিকিৎসক সভ্যদিগকে লইয়া

৪। রাসায়নিক বিদ্যা—
সমিতির সমস্ত চিকিৎসক সভ্য ও অন্য ৭ জনকে লইয়া

৫। কৃষিবিদ্যা (Georgical)—
৩২ জন সভ্যকে লইয়া।

৬। বাণিজ্য বিষয়ক ইতিহাস—
৩৫ " " "।

সার ক্রিষ্টোফার রেন পি-আর-এস

৭। প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে
আবিষ্কৃত লিপিবদ্ধ জ্ঞান সংগ্রহের জন্য
২১ " " "।

৮। সর্ব্বপ্রকার চিঠি পত্র লিখিবার জন্য

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে সমিতির গঠন-সংক্রান্ত কতকগুলি আইনের সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রতি বৎসর ১৫ জন করিয়া নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত করা হইবে। প্রতি দুই বৎসরে একবার করিয়া একুশ জনের সভা, বিজ্ঞান-রাজ্যে

বিশিষ্ট গবেষণা করিয়াছে এমন দুই ব্যক্তিকে নূতন সদস্য মনোনয়নের জন্য সমিতির নিকট সুপারিশ পত্র দাখিল করিতে পারিবেন। বিলাতের রাজবংশের এক জন রাজপুত্রকে (A British Prince of Blood Royal) অবিলম্বে সভ্য শ্রেণী ভুক্ত করা হইবে।

ইংলণ্ডের রাজাই সাধারণতঃ সভার প্রধান পৃষ্ঠপোষক (Patron) হইয়া থাকেন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সমিতির সাধারণ সদস্য মনোনীত হন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোক গমনের পর রাজা হইয়া ইনি সমিতির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ থাকা সময়ে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সমিতির সদস্য হন এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সভায় স্বয়ং উপস্থিত হন। ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী লর্ড স্যালিশ্‌বেরী (Lord Salisbury) (সমিতির সদস্য) যুবরাজকে সকলের নিকট পরিচিত করিয়া দিবার পর আনুসঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হয় ও সভাপতি তাঁহাকে সমিতির পাকা সদস্য পদে বৃত করেন। মাঝে মাঝে বিশিষ্ট বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকদিগকেও সভার সদস্য মনোনীত করা হয়। কিন্তু তাঁহাদের মোট সংখ্যা কোন প্রকারেই পঞ্চাশের অধিক হইতে পারে না। অধুনা সমিতির মোট সদস্য-সংখ্যা ৪৫৪। পূর্ব্বে সভাপতি প্রতিবৎসর নির্ব্বাচিত হইতেন। আইনে (Statutes) একই ব্যক্তির সভাপতি পদে পুনর্নির্ব্বাচনের পক্ষে প্রতিবন্ধক স্বরূপ কোনও বিধান নাই। স্যর যোশেপ্ বাঙ্কস্ (Sir Joseph Banks) ৪১ বৎসর, স্যর আইজাক নিউটন ২৪ বৎসর, স্যার হাঁস্‌স্লোয়ান্ (Sir Hans Sloane ১৪ বৎসর কাল একাদিক্রমে সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এত অধিক কাল একই ব্যক্তির সভাপতিত্ব করা সমিতি অপছন্দ করেন এবং সেই হইতে সভাপতির কার্য্য কাল ৫ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও পুনর্নির্ব্বাচন প্রথা রহিত হইয়াছে।

আশাসোঁটা

১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে রাজার নিকট হইতে সমিতি সভাপতির ব্যবহারের জন্য একটি আশাসোঁটা (Mace) প্রাপ্ত হন। তাহা ধারণ করিবার জন্য সভাপতিকে দুই জন চোপদার (bearer) নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা-পত্রও দেওয়া হইয়াছে। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার ন্যায় রয়েল সোসাইটীতে উক্ত রাজদণ্ডটি টেবিলে স্থাপন না করা পর্য্যন্ত সভার কোনও কার্য্য আইনতঃ আরম্ভ হইতে পারে না।

রয়েল সোসাইটীর সভাপতিগণের তালিকা।

নাম	কত সালে নির্ব্বাচিত	কার্য্যকাল-বৎসর
১ লর্ড ব্রাউঙ্কার (Lord Brouncker)	১৬৬৩	১৪
২ স্যর যোশেফ্ উইলিয়মসন্ (Williamson)	১৬৭৭	৩
৩ স্যর ক্রিষ্টফার রেন্ (Wren)	১৬৮০	২
৪ স্যর জন্ হস্‌কিন্স (Hoskins)	১৬৮২	১
৫ স্যর সিরিল্ উইক্ (Wyche)	১৬৮৩	১
৬ স্যেমুয়েল পেপিস্ (Pepys)	১৬৮৪	২
৭ লর্ড ভগান (Vaughan)	১৬৮৬	৩

৮ টমাস্, আরল্ অব পেমব্রক্ (Earl of Pembroke)	১৬৮৯	১
৯ স্যর রবার্ট সাউদ্‌ওয়েল্ (Southwell)	১৬৯০	৫
১০ চার্লস্ মণ্টেগ্ (Late Earl of-Halifax)	১৬৯৫	৩
১১ লর্ড সমার্স (Somers)	১৬৯৮	৫
১২ স্যর আইজাক্ নিউটন্ (Newton)	১৭০৩	২৪
১৩ স্যর হাঁস স্লোয়ান্ (Hans Sloane)	১৭২৭	১৪
১৪ মার্টিন্ ফোক্‌স্ (Folkes)	১৭৪১	১১
১৫ জর্জ্জ (Earl of Macclesfield)	১৭৫২	১২
১৬ লর্ড এবারডার (Aberdour)	১৭৬৪	৪

প্রাচীন গ্রেসাম কলেজ

১৭ জেম্‌স বারো (Burrow)	১৭৬৮	—
১৮ জেম্‌স ওয়েষ্ট (West)	১৭৬৮	৪
১৯ জেম্‌স বারো	১৭৭২	—
২০ স্যর জন্ প্রিঙ্গল্ (Pringle)	১৭৭২	৬
২১ স্যর যোশেফ্ ব্যাঙ্কস্ (Banks)	১৭৭৮	৪১
২২ উইলিয়ম্ হাইড্ ওলেষ্টন (Wolleston)	১৮২০	—
২৩ স্যর হাম্‌ফ্রে ডেভী (Davy)	১৮২০	৭
২৪ ডেভিস গিলবার্ট (Gilbert)	১৮২৭	৩
২৫ ডিউক্ অব্ সাসেক্স্ (Sussex)	১৮৩০	৮
২৬ মার্কুইস্ অব নর্দাম্পটন্ (Northampton)	১৮৩৮	১০
২৭ আরল্ অব রোসে (Rosse)	১৮৪৮	৬
২৮ লর্ড রোট্‌স্‌লি (Wrottesley)	১৮৫৪	৪
২৯ স্যর বেন্‌জামিন্ ব্রোডি (Brodie)	১৮৫৮	৩
৩০ স্যর এড্‌ওয়ার্ড সেবাইন্ (Sabine)	১৮৬১	১০
৩১ স্যর জর্জ্জ এয়ারি (Airy)	১৮৭১	২
৩২ স্যর যোশেফ্ হুকার (Hooker)	১৮৭৩	৫
৩৩ উইলিয়ম্ স্পটিশ্‌উড্ (Spattis woode)	১৮৭৮	৫
৩৪ টমাস্ হাক্সলি (Huxley)	১৮৮৩	২
৩৫ স্যর জর্জ্জ ষ্টোক্‌স্ (Stokes)	১৮৮৫	৫
৩৬ লর্ড কেল্‌ভিন্ (Kelvin)	১৮৯০	৫
৩৭ লর্ড লিষ্টার (Lister)	১৮৯৫	৫
৩৮ স্যর উইলিয়ম্ হাগিন্স (Huggins)	১৯০০	৫
৩৯ লর্ড র‍্যালে (Rayligh)	১৯০৫	৫

রয়েল সোসাইটী প্রদত্ত পদক-তালিকা

১। কপ্‌লী পদক (The Copley medal)—সমিতির সদস্য স্যর গড্‌ফ্রে কপ্‌লীর (Sir Godfrey Copley) উইল অনুসারে ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতি বৎসর জাতি নির্ব্বিশেষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গবেষণার (research)

ডাঃ ড্যালটন এফ-আর-এস

উইলিয়াম হার্ভে

জন্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। এইটী সমিতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার (premier award)।

২। রামফোর্ড পদক (Rumford medal)—১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে কাউন্ট রামফোর্ড প্রতিষ্ঠিত এই পদকটী প্রতি দুই বৎসর অন্তর তাপ কিংবা আলোক-বিদ্যা (Heat or Light) সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গবেষণার জন্য দেওয়া হইয়া থাকে।

৩। রাজকীয় পদক সমূহ (Royal medals) —রাজা চতুর্থ জর্জ্জ (George IV) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এক বৎসরের অধিক ও দশ বৎসরের কম সময়ের মধ্যে প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর প্রকাশিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুইটী গবেষণার জন্য এই পদক দুইটী প্রতি বৎসর দেওয়া হইয়া থাকে। প্রতিষ্ঠা হইতে এ যাবৎ সদাশয় রাজ পরিবার এই পদকদ্বয়ের ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন।

সভা-গৃহ—বার্লিংটন হাউস

সার আইজাক নিউটনের নির্ম্মিত মুকুরযুক্ত প্রথম দূরবীক্ষণ

৪। ডেভী পদক (Davy medal)—১৮৬৯ সালে স্যর হামফ্রী ডেভীর ভ্রাতা ও সমিতির সদস্য জন্ ডেভী (John Davy) ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। রসায়ন-বিদ্যা সম্বন্ধে য়ুরোপের কিংবা ইঙ্গ-আমেরিকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গবেষককে প্রতি বৎসর এই পদক প্রদত্ত হয়।

৫। ডারউইন্ পদক (Darwin medal)—১৮৯০ সালে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাণী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গবেষণার জন্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর এই পদকটি দেওয়া হয়।

৬। বুকনান্ পদক (Buchanan medal)—এইটিও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতি ও স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-বিশারদকে এই পদক দেওয়া হইয়া থাকে।

স্যর এডজিন সেক্রেটারী, রয়েল সোসাইটি

আচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসু

৭। সিল্‌ভেষ্টার পদক (Sylvester medal)—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সমিতির স্বর্গীয় সদস্য অধ্যাপক সিল্‌ভেষ্টার সাহেবের স্মৃতিরক্ষার্থ এই পদকের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতি তিন বৎসর অন্তর জাতি-নির্ব্বিশেষে গণিত-শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণায় উৎসাহদান কল্পে এই পদক প্রদত্ত হইয়া থাকে।

৮। হিউজেস পদক (Hughes medal)—সমিতির স্বর্গীয় সদস্য হিউজেসের উইল্ অনুসারে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। জাতি ও স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে এই পদক প্রতি বৎসর পদার্থ-বিজ্ঞান বিশেষতঃ তাড়িত ও চুম্বকতত্ত্ব (Electricity and magnetism) বা তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার জন্য এই পদক প্রদত্ত হয়।

দ্বিতীয় চার্লস—প্রতিষ্ঠাতা

রয়েল সোসাইটীর পুস্তকাগার

১৬৬৬—৬৭ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী মিষ্টার হেন্‌রী হাওয়ার্ড (Henry Howard, afterwords Sixth Duke of Norfolk) তাঁহাদের লাইব্রেরীর সমুদায় পুস্তক (Library of the Arundel House) রয়েল সোসাইটীকে দান করেন। ইহা হইতে সমিতির পুস্তকাগারের সূত্রপাত। Arundel Libraryর অনেক পুস্তক হাঙ্গেরীর রাজা মথিয়াস্ কর্ভিনাস্ (Mathius Corvinus) কর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর, নুরেমবার্গের (Nuremburg) বিখ্যাত Bilibald Pirckheimer পুস্তকগুলির মালিক হন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর হাওয়ার্ডের পিতামহ টমাস্ ভিয়েনাতে দৌত্যকালে গ্রন্থগুলি খরিদ করেন। সমিতির সংগ্রহের মধ্যে খাঁটি সাহিত্য সম্বন্ধীয় যে সব দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান্ গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। Caxton এর Chaucer—১ খানি।

২। Liber Sextus Decretolium cum Glossis—১ খানি।

৩। Cicero's Officia et Paradoxa—১ খানি। এই গ্রন্থদ্বয় Fust ও Schœffer কর্ত্তৃক ক্রমান্বয়ে ১৪৬৫ ও ১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। উহারা ভেলাম্ (উৎকৃষ্ট পার্চ্চমেণ্ট) কাগজে ছাপা।

৪। Albrecht Durer's Historia Marioe, Passio Domini, ও Apocalipsis নামক গ্রন্থত্রয় একত্রে বাঁধান (১৫১১ খৃঃ)।

৫। Nuremburg Chronicle—১ খানি।

৬। Euclidis Elementa—১ খানি।

৭। Editione's Principes of the Latin Classics—কয়েক খণ্ড।

মার্টিন লুথারের (Martin Luther) ও Reformation সম্বন্ধীয় অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ।

এতদ্ব্যতীত আরও বহু প্রাচীন গ্রন্থ এই পুস্তকাগারে আছে।

আরাণ্ডেল লাইব্রেরী হইতে প্রাপ্ত অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ৬২৫৯ পাউণ্ড মূল্যে বৃটিশ

চার্টার পুস্তকের অগ্রবর্ত্তী পৃষ্ঠা
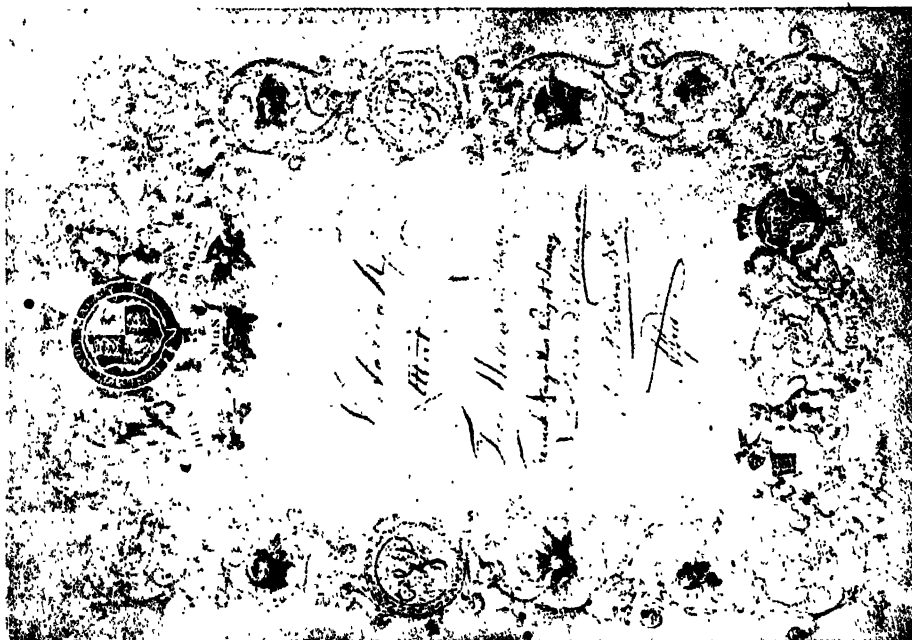
চার্টার পুস্তকের পৃষ্ঠা (১৮৩৮)
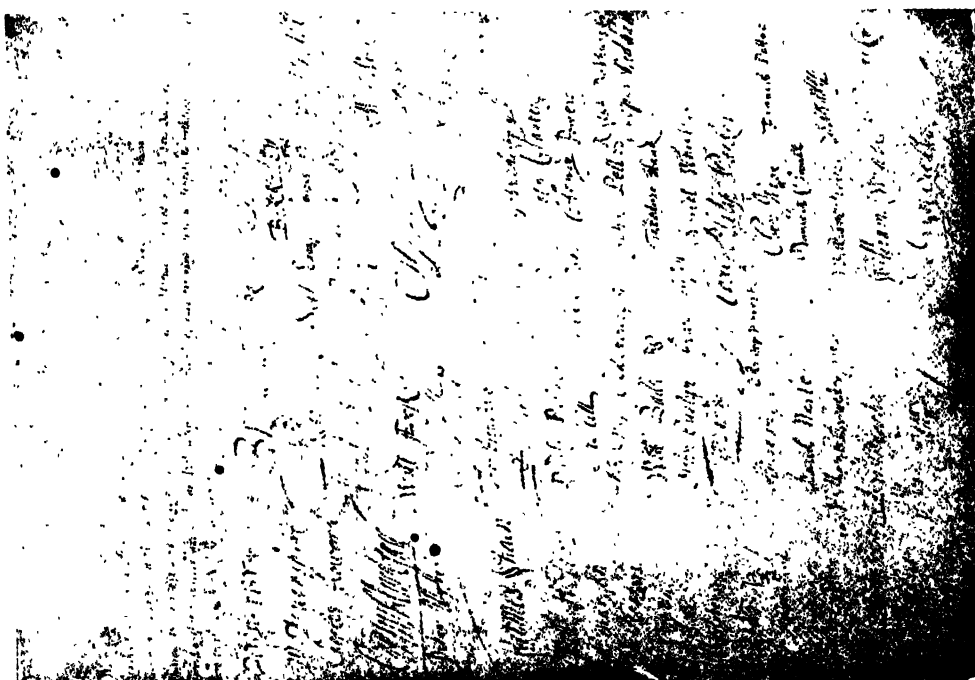
মিউজিয়ামের নিকট বিক্রী করিয়া এই অর্থে অনেক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ খরিদ করা হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০০০ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এই পুস্তকাগারে আছে। প্রতি বৎসর প্রায় ৬০০০ টাকা মূল্যের পুস্তক খরিদ করা হইয়া থাকে।

ছাপান পুস্তক ছাড়া এখানে অনেক চিঠি, দলিলপত্র ও হস্তলিখিত খসড়া আছে। তন্মধ্যে নিউটনের স্বহস্ত লিখিত ও সংশোধিত Principia নামক বিখ্যাত গ্রন্থের খসড়া আছে। ইহা হইতেই উপরিউক্ত গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছিল। Fluxions আবিষ্কারের পূর্ব্ববর্ত্তিতা (priority) লইয়া লাইবিজ ও নিউটনের মধ্যে যে বাদানুবাদ (Libnitz-Newton controversy on the priority of the invention of Fluxions) চলিয়াছিল, সেগুলি সংগৃহীত হইয়া Commercium Epistolicum নামক গ্রন্থরূপে এই পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়াছে। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে John Aubrey লিখিত memories of Naturall Remarques in the county of Wilts নামক গ্রন্থের খসড়া, Leeuwenhock এর লিখিত প্রায় ৩০০ চিঠি, Henry Oldenburg এবং ডাক্তার বিল্ (Beale) কর্ত্তৃক রবার্ট বয়েলকে লিখিত কতকগুলি চিঠি, Malpighiর কতকগুলি চিঠি ও খসড়া, Treatise on Logic নামক গ্রন্থের Wallisএর স্বহস্ত লিখিত খসড়া, যোশেফ প্রিষ্টলীর (Joseph Priestley) লিখিত কতকগুলি চিঠি, আলেখ্য, ও খসড়া সম্বলিত একখানি এলবাম্ প্রভৃতিও বিশেষে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত ৫৩ খণ্ডে বাঁধান রবার্ট বয়েলের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসমূহ, ও সমিতির সূচনা হইতে সকল প্রকারের রেকর্ড, চিঠিপত্র প্রভৃতি সযত্নে রক্ষিত আছে।

রয়েল্ সোসাইটী কর্ত্তৃক সংগৃহীত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞানও যন্ত্রপাতির তালিকা।

প্রধান পুস্তাকাগার বার্লিংটন হাউস

স্যর আইজাক্ নিউটনের তিরোভাবের পর পরম শ্রদ্ধার সহিত রক্ষিত তাঁহার দ্রব্যসামগ্রী :—

১। বাল্যকালে নিউটনের স্বহস্ত-নির্ম্মিত পাথরের সূর্য্য-ঘড়ি (Solar Dial)। Woolsthropeএর যে গৃহে নিউটনের জন্ম হয় সে গৃহের দেয়াল হইতে লইয়া ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে রেভাবেণ্ড টার্ণার এটি সমিতিকে দান করেন।

২। Woolsthropeএ নিউটনের আপেলগাছের কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত ২টী রেখা টানিবার দণ্ড (rule) রেভাঃ টার্ণার প্রদত্ত।

৩। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে নিউটনের স্বহস্ত নির্ম্মিত Original Reflecting télescope—১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে Heath and Wing কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৪। সুবিখ্যাত Principia গ্রন্থের খসড়া—ইহার অনেক ভুল নিউটন স্বহস্তে সংশোধন করিয়াছিলেন এবং ইহা হইতেই বইখানির প্রথম সংস্করণ ছাপা হইয়াছিল।

৫। ১৭২০ খৃষ্টাব্দের ২৭এ জুলাই তারিখ নিউটন

Dr. John Francis Flonquierকে তাঁহার গচ্ছিত অর্থ হইতে নিজের জন্য south sea stock কিনিবার নিমিত্ত স্বহস্তে যে পত্র লিখিয়াছিলেন Wallaston তাহা সমিতিকে দিয়াছেন।

৬। নিউটনের একটি মুখস—হাণ্টার ক্রিষ্টী এটি দিয়াছেন।

৭। নিউটনের ব্যবহৃত পকেট ঘড়ি।

৮। নিউটনের একগুচ্ছ কেশ—হেন্‌রী গার্লিং কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৯। নিউটনের ব্যবহৃত হাত-কেদারা (arm chair) মিষ্টার টমাস কার্সলেক্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রীর তালিকা।

১। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে সমিতিকে রবার্ট বয়েল প্রদত্ত বায়ু নিষ্কাশনী যন্ত্র (Air Pump).

২। স্যর উইলিয়ম পেটির (Petty) নিজের প্রস্তুত Double bottomed boat.

৩। হাইগেন্সের (Huygens) প্রস্তুত Arial Telescope.

৪। হাইগেন্সের একখানি object glass (Focal length 170 ft) নিউটন কর্ত্তৃক সমিতিকে প্রদত্ত।

৫। হাইগেন্সের আর একখানি object glass ও Scarletএর ২খানি Eye glass—গিলবার্ট বার্ণেট্ প্রদত্ত।

৬। ৬০ ফিট Focal lengthযুক্ত ভেনিসিয়ান্ কাচের প্রস্তুত একখানি object glass—ইহা পূর্ব্বে Flamstedএর ছিল। জেমস্ হগসন্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

৭। কাপ্তেন কেটারের (Kater) Convertible Pendulum।

৮। আরনল্ডের chronometer ২টী। Captain Cook এই যন্ত্র দুইটী তাঁহার ২য় ও ৩য় সমুদ্র যাত্রাকালে সঙ্গে লইয়াছিলেন।

৯। একটি চুম্বক প্রস্তর (Armed load stone)

১০। ডাক্তার ওলেস্‌টন্ (Wollaston) কর্ত্তৃক প্রস্তুত একটি Galvanic Battery— ফ্রান্কস্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

ডাক্তার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটাপ্পা রমণ

১১। প্রিষ্টলীর বৈদ্যুতিক যন্ত্র (Electrical machine)

১২। ডেভীর রক্ষণ বর্ত্তিকার (safety lamp) আসল্ মডেল্।

১৩। চার্লস ডারুইন কর্ত্তৃক সমুদ্রপথে পৃথিবী পরিভ্রমণকালে ব্যবহৃত বায়ুমান যন্ত্র (mountain Barometer)

গরমিল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

প্রথম অংশ

৩

লীলা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবামাত্র, কমলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দু'জনে মান-ভঞ্জনের পালা গাইতেছিলে বুঝি? তা আমার সঙ্গে আবার কি দরকারটা শুনি?"

"যদি কাউকে না বল তো তোমায় বলি।"

"সে রকম কথা আমি শুনতেও চাই না।"

"কেন কমলা, একটা মনের কথা তোমার কাছে খুলে বলতে চাই, তা তুমি শুনবে না?"

"কারুর মনের কথা শোনবার আমার মোটেই ফুরসুৎ নেই।"

"কেন, আগে তো খুব শুনতে। সেই ছোটবেলায় যখন তুমি আমি দুটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে—গাঁয়ের পাঠশালায় এক সঙ্গে পড়তে যেতুম, রায়েদের পুকুরে সাঁতার কাটতুম, ঘোষালদের বাগান থেকে আঁম পেড়ে আনতুম, তেলিদের পোড়ো গোয়াল-ঘরটায় ছুটীর দিন সারা দুপুর বেলাটা দু'জনে খেলা করে কাটিয়ে দিতুম—তার পর সেই যে আমাদের গ্রামে যখন কি একটা মহামারী এসে আমাদের দুজনকে একেবারে পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ করে দিয়ে গেল,—সেদিনও তো তুমি আমি বিশেষ তফাৎ হ'তে পারি নি! বুড়ো দয়াল ঠাকুর এক সঙ্গেই তোমার আমার হাত ধরে নিয়ে এসে যেদিন ভঞ্জদের বাড়ী রেখে গেল, তুমি সেদিন তোমাদের কুঁড়ে ঘরখানার জন্যে হাপুস নয়নে কত কেঁদে-ছিলে—আমি কিন্তু কাঁদতে কাঁদতেও তোমাকে কত ভুলিয়েছিলুম তা মনে আছে?—তার পর দেখতে দেখতে কত দিন কেটে গেল। আমি বড় হোয়ে কোলকাতায় যেদিন পড়তে এলুম, তুমি স্নেহময়ী বোনটীর মতো চক্ষের জল মুছতে মুছতে আমার সব গুছিয়ে দিয়েছিলে। তার পর সে এক পুজোর ছুটীতে শশাঙ্ক এলো আমাদের দেশটা দেখ্‌তে,—দেশ দেখ্‌তে এসে তোমাকেও সে দেখে গেল, কিন্তু আর ভুলতে পারলে না।"

কমলা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল "আর থাক্ কথক ঠাকুর,—তোমাকে আর সে সত্যযুগের কুলুচি আওড়াতে হবে না। হঠাৎ আজ ও-সব পুরোনো কাসুন্দী ঘাঁটতে বসেছ কেন শুনি।"

"আজ আমার দুর্দ্দিনে একটা দুঃখের কথা বলতে চাই-লুম বড় মুখ করে তোমার কাছে—আর তুমি কি না স্বচ্ছন্দে বললে, তোমার শোনবার সময় নেই! অথচ এই তুমিই ছিলে সেদিনও পর্য্যন্ত এই অনাথ অনাত্মীয়ের একমাত্র আপনার জন! তখন তো আমার কোন কথা শোনবার তোমার অবসরের অভাব হোতো না কমলা! লীলাকে আর আমাকে ঠকিয়ে আমাদের সব মনের কথাগুলি তো সেদিনও পর্য্যন্ত একটি একটি ক'রে টেনে বার ক'রে নিয়ে উপভোগ করছো? এখন আবার আমাদের ওপোর এমন বিরূপ হচ্ছ কেন কমলা!" বলিতে বলিতে নরেশ দুই হাত বাড়াইয়া ব্যগ্র ভাবে কমলার হাত দু'খানি ধরিল। কমলা হাসিতে হাসিতে সন্তর্পণে হাত দু'খানি ছাড়াইয়া লইয়া বলিল "চিরদিন কি সবার সমান যায় নরেশদা?"

নরেশ যেন একটা আরামের—একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আঃ! আজ কত দিন পরে তোর মুখে এই ছেলেবেলার ডাকটা শুনে আমার ভারি আহ্লাদ হচ্ছে কম্‌লি!"

কমলা চ'খে হাসিতে হাসিতে, মুখে ধমক দিয়া বলিল, "খবরদার! বৌদি বলে ডাকো,—আমি না এখন তোমার গুরুজন?"

নরেশ প্রথমটা থতমত হইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু তার পর কমলার চোখে চোখ পড়িতেই সেও হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "ওহো—তাও তো বটে,—বড় ভুল করে ফেলেছি বৌদি ; মাপ কর ভাই।"

"উহুঁ, একেবারে মাপ হোতেই পারে না,—অন্ততঃ লীলাকে দিয়ে একবার কাণ মলিয়েও দেওয়াবো।"

"তা দিও। আচ্ছা বৌদি, তুমি যে তখন বল্‌লে চিরদিন কারুর সমান যায় না,—তার মানে কি তুমি বলতে চাও যে, তোমার দিন এখন ফিরেছে ?"

"তা জানি নি, হয় ত বা ফিরেছে আমার জন্মাবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের আর একটা চড়া পর্দায়—কিন্তু, সে যা হোক্, তোমার দিন যে ফিরেছে, সে তো আর অস্বীকার কর্‌তে পারো না ?"

"কেন ?—কিসে বুঝ্‌লে ?"

"বাঃ—অমন জলজ্যান্ত প্রমাণ রয়েছে তার ! লীলাকে যে পেয়েছে, তার সময় ফেরে নি—এ কথা কেউ এক-গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্‌লেও আমি বিশ্বাস কোরবো না।"

"কিন্তু লীলাকে যে আমি মোটেই পাই নি ! তোমার যে গোড়াতেই গলদ হচ্ছে !"

"বটে ? তাই না কি ? লীলা আজ তোমার বিবাহিতা পত্নী,—অথচ তুমি তাকে পাও নি কি রকম ?"

"জিজ্ঞাসা ক'রছো কেন কমলা ? তুমি বুদ্ধিমতী—তুমি কি এখনও সেটা বুঝ্‌তে পারো নি ? তোমার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিকে তো কিছুই এড়িয়ে যেতে পারে না।"

"কি জানি ভাই ! আমার ধারণা ছিল যে, তোমাদের দু'টিতে বেশ মাণিকজোড় বেঁধেছে !"

"কেন আমাকে মিথ্যে বোঝাবার চেষ্টা করছো কমলা ? তুমি সব জানো। কেবল মুখে কিছু স্বীকার কর না। আমি আজকাল এটা বেশ লক্ষ্য করিছি—তুমি আমাকে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করো। আর তেমন ক'রে তুমি আমাদের সঙ্গে মেশো না। আগে যেমন আমাদের আলাপের, আমোদের, রহস্যের, কলহের মধ্যে তোমার আসনখানি সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতুম, আজ তা শূন্য হ'য়ে গেছে ! আগে যেমন প্রতিদিন তুমি এসে আমাদের হাসি-অশ্রুর, মান-অভিমানের সমান ভাগ নিয়ে আমাদেরই মধ্যের একজন প্রধান হয়ে থাক্‌তে, আজ তেমনিই সে সব থেকে যথাসাধ্য তফাৎ থাক্‌বার চেষ্টা করো ! কেন কমলা, আমি কি তোমার কাছে কোনও অপরাধ করেছি ? না জেনে তোমার মনে যদি কোনও কষ্ট দিয়ে থাকি,—হাস্য-পরিহাসের ফাঁকে, অজ্ঞাতসারে যদি কোনও দিন তোমার অমর্য্যাদা ক'রে থাকি—আমায় তুমি মাপ্ কর। আমি অকৃতজ্ঞ নই। আমি ভুলিনি যে, তোমার অনুগ্রহেই আমি আমার বড় আকস্মিক ধন লীলার পাণিগ্রহণ করতে পেরিছি। যেদিন শশাঙ্কর মৃত্যু-সংবাদ বজ্রাঘাতের মতো আমার কাছে এসে পৌঁছল—আমি পাগলের মতো ছুটে এসেছিলুম তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তোমার দেশের সেই নির্জ্জন কুঁড়েখানিতে—কিন্তু এসে দেখলুম, তোমার সিংহাসন এখানে অটল হয়ে গেছে ; অত বড় ভূমিকম্পেও তাকে কিছুমাত্র বিচ্যুত করতে পারে নি ! আমি হয় ত সেদিন নিশ্চিন্ত হ'য়ে ফিরে যেতে পারতুম কমলা, কিন্তু লীলার আকর্ষণ আমাকে টেনে ধরে রাখলে। তোমাকে সান্ত্বনা দিতে আসবার অছিলায় রোজ আমি লীলাকেই দেখ্‌তে আসতুম। তোমার বিপদে আমার অসীম সহানুভূতি জেনে, মমতাময়ী সরলা লীলা আমাকে সাহায্য করতে ছুটে আস্‌তো—ভাবতো কতই না আমি তোমার উপকার করছি—"

"অথচ উপকারটা তখন আমিই করছিলুম তোমার—কি বল ?"

"নিশ্চয় ! কিন্তু সে তা কোন দিন সন্দেহও করতে পারে নি—এমনই নির্ম্মল ছিল ওর অন্তরখানি !"

"আজও সে ঠিক তেমনিই আছে নরেশদা।"

"তা জানি কমলা !—কিন্তু এখন যেন আমার মনে হয়, তাকে আরও কিছু দিন সময় দিলে হোতো। বড় তাড়াতাড়ি তার মাথায় পত্নীর গুরুতর কর্ত্তব্যভার চাপিয়ে দিয়েছি আমি। কিন্তু সেটুকু বিলম্ব করবারও উপায় ছিল না আর। এখানে আমার ঘন ঘন আসা যাওয়াতে, পাড়ার নিষ্কর্ম্মা লোকেরা তোমার-আমার নামে একটা কুৎসা রটাবার উদ্যোগ করছে শুনে, আমি আর অপেক্ষা করতে পারিনি। তোমার সম্মান, নিজের সুনাম বাঁচাবার জন্যে আমি ব্যস্ত হ'য়ে লীলাকে গ্রহণ করবার প্রস্তাব করেছিলুম। এমন কি রায় বাহাদুর মুকুন্দ মজুমদারের প্রস্তাবে বর-

জামাই হোয়ে থাকার অপরিসীম লজ্জাটাও অম্লান বদনে স্বীকার করিছি।"

কমলা অন্যমনস্ক ভাবে বলিল "হ্যাঁ, তুমি সকলকে ভারি আশ্চর্য্য করে দিয়েছিলে বটে!"

"আমি নিজেও আমার সেই নির্লজ্জতায় বড় কম আশ্চর্য্য হই নি কমলা! নিজের দুঃসাহসে নিজেই বিস্মিত হ'য়ে গেছলুম! একটা জীবনব্যাপী সুখ দুঃখের ঘটনায় আমি এমন মরিয়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়িছিলুম যে, আজও সেদিনের কথা মনে ক'রে আমি শিউরে উঠি!"

"মরিয়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে কি রকম?—লীলাকে তো সেই প্রথম দিন থেকেই তুমি আপনার করতে চেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ চেয়েছিলুম সমস্ত অন্তরের মধ্যে জীবনব্যাপী করে—চেয়েছিলুম আমার সমস্ত কাজে অকাজে—চিন্তায় জাগরণে—কিন্তু লীলা আমাকে তেমন ক'রে ধরা দেবার আগেই আমি তাকে গ্রহণ করে নিজেই আজ পিঞ্জরাবদ্ধ হয়েছি কমলা।"

"তার মানে?"

"মানে যে ঠিক কি, তার ব্যাখ্যা বোধ হয় আমার মতো অবস্থায় পড়লে কোনও পণ্ডিতেও করতে পারে না। আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলুম যে লীলা এখনও বালিকা! সদ্য সমাগত যৌবন তার তরুণ তনুখানি ঘিরে সেদিন আনন্দের নৃত্য ক'রে ফিরছিল বটে, কিন্তু তার হৃদয়ের কিশোর অন্তঃপুরে তখনও প্রবেশ করতে পারে নি! তবু আমার আশা ছিল যে, এক দিন আমার প্রেমের যাদু-স্পর্শে ওর অন্তরে-বাহিরে যৌবন সাড়া দিয়ে উঠে, ওকে প্রকৃত তরুণী করে তুলবে—কিন্তু হতাশ হয়েছি কমলা। প্রেমের আকুল আহ্বান বৃথাই তার হৃদয়-দ্বারে বারবার করাঘাত করে নিষ্ফল হয়ে ফিরে এসেছে! সে যেন এক অনন্ত কৌমার-কোরক,—কোন দিনই ফলে ফুলে সার্থক হ'য়ে ফুটে উঠবে না! অন্ততঃ আমি তো হার মেনেছি ভাই। এত চেষ্টা কোরেও পারলুম না তার পাপড়ীর আবরণগুলি একটী একটী ক'রে খুলে দিয়ে এই অনিন্দ্য পদ্মকলিকে বিকশিত শতদলে পরিণত করতে! তুমি যদি একটু চেষ্টা কর কমলা, বোধ হয় নিশ্চয় পারো তার মধ্যে নারীর যথার্থ রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতে! তোমাকে সে বড্ড ভালবাসে। তোমার উপদেশ তার কাছে বেদবাক্য! তার নিভৃত মনের বিজন কোণে এমন কোনও গোপন কথাটি নেই, যা সে তোমার কাণে কাণে নিবেদন করে দেয়নি! তা ছাড়া, তুমি যে বিশেষ করে জানো কমলা—কাকে বলে অপরের জন্যে আত্ম-বলি দেওয়া! আর এও তো শুনলে ভাই, যে, সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে সে ধরা দেবার আগেই, ব্যস্ত হ'য়ে—আমিই তাকে স্বেচ্ছায় বন্দিনী করেছি—যা হয় তো এ জীবনে কোন দিনই পারতুম না—যদি না করুণাময়ী তোমার অযাচিত অজস্র স্নেহধারা আমাকে আশৈশব অভিষিক্ত করে রাখতো। তুমিই যখন দয়া করে এই দুর্লভ রত্নটি এমন কাঙালের হাতে তুলে দিয়েছো, তখন তুমিই আজ ওকে হাত ধ'রে, ওর পিতামাতার মোহপাশ থেকে মুক্ত করে নিয়ে, আমার কুটীরাভিমুখিনী করে দাও—আমার অন্তরাভিমুখিনী করে দাও—আমার প্রেমাভিমুখিনী করে দাও!"

কমলা তাহার দুই আঁখি বিস্ফারিত করিয়া বলিল "আমি!"

নরেশ মিনতি করিয়া বলিল "হ্যাঁ কমলা, তুমি!—দেবে না কি?"

ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কমলা বলিল "উঁহু।"

নরেশ ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন কমলা?"

কমলা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল "না ভাই,—আমি ওসব পারবো না।"

বিস্ময়-বিহ্বল নরেশ কাতর ভাবে বলিতে লাগিল, "পারবে না কমলা? কিন্তু যদি কেউ তা সম্ভব করতে পারে, তো সে কেবল একা তুমিই! কারণ, আমি জানি, তুমি তাকে ভালবাসো নিজের সহোদরার অধিক।"

কমলা অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "দেখো, আমি তাকে মার পেটের বোনের মতোই স্নেহ করি সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে—"

নরেশ তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "তুমিই একমাত্র উপযুক্ত। কেন না, সব রকম মানুষের মনের একেবারে নিভৃত স্থানটিতে পর্য্যন্ত গিয়ে পৌছবার তোমার একটা অসাধারণ শক্তি আছে। আমি লক্ষ্য ক'রে দেখিছি

কমলা, যে, যখনই আমাদের স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে একটা তুমুল তর্ক উঠেছে, আর শেষটা যখন দু'জনে গিয়ে তোমাকেই আমাদের মধ্যস্থ মেনেছি, দু'পক্ষের কি বলবার আছে—আগাগোড়া সব শুনে, তুমি যখনই যে রায়টি দিয়েছো,—প্রতিবারই তোমার সে সিদ্ধান্তটুকু আমার অন্তর স্পর্শ ক'রে যেন অল্প দু'কথায় একেবারে একটা দীর্ঘ পরিচ্ছেদের সমস্ত ইতিহাসটা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে।"

মৃদু মধুর হাস্য করিয়া কমলা বলিল, "তোষামোদীতে তোমার দক্ষতার পরিচয় আমি এর আগেও অনেকবার পেয়েছি নরেশদা! ওকাজটায় তুমি যে বেশ পটু, এ সম্বন্ধে আমি তোমাকে অযাচিত ভাবে একখানা প্রশংসাপত্র লিখে দিতে প্রস্তুত আছি।"

অপ্রতিভ হইয়া নরেশ বলিতে গেল, "তোষামোদ কমলা! একে তুমি তোষামোদ মনে করলে? যে জন্যে আজ আমি কাতর হোয়ে তোমার সাহায্য চাইছি—আমার সেই অনুরোধটাই কি এর বিরুদ্ধে—"

বাধা দিয়া কমলা বলিল, "আর থাক্ বক্তৃতা-বাগীশ মশাই।—আর আপনাকে বচন আওড়াতে হবে না। সেই যে কথায় বলে—

'কর্ম্মে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে
বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে।'

এ বর্ণনাটা দেখছি তোমার সঙ্গে ঠিক হুবহু মিলে যায়। যাই হোক্, তোমায় স্পষ্ট বলাই ভালো—যে, তুমি যা আব্দার ধরেছো, আমার দ্বারা সেটি হওয়া অসম্ভব।"

নরেশ কাতর হইয়া বলিল "দোহাই তোমার—এটুকু ক'রে দিতেই হবে।"

"আমি কিছুতেই তা পারবো না!".

"কেন ভাই, তোমার পক্ষে এটা তো কিছু শক্ত কাজ নয়।"

কমলার মুখখানি হঠাৎ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। সে অনেকক্ষণ মাথাটি নীচু করিয়া কি ভাবিতে লাগিল; তার পর সহসা বিদ্যুৎ-চমকের মতো নরেশের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আমার পক্ষেই এটা সব চেয়ে শক্ত কাজ নরেশদা।" সবিস্ময়ে নরেশ কমলার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কমলা সে দৃষ্টির সম্মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ মুখখানি ফিরাইয়া লইল। নরেশ ধীরে ধীরে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিল "তার কারণটা জিগ্‌গেস করতে পারি কি?"

মুহূর্ত্তের জন্য কমলা কি যেন ভাবিয়া লইল; তার পর নরেশের দিকে ফিরিয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া বলিল, "না! আর জিজ্ঞেস করলেও আমি তা বোলবো না। কারণ—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কমলা থামিয়া গেল। তার পর মাথাটি নীচু করিয়া পায়ের আঙুলে মেঝের উপরের কার্পেটটাতে খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "থাক্—এখন আর তা শুনে তোমার কোনও লাভ নেই।"

উৎকণ্ঠিত হইয়া নরেশ বলিল, "না—না, তোমায় ব'ল্‌তেই হবে। নইলে আমি স্থির হ'তে পার্চ্ছি না।"

কমলা তখন কি যেন বলিবার জন্য আর একবার মুখটি তুলিয়া নরেশের দিকে চাহিল। তাহার ঠোঁট দুখানিও ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু কিছুই সে বলিতে পারিল না। ক্ষণিকের জন্য নরেশের মুখের দিকে শরাহত পক্ষীর মতো করুণ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া, কমলা হঠাৎ সে ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

নরেশ অবাক্ হইয়া স্তম্ভিতের মতো কিছুক্ষণ সেদিকে চাহিয়া রহিল; তার পর নিকটস্থ একখানা চেয়ারে পথ-শ্রান্তের মতো অলস ভাবে বসিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

আত্ম-সমর্পণ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, বি-এ

'আমি যে মেয়েমানুষ!' যতই আমি পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করি না কেন, তবু 'আমি যে মেয়েমানুষ' এই কথাটা যখনি মনের মাঝে ভোবের বেলার আধ-অন্ধকারে কুঁড়ি ফুলের মত অতি ধীরে ফুটে ওঠে, তখনি আমি তার একটুখানি সুবাসে অধীর দুর্ব্বল হয়ে যাই! কেন হয়ে যাই তা জানি না! সুন্দর রচনার মধ্য দিয়ে নারীজাতির স্বাধীনতার দাবী করা যত সহজ, আর ঘরে বসে চোখ বুজিয়ে তার মোহময় উপলব্ধিতে যত আনন্দ,-- ঘরের বাইরে সেই দাবীর মর্য্যাদা বজায় রাখা মোটেই তত সহজ নয়। মাগো, আমাদের এই লজ্জাটা যতই তর্ক-যুক্তি করে তাড়িয়ে দিতে চাই, ততই মুগ্ধ মধুকরের মত সে যেন গা-ময় বস্‌তে চায়; মলয় হাওয়ায় ভেসে আসা চাঁপা ফুলের গন্ধের মত সে যেন আমার দেহখানি পূর্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে—তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই না। বীরদম্ভে দশটা পুরুষের সাম্‌নে যখন গিয়ে দাঁড়াই, কি জানি কেমন করে যেন ধীরে ধীরে বীরত্বটুকু মনের মাঝখানে হারিয়ে যায়! আর যতই সেই হারান ধন যত্ন করে মনের মাঝখানে খুঁজে বেড়াই, ততই কেমন যেন একটা ত্রস্ত ব্যাকুলতা সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। সেটাকে যত সাম্‌লাতে যাই, ততই সেটা মুখে-চোখে প্রকাশ পায়। মাগো মা, এই দুর্ব্বলতা লতার মত আমাদের সরল প্রকৃতির জমিতে গজিয়ে উঠে এম্‌নি ছড়িয়ে পড়েছে, আর তার বিভিন্ন তন্ত দিয়ে কোমল-কঠোর বেষ্টনীতে মনের সকল দিক এম্‌নি করে বেঁধেছে যে, তাকে ছিন্নভিন্ন করে সমূলে বিনাশ করি, এমন অস্ত্র খুঁজে পাচ্ছি না। কি জ্বালাতন! মুখে যতই বলি না কেন যে—স্বাধীনতা চাই, পুরুষের সঙ্গে সব বিষয়ে সমান হতে চাই, সমান অধিকার চাই; কিন্তু মনের মাঝে এই যে প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা, তা আমি নিজে বুঝি; আর আমি যে নিজে বুঝি, তাও প্রকাশ করে কাউকে বল্‌তে পারি না—এম্‌নি মজা! আমি এত প্রবন্ধ লিখিছি,—মেয়েমানুষের সকল রকম দাবী সুন্দর ভাষায় ফুটিয়ে তুলিছি; কিন্তু মনে হয়, সে সব বুঝি পুরুষদের ঠকাবার জন্য,—একটা জিদ্ বজায় রাখ্‌বার জন্য। এটাও যে প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল না তা নয়, যে, পুরুষদের কাছ থেকে আরও বেশী আদর, যত্ন সোহাগ, ভালবাসা প্রভৃতি পাব। পৌরুষের পসরা মাথায় করে ভাল করে পুরুষের হাতে ধরা পড়বার জন্য—ছিঃ ছিঃ তাই বা কেন।

এই রকম নানা চিন্তায় যখন সকাল কাটছিল, ঠিক সেই সময়ে অনেক দিনের পরিচিত এক যুবক সমালোচক লেখিকার ঘরে হঠাৎ এসে উপস্থিত। তাঁর লম্বা মুখখানার কতকটা মানানসই; জ্বল্‌জ্বলে চোখ দুটো চশ্‌মার অলঙ্কারে শোভিত হয়ে যেন নব হর্ষে ও একান্ত আগ্রহে রমণীর দিকে দৃষ্টি হান্‌ছিল। মিনিটখানেক দুজনে নীরব। প্রথমে কে কথা কইবে, এই চিন্তায় সমালোচক অস্থির। লেখিকা তাঁর বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলি মনের কোণে গুছিয়ে রাখ্‌ছিলেন। এক মিনিটের নীরবতা এত কষ্ট-

দায়ক মনে হচ্ছিল যে, সে ভদ্রলোক অস্থির হয়ে সস্মিতমুখে জিজ্ঞাসা কর্লেন—"আমি বাধা দিলুম কি?......" চেষ্টা করে নিজের মনটা হাল্কা করে নিয়ে স্বাভাবিক হাসির একটা কৃত্রিম আভাস মুখে ফুটিয়ে তুলে লেখিকা বল্লেন—'কি—কি বল্লেন—বাধা?" "আপ্নি কিছু লেখ্বার চেষ্টা কচ্ছিলেন হয়ত!"

"নাঃ—মোটেই না। এম্নি বসে রাস্তার লোক গুণ্ছিলুম। কত রকমের লোক···মটরগাড়ী...চলেছে ত চলেছেই...যেমন অনেক আগে যাচ্ছিল এখনো তেম্নি চলেছে...কিন্তু তারি মধ্যে কিছু পরিবর্ত্তন...কিছু বিবর্ত্তন··· দেখ্বার ও ভাব্বার জিনিস..."

"যাক্, বাঁচ্লুম। তা হলে আপনার লেখায় বাধা দিই নি। ভাল কথা, আপনার সেই "চিরকুমারী থাকার আবশ্যকতা" প্রবন্ধটা মাসিকে, সাপ্তাহিকে, দৈনিকে, অর্দ্ধ দৈনিকে হুলুস্থুল লাগিয়ে দিয়েছে...দরকার...যেমন একদল স্বাস্থ্যবান্ চরিত্রবান্ ছেলেদের চিরকুমার থাকা দরকার··· তেম্নি একদল স্বাস্থ্যবতী চরিত্রবতী মেয়েদের চিরকুমার অর্থাৎ চিরকুমারী থাকা বিলক্ষণ···কি বলে···দরকার। আপনার মত সমর্থন করে আমি যে সমালোচনা করেছি, তা আপনি তা দেখেছেন। আজ আমায় জানাতে হবে—আপনার কি মত তৎবিষয়ে। আমার লেখার বাহাদুরী নেই তা আমি বিজ্ঞাত—তবু আপনার মত জান্বার জন্য অন্য সকলেই আমি ছুটে এসিছি।...সারারাত অনিদ্রা হয়নি।"

"আমার সুখ্যাতি আপনি যা করেছেন, তার জন্য আমি আপনার কাছে—"

বাধা দিয়া সমালোচক বল্লেন—"বলেন কি? এমন মৌলিক প্রবন্ধ...লেখনীর উত্তেজনা···ভাবের স্বাধীনতা... ভাষার তেজস্বিতা...কেউ কখনো দেখেছে!"

"কিন্তু..."

"কিন্তু টিন্তু নয়। যার লোচন আছে, সেই সমালোচন করতে পারে। পাঁচজনের কৃপায় সত্যালোচন আমি লেখনী দ্বারা সত্যঘোষণ কর্ত্তে ডরি না। আপনার লেখার মধ্যে একটা সাহসিকতা···এই উচ্ছন্ন সমাজের প্রচ্ছন্ন বন্ধন-বিচ্ছিন্নকারিণী আপনার মঙ্গলময়ী প্রচেষ্টা......অবর্ণনীয়। তার ভাষা···আহা-হা···প্রাম্-কেকে মাঝে মাঝে মোলাম কিচ্মিচের মত এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত সংস্কৃত শ্লোক আপনার রচনাকে সুস্বাদু করেছে। এমন লেখা কত যুগ পরে···অদ্ভুত ..অত্যদ্ভুত!···"

"আমার মাথা আর ঘুরিয়ে দেবেন না। লিখতে পারি এতেই আমার গর্ব্ব; তার ওপর যদি ছাপিয়ে প্রশংসা প্রচার করেন, তা হলে আমার আর রক্ষা থাক্‌বে না। আমি ক্ষেপে যাব...দোহাই আমায় বাঁচান।"

"গীতা, উপনৈষধ, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতি তিরেনব্বই শাস্ত্র মায় চণ্ডীদাস পর্য্যন্ত যাঁর কণ্ঠাগত···তাঁর আজ আবার এ কি পরিবর্ত্তন! এ ভাব—আপনার কিছু হয়েছে কি? মাপ কর্ব্বেন···আমি বুঝ্তে পাচ্ছি না।"

"বুঝ্তে পাচ্চেন না। আসলটা যদি বুঝ্তেন, তা হলে আমার সঙ্গে আপনার ভাব আছে বলে এত প্রশংসা আপনি আমার নামে বিনা পয়সায় ছাপাতেন না।"

"বলেন কি? এ কি শুনি! আম্‌রা···অন্ততঃ আমি .. আপনার মুখ চেয়ে আজ সাহিত্য-গগনে সমালোচক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়িছি। আপনি যদি এই মাঝখানে আমাদের ছেড়ে দেন, তাহলে একেবারে ভরাডুবি।"

"তাহলে লাফিয়েছেন 'গগনে' নয় 'সাগরে'।"

"আপনিই ত বলেছেন সাহসিকতা না হলে বলায় বা লেখায় স্বচ্ছন্দতা আসে না। তাই আমি যখন বলি, তখন ভাবি না; আর যখন ভাবি, তখন বলি না। এর মধ্যে একটা বড় সত্য...আপনার আজ কথা শুনে আমরা...অর্থাৎ আমি···একেবারে হতাশ হয়ে গেছি। আপনার কথা শুনে আর লেখা দেখে..."

"আমার লেখা যা দেখেছেন তা আমার কথা নয়।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ আমি যা লিখিছি, তা সুধু লিখিছি। আমার প্রাণের কথা আপনারা শুনেন নি। এই গুছিয়ে দুটো লিখ্‌তে পারার এত চাতুরী সভ্যতার নাম নিয়ে একে ছুরী মেরে যাচ্ছে যে তার ইয়ত্তা নেই। বিনিয়ে দুটো কথা বল্‌তে শেখাতে মনের ভাব লুকানো আজ বড় সোজা হয়ে উঠেছে। আমাদের শিক্ষায় হয়েছে এইটুকু লাভ। ভগবান মানুষকে কথা দিয়েছিলেন মনের ভাব গোপন কর্ব্বার জন্য—এই কথাটাই সভ্যতার ইতিহাসে বর্ত্তমান যুগে সব চেয়ে বড় সত্য। আমার লেখার

চাক্‌চিক্যে ও ভাবের মদিরতায় আপনারা মাতাল হয়েছেন, মুগ্ধ হয়েছেন; কিন্তু এর ভিতর যে তরল কারে একটু গরল মেশান আছে, সেটা আস্বাদনের মিষ্টত্বে আপনারা ধর্‌তে পাচ্ছেন না। কিন্তু যতই পান কর্ব্বেন, প্রচ্ছন্ন বিষের ক্রিয়া ততই শরীরে প্রকাশ পাবে। তখন সে অনেক পরে, জীবনের অপরাহ্নে, আসলটা কতকটা ধর্‌তে পার্ব্বেন। আপনার সমালোচনা ঠিক সেই রকমের।...'

"তা আপনি যতই বলুন। আপনার ও সব মহত্ব। তবে আমায় যা উপদেশ দেবেন, তা আমি মাথায় তুলে নিতে রাজী। আমার মনীষা...আমার বোদ্ধা-শক্তি কম হলেও যোদ্ধা-শক্তি আপনার চেয়েও বেশী। কাজেই আমি যে একেবারে বুঝি না তা নয়। তবে হ্যাঁ যখন আপনার কথা তখন সাগ্রহে...

"বুঝ্‌তে পার্লেন না।"

"হ্যাঁ...আপনার প্রাণের কথাটা কি?"

"যা লিখি, ঠিক তার উল্‌টো। অর্থাৎ 'আত্ম-সমর্পণ'।"

"রমণীর আত্মসমর্পণকে না আপনি 'আত্মবলি' বলে ঘৃণা করেছেন! আজ আবার—"

"আবার তাকেই আজ বলি আত্ম-সমর্পণ। কথার ভেল্‌কীতে মানুষের চোখে ধাঁধাঁ দেওয়া যায়; কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি কর্ত্তে গেলে, মনে এমন একটা জিনিস আছে, যার কাছে ধরা পড়্‌তে হয়..মরণ যেমন মেয়েমানুষের অবশ্যম্ভাবী, বিবাহও সেই রকম, অবশ্যম্ভাবী। তর্কযুক্তি সব ভণ্ডামী। প্রাণের কথা যদি কেউ বলে, ত সে এই কথাই বল্‌বে।"

শেষ চেষ্টা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

মেসার্স হ্যামিল্টন এণ্ড কোং'র সৌজন্যে

পিয়ারী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

বাড়ী ফিরিয়া পাপিয়া ভাবিতে বসিল...ঠিক, এই বেশ হইবে! কি বলিয়া সে কোন্ মুখে অমলের গৃহে আবার গিয়া হাজির হইবে, কয়দিন ধরিয়া ভাবিয়া এর কোন উপায়ও সে বাহির করিতে পারে নাই! আর আজ! এ বেশ হইয়াছে!...

রাত্রে মানগোবিন্দ আসিলে পাপিয়া কহিল,—আমার শরীরটা বড় খারাপ, একলা থাকতে চাই। তুমি এক কাজ কর দিকি, আসচে শনিবার ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে সীতার বনবাস প্লে হবে। চপলা দিদি এক রাত্রের জন্ত শুধু সীতা সাজচে। তুমি একটা বক্স নিয়ে রাখো...

মানগোবিন্দ কৌচে বসিয়াছিল; উঠিবার কোন উদ্যোগ করিল না। পাপিয়া তার পানে চহিল, চাহিয়া বলিল—বসলে যে! যাও এখনি—নৈলে বক্স পাবে না এর পর গেলে।

মানগোবিন্দ পাপিয়ার পানে হতাশ দৃষ্টিতে একবার চাহিল, তারপর উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

মানগোবিন্দ চলিয়া গেলে, পাপিয়া একতলায় সারদার ঘরের সামনে গিয়া ডাকিল,—সারদা দিদি—

—কে, পাপিয়া?—বলিয়া সারদা বাহিরে আসিল।

পাপিয়া কহিল,—তোমার নেমন্তন্ন রইল ভাই শনিবারে—আমার সঙ্গে থিয়েটারে যাবে। মোদ্দা এক কাজ করতে হবে। তোমার ভাইকে একবার থিয়েটারে পাঠাও এখনি। আমি পাঁচটা টাকা দিচ্ছি—পাঁচ টাকার একটা সীট্ রিজার্ভ করে টিকিট কিনে আনবে। ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে, বুঝলে? আসচে শনিবারের জন্যে!..আমার এখনি টিকিট চাই কিন্তু!...বলিয়া সারদার হাতে পাঁচটা টাকা দিয়া পাপিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল; আসিয়া এস্রাজটা পাড়িয়া গান ধরিল—

তেরি লিয়ে রোয়ে, রোয়ে...
তু ন আওয়ে,...পিয়ারে!

গাহিতে গাহিতে চকিতে সুরের মধ্যে ডুবিয়া সে একেবারে উধাও হইয়া গেল, কোন্ সুদূর কল্পলোকে! সেখানে অপ্সরীরা প্রমোদ-কুঞ্জ সাজাইয়া রাখিয়াছে—ফুলের মালায়, আলোর ফানুষে এক বিচিত্র মায়াপুরী...অপ্সরীরা করুণ চোখে চাহিয়া আছে—আর ঐ ফুল-দলে রচা শয্যা, তার উপর মলিন মুখে ম্লান চোখে পড়িয়া আছে, কে ও বিরহিণী? পিঠের উপর কালো কেশের রাশি তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত পড়িয়া,...যুগ-যুগ ধরিয়া প্রিয়ের বিরহ-দুঃখ সহিয়া প্রাণ যেন তার আর বাঁচে না! অপ্সরীরা তাকে পদ্ম-পত্রে বীজন করিতেছে...ছিন্ন-লতিকার মত বিরহিণী মৃণাল-শয়নে পড়িয়া আছে!...কে, ও...? পাপিয়া শিহরিয়া উঠিল। ও যে চপলা!...সেই থিয়েটারের কাগজে ছাপা ছবির মূর্ত্তি!...

পাপিয়া চমকিয়া গান থামাইল। এস্রাজ রাখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল—দুই চোখে তার জলের ধারা, বুক যেন কে সবলে চাপিয়া ধরিয়াছে! পাপিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া একেবারে বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।...আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়া নীরব নত নেত্রে পৃথিবীর পানে চাহিয়া আছে। চোখে তাদের কি ও করুণা আর সমবেদনা!

পাপিয়ার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, তার হাতে-পায়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে কেবলি নাগপাশের বন্ধন! সে-বাঁধন আঁটিয়া চাপিয়া তাকে যেন পিষিয়া মারিবে!...কি করিলে, কোথায় গেলে এ বন্ধন হইতে মুক্তি মেলে!...মুক্তি, ওগো মুক্তি! মুক্তির পিপাসায় প্রাণ তার আর্ত্ত আকুল হইয়া উঠিল। পাপিয়া বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আকাশে মেঘের ছুটোছুটি, পথে লোকজনের ভিড়, সামনের বাড়ীর একতলার ঘরে নবীন স্যাকরার হাতুড়ির পট্‌পট্ আওয়াজ, আর ঐ পাণের দোকানের পাশে রোয়াকে বসিয়া ঝণ্টুর মা ফুলুরি ভাজিতেছে—এ-সব সমানে চলিয়াছে—কোন দিকে কোথাও যে কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, কারো কোনো বাঁধনে টান্ পড়িতেছে—সে-সব দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া!

"ঐ বুঝি বাঁশী বাজে—
বন মাঝে কি মন মাঝে"

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রণদাচরণ উকিল

Bharatvarsha Halftone & Printing Works,

সারদার ভাই বৃন্দাবন আসিয়া কহিল,—টিকিট এনেছি।

পাপিয়া ফিরিয়া চাহিল।

বৃন্দাবন আবার কহিল,—সীতার বনবাসের টিকিট।

পাপিয়া বলিল—ও, এনেচো, দাও...টিকিটটা সে হাতে লইল; লইয়া বলিল,—দাঁড়াও একটু। বলিয়া পাপিয়া ঘরে গেল ও পরমুহূর্ত্তেই একটা টাকা আনিয়া বৃন্দাবনের হাতে দিয়া কহিল,—জল খেয়ো।

বৃন্দাবন খুসী-মনে টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

পাপিয়া টিকিট হাতে লইয়া ঘরে আসিয়া একটা কৌচে বসিয়া পড়িল। এ টিকিট তার ইষ্ট-কবচ! এই কবচ বুকে আঁটিয়া আর একবার অমলের চিত্ত-গৃহের দ্বারে সে দাঁড়াইবে গিয়া—এবার যদি একটু প্রসন্ন-দৃষ্টি তার ভাগ্যে লাভ হয়!...আশার কল্পনায় পাপিয়ার মন নাচিয়া উঠিল। কিন্তু এত রাত্রে···? তার চেয়ে কাল দিনের বেলায়!

মন তখনি বলিয়া উঠিল, না, না! এই স্তব্ধ রাত্রি, সেই বিজন ঘর...কোলাহলের তীব্রতা যখন কোথাও এতটুকু নাই...এই ঠিক সময়···! পাপিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া আয়নার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। এ বেশে···? হাঁ, এই ভালো! নির্লজ্জের মত সাজিয়া গিয়া উপেক্ষার বাণে জর্জ্জরিত হইয়া ফেরা...সে ভারী অসহ্য ঠেকে!

একটা সিল্কের চাদর গায়ে জড়াইয়া পাপিয়া হাঁকিল,—বিষ্টু...

বিষ্টু ভৃত্য আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। পাপিয়া বলিল—একটা ট্যাক্সি ডেকে দে, শীগ্‌গির!

ভৃত্য চলিয়া গেল। পাপিয়া আলমারি খুলিয়া সিল্কের একটা ছোট থলি বাহির করিয়া সেটা টাকায় ভর্ত্তি করিয়া লইল—তারপর আলমারি বন্ধ করিয়া বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বিষ্টু তখনই ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিল। পাপিয়া বিদ্যুতের মত নীচে নামিয়া আসিল এবং ট্যাক্সিতে উঠিয়া ভৃত্যকে বলিল,—আমি একটু বেড়াতে যাচ্ছি। রাত্রেই ফিরতে পারি, নয় তো কাল সকালে ফিরবো।—বাবু এলে বলিস্, বুঝলি? আর ঘর খোলা রইলো, বন্ধ করিস্।

ভৃত্য মাথা নাড়িল। পাপিয়া ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বলিল,—যাও, কাশীপুর—

ট্যাক্সি আসিয়া কাশীপুরে বাগানের সামনে দাঁড়াইল। পাপিয়া ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া মালীকে ডাকিল, বলিল,—সজাগ থাকিস্ রে। আমি রাত্রে এখানে আসতে পারি···বলিয়াই সে অমলের গৃহের দিকে চলিল।

মাথার উপর আকাশে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছিল। হাওয়াও বেশ বহিতেছিল। চারিদিকে যেন হাসির পাথার উথলিয়া উঠিয়াছে! পাপিয়া আসিয়া অমলের ঘরের দ্বারে করাঘাত করিল। অমল দ্বার খুলিয়া পাপিয়াকে দেখিয়া কহিল—তুমি...! আবার এসেছ যে?

পাপিয়া কহিল,—আজ আমি বসন্তের দূত! সু-খপর এনেচি...

অমল তার মুখের দিকে চাহিল। পাপিয়া কহিল,—দূতকে আগে ভিতরেই যেতে দাও...ধুলো পায়েই এখান থেকে বিদায় করো না। আজ আমি আমার নিজের কোন দুঃখ বা মিনতি জানাতে আসিনি...

অমল দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল, পাপিয়া গিয়া ভিতরে ঢুকিল।

সেই ঘর...জীর্ণ, মলিন...তবু কি সুখ, কি শান্তিতেই না ভরিয়া আছে!···

পাপিয়া চারিধারে চাহিল, কহিল—কৈ, খাতা কৈ? তোমার সেই কবিতার খাতা?

অমল কহিল,—খাতা কি হবে?

পাপিয়া কহিল,—আবার নতুন কিছু লিখলে কি না, দেখি না...আমি যে তোমার কবিতা পড়তেই এলুম!

অমল কহিল,—কেন তুমি আমার এ দুর্ব্বলতাকে বার-বার এমন বিদ্রূপের বাণে জর্জ্জরিত কর! এতে কি সুখ পাও তুমি!...

পাপিয়া অমলের পানে চাহিল,...অমলের চোখে বেদনার কাতরতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাপিয়া বলিল,—বিদ্রূপ নয় এ। সত্যি বলছি, আমার ভারী ভালো লাগে তোমার কবিতা পড়তে···

অমল কহিল,—না, সে তোমার দেখার জন্য নয়!

পাপিয়া বলিল,—তবে দেখিয়েছিলে কেন?...সেই কবিতা দেখিয়েই তো আমার এ দশা করেছ আজ...পথের কুকুরের অধম!...যে তাড়িয়ে দিলেও বার-বার ফিরে আসি!

অমল কহিল—আমি করেচি!...মিথ্যা কথা! তোমার লজ্জা নেই,—তাই তুমি আমার মত কাঙালের পিছনে কেঁদে ফিরছো।...তুমি কত উঁচুতে, আর আমি পৃথিবীর ধুলোর চেয়েও হীন,...এ যে মস্ত বড় পরিহাস! অমলের স্বর স্থির, গম্ভীর।

পাপিয়া কহিল,—কিন্তু ঐ ধুলোর মাঝে কি রত্নই আছে...তা তুমি নিজে ধুলো হয়েও জানো না! আর তোমার ঐ চপলাসুন্দরী, সেও তার কোন খোঁজ রাখে না, রাখতে চায়ও না...আশ্চর্য্য!

অমল কহিল,—তুমি জহুরী, একদিনে সে রত্নের সন্ধান পেয়েছ, না?—অমলের স্বরে হাসির ঝিলিক মৃদু বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল।

পাপিয়া কহিল,—বাজে তর্ক নয়। তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনা আমি, সেজন্যে আসিও নি। ক'দিন ঢের তর্ক হয়েছে। তাতে আমার অঙ্গে কাঁটার চাবুক পড়েচে যেন—আর সে কাটা ঘায়ে রক্ত খুঁজিয়ে তুলো না গো, দোহাই, তোমার পায়ে পড়ি। একদণ্ড স্থির হয়ে শোনো, যা বলতে এসেচি...পাপিয়ার স্বর অশ্রুর বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

অমল বলিল,—বেশ...কি বলতে চাও, বল। কোন তর্ক করবো না আর।

পাপিয়া বলিল,—কবিতা দেখতে পাবো না তাহলে?...কবিতার সম্বন্ধে কোনো কথা কব না, শুধু পড়বো...পড়বো শুধু...পাপিয়ার স্বর বাধিয়া গেল।

অমল আর আপত্তি না করিয়া কবিতার খাতা লইয়া পাপিয়ার হাতে দিল। পাপিয়া পাতা উল্টাইয়া পড়িতে লাগিল। এই যে,...দুটো, তিনটে,...না, চারটে নূতন কবিতা লেখা হইয়াছে! এ কি...

কঠিন ধরা...কঠিন চারিধার,
তোমার পূজায় মগ্ন আমার মন,—
বিঘ্ন সেথা, তাতেও জ্বালাতন!
এটুকুতে নাইকো অধিকার!

এ কবিতার মানে? পাপিয়া আবার পড়িতে লাগিল। আর এক জায়গায় লেখা রহিয়াছে,—

দূর হয়ে যা, সর্ব্বনাশী,
কুহকিনী ওরে,—
রূপের গরব এতই কিসে...
কণ্ঠ তোর ও ভরা বিষে!
লোভ দেখিয়ে ভোলাবি হায়,—
ভোলাবি তুই মোরে!
পারবিনে তা, পারবিনে তুই,
যে-বেশে সাধ হয়—
সেই বেশে তুই আয় না সেজে,'
মান্‌বি পরাজয়!

পাপিয়ার দুই চোখ ক্ষোভে যাতনায় একেবারে মলিন নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সে অমলের পানে চাহিয়া বলিল,—আমায় উদ্দেশ করে লিখেছ!...এত বড় কঠিন কথা লিখতে তোমার মায়া হলো না? একটু দয়া...? আমি যে জ্বালা পাচ্চি, সেই কি যথেষ্ট নয়? তার উপরে আরো...এমন নিষ্ঠুর অবিচার!

পাপিয়ার দুই চোখ জলে ভাসিয়া গেল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—যাক্, আমি তোমার ধ্যানভঙ্গ করতে আসিনি...সত্যি বলচি! মোহিনী সেজে তোমায় ভোলাতেও আসিনি। আমি এসেছিলুম শুধু তোমার পায়ে আমার প্রাণের ব্যাকুল নিবেদন জানাতে... তোমায় ভোলাতে আসিনি...এত বড় শক্তি কি স্পর্দ্ধা আমার নেইও! আর সত্যিই আমি এমন সর্ব্বনাশী কুহকিনী নই!...তোমায় অত করে বলেছিলুম,—একটি কবিতা লিখো, আমার সে-রাত্রের কথা নিয়ে...তা এ বেশ লিখেচ! আমার বুকে তোমার ছুরি বেঁধার কথাটাই জ্বল্‌জ্বল্ করতে থাকুক! তৃপ্তি হয়েছে তো তোমার, এ ছুরি বিঁধে?

অমল অপ্রতিভ হইল। এ কথাগুলা পাপিয়াকে দেখানো ঠিক হয় নাই! ছি!

পাপিয়া বলিল,—শোনো এখন, যেজন্য এসেছিলুম... বলিয়া সে সিল্কের থলি খুলিয়া থিয়েটারের টিকিট বাহির করিয়া অমলকে বলিল—এই নাও থিয়েটারের টিকিট। শনিবারে সীতার বনবাস হবে,—আর সীতা সাজবে চপলা—ঐ একটি রাত্রির জন্যে শুধু। তুমি ভালোবাসো বলে চপলার কাছ থেকে এই টিকিট এনেছি তোমার জন্যে। তুমি দেখতে যেয়ো।

অমল টিকিট লইয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে পাপিয়ার পানে

চাহিল। এ কি, এ যে সত্যই থিয়েটারের একখানা টিকিট! টিকিটখানা ভালো করিয়া দেখিয়া সে বলিল,—পাঁচ টাকার টিকিট!—ও, তুমি কিনে এনেচো!…তা এ তো আমি নেবো না।…আমার সামর্থ্যে কুলোয়, আমি আট আনার টিকিট কিনে দেখে আসবো…

পাপিয়া তীব্র দৃষ্টিতে অমলের পানে চাহিল। এত তেজ…! ওঃ ভগবান! ঐ চোখ একদিন যদি তার পানে একটু কৃপার ভিখারী হইয়া চাহিত, ঐ স্বর একদিন মিনতির একটি অতি-ক্ষুদ্র সুরেও যদি ভরিয়া উঠিত, একটি পলকের জন্যও…! পাপিয়া তাহা হইলে তার সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিতে পারিত যে!…

পাপিয়া কহিল,—এ টিকিট আমি কিনি নি। আমার কি বয়ে গেছে কিনতে! সর্ব্বনাশী কুহকিনী আমি, এতে তো আমার পথে কাঁটাই আরো পড়বে…না, তা নয়। চপলাকে তোমার কথা অনেক বলেছি,…রোজই বলি। তাই সে এই টিকিট পাঠিয়েছে আমার হাতে…তোমার জন্যে। সে সীতা সাজবে…তুমি থিয়েটার দেখতে গেলে সে খুসী হবে…তাই। বুঝলে?

তৃপ্তির উচ্ছ্বাসে অমলের অন্তর ভরিয়া উঠিল। সে তৃপ্তি দুই চোখের দৃষ্টিতে হীরার মত এমন জ্যোতি মাখিয়া ফুটিয়া বাহির হইল যে পাপিয়া তা দেখিয়া একেবারে যেন মরিয়া গেল!

অমল কহিল,—চপলা পাঠিয়েচে? সত্যি বলচো?

পাপিয়া কহিল,—মিছে বলে আমার লাভ! পাপিয়া স্থির গম্ভীর মূর্ত্তিতে অমলকে লক্ষ্য করিতেছিল।

অমল কহিল,—তোমায় ধন্যবাদ!…কিন্তু পাঁচ টাকার সীটের কি দরকার ছিল?

পাপিয়া কহিল,—ভালো দেখতে পাবে। তা ছাড়া সে-ও তোমায় দেখতে চায় কি না…

অমল কহিল,—আমায় দেখতে চায়…অমল একটা নিশ্বাস ফেলিল।

পাপিয়া ভাবিল, হায় অন্ধ, কি মন্ত্রে কিসের মোহেই যে সে তোমায় ভুলাইয়াছে! যার আগাগোড়া ভাণ… এই মুহূর্ত্তে সীতা সাজিয়া মর্ম্মভেদী বিলাপে নিজে কাঁদিয়া লক্ষ লোকের চোখে জলের ধারা বহাইয়া, পর-মুহূর্ত্তেই সাজ-ঘরে গিয়া সিগারেট টানিয়া অপরূপ কৌতুকের যে নির্ঝর ছুটাইয়া দেয়—তার কি দেখিয়াই যে তোমরা মজ… অন্ধ, মূঢ় পুরুষ, তা তোমরাই জানো! সেও কি রূপের ফাঁদ পাতে না…? পাতে! তবে এত কৃত্রিমতা, এমন প্রচণ্ড মিথ্যা দিয়া সে লোক ভুলাইতে যায় নাই কোনদিন!

অমল পাপিয়ার পানে চাহিল, কহিল,—তুমি তাহলে এখনি তো বাড়ী যাবে? গাড়ী আছে…? এত কষ্ট করে এলে আমার জন্যে…

পাপিয়া সগর্ব্ব ভঙ্গীতে কহিল—তোমার জন্যে আসিনি আমি! আমার কে তুমি…! চপলাদিদির কথায় আমি এসেচি…তার সময় নেই, তাছাড়া আমি তোমার বাড়ী চিনি, তোমায় চিনি, তাই তার কাজে এসেচি…কথাটা বলিতে বলিতে রুদ্ধ অভিমান কখন্ যে ফাটিয়া চুরমার হইয়া তার বুকটাকে একেবারে বেদনায় আতুর করিয়া তুলিল…! সে আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে না দাঁড়াইয়া চলিয়া আসিল।…পাষাণ, পাষাণ! এ পাষাণকে একবার যদি সে ভাঙ্গিতে পারিত, খুব কঠিন নির্ম্মম আঘাতে…! পাপিয়ার অন্তরের মধ্যে হু-হু করিয়া প্রচণ্ড আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

১০

কম্পিত চরণে বাগান-বাড়ীতে পৌঁছিয়া পাপিয়া একেবারে নিজের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল; আসিয়া যা দেখিল, তাহাতে চমকিয়া উঠিল। মানগোবিন্দ মুখ ভার করিয়া একটা কোচে বসিয়া আছে। পাপিয়াকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া সে কহিল,—এর মানে কি পিয়ারী? আমায় থিয়েটারে বক্সের জন্যে পাঠিয়ে এমনি হঠাৎ পালিয়ে আসা…!

পাপিয়া কোন কথা কহিল না, নীরব নত-মুখে আসিয়া একধারে একটা সোফায় বসিয়া পড়িল। তার বুকের মধ্যে অসহ্য বেদনা ঠেলিয়া উঠিতেছিল! সেখানে যেন একটা প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছিল!

মানগোবিন্দ বলিল—শুধু আজ বলেই নয়—আজ ক'দিন ধরেই আমার উপর তুমি বিমুখ হয়েছ! ব্যাপার কি? তোমার কি চাই, মুখ ফুটে বল। একটা কথার ওয়াস্তা! যদি অদেয় না হয়…। পাবেই।…অসুখই যদি হয়ে থাকে, তাই বা আমার কাছে লুকোচ্ছ কেন…?

পাপিয়া তবু মাটীর দিকে মুখ নত করিয়া বসিয়া

রহিল। স্তম্ভিত অশ্রুর বেগে তার নাকের ডগা ঈষৎ কাঁপিতেছিল···বাতাসের দোলায় ফোটা ফুলের পাপড়ির মত। চোখে অশ্রু নাই! কাঁদিবার ইচ্ছায় মনটা একেবারে উচ্ছ্বসিত, উন্মাদ—কিন্তু ভিতরকার ব্যথার তাপে সে অশ্রু ভিতরেই শুকাইয়া উঠিতেছে।

মানগোবিন্দ উঠিয়া পাপিয়ার পাশে দাঁড়াইল, তার চিবুকে হাত দিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিল—কি ম্লান মুখ, কি হতাশ দৃষ্টি পাপিয়ার দুই চোখে! মানগোবিন্দ বলিল—কি হয়েছে, বল।...বলবে না?

পাপিয়া মুখ তুলিয়া ক্ষণেকের জন্য মানগোবিন্দর পানে চাহিল; আবার পরক্ষণেই একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মুখ নামাইল।

মানগোবিন্দ বলিল,—কোনো অপরাধ করেছি কি আমি?···তা'ও বল—

একটা প্রচণ্ড নিশ্বাস ঝড়ের মত পাপিয়ার বুকটাকে তোলপাড় করিয়া ছুটিয়া বাহির হইল। সে মুখ তুলিয়া বলিল—বলবার কিছু নেই...!

—তবে?

—এমনি!···অর্থাৎ আমার মনটা ভালো নয়। লোকের সঙ্গ ভালো লাগে না। আমি নির্জ্জনে থাকতে চাই, একলা!

মানগোবিন্দ স্থির দৃষ্টিতে পাপিয়াকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—কেন এমন হলো হঠাৎ?···তারপর একটু থামিয়া আবার কহিল,—সে রাত্রে সেই যে শশধরের সঙ্গে বকাবকি হচ্ছিল—তারপর কোথায় তুমি ছুটে বেরিয়ে গেলে, সারা রাত তোমায় খুঁজে হায়রাণ—ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে কি রকম! তাতে একটি কথা কই নি! তার উপর জানো, শশধর আমার একজন ভালো শাঁসালো মক্কেল! সেই ঘটনা থেকে তার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ হয়ে গেছে। তোমার কথায় কি না আমি করতে পারি, পিয়ারী? আর তুমি আমাকে এমন করে ছেঁটে ফেলচো! এর পরিণাম কি হবে, জানো...?

পাপিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মানগোবিন্দর পানে চাহিল। মানগোবিন্দ বলিল,—তোমায় এত ভালোবেসেচি যে তুমি আমায় ত্যাগ করলে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা দায় হবে।···

কথাটা বলিয়া সুগভীর সহানুভূতির প্রত্যাশায় মানগোবিন্দ পাপিয়ার পানে চাহিল। পাপিয়া তবু কোনো কথা কহিল না। এ যেন একটা মাটীর প্রতিমূর্ত্তির সামনে পাগলের মত তার যা-তা বকিয়া যাওয়া!

মানগোবিন্দ কহিল—নির্জ্জনে থাকার কথা যা বলচো, তাই যদি তো আমায় তা বলে আসতেও পারতে! তা না, হাসি-মুখে বললে, বক্স রিজার্ভ করতে...আমি চলে গেলুম, ফিরে এসে দেখি, তুমি নেই!···আমি অবাক!... তারপর বিট্টু বল্লে, ট্যাক্সিতে করে কাশীপুরে আসাব কথা। তাই তো এলুম···নাহলে কি ভাবনাতেই যে থাকতুম, ভাবো দিকি।...

মানগোবিন্দ চুপ করিল; কিন্তু সে বিস্মিত হইল।···এ তো অভিমান নয়, ক্রোধ নয়···কি তবে? এই বেশ হাসি-খুসী-গান চলিয়াছে—পরক্ষণেই হঠাৎ স্থির-গম্ভীর মূর্ত্তি... কঠিন নির্ম্মম হেঁয়ালির মত ভাব...কি এ!...কাঁটার মত একটা চিন্তা তার মনে বিঁধিল। তাই কি···? সে পাপিয়ার পানে চাহিল। পাপিয়ার সেই একই ভাব...উদাস, আকুল অবিচল মূর্ত্তি! যেন পাথরের পুতুল!

মানগোবিন্দ বলিল,—বলি, আর কারো প্রতি সদয় হয়ে থাকো যদি—

আহত সর্পের মত পাপিয়া একেবারে গর্জ্জিয়া উঠিল। তীব্র বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, দুই চোখে আগুন জ্বালিয়া সে কহিল,—চুপ! ও কথা নয়, খবর্দ্দার! এবং কথাটা বলিয়াই সে একেবারে মূর্চ্ছিতার মত সোফার বুকে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া বুক-ফাটা কান্নায় নিজেকে ভাসাইয়া দিল।

মানগোবিন্দ ব্যাকুল হইয়া তার হাত ধরিয়া ডাকিল,—পাপিয়া...

পাপিয়া পাগলের মত উদ্বেলিত আবেগে মানগোবিন্দর দুই হাত ধরিয়া আর্ত্ত কণ্ঠে কহিল,—ছুটী, ছুটী, ওগো আমায় ছুটী দাও...এ মন-জোগানো ব্যবসা, এ রূপের পশরা সাজিয়ে নিত্যি সাম্‌নে ধরা···এ আর ভালো লাগে না, ভালো লাগে না...ঘৃণা ধরে গেছে আমার। আমি বুঝতে পেরেচি, এর চেয়ে হেয় হীন কাজ নারীর আর কিছু নেই! নারী হয়ে বুকের মধ্যে রাজার ঐশ্বর্য্য নিয়ে তার পানে না চেয়ে, অতি তুচ্ছ খেলা, হীন জঘন্য বিলাসে মত্ত থাকা নারীর সাজেও না। নারীত্বকে অহরহ ছেঁচে পিষে এই উদ্দাম রঙ্গ আর নির্লজ্জ হাসি-খুসী...অসহ্য হয়েছে আমার!... আমায়

তোমরা ছুটী দাও...এই প্রাণ নিয়ে মন নিয়ে ঢের ছেলেখেলা করেছি...আর না...আর না—

উত্তেজনায় পাপিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

মানগোবিন্দ কহিল,—কি বলছো তুমি পাপিয়া...এ-সব কথা...এ কথার মানে ?

পাপিয়া কহিল,—কি বলচি, তা আমি নিজেই জানি না।...বলচি তো, আমার কিছু হয়েছে। কি হয়েছে, তা আমি জানি না, বুঝতেও পারচি না। তাই ছুটী চাইছি। দু'দিন ছুটী দাও। একবার নির্জ্জনে বসে ভেবে দেখি, আমি কে ছিলুম, আর কি-বা হয়েছে আমার! নিজে না বুঝলে তোমাদের কি বোঝাবো ?

মানগোবিন্দ বলিল,—আমায় তাড়িয়ে দিয়ো না তোমার কাছ থেকে, পাপিয়া। তোমার এ অবস্থায় তোমায় ছেড়ে দূরে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবও হবে না!...

পাপিয়া সে কথায় কাণ দিল না। সে হঠাৎ ধড়মড়িয়া উঠিয়া পাশের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে ঐ উদার মুক্তি...দেওয়ালের একটু আড়াল নাই—প্রাণ-মাতানো মধুর বাতাস...আর ঐ নীল নির্ম্মল মুক্ত আকাশ, নীচে গঙ্গার স্নিগ্ধ শুভ্র বারির অবাধ প্রসার...প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল! সে বারান্দায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মানগোবিন্দ ঘরের মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তারপর সহসা নীচে নামিয়া গেল। গিয়া মালীকে জিজ্ঞাসা করিল,—যে বাড়ীতে গেছলি, সেদিন সকালে, সেখানে শুধু সেই ছোকরা বাবুটি থাকে...আর কেউ না ?

মালী বলিল—না।

মানগোবিন্দ বলিল—আর সেই ঝড়ের রাত্রে বিবি এসে ঐখানেই ছিল—এ বাড়ীতে থাকেওনি মোটে ?

মালী বলিল,—না।

—হুঁ! বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মানগোবিন্দ উপরে আসিল; আসিয়া বারান্দায় গিয়া পাপিয়ার পিছনে দাঁড়াইল, গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল,—পাপিয়া—

এ আহ্বানে চমকিয়া পাপিয়া ফিরিয়া চাহিল, কহিল, —কি ?

মানগোবিন্দ কহিল,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো,—সত্যি জবাব দেবে ?

পাপিয়া ঈষৎ গর্ব্ব-ভরে মানগোবিন্দর মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—বলবো।

মানগোবিন্দ বলিল,—তুমি যখন যা চেয়েছ, তখনি তা আমার কাছ থেকে পেয়েছ কি না...?

পাপিয়া এ কথার কোন জবাব দিল না। মানগোবিন্দ বলিল,—যে খেয়াল হয়েছে তোমার, যখন যা, তাই পূরণ করেছি—তোমার গায়ে যে গহনা পরিয়েচি, আমার স্ত্রীর গায়েও তা নেই! ঘরে আমার স্ত্রী কেঁদে পায়ে লুটিয়ে পড়েছে,—তা গ্রাহ্য না করে তোমার পায়ের কাছে আমি কুকুরের মত লুটিয়ে রয়েছি—নয় কি ?

পাপিয়া ফুঁসিয়া উঠিল,—আমি তোমায় কোনদিন এ অনুগ্রহ, এ প্রসাদ পাবার জন্য অনুরোধ করেচি...? আমার কথায় এ-সব করেছ তুমি...?

মানগোবিন্দ বলিল,—ঠিক এমন হুকুম তুমি করনি বটে, কোনদিন—কিন্তু তোমার জন্যেই তো আমি ঘর-ছাড়া!

পাপিয়া কহিল,—মিথ্যা কথা! লুব্ধ ব্যাধ তুমি, আমার এই রূপ দেখে শিকারে এসেছিলে—নিজের মনের বাসনা মেটাতে, নিজের প্রাণে তৃপ্তি পেতে...আমার মুখ চেয়ে আমায় দয়া করতে আসোনি! তুমি এসেচো তোমার লুব্ধ বাসনা লালসা, তার পরিপূর্ণ তৃপ্তির প্রত্যাশায়... আমায় লুণ্ঠন করতে...নিজের স্বার্থে! তোমরা পুরুষ, তোমরা যখন ভালোবাসার কথা তোলো, তোমরা যখন মুখে বল, ভালবাসি—তখন তার অর্থ এ নয় যে আমাদের ভালোবেসে ও কথা বলচো—নিজের পিপাসা পূর্ণ করতে তোমরা মুখে বল, ভালোবাসি!...

মানগোবিন্দ বলিল,—কিন্তু কোনদিন তোমার উপর কোন অত্যাচার করেচি আমি? বল, তোমারি খেয়ালে চলেছি আমি চিরদিন...

পাপিয়া কহিল,—কারণ, আমার খেয়াল নিবৃত্ত করাতেই ছিল তোমার সুখ! আমার খেয়াল তুমি মিটিয়েছ, সে আমায় তৃপ্ত করতে নয়, নিজেকে তৃপ্ত করবার জন্য। আমার হাসি ভালো লাগে বলেই আমায় হাসি-মুখে রাখবার প্রয়াস পেয়েছ!...মানুষ পাখী পোষে, তাকে আদর করে, যত্ন করে, সেটা পাখীর প্রতি অনুকম্পার দরুণ নয়—মানুষের নিজের সখের জন্য, তৃপ্তির জন্য! পাখীকে

নেড়ে-চেড়ে সে নিজে সুখ পায়, তাই! ছেলেরা যদি বায়না নিয়ে বলে, বাপের পিঠে চড়বে তো বাপ ছেলের তৃপ্তিটুকুর জন্যেই তাকে পিঠে তোলে—ছেলের তৃপ্তি দেখলে নিজে ঢের বেশী তৃপ্তি পায়, তাই ছেলেকে পিঠে তোলে! ...সে তৃপ্তি বাপ যদি না পেত, তা হলে ছেলের বায়না শুনে পিঠে তাকে চড়তে দিত না—ছেলের পিঠে চড় বসাতো!

মানগোবিন্দ বলিল,—তবু বল, তোমার কোন সাধে কখনো কোন বাদ সেধেছি? তোমার কোনো আকাঙ্ক্ষা কখনো অতৃপ্ত রেখেছি?

পাপিয়া কহিল,—তা তো রাখবার কথা নয়।... এ যে দেনা-পাওনার কারবার। আমি কাঁচের পুতুল। আমায় নিয়ে নানাভাবে তুমি খেলা করেছ, খেলা করে নিজে তৃপ্ত হয়েছ...আর সে তৃপ্তির দাম দিয়েছ টাকা-কড়ি, গহনা, আমার অতি-তুচ্ছ বায়না মেনে! প্রাণের সম্পর্ক এর মধ্যে কোথায় বল দিকি...একবার ভাবো —ভেবে বল...

মানগোবিন্দ কোন কথা বলিল না। পাপিয়া বলিল,—কিন্তু এ-সবে অরুচি ধরে গেছে। সারা জীবনটা দাম নিয়ে পরের মন জুগিয়েই বেড়াবো কি? নিজের মন কি চায়, তার খোঁজ নেবো না? সে যা চায়, তা বুঝে তাকে তা দেবার কোন চেষ্টা করবো না...?

মানগোবিন্দ কহিল,—কিন্তু এ কি ভালো...? আমায় গোপন করে এই যে জঙ্গলের মধ্যে আর-একজনের কাছে ছুটে আসো—?

পাপিয়া দুই চোখে আগুন জ্বালিয়া মানগোবিন্দর পানে চাহিল; মানগোবিন্দ ভয় পাইল। সে বলিল,—আমি তোমায় কতখানি বিশ্বাস করি...তার কি এই প্রতিদান? আমি যে কুকুরের মত পড়ে আছি—নিজের মান-মর্য্যাদা, আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ী সব ছেড়ে—

পাপিয়া সগর্জ্জনে কহিল,—এইখানেই তো দুঃখ!... যাদের চাই না, তারা কুকুরের মত পায়ের কাছে লুটিয়ে থাকে...আর যাকে চাই...সে কঠিন, নির্ম্মম,—ফিরেও তাকায় না...! বলিতে বলিতে তার রুদ্ধ আবেগ বাঁধ কাটিয়া তীব্র স্রোতে বহিয়া চলিল। পাপিয়া বলিল,—এ জীবনে এই রূপ আর যৌবন নিয়ে কত লোককে মুগ্ধ করেছি, লুব্ধ করেছি, শেষে নিরাশ প্রাণে তাদের তুচ্ছ অবহেলা দেখিয়ে ফিরিয়েও দিছি—কত দীর্ঘ-নিশ্বাস যে আশে-পাশে সঞ্চিত আছে—সে কি কম পাপ!...সেই পাপেই আজ এ শাস্তি!...প্রকাণ্ড গর্ব্ব নিয়ে ভীরু কাপুরুষদের মজিয়ে জয় করেই ফিরেছি...কখনো ভাবি নি, যে এ-সব কাপুরুষ ছাড়া পৃথিবীতে যথার্থ পুরুষ আছে—যারা এ রূপ, এ যৌবনের মায়াজাল একটি দৃষ্টির ভঙ্গীতে এক-মুহূর্ত্তে ফাঁসিয়ে চুর করে দিতে পারে!—কথাটা বলিয়া সে শ্রান্ত হইয়া বারান্দার উপর বসিয়া পড়িল।

মানগোবিন্দ ব্যর্থ মনোরথে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মূর্খের মত সে যে এ নিজেরি সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিল!—পাপিয়ার রূপের ফাঁদ কাটিয়া যাওয়া তার পক্ষে এখন অসম্ভব! তার চোখের দৃষ্টিতে, তার মুখের কথায়, তার ঐ যৌবনের উচ্ছ্বাসে যে কি মাদকতা আছে, কি সুগভীর আকর্ষণ আছে—কঠিন অবজ্ঞায় পাপিয়া ফিরাইয়া দিলেও সে এখান হইতে নড়িতে পারিবে না! মানগোবিন্দ অস্থিরভাবে খানিকক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইল—তারপর পাপিয়ার পাশে বসিয়া তার শ্রান্ত শির কোলের উপর তুলিয়া লইল এবং তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া বলিল—তোমার স্বাধীনতায় কখনো হাত দেবো না, পিয়ারী! তুমি মুক্ত।...কিন্তু আমি তোমার অতি দীন হতভাগা ভক্ত...আমায় কোনদিন তোমার পাশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ো না। বেশী না পারো, অন্ততঃ এইটুকু দয়া করো! না হলে,...না হলে আমি মরে যাবো,—সত্যি মরে যাবো।

ক্রমশঃ

মনোবিদ্যা

ডাক্তার শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম-এ, পিএইচ্-ডি (হার্ভার্ড)

মনের সম্বন্ধে কথা উঠিলেই আমরা ভাবি যে, অন্তহীন দার্শনিক আলোচনার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। যাহা ধরা-ছোঁয়া যায় না, তাহার সম্বন্ধে কোনও চরম সিদ্ধান্তে কোন কালে পৌছান যাইতে পারে, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করেন না। মনের তথ্য কাহাকেও চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখান কঠিন। জড় জগতের ঘটনা যেমন দশজনকে প্রত্যক্ষ করাইয়া প্রমাণ করা যায়, মনোজগতের বেলায় না কি তাহা অসম্ভব। বিশেষতঃ আমরা মানুষের বাহিরের চলাফেরা, আচার ব্যবহার লইয়াই ঘর-সংসার করি। আমাকে যদি কেউ লক্ষ টাকা খয়রাৎ করে, আমি টাকাটা পকেটস্থ করিয়াই নিশ্চিন্ত। দানের মূলে বিশ্ব-প্রেম বা পাগলামী—কি আছে, সে কথা দু' একবার মনে আসিতে পারে। টাকা ফেরৎ দিতে না হয় অথবা অন্য কোন মুস্কিলে পড়িতে না হয়, এই জন্যই যতটুকু দরকার, আমরা সেই মতলব্ লইয়া মাথা ঘামাই। মনের অন্তরালে কি ঘটে, তাহা জানিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। ইহা ছাড়া আমাদের বিশ্বাস যে, মন নিজের খেয়ালে চলে। আমরা যাহা ইচ্ছা তাহাই ভাবিতে পারি ; স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে মনের অবাধ গতি। প্রকৃতি-দেবী জড়জগৎকে নিয়মে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন ; মনকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। নিজের চঞ্চল গতিতে, নিজের লীলায় মন ছুটিয়া বেড়ায় ; ধরা-বাঁধা আইন-কানুন কিছুই মন মানে না—এ ধারণা আমাদের মনে দৃঢ়মূল হইয়া রহিয়াছে।

অথচ, মনের প্রত্যেক অবস্থা নিয়মে বাঁধা, এ কথা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমাদের সংসারে চলা-ফেরাই অসম্ভব হইত। আমার টাকার থলিটি রাস্তার উপর রাখিয়া দিই না ; কারণ, মানুষের মন স্বভাবতঃই টাকার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে। বয়োবৃদ্ধ ভুঁড়িওয়ালা লোককে রাস্তায় যাইতে দেখিলে, আমার এক বন্ধুর না কি কাতুকুতু দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাহাতে তিনি নিরস্ত থাকেন ; কারণ, মানুষের মনে এ রকম অবস্থায় কতখানি উষ্মা জন্মিবার কথা, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারেন।

ছেলে-মেয়েদের রংচঙে কাপড় কিনিয়া দিই ; কারণ, জানি যে, তাহারা ইহাতেই আনন্দিত হইবে। নিজে রঙিন

জামা পরিয়া বাহির হই না ; কারণ, দশজনে হাসিবে। কেবল এই সকল সামান্য বিষয়ে নয়,—অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, মনের প্রত্যেক অবস্থাই নিয়মের অটুট শৃঙ্খলে বাঁধা। প্রকৃতিদেবী জড়জগৎ ও মনোজগৎকে একই ধরণে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

যেখানেই ঘটনানিচয় নিয়মের বশ, সেখানেই বৈজ্ঞানিক তাঁহার যন্ত্রপাতি দিয়া পরীক্ষা করিয়া ও হিজি-বিজি অঙ্ক কষিয়া বলিয়া দিতে পারেন, ভবিষ্যতে কি হইবে। অঙ্ক কষিয়া জ্যোতিষী বলিয়া দেন, কবে গ্রহণ হইবে, কবে ধূমকেতু দেখা দিবে। মনের বেলাতেও এইরূপ ভবিষ্যৎজ্ঞান সম্ভব বলিয়াই আমাদের সংসারের লেনদেন চলে। মাষ্টার মহাশয় কলেজে পড়াইতে যান ; ছাত্রেরা পড়িবার উদ্দেশ্যে বেতন দিয়া পড়িতে যায়। মাষ্টার মহাশয় যদি ক্লাশে আসিয়া কোন দিন টেবিলে উঠিয়া নৃত্য-গীত করেন, কখনও বা ছোরা, পিস্তল লইয়া ছেলেদের তাড়া করেন, অভিভাবকেরা তাহা হইলে পয়সা খরচ করিয়া ছেলেদের পড়িতে পাঠান না। রাস্তায় চলিতে চলিতে যদি একজন অপরিচিত লোকের পকেটে হাত দিই, তাহা হইলে তিনি কি করিবেন, এটুকু ভবিষ্যৎ জ্ঞান লাভের জন্য কর-কোষ্ঠী গণাইতে হয় না। ব্যবসায়ী কাহাকেও টাকা দিতে হইলে আগেই রসিদের বন্দোবস্ত করেন। কারণ, দলিল না থাকিলে লোকে সাধারণতঃ কি করে, তাহা বেশ জানা আছে। সংসারের সব রীতি, সব প্রতিষ্ঠানই উদ্ভূত হইয়াছে এই তথ্য হইতে যে, মানুষের মন নিয়মের বশ। সেগুলি টিকিয়া আছে, কারণ, মানুষের মন কোন্ পথে চলিবে, তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই বলিতে পারি ; মনের ভবিষ্যৎ গতি কি হইবে, তাহা আমরা মোটামুটি জানি।

বিজ্ঞানের সত্যকে অবলম্বন করিয়া আমরা আবার প্রকৃতির গতিকে নিজের কাজে লাগাইতে পারি। বস্তু-বিজ্ঞানের নিয়মে মানুষ যে পরিমাণ অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই পরিমাণেই জড়জগৎ মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সেবায় লাগিয়াছে। জগৎকে মানুষ নিজের আদর্শের ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে।

মনের লুকানো নিয়ম আমরা যতটা বুঝিয়াছি, মনকেও সেই পরিমাণে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিয়াছি। মনকে গড়িয়া তোলা যায়, এই বিশ্বাসেই যত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান জন্মিয়াছে। আর এই জন্যই কুসঙ্গের দোষের কথা ছেলে-বেলা হইতে শুনিতেছি। ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন দেয়, যাহাতে সকলের মন তাহার পণ্যের জন্য লালায়িত হয়। বিজ্ঞাপন দিয়াই ব্যবসায়ী সকলের মনকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে চায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁহারা 'ভোট-প্রার্থী', এ বিদ্যা তাঁহাদের অজ্ঞাত নহে। মানুষের সঙ্গে যেখানে মানুষের সম্বন্ধ, সেখানেই মনকে নানা উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

সাধারণতঃ মনকে যেমন স্বাধীন, স্বৈরগতি মনে করা হয়, তাহা হইলে সে ধারণার মূলে সত্য নাই। জড়জগৎ যেমন নিয়মের বশ, প্রাণের জগৎ যেমন কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলে বাঁধা, মনোজগৎও সেইরূপ। জড়-বিজ্ঞানের মূল তথ্য এই যে, খামখেয়ালী ভাবে, বেনিয়মে কিছুই হইবার জো নাই। মনোবিদ্যার মূলও তাই। কবির কল্পনা, পাগলের পাগলামী, শিশুর অসংলগ্ন মনোভাব, ব্যবসায়ীর শাঠ্য, ইহাদের প্রত্যেকটিই নিয়মের অটুট শৃঙ্খলে বাঁধা। রূপ, রস, ভাব ও চিন্তার স্রোত মনের স্বচ্ছন্দ লীলায় বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই সহজ গতির মধ্যেই লুকানো রহিয়াছে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম। এই নিয়মের অনুসন্ধানই মনোবিদ্যা।

অনেকে এইখানে আপত্তি করিবেন। মনের মধ্যে নিয়ম খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু, বেনিয়মে যে মনের চলিবার শক্তি নাই, ইহার প্রমাণ কি ? মানুষ অনেকটা সবার সঙ্গে এক ধাঁচে চিন্তা করে, একই ভাবে চলে ফিরে। কিন্তু—তাহার বৈশিষ্ট্যও ত বড় কম নহে। ইহা সত্ত্বেও কেন বলিব যে মন নিয়মে বাঁধা? ইহার উত্তর এই যে, কোনও বিজ্ঞানই প্রমাণ করিতে পারে না যে, জগতের সর্ব্বত্রই নিয়মের রাজ্য। যেদিন সংসারের সব কার্য্য-কারণের সূত্র মানুষের চোখের সামনে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, সে দিনই এ কথা বলা চলিবে। এখন সকল বিজ্ঞানের পক্ষেই এটা একটা বিশ্বাস, যাহা ছাড়া কাজ চলে না। মনোবিদ্যার বেলাতেও তাই। বিশ্বের সকলই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে জড়িত—এটী, পাশ্চাত্য দর্শনে যাহাকে প্রকৃতিবাদ (Naturalism) বলে, তাহার একটী মূল সূত্র। যত দিন এ বিশ্বাস কেবল জড়জগৎ সম্বন্ধেই ছিল, তত দিন প্রকৃতি-বাদের পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। কারণ, মনকে বাদ

দিয়া বিশ্ব সম্বন্ধে কথা বলা চলে না। এইজন্য মনোবিদ্যাকে একজন দার্শনিক বলিয়াছেন-- The last word of Naturalism.

মনের বিষয়ে ভবিষ্যৎ জ্ঞান সম্বন্ধেও ঐ একই আপত্তি উঠিবে। বৈজ্ঞানিক হিসাব করিয়া বলিয়া দিলেন যে, রামবাবু পর দিন গুরু-গম্ভীর মুখে চিন্তামগ্ন থাকিবেন। রামবাবু খবরটী পাইয়া, মদ খাইয়া সারা সহর নাচিয়া বেড়াইলেন। সমস্ত হিসাব মাঠে মারা গেল। চন্দ্রগ্রহণের বেলায় এটী হইবার নয়। যতই আগে নোটীশ দাও না কেন, চন্দ্র দেবের 'লেট' হইবার এক্তিয়ার নাই। মোট কথা, যে বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়ম-রহস্য যতই তলাইয়া বুঝিয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ জ্ঞান ততই নির্ভুল হইবার সম্ভাবনা। ভূবিদ্যায় যে সব সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ বড় কম নহে। অথচ ভূবিদ্যার ভবিষ্যৎ জ্ঞানের মাত্রা খুব বেশী নহে। প্রাণী লইয়া যে সকল বিজ্ঞানের কাজ, তাহাদের ভবিষ্যৎ জ্ঞানের মূল্য আবার ইহা অপেক্ষাও কম। জল-হাওয়া যে বিজ্ঞানের কারবার, তাহার নাম meteorology। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে একটী সরকারী বিভাগ আছে। সেখান হইতে প্রায়ই কবে ঝড় হইবে, কবে বৃষ্টি হইবে, এ বিষয়ে ইস্তাহার বাহির হইয়া থাকে। এ ভবিষ্যৎ জ্ঞানের মূল্য যে কতখানি, তাহা আমরা সকলেই জানি। পক্ষান্তরে, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, বস্তুবিদ্যা প্রভৃতি জড়-বিজ্ঞান এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মনোবিদ্যা প্রাণীর মন লইয়া আলোচনা করে; ইহার ভবিষ্যৎ জ্ঞানের মূল্য অপরাপর প্রাণিবিদ্যায় যেমন সেই রকমই।

ভবিষ্যৎ জানার ক্ষমতা থাকিলেই প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা আসে না। জ্যোতির্ব্বিদ্যার অসাধারণ উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ সামান্য নক্ষত্রেরও গতি ফিরাইতে পারে না। ভূতত্ত্ববিৎ ভূপৃষ্ঠের বিবর্ত্তনের অনেক নিয়মই জানেন। লক্ষ বৎসর পরে কি হইবে তাহাও মাঝে মাঝে বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতি দেবী যে পথে পৃথিবীকে লইয়া যাইতেছেন, তাহার বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে মানুষের মনকে এক পথ হইতে অপর পথে ঘুরানো যায়। ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ধর্ম্মপ্রচারক বহুকাল হইতে, মনকে বদলানো যায়, এই বিশ্বাসেই চলিতেছেন। আমরাও এই বিশ্বাসেই অযাচিত-ভাবে যেখানে সেখানে অমূল্য উপদেশ বিতরণ করি। বস্তুতঃ, মনোবিদ্যার উন্নতি বেশী না হইয়া থাকিলেও, মনের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে অবিশ্বাস করা চলে না।

মনোবিদ্যা গত ২৫।৩০ বৎসর হইতে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইয়োরোপে বিবর্ত্তনবাদের প্রচার হয়। পণ্ডিতেরা সকল সমস্যারই সমাধান করিতে চাহিতেন বিবর্ত্তনবাদের তথ্যের সাহায্যে। বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতেই মনোবিদ্যা এই স্থান অধিকার করিয়াছে। মানুষের জীবনের সকল প্রশ্নই আমরা এখন বুঝিতে চেষ্টা করি— মনোবিদ্যার মধ্য দিয়া। কথায় কথায় এখন Psychological standpoint-এর বিষয় শুনা যায়। মনকে বাদ দিলে, যে সকল সমস্যায় মানুষকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহার সমাধান যে সম্ভব নহে, ইহা প্রতিদিনই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তাই মনোবিদ্যার আদর পাশ্চাত্যের সকল দেশেই দেখা যাইতেছে।

কিছু দিন পূর্ব্বেও মনোবিদ্যার চর্চ্চা ছিল দার্শনিকের নিজস্ব। এখনও আমাদের দেশে ও অপর অনেক স্থানে এই বন্দোবস্তই রহিয়াছে। ইহার দোষ এই যে, দর্শনের তথ্য আসিয়া মনোবিদ্যার স্থান অধিকার করে। দার্শনিক নিজের মন হইতেই মনের নিয়ম আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। মনোবিদ্যার যে নূতন ধারা চলিতেছে, তাহার মূল কথাই এই যে, মনের নিয়ম বহু লোকের মন পরীক্ষা করিয়াই আবিষ্কার করা সম্ভব। ইহার ফলে, মনোবিদ্যার নিত্য সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে statistics ও যন্ত্রপাতি। অনেক লোকের ও অনেক তথ্যের মধ্য হইতে একটী মূল ধারা বাছিয়া বাহির করিতে হইলে statistics ভিন্ন গতি নাই। যদি পাঁচশত লোকের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষার ফলে একটী নিয়মের সন্ধান পাওয়া যায়, statistics এর সাহায্যেই তাহা ধরা পড়িবে। আবার এতগুলি লোকের একই অবস্থায় একই চিত্তবৃত্তির পরীক্ষা করিতে হইলে, যন্ত্রপাতি ছাড়া গতি নাই। কারণ, অন্য প্রকারে সকল অবস্থার সাম্য রাখা সম্ভব নহে। এই জন্যই মনোবিদ্যার আলোচনায় পরীক্ষাগারের দরকার হইতেছে।

নূতন জীবনের প্রেরণায়, মনোবিদ্যা বহু ধারায় বহিয়া চলিয়াছে। যেখানেই মনের খেলা দেখা যায়, মনোবিজ্ঞানের সেবক সেদিকেই ছুটিয়াছেন। শিশুর মন,

পশুর মন, সমাজের মন, মনের রোগ—সকল দিকেই নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইতেছে; এক মনোবিদ্যা বহুধা হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। বিজ্ঞানের সফলতা তাহার প্রয়োগে। মনোবিদ্যারও নানা দিকে প্রয়োগ হইতেছে—শিক্ষায়, ব্যবসায়ে, চিকিৎসায়। বিংশ শতাব্দীতে বর্দ্ধিত এই নূতন বিজ্ঞানের এখনও কেবলমাত্র শৈশব অথবা কৈশোর। কোন্ দিক দিয়া ইহার পরিণতি হইবে, এখনও তাহা বলা কঠিন।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন খাস্তগির] অন্তঃপুরিকা

কনে পছন্দ

শ্রীরেবা দেবী

তাকে প্রথম সে দেখেছিল একটা মেয়েদের স্কুলে। সুকুমারকে মেয়েদের মধ্যে বড়-একটা দেখ্‌তে পাওয়া যেত না,—বরং সে তাদের এড়িয়েই চল্‌ত। সেদিন কিন্তু তার ছোট বোন রেণুর বিশেষ অনুরোধে সে তাদের স্কুলে "শকুন্তলা"র অভিনয় দেখ্‌তে গিয়েছিল। সুকুমার মনে মনে ঠিক করেছিল, এক ঘণ্টা সে ঘুমিয়ে কাটাবে। অভিনয় আরম্ভ হ'ল,—সুকুমার বোধ হয় তখন স্বপ্ন-রাজ্যে। হঠাৎ সশব্দে করতালি হওয়াতে তার নিদ্রার জাল কেটে গেল। পাশ থেকে শুন্‌লে রেণু বল্‌ছে—"আসল শকুন্তলা কখনও এর চেয়ে সুন্দর ছিল না, ললিতাদি'কে ঠিক যেন একটা পরীর মত দেখাচ্ছে।" সুকুমার তার নিদ্রা-জড়িত অলস চোখ দুটো ধীরে ধীরে ষ্টেজের দিকে তুল্লে—এ কি? এ হো'ল কি? সুকুমার বাবুর ঘুম গেল কোথায়? বরং বেশ ঝেড়ে শক্ত ক'রে চৌকিতে বসা হ'ল, রুমাল দিয়ে চোখ দুটো একবার মুছে নিতেও ছাড়্‌লেন না। সত্যি ললিতাকে শকুন্তলার সাজে বড়ই মানিয়েছিল। আজ প্রথম কোনও মেয়েকে জান্‌বার জন্যে সুকুমারের আগ্রহ হ'ল। পাশেই ছিল রেণু,—সে তখন তন্ময় হয়ে প্লে দেখ্‌ছিল। সুকুমার যথাসম্ভব গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"হ্যাঁ রে, শকুন্তলা যে মেয়েটি সেজেছে, ও কে?" রেণুর তখন মোটে কথা বল্‌বার ইচ্ছা ছিল না, সে তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল—"থাম না দাদা, কি বল্‌ছে শুন্‌তে দাও।" সুকুমারের কিন্তু থাম্‌বার কোনই ইচ্ছা দেখা গেল না, সে পুনরায় প্রশ্ন কর্‌লে—"বল্ না, ও মেয়েটি কে?" বিরক্তিপূর্ণ উত্তর এল—"ও মেয়ে নয়।"—"আরে মেয়ে নয় তো কি পুরুষ? জান্‌তাম না তোদের স্কুলে অত বড় বড় ছেলেরা পড়ে।" আর চুপ করে থাকা ভাল দেখায় না,—রেণু অবজ্ঞার সহিত বল্লে—"এই বুঝি তোমার বুদ্ধি? ললিতাদি'কে যে কেউ পুরুষ ব'লে ভুল করতে পারে, এ আমার ধারণাই ছিল না।"—"বাঃ তুই-ই তো বল্লি—ও মেয়ে নয়।" "উনি তো সত্যিই মেয়ে ন'ন,—উনি যে আমাদের টিচার।"—"ও, তাই বল! তা শোন্ একটা কথা—" রেণু কিন্তু এবার সত্যই চটেছে দেখে, অগত্যা সুকুমার ধৈর্য্য ধরে বসে রইল। একবার রেণু বল্লে—"দাদা, দুর্ব্বাসা কি রকম শাপ দিলে, ওর চোখ দেখে ভয় হ'ল।" সুকুমার শকুন্তলার মুখ থেকে মুগ্ধ দৃষ্টি সরিয়ে বল্লে—"কৈ রে, কোথায় দুর্ব্বাসা?" —"আরে দুর্ব্বাসা তো শাপ দিয়ে চলে গেল—তুমি কি এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলে না কি?"—"নারে, মোটেই আমি ঘুমুই নি।" "ছাই।" রেণু গম্ভীরভাবে প্লেতে মন দিলে।

অভিনয় সাঙ্গ হ'ল। সকলের মুখেই একই কথা—"শকুন্তলা কি সুন্দর অভিনয় করেছে!" এদিকে রেণু যে হঠাৎ কোথায় মিশিয়ে গেল, সুকুমার দেখ্‌তেই পেলে না। মনে মনে ঠিক কর্‌লে—রেণুকে কাছে পেলে তার কাণ দুটো আর আস্ত রাখ্‌বে না। একে মেয়ে স্কুল, তার উপর চারি ধারে দলে দলে মেয়ে ঘুর্‌ছে! সুকুমার রাগে লজ্জায় কি যে কর্‌বে, কিছু ঠিক কর্‌তে পার্‌লে না। একবার ভাব্‌লে তাকে ফেলেই বাড়ী পালায়। আবার মনে হ'ল, রেণু ছেলেমানুষ,—তাকে এই রাত্রে একা ফেলে আসা ঠিক হ'বে না। এমন সময় রেণু এসে বল্লে—"দাদা, ললিতাদির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।" সুকুমার চম্‌কে ফিরে দেখ্‌লে—সাম্‌নেই শকুন্তলা। কোন রকমে নমস্কারটা সেরে নিয়ে বল্লে—"আপনাদের প্রত্যেকেরই প্লে খুব ভাল হয়েছিল।" ললিতা একটু হেসে বল্লে—"দুর্ব্বাসার জটাটা যখন পড়ে গেল, তখন নিশ্চয় আপনার খুব হাসি পেয়েছিল?" এই হাস্যকর ব্যাপার যে কখন হয়েছিল, সুকুমার তা মোটেই দেখে নি, তবু অম্লান মুখে বল্লে—"হ্যাঁ, পেয়েছিল বৈ কি?" রাত হয়ে এসেছিল, আর বেশী কিছু বলা হ'ল না। বাড়ী ফের্‌বার পথে—রেণুর মুখে কেবলই ললিতাদির প্রশংসা। অন্য সময় হ'লে সুকুমার তাকে দুই ধমকে থামিয়ে দিত; কিন্তু আজ সে একটি কথাও বল্লে না,—বরং মনে হ'ল, যেন মনোযোগ দিয়ে তার সব কথা শুনছে। রেণু কোন বাধা না পেয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—"ললিতাদির শকুন্তলা হবার তো কথা ছিল না, তবে শেষ মুহূর্ত্তে নলিনীর অসুখ করে যে'তে, ললিতাদি'কে বাধ্য হয়ে শকুন্তলা সাজ্‌তে হ'ল।"—"ললিতাদি'কে প্রথম থেকেই শকুন্তলা করা হয় নি কেন?" সুকুমারের স্বরে বোঝা গেল,

সে ললিতাদি'র সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে চায়। রেণু ললিতাদি'র কথা পেলে আর কিছু চায় না। সে খুসি হয়ে বলে উঠল,—"ও মা, ললিতাদি যে টিচার,—এটা যে মেয়েদেরই করবার কথা।"—"বাঃ, ললিতাদি'কে তো দেখতে এতটুকু,—ও আবার কেমন টিচার?"—"ললিতাদি'র বয়স যে খুব কম। মীরা ওঁদের চেনে। সে বলছিল, ওঁর বয়স ২০ কি ২১ হ'বে। ছোট হ'লে কি হ'বে,—কি সুন্দর যে উনি পড়ান, তা আর কি বলি। আচ্ছা দাদা, তুমি তো আমাদের স্কুলের সব মেয়েদেরই কুৎসিত বল। এবার কিন্তু সত্যি করে বল তো—ললিতাদি' সুন্দর কি না?"

"দূর পাগল, ওকে বুঝি সুন্দর বলে? এক গাদা রং মেখে সাদা মুখ সকলেরই হয়।"

"তুমি কি যে বা' তা' ব'লছ দাদা,—ললিতাদি আদতেই রং মাখেন নি। ওঁর স্বাভাবিক রংই অমন ফর্সা। তুমি জান না, উনি প্রতিদিন এই এত এত ফুল পান।"

"সে কি কথা? ওঁর কি বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছে না কি? কৈ, কার সঙ্গে? সেই বুঝি রোজ ফুল পাঠায়?"

সুকুমার অস্পষ্ট ভাবে কি একটা বল্লে—ভাল শোনা গেল না। সুকুমারের অদ্ভুত কথায় রেণু হেসেই লুটোপুটি। এমন মজার কথা সে কখনও শোনে নি—অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বল্লে—"না—না, ও সব কিছু নয়; মীরা বলছিল, ললিতাদি না কি কাউকেই বিয়ে করবেন না। ওঃ, দাদা, তুমি কি বোকা,—বুঝলে না, ললিতাদি'কে কে ফুল দেয়? এই সব স্কুলের মেয়েরা,—আমিও কতবার তাঁকে ফুল দিয়েছি। তুমি তো স্কুলে পড়েছ, তোমাদের মাষ্টারদের কখনও ফুল টুল দিতে না?"—"ওঃ, তাই বল। না রেণু, আমি মাষ্টারদের ফুল দেবার জন্যে কোনও দিনও এক পয়সা খরচ করি নি, ওটা একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছে। আগে জানলে অঙ্কের মাষ্টারকে ফুল টুল দিয়ে হাত করতে পারা যেত। আচ্ছা, তুই বুঝি ললিতাদি'র বিশেষ ভক্ত?"—"তুমি যে কি ব'ল দাদা—ওঁকে সকলেই ভালবাসে।"—"আচ্ছা, তুই যদি ওঁকে অতই ভালবাসিস, তবে তাঁকে এক দিনও এখানে নেমন্তন্ন করিস নে কেন? আমরা কিন্তু আমাদের মাষ্টারদের প্রায়ই বাড়ী এনে খাওয়াতাম।" সুকুমারের দিদি সুধীরা এ সময় থাকলে বলতে পারত—এ কথাটা কতদূর সত্য।

দাদার প্রশ্নে কাঁদো-কাঁদো সুরে রেণু বল্লে—"নেমন্তন্ন বুঝি করি না তাঁকে? উনি তো আমাদের এখানে অনেক-বার এসেছেন! দিদির সঙ্গে তাঁর খুব ভাব। এই শেষ যখন ললিতাদি আমাদের এখানে এসেছিলেন, তখনও তো তুমি বিলেতে। সেবার কিন্তু দিদি আসতে পারেন নি। খাবারের ভার ঠাকুরের উপর ছিল। তা সে এমন বিশ্রী কচুরি ভেজেছিল যে, লজ্জায় আমি তাঁকে আর খেতে বলতে পারি নি।"

"আচ্ছা, এবার তাঁকে এক দিন চায়ে বল,—খাবার ভার আমার উপর,—তোকে কিছু ভাবতে হ'বে না।"

রেণু একটু আশ্চর্য্য হ'ল,—তার দাদা তো তার বন্ধুদের সম্বন্ধে এতটা আগ্রহ কখনও দেখায় নি। কি জানি কি কারণে দাদার মেজাজটা আজ বড়ই প্রসন্ন। সে খুব আহ্লাদের সঙ্গে বল্লে—"কালই আমি তাঁকে এ শনিবারে আসতে বলব।" তার পর দাদাকে আরও খুসি করবার জন্যে বল্লে—"জান দাদা, এবার বিলেত থেকে তোমার যে ফোটোটা পাঠিয়েছিলে, সেটা ঐ ড্রয়িং রুমেই ছিল; ললিতাদি' প্রথম দেখে তোমায় সাহেব বলে ভুল করেছিলেন, দিদি ঐ নিয়ে ললিতাদি'কে কত ঠাট্টা করে।" সুকুমারের হঠাৎ মনে পড়ে গেল—মাসখানেক পরে রেণুর জন্মদিন,—সে কি উপহার চায়, এখন থেকে যেন ঠিক করে রাখে। দাদার এই অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহে রেণু যথার্থই আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

(২)

রেণু এবার ভীষণ মুস্কিলে পড়ল। আগে তো ললিতাদি' বাড়ী আসতে এত ওজর আপত্তি তুলতেন না? এবার তাঁর হোল কি? এত ব'লেও তো তাঁকে রাজি করা গেল না। দাদাকে কত জোর করেই না সে বলেছিল ললিতাদিকে নিশ্চয় বাড়ীতে আনবে। দাদার দেওয়া এক বোতল লজঞ্চুস সে এখনও ফোরায় নি। উপায় না দেখে রেণু দিদির শরণাপন্ন হল। আজ প্রায় হপ্তাখানেক সাধ্য সাধনার পর ললিতা সুধীরাদের বাড়ী যেতে রাজি হয়েছে। রেণু এতে সত্যি দুঃখিত হ'ল,—তাদের বাড়ী না এসে ললিতাদি যে দিদির ওখানে যেতে চেয়েছেন, এই একেবারে অসহ্য। সে প্রথমে ভেবেছিল, শনিবারে দিদি

ওখানে কিছুতেই যাবে না কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে ললিতাদি'কে দেখ্‌বার লোভ সম্বরণ না কর্‌তে পেরে, কিছুক্ষণের জন্যে রাগ তুলে রেখে দাদার সঙ্গে যাওয়াই ঠিক কর্‌লে।

প্রায় ৭টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন ললিতা এল না, তখন সুধীরা তার আসার আশা ছেড়ে, পাশের বাড়ীর বৌয়ের সঙ্গে গল্প কর্‌তে চলে গেল। রেণুর দুঃখ দেখে, সুকুমার তাকে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলে গাড়ীতে উঠ্‌তে যাচ্ছে, এমন সময় একটা ট্যাক্সি এসে গেটে দাঁড়াল। সুকুমার অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ রেণুর অস্ফুট আনন্দ-ধ্বনিতে চোখ তুলে চেয়ে দেখে, সাম্‌নের ট্যাক্সি থেকে নাম্‌ছে ললিতা। তার সাজগোজে কোন আড়ম্বর ছিল না, তবুও তাকে দেখাচ্ছিল ভাল। প্রকৃত সৌন্দর্য্য কাপড়ের উপরে নির্ভর করে না। ললিতা তার দেরির জন্যে দুঃখ প্রকাশ কর্‌লে, কিন্তু দেরির কারণ সকলের সাম্‌নে বল্লে না। কেবল যাবার সময় ললিতা সুধীরার প্রায় কাণে কাণেই বল্লে—"হঠাৎ বাবা ডেকে পাঠিয়েছিলেন,—আপদ আবার এসে জুটেছে। এবার দেখ্‌ছি কল্‌কাতা ছাড়্‌তে হবে।" সুধীরা ললিতাকে মৃদু আঘাত করে বল্লে—"আমার ভাইটির তো মাথা ঘুরিয়েছ,—এবার তাকে সুখী করে সব দিক বজায় রাখ।" ললিতা আরক্ত মুখে নীচে নেমে গেল।

(৩)

সুকুমারের পিসি হেমাঙ্গিনী বেশীর ভাগ সময় দেশেই কাটাতেন; কিন্তু প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার দাদার সঙ্গে দেখা না করে যেতেন না। তিনি নিজে নিঃসন্তান—তাই দাদার ছেলেদের তিনি আপন সন্তানের মতই ভালবাস্‌তেন। এবার হেমাঙ্গিনী দেবী ঠিক করে এসেছিলেন—সুকুমারের বিয়ে না দিয়ে বাড়ী ফির্‌বেন না। অনেক দেখে-শুনে একটি মনের মতন পাত্রীও পেয়েছিলেন। মেয়ের মা তাঁরই এক বাল্য-সখী। এ বিষয়ে তিনি সুধীরার সঙ্গে পরামর্শ করেন। সুধীরা এ বিয়েতে খুবই খুসি হ'বে,. জানিয়েছে। পিসিমা নিশ্চিন্ত মনে সুকুমারকে ডেকে বল্লেন—"তোর জন্যে একটি ক'নে ঠিক করেছি খোকা।" সুকুমার হেসে বল্লে—"বাড়ীর মধ্যে তুমিই এক কাঁযের লোক দেখ্‌ছি পিসিমা।" "ঠাট্টা করিস নি বাপু! শোন্ বলি,—দিব্যি মেয়েটি, বাপের পয়সাও আছে। ঐটিই তাদের একটি মাত্র সন্তান,—দেবে থোবে ভাল।"

"দুঃখের বিষয় পিসিমা, এই একচোখো বিধাতাপুরুষ তোমার ঐ রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতীটিকে আমার জন্যে গড়েন নি।" "সে আবার কি কথা রে—আমি যে এক রকম ঠিক করে ফেলেছি,—মেয়ের মা যে আমার মিতিন।"

"হ'তে পারে, কিন্তু কি করি বল? আমার ওখানে বিয়ে হওয়া অসম্ভব।"

"তবে তোর বুঝি আর কোথাও ঠিক হয়েছে? কৈ, দাদা তো আমায় কিছু বল্লেন না।"

এমন সময় সুধীরা হাস্‌তে হাস্‌তে ঘরে ঢুকে বল্লে—"না পিসিমা, বাবা কিছু ঠিক করেন নি; তবে খোকার একটি মেয়েকে পছন্দ হয়েছে।"

সুকুমার সুধীরাকে আস্‌তে দেখে, এক লাফে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিসিমা সেকেলে মানুষ—আধুনিক মেয়ে-ছেলেদের ধরণ-ধারণ মোটেই পছন্দ করেন না। বিরক্ত হয়ে বল্লেন—"সে আবার কাদের বাড়ীর মেয়ে গা?" পিসিমার রাগ দেখে সুধীরার হাসি পাচ্ছিল। সে অনেক কষ্টে হাসি চেপে বল্লে—"সে কাদের বাড়ীর মেয়ে জানি না,—তবে মেয়েটি ভাল,—ঐ খুকীদের স্কুলেই পড়ায়।"

"ওমা, কি ঘেন্না, দাদার বেন শেষে হ'রে এক খিষ্টানী মাগী! বৌদিদি থাক্‌লে আজ বুক ফেটে মর্‌তে গো!"

পিসিমার চোখে জল এল। সুধীরা হাসি থামিয়ে বল্লে—"সে খৃষ্টান নয়, ভদ্র ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়। অবিশ্যি বিয়ের আগে খোঁজ খবর নেওয়া হ'বে।"

"যা খুসি তোমরা করগে.—আমি তো এ মুখ দেখাতে পার্‌ব না। তোমার বাবাকে বল, কালই যেন আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দেন।" সুধীরা অনেক করে পিসিমাকে ঠাণ্ডা করে বল্লে—"পিসিমা, খোকা না হয় মেয়েটাকে একবার দেখে আসুক,—পরে বলা যাবে পছন্দ হয় নি; তাই বিয়ে হবে না।"

"তোমার ভাই কি তেমন ছেলে যে আমার মুখ রক্ষে কর্‌বে? সে কখনই যাবে না।"

"না—না, খোকা আমাদের তেমন ছেলে নয়—ওকে সব বুঝিয়ে বল্লে ঠিক যাবে।"

"যা হয় কর বাছা,—এমন জান্‌লে কি ছাই কথা দিই? পোড়া কপাল আমার।"

(৪)

সুকুমার এবার মহা বিপদে পড়েছে। পিসিমা, সুধীরা, বাড়ীর আর আর সকলে মিলে তাকে বিয়ে কর্‌বার জন্যে ধ'রে বসেছে। বিয়েতে তো তার আপত্তি নেই; তবে তাঁরা যার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চান, তাকে বিয়ে করা অসম্ভব। ললিতা থাক্‌তে সে আর কাউকে স্ত্রী বলে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বে না। পিসিমার চোখের জলের ভয়ে সে মেয়ে দেখ্‌তে রাজি হয়েছে। যাবার আগে কিন্তু সে ললিতাকে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলে। চিঠিতে সে তার সব গোপন কথা জানালে। এমন কি, সে এও জানালে যে, পিসিমার অনুরোধে সে মেয়ে দেখ্‌তে যাচ্ছে। তবে সেটা নামে মাত্র,—ললিতা থাক্‌তে আর কোন মেয়েকে দেখ্‌বার তার ইচ্ছাও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

পরদিন সুকুমার ললিতার চিঠির আশায় উৎসুক হয়ে রইল; কিন্তু ললিতার কাছ থেকে কোন চিঠিই এল না। রেণুর মুখে সুকুমার শুন্‌লে যে, ললিতা এ ছুটির পর আর আস্‌বে না। রেণু স্কুল থেকে শুনে এসেছে—ললিতার বিবাহের সব ঠিক। অধীর হয়ে সুকুমার জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "মেয়েরা কি করে জান্‌তে পার্‌লে?" রেণু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে—"আমি বাবা কিছু জানি না, মীরা বাইরে থেকে শুনে এসেছে।" "কে ছাই মীরা জুটেছে,—যত রাজ্যের বাজে খবর তার কাছে আগে আসে।" "না দাদা, মীরা একা বলে নি,—আমাদের ক্লাশের মিনি বল্‌ছিল, রোজ বিকেলে একটা বড় মোটরে ক'রে ললিতাদি' বাইরে যান। অত বড় 'কার' তাঁর নিজের কখনই নয়। তাই যদি হ'ত, তা' হ'লে তিনি কি স্কুলে পড়াতে আস্‌তেন? সকলেই তো তাই ব'লে, বোধ হয় ললিতাদি'র যার সঙ্গে বিয়ে হ'বে, সেই রোজ তাঁকে নিতে গাড়ী পাঠায়।" রেণুর যুক্তির কাছে সুকুমার হার মান্‌লে,—সত্যিই তো, পয়সার অভাব না থাক্‌লে ললিতা কি আর স্কুলে পড়াতে আস্‌তো? নিশ্চয় তার বড়লোক ভাবী স্বামী তাকে রোজ নিয়ে যায়। ছিঃ, সুকুমার কেন না জেনে-শুনে তাকে অমন চিঠিখানা লিখ্‌লে,—সে নিশ্চয় তাতে অপমানিত হয়েছে,—তাই আর কোন জবাব দেয়নি। হু হু ক'রে ভাব্‌না এসে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত তাকে ডুবিয়ে দিলে। এক টিন সিগারেট ধ্বংস করেও যখন কোন মীমাংসা হ'ল না, তখন সুকুমার একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে গেল তার দিদির বাড়ী। তার দিদির তখনও বৈকালিক সাজসজ্জা শেষ হয় নি; তাই সে একা বারাণ্ডায় এসে বস্‌ল। অদূরেই সুধীরার তিন বছরের মেয়ে মিনু খেলাতে মত্ত। মিনুর যখন মামার দিকে দৃষ্টি পড়্‌ল, সে সোজা গিয়ে সুকুমারের পকেটে হাত পূরে দিলে। অন্য দিনের মত সেখানে মিনুর জন্যে কিন্তু কিছুই ছিল না। বিষণ্ণ মনে মিনু একবার মামার দিকে চাইলে। মামার চেহারা দেখে তিন বছরের মিনুরও বুঝ্‌তে বাকি রইল না যে, তার মামার কি একটা হয়েছে। সে বিনা নিমন্ত্রণে সুকুমারের কোলে চ'ড়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"মামা, তোমাকে কে বকেছে? বল দেখি তার নামটা, তাকে এইসা গো ঠ্যাঙ্গান ঠ্যাঙ্গাব, কিছুদিন মনে থাক্‌বে।" মিনুর মুখে এই লম্বা-চওড়া কথা শুনে সুকুমার হেসে ফেল্লে। মিনুকে চুমু দিয়ে জান্‌তে চাইলে, কে তাকে এ কথা শিখিয়েছে। মিনু গম্ভীরভাবে বল্লে—"বাঃ, সেদিন কাদু ঝি সইসের ছেলেকে ঐ বলে বক্‌ছিল যে।"

অল্পক্ষণ পরে সুধীরাও বারাণ্ডায় এসে বস্‌ল। সুকুমারকে দেখে বল্লে—"কি খোকা, কি মনে করে?"

"দেখ দিদি, আমি কাল বালিগঞ্জে যেতে পার্‌ব না।"

"কেন রে, আবার মত বদলালি কেন? সব তো ঠিক আছে!"

"নাঃ, আমি আর কলকাতায় থেকে বৃথা সময় নষ্ট কর্‌ব না। প্র্যাকটিস তো বিশেষ জম্‌ল না,—এবার ভাব্‌ছি, বিদেশে গিয়ে দেখ্‌ব।"

"ওমা, এ আবার কি কথা,—এই তো কালই উনি বল্‌ছিলেন, তোর এরই মধ্যে বেশ পশার হয়েছে।"

"কৈ আর হ'ল? অন্য চেষ্টা দেখ্‌তে হ'বে।"

"আচ্ছা, কালতো যোগেন বাবুর ওখানে চল্‌—তার পর নয় বিদেশে যাবি।"

"না, আমি কালই যাব।"

সুধীরা উঠে গিয়ে সুকুমারের চেয়ারের হাতার উপর বস্‌ল। সস্নেহে তার চুলের ভিতর হাত চালাতে চালাতে

বল্লে—"খোকা, আমার কথা রাখ, কাল বালিগঞ্জে চল্। মেয়েকে যদি তোর পছন্দ না হয়, তা হ'লে জোর ক'রে তো আর তোর কেউ বিয়ে দেবে না,—মিথ্যে কেন ভেবে মর্‌ছিস্? আমি সে মেয়েকে জানি। তাকে তো অপছন্দ হবার কোন কারণ দেখি না।"

যখন তোমাদের হাতে পড়েছি, তখন আর উপায় নেই। কাল না হয় যাব, কিন্তু তার পরদিনই আমি মাসিমার কাছে রাঁচি চলে যাব।"

"আচ্ছা, তাই হ'বে। আজ এখানে খেয়ে যা না?"

"না, আজ হ'বে না—বাবাকে বলে আসিনি, তিনি আমার জন্যে শেষে না খেয়ে বসে থাক্‌বেন।"

"কাল তবে ঠিক থাকিস্—আমি বিকেলের মধ্যেই হাজির হ'ব।"

অনেক কান্নাকাটির পর পিসিমা সুকুমারকে নিয়ে মেয়ে দেখ্‌তে গেলেন। মেয়ের বাপ বড় ব্যারিষ্টার। বালিগঞ্জের ওদিকে মস্ত বাড়ী। ব্যারিষ্টার সাহেব স্বয়ং সুকুমারদের গাড়ী থেকে নামালেন। পিসিমা উপরে চলে গেলেন, সুকুমার নীচেই রইল। ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল; কিন্তু কৈ, মেয়ে দেখাবার তো নাম নেই। তবে কি ব্যারিষ্টার সাহেব আগেই সব টের পেয়ে বিয়ে থামিয়ে দিয়েছেন? সুকুমার আরামের নিঃশ্বাস ফেল্লে। কিছুক্ষণ পরে খাবার জন্য উপর থেকে ডাক এল। খাবারের আয়োজন খুব প্রচুর পরিমাণেই হয়েছিল কনের মা খুব যত্ন করে সুকুমারকে খাওয়ালেন। এঁদের মধুর ব্যবহার কিন্তু তাকে লজ্জা দিচ্ছিল। সে তো মনে মনে জানে, সে তাদের মেয়েকে কোন মতেই বিয়ে কর্‌তে পার্‌বে না, তাই তাদের যত্নে সে কুণ্ঠিত হ'ল। খাবার পর ব্যারিষ্টার সাহেব তাকে নিয়ে গেলেন বস্‌বার ঘরে। কিছুক্ষণ পরে সাহেব বল্লেন—"একটু বোস, আমি লতাকে নিয়ে আসি।"

লতাকে দেখবার তার কোনই ইচ্ছা ছিল না,—সে তখন ললিতার ধ্যানে মগ্ন। হঠাৎ চুড়ির শব্দে তার চমক্ ভাঙ্গল। ফিরে দেখে—সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে তার আরাধ্যা দেবী।

—"এ কি? তুমি যে এখানে? আমি তো জান্‌তাম না, যোগেন বাবুর সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে।"

"আপনি আমার পরিচয় কি কোন দিনও জান্‌তে চেয়েছিলেন?"

"তোমাকে জানি তাই যথেষ্ট,—তোমার পরিচয় নেবার প্রয়োজন বোধ করি নি।"

"বেশ লোক তো আপনি,—আমি কার মেয়ে কিছু না জেনেই আমাকে চান?"

"তোমাকে পেলে আমার জীবন ধন্য হ'বে, সে তুমি যারই মেয়ে হও না।"

"দেখ্‌ছি আমার পরিচয়টা নিজেকেই দিতে হ'বে। আচ্ছা থাক, এখন বলুন, কনে পছন্দ হয়েছে?"

"তাকে এখনও চোখে দেখি নি।"

"সে কি? চোখ খারাপ হয়েছে না কি? সাম্‌নেই তো সে দাঁড়িয়ে!"

"ললিতা, তুমি তো সব জান,—তবে কেন এমন ঠাট্টা কর্‌ছ?"

"ঠাট্টা নয়, সত্যি বল্‌ছি, তুমি যদি খোঁজ নিতে তো জান্‌তে—আমিই যোগেন বাবুর মেয়ে।"

"ললিতা!" সুকুমার তার দুই হাত নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধর্‌লে।

"আমার কথা বিশ্বাস হয়?"

"হয়,—তবে স্কুলে পড়াতে কেন?"

"সে শুনে তোমার কোন লাভ নেই।"

"আছে, বল।"

"এরই মধ্যে হুকুম কর্‌ছ, এখনও কোন উত্তর দিই নি।

"চালাকি নয়, বল লতা।"

"বল্‌ছি।" ক্ষণেক ইতস্ততঃ করে বল্লে—

"সে ভদ্রলোকটি বাবার বন্ধুর ছেলে,—প্রায়ই আমাদের বাড়ী আস্‌ত। কতবার বলেছিলাম তাকে—বিয়ে কর্‌তে পারব না,—তবু সে জোর কর্‌ত।" বাধা দিয়ে সুকুমার বল্লে—"তার তো কম আস্পর্দ্ধা নয়। কে সে ব্যক্তি?"

"আহা সবটাই শোন না,—তার নামে তোমার কোন প্রয়োজন নেই। বাবার বন্ধুর খাতিরে তাকে বাড়ী আস্‌তে দিতেই হ'ত। অনেক বলে-কয়েও যখন কিছু হ'ল না, তখন রণে ভঙ্গ দিলাম। হেমবালাদির ও তখন লোকের দরকার ছিল, সুযোগে কাজ নিলাম। যেদিন তোমার দিদির ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল, সেদিন এই ভদ্রলোকটী এখানে এসেছিলেন, তাই আমার যেতে অত দেরি হয়েছিল।"

"সে এসেছিল তাতে তোমার কি ?"

"আমার কিছু নয় বটে, তবে একটা লোককে বার বার আঘাত করতে ভাল লাগে না।"

"মাপ কর ললিতা, আমি না ভেবে ও কথাটা বলেছি। তার পর কি হ'ল ?"

"কি আর হ'বে, এবার তাকে স্পষ্ট করে সব বল্লাম—"

কি বল্লে ?"

বল্লাম্ আমি অন্যকে বিয়ে করব।"

'কাকে ?"

সে খোঁজে তোমার কি ?"

'আমার চিঠির উত্তর দাও নি কেন ?"

"চিঠি না লিখে নিজেই উত্তর দিতে এসেছি।"

"কি উত্তর দেবে ?"

"এক উপদ্রবের হাত থেকে রক্ষা পেতে না পেতে আবার এক নতুন উপদ্রব এসে জুটেছে।"

"ললিতা, আমার ভালবাসাটা কি উপদ্রব বলে মনে হয় ? তাই যদি হয় তো বল, সরে যাই। তোমাকে ভালবাসা দিয়ে পীড়ন করতে চাই না। আমার জন্যে তোমাকে ঘরছাড়া হ'তে হ'বে, এটা আমার অসহ্য।" সুকুমারের কথায় একটা ব্যথার সুর বেজে উঠল।

ললিতার সুন্দর চোখে এক অপূর্ব্ব হাসির রেখা দেখা দিল। সুমধুর কণ্ঠে সে বল্লে—"এর আগে চ'লে গেলে হ'ত। এখন আর সময় নেই,—এবার আমিই ছেড়ে দিতে পারব না।" সুকুমার সজোরে ললিতাকে নিজের কাছে টেনে নিলে। স্বহস্তে তার চুল খুলে দিয়ে গাঢ় স্বরে ডাকলে—"শকুন্তলা!"

"ছিঃ, ও অলক্ষুণে নাম দিয়ে ডেক না,—জান তো দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিন্তে না পেরে তাড়িয়ে দেয় ?"

"সে ভয় তোমার নেই। এ দুষ্মন্ত জন্ম-জন্মান্তরের পরও ঠিক তার শকুন্তলাকে চিনে নেবে।"

বাইরে থেকে সুধীরা হেঁকে বল্লে—"কি খোকা, কনে পছন্দ হ'ল ? পিসিমা কিন্তু বিয়ের ফর্দ্দ করছেন।"

বিবিধ-প্রসঙ্গ

চন্দননগরের পাদ্রী জ্যোতির্ব্বিদ্ গেরেণের শতবর্ষের গ্রহণ গণনা ও তাঁহার সম্পাদিত প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক

শ্রীহরিহর শেঠ

পুরাতন চন্দননগরের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে করিতে "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" নামক একখানি অতি পুরাতন গ্রন্থের চন্দননগরের সহিত সম্পর্কিত, বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত সংস্করণের কথা অবগত হই। তৎপর বহু চেষ্টার পর শেষে চন্দননগরের মধ্যেই উহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হই। (১) ফাদার গেরেন্ (I. F. M. Guerin) নামক একজন ফরাসী ধর্ম্ম-যাজকের দ্বারা বাঙ্গালা অক্ষরে এই সংস্করণ সম্পাদিত হইয়া চন্দননগর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ফাদার গেরেন্,—একজন অসাধারণ ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ—চন্দননগরের সেণ্টলুই গির্জ্জার পাদ্রী হইয়া আগমন করেন। তখনকার কালে একজন বিদেশীয়ের হিসাবে তিনি বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন। বাঙ্গলা ভাষায় বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে, এই গ্রন্থ তিনি চন্দননগরে অবস্থিতিকালে সম্পাদনপূর্ব্বক শ্রীরামপুরে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তক দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে গুরু-শিষ্যের কথোপকথনছলে খৃষ্ট ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্য ধর্ম্মের দোষ ও ভ্রমসমূহের কথা আলোচিত হইয়াছে। শেষাংশে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের গণনা আছে। জ্যোতীষ শাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। এই গণনা ভিন্ন চন্দননগর হইতে ইয়োরোপে প্রত্যাগমনের পর অর্থাৎ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পর, ভারতীয় জ্যোতীষ সম্বন্ধে তিনি একখানি বহু গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

গেরেণ সাহেবের সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখ লেখা আছে। এই পুস্তকের মূল রচয়িতা তিনি না হইলেও, তাঁহার দ্বারা ইহার এরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে যে, উহা প্রায় একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। তিনি নিজের রচিত তিনটি কথোপকথন উহাতে সন্নিবেশিত করেন এবং মিথ্যা ও অনাবশ্যক বোধে, মূল গ্রন্থের অনেক অংশ বাদ দিয়া ইহাকে নূতন আকার দান করেন। এই কার্য্যের জন্য দুইজন খ্রীষ্টান, দুইজন ব্রাহ্মণ ও একজন মুসলমানের সাহায্য তাঁহাকে লইতে হইয়াছিল,

(১) খ্যাতনামা ডাক্তার সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর শ্রীমাণী মহাশয়ের নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হই।

এবং নয় মাস কাল সময় লাগিয়াছিল। এই সংশোধন করিতে এবং অনাবশ্যক অংশ বাদ দিতে মূল গ্রন্থের অর্দ্ধেকেরও উপর বাদ যায়। (২)

গ্রন্থ শেষে যে ১০৫ বৎসরের গ্রহণ-তালিকা দেওয়া আছে, তাহা তাঁহার নিজের গণনা। প্রথমে গ্রন্থপরিচয়ে ও গ্রন্থের মধ্যে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার এই গণনা বাঙ্গালা ও ফরাশডাঙ্গার নিমিত্ত। এইরূপ একজন বৈদেশিক জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে এখানকার লোকের জন্য এতাদৃশ পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালাভাষায় লিখিয়া এবং তখনকার দিনে বহু ব্যয় করিয়া গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন, ইহা অনেকেরই জানা নাই। তাঁহার ও তাঁহার গ্রন্থের কথা কিছু বলিয়া, এই প্রবন্ধের শেষে, তাঁহার দ্বারা গণিত গ্রহণের তালিকা ও সময়াদি সন্নিবেশিত করিয়া ইহার উপসংহার করিব।

এই বঙ্গভাষাভিজ্ঞ জ্যোতিষ শাস্ত্রবিৎ পাদ্রীর সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থাদি হইতে যতদূর অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি, তাহাতে চন্দননগরনিবাসী শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় প্রথম সাহিত্য-সংহিতা পত্রিকায় ইঁহার কথা লিখিয়াছেন (৩)। তৎপরে কলিকাতার সেন্ট্ জেভিয়ার্ কলেজের ফাদার হস্তে (Father Hosten S. J.) লিখিত প্রবন্ধে (৪), তাহার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত "১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গ-সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধে (৫), এবং তাহার পর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে (৬) ও তাঁহার লিখিত বহু গবেষণাপূর্ণ History of Bengali Literature in the Nineteenth Century গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বঙ্গভাষা বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই পুস্তকের নাম উল্লিখিত আছে বলিয়া মনে হইতেছে না।

সাগরবাবুর প্রবন্ধ ভিন্ন উক্ত সকল স্থানে "কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ" গ্রন্থ প্রসঙ্গেই প্রধানতঃ পাদরী সাহেবের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। হস্তে সাহেব ও সুশীলবাবু উভয়ের লেখায় গেরেণের ল্যাটিন ভাষায় লিখিত পুস্তকের মুখবন্ধের প্রসঙ্গে তাঁহার গ্রহণ-গণনার কথামাত্র লেখা আছে; এবং এই সাহেবের লেখা হইতেই প্রথম জানিতে পারা যায় যে, তিনি ভারতবর্ষের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উপর একখানি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সাগরবাবুর লেখায় তাঁহার বঙ্গভাষায় সম্পাদিত ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থের কথা বেশি কিছু না থাকিলেও, তাঁহার জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞান ও গ্রহণ-গণনার কথা কিছু জানা যায়। আর একটি কথা—কেবলমাত্র তাঁহারই প্রবন্ধে ১০৪ বৎসরের গ্রহণ গণনার কথা লিখিত আছে। নচেৎ অন্য যেখানে যেখানে এই প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে, সেইখানেই ১৪০ বৎসরের বলিয়া লেখা আছে। এই ভুলের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিয়াছি, গেরেণের গ্রন্থে দুই বিভিন্ন স্থানে ১৪০ বৎসর ছাপা আছে। ইহা হইতে মনে হয়, লেখকেরা মূল গ্রন্থখানি না দেখিয়া, তাহা হইতে উদ্ধৃত কেবল ভুল মুখবন্ধের অনুসরণ করিয়াই এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ১০৫ বৎসরের গণনা দেওয়া আছে; কিন্তু গ্রন্থের পরিশিষ্টে তালিকার প্রথমে ১০৪ বৎসর ছাপা আছে। সাগর বাবু পুস্তকখানি সমস্ত পাঠ করিলেও, তিনিও ঐ লেখা দৃষ্টেই সম্ভবতঃ ১০৪ বৎসর লিখিয়াছেন।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ গ্রন্থ আগষ্টিনিয়ান্ সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গলা মিশনের অধ্যক্ষ মানোয়েল্ দা আসাম্সাও (Father Frey Manoel da Assumpcao) কর্ত্তৃক ঢাকার নিকট নাগোরি ভাওয়াল গ্রামে লিখিত হয়। বাঙ্গালা ও পোর্ত্তুগীজ এই উভয় ভাষায় এক দিকে পোর্ত্তুগীজ এবং অপর দিকে বাঙ্গলায় রোমান অক্ষরে, এক দিকে Cathecismo da Doutrina Christaa এবং অপর দিকে কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ("Creper Xaxtrer Orth bhed") নাম দিয়া প্রকাশিত হয়।

গেরেণ সাহেব পুস্তকের মুখবন্ধে ল্যাটিন ভাষায় লিখিয়াছেন, কেবল পোর্ত্তুগীজ অংশ মানোয়েল্ দ্বারা লিখিত। বাঙ্গলা অংশ ভাওয়ালের একজন বাঙ্গালি খৃষ্টানের লেখা।

মানোয়েল্ সাহেব পোর্ত্তুগালের অন্তর্ব্বর্ত্তী এভোরা (Evora) নামক স্থানের অধিবাসী। তিনি Missio de St. Nicolae Tolentino (Bhowal) নামক মিশনের কর্ত্তা ছিলেন। এই মিশনই আগষ্টিনিয়ান্ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্থাপিত। ইনিই সম্ভবতঃ কিছুকাল ব্যাণ্ডেল এবং চুঁচুড়ার দ্বিতীয় পুরোহিত ছিলেন। (৭) চন্দননগরের বিবাহ রেজিষ্টার বহিতেও তাঁহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। (৮)

ভাওয়ালের নিকট এখনও উক্ত মিশনের গির্জ্জা ও অনেক পোর্ত্তুগীজ খৃষ্টানের বসতি আছে এবং পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে লিখিত গান এখনও উক্ত গির্জ্জায় গীত হইয়া থাকে। (৯) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র

---

(২) Three first Type-Printed Bengali Books
Bengal : Past and Present, Vol. IX.

(৩) জ্যোতির্ব্বিদ্ ফাদার জোসেফ মারিয়া জের্‌গা এবং তাঁহার গ্রহণ গণনা। সাহিত্য-সংহিতা, ৫ম খণ্ড।

(৪) Three first Type-Printed Bengali Books
Bengal : Past and Present, Vol. IX.

(৫) মানসী ও মর্ম্মবাণী।—৮ম বর্ষ।

(৬) ইউরোপীয় লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গলা পুস্তক।
সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা। ১৩২৩ সাল।

(৭) Bandel and Chinsurah Church Registers (1759-1913) Bengal : Past & Present, Vol. XI.

(৮) Chandernagore Marriage Register
Bengal : Past & Present, 1914, Vol. IX.

(৯) ইউরোপীয় লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গলা পুস্তক।
সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা—১৩২৩ সাল।

সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে—"ঢাকার অন্তঃপাতী ভাওয়াল নামক স্থানের ভাষায় বিরচিত বাইবেলের খানিকটা অনুবাদ লিসবন্ নগরে ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত হয়। ঐ পুস্তকে যে ভূমিকা দৃষ্ট হয়, তাহা ২৮শে আগষ্ট ১৭৩৪ খৃঃ অব্দে লেখা শেষ হয়।" এইরূপ লেখা আছে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের সম্বন্ধেও যাহা জানা যায়, তাহাতে উহা ১৭৩৪ খৃঃ অব্দে লিখিত এবং ১৭৪৩ খৃঃঅব্দে ফ্রান্সিস্কো দা সিলভা (Francisco da Silva) দ্বারা লিস্‌বনে মুদ্রিত হয়। যদিও এই পুস্তকখানি ঠিক বাইবেলের অনুবাদ নহে, তথাপি দীনেশ বাবুর উল্লিখিত গ্রন্থ ইহা ভিন্ন স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে বলিয়াই অনুমান হয়। তিনি এই একখানি পুস্তকই পাওয়া যাইতেছে বলিয়াছেন। কিন্তু হস্তে সাহেব, অমূল্য বাবু ও সুশীল বাবুর প্রবন্ধে, মানোয়েল-বিরচিত একখানি বাঙ্গলা-পোর্ত্তুগীজ ব্যাকরণ অভিধান (Vocabulario em Idoma Bengallac Portuguez) এবং আর একখানি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক (Catachism of Christian Doctrine) এই দুইখানি গ্রন্থের কথা জানা যায়। হস্তে'র প্রবন্ধের সহিত অভিধানের পরিচয়-পত্রের যথাযথ ফটো-প্রতিলিপি মুদ্রিত আছে। লিস্‌বনের রোমান অক্ষরে মুদ্রিত আলোচ্য পুস্তকের একখণ্ড খণ্ডিত অবস্থায় কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটির গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।

এ পর্য্যন্ত যাহা নির্ণীত হইয়াছে, তাহাতে এই পুস্তকত্রয়ই প্রথম ইউরোপীয় লিখিত বাঙ্গলা পুস্তক, এবং ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম ছাপা বই বলিয়া জানা যায়। আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রথম হইতেও পারে। শেষোক্ত পুস্তকখানির প্রথম রচনা সম্বন্ধে এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে। বসুনা (ভূষণা) রাজ্য ধ্বংসের পর ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে তথাকার কোন এক রাজপুত্র ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হন। তথায় খৃষ্টান পাদরীদের সংস্রবে আসিয়া তিনি তাঁহাদের নিকট উপদেশাদি প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, প্রথমে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে স্বীকৃত হন নাই। শেষে তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ভগবানের ইচ্ছা, ইহার স্বপক্ষে প্রমাণ পাইয়া পরে তিনি খৃষ্টান হন। এই সময় তাঁহার পূর্ব্বনামের পরিবর্ত্তে ডন্ এন্টোনিও (Don Antonio de Rozario) নাম প্রাপ্ত হন। রাজপুত্র বলিয়া নামের পূর্ব্বে ডন্ সংযোজিত হয়। তাঁহার নবগৃহীত ধর্ম্মের বহুল প্রচার উদ্দেশ্যে তিনিই বাঙ্গলা ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা গুপ্ত বিদ্যার দ্বারা প্রথমে তাঁহাকে মারিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে বলেন, যদি গ্রন্থখানি অগ্নিগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াও ভস্মীভূত না হয়, তাহা হইলে এ ধর্ম্ম সত্য বলিয়া মানিয়া লইবেন। কথিত আছে, অগ্নি পরীক্ষায় ইহা উত্তীর্ণ হয়। তাহা দৃষ্টে তখন বহু হিন্দু, এমন কি ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এভোরার সাধারণ পুস্তকাগারে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এখনও রক্ষিত আছে।

গেরেণ সাহেবের সম্পাদিত কৃপার শাস্ত্র গ্রন্থের চন্দননগর সংস্করণের ল্যাটিন ভাষায় লিখিত মুখবন্ধ ও পরিচয়-পত্রের প্রথমাংশ ভিন্ন আর সমস্তই বাঙ্গলা ভাষায় বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত। উহার ভাষা, রচনা বা লিখিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সুশীল বাবু ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধে (১০) সে বিষয়ে অনেক কথা জানা যায়। চন্দননগর সংস্করণে গায়ত্রী মন্ত্র প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রের যে সকল কথা লিখিত আছে, ঐ সকল অংশই সাহেবের দ্বারা সংযোজিত। তিনি বিশেষ পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে ইহা সংগ্রহ করেন। শুনা যায়, চন্দননগরের গোয়াবাগান নামক পল্লীনিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র শিরোমণির নিকট তিনি সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষা করেন; এবং প্রভূত অর্থ দানে তাঁহারই নিকট হইতে ব্রাহ্মণদিগের গোপনীয় গায়ত্রী মন্ত্রাদি জানিয়া লইয়া গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

এই বাঙ্গালা পুস্তকের ভাষার সম্বন্ধে কিছু বিশেষ প্রশংসা করিবার না থাকিলেও, এবং সে সময়ে ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বাঙ্গলা রচনার অভাব না থাকিলেও, সে কালের মিশনারি বাঙ্গলা এবং প্রাচীন গদ্য রচনার নিদর্শন,—বিশেষতঃ ইহা ইয়োরোপীয় কর্ত্তৃক লিখিত ও সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত বাঙ্গলা পুস্তকের একটি সংস্করণ, এই হিসাবেও ইহা মূল্যবান। এই গ্রন্থের পরিচয়-পত্রে বাঙ্গলায় এইরূপ লিখিত আছে—

কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ।
সূর্য্যের আর চন্দ্রের গ্রহণ গণনার সহিত ১৪০ বৎসরের
আরম্ভ ১৮৩৬ সাল অবধি
সহর চন্দননগর
এবং সমস্ত বাঙ্গালা দেশের নিমিত্তে।
করিয়াছেন জাকবছ ফ্রঁছিসকস মারিয়া গেরেঁ
চন্দননগরের সর্ব্ব গ্রাহের পাদরী
নিয়োজিত প্রেরিত সম্পর্কীয় এবং ধর্ম্মাস্ত্রায় সভায়।
দ্বিতীয় বার এবং শুদ্ধরূপে
শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত হইল।
সন ১৮৩৬।

ইহার পর বাঙ্গলায় ভূমিকার মত এইরূপ লেখা আছে।—

"কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ কথন।"
হিন্দু ও মোসলমানেরে জানান।

"বন্ধু হিন্দু ও মোসলমান শুনহ। পুথি সকলের উত্তম পুথি। শাস্ত্র সকলের উত্তম শাস্ত্র। শাস্ত্রী সকলের উত্তম শাস্ত্রী। বৃহত্তর শাস্ত্রী কৃপার শাস্ত্র এবং কৃপার শাস্ত্রের পুথি।

এই পুথিতে শুনহ মন দিয়া পাইবা বুঝন বুঝান বুঝিবার বুঝাইবার উপায় করিবার। আত্মার বেদের অর্থ শুনহ শুনাও। পৃথক জানিয়া বুঝহ বুঝাও। পরিণামের পথ ধর ধরাও। গুরু শিষ্যের ন্যায়েতে

---

(১০) কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণ তত্ত্ব। সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৩ সাল।

ন্যায় করিতে শিখহ শিখাও। ইহা জানিয়া বুঝিয়া মানিয়া মুক্তি হইবেক। দশ আজ্ঞা পালন কর যদি।"

এই গ্রন্থে গল্পের ছলে অনেক উদাহরণাদি দ্বারা অনেক বিষয় বুঝান আছে। দশ আজ্ঞায় তারকেশ্বর, কালীঘাটের কালী, সত্যপীর, হাঁচি, টিকটিকি, বারবেলা প্রভৃতি মানিতে নিষেধ উপদেশ আছে। পাঠক পাঠিকাদের কুতুহল নিবারণার্থ সে সকল কথা উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা হইলেও এখানে তাহার স্থান নাই। সুবিধা হইলে পরে সেই পুস্তকের পরিচয় দিবার বাসনা রহিল।

গ্রন্থের শেষাংশে পরিশিষ্ট রূপে কেবল ১০৫ বৎসরের গ্রহণ-গণনা আছে। সাহিত্য-সংহিতায় ১০৪ বৎসরের পঞ্জিকা মুদ্রিত আছে বলিয়া লেখা আছে। (১১) কিন্তু তাহা নহে ১০৫ বৎসরের গ্রহণ-গণনার তালিকা ভিন্ন, পঞ্জিকার আর কিছু নাই। গণনার কালের সম্বন্ধে ভুলের কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। হন্টে সাহেবের প্রবন্ধে আছে ১৮১৬ হইতে ১৯৪০ (১২) এবং সুশীল বাবুর প্রবন্ধে আছে ১৮৩৬ নাগাইদ ১৯০৪ (১৩)। স্বয়ং গ্রন্থকার পুস্তকের পরিচয়-পত্রে ১৪০ বৎসর এবং অন্যত্র একাধিক স্থানে ১০৪ বৎসর লিখিয়াছেন। এইরূপ সর্ব্বক্ষেত্রে ভুলের কারণ ঠিক করা যায় না। সেকালের মুদ্রাকর প্রমাদ বলিয়া ধরিয়া লইলেও, উক্ত লেখক মহাশয়গণ—যাঁহারা পুস্তকখানি দেখিয়াছেন, তাঁহারা কি কারণে এই ভুল করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না।

এই গ্রন্থ প্রকাশের অনেক দিন পূর্ব্বেই গ্রহণ গণনা বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ তালিকা এবং কোথা হইতে দৃশ্য বা অদৃশ্য হইবে তাহা নির্ণয় পূর্ব্বক পাদরী সাহেব লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা হইতে অনেক সময় গ্রহণ কালে পুরশ্চরণাদির সময় প্রভৃতির কথা এখানকার হিন্দু অধিবাসীদের বলিয়া দিতেন। এতদ্দ্বারা অনেকেই তাঁহার জ্যোতিষ বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাইতে লাগিলেন। পরিশেষে বৃন্দাবনচন্দ্র গুঁই নামক চন্দননগরের তৎকালীক 'নতের' জনৈক ভদ্রলোকের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, প্রধানতঃ তাঁহারই অনুরোধে তিনি তাঁহার গণনা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া কৃপার শাস্ত্রের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কতিপয় গ্রহণের সময় আমি তাঁহার গণনা মিলাইয়া দেখিয়াছি এবং তাহাতে গণনা অভ্রান্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন হওয়ায়, এমন একটি পুরাতন সামগ্রী যাহাতে এত শীঘ্র লুপ্ত না হয় এই উদ্দেশ্যে উহা যথাযথ রূপে ইহার সহিত প্রকাশ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। (১৪)

(১১) জ্যোতির্ব্বিৎ ফাদার জসেফ মারিয়া জেরা এবং তাঁহার গ্রহণ গণনা। সাহিত্য-সংহিতা ১৩১১

(১২) The three first Type-Printed Bangali Books. Bengal: Past and Present, Vol. IX.

(১৩) The Bengali Literature in the Nineteenth Century ও ইউরোপীয় লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গলা পুস্তক।

(১৪) 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থ সম্বন্ধে বিগত শ্রাবণের মাসিক বসুমতীতে 'চন্দননগর পরিচয়' প্রবন্ধে ও আশ্বিনের প্রবাসীতে 'চন্দননগরের সাময়িক পত্র ও গ্রন্থ পরিচয়' প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি,—এই প্রবন্ধের কোন কোন অংশের সহিত তাহাদের যে সামান্য অমিল দেখা যায়, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধেরই ভুল এবং আমার অনবধানতা বশতঃই তাহা ঘটিয়াছে।—লেখক।

১৮৩৬ হইতে ১৯৪০ পর্য্যন্ত গ্রহণ গণনা। (১৫)

সন	গ্রহণ	তাং	মাস	ঘণ্টা	মিনিট	সময়	দৃশ্যাদৃশ্য	কলা	গ্রাস।	স্থিতির নিয়ম।
১৮৩৬	চন্দ্র	১	মে	২	১৫	বৈকালে	অদৃশ্য	৪	অপূর্ণ	
	সূর্য্য	১৫	মে	৮	১৫	বৈকালে	,,	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি কিন্তু দৃশ্য ও মধ্যাস্থ হইবে ইং বিলাতের উত্তরে	
	চন্দ্র	২৪	আকটোবর	৭	৩০	বৈকালে	দৃশ্য	১।	অপূর্ণ	আরম্ভ ৭ ঘণ্টায় মুক্ত ৮ ঘণ্টায়
১৮৩৭	চন্দ্র	২১	এপ্রেল	২	৪৫	সকালে	,,	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ১ ঘণ্টায় মুক্ত ৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে
	সূর্য্য	৫	মে	১	১৫	সকালে	অদৃশ্য	০	ছোট	কিন্তু দৃশ্য হইবেক কামস্কাটকায়
	চন্দ্র	১৪	আকটোবর	৫	১৫	সকালে	দৃশ্য	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে মুক্ত ৭ ঘণ্টায়
১৮৩৮	চন্দ্র	১০	এপ্রেল	৮	০	সকালে	অদৃশ্য	৭	অপূর্ণ	
	চন্দ্র	৩	আকটোবর	৮	৪৫	বৈকালে	দৃশ্য	১০৮	,,	আরম্ভ ৭ঘণ্টা ১৫ মি মুক্ত ১০ঘণ্টা ১৫
১৮৩৯	সূর্য্য	১৫	মার্চ্চ	৮	১৫	বৈকালে	অদৃশ্য	০	সর্ব্ব	কিন্তু মধ্যাস্থ অতি দৃশ্য ছেলেগাঁবিএ
	সূর্য্য	৮	সেপ্তেম্বর	৪	১৫	সকালে	দৃশ্য	০	মুক্তের সময়	অঙ্গুরীয়কাকৃতমধ্যস্থ এবং অতি দৃশ্য করিয়ায়
১৮৪০	চন্দ্র	১৭	ফিবরেল	৭	৪৫	বৈকালে	,,	৪।	অপূর্ণ	আরম্ভ ৬ঘণ্টা ৩০মিনিটে মুক্ত ৯ ঘণ্টায়
	সূর্য্য	৪	মার্চ্চ	৯	৪৫	প্রাতে	,,	০	,,	কিন্তু মধ্যস্থিত তারতারি চিনায়

(১৫ মূল গ্রন্থে ঠিক যেরূপ লেখা আছে, তাহার কোন পরিবর্ত্তন করা হইল না। তালিকা যথাযথ রূপে লিখিত হইল।

সন	গ্রহণ	তাং	মাস	ঘণ্টা	মিনিট	সময়	দৃশ্যাদৃশ্য	কলা	গ্রাস।	স্থিতির নিয়ম।
	চন্দ্র	১৩	আগষ্ট	১	১৫	বৈকালে	অদৃশ্য	৭।	„	
১৮৪১	চন্দ্র	৬	ফিবরেল	৮	১৫	প্রাতে	অদৃশ্য	০	সর্ব্ব	
	সূর্য্য	২১	ফিবরেল	৪	৪৫	বৈকালে	অদৃশ্য	০	অপূর্ণ	কিন্তু দৃশ্য ছিবেরায়
	সূর্য্য	১৮	জুলই	৭	৪৫	বৈকালে	অদৃশ্য	০	„	কিন্তু দৃশ্য ফ্রাঁছে
	চন্দ্র	২	আগষ্ট	৩	৪২	বৈকালে	অদৃশ্য	০	সর্ব্ব	
১৮৪২	চন্দ্র	২৬	জানের	১১	৪৫	বৈকালে	দৃশ্য	৯	অপূর্ণ	আরম্ভ ১০ঘণ্টা ৫মিনিট মুক্ত ১ঘণ্টা ২৫মিনিটে
	সূর্য্য	৮	জুলাই	১২	৪৫	বৈকালে	দৃশ্য	০	সর্ব্ব	চন্দননগরে প্রায় মধ্যস্থ ও নানকিনে
	চন্দ্র	২২	জুলাই	৪	৪৫	বৈকালে	অদৃশ্য	৩	অপূর্ণ	
১৮৪৩	চন্দ্র	১২	জুন		৪৫	বৈকালে	,,	০		
	চন্দ্র	৭	ডিসেম্বর	৬	১৫	প্রাতে	দৃশ্য	২।	,,	আরম্ভ ২ঘণ্টা ৩৮মিনিটে মুক্ত ৬ ঘণ্টা ৫২ মিনিটে
	সূর্য্য	২১	ডিসেম্বর	১১	১৫	প্রাতে	,,	০	সর্ব্ব	
১৮৪৪	চন্দ্র	১	জুন	৫	০	প্রাতে	,,	০	,,	আরম্ভ ৩।১৫ মিনিটে মুক্ত ৬।৪৫ মিনিটে
	চন্দ্র	২৫	নবম্বর	৬	.	প্রাতে	,,	০	,,	আরম্ভ ৪।১৫ মিনিটে মুক্ত ৭।৪৫ মিনিটে
১৮৪৫	সূর্য্য	৬	মে	৪	১৫	বৈকালে	অদৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	কিন্তু দৃশ্য সুইজবেরগেতে
	চন্দ্র	২১	মে	১০	১৫	বৈকালে	দৃশ্য	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ৮।৩০ মিনিটে মুক্ত দুই প্রহর রাত্রিতে
	চন্দ্র	১৪	নবম্বর	৬	৪৫	বৈকালে	,,	১০।	,,	আরম্ভ ৫।১৫ মিনিটে মুক্ত ৮।১৫ মিনিটে
১৮৪৬	সূর্য্য	২৫	এপ্রেল	১১	০	বৈকালে	অদৃশ্য	০	অপূর্ণ	কিন্তু দৃশ্য আর মধ্যস্থ ফোর্‌তাবেঁন্তরের দ্বীপেতে
	সূর্য্য	২০	আক্‌টোবর	২	১৫	বৈকালে	দৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	প্রায় মধ্যস্থ গোয়ায় আর মান্দ্রাজেতে
১৮৪৭	চন্দ্র	১	এপ্রেল	৩	১৫	প্রাতে	,,	২৬	অপূর্ণ	আরম্ভ ২।৩৮ মিনিটে মুক্ত ৩।৫২ মিনিটে
	চন্দ্র	২৪	সেপ্টেম্বর	৮	৪৫	বৈকালে	,,	৪।	,,	আরম্ভ ৭।৩০ মিনিটে মুক্ত ১০ ঘণ্টায়
	সূর্য্য	৯	আক্‌টোবর	৩	১৫	বৈকালে	,,	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	প্রায় মধ্যস্থ জেরূজালেমেতে
১৮৪৮	চন্দ্র	২০	মার্চ	৬	১৫	প্রাতে	দৃশ্য	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে মুক্ত ৫ ঘণ্টায়
	,,	১৩	সেপ্টেম্বর	১২	,,	বৈকালে	,,	০	,,	আরম্ভ ১০ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে মুক্ত ২ ঘণ্টায়
	সূর্য্য	২৭	,,	৩	৪৫	,,	অদৃশ্য	০	অতি ক্ষুদ্র	কিন্তু দৃশ্য ছাময়িএদের দেশে
১৮৪৯	,,	২৩	ফিবরেল	৭	১৫	প্রাতে	দৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	দৃশ্য আর মধ্যস্থ দিল্লীতে এবং নান্‌কিনে
	চন্দ্র	৯	মার্চ	৬	৪৫	,,	,,	৮॥	অপূর্ণ	আরম্ভ ৫।১৫ মিনিটে মুক্ত ৮।১৫ মিনিটে
	,,	২	সেপ্টেম্বর	১১	১৫	বৈকালে	,,	৭	,,	আরম্ভ ৯।৪৫ মিনিটে মুক্ত ১২।৪৫ মিনিটে
১৮৫০	সূর্য্য	১২	ফিবরেল	১২	১৫	,,	অল্প দৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	মধ্যস্থ এবং দৃশ্য বরণেওএ
	,,	৮	আগষ্ট	৩	৪৫	প্রাতে	অদৃশ্য	০	সর্ব্ব	কিন্তু দৃশ্য আর মধ্যস্থ মানিলায়
১৮৫১	চন্দ্র	১৭	ফিবরেল	১০	৪৫	বৈকালে	দৃশ্য	৫।	অপূর্ণ	আরম্ভ ৯।৩০ মিনিটে মুক্ত ১২ ঘণ্টা রাত্রিতে
	,,	১৩	জুলাই	১	১৫	,,	অদৃশ্য	৮।	,,	
	সূর্য্য	২৮	,,	৮	১৫	,,	,,	০	সর্ব্ব	কিন্তু দৃশ্য ফ্রাঁছেতে এবং ইংরাজের বিলাতে
১৮৫২	চন্দ্র	৭	জানের	১২	১৫	দিনে	,,	০	,,	
	,,	১	জুলাই	৯	৩০	বৈকালে	দৃশ্য	০	,,	আরম্ভ ৭।৪৫ মিনিটে মুক্ত ১১।১৫ মিনিটে
	সূর্য্য	১১	ডিসেম্বর	৯	৪৫	প্রাতে	,,	০	,,	আর মধ্যস্থিত পেকিনে
	চন্দ্র	২৬	,,	৬	৪৫	বৈকালে	,,	৮	অপূর্ণ	আরম্ভ ৫ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে মুক্ত ৮ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে
১৮৫৩	,,	২১	জুন	১১	৪৫	প্রাতে	অদৃশ্য	২	,,	
১৮৫৪	,,	১২	মে	৯	৪৫	বৈকালে	দৃশ্য	৩	অপূর্ণ	আরম্ভ ৮ ঘণ্টা ৩০ মিনিট মুক্ত ১১ ঘণ্টায়
	,,	৫	নবম্বর	৩	১৫	প্রাতে	,,	১	,,	আরম্ভ ২০ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে মুক্ত ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে
১৮৫৫		২	মে	১০	১৫	,,	অদৃশ্য	০	সর্ব্ব	

সন	গ্রহণ	তাং	মাস	ঘণ্টা	মিনিট	সময়	দৃশ্যাদৃশ্য	কলা	গ্রাস।	স্থিতির নিয়ম
	সূর্য্য	১৬	মে	৮	১৫	,,	,,	•	অপূর্ণ	কিন্তু দৃশ্য ছামোএদে
	চন্দ্র	১৫	আক্টোবর	১	৪৫	বৈকালে	,,	•	সর্ব্ব	
১৮৫৬	,,	২০	এপ্রেল	৩	১৫	,,	,,	৮।	অপূর্ণ	
	সূর্য্য	২৯	সেপ্তেম্বর	৯	৪৫	প্রাতে	,,	•	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	কিন্তু দৃশ্য ছামোএদে
	চন্দ্র	১৪	আক্টোবর	৫	১৫	,,	দৃশ্য	১১॥	অপূর্ণ	আরম্ভ ৩ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে মুক্ত ৬ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে
১৮৫৭	সূর্য্য	১৮	সেপ্তেম্বর	১১	৪৫	,,	,,	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	মধ্যস্থ ইয়ানাওঁতে
১৮৫৮	চন্দ্র	২৮	ফিবরেল	•	৪	,,	,,	৪	অপূর্ণ	আরম্ভ ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে মুক্ত ৫ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে
	সূর্য্য	১৫	মার্চ	৬	১৫	বৈকালে	,,	০	,,	মধ্যস্থ পরতুগালে
	চন্দ্র	২৪	আগষ্ট	৮	১৫	,,	,,	৫॥	,,	আরম্ভ ৭ ঘণ্টাতে মুক্ত ৯ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে
১৮৫৯	,,	১৭	ফিবরেল	৪	৪৫	,,	অদৃশ্য	•	সর্ব্ব	
	সূর্য্য	৩০	জুলাই	২	৪৫	প্রাতে	,,	•	ক্ষুদ্র	দৃশ্য তারতারি রুষিয়ানে
	চন্দ্র	১৩	আগষ্ট	১০	১৫	বৈকালে	দৃশ্য	•	সর্ব্ব	
১৮৬০	,,	৭	ফিবরেল	৮	১৫	প্রাতে	অদৃশ্য	৯।	অপূর্ণ	
	সূর্য্য	১৮	জুলাই	৭	৪৫	বৈকালে	দৃশ্য	•	সর্ব্ব	অতি দৃশ্য পেরছিয়ায়
	চন্দ্র	১	আগষ্ট	১১	১৫	,,	,,	৪৵	অপূর্ণ	আরম্ভ ১০ ঘণ্টায় মুক্ত ১২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে
১৮৬১	সূর্য্য	১১	জানের	৯	১৫	প্রাতে	দৃশ্য	•	অতিক্ষুদ্র	
	„	৮	জুলাই	৭	৪৫	„	„	•	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	মধ্যস্থ নুতন গিনেয়ে
	চন্দ্র	১৭	ডিসেম্বর	২	১৫	বৈকালে	অদৃশ্য	২	অপূর্ণ	
	সূর্য্য	৩১	„	৮	„	„	„	•	সর্ব্ব	মধ্যস্থ ছেনেগালে
১৮৬২	চন্দ্র	১২	জুন	১২	৩০	আদঘণ্টা দিনে	„	•	„	
	„	৬	ডিসেম্বর	৩	৪৫	বৈকালে	„	•	„	
	সূর্য্য	২১	„	১১	১৫	প্রাতে	„	•	অপূর্ণ	দৃশ্য ছিবেরিয়ে
১৮৬৩	„	১৭	মে	১০	৪৫	বৈকালে	„	•	„	দৃশ্য ইংরাজের বিলাতে
	চন্দ্র	২	জুন	৫	„	প্রাতে	দৃশ্য	•	সর্ব্ব	আরম্ভ ৪ ঘণ্টাতে মুক্ত ৭ঘণ্টা ৩০ মিনিটে
	„	২৫	নবেম্বর	২	৪৫	বৈকালে	অদৃশ্য	১১	অপূর্ণ	
১৮৬৪	সূর্য্য	৬	মে	৬	৩০	প্রাতে	দৃশ্য	•	সর্ব্ব	
১৮৬৫	চন্দ্র	১১	এপ্রেল	১০	৪৫	„	অদৃশ্য	•	অপূর্ণ	
	„	৫	আক্টোবর	৪	„	„	দৃশ্য	৩৵	„	আরম্ভ ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট মুক্ত ৬ ঘণ্টাতে
	সূর্য্য	১৯	„	১০	„	বৈকালে	অদৃশ্য	•	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	দৃশ্য মাদেরায়
১৮৬৬	„	১৭	মার্চ	৩	„	প্রাতে	„	•	অতি ক্ষুদ্র	দৃশ্য তারতারি চিনেয়ে
	চন্দ্র	৩১	„	১০	„	„	„	•	সর্ব্ব	
	„	২৪	সেপ্তেম্বর	৮	১৫	বৈকালে	দৃশ্য	•	„	আর ৬ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে মুক্ত ১০ ঘণ্টাতে
	সূর্য্য	৮	আক্টোবর	১১	•	„	অদৃশ্য	•	অপূর্ণ	দৃশ্য বিলাতে
১৮৬৭	„	৬	মার্চ	৩	৪৫	„	অর্দ্ধেক দৃশ্য	•	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	কিন্তু মধ্যস্থ আলজেরে এবং দৃশ্য
	চন্দ্র	২০	„	২	„	„	অদৃশ্য	৯।	অপূর্ণ	
	„	১৪	সেপ্তেম্বর	৬	„	প্রাতে	দৃশ্য	৮	„	আরম্ভ ৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে মুক্ত ৮ ঘণ্টাতে
১৮৬৮	সূর্য্য	২৩	ফিবরেল	৮	১৫	বৈকালে	অদৃশ্য	•	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	কিন্তু দৃশ্য মধ্যস্থ আরবীতে
	,,	১৮	আগষ্ট	১১	,,	প্রাতে	দৃশ্য	•	সর্ব্ব	দৃশ্য আর মধ্যস্থ কারিকালে
১৮৬৯	চন্দ্র	২৮	জানের	৭	৩০	,,	অল্প দৃশ্য	৫॥	অপূর্ণ	আরম্ভ ৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে মুক্ত ৮ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে
	„	২৩	জুলাই	৭	৪৫	বৈকালে	দৃশ্য	৬৵	,,	,, ,, ৯ ,, ১৫ ,,

সন	গ্রহণ	তাং	মাস	ঘণ্টা	মিনিট	সময়	দৃশ্যাদৃশ্য	কলা	গ্রাস	স্থিতির নিয়ম।
	সূর্য্য	৮	আগষ্ট	৬	,,	প্রাতে	অদৃশ্য	০	সর্ব্ব	কিন্তু দৃশ্য আর মধ্যস্থ যাপনে
১৮৭০	চন্দ্র	১৭	জানের	৮	,,	বৈকালে	দৃশ্য	০	,,	আরম্ভ ৭ ঘণ্টাতে মুক্ত ১০ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে
	,,	১৩	জুলাই	৪	,,	প্রাতে	,,	০	,,	,, ৩ ,, ,, ৬ ,, ,,
	সূর্য্য	২২	ডিসেম্বর	৬	৩০	বৈকালে	অল্প দৃশ্য	০	,,	দৃশ্য আর মধ্যস্থ গিরেনে
১৮৭১	চন্দ্র	৭	জানের	৩	১৫	প্রাতে	দৃশ্য	৮	অপূর্ণ	আরম্ভ ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে মুক্ত ৮ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে
	সূর্য্য	১৮	জুন	৮	,,	,,	,,	০	অতিক্ষুদ্র	
	চন্দ্র	২	জুলাই	৭	,,	বৈকা‍ে	,,	৪	অপূর্ণ	আরম্ভ ৬ ঘণ্টাতে মুক্ত ৮ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে
	সূর্য্য	১২	ডিসেম্বর	১০	,,	প্রাতে	অর্দ্ধেক দৃশ্য	০	সর্ব্ব	মধ্যস্থ আর দৃশ্য নূতন হলান্দে
১৮৭২	চন্দ্র	২৩	মে	৫	,,	,,	দৃশ্য	১॥	অপূর্ণ	আরম্ভ ৪ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে মুক্ত ৫ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে
	সূর্য্য	৬	জুন	৯	,,	,,	,,	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	মধ্যস্থ করেএ
১৮৭২	চন্দ্র	১৫	নবম্বর	১১	৩০	প্রাতে	অদৃশ্য	।০	অপূর্ণ	
১৮৭৩	চন্দ্র	১২	মে	৫	১৫	বৈকালে	দৃশ্য	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ৩ ঘণ্টা মিনিট মুক্ত ৭ ঘঃ
	সূর্য্য	২৬	মে	৩	১৫	বৈকালে	অদৃশ্য	০	অপূর্ণ	দৃশ্য ইংরাজের বিলাতে
	চন্দ্র	৪	নবম্বর	১০	১৫	বৈকালে	দৃশ্য	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ৮।৩০ মিনিটে মুক্ত দুই প্রহর রাত্রিতে
১৮৭৪	চন্দ্র	১	মে	১০	১৫	বৈকালে	,,	৯৵	অপূর্ণ	আরম্ভ ৮।৪৫ মিনিটে মুক্ত ১১।৪৫ মিনিটে
	সূর্য্য	১০	আক্‌টোবর	৫	১৫	বৈকালে	অদৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	দৃশ্য আর মধ্যস্থ প্রায় লাপনীয়ে
	চন্দ্র	২৫	আক্‌টাবর	১	৪৫	বৈকালে	,,	০	সর্ব্ব	
১৮৭৫	সূর্য্য	৬	এপ্রেল	১২	৪৫	দিনে	দৃশ্য	০	,,	
	সূর্য্য	২৯	সেপ্তম্বর	৭	১৫	বৈকালে	অল্প দৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	মধ্যস্থ আর দৃশ্য এথিওপিয়ে
১৮৭৬	চন্দ্র	১০	মার্চ্চ	১২	১৫	দিনে	অদৃশ্য	৩॥	অপূর্ণ	
	চন্দ্র	৪	সেপ্তম্বর	৩	১৫	প্রাতে	দৃশ্য	৪	,,	আরম্ভ ২ ঘণ্টাতে মুক্ত ৪ ঘণ্টাতে ৩০ মিনিটে
১৮৭৭	চন্দ্র	২৮	ফিবরেল	১	১৫	প্রাতে	,,	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ১১।৩০ মিনিটে মুক্ত ৩ ঘঃ
	সূর্য্য	১৫	মার্চ্চ	৮	৪৫	প্রাতে	অদৃশ্য	০	অপূর্ণ	কিন্তু ছামএদেরা দেখিবেক
	সূর্য্য	৯	আগষ্ট	১০	৪৫	প্রাতে	,,	০	,,	কিন্তু দৃশ্য তারতারি রুছিএনে
	চন্দ্র	২৪	আগষ্ট	৫	১৫	প্রাতে	দৃশ্য	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ৩।৩০ মিনিটে মুক্ত ৭ ঘণ্টাতে
১৮৭৮	চন্দ্র	১৭	ফিবরেল	৫	০	বৈকালে	দৃশ্যনাং ৪৯ মিঃ		অপূর্ণ	
	সূর্য্য	৩০	জুলাই	৩	১৫	প্রাতে	অদৃশ্য	০	সর্ব্ব	কিন্তু দৃশ্য তারতারি চিনেয়ে
	চন্দ্র	১৩	আগষ্ট	৬	১৫	প্রাতে	দৃশ্য	৬।	অপূর্ণ	দৃশ্য নাগাএদ ৪।৪৫ মিনিট প্রাতে
১৮৭৯	সূর্য্য	২২	জানের	৫	৪৫	বৈকালে	,,	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি অতি ক্ষুদ্র	মধ্যাহ্ন কারলিনের দ্বীপে
	সূর্য্য	১৯	জুলাই	২	৪৫	বৈকালে	,,	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি অতি ক্ষুদ্র	মধ্যাহ্ন আর দৃশ্য মক্কায়
	চন্দ্র	২৮	ডিসেম্বর	১০	১৫	বৈকালে	,,	১৵	অপূর্ণ	আরম্ভ ৯।৪৫ মিনিটে মুক্ত ১০।৪৫ মিনিটে
১৮৮০	সূর্য্য	১২	জানের	৪	৪৫	প্রাতে	অল্প দৃশ্য	০	সর্ব্ব	প্রায় মধ্যস্থ ফরাসডাঙ্গাতে
	চন্দ্র	২২	জুন	৭	৪৫	বৈকালে	দৃশ্য	০	,,	আরম্ভ ৬ঘণ্টাতে মুক্ত ৯।৩০ মিনিটে
	চন্দ্র	১৬	ডিসেম্বর	৯	৪৫	বৈকালে	,,	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ৮ ঘণ্টাতে মুক্ত ১১।৩০ মিনিটে
	সূর্য্য	৩১	ডিসেম্বর	৭	৪৫	বৈকালে	অদৃশ্য	০	অপূর্ণ	দৃশ্য আফ্রীকায়
১৮৮১	সূর্য্য	২৮	মে	৫	৪৫	প্রাতে	,,	০	অপূর্ণ	দৃশ্য তারতারি রুছিয়ানে।
	চন্দ্র	১২	জুন	১	০	বৈকালে	,,	০	সর্ব্ব	
	চন্দ্র	৫	ডিসেম্বর	১১	১৫	বৈকালে	দৃশ্য	১॥	অপূর্ণ	আরম্ভ ৯।৩০ মিনিটে মুক্ত ১ ঘণ্টা প্রাতে
১৮৮২	সূর্য্য	১৭	মে	১	৪৫	বৈকালে	,,	০	সর্ব্ব	মধ্যস্থ জেরুজালেমে
	সূর্য্য	১১	নবম্বর	৫	৪৫	,,	অল্পদৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	অতি দৃশ্য আর মধ্যস্থ করেএ

সন	গ্রহণ	তাং	মাস	ঘণ্টা	মিনিট	সময়	দৃশ্যাদৃশ্য	কলা	গ্রাস।	স্থিতির নিয়ম।
১৮৮৩	চন্দ্র	২২	এপ্রেল	৫	৪৫	,,	অদৃশ্য	।	অপূর্ণ	
	চন্দ্র	১৬	আক্‌টোবর	১	১৫	বৈকালে	,,	৩	অপূর্ণ	
	সূর্য্য	৩১	আক্‌টোবর	৬	১৫	প্রাতে	অল্পদৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	দৃশ্য মধ্যস্থ তারতারি চিনেয়ে
১৮৮৪	সূর্য্য	২৭	মার্চ্চ	১১	৪৫	প্রাতে	দৃশ্য	০	অপূর্ণ	
	চন্দ্র	১০	এপ্রেল	৫	৪৫	বৈকালে	,,	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ৪ ঘণ্টাতে মুক্ত ৭।৩০ মিনিটে
১৮৮৪	চন্দ্র	৫	আক্‌টোবর	৪	১৫	প্রাতে	দৃশ্য	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ২।৩০ মিনিটে মুক্ত ৬ ঘণ্টাতে
	সূর্য্য	১৯	,,	৬	৪৫	,,	অদৃশ্য	০	অপূর্ণ	দৃশ্য ছামএদে
১৮৮৫	চন্দ্র	৩০	মার্চ	১০	,,	বৈকালে	দৃশ্য	১০	অপূর্ণ	আরম্ভ ৯।১৫ মি মুক্ত ১২।১৫ মি রাত্রিতে
	,,	২৪	সেপ্তম্বর	২	১৫	,,	অদৃশ্য	৯	,,	
১৮৮৬	সূর্য্য	২৯	আগষ্ট	৭	,,	,,	ছায়ার ২ অল্প দৃশ্য	০	সর্ব্ব	
১৮৮৭	চন্দ্র	৮	ফিবরেল	৪	,,	,,	অদৃশ্য	৫।	অপূর্ণ	
	,,	৪	আগষ্ট	২	৪৫	প্রাতে	দৃশ্য	৫	,,	আরম্ভ ১।৩০ মিনিটে মুক্ত ৪ ঘণ্টাতে
	সূর্য্য	১৯	,,	১১	,,	,,	ছায়ার ২ অল্প দৃশ্য	০	সর্ব্ব	প্রায় মধ্যস্থ পেতরূ বুরছে
১৮৮৮	চন্দ্র	২৯	জানের	৫	১৫	,,	দৃশ্য	০	,,	আরম্ভ ৩।৩০ মিনিটে মুক্ত ৭ ঘণ্টাতে
	,,	২৩	জুলাই	১১	৪৫	,,	অদৃশ্য	০	,,	
১৮৮৯	,,	১৭	জানের	১১	১৫	,,	,,	৮।	অপূর্ণ	
	চন্দ্র	১৩	জুলাই	২	৪৫	,,	দৃশ্য	৫।	,,	আরম্ভ ১।৩০ মিনিটে মুক্ত ৪ ঘণ্টাতে
	সূর্য্য	২২	ডিসেম্বব	৬	,,	বৈকালে	ছায়ার ছায়া দৃশ্য	০	সর্ব্ব	
১৮৯০	চন্দ্র	৩	জুন	১২	১০	,,	অদৃশ্য	১।	অপূর্ণ	
	সূর্য্য	১৭	,,	৩	৪৫	,,	দৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	দৃশ্য প্রায় মধ্যস্থ লাহোরে
	চন্দ্র	২৬	নবম্বর	৭	,,	,,	,,	।	অপূর্ণ	আরম্ভ ৭।৩৫ মিনিটে মুক্ত ৭।৫৫ মিনিটে
১৮৯১	,,	২৪	মে	১২	,,	প্রাতে	,,	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ১১ ঘণ্টায় মুক্ত ২।৩০ মিনিটে
	সূর্য্য	৬	জুন	১০	১৫	বৈকালে	অদৃশ্য	০	অপূর্ণ	দৃশ্য ইংরাজের বিলাতে
	চন্দ্র	১৬	নবম্বর	৬	৩০	প্রাতে	দৃশ্য	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ৪।৪৫ মিনিটে মুক্ত ৮।১৫ মিনিটে
১৮৯২	চন্দ্র	১২	মে	৫	১৫	,,	,,	১১।	অপূর্ণ	,, ৩ ,, ৩৫ ,, ৬ ,, ৫৫
	,,	৪	নবম্বর	১০	,,	বৈকালে	,,	০	সর্ব্ব	,, ৮ ,, ৩০ ,, ১২ ,,
১৮৯৩	সূর্য্য	১৬	এপ্রেল	৮	৪৫	,,	অদৃশ্য	০	,,	কিন্তু দৃশ্য আর মধ্যস্থ আরবীতে
১৮৯৪	চন্দ্র	২১	মার্চ	৮	১৫	,,	দৃশ্য	৩	অপূর্ণ	আরম্ভ ৭ ঘণ্টায় মুক্ত ৯।৩০ মিনিটে
	সূর্য্য	৬	এপ্রেল	১০	,,	প্রাতে	,,	০	,,	মধ্যস্থ চিনায়
	চন্দ্র	১৫	সেপ্তেম্বর	,,	৩০	,,	অদৃশ্য	২।	,,	
	সূর্য্য	২৯	সেপ্তেম্বর	১১	১৫	,,	দৃশ্য	০	,,	
১৮৯৫	চন্দ্র	১১	মার্চ	১	৪৫	,,	অদৃশ্য	০	সর্ব্ব	
	সূর্য্য	২৬	মার্চ	৩	৪৫	বৈকালে	,,	০	অপূর্ণ	দৃশ্য ইংরাজের বিলাতে
	,,	২০	আগষ্ট	৬	১৫	,,	,,	০	,,	দৃশ্য ছামোএদের দেশে
	চন্দ্র	৪	সেপ্তেম্বর	১১	৪৫	প্রাতে	,,	০	সর্ব্ব	
১৮৯৬	,,	২৯	ফিবরেল	১	,,	,,	দৃশ্য	১০	অপূর্ণ	আরম্ভ ১২।১৫ মি রাত্রিতে মুক্ত ৩।১৫ মিনিটে
	সূর্য্য	১	আগষ্ট	১০	১৫	,,	অর্দ্ধেক দৃশ্য	০	সর্ব্ব	কিন্তু দৃশ্য আর প্রায় মধ্যস্থ জে নিসিকে
	চন্দ্র	২৩	,,	১২	৪৫	বৈকালে	অদৃশ্য	৮	অপূর্ণ	
১৮৯৭	০	০	০	০	০	০	০	০	০	গ্রহণং নাস্তি
১৮৯৮	চন্দ্র	৮	জানের	৬	৪৫	প্রাতে	দৃশ্য	১।	অপূর্ণ	আরম্ভ ৫ঘণ্টা ৪৫মিনিটে মুক্ত ৬ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে

সন	গ্রহণ	তাং	মাস	ঘণ্টা	মিনিট	সময়	দৃশ্যাদৃশ্য	কলা	গ্রাস	স্থিতির নিয়ম।
	সূর্য্য	২২	,,	১	৪৫	বৈকালে	,,	•	সর্ব্ব	প্রায় মধ্যস্থ ফরাসডাঙ্গায়
	চন্দ্র	৪	জুলাই	৩	১৫	প্রাতে	,,	১১	অপূর্ণ	আরম্ভ ১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে মুক্ত ৪ ঘঃ ৫৫ মিনিটে
	,,	২৮	ডিসেম্বর	৫		,,	,,	•	সর্ব্ব	আরম্ভ ৪ ঘণ্টায় মুক্ত ৭ ঘণ্টা ৩০ মিনিটে
১৮৯১	সূর্য্য	১২	জানের	৪	৪৫	,,	অদৃশ্য	•	অপূর্ণ	কিন্তু দৃশ্য চিনায়
	,,	৮	জুন	১২	৪৫	বৈকালে	,,	•	,,	দৃশ্য রুশিয়ায়
	চন্দ্র	২৩	,,	৮	১৫	,,	দৃশ্য	•	সর্ব্ব	আরম্ভ ৬।৩০ মিনিটে মুক্ত ১০ ঘঃ
	,,	১৭	ডিসেম্বর	৭	১৫	প্রাতে	,,	১১।	অপূর্ণ	আরম্ভ ৫।৩০ মিনিটে মুক্ত ৩ ঘঃ
১৯০০	সূর্য্য	২৮	মে	১	০	বৈকালে	অদৃশ্য	•	সর্ব্ব	দৃশ্য আর মধ্যস্থ আরবীতে
	চন্দ্র	১৩	জুন	৯	৪৫	প্রাতে	,,	০	,,	
	সূর্য্য	২২	নবেম্বর	১	৪৫	বৈকালে	অর্দ্ধেক দৃশ্য	•	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	এই ছোট গ্রহণ মধ্যস্থ আর দৃশ্য নূতন গিনেয়ে
১৯০১	চন্দ্র	৪	মে	১২	১৫	প্রাতে	,,	০	অপূর্ণ	অতি ছোট
	সূর্য্য	১৮	মে	২	১৫	বৈকালে	অদৃশ্য	•	সর্ব্ব	দৃশ্য আর মধ্যস্থ হলাণ্ডের দেশে
	চন্দ্র	২৭	আকটোবর	৯	৪৫	বৈকালে	দৃশ্য	৩	অপূর্ণ	আরম্ভ ৮।৪৫ মিনিটে মুক্ত ১০।৪৫ মিনিটে
	সূর্য্য	১১	নবম্বর	১	৪৫	,,	,,	•	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	অতি দৃশ্য আর মধ্যস্থ ফুলচরিতে
১৯০২	চন্দ্র	২৩	এপ্রেল	১২	৪৫	প্রাতে	,,	•	সর্ব্ব	আরম্ভ ১১।৪৫ মিঃ মুক্ত ২।৩০ মিঃ প্রাতে
	,,	১৭	আকটোবর	,,		বৈকালে	অদৃশ্য	•	,,	
	সূর্য্য	৩১	,,	২	৩০	,,	,,	০	অপূর্ণ	এই ছোট গ্রহণ দৃশ্য ছামএদের দেশে
১৯০৩	,,	২৯	মার্চ	৭	১৫	প্রাতে	দৃশ্য	•	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	দৃশ্য ও মধ্যস্থ লাহোর
	চন্দ্র	১২	এপ্রেল	৫	৪৫	,,	,,	•	সর্ব্ব	আরম্ভ ৪ ঘণ্টায় মুক্ত ৭।৩০ মিঃ
	সূর্য্য	২১	সেপ্টেম্বর	১০	৪৫	,,	অদৃশ্য	•	,,	মধ্যস্থ হলাণ্ডের দেশে আর দৃশ্য সূর্য্যের প্রকাশে
	চন্দ্র	৬	আকটোবর	,,	১৫	বৈকালে	দৃশ্য	১০	অপূর্ণ	আরম্ভ ৮।৪৫ মিঃ মুক্ত ১১।৪৫ মিঃ
১৯০৪	সূর্য্য	১১	মার্চ	১১	১৫	প্রাতে	,,	•	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	দৃশ্য আর মধ্যস্থ মালাকারে
১৯০৫	চন্দ্র	২০	ফিবরেল	১২	৪৫	,,	দৃশ্য	৫॥	অপূর্ণ	আরম্ভ ১১।১৫ মুক্ত ১ ঘণ্টা প্রাতে
	,,	১৫	আগষ্ট	৯	৪৫	,,	অদৃশ্য	৪	,,	
	সূর্য্য	৩০	,,	৭	৪৫	বৈকালে	,,	•	সর্ব্ব	মধ্যস্থ আর দৃশ্য মক্কায়
১৯০৬	চন্দ্র	৯	ফিবরেল	১	৪৫	,,	,,	•	,,	
	,,	৪	আগষ্ট	৬	৪৫	,,	দৃশ্য	•	,,	আরম্ভ ৫ঘঃ মুক্ত ৮।৩০ মি
	সূর্য্য	০	,,	৭	,,	প্রাতে	অদৃশ্য	•	অতি ছোট	দৃশ্য ছামএদের দেশে
১৯০৭	,,	১৪	জানের	১১	,,	,,	দৃশ্য	•	সর্ব্ব	মধ্যাহ্ন আর অতি দৃশ্য সারমাকান্দে
	চন্দ্র	২৮	,,	৭	,,	বৈকালে	,,	৮॥	অপূর্ণ	আরম্ভ ৬।১৫ মি মুক্ত ৯।১৫ মি
	,,	২৫	জুলাই	১০	১৫	প্রাতে	অদৃশ্য	৭॥	,,	
১৯০৮	সূর্য্য	২৭	জুন	,,	৪৫	বৈকালে	,,	•	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	দৃশ্য আর মধ্যস্থ উইলমেণ্টেনে আমেরিকায়
	চন্দ্র	৮	ডিসেম্বর	৩	,,	প্রাতে	দৃশ্য	॥	অপূর্ণ	আরম্ভ ৩।৩০ মি মুক্ত ৫ঘ
	সূর্য্য	২৩	,,	৬	১৫	বৈকালে	অদৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	দৃশ্য মাদাগাছকারে
১৯০৯	চন্দ্র	৪	জুন	৬	৪৫	প্রাতে	,,	•	সর্ব্ব	আরম্ভ ৫ ঘঃ মুক্ত ৮।৩০ মিঃ
	সূর্য্য	১৮	,,	৫	১৫	,,	,,	•	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	
	চন্দ্র	২৭	নবম্বর	২	৪৫	বৈকালে	,,	•	সর্ব্ব	
১৯১০	,,	২৪	মে	১	১৫	,,	,,	১১।০	অপূর্ণ	
	সূর্য্য	২	নবম্বর	১১	৪৫	প্রাতে	দৃশ্য	•	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	প্রায় মধ্যস্থ পেকিঙে
	চন্দ্র	১৭	নবম্বর	৮	৪৫	,,	অদৃশ্য	১১	অপূর্ণ	

সন	গ্রহণ	তাং	মাস	ঘণ্টা	মিনিট	সময়	দৃশ্যাদৃশ্য	কলা	গ্রাস।	স্থিতির নিয়ম।
১৯১১	সূর্য্য	২২	আক্টোবর	১০	১৫	,,	দৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	দৃশ্য আর প্রায় মধ্যস্থ আবায়
১৯১২	চন্দ্র	২	এপ্রেল	৩	৪৫	,,	,,	২	অপূর্ণ	আরম্ভ ৩ ঘঃ ৮ মিঃ মুক্ত ৪।২২ মিঃ
	সূর্য্য	১৭	এপ্রেল	৫	১৫	বৈকালে	অর্দ্ধেক দৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	দৃশ্য আর মধ্যস্থ কীয়েনে আর লিয়নে
	চন্দ্র	২৬	সেপ্তেম্বর	৫	৪৫	,,	অদৃশ্য	২	অপূর্ণ	
	সূর্য্য	১০	আক্টোবর	৭	৪৫	,,	অঃ	০	সর্ব্ব	দৃশ্য হতাস্ততের দেশে
১৯১৩	চন্দ্র	২২	মার্চ্চ	৫	৪৫	,,	দৃশ্য	০	,,	আরম্ভ ৪ ঘঃ মুক্ত ৭।৩০ মিঃ
	চন্দ্র	১৫	সেপ্তেম্বর	৬	৪৫	,,	,,	০	,,	আরম্ভ ৫ ঘঃ মুক্ত ৮।৩০ মিঃ
১৯১৪	,,	১১	মার্চ্চ	৯	৪৫	প্রাতে	অদৃশ্য	১১।০	অপূর্ণ	
	সূর্য্য	২১	আগষ্ট	৮	৪৫	বৈকালে	অঃ	০	সর্ব্ব	অতি দৃশ্য প্রায় মধ্যস্থ লিজবনে
	চন্দ্র	৪	সেপ্তেম্বর	৭	৪৫	,,	দৃশ্য	১০	অপূর্ণ	আরম্ভ ৬ ঘঃ ১৫ মিঃ মুক্ত ৯।১৫ মিঃ
১৯১৫	সূর্য্য	১৪	ফিবরেল	৯	৪৫	প্রাতে	,,	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	মধ্যস্থ লাছায় লাহোরের নিকটে
	,,	১১	আগষ্ট	৪	৪৫	,,	অদৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	দৃশ্য আর মধ্যস্থ লুইজিয়াদে
১৯১৬	চন্দ্র	৮	জানের	১	৪৫	বৈকালে	,,	১॥০	অপূর্ণ	,, আর মধ্যস্থ গিউএন্ ফ্রাছিসে
	সূর্য্য	৩	ফিবরেল	৯	৪৫	,,	,,	০	,,	,, আর মধ্যস্থ ফ্রাছিস গিয়ানেতে
	চন্দ্র	১৫	জুলাই	১১	১৫	প্রাতে	,,	৯।০	,,	
১৯১৭	,,	৮	জানের	১	৪৫	বৈকালে	,,	০	সর্ব্ব	
	সূর্য্য	২৩	জানের	১	৪৫	,,	,,	০	ছোট	,, ছিবেরিয়ে
	,,	১৯	জুন	৬	৪৫	,,	,,	০	,,	,, ছুয়েদে
	চন্দ্র	৫	জুলাই	৩	৪৫	প্রাতে	দৃশ্য	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ২ ঘঃ মুক্ত ৫।৩০ মিঃ
	,,	২৮	ডিসেম্বর	৩	৪৫	বৈকালে	অদৃশ্য	০	,,	
১৯১৮	সূর্য্য	৯	জুন	৪	১৫	প্রাতে	অল্পদৃশ্য	০	,,	দৃশ্য আর মধ্যস্থ কাঁতনে
	চন্দ্র	২৪	জুন	৪	৪৫	বৈকালে	অদৃশ্য	১।০	অপূর্ণ	
	সূর্য্য	৩১	ডিসেম্বর	৯	১৫	,,	,,	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	,, আর মধ্যস্থ গিনেয়ে
১৯১৯	সূর্য্য	২৯	মে	৬	৪৫	,,	,,	০	সর্ব্ব	,, আর মধ্যস্থ বুরবাক্রের দ্বীপে
	চন্দ্র	৮	নবম্বর	৬	১৫	প্রাতে	অল্পদৃশ্য	০	অপূর্ণ	আরম্ভ ৫ ঘঃ ৫৫ মিঃ মুক্ত ৬।৩৫ মিঃ
	সূর্য্য	২২	নবম্বর	৯	১৫	বৈকালে	অদৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	দৃশ্য আর মধ্যস্থ কাইএনে
১৯২০	চন্দ্র	৩	মে	৭	৪৫	প্রাতে	,,	০	সর্ব্ব	
	চন্দ্র	২৭	আক্টোবর	৮	৪৫	বৈকালে	দৃশ্য	০	,,	আরম্ভ ৭ ঘঃ মুক্ত ১০।৩০ মিঃ
	সূর্য্য	১০	নবম্বর	৮	১৫	,,	অদৃশ্য	০	ছোট	দৃশ্য আলস্কেরে
১৯২১	সূর্য্য	৮	এপ্রেল	২	৪৫	বৈকালে	অদৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	দৃশ্য আর মধ্যস্থ লাপনের দেশে
	চন্দ্র	২২	এপ্রেল	২	১৫	বৈকালে	অদৃশ্য	০	সর্ব্ব	
	সূঃ	১	আক্টোবর	৬	৪৫	বৈকালে	অদৃশ্য	০	সর্ব্ব	দৃশ্য সেনউইচে
	চন্দ্র	১৬	আক্টোবর	৫	৪৫	প্রাতে	দৃশ্য	১১	অপূর্ণ	আরম্ভ [illegible] ঘ ৫ মিঃ মুক্ত ৭ ঘ ২৫ মিনিটে
১৯২২	সূঃ	২৮	মার্চ্চ	৭	১৫	বৈকালে	অল্পদৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	স্বল্পদৃশ্য আর প্রায় মধ্যস্থ দিল্লীতে
১৯২৩	চন্দ্র	৩	মার্চ্চ	৯	”	প্রাতে	অদৃশ্য	৪।	অপূর্ণ	
	সূঃ	১৭	মার্চ্চ	১	”	বৈকালে	দৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	মধ্যস্থ হতাস্ততের দেশে
	চন্দ্র	২৬	আগষ্ট	৫	”	বৈকালে	অদৃশ্য	২॥	অপূর্ণ	
	সূঃ	১১	সেপ্তম্বর	৩	”	প্রাতে	অদৃশ্য	০	সর্ব্ব	দৃশ্য তারতারি চিনেজেতে
১৯২৪	চন্দ্র	২০	ফিবরেল	৮০	৪৫	বৈকালে	দৃশ্য	০	”	আরম্ভ ৭ ঘঃ ; মুঃ ১০ ঘ ৩০ মিঃ
	চন্দ্র	১৫	আগষ্ট	২		প্রাতে	দৃশ্য	০	”	আরম্ভ ১ ঘণ্টাতে মু ৪ ঘ ৩০ মিঃ

সন	গ্রহণ	তাং	মাস	ঘণ্টা	মিনিট	সময়	দৃশ্যাদৃশ্য	কলা	গ্রাস।	স্থিতির নিয়ম।
	সূঃ	৩০	আগষ্ট	১	”	বৈকালে	অদৃশ্য	০	ছোট	দৃশ্য ছিবেরিয়ে
১৯২৫	সূঃ	২৪	জানের	৮	”	বৈকালে	”	০	সর্ব্ব	দৃশ্য আর মধ্যাস্থ একছে
	চন্দ্র	৯	ফিবরেল	৩	”	প্রাতে	দৃশ্য	৯	অপূর্ণ	আরম্ভ ২ঘ ১০ মিঃ মুক্ত ৯ ঘ ২০ মিনিটে
	”	৪	আগষ্ট	৬	”	বৈকালে	”	৯	”	আরম্ভ ৪ ঘ ৪০ মিঃ মুক্ত ৭ ঘ ৫০ মিঃ
১৯২৬	সূঃ	১৪	জানের	১২	”	বৈকালে	,,	০	”	মধ্যাস্থ গোওয়ায় এবং অতিদৃশ্য
	সূঃ	৯	জুলাই	৫	”	প্রাতে	,,	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	মধ্যাস্থ আর দৃশ্য বর্ণেওদ্বীপে
	চন্দ্র	১৯	ডিসেম্বর	১২	১৫	বৈকালে	অদৃশ্য	।	অপূর্ণ	
১৯২৭	,,	১৫	জুন	২	৪৫	,,	,,	০	সর্ব্ব	
	সূঃ	২৯	জুন	১২	”	,,	,,	০	,,	দৃশ্য আর প্রায় মধ্যাস্থ এদেম্বুরগেতে
	চন্দ্র	৮	ডিসেম্বর	১০	”	,,	দৃশ্য	০	,,	আরম্ভ ৯ ঘ মুক্ত ১২ ঘ ৩০ মিঃ রাত্রিতে
১৯২৮	সূঃ	১৯	মে	৭	”	,,	অদৃশ্য	০	ছোট	
	চন্দ্র	৩	জুন	৫	”	,,	দৃশ্য	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ৪ ঘঃ মুক্ত ৭ ঘ ৩০ মিনিটে
	সূঃ	১২	নবম্বর	৩	”	,,	,,	০	ছোট	
	চন্দ্র	২৭	নবম্বর	২	”	,,	,,	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ১ ঘতে মুঃ ৪ ঘ ৩০ মিনিট
১৯২৯	সূঃ	৯	মে	১১	”	প্রাতে	,,	০	,,	মধ্যাহ্ন ছুমাত্রায়
	চন্দ্র	২৩	মে	৬	১৫	বৈকালে	অর্দ্ধেকদৃশ্য	০	অতি ছোট	
	সূঃ	১	নবম্বর	৭	”	,,	দৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	মধ্যাহ্ন আর দৃশ্য আবিছিনিয়ে
১৯৩০	চন্দ্র	১৩	এপ্রেল	১১	৪৫	প্রাতে	অদৃশ্য	১।	অপূর্ণ	
	,,	৭	আক্টো	১২	৪৫	বৈকালে	,,	১।	”	
১৯৩১	,,	৩	এপ্রেল	১	৪৫	প্রাতে	দৃশ্য	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ২ প্রহর রাত্রিতে মুক্ত ৩ ঘ ৩০ মিনিটে
	সূঃ	১৭	এপ্রেল	৫	৪৫	,,	অদৃশ্য	০	অপূর্ণ	দৃশ্য তারতারি চিনেজেতে
	চন্দ্র	২৭	সেপ্টেম্বর	১০	৪৫	,,	দৃশ্য	০	সর্ব্ব	আরম্ভ দুই প্রহর রাত্রিতে মুক্ত ৩ ঘ ৩০ মিনিটে
১৯৩২	,,	২২	মার্চ্চ	৫	৪৫	বৈকালে	,,	০	,,	” ৬ ঘতে মুক্ত ৭ ঘ ৩০ মিনিটে
	,,	১৫	সেপ্টেম্বর	২	৪৫	প্রাতে	,,	১১।	অপূর্ণ	” ১ ঘ ৫ মিঃ মুক্ত ৪ ঘ ২৫ মিনিটে
১৯৩৬	সূর্য্য	২৪	ফিবরেল	৬	১৫	বৈকালে	দৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	মধ্যাস্থ কুলচরীতে আর অবিছিনিতে
	,,	২১	আগষ্ট	১১	৪৫	প্রাতে	,,	০	,,	মধ্যাস্থ আর দৃশ্য ছিয়ামে
১৯৩৪	চন্দ্র	৩০	জানের	১০	১৫	বৈকালে	অল্পদৃশ্য	৫	অতি ছোট	আরম্ভ ১০ ঘঃতে মুক্ত ১০।৩০ মি
	সূর্য্য	১৪	ফিবরেল	৬	১৫	প্রাতে	দৃশ্য	০	সর্ব্ব	মধ্যাস্থ আর অতি দৃশ্য বর্ণেওদ্বীপে
	চন্দ্র	২৬	জুলাই	,,	,,	বৈকালে	,,	৮	অপূর্ণ	আরম্ভ ৪।৪৫ মি ক্ত ৭ ৪৫ মি
	সূর্য্য	১০	আগষ্ট	২	৪৫	,,	,,	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	মধ্যাস্থ লাহোরে
১৯৩৫	চন্দ্র	১৯	জানের	৯	৪৫	,,	,,	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ৮ঘ তে মুক্ত ১১।৩০ মি
	,,	১৬	জুলাই	১১	১৫	প্রাতে	অদৃশ্য	০	,,	
১৯৩৬	,,	৯	জানের	১২	১৫	,,	দৃশ্য	০	,,	আরম্ভ ১০।৩০ মি, মুক্ত ২ঘঃ
	সূর্য্য	১৯	জুন	১১	১৫	,,	অর্দ্ধেকদৃশ্য	০	,,	প্রায় মধ্যাস্থ বৌনিসকে
	চন্দ্র	১৪	জুলাই	,,	,,	বৈকালে	দৃশ্য	৩	অপূর্ণ	আরম্ভ ১০ঘঃ মুক্ত ১২।৩০ মি
১৯৩৭	,,	১৮	নবম্বর	২	৪	,,	অদৃশ্য	২।	,,	
	সূর্য্য	৩	ডিসম্বর	৫	৪৫	প্রাতে	দৃশ্য	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	মধ্যাস্থ নেকোএও দ্বীপে
১৯৩৮	চন্দ্র	১৪	মে	২	৪৫	বৈকালে	অদৃশ্য	০	সর্ব্ব	
	,,	৮	নবম্বর	৪	৪৫	প্রাতে	দৃশ্য	০	,,	আরম্ভ ৩ঘ মুক্ত ৬।৩০ মি
	সূর্য্য	২২	,,	৬	১৫	,,	অদৃশ্য	০	ছোট	দৃশ্য জাপানে

সন	গ্রহণ	তাং	মাস	ঘণ্টা	মিনিট	সময়	দৃশ্যাদৃশ্য	কলা	গ্রাস।	স্থিতির নিয়ম।
১৯৩৯	,,	১৯	এপ্রেল	১০	১৫	বৈকালে	,,	০	অঙ্গুরীয়কাকৃতি	মধ্যাহ্ন মাকছকাটকায়
	চন্দ্র	৩	মে	৯	১৫	,,	দৃশ্য	০	সর্ব্ব	আরম্ভ ৭।৩০ মিঃ মুক্ত ১১ ঘ
	,,	২৮	আক্‌টোবর	১২	৪৫	,,	অদৃশ্য	১১৮	অপূর্ণ	
১৯৪০	,,	২২	এপ্রেল	৯	৪৫	প্রাতে	,,	০	অতি ছোট	
	সূর্য্য	৭	আক্‌টোবর	৭	১৫	বৈকালে	,,	০	সর্ব্ব	মধ্যাহ্ন আর দৃশ্য বাহুবার

আয়ুর্ব্বেদের সংস্কার না সংহার?

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

(৩)

প্রত্যক্ষ শারীরের মূল (গ্রন্থ) আলোচনার পূর্ব্বে আমাদের তিনটী কথা বলিবার আছে।

প্রথম কথা এই—"প্রত্যক্ষশারীরে"র সমালোচনাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। আয়ুর্ব্বেদের শারীরাংশ (তৎফলে অনেক অংশই) সুদীর্ঘকাল যাবৎ যেরূপ বিকৃত ও বিপরীত রূপে আলোচিত এবং ব্যাখ্যাত হইতেছে, অগ্রে তাহার প্রতিকার না হইলে,আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি বা পরিবর্দ্ধনাদির সমুদায় চেষ্টাই পণ্ড হইবে। অতএব সর্ব্বপ্রথমে সেই বিকৃতি—"উদোর পিণ্ড" কিরূপে "বুধোর ঘাড়ে" পড়িয়াছে, তাহার পরিচয় লওয়া আবশ্যক। "প্রত্যক্ষ শারীর"কার আয়ুর্ব্বেদীয় শারীর বিপর্য্যস্ত হইয়াছে বলিয়াই শারীর প্রতিসংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন ; এবং "উপোদ্ঘাতে" এই "শারীর বিপর্য্যাস" চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর শারীর বিপর্য্যয়ের কারণ তাঁহার মতে—"প্রতিসংস্কর্ত্তৃণাং (১) সংগ্রহ কৃতাঞ্চ কল্পনাকল্পতরোরুদিয়ায় নানাবিধঃ শারীর বিবরণ বিস্তরঃ* * * সোঽসৌ অনার্ষঃ প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধশ্চ"* *(উপোদ্ঘাত ৬৯ পৃঃ) ; অর্থাৎ প্রতিসংস্কর্ত্তা এবং সংগ্রহকারগণের কল্পনার কল্পবৃক্ষ হইতে নানারূপ শারীর বিবরণসমূহ উদ্গাত হইয়াছে* * (সেইগুলি) তাহা ঋষিকৃত নহে এবং প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ * *। এবং তৎপ্রতিকারার্থ প্রত্যক্ষের অনুগামী হইয়া প্রামাদিক পাঠ সংশোধন, প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট শারীরের সম্যক্ বর্ণনা প্রভৃতি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় মহাশয় এবং তত্তুল্য নবীন সংস্কারক এবং গ্রন্থকারগণের কল্পনারূপ কল্পবৃক্ষ হইতে ব্যাখ্যাদি উদ্গাত হইয়া যে আয়ুর্ব্বেদীয় শারীর কেবল বিপর্য্যস্ত নহে, সমূলে উৎপাটিত করিবার উপক্রম করিয়াছে, তাহার কোন উল্লেখ বা তৎপ্রতিকারার্থ কোন উপায় নির্দ্দেশ করেন নাই। বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য যাঁহারা বিশেষ উৎসাহ এবং আনুকূল্য প্রদর্শন করিতেছেন, সেই শিক্ষিত জনসাধারণের চিত্ত সেই বিষয়ে আকৃষ্ট করা আমরা আবশ্যক মনে করিতেছি ; এবং প্রাচীন ও আধুনিক বিকৃত বা অদ্ভুত ব্যাখ্যাসমূহের অধিকাংশই "প্রত্যক্ষশারীর" গ্রন্থে সুসংগৃহীত, সুশৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সুসংহত হইয়াছে বলিয়াই, উক্ত প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এই গ্রন্থ অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

এ কথা দ্বারা কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা "প্রত্যক্ষ শারীর" স্থ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিতেছি। বস্তুতঃ, বর্ত্তমান কালে শরীর বিবরণ সম্বন্ধে যে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে (ডাঃ হার্ণলের গ্রন্থ "শারীর" শব্দ বাচ্য নহে—আলোচনা মাত্র) ইহা সর্ব্ব বিষয়েই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। "প্রত্যক্ষ শারীরে"র পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১খানা গ্রন্থের সহিত কিঞ্চিৎ তুলনা করিলেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে। আমরা এই প্রবন্ধের পূর্ব্ব-প্রকাশিত ২য় পরিচ্ছেদে "ফুস্ফুস" সম্বন্ধে কেবল "প্রত্যক্ষ শারীর"কারের মতেরই আলোচনা করিয়াছি, "সুশ্রুতার্থ সন্দীপন ভাষ্য" নামক সুশ্রুতের নবীন টীকাকার খ্যাতনামা কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতের উল্লেখও করি নাই। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই টীকা (সুশ্রুতের শারীর স্থানের) তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর্গীয় কবিরাজ বিনোদলাল সেন কৃত আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান নামক গ্রন্থের "শারীর স্থান" খণ্ডেরই প্রায়শঃ অনুবাদ।

(১) সাধারণ পাঠকগণের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, বর্ত্তমানে প্রচলিত চরক এবং সুশ্রুত সংহিতা প্রতিসংস্কৃত গ্রন্থ। অগ্নিবেশতন্ত্র চরক (এবং দৃঢ়বল) কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়া চরক-সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সুশ্রুতের প্রতিসংস্কারক কে তৎসম্বন্ধে প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যেই মতভেদ আছে। মূল অগ্নিবেশতন্ত্র এবং সুশ্রুত (বৃদ্ধ সুশ্রুত নামে প্রসিদ্ধ) অধুনা বিলুপ্ত।

কেবল তাহাই নহে—তদুপরি বিবিধ অপূর্ব্ব বিদ্যারাগরঞ্জিত। ৺ সেন মহাশয় তৎকৃত "শারীর স্থানে" ফুপ্‌ফুস-বর্ণনায় পাশ্চাত্য "শারীরো"ক্ত Lungs এর বিবরণই স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা করিতে যাইয়া প্রথমেই লিখিলেন, "ফুপ্‌ফুস স্তু দ্বিধা ভিন্নো বাম দক্ষিণ ভেদতঃ।" ৺সেন মহাশয়েরই কৃত অর্থ—"ফুপ্‌ফুস দুইভাগে বিভক্ত—বাম ফুপ্‌ফুস ও দক্ষিণ ফুপফুস"। পাশ্চাত্য শারীরে (এবং প্রত্যক্ষতঃও বটে) Lungs দুইটী; কিন্তু সুশ্রুতের উক্তি—ফুপ্‌ফুস একটী (একবচনান্ত)। এতদুভয়ের সামঞ্জস্য করিবার জন্যই ৺ সেন মহাশয় এই আংশিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুশ্রুতের "তস্যাধো বামতঃ প্লীহা ফুপ্‌ফুসশ্চ" (২) এই পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যায় ৺ সেন মহাশয়ের মত সুযোগ না পাইয়াই হউক, অথবা "স্বাধীন শিক্ষিত বিদ্যা" প্রকটনের জন্যই হউক, অম্লান ভাবে লিখিলেন, "ফুপফুসশ্চ প্রায়েনোরো-ব্যাপকোঽপি বাহুল্যানুশয়াদ্বামত ইতি যোজনা" অর্থাৎ ফুপ্‌ফুস (একটী) প্রায় বক্ষোব্যাপী হইলেও আধিক্য নিবন্ধন বামদিকে এইরূপ বুঝিবে (—ফুপ্‌ফুসের অধিকাংশই বাম দিকে থাকে বলিয়া বামতঃ কথিত হইয়াছে)। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, নরদেহে যে দুইটী শ্বাসযন্ত্র বা Lungs নামে প্রসিদ্ধ, তাহাদের সহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কোন দিন চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই (৩)। "ক্লোমে"র প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মত সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। "ক্লোমে"র অর্থ Pancreas (৪) এই ব্যাখ্যাও ৺ সেন মহাশয়ের। কিন্তু ৺ সেন মহাশয় যেখানে সরলভাবে বলিয়াছেন, 'অতি প্রাচীন গ্রন্থে কোন্ যন্ত্র ক্লোম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাও হঠাৎ বলা যায় না; হয় ত বক্ষঃস্থলস্থ কোন যন্ত্রাংশ তত্তদ্ গ্রন্থকারদিগের ক্লোম শব্দ বাচ্য' ইত্যাদি,—চক্রবর্ত্তী মহাশয় সে স্থলে সুশ্রুতের "কণ্ঠ হৃদয়নেত্র ক্লোম নাড়ীষু মণ্ডলাঃ" ও "হৃদয়ক্লোম নিবদ্ধাস্থ নাড়ীষু অষ্টাদশ" এই (৫) দুইটী পঙ্‌ক্তিই কল্পিত বলিয়া কাটিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন; এবং তাঁহার ব্যাখ্যাত সুশ্রুতের মূলে স্বরচিত অভিনব বচন সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কেবল তাহা হইলেও তত ক্ষতি ছিল না; কিন্তু ইহার উপর আর এক "অতি বড়" বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন। নিজের ব্যাখ্যার প্রাচীনতা (অতএব যথার্থতা) সম্বন্ধে পাঠকগণের দৃঢ় ধারণা জন্মাইবার জন্য Pancreas সম্বন্ধীয় পাশ্চাত্য "শারীরো"ক্ত বর্ণনার কিয়দংশ স্বয়ং সংস্কৃত শ্লোকাকারে অনুবাদ করিয়া 'যদুক্তং' অর্থাৎ যেহেতু কথিত হইয়াছে এবং 'যদাহ' যেমন বা যেহেতু বলিয়াছেন (কোথায় কথিত হইয়াছে বা কে বলিয়াছেন তাহার নাম-গন্ধও নাই) এইরূপ ইঙ্গিত সহ উক্তি-চিহ্নের (" ") অন্তরালে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।। এরূপ কাণ্ড এক স্থানে নহে, অনেক স্থানেই করিয়াছেন। সম্ভবতঃ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বার্দ্ধক্যজনিত বা স্বাভাবিক শক্তিহীনতার জন্য সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই এবং তজ্জন্যই ঐরূপ গুপ্তঘাতকোচিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় তাঁহার রসময়ী লেখনী মুখে চিত্রিত নবীন ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মুখে যে কথা বলাইয়াছিলেন :—

"আসছে সব বিধি নিতে
এমন বিধি হবে দিতে
দেখেননি যা বিধির পিতে
চৌদ্দ ভুবনম্—"

সে কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকার প্রায় ছত্রে ছত্রে বিরাজমান। ফলতঃ ঈদৃশ গ্রন্থের প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, মতের উল্লেখ করাও বিড়ম্বনাকর। তথাপি আমরা প্রবন্ধের বৈচিত্র্য সম্পাদনার্থ এবং অন্য প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব মাত্র।

দ্বিতীয় কথা এই—পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধাংশে আমাদের সিদ্ধান্ত বা ব্যাখ্যা কেন প্রদত্ত হয় নাই, তাহার কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। আমাদের এই প্রবন্ধের নাম বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, পাঠক মহোদয়গণ তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাদৃশ সিদ্ধান্ত বা ব্যাখ্যা দিতে গেলে কেবল যে অপ্রাসঙ্গিক হইত তাহা নহে,—যে বিষয়ে আমরা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, তাহাও সুদূরেই বিক্ষিপ্ত হইত; কেন না, আয়ুর্ব্বেদীয় শারীরের বা শারীর সংজ্ঞাসমূহের যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাবলীতে (যত দূর পাওয়া যায়) তত্তৎ বিষয়ে যেখানে যতটুকু পাওয়া যায়, সেই সমস্ত বিবরণ একত্র করিয়া সেই সমগ্র বিবরণের সামঞ্জস্য অর্থাৎ অর্থ-সঙ্গতি হয় অথচ প্রত্যক্ষসিদ্ধ (বা অন্ততঃ প্রত্যক্ষাবিরুদ্ধ) (৬) এইরূপ ব্যাখ্যা আবশ্যক। বিশেষতঃ, প্রাকৃতিক নিয়মে দুইটী পদার্থ একই সময়ে একই স্থানে থাকিতে পারে না। পুরাতনের পরিবর্ত্তে নূতনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, অগ্রে পুরাতনের স্থান-চ্যুতি আবশ্যক। যে ভ্রমপূর্ণ বা বিপরীত ব্যাখ্যায় লোকের চিত্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই ব্যাখ্যার ভ্রম পূর্ব্বে প্রমাণিত না হইলে, সেই ভ্রান্ত-সংস্কার-মোহ-মুক্ত চিত্তে নূতন ব্যাখ্যার স্থান হইতে পারে না। মহাকবি শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন :—

---

(২) অর্থ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩) দক্ষিণ শ্বাসযন্ত্র (Lungs) বামাপেক্ষা বৃহত্তর।

(৪) উদরস্থিত পরিপাকের বিশিষ্ট যন্ত্র। (অনবধানতা বশত পূর্ব্বে বলা হয় নাই)

(৫) ইতিপূর্ব্বে (২য় পরিচ্ছেদে) অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

(৬) এ কথা "প্রত্যক্ষ শারীরের" অনুরোধেই বলিতেছি না। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের উপদেশও এইরূপ :—"প্রত্যক্ষ তো হি যদ্দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যদ্ভবেৎ। সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়ো জ্ঞানবিবর্দ্ধনম্॥" (সুঃ শাঃ ৫অঃ) অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায় এবং যাহা শাস্ত্রে পাওয়া (জানা) যায়, এতদুভয়ের সম্মেলনেই প্রচুর জ্ঞান বৰ্দ্ধিত হয়। "সম্পূর্ণ" না বলিয়া প্রচুর বলার তাৎপর্য্য এই—সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (যন্ত্রাদির সাহায্যেও) সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে।

"অপাং হি তৃপ্তায় না বারিধারা, স্বাদুঃসুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা" (৭) অর্থাৎ (যে কোন প্রকারেই হউক না কেন) জলপানে তৃপ্ত ব্যক্তির নিকট মধুর সুগন্ধি ও সুশীতল জলধারাও রুচিকর হয় না। দুইটী উদাহরণ দিলেই আমাদের বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইবে।

আমাদের প্রবন্ধের পূর্ব্বপ্রকাশিত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "ফুস্‌ফুস" এবং "ক্লোম" এই দুইটী সংজ্ঞা সমালোচিত হইয়াছে। "ফুস্‌ফুসের" অর্থ শ্বাসপ্রশ্বাসনির্ব্বাহক যন্ত্রদ্বয়, অর্থাৎ "Lungs"—এই ধারণা বোধ হয় অধিকাংশের চিত্তেই বদ্ধমূল; অথচ সুশ্রুতে "ফুস্‌ফুসের' যে বর্ণনা দেখা যায়, তাহা "Lungs"এর বিবরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুশ্রুতোক্ত বর্ণনা ভ্রমপূর্ণ কি না স্থির করিবার পূর্ব্বে "ফুস্‌ফুস" শব্দে প্রকৃতই "Lungs" বুঝায়—এই সংজ্ঞা-প্রবর্ত্তক সুশ্রুতের উক্তি হইতে (কিংবা এই সংজ্ঞা সুশ্রুতের পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, যদি এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সুশ্রুতের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমকালীন অন্যান্য গ্রন্থকারগণের উক্তি হইতে) তৎপ্রমাণ সংগ্রহ করা আবশ্যক; নচেৎ নিজেদের বা অপরের কল্পিত এবং যাদৃচ্ছিক ব্যাখ্যার দোষে সুশ্রুত অপরাধী সাব্যস্ত হইতে পারেন না (প্রতিসংস্কারকগণের সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে)। অথচ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথের মত প্রতিভাবান্ আয়ুর্ব্বেদ মহারথীও "সুশ্রুতে ফুস্‌ফুসের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না এবং ইহা যে শ্বাসযন্ত্র ইহা কোথায়ও কথিত হয় নাই" ইত্যাদি বলিয়াও, পূর্ব্বপ্রচলিত ধারণা ত্যাগ করিতে কিংবা আয়ুর্ব্বেদীয় শারীর সংস্কারের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া, সুশ্রুত সংহারে ব্যগ্র হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে পূর্ব্বপ্রচলিত ধারণাই ভ্রমাত্মক কি না, তাহা নির্ণীত হওয়ার পূর্ব্বেই, নূতন ব্যাখ্যা দিতে গেলে তাহা উন্মত্তপ্রলাপবৎ উপেক্ষিত হইত না কি? "ক্লোম" সম্বন্ধেও আমরা দুইটী ব্যাখ্যার আলোচনা করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে, (১) উভয় ব্যাখ্যাকারকই (কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণ চক্রবর্ত্তী এবং মহামহো-পাধ্যায় গণনাথ) সুশ্রুতোক্তিসমূহের মধ্যে কেহ একটী বচনের আধখানা, কেহ অন্য বচনের কিছুটুকু অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় ব্যাখ্যা (৪) প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন; (৬) কোন কোন বচন সম্বন্ধে (৫) উভয়েই সম্পূর্ণ নিঃশব্দ রহিয়াছেন; ও (৭) একজন যে বচন প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, অন্যজন তাহাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গেই "ক্লোম" সম্বন্ধে অষ্টাদশজন গ্রন্থকারের মতের (আমাদের ক্ষুদ্র অনুসন্ধানলব্ধ) কথাও ইঙ্গিতে বলিয়াছি। এই সকল বিভিন্ন ব্যাখ্যার সত্যাসত্য মীমাংসিত হওয়ার পূর্ব্বেই আর একটী নূতন ব্যাখ্যা দিতে গেলে, তাহা যে কেবল বৃথা হইত, তাহা নহে; মীমাংসার পথও আরও জটিল এবং কণ্টকাকীর্ণ হইয়া পড়িত। তাই আমরা সাধারণের সেই পিপাসা—জিজ্ঞাসা উদ্রেকের প্রতীক্ষা করিতেছি। সেইজন্যই ধর্ম্ম (কর্ম্ম) তত্ত্ব নিরূপণার্থ (ভগবান্ জৈমিনি) কৃত মীমাংসা দর্শনের প্রথম সূত্রই "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"। ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণার্থ (ভগবান্ বেদব্যাস) প্রণীত বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্রও তাই—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"।

আমাদের তৃতীয় কথা এই—সাধারণের মধ্যে এবং কবিরাজদের মধ্যেও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য শারীরা-লোচনা নিষ্প্রয়োজন; কেন না, যে রোগ নির্ণয় এবং ঔষধাদি প্রয়োগই (প্রচলিত) আয়ুর্ব্বেদের উদ্দেশ্য, তাহা আয়ুর্ব্বেদমতে বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিনটীর উপরই নির্ভর করে। চরক সুশ্রুতাদি গ্রন্থে শারীর জ্ঞানের যে প্রশংসা কীর্ত্তন (১০) দৃষ্ট হয়, তাহা শল্য শালাক্যাদি অঙ্গ লক্ষ্য করিয়া; অর্থাৎ অস্ত্র-চিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা, চক্ষুঃকর্ণাদি রোগ চিকিৎসার জন্যই শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানা আবশ্যক,—কায়চিকিৎসার জন্য নহে। আমাদের আরব্ধ আলোচনায় আর অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে মীমাংসা করা অত্যাবশ্যক; কেন না তাহার উপর এই প্রবন্ধেরও প্রয়োজন বা ঔচিত্য নির্ভর করিতেছে। এই প্রবন্ধের (পূর্ব্বপ্রকাশিত) প্রথম পরিচ্ছেদের শেষভাগে অতি সংক্ষেপে ইহার কিছু উত্তর দিয়াছি; কিন্তু তাহা বোধ পর্য্যাপ্ত হয় নাই।

চরক-সংহিতা কায়চিকিৎসা-প্রধান গ্রন্থ ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু চরক-সংহিতার শারীর বা অন্যস্থানে শারীর জ্ঞানের যে প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে, আমরা আপাততঃ সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না। শারীরের আলোচনার অভাবে বায়ুপিত্ত ও কফের পরিচয় বা স্বরূপ জ্ঞানও যে লুপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে সম্বন্ধেও এক্ষণে কিছু বলিব না। আমরা অন্য রকমের উত্তরের অনুসন্ধান করিব।

"ক্ষয়ঃস্থানঞ্চ বৃদ্ধিশ্চ দোষাণাং ত্রিবিধা গতিঃ। ঊর্দ্ধং চাধশ্চ তির্য্যক্ চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা পরা। ত্রিবিধা চাপরা কোষ্ঠ শাখা মর্ম্মাস্থি সন্ধিষু" (চরক সূত্র ১৭অঃ) অর্থাৎ দোষসমূহের (বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষ) গতি তিন প্রকার—ক্ষয়, বৃদ্ধি ও সমভাবে অবস্থান। অন্য তিন প্রকারের গতিঃ—ঊর্দ্ধ, অধঃ, এবং তির্য্যক্ (১১)। অপর তিন প্রকারের গতিঃ—কোষ্ঠ, শাখা, এবং মর্ম্ম ও অস্থি-সন্ধিসমূহে; (এইগুলি) বিশেষ ভাবে জ্ঞাত হইবে। এ স্থলে শেষোক্ত ত্রিবিধ গতির বিশিষ্ট জ্ঞান কোষ্ঠ-মর্ম্মাদির বিবরণ জ্ঞান-সাপেক্ষ—ইহা পাওয়া গেল। পুনশ্চ "ত্রয়ো রোগমার্গা ইতি শাখা

(৭) নৈষধচরিতে।

(৮) শ্রীযুক্ত হারাণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ব্যাখ্যাও তাঁহার নিজের আবিষ্কৃত নহে। সে রহস্য প্রকাশ করিয়াছি।

(৯) "হৃদয় ও ক্লোম নিবদ্ধ নাড়ীতে আঠারটী অস্থিসন্ধি" "তালু ও ক্লোম উদকবহ স্রোতের মূল" প্রভৃতি। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে পূর্ব্বোক্তটীও প্রক্ষিপ্ত।

(১০) "প্রত্যক্ষ শারীরে"ও উদ্ধৃত হইয়াছে।

(১১) এই কথাগুলির অর্থ আপাততঃ যেরূপ বোধ হয়, তাহা নহে, আরও গভীর; কিন্তু তাহা বলার প্রয়োজন হইবে যাহা বলা যাইতেছে তাহাতেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

মর্ম্মাস্থি সন্ধয়ঃ কোষ্ঠঞ্চ।" (চরক সূত্র• ১১ অ•) অর্থাৎ রোগ সমূহের পথ তিনটী শাখা, মর্ম্ম ও অস্থিসন্ধি এবং কোষ্ঠ। এখানেও রোগমার্গ জ্ঞান পূর্ব্ববৎ কোষ্ঠমর্ম্মাবিজ্ঞানের সহিত সংস্পৃষ্ট দেখা গেল। পুনশ্চ সুখ সাধ্য রোগের লক্ষণাবলী নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে—"* * গতিরেকা * *" (চঃ সূ-১০অঃ) অর্থাৎ দোষের গতি এক প্রকার। এবং "* * দ্বিপথং নাতিকালজ্বা * *" অর্থাৎ অচিরোৎপন্ন। দুই পথে বিচরণকারী রোগ—ইহা কৃচ্ছ্র সাধ্য রোগের অন্যতম লক্ষণ। এবং "* * সর্ব্বমার্গানুসারিণম্ * *" (চঃ সূ• ১০ অঃ) অর্থাৎ রোগ সর্ব্বপথচারী হইলে—ইহা অসাধ্য রোগ লক্ষণ। এখানে দেখা যাইতেছে রোগ সুখসাধ্য বা কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য নির্ণয় করিতে হইলে দোষের গতি কয় প্রকারের হইতেছে বা রোগ কয়টী পথে বিচরণ করিতেছে জানা আবশ্যক; এবং তাহা জানিতে হইলেই শাখা, কোষ্ঠ, মর্ম্ম এবং অস্থি-সন্ধিসমূহের বৃত্তান্ত জানা অত্যাবশ্যক। অতঃপর

"স এব কুপিতো দোষঃ সমুত্থান বিশেষতঃ।
স্থানান্তর গতশ্চাপি বিকারান্ কুরুতে বহুন্॥
তস্মাদ্ বিকার প্রকৃতী রধিষ্ঠানান্তরানি চ।
সমুত্থান বিশেষাংশ্চ বুদ্ধা কর্ম্ম সমাচরেৎ॥
যোহ্যেত ত্রিবিধং জ্ঞাত্বা কর্ম্মান্যারভতে ভিষক্।
জ্ঞানপূর্ব্বং যথান্যায়ং স কর্ম্মসু ন মুহ্যতি (চরক-সূত্র•১৮অঃ)

অর্থাৎ সেই দোষই (একই দোষ) কারণের বৈশিষ্ট্য বশতঃ এবং অন্যস্থানে (মূল বা প্রথম আক্রমণের স্থানের অতিরিক্ত) গমন করিয়া বহু রোগ উৎপাদন করে। অতএব রোগ-প্রকৃতিসমূহ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কফ, (১২) অধিষ্ঠানান্তর অর্থাৎ রোগের প্রধান বা প্রথম আক্রমণ স্থান ভিন্ন পরবর্ত্তী আক্রান্ত স্থান, (১৩) এবং রোগকারণ সমূহের বৈশিষ্ট্য (পার্থক্য প্রভৃতি) বুঝিয়া চিকিৎসা করিবে। যে চিকিৎসক এই ত্রিবিধই (তিন প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়—পূর্ব্বোক্ত) জ্ঞাত হইয়া বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন, তিনি চিকিৎসা-কার্য্যে মুগ্ধ (হতভম্ব) হন না।

বোধ হয় আর অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। আশা করি পাঠকগণ এক্ষণে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, আয়ুর্ব্বেদ মতে কায়চিকিৎসাতেও রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা কেবলমাত্র বায়ু পিত্ত ও কফ দ্বারাই কর্ত্তব্য নহে, সম্ভবও নহে; অন্ততঃ শাস্ত্রবিহিত উপদেশ সেরূপ নহে। রোগের ক্ষেত্র অর্থাৎ স্থান এবং রোগোৎপাদক কারণ-সমূহের বৈশিষ্ট্যও চিকিৎসক মাত্রেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য; এবং উক্ত রোগ-ক্ষেত্রের সম্যক্ জ্ঞান সর্ব্বতোভাবেই "শারীরের" মুখাপেক্ষী। কেবল তাহাই নহে; আয়ুর্ব্বেদোক্ত রোগাধিষ্ঠানসমূহের বিবরণ জানিতে হইলে, আয়ুর্ব্বেদীয় "শারীর" আলোচনা আবশ্যক। পাশ্চাত্য "শারীরের" দ্বারা সে কার্য্য চলিবে না; কেন না, কি সংজ্ঞা বা পরিভাষা, কি বর্ণনা-পদ্ধতি, কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বিভাগ-বৈশিষ্ট্য—বহু বিষয়েই এই উভয় দেশীয় "শারীরের" প্রচুর পার্থক্য রহিয়াছে; এবং এইজন্যই ইংরাজী ব্যাকরণ পড়িয়া সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়নের মত কেবল পাশ্চাত্য "শারীরের" সাহায্যে আয়ুর্ব্বেদ আলোচনা বহু বিড়ম্বনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ জ্ঞাতব্যের মধ্যে শেষোক্ত দুইটী অর্থাৎ রোগের অধিষ্ঠান এবং কারণের বৈশিষ্ট্য সর্ব্বদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রেই জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে এই দুইটীর যথেষ্ট চর্চ্চা এবং উন্নতিও হইতেছে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে ঐ দুইটী ত আছেই; তদুপরি এমন আর একটী আছে—বায়ু, পিত্ত, কফের বিচার—নিত্য নব-নব তত্ত্ব প্রকাশক বিজ্ঞানের আলোকেও পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র অদ্যাপি তাহার সন্ধান মিলিতেছে না। একই স্থানে একই কারণে উৎপন্ন রোগের বায়ু, পিত্ত, কফের পার্থক্য অনুসারে ভেদ নির্ণয় এবং তদনুসারে ঔষধ পথ্যাদিরও প্রভেদ আয়ুর্ব্বেদেরই অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও গৌরব। বর্ত্তমানে আমরা "শারীর" ভুলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি; তৎফলে রোগের অধিষ্ঠান বিচারে জলাঞ্জলি দিয়াছি। কারণের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ত নামমাত্রাবশেষ হইয়া আছে। কেবলমাত্র বায়ু পিত্ত কফ বলিয়া চীৎকার করিতেছি। সেই বায়ু পিত্ত কফও যে কোন্ পদার্থ তাহার স্বরূপ অনুসন্ধানের জন্যও শিরঃপীড়া অনুভব করিতেছি না। আমাদের এবং আমাদের সংস্রবে আয়ুর্ব্বেদের যদি অধঃপতন না হইবে, তবে অধঃপতন হইবে কাহার?

অতঃপর আমরা প্রারব্ধ কার্য্যে পুনরায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

---

(১২) ইহাই প্রচলিত ও বহুসম্মত ব্যাখ্যা। অন্য ব্যাখ্যাও হইতে পারে—আয়ুর্ব্বেদমতে রোগ-প্রকৃতি দ্বিবিধ—নিজ এবং আগন্তু (চঃ সূঃ ২০ অঃ)। অহিতকর আহার বিহারাদি কারণে কুপিত বায়ু পিত্ত ও কফ সাক্ষাৎভাবে যে সকল রোগ উৎপাদন করে, সেইগুলি "নিজ" এবং অগ্নি শস্ত্র আঘাত প্রভৃতি (আকস্মিক) কারণে যে সকল রোগ ব্যথা সহ উৎপন্ন হয় (তৎপরে কুপিত বায়ু পিত্ত ও কফ সংস্পৃষ্ট হয়) সেইগুলি "আগন্তু"। এই দ্বিবিধ রোগেই বায়ু পিত্ত কফ সংস্পৃষ্ট থাকে, তবে "নিজ" ব্যাধিতে প্রথম হইতেই, "আগন্তুতে" কিঞ্চিৎ পরে।

(১৩) ইহাই বহুসম্মত ও প্রচলিত ব্যাখ্যা। অন্য ব্যাখ্যা—স্থান-সমূহের অভ্যন্তর।

"মর্গে"র মর্ম্মব্যথা

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ

তোমাদের কারুর বোধ হয় জন্ম-কথা মনে নেই? কিন্তু আমি যখন ইট-পাথরে গ'ড়ে উঠ্‌ছিলুম, তখন ভ্রূণস্থ আমার চৈতন্য রঙীন আশার আনন্দে যে কি আকুল হয়ে উঠেছিল, তা আজো আমার বেশ মনে পড়ে! মনে পড়ে—যখন রাজমিস্ত্রীর দল গানের তালে-তালে আমায় তিলে-তিলে গ'ড়ে তুল্‌ছিল, তখনকার কথা!—তখন ভেবেছিলুম, এম্‌নি গানের সুরেই সারা জীবন আমার ভরে থাক্‌বে! তখন ভাবতুম, আমার এই শান্‌-বাঁধানো বুকে, তরুণ-তরুণীর চোখে চোখে, বুকে-বুকে, সোহাগে-সরমে-স্পন্দনে-রচা কত অকথিত প্রণয়ের ইতিহাস রেখায়-রেখায় স্মৃতি রেখে যাবে! তার পর এক দিন দেখ্‌ব—প্রণয়ের সে পুষ্পরস দানা বেঁধে উঠ্‌তে আরম্ভ করেছে—একটি একটি শিশু-মূর্ত্তিতে! সেই শিশুর দল তাদের শৈশবের আনন্দ-হিল্লোলে, কৈশোরের উচ্চহাস্যে আমার বুকে সুখের নন্দন গড়ে তুলে, যৌবনের জ্যোৎস্নারাজ্যে হাজির হয়ে, তাদেরই বাপ-মায়ের মত প্রণয়ের সেই চিরন্তন কাহিনী নূতন ছন্দে নূতন ভাষায় রচনা করতে থাকবে...এম্‌নি করে আনন্দের ধারা ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে আমার পাষাণ বুকে স্মৃতির পসরা সাজিয়ে যাবে! হায় রে! এই আশা নিয়েই গড়ে উঠেছিলুম; কিন্তু যখন শেষ হলুম—শুনলুম...আমি না কি 'মর্গ'—মড়া-কাটার ঘর! জ্যান্তর পরিচয় জানতে আমার জন্ম নয়! আমার জন্ম—আড়ষ্ট হিমের তালের মধ্যে মৃত্যুর মর্ম্ম চিরে-চিরে বার করবার জন্যে!

এই দীর্ঘ বারো বছর সেই কাজই ক'রে আস্‌চি। এই বুকের ওপর কত কমনীয়-কান্তি তরুণ-তরুণীর মৃত্যু-মলিন পাণ্ডুর দেহ ছুরির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে—কত যে আফিংয়ের ডেলা, বিষের বড়ি আর মারাত্মক শিকড় বেরিয়েচে, তার ঠিক নেই। সংসারের জ্বালা সইতে না পেরে, ক্ষণিকের ভুল সমাজের ক্ষমা না পেয়ে, ফলে-ফুলে-বর্ণে-গন্ধে-ভরা এমন সুন্দর ধরা যারা বড় দুঃখে অসময়ে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েচে, তাদের মরা দেহ নিয়ে মৃতের উদ্দেশে জীবিতের যে বীভৎস কুৎসিত বিদ্রূপ মাঝে-মাঝে প্রেতের হাসির মত উছ্‌লে উঠত, তার দুর্গন্ধে যেন আমার দম্‌ আট্‌কে যেত! হায় রে!—এই বুকে কত পর্দানসীনের ঘরের মেয়ে-বউ বে-আব্রু হয়ে মুর্দফরাসের হাতে ছুরির ঘা সয়েচে, আর তাই, পথের কুকুরগুলো নাকে কাপড় দিয়ে আমার তারে-বোনা জালতির পাশে অশ্লীল হাসিতে মুখ টিপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেচে! ইচ্ছে হ'ত, ছাদ-শুদ্ধ হুড়-মুড় করে তাদের ঘাড়ে পড়ি! এমনি জ্বালা বুকে জড়িয়ে একটানা বারো বছর কাটিয়েছি!—মৃত্যুর তুষার-কাঁপানো শীতলতা সে জ্বালার এক বিন্দুও জুড়োতে পারেনি...জ্বালায় বুক ফেটে গেছে, তবু কিন্তু এত দিন মুখ ফোটেনি! কি—হাসচ তুমি? ভাবচ—সব মিথ্যে? আমি মর্গ,—মানুষ নই বলে আমার জ্বালা থাক্‌তে পারে না? তবে, এস আমার পশ্চিমের দেয়ালের দিকে,—দেখ্‌বে, কত বড় ফাট আমার বুকে ধরেচে! চূণ-শুরকীর গরঙ্গিলের ফাট—ও নয়! কন্‌ট্রাক্টরের হাড়-হদ্দ হয়ে গেছে—ও ফাট সারাতে পারে নি!

এত দিন, বুক ফাটলেও যে মুখ ফোটেনি, আজ তা ফুটল কেন? হাঁ—এর উত্তর দেব। আমি পাষাণে গড়া হলেও, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া আমার স্বভাব সত্ত্বেও, যেদিন দেখলুম—আমি যার হাতে গড়া, সেই মিঞাজান মিস্ত্রীর আদরের মেয়ে মহরম, তার আঠার বছরের পূর্ণ যৌবন আর সারা জীবনের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, কলঙ্কের পাহাড় শিয়রে রেখে, আমার বুকে শুয়ে আছে, সে দিন যে কি হয়ে গিছলুম...ভাষা পাচ্ছি না বুঝিয়ে বলবার! শুধু মনে পড়ে—আমি কেঁপে উঠেছিলুম! শুনেছি, সে কাঁপুনির তাড়সে সে দিন আরো অনেকে কেঁপে উঠেছিল। তোমরা বল্‌বে সেটা ভূমিকম্প। অবিশ্বাসীর মন এম্‌নি করেই ব্যাখ্যা করে বটে!

যাক্‌, বিশ্বাস কর না কর, আমি সেদিন কেঁপে উঠেছিলুম! কেঁপে উঠ্‌ব না!...সে যে আমার শৈশবের

স্মৃতির অনেকখানি স্থান দখল করে গেছে! সে তখন বছর ছয়েকের,—আমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়। সে যখন তার নরম পায়ের চাপে-চাপে আমার বুকের ধাপে ধাপে ঘুরে বেড়াত, তখন আমি আনন্দে আড়ষ্ট হয়ে থাকতুম,—পাছে আমার বুকের হাড়ে তার কচি পায়ের কোমলতা ছিঁড়ে গিয়ে, তাকে নিত্য দেখার আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করে! সে আস্ত নিত্য তার বাপের খানা নিয়ে, আর সঙ্গে আসত তার নিত্য সহচর রক্ষী রহমন লিখের মানা নিয়ে! 'এটা কোরোনা', 'ঐদিকে এসোনা,' 'ওদিকে যেওনা' 'কণিকে হাত দিও না'—এই রকম হাজার দফা নিষেধের দুর্গ রচনা করে রহমন তার মহরমকে আগলে বেড়াত দেখতুম। দেখতুম,—আর ভাবতুম কত কথা! আমার বুকে সেই অনাগত তরুণ-তরুণীর কথা ভাবতে গেলেই মহরমের মুখখানি সব সময়েই ভেসে উঠ্ত! রহমন অনেক সময় বাদ পড়ে যেত। তাই ভাবতুম—আর কাউকে না হক, মহরমকে যদি বুকে পাই! কিন্তু এমন ভাবে তো তাকে বুকে পেতে চাইনি! ওগো দুনিয়ার মালিক! দুনিয়ার চোখে মহরম আজ শুধু ব্যাভিচারিণী নয়;—তার চেয়েও জঘন্য—সে প্রেমাস্পদের অনুরোধে স্বামীকে মারতে গিয়ে ভুলের ফাঁদে জড়িয়ে নিজে মরেচে! দুনিয়ার সবজান্তা ওগো কেউ যদি থাক, তবে আকাশ ফাটিয়ে রটিয়ে দাও—সত্যি কি না! তা যদি না পার···তবে তুমি কিসের দুনিয়ার মালিক?—কিসের সর্ব্বশক্তিমান?...কিসের ন্যায়বিচারক? তবে তুমিও যা, আমিও তা—বরং কিছু ভাল! আমি মড়ার ওপর অস্ত্র চালাই, তুমি মড়ার ওপর মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপাও! তুমি মিথ্যার প্রতিবাদে নির্ব্বিকার, আর আমি তোমার মত জড় হয়েও সত্যের প্রচারে মরিয়া হয়ে উঠেছি!

হাঁ, মানছি—রহমন পতি না হয়েও মহরমের সে প্রেমাস্পদ। সে দোষ কার? মহরমের—না মিঞাজানের? দৌলতের নেশায় কে মহরমকে তার প্রেমাস্পদের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বুড়া স্বামীর সঙ্গে সাদি দিয়েছিল? তবু সমাজ!—তোমারই জিৎ—স্বীকার করচি···মহরম দোষী—সে ব্যাভিচারিণী!

কিন্তু মহরম হাজার ব্যাভিচারিণী হোক—সে তার স্বামীকে শ্রদ্ধা করত, আর এমন সেবা করত, যার চেয়ে কোন সাধ্বী স্ত্রী বেশী করতে পারে না। কিন্তু স্বামীকে সে ভালবাসতে পারেনি···এজন্য হয় ত সে অনুতপ্ত হয়ে থাকবে...কিন্তু তবু সে—তোমাদের ভাষায়—তার দুর্ব্বলতার মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি!...সে লুটিয়ে থাকত তার স্বামীর পায় কৃতজ্ঞতায়, আর নিজের দুর্ব্বলতায়; কিন্তু ভালবাসত সেই নেশাখোর বদমেজাজী রহমানকে!

জীবনে এক দিন মহরম তার ভালবাসাকে জোর করে স্বামীর দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।—যেদিন রহমন মহরমকে দিয়ে তার স্বামীকে হত্যা করার প্রস্তাব করে!

রহমনের প্রস্তাব শুনে মহরম খানিকক্ষণ রহমনের দিকে চেয়ে রইল। রহমন জিজ্ঞেস করলে—"অমন করে তাকিয়ে রইলে যে?"

"দেখচি—তুমি সুন্দর কোন্‌খানটায়?"

রহমন গর্ব্বভরে নিজের বুকে আঘাত করল।

মহরম দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া মাথা নাড়িল।

রহমন বল্‌ল—"কি? চাও না আমার ভালবাসা?"

মহরম রুক্ষস্বরে বলে উঠল—"তোমার ভালবাসাই নেই! আর থাকলেও আমি চাই না—" মহরম চলে যাচ্ছিল, রহমন হাতখানা ধরে ফেলে বল্লে, "বেশ! নাই চাও—কিন্তু ভালবাসা নেই, বুঝলে কিসে?"

"যে বুকে অত বেইমানি—"

"বেইমানি!···কার সঙ্গে?"

"যার আশ্রয় না পেলে আজ তুমি পথে পথে বেড়াতে, যার দানাপানি না পেলে হয় ত আজ তুমি কবরের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে থাকতে—"

রহমন বাধা দিয়ে বলে উঠল—"ভুল মহরম!···মস্ত ভুল তোমার! পাখীর-ঠুক্‌রে-ফেলা কোন ফল যদি খেয়ে থাকি, তার জন্যে তার কাছে সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকতে রাজী; কিন্তু তোমার স্বামীর কাছে এক তিল কৃতজ্ঞ থাকতে রাজী নই···জান—সে আমার কি দৌলত লুটে নিয়েচে! একমুঠা দানা দিয়ে সে আমার মাথা কিনে রেখেচে বলতে চাও? ·· যে দৌলত সে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েচে··· তার উচিত মূল্য হচ্চে—তার জান্!...আমি সেই উচিত মূল্য চাচ্চি...পারবে কি না দিতে—বল্!"

এবার মহরম কেঁদে ফেল্লে—"আমার স্বামী তো তোমার পথে কোন বাধা হন নি, তবে কেন তুমি—"

"বেশ! তবে তোমার স্বামী থাক—আমিই সরে যাচ্ছি!"

"কোথায় যাবে?"

"দু-চোখ যেদিকে নিয়ে যাবে!"

"আমাকেও সঙ্গে নাও না—"

"তার আগে তোমার স্বামীর জান চাই।" মহরম উত্তেজিত স্বরে কহিল—"কিছুতেই নয়!" "বেশ! তবে চল্লাম!" বলে রহমন চলে গেল। মহরম কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল...সে কি করবে কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলে না।...সে যেন এক হাতে তার স্বামীর পা জড়িয়ে, আর এক হাতে প্রাণাধিক প্রিয়তমের কণ্ঠ বেষ্টন করে ঊর্দ্ধে চেয়ে বলছে..."খোদা, পথ দেখিয়ে দাও!"...এম্নি তার তখন মনের অবস্থা!

অনেকক্ষণ পরে সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্লে। রহমনের সঙ্গে দেখা করে বল্লে..."কি করতে হবে—বল!"

মহরমের চোখ দুটো ক্ষণিকের জন্য ধ্বক্ করে জ্বলে উঠ্‌ল। রহমন তা লক্ষ্য করেনি...সে খুসী হয়ে একটা সাজা পাণ মহরমকে দিয়ে বল্লে--"এইটে...বুঝেচ ত?...খুব সাবধান।"

রহমন চলে গেল...মহরম অনেকক্ষণ সেই দিকে চেয়ে রইল...তারপর ধীরে একটা নিশ্বাস ফেল্লে।

যথাসময়ে মহরম সেই তাম্বুল চর্ব্বণ করতে-করতে স্বামীর শেষ পদসেবা করতে গেল।

কিন্তু পর দিন যখন সেই ছ-বছরের মহরম আঠারো বছর বয়সে আমার বুকে এল, তখন দেখলুম, জগৎ তাকে ধিক্কার দিচ্ছে, আর বলচে, "ছিঃ—ছিঃ! কি সয়তানী গো! ...জারের হুকুমে স্বামীকে বধ করতে গেছল!"...তাই বলছি—ওগো সত্য-মিথ্যার মালিক...যে সত্য সে নিজের মৃত্যুর পরদা দিয়ে ঢেকে গেল, সে সত্য কি চিরদিনই চাপা থাকবে...যে মিথ্যা কলঙ্ক লোকের মুখে মুখে ফিরে, শেষে ইহলোকের বিচারালয়ে পাকা খাতায় স্থায়ী হয়ে রইল, সে মিথ্যা কি তোমার আসমানের আদালতেও সত্য বলে ধার্য্য হয়ে যাবে?

যদি কোন দৈব-বলে আমি আমার বুকের প্রত্যেক ইটখানির মুখে ভাষা ফোটাতে পারতুম, তবে আজ আমি আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠতুম—"ওগো অন্ধ জনরব!—ততোধিক অন্ধ ওগো ন্যায়বিচার!—মৃতের ওপর মিথ্যা কলঙ্কের ভার চাপিও না আর!"

কাচের আৰ্জ্জি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

১

কাচ আমি—বাস্, ঠুনকো জিনিস,
নই আমি মণি-কাঞ্চন;
নই বটে দামী, তবু অভিমানী—
তিলেক সহি না লাঞ্ছন।
ভঙ্গুর আমি—বেশী কি কহিব,
নলিনী-দল-গত-জলমিব,
ঝরণার মত ঝরিয়া পড়িতে
করি নিশি-দিন আন্‌চান্।

২

হর্ষেতে আমি শার্শীতে আছি
রোধি' ঝড় ধূলাবর্ষী,
মুই হাঁড়ি ডুম চিমনিতে আছি
আঁধারের পথ দর্শি।
চশমায় আমি অন্ধের আঁখি—
নানা রূপ ধরে রাখি চোখ ঢাকি,
আদর দেখিয়া অনাদর করে—
প্রতিবাদী পাড়া-পড়সী।

৩

আলমারী ভরি ঔষধ রাখি,
শিশি ভরে রাখি পথ্য ;
আমি ভারে-ভার দিতাম আহার
বিধি যদি বড় করতো !
ভাণ্ডার মোর দেখ ভরপূর
এলাচ, ব্রশ', হিঙ, কর্পূর,
রাঙা পা রাঙাতে আলতাও রাখি—
একেবারে নই গণ্ড।

৪

বধূর লাগিয়া আনি পমেটম
বাস তেল চুল বাঁধতে,—
মসলা এবং লঙ্কার গুঁড়ি
বাটনা না বেটে রাঁধতে।
আনি ললাটের কাঁচপোকা টিপ,
হেম-মন্দিরে সোহাগের দীপ,
লজেঞ্জুসটা কাছে কাছে রাখি
ছেলে যদি ধরে কাঁদতে।

৫

আদর করিয়া আতর এনেছি—
খাঁটী রু কনোজ হইতে।
এনেছি চামেলী মতিয়া ও বেলা
তৈরী যা গত চৈতে।
খোসবো এনেছি মাথা ঠাণ্ডার
লুটি' পারিসের ফুল-ভাণ্ডার,
যত জার্ম্মাণ প্রেম-সম্ভার
আমাকেই হয় বইতে।

৬

মার্ম্মালাডের ডজন এনেছি
সানাটোজেনের সঙ্গে,
ওরিয়েণ্টাল বামটা ভুলিনি—
দবকারী ওটা বঙ্গে।
গোলাপের দুধ নানা রংদার—
মূল্যটা জেনো নয় কম তার,
খাসা কক্‌ আঁটা আনিয়াছি আটা
লাগে না ক দাগ অঙ্গে।

৭

ইউরোপ থেকে আচার এনেছি
অনাচারী দেশ তরতে ;
বিদেশ হইতে হদিশ এনেছি
এদেশ স্বদেশী করতে।
ইয়াঙ্কী দেশ করি দয়া-মায়া
দিয়াছে নকল জাফ্রাণ আহ্‌,
ধনীর অবনী পনীর দিয়েছে
ননীর গরব হরতে।

৮

এনেছি যতনে নানাবিধ ফুড
ছোঁয়া নয় কারো হস্তে,
হেরিংএর তাজা সুঁটকী এনেছি
দিই না সহজে পচতে।
এনেছি সুদূর দেশ-দেশ ঘুরি
নয়ন ভুলানো বেলোয়ারী চুড়ি,
রঙিন দোদুল দুল যা এনিছি
মূল্য হবে না কস্‌তে।

কিরীটবিহীন স্পিরিট এনেছি
অক্লেশে চুলা জ্বাল্‌বার ;
এনেছি নস্য—চলিতেছে যেটা
কাশ্মীর হ'তে মাল্‌বার।
এনেছি আ-মরি আমীরি দোক্তা,
আজি ঘরে ঘরে কত যে ভোক্তা,—
খাসা সুগন্ধি সুরমা এনেছি
আঁখি ভাল করে ঝাল্‌বার !

১০

মাতালের লাগি বোতলের সুরা
আনিয়াছি সেরী-শ্যাম্পেন,
আরও শত শত নাম লব কত
শুনিয়া ঘৃণায় ঘাম্‌বেন।
আনিয়াছি সাফ কাপ টাম্বলার,
রঙের বাহার আলোকের ঝাড়,
ছেলের খেলনা কাতারে কাতার
লোভে দেব-শিশু নাম্‌বেন।

১১

অণু-পরমাণু এড়ায় না চোখে
আমি গড়ি অনুবীক্ষণ,
দূরবীণে দেখি সৌর-জগৎ
বীণা নই, নাই নিক্কণ।
মিতালি আমার রবি-শশী সাথে
বিজলী-আদরে উজলে যে রাতে,
ভেঙ্গে যাই তবু সহি না ক দাগা
আমি চিরদিন চিক্কণ।

১২

ভাঙ্গা দেহ লয়ে দেয়ালেতে রয়ে
দস্যু ও চোরে আটকাই,
গুঁড়া হই তবু হত্যাকারীরে
নিদারুণ ডোরে লটকাই।
কচি গাছ তাপ-হিমেতে কাতর—
বুকে ঢেকে রাখি করিয়া আদর,
মানুষের গড়া আমি প্রেমহারা
গেল না এ মোর খট্‌কাই।

১৩

বলে দিই জ্বর আছে কি না দেহে
আছে কি না জল দুগ্ধে;
আমারি আলোয় রাতে রেল চলে—
কত দুখ হয় ভুগ্‌তে।
আমি গড়ে দিই আলোকের ঘর
হেলিওগ্রাফেতে চালাই সমর,
হারাই আমার সকল গুমর
কুবেরের ঘরে ঢুকতে।

১৪

হয়ে পরিপাটী আপনার খাঁটী
ঘরে ঘরে মোর ঠাঁই গো;
আমি মুখ দেখি নূতন বধূর
অনাদর মোর নাইক।
পরগাছা আমি মিশে গেছি গায়ে
আছি মমতার সুশীতল ছায়ে
জনম জনম যেন তোমাদের
ভালবাসা আমি পাই গো।

১৫

ইন্দ্রনীল কি নহি ক গোমেধ—
নহি আমি চুনী-পান্না,
নহি কোহিনুর—দুঃখ প্রচুর,
কত দিন আসে কান্না।
যশের আমার নাহি সৌরভ
আভিজাত্যের গুরু গৌরব
ছায়ার বেপারি দিয়ে আছি আমি
রূপের দুয়ারে, ধন্না।

১৬

বাহুবলে নয় প্রণয়ের বলে
থাপিয়াছি আমি স্বত্ব,
কর্ম্ম ত ভাল হই কালো ধলো
জনম দৈবায়ত্ত।
হোম-কুণ্ডের নহি অঙ্গার,
নহি হীরা আমি গোলকুণ্ডার,
কাঁচুমুচু মুখ কাচ তোমাদের—
চির-অনুগত ভৃত্য !!

কোষ্ঠির ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৪

এতক্ষণ যেন নেশার ঘোরে ছিলাম! যে-যার চলিয়া যাওয়ায়—সহসা চট্‌কা ভাঙিল,—দেখি একা একটা গলি-রাস্তায় দাঁড়িয়ে! সূর্য্যদেব ঠিক্ মাথার উপর। জয়হরি কোথায়,—মাতুলই বা কই!

একধারে কয়েকটা কাকের আওয়াজ পাইয়া চাহিয়া দেখি—একদম্ "সিনেমা"! অদূরে এক পাণ্ডার বাড়ীর বাহিরের রোয়াকে জয়হরি দেয়াল্ ঠেশ্ দিয়া পা গুটাইয়া বসিয়াছে,—হাঁটুদ্বয়ের মধ্যে প্রসাদের হাঁড়ি! হাত দু'খানি বোধ হয় হাঁটুদ্বয় বেষ্টন করিয়া হাঁড়ির রক্ষাবন্ধনি হিসাবে ছিল, অধুনা স্খলিত। নাসিকা তাহার অস্বাভাবিক সুর সাধিতেছে। রোয়াকের উপর হাত পাঁচেক তফাতে থাকিয়া, তাহার উভয় পার্শ্বে দুই তিনটা কাক হাঁড়ির উপর লক্ষ্য করিতেছে। নীচে একটা কুকুর—জয়হরির নাসিকা গর্জ্জনের উদাত্ত অনুদাত্ত অনুসারে—তিন পদ পিছাইতেছে আবার দুইপদ অগ্রসর হইতেছে,—ফলে দূরে থাকিয়াই যাইতেছে। আমি অবাক্ হইয়া এই অভিনব অভিনয় দেখিতেছি, এমন সময়—শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন বাধা-ব্যতিক্রম ঘটাতেই হউক, বা নিদ্রামগ্ন হইবার অব্যবহিত-পূর্ব্ব-গৃহীত প্রসাদী পেঁড়ার কিয়দংশ মুখে থাকিয়া গিয়া শ্বাসনলির ব্যাঘাত ঘটাইবার জন্যই হউক, গ্রীবা সঞ্চালনের সহিত জয়হরির নাক মুখ দুই-ই একটা বিকট বেসুরো উচ্ছ্বাসে মোড় ফিরিল। ব্যাপারটা আচম্‌কা ঘটায়—কুকুরটা একবার কেঁউ করিয়াই দ্রুত ছুট মারিল; কাকগুলা ত্বরিতগতিতে নিকটস্থ অশ্বত্থ গাছটায় গিয়া বসিল।

আমি আর অপেক্ষা না করিয়া, রোয়াকটায় উঠিয়া তাহার ক্রোড়স্থিত প্রসাদের হাঁড়িটা তুলিয়া লইলাম এবং তাহাকেও তুলিলাম। দেখি—হাঁড়িটা একদম্ পেঁড়াশূন্য! জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—মাতুল এই নিতান্ত আবশ্যকীয় কাজটি এইখানেই নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিয়া গিয়াছেন,—কারণ তাঁহার বাসার ব্যবস্থা অনিশ্চিত। তবে জয়হরি সবটা শপথ করিয়া বলিতে পারিল না,—সম্ভবতঃ সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার যতদূর স্মরণ হয়—মাতুল তাহার পার্শ্বেই উপু হইয়া বসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন,—গিয়ে যদি দেখি বৈবাহিক মশাই statue (মুরোদ) মেরে গেছেন আর—গড়েরমাঠ আলো করে আউটর‍্যামের পাশে লোহারাম হয়ে বসবার নোটিস্ দিচ্চেন, এবং সে মাল্ যদি তাঁকেই পৌঁছে দিতে হয়, তা হলে তাঁকে এইরূপ প্রসাদ পেয়েই এ জন্মটা নাকি প্রাণ ধারণ করতে হবে!—টীকা অনাবশ্যক। মাতুলকে যখন তখন বলিতে শুনিয়াছি—"আত্মাকে কষ্ট দিতে নেই"—অর্থাৎ নিজের আত্মাকে! আজ বুঝিলাম—তিনি কেবলই বলেন না, যা বলেন তা কাজেও করেন; প্রকৃত কর্ম্মবীর!

যাহা হউক—এখন উপায়? একজন তো আত্মাকে তুষ্ট করিতে প্রসাদের হাঁড়িটি পান্তা-সার করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন; অবশ্য—তাঁহাকে দুষিতে পারি না, কারণ প্রথম পরিচয় কালে তিনি বলিয়াই রাখিয়াছেন—"আমাকে মাতুলও বলিতে পারেন, বাতুলও বলিতে পারেন!" কিন্তু বাবা বৈদ্যনাথ দর্শনান্তে কুটুম্বের বাসায় প্রসাদশূন্য হস্তে কি করিয়া প্রবেশ করিব, বালক বালিকাদের হাতেই বা কি দিব!

জয়হরি আশ্বাস দিল—"আপনি অত ভাবচেন কেন, —লাঠ্যান্ যদি কিনতে না হয় তো সেই টাকায় ত' পেঁড়া কেনা যেতে পারে। এখানকার পেঁড়া লাঠ্যানের চেয়ে ঢের ভাল জিনিস মশাই।" তার বস্তুবিচার সম্বন্ধে জ্ঞান দেখিয়া আমি ত' অবাক্। বলিলাম—"সেটাকে কি প্রসাদ বলা চলবে?"

জয়হরি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—"কেন' চলবে না মশাই, এ হাঁড়িটা তো সেই প্রসাদের! স্পর্শ দোষ যদি

থাকে ত' স্পর্শ গুণও তো আছে! এই দেখুন না—মহাপ্রসাদ বাড়ে কি ক'রে,—মায়ের কাছে তো একটি বাচ্চা পাঁটা কাটা হয়,—খাবে কিন্তু তিনশো লোক,—সকলেই চান মহাপ্রসাদ! তখন পগারে আর-পাঁচটা কুপিয়ে এনে, তাতে মিশিয়ে দিয়েই তো তাদের মহাপ্রসাদ বানিয়ে নিতে হয়! দিন টাকা দিন।"

এ উদাহরণ উদরস্থ করিতেই হইল;—জয়হরিও সের খানেক পেঁড়া আনিয়া প্রসাদী হাঁড়ির মধ্যে প্রমোসন্ দিলেন! বোধ হয় সে অনুমান করিয়া লইয়াছিল—কাজটা আমার মনঃপুত হয় নাই, তাই অকস্মাৎ মধ্য পথে আরম্ভ করিল—"আমাদের গাঁয়ের কারখানাবাড়ীর ম্যানেজার সায়েব কেরাণী কুঞ্জ নন্দীর কাণ ধরে টেনেছিল; মশাই সেই মাস থেকেই তার দশ দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি!" আমি তার মতলব বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম—"সে কিছু বললে না?" জয়হরি বলিল—"বলবে কি মশাই! ওরাই জাগ্রত দেবতা,—স্পর্শ গুণটা দেখুন না! আর এটা তো আপনার জানাই আছে—গরম গরম একখানা ইলিস্ মাছ ভাজা পাতে মজুদ রেখে,—ভাতে কেবল ঠেকিয়েই—দু থাল বেশ উড়িয়ে দেওয়া যায়। স্পর্শ গুণ আর কা'কে বলবেন? এ দুটোই আমার নিজের দেখা।"

বাসার সামনেই আসিয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম—"এখন আমার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই জয়হরি,—এ কথা কিন্তু আর নয়।"

বেলা বারোটা হইয়া যাওয়ায় মনে মনে লজ্জা অনুভব করিতেছিলাম, ভালমানুষটির মত রোয়াকে উঠিতেই রন্ধনশালার সুমধুর ছ্যাক্-ছোঁক্ শব্দ—প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়া নিরুদ্বেগ করিয়া দিল। কর্ত্তা বাহিরের ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিতে পাইয়া—অন্দরের দিকে ফিরিয়া তাড়া দিলেন—এঁরা এসে গেছেন—গরম গরম ভেজে দাও;—অর্থাৎ সেই ডালপুরি!

আমার নিষেধ সত্ত্বেও ডালপুরি ও চা আসিয়া পড়িল। কর্ত্তা বলিলেন—"এ সব সম্বন্ধে আপনার মতামতের কোন মূল্য নেই, সকালে আপনিই জয়হরি বাবুর মুখের গ্রাস নষ্ট করেছেন।"

জয়হরি তখন কাজ সুরু করিয়া দিয়াছে,—একবার কেবল মাথা তুলিয়া বলিল—"একবার মুখে দিয়ে দেখুন—কি বড়িয়া হয়েছে! এদিকে ছ'খানা তল্‌গড়্!" কর্ত্তা উৎসাহ দিয়া হাসিলেন, আমি কিন্তু পুরো দেড় খানারও খবর লইতে পারিলাম না। তাহার পর একটা সিগারেট সম্পূর্ণ দগ্ধ করিবার পূর্ব্বেই আহারের জন্য ডাক পড়িল। মনে মনে ভাবিলাম—এটা মিথ্যা ভোগাভোগ মাত্র;—কিন্তু উপায়ান্তরও ছিল না, উঠিতেই হইল।

আহার্য্যের ও আহারের বিবরণ বাদ দেওয়াই ভাল,—রাবিশ বাড়াইতে আর ইচ্ছা নাই। বোধ হয় এই বলিলেই বিশদ হইবে—বাড়ীওলারাও নিত্য নব নব উপকরণে দুর্ব্বাসার পারণের পাহাড় বানাইতেছিলেন, আমার সঙ্গেও ছিলেন—অকৃত্রিম দামোদর!

রহস্যপ্রিয় "নিঠুর কালিয়া" মানুষের যেন এই সব অবস্থাই খোঁজেন। আহার আরম্ভ হইবার পর, এই অসময়ে—দুখানা করে' গরম গরম ইলিস মাছ ভাজা,—তার তীব্র মধুর গন্ধ সহ, প্রত্যেকের পাতে আসিয়া পড়িল!—জয়হরির উদাহরণের কি মধুর উপসংহার—আশ্চর্য্য যোগাযোগ! সে মাথা তুলিয়া হর্ষোৎফুল্লনেত্রে আমার দিকে তাকাইয়া ইঙ্গিতে জানাইল—"দেখিয়ে দিচ্চি!" আমি ভীত হইলাম; প্রাণটা কাতরে বলিয়া উঠিল—"এবার ফিরাও মোরে।"

কর্ত্তা তখন তাঁহার প্রিয় ভৃত্য বাণেশ্বরের সহিত কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত ছিলেন,—জয়হরির ইঙ্গিতটা লক্ষ্য করেন নাই। তিনি তাহাকে বলিতেছিলেন—"সারাদিন কোথায় ছিলিরে বেটা বেণীসংহার?"—"সারাদিন" অর্থে,—সে আমাদের চা দিয়া কি কাজে বাজারে গিয়াছিল।

বাণেশ্বর। আলু আন্‌তি গেছনু বাবু।

কর্ত্তা। ক' পয়সা সরালি?

বাণেশ্বর। সরাবো কি বাবু!

কর্ত্তা। আ-বেটা মেদিনীপুরের মুখ্‌খু—সাধুভাষা বোঝ না,—মরবে যে দুখ্খে,—চুরি—চুরিরে হারামজাদা! তোদের ওখানে আজো সাহিত্য-পরিষৎ ঢোকেনি বুঝি? আচ্ছা,—কত করে সের পেলি! ঠিক বলিস্, এই আমি ভাত ছুঁয়ে রইলুম!

বাণেশ্বর। চোদ্দ পয়সা সের নিলে বাবু।

কর্ত্তা। নিলে,—আর তুমি দিলে! তুইও তাদের

কাউনসিলের মেম্বার না কি রে বেটা! আর আমি যে এই আজই ছ' পয়সা করে সের রাঙা আলু এনেছিরে পাজি!

বাণেশ্বর হাসি-মাখানো মুখে বলিল—"সে যে রাঙা আলু বাবু, আমি যে গোল আলু আনন্থ।"

কর্ত্তা আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"শুনলেন বেটা বেণীমাধবের কথা।' উঃ—এরি জন্যেই Mass Education দরকার; এ সব লোকসেনে মুখ্খুকে নিয়ে আর তো প্পারি না মশাই।"

বলিলাম—"আপনি যে কি করে পারচেন—এসে পর্য্যন্ত সেই কথাই সর্ব্বক্ষণ ভাবছি। এতে বশিষ্টকেও অশিষ্ট করে তোলে;—এ যাতনা আর রাখা কেন?"

কর্ত্তা সবেগে বলিলেন—"রাখা?—ও বেটাকে কি আমি রেখেছি? ঐ বেটাই ত আমার কয়েদির কম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে,—কি শীত কি গ্রীষ্যি তোফা জড়িয়ে থাকো। হারামজাদা বলে কি না—"আমি যে গোল আলু আনন্থ!"—ওরে গো-মুখ্খু—রাঙা আলু বড় না গোল আলু বড়! রাঙা আলু গতরে বড়, মাপে বেশী, তার রঙের একটা দাম আছে, মিষ্টতার আলাদা মূল্য আছে; তোর "গোলের" খরচটা কি? সূর্য্য গোল, চন্দ্র গোল, সারা পৃথিবীটেই গোল,—কারুর তাতে এক পয়সা লেগেছে, না কেউ তা চায়? তবে কোন্ হিসেবে তোর গোল আলুর দর বেশী হবেরে রাস্কেল্?—চুপ্ করে রইলি যে?"

বাণেশ্বর কাতর কণ্ঠে বলিল—"আমাকে আর রাখবেন না বাবু"—

'কর্ত্তা একটু মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন—"কেন'—তোমার হুকুমে! তোরে রাখবো না তো কাবে রাখবোরে পাজি;—তোর জোড়া আর মিল্বে?"

বাণেশ্বর। তা কি জানি বাবু—

কর্ত্তা। তবে?—তুই বেটাই জানিস—আমার সিন্দুক প্যাটারা নেই, টাকা পয়সা যেথা সেথা পড়ে থাকে;—সে সব আর আমাকে ফিরে দেখতে হয় না। তুই গেলে সে কাজ করবে কেরে বেইমান!—পারবে কেউ?—বেরো সামনে থেকে;—বেটা যেন কোলু—কাপড় দেখ না!—যাঃ ঐ মাঝের কুলুঙ্গিতে আছে,—এখুনি কাপড় কিনে এনে পর—

জয়হরি ইতিমধ্যে এক থাল অন্ন শেষ করিয়া, তর্জ্জনী তুলিয়া আমাকে ইঙ্গিতে সেটা জানাইয়াছিল। এইবার তর্জ্জনী ও মধ্যমা তুলিল;—আমি নিষেধ-কটাক্ষসহ চাপা গলায় বলিলাম—"বস্"। এবার সে কর্ত্তার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তিনি সহাস্যে বলিলেন—"জয়হরি বাবু দেখছি সর্ব্বশক্তিমান! উনি কি করে জানলেন যে কুলুঙ্গিতে দু' টাকা আছে!"

নারায়ণ রক্ষা করিলেন, বলিলাম—"আর জোড়া মিলবে না বলে' আপনি ভাবছিলেন না!"

কর্ত্তা উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"আরে বাপ্ রে—এমন কথা বলবেন না,—সে কি কথা—"

কর্ত্তার দৌহিত্রী—মাধুরী মেয়েটি আসিয়া বলিল—"দিদিমা বলচেন—"

কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ-হ্যাঁ—সে জানি,—এই ভাতগুলি সব খেতে তো? তা বলবেন বই কি,—চাল খুব সস্তা কি না!"

মাধুরী মুখখানা ঘুরাইয়া বলিল—"আহা—তাই বলচেন না কি? বাণেশ্বর এই সিদিন কাপড় পেয়েছে,—যেখানা পরে রয়েছে ওখানা তো নতুন,—ময়লা হয়েছে বই ত নয়। এ সব বাজে খরচ নয় কি?"

কর্ত্তা আশ্চর্য্য হইয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন—"অ্যাঁ—বলিস্ কি? কই ও বেটা তা বললে না তো! ইস্—বেশ নীরবে সর্ব্বনাশ করে চলেছে দেখচি! হারামজাদা থাকে থাকে যায় কোথায় বল্ দিকি?—এই ত্রিবেণী-শঙ্কর,—ওরে বনোয়ারী? বেটা সট্কালো নাকি! হুঁ,—তাই হবে"—

পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দেখুন—লোক চিনি না তা তো নয়। রোজই দেখি—কি রোদ কি বিষ্টি বেটা কাজকর্ম্ম সেরে দিব্বি নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্চে! ভদ্দোর লোকের এমন ঘুম হয় মশাই?—উঠেই—ঝাঁটা নিয়ে উঠোন ঝাঁট্! ক্যান্ব্যা ব্যাটা,—বাবার উঠোন পেয়েছ! ভদ্দোর লোকের বাড়ী ভাড়া নিয়েছি—পাঁচ মাসে উঠনটা পুকুর বনে যাক! ছেলেপুলেগুলো যে রকম ধীর—বজায় খঞ্জন পাখীর ল্যাজ,—একদম তলায় গিয়ে নাচুক, আর আমরা ডাঙায় ডিগবাজি খাই! উঃ চোর ব্যাটার কি দুরভিসন্ধি মশাই! লোক চিনি না! আর দেখুন এটাও বরাবর

লক্ষ্য করছি—বেটা রোজই নাম বদলায়। এতো ভাল কথা নয়,—ফেরার আসামী নয় তো! উঃ—আমি ত আর ভাবতে পারিনে মশাই, আপনারা আছেন, দয়া করে যা বিহিত হয় করুন; আমি আর চোর বেটার মুখ দেখব না;—তা আপনারা আমাকে ভালই বলুন আর মন্দই বলুন;—নাঃ—কখ্খনই না।—কোথায় গেলি,—ওরে ও বক্কেশ্বর;—এই যে ব্যাটা! নে তো বাবা—বাবুদের খাওয়া হয়ে গেছে, হাতে জল দে।"

বলিলাম—"মাধুরী বাজে খরচের কথা কি বলছিল না?"

কর্ত্তা বেশ সহজ ভাবেই বলিলেন—"সে দুঃখের কথা আর কেন বলেন,—শিল নয়, পেরেক নয়, যাতে সংসার গোছায়—দু'চার পুরুষ থাকে;—কাল্ দুম্ করে দু' আনার ধুনো কিনে ফেললেন! উড়িয়ে পুড়িয়ে দেওয়া চাই তো! যাক্—আমি আর ক'দিন দেখবো। ঘুম থেকে উঠেই দেখি—রান্না ঘরে ধোঁ,—একি একদিন মশাই,—রোজ; আর কি বোলবো।"

মাধুরী মাথা নাড়িয়া বিরক্তি প্রকাশের ভঙ্গীতে বলিল—"আহা—আমি বুঝি ঐ কথা বললুম!"

কর্ত্তা বলিলেন—"নাঃ, আমি যেন মেম সাহেবের কথা বুঝিতে পারি না;—যাঃ এখন খেগে যা"—

আমরা তো অবাক্!

৩৫

জয়হরিকে বলিলাম—তুমি যে রকম load (বোজাই) নিয়েছ, একটু গড়াও, আমি একবার অমরকে দেখে আসি।

সে বলিল—গড়াবো কি মশাই, আমাকেও যেতে হবে।

বলিলাম,—"যেতে হবে"—তার মানে?

জয়হরি গম্ভীর ভাবে বলিল,—অসাক্ষাতে কারুর কিছু নেওয়াকেই ত' অপহরণ বলে। মাতুল সেই কাজটি করে গেছেন, অনেকগুলি পেঁড়া গেঁড়া মেরেছেন, না হয় উড়িয়েছেন! মনটা ভারী বিগড়ে রয়েছে, দেখলেন না খেতে পারলুম না। পেঁড়াগুলো খুব উঁচুদরের ছিল মশাই।

বলিলাম,—অপহরণটা হ'ল কি ক'রে, তুমি ত' উপস্থিতই ছিলে।

জয়হরি একটু উত্তেজিত ভাবেই বলিল,—আমি জ্যান্তো থাকলে আর এমন সর্ব্বনাশটা ঘটে!

"কি করতে?"

"মাতুল একখানা গালে দিলে আমি পাঁচখানা গালে দিতুম,—দেখতুম কেমন খান!"

বলিলাম—তা হ'লে বুঝি যেমন প্রসাদ তেমনি মজুদ্ থাকতো, প্রসাদের second editionএর (দ্বিতীয় সংস্করণের) আর দরকার হ'ত না?

একটু ভাবিয়া বলিল—তা আমি তো প্রসাদ পেটে নিয়ে এই বাসাতেই ফিরতুম,—অন্য কোথাও তো যেতুম না মশাই!

এ যুক্তির উপর শক্তি ছিল না যে কথা কই।

আবার বলে—"এডিসন্ যত হয় হোক্ না,—সেটা আমি খুব পচন্দ করি মশাই!"

বলিলাম—"তোমার এই "খুব পচন্দ করাটা" মস্ত একটা ত্যাগ স্বীকার বটে,—এতে উদারতাও যথেষ্ট রয়েছে। যাক্,—এখন মাতুলের বাসায় যাবার উদ্দেশ্যটা কি শুনি!"

জয়হরি বলিল—শোধটা নিতেই হবে মশাই,—বোলবো—"আজ রাত্রে এইখানেই মুখ বদলাব মাতুল!"

বলিলাম—তাঁর বাড়ী আজ যে রকম বিভ্রাট—একজন দেহ বদলাবার জোগাড় ক'রে বসেছেন, এ সময় কি মুখ বদলাবার কথা মুখে আনতে আছে। অমর সামলে উঠলে একদিন দেখা যাবে।

তাহার প্রস্তাবের মধ্যে আমারো পার্ট থাকিবার আভাস পাইয়া সে আনন্দের সহিত সম্মত হইল। উভয়ে বাহির হইয়া পড়িলাম।

একটা মোড় ফিরিয়াই দেখি—মাতুল আমাদের দিকেই আসিতেছেন। দূর হইতেই হাত নাড়িয়া জানাইলেন—"যেতে হবে না।"

নিকটে আসিয়া বলিলেন—"পায়ের ধুলো দিন মশাই,—যা বলেছিলেন তাই,—দু' কাপ্ চা গলা থেকে নাবতেই—পেটে যেন পুলিশ্ ঢুকলো, পাঁচ মিনিটে সব ভিড় সাফ্! * * * এসে বলিলেন—"আঃ বাঁচলুম,—একটু গড়াই—ঘুম ভাঙিয়ো না। আজ আর জলগ্রহণ নয়, উঠে সেরেক্ আধ সেরটাক গরম মোহোনভোগ গ্রহণ। মাঝে মাঝে উপোস দেওয়াটা ভাল।"

এ কি রকম উপোস মশাই! বেদানা থেকে বাঁচলুম তো ওষুধের চিন্তা; এ যে আবার ওষুধের বাবা,—খাঁটি

বোগদাদী বুলেটিন্—হেকিমী হালুয়া! চণ্ডে স্যাকরা কি কু লগ্নেই হার ছড়াটায় হাত দিয়েছিল! এখন আর ব্রহ্মা বিষ্ণুর সাধ্য নেই সেটাকে বাঁচায়। চুলোয় যাক্, আপনি বলতে পারেন—ত্রিকুট পাহাড়ে বাঘ বেরোয় কখন? রোজ বেরোয় ত'?"

বলিলাম—"কেন,—এ খোঁজ কেন!"

মাতুল আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"কেন কি মশাই! এখন বাঘ ছাড়া আর বন্ধু কে,—খেলেই বাঁচি! মুস্কিল—তাদের education (শিক্ষা) নেই যে engagement করি। এ কি অন্য দেশ যে শ্যাল কুকুরেরও education চাই। হায় গোখলে—তুমি বৃথাই ছোক্‌লে! এখন কোথায় গিয়ে বনে জঙ্গলে বাঘ হাতড়ে বেড়াই বলুন দিকি! আবার ভাগ্য তো দেখ্‌চেন,—সেদিন নিশ্চয়ই তাদের মধুপুর বেড়াবার সখ্ চাগবে;—এ আপনি দেখে নেবেন!"

কি বিভ্রাট! বলিলাম—"এত' ভাবচেন কেন,—দেখবেন দুদিনেই চাঙ্গা হয়ে যেখানকার বে'ই সেখানে গেছেন, যেখানকার হার ঠিক্ সেখানেই শোভা পাচ্চে; এত' অধীর হবেন না। মোহনভোগটা খুব বেশী ঘি ঢেলে মেন করা হয়। দু'বারের বেশী তিনবার গাড়ু হাতে করতে হলে "মাঝে মাঝে"র ফ্যাসাদটা ঐ সঙ্গেই ফুরিয়ে যাবে,—বে'ই মশায় উপোসে আর রুচি থাকবে না।"

"যে আজ্ঞে, তাই করেই দেখি। আমি তবে এখন বাজারে চললুম, কখন তাঁর ঘুম ভাংবে তারও' ঠিক্ নেই।" এই বলিয়া মাতুল গমনোদ্যত হইতেই জিজ্ঞাসা করিলাম—"আহার হয়েছে?"

"আর আহার! একবার বসেছিলুম মাত্র, দুর্ভাবনাতেই পেট ভরপুর,"—বলিতে বলিতে মাতুল দ্রুত প্রস্থান করিলেন। জয়হরি আমার গা টিপিয়া বলিল—"পেঁড়ায় যে আকণ্ঠ বোঝাই!" তাহার কথা আমার ভাল লাগিল না। বুঝিয়াছি মাতুল একটি সুখের পায়রা,—জুতা জোড়াটিতে ব্রশো না লাগাইয়া তিনি মুদির দোকানেও মুখ দেখাইতে পারেন না—অর্দ্ধ পথ হইতে ফিরিয়া আসেন; প্রাতে শয্যা ত্যাগান্তে তাঁহার প্রধান কাজ চুল ফেরানো। তাহা হইলেও তিনি কেরাণী,—তাঁহার সাংসারিক দুঃখ কষ্ট নিশ্চয়ই বহু। তাঁহার এই মোহনভোগের আয়োজনের জন্য ছোটার পশ্চাতে যে কতটা ভদ্রতা "বজায়ের" চিন্তা ভোগ অহরহ রহিয়াছে, সেই ভাবনাই আসিয়া গেল,—অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—"হায় রে মধ্যবিত্ত ভদ্র কেরাণি; তোমার মত দুঃখী জগতে নাই। তোমার মত দুর্ভাবনাবাহী, চিরসহিষ্ণু বীরও জগতে নাই। ধনী তোমাকে চেনে না, উচ্চশিক্ষিতে বোঝে না; লেখক বক্তারা আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার্থে বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না। সম্মুখে তোমার পেষণ যন্ত্র—আপিস,—পশ্চাতে তোমার গুরুভার সংসার, দুই পার্শ্বে পাওনাদারের তাগাদা! বিনয়, কাতরোক্তি, মিথ্যা উদ্ভাবন ভিন্ন তোমার উপায়ান্তর নাই। তাহারাই তোমার রক্ষা-কবচ! ৫০।৫০ টাকায় সাতটি মুখে অন্ন, সাতটি দেহে আবরণ, ইস্কুলের মাইনে,—পড়ার বই, দুর্গোৎসবের যথা কর্ত্তব্য, লোক-লৌকিকতা রক্ষা, কন্যার বিবাহ,—তত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি! জগতের আশ্চর্য্যগুলি ইহার কাছে কত তুচ্ছ! তোমার এ দুঃখ কেহ জানে না—জানিতে চায়ও না. বোঝে না—বুঝিতে চায়ও না, কেহ ভাবে না—ভাবিবার আবশ্যক বোধও করে না! জানেন কেবল একজন—যিনি অন্তর্যামী! আর ভাবেন কেবল একজন,—যিনি এই নিদারুণ দুঃখ-দারিদ্র্যের মাঝখানে—সংসারের সর্ব্বত্র তাঁর জীর্ণ দীর্ণ হতাশ হৃদয়খানি পাতিয়া দিয়া নীরবে যথাসাধ্য টানিয়া চলিয়াছেন ও সামলাইতেছেন;—যিনি স্বামীর বিষণ্ণ মুখে একটু প্রফুল্লতা জাগাইবার জন্য অঙ্গের এক একখানি প্রিয় অলঙ্কার খুলিয়া দিয়া, ক্রমে ক্রমে নিজেকে নিরাভরণা করিয়া—মাত্র শাঁখা-সিন্দুরধারিণী! যিনি শত বেদনা বক্ষে চাপিয়া স্বামীর সম্মুখে প্রফুল্ল,—অন্তরালে—নিষ্প্রভ কুসুম। যাঁর একমাত্র আশা ভরসা ও আশ্রয়,—উঠানের তুলসী গাছটী, যাঁর পাদমূলে তাঁর মাথা—তাঁর প্রাণ, কাতর নিবেদন সহ দিনে শতবার নত হয়! টেক্স দারগা আসিয়া ছয় গণ্ডা পয়সার জন্য যমের মত' দ্বারে হানা দিয়াছে,—ঘরে ছয়টি পয়সাও নাই! স্বামী, লজ্জা-ম্লান মুখে খিড়কি দ্বার দিয়া স্নানে সরিয়া গেলেন;—অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে যিনি দ্বার পার্শ্বে গিয়া, লজ্জা-কাতর, মুমূর্ষু-কণ্ঠে বলিতে বাধ্য হন—"তিনি বাড়ী নাই!" এবং ফিরিয়াই তুলসীতলায় ব্যাধবিদ্ধের মত' লুটাইয়া মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দনে ক্ষমা চান আর বলেন—"ঠাকুর, লজ্জা রাখো, উপায় করে

বৌ দেখা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

দাও,—এ যে আর পারি না ঠাকুর !" একমাত্র এই গৃহ-লক্ষ্মীটিই দুস্থ কেরাণীর ভাবনা ভাবেন—তাঁর কুশল যাচেন। গৃহলক্ষ্মী কথাটির এমন সত্য প্রয়োগ বুঝি আর নাই। অন্যত্রের জন্য অনেক ভাল ভাল শব্দ অভিধান আলো করিয়া থাকিতে পারে যাহা গৌরবের ও আদরের ;—এটি যেন দুঃখ দারিদ্র্যের মহিমায় উজ্জ্বল। অনেকেই বোধ হয় জানেন না—কেরাণিরাই এই দুঃখ কষ্ট বেদনা বহন করিয়া বাঙ্গলা দেশের বহু ভদ্র পরিবারের ভার লইয়া আছে ও তিল তিল করিয়া আত্মদান করিতেছে। মাইনে কি মজুরী বাড়াইবার জন্য সকলেই ধর্ম্মঘট করিতে পারেন ;—পারে না ও করে না কেবল কেরাণী! কারণ তার যে একদিন চলিবার মতও সঙ্গতি থাকে না,—থাকে কেবল-- মুখ চাহিয়া বৃহৎ একটি পরিবার !

দুর্ব্বল-স্নায়ুর লোকেদের মাথায় নিরর্থক চিন্তাগুলা বেশ সহজেই ঢুকিয়া পড়ে আর অবিরাম গতিও লাভ করে। আমার মাথাটারও এ সম্বন্ধে উদারতা যথেষ্ট। জয়হরি বাধা না দিলে চিন্তাটা বোধ হয় স্বরাজ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যাইত ! সে বলিয়া উঠিল—"চলুন তবে, ফেরা যাক্।"

বলিলাম—"না, এ অবেলায় আর গড়ানো নয়। চল' একটু ঘুরে আসি।"

মান্দ্রাজের বন্দরে

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু বি-এ

১০ই ফেব্রুয়ারী রবিবার। রজনীর তিমিরাবরণ অপসৃত হইতে না হইতেই ভ্রমণ-সঙ্গী হরিহর বাবুর উচ্চ চীৎকারে সুখ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখি, ব্রাহ্মণ সেই অন্ধকারে স্বহস্তে উনান জ্বালিয়া চা প্রস্তুত করিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এটা তাঁহার একটা বাতিক। রাত্রি তিনটায় উঠিয়া চা না খাইলে, তাঁহার চা-পান নাকি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কি করি ? সম্মুখে পরম লোভনীয় গরম গরম চা ! অগত্যা শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলাম। আজ মান্দ্রাজ বন্দর দর্শন করিবার পালা। এই বন্দরে সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইলে, কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে পাশ বা ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হয়। বলা বাহুল্য, আমরা পূর্ব্বাহ্নেই সেই পাশ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম।

বাসা হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রতীর ধরিয়া উত্তরাভিমুখে চলিলাম। কিয়দ্দুর অগ্রসর হইতেই, সুপ্রসিদ্ধ সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গের পূর্ব্ব-তোরণ-দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি এইখানেই সর্ব্বপ্রথমে নির্ম্মিত হয়। ইংরাজ যখন প্রথম বাণিজ্য ব্যপদেশে ভারতে আগমন করেন, তখন পর্ত্তুগীজাধিকৃত স্যানথোম নগরী এতদঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। চতুর ইংরাজ বণিক দেখিলেন যে, স্যানথোমে পর্ত্তুগীজ অধিকার এরূপ সুদৃঢ় যে, তথায় বাণিজ্য-প্রচলন-প্রয়াস নিষ্ফল। তদনুযায়ী তাঁহারা চেলাপত্তম ও মান্দ্রাসাপত্তম (পত্তম অর্থে নগর) নামে স্যানথোমের প্রায় তিন মাইল দূরস্থিত দুইটি নগরী অধিকার করিতে কৃতসংকল্প হন। এই দুইটী নগরীতে তৎকালে বহু সুনিপুণ তন্তুবায়ের বসতি ছিল ; এবং ইহাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে সুপ্রচুর কার্পাস সূত্র ও ক্যালিকো উৎপন্ন হইত।

মান্দ্রাসাপত্তম তদানীন্তন বিজয়নগরাধিপের অধিকার-ভুক্ত ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তৎকালীন এজেণ্ট মিঃ ফ্রান্সিস ডে বিজয়নগরাধিপের অধীনস্থ কর্ম্মচারী নায়ক ভেঙ্কটাপ্পার নিকট হইতে উক্ত স্থানে বাণিজ্য-প্রচলন ও দুর্গ-নির্ম্মাণের আদেশ সংগ্রহ করেন। ১৬৪০ অব্দের ১লা মার্চ্চ সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গ নির্ম্মাণ-কার্য্য আরদ্ধ হয়। কিন্তু অর্থাভাব নিবন্ধন এই কার্য্য শেষ করিতে প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত হয়।

এই সময়ে বিলাতের ডাইরেক্টার-সভার নিকট ফ্রান্সিস

ডের বিরুদ্ধে—কোম্পানীর ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া নিজ অর্থ বৃদ্ধি মানসে গোপনে ব্যবসা প্রচলনের এক অভিযোগ আনীত হয়। তদনুযায়ী ডে মিঃ টমাস আইভির হস্তে নিজ কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে ডাইরেক্টার-সভার বিচার-ফলে তিনি কার্য্যচ্যুত হন, ও পাঁচশত পাউণ্ড জরিমানা দিতে বাধ্য হন। তাঁহার জীবনের পরবর্ত্তী ইতিহাস সাধারণের অজ্ঞাত। ভারতে যিনি ইংরাজ-রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার এইরূপ শোচনীয় পরিণাম বড়ই বিসদৃশ, সন্দেহ নাই।

ফ্রান্সিস ডের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মান্দ্রাজ নগরী ও তদন্তর্গত দুর্গ ক্রমেই সমৃদ্ধি-

মান্দ্রাজের বন্দরে

সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। এ রাজ্যে অবাধ-বাণিজ্য প্রচলিত হওয়ায়, বণিকেরা দলে দলে আসিয়া এখানে বসবাস করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই অখ্যাতনামা মান্দ্রাজ করোমণ্ডল উপকূলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল।

১৬৬৬ অব্দে মান্দ্রাজে প্রথম গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। মিঃ জর্জ্জ ফক্সক্রফ্‌ট (Foxcroft) এই পদে প্রথম মনোনীত হন। ১৬৮৮ অব্দে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমাসমূহের বিচারের জন্য একজন মেয়র, ১২ জন অল্ডারম্যান এবং ষাট বা ততোধিক জন বার্গেশ (Burgess) লইয়া একটি কর্পোরেশন সংগঠিত হয়।

গভর্ণর নিয়োগের পূর্ব্বে মান্দ্রাজের শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য একটি কাউন্সিল কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। ইহার সিনিয়র মেম্বার "এজেণ্ট" ও অন্যান্য মেম্বারেরা বণিক (merchants) নামে অভিহিত হইতেন। ১৬৫৩ অব্দে সিনিয়র মেম্বার সর্ব্ব প্রথম "প্রেসিডেণ্ট" সংজ্ঞায় অভিহিত হন। তৎপরে ১৬৬৬ অব্দে তাঁহাকে "গভর্ণর" নামে অভিহিত করা হয়। এজেণ্ট কাউন্সিলের সর্ব্বপ্রধান সদস্য ছিলেন; এবং বুককিপার, ওয়্যারহাউসকিপার (warehousekeeper) ও কাষ্টম্‌স কালেক্টর যথাক্রমে ২য় ৩য় ও ৪র্থ সভ্য ছিলেন। ১৬৭৫ অব্দে কোম্পানী সিভিল সার্ভিসের গ্রেড নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। উক্ত সার্ভিসের মনোনীত ব্যক্তি-গণকে এপ্রেণ্টিস ভাবে ৭ বৎসর কার্য্য করিতে হইত। তাঁহারা প্রথম ৫ বৎসর বাৎসরিক ৫ পাউণ্ড হিসাবে এবং শেষ দুই বৎসর ১০ পাউণ্ড হিসাবে মাহিনা পাইতেন। ক্রমে তাঁহারা বাৎসরিক ২০ পাউণ্ড মাহিনায় যথাক্রমে রাইটার (Writer) ও ফ্যাক্টর (Factor) পদে উন্নীত হইতেন। ক্রমে বাৎসরিক ৫০ পাউণ্ড বেতনে বণিক (merchants) অর্থাৎ কাউন্সিলের সভ্য হইতেন। তদানীন্তন গভর্ণর বেতন হিসাবে বাৎসরিক দুই শত পাউণ্ড এবং এতদতিরিক্ত বাৎসরিক বৃত্তি বা গ্রাটুইটি (Gratuity) হিসাবে ১০০ পাউণ্ড পাইতেন। গভর্ণর পিগটের শাসনকালে উক্ত বেতন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বাৎসরিক ৩০০০ পাউণ্ডে পরিণত হয়। বর্ত্তমানে মান্দ্রাজের গভর্ণর মাহিনা বাবদ বাৎসরিক ১২০,০০০ টাকা এবং Household Allowance, Tour Allowance ও Furniture Allowance বাবদ ১০১,৫০০ টাকা পাইয়া থাকেন।

কাউন্সিলের ২য় সভ্য বাৎসরিক ১০০ পাউণ্ড, ৩য় ৭০ পাউণ্ড এবং ৪র্থ ৫০ পাউণ্ড হিসাবে মাহিনা পাইতেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহাদের আহার ও বাসস্থান আদির খরচ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইত।

সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গ মান্দ্রাজের একটি বিশেষ দর্শনযোগ্য স্থান। যাঁহারা ভারতে ইংরাজ রাজত্বের প্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই স্মৃতি এই দুর্গের সহিত বিজড়িত। পিট, কুট, ক্লাইভ, ওয়াটসন্, চার্ণক, লরেন্স,
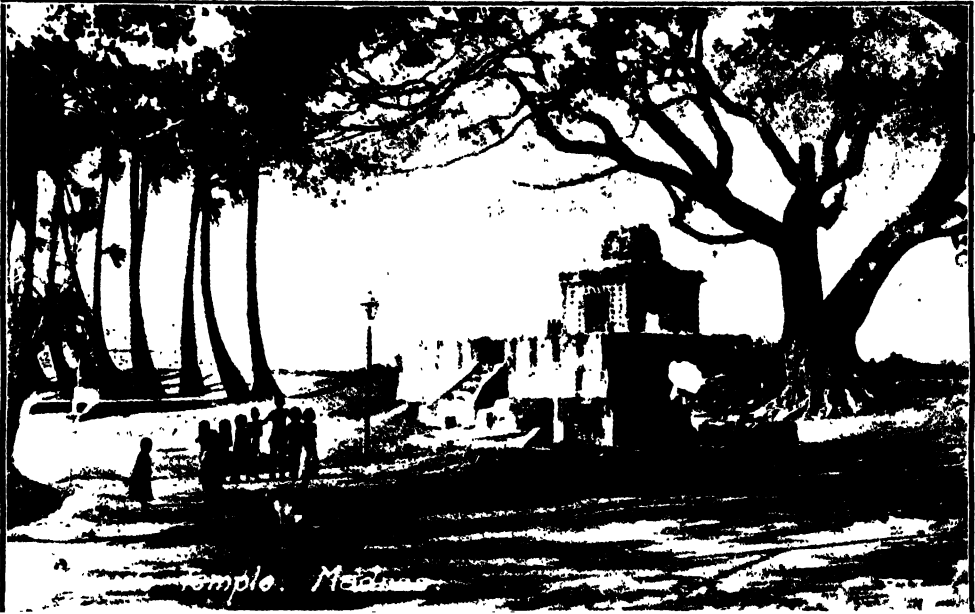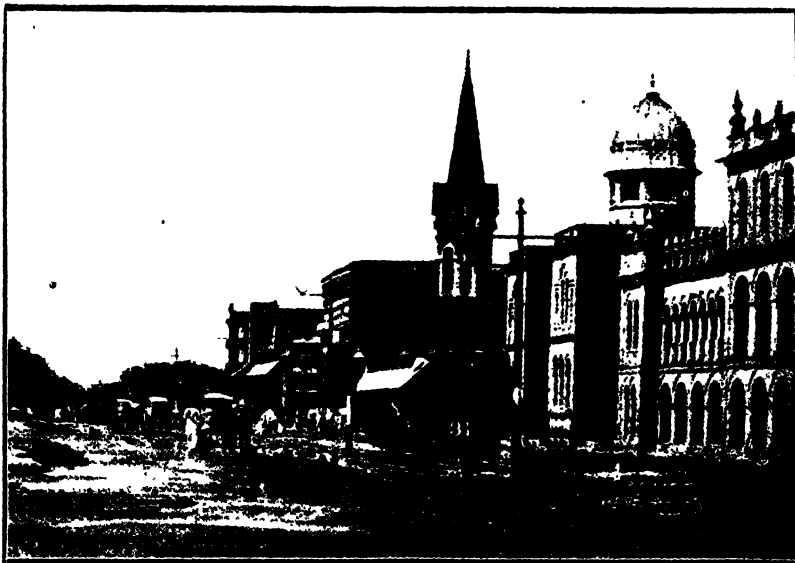
পথিপাথর মন্দির—মান্দ্রাজ

মানরো, আর্থার ওয়েলস্লী প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মনস্বিগণের অনেক কীর্ত্তিকাহিনী এই সুবিরাট দুর্গের সহিত সংশ্লিষ্ট। দুর্গাভ্যন্তরস্থ সেণ্ট মেরি গির্জ্জায় অনুষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্যের বিবরণ ১৬৮০ অব্দ হইতে সংরক্ষিত হইতেছে। চ্যাপলিনের নিকট দরখাস্ত করিলে সেই রেকর্ডসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। আমার দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই ; কিন্তু শুনিলাম, কলিকাতার

মিলার স্কুল—মান্দ্রাজ

স্থাপয়িতা জবচার্ণকের তিনটী কন্যার ব্যাপটিজম (Baptism) এবং পলাশী-বিজেতা লর্ড ক্লাইভের মার্গারেট মেস্কেলিনের সহিত পরিণয় (১৮ ফেব্রুয়ারী ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দ) প্রভৃতির বিবরণ এই রেকর্ডসমূহে লিপিবদ্ধ আছে।

সেণ্ট মেরি গির্জ্জা সংলগ্ন প্রাঙ্গণে কয়েকটি সমাধি-স্তম্ভ দেখিলাম। এই সকল সমাধি-স্তম্ভে উৎকীর্ণ, অধিকাংশ লিপি লাটিন ভাষায় লিখিত। প্রেসিডেণ্ট এঁরাও বেকারের (Aaron Baker) স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে সমাধিস্তম্ভটি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। এই মহিলা ১৬৬২ অব্দে মান্দ্রাজে আসিবার সময়ে জাহাজেই প্রাণত্যাগ করেন। আর একটি সমাধির কথা এখানে উল্লেখ-যোগ্য মনে করি। এই সমাধি টমাস ক্লার্ক নামক জনৈক ভদ্রলোকের। ইনি মান্দ্রাজের সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ অধিবাসী। ১৬৪১ অব্দে ইনি মান্দ্রাজে সর্ব্বপ্রথম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। ইঁহার মৃত্যুর পরে ইঁহার বিধবা বিশ্ববিখ্যাত "ষ্টোরিয়া ডো মোগর-(Storia Do Mogor) প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ভিনিসীয় চিকিৎসক মেনুষীকে বিবাহ করেন। ভারতের পুরাতন মানচিত্রসমূহে ক্লার্কের বসতবাটী ও তৎসংলগ্ন উদ্যানকে "মেনুষীর বাগান-বাড়ী" নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

মিউজিয়াম—মান্দ্রাজ

হাইকোর্ট ও তদুপরিস্থ বাতিঘর—মান্দ্রাজ

গির্জ্জা সংলগ্ন সমগ্র প্রাঙ্গণটী লৌহ-রেলিঙ্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার উত্তরাংশে সমাধিস্তম্ভগুলি বিরাজমান। শুনিলাম, মহীশূরের প্রসিদ্ধ সুলতান হাইদর আলির সহিত যুদ্ধের সময়ে এই সমাধি-স্তম্ভগুলি কামান রাখিবার মঞ্চ রূপে ব্যবহৃত করা হইয়াছিল। সমাধিগুলি ভাল করিয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বন্ধুবরের অসহিষ্ণুতায় বাধ্য হইয়া সে ইচ্ছা দমন করিতে হইল। কোথায় মান্দ্রাজ বন্দর দেখিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিব তা নয়, এই "ভূতুড়ে" স্থানের মধ্যে অশরীরি ভাবের মতন ঘুরিয়া বেড়াইতেছি,—এজন্য তিনি

আমাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। অগত্যা সমাধি-দর্শনের আশা পরিত্যাগ করিয়া দুর্গ হইতে বাহির হইলাম।

সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গ মধ্যে একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের আফিস, টাঁকশাল, আসিনেল আফিস, হাসপাতাল প্রভৃতি আরও অনেক দর্শনযোগ্য গৃহ আছে। ইহার মধ্যে আসিনেল

সেণ্টমেরি গির্জ্জা

এষ্ট্যাবলিসমেণ্ট আফিস নামক হরিদ্রা বর্ণের ত্রিতল ভবনে নেপোলিয়ন-বিজয়ী ডিউক অব ওয়েলিংটন এক সময়ে বাস করিতেন।

দুর্গ অতিক্রম করিয়া আমরা হাইকোর্টের প্রান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে এইখানে জার্ম্মাণ জাহাজ এমডেন আসিয়া অনেক উৎপাত করে। দেখিলাম, সেই ঘটনার স্মরণ কল্পে গ্রেনাইট প্রস্তরের একটি টেবলেটের উপরে লিপি খোদিত রহিয়াছে—

"During the bombardment of Madras by the German Cruiser "Emden" on the night of 22nd September 1914 a shell struck this spot and carried away a portion of the compound wall."

হাইকোর্টের গৃহটি সমগ্র সহরের একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও নয়নাভিরাম সৌধ। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ গম্বুজের উপর একটি "আলোক-গৃহ" বিরাজমান। সুদূরবর্ত্তী সাগরগামী অর্ণবপোতসমূহের সুবিধার জন্য এই আলোকভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাতে ৮টা হইতে ১১টা এবং বৈকালে ১টা হইতে ৫টা—এই সময়ের মধ্যে দর্শনার্থীগণকে এই গৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। দর্শনী দুই আনা।

হাইকোর্টের সম্মুখবর্ত্তী সুবিস্তৃত বালুকা-বেলায় এসিয়াটিক পেট্রোলিয়ম কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইয়ার্ড। এইখানেই ভারতবিখ্যাত কেরোসিনের টিন নির্ম্মিত হয়। হাইকোর্টের পূর্ব্ব-দক্ষিণ পার্শ্বে একটি সুন্দর স্তম্ভ সন্দর্শন করিলাম। স্তম্ভটি উচ্চতায় প্রায় ১২৫ ফিট। ইহা গ্রীক ডোরিক স্তম্ভের আদর্শে নির্ম্মিত এবং পূর্ব্বে বাতি-ঘর রূপে ব্যবহৃত হইত। ১৮৪৪ অব্দের ১লা জানুয়ারী এই বাতিঘরে সর্ব্বপ্রথমে আলোক প্রজ্বালিত করা হইয়াছিল। শোনা যায়, প্রায় ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী সাগরে এই বাতিঘরের আলোক-রশ্মি পরিদৃশ্যমান হইত।

হাইকোর্টের পশ্চিম পার্শ্বে আর একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা দেখিলাম। এই সৌধটি উনবিংশ শতাব্দীর বহুল-প্রচলিত "ইণ্ডো-সারাসেন" আদর্শে বিনির্ম্মিত। ইহাই ল কলেজ। ইহার পার্শ্বেই রেভারেণ্ড এণ্ডারসন-প্রতিষ্ঠিত এতদঞ্চল-প্রসিদ্ধ খৃষ্টান কলেজ। কলেজের ঠিক সম্মুখেই ছাত্রপ্রিয়

ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মিঃ উইলিয়ম মিলারের একটি সুন্দর ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান।

ল কলেজের পশ্চাদস্থ ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে এক সময়ে এতদঞ্চলবাসী ইংরাজগণের সমাধিস্থান ছিল। সেই সমাধি-সমূহের প্রস্তরফলকগুলি এক্ষণে সেণ্ট মেরি গির্জ্জার সংলগ্ন প্রাঙ্গণে রক্ষিত। কেবল অতীতের নিদর্শন স্বরূপ পুরাতন গোরস্থানে এখনো দুইটি সমাধি-স্তম্ভ বিরাজমান রহিয়াছে দেখিলাম। সমাধি দুইটি ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু আমার মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান বন্ধুবরের স্বভাব-আয়ত লোচন-যুগল আরও বিস্তৃততর হইতেছে দেখিয়া সে আশা মনোমধ্যেই বিলীন করিয়া লইলাম।

এইবার আমরা দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে নর্থবিচ রোডের বাম পার্শ্বস্থিত ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের আফিস, নেশানেল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, মার্কাণ্টাইল ব্যাঙ্ক, সিটি পুলিশ কোর্ট, গভর্ণমেণ্ট ষ্টেশনারী আফিস প্রভৃতি সুরম্য সৌধরাজি ছাড়াইয়া পোর্ট হেলথ আফিসের সম্মুখে আসিয়া পৌছিলাম। পোর্ট হেলথ আফিসের গাত্রসংলগ্ন মান্দ্রাজ হারবার।

পচপ্পা কলেজ—মান্দ্রাজ

মান্দ্রাজ বন্দর,—কেবল মান্দ্রাজের কেন—সমগ্র ভারতের একটি দর্শনযোগ্য স্থান। বন্দরের পরিচালনা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যাদি মান্দ্রাজ পোর্ট ট্রাষ্ট বোর্ড কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হয়। গ্রেনাইট প্রস্তর-বিনির্ম্মিত তোরণ-দ্বারের অব্যবহিত পরেই "মেমোরিয়েল-ষ্টোন" প্রোথিত রহিয়াছে দেখিলাম। বিগত ১৮৭৫ অব্দে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অফ ওয়েলস রূপে যখন মান্দ্রাজে পদার্পণ করেন, তখন তৎকর্ত্তৃক এই প্রস্তরফলক প্রোথিত হইয়াছিল।

বন্দরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে সারা প্রাণ বিস্ময়ে পরিপ্লুত হইয়া গেল। দেখিলাম, সুবিস্তীর্ণ বালুকাবেলা হইতে দুইটী সুউচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর সাগর-বক্ষে বিস্তৃত করিয়া এই সুন্দর বন্দরটি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। অর্ণবপোতের প্রবেশ-দ্বারটি প্রায় চারিশত ফিট চওড়া এবং সমুদ্রের গভীরতা এখানে প্রায় ৪০ ফিট। সমুদ্রের বিশাল বক্ষ হইতে প্রায় ২০০ একার পরিমিত স্থানের জল-রাশি বিচ্যুত হইয়া এই সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। সেই প্রস্তর-প্রাচীরের বহির্ভাগে, পূর্ব্বাধিকার ফিরিয়া পাইবার জন্য যেখানে অকূল সিন্ধু আকুল কল্লোলে দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিতেছে, সেইখানে সমুদ্রের উদ্দাম শক্তি সংযত করিবার জন্য বৃহদাকৃতি অসংখ্য প্রস্তরনিচয় রক্ষিত। প্রস্তরের পর প্রস্তরের বিরাট স্তূপ। শুনিলাম ১১ মাইল দূরবর্ত্তী পল্লভরম হইতে এই সুবৃহৎ প্রস্তররাজি আনীত হইয়াছে। শাবকহারা ক্রুদ্ধা শার্দ্দুল-মাতার মত ভীষণ গর্জ্জনে দিগ্বিদিক প্রকম্পিত করিয়া জলনিধির উত্তাল তরঙ্গমালা এই প্রস্তর-প্রাকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে এবং পাষাণে প্রতিহত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমরা প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া জড়প্রকৃতির অনন্ত শক্তির সহিত মানব-মনীষার এই অপূর্ব্ব সমর অবলোকন করিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে সাগরের সফেন বারিরাশি আসিয়া আমাদের চরণ-প্রান্ত সিক্ত করিয়া তুলিতেছিল। আমাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না।

আমরা নিস্পলক নেত্রে সমুদ্রের উদ্দাম নৃত্য দেখিতেছিলাম।

বন্দরের গভীরতা সাধারণতঃ ৩০ ফিট। বন্দর মধ্যে ১০খানি জাহাজ নোঙ্গর করিবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত রহিয়াছে দেখিলাম। চারিপার্শ্বে কয়েকটি জাহাজ-ঘাট রহিয়াছে; তন্মধ্যে পশ্চিমদিকস্থ ঘাটটি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০০ ফিট এবং একসঙ্গে চারিখানি জাহাজকে আশ্রয়দানে সমর্থ। এতদ্ব্যতীত আরও চারিটি জাহাজ-ঘাট রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া জাহাজ দাঁড়াইতে পারে। কয়লা বোঝাই জাহাজের জন্য তিনটী ঘাট স্বতন্ত্র রাখা হইয়াছে। এই তিনটী ঘাটে দৈনিক প্রায় ১২০০ টন কয়লা নামাইয়া রেলওয়ে ওয়াগনে (Wagon) বোঝাই করা হয়। জাহাজের মাল বোঝাই ও খালাস কার্য্য প্রধানতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাইটার (Lighter) দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ৫০টী ৪০টন এবং বাকী ১৮০টী তন্যূন ভার বহনে সমর্থ। এতদ্ সাহায্যে প্রায় ৪০০০ টন মাল এককালে জলে ভাসান যাইতে পারে। মাল উঠানামা করিবার জন্য পশ্চিম ঘাটের উপর অনেকগুলি কপিকল দেখিলাম। ইহাদের সাহায্যে এক হইতে ৩৮ টন পর্য্যন্ত মাল স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়।

ল-কলেজ—মাদ্রাজ

বন্দর মধ্যে বেড়াইবার জন্য কয়েকখানি নৌকাও রক্ষিত হইয়াছে দেখিলাম। তাহার একখানি অধিকার করিয়া আমরা বন্দর পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। একখানি রেঙ্গুনগামী জাহাজ বন্দরমধ্যে নোঙ্গর করিয়া ছিল। তাহার গায়ে নৌকা লাগাইয়া আমরা সকলে জাহাজে আরোহণ করিলাম। কেবলমাত্র বন্ধুবর সুশীলবাবু সেই নৌকাখানি লইয়া বন্দর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র বিহারে চলিলেন। জাহাজের ওয় ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের সৌজন্যে জাহাজের দর্শনীয় যাবতীয় স্থান সমূহ দর্শন করিয়া পরম পুলকিতচিত্তে জাহাজ-গাত্র-সংলগ্ন দড়ির সিঁড়ি বাহিয়া নীচে আসিলাম। ততক্ষণে সুশীলবাবুর সাগর-ভ্রমণ শেষ হইয়াছিল। অতঃপর আনন্দ-কলরবে মাদ্রাজের রাজপথ মুখরিত করিয়া আমরা ট্রিপলীকেনস্থিত বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

মন দিয়ে মন জানা যায়

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

মন দিয়ে মন জানা যায়,
না-পেয়েও দুঃখ ঘুচে, অশ্রুজল যায় মুছে,
আঁধারে আলোর রূপ নয়ন ভুলায়!
মন দিয়া শুনিবারে পাই,
যে কথা বলনি মুখে, চেপে রেখেছিলে বুকে,
তারি সুর চারিদিকে—আর কিছু নাই।

যে সোহাগ চেয়েছিলে দিতে—
অতনু পরশে তার, এ-তনু বীণার তার,
কেবলি পুলকে কাঁপে দিবসে-নিশীথে!
এ আমার একেলার ঘরে,
তোমারি সে ভালবাসা, কত দিকে নিল বাসা,
কত আশাতীত ধন দিল চিরতরে!

অপরাধ-ভঞ্জন

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

এ মর-ধরায় বাড়াইতে, হায়, দু-চারি বছর আয়ু,
তব কাশীধামে যারা আসি' নামে সেবিতে স্বাস্থ্য-বায়ু,
তীর্থ-ধর্ম্ম, পুণ্য কর্ম্ম কিছুই মানে না অত,
যারা এ জগতে শুধু বিবিধমতে স্বার্থ সাধনে রত,
আমি সেই দলে ছিনু কুতূহলে, ওগো বিশ্বের নাথ,
ক্ষম অপরাধ, যাচি গো প্রসাদ, পদে করি প্রণিপাত।

দেহটার লাগি' হ'য়ে অনুরাগী, তেয়াগিয়া ঘর-দ্বার
পূজার বন্ধে কি মহানন্দে কাশী আসি বারবার;
ছড়ি ল'য়ে হাতে রোজ রোজ প্রাতে গৈবী-কূয়ায় যাই,
পিয়া সেই জল বাত-অম্বল শাসিতে, নাশিতে চাই;
মনে করি, ধিক্ পূজা-আহ্নিক, দেব-অর্চ্চনা মিছে,
করি' তদ্বির রাখিব শরীর—আর সব তার পিছে।
থাকি' উপবাসী পুণ্য-প্রয়াসী গিয়া তব মন্দিরে
বিল্বের দল গঙ্গার জল ঢালি নাই তব শিরে।
বুঝিয়া সে ভুল হ'তেছি ব্যাকুল, ওগো বিশ্বের নাথ!
ক্ষম অপরাধ মম পরমাদ, পদে করি প্রণিপাত।

"আনি বাছেবাছ তরকারী-মাছ পুরায়ে মনের সাধ,
কিনি ডালপুরী, জিলিপী, কচুরী, রাবড়ি ও কালাকাঁদ,
সে সব আদরে দিয়েছি উদরে, আজ তাই হয় ক্ষোভ,
তব সম্ভোগে, শিব-শম্ভো হে, দিই নাই করি' লোভ;
করি' আয়োজন দণ্ডী ভোজন করাইনি কভু, হায়,
এমনি শিক্ষা—চাহিলে ভিক্ষা ভাবিতাম এ কি দায়!
কভু স্নেহভরে প্রার্থীর করে অর্থ করি নি দান,
অন্ধ-আতুর করিয়াছি দূর, এমনি কঠিন প্রাণ!
আরও কত শত ছিনু পাপে রত, আসে আজ অবসাদ,
বিশ্বের নাথ! করি প্রণিপাত, ক্ষম মোর অপরাধ।

প্রতি সন্ধ্যায় বন্দনা গায় তোমার ভক্তজন,
গুরু-গম্ভীরে তব মন্দিরে আরতির আয়োজন;
সব কলরব নিথর-নীরব, ঘণ্টার রণরণি,
ভেদি' অম্বর উঠে 'হর-হর শিব-শঙ্কর' ধ্বনি,
সুখ-দুখ-ব্যথা, সংসার-কথা কিছুই থাকে না মনে,
ভক্তের প্রাণ ডাকে ভগবান ব্যোম-ব্যোম রব সনে;
কত নর-নারী দাঁড়ায়ে দু'ধারি,—গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি,—
ভাবে মাতোয়ারা, সঙ্কোচ-হারা, বন্ধন দূরে ফেলি',
তাদের চিত্ত করে যে নৃত্য তোমার নিত্য-ধামে,
নির্ম্মল মন, চাহে না তখন দক্ষিণে কিবা বামে;
ল'য়ে বন্ধুরে ভ্রমিতাম দূরে—মনে সদা ভয় জাগে,
পাছে এ শরীরে সে বিষম ভিড়ে একটু আঁচড় লাগে;
—তব মন্দিরে অবনত শিরে অযুত ভক্ত সনে
কোন' সন্ধ্যায় যাইনি ক, হায়, পূজিবার প্রয়োজনে;
করি' যোড়-কর, বলি 'শঙ্কর' ডাকিতে হয় নি সাধ,
করি প্রণিপাত, বিশ্বের নাথ, ক্ষম মোর অপরাধ।

গঙ্গার তীরে স্নিগ্ধ সমীরে, সূর্য্য বসিলে পাটে,
পূত করি' মন কত ব্রাহ্মণ আহ্নিক করে ঘাটে,
গীতা, ভাগবত, বেদোপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্র আর,
সন্ধ্যা-গগন করি আলোড়ন ধ্বনিছে মন্ত্র তার,
কবিকঙ্কণ গায় কোন জন কঙ্কণ বাজাইয়া,
রামায়ণ গায়—সীতার ব্যথায় গলায়ে পাষাণ হিয়া;
কোথা বা রঙ্গে মধু-মৃদঙ্গে উঠে কীর্ত্তন-গান,
কিশোরী-রাধার মিলনাভিসার, বিরহ, মাথুর, মান;
সাধু-সজ্জন গাহিছে ভজন দিয়া প্রেম-অঞ্জলি,
তুলসীর আর কবীর মীরার সুগভীর দোঁহাবলী,
ল'য়ে খঞ্জনী গায় গুঞ্জনি,' মন করি উন্মদ,
রামপ্রসাদের, লোচনদাসের, নরোত্তমের পদ;
—আমি সেই ফাঁকে বন্ধুর ঝাঁকে খুলিয়া মনের খিল,
পর-চর্চ্চায়, বিনা খরচায়, তাজা করে' লই দিল।

* * * *

আরও আছে কিছু, হয় মাথা নীচু, কেমনে বলিব আমি,
গোপন বারতা, তুমি ত জান তা, ওগো অন্তরযামি!
তীর্থের পাপে পিশাচের শাপে পুড়িয়া হ'তেছি ক্ষার,
তব করুণায় অসী-বরুণায় পশি যেন এইবার;
করি প্রণিপাত, বিশ্বের নাথ, আর কিছু নাই সাধ,
ক্ষম অপরাধ, ক্ষম অপরাধ, ক্ষম শুধু অপরাধ।

কথা ও সুর—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্বরলিপি—শ্রীসাহানা দেবী

জয়-জয়ন্তী—একতালা

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে
এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা
মন্দির তোমাব কি গড়িব মাগো
মন্দির যাঁর দিগন্ত নীলিমা।
তোমার প্রতিমা শশী তারা রবি
সাগর নির্ঝর ভূধর অটবী
নিকুঞ্জ ভবন বসন্ত পবন
তরুলতা ফল ফুল মাধুরিমা!
সতীর পবিত্র প্রণয় মধু মা
শিশুর হাসিটী জননীর চুমা
সাধুর ভকতি প্রতিভা শকতি
তোমারি মাধুরী তোমারি মহিমা!
যেইদিকে চাই এ নিখিল ভূমি
শত রূপে মাগো বিরাজিত তুমি
বসন্তে কি শীতে দিবসে নিশীথে
বিকশিত তব বিভব গরিমা!
তথাপি মাটীর এ প্রতিমা গড়ি
তোমারে পুজিতে চাই মা ঈশ্বরী
অমর কবির হৃদয় গভীর
ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা।
খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা
দেখিনা আপনি দিয়েছ ম্যা'ধরা
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটী বাড়ায়ে
ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা॥

০ ১ + ৩ ০

II | সা সরা ঋা | ঋা ঋা ঋা | ঋা ঋা ঋা | ঋা গরগা সা | সা সা মা |

প্র তি মা দি য়ে কি পূ জি ব তো মা রে এ বি শ্ব

স তী র প বি ত্র প্র ণ য় ম ধু মা শি শু র

ত থা পি মা টী র এ প্র তি মা গ ড়ি তো মা রে

১ + ৩ II ০ ১

মা মা মা | গা মগরা গজ্ঞা | ঋা সা সা | ঋা মা মপা | পা পধণা মপা |

নি খি ল তো মা রি প্র তি মা ম ন্দি র তো মা র

হা সি টী জ ন নী র চু মা সা ধু র ভ ক তি

পূ জি তে চা ই মা ঈ শ্ব রী অ ম র ক বি র

+ ৩ ০ ১

না নর্সা র্সা | র্ঋসনর্সা র্সনর্সা র্সা | র্সা র্সা নর্সরা | র্সরা ণা ধপ |

কি গ ড়ি ব মা গো ম ন্দি র যা হা র

প্র তি ভা শ ক তি তো মা রি মা ধু রী

হৃ দ য় গ ভী র ভা ষা য় যা হা র

ধা মপধা পগপা | মা গা মগঋজ্ঞা | II II

দি গ ন্ত নী লি মা

তো মা রি ম হি মা

দি তে না রে সী মা

০ ১ + ৩ ০

II { | মা পা না | না না নর্সা | র্সা র্সা র্সা | র্ঋসর্সা র্সনর্সা | পা র্ঋা সর্ঋজ্ঞা |

তো মা র প্র তি মা শ শী তা রা র বি সা গ র

যে ই দি কে চা ই এ নি খি ল তু মি শ ত রূ

খুঁ জি য়ে বে ড়া ই অ বো ধ আ ম রা দে খি না

১ + ৩ ০

| র্ঋা র্সা র্সা | সর্ঋা সর্ঋা ণা | ণা ধা (ণধপধা) } পা | রমা মপা পা |

নি র্ঝ র ভূ ধ র অ ট বী বী নি কু ঞ্জ

পে মা গো বি রা জি ত তু মি মি ব স ন্তে

আ প নি দি য়ে ছ মা ধ রা রা ছ রা , রে

১　　+　　৩　　০　　১
পা পা গধণা | মপা পনা না | র্সা র্সা নর্সা | র্সা নর্সর্রা সর্র্ণা | ণা ধা পা
ভ ব ন　ব স ন্ত　প ব ন　ত রু ল　তা ফ ল
কি শী তে　দি ব সে　নি শী থে　বি ক শি　ত ত ব
দাঁ ড়া য়ে　হা ত্‌ টী　বা ড়া য়ে　ডা কি ছ　নি য় ত

+　　৩
ধা মপধা পগমা | মা গা মগরজ্ঞা | II II
ফু ল মা　ধু রি মা
বি ভ ব　গ রি মা!
ক রু ণা　ম য়ী মা

চাঁদের কলঙ্ক

শ্রীসুকুমার ভাদুড়ী

কয় দিন হইতে অত্যন্ত শীত পড়িয়াছে।...

অতি প্রত্যুষেই সাতকড়ি একটা কম্বল মুড়ি দিয়া শশী সরকারের ভাঙ্গা রকটার উপর উঠিয়া ডাকিল,—ওহে ভায়া, বলি উঠেছো না কি ?

ভিতর হইতে শশী উত্তর দিল,—হুঁ, যাই!

উইয়ে-খাওয়া নড়নড়ে অতি জীর্ণ দরজাটা সন্তর্পণে খুলিয়া, কাপড়-দিয়া-হাতে-ধরা কলঙ্কের-দাগ-পড়া পিতলের একটা গেলাসে করিয়া চায় ফুঁ দিতে দিতে শশীশেখর বাহির হইয়া আসিল। গায়ে একটা মোটা গরম কোট ও তাহার উপর একখানা মোটা বিলাতী কম্বল, মাথায় একটা কম্ফর্টার জড়ান, পায়ে হাঁটু-পর্য্যন্ত মোজা ও তদুপরি বুটজুতা আঁটা!

চায়ের গেলাসটায় ছোট্ট একটা চুমুক দিয়া শশী সরকার কহিল, দাদা যে—এই শীতে এত সকালেই ?

রোয়াকের একধারে সদ্য উদিত সূর্য্যের অল্প একটু রৌদ্রের আভাষ আসিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছিল। ঠিক সেইখানটিতে বেশ মুড়িসুড়ি দিয়া বসিয়া সাতকড়ি কহিল,—কথা আছে! তোমার এত ভোরেই চা-পান যে আজ ?

—কাল রাতে ডিউটি ছিল কি না! এই ত ফিরছি ছোঁড়াদের বিদেয় ক'রে।

—কাল কিছু শিকারপত্তর পেলে না কি ?

—কৈ ? সারা রাত ঘোরাই সার!

কয়েক মাস হইতে পাড়ায় অত্যন্ত চোরের উপদ্রব হইয়াছিল। তাই পাড়ার ছেলেরা দল বাঁধিয়া পালা করিয়া আজ কয় মাস হইতে রাতের পর রাত পাহারা দিয়া বেড়াইত। শশীশেখরের কাল রাত্রে তাহারই ডিউটি ছিল; এবং সেই সে দলের ছিল ক্যাপ্টেন।

চায়ের গেলাসে গোটা দুই ফুঁ দিয়া শশীশেখর কহিল, —চা একটু খাবেন না কি,—আছে এখনও!

—খেলেও হয়! যা শীত পড়েছে আজ—উঃ!

—বসুন তবে আনি! বলিয়া শশীশেখর ভিতরে চলিয়া গেল।

সামনের বাড়ীর জানলা খোলার শব্দে সাতকড়ি

সেই দিকে একবার একটা উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, আবার পথের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

বাম হস্তে আর একটা চায়ের গেলাস আনিয়া সাতকড়ির হাতে দিয়া শশীশেখর একপাশে উবু হইয়া বসিয়া কহিল,—তার পর, কি কথাটা বলুন দেখি!

গরম গেলাসটায় কাপড় জড়াইয়া ধরিয়া ঠোঁটে ঠেকাইতেই সাতকড়ি বুঝিল,—চায়ের চেয়ে গেলাসটা অনেক বেশী গরম। তাই গেলাসটাকে মুখ হইতে নামাইয়া সাতকড়ি তার কোটর-প্রবিষ্ট চোখ দুইটা টানিয়া সাধ্যমত বড় করিয়া কহিল,—কথা কি জান ভায়া!—ওপাড়ার নিতাই ফেরিওলাকে চেন ত?

ভ্রূ কুঁচকাইয়া শশীশেখর কহিল,—হুঁ; তা'র কি হল?

—হবে আর কি! ব্যাটার বয়েস ত' চল্লিশ পার হল—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ছেলেপুলে কিছুই হল না জানো বোধ হয়?

—হুঁ।

ঈষৎ হাসিয়া সাতকড়ি কহিল,—এই সেদিনও ব্যাটার বৌটা দে'-পাড়ায় পূজো দিয়ে ইঁট বেঁধে এলো,—বুড়ো বয়সেও যদি একটা হয় ঠাকুরের দয়ায়!

—হুঁ; তার হল কি?

—আরে কাল সন্ধ্যে থেকে শুনি, তার বাড়ী একটা ছোট ছেলে ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে!—

—ছেলে? কার!

—আরে শোনো তো? সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরছি, একটু ভয়ও হল। বাড়ী পৌঁছে গিন্নীকে শুধোলাম—গিন্নী, নিতাইয়ের বাড়ী ছেলে কাঁদে কেন! গিন্নী বল্লেন, ওমা, জান না? আজ দুপুরে নিতাই যে কোত্থেকে একটা ছেলে কুড়িয়ে এনেছে! কোত্থেকে না কি ও খাবার বেচে ফিরছিল। মাঠের মাঝখানে ছেলেটা একটা গাছ তলায় শুয়ে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদছিল। দেখে কুড়িয়ে এনেছে—নিজের ছেলেপিলে নেই—মানুষ করবে। খাসা গোপালের মত ছেলেটি কিন্তু!—

—ঐ কুড়োনো ছেলে মানুষ করবে?

—হ্যাঁ! কার ছেলে, কি বিত্তান্ত, কিছু ঠিক নেই—অমনি ঘরে আন্‌ল, কি না মানুষ করবে।

—ছেলে যে কোন্ সতী সাবিত্রীর, তা বেশই বোঝা যাচ্ছে! কে কুলের মাথা খেয়ে অমন করে বোধ হয় পথের কাঁটাটাকে মাঠের মাঝখানে উপড়ে ফেলে রেখে গেছেন। সেই বেজন্মা ছেলেটাকে ঘরে এনে তুই কি না মানুষ করবি? আর এই ভদ্দর পল্লীর বুকে বসে? ব্যাটার আস্পর্দ্ধা কম নয়!

চায়ের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে শশীশেখর বিজ্ঞের মত উত্তর দিল,—তাই বটে; ব্যাটা ভাবে পাড়ায় যেন আর লোক নেই; নচ্ছার কোথাকার! বের করাচ্ছি ওর ছেলে মানুষ করা!—

এতক্ষণে শীতের হাওয়ায় চায়ের গেলাস বেশ ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছিল। পাশ হইতে সেটাকে তুলিয়া লইয়া, এক চুমুকে সমস্ত চাটুকু নিঃশেষ করিয়া সাতকড়ি কহিল,—এখন এর ব্যবস্থা কি?

গেলাসের তলানি চাটুকু উপুড় করিয়া রকের পাশে ফেলিয়া শশীশেখর মাথা নাড়িয়া কহিল,—হুঃ, এর ব্যবস্থা একটা অচিরেই করতে হচ্ছে। তার পর উঠিয়া পড়িয়া কহিল,—আপনি বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি- এসেই বেরুব।—বলিয়া শূন্য গেলাস দুইটা লইয়া বাসার ভিতরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টাদেড়েক পরে আরও কয়েকজন প্রতিবেশীর সহিত শশীশেখর ও সাতকড়ি বেশ একটা দল পাকাইয়া নিতাই-চরণের বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত হইল। রুদ্ধ দরজায় আঘাত করিয়া শশীশেখর ডাকিল,—নিতাই!

গাঁয়ে বেচিতে যাইবার জন্য নিতাই তখন খাবার ভাজিতেছিল; আর তার স্ত্রী যোগাড় দিতেছিল। শশী-শেখরের বজ্রকণ্ঠ কাণে যাইতেই নিতাই উত্তর দিল,—এজ্ঞে যাই বাবু। তার পর ধপ্ করিয়া উনানের পাশে গরম তেলের কড়াটা নামাইয়া সে বাড়ীর বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া এত সকালেই আজ আপনার দ্বারে একসঙ্গে এতগুলি সমবেত ভদ্র সজ্জনের পবিত্র মুখ দেখিয়া নিতাই সানন্দে সকলকে সভক্তি প্রণাম করিয়া হাসিয়া কহিল,—আপনারা আজ সকালেই যে এ দীনের বাড়ী?

গম্ভীরকণ্ঠে শশীশেখর কহিল,—হুঁ, দরকার আছে!—

শশীর কণ্ঠস্বরে অল্প একটু শঙ্কিত হইয়া নিতাই তাহার পানে চাহিল।

শশী কহিল,—তুই না কি কাল একটা ছেলে কুড়িয়ে পেয়েছিস?

আবার তেমনি সরল হাসিয়া নিতাই কহিল,—এজ্ঞে! ভগবান মিলিয়ে দিলেন। এই শনিবারেই দে-পাড়ায় পূজো দেবো।'

শশীশেখর আবার প্রশ্ন করিল,—ছেলে কার?

—তা ত' জানি না! মাঠের মাঝখানে একটা গাছের তলায় পড়ে পড়ে কাঁদছিল। আমি দেখে কুড়িয়ে আন্‌লাম! আহা, কচিছেলে বাবু, শীতে—

বাধা দিয়া শশীশেখর কহিল,—কি জাত জানিস?

—আজ্ঞে না!

—তবে তুই কেমন করে ঘরে আনলি?

—হুঁঃ—ঐ একরত্তি ছেলে—ওর আবার জাত! কি বলেন যে ঠাকুর! ও ত দেবতা!—

—ধ্যেত্তোর দেবতা! বেজন্মা ছেলে দেবতা না হাতি!

জিভ কাটিয়া নিতাই কহিল,—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ও শিশু ঠাকুর, ও শিশু; এক্কেবারে এতটুকু,—বোধ হয় এক মাসেরও নয়!

—তা জানি! তোর ওকে ফেলতে হবে! নৈলে এ ভদ্দর লোকের পাড়ায় অমন বেজাত-বেজন্মা নিয়ে ঘর করা চলবে না! এ মুচি-ম্যাথরের পাড়া পাস্‌নি! বুঝলি!

বিস্মিত নেত্রে শশীশেখরের পানে চাহিয়া নিতাই কহিল,—সে কি ঠাকুর—ওকে ফেলবো কোথায়?

যেখানেই হ'ক্ ফেলতে হবে। নয় ত' থানায় দিয়ে আয়,—আর নয় গির্জ্জের খ্রীষ্টানদের দিয়ে আয়।

নিতাই উত্তর করিল,—তা' কি হয় ঠাকুর? একটা জীব ত'!

রাগিয়া শশীশেখর গর্জ্জিয়া উঠিল,—হুঁ, হুঁ,—ভারি তোর জীব! রেখে দে তোর ধর্ম্ম-কথা! ওকে ফেল্‌তে হবে, তবে তুই এ পাড়ায় থাকতে পাবি—

নিতাই তেমনি ভাবেই জবাব দিল,—পারব না!

একেই শশীশেখর ইতিপূর্ব্বে চটিয়াছিল। তাহার উপর নিতাইয়ের এমন সোজা উত্তরে সে আরও রাগিয়া, ঠাস্ করিয়া সজোরে তাহার গালে একটা' চড় মারিয়া কহিল,—কি? ফেলবিনে?

অবাক্-বিস্ময়ে শশীর পানে চাহিয়া নিতাই অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে কহিল,—মারলেন যে?

—বেশ করেছি,—মারবো না? ব্যাটা দোষ করবে, আবার আমাদের সামনে চোখ রাঙিয়ে জবাব করবে। ছোটলোক, জানোয়ার কোথাকার!

দুই হাতে চোখ মুছিয়া নিতাই কহিল,—আমি ছেলে ফেল্‌বো না! ও আমার ছেলে!

—ফেলবিনে?

—না!

—আচ্ছা; দেখছি, তুই-ই কত বড়, আর শশী সরকারই কত বড়! ঘুঘু দেখেছ চাঁদ, এখনও ফাঁদ ত' দ্যাখোনি!

তার পর ক্যাপ্তেন-চালে পিছন ফিরিয়া দলের পানে চাহিয়া কহিল,—চল ত' হে! একবার ছোটলোকের আস্পর্দ্ধাটা বার করা যাক্!

সকলে চলিয়া গেল। চোখ মুছিতে মুছিতে নিতাই ভিতরে ঢুকিয়া গেল। যাইতে যাইতে সে অস্ফুটে বলিতে লাগিল,—ভদ্দরলোক না হাতি,—সব চামার, চামার!

(২)

নিতাইয়ের বয়স প্রায় চল্লিশের উপর হইবে—মাথার চুল প্রায় অর্দ্ধেক পাকিয়া গিয়াছে; গোঁফ দাড়ি সামান্য—স্বাস্থ্যটা এখনও বেশ ভালই আছে; কেন না, সেটীর পানে চাহিলে তাহার বয়সটা তিরিশের অধিক বলিয়া কাহারও বিশ্বাস হয় না।

দূর চাষাগাঁয় তেলা খাবার ভাজিয়া ফেরি করাই ছিল তার একমাত্র ব্যবসা। এই ব্যবসা করিয়াই সে আপনার ও স্ত্রীর উদরান্নের সংস্থান করে,—স্ত্রীর গহনাও গড়াইয়া দ্যায়;—আবার তাহারই কিছু কিছু বাঁচাইয়া অদ্য সে আপনার বাসের জন্য এই ক্ষুদ্র চালাখানি তৈয়ারী করাইয়াছে।

কিন্তু এত বয়স হইলেও তার ছেলেপিলে আজ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। অনেক দেবদেবীর নিকট পূজা দিয়া, হুড়ি বাঁধিয়া, মানত্ করিয়াও কোনও ফল হইল না। লাভের মধ্যে শুধু দেবদেবীর উপর তাহাদের এতদিনের অটুট ভক্তিটাই ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতে লাগিল।

রাত্রে শুইয়া শুইয়া নিতাই ভাবিত—সন্তান যাহারা সত্যি করিয়া চায়—তাহারা পায় না; কিন্তু যাহাদের পালন করিবার সামর্থ্য নাই, তাহাদেরই ঘরে বছরে বছরে শিশুর দল বাড়িয়াই চলে। ও পাড়ার নারাণ বৈরাগীর দশটা ছেলে মেয়ে আছে। নিতাইচরণ একটি ছেলের জন্য এতই লালায়িত হইয়া পড়িয়াছিল যে, অবশেষে সে এক দিন প্রচার করিল, সে পোষ্য পুত্র লইবে।—কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে 'ছেলে' মিলাইয়া দিলেন—হঠাৎ সেদিন একটা গ্রাম হইতে খাবার বেচিয়া ফিরিবার পথে, নিতাই একটী একমাসের শিশু কুড়াইয়া পাইল। গাছের তলায় পড়িয়া পড়িয়া অসহায় শিশুটি কাঁদিয়া তখন হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল।—তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া নিতাইয়ের পুত্রলোভী হৃদয়টা সহসা নিবিড় স্নেহে আর্দ্র হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইল।

বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর কোলে ছেলেটীকে তুলিয়া দিয়া নিতাই কহিল,—এই নাও—সেদিন দে'পাড়ায় পুজো দিইছিলে নৃসিংহদেব দিয়েছেন।

ছেলে লইয়া স্ত্রী কহিল,—এ কোথায় পেলে?

—মাঠের গাছতলায়!

—বেশ ছেলেট ত!—খাসা!

স্ত্রীর এত দিনের ক্ষুধিত শূন্য হৃদয়টা আজ ধীরে ধীরে মাতার স্নেহরসে কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল। ঠোঁটের কোণে একটি ক্ষীণ হাসির রেখা তা'র এত দিনের ব্যাকুল প্রার্থনার সার্থকতায় চরম তৃপ্তি প্রকাশ করিয়া গেল।

সেই সন্তান লইয়াই পাড়ায় আজ এত গোলযোগ।

...গভীর রাত্রে সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত দেহটাকে আপনার শতচ্ছিন্ন মলিন শয্যায় এলাইয়া দিয়া নিতাইচরণ নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাইতেছিল। বাহির হইতে পুলিশের রুক্ষ চীৎকারে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ধীরে ধীরে লেপ খুলিয়া, কোঁচার খুঁটটা গায়ে দিয়া সে চৌকি হইতে নামিয়া পড়িল; জানালার সম্মুখে আসিয়া জানালাটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া কহিল,—কে?

পুলিশ কহিল,—হামি,—বাহারে এসো! তোমাকে থানামে যেতে হোবে!

ভীত ও বিস্মিত কণ্ঠে নিতাই কহিল,—এত রাত্তিরে!

—হাঁ, এসো না জল্‌দি!

কথাটা ভাল করিয়া না বুঝিলেও, নিতাইয়ের মনে মনে বেশ ভয় হইল। সে কহিল,—আচ্ছা যাচ্ছি, দাঁড়াও।

নিতাইয়ের স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—এত রেতে থানায় কেন?

—কি জানি কেন!

—বোধ হয় শশী সরকারের কারসাজি!

—হবে!

একটা মোটা কোট গায়ে দিয়া ও চটিটা পায় দিয়া লাঠি হাতে বাহিরে আসিয়া নিতাই কহিল,—দোরটা দাও! আমি ফিরে না এলে দোর খুলো না।

স্ত্রী আসিয়া দোর বন্ধ করিয়া গেল। বিছানায় ফিরিয়া গিয়া সে মনে মনে বলিল,—ঠাকুর, সওয়া পাঁচ আনার হরিনোট দোব—ও ভালয় ভালয় ফিরে আসুক।

সেই রাত্রে পুলিশের সহিত নিতাই থানায় আসিল। দারোগা বাবু তখন বাসায়। অগত্যা পুলিশ তাহাকে সারারাত্রি সেই থানার গারদে আটক করিয়া রাখিল। গারদের ঠাণ্ডা মেঝেয় আপনার কম্বলখানা বিছাইয়া নিতাইচরণ মুখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া তখন অশ্রুপ্রবাহ ঝরিয়া পড়িতে চাহিতেছিল।...

সকালবেলা দারোগা আসিয়া তাহাকে বাহিরে আনাইয়া শুনাইলেন,—সে না কি পাড়ার কোন্ এক বাড়ীতে চুরি করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া এখানে আনীত হইয়াছে—এবং পাড়ার স্বেচ্ছাসেবকদলের সভ্যরাই না কি সেদিন রাত্রে পাহারা দিবার সময় তাহাকে চুরি করিতে দেখিতে পাইয়াছে।

আপনার বিরুদ্ধে এমন স্বপ্নাতীত অভিযোগ শুনিয়া নিতাই যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। বিস্ময়ে চোখ দুইটা বড় করিয়া কহিল,—আমি চুরি করিছি?

দারোগা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—হাঁ, তুই!

—কখ্খনো না; মিথ্যে কথা।

অপরাধ স্বীকার করিবার জন্য সেদিন দারোগা ও পুলিশের হাতে নিতাই অনেক মার খাইল। গাল, পিঠ, পা সর্ব্বাঙ্গ কাটিয়া কাটিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িল;—সাদা মুখখানা ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিল। তবুও তাহার মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না।

সকালবেলা শশী সরকার থানায় আসিয়া উপস্থিত

হইয়াছিলেন। থানার বারান্দায় এক কোণে দাঁড়াইয়া তিনি এতক্ষণ নিতাইয়ের নির্যাতন হাসিমুখেই উপভোগ করিতেছিলেন। অবশেষে আগাইয়া আসিয়া নিতাইয়ের পক্ষ হইতে কহিলেন,—আচ্ছা, এবার ওকে ছেড়ে দিন। আবার কখনো ধরা পড়লে, তখন—

নিতাইয়ের পানে একবার চাহিয়া দারোগা কহিলেন,—যা', ফের যদি কখনো—

দারোগা ও শশী সরকার উভয়ের পানে তার সজলাক্ষির গোটা-দুই অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিতাইচরণ সেখান হইতে চলিয়া গেল।……

দারোগার মার খাইয়া বাড়ী ফিরিয়া নিতাইচরণ সাত দিন বিছানায় পড়িয়া রহিল। খাবার বেচিতে যাওয়া, বাজার দোকান সমস্তই বন্ধ!—গায়ের বেদনায় সারাদিন সে বিছানায় শুইয়া থাকে; মাঝে দুই দিন তাহার বেশ জ্বরও হইল। স্ত্রী শুষ্কমুখে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে; কিন্তু কিছু বলিতে পারে না। নবাগত শিশুটীর পানে চাহিয়া তাহার হৃদয়ে একসঙ্গে স্নেহ ও ঘৃণা পাশাপাশি জাগিয়া উঠে—কিন্তু মাতৃত্বের নিবিড় স্নেহের পাশে ঘৃণার স্থান দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। মুহূর্ত্তের মধ্যেই তার ভিতরের নারীটি জাগিয়া উঠিয়া বলে,—ও যে পরিত্যক্ত শিশু,—অসহায়, জাতিহীন, জ্ঞাতিহীন—ও যে ভগবান্! নিতাইচরণও ভাবে—ব্যথা ও বেদনার ভার দিয়াই বুঝি এমনি করিয়া ভগবান তাহার মনুষ্যত্বকে যাচাই করিয়া লইতে চান। যন্ত্রণার বৃদ্ধির সময় তাহার মাঝে মাঝে মনে হইত, শিশুকে সে তাহার আপনার স্থানে আবার ফেলিয়া রাখিয়া আসে। কিন্তু কথাটা ভাবিতে গিয়া তাহার বুকের মধ্যে কোন্ একটা নিভৃত স্থানে যেন হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ কাঁটার আঘাত বাজিত—যাহার বেদনা তাহার বাহিরের বেদনাকেও ছাপাইয়া উঠিত।

(৩)

দিন চলিয়া যায়। নিতাইয়ের বিরুদ্ধে শশী সরকারের দলের উপদ্রব ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিল। পাড়ার দু' একজন ভদ্রলোকের নিকট কিছু বলিতে গেলে, তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। অজ্ঞাতকুলশীল, পথের পরিত্যক্ত শিশুকে মৃত্যুর নিকট হইতে আড়াল করিয়া আপনার ঘরে আশ্রয় দিলে, তাহার না কি এমনি দুর্দ্দশা হইবে। উপায়ের মধ্যে দুই—হয় সে দেশ ছাড়ুক, নয় শিশু ছাড়ুক! নিতাইয়েরও কি এক গোঁ চাপিয়া গেল—সে কিছুই ছাড়িবে না।

এত দিন ধরিয়া নিতাইয়ের স্ত্রীর কাজ ছিল শুধু রান্না করা আর গরুর সেবা। আর নিতায়ের কাজ ছিল—খাবার ভাজিয়া দূর গাঁয় বিক্রয় করা ও সেই পয়সা দিয়া বাজার করিয়া আনা। আজকাল তাহাদের উভয়েরই সকল কাজের সেরা কাজ হইয়া দাঁড়াইল—ঐ একমাসের কচি শিশুটীকে খাওয়ান, জামা পরান, আদর করা—এই সব। ছেলেকে আদর করিতে গিয়া নিতাইয়ের এক এক দিন এত বেলা হইয়া যাইত যে, হয় ত আর সে দিন খাবার বেচিতে যাওয়াও হইয়া উঠিত না। ঐ অজ্ঞান মাংসপিণ্ডটীকে অজস্র চুমার পর চুমায় স্নান করাইতে গিয়া তার স্ত্রীরও এক এক দিন হয় ত ভাত তরকারী পুড়িয়া যাইত—সংসারের বাসি কাজ কত বেলা পর্য্যন্ত অসম্পন্ন পড়িয়া থাকিত, কিন্তু সেদিকে তাহার খেয়ালও থাকিত না। শশী সরকারের উপদ্রবের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়িবার সমস্ত শক্তিটুকুই নিতাইচরণ ঐ শিশুটীরই কচি মুখের মধ্য হইতে আহরণ করিত।

দুপুরবেলা নিতাইচরণ খাবার বেচিতে বাহির হইয়া গেলে, তার স্ত্রী শিশুটীকে কোলে লইয়া বসিয়া বসিয়া রোদ পোহাইত। রোদে ফেলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তেল মাখাইত—আনন্দে শিশু আপনমনে হাসিত। কিন্তু কিসের আনন্দে সে হাসিত, তা' সেই জানে। তাহার হাসি দেখিয়া নিতাইয়ের স্ত্রীর মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিত।

জাগিয়া জাগিয়া শিশু ঘুমাইয়া পড়িত, কিন্তু তাহাতে যেন নিতাইয়ের স্ত্রীর স্বস্তি বোধ হইত না। ইচ্ছা করিয়া মাঝে মাঝে সে তাহাকে জাগাইয়া তুলিত—আবার ঘুম পাড়াইত। অধিকক্ষণ ঘুমাইয়া থাকিলে তাহার মনে ভয় হইত—যদি সে……

ভাবিয়া ভাবিয়া আপনিই নীরবে শিহরিয়া উঠিত।

শুক্রবারের সন্ধ্যায় খাবার বেচিয়া ফিরিয়া আসিয়া, নিতাই তার স্ত্রীকে কহিল,—কাল দে'পাড়ায় যাব পূজো দিতে।

স্ত্রী বলিল,—বেশ তো; অনেক দিনের মানত রয়েছে

—আর ঠাকুর দেবতার মানত্ ; ও শীগ্‌গির শীগ্‌গির দিয়ে আসাই ভাল।

নিতাই বলিল,—কাল ভোরে উঠেই বেরিয়ে যাব।

স্ত্রী বলিল,—খোকার কপালে ছুঁইয়ে একটা টাকা রেখেছি তুলে—নিয়ে যেয়ো মনে করে!

—আচ্ছা! বলিয়া কি একটা কাজে নিতাই তখনি বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর নিতাই বাড়ী ফিরিলে, তাহার স্ত্রী বলিল,—হ্যাঁ গা, আজ ত' এখনও গরুটা ফিরল না! কাল সকালে খোকা খাবে কি?

নিতাই চোখ তুলিয়া স্ত্রীর পানে চাহিল। ঈষৎ ভাবিয়া কহিল,—এ নিশ্চয় শশী সরকারের কাজ।

দাওয়ার আলনা হইতে গায়ের কম্বলটা টানিয়া লইয়া নিতাই গরুর সন্ধানে বাহির হইল—এবং অনেক খুঁজিয়া তিন মাইল দূরের এক খোঁয়াড় হইতে সেই রাত্রেই গরু উদ্ধার করিয়া আনিল। ঘরে তুলিয়া আলো ধরিয়া গরুটার সকল গা পরীক্ষা করিয়া দেখিল,—কে যেন অতি নির্মম-ভাবে তাহাকে আঘাতের পর আঘাত করিয়াছে। তাহার দেহের স্থানে স্থানে কাটিয়া কাটিয়া রক্ত জমিয়া গিয়াছে। জমিয়া-যাওয়া রক্তবিন্দুগুলির পানে সকরুণ নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া নিতাইচরণ আপন মনে বলিয়া উঠিল,—ইস্! চামার! ছেলেটাকে আনার জন্যে কি এরও ঘাড়ে দোষ পড়ল?

...পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া, একখানা লাল চেলির কাপড় বগলে লইয়া, নিতাইচরণ দে'পাড়ায় চলিয়া গেল। সেইখানে পৌঁছিয়া পুকুরে স্নান করিয়া ঠাকুরের পূজা দিবে,—তাহার পর ফুল-বিল্বপত্র প্রসাদ প্রভৃতি লইয়া আসিবে। চরণামৃতের জন্য ছোট্ট একটি পিতলের ঘটিও সঙ্গে লইল।......

পূজা দিয়া বাড়ী ফিরিতে নিতাইয়ের প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। মুক্ত দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিতেই দেখিল—গালে হাত দিয়া দাওয়ার সিঁড়ির উপর তার স্ত্রী চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে; পাশেই ঘাট হইতে আনা জলের ঘড়াটা নামান।

নিতাই আসিতেই তার স্ত্রী শুষ্ক দৃষ্টিটাকে স্বামীর পানে তুলিয়া ধরিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল—কোনও কথাই বলিতে পারিল না।

স্ত্রীর রকম দেখিয়া হঠাৎ নিতাই যেন কেমন হতভম্ব হইয়া গেল। সে উঠানের মাঝে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যেন কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না। কি জানি, যদি কোন দুঃসম্বাদ শুনিতে হয়!

মিনিট কয়েক তেমনি নীরবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিতাই কহিল,—কি হয়েছে?

স্ত্রী কোনও উত্তর দিল না। তেমনি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। চোখের পাতায় অশ্রু যেন এতক্ষণ ধরিয়া জমিয়াই উঠিতেছিল—স্বামীর কথায় তাহা যেন এমন করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

নিতাই আবার কহিল,—খোকা?

কোনমতে স্ত্রী উত্তর দিল,—নেই!

নিতাইয়ের সমস্ত কণ্ঠ যেন সহসা শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে সে বলিল,—কি করে মল?

—মরেনি।

—তবে?

—শশী সরকার চুরি করে নিয়ে গেছে।

—কখন?

—ঘাটে আমি জল আনতে গেলে।

নিতাইয়ের পা দুইটা একবার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পরিশ্রান্ত, অবসন্ন দেহটাকে সে আর খাড়া রাখিতে পারিল না। আস্তে আস্তে উঠানে বসিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ তেমনি নীরবেই কাটিয়া গেল। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিতাইচরণ আঁচলের খুঁট খুলিয়া ঠাকুরের পূজার প্রসাদ ও ফুল বিল্বপত্রগুলি ধীরে ধীরে বাহির করিল। তার পর উঠিয়া একবার সিক্তচক্ষে তার পানে চাহিয়া সেগুলিকে অদূরের আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিয়া সে ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

গোধূলির হিমাচ্ছন্ন ধূসর অন্ধকার তখন পৃথিবীর নগ্নদেহকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। অদূরের ঘন জঙ্গল হইতে আর্তকণ্ঠে শৃগালের দল তখন সমস্ত জাগ্রত বিশ্বকে জানাইয়া গেল—রাত্রির আঁধার কোলে মাথা দিয়া দিবস মরিয়াছে।

কুলি-মজুরের গান

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

(কোরাস্)

মোরা মূর্খ নোংরা পাজী অসভ্য বেইমান্ ঠেঁটা বদ্‌মাইস্!
ঘৃণ্য চোরের অগ্রগণ্য—বল্ তোরা সব যত পারিস্!

অতি নীচ মোরা—মোদের স্বভাব,
গালি খাই দি' না পাল্টা জবাব;
লাথি সহি, নহে শক্তি-অভাব
সার্কেসে যথা বাঘেরা খেলে,—
হায় পণ্ডিত, বিদ্যাভিমানী, ইহার অর্থ খুঁজে না পেলে?

লোকালয় হতে দূর নিরালায় কুলির পল্লী, কুটীর সারি—
যার তুলনায় তব গৃহ গায়, আস্তাবলও যে প্রাসাদ ভারি!
গজ গরু ঘোড়া মুর্গী কুকুরে
রেখেছ আদরে নিতি তব পুরে
মানুষ আমরা এ দয়াটুকুরে
মানুষের কাছে পাই না বলি'
গোপন দুঃখ গুমোটে গুমরি, তোমাদের ছায়া এড়ায়ে চলি।

প্রাণপণে মোরা আহরণ করি তোমাদের তরে মোহর মণি
বিনিময়ে তার হাসিমুখে লই তামার কয়েক পয়সা, ধনী;
মোদের জীবন-শক্তি-শোণিতে
অর্জ্জিত তব ধন ধরণীতে
এই কালো দৃঢ় বাহু দু'খানিতে
গড়েছি আমরা তোমার বেদী,
বাসুকীর মত ধরিয়া রেখেছি করিয়া তোমারে অভ্রভেদী।
পশুরো অধম করিয়া রেখেছ', না দিয়া শিক্ষা ধর্ম্ম জ্ঞান;
মানুষ হইতে রাখিয়াছ দূরে, পাছে দেখে হাতী স্বদেহখান্।
জন্মেছি এই কুলির লাইনে
কুলি ছাড়া কিছু দেখিতে পাইনে;
মরিব যখন চরম আইনে
তখনো সে এই ব্যারাক্ মাঝে,—
জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি বংশাবলী এ কুলির কাযে।
শীত কাটি মোরা বুকে হাঁটু দিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া ঝলসি মরি,
অঝোর বাদলে বসি তরুতলে বরষ বরষ বরষা তরি।
এই কোটী কোটী শিশু নরনারী
অর্দ্ধভুক্ত কৌপীনধারী—
আহরিছে ধন রত্ন তোমারি—
তুমি অকরুণ স্বার্থপর,—
মানুষের প্রতি মানুষের এই অত্যাচার কি ভয়ঙ্কর!!

তোমরা ভদ্র, বড়লোক সব, শিক্ষিত ধনী জ্ঞানী ও গুণী,
মোদের পরশে তোমাদের না কি জাতি যায়—
লোক-মুখেতে শুনি!
কিন্তু কোথায় সভ্যতা, ওরে,
কুলি-কন্যার যৌবন তরে
এ নর-নরকে দাঁড়াস্ কাতরে
যবে বেইমান্ ভণ্ড পাজী?—
মোরা ছোটলোক নিরুপায়ে সহি, বড়লোকদের ধাপ্পাবাজী।

তুমি ধনী, মোরা হতাদৃত কুলি-মজুরের দল জগৎ-জোড়া;
ধরণীর লোক সংখ্যা হিসাবে তোমারি মতন মানুষ মোরা!
এ দেহেও নাচে লাল লোহ-ধারা,
এ বুকের মাঝে দেয় প্রাণ সাড়া
এ লাঞ্ছিতেরও অন্তর সারা
স্নেহ প্রেম সেবা মমতাগত,—
করুণায় গলে, অপমানে জ্বলে, অবিকল ঠিক তোমারি মত।

এ ঐশ্বর্য্যময়ী এ পৃথ্বী এই কামধেনু দোহায় কে?
চিনেছ শুধুই ননি নবনীত, চেন না কেবলি জোগায় যে।!
রেল টেলিগ্রাফ্ কল কারখানা
তরুছায়া ঢাকা বাট ঘাট নানা
মোটর জাহাজ বায়ুরথ আনা
এ পেশী-বহুল হাতের কায—
তবুও মুখের মিষ্ট কথার কাঙাল কুলিরা জগৎ মাঝ!

মদ খেয়ে মোরা হাল্লা করি, ও জলপ্রপাত রুখিয়া ধরি,'
খনির গর্ত্তে আমরাই ঢুকি, পাহাড় ভাঙিয়া চূর্ণ করি,
অতল সাগর-তলের যাত্রী,
বিজলীর জাত-গৃহেতে ধাত্রী,
আগুনে খেলাই দিবস রাত্রি
নগর বসাই কাটিয়া বন,
তবুও আমরা খুনে' আর দাগী বদ্‌রাগী কুলি চিরন্তন!

ওর মধ্যে পাগল কে ?

৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ডাক্তার এসে, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখা হয়েছে বলে' তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চাইলেন। ফ্রাঁসোয়া উঠে দাঁড়াল, টেবিলের উপর তার টুপিটা রাখ্লে—তার ঘরের ভিতর সজোরে পায়চালি করতে করতে, খুব বাগাড়ম্বরের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা ডাক্তারকে বুঝিয়ে দিতে লাগ্ল। সে বল্লে—মহাশয়, ইনি আমার মামা, আমি এঁকে আপনার হাতে সমর্পণ করতে চাই। এঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ কিংবা পঞ্চাশের মধ্যে। ইনি হাতের কাজে বরাবর অভ্যস্ত,—সারাজীবন খেটে-খুটে কষ্ট-সৃষ্টে সংসার চালিয়েছেন। সুস্থ পিতা মাতা থেকে এঁর জন্ম; এঁর বংশে কখনো কারও মানসিক ব্যাধি ছিল বলে' জানা নেই। অতএব এ ক্ষেত্রে কোন কৌলিক ব্যাধির সঙ্গে আপনার যুঝাযুঝি করতে হবে না। এঁর ব্যাধিটা হচ্ছে—এক-চিন্তার বাতিক (Monomania)। এমন অদ্ভুত বায়ু-রোগ বোধ হয় আপনার হাতে কখনও আসে নি। এঁর মনের ভাব চট্‌ করে বদ্‌লে যায়—একবার খুব উৎফুল্ল—আবার যার-পর-নাই বিমর্ষ।

"এখনও সম্পূর্ণ বুদ্ধিলোপ হয় নি ত ?"

"না মহাশয়, একেবারে বুদ্ধিলোপ হয় নি। কেবল এক বিষয়ে মাথা ঠিক্ থাকে না। এই রকম ব্যামোর চিকিৎসা করাই ত আপনার বিশেষত্ব।"

"এঁর ব্যাধির লক্ষণটা কি ?"

"সে কথা আর বলেন কেন—আমাদের কালে যা প্রায়ই দেখা যায়—অর্থলোভ। বেচারী শিশুকাল থেকেই কাজ করতে আরম্ভ করেছে—কিন্তু দারিদ্র্য ঘুচ্‌ল না। আমার বাবা এক সময়েই কাজ আরম্ভ করেছিলেন—তিনি আমাকে অনেক ধনসম্পত্তি দিয়ে গেছেন। এতে আমার মামার হিংসে হতে আরম্ভ হল। যখন দেখ্‌লেন, উনিই আমার একমাত্র আত্মীয়, আমার মৃত্যু হলে উনিই আমার উত্তরাধিকারী হবেন, কিংবা আমি যদি উন্মাদ হই, উনিই আমার অভিভাবক হবেন,—তখন দুর্ব্বল মনের যা হয়ে থাকে,—তিনি ক্রমে আপনাকে বোঝাতে লাগ্‌লেন যে, আমার মাথা খারাপ হয়েছে। সকলকেই এই কথা বল্লেন, আপনার কাছেও এই কথা বল্‌বেন। হাত বাঁধা থাক্‌লেও, গাড়ীতে বসে মনে করছিলেন যে, উনিই আপনার কাছে আমাকে নিয়ে আসছেন।"

"ব্যামোটার প্রথম আরম্ভ কখন্ হয় ?"

"প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে। তিনি নীচে নেমে, আমার দ্বাররক্ষককে বল্লেন—(মুখে ভয়ের ভাব)—এম্যানুয়েল তোমার একটি মেয়ে আছে—তাকে তোমার ঘরে রেখে, আমার সঙ্গে এসো। আমার ভাগ্‌নের হাত বাঁধ্‌তে হবে—তোমার সাহায্য চাই।"

"উনি কি নিজের আসল অবস্থাটা বুঝেছেন ? তিনি কি জানেন, তাঁর মাথা খারাপ হয়েছে ?"

"না মশায়; আমার ত মনে হয়, এইটে একটা ভাল লক্ষণ। আর একটা কথা আপনাকে বলি; ওঁর দেহ-যন্ত্রটা একটু বিগ্‌ড়ে গেছে—বিশেষতঃ পরিপাকের যন্ত্রটা। ক্ষুধা একেবারেই নেই। আর দীর্ঘকাল অনিদ্রায় কষ্ট পাচ্ছেন।"

"সে এক রকম ভাল। যে উন্মাদ সময়মত আহার করে, সময়মত নিদ্রা যায়, তার ব্যাধি প্রায় আরোগ্যের অতীত। আচ্ছা, এঁকে আমি জাগিয়ে দি।"

ডাক্তার নিদ্রিত ব্যক্তির কাঁধটা ধরে' একটু নাড়া দিলেন—সে লাফিয়ে উঠ্‌লো। উঠেই চোখ রগড়াতে লাগ্‌ল। যখন দেখলে তার হাত বাঁধা, তখন সে বুঝতে পারলে তার ঘুমবার সময় এই সব কাণ্ড হয়েছে। সে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠ্‌ল। সে বল্লে—"এ তামাসা মন্দ নয়!"

ফ্রাঁসোয়া ডাক্তারের হাত ধরে একটু বিরলে নিয়ে গেল। "এই দেখুন। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দেখ্‌বেন, কত কি প্রলাপ বক্‌ছে।"

"আমার হাতে ওকে ছেড়ে দাও। প্রলাপের কথা আমি বেশ বুঝ্‌ব।" ছেলেকে আমোদ দেবার জন্য যে

রকম লোকে করে—সেই রকম হাসিমুখে ডাক্তার তাঁর রোগীর দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি বল্লেন—"বেশ ভাই, ঠিক্ সময়ে তুমি জেগে উঠেছ। বেশ সুস্বপ্ন হয়েছিল ত ?"

"আমি ?—আমি ত স্বপ্ন দেখছিলুম না। এক বাণ্ডিল কাঠির মত আমি বাঁধা পড়েছি—এই মনে করেই আমি হাস্‌ছিলুম। লোকে আমাকে পাগল ঠাওরাতে পারে।"

ফ্রাঁসোয়া বল্লে—"এই দেখুন !"

"ডাক্তার, অনুগ্রহ করে আমার হাতের বাঁধনটা খুলে দিন—ছাড়ান পেলে, আমি সব ভাল করে বুঝিয়ে বল্‌ব।"

"বৎস, আমি এখনি তোমার বাঁধন খুলে দিচ্চি—কিন্তু আর কোন গোলমাল করবে না বলে' অঙ্গীকার করতে হবে।"

"সত্যই কি আপনি আমাকে পাগল ঠাওরাচ্চেন ?"

"না ভাই, তা নয় ; কিন্তু তোমার শরীরটা ভাল নেই। আমরা তোমার ভার নেব—তোমাকে আরাম করে দেব। চুপ্ করে থাক, নোড়ো না। এই দেখ তোমার বাঁধন খুলে দিলুম। তুমি এখন মুক্ত হলে। কিন্তু দেখো, এর অপব্যবহার কোরো না।"

"আমি কি করব, আপনি মনে করছেন ? আমার ভাগনেকে আপনার কাছে এনেছি—"

ডাক্তার বল্লেন, "আচ্ছা বেশ—সময়ক্রমে সে কথা হবে। আমি দেখলেম, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ—তুমি কি দিনের বেলায় ঘুমোও ?"

"কক্ষন না ! ঐ লক্ষীছাড়া বইটা—"

গ্রন্থকার বল্লেন—"ওঃ ওঃ ! আমি দেখছি রোগটা গুরুতর—তাহলে তোমার কি মনে হয়, তোমার ভাগনে পাগল হয়েছে ?"

"পাগল বলে পাগল ! তাই ত এই দড়ি দিয়ে তার হাত দুটো বাঁধতে হয়েছিল !"

"কিন্তু তোমার হাত দুটোই ত বাঁধা ছিল। তোমার মনে নেই, আমিই তোমার বাঁধন খুলে দিয়েছিলুম ?"

"আমার হাতের বাঁধন ?—ওরই হাতের বাঁধন ! সমস্ত ব্যাপারটা আমি বুঝিয়ে দিচ্চি—শুনুন।"

"না বন্ধু না—, ছিঃ, তুমি উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ছ। তোমার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। এই রকম্ করলে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আমি তা চাইনে। আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেও দিকি—তুমি বল্‌ছ, তোমার ভাগনের অসুখ করেছে ?"

"অসুখ ?—একেবারে ডাহা পাগল, পাগল, পাগল !"

"ও পাগল হয়েছে বলে তুমি খুসী হয়েছ ?"

"আমি ?"

"বেশ খোলাখুলি উত্তর দেও। তুমি চাও না যে ও শীঘ্র ভাল হয়ে ওঠে। তাই না ?"

"কেন ?"

"এই জন্যে যে তাহলে ওর সম্পত্তিটা তোমার হাতে আসে। তুমি ধনী হতে চাও। তুমি এত দিন খেটে কিছুই রোজগার করতে পারনি, তাই তোমার ভাল লাগছে না। তুমি মনে করছ, এখন তোমার পালা।—না ?"

মার্লো কোন উত্তর করল না। চোখ নীচু করে, মাটির দিকে চেয়ে রইল। সে মনে মনে ভাবতে লাগল, সে একটা কুস্বপ্ন দেখছে না কি—তার হাত বাঁধা দেখে একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাকে জেরা করচে, প্রশ্ন করচে—খোলা কেতাবের মত তার মনের কথা পড়ছে—ব্যাপারটা কি ? ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—"কারও কণ্ঠস্বর শুনতে পাও কি ?"

মামা বেচারীর মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। তার মনে পড়ল, একটা যেন কার কণ্ঠস্বর তার কানে কানে একটা কথা ক্রমাগত ফিস্‌ফিস করে বলত।' সে সহজ ভাবে বল্লে,—"কখন-কখন।"

"আ ! তুমি খেয়াল দেখ ?"

"না—না, আমার কোন অসুখ নেই—আমাকে ছেড়ে দিন। এখানে থাক্‌লে আমি পাগল হয়ে যাব।' আমার বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করে দেখবেন—আমার মাথা একটুও খারাপ হয় নি। আমার জ্বর নেই।"

ফ্রাঁসোয়া বল্লে—"মামা-বেচারি! উনি জানেন না, যে বায়ুরোগে জ্বর হয় না—তাকেই উন্মাদ বলে।"

ডাক্তার বল্লেন—"আমাদের রোগীদের জ্বর হলে ত ভালই হয়—তাহলে আরাম হতে দেরী হয় না।"

মার্লো একটা কৌচের উপর শুয়ে পড়ল। ভাগনে ডাক্তারের ঘরে পায়চালি করতে লাগল।

ফ্রাঁসোয়া বলিল :—"মশায়! আমার মামার এই বিপদে আমি বড়ই ব্যথিত হয়েছি—তবে, আপনার মত লোকের হাতে আমি যে এঁকে সঁপে দিতে পেরেছি, এই একটা আমার মস্ত সান্ত্বনা। আপনার 'বুদ্ধি-বিচারক্ষম মনোমেনিয়া'—নামক অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি আমি পাঠ করেছি। তা ছাড়া আমি জানি, আপনি রোগীদের মা-বাপ—আপনি খুবই যত্ন নিয়ে এঁকে দেখবেন। আর চিকিৎসার জন্য যে ব্যয় হবে—সে সম্বন্ধে সমস্ত ভার আপনার উপরেই দিলুম। আপনি যা বিবেচনা করবেন তাই দেওয়া যাবে।" এই কথা বলে' ৫০০৲ টাকার একখানা নোট পকেট থেকে বের করে' আস্তে আস্তে চিম্‌নি-তাকের উপর রেখে দিলে।

"আর এক হপ্তার পরে আমি আবার আস্‌ব। কোন্ সময়ে রোগীদের সঙ্গে দেখা করতে পারা যায়?"

"মধ্যাহ্ন থেকে বেলা ডুটো পর্য্যন্ত। আর আমি—আমি সর্ব্বদাই বাড়ী থাকি। নমস্কার।"

মামা বেচারী চেঁচিয়ে বলে উঠল—"ওকে যেতে দেবেন না। ওরই মাথা খারাপ হয়েছে। ওর পাগলামিটা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বল্‌ছি!"

যাইবার সময় ফ্রাঁসোয়া বলিল—"মামা তুমি শান্ত হও। আমি ডাক্তার ওভ্রের হাতে তোমাকে রেখে গেলুম। উনি তোমায় খুব যত্ন করবেন।"

মার্লো তার ভাগনের পিছনে পিছনে যেতে চেষ্টা করলে। কিন্তু ডাক্তার তাকে আট্‌কে রাখলেন। মামা বেচারী বলে উঠ্‌ল—"এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! মশায়, আপনি একটু বিবেচনা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন, আমি পাগল নই। আমার ঐ ভাগনেই পাগল।"

ফ্রাঁসোয়া তখনো দরজার হাতলটা ধরে ছিল, সে আবার ফিরে এল—যেন সে একটা কি ভুলে গেছে। একেবারে সিধে ডাক্তারের কাছে এসে বল্লে—"শুধু আমার মামার অসুখের জন্য আমি এখানে আসিনি। (মার্লোর মনে, এই কথায় একটু আশার সঞ্চার হল) মহাশয় আপনার একটি মেয়ে আছে।"

তখন মামা-বেচারী উত্তর করলে—"এইবার আসল কথাটা বেরিয়ে পড়েছে! আপনি সাক্ষী রইলেন, ও বল্‌ছে কি না—আপনার একটি মেয়ে আছে।"

ডাক্তার ফ্রাঁসোয়াকে বল্লে, "আছে বটে—তাতে কি হয়েছে?—কথাটা বুঝিয়ে বল।"

"আপনার একটি কন্যা আছে—তার নাম কুমারী ক্লেয়ার ওভ্রে।"

"ঐ দেখুন! দেখুন!—আমি ত ঐ কথাই আপনাকে বলছিলুম।"

ডাক্তার বল্লেন—"হাঁ, মশায়, আমার একটি কন্যা আছে।"

"তিন মাস পূর্ব্বে তিনি তাঁর মা-র সঙ্গে Ems springsএ ছিলেন!"

মার্লো চীৎকার করে উঠ্‌ল—"বাহবা! বাহবা!"

ডাক্তার উত্তর করলেন—"হাঁ, সে কথা ঠিক্।"

মার্লো ডাক্তারের কাছে ছুটে গিয়ে বল্লে—"আপনি ত ডাক্তার নয়—আপনিই ত দেখ্‌ছি একজন রোগী।"

ডাক্তার উত্তর করলেন—"বন্ধু, তুমি যদি ভাল ব্যবহার না কর, তাহলে তোমার মাথা ঠাণ্ডার জন্য একটা Shower bath দিতে হবে।"

মার্লো ভীত হয়ে একটু পিছু হট্‌ল। তখন তার ভাগ্‌নে আবার বল্‌তে আরম্ভ করলে—"মহাশয়, শ্রীমতী কুমারীকে—আপনার কন্যাকে—আমি ভালবাসি। আমার কতকটা আশা আছে, আপনার কন্যাও আমাকে ভালবাসেন। তার পর তাঁর মন যদি না বদ্‌লে গিয়ে থাকে, তাহলে তাঁর হস্তপ্রার্থী হয়ে আপনার কাছে অনুমতি চাচ্ছি।"

ডাক্তার উত্তর করলেন—"তাহলে আপনার নামই কি ফ্রাঁসোয়া টমাস্?"

"হাঁ—পূর্ব্বেই আপনার কাছে আমার নামটা বলা উচিত ছিল।"

"তাতে কিছু এসে যায় না!"

এই সময় মার্লোর দিকে ডাক্তারের মনোযোগ আকৃষ্ট হ'ল। মার্লো খুব একটা আবেগের সহিত তার হাত রগ্‌ড়াচ্ছিল। ডাক্তার সস্নেহ মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"বন্ধু, ও-রকম করচ কেন? তোমার হয়েছে কি?"

"ও কিছু না, ও কিছু না—আমি শুধু আমার হাত রগ্‌ড়াচ্ছি।"

"কিন্তু—কেন?"

"আমার যা কিছু গোলযোগ—সে ত ঐখানেই।"

"দেখাও দিকি আমাকে। কৈ—আমি ত কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি নে।"

"আপনি কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চেন না? এই যে, এই আঙ্গুলগুলোর ভিতরে। আমি ত দেখ্‌তে পাচ্চি—স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি।"

"কি দেখ্‌তে পাচ্চ ?"

"আমার ভাগ্‌নের টাকা। টাকাগুলো নিয়ে যাও ডাক্তার! আমি খাঁটি লোক। আমি কারও সম্পত্তি চাই নে।"

যখন ডাক্তার মার্লোর এই প্রথম বুদ্ধি-বিভ্রমের কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, ফ্রাঁসোয়ার চেহারায় একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন উপস্থিত হ'ল। সে ফ্যাকাসে হয়ে গেল, তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তার দাঁতে দাঁতে প্রচণ্ড ঘর্ষণ হতে লাগ্‌ল। ডাক্তার তার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি হয়েছে ?

সে উত্তর করলে—"কিছুই না—তিনি আস্‌ছেন। আমি তাঁর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কি আনন্দ!… কিন্তু এই আনন্দ আমাকে অভিভূত করে ফেল্‌ছে। সুখ আমার উপর যেন তুষার বর্ষণ কর্‌ছে। শীত ঋতু প্রেমিকদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। ডাক্তার দেখ, আমার মাথার ভিতর কি হচ্চে।"

মার্লো তার কাছে ছুটে এসে বল্লে—"ঢের হয়েছে। আর পাগ্‌লামি কোরো না। লোকে বল্‌বে আমিই তোমাকে পাগল করে দিয়েছি। ডাক্তার, আমি খাঁটি লোক। আমার হাত দেখ। আমার পকেট খুঁজে দেখ। আমার বাড়ীতে লোক পাঠাও। সে আমার সব দেরাজ-গুলো খুলে দেখুক; দেখ্‌তে পাবে, তাতে আর কারো জিনিস নেই।"

দুই রোগীর মাঝখানে পড়ে' ডাক্তার হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন—এমন সময় "ক্লেয়ার" এসে তার বাবাকে বল্লে,—প্রাতরাশ প্রস্তুত। তাঁর জন্য সবাই অপেক্ষা করছে।

একটা কল্‌কাঠি টিপ্‌লে যে রকম হয়, ফ্রাঁসোয়া একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌ল। তার শুধু মনোবাঞ্ছাই কুমারীর নিকট পৌঁছিল, তার শরীর ধপাস্ করে কোচের উপর পড়ে গেল। তার মুখ দিয়ে দুই একটা অস্ফুট কথামাত্র বের হ'ল—"ক্লেয়ার! আমি—আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি কি…" সে তার কপালে একবার হস্ত সঞ্চালন করলে। তার পাংশুবর্ণ মুখখানা আবার লাল হয়ে উঠ্‌ল। তার রগ দপ্‌দপ্ করতে লাগ্‌ল; চোখের পাতায় ভয়ানক বেদনা অনুভব করতে লাগ্‌ল। ক্লেয়ার, তার দুই হাত ধরে ফেল্লে। তার গা শুক্‌নো, তার নাড়ী শক্ত দেখে ক্লেয়ার ভীত হয়ে পড়ল। এ রকম অবস্থায় তাকে আবার দেখ্‌বে বলে' সে মনে করে নি। কয়েক মিনিটের মধ্যে নাসারন্ধ্রের চারিদিকে একটা হল্‌দে আভা ছড়িয়ে পড়ল—তার পর বমনেচ্ছা। ডাক্তার দেখ্‌লেন, পৈত্তিক জ্বরের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে। কি দুর্ভাগ্য,—এই জ্বরটা যদি ওর মামার হত, তাহলে ওর মামা সেরে উঠ্‌তে পারত।

ডাক্তার ঘণ্টা নাড়লেন। একজন দাসী ছুটে এল। তার পর ডাক্তার-গৃহিণীও এসে পড়লেন। ওরে গৃহিণীকে ফ্রাঁসোয়া চিন্‌তে পারলে না—জ্বরে সে এমনি অভিভূত হয়ে পড়েছিল। রোগীকে তখনই বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। ক্লেয়ার তার নিজের ঘর ও শয্যা ছেড়ে দিলে। ঘরের ভিতর একটি সুন্দর ক্ষুদ্র কোচ—তার চারধারে সাদা পর্দ্দা। ঘরটি খুব ছোট—আস্‌বাবপত্রের আড়ম্বর নেই—ফুলদানীতে একগোছা সুগন্ধি ফুল। চিম্‌নীর তাকের উপর একটা অনিক্‌স্-মণির বড় পেয়ালা রয়েছে। এই একমাত্র উপহার যা ক্লেয়ার তার প্রণয়ীর কাছ থেকে পেয়েছিল! প্রিয় পাঠক, যদি তোমার কখনও জ্বর হয়, তুমি যেন এই রকম রোগীর ঘরে থাকতে পাও!

যখন ওরা ফ্রাঁসোয়ার সেবা-শুশ্রূষায় ব্যাপৃত, ফ্রাঁসোয়ার মামা ঘরময় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিল—কখন কখন ডাক্তারের পথের সামনে এসে পড়ছিল; কখন বা রোগীকে চুম্বন করছিল, কখন বা ডাক্তার-গৃহিণীর হাত ধরেছিল; আর খুব চীৎকার করে বল্‌ছিল;—"শীগ্‌গির ওকে সারিয়ে দেও—শীগ্‌গির, শীগ্‌গির। আমি চাইনে, ও মরে। আমি ওকে মরতে দেব না। আমার আপত্তি করবার অধিকার আছে। আমি ওর মামা, আমি ওর অভিভাবক। তোমরা যদি ভাল না কর, তাহলে লোকে বল্‌বে, আমিই ওকে খুন করেছি। তোমরা সবাই সাক্ষী, আমি ওর উত্তরাধিকারের দাবী করি নে। আমি সমস্ত সম্পত্তি

গরীবদের দান করব। এক গ্লাস জল দিন্ তো—আমি হাতটা ধুয়ে ফেলি।"

ওরা শেষে বাধ্য হয়ে মামা বেচারীকে উন্মাদ-বিভাগের একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে সে এত প্রলাপ বল্‌তে লাগ্‌ল যে, তাকে একটা চটের জ্যাকেট্ পরিয়ে দিতে হল—তার আস্তিনের শেষপ্রান্ত সেলাই করা। একেই "সিধে জ্যাকেট্" বলে। নর্সেরা তার তত্ত্বাবধান করতে লাগ্‌ল।

ওভ্রে-গৃহিণী ও তাঁর কন্যা প্রাণপণে ফ্রাঁসোয়ার সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। জ্বর-রোগীর সঙ্গে এই ঘরে তাঁরা দিবারাত্র থাক্‌তেন—একটু সময় পেলেই তাঁদের পূর্ব্ব-স্মৃতি ও আশা সম্বন্ধে আপনাদের মধ্যে বলাবলি করতেন। ফ্রাঁসোয়া এত দিন কেন নীরব ছিল—হঠাৎ কেন এখানে এল,—তারা ঠিক বুঝ্‌তে পারছিল না। যদি ক্লেয়ারকে সত্যই ভালবেসেছিল, তাহলে এই তিনমাস অপেক্ষা করবার কারণ কি? ওর মামার অসুখের জন্যই কি ওর এখানে আস্‌তে হয়েছে? সে এখানে না এসে অন্য ডাক্তারের ওখানেও ত যেতে পারত? প্যারিসে ত আরও অনেক ডাক্তার আছে। মনে করেছিল হয় ত ক্লেয়ারের উপর তার আর ভালবাসা নেই—কিন্তু ক্লেয়ারকে দেখেই তার ভুল ভেঙ্গেছে। কিন্তু না—ক্লেয়ারকে দেখ্‌বার পূর্ব্বেই যে সে ক্লেয়ারকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

ফ্রাঁসোয়া তার জ্বরের প্রলাপের মধ্যে, এই সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। ক্লেয়ার তার মুখনিঃসৃত ছোটখাটো কথাও খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। তার পর ঐ সব কথা নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করত। ডাক্তারের এ সম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞতা ছিল—প্রলাপের ভিতর থেকেও সত্য আবিষ্কার করা তাঁর অভ্যাস ছিল। এখন ওঁরা বুঝ্‌তে পারলেন, কি অবস্থায় পড়ে ওর মাথা খারাপ হয়েছিল; এবং ফ্রাঁসোয়াই যে তার মামার উন্মাদেরও কারণ, তাও বুঝ্‌তে বাকি রইল না।

তার পর ডাক্তার-গৃহিণীর মনে আর কতকগুলি সংশয় উপস্থিত হল। ফ্রাঁসোয়া পাগল হয়েছিল। তার দরুণই ফ্রাঁসোয়ার এই ভয়ানক অবস্থা ঘটেছিল। রোগটা সারবে কি? ডাক্তার তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, যদি জ্বর হয় তাহলে সারবে। কিন্তু সারলেও আবার "রিল্যাপ্সের" ভয় নেই ত? ডাক্তার কি এই রকম রোগীর হাতে তাঁর মেয়েকে সমর্পণ করবেন? ক্লেয়ার একটু বিষাদের হাসি হেসে বল্লে, "আমার কথা যদি বল মা, আমি ভয় করি নে। আমি এর ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত আছি। বাবা, তুমি ওকে কোন রকম করে ভাল করে দেও—বেচারা বেশী মাত্রায় ভালবেসেই ত পাগল হয়েছে।"

ডাক্তার ওভ্রে উত্তর করলেন—"আচ্ছা দেখা যাবে। জ্বরটা আগে ছেড়ে যাক্। যদি দেখা যায়, পাগল হয়েছিল বলে লজ্জিত হয় নি, যদি তোমাদের উপর বিদ্বেষের ভাব না থাকে, তাহলে নিশ্চয় জান্‌বে, "রিল্যাপ্সের" আর কোন ভয় নেই।"

"আমরা তার এত সেবা-শুশ্রূষা করলুম,—আমাদের উপর এর বিদ্বেষ হবে কেন বাবা?"

ছয় দিনের প্রলাপ বকুনির পর, খুব ঘাম হয়ে জ্বরটা ছেড়ে গেল। রোগী আস্তে আস্তে সেরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যখন সে দেখ্‌লে, ওভ্রে-গৃহিণী ও কুমারী ওভ্রের সঙ্গে সে একটা অপরিচিত ঘরে রয়েছে, তখন সে মনে করলে সেই Emsএর হোটেলেই বুঝি আছে। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, ডাক্তার নিকটে রয়েছেন—এর থেকে তার অন্য কথা মনে এল। স্মৃতিশক্তি ছিল কিন্তু খুব ক্ষীণ। ডাক্তার অতি সাবধানে আস্তে আস্তে আসল কথাটা তাকে জানিয়ে দিলেন। ডাক্তারের কথা একটা গল্প বলে তার মনে হল। জ্বর ছেড়ে যাবার পর সে যেন কবরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। স্মৃতির ফাঁক্‌গুল ক্রমে ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। শীঘ্রই সে আবার প্রকৃতিস্থ হল। পূর্ব্ব-কথা সমস্তই আবার তার মনে পড়্‌ল। বিজ্ঞানের বলে, বিশেষতঃ ধৈর্য্যের বলে, এই আরোগ্যটা সংসাধিত হল।

একটু চিকেন্-সুপ ও আধখানা ডিম তার পথ্য। খাবার সময়, সে বেশ শান্ত ভাবে, তার তিন মাসের ঘটনাগুলো বল্‌তে লাগ্‌ল। ক্লেয়ার ও ডাক্তার-গৃহিণীর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। তার গল্প শেষ হলে, উপসংহারের হিসাবে সে এই কথা বল্লে—"মহাশয়, আপনার একটি কন্যা আছে। তাঁর নাম "কুমারী ক্লেয়ার ওভ্রে"। গত গ্রীষ্মকালে, আমি তাঁকে তাঁর মার সঙ্গে Ems Springsএ দেখেছিলুম। আমি তাঁকে ভালবাসি। তিনিও যে আমাকে ভালবাসেন, তার প্রচুর প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমি আবার পীড়িত

হয়ে পড়ব বলে' আপনার যদি ভয় না হয়, তাহলে আমি তাঁর পাণিগ্রহণ করবার জন্ত আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি।"

ডাক্তার তাঁর সম্মতি জানিয়ে শুধু একটু ঘাড় নাড়লেন। ক্লেয়ার রোগীর গলা জড়িয়ে ধরে তার ললাটে চুম্বন করলে।

সেই দিনই মামা মার্লো একটু শান্ত হওয়ায় তার "ষ্ট্রেট্-জ্যাকেট্" খুলে দেওয়া হয়েছিল। শয্যা থেকে বেরিয়েই সে তার চটি জোড়া নিয়ে ঘোরাতে ফেরাতে লাগ্‌ল, ঝাড়তে লাগ্‌ল—তার পর নর্সের হাতে দিলে। আর তাকে বল্লে—"তুমি ভাল করে দেখ, ওর ভিতর ১৫ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি আছে কি না। তা না জান্‌তে পারলে, আমি ওটা আর পায়ে দেব না।" আর ক্রমাগত বল্‌তে লাগ্‌ল—"এ যেন কেউ বল্‌তে না পারে, আমার ভাগ্‌নের ধনসম্পত্তি হস্তগত করা আমার মৎলব ছিল। আর তার সমস্ত কাপড়-চোপড় জান্‌লার বাইরে ঝাড়তে লাগ্‌ল। তার পর একটা পেনসিল চেয়ে নিয়ে তার ঘরের দেয়ালের গায়ে এই কথাগুল লিখ্‌লে—"কারও ধনে লোভ কোরো না"।

তার পর আবার পূর্ব্বের মত হাত ঘষতে লাগ্‌ল—যেন হাতে কি লেগে আছে। ডাক্তার এসে বল্লেন, তার ভাগ্‌নের অসুখ সেরে গেছে। মামা-বেচারী জিজ্ঞাসা করলে, তার টাকা সে ফিরে পেয়েছে কি না। "আমার ভাগ্‌নে যখন এখান থেকে চলে যাচ্চে, তার টাকার দরকার হবেই। কোথায় সেই টাকা? আমার কাছে ত নেই, তবে যদি আমার বিছানার ভিতর থাকে।" এই কথা বলেই সে ঘরে গিয়ে তার শয্যাটা ওলট-পালট করে ফেল্লে। ডাক্তার তার করমর্দ্দন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তার প্রাতরাশ টেবিলে এনে রাখা হল। সে ন্যাপকিন, ছুরী, কাঁটা সব তন্নতন্ন করে খোঁজ করে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। আর ক্রমাগত বল্‌তে লাগ্‌ল—"আমার ভাগ্‌নের সম্পত্তি আমি গ্রাস করতে চাই নে।" আহারান্তে, অনেকটা জল নিয়ে সে হাত ধুতে লাগ্‌ল। সে বল্লে—"এটা রূপোর কাঁটা,—বোধ হয় একটু রূপো আমার হাতে লেগে আছে।"

ডাক্তার এখনও নিরাশ হন নি। বল্লেন, "একটু সময় লাগ্‌বে।"

ব্রজের বাঁশরী

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, এম্‌-এ, বি-সি-এস্‌

(১)

ব্রজের বাঁশরী　　বেজেছিল কবে
কোন্ কদম্বের তলে?
শ্যাম-বিরহিনী　　অশ্রু মিশেছিল
কোন্ কালিন্দীর জলে?
কোন্ কালিয়ার পিয়াসে আকুল আজিও মানব-হৃদি?
গহন-বিপিনে আজো' বাঁশীরব,—কোথা-সে ব্রজের নিধি!

(২)

'অনন্ত রোদন　　মানবের প্রাণে,—
এ-কি-এ রহস্য-মেলা?
অনন্ত উলাস　　শুষ্ক মরুভূমে,—
বৃন্দাবন জল-খেলা!
জীবন-মরণ কাল-সমষ্টিরে ভেঙে-গড়ে কতবার
অশ্রু-আর-হাসি,—নিরাশা-আশ্বাস,—
কি নিয়ে যে লীলা তার!

(৩)

বিরহ-সাধনে　　লভিয়া বিরহ,—
মিটেছে রাধার মান।
সেই মিলনেরে　　মিলাতে আজিও
বাজিছে কি বাঁশী-তান!
লব্ধ-অলব্ধের চির-আকিঞ্চন,—লীলার সমাধা কবে?
প্রলয়ের পরো' ঘুমাবে কি ধরা ব্রজের বাঁশরী-রবে!

দাবীহারা

শ্রীরাধারাণী দত্ত

[সরিতে'র কথা]

হ্যাঁরে নন্দ! বাবুর ধুতি কৈ কুঁচিয়ে রাখিস্‌নি? অম্‌নি জড়ো ক'রে রাখা হয়েচে! হতভাগা!! কাছারী থেকে খেটে-খুটে এসে তিনি নিজে ধুতি কুঁচিয়ে কাপড় পরবেন, নয়? আর তুমি শুধু আয়েস্ করে বেড়িয়ে বেড়াবে? শীগ্‌গির ধুতি কুঁচিয়ে, মুখ হাত ধোবার জল, চটী জুতো, তোয়ালে ঠিক করে রাখ্। আজ তিন বচ্ছর রয়েছিস্, এই তিন বছর ধরে তোকে শিখিয়ে শিখিয়ে আর পারলুম না। যেটি নিজের চোখে না দেখবো, সেইটিতেই একটি-না-একটি খুঁৎ থাকবেই। আমি এই শরীর নিয়ে তোদের সঙ্গে আর কত বকতে পারি বল্ দেখি? নে, ধুতিখানা শীগ্‌গির কুঁচিয়ে রাখ্। ওঁর গেঞ্জিতে আজ সাবান দিতে বলেছিলুম, দেওয়া হয়েচে?"......" এখনো শুখোয়নি? বেলা তিনটের পর কাচলে কি রোদ্দুর থাকে? কোন্ সকালে বলেছিলুম কেচে দিতে। আর একটা গেঞ্জিও আলমারী থেকে বার কর তা'হলে। এই আমার মাথার বালিশের নীচে আলমারীর চাবি আছে, নিয়ে যা।

এই রকম বকিয়ে বকিয়েই তোরা আমায় বিছানা থেকে উঠতে দিবিনে দেখ্‌চি। বামুন ঠাকুরকে একবার আমার কাছে ডেকে দে দেখি! হ্যাঁ,—এই যে, তোমাকেই ডাকতে বল্‌ছিলুম। এখন এলে না কি? বাবুর খাবার তৈরী হয়েচে?"........." ঐ যাঃ! লুচি এরই মধ্যে তোমায় কে ভাজতে বল্লে? তোমরা সকলেই দেখচি নিজের ইচ্ছে মত কাজ আরম্ভ করেছ। আমি বলেছিলুম, লুচির ময়দা মেখে রেখে দেবে, উনি খেতে বস্‌লে গরম-গরম ভেজে দেবে। যাঃ! আমার মাথা-মুণ্ডু খেয়ে রেখেছ, কি করি এখন? উনি এসে হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে জিরুতে, ততক্ষণে ও-লুচি তো ন্যাকড়া হয়ে যাবে। আচ্ছা ঠাকুর! এক মাস দেশে গিয়ে তুমিও কি নতুন হয়ে এলে না কি? এই একমাস ধরে একটা নতুন জংলী ভূত বামুনকে নিয়ে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়েচি। তুমি এসেছো, কোথায় নিশ্চিন্ত হলুম যে, ঠাকুর এসেচে, ওঁর খাওয়া-দাওয়ার আর কষ্ট হবে না।—তা' আমারই বরাত্! নৈলে বারোমাস আর এমন করে কে বিছানায় পড়ে থাকে বল না? আমার আজ সামর্থ্য থাকলে তোমাদেরই বা খোসামোদ কর্ত্তে যাবো কেন? সেই কোন্-সকালে দু'টি ভাত মুখে দিয়ে বেরিয়ে গেছেন, এসে খেতে পাবেন না।. নাঃ, শুয়ে শুয়ে নিজের চোখে এগুলো আর দেখ্‌তে পারা যায় না।"........" হ্যাঁ, আবার লুচির ময়দা মাখতে হবে, তাও বলে দিতে হবে না কি?

কিরে নন্দ! সব ঠিক হয়েচে? সরবৎ করেচিস্? "...... ..." তরমুজের আবার ঘোলের দু'রকমের কি দরকার ছিল? তা যাক্, করেছিস্ বেশ করেছিস্। বরফ এনেছে নিধিয়া?"........." আচ্ছা। এখনি সরবতে দিস্‌নি যেন। বরফদানীর ভিতর রেখে দিগে যা। খাবার সময় সরবতে আর খাবার জলে দিয়ে দিবি। পান এনে রেখেচিস্?"........." ছাঁচি কেন? মিঠে-পানের দোনা কিনে এনে রাখবি বলে দিয়েচি, তাও কি ছাই রোজই বলে দিতে হবে রে? দোকানের সাজা পান উনি কি খেতে পারেন? তবু মিঠে-পান হলে যা-হোক্ হয়।... যা, চট্ করে ছাঁচিপান বদ্‌লে মিঠে পান এনে রাখ্।

—এসো।"........." হ্যাঁ, বেশ ভালই আছি। আজ আর শরীরে কোনও উপসর্গ নেই।"........." না—না—বেশী কথা কইনি গো, ঐ নন্দটাকে কাজকর্ম্মগুলো বলে দিচ্ছিলুম। ওরা নিজে কি আপনা-হাতে কিছু কর্ত্তে পারে?"...... ..." হ্যাঁ পারে বৈকি। কাজ আপনিই হয়ে যাবে বটে!! বাবা, একটি দণ্ড পাশ ফিরে শুয়ে থাকলে সংসার উলোট-পালোট করে দেয় হনুমানের দল। ওরা না কি আবার নিজেরা দেখে-শুনে কাজ কর্ম্ম করবে? "........." তুমি তো বলবেই গো 'হোক্‌গে' কিন্তু 'সংসার' জিনিসটি তো ঠিক তোমার নয়, ওটা যে আমারই নিজস্ব জিনিস। নিজের জিনিষ কে আর চোখের সামনে লণ্ডভণ্ড হওয়া দেখতে পারে বল? তা' সে যাক্‌গে। তুমি

এখন ধড়াচুড়ো ছাড় দেখি? না—না—আমার মাথায় কিছু এমন ভীষণ শিরঃপীড়া ধরেনি যে, তোমায় সমস্ত দিন খেটে খুটে ক্লান্ত হয়ে এসে, পোষাক না ছেড়েই আমার মাথায় হাত বুলুতে বস্‌তে হবে! না, না—ওঠো, ওঠো, লক্ষ্মীটি!

নন্দ গেল কোথায়? এই যে, হাঁ করে কোথায় ছিলে? জুতো খুলে দেবে না? না গো, আমি এই শুয়েই একটু বাতাস করি। না, না, আমার এতে কিছু কষ্ট হচ্চে না। হুঁ, এতেই কষ্ট বটে! তুমি খেটে খুটে এসে ঘেমে নেয়ে বসে থাকবে, আর আমি শুয়ে শুয়ে দুই চক্ষু মেলে তাই দেখলেই খুব তৃপ্তি পাব। না গো, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় পাখাখানা একটু নাড়তে দাও। নন্দ! বাবুর সার্ট গেঞ্জি সব বাইরে হাওয়ায় শুখুতে দে। আঃ, নন্দ রয়েচে যে, কী যে পাগলামী কর, হাত ছেড়ে দাও।"........." না শরীরে এখন কোনও কষ্ট নেই, এখন বেশ ভাল।".. ... ." আহাঃ,—না গো, শরীরে কোনও কিছু কষ্ট নেই—মিথ্যে করে বল্‌তে হবে না কি? "........." এবার থেকে তোমার কোনও অসুখ করলে, ওষুধের বন্দোবস্ত না ক'রে একখানা আরশী এনে তোমার সামনে ধরলেই হবে, সব সেরে যাবে এখন। "......" ওঃ! আমার মুখ দেখলেই তোমার অসুখ সেরে যাবে? তাই বটে! আমি তো আর বলিনি যে "আমার মুখ দেখলে তোমার সব অসুখ সেরে যায়!" বরং আমার এই ছাই মুখ দেখলে তোমার অসুখ উল্টে আরও বেড়ে যাবে। যাক্‌গে, যাক্‌গে, কিই যে সব ছাইপাশ কথা তুললে তুমি, মুখ দিয়ে আমার অলুক্ষুণে কথা সব বেরিয়ে গেল। যাও, ছেলেমানুষী করে না,—এখুনি নন্দ এসে পড়বে। সত্যি তোমার সঙ্গে আজকাল আর আমি মোটেই পেরে উঠি না।"........." আঃ——। তোমার হাতখানি বেশ নরম! এত লোক কপালে হাত বুলোয়, এমনিটি কিন্তু কারুর নয়।"........." হ্যাঁ, আমারই গুণে বৈকি? আর অত ঠাট্টা কেন? রুগ্ন, ঘাটের মড়া, ফেলে দিয়ে এলেই হয়, তার আবার——না না থাক্ থাক—আর বোল্‌বো না লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না। "....:...." আচ্ছা আচ্ছা—আর কোরবো না এমন দোষ, —ছাড় ছাড়, ঐ বুঝি কে আস্‌চে।

কিরে নিধিয়া? বাবুর ঠাঁই হ'য়েচে? এই ঘরেই ঠাঁই ক'রে দে। ঠাকুরকে খাবার দিতে বল্।"........." হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার ওষুধ খাওয়া হয়েচে, তোমায় আর শিশি দেখতে হবে না। না বাপু, আমি আর দিনরাত্রি ঐ ছাই ওষুধগুলো গিলতে পারি না।"........." আচ্ছা, আমি খাচ্ছি নিজে, তোমার আর অত অনুনয়-বিনয়ে কাজ নেই, তুমি নিজে এখন খেতে বস দেখি!"...:....." হুঁ, আবার সুলোচনা-নার্সকে রাখবে বৈকি! আমি তাকে আর থাকতে দিলে তো? বাবা গো! নার্সে আর আমার কাজ নেই; দিনরাত্রি ঘড়ি ধরে ওঠা-বসা, খাওয়া, কথা কওয়া, ঘুমুনো সমস্তই ঘড়ির কাঁটা মেপে করা। সেই বন্ধনের মধ্যে থেকে আমার রোগ যেন আরও চেপে ধরে বেশী। এ আমি বেশ আছি। পাঁচুর মা আর লছমী আমায় খুবই যত্ন করে। হ'লেই বা ঝি, নার্সের চেয়ে ঝিই আমার ভাল। ওদের হুকুমে তো আমায় চলতে হয় না, বরং আমার হুকুমেই ওরা চলে।"........." আচ্ছা গো—এক্ষুনিই তো আর তোমার নার্স আসচে না। এখন খেতে বসো দেখি! ও কি! পটল-ভাজাগুলো পুড়িয়ে কালি করেচে যে,—আর পায়েসের রং অমন দুধ-সাগুর মত হ'ল কেন? নাঃ——এ একেবারেই নাচারি। আমি বেশ বুঝতে পারচি, আমার এই কাল রোগটি এসেচে, আমাকে মারবার জন্যে নয়, তোমাকে মারবার জন্যে। এই খাটুনির উপর এই রকম খাওয়া দাওয়ায় কষ্ট হ'লে মানুষের শরীর আর ক'দিন টেঁকে?"........." তুমি তো শুধু আমাকেই উপদেশ দিচ্ছ। বামুন চাকরকে ভুলেও তো একটি কথা বলবে না। এই রকম উপদেশ কিছু কিছু ওদের দাও না, আমি তা'হলে একটু রেহাই পাই।"........." কোনও কষ্ট হ'চ্ছে না বল্লেই হবে? তোমার খাওয়া কিসে ভাল হয় না হয়, কখন পেট ভরে না ভরে, সে কি আমার চেয়ে তুমি বেশী জান? হুঁঃ, তাই, যদি হবে, তবে আর আমার আজ এত ভাবনা কেন বল? নিজের শরীরের দিকে খাওয়া দাওয়ার দিকে দৃষ্টি থাকলে, আমায় আজ এই অফুরন্ত ভাবনার বোঝায় পিষে মরতে হবে কেন?"... ....." তুমি বল্লেই কি ভাবনা আমায় ছাড়বে? আমি তোমার অনুরোধে চুপ করতে পারি বটে, কিন্তু ভাবনা তো তোমার অনুরোধে চুপ

কর্‌বে না।"........." হ্যাঁ, বকে-বকেই মারা যাব বটে! এত সহজেই মেয়ে-মানুষের মৃত্যু হয় না গো! ও কি! উঠে পড়লে যে! আর লুচি নিলে না? নাঃ,—আমার আর কিছুই বলবার নেই।

* * * *

না, আমার পান চাই না, তুমি খাও। তুমি এইবার একটু বেড়াতে বেরোও কিম্বা খেল'গে। দিনরাত্রি রুগীর ঘরে বন্ধ হ'য়ে থাকা ভাল নয়। এ বিছানায় কেন? ঐ সোফাটায় বোসো না——!"........." না রুগীর বিছানায় বসে না, ওঠো। রোগীর বিছানা মাত্রই সুস্থ'র পক্ষে অস্পৃশ্য। দিনরাত্রি কি রোগীর বিছানায় শোয়া-বসা ঠিক?"........" হ্যাঁ আমি ডাক্তার-সাহেব বৈকি? ভাল কথা বল্লেই তুমি অমনি হেসে উড়িয়ে দেবে, নয় তো ঠাট্টা করবে! নার্স রাখা দেখচি এক রকমে ভাল। তুমি তা'হলে বাইরের আলো হাওয়ার মুখ দেখতে যাও। আচ্ছা, সুলোচনাকেই চিঠি লিখে দাও, সে এসেই থাকুক। "........." রাগ হ'ল বুঝি? এ' কিন্তু তোমার অন্যায় রাগ।"........." আহা,—কি কথাতে কি কথাই আনলেন! ও-কথার মানেই হয় না। তোমার অসুখ হ'লে আমি তোমার বিছানাতে বোস্‌বো না এ'ও কি আবার একটা কথা? তোমার জীবনে আর আমার জীবনে যে আসমান-জমিন্ তফাৎ! তুমি দেখচি সত্যি সত্যিই পাগল। "........." না—না, আমি কি তোমায় ঘর থেকে চলে যেতে বলেছি? আমি বললুম, বিছানায় না-বসে ঐ সোফাটায় বোস, তার পর একটু বেড়াতে বেরোও। "........." হুঁ এই রোগীর বিছানাটাই বড় মিষ্টি নয়?"........" যাঃও, তোমার সব তাতেই ঠাট্টা আর দুষ্টুমী। "......" না, আমি আর মিক্‌স্ খেতে পারি না। আমি খাবো না। "......" আঃ,—মাগো,-নাও, হোল তো? তুমি দিন-রাত্রি ওষুধ আর পথ্যি নিয়ে নিজেও পাগল হ'বে, আমাকেও পাগল ক'রে ছাড়বে দেখ্‌চি। "......" ভাল আর এ জন্মে হ'ব না। এই শোয়াই আমার শেষ শোয়া। আর যে উঠব, এ আশা আমি করিনি,—আচ্ছা আচ্ছা, চুপ ক'রছি। লক্ষ্মীটি রাগ কোরো না। তোমার কণ্ঠা বেরিয়ে পড়েচে—বড্ড রোগা হ'য়ে গেছ। এত রোগা তুমি কোনও দিন ছিলে না। এ শুধু আমারই জন্যে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, একটু বাইরে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হয়েচে। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, চিন্তা, রোগীর সেবায় মানুষের স্বাস্থ্য কত দিন আর ভাল থাকে?

* * * *

"..........." কি বলছ? হ্যাঁ, কি সুন্দর লাল আকাশ! ওদিকের জানালাগুলো সব ভাল করে খুলে দাও না,—আঃ—কী চমৎকার! পশ্চিম-আকাশে আজ যেন হোলী-খেলা হয়েচে'। দেখ, দূরে ঐ নারকেল-গাছগুলো যেন গলানো সোণার ধারায় চান্ করেছে। আ—কী সুন্দর! প্রকৃতির সান্ধ্য সৌন্দর্য্যই সব চেয়ে সুন্দর ও মনোরম, না? দিন-শেষে এই সন্ধ্যা—এই শেষ আলো—আ—। কবে আমার জীবন-আলোর সন্ধ্যা এম্‌নি ক'রে সৌন্দর্য্যের ঝর্ণা উৎসারিত করে আমার সামনে এসে দাঁড়াবে! কী সুন্দর মিষ্টি হাওয়া বইছে! রজনীগন্ধার গন্ধ পাচ্ছ? তোমার হাতখানি আমার বুকের ওপর রাখ না—। আঃ—মুক্তি,—মুক্তির জন্য প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে; কত দিন আর এমন বন্ধ হয়ে থাকবো?"................" না, না, আমায় আর বাধা দিও না। আমায় বলতে দাও। আজ অনেক কথা আমার বলবার আছে। আমার রুদ্ধ মনের কথাগুলো প্রকাশ কর্ত্তে দিয়ে, আমায় একটু লঘু হ'তে, সুস্থ হ'তে, শান্ত হ'তে দাও।

* * * * *

আমি জানি, আমি আর ভাল হ'ব না। না—না, কেন, আমায় বল্‌তে বাধা দিচ্ছ তুমি? যা' সত্যি, তা চিরকালই সত্যি। মিথ্যার কপট-আচরণে সত্য কখনও চিরদিনের মত ঢাকা থাকে না। কেন আমায় তুমি ভোলাচ্ছ আর? আমি নিজের রোগ-যন্ত্রণার চেয়েও বেশী কষ্ট পাচ্ছি তোমার জন্যে।"........" হ্যাঁ তোমারই জন্যে। আমি এই রকম ভাবে বেঁচে থেকে যে তোমার কতখানি কষ্ট দুশ্চিন্তা ও ব্যথার কারণ হ'য়ে রয়েচি, সে তো অহর্নিশি দেখতেই পাচ্ছি। আবার মরেও তোমায় কতখানি গভীর কষ্ট দেব, তাও আমি একটু একটু অনুভব করছি। ওগো, তোমারই চিন্তা আমায় পাগল করে তুলেচে। এই সাত বৎসর ধরে রোগ-শয্যায় পড়ে, অনেক ভেবে অনেক চিন্তা করে এই বুঝিচি—বিধিলিপির উপর কারুর হাত নেই। আমায়

নিয়ে চিরকাল কষ্টই পেলে শুধু।“.........” না না, ওগো বল্‌তে দাও আমায় আজ। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তোমার প্রাণের সুখ শান্তি আনন্দ আমি গ্রাস করছি। এত দিন এত অসুখে ভুগেও মর্ত্তে চাই নি। কারণ, এই সুদীর্ঘ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও আমি যা' সুখ, যা' আনন্দ পেয়ে আস্‌চি,—সুস্থ শরীরে অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকেও কেউ ঠিক এমনিই বুকভরা তৃপ্তি ও আনন্দ পেয়েচে কি না আমি জানি না। তোমায় ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও কোথাও যেতে চাইনি তা' তুমি বেশ জান। তোমায় ছেড়ে স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করবারও আমার উপায় নেই!

তোমায় ছেড়ে মৃত্যুর ওপারে যাওয়ার কথা ভাবলে, আগে শিউরে উঠতুম, কিন্তু না, এখন আর তা' নয়। এ' রকম চিররুগ্না যার স্ত্রী, শাস্ত্রকারেরা তার বিবাহের ব্যবস্থা করে গেছেন। তুমি এ অবস্থায় আবার বিবাহ ক'রলেও কোনও পাপ বা অন্যায় তোমায় স্পর্শ করতে পারে না। অবশ্য আজই আমি তোমায় তা' ক'রতে বলছি না, কারণ, আমি জানি, সে তোমার পক্ষে অসম্ভব। আর, আমার যখন দিন ফুরিয়েই এসেচে, তখন আর তাড়াতাড়ির বিশেষ আবশ্যকতা নেই। আজ আমার একটি কথা তোমায় রাখতেই হবে, নইলে হবে না।“.........” না না, অত কাতর হ'লে চলবে না আজ। দেখ্‌চ, আমি আজকে কতদূর শক্ত হয়েচি? তোমাকেও আজ কঠিন হতে হবে। এইতেই যদি তুমি এত কাতর হয়ে পড়,—তখন কি করবে? অন্ততঃ আজকের মত তুমি আমার মুখ-চেয়ে শক্ত হও।“.........” কি অনুরোধ শুনতে চাও? বলচি, কিন্তু আগে প্রতিজ্ঞা কর আমার মাথায় হাত দিয়ে, আমার কথা রাখবে? না, আগে প্রতিজ্ঞা কর, না করলে হবে না।“.........” আমি কি কখনও কোনও দিন অন্যায় অনুরোধ করেচি তোমায়? না—না, এ কথাটি রাখতেই হবে তোমায়, নৈলে মরেও আমি নিশ্চিন্তি হতে পারবো না। বল, রাখবে?“.........” রাখবার যোগ্য হ'লে তবে রাখ্‌বে? অন্যায় বা অযোগ্য হলে তোমায় কি আমি বলতে পারতুম? আমার এই শেষ অনুরোধ—শেষ ভিক্ষাটি পূর্ণ কোরো। আমি চলে গেলে তুমি স্নেহকে বিয়ে কোরো। ও কি? অমন ক'রে চম্‌কে উঠ্‌লে কেন?... না—না, তোমার অমন বেদনা-কাতর মুখ আমি সইতে পারি না। কি ক'রব, উপায় নেই, তাই আজ এ'কথা বলতে হ'চ্চে।

স্নেহকে কেন বিয়ে কর্ত্তে ব'লে যাচ্ছি জান? মাসিমা ওকে সৎ পাত্রে দিতে পারবেন বলে তো মনে হয় না। স্নেহ'র মত বুদ্ধিমতী ধীর ও সহৃদয়া মেয়ে আমি কমই দেখেচি। ওর অন্তরটা খুব উঁচু ও উদার। তুমিই ত' বল যে, মানুষের 'অন্তঃকরণ'ই হ'চ্চে আসল জিনিস। গুণও নয়, রূপও নয়, অর্থও নয়। খাঁটী প্রাণ মেলে বড় অল্প।

স্নেহের মধ্যে এই 'প্রাণ' জিনিসটা বড় বেশীই বলে মনে হয়। বড় সৎ, লক্ষ্মী, কোমলমনা মেয়ে সে। মাসিমা'র আজকাল যে রকম অবস্থা, অমন সোণার প্রতিমা মেয়ে, হয় তো কোনও বাঁদরের হাতেই পড়বে। তাই বলচি, স্নেহকে ঘরে আনলে, সহায়-সম্পত্তিহীনা বিধবার উপকার করা হবে, আর পাবেও একটি খাঁটী মানুষ। সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য, লেখাপড়া, গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম, সব দিকেই নিখুঁত সুন্দর সে। নেই শুধু টাকা। তা' তোমার টাকার দরকার নেই। কিন্তু তা বলে তুমি ভেবো না যেন, বিয়ে করে তুমি স্নেহকে দয়া ক'রলে বা উদ্ধার করলে। সে বরং উল্টো। স্নেহকে যদি তোমার গৃহলক্ষ্মী করে বরণ করে আনতে পার, তবে তোমারই সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিও,—সে একটি অমূল্য রত্ন। আমি বেশ জানি, তোমার এই সংসারের, আর তোমার জীবনের হাল যদি কেউ অবলীলাক্রমে ধরতে পারে, তবে সে এক স্নেহ। হাজার হোক্ আমার বোন তো সে।

তার পর আর একটি কথা। এতদিন ধরে তোমায় ঢের ভোগই ভুগিয়েছি, আরও কত দিন ভোগাব জানি না; কিন্তু মরণের কূলে এসে দাঁড়িয়ে, আবার তোমায় কি দিতে বসেচি জানিনে। আমি তো সন্তান চাইনি কোনও দিন? ভয় হ'ত আবার কাকে ডেকে এনে তোমার ভাবনার বোঝা, ব্যথার বোঝা আরও কি বাড়াব? সমুদ্র-মন্থনে আমার ভাগ্যে বিষের আশঙ্কাই বেশী। তাই 'ও' প্রার্থনা ক'রতে ভয় হ'ত মনে। তোমার কাছে লুকাব না—কিন্তু তবু— তবুও কত দিনই ঐ চিন্তা, ঐ সাধ আমার নিজের অগোচরেই মনের ভেতর উঁকি ঝুঁকি দিয়েচে। যখনি একলা থেকেচি—

একখানি কচি মুখের ছবি কল্পনায় কেবলই চোখের সামনে ভেসে উঠেচে, তন্ময় হয়ে মুগ্ধ হয়ে সেই চিন্তায় ডুবে গেছি। তার পর যখনই চমক ভেঙেছে, তখনই লজ্জায় মুশড়ে পড়েছি, ছি ছি! যে চিররুগ্না হয়ে স্বামীকে এত কষ্ট দিচ্ছে, তার আবার সন্তান-সাধ!! রুগ্না মায়ের তো রুগ্ন সন্তান হবার ষোল আনাই সম্ভাবনা। নিজেকে নিজে কঠোর তিরস্কার করেছি—ব্যর্থতার ধিক্কারে অন্তর পূর্ণ হ'য়ে উঠেচে। তোমাকে মুক্তি দেবার জন্যে আমার শেষের দিন যখন এগিয়েই এল, তখন ভগবান এবার কী পাঠাচ্ছেন, বুঝতে পারচি না। এ' তোমার ফুলের মালা হবে, না, লোহার শিকল হবে, তাই ভাবচি। মরণ-নদীর তীরে দাঁড়িয়ে, জীবনের প্রথম ও শেষ উপহার কী তোমায় দিয়ে যাব, তা' বুঝতে পারছিনে। কিই যে হবে, তা' কে জানে? তাই বড় ভাবনা,—ওগো আমার বড় ভয়। "......" না, না, আমি শ্রান্ত হইনি। তুমি প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমায় এমন ক'রে আরাম স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ শান্তি দিয়ে আর অপরাধী করে তুলো না।"......" না, আমি আর ওষুধ খাব না। আর আমার একটুও ওষুধ খেতে ইচ্ছে করে না। শুধু কেবল একটাকে পেটে ধরেছি বলেই ওরই জন্যে আমার ওষুধ খাওয়া, ওরই জন্য ভাবনা। ভগবান যখন পাঠিয়েছেনই, যেন অসম্পূর্ণ করে কেড়ে না নেন্, এই সর্ব্বদা মনে হয়। না—না,—কেন তুমি আমার জন্য এত ব্যস্ত! সুস্থ মানুষ তুমি,—কি করে অহোরাত্র এই রোগীর বদ্ধ-কারায় স্বাচ্ছন্দ্যবিহীন সঙ্গ নিয়ে আবদ্ধ হ'য়ে আছ বল দেখি? একটু বাইরে বেড়িয়ে এস না।—উঃ, বুকের যন্ত্রণাটা যে আবার বাড়লো—

* * * *

এখন একটু ভাল আছি। না, না, আর কক্ষণো বুঝবো না। লক্ষ্মীটি তোমার চোখে জল আমি সইতে পারি না। ছি ছি, রাক্ষুসী আমি, তোমায় কেবল ব্যথা দেবার জন্যে এসেছিলুম "।........" ও'সব কথা ভুলবো? আচ্ছা, কাজ নেই আর ও'সব কথায়। তুমি একটা গান গাও না;—সেই, সেই গানটা—

"জানি গো দিন যাবে এ'দিন যাবে
একদা কোন্ বেলা শেষে
মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার
মুখের পানে চা'বে।"

"..............."হ্যাঁ, বেহালাই ভাল, অর্গ্যানের আওয়াজ বড্ড কাণে লাগে।

আর! আমার সারা দেহের শিরগুলোর ভেতরেও যেন বাজ্‌চে—"ওগো দিন যাবে, এ' দিন যাবে।" এ' যে দেখচি তুমি সত্যি সত্যিই "সুরের আগুণ জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে।" বুকটার ভেতর কেমন ক'র্‌চে। ওগো তুমি উঠে এস আমার কাছে। না, না, জানালা বন্ধ কোরো না, খোলা থাক্ অম্‌নি।

[স্নেহ'র কথা]

না—বৌদি! ভুল বুঝেচ। তুমি সরিৎ'দিকে জানতে না, তাই ঐ কথা বল্‌চ। সরিৎদি'র মত মেয়ের স্বামী যিনি, তিনি আবার কখনও বিয়ে করতে পারেন না। তাঁর এই বিয়ে করা কেন জান? এ'ও সেই সরিৎদিরই জন্যে। এ' বিয়ে তাঁর নিজের জন্যে তো নয়ই, বরং তাঁর নিজের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে, প্রকাণ্ড বিড়ম্বনা—শাস্তি বলেই মনে হয়। তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না বৌদি, এর মধ্যে কতখানি ব্যথা লুকানো আছে!"............" একটা নির্দ্দোষ বালিকার জীবন নষ্ট কর্ব্বার জন্যে উপযাচক হ'য়ে এ' বিয়ে কেন করলেন, জিজ্ঞাসা ক'রছো? জীবন নষ্ট করা?—না, সার্থক করা, ধন্য করা বলো। একে কি জীবন নষ্ট করা বলে?

বৌদি! স্ত্রী মারা গেলে সাধারণতঃ পুরুষমানুষেরা কেউ বা অশৌচান্ত হ'লেই বিয়ে করে, কেউ বা বড় জোর দু' পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করে। তাদের মধ্যেই আবার কেউ কেউ বা প্রথমটা স্ত্রীর ছবি পুজো করে, কিম্বা উন্মাদ পাগল সাজে; কেউ বা গেরুয়া পরে দিন কতকের জন্য সন্ন্যাসীও হ'য়ে যা'য়। তার পর যথাসময়ে নতুন কোনও আলতা-পরা পদপল্লব পুজো কর্ত্তে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তুমি জেনো বৌদি! স্ত্রী মারা গেলে যাঁদের ঘরে 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' 'এষা' প্রভৃতি শোক-কাব্য ও মৃতা পত্নীর পুষ্প-পূজিত ফটোগ্রাফ দেখবে, তাঁদের ঘরেই শীঘ্র আবার দ্বিতীয় পক্ষের প্রিয়ার 'মান-ভঞ্জন' চিত্রটাও দেখতে পাবে। তাদের দলে যেন এঁকেও টেনে নিও না। ইনি

তাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে, সম্পূর্ণ বিপরীত। "........." তুমি কি পাগল বৌদি? স্বামীর প্রতি অল্প ভালবাসায় মুগ্ধ হ'য়ে আমি এ' কথা বলছি, এ তোমার মস্ত বড় ভুল ধারণা। প্রথমতঃ আমার 'স্বামী' কে, যে, তাঁকে ভালবাসব? ভালবাসার পাত্রই যখন অনুপস্থিত, তখন অন্ধ কিম্বা চক্ষুষ্মান্ কোনও ভালবাসাই এখানে আস্‌তে পারে না। "........."গালে হাত দিয়ে অবাক্ হওয়াই তোমাদের পক্ষে সম্ভব বটে! কিন্তু ছি বৌদি, অমন করে একজন নির্দ্দোষ দেবচরিত্র লোককে বিনা কারণে গালাগালি দিও না—এর বাড়া পাপ আর নেই।

".........."তুমি বলতে পার বটে, যদি এতই মৃতা স্ত্রীর উপর প্রেম, তবে স্ত্রী মারা যাবার পরই এত শীঘ্র বিবাহই বা করা কেন, আর, একটা নির্দ্দোষ কুমারী-জীবন এমন ক'রে ব্যর্থ ক'রে দেওয়ারই বা উদ্দেশ্য কি? কিন্তু আমি তো তা' মোটেই বল্‌তে পারি না। বৌদি! খোকার কথা কি তোমরা একটি বারও ভাবতে পারচ না? যত ভাবনা কি এই বুড়ো মেয়ের জন্যে? পৃথিবীতে নবাগত এই অসহায় শিশুটির এই মুহূর্ত্তেই কি প্রয়োজন এখন? "..............." তুমি নিজে 'মা' হ'য়ে কি ক'রে ও কথা উচ্চারণ ক'রলে ভাই? "..............." দাই রেখে মানুষ করা? পৃথিবীতে এসে আজ কি ওর দাইয়ের অভাবটাই সব চেয়ে বড় বলে বোধ হবে? মাতৃস্তন্যটাও হয় ত' না হ'লে চলতে পারে, কারণ খাঁটী দুধের অভাব পৃথিবীতে নেই; কিন্তু খাঁটী স্নেহের অভাব বড় বেশী। মাতৃস্নেহ থেকেই যদি এ' আজন্ম বঞ্চিত থাকে, তবে জীবনের গোড়াটাই যে সব ফাঁকিতে ভরে' যাবে!

"........." আমি যে ওকে মাতৃস্নেহে বুকে তুলে নিতে পারব—সরিৎদি'র কাছে এই ভরসা পেয়েই উনি আমাকে নিয়ে গেছেন। উদিতেন্দু'র মা করেই আমায় নিয়ে গেছেন—সরিৎদির'র সতীন করে নিয়ে যান নি। আমি সরিত্‌দি'রই বোন বলেই বোধ হয় আমার উপর এই বিশ্বাস উনি স্থাপন করতে পেরেছেন।

বৌদি! আমি উদিতে'র মা হয়েচি—এটা বেশী গৌরবের, সুখের, না—যদি সরিৎদি'র সতীন হতুম, সেটা বেশী গৌরবের হ'ত? ভগবান রক্ষে করেছেন। সে হলে এটাও যে প্রমাণ হ'ত—উনি পূর্ব্বে সরিৎ-দি'কে যা' দিয়েছিলেন, সেটা মিথ্যা; এবং এখন আমি যা পেতুম সেটাও মিথ্যা—কারণ, এ' একটা এমন জিনিস, যা অটুট অবস্থায় কেবল একজনকেই দেওয়া যায়, দু'জনকে দেওয়া চলে না।

"..........." হাঁ, আমি চিরদিনই দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি! তুমি ভেব না—আমি অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মতেরও পরিবর্ত্তন ক'রব! সাধারণতঃ অনেকেই এ রকম করে থাকে বটে, তার দৃষ্টান্তও আমাদের দেশে খুব দেখা যায়। আমি বলি, স্বার্থ বা আবশ্যকানুরোধে বিপরীত-পন্থী হওয়াটা অন্যায় নয়। তবে মতটাও যাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সমূলে পরিবর্ত্তন করেন, তাঁরা দুর্ব্বল! তাঁদের মেরুদণ্ড নেই। কিন্তু আমায় তা ভেব' না। দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ আমি এখনও অন্তরের সহিত ঘৃণা করি এবং চিরদিনই ক'রব।

"........." উনি যদি আজ আমাকে 'দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী' ক'রে নিয়ে যেতেন, তা'হলে আজ আমার মুখে এই অম্লান হাসি—এই সুখের ও গর্ব্বের হাসি দেখতে পেতে না। ভাই, যে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করে, সে কেবল একটা জীবনই ব্যর্থ করে না—তিন-তিনটা জীবন ব্যর্থতায় ও ফাঁকিতে ভরে দেয়। তুমি তো জান, মা এই বিয়েতে সম্মতি দেবার আগে গোপনে আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এতে আমার মত আছে কি না! আমি দ্বিধাহীন চিত্তে মার কাছে সম্মতি জানিয়েছিলুম; কারণ, সরিৎদি' মারা যাবার আগে দু'বার আমায় তাঁর কাছে নিয়ে গেছলেন! দিদির কাছে আমি ওঁর সব কথা জেনেছিলুম। তার পর যখন সরিৎ-দি' মারা গেলেন, মা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মা উদিতকে বুকে করে যখন আমার কাছে নিয়ে এলেন, একরাশ শাদা ফুলের মত ছোট্ট কচি ছেলেটী—তখনও চোখ মেল্‌তে শেখেনি,—কয়েক ঘণ্টামাত্র পূর্ব্বে সে এই পৃথিবীতে এসেচে! উদিত যে আমারি কোলে চোখ মেল্‌তে শিখল, দুধ খেতে শিখল, হাসতে শিখল! আমি তখনই স্থির করে ফেললুম, স্বামীর দিক্ থেকে ফাঁকি পাওয়াটা যদি আমার অদৃষ্টে থাকে,—উদিতকে বুকে নিয়ে সব ব্যথা ভুলতে—সব ফাঁকি সইতে পারবো। বৌদি! আমার মত সৌভাগ্যবতী ক'জন আছে জানি না। এমন খাঁটী প্রেমিক, এমন সত্যগত-প্রাণ,

মহৎহৃদয় দেবতার দাসী ক'জন হ'তে পেরেছে জানি না।

"..........." স্বামীর অহঙ্কার? বৌদি! বার বার ঐ ভুল কথাটা কেন বোল্‌চ? আমার বিয়ে হয়েচে বটে, কিন্তু 'স্বামী' তো হয়নি। তা' এর জন্যে কি বুক-ফেটে মরে যেতে হবে? কি করে তোমায় বোঝাবো যে—এই বিবাহে আজ যদি আমি স্বামী পেতুম, তা' হলে সত্যিই স্বামী হারাতুম। আমি তাঁকে পাইনি বলেই আজ আমার এত গর্ব্ব, এত গৌরব। বৌদি! আমি কোনও দিনই আশা করিনি যে, আমার মতো একজন দীনা, নগণ্যার এত বড় সৌভাগ্য হবে যে, আমি একটা মহৎ কাজের পাত্রী নির্ব্বাচিতা হ'ব—যিনি দেবতার চেয়েও মহান্‌, এমন একজনের সঙ্গিনী হ'ব, সেবিকা হ'ব, সবচেয়ে তাঁর মহৎ কর্ম্মের সহায় হ'ব! এ যে আমার নিতান্তই স্বপ্নাতীত ছিল।

"......"আমায় বিয়ে করে উনি যে মা'কে উপকৃতা ও আমায় উদ্ধার করেছেন, এ' তো বাস্তবিক সত্যই। তবে শুধু এই উদ্দেশ্যেই উনি বিয়ে করেন নি।

বৌদি! তোমরা যা' বুঝবে না, তা' বোঝবার বৃথা চেষ্টা ক'রে আরও কতকগুলো ভুল ধারণা মাথায় ঢুকিয়ো না। আমি অসুখী—কি করে জানলে, কি দেখে বুঝলে ভাই? আমি সত্যি সত্যিই বল্‌চি, এর মধ্যে এতটুকুও মিথ্যা নেই, আমি সুখী,—খুবই সুখী। আমার কথা'তে যদি বিশ্বাস স্থাপন করতে না পার, কোর না; কিন্তু কতকগুলো মিথ্যা, অমূলক, কাল্পনিক দুঃখের সৃষ্টি করে, শেষে আমার মায়ের মনে একটা মিথ্যা কষ্ট ডেকে এনে দিও না।

"......"তোমরা চির প্রথামত যা' দেখতে না পেয়ে এত হা-হুতাশ করচ, সেটা থাকলে যে আমি সত্যিই বড় কষ্ট পেতুম—নিজেকে দুর্ভাগিনী বলে মনে করতুম,—এ' কথা তো বার বার বলচি ভাই! তবুও কি তুমি আমার কথা বিশ্বাস ক'রতে পারচো না?

"......" মাফ্‌ কোরো ভাই,—আমি এ'সব কথা বেশী আলোচনা করতে পারি না। তোমরা এ' বিষয়ে ভালমন্দ কিছু না ভাবলেই সুখী হ'ব। কারণ, আমি গুছিয়ে সব কথা বলতে গেলে, আপনা আপনি কি-জানি-কেন আত্মহারা হয়ে পড়ি। আমি যে 'ভাব' নিয়ে একটা কথা বলি, ভাষার দোষে হয় তো সেটার বিপরীত অর্থ দাঁড়ায়।

—খোকনকে দুধ খাওয়াবার সময় হ'ল, যাই ভাই!

[দিব্যেন্দু'র কথা।]

ঘর থেকে যেও না স্নেহ! তোমায় আজ আমার কিছু বলবার আছে। ঐ কৌচটার উপর বোসো। থাক্‌—থাক্‌, এই যে আমি এই চেয়ারটাতেই বস্‌ছি। তুমি এত কুণ্ঠিত হ'চ্ছ কেন? বোধ হয় একটু বেশীক্ষণই তোমাকে আমার কথা শোনবার জন্য অপেক্ষা ক'রতে হবে।

শোনো স্নেহ! আমি তোমার কাছে অত্যন্ত অপরাধী!...আমায় তুমি ক্ষমা ক'রতে পারবে কি না জানি না,—কিন্তু ক্ষমা আমি চাই না, কারণ, তার যোগ্য পাত্র আমি নই। আমার স্বার্থপরতার বিষয় শুনলে হয় তো তোমার অন্তর ঘৃণায় ভরে উঠবে,—আর সেটা আমি স্বাভাবিকই মনে করি। তবে একটা অনুরোধ,—তুমি আমার দিক্‌ দিয়ে একবার বিষয়টা ভাল করে বুঝে দেখবার চেষ্টা কোরো। আমার মত অযোগ্য ব্যক্তির এ' ছাড়া বোধ হয় অন্য পন্থা ছিল না। তবে সেটা শুধু আমার নিজেরই দিক্‌ দিয়ে।

আমি বড় হতভাগ্য, স্নেহ! আমার নিজের এই দুরদৃষ্টের সঙ্গে—আজীবনব্যাপী দুঃখের সঙ্গে, অম্লান ফুলটিরই মতো আনন্দ-প্রতিমা তোমায় কেন জড়িত করে, শুধু এই দুঃখেরই অংশ দিতে নিয়ে এলুম, তাই ভাব্‌চি। তবে এ'ও আমি জানি এবং আমার চেয়েও আমার কথা যে আরও ভাল করে জান্‌ত, সেই সরিৎও জেনেছিল, আমার মত লোকের ভার যদি কেউ গ্রহণ করতে পারে ও আমায় ঠিক্‌ বুঝতে পারে, তবে সে কেবল মাত্র তুমিই। সরিৎ আমাকে তোমার কথা বার বার ক'রে কেন বলে গিয়েছিল, তা এখন বুঝতে পারচি। কিন্তু সে'ও তার স্বামীর জন্য একটা মস্ত বড় স্বার্থপরতা করে গিয়েছে; কারণ, সে শুধু তার স্বামীর দিক্‌টাই চিন্তা করেছে, ও তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে; কিন্তু তোমার দিক্‌টা একেবারেই চেয়ে দেখেনি।

"......" সরিতের সঙ্গে তোমার 'এ' বিষয়ে কথা হয়েছিল? সে তোমায় এ' সম্বন্ধে কতকটা বলে গেছে? ওহ্‌! সরিৎ তা'হলে মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত, তার এই

অক্ষম অপারগ স্বামীরই ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল হয়ে-ছিল!! মৃত্যুকে সে শান্তিতে বরণ করে নিতে পারে নি এই অভাগার জন্যে। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও সে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে নি! আমার মনে হয়, মৃত্যুও তাকে এই চিন্তা হতে অব্যাহতি দিতে পারেনি, বৈতরণীর ওপারেও সরিৎ, ঠিক তেমনিই আমার জন্য চিন্তাকুল উদ্বিগ্ন প্রাণ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—যাক! তুমি যদি কিছুমাত্রও আভাস সরিতের কাছে পেয়ে থাক, তবে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার বোধ হয় বলবার দরকার হবে না। তবে আমার নিজের যা বলবার আছে তোমায়, তাই বলছি শোনো।

সরিৎকে আমি ভালবাসতুম খুবই, কিন্তু সে যে কতখানি, তার পরিমাণ আজ সরিৎকে হারিয়ে বুঝতে পারচি। আমি চিরকালই নিজের সম্বন্ধে একটু অধিক পরিমাণেই উদাসীন, তা' জানো বোধ হয়। তেরো বছরের মেয়ে সরিৎ এসে আমার সমস্ত ভিতর বাইরের ভার এমনিই অবলীলাক্রমে সম্পূর্ণ ভাবে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল যে, তাতে আমি নিজের সম্বন্ধে এতই বেশী অজ্ঞ হয়ে পড়েছিলুম, যা বোধ হয় সচরাচর কোনও মানুষেই হয় না। আমার জীবনে যখনি যে জটিল সমস্যা জোট্ পাকিয়ে উঠেছে, তার প্রত্যেকটি গ্রন্থি সরিৎ নিজের হাতে খুলে না দিলে, আমার নিজের খোলবার শক্তি ছিল না।

সে চির-রুগ্না ছিল। শেষের দুই-এক বৎসর কি-জানি-কেন সে আপনা আপনিই নিজের রুগ্নতার জন্য ক্ষুব্ধ লজ্জার ব্যথায় আমার উপর তার সেই অটুট্ অধিকার ও দাবী যেন হারিয়ে ফেলছিল! আমি প্রাণপণ যত্নে তার এই অমূলক লজ্জার দুঃখ মুছে নিতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি। সে নিজের অক্ষমতা ও রুগ্নতার জন্য, নিজের উপর ভয়ানক বিরক্ত হয়েছিল; ও ইদানীং আমার উপর তার আগেকার দাবী নেই বা থাকতে পারে না এই ভ্রান্ত ধারণা হয়েছিল। কিন্তু আমার উপর তার অগাধ ভালবাসা এক দিনের জন্যও ম্লান হয়নি। তার এই কল্পিত দাবী-হারানোর ব্যথা শেষকালে আমায় বড়ই আঘাত দিয়েচে। নিজের অক্ষমতার অজুহাতে একটা কল্পিত অপরাধ সৃষ্টি করে সরিত্ শেষটায় কেনই যে এত কষ্ট নিজে পেয়ে গেল, আর আমাকেও দিয়ে গেল, তা বুঝতে পারি না।

যা' হয়ে গেছে তা' গেছে। এখন এই যে একটা জটিল সমস্যায় পড়ে গেছি,—সরিৎ তো নেই, কে আমার এই সমস্যার মীমাংসায় সাহায্য কর্ব্বে? তোমার কাছে তাই এলুম স্নেহ! সমস্যাটা হচ্ছে, নিজেকে নিয়ে, তোমাকে নিয়ে ও উদিত্কে নিয়ে। প্রথম তোমার কথা বলি!

আমি তোমায় বিবাহ করেছিলুম যখন, তখন আমি স্থিরচিত্তে কিছু চিন্তা করতে বা ভবিষ্যৎ ভাবতে পারি নি; কারণ, তখন উদিতেন্দু'র চিন্তাই আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সরিতের চির-প্রস্থানের জন্য আগে থেকেই তিল তিল করে প্রস্তুত হয়েই ছিলুম; কিন্তু উদিতেন্দু'র জন্য তো মোটেই কোনও চিন্তা করি নি বা প্রস্তুত হই নি। আমি কেবল বুঝেছিলাম তখন, উদিতেন্দু'র একজন 'মা' চাই। এমন একজন কারুর কোলে ওকে তুলে দিতে হবে, যে ওর সত্যই 'মা' হবে, ভিতরে বাইরে কোনও খানে এককণা ফাঁকি থাকবে না। আমি তাকে হাজার স্নেহ-মমতা দিয়ে ঘিরে রাখলেও মায়ের প্রাণের অভাব ঠিক ঠিক কি পূর্ণ কর্ত্তে পারবো? নিজের উপর তখন এক বিন্দু বিশ্বাস নেই। আর আমার অন্তরের অন্দর-মহলের খবর যে জানত, সে তখন অনেক দূরে চলে গেছে। আমি পাগলের মত ভাবতে লাগলুম। ধাত্রী আনবো কি? কিন্তু 'মায়ের স্নেহ' কি তারা দিতে পারবে? কখনও নয়। তার পর বিমাতা। মাতৃহারা বালকের জীবনে সে তো একটা অতিরিক্ত অভিসম্পাৎ স্বরূপ। আমি যে চাই উদিতে'র মা,—বিমাতা ত' নয়।

সেই ভাবনার মধ্যে তোমারই কথা মনে জেগে উঠ্ল। সরিৎ আমায় তোমার কথাই বলে গিয়েছিল। আমি তোমার নিজের দিকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখ কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রে, সরিতের উপদেশ ও উদিতেন্দু'র প্রয়োজন স্মরণ করে অবিলম্বে তোমায় নিয়ে এলুম। উদিত্ ছাড়া আরও একটা কথা আছে। আমি সাংসারিক ব্যাপার, গৃহস্থালীর ভার ও নিজের শরীর-রক্ষা ব্যাপারে একান্ত অপটু। উদিতে'র জন্য মুখ্যতঃ তোমায় আনলেও, ওর মধ্যে গৃহস্থালী ও নিজের সুবিধাও ষোলআনা গৌণ ভাবে বর্ত্তমান ছিল। তা'হলে বুঝচো স্নেহ, তুমি

যে আমায় উদারচেতা বা মহৎ-প্রাণ বলে ভাবচো, সেটা একেবারেই ভ্রম। মহৎ তো মোটেই নই,—উপরন্তু ভীষণ স্বার্থপর।

"... ..." তুমি কুণ্ঠিত হ'য়ো না, আমায় সব কথা ভাল করে বলতে দাও। শোনো স্নেহ! তোমার কাছ থেকে আমার নেবার জিনিস তো এত, কিন্তু তোমায় দেবার কিছু নেই। তোমায় সুখী ক'রবো, এ' ভাবনা আমি একবারও ভাবি নি। তোমাকে বিবাহ ক'রবার আগে সে কথা ভাবতে পারি নি, এখন সেই ভাবনা প্রবল হয়েছে। আমি খুঁজে-পেতে দেখলুম স্নেহ, তোমায় দেবার মত কিছুই পেলাম না। তোমাকে বিবাহ করে তোমার জীবন যে কতখানিই ব্যর্থতায় ভরে' দিয়েচি, সেটা এখন সম্যক্ রূপে বুঝতে পেরে অনুতাপে মন ভরে গেছে।

সরিৎ জীবিতাবস্থায় আমার উপর যেমন দাবী হারিয়েছিল, মরণের পরপারে গিয়ে সেটা খুবই পুষিয়ে নিয়েচে। আজ সরিৎকে হারিয়ে বুঝতে পারচি, আমার উপরে তার কতখানিই অধিকার ছিল। আমার নিজের উপর একটুকুও অধিকার কিছু নেই, যে অধিকারে আমি তোমাকে কিছু দিতে পারি! কিন্তু সরিৎ মৃত্যুর ওপারে থেকেও তার স্বামীর উপর পূর্ণাধিকারে রাণী হয়ে প্রতিষ্ঠিতা থাকবে, আর তুমি সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে সরিতেরই স্বামী-পুত্রের সেবিকা হয়ে থাকবে,—এ'ও কখনো হ'তে দিতে পারি না। আমি তারই একটা ব্যবস্থা করতে চাই।

আমি তোমায় বিবাহ করে এনেছি বটে, কিন্তু তুমি আমায় স্বামীর চক্ষে দেখো না—এই-ই আমার একমাত্র নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ অনুরোধ। তুমি বিবাহের পূর্ব্বে আমায় যে সম্পর্কে শ্রদ্ধা-ভক্তি ক'রতে বা ভালবাসতে, সেই সম্পর্কই বজায় রেখে, তেমনি চোখেই দেখতে চেষ্টা ক'রবে। আমি তোমার কাছে আগেও যেমন ছিলাম, এখনও তেমনি সেই তোমার দিদিরই স্বামী থাকতে চাই। মন্ত্রপাঠ ক'রে, দেবতা-ব্রাহ্মণ সাক্ষী করে, তোমাকে সব চেয়ে নিকটতম সম্পর্কে বেঁধে এনেছি বটে, কিন্তু তা উদিতেন্দুর জন্য! যদি এমন কোনও মন্ত্র বা নিয়ম-পদ্ধতি থাকত, যার দ্বারা মাতৃহারা শিশুর কেবল 'মা' করে আনা যেত, তা'হলে আজ তোমায় উদিতেন্দু'র মা হ'বারই মন্ত্রপাঠ ক'রে নিয়ে আসতুম। কিন্তু তা' যখন নেই, জগতের চোখে তোমায় উদিতেন্দু'র মা করে দাঁড় করাতে গেলে, আমার যে এই মন্ত্রপাঠ—এই ক্রিয়া-পদ্ধতির শরণাগত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, তাই বাধ্য হয়েই আমায় করতে হয়েচে।

উদিত্ পৃথিবীতে এসেই মা-হারা হয়েছে, এখন তুমিই ওর মা। সত্যিকারের মা, গর্ভধারিণী মা। এই মাতৃত্বের মধ্যে কোথাও একটুও ফাঁক আমি রাখতে চাই না। সরিৎ তোমায় স্বামী দিলে না, আমি তোমায় তার সন্তান কেড়ে নিয়ে দিচ্ছি। ও' তোমারি ছেলে। ও' যাতে জানতে না পারে, ওর গর্ভধারিণী অন্য কেউ ছিল,—তার ব্যবস্থাও আমি করেছি।

বাংলা দেশ ছেড়ে এই সুদূর প্রবাসে আমার চলে আসবার কারণই হচ্ছে ঐ। আমার উচিত ছিল উদিতের মনে শৈশব থেকেই তার মায়ের ছবি এঁকে দেওয়া, তার মায়ের প্রত্যেকটি কায, প্রত্যেকটি কথা তার শিশু-চিত্তে মুদ্রিত করে দেওয়া। আর সরিতেরই শেষ উপহার একমাত্র জীবন্ত-স্মৃতি ব'লে উদিত্কে সরিতের স্মৃতি মাখিয়ে বুকে করে নিয়ে রাখা—এই আমার কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু আমি তা' না করে,—তার দেহের রক্তে গড়া, তারই শরীর পাত করা সন্তানকে তার দাবী থেকে, তার নাম থেকে, তার স্মৃতি থেকে জন্মের মত ছিঁড়ে নিয়ে, তোমারই কোলে তুলে দিচ্ছি। যদি বাঁচিয়ে রাখতে পারো, যথার্থ মানুষ ক'রে গড়ে তুলতে পারো, তবে স্বামী-না-পাওয়ার ফাঁকিটা অনায়াসেই পূর্ণ করে নিতে পারবে,—খুব বেশী ঠকবে না···। নারী-জীবনে রমণীত্ব আর মাতৃত্ব—এর মধ্যে কোনটায় বেশী সার্থকতা বলতে পারো?—

কলকাতার বাড়ীখানি আমার কত প্রিয় ছিল, তা' তোমায় বেশী বলতে হবে না বোধ হয়। সেই বাড়ীতে আমি তের বছরের কিশোরী সরিৎকে যখন নিয়ে আসি, তখন আমার মা বেঁচে ছিলেন। বাবা গেছেন, মা গেছেন ঐ বাড়ীতে। সরিৎকে পেয়েছিলাম ঐখানে, রেখেছিলাম ঐখানে, আবার হারিয়েছিও ঐখানেই। আশৈশবের কত স্মৃতি, কত আশা-বাসনা মাখান আছে সেইখানে, সে শুধু আমিই জানি। সে বাড়ীর সর্ব্বত্র চারিদিকে

বসন্তের রাণী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works,

এখনও বোধ হয় সরিতের পায়ের দাগ আঁকা আছে, মুছে যায়নি। সে বাড়ীর বাতাসে বোধ হয় এখনও তার চুলের গন্ধ, হাসির রেশ্ মিশানো আছে। পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে কাম্য, সবচেয়ে প্রিয়, সব তীর্থের সেরা সেই বাড়ী যখন জন্মের মতন,—হ্যাঁ জন্মের মতনই বৈ কি,—ছেড়ে চলে এসেচি, আমার বুক ভেঙে গেছে…।

…এমনি ক'রে সরিতের চিহ্ন, সরিতের স্মৃতি বাইরে থেকে ধুয়ে মুছে উঠিয়ে দিতে, আমার প্রাণে যে কতখানি ব্যথা বেজেছে, তা' শুধু অন্তর্যামীই জানেন। উদিত্ যে তার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জীবন্ত-স্মৃতি—তার মৃত্যু'র দান! তাও আমি তার নাম থেকে মুছে সরিয়ে নিলুম। আমি নিজের অন্তরে-অন্তরে ভাবতে চেষ্টা ক'র্‌ছি, উদিত্ তোমারই ছেলে। সরিতের একখানি ফটোগ্রাফ্ কি একটি তার ব্যবহৃত জিনিস পর্য্যন্তও আমি এখানে আনি নি, পাছে ভবিষ্যতে কোনও দিন উদিত কিছু জানতে পারে! স্বদেশ, বাসভূমি, পৈতৃক-ভিটা, আত্মীয়-স্বজন, কর্ম্মের উন্নতি—সব ছেড়ে এই দূরদেশে এসেছি স্নেহ, সরিতের ছেলেকে সম্পূর্ণরূপে তোমার করে দেব বলে। পুরানো ঝি-চাকরেরা আসতে চাইলেও তাদের ঐ জন্যই আনি নি। পাছে কোনও দিন তারা কোনও কথা প্রকাশ করে দেয়। তুমি বোধ হয় হঠাৎ আমার এই উন্নতির আশা-হীন সুদূর বিদেশে 'প্র্যাক্‌টিস্' করতে আসায়, ও পুরানো আমলের লোকজনেরা আসতে চাওয়া সত্বেও তাদের না নিয়ে আসায়, একটু আশ্চর্য্যই হয়েছিলে, নয়? এখন বোধ হয় বুঝতে পারচ।

—তুমি এই যে আমায় ভূমিষ্ঠা হয়ে প্রণাম কচ্ছ স্নেহ, এতে বুঝলুম, তুমি আমায় মার্জ্জনা করেচ, ও আমার প্রস্তাবেও সম্মতা হয়েচ। এতে যে আমি কতটা শান্তি পেলুম, সে আর তোমায় কি বলবো।

তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রবার ক্ষমতা আমার নেই। যিনি তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রতে পারেন, তাঁর কাছে আমিই যে সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করছি। আর, তোমায় আশীর্ব্বাদ করবার আমার তো কোনও অধিকার নেই,—কারণ তোমার যা আশীর্ব্বাদ করবার, তার সঙ্গে আমারও যে স্বার্থ সম্পূর্ণ জড়িত রয়েচে। তবে তুমি আমার উদিতেন্দু'র মা,—তোমায় যেন যোগ্য-সম্মানে যোগ্য-স্থানে চিরদিন রাখতে পারি,—তাঁর কাছে এই প্রার্থনা আমার চিরদিন যেন অব্যাহত থাকে।

সপ্তগ্রাম

শ্রীকালিদাস রায়

রাঢ় বঙ্গের রাজধানী তুমি প্রাচী-লক্ষ্মীর সিংহদ্বার—
বিজয়-ধ্বজা বহে না ক আজ তব গৌরবশৃঙ্গ আর।
জাগে অমা-রাতি, কোথা হেমবাতি, দীপচূড়া আজ ধ্বংস শেষ,
ধরে না তরণী কেলি-কুতূহলে তোমা লাগি রাজহংস-বেশ।
সিংহল-চীন-রোম-কার্থেজে বহে না ক পোত পণ্যভার
বিশাল স্বর্ণভাণ্ডার আজি শূন্য হয়েছে অন্নদার।
লুপ্ত তোমার কীর্ত্তি-গরিমা শ্মশান হয়েছে সপ্তগ্রাম,
লক্ষ্মীরাণীর মিলন-তীর্থ আজি তুমি অভিশপ্ত ধাম।
সাধু শ্রীমন্ত আর মেখলায় পরায় না মোতিচন্দ্রহার
ধনপতি চাঁদ আসে না বেচিতে এলা-লবঙ্গ-গন্ধসার।
অভ্রংলিহ্ হর্ম্ম্য তোমার পণ্যবীথিকা লুপ্ত আজ—
মুক্তা কিনিতে মগধ বণিকে পাঠায় না আর গুপ্তরাজ।
বসে না ক আর ত্রিবেণীক্ষেত্রে চারু-শিল্পের রত্নহাট,
অতলে ডুবেছে শৌর্য্য তোমার পাতালে নিহিত প্রত্নপাট।
জ্ঞান-বিজ্ঞান কলা-বাণিজ্যে পরমপূজ্য সপ্তগ্রাম
বিস্মৃতি আজি অন্ধ-সিন্ধুতে তোমার বিশ্বব্যাপ্ত নাম।
গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম-ভূমি পুণ্যময়
বঙ্গ-প্রয়াগ, তোমার পরশে পাপী পাপ-তাপ-শূন্য হয়।
নিত্যানন্দ নৃত্যানন্দে বিলাল এখানে নিত্যধন
রঘুনাথ হেথা নিল ঝুলি কাঁথা তেয়াগি হর্ম্ম্য বিত্ত জন।
উদ্ধারণের উদ্ধার-পীঠ, লুটি তব পূত মৃত্তিকায়
এখনো মাধবী-কুঞ্জ গরবে তাঁহার সুরভি কীর্ত্তি গায়।
পুণ্যশ্লোকের জননী ধাত্রী রত্নগর্ভা সপ্তগ্রাম
শূন্যে আজিকে, বিলীন হয়েছে তোমার পুণ্য দীপ্তিদাম।
দিগ্‌বিজয়িনী চতুষ্পাঠীর নাহি এ শ্মশানে চিহ্ন আর,
সরস্বতীর বালুতে লুপ্ত সরস্বতীর ছিন্নহার।
আজি গঙ্গার তীরে তীরে আর হয় না নিখাত যজ্ঞ যূপ
শিবের বদলে শিবা রাজে মঠে, জ্বলে না দেউলে অর্ঘ্য ধূপ।
শোচনীয় তব পরিণাম ফল নিয়তির অনিবার্য্যতার
লক্ষ্মী গেছেন গোলোকে ফিরিয়া, পেচক নিয়েছে রাজ্যভার
মথুরা কোশল গৌড় গিয়াছে, তুমিও গিয়েছ সপ্তগ্রাম—
যুগে যুগে জয়ী রুদ্র এমনি ধ্বংস প্রয়াসে আপ্তকাম।

অভিভাষণ *

ডাক্তার শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, পিএচ-ডি, পি-আর-এস্, আই-ই-এস

এ বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতিরূপে আমাকে কার্য্য করিবার অবসর প্রদান করিয়া আপনারা আমার যেরূপ সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আমরা বৈজ্ঞানিক; স্বল্প ভাষায় কাজের কথা বলা আমাদের শিক্ষাদীক্ষাগত অভ্যাস। সেইজন্য প্রচলিত বিনয় প্রকাশ ও ধন্যবাদের পালাটা ক্ষুদ্র হইল বলিয়া আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

আমার মনে হয়, সম্মিলনের এই বিজ্ঞান-শাখার কার্য্যটা, ইংরাজিতে যাহাকে বলে amateurist--তাহাই; কারণ, বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি খুব বিরল, এবং বাঙ্গালা ভাষা এখনও বিজ্ঞানের ভাষারূপে পরিণত হয় নাই। এই যে আমি বিজ্ঞান শাখার সভাপতি রূপে বা আমার বন্ধুগণ প্রবন্ধপাঠক রূপে আপনাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি ও হইয়াছেন, সেই আমরা কালই স্ব স্ব কলেজে ফিরিয়া গিয়া বিজ্ঞানের নানা গূঢ়তত্ত্ব ছাত্রদিগকে ইংরাজি ভাষাতেই শিখাইতে থাকিব, বাঙ্গালা ভাষার ধার দিয়াও যাইব না।

বরঞ্চ রাজসাহীতে যখন ছিলাম, তখন আধা-বাঙ্গালা আধা-ইংরাজি, আমি যাহাকে খিচুড়ি ভাষা বলিয়া থাকি, তাহাতেই বক্তৃতা দিতাম। এখন এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আসিয়া, এখানে অনেক সাহেব ছাত্র থাকাতে, তাহাও বাধ্য হইয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। তাহার উপর বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন, তাঁহারা সকলেই ইংরাজি, জার্ম্মান বা ফরাসী ভাষাতে তাঁহাদের গবেষণার ফল প্রকাশিত করিয়া থাকেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল এই মাত্র যে, এই সকল ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, শীঘ্রই বৈজ্ঞানিক সমাজে উহাদের বহুল প্রচার হইয়া থাকে। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। ভারতবাসীর মত অনেক জাপানী, চীনা, রুষীয়, পর্ত্তুগীজ, নরুইজিয়ান বৈজ্ঞানিক তাঁহাদের গবেষণার ফল জার্ম্মান বা ইংরাজী ভাষাতে প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

তাই বলিতেছিলাম যে, আমাদের মাতৃ-ভাষা এখনও বিজ্ঞানের ভাষা হয় নাই। সেইজন্য বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের যে সকল চেষ্টা হইতেছে, তাহা প্রশংসার্হ হইলেও আপাততঃ বিশেষ কার্য্যকরী হইতেছে না। সেইজন্য chlorine oxide 'গন্ধকুল-হরিণ' বা 'ক্লোরিণ অম্লজানযৌগিক' বা অপর কিছু হইবে সেজন্য খুব বেশী মাথা ঘামাইতে রাজী নহি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি, বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানের নানা বিভাগে যতগুলি গ্রন্থ আছে, তাহার একটি তালিকা "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত করিয়াছিলাম। তাহাতে দেখা যায় যে ডাক্তারি, অঙ্কশাস্ত্র, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভাগগুলিতে কয়েকখানি গ্রন্থ আছে বটে, কিন্তু অন্যান্য ভাষার তুলনায় তাহাদের সংখ্যা কিছুই নহে। গ্রন্থ লিখিব কাহার জন্য? পাঠকের জন্য ত? পাঠক জুটিলে গ্রন্থ আপনা হইতে আসিবে ও লিখিতে লিখিতে পরিভাষা ঠিক হইয়া যাইবে। আপনারা জানেন যে, হায়দ্রাবাদ ষ্টেটের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ উর্দ্দু ভাষায় সকল বিষয়ের শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞান ও নানা বিষয়ের গ্রন্থাদি ইংরাজি হইতে উর্দ্দু ভাষায় তর্জ্জমা হইতেছে। যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কালই বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানপাঠের আদেশ দেন, তাহা হইলে আমি Roscoe, Schobeneur এর রসায়ন গ্রন্থের মত অত বড় গ্রন্থ কয়েক মাসের মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষায়, মায় পরিভাষা সমেত, প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রন্থের অভাবে এক দিনও পড়াশুনা বন্ধ থাকিবে না।

মোট কথা, বিশ্ববিদ্যালয় যত দিন বাঙ্গালা ভাষায় দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের পঠন পাঠন সম্পন্ন করিবার আদেশ না দিতেছেন, তত দিন বাঙ্গালা ভাষা দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির

* মুন্সীগঞ্জ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

ভাষা হইতে পারে না। প্রয়োজন হইলেই ইপ্সিত দ্রব্যের সরবরাহ আপনা আপনিই হইয়া থাকে। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক গ্রন্থ আছে ডাক্তারি সম্বন্ধে। তাহার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ পূর্ব্বে মেডিক্যাল স্কুলসমূহে বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারি পড়ান হইত; সুতরাং এই সকল ছাত্রদের জন্য বড় বড় ডাক্তারি বই বাঙ্গালা ভাষাতে রচিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে—দেশে বাঙ্গালা-বহি-পড়া হাতুড়ে ডাক্তারের আধিক্য। যদি বাঙ্গালা দেশে পাঁচ হাজার পাশ করা ডাক্তার থাকে, তাঁহা হইলে তাহার অন্ততঃ দশগুণ অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার হাতুড়ে ডাক্তার আছে। তাহাদের অনেকে স্বীয় ব্যবসা চালাইবার জন্য বাঙ্গালা ডাক্তারি বহি কিনিয়া থাকে।

সেইজন্য বলিতেছিলাম যে, যদি মাতৃভাষাকে দর্শন-বিজ্ঞানের ভাষা করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের সমবেত ভাবে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে—যেন ক্রমশঃ মাতৃভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা হয়। বাঙ্গালার একজন মনীষী পুরুষ-সিংহের অদম্য সাহস ও অতিমানুষিক চেষ্টার ফলে অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার স্থান হইয়াছে। কিন্তু সে স্থান কেবল বাঙ্গালার সুকুমার সাহিত্যে নিবদ্ধ আছে। অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালায় আর একজন আশুতোষের ন্যায় মনীষীর আবির্ভাব আবশ্যক, যিনি স্বীয় কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও সাহসের উপর নির্ভর করিয়া নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত দর্শন বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন মাতৃভাষার সাহায্যে সম্পন্ন হইবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন এই সাহিত্য সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখা একটা জীবন্ত বৃক্ষের সতেজ সবল শাখারূপে পুষ্ট হইতে পারিতেছে না—উহা একটা ornamental কিন্তু দুর্ব্বল লতাগুল্মের আকার ধারণ করিয়াই থাকিবে।

ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আপাততঃ আমরা কি করিতে পারি, তাহার আলোচনা করিব। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে তিন প্রকার কাজে আমরা এখনই হাত দিতে পারি।

প্রথমতঃ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্য-সম্মিলন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি, যাহাতে ক্রমশঃ মাতৃভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের ভাষা হয়, তাহার জন্য অবিরত সচেষ্ট থাকিবেন। অনেকের ন্যায় আমিও Calcutta University Commissionএর নিকট মাতৃভাষার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় এই যে, কমিশনের রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের স্বপক্ষে কোনও স্থির মন্তব্য সন্নিবেশিত হয় নাই। তবে মাত্র কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভা স্থির করিয়াছেন যে, আপাততঃ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সকল বিষয়ের পরীক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে গৃহীত হইবে। এ মন্তব্য এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যাহাতে ইহা কার্য্যকরী হয়, সে বিষয়ে সকলে যেন সচেষ্ট হন।

আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হইবে এই যে, সাধারণ পাঠকগণের উপযোগী করিয়া বিজ্ঞানের নানা পুস্তক বঙ্গভাষায় রচনা করা। এরূপ পুস্তকের পাঠক আছে। ইংরাজি ভাল জানেন না অথচ বেশ বাঙ্গালা জানেন, এরূপ ব্যক্তি দেশে অনেক আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিজ্ঞানের মোটা মোটা তথ্যগুলি জানিতে উৎসুক। তাঁহাদের জন্য সহজ ভাষায় বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচিত হইলে উহা বিকাইবে। ইঁহাদের মধ্যে অপর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা ফলিত-বিজ্ঞানের (applied Science) তথ্যগুলি জানিতে চাহেন। এই ভীষণ অন্নসমস্যার দিনে অনেকের দৃষ্টিই শিল্প-বিজ্ঞানের দিকে পড়িয়াছে, অথচ ইঁহারা ইংরাজি শাস্ত্রে পারদর্শী নহেন। ইঁহাদের বোধগম্য ভাবে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অনেক পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইতে পারে।

আমাদের তৃতীয় কর্ত্তব্য এই হইবে—সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন। উপরিউক্ত প্রকারের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি রচনার জন্য পরিভাষার প্রয়োজন হইবে। যাহাতে একই পরিভাষা সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়, সেইজন্য বিশেষজ্ঞরা মিলিত হইয়া পরিভাষার সৃষ্টি করুন। নাগরী-প্রচারিণী সভা এরূপ একখানি পরিভাষার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ একটি পরিভাষা-কমিটি স্থাপন করিয়াছেন। আশা করি, এই কমিটি একটি নির্দ্দিষ্ট (Standard) পরিভাষার পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনায় সহায়তা করিবেন।

এত গেল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদির কথা। অনেকে এই প্রশ্ন

করিয়া থাকেন,—একদিন একজন ছাত্র আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিল,—যে, আমাদের দেশে আজ পঞ্চাশ বৎসর বিজ্ঞান পঠিত হইতেছে, তবু দেশ ধনধান্যে পূর্ণ হইতেছে না কেন? দেশে এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ কেন? এত অকাল-মৃত্যু, এত ম্যালেরিয়া কেন? কলকারখানায় দেশ ছাইয়া যাইতেছে না কেন? জুতা বুরুষের কালি হইতে চণ্ডী-পাঠের কাগজ পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে আসে কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত জটিল। নানা কারণে—রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, বৈজ্ঞানিক কারণ-পরম্পরার জন্য এরূপ ঘটিতেছে। আমি এখানে কেবল এ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক দিকটার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আমি বলি, এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হইতেছে এই—বিজ্ঞানের তথ্যগুলি যখন শুধু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি বা আমেরিকাতে সত্য নহে, যখন ঐগুলি সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া সত্য, তখন ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যাহা সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা ভারতেও সম্ভবপর হইবে না কেন? বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া আমেরিকার পানামা, ইয়োরোপের ইটালী প্রভৃতি দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত হইয়াছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার দেশগুলি এত যে সমৃদ্ধিশালী, সে ত বিজ্ঞানেরই মহিমায়। এই দেখুন—বিজ্ঞানের সেবালব্ধ জ্ঞানের সহায়তায় এক আল্‌কাতরা হইতে লাল, নীল, সবুজ, বেগুনে প্রভৃতি শত শত প্রকারের রং প্রস্তুত করিয়া জার্ম্মাণী পৃথিবীর তাবৎ দেশে রপ্তানি করিয়া, বৎসরে বৎসরে কোটি কোটি টাকা লাভ করিতেছে। কোটি কোটি টাকার কাপড়, চিনি, লবণ, লৌহ, বিবিধ ধাতু, কাচ, কাগজ, পোর্সিলেন, সাবান, দেশলাই, প্রভৃতি সহস্র সহস্র দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকার তাবৎ দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। তফাতের মধ্যে এই যে, আমরা এই সকল জিনিস কিনি, কিন্তু প্রস্তুত করিতে পারি না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী আমরা জানি না, আমাদিগকে কেহ শিখায় না।

সত্য বটে, আমাদের দেশে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া হইতেছে,—কিন্তু আমি আজ সতের বৎসর বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিয়া বুঝিতেছি যে, বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন আমাদের দেশে যেরূপ ভাবে হইতেছে, তাহাতে বিজ্ঞান পাঠের প্রত্যক্ষ ফল দেশ লাভ করিতে পারিতেছে না। প্রথমতঃ দেখুন—স্কুলসমূহে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন আদৌ নাই। অন্যান্য দেশে তাহা নহে। অন্যান্য দেশে স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে nature study ও উচ্চশ্রেণীতে বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা আছে। তাহাতে ফল এই হয় যে, ছেলেবেলা হইতে ছাত্র-বৃন্দের মনে একটা বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি বা নেশা জন্মিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, কলেজে যে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন হয়, তাহা কেবল শুদ্ধ বিজ্ঞান (theoretical science)। ফলিত বা ব্যবহারিক বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা পঞ্চাশ বৎসরেও দেশে হইল না। তাহার ফল এই হইয়াছে—আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিজ্ঞানের এম-এ, এম-এসসি'রা বিজ্ঞানের বড় বড় সূত্রের লম্বা লম্বা ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ, কিন্তু একখানা সাবান বা একটা দেশলাইয়ের কাঠি প্রস্তুত করিতে হইলে তাঁহাদের গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়। দোষ কিন্তু তাঁহাদের একটুও নয়। এই সকল কৃতী ছাত্র যদি কোনও টেক্‌নলজিক্যাল কলেজে বা কোন ফ্যাক্‌টরীতে কাজ করিবার সুযোগ পান, তাহা হইলে তাঁহারা খুব উচ্চদরের 'ব্যবহারিক বিজ্ঞানে' বিশেষজ্ঞ হইয়া দেশে নানারূপ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। আমাদের দেশে টেক্‌নলজিক্যাল কলেজের অভাবের দরুণ, খুব কম ছাত্রই সে সুযোগ পাইয়া থাকেন। সেইজন্য সরকারি ও বেসরকারি এত অর্থ ব্যয়ে যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এই সকল ছাত্রকে দেওয়া হইতেছে, তাহা নিতান্তই বৃথা হইতেছে; এবং এই সকল কৃতী ছাত্র, যাঁহারা সুযোগ ও পাঠের সুবিধা পাইলে, দেশে প্রচুর ধনাগমের উপায় করিতে পারিতেন, তাঁহারাই অনন্যোপায় হইয়া এম-এসসি, বি-এল হইয়া, বা কেরাণীগিরি করিয়া তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অবমাননা করিতে বাধ্য হইতেছেন।

দেশের লোকমত কিন্তু বদলাইতেছে। লোকে এখন বুঝিতেছে যে, শুধু বিজ্ঞানের তথ্যগুলি পাখীর মত আবৃত্তি করিতে পারিলেই বিজ্ঞানের সেবা করা হইল না। বিজ্ঞানের ক্রিয়া ও উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথম উদ্দেশ্য এই যে, এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কার্য্য-কারণ-পরম্পরার মধ্যে যে সকল গূঢ় সত্য নিহিত আছে, তাহা আবিষ্কার করা। বিজ্ঞানের দ্বিতীয় কার্য্য হইতেছে এই যে, এই সকল আবিষ্কৃত তথ্যের সাহায্যে মানবের সভ্যতা

ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বর্দ্ধক নানা দ্রব্য-সম্ভার প্রস্তুত করা। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আমরা বিজ্ঞানের সূত্রগুলির কেবল চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়াই আসিতেছি। নূতন বড়-একটা কিছু করি নাই, শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালীও শিখি নাই। কিন্তু আধুনিক ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের এই মামুলি উচ্ছিষ্ট ভোজনের প্রবৃত্তি আর থাকিতেছে না। তাই আজ ভারতের নবীন বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় বিজ্ঞানের প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে ক্রমশঃ তৎপর হইতেছেন। গত দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের নানা প্রদেশের নবীন বৈজ্ঞানিকেরা অনেকে স্বীয় মৌলিক গবেষণার দ্বারা জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি কল্পে সাহায্য করিতেছেন। অপর দিকে আর এক দল নবীন বৈজ্ঞানিক, দেশে টেক্‌নলজিক্যাল কলেজ না থাকার দরুণ, জাপান, আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণিতে গিয়া সেখানকার কলেজে পড়িয়া ও ফ্যাক্টরীতে কাজ করিয়া কৃতবিদ্য হইতেছেন; এবং দেশে ফিরিয়া আসিয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেছেন। এরূপ শত শত ছাত্র বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। সকলেই যে নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠায় একেবারে কৃতকার্য্য হইবেন, সেরূপ আশা করা যায় না, তাহা হইতেছেও না। কিন্তু এই প্রাথমিক অসাফল্যের উপরেই ভবিষ্যতের সাফল্য নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইবে। এইরূপে বিদেশ-প্রত্যাগত শিল্প-দক্ষ অনেক ছাত্র অর্থের অভাবে বা ধনীর সাহায্য না পাইয়া নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া আছেন। আমি তাঁহাদের পক্ষ হইতে, শিল্প-সম্ভার প্রস্তুত কল্পে দেশের ধনীবৃন্দকে সবিনয়ে আহ্বান করিতেছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, এই সকল কৃতী বৈজ্ঞানিকের শিক্ষার সদ্ব্যবহার করিয়া, নিজেদের অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত করুন, এবং দেশের মঙ্গল সাধন করুন।

কিন্তু বিদেশে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করিতে যাইবার সুবিধা বা সামর্থ্য কয়জন ছাত্রের হইতে পারে? দেশে ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা রীতিমত করিতে হইবে। এ বিষয়ে দেখিতেছি যে লোকমত সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়াছে। কলেজে এখন আই-এ, বি-এ অপেক্ষা আই-এসসি, ও বি-এসসি ছাত্রের সংখ্যা বেশী হইতেছে। সংবাদপত্রে, সাময়িক পত্রে, লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে যত্র তত্র এ বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছে। এই সকল আলোচনা একেবারে নিষ্ফলও হয় নাই। ভারতের নবীন লৌহ-শিল্পের কেন্দ্রস্থল জামসেদপুরে metallurgical Institute স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এসসি পরীক্ষায় ফলিত রসায়নের বিভাগ খোলা হইয়াছে। নূতন একটী এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রকাণ্ড ইলেকৃট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতায় বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল কলেজ ক্রমে বড় এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পরিণত হইতে চলিয়াছে। কানপুরে একটি টেক্‌নলজিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে কয়েকটি রসায়নের ফলিত শাখার বিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐখানে একটি রং করিবার প্রণালী শিখাইবার স্কুলও (dying school) স্থাপিত হইয়াছে। বোম্বায়ের ভিক্টোরিয়া জুবিলী টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট বেশ চলিতেছে। মহীশূর রাজ্যে স্বনামধন্য জামসেদজি টাটার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ব্যাঙ্গালোরের ইন্‌স্টিটিউট অব সায়েন্স ফলিত রসায়ন ও ইলেকৃট্রিক এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট একটি করিয়া ইণ্ডাস্‌ট্রিজ ডিপার্টমেণ্ট খুলিয়াছেন। যাঁহার ইচ্ছা তিনি শিল্প-বিজ্ঞানের যে কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশ এখানে পাইতে পারেন।

কিন্তু ইহা প্রারম্ভের সূচনা মাত্র। ইহা কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি নহে। আমার মনে হয়, আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর আমূল সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছে। নিম্নতন শিক্ষা হইতে উচ্চতম শিক্ষা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কৃষি-বিজ্ঞান, বিশেষতঃ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের স্থান থাকা আবশ্যক। আধুনিক কলেজের শিক্ষায় লোকের আর পেট ভরিতেছে না। বিদ্যা জ্ঞানদায়িনী ও অর্থকরী দুইই। বিদ্যা শিক্ষায় জ্ঞানলাভ ত হয়ই, কিন্তু শুধু জানাতে কিছুই লাভ নাই। জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি যে বিদ্যা না দিতে পারে, সে বিদ্যা পূর্ণ নহে। বিদ্যা উপায়, উদ্দেশ্য নহে। সেইজন্য বলিতেছি যে, যেমন এক দিকে কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপিয়ার, মিল্টনের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকিবে, সেইরূপ অপর দিকে জীবনের দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য শত সহস্র প্রকার দ্রব্যের প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দিবারও

সম্যক ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখনকার শিক্ষায় প্রথমটি হইতেছে, দ্বিতীয়টি প্রায় আদৌ হইতেছে না।

এ স্থলে আর একটী বিষয়ের প্রতি অবধান আকর্ষণ করার প্রয়োজন মনে করি। সেটা হইতেছে কৃষি-বিজ্ঞান। সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন—কৃষি। ভারতের শতকরা ৮০ জন লোকের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় কৃষি, বাস পল্লীগ্রামে। ইংলণ্ডে ব্যাপারটা ঠিক উল্টা। ইংলণ্ড শিল্পপ্রধান দেশ; ঐ দেশে শতকরা ৮০ জনের জীবিকা শিল্প-নির্ম্মাণ, বাস সহরে। অথচ ৮০ বা ১০০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের অবস্থা এরূপ ছিল না। তখন ইংলণ্ড আমাদের দেশের মতই কৃষি-প্রধান ছিল, অধিকাংশ ব্যক্তিই পল্লীগ্রামে বাস করিত—এখনকার মত এত বড় বড় সহর তথায় তখন ছিল না। তার পর যখন হাতের পরিবর্ত্তে কলের প্রথম প্রচলন হইল, তখনও উপজীবিকা লোপের ভয়ে অনেক পল্লীবাসী ঐ সকল কল ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এখন ইংলণ্ডের সে অবস্থা আর নাই। ইংলণ্ড এখন শত সহস্র প্রকারের দ্রব্য নির্ম্মাণের কলে ছাইয়া গিয়াছে। স্বদেশজাত নানা পণ্য-সম্ভারে পূর্ণ হইয়া ইংরাজের জাহাজ আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই সকল পণ্য বিক্রয় করিয়া বহু অর্থ স্বদেশে লইয়া যাইতেছে। আমি বলিতেছি না—ভারতবাসী মাত্রেই কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া দিয়া কলে কাজ করুক। এ বিষয়ে আমার আদর্শ ইংলণ্ড নহে—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। আমি বলি এই যে, ভারতবর্ষ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় এক দিকে কৃষি-প্রধান, অন্য দিকে যুগপৎ শিল্পপ্রধান দেশ হউক। ভারতের জমি উর্ব্বরা,—দেশ আমাদের সুজলা সুফলা, শস্যশ্যামলা। দেশের এ মূর্ত্তির আরও যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহারই কামনা করিতেছি। বৈজ্ঞানিক কৃষির সাহায্যে দেশে শস্য উৎপাদন যাহাতে অন্ততঃ তিনগুণ বৃদ্ধি পায়, তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে সকলকে অনুরোধ করিতেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে যাহাতে নানবিধ শিল্প প্রস্তুতের ব্যবস্থা হয়, তাহার জন্যও সচেষ্ট হইতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ বিষয়ে আমার আদর্শ ইংলণ্ড নহে, আমেরিকা। এই আমেরিকার যুক্তরাজ্য যেমন কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেইরূপ শত সহস্র প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিয়াও পৃথিবীর বরেণ্য। যুক্তরাজ্য সপ্রমাণ করিয়াছে যে, কৃষি ও শিল্প পরস্পর বিরোধী নহে। একই সময়ে দেশ কৃষিপ্রধান ও শিল্পপ্রধান হইতে পারে। এই আদর্শ—আমি ছাত্রবৃন্দ ও যুবকগণের সম্মুখে পরিস্ফুট করিতে চাই। এ আদর্শ যাহাতে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তাহার জন্য তাঁহারা যেন সচেষ্ট হন।

কিন্তু এখন যেরূপ ভাবে দেশে কৃষিকার্য্য চলিতেছে, সেরূপ ভাবে চলা আর এক দিনও উচিত নহে। মান্ধাতার কাল ত বহুদিন গত হইয়াছে। আমরা যেন মনে রাখি যে, বিঘা প্রতি 'সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা' ভারতের মৃত্তিকায় যত শস্য উৎপন্ন হয়,—উৎকৃষ্ট বীজ, প্রচুর সাঁর, উপযুক্ত পরিমাণ জল প্রয়োগ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাবলীর সাহায্যে পাশ্চাত্য দেশে অন্ততঃ তাহার তিনগুণ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন—যে বিটের চিনি আমরা বহুল পরিমাণে খাইয়া থাকি, তাহাতে আগে শতকরা পাঁচ ভাগ শর্করা থাকিত। বৈজ্ঞানিক কৃষিবিস্তার ফলে সেই বিটে এখন শর্করার পরিমাণ শতকরা পাঁচ হইতে বার ভাগে উঠিয়াছে। আমাদের দেশে সরু লিক্‌লিকে খাগড়ি ইক্ষু অনেকে দেখিয়াছেন; কিন্তু বৈজ্ঞানিক কৃষিজাত জাভা, মরিসস, করবোডাজ প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত "শালপ্রাংশু মহাভুজ" সদৃশ আখ যিনি না দেখিয়াছেন, তিনি বুঝিবেন না যে, আখ কত প্রকাণ্ড হইতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে কৃষির উন্নতির পরিচয় ত কিছু পাইলেন। কিন্তু আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির উন্নতি ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কবে দেখিতে পাইব? কৃষককুল নিরক্ষর ও দরিদ্র। ভদ্রলোক কৃষিকার্য্য ঘৃণা করেন। ভদ্রলোকের মধ্যে যাঁহাদের কিছু জমিজমা আছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কৃষককে ভাগে জমি বিলি করিয়া দিয়া সহরে আসিয়া বিশ-ত্রিশ টাকা মাহিনার চাকুরি করিতে পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করেন। তাহার উপর জমি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। তাহা হইলে দেখা গেল—দেশ অজ্ঞ, জমি ক্ষুদ্র। বিজ্ঞান স্থান পায় কিরূপে? সমস্ত বঙ্গদেশে একটি কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার কলেজ পর্য্যন্ত নাই। দুইটি স্কুল ছিল, তাহাও উঠিয়া যাইবার মত হইয়াছে। ভাগ্যে একজন আমেরিকান ভারতের কৃষির দুর্দ্দশায় ব্যথিত

হইয়া উহার উন্নতি কল্পে কিছু টাকা দান করিয়াছিলেন, তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া এখন পুষাতে কৃষিবিদ্যার মৌলিক গবেষণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। সুখের বিষয়, প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট একটি করিয়া কৃষিবিভাগ খুলিয়াছেন। তাহাতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞও নূতন বীজের ব্যবহার ও কৃষি-পদ্ধতি অবলম্বনের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সংখ্যায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়। পক্ষান্তরে দেশের লোক কিছুই না বুঝিয়া আজই তাঁহাদের গবেষণার ফল চাহিয়া থাকে। তাহা যে সম্ভবপর নহে, এ কথা লোকে বুঝে না। যদিই বা কিছু নূতন ফল এই বিশেষজ্ঞরা বাহির করিলেন, তাহা আবার অজ্ঞ কৃষকের দ্বারে পহুঁছান বড়ই শক্ত কাজ। দুই একটি জেলায় এক্‌সপেরিমেণ্টাল ফার্ম্ম আছে, কয়েক জন ডিমন্সট্রেটারও আছেন। এ সব সমুদ্রে পাদ্যর্ঘ্য মাত্র। হওয়া উচিত—মহাযজ্ঞের ব্যাপার। পূর্ব্বে যে যুক্তরাজ্যের আদর্শের কথা আমি বলিয়াছি, সেখানে ৩২টি কৃষি-কলেজ আছে এবং বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কৃষির উন্নতির জন্য গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। কৃষকেরা অধিকাংশই প্রাথমিক শিক্ষায় অভিজ্ঞ। তাহারা কৃষিসমাচার পড়ে, বুঝে, কাজে লাগায়। সেখানে ভদ্রচাষী অনেক আছেন। এক সঙ্গে অনেক জমিও পাওয়া যায়—বড় বড় ফার্ম্ম আছে। ঐ সকল ফার্ম্মে যন্ত্রচালিত বহু নূতন কৃষি-পদ্ধতির প্রয়োগ হইতেছে। নূতন ও বেশী ফলদায়ক বীজ উৎপন্ন হইতেছে। কৃষকেরা তাহা ব্যবহার করিতেছে। বৈজ্ঞানিক সারের ব্যবহার সর্ব্বত্র। ফলে যেখানে এক গাছি শস্য উৎপন্ন হইত, সেখানে তিন চারি গাছি উৎপন্ন হওয়াতে, দেশে কৃষিজাত অর্থ তিন-চারি গুণ বাড়িয়া যাইতেছে। কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য বৎসর বৎসর যুক্তরাজ্যে বহু লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়, কিন্তু তাহার দশগুণ টাকা উৎপন্ন কৃষিজাত শস্য মূল্য রূপে লাভ হয়।

আমাদের দেশে এরূপ পদ্ধতি যে কবে প্রচলিত হইবে, তাহা বলা বড় কঠিন। আদৌ হইবে কি না, তাহাই সন্দেহ স্থল। প্রথমতঃ দেখিতে পাই, অনেকের বিশ্বাস যে, আমাদের কৃষকদিগকে শিখাইবার কিছুই নাই,—তাহারা কৃষি-বিদ্যায় সর্ব্বজ্ঞ। দ্বিতীয়তঃ, এ দেশের কৃষকেরা নিরক্ষর; নিজেরা পড়িয়া-শুনিয়া কোনও নূতন পদ্ধতি তাহারা নিজে প্রয়োগ করিতে অসমর্থ। তৃতীয়তঃ, দেশে বৈজ্ঞানিক কৃষি শিখাইবার জন্য স্কুল কলেজ নাই। চতুর্থতঃ, মাত্র মুষ্টিমেয় অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক কৃষিবিষয়ক গবেষণায় নিযুক্ত। পঞ্চমতঃ, ইঁহাদের গবেষণার ফল কৃষকের ক্ষেত্রে প্রদর্শন করাইবার ব্যবস্থা অতীব অসন্তোষজনক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ কার্য্য অল্প আয়াসে বা অল্প পরিশ্রমে সাধিত হইতে পারে না। প্রত্যেক কৃষককে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হইবে, কৃষি শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে। কৃষি-গবেষণায় আরও অনেক বিশেষজ্ঞকে লাগাইতে হইবে। কৃষকগণকে হাতে কলমে এই সকল উন্নত প্রণালী তাহাদের ক্ষেত্রে গিয়া শিখাইয়া দিতে হইবে। সর্ব্বোপরি, ভদ্র-সন্তানকে চাষী হইতে হইবে। শিক্ষিত যুবকেরা যাহাতেই হাত দিবেন, বিদ্যাশিক্ষার এমনই গুণ, তাহাতেই তাঁহারা সোণা ফলাইতে পারিবেন। তাঁহারা চেষ্টা করিলে খণ্ড খণ্ড জমি একত্র করিতে পারিবেন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীজ ব্যবহার করিতে পারিবেন, বৈজ্ঞানিক সারের উপকারিতা তাঁহারা বুঝিবেন, বৈজ্ঞানিক কৃষির পরিচালনা করিতে তাঁহারাই পারিবেন।

রাজসাহী কলেজে আমি একবার ভদ্রসন্তানকে চাষা বানাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলাম। রাজসাহীতে একটি সরকারী ফার্ম্ম আছে। আমি কৃষিবিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাদের সহায়তায় ফার্ম্মের একটা পোড়ো ঘরে কয়েকখানা বেঞ্চি ও চেয়ার আনাইয়া প্রতি রবিবার কলেজের ছাত্রদিগকে লইয়া গিয়া ফার্ম্মের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দ্বারা বক্তৃতা করাইয়া শুনাইতাম। আমার আহ্বানে কলেজের ৮০০ ছাত্রের মধ্যে ২০০ ছাত্র প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে প্রত্যেক রবিবার ফার্ম্মে গিয়া বৈজ্ঞানিক কৃষি সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিত ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির ব্যবহার হাতে-কলমে শিখিত। যে দিন লাঙ্গল ধরিতে হইবে, সেদিনকার দৃশ্য আমার বেশ মনে আছে। বর্ষাকাল, মাঠে খুব কাঁদা,—ছেলেরা লাঙ্গলের দিকে কেহ বড় এগোয় না। আমিও নাছোড়বান্দা। তাহাদিগকে বলিলাম, "বাপু হে! তোমাদের চেয়ে আমি ঢের বেশী পাশ করিয়াছি, আমি রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-বৃত্তিধারী, পিএচ-ডি,—আমি যদি লাঙ্গল ধরিতে পারি, তোমরা পারিবে না কেন?" এই বলিয়া আমি কাপড়-

চোপড় গুটাইয়া যেমন লাঙ্গল লইয়া কাদার মধ্যে নামিয়া পড়িলাম, সেই সঙ্গে দুই শত ছাত্রও আমার দেখাদেখি লাঙ্গল লইয়া নামিয়া পড়িল। সেই কাদায় তাহারা চষিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছিল, আমার বিশ্বাস সেরূপ আনন্দ তাহারা জীবনে কখনও লাভ করে নাই। প্রতি রবিবার ছাত্রেরা ফার্ম্মে যাইত, আমিও যাইতাম। রাজসাহী হইতে আমি চলিয়া আসিবার পর শুনিলাম, সে ক্লাস উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে সেই সকল ছাত্রদের নিকট হইতে পত্র পাই যে, তাহারা ফার্ম্মে যে কৃষিবিজ্ঞানের জ্ঞান পাইয়াছিল, ভবিষ্যৎ জীবনে তাহা কার্য্যে লাগিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, কৃষির উন্নতি সাধন করিতে হইলে, ভদ্রলোককে আগে চাষা হইতে হইবে। পারিবেন কি?

এক দিকে যেমন কৃষি, বিজ্ঞান, ফলিত রসায়ন-বিজ্ঞানের অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজন, অপর দিকে ঐ সকল বিষয়ে মৌলিক গবেষণাও তদ্রূপ প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানের নিত্য-নূতন তথ্য আবিষ্কারের এই সতত চেষ্টা, এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা পাশ্চাত্য দেশসমূহে খুবই প্রবল। তাই তাহারা এত বড়। এক দিন আমাদের দেশেও উহা প্রবল ছিল। ফলমূলাহারী, সর্ব্বস্বত্যাগী প্রাচীনকালের বহু ভারতীয় মনীষী ভারতের বিবিধ জ্ঞানের নিদর্শন স্বরূপ বেদ, ষড়দর্শন, গৃহসূত্র, উপনিষদ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। নানা কারণে এ অনুসন্ধান প্রবৃত্তি আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। এখন আমাদিগকে আবার পাশ্চাত্য জাতিদিগের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিতে হইতেছে। পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের কি বিরাট অনুসন্ধিৎসা! মাউণ্ট এভারেষ্ট বা গৌরী-শৃঙ্গ আমাদেরই—'কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান'—সেই হিমালয়ের উচ্চতম শিখর। ইহারই অভ্রভেদী শিখরে উঠিবার প্রবৃত্তি বা উৎসাহ আমাদের হইল না,—হইল কতিপয় ইংরাজ পুরুষসিংহের। ইঁহাদের মধ্যে গত বৎসর দুইজন মারা পড়িলেন, কিন্তু সে চেষ্টা কি তাঁহারা ছাড়িয়াছেন? ছাড়া ত দূরের কথা—এই মৃত বীরপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইবার জন্ম শুধু ইংলণ্ড কেন, জার্ম্মাণী, আমেরিকা, সুইজর্লাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে লোকে আগামী বৎসর এভারেষ্ট বিজয়ের জন্ম আসিতেছেন। অনুসন্ধিৎসা ত ইহাকেই বলে। তার পর মনে রাখিবেন যে, এই যে এরোপ্লেন আকাশমার্গে আজ ঘণ্টায় ১৫০ মাইল যাইয়া প্রবাদ-বিশ্রুত দশাননের পুষ্পকরথকে হার মানাইয়াছে, তাহার আবিষ্কার ও উন্নতিকল্পে বহু ইয়োরোপীয় ও আমেরিক্যান আবিষ্কারককে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে ও প্রত্যহই হইতেছে। এক বৎসর পরে যখন এই এরোপ্লেন সাহায্যে তিন দিনে বিলাত যাইবেন, তখন যেন স্মরণ থাকে যে, এই বিংশ শতাব্দীর অত্যদ্ভুত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সহিত ভারতের কোনও বৈজ্ঞানিকের সংস্রব নাই। উত্তরমেরু, দক্ষিণমেরু আবিষ্কার কার্য্যে কত উৎসাহী, সাহসী ইয়োরোপীয় জীবন দিয়াছেন! বাঙ্গালীর বড়ই সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা যে, বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার—তার-বিহীন টেলিগ্রাফি—তাহার সহিত আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের নাম সংশ্লিষ্ট। তিনিই বৈজ্ঞানিক সমাজে বাঙ্গলার,—ভারতের নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনেক নবীন বৈজ্ঞানিক অগ্রসর হইয়াছেন,—এই অনুসন্ধিৎসার আস্বাদ তাঁহারা পাইয়াছেন। আমরা যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখি যে, কলম্বাস এক দিন কবির ভাষায় "মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে কি সঙ্গীত ঐ ভেসে আসে"—এইরূপ কোনও সঙ্গীতের সুদূর মূর্চ্ছনা শুনিতে পাইয়া, দুস্তর সাগরে তরণী ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। ফলে পৃথিবীর অপরার্দ্ধ আমেরিকার আবিষ্কার হইয়াছে। ভাসকোডি গামাও সেইরূপ অনুসন্ধিৎসার প্রেরণায় অকূল সমুদ্রে যে তরণী ভাসাইলেন, তাহা আসিয়া ঠেকিল স্বর্ণপ্রসূ ভারতের উপকূলে। ভুলে যান—সমুদ্র পারে যাইলে জাত যাইবে; ভুলে যান—পাশ্চাত্য জাতিদের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে লজ্জা আছে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতিমানুষিক অনুসন্ধিৎসা পাশ্চাত্য জাতিদিগকে এত বড় করিয়াছে, তাহাদের দেশকে ধনধান্যে,—শৌর্য্যে ঐশ্বর্য্যে বড় করিয়াছে। বিজ্ঞান রত্নপ্রসূ। আমরাও ইহার প্রকৃত সেবা করিতে পারিলে, আমাদের দেশেও বিজ্ঞান রত্ন ছড়াইয়া দিবে,—দেশ হইতে সমস্ত অমঙ্গল দূর হইবে,—আবার ভারত ধনধান্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমকক্ষ হইবে।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্-সি

নূতন প্যারাচুট

সম্প্রতি সার্জ্জেণ্ট ফোর্ড (Sergeant Ford) নামক এক-জন বৈজ্ঞানিক এক নূতন ধরণের প্যারাচুট (Parachute) নির্ম্মাণ ক'রেছেন। এই প্যারাচুটের কার্য্যকারিতা পরীক্ষা ক'রবার সময় তিনি যে সব বিপদজাল অতিক্রম ক'রেছেন, তা' শুন্‌লে দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এক আধবার নয়, তিনি ক্রমাগত আট দশবার পরীক্ষা করবার পর তবে তাঁর প্যারাচুট্‌কে একেবারে নির্দ্দোষ ক'রতে পেরেছেন। এখন তাঁর এই নব নির্ম্মিত প্যারাচুট্‌টাই বৈজ্ঞানিক সমাজে "একমাত্র জীবন রক্ষক" বলে খ্যাতিলাভ ক'রেছে।

কর্ম্মক্ষেত্রে ফোড সাহেব
(ফোর্ড সাহেব উড্ডীয়মান বিমানপোত থেকে তাঁর নবনির্ম্মিত প্যারাচুট স্কন্ধে নিয়ে শূন্যে ঝম্প প্রদান ক'রছেন)
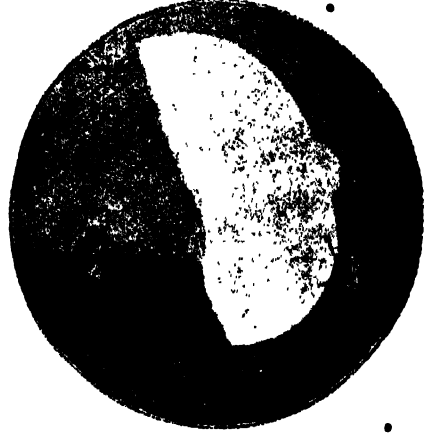
পৃথিবীতে ফোর্ড সাহেব
(ফোড সাহেব পৃথিবীতে নেমে আবার প্যারাচুটকে ঠিক ক'রে রাখ্‌ছেন)
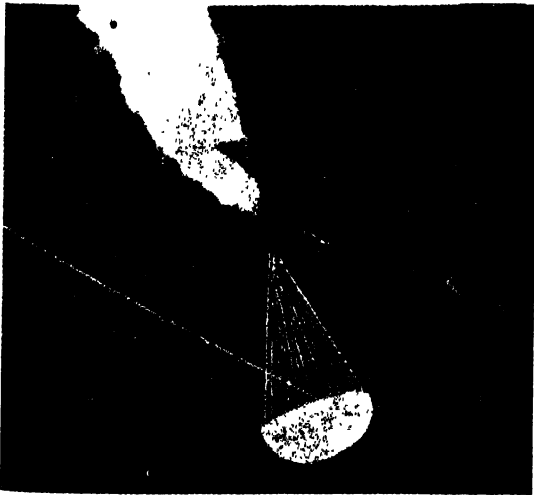
শূন্যে ফোড সাহেব
(ফোর্ড সাহেব প্যারাচুট সাহায্যে পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হ'চ্ছেন)

ফোর্ড সাহেব
(কর্ম্মক্ষেত্রে নাম্‌বার আগে ফোর্ড সাহেব প্যারাচুট পরীক্ষা করে দেখছেন)

সৌধোদ্যান

সম্প্রতি কোনও কোনও সৌখীন মার্কিন নারী ও পুরুষ নিউ ইয়র্ক সহরের গগনস্পর্শী গৃহচূড়ার উপর উদ্যান তৈয়ারী ক'রে নিজেদের বিলাস বাসনা চরিতার্থ ক'রছেন। তাঁরা ছাদের উপর বড় বড় বৃক্ষ রোপণ ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, আবার ঝিল ও পুষ্করিণী সৃষ্টি ক'রে তা'র উপর নৌবিহার ও সন্তরণ প্রভৃতির দ্বারা প্রীতিলাভ ক'রছেন।
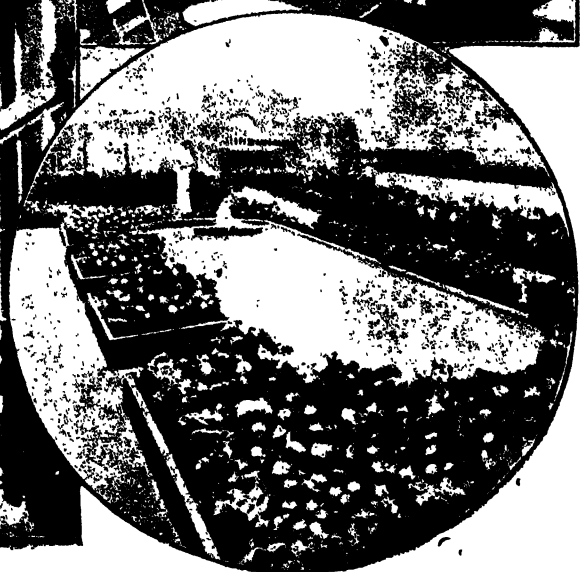
মিডার সাহেবের সৌধোদ্যান। (মিডার সাহেব সৌধোদ্যান পরিভ্রমণ ক'চ্ছেন আর তাঁর স্ত্রী একখানি পাথরের চৌকীর উপর বসে কাগজ পড়ছেন
উদ্যান রচনায় ইগল সাহেব (Eagle সাহেব সৌধোদ্যানে বৃক্ষরোপণ ক'রবার পূর্ব্বে কলে ঘাস ছাঁটিতেছেন।)

ক্যাট্ সাহেবের সৌধোদ্যান
ব্রাউনিং সাহেবের সৌধোদ্যান"
(সৌধোদ্যানে ঝিলের উপরে Mrs. Browning নৌবিহার ক'রছেন)

জাহাজে বিমান

জাহাজের উপর স্থানাভাববশতঃ জাহাজের উপর থেকে বিমান-পোত আকাশে উঠিতে পারিত না। এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য একজন বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন ক'রেছেন, যদ্দ্বারা বিমান পোত জাহাজের উপর থেকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে স্বচ্ছন্দে আকাশে উঠ্‌তে পারে। সেই উপায়টি হ'চ্ছে এই যে প্রথমে জাহাজের ছাদের উপরে রেলের লাইনের মতো "লাইন" তৈয়ারী ক'রে তা'র উপরে বিমান পোতটিকে রেখে দেওয়া হয়। পরে কামানের বারুদ সাহায্যে বিমানপোতকে "লাইনের" উপর দিয়ে তীব্রগতিতে জলের উপরে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করা হয়।
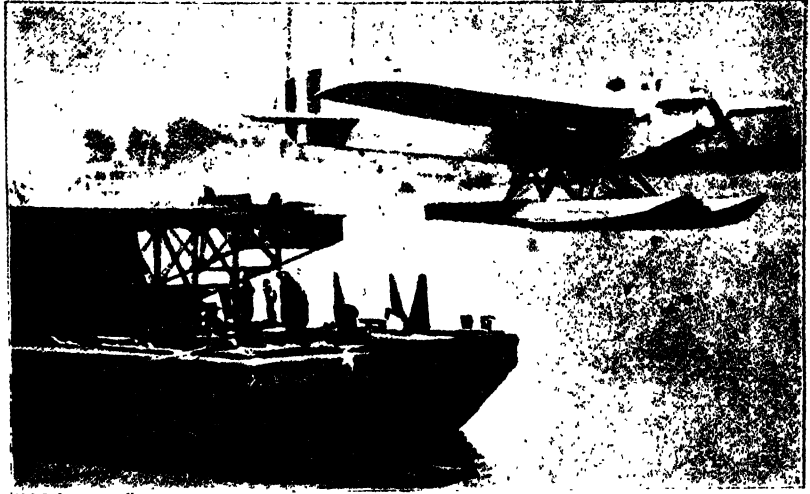
জাহাজে বিমান (জাহাজের উপর থেকে বিমানপোত শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হ'চ্ছে)
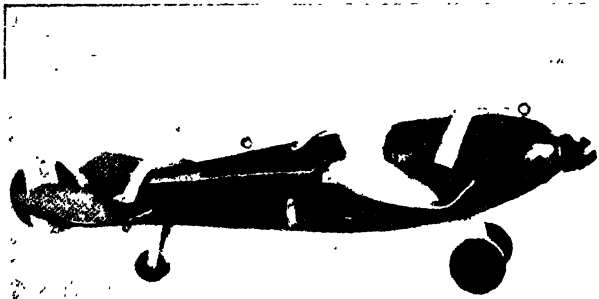
জলের উপরে ডুবজাহাজ

জলের ভিতরে ডুবজাহাজ

ডুব জাহাজ

শত্রু পক্ষীয় জাহাজ ধ্বংস ক'রবার জন্য কয়েকজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক মিলিত হয়ে এক প্রকার "ডুব জাহাজ" তৈয়ারী ক'রেছেন, যার আকার অনেকটা বিমান-পোতের মতো। তবে বিমানপোত যেরূপ নিম্ন থেকে ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠ্‌তে থাকে, ডুব জাহাজ সেইরূপ জলের উপর থেকে ক্রমশঃ নীচে নেমে গিয়ে বিমান পোতের গতির মতো তীব্র গতিতে জলের ভিতরে চল্‌তে থাকে। আবার ইচ্ছা মতো জলের উপরেও উঠে আস্‌তে পারে।

কর্কট চিকিৎসার যন্ত্র

মানব শরীরের একেবারে অভ্যন্তর প্রদেশে কর্কট (Cancer) ব্যাধি হলে রণজেন রশ্মির দ্বারা তা'র চিকিৎসা ক'রবার জন্য Dr. W. D. Coolidge নামক একজন বৈজ্ঞানিক একটী নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। ঐ যন্ত্রের

সাহায্যে রোগীর শরীরে যে কোনও স্থানে কর্কট ব্যাধি হ'ক না কেন, বৈজ্ঞানিক কুলিজ রণজেন-রশ্মি ব্যবহার ক'রে তা'কে একেবারে নিরাময় ক'রে তোলেন।

কর্ক্‌ট-চিকিৎসার যন্ত্র (বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে যন্ত্র পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ছেন)

চিত্ত-বৃত্তি পরিবর্ত্তক যন্ত্র

সম্প্রতি Thomas Wilfred নামক একজন বৈজ্ঞানিক "Colour Organ" নামক একটি নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রেছেন, যে যন্ত্রের সাহায্যে তিনি মানবের ইচ্ছাশক্তিকে নিজের ইচ্ছা মতো পরিবর্ত্তিত ক'রে দিতে পারেন।
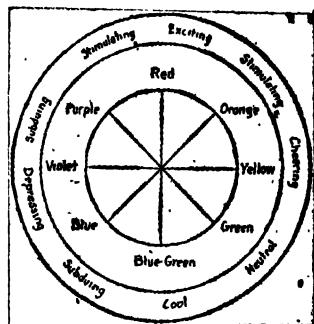
চিত্ত-বিক্ষেপের বৈচিত্র্য

(চিত্তবৃত্তি নির্দ্দেশক যন্ত্র হইতে নিক্ষিপ্ত বর্ণসম্পাতে যে প্রকার চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত তা'রই একখানি চিত্র)

ঐ যন্ত্রের দ্বারা আলোকের বর্ণ বিভিন্ন প্রকারের করে' তিনি মানব চিত্তকে কখনও বিমর্ষ কখনও হৃষ্ট করে রাখ্‌তে পারেন। এই যন্ত্রের আলোক সাহায্যে অনেক রোগীকে তিনি দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা ক'রতে পেরেছেন।

চিত্তবৃত্তি নির্দ্দেশক যন্ত্র আলোক রেখা

(চিত্তবৃত্তি নির্দ্দেশক যন্ত্র হ'তে নিক্ষিপ্ত একটি আলোকরেখার চিত্র)

সমুদ্রে প্রবেশের উপায়

জাহাজ সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হলে সেই জাহাজের তৈজসপত্র ও ধন সম্পদ উদ্ধার করবার একটি উপায় Capt Charles Williamson নামক একজন জাহাজের কাপ্তেন উদ্ভাবন করেছেন। তিনি একপ্রকার বর্ম্ম নির্ম্মাণ ক'রেছেন, যেটি পরিধান করে' সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ ক'রে লোকে নিজের ইচ্ছা মতো চলাফেরা ক'রতে পারে; এবং

এককালে ছয় মাস বা ততোধিক কাল সমুদ্রগর্ভে থাকতে পারে ; এতে তা'র কিছুমাত্র স্বাস্থ্যহানি বা অসুবিধা হয় না।
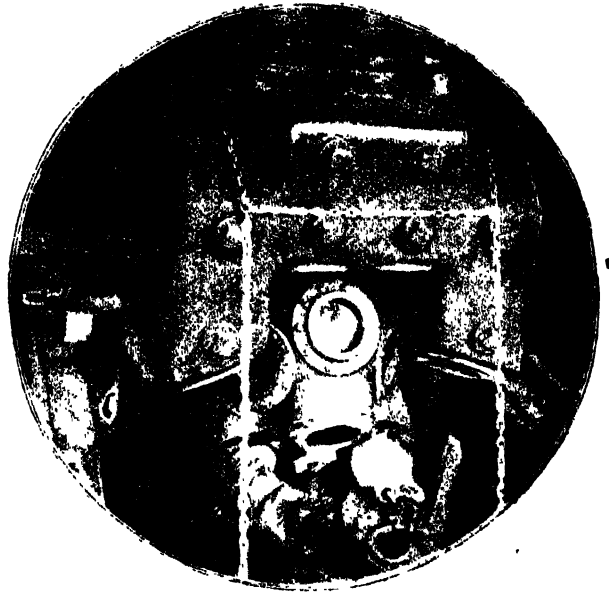
সমুদ্রের তলে
(ডুবুরী সমুদ্রের তলে গিয়ে কাজ ক'রচে)
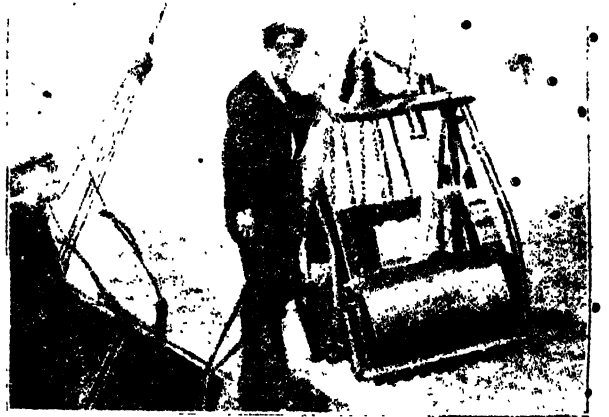
বর্ম্মসজ্জায় (একজন ডুবুরীকে চার্লস সাহেব বর্ম্ম পরিয়ে দিচ্ছেন)
সমুদ্র প্রবেশের পথে
(ডুবুরী সমুদ্র প্রবেশ ক'রবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে ; চার্লস সাহেব যন্ত্রপাতি ঠিক ক'রে রাখ্‌ছেন)

বায়ু ও খাদ্য সরবরাহের যন্ত্র।
(এই যন্ত্রের সাহায্যে ডুবুরীর জন্য উপর থেকে বায়ু ও খাদ্য সরবরাহ করা হয়)

প্রাচীন স্তম্ভ

পেন্‌সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (Pennsylvania University) যাদুঘরে ছয়টি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীন যুগের স্তম্ভ আনীত হয়েছে। এই স্তম্ভগুলির গাত্রে যে চিত্রলিপি উৎকীর্ণ করা আছে, তাহা পরীক্ষা ক'রে দেখে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত ক'রেছেন যে, স্তম্ভগুলি মিশর দেশীয় এবং খুব সম্ভব যে সময়ে Moses ও Aaron Pharaoh Merenptahএর বিরুদ্ধে Israelities দের বন্দী করার দরুণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, সেই সময়ে বা তা'র কিছু পূর্ব্বে স্তম্ভগুলি নির্ম্মিত হয়েছে বলে মনে করেন। স্তম্ভগুলি প্রত্যেকে আট ফিট উচ্চ ও ওজনে প্রায় পাঁচ টন।
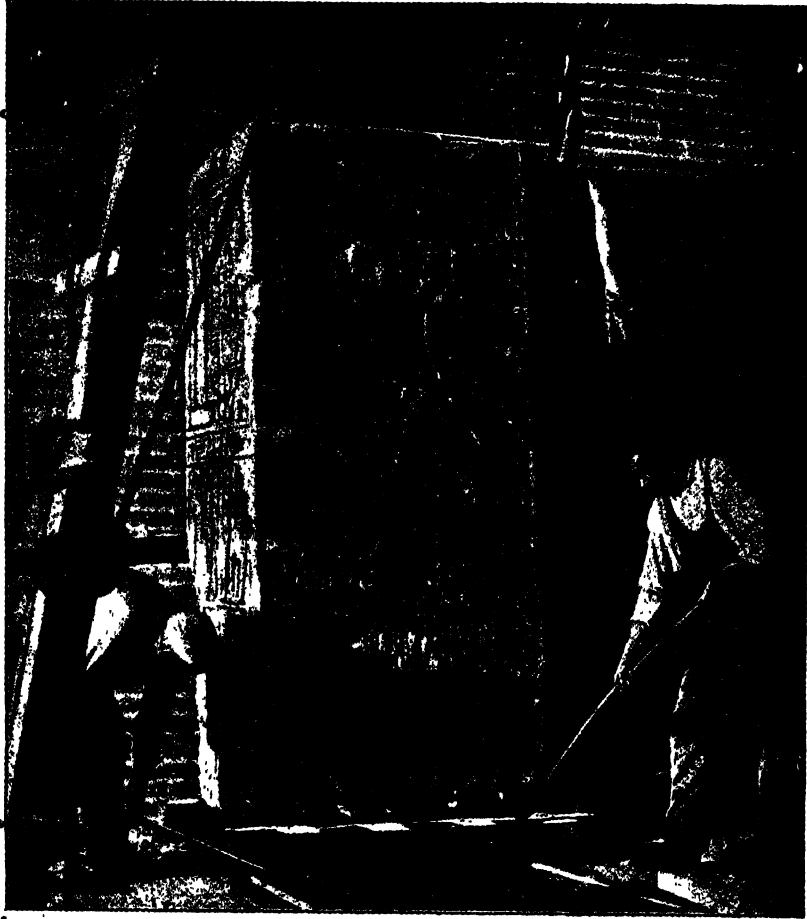
প্রাচীন যুগের স্তম্ভ
(যাদুঘরের ভিতরে কারিগররা যত্ন ক'রে স্তম্ভগুলিকে তুলে রাখ্‌ছে)

বলিভিয়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

দক্ষিণ আমেরিকার গণতন্ত্রমূলক আন্দাইন রাজ্যের মধ্যে বলিভিয়ার বিশেষত্ব বড় কম নয়। বলিভিয়া যদিও একটি বিশাল প্রদেশ, কিন্তু এর জনসংখ্যা আয়তনের অনুপাতে নিতান্ত কম। মাত্র পঁচিশ লক্ষ লোকের বাস এখানে, তবু কিন্তু তারা জগতের অন্যান্য দেশবাসীর তুলনায় এখনও অত্যন্ত পিছিয়ে পড়ে আছে।

কুইচুয়া যুবতী

গত তিরিশ বৎসরের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ও সামাজিক উন্নতির দিক দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা আশাতীত অগ্রসর হ'য়েছে বটে, কিন্তু তাদের এই উন্নতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বলিভিয়া এক পদও অগ্রসর হ'তে পারেনি। অথচ বলিভিয়ার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা এত বেশী আছে যে, দক্ষিণ আমেরিকার অপর কোনও প্রদেশের সেরূপ নাই। বলিভিয়ার খনিজ সম্পদ এ পর্য্যন্ত স্পর্শ করা হয়নি, এবং এর অরণ্যগর্ভে যে রবার সঞ্চিত রয়েছে, ব্যবসায়ীর শ্যেন-দৃষ্টি এখনও সেদিকে পড়েনি। সুতরাং আশা করা যায় যে, পেরুর বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে এক-

তরুণী জননী

দিন বলিভিয়াও বিশ্বের বণিকের লোলুপ দৃষ্টি এড়াতে পারবে না। তারা সবাই সেদিন ছুটে এসে, কেউ এর খনিজ সম্পদ উদ্ধার করতে সুরু করে দেবে, কেউ এর রবারের অফুরন্ত ভাণ্ডার লুট করতে লেগে যাবে, কেউ এসে এখানে কৃষি-শিল্পের নব নব অনুষ্ঠান আরম্ভ করে দেবে।

তখন দেখতে দেখতে এখানে সব নূতন নূতন রাস্তাঘাট তৈরি হয়ে যাবে, রেলপথের বিস্তার হবে, বড় বড় বন্দর প্রতিষ্ঠিত হবে। ক্রমে বলিভিয়া জগতের অন্যান্য সুসভ্য দেশের সঙ্গে সমান আসনে উঠে আসতে পারবে।

ঘোড় শোয়ারের দল

সুসভ্য দেশ বলা চলে না। অথচ এ কথা কেউ সেখানে প্রকাশ্য ভাবে ব'ললে, শিক্ষিত বলিভিয়ান অত্যন্ত চটে যায়। কেবল কয়েক জন মাত্র শিক্ষিত নরনারী তাদের মধ্যে আছে বলেই, সেই মুষ্টিমেয় লোকগুলিকে দেখিয়ে

পালকের বিচিত্র মুকুটধারী ঢুলির দল

বলিভিয়ার রাজধানী লা-প্লাজ, যদিও বেশ একটি আরামপ্রদ সহর; তবু বলিভিয়াকে এখনও একটি সম্পূর্ণ

কোনও জাতিই যথার্থ সভ্যতার দাবী করতে পারেন না। সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় সেই দেশের জনসাধারণের

আচার ব্যবহার, চিত্তবৃত্তির প্রসার, জ্ঞান ও শিক্ষার উৎকর্ষতার ভিতর দিয়ে! এই কষ্টিপাথরে ফেলে বলিভিয়াকে যদি আজ যাচাই ক'রে দেখা হয়, তাহ'লে হয়ে পড়েনি; অথবা ব্রেজিল ও চিলির মতো তারা একটা মিশ্র জাতিতেও পরিণত হয়নি! তারা এখনও স্পেনের ভূতপূর্ব্ব অন্যায় শাসনের সাক্ষী স্বরূপ সকলের চেয়ে হীন ও
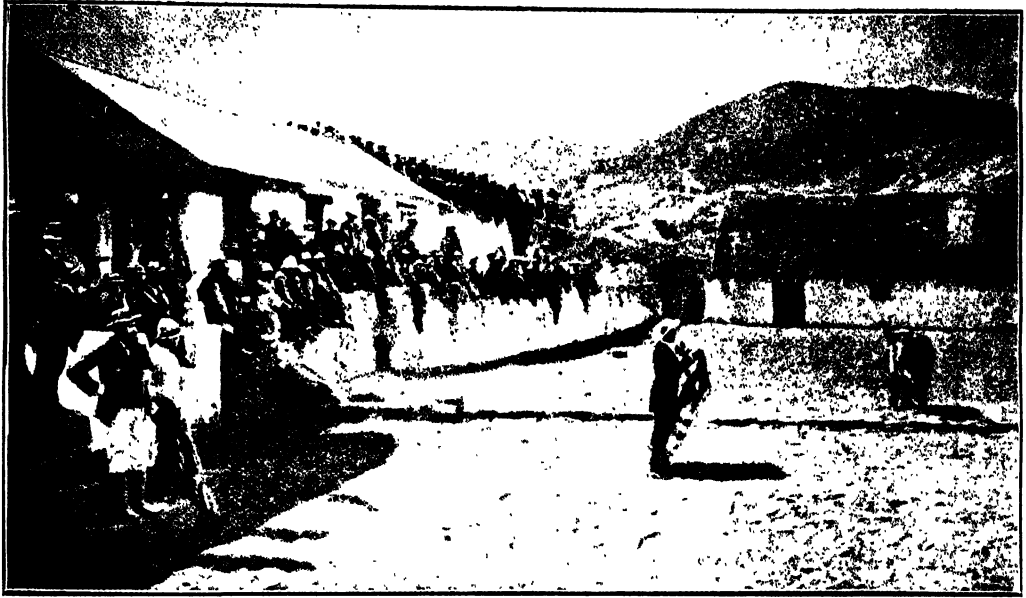
বৃষ-যুদ্ধ (বৃষযুদ্ধ বলিভিয়ার একটি প্রধান আমোদ)

দেখা যাবে যে, স্পেনের নিষ্ঠুর ও ধর্ম্মভ্রষ্ট সাম্রাজ্যের শোচনীয় শাসনের ফলে, বলিভিয়া এখনও সভ্য সমাজে অচল হ'য়ে পড়ে আছে!

বলিভিয়ান যুবক

বলিভিয়ার রেড্-ইণ্ডিয়ান আদিম অধিবাসীরা সংখ্যায় ক্রমেই কমে এসে একেবারে আর্জেন্টাইনের মতো নগণ্য

হেয় হ'য়ে পড়ে আছে ! তথাপি তারাই হ'চ্ছে বলিভিয়ার অধিবাসীদের মোট সংখ্যার বারো আনা অংশ।

বলিভিয়ার প্রাচীন স্পেনীয় বংশধরেরা এবং চোলো বা রেড-ইণ্ডিয়ান ও স্পেনীয়দের সংমিশ্রণে উদ্ভূত মিশ্র জাতিরা নিতান্ত অল্পসংখ্যক মাত্র।

রেড্ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে 'আয়মারা' ও 'কুইচুয়া' এই দুটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতির অস্তিত্ব দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ইন্‌কা দেবমূর্ত্তি

(লাপাজের যাদুঘরে এই মূর্ত্তিটি রক্ষিত আছে)

এই দুই আদিম অধিবাসীদের মধ্যে অনেক প্রভেদ। পূর্ব্বোক্তেরা হিংস্র, অশান্ত, দুর্দ্দমনীয় এবং দারুণ নিষ্ঠুর। তবু এদের পল্লী-জীবনের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে যে এক দিন একটা প্রাচীন সভ্যতা ছিল, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। তবে 'ইন্‌কা' অধীনতা এক দিন যে ভাবে তাদের অদ্ভুত প্রণালী প্রচলনের দ্বারা এদের গ্রাস করে ফেলেছিল, তাতে আয়মারাদের সে প্রাচীন উৎকর্ষতার আর চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

কুইচুয়ারা শান্তশিষ্ট লোক। সহজেই শাসন মেনে চলে। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে তাদের বৈরীভাব নেই, তবে দেবতাদের প্রত্যাদেশ পেলে বা কারুর প্ররোচনায় উত্তেজিত হ'লে, তারা ধরণী নিঃশ্বেত করবার জন্য উদ্যত হয়। 'আয়মারা' ও 'কুইচুয়া' এই উভয় জাতিই উপযুক্ত শিক্ষা পেলে, এবং আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে সুশাসিত হ'লে, আজ জগতের অন্যান্য আত্মসম্মানজ্ঞানী সভ্যজাতির

চোলো বালিকা

মতোই তারা বিশ্ব-সমাজের কল্যাণকর জীব হয়ে উঠ্‌তে পারতো। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কখনও তাদের নিয়ে সে চেষ্টা করা হয়নি। অথচ তারা যে নূতন কিছু শিখতে বা জানতে বিমুখ, এ কথা বলা চলে না; কারণ তাদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচারকেরা গিয়ে যে ইস্কুল স্থাপিত ক'রেছে, তারা সেগুলিকে বরণ ক'রে নিচ্ছে। কিন্তু এই মিশনারী প্রভুদের উদ্দেশ্য নিছক ধর্ম্মপ্রচার নয় বলেই, শিক্ষা তারা

যা পায়—সে অতি নিম্ন শ্রেণীর। কাজে কাজেই তাদের মধ্যে মদ্যপান এখনও প্রবল ভাবে চলেছে। তারা এখনও তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে থাকতে শেখেনি। নোংরা এরা, কথার খেলাপ করে না কিছুতেই। 'মরদকা বাত হাতিকা দাঁত' এটা যেন এরা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। তবে এরা বড় অমিতব্যয়ী সঞ্চয়ের দিকে এদের একটুও

উৎসব-বেশে সজ্জিত বাদ্যকরের দল

লামার পাল (ভারবাহী লোমশ উষ্ট্র বিশেষ)

ময়লাকে তারা ঘৃণা করে না। স্থানীয় রাজকর্ম্মচারী আর পাদ্রী পুঙ্গবেরা তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে নিজেদের বেশ গুছিয়ে নেয়। তারা অধিকাংশ অশিক্ষিত হ'লেও কাজে কিন্তু কখনও ফাঁকি দেয় না। কঠোর পরিশ্রমী আগ্রহ দেখতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে স্বাধীন গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েও তাদের অবস্থা যে পূর্ব্বের সেই স্পেনীয় শাসন-জোয়ালের অধীনে থাকার চেয়ে বিশেষ কিছু ভাল হ'য়েছে, এমন মনে হয় না।

তাদের অধিকাংশেরই আকৃতি বেশ প্রিয়দর্শন এবং কেউই নিতান্ত নির্ব্বোধের মতো দেখতে নয়। তবে 'হাঁ' ক'রে থাকাটা তাদের শ্বাস-বায়ুর বিষম লঘুতার জন্য অভ্যাস হ'য়ে গেছে। কারণ, তারা যেখানে থাকে, সে একটা পার্ব্বত্য উপত্যকা-ভূমি—প্রায় চোদ্দ হাজার ফিট্ উঁচু। কাজে-কাজেই তাদের 'হাঁ'করা মূর্ত্তি দেখলে, বাইরে থেকে তাদের বোকা বলেই মনে হয় বটে।

তাদের জাতীয় শিল্পে তারা সুদক্ষ কারিগর। তাদের নিজেদের প্রাচীন অস্ত্র চালাতেও তারা সুনিপুণ। তাদের মতো

রেড ইণ্ডিয়ানদের বিচিত্র বাসগৃহ
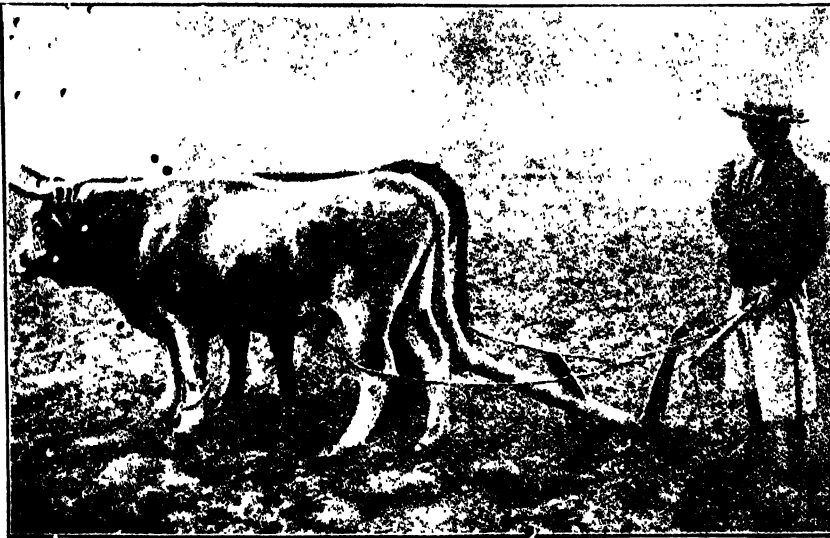
ক্ষেত্রকর্ষণ

শিকারী খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তারা বড় অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হবার সুযোগ অভাবে উৎকর্ষতা লাভ করেনি। এদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার বা ধর্ম্মভাব শিক্ষা দেয় এদের ধর্ম্মযাজকেরা। এই ধর্ম্মযাজকদের সম্বন্ধে সেনর্ পারেদিস্ নামক একজন বলিভিয়ান লেখক বলেছেন যে, তারা সকলেই অত্যন্ত অর্থলোভী ও দুর্নীতিপরায়ণ। তাদের দেখ্‌লে তাদের প্রতি মোটেই সম্মানের উদ্রেক হয় না। প্রত্যেকেই নানা রকম নীচ কুসংস্কারের ভাণ্ডার বললেই হয়। তাদের মধ্যে সকলেই প্রায় খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছে; কিন্তু, তবুও তারা যে বিশেষ কিছু উন্নত হ'তে পেরেছে, তাও মনে হয় না। একজন ফরাসী লেখক এই বলিভিয়ান খৃষ্টানদের সম্বন্ধে বলেছেন যে, ইষ্টার্ বা খৃষ্টের

জন্মোৎসব উপলক্ষে তারা যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন করে তা দেখলে মনে হবে যেন একদল পৌত্তলিক সম্প্রদায় সূর্য্যোপাসনা বা ওই ধরণের কোনও দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনা ক'রছে এবং ঠিক তাদের সেই জাতীয় প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী; কারণ সেই ধর্ম্মোৎসব উপলক্ষে তারা শেষটা যে আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান করে, সেটা ঠিক একেবারে প্রাচীন রোমের অধঃপতনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তারা যে রকম উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল কামোৎসবের আয়োজন করতো, হুবহু সেই রকমের।

বলিভিয়ান গভর্মেণ্ট যদিও রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের

মেলা ক্ষেত্র (গির্জ্জার সম্মুখস্থ ময়দানে খৃষ্টপর্ব্ব উপলক্ষে মেলা বসেছে)

পক্ষপাতী, তবু ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাদের যথেষ্ট উদারতা দেখতে পাওয়া যায়। আমেরিকার মিশনারী সম্প্রদায়কে তাঁরা সেখানে অবাধে কাজ করবার অনুমতি দিয়েছেন। এই আমেরিকান মিশনারী সম্প্রদায় বলিভিয়ার চারিদিকে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দরিদ্র বলিভিয়ানদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

গভর্মেণ্টের কাজে মজুরের অভাব হ'লে, জোর ক'রে লোক ধরে এনে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। সাধারণের প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া অনেক সময় ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও এই জোর করে মজুর সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়, এবং বলিভিয়ান গভর্মেণ্ট সেটাকে
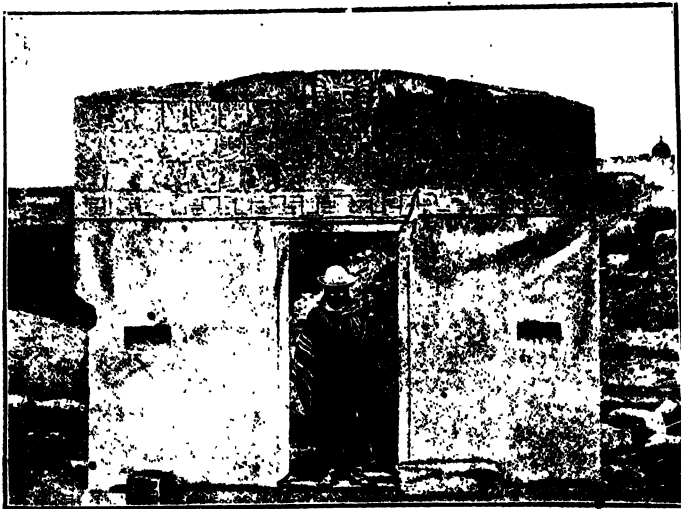
সূর্য্য-তোরণ (প্রবাদ—এইটি নাকি পশ্চিম জগতের প্রাচীনতম মন্দির। তোরণ শীর্ষে সূর্য্যমূর্ত্তি খোদিত আছে। ইহার উপর যে শিলালিপি উৎকীর্ণ রয়েছে তা অসম্পূর্ণ। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন যে, এটির নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হবার আগেই কোনও কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল)

বেআইনী কাজ বলে মনে করেন না। বলিভিয়ার রেড-ইণ্ডিয়ানরা এখনও সেই প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী কাঠের লাঙল দিয়েই জমী চষে। জমীতে তারা কোনও রকম সার দেয় না। তাদের প্রত্যেকেরই প্রায় পালে পালে ভেড়া আছে;

রেডইণ্ডিয়ান পরিবার

কিন্তু সে ভেড়ার পালের পুরীষ যে সার হিসাবে তাদের অনেক কাজে লাগতে পারে, এ কথা জেনেও তারা সেটা কাজে লাগায় না। কাঠের ফ্রেমের উপর মাটি লেপে তারা মেটে ঘর তৈরি ক'রে বাস করে। ঘরে তারা একটিও জানালা রাখে না। কেবল যাত'-য়াতের জন্য এত ছোট একটি মুখ খুলে রাখে যে, তার ভিতর দিয়ে যাওয়া আসা করবার সময় তাদের সকলকেই হেঁট হয়ে—মাথা নীচু করে ঢুকতে হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বলিভিয়ার অর্দ্ধেক আদিম অধিবাসীরা এখনও বর্ব্বর যুগে বাস করছে। শ্বেতাঙ্গদের ভয়ে তাদের মধ্যে আজকাল আর যুদ্ধ বিগ্রহ হয় না। আবার শ্বেতাঙ্গ ও অর্দ্ধশ্বেতাঙ্গরাও এদের এত বেশী ভয় করে যে, তারা সর্ব্বদা এক পল্লীতে দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। পাছে এই বর্ব্বর রেড-ইণ্ডিয়ানরা এদের একলা পেয়ে হত্যা ক'রে ফেলে এই আশঙ্কায় তারা কেউ পৃথক হ'য়ে থাকতে সাহস করে না।

রেড্-ইণ্ডিয়ান দল হয়ত শ্বেতাঙ্গদের কোনও দিনই তাদের দেশে থাকতে দিতে পারতো না—যদি না তারা একটা নেশার এতো বশীভূত হ'তো। নেশাটা অন্ত

আয়মারা কাঠুরিয়া বালিকাত্রয়

কিছুই নয়—কেবল দিনরাত্রি 'কোকো' গাছের পাতা চিবুনো! এই কোকো গাছ থেকেই বিখ্যাত নেশা 'কোকেন' প্রস্তুত হয়। অস্ত্র চিকিৎসার সময় স্থান বিশেষ অসাড় ক'রে ফেলবার জন্য চিকিৎসকেরা যে দ্রব্য ব্যবহার ক'রে, ইণ্ডিয়ানরা সেইটেকেই নিজেদের বলবর্দ্ধক ও কার্য্যে উৎসাহ সঞ্চারক এবং ক্লান্তি ও আলস্য বা জড়তা নাশক ব'লে মনে করে! সেই জন্য তারা এত অতিরিক্ত মাত্রায় এই কোকোর পাতা ব্যবহার করে যে, সেখানকার
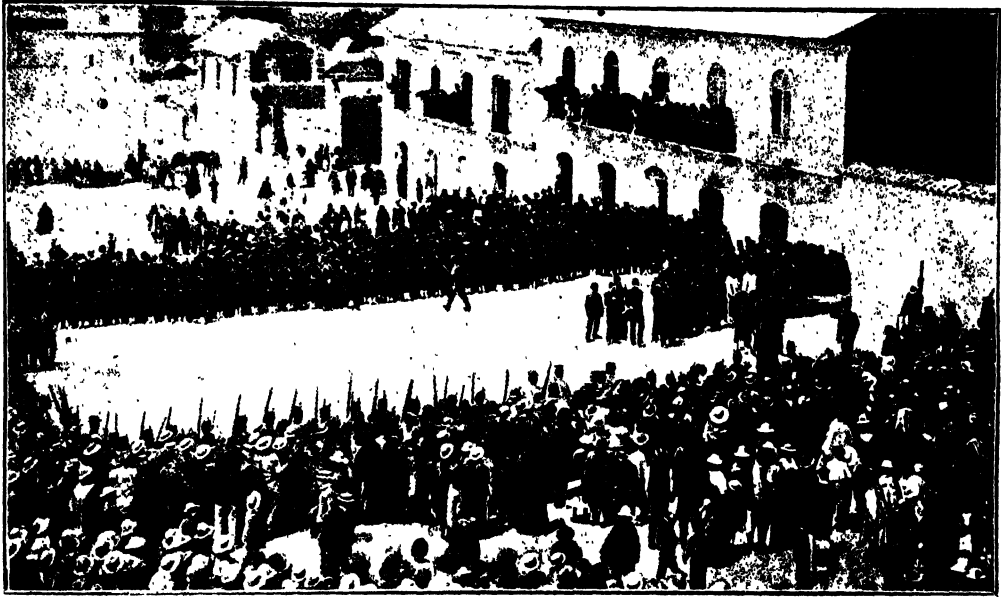
ফাঁসী তলায় (প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোনও অপরাধীর ফাঁসী দেখবার জন্য লাপাজে বিপুল জনতা হয়)

পসারিণী (রেডইণ্ডিয়ান মেয়েরা পথের ধারে বসে পাঁচরকম জিনিস বেচছে)

কলকারখানা বা খনির মালিকেরা তাদের শ্রমিকদের মজুরী দেবার সময়ে এক-এক মুঠো ক'রে এই কোকোর পাতাও দিতে বাধ্য হন। নইলে তারা কাজে আসবে না! তারা ৪।৫ দিন কিছু না খেয়ে বন্ধুর পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রম করে মাথায় মোট নিয়ে চলে যেতে পারে; যদি তাদের সঙ্গে প্রচুর 'কোকো' সঞ্চিত থাকে। তাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে একটি করে চামড়ার থলে থাকে; সেইটিতে সর্ব্বদা কোকোর পাতা ঠাসা থাকে।

সেই থলেটি কাঁধে ঝুলিয়ে তবে তারা পথে নিক্রান্ত হয়। এই রকম অতিরিক্ত মাত্রায় ক্রমাগত কোকো চিবিয়ে যাওয়ার ফলে তাদের মন ও সমস্ত স্নায়বিক চেয়ে বেশীক্ষণ কাজ করতে পারে বটে, কিন্তু কোকো সেবনের বিষময় ফলে তাদের বুদ্ধি বৃত্তির বিনাশ ঘটে এবং তারা জীবন্ত যন্ত্রে পরিণত হয়ে যায়!

ধর্ম্মোৎসবের মিছিল

কুইচুয়া যুবকবৃন্দ

শক্তি একেবারে মুসড়ে গেছে। কোকো না খেলে তারা যতক্ষণ খাটতে পারে; কোকো খেলে অবশ্য তার

বলিভিয়ার শাসক সম্প্রদায় প্রধানতঃ সকলেই 'প্রাচীন স্পেনীয় বংশধর। এরা অনেকেই বেশ সুশিক্ষিত ও সভ্য;

কিন্তু কোনও রকম স্বাধীন উপজীবিকার দিকে এদের মোটেই ঝোঁক নেই। সরকারী চাকুরীর উপরই সকলের প্রবল লোভ। কাজেই এ জিনিসটা তারা একেবারে

ধীবরের দল (মাছধরা বালশায় চড়ে এরা জাল নিয়ে বেরিয়েছে)

পটোশীয় অধিবাসীবৃন্দ

একচেটে করে নিয়েছে। তবে একটা সুবিধে এই যে, শাসক সম্প্রদায় হিসাবে বা রাজকর্মচারী হিসাবে এরা লোক মন্দ নয়। অন্যায় ও অযথা অত্যাচার ক'রে এরা ক্ষমতার অপব্যবহার ক'রে না। রাজ্যের ও দেশের কল্যাণের জন্য এদের একটা আন্তরিক চেষ্টা আছে; এবং তারই ফলে বলিভিয়া বেশ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। বলিভিয়ায় ধনীর সংখ্যা খুবই অল্প বটে,

কিন্তু নিতান্ত দীন দরিদ্রও সেখানে কেউ নেই। ইণ্ডিয়ানরা যদি এতটা উদাস ও নির্ব্বিকারচিত্ত না হ'তো, তা হলে বলিভিয়ার চারিদিকে যে ধনরত্ন ছড়ানো আছে, তা আহরণ করে এনে তারা দেশকে ও নিজেদের সম্পদশালী করে তুলতে পারতো। এখন বিদেশী বণিকদের দৃষ্টি এই দিকে পড়েছে। বলিভিয়া তার ধনরত্ন উদ্ধারের জন্য শীঘ্র যদি নিজে না সচেষ্ট হয়, তা হ'লে অবিলম্বে বিদেশীরা গিয়ে তাদের সেই গুপ্ত ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করে নিয়ে আসবে।

সন্তানবতী জননীর দল

নীড়েন দিয়ে মাটি খোঁড়া

চোলোরা অর্থাৎ স্পেনীয় ও ইণ্ডিয়ানের সংমিশ্রণে উদ্ভূত যে সঙ্কর জাতি, তারা বেশ বুদ্ধিমান, ভদ্র, সভ্য ও বিনয়ী এবং সুরসিক লোক। তাদের শরীরও বেশ বলিষ্ঠ। স্পেনের রক্ত তাদের দেহে প্রবাহিত হচ্ছে বলে তাদের বেশ একটা গর্ব্ব আছে। স্বাধীন উপজীবিকা ও ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে যেটুকু ঝোঁক, তা কেবল এই এদেরই মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এরা
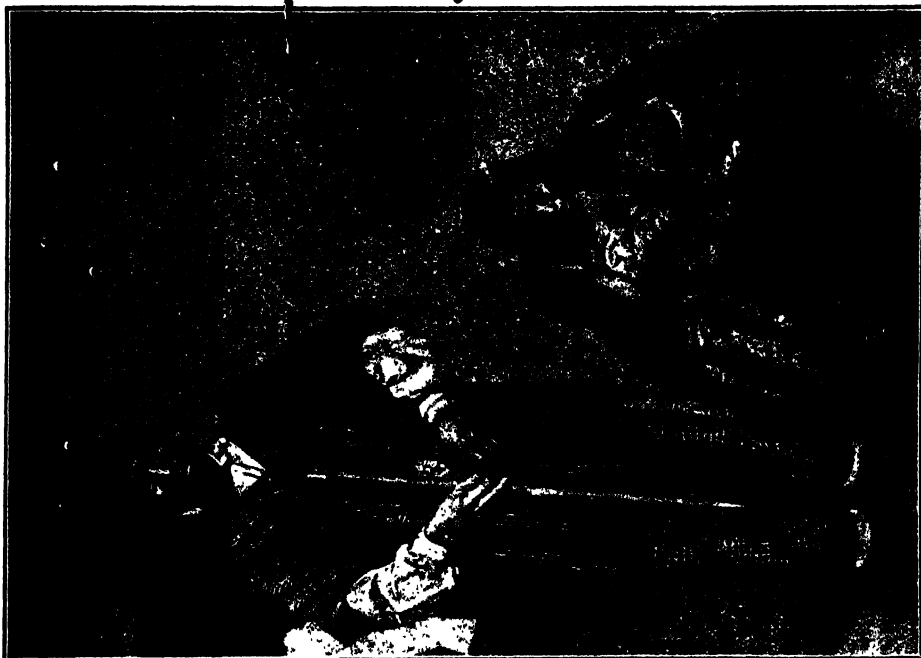
কুইচুয়া সর্দার ও তার পত্নী-পুত্র
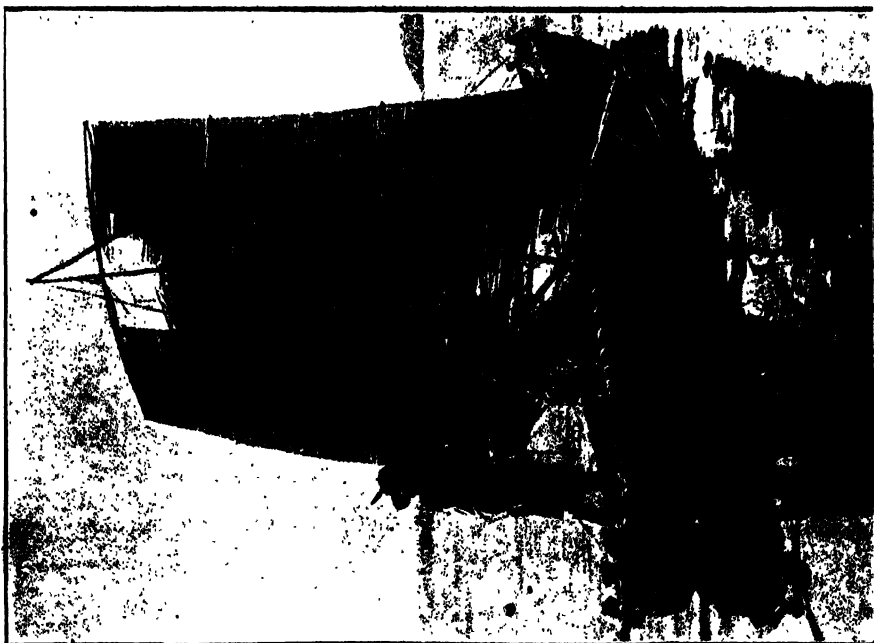
বাল্সা তরী (নৌকাকে এরা বলে বাল্সা। কাঠের তৈরি এই নৌকাগুলির পাল শুঁকাঠিতে চাটাইয়ের মত বোনা)

হ'চ্ছে বলিভিয়ার ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল। কেবলমাত্র একটা অবশ্যম্ভাবী সামাজিক বাধা ছাড়া শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে এদের সমান ভাবে চলবার আর কোনও বাধা নেই। এরা যে-কোনও ব্যবসা, যে' কোনও পেশা এবং রাজ সরকারের যে-কোনও উচ্চপদ ইচ্ছা করলেই গ্রহণ ক'রতে পারে। যদিও চেহারায় ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে এদের আকৃতির পার্থক্য খুবই কম; এমন কি পোষাকের প্রভেদ না থাকলে হয় ত অনেক চোলোকে ইণ্ডিয়ান বলেই মনে হ'তে পারতো। কিন্তু গুণে তারা শ্বেতাঙ্গদেরই সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে চলতে চায়। ইণ্ডিয়ানদের এরাই বেশী ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখে এবং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাদের 'ইণ্ডিয়ো' ব'লে উল্লেখ করে! 'ইণ্ডিয়ো' শব্দটা তারা 'ষ্টুপিড্' অর্থে ব্যবহার করে। চোলোদের যদি কেউ 'ইণ্ডিয়ো' ব'লে গাল দেয়, তাহলে সেটাকে তারা সকলের চেয়ে বড় অপমান ব'লে মনে করে এবং কিছুতেই সে অপমানকারীকে ক্ষমা করে না। বলিভিয়ার সমস্ত গির্জ্জা বা উপাসনা মন্দিরে তাদের অবাধ গতি। বরং শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে গির্জ্জেয় চোলোদেরই খাতির বেশী।

ইন্‌কাদের প্রাচীন বাসভবন (রেড ইণ্ডিয়ানরা এই ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন ইন্‌কাবাসগুলিকে বলে "শূদ্রা"—এটি বৌদ্ধ "স্তূপ" শব্দের অপভ্রংশ কি না, প্রত্নতাত্ত্বিকেরাই তা বলতে পারেন)

'লা-প্লাজ্' বলিভিয়ার বর্ত্তমান রাজধানী হ'লেও বলিভিয়ার প্রাচীন রাজধানী 'সুক্রে' এখনও তার প্রাধান্য হারায়নি। তবে রেল-ষ্টেশন থেকে 'সুক্রে' অনেক দূরে অবস্থিত বলে এবং একমাত্র ঘোড়ায় চ'ড়ে যাওয়া ছাড়া যাতায়াতের জন্য অন্য কোনও যানবাহনের সুবিধা নেই বলে, শাসন পরিষদ ও বিচারালয় 'ল-প্লাজে' স্থানান্তরিত হয়েছে। সুক্রে'তে কেবল প্রধান ধর্ম্মযাজক অর্থাৎ 'আর্কবিশপের' আড্ডা ও বলিভিয়ার সর্ব্বোচ্চ আদালত অবস্থিত আছে। আসামী নিয়ে যাবার অসুবিধে ব'লে জেলখানাটা 'লাপ্লাজেই' নূতন ক'রে তৈরী হয়েছে। বলিভিয়ার যিনি প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ গণরাষ্ট্রপতি এবং তাঁর মন্ত্রীবর্গ, আগে ছ'মাস সুক্রেতে ও ছ'মাস লাপ্লাজে থাকৃতেন; কিন্তু যাওয়া আসার অসুবিধের জন্য তাঁরাও আজ-কাল লাপ্লাজেই' বরাবর অবস্থান করেন। 'অস্তোযনগাস্তা' থেকে রেল পথে বলিভিয়ার মাত্র তিনটি সহরে যাওয়া যায়। উইয়ুনী, ওরুরো, আর লাপ্লাজ। 'সুক্রে' সহরটি পোটোশী প্রদেশে অবস্থিত এবং সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে এত উঁচুতে বোধ হয় আর কোন সহরই নেই। সুক্রে প্রায় ১৩৬০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এইখানে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রজত খনি ছিল। বলিভিয়া ও পেরু পুরাকালে যখন তাদের অধীনে ছিল, তখন তারা এই রজত-খনি আবিষ্কার করেছিল, তার পর স্পেনের বিজয়-বাহিনী গিয়ে যখন বলিভিয়া অধিকার করলে, তখন তারা এই রজত-খনি

লুণ্ঠন করতে সুরু করে। প্রায় সাড়ে সাতশ' কোটী টাকার রূপা এখান থেকে স্পেনে চালান হ'য়েছিল। এখন এই রজত খনিতে আর রূপা পাওয়া যাচ্ছেনা; তবে খনি এখনও শূন্য হয়নি, এখান থেকে এখন প্রচুর 'টিন' পাওয়া যাচ্ছে।

লাপ্লাজ সহরটি পাহাড়ের উপর একটি প্রকাণ্ড গহ্বরের মধ্যে স্থাপিত। বৃহৎ আগ্নেয়-গিরির মুখে যে রকম বিশাল গহ্বর দেখা যায়, সেই রকম পাহাড়ের এক বিরাট খোঁদলের মধ্যে লাপ্লাজ সহরটি নির্ম্মিত হয়েছে। লাপ্লাজের চারিদিকের সীমান্ত ঘিরে অভ্রভেদী পর্ব্বত-চূড়া দুর্গ-প্রাকারের মতো খাড়া হয়ে আছে। এক দিকে তার আন্দে গিরিশ্রেণীর গগনস্পর্শী চিরতুষারাচ্ছন্ন আগ্নেয় চূড়া 'ইলিমাণী' শৃঙ্গ যেন এই সহরের পশ্চাতে এক-জন দেহরক্ষী প্রহরীর মতো দিবারাত্র সজাগ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই আগ্নেয়-গিরিচূড়ার উপর থেকে দেখ্‌লে মনে হয় 'লাপ্লাজ' যেন এক সমতল ভূমির উপর স্থাপিত; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে লাপ্লাজের খাড়া খাড়া প্রবেশ-পথগুলি এত ঢালু ও গড়ানে যে বর্ষাকালে কাদার সময় সে পথ দিয়ে নামা এক অসাধ্য-সাধন ব্যাপার!

চিলি থেকে যাঁরা লাপ্লাজে আসে তাদের বলিভিয়ায় পা দিয়েই একটা বিষণ্ণকর মরুভূমি পার হ'তে হয়। এই বিস্তীর্ণ মরুপ্রদেশের কোথাও একটি সবুজ তৃণ পত্র মাত্র দেখতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে কেবলই চখে পড়ে সারি সারি পর্ব্বত-শ্রেণী। আকাশ যখন বেশ পরিষ্কার থাকে, তখন এই পর্ব্বতমালার প্রত্যেকটি স্পষ্ট চখের উপর ভেসে উঠে; কিন্তু মেঘলা দিনে তারা জলধর জলদের আড়ালে এমন বেমালুম আত্মগোপন করে থাকে যে, তাদের ছায়া পর্য্যন্ত আর কারুর দৃষ্টিগোচর হয় না।

বর্ষায় যখন চাষবাস সুরু হয়, তখনও অতি অল্পসংখ্যক লোককেই লাঙল কাঁধে ক্ষেতের কাজে লাগতে দেখা যায়, কারণ এ জাতটাই এমন অসাধারণ কুঁড়ে যে চাষবাসের ধার দিয়েও যেতে চায়না। বলিভিয়ার যাত্রীদের দেশটা সম্বন্ধে প্রথমটাতেই একটা বদ্ধারণা হ'য়ে যায়। মনে হয় এ দেশটা বড় মলিন, বড় বিষাদোদ্দীপক, বড় নীরস!

১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত লাপ্লাজে প্রবেশ ক'রতে হোতো ঘোড়ার গাড়ী চড়ে। ঢালু রাস্তায় নামবার সময় গাড়ী এমন জোরে চল্‌তো এবং পাহাড়ের রাস্তা বলে গাড়ী এমন ঝাঁকানী খেতো যে, আরোহীরা ভীত হ'য়ে উঠ্‌তো। এখন এই ঢালু পথে রেল লাইন পেতে ইলেকট্রিক ট্রেনে যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয়। সামনে পেছনে দুখানি ইঞ্জিন, খুব আস্তে ট্রেন চলে; কাজেই আরোহীদের আর কোনও ক হয়না। এই ঢালু পথ দিয়ে প্রায় ১৪০০ ফুট নীচে নামলে তবে সহরে গিয়ে পৌঁছানো যায়। এ সহরটিও প্রায় ১২০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। সহরের ভিতর দিয়ে একটি স্বচ্ছ গিরি-নদী প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। নদীর দু'ধারে লাল টালির ছাদওয়ালা সাদা সাদা বাড়ীগুলি দেখ্‌তে ভারি সুন্দর! রেড-ইণ্ডিয়ান ও চোলোদের রঙীন ও রকমারী পোষাক সহরের সৌন্দর্য্য অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছে।
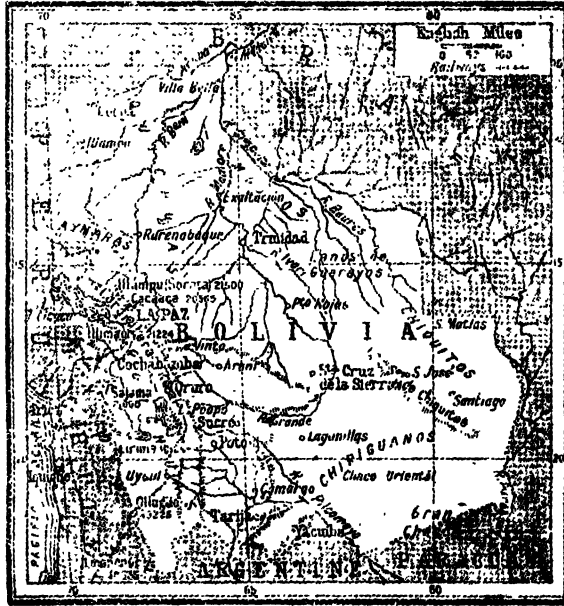
গর্দ্দভ, অশ্বতর ও লামার দল দিবারাত্র তাদের বোঝা নিয়ে সহরের একধার থেকে আর একধারে যাতায়াত ক'রছে। লামারাই হ'চ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার অনাদি কালের সুপ্রসিদ্ধ ভারবাহী জীব।

বলিভিয়ার মানচিত্র

চোলো মেয়েদের পোষাক অনেকটা রঙ্গালয়ের নর্ত্তকীদের মতো। তলায় নানা বর্ণের অনেকগুলো পেটি-কোট চড়িয়ে তার উপর একটা খাটো ঘাগ্‌রা পরে। লাল কিম্বা নালরংয়ের জালি মোজা পায়ে দেয়। গায়ে একখানা শাল জড়ানো থাকে। মাথায় একটা বনাতের টুপী পরে। গ্রীষ্মকালে সবার হাতে এক একখানা হাত-পাখা থাকে। লীলায়িত ভঙ্গীতে সেই পাখাখানি নেড়ে তারা যখন বাতাস খায় তখন তাদের ভারি সুন্দর দেখায়। বলিভিয়ার মেয়েরা সবাই সিগারেট্ খায় বটে, কিন্তু তারা এমন সভ্য, ভব্য, ভদ্র, বিনয়ী ও লজ্জাশীলা যে বাইরে থেকে তাদের মোটেই এত ভালো মেয়ে বলে বুঝ্‌তে পারা যায় না। বলিভিয়ার বাজারে চালডাল শাকসব্জীর সঙ্গে আর একটা জিনিস খুব বেশী বিক্রয় হ'তে দেখা যায়; সেটা হ'চ্ছে বরফ-জমা আলু! এই বরফ-জমানো আলু খেতে সেখান-কার ছেলে বুড়ো সবাই ভয়ানক ভালবাসে। এই বরফ-জমা আলুর একটা প্রধান গুণ হচ্ছে যে বছরের পর বছর তুলে রেখে দিলেও কখনও খারাপ হ'য়ে যায়না। ষ্টু রাঁধবার সময় প্রধানতঃ এই বরফ-জমানো আলু ব্যবহৃত হয়।

এক সময় সমগ্র য়ুরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ সর্ব্বত্র কুইনীন্ সরবরাহ করতো এই বলিভিয়া এবং পেরু। কারণ তখন এই দক্ষিণ আমেরিকা ভিন্ন অন্য কোথাও আর কুইনীন্ উৎপন্ন হ'তনা।

যারাই প্রথম লাপ্লাজে বেড়াতে যায়, তারাই সেখানে গিয়েই গোড়ায় অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। মাথাধরা, জ্বর, নিদ্রাহীনতা, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, ক্ষুধানাশ এইসব অসুস্থতার লক্ষণ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেখানকার আবহাওয়ার চাপের লঘুত্ব ও বাতাসের ভার-বিরলতার জন্য এই সব পীড়ায় প্রথমটা অসন্তোষ উৎপাদন করে। বেশী দূরে বা বেশী জোরে হাঁটিলেই একটা যন্ত্রণাদায়ক অস্বস্তি বোধ হবে। ঘোড়া ছুটিয়ে গেলে ঘোড়ারও এই অবস্থা হয়। বেশী দূর আর সে ছুটতে পারে না।

বিদেশীদের মধ্যে জার্ম্মাণদের আধিপত্য লাপ্লাজে সকলের চেয়ে বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ব্যবসা বাণিজ্য অধিকাংশই এই জার্ম্মাণদের হাতে। বলিভিয়ার সৈন্য-বাহিনী জার্ম্মাণ রণপদ্ধতিতে শিক্ষিত হয়েছে। জনকতক জার্ম্মাণ সৈন্যাধ্যক্ষ এখনও বলিভিয়ার সমর-বিভাগে নিয়োজিত আছে। শাসনবিভাগেও কোনও কোনও উচ্চপদে জার্ম্মাণ কর্ম্মচারীদের দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

বলিভিয়া যে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও টিনের খনি সেদেশে অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে তাকে ঐশ্বর্য্যশালী করবার জন্য অপেক্ষা করছে। বলিভিয়ার লোকবলও যথেষ্ট, সুতরাং তাদের সুদিন যে সমাগতপ্রায়, এ ভবিষ্যদ্বাণী অনায়াসে করা যেতে পারে।

বাদানুবাদ

আমার শেষ কথা

শ্রীরাধারাণী দত্ত

বৈশাখের 'ভারতবর্ষে' দেখিলাম আমার প্রবন্ধের আরও একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, এবার প্রতিবাদকারিণী একজন বিদুষী নারী। ইনি দেখিতেছি নিখিল মানবধর্ম্মগত মনোধর্ম্মটাকেই প্রায় অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন।

মানবের মনোধর্ম্ম যে সকলকারই মধ্যে একই ধারায় এবং একই রূপে'র মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে, এমন কথা আমার প্রবন্ধে কোথাও বলা হয় নাই! আমি মনোধর্ম্মের স্বভাব—সৎ, সুন্দর ও আনন্দের প্রতি আকৃষ্ট বা অবনত হওয়া, ইহাই মাত্র বলিয়াছি।

সকল মানব যে একই বস্তুর মধ্যে—এই সুন্দরত্ব, দেবত্ব ও আনন্দের সন্ধান পাইয়া থাকেন, ইহা আমি বলি নাই!

মনোধর্ম্ম বলিতে আমি মহত্ত্ব, দেবত্ব, উচ্চ গুণবিশিষ্ট অসাধারণ চরিত্র এবং সুন্দর ও আনন্দের প্রতি মানবের স্বাভাবিক আকর্ষণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহার প্রকৃত অর্থ প্রতিবাদকারিণী আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। উঁহার মোটামুটি একটা কদর্থ অনুমান করিয়া, ক্রোধান্ধ চিত্তে প্রতিবাদ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। প্রতিবাদকারিণী শালগ্রাম শিলার প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও প্রেম ভক্তির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রবন্ধোক্ত মনোধর্ম্মকে 'ভ্রান্তি' এবং 'বিকৃত-শিক্ষালব্ধ ফল' বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন, অথচ প্রবন্ধকথিত 'সুন্দরের প্রতি স্বাভাবিক-আকর্ষণে' তিনিও জড়িতা হইয়া পড়িয়াছেন। ঐ শালগ্রাম শিলার মধ্যেই তিনি প্রবন্ধ-কথিত 'দেবত্ব' ও 'সুন্দরত্ব'

এবং 'আনন্দে'র সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়াই সেখানে অবনতা হইয়াছেন।

প্রতিবাদকারিণী "সৎ ও সুন্দরের প্রতি মনের স্বাভাবিক-আকর্ষণে অবনত হওয়া" অর্থে কেবল মাত্র 'পুরুষ' বা 'পরপুরুষ' বলিয়া বুঝিয়াছেন এইরূপ মনে হয়। কিন্তু বাস্তব-জগতে জীবন্ত-মানবের চেয়ে মানুষ যে অনেক সময়ে কল্পনায় মানব বা দেবতা সৃষ্টি করিয়া অনেক বেশী সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও আনন্দ উপভোগ করে, ইহা তাঁহার শালগ্রাম-প্রীতি হইতেই সপ্রমাণ হয়। ইহা ব্যতীত জগতে সর্ব্বপ্রকার পৌত্তলিক ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিতে এবং ভারতবর্ষে হিন্দু মহাজাতি বিদ্যমান থাকিতে এ সত্যটি এখানে কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। রাজরাণী মীরাবাই স্বামী, সংসার ও রাজ্যসুখভোগ ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারিণী হইয়া বৃন্দাবনের পানে ছুটিয়াছিলেন কাহার সন্ধানে? কিসের প্রেরণায়? সেও কি সুন্দরেরই, আনন্দেরই, সত্যেরই আকর্ষণে নহে?

মনোধর্ম্মের মূলই হইতেছে আনন্দ ও সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। ইহা জাতি সমাজ শিক্ষা ও দেশকালানুযায়ী ভাবে মানবের মধ্যে তাহাদের Tradition অনুসারে বিভিন্নতর রূপে ও বিভিন্ন ধারায় বিকশিত হইয়া থাকে। শালগ্রাম শিলার চরণে প্রণতা হইলে শ্রীমতী সুনীতি দেবীর প্রাণ স্বর্গীয় ভাবে এবং ভক্তি ও শান্তিরসে প্লুত হয় কেন? তাহার কারণ উহাই তাঁহার জ্ঞানোন্মেষ হইতে শিক্ষা, সংস্কার, ধারণা, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন এবং জাতি ও রক্তগত সংস্কার।

একজন হিন্দু নারীর মনোবিকাশে এবং তাঁহার মনোধর্ম্মের আকর্ষণীয় বস্তুতে, আর একজন খৃষ্টান মহিলার মনোবিকাশে ও তাঁহার মনোধর্ম্মের আকর্ষণীয় বস্তুতে, এবং আর একজন Athaeist রমণীর মনোবিকাশে ও তাঁহার মনোধর্ম্মের আকর্ষণকারী বস্তুতে অনেকখানি পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও এই তিন সম্প্রদায়ের মহিলাই ঈশ্বর-সৃষ্ট একই নারী এবং মনোধর্ম্মের স্বভাবও ইঁহাদের মূলতঃ এক থাকিলেও, চিত্ত-আকর্ষণকারী বস্তু নির্ব্বাচনে তাঁহাদের এই যে অনেকখানি প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহার কারণ তাঁহাদের পরস্পরের বিভিন্ন শিক্ষা, ধারণা, সংস্কার এবং জাতি ও ধর্ম্মগত Tradition।

সংযম এবং বিবেক এই দুইটি বৃত্তি মানুষের মধ্যে জাগ্রত থাকিয়া মানুষে এবং ইতর প্রাণীতে পার্থক্য বজায় রাখিয়াছে। এই মনোধর্ম্মকে যদি সম্পূর্ণ হত্যা করা বা জয় করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে এত বেদ-বেদান্ত উপনিষৎ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ কোরাণ বাইবেল ঘাঁটিবার ও তপশ্চর্য্যা, কৃচ্ছ্রসাধন প্রভৃতি করার প্রয়োজন হইত না।

সংসারে সাধারণ নারীর পক্ষে সম্পূর্ণ মনোজয় বা মনোনিবৃত্তি যখন সম্ভবপর নহে, তখন মনোধর্ম্মকে অস্বীকার না করিয়া ভণ্ডামীর মুখোসটি উন্মোচনপূর্ব্বক * সহজ ও সরলভাবে সত্য স্বীকার করা এবং ঐ মনোধর্ম্মকে সংযতভাবে বিবেকানুমোদিত পথে পরিচালিত করাই কল্যাণকর এবং মনুষ্যত্ব, ইহাই আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়

'মনোধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়া সংযম বিবেক হিতাহিত কর্ত্তব্য জ্ঞান সব জলাঞ্জলি দিয়া মনেরই অনুসরণ কর, অর্থাৎ 'স্বেচ্ছাচারে গা ভাসান্ দাও' এত বড় অশুভকর বাণী—কোনও মানুষ, কোনও নারী, এবং বিশেষ করিয়া কোনও হিন্দু নারীর পক্ষে প্রচার করা যে সম্ভব, ইহা যাঁহারা কল্পনা করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের বোধশক্তির আমি প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। এবং তাঁহারা যে আমার বক্তব্য বিষয়টিকে নিতান্তই ভুল বুঝিয়াছেন, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

পুরুষের মতো নারীরও সর্ব্ব প্রথম পরিচয় 'মানুষ'। বিশ্বে পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে প্রথমেই বলিতে হইবে 'আমি মানুষ', তাহার পরে 'আমি নারী' এবং তাহার পরে তাহার জাতি ও ধর্ম্মের পরিচয় দিতে হইবে। সুতরাং—সর্ব্বপ্রথম যদি আমরা 'মানুষ' বলিয়াই আত্ম পরিচয় দিই অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে যদি মনুষ্যত্বেরই দাবী করি, তাহা হইলে মনুষ্যত্বকেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহার পর 'নারী'-পরিচয়ে 'কন্যাত্ব' 'ভগ্নীত্ব' 'পত্নীত্ব' ও 'মাতৃত্ব' এই রূপ-চতুষ্টয়ের পূর্ণ-বিকাশে নিজের সার্থকতা এবং পরিচয় জ্ঞাপন করিতে হইবে। তাহার পরে 'হিন্দুনারী' পরিচয়ে আমাদের সমাজ জাতি ও দেশানুযায়ী সকীর্ণ-সংজ্ঞায় নিজেদের পরিচয় এবং সার্থকতা জানাইতে হইবে।

অতএব মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্বই হইতেছে সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সতীত্ব কিছুতেই মনুষ্যত্বের উর্দ্ধে স্থান লাভ করিতে পারে না। কারণ উহা পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের একটা প্রধান অঙ্গ মাত্র। মনুষ্যত্বশূন্য সতীত্বও পৃথিবীতে আছে বটে, কিন্তু তাহা কখনও সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিতে পারে না। "মনুষ্যত্বশূন্য সতীত্ব" কথাটা বলিলাম বলিয়া কেহ হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইবেন না, ধীর ভাবে এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। যেহেতু সতীত্বের স্বরূপতঃ কোনও মূল সংজ্ঞা বা নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই। যুগে যুগে 'সতীত্ব' বিভিন্ন রূপে এবং বিভিন্ন প্রথায় পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে এবং আসিতেছে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের অসংখ্য শাস্ত্র পুরাণ ছাড়িয়া দিলেও শুধু মূল মহাভারতখানি খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের যুগে যাহা সতীত্বের অন্তর্গত ছিল, আধুনিক যুগে তাহা অসতীত্বের চরম নিদর্শন। বর্ত্তমান সভ্য জগতে যদিও সমাজের মূল-ভিত্তিই হইতেছে নারীর সতীত্ব, কিন্তু তথাপি এই সতীত্ব ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বিভিন্ন নিয়মে প্রবর্ত্তিত দেখা যায়। সার্ব্বজনীন ভাবে বা সমগ্র বিশ্বের অনুমোদিত—ইহার কোনও রূপ নির্দ্ধারিত হয় নাই এবং হওয়াও অসম্ভব। কারণ স্ব স্ব সমাজের প্রয়োজন অনুসারেই সতীত্বের মর্য্যাদা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যাহা এক দেশে ও এক সমাজে অসতীত্বের চরম নিদর্শন, ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতিতে হয় ত তাহাই সতীত্বের আদর্শের অন্তর্গত—ইহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন; সুতরাং সতীত্বের স্বরূপতঃ মূল সংজ্ঞা যে কিছু নাই, ইহা বলিলে, আশা করি, অন্ততঃ শিক্ষিত সুজনেরা আমাকে গুরুতর অপরাধিনী মনে করিবেন না।

* কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ গীতা ৩য় অধ্যায়।

আমি আমাদের হিন্দুসমাজের দিক হইতে 'সতীত্ব' শব্দের অর্থ যাহা করিয়াছি, হিন্দুর পক্ষে তদপেক্ষা উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর সতীত্বের সংজ্ঞা আরও কিছু আছে কি না, আমার জানা নাই। এই প্রবন্ধে যে 'সতীত্ব-সংজ্ঞা' নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে তাহা কেবল মাত্র হিন্দু নারী এবং হিন্দু সমাজেরই বৈশিষ্ট্য। অহিন্দু জাতি ও অহিন্দু সমাজে উহা স্বীকৃত না'ও হইতে পারে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, যাহা মনুষ্যত্বের হানি করে, মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব ও সঙ্কুচিত করিয়া আনে, তাহা কখনও উচ্চ আসন লাভ করিবার যোগ্য নহে। কারণ মানব-জীবনে আমি মনুষ্যত্বকেই সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বোচ্চে বরণীয় মনে করি। সতীত্বকে আমি নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ এবং বিশেষ ভাবে হিন্দু নারীর মেরুদণ্ড বলিয়া বিশ্বাস করি। মনুষ্যত্ব ও নারীত্বকে আরও উজ্জ্বলতর রূপে বিকশিত করিয়া তোলে নারীর সতীত্ব। সুতরাং শুদ্ধ সতীত্ব যে মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক নহে বরং প্রসারক, এই ধারণাই আমি আমার প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

মনুষ্যত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বিকশিত হয় সংযমে, বিবেকের ব্যবহারে ও আত্মপ্রসারণে। যে সকল সতী স্বামীকে ব্রহ্মেরই প্রতীক্ বা ঈশ্বরের সাকার বিগ্রহ রূপে বরণ করিয়া একনিষ্ঠ প্রেমে স্বামীর প্রতি অনন্যানুরাগিণী হ'ন,—তাঁহাদের মধ্যে সংযম, বিবেক ও প্রসারতা সমভাবে বিদ্যমান থাকে; কারণ ঐ গুণগুলি ব্যতীত একনিষ্ঠ প্রেম বা অনন্যানুরাগ লাভ করা অসম্ভব। যিনি প্রকৃত সতী, স্বামীর প্রতি যাঁর সুগভীর ঐকান্তিক প্রেম ও অচলা ভক্তি বিশ্বাস সুরক্ষিত,—বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব, দেবত্ব,—সদ্গুণ ও আনন্দকর বস্তুর আকর্ষণ সেই সতীকে তাঁহার ইষ্ট হইতে স্খলিতা বা বিচলিতা করিতে সমর্থ হয় না।

হিন্দু দর্শনের কথা তুলিয়া প্রতিবাদকারিণী সর্ব্বশেষে এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে 'অসত্য' 'অশিব' ও 'অসুন্দর' বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিবার বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও উপস্থিত প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি ভয়ে সামান্য দুই-একটি সহজ ও সরল কথায় আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

যিনি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এই পরিদৃশ্যমান লীলাময় জগৎকে 'অসত্য' ও 'অসুন্দর' বলিয়া জানাইয়াছেন, তাঁহার এটাও জানা উচিত ছিল, যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' প্রভৃতি মহাবাক্যগুলি তত্ত্বদ্রষ্টা ব্রহ্মদর্শী ঋষিদের অনুভূতিজাত সত্য বাক্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে গেলে, জগতে যে আর কিছুই 'অশিব' 'অসুন্দর' ও 'অসত্য' অবশিষ্ট থাকে না! এবং ও-সবের সত্ত্বাই যে তখন অন্তর্হিত হইয়া যায়! আনন্দময় চিদ্ঘন সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই যখন এই চরাচর ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, অথবা তিনিই জগৎ রূপে প্রকাশমান, তখন 'অসত্য' 'অশিব' ও 'অসুন্দর' কোথায় থাকিতে পারে? এখানে 'অসত্য' 'অশিব' 'অসুন্দর'কে স্বীকার করিতে গেলে, ব্রহ্ম ব্যতীত আরও একটা কিছু স্বীকার করিতে হয় না কি? স্বরূপতঃ চিন্তা করিলে চরাচরে কুত্রাপিই এই 'অসত্যে'র অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। *

* এ সম্বন্ধে অতঃপর আর কোন আলোচনা প্রকাশিত হইবে না।—ভারতবর্ষ-সম্পাদক।

বসে আছি তোমারি আশায়

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ

বসে আছি তোমারি আশায়,
অরুণ তরুণ মুখে জাগাল উষায়!
এতটুকু আলোকের না পেতে ইসারা,
পাখী দিল সাড়া,
গানে গানে ভরিল আকাশ!
কুসুম সুবাস,
বাতাসে জানাল মনোব্যথা,
জেগে থাকা নিশীথের ছিল যত কথা;
তোমার সুদূর পরবাসে
বনে বনে ফুল বাসে
এমনি কি জাগে নাই ব্যথা?
প্রতি শ্বাসে মরমের জানাতে বারতা!
এমনি উষার হাসি দেখা দেয় নাই আসি
অরুণ কিরণে আঁখি মেলে'
নিশীথের বেদনার সব মুছে ফেলে!
আমি যে তোমারি লাগি
প্রতিদিন রাত জাগি;
পথ চেয়ে, চেয়ে বসে থাকি,
আর কতদিন বাকী?
বিহগী গাহিতে চায় গান,
তোমার আলোর পানে মেলিয়া নয়ান।

আশুতোষ

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পাবনা জিলার বাগ গ্রামে ১৩ই জুন ৩০শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার মধ্যাহ্নে মাতামহ-আলয়ে আশুতোষ চৌধুরীর জন্ম হয়। তাঁহার মাতা মগ্নময়ী দেবী বঙ্গদেশের দ্বাদশ ভূম্যধিকারীর অন্যতম কালীচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যা। রায় মহাশয়ের পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা দ্রবময়ী দেবী বালবিধবা; নাটোরের নিকটবর্ত্তী বক্তারপুর গ্রামের ভবানী খাঁ মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে বিধবা হইয়া তিনি চিরজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পরসেবায় ও পূজা-ব্রত-নিয়মে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। কনিষ্ঠা পরমা সুন্দরী ও সৌভাগ্যবতী মগ্নময়ী দেবী ৯।১০ বৎসর বয়সে (পূর্ব্বে রাজসাহী এক্ষণে) পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের অতি পুরাতন চৌধুরী বংশের ৺দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয়ের সহিত পরিণীতা হন। বাগ-কাশীনাথপুরের রায় মহাশয়দিগের পূর্ব্ব মান-সম্ভ্রম, বিষয়-সম্পদ অতুলনীয় ছিল। কালে সে সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—কেবল নামমাত্র আছে। রায় মহাশয়দিগের পুরাতন দেবমন্দির, প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও পরিখা-বেষ্টিত দুর্গ অদ্যাপি ছাতকে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

আশুতোষের জন্মের সহিত পরিবারে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ শ্রীমানের জন্মের পরই মায়ের এক অঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হইয়া যায় এবং নাটোর রাজধানীতে মাতৃস্বসা-গৃহে পিতৃদেব কঠিন পীড়ায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন। এই সব বিপদের উপর আবার অল্প দিনের ভিতর নবজাত শিশু অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে ও তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে।

দেশ-দেশান্তর হইতে গণক, জ্যোতিষী, এবং ঝাড়া জলপড়ার জন্য সেকালের সব গুণী, ওঝা আনা হইয়াছিল। জ্যোতিষীগণ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শিশু আশুতোষের পিতামাতার সৌভাগ্য বশতঃ পুত্র যদি রক্ষা পাইয়া যায়, তাহা হইলে সে ভারতবর্ষের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ লোক হইবে ও পিতৃমাতৃ-বংশ উজ্জ্বল করিবে! পিতামাতার জীবন রক্ষা হইয়া গেল; ক্রমে শিশুও আরোগ্য লাভ করিল।

আমি পিতামাতার প্রথম সন্তান। আমার জন্মের পাঁচ বৎসর ৮ মাস পরে প্রথম পুত্রসন্তান আশুতোষের জন্মের উৎসবটা অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। যে সকল লোক এই শুভসংবাদ লইয়া কুটুম্ব-গৃহে ও গ্রামে-গ্রামে গিয়াছিল, নিদর্শন স্বরূপ তাহারা এমন সব পারিতোষিক পাইয়াছিল যে, তাহার সাল-বনাত বহু বৎসর তাহাদের গৃহে রক্ষিত ছিল।

ছয় মাস বয়স্ক সুস্থ সবল ও সুন্দর শিশু পুত্র লইয়া মাতা মগ্নময়ী দেবী হরিপুরে আসিয়াছিলেন। সে যেন এক নব পুণ্যাহের দিন। কত গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে পুরাতন প্রজাবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অনেক "মুখ-দেখানি"ও লাভ হইয়াছিল। আমাদিগের গৃহের পূর্ব্ব নিয়মানুসারে পুত্রসন্তান জন্মিলে একটী "ছোকরা ভাণ্ডারী" বালক ভৃত্য ও একজন প্রাচীনা পরিচারিকার উপর শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হইত। মায়ের শরীর তখনও বড় দুর্ব্বল ছিল বলিয়া শিশুকে স্তন্য দিবার জন্য একটী "মেটেরনী" রাখা হইয়াছিল। শিশুকাল হইতে আশু বড় বাধ্য ও স্বভাবগুণে সকলেরই অতীব প্রিয় ছিল। খেলার মধ্যে তাহার প্রধান খেলা ছিল—পুরাতন ভৃত্যগণের সহিত একত্র বসিয়া বাসন মাজা ও গৃহের একদল রাজহাঁসকে পুষ্করিণীতে লইয়া গিয়া খৈ মুড়কী প্রভৃতি খাদ্য আনিয়া খাওয়ান। সেই সময় কুলপুরোহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় নাম, শ্লোক শিখাইতেন ও মুখে মুখে চাণক্যের শ্লোক মুখস্থ করাইতেন।

আশুর জন্ম-বৎসরের কার্ত্তিক মাসে জ্যেষ্ঠ-তাত তাঁহার পুত্র ৺নবকুমার চৌধুরী দাদা মহাশয়ের অতি সমারোহে বিবাহ দেন ও সেই বিবাহে পিতাঠাকুর শারীরিক পরিশ্রম ও অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। সেই সময় জ্যেঠা মহাশয় নববধূর পাকস্পর্শের দিন আশুর অন্নপ্রাশন দিবার সমস্ত ঠিক করায়, পিতৃদেবের মন বড় বিরূপ হইয়া যায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের অন্নপ্রাশন তাহার দাদার বৌভাতের সঙ্গে দিতে

তিনি কিছুতেই রাজি হইলেন না। আশুর নয় মাস বয়সে তাঁহার পিসিমাতারা শিশুর অন্নপ্রাশনের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ভ্রাতৃগণের নিকট পত্র লিখিয়া লোক পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু পিতৃদেব সন্তানের অন্নপ্রাশনে আর কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি "আশুতোষ" নাম রাখিতে বলিয়া পাঠাইলেন; রাশিনাম "প্রবোধচন্দ্র" কোষ্ঠীতে উঠিল। নিরুপায় আত্মীয়গণ নাটোর মহারাজের ভবানীপুরের ভবানী ঠাকুরাণীর প্রসাদ আনিয়া আশুতোষের অন্নপ্রাশন করাইলেন।

পিসীমারা এইরূপ অন্নপ্রাশনে মনে অত্যন্ত ব্যথা বোধ করিয়াছিলেন; মা কিন্তু ক্ষুণ্ণ হন নাই। তিনি হাস্যমুখে বলিয়াছিলেন; "আপনারা কেন দুঃখ করিতেছেন। ভবিষ্যতে আমার এই ক্ষুদ্র বালক মানুষ হইয়া কত লোককে অন্ন বস্ত্রে প্রতিপালন করিবে; কত লোকের অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহ দিয়া দিবে। ভবানী মায়ের প্রসাদের মাহাত্ম্যে অদ্যকার এই অন্নপ্রাশনে তাহার জীবন সার্থক হইয়া যাইবে।"

বড় ভাইয়ের অন্নপ্রাশন কি উপনয়ন না হইলে ছোট ভাইয়ের শাস্ত্রসম্মত ভাবে কোন সংস্কার হইতে পারে না; এজন্য আশু-যোগেশের একত্র অন্নপ্রাশন খুব জাঁকের সহিত আবার দেওয়া হইল। আশুর বয়স তখন তিন বৎসর নয় মাস। বাড়ীতে সেই সময়ে অন্যান্য আত্মীয় ছেলেদের হাতেখড়ির ধূম পড়িয়া গেল। আশুর অন্নপ্রাশন যেমন হয় নাই, সেইরূপ হাতেখড়িও হয় নাই। উপনয়নও দুইবার হইয়াছিল। অসময়ে মেঘ-গর্জ্জন হইলে যজ্ঞোপবীত নষ্ট হইয়া যায়। সেই কারণে দুইবার পৈতা দিতে হয়। সেই বৎসরই আমার জ্যেঠিমাতার মৃত্যু ও তৃতীয় ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হইয়াছিল। অর্দ্ধোদয় যোগের সময় পরিবারের অনেকের অকালমৃত্যু হওয়াতে বড় পিসীমাতা রোগশয্যায় শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। জ্যেঠা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র কালীপ্রসন্ন দাদা ও কন্যা স্বর্ণময়ী দেবী অসময়ে মারা যান। এই সমস্ত শোকে পিতৃদেবও একা প্রবাসে না থাকিতে পারিয়া নববর্ষের প্রারম্ভে বৈশাখ মাসে আমাদিগকে তাঁহার কর্ম্মস্থান বনগ্রামে লইয়া যান। তিনি সেখানকার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আশু তখন সাড়ে চারি বৎসরের। তিন বৎসর বয়সে আশুকে হরিপুরের গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর বনগ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। বনগ্রামে আসিবার পরেই বড় পিসীমাতার গঙ্গাপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া পিতৃদেব একেবারে শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। শোক দুঃখের মধ্যে সংসারযাত্রা যেমন সকলেরই চলিতে থাকে, সেইরূপই আমাদিগেরও চলিতে লাগিল। আশুও নিয়মিত ভাবে স্কুলে যাতায়াত করিতে লাগিল। সেই সময় হঠাৎ এক দিন স্কুলের ইনস্‌পেক্টর আসিয়া বালকদিগের পরীক্ষা করেন। হরিপুর ও বনগ্রামের স্কুলে আশু ২।৩ খানা পুস্তক শেষ করিয়া প্রমোশন প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ইনস্‌পেক্টর বাবু তাঁহার রচিত "কুসুমাঞ্জলি" আশুকে উপহার দিয়া পিতৃদেবকে লিখিয়া পাঠান যে, "আশু একটী অক্ষরও চেনে না। অসাধারণ মেধা ও স্মরণ-শক্তির জন্য চারিখানি পুস্তকের পাঠে সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছে; অন্য পুস্তক পড়িতে দেওয়ায় তাহার এক বর্ণও চিনিতে পারে নাই। বালককে যত্ন পূর্ব্বক অক্ষর পরিচয় করাইয়া আর এক ক্লাসে প্রমোশন যেন দেওয়া হয়। অসাধারণ প্রতিভাবান বালককে যথারীতি শিক্ষা দিলে, কালে সে দেশের একটা গৌরবস্থানীয় হইবে।"

বনগ্রাম তখনকার যশোহর জেলার একটা সাব-ডিভিসন। সেইখানেই কুমুদের জন্ম। সবডিভিসনাল অফিসারের সহিত পিতৃদেবের অতিশয় আত্মীয়তা ছিল। তাঁহার বদলীর আদেশ আসিলে, তাঁহার গৃহসজ্জা ও অন্যান্য দ্রব্য প্রকাশ্যে বিক্রয় হইতে লাগিল। তাঁহার অতি প্রিয় Mary নাম্নী ঘোটকী বিক্রয়ের নিমিত্ত লটারী খেলা হয়। এক এক টাকার টিকিট কিনিয়া অনেক লোক সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। সহসা দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। মৌলবী সাহেব সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আশুর নামে ঘোড়া উঠিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়া সুসজ্জিত করিয়া, সেই প্রকাণ্ড ঘোড়ার উপর আশুকে চড়াইয়া, তাঁহার অতি পুরাতন এক-চক্ষু সহিসের হস্তে আশুকে সমর্পণ করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বৃহৎ ঘোড়া, তাহার পৃষ্ঠোপরি ক্ষুদ্র বালক সোয়ার—এই অভিনব দৃশ্য দেখিবার জন্য রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সেই হইতে আশুকে অশ্বচালনা শিখাইবার জন্য পিতাঠাকুর একটী ছোট টাট্টু

কিনিয়া দিলেন। প্রত্যহ প্রাতে সেই টাট্টুতে আশু ও Maryতে পিতৃদেব চড়িয়া প্রাতঃভ্রমণ করিয়া আসিতেন। তাহাতেই আশু বেশ ঘোড়ায় চড়া শিখিয়াছিল।

দ্বিতীয় বৎসর আবার ইনস্পেক্টর বাবু স্কুল দেখিতে আসিয়া আশুর পাঠের উন্নতি দর্শনে অবাক্ হইয়া যান; এবং অনেকগুলি ভাল ভাল পুস্তক তাহাকে উপহার স্বরূপ দিয়া পিতৃদেবের আতিথ্য গ্রহণ করেন। আশু দিবাভাগে স্কুলে ও রাত্রে পিতাঠাকুরের নিকট অধ্যয়ন করিত,—তাহার কোন গৃহ-শিক্ষক ছিল না। বনগ্রাম পল্লীগ্রাম হইলেও তথায় সাবডিভিসন থাকায় দুইজন হাকিম, স্কুল, হাসপাতাল ও কয়েদি রাখিবার ক্ষুদ্র কারাগৃহও ছিল। সুন্দর মুক্ত স্থান ও স্বাস্থ্য ভাল থাকায় আমরা সকলেই সেখানে ভাল ছিলাম।

সরকারী কর্ম্মচারীদের এক স্থানে স্থায়ী ভাবে থাকিবার সৌভাগ্য হয় না। পিতৃদেবও সেই কারণে ম্যালেরিয়া-প্রধান যশোহর সদরে বদলী হইয়া যান। সেখানে ভ্রাতৃগণকে জেলা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। পিস্তুত ভ্রাতুষ্পুত্র নগেন্দ্রনাথ আশুর অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় হইয়াও তাহারই সহিত এক শ্রেণীতে পড়িতেন। আশু তখন পরাক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া অতি প্রশংসার সহিত প্রাইজ ইত্যাদি পাইত।

যশোহরে থাকার কালে আশুতোষের তৃতীয় সহোদর প্রতিভাসম্পন্ন বালক দেবেন্দ্রনাথের সংক্রামক রোগে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায়, যশোহর-বাস সকলের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিলে, পিতৃদেব কমিশনার লর্ড ইউলিক ব্রাউনকে বলিয়া কৃষ্ণনগরে বদলী হন। দেবেন্দ্র যদিও ছয় বৎসরের বালক, তথাপি তাহার অসামান্য প্রতিভা দর্শনে সমস্ত স্কুলের শিক্ষকগণ ও হেডমাষ্টার ৺উমাচরণ দাস মহাশয় তাহার অকাল-বিয়োগে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়েন ও অশ্রু বর্ষণ করিতে থাকেন। পিতৃঠাকুর সপরিবারে কৃষ্ণনগরাভিমুখে রওনা হইয়া পথে বনগ্রামে সমাজ-সংস্কারক পিতৃবন্ধু ৺শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৃহে অতিথি হন। সেখানে আমরা সকলে ২।৩ দিন অবস্থান করি। আমরা দেশ হইতে প্রথম এই বনগ্রামে আসিয়াছিলাম। এইখানেই কুমুদনাথের জন্ম হয়—এইখানকার স্কুল হইতে আশু প্রথম প্রাইজ পাইয়া যশোহরে গিয়াছিল। সেই পুরাতন বনগ্রামে আসিয়া সকলেই বড় আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। আশু তখন ১২ বৎসরের বালক।

প্রথমতঃ কৃষ্ণনগরে যাইয়া কাছারীর অতি সন্নিকটে একটী সুবিধাজনক বাসা-বাটী পাওয়া গিয়াছিল। সঙ্গে পুরাতন দাস-দাসী থাকায় কোন কষ্ট হয় নাই। তবে কৃষ্ণনগরে আমাদিগকে প্রথম প্রথম লোকে খৃষ্টান মনে করিত বলিয়া দাস-দাসী, পাচক ব্রাহ্মণ ইত্যাদি পাওয়া বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রদ্ধেয় ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় এই সংবাদ পাইয়া তমলুক হইতে স্বয়ং আসিয়া আমাদিগের এই অসুবিধা দুর করিয়া দিয়া যান।

পাঠে অসাধারণ মনোযোগ স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রখর মেধার জন্য আশু শিক্ষকগণের অতীব প্রিয়-পাত্র হইয়াছিল। সেই সময় প্রবেশিকা পরীক্ষার বয়স ১৬ বৎসর থাকায়, প্রথম শ্রেণীতে প্রমোশন পাইয়াও সে বয়স অল্প বলিয়া পরীক্ষা দিতে পারিল না। তখন সু-পণ্ডিত লব সাহেব কালেজের প্রিন্সিপ্যাল। তিনি স্ব-ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া ডিরেক্টারকে এ বিষয় জানাইয়া একটা ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতৃদেব ইউনিভারসিটির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পুত্রকে পরীক্ষায় পাঠাইতে অসম্মত হইলেন।

এই সময় কর্ত্তৃপক্ষ কালেজ লাইব্রেরীতে বিনা চাঁদায় আশুকে পুস্তক পড়িবার অনুমতি দিয়াছিলেন। সুপণ্ডিত ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ও রো সাহেব অবকাশ-সময়ে তাহাকে অতি যত্নে সাহিত্য, ইতিহাস, ইংরাজী কবিতা, জীবন-চরিত পড়াইতেন। প্রথম শ্রেণীতে তাহার নাম রহিয়া গেল। সে প্রত্যহ স্কুলে উপস্থিত হইয়া নাম রেজেষ্টরী করাইয়া পরে লাইব্রেরীতে যাইয়া নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিল। অতি কঠিন কঠিন পুস্তক সকল পড়িয়া প্রিন্সিপ্যালের আদেশানুসারে তাহা হইতে প্রবন্ধ রচনা করিত। কালেজের ছাত্রবৃন্দ ও আশুর বন্ধুরা আমাদিগের গৃহে যাতায়াত করিতেন। আশুর সহিত সকলেরই খুব ভাব ছিল। "উদার চরিতানাস্তু বসুধৈব কুটম্বকম্॥" তাহার কেহ শত্রু ছিল না; আশৈশব সে অজাতশত্রু। কলেজের সভা-সমিতিতে ইংরাজী প্রবন্ধ রচনার ভার তাহারই উপর পড়িত। আশু চতুর্দশ বৎসর বয়সে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিল, তাহা এখনও ইউনিভারসিটির ক্যালেণ্ডারে মুদ্রিত রহিয়াছে।

১৬ বৎসর বয়সে আশু প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ১০৲ টাকা বৃত্তি পায়। ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকায় যদিও এফ-এ পরীক্ষায় দুই এক নম্বরের জন্য সে একবার ফেল হয়, দ্বিতীয়বারের পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত পাস করিয়া ১১৲ টাকা "শঙ্কর" বৃত্তি পাইয়াছিল। তাহার বৃত্তি হইতে কলেজের বেতন কাটিয়া দিতে হয় নাই। অতীব স্নেহশীল পিতার ইচ্ছানুসারে কলেজের বেতন গৃহ হইতে দেওয়া হইত। ঐ ১১৲ টাকা তাহার ইচ্ছামত সে ব্যয় করিত; তাহা হইতে প্রতি মাসে ছোট ভাই ভগিনী ও আমাকে অনেক সুন্দর সুন্দর ছোট-খাট উপহার দিত।

তখন কৃষ্ণনগরে মধু নামে এক মুসলমান শিকারী ছিল। সে আশুকে বড় ভালবাসিত; এবং তাহার ভাল অবস্থার সময় নানাপ্রকার খাদ্য আনিয়া আশুকে ও অন্যান্য ভাই-দিগকে খাইতে দিত। দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই সে আমাদিগের বাড়ী থাকিত। আশুর পাঠাগারে বসিয়া সে অনেক ভূত-প্রেতের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প করিত। তাহার এই নূতন আরব্য উপন্যাসের কাহিনী শুনিবার জন্য কলেজের বহু ছাত্র আমাদের বাড়ীতে মিলিত হইত। নিঃসন্তান মধু বহুকাল রোগ-শয্যাগত থাকায় তাহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। আশু বৃত্তির টাকা ও নিত্য আহার্য্য দিয়া তাহার জীবন রক্ষা করে। আশু যখন কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে যায়, তখন মধুর রোদনে আমরা সবাই বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ছুটীর সময় আশু বাড়ী আসিলে সর্ব্বাগ্রে মধু আসিয়া দেখা দিত। আশু তাহাকে কাপড় ও খাদ্য দিত এবং তাহার স্ত্রীর নাম করিয়া দুই একটা সৌখীন জিনিসও দিত। বাসা-খরচের টাকা হইতে যাহা বাঁচিয়া যাইত, তাহাও দিত। মা তাই পরিহাস করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন "শ্বশুর"।

আশৈশব গরীব দুঃখীর প্রতি দয়া থাকায়, অনেক লোক আশুর বড় ভক্ত ছিল। জীবনে আশুতোষ কখনও ধূমপান করে নাই, কিন্তু ঐ কৃষ্ণনগরেই একজন হিন্দুস্থানী তামাকওয়ালা তাহার অনুগত ভৃত্যবৎ হইয়াছিল। প্রত্যহ সে পিতৃদেবের জন্য তামাক দিতে আসিয়া ছেলেদের ঘরে যাইয়া বসিয়া থাকিত। রবিবারে খড়ে নদীতে স্নানের সময় তেল গামছা কাপড় ইত্যাদি বহন করিয়া লইয়া যাইত। সে টাকাকড়ি কিছুরই প্রত্যাশা করিত না। সে অবস্থাপন্ন লোক। অবকাশ-দিনে সে এমন সব অদ্ভুত হিন্দুস্থানী কাহিনী বলিত, তাহার সত্যাসত্য বিচার করিবার কাহারো ইচ্ছা হইত না। গল্প শুনিয়া সবাই মুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিত। সে কখন কখন দুই চারি আনার আতর আনিয়া সবাইকে উপহার দিয়া যাইত। সে পাঞ্জাবী; ধুতি, চাদর সুন্দর রূপে "চুনট" ও কখন কোঁগিলা করিয়া দিত। ছেলেদের পাঠাগারে সে সর্ব্বদা বসিয়া থাকিত বটে, কিন্তু কখন বালকদিগের পড়ার কোন ক্ষতি করিত না। আশু কলিকাতায় চলিয়া গেলে তাহার মনে অতিশয় কষ্ট হইত। সে যখন-তখন আসিয়া তাহার খবর-বার্ত্তা জানিয়া যাইত ও আশুর পত্রাদি পাইবার জন্য ডাকের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত। আশু শিশুকাল হইতেই অতি স্নেহশীল, সরল-প্রকৃতি ও প্রফুল্ল-চিত্ত ছিল।

দাস-দাসীর ও আমাদিগের কুটুম্বগণের ছেলেদিগকে আশু নিজে পড়াইত। তাহাতে দাস-দাসীগণ তাহাকে বড় মান্য ও স্নেহ করিত। আশু কলিকাতায় চলিয়া গেলে, তাহার পাঠশালা উঠিয়া যায়।

পিতৃদেব আশুর প্রবেশিকা পরীক্ষার পরেই আশুকে সিভিল সার্ভিস দিবার জন্য বিলাতে পাঠাইবার আয়োজন করিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া ৺আনন্দমোহন বসু ও ৺মনোমোহন ঘোষ মহাশয়দিগের সহিত পরামর্শ করিতে গিয়াছিলেন। তখন সিভিল সার্ভিসের বয়স ১৯ বৎসর থাকায়, বসু ও ঘোষ মহাশয় অত অল্প বয়সে আশুকে বিলাত পাঠাইবার বিষয়ে ঘোর আপত্তি করিয়াছিলেন। অপরিণত-বয়স্ক ছেলেরা বিলাত-প্রবাসে কিরূপ কুপথগামী হইতে পারে, তাঁহারা তাহার অনেক উদাহরণ দেন। সুতরাং তৎকালে আশুর বিলাত গমন বন্ধ হয়। আশু প্রেসিডেন্সিতে বি-এ পড়িতে থাকে। মেসে কিম্বা ছাত্রাবাসে না থাকিয়া আশু চাঁপাতলায় একটী বাড়ীর অর্দ্ধেক ভাড়া করিয়া সেখানেই থাকিত। দুইজন গৃহ-ভৃত্য তাহার সঙ্গে থাকে। ভ্রাতুষ্পুত্র নগেন্দ্রনাথ আশুর অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় বলিয়া তিনি সেই বাসায় থাকিয়া আশুর তত্ত্বাবধান ও এলবার্ট কলেজে অধ্যয়ন করিতেন।

সাময়িকী

বার বৎসর পূর্ব্বে যিনি 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যিনি ইহার প্রথম সংখ্যার প্রচারও দেখিয়া যাইতে পারেন নাই; ১লা আষাঢ় 'ভারতবর্ষ' প্রথম প্রকাশিত হইবে, যিনি তাহার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন, এমন সময় ৩রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে অকস্মাৎ হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হইয়া যাঁহার দেহাবসান হইল, সেই মনীষী, সেই ধীমান্ কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিকৃতি দ্বারা এই মাসের 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপট অলঙ্কৃত করিয়া আমরা সাশ্রুনেত্রে তাঁহার স্মৃতির তর্পণ করিলাম।

এবার গুডফ্রাইডের অবকাশে বাঙ্গালা দেশে কয়েকটি বড় বড় সভা ও সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ঢাকা মুন্সীগঞ্জের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন, কলিকাতার হিন্দু মহাসভা ও বর্দ্ধমানের ব্রাহ্মণ-সভা। এই তিনটী সম্মেলনেই বহু জন-সমাগম হইয়াছিল। নানা স্থান হইতে সুধিবৃন্দ এই তিনটী সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সম্মেলনের কার্য্যও অতি সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে এই তিনটী সম্মেলনেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

প্রথমেই বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের কথা বলি। ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জের অনতিদূরেই ইতিহাস-বিখ্যাত, বঙ্গের শেষ হিন্দু নরপতির রাজধানী রামপাল। বিগত বৎসরে রাধানগরে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তখন প্রথিতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর রামপালে সাহিত্য সম্মেলনকে আহ্বান করেন। কিন্তু রামপাল এখন জঙ্গলাকীর্ণ স্থান, অতীত গৌরবের শ্মশানভূমি। সেখানে সম্মেলনের অধিবেশন সম্ভবপর না হওয়ায়, রামপালের অনতিদূরে মুন্সীগঞ্জেই সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় এবং সম্পাদক হইয়াছিলেন রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন মহাশয়দ্বয়। দেশবন্ধু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তাঁহার কার্য্য স্থানীয় প্রবীণ

উকিল শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদন করেন।

———

এবারে সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচন অতি সুন্দর হইয়াছিল; সর্ব্বাংশে উপযুক্ত সাহিত্যিকগণই সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। মূল সভাপতি হইয়াছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক, সুপণ্ডিত, প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর উপযুক্ত বংশধর নাটোরাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর। সাহিত্য-শাখার সভাপতি

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হইয়াছিলেন বাঙ্গালার সর্ব্বজনপরিচিত, গল্প-সাহিত্যের যাদুকর, শ্রীমান শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়; ইতিহাস-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, প্রিয়দর্শন, সুধী শ্রীযুক্ত ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়; দর্শন-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন বিশ্ব-ভারতীর খ্যাতনামা অধ্যাপক, বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ, বিনয়ের অবতার, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়: আর বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, জনপ্রিয় অধ্যাপক, কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়। সুতরাং, সকলেই একবাক্যে বলিবেন যে, সভাপতি মহাশয়গণের নির্ব্বাচন এবার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল; যিনি যে বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, তাঁহাকেই সেই বিভাগের কর্ত্তৃত্বে বরণ করা হইয়াছিল। তাই এবার মুন্সীগঞ্জের সাহিত্য-সম্মেলন সর্ব্বাংশে শোভন হইয়াছিল এবং সভার কার্য্যও অতি শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম, যত্ন, চেষ্টা ও আদর-আপ্যায়ন পূর্ব্ববঙ্গের চিরাচরিত আতিথেয়তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

———

সম্মেলনের কার্য্য এতকাল যে ভাবে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে, মুন্সীগঞ্জেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আমরা কিন্তু বহু দিন হইতেই সম্মেলনের কার্য্য পরিচালনার সংস্কারের কথা বলিয়া আসিতেছি; এবারও সেই কথাগুলির উল্লেখ করিব। আমাদের প্রথম কথা, এই চারিটি শাখার অধিবেশন লইয়া। দুই দিনে সম্মেলনের কাজ শেষ করিতে হয়। প্রথম দিন ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ও মূল সভাপতির অভিভাষণেই কাটিয়া যায়; কোন কোন বৎসর দুই একটী শাখার অভিভাষণও সেই দিন পঠিত হইয়া থাকে। তাহাতেই দিন কাটিয়া যায়। দ্বিতীয় দিনে চারিটী শাখার অধিবেশন একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে হয়। তাহাতে বিশেষ অসুবিধা হয়। মনে করুন, যিনি সাহিত্য-শাখায় গিয়াছেন, তিনি আর তিনটী শাখায় যে সমস্ত সুন্দর প্রবন্ধ পঠিত হইল, যে সকল বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইল, তাহাতে যোগদান করিতে পারিলেন না, কিছু শুনিতেও পাইলেন না। অবশ্য, বিশেষজ্ঞেরা নিজ নিজ স্থানেই উপস্থিত থাকেন কিন্তু, সকলেই ত আর বিশেষজ্ঞ নহেন। তাঁহারা সত্য সত্যই বিভিন্ন বিভাগে উপস্থিত হইবার সুযোগ না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন। এইবার মুন্সীগঞ্জের কথা বলি। সেখানে দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে সম্মেলন-মণ্ডপেরই দুই প্রান্তে সাহিত্য ও ইতিহাস-শাখার অধিবেশন হইল; দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশন স্থানান্তরে হইল। আমরা দেখিতে পাইলাম যে, যাঁহারা সম্মেলনে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এক স্থানে স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছিলেন না; একবার এখানে, একবার সেখানে যাইতেছিলেন। ইহাতে শাখাগুলির অধিবেশন বৃথা

হইয়া গেল। আমরাই ত দর্শন ও বিজ্ঞান শাখায় যাইতেই পারিলাম না; ইতিহাস-শাখার স্থান সাহিত্য-শাখার পার্শ্বেই হইয়াছিল; তাই ইতিহাস-শাখায় একবার মাত্র যাইতে পারিয়াছিলাম; অথচ শুনিলাম, অন্যান্য শাখায় অনেকগুলি সুন্দর ও সারগর্ভ প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল; কিন্তু যাঁহারা শ্রোতা, তাঁহারা দুই নৌকায় নহে, চারি নৌকায় পা দিয়া কোন দিকেরই রসাস্বাদন করিতে পারিলেন না। এই কারণে আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে, চারিটী শাখার অধিবেশন যদি বিভিন্ন সময়ে করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে ঐ শাখাগুলি কাটিয়া ফেলা হউক, এক সাধারণ সভাতেই বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য পরিচালিত হউক; এমন করিয়া প্রহসনের অভিনয় করা কিছুতেই সঙ্গত নহে।

তাহার পর আমাদের দ্বিতীয় কথা প্রবন্ধ পাঠ সম্বন্ধে। যে বৎসরই যেখানে সম্মেলন হয়, সেখানকার অভ্যর্থনা সমিতি একেবারে দেশময় নারদের নিমন্ত্রণ করিয়া বসেন,—দেশে যত লেখক আছেন, তাঁহাদের সকলেরই নিকট 'সবিনয় অনুরোধ' করেন যে, তাঁহারা যেন সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সকলেই যদি এই অনুরোধ প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে, যেমন করিয়া হউক, বিভিন্ন বিষয়ের দুই তিন হাজার প্রবন্ধ যে সম্মেলনে উপস্থাপিত হইতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সকলেই এই 'সবিনয় অনুরোধ' রক্ষা করেন না। তাহা হইলেও, প্রতি বৎসরই তিন চারিশত প্রবন্ধ সম্মেলনে পাঠের জন্য উপস্থাপিত হয়। এই সকল প্রবন্ধের যে কি দুর্গতি হয়, তাহা ভুক্তভোগী আমরা বিশেষ জানি। শাখা-সভার অধিবেশনে তিন চারি ঘণ্টার অধিক সময় পাওয়া যায় না। এই অল্প সময়ের মধ্যে শাখা-সভাপতি মহাশয়গণ এতগুলি প্রবন্ধের গতি কেমন করিয়া করিবেন? আমরা জানি, বিভিন্ন বিভাগে যে সমস্ত প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়, তাহার অধিকাংশই সারগর্ভ এবং তথ্যপূর্ণ। কিন্তু, সেই সকল প্রবন্ধের তিনটী কি চারিটী যদি আগাগোড়া পড়িতে দেওয়া হয়, তাহা হইলেই শাখার সময় কাটিয়া যায়। এ অবস্থায় সভাপতি মহাশয়েরা কি করিবেন? তাঁহারা কোন প্রবন্ধ কবন্ধ করেন, কোন প্রবন্ধ 'পঠিত বলিয়া গৃহীত' করেন, কোন প্রবন্ধ আমলেই আসে না। ইহাতে যে প্রবন্ধ লেখকগণ কি মনোকষ্ট অনুভব করেন, তথা নিজেদের অবমানিত মনে করেন, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। আমরা ক্রমাগত বলিয়া আসিতেছি যে, এমন নারদের নিমন্ত্রণ করিয়া প্রবন্ধ আনিয়া তাহাদের এমন দুর্গতি করা কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যেক বিভাগের দুই তিন জন বিশেষজ্ঞকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধ লিখাইলে, তাহাতে কাজও হয়, অনর্থক মনোকষ্টেরও কারণ

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার

হয় না। আর, তাহা হইলে 'সম্মেলন' শব্দের যে অর্থ, তাহারও সার্থকতা সম্পাদিত হয়। সভা করিয়া আর প্রবন্ধ শুনিয়া সময় কাটিয়া যায়, পরস্পরের সহিত মিলন হইবার সময় ও সুবিধাই হয় না। আমরা সম্মেলন-পরিচালন-সমিতিকে এ কথা কতবার বলিয়াছি; কিন্তু কেহই সে সকল কথায় কর্ণপাত করেন না।

এইবার হিন্দু মহাসভার অধিবেশনের কথা বলি। কলিকাতার হ্যালিডে পার্কে প্রকাণ্ড মণ্ডপে এই মহা-

সভার অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং মূল সভাপতি হইয়াছিলেন পঞ্জাব-কেশরী লালা লজপত রায় মহোদয়। এই সভায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেশ-বিখ্যাত নেতা ও কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য মহোদয় ও এই মহাসভায় যোগদান করিয়াছিলেন। যাহাতে সমগ্র হিন্দু-সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধিত হয়, সে সম্বন্ধে এই মহাসভায় কয়েকটী মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন প্রস্তাব মাঝামাঝি ভাবে গৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ অনেক স্থানের (দক্ষিণাঞ্চলে আরও বেশী) হিন্দুগণ অস্পৃশ্য জাতির জল আচরণ দূরে থাকুক, এক কূপ হইতে জল তুলিতেও দেন না; মহাসভা এ সম্বন্ধে মাঝামাঝি কথা বলিয়াছেন; তাঁহারা মন্তব্য করিয়াছেন, এক কূপের জল ব্যবহার না করিয়া অস্পৃশ্য জাতির জন্য পৃথক কূপের ব্যবস্থা করা হউক এবং তাহাদিগের প্রতি যে প্রকার ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কম করা হউক। এই মহাসভা তথাকথিত নিম্ন জাতির বেদপাঠের অধিকারও সমর্থন করেন নাই।

—

এই গেল হিন্দু মহাসভার কথা। বর্দ্ধমান সহরে এই সময়ই ব্রাহ্মণ সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি হইয়াছিলেন তাহিরপুরের রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর। এই সভা সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রাহ্মণগণের উন্নতি বিধানের জন্য অনেকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন। যাহাতে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণ প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করেন, তাহার জন্য এই সম্মেলন চেষ্টা করিবেন; সর্ব্বত্র প্রচারক প্রেরণ করিয়া ব্রাহ্মণ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবেন। এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য ধন-ভাণ্ডার স্থাপনের কথা হইয়াছে।

—

বিগত ১৯শে বৈশাখ ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশপূজ্য মহাত্মা গান্ধী এই সম্মেলন-ক্ষেত্রে, শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও, উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা যেমন সুন্দর, তেমনই সরল। তাঁহার কথার মধ্যে কোন রাষ্ট্রনীতির চাল বা পলিসি ছিল না;—তিনি অতি সুস্পষ্ট ভাবে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার এই সুন্দর অভিভাষণের কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

—

অভিভাষণের আরম্ভেই দেশবন্ধু বলিয়াছেন, "যুগে যুগে ভারতবর্ষ এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, 'মুক্তি কোন্ পথে?' ইহাই ভারতবর্ষের আত্মপ্রশ্ন। বেদের অতি প্রাচীনতম মন্ত্রে এই প্রশ্ন ধ্বনিত হইয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর চৈতন্যচরিতামৃতেও এই প্রশ্নের সমাধানের একটা চেষ্টা চলিয়াছে। এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করিয়া কেবল ধর্ম্ম নহে, কেবল দর্শন নহে, কেবল কাব্য—মহাকাব্য বা সাহিত্যও নহে, পরন্তু কত বড় বড় সাম্রাজ্য—কত বড় রাজপ্রতাপ আমাদের জাতির ইতিহাস-পথে গড়িয়া উঠিয়াছে—আবার কালক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইতিহাসের পথ—গতিমুক্তির পথ। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস—তাহাও এক প্রচণ্ড গতি-পথে—যুগে যুগে মুক্তি পাওয়ার ইতিহাস, অথবা এক চিরন্তন মুক্তি-পথে পুনঃ পুনঃ অতি দুর্দ্দম গতিবেগের ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাস কেবল ধর্ম্মের ইতিহাস নহে। শুধু দাসত্বের ইতিহাসও নহে। যুগের অবসানে অথবা যুগের প্রারম্ভে—ভারতবর্ষ আবার আজ সেই সনাতন প্রাচীন প্রশ্নই—নূতন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—'মুক্তি কোন্ পথে?' এই প্রশ্নের সমাধানে আবার কোন্ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিবে,—এবং কোন্ সাম্রাজ্যই বা ভাঙ্গিয়া পড়িবে—তাহা ইতিহাসের ভাগ্যবিধাতাই জানেন। আমরা জানি না। নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি না। তবে ভাঙ্গা-গড়া লইয়াই যদি ইতিহাস হয় এবং ভবিষ্যৎ ভারতের যদি ইতিহাস থাকে—তবে কোন কিছু ভাঙ্গিবেই, এবং কিছু না কিছু গড়িয়া উঠিবেই, ইহা নিশ্চিত। ইহা সৃষ্টির নিয়ম। ভারতবর্ষ সৃষ্টির বাহিরে নয়। অনিয়মে ভারতবর্ষ চলিবে না। আলোক ও অন্ধকারে মেশামিশি,—প্রাচীন ভারতের যে অতীত অস্পষ্ট যুগ—তাহার মধ্য হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে যে সুস্পষ্ট বাণী—যুগের পর যুগে যে বাণী রূপ গ্রহণ করিয়াছে, রূপ হইতে রূপান্তরে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে—সেই রূপ

সেই বিগ্রহ ;—সেই সুর—সেই আত্মার মুক্তির—বন্ধনের নহে। ভারতবর্ষ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই এই জড় জগতের পরিবর্তনশীল মায়াপ্রপঞ্চ—প্রকৃতির দাসত্ব হইতে জীবের বা জীবাত্মার মুক্তি খুঁজিয়া আসিয়াছে। জন্ম ও মৃত্যু আলো ও আঁধারের মত যেখানে আসিতেছে—যাইতেছে ; যাহা নশ্বর, যাহা দুদিনের, তাহাকে চিরদিনের বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে ভারতবর্ষ কোনদিন পরামর্শ দেয় নাই। যাহা দেখায় সত্য—অথচ মিথ্যা, তাহাকে ভারতবর্ষ মিথ্যা বলিয়াই জানিয়াছে। প্রকৃতির দাসত্ব হইতে

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী

আত্মার মুক্তির পথ যে দুর্গম—ক্ষুরধার-শানিত—তাহা জানিয়াও মুক্তিকামী ভারত সেই কণ্টকময় সঙ্কট-পথে বীরদন্তে চলিয়া গিয়াছে। ভয় পায় নাই—থামে নাই—পশ্চাতে তাকায় নাই। আজ আবার বর্ত্তমান ভারত মর্ম্মে মর্ম্মে নিপীড়িত হইয়া তাহার সমষ্টিভূত জাতীয় চৈতন্যকে জাগ্রত করিয়া পুনরায় আত্মপ্রশ্ন করিতেছে 'মুক্তি কোন্ পথে ?' ইহা প্রাচীন ভারতের ব্যষ্টি-মুক্তি নয়। ইহা বর্ত্তমান ভারতের সমষ্টি-মুক্তি। হে ভারতের অতুলনীয় জাতীয় সম্পদ—হে বাঙ্গালী আমি আপনাদের সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ আপনাদের সম্মুখে ভারতের সেই সনাতন প্রশ্নই উত্থাপন করিতেছি—এ সঙ্কটে, এ দুর্দ্দিনে 'মুক্তি কোন্ পথে ?' আমি অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্ট করিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলাম। কেন না অতি সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত-রূপে আমাদের জানিতে হইবে যে কি আমরা চাই—এবং তাহা পাইবার জন্য কি আমাদের করিতে হইবে।"

অন্যান্য অনেক কথার পর দেশবন্ধু স্বরাজ সম্বন্ধে সোজা কথায় বলিয়াছেন—"আমরা যে জাতীয় মুক্তি লাভ করিব, তাহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া, না তাহার বাহিরে গিয়া ? কংগ্রেস ইহার উত্তর স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার যে সমস্ত অধিকার তাহা যদি বৃটিশ সাম্রাজ্য স্বীকার করে, তবে আমাদের এই সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই। আর যদি স্বীকার না করে—তবে বাধ্য হইয়া সাম্রাজ্যের বাহিরে আমাদের যাইতে হইবে। কেন না জাতীয় মুক্তি আমাদের লাভ করিতে হইবে—ইহা নিশ্চিত। আমরা সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিব—কি সাম্রাজ্যের গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া পড়িব—ইহার উত্তর আমাদের অপেক্ষা আমাদের বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের যাঁরা নিয়ামক তাঁহারাই বেশী করিয়া বলিতে পারেন। একটা জাতি হিসাবে আমাদের জীবন-ধারণ করিতেই হইবে। শুধু জাতীয়-জীবন ধারণ নয়—জীবনকে প্রসারিত করিতে হইবে, পরিপূর্ণ করিতে হইবে, জাতীয় জীবনের এই বিকাশে ব্রিটীশ সাম্রাজ্য যদি আমাদিগকে যথোপযুক্ত সুযোগ দেয়—তবে সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই আমরা মুক্তিলাভ করিব। আর যদি সুযোগ না দেয়—সাম্রাজ্যের রথচক্র যদি আমাদের নবজাগ্রত জাতীয় জীবনকে পিষিয়া ফেলে তাহা হইলে সাম্রাজ্যের বাহিরে গিয়াই আমাদের স্বরাজলাভ করিতে হইবে। অন্যথা উপায় কি ? কিন্তু ইহা সত্য যে, আমরা যদি এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকি, তবে অনেক দিকে অনেক রকমের সুবিধা ও সুযোগ আমরা লাভ করিতে পারি। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সহিত এখন আর প্রভু ও ক্রীতদাসের সম্বন্ধ নাই। খণ্ড দেশ বা রাজ্যগুলি এখন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় সাম্রাজ্যের সহিত একসঙ্গে গ্রথিত থাকিবার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ। বাহুসম্পদ লাভের

সুযোগ ও সুবিধার জন্য, স্বেচ্ছায় খণ্ডরাজ্যগুলি, সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চায়। সুতরাং এই স্বাধীন ও চুক্তি-মূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইচ্ছামত খণ্ডরাজ্যগুলি অসুবিধা বুঝিলে, সাম্রাজ্যের গণ্ডীর বাহিরে যখন খুসি চলিয়া যাইতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে, খণ্ডরাজ্যগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার একটা ভাব খুবই পরিস্ফুট হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ যখন শেষ হইয়া গেল তখন কি সাম্রাজ্যবাদী, কি খণ্ড ও স্বতন্ত্র রাজ্যবাদীগণ বুঝিতে পারিলেন যে উভয়ের পক্ষেই স্বাধীনতা-মূলক চুক্তিসর্ত্তে পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভাবে একসঙ্গে থাকাই শ্রেয়স্কর। এখন ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে পৃথিবীর জাতিসকলের বর্ত্তমান অবস্থায়, কোন এক দেশ বা জাতিই অন্যের নিরপেক্ষ হইয়া, পৃথক ভাবে থাকিতে পারে না—বাঁচিতে পারে না! এবং এই আদর্শের অনুপাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত খণ্ডরাজ্যগুলি নিশ্চয়ই তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য স্বাধীনভাবে রক্ষা করিয়া—ও তাহার উন্নতি-কল্পে কোনরূপ বাধা না পাইয়া, যদি অগ্রসর হইতে পারে, তবে সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াও স্বরাজ অর্থে আমি যাহা বুঝি, তাহা অবশ্যই লাভ করিতে পারে। আমি নিজে এই সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিবার জন্য আর একটি বিশেষ কারণে উৎসাহ পাই। এই কারণটি রাজনৈতিক নহে—আধ্যাত্মিক। আমি জগতের পরিণামে একটা শান্তিতে বিশ্বাস করি। সমগ্র মানবজাতির একটা মহামিলনের যে স্বপ্ন—তাহাকে আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। ব্রিটীশ সাম্রাজ্য যদি তাহার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খণ্ড-রাজ্যগুলির বিশেষ বিশেষ স্বার্থ, স্বাতন্ত্র্য ও সভ্যতাকে রক্ষা করিয়া এক অখণ্ড ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে—তবে এই ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের ঐক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথিবীতে সমগ্র মানবজাতির বিভিন্ন বিচিত্র শাখার মধ্যে এক অখণ্ড সুমহান্ ঐক্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। মানবজাতির ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা বড় কিছু কল্পনায় বা ধারণায় আসে না। যদি প্রত্যেক জাতির উদার-হৃদয় ও অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই কার্য্যে ব্রতী হন—তবে স্বতন্ত্র রাজ্যগুলিকে, সাম্রাজ্যের ঐক্যের জন্য আপাততঃ কোন কোন দিকে কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদীগণ অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলিকে দাসের প্রতি প্রভুর দৃষ্টি লইয়া যে দেখা তাহা চিরকালের মত পরিত্যাগ করিবেন। আমি মনে করি—ভারতের মঙ্গলের জন্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, মানবজাতির মঙ্গলের জন্য, ভারতবর্ষ—ব্রিটীশসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াই স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিবে। এই চেষ্টা সফল হইলে, প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতি মানবজাতিকে যে ভাবে সাহায্য করিতে পারে—ভারতবাসীও তাহা করিবেই এবং সম্ভবতঃ তাহার অতি-রিক্তও কিছু করিবে। কেন না মানবজাতি ভবিষ্যৎ মহা-মিলনের একটা আদর্শ—ভারতবাসীর নিকট হইতে পাইবে।"

তাহার পর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন হিংসা ও অহিংসা সম্বন্ধে যে সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, তাহার দিকে সকলের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন—"এখন উপায় যদি আদর্শের একটা অংশ হয়—তবে হিংসা কোন যুগেই আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ ছিল না—বা এখনও নাই—সুতরাং হিংসামূলক কোন উপায় আমরা অবলম্বন করিতে পারি না। কেন না, তাহা আমাদের জাতীয় সভ্যতার আদর্শে নাই। আমি বলি না যে, ভারতের ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ নাই, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে হিংসামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই। আমাদের ইতিহাস কোন বালকে পাঠ করিলেও আপনা-দিগকে বলিয়া দিবে যে ইহা মিথ্যা। কিন্তু অনেক জিনিস জোর করিয়া আমাদের মধ্যে প্রবেশ করান হইয়াছে। ইতিহাস পাঠকদের মধ্যে বিশেষজ্ঞগণ অবশ্যই আমাদের জাতীয় সভ্যতার যে যথার্থ স্বরূপ—তাহা হইতে তাহার উপর আরোপিত যে মিথ্যা আবরণ—তাহা অবশ্যই পৃথক করিয়া দেখিতে পারিবেন। হিংসা আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তেমন ভাবে নাই যেমন ইয়োরোপে আছে। এই হিংসামূলক অবাধ্যতা দূর করিবার জন্য ইয়োরোপে যে আইনের সাহায্য লওয়া হয়—সে আইনের ভিত্তিও পাশবিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা ভারতবাসীরা স্বভাবতঃই প্রাচীন প্রথা ও আচার-ব্যবহার পালন করিয়া আসিতেছি। প্রাচীনতার প্রতি আমাদের স্বভাবের মধ্যে একটা ঝোঁক আছে। কতকটা এই গতানুগতিক ভাবের জন্যই হিংসার ভাব আমাদের

প্রকৃতির মধ্যে কম। আমাদের গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলি অহিংসভাবে কাজ করিবার এক আশ্চর্য্য নিদর্শন। আমাদের সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠানগুলিই—ফুল যে রকম আপনিই ফুটে—সেই রকম আপনা হইতেই বিকশিত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা পাণ্ডিত্য লইয়া তর্ক করিয়াছেন—ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন;—মুমুক্ষু আত্মা সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য করুণ আর্ত্তনাদ করিয়াছে। কলহ ও বাদবিসম্বাদ—সালিশগণের সুপরামর্শে নিষ্পত্তি হইয়াছে। এইরূপ জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া যে কোন উপায় এখন অবলম্বন করা যাইবে, তাহা যে শুধু নীতির বিরোধী হইবে তাহা নয়,—তাহা ব্যর্থ হইবে। কোন ফল প্রসব করিবে না। আমি বলিতে দ্বিধা বোধ করি না—যে হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা আমরা কখনই জাতীয় মুক্তি লাভ করিতে পারিব না। তার পর ভারতীয় প্রকৃতির অহিংসামূলক বৈশিষ্ট্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও—ইহা কিরূপে সম্ভব যে নিরস্ত্র একটা পরাধীন জাতি হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত গভর্ণমেণ্টের আজিকার দিনের প্রচণ্ডহিংসামূলক—প্রচুর আয়োজন ও বাধার বিরুদ্ধে জয়ী হইবে? ফরাসী বা অন্যান্য দেশের বিদ্রোহের কথা তুলিয়া কাজ নাই। সেই সমস্ত বিদ্রোহের যুগে মানুষেরা তীর ধনুক ও বর্শা হাতে যুদ্ধ করিত। কখন বা জয়লাভও করিত। ইহা কি কল্পনায় সম্ভব যে ঐ উপায়ে আমরা এই বিজ্ঞানের যুগে সামরিক ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত একটা রাজশাসনকে বিধ্বস্ত করিতে পারি? আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ইংলণ্ডেও এই শ্রেণীর বিদ্রোহ আর আজিকার দিনে সম্ভবপর নয়।"

ডাক্তার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী

তৎপরে ভারত-শাসন-সংস্কার ব্যবস্থা (Reform Act) সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন—"তার পর প্রশ্ন, সেই চিরন্তন প্রশ্ন—তবে 'মুক্তি কোন্ পথে'? কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা স্বরাজ লাভ করিব? খুব বিজ্ঞতার সহিত অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, Reform Act অনুযায়ী গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্র কার্য্য করিলেই স্বরাজ একেবারে আমাদের হাতের মুঠার মধ্যে! ইহার উত্তরে আমার যাহা বলিবার—তাহা খুব পরিষ্কার করিয়া আবার আমি আপনাদিগকে বলিতেছি; এবং আমি ইচ্ছা করি না যে, কেহ এই প্রসঙ্গে আমার অভিপ্রায়কে অস্পষ্টতা দোষে দোষী করেন। আমি যদি বুঝিতাম এই Reform Actএ সত্যিকার কোন ক্ষমতা ও দায়িত্ব যথার্থই আমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহার বলে—আমরা জাতীয় অভাব সকল পূর্ণ করিয়া, জাতীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি—তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্র কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া Council Chamberএর ভিতরে থাকিয়াই জাতির গঠন-মূলক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম ও আমার দেশবাসীদিগকে সেইরূপ করিতে পরামর্শ দিতাম। কিন্তু মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া আমি আসল বস্তুটি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নই। Reform Act যে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদিগকে কোন ক্ষমতা দেয় নাই, তাহা আবার আজ আপনাদিগের নিকট বুঝাইতে গিয়া অযথা সময়ের অপব্যবহার করিব না। আপনারা ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশ ইহা আপনাদিগকে দেখাইয়াছে। দেখাইতে পারিয়াছে। আপনারা যদি এ সম্বন্ধে যুক্তি চান

কংগ্রেসের বক্তৃতা আবার আপনাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে বলিব মাত্র। যদি আরও নিঃসংশয় হইতে চান, তাহা হইলে Muddiman Committeeর সমক্ষে যে সমস্ত সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে—তাহা আর একবার পাঠ করিবেন। এবং এমন সমস্ত লোক ঐ সকল সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, স্বয়ং গভর্ণমেণ্টও তাঁহাদের ধীরতা ও রক্ষণশীলতা সম্বন্ধে কোন-রূপ সংশয় করিতে পারেন না। বর্ত্তমান Reform Actএর আসল কথা হইতেছে এই যে, গভর্ণমেণ্ট মন্ত্রীদিগকে বিশ্বাস করে না। অবিশ্বাস করে। এবং যেখানে এইরূপ অবিশ্বাস মনের মধ্যে থাকে, সেখানে সেই অবিশ্বাসের আব-হাওয়ার মধ্যে সহযোগিতা বা একত্র কাজ করিবার কথা মুখেও আনা যায় না। তথাপি গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্র কাজ করা সম্বন্ধে আমার মত আমি সুস্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি। আমি আশা করি, বাঙ্গালার প্রাদেশিক সম্মিলন আমার সহিত একমত হইয়া এ বিষয়ে সুস্পষ্ট মতই প্রকাশ করিবে। আমার কথা এই যে, গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্র কাজ করিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই—কেবল যদি গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিয়া সত্যিকার ক্ষমতা ও দায়িত্ব আমাদের উপর ছাড়িয়া দেন এবং কাজ করিতে কোন বাধা না দেন। তবে এই একত্র কাজ করাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন। প্রথমতঃ, আমাদের শাসনকর্ত্তাদের আমাদের প্রতি মনের ভাব যথার্থ রূপে পরিবর্ত্তিত হওয়া চাই,—দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ স্বরাজ নিকটবর্ত্তী ভবিষ্যতে আপনা হইতেই বিনা বাধায় যাহাতে আমরা পাইতে পারি, এখনই তাহার সূত্রপাত করা দরকার। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আমাদিগকে এমন ভাবে কথা দিবেন যে, তাহার যেন আর নড়চড় না হইতে পারে।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণের উপসংহার উদ্ধৃত করিয়াই আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন—"জাতীয়তা একটা উপায়—যাহা অবলম্বন করিয়া মানবাত্মা গতি-মুখে ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে। জাতীয়তার বিকাশ এই জন্য প্রয়োজন যে—ইহার মধ্য দিয়া সমগ্র মানবজাতি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে আরোহণ করিতে পারে। জাতীয়তাই শেষ কথা নয়। এবং আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি যে, যখন তোমরা মিলনের সর্ত্তগুলিকে বিবেচনা করিবার জন্য আহুত হইবে—তখন জাতীয়তার গৌরবে অন্ধ হইয়া সমগ্র মানবজাতির যে ঐক্যমূলক গভীর স্বার্থ তাহা ভুলিও না। আমি নিজে কি চাই তাহার সম্বন্ধে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা আছে। আমি চাই—ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ তাহার আপন সভ্যতার, আপন ধর্ম্মের—আপন আচার-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য নবযুগের উপযোগী ভাবে রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত এক জাতীয়তার মধ্যে মিলিত হইবে। প্রত্যেক প্রদেশেই সমগ্র ভারতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত, ভারতের একতাকে রক্ষা করিবে।—ভারতের এই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও মিলন, সাম্রাজ্যের এক মহামিলনের অঙ্গীভূত। সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের ভিতরে একটা বিরাট অঙ্গের মত অবস্থান করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, সাম্রাজ্যের বল, সমৃদ্ধি ও গৌরব বৃদ্ধি করিবে। প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতির স্বাধীনতার সার্থকতা সমগ্র মানবজাতিকে উন্নতির পথে সাহায্য করিবার উপর নির্ভর করিতেছে।—জাতিতে জাতিতে মিলন—পৃথিবী-পৃষ্ঠে ব্যাকুল মানবাত্মার শান্তি আনয়ন করিবে।

বন্দেমাতরং।"

সাহিত্য-সংবাদ

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর প্রণীত "জলধর গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড" প্রকাশিত হইল ; মূল্য—২৲।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত উপন্যাস "মিলন-রাত্রি" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল ; মূল্য—২৲।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "বেদান্ত পরিচয়" প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য—১৷৹।

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত প্রণীত নূতন উপন্যাস "রঙের গোলাম" প্রকাশিত হইল ; মূল্য—১৲।

শ্রীযুক্ত গদাধর সিংহরায় কৃত "ভোগের পথে" প্রকাশিত হইল—১৷৹

শ্রীযুক্ত গৌরগোপাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "সন্ধ্যাতারা" প্রকাশিত হইল ; মূল্য—৷৹।

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "বিজলী" প্রকাশিত হইল ; মূল্য—১৷৹।

স্বামী বাসুদেবানন্দের "প্রাচীন ভারতের অনুশীলন" প্রকাশিত হইল ; মূল্য—১৷৷৹।

শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ঘোষের নূতন উপন্যাস "জন্মভূমি" প্রকাশিত হইয়াছে ;—মূল্য—১৷৷৹।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea.
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201. Cornwallis Street, Calcutta

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1 Cornwallis Street. Calcutta.

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিকপত্র

দ্বাদশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ ১৩৩১—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্—

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা